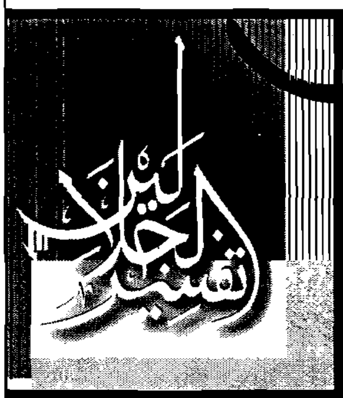
আল্লামা জালালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল মহল্লী (র.)
[৭৯১—৮৬৪ হি. ১৩৮৯—১৪৫৯ খ্রি.]
আল্লামা জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনে আবী বকর আস সুয়ূতী (র.)
[৮৪৯—৯১১ হি. ১৪৪৫—১৫০৫ খ্রি.]



তাফসীরে জালালাইন

১

প্রথম পারা • দ্বিতীয় পারা • তৃতীয় পারা • চতুর্থ পারা • পঞ্চম পারা

• লেখকবৃন্দ •

মাওলানা আব্দুল গাফফার শাহপুরী
উস্তাদ, জামিয়া আরাবিয়া দারুল উলূম, দেওভোগ, নারায়ণগঞ্জ

মাওলানা আমীরুল ইসলাম ফরদাবাদী
সাবেক ভাইস প্রিন্সিপাল, জামিয়া হুসাইনিয়া আশরাফুল উলূম
[বড় কাটারা মাদরাসা] বড় কাটারা, ঢাকা

মাওলানা হাবীবুর রহমান হবিগঞ্জী
উস্তাযুল হাদীস, দারুল উলূম পাটলি মাদরাসা, সুনামগঞ্জ

ইসলামিয়া সম্পাদনা পর্ষদ কর্তৃক সম্পাদিত

• প্রকাশনায় •

ইসলামিয়া কুতুবখানা

৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

তাফসীরে জালালাইন : আরবি-বাংলা

লেখকবৃন্দ ❖ মাওলানা আমীরুল ইসলাম ফরদাবাদী
মাওলানা আব্দুল গাফফার শাহপুরী
মাওলানা হাবীবুর রহমান হবিগঞ্জী

সম্পাদনায় ❖ ইসলামিয়া সম্পাদনা পর্ষদ

প্রকাশক ❖ মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তফা

সৌন্দর্য বর্ধনে ❖ মাহমুদ হাসান কাসেমী

শব্দবিন্যাস ❖ আল মাহমূদ কম্পিউটার হোম, ৩০/৩২ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মুদ্রণে ❖ ইসলামিয়া অফসেট প্রেস, প্যারীদাস রোড, ঢাকা ১১০০

হাদিয়া ❖ ৬৫০.০০ [ছয়শত পঞ্চাশ টাকা মাত্র]

উপক্রমণিকা

الحمد لاهله والصلاة لاهلها اما بعد

পবিত্র কুরআনের তাফসীর জানার ক্ষেত্রে আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী ও জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) প্রণীত তাফসীরে জালালাইন গ্রন্থটি একটি প্রাথমিক ও পূর্ণাঙ্গ বাহন। রচনাকাল থেকেই সকল ধারার মাদরাসা ও কুরআন গবেষণাকেন্দ্রে এ মূল্যবান তাফসীরটি সমভাবে সমাদৃত। কারণ বাহ্যিক বিচারে এটি অতি সংক্ষিপ্ত তাফসীর হলেও গভীর দৃষ্টিতে এটি সকল তাফসীরের সারনির্যাস। হাজার হাজার পৃষ্ঠা ব্যাপী রচিত কোনো তাফসীর গ্রন্থের অনেক পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করে অতি কষ্টে যে তথ্যের খোঁজ পাওয়া যায়, তাফসীরে জালালাইনের আয়াতের ফাঁকে ফাঁকে স্থান পাওয়া এক-দুই শব্দেই তা মিলে যায় যেন মহাসমুদ্রকে ক্ষুদ্র পেয়ালায় ভরে দেওয়া হয়েছে। একাধিক সম্ভাবনাময় ব্যাখ্যার মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও প্রাধান্যপ্রাপ্ত ব্যাখ্যাটি কোনো প্রকার অনুসন্ধান ছাড়াই অনায়াসে পাওয়া যায়। তাফসীর গ্রন্থসমূহের ব্যাপক অধ্যয়ন করলে এ সত্যটি সহজে অনুধাবন করা যাবে।

ছাত্রজীবন থেকেই তাফসীরে জালালাইনের প্রতি আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল। জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগের খ্যাতিমান উস্তাদ, মুহাক্কিক আলেম মাওলানা আহমদ মায়মূন সাহেবের উৎসাহ-উদ্দীপনায় জালালাইনের সর্ববৃহৎ আরবি শরাহ আল্লামা সুলাইমান জামাল প্রণীত الفتوحات الالهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية। ওরফে 'হাশিয়াতুল জামাল' মুতালার সুযোগ হয়েছিল। একটু আধটু যাই বুঝেছিলাম তাতে এ অনুভূতি হয়েছিল যে, উর্দু কামালাইন আর আরবি হাশিয়াতুল জামাল কিছুতেই একটি অপরটির বিকল্প হতে পারে না। দুটি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু। কিতাব 'হল' করতে হলে হাশিয়াতুল জামালের কোনো তুলনা হয় না। ফারাগাতের কয়েক বছর পর আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানিতে বাংলাদেশের প্রাচীনতম দীনি শিক্ষাকেন্দ্র নারায়ণগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী মাদরাসা দেওভোগে দরসী খেদমতের সুযোগ হয়। প্রথম বছরই আমার দায়িত্বে আসে সেই প্রিয় কিতাব তাফসীরে জালালাইনের প্রথম খণ্ড। আরবি-উর্দু শরাহ ও নানা তাফসীর গ্রন্থের সাহায্যে এক বছর যথাসম্ভব শ্রম দিয়ে পড়ালাম। পরের বছর চিন্তায় এলো সহায়ক গ্রন্থাবলি থেকে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তগুলো যদি সুবিন্যস্তভাবে সংকলন করে রাখা যায় তাহলে ভবিষ্যতে মুতালা করতে সহজ হবে। এ চিন্তা থেকেই প্রথমে উলূমুল কুরআন তথা কুরআন ও তাফসীর সংক্রান্ত একটি ভূমিকা তৈরি করি, যা 'মুকাদ্দামায়ে জালালাইন' নামে ভিন্নভাবে ছাপা হয়েছে। তারপর মূল কিতাবের ব্যাখ্যা ও তাকরীর লিখতে শুরু করি। হাশিয়াতুল জামাল, হাশিয়াতুস সাবী, কামালাইন, তাফসীরে উসমানী, তাফসীরে মাজেদী, তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন [-মুফতী শফী (র.)] ও মা'আরিফুল কুরআন -[আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (র.)] ইত্যাদি তাফসীর গ্রন্থ ধারাবাহিক অধ্যয়নের মাধ্যমে অধ্যাপনার ফাঁকে ফাঁকে অল্প বিস্তর করে লেখা চলতে থাকল। কিছুদিন পর বাজারে এলো আরেকটি উর্দু শরাহ জামালাইন। তাও সংগ্রহ করলাম। যেহেতু কোনো একটি উর্দু শরাহ অনুবাদ করে প্রকাশ করার ইচ্ছা আমার ছিল না, তাই সবগুলো শরাহ গভীরভাবে অধ্যয়ন করে যে কথা ও বিশ্লেষণগুলো যথার্থ পরিচ্ছন্ন ও ছাত্রদের জন্য উপযোগী এবং জরুরি মনে হয়েছে, সেগুলোই কেবল সযত্নে সহজে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। এভাবে দীর্ঘ তিন বছরে তিলে তিলে সম্পন্ন হয় প্রথম তিন পারার ব্যাখ্যা।

এ বিষয়ে বাংলাবাজারস্থ স্বনামধন্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ইসলামিয়া কুতুবখানার স্বত্বাধিকারী মাওলানা মোস্তফা সাহেবের সাথে দীর্ঘ আলোচনার পর জানতে পারলাম যে, তিনি একাধিক লেখকের যৌথ প্রয়াসে তাফসীরুল জালালাইনের বাংলা ব্যাখ্যাগ্রন্থ ছাপার উদ্যোগ নিয়ে কাজ শুরু করেছেন।

ইতোমধ্যে তাঁর উদ্যোগে ঢাকাস্থ বড় কাটারা মাদরাসার সাবেক ভাইস প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা আমীরুল ইসলাম ফরদাবাদী [দা. বা.] প্রথম পারার এবং দারুল উলূম পাটলি মাদরাসা, সুনামগঞ্জ -এর মুহাদ্দিস, মাওলানা হাবীবুর রহমান হবিগঞ্জী [দা. বা.] চতুর্থ পারা ও পঞ্চম পারার অর্ধাংশের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছেন। এদিকে আমি প্রথম তিন পারার পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছিলাম। আর কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা হচ্ছে প্রথম পাঁচ পারা একত্রে এক ভলিয়মে প্রকাশ করা। সেক্ষেত্রে আমাদের তিনজনের পাণ্ডুলিপি একত্রে মিলালে সাড়ে চার পারা হয়ে যায়। অবশিষ্ট রইল পঞ্চম পারার বাকি অর্ধাংশের কাজ। অবশেষে ইসলামিয়া কুতুবখানার স্বত্বাধিকারীর অনুরোধে পঞ্চম পারার অসমাপ্ত কাজটুকু আমাকেই সম্পন্ন করতে হয়েছে।

এরপর আমাদের তিনজনের লেখা পাণ্ডুলিপিকে ইসলামিয়া সম্পাদনা পর্ষদের সুদক্ষ সম্পাদক মণ্ডলীর কাছে অর্পণ করা হয়। তাঁরা এতে প্রয়োজনীয় সংযোজন-বিয়োজন ও সংশোধন করে কিতাবটিকে যথাসাধ্য সুন্দর ও সমৃদ্ধ করার শেষ চেষ্টাটুকু করেছেন। এ বিষয়ে তাঁদের বিচক্ষণতাপূর্ণ দূরদৃষ্টি, বিজ্ঞতাসুলভ পদক্ষেপ ও সুন্দর পরামর্শের জন্য আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাঁদেরকে জাযায়ে খায়ের দান করুন!

আশা করি কিতাবটি ছাত্র-শিক্ষক উভয়েরই যথেষ্ট উপকারে আসবে। কিতাবটিকে নিখুঁত ও নির্ভুল করার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে। তথাপি তথ্যগত কোনো ভুল কারো দৃষ্টিগোচর হলে তা আমাদেরকে অবগতির বিনীত অনুরোধ রইল। পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরে দেব ইনশাআল্লাহ!

কিতাবটি প্রকাশনার এ আনন্দঘন মুহূর্তে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছি সেসব উস্তাদগণের কথা, যাঁদের কাছে আমি 'তাফসীরে জালালাইন' পড়েছি। আল্লাহ আসাতোযায়ে কেরামকে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ দান করুন!

আল্লাহ এ কিতাবটিকে কবুল করুন! কিতাবটিকে এর লেখকমণ্ডলী, সম্পাদকমণ্ডলী ও প্রকাশকসহ এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের নাজাতের অসিলা হিসেবে কবুল করে নিন! আমীন!

বিনীত

লেখকদের পক্ষে

আব্দুল গাফফার শাহপুরী

সূচিপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ওহী ও আসমানি কিতাব

জ্ঞান লাভের তিনটি মাধ্যম : জীবনযাত্রার অপরিহার্য জ্ঞান আহরণের জন্য মানুষ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তিনটি সূত্র ও উপায় প্রাপ্ত হয়েছে। তন্মধ্যে বাহ্যিক ও প্রাথমিক সূত্র হচ্ছে اَلْحَوَاسُّ الْخَمْسَةُ বা পঞ্চ ইন্দ্রিয় । দ্বিতীয় সূত্র اَلْعَقْلُ বা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি, চিন্তা গবেষণা ও বিচার বিবেচনা। তৃতীয় সূত্র اَلْوَحْىُ ওহী।

ইন্দ্রিয় শক্তি হলো ৫টি। যথা- চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা ত্বক ও নাসিকা। এগুলো দ্বারা মানুষ নিকটস্থ ধরা-ছোঁয়া ব্যাপারগুলো অনুভব করে। ইন্দ্রিয়ের আওতা বহির্ভূত জিনিস সম্পর্কে জানতে হলে তাকে বিবেক ব্যবহার করতে হয়। এ বিবেকও নির্ধারিত একটি সীমানা পর্যন্ত কাজ দেয়। সেই সীমানার উর্ধ্বে অবস্থিত কোনো তথ্য জানার কাজে বিবেক ব্যর্থ। ইন্দ্রিয় ও বিবেক যেখানে সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে ব্যর্থ, সেখানে মানুষকে নিশ্চিত ধারণা প্রদান করে ওহী।

মোটকথা, জ্ঞান আহরণের উপরিউক্ত তিনটি মাধ্যম যেমন পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত, তেমনি নিজ নিজ পরিমণ্ডলে সীমিত।

যেমন- কারো সম্মুখে যদি একজন লোক উপবিষ্ট থাকে, তবে তাকে দেখে সে দৃষ্টিশক্তির মাধ্যমে লোকটির আকৃতি, গঠন, রং, রূপ ইত্যাদি বলে দিতে পারে। ইন্দ্রিয় শক্তির ব্যবহারই এখানে যথেষ্ট। কিন্তু নিশ্চয় লোকটির একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছে, সৃষ্টিকারী ব্যতিরেকে কোনো সৃষ্টির অস্তিত্ব হতে পারে না; এ জাতীয় তথ্য সে ইন্দ্রিয় শক্তির দ্বারা জানতে সক্ষম নয়; বরং তা বিবেকের দ্বারা উপলব্ধি করে। আবার তার সেই সৃষ্টিকর্তা তাকে কেন, কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন? তিনি তার নিকট থেকে কোন কাজ পছন্দ করেন আর কোনটি পছন্দ করেন না; এ সকল প্রশ্নের সঠিক জবাব বিবেক দ্বারাও অর্জন করা যায় না। অথচ মানুষ নিজের জীবনকে সফল ও সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য এসব প্রশ্নের সদুত্তর জানা এবং সে মুতাবেক জিন্দেগী পরিচালনা করা আবশ্যক। কোনো সন্দেহ নেই, ওহী হলো জ্ঞানার্জনের সেই উচ্চতম মাধ্যম, যা মানুষের এ অনিবার্য প্রয়োজনকে পূরণ করে এবং বিবেকের সীমানা থেকে উর্ধ্বে অবস্থিত প্রশ্নাবলির সুষ্ঠু সমাধান দিয়ে থাকে।

একদিকে যেমন ইন্দ্রিয় এবং বিবেক নির্দিষ্ট পরিমণ্ডলে সীমিত, অপরদিকে জ্ঞানের এ সূত্রদ্বয় সর্বদা নির্ভুল ও অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত দিতে অক্ষম। অনেক সময় এরা মানুষকে নিতান্ত ভুল ও অবাস্তব তথ্য পরিবেশন করে কখনো প্রতারিতও করে। যেমন- রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মুখে স্বাদের বস্তু বিস্বাদ মনে হয়। এমনিভাবে দ্রুত গতিশীল গাড়ির আরোহীর দৃষ্টি প্রতারিত হয়। ফলে দুই পার্শ্বের স্থায়ী দণ্ডায়মান দৃশ্যাবলি দুরন্ত গতিতে ধাবমান বলে অনুভূত হয়। আর চলন্ত জাহাজ মনে হয় স্থির দণ্ডায়মান। এখানে মানুষের ইন্দ্রিয় তাকে প্রতারিত করছে। বিবেকের ব্যাপারটিও তদ্রূপ। তাইতো আধুনিক দার্শনিক চিন্তাধারা ও মতাদর্শ এক্ষেত্রে চরমভাবে দুর্দশাগ্রস্ত। এর কারণ হলো সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদানে মানবীয় বিবেকের ত্রুটিগ্রস্ততা। কাজেই জীবনের সর্বাঙ্গীন সফলতা ও কল্যাণে ইন্দ্রিয় ও বিবেকের উর্ধ্বে আরো এমন একটি জ্ঞানসূত্র আবশ্যক যা মানুষকে নিশ্চিত ধারণা প্রদান করবে। বলা বাহুল্য, বিবেকের চেয়েও উচ্চশক্তি সম্পন্ন এবং নিশ্চিত জ্ঞান প্রদানকারী সেই মাধ্যমটি হলো ওহী। ওহীর আলোকে মানুষ জীবনে সফলতার প্রয়োজনীয় বিষয়ে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করে থাকে।

ওহী শব্দের বিশ্লেষণ :

ওহীর আভিধানিক অর্থ : وَحْىٌ [ওহী] শব্দটি আভিধানিকভাবে বিভিন্ন অর্থের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইঙ্গিত করা, লিখন, পৌছানো, কারো মনে কোনো কথা জাগ্রত করে দেওয়া, নিঃশব্দে কথা বলা এবং অন্যকে কোনো কথা বলা ও নির্দেশ করা ইত্যাদি সবই ওহী শব্দের আভিধানিক অর্থের অন্তর্ভুক্ত। -[আল মু'জামুল ওয়াসীত : ১০১৮]

আল্লামা কিসায়ী (র.) আরবদের একটি প্রবাদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন-

يُقَالُ وَحَيْتُ اِلَيْهِ بِالْكَلَامِ اِذَا تَكَلَّمْتَ بِكَلَامٍ تُخْفِيْهِ مِنْ غَيْرِهِ .

অর্থাৎ وَحَيْتُ اِلَيْهِ بِالْكَلَامِ বাক্যটি তখন বলা হবে, যখন তুমি কারো সাথে এমনভাবে কথা বল যে, এটি তুমি অন্যদের থেকে গোপন করে পেশ করছ।

অভিধান বিশারদ আবূ ইসহাক বলেন -ওহী শব্দের সকল প্রয়োগের মধ্যে মৌলিকভাবে যে অর্থটি বিদ্যমান, তাহলো- إِعْلَامٌ فِىْ خَفَاءٍ অর্থাৎ অন্যদের শোনা থেকে গোপন রেখে কাউকে কোনো কিছু বলে দেওয়া।

আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র.) ওহী শব্দের সারনির্যাস ব্যাখ্যা করে বলেন- অভিধানে ওহী শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ হলো اَلْإِعْلَامُ الْخَفِىُّ অর্থাৎ গোপনভাবে জানানো।

এ অর্থের সাথে আরো একটি বিশেষণ যুক্ত করে ইবনুল কায়্যিম (র.) বলেন هُوَالْإِعْلَامُ الْخَفِىُّ السَّرِيْعُ অর্থাৎ ওহীর অর্থ হলো গোপনভাবে দ্রুত কোনো কিছু জানানো।

এতে বুঝা গেল আভিধানিকভাবে ওহী শব্দের অর্থের মধ্যে তিনটি গুণ থাকা আবশ্যক। ১. ইঙ্গিত ২. দ্রুতগতি ও ৩. গোপনীয়তা।

ইঙ্গিত অর্থ কোনো জিনিসকে সংক্ষেপে বুঝিয়ে দেওয়া। এটি কখনো বিচ্ছিন্ন এক বা একাধিক অক্ষরের প্রয়োগে হতে পারে। যেমন- বি. এ. এম. এ. ইত্যাদি বলে দীর্ঘ কথা বুঝানো হয়। তেমনি হাত, চোখ ঠোঁট ইত্যাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিশেষ ব্যবহার দ্বারাও হতে পারে। নবীগণ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ইঙ্গিত লাভ করেন এবং সে ইঙ্গিতের সঠিক অর্থ উপলব্ধি করে তা কথা ও কাজ বাস্তবায়ন করেন।

ওহী শব্দের আবশ্যকীয় দ্বিতীয় গুণ হলো দ্রুতগতি সম্পন্ন হওয়া। এ থেকে নবীগণের ওহীর তাৎপর্য অনুমান করা যায়। কারণ তাদের ওহীগুলো দ্রুতগতিতে অবতীর্ণ হতো।

হযরত শায়খ আকবর (র.) বলেন- নবী-রাসূলগণের উপর যখন ওহী অবতীর্ণ হতো, তখন তারা একই সময়ে ওহী মুখস্থকরণ, পূর্ণ উপলব্ধি-হৃদয়ঙ্গমকরণ এবং তা অন্যকে বুঝানোর উপযুক্ত ব্যাখ্যা ইত্যাদি সবকিছু একত্রে লাভ করতেন।

ওহীর অর্থের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য গোপনীয়তা। অর্থাৎ একটি ইঙ্গিত বিদ্যমান থাকবে, তবে তা অন্যদের দৃষ্টির আওতায় আসবে। নবীগণের ওহীতে এ বিশেষত্ব রয়েছে। কারণ ওহীর ব্যাপারটি কেবল নবী রাসূলগণই শুনতেন বা দেখতেন। অথচ পাশে বসা অন্য কেউ নবীর উপর ওহী অবতীর্ণ হচ্ছে বলে অনুভব করলেও বাস্তবে তিনি কিছুই শুনতেন না বা দেখতেন না। -[ফজলুলবারী, শরহে সহীহ বুখারী, খ. ১ম, পৃ. ১২৯]

আল কুরআনে ওহী শব্দের ব্যবহার : পবিত্র কুরআন وَحْىٌ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যথা-

১. [প্রাকৃতিক] নির্দেশ অর্থে যেমন يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا অর্থাৎ সে দিন পৃথিবী তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে। কারণ তোমার প্রভু তাকে আদেশ [ওহী] করবেন। -[সূরা যিলযাল : ৪-৫]

২. মনের অভ্যন্তরে কোনো কথা জাগ্রত করে দেওয়ার অর্থে। যেমন-

إِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّيْنَ أَنْ اٰمِنُوْا بِىْ وَبِرَسُوْلِىْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ.

অর্থাৎ আরো স্মরণ কর যখন আমি হাওয়ারীদেরকে এ প্রেরণা [ওহী] দিয়েছিলাম যে, তোমরা আমার প্রতি ও আমার রাসূলের প্রতি ঈমান আন। তারা বলেছিল- আমরা ঈমান আনলাম এবং তুমি সাক্ষী থাক যে আমরা আত্মসম্পর্ণকারী।
-[সূরা মায়েদা : ১১১]

৩. জানিয়ে দেওয়ার অর্থে যেমন-

إِذْ يُوْحِىْ رَبُّكَ إِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ أَنِّىْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَأُلْقِىْ فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ.

অর্থাৎ স্মরণ যখন কর তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে জানিয়ে [ওহী] দেন যে, আমি তোমাদের সাথে আছি। সুতরাং মুমিনগণকে অবিচলিত রাখ, যারা কুফরী করে আমি তাদের মনে ভীতির সঞ্চার করব। সুতরাং তাদের কাঁধে ও সর্বাঙ্গে আঘাত কর।

৪. কোনো জিনিসের প্রতি দ্রুত ইঙ্গিত করার অর্থে। যেমন-

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحٰٓى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا.

অর্থাৎ অতঃপর সে কক্ষ থেকে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের নিকট আস এবং দ্রুত ইঙ্গিত [ওহী] করল, তারা যেন সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করে। -[সূরা মারইয়াম : ১১]

৫. চুপিসারে কথা বলা ও প্ররোচনাদানের অর্থে। যেমন–

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ـ

অর্থাৎ এভাবে আমি মানুষ ও জিনদের মধ্যে শয়তানদেরকে প্রত্যেক নবীর শত্রু বানিয়েছি। প্রতারণার উদ্দেশ্যে তাদের একে অন্যকে চকমপ্রদ বাক্য দ্বারা প্ররোচিত [ওহী] করে। –[সূরা আনআম : ১১২]

ওহী শব্দের প্রয়োগ ও ব্যবহারের ব্যাপকতা : ওহী শব্দটি প্রয়োগ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এ ব্যাপকতা লক্ষণীয় ।

১. আভিধানিকভাবে ওহী শব্দটির প্রয়োগ শয়তানের জন্যও করা হয়েছে । যেমন–

وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰى اَوْلِيٰٓئِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ ـ

অর্থাৎ শয়তান তাদের বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে বিবাদ করতে প্ররোচনা [ওহী] দেয়। যদি তোমরা তাদের কথমত চল, তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হবে। –[সূরা আন আম : ১২১]

২. শরিয়তের দৃষ্টিতে গায়রে মুকাল্লাফ বা যার উপর শরিয়ত কার্যকর নয়, এমন প্রাণীর দিকেও ওহী শব্দের নিসবত করা হয়েছে। যেমন- وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِيْ অর্থাৎ তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে [যা একটি গায়রে মুকাল্লাফ প্রাণী] তার অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দেন যে, তুমি গৃহ নির্মাণ কর পাহাড়ের বৃক্ষে এবং মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে তাতে। –[সূরা নাহল : ৬৮]

৩. কখনো কখনো এমন ব্যক্তি যে শরিয়তের দৃষ্টিতে মুকাল্লাফ তবে নবী নয়, তার দিকেও ওহী শব্দের নিসবত করা হয়েছে। যেমন– اِذْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى اُمِّكَ مَا يُوْحٰى অর্থাৎ যখন আমি তোমার মায়ের অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দিয়েছিলাম যা নির্দেশ করার। –[সূরা ত্বাহা : ৩৮]

৪. কখনো শুধুমাত্র নবীদের জন্য ওহী শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন– وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ অর্থাৎ মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তাঁর সাথে কথা বলবেন, ওহীর মাধ্যম ব্যতিরেকে বা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে বা এমন দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে যে দূত তাঁরই অনুমতিক্রমে, তিনি যা চান তা ব্যক্ত করেন। –[সূরা শূরা : ৫১]

মোটকথা, অর্থ ও প্রয়োগ উভয় দিক থেকে ওহী শব্দের মধ্যে ব্যাপকতা আছে। কিন্তু অভিধান বিষয়ের পণ্ডিতগণ বলেন, এগুলোর মধ্যে মূল অর্থটি হলো অন্যের অলক্ষ্যে চুপিসারে কোনো কথা বলা।

–[উলুমুল কুরআন : আল্লামা ইসহাক ফরিদী সম্পাদিত পৃ. ৫৮, ৫৯]

ওহীর পরিভাষিক অর্থ : هُوَ كَلَامُ اللّٰهِ الْمُنَزَّلُ عَلٰى نَبِيٍّ مِنْ اَنْبِيَائِهٖ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সেই কালামকে ওহী বলে যা তার নবীগণের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে। –[উমদাতুলকারী লি শরহি সহীহ আল বুখারী, খ. ১ পৃ. ১৮]

আল্লামা তকী উসমানী [দা. বা.] ওহীর সংজ্ঞাকে আরো স্পষ্ট করে বলেন, ওহী মানুষের জন্য জ্ঞান আহরণের সেই সর্বোচ্চ মাধ্যম যা দ্বারা মানুষ এমন জিনিসের জ্ঞান লাভ করতে পারে যা তার ইন্দ্রিয় শক্তি ও বিবেকের দ্বারা অর্জন করা সম্ভব নয়। যে মাধ্যম, একমাত্র নবী-রাসূলগণই সরাসরি লাভ করেন। আর উম্মত নবী রাসূলগণের মাধ্যমে তা থেকে জ্ঞান অর্জন করে থাকে। –[উলুমুল কুরআন : মুফতি তকী উসমানী পৃ. ২৭]

এক কথায় আল্লাহ ও তার বান্দাদের মধ্যে জ্ঞান বিষয়ক একটি পবিত্র শিক্ষা মাধ্যমকে ওহী বলা হয়।

ওহীর গুরুত্ব : শরিয়তের দৃষ্টিতে যে কথাটি ওহী হিসেবে সাব্যস্ত রয়েছে তার উপর বিশ্বাস করা ফরজ তথা অবশ্য কর্তব্য। ওহীর বাণী অবিশ্বাস করা বা তাতে অহেতুক সন্দেহ পোষণ করা স্পষ্ট কুফুরি। এ কারণে পবিত্র কুরআনের শুরুতেই বলা হয়েছে– الٓمّٓ ـ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ অর্থাৎ আলিফ লাম মীম। এটি সেই কিতাব, যেখানে কোনো সন্দেহ নেই। এটি মুত্তাকীগণের জন্য পথ প্রদর্শক। –[সূরা বাকারা– ১-২] এখানে كِتَابٌ বলে ওহীকে নির্দেশ করা হয়েছে। ওহীর সত্যতাকে বিশ্বাস করার আদেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ـ

অর্থাৎ হে মানুষ তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে রাসূল সত্যসহ/ওহী আগমন করেছেন। সুতরাং তোমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন কর এবং ঈমান আন, এটা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। –[সূরা নিসা : ১৭০]

একই আয়াতে ওহীর অস্বীকার যে মূলত কুফরি হয় সেদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۔

অর্থাৎ আর তোমরা ওহীকে অস্বীকারপূর্বক কুফরীর পথ অবলম্বন করলে তাতে আল্লাহর কোনো ক্ষতি নেই; ক্ষতি তোমাদেরই তোমাদের মনে রাখতে হবে যে, আসমান জমিনে যা আছে সব আল্লাহরই। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। –[সূরা নিসা :১৭০]

মক্কাবাসীদের কাছে রাসূল ﷺ ওহীর পয়গাম পেশ করলে প্রাথমিক পর্যায়ে তারাও ওহীকে অস্বীকার করেছিল। তখন তাদের অস্বীকারের ভয়াবহ পরিণামের দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلٰى نُوْحٍ وَالنَّبِيّٖنَ مِنْ بَعْدِهٖ ۔

অর্থাৎ হে নবী! আমি তোমার নিকট ওহী প্রেরণ করেছি যেমন ওহী প্রেরণ করেছিলাম হযরত নূহ (আ.) ও তাঁর পরবর্তী নবীগণের নিকট। –[সূরা নিসা ১৬৩]

মুহাদ্দিসগণ বলেন, এ আয়াতে প্রিয় নবীর ﷺ ওহীকে হযরত নূহ (আ.)-এর ওহীর সঙ্গে তুলনা করে একথা বুঝানো হয়েছে, ওহী অস্বীকার মানবজাতির জন্য প্রচণ্ড গজবের কারণ হয়ে থাকে। পূর্ববর্তীকালে হযরত নূহ (আ.)-এর উম্মতগণ তাঁর ওহীকে অস্বীকার করেছিল বিধায় তাদের উপর মহাপ্লাবনের গজব আরোপিত হয়েছিল।

সুতরাং বুঝা গেল, নবীকে বিশ্বাস করা যেমন আবশ্যক তেমনি তার ওহীকেও বিশ্বাস করা আবশ্যক। এ কারণে ইসলামি শরিয়ত মতে কোনো মানুষ মুমিন হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য যেমন শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর নাজিলকৃত ওহীর সত্যতা বিশ্বাস করতে হয়. তেমনি তার পূর্ববর্তী নবীগণের উপর নাজিলকৃত ওহীকেও সত্যবাণী হিসেবে মেনে নেওয়া আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِىْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ۔

অর্থাৎ হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর উপর তার রাসূলের উপর, তিনি যে কিতাব তাঁর রাসূলের কাছে অবতীর্ণ করেছেন তার উপর এবং যে কিতাব তিনি ইতোপূর্বে [অন্যান্য নবীগণের কাছে] অবতীর্ণ করেছেন তার উপর ঈমান আন। কেউ যদি আল্লাহকে বা তাঁর ফেরেশতাগণকে বা তাঁর কিতাবসমূহকে তাঁর রাসূলগণকে বা পরকালকে অস্বীকার করে, তবে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। –[সূরা নিসা : ১৩৬]

ওহীর প্রয়োজনীয়তা : আল্লাহ তা'আলা মানুষকে কেন কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন? তিনি তার কোন কোন কাজ পছন্দ করেন, কোনটি পছন্দ করেন না? মানুষের নিজের জীবনকে সফল ও সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য এ সকল প্রশ্নের সদুত্তর জানা এবং সে মোতাবেক জিন্দেগী পরিচালনা করা আবশ্যক। কোনো সন্দেহ নেই, ওহী হলো জ্ঞানার্জনের সেই উচ্চতম মাধ্যম যা মানুষের এ অনিবার্য প্রয়োজনকে পূরণ করে এবং বুদ্ধির সীমানা থেকে ঊর্ধ্বে অবস্থিত প্রশ্নাবলির সমাধান দিয়ে থাকে, এ দৃষ্টিকোণ থেকে ওহীর প্রয়োজনয়ীতা অনস্বীকার্য।

ওহী প্রেরণে আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য : ওহী প্রেরণে আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য মানুষকে তার রূহ জগতে স্বীকারোক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। তাকে ওহীর মাধ্যেমে আল্লাহর অনুগত্যের কারণে সুসংবাদ ও অবাধ্যতা অবলম্বনের কারণে সাবধানবাণী শুনিয়ে অজুহাত উত্থাপনের পথ বন্ধ করে দেওয়া। যেন কিয়ামতের বিচার দিবসে কোনো মানুষ এমন অজুহাত পেশ করতে না পারে যে, হে আল্লাহ! পৃথিবীতে এ কথাটি কেউ আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়নি। পবিত্র কুরআনে নবীগণের প্রতি ওহী প্রেরণের হিকমত বর্ণনা করে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন-

رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ الرُّسُلِ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۔

অর্থাৎ আমি সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী রাসুলগণকে প্রেরণ করেছি যেন রাসূল আসার পর আল্লাহর কাছে মানুষের কোনো অভিযোগ করার কিছু না থাকে। আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। –[সূরা নিসা–১৬৫]

এ হিকমতকে সামনে রেখেই প্রত্যেক যুগে আল্লাহ তা'আলা নবী ও আসমানি কিতাব প্রেরণ করেছেন। –[ইজাহুল বুখারী খ. ১ পৃ. ৪৮]

ওহীর শ্রেণি বিভাগ : ওহী প্রথমত দু প্রকার–

১. وَحْىٌ تَكْوِيْنِىْ ওহীয়ে তাকবীনী।

২. وَحْىٌ تَشْرِيْعِىْ ওহীয়ে তাশরী'ঈ।

وَحْى تَكْوِيْنِى বলতে বুঝানো হয় প্রাকৃতিক সাধারণ বিষয় সম্পর্কিত ওহীকে। আর وَحْى تَشْرِيْعِى বলতে বুঝানো হয় ধর্মীয়ভাবে মানুষের জীবনপদ্ধতি সম্পর্কিত হুকুম আহকামকে।

হযরত আদম (আ.) থেকে হযরত নূহ (আ.)-এর পূর্বপর্যন্ত নবীগণের কাছে যে আসমানি ওহী নাজিল হয়েছিল তাতে وَحْى تَكْوِيْنِى-ই ছিল বেশির ভাগ। তৎকালের تَكْوِيْن তথা জগতকে গড়ে তোলা বিষয়ক ওহীর প্রয়োজনও ছিল বেশি। জগতে মানব বসতির সূচনাকারী হিসেবে যেহেতু হযরত আদম (আ.)-এসেছিলেন তাই তাকে দুনিয়ায় পদার্পণের পূর্বেই জগতের সকল বস্তুর নাম গুণাগুণ ইত্যাদির তালীম দেওয়া হয়। ইরশাদ হয়েছে- وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاۤءَ كُلَّهَا অর্থাৎ আর তিনি আদমকে যাবতীয় বস্তুজগতের পূর্ণ জ্ঞান শিক্ষা দিলেন। -[সূরা বাকারা-৩১]

অন্যদিকে হযরত নূহ (আ.)-এর পূর্বকালে মানুষ স্বাভাবিক নিয়মেই আল্লাহকে বিশ্বাস করে চলত। কুফর, শিরক, খাহেশাতের অনুকরণ ও দুনিয়ার মোহ মানুষের মধ্যে তখনও প্রবলভাবে বিস্তার লাভ করেনি। তাই তৎকালে تَشْرِيْعِى [তাশরীয়ী] ওহীর প্রয়োজন কম ছিল। -[ফজলুল বারী, খ. ১, পৃ. ১৩৫]

হযরত নূহ (আ.)-এর আমল থেকে কুফর শিরকের প্রাদুর্ভাব সূচিত হয়। শুরু হয় وَحْى تَشْرِيْعِى [ওহীয়ে তাশরীঈ] -এর ধারা। তাঁর আমল পর্যন্ত জগতে মানুষ বসবাস করার জন্য প্রয়োজনীয় যে সকল জাগতিক জ্ঞানের দরকার ছিল, তা ক্রমে ক্রমে মান প্রদান সম্পন্ন হয়ে হয়ে গিয়েছিল। সেগুলোর ভিত্তিমূলে মানুষ জ্ঞানচর্চা করেই পরবর্তী জাগতিক উন্নতি উত্তরোত্তর সম্পন্ন করতে পারে। এ উন্নতি বিধানের জন্য অতিরিক্ত ওহীর প্রয়োজন নেই। কেননা দুনিয়ার প্রতি মানুষের স্বভাবজাত মোহ ও আকর্ষণই তাদেরকে জাগতিক উন্নতি বিধানের প্রতি উৎসাহিত করা অব্যাহত রাখবে। তবে তখন থেকে কুফর শিরকের সূচনা ঘটার কারণে শরিয়ত বিষয়ক সর্ব প্রথম রাসূল রূপে যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি হলেন হযরত নূহ (আ.)। হযরত নূহ (আ.) থেকে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত ওহীর ধারা একই রকমের ছিল। অর্থাৎ এ অধ্যায়ে তাকবীনী ওহীর তুলনায় তাশরীয়ী ওহীর পরিমাণ অধিক ছিল।

تَكْوِيْن [তাকবীন] বিষয়ক ওহী যা মোটেও ছিল না, তা নয়। স্বয়ং হযরত নূহ (আ.)-এর কাছে তাকবীন বিষয়ক ওহী নাজিল করা হয়। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন- وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا অর্থাৎ হে নূহ! তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার প্রত্যাদেশ অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ কর। -[সূরা হূদ : ৩৭]

হযরত দাউদ (আ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে- وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْۢ بَأْسِكُمْ فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ অর্থাৎ আর আমি তাকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যেন তা দ্বারা তোমরা যুদ্ধে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পার। সুতরাং তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে না? -[সূরা আম্বিয়া : ৮০]

তাকবীনী ও তাশরীয়ী ওহীর উপরিউক্ত বিভক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে যেহেতু হযরত নূহ (আ.) থেকে হযরত মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত নবীগণের কাছে প্রেরিত ওহী একই ধারা ও একই শ্রেণিভুক্ত সেহেতু পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতে মহানবী ﷺ -এর নিকট প্রেরিত ওহীর প্রকৃতি নির্দেশ করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

اِنَّاۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ كَمَاۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰۤى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيْسٰى وَاَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ۔

অর্থাৎ আমি তোমার নিকট ওহী প্রেরণ করেছি যেমন ওহী প্রেরণ করেছিলাম নূহ ও তৎপরবর্তী নবীগণের নিকট। আর ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরগণ, ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারুন এবং সুলাইমানের নিকট ওহী প্রেরণ করেছিলাম এবং দাউদকে জবুর দিয়েছিলাম। -[সূরা নিসা : ১৬৩]

অবতীর্ণ হওয়ার পদ্ধতির দিক থেকে ওহীর শ্রেণি বিভাগ : নবীগণের কাছে ওহী অবতীর্ণ হওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতির দিক থেকে চিন্তা করেও ওহীর শ্রেণি বিভাগ করা হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ওহী মোট তিন ভাগে বিভক্ত। যথা-

১. وَحْى قَلْبِى **ওহীয়ে কালবী :** ওহীয়ে কালবী হলো এমন ওহী যা কোনো প্রকার মাধ্যম ব্যতিরেকে আল্লাহর নিকট থেকে সরাসরিভাবে নবীর হৃদয়পটে এসে স্থান নেয়। এ পদ্ধতির ওহীর মধ্যে কোনো ফেরেশতা বা নবীর কোনো ইন্দ্রিয় শক্তির মধ্যস্থতা থাকে না। নবীর মনে কথাটি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি উপলব্ধি করেন যে, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী হিসেবে আগত হয়েছে । এ পদ্ধতির ওহী নবীগণের জাগ্রত বা নিদ্রিত উভয় অবস্থায় অবতীর্ণ হতো। সে কারণে নবীগণের স্বপ্নও ওহী হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে।

২. وَحْى كَلَامِى **ওহীয়ে কালামী :** ওহীয়ে কালামী হলো এমন ওহী যা আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীকে সরাসরি প্রদান করা হয়। এখানে ফেরেশতার কোনো মধ্যস্থতা থাকে না। তবে নবী আল্লাহর কুদরতি কালামের ধ্বনি শুনে থাকেন।[১]

৩. وَحْى مَلَكِى **ওহীয়ে মালাকী :** ওহীয়ে মালাকী হলো এমন ওহী যা কোনো ফেরেশতার মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়ে থাকে। পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতের মধ্যে ওহীকে উপরিউক্ত বিবিধ প্রকারে বিভক্তির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَاۤءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِىَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَاۤءُ

অর্থাৎ মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন ওহীর মাধ্যম ব্যতিরেকে বা পর্দার অন্তরাল ব্যতীত বা এমন দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে যে দূত তাঁরই অনুমতিক্রমে, তিনি যা চান, তা ব্যক্ত করেন। -[সূরা শূরা : ৫১]

উপরিউক্ত আয়াতে وَحْيًا শব্দ দ্বারা ওহীয়ে কালবীকে বুঝানো হয়েছে। তারপর مِنْ وَّرَاۤءِ حِجَابٍ দ্বারা কালামে ইলাহীকে এবং يُرْسِلَ رَسُوْلًا দ্বারা ওহীয়ে মালাকীকে বুঝানো হয়েছে। -[উলুমুল কুরআন : মুফতি তকী উসমানী, ৩১-৩২]

ওহীয়ে মাতলূ ও গায়রে মাতলূ : প্রিয়নবী ﷺ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যে ওহী লাভ করেছেন সেটি দু'টি শাখায় বিভক্ত। ওহীয়ে মাতলূ এবং ওহীয়ে গায়র মাতলূ। ওহীয়ে মাতলূ এমন ওহী যার শব্দ, বাক্য অর্থ ও মর্ম সবকিছুই আল্লাহর তরফ থেকে আগত। পরিভাষায় এটি আল-কুরআন নামে পরিচিত। আর ওহীয়ে গায়র মাতলূ এমন ওহী যার অর্থ ও মর্ম আল্লাহ প্রেরিত, তবে শব্দ ও বাক্য প্রিয়নবী ﷺ -এর ইসলামের পরিভাষায় এ প্রকারের ওহী হাদীসও সুন্নাহ নামে অভিহিত।

উম্মতের কাছে উভয়বিধ ওহীই সংরক্ষিত অবস্থায় আছে এবং কুরআনে ব্যক্ত আল্লাহর নিজ দায়িত্ব সংরক্ষণের অঙ্গীকার বাণীর মধ্যে উভয়বিধ ওহী-ই অন্তর্ভুক্ত। এ দুপ্রকারের ওহীর মধ্যে মানগত পার্থক্য থাকলেও ওহী তথা আল্লাহর বাণী হওয়ার মধ্যে উভয়ের কোনো তফাৎ নেই। ইরশাদ হয়েছে- وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى আর সে [মুহাম্মদ ﷺ] মনগড়া কোনো কথা বলে না; বরং তিনি যা বলেন, তাও ওহী যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।

-[সূরা নাজম : ৩ ও ৪]

প্রিয়নবী ﷺ -এর হাদীসেও এর সমর্থন বিদ্যমান। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন- اُوْتِيْتُ الْقُرْاٰنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ

অর্থাৎ আমাকে কুরআন প্রদান করা হয়েছে এবং কুরআনের সাথে অনুরূপ আরেকটি [অর্থাৎ হাদীস]।

-[উলুমুল কুরআন : মুফতি তকী উসমানী ৪০ ও ৪১]

রাসূল ﷺ -এর নিকট ওহী অবতীর্ণ হওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট ওহী বিভিন্ন পদ্ধতিতে নাজিল হতো। আলেমগণের মতে প্রিয়নবী ﷺ -এর নিকট সাধারণত ৬টি পদ্ধতিতে ওহী অবতীর্ণ হতো। যেমন-

---

১. কালামের এ ধ্বনি কোন ধরনের তা নবী ব্যতীত অন্যদের পক্ষে নির্ণয় করা সুকঠিন। এতটুকু নিশ্চিত যে, এ ধ্বনি কোনো জীব-জন্তু বা সৃষ্ট বস্তুর ধ্বনির মতো নয়।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (র.) বলেন, বিবিধ পদ্ধতির মধ্যে ওহীর এ পদ্ধতি শ্রেষ্ঠ।। কেননা এ পদ্ধতির মধ্যে সরাসরি আল্লাহর সাথে কথোপকথনের ব্যবস্থা থাকে। এ কারণে নবীগণকে ওহীর নিয়ামত প্রদানের আলোচনায় আল্লাহ তা'আলা ওহীয়ে কালামীকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللّٰهُ . অর্থাৎ এ রাসূলগণের মধ্যে আমি কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। তাদের মধ্যে এমনও আছে যার সাথে আল্লাহ [সরাসরি] কথা বলেছেন। -[সূরা বাকারা : ২৫৩]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا আর মূসার সাথে আল্লাহর সাক্ষাত বাক্যালাপ করে ছিলেন। -[সূরা নিসা-১৬৪]

মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র.) বলেন- ওহীয়ে কালামীর এ পদ্ধতির মধ্যে নবীর শ্রবণেন্দ্রিয় ওহীর ধ্বনি শ্রবণের স্বাদ গ্রহণ করে, কিন্তু চাক্ষুষভাবে তিনি কোনো কিছু দেখতে পান না। তূর পর্বতে হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর সাথে যে বাক্যালাপ করেছেন, সে মুহূর্তে তিনি আল্লাহকে চাক্ষুষভাবে দেখেননি। এ কারণেই তিনি পুনর্বার আল্লাহকে দেখার জন্য দরখাস্ত করেছিলেন। ইরশাদ হয়েছে-

وَلَمَّا جَاۤءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ اَرِنِىْٓ اَنْظُرْ اِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرٰىنِىْ .

অর্থাৎ মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলো এবং তাঁর প্রভু তার সাথে কথা বললেন তখন সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দাও। আমি তোমাকে দেখব। তিনি বললেন, তুমি দেখতে পাবে না। -[সূরা আরাফ : ১৪৩]

আল্লাহর সাথে সরাসরি কথোপকথনের এ নিয়ামত মিরাজ রজনীতে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ নিজেও লাভ করেন। -[ফজলুল বারী খ. ২ পৃ. ১৩০]

১. **এক ধরনের নিরবচ্ছিন্ন ঘন্টাধ্বনি :** ওহী নাজিল হওয়ার মুহূর্তে প্রিয়নবী ﷺ নিরবচ্ছিন্ন ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় এক ধরনের আওয়াজ শুনতেন। হাদীসে এ ধ্বনিকে বুঝানোর জন্য مِثْلُ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ [নিরবচ্ছিন্ন ঘণ্টা ধ্বনির মতো] كَسِلْسِلَةٍ عَلٰى صَفْوَانٍ [পাথরের উপর লোহার শিকল ফেলার ধ্বনির মতো] كَدَوِيِّ النَّحْلِ [মৌমাছির গুণগুণ ধ্বনির মতো] এ তিনটি বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে। বিবিধ উপমার মূল বক্তব্য অভিন্ন। অর্থাৎ তিনি একটি ধ্বনি শুনতেন যার অগ্র-পশ্চাৎ অনুমান করা যেত না, যা ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকত।[১]

২. **ফেরেশতার মানবাকৃতিতে আগমন :** হযরত জিবরীল (আ.) কখনো কখনো মানুষের আকৃতি ধারণ করে ওহী নিয়ে আসতেন। এ ধরনের পরিস্থিতিতে হযরত জিবরীল (আ.) সাধারণত সাহাবী হযরত দাহইয়ায়ে কালবী (রা.)-এর আকৃতি বেশি গ্রহণ করতেন। আল্লামা আইনী (র.) বলেন, কোনো কোনো সময় অন্য মানুষের আকৃতিতে আসার বর্ণনাও হাদীসে এসেছে। হযরত আবূ আওয়ানা (র.) বলেন, এ পদ্ধতির ওহী ছিল সর্বাপেক্ষা সহজ পদ্ধতির ওহী।

৩. **ফেরেশতার নিজ আকৃতিতে আগমন :** কখনো কখনো হযরত জিবরীল (আ.) ফিরিশতার আকৃতিতেই ওহী নিয়ে অবতরণ করতেন। প্রিয়নবী ﷺ -এর জীবনে এ ধরনের ওহীর ঘটনা মাত্র তিনবার ঘটেছে।

৪. **সত্য স্বপ্ন :** প্রিয়নবী ﷺ কখনো স্বপ্নের মাধ্যমেও ওহী লাভ করতেন। নবীগণের স্বপ্নও ওহী। নবীগণের ঘুমন্ত অবস্থায় তাদের চোখ বন্ধ থাকত; কিন্তু হৃদয় থাকত সম্পূর্ণ জাগ্রত। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, প্রিয়নবী ﷺ -এর নিকট ওহীর সূচনাও হয়েছিল সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। ঐ সময় তিনি রাতে যা স্বপ্ন দেখতেন পরদিন তারই বাস্তব প্রতিপালন প্রত্যক্ষ করতেন। মদীনা শরীফে ইহুদিরা তাঁর শরীরের উপর যে যাদুক্রিয়া চালিয়েছিল, সে সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং এ যাদুর বিষক্রিয়া দূরীকরণের বিষয়গুলোও তিনি এ স্বপ্নের মাধ্যমেই লাভ করেছিলেন।

৫. **আল্লাহর সরাসরি বাক্যালাপ :** হযরত মূসা (আ.)-এর ন্যায় প্রিয়নবী ﷺ আল্লাহর সাথে সরাসরি বাক্যালাপ করার গৌরব অর্জন করেন। বিশেষ মর্যাদা জাগ্রত অবস্থায় তিনি মি'রাজের সময় লাভ করেন। আর একবার স্বপ্নেও আল্লাহ তা'আলার সাথে তাঁর বাক্যালাপ ঘটেছিল।

৬. **মানসপটে ওহী ফুঁকে দেওয়া :** কখনো কখনো হযরত জিবরাঈল (আ.) কোনো ফেরেশতা বা কোনো মানুষের আকার অবলম্বন না করেই অদৃশ্য থেকে প্রিয়নবী ﷺ -এর পবিত্র হৃদয়ে ওহী ফুঁকে দিতেন। যেমন একখানা হাদীসে নবীজী ইরশাদ করেছেন- إِنَّ رُوْحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِىْ رُوْعِىْ الخ অর্থাৎ রূহুল কুদুস আমার অন্তরে একথা ঢেলে দিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ তার জন্য বরাদ্ধ রিজিক সম্পূর্ণ ভোগ করা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করবে না। −[প্রাগুক্ত পৃ. ৩২−৪০]

ওহী কাশফ ও ইলহামের মধ্যে পার্থক্য : ওহীর সম্পর্ক শুধুমাত্র নবীগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। নবী ব্যতীত অন্যকোনো মানুষ আধ্যাত্মিক পথে যত উন্নত মর্যদার অধিকারীই হোক না কেন তার কাছে ওহী আসতে পারে না।

তবে আল্লাহ পাক তাঁর বিশেষ বান্দাদেরকে কখনো আধ্যাত্মিকভাবে কিছু বিশেষ জ্ঞান দান করে থাকেন। পরিভাষায় এগুলোকে কাশফ ও ইলহাম বলে।

কাশফ ও ইলহাম মৌলিকভাবে একই শ্রেণিভুক্ত হলেও হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (র.) উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিত পার্থক্য করেছেন, তার মতে কাশফের সম্পর্ক হলো ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জিনিসের সাথে। অর্থাৎ কাশফের দ্বারা কোনো বস্তুর হাকীকত বা কোনো ঘটনার প্রকৃত রূপ ব্যক্তির নজরে ভেসে উঠে। পক্ষান্তরে ইলমের সম্পর্ক হলো মানুষিক অনুভূতির সাথে। অর্থাৎ ইলহামের ক্ষেত্রে কোনো জিনিস নজরে ভেসে উঠে না, তবে অন্তরের মধ্যে সে বিষয়টি সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টি হয়। কাশফ ও ইলহামের মধ্যে তুলনামূলকভাবে ইলহাম কাশফ অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী এবং অধিকতর বিশুদ্ধ হয়ে থাকে।

ইলহাম নবী ও সাধারণ মানুষ উভয়ের মধ্যে পাওয়া যেতে পারে। নবীর ব্যাপারে যেমন এক হাদীসে প্রিয়নবী স্বয়ং দোয়া করে বলেছেন− اَللّٰهُمَّ اَلْهِمْنِىْ رُشْدِىْ "আল্লাহ আমাকে সৎপথে ইলহাম দান কর।"

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে− فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا অর্থাৎ "অতঃপর তিনি মানুষকে সৎকর্ম ও অসৎকর্মের ইলহাম দান করেছেন।"

---

১. এ আওয়াজ কিসের ছিল, তা নিয়ে একাধিক অভিমত পাওয়া যায়। কারো মতে এটি কালামে ইলাহীর নিজস্ব আওয়াজ। কেউ কেউ এটিকে ফেরেশতা বা তাদের পাখার আওয়াজ বলে মত প্রকাশ করেছেন। হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র.) বলেন, এটি বাইরের কোনো ধ্বনি নয়; বরং ওহী অবতরণের মুহূর্তে যেহেতু বাহ্য ইন্দ্রিয়সমূহকে জাগতিক সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে একমাত্র ওহীর দিকেই মনোযোগী করে দেওয়া হতো, আর মানুষের বাহ্য ইন্দ্রিয় যেমন শ্রবণেন্দ্রিয়কে এভাবে বিচ্ছিন্ন করা হলে আপনা থেকেই তখন এ ধরনের ধ্বনি শ্রুত হয়ে থাকে। আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.)-এর মতে এটি বস্তুত কালামে রাব্বানীর নিজস্ব আওয়াজ। −[উলূমুল কুরআন : ৩৩]

এখান থেকে বুঝা যায়, ইলহাম নবীর জন্য একান্ত কোনো ব্যাপার নয়, ওলীদের জন্যও হতে পারে। তবে উভয়ের ইলহামের মধ্যে পার্থক্য এতটুকু যে, নবীগণের ইলহাম ওহীরই অন্তর্ভুক্ত, এটি নিশ্চিত ও ভ্রান্তিমুক্ত। কিন্তু ওলীদের ইলহাম ওহীর অন্তর্ভুক্ত নয় এবং নিশ্চিত ও ভ্রান্তিমুক্ত বলেও দাবি করা যায় না। কারণ শয়তানের পক্ষ থেকে হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

ওলীগণের প্রাপ্ত ইলহামের মধ্যে কোনো ফেরেশতার মধ্যস্থতা থাকে কিনা? এব্যাপারে জ্ঞানী ওলামায়ে কেরাম বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম গাজালী (র.)-এর মতে এখানে ফেরেশতার কোনো মধ্যস্থতা নেই। কিন্তু ইমাম মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী (র.) তার ফুতহাত গ্রন্থে বলেন, ইমাম গাজালী (র.)-এর আভিমত সঠিক নয়। আমি পরীক্ষা করে দেখেছি যে, এখানে ফেরেশতার মধ্যস্থতা আছে । তিনি বলেন, বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে আরো জানা গেছে যে, ওলীর কাছে ইলহাম নিয়ে যে ফেরেশতা আগমন করেন, ওলী তাকে নিজ চোখে দেখেন না, তবে একজন ফেরেশতা যে তাঁর মনে কথাগুলো ঢেলে দিচ্ছেন, তিনি সেটি অনুধাবন করেন।

শায়খ আকবর আরো লিখেছেন আমার জানা মতে আরো কতিপয় আলেমের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে যে, ইলহাম নিয়ে ফেরেশতা এসে থাকেন। তবে এ ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ.) নন, অন্য কোনো ফেরেশতা। হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর আগমন কেবল নবীগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অনুরূপভাবে ওলী কখনো ফেরেশতার দর্শন লাভ করেন না। ফেরেশতা দর্শনের ব্যাপারটিও একমাত্র নবীগণের জন্য প্রযোজ্য। যেহেতু ওলীগণ ইলহাম প্রদানকারীকে নিজ চোখে দেখেন না, সেহেতু তাদের ইলহাম নিশ্চিত ধারণা দিতে পারে না। কেননা এখানে ফেরেশতা না হয়ে কোনো শয়তান বা জিনের পক্ষ থেকে হওয়ার আশঙ্কাও বিদ্যমান থাকে।

আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র.) বলেন, এ ব্যাপারে সার বক্তব্য হলো–

১. ওলীগণের ইলহামের মধ্যে বস্তুত আল্লাহর সাথে বাক্যালাপ ঘটে না। ইবনুল কাইয়্যিম (র.) এ কথাটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন।
২. তাতে কোনো ফেরেশতার মধ্যস্থতাও সাধারণত থাকে না। যেমন ইমাম গাযালী (র.) তা তুলে ধরেছেন।
৩. আর কখনো ফেরেশতার মধ্যস্থতা থাকলেও ওলী সে ফেরেশতার দর্শন ও বাণী শ্রবণ একই সঙ্গে লাভ করেন না। এটি শায়খ আকবর স্পষ্ট ব্যক্ত করেছেন। পক্ষান্তরে নবীগণের ইলহামের মধ্যে উপরিউক্ত সবগুলো বিশেষণ একই সময়ে বিদ্যমান থাকে। –[প্রাগুক্ত ৩৯ ও ৪০]

আসমানি কিতাবসমূহ

পৃথিবীতে প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী হযরত আদম (আ.) থেকে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত বহু নবী আগমন করেছেন। কুরআনের বর্ণনা মতে বিগত কালের এমন কোনো কওম বা জনপদ নেই, যাদের কাছে আল্লাহ তা'আলা হেদায়েতের বাণী দিয়ে নবী প্রেরণ করেননি। ইরশাদ হচ্ছে– وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا

অর্থাৎ আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। –[সূরা নাহল : ৩৬]

وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ . অর্থাৎ এমন কোনো সম্প্রায় নেই যার নিকট সতর্ককারী রাসূল প্রেরিত হয়নি। –[সূরা ফাতির–২৪]

একখানা হাদীসে তাদের সংখ্যা ১লক্ষ ২৫ হাজার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ রাসূলগণের প্রত্যেকের সঙ্গেই ওহীর সম্পর্ক ছিল। তাঁরা উম্মতকে হেদায়েত করার মতো বহু সহীফা ও ধর্মগ্রন্থ প্রাপ্ত হয়েছেন। এসব সহীফা ও ধর্মগ্রন্থকেই মূলত আসমানি কিতাব বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা সর্বমোট একশত চারখানা কিতাব নাজিল করেছেন। তন্মধ্যে চার খানা সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। যথা–১. তাওরাত ২. ইনজীল ৩. যাবূর ও ৪. কুরআন।

তাওরাত হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি, ইনজিল হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি, যাবূর হযরত দাউদ (আ.)-এর প্রতি এবং কুরআন হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি নাজিল করা হয়েছে।

এছাড়া বাকিগুলো হলো সহীফা। সহীফাগুলোর দশ খানা হযরত আদম (আ.) -এর উপর, পঞ্চাশ খানা হযরত শীস (আ.) -এর উপর, ত্রিশ খানা হযরত ইদরীস (আ.)-এর উপর এবং দশ খানা হযরত ইবরাহীম (আ.) উপর নাজিল করা হয়েছে।

আসমানি কিতাবসমূহের নাম **এবং কোনটি কোন নবীর উপর নাজিল হয়েছিল** এবং কোনটির ভাষা কি? মনে রাখার সুবিধার্থে একটি **ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো–** فعم ـ تعم ـ اسعى ـ زيد

প্রথম অক্ষর কিতাবের **নাম, দ্বিতীয় অক্ষর ভাষার নাম** এবং তৃতীয় অক্ষর নবীর নাম।

যেমন–

فعم : ف : فُرْقَان ، ع : عَرَبِى ، م : مُحَمَّدٌ

تعم : ت : تَوْرَات ، ع : عِبْرَانِى ، م : مُوْسٰى

اسعى : ا : اِنْجِيْل ، س : سُرْيَانِى ، عي : عِيْسٰى

زيد : ز : زَبُوْر ، ي : يُوْنَانِى ، د : داود

[সূত্র : মিফতাহুত তাফসীর, শাইখুল হাদীস আল্লামা আলতাফ হুসাইন]

পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ বিকৃত ও রহিত : একথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে কুরআন মাজীদের আগে যেসব কিতাব নাজিল **হয়েছিল, সেগুলো সবই মানসূখ** এবং রহিত হয়ে গেছে। অধিকন্তু বর্তমানে এগুলো বিকৃত এবং অনির্ভরযোগ্যও বটে।

বাইবেল কি আসমানী কিতাব?: বর্তমানে 'বাইবেল শরীফ' বলে যে কিতাবটি প্রচার করা হচ্ছে তা আসমানি কিতাব নয়। **তাতে রয়েছে তাওরাত,** যাবূর ও ইনজিল এই তিনটি কিতাব। উক্ত কিতাবত্রয়ের সমন্বয়ে সংকলিত বাইবেলের দুটি অংশ **রয়েছে। তন্মধ্যে একটি** অংশ ওল্ড টেস্টমেন্ট নামে পরিচিত।

আটত্রিশ খণ্ডে সংকলিত বাইবেলের পুরাতন নিয়ম ওল্ড টেস্টমেন্ট-এর অন্তর্ভুক্ত। তাওরাত সম্বন্ধে গবেষকদের অভিমত এই **যে, যখন বাবেল সম্রাট** "বুখতে নাসর" বনী ইসরাঈলের উপর আক্রমণ করে হাজার হাজার নারী পুরুষকে নির্বিচারে হত্যা **করে এবং বন্দী করে** নিয়ে যায় অসংখ্য নিরাপরাধ ব্যক্তিকে, তখন তারা আল্লাহর ঘর মসজিদে আকাসায়ও হামলা করে **এবং হযরত** মূসা (আ.)-এর উপর নাজিলকৃত আসমানি কিতাব তাওরাতসহ মসজিদে রক্ষিত যাবতীয় গ্রন্থাদি জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করে দেয়। জনশ্রুতি রয়েছে যে, এ ঘটনার দীর্ঘদিন পর তাওরাতের একটি কপি তাদের হস্তগত হয়। এর পর পুনঃ পুনঃ তারা রোমী এবং গ্রীকদের দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং এতে তাওরাতের শেষ কপিটিও জ্বলে ছারখার হয়ে যায়।

তখন থেকে বাইবেল পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তা জনশ্রুতি তথা মানুষের স্মৃতিনির্ভর কাহিনী ছিল মাত্র। লোকমুখে প্রচলিত কাহিনী নয়শত বছরেরও বেশি সময় লাগিয়ে তা পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়। খ্রিস্টপূর্ব দশম শতাব্দী থেকে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত বাইবেলের পুস্তকসমূহ বহুবার লিখন ও সংশোধনের পরে তা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে।

পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে কিতাবটিকে মূল ভাষায় লিপিবদ্ধ না করে লেখকগণ এর অনুবাদ লিপিবদ্ধ করেছেন। এতে তারা তাহরীফ ও বিকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন খুব বেশি। তারা তাদের নিজেদের স্বার্থে নিজস্ব যুগের এবং পরিবেশের প্রয়োজনে বর্ণিত বিষয়বস্তুর ব্যাপক অদল-বদল এমনকি সংযোজন ঘটাতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেনি। বিভিন্ন সূত্রে প্রকাশিত সমস্ত বাইবেলে-ই এ বিভ্রান্তকর কর্মকাণ্ড বিদ্যমান।

কুরআন মজীদের বর্ণনা হতে জানা যায় যে, তারা মূল হতে কিছু অংশ বাদ দিয়ে মূলে কিছু সংযোজন করে, মূলের অংশ বিশেষের স্থলে নিজেরা কিছু লিখে, উচ্চারণের বিকৃতি যোগে ভুল বুঝিয়ে এবং ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে তাহরীফ সাধন করেছে। –[ইজহারে হক : মাওলানা রহমত উল্লাহ কিরানভী (র.), বাইবেল ছ্যো কুরআন তক : মুফতি তকী উসমানী সূত্রে উলূমুল কুরআন, আল্লামা ইসহাক ফরিদী (র.) পৃ. ২০–২২]

কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে–

اَفَتَطْمَعُوْنَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلَامَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهٗ مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থাৎ তোমরা কি এই আশা কর যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে যখন তাদের একদল আল্লাহর বাণী শ্রবণ করে, তারপর তারা তা বিকৃত করে, অথচ তারা জানে। –[সূরা বাকারা–৭৫]

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ـ

অর্থাৎ সুতরাং দুর্ভোগ তাদের জন্য, যারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে এবং তুচ্ছ মূল্য প্রাপ্তির জন্য বলে এটা আল্লাহর নিকট হতে প্রাপ্ত। তাদের হাত যা রচনা করেছে, তার জন্য শাস্তি তাদের এবং যা তারা উপার্জন করে তার জন্য শাস্তির তাদের। –[সূরা বাকরা– ৭৯]

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ .
অর্থাৎ তারা শব্দগুলোর আসল অর্থ বিকৃত করতো এবং তারা যা উপদিষ্ট হয়েছিল তার এক অংশ ভুলে গিয়েছিল। –[সূরা মায়েদা : ১৩]

আরো ইরশাদ হয়েছে– يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ يَقُوْلُوْنَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ وَاِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا
অর্থাৎ তারা সেগুলোর অর্থ বিকৃত করে। তারা বলে, এই প্রকার বিধান দিলে তা গ্রহণ করবে এবং তা না দিলে বর্জন করবে। –[সূরা মায়েদা : ৪১]

ড: মরিস বুকাইলী বলেন, বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত সব পুস্তকই বেশ কয়েকবার করে সংশোধন ও সম্পাদনা করা হয়েছে এবং প্রতিবারই বর্জিত বিষয় সম্পর্কে বলা হয়েছে; ওই সব বাড়তি বিষয় সম্ভবত পরবর্তী সময়ের সংযোজন।

বস্তুত বাইবেলের কোথাও রয়েছে ঐতিহাসিক তথ্যের বিভ্রান্তি; কোথাও পুনরাবৃত্তির দোষ, কোথাও কাহিনীগত গড়মিল এবং কোথাও রচনাগত তারতম্য। এক কথায় ইহুদিদের গির্জার যেমন বিভিন্নতা রয়েছে, তেমনি গির্জা ভিত্তিক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক বাইবেল। কেননা বাইবেল সম্পর্কে একেক গির্জার ধারণা একেক রকম। আর পারস্পরিক ভিন্ন ধারণার কারণেই অন্য ভাষায় বাইবেল তরজমা করতে গিয়েও তাদের পক্ষে এক মতে পৌঁছা সম্ভব হয়নি। এই পরিস্থিতি এখনো অব্যাহত রয়েছে। –[বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান : ড. মরিস বুকাইলী]

বাইবেলের পুরাতন নিয়ম অর্থাৎ ওল্ড টেস্টমেন্টে তাওরাত ছাড়াও বিভিন্ন নবীর শিক্ষা সম্পর্কিত আরো কয়েকটি কিতাব এবং আরো কিছু ঐতিহাসিক পুস্তক স্থান লাভ করেছে। এগুলোর অবস্থানও তাওরাত এবং যাবূরের অনুরূপই।

বাইবেলের অপর অংশকে নিউ টেস্টমেন্ট [নতুন নিয়ম] বলা হয়। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের নিকট এটি ইঞ্জীল শরীফ হিসেবে পরিচিত। হযরত ঈসা (আ.)-কে আসমানে উঠিয়ে নেওয়ার সত্তর বছর পর নিউ টেস্টমেন্টের সুসমাচারসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়। পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ ঐশী বাণীসমূহ জনশ্রুতি তথা মানুষের স্মৃতিনির্ভর কাহিনী ছিল মাত্র।

নিউ টেস্টমেন্টের এ সুসমাচারসমূহ কিভাবে লিপিবদ্ধ হয় তা বর্ণনা করতে গিয়ে ইক্যুমেনিক্যাল ট্রান্সলেশন অব দি বাইবেল এর অনুবাদকগণ এ অভিমত ব্যক্ত করছেন যে, ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারের তাগিদে ধর্মপ্রচারকগণ যেসব কাহিনী ও বিবরণ পেশ করতেন তাই লোক মুখে প্রচারিত হতো। আবার লোকমুখে এসব কাহিনী সংকলন করে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হতো। বাইবেলের নতুন নিয়মের সুসমাচারগুলো এমন ধরনেরই সংকলন। এভাবে অসংখ্য ধর্মপ্রচারক অসংখ্য বাইবেল সংকলন করে নেয়।

এগুলোর কোনটি বিশুদ্ধ, তা নিরূপণের জন্য পূর্বরোমের ফীলস শহরে ৩২৫ খ্রিস্টাব্দে পাদ্রীদের এক কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে তিন শতাধিক পাদ্রী অংশ গ্রহণ করে। পাদ্রীগণ এ যাবত যত সুসমাচার লেখা হয়েছে, তা একত্র করে একটি স্তূপ দেয়। তারপর সর্বজন মান্য এক পাদ্রী সিজদাবনত অবস্থায় এ বলে মন্ত্র আওড়াতে থাকে যে, যেটি অসত্য তা যেন পড়ে যায়। এভাবে বলতে বলতে চারটি সুসমাচার ব্যতীত বাকি সবকটি মাটিতে পড়ে যায়। আর এ চারটি হলো মার্ক, মথি, লুক ও যোহনের সুসমাচারসমূহ। অভিজ্ঞ লেখকদের মতে এই চারটি সুসমাচার প্রামাণ্য গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করেছে ১৭০ খ্রিস্টাব্দের দিকে।

বস্তুত এসব সুসমাচার হচ্ছে সেসব রচনার সমাহার, যেসব দ্বারা বিভিন্ন মহলকে সন্তুষ্ট করা হয়েছে। গির্জার প্রয়োজন মিটানো হয়েছে, ধর্মশাস্ত্র সংক্রান্ত নানা বক্তব্যের সমাধান দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে বিরুদ্ধ পক্ষীয়দের উত্থাপিত নানা অভিযোগের জবাব দেওয়া হয়েছে এবং প্রচলিত ধর্মীয় ভুল-ত্রুটিসমূহের সংশোধন পেশ করা হয়েছে। সুসমাচারের লেখকগণ স্বস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে লোক নিয়ে নিজ নিজ পুস্তক সংকলন ও প্রণয়ন করেছেন।

এতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, এসব সুসমাচার হচ্ছে বিচ্ছিন্ন পরিকল্পনার এলোমেলো এক সাহিত্য কর্ম তো বটেই, সে সাথে এগুলোতে রয়েছে অসংখ্য বৈপরীত্যেরও বিপুল সমাহার। এ মন্তব্য আমাদের নয়। এ মন্তব্য করেছেন 'ইক্যু মেনিক্যাল ট্রান্সলেশন অবদি বাইবেলে'র শতাধিক বিজ্ঞ ভাষ্যকার। তারা বলেন, যেসব বাইবেল আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে, এর সবগুলোর রচনা ও বক্তব্য এক নয়; বরং একটির সাথে আরেকটির পার্থক্য সুস্পষ্ট। প্রাপ্ত বিভিন্ন বাইবেলের মধ্যে এই যে ভিন্নতা, তাও বিভিন্ন ধরনের। সংখ্যার দিক থেকেও সে পার্থক্য কম নয়; বরং প্রচুর। কোনো কোনো বাইবেলের মধ্যে ব্যাকরণ সংক্রান্ত ও ভাষাগত ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। শব্দ চয়নে কিংবা শব্দের অবস্থানের ভিন্নতাও কম নয়। কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে এমন ধরনের পার্থক্যও বিদ্যমান যার ফলে দু'টি বাইবেলের গোটা একটা অনুচ্ছেদের অর্থ পুরোপুরি ভিন্ন রকমের হয়ে দাঁড়ায়। এতে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, প্রচলিত বাইবেলের সুসমাচারসমূহ মূলত মানুষের রচনা। আল্লাহর পক্ষ হতে নাজিল কৃত ঐশীবাণী নয় এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর বাণীসমূহের হুবহু বর্ণনাও নয়।
–[বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান সূত্রে উলুমূল কুরআন আল্লামা ইসহাক ফরিদী– ২৩-২৪]

কুরআন পরিচিতি ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কুরআন শব্দের আভিধানিক অর্থ : আরবি কুরআন (قُرْاٰنٌ) শব্দটি قَرَءَ يَقْرَأُ ক্রিয়ার শব্দমূল (مَصْدَرٌ)। সে হিসেবে قُرْاٰنٌ অর্থ পাঠ করা। শব্দটি তথা مَقْرُوْءٌ مَفْعُوْل [পঠিত] অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেহেতু কুরআন মজীদ নামক গ্রন্থটিও পাঠ করা হয় বা পঠিত হয়, তাই একে কুরআন (قُرْاٰنٌ) বলে নামকরণ করা হয়েছে।

কুরআনের পারিভাষিক অর্থ : পরিভাষায় কুরআনের সংজ্ঞা হলো নিম্নরূপ–

اَلْكِتَابُ الْمُنَزَّلُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْمَكْتُوْبُ فِى الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُوْلُ عَنْهُ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا بِلَا شُبْهَةٍ

অর্থাৎ কুরআন ঐ কিতাবকে বলা হয় যা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি নাজিল করা হয়েছিল এবং যা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আর যা সন্দেহাতীত "তাওয়াতুর" (تواتر) -এর সাথে বর্ণিত হয়ে আসছে। -[নুরুল আনওয়ার, পৃ. ৯ ও ১০]

ফাওয়ায়েদে কুয়ূদ : উক্ত সংজ্ঞায় "যা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি নাজিল করা হয়েছে" বলে পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবসমূহ থেকে কুরআনকে আলাদা করা হয়েছে এবং "যা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ রয়েছে" বলে যা গ্রন্থকারে লিপিবদ্ধ নেই, সেগুলো থেকেও কুরআন মাজীদকে পৃথক করে দেওয়া হয়েছে । যেমন-ঐ সমস্ত আয়াত যেগুলোর বিধান বলবৎ আছে; কিন্তু তেলাওয়াত রহিত হয়ে গেছে। আর যা সন্দেহাতীতভাবে তাওয়াতুর -এর সাথে বর্ণিত হয়ে আসছে" বলে যা এই প্রক্রিয়ায় বর্ণিত নেই সেগুলো থেকে কুরআন মাজীদকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে।

এতে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে গোটা কুরআনই মুতাওয়াতিরভাবে প্রমাণিত এবং মাসহাফে উসমানীতে যা আছে, তা পুরোটাই মুতাওয়াতিরভাবে প্রমাণিত। কুরআনের কোনো অংশই মাসহাফে উসমানী থেকে বাদ পড়ে যায়নি। এটাই গোটা মুসলিম উম্মাহর আকিদা ও অকাট্য সত্য। কাজেই শীয়া ইসমিয়্যা সম্প্রদায়ের বক্তব্য– "এই কুরআন আসল কুরআন নয়, আসল কুরআন আমাদের দ্বাদশ ইমামের নিকট রক্ষিত আছে" একান্তই মিথ্যা ও বানোয়াট। সর্বোপরি তাদের এ বক্তব্য কুরআন হেফাজতের ব্যাপারে ইলাহী প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য এক চ্যালেঞ্জ বটে। যারা এ আকীদায় বিশ্বাসী, তারা যে কাফের এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

কুরআন মাজীদের নামসমূহ : ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি অবতীর্ণ কুরআন মাজীদের চারটি নাম আল্লাহ তা'আলা কালামে পাকে উল্লেখ করেছেন। যথা–

১. আল কুরআন : ইরশাদ হয়েছে– نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ

অনুরূপভাবে কুরআন মাজীদের আরো ৬৫ স্থানে এই قُرْاٰنٌ কুরআন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

২. আল ফুরকান : ইরশাদ হয়েছে– تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا

৩. আল কিতাব : ইরশাদ হয়েছে– اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا

৪. আয যিকর : ইরশাদ হয়েছে– اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ

এছাড়াও গুণবাচক বহুনাম কুরআনে উল্লিখিত হয়েছে। যেমন–

اَلتُّقَاءُ ـ اَلْهُدٰى ـ اَلنُّوْرُ ـ كَلَامُ اللّٰهِ ـ اَلْمَجِيْدُ ـ حَبْلُ اللّٰهِ ـ اَلْمُهَيْمِنُ ـ اَلْحَكِيْمُ ـ اَلْحِكْمَةُ ـ اَلْبَلَاغُ ـ اَلتَّبْصِرَةُ ـ اَلْبُرْهَانُ ـ اَلْمُتَشَابِهُ ـ بَشِيْرٌ وَّ نَذِيْرٌ ـ اَلرُّوْحُ ـ اَلْمُتَشَابِهُ ـ اَلصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ ـ اَلْمُبِيْنُ ـ اَلْمَوْعِظَةُ ـ اَلْحَقُّ ـ اَلْكَرِيْمُ ـ اَلْقَوْلُ اَلْفَصْلُ ـ اَلْعَلِىُّ ـ اَلنَّبَاءُ ـ اَلْعَجَبُ ـ اَلْوَحْىُ ـ اَلْعَزِيْزُ ـ اَلْبَيَانُ ـ اَلتَّذْكِرَةُ ـ اَلْاَمْرُ ـ اَلْعُرْوَةُ الْوُثْقٰى ـ اَلْبَصَائِرُ ـ اَلْعِلْمُ ـ اَلْبُشْرٰى ـ اَلْكَرِيْمُ ـ مُبَارَكٌ ـ اَلْبَيِّنَةُ ـ اَلْهَادِىْ ـ اَلرَّحْمَةُ ـ اَلزَّبُوْرُ ـ اَحْسَنُ الْقَصَصِ ـ اَلْعَرَبِىُّ ـ اَلصِّدْقُ وَالْعَدْلُ ـ اَلْعَظِيْمُ اَلْمَرْفُوْعَةُ ـ اَلصُّحُفُ ـ اَلتَّنْزِيْلُ ـ

[বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন উলূমূল কুরআন : আল্লামা ইসহাক ফরিদী পৃ. ৩৭-৫০]

কুরআন নাজিলের উদ্দেশ্য : ইমামুল হিন্দ হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) বলেন কুরআন নাজিলের উদ্দেশ্য তিনটি- تَهْذِيْبُ النُّفُوْسِ الْبَشَرِيَّةِ وَدَمْعُ الْعَقَائِدِ الْبَاطِلَةِ وَنَفْيُ الْاَعْمَالِ الْفَاسِدَةِ আত্মার সংশোধন, বাতিল আকীদার মূলোৎপাটন এবং ভ্রান্ত আমলের মূলোচ্ছেদ'। -[আল্ ফাউজুল কাবীর]

এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে-

الٓرٰ ـ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ـ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ـ

এই কিতাব, আমি এটা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানব জাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে বের করে আনতে পার অন্ধকার হতে আলোকে তার পথে যিনি পরাক্রমশালী প্রশংসাময়। -[সূরা ইবরাহীম : ১]

কুরআন নাজিলের ইতিহাস : সৃষ্টির সূচনা থেকেই আল কুরআন লাওহে মাহ্ফূযে সুরক্ষিত হয়েছে। এ ব্যাপারে কুরআনে পাকে ইরশাদ হয়েছে- بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ فِىْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ـ وَاِنَّهٗ فِىْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِىٌّ حَكِيْمٌ

অর্থাৎ বরং তা [সেই] কুরআন [যা] লাওহে মাহফুজে সুরক্ষিত রয়েছে। -[সূরা বুরুজ : ২১ ও ২২]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে- وَاِنَّهٗ فِىْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِىٌّ حَكِيْمٌ অর্থাৎ এটা তো রয়েছে আমার নিকট উম্মুল কিতাবে [লওহে মাহফূজে]; এটা মহান, জ্ঞানগর্ভ। -[সূরা যুখরুফ : ৪]

অতঃপর লাওহে মাহ্ফূয থেকে দুই পর্যায়ে কুরআন নাজিল হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে সম্পূর্ণ কুরআন একই সঙ্গে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানের 'বায়তুল ইযযাতে' নাজিল করা হয়।

'বায়তুল ইযযা'-কে বায়তুল মামূরও বলা হয়। এটি কা'বা শরীফের বরাবর উপরে দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশে ফেরেশতাগণের ইবাদতগাহ্। এখানে পবিত্র কুরআন একসাথে লাইলাতুল ক্বদরে নাজিল করা হয়েছিল। অতঃপর দ্বিতীয় পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি প্রয়োজন সাপেক্ষে অল্প অল্প করে দীর্ঘ তেইশ বছরে নাজিল হয়।[১]

প্রথম অবতীর্ণ আয়াত : নির্ভরযোগ্যে বর্ণনা মতে রাসূল ﷺ -এর প্রতি সর্ব প্রথম যে আয়াতগুলো নাজিল হয়েছে, সেগুলো ছিল সূরা আলাক্ব-এর প্রথম পাঁচ আয়াত। ইমাম বুখারী হযরত আয়েশা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি প্রথম ওহী নাজিল হয়েছিল হেরা গুহায়। তিনি নির্জনে ইবাদতে মশগুল থাকতেন। রাতের পর রাত হেরা গুহায় কাটিয়ে দিতেন। এ অবস্থাতেই এক রজনীতে হযরত জিব্রাঈল (আ.) হেরা গুহায় তাঁর নিকট এসে বলেন, اِقْرَاْ [পড়ুন] রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তরে বললেন, আমি পড়তে জানি না। এ উত্তর শুনে হযরত জীব্রাঈল (আ.) রাসূল ﷺ -কে বুকে চেপে ধরেন। অতঃপর ছেড়ে দিয়ে আবারো বলেন اِقْرَاْ [পড়ুন]। রাসূল ﷺ উত্তরে বললেন, আমি পড়তে জানি না। তিন বারের পর রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, কি পড়ব? নাজিল হলো-

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ـ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ـ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ـ

পড়ুন আপনার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পড়ুন আপনার পালনকর্তা অত্যন্ত অনুগ্রহশীল। -[সূরা আলাক : ১-৩]

এই ছিল তাঁর প্রতি সর্বপ্রথম অবতীর্ণ কয়েকটি আয়াত। এর পর তিন বছর ওহী নাজিলের ধারা বন্ধ থাকে। এ সময়কে ফাতরাতুল ওহী'র কাল বলা হয়। তিন বছর পর পুনরায় রাসূল ﷺ হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে আসমান ও জমিনের মধ্যস্থলে দেখতে পেলেন। ফেরেশতা তাঁকে সূরা মুদ্দাসসির -এর কয়েকটি আয়াত শোনালেন। এরপর থেকেই নিয়মিত ওহী নাজিলের ধারা শুরু হয়। -[বুখারী শরীফ খ. ১ম, পৃ. ২-৩; উলূমুল কুরআন : ৫৬]

কুরআন নাজিলের পরিসমাপ্তি ও কুরআনের শেষ আয়াত : একাদশ হিজরিতে রাসূলে কারীম ﷺ -এর ইন্তেকালের একাশি দিন মতান্তরে নয় দিন পূর্বে কুরআন নাজিল সমাপ্ত হয়। শেষ আয়াত সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তেকালের মাত্র ৯ দিন পূর্বে নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

---

১. ওহীর এ উভয়বিধ অবতরণের ভাবকে কুরআনুল কারীম দুটি শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে। একটি হলো ইনযাল অপরটি হলো তানযীল। ইনযাল শব্দের অর্থ- কোনো বস্তু বা বিষয়কে সম্পূর্ণ এক দফায় নাজিল করা। তানযীল শব্দের অর্থ- কোনো বস্তু বা বিষয়কে ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে নাজিল করা। সুতরাং কুরআনের যেখানে ইনযাল শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে সাধারণত লওহে মাহফূজ থেকে দুনিয়ার আসমানে অবতরণের কথা বুঝানো হয়েছে। আর যেখানের তানযীল শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে হুজুর ﷺ -এর প্রতি ধীরে ধীরে অবতরণের কথা বুঝানো হয়েছে।

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

ঐ দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। তারপর প্রত্যেকেই তার কর্মের ফল পুরোপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি কোনো অবিচার হবে না। -[সূরা বাকারা : ২৮১]

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার ৯ দিন পর রাসূলে কারীম ﷺ ইহলোক ত্যাগ করেন। তবে শেষ আয়াত সম্পর্কে সাধারণভাবে জানা যায় যে, সূরা মায়িদার নিম্নোক্ত আয়াতের অংশটুকু। অবতীর্ণ হয় সর্বশেষে

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ـ

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসেবে মনোনীত করলাম। -[সূরা মায়িদা : ৩]

উল্লেখ্য, এ আয়াতটি নাজিল হয়েছিল দশম হিজরির জিলহজ মাসে আরাফাতের ময়দানে এবং একাধিক নির্ভরযোগ্য হাদীসের দ্বারা এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, এরপরও কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তবে যেহেতু উল্লিখিত আয়াতটি নাজিলের পর শরিয়তের বিধান সম্বলিত অন্য কোনো আয়াত নাজিল হয়নি, এ জন্যই অনেকে ধারণা করেছেন যে, এটাই হচ্ছে কুরআনের নাজিলকৃত শেষ আয়াত। -[উম্মুল কুরআন, আল্লামা ইসহাক ফরিদী : ১১৩]

আল-কুরআনুল কারীম এক সাথে দুনিয়ার আসমানে নাজিল করা এবং পরে পর্যায়ক্রমে নাজিল করার তাৎপর্য : আল-কুরআনুল করীম এক সাথে দুনিয়ার আসমানে নাজিল করার তাৎপর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে ইমাম আবূ শামাহ (র.) বলেন, এর দ্বারা আল-কুরআনের উচ্চতম মর্যাদা প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য। তাছাড়া ফেরেশতাগণকেও এ তথ্য অবগত করানো উদ্দেশ্য ছিল যে, এটিই আল্লাহর শেষ কিতাব যা দুনিয়ার মানুষের হেদায়েতের জন্য নাজিল করা হয়েছে। শায়খ যুরকানী (র.) বলেন, এভাবে দুই বারে নাজিল করে একথাও বুঝানো উদ্দেশ্য ছিল যে, এই কিতাব সর্বপ্রকার সন্দেহ-সংশয়ের ঊর্ধ্বে। তদুপরি রাসূল ﷺ -এর পবিত্র বক্ষদেশ ছাড়াও আরো দু'জায়গায় তা সুরক্ষিত রয়েছে। লাওহে মাহফুয এবং বায়তুল মা'মূরে। রাসূল ﷺ -এর বয়স ৪০ বছরে পৌঁছলে রমজান মাসে লাইলাতুল ক্বদরে কুরআন নাজিল শুরু হয়।

-[প্রাগুক্ত : ১১১]

কুরআনুল কারীম পর্যায়ক্রমে নাজিল হলো কেন? : পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, কুরআন একবারে নাজিল হয়নি, হয়েছে ধীরে ধীরে, পর্যাক্রমে; সুদীর্ঘ তেইশ বছরে। অন্যান্য আসমানি গ্রন্থ তথা তাওরাত, যাবূর ও ইঞ্জিল লিপিবদ্ধ আকারে সম্পূর্ণ গ্রন্থ এক সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু কুরআন নাজিল হয়েছে ধীরে ধীরে। কখনো এক আয়াত, কখনো দু'তিন আয়াত, আবার কখনো এক সূরা।

কুরআনের সর্বাপেক্ষা ছোট যে আয়াতের অংশ নাজিল হয়েছে তা ছিল সূরা নিসার ৯৫নং আয়াতের অংশ বিশেষ তথা- غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ অথচ অপরদিক সমগ্র সূরা আন'আম একই সঙ্গে নাজিল করা হয়েছে।

কুরআন শরীফকে একবারে নাজিল না করে অল্প অল্প করে নাজিল কেন করা হলো? এ প্রশ্ন আরবের মুরশরিকরাও রাসূল ﷺ -কে করেছিল। এর উত্তরে নিম্নোক্ত আয়াত নাজিল হয়-

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا وَلَا يَأْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ اِلَّا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيْرًا

"এবং কাফেররা বলে, কুরআন তাঁর প্রতি একবারে কেন নাজিল করা হলো না? এভাবে [ধীরে ধীরে আমি পর্যায়ক্রমে নাজিল করেছি] যেন আপনার অন্তরে তা দৃঢ়মূল করে দেওয়া যায় এবং আমি তা ধীরে ধীরে পাঠ করেছি। তাছাড়া এরা এমন কোনো প্রশ্ন উথাপন করতে পারবে না যার [মোকাবিলায় আমি যথার্থ সত্য এবং তার পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা পেশ করবো না"।

-[সূরা ফুরকান : ৩২]

ইমাম ত্বাবারী (র.) উপরিউক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে কুরআন শরীফ পর্যায়ক্রমে নাজিল হওয়ার যে তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন, তাই এখানে যথেষ্ট হবে বলে মনে করি। তিনি লিখেছেন-

১. রাসূল ﷺ উম্মি ছিলেন। লেখাপড়া চর্চা করতেন না। এমতাবস্থায় কুরআন যদি একই সাথে একবারে নাজিল হতো, তবে তা স্মরণ রাখা বা অন্য কোনো পন্থায় সংরক্ষণ করা হয়তো তাঁর পক্ষে কঠিন হতো। অপরপক্ষে হযরত মূসা (আ.) যেহেতু লেখাপড়া জানতেন, সে জন্য তার প্রতি 'তাওরাত' একই সঙ্গে নাজিল করা হয়েছিল। কারণ তিনি লিপিবদ্ধ আকারে তাওরাত সংরক্ষণে সমর্থ ছিলেন।

২. কুরআনের প্রধান অংশ বিধান সম্বলিত। তাই সেদিকে লক্ষ্য রেখে ধীরে ধীরে নাজিল করা হয়েছে, যেন বিধানের উপর আমল সহজ হয়ে যায়। এক সাথে নাজিল হলে সকল বিধানের উপর আমল করা দুষ্কর ছিল।

৩. বারবার ঘন ঘন হযরত জিব্রাঈল (আ.)-এর আগমন রাসূল ﷺ -এর মানসিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য সহায়ক ছিল।

৪. কুরআন শরীফের উল্লেখযোগ্য অংশ বিরুদ্ধবাদীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর এবং বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে নাজিল হয়েছে। এমতাবস্থায় সে প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ার পর এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলি সংঘটিত হওয়ার মুহূর্তে সে সম্পর্কিত আয়াত নাজিল হওয়াই ছিল স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত। এতে একাধারে যেমন মুমিনদের অন্তর্দৃষ্টি প্রসারিত হয় তেমনি সমকালীন বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে অগ্রিম সংবাদ প্রদানের ফলে কুরআনের অভ্রান্ততা দৃঢ়ভাবে প্রমাণ হয়। -[প্রাগুক্ত : ১১২, ১১৩]

কুরআন সংকলন ও সংরক্ষণের ইতিহাস

নবী যুগে কুরআন সংকলন ও সংরক্ষণ :

- **হিফয বা মুখস্থকরণ :** কুরআনে কারীম যেহেতু একত্রে অবতীর্ণ হয়নি; বরং বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনের তাগিদে অল্প অল্প করে নাজিল হয়েছে। এ কারণে মহানবী ﷺ -এর যুগে কুরআনে কারীম গ্রন্থাকারে একত্রে লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর ছিল না। এতদ্ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য আসমানি কিতাবের মোকাবিলায় পবিত্র কুরআনের স্বতন্ত্র মর্যাদা রেখেছেন। আর তা হলো কাগজ কলমের তুলনায় তাঁর অধিক হেফাজত হাফেজগণের সীনার মাধ্যমে করবেন। মুসলিম শরীফে আছে- আল্লাহ তা'আলা মহানবী ﷺ -কে বলেছেন- وَنُنَزِّلُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ

অর্থাৎ আমি তোমার উপর এমন এক কিতাব অবতীর্ণ করব, যা পানি ধুয়ে মুছে ফেলতে সক্ষম হবে না।

এ কথার ভাবার্থ এই যে, পৃথিবীর সাধারণ কিতাবপত্রের অবস্থা হলো দুনিয়াবী আপদ-বিপদের কারণে তা নষ্ট হয়ে যায়; কিন্তু কুরআনে কারীমকে সীনার মাধ্যমে এমনভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে যে, তা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা নেই। এ কারণে প্রথমত কুরআন হেফাজতের জন্য মুখস্থ করণের প্রতি সর্বাধিক জোর দেওয়া হয়েছিল।

ওহী অবতীর্ণের প্রাথমিক জামানায় মহানবী ﷺ ওহীর শব্দাবলি সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত উচ্চারণ করতেন যেন তা অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যায়। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা কিয়ামার এ আয়াত অবতীর্ণ হলো-

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ.

"তাড়াতাড়ি শিখে নেওয়ার জন্য আপনি দ্রুত ওহী আবৃত্তি করবেন না। এ সংরক্ষণ ও পাঠ আমারই দায়িত্ব"।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মহানবী ﷺ -কে আশ্বাস দিচ্ছেন যে, কুরআন কণ্ঠস্থ করার জন্য ওহী অবতীর্ণ অবস্থায় শব্দাবলি সাথে সাথে উচ্চারণের কোনো প্রয়োজন নেই। আমি আপনার মধ্যে এমন প্রখর স্মৃতিশক্তি সৃষ্টি করে দিবে যে, একবার ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পর আপনি তা কখনও ভুলবেন না। এ কারণে ওহী নাজিল হওয়ার সাথে সাথেই তা মহানবী ﷺ -এর অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যেত। এভাবেই রাসূল ﷺ -এর সীনা মুবারক পবিত্র কুরআনের এমন এক সুরক্ষিত ভাণ্ডারে পরিণত হয়ে গেল যে, তন্মধ্যে সামান্যতম সংযোগ ও ভুল-ভ্রান্তির আশঙ্কাটুকুও বিদ্যমান ছিল না। এতদসত্ত্বেও মহানবী ﷺ অধিক সতর্কতার জন্য প্রতি রমজানে জীবরাঈল (আ.)-কে নাজিলকৃত ওহীর অংশ তেলাওয়াত করে শুনাতেন এবং হযরত জীবরাঈল (আ.)-এর নিকট হতেও তেলাওয়াত শুনতেন। তিরোধানের বছর মহানবী ﷺ হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে সমগ্র কুরআন দু'বার শুনিয়েছেন এবং তার কাছ থেকে শুনেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমত সাহাবায়ে কেরামকে অবতীর্ণ ওহীর আয়াতগুলো মুখস্থ করাতেন, অতঃপর তার মর্মার্থ শিক্ষা দিতেন। নবীন সাহাবীদের মধ্যে কুরআন মুখস্থকরণ ও তার মর্মার্থ শিক্ষা করার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। এমন কি অনেক মহিলা সাহাবী পাত্রের প্রতি বিবাহের পর কুরআন শিক্ষা দেওয়ার শর্ত জুড়ে দিতেন।

হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.) বর্ণনা করেন যে, পুণ্যভূমি মক্কা ছেড়ে কেউ হিজরত করে মদীনায় এলে কুরআন শিক্ষার জন্য তাকে একজন আনসারীর সাথে সম্পৃক্ত করে দেওয়া হতো। মসজিদে নববীতে অতি উচ্চকণ্ঠে কুরআন শরীফের শিক্ষা ও তেলাওয়াত হতো। অবশেষে রাসূল ﷺ নমনীয় করে তেলাওয়াতের নির্দেশ প্রদান করেছেন।

নিয়মিত অসাধারণ অধ্যাবসায় ও সীমাহীন আগ্রহ-উদ্দীপনার ফলে খুব সামান্য সময়ের ব্যবধানে নবীন সাহাবীগণের মধ্য হতে হাফেজে কুরআনের একটি দল প্রস্তুত হয়ে গেল। উক্ত জামাতের মধ্যে ৪ জন খলীফা ছাড়াও হযরত তালহা, সাআদ ইবনে মাসউদ, হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান, সালিম ইবনে উবাইদ, আবূ হুরায়রা, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত আমর ইবনুল আস, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর, মুআবিয়া, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর,আব্দুল্লাহ ইবনে সায়িব, আয়েশা, হাফসা ও উম্মে সালমা (রা.) প্রমুখ সাহাবাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সারকথা, নবুয়তের প্রাথমিক যুগে কুরআন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মুখস্থ করার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হতো। কারণ সে যুগে একদিক থেকে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা ছিল খুবই কম। অপরদিকে বই পুস্তক প্রকাশের উপযোগী উপকরণের অস্তিত্বই ছিল না বলা চলে। সুতরাং এমতাবস্থায় যদি ওহী শুধু লেখার উপর নির্ভর করা হতো, তাহলে কুরআন সংরক্ষণ ও ব্যাপক প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে মারাত্মক জটিলতা সৃষ্টি হতো। বিধায় কুরআন মুখস্থকরণের প্রতি অধিক পরিমাণ গুরুত্বই দেওয়া হয়েছিল। ফলে ওহী মুখস্থকরণের মাধ্যমে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র আরবের ঘরে ঘরে কুরআনের বাণী পৌঁছে দেওয়া সম্ভবপর হয়েছিল। -[উম্মুল কুরআন : তাকী উসমানী ১৭৩ ও১৭৪]

- **কিতাবত বা লিপিবদ্ধকরণ :** মাহানবী ﷺ কুরআনে কারীম মুখস্থ করানোর সাথে সাথে লিপিবদ্ধ আকারে রাখারও সুব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি বিশিষ্ট কয়েকজন লেখাপড়া জানা সাহাবীকে এ গুরুদায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন। হযরত উসমান (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর কোনো আয়াত অবতীর্ণ হলে ওহী লিপিবদ্ধ করার দায়িত্বে নিয়োজিত সাহাবীকে ডেকে সংশ্লিষ্ট আয়াতখানা কোন সূরার কোন আয়াতের আগে বা পরে সংযোজন করতে হবে তা বলে দিতেন। ফলে সেভাবেই তা লিখা হতো।

ওহী লিখে রাখার পদ্ধতি সম্পর্কে হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) বর্ণনা করেন–

كُنْتُ اَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ اِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ اَخَذَتْهُ بُرَجَاءُ شَدِيْدَةٌ وَعَرَقٌ مِثْلَ الْجُمَانِ ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَكُنْتُ اُدْخِلُ عَلَيْهِ بِقِطْعَةِ الْكَتِفِ اَوْ كِسْرَةٍ فَاَكْتُبُ وَهُوَ يُمْلِيْ عَلَيَّ فَمَا فَرَغَ حَتّٰى تَكَادَ رِجْلِيْ تَنْكَسِرُ مِنْ ثِقْلِ الْقُرْاٰنِ حَتّٰى اَقُوْلَ لَا اَمْشِيْ عَلٰى رِجْلِيْ اَبَدًا فَاِذَا فَرَغْتُ قَالَ اِقْرَاْ فَاَقْرَؤُهُ فَاِنْ كَانَ فِيْهِ سِقْطٌ اَقَامَهُ ثُمَّ اَخْرُجُ بِهِ اِلَى النَّاسِ.

"আমি ওহী লিখে রাখার কাজে নিয়োজিত ছিলাম। যখন মহানবী ﷺ -এর উপর ওহী অবতীর্ণ হতো তখন তার সর্ব শরীরে মুক্তার মতো বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে যেত। এ অবস্থা শেষ হওয়ার পর আমি দুম্বার চামড়া, হাড় অথবা লিখে রাখার উপযোগী কোনো কিছু নিয়ে উপস্থিত হতাম। লেখা সমাপ্ত করার পর আমার শরীরে কুরআনের এমন ওজন অনুভূত হতো, যেন আমার পা ভেঙ্গে গেছে। আমি যেন চলার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেছি। লেখা শেষ হলেই মহানবী ﷺ বলতেন, আমাকে পড়ে শুনাও। আমি পড়ে শুনাতাম। কোথাও কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলে তিনি তৎক্ষণাৎ তা ঠিক করে দিতেন। এবং সংশ্লিষ্ট ওহীর অংশটুকু অন্যদের সামনে পাঠ করতেন। -[তাবারানী সূত্রে উম্মুল কুরআন : তাকী উসমানী : ১৭৮]

হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) ছাড়াও প্রথম চার খলিফাসহ আরো কিছু সংখ্যক অন্যতম সাহাবী ওহী লিখে রাখার গুরুদায়িত্ব লাভ করেছিলেন। -[প্রাগুক্ত : ১৭৮]

যেসব বস্তুতে ওহী লিপিবদ্ধ করা হত : সে যুগে আরব দেশে কাগজ দুষ্প্রাপ্য ছিল বিধায় কুরআনের আয়াত প্রথমত : পাথর শিলা, শুকনো চামড়া, খেজুরের ডাল, বাঁশের টুকরা, গাছের পাতা ও পশুর হাড়ে লিখা হতো। ওহী লিপিবদ্ধকরণ কাজে কখনও কাগজের টুকরাও ব্যবহৃত হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। -[প্রাগুক্ত : ১৭৯]

লিখিত পাণ্ডুলিপির সন্ধান : লিখিত পাণ্ডুলিপিসমূহের মধ্যে এমন একখানা পাণ্ডুলিপি ছিল, যা মহানবী ﷺ তার বিশেষ তত্ত্বাবধানে একান্ত নিজের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন। যা পরিপূর্ণ কিতাব আকারে ছিল না, বরং পাথর শিলা, চামড়া ও সে যুগের লিখন সামগ্রীর সমষ্টিরূপে সংরক্ষিত ছিল। ওহীর নিয়মিত লেখকমণ্ডলী ছাড়াও সাহাবীদের মধ্যে অনেকেই ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য কিছু সংখ্যক আয়াত ও কোনো কোনো সূরা লিখে রাখতেন এবং এ ব্যক্তিগত লিখনের প্রচলন ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই ছিল। হযরত ইবনে ওমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত–

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْاٰنِ اِلٰى اَرْضِ الْعَدُوِّ ـ

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআনে কারীম সঙ্গে করে শত্রুদেশে গমন করতে নিষেধ করেছেন।

অন্যত্র মহানবী ﷺ বলেছেন–

قِرَاءَةُ الرَّجُلِ فِىْ غَيْرِ الْمُصْحَفِ اَلْفُ دَرَجَةٍ وَقِرَاءَةُ الرَّجُلِ فِى الْمُصْحَفِ يُضَاعِفُ عَلٰى ذٰلِكَ اَلْفَىْ دَرَجَةٍ ـ

অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি কুরআনে কারীম না দেখে পড়লে এক হাজার গুণ ছওয়াব পাবে। আর দেখে পড়লে দু'হাজার গুণ। উল্লিখিত দুটি বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহানবী ﷺ -এর যুগেই সাহাবীদের কাছে কুরআনের ব্যক্তিগত পাণ্ডুলিপি ছিল। যদি তা-ই না হতো তবে কুরআনে কারীম দেখে পড়া ও শত্রুদেশে তা নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই আসতো না।

হযরত ওমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় তার বোন ফাতেমা বিনতে খাত্তাব (রা.) ও ভগ্নিপতি সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা.)-এর হাতে সূরা তোয়াহার কতিপয় আয়াত সম্বলিত একটি পাণ্ডুলিপি ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়, যা হযরত খাব্বাব ইবনে আরত (রা.) পাঠ করেছিলেন।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর খেলাফতকালে কুরআন সংকলন ও সংরক্ষণ : যেহেতু মহানবী ﷺ -এর যুগে চামড়া হাড়, পাথর শিলা, গাছের পাতা ইত্যাদিতে লিপিবদ্ধ কুরআনে কারীমের পাণ্ডুলিপি পরিপূর্ণ কিতাব আকারে সংকলিত ছিল না এবং সাহাবীদের ব্যক্তিগত ব্যবহারের নুসখাও ছিল অপূর্ণাঙ্গ। অনেকেই আবার আয়াতের সাথে তাফসীরও লিখে রেখেছিলেন। তাই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) সকল বিচ্ছিন্ন পাণ্ডুলিপিগুলো একত্র করে পরিপূর্ণ নুসখা প্রস্তুতকরণের তীব্র প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং কুরআনে কারীমকে একত্রে সংকলন ও সংরক্ষণের প্রশংসনীয় উদ্যাগ গ্রহণ করেন।

কি কারণে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) কুরআন শরীফের একটি পরিপূর্ণ পাণ্ডুলিপি সংকলন ও সংরক্ষণের তীব্র প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন এবং উক্ত গুরু দায়িত্ব কাদের দ্বারা কিভাবে সম্পাদিত হলো, সে সম্পর্কে হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) বলেন,

ইয়ামামার যুদ্ধের পরপরই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) আমাকে জরুরি ভিত্তিতে আহবান করলেন। আমি সেখানে পৌঁছে হযরত ওমর (রা.)-কে দেখতে পেলাম। আমাকে দেখে হযরত সিদ্দীকে আকবার (রা.) বললেন, হযরত ওমর (রা.) এসে আমাকে বলছেন যে, ইয়ামামর যুদ্ধে বহু সংখ্যক হাফিজে কুরআন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেছেন। এভাবে বিভিন্ন যুদ্ধে হাফিজ সাহাবী শহীদ হলে কুরআনের কিছু অংশ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। সুতরাং আমি অভিমত ব্যক্ত করছি যে, আপনি জরুরি নির্দেশের মাধ্যমে পবিত্র কুরআনকে একত্রে সংকলনের সুব্যবস্থা গ্রহণ করুন!

এ মর্মে আমি হযরত ওমর (রা.)-কে বলছি, যে কাজ মাহনবী ﷺ তাঁর জীবদ্দশায় সম্পাদন করেননি, তা আমার জন্য করা সমীচীন হবে কিনা, তা ভাবছি। হযরত ওমর (রা.) উত্তরে বললেন, আল্লাহর শপথ! এ কাজ অতি উত্তম। একথা তিনি বারংবার বলতে থাকায় আমার অন্তরে উক্ত কাজের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে। অতঃপর হযরত সিদ্দীকে আকবার (রা.) আমাকে [যায়েদ ইবনে সাবিত] বললেন, তুমি একজন তীক্ষ্ম বুদ্ধি সম্পন্ন উদ্যমী যুবক। তোমার সততা, সাধুতা সম্পর্কে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই। এতদ্ভিন্ন তুমি মহানবী ﷺ -এর যুগে ওহী লিপিবদ্ধকরণ কাজে নিয়োজিত ছিলে। সুতরাং তুমিই বিভিন্ন সাহাবীর নিকট হতে বিক্ষিপ্ত সূরা ও বিভিন্ন আয়াতসমূহ একত্র করত লিপিবদ্ধ করতে থাক।

হযরত যয়েদ ইবনে সাবিত (রা.) বলেন, আল্লাহর শপথ! তাঁরা যদি আমাকে একটি পাহাড়কে স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দিতেন তাতেও আমার কাছে এতটুকু বোঝা মনে হতো না, যতটা কঠিন মনে হচ্ছে পবিত্র কুরআন লিপিবদ্ধ করার কাজটি। আমি বললাম, আপনি এ কাজ কিভাবে করতে চান? যা মহানবী ﷺ নিজে করেননি। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) উত্তর দিলেন। এ কাজ অতি উত্তম এ কথা তিনি বারংবার বলতে লাগলেন। এমনকি অবশেষে আল্লাহ তা'আলা হযরত আবূ বকর ও ওমর (রা.)-এর অভিমতের যথার্থতা সম্পর্কে আমার মনে দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি করে দিলেন। তাই আমি খেজুরের ডাল, পাথর শিলা, চামড়া ও পশুর হাড় ইত্যাদিতে লিপিবদ্ধ বিচ্ছিন্ন সূরা ও আয়াতসমূহ একত্র করতে লাগলাম। সাহাবীদের স্মৃতিতে সংরক্ষিত কুরআনের সাথে যাচাই বাছাই করে সেগুলো ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করে সংকলনের কাজ শেষ করলাম। –[প্রাগুক্ত : ১৮১ ও১৮২]

হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)-এর পক্ষ হতে কুরআনে কারীম একত্রে লিপিবদ্ধ ও সংকলনের ব্যাপারে গৃহীত কার্যক্রম : এখানে হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)-এর পক্ষ হতে কুরআনে কারীম একত্রে লিপিবদ্ধ ও সংকলনের ব্যাপরে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

পূর্বেই আলোচনা হয়েছে যে, হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) একজন হাফেজে কুরআন সাহাবী ছিলেন। সুতরাং নিজের স্মৃতি থেকে পুরো কুরআন লিপিবদ্ধ করতে সক্ষম ছিলেন। তাছাড়াও বহু হাফেজে কুরআন সাহাবী বিদ্যমান ছিলেন। যাদেরকে সমবেত করে সমগ্র কুরআন একত্র করে লিপিবদ্ধ করা মোটেই কঠিন কাজ ছিল না। বিশেষ করে মহানবী ﷺ -এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা হয়েছিল, তা থেকেও তিনি লিখে নিতে পারতেন। কিন্তু তা না করে অধিকতর সতর্কতার জন্য তিনি সবগুলো উপকরণকে একত্র করে উক্ত সংকলনের কাজ সম্পাদন করেন। প্রত্যেকটি আয়াতের ক্ষেত্রেই তিনি নিজের স্মৃতি লিখিত নুসখা এবং অন্যান্য হাফেজদের তেলাওয়াত সবগুলোর সাথে যাচাই-বাছাই করে সর্বসম্মত বর্ণনার ভিত্তিতেই তাঁর পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন। মহানবী ﷺ -এর দরবারে যাঁরা কাতিবে ওহীর মর্যাদা লাভ করেছিলেন সাধারণ ঘোষণার মাধ্যমে তাঁদের নিকট হতে সবগুলো নুসখা সংগ্রহ করত হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) -এর নিকট উপস্থিত করা হয়। কাতিবীনে ওহী সাহাবীদের নিকট হতে সংগ্রহকৃত পাণ্ডুলিপিসমূহ নিম্নোক্ত চারটি পদ্ধতিতে যাচাই করা হয়–

১. হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) সর্বপ্রথম তাঁর স্মৃতিতে রক্ষিত কুরআনের সাথে উক্ত পাণ্ডুলিপি যাচাই করতেন।
২. হযরত ওমর (রা.) ও হাফেজে কুরআন ছিলেন। ফলে হযরত আবূ বকর (রা.) তাঁকেও হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)-এর সাথে উক্ত কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। তারা দু'জন যৌথভাবে লিখিত পাণ্ডুলিপিসমূহ গ্রহণপূর্বক একজনের পর আরেকজন নিজ নিজ স্মৃতির সাথে যাচাই করতেন।
৩. কমপক্ষে দু'জন বিশ্বস্ত সাক্ষীর সাক্ষ্য গহণ করতেন, তারা এ মর্মে সাক্ষ্য দিত যে, এই আয়াতগুলো মহানবী ﷺ -এর সামনে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। দু'জনের সাক্ষ্য ব্যতীত কোনো আয়াত গ্রহণ করতেন না।
৪. অতঃপর লিখিত আয়াতগুলো অন্যান্য সাহাবী কর্তৃক লিখিত পাণ্ডুলিপির সাথে সঠিকভাবে যাচাই করে মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্ভুক্ত করা হতো।

মোটকথা, হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) অত্যন্ত সাবধানতার সাথে কুরআনে কারীমের পরিপূর্ণ পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করত ধারাবাহিকভাবে কাগজে লিপিবদ্ধ করেন।

কিন্তু যেহেতু প্রত্যেকটি সূরা আলাদা করে লেখা হয়েছিল। এ কারণে তা অনেকগুলো সহীফায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। সে কালের পরিভাষায় উক্ত সহীফাগুলোকে "উম্ম" বা মূল পাণ্ডুলিপি বলে আখ্যায়িত করা হতো।

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.)-এর উদ্যোগে সংকলিত এ পাণ্ডুলিপিটি তাঁর কাছে সংরক্ষিত ছিল। তাঁর ইন্তেকালের পর তা হযরত ওমর (রা.) তার নিজের হেফাজতে রেখে দেন। হযরত ওমর (রা.)-এর শাহাদাতের পর নুসখাটি উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা.)-এর কাছে রক্ষিত থাকে।

অবশেষে হযরত উসমান (রা.) কর্তৃক সূরাসমূহের তারতীব অনুসারে লিখন পদ্ধতিসহ পবিত্র কুরআনের শুদ্ধতম পাণ্ডুলিপি তৈরি করে চারিদিকে বিতরণের পর হযরত হাফসা (রা.)-এর নিকট রক্ষিত নুসখাটি নষ্ট করে ফেলা হয়। কেননা সর্বসম্মত লিখন পদ্ধতিবিহীন ও সূরার তরতীববিহীন পাণ্ডুলিপি কারো কাছে অবশিষ্ট থাকলে সাধারণ মানুষ এতে বিভ্রান্তিতে পতিত হওয়ার তীব্র আশঙ্কা ছিল। –[প্রাগুক্ত : ১৮২–১৮৪]

হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে কুরআন সংকলন ও সংরক্ষণ : হযরত উসমান (রা.)-এর খেলাফতকালে ইসলাম আরব ভূমির সীমানা পেরিয়ে রোম, ইরান ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। প্রত্যেকটি নতুন এলাকার লোক ইসলাম গ্রহণের পর মুসলিম মুজাহিদ ও বণিকদের নিকট হতে কুরআনে কারীম শিক্ষা করতে আরম্ভ করেন। আমরা জানি, কুরআনে কারীম সাতটি কেরাতে অবতীর্ণ হয়েছিল। সাহাবীগণও বিভিন্ন কেরাতে মহানবী ﷺ -এর নিকট হতে তেলাওয়াত শিক্ষা করে তদনুযায়ী লোকদেরকে শিখাচ্ছিলেন। এভাবে শুধু আরবেই নয়; বরং দূর দেশেরও বিভিন্ন কেরাতে কুরআনে কারীম তেলাওয়াত করা হচ্ছিল। এতে করে মানুষের মধ্যে কোথাও কোথাও কেরাতের ভিন্নতাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মতবিরোধ এমকি ঝগড়া বিবাদ পর্যন্ত শুরু হয়ে যায়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কেরাত পদ্ধতিকে বিশুদ্ধ ও অপর পদ্ধতিকে ভুল বলে আখ্যায়িত করতে আরম্ভ করে। ফলে পারস্পরিক মতবিরোধ ও ভুল বুঝা-বুঝির অবসান ঘটানো ও আল্লাহর নবীর সমর্থিত কেরাত পদ্ধতিকে ভুল বলে অবহিত করার মতো মারাত্মক পাপ থেকে মানুষকে রক্ষা করা একটি জরুরি বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তখন পবিত্র মদিনায় রক্ষিত হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) কর্তৃক লিপিবদ্ধ পাণ্ডুলিপি ছাড়া আর কোনো

নির্ভরযোগ্য নুসখা ছিল না। উক্ত সমস্যার সমাধানের একটিই মাত্র পন্থা ছিল তা হলো এমন একটি লিপি পদ্ধতির মাধ্যমে কুরআনে কারীমকে লিপিবদ্ধ করে সমগ্র মুসলিম জাহানে ছাড়িয়ে দেওয়া, যে লিপি পদ্ধতির মাধ্যমে সাত কেরাতের তেলাওয়াত সম্ভবপর হবে এবং এ ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা দেখা দিলে উক্ত পাণ্ডুলিপির মাধ্যমে সে সমস্যার সঠিক সামাধান দেবে। হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা.) তাঁর খেলাফতকালে এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সমাধা করেছেন।[১]

এ উদ্দেশ্য হযরত উসমান (রা.) সর্বপ্রথম নবী পত্নী হযরত হাফসা (রা.)-এর নিকটে রক্ষিত হযরত আবূ বকর (রা.) কর্তৃক লিপিবদ্ধ পাণ্ডুলিপিটি চেয়ে নিলেন। উক্ত পাণ্ডুলিপি সামনে রেখে সূরাসমূহের তারতীব ও বিশুদ্ধতম নুস্‌খা তৈরির উদ্দেশ্যে কুরআনে কারীম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ সদস্যবিশিষ্ট বোর্ড গঠন করে তাদেরকে দায়িত্ব দিলেন। সদস্যগণ হলেন, সাহাবী হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত,আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর, সাঈদ ইবনুল আস এবং আব্দুর রহমান ইবনে হারেস ইবনে হিশাম (রা.)। হযরত উসমান (রা.) উক্ত কমিটিকে নির্দেশ দিলেন যে, হযরত আবূ বকর (রা.) কর্তৃক সংকলিত নুস্‌খাকেই শুধুমাত্র এমন একটি সর্বসম্মত লিখন পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করুন, যার সাহায্যে প্রত্যেকটি নুস্‌খা শুদ্ধ কেরাত পদ্ধতি অনুযায়ী পাঠ করা সম্ভব হয়।

উক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত চারজন সহাবীর মধ্যে হযরত যায়েদ ইবনে সবিত (রা.) ছিলেন আনসার। আর বাকি তিনজন ছিলেন কুরাইশী। হযরত উসমান (রা.) বললেন, যদি লিখন পদ্ধতি নিয়ে হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)-এর সাথে অন্যান্যদের মতবিরোধ দেখা দেয়, তবে কুরাইশদের লিখন পদ্ধতিই অনুসরণ করবে। কেননা পবিত্র কুরআন যার উপর অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি হলেন কুরাইশী এবং কুরাইশদের ব্যবহৃত ভাষাই কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে উক্ত চারজনকে নুস্‌খা তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হলেও আরো অনেকেই বিভিন্নভাবে তাদেরকে সহযোগিতা করছেন। তারা কুরআন সংকলনের ক্ষেত্রে নিম্ন বর্ণিত কাজগুলো সম্পাদন করেন।

১. হযরত আবূ বকর (রা.)-এর উদ্যোগে লিখিত পাণ্ডুলিপিতে সূরাসমূহ ধারাবাহিকভাবে না সাজিয়ে পৃথক পৃথক নুস্‌খায় লিখা হয়েছিল। আর উক্ত কমিটি সমস্ত সূরা ক্রমানুসারে একই মাসহাফে বিন্যস্ত করেন।

২. আয়াতসমূহ এমন এক লিখন পদ্ধতির অনুসরণে লিপিবদ্ধ করা হয়, যা দ্বারা সবগুলো বিশুদ্ধ কেরাত পদ্ধতিতে তেলাওয়াত সম্ভব হয়। এ কারণে অক্ষরসমূহে নুকতা, যবর, যের ও পেশ দেওয়া হয়নি।

৩. তখন পর্যন্ত পবিত্র কুরআনের নির্ভরযোগ্য ও সর্বসম্মত একটি মাত্র নুস্‌খা ছিল। উক্ত কমিটি একাধিক নুস্‌খা প্রস্তুত করেন। বর্ণনা অনুযায়ী হযরত উসমান (রা.) পাঁচটি নুস্‌খা তৈরি করান আবূ হাতেম সাজেস্তানীর মতে হযরত উসমান (রা.) সাতটি নুস্‌খা তৈরি করান। নুসখাগুলো মক্কা, সিরিয়া, বসরা ও কূফায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং একটি নুসখা অত্যন্ত যত্নসহকারে পবিত্র মদীনায় সংরক্ষণ করা হয়।

---

১. **হাদীস** গ্রন্থসমূহে উক্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনপূর্বক বিরাজিত সমস্যার সমাধানের পটভূমি এভাবে বর্ণিত আছে যে, হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা.) আযারবাইজান ও আর্মেনিয়া এলাকায় জিহাদে লিপ্ত ছিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, কুরআনে কারীমের তেলাওয়াত নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে মতভেদ, ঝগড়া-বিবাদ ও ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হচ্ছে। তিনি পবিত্র মদীনায় ফিরেই সর্বপ্রথম হযরত উসমান (রা.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! উম্মতে মুহাম্মদী আল্লাহর কিতাব নিয়ে খ্রিস্টান ও ইহুদিদের মতো মতবিরোধে লিপ্ত হওয়ার আগে আপনি এর সুষ্ঠু সমাধানের ব্যবস্থা করুন।

হযরত উসমান (রা.) হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা.) থেকে উক্ত ঘটনা বিস্তারিত জানতে চান। হযরত হুযায়ফা (রা.) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ও উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর পৃথক পৃথক কেরাত পদ্ধতির অনুসরণকারীদের মধ্যে পারস্পরিক মতবিরোধ, একে অন্যকে কাফের বলে আখ্যায়িত করা পর্যন্ত গড়িয়েছে। তিনি বিস্তারিত জানার পর সঠিক সমাধানের জন্য বিশিষ্ট সাহাবীদের জামায়েত করে পরামর্শ চান। সাহাবীগণ ঘটনা জানার পর হযরত উসমান (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এ ব্যাপারে কি চিন্তা করেছেন? তিনি বললেন, আমার অভিমত হলো সকল বিশুদ্ধ বর্ণনা একত্র করে এমন একটি সর্বসম্মত পাণ্ডুলিপি তৈরি করা, যাতে কেরাত পদ্ধতির মধ্যেও কোনো প্রকার মতানৈক্যের অবকাশ না থাকে। উপস্থিত বিশিষ্ট সাহাবীগণ সর্বসম্মতিক্রমে হযরত উসমান (রা.)-এর অভিমতটি সমর্থন করেন এবং এ ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতার অঙ্গীকার করেন।

হযরত উসমান (রা.) কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের পর সর্বস্তরের জনসাধারণকে একত্র করে এ মর্মে এক ভাষণ দেন। তিনি বলেন, আপনারা মদীনায় আমার অতি নিকটে অবস্থান করেও কুরআনে কারীম নিয়ে মতবিরোধ করছেন, একে অন্যকে দোষারোপ করছেন। এতেই প্রতীয়মান হয় দূরদেশে অবস্থানকারীরা আরো অধিক মতবিরোধ ও ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত রয়েছে। সুতরাং আসুন আমরা সবাই মিলে কুরআনে কারীমের এমন একটি নুসখা তৈরি করি, যে পাণ্ডুলিপিতে কারো পক্ষেই কোনো মতবিরোধ করার সুযোগ থাকবে না এবং সবার জন্য সেটি অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য বলে গণ্য হবে।

৪. লেখার সময় হযরত আবূ বকর (রা.) -এর জমানায় লিখিত নুস্‌খার অনুসরণের সাথে তার জমানার পদ্ধতির প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয়। মহানবী ﷺ -এর যুগে সাহাবাদের কাছে যে সকল লিখিত অনুলিপি রক্ষিত ছিল, সেগুলো মূল নুস্‌খার সাথে মিলিয়ে যাচাই করা হয়।

৫. কুরআনে কারীমের এই সর্বসম্মত ও নির্ভরযোগ্য চূড়ান্ত নুসখা প্রস্তুত হওয়ার পর হযরত উসমান (রা.) পূর্বেকার বিক্ষিপ্ত সকল নুসখা সংগ্রহ করে আগুনে পুড়িয়ে ফেলেন।

হযরত সাহাবায়ে কেরাম সর্বসম্মতভাবে হযরত উসমান (রা.)-এর কুরআন সংকলনের কাজকে সমর্থনপূর্বক সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন। ফলে মুসলিম উম্মাহ হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা.)-এর এ কাজকে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখেন। এ প্রসঙ্গে হযরত উসমান (রা.) সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে হযরত আলী মুরতাজা (রা.) বলেছেন–

لَا تَقُوْلُوْا فِيْ عُثْمَانَ اِلَّا خَيْرًا فَوَاللّٰهِ مَا فَعَلَ الَّذِيْ فَعَلَ فِي الْمَصْحَفِ اِلَّا عَنْ مَلَاٍ مِنَّا .

অর্থাৎ "হযরত উসমান গনী (রা.) সম্পর্কে ভালো ছাড়া কিছুই বলো না। কারণ আল্লাহর শপথ! তিনি কুরআন সংকলনের ব্যাপারে যা কিছু করেছেন, তা আমাদের সামনে আমাদের পরামর্শেই করেছেন।" –[প্রাগুক্ত : ১৮৭–১৯২]

তেলাওয়াত সহজীকরণ প্রচেষ্টা : হযরত উসমান (রা.) কর্তৃক মাসহাফ তৈরির কাজ চূড়ান্ত হওয়ার পর দুনিয়ার সর্বত্র তার অনুলিপির ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু যেহেতু মূল উসমানী নুসখায় নুকতা এবং হরকত ছিল না, সে জন্য অনারবদের পক্ষে এ মাসহাফের তেলাওয়াত অত্যন্ত কঠিন এবং কষ্টকর ছিল। ইসলাম দ্রুত আরবের বাইরে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে উসমানী অনুলিপিতে নুকতা এবং হরকত সংযোজন করার তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে শুরু থাকে। সর্ব সাধারণের জন্য তেলাওয়াত সহজতর করার লক্ষ্যে মূল উসমানী মাসহাফে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন উন্নয়ন ও সহজিকরণ প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়। সংক্ষেপে সেই প্রক্রিয়াগুলোর বিবরণ নিম্নরূপ–

نقطه নুকতা : আরবি ভাষাভাষীদের মাঝে হরফে নুকতা লাগানোর রীতি ছিল না। তাই লিখকগণ নুকতাবিহীন লেখায় অভ্যস্থ ছিলেন এবং পাঠকগণও এই নিয়মে পড়ায় এতই পারদর্শী ছিলেন যে, নুকতা ব্যতীত হরফ পড়তে কোনো ধরনের অসুবিধা হতো না।

শব্দের পূর্বাপরের সাহায্যে একই ধরনের বিভিন্ন হরফের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় অনায়াসেই করতে পারতেন। শুধু তাই নয়, এ ব্যাপারে তারা এতই অভিজ্ঞ ছিলেন যে, কখনো কখনো কেউ যদি তার লেখায় নুকতা দিতেন, তাহলে তাকে অনভিজ্ঞ বলে অভিহিত করা হতো।

সুতরাং মাসহাফে উসমানীও নুকতাবিহীন ছিল। তাছাড়া কুরআনে নুকতা না দেওয়ার আরো একটি কারণ হলো, যেন সকল কেরাতকেই অন্তর্ভুক্ত করা যায়। পরবর্তীতে আনারবী ও আরবি ব্যাকরণ সম্পর্কে অনবহিতদের সুবিধার্থে কুরআনে নুকতা দেওয়া হয়।

তবে সর্বপ্রথম কে কুরআনে নুকতা দিয়েছেন, এ সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। এক বর্ণনা মতে সর্বপ্রথম এ কাজ আঞ্জাম দেন আবুল আসওয়াদ দুওয়ায়লী (র.)। কেউ বলেছেন, এ কার্যাদি আবুল আসওয়াদ দুওয়ায়লী হযরত আলী (রা.)-এর তত্ত্বাবধানে সমাপ্ত করেছেন। ঐতিহাসিক আবুল ফরয বলেন, কূফার গভর্নর তার দ্বারা এই কাজ করিয়েছেন। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, এ কাজ হাসান বসরী, ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামুর ও নাদর ইবনে আছিম (র.)-এর দ্বারা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ করিয়েছেন।

এক বর্ণনা মতে আরবি রুসমুলখত্ব -এর প্রবর্তক হলেন বোলান গোত্রের মুরারা ইবনে মুররাহ আসলাম ও আমির ইবনে হাররাহ। মুরারাহ হলেন হরফের আকৃতির প্রবর্তক, আসলাম সংযুক্ত ও বিচ্ছিন্নকরণের নিয়ম-নীতির প্রবর্তক এবং আমির হলেন নুকতার প্রবর্তক।

অন্য এক বর্ণনা মতে নুকতার সর্বপ্রথম প্রচলন হয় হযরত আবূ সুফিয়ান ইবনে হরব -এর দাদা আবূ সুফিয়া ইবনে উমাইয়া থেকে। তিনি শিখেছেন হিরার অধিবাসীদের থেকে।

حركات হারাকাত বা যবর যের পেশ : নুকতার মতো কুরআনুল কারীমে হরকতের [যবর, যের, পেশ] প্রচলনও প্রথম জামানায় ছিল না। সর্বপ্রথম কে পবিত্র কুরআনে হরকত লাগিয়েছেন, এ ব্যাপারেও মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, পবিত্র কুরআনে সর্বপ্রথম আবুল আসওয়াদ দুওয়াইলী হরকত সংযোজন করেন। কেউ কেউ বলেন, ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামুর ও নস্‌র ইবনে আসেম লাইসী দ্বারা হাজ্জাজ ইবনে ইউসূফ এ কাজ করিয়েছেন।

সকল রেওয়ায়েতের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এ কথাই বুঝে আসে যে, হযরত আবুল আসওয়াদ দুওয়াইলী সর্বপ্রথম হরকত প্রবর্তন করেন।

তবে তৎকালের হরকত আর বর্তমান সময়ের হরকতের মাঝে রয়েছে যথেষ্ট পার্থক্য। তৎকালে যবরের জন্য হরফের উপর এক নুকতা, যেরের জন্য হরফের নীচে এক নুকতা, এবং পেশের জন্য তদ্রূপ হরফের সামনে এক নুকতা এবং তানবীনের জন্য দুই নুকতার ব্যবহার প্রচলিত ছিল।

পরবর্তীতে খলীল আহমদ (র.) হামজা ও তাশদীদ-এর আলামত প্রবর্তন করেন এবং কিছু দিন পরে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ, ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামুরা, নাসির ইবনে আসম লাইসী ও হাসান বসরী (র.)-এর মাধ্যমে পবিত্র কুরআনে একই সময়ে নুকতা এবং হারাকাত লাগানোর নির্দেশ দেন। তখন হরকত প্রকাশের জন্য নুকতার পরিবর্তে বর্তমানের যবর, যের পেশ নির্ধারণ করা হয়। যাতে হরফের নুকতার সাথে এর সংমিশ্রণ না হয়।

حِزْبٌ وَّمَنْزِلٌ মানযিল বা হিযব : সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এবং তাবেয়ীগণ সপ্তাহে কমপক্ষে একবার কুরআন মাজীদ খতম [শেষ] করতেন। আর এ উদ্দেশ্যে তাঁরা দৈনন্দিন তেলাওয়াতের একটা পরিমাণ নির্ধারণ করেছিলেন, যাকে মানযিল বা হিযব বলা হয়। তাই তাঁরা পাঠের সুবিধার্থে পবিত্র কুরআনকে ৭ মানযিলে বিভক্ত করেছেন–

প্রথম মানযিল : সূরা ফাতিহা হতে সূরা আননিসা -এর শেষ পর্যন্ত
দ্বিতীয় মানযিল : সূরা মায়িদা হতে সূরা আত তাওবা -এর শেষ পর্যন্ত
তৃতীয় মানযিল : সূরা ইউনূস হতে সূরা আন নাহল -এর শেষ পর্যন্ত
চতুর্থ মানযিল : সূরা বনী ইসরাঈল হতে সূরা আল ফুরকান -এর শেষ পর্যন্ত
পঞ্চম মানযিল : সূরা আশ-শুআরা হতে সূরা ইয়াসীন -এর শেষ পর্যন্ত
ষষ্ঠ মানযিল : সূরা আস্‌সাফফাত হতে সূরা আল হুজরাত -এর শেষ পর্যন্ত
সপ্তম মানযিল : সূরা কাফ হতে শেষ সূরা পর্যন্ত।

جزء বা পারা : পবিত্র কুরআনে ত্রিশটি অংশে বিভক্ত যাকে ত্রিশ পারা বলা হয়। পারার এই বিভক্তি অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে করা হয়নি; বরং পড়তে যাতে সহজ হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে সমান অংশে কুরআনে কারীমকে বিভক্ত করা হয়েছে। নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন যে, ত্রিশ পারার এই বিভক্তি সর্বপ্রথম কে করেছেন? তবে কারো কারো ধারণা এটা নবী জামাতা হযরত উসমান (রা.) মাসহাফ অনুকপি করানোর সময় পৃথক পৃথক ত্রিশটি পারায় [সহীফায়] লিপিবদ্ধ করিয়েছেন। কিন্তু আল্লামা তকী উসমানী [দা.বা.] বলেন, পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরামের কিতাবে আমি -এর কোন দলিল এ পর্যন্ত পাইনি

আল্লামা বদরুদ্দীন যারকাশী (র.) বলেন, কুরআনের ত্রিশ পারার এই নিয়ম প্রসিদ্ধভাবে ধারাবাহিকতার সাথে চলে আসছে এবং মাদরাসাসমূহের কুরআনী নুসখায়ও এটা প্রচলিত রয়েছে। বাহ্যত মনে হয় যেন এই বণ্টনধারা সাহাবা পরবর্তী যুগে শিক্ষাদানের সুবিধার্থে করা হয়েছে।

أَخْمَاسٌ وَأَعْشَارٌ খুমুস এবং আ'শার : প্রথম যুগের কুরআনি নুসখায় আরেকটি প্রচলন ছিল, তা হলো– পাঁচ আয়াতের পরে হাশিয়াতে খামছ বা خ এবং দশ আয়াত শেষে আ'শার বা ع লেখা হতো

প্রথম প্রকারের চিহ্নকে أَخْمَاس এবং দ্বিতীয় প্রকারের চিহ্নকে أَعْشَار বলে। –[মানাহিলুল ইরফান, খ. ১ম, পৃ. ৪০৩] পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরামের মাঝে এ ব্যাপারে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ বলেন, এই আলামতগুলো জায়েজ, আবার কেউ কেউ বলেন, এগুলো মাকরূহ। –[আল ইতকান, খ. ২য়, পৃ. ১/১৭]
কারণ মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বার বর্ণনা মতে, সাহাবা যুগ থেকেই এগুলোর প্রচলন শুরু হয়.

عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ كَرِهَ التَّعْشِيْرَ فِى الْمُصْحَفِ.

অর্থাৎ হযরত মাসরূক (রা.) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) পাণ্ডুলিপির মাঝে أَعْشَار সংযোজন করাকে অপছন্দ করতেন। –[মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা,খ. ২য়, পৃ. ৪৯৭]-এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আশার সাহাবা যুগে প্রচলিত ছিল।

رُكُوْعٌ রুকূ' : আরেকটি চিহ্ন হচ্ছে রুকূ'। যার প্রবর্তন পরবর্তীকালে করা হয়েছে এবং এ যাবত প্রচলিত হয়েছে। রুকূ' গঠনে সাধারণত আলোচ্য বিষয়ের প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। অর্থাৎ যেখানে এক ধরনের আলোচনা শেষ হয়, সেখানেই হাশিয়াতে রুকূ' এর চিহ্ন দেওয়া হয় আর তার সংকেত হচ্ছে (ع)। উলূমুল কুরআনের প্রণেতা হযরত মাওলানা তাকী

ওসমানী [দা.] বলেন, আমি যথেষ্ট খোজাখুঁজি করেও নির্ভরযোগ্যভাবে জানতে পারিনি যে, কে কবে রুকুর সূচনা করেন। [তারিখুল কুরআন, পৃ. ৮১] কারো কারো ধারণা হচ্ছে, হযরত ওসমান (রা.)-এর সময়েই রুকূ' নির্ধারণ করা হয়। মাওলানা তাকী উসমানী [দা.বা.] বলেন, রেওয়ায়েতে এর কোনো প্রমাণ আমি পাইনি।

অবশ্য একথা প্রায় নিশ্চিত যে, এই আলামতের উদ্দেশ্য হচ্ছে আয়াতের এমন একটি পরিমাণ নির্ণয় করা যা নামাজের এক রাকাতে পাঠ করা যায়। এই চিহ্নগুলোকে রুকূ' এই জন্য বলা হয় যে, নামাজে এই স্থানে পৌঁছে রুকূ' করা হয়।

رُمُوْز وَ اَوْقَاف বিরাম চিহ্ন : কুরআন তেলাওয়াত ও তাজবীদের সহজকরণের নিমিত্তে আরেকটি উপকারী কাজ এটা করা হয়েছে যে, বিভিন্ন বাক্যের শেষে এমন কিছু চিহ্ন দেওয়া হয়েছে, যার দ্বারা বুঝা যাবে যে, এই স্থানে ওয়াকফ করাটা কেমন? এই চিহ্নগুলোকে রুমূয ও আওকাফ বলে। এর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো একজন অনারবী ব্যক্তি যখন কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করবে, তখন যেন সে যথাস্থানে ওয়াক্ফ করতে পারে এবং ভুল স্থানে শ্বাস ত্যাগ করার কারণেও যেন অর্থের মাঝে কোনোরূপ পরিবর্তন সাধিত না হয়। এ ধরনের অধিকাংশ চিহ্নের প্রণেতা হলেন আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে তাইফুর সাজাওয়ান্দী (র.)।

পবিত্র কুরআনের বিরামচিহ্নসমূহ নিম্নরূপ :

ه : বাক্যের শেষে এই চিহ্ন থাকে। এটা ওয়াকফ তাম -এর সংক্ষেপ। বিরতির চিহ্ন। একটি আয়াতের সমাপ্তি বুঝায়। কিন্তু এর উপরে অন্য কোনো চিহ্ন থাকলে সে অনুযায়ী আমল করতে হবে।

ط : এটা ওয়াকফ মুতলাকের সংক্ষিপ্তরূপ। এর উদ্দেশ্য হলো এখানে ধারাবাহিক আলোচনা বা কথার মিল সমাপ্ত হয়েছে। তাই এরূপ চিহ্নিত স্থানে বিরতি করা উত্তম।

ج : এটা ওয়াকফ জায়িজ -এর চিহ্ন। এ চিহ্নিত স্থানে থামা না থামা উভয়েরই অনুমতি আছে। তবে থামাই ভালো।

ز : ওয়াকফে মুযাওয়াযের ইহা সংক্ষিপ্তরূপ। এরূপ চিহ্নিত স্থানে থামা না থামা উভয়ই অনুমতি আছে। তবে এখানে না থামাই ভালো।

ص : এটা ওয়াকফে মুলাখখাসের চিহ্ন। এরূপ চিহ্নিত স্থানে না থেমে মিলিয়ে পড়া ভালো। তবে যেহেতু বাক্য দীর্ঘকার বা প্রলম্বিত হয়েছে সেহেতু নিঃশ্বাস রাখা সম্ভব না হলে বিরতি করা যায়।

م : এটা ওয়াক্ফে লাযেম -এর সংকেত। এরূপ চিহ্নিত স্থানে যদি ওয়াকফ করা না হয়, তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আয়াতের অর্থ বিকৃত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা থাকে। সুতরাং এ স্থানে বিরতি করা [ওয়াকফ্ করা] অতি উত্তম। কেউ কেউ একে ওয়াকফ ওয়াজিব নামেও অভিহিত করেছেন।

তবে এখানে ওয়াজিব বলতে পারিভাষিক ওয়াজিব বুঝানো হয়নি, যা না করলে গুনাহ হয়; বরং এখানে ওয়াজিব বলতে বুঝানো হয় যে, মাঝে মাঝে এই স্থানে ওয়াক্ফ করা অধিক উত্তম।

لا : এটা لَا تَقِفْ-এর সংক্ষেপ। অর্থ এখানে থেমো না। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, এখানে ওয়াক্ফ করা নাজায়েজ; বরং এর অনেক স্থান এমন আছে, যেখানে ওয়াক্ফ করলে কোনো অসুবিধা নেই। এরূপ চিহ্নিত স্থানে যদি ওয়াক্ফ করতে হয় তবে উত্তম হলো একে পুনরায় মিলিয়ে পড়া। উপরোল্লিখিত বিরাম চিহ্নসমূহ সম্পর্কে বিশুদ্ধতম অভিমত হলো এর প্রবর্তনকারী হলেন আল্লামা সাজাওয়ান্দী (রা.)

سَكْتَة : এটা সাকতার চিহ্ন। এ স্থানে পড়া ক্ষান্ত করে কিঞ্চিত থামতে হয়; কিন্তু নিঃশ্বাস ছাড়া যায় না। এটা সাধারণত এমন স্থানে আনা হয়, যেখানে মিলিয়ে পড়লে অর্থের মাঝে ভুল হওয়ার সমূহ আশঙ্কা থাকে। কুরআনের ৪ স্থানে এটা আছে।

قف : এ ধরনের চিহ্নিত স্থানে সাকতার থেকে সামান্য দীর্ঘ বিরতি করতে হয়। এ ধরনের স্থানে নিঃশ্বাস ত্যাগ করা যাবে না।

ق : এটা قِيْلَ عَلَيْهِ -এর সংক্ষেপ। এখানে থামার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে এরূপ চিহ্নিত স্থানে বিরতি হবে, আর অন্যান্যদের মতে বিরতি হবে না।

قف : এর অর্থ থেমে যাও। এরূপ চিহ্নিত স্থানে থামা উচিত

صل : এটা [قَدْ يُوْصَلُ] কাদইউসালু -এর সংক্ষেপ। এরূপ স্থানে থামা না থামা উভয়টাই সঠিক তবে থামাই ভালো।

صلى : এটা اَلْوَصْلُ اَوْلٰى -এর সংক্ষিপ্ত রূপ। অর্থাৎ মিলিয়ে পড়া উত্তম এই অর্থ প্রকাশ করে।

مُعَانَقَة - مع এটা মু'আনাকা নামে অভিহিত। আয়াতের বা শব্দের ডানে বা বামে উক্ত তিন বিন্দু অথবা مع -এর চিহ্ন থাকে অথবা বলা হয় এক আয়াতের দুটো তাফসীর যেখানে সম্ভব, সেখানে এই চিহ্ন লেখা হয়েছে। এক তাফসীর অনুযায়ী এক স্থানে ওয়াক্ফ হবে এবং অন্য তাফসীর অনুযায়ী অন্য স্থানে ওয়াক্ফ হবে।

তবে এ দুয়ের মাঝে যেকোনো এক স্থানেও ওয়াক্ফ করতে পারে; কিন্তু যদি এক স্থানে বিরতি করে তাহলে অন্য স্থানে ওয়াকফ করা জায়েজ নেই -[উলূমুল কুরআন, পৃ.২০০] একে مُقَابَلَه নামেও অভিহিত করা হয়।

وَقْفُ النَّبِى : কোনো কোনো রেওয়ায়েত মুতাবিক হযরত মুহাম্মদ ﷺ এখানে ওয়াক্ফ করেছিলেন।

وَقْفُ جِبْرَئِيْل : এরূপ চিহ্নিত স্থানে থামলে বরকত লাভ হয় বলে বর্ণিত আছে।

وَقْف غُفْرَان : এর চিহ্নিত স্থানে ওয়াকফ করলে গুনাহ মাফ হওয়ার আশা করা যায়।

الربع : এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ পারার এক চতুর্থাংশ।

النصف : অর্ধাংশ অর্থাৎ পারার অর্ধাংশ।

الثلث : তিন চতুর্থাংশ অর্থাৎ পারার তিন চতুর্থাংশ। -[প্রাগুক্ত : ১৯৩-২০১]

কুরআনের আয়াত ও সূরাসমূহের তারতীব ও ধারাবাহিকতা : কুরআন শরীফের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সকল আয়াত ও সূরা যে তারতীবে আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান রয়েছে, মূলত সেটাই আল্লাহ তা'আলার মনোনীত একমাত্র তরতিব। হযরত জিব্রাঈল (আ.)-এর মারফত রাসূল ﷺ -এর প্রতি ওহী প্রেরণ করে তিনি কুরআনের এই ধারাক্রম নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অতঃপর হুজুর ﷺ সাহাবায়ে কেরামকেও এই তরতিবে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং এ কথা স্পষ্ট যে, কুরআনে বর্তমান তরতিব একান্তই ওহীগত একটি বিষয়। এ বিষয়ে আল্লামা সুয়ূতী (র.) মুসলিম উম্মাহর ইজমা উল্লেখ করে লিখেন- تَرْتِيْبُ الْاٰيَاتِ فِى السُّوَرِ بِتَوْقِيْفِيَّةٍ ﷺ اَمْرُهٗ غَيْرُ خِلَافٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ-

অর্থাৎ "কুরআনের প্রত্যেক সূরা আয়াতসমূহের তারতিব আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল ﷺ কে অবগত করানোর পর সুবিন্যস্ত হয়েছে। এ সম্পর্কে গোটা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই। -[হাশিয়াতুল জামাল, খ. ১. পৃ. ১২]

কুরআনের প্রথম ৭টি সূরা বড়। পরিভাষায় এগুলোকে سَبْع طِوَال বলা হয়। সূরা বাকারা হতে তওবা পর্যন্ত। তার পর কম বেশি একশত আয়াত সম্বলিত বৃহৎ সূরাগুলো রয়েছে। পরিভাষায় এগুলোকে مِيْئِيْن [মিঈন] বলা হয়। এরূপ সূরা -সূরা ইয়াসীন থেকে সূরা কাফ পর্যন্ত ২৪টি। তারপর রয়েছে শতের কম আয়াত সম্বলিত সূরাসমূহ এসব বলা হয় مَثَانِى [মাছানী] এ সূরাগুলোতে ঘটনাবলি ও উপদেশসমূহের পুনরুক্তি রয়েছে, তাই এগুলোকে মাছানী বলে নামকরণ করা হয়েছে। তারপর রয়েছে ছোট সূরাগুলো- এগুলোকে বলা হয় مُفَصَّل মুফাসসাল। সূরা হুজরাত থেকে শেষ পর্যন্ত সূরাগুলোকে মুফাসসাল বলে।

মুফসসাল সূরাগুলো আবার তিনভাগে বিভক্ত :

১. طِوَال مُفَصَّل : সূরা হুজুরাত থেকে সূরা বুরূজ পর্যন্ত সূরাগুলোকে তিওয়ালে মুফাসসাল বলা হয়। এতে মোট ৩০টি সূরা রয়েছে।

২. اَوْسَط مُفَصَّل : সূরা বুরূজ থেকে সূরা বায়্যিনাহ [সূরা লাম ইয়াকুন] পর্যন্ত সূরাগুলোকে আওসাতে মুফাসসাল বলা হয় এতে মোট ১৩টি সূরা রয়েছে।

৩. قِصَار مُفَصَّل : সূরা বায়্যিনাহ [লাম ইয়াকুন] থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলোকে কিসারে মুফাসসাল বলা হয়। এতে মোট ১৭টি সূরা রয়েছে। -[তাফসীর শাস্ত্র পরিচিতি : ই. ফা. বা]

তাফসীর পরিচিতি

তাফসীর শব্দের আভিধানিক অর্থ : [تَفْسِيْر] তাফসীর শব্দটি একবচন, বহুবচনে [تَفَاسِيْر] তাফাসীর। এর অর্থ- ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ বা ভাষ্য। ইসলামে তাফসীর শব্দটি এক বিশেষ পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তাফসীর শব্দটি দ্বারা কুরআনে কারীমের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকেই বুঝায়।

তাফসীর تَفْسِيْر শব্দটি بَاب تَفْعِيْل-এর مَصْدَر শব্দমূল فَسْرٌ থেকে গঠিত। অর্থ প্রকাশ করা, স্পষ্ট করা, উন্মুক্ত করা, বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা, প্রসারিত করা। সাধারণ অর্থে কোনো কথা বা বাক্যকে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করাকে তাফসীর বলে।

কারো কারো মতে سَفْرٌ শব্দ থেকে উল্টিয়ে فَسْرٌ গঠন করা হয়েছে। সকালের আলো উদ্ভাসিত হলে আরবের লোকেরা বলে أَسْفَرَ الصُّبْحُ

আরো বলা হয়- سَفَرَتِ الْمَرْأَةُ سُفُوْرًا অর্থাৎ স্ত্রীলোকটি তার মুখমণ্ডল থেকে পর্দা সরিয়ে দিয়েছে। -[আল মুনজিদ : ৬৩৩]

তাফসীর শব্দের পারিভাষিক অর্থ : আল্লামা যারকাশী (র.) লিখেন-

عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهٖ فَهْمُ كِتَابِ اللّٰهِ الْمُنَزَّلِ عَلٰى نَبِيِّهٖ مُحَمَّدٍ ﷺ مَعَانِيْهِ وَاسْتِخْرَاجُ اَحْكَامِهٖ وَحِكَمِهٖ -

অর্থাৎ তাফসীর হলো, এমন শাস্ত্র যা দ্বারা কুরআনের বুঝ অর্জিত হয় এবং কুরআনের অর্থের ব্যাখ্যা, তার আহকামও হিকমতসমূহের উদঘাটন করা যায়। -[আল বুরহান খ.১, পৃ. ১৩]

নবুয়ত যুগের নিকটবর্তীতা এবং বিষয়ভিত্তিক শাস্ত্রগত রূপ পরিগ্রহ না করায় তাফসীর শাস্ত্রেরও কোনো শাখা-প্রশাখা ছিল না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন তাফসীরশাস্ত্র একটি বিধিবদ্ধ শাস্ত্রের রূপ ধারণ করে এবং এর বিভিন্ন দিকের প্রতি অনুসন্ধিৎসু গবেষকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে থাকে তখন এই শাস্ত্র অসংখ্য শাখা- প্রশাখায় সুবিস্তৃত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। সময়ের প্রয়োজনুপাতে এতে আরো অধিকতর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সংযোজিত হয়ে ব্যাপকতর হতে থাকে। এ সমুদয় বিষয়াবলির প্রেক্ষাপটে তাফসীরশাস্ত্রের পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নরূপ-

اَلتَّفْسِيْرُ عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيْهِ عَنْ كَيْفِيَّةِ النُّطْقِ بِاَلْفَاظِ الْقُرْاٰنِ وَمَدْلُوْلَاتِهَا وَاَحْكَامِهَا الْاِفْرَادِيَّةِ وَالتَّرْكِيْبِيَّةِ وَمَعَانِيْهَا الَّتِىْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ حَالَةَ التَّرْكِيْبِ وَتَتِمَّاتٌ لِذٰلِكَ

তাফসীর এমন এক বিদ্যা, যার মাঝে কুরআনের শব্দাবলির গঠন পদ্ধতি, এর প্রকৃত অর্থ ও নির্দেশাবলি, শব্দ ও বাক্য বিন্যাস এবং এর মর্মার্থ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। -[রূহুল মাআনী খ. ১, পৃ. ৪]

এই সংজ্ঞার আলোকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো তাফসীর শাস্ত্রের অন্তর্গত হয়েছে-

১. **কুরআনের শব্দাবলি উচ্চারণ পদ্ধতি :** অর্থাৎ কুরআনের শব্দাবলিকে কোন নিয়ম ও পদ্ধতিতে পড়া যাবে এ সম্পর্কিত আলোচনা। এই বিষয়টি আলোচনা ও ব্যাখ্যার জন্য আরবিভাষী প্রাচীন তাফসীরকারগণ স্ব স্ব তাফসীরগ্রন্থে প্রতিটি আয়াতের সাথে এর গঠনরীতি ও উচ্চারণ পদ্ধতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করতেন। এ উদ্দেশ্যে ইলমে কিরাত নামে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রও বিদ্যমান রয়েছে।

২. **কুরআনের শব্দার্থ : অর্থাৎ কুর**আনের শব্দসমূহের আভিধানিক অর্থ পরিজ্ঞাত হয়েছে এ জন্য অভিধানশাস্ত্রে পরিপূর্ণ জ্ঞান অপরিহার্য। মূলত এ কারণেই তাফসীর- গ্রন্থসমূহে অভিধান বিশেষজ্ঞদের অভিমত ও আরবি সাহিত্যের অধিকতর দৃষ্টি পরিলক্ষিত হয়।

৩. **শব্দের স্বতন্ত্র ও নিজস্ব বিধান :** অর্থাৎ প্রতিটি শব্দ সম্পর্কে অবগত হওয়া যে, শব্দটির মূলধাতু কি? বর্তমান গঠন আকৃতিতে কিভাবে আসলো? এর কাঠামোগত ধরন কি? আর এই ধরনের অর্থ ও বৈশিষ্ট্যই বা কি? এ বিষয়গুলো জানার জন্য সরফশাস্ত্রের জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

৪. **শব্দের বাক্য বিন্যাস পদ্ধতি :** অর্থাৎ প্রতিটি শব্দ সম্পর্কে অবগত হওয়া যে, শব্দটি অপর শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে কোন অর্থটি প্রকাশ করছে? এর নাহুশাস্ত্রগত বিন্যাস কোন পদ্ধতির? শব্দটির উপর বর্তমান হরকতটি কেন আসলো এবং কোন অর্থটির প্রতি ইঙ্গিত করছে? এ বিষয়গুলার জন্য ইলমে নাহু ও ইলমে মা'আনীর সাহায্য গ্রহণ করতে হয়।

৫. **বিন্যস্ত অবস্থায় শব্দগুলোর সামষ্টিক অর্থ :** অর্থাৎ পুরো আয়াতটি তার পূর্বাপর সম্পৃক্ততার মাধ্যমে কোন অর্থটি প্রকাশ করছে। এ উদ্দেশ্যে আয়াতের বিষয়বস্তুর নিরিখে বিভিন্ন শাস্ত্র হতে সাহায্য গ্রহণ করা হয়। উপরোল্লিখিত শাস্ত্র ও

বিষয়বস্তু ছাড়াও কোনো কোনো সময় আরবি সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইলমে হাদীস আবার কোনো কোনো সময় উসূলে ফিকহের শরণাপন্ন হতে হয়।

৬. **অর্থসমূহের পরিশিষ্ট :** অর্থাৎ কুরআনি আয়াতের প্রেক্ষাপট এবং কুরআনে যে আয়াতটি সংক্ষিপ্তভাবে এসেছে এর ব্যাখ্যা প্রদান করা। এ উদ্দেশ্যে অধিকতর ক্ষেত্রে ইলমে হাদীসের সাহায্য নিতে হয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও বিষয়টি এতো ব্যাপক যে, এতে দুনিয়ার সমগ্র জ্ঞানও অভিজ্ঞতাই নিয়োজিত করা যায়। কেননা কোনো কোনো ক্ষেত্রে কুরআনুল কারীমে অতি সংক্ষিপ্ত একটি বাক্য ইরশাদ হয়েছে; কিন্তু তথ্য ও তত্ত্বের এক অসীম জাহান তার মধ্যে গুপ্ত রয়ে গেছে। যেমন- কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- وَفِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ অর্থাৎ "আর তোমরা নিজেদের মধ্যে চিন্তা কর; তোমরা কি অনুধাবন কর না"।

এই সংক্ষিপ্ত বাক্যের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিরাট অংশ এসে যাবে। এতদসত্ত্বে ও এ কথা বলা যাবে না যে, আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে তাঁর বৈচিত্র্যময় নিপুণ সৃষ্টির যে তত্ত্বের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তা যথাযথভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে। সুতরাং তাফসীরের এই দিকটিতে বুদ্ধি-জ্ঞান,অভিজ্ঞতা ও প্রামাণ্য তথ্যের মাধ্যমে বিস্ময়কর বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত হবে। -[উলূমুল কুরআন : তাকী উসমানী ৩২৪-৩২৫]

তাফসীর ও তা'বীলের মধ্যে পার্থক্য : প্রাথমিক যুগে তাফসীর অর্থে তাবীল শব্দটি সমভাবে ব্যবহৃত হতো। স্বয়ং কুরআনুল কারীম তাঁর তাফসীর অর্থে এ শব্দটি ব্যবহার করেছে- وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهٗٓ اِلَّا اللّٰهُ

ইমাম আবূ উবাইদ (র.)-সহ কয়েকজন বিশেষজ্ঞের অভিমত হলো দুটি শব্দই অভিন্ন অর্থবোধক। তবে অন্যান্য পণ্ডিত ব্যক্তিগণ শব্দ দু'টির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের চেষ্টা করছেন। কিন্তু পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে পরস্পর বিরোধী অভিমত প্রকাশ করেছেন। সবগুলো অভিমত এখানে সন্নিবেশিত করা কঠিন ব্যাপার। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে কয়েকটি অভিমত তুলে ধরা হলো-

১. ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রত্যেকটি শব্দের ব্যাখ্যা হলো তাফসীর। আর বাক্যের সমষ্টিগত ব্যাখ্যার নাম হলো তাবীল।
২. শব্দের বাহ্যিক অর্থ বর্ণনাকে বলা হয় তাফসীর। মূল উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা হলো তাবীল।
৩. যেসব আয়াতের একাধিক অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেসব আয়াতেরই শুধুমাত্র তাফসীর হয়। তা'বীলের অর্থ হলো আয়াতের যেসব ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা হওয়া সম্ভব, এর মধ্যে কোনো একটিকে দলিল প্রমাণের দ্বারা গ্রহণ করা।
৪. প্রত্যয়ের সাথে ব্যাখ্যা করাকে তাফসীর বলা হয়। আর তা'বীল বলা হয় বিষয়বস্তু হতে নির্গত শিক্ষা ও ফলাফলের ব্যাখ্যাকে।

সারকথা, এ সম্পর্কিত আলোচনায় প্রকৃত প্রস্তাবে আবূ উবাইদা (রা.)-এর অভিমতটিই সঠিক বলে অনুমিত হয় তাঁর মতে তাফসীর ও তাবীল শব্দ দু'টির মধ্যে ব্যবহারিক দিক থেকে প্রকৃত কোনো ব্যবধান নেই। যে সকল গবেষকগণ পার্থক্য নির্ণয়ের প্রয়াস পেয়েছেন, তাদের পরস্পর মতের ব্যবধানের প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, এটি কোনো সুনির্দিষ্ট মতৈক্যে প্রতিষ্ঠিত পরিভাষা হতে পারে না। উভয় শব্দের মধ্যে সত্যিই কোনো পার্থক্য থাকলে বিশেষজ্ঞদের মতানৈক্যের কোনো অর্থ হয় না। বিষয়টি এমন মনে হয় যে কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ তাফসীর ও তা'বীল শব্দদ্বয়কে ভিন্ন ভিন্ন পরিভাষা হিসেবে মর্যাদা দিতে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু তা করতে গিয়ে পরস্পর বিরোধী এমন অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, কোনোটিই তার সামগ্রিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। তাই দেখা যায় প্রথম থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত সকল তাফসীর বিশারদ তাফসীর ও তাবীল শব্দ দু'টিকে একটির স্থলে অন্যটি ব্যবহার করেছেন। সুতরাং এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকেনি। -[প্রাগুক্ত : ৩২৫ ও ৩২৬]

তাফসীরের আলোচ্য বিষয় : آيَاتُ الْقُرْآنِ مِنْ حَيْثُ فَهْمِ مَعَانِيْهِ অর্থাৎ মর্ম ও ব্যাখ্যা জানার দিক থেকে আল কুরআনের আয়াতসমূহ তাফসীরের আলোচ্য বিষয়। -[হাশিয়ায়ে সাবী খ. ১, পৃ. ৪]

ইলমে তাফসীরের শরয়ী হুকুম : اَلْوَاجِبُ الْكِفَائِيُّ অর্থাৎ কিছু সংখ্যক লোকের উপর ফরজে কেফায়া। কেউ না শিখলে সকলে গুনাহগার হবে।

তাফসীরের লক্ষ্য উদ্দেশ্য : اَلْفَوْزُ بِسَعَادَةِ الدَّارَيْنِ ـ اَمَّا لِدُنْيَا فَبِامْتِثَالِ الْأَوَامِرِ وَاجْتِنَابِ النَّوَاهِيْ، وَأَمَّا فِى الْاٰخِرَةِ فَبِالْجَنَّةِ وَنَعِيْمِهَا ـ

অর্থাৎ উভয় জগতের সৌভাগ্য লাভে ধন্য হওয়া। দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ পালন করতে এবং আখিরাতে জান্নাত ও তার নিয়ামতরাজি লাভে। -[হাশিয়ায়ে সাবী খ. ১, পৃ. ৪]

তাফসীরের উৎস

তাফসীরের উৎস বলতে বুঝায় যার মাধ্যমে কোনো আয়াতের তাফসীর বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ জানা যায়। তাফসীরের উৎসসমূহ নিম্নরূপ–

১. **আল কুরআনুল কারীম :** তাফসীর শাস্ত্রের উৎস স্বয়ং কুরআনুল কারীম অর্থাৎ কুরআনের কোনো কোনো আয়াত কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি আরেকটির ব্যাখ্যা প্রদান করে। এক স্থানে একটি কথা অস্পষ্টভাবে বলা হলো এবং অন্য স্থানে এই অস্পষ্টতাকে দূর করে স্পষ্ট করে দেওয়া হলো। যেমন সূরা ফাতেহায় ইরশাদ হয়েছে–

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ . صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ .

উক্ত আয়াতে আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত লোক কারা? এ সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। কিন্তু অন্যত্র বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করে ইরশাদ হয়েছে– اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاۤءِ وَالصّٰلِحِيْنَ

এমনিভাবে এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ

কিন্তু সেই কালেমা বা বাক্যগুলো কি ছিল? একথা বলা হয়নি; অন্যত্র এই কালেমা বা বাক্যগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে– قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَاۤ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

২. **আল হাদীস :** রাসূল ﷺ -এর জীবন কুরআন শরীফের বাস্তব ও জীবন্ত ব্যাখ্যা। রাসূল ﷺ -এর জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কেরাম কোনো আয়াতের মর্ম উদ্ধারে জটিলতা অনুভব করলে তার নিকট যেতেন। তিনি সকল সমস্যা, সংশয় ও জটিলতার সমাধান করতেন। কারণ কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও রাসূল ﷺ -এর দায়িত্বের অন্যতম । আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَاَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ

অতএব কুরআন দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল ﷺ -এর শিক্ষা ও আদর্শ হচ্ছে কুরআন তাফসীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

৩. **اَقْوَالُ الصَّحَابِىْ বা সাহাবায়ে কেরামের উক্তি :** সাহাবায়ে কেরাম হলেন নবী করীম ﷺ -এর নিকট সরাসরি কুরআনের তা'লীম প্রাপ্ত সৌভাগ্যবান পূত পবিত্র ব্যক্তিবর্গ। তাঁরা ছিলেন কুরআনের ভাষাভাষী। কুরআন অবতরণ ও সামগ্রিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক অবগত। এ জন্য তাদের উক্তি ও অভিমত তাফসীরের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে ধর্তব্য। তাই সাহাবীগণ থেকে বিশুদ্ধ বর্ণনা পাওয়া গেলে তা মারফূ' হাদীস সমতুল্য হবে। তাঁদের বর্ণনাকে ব্যক্তিগত অভিমত বলে পরিত্যাগ করা যাবে না। কেননা তাঁরা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার গোপন রহস্য, বর্ণনাভঙ্গি ও পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তাঁরা কুরআন নাজিলের প্রকৃত অবস্থা ও পরিস্থিতি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছেন। এছাড়া আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অসাধারণ স্মরণশক্তি ও মেধা দান করেছিলেন।

৪. **اَقْوَالُ التَّابِعِىْ তাবেয়ীগণের বক্তব্য :** যেসব মহৎ ব্যক্তিবর্গ সাহাবায়ে কেরামের মুখ থেকে কুরআনের ব্যাখ্যা শুনার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরাই হলেন তাবেয়ী। এ কারণে তাবেয়ীগণের বক্তব্যও তাফসীরশাস্ত্রে বিশেষ গুরুত্ব রাখে। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেন, তাবেয়ী কোনো সাহাবী হতে তাফসীর উদ্ধৃত করলে তা সাহাবায়ে কেরামের তাফসীরেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। আর তাবেয়ী তাঁর নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করলে দেখা হবে, অন্যকোনো তাবেয়ীর অভিমত তাঁর বিরোধী কিনা? যদি কোনো অভিমত তার অভিমতের বিরোধী হয়, তবে তাবেয়ীর উক্তি বা অভিমত হুজ্জত হিসেবে গণ্য হবে না। এমতাবস্থায় আয়াতের তাফসীরের জন্য কুরআনুল কারীম, আরবি অভিধান, হাদীসে নববী, সাহাবায়ে কেরামের উক্তি ও অন্যান্য শরয়ী দলিল প্রমাণের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে। আর তাবেয়ীগণের মধ্যে মতানৈক্য না হলে নিঃসন্দেহে তাঁর তাফসীর হুজ্জত হবে। এই তাফসীরের অনুসরণ করা ওয়াজিব হবে।

৫. **আরবি অভিধান :** কুরআনের যেসব আয়াতের বিষয়বস্তু এতই সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্য যে, যার আলোচ্য বিষয়ে কোনো প্রকার অস্পষ্টতা ও সংক্ষিপ্ততা নেই এবং বুঝার জন্য ঐতিহাসিক যোগসূত্রতা জানার প্রয়োজন নেই, সেখানে তাফসীরের জন্য আরবি অভিধান-ই একমাত্র উৎস। কিন্তু যেখানে কোনো অস্পষ্টতা ও সংক্ষিপ্ততা দেখা যায় বা যে আয়াত কোনো সংঘটিত ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত বা এর দ্বারা কোনো ফিকহী বিধান উদঘাটন করা হয়, সেখানে কেবল অভিধানের উপর নির্ভর করে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। এমতাবস্থায় উপরিউক্ত উৎসগুলোই মূল ভিত্তি হিসেবে সাব্যস্ত হবে।

৬. عَقْل سَلِيْم **বা শান্ত ও পরিশুদ্ধ বিবেক বুদ্ধি :** দুনিয়ার প্রতিটি কাজে কর্মেই শান্ত, পরিমার্জিত ও পরিশুদ্ধ বিবেক-বুদ্ধির একান্ত প্রয়োজন। পূর্বোক্ত উৎসগুলোর দ্বারা উপকৃত হতে হলেও এই গুণটি ব্যতীত তা সম্ভব নয়। এতদসত্ত্বেও এটিকে একটি স্বতন্ত্র উৎস হিসেবে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো কুরআন শরীফ একটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিপুণ ও বৈচিত্র্যময় তথ্য ও তত্ত্বের অতলান্ত মহাসমুদ্রের ন্যায়। উপরোল্লিখিত পঞ্চ উৎসের মাধ্যমে প্রয়োজনানুযায়ী এর বিষয়বস্তু জানা যাবে; কিন্তু এর তথ্য ও তত্ত্ব, হিকমত ও দর্শনের বিষয়ে কোনো যুগেই একথা বলা যাবে না যে, এর প্রান্তসীমা আবিষ্কৃত হয়ে গেছে এ সম্পর্কে আর অধিক বলা বা আবিষ্কারের কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু প্রকৃত ও বাস্তব সত্য হলো কুরআনের তথ্য ও তত্ত্বের অনুসন্ধান, চিন্তা ও গবেষণার দ্বার কিয়ামত পর্যন্ত উন্মুক্ত থাকবে। মহান আল্লাহ যাকে ইলম, জ্ঞান, বুদ্ধি ভয় ভীতি ও সান্নিধ্যের দৌলতে সৌভাগ্যশীল করবেন, তিনি এই উন্মুক্ত দ্বারে প্রবেশ করে নব বৈচিত্র্যময় দিগন্ত উন্মোচিত করতে সচেষ্ট হবেন। এভাবেই তাফসীরকারগণ যুগে যুগে নিজেদের আকণ্ঠ নিমগ্ন সাধনায় মানবজ্ঞানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে এসেছেন। এটি এমন এক মহাভাণ্ডার, যার জন্য আল্লাহর পেয়ারা হাবীব হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অনুকূলে দোয়া করেছেন– اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ التَّاوِيْلَ وَفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ অর্থাৎ হে আল্লাহ! একে তাফসীরের জ্ঞান ও দীনের প্রজ্ঞা দান করুন।

স্মরণ রাখতে হবে সমঝ, আকল ও বুদ্ধির উদঘাটিত যেসব তথ্য তত্ত্ব গ্রহণীয় হবে, সেগুলো যেন শরিয়তের অন্যান্য মৌলনীতি ও উপরোল্লিখিত পঞ্চ উৎসের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। শরিয়তে মৌলনীতির উপর আঘাত করে যত তথ্য ও তত্ত্বই বর্ণনা করা হোক ইসলামে এর কোনোই মূল্য নেই। –[উলূমুল কুরআন : তাকী উসমানী ৩২৭-৩৪৩]

তাফসীরের অগ্রহণযোগ্য উৎসসমূহ :

- **ইসরাঈলী রেওয়ায়েত :** যে সকল রেওয়ায়েত ইহুদি বা খ্রিস্টানদের মাধ্যমে আমাদের নিকট পৌঁছেছে, সেগুলোকে বলা হয় اِسْرَائِيْلِيَّاتٌ [ইসরাঈলী বর্ণনা] এই বর্ণনাগুলোর কিছু সরাসরি বাইবেল বা তালমুদ নামক গ্রন্থ হতে নেওয়া হয়েছে। কিছু অংশ এসেছে মুসনা বা তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ হতে। কিছু বর্ণনা রয়েছে মৌখিক। আহলে কিতাবদের মাঝে কাল পরম্পরায় এগুলো বর্ণিত ও শ্রুত হয়ে আসছে। আরবের ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মাঝে এগুলো ছিল খুবই প্রসিদ্ধ। প্রচলিত তাফসীর গ্রন্থসমূহে বিপুল পরিমাণে এই ইসরাঈলী রেওয়ায়েত দেখা যায়। সুবিখ্যাত গবেষক ও তাফসীরকার আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) এই রেওয়ায়েতগুলোর হুকুম বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন– এই ধরনের রেওয়ায়েত তিন প্রকারে বিভক্ত এবং প্রত্যেক প্রকারের হুকুম ভিন্ন ভিন্ন। যথা–

১. নির্ভরযোগ্য দলিল প্রমাণের দ্বারা যেসব ইসরাঈলী রেওয়ায়েত সত্যায়িত হয়েছে। যেমন– ফেরাউনের নদী বক্ষে নিমজ্জিত হওয়া, হযরত মূসা (আ.)-এর তূর পাহাড়ে গমন, যাদুকরদের সাথে তাঁর মোকাবেলা হওয়ার ঘটনা। এ সকল বর্ণনা এ জন্যেই গ্রহণযোগ্য হবে যে, কুরআনুল কারীম বা সহীহ হাদীস এগুলোর সত্যায়ন করেছে।

২. নির্ভরযোগ্য দলিলাদির দ্বারা যেসব ইসরাঈলী বর্ণনা মিথ্যা হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে। যেমন হযরত সুলাইমান (আ.) জীবনের শেষপ্রান্তে এসে [মাআযাল্লাহু] মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়ে পড়েন [বাইবেল: কিতাব সালাতীন: ১/ ১১-১৩]

কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় এই বর্ণনার প্রতিবাদ করেছে। সুতরাং এ ধরনের ইসরাঈলী রেওয়ায়েত সম্পূর্ণ বাতিল ও মিথ্যা বলে সাব্যস্ত হয়েছে।

৩. নির্ভযোগ্য দলিল প্রমাণের দ্বারা যেসব ইসরাঈলী বর্ণনার সত্য বা মিথ্যা হওয়ার কোনোটাই প্রমাণিত হয় না। যেমন তাওরাতের বিধানসমূহ। এমন ইসরাঈলী রেওয়ায়েত সম্পর্কে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– لَا تُصَدِّقُوْهَا وَلَا تُكَذِّبُوْهَا অর্থাৎ "এগুলোকে সত্যও বলো না, মিথ্যাও বলো না"।

এই প্রকারের রেওয়ায়েত বর্ণনা করা জায়েজ আছে বটে, কিন্তু এগুলোর উপর কোনো শরয়ী বিষয়ের ভিত্তি করা যায় না, তেমনি এগুলো বয়ান করার দ্বারা বিশেষ কোনো উপকারও নেই।

- **সুফিয়ায়ে কেরামের তাফসীর :** কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন আয়াতের অধীনে সুফিয়ায়ে কেরামের কিছু এমন কথা বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো বাহ্যত তাফসীর'ই মনে হয়; কিন্তু তা আয়াতের বাহ্যিক ও বর্ণিত অর্থের পরিপন্থি হয়ে থাকে। যেমন কুরআনের ইরশাদ হয়েছে- قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ অর্থাৎ "তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ কর।"

এই আয়াতের অধীনে কোনো কোনো সূফী সাধক বলেছেন– قَاتِلُوا النَّفْسَ فَاِنَّهَا تَلِىَ الْاِنْسَانَ অর্থাৎ "তোমরা নফসের সাথে যুদ্ধ কর কেননা, এটা মানুষের সবচেয়ে নিকটবর্তী।"

◗ তাফসীর বির রায় : এ সম্পর্কে আলোচনা সামনে আসছে।

তাফসীরের শর্ত : তাফসীরের শর্ত বলতে মুফাসসির -এর শর্তকেই বুঝায়। অর্থাৎ যিনি তাফসীর করবেন তার কি কি জিনিস জানা থাকতে হবে? যা ছাড়া তাফসীর করলে তা তাফসীর বিররায় তথা নিজস্ব মনগড়া তাফসীর হিসেবে গণ্য হবে। আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেন, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা শরিয়তের ইলম, আরবি সাহিত্য, ফিক্‌হ, নাহু, বালাগাত ইত্যাদি শাস্ত্রের গভীর জ্ঞান দান করেছেন, তারাই কেবল তাফসীর করার ক্ষমতা রাখেন।

পরবর্তী যুগের ওলামায়ে কেরাম একমত হয়েছেন যে, ১৫ টি বিষয়ে জ্ঞান না থাকলে কেউ মুফাসসির হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।

বিষয়গুলো নিম্নরূপ :

১. ইলমে লুগাহ তথা ভাষা জ্ঞান। এর দ্বারা কুরআনের একক শব্দসমূহের অর্থ জানা যায়।

২. ইলমে নাহু তথা আরবি বাক্য প্রকরণ শাস্ত্র। কেননা যের-যবরের ও পেশের পরিবর্তনে বাক্যের অর্থও পাল্টে যায়।

৩. ইলমে তাসরীফ তথা আরবি শব্দ প্রকরণ শাস্ত্র। কেননা শব্দ গঠন প্রণালীর বিভিন্নতার কারণে অর্থও ভিন্ন হয়ে যায়। আল্লামা যমখশরী (র.) তাঁর রচিত 'উজুবাতে তাফসীর'। কিতাবে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি ইলমে সরফ না জানার কারণে কুরআনের আয়াত– يَوْمَ نَدْعُوْ كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ (بَنِىْ اِسْرَائِيْل . ٧١) অর্থাৎ যে দিন আমি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার ইমাম ও নেতাদের সাথে আহ্বান করব– এর তাফসীর করল– যে দিন আমি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার মায়ের সাথে ডাকব এখানে সে اِمَامٌ শব্দটিকে اُمٌّ [মা]-এর বহুবচন মনে করেছে। যদি সে ইলমে সরফ ভাল করে জানত তবে সে বুঝতে পারত যে, اُمٌّ -এর বহুবচন اِمَامٌ আসে না।

৪. ইলমে ইশতেক্বাক তথা শব্দসমূহের উৎস জ্ঞান। কেননা কোনো শব্দ যখন দুটি ধাতু হতে নির্গত হয়ে আসে, তখন তার অর্থ ভিন্ন হয়ে যায়। যেমন– مَسِيْحٌ একটি শব্দ। এটা مَسْحٌ ধাতু হতে নির্গত হলে অর্থ হবে স্পর্শ করা এবং কোনো কিছুর উপর ভিজা হাত বুলানো। আর مَسَاحَةٌ হতে নির্গত হলে এর অর্থ হবে পরিমাপ করা।

৫. ইলমে মা'আনী তথা শব্দসমূহের নিগুঢ় ভাব ও অর্থ জ্ঞান। এ ইলম দ্বারা অর্থ হিসেবে বাক্যের পরস্পর সম্পর্ক জানা যায়।

৬. ইলমে বয়ান তথা আরবি অলঙ্কার শাস্ত্র। এই ইলম দ্বারা বাক্যের স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতা এবং তুলনা ও ইশারা-ইঙ্গিত জানা যায়।

৭. ইলমে বদী তথা আরবি অলঙ্কার শাস্ত্র। এই শাস্ত্র দ্বারা ভাব-প্রকাশে বাক্যের সৌন্দর্য জানা যায়। মাআনী, বয়ান ও বদী এই তিনটিকে একত্রে ইলমে বালাগাত বলা হয়। কুরআন তাফসীরের জন্য এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ কুরআন মাজিদ হলো সম্পূর্ণরূপে অলৌকিক গ্রন্থ। আর এ তিন শাস্ত্রের মাধ্যমে তার অলৌকিকত্ব জানা যায়।

৮. ইলমে কেরাত তথা কেরাতের বিভিন্নতা সম্পর্কে জ্ঞান। বিভিন্ন কেরাত দ্বারা বিভিন্ন অর্থ এবং এক অর্থের উপর অন্য অর্থের প্রাধান্য জানা যায়।

৯. ইলমে উসূলে দীন তথা দীনের মূলনীতি সম্পর্কে জ্ঞান। কুরআনে অনেক আয়াত এমন আছে, যেগুলোর জাহেরী অর্থ আল্লাহ পাকের শানে ব্যবহার করা ঠিক হয় না। তাই এসব আয়াতের ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন দেখা দেয়। যেমন– يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ –[সূরা ফাতাহ : ১০]

১০. ইলমে উসূলে ফিকহ তথা ফিকহ বা ইসলামি আইন শাস্ত্রের মূলনীতিসমূহ। এই শাস্ত্রদ্বারা দলিল প্রমাণের প্রয়োগ ও বিধি-বিধান আহরণের কারণসমূহ জানা যায়।

১১. শানে নুযূল বা কুরআন নাজিলের কারণ ও প্রেক্ষাপট সংক্রান্ত জ্ঞান। শানে নুযূলের দ্বারা আয়াতের অর্থ– অধিক সুস্পষ্ট হয়।

১২. নাসিখ ও মানসূখ সম্পর্কিত জ্ঞান।

১৩. ইলমে ফিকহ তথা ইসলামি আইন শাস্ত্র। এই শাস্ত্র দ্বারা শাখাগত বিধানসমূহ আহরণ করা যায়।

১৪. আহাদীসে মানি'য়্যাহ । অর্থাৎ ঐ সকল হাদীস জানাও আবশ্যক, যেগুলো কুরআন মাজীদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সম্বলিত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

১৫. ইলমে মাউহুবী তথা ইসলাম সম্পর্কে আল্লাহপ্রদত্ত জ্ঞান। এটা আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দান, খাস বান্দাদেরই এই ইলম দান করা হয়। নিচের হাদীস শরীফে এই দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে–

مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَّثَهُ اللّٰهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ .

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের জানা বিষয়ের উপর আমল করে আল্লাহ তা'আলা তাকে অজানা বিষয়ের ইলেম দান করেন।

উপরে বর্ণিত শাস্ত্রগুলো একজন মুফাসসিরের জন্য হাতিয়ার স্বরূপ। এগুলো জানা ব্যতীত কেউ কুরআনের তাফসীর করলে তা তাফসীর বিররায় [মনগড়া তাফসীর] বলে গণ্য হবে, যা নিষেধ করা হয়েছে। –[ফাজায়েলে কুরআন শায়খুল হাদীস আল্লামা জাকারিয়া (র.) পৃ. ২৫, ২৬, ২৭]

তাফসীরের কতিপয় পরিভাষা :

مُحْكَمٌ মুহকাম : অর্থ স্পষ্ট অর্থাৎ যার ভাষা এত সুদৃঢ় ও শক্তিশালী যে, আরবি ভাষা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত শ্রোতার কাছে তার অর্থ, মর্ম ও দাবি অস্পষ্ট থাকে না। অনেক সময় এত স্পষ্ট থাকে যে, চিন্তা ছাড়াই বুঝে আসে। যেমন কুরআনের কারীমের আয়াত- قُلْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ

অর্থাৎ বলুন, তোমরা এসো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের উপর যা নিষিদ্ধ করেছেন তা পড়ে শুনাই।

আবার কখনো সামান্য চিন্তা ও অনুসন্ধান করলেই বুঝে আসে। শারে' [বিধানদাতা]-এর পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন পড়ে না যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী–

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا অর্থাৎ পুরুষ ও নারী চোর, তোমরা তাদের হাত কেটে দাও।

এই আয়াতে একটু চিন্তা করলেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পকেটমারও এর অন্তর্ভুক্ত। এ হিসেবে উসূলে ফিকহ এর পরিভাষায় যাহির, নস, মুফাসসার, মুহকাম, খফী ও মুশকিল এগুলো মুহকামের অন্তর্ভুক্ত হয়। মুহকামের এই ব্যাখ্যা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর ব্যাখ্যা হতেই সংগৃহীত।

হযরত জাফর ইবনে যুবায়ের (রা.) বলেন, মুহকাম ঐ আয়াতকে বলে, যা একাধিক ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। কেউ কেউ বলেন, যার অর্থ প্রসিদ্ধ আর সুস্পষ্ট দলিল হতে পারে এবং তার স্পষ্ট দলিল রয়েছে তাই মুহকাম।

–[তাফসীরে মাযহারী : খ. ১]

مُتَشَابِهٌ মুতাশাবিহ : مُتَشَابِهٌ শব্দটি بَابُ مُفَاعَلَةٌ এর مَصْدَرٌ [শব্দমূল]। অর্থ– একে অন্যের মতো হওয়া। شِبْه [সাদৃশ্য পূর্ণ] হওয়া থেকে উদগত। তার বহুবচন شِبْه – شُبُهَاتٌ ؛ مُشَابَهَةٌ অর্থ ব্যাপক। অর্থাৎ আরবি ভাষা সম্পর্কে পারদর্শী শ্রোতার কাছে যার মর্ম অনুসন্ধান করে চিন্তা-ভাবনার পরও অস্পষ্ট থাকে। যদি শারে' [বিধানদাতা]-এর পক্ষ হতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, প্রশিক্ষণ পাওয়া যায় এবং তার দ্বারা সে আয়াতের মর্ম স্পষ্ট হয়ে উঠে, তখন উসূলবিদগণের পরিভাষায় এটাকে মুজমাল বলে। যেমন– সালাত ও জাকাত। যদি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ না পাওয়া যায়, তাহলে পরিভাষায় এটাকে মুতাশাবিহ বলা হয়। এই ধরনের অস্পষ্টতা শুধু ঐ সকল আয়াতেই হতে পা,রে যা ব্যবহারিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত নয়। যাতে তা অসাধ্য সাধনের নির্দেশ সাব্যস্ত না করে। যেমন– সূরার শুরুতে حُرُوْفُ مُقَطَّعَاتٌ [বিচ্ছিন্ন অক্ষরসমূহ] অনুরূপ আয়াত– يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ অর্থাৎ আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর" ইত্যাদি। [প্রাগুক্ত]

نَسْخٌ নাসখ : পরিভাষায় نَسْخٌ বলা হয় رَفْعُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ بِدَلِيْلٍ شَرْعِيٍّ কোনো হুকমে শরঈকে কোনো শরয়ী দলিলের মাধ্যমে রহিত করে দেওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোনো সময় কোনো কালের অবস্থার প্রেক্ষাপটে উপযুক্ত এক শরয়ী আদেশকে জারি করেন। অতঃপর আরেক সময় স্বীয় হেকমতপূর্ণ দৃষ্টিতে বান্দার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে এ নির্দেশকে রহিত করে তদস্থলে কোনো নতুন নির্দেশ নিয়ে আসেন। এ অবস্থাকে نَسْخ বলে। আর যে পুরাতন হুকুমকে বিলুপ্ত করেছেন তাকে مَنْسُوْخٌ বলে এবং যে নতুন নির্দেশ এসেছে তাকে نَاسِخٌ বলা হয়।

বস্তুত আল্লাহর কিতাবে নাসখ কয়েক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। একটি হচ্ছে কোনো আয়াত তেলাওয়াতের দিক থেকে রহিত হওয়া এবং বর্ণনা করা বিধান বহাল থাকা। যেমন– আয়াতে রজমের বিধান বহাল রয়েছে এবং এর তেলাওয়াত রহিত হয়েছে কিংবা শুধু বিধানের শেষ সীমা বর্ণনা করা এবং তেলাওয়াত বহাল থাকা। যেমন– নিকটাত্মীয়দের জন্য অসিয়ত করার আয়াত এবং আয়াতে ওফাতের ইদ্দত এক বছর বলা হয়েছে। অথবা তেলাওয়াত ও বিধান উভয়টির শেষ সীমা বর্ণনা করা। যেমন– বলা হয়ে থাকে যে, দুটোই রহিত হয়েছে।

যে আয়াতের বিধান রহিত বা مَنْسُوْخٌ হয় তা দুই প্রকার–

১. রহিত বিধানের স্থলে অন্য কোনো বিধান থাকা। যেমন– নিকটাত্মীয়কে অসিয়ত করার বিধান মিরাস- এর আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে।

২. অন্য কোনো বিধান না থাকা। যেমন– স্ত্রীদের পরীক্ষা করার বিধান প্রথমে চালু ছিল পরে তা রহিত হয়ে গেছে। نَسْخ বা রহিত হওয়া আদেশ নিষেধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সংবাদের ক্ষেত্রে নয়। –[তাফসীরে মাযহারী, খ-১]

سَبْعَةُ اَحْرُفٍ সাত কেরাত : উম্মতের সর্বশ্রেণির লোকের জন্য তেলাওয়াতে কুরআন সহজতর করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কালামের কিছু সংখ্যক শব্দকে বিভিন্ন উচ্চারণে পাঠ করার সুযোগ দান করেছেন। অনেকের জন্য বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে অক্ষর বিশেষের সঠিক উচ্চারণ করা সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় তারা নিজেদের পক্ষে সহজ পাঠ্য কোনো উচ্চারণে কুরআন তেলাওয়াত করলে তা শুদ্ধ বলে পরিগণিত হবে। রাসূল ﷺ বর্ণনা করেন–

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ اُنْزِلَ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ.

অর্থাৎ এই কুরআন সাত হরফে নাজিল করা হয়েছে, তোমাদের যার পক্ষে যে হরফে তেলাওয়াত করা সহজ হয়, সে ভাবেই তেলাওয়াত কর। –[বুখারী, ফাজাইলে কুরআন অধ্যায়]

উক্ত হাদীস শরীফে উল্লিখিত 'সাত হরফ' শব্দটির অর্থ কি? এ সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। তন্মধ্যে তত্ত্বদর্শী ও মুহাক্কিক ওলামার মতে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হচ্ছে– আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন যে নির্দিষ্ট কেরাতের মাধ্যমে নাজিল করেছেন, তার মধ্যে পারস্পরিক উচ্চারণ– পার্থক্য সর্বাধিক সাত ধরনের হতে পারে। কেরাত যদিও সাতের অধিক রয়েছে। কিন্তু কেরাতসমূহের মধ্যে যে ভিন্নতা তা সাত ধরনের অনুমোদিত, সেই সাতটি ধরন নিম্নলিখিত ভিত্তিতে রূপান্তরিত হওয়া সম্ভব–

১. বিশেষ্যের উচ্চারণে তারতম্য। এতে একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন, পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ প্রভৃতির ক্ষেত্রে তারতম্য হতে পারে। যেমন– এক কেরাত وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ আয়াতে 'কালিমাতু' শব্দটি একবচন ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু অন্য কেরাতে এই শব্দটি বহুবচন উচ্চারিত হয়ে وَتَمَّتْ كَلِمٰتُ رَبِّكَ ব্যবহৃত হয়েছে।

২. ক্রিয়াপদে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালের বিভিন্নতা অবলম্বিত হয়েছে। যেমন– প্রচলিত কেরাতে رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا পঠিত হয়েছে এবং এ আয়াতই অন্য কেরাতে رَبَّنَا بَعِّدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا পঠিত হয়েছে।

৩. রীতি অনুযায়ী হরকত বা যের-যবর পেশ ইত্যাদি প্রয়োগের ক্ষেত্রে মত-পার্থক্যের কারণে কেরাতে বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। যেমন لَا يُضَارَّ -এর স্থলে কেউ কেউ لَا يُضَارُّ তেলাওয়াত করেছেন। এমনিভাবে ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدِ-এর স্থলে ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ তেলাওয়াত করেছেন।

৪. কোনো কোনো কেরাতে শব্দের হ্রাস বৃদ্ধিও হয়েছে। যেমন– تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ -এর স্থলে تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهَارُ তেলাওয়াত করা হয়েছে।

৫. কোনো কোনো কেরাতে শব্দের পূর্বাপরও হয়েছে। যেমন– وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ -এর স্থলে وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْحَقِّ بِالْمَوْتِ পড়া হয়েছে।

৬. শব্দের পার্থক্য হয়েছে। অর্থাৎ এক কেরাতে এক শব্দ এবং অন্য কেরাতে অন্য শব্দ পঠিত হয়েছে। যেমন– فَتَبَيَّنُوْا -এর স্থলে فَتَثَبَّتُوْا এবং ضُعْفٍ -এর স্থলে ضَعْفٍ পঠিত হয়েছে।

৭. উচ্চারণে পার্থক্য। যেমন কোনো কোনো শব্দের উচ্চারণ ভঙ্গিতে লম্বা, খাটো, হালকা, শক্ত প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। এতে মূল শব্দের মধ্যে কোনো পরিবর্তন হয়নি, শুধু উচ্চারণে বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। যেমন مُوْسٰى শব্দটি কোনো কোনো উচ্চারণে مُوْسِي রূপে উচ্চারিত হয়েছে।

মোটকথা সাত কেরাতের উচ্চারণের সুবিধার্থে যেসব পার্থক্য অনুমোদন করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে অর্থের কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় না। বিভিন্ন এলাকা ও শ্রেণি– গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত উচ্চারণ ধারার প্রতি লক্ষ্য রেখেই সাত কেরাত পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছে। –[উলূমুল কুরআন : তাকী উসমানী ১০৬-১০৯]

মক্কী মদনী সূরা বা আয়াত : অধিকাংশ মুফাসসিরীনের পরিভাষায় মক্কী সূরা বা আয়াত বলতে বুঝায় যেসব সূরা বা আয়াত হুযূর ﷺ মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়ে নাজিল হয়েছে এবং মদনী সূরা বা আয়াত বলতে বুঝায়, যেগুলো মদীনায় হিজরত করে যাওয়ার পর নাজিল হয়েছে।

কোনো কোনো লোক মক্কী আয়াত বলতে যেগুলো মক্কা শহরে নাজিল হয়েছে এবং মদনী আয়াত বলতে যেগুলো মদীনা শহরে নাজিল হয়েছে, সেগুলোকে বুঝে থাকেন। বস্তুত অধিকাংশ মুফাসসিরীনের উপরিউক্ত পরিভাষা অনুযায়ী এ ধারণা ঠিক নয়। কেননা কতিপয় আয়াত এমন রয়েছে যেগুলো মক্কা শহরে নাজিল হয়নি; তবুও হিজরতের পূর্বে নাজিল হওয়ার

কারণে সেগুলোকে মক্কী বলা হয়। এমনিভাবে যেসব আয়াত মিনা, আরাফাত ইত্যাদি জায়গায় অথবা মে'রাজের সফরে নাজিল হয়েছে. এমনকি হিজরতের উদ্দেশ্যে মক্কা ত্যাগ করার পর মদীনায় পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত পথে পথে নাজিল হয়েছে, সেগুলোকেও মক্কী বলা হয়।

অনুরূপ অনেক আয়াত এমনও রয়েছে যেগুলো মদীনা শহরে নাজিল হয়নি; অথচ সেগুলোকে মদনী বলা হয়। হিজরতের পর হুযূর ﷺ অনেক সময় সফরে বের হতেন। তখন মদীনা থেকে শত শত মাইল দূরেও চলে যেতেন। এসব স্থানে অবতীর্ণ আয়াতগুলোকেও মদনী বলা হয়। এমনকি যেসব আয়াত মক্কা বিজয় হুদায়বিয়ার সন্ধি প্রভৃতি সময়ে খোদ মক্কা শহরের ভিতরে অথবা তার আশ পাশে নাজিল হয়েছে, সেগুলোকেও মদনী নামে আখ্যায়িত করা হয়।

মক্কী মদনী সূরার কতিপয় পরিচয় : মুফাসসিরীনে কেরাম মক্ক মদনী সূরাসমূহের এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিয়েছেন যার মাধ্যমে অতি সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, কোন সূরা মক্কী আর কোনটি মদনী।

মক্কী সূরার কতিপয় পরিচয় :

১. যে সূরায় সিজদার আয়াত রয়েছে সেটা মক্কী।
২. যে সূরায় 'كلا' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সেটা মক্কী।
৩. সম্বোধনের উদ্দেশ্যে কেবল মাত্র يَاَيُّهَا النَّاسُ ব্যবহার করা। يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا **ব্যবহার করা মদনী সূরার** একটি অন্যতম পরিচিতি। সুতরাং সূরা হজ ব্যতীত অন্য কোনো মক্কী সূরায় يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বলে সম্বোধন করা হয়নি।
৪. সূরা বাকারা ব্যতীত যেসব সূরায় আম্বিয়ায়ে কেরাম ও তাদের উম্মতগণের বর্ণনা এবং হযরত আদম (আ.) ও শয়তানের বিভিন্ন ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তা মক্কী।
৫. মক্কী সূরার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এসব সূরাতেই তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদির আলোচনা করা হয়েছে।

মদনী সূরার কতিপয় পরিচিতি :

১. জিহাদের অনুমতি প্রদান বা জিহাদ সংক্রান্ত আলোচনা মাদানী সূরা সমূহের একটি অন্যতম পরিচিতি।
২. একমাত্র মদনী সূরাসমূহের মধ্যেই ধর্মীয়, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বিধিবিধান সংক্রান্ত আলোচনা রয়েছে।
৩. শরয়ী বিধানের হিকমত বর্ণনাও মদনী সূরার একটি বৈশিষ্ট্য কেবল মাত্র মদনী সূরাগুলোতেই মুনাফিকদের আচার-আচরণ, অভ্যাস-চরিত্র , চাল-চলন ও রীতিনীতি ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে।
৪. কেবল মাত্র মদনী সূরাগুলোতেই উম্মতে মুহাম্মদীকে সম্বোধন করা হয়েছে।
৫. মদনী সূরাসমূহ অধিক দীর্ঘ। –[উলুমুল কুরআন : তাকী উসমানী ৫৭-৬৪]

কুরআনের আয়াতসমূহের স্থান ও কালভিত্তিক শ্রেণি বিভাগ : কুরআনুল করীমের আয়াত ও সূরাসমূহকে মক্কী ও মদনী ছাড়াও মুফাসসিরগণ আরো কয়েক প্রকারে বিভক্ত করেছেন। যেমন–

১. حَضَرِىْ ঐ সমস্ত আয়াত যেগুলো হুজুর ﷺ -এর বাসস্থানে অবস্থানকালে অবতীর্ণ হয়েছে।
২. سَفَرِىْ যেগুলো হুজুর ﷺ -এর সফরকালে নাজিল করা হয়েছে।
৩. نَهَارِىْ যেগুলো দিনের বেলায় নাজিল করা হয়েছে।
৪. لَيْلِىْ যেগুলো রাত্রিতে নাজিল করা হয়েছে।
৫. صَيْفِىْ যেগুলো গ্রীষ্মকালে নাজিল করা হয়েছে।
৬. شِتَائِىْ যেগুলো শীতকালে নাজিল করা হয়েছে।
৭. فِرَاشِىْ যেগুলো বিছানায় অবস্থানকালে নাজিল করা হয়েছে।
৮. نَوْمِىْ যেগুলো নিদ্রা অবস্থায় নাজিল করা হয়েছে।
৯. سَمَاوِىْ যেগুলো মে'রাজের সময় আকাশে অবস্থানকালে নাজিল করা হয়েছে।
১০. فَضَائِىْ. শূন্যে অবতীর্ণ আয়াত। –[প্রাগুক্ত ৬৪-৬৬]

চিত্রে পবিত্র কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়ের পরিসংখ্যান

সূরা	১১৪	যবর	৫৩২৪২
রুকূ'	৫৪০	যের	৩৯৫৮২
মদনী আয়াত	৬২১৪	পেশ	৮৮০৪
মক্কী আয়াত	৬২২১	মাদ্দ	১৭৭১
বসরী আয়াত	৬২২৫	তাশদীদ	১২৫২
শামী আয়াত	৬২২৬	নোক্তা	১৫৬৮৪
মোট শব্দ	৭৭,৪৩৯	হরফ	৩,৬৪,২১৯

اَسْبَابُ النُّزُوْلِ শানে নুযূল : অবতরণের দিক দিয়ে কুরআনের আয়াতসমূহ দুপ্রকার। শানে নুযূলবিহীন আয়াত ও শানে নুযূল বিশিষ্ট আয়াত। কুরআনের বেশিরভাগ আয়াতই এমন, যেগুলো আল্লাহ তা'আলা নিজেই বান্দার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাদের হেদায়েতের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ করেছেন। অর্থাৎ কোনো ঘটনার বিবরণ কিংবা কোনো সমস্যার সমাধান এসব আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত নয়। পক্ষান্তরে অন্যান্য আয়াতসমূহ এরূপ যেগুলো কোনো সমস্যার সমাধান বা কোনো প্রশ্নের জবাব প্রদান কিংবা বিশেষ কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছে। মূলত আয়াত নাজিলের পটভূমির এসব সমস্যা, উত্থাপিত প্রশ্ন ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলিকে তাফসীর শাস্ত্রের পরিভাষায় বলা হয় শানে নুযূল।

تَفْسِيْر بِالرَّاْىِ [চিন্তাপ্রসূত তাফসীর] : তাফসীর বির্ রায় [تَفْسِيْر بِالرَّاْىِ] -এর অর্থ হলো, কোনো আয়াতের ব্যাখ্যায় নিজের অনুমান ও মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া। এর বৈধতা সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ ঢালাওভাবে এরূপ তাফসীরকে নাজায়েজ বলেন। আবার কেউ কেউ শর্ত সাপেক্ষে জায়েজ বলেন। তবে এ মতপার্থক্যের সারকথা এই যে, تَفْسِيْر بِالرَّاْىِ [ব্যক্তিগত অভিমত বা বুদ্ধিভিত্তিক তাফসীর] ঐ সময় হারাম বা নিষিদ্ধ হবে যখন তাফসীরকার সঠিক প্রমাণ ব্যতীত দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, আয়াতের অর্থ এটাই, কিংবা যখন তাফসীরকার ভাষাগত মৌলনীতি ও শরিয়তের মৌলিক বিধি-নিষেধ সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও তাফসীর করার ধৃষ্টতা দেখায়। অথবা যখন তাফসীরকার বিদ'আতের সপক্ষে কুরআনের আয়াত বিকৃতরূপে পেশ করে।

যারা তাফসীর বির রায়কে নাজায়েজ বলেন তাদের প্রমাণ : যারা মস্তিষ্ক, প্রসূত তাফসীরকে শর্তহীনভাবে নাজায়েজ বলেন, তাদের দলিল নিম্নরূপ–

প্রথম দলিল : ইজতিহাদ ও রায়ের দ্বারা তাফসীর করা ঠিক নয়। কারণ মুজতাহিদ নিশ্চিত বিশ্বাসের সাথে বলতে পারেন না যে, এটাই আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য। আর এমনভাবে না জেনে ধারণা করে আল্লাহর উপর কোনো কথা বলা জায়েজ নেই। কুরআনে তা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطَانًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (اعراف : ٣٣)

দলিল খণ্ডন : তাফসীর বির রায় আল্লাহ সম্বন্ধে কিছু না জেনে বলার নামান্তর– একথা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ কোনো বিষয়ে যদি সুস্পষ্ট দলিল না পাওয়া যায়, তাহলে শরিয়ত সম্মত ইজতিহাদের ভিত্তিতেই ফয়সালা দিবে। সে ক্ষেত্রে তাই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তা আল্লাহ সম্পর্কে না জেনে বলার নামান্তর হবে না। কারণ মানুষ তার সাধ্যের বাইরে কোনো কাজের জন্য বাধ্য নয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا "আল্লাহ সাধ্য বহির্ভূত কোনো কিছুর মুকাল্লাফ কাউকে বনান না।"

হাদীসও এর সমর্থন করে। নবী কারীম ﷺ বলেছেন– مَنِ اجْتَهَدَ وَأَخْطَأَ لَهُ أَجْرٌ وَمَنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ অর্থাৎ "যে ইজতিহাদ করবে এবং ভুল করে ফেলবে সেও একটি ছওয়াব পাবে। আর যদি ঠিক করে, তাহলে সে দু'টি ছওয়াবের অধিকারী হবে।"

এতে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, ইজতিহাদের দ্বারা তাফসীর করা আল্লাহ সম্বন্ধে কিছু না জেনে বলা নয়। তাই উক্ত আয়াত তাফসীর বির রায়ের বিপক্ষে নয়।

দ্বিতীয় দলিল : তারা নাজায়েজ হওয়ার উপর দু'টি হাদীস প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন। যথা–

১. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اتَّقُوا الْحَدِيْثَ عَلَيَّ إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْاٰنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ- وَفِيْ رِوَايَةٍ مَنْ تَكَلَّمَ فِى الْقُرْاٰنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

২. وَعَنْ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ فِى الْقُرْاٰنِ بِرَأْيِهِ فَاَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ . رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ

দলিল খণ্ডন : প্রথম হাদীসের দু'টি অর্থ হতে পারে।

১. যে ব্যক্তি কুরআনের দুর্বোধ্য স্থানের ব্যাখ্যা করে, যা সে জানে না, তবে সে আল্লাহর ক্রোধে নিপতিত হবে। –[খাযিন, রূহুল মা'আনী]

২. যে ব্যক্তি নিজের মতাদর্শ প্রমাণ করার জন্য কুরআনকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে জেনে-শুনে ভুল ব্যাখ্যা দেয়, সে যেন জাহান্নামে আপন ঠিকানা নির্ধারণ করে নেয়। –[রূহুল মা'আনী]

দ্বিতীয় হাদীসটি সহীহ নয়। 'আল মাদখাল' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে হাদীসটির ক্ষেত্রে আপত্তি রয়েছে। তার সনদের মধ্যে দুর্বলতা আছে। হাদীসটিকে সহীহ হিসেবে মেনে নিলেও এর বিভিন্ন অর্থ করা যায়।

এক সে ভুল করার অর্থ হলো যে, সে তাফসীরের পদ্ধতি ভুল করেছে। কারণ একক শব্দের ব্যাখ্যার পদ্ধতি হচ্ছে ভাষাবিদ ও সাহিত্যিকদের অনুসরণ করা। তাদের উক্তি খোঁজ করা। আর নাসেখ মানসূখের তাফসীর করার পদ্ধতি হলো ইতিহাস তালাশ করা এবং আয়াতের উদ্দেশ্য বর্ণনা করার জন্য আবশ্যক হলো বিধানদাতার কথার প্রতি লক্ষ্য করা। অথবা এখানে ভুল বলতে বুঝানো হয়েছে– যে ব্যক্তি নিজের মাযহাবের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে তার সমর্থনে তাফসীরকে কাজে লাগায় এবং মাযহাবকে ঢাল স্বরূপ ব্যবহার করে– তার তাফসীর কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়; বরং তা একেবারে প্রত্যাখ্যাত হবে। অতএব সে ভুল করেছে। অথবা, ভুল করার অর্থ হলো যে এমন দ্বি-অর্থবোধক আয়াতের তাফসীর করে ইজতিহাদ দ্বারা, যার অর্থ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেন না। তাহলে সে ভুল করেছে অথবা হাদীসের উদ্দেশ্য হলো দলিল ব্যতীত নিশ্চিত কোনো ফায়সালা দেওয়া।

তৃতীয় দলিল : সাহাবাগণের কথা ও কাজ এবং তাবেয়ীনদের কথা দ্বারাও বুঝা যায় যে, তাফসীর বির্ রায় নাজায়েজ। যেমন– হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.), সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (র.), শা'বী (র.) -এর কথা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বর্ণিত আছে– হযরত আবূ বকর (রা.)-কে কোনো এক আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি প্রতিউত্তরে বলেছেন– اَىُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِىْ ؟ وَاَىُّ اَرْضٍ تُقِلُّنِىْ ؟ اِذَا قُلْتُ فِى الْقُرْاٰنِ بِرَأْيِىْ اَوْ بِمَا لَمْ اَعْلَمْ অর্থাৎ "না জেনে বা মনমতো কুরআন সম্পর্কে যদি কিছু বলি, তাহলে কোন অন্তরীক্ষ আশ্রয় দিবে আমায়? কোন ধারিত্রীতে হবে আমার ঠাঁই?"

অনুরূপভাবে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (র.) বলেছেন– اَنَا لَا اَقُوْلُ فِى الْقُرْاٰنِ شَيْئًا অর্থাৎ "আমি কুরআন সম্বন্ধে কিছুই বলি না।"

তদ্রূপ শা'বী (র.) বলেছেন, তিনটি জিনিস সম্পর্কে আমি মৃত্যু পর্যন্ত কিছু বলব না। কুরআন, রূহ এবং স্বপ্ন। –[মানাহিলুল ইরফান]

দলিল খণ্ডন : উল্লিখিত উক্তিসমূহের বিভিন্নভাবে উত্তর দেওয়া যায়–

১. সাহাবী ও তাবেয়ী হলেন পর্যায়ক্রমে শ্রেষ্ঠ উম্মত। খওফে ইলাহির তাড়নায় প্রকম্পিত ছিলেন তারা সবচে' বেশি। সবক্ষেত্রে সতর্কতাও অবলম্বন করেছেন বেশি। তাঁদের সতর্কতামূলকভাবে কুরআনের কোনো আয়াত সম্পর্কে মতামত না দেওয়ার সাথে তাফসীর বির রায়ের বৈধতার সাথে কোনো বিরোধ নেই।

২. এও বলা যায় যে, যে সকল আয়াতের ক্ষেত্রে তাদের সঠিক ব্যাখ্যা জানা ছিল না, সে ক্ষেত্রে তাঁরা এ উক্তি করেছেন। তাই বলে যার ব্যাখ্যা জানা ছিল তার তাফসীর করতে পিছপা হননি। যেমন– হযরত আবূ বকর (রা.)-কে যখন সূরা নিসার এক আয়াতে উল্লিখিত اَلْكَلَالَةُ শব্দের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করা হলো, তিনি উত্তরে বলেছিলেন, আমি কালালাহ

সম্বন্ধে আমার রায় ও ইজতিহাদ দ্বারা ব্যাখ্যা দিচ্ছি। যদি সঠিক হয় তাহলে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে আর যদি ভুল হয়, তবে তা আমার ও শয়তানের পক্ষ থেকে। (اَلْكَلَالَةُ كَذَا وَكَذَا) এমনিভাবে হযরত আলী (রা.), হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও অন্যান্য সাহাবা এবং তাবেয়ীগণের থেকেও এ ধরনের বর্ণনা রয়েছে। সুতরাং তাদের উক্তি নাজায়েজ হওয়ার কোনো দলিল হতে পারে না। –[প্রাগুক্ত]

৩. অথবা বলা যায় বিনা প্রয়োজনে তাঁরা কোনো তাফসীর করতেন না, প্রয়োজন হলে করতেন। তাদের এ সকল উক্তি দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, তাফসীরের ক্ষেত্রে অবশ্যই সতর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়– কথাটির অর্থ হলো আল্লাহর ভয় রাখা অবশ্য কর্তব্য। –[সূত্র : উলুমুল কুরআন ফরিদী ২১৯-২২২]

তাফসীর বির রায় জায়েজ হওয়ার পক্ষে দলিলসমূহ : কুরআন, সুন্নাহ ও যুক্তির আলোকে তাফসীর বির-রায়ের বৈধতা **প্রমাণিত আছে।** ধারাবাহিকভাবে এর দলিলগুলো পেশ করা হলো–

প্রথম দলিল : কুরআনের অনেক আয়াত তাফসীর বিররায় বৈধ হওয়ার প্রমাণ বহন করে। নিম্নে এমন কতিপয় আয়াত **উল্লেখ করা হলো–**

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا : محمد - ٢٤

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন– كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ (ص : ٢٩)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে– وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلٰٓى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْۢبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ (النساء : ٨٣)

উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা জ্ঞানীদেরকে কুরআন **সম্বন্ধে চিন্তা-ফিকির এবং গবেষণা করার** প্রতি উৎসাহিত **করেছেন** এবং পরোক্ষভাবে এর মাঝে কুরআনের অর্থ ও তত্ত্ব **অনুসন্ধানের আদেশও রয়েছে। যাতে কুরআনের** ই'জায [**অলৌকিকতা**] **প্রকাশ** পায়। এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, **ইজতিহাদ এবং গবেষণা করে অর্থ** ও ব্যাখ্যা করা শুধু **জায়েজ-ই নয়;** বরং প্রয়োজনীয়ও বটে।

দ্বিতীয় দলিল : হাদীস ও আছারে সাহাবা দ্বারা তাফসীর বির রায়ের বৈধতা **প্রমাণিত হয়।**

১. **হযরত** আব্দুল্লাহ **ইবনে** আব্বাস (রা.) বলেন– اَلْقُرْاٰنُ ذَلُوْلٌ ذُوْ وُجُوْهٍ فَاحْمِلُوْا عَلٰى اَحْسَنِ وُجُوْهِهٖ **কুরআন,** অতিসহজ ও বিভিন্ন ধরনের অর্থ সম্বলিত। সুতরাং তোমরা সবচেয়ে উত্তম **অর্থের উপর প্রয়োগ কর। –[রূহুল মা'আনী]**

২. রাসূল ﷺ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর জন্য দোয়া **করেছেন–** اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَعَلِّمْهُ التَّاْوِيْلَ
হযরত আলী (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ **কি আপনাদেরকে বিশেভাবে কিছু** বলে গেছেন, যা অন্যদেরকে বলেননি? তিনি উত্তরে বললেন, আমাদের নিকট **এই সহীফা তথা কুরআনে যা** আছে, তা ব্যতীত অন্য কিছুই নেই। হ্যাঁ, তবে কুরআনের গভীর জ্ঞান ও বুঝার শক্তি **যা আল্লাহ কোনো ব্যক্তিকে দান করে থাকেন।** –[মিশকাত শরীফ খ. ২]

এ সকল সাহাবাগণের কথা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, **তাফসীর বির রায় জায়েজ।**

তৃতীয় দলিল : যুক্তির আলোকেও তাফসীর বির রায়ের বৈধতা **প্রমাণিত হয়। কেননা** নবী করীম ﷺ সকল আয়াতের তাফসীর করে যাননি। অথচ অনেক আয়াত বিধান সম্বলিত, যার ব্যাখ্যার **প্রয়োজন।** যদি ইজতিহাদ দ্বারা তাফসীর করা নাজায়েজ হয়, তাহলে ঐ আয়াতের বিধি বিধানগুলো পাওয়া যেত না। এ জন্য রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

مَنِ اجْتَهَدَ فَلَهٗ اَجْرٌ وَاِنْ اَصَابَ فَلَهٗ اَجْرَانِ .

অর্থাৎ "মুজাতাহিদ যদি ভুল করে, তাহলে এক ছওয়াব, আর ঠিক **করলে দ্বিগুণ** ছওয়াব।"

আমরা উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহ, হাদীস, আছারে সাহাবা এবং **যুক্তির আলোকে** এ কথার সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, যে ব্যক্তি শর্তানুযায়ী ইজতেহাদের যোগ্যতা রাখে, সে তাফসীরের যোগ্যতাও রাখে।

ই'জাযুল কুরআন [কুরআনের অলৌকিকতা] : اِعْجَازٌ [**ই'জাযুন**] **শব্দের অর্থ** অক্ষম করে দেওয়া, মুজিযা, অলৌকিক কাণ্ড। ই'জায বা মুজিযা সেই সকল কাজকে বলা হয় যার দ্বারা **বিরুদ্ধবাদীদের** চ্যালেঞ্জকে নিষ্ক্রীয় করে দেওয়া হয়।

কুরআন নাজিলের পর কাফেররা বিদ্রূপের সূরে বলতো, কুরআন মুহাম্মদের নিজস্ব রচনা। আমরাও এমন একটি তৈরি করতে পারি। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের চ্যালেঞ্জ ছুড়েন এবং নিজেই ঘোষণা করেছেন যে, কিয়ামত পর্যন্ত এ চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে সক্ষম হবে না। ইরশাদ হচ্ছে–

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ وَّادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ . (هود : ١٣)

কুরআনের এ চ্যালেঞ্জের পরিপ্রেক্ষিতে অনুরূপ দশটি সূরা উপস্থাপন করতে যখন তারা ব্যর্থ হলো, তখন ইরশাদ হলো-
وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا شُهَدَاۤءَ كُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ . (البقرة : ٢٣)

তাফসীর বিশারদদের মতে, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কাফেরদেরকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন যে, তোমরা কুরআনের ক্ষুদ্রতম সূরা [কাউসার] -এর ন্যায় একটি সূরা এনে পেশ কর। তারা সকলে একত্র হয়ে সর্বাধিক প্রচেষ্ট চালিয়েও কাউসারের ন্যায় একটি ক্ষুদ্র সূরা বানাতে পারল না। তখন তারা সকলে এক বাক্যে ঘোষণা আকারে কা'বার দেয়ালে লটকিয়ে দিয়েছিল- لَيْسَ هٰذَا مِنْ كَلَامِ الْبَشَرِ অর্থাৎ এটি মানব রচিত কোনো গ্রন্থ নয়।

ভাষা ও অলংকার শাস্ত্রবিদ খ্যাতনামা আরব্য কবি ও পণ্ডিতরাও যখন কুরআনের অনুরূপ একটি সূরাও রচনা করতে ব্যর্থ হলো, তখন ইরশাদ হলো- قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا . (بنى اسرائيل : ٨٨)

অনুরূপ আরো অনেক আয়াত রয়েছে, যার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা কুরআন বিরোধীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ করেছেন, তারা যেন কুরআনের অনুরূপ অন্তত একটি সূরা রচনা করে। কিন্তু শত চেষ্টা করেও তারা অনুরূপ একটি আয়াত রচনায়ও সক্ষম হয়নি।

ই'জাযের প্রকৃতি : কি কারণে এবং কিসের ভিত্তিতে পবিত্র কুরআন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন্ত ও অনন্য মু'জিযা হিসেবে স্বীকৃত? আর কেনইবা কুরআন সর্বযুগে অপরাজেয় এবং সমগ্র বিশ্ববাসী কেন এর নজির পেশ করতে সক্ষম হয়নি? পৃথিবীর কবি, সাহিত্যিক, পণ্ডিত-বুদ্ধিজীবী ভাষাবিদ, গবেষক, দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরা কেন হতবাক হয়েছেন এবং থমকে গেছেন কুরআনের সুদীপ্ত চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায়? প্রাচীনকাল থেকে কুরআনের ভাষ্যকার, বিশেষজ্ঞগণ নিরন্তর গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছেন এবং শত শত গ্রন্থ রচনা করে বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়েছেন। আর তাঁরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব রুচি ও বর্ণনাভঙ্গিতে এর বিশ্লেষণ ও বিবরণ দিয়েছেন। বস্তুত কুরআনের মুজিযার সকল প্রকৃতি [বৈশিষ্ট্য] বা প্রকার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তারপরও গবেষণার আলোকে নিম্নে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাত করা হলো-

শব্দ ও শব্দ প্রয়োগের অলৌকিকত্ব : গদ্য, পদ্য এবং ভাষা সম্পর্কে যার সাধারণ ধারণা আছে, তারই এ সত্যটা জানা আছে যে, পৃথিবীর কোনো ভাষারই কোনো সাহিত্যিক কিংবা কবি এমন দাবি করার জোর রাখে না যে, তার রচনার কোথাও কোনো অশুদ্ধ কিংবা অমার্জিত অথবা অশোভন শব্দের একটি ব্যবহারও হয়নি। এটা সম্ভব নয়। কারণ মনের ভাব ফোটাতে গিয়ে বাধ্য হয়েও কখনো কখনো এমনটা করতে হয়। ভাবটা ঠিকই ফুটে উঠে, সঙ্গে থেকে যায় শব্দের অশুদ্ধতা কিংবা অশোভনত্বের দোষ। এ ক্ষেত্রে বিস্ময়করভাবে ব্যতিক্রম হচ্ছে আল কুরআন। শুধু অশুদ্ধ শব্দের প্রয়োগমুক্তই নয়; বরং আলহামদু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি শুদ্ধ শব্দেরই প্রয়োগ উপযোগিতার ও অলঙ্কারের দিক থেকে এমনই লাগসই, যুৎসই ও অনিবার্য যে, তার কোনো সফল বিকল্প ও ব্যতিক্রমের অবকাশ নেই। পৃথিবীর জীবন্ত ও সর্বোচ্চ বিত্তবান ভাষাসমূহের একটি আরবি ভাষা। যেই আরবি ভাষার বিপুল শব্দের ভাণ্ডার থেকে নিজস্ব মর্ম ও উদ্দেশ্যকে প্রকাশের জন্য কুরআনে করীম সেই শব্দটিই নির্বাচন করেছে, যা পূর্বাপর ধারাবাহিকতা, অর্থের পূর্ণাঙ্গতা ও নির্দিষ্টতা এবং ভাষাশৈলীর প্রাঞ্জলতা ও গতিময়তার দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে উপযোগী ও সর্বোচ্চ যথাযথ। শব্দগত এই অলৌকিকত্বের কয়েকটি উদাহরণ দেখা যেতে পারে-

১. মৃত্যু বা মরণ এর অর্থ দেওয়ার জন্য জাহেলী যুগে প্রায় চব্বিশ পঁচিশটি শব্দ ব্যবহৃত হতো। যেমন-
هَلَاكٌ . مَوْتٌ . سَامٌ . مَنُوْنٌ . حَمَامٌ . حَتْفٌ . فَنَاءٌ . شُعُوْبٌ قَاضِيَةٌ . هَمْغٌ . يَنْطٌ . فَوْدٌ . مِقْدَارٌ . جَبَازٌ . فَتِيْمٌ . حَلَاقٌ . طَلَاطِلٌ . طَلَاطَلَتٌ . عَوْلٌ . ذَامٌ . كَفْتٌ . جَرَاعٌ . جَزَرَةٌ . خَالِجٌ .

সকল শব্দের অধিকাংশের প্রয়োগ যেই মৃত্যুকে বুঝানো হতো, সেই মৃত্যু হলো দ্বিতীয়বার উত্থান ও জীবন লাভের সম্ভাবনা রহিত একটি সর্বাত্মক নাশ বা ধ্বংস। জাহেলী যুগের আরবদের প্রাচীন পরকালহীনতার বিশ্বাস সে সব শব্দে ফুটে উঠতো। মৃত্যুকে বুঝানোর জন্য কুরআনে কারীমেই প্রথম একটি সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক ও যথাযথ অর্থবোধক শব্দ উপহার দিয়েছে। সেই শব্দটি হলো وَفَاةٌ বা تَوَفِّىْ [ওফাত] যার অর্থ কোনো বস্তুর পূর্ণাঙ্গ পরিশোধ ও উসূল করে নেওয়া। এর দ্বারা ইসলামের পরকালবাদী বিশ্বাসকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এবং মৃত্যুর মূল স্বরূপ তুলে নেওয়া হয়েছে। ইহকালীন জীবনের পাঠ পূর্ণ করাই হচ্ছে ওফাত। এরপরই মানুষের পরকালীন জীবনের যাত্রা শুরু হয়। পবিত্র কুরআনের আগে মৃত্যুকে বুঝানোর জন্য এই শব্দটির প্রয়োগের কোনো ইতিহাস পাওয়া যায়নি।

২. সকল ভাষাতেই কিছু শব্দ এমন থাকে, যেগুলো শ্রুতিমধুর হয় না, স্বর ও ধ্বনির দিক থেকে শুদ্ধ ও শোভন হয় না। কিন্তু বিকল্প শব্দের অভাবে প্রতিশব্দের অনুপস্থিতিতে বাধ্য হয়েই উদ্দেশ্য স্পষ্ট করতে গিয়ে সেই শব্দের প্রয়োগ অনিবার্য হয়ে উঠে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কুরআনে কারীম এমনই আকর্ষণীয় অভিব্যক্তি ও বর্ণনা উপহার দেয়, যা সাহিত্য ও উপলব্ধির সুরুচির কাছে তাক লাগানো ও কাঙ্ক্ষিত দিগন্তের সন্ধান লাভের আনন্দ দান করে। যেমন ভবন নির্মাণের জন্য যে পাকা ইটের দরকার হয়, সেই ইটের অর্থ দানকারী আরবি শব্দগুলোর প্রায় সবকটিকেই ভারি, দুরূহ অপছন্দযোগ্য মনে করা হয়ে থাকে। যেমন- اٰجر ـ طُوب ـ قَرمد ; কিন্তু কুরআনে কারীমের বর্ণনায় ফেরাউন কর্তৃক তার উজির হামানকে প্রাসাদ নির্মাণের নির্দেশ দানের বিষয়টি এসেছে এমনভাবে যে, মর্ম ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অথচ তাতে ইটের কথা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নেই। শ্রুতিকটু শব্দের প্রয়োগ থেকে মুক্ত থাকার পাশাপাশি উন্নত ভাষাশৈলীর ব্যবহার সেখানে পাঠককে বিমোহিত করে ফেলে- فَاَوْقِدْ لِىْ يَا هَامَانُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّىْ صَرْحًا

অর্থাৎ অতএব, হে হামান! কাদামাটির উপর আগুন প্রজ্জ্বলিত করো এবং আমার জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করো।

৩. আরবি ভাষায় এমন কিছু শব্দ রয়েছে যেগুলো একবচনে শুদ্ধ, শোভন ও প্রাঞ্জল হলেও বহুবচনে সেটি ভারি ও দুরূহ শব্দের অন্তর্ভুক্ত। اَرْض [জমিন] শব্দটির বহুবচন হলো اَرَاضِى একবচনে اَرْض শব্দটি সাবলীলও প্রাঞ্জল হলেও বহুবচনবোধক উভয় শব্দই কঠিন শব্দাবলির অন্তর্ভুক্ত। কথার প্রাঞ্জলতা বাঁধাগ্রস্ত হয় এগুলো দ্বারা। বহুবচনের অর্থ প্রকাশ যেখানে জরুরি, সেখানে অনিবার্যভাবেই আরব সাহিত্যগণ বাধ্য হন এইসব শব্দ প্রয়োগে। কিন্তু কুরআনে কারীমের উপস্থাপনা ও অভিব্যক্তির ধারা এ ক্ষেত্রে ভিন্ন। سَمٰوٰتٌ বহুবচনের সাথে اَرْض একবচনের শব্দের প্রয়োগ হয়েছে বহু স্থানে। একটিমাত্র অনিবার্য ও বিকল্পহীন ক্ষেত্র ব্যতীত কোথাও اَرْض -এর বহুবচনের ব্যবহার আসেনি। বরং اَرْض -এর বহুবচনের প্রয়োগ জরুরি- এমন স্থানে পবিত্র কুরআনের চমৎকার উপস্থাপনা শৈলী হলো- اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ـ

অর্থাৎ আল্লাহ সেই সত্তা, যিনি সেই সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং জমিনের মধ্যে থেকে তত সংখ্যক।

পবিত্র কুরআনের শব্দ প্রয়োগ ও শব্দের ব্যবহারের ভাষা ও অলংকারের বুৎপত্তি নিয়ে গভীরভাবে লক্ষ্য করলে আকর্ষণীয় চমৎকার, অত্যুজ্জল ও যুৎসই শব্দ ব্যবহারের এক অনির্বাচনীয় স্বাদ ও রুচির দিগন্ত উম্মোচিত হতে বাধ্য। বিশেষত বিচ্ছিন্ন ও এককভাবে শ্রুতিকটু ও ভারি হিসেবে গণ্য কিছু কিছু শব্দের প্রয়োগ পূর্বাপর সামঞ্জস্য ও উপযোগিতায় এতই আকর্ষণীয়ভাবে পবিত্র কুরআনে এসেছে যে, সে স্থানে কোনো শব্দেরই বিকল্প প্রয়োগ ব্যর্থ হতো।

তারকীব বা বাক্যের অলৌকিকত্ব : শব্দের পরে আসে বাক্য, বাক্যের গঠন প্রকৃতি ও সৌন্দর্যের কথা। বাক্যের ব্যবহার ও তার সৌন্দর্য ও মিষ্টতার ক্ষেত্রেও কুরআন মাজীদের অবস্থান সাহিত্য ও নান্দনিকতার চূড়া। পবিত্র কুরআনের বাক্যসমূহের প্রাঞ্জলতা, সাবলীলতা মধুরতা, অর্থের ব্যাপকতা এবং রূপ-সৌন্দর্যের কোনো বিকল্প নজির পেশ করা সম্ভব নয়। কুরআন মাজীদ থেকে শুধু একটি মাত্র উদাহরণ আমরা দেখতে পারি। হত্যাকারীর হত্যার বদলা গ্রহণ করা আরবদের মাঝে ছিল অত্যন্ত প্রশংসাযোগ্য বিষয়। তাই হত্যার বদলা গ্রহণের উপকারিতার কথা উল্লেখ করে আরবিতে একাধিক বাগধারা ও কথা প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। যেমন-

اَلْقَتْلُ اِحْيَاءٌ لِّلْجَمِيْعِ [হত্যা সমাজের জন্য জীবন স্বরূপ]
اَلْقَتْلُ اَنْفٰى لِلْقَتْلِ [হত্যা হত্যাকে থামায়]
اَكْثِرُوا الْقَتْلَ لِيَقِلَّ الْقَتْلُ [অধিক হত্যাকাণ্ড করো, যেন হত্যা কমে যায়]

আবরদের মাঝে এই বাক্যগুলোর গ্রহণযোগ্যতা এত বেশি যে, মানুষের মুখে মুখে এগুলোর প্রচলন ছিল এবং এই বাক্যগুলোকে অলঙ্কারপূর্ণও মনে করা হতো। কিন্তু এ বিষয়টাকেই কুরআনে কারীম উপস্থাপন করেছে অপরূপ সুন্দর তাৎপর্যপূর্ণ অর্থের ধারক এবং অলঙ্কার ও শিল্পের চূড়ান্ত অবস্থানকারী একটি বাক্যে। সেটি হলো- وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ অর্থাৎ আর কিসাস বা হত্যার বদলে মৃত্যুদণ্ডের মাঝে রয়েছে তোমাদের জন্য জীবন।

এই বাক্যে সংক্ষিপ্ততা, ব্যাপকতা, সাবলীলতা এবং সৌন্দর্যই যে, চূড়ান্ত পর্যায়ে ফুটে উঠেছে, তাই নয়; বরং এতে হত্যার শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড বাস্তবায়ানে মানব জীবনের যে কল্যাণ নিহিত ও সংরক্ষিত আছে, তাও কুরআনের নিজস্ব ধারা ও বিশ্লেষণে ফুঠে উঠেছে। হত্যাকারীর শাস্তি হিসেবে হত্যাকারীকে বধ করায় কোনো প্রতিশোধ চেতনা কিংবা রিপুতাড়িত প্রবণতাকে উস্কে না দিয়ে এখানে বৃহত্তর মানব সমাজের জীবনের সংরক্ষণ ও স্থিতির সুন্দর লক্ষ্যের কথাই উদ্ভাসিত হয়েছে। হত্যার বদলা সম্পর্কিত যেসব বাক্য আরবি ভাষায় চালু আছে সেগুলোর সকল বাক্যই এই একটি বাক্যের সৌন্দর্য ও সুষমার সামনে তুচ্ছ হয়ে গেছে।

ভাষাগত শৈলীর অলৌকিকত্ব : কুরআনে করীমের ভাষাগত অলৌকিকত্বের সবচেয়ে প্রধান ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে, কুরআনের গদ্যশৈলী, বর্ণনার স্টাইল ও রীতি। পবিত্র কুরআনের ভাষাগত মাধুর্যের এই একটি দিক এমন যে, সে সম্পর্কে প্রত্যেকেই অল্প বিস্তর অনুধাবন ও অনুভব করতে সক্ষম হয়। এমনকি কুরআনে কারীমের তেলাওয়াত শুনে এই মাধুর্যের পরশ তার হৃদয়ে অনুভব করতে পারে। পবিত্র কুরআনের অলৌকিক ভাষাশৈলী, স্টাইল ও গদ্যরীতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের কয়েকটি হলো–

ক. পবিত্র কুরআন মূলত এমন একটি গদ্য বর্ণনার সমষ্টি, ব্যাকরণসিদ্ধ আরবি, কবিতা ও কাব্যের কোনো নিয়ম-নীতির সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট বিবেচনা ও অবলম্বন না থাকলেও যার মাঝে বিরাজ করছে এমনই স্বাদ, মিষ্টি দ্যোতনা, যা কবিতার চেয়েও অধিক, কবিতার চেয়েও ঊর্ধ্বে। ভাষার যাবতীয় রূপ ও প্রকাশের মধ্য থেকে একমাত্র কবিতাই হচ্ছে এমন যার মাঝে দ্যোতনা ও হৃদয়ের গুরুত্ব সর্বোচ্চ, তার সঙ্গে থাকে আবার নানা মিল ও ওযনের বাধ্যবাধকতা । দেশ, রুচি, ও অঞ্চল ভেদে কবিতার ক্ষেত্রে নানা ধরনের নিয়ম ও ওযনের বাধ্য বাধকতা বিদ্যমান। এক্ষেত্রে আরবি-ফার্সি কবিতায় আটো সাটো ও সমৃদ্ধি ব্যাকরণ সবচেয়ে বেশি ক্রিয়াশীল। কিন্তু সকল ভাষার কবিতারই মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাতে শব্দসমূহের পারস্পরিক সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে এমন একটি স্বর ও ধ্বনি দ্যোতনার উপস্থিতি থাকবে যে, মানুষ তা পাঠ ও শ্রবণ করার পর তার রুচির স্নিগ্ধতা ও কোমলতায় তা বিশেষভাবে বরণযোগ্য, অনুভবযোগ্য হয়ে উঠবে। কবিতার এই অনিবার্য বৈশিষ্ট্যটিকে অবলম্বন করার জন্য প্রচলিত, বিরাজমান, স্বীকৃত কাব্যবিধি অনুসরণ করা কবিদের পক্ষে জরুরি হয়ে যায়। কবিতার জন্য এই সীমাবদ্ধতা ও নিয়ন্ত্রণকে উপেক্ষা করা কবির পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু পবিত্র কুরআনের গদ্যে বর্ণাঢ্য ও অতুলনীয় ভঙ্গিতে কবিতার এই মূল বৈশিষ্ট্যটির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, কোনো ভাষার কোনো কাব্যবিধির নিয়ন্ত্রক ও সীমাবদ্ধতা অনুচিত না হওয়া সত্ত্বেও। এটি পবিত্র কুরানের গদ্যশৈলীর এক অনির্বচনীয় ব্যাপক সৌন্দর্য, যা শুধু আরবরাই নয়; বরং দুনিয়ার যে কোনো ভাষাভাষী মানুষই কিছু না কিছু অনুভব করতে সক্ষম হন এবং পবিত্র কুরআনের তেলাওয়াত শ্রবণ মাত্রই অসাধারণ এক স্বাদ ও প্রভাব অনুভব করেন।

খ. অলংকারবিদগণ গদ্যশৈলীর তিনটি প্রকার নির্ধারণ করেছেন। প্রকার তিনটি হলো, বক্তৃতামূলক, সাহিত্যমূলক, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যমূলক গদ্যের এই তিনটি শৈলীর প্রতিটিরই ক্ষেত্রে পরিধি ও চরিত্র আলাদা। একই গদ্যে তিনটি রীতির সমন্বয় সম্ভব নয়। কিন্তু কুরআনে কারীমের অলৌকিকত্ব হলো এই তিনটি শৈলীরই অপূর্ব সমন্বয় ও সমাবেশ তাতে সফলভাবে বিদ্যমান। একটি গদ্যেই বক্তৃতার জোর, সাহিত্যের সৌরভ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভারত্ব একই সঙ্গে সচল থাকে এবং কোনটাতেই কোন ধরনের ত্রুটি বা অপূর্ণতা পরিলক্ষিত হয় না।

গ. কুরআন মাজীদের সম্বোধিত শ্রেণি হচ্ছে গোটা মানব জাতির সকল শ্রেণি। অশিক্ষিত, গ্রাম্য, শিক্ষিত এবং উচ্চ শিক্ষিত ও নানা বিষয়ে পারদর্শী পণ্ডিতদের সকলেই পবিত্র কুরআনের সম্বোধিত শ্রেণি। পবিত্র কুরআনের একটি শৈলী একই সঙ্গে সকল শ্রেণির মানুষকেই বিমোহিত করে থাকে, প্রভাবিত করে থাকে। এ দিকে অশিক্ষিত ও স্বল্প শিক্ষিত মানুষ কুরআন মাজীদের মাঝে সরল ও সাদা বাস্তবতা খুঁজে পায় এবং ভাবে যে, কুরআন আমার জন্যই নাজিল হয়েছে। অপরদিকে জ্ঞানী ও গবেষক শ্রেণি যখন গভীর মনোযোগ ও অনুসন্ধিৎসা নিয়ে কুরআন শরীফ পাঠ করেন, তখন তারা তার মাঝে বহু প্রজ্ঞাদীপ্ত সূক্ষ্মতত্ত্বের সন্ধান লাভ করেন এবং ভাবেন যে, এই গ্রন্থ খানা ইলম এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন সব সূক্ষ্ম তথ্য ও তত্ত্বপূর্ণ যে, মামুলি শিক্ষা-দীক্ষা নিয়ে কেউ কুরআন শরীফ বুঝতেই পারবে না।

ঘ. একটি বিষয়কেই বারবার উল্লেখ করা এবং তাতে পূর্ণ আকর্ষণ বজায় রাখা একজন সর্বোচ্চ সাহিত্য প্রতিভাসম্পন্ন মানুষের পক্ষেও কঠিন। শ্রোতা বা পাঠকের বিরক্তি কিংবা অনীহা এক্ষেত্রে অনিবার্য হয়ে উঠে। বক্তব্যের শক্তি ভেঙ্গে যায়। প্রভাব ও ক্রিয়া কমে যায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কুরআনে কারীমের মুআমালা হলো এই যে, তাতে একই বিষয়, একই প্রসঙ্গ, এই কাহিনী বারবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশবার পর্যন্ত পুনরোল্লেখ হয়েছে; কিন্তু প্রতিবারই কুরআন নতুন ধরন, নতুন স্বাদ এং নতুন প্রভাব ও ক্রিয়া উপস্থাপন করেছে।

ঙ. কোনো কথা ও সত্যের শক্তি ও প্রাচুর্য এবং সূক্ষ্মতা ও মিষ্টতা ভিন্ন দুটি বৈশিষ্ট্য। দুটি বৈশিষ্ট্যের প্রত্যেকটির জন্য ভিন্ন স্টাইল ও শৈলী অবলম্বন করতে হয়। এই উভয় বৈশিষ্ট্যকে একটি মাত্র গদ্যে একত্র ও একীভূত করা মানবীয় শক্তি বহির্ভূত কাজ। কিন্তু শুধুমাত্র কুরআনিক গদ্যশৈলীর অলৌকিক অনন্যতা যে, কুরআনের মাঝে এই উভয় গুণ বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি অত্যন্ত উজ্জ্বল ও চমৎকারভাব বিদ্যমান।

চ. কিছু কিছু বিষয় ও প্রসঙ্গ এমন রয়েছে যে, যেগুলো বর্ণনার ক্ষেত্রে হাজার চেষ্টা করলেও কোনো মানবীয় মেধা ও মস্তিষ্ক সাহিত্যের স্বাদযুক্ত করতে সক্ষম হয় না। পবিত্র কুরআন এ ধরনের বিষয় নিয়েও সাহিত্য ও অলঙ্কারের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত পেশ করেছে। উদাহরণস্বরূপ উত্তরাধিকার বিষয়ক আইনকানুনের কথা বলা যেতে পারে। এটি একটি মারাত্মক পর্যায়ের

শুষ্ক ও শক্ত বিষয়। দুনিয়ার সকল সাহিত্যিক ও কবি ঐক্যবদ্ধ হয়েও বিষয়টি নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে কোনো সাহিত্য কিংবা সৌন্দর্য ও শিল্পের সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে না। কিন্তু আপনি কুরআন শরীফের সূরা নিসায় يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ থেকে একটি রুকু' তেলাওয়াত করুন; যেখানে উত্তরাধিকার আইন কানুনের সবিস্তার আলোচনা রয়েছে; আপনি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই স্বগতোক্তি করে উঠবেন, এতো এক বিস্ময়কর কালাম, অসাধারণ ও অলৌকিক কালাম! কারণ এই রুকু'তে উত্তরাধিকারের বিধি-বিধানের সাথে সৌন্দর্য ও শিল্পের এমনই চমৎকার সংমিশ্রিত পরিবেশনা রয়েছে যে, সাহিত্য ও উপলব্ধির সুস্থ ও স্নিগ্ধ রুচি সেখানে স্বাদ ও সুখের দিগন্ত আবিষ্কারের আনন্দ লাভ করে।

ছ. প্রত্যেক কবি ও সাহিত্যকের জন্য উপযোগিতা ও অলংকারের একটি নির্দিষ্ট ময়দান বা অঙ্গন থাকে। সেই অঙ্গনে শিল্প ও সাহিত্যিক কারুকাজে পারঙ্গমতার স্বাক্ষর রাখতে তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। কেউ রোমান্টিক কাব্যে, কেউ কথা সহিত্যির সাধারণ বিষয়ে, কেউ জীবন গঠনমূলক সাহিত্যে, কেউ বা ইতিহাস ঐতিহ্য বিষয়ে সাহিত্য সৃষ্টিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। আরবি সাহিত্যেও ইমরুল কায়েস, নাবেগা, আ'শা, যুহায়েরের কাব্যে এই প্রক্রিয়ায় ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গন ও বিষয় চিহ্নিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু কুরআন কারীমের মাঝে এ পরিমাণ বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে, যা গণনা ও আয়ত্ত করা দারুণ দুরূহ; কিন্তু সকল বিষয় ও প্রসঙ্গেই কুরআন কারীমের বর্ণনা অলংকার ও ভাষা শিল্পের উচ্চমান ও মাপের বাহক হয়ে আছে।

জ. সংক্ষিপ্ততা এবং বাহুল্য বর্জন কুরআন শরীফের স্টাইল ও শৈলীর অনন্য বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যে কুরআন মাজীদের অলৌকিকত্ব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সংক্ষিপ্ত এক একটি বাক্যে সুবিস্তৃত বিষয় ও বক্তব্য এতো চমৎকারভাবে ধারণ করেছে যে, সকল যুগ ও কালের মানুষই সেখান থেকে হেদায়েত লাভ করতে পারে। কুরআন মজীদ ইতিহাসগ্রন্থ নয়; কিন্তু ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য উৎস; রাষ্ট্রনৈতিক বিধি-বিধানের গ্রন্থ নয়, কিন্তু কুরআন মাজীদের কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে রাষ্ট্রনীতি ও জগৎ গড়ার এমন সব নীতিমালা উপস্থাপিত হয়েছে, যা দুনিয়ার শেষ দিন পর্যন্ত মানুষকে রাহনুমায়ী করে যাবে। কুরআন মাজীদ দর্শন এবং বিজ্ঞানের গ্রন্থ নয়, কিন্তু তার মাঝে দর্শন ও বিজ্ঞানের বহু দিক উন্মোচিত হয়েছে। কুরআন মাজীদ অর্থনীতি ও জীবন-জীবিকার কোনো গ্রন্থ নয়, কিন্তু উভয় বিষয়েই সংক্ষিপ্তভাবে এমন ব্যাপক ও সম্পূর্ণ হেদায়েত তাতে উপস্থিত যে, পৃথিবী সমৃদ্ধ হোক বা ধ্বংস হোক সব ক্ষেত্রে সেটিকেই অবলম্বন করতে হবে। এছাড়াও আরো বহু বিষয় ও প্রসঙ্গ কুরআন মাজীদে এসেছে পৃথিবীর মানুষের জন্য সবকিছুর দিক নির্দেশক ও মীমাংসাকারী হিসেবে। অথচ এর সবই এসেছে বাহুল্য বর্জিত উপস্থাপনায় সংক্ষিপ্ত কয়েকটি মাত্র বাক্যে।

ধারাবাহিকতা ও পরম্পর অলৌকিকত্ব : পবিত্র কুরআনের একটি উল্লেখযোগ্য ও শক্তিশালী অলৌকিকত্বের দিক হলো, কুরআনের আয়াতসমূহের মাঝে পারস্পরিক সামঞ্জস্য, সম্বন্ধ, ধারাবাহিকতা, পরম্পরা এবং পূর্বাপর বিন্যাস। ভাসা ভাসা চোখে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করে যেতে থাকলে দৃশ্যত মনে হতে থাকবে প্রতিটি আয়াতই ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ও বক্তব্যের বাহক, প্রতিটি আয়াতই স্বয়ংসম্পূর্ণ পূর্ব ও পরের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। আবার গভীরভাবে, সুক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, আয়াতসমূহের মাঝে গভীর সূক্ষ্ম ও কোমল একটি সম্বন্ধ বিদ্যমান। বিদ্যমান চমৎকার ধারাবাহিকতা, পরম্পরা ও বিন্যাস। একই সাথে প্রত্যেক আয়াতের স্বয়ংসম্পূর্ণতা, পূর্বাপরের প্রতি অনির্ভরতা এবং পরম্পরা ও ধারাবাহিকতার এই অনন্য বৈশিষ্ট্যটি পবিত্র কুরআনের এমনই অলৌকিক বিশেষত্ব যা মানবীয় সামর্থ্যের বহু উর্ধ্বের বিষয়।

ভবিষ্যত সংবাদ প্রদান : কুরআনে কারীম ভবিষ্যৎ ঘটনাবলি সম্পর্কে যেভাবে সংবাদ দিয়েছে, ঠিক সেভাবেই তা যথাসময়ে সংঘটিত হয়েছে। আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতায় পৌঁছেও বর্তমানে কেউ ভবিষ্যতের সঠিক সংবাদ দিতে পারছে না। এটি একমাত্র কুরআনের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। বিরুদ্ধবাদীরাও তা অকপটে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। যেমন রোমকদের বিজয় সংবাদ, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে হেফাজতের ওয়াদা, বদর যুদ্ধে জয়লাভের সুসংবাদ ইত্যাদি।

বিগত জাতিসমূহের বৃত্তান্ত : কুরআনে কারীম অতীত জাতিসমূহ সম্পর্কে এমন নির্ভুল তথ্য দিয়েছে, যা আজ পর্যন্ত কেউ দিতে পারেনি। যেমন– আসহাবে কাহাফ, হযরত ইউসূফ (আ.), যুল কারনাইন, লুকমান (আ.) ও খিজির (আ.)-এর বিবরণ তার উজ্জ্বল প্রমাণ।

প্রভাব বিস্তার ক্ষমতা : কুরআনের তেলাওয়াত বা শ্রবণ পাঠক-শ্রোতাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। যা পৃথিবীর কোনো গদ্যের কিংবা পদ্যের গ্রন্থে এহেন স্থায়ী প্রভাব ও আকর্ষণীয় শক্তি, মাধুর্য ও মহত্ত্ব নেই।

পুনঃ পুনঃ পাঠের স্বাদ : কারো কোনো রচনা যতই অলঙ্কার ও সাহিত্যমণ্ডিত হোক না কেন, মানুষ তা দু' এক বার পড়া বা শোনার পর আর পড়ে না বা শুনতে চায় না; বরং তার প্রতি এক ধরনের বিরক্তি বোধ হয়। কিন্তু কুরআনে কারীম একমাত্র গ্রন্থ, যা যা বারবার পাঠে বা শ্রবণে নতুন স্বাদ অনুভব করা যায়। পড়ার প্রতি সমান আগ্রহ বিরাজ করে

স্থায়িত্ব ও চিরন্তনতা : আলকুরআন এমন একটি গ্রন্থ যা চিরকাল অবিকৃতভাবে বিদ্যমান থাকবে। অন্যান্য আসমানি কিতাবও এ বৈশিষ্ট্য লাভ করতে পারেনি। ইরশাদ হয়েছে– إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ অর্থাৎ আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষক। –[সূরা হিজর : ৯] সূত্র : –[উলূমুল কুরআন : তাকী উসমানী ২৪৮-২৫২]

তাফসীর শাস্ত্রের ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ

কুরআন নাজিলের সময় থেকেই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জীবনে স্বীয় বাণী দ্বারা কুরআনে কারীমের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন এভাবে সাহাবায়ে কেরাম নবুয়তে মুহাম্মদি ও নূরে রিসালাতের আলোকে কুরআনের তাফসীর করেছেন। তাবেয়ীগণের যুগে তাফসীরের মধ্যে আরো সম্প্রসারণ ঘটতে থাকে। এভাবে প্রতিটি যুগে তার পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় নতুন নতুন ব্যাখ্যা ও তথ্য কুরআন থেকে উদঘাটিত হতে থাকে। এ অফুরন্ত অমূল্য রতন থেকে লাভবান হওয়ার জন্য সকল শ্রেণির জ্ঞানী-গুণী ও পণ্ডিতবর্গ দিবানিশি প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। সে ধারা আজ পর্যন্ত চলছে। আর কিয়ামত পর্যন্ত অনবরত চলতেই থাকবে। কারণ এই নিখিল ধারার সকল মানুষ ও সমগ্র জাতি একত্র হয়েও যদি কুরআন ব্যাখ্যায় আপন আপন জীবনকে উৎসর্গ করে দেয় তবুও তার ব্যাখ্যা অপূর্ণই থেকে যাবে। এ কথার প্রতিই রাসূলুল্লাহ ﷺ ইঙ্গিত করে বলেন - لَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ [কুরআনের ব্যাখ্যা ও আশ্চর্য প্রকাশের কোনো পরিধি নেই]

তাফসীরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস :

রাসূল ﷺ-এর যুগে তাফসীর : পবিত্র কুরআন আরবি ভাষায় নাজিল হয়েছে। কুরআন অবতরণের যুগে সাহাবায়ে কেরাম আয়াতের অর্থ ও মর্ম অতি সহজেই অনুমান করে নিতেন। কোথাও কোনো অস্পষ্টতা থাকলে কিংবা অবোধগম্য হলে রাসূল ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে জেনে নিতেন। আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ-কে কুরআনের ধারক বাহক হিসেবে প্রেরণ করার সাথে সাথে এ কথাও রাসূল ﷺ -কে জানিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষের কাছে কুরআনকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিন।

সাহাবায়ে কেরামের যুগে তাফসীর : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যুর পর খেলাফাতে রাশেদার যুগে যখন চতুর্দিকে ইসলামের বিজয় শুরু হলো আর সাহাবায়ে কেরাম বিশ্ব মানবের কাছে ইসলামের বাণী নিয়ে ঝাপিয়ে পড়লেন, তখন ইসলামি সভ্যতা ও কৃষ্টি কালচারের ক্ষেত্র ও পরিধি বাড়তে থাকল। তখন দ্রুতগতিতে দলে দলে মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়ায় অনুপ্রবেশ করতে লাগল। দৈনন্দিন জীবনে বেশ কিছু সমস্যা দেখা দেয়। নতুন নতুন সমস্যার সমাধানকালে সাহাবায়ে কেরাম কুরআনে কারীমের আহকাম সম্পর্কিত আয়াতসমূহের মাঝে গবেষণা করার বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করেন এবং রাসূল ﷺ -এর হাদীসের আলোকে তার ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেন। হাদীসে পাওয়া না গেলে ইলমে নববীর আলোয় উদ্ভাসিত ইজাতিহাদ দ্বারা ব্যাখ্যা দেন।

সে যুগে দশজন সাহাবা এমন ছিলেন যাঁরা এ বিষয়ে পারদর্শী ও প্রজ্ঞাবান ছিলেন। বিশেষভাবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ছিলেন এ ময়দানের অগ্রগামী, অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুফাসসির। রাসূল ﷺ তাঁকে তাফাক্কুহ ফিদ্দীন [দীনি ইলমে পাণ্ডিত্য] হাসিলের জন্য দোয়া করেন। তাই তাঁকে বলা হয় রঈসুল মুফাসসিরীন। তিনি খোদাপ্রদত্ত বিজ্ঞতা, দক্ষতা ও তথ্যবহুল জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাফসীর বিষয়ে তাঁর কথাকে ঐক্যবদ্ধভাবে সাধারণত অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু তখনো কিতাব আকৃতিতে কোনো তাফসীর লিপিবদ্ধ হয়নি; বরং তা সাহাবায়ে কেরামের নিকট বিভিন্ন উপায়ে সংরক্ষিত ছিল। ধীরে ধীরে যখন তাফসীরের মধ্যে সম্প্রসারণ ঘটতে লাগল, তখন বিশেষভাবে তা লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

তাবেয়ীগণের যুগে তাফসীর : যাঁরা রাসূল ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করেননি, তবে রাসূলের সাহাবীগণের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। কিছু সাহাবীদের সংশ্রবে থেকে ইলমে ওহীর শারানান তাহুরায় পরিশোধিত করেছেন নিজেদের। অর্জন করেছেন ইলমে নববীর পাণ্ডিত্য। তাঁদের মধ্যেও বিশেষ কিছু ব্যক্তি ছিলেন, যাঁরা তাফসীরের ক্ষেত্রে পারদর্শী ও দক্ষ ছিলেন। যেমন- আতা ইবনে আবী রাবাহ, ইকরামা , সাঈদ ইবনে যুবাইর, হাসান বসরী ও আবুল আলিয়াহ প্রমুখ। খলীফা আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান সাঈদ ইবনে যুবাইর -এর নিকট একখানা তাফসীরগ্রন্থ লিখার দরখাস্ত করলে তিনি তার ফরমায়িশ রক্ষার্থে একখানা তাফসীরগ্রন্থ খলীফার কাছে পাঠিয়ে দেন। সেটা ছিল তাফসীরে আতা ইবনে দিনার। এটি ঐতিহাসিক একখানা তাফসীরগ্রন্থ। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এটাই তাফসীর সম্পর্কে প্রণীত প্রথম কিতাব।

তাফসীর সংকলনের যুগ : এ যুগ ছিল ঐ যুগ, যে যুগে সত্যিকারার্থেই তাফসীরের ক্ষেত্রে বিশেষ গবেষণা ও তাফসীরের প্রসারের ব্যাপকতা লাভ করে। আর এ যুগটা খেলাফতে উমাইয়ার শেষলগ্ন থেকে খেলাফতে আব্বাসিয়ার শুরু পর্যন্ত। তাফসীর প্রথমে হাদীস শাস্ত্রেরই একটি শাখা ছিল। পরবর্তীতে এ বিষয়ের ব্যাপকতা সৃষ্টি হলে এবং বিষয়বস্তুর বিস্তার ঘটলে সে যুগের বিজ্ঞ মনীষীগণ তাফসীরশাস্ত্রকে হাদীসশাস্ত্র থেকে আলাদা করে অন্য একটি আলাদা ও ভিন্ন শাস্ত্রের রূপ দেন। অনেকেই গ্রন্থ আকারে তাফসীর লিখেছেন । যেমন- তাফসীরে ইবনে জারীর তাবারী। যা একটি উল্লেখযোগ্য, প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় তাফসীরগ্রন্থ।

তাফসীর উদ্ভাবনের পরবর্তী যুগ : এখান থেকে তাফসীরের পঞ্চম যুগ শুরু হয়। আর তা খেলাফতে আব্বাসিয়ার শুরুলগ্ন থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত চলে আসছে। এর আগের যুগে তাফসীর শুধুমাত্র রেওয়ায়েত, আছার এবং আহাদীসের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল। এ যুগে তার সাথে ইজতিহাদ, আকল ও ব্যক্তি মতামতের সৃষ্টি হয়। তার সাথে সাথে অন্যান্য আরো কিছু বিষয়ের সংমিশ্রণ হয়। যেমন- নাহু, সরফ, লুগাত, দর্শন, হিকমত ও ইতিহাস ইত্যাদি।

হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর দীন ইসলামের মাঝে বিভিন্ন ফেতনা ও বিপর্যয় দেখা দেয় এবং হক বাতিলের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। আবিষ্কার হতে থাকে নানা দৃষ্টিকোণ। শুরু হয় মুসলমানদের মাঝে অযাচিত লড়াই। এ ধারা ক্রমপর্যায়ে খিলাফতে আব্বাসিয়ার যুগে আরো চাঙ্গা হয়ে উঠে। তখন দলগত গোড়ামি এবং স্বজনপ্রীতি চরম আকার ধারণ করে। প্রত্যেকেই কুরআনী ব্যাখ্যা দ্বারা নিজ নিজ মতবাদ ও দৃষ্টিকোণ এবং আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করে। প্রতিটি শাস্ত্রে গবেষক ও পণ্ডিতগণ কুরআনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তার শাস্ত্রকে ফুটিয়ে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যান। মুহাদ্দিসগণ তাদের প্রণীত তাফসীরগ্রন্থে শুধুমাত্র হাদীস সংক্রান্ত তাফসীর সন্নিবিষ্ট করেছেন। যেমন- তাফসীরে ইবনে কাসীর, তাফসীরে ইমাম বুখারী ইত্যাদি। ফকীহগণ তাদের বর্ণিত তাফসীরগ্রন্থে ফিকহী মাসায়েল তুলে ধরেছেন এবং নাহুবিদগণ যে সমস্ত তাফসীরগ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, তাতে নাহুর মাসায়িল তুলে ধরেছেন। আনুষঙ্গিকভাবে অন্যান্য বিষয় নিয়েও আলোচনা করেছেন। যেমন প্রসিদ্ধ নাহুবিদ যুজাজ তার কিতাবে আর ওয়াহেদী তার কিতাব বসীত-এর মধ্যে আবূ হাইয়ান তার কিতাব আল বাহরুল মুহীতে নাহুর কায়দা কানুন ও তথ্যাবলি পেশ করেছেন। আর যারা উলূমে আফলিয়্যাহ ও যুক্তিবিদ্যায় পারদর্শী, তারা তাদের তাফসীরগ্রন্থে যুক্তির নীতিমালা ব্যাখ্যা করেছেন দক্ষ হাতে। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযীর কিতাব এ ধারার একটি বিশেষ নুমনা। তাতে তিনি আকলী-নকলী সকল প্রকারের দলিল পেশ করেছেন।

সূফীগণ তাঁদের প্রণীত তাফসীরগ্রন্থে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সমাহার ঘটিয়েছেন। যেমন– ইসলামের নামধারী বাতিল মতাদর্শীরাও তাদের ভ্রান্ত মতাদর্শ ও দৃষ্টিকোণকে প্রমাণ করতে গিয়ে তাফসীর লিখেছে, যাতে একমাত্র তাদেরই মতাদর্শ স্থান পেয়েছে। যেমন– শীয়ারা তাদের গ্রন্থাদিতে শীয়া মতবাদকে জায়গা দিয়েছে। মু'তাজিলারা তাদের মতাদর্শকে সামনে রেখে কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন। আবুল আলা মওদুদী সাহেবও এ ধারারই একজন। নিজের ভ্রান্ত মতবাদ প্রমাণ করার জন্য কুরআনকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন তিনি।

তাফসীরগ্রন্থের শ্রেণি বিন্যাস : তাফসীরগ্রন্থসমূহ মূলত দু ভাগে বিভক্ত । যথা–

১. তাফসীর বিল মাসূর অর্থাৎ ঐ সকল তাফসীরগ্রন্থ যাতে শুধু কুরআন হাদীসের আলোকে তাফসীর করা হয়েছে; সেখানে রায়, কিয়াসের দখল নেই।
২. তাফসীর বিল মাকূল অর্থাৎ যাতে শুধু দেরায়াত ও আকলিয়াতের উপর নির্ভর করা হয়েছে।
৩. রেওয়ায়েত এবং দেরায়াত উভয়টির সমন্বিত তাফসীর। [এটি সবচেয়ে বেশি উচ্চ স্তরের]

তাফসীর গ্রন্থের আরো একটি শ্রেণি বিন্যাস : তাফসীরের কিতাবসমূহ তিন রকমের হয়ে থাকে। যথা–

১. مُخْتَصَرْ وَ اَوْجَزْ অতি সংক্ষিপ্ত তাফসীর। যেমন– জালালাইন শরীফ। এর মতন এবং তাফসীরের শব্দসমূহ সমান সমান।
২. اَوْسَطْ মধ্যম স্তরের তাফসীর। যেমন– তাফসীরে বায়যাবী, মাদারেক, কাশশাফ, তাফসীরে কুরতুবী ইত্যাদি।
৩. مَبْسُوْط وَ مُفَصَّلْ অধিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সম্বলিত তাফসীর, যেমন ইমাম রাযী (র.)-এর তাফসীরে কাবীর, তাফসীরে ইমাম রাগেব ইস্পাহানী (র.) ইত্যাদি।

প্রসিদ্ধ তাফসীরগ্রন্থসমূহ

তাফসীর বিল মাসূর সম্পর্কে কতিপয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থাদি :

١. جَامِعُ الْبَيَانِ فِيْ تَفْسِيْرِ الْقُرْاٰنِ - اِبْنُ جَرِيْر طَبَرِيْ (رح)
٢. بَحْرُ الْعُلُوْم - اَبُو اللَّيْث سَمَرْقَنْدِيْ (رح)
٣. اَلْكَشْفُ وَالْبَيَانُ عَنْ تَفْسِيْرِ الْقُرْاٰنِ - اَبُوْ اِسْحَاقَ تَغْلِبِيْ (رح)
٤. مَعَالِمُ التَّنْزِيْل - اَبُوْ اِسْحَاقُ حُسَيْن بَغْوِيْ (رح)
٥. اَلْمُحَرَّرُ الْوَجِيْزُ فِيْ تَفْسِيْرِ الْكِتَابِ الْعَزِيْزِ - اِبْنُ عَطِيَّةَ اَنْدُلُسِيْ (رح)
٦. تَفْسِيْرُ الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْم - حَافِظ اِبْنُ كَثِيْر (رح)
٧. اَلْجَوْهَرُ الْحَسَّانُ فِيْ تَفْسِيْرِ الْقُرْاٰنِ - عَبْدُ الرَّحْمٰن ثَعْلَبِيْ (رح)
٨. اَلدُّرُّ الْمَنْثُوْرُ فِى التَّفْسِيْرِ الْمَاثُوْر - جَلَالُ الدِّيْن سُيُوْطِيْ (رح)

তাফসীর বিররায় সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহ :

١. مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ ـ اَلْاِمَامُ فَخْرُ الدِّيْنِ رَازِىْ (رحـ) ـ

٢. اَنْوَارُ التَّنْزِيْلِ ـ بَيْضَاوِىْ (رحـ)

٣. مَدَارِكُ التَّنْزِيْلِ وَحَقَائِقُ التَّاوِيْلِ ـ اِمَامُ نَسَفِىْ (رحـ)

٤. لُبَابُ التَّاوِيْلِ فِىْ مَعَانِى التَّنْزِيْلِ ـ خَازِنْ (رحـ)

٥. اَلْبَحْرُ الْمُحِيْطُ ـ اَبُوْ حَيَّانْ (رحـ)

٦. غَرَائِبُ الْقُرْاٰنِ وَرَغَائِبُ الْفُرْقَانِ ـ نِيْسَابُوْرِىْ (رحـ)

٧. تَفْسِيْرُ الْجَلَالَيْنِ ـ جَلَالُ الدِّيْنِ مَحَلِّىْ وَجَلَالُ الدِّيْنِ سُيُوْطِىْ (رحـ)

٨. اَلسِّرَاجُ الْمُنِيْرُ ـ اَلْخَطِيْبُ الشَّرْبِيْنِىْ (رحـ)

٩. اِرْشَادُ الْعَقْلِ السَّلِيْمِ اِلٰى مَزَايَا الْقُرْاٰنِ الْكَرِيْمِ ـ اَبُو السَّعُوْدِ (رحـ) ـ

١٠. رُوْحُ الْمَعَانِىْ ـ اَلُوْسِىْ (رحـ) ـ

সুফিয়ায়ে কেরামের তাফসীর : সুফিয়ায়ে কেরাম এ ক্ষেত্রে কম যাননি। তারাও তাফসীরের ক্ষেত্রে কলম ধরে তাসাউফের বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অনেকের তাফসীর পড়লে তো মনে হবে কুরআনে তাসাউফ বর্ণনাই মূল উদ্দেশ্য। নিম্নে তাদের কিছু কিতাবের তালিকা দেওয়া হলো–

১. عَرَائِسُ الْبَيَانِ فِىْ حَقَائِقِ الْقُرْاٰنِ রচয়িতা : আবূ মুহাম্মদ রোযাবাহান ইবনে আবূ জাফর নসর বাকূলী সিরাজী সূফী (র.)। তিনি ৩০৬ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

২. اَلتَّاوِيْلَاتُ النَّجْمِيَّةُ এই তাফসীর গ্রন্থটি দু'জনের রচিত, নাজমুদ্দীন দায়াহ (র.) এর রচনা আরম্ভ করেন। তার মৃত্যুর পর আলাউদ্দীন রাযী তা পরিপূর্ণ করেন। শায়েখ নাজমুদ্দীন আবূ বকর ইবনে আব্দুল্লাহ আসাদী রাযী দায়ার উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ৬৫৪ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। আলাউদ্দীন হলো অপর জনের উপাধি। নাম মুহাম্মদ আহমান. নিসবত শামস। তিনি ৬৫৯ হিজরিতে জন্মলাভ করেন এবং৭৩৬ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

ফুকাহায়ে কেরামের তাফসীর : কুরআনের একটি অংশ জুড়ে রয়েছে আহকামের আয়াত তথা উম্মতে মুহাম্মদীকে দেওয়া বিধি বিধান। এগুলোই হলো কুরআনের মূল অংশ। ফুকাহায়ে কেরাম এ আয়াতগুলোর আলোকে মাসআলা ইসতিম্বাত করেছেন। এ আয়াতগুলোর উপর রচিত হয়েছে আলাদা তাফসীরগ্রন্থ। এর কিছু বিবরণ তুলে ধরা হলো–

১. اَحْكَامُ الْقُرْاٰنِ [আহকামুল কুরআন] লিখক : আবূ বকল আহমদ ইবনে আলী রাযী। তিনি ৩০৫ হিজরিতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৩৭০ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

২. اَحْكَامُ الْقُرْاٰنِ আহকামুল কুরআন] লিখক : ইমামুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে তাবারী (র.)। তিনি ৪৫০ হিজরিতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৫০৪ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

৩. اَحْكَامُ الْقُرْاٰنِ [আহকামুল কুরআন] লিখক : আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনুল আরবি (র.) । তিনি ৪৬৮হিজরিতে জন্ম গ্রহণ করেন।

৪. اَلْجَامِعُ لِاَحْكَامِ الْقُرْاٰنِ লিখক : আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আনসারী খায়রদী কুরতুবী মালেকী (র.)। তিনি ৬৭১ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন।

৫. كَنْزُ الْعِرْفَانِ فِىْ فِقْهِ الْقُرْاٰنِ লিখক : মিকদাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আস্‌সুয়ূতী (র.)।

৬. اَلْقَوْلُ الْوَجِيْزُ فِىْ اَحْكَامِ الْقُرْاٰنِ الْعَزِيْزِ লিখক : শিহাবুদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে ইউসুফ হালিবী। তিনি ৭৫৬ হিজরির মৃত্যুবরণ করেন।

৭. اَحْكَامُ الْكِتَابِ الْمُبِيْنِ [আহকামূল কিতাবিল মুবীন] লিখক : আলী ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ শানকফী (র.)।

৮. اَلْاِكْلِيْلُ فِيْ اِسْتِنْبَاطِ التَّنْزِيْلِ লিখক: আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী। তিনি ৯১১ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

প্রখ্যাত মুফাসসিরীনে কেরাম

১. **হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) :** তিনি হিজরতের তিন বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ এবং তিনি মতান্তরে ৬৮/৭০/৭১ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

২. **হযরত আলী (রা.) :** চতুর্থ খলিফা। কুরআনের তাফসীর বিষয়ে তার মর্যাদা অত্যন্ত উঁচু। প্রথম তিন খলিফার ইন্তেকাল হয়েছিল খুব তাড়াতাড়ি। এ জন্য তাদের থেকে তাফসীর সম্পর্কিত রেওয়ায়েত খুবই কম বর্ণিত হয়েছে। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত লাভের দশ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন এবং হিজরি ৪০ সনের ১৮ই রমজান শুক্রবার ফজর নামাজে যাত্রাপথে আব্দুর রহমান ইবনে মুলজিম নামক খারিজী ঘাতকের তলোয়ারের আঘাতে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে তিন দিন পর তিনি শাহাদাতবরণ করেন।

৩. **হযরত আয়েশা (রা.) :** তিনি মতান্তরে ৫৭/ ৫৮ হিজরিতে ৬৬ / ৬৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

৪. **হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) :** সাহাবী

৫. **হযরত উবাই ইবনে কা'ব** (রা.) : সাহাবী

৬. **হযরত মুজাহিদ (র.) :** তাবেয়ী। **জন্ম ২১ হিজরি**, মৃত্যু ১০৩ হিজরি। তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর **বিশিষ্ট শিষ্য ছিলেন।**

৭. **হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইর (র.) : প্রসিদ্ধ** তাবেয়ী। মৃত্যু ৯৪ হিজরি। তিনি খলিফা আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান -এর অনুরোধে একটি তাফসীর লিখেছিলেন।

৮. **হযরত ইকরিমা** (র.) তাবেয়ী।

৯. **হযরত তাউস** (র.) ইয়েমেনের অধিবাসী।

১০. **হযরত আতা ইবনে রাবা (র.) :** জন্ম হযরত উসমান (রা.)-এর খেলাফতের শেষ পর্যায়ে, ইন্তেকাল ১১৪ হিজরি।

১১. **হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব** (র.) : তাবেয়ী।

১২. **হযরত মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (র.) :** বসরার অধিবাসী । তিনি তাবেয়ী ছিলেন। ১১০ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

১৩. **হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (র.) :** তাবেয়ী।

১৪. **হযরত আবুল আলীয়া (র.) :** বসরার অধিবাসী, জাহেলী যুগে জন্ম গ্রহণ করেছেন কিন্তু রাসূল ﷺ -এর ওফাতের দু বছর পর মুসলমান হয়েছেন।

১৫. **হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইর (র.) :** তাবেয়ী।

১৬. **হযরত কাতাদা (র.) :** হাসান বসরী (র.) তাবেয়ী। মৃত্যু ১১৮ হিজরি।

১৭. **হযরত আলকামা (র.) :** মক্কার অধিবাসী, তাবেয়ী।

১৮. **হযরত নাফে (র.) :** তাবেয়ী। নিশাপুরের অধিকারী তিনি ১১৭ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

১৯. **হযরত শা'বী (র.) :** তাবেয়ী। তিনি হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর উস্তাদ ছিলেন।

২০. **হযরত আবী মুলাইকা (র.) :** মক্কাবাসী। তাবেয়ী। ইন্তেকাল ১১৭ হিজরি।

২১. **হযরত ইবনে জুরাইজ (র.) :** তাবেয়ী।

২২. **হযরত যাহহাক (র.) :** খেরাসানের অধিবাসী। মৃত ১০২ হিজরি এবং ১০৬ হিজরির মধ্যবর্তী সময়ে।

২৩. **কাযী আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর বায়যাবী (র.) :** তিনি পারস্যের বায়যা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। ৬৮২ হিজরি মতান্তরে ৬৮৫ হিজরিতে তিবরিজ নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন।

২৪. **হাফিয ইবনে কাছীর (র.) :** তিনি ৭০০ হিজরি মুতাবিক ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে সিরিয়ার বসরা শহরে এক সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭৭৪ হিজরি মুতাবিক ১৩৭২ খ্রিস্টাব্দের ২৬ শে শাবান রোজ বৃহস্পতিবার তিনি ইন্তেকাল করেন।

২৫. **ইমাম তাবারী (র.) :** তিনি ২২৪/ ২২৫ হিজরি মুতাবিক ৮৩৮/ ৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে অষ্টম আব্বাসী খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহর শাসনামলে ইরানের কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী পাহাড় ঘেরা তাবারিস্তানের আমুল শহরে এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩১০ হিজরি মুতাবিক ৯২৩ খ্রিস্টাব্দে অষ্টাদশ আব্বাসী খলীফা আল মুকাতাদির বিল্লাহ্‌র আমলে ইন্তেকাল করেন।

২৬. **আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) :** তিনি ৭১৯ হিজরি শাওয়াল মাসে মিশররের কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮৬৪ হিজরির রমজান মাসের ১৫ তারিখে ইন্তেকাল করেন।

২৭. **আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (র.) :** তিনি মিশরের নীল নদের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত খাযিরিয়া নামক গ্রামে ১লা রজব ৮৪৯ হিজরি সনে মাগরিব নামাজের পর জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি ৯১১ হিজরি সনের ১৯ শে জুমাদাল উলায় ইন্তেকাল করেন।

২৮. **হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দীসে দেহলভী (র.) :** তিনি ১৭০৩ ইং সনে উত্তর ভারতে অবস্থিত [তার নানার বাড়ি] মুযাফফর নগর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি ১১৭৬ হিজরির ৯ই মুহাররম যোহরের সময় দিল্লীতে ইন্তেকাল করেন।

২৯. **শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান (র.) :** তিনি তরজমায়ে শাইখুল হিন্দ -এর লেখক।

৩০. **হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী (র.) :** তিনি বয়ানুল কুরআনের লেখক। জন্ম ১২৮৫ হি.।

৩১. **আল্লামা ছানউল্লাহ পানীপতী (র.) :** তিনি তাফসীরে মাজহারীর লেখক।

৩২. **আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (র.) :** তিনি তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআনের লেখক।

৩৩. **মুফতি মুহাম্মদ শফী (র.) :** তিনি তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআনের লেখক। জন্ম ১৩৫৩ হি.।

তাফসীরে জালালাইন

তাফসীরে জালালাইন গ্রন্থ পরিচিতি : এ কিতাবের লিখক দু'জন। দু'জনের নামই জালালুদ্দীন। একজন জালালুদ্দীন মহল্লী। অপরজন হলেন জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.)। তাঁদের নামের প্রথম অংশ হচ্ছে– জালাল, আর আরবিতে জালাল-এর দ্বিবচন হলো জালালান। যেহেতু তাদের দু'জনের প্রতি তাফসীরকে اِضَافَتْ করা হয়েছে তাই مُضَافْ اِلَيْهِ হিসেবে মাজরূর হয়ে তা جَلَالَيْنْ হয়েছে। জালাল নামক দু'জন ব্যক্তি লিখা বিধায় তাকে تَفْسِيْرُ الْجَلَالَيْنِ বলা হয়। জালালুদ্দীন মহল্লী [৭৯১-৮৮৪] সূরা কাহাফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত শেষ অর্ধেকের তাফসীর করেছেন। অতঃপর সূরা ফাতেহা থেকে শুরু করার পর তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকালের ছয় বছর পর তারই বিশিষ্ট শাগরিদ আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী তারই নীতি ও পদ্ধতিতে সূরা বাকারা থেকে সূরা কাহাফ পর্যন্ত প্রথম অংশের তাফসীর রচনা করে উস্তাদের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করেন। উল্লেখ্য যে, সূরা ফাতেহার তাফসীর যেহেতু আল্লামা মহল্লী -এর লেখা তাই তা শেষাংশের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

উভয় তাফসীরের মাঝে অনেক মিল পরিলক্ষিত হয়। পাঠকের কাছে উভয় অংশের তাফসীর একজনের লেখাই মনে হবে। তবে এ তাফসীরের মাঝে কিছু ইসরাঈলী রেওয়ায়েত ও অনির্ভরযোগ্য ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।

তাফসীরে জালালাইন -এর স্তর : পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তাফসীরের কিতাবসমূহ তিন রকমের হয়ে থাকে–

১. مُخْتَصَرْ وَ اَوْجَزْ অতি সংক্ষিপ্ত তাফসীর।

২. اَوْسَطْ মধ্যম স্তরের তাফসীর।

৩. مَبْسُوْطْ وَمُفَصَّلْ অধিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সম্বলিত তাফসীর।

যে স্তরের তাফসীর : উপরিউক্ত স্তরসমূহের মধ্যে তাফসীরে জালালাইন প্রথম স্তরের তাফসীর। এর মতন এবং তাফসীরের শব্দসমূহ সমান সমান সংক্ষিপ্ত।

তাফসীরের কিতাবের আরো একটি শ্রেণি বিন্যাস রয়েছে :

১. শুধুমাত্র রেওয়ায়েত ও নকলিয়াত নির্ভর।

২. শুধুমাত্র দেরায়াত ও আকলিয়াত নির্ভর।

৩. রেওয়ায়েত ও দেরায়াত উভয়টির সমন্বিত। [এটি সবচেয়ে উচ্চস্তরের]

যে স্তরের তাফসীর : উপরিউক্ত স্তরসমূহের মধ্যে জালালাইনকে তৃতীয় প্রকারের মধ্যে গণ্য করা হয়।

তাফসীরে জালালাইনের বৈশিষ্ট্য : কুরআন মাজীদের ভাষা, শব্দগঠন, বাক্যগঠন রীতি ইত্যাদি ভাষাগত এবং ব্যাকরণ ও অলঙ্কারগত বিষয়াবলির ক্ষেত্রে জালালাইন -এর সহজ ও অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণেই আজ পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় সব দীনি মাদরাসার পাঠ্যসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে তা সর্বজন স্বীকৃতি লাভ করেছে। নিম্নে এর কতিপয় বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা গেল–

ক. কুরআন মাজীদে মোট যত শব্দ প্রায় তত শব্দেই তাফসীরটি সমাপ্ত হয়েছে।

খ. একাধিক অর্থবোধক শব্দের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্থানে কোন অর্থ প্রযোজ্য হবে তৎবোধক সমার্থসূচক শব্দ উল্লেখ করে তা চিহ্নিত করা হয়েছে।

গ. কেরাত বা পঠনরীতি উল্লেখ করা হয়েছে।

ঘ. সরফ বা শব্দ প্রকরণতত্ত্বের উল্লেখ করা হয়েছে।

ঙ. নাহু বা শব্দ গঠন ব্যবচ্ছেদ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

চ. বালাগত বা আলঙ্কারিক বিশ্লেষণও এতে রয়েছে।

ছ. আরবি ভাষা রীতি অনুসারে কুরআনের যে স্থানে যে শব্দ বা বাক্য উহ্য রয়েছে, তা যথাযথ স্থানে উল্লেখ করে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে।

জ. প্রয়োজনীয় শানে নুযূল বা আয়াত ও সূরা সংশ্লিষ্ট ঘটনাও অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঝ. প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসাইলেরও ইঙ্গিত রয়েছে।

জালালাইনের উৎস : শায়খ মুওয়াফফাকুদ্দীন আহমাদ ইবনে ইউসুফ (র.) রচিত তাফসীরে সীগার হলো জালালাইন -এর উৎস। এর উপর নির্ভর করে আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) তাঁর অংশটির তাফসীর লিখেছেন। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.)-ও প্রধানত এটিরই অনুসরণ করেছেন।

জালালাইন -এর ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ :

১. جَمَالَيْن লেখক- মোল্লা নূরুদ্দীন আলী ইবনে সুলতান মুহাম্মদ আল হারাবী ওরফে মোল্লা আলী কারী (র.)। মৃত্যু ১০১৪ হিজরি। রচনাসাল-১০০৪ হিজরী।

২. قَبَسُ النَّيِّرَيْن লেখক : শায়খ শামসুদ্দীন মুহম্মদ ইবনে আলকামী (র.) রচন সাল ৯৫৩ হিজরি।

৩. مَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ وَمَطْلَعُ الْبَدْرَيْنِ লেখক : জালালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল কারখী (র.)।

৪. اَلْفُتُوحَاتُ الْاِلٰهِيَّةُ بِتَوْضِيحِ تَفْسِيرِ الْجَلَالَيْنِ لِلدَّقَائِقِ الْخَفِيَّةِ লেখক : শায়খ সুলাইমান আল জামাল। মৃত্যু ১২০৪ হিজরি।

৫. كَمَالَيْن লেখক : শায়খ সালামুল্লাহ ইবনে শায়খুল ইসলাম ইবনে আব্দুস সামাদ ফখরুদ্দীন আল হানাফী। মৃত্যু ১২২৯ হিজরি। তিনি আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)-এর সুযোগ্য নাতী ছিলেন।

৬. حَاشِيَةُ الصَّاوِىْ লেখক : আল্লামা শায়খ আহমদ মুহাম্মদ আস সাবী [১১৭৫-১২৪১]।

৭. تَعْلِيل بَرْ جَلَالَيْن লেখক : মৌলভী অছী আলী ইবনে হাকীম মুহাম্মদ ইউসূফ মালিহাবাদী।

৮. كَمَالَيْن (اُرْدُوْ شَرْح) লেখক : মাওলানা নাঈম সাহেব। উস্তাদ, দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারত।

৯. جَمَالَيْن (اُرْدُوْ شَرْح) লেখক : মাওলানা জামালউদ্দীন, উস্তাদ, দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত।

তাফসীরে জালালাইনের লেখক পরিচিতি

প্রথমার্ধের লেখক আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.)-এর জীবনী :

নাম ও বংশ : তাঁর আসল নাম আব্দুর রহমান, উপাধি জালালুদ্দীন,উপনাম আবুল ফজল। তবে জালালুদ্দীন সুয়ূতী নামেই তিনি বিশ্বে প্রসিদ্ধ লাভ করেন। তাঁর পিতার নাম কামাল আবূ বকর/আবূ বকর মুহাম্মদ কামালুদ্দীন সুয়ূতী। সুয়ূত মিশরের নীল দরিয়ার পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি শহর। এদিকে নিসবত করে তাকে সুয়ূতী বলা হয়। তিনি এ শহরের একটি মহল্লায় [যা سَوْقِ خِضْرِيَّةْ বা مَحَلَّةْ خِضْرِيَّةْ নামে প্রসিদ্ধ] ৮৪৯ হিজরি সানের ১লা রজব জন্ম গ্রহণ করেন।

বিদ্যার্জন : পাঁচ বছর সাত মাস বয়সে তথা ৮৫৫ হিজরিতে তার পিতা আবূ বকর মুহাম্মদ কামালুদ্দীন তাকে এতিম করে পরপাড়ে পাড়ি জমান। পিতার ইন্তেকালের পর পূর্ব অসিয়ত মোতাবেক পিতার সাথী-সঙ্গীগণ জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.)-এর পড়ালেখার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিশেষভাবে শায়খ কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম হানাফী তার প্রতি সার্বিকভাবে দৃষ্টি রাখেন। আট বছর বয়সেই তিনি পবিত্র কুরআন হিফজ সম্পন্ন করেন। অতঃপর বালাগাত, ফিকহ, ফারায়েজ, হাদীস, তাফসীর, তাসাউফ, আকাইদ, চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) বলেন, আমি হজের সময় এ নিয়তে জমজম কূপের পানি পান করেছি যে, ফিকহ শাস্ত্রে শায়খ সিরাজুদ্দীন বালকিনীর পর্যায়ে, হাদীস শাস্ত্রে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানীর পর্যায়ে পৌঁছতে পারি। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে সাতটি শাস্ত্রে তথা তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, নাহু, মা'আনী, বয়ান এবং বদী' শাস্ত্রে বুৎপত্তি দান করেছেন।

তিনি প্রখর মেধাশক্তির অধিকারী ছিলেন। ইলমে হাদীসের জগতে তৎকালীন জমানার সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন। তিনি নিজেই বলেন, আমার দুলাখ হাদীস মুখস্থ আছে যদি এর চেয়েও অধিক হাদীস আমি পেতাম, তাও মুখস্থ করতাম। সম্ভবত তখন এর চেয়ে বেশি সংখ্যক হাদীস বিদ্যমান ছিল না।

ইলম শেখার জন্য তিনি বহুদেশ ও অঞ্চল সফর করেছেন। বহু উস্তাদের সান্নিধ্য ও সংশ্রব গ্রহণ করেছেন। তিনি পাঁচশত উস্তাদ ও শায়খের কাছ থেকে ইলম অর্জন করেছেন। তন্মধ্যে কামাল ইবনে হুমাম, শামস শাইরামী, শামস মিরজাবানী আল হানাফী, সাইফুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ, আল্লামা তকী শামনী, শায়খ শিহাবুদ্দীন শারমসাহী, শরফুদ্দীন মানাবী এবং মহিউদ্দীন কাফিজী (র.) প্রমুখগণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উল্লেখ্য যে, তিন বছর বয়সে তার পিতা তাকে ইবনে হাজার (র.)-এর মজলিসেও উপস্থিত করেছিলেন।

একটি ভুল ধারণা নিরসন : কোনো কোনো জীবনী লেখক লিখেছেন যে, আল্লামা সুয়ূতী হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.)-এর শিষ্য ছিলেন, তবে ইতিহাসের কষ্টিপাথরে এ মন্তব্য সঠিক নয়। কারণ হাফেজ ইবনে হাজার (র.) ৮৫২ সনে ইন্তেকাল করেছেন। আর আল্লামা সুয়ূতী (র.) জন্মলাভ করেছেন ৮৪৯ হিজরি সনে। কাজেই মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল মাত্র ৩ বছর। আর এ বয়সে আল্লামা ইবনে হাজরের ছাত্র হওয়ার কোনো প্রশ্ন উঠে না।

অধ্যায়ন, অধ্যাপনা ও ফতোয়া প্রদান : আল্লমা সুয়ূতী (র.) ছাত্রজীবন শেষ করার পর ৮৭০ সনে ফতওয়া দেওয়ার কাজ শুরু করেন এবং ৮৭২ সন থেকে ফতওয়া ইত্যাদি লেখার কাজে নিয়োজিত হন। ৪০ বছর বয়সে তিনি বিচার ও ফতওয়ার কাজ থেকে অব্যাহতি লাভ করে নির্জনতা অবলম্বন করেন এবং রিয়াজত ও মুজাহাদা এবং ইবাদত ও হেদায়েতের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। পরহেজগারিতাও অল্পে তুষ্টির ক্ষেত্রে তার অবস্থা এই ছিল যে, বিভিন্ন আমীর-উমারা ও ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ তার খেদমতে আসতেন এবং অতি মূল্যবান হাদিয়া ও উপঢৌকন পেশ করতেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতেন না। সুলতান ঘোরী এক নপুংশক গোলাম এবং এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা তার খেদমতে পাঠিয়েছিলেন, তিনি স্বর্ণমুদ্রা ফেরত দেন এবং গোলামকে আজাদ করে তাকে রাসূলে কারীম ﷺ -এর হুজরা মোবারকের খাদিম হিসেবে মনোনীত করেন।

যেমন ছিল তার মেধা শক্তি তেমন ছিল লিখনী শক্তি। খুব দ্রুত লিখতে পারতেন। জ্ঞানের প্রায় সবশাখায় তিনি কলম ধরেছেন। এভাবে তিনি প্রায় পাঁচশত গ্রন্থ রচনা করেছেন। নিম্নে তার কতিপয় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম পেশ করা হলো–

১. تَفْسِيْر جَلَالَيْنِ نِصْفُ اَوَّلْ

২. اَلْاِتْقَانُ فِىْ عُلُوْمِ الْقُرْاٰنِ

৩. اَلدُّرُّ الْمَنْثُوْرُ فِى التَّفْسِيْرِ الْمَاثُوْر

৪. خَصَائِصُ كُبْرٰى

একই সঙ্গে তিনি একজন বড় মাপের কবিও ছিলেন। তার রচিত বহু কবিতা রয়েছে। অধিকাংশ কবিতা فَوَائِدْ عِلْمِيَّة ও أَحْكَامْ شَرْعِيَّة সংক্রান্ত।

সর্বোপরি তিনি আল্লাহর বড়মাপের একজন ওলী ছিলেন। আধ্যাত্মিক সাধক ছিলেন। অধিক সংখ্যকবার [৭০ বার] তিনি স্বপ্নযোগে রাসূল ﷺ -এর জেয়ারত লাভে ধন্য হয়েছেন।

তিনি নিজে এবং অন্যান্য লোকজন একাধিকবার স্বপ্নে দেখেছেন যে, রাসূল ﷺ তাঁকে يَا شَيْخَ السُّنَّةِ বা يَا شَيْخَ الْحَدِيْثِ বলে সম্বোধন করেন।

এছাড়া তাঁর একটি কেরামত প্রসিদ্ধ রয়েছে। তাঁর বিশেষ খাদেম মুহাম্মদ ইবনে আলী হাব্বাক বর্ণনা করেন, একদিন দুপুরে খাবারের পর তিনি বললেন, যদি তুমি আমার মৃত্যুর পূর্বে কারো নিকট এ রহস্যের কথা ব্যক্ত না কর, তাহলে আজ আসরের নামাজ তোমাকে মক্কা শরীফে পড়ার ব্যবস্থা করব। সে বলল, ঠিক আছে। তিনি বললেন চোখ বন্ধ কর। তিনি আমার হাত ধরে প্রায় ২৭ কদম সামনে অগ্রসর হওয়ার পর বললেন: চোখ খোল। চোখ খুলে দেখি আমরা বাবে মুয়াল্লায় দণ্ডায়মান। অতঃপর হেরেম শরীফ পৌঁছে তওয়াফ করলাম, জমজমের পানি পান করলাম। অতঃপর তিনি বললেন, আমাদের জন্য জমিন সংকুচিত হয়ে গেছে। এতে আশ্চর্যবোধ কর না; বরং হরমের আশে পাশে আমাদের পরিচিত মিসরের বহু লোক রয়েছে। তারা আমাদেরকে চিনতে পারেনি। তারপর তিনি বললেন, তুমি ইচ্ছা করলে আমার সঙ্গে চলো, অন্যথায় হাজীদের সঙ্গে চলে এসো! আমি বললাম, আপনার সঙ্গেই যাব। আমরা রওয়ানা হলাম। বাবে মুয়াল্লা পর্যন্ত যাওয়ার পর বললেন, চোখ বন্ধ কর। চোখ বন্ধ অবস্থায় মাত্র সাত কদম সামনে অগ্রসর হয়ে বললেন, এবার চোখ খোল! চোখ খুলে দেখি আমরা মিসরে পৌঁছে গেছি।

ইন্তেকাল : হাতের মাঝে ফোঁড়া হয়ে ৯১১ হিজরি সনের ১৯ শে জুমাদাল উলা বৃহস্পতিবার এ ক্ষণজন্মা মণীষী ইন্তেকাল করেন। –[যাফরুল মুহাসসিলীন, মাওলানা হানীফ গাঙ্গুহী (র.)]

দ্বিতীয়ার্ধের লেখক আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.)-এর জীবন :

নাম : নাম মুহাম্মদ উপাধি জালালুদ্দীন; পিতার নাম আহমদ।

বংশ : মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আহমদ ইবনে হাশিম ইবনে শিহাব ইবনে কামাল আল-আনসারী মহল্লী।

পশ্চিম মিসরের সুপ্রসিদ্ধ শহর মহল্লা কুবরা-র সাথে সম্পর্কিত করে তাকে মহল্লী বলা হয়। তিনি তার উপাধি জালালুদ্দীন নামে সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

জন্ম : তিনি শাওয়াল ৭৯১ হিজরি সনে কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন।

জ্ঞানার্জন : কুরআন মাজীদ হিফজয করার পর তৎকালীন রীতি অনুসারে ইসলামি শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলাদা আলাদা উস্তাদের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। তার প্রসিদ্ধ শিক্ষকগণের মধ্যে অন্যতম হলেন ইবনে জামআ, ওয়ালী ইরাকী ও আল্লামা বিজুরী (র.)। ইলমে নাহব অধ্যয়ন করেন শিহাব আজমী ও শামস শাতকুনী -এর নিকট এবং ইলমে ফরায়েজ ও গণিতশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাসির উদ্দিন ইবনে আনাস মিশরী হানাফী -এর নিকট। মানতেক, তর্কশাস্ত্র, মাআনী, বয়ান ও উরুজ বদর মাহমূদ আকসেরায়ী এর নিকট এবং উসূলে ফিকহ ও তাফসীর অধ্যয়ন করেন আল্লামা শামস বিসাতি (র.) প্রমুখের নিকট। এছাড়াও আরও বিভিন্ন ওলামায়ে কেরামের নিকট থেকে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন।

কর্ম জীবন : শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি কিছুদিন কাপড়ের ব্যবসা করেন। কাজি বা বিচারক পদের প্রস্তাব পাওয়া সত্ত্বেও তিনি তা গ্রহণ করেননি। তিনি বহুগ্রন্থ ও ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে জামউল জাওয়ামি, মিনহাজ, ওয়াফায়ত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ইন্তেকাল : ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ১৫ই রমজান ৮৬৪ হিজরি সনে তিনি ইন্তেকাল করেন। বাবে নাসর -এ জানাযার পর ভূজানের নিকট নির্মিত কবরস্থানে পূর্ব পুরুষদের পাশেই তাঁকে দাফন করা হয়। –[প্রাগুক্ত]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا مُوَافِيًا لِنِعَمِهِ، مُكَافِيًا لِمَزِيْدِهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَجُنُوْدِهِ . أَمَّا بَعْدُ فَهٰذَا مَا اشْتَدَّتْ اِلَيْهِ حَاجَةُ الرَّاغِبِيْنَ فِىْ تَكْمِلَةِ تَفْسِيْرِ الْقُرْاٰنِ الْكَرِيْمِ الَّذِىْ اَلَّفَهُ الْاِمَامُ الْعَلَّامَةُ اَلْمُحَقِّقُ الْمُدَقِّقُ جَلَالُ الدِّيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ الْمَحَلِّىُّ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ ، وَتَتْمِيْمِ مَا فَاتَهُ وَهُوَ مِنْ اَوَّلِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ اِلٰى اٰخِرِ الْاِسْرَاءِ بِتَتِمَّةٍ عَلٰى نَمَطِهِ مِنْ ذِكْرِ مَا يُفْهَمُ بِهِ كَلَامُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْاِعْتِمَادِ عَلٰى اَرْجَحِ الْاَقْوَالِ وَاِعْرَابِ مَا يَحْتَاجُ اِلَيْهِ وَتَنْبِيْهٍ عَلَى الْقِرَاءَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ الْمَشْهُوْرَةِ عَلٰى وَجْهٍ لَطِيْفٍ وَتَعْبِيْرٍ وَجِيْزٍ وَتَرْكِ التَّطْوِيْلِ بِذِكْرِ اَقْوَالٍ غَيْرِ مَرْضِيَّةٍ وَاَعَارِيْبَ مَحَلُّهَا كُتُبُ الْعَرَبِيَّةِ، وَاللّٰهَ اَسْأَلُ النَّفْعَ بِهِ فِى الدُّنْيَا وَاَحْسَنَ الْجَزَاءِ عَلَيْهِ فِى الْعُقْبٰى بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ .

অনুবাদ : সব ধরনের সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার। আমরা তার এমন প্রশংসা করি, যা তাঁর প্রদানকৃত নিয়ামতরাজির সমপরিমাণ হয়। আমরা তার এমন প্রশংসা করি, যা তাঁর প্রদানকৃত অতিরিক্ত অনুগ্রহসমূহের জন্যও যথেষ্ট হয়। প্রিয়নবী সায়্যিদুনা মুহাম্মদ ﷺ তাঁর পরিবার, পরিজন, সাহাবী ও তাঁর অনুগত অনুসারীদের উপর দরূদ ও সালাম।

হামদ ও সালাতের পর আরজ এই যে, এটা সেই কিতাব, যার প্রতি আগ্রহীদের প্রয়োজন তীব্রতর হয়েছিল। তা হলো কুরআনে কারীমের ঐ তাফসীরের পরিপূর্ণতার প্রতি, যা সূক্ষ্মদর্শী গবেষক ইমাম আল্লামা মুহাম্মদ জালালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ মহল্লী শাফেয়ী (র.) রচনা করেছেন এবং এটা সে অংশের পূর্ণতা যা মহল্লী (র.) অপূর্ণ রেখে গেছেন। তথা সূরা বাকারা হতে সূরা ইসরার শেষ পর্যন্ত। [তা পরিপূর্ণ করা হয়েছে] একটি পরিশিষ্ট সহ। যা তাঁরই অনুসৃত পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হয়েছে।

[সারকথা, সূক্ষ্মদর্শী গবেষক আল্লামা জালালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ ইবনে মহল্লী আশ শাফেয়ী কুরআনে কারীমের যে তাফসীর রচনা শুরু করেছিলেন তা সমাপ্ত করার এবং সূরা আল বাকারা হতে সূরা আল ইসরার শেষ পর্যন্ত যে অংশটুকুর তাফসীর তিনি করে যেতে পারেননি, সেই অংশটি তাঁর অনুসৃত পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন করার জন্য লোকদের মাঝে যে অত্যন্ত আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়েছে এ হলো সেই কিতাব।] আল্লামা মহল্লী তাফসীর রচনার ক্ষেত্রে যে রীতি অবলম্বন করেছেন, তা হলো যতটুকু বিষয় উল্লেখ করলে আল্লাহ তা'আলার কালাম বুঝা সম্ভব, ততটুকু বিষয়ের জন্য সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য মতামতের উল্লেখ করা। প্রয়োজনীয় ই'রাব [ব্যাকরণিক বিবরণ] ও প্রসিদ্ধ কেরাত বা পঠনরীতির দিকে ইঙ্গিত করা সূক্ষ্মভাবে এবং সংক্ষিপ্ত বর্ণনায়। এর সঙ্গে অপছন্দনীয় মতামত এবং বিস্তারিত ব্যাকরণিক বিবরণ ও বিশ্লেষণ উল্লেখপূর্বক আলোচনা দীর্ঘায়িত না করা। কেননা বিরাট বিরাট আরবি ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থসমূহ হলো বিস্তারিত ব্যাকরণগত বিশ্লেষণের উপযুক্ত স্থান। আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করি তিনি যেন অনুগ্রহ ও মেহেরবানি করে এর দ্বারা আমাদেরকে জাগতিক জীবনেও উপকৃত করেন এবং পরকালীন জীবনেও এর উত্তম বদলা দান করেন। আমীন!

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا الخ : আল্লামা সুয়ূতী (র.) "হামদ" বা প্রশংসা জ্ঞাপনের অন্যান্য পদ্ধতি ও ধরন বাদ দিয়ে উক্ত পদ্ধতি ও বাক্যে হামদ প্রকাশ করার কারণ হলো, 'হামদ' -এর উক্ত বাক্যটিকে হাদীস শরীফে اَفْضَلُ الْمَحَامِدِ বা সর্বোত্তম 'হামদ' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেন এ বাক্যটি নিম্নোক্ত হাদীস শরীফ থেকে চয়ন করা হয়েছে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا يُوَافِىْ نِعَمَهُ وَيُكَافِىْ مَزِيْدَهُ .

ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, কেউ যদি মান্নত করে যে, সে সর্বোত্তম হামদ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করবে অথবা কসম করে যে, সে আল্লাহ তা'আলার সর্বপ্রকার প্রশংসা করবে, তাহলে তার মান্নত ও কসম পূরণের পদ্ধতি হলো, সে বলবে– اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا يُوَافِىْ نِعَمَهُ وَيُكَافِىْ مَزِيْدَهُ এতে তার মান্নত ও কসম পূর্ণ হয়ে যাবে। –[হাশিয়াতুল জামাল : খ. ১, পৃ. ৮]

প্রশ্ন : মান্যবর মুফাসসির (র.) হাদীসের শব্দে تَصَرُّفْ বা কম বেশি করেছেন। এটা সঠিক হয়েছে কিনা?

উত্তর : মুফাসসির (র.)-এর এ বাক্যটি হাদীস নয়; বরং এতে হাদীস থেকে اِقْتِبَاسْ বা শব্দ গ্রহণ করা হয়েছে মাত্র। আর এতে প্রয়োজনানুপাতে পরিবর্তন জায়েজ আছে। –[প্রাগুক্ত]

قَوْلُهُ مُوَافِيًا لِنِعَمِهِ : اَىْ مُطَابِقًا لِنِعَمِهِ وَمُقَابِلًا لَهَا অর্থাৎ এমন 'হামদ' যা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত ও অনুগ্রহসমূহের অনুযায়ী হয়। এভাবে যে, বর্তমান নিয়ামতের মধ্য থেকে কোনো নিয়ামত হামদ বিহীন না থাকে। যেন এ হামদটি আল্লাহ তা'আলার প্রতিটি নিয়ামতের মোকাবেলায় হয়ে যায়। বস্তুত এমনটি মোবালাগা স্বরূপ বলা হয়েছে। অন্যথায় প্রত্যেক নিয়ামতের জন্যই ভিন্ন ভিন্ন হামদের প্রয়োজন রয়েছে। −[প্রাগুক্ত]

قَوْلُهُ مُكَافِيًا لِمَزِيْدِهٖ : اَىْ مُمَاثِلًا وَمُسَاوِيًا لَهُ অর্থাৎ আগামীতে যেসব নিয়ামত প্রদান করা হবে সেগুলোরও বরাবর ও সমপরিমাণ হয়।

قَوْلُهُ مَزِيْد : এটি مَصْدَرْ مِيْمِىْ অর্থ− اَلزِّيَادَةُ - اَلنُّمُوُّ বা বৃদ্ধি হওয়া। বলা হয়− زَادَهُ اللّٰهُ النِّعَمَ - زَادَهُ اللّٰهُ الْخَيْرَ শব্দটি لَازِمْ এবং مُتَعَدِّىْ উভয়ভাবেই ব্যবহৃত হয়। যেমন− زَادَ الشَّىْءُ [বস্তুটি বৃদ্ধি পেয়েছে], زَادَ غَيْرَهُ [অপর বস্তুকে বৃদ্ধি করেছে] مُتَعَدِّىْ হলে দুটি মাফউল দাবি করে। −[প্রাগুক্ত]

মোটকথা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বাক্যটি যেন বর্তমান ও ভবিষ্যতে প্রাপ্য সকল নিয়ামতের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়।

قَوْلُهُ سَيِّدِنَا : কোনো কোনো 'নোসখায়' এ শব্দটি নেই। আমাদের নোসখায় রয়েছে। যে নোসখাসমূহে سَيِّدِنَا শব্দটি বিদ্যমান রয়েছে, সেখানে وَاٰلِهٖ এবং তার পরবর্তী বাক্যের عَطْف হবে سَيِّدِنَا -এর সাথে। مُحَمَّدْ -এর সাথে হবে না। অন্যথায় অন্যান্য مَعْطُوْف গুলো سَيِّدِنَا হওয়া লাজেম আসবে। কেননা سَيِّدِنَا হলো بَدَل আর مُحَمَّدْ হলো مُبْدَلْ مِنْهُ এখন مُحَمَّدْ -এর উপর عَطْف করলে পরবর্তীগুলোও سَيِّدِنَا -এর مُبْدَلْ مِنْهُ হয়ে سَيِّدِنَا হওয়া লাজেম আসে। অথচ প্রকৃতপক্ষে রাসূল ﷺ -ই হলেন سَيِّدِنَا ; অন্যরা নন। −[প্রাগুক্ত]

قَوْلُهُ وَجُنُوْدِهٖ : جُنْد -এর বহুবচন। অর্থ সৈন্য। جُنْد -এর অন্য একটি অর্থ সাহায্যকারীও রয়েছে। جُنْد এমন اِسْمِ جِنْس যার একবচন ও বহুবচনের ক্ষেত্রে يَاءْ দ্বারা পার্থক্য করা হয়ে থাকে। (عَلٰى خِلَافِ الْغَالِبِ) সুতরাং يَاءْ সহ হলে একবচন এবং ياء ছাড়া হলে বহুবচন হবে। যেমন جُنْد অর্থ− সৈন্য এবং جُنْدِىْ অর্থ− একজন সৈন্য। একই বিধান يَهُوْد এবং يَهُوْدِىْ -এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়েছে। يَهُوْد অর্থ− ইহুদি সম্প্রদায় আর يَهُوْدِىْ অর্থ- একজন ইহুদি।

جُنْدِهٖ ﷺ দ্বারা দীনের সাহায্যকারীদের বোঝানো হয়েছে। নবী যুগ থেকে অদ্যাবধি যারা অস্ত্র, ইলম, কলম, বক্তৃতা ইত্যাদির মাধ্যমে দীনের হেফাজত ও সংরক্ষণ করছেন তারা সকলেই এতে শামিল। -[প্রাগুক্ত]

قَوْلُهُ اَمَّا بَعْدُ : কোনো কোনো নোসখায় اَمَّا بَعْدُ নেই। সেখানে هٰذَا ইসমুল ইশারাটি اَمَّا بَعْدُ -এর স্থলাভিষিক্ত হবে। আর যে নোসখায় اَمَّا بَعْدُ লেখা আছে, সেখানে اَمَّا হবে حَرْفِ شَرْط আর فَهٰذَا তার جَزَاءْ হবে ।

فَهٰذَا : বিজ্ঞ মুফাসসির هٰذَا ইসমূল ইশারাহ দ্বারা ঐ ظَنِّىْ ইবারতসমূহের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যা মহল্লীর তাফসীরের পূর্ণতার জন্য তার যেহেনে مُسْتَحْضَرْ ছিল। (حَاشِيَةُ جَلَالَيْن ٤)

هٰذَا -এর مُشَارٌ اِلَيْهِ হলো مَعْهُوْدْ فِى الذِّهْنِ যা খুবই নিকটবর্তী। আর তা হলো সূরা বাকারা থেকে নিয়ে সূরা ইসরার শেষ পর্যন্ত।

قَوْلُهُ مَا اشْتَدَّتْ : এখানে مَا দ্বারাও مَعْهُوْدٌ ذِهْنِىْ উদ্দেশ্য। আর دَعَتْ না বলে اِشْتَدَّتْ বলার দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ তাকমিলার প্রতি তাদের প্রয়োজনটা শেষ সীমায় পৌছেছিল। কেননা শেষার্ধের বর্ণনাধারা রচনাশৈলী বাহুল্যবর্জিত লক্ষ্যভেদী বক্তব্যের মতো করে কেউ লিখতে সক্ষম হচ্ছিল না।

قَوْلُهُ رَاغِبِيْنَ : رَاغِبِيْنَ অর্থ আগ্রহী এবং অন্বেষু। অর্থাৎ আল্লামা মহল্লীর তাফসীরের পূর্ণতা দানের প্রতি অন্বেষু এবং আগ্রহীদের প্রয়োজন তীব্র হয়েছে, رَغْبَةٌ শব্দটি কোনো صِلَةٌ ছাড়া এবং صِلَةٌ সহ উভয়ভাবেই ব্যবহৃত হয়। অতঃপর কোনো বস্তুর প্রতি আসক্তি ও ভালোবাসা প্রকাশ করতে صِلَةٌ হিসেবে فِىْ আসে আর অনাসক্তি ও ঘৃণাপ্রকাশ করতে عَنْ ব্যবহৃত হয়।

قَوْلُهُ تَكْمِلَةٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচনে تَكْمِلَاتٌ অর্থ− نِهَايَةٌ শেষ সীমা। বলা হয়− غَدًا نَقْرَأُ تَكْمِلَةَ الْقِصَّةِ (مُعْجَمِى الْحَىِّ) [আমরা আগামীকাল ঘটনার শেষ অংশ পাঠ করব]

اَلتَّكْمِلَةُ مَا يَتِمُّ بِهِ الشَّىْءُ অর্থাৎ যার দ্বারা কোনো বস্তু পরিপূর্ণ করা হয় তাকে তাকমিলা বলা হয়। −[মু'জামুল ওয়াসীত]

قَوْلُهُ الْاِمَامُ : আভিধানিক অর্থ اَلْمُقَدَّمُ আগে পেশকৃত, অগ্রভাগ।

পরিভাষায় ইমাম বলা হয়− مَنْ بَلَغَ رُتْبَةَ اَهْلِ الْفَضْلِ অর্থাৎ যিনি কোনো ব্যাপারে মর্যাদাপূর্ণ স্তরে পৌছেছেন।

قَوْلُهُ الْعَلَّامَةُ : مُبَالَغَةٌ فِى الْعِلْمِ، وَمَعْنَاهُ الْجَامِعُ بَيْنَ الْمَعْقُوْلِ وَالْمَنْقُوْلِ بِاَبْلَغِ وَجْهٍ (حَاشِيَةُ الصَّاوِىْ ص٧ ج١) অর্থাৎ যিনি অধিক জ্ঞানের অধিকারী।

قَوْلُهُ الْمُحَقِّقُ : اَىِ الْاٰتِىْ بِادِلَّةٍ عَلَى الْوَجْهِ الْحَقِّ (حَاشِيَةُ الصَّاوِى ص٧ ج١) যিনি সঠিক পন্থায় দলিল-প্রমাণ পেশ করেন।

قَوْلُهُ جَلَالُ الدِّيْنِ : এটি তার উপাধি। জালাল অর্থ- মহিমা, বড়ত্ব, সম্মান।

مَعْنَاهُ ذُوْ جَلَالَةٍ فِى الدِّيْنِ اَوْ مُجِل وَمُعَظِّمٌ لَهُ لِاَنَّهُ شَيَّدَهُ وَاَظْهَرَ قَوَاعِدَهُ (حَاشِيَةُ الصَّاوِى ص٧ ج١)

قَوْلُهُ مُحَمَّدٌ : এটা তার নাম। اَحْمَدَ এটা তার পিতার নাম। اَلْمَحَلِّىْ (بِفَتْحِ الْحَاءِ) মিশরের اَلْمَحَلَّةُ الْكُبْرٰى নামক শহরের দিকে নিসবত করা হয়েছে। জন্ম ৭১৯ হিজরি মৃত্যু ৮৬৪ হিজরি। اَلشَّافِعِىُّ ইমাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রিস শাফেয়ী (র.)-এর প্রতি নিসবত।

قَوْلُهُ وَتَتْمِيْمِ مَا فَاتَهُ : تَتْمِيْمِ শব্দে رَفْع এবং جَرّ উভয়টি হতে পারে। رَفْع অবস্থায় مَا اشْتَدَّتْ اِلَيْهِ حَاجَةُ الرَّاغِبِيْنَ -এর উপর عَطْف হবে। আর جَرّ অবস্থায় فِىْ تَكْمِلَةِ تَفْسِيْرِ الْقُرْاٰنِ -এর উপর عَطْف হবে এবং فِىْ -এর পরে হওয়ার কারণে مَجْرُوْر হবে।

জ্ঞাতব্য : বিজ্ঞ মুফাসসির (র.)-এর বক্তব্য وَتَتْمِيْمِ مَافَاتَهُ الْمَحَلِّىُّ বাক্যে تَتْمِيْم শব্দ ব্যবহারে তাসামুহ পরিলক্ষিত হয়। কেননা আল্লামা সুয়ূতী (র.) مَافَاتَ الْمَحَلِّىُّ অর্থাৎ মহল্লী (র.) যা ছেড়ে দিয়েছেন তার পরিশিষ্ট লিখেননি; বরং مَا اَتٰى بِهِ الْمَحَلِّىُّ অর্থাৎ মহল্লী (র.) যা রেখে গেছেন তার পরিশিষ্ট লিখেছেন।

মোটকথা ইমাম মহল্লী (র.) যা রচনা করেছেন পরিপূর্ণ করেছেন, যা লিখেননি তা পরিপূর্ণ করেননি। কারণ تَتِمَّةٌ বা পরিশিষ্ট مَالَهُ التَّتِمَّةُ -এর অংশ হয়ে থাকে। আর আল্লামা সুয়ূতীর পরিশিষ্ট অর্থাৎ প্রথম অর্ধেক مَا فَاتَ الْمَحَلِّىُّ -এর অংশ নয়; বরং مَا اَتٰى بِهِ অর্থাৎ শেষ অর্ধেকের পরিশিষ্ট। -[হাশিয়াতুস সাবী, খ. ১, পৃ. ৭]

قَوْلُهُ وَهُوَ مِنْ اَوَّلِ : هُوَ জমীর مَا فَاتَهُ বা تَتْمِيْم -এর দিকে ফিরেছে। উভয়টির মেসদাক একই। তাহলো সুয়ূতীর তাফসীর। -[হাশিয়াতুল জামাল খ. ১, পৃ. ১০]

قَوْلُهُ مِنْ اَوَّلِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ : সূরা ফাতিহার তাফসীর আল্লামা মহল্লী (র.) করেছেন। তাই আল্লামা সুয়ূতী (র.) তা শেষাংশের সাথে জুড়ে দিয়েছেন এবং তিনি সূরা বাকারা থেকে রচনা শুরু করেন।

উল্লেখ্য সূরা ইসরার শেষে মুসান্নিফ (র.) উল্লেখ করেছেন যে, তিনি এ অংশের তাফসীর সম্পন্ন করেছেন مِقْدَارُ مِيْعَادِ الْكَلِيْمِ তথা ৪০ দিনে। তখন তাঁর বয়স ছিল প্রায় ২২ বছর। এটিই তাঁর প্রথম তাফসীর। তিনি ৮৭০ হিজরির রমজানের প্রথম তারিখ বুধবার এর রচনা শুরু করেন এবং ১০ শাওয়াল সমাপ্ত করেন। ইমাম মহল্লীর ইন্তেকালের ছয় বছর পর এ কিতাব রচনা করেন। -[হাশিয়াতুল জামাল খ. ১, পৃ. ১০]

قَوْلُهُ بِتَتِمَّةٍ : এটা تَتْمِيْم -এর مُتَعَلِّقْ আর بَاء হরফটি مَعَ -এর অর্থে।

اَىْ هٰذَا التَّتْمِيْمُ الَّذِىْ اَتٰى بِهِ السُّيُوْطِىُّ تَفْسِيْرًا لِلنِّصْفِ الْاَوَّلِ مُصَاحِبٌ لِتَتِمَّةٍ (حَاشِيَةُ الْجَمَلِ ص١ ج١)

আর تَتِمَّةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সূরা ইসরার শেষে তিনি هٰذَا اٰخِرُ مَا كَمَلَتْ بِهِ تَفْسِيْرُ الْقُرْاٰنِ الخ বলে যে আলোচনা করেছেন, সে অংশটুকু। -[প্রাগুক্ত]

عَلٰى نَمَطِهِ : এটা تَتْمِيْم থেকে حَالْ হয়েছে। অর্থাৎ এ অবস্থায় পরিপূর্ণ হয়েছে যে, সেটি আল্লামা মহল্লীর পদ্ধতি অনুযায়ী হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنْ ذِكْرِ مَا يُفْهَمُ بِهِ كَلَامُ اللّٰهِ : এটা نَمَط -এর بَيَانْ হয়েছে। এখান থেকে আল্লামা মহল্লীর তাফসীরের পদ্ধতিও নীতিমালা বর্ণনা করা হচ্ছে, যা আল্লামা সুয়ূতী (র.) অনুসরণ করেছেন। আর সে পদ্ধতি হচ্ছে ৪টি। যা সামনের ইবারতে রয়েছে। نَمَط (ج) اَنْمَاطٌ অর্থ- اَلطَّرِيْقَةُ বা পদ্ধতি ও ধরন।

قَوْلُهُ الْاِعْتِمَادُ : এটা ذِكْرِ مَا يُفْهَمُ -এর উপর عَطْف হয়েছে এবং مِنْ -এর পর হওয়ার কারণে مَجْرُوْر হয়েছে।

قَوْلُهُ اِعْرَابُ مَا يَحْتَاجُ اِلَيْهِ : এটি এবং تَنْبِيْهٍ عَلَى الْقِرَاءَةِ الْمُخْتَلِفَةِ الْمَشْهُوْرَةِ এ উভয় জুমলার عَطْف ও হয়েছে ذِكْر -এর উপর।

قَوْلُهُ وَتَنْبِيْهٌ - وَالْاِعْرَابُ - وَالْاِعْتِمَادُ : এসবগুলোর عَطْف হয়েছে ذِكْر -এর সাথে। আর এ তিনটির মধ্যে প্রথম দুটি বাদ দিয়ে تَنْبِيْه শব্দটিকে نَكِرَةٌ হিসেবে ব্যবহার করার কারণ হলো قِلَّتْ বা স্বল্পতা বুঝানো। অর্থাৎ তিনি সকল কেরাতের প্রতি تَنْبِيْه করেননি। সামান্য কিছু কেরাতের প্রতি সতর্ক করেছেন।

উল্লেখ্য এখানে مَشْهُوْرْ দ্বারা উসূলে হাদীস ও ফিকহের পারিভাষিক مَشْهُوْرْ উদ্দেশ্য নয়; বরং আভিধানিক অর্থ [প্রসিদ্ধ ও সুস্পষ্ট] উদ্দেশ্য। কারণ মাসহাফে লিখিত সকল কেরাতই মুতাওয়াতিরভাবে প্রমাণিত।

قَوْلَهُ الْقِرَاءَةُ الْمُخْتَلِفَةُ : কেরাতের ভিন্নতার তাৎপর্য : আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন যে নির্দিষ্ট কেরাতের মাধ্যমে নাজিল করেছেন, তার মধ্যে পারস্পরিক উচ্চারণ পার্থক্য সর্বাধিক সাত ধরনের হতে পারে। অনুমোদিত সেই সাতটি ধরন নিম্নলিখিত ভিত্তিতে রূপান্তরিত হওয়া সম্ভব–

১. বিশেষ্যের উচ্চারণে তারতম্য। এতে একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন, পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ প্রভৃতির ক্ষেত্রে তারতম্য হতে পারে। যেমন, এক কেরাতে وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ -এর কালিমাতু শব্দটি একবচন ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু অন্য কেরাতে এই শব্দটি বহুবচন উচ্চারিত হয়ে وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ ব্যবহৃত হয়েছে।

২. ক্রিয়াপদে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত কালের বিভিন্নতা অবলম্বিত হয়েছে। যেমন প্রচলিত কেরাতে رَبَّنَا بَاعِدْنَا بَيْنَ اَسْفَارِنَا পঠিত হয়েছে এবং এ আয়াতই অন্য কেরাতে رَبَّنَا بَعَّدَ بَيْنَ اَسْفَارِنَا পঠিত হয়েছে। অথবা যেমন– এক কিরাতে পঠিত হয়েছে– وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ اِبْرٰهِيْمَ পক্ষান্তরে অপর কেরাতে وَاتَّخَذُوْا রয়েছে।

৩. রীতি অনুযায়ী হরকত বা যের-যবর, পেশ ইত্যাদি প্রয়োগের ক্ষেত্রে মত পার্থক্যের কারণে কেরাতে বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। যেমন– لَا يُضَارَّ -এর স্থলে কেউ কেউ لَا يُضَارُّ তেলাওয়াত করেছেন। এমনিভাবে ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ -এর স্থলে ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدِ তেলাওয়াত করেছেন।

৪. কোনো কোনো কেরাতে শব্দের হ্রাস-বৃদ্ধিও হয়েছে। যেমন- تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ -এর স্থলে تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهَارُ তেলাওয়াত করা হয়েছে।

৫. কোনো কোনো কেরাতে শব্দের আগ-পরও হয়েছে। যেমন– وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ -এর স্থলে وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْحَقِّ بِالْمَوْتِ পড়া হয়েছে।

৬. শব্দের পার্থক্য হয়েছে। অর্থাৎ এক কেরাতে এক শব্দ এবং অন্য কেরাতে অন্য শব্দ পঠিত হয়েছে। যেমন– فَتَبَيَّنُوْا -এর স্থলে فَتَثَبَّتُوْا এবং فِيْ طَلْحٍ -এর স্থলে فِيْ طَلْعٍ পঠিত হয়েছে।

৭. উচ্চারণ পার্থক্য : যেমন কোনো কোনো শব্দের উচ্চারণ ভঙ্গিতে লম্বা খাটো হালকা, শক্ত প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। এতে মূল শব্দের মধ্যে কোনো পরিবর্তন হয়নি, শুধু উচ্চারণে বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। যেমন– مُوْسٰى শব্দটি কোনো কোনো উচ্চারণে مُوْسٰي রূপে উচ্চারিত হয়েছে।

উল্লেখ্য সাত কেরাতের মাধ্যমে উচ্চারণের সুবিধার্থে যেসব পার্থক্য অনুমোদন করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে অর্থের কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় না। বিভিন্ন এলাকা ও শ্রেণি-গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত উচ্চারণ-ধারার প্রতি লক্ষ্য রেখেই সাত কেরাত পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। –[উলূমুল কুরআন : মুফতি তকী উসমানী : ১০৬–১০৯]

قَوْلَهُ عَلٰى وَجْهٍ لَطِيْفٍ : পূর্বোক্ত চারটি মাসদারের সাথে এর সম্পর্ক। لَطِيْف দ্বারা এখানে قَصِيْر বা সংক্ষিপ্ত বুঝানো হয়েছে। لَطُفَ الشَّيْءُ (ك) - ছোট হওয়া, সূক্ষ্ম হওয়া। এটি ضَخَامَة -এর বিপরীত।

قَوْلَهُ وَتَعْبِيْرٍ وَجِيْزٍ : এটি عَطْف تَفْسِيْر হয়েছে।

قَوْلَهُ وَتَرْكِ التَّطْوِيْلِ : এর عَطْف হয়েছে وَجْهٍ لَطِيْفٍ -এর উপর এবং এটি عَطْف تَفْسِيْرِيْ হিসেবে ব্যবহৃত। এভাবে যে, عَلٰى وَجْهٍ لَطِيْفٍ وَتَعْبِيْرٍ وَجِيْزٍ -এর মাঝে যে বিষয়টি সংক্ষেপে এবং ইঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে সে বিষয়টি مَعْطُوْف তথা وَتَرْكِ التَّطْوِيْلِ -এর মাঝে বিস্তারিত এবং সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। কেননা কোনো বস্তু সংক্ষিপ্ত হওয়া মানে দীর্ঘ না হওয়া।

قَوْلَهُ بِذِكْرِ اَقْوَالٍ : -এর সম্পর্ক হলো تَطْوِيْل -এর সাথে সাথে।

قَوْلَهُ غَيْرِ مَرْضِيَّةٍ : اَيْ عِنْدَ الْمُفَسِّرِيْنَ

قَوْلَهُ وَاَعَارِيْبَ مَحَلُّهَا : এটি اَقْوَال -এর সাথে عَطْف হয়েছে। হিন্দুস্তানী নোসখাগুলোতে مَحَالُهَا লিখা রয়েছে। অথচ আরবি সকল নোসখাতেই مَحَلُّهَا রয়েছে এবং এটাই সঠিক।

قَوْلَهُ كُتُبُ الْعَرَبِيَّةِ : অর্থাৎ নাহব বালাগাত ইত্যাদি শাস্ত্রের কিতাবসমূহ।

قَوْلَهُ وَاللّٰهَ اَسْاَلُ النَّفْعَ بِهِ : بِهِ -এর যমীর আলোচিত تَتِمَّة -এর দিকে ফিরেছে।

প্রথম পারা

سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ مَدَنِيَّةٌ مِائَتَانِ وَسِتٌّ اَوْ سَبْعٌ وَثَمَانُوْنَ اٰيَةً .

সূরা বাকারা মাদানী, যার মধ্যে ২৮৬ অথবা ২৮৭ আয়াত রয়েছে

তাহকীক ও তারকীব

سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ মুবতাদা, مَدَنِيَّةٌ খবরে আউয়াল এবং مِائَتَانِ খবরে ছানী।

سُوْرَةٌ ও اٰيَةٌ-এর তাহকীক : سُوْرَةٌ-এর وَاو টি মূল হরফ হলে এটি سُوْرُ الْبَلَدِ বা سُوْرُ الْمَدِيْنَةِ [নগর-প্রাচীর] থেকে উদ্ভূত। নগর-প্রাচীর যেমন পুরো শহরকে বেষ্টিত করে রাখে, তেমনি কুরআনের এক একটি সূরা কুরআনের একটি অংশকে বা সংশ্লিষ্ট সূরার অভ্যন্তরস্থ বিষয়বস্তুকে বেষ্টন করে আছে। আর যদি مَهْمُوْزُ الْاَصْلِ হয় এবং هَمْزَة-কে وَاو দ্বারা পরিবর্তন করে নেওয়া হয়, তাহলে অর্থ হবে بَقِيَّةُ الشَّيْءِ وَقِطْعَتُهٗ বস্তুর অবশিষ্ট অংশ বা খণ্ড। -[হাশিয়ায়ে জামাল : খ. ১, পৃ. ১২]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ سُوْرَةٌ : সূরার আরেকটি অর্থ-উচ্চতা। (لِسَان) اَلسُّوْرَةُ الرِّفْعَةُ যেন কুরআনের প্রতিটি অধ্যায় স্বতন্ত্র মর্যাদার উঁচু স্থানে অধিষ্ঠিত। -[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ৭]

পরিভাষায় সূরার সংজ্ঞা : পরিভাষায় সূরা বলা হয়- ١. هِيَ طَائِفَةٌ مِنَ الْقُرْاٰنِ لَهَا اَوَّلٌ وَاٰخِرٌ (جمل . ج١ ص٢)

٢. قَالَ الْجَعْبَرِيُّ : حَدُّ السُّوْرَةِ قُرْاٰنٌ يَشْتَمِلُ عَلٰى اٰيٍ ذِيْ فَاتِحَةٍ وَخَاتِمَةٍ وَاَقَلُّهَا ثَلَاثُ اٰيَاتٍ . (حَاشِيَةُ جَلَالَيْن)

অর্থাৎ সূরা হলো পবিত্র কুরআনের বিশেষ অংশ যার শুরু ও শেষ রয়েছে এবং যার মধ্যে কমপক্ষে তিনটি আয়াত রয়েছে।

قَوْلُهُ الْبَقَرَةِ **: সূরা বাকারার নামকরণের কারণ :** এ সূরার নাম بَقَرَةٌ [বাকারা] এ জন্য হয়েছে যে, এর এক স্থানে بَقَرَةٌ বা গাভীর আলোচনা এসেছে। এটা আরবি কায়দা تَسْمِيَةُ الْكُلِّ بِاسْمِ الْجُزْءِ [তথা অংশ বিশেষের নামে পূর্ণ বস্তুর নামকরণ] হিসেবে হয়েছে। এটা বিষয়ভিত্তিক নাম নয়; বরং প্রতীকি নাম। কুরআনের প্রতিটি সূরায় এ পরিমাণ ব্যাপক ও অধিক বিষয়সমূহ বর্ণিত হয়েছে যে, বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে সে সূরার জন্য সমৃদ্ধ কোনো শিরোনাম নির্ধারণ করা যায় না। এটা মানবীয় ক্ষমতার ঊর্ধ্বে। তাই রাসূল ﷺ আল্লাহ তা'আলার তত্ত্বাবধান ও দিক নির্দেশনায় অধিকাংশ সূরা জন্য শিরোনামের বদলে নাম নির্ধারণ করেছেন। যা কেবল আলামত ও নিদর্শনের কাজ দেয়। এ সূরাকে সূরা বাকারা বলে নামকরণের উদ্দেশ্য এই নয় যে, এখানে গাভীর বিধান স্বরূপ, উপকারিতা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে; বরং তার উদ্দেশ্য হলো এটা ঐ সূরা যেখানে গাভী শব্দটির উল্লেখ রয়েছে। -[তাফসীরে মাজেদী, জালালাইন খ. ১, পৃ. ৩৮]

ফায়দা : সূরার নাম ও বিন্যাস : বিশুদ্ধ মতে সূরার নাম ও পারস্পরিক বিন্যাস تَوْقِيْفِي ব্যাপার। অর্থাৎ স্বয়ং রাসূল ﷺ থেকে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ইঙ্গিতে সাব্যস্ত। যখন কোনো সূরা শেষ হতো, তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) নবীজী ﷺ -কে বলতেন- اِجْعَلْ هٰذِهِ السُّوْرَةَ عَقِبَ سُوْرَةِ كَذَا وَقَبْلَ سُوْرَةِ كَذَا অর্থাৎ এ সূরাটি অমুক সূরার পরে কিংবা পূর্বে স্থাপন করুন! এমনিভাবে আয়াতের তারতীব বা ক্রমবিন্যাসও توقيفي হযরত জিবরাঈল (আ.) নবীজী ﷺ -কে বলতেন- اِجْعَلْ هٰذِهِ الْاٰيَةَ عَقِبَ اٰيَةِ كَذَا وَقَبْلَ اٰيَةِ كَذَا এ আয়াতটিও অমুক আয়াতের পরে কিংবা পূর্বে স্থাপন করুন!

উল্লেখ্য, আয়াত এবং সূরার তারতীব তাওকীফী হওয়ার বিষয়টি راجح বা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মতের ভিত্তিতে, অন্যথায় এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। যেমন- কেউ কেউ বলেছেন, সূরা ও আয়াতের তারতীব সাহাবায়ে কেরামের ইজতিহাদে নির্ধারিত হয়েছে। তবে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর কুরআনের নোসখায় সূরার নাম লেখা ছিল না। পরবর্তীতে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ তা লিখেছেন। যেমনিভাবে সে কুরআনকে عُشْر . رُبْع . سُبْع ইত্যাদিতে বিভক্ত করেছে। -[হাশিয়ায়ে জামাল : খ. ১, পৃ. ১২]

উল্লেখ্য, সূরার নামসমূহ تَوْقِيْفِي বলতে প্রসিদ্ধ নামটি। অন্যথায় সাহাবা এবং তাবেঈনের এক জামাত নিজেদের পক্ষ থেকে কতিপয় সূরার নাম দিয়েছিলেন। যেমন হুযায়ফা (রা.) সূরা তওবার নাম রেখেছেন– سُوْرَةُ الْعَذَابِ اَلْفَاضِحَةُ এবং হযরত খালেদ ইবনে মা'দান সূরা বাকারার নাম فُسْطَاطُ الْقُرْاٰنِ রেখেছেন।

আবার কিছু সূরার একাধিক নামও রয়েছে। যেমন সূরা ফাতেহার নামসমূহ নিম্নরূপ–

اُمُّ الْقُرْاٰنِ ـ اُمُّ الْكِتَابِ ـ سُوْرَةُ الْحَمْدِ ـ سُوْرَةُ الصَّلَاةِ ـ اَلشِّفَاءُ ـ اَلسَّبْعُ الْمَثَانِيْ ـ اَلرُّقْيَةُ ـ اَلنُّوْرُ ـ اَلدُّعَاءُ ـ اَلْمُنَاجَاةُ ـ اَلشَّافِيَةُ ـ اَلْكَافِيَةُ ـ اَلْكَنْزُ ـ اَلْاَسَاسُ ـ

সূরা তাওবার নাম اَلْفَاضِحَةُ এবং سُوْرَةُ الْعَذَابِ এবং সূরা ইউনুস -এর নাম اَلسَّابِعَةُ ; কেননা এটি طِوَال مُفَصَّل -এর সাতটি সূরার সপ্তম সূরা। সূরা ইসরার নাম بَنِى إِسْرَائِيْل। সূরা সাজদার নাম المضاجع। সূরা ফাতিরের নাম اَلْمَلَائِكَةُ সূরা মু'মিনের নাম اَلْغَافِرُ সূরা জাছিয়ার নাম اَلشَّرِيْعَةُ ইত্যাদি।

আবার কখনো কয়েকটি সূরার সমন্বিত নামও রয়েছে। যেমন সূরা বাকারা ও আলে ইমরান -এর নাম الزهراوين এবং সূরা বাকারা থেকে আ'রাফ পর্যন্ত সাতটি সূরার নাম اَلسَّبْعُ الطِّوَالُ ইত্যাদি। –[হাশিয়াতে জামাল : খ. ১, পৃ. ১৩]

কুরআন শরীফের তরতিব : পবিত্র কুরআনের আয়াত ও সূরাসমূহের তরতিব দু'প্রকার–

১. **সংকলনের, অর্থাৎ** সূরা ফাতিহা থেকে সূরা নাস **পর্যন্ত** যে তরতিব পবিত্র কুরআন বর্তমানে আমাদের সামনে বিদ্যমান **আছে। এ তরতিবও সঠিক বর্ণনা মতে এবং হযরত** জিবরাঈল (আ.) ও নবী করীম ﷺ -এর নির্দেশ অনুসারে।

২. **অবতরণের, অর্থাৎ যে তরতিবে বাস্তবে আয়াত** ও সূরাসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে, তা হচ্ছে– সূরা 'আলাক, কলম, মুযযাম্মিল, মুদ্দাছ্ছির, লাহাব, তাকভীর, আ'লা, ওয়াল লাইল, ওয়াল ফাজর, ওয়াদ দুহা, আলাম নাশরাহ, ওয়াল 'আছর, ওয়াল 'আদিয়াত, কাওছার, তাকাছুর, মাউন, কাফিরুন, ফীল, ইখলাস, নাজম, 'আবাসা, কদর, বুরূজ, তীন, কুরাইশ, কারিয়াহ, মুরসালাত, কাফ, কিয়ামাহ, বালাদ, তারিক, কামার, সোয়াদ, আ'রাফ, জিন, ইয়াসীন, ফুরকান, ফাতির, মারইয়াম, তাহা, ওয়াকিআহ, শু'আরা, নামল, কাসাস, বনী ইসরাঈল, ইউনুস, হুদ, ইউসুফ, হিজর, আন'আম, ওয়াস সাফফাত, লুকমান, সাবা, যুমার, মু'মিন, হামীম সিজদা, হামীম 'আঈন-সীন-কাফ, যুখরুফ, দুখান, জাছিয়া, মু'মিনূন, তানযীল, আসসিজদা, তূর, মুলক, হাক্কাহ, মা'আরিজ, নাবা, নাযি'আত, ইনফিতার, ইনশিকাক, রূম, মুতাফফিফীন ও 'আনকাবূত। উক্ত ৮৩ টি **সূরা মক্কী। হযরত** আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) মক্কী সূরাগুলোর মধ্যে সর্বশেষ সূরা 'আনকাবূতকে বলেছেন, আর হযরত **যাহহাক** (র.) ও **হযরত** 'আতা (র.) সর্বশেষ সূরা সূরা মু'মিনূনকে বলেছেন।

মাদানী সূরাগুলো অবতীর্ণের তারতীব হচ্ছে– সূরা বাকারা, আনফাল, আলে ইমরান, আহযাব, মুমতাহিনা, নিসা, যিলযাল, হাদীদ, মুহাম্মদ, রা'দ, রাহমান, দাহর, তালাক, বাইয়্যিনাহ, হাশর, ফালাক, নাস, নছর, নূর, হজ, মুনাফিকূন, মুজাদালাহ, হুজুরাত, তাহরীম, ছাফ, জুমু'আহ, তাগাবুন, ফাতহ, তওবা, মায়িদা কেউ কেউ সূরা মায়িদাকে সূরা তাওবার পূর্বে উল্লেখ করেছেন। সূরা ফাতিহার অবতরণ মক্কা ও মদীনা দু'স্থানে হয়েছে বিধায়– তাকে মক্কীও বলা যায় এবং মাদানীও বলা যায়, আর কিছু সংখ্যক সূরা সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। –[কামালাইন, খ. ১, পৃ. ১০]

সূরা বাকারা নাজিল হওয়ার সময়কাল : সূরাটির অধিকাংশ আয়াতই নাজিল হয়েছে রাসূল ﷺ -এর মদীনা শরীফে হিজরতের প্রথম দিকে। অবশ্য এর কিছু অংশ পরবর্তীকালে নাজিল হলেও বিষয়বস্তুর মিল থাকার কারণে তা এই সূরার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। যেমন– সুদ নিষিদ্ধ করে যে আয়াতগুলো নাজিল হয়েছে, সেগুলোও তার মাঝে শামিল করা হয়েছে। অথচ সে আয়াতগুলো নাজিল হয়েছে রাসূল ﷺ -এর জীবনের একবারে শেষের দিকে। সূরার উপসংহারে যে কয়টি আয়াত সন্নিবিষ্ট হয়েছে, সেগুলো নাজিল হয়েছিল হিজরতের পূর্বে মক্কায়। কিন্তু বিষয়বস্তুর মিল থাকার কারণে সে আয়াতগুলোও এই সূরার সাথে যুক্ত করা হয়েছে। –[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ২৭]

সূরা বাকারার ফজিলত ও বৈশিষ্ট্য : কুরআনের প্রতিটি সূরা স্বতন্ত্র মর্যাদা ও ফজিলতের অধিকারী হলেও আলোচ্য সূরাটি হলো শীর্ষ মর্যাদার সূরাগুলোর অন্যতম। আকীদা-বিশ্বাস ও আমল-কর্ম উভয় ক্ষেত্রে ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাসমূহের বলতে গেলে সবটুকুই সূরা বাকারাতে এসে গেছে। বিভিন্ন হাদীসে এ সূরার বড় ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। যেমন–

১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন– اِنَّ الشَّيْطَانَ يَفِرُّ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِىْ تُقْرَأُ فِيْهَا سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ

অর্থাৎ যে ঘরে সূরা বাকারা পড়া হয়, সেখান থেকে শয়তান পলায়ন করে। –[মুসলিম, তিরমিযী]

কেননা শয়তান হলো আঁধার আর সূরা বাকারা হলো 'নূর'। আর বলাই বাহুল্য নূর ও আঁধার একত্র হতে পারে না।

২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

لَا تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا فَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِيْ تُقْرَأُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ . (مُسْلِمٌ بَابُ اِسْتِحْبَابِ صَلٰوةِ النَّافِلَةِ فِيْ بَيْتِهِ)

অর্থাৎ তোমরা নিজেদের ঘরকে কবরে পরিণত করো না। নিশ্চয় যে ঘরে সূরা বাকারা পাঠ করা হয়, তাতে শয়তান প্রবেশ করতে পারে না।

৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে আরও বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ وَسَنَامُ الْقُرْاٰنِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ
অর্থাৎ প্রত্যেক জিনিসের একটি চূড়া থাকে, কুরআনের চূড়া হলো সূরা বাকারা।

৪. হযরত খালিদ ইবনে মা'দান (রা.) বর্ণনা করেন–

اِقْرَءُوْا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلَا تَسْتَطِيْعُهَا الْبَطَلَةُ وَهِيَ فُسْطَاطُ الْقُرْاٰنِ .

অর্থাৎ তোমরা সূরা বাকারা তেলাওয়াত করো! কেননা তা গ্রহণে বরকত, আর বর্জনে হাসারাত-অনুতাপ। অকর্মরা এটা বহনে সক্ষম নয়। এটা কুরআনের শামিয়ানা। –[দারিমী]

৫. অপর একটি বর্ণনায় আছে– سَيِّدَةُ اٰيَاتِ الْقُرْاٰنِ اٰيَةُ الْكُرْسِيِّ অর্থাৎ কুরআনের আয়াতসমূহের সরদার হলো আয়াতুল কুরসী। বালাবাহুল্য, এটি সূরা বাকারারই অন্যতম আয়াত। –[তিরমিযী]

৬. বিষয়বস্তু ও মাসায়েলের দিক দিয়েও সূরা বাকারা সমগ্র কুরআনে অনন্য বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার অধিকারী। ইবনে আরাবী (র.) বলেন–

سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ فِيْهَا اَلْفُ اَمْرٍ وَاَلْفُ نَهْيٍ وَاَلْفُ حِكَمٍ وَاَلْفُ خَبَرٍ أَخْذُهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكُهَا حَسْرَةٌ لَا تَسْتَطِيْعُ الْبَطَلَةُ وَهُمُ السَّحَرَةُ سُمُّوْا بِذٰلِكَ لِمَجِيْئِهِمْ بِالْبَاطِلِ . اِذَا قُرِأَتْ فِيْ بَيْتٍ لَمْ تَدْخُلْهُ مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ . (جمل: ص١٣ج١)

অর্থাৎ এ সূরায় এক হাজার (اَمْر) আদেশ এক হাজার (نَهِي) নিষেধ, এক হাজার হেকমত, এক হাজার সংবাদ ও কাহিনী রয়েছে। তা গ্রহণে বরকত এবং বর্জনে অনুতাপ। জাদুকররা তা বহন করতে পারে না। কোনো ঘরে তা পাঠ করা হলে, শয়তান সেখানে তিনদিন পর্যন্ত প্রবেশ করে না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এ সূরার মর্ম আয়ত্ত ও অনুধাবন করতে আট বছর সময় ব্যয় করেছেন। –[হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১, পৃ. ১৩]

৭. বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত যে, হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর (রা.) রাতে সূরা বাকারা পড়ছিলেন, হঠাৎ তাঁর কাছে বাঁধা অশ্বটি ভয়ে ছটফট আরম্ভ করল, তখন তিনি তেলাওয়াত বন্ধ করে দিলেন, আর অশ্বটিও শান্ত হয়ে গেল, পরে যখন আবার তিনি তেলাওয়াত আরম্ভ করলেন, তখন অশ্বও ভয়ে ছটফট আরম্ভ করল এবং নিকটেই তাঁর ছেলে ইয়াহ্য়া নিদ্রাবস্থায় ছিল। তিনি চিন্তা করলেন যে, তাঁর ছেলের কোনো অসুবিধা হয় কিনা, তাই তিনি তেলাওয়াত বন্ধ করে উপরের দিকে দৃষ্টি করলে একটি উজ্জ্বল ছায়ানীড় দেখতে পেলেন, যার মধ্যে আলো দানকারী চেরাগ ছিল, তিনি এ দৃশ্য দেখার জন্য ঘর থেকে বের হয়ে আসলে পরে ওটা অদৃশ্য হয়ে গেল। সকালে এ ঘটনা রাসূল ﷺ -এর দরবারে বললেন। তখন রাসূল ﷺ বললেন যে, ফেরেশতা তোমার তেলাওয়াতের আওয়াজ শুনতে এসেছিল, যদি তুমি তেলাওয়াত করতে থাকতে– তবে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতাগণ উপস্থিত থাকতেন এবং লোকেরা তাঁদেরকে স্বচক্ষে-বাস্তবে দেখতে পারতো। সুতরাং তুমি নিয়মিত সূরা বাকারা পড়তে থাক!

৮. মুসলিম শরীফ হযরত আবূ উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন, সূরা বাকারাহ ও আলে-ইমরান নিজ পাঠকারীদের জন্য কিয়ামতের দিন সায়েবানের কাজে আসবে, সূরা বাকারা পড়তে থাক, এটা পাঠ করার মধ্যে বরকত এবং তেলাওয়াত ছেড়ে দেওয়ার মধ্যে আফসোস রয়েছে। এর বরকতে প্রতারকের ধোঁকা চলতে পারে না।

مَدَنِيَّةٌ : সূরার বেশির ভাগ বরং প্রায় সবগুলো আয়াতই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হিজরত পরবর্তী মদনী জীবনে অবতীর্ণ। সুতরাং এক দুটি মক্কী আয়াতের অন্তর্ভুক্তি সূরাটি মাদানী হওয়ার অন্তরায় নয়।

এক নজরে পবিত্র কুরআনের পরিচিতি : পবিত্র কুরআনের সমস্ত সূরাগুলো নাসিখ-মানসূখ অর্থাৎ রহিতকারী ও রহিত হওয়ার দৃষ্টিতে চার প্রকার। যথা–

প্রথম প্রকার : যে সূরাগুলোতে শুধু (نَاسِخٌ) রহিতকারী আয়াতসমূহ রয়েছে, এমন সূরার সংখ্যা ৬টি। যথা– সূরা ফাতহ, হাশর, মুনাফিকূন, তাগাবুন, ত্বালাক ও আ'লা।

দ্বিতীয় প্রকার : যে সূরাগুলোতে নাসিখ মানসূখ উভয় প্রকার আয়াতসমূহ রয়েছে, এমন সূরার সংখ্যা– ২৫টি। যথা– সূরা আল বাকারা, আল আল ইমরান, আন নিসা, আল মায়েদা, আল আনফাল, আত তওবা, ইব্রাহীম, মারয়াম, আল আম্বিয়া, আল হজ, আন নূর, আল ফোরকান, আশ শু'আরা, আল আহযাব, আস সাবা, আল মু'মিন, আয যারিয়াত, আততূর, আল মুজাদালা, আল ওয়াকিআহ, আল মুযযাম্মিল, আল মুদ্দাসসির, আত তাকভীর ও আল আছর।

তৃতীয় প্রকার : যে সূরাগুলোতে শুধু মানসূখ আয়াতসমূহ রয়েছে, এমন সূরার সংখ্যা ৪০টি। যথা– সূরায়ে আন'আম, আ'রাফ, ইউনুস, হুদ, রা'আদ, হিজর, নহল, ইসরা, কাহফ, তাহা, মু'মিনূন, নামল, কাছাছ, 'আনকাবূত, রোম, লুকমান, আলিফ লাম মীম সিজদা, ফাতির, সাফফাত, সোয়াদ, যুমার, হামীম সিজদা, শুরা, যুখরুফ, দুখান, জাকিয়া, আহকাফ, মুহাম্মদ, ক্বাফ, নাজম, কামার, মুমতাহিনা, মা'আরিজ, কিয়ামাহ, ইনসান, 'আবাসা, তারিক, গাশিয়াহ, তীন, কাফিরূন।

চতুর্থ প্রকার : যে সূরাগুলোতে মানসূখ আয়াতও নেই এবং নাসিখ আয়াতও নেই, এমন সূরার সংখ্যা ৪৩টি। যথা– সূরা ফাতিহা, ইউসুফ, ইয়াসীন, হুজরাত, রাহমান, হাদীদ, সাফ, জুমু'আহ, তাহরীম, মুলক, হাক্কা, নূহ, জিন, মুরসালাত, নাবা, নাযি'আত, ইনফিতার, মুতাফফিফীন, ইনশিকাক, বুরূজ, ফাজর, বালাদ, শামস, লাইল, দুহা, আলাম নাশরাহ, কালাম, ক্বাদর, বাইয়িনাহ, যিলযাল, 'আদিয়াত, কারিআহ, তাকাছুর, হুমাযাহ, ফীল, কুরাইশ, মাউন, কাউছার, নাসর, লাহাব, ইখলাস, ফালাক নাস। পবিত্র কুরআনে সর্বমোট সূরা ১১৪টি।

সূরাসমূহের বিশ্লেষণ :

প্রথমত সূরাসমূহকে সময় ও স্থান হিসেবে ভাগ করা হয়েছে। যেমন– যে সূরাসমূহে মক্কাবাসীকে সম্বোধন করা হয়েছে– ঐ সূরাগুলো মক্কী, আর যে সূরাসমূহে মদীনাবাসীকে সম্বোধন করা হয়েছে– ঐ সূরাগুলো মাদানী।

দ্বিতীয়ত যে সূরাগুলো মক্কা ও তার আশেপাশে যেমন– মীনা ইত্যাদি স্থানে অবতীর্ণ হয়েছে– ঐ সূরাগুলো মক্কী, আর যে সূরাগুলো সূরা মদীনা ও তার আশেপাশে অবতীর্ণ হয়েছে– ঐ সূরাগুলো মদনী।

তৃতীয়ত যা সবচেয়ে অধিক বিশুদ্ধ, তা হচ্ছে নবী করীম ﷺ -এর মদীনায় হিজরতের পূর্বে যতগুলো সূরা অবতীর্ণ হয়েছে– ঐ সবগুলো মক্কী, আর তার হিজরতের পর যতগুলো সূরা নাজিল হয়েছে– যদিও তা মক্কাতেই অবতীর্ণ হয়ে থাকে– ঐ সবগুলো মাদানী।

জালালাইন-এর সিদ্ধান্ত : জালালাইন-এর বর্ণনা মোতাবেক ২০টি সূরা নিঃসন্দেহে মাদানী, আর ৭৭টি সূরা নিঃসন্দেহে মক্কী এবং ১৭টি সূরা সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে।

সূরাসমূহের নাম : যেমনভাবে বড় আকারের বই ও কিতাবাদিকে সহজ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন অধ্যায় ও বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয় এবং বিভিন্ন শিরোনামের অধীনে বিষয়গুলোকে পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়। যাতে করে কোনোরূপ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয় এবং পাঠকদের বুঝতে ও আয়ত্তে আনতে সুবিধা হয়। তদ্রূপ অবস্থাই হচ্ছে পবিত্র কুরআনের সূরা ও আয়াতসমূহের, আর এ সূরাসমূহকে পরস্পর পৃথক করার লক্ষ্যে পৃথক পৃথক নামে নামকরণ করা হয়েছে এবং এ নামকরণের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে। কোথাও প্রথম শব্দের প্রতি লক্ষ্য করে সূরার নাম রাখা হয়েছে। যেমন– সূরা ইয়াসীন, সোয়াদ, নূন, যাকে আরবিতে বলা হয় تَسْمِيَةُ الْكُلِّ بِاسْمِ أَوَّلِ الْجُزْءِ আর কোথাও সূরাতে উল্লিখিত বিশেষ কোনো শব্দের প্রতি লক্ষ্য করে ঐ শব্দের দ্বারাই সূরার নাম রাখা হয়েছে। যেমন– সূরা মুহাম্মদ, সূরা ইব্রাহীম ইত্যাদি, যাকে আরবিতে বলা হয় تَسْمِيَةُ الْكُلِّ بِاسْمِ أَشْهَرِ الْجُزْءِ - আর কোথাও সূরাতে উল্লিখিত কোনো ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করে ঐ সূরার নাম রাখা হয়েছে। যেমন– সূরা বাকারা।

قَوْلُهُ وَسِتٌّ أَوْ سَبْعٌ الخ : এখানে আয়াত সংখ্যার ব্যাপারে মতভেদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ মতভেদের উৎস হলো– কোনো কোনো আয়াতের শুরুভাগে মাসহাফে কূফী ও অপরাপর মাসহাফের ভিন্নতা।

اٰيَةٌ : আয়াত অর্থ চিহ্ন, নিদর্শন। পথিকদের চলার সুবিধার্থে রাস্তার পার্শ্বে যে চিহ্ন প্রতিষ্ঠিত করা হয় তাকে আয়াত বলা হয়। পরিভাষায় اٰيَةٌ বলা হয়– طَائِفَةٌ مِنْ كَلِمَاتِ الْقُرْاٰنِ مُتَمَيِّزَةٌ بِفَصْلٍ [কয়েকটি শব্দের সমষ্টিকে আয়াতে কুরআনী বলা হয়] কখনো একটি কালিমাও আয়াত হিসেবে সাব্যস্ত হয়। যেমন– مُدْهَامَّتَانِ - وَالْفَجْرِ . وَالضُّحٰى . وَالْعَصْرِ . الٓمّٓ . طٰهٰ . يٰسٓ ইত্যাদি। –[হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১, পৃ. ১৪]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ : পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

তা'আওউয ও তাসমিয়া-এর হুকুম : পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের পূর্বে تَعَوُّذ পড়া উচিত। যার অর্থ হলো আমি বিতাড়িত শয়তানের ফেতনা থেকে আল্লাহর আশ্রয়ে আসার আহ্বান করছি। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ [অর্থ- অতএব, যখন আপনি কুরআন পাঠ করেন, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করুন। -[সূরা নাহল : ৯৮] আল্লাহর এ নির্দেশের কারণে পবিত্র কুরআনের তেলাওয়াতের শুরু তা'আউয দ্বারা হতে হবে, চাই কোনো সূরার প্রথম থেকে তেলাওয়াত শুরু হোক কিংবা না-ই হোক, পবিত্র কুরআনের যে স্থান থেকেই তেলাওয়াত আরম্ভ করতে চাইলে তা'আউয দ্বারা শুরু করতে হবে। কেননা এ **اِسْتِعَاذَة হলো শয়তানের ধোঁকা ও** কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার রক্ষাকবচ। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ إِنَّهُ هُوَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ . إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُوْنَ . (الاَعْرَافُ : ٢٠١-٢٠٠)

জমহুরের মতে নামাজে تَعَوُّذ পড়া সুন্নত। ইচ্ছাকৃত বা ভুলে না পড়া হলে নামাজ নষ্ট হবে না। আর নামাজের বাহিরে تعوذ পড়া মোস্তাহাব। হযরত আতা (র.) বলেন, নামাজের ভেতর এবং বাহিরে উভয় জায়গায়ই ওয়াজিব। হযরত ইবনে সীরীন (র.) বলেন, জীবনে একবার পাঠ করলেও ওয়াজিব আদায় হওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে। -[হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১, পৃ. ১৪]

تَعَوُّذ পড়ার সময় : জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে নামাজের ভেতরে কিংবা বাহিরে সর্বত্র কেরাতের পূর্বে تَعَوُّذ পড়বে। তবে আয়াতের বাহ্যিক বর্ণনাধারার প্রতি লক্ষ্য করে ইমাম নাখঈ ও দাউদ (র.) কেরাতের শেষে تَعَوُّذ পড়ার মত দিয়েছেন।

-[হাশিয়ায়ে জামাল : খ. ১, পৃ. ১৪]

تَعَوُّذ-এর বাক্য কি হবে? : এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে তা তুলে ধরা হলো-

১. ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে তা'আউয -এর শব্দগুলো হচ্ছে- اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

২. আর ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মতে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ বলা উত্তম হবে। কেননা এর দ্বারা تَعَوُّذ -এর নির্দেশনামূলক দুটি আয়াতের মাঝে সমন্বয় সাধিত হয়। আয়াতদ্বয় হলো-
   فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (اَلنَّحْلُ : ٩٨) এবং وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (فُصِّلَتْ : ٣٦)

৩. ইমাম আওযায়ী (র.) ও ইমাম ছাওরী (র.)-এর মতে, উত্তম হচ্ছে এভাবে বলা-
   اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ إِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ .

اَلتَّعَوُّذُ-এর মর্ম ও বিশ্লেষণ :

قَوْلُهُ اَعُوْذُ : عَاذَ يَعُوْذُ আশ্রয় গ্রহণ করল, আশ্রয় নিল। قَالَ يَقُوْلُ-এর ওজনে। عَاذَ بِهِ (ن) عِيَاذًا وَمَعَاذًا থেকে নির্গত।

قَوْلُهُ الشَّيْطَانِ : شَيْطٰن শব্দটির মূল ধাতু হলো شَطْنٌ যার অর্থ হলো রহমত থেকে দূরে সরে গেছে। কেউ বলে মূল ধাতু হলো شاط يشيط -ধ্বংস হওয়া বা ভস্ম হওয়া।

পরিভাষায় শয়তানের সংজ্ঞা হলো- اَلشَّيْطَانُ اِسْمٌ لِكُلِّ عَاتٍ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ حَاشِيَةُ الصَّاوِيْ ص١٠ ج١ [মানব এবং জিন জাতির মধ্যে প্রত্যেক দাম্ভিক ও সীমা অতিক্রমকারীকে শয়তান বলে]

قَوْلُهُ الرَّجِيْمِ : এটি فَعِيْلٌ-এর ওজনে فَاعِلٌ-এর অর্থে। اَىْ يَرْجِمُ بِالْوَسْوَسَةِ وَالشَّرِّ মানব মনে অসওয়াসা ও অনিষ্ট ঢেলে দেয়।

কেউ বলেন– مَفْعُوْل -এর অর্থে– اَىْ مَرْجُوْمٌ بِالشُّهُبِ عِنْدَ اِسْتِرَاقِ السَّمْعِ অর্থাৎ আকাশ থেকে চুরি করে কথা শোনার সময় উল্কা দিয়ে যাকে আঘাত করা হয়।

কেউ বলেন– مَرْجُوْمٌ بِالْعَذَابِ আজাব দ্বারা আক্রান্ত।

কেউ বলেন– مَرْجُوْمٌ بِمَعْنٰى مَطْرُوْدٍ عَنِ الرَّحْمَةِ وَعَنِ الْخَيْرَاتِ وَعَنْ مَنَازِلِ الْمَلَاِ الْاَعْلٰى রহমত ও সকল কল্যাণ এবং ফেরেশতাদের সমাজ থেকে বিতাড়িত। –[হাশিয়ায়ে সাবী খ.১, পৃ. ১০]

اِسْتِعَاذَةْ -কে تَسْمِيَةْ -এর পূর্বে আনার কারণ : বস্তুত: اِسْتِعَاذَةْ হলো শয়তানের ধোঁকার জালে আটকে পড়া থেকে বেঁচে থাকা : আর বিসমিল্লাহ -এর হাকীকত হলো বান্দা আল্লাহ তা'আলার রহমতে দাখিল হয়ে যাওয়া। এ জন্য اِسْتِعَاذَةْ কে বিসমিল্লাহ -এর আগে আনা হয়েছে। কেনেনা কায়দা আছে– دَفْع مُضَرَّت مُقَدَّم از جَلْب مَنْفَعَت অর্থাৎ লাভ অর্জনের চেয়ে ক্ষতি রোধ করা অগ্রগণ্য]।

এছাড়াও কুরআনে কারীম হলো আল্লাহ তা'আলার কালাম। তা তেলাওয়াতের পূর্বে জবান এবং কলবের পবিত্রতা আবশ্যক। তাই কুরআন তেলাওয়াতের পূর্বে اِسْتِعَاذَةْ -এর হুকুম দেওয়া হয়েছে, যাতে জবান এবং কলব পবিত্র হয়ে যায়।

–[মাআরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্ধলভী (র.) খ. ১, পৃ. ৬]

تَعَوُّذ পাঠের তাৎপর্য : আল্লামা সুলায়মান জামাল (র.) বলেন–

وَمِنْ لَطَائِفِ الْاِسْتِعَاذَةِ اَنَّ قَوْلَهٗ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اِقْرَارٌ بِالْعَجْزِ وَالضُّعْفِ وَاعْتِرَافٌ مِنَ الْعَبْدِ بِقُدْرَةِ الْبَارِىْ عَزَّ وَجَلَّ وَاَنَّهُ الْغَنِيُّ الْقَادِرُ عَلٰى دَفْعِ جَمِيْعِ الْمُضَرَّاتِ وَالْاٰفَاتِ وَاعْتِرَافٌ مِنَ الْعَبْدِ أَيْضًا بِاَنَّ الشَّيْطَانَ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ فَفِى الْاِسْتِعَاذَةِ اللَّجَأُ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى الْقَادِرِ عَلٰى دَفْعِ وَسْوَسَةِ الشَّيْطَانِ الْغَوِيِّ الْفَاجِرِ وَاَنَّهٗ لَا يَقْدِرُ عَلٰى دَفْعِهٖ عَلَى الْعَبْدِ اِلَّا اللّٰهُ تَعَالٰى . (حَاشِيَةُ الْجَمَلِ ١/١٤)

আল্লামা শায়খ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ সাবী আরো সংক্ষেপে এভাবে বলেন–

فَحِكْمَةُ الْاِسْتِعَاذَةِ تَطْهِيْرُ الْقَلْبِ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ يَشْغَلُ عَنِ اللّٰهِ تَعَالٰى، فَاِنَّ فِىْ تَعَوُّذِ الْعَبْدِ بِاللّٰهِ اِقْرَارًا بِالْعَجْزِ وَالضُّعْفِ وَاِعْتِرَافًا بِقُدْرَةِ الْبَارِىْ وَاَنَّهُ الْغَنِيُّ الْقَادِرُ عَلٰى دَفْعِ الْمُضَرَّاتِ وَاَنَّ الشَّيْطَانَ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ وَقَدْ دَخَلَ مِنْهُ فِى الْحِصْنِ الْحَصِيْنِ . (حَاشِيَةُ الصَّاوِىْ ص١٠ ج١)

অর্থাৎ পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের পূর্বে আউযু বিল্লাহ পড়ার তাৎপর্য ও হেকমত হলো, বান্দার অন্তরকে গাইরুল্লাহ থেকে পবিত্র করা। কেননা تَعَوُّذ -এর মধ্যে বান্দার পক্ষ থেকে অক্ষমতা প্রকাশ এবং আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতার স্বীকারোক্তি রয়েছে। সেই সাথে বান্দা এটাও স্বীকার করে যে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই সকল অনিষ্ট হতে রক্ষা করতে পারেন।

قَوْلُهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ :

তারকীব : بِسْمِ اللّٰهِ -এর مُتَعَلِّق মাহযূফ রয়েছে। তা فِعْل عَامّ -ও হতে পারে অথবা فِعْل خَاصّ -ও হতে পারে, مُقَدَّم -ও হতে পারে অথবা مُؤَخَّر -ও হতে পারে। উক্ত চারটি পদ্ধতি مُتَعَلِّق -এর সহীহ ও বিশুদ্ধ সূরত। জুমলায়ে فِعْلِيَّه ও হতে পারে অথবা জুমলায়ে اِسْمِيَّة ও হতে পারে। মোট আটটি পদ্ধতিই হয়, কিন্তু সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি হচ্ছে– فِعْل 'আম হওয়া এবং শেষে مُقَدَّر মানা, তাতে اَللّٰه مُقَدَّم থাকবে এবং তাঁর বড়ত্বও ঠিক থাকবে এবং সর্বকাজের সাথেই তাঁকে সংযুক্ত করা যাবে। –[কামালাইন খ. ১, পৃ. ১২]

বিসমিল্লাহ -এর পূর্বে উহ্য থাকা শব্দের ضَمِيْر [সর্বনাম] সম্পর্কে : আরবি ভাষার নিয়মে যে বাক্যের শুরুতে ب অক্ষরটি রয়েছে, তা কোনো একটি ক্রিয়া পদের সাথে مُتَعَلِّق বা সংশ্লিষ্ট হওয়া আবশ্যক, তা উহ্য হোক বা প্রকাশমান। উহ্য হলে ক্রিয়া পদের সর্বননাম (ضَمِيْر) এখানে দু'টি অবস্থার যে কোনো একটি হতে হবে। হয় কাজের সংবাদদান পর্যায়ের হবে, না হয় হবে কাজের আদেশ। সংবাদদান পর্যায়ের হলে বাক্যটি হবে : اَبْدَأُ بِسْمِ اللّٰهِ অর্থাৎ আমি আল্লাহ তা'আলার নামে শুরু করছি ... আর কাজের আদেশ প্রদান পর্যায়ের হলে বাক্যটি হবে : اِبْدَءُوْا بِسْمِ اللّٰهِ অর্থাৎ শুরু কর আল্লাহ তা'আলার নামে

এ দু'টি সম্ভাবনার যে কোনো একটি হতে পারে। সূরা পাঠ করার নিয়মানুসারে মনে হয় এখানে আদেশসূচক শব্দই উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ বলা হয়েছে আল্লাহ তা'আলার নাম নিয়ে পড়াশুনা কর। যেমন সূরা ফাতিহার শব্দ إِيَّاكَ نَعْبُدُ অর্থাৎ হে আল্লাহ আমরা কেবলমাত্র তোমারই দাসত্ব করছি। এর পূর্বে 'তোমরা বল' উহ্য ধরা হয়েছে। 'বিসমিল্লাহ' বাক্যেও এই সম্বোধন উহ্য আছে বলা যায়। কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে এই আদেশ স্পষ্ট ভাষায় উদ্ধৃত রয়েছে। যেমন اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ অর্থাৎ পড় তোমার রব -এর নামে। এখানে পাঠ শুরু করার পূর্বে আল্লাহ তা'আলার নাম উচ্চারণ করতে বলা হয়েছে। অপর এক আয়াতে কুরআন পাঠের পূর্বে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় গ্রহণ করতে অর্থাৎ আ'উযু বিল্লাহ বলতে আদেশ করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে যদি সংবাদদানের তাৎপর্য অনুযায়ী 'আমি পড়া শুরু করছি' এই কথা উহ্য ধরা হয়, তাহলেও তাতে আদেশ নিহিত রয়েছে মনে করা যায়। কেননা যখন জানা যাবে যে, আল্লাহ নিজেই আল্লাহর নামে পড়া শুরু করেছেন, তখনই সেই আল্লাহর নামে শুরু করার জন্য আমাদের প্রতি আদেশ করা হচ্ছে বোঝা যাবে। কেননা তাঁর নাম করে পাঠ শুরু করলে তাতে বরকত হবে। আমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আমরাও যেন তাই করি।

উপরিউক্ত দুটি তাৎপর্যের উভয়ই এখানে বৈধ মনে করাও সমীচীন নয়। অর্থাৎ এখানে যেমন সংবাদ দেওয়া হয়েছে, তেমনি তা করার আদেশও করা হচ্ছে। শব্দের গঠন প্রণালিতে এই দু'টিরই সমান সম্ভাবনা বিদ্যমান।

–[আহকামুল কুরআন, জাসসাস খ. ১, পৃ. ১৫]

بِسْمِ اللّٰهِ -এর ফজিলতসমূহ :

১. মুসলিম শরীফে বর্ণিত, যে খাদ্যে বিসমিল্লাহ পড়া না হয়, সে খাদ্যে শয়তানের অংশ থাকে।

২. আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ -এর খানার মজলিসে জনৈক সাহাবী (রা.) বিসমিল্লাহ ব্যতীত খানা খাওয়া আরম্ভ করেছেন, পরে যখন স্মরণ হয়েছে, তখন বলেছেন "বিসমিল্লাহি মিন্ আউয়ালিহী ওয়া আখিরিহী" তখন রাসূল ﷺ এ অবস্থা দেখে হাসতে লাগলেন এবং বললেন যে, শয়তান যা কিছু খেয়েছিল তিনি [সাহাবী] বিসমিল্লাহ পড়ার সাথে সাথে দাঁড়িয়ে সব বমি করে দিয়েছে।

৩. তিরমিযী শরীফে হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। পায়খানায় প্রবেশকালে বিসমিল্লাহ পড়লে জিন জাতিও শয়তানদের দৃষ্টি তার গুপ্তাঙ্গ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না।

৪. ইমাম রাযী (র.) তাফসীরে কাবীরে লিখেছেন, হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.)-এর বিপক্ষে শত্রু যুদ্ধের ময়দানে অপেক্ষা করছিল এবং বিষে ভরা একটি শিশি দিয়ে হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদের ধর্মের সততার পরীক্ষা করতে চেয়েছিল। হযরত খালিদ (রা.) শিশির সম্পূর্ণ বিষ বিসমিল্লাহ পড়ে পান করেছেন; কিন্তু বিসমিল্লাহ -এর বরকতে বিষের বিন্দুমাত্র প্রভাবও তাঁর উপর হয়নি।

কিন্তু বর্তমানে এ ধরনের ঘটনা বাস্তবে দেখা যায় না বলে উল্লিখিত ঘটনাটি যে কাল্পনিক, তা নয়, বরং তা সঠিক চিন্তার মাধ্যমে বুঝতে হবে যে, কোনো বস্তুর ক্রিয়া পেতে হলে অবশ্যই ঐ বস্তুর জন্য কিছু শর্ত ও উপকরণাদি থাকে এবং প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হয়। যেমন– রোগ দূর করা ও সুস্থতা লাভ করার জন্য শুধু ঔষধ কখনো কার্যকরী হতে পারে না– যতক্ষণ পর্যন্ত তার জন্য ক্ষতিকারক উপকরণাদি থেকে বিরত না থাকবে। ঠিক এ স্থানেও বিসমিল্লাহ কার্যকর হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে– খালেছ নিয়ত, সুদৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহর সাথে মজবুত সম্পর্ক এবং পরিপূর্ণ ঈমান। আর লোক দেখানো, কু-ধারণা, কল্পনা ও অবিশ্বাস ইত্যাদি থেকে বিরত থাকতে হবে। অর্থাৎ সব জিনিসই শর্ত সাপেক্ষে কাজ করে, তদ্রূপ উল্লিখিত ঘটনায় বিসমিল্লাহ কার্যকর হওয়ার জন্য যা কিছু থাকার প্রয়োজন এবং যা কিছু থেকে বিরত থাকা দরকার, ঐসব বিষয় হযরত খালিদ (রা.)-এর মধ্যে বিদ্যমান ছিল, যার কারণে উক্ত ঘটনা সত্য ও বাস্তব হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার।

৫. আহমদ ইবনে মূসা ইবনে মারদুয়াওয়াইহ নিজ তাফসীর গ্রন্থ 'মারদুওয়াই' হতে হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, বিসমিল্লাহ যখন অবতরণ হয়েছে– তখন মেঘমালা দ্রুত গতিতে পূর্বদিকে দৌড়তে ছিল, সাগরগুলো উত্তাল অবস্থায় ছিল সকল প্রাণী নিস্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে শুনতে ছিল, শয়তানকে দূরে বিতাড়িত করা হয়েছিল এবং আল্লাহ তা'আলা নিজ ইজ্জত ও জালালিয়াতের কসম খেয়ে বলেছেন, যে জিনিসের উপর বিসমিল্লাহ পড়া হবে, ঐ জিনিসে অবশ্যই বরকত দান করবো। লেখার ক্ষেত্রে যদি কোনোস্থানে "বিসমিল্লাহ" লিখলে বে-আদবী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে ঐ স্থানে ওলামায়ে সলফের অনুকরণ করে আবজাদের হিসাব অনুযায়ী বিসমিল্লাহ এর অক্ষরসমূহের মান– সংখ্যা ৭৮৬ লিখে দেওয়াটাও বরকতের উৎস। –[কামালাইন খ. ১, পৃ. ১২]

বিসমিল্লাহ নাজিল হওয়ার পূর্বের কথা : হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত জিবরাঈল (আ.) সর্বপ্রথম কুরআন নিয়ে যখন নবী করীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন তিনি প্রথমে বললেন- اِقْرَأْ 'পড়'। রাসূল ﷺ বললেন- مَا اَنَا بِقَارِئٍ অর্থাৎ আমি তো পড়তে সক্ষম নই। পরে বললেন- اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ অর্থাৎ পড় তোমার সেই রবের নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।

নবী করীম ﷺ চিঠিসমূহের শুরুতে প্রথমে লিখতেন- بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ অর্থাৎ হে আল্লাহ! তোমার নাম করে [শুরু করছি]।

পরে এ আয়াত নাজিল হয়- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسٰهَا (هود : ٤١) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নাম নিয়ে [নৌকায় আরোহণ কর], যিনি নৌকাকে চালু রাখবেন এবং শক্ত করে উঁচু করে ধারণ করবেন।

অতঃপর রাসূল ﷺ بِسْمِ اللّٰهِ লিখতে শুরু করেন। পরে নাজিল হলো قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ অর্থাৎ বল! তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ডাক কিংবা ডাক রাহমানকে।

পরে তিনি চিঠির উপর আল্লাহ তা'আলার পর 'রহমান'-ও লিখতে থাকেন। পরে সূরা নামলের আয়াত وَاِنَّهٗ بِاسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ যখন নাজিল হলো তখন তিনি পূর্ণ 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখতে শুরু করেন।

হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে তাঁর ও সুহাইল ইবনে আমর -এর মধ্যকার চুক্তিপত্র রচনার সময় হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব (রা.) কে বললেন, প্রথমে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখ। সুহাইল বললো, না, بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ অর্থাৎ "হে আল্লাহ তোমার নামে" লিখতে হবে। কেননা আমরা রহমানকে চিনি না। নবী করীম ﷺ সুহাইলের কথা মেনে নিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বাক্যটি পূর্বে কুরআনে নাজিল হয়নি। পরে সূরা আন-নামল নাজিল হওয়ার পরই তা ব্যবহৃত হতে থাকে। উল্লেখ্য, সূরা নামল মক্কায় হিজরতের পূর্বে নাজিল হওয়ার কথা সর্বসম্মত।

-[আহকামুল কুরআন, জাসসাস, খ. ১, পৃ. ১৮]

মুশরিকদের বিসমিল্লাহ : আরবের মুশরিকরা নিজেদের মনগড়া মাবুদগুলোর নামে بِاسْمِ اللَّاتِ وَالْعُزّٰى বলে সর্বপ্রকার কাজ আরম্ভ করত।

বিসমিল্লাহর ক্ষেত্রে কি নবী করীম ﷺ অন্যান্য ধর্মের অনুকরণ করেছেন? : জড়বাদী ধর্মাবলম্বীদের ও অগ্নিপূজকদের কিতাবের প্রতিটি লিখনীতেও এমন ধরনের [বিসমিল্লাহ'র মতো] কিছু শব্দ আছে। যেমন- بنام ایزد بخشائنده - بخشائشگر - مهربان داد گر ইত্যাদি এবং বর্তমান ইঞ্জীলের কোনো কোনো গ্রন্থের প্রাথমিক শব্দগুলোতেও কিছু এমন শব্দাবলি [বিসমিল্লাহ'র ন্যায়] রয়েছে, যদ্দারা সন্দেহ হতে পারে যে, রাসূল ﷺ ইঞ্জীল অথবা পারসিকদের কিতাব থেকে হয়তো উপকার লাভ করেছেন এবং বিসমিল্লাহ দ্বারা পবিত্র কুরআন আরম্ভ করার মাধ্যমে হয়তো তাদের অনুকরণ ও অনুসরণ করেছেন।

কিন্তু প্রথমত মনে রাখতে হবে যে, ইঞ্জীলের অতি পুরাতন গ্রন্থগুলো এ ধরনের নয়, যদ্দারা উল্টো প্রমাণিত হয় যে, খ্রিস্টান সম্প্রদায় মুসলমানদের দেখাদেখি পবিত্র কুরআনের অনুকরণ করেছে। হ্যাঁ, পারস্যবাসীদের কিতাব সম্পর্কে যতটুকু জানা যায়- তা হচ্ছে নবী করীম ﷺ কখনো ইরান যাননি এবং তৎকালে অগ্নিপূজক কোনো আলেম বা পণ্ডিত আরবে বসবাসও করেনি, তৎকালে তাদের কোনো লাইব্রেরী বা কোনো পাঠশালার নাম-নিশানও আরবে ছিল না।

ঐ কালে তো অগ্নিপূজকদের কিতাবাদির প্রচারের প্রথা ও রেওয়াজ তাদের দেশের মধ্যে এবং তাদের জাতির মধ্যেও ছিল না। বিশেষ বিশেষ লোকেরা অন্যান্য লোকদের দৃষ্টি থেকে নিজ ধর্মীয় কিতাবাদিকে লুকিয়ে রাখত, যাতে করে অন্য কেউ দেখতে পর্যন্ত না পারে, আরব দেশ পর্যন্ত তাদের কিতাব পৌঁছা তো অনেক দূরের কথা।

তারপর স্বয়ং রাসূল ﷺ নিজ ভাষায় পড়তে ও লিখতে পারতেন না। এখন একটি বিষয়ই রয়েছে- তা হচ্ছে হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর ব্যাপারটি? তিনি তো ছিলেন ক্রীতদাস, কোনো ধর্মীয় আলেম ছিলেন না। এমতাবস্থায় যদি স্বয়ং রাসূল ﷺ তার থেকে উপকার লাভ করতেন, তবে উল্টো সালমান ফারসী কেন রাসূল ﷺ -এর ভক্ত হয়েছেন? এবং নিজ মালিকের পক্ষ থেকে অসহনীয় কষ্ট সহ্য করে নবী করীম ﷺ-এর খেদমতে থাকাকে কেন গৌরবের উৎস মনে করেছেন?

তাছাড়া রাসূল ﷺ যদি অন্যদের অনুকরণে এমন করেও থাকেন, তবে এর দ্বারা রাসূল ﷺ -এর গুণাবলি আরও বৃদ্ধি হয়েছে। আর এ অনুকরণের দ্বারা নবী করীম ﷺ-এর ন্যায়পরায়ণতার অন্তরের প্রশস্ততার উঁচু চিন্তাধারার আন্দাজ করা যায় যে, তিনি অন্যান্য লোকদের উত্তম গুণাবলি থেকে দূরে থাকতেন না; বরং সেগুলোকে নিজের মধ্যে স্থাপন করতে সচেষ্ট ছিলেন এবং মনে প্রাণে ঐ গুণাবলিকে গ্রহণ করে অন্যদেরকেও সেগুলো গ্রহণ করতে পরামর্শ দিতেন। একজন গোঁয়ার,

উগ্রবাদী, হিংসুটে ব্যক্তি দ্বারা কখনো এ ধরনের উঁচু আদর্শের আশা করা যায় না। আর ইসলাম কখনো নিজেকে সম্পূর্ণ নতুন বলে ঘোষণা করেনি, পুরানো ও ঐতিহ্যবাহী হওয়ার কারণে গৌরব করেছে। অর্থাৎ ইসলামের সমস্ত বিধানবলি পুরাতন যেগুলোর তাবলীগও প্রচার সর্বদাই হযরত আম্বিয়া (আ.) করে আসছেন এবং নতুন কোনো কথা এর মধ্যে নেই। হ্যাঁ, অতীতের বর্বর লোকেরা যে বিধানগুলোকে গোপন করে রেখেছিলো, ইসলাম সেগুলোকে প্রকাশ করে দিয়েছে এবং প্রকৃত বাস্তবতাকে উজ্জ্বল করেছে।

সুতরাং হতে পারে যে, পূর্বের জমানায় অতীতের ধর্মগুলোতে শুরু বা আরম্ভ আল্লাহর নামেই হতো, তারপর উক্ত লোকেরা এ বিসমিল্লাহ বা আল্লাহর নামে শুরুকে রহিত করে দিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ইসলাম এসে অতীতের সেই আসল বিধানের [আল্লাহর নামে আরম্ভ করা বা বিসমিল্লাহর সাথে শুরু করার] অনুকরণ করেছেন! এতে প্রতিবাদের বা আপত্তির কি আছে? কিছুই নেই। -[কামালাইন খ. ১, পৃ. ১৩-১৪]

বিশ্লেষণ : সকল সৃষ্টি ও মানুষের তিনটি অবস্থা, প্রথমত সৃষ্টির পূর্বে না থাকার অবস্থা। দ্বিতীয়ত দুনিয়াবী জীবনে থাকার অবস্থা। তৃতীয়ত পরকালের চিরস্থায়ী অবস্থা। বিসমিল্লাহি.........-এর তিনটি শব্দ দ্বারা ঐ তিনটি অবস্থার দিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। اَللّٰه শব্দের মধ্যে প্রথম অবস্থার দিকে ইঙ্গিত। অর্থাৎ তিনিই সকল বিদ্যমানকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন, তিনি অস্তিত্ব দান না করলে কিছুই হত না।

দ্বিতীয়ত اَلرَّحْمٰن এটাও মুবালাগার সীগাহ, এর মধ্যে اَلرَّحِيْم -এর তুলনায় অক্ষর ও অর্থ- উভয়টিই বেশি। সুতরাং এর مِصْدَاق দুনিয়াতে মুসলমান, কাফের, বাধ্যগত ও অবাধ্য সবই, তাই দুনিয়াতে দয়া ও রহমতপ্রাপ্তদের সংখ্যা বেশি। তৃতীয়ত اَلرَّحِيْم এটাও মুবালাগার সীগাহ, এর মধ্যে اَلرَّحْمٰن -এর তুলনায় অক্ষরও কম এবং অর্থও কম। সুতরাং পরকালের নিয়ামত যদিও বেশি ও বড় হবে, কিন্তু দয়া ও রহমত পাওয়ার পাত্র কম হবে, শুধু মু'মিন ব্যক্তিগণ হবেন। অর্থাৎ দুনিয়াতে রহমতপ্রাপ্তদের সংখ্যা বেশি এবং পরকালে রহমত থেকে বঞ্চিতদের সংখ্যা বেশি হবে। এ জন্যই يَا رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَ رَحِيْمَ الْاٰخِرَةِ বলা হয়। -[কামালাইন খ. ১, পৃ. ১৪]

দু'সূরার মাঝে বিসমিল্লাহ পড়ার সূরত : দু'সূরার মাঝে বিসমিল্লাহি .... পড়া/ না পড়ার মধ্যে চারটি প্রকার হতে পারে, ১. وَصْلِ كُلْ ২. فَصْلِ كُلْ ৩. فَصْلِ اَوَّل وَصْلِ ثَانِى উক্ত তিনটি প্রকার জায়েজ। আর চতুর্থ প্রকার- অর্থাৎ ৪. وَصْلِ اَوَّل فَصْلِ ثَانِى নাজায়েজ।

বিসমিল্লাহ কি সূরা ফাতিহাসহ অন্যান্য সূরার অংশ : 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' কুরআনের একটি আয়াত- এই বিষয়ে কোনো মতপার্থক্য নেই। সূরা আন-নামলে পূর্ণ আয়াত এইভাবে উদ্ধৃত রয়েছে-

اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (النمل : ٣٠)

'এই চিঠি সুলায়মানের নিকট থেকে এসেছে এবং তা দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ তা'আলার নামে শুরু করা হয়েছে। কিন্তু بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ সূরা ফাতিহাসহ অন্যান্য সূরার অংশ কিনা? এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন মত রয়েছে। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো-

মাযহাব : ১. ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং মদীনা, বসরা ও শামের ফুকাহায়ে কেরামের মতে بِسْمِ اللّٰهِ সূরা ফাতিহা ও অন্যান্য সূরার অংশ নয়। শুধু বরকত লাভের ও দু'সূরার মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করার জন্য নাজিল করা হয়েছে। তবে এটি সূরা নামলের আয়াত এ বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই।

দলিল :

১. তাবারানী ইবনে খুযাইমা এবং আবূ দাউদ (র.)-এর বর্ণনা হতে প্রমাণিত হুজুর ﷺ নামাজে بِسْمِ اللّٰهِ আস্তে আস্তে পাঠ করতেন এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ সশব্দে পড়তেন। এ থেকে জানা গেল بِسْمِ اللّٰهِ সূরা ফাতিহা কিংবা অন্যান্য সূরার অংশ নয়। যদি সূরার অংশ হতো, তাহলে সূরার কিছু অংশ সশব্দে এবং কিছু নিঃশব্দে কেন পড়তেন? অথচ এভাবে পড়া কারো মতেই শুদ্ধ নয়। এজন্য এ মতটি অধিকতর শক্তিশালী।

২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন- নবী করীম ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, সালাত আমার ও আমার বান্দার মধ্যে দুইভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। তার অর্ধেক আমার জন্য আর অপর অর্ধেক আমার বান্দার জন্য। আমার বান্দার জন্য তা-ই আছে, যা সে চেয়েছে। সে যখন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বলে, তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

আমার বান্দা আমার হামদ [প্রশংসা] করেছে। যখন সে বলে- اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বলে, তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা আমাকে মর্যাদাবান করেছে বা আমার বান্দা আমার গুণ বর্ণনা করেছে। যখন সে বলে- مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা আমার নিকট সবকিছু সোপর্দ করেছে। যখন সে বলে- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, এই কথাটি আমার ও আমার বান্দার মধ্যকার ব্যাপার। আমার বান্দা যা চেয়েছে তা-ই সে পাবে। এরপর বান্দা اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ সূরার শেষ পর্যন্ত পড়ে, তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বান্দা তা-ই পাবে, যা সে চেয়েছে।

বিসমিল্লাহ ....যদি সূরা ফাতিহার একটি আয়াত হতো, তাহলে সূরাটির আয়াতসমূহের উল্লেখ করলে সেটিও উল্লেখ হতো। এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, বিসমিল্লাহ ....সূরা ফাতিহার অংশ নয়। আর একথা তো সকলেরই জানা যে, উপরোল্লিখিত হাদীসে 'সালাত' বা নামাজকে দুই ভাগে ভাগ করার কথা বলে সূরা ফাতিহা-ই বুঝিয়েছেন। আর তাকেই দুই ভাগ করার কথা বলেছেন। 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' যে সূরা ফাহিতহার অংশ নয় এবং তা তার মধ্যকার কোনো আয়াত নয়, তা এ প্রেক্ষিতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হলো। মোটকথা, দুটি দিক দিয়ে কথাটির ব্যাখ্যা করা যায়। প্রথমত উক্ত বিভক্তিতে তা উল্লেখ করা হয়নি। দ্বিতীয়ত তা এই বিভক্তিতে থাকলে তা দু'ভাগে বিভক্ত হতো না। কেননা তাতে বান্দার অংশের তুলনায় আল্লাহ তা'আলার অংশ অনেক বড়। এই বিসমিল্লাহ ....আল্লাহ তা'আলার গুণ বর্ণনা সম্বলিত। তাতে বান্দার কোনো অংশ নেই

৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ -এর এই কথাটি বর্ণনা করেছেন-

سُوْرَةٌ فِي الْقُرْاٰنِ ثَلَاثُوْنَ اٰيَةً شَفَعَتْ لِصَاحِبِهَا حَتّٰى غُفِرَ لَهٗ تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ـ

অর্থাৎ কুরআনে ত্রিশটি আয়াত সম্বলিত সূরা তার পাঠকের জন্য শাফাআত করবে। শেষ পর্যন্ত সমগ্র রাজ্যের কর্তা আল্লাহ তা'আলা তাকে মাফ করে দিবেন।

কুরআনের সব কারীই এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত যে, যে ত্রিশটি আয়াতের কথা বলা হয়েছে, তাতে নিশ্চয় বিসমিল্লাহ .... গণ্য নয়। যদি তা গণ্য হতো, তাহলে তো ত্রিশটি নয়- একত্রিশটি আয়াত হয়ে যাবে। তাহলে তা রাসূলে কারীম ﷺ -এর কথার বিপরীত হয়ে যাবে। উপরন্তু সমস্ত দেশ ও নগরের কারী এবং ফিকহবিদ একমত হয়ে বলেছেন, সূরা আল-কাওছার তিন আয়াতবিশিষ্ট, সূরা ইখলাসের মাত্র চারটি আয়াত। বিসমিল্লাহ .... যদি সূরার আয়াত গণ্য হতো, তাহলে এ দুটি সূরার আয়াত সংখ্যা একটি করে বেশি ধরতে হতো, অথচ তা ধরা হয়নি। -[আহকামুল কুরআন, জাসসাস : খ. ১, পৃ. ১৯-২২-২৩]

মাযহাব : ২. ইমাম শাফেয়ী, আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক এবং মক্কা ও কুফার কারীগণের অভিমত হলো بِسْمِ اللّٰهِ সূরা ফাতিহাসহ অন্যান্য সূরার অংশ। এজন্য তারা নামাজে সশব্দে بِسْمِ اللّٰهِ পড়তেন। তাদের কাছেও দলিল ও প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু রাসূল ﷺ এবং চার খলীফার কারো এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোনো বক্তব্য নেই।

অতঃপর যারা بِسْمِ اللّٰهِ -কে সূরা ফাতিহার অংশ মনে করেন, তাদের মধ্যে কারো মত হলো بِسْمِ اللّٰهِ স্বতন্ত্র আয়াত। আর কারো মত হলো اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -এর সঙ্গে মিলে পূর্ণ আয়াত।

বিসমিল্লাহ সম্পর্কে শরিয়তের হুকুম : বিসমিল্লাহ.......পড়ে সব কাজ শুরু করাই শরিয়তের হুকুম। তা বরকতের জন্য এবং আল্লাহ তা'আলা বড়ত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। পশু-পাখি জবাই করাকালে তা বলা দীন-ই ইসলামের বিশেষত্ব ও মর্যাদাসম্পন্ন নিয়ম, তা দ্বারা শয়তান তাড়ানো হয়। নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, খাওয়ার সময় বান্দা যদি আল্লাহ তা'আলার নাম উচ্চারণ করে, তাহলে শয়তান তার সাথে খেতে বসতে পারে না, তাঁর নাম উচ্চারণ না করা হলে শয়তান অবশ্যই খাওয়ায় শরিক হবে। মুশরিকরা তাদের কাজ-কর্ম শুরু করে তাদের দেব-দেবী মূর্তির নামে, যাদের ওরা পূজা করে। ওদের বিরোধিতা করা হবে যদি আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে কাজ শুরু করা হয়, তা ভীতুকে সাহসী বানায়, তা উচ্চারণ করলে বান্দা একান্তভাবে আল্লাহমুখী হয়ে যেতে পারে। তাঁর নিয়ামতের স্বীকৃতি হয়, তাঁর নিকট আশ্রয় চাওয়া হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে কাজ বিসমিল্লাহ ব্যতীত আরম্ভ করা হয়, তাতে কোনো বরকত থাকে না। এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, ঘরের দরজা বন্ধ করতে বিসমিল্লাহ বলবে, বাতি নেভাতেও বিসমিল্লাহ বলবে, পাত্র আবৃত করতেও বিসমিল্লাহ বলবে। কোনো কিছু খেতে, পানি পান করতে, উজু করতে, সওয়ারীতে আরোহণ করতে এবং তা থেকে অবতরণকালেও বিসমিল্লাহ বলার নির্দেশ কুরআন-হাদীসে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে।

-[কুরতুবী সূত্রে মাআরিফুল কুরআন, মুফতি মুহাম্মদ শফী (র.)]

١. الٓمٓ ـ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِذٰلِكَ ـ

অনুবাদ : ১. আলিফ লাম মীম এর প্রকৃত মর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা-ই অধিক অবহিত রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : সূরা ফাতিহার সাথে সূরা বাকারার বিশেষ সম্বন্ধ রয়েছে। তাহলো সূরা ফাতিহাতে যে হেদায়েতের জন্য দরখাস্ত করা হয়েছিল, সূরা বাকারাতে এর মঞ্জুরি দেওয়া হয়েছে অথবা এমনও বলা যায় যে, এ সূরার তৃতীয় রুকূ থেকে আল্লাহ তা'আলার জাহিরী ও বাতিনী, সাধারণ ও বিশেষ নিয়ামতসমূহের যে ধারাবাহিক বর্ণনা শুরু হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে ঐসব اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -এর সাথে সম্পৃক্ত। এমনিভাবে বনী ইসরাঈলের অবাধ্যতাসমূহ, শাস্তি ও তওবার বর্ণনা, ইবাদত, বন্দিগী ও শরয়ী বিধানাবলির বর্ণনা এসবই হচ্ছে- مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -এর ব্যাখ্যা। ভালো ও মন্দ লোকদের যে ইতিহাস বা পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে, এগুলো মূলত-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ـ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ـ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ ـ

-এর স্পষ্ট ও উজ্জ্বল বর্ণনা।

শানে নুযূল : মক্কী জীবনে রাসূল ﷺ -এর দু'ধরনের লোকদের সাথে সম্পর্ক ছিল। তাঁর পরিপূর্ণ অনুসারী অথবা সম্পূর্ণ বিরোধী, অর্থাৎ প্রকাশ্য ও গোপনে সর্বাবস্থায় তাঁর অনুসরণকারী অথবা সর্বাবস্থায় বিরোধী ও শত্রু। কিন্তু হিজরত করে যখন তিনি পবিত্র মদীনায় আগমন করলেন, তখন সেখানে নতুন ও নিকৃষ্ট তৃতীয় একটি দলের সাথে সাক্ষাৎ হয়। তারা হলো মুনাফিক সম্প্রদায়, যাদের অধিকাংশ ইহুদিদের মধ্যে গণ্য ছিল, আর তাদের নেতা ছিল 'আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই, সে পূর্ব থেকেই নিজ ক্ষমতা ও নেতৃত্বের স্বপ্ন দেখতেছিল।

কিন্তু রাসূল ﷺ মদীনায় আগমনের কারণে যখন তার [আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই-এর] আশার গুড়ে বালি পড়ে গেল, তখন সে অত্যন্ত রাগান্বিত হলো। অবশেষে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষমতা না পেয়ে আড়ালে বিরোধিতায় মেতে উঠল। এ সূরাতে যে যে স্থানে মু'মিন ও কাফেরদের আলোচনা করা হয়েছে, ঐসব স্থানে এ খারাপ অন্তর, ইসলামের শত্রু, তৃতীয় দলটির গোপন ষড়যন্ত্রের পর্দাও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উন্মোচন করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এ সূরার প্রথম রুকূ'তে মু'মিন ও কাফের উভয় দলের সংক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে এবং দ্বিতীয় রুকু থেকে ১৩টি আয়াতে মুনাফিকদের আলোচনা রয়েছে।

(الٓمٓ) হরুফে মুকাত্তা'আত প্রসঙ্গ : কুরআনে কারীমের ২৯টি সূরার শুরুভাগে কতগুলো বিচ্ছিন্ন হরফ উল্লিখিত হয়েছে। যথা- الٓمٓ ـ صٓ ـ حٰمٓ ـ الٓمٓصٓ এগুলোকে কুরআনের পরিভাষায় حُرُوْف مُقَطَّعَات বলা হয়। এ হরফগুলোর প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথকভাবে সাকিন পড়া হয়, একত্রে যুক্ত অবস্থায় লেখা হলেও। যথা- اَلِف ـ لَام ـ مِيْم -[মাআফিল কুরআন : মুফতি শফী (র.)] এগুলোকে حُرُوْف تَهَجِّي -এর মতো পৃথক পৃথকভাবে পড়া হয় বিধায় مُقَطَّعَات বলা হয়।

-[মাআরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্ধলভী (র.) : খ. ১, পৃ. ২৯]

এগুলো মোট ১৪টি হরফ। যা আরবি বর্ণমালার অর্ধেক। কতক সূরার শুরুতে একটি হরফ রয়েছে। যেমন- ن ـ ق এটিকে اُحَادِي বলা হয়। কতক সূরার শুরুতে দুটি হরফ রয়েছে। যেমন- حٰمٓ এটিকে ثُنَائِي বলা হয়। কতক সূরার শুরুতে তিনটি হরফ রয়েছে। যেমন الٓمٓ এটিকে ثُلَاثِي বলা হয়। এভাবে رُبَاعِي এবং خُمَاسِي। এর চেয়ে বেশি হয় না। কেননা আরবি ভাষায় পাঁচ হরফের বেশি কোনো শব্দ নেই। -[জামালাইন খ.১, পৃ. ২৯]

হুরুফে মুকাত্তাআতের তাৎপর্য :

قَوْلُهٗ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِذٰلِكَ : এ বাক্যটি দ্বারা মুফাসসির (র.) حُرُوْف مُقَطَّعَات সম্পর্কে সর্বাধিক رَاجِح قَوْل বা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বক্তব্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আর তা হলো এই সমস্ত হরফ مُتَشَابِه শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। যার মর্ম সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই অবগত রয়েছেন। নিম্নোক্ত উক্তিসমূহে এর সমর্থন পাওয়া যায়-

قَالَ الشَّعْبِيُّ وَجَمَاعَةٌ : الٓمٓ وَسَائِرُ حُرُوْفِ الْهِجَاءِ فِيْ اَوَائِلِ السُّوَرِ مِنَ الْمُتَشَابِهِ الَّذِيْ اِسْتَأْثَرَهُ اللّٰهُ بِعِلْمِهٖ وَهُوَ سِرُّ الْقُرْاٰنِ فَنَحْنُ نُؤْمِنُ بِظَاهِرِهَا وَنَتَّكِلُ الْعِلْمَ فِيْهَا اِلَى اللّٰهِ .

قَالَ اَبُوْ بَكْرِ الصِّدِّيْقُ (رض) : فِيْ كُلِّ كِتَابٍ سِرٌّ وَ سِرُّ اللّٰهِ فِى الْقُرْاٰنِ اَوَائِلُ السُّوَرِ .

وَقَالَ عَلِيٌّ (رض) : اِنَّ لِكُلِّ كِتَابٍ صَفْوَةٌ وَصَفْوَةُ هٰذِهِ الْكِتَابِ حُرُوْفُ التَّهَجِّيْ .

قَالَ دَاوُدُ ابْنُ اَبِيْ هِنْدٍ : كُنْتُ اَسْأَلُ الشَّعْبِيَّ عَنْ فَوَاتِحِ السُّوَرِ فَقَالَ يَا دَاوُدُ لِكُلِّ كِتَابٍ سِرٌّ وَاَنَّ سِرَّ الْقُرْاٰنِ فَوَاتِحُ السُّوَرِ فَدَعْهَا وَسَلْ مَا سِوٰى ذٰلِكَ . (حَاشِيَةُ جَلَالَيْنِ عَلٰى صَفْحَةِ (دقم : ٤)

মোটকথা, জমহুরের মতে এগুলো প্রথম স্তরের মুতাশাবিহ -এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ এর প্রকৃত অর্থ উদঘাটন অন্যদের সাধ্যের বাহিরে, বরং তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর মধ্যে সীমাবদ্ধ এক গোপন রহস্য, যা কোনো সঠিক কল্যাণ ও সুষ্ঠ পরিকল্পনার ভিত্তিতে প্রকাশ করা হয়নি। –[তাফসীরে উসমানী, পৃ. ৩]

আরো কিছু মতামত :

১. কোনো কোনো আহলে ইলম এ মুক্বাত্তাআতকে ঐ সমস্ত সূরার নাম হিসেবে গণ্য করেন– যে সূরাসমূহের শুরুতে এ অক্ষরগুলো এসেছে।

২. কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এগুলো আল্লাহ তা'আলার নাম, বরকতের জন্য সূরার শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন– বর্ণিত আছে যে, দোয়ার শুরুতে হযরত আলী (রা.) يا كهيعص - حمعسق বলতেন।

৩. কোনো কোনো আলেমের মতে, এগুলো আল্লাহর নামের অংশ, যেমন– হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়ের (রা.) বলেছেন যে, الٓرٰ - حٰمٓ - نٓ এগুলোর সমষ্টি হলো اَلرَّحْمٰنُ

৪. কিছু সংখ্যক আলেমের মন্তব্য হচ্ছে যে, এসব পবিত্র কুরআনের নাম, হযরত মক্কী (র.) সাদ্দী (র.) ও কাতাদাহ (র.) এ মন্তব্য করেছেন।

৫. কিছু সংখ্যক আলেমদের ধারণা যে, উক্ত পৃথক পৃথক হরফগুলোর দ্বারা বাক্যসমূহের দিকে ইঙ্গিত হতে পারে। যেমন– حَرْف مُقَطَّعَات -এর উপরিউক্ত জমহুরের মত ছাড়াও মুফাসসিরীনে কেরামের আরো কিছু মতামত রয়েছে। সেগুলোও জানা আবশ্যক। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো–

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, الٓمٓ -এর اَلِف দ্বারা اٰلَاءُ اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহর নিয়ামতসমূহ উদ্দেশ্য, আর لَام দ্বারা لُطْف অর্থাৎ দয়া বা অনুগ্রহ উদ্দেশ্য এবং مِيْم দ্বারা مُلْك রাজত্ব, অর্থাৎ আল্লাহর রাজত্বের সকল নিয়ামত, তাঁরই অনুগ্রহ ও মহত্ত্বের দান। তিনি আরোও বলেন–الٓمٓ মূলত اَنَا اللّٰهُ اَعْلَمُ [আমি আল্লাহ সর্বজ্ঞানী] -এর সারসংক্ষেপ। –[তাফসীরে মাজেদী : খ. ১, পৃ. ২৭] অনুরূপভাবে كهيعص সম্পর্কে তিনি বলেন– كَاف দ্বারা كَافِى এবং هَاء দ্বারা هَادِى এবং يَاء দ্বারা حَلِيْم এবং عَيْن দ্বারা عَلِيْم এবং صَاد দ্বারা صَادِق উদ্দেশ্য। –[হাশিয়া জালালাইন]

অথবা اَلِف দ্বারা আল্লাহ لَام দ্বারা জিবরাঈল (আ.) এবং مِيْم দ্বারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ উদ্দেশ্য হতে পারে, অর্থাৎ আল্লাহর কালাম হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর নাজিল হয়েছে।

৬. কুতরুব (র.)-এর মত হচ্ছে যে, একটি বিষয়ের আলাপ শেষ করে অন্য বিষয়ে আলাপ আরম্ভকালে শ্রোতাদেরকে সতর্ক করার লক্ষ্যে আরববাসী উক্ত হরফগুলো ব্যবহার করতেন।

৭. আবুল আলিয়া (র.) বলেন, اَبْجَدْ [আবজাদ]-এর হিসেব মতে– উক্ত হরফগুলোতে [হুরূফে মুক্বাত্তাআতে] জাতি ও ধর্মসমূহের ইতিহাস, তাদের উত্থান ও পতনের কাহিনী লুক্বায়িত রয়েছে। যেমন– কোনো ইহুদি যখন রাসূল ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়েছে এবং তিনি তাদের সামনে الٓمٓ পড়েছেন, তখন তারা বলতে লাগলো যে, যে ধর্মের স্থিতিকাল মাত্র ৭১ বছর সে ধর্ম আমরা কিভাবে গ্রহণ করবো? এ কথা শুনে তিনি মুচকি হাসি দিলেন। তারপর যখন তাঁর কাছ থেকে আরো কিছু জানার আগ্রহ প্রকাশ করা হলো, তখন তিনি المص ও المر পড়ে শুনালেন, তখন তারা বলতে লাগলো যে, এ হরফগুলোর সংখ্যা ১৬১ ও ২৭২ এবং প্রথমটির চেয়ে বেশি, তাই ব্যাপারটি এখন আমাদের উপর জটিল হয়ে গেল। অতএব, এখন আমরা এর কোনো ফয়সালা করতে পারছি না। –[কামালাইন : খ. ১, পৃ. ১৬]

৮. কেউ কেউ মনে করেন, যখন কুরআনে কারীম নাজিল হয়েছে, সে যুগের বর্ণনাধারায় এ ধরনের বিচ্ছিন্ন হরফের ব্যাপক ব্যবহার ছিল। বক্তা এবং কবিগণও এ ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করত। তাই তো এখনো পর্যন্ত সংরক্ষিত জাহিলী যুগের কবিতায় তার নমুনা পাওয়া যায়। যেমন জনৈক কবি বলেন- قُلْتُ لَهَا قِفِيْ فَقَالَتْ قَ اَيْ وَقَفْتُ

হাদীস শরীফেও এরূপ ব্যবহার রয়েছে। যেমন- مَنْ اَعَانَ عَلٰى قَتْلِ مُسْلِمٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ অর্থ কেউ কাউকে হত্যার ব্যাপারে اُقْتُلْ বলার পরিবর্তে اُقْ বলল। এটাও হত্যায় সহযোগিতা বলে ধর্তব্য হবে। এ থেকে জানা গেল যে, حُرُوْف مُقَطَّعَات অভূতপূর্ব কোনো বস্তু নয় যে, বক্তা ছাড়া তা কেউ বুঝবে না, বরং শ্রোতারা অনায়াসেই তার মর্ম বুঝতে সক্ষম হতেন। আর এ কারণেই নবী যুগের কুরআন বিদ্বেষীদের কেউ এমন আপত্তি তোলেনি যে, তোমার কুরআনে এ অর্থহীন শব্দ কেন ব্যবহৃত হয়েছে। একই কারণে সাহাবায়ে কেরাম থেকেও এ মর্মে কোনো বর্ণনা নেই যে. তারা নবী করীম ﷺ -এর কাছে এগুলোর অর্থ জানতে চেয়েছেন। আর হুজুর ﷺ থেকেও এগুলোর কোনো তাফসীর বর্ণিত হয়নি। পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে আরবি ভাষা থেকে এ পদ্ধতি বাদ পড়তে থাকে। এ সুবাদেই মুফাসসিরদের নিকট সেগুলোর অর্থ নির্ণয় করররা দুষ্কর হয়ে পড়ে। -[জামালাইন : খ. ১, পৃ. ৩৯]

৯. আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী (র.) বলেন, আমার ধারণা মতে এ সকল মন্তব্য ও মতামত যথাস্থানে প্রতিটিই সঠিক। আরবি ভাষার দিক দিয়ে এগুলো حُرُوْف تَهَجِّى -এর নাম। আর শরিয়তের বাহ্যিক বিধানানুসারে **এগুলো** مُتَشَابِهَاتْ এবং আল্লাহর গোপন রহস্য, যার মর্ম সম্পর্কে সাধারণভাবে মানুষকে অবহিত করা হয়নি। আর না তাদের মাঝে সে যোগ্যতা আছে। এ জন্য এগুলোর প্রতি ঈমান আনা আবশ্যক। এগুলো মর্ম অনুসন্ধান ও ঘাটাঘাটি করা নিষেধ।

-[তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন খ. ১, পৃ. ৩১]

মান্যবর মুফাসসির জালালুদ্দীন (র.) وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِذٰلِكَ **বলে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।** যেহেতু এর মর্ম না জানলে দীনের মৌলিক বিষয়ে কোনো সমস্যা দেখা দেয় না। এজন্য কোনো আপত্তি করা ও এর মর্ম উদ্ধারে লেগে থাকা সমীচীন নয়। -[কামালাইন খ. ১, পৃ. ১৭]

১০. কেউ কেউ বলেন- এগুলো সংশ্লিষ্ট সূরার বিষয়বস্তুর সার-সংক্ষেপ। -[মাআরিফুল কুরআন : ইদ্রীস কান্ধলভী : খ. ১, পৃ. ৩১]

১১. কেউ কেউ বলেন, এগুলো দ্বারা اِعْجَازُ الْقُرْاٰنِ -এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের কতিপয় সূরা বিচ্ছিন্ন হরফ দ্বারা শুরু করার মাঝে কুরআনের অলৌকিকতার প্রমাণ রয়েছে। যেন কাফেরদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে- এই কুরআন মাজীদ, যেটি আল্লাহর কালাম হওয়ার ব্যাপারে তোমরা সন্দেহ কর, সেটি এমন কিছু হরফের সমন্বয়েই রচিত, যেসব হরফ দিয়ে তোমরা নিজেদের কথা ও বাক্য গঠন করে থাক। সুতরাং যদি এ কুরআন আল্লাহর কালাম না হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা এর অনুরূপ আয়াত বা সূরা রচনা করতে অক্ষম কেন? তাছাড়া এটাও লক্ষ্য করে দেখ যে, যিনি এ حُرُوْف مُقَطَّعَات সম্বলিত কুরআনের বাহক, তিনি তো একজন নিতান্তই উম্মী মানুষ। যিনি কোনো দিন কোনো পাঠশালায় গমন করেননি কিংবা কোনো শিক্ষক-গুরু বা লেখক ও কবি সাহিত্যিকদের কাছে কিছু পড়াশুনাও করেননি। অথচ তোমরা হলে সুসাহিত্যিক বাগ্মী ও সুপণ্ডিত। নিরক্ষর উম্মী নবী যেসব হরফ পেশ করেছেন সেগুলোর মাঝে এমন এমন তত্ত্ব ও সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে যেগুলোর প্রতি বড় বড় ভাষাবিদ, সাহিত্যিক, কবি ও পণ্ডিতরাও লক্ষ্য রাখে না। -[মাআরিফুল কুরআন, ইদ্রীস কান্ধলভী খ. ১, পৃ. ৩০]

আল্লামা সুলায়মান জামাল (র.) উক্ত কথাটিই খুব সংক্ষেপে বলেছেন-

وَاِنَّ فَائِدَتَهَا اِعْلَامُهُمْ بِاَنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ مُنْتَظِمٌ مِنْ جِنْسِ مَا تَنْتَظِمُوْنَ مِنْهُ كَلَامَكُمْ وَلٰكِنْ عَجَزْتُمْ عَنْهُ .
(حَاشِيَةُ الْجَمَلِ صـ١ جـ١)

একটি সংশয় ও নিরসন : যদি এ সংশয় জাগে যে, حُرُوْف مُقَطَّعَات -কে আল্লাহ তা'আলার গোপন রহস্য মনে করা হলে তো কুরআন مَفْهُوْمُ الْمَعْنٰى থাকল না। কুরআন যেহেতু আমাদের উদ্দেশ্য করে অবতীর্ণ, সেহেতু এ হরফগুলোও আমাদের বোধগম্য হওয়া অপরিহার্য। এগুলোর অর্থ অজ্ঞাত থাকলে এগুলো নাজিল করার দ্বারা ফায়দা কি?

জবাব : কুরআন নাজিলের উদ্দেশ্য শুধু অর্থ বুঝার মাঝে সীমাবদ্ধ নয়; বরং কুরআনের বহু স্থান এমন আছে, যেগুলোতে শুধু বান্দার ঈমান আনাই উদ্দেশ্য। অনুরূপভাবে حُرُوْف مُقَطَّعَات নাজিল করার উদ্দেশ্য ও হলো মানুষ এগুলোর উপর ঈমান আনবে এবং এগুলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হওয়ার কথা একীন করবে। যাতে বান্দার পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ পায়।

-[তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী- খ. ১, পৃ. ৩১]

٢. ذٰلِكَ اَىْ هٰذَا الْكِتٰبُ الَّذِىْ يَقْرَأُهُ مُحَمَّدٌ ﷺ لَا رَيْبَ شَكَّ فِيْهِ اَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَجُمْلَةُ النَّفْيِ خَبَرٌ مُبْتَدَأُهُ ذٰلِكَ وَالْاِشَارَةُ بِهِ لِلتَّعْظِيْمِ ـ هُدًى خَبَرٌ ثَانٍ هَادٍ لِلْمُتَّقِيْنَ ـ اَلصَّائِرِيْنَ اِلَى التَّقْوٰى بِامْتِثَالِ الْاَوَامِرِ وَاجْتِنَابِ النَّوَاهِىْ لِاتِّقَائِهِمْ بِذٰلِكَ النَّارَ ـ

অনুবাদ :

২. এই ذٰلِكَ শব্দটি এইস্থানে هٰذَا অর্থে ব্যবহৃত। কিতাব যা মুহাম্মদ ﷺ পাঠ করেন কোনো সন্দেহ সংশয় নেই এতে এ ব্যাপারে যে, এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ। এই আয়াতটিতে لَا رَيْبَ নাবাচক বাক্যটি خَبَر -এর। مُبْتَدَا হলো ذٰلِكَ এই ذٰلِكَ শব্দটি আরবি ভাষায় দূরবর্তী ইঙ্গিতের জন্য ব্যবহৃত হয়, তবে আল-কুরআনের সম্মানার্থে এই স্থানে এরূপ ব্যবহার করা হয়েছে। পথ নির্দেশক هُدًى শব্দটি উক্ত مُبْتَدَا বা উদ্দেশ্যের দ্বিতীয় خَبَر এটা مَصْدَر বটে, তবে এই স্থানে اِسْم فَاعِل বা কর্তৃবাচক বিশেষ্য هَادٍ পথ নির্দেশক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মুত্তাকীদের জন্য। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশসমূহ পালন করে এবং নিষেধসমূহ হতে বিরত থেকে যারা তাকওয়ার অধিকারী হতে যাচ্ছে তাদের জন্য। কেননা এই তাকওয়া অর্জনের মাধ্যমেই তারা জাহান্নাম হতে মুক্তি পাবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَلْكِتَابُ : মূলত কিতাব শব্দটি মাসদার, যেমন কুরআনে রয়েছে– كِتَابُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ কখনো এর দ্বারা مَكْتُوْبٌ বা লিখিত বস্তু বুঝানো হয়। كَتْبٌ ধাতুর প্রকৃত অর্থ একত্র করা। এ থেকে كَتِيْبَةُ الْجَيْشِ -এর ব্যবহার হয়। আর পরিভাষায় كِتَابَة অর্থ হলো– ضَمُّ بَعْضِ حُرُوْفِ الْهِجَاءِ اِلٰى بَعْضٍ –[হাশিয়ায়ে জামাল : খ. ১, পৃ. ১৪]

قَوْلُهُ لَا رَيْبَ : رَيْب-এর আভিধানিক অর্থ : اَلشَّكُّ مَعَ التُّهْمَةِ অপবাদসহ সন্দেহ করা, সংশয় করা। পরিভাষায় رَيْبَ বলা হয়- هُوَ التَّرَدُّدُ بَيْنَ النَّقِيْضَيْنِ لَا تَرْجِيْحَ لِاَحَدِهِمَا عَلَى الْاٰخَرِ عِنْدَ الشَّكِّ

আল্লামা জমখশরীর মতে رَيْب হলো– قَلَقُ النَّفْسِ وَاضْطِرَابُهَا। এ অর্থেই হাদীস বর্ণিত হয়েছে–

دَعْ مَا يُرِيْبُكَ اِلٰى مَا لَا يُرِيْبُكَ ـ

কেউ বলেন– رَيْب -এর মাঝে তিনটি অর্থ রয়েছে– ১. اَلشَّكُّ ২. اَلتُّهْمَةُ ৩. اَلْقَلَقُ وَالْاِضْطِرَابُ [হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১, পৃ. ১৬]

উল্লেখ্য رَيْب এবং شَكّ সমার্থক নয়; বরং তা شَكّ থেকে খাছ। উভয়ের মাঝে عُمُوْم خُصُوْص -এর সম্পর্ক।

قَوْلُهُ لَا رَيْبَ فِيْهِ : উদ্দেশ্য যেহেতু সন্দেহ প্রকাশ অনুচিত হওয়ার বিষয়টি জোরদার করা, এ কারণে বাক্য বিন্যাসে لَا فِيْهِ رَيْبَ না বলে لَا رَيْبَ فِيْهِ বলা হয়েছে। কেননা দ্বিতীয় বাক্য বিন্যাসটি অধিকতর দৃঢ়তা জ্ঞাপক, অনেক শক্তিশালী।

الٓمّٓ মুবতাদা, ذٰلِكَ খবর মউসূফ, اَلْكِتَابُ -এর সিফত অথবা الٓمّٓ মুবতাদা মাহযূফ (اَلْمُؤَلَّفُ مِنْ هٰذِهِ الْحُرُوْفِ)-এর খবরে আউয়াল, আর ذٰلِكَ খবরে ছানী কিংবা বদল এবং اَلْكِتَابُ -এর সিফত। لَا নফিয়ে জিনস, رَيْبَ -এর اِسْم এবং فِيْهِ খবর, অথবা رَيْبَ মউসূফ এবং فِيْهِ সিফত, দু'টো মিলে اِسْم আর لِلْمُتَّقِيْنَ খবর এবং هُدًى হাল, কিংবা رَيْبَ মউসূফ, فِيْهِ সিফত এবং খবর মাহযূফ, তবে এমতাবস্থায় فِيْهِ খবরে মুক্বাদ্দাম হয়ে যাবে هُدًى -এর, অথবা বলা যায় যে, ذَالِكَ الْكِتَابُ মুবতাদা, لَا رَيْبَ فِيْهِ জুমলা হয়ে খবরে اَوَّل এবং هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ জুমলা হয়ে খবরে ثَانِىْ এগুলো ব্যতীত এরও সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু সবচেয়ে উত্তম তরকীব এটা যে, উক্ত চারটি বাক্যকে [জুমলাকে] যদি পৃথক পৃথক করা হয়, তবে

পরের প্রত্যেকটি জুমলাকে দলিল বলা যাবে। অর্থাৎ الٓمّٓ প্রথম জুমলা ও সর্বপ্রথম দাবি যে, এ অতুলনীয় কালাম হচ্ছে- الٓمّٓ, আর ذٰلِكَ الْكِتَابُ দ্বিতীয় জুমলা, এর চ্যালেঞ্জ করার দলিল বা প্রমাণ এবং স্বয়ং দাবিও বটে। لَا رَيْبَ فِيْهِ তৃতীয় জুমলা উক্ত দলিলের দলিল, অর্থাৎ সকল কিতাবের দাবির দলিল, শর্ত হচ্ছে প্রকৃতি যদি ন্যায়-পরায়ণ হয় এবং রুচি যদি যথার্থ ও সাদাসিধে হয়। কুৎসা, পক্ষপাতিত্ব ও হিংসার কথা ভিন্ন।

قَوْلُهٗ هُدًى : এটি يَهْدِيْ (ض) هَدْي -এর মাসদার। শব্দটি অধিকাংশই مُذَكَّر সাব্যস্ত করেছেন। আর কেউ কেউ مُؤَنَّث-ও সাব্যস্ত করেছেন। وَفِى السَّمِيْنِ : أَنَّهٗ يُذَكَّرُ وَهُوَ الْكَثِيْرُ وَبَعْضُهُمْ يُؤَنِّثُ فَيَقُوْلُ هٰذِهٖ هُدًى

قَوْلُهٗ خَبَرٌ ثَانٍ : এর দ্বারা আয়াতের তারকীবের দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, ذٰلِكَ الْكِتٰبُ হলো مُبْتَدَأ আর لَا رَيْبَ فِيْهِ হলো خَبَر أَوَّل এবং هُدًى হলো তার خَبَر ثَانِى

قَوْلُهٗ أَىْ هَادٍ : এর দ্বারা মুফাসসির (র.) বোঝাতে চাচ্ছেন যে, هُدًى মাসদারটি هَادٍ ইসমে ফায়েলের অর্থে ব্যবহৃত। আর هَادٍ اِسْم فَاعِل -এর স্থলে هُدًى মাসদার ব্যবহার করা হয়েছে مُبَالَغَة হিসেবে। যেমন زَيْدٌ عَادِلٌ -এর স্থলে কখনো زَيْدٌ عَدْلٌ -ও ব্যবহার করা হয়। مُبَالَغَة ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হলো এ কিতাব وَصْف هِدَايَت -এর মাঝে এমন উত্তীর্ণ যে, যদি এটাকে مُجَسَّم هِدَايَت মনে করা হয়, তাহলেও অসম্ভব কিছু নয়। -[কামালাইন : খ. ১, পৃ. ১৮]

قَوْلُهٗ لِلْمُتَّقِيْنَ : এটি مُتَّقِ -এর বহুবচন। مُتَّقِ শব্দটি اَلْوِقَايَةُ [রক্ষা করা] মাসদার থেকে ইসমে ফায়েল। যেহেতু মুত্তাকি ব্যক্তি নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে রাখেন, তাই তাকে মুত্তাকি বলা হয়।

مُتَّقِيْنَ শব্দটি মূলত مُتَّقِيِيْنَ ছিল। তাতে দুইটি يَاء রয়েছে। একটি يَاء লাম কালিমা তথা মূল হরফ। আর অপরটি বহুবচনের আলামত। লাম কালিমায় তথা প্রথম يَاء-এর মাঝে كَسْرَة পড়া কঠিন বিধায় কাসরাকে হযফ করা হয়েছে। অতঃপর দুই সাকিন একত্র হওয়ায় একটিকে [প্রথমটিকে] হযফ করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

هٰذَا -এর স্থলে ذٰلِكَ ব্যবহারের তাৎপর্য :

قَوْلُهٗ ذٰلِكَ . اَىْ هٰذَا الْكِتٰبُ : সাধারণত কোনো দূরবর্তী বস্তুকে ইশারা করার জন্য ذٰلِكَ ব্যবহৃত হয়। এ সর্বনামের বাংলা অর্থ- ঐ। এখানে الكتب দ্বারা কুরআনে কারীমকে বোঝানো হয়েছে। এটি বাহ্যত দূরবর্তী ইশারার স্থান নয়। কারণ ইশারা কুরআন শরীফের প্রতিই করা হয়েছে। যা মানুষের সামনেই রয়েছে। তাহলে দূরবর্তী ইশারার শব্দ ব্যবহার করা হলো কেন? এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের বক্তব্য হলো-

১. ذٰلِكَ মূলত দূরবর্তী ইঙ্গিতের অর্থেই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু দূরবর্তীতা শুধু স্থান ও কালের পরিমণ্ডলেই আবর্তিত হয় না, মর্যাদাগত দূরত্বও এক প্রকার দূরত্ব। এ স্থানেও কুরআনের সম্মানার্থে নিকটবর্তী নির্দেশবাচক সর্বনাম هٰذَا -এর স্থলে ذٰلِكَ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবদের বাকপ্রণালীতে هٰذَا ও ذٰلِكَ একটির স্থলে অন্যটিকে ব্যবহার করার যথেষ্ট প্রচলন রয়েছে। এদিকে ইঙ্গিত করেই মুফাসসির (র.) বলেন- وَ الْاِشَارَةُ لِلتَّعْظِيْمِ সুতরাং এর অনুবাদ হবে- এই পবিত্র ও সম্মানিত কিতাব। (تَنْزِيْلًا لِبُعْدِ الرُّتْبَةِ مَنْزِلَةَ بُعْدِ الْمَكَانِ وَالْمَعْقُوْلُ بِمَنْزِلَةِ الْمَحْسُوْسِ)

২. اِسْم اِشَارَة قَرِيْب -এর স্থলে ذٰلِكَ اِسْم اِشَارَة بَعِيْد ব্যবহার করার কারণ হলো, এ কিতাব স্বীয় অতুলনীয় প্রভাবসহ دَقَائِق وَلَطَائِف . اَسْرَار وَ غَوَامِض . حَقَائِق وَمَعَارِف সম্বলিত হওয়ার কারণে দৃষ্টি ও চিন্তার সীমানার থেকে বহু উর্ধ্বে অবস্থিত। অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে যদিও কুরআনে কারীম আমাদের দৃষ্টির সামনে ও নিকটে রয়েছে; কিন্তু اَسْرَار وَحَقَائِق -এর দিক থেকে তা আমাদের অনুভূতি ও উপলব্ধি থেকে অনেক দূরে। এজন্য هٰذَا -এর স্থলে ذٰلِكَ اِسْم اِشَارَة بَعِيْد ব্যবহার করা হয়েছে। -[মাআরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্ধলভী (র.) খ. ১, পৃ. ৩২]

৩. দূরবর্তী ইশারার শব্দ ذٰلِكَ ব্যবহার করে এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, সূরাতুল ফাতিহাতে যে সীরাতুল মুস্তাকীমের প্রার্থনা করা হয়েছিল, সমগ্র কুরআন শরীফ সে প্রার্থনারই জবাব এবং এটি সীরাতুল মুস্তাকীমের বিস্তারিত ব্যাখ্যাও বটে। অর্থাৎ

আমি তোমাদের প্রার্থনা শুনেছি এবং হেদায়েতের **উজ্জ্বল সূর্যসদৃশ** পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছি। যে ব্যক্তি হেদায়েত লাভে ইচ্ছুক সে যেন এ কিতাব অনুধাবন **করে এবং তদনুযায়ী আমল করে**। -[মাআরিফুল কুরআন মুফতি শফী (র.)]

৪. ইমাম ফাররা বলেন- كَانَ اللّٰهُ قَدْ وَعَدَ نَبِيَّهُ ﷺ اَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْهِ كِتَابًا لَا يَمْحُوْهُ الْمَاءُ وَلَا يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ فَلَمَّا اَنْزَلَ الْقُرْاٰنُ قَالَ هٰذَا ذٰلِكَ الْكِتَابُ الَّذِىْ وَعَدْتُكَ ـ (حَاشِيَة جَلَالَيْن)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা **স্বীয় নবীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন** যে, তাঁর প্রতি তিনি এমন কিতাব নাজিল করবেন, যাকে পানি মুছে ফেলতে **সক্ষম হবে না এবং যা অধিক হাত বদল** ও ব্যবহারের কারণে পুরাতন হবে না। কুরআন নাজিল হওয়ার পর **আল্লাহ তা'আলা বলে দিলেন, এটি সেই কিতাব, যা নাজিলের** ওয়াদা আপনাকে করেছিলাম।

৫. **সূরা বাকারা মদনী। এ সূরা মদীনায় অবতীর্ণ** হয়েছে। আর মদীনায় অধিকহারে ইহুদিদের বসবাস ছিল। যাদের ধর্মগ্রন্থ **তাওরাতে কুরআন শরীফ নাজিল হওয়ার** সংবাদ প্রদত্ত হয়েছিল। যা বহুদিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। সেই প্রতিশ্রুত **কিতাবের দিকে ইঙ্গিত করার** জন্য ذٰلِكَ اِسْمِ اِشَارَةِ بَعِيْد ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যথায় هٰذَا ব্যবহার করা উচিত ছিল। -[কামালাইন, খ. ১, পৃ. ১৭]

৬. **অথবা এটাও বলা যায় যে,** ذٰلِكَ -এর مُشَارٌ اِلَيْهِ হলো সূরা বাকারার পূর্বে নাজিলকৃত সূরাসমূহ যেগুলোকে কাফেররা **অস্বীকার করেছে,** মিথ্যা বলেছে। এখানে তাদের জন্য বলা হচ্ছে, সে সকল সূরা বা আয়াত সন্দেহাতীত। -[প্রাগুক্ত]

৭. ذٰلِكَ **দ্বারা** সূরা বাকরার প্রতিও ইঙ্গিত হতে পারে। তখন ইসমে ইশারা মুজাক্কার আনাটা كِتَاب শব্দের প্রতি লক্ষ্য করে হবে। -[প্রাগুক্ত]

কুরআন সুসংরক্ষিত গ্রন্থ :

قَوْلُهُ اَلْكِتَابُ : কুরআন মাজীদ নিছক মৌখিক বর্ণনা কিংবা স্মৃতিচারণের সমষ্টি নয়; বরং তা সুবিন্যস্ত ও সুরক্ষিত গ্রন্থ, লিখিত আকারেও মুখস্থ আকারেও। অন্যান্য ধর্মের ইলহামী গ্রন্থের মতো নয় যে, ধর্ম প্রবর্তকের স্মৃতিতে শুধু বিষয় ও ভাব সংরক্ষিত ছিল আর তাদের কাছ থেকে একেক বর্ণনাকারী একেক অংশ একেক রকম বর্ণনা করেছে। এমনকি কয়েক শতাব্দী পরে সংকলন ও গ্রন্থনার পালা শুরু হলে ভাষা ও শব্দগত বিশুদ্ধতা তো দূরের কথা, স্বয়ং ভাব ও বিষয়বস্তুই বিকৃতির শিকার হয় এবং আসমানি কিতাবের নাম ধারণ করলেও তার বিন্যাস ও রচনায় কত শত মানুষের লেখনী ও মস্তিষ্ক কাজ করছে তা আল্লাহ পাকই ভাল জানেন। -[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ২৮]

اَلَّذِىْ يَقْرَأُهُ مُحَمَّدٌ ﷺ : এর দ্বারা অন্যান্য আসমানি কিতাবকে খারিজ করা হয়েছে। যথা- তাওরাত, যাবুর ও ইঞ্জীল।

اَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ : এটি لَا رَيْبَ فِيْهِ -এর فِيْهِ যমীর থেকে بَدَل হয়েছে। অর্থাৎ এ দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো সন্দেহ নেই যে, এটি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।

সংশয় নিরসন :

প্রশ্ন : উক্ত আয়াতে কুরআনকে সন্দেহাতীত বলা হয়েছে অথচ প্রতি যুগেই কিছু কিছু মানুষ এতে সন্দেহ ও সংশয় প্রকাশ করেছে। যদি সন্দেহ না থাকত, তাহলে তো সকল মানুষই মুসলমান হয়ে যাওয়ার কথা ছিল।

১. সম্মানিত মুফাসসির (র.) এই সংশয় অপনোদনের লক্ষ্যেই اَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ লিখেছেন। এখানে তিনি বলতে চাচ্ছেন যে, সন্দেহ নেই দ্বারা ব্যাপকভাবে সন্দেহকে নাকচের দাবি করা উদ্দেশ্য নয়; বরং এ কথার দাবি করা হচ্ছে যে, এটা কালামে ইলাহী হওয়াটা সন্দেহাতীত। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নাজিল হওয়ার মাঝে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই। -[জালালাইন পৃ. ৪]

২. ব্যাপকভাবে সকল প্রকার সন্দেহকেই নাকচ করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ কুরআনে কারীমের সকল কথাই সত্য, সঠিক, সন্দেহমুক্ত। দুনিয়ার মানুষ তাতে সন্দেহ করলে সেটা তার বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে হবে। মূলত কুরআন সন্দেহের বস্তু নয়। তারপরও যদি কোনো দুর্ভাগা তাতে অন্য কিছু দেখে, তবে দোষ সূর্যালোকের নয়, দোষ তীর্যক দৃষ্টির বাঁদুড়ের দৃষ্টি শক্তির। এজন্যই একথা বলা হয়নি যে, এ বিষয়ে কারো কোনো দ্বিধা-সন্দেহ হবে না; বরং শুধু বলা হয়েছে যে, খোদ এ মহান কিতাব ও তার বিষয়বস্তু সকল সংশয়-সন্দেহের উর্ধ্বে। -[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ২৯; কামালাইন খ. ১, পৃ. ১৮]

এ উত্তরটি তাফসীরে উসমানীতে এভাবে দেওয়া হয়েছে যে, কোনো কথার মধ্যে সন্দেহ হওয়ার দুটি কারণ থাকতে পারে। এক. হয়তো সে কথার মধ্যেই কোনো ভ্রান্তি বা ত্রুটি নিহিত আছে। দুই. অথবা শ্রোতার বোধশক্তিতে ত্রুটি আছে, বুঝের ভুলেই কোনো বর্ণনা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। প্রথম অবস্থায় বর্ণনা-ই সন্দেহের ক্ষেত্র। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় অবস্থায় শ্রোতার বোধশক্তি-ই সন্দেহের উৎস। একটি সন্দেহাতীত বর্ণনাকে সে নিজের বুদ্ধির দোষে-ই সন্দেহ করছে। উক্ত আয়াতে সন্দেহের প্রথম কারণ নিরসনেই ঘোষণা করা হয়েছে- لَا رَيْبَ فِيْهِ অর্থাৎ পবিত্র কুরআন যে, আল্লাহ তা'আলার কিতাব এবং তার প্রত্যেকটি বর্ণনা যথার্থ, বাস্তব এবং ধ্রুবসত্য, সর্ব প্রকার সন্দেহের উর্ধ্বে, সন্দেহের অবকাশ মাত্র তাতে নেই। এতদসত্ত্বেও যদি কাফেররা তাতে সন্দেহ করে, তবে তাতে কুরআনের উল্লিখিত ঘোষণা আহত হয় না। কেননা এহেন সন্দেহের মূলে পবিত্র কুরআন ও তার বর্ণনা নয়; বরং কাফেরদের নিজেদের বুদ্ধির গলদ-ই এই সন্দেহের উৎস। তাদের নিজেদের এই নির্লজ্জ-কলঙ্ক উল্লিখিত মহান ঘোষণাকে স্পর্শ মাত্র করতে পারে না। -[তাফসীরে উসমানী পৃ. ৩, টীকা. ২]

কুরআনের আত্মপরিচয় :

هُدًى لِّلنَّاسِ : কুরআনের এই প্রথম আত্মপরিচয় থেকেই কুরআন অধ্যায়নকারীকে বুঝে নিতে হবে যে, এটা কোনো ইতিহাসগ্রন্থ নয় যে, তাতে সন-তারিখসহ অতীত ঘটনাবলির সুবিন্যস্ত বিবরণ পরিবেশিত হবে। নয় কোনো বিজ্ঞানগ্রন্থ যে, তার পাতায় পাতায় পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা এবং গণিত শাস্ত্রের বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধান তালাশ করা হবে। নয় কোনো দর্শনগ্রন্থ যে, গ্রীক ও ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন কল্প তত্ত্বের জটিলতায় ঘোরপাক খেতে হবে। তদ্রূপ নয় কোনো গল্প ও প্রবন্ধ সঞ্চয়ন যে, তা পাঠককে চিত্তবিনোদনের খোরাক যোগাবে; বরং কুরআনের মৌলিক পরিচয় কেবল এই যে, তা হেদায়েতের আলোকে প্রোজ্জ্বল ও পূর্ণাঙ্গ এক জীবন বিধান। -[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ৩০]

تَقْوٰى-এর পরিচয় ও স্তর : تَقْوٰى-এর আভিধানিক অর্থ বেঁচে থাকা, রক্ষণাবেক্ষণ করা। পরিভাষায় ঐ সকল বস্তু থেকে বেঁচে থাকাকে তাকওয়া বলা হয়। যেগুলো আখিরাতের দৃষ্টিতে ক্ষতিকর হয়। চাই সেটা আকাঈদ ও আখলাক সংক্রান্ত হোক কিংবা কথা, কাজ ও অবস্থা সংক্রান্ত হোক। আর ক্ষতির যেমন বিভিন্ন স্তর রয়েছে, সে হিসেবে তাকওয়ার ও বিভিন্ন স্তর রয়েছে।

প্রথম স্তর : প্রথম স্তর হলো কুফর থেকে তওবা করে ইসলামে প্রবেশ করা এবং নিজেকে চিরস্থায়ী আজাবের ক্ষতি থেকে রক্ষা করা। এটাই কুরআনের বাণী وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى-এর মর্ম।

দ্বিতীয় স্তর : দ্বিতীয় স্তর হলো নফসকে কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়া এবং ছগীরা গুনাহের উপর اِصْرَار করার ক্ষতি থেকে রক্ষা করা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا শরিয়তের পরিভাষায় تَقْوٰى শব্দ দ্বারা সাধারণভাবে এটাকেই বুঝানো হয়েছে।

হযরত ওমর (রা.) সাহাবী হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর কাছে তাকওয়ার হাকীকত ও স্বরূপ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি জবাবে বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কি কখনো কাটাযুক্ত পথ দিয়ে হেঁটেছেন? তিনি বললেন, অবশ্যই হেঁটেছি। হযরত উবাই (রা.) শুধালেন চলার পথে আপনি কি কি করেছেন? বললেন, আমি গায়ের কাপড় গুটিয়ে সতর্কভাবে কদম ফেলেছি। কাঁটার আঘাত থেকে বাঁচার জন্য আমার পূর্ণ চেষ্টা ব্যয় করেছি। হযরত উবাই (রা.) বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! এটাই হলো তাকওয়া। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি থেকে বাঁচার জন্য নিজের সম্পূর্ণ শক্তি ব্যয় করে দেওয়ার নাম হলো তাকওয়া। আর 'আল্লাহর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকার জন্য।' শর্তটুকু আরোপ করে বুঝানো হয়েছে যে, পার্থিব লাঞ্ছনার ভয়ে কোনো বর্জন করাকে তাকওয়া বলা হবে না।

তৃতীয় স্তর : তাকওয়ার তৃতীয় স্তর হলো কলবকে ঐ সকল বস্তু থেকে বাঁচিয়ে রাখা, যেগুলো আল্লাহ তা'আলার স্মরণ থেকে গাফিল করে দেয়। কুরআনের আয়াত- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ-এর মাঝে এ স্তরের তাকওয়ার কথাই বলা হয়েছে।

বস্তুত খওফে ইলাহীই হলো হেদায়েদের পূর্বশর্ত এবং সর্বপ্রকার কল্যাণের উৎসধারা। তাই তো হযরত নূহ (আ.), হুদ (আ.), সালেহ (আ.), লূত (আ.) এবং শোয়াইব (আ.) প্রমুখ নবীগণ নিজেদের কওমকে সর্বপ্রথম নসিহত করে বলেছেন- اَلَا تَتَّقُوْنَ [অর্থাৎ তোমরা কি আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করো না?] فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর। কেননা আল্লাহ তা'আলার ভয় ছাড়া নসিহত কার্যকরী হয় না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى অর্থাৎ যে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে, সেই নসিহত গ্রহণ করবে।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ -এর স্থলে هُدًى لِّلنَّاسِ বলেছেন। এতে ইঙ্গিত করেছেন যে, যে মুত্তাকী নয় প্রকৃত পক্ষে সে মানুষই নয়। মানবতার দাবীই হলো নিজের সৃষ্টিকর্তা এবং মালিককে ভয় করা। আর যে আহকামুল হাকিমীনকে ভয় করে না, সে মানুষ নয়; বরং চতুষ্পদ পশু। এমনকি চতুষ্পদ পশু থেকেও নিকৃষ্ট। ইরশাদ হয়েছে– أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ

–[তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন : ইদরীস কান্দলভী (র.) খ. ১, পৃ. ৩৪-৩৬]

সংশয় নিরসণ :

قَوْلُهُ الصَّائِرِيْنَ إِلَى التَّقْوٰى :

প্রশ্ন : আয়াতে বলা হলো এ কুরআন মুত্তাকীদের জন্য হেদায়েতকারী। আর বলাই বাহুল্য যে, হেদায়েতপ্রাপ্তদেরকেই মুত্তাকী **বলা হয়। এমতাবস্থায় হেদায়েতপ্রাপ্তদের জন্য** কুরআনকে হেদায়েতকারী বলা নিরর্থক। এতে تَحْصِيْلِ حَاصِل লাজেম **আসে। কুরআন একজন পথহারা** ব্যক্তির জন্য হেদায়েতের কারণ হতে পারে; কিন্তু تَقْوٰى -এর স্তরে পৌঁছার পর হেদায়েত **লাভের অর্থ কি?**

১. মুফাসসির (র.) উক্ত সংশয়টি নিরসন কল্পেই লিখেছেন– اَلصَّائِرِيْنَ إِلَى التَّقْوٰى بِامْتِثَالِ الْأَوَامِرِ وَاجْتِنَابِ النَّوَاهِيْ الخ অর্থাৎ এখানে مُتَّقِيْن দ্বারা مُتَّقِى بِالْقُوَّةِ -কে বুঝানো হয়নি; বরং مُتَّقِى بِالْفِعْلِ -কে বুঝানো হয়েছে। যাদের মাঝে تَقْوٰى -এর যোগ্যতা ও ঝোঁক বিদ্যমান রয়েছে। কুরআন তাদের সে যোগ্যতা ও ঝোঁককে কাজে লাগিয়ে তাদেরকে مُتَّقِى بِالْفِعْلِ বানিয়ে দিবে। যেন তাদেরকে تَفَاؤُل বা নেকফালি স্বরূপ مَجَاز বা রূপক অর্থে প্রথম থেকেই مُتَّقِى বলা হয়েছে।

২. জবাবে এ কথাও বলা যায় যে, হেদায়েত ও তাকওয়া উভয়টিরই বিভিন্ন স্তর রয়েছে। যথা– أَعْلٰى ـ أَوْسَط ـ أَدْنٰى সুতরাং কুরআনের কারণে প্রত্যেকে যখন নিম্নস্তর থেকে উঁচু স্তরে উপনীত হবে, তখন কুরআনকে মুত্তাকীদের জন্য هُدًى বলাটা সঠিক হবে। অর্থাৎ নিম্ন স্তরটি হিসেবেই সে মুত্তাকী এবং উঁচু স্তরটির হিসেবে সে হেদায়াত পেয়েছে।

–[কামালাইন খ. ১, পৃ. ১৮]

৩. এ হেদায়েত গ্রন্থ থেকে কেবল তারাই উপকৃত হবে, যাদের অন্তরে আল্লাহভীতি বিদ্যমান। যদিও এটি সমগ্র বিশ্বের জন্য অবতীর্ণ এবং গোটা মানবজাতিকে লক্ষ্য করেই তার উদাত্ত আহ্বান। কিন্তু কার্যত তা থেকে লাভবান কেবল তারাই হবে, যাদের হৃদয়ে আছে সত্যের অনুসন্ধিৎসা। নইলে প্রভাতী সূর্যের কাঁচা আলো যত ঝলমলেই হোক, চোখের আলো যাদের নিভে গেছে, তাদের জন্য তা অর্থহীন। ভূমি যদি অনুর্বর হয় বৃষ্টিপাত যেমনই হোক, তাতে তো আর সবুজ বাগিচা সৃষ্টি হতে পারে না। হজম শক্তি বিপর্যস্ত হলে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার তাদের জন্য অর্থহীন, এমনকি ক্ষতিকারকও হতে পারে।

–[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ৩০]

৪. যারা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে এ কিতাব তাদের জন্য নূর ও হেদায়েতের আলোকবর্তিকা। যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ভয় না থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত হেদায়াতের পথ দৃষ্টিগোচর হবে না। এজন্য আল্লাহকে ভয়কারীরাই হেদায়েত পাবে। –[মাআরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (র.) : খ. ১, পৃ. ৩৪]

قَوْلُهُ لِاتِّقَائِهِمْ بِذٰلِكَ النَّارِ : এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে মুত্তাকীকে মুত্তাকী বলার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ যেহেতু মুত্তাকীকে তার নেক আমলের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করা হবে, এ জন্য তাকে মুত্তাকী বলা হয়।

قَوْلُهُ بِذٰلِكَ : أَيْ بِالْإِمْتِثَالِ وَالْإِجْتِنَابِ অর্থাৎ ذٰلِكَ -এর مُشَارٌ إِلَيْهِ হলো اِمْتِثَالُ الْأُمُوْرِ এবং اِجْتِنَابُ النَّوَاهِيْ

قَوْلُهُ النَّارَ : এ শব্দের উল্লেখ থেকে বুঝা যায় اَلْمُتَّقِيْنَ -এর مَفْعُوْل بِهٖ টি উহ্য রয়েছে। ইবারতের মূলরূপ এমন হবে– هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ النَّارَ অর্থাৎ এ কিতাব ঐ সকল মানুষের জন্য হেদায়েত, যারা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করে।

٣. اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِالْغَيْبِ بِمَا غَابَ عَنْهُمْ مِنَ الْبَعْثِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ اَىْ يَأْتُوْنَ بِهَا بِحُقُوْقِهَا وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ اَعْطَيْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ فِىْ طَاعَةِ اللّٰهِ.

অনুবাদ :

৩. যারা বিশ্বাস করে সত্য বলে প্রত্যয় স্থাপন করে অদৃশ্যে [সেই সকল বিষয়ে] যে সকল জিনিস আজ তাদের থেকে অদৃশ্যমান, অর্থাৎ পুনরুত্থানে, জান্নাতে, জাহান্নামে সালাত কায়েম করে অর্থাৎ সকল প্রকার আহকাম-আরকান ও আদাবসহ যথাযথভাবে তা সম্পাদন করে এবং তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি প্রদান করেছি, তা হতে ব্যয় করে আল্লাহ তা'আলার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে।

তাহকীক ও তারকীব

اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ : এই ইবারতটুকুর এরাব কয়েকভাবে হতে পারে। যথা–

১. مُتَّقِيْنَ -এর صِفَت হিসেবে جَرّ

২. فِعْل مَحْذُوْف -এর مَفْعُوْل হিসেবে نَصْب . بِتَقْدِيْرِ اَعْنِىْ

৩. مُسْتَأْنِفَة مُبْتَدَأ হিসেবে رَفْع - بِتَقْدِيْرِهِمْ

এটি جُمْلَة مُسْتَأْنِفَة হিসেবে মুবতাদাও হতে পারে। তখন তার خَبَر হবে اُولٰئِكَ عَلٰى هُدًى الخ

يُقِيْمُوْنَ : اِقَامَت -এর অর্থ শুধু নামাজ পড়া নয়; বরং নামাজকে সার্বিকভাবে শুদ্ধ করার নাম হলো ইকামত। আল্লামা বায়জাবী (র.) اِقَامَت -এর চারটি অর্থ করেছেন–

١. تَعْدِيْل اَرْكَان ٢. اَلْمُوَاظَبَةُ ٣. اَلتَّشَمُّرُ لِاَدَاءِ الصَّلَاةِ ٤. اَدَاءُ الصَّلَاةِ مُطْلَقًا .

১. প্রথম অর্থের মূল কথা হলো تَعْدِيْل اَرْكَان এর মর্ম হলো يُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ অর্থাৎ يَعْدِلُوْنَ اَرْكَانَ الصَّلَاةِ আর নামাজের রোকনসমূহ এমন সঠিকভাবে আদায় করা, যাতে তার মাঝে কোনো রকমের কম বেশি না পাওয়া যায়। আর اِقَامَت-এর অর্থটি اَقَامَ الْعُوْدَ بِمَعْنٰى قَوَّمَهٗ থেকে নির্গত। اَقَامَ الْعُوْدَ ঐ সময় বলা হয়, যখন কাঠকে সমান করা হয় এবং তার বক্রতা দূর করা হয়। مُشْتَق مِنْهُ ও مُشْتَق -এর মধ্যে সামঞ্জস্য হলো– যেভাবে تَقْوِيْمُ عُوْد -এর সময় যেমনভাবে কাঠ বা খুঁটি সোজা হয়ে যায়, এমনিভাবে تَعْدِيْل اَرْكَان -এর মাঝেও নামাজের ক্রিয়াসমূহ সঠিক হয়ে যায়।

২. مُوَاظَبَت -এর অর্থটি اَقَمْتُ السُّوْقَ থেকে নির্গত। এটি ঐ সময় বলা হয়, যখন কেউ বাজারকে চালু করে আর চালু করা বা প্রচলিত বস্তু প্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে যে বস্তু নিয়মিত করা হয়, তাও আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে।

৩. يُقِيْمُوْنَ -এর তৃতীয় অর্থ হলো تَشَمُّر لِلْاَدَاءِ তথা কোনো প্রকার অলসতা ও উদাসীনতা ছাড়া নামাজ আদায় করা। এ অর্থটি قَامَ بِالْاَمْرِ وَاَقَامَهٗ থেকে নির্গত। একথাটি আরবরা ঐ সময় বলে থাকে, যখন কেউ কোনো কাজ শক্তির সাথে সম্পাদন করে থাকে। তার বিপরীত قَعَدَ عَنِ الْاَمْرِ ঐ সময় বলা হয়, যখন কেউ অলসতা প্রদর্শন করে কোন কাজ করে।

৪. চতুর্থ অর্থ আদায় করা। অর্থাৎ اِقَامَت দ্বারা اَدَاءِ صَلَاة উদ্দেশ্য। এভাবে যে, يُقِيْمُوْنَ -এর هَمْزَة টি تَسْعِيْر -এর জন্য। يُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ -এর অর্থ হলো নামাজকে قِيَام সম্বলিত করা। আর قِيَام বলে এখানে সকল রোকনের পরিপূর্ণ আদায় উদ্দেশ্য। অর্থাৎ جُز বলে كُل বুঝানো হয়েছে। যেমনটি পবিত্র কুরআনের وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ -এর মাঝেও করা হয়েছে। –[দরসে জালালাইন খ. ১, পৃ. ৩২]

اَلصَّلٰوةُ : এটি হয়ত আভিধানিক صَلٰوة [তথা দোয়া] থেকে নির্গত হয়েছে। কেননা নামাজ তো দোয়ারই সমষ্টি। **অথবা** وَصْلَة থেকে নির্গত। قَلْب مَكَانِى হয়ে صَلٰوة হয়েছে। আর নামাজকে صِلٰوة এজন্য বলা হয় যে, এটি বান্দা এবং আল্লাহর মাঝে সেতুবন্ধন। আর وَصْلَة হলো صِلَة [সম্পর্ক]-এর অর্থে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ الخ : এখান থেকে মুত্তাকীদের পরিচয় প্রদান করা হচ্ছে সূরায়ে ফাতেহার মাঝে বান্দাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা জ্ঞাপন করা হয়েছিল। সূরা বাকারাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে মু'মিন বান্দাদের প্রশংসা করা হচ্ছে। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ নিজেই স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে বান্দাকে ঈমান এবং তাকওয়া প্রদান করেছেন এবং নিজেই তার স্বস্তি প্রকাশ করেছেন। -[তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্ধলভী (র.) খ. ১, পৃ. ৩৪]

ঈমানের সংজ্ঞা : إِيْمَان শব্দটি بَاب إِفْعَال -এর মাসদার। أَمْنٌ থেকে নির্গত। যার অর্থ- নিরাপদ ও আশ্বস্ত হওয়া। যেমন কুরআনে রয়েছে- أَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ [তারা কি আল্লাহ তা'আলার কৌশল থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে?] যখন এ শব্দটি بَاب إِفْعَال থেকে ব্যবহৃত হয়েছে, তখন এটি مُتَعَدِّى হয়ে গেছে। এখন অর্থ হবে- নিরাপদ করা বা নিরাপত্তায় প্রবেশ করা।

শরিয়তের পরিভাষায় বিভিন্নরূপে ঈমানের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। সবগুলোর সারনির্যাস প্রায় একই। তা হলো-

اَلْإِيْمَانُ هُوَ التَّصْدِيْقُ بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ اِعْتِمَادًا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ .

অর্থাৎ নবী করীম ﷺ যা নিয়ে এসেছেন, তা তাঁর প্রতি আস্থা রেখে বিশ্বাস করা। -[দরসে মিশকাত, পৃ. ৩৭, খ. ১]

আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থের মাঝে সামঞ্জস্য : যে ব্যক্তি হুজুর ﷺ -এর প্রতি ঈমান আনল, সে হুজুরকে মিথ্যা সাব্যস্ত হওয়া থেকে নিরাপদ করে দিল এবং নিজেকে জাহান্নাম থেকে নিরাপদ করল। -[প্রাগুক্ত]

অনুভূতিগ্রাহ্য ও দৃশ্যমান কোনো বস্তুতে কারো কথায় বিশ্বাস করার নাম ঈমান নয় : মু'মিনের পরিচয় দিতে গিয়ে আয়াতে দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ অর্থাৎ ঈমান এবং গায়ব। এ থেকে বোঝা গেল, অনুভূতিগ্রাহ্য ও দৃশ্যমান কোনো বস্তুতে কারো কথায় বিশ্বাস স্থাপন করার নাম ঈমান নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা হয় যে, কোনো ব্যক্তি যদি এক টুকরো সাদা কাপড়কে সাদা এবং এক টুকরো কালো কাপড়কে কালো বলে এবং আর এক ব্যক্তি তার কথা সত্য বলে মেনে নেয়, তাহলে একে ঈমান বলা যায় না। এতে বক্তার কোনো প্রভাব বা দখল নেই। অপরদিকে রাসূল ﷺ -এর কোনো সংবাদ কেবলমাত্র রাসূল ﷺ -এর উপর বিশ্বাসবশত মেনে নেওয়াকেই শরিয়তের পরিভাষায় ঈমান বলে।

-[মাআরিফুল কুরআন : মুফতি শফী (র.)]

ঈমান ও ইসলামের পার্থক্য : অভিধানে কোনো বস্তুতে আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন ঈমান এবং কারো অনুগত হওয়াকে ইসলাম বলে। ঈমানের আধার হলো অন্তর, আর ইসলামের আধার অন্তরসহ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। কিন্তু শরিয়তে ঈমান ব্যতীত ইসলাম এবং ইসলাম ব্যতীত ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত এ বিশ্বাসের মৌখিক স্বীকৃতির সাথে সাথে কর্মের দ্বারা আনুগত্য ও তাবেদারী প্রকাশ করা না হয়।

মোটকথা, আভিধানিক অর্থে ঈমান ও ইসলাম স্বতন্ত্র অর্থবোধক বিষয়বস্তুর অন্তর্গত। অর্থগত পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে কুরআন-হাদীসে ঈমান ও ইসলামের পার্থক্যের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু শরিয়ত ঈমানবিহীন ইসলাম এবং ইসলামবিহীন ঈমান অনুমোদন করে না।

প্রকাশ্য আনুগত্যের সাথে যদি অন্তরের বিশ্বাস না থাকে, তবে কুরআনের ভাষায় একে নিফাক বলে। নিফাককে কুফর হতেও বড় অন্যায় সাব্যস্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে- إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ অর্থাৎ মুনাফিকদের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তর।

অনুরূপভাবে আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে যদি মৌখিক স্বীকৃতি এবং আনুগত্য না থাকে, কুরআনের ভাষায় একেও কুফরি বলা হয়। বলা হয়েছে- يَعْرِفُوْنَهُ كَمَا يَعْرِفُوْنَ أَبْنَاءَهُمْ অর্থাৎ কাফেররা রাসূল ﷺ এবং তার নবুওয়তের যথার্থতা সম্পর্কে এমন সুস্পষ্টভাবে জানে, যেমন জানে তাদের নিজ নিজ সন্তানদেরকে।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا অর্থাৎ তারা আমার নিদর্শন বা আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে, অথচ তাদের অন্তরে এর পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। তাদের এ আচরণ কেবল অন্যায় ও অহংকারপ্রসূত।

ঈমান ও ইসলামের ক্ষেত্র এক, কিন্তু আরম্ভ ও শেষের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য বিদ্যমান। অর্থাৎ, ঈমান যেমন অন্তর থেকে আরম্ভ হয় এবং প্রকাশ্য আমলে পৌঁছে পূর্ণতা লাভ করে, তদ্রূপ ইসলামও প্রকাশ্য আমল থেকে আরম্ভ হয় এবং অন্তরে পৌঁছে পূর্ণতা লাভ করে। অন্তরের বিশ্বাস প্রকাশ্য আমল পর্যন্ত না পৌঁছলে তা গ্রহণযোগ্য হয় না। অনুরূপভাবে প্রকাশ্য আনুগত্য ও তাবেদারী আন্তরিক বিশ্বাসে না পৌঁছলে গ্রহণযোগ্য হয় না। ইমাম গাজালী এবং ঈমান সুবকী (র.)-ও এ মত পোষণ করেছেন। –[মা'আরিফুল কুরআন : মুফতি শফী (র.)]

জ্ঞাতব্য : ত্বাকওয়ার দু'টি অংশ। একটি হচ্ছে– ভালো কাজগুলো করা। আরেকটি হচ্ছে– মন্দ কাজগুলো থেকে বিরত থাকা। আর কোনো কোনো আদেশাবলির সম্পর্ক অঙ্গসমূহের রাজা তথা ক্বলবের সাথে এবং কোনো কোনোটির সম্পর্ক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে। প্রথম প্রকারকে ঈমান বলা হয়। অর্থাৎ আকিদা, চিন্তা-ভাবনা ও আন্তরিক বিশ্বাস সম্পর্কীয় আদেশাবলির সম্পর্ক ক্বলবের সাথে হয়। إِنَّ فِي الْجَسَدِ..... হাদীস পাকে এর দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আর যেগুলোর সম্পর্ক শারীরিক ইবাদতের সাথে কিংবা আর্থিক ইবাদতের সাথে, ঐ কার্যাবলি কে বলা হয় আমল يُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ দ্বারা শারীরিক ইবাদতসমূহ এবং مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ দ্বারা আর্থিক ইবাদতসমূহ উদ্দেশ্য।

এমনিভাবে যারা (مُتَّقِيْنَ) মুত্তাকীন তারা চিন্তাশক্তি ও আমল শক্তি উভয়টিকে পরিপূর্ণ করেন। 'আক্বিদা বা বিশ্বাসসমূহকে সংশোধন করার নাম عِلْمُ الْكَلَامِ অর্থাৎ ধর্মতত্ত্ব এবং আমলসমূহকে সংশোধন করার অধ্যায়কে فِقْه ফিকহশাস্ত্র বলা হয়। অন্তরকে পবিত্রকরণ ও আভ্যন্তরকে পরিষ্কারকরণে عِلْمُ الْاَخْلَاقِ চারিত্রিক তত্ত্ব, যাকে تَصَوُّف ও اِحْسَان বলা হয়। উচ্চস্তরের মুত্তাকী উক্ত তিনটিরই পরিপূরক। –[কামালাইন খ. ১, পৃ. ১৯]

অদৃশ্যের উপর ঈমান : ঈমান দু'প্রকার– তন্মধ্যে এক প্রকার হচ্ছে– اِيْمَان اِجْمَالِي অর্থাৎ সংক্ষেপে বিশ্বাস করা, যেমন উপরিউক্ত আয়াতে উদ্দেশ্য হচ্ছে নবী করীম ﷺ যা কিছু নিয়ে এসেছেন– ঐ সবগুলোকে বিশ্বাস করা।

দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে– اِيْمَان تَفْصِيْلِي বিশদভাবে বিশ্বাস করা, অর্থাৎ সকল আনুষঙ্গিক ও খুঁটিনাটি বিষয়াদির উপর পৃথক পৃথক ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ঈমান আনা বা বিশ্বাস করা। সুতরাং ঈমান শুধু সত্য জানার নাম নয়; বরং সত্য মানা ও সত্য বুঝাকে ঈমান বলা হয়। ঈমান একটি পৃথক বিষয়, আর আমল আরেকটি পৃথক বিষয়। আর اِيْمَانٌ بِالْغَيْبِ [অদৃশ্যের প্রতি ঈমান] হচ্ছে– জ্ঞান ও অনুভূতির মাধ্যমে অদৃশ্য ও গোপন বিষয়াদিকে শুধু আল্লাহ ও রাসূল ﷺ -এর নির্দেশের কারণে সত্য ও সঠিক হিসেবে মেনে নেওয়া গায়েব বা অদৃশ্যের এক অর্থ অন্তরও আসে, কেননা অন্তর তো অদৃশ্য। –[প্রাগুক্ত]

يُصَدِّقُوْنَ : অভিধানের ভিত্তিতে اِيْمَان -এর ব্যবহার تَصْدِيْق এবং وُثُوْق দুটি অর্থের ক্ষেত্রেই হয়। মুফাসসির (র.) يُصَدِّقُوْنَ বলে এদিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, এখানে تَصْدِيْق অর্থটি প্রযোজ্য। কেননা يُؤْمِنُوْنَ -এর صِلَه হিসেবে بَاء এসেছে। আর যখন يُؤْمِنُوْنَ -এর صِلَه হিসেবে بَاء আসে, তখন সর্বসম্মতিক্রমে تَصْدِيْق -এর অর্থে হয়।

এছাড়াও ঈমানের হাকীকত সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে। জমহুর মুতাকাল্লিমীনের মতে ঈামন কেবল تَصْدِيْق قَلْبِي -কে বলা হয়। আর জমহুর মুহাদ্দিসীনের মুতাজিলা ও খারেজীদের মতে ঈমান হলো তিন জিনিসের সমষ্টির নাম। সেগুলো হলো– تَصْدِيْق قَلْبِي ـ اِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ ـ عَمَلٌ بِالْاَرْكَانِ মুফাসসির (র.) يُصَدِّقُوْنَ শব্দ উল্লেখ্য করে এ দিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, এখানে ঈমান বলতে শুধু تَصْدِيْق قَلْبِي উদ্দেশ্য; اِقْرَار বা عَمَلٌ بِالْاَرْكَانِ উদ্দেশ্য নয়।

–[দরসে জালালাইন : ৩০]

গায়েবের সংজ্ঞা ও পরিচিতি : 'গায়েব'-এর আভিধানিক অর্থ অজ্ঞাত, অদৃশ্য ও গোপন। কুরআনে غَيْب শব্দ দ্বারা সে সমস্ত বিষয়কেই বুঝানো হয়েছে, যেগুলোর সংবাদ রাসূল ﷺ দিয়েছেন এবং মানুষ যে সমস্ত বিষয়ে স্বীয় বুদ্ধিবলে ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান লাভে সম্পূর্ণ অক্ষম।

নিম্নে এ মর্মে ওলামায়ে কেরাম প্রদত্ত কতিপয় সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো।

তাফসীরে ইবনে কাছীরে উল্লেখ রয়েছে–

أَمَّا الْغَيْبُ : فَمَا غِيْبَ عَنِ الْعِبَادِ مِنْ أَمْرِ الْجَنَّةِ وَأَمْرِ النَّارِ وَمَا ذُكِرَ فِى الْقُرْاٰنِ . (تَفْسِيْر اِبْن كَثِيْر)

অর্থাৎ গায়েব বলা হয় ঐ জিনিসকে, যা বান্দা থেকে গোপন রয়েছে। যেমন– জান্নাত-জাহান্নামের অবস্থাসমূহ এবং কুরআনে কারীমে বর্ণিত বিষয়াবলি।

হাশিয়ায়ে জালালাইনে উল্লেখ রয়েছে–

اَىْ مَا غَابَ عَنِ الْحِسِّ وَالْعَقْلِ غَيْبَةً كَامِلَةً بِحَيْثُ لَا يُدْرَكُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا اِبْتِدَاءَ الْبَدَاهَةِ . حَاشِيَة جَلَالَيْن .

আল্লামা কাজী বায়যাবী (র.) লিখেন– اَلْمُرَادُ بِهٖ (اَىِ الْغَيْبِ) اَلْخَفِىُّ الَّذِىْ لَا يُدْرِكُهُ الْحِسُّ وَلَا يَقْتَضِيْهِ بَدَاهَةُ الْعَقْلِ

অর্থাৎ মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয় শক্তি এবং মেধা শক্তি দ্বারা যা কিছু জানার উপায় নেই, তাকে গায়েব বলে। –[বায়জাবী পৃ. ১৮]

সুবিখ্যাত গ্রন্থ শরহে আকাঈদ নাসাফীর ভাষ্যগ্রন্থ -নেবরাসে উল্লেখ রয়েছে–

وَالتَّحْقِيْقُ اَنَّ الْغَيْبَ مَا غَابَ عَنِ الْحَوَاسِّ وَالْعِلْمِ الضَّرُوْرِيِّ وَالْعِلْمِ الْاِسْتِدْلَالِىْ وَاَمَّا مَا عُلِمَ بِحَاسَّةٍ اَوْ ضَرُوْرَةٍ اَوْ دَلِيْلٍ فَلَيْسَ بِغَيْبٍ (نِبْرَاس : ٥٧٥)

অর্থাৎ যা পঞ্চ ইন্দ্রিয় বা অন্য কোনো দলিল ব্যতীত সাধারণতভাবে জানা যায় না, তাকে গায়েব বলা হয়। আর যা কোনো ইন্দ্রিয় বা দলিল দ্বারা জানা যায়, তা গায়েব নয়। –[নিবরাস : ৫৭৫]

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ তাফসীরগ্রন্থ তাফসীরে মাদারেকে বলা হয়েছে–

اَلْغَيْبُ هُوَ مَا لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دَلِيْلٌ وَلَا اِطَّلَعَ عَلَيْهِ مَخْلُوْقٌ .

অর্থাৎ ঐ জিনিসকে গায়েব বলা হয়, যার উপর কোনো দলিল বিদ্যমান নেই এবং কোনো মাখলুক সে বিষয়ে অবগত নয়।

মোটকথা, কোনো দলিল প্রমাণ ও মাধ্যম ছাড়া যা জানা যায়, তাকেই গায়েব বলা হয়। কোনো সূত্রে বা দলিল প্রমাণ ও নিদর্শনের মাধ্যমে জানা গেলে তা আর গায়েব থাকে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা নিজ ওহীর মাধ্যমে হুজুর ﷺ-কে গায়েবের খবর জানিয়েছেন। ওহী হলো জানার একটি দলিল। আর দলির দ্বারা যা জানা যায় তা গায়েব নয়। যেমন কবরের অবস্থা আমাদের জন্য গায়েব ছিল। আল্লাহ তা'আলা হুজুর ﷺ কে কবর সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন। হুজুর ﷺ বলেছেন, কবরে মুনকার নাকীর নামে দু'জন ফেরেশতা এসে মৃত ব্যক্তিকে জিন্দা করার পর জিজ্ঞেস করবে– তোমার রব কে? তুমি কোন ধর্মের অনুসারী ছিলে? এবং হুজুর ﷺ -কে দেখিয়ে বলবে ইনি কে? একথাগুলো একদিন গায়েব ছিল। দুনিয়ার মুসলমানরা জেনে যাওয়ার পর আর তা গায়েব থাকেনি। তবে প্রত্যেকের কবরে প্রতি মুহূর্তে কি হচ্ছে এটা এখনো গায়েব হিসেবেই রয়েছে।

গায়েবের প্রকার : গায়েব দু'প্রকার। ১. غَيْب مُطْلَقْ বা নিরঙ্কুশ গায়েব। ২. غَيْب اِضَافِى বা আপেক্ষিক গায়েব।

নিরঙ্কুশ গায়েব বলতে বুঝায় তা, যা কস্মিনকালেও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না। যা বস্তুগত যন্ত্রপাতি বা উপায়-উপকরণ দ্বারাও প্রত্যক্ষ করা যায় না। যা কোনোক্রমেই ইন্দ্রিয়ের আওতাধীন হওয়ার নয়। হওয়া সম্ভবপরও নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলার সত্তা, তাঁর পবিত্রতা ইত্যাদি।

আর আপেক্ষিক গায়েব বলতে বুঝায়, একটি জিনিস কোনো কোনো সূত্রে ও পরিবেশে গায়েব হলেও অন্য ক্ষেত্রে ও পরিবেশে তা 'গায়েব' নাও হতে পারে। আবার কোনো কোনো ব্যক্তির জন্য যা গায়েব, অন্য ব্যক্তির জন্য তা গায়েব নাও হতে পারে। যেমন শুক্রকিট, অতীতে তা 'গায়েব' অদৃশ্য যা অগোচরীভূত ছিল। বর্তমানে তা নয়। কেননা তা যতই সূক্ষ্ম হোক বর্তমানে অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃশ্যমান হয়ে উঠে। বর্তমান বিজ্ঞান-উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতিতে তা আর 'গায়েব' থাকেনি। ইন্দ্রয়গ্রাহ্য জিনিসে পরিণত হয়েছে। অনুরূপভাবে সৌরলোকের নানা স্থানে অবস্থিত অনেক অবয়ব এবং পৃথিবীরও অনেক সূক্ষ্ম জিনিস কেবল অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রেই ধরা পড়ে, তার বাইরে এখনও তা গায়েবই রয়ে গেছে। কেননা সাধরণ খোলা চোখে তা দৃষ্টিগোচর হয় না।

পক্ষান্তরে নিরঙ্কুশভাবে 'গায়েব' যা এই দুনিয়ায় কখনো প্রচ্ছন্নতার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসবে না। তার এই 'গায়েব' হওয়া অবস্থার মধ্যে কখনোই কোনো পার্থক্যের সৃষ্টি হয় না। ক্ষেত্র ও অবস্থানে যতই পার্থক্য হোক না কেন। এই পর্যায়ের জিনিসসমূহের প্রতি মানুষকে অবশ্যই ঈমান আনতে হবে। যদি তার অস্তিত্ব ও অবস্থিতি পর্যায়ে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। কেননা তা কখনই এই দুনিয়ায় প্রত্যক্ষ হবে না। এ দুনিয়ায় তার সত্যতা ও বাস্তবতা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জানা সম্ভব নয়। কেননা এই জিনিসসমূহ বস্তু-অতীত আর মানুষ বস্তুগত আবরণে পরিবেষ্টিত। এ আচরণ দীর্ণ না পাওয়া পর্যন্ত মানুষের পক্ষে তা গায়েবই থেকে যাবে, কখনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হবে না। সে আবরণ দীর্ণ হওয়ার প্রথম পর্যায় হচ্ছে মৃত্যু তথা বস্তুগত দেহের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ –[আল কুরআনে নবুয়ত ও রিসালাত : পৃ. ১৯৫, ১৯৬ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম]

জালালাইনের হাশিয়াতে আরেকটি ভাগের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। নিম্নে ইবারতটুকু বিবৃত হলো–

وَهُوَ قِسْمَانِ قِسْمٌ لَا دَلِيْلَ عَلَيْهِ وَهُوَ الَّذِىْ اُرِيْدَ بِقَوْلِهٖ سُبْحَانَهٗ وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ وَقِسْمٌ نُصِبَ عَلَيْهِ دَلِيْلٌ كَالصَّانِعِ وَصِفَاتِهٖ وَالنُّبُوَّاتِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنَ الْاَحْكَامِ وَالشَّرَائِعِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَحْوَالِهٖ مِنَ الْبَعْثِ وَالنُّوْرِ وَالْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ وَهُوَ الْمُرَادُ هٰهُنَا . (رُوْحُ الْبَيَانِ؛ حَاشِيَة جَلَالَيْن)

উল্লেখ্য কোনো কিছু গায়েব হওয়ার ব্যাপাটি কেবল মানুষের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আল্লাহর ক্ষেত্রে গায়েব-অদৃশ্য বা অজ্ঞাত বলতে কিছুই নেই। কোনো বস্তু থাকতে পারে না তাঁর অগোচরে। এ কারণেই তাঁর পরিচিতিতে বলা হয়– عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ "তিনি গায়েব ও উপস্থিত, অদৃশ্যমান ও দৃশ্যমান সর্ববিষয়ে অবহিত।"

সন্দেহ নিরসন :

এক্স-রে, আল্ট্রাসনোগ্রাফি ও বিভিন্ন যন্ত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত রিপোর্ট ইলমে গায়েব নয়? অনেকে গায়েব শব্দটি আভিধানিক অর্থে বুঝে নিয়ে যেসব বস্তু আমাদের জ্ঞান দৃষ্টির অন্তরালে তাকে 'গায়েব' বলে অভিহিত করে। ফলে নানা প্রশ্নের উদয় হয়। যেমন রোগীর শরীর দেখে, এক্স-রে করে বা আল্ট্রাসনোগ্রাফী করে রোগী সম্পর্কে বিভিন্ন খবর বা আবহাওয়াবিদদের প্রদত্ত ঝড়-বৃষ্টির সংবাদ শুনে অনেকে মনে করেছে যে, গায়েবের ইলম আল্লাহ তা'আলার সাথে নির্দিষ্ট করা হয়েছে; অথচ এখন তা মানুষও জানে। এসব প্রশ্নের উত্তর হলো, পূর্বে বলা হয়েছে 'ইলমে গায়েব' বলা হয়, যা জানার জন্য কোনো দলিল নেই। বৃষ্টির খবর আবহাওয়াবিদরা দলিল দ্বারা জেনে বলে থাকে অথবা অনুমানের ভিত্তিতে বলে। অর্থাৎ ঝড়-বৃষ্টির নিদর্শন ও প্রমাণ পাওয়ার পর তারা ঝড়-বৃষ্টির খবর দেয়। তাদের এ খবর নিদর্শনের উপর ভিত্তি করে। নিদর্শন বৃষ্টির দলিল। গায়েব বলা হয়, যা জানার জন্যে কোনো দলিল নেই। সুতরাং তাদের বৃষ্টি সম্পর্কিত এ সংবাদ 'ইলমে গায়েব' নয়। ঝড়-বৃষ্টির নিদর্শন ও প্রমাণ পাওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, কখন বৃষ্টি হবে। এটা হলো 'ইলমে গায়েব'। এ ইলম আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো নেই। এটা আল্লাহ তা'আলার জন্য খাস।

অনুরূপভাবে এক্সরে ইত্যাদির মাধ্যমে গর্ভজাত সন্তানটি ছেলে মেয়ে বা হওয়ার সংবাদ জানা ইলমে গায়েব নয়; কারণ ডাক্তারগণ এ সংবাদ দিতে পারে সন্তানের দেহে রূহ দেওয়ার পর। রূহ ফেরেশতাদের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। সুতরাং তখন ফেরেশতারা জানতে পারে এ গর্ভের সন্তানটি ছেলে না মেয়ে। ইলমে গায়েব তো আল্লাহ তা'আলার সাথে খাস। যখন ফেরেশতা জেনে ফেলে তখন আর গর্ভের সন্তানের খবরটি আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে খাস রইল না। তাহলে কুরআনে বর্ণিত وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ এর অর্থ কি? অর্থ হলো ফেরেশতাদের জানার পূর্বে রূহ প্রদানের আগে একমাত্র আল্লাহই জানেন যে, গর্ভের সন্তানটি ছেলে হবে নাকি মেয়ে হবে। রূহ প্রদানের সময় ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিলেন। ফেরেশতাদের মাধ্যমে রূহ না দিলে তারা জানত না। মোটকথা, যখন ফেরেশতারা জানল, তখন অন্যরাও জানতে পারে। কারণ তখন এটা গায়েবের অন্তর্গত রইল না। রূহ প্রদানের পূর্বে গায়েব ছিল। আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে জানানোর কারণে এটা আর গায়েব রইল না।

সার কথা হলো, আবহাওয়া বিভাগের খবর, শিরা দেখে বা এক্স-রে করে রোগীর শারীরিক অবস্থা বলে দেওয়া, গর্ভের সন্তান ছেলে নাকি মেয়ে, তা নির্ণয় করা ইত্যাদি হলো উপরকরণ ও যন্ত্রপাতির মাধ্যমে অর্জিত ইলম। এটা ইলমে গায়েব নয়। আবহাওয়া বিভাগের কর্মকর্তা ও হাসপাতালের ডাক্তাররা এসব খবর দেওয়ার সুযোগ তখনই পায় যখন এসবের উপকরণ সৃষ্টি হয়ে প্রকাশ পায়। তবে তখন ব্যাপকভাবে প্রকাশ পায় না। শুধু বিশেষজ্ঞরা যন্ত্রপাতির মাধ্যমে জানতে পারে। কিন্তু স্থূল দৃষ্টিসম্পন্ন সাধারণ লোকের নিকট এগুলো অজানা থাকে। অতঃপর উপকরণ যখন শক্তিশালী হয়, তখন সকলের দৃষ্টিতেই প্রকাশ পায়। কিন্তু উপকরণ ও লক্ষণাদি প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে তার খবর দেওয়া যায় না। সেটি একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এখন ঈমান বিল-গায়েব বা অদৃশ্যে বিশ্বাসের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে হেদায়েত এবং শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন, সে সবগুলোকে আন্তরিকভাবে মেনে নেওয়া। তবে শর্ত হচ্ছে যে, সেগুলো রাসূল ﷺ-এর শিক্ষা হিসেবে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হতে হবে। আহলে-ইসলামের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ঈমানের এ সংজ্ঞাই দিয়েছেন। 'আকিদাতুত-তাহাবী' ও 'আকায়েদে-নসফী' -তে এ সংজ্ঞা মেনে নেওয়াকেই ঈমান বলে অভিহিত করা হয়েছে। এতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, শুধু জানার নামই ঈমান নয়। কেননা খোদ ইবলীস এবং অনেক কাফেরও রাসূল ﷺ -এর নবুয়তকে সত্য বলে আন্তরিকভাবে জানতো, কিন্তু না মানার কারণে তারা ঈমানদারের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি।

এখানে يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ দ্বারা ঈমানের **সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া** হয়েছে। যার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব ও সত্তা, সিফাত বা গুণাবলি এবং তাকদীর **সম্পর্কিত বিষয়সমূহ, বেহেশত**-দোজখের অবস্থা কিয়ামত এবং কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার ঘটনাসমূহ, ফেরেশতাকুল, **সমস্ত আসমানি কিতাব, পূর্ববর্তী** সকল নবী ও রাসূলগণের বিস্তারিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত, যা সূরা বাকারার اٰمَنَ الرَّسُوْلُ **আয়াতে দেওয়া হয়েছে। এখানে** ঈমানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং শেষ আয়াতে ঈমানের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ بِمَا غَابَ عَنْهُمْ : এ অংশে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, غَيْب শব্দটি مَصْدَر بِمَعْنٰى اِسْم فَاعِل আর এখানে **غَائِبَة ইসমে ফায়েলে স্থলে غَيْب মাসদারকে** مُبَالَغَة স্বরূপ ব্যবহার করা হয়েছে।

اِيْمَانٌ بِالْغَيْبِ-এর শ্রেষ্ঠত্ব : কোনো কিছুকে দেখার পর কিংবা বুঝার পর বিশ্বাস করা বা মেনে নেওয়া এত বেশি প্রসংশনীয় **কাজ নয়, যত বেশি প্রসংশনীয়** কাজ হচ্ছে- শুধু কেউ বলার কারণে মেনে নেওয়া বা বিশ্বাস করা। কেননা- প্রথম পদ্ধতিতে **তো নিজ চক্ষু ও বিবেকের উপর** ভরসা করা হলো। নবী করীম ﷺ -এর উপর প্রকৃত ঈমান আনার অর্থ এটাই যে, শুধু তিনি **বলার কারণে বিশ্বাস করে** নেওয়া এবং অন্য কোনো প্রমাণাদির অপেক্ষা না করা।

اِيْمَانٌ بِالْغَيْبِ-এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে নিম্নে কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত হলো-

১. **ত্বাবারানী (র.)** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একবার সফরে যাত্রীদলের জন্য পান করার পানিও **শেষ হয়ে** গিয়েছিল। তালাশ করে শুধু একটি ভাণ্ডে সামান্য পানি পাওয়া গেল। রাসূল ﷺ সে পানির পাত্রে নিজ হাতের **অঙ্গুলী** রেখেছিলেন, যাঁর বরকতে ঐ পানি ফোয়ারার ন্যায় উদ্বেলিত হতে লাগলো এবং সকলের প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট **হয়ে** গেলো, যাদের সংখ্যা ছিল শত শত।

   রাসূল ﷺ সাহাবা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেছেন যে, কাদের ঈমান সবচেয়ে বেশি বিস্ময়কর? তাঁরা বললেন, **ফেরেশতাদের**। তিনি বললেন, ফেরেশতারা আল্লাহর দরবারে উপস্থিত থাকেন, তাঁর আদেশাবলি পালনে লিপ্ত থাকেন, তারা ঈমান কেন আনবে না? সাহাবাগণ (রা.) আরজ করলেন যে, তাহলে আপনার সহচরদের ঈমান অধিক বিস্ময়কর। তিনি বললেন যে, আমার সাথীগণও শত শত মু'জিযা ও অলৌকিক ঘটনাবলি দেখতেছে, তাদের ঈমান আনার মধ্যে বিস্ময়ের কি আছে? তারপর তিনি নিজেই ইরশাদ করলেন যে, বিস্ময়কর ঈমান তাদের হবে, যারা আমাকে দেখেনি, আমার পরে আগমন করবে; কিন্তু আমার নাম শুনে সত্য অন্তরে আমার উপর ঈমান আনবে, তারা আমার ভাই এবং তোমরা আমার সাথী। -[কামালাইন খ. ১, পৃ. ২০]

২. হারিছ ইবনে কায়স নামী এক তাবেয়ী একজন সাহাবী (রা.)-এর নিকট আরজ করলেন যে, আফসোস, আমরা রাসূল ﷺ -এর দর্শন থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছি, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বললেন, এটা সত্য যে, তোমরা ঐ বিশেষ সম্মান থেকে বঞ্চিত রয়েছ; কিন্তু তোমরা এই একটি বড় নিয়ামত পেয়েছ যে, তোমরা রাসূল ﷺ -কে দেখা ব্যতীত তাঁর উপর ঈমান এনেছ। যে তাঁকে দেখেছে তার কাছে হাজার প্রমাণাদি দ্বারা তাঁর নবুয়ত উজ্জ্বল হয়ে গেছে। তারপরও যদি সে ঈমান না আনে, তবে সে আর কি করবে? ঈমান হচ্ছে- তোমাদের, কেননা তোমরা তাঁকে না দেখে ঈমান এনেছ। -[প্রাগুক্ত]

৩. আবূ দাউদ (র.)-এর বর্ণনা যে, এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলো যে, আপনি কি রাসূল ﷺ -কে স্বচক্ষে দেখেছেন? স্বয়ং তাঁর সাথে কথা বলেছেন? এবং নিজ হাত দ্বারা তাঁর বরকতময় হাত ধরে বায়'আত হয়েছেন? তিনি সব ক'টি প্রশ্নের উত্তরে "হ্যাঁ" বলেছেন। প্রশ্নকারী একথা শুনে অতিশয় কাঁদতে লাগলেন এবং তার উপর এক আবেগের অবস্থা প্রকাশ হলো। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বললেন, আমি তোমাকে একটি সুসংবাদ শুনাচ্ছি, যা রাসূল ﷺ থেকে আমি শুনেছি, রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাকে দেখে ঈমান গ্রহণ করলো তার জন্য সুসংবাদ, আর যে আমাকে না দেখে ঈমান আনলো তার জন্য অনেক বেশি সুসংবাদ।

উল্লিখিত হাদীস ও বর্ণনাগুলো দ্বারা বুঝা গেল যে, اِيْمَانٌ بِالْغَيْبِ -এর বড় মর্যাদা ও মূল্য অধিক। -[প্রাগুক্ত]

قَوْلُهُ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ : ঈমান বিল গায়েবকে মুত্তাকীদের প্রথম পরিচয় রূপে তুলে ধরার পর দ্বিতীয় পরিচয় হিসাবে বলা হয়েছে যে, বাস্তবজীবনে সালাতের প্রতি তারা নিষ্ঠাবান। إِقَامَة বা প্রতিষ্ঠা অর্থ শুধু নামাজ আদায় করা নয়; বরং নামাজকে সকল দিক দিয়ে ঠিক করাকে প্রতিষ্ঠা করা বলা হয়। ইকামত অর্থে নামাজের সকল ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, মোস্তাহাব পরিপূর্ণভাবে আদায় করা, এতে সব সময় সুদৃঢ় থাকা এবং এর ব্যবস্থাপনা সুদৃঢ় করা– সবই বুঝায়। ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও নফল প্রভৃতি সকল নামাজের জন্য একই শর্ত। এক কথায় নামাজে অভ্যস্ত হওয়া ও তা শরিয়তের নিয়ম মতো আদায় করা এবং এর সকল নিয়ম-পদ্ধতি যথার্থভাবে পালন করাই ইকামতে সালাত। মুফাসসির (র.) يَأْتُوْنَ بِهَا بِحُقُوْقِهَا বলে এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ يَأْتُوْنَ بِهَا بِحُقُوْقِهَا : বিজ্ঞ মুফাসসির (র.) এ দুটি মাত্র শব্দে ইকামতে সালাতের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। নামাজের দু ধরনের হক রয়েছে। যথা–

১. জাহেরী বা বাহ্যিক হক। যেমন– নামাজের শর্ত, আদাব ও রোকনসমূহ।

২. বাতেনী বা আভ্যন্তরীণ হক। যেমন– খুশু, খুজূ ও ইখলাস ইত্যাদি। এ সব ধরনের হক আদায় করে নামাজ পড়াকেই إِقَامَةُ الصَّلٰوةِ বলা হয়।

اَیْ بِحُقُوْقِهَا الظَّاهِرَةِ كَالشُّرُوْطِ وَالْاٰدَابِ وَالْاَرْكَانِ وَالْبَاطِنَةِ كَالْخُشُوْعِ وَالْخُضُوْعِ وَالْإِخْلَاصِ - (صَاوِی ص١٢ ج١)

প্রকৃত নামাজ : আমলের ক্ষেত্রে يُؤَدُّوْنَ الصَّلٰوةَ -এর স্থলে يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ বলা হয়েছে, মুফাসসির জালাল (র.) এ সূক্ষ্মতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, শুধু নামাজ আদায়ই উদ্দেশ্য নয়; বরং সকল জাহিরী শর্ত ও বাতিনী নিয়মাবলির সাথে নামাজ আদায় করাই উদ্দেশ্য, যার মধ্যে সুন্নত ও মোস্তাহাবসমূহের পরিপূর্ণতার পূর্ণাঙ্গ উদাহরণ, বাতিনী নিয়মাবলি, নম্রতা ও শিষ্টতা আন্তরিকতা সবই থাকবে, যে নামাজ إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ -এর সত্যায়ন হবে। মূল তত্ত্ববিহীন ও আত্মাবিহীন নামাজ, যাকে মূলত নামাজের বাহ্যিক আকৃতি বলা হয়– সে নামাজ উদ্দেশ্য নয়, যে নামাজের ব্যাপারে فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ -এর শাস্তির প্রতিজ্ঞা বা ধমকি রয়েছে।

قَوْلُهُ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ : মুত্তাকীদের তৃতীয় গুণ-বৈশিষ্ট্য এই যে, আল্লাহ বাহ্যিক ও আত্মিক যত নিয়ামতই তাদের দিয়েছেন, তারা সেগুলোকে আল্লাহরই দীনের জন্য, সত্যের পথে ব্যয় করে; আল্লাহর নাফরমানিতে গর্হিত কাজে ব্যয় করে না।

قَوْلُهُ يُنْفِقُوْنَ : আল্লাহর পথে ব্যয় অর্থে এখানে ফরজ, ওয়াজিব এবং নফল দান-খায়রাত প্রভৃতি যা আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় ব্যয় করা হয়, সে সবকিছুই বোঝানো হয়েছে। কুরআনে সাধারণত إِنْفَاق শব্দ নফল দান-খয়রাতের জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। যেখানে ফরজ জাকাত উদ্দেশ্য সেসব ক্ষেত্রে زَكٰوة শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

উল্লেখ্য এ আয়াতে مِمَّا শব্দ যোগ করে একথা বোঝানো হয়েছে যে, যে ধন-সম্পদ আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, তা সবই ব্যয় করতে হবে এমন নয়, বরং কিয়দংশ ব্যয় করার কথাই বলা হয়েছে। –[তাফসীরে মা'রিফুল কুরআন : মুফতি শফী (র.)]

قَوْلُهُ رَزَقْنٰهُمْ : رِزْق -এর আভিধানিক অর্থ অংশ। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ (الواقعة : ٨٢) আর এই নিয়ামতে তোমরা নিজেদের এই অংশ নির্দিষ্ট করে রেখেছ যে, তাকে তোমরা মিথ্যা মনে করছ, অবিশ্বাস করছ?

رِزْق শব্দটি আরবি ভাষায় এত ব্যাপক যে, বাহ্যত ও আত্মিক সর্ব প্রকার দান ও নিয়ামত এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন বাহ্যিক ও বস্তুগত সম্পদ, স্বাস্থ্য, সন্তান এবং আভ্যন্তরীণ ও আত্মিক যেমন– জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিশুদ্ধ বোধ ইত্যাদি। এমনকি সে নিয়ামত দুনিয়ারও হতে পারে, আখিরাতেরও হতে পারে।

ফায়দা : রিজিককে নিজ সত্তার সাথে সম্পৃক্ত করে আল্লাহ তা'আলা বলে দিলেন, যত প্রকারের এবং যত পরিমাণের নিয়ামতই মানুষ পেয়ে থাকে, সবই আল্লাহ তা'আলার দান ও করুণার ফল, মানুষের নিজস্ব কিছুই নেই। –[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ৩৩]

আরো চিন্তার বিষয় হলো, এখানে ব্যয় করতে বলা হয়েছে আল্লাহ তা'আলার দেওয়া রিজিক থেকে। এ থেকে বোঝা যায়, 'রিজিক' নাম হতে পারে শুধু মুবাহ [অ-নিষিদ্ধ] রিজিকের। নিষিদ্ধ রিজিক এই পর্যায়ে গণ্য নয়। যা অপহরণ করা হয়েছে এবং যা অন্যের উপর জুলুম করে নেওয়া হয়েছে, তা রিজিক গণ্য হতে পারে না। কেননা তা আল্লাহ তাকে রিজিক হিসেবে দেননি। তার রিজিক হলে তা ব্যয় করাও জায়েজ হবে। অন্যকে দান হিসেবে দেওয়া সঙ্গত হবে। তা দিয়ে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের আশা করাও অসমীচীন হবে না। কিন্তু মুসলিম সমাজ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, অপহরণকারীর অপহৃত

মাল-সম্পদ সদকা করা হারাম। নবী করীম ﷺ তাই বলেছেন- لَا تُقْبَلُ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُوْلٍ অর্থাৎ "অপহৃত ধন-মালের সদকা কবুল হয় না।" -[আহকামুল কুরআন সূত্রে মাআরিফুল কুরআন : মুফতী শফী (র.)]

মুফাসসির (র.)-এর أَعْطَيْنَاهُمْ শব্দেও এ দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা হাশিয়ায়ে জামালে أَعْطَيْنَاهُمْ -এর অর্থ مَلَّكْنَاهُمْ করা হয়েছে।

জাকাতের তত্ত্ব : মানুষ যেহেতু স্বভাবগত দিক দিয়ে কৃপণ হয়, নিজ রক্ত ও ঘর্মসিক্ত পরিশ্রমের দ্বারা উপার্জিত একটি পয়সাও কাউকে দেওয়া সহ্য করতে পারে না, চামড়া ছিলে যাক তবু অর্থের উপর আঘাত না আসুক। তাই আল্লাহ তা'আলা অর্থ ব্যয়ের এমন চিত্তাকর্ষক শিরোনাম রেখেছেন, যদ্দ্বারা এ ত্যাগ সহজ হয়. অর্থাৎ এগুলো আমারই দেওয়া সম্পদ. যেগুলোকে ব্যয় করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। মায়ের গর্ভ থেকে উলঙ্গ দেহ শূন্য হাতে আসে. তারপরও যদি সম্পদ উপার্জনের উপর অহংকার থাকে, তবে স্মরণ রাখা উচিত যে. উপার্জনের ক্ষমতা তো আমারই দেওয়া। তারপরও এ ধারণা বা অহংকার কেন? আমি যদি সমস্ত উপার্জন তলব করতাম. তাও তো ঠিক ও ন্যায়সঙ্গত ছিল।

شعر : جان دی، دی ہوئی اسکی تھی ـ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا ـ

অর্থ : প্রাণ দিয়েছ. প্রাণ তো তারই দেওয়া ছিল, সত্য ও সঠিক এটা যে. হক্ব [প্রাপ্য] আদায় [পরিশোধ] হয়নি।

-[কামালাইন খ. ১, পৃ. ২১]

ট্যাক্স কঠিন না কি জাকাত কঠিন? : সর্বপ্রকার সম্পদের উপর জাকাতের নির্দেশ দেওয়া হয়নি, শুধু এক বিশেষ প্রকার, অর্থাৎ যেসব সম্পদে জাকাতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সকল প্রয়োজন থেকে পূর্ণ এক বছর [বেশি] উদ্বৃত্ত থাকে, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের পর শতকরা আড়াই টাকা নেয়. যা সরকারের ধার্যকৃত ট্যাক্সসমূহের মোকাবিলায় অতি নগণ্য একটি পরিমাণ।

মোটকথা জাকাতের সূচনায় সহজ করাও লক্ষ্য, আর খরচের মিতাচারের শিক্ষা দেওয়াও লক্ষ্য, যা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- সৎকাজে ব্যয় করো. অতিরিক্ত ও নাম ছড়ানোর স্থানে ব্যয় করো না এবং এত অধিক ব্যয় করো না যে, আগামীতে তুমি স্বয়ং মুখাপেক্ষী হয়ে অন্যের কাছে হাত বাড়াতে যাও। উপরিউক্ত দু'টি সূক্ষ্মতা مِنْ তাবঈযিয়্যাহ দ্বারা বুঝে আসলো।

সাধারণ মু'মিনগণ চল্লিশ টাকা থেকে শুধু একটি টাকা জাকাত দেয়, আর বিশেষ মু'মিনগণ চল্লিশ টাকা থেকে এক টাকা স্বয়ং রাখেন, আর অবশিষ্ট ঊনচল্লিশ টাকা দান করে দেন। কিন্তু বিশিষ্টতর লোকেরা জানমাল সব আল্লাহর পথে দান করেছেন। তাঁদের দৃষ্টিতে مِنْ তাবঈযিয়্যাহ নয়; বরং বয়ানিয়াহ। -[প্রাগুক্ত]

বিদ্যার জাকাত : এমনইভাবে مَا رَزَقْنٰهُمْ -এর ব্যাপকতার মধ্যে প্রকাশ্য ও গোপন ইলমের উপকার পৌঁছানোও গণ্য, অর্থাৎ একজন আলেম ও শায়খের উপরও ইলমের দৌলত এবং বাতিন থেকে শিক্ষার্থীদেরকে দান করা অতীব জরুরি। -[প্রাগুক্ত]

فِيْ طَاعَةِ اللّٰهِ : এখানে فِيْ হরফটি تَعْلِيْل বা কারণ বর্ণনা উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে-

اَيْ يُنْفِقُوْنَ مِنْ اَجْلِ طَاعَةِ اللّٰهِ لَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً ـ

জ্ঞাতব্য : আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের গুণাগুণ বর্ণনা করতে গিয়ে প্রথমে اِيْمَانٌ بِالْغَيْبِ-এর আলোচনা করেছেন। তারপর اِقَامَتْ صَلٰوة তারপর اِنْفَاقٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ-এর আলোচনা করেছেন। প্রথমত ঈমানের আলোচনা এসেছে أَصْلُ الْأُصُوْلِ হিসেবে। কেননা এটি সকল আমলের মূলভিত্তি। তারপর আমলের আলোচনা এসেছে কারণ তাকওয়া এবং পরিপূর্ণ ঈমানের জন্য আমলেরও প্রয়োজন রয়েছে।

এখানে একটি প্রশ্ন জাগে, তাহলো আমলের পরিধি তো অনেক দীর্ঘ। ফরজ ওয়াজিব ইত্যাদির সংখ্যা অধিক। এতদসত্ত্বেও আমলসমূহের মধ্যে শুধু দুটি আমল তথা নামাজ ও আল্লাহর পথে ব্যয়ের কথা বলে ক্ষান্ত করার কারণ কি?

উত্তর : মানুষের জিম্মায় যতগুলো আমল ওয়াজিব বা ফরজ হিসেবে আরোপিত রয়েছে, সেগুলোর সম্পর্ক হয়ত মানুষের 'যত' তথা শরীর ও সত্তার সাথে সম্পৃক্ত। শারীরিক ইবাদতের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো নামাজ। আর্থিক ইবাদতের সকল শাখা-প্রশাখা اِنْفَاق শব্দের মাঝে নিহিত রয়েছে। তাই দু'টি আমলের কথা উল্লিখিত হলেও সমস্ত আমলই তাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সুতরাং আয়াতের মর্ম হবে এই মুত্তাকী ঐসকল লোক, যাদের ঈমান পরিপূর্ণ হওয়ার পাশাপাশি আমলও পরিপূর্ণ। আর ঈমান-আমলের সমষ্টিই হলো ইসলাম। যেন এ আয়াতে ঈমানের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের প্রকৃত মর্মের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে।

٤. وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ أَيِ الْقُرْاٰنِ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ أَيِ التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَغَيْرِهِمَا وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ يَعْلَمُوْنَ .

٥. أُولٰئِكَ الْمَوْصُوْفُوْنَ بِمَا ذُكِرَ عَلٰى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ اَلْفَائِزُوْنَ بِالْجَنَّةِ النَّاجُوْنَ مِنَ النَّارِ .

অনুবাদ :

৪. এবং যারা বিশ্বাস করে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে অর্থাৎ কুরআনুল কারীম এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে [তাতে] অর্থাৎ তাওরাত, ইঞ্জীল ইত্যাদি আসমানি কিতাবসমূহে ও পরলোকে যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী অর্থাৎ নিশ্চিত বলে প্রত্যয় করে।

৫. তারাই অর্থাৎ উল্লিখিত গুণাবলিতে গুণান্বিতরা তাদের প্রতিপালক নির্দেশিত পথে অধিষ্ঠিত এবং তারাই সফলকাম জান্নাত অর্জন করে সফলকাম ও জাহান্নাম হতে মুক্তি লাভকারী।

তাহকীক ও তারকীব

اَلَّذِيْنَ দ্বিতীয় মউসূল, مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ মা'তূফ আলাইহি, مَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ মা'তূফ, উভয়টি মিলে يُؤْمِنُوْنَ -এর মাফউল হয়েছে, এটা পুরো জুমলা হয়ে সেলা হয়েছে এবং প্রথম اَلَّذِيْنَ -এর উপর আতফ্ হয়েছে। أُولٰئِكَ মুবদাতা এবং عَلٰى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ জরফে লাগ্ব খবর, এমনিভাবে দ্বিতীয় أُولٰئِكَ মুবতাদায়ে ছানী, هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ তার খবর, দু'টি জুমলা মা'তূফ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ :

যোগসূত্র : এ অংশটুকু প্রথম اَلَّذِيْنَ -এর সাথে عَطْف হয়েছে। এরা হলো মুত্তাকীদের দ্বিতীয় প্রকার। এ আয়াত তাদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে যারা হযরত ঈসা (আ.)-এর উপর ঈমান এনেছিল এবং আখেরী নবী ﷺ -কে পেয়ে তাঁর প্রতিও ঈমান এনেছিল। যেমন– হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম, আম্মার ইবনে ইয়াসার, সালমান ফারসী ও নাজ্জাসী প্রমুখ। আর প্রথম প্রকার হলো আরবের মুশরিকরা। যাদের কাছে হযরত মুহাম্মদ ﷺ ব্যতীত কোনো নবী আগমন করেনি। প্রথম আয়াত তাদের সম্পর্কেই নাজিল হয়েছে। –[ছাবী খ. ১, পৃ.১৩]

قَوْلُهُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ : **প্রশ্ন :** এখান أُنْزِلَ তথা মাজির সীগা ব্যবহার করা হলো কেন? অথচ তখন পূর্ণ কুরআন নাজিল হয়নি; বরং কিছু অংশ নাজিলের অপেক্ষায় ছিল।

উত্তর : এর জবাবে আল্লামা ছাবী বলেন– نُزِّلَ الْمُسْتَقْبِلُ مَنْزِلَةَ الْمَاضِىْ لِتَحَقُّقِ الْوُقُوْعِ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ تَمَّ نُزُوْلُهُ .(صاوى) অর্থাৎ যেগুলো এখনো অবতীর্ণ হয়নি, সেগুলো অবতরণ অবশ্যম্ভাবী হওয়ার কারণেই مُسْتَقْبِلْ -কে মাজির স্থলে রাখা হয়েছে। –[হাশিয়ায়ে সাবী খ. ১, পৃ. ১৩]

আল্লামা সুলায়মান আল জামাল (র.) বলেন–

وَالتَّعْبِيْرُ عَنْ اِنْزَالِهِ بِالْمَاضِىْ مَعَ كَوْنِ بَعْضِهِ مُتَرَقَّبًا حِيْنَئِذٍ لِتَغْلِيْبِ الْمُحَقَّقِ عَلَى الْمُقَدَّرِ

অর্থাৎ আরবি নিয়ম تَغْلِيْب হিসেবে এমনটি করা হয়েছে। অর্থাৎ নাজিলকৃত আয়াতসমূহকে নাজিল করা হয়নি এমন আয়াতের উপর প্রাধান্য দিয়ে এভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন কুরআনের অন্য আয়াতে জিনদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে– إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى (الاحقاف : ٣٠) অথচ জিনেরা তখন পূর্ণ কুরআন শ্রবণ করেনি। এমনকি তখন পূর্ণ কুরআন নাজিলও হয়নি। সেখানে একই নিয়মে বলা হয়েছে। –[হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১, পৃ. ১৯]

ফায়দা : এ আয়াতের বর্ণনা রীতিতে মৌলিক বিষয়ে মীমাংসাও প্রসঙ্গক্রমে বলা দেওয়া হয়েছে। তারা হচ্ছে হুজুর ﷺ -ই শেষনবী এবং তাঁর নিকট প্রেরিত ওহীই শেষ ওহী। কেননা কুরআনের পরে যদি কেনো আসমানী কিতাব অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকতো, তবে পরবর্তী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার কথাও একইভাবে বলা হতো; বরং এর প্রয়োজনই ছিল

বেশি। কেননা তাওরাত ও ইঞ্জীলসহ বিভিন্ন আসমানি কিতাবের প্রতি ঈমান তো পূর্ব থেকেই বর্তমান ছিল এবং এগুলো সম্পর্কে কম-বেশি সবাই অবগতও ছিল। তাই হুজুর ﷺ-এর পরেও যদি ওহী ও নবুয়তের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রায় হতো, তবে অবশ্যই পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ এবং নবী রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনার বিষয়টির মতো পরবর্তী কিতাবও নবী-রাসূলের প্রতি ঈমান আনার বিষয়টিরও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন হতো, যাতে পরবর্তী লোকেরা এ সম্পর্কে বিভ্রান্তির কবল থেকে নিরাপদ থাকতে পারে।

কিন্তু কুরআনের যেসব জায়গায় ঈমানের উল্লেখ রয়েছে, সেখানেই পূর্ববর্তী নবীগণের এবং তাদের প্রতি প্রেরিত কিতাবসমূহেরও উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু কোথাও পরবর্তী কোনো কিতাবের উল্লেখ নেই। কুরআন মাজীদে এ বিষয়টি অন্যূন পঞ্চাশটি স্থানে উল্লেখ রয়েছে। সর্বত্রই হযরত ﷺ -এর পূর্ববর্তী নবী ও ওহীর কথা বলা হলেও কোনো একটি আয়াতেও পরবর্তী কোনো ওহীর উল্লেখ তো দূরের কথা, কোনো ইশারা-ইঙ্গিতও দেখা যায় না।

–[মা'আরিফুল কুরআন : মুফতি মুহাম্মদ শফী (র.)]

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ : অর্থাৎ অন্যান্য নবীদের উপর, তাঁরা যে দেশের যে জাতির এবং যে সময়েরই হোন। এখানে কুরআন এটা পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, খোদায়ী বাণী তথা হেদায়েত ও তাবলীগের এ ধারা নতুন জন্মলাভ করা কিছু নয়; বরং পৃথিবীর বুকে মানুষের প্রথম পদচারণা থেকেই তার সূচনা। পৃথিবীতে মানুষের নিবাস যত প্রাচীন, ওহী খোদায়ী বাণীর বয়সও তত প্রাচীন। সুতরাং শুধু আখেরী নবীর প্রতি ঈমানই মু'মিনের জন্য যথেষ্ট নয়; বরং এক কথায় হলেও সকল নবী-রাসূলের উপরও ঈমান আনতে হবে। সুতরাং মুত্তাকীদের পঞ্চম পরিচয় হলো, ইহুদি-খ্রিস্টান জাতির বিপরীতে অন্যান্য নবী-রাসূলের বাণী এবং শিক্ষায়ও তারা ঈমান পোষণ করে। –[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ৩৩]

قَوْلُهُ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ : اَلْاٰخِرَةُ অর্থ দারুল আখিরাত বা আলমে আখিরাত তথা পরকাল বা পরজগৎ, যা বর্তমান জীবনধারার অবসানের পর শুরু হবে। তাকে আখিরাত বলা হয় শুধু এজন্য যে, এই জড় জীবনের অবসানের পর তার সূচনা হবে। শাস্তি ও পুরস্কারের জন্য স্বতন্ত্র একটি দিবস সমাগত, এটা ঈমান ও বিশুদ্ধ দীনের অপরিহার্য অঙ্গ। এখানে ঐসব বাতিল ধর্মকে খণ্ডন করা হয়েছে, যেগুলো নামে ধর্ম হলেও কর্মে ও প্রতিদানেই বিশ্বাসী নয়। অথবা বিশ্বাসী হলেও এই পৃথিবীকেই তার প্রতিদানক্ষেত্র মনে করে। নব্য বাতিলপন্থি দল কাদিয়ানীরা এর তরজমা করেছে শেষ যুগের ওহী বলে, যাতে তাদের মনগড়া নবুয়তের লাইসেন্স কুরআন থেকেই সংগ্রহ করা যায়। এটা আরবি ভাষার সাথে বিদ্রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়।

–[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ৩৪]

قَوْلُهُ يُوْقِنُوْنَ : يُوْقِنُوْنَ শব্দটি اِيْقَانٌ থেকে নির্গত। يَقِيْن বলা হয়– اِتْقَانُ الْعِلْمِ بِنَفْيِ الشَّكِّ وَالشُّبْهَةِ عَنْهُ نَظَرًا وَاسْتِدْلَالًا অর্থাৎ সন্দেহ ও সংশয় দূর করে দলিল প্রমাণের মাধ্যমে ইলমকে সুদৃঢ় করা, اِيقان বা يقين -এর অর্থ কোনো বিষয় নিছক যুক্তিতর্কে ধরাশায়ী হয়ে মেনে নেওয়া কিংবা অগভীর ও ভাসা ভাসাভাবে মগজ থেকে শুধু শব্দসর্বস্ব স্বীকৃতি দেওয়া নয়, যেমনটি প্রায়শ ঘটে দার্শনিক বাদ-মতবাদের ক্ষেত্রে; বরং এ একীন অর্থ হলো– মনে-প্রাণে এমনভাবে বিশ্বাস করা যে, ইচ্ছা, অনুভূতি ও মস্তিষ্ক সব কিছু তাতে বিস্তার লাভ করবে। মোটকথা সন্দেহাতীত জ্ঞানকে একীন বলা হয়।

–[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ৩৪]

وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ : একীন এমনিতেই নিছক জ্ঞানের তুলনায় বলীয়ান। তার স্থান জ্ঞানের অনেক ঊর্ধ্বে তদুপরি এখানে جَارّ مَجْرُوْر -কে حَصْر -এর আগে আনা হয়েছে -এর জন্য। সেই সাথে هُمْ -এর সংযোজন তা আরো কয়েক গুণ বর্ধিত করে দিয়েছে। সুতরাং অর্থ দাঁড়ায়, মুত্তাকী মু'মিনদের কাছে আখিরাত এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, ঐ একটি বিষয়েই যেন তারা ঈমান পোষণ করে। –[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ৩৪]

আর বাক্যটি جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ রূপে ব্যবহার করার কারণ এই যে, আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস اِنْفَاق থেকেও উচ্চতর।

قَوْلُهُ اُولٰئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ : সূরা ফাতিহায় বান্দার ভাষায় اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ বলে সিরাতুল মুস্তাকীম লাভের প্রার্থনা করা হয়েছিল। বান্দার প্রার্থনা মঞ্জুর করে আল্লাহ নাজিল করলেন হেদায়েতগ্রন্থ আল-কুরআন। ইরশাদ করলেন– هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ তারপর বলে দেওয়া হলো যাদের মাঝে ৬টি গুণ বা আলামত পাওয়া যাবে, তারাই হেদায়েতপ্রাপ্ত।

قَوْلُهُ يَعْلَمُوْنَ : يُوْقِنُوْنَ -এর ব্যাখ্যায় মুফাসসির (র.) يَعْلَمُوْنَ শব্দ উল্লেখ করে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। সেটি হলো– يَقِيْن তিন প্রকার। ১. عِلْمُ الْيَقِيْنِ ২. عَيْنُ الْيَقِيْنِ ৩. حَقُّ الْيَقِيْنِ একটি উদাহরণের মাধ্যমে প্রত্যেকটির পরিচয় ও স্বরূপ ফুটে উঠবে। যেমন কোন ব্যক্তি কারো কাছ থেকে জানল যে, আগুন বস্তুকে পুড়িয়ে দেয়। এ অবস্থার বিশ্বাসকে বলে عِلْمُ الْيَقِيْنِ তারপর বস্তুকে আগুনে জ্বলে যেতে দেখল।

এ অবস্থার বিশ্বাসকে বলে عَيْنُ الْيَقِيْنِ বলে। তারপর সে নিজেই নিজের আঙ্গুল আগুনে দিয়ে দেখল যে, বাস্তবেই আগুন পুড়িয়ে দেয়। এ অবস্থার বিশ্বাসকে বলে حَقُّ الْيَقِيْنِ

এ পর্যায়ের একীন ও বিশ্বাস সকলের দ্বারা সম্ভব হবে না। কেবল নবীগণই এমন একীনের অধিকারী হতে পারেন। এ সমস্যার কারণে মুফাসসির (র.) يَعْلَمُوْنَ শব্দ উদ্দেশ্য করে বুঝিয়ে দিলেন যে, শরিয়তের উসূলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এখানে يَقِيْن -এর তিনটি স্তর থেকে এখানে প্রথম স্তর তথা عِلْمُ الْيَقِيْنِ -ই উদ্দেশ্য।

–[শায়খুল হাদীস মাওলানা আলতাফ হুসাইন [দা. বা.]-এর মুখনিঃসৃত]

عَلٰى هُدًى : عَلٰى হরফে জর। اِسْتِعْلَاء -এর অর্থে গঠিত। যেমন বলা হয়– زَيْدٌ عَلَى السَّطْحِ যায়েদ ছাদের উপর। কিন্তু এখানে عَلٰى তার হাকীকী বা প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত নয়। কেননা هُدًى বা هِدَايَت একটি مَعْنَوِى বস্তু। এটি কোন حِسِّى তথা অনুভব করার বা ধরা ছোঁয়ার জিনিস নয়। অথচ اِسْتِعْلَاء، حَقِيْقِى -এর জন্য مُسْتَعْلٰى عَلَيْه টা حِسِّى হওয়া আবশ্যক। সুতরাং বুঝা গেল এখানে عَلٰى -এর ব্যবহার حَقِيْقِى অর্থে হয়নি; বরং اِسْتِعَارَة تَبْعِيَّة হিসেবে হয়েছে। এভাবে যে, মুত্তাকীকে হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে, যে ব্যক্তি কোনো সওয়ারীর উপর রয়েছে। এভাবে তাশবীহ দিয়ে বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হলো যে কোনো مَعْقُوْلِى বস্তুকে مَحْسُوْسِى বস্তুর আকৃতিতে পেশ করা হলে হৃদয়পটে অধিক পরিমাণে রেখাপাত করে; আর এখানে عَلٰى ব্যবহার করে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ সকল লোক হেদায়েতকে পরিবেষ্টন করে আছে এবং হেদায়েতের উপর মজবুতভাবে স্থির আছে। –[মাআরিফুল কুরআন : ইদরীস কান্ধলভী (র.) খ. ১, পৃ. ৫]

هُدًى : এখানে هُدًى শব্দটিকে نَكِرَه ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হলো হেদায়েতের মর্যাদা ও গুরুত্ব বুঝানো

قَوْلُهُ مِنْ رَبِّهِمْ : جَارّ এবং مَجْرُوْر মিলে ظَرْف مُسْتَقِرّ হয়ে هُدًى -এর সিফত।

প্রশ্ন: مِنْ رَبِّهِمْ থেকে বুঝা গেল যে, হেদায়েত দ্বারা আল্লাহর হেদায়েত উদ্দেশ্য এবং হেদায়েতদাতা হলেন আল্লাহ তা'আলা। অথচ একথাটি مِنْ رَبِّهِمْ উল্লেখ না করলেও বুঝে আসে। কেননা কুরআনের আয়াত اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ الخ -এর মাঝে অন্যের থেকে হেদায়েতকে নাচক করা হয়েছে এবং وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ -এর মাঝে তা শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই সাব্যস্ত করা হয়েছে। যা দ্বারা বুঝা যায় হেদায়েত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে পাওয়া যায় না। অধিকন্তু এখানে هُدًى -কে نَكِرَه ব্যবহার করে বড় ধরনের হেদায়েতকে বুঝানো হয়েছে। যা অন্য কারো কাছে পাওয়া যাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। অতএব এখানে مِنْ رَبِّهِمْ বলার প্রয়োজন বা হেকমত কি?

উত্তর : এখানে مِنْ رَبِّهِمْ শব্দটি تَعْيِيْن هَادِى বা হেদায়েতকারীকে নির্ণয় করার জন্য ব্যবহৃত হয়নি; বরং **هُدًى -এর মাঝে نَكِرَه** হিসেবে যে تَعْظِيْم বা সম্মান ও বড়ত্বের অর্থ রয়েছে, তাকে আরো জোরদার করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আর তা এভাবে যে এ হেদায়েতের সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলার সাথে। তিনিই তা প্রদানকারী। আর যে জিনিস আল্লাহর সাথে **সম্পৃক্ত, তা খুবই মর্যাদাপূর্ণ।**

قَوْلُهُ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ : مُفْلِح ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে স্বীয় লক্ষ্যে ভালোভাবে পৌঁছতে সক্ষম হয় এবং এতে কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা ও ত্রুটি দেখা দেয় না।

اَلْمُفْلِحُوْنَ -এর পূর্ণ ভাব প্রকাশ করা কঠিন। আরবি অভিধান শাস্ত্রের ইমাম যুবায়দীর মতে আরবি ভাষায় সমগ্র কল্যাণ বোঝানোর জন্য فَلَاح -এর চেয়ে উত্তম ও সমৃদ্ধ কোনো শব্দ নেই। –[তাফসীর মাজেদী : খ. ১, পৃ. ৩৫]

هُمْ শব্দটি এখানে একদিকে পার্থক্যকারী ভূমিকা পালন করেছে। [যাতে اَلْمُفْلِحُوْنَ খবরটি صِفَة বলে ভ্রম না হয়] অপরদিকে নিসবত বা বাক্যসংযোগকে জোরদার করেছে এবং اَلْمُفْلِحُوْنَ মুসনাদটি اُولٰئِكَ মুসনাদ ইলাইহির সাথে সম্পৃক্ত, এ কথা বুঝিয়ে দেয়।

ফায়দা : اُولٰئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ -এর মাঝে ঈমান এবং তাকওয়ার পার্থিব ফলাফলের বর্ণনা রয়েছে। আর اُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -এর মাঝে তার পরকালীন ফলাফলের বর্ণনা রয়েছে। –[মাআরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্ধলভী (র.) খ. ১, পৃ. ৪৭]

আম্বিয়া (আ.) -এর সত্যায়নের ব্যাখ্যা : নবী করীম ﷺ -এর উপর যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে, চাই সেটা ওহীয়ে مَتْلُو [কুরআন] হোক কিংবা ওহীয়ে غَيْر مَتْلُو [হাদীস] হোক অথবা সেগুলো থেকে উদ্ভাবনকৃত ফিকহী ও শরয়ী বিধানাবলি হোক, একজন মুসলমানের জন্য যেমনভাবে সেসবকে মানা অত্যাবশ্যক, তেমনিভাবে এ বিশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যক যে, নিজ নিজ যুগে যে সকল পয়গাম্বর (আ.) হেদায়েত ও শিক্ষাসমূহ নিয়ে জগতে আগমন করেছেন, তাঁরা সকলে নিজ নিজ স্থানে সত্য ও সঠিক ছিলেন। পরবর্তী সময়ে লোকেরা যা কিছু এর মধ্যে ভেজাল করেছে– সেগুলো নিঃসন্দেহে ভুল ও নাজায়েজ।

অবশেষে আল্লাহ তা'আলা সাময়িক, অস্থায়ী ও সীমিত বিধানাবলিকে খত্‌ম করে একটি বলিষ্ঠ ও স্থায়ী; বরং আন্তর্জাতিক বিধান [কুরআন] দিয়ে নবী করীম ﷺ -কে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন এবং আমাদেরকে শুধু তাঁর অনুকরণ, ও বাধ্যগত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। এ হচ্ছে ইসলামি তা'লীমের [শিক্ষার] সারমর্ম।

সুতরাং ইসলামে প্রবেশ হওয়ার জন্য যেমনিভাবে নবী করীম ﷺ -এর সত্যায়ন অত্যাবশ্যক, তেমনিভাবে অতীতের সকল ধর্ম ও সকল নবী (আ.)-এর সত্যায়ন অপরিহার্য। কেননা সকল পয়গাম্বর (আ.)-এর নবুয়ত একই ছিল, তাই এক নবীকে মিথ্যাবাদী বলা অন্যান্য সকল নবী কে মিথ্যাবাদী বলার সমতুল্য, যা বাস্তবের পরিপন্থি। এটি ইসলাম ধর্মের একটি পৃথক সৌন্দর্য যে, এর ভিত্তি হচ্ছে সকল পয়গাম্বর (আ.)-কে মেনে নেওয়ার উপর, কাউকে মিথ্যা ও প্রত্যাখ্যান করার উপর নয়; لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ - ইহুদি-নাসারাদের বিপরীত, এজন্য যে, ওরা পরস্পর একে অপরকে যে, শুধু মিথ্যাবাদী বলে ও প্রত্যাখ্যান করে তা-ই নয়; বরং একে অপরের ধর্মকে অস্বীকার করে হয়তো ইহুদি হয় বা খ্রিস্টান হয় وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارٰى عَلٰى شَيْءٍ الخ অর্থ– ইহুদিরা বলে, খ্রিস্টানরা কোনো ভিত্তির উপরেই নয় এবং খ্রিস্টানরা বলে, ইহুদিরা কোনো ভিত্তির উপরেই নয়। –[কামালাইন খ. ১, পৃ. ২২]

দু'টি সূক্ষ্মবিষয় : কিন্তু এ স্থানে দু'টি সূক্ষ্মতা সামনে রাখা উচিত। একটি হচ্ছে যে, অতীতের কিতাবগুলোকে সত্যায়ন দ্বারা উদ্দেশ্য প্রকৃত কিতাবগুলো, বিকৃতগুলো নয়। রদ, পরিবর্তন ও বিকৃত করার পর তো সেগুলো মূলত কালামে এলাহীই থাকেনি।

আর একটি বিষয় হচ্ছে যে, অতীতের আসমানি কিতাবগুলো বিকৃত হওয়ার পূর্বে হক্ব ও সত্য ছিল– বিশ্বাস পোষণকে এতটুকু পর্যন্ত সীমিত রাখা উদ্দেশ্য। সেগুলোকে আমলে বাস্তবায়ন করা অথবা অনুকরণ করা উদ্দেশ্য নয়। কেননা অনুকরণের ব্যাপারটি শুধু রাসূল ﷺ -এর সাথেই নির্দিষ্ট ও খাছ।

উক্ত ধারা মোতাবেক ফিকহী মাসায়েল ও আধ্যাত্মবাদের ক্ষেত্রে অতীত ধর্মগুলোর বুযুর্গ ও পীরমাশায়েখ এবং হেদায়েতের ইমামগণকেও সঠিক ও সত্য বলে বিশ্বাস করতে হবে, তবে এর জন্য শর্ত হচ্ছে তাঁরা যদি তাঁদের নবী (আ.)-এর সুন্নত ও ইখলাছের উপর থাকেন। এটা চির সত্য যে, অনুকরণ ও আনুগত্য শুধু নিজ ইমাম ও শায়খেরই হওয়া উচিত। হ্যাঁ, যদি শায়খ ও ইমামগণ মনের পূজারী ও বিদ'আতী কার্যাবলিতে লিপ্ত হয়, তবে তাদেরকে সত্যায়নও করা যাবে না, তারা সত্যবাদী বলে বিশ্বাসও করা যাবে না এবং তাদের অনুসরণও করা যাবে না। উপরিউক্ত সমস্ত মন্তব্যগুলোর বিশুদ্ধতার প্রমাণ হচ্ছে হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর তওরাত কিতাব পাঠের ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ -এর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা। –[কামালাইন খ. ১, পৃ. ২২]

মুত্তাকীদের প্রকাশ্য পরিচয় : ত্বাকওয়ার নযরী, ইলমী ও جَامِع مَانِع সংজ্ঞা ছাড়া মুফাসসির আল্লাম (র.) সহজ ও পরিষ্কার পন্থা এটা অবলম্বন করেছেন যে, এর সত্যায়ন ও প্রমাণাদি বলে দিয়েছেন এবং একে অনুভবযোগ্য করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, যাদের মধ্যে এসব গুণাবলি পাওয়া যায়, তাঁরাই মুত্তাকী। তাছাড়া عَلٰى শব্দ দ্বারা তাঁদের হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং সরল-সোজা হওয়াকে বলে দিয়েছেন যে, যেমনিভাবে আরোহী সওয়ারীর উপর ক্ষমতাশীল ও প্রতিষ্ঠিত হয়, তদ্রূপ মুত্তাকীগণ হেদায়েতকে সওয়ারির ন্যায় করে নিয়েছেন। এ সংজ্ঞার মধ্যে তাঁদের স্বনির্ভরতা, সঠিক হওয়া ও দৃঢ় হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ হেদায়েতের অনুকরণ করতে করতে তাঁরা এখন হক্ব ও সত্যের কেন্দ্র এবং হেদায়েতের মাপকাঠি হয়ে গেছেন, হেদায়েতের লাগাম যেদিকে তাঁরা ফেরান, হক্ব ঐ দিকে চলে। –[প্রাগুক্ত]

ফেরকায়ে মু'তাযিলাকে খণ্ডন : بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ এবং هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -এর মধ্যে فِعْل -এর জমীর দ্বারা পরিপূর্ণ হেদায়েত ও পরিপূর্ণ কল্যাণের সীমাকে বুঝানো হয়েছে। সাধারণ হেদায়েত ও কল্যাণকে নয়, অর্থাৎ এ হচ্ছে বিশ্বাস ও কল্যাণের পরিপূর্ণতা। তাই এ শব্দগুলো দ্বারা মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের নিজ কর্ম পন্থার উপর দলিল পেশ করা যথাযথ। এজন্য যে, কল্যাণ ও হেদায়েত শুধু ঐ ধরনের ব্যক্তিবর্গের জন্যই খাছ। পাপী মু'মিন অথবা গুনাহগার এর থেকে বহিষ্কৃত ও দোজখের যোগ্য।

মূলকথা হচ্ছে, এখানে সাধারণ কল্যাণের সীমা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়, যার দু'টি তালিকা হবে, একটি কামেল [মু'মিন পাপী নয়], অপরটি নাকেস [মু'মিন পাপী], বরং কল্যাণের পরিপূর্ণতার সীমা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। অতএব, পাপী মু'মিন কল্যাণের পরিপূর্ণতা থেকে অবশ্যই বহিষ্কৃত ও বঞ্চিত থাকবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সাধারণ কল্যাণের নগণ্য একজন হিসেবে থেকে যাবে, এ মতই হচ্ছে আহলে সুন্নতের। –[প্রাগুক্ত]

اَلنَّاجُوْنَ مِنَ النَّارِ : এখানে نَجَات দ্বারা اِبْتِدَاء এবং اِنْتِهَاء উভয় প্রকার নাজাত ও মুক্তি উদ্দেশ্য। অর্থাৎ মুত্তাকীরা শুরু থেকেই অনাদি অনন্তকাল পর্যন্ত জাহান্নাম থেকে বেঁচে থাকবে। পক্ষান্তরে পাপী মুমিনগণ শুরুতে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তারপর পবিত্র হয়ে তা থেকে মুক্তি পাবে।

٦. إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَأَبِيْ جَهْلٍ وَأَبِيْ لَهَبٍ وَنَحْوِهِمَا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَإِبْدَالِ الثَّانِيَةِ اَلِفًا وَتَسْهِيْلِهَا وَإِدْخَالِ اَلِفٍ بَيْنَ الْمُسَهَّلَةِ وَالْأُخْرٰى وَتَرْكُهُ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ لِعِلْمِ اللّٰهِ مِنْهُمْ ذٰلِكَ فَلَا تَطْمَعْ فِيْ اِيْمَانِهِمْ وَالْاِنْذَارُ اِعْلَامٌ مَعَ تَخْوِيْفٍ.

অনুবাদ :

৬. যারা কুফরি করেছে যেমন আবূ জাহেল, আবূ লাহাব ও তাদের মতো অন্যান্যরা তাদের পক্ষে উভয়ই সমান; তুমি তাদেরকে সতর্ক কর ءَأَنْذَرْتَهُمْ -এ ব্যবহৃত হামজাদ্বয়কে অলগ অলগ স্পষ্টভাবে বা দ্বিতীয়টিকে আলিফ -এ রূপান্তরিত করে বা তাকে তাসহীলসহ বা তাসহীলকৃত ও তার পরবর্তী হরফটির মাঝে আলিফ বৃদ্ধি করে বা তাসহীল পরিত্যাগ করে পাঠ করা যায়। বা তাদেরকে সতর্ক না কর, তারা ঈমান আনবে না। যেহেতু এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অবগত আছেন। সুতরাং তাদের ঈমান আনয়নের আর আশা করো না। اَلْاِنْذَارُ অর্থ হুমকি বা ভয় প্রদর্শনসহ কাউকে কোনো বিষয় সম্পর্কে অবহিত করা।

তাহকীক ও তারকীব

إِنَّ হরফে মুশাব্বাহ بِالْفِعْلِ، اَلَّذِيْنَ মউসূল, كَفَرُوْا সেলাহ, উভয়টি মিলে اِسْمٌ، سَوَاءٌ শব্দটি اِسْتِوَاءٌ -এর অর্থে মাসদার, তারপর মরফূ' فَاعِلٌ , এসব মিলে إِنَّ -এর খবর। মূল বাক্য এমন হবে إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُسْتَوٰى عَلَيْهِمْ اِنْذَارُكَ وَعَدَمُهُ এবং لَا يُؤْمِنُوْنَ তাওয়াসসুত اَلِف এর- تَسْهِيْلِ هَمْزَةٍ ثَانِيَةٍ বয়ান, আর وَ اِدْخَال -এর শুরুতে وَاو টি مَعَ -এর অর্থে। অর্থাৎ تَوَسُّطِ اَلِفٍ ...... مَعَ -এর وَتَرْكِهِ - ه যমীরের مَرْجِع - تَسْهِيْل -এর দিকে رَاجِع অর্থাৎ تَرْكِ تَسْهِيْل করা।

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ : سَوَاء মূলত اِسْتِوَاء -এর অর্থে মাসদার। এখানে মাসদার হলেও اِسْم فَاعِل -এর অর্থে اَيْ مُسْتَوٍ عَلَيْهِ - سَوَاء -এর مَحَلِّ اِعْرَاب তিনটি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে–

১. سَوَاء খবরে মুকাদ্দাম এবং اَنْذَرْتَهُمْ الخ হলো খবর।

২. سَوَاءٌ مَصْدَرٌ بِمَعْنٰى اِسْمِ فَاعِلٍ এবং اَنْذَرْتَهُمْ তার ফায়েল।

৩. سَوَاء মুবতাদা মাহযুফের খবর اَيِ الْاَمْرَانِ سَوَاءٌ এবং اَنْذَرْتَهُمْ - سَوَاء -এর তাফসীর বা ব্যাখ্যা।

ءَاَنْذَرْتَهُمْ -এর প্রথম হামজাটি اِسْتِفْهَام تَسْوِيَة -এর জন্য এসেছে। ءَاَنْذَرْتَهُمْ মুবতাদা এবং سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ খবরে মুকাদ্দম। এভাবেও হতে পারে যে, سواء মাসদারের স্থলাভিষিক্ত এবং ءَاَنْذَرْتَهُمْ -এর ফায়েল। উভয়টি মিলে জুমলা হয়ে ان -এর خَبَر

اِنْذَار শব্দের অর্থ হচ্ছে এমন সংবাদ দেওয়া, যাতে ভয়ের সঞ্চার হয়। আর اِبْشَار এমন সংবাদকে বলা হয়, যা শুনে আনন্দ লাভ হয়। সাধারণ অর্থে اِنْذَار বলতে ভয় প্রদর্শন করা বুঝায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শুধু ভয় প্রদর্শনকে ইনজার বলা হয় না; বরং শব্দটি দ্বারা এমন ভয় প্রদর্শন বোঝায়, যা দয়ার ভিত্তিতে হয়ে থাকে। যেভাবে মা সন্তানকে আগুন, সাপ, বিচ্ছু এবং হিংস্র জীবজন্তু হতে ভয় দেখিয়ে থাকেন। 'নাজির' বা ভীতি প্রদর্শনকারী ঐ সমস্ত ব্যক্তি যারা অনুগ্রহ করে মানবজাতিকে যথার্থ ভয়ের খবর জানিয়ে দিয়েছেন। এ জন্যই নবী রাসূলগণের বিশেষভাবে نَذِيْر বলা হয়। কেননা তাঁরা দয়া ও সর্তকতার ভিত্তিতে অবশ্যম্ভাবী বিপদ হতে ভয় প্রদর্শন করার জন্যই প্রেরিত হয়েছেন। নবীগণের জন্য نَذِيْر শব্দ ব্যবহার করে এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যারা তাবলীগের দায়িত্ব পালন করবেন, তাদের কর্তব্য হচ্ছে– সাধারণ মানুষের প্রতি যথার্থ দরদ, মমতা ও সমবেদনা সহকারে কথা বলা।

إِنْذَار এবং إِخْبَارٌ بِالْعَذَابِ-এর মাঝে পার্থক্য :

إِنْذَار ঐ সময়ে ভীতি প্রদর্শনকে বলা হয়, যখন أَمْرٌ مُخَوَّفٌ مِنْهُ [ভয়ংকর বস্তু] থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হয়। অন্যথায় তাকে إِخْبَارٌ بِالْعَذَابِ বলা হবে। −[হাশিয়ায়ে সাবী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا : **যোগসূত্র :** সূরা বাকারার প্রথম পাঁচটি আয়াতে কুরআনকে হেদায়েত গ্রন্থরূপে ঘোষণা করে সকল সন্দেহ ও সংশয়ের **ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়ার** পর সে সমস্ত ভাগ্যবান ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যারা এ গ্রন্থের হেদায়েতে পরিপূর্ণভাবে উপকৃত **ও লাভবান হয়েছেন** এবং যাদেরকে মু'মিন ও মুত্তাকী উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। তাদের বৈশিষ্ট্য, গুণাবলি এবং পরিচয় বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর এখান থেকে পনেরটি আয়াতে এ সমস্ত লোকের কথা আলোচিত হয়েছে, যারা এ হেদায়েতকে অস্বীকার করে **বিরুদ্ধাচারণ** করেছে।

রাসূল ﷺ তীব্রভাবে কামনা করতেন যেন সকল মানুষ মুসলমান হয়ে যায়। এ হিসেবে তিনি চেষ্টাও চালিয়ে যেতেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বলে দেন যে, ঈমান তাদের নসীব হবে না।

কুফর ও কাফেরের পরিচয় : كُفْر-এর শাব্দিক অর্থ গোপন করা। না-শুকরী বা অকৃতজ্ঞতাকেও কুফর বলা হয়। কেননা এতে **ইহসানকারীর** ইহসান গোপন করা হয়। শরিয়তের পরিভাষায় কুফর বলতে বোঝায়, إِنْكَارُ مَا عُلِمَ بِالضَّرُوْرَةِ مَجِيْئُ الرَّسُوْلِ بِهِ যে সমস্ত বিষয়ে বিশ্বাস **স্থাপন করা** ফরজ, এর যে কোনোটিকে অস্বীকার করা। যথা− ঈমানের সারকথা হচ্ছে যে, **রাসূল** ﷺ আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক **প্রাপ্ত ওহীর** মাধ্যমে উম্মতকে যে শিক্ষাদান করেছেন এবং যেগুলো অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে, সেগুলোকে **আন্তরিকভাবে স্বীকার করা** এবং সত্য বলে জানা। কোনো ব্যক্তি যদি এ শিক্ষামালার কোনো একটিকে হক বলে না মানে, তাহলে তাকে **কাফের বলা** যেতে পারে। −[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : কান্ধলভী খ. ১, পৃ. ৪৯]

কুফরের প্রকার : ওলামায়ে কেরাম কুফরের পাঁচটি প্রকার বর্ণনা করেছেন−

১. كُفْر تَكْذِيْب অর্থাৎ নবী রাসূলদেরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা। যেমন− আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন−

وَقَالَ الْكَافِرُوْنَ هٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ . اِنْ كُلٌّ اِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ .

২. كُفْر اِسْتِكْبَار অর্থাৎ অহংকারের **কারণে আল্লাহ** এবং তার রাসূলের হুকুম অমান্য করা ও গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানানো। যেমন− ইরশাদ হয়েছে− اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ

৩. كُفْر اِعْرَاض অর্থাৎ পয়গাম্বরদেরকে সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী কোনোটাই না বলা; বরং উপেক্ষা করা ও মনযোগ না দেওয়া। ইরশাদ হয়েছে−

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّا اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ . قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ . فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِيْنَ

এ আয়াতে উপেক্ষকারীদেরকে কাফের বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

৪. كُفْر اِرْتِيَاب অর্থাৎ পয়গাম্বরদের ব্যাপারে সত্যবাদী কিংবা মিথ্যাবাদী কোনোটাই বিশ্বাস না করা; বরং সন্দেহ ও সংশয় করা। এটাও কুফর। তাই তো কুরআনে وَقَدْ كَفَرَ رَبَّهٗ-এর কারণ বর্ণনা করেছে এভাবে− اِنَّهُمْ كَانُوْا فِيْ شَكٍّ مُرِيْبٍ

৫. كُفْر نِفَاق অর্থাৎ মুখে ঈমানের কথা স্বীকার করা এবং অন্তরে অস্বীকার করা। ইরশাদ হয়েছে−

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ .

এ আয়াত থেকে ১৩টি আয়াত পর্যন্ত এ কুফরে নেফাক সম্পর্কেই আলোচনা হবে।

−[মা'আরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্ধলভী : ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯-৫০]

قَوْلُهُ كَاَبِىْ جَهْلٍ وَاَبِىْ لَهَبٍ وَنَحْوِهِمَا :

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তরের ব্যাখ্যা : মুফাসসির জালাল (র.) كَاَبِىْ جَهْلٍ الخ বলে একটি সন্দেহের উত্তর দিতে চাচ্ছেন। সন্দেহটি হচ্ছে এই যে, আমরা দেখছি যে, দীনের তাবলীগের পর অনেক কাফের ঈমান গ্রহণ করেছে; বরং সকল সাহাবায়ে কেরাম রাসূল ﷺ -এর তাবলীগের পরই ঈমান গ্রহণ করেছেন। তারপর আল্লাহ্ পাকের এ কথা বলা "আপনি সতর্ক করুন কিংবা না করুন এরা ঈমান আনবে না" কিভাবে সঠিক হতে পারে?

উত্তরের সারমর্ম হচ্ছে, এর দ্বারা 'সাধারণ কাফের' উদ্দেশ্য নয়, বরং বিশেষ প্রতিশ্রুত ঐ সকল কাফের উদ্দেশ্য, যাদের জন্য আল্লাহর ইলমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, এরা শেষ পর্যন্ত ঈমান গ্রহণ করবে না; বরং কুফরের উপরই অটল থাকবে। যেমন– আবূ জহল ও আবূ লাহাব প্রমুখ। তাছাড়া سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ দ্বারা উদ্দেশ্য এ নয় যে, এখন আর তাদেরকে দীনের বিধানাবলি শুনানোর এবং তাদের কাছে তাবগীলের প্রয়োজন নেই। কেননা এ তাবলীগ তো রাসূল ﷺ -এর উপর মর্যাদাশীল ফরজ। সুতরাং তারপরও তিনি তাবলীগ বন্ধ করেননি। মুফাসসির (র.) উক্ত সন্দেহকেই দূর করার দিকে فَلَا تَطْمَعْ দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন, অর্থাৎ তাবলীগ ছেড়ে দেওয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং তাদের থেকে [ঈমান গ্রহণের ব্যাপারে] বিশ্বাস ও আশা না রাখার কথা বলা হচ্ছে। কেননা আশার বিপরীত ফল দ্বারা দুঃখ ও বেদনার সম্মুখীন হতে হয়।

আম্বিয়া (আ.)-এর অন্তর যেহেতু স্নেহ ও দয়ায় পরিপূর্ণ থাকে, তাঁরা যদি অধিক মহব্বত ও স্নেহ করে থাকেন, ঈমানের আশা পোষণ করেন, তারপর এর বিপরীত হলে কত বড় ও অসহনীয় দুঃখ তাঁদের মনে আসতে পারে ! তাই এ স্থানে তাবলীগের ব্যাপারে সংযমী হওয়ার তা'লীম দেওয়া হয়েছে। –[কামালাইন খ. ১, পৃ. ২৩]

قَوْلُهُ وَنَحْوِهِمَا : অর্থাৎ আবূ জেহেল ও আবু লাহাবের মত ঐসব লোকও এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত, যাদের ঈমান না আনার বিষয়টি আল্লাহর ইলমে রয়েছে।

তাবলীগের উপকারিতা : কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, এখন তাদের কাছে রাসূল ﷺ আর তাবলীগও করবেন না এবং তার জন্য তাবলীগ করা অযথা ও অর্থহীন কাজ। কেননা অর্থহীন কাজ ঐ সময় বলা হয়– যখন এর মধ্যে কোনো প্রকার উপকার না থাকে, অথচ তার জন্য এ কাজের বিনিময় ও ছওয়াব সদা-সর্বদার জন্যই রয়েছে। তাই سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ বলা হয়েছে, سَوَاءٌ عَلَيْكَ বলা হয়নি। সারকথা হচ্ছে, তাবলীগ রাসূল ﷺ -এর নিজের জন্য উপকারী। কিন্তু আবূ জাহলের ন্যায় লোকদের জন্য নিষ্ফল। –[প্রাগুক্ত]

قَوْلُهُ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ الخ : এখানে أَأَنْذَرْتَهُمْ -এর কেরাতের প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে।

এখানে মোট পাঁচটি কেরাত রয়েছে। যথা–

* উভয় হামজা স্পষ্ট করে পড়বে। এ সূরতে দু'টি কেরাত হবে। এক. দুই হামজার মাঝে আলিফ দাখেল করে পড়বে। দুই. হামজা দাখেল না করে পড়বে।
* দ্বিতীয় হামজা তাসহীল করে পড়বে। এ সূরতেও দু'টি কেরাত। এক. আলিফ দাখেল করে। দুই. আলিফ দাখেল না করে। এ হলো চারটি কেরাত।
* তাসহীল না করে দ্বিতীয় হামজাকে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করে।

উপরিউক্ত পাঁচটি কেরাতকে মুফাসসির (র.) নিম্নোক্ত তারতীবে বর্ণনা করেছেন–

১. بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ (يَعْنِى تَحْقِيْقَ مَحْضٍ بِلَا اِدْخَالٍ)

২. اِبْدَالُ ثَانِيَةٍ بِالْاَلِفِ مَعَ الْمَدِّ ـ

৩. تَسْهِيْلُ مَحْضٍ (بِلَا اِدْخَالِ اَلِفٍ)

৪. تَسْهِيْلُ ثَانِى مَعَ اِدْخَالِ اَلِفٍ ـ

৫. تَحْقِيْقُ الْهَمْزَتَيْنِ مَعَ اِدْخَالِ اَلِفٍ اَىْ تَرْكِ التَّسْهِيْلِ مَعَ اِبْقَاءِ الْاَلِفِ بَيْنَ الْهَمْزَتَيْنِ ـ

أَىْ مَعَ مُدٍّ بَيْنَهُمَا مَدًّا طَبْعِيًّا : تَحْقِيْقُ الْهَمْزَةِ

بِأَنْ تَكُوْنَ بَيْنَ الْهَمْزَةِ وَالْهَاءِ : تَسْهِيْل অর্থাৎ তাসহীল বলা হয় হামজার উচ্চারণ হামজা এবং هَا -এর মাঝামাঝি করা।

অধার্মিকতার অভিযোগ আল্লাহর উপর নয়, বান্দাদের উপর : لَا يُؤْمِنُوْنَ -এর ব্যাপারে এ সন্দেহ করা উচিত হবে না যে, যখন আল্লাহ স্বয়ং তাদের ঈমান গ্রহণ না করার কথা বলেছেন, তার সংবাদের বিপরীত হওয়া যেহেতু অসম্ভব, তাই ঈমান গ্রহণ না করার ক্ষেত্রে এখন তাদেরকে অপারগ মনে করতে হবে এবং তাদের উপর কোনো ধরনের অভিযোগ নেই।

অথচ প্রকৃত তত্ত্ব হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা لَا يُؤْمِنُوْنَ [তারা ঈমান গ্রহণ করাবে না] একথা বলা এমনই, যেমন কোনো ডাক্তার কোনো বিপদসঙ্কুল রোগীকে দেখে তার মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী করে দেয় এবং সে রোগী ডাক্তারের কথানুযায়ী ঐ সময় সত্যিই মরে যায়। তবে এ কারণে ডাক্তারের উপর কোনো অভিযোগ আসবে না। এ কথা বলা যাবে না যে, ডাক্তারের বলার কারণে রোগী মরে গেছে, যদি ডাক্তার না বলতো, তবে মরতো না; বরং এটাই বলা হবে যে, স্বয়ং ডাক্তারের এ কথা বলা "এ সময়ের মধ্যে মরে যাবে" রোগীর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ছিল, যা সঠিক হয়েছে। এমনিভাবে এস্থানে আল্লাহর জানা ও সংবাদকে তাদের অধার্মিকতা ও দুরবস্থার কারণ বলা যাবে না; বরং স্বয়ং তাদের অন্যায় আচরণ, অপকর্ম ও অধার্মিকতাকে আল্লাহর সংবাদের কারণ সাব্যস্ত করা হবে। অর্থাৎ তাদের দুরবস্থার উপর ভিত্তি করে আল্লাহর এ সংবাদ দিয়েছেন, যা সঠিক হয়েছে। -[কামালাইন খ. ১, পৃ. ২৪]

فَلَا تَطْمَعْ فِىْ إِيْمَانِهِمْ : এ ইবারত দ্বারা ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতে রাসূল ﷺ-কে কাফেরদের ঈমানের ব্যাপারে নিরাশ করছেন। প্রশ্ন জাগে যখন তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা বা না করা উভয়টি সমান হলো তাহলে ভীতি প্রদর্শনের উপকারিতা কি?

উত্তর : এর উপকারিতা হলো إِلْزَام حُجَّتْ বা তারা যেন কিয়ামতের দিন কোনো অনুজাত পেশ করতে না পারে। দ্বিতীয় জবাব হলো ভীতি প্রদর্শনের দ্বারা কাফেরদের উপকার না হলেও ভীতির উপকার তাতে নিহিত রয়েছে। দাওয়াত ও তাবলীগের প্রতিদান তিনি প্রাপ্ত হবেন। আর এজন্য আল্লাহ তা'আলা আয়াতে سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ বলেছেন سَوَاءٌ عَلَيْكَ বলেননি।

অধিকাংশ মুফাসসির لَا يُؤْمِنُوْنَ বাক্যকে পূর্ববর্তী বাক্যের ব্যাখ্যা ও তাকীদ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ অবশ্য ভিন্ন একটি তারকীব করেছেন। তা হলো- لَا يُؤْمِنُوْنَ অংশটি إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا মুবতাদার খবর। আর উভয় বাক্যাংশের মাঝে سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ অংশটি جُمْلَة مُعْتَرِضَة বা একটি স্বতন্ত্র ও মধ্যস্থিত বাক্য। অবশ্য মূল বক্তব্যের বিচারে উভয় বিন্যাসই অভিন্ন। -[বায়জাভী পৃ. ২৩]

وَالْإِنْذَارُ إِعْلَامٌ مَعَ تَخْوِيْفٍ : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) إِنْذَار-এর অর্থ বর্ণনা করেছেন। إِنْذَار শব্দটি بَاب إِفْعَال-এর মাসদার। অর্থ কাউকে বস্তুকে ভয় দেখানো। পরিভাষায় إِنْذَار বলা হয় আল্লাহর বিধিবিধান সম্পর্কে সতর্ক করা এবং গুনাহে লিপ্ত হওয়ার শাস্তি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করা।

প্রশ্ন ও উত্তর :

প্রশ্ন : রাসূল ﷺ-এর গুণাবলির মধ্যে بَشِيْر ও نَذِيْر উভয়টি রয়েছে। এখানে إِنْذَار-এর সাথে تَبْشِيْر-ও উল্লেখ করা উচিত ছিল। কিন্তু তা না করে কেবল একটির উপরই ক্ষান্ত করা হলো কেন?

উত্তর : إِنْذَار এবং تَبْشِيْر এর মধ্যে إِنْذَار টি হৃদয়ের মধ্যে অধিকর প্রভাব সৃষ্টি করে। কেননা إِنْذَار দ্বারা دَفْع مُضَرَّت উদ্দেশ্য। যা جَلْب مَنْفَعَت-এর তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং অধিক গুরুত্বপূর্ণটি যখন কাজে আসবে না, তখন تَبْشِيْر-ও কাজে আসবে না। তাই إِنْذَار-এর কথা বলেই ক্ষান্ত করা হয়েছে।

٧. خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ طَبَعَ عَلَيْهَا وَاسْتَوْثَقَ فَلَا يَدْخُلُهَا خَيْرٌ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ ط أَيْ مَوَاضِعِهِ فَلَا يَنْتَفِعُوْنَ بِمَا يَسْمَعُوْنَهُ مِنَ الْحَقِّ وَعَلٰى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ غِطَاءٌ فَلَا يُبْصِرُوْنَ الْحَقَّ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ـ قَوِيٌّ دَائِمٌ ـ

অনুবাদ :

৭. আল্লাহ তা'আলা তাদের হৃদয় মোহর করে দিয়েছেন ছাপ মেরে দিয়েছেন, সুদৃঢ়ভাবে রুদ্ধ করে দিয়েছেন। সুতরাং এতে কল্যাণকর কিছু প্রবেশ করতে পারছে না এবং তাদের কর্ণে অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়ে। ফলে সত্য সম্পর্কে তারা যা কিছু শুনে তা দ্বারা কোনো উপকার লাভ করতে পারছে না। এবং তাদের চক্ষুর উপর আবরণ আচ্ছাদন [বিদ্যমান] ফলে তারা সত্য অবলোকন করতে পারে না। আর তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি যা কঠোর ও চিরস্থায়ী।

তাহকীক ও তারকীব

خَتَمَ ফেয়েল اللّٰهُ ফায়েল عَلٰى قُلُوْبِهِمْ প্রথম মা'তূফ عَلٰى سَمْعِهِمْ মা'তূফ আলাইহি, وَعَلٰى اَبْصَارِهِمْ দ্বিতীয় মা'তূফ مَعْطُوْف عَلَيْه তার মা'তূফদ্বয় মিলে মাজরূর جَار مَجْرُوْر মিলে خَتَمَ ফেয়েলের সাথে مُتَعَلِّق পুরো جُمْلَه ফেলিয়া হয়েছে; غِشَاوَةٌ মুবতাদায়ে مُؤَخَّر - لَهُمْ খবরে مُقَدَّم উভয়টি মিলে جُمْلَه ইস্‌মিয়্যাহ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ : এখানে কাফেরদের ঈমান গ্রহণ না করার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু কুফর ও নাফরমানিতে সদা-সর্বদা লিপ্ত থাকার কারণে তাদের অন্তরসমূহ হক গ্রহণের যোগ্যতাশূন্য হয়ে পড়েছিল, তাদের কানসমূহ হক কথা শ্রবণ করতে উদ্বুদ্ধ ছিল না এবং তাদের দৃষ্টিসমূহ পৃথিবীতে বিরাজমান আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহ অবলোকন করতে অক্ষম, সেহেতু তারা কিভাবে ঈমান আনতে পারে? ঈমানতো ঐ সকল লোকদের অর্জন হতে পারে যারা আল্লাহপ্রদত্ত যোগ্যতাসমূহের সঠিক ব্যবহার করে থাকে। মোটকথা خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ এবং এর পরবর্তী বাক্য পূর্বের ইল্লত বা কারণ হিসেবে বিবেচ্য, অর্থাৎ এ সকল লোক ঈমান না আনার কারণ তাদের অন্তরে মোহর অঙ্কিত করা হয়েছে।

خَتَم -এর প্রকৃত অর্থ হলো ضَرْبُ الْخَاتَمِ عَلَى الشَّيْئِ অর্থাৎ কোনো বস্তুর উপর মোহর বা সীল দিয়ে সেটিকে নির্ভরযোগ্য বানানো। خَتَم -এর দ্বিতীয় অর্থ হলো শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছানো। অর্থাৎ কোনো বস্তু পূর্ণাঙ্গ হওয়া এবং শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছার ক্ষেত্রেও মাজাযী বা রূপক অর্থে خَتَم শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়– خَتَمْتُ الْقُرْاٰنَ

قَوْلُهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ : قُلُوْبٌ শব্দটি قَلْبٌ -এর বহুবচন। আর قَلْب হলো عِلْم -এর মহল বা ক্ষেত্র, যা একটি মাংসপিণ্ড। কখনো قَلْب দ্বারা বিবেক ও মারেফাত উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। যেমন পবিত্র কুরআনের অন্যত্র রয়েছে–

إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ الخ ـ

প্রশ্ন : মোহর লাগানো বলতে কি বোঝানো হয়েছে? আজ পর্যন্ত তো কোনো কাফেরের অন্তরই মোহর অঙ্কিত দেখা যায়নি। কেননা অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে অনেকের অন্তরই দেখা গেছে।

উত্তর : এখানে কলব দ্বারা চিকিৎসা শাস্ত্রের পরিভাষায় হৃদপিণ্ড উদ্দেশ্য নয়, বরং এখানে কলব মানে সেই হৃদয়, যা অনুভূতি, জ্ঞান ও ইচ্ছার উৎস। যেমন আল্লামা সুলাইমান জামাল (র.) উল্লেখ করেছেন–

فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الْجِسْمُ الصَّنَوْبَرِيُّ الشَّكْلِ بَلِ الْمُرَادُ بِالْقُلُوْبِ الْعُقُوْلُ وَهِيَ اللَّطِيْفَةُ الرَّبَّانِيَّةُ الْقَائِمَةُ بِالشَّكْلِ الصَّنَوْبَرِيِّ قِيَامُ الْعَرْضِ بِالْجَوْهَرِ أَوْ قِيَامُ حَرَارَةِ النَّارِ بِالْفَحْمِ ـ (حَاشِيَةُ الْجَمَلِ ص٢٢ ج١)

قَوْلُهُ طَبَعَ عَلَيْهَا : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) خَتَم -এর আসল অর্থ বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ কোনো বস্তুতে মোহর এঁটে সেটি সুদৃঢ় করা, কিন্তু এখানে প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য নয়; বরং اِسْتِعَارَه হিসেবে রূপক অর্থ উদ্দেশ্য। আর সেটি হলো আল্লাহ তা'আলা তাদের গোমরাহীর কারণে তাদের অন্তরে এমন একটি অবস্থা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যা তাদেরকে কুফর ও নাফরমানির প্রতি আকৃষ্ট এবং ঈমান ও আনুগত্যের প্রতি বিদ্বেষী করে রেখেছে। এখন সে অবস্থাটিকে ضَرْبُ الْخَاتَمِ عَلَى الشَّيْئِ -এর সাথে উপমা দিয়ে اِسْتِعَارَةٌ تَبْعِيَّه হিসেবে خَتَم শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর وَجْهُ الشَّبَهِ হলো عَدَمُ دُخُوْلِ الْخَيْرِ বা কল্যাণকর কিছু প্রবেশ না করা। যা মুসান্নিফ (র.)-এর ইবারত فَلَا يَدْخُلُهَا خَيْرٌ দ্বারা বুঝে আসে।

আল্লামা সুলাইমান জামাল (র.) বলেন–

هٰذَا بَيَانٌ لِمَعْنَى الْخَتَمِ فِي الْأَصْلِ وَهُوَ وَضْعُ الْخَاتَمِ عَلَى الشَّيْءِ وَطَبْعُهُ فِيهِ صِيَانَةً لِمَا فِيهِ . وَلَيْسَ هٰذَا الْمَعْنٰى مُرَادًا هُنَا بَلِ الْمُرَادُ بِالْخَتَمِ عَدَمُ وُصُوْلِ الْحَقِّ إِلَى قُلُوْبِهِمْ وَعَدَمُ نُفُوْذِهِ وَاسْتِقْرَارِهِ فِيْهَا . فَشُبِّهَ هٰذَا الْمَعْنٰى بِضَرْبِ الْخَاتَمِ عَلَى الشَّيْءِ تَشْبِيْهُ مَعْقُوْلٍ بِمَحْسُوْسٍ وَالْجَامِعُ إِنْتِفَاءُ الْقَبُوْلِ لِمَانِعٍ مِنْهُ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْخَتَمِ عَلَى الْإِسْمَاعِ وَجَعْلِ الْغِشَاوَةِ عَلَى الْأَبْصَارِ . (جَمَلْ . صـ٢٢ جـ١)

মোহরাঙ্কিত ও পর্দাবৃতকরণের তাৎপর্য :

- জমহুর উলামা, মুফাসসিরীন ও মুতাকাল্লিমীন বলেন, আয়াতে বর্ণিত خَتَمَ এবং غِشَاوَة-এর মর্ম এই নয় যে, আল্লাহ তা'আলা বাস্তবেই অন্তর ও কানে মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছেন এবং তাদের চোখের উপর কোনো পর্দা দিয়েছেন; বরং এর মর্ম হলো, এ সকল অহংকারী বিদ্বেষী প্রবৃত্তিপূজারী ও হক-হেদায়েতের দুশমনরা নিজের প্রকৃতিগত ও স্বভাবজাত বক্রতার কারণে এ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, মন্দ স্বভাবসমূহ তাদের অন্তরে মজবুত স্থির হয়ে গেছে। ফলে প্রত্যেক অশ্লীলতা ও গর্হিত কার্যকলাপ তাদের কাছে ভালোও সুন্দর মনে হয় এবং আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি মজাদার মনে হয়। তাদের অবস্থা নাপাকির মাঝে বসবাসকারী পোকার মতো। দুর্গন্ধের সাথে যার প্রকৃতিগত আকর্ষণ ও আসক্তি রয়েছে এবং সুঘ্রাণের সাথে রয়েছে প্রকৃতিগত ঘৃণা। অনেক সময় তো এই পোকা আতরের তীব্র ঘ্রাণ সইতে না পেরে মরে যায়। অনুরূপ অবস্থা সেসব কাফেরের। কুফুরির নাপাকিতে আসক্ত এবং হক-হেদায়েতের খুশবুর প্রতি অনাসক্ত। আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের এই অবস্থাটি اِسْتِعَارَة স্বরূপ خَتَم এবং غِشَاوَة দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। এর মর্ম হলো মোহর এবং পর্দা যেভাবে বাইরের বস্তুর ভিতরে প্রবেশে প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে তেমনি তাদের এ অবস্থা ও অন্তরে ঈমান ও হেদায়েত প্রবেশ করতে দেয় না এবং ভেতরের কুফরিও বাইরে আসতে দেয় না। এমনিভাবে তাদের কান হক কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। চোখ কোনো হক দেখতে প্রস্তুত নয়। সুতরাং এমন লোকদের ভীতি প্রদর্শন করা না করা সমান।
- ইমাম হাসান বসরী (র.) বলেন, আয়াতে উল্লিখিত خَتَم এবং غِشَاوَة বাহ্যিক ও বাস্তবের উপর ধর্তব্য। কাফেরদের অন্তর ও কানে বাস্তবেই একটি মোহর রয়েছে এবং চোখে বাস্তবেই পর্দা দেওয়া হয়েছে, যার আকৃতি অজ্ঞাত এবং যা আমাদের দৃষ্টির আড়ালে। আল্লাহর ফেরেশতারা সে মোহর এবং পর্দা দর্শন করেন এবং তা দেখে তারা বুঝে ফেলেন যে, এ কাফের কখনো ঈমান আনবে না। তাই তারা তার প্রতি অভিসম্পাত করেন। যেমনিভাবে তারা মু'মিনের অন্তকরণে ঈমানের চিত্র অঙ্কিত দেখে তার জন্য দোয়া ও এস্তেগফার করেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে– أُولٰئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْإِيْمَانَ সুতরাং মু'মিনের অন্তরে ঈমান লিপিবদ্ধ করা ও অঙ্কিত করার বিষয়টি যেমন বাস্তব, অনুরূপভাবে কাফেরদের অন্তরে মোহর ও চোখে পর্দার বিষয়টিও বাস্তব। كِتَابَتِ إِيْمَان-এর মতো خَتَم كُفْر و كِتَابَتْ-এর ধরনও অজ্ঞাত। ফেরেশতারা যেমনিভাবে حِسًّا وَعَيَانًا মু'মিনদের অন্তরে ঈমানের চিত্র দর্শন করে অনুরূপভাবে তারা কাফেরদের অন্তরের মোহর এবং পর্দাও বাস্তবে প্রত্যক্ষ করেন।

ইমাম বায়হাকী (র.) শোআবুল ঈমানের মাঝে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, মোহর অঙ্কনকারী ফেরেশতা আরশের খুঁটি ধরে দণ্ডায়মান থাকেন। যখন কেউ আল্লাহর হুকুমের অমর্যাদা করে, প্রকাশ্যে তাঁর নাফরমানিতে লিপ্ত হয় ও তাঁরি সাথে বেয়াদবি ও দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করে, তখন আল্লাহ তা'আলা দুঃসাহসী কাফেরের অন্তরে মোহর অঙ্কন করে দেওয়ার নির্দেশ করেন। যার ফলে সে কোনো হক গ্রহণ করতে পারে না। [অবশ্য ইমাম বায়হাকী (র.) এ হাদীসটির সনদ জয়ীফ বলে আখ্যা দিয়েছেন]।

সহীহ হাদীসসমূহেও এ বিষয়টির সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, মু'মিন যখন কোনো গুনাহ করে তখন তার অন্তরে একটি কাল দাগ পড়ে যায়। পরবর্তীতে সে তওবা করলে এবং গুনাহ থেকে ফিরে এলে তা মুছে যায় এবং আরো কোনো গুনাহ করলে সে দাগ বাড়তে থাকে। এমনকি এক পর্যায়ে তা তার পুরো অন্তরটিকে ঘিরে ফেলে। আর এটিই হলো সেই মরিচা যার কথা নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন– كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ –[তিরমিযী]

আমরা যেভাবে বাহ্যিক কৃষ্ণতা ও মরিচা নিজেদের চোখে অবলোকন করি, তেমনিভাবে ফেরেশতারা আমাদের চেয়েও অধিক পরিমাণে বনী আদমের অন্তরের শুভ্রতা-কৃষ্ণতা ও মরিচা প্রত্যক্ষ করে থাকেন। ইমাম মুজাহিদ (র.) বলেন, رَيْن [মরিচা] -এর স্তর خَتَم এবং طَبَع -এর নিম্নে। خَتَم এবং طَبَع -এর স্তর اَقْفَال -এর নীচে আর اَقْفَال হলো অধিকতর কঠোর। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– اَمْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَقْفَالُهَا

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, বান্দা যখন মিথ্যা বলে, তখন তার দুর্গন্ধের কারণে ফেরেশতারা তার কাছ থেকে এক মাইল দূরে চলে যায়। –[তিরমিযী]

হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা এক সফরে রাসূল ﷺ -এর সাথে ছিলাম। হঠাৎ একটি দুর্গন্ধ ভেসে এলো। হুজুর ﷺ ইরশাদ করলেন, তোমরা জান এটা কিসের দুর্গন্ধ? অতঃপর বললেন, এ দুর্গন্ধ ঐ সকল লোকদের মুখ থেকে আসছে, যারা এ মুহূর্তে মুসলমানদের গিবত করছে। অর্থাৎ মুনাফিকদের মুখ থেকে। -[মুসনাদে আহমদ]

আমরা যদিও আমাদের অন্তর্দৃষ্টির অভাবে মিথ্যা এবং গিবতের দুর্গন্ধ অনুভব করতে পারি না; কিন্তু আল্লাহর ফেরেশতা ও নবী রাসূলগণ তা পরিপূর্ণভাবেই অনুভব করতে পারতেন। অনুরূপভাবে আমরা আমাদের অন্তর্দৃষ্টির অভাবে কাফেরদের অন্তর মোহরাঙ্কিত দেখতে না পেলেও ফেরেশতারা তা দেখতে পান।

-[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : মাওলানা ইদরীস কান্ধলভী (র.). খ. ১, পৃ. ৫২]

কাফেরদের অন্তর কি প্রথম থেকেই মোহরাঙ্কিত ছিল? : প্রথম থেকেই আল্লাহর পক্ষ থেকে কাফেরদের অন্তর মোহরাঙ্কিত ও চোখ পর্দাবৃত ছিল না; বরং এটি তাদের উপেক্ষা-অহংকার ও অস্বীকৃতির শাস্তি স্বরূপ ছিল। যেমন নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে ইরশাদ হয়েছে :

১. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا .

২. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ .

৩. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ .

বর্ণিত আয়াতসমূহের সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, তাদের অন্তরের মোহর ও চোখের পর্দা তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ, নবী হত্যা এবং অন্তরের বক্রতার শাস্তিস্বরূপ ছিল। তাদের প্রকাশ্য নাফরমানি এবং দুঃসাহসিকতার ফলে তাদেরকে চিরদিনের জন্য হেদায়েত থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হয়েছে এবং অন্তরে মোহর লাগিয়ে হেদায়েত গ্রহণের যোগ্যতাই বিলোপ করে দেওয়া হয়েছে, মারেফাত এবং হেদায়াতের সকল পথ তাদের বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে তারা সত্য শুনতেও পায় না, অনুভবও করতে পারে না এবং দেখতেও পারে না। এজন্য এখন তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা না করা উভয়টাই বরাবর।

এটা কি জুলুম হবে? : যদি মেনেও নেওয়া হয় যে, আল্লাহ তা'আলা শুরু থেকে কারো অন্তরে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন এবং স্বীয় তৌফিক এবং হেদায়েত থেকে মাহরুম করে দিয়েছেন তবুও তা বিন্দু পরিমাণ জুলুম হবে না। যেমন হযরত আতা ইবনে রাবাহ (র.) বর্ণনা করেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে প্রশ্ন করল, আল্লাহ তা'আলা যদি আমার জন্য হেদায়েত বন্ধ করে দেন এবং আমার ভাগ্যে গোমরাহী লিপিবদ্ধ করে দেন, তবে কি এটা জুলুম হবে না? হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) জবাব দিলেন, আল্লাহ তা'আলা যদি তোমার অধিকারভুক্ত কোনো বস্তু নিয়ে নেন, তাহলে এটা জুলুম হবে। আর যদি তিনি নিজের অধিকারভুক্ত বস্তুকে নিয়ে নেন, তাতে কোনো জুলুম হবে না। কারণ সেটা তার অধিকারভুক্ত। যাকে ইচ্ছা দিবেন, যাকে ইচ্ছা দিবেন না। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ . قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ অনুরূপ হেদায়েতও আল্লাহ তা'আলার অধিকারভুক্ত বস্তু। তিনি তা অনুগতদেরকে প্রদান করেন এবং অহংকারী ও নাফরমানদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করেন। -[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : মাওলানা ইদরীস কান্ধলভী (র.) : খ. ১, পৃ. ৫৩]

قُلُوبٌ এটা قَلْبٌ -এর বহুবচন, অর্থ- বহুরূপী হওয়া, অন্তরও যেহেতু পরিবর্তন হয় এবং গতিসম্পন্ন থাকে, তাই অন্তরের অর্থ হয়ে গেছে। কিন্তু এ قَلْبٌ দ্বারা এ স্থানে গোশতের টুকরা ও দেহের অংশ উদ্দেশ্য নয়। কেননা ওটা তো সকল প্রাণীর মধ্যেই হয়; বরং আল্লাহপ্রদত্ত সূক্ষ্ম বোধশক্তি সম্পন্ন ক্ষমতা উদ্দেশ্য, যা গোশ্‌তের টুকরার সাথে এমনভাবে সংযুক্ত, যেমনভাবে আগুন কয়লার সাথে।

কাফেরদের قُلُوبٌ -কে সীলমোহরকৃত বস্তুর সাথে তাশ্‌বীহ দেওয়ার দ্বারা إِسْتِعَارَه بِالْكِنَايَةِ হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ عَلَى سَمْعِهِمْ -এর অর্থ : মুফাস্‌সির জালাল (র.) أَيْ مَوَاضِعِهِ এ অংশটি বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করেছেন যে, خَتَمَ -এর সম্পর্ক سَمْع -এর দিকে মুযাফ مُقَدَّر -এর মাধ্যমে অর্থাৎ مَوْضِعِ سَمْعٍ -এর দিকে, যদিও سَمْع -এর অর্থ শ্রবণ ও কর্ণ দুটির জন্য আসে। হ্যাঁ, قُلُوبٌ ও أَبْصَار -কে বহুবচন এবং سَمْع -কে একবচন আনার কয়েকটি নির্দেশনা হতে পারে, একটি নির্দেশনাতো এটা, যার দিকে মুফাস্‌সির জালাল (র.) مَوَاضِعِهِ শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করছেন। অর্থাৎ سَمْع মাসদার وَالْمَصْدَرُ لَا يُثَنّٰى وَلَا يُجْمَعُ [যা দু'বচন ও বহুবচন হয় না] এবং মুযাফ উহ্য আছে أَيْ مَوَاضِعِ السَّمْعِ غِشَاوَةٌ -এর মধ্যেও রূপক ও إِسْتِعَارَه অবলম্বন করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ : عَذَاب বলা হয় إِيْصَالُ الْأَلَمِ إِلَى حَيٍّ هَوَانًا وَذِلًّا অর্থাৎ কোনো প্রাণীকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করার জন্য কষ্ট দেওয়া, তাই অবুঝ শিশু ও পশুর কষ্টে লিপ্ত হওয়াকে আজাব বলা হয় না। কেননা তাতে হেয় করা বা লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্য থাকে না। -[হাশিয়ায়ে জামাল : খ. ১, পৃ. ২২]

عَظِيْم অবস্থার কঠোরতার জন্য আসে বা ব্যবহার হয়, এর বিপরীত হচ্ছে حَقِيْر [তুচ্ছ, হীন, নগণ্য] আর পরিমাণের আধিক্যের জন্য كَبِيْر ও صَغِيْر পরস্পর আসে। কিন্তু عَظِيْم -এর মধ্যে كَبِيْر থেকে অধিক مُبَالَغَه রয়েছে। যেমন صَغِيْر -এর তুলনায় حَقِيْر -এর মধ্যে অধিক مُبَالَغَه হয়েছে। -[প্রাগুক্ত]

عَظِيْمٌ هُوَ ضِدُّ الْحَقِيْرِ وَأَصْلُهُ أَنْ تُوْصَفَ بِهِ الْأَجْرَامُ وَقَدْ تُوْصَفُ بِهِ الْمَعَانِيْ كَمَا هُنَا وَ لِهٰذَا قَالَ الشَّارِحُ قَوِيٌّ دَائِمٌ (جَمَل)

عَظِيْم শব্দটি যদিও أَجْرَام -এর সিফত কিন্তু কখনো مَعَانِي -এর জন্যও ব্যবহৃত হয় এবং এখানে সে হিসেবেই হয়েছে।

قَوْلُهُ قَوِيٌّ : অর্থাৎ তাদের আযাব খুবই বড় ও ভয়ানক হবে। জাহান্নামের আজাব বড় এবং সেখানকার আযাবসমূহ দুনিয়া ও বরযখের আজাবের তুলনায় বড়। আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার আজাব তুচ্ছ ও ছোট।

دَائِمٌ : অর্থাৎ তাদের আযাব চিরস্থায়ী হবে। পক্ষান্তরে মুমিনদের আযাব হবে অল্প দিনের জন্য।

তিনটি অঙ্গের উল্লেখ করা হলো কেন? আল্লামা সুলায়মান জামাল (র.) বলেন-

وَإِنَّمَا خَصَّ اللّٰهُ تَعَالٰى هٰذِهِ الْأَعْضَاءَ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهَا طُرُقُ الْعِلْمِ بِاللّٰهِ فَالْقَلْبُ مَحَلٌّ لِلْعِلْمِ وَطَرِيْقُهُ إِمَّا السَّمَاعُ وَإِمَّا الرُّؤْيَةُ (جَمَل ص٢٣ ج١)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এ তিনটি অঙ্গকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো, এ তিনটি অঙ্গ হলো জ্ঞান লাভের মাধ্যম ও উপায়। অন্তর হলো ইলমের 'মহল' বা স্থান। আর এ ইলম অর্জিত হয় দুভাবে- ১. কানে শুনে, ২. চোখে দেখে।

-[হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১, পৃ. ২২]

অন্তর এবং কানে মোহর আর চোখে পর্দা দেওয়া হলো কেন?

জালালাইন শরীফের হাশিয়াতে এর জবাব এভাবে রয়েছে-

وَلَمَّا اشْتَرَكَ السَّمْعُ وَالْقَلْبُ فِي الْإِدْرَاكِ مِنْ جَمِيْعِ الْجَوَانِبِ جُعِلَ مَا يَمْنَعُهَا مِنْ خَاصِّ فِعْلِهِمَا الْخَتْمُ الَّذِيْ يَمْنَعُ مِنْ جَمِيْعِ الْجِهَاتِ وَإِدْرَاكُ الْأَبْصَارِ لَمَّا اخْتُصَّ بِجِهَةِ الْمُقَابَلَةِ جُعِلَ الْمَانِعُ مِنْهَا عَنْ فِعْلِهَا الْغِشَاوَةَ الْمُخْتَصَّةَ بِتِلْكَ الْجِهَةِ. (ص٥ حاشية ٣)

অর্থাৎ অন্তর এবং শ্রবনেন্দ্রিয় সকল দিক থেকে জ্ঞান লাভ করে থাকে। তাই তা বন্ধ করার জন্য এমন প্রতিবন্ধক বস্তু আনা হয়েছে। যেটা আনা হয়েছে, সেটা চতুর্দিক থেকেই বারণকারী হয়। আর তা হলো خَتَم কোনো বস্তুতে মোহর লাগানো হলে তাতে আর কিছু প্রবেশের সুযোগ থাকে না। আর চোখ কেবল এক দিক থেকে তথা সম্মুখ দিক থেকে অনুভব করে থাকে বিধায় তার জন্য غِشَاوَة শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা এক দিক বন্ধ করতে হলে পর্দাই যথেষ্ট।

কল্যাণ ও অনিষ্টের দর্শন : ঔষধ ও পথ্যসমূহের ন্যায় নেকী ও বদির প্রতিক্রিয়া হয়, যা আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন লোকেরা আধ্যাত্মিক চোখে দেখেন ও অনুভব করেন। যেহেতু সব জিনিসের স্রষ্টা আল্লাহ তাই خَتَم -এর সংযোগও নিজের দিকে করেছেন; কিন্তু এ কারণে বান্দা কোনোভাবেই দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে পারে না। আল্লাহ তো হেদায়েত ও পথভ্রষ্টতা এবং এর উপকরণসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং বান্দাকে পার্থক্য করার ক্ষমতা দিয়েছেন। বান্দা নিজ ক্ষমতা ও ইচ্ছায় যে পথকে অবলম্বন করবে, সে ওটারই জিম্মাদার হবে।

পশুর মধ্যে কিংবা ছোট শিশু ও স্বল্পবুদ্ধির লোকদের মধ্যে যেহেতু এতটুকু উপলব্ধি বা অন্তর্দৃষ্টি থাকে না, যা দ্বারা এদের উপর ভার অর্পণ করা যায়। তাই এরা এ দায়িত্ব থেকে মুক্ত।

এখন এ প্রশ্ন করা যে, যেমনিভাবে কোনো মন্দকাজ করা মন্দ ও অন্যায়, এমনিভাবে মন্দকে সৃষ্টি করাও মন্দ এবং অন্যায় হওয়া উচিত। এ প্রশ্ন সঠিক নয়। কেননা মন্দকাজ করার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাস্তব কোনো মঙ্গল নেই। পক্ষান্তরে অনিষ্টতার সৃষ্টির মধ্যে অজস্র কল্যাণ রয়েছে যেগুলো যদিও আমাদের জানা নেই। কিন্তু যখন অনিষ্টতার স্রষ্টাকে আমরা সাধারণত প্রজ্ঞাবান হিসেবে বিশ্বাস করি, আর فِعْلُ الْحَكِيْمِ لَا يَخْلُوْ عَنِ الْحِكْمَةِ [প্রজ্ঞাবানের কোনো কর্ম বিচক্ষণতা থেকে খালি নয়] স্বীকৃত বিধান রয়েছে, তবে একই বস্তুকে সৃষ্টি করা উত্তম কাজ এবং এর ব্যবহার অবশ্য মন্দ বুঝা যায়। যেমনিভাবে মধু ও বিষের প্রতিশেধককে সৃষ্টি করা জরুরি, এমনিভাবে সর্প, বিচ্ছু ও বিষাক্ত প্রাণীর সৃষ্টি গোটা জগতের জন্য অত্যাবশ্যক। কিন্তু সর্প, বিচ্ছু ও বিষকে অস্থানে ব্যবহার দ্বারা যে ধ্বংস পতিত হবে, ওটাকে কোনো বুদ্ধিমান জ্ঞানী ব্যক্তি ভাল বলবে না।

-[কামালাইন- খ.১, পৃ. ২৫]

অনুবাদ :

٨. وَنَزَلَ فِي الْمُنَافِقِيْنَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَيْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِاَنَّهُ اٰخِرُ الْاَيَّامِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ رُوْعِيَ فِيْهِ مَعْنٰى مَنْ وَفِيْ ضَمِيْرِ يَقُوْلُ لَفْظُهَا ـ

৮. মুনাফিকদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। মানুষের মধ্যে এমন কতিপয় লোক রয়েছে যারা বলে, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম আল্লাহ ও শেষ দিবসে অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে। কেননা এটাই সর্বশেষ দিন অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা বিশ্বাসী নয় এখানে مَنْ শব্দটির অর্থের প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে। [তাই مُؤْمِنِيْنَ শব্দটি বহুবচনরূপে ব্যবহার করা হয়েছে] তাই পূর্বে يَقُوْلُ ক্রিয়া পদটি একবচনরূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

٩. يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاِظْهَارِ خِلَافِ مَا اَبْطَنُوْهُ مِنَ الْكُفْرِ لِيَدْفَعُوْا عَنْهُمْ اَحْكَامَهُ الدُّنْيَوِيَّةَ وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ لِاَنَّ وَبَالَ خِدَاعِهِمْ رَاجِعٌ اِلَيْهِمْ فَيَفْتَضِحُوْنَ فِي الدُّنْيَا بِاِطِّلَاعِ اللّٰهِ نَبِيَّهُ عَلٰى مَا اَبْطَنُوْهُ وَيُعَاقَبُوْنَ فِي الْاٰخِرَةِ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ـ يَعْلَمُوْنَ اَنَّ خِدَاعَهُمْ لِاَنْفُسِهِمْ وَالْمُخَادَعَةُ هُنَا مِنْ وَاحِدٍ كَعَاقَبْتُ اللِّصَّ وَذِكْرُ اللّٰهِ فِيْهَا تَحْسِيْنٌ وَفِيْ قِرَاءَةٍ وَمَا يَخْدَعُوْنَ ـ

৯. তারা প্রতারিত করতে চায় আল্লাহ ও বিশ্বাসীগণকে স্বীয় মনের প্রকৃত বিশ্বাস কুফরির বিপরীত বিষয় ঈমান প্রকাশ করে, তাদের [কাফেরদের] সম্পর্কে ইসলামের জাগতিক বিধান [হত্যা যুদ্ধ ইত্যাদি] বিষয়সমূহ নিজেদের হতে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে। তারা প্রকৃতপক্ষে নিজেদেরকে ছাড়া কাউকেও প্রতারিত করছে না কেননা এই প্রতারণার অশুভ পরিণাম তাদের উপরই প্রত্যাবর্তিত হবে। অনন্তর তারা এই পৃথিবীতেই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহ তা'আলা তাদের গোপন অভিসন্ধি সম্পর্কে অবহিত করার মাধ্যমে আর পরকালে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা হবে অথচ এটা তারা বুঝতে পারছে না। অর্থাৎ নিজেদের সাথেই যে মূলত এই প্রতারণা করছে তা তারা উপলব্ধি করতে পারছে না। اَلْمُخَادَعَةُ [অর্থ পরস্পর প্রবঞ্চনা করা; তবে] -এ স্থানে এটা এক পক্ষ হতে প্রবঞ্চনা করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন عَاقَبْتُ اللِّصَّ চোরকে শাস্তি প্রদান করেছি, অর্থ পরস্পর শাস্তি প্রদান নয়। يُخَادِعُوْنَ -এর মধ্যে اَللّٰهُ শব্দটির উল্লেখ تَحْسِيْن অর্থাৎ আলঙ্কারিক সৌন্দর্য বর্ধনের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। يُخَادِعُوْنَ ক্রিয়াটি অপর এক কেরাত অনুসারে وَمَا يَخْدَعُوْنَ -রূপে পঠিত রয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

تَقْدِيْر। এর- مَنْ হয়েছে রফা দানকারী হয়েছে وَمِنَ النَّاسِ মুতা'আল্লিক হয়ে يَقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ জুমলা হয়ে সিফত مَنْ মউসূফ, كَلَام [বাক্যের নিরূপণ] এমন وَمِنَ النَّاسِ نَاسٌ পূর্ণ জুমলা হয়ে পূর্বের জুমলা اَلَّذِيْنَ-এর উপর عَطْف হয়েছে কিংবা اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا -এর উপর عَطْف হয়েছে এবং مَنْ মউসূলও হতে পারে। مَا -এর ইসম هُمْ আর بِمُؤْمِنِيْنَ তার খবর।

خِدَاع -এর অর্থ : গোপনের বিপরীতকে প্রকাশ করা। আরববাসীরা বলেন– ضَبٌّ خَادِعٌ যখন গুইসাপ এক গর্ত দিয়ে ঢুকে অন্য গর্ত দিয়ে বের হয়। مَخْدَعَان গর্দানের বিশেষ গোপন শিরাগুলোকে বলে। مَخْدَعُ الْبَيْتِ অর্থ– ঘরের কামরা।

قَوْلُهُ اَلنَّاسِ : কেউ বলেন, اَلنَّاسِ হলো বহুবচন ইসিম। শব্দগতভাবে এর কোনো একবচন নেই। أُنَاسٌ হলো তার সমার্থক শব্দ। যা বহুবচন। এর এক বচন হলো إِنْسَانٌ বা أَنْسِيٌّ কেউ বলেন, এটি মূলত أُنَاسٌ ছিল। تَخْفِيْف করণার্থে هَمْزَة-কে হজফ করা হয়েছে। সূরা ইসরাতে এই মূল ব্যবহারটি লক্ষণীয়- يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ইমাম সিবওয়াই ও ফাররা (র.)-এর মতে- أُنَاسٌ -এর মূলধাতু হলো هَمْزَة . نُوْن . سِيْن আর ইমাম কিসাই (র.)-এর মতে نُوْن . وَاو . سِيْن অর্থাৎ اَلنَّوْسُ থেকে নির্গত। যার অর্থ নড়াচড়া করা। نَاسَ يَنُوْسُ نَوْسًا নড়াচড়া করা। –[লুগাতুল কুরআন] وَاو মুতাহাররিক তার পূর্বে ফাতাহ হওয়ায় وَاو-কে اَلِف দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। অতঃপর يَاء-কে اَلِف দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে।

اَللِّصُّ ব-ব لُصُوْصٌ অর্থ– দস্যু, অপহরণকারী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : এ পর্যন্ত কুরআনে দু'ধরনের মানুষের আলোচনা করা হয়েছে।

১. আল্লাহর বিধানের অনুগত, ফরমাবরদার মু'মিন।

২. নাফরমান কাফের, তথা আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী। এখান থেকে তৃতীয় প্রকার লোকদের বর্ণনা, যাদের প্রকাশ্য রূপ ছিল ভিন্ন এবং গোপন রূপ ছিল ভিন্ন। যেমন– হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ও মা'তাব ইবনে কোশাইর প্রমুখ। যাদেরকে মুনাফিকীন বলা হয়। এখানে থেকে মুনাফিকদের কতিপয় ইতর স্বভাব সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়েছে। তন্মধ্যে এ আয়াতে خِدَاع বা ধোঁকার কথা বলা হয়েছে।

নিফাক -এর প্রকারসমূহের ব্যাখ্যা : নিফাক দু'প্রকার হয়। যথা–

প্রথম প্রকার হচ্ছে– نِفَاقٌ فِى الْعَمَلِ [কাজ বা কার্যক্ষেত্রে নিফাক] যার বাস্তবতা বা সংগঠন বর্তমানে অনেক।

দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে– نِفَاقٌ فِى الْاِعْتِقَادِ [বিশ্বাস পোষণে নিফাক] এর তিনটি আকৃতি বা রূপ। একটি হচ্ছে- মুহাম্মদ ﷺ সত্য পয়গাম্বর হওয়ার ব্যাপারে অন্তরে একেবারেই বিশ্বাস ছিল না; বরং অস্বীকারকারী ছিল। কিন্তু দুনিয়াবী কোনো কোনো কল্যাণকে সামনে রেখে হৃদয়ের ঐ আবেগের বিপরীত প্রকাশ করা হয়েছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে অন্তরের দ্বিধা, এমন যে মুসলমানদের ভালো অবস্থা দেখে কোনো কোনো সময় অন্তর তাদের দিকে ধাবিত হয়ে যায়, কিন্তু দুরবস্থাসমূহ সামনে আসলে পরে পুনরায় মুসলমানদের প্রতি খারাপ ধারণা এসে যায়।

তৃতীয়টি হচ্ছে– অন্তরে রাসূল ﷺ -এর সততার কিছুটা আলো তো আছে কিন্তু দুনিয়াবী স্বার্থ পুনরায় প্রবল হয় এবং তাকে ইসলামের বিরোধিতার উপর আগে বাড়িয়ে দেয়। –[কামালাইন খ. ১, পৃ. ২৭]

নিফাকের সূচনা ও উৎপত্তিস্থল : সূরা বাকারা হচ্ছে মাদানী সূরা। মদীনায় বিস্তর মুনাফিক ছিল। রাসূল-বিদ্বেষ ও ইসলাম বৈরিতায় এরা প্রকাশ্য কাফেরদের চেয়ে মোটেই পিছিয়ে ছিল না; বরং এক ধাপ এগিয়েই ছিল। নিফাক তথা ইসলামের মিথ্যা দাবি মক্কায় ছিল না। সেখানে বরং অবস্থা এই ছিল যে, মু'মিনরাও ঈমান গোপন রেখে কাফেরদের মাঝে মিশে থাকত। নিফাকের সূচনা হয় মদীনায়। আর তাও বদর যুদ্ধের পরে। ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধির কারণে কিছু সুযোগসন্ধানী লোক নিছক ছলনাবশত নিজেদেরকে মু'মিন ও মুসলিম বলে পরিচয় দিত। ঈমান ও বিশ্বাসের কোনো বালাই ছিল না তাদের। এ দলটির নটবর ছিল খাযরাজ গোত্রের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল। প্রতিপক্ষ গোত্রেও তার অপ্রতিহত প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। সে ছিল সমসাময়িক আরবদের এক সফল নেতা। গোটা জনপদ তার নেতৃত্বের অনুগত ছিল এমনকি তাকে বাদশাহ ঘোষণা করার আয়োজনও সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল প্রায়। ঠিক সেই মুহূর্তে দেখতে দেখতে মদীনায় ইসলাম দৃঢ়মূল হলো। নিজের সাজানো বাগান লণ্ডভণ্ড হতে দেখে নিজ অনুসারীদের কানে সে মন্ত্রণা দিল অন্তরে নিজস্ব আকীদা বদ্ধমূল রেখে মুখে ইসলামের কালিমা গেয়ে বেড়াও। আওস-খাজরাজের বাইরে ইহুদিদের একদল বিবেক-বেচা গাদ্দার স্বতঃস্ফূর্তভাবে লাব্বাইক বলে এ আন্দোলনে যোগ দিল। তবে মক্কার কোনো মুহাজির এতে ছিল না।

ইসলামের নিকৃষ্ট শত্রু : এ তিন প্রকার লোক রাসূল এর কল্যাণময় যুগে বিদ্যমান ছিল এবং এ লোকগুলো ইসলামের নিকৃষ্ট শত্রু ও আস্তীনের সর্প প্রমাণিত হয়েছিল। এ পর্দার আড়ালের শত্রু দ্বারা ইসলাম ও মুসলমানদের যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, প্রকাশ্য শত্রুদের দ্বারা ততটুকু ক্ষতি হয়নি। তাই সূরা মূনাফিকূন, সূরা তওবা ও সূরা বাক্বারার পূর্ণ এক রুকূ‘ এবং অন্যান্য অনেক আয়াতের মধ্যে তাদের মুখোশ উন্মোচন করা হয়েছে, আর يَاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ এবং اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ আয়াতে কঠোরতর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রাণ উৎসর্গকারী ও একনিষ্ঠ সাহাবায়ে কেরাম এ নির্দেশ শুনে এত অধিক ভীত হয়ে পড়লেন যে, প্রকাশ্যে ও গোপনের বিন্দু পরিমাণ বিরোধিতার উপর তাদের নিজেদের মধ্যে নিফাক্বের সন্দেহ হতে লাগলো।

সুতরাং হযরত হানজালা (রা.) একদা এ অবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে نَافَقَ حَنْظَلَةُ বলে চিৎকার আরম্ভ করেছেন। হযরত আবূ বকর (রা.) নিজ অবস্থার উপর ধ্যান করেছেন তখন তার নিজের ব্যাপারে ঐ সন্দেহ হয়েছে। অবশেষে এ সমস্যা রাসূল ﷺ -এর খেদমতে পেশ করা হলে রাসূল ﷺ তাকে পূর্ণ সান্ত্বনা দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, যদি সর্বদা তোমাদের এ অবস্থাই থাকে- যা আমার মজলিসে হয়, তবে যে ফেরেশতাগণ তোমাদের বিছানায় উপস্থিত হয়ে তোমাদের সাথে মুছাফাহা করতে শুরু করবেন, কিন্তু কখনো এ রকম হবে, কখনো ও রকম হবে। অর্থাৎ ইসলামের জন্য কখনো অন্তর পূর্ণ ধাবিত থাকবে, আবার কখনো পূর্ণ ধাবিত থাকবে না। –[কামালাইন খ. ১, পৃ. ২৭]

মুনাফিকদের প্রথম চরিত্র : مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ

قَوْلُهُ اَىْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ : এই ইবারতটুকু বৃদ্ধি করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, يَوْمُ الْاٰخِرَةِ দ্বারা يَوْمُ الْقِيَامَةِ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ হিসাব কিতাব এবং আমলের প্রতিদানের দিন। আর এই দিনের প্রতি ঈমান রাখা দীনের অপরিহার্য বিষয়।

قَوْلُهُ لِاَنَّهُ اٰخِرُ الْاَيَّامِ : এ ইবারত দ্বারা يَوْمُ الْاٰخِرَةِ -এর নামকরণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ رُوْعِىَ فِيْهِ مَعْنٰى مَنْ وَفِىْ ضَمِيْرِ يَقُوْلُ لَفْظُهَا : এখানে একটি ইশকালের জবাব দিয়েছেন। ইশকালটি হলো- আয়াতের শুরুতে يَقُوْلُ -কে একবচন আনা হয়েছে এবং শেষে وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ -কে বহুবচন আনা হলো কেন?

এর জবাবে মুসান্নিফ (র.) উক্ত ইবারতটি উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ এখানে مِن শব্দটির অর্থের প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে। [তাই مُؤْمِنِيْنَ শব্দটি বহুবচনরূপে ব্যবহার করা হয়েছে]। আর يَقُوْلُ ক্রিয়া পদটির সর্বনামে তার [مَنْ শব্দটির] শাব্দিক আঙ্গিকের প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে, [তাই পূর্বে يَقُوْلُ ক্রিয়া পদটি একবচনরূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

قَوْلُهُ يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا : এখানে মুনাফিকদের দ্বিতীয় পরিচয় দেওয়া হয়েছে, তা হলো ধোঁকা দেওয়া। يُخَادِعُوْنَ বাবে مُفَاعَلَة -এর اَلْمُخَادَعَةُ মাসদার থেকে جَمْع مُذَكَّر غَائِب -এর সীগা। অর্থ– তারা পরস্পরে ধোঁকা দেয়।

قَوْلُهُ لِيَدْفَعُوْا عَنْهُمْ اَحْكَامَهُ الدُّنْيَوِيَّةَ : তাদের [কাফেরদের সম্পর্কে কুফরের জাগতিক বিধান তথা হত্যা, যুদ্ধ. জিযইয়া ইত্যাদি বিষয়সমূহ] নিজেদের হতে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে।

قَوْلُهُ وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ : অর্থাৎ তারা মুনাফিকি করে কারো ক্ষতি করে না; বরং নিজেদেরই ক্ষতি করে। একপটতার পরিণাম তাদের উপরই বর্তাবে। আর সে ক্ষতি হলো আখেরাতের আজাব এবং দুনিয়াতে লজ্জিত হওয়া ইত্যাদি।

এখানে يَعْلَمُوْنَ না বলে يَشْعُرُوْنَ ব্যবহার করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মুনাফিকদের এই প্রতারণা ও ধোঁকাবাজিতে যে ক্ষতি হচ্ছে, তা বস্তুগত হওয়ার পাশাপাশি সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট ব্যাপার। কিন্তু এই নির্বোধরা গাফলতির আধিক্যতায় এটাও অনুভব করে না। –[কাশশাফ সূত্রে তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ৪০]

عُبِّرَ بِالشُّعُوْرِ دُوْنَ الْعِلْمِ اِشَارَةً اِلٰى اَنَّهُمْ لَمْ يَصِلُوْا اِلٰى رُتْبَةِ الْبَهَائِمِ فَاِنَّ الْبَهَائِمَ يَمْتَنِعُ عَنِ الْمُضَارِّ فَلَا تَقْرَبُهَا لِشُعُوْرِهَا بِخِلَافِ هٰؤُلَاءِ . (صَاوِى)

قَوْلُهُ وَمَا يَشْعُرُونَ : ইন্দ্রিয় জ্ঞানকে আরবিতে شُعُوْر বলে। এটাকেই আমরা অনুভূতি বলি।

قَوْلُهُ اَلْمُخَادَعَةُ هٰنَا مِنْ وَاحِدٍ : এই অংশটুকু বৃদ্ধি করে একটি আপত্তির জবাব দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন : يُخَادِعُوْنَ ক্রিয়া بَاب مُفَاعَلَة শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এ শ্রেণির বৈশিষ্ট্য হলো مُشَارَكَة বা দু'পক্ষ থেকে ক্রিয়া বিনিময়। মুনাফিকদের পক্ষ থেকে ধোঁকা প্রতারণার বিষয়টি তো বুঝে আসে; কিন্তু আল্লাহ তা'আলার প্রতি এই মন্দ স্বভাবের নিসবত করাটি বুঝে আসে না। কেননা ধোঁকা ও প্রতারণা হলো ইতর স্বভারের অন্তর্ভুক্ত। যা থেকে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র।

উত্তর : بَاب مُفَاعَلَة যদিও উভয় দিক থেকে অংশগ্রহণ দাবি করে; কিন্তু এটা قَاعِدَة كُلِّيَّة নয়। কারণ তার একটি বৈশিষ্ট্য مُوَافَقَت مُجَرَّد তথা ثُلَاثِى مُجَرَّد -এর অর্থ প্রদানও রয়েছে। যেমন سَفَرَ بِمَعْنٰى سَافَرَ وَعَاقَبْتُ اللِّصَّ সুতরাং এখানে خَادَعَ ক্রিয়াটিও خَدَعَ -এর অর্থে ধর্তব্য হবে। আর مُفَاعَلَة শ্রেণির ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে নিছক জোর প্রদান করার উদ্দেশ্যে।

اَلْمُفَاعَلَةُ لِاِفَادَةِ الْمُبَالَغَةِ فِى الْكَيْفِيَّةِ (اَبُو السُّعُوْد)

قَوْلُهُ يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ :

প্রশ্ন : উপরের জবাব থেকে তো বোঝা গেল, আল্লাহ ধোঁকা দেন না। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়, তা হলো আল্লাহ তা'আলা তো হলেন অন্তর্যামী, তাঁর কাছে কোনো বিষয়-ই গোপন থাকে না। তাহলে মুনাফিকরা তাঁকে কিভাবে ধোঁকা দেয়?

উত্তর :

১. **সত্যের অব্যাহত বিরুদ্ধাচারণ এবং সত্যকে অস্বীকার** করার ঔদ্ধত্য তাদের এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, নিজেদের **আত্মপ্রসাদ** আর ধারণা মতে আল্লাহ তা'আলাকে পর্যন্ত তারা প্রতারিত করেছে। তাই মূল তরজমা হবে- তারা প্রতারিত করতে চায়। اِجْتَرَءُوْا عَلَى اللّٰهِ حَتّٰى ظَنُّوْا يَخْدَعُوْنَ اللّٰهَ (اِبْنُ جَرِيْر عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ)

২. এমন অর্থও হতে পারে যে, রাসূল ﷺ -এর সাথে প্রতারণার অপচেষ্টাকে কুরআন খোদ আল্লাহ তা'আলার সাথে প্রতারণা বলে ধরে নিয়েছে। এর আরো দৃষ্টান্ত কুরআনে আছে। প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো কর্মটির জঘন্যতা প্রকাশ করা।

قَوْلُهُ وَ ذِكْرُ اللّٰهِ فِيْهَا تَحْسِيْنٌ : মুসান্নিফ (র.) এ ইবারত দ্বারা উল্লিখিত ইশকালেরই জবাব দিতে চাচ্ছেন এভাবে যে, يُخَادِعُوْنَ -এর মধ্যে اَللّٰهَ শব্দটির উল্লেখ تَحْسِيْن অর্থাৎ আলঙ্ককারিক সৌন্দর্য বর্ধনের উদ্দেশ্য করা হয়েছে। মূলত ইবারতটি এভাবে হবে- يُخَادِعُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

এছাড়াও এর আরো জবাব এই যে, এখানে বালাগাতের নিয়ম اِسْتِعَارة تَمْثِيْلِيَّة হয়েছে مُشَبَّه بِهٖ -কে- مُشَبَّه -এর জন্য مُسْتَعَار নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সাথে মুনাফিকদের আচরণটি ঐ ব্যক্তির অবস্থার সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে, যে স্বীয় সঙ্গীর সাথে ধোঁকা ও প্রতারণামূলক আচরণ করে। অথবা مَجَاز عَقْلِى হিসেবে আল্লাহর দিকে ধোঁকার নিসবত করা হয়েছে। যেমন- فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى -এর মধ্যে اِسْنَاد টি مَجَازِى বা রূপক অর্থে হয়েছে। অথবা مُشَاكَلَة রূপে خِدَع -এর নিসবত আল্লাহর প্রতি করা হয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে আয়াত جَزَاءُ السَّيِّئَةِ سَيِّئَةٌ -এর মাঝে হয়েছে। -[হাশিয়ায়ে জালালাইন]

অনুবাদ :

১০. فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ شَكٌّ وَنِفَاقٌ فَهُوَ يُمَرِّضُ قُلُوْبَهُمْ اَىْ يُضْعِفُهَا فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ج بِمَا اَنْزَلَهُ مِنَ الْقُرْاٰنِ لِكُفْرِهِمْ بِهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ مُؤْلِمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ بِالتَّشْدِيْدِ اَيْ نَبِيَّ اللّٰهِ وَبِالتَّخْفِيْفِ اَيْ فِيْ قَوْلِهِمْ اٰمَنَّا .

১০. তাদের অন্তরে রয়েছে ব্যাধি সন্দেহ ও কপটতা, ফলে এ ব্যাধি তাদের অন্তর রোগাক্রান্ত অর্থাৎ দুর্বল করে দেয়। অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরো বৃদ্ধি করেছেন কুরআনের যে অংশ [নতুন নতুন] নাজিল করেছেন তার দ্বারা, কেননা [যতবারই নতুন বিধান ও আয়াত নাজিল হয়েছে] তারা সেটাকে অস্বীকার করেছে। [এই অস্বীকৃতি ও কুফরির দরুন তাদের ঐ ব্যাধি বৃদ্ধি পেয়ে চলছে] ও তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক যন্ত্রণাকর শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাচারী। يَكْذِبُوْنَ ক্রিয়াটির ذ হরফটি] তাশদীদসহ। بَاب تَفْعِيْل হতে গঠিত ক্রিয়ারূপ] পঠিত হলে এর মর্ম হবে আল্লাহর নবীকে অস্বীকার করার দরুন তাদের এই পরিণতি আর ذ হরফটি তাখফীফ অর্থাৎ তাশদীদ ব্যতিরেকে লঘু আকারে [بَاب ضَرَبَ হতে গঠিত ক্রিয়ারূপ] পঠিত হলে এর মর্ম হবে ঈমান এনেছে বলে তাদের মিথ্যা ভাষণের দরুন।

১১. وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَيْ لِهٰؤُلَاءِ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ لِلْكُفْرِ وَالتَّعْوِيْقِ عَنِ الْاِيْمَانِ قَالُوْا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ وَلَيْسَ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ بِفَسَادٍ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى رَدًّا عَلَيْهِمْ .

১১. যখন তাদেরকে বলা হয় উক্ত লোকদেরকে অশান্তি সৃষ্টি করো না পৃথিবীতে, সত্য প্রত্যাখ্যান এবং ঈমান হতে লোকজনকে বাধা প্রদানের মাধ্যমে তারা বলে, আমরা তো সংশোধনবাদী মাত্র। আমরা যে কাজ করছি সেটা বিশৃঙ্খলা নয়। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতিবাদ করে ইরশাদ করেন।

১২. اَلَا لِلتَّنْبِيْهِ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ بِذَالِكَ

১২. সাবধান! لا শব্দটি সতর্কীবাচক অব্যয়; তারাই অশান্তি সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা তা বুঝে না।

১৩. وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ اَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ط الْجُهَّالُ اَيْ لَا نَفْعَلُ كَفِعْلِهِمْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى رَدًّا عَلَيْهِمْ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ .

১৩. যখন তাদেরকে বলা হয় তোমরাও বিশ্বাস কর অপরাপর লোকদের মতো রাসূল ﷺ -এর সাহাবীগণের মতো, তারা বলে নির্বোধগণ অজ্ঞ, মূর্খগণ যেরূপ বিশ্বাস করেছে আমরাও কি সেইরূপ বিশ্বাস করব? অর্থাৎ আমরা তাদের ন্যায় কাজ করতে পারি না। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতিবাদে ইরশাদ করেন– সাবধান! তারাই নির্বোধ, কিন্তু তারা তা জানে না।

তাহকীক ও তারকীব

فِيْ قُلُوْبِهِمْ খবরে মুকাদ্দাম مَرَضٌ মুবতাদায়ে مُؤَخَّر : [illegible] مَرَضٌ - [illegible]
[illegible] مَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ [illegible]

لَهُمْ খবর. مَرَض [ব্যাধি] শরীরের অস্বাভাবিক ও অসামঞ্জস্য অবস্থা। مَجَازًا [রূপকার্থে] আত্মিক বদ অভ্যাসগুলোকেও বলে। এ স্থানে এটাই উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ شَكٌّ وَنِفَاقٌ : মুফাসসির (র.) مَرَض -এর ব্যাখ্যায় এ দুটি শব্দ উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে مَرَض দ্বারা রূহানী ব্যাধি উদ্দেশ্য।

بِمَا اَنْزَلَهُ مِنَ الْقُرْاٰنِ لِكُفْرِهِمْ بِهٖ : এ ইবারত দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে زِيَادَتْ مَرَض বা রোগ বৃদ্ধি দ্বারা কুফর উদ্দেশ্য। এভাবে যে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিধি-বিধানের মুকাল্লাফ বালাচ্ছেন আর তারা তা অস্বীকার করছে। রাসূল ﷺ -এর প্রতি ওহী অবতীর্ণ হচ্ছে আর তারা অস্বীকার করছে। এভাবে যেন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের রূহানী রোগ-ব্যাধিতে বৃদ্ধি ঘটেছে।

زَادَ -এর সম্পর্ক خَتَمَ -এর মতো আল্লাহ তা'আলা নিজের দিকে করেছেন। তাই মু'তাযিলাদের জন্য দলিল পেশ করার সুযোগ নেই। اَلِيْم - فَعِيْل -এর ওজনে। জালাল মুফাস্‌সির (র.) এরপরে مُؤْلِم বের করে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, এটাকে ইস্‌মে ফায়েলের অর্থেও নেওয়া যায়। عَذَاب কষ্টদায়ক হয় এবং অর্থের দিক দিয়ে ইসমে মাফঊলও নেওয়া যায়, যা দ্বারা উদ্দেশ্য হবে مُبَالَغَة এত ভয়াবহ শাস্তি হবে যে. عَذَاب স্বয়ং কষ্টে পড়বে كَالنَّارِ اِذَا اشْتَدَّتْ يَأْكُلُ بَعْضُهُ بَعْضًا

بِالتَّشْدِيْدِ : অর্থাৎ يَكْذِبُوْنَ -এর মধ্যে দু'টি কেরাত রয়েছে। একটি হলো তাশদীদসহ অপরটি তাশদীদ ছাড়া। প্রথম কেরাতটি [তাশদীদসহ] بَاب تَفْعِيْل -এর মাসদার تَكْذِيْب [তাশদীদসহ] بَاب تَفْعِيْل -এর এটি تَكْذِيْب [মিথ্যা প্রতিপন্ন করা] থেকে। এ সূরতে এটি مُتَعَدِّىْ হবে। একজন মুফাসসির (র.) اَىْ نَبِىَّ اللّٰهِ উল্লেখ্য করে তার মাফঊলের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

وَبِالتَّخْفِيْفِ : এটি ইমাম আসেম এবং কিসাঈ (র.)-এর কেরাত। এ সূরতে অর্থ হতে তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক। শাস্তি এ কারণে যে, তারা মিথ্যা বলে।

اَىْ فِىْ قَوْلِهِمْ اٰمَنَّا : অর্থাৎ تَخْفِيْف -এর কেরাত অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হবে তারা নিজেদের বক্তব্য اٰمَنَّا بِاللّٰهِ -এর মাঝে মিথ্যুক।

اِذَا - শর্তিয়াহ, قِيْلَ -এর নায়েবে ফায়েল হলো لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ ؛ لَهُمْ মুতা'আল্লিক্ব قَالُوْا ফেয়েল বা-ফায়েল, জুমলা হয়ে মুবতাদা, اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ জুমলা হয়ে খবর হয়ে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ। اَلَا হরফে তাম্বীহ বাক্যের প্রথমে আনা হয়, اِنَّ -এর اِسْم যমীরে هُمْ ,هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ জুমলা اِنَّ -এর খবর لٰكِنْ ইস্তিদরাকিয়াহ্। فَسَاد সামঞ্জস্যতার সীমা থেকে বের হয়ে যাওয়া। এর বিপরীত হচ্ছে اِصْلَاح - قِيْلَ -এর নায়েবে فَاعِل হয়ত মু'মিনীন তা না হয় রাসূল ﷺ। অথবা আল্লাহ তা'আলা। হযরত ইবনে আব্বাস ও হাসান এবং কাতাদাহ্ (রা.)-এর মতে এখানে فَسَاد দ্বারা উদ্দেশ্য গুনাহ ও অবাধ্যতামূলক কার্যকলাপ, যেগুলোর কারণে জাহেরী ও বাতেনী সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়।

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ -

قَوْلُهُ التَّعْوِيْق : بَاب تَفْعِيْل -এর মাসদার। অর্থ– বাঁধা দেওয়া, বিরত রাখা, কোনো কাজে প্রতিবন্ধক হওয়া। এখানে অর্থ হলো– تَعْوِيْقُ الْغَيْرِ عَنِ الْاِيْمَانِ [কাউকে ঈমান থেকে ফিরিয়ে রাখা]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ عَذَابٌ اَلِيْمٌ مُؤْلِمٌ : اَلِمَ (س) اَلَمًا -ব্যথা অনুভব করা। اَلِيْم ইসমে ফায়েলের অর্থ হলো ব্যথা অনুভবকারী।

প্রশ্ন : عَذَاب -এর সিফত হিসেবে اَلِيْم আনা শুদ্ধ নয়। কেননা আজাব দ্বারা তো যাকে আজাব দেওয়া হবে, সে কষ্ট পাবে, আজাব কষ্ট পাবে না।

উত্তর : এ সংশয় নিরসনকল্পেই বিজ্ঞ মুফাসসির (র.) مُؤْلِمٌ শব্দটি বৃদ্ধি করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, মূলত শব্দটি اِيْلَام [ব্যথা দেওয়া] থেকেই কিন্তু মোবালাগা স্বরূপ এখানে اَلِيْم ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ এমন কঠিন শাস্তি, যার প্রচণ্ডতার কারণে স্বয়ং আজাবও কষ্ট অনুভব করে।

وَ وَجْهُ الْمُبَالَغَةِ اَنَّ اِفَادَةَ الْاَلَمِ بَلَغَ الْغَايَةَ حَتّٰى سَرٰى مِنَ الْمُعَذَّبِ اِلَى الْعَذَابِ ...

ফায়দা : পূর্বে ৭নং আয়াতে কাফেরদের ব্যাপারে যে আজাবের সংবাদ দেওয়া হয়েছে, তার সিফত عَظِيْم ব্যবহার করা হয়েছে। আর এখানে মুনাফিকদের যে আজাবের ধমকি দেওয়া হচ্ছে, তার সিফত اَلِيْم ব্যবহার করা হয়েছে। আর اَلِيْم অর্থ বেদনাদায়ক শাস্তি। যেন তার মাঝে শাস্তির দিকটা অধিক। এর কারণ এই যে, যারা মুনাফিক, তারাও কাফের। কিন্তু তাদের অপরাধ অনেক জঘন্য ও সাংঘাতিক। কেননা তারা কুফরির পাশাপাশি ধোঁকা, প্রতারণা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে। আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের পরিণতি সম্পর্কে আগাম সংবাদ দিয়ে বলেছেন : اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ অর্থাৎ নিশ্চয় মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্নতর স্তরে থাকবে। -[সূরা নিসা : ১৪৫]

বাস্তবের বিপরীত কথাকে كِذْب বলে এবং কারো কারো দৃষ্টিতে বিশ্বাসের বিপরীত, আর কারো কারো দৃষ্টিতে বিশ্বাস ও বাস্তবের বিপরীত উভয়টি (كِذْب) মিথ্যার জন্য শর্ত। এমনিভাবে এর বিপরীত صِدْق -এর মধ্যেও তিনটি ব্যাখ্যা হবে। কাজী বায়যাবী (র.) ও আল্লামা যমখশারী (র.) ব্যাখ্যা করেছেন যে, এর দ্বারা (كِذْب) মিথ্যা ব্যাপকভাবে ও সাধারণভাবে হারাম হওয়া বুঝা গেল। কিন্তু বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে এটা যে, (كِذْب) মিথ্যার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে, কোনোটি হারাম, কোনোটি মাকরূহ, কোনোটি মুবাহ। কোনোটি মনদূব, কোনোটি ওয়াজিব, ব্যবহারের স্থান বিশেষে পার্থক্য হবে। যেমনটি ফেকহর কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।

يُكَذِّبُوْنَ যদি مُشَدَّد ক্বেরাত হয়। তবে বাবে تَفْعِيْل থেকে মুফাস্সির আল্লাম (র.) মাফউলকে حَذْف -এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন। اَىْ نَبِيَّ اللّٰهِ এবং যদি بِالتَّخْفِيْفِ হয়, তবে ছুলাছী মুজাররাদ থেকে।

قَوْلُهٗ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ : এখানে بَاء হরফটি سَبَبِيَّة বা কারণ দর্শানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে অর্থ তাদের মর্মন্তুদ শাস্তি এজন্য যে, তারা মিথ্যা কথা বলত। এখানে মিথ্যা বলা ক্রিয়া পদের দ্বারা ইসলাম গ্রহণের দাবি অর্থাৎ মহান আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি তাদের ঈমানের মিথ্যা দাবির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ মর্মন্তুদ শাস্তি বস্তুবিক পক্ষে তাদের কপটতার জন্য; সাধারণভাবে মিথ্যা বলার জন্য নয়। -[তাফসীরে উসমানী পৃ. ৪, টীকা. ৮]

قَوْلُهٗ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ : মুনাফিকদের কতিপয় গর্হিত স্বভাব ও কর্মের কথা তুলে ধরা হলো। পূর্বের আয়াতে ধোঁকার কথা বলা হয়েছে। এখানে দ্বিতীয় স্বভাবটি উল্লেখ করা হয়েছে। তা হলো নিজেরা সন্ত্রাসী হওয়া সত্ত্বেও অপরকে সন্ত্রাসী বলে আখ্যা দেওয়া।

قَوْلُهٗ قِيْلَ لَهُمْ : قِيْلَ মাজহূলের সীগাহ। অর্থাৎ যখন তাদেরকে বলা হয়, এখন কথা হলো قَائِل বা বক্তা কে? এ ব্যাপারে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে। ১. আল্লাহ তা'আলা ২. রাসূল ﷺ ৩. কতিপয় মু'মিন।

قَوْلُهٗ لِهٰؤُلَاءِ : মুফাসসির (র.) এ ইবারত দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এ আয়াতের মেসদাক ঐ সকল মুনাফিক, যারা পূর্বের আয়াতের মেসদাক ছিল এবং لَهُمْ -এর জমিতে মুত্তাসিল, তাদের দিকে ফিরেছে।

قَوْلُهٗ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ : فَسَاد অর্থ- خُرُوْجُ الشَّيْءِ عَنِ الْحَالَةِ اللَّائِقَةِ (صَاوِى) خُرُوْجُ النَّبِيِّ عَنِ الْاِعْتِدَالِ (جَمَل) আয়াতে মুনাফিকদেরকে যে বিশৃঙ্খলা থেকে বারণ করা হচ্ছে, তা দ্বারা উদ্দেশ্য কুফরি ও অন্যের ঈমান গ্রহণে প্রতিবন্ধক হওয়া। কেননা কুফর এবং নাফরমানির কারণে জমিনে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি ছড়ায়। পক্ষান্তরে ঈমান ও আল্লাহর আনুগত্য দ্বারা শান্তি-নিরাপত্তা ও স্বস্তি বিস্তার করে। এমনিভাবে মু'মিনদের গোপন খবরা-খবর কাফেরদের নিকট প্রকাশ করে দেয় এবং তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করাও فَسَاد -এর অন্তর্ভুক্ত।

আল্লামা সুলাইমান জামাল (র.) বলেন-

وَالْمُرَادُ بِمَا نُهُوْا عَنْهُ مَا يُؤَدِّىْ اِلٰى ذٰلِكَ مِنْ اِفْشَاءِ اَسْرَارِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِلَى الْكُفَّارِ وَاِغْرَائِهِمْ عَلَيْهِمْ وَغَيْرِ ذٰلِكَ مِنْ فُنُوْنِ الشُّرُوْرِ . كَمَا يُقَالُ لِلرَّجُلِ : لَا تَقْتُلْ نَفْسَكَ بِيَدِكَ وَلَا تُلْقِ نَفْسَكَ فِى النَّارِ (جَمَل صـ٢٤ جـ١) .

قَوْلُهٗ بِالْكُفْرِ وَالتَّعْوِيْقِ : মুনাফিকরা কয়েকভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করত। তন্মধ্যে হতে দুটি পদ্ধতির কথা মুসান্নিফ (র.) উল্লেখ করেছেন।

১. **কুফর :** মুনাফিকদের কুফর ছিল বড় ধরনের বিশৃঙ্খলা। কুফরীর কারণে তারা কাফেরদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করত এবং কাফেরদের কাছে মুসলমানদের খবরা-খবর ফাঁস করে দিত। কাফেরদের আপত্তিসমূহ মুসলমানদের সামনে উল্লেখ করত, যাতে তাদের ঈমানে দুর্বলতা আসে।

২. **ঈমানের পথে অন্তরায় হওয়া :** অর্থাৎ মুনাফিকরা অন্যদেরকে ঈমান গ্রহণ থেকে বারণ করত। যা বিশৃঙ্খলার কারণ ছিল। কেননা কুফরের কারণে বিশ্বের শৃঙ্খলায় বিঘ্ন ঘটে। এ ছাড়াও মুনাফিকী বা দ্বিমুখী স্বভাব দীনি এবং দুনিয়াবী সকল ক্ষেত্রেই বিশৃংখলার কারণ।

قَوْلُهُ قَالُوْا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ : প্রত্যেক যুগের ধর্মবিদ্বেষী ও মুনাফিকদের চরিত্রই হলো নিজেরা বিশৃঙ্খলা ও অশান্তিমূলক কর্মকাণ্ড করেও শান্তি ও উন্নতির দাবি করা। তারা যেন মদের বোতলে শরবতের লেবেল দিয়ে দেয়। মদীনার মুনাফিকদের অবস্থা তাই ছিল। যখন তাদেরকে কেউ বলত, মুনাফেকি করে জমিনে বিশৃঙ্খলা করো না, তখন তারা অকুণ্ঠভাবে জবাব দিত- إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ আমরাই তো একমাত্র শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী। আল্লাহ তা'আলাও বড় বলিষ্ঠতাপূর্ণ ও অধিক তাকীদ সম্বলিত বাক্যে তাদের জবাব দিয়ে বলেন- أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ শুনে রাখ! ওরাই একমাত্র বিশৃঙ্খলাকারী; কিন্তু তাদের অনুভূতি নেই যে, তারাই বিশৃঙ্খলাকারী। তাদের বিবেক বুদ্ধি এ পরিমাণ লোপ পেয়েছে যে, তারা বিশৃঙ্খলাকে শৃঙ্খলা এবং অশান্তিকে শান্তি মনে করছে। যেমন কুরআনের অন্যত্র এসেছে–

أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوْٓءُ عَمَلِهِ فَرَاٰهُ حَسَنًا (فَاطِر : ٨)

এর কারণ এই ছিল যে, কিছু বিষয় তো এমন রয়েছে যেগুলোকে প্রত্যেক মানুষ-ই মনে করে যে, এগুলো ফিতনা ও ফ্যাসাদ। যেমন, হত্যা রাহাজানী, চুরি, ডাকাতি, জুলুম, অন্যায়, ধোঁকা, প্রতারণা ইত্যাদি। প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলতেই এগুলোকে খারাপ ও ফেতনা ফ্যাসাদ মনে করে। প্রত্যেক ভদ্র মানুষ এগুলো থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করে। আর কিছু বিষয় এমন রয়েছে, যেগুলো বাহ্যিক দৃষ্টিতে ফেতনা ফ্যাসাদ নয়; কিন্তু সেগুলোর কারণে মানুষের আখলাক চরিত্র বিনষ্ট হয়ে যায়। যার ফলে সব রকমের ফেতনা ফ্যাসাদের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। মুনাফিকদের অবস্থা অনুরূপ ছিল। তারা চুরি-ডাকাতি, অন্যায়-অবিচারসহ অন্যান্য খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকত এবং সেগুলোকে দূষণীয় মনে করত। তাইতো তারা বেশ জোর দিয়েই নিজেদের বিশৃঙ্খলাকারী হওয়াকে অস্বীকার করেছে। বস্তুত যখন মানুষ চরিত্রগত বিপর্যয়ের শিকার হয়, তখন নিজের মনুষ্যবোধকে হারিয়ে ফেলে। –[জামালাইন খ. ১, পৃ. ৫৬]

قَوْلُهُ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ : মুনাফিকরা তাদের বক্তব্যটি إِنَّمَا (كَلِمَةُ حَصْر) এবং جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ দ্বারা তাকীদরূপে পেশ করেছে। আল্লাহ তা'আলাও তাদের জবাবে এমন جُمْلَةٌ ব্যবহার করেছেন, যা চারটি তাকিদ সম্বলিত। আর তা হলো–

أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ

١. أَلَا حَرْفُ التَّنْبِيْهِ ـ ٢. إِنَّ حَرْفُ الْمُشَبَّهِ بِالْفِعْلِ ـ ٣. هُمْ ضَمِيْرُ الْفَصْلِ ـ ٤. تَعْرِيْفُ الْخَبَرِ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ ـ (أَيِ الْمُفْسِدُوْنَ)

لِلتَّنْبِيْهِ : أَيْ تَنْبِيْهُ الْمُخَاطَبِ لِلْحُكْمِ الَّذِيْ يُلْقٰى بَعْدَهَا

أَلَا حَرْفُ تَنْبِيْهٍ وَاسْتِفْتَاحٍ وَلَيْسَتْ مُرَكَّبَةً مِنْ هَمْزَةِ الْاِسْتِفْهَامِ وَلَا النَّافِيَةِ بَلْ هِيَ بَسِيْطَةٌ؛ وَلٰكِنَّهَا لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ التَّنْبِيْهِ وَالْاِسْتِفْتَاحِ فَتَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَةِ اِسْمِيَّةً كَانَتْ أَوْ فِعْلِيَّةً (جَمَل بِحَوَالَةِ السَّمِيْن)

أَيْ بِأَنَّهُمْ مُفْسِدُوْنَ أَوْ بِأَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يُطْلِعُ نَبِيَّهُ عَلٰى فَسَادِهِمْ (جَمَل) : بِذٰلِكَ

قَوْلُهُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ : মুফাসসির (র.) اَلنَّاسُ-এর ব্যাখ্যায় أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, اَلنَّاسُ-এর মাঝে اَلِف ـ لَامْ টি عَهْد ذِهْنِي। আর তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম (রা.)।

قَوْلُهُ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ : এতে মুনাফিকদের বুদ্ধিমত্তার বাতিল দাবির জবাব দেওয়া হয়েছে। আয়াতে চারটি তাকিদ ব্যবহার করে মুনাফিকদের নির্বুদ্ধিতার কথা জোরালোভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এরা এ পরিমাণ বেকুব যে, নিজেদের লাভ ক্ষতিও পরখ করতে পারে না।

মুনাফিকরা সাহাবায়ে কেরাম (রা.) -কে কোন দৃষ্টিতে আহমক বলত? : মুনাফিকরা সাহাবায়ে কেরামকে নির্বোধ মনে করার কারণ হলো কেবল ইসলামের খাতিরে গোটা দেশের মানুষকে দুশমন বানানো তাদের দৃষ্টিতে নিতান্তই বোকামির কাজ ছিল। তারা বুদ্ধিমত্তা বলতে মনে করতো হক– বাতিলের আলোচনা না করা এবং শুধু নিজের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা।

قَوْلُهُ أَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَاءُ : এটা ছিলো যুগের পাক্কা ও সাচ্চা মুসলমানদের প্রতি, রাসূলের সাহাবীদের প্রতি কটাক্ষ। এই রীতি আজো বহাল আছে। প্রগতিবাদী ও নব্যপন্থিদের দরবার থেকে স্থবির, প্রতিক্রিয়াশীল, সেকেলে চিন্তাধারা, মৌলবাদী ইত্যাদি কত কিসিমের কিতাবই না বিতরণ করা হয় নিবেদিতপ্রাণ খাঁটি ঈমানদারদের প্রতি। –[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ৪৫]

اَلْجُهَّالُ : এটি سُفَهَاءُ-এর তাফসীর। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেছেন– وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ তাই মুফাসসির (র.) এখানে اَلسُّفَهَاءُ দ্বারা اَلْجُهَّالُ-এর তাফসীর করেছেন।

فُسِّرَ السَّفَهُ بِالْجَهْلِ أَخْذًا مِنْ مُقَابَلَتِهِ بِالْعِلْمِ وَفُسِّرَ غَيْرُهُ بِنَقْصِ الْعَقْلِ لِأَنَّ السَّفَهَ خِفَّةٌ وَسَخَافَةُ رَأْيٍ يَقْتَضِيهِمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالْحِلْمِ يُقَابِلُهُ . (جَمَل :٢٩١)

اَلسُّفَهَاءُ : এটি سَفِيْهٌ -এর বহুবচন। سَفَهٌ থেকে নির্গত। سَفَهٌ -এর অর্থ বুদ্ধি স্বল্প হওয়া।

قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ اَلسَّفِيْهُ الْجَاهِلُ ضَعِيْفُ الرَّأْيِ قَلِيْلُ الْمَعْرِفَةِ [অর্থাৎ سَفِيْه বলা হয় সে নির্বোধকে, যে নিজের ভালোমন্দ পুরো মাত্রায় বুঝতে অক্ষম।

قَوْلُهُ لَا نَفْعَلُ كَفِعْلِهِمْ : এর দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, أَنُؤْمِنُ -এর হামযাটি اِسْتِفْهَام اِنْكَارِىْ হিসেবে ব্যবহৃত।

قَوْلُهُ وَلٰكِنْ لَا يَعْلَمُوْنَ : তাদের বোকামি আর নির্বুদ্ধিতা লক্ষণীয়। আগে তো অরাজকতাকে সংশোধন বলেছিল। এবার নিবুদ্ধিতার পরাকাষ্ঠা দেখাল আকল ও বুদ্ধিমত্তাকে বুদ্ধিহীনতা আখ্যা দিয়ে।

ফায়দা : এখানে একটি ইশকাল হয় যে, পূর্বের আয়াতে لَا يَشْعُرُوْنَ বলা হয়েছে এবং এখানে لَا يَعْلَمُوْنَ বলা হলো কেন?

জবাব : এ আয়াতে سَفَاهَتْ বা নির্বুদ্ধিতার আলোচনা হয়েছে আর سَفَاهَتْ বা নির্বুদ্ধতা عَدَم عِلْم তথা না জানাকে আবশ্যক করে। তাই এখানে- لَا يَعْلَمُوْنَ বলা হয়েছে। আর পূর্বের আয়াতে اِفْسَاد বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার কথা আলোচিত হয়েছে। আর اِفْسَاد হলো مَحْسُوْس বা অনুভব করার মত বিষয়। তাই সেখানে لَا يَشْعُرُوْنَ বলে اِحْسَاس বা অনুভবকে নাকচ করা করা হয়েছে।

আল্লামা সুলাইমান জামাল (র.) বলেন-

عُبِّرَ هُنَا بِنَفْيِ الْعِلْمِ، وَ ثَمَّ بِنَفْيِ الشُّعُوْرِ، لِأَنَّ الْمُثْبَتَ لَهُمْ هُنَاكَ هُوَ الْإِفْسَادُ وَهُوَ مِمَّا يُدْرَكُ بِأَدْنٰى تَأَمُّلٍ كَأَنَّهُ مِنَ الْمَحْسُوْسَاتِ الَّتِىْ لَا تَحْتَاجُ إِلٰى فِكْرٍ كَثِيْرٍ . فَنُفِيَ عَنْهُمْ مَا يُدْرَكُ بِالْحَوَاسِّ مُبَالَغَةً فِىْ تَجْهِيْلِهِمْ وَهُوَ أَنَّ الشُّعُوْرَ الَّذِىْ قَدْ ثَبَتَ لِلْبَهَائِمِ مَنْفِيٌّ عَنْهُمْ وَالْمُثْبَتُ هُنَا هُوَ السَّفَهُ وَالْمَصْدَرُ بِهِ هُوَ الْأَمْرُ بِالْإِيْمَانِ وَ ذٰلِكَ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلٰى إِمْعَانِ فِكْرٍ وَ نَظَرٍ تَامٍّ يُفْضِىْ إِلَى الْإِيْمَانِ وَالتَّصْدِيْقِ وَلَمْ يَقَعْ مِنْهُمُ الْمَأْمُوْرُ بِهِ وَهُوَ الْإِيْمَانُ فَنَاسَبَ ذٰلِكَ نَفْيَ الْعِلْمِ عَنْهُمْ . (جَمَل)

ذٰلِكَ : اَىْ أَنَّهُمْ سُفَهَاءُ অর্থাৎ ذٰلِكَ -এর مُشَارٌ اِلَيْهِ হলো তাদের নির্বুদ্ধিতা।

ফায়দা : মুনাফিকরদেরকে দুভাবে নসিহত করা হয়েছে-

১. اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ পদ্ধতিতে। তা হলো ঈমান গ্রহণের দাওয়াত প্রদান।
২. نَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ পদ্ধতিতে। তা হলো-বিশৃঙ্খলা না করা।

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সত্যের মাপকাঠি : ১৩ নং আয়াতে তথা اٰمِنُوْا كَمَا اٰمَنَ النَّاسُ -এর মাঝে সঠিক ঈমানের একটি মাপকাঠি দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের মতো ঈমান আন। এতে জানা গেল, সাহাবায়ে কেরামের ঈমান অন্যদের জন্য একটি মাপকাঠি। সঠিক এবং অসঠিক ঈমানকে যাচাই করার এক কষ্টিপাথর। বর্তমান যুগের মুনাফিকরা তো এ প্রোপাগাণ্ডা চালাচ্ছে যে, [নাউযুবিল্লাহ] সাহাবায়ে কেরাম ঈমানের সম্পদ থেকে মাহরুম ছিলেন। এটা শিয়াদের আকীদা।

সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী কে? : কু-জন্মা ব্যক্তি দ্বারা সর্বদা সন্ত্রাস হওয়াই সম্ভাব্য; কিন্তু যদি হিতাকাঙ্ক্ষী লোক আবেগে বাধ্য হয়ে এ কু-জন্মা লোকদের মঙ্গলের চিন্তা করে তাদেরকে বুঝায় যে, তোমাদের এ অসৎ কার্যাবলির কারণে জমিনে অশান্তি ও সন্ত্রাস বিস্তার হচ্ছে। তাই তোমরা ফিরে এসো! তখন এরা চূড়ান্ত বোকামি ও নির্বুদ্ধিতার কারণে নিজেদের দোষগুলোকে গুণ হিসেবে প্রকাশ করে বড় জোরে শোরে উত্তর দেয় যে, আমাদের কাজ তো শুধু সংশোধন করা; সন্ত্রাস নয়। এ জেহলে মুরাক্কাব ও ধ্বংসের অপেক্ষাকারীর কি চিকিৎসা? যে, অজ্ঞতাকে জ্ঞান, সন্ত্রাসকে সংশোধন, তিক্তকে মিষ্টি এবং কালোকে সাদা বুঝতেছে।

شعر : ہر کس کہ نداند وبداند کہ بداند ۔ در جہل مرکب ابد الدہر بماند

অর্থ : যে ব্যক্তি স্বয়ং অজ্ঞ এবং নিজকে মনে করে যে সে পণ্ডিত, সে অজ্ঞতা চিরকাল মিশ্রিতাবস্থায় থেকে যাবে। এ চিকিৎসাহীন রোগ থেকে বাঁচার ও বের হওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই।

অনুবাদ :

١٤. وَإِذَا لَقُوا أَصْلُهُ لَقِيُوا حُذِفَتِ الضَّمَّةُ لِلْاِسْتِثْقَالِ ثُمَّ الْيَاءُ لِالْتِقَائِهَا سَاكِنَةً مَعَ الْوَاوِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا مِنْهُمْ رَجَعُوْا إِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ـ رُؤَسَائِهِمْ قَالُوْٓا إِنَّا مَعَكُمْ فِي الدِّيْنِ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ بِهِمْ بِإِظْهَارِ الْإِيْمَانِ

১৪. যখন তারা সাক্ষাৎ করে لَقُوا ক্রিয়াটি মূলত لَقِيُوْا রূপে ছিল। ى -এর মাঝে পেশ উচ্চারণে কঠিন বিধায় তাকে বিদূরিত করে দেওয়া হয়, অতঃপর وَاو সাকিনের সাথে তার একত্র হওয়ায় দুই সাকিন একসঙ্গে উচ্চারণ হয় না বলে তাকেও বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। বিশ্বাসীগণের সাথে, তখন বলে 'আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি' আর যখন পৃথক হয় বিশ্বাসীগণ হতে এবং প্রত্যাবর্তন করে তাদের শয়তানের নিকট অর্থাৎ তাদের দলপতিগণের নিকট তখন বলে, 'আমরা তোমাদের সাথেই রয়েছি ধর্ম বিশ্বাসে। তাদের সাথে আমরা শুধু ঠাট্টা-তামাশা করছি বাহ্যত ঈমানের কথা প্রকাশ করে।

١٥. اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ يُجَازِيْهِمْ بِاسْتِهْزَائِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ يُمْهِلُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ تَجَاوُزِهِمُ الْحَدَّ بِالْكُفْرِ يَعْمَهُوْنَ ـ يَتَرَدَّدُوْنَ تَحَيُّرًا حَالٌ

১৫. আল্লাহ তাদের পরিহাস করেন অর্থাৎ তিনি তাদের এই তামাশার শাস্তি দান করবেন আর তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় অর্থাৎ কুফরি করে সীমালঙ্ঘন করার মধ্যে অবকাশ ঢিল দিয়ে রেখেছেন আর তারা বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরছে অর্থাৎ হতবুদ্ধি হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। يَعْمَهُوْنَ [তারা বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে] এই বাক্যটি حَالٌ বা ভাব ও অবস্থাবাচক পদ।

١٦. أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ـ اِسْتَبْدَلُوْهَا بِهٖ فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ أَيْ مَا رَبِحُوْا فِيْهَا بَلْ خَسِرُوْا لِمَصِيْرِهِمْ إِلَى النَّارِ الْمُؤَبَّدَةِ عَلَيْهِمْ ـ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ـ فِيْمَا فَعَلُوْا ـ

১৬. তারাই সৎ পথের বিনিময়ে ভ্রান্ত পথ ক্রয় করেছে। অর্থাৎ হেদায়েতকে গুমরাহী দ্বারা পরিবর্তিত করে নিয়েছে সুতরাং তাদের এই ব্যবসা লাভজনক হয়নি অর্থাৎ এতে তারা লাভবান হয়নি; বরং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কারণ তার দরুন তারা সদা-সর্বদার জন্য জাহান্নামে নিপতিত হতে যাচ্ছে এবং তারা সৎ পথেও পরিচালিত নয় তাদের এই কর্মে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ لَقُوا : لَقُوا -এর মধ্যে تَعْلِيْل হয়েছে আসলে لَقِيُوْا ছিল, يَاى مَضْمُوْم -এর পূর্বে مَكْسُوْر কঠিনের কারণে ضَمَّه হযফ করে দিয়েছে এখন وَاو এবং يَاء দুটি سَاكِن হয়েছে, يَاء -কে হযফ করে দিয়েছে, لَقُوْا হয়েছে, জুমলায়ে শর্তিয়া। قَالُوْٓا إِنَّا مَعَكُمْ লَقُوا ـ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا -এর মাফউল قَالُوْٓا اٰمَنَّا জাযা, إِذَا خَلَوْا إِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ জুমলা শর্ত মুয়াক্কাদ অথবা مُبْدَل مِنْه - إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ বদল কিংবা তাকিদ, উভয় মিলে জাওয়াবে শর্ত اَللّٰهُ মুবতাদা يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ জুমলা খবর, মা'তূফ 'আলাইহি وَاو আতেফাহ يَمُدُّهُمْ জুমলা-খবর মা'তূফ, فِيْ طُغْيَانِهِمْ -এর যুক্ত আম্বিক, يَعْمَهُوْنَ হাল।

طُغْيَان - ضَمَّه ও كَسْرَه-এর সাথে অর্থ– সীমা অতিক্রম করা।

شَيْطَان : এ ব্যাপারে ভাষাবিদগণের দুটি মন্তব্য, একটি হচ্ছে شَيْطَان - فَيْعَال-এর ওজনে, অর্থ بَعُدَ অর্থাৎ ن আসল অক্ষর। দ্বিতীয়টি হচ্ছে যে ن অতিরিক্ত شَاطَ অর্থ بَاطِل [অকেজো-অসত্য] এ নামে নামকরণের কারণ স্পষ্ট। আহলে সুন্নতের দৃষ্টিতে সে হচ্ছে আবুল জিন [জিন জাতির পিতা]

يَمُدُّهُمْ-এর মধ্যে إِسْنَاد حَقِيْقِي মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের বিপরীত। عَمَه ও عَمَى-এর মধ্যে এমনই পার্থক্য যেমন بَصِيْرَت [মনোচক্ষু] ও بصارت [বাহ্যিক চক্ষু] এর মধ্যে একটি প্রকাশ্য, অপরটি গোপন। اِشْتِرَاء ও بَيْع উভয়টি ক্রয় ও বিক্রয়, বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়, এখানে مَجَازًا সাধারণ পরিবর্তন করার অর্থে। هِدَايَت দ্বারা উদ্দেশ্য এ স্থানে স্বভাবগত হেদায়েত فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا-এর হিসেবে। এবং كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ الخ

اِسْتِبْدَال-এর মধ্যে اِسْتِعَارَه تَرْشِيْحِيَه তাই تِجَارَت মুশাব্বাহ্ বিহীর সম্পৃক্ততার কারণে فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ মুশাব্বিহ -এর জন্য প্রমাণ করা হয়েছে। মুফাস্‌সির জালাল (র.) اَىْ فَمَا رَبِحُوْا বলে ইঙ্গিত করেছেন যে, اِسْنَاد মাজাযী হচ্ছে। অর্থাৎ رِبْح-এর সম্পর্ক تِجَارَت-এর পরিবর্তে ব্যবসায়ীদের দিকে হওয়া উচিত ছিল

قَوْلُهُ وَيَمُدُّهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ : اَلْمَدُّ بِمَعْنَى الزِّيَادَةِ : مَدَّ-এর ব্যবহার অকল্যাণমূলক স্থানে হয়ে থাকে। যেমনটা এখানে হয়েছে। এমনিভাবে সূরা মারইয়ামে রয়েছে। (مَرْيَم : ٧٩) وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا আর اِمْدَاد-এর ব্যবহার কল্যাণকর স্থানে হয়ে থাকে। যেমন ইরশাদ হয়েছে–

وَاَمْدَدْنَا بِاَمْوَالٍ وَبَنِيْنَ وَاَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ (اَلطُّوْر : ٢١) . اَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ اٰلَافٍ (اٰلِ عِمْرَان : ١٢٤)

اَلطُّغْيَانُ : এটি طَغٰى يَطْغٰى طُغْيَانًا وَطِغْيَانًا-এর মাসদার। কেউ বলেন- طُغْىٌ-এর লাম কালিমা হলো يَاء আবার কেউ বলেন- وَاو যেমন বলা হয়- طَغَيْتُ - طَغَوْتُ আর اَلطُّغْيَانُ অর্থ– সীমালঙ্ঘন করা।

اَلطُّغْيَانُ مَصْدَرٌ طَغٰى يَطْغٰى طُغْيَانًا وَطِغْيَانًا بِكَسْرِ الطَّاءِ وَضَمِّهَا وَلَامُ طَغٰى قِيْلَ يَاءٌ وَقِيْلَ وَاوٌ

«يَعْمَهُوْنَ» : (مُضَارِع جَمْع مُذَكَّر غَائِب) عَمَهًا (س ـ ف) عَمِهَ পেরেশান হয়ে ছোটাছুটি করা। عَمَهٌ বলা হয়, মানুষ রাস্তা না পেয়ে অন্ধের মতো ছোটাছুটি করাকে।

আল্লামা কুরতুবী লিখেন– اَلْعَمٰى فِى الْعَيْنِ وَالْعَمَهُ فِى الْقَلْبِ আল্লামা সুলাইমান জামাল (র.) লিখেন–

وَالْعَمَهُ التَّرَدُّدُ وَالتَّحَيُّرُ وَهُوَ قَرِيْبٌ مِنَ الْعَمٰى . اِلَّا اَنَّ بَيْنَهُمَا عُمُوْمًا وَ خُصُوْصًا . لِاَنَّ الْعَمٰى يُطْلَقُ عَلٰى ذَهَابِ ضَوْءِ الْعَيْنِ وَعَلَى الْخَطَاِ فِى الرَّاْيِ . وَالْعَمَهُ لَا يُطْلَقُ اِلَّا عَلَى الْخَطَاِ فِى الرَّاْيِ .

قَوْلُهُ حَالٌ : অর্থাৎ يَعْمَهُوْنَজুমলাটি يَمُدُّهُمْ-এর যমীর هُمْ কিংবা طُغْيَانِهِمْ-এর যমীর هُمْ থেকে হাল হয়েছে

قَوْلُهُ يَتَرَدَّدُوْنَ : اَىْ فِى الْبَقَاءِ عَلَى الْبَقَاءِ عَلَى الْكُفْرِ وَتَرْكِهِ اِلَى الْاِيْمَانِ অর্থাৎ কুফরির উপর অটল থাকা কিংবা তা বর্জন করে ঈমান আনার ব্যাপারে কিংকর্তব্য বিমূঢ়।

قَوْلُهُ تَحَيُّرًا : এটি لِيَتَرَدَّدُوْنَ-এর حَال مُؤَكِّدَة কিংবা مَفْعُوْل لَهُ

قَوْلُهُ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدٰى : اَىِ الْمَوْصُوْفُوْنَ بِالصِّفَاتِ السَّابِقَةِ مِنْ قَوْلِهِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُوْلُ اٰمَنَّا اِلٰى هُنَا

অর্থাৎ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُوْلُ اٰمَنَّا-এর মাঝে যাদের বিবরণ এসেছে তারাই হলো اُولٰئِكَ-এর مُشَارٌ اِلَيْه

اَلْمُؤَيَّدَة : وَاحِدْ مُؤَنَّث (اِسْم مَفْعُوْل) تَأْبِيْدًا (تَفْعِيْل) اَبَّدَ يُؤَبِّدُ চিরস্থায়ী করে দেওয়া। اَلْمُؤَبَّدَةُ عَلَيْهِمْ যা তাদের উপর চিরস্থায়ী করে দেওয়া হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য বিষয় : মুনাফিকরা মু'মিনদের সাথে কি আচরণ করত এবং কাফেরদের সাথে কি আচরণ করত এখানে তার বিবরণ দেওয়া হচ্ছে। আর আলোচনার শুরু তথা وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ اٰمَنَّا الخ -এর মাঝে তাদের নিফাকী মতবাদ ও তার স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। সুতরাং আলোচনায় তাকরার বা দ্বিরুক্তি নেই।

قَوْلُهُ وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ الخ : শানে নুযূল : হযরত আবূ বকর, ওমর ও আলী (রা.) একবার মুনাফিক আব্দুল্লাহ ইবনে সালূল ও তার সহচরদেরকে নসিহত করার জন্য গেলেন। সাক্ষাৎ করে বললেন, হে উবাই! তুমি এবং তোমার সাথীরা আমাদের সাথে খাঁটি ঈমান নিয়ে বসবাস কর। তখন ইবনে সালূল হযরত আবূ বকর (রা.)-কে সম্বোধন করে বলল- مَرْحَبًا بِالشَّيْخِ وَالصِّدِّيْقِ হযরত ওমর (রা.)-কে সম্বোধন করে বলল مَرْحَبًا بِالْفَارُوْقِ الْقَوِيِّ فِىْ دِيْنِهٖ এবং হযরত আলী (রা.)-কে সম্বোধন করে বলল مَرْحَبًا بِابْنِ عَمِّ النَّبِيِّ তখন হযরত আলী (রা.) তাকে বললেন, اِتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُنَافِقْ অর্থাৎ মুনাফিকী না করে আল্লাহকে ভয় কর। জবাবে ইবনে সালূল বলল, আমার ঈমান তোমাদের ঈমানের মতোই এবং আমি যা বলেছি, **অন্তর থেকেই বলেছি**। অতঃপর সে তার গোত্রের লোকদের কাছে ফিরে গিয়ে বলল, যখন তোমরা মুসলমানদের সাথে **সাক্ষাৎ করবে, তখন আমার** মতো বাক্যালাপ করবে। তখন তারা বলল, তুমি যত দিন আমাদের মাঝে বেঁচে থাকবে, ততদিন **আমরা কল্যাণের মাঝে থাকবো।** -[খাজিনের সূত্রে হাশিয়ায়ে ছাবি : খ. ১, ১৭, জামাল : খ. ১, পৃ. ২৮]

قَوْلُهُ لَقُوْا : মুফাসসির (র.) শব্দটির পূর্ণ তালীল করেননি। পূর্ণ তালীল এভাবে- لَقُوْا মূলত لَقِيُوْا ছিল, شَرِبُوْا -এর **ওজনে।** يَاء -এর উপর ضَمَّه কঠিন মনে করে সহজ করণার্থে হজফ করে দেওয়া হয়েছে। এখন يَاء এবং وَاو -এর মাঝে **দুই সাকিন** একত্রিত হওয়ায় একটিকে [তথা يَاء কে] ফেলে দেওয়া হয়েছে। আর وَاو -এর মুনাসাবাতে قَاف -এর কাসরাকে **জুম্মা** দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। لَقُوْا হয়েছে।

قَوْلُهُ خَلَوْا مِنْهُمْ وَرَجَعُوْا : এখানে مِنْهُمْ উহ্য ধরে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, خَلَوْا ফেয়েলের مُتَعَلِّق উহ্য রয়েছে। আর خَلَوْا -এর ব্যাখ্যায় رَجَعُوْا উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, خَلَوْا -এর মাঝে رَجَعُوْا -এর অর্থ নিহিত রয়েছে। যাতে তার صِلَة হিসেবে اِلٰى আনা সহীহ হয়। خَلَوْا মূলত خَلَوُوْا ছিল। প্রথম وَاو টি লামকালিমা [মূল হরফ] আর দ্বিতীয় وَاو টি বহুবচনের আলামত। وَاو মুতাহাররিকের পূর্বে مَفْتُوْح বিধায় প্রথম وَاو টিকে اَلِف দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। এখন اَلِفْ এবং দ্বিতীয় وَاو -এর মাঝে দুই সাকিন একত্র হয়েছে। اَلِف বিলুপ্ত হয়ে গেছে। اَلِف পড়ে যাওয়ার নিদর্শন স্বরূপ فَتْحَة অবশিষ্ট রয়ে গেছে। خَلَوْا হয়েছে।

قَوْلُهُ شَيَاطِيْنِهِمْ : شَيْطَانٌ শব্দটির মূলধাতু হলো شَطْنٌ অর্থ- হক এবং কল্যাণ থেকে দূরে থাকা। আরবি ভাষায় شَيْطَان **শব্দটি** অনেক ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। كُلُّ عَاتٍ مُتَمَرِّدٍ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالدَّوَابِّ شَيْطَانٌ অর্থাৎ প্রত্যেক অবাধ্য ঔদ্ধত্যকে شَيْطَان বলা হয়। জিন ইনসান এমনকি জীব-জন্তুর ক্ষেত্রেও এর ব্যবহার রয়েছে। হাদীস শরীফে একাকী সফরকারীকেও শয়তান বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ رُؤَسَائِهِمْ : অর্থাৎ এ আয়াতে শয়তান বলে ইহুদি-মুশরিক ও মুনাফিকদের নেতৃবৃন্দকে বুঝানো হয়েছে, যাদের ইঙ্গিতে তারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করত।

আর এদেরকে শয়তান বলে আখ্যায়িত করার কারণ হলো–

১. তাদের প্রত্যেকের সাথে একটি করে শয়তান রয়েছে, যে তাকে প্ররোচিত করে ও ষড়যন্ত্র-প্রতারণা শিক্ষা দেয়।

২. কেউ কেউ বলেন, তাদেরকে শয়তান বলে আখ্যায়িত করার কারণ হলো তারা মানুষকে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট করার ক্ষেত্রে শয়তানের মতো। আর সে যুগে এ সকল নেতৃবৃন্দ ছিল পাঁচজন: মদীনায় কা'ব ইবনুল আশরাফ, জুহাইনা গোত্রে আব্দুদ দার, বনী আসলামে আবু বুরদাহ, বনী আসাদে আউফ ইবনে আমের, আর শামে আব্দুল্লাহ ইবনে আসওয়াদ।

-[হাশিয়ায়ে সাবী- খ. ১, পৃ.১৭; জামালাইন- খ. ১, পৃ. ১৮]

قَوْلُهُ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ : إِسْتِهْزَاء অর্থ ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও উপহাস করা। অর্থাৎ সাধারণ মুনাফিকরা যখন স্বীয় সর্দারদের সঙ্গে নির্জনে মিলিত হতো, তখন বলত, আমরা মনেপ্রাণে আপনাদের সঙ্গেই আছি। তবে মুসলমানদেরকে বোকা বানানোর জন্য তাদের সঙ্গে তাদের পছন্দ অনুযায়ী কথা বলে থাকি।

قَوْلُهُ يُجَازِيْهِمْ بِاسْتِهْزَائِهِمْ : এ ইবারতটুকু মূলত একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্ন : আল্লাহ তা'আলা কিভাবে ঠাট্টাবিদ্রূপ করেন? ঠাট্টা-বিদ্রূপ করাতো আল্লাহর শানের খেলাফ। মুফাসসিরীনে কেরাম এর জবাব এভাবে দিয়েছেন যে, এখানে مُشَاكَلَةً فِى اللَّفْظِ তথা কথার জওয়াব অনুরূপ কথা দিয়ে দেওয়া হয়েছে, যদিও তার আসল অর্থে নয় তার আসল অর্থ হবে, يُجَازِيْهِمْ তিনি তাদেরকে এভাবে শাস্তি দিবেন।

অন্যত্র রয়েছে- فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ "যে লোক তোমাদের উপর সীমালঙ্ঘন করেছে, তোমরা তার উপর সীমালঙ্ঘন কর [করতে পার], যেমন সে তোমাদের উপর সীমালঙ্ঘন করেছে। -[সূরা বাকারা : ১৯৩] সীমালঙ্ঘনের এই দ্বিতীয় কথাটি মূলত সীমালঙ্ঘন নয়, অনুরূপ কথা।

আরো ইরশাদ হয়েছে- فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ অর্থাৎ তোমরা যদি প্রতিশোধ লও, তাহলে প্রতিশোধ নেবে ততটা, যতটা তোমরা নিপীড়িত হয়েছে।

এখানে প্রথম প্রতিশোধ কথাটি কিন্তু মূলত পীড়নের প্রতিশোধ, আসলে প্রতিশোধ নয়। প্রতিশোধ শব্দের মোকাবিলায়ই তা বলা হয়েছে। আরবরা বলে থাকে اَلْجَزَاءُ بِالْجَزَاءِ অর্থাৎ প্রতিফল প্রতিফলের দ্বারা। প্রথমটা কিন্তু প্রতিফল নয়। নিম্নের কবিতা ছত্রটিও অনুরূপ। اَلَا لَا يَجْهَلَنْ اَحَدٌ عَلَيْنَا * فَنَجْهَلُ فَوْقَ جَهْلِ الْجَاهِلِيْنَا সাবধান : কেউ যেন আমাদের উপর মূর্খতা না করে। তাহলে আমরাও আমাদের মূর্খদের মূর্খতার উপরের মূর্খতা করব।

১. এ কথা জানাই আছে যে, কবি মূলতই মূর্খতাচ্ছন্ন হননি। কিন্তু কথার সাথে মিল রেখে জওয়াবী কথা বলাই আবরদের অভ্যাস বিধায় এরূপ বলা হয়েছে।

২. কারো কারো মতে, ঠাট্টা-বিদ্রূপের অশুভ ফল যেহেতু তাদেরই ভোগ করতে হবে, তখন বলা যেতে পারে যে, তাদের সাথেও ঠাট্টা-বিদ্রূপই করা হয়েছে।

৩. এর জবাবে এও বলা হয়েছে যে, ওরা যখন দুনিয়ায় যথেষ্ট সময় অবকাশ পেয়ে গেছে, খুব দ্রুত ও তাৎক্ষণিকভাবে আজাবে লিপ্ত হয়নি, অন্যান্য মুশরিকের ন্যায় হত্যার সম্মুখীন হয়নি, তাদের শাস্তি বিলম্বিত হয়েছে, তারা এতে ধোঁকায় পড়ে গেছে, ফলে তাদের সাথেও যেন ঠাট্টা-বিদ্রূপই করা হয়েছে, এমনই হয়ে গেল। -[আহকামুল কুরআন : খ. ১, পৃ. ৪৪-৪৫]

ফায়দা : وَيَمُدُّهُمْ فِى طُغْيَانِهِمْ : এ অংশটুকু মূলত اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ-এর ব্যাখ্যা। অর্থাৎ তারা যেমন মুসলমানদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তেমনি আল্লাহও তাদের সাথে এক ধরনের উপহাসমূলক আচরণ করেন। আর তা হলো তাদেরকে অপরাধ ও অবাদ্ধতার অবকাশ দিয়ে রেখেছেন, যাতে তাদের নাফরমানি পূর্ণ করে পরিপূর্ণ শাস্তির যোগ্য হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা তাকবীনী বিধান অনুসারে মাখলুককে স্বাধীনতা ও এখতিয়ার দিয়েছেন, তাতে তিনি শুধু শুধু হস্তক্ষেপ করেন না। সাপের দংশন করা বিষের প্রতিক্রিয়ায় মৃত্যু এবং আগুনের দাহ্য ক্ষমতা সেই তাকবীনী বিধান অনুসারেই।

قَوْلُهُ اِسْتَبْدَلُوْهَا بِهٖ : এ অংশটি বৃদ্ধি করে এ দিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, এখানে اِشْتِرَاء-এর মাজাযী বা রূপক অর্থ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ এখানে شِرَاء দ্বারা اِسْتِبْدَال [পরিবর্তন] উদ্দেশ্য। যা شِرَاء-এর জন্য লাজেম বা আবশ্যিক বিষয়। যেমন مَلْزُوْم বলে لَازِم কে বুঝানো হয়েছে। আরবরা যে কোনো রকম বিনিময়ের জন্য شِرَاء শব্দ ব্যবহার করে। আর اِسْتِبْدَال দ্বারাও উদ্দেশ্য হলো প্রাধান্য দেওয়া। অর্থাৎ হেদায়েত এবং গোমরাহী উভয়টির পথ তাদের সম্মুখে খোলা ছিল। কিন্তু তারা নিজেদের মর্জি মোতাবেক গোমরাহীকেই প্রাধান্য দিয়েছে।

প্রশ্ন : বর্ণনাধারায় বোঝা যায়, তাদের কাছে পূর্ব থেকেই হেদায়েত ছিল। পরে তারা তা বাদ দিয়ে গোমরাহী গ্রহণ করেছে। বিষয়টি কি এমন?

উত্তর :

১. এর একটি উত্তর তো এক্ষুণি প্রদান করা হলো যে, হেদায়েত এবং গোমরাহী উভয়টির পথ তাদের সম্মুখে খোলা ছিল। কিন্তু তারা নিজেদের মর্জি মোতাবেক গোমরাহীকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

২. আরেকটি জবাব হলো, রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتّٰى يُهَوِّدَانِهِ اَبَوَاهُ অর্থাৎ প্রত্যেকটি শিশু ইসলামের উপর জন্মলাভ করে। পরবর্তীতে তার পিতা-মাতা বিভিন্ন ধর্মে দীক্ষিত করে।

৩. তাছাড়াও রূহের জগতে আল্লাহ তা'আলা যখন বলেছিলেন- اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ [আমি কি তোমাদের প্রভু নই?] তখন সকলেই সাড়া দিয়ে বলেছিল- بَلٰى [হ্যাঁ, আপনিই আমাদের প্রভু।] এখানে হেদায়েত দ্বারা সেই স্বীকারোক্তি উদ্দেশ্য হতে পারে। তাহলে কোনো প্রশ্নও থাকে না।

قَوْلُهُ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ اَىْ مَا رَبِحُوْا فِيْهَا :

প্রশ্ন : এখানে تِجَارَتٌ বা ব্যবসায় প্রতি رِبْحٌ তথা লাভের নিসবত করা হয়েছে। অথচ লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ব্যবসায়ীর গুণ, ব্যবসার নয়। এর জবাব কি?

উত্তর : এখানে مَجَاز عَقْلِى হিসেবে ব্যবসার প্রতি লাভের নিসকত করা হয়েছে। যেমনটি اَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ-এর মাঝে হয়েছে। আরবদের মাঝে এ ধরনের ব্যবহার রয়েছে। তারা বলেন- رَبِحَ بَيْعُكَ وَخَسِرَتْ صَفْقَتُكَ উক্ত সংশয়টি নিরসনকল্পেই মুফাসসির (র.) ব্যাখ্যায় বলেন, اَىْ مَا رَبِحُوْا فِيْهَا অর্থাৎ মুনাফিকরা খাঁটি ঈমানের প্রকৃত মূল্য মেকী ঈমান দ্বারা আদায় করার দুঃস্বপ্ন দেখে ব্যবসা মাটি করল। অধিকন্তু তাদের ধোঁকাবাজি জনসমক্ষে প্রকাশ হওয়ার কারণে অপদস্থও হলো। সত্যিকার ঈমান আনলে কিন্তু তারা আল্লাহর কাছে, মানুষের কাছে দুনিয়াতে ও আখিরাতে লাভবান হতো। তাদের একুল ওকুল উভয়টি-ই রক্ষা হতো।

মোটকথা এখানে سَبَب বলে مُسَبَّب মুরাদ নেওয়া হয়েছে। কেননা ব্যবসা হলো লাভ-ক্ষতির কারণ।

قَوْلُهُ لِمَصِيْرِهِمْ اِلَى النَّارِ لِمُؤَبَّدَةٍ عَلَيْهِمْ : এটি হলো লাভবান না হওয়ার ইল্লত বা কারণ। অর্থাৎ তারা তো মুনাফিকী করে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। কারণ দুনিয়াতে যতই সুবিধা ভোগ করুক না কেন, পরকালে তো জাহান্নামই তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল। এটাতো কোনো লাভের লক্ষণ নয়।

قَوْلُهُ «وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ» فِيْمَا فَعَلُوْا : অর্থাৎ তারা ব্যবসায় যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছে, তাতে নিশ্চিত ঠক আর ক্ষতিগ্রস্ততাই রয়েছে। অর্থাৎ লাভ এবং মূল পুঁজি উভয়টাই ধ্বংস হয়ে গেছে। কেননা ব্যবসার উদ্দেশ্য হলো পুঁজি এবং মুনাফা উভয়টির সংরক্ষণ। এসব মুনাফিকরা উভয়টিই হারিয়েছে। কেননা তাদের পুঁজি হলো সুস্থ ফিতরত এবং বিবেক। যখন তারা নানা গোমরাহীতে বিশ্বাসী হয়েছে, তখন তাদের বিবেক লোপ পেয়েছে। যেন তাদের পুঁজি নিঃশেষ হয়েগেছে। আর পুঁজি হারালে লাভের তো প্রশ্নই উঠে না। হক গ্রহণে পরিপূর্ণ ব্যর্থ হয়েগেছে।

اَىْ لِطُرُقِ التِّجَارَةِ، فَاِنَّ الْمَقْصُوْدَ مِنْهَا سَلَامَةُ رَأْسِ الْمَالِ وَالرِّبْحِ، وَهٰؤُلَاءِ قَدْ اَضَاعُوا الطَّلَبَتَيْنِ لِاَنَّ رَأْسَ مَالِهِمُ الْفِطْرَةُ السَّلِيْمَةُ وَالْعَقْلُ الصِّرْفُ، فَمَا اعْتَقَدُوْا هٰذِهِ الضَّلَالَاتِ بَطَلُ اِسْتِعْدَادِهِمْ وَاخْتَلَّ عَقْلُهُمْ وَلَمْ يَبْقَ لَهُمْ رَأْسُ مَالٍ يَتَوَصَّلُوْنَ بِهٖ اِلٰى اِدْرَاكِ الْحَقِّ وَنَيْلِ الْكَمَالِ، فَبَقُوْا خَاسِرِيْنَ اٰيِسِيْنَ مِنَ الرِّبْحِ فَاقِدِيْنَ الْاَصْلَ.

(بَيْضَاوِى، جَمَل : جـ١، صـ٣)

قَوْلُهُ فِيْمَا فَعَلُوْا : اَىْ مِنَ الْاِسْتِبْدَالِ الْمَذْكُوْرِ اِشْتَرَوُا এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, আয়াতে তাকরার রয়েছে। কেননা **الضَّلَالَةَ** দ্বারাও হেদায়েত না থাকা বুঝা যায় এবং وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ দ্বারাও বুঝা যায়।

উত্তর : এখানে হেদায়েতে দ্বারা দীনি হেদায়েত উদ্দেশ্য ছিল, আর এখানে ব্যবসার পদ্ধতি সংক্রান্ত হেদায়েত উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ব্যবসার পুঁজি কিভাবে সংরক্ষিত থাকবে সেটাও তারা বুঝত না। সুতরাং কোন তাকরার নেই।

অনুবাদ :

١٧. مَثَلُهُمْ صِفَتُهُمْ فِيْ نِفَاقِهِمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ اَوْقَدَ نَارًا فِيْ ظُلْمَةٍ فَلَمَّا اَضَاءَتْ اَنَاءَتْ مَا حَوْلَهُ فَاَبْصَرَ وَاسْتَدْفَأَ وَاَمِنَ مِمَّا يَخَافُهُ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ اَطْفَأَهُ وَجَمْعُ الضَّمِيْرِ مُرَاعَاةً لِمَعْنَى الَّذِىْ وَتَرَكَهُمْ فِيْ ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُوْنَ مَا حَوْلَهُمْ مُتَحَيِّرِيْنَ عَنِ الطَّرِيْقِ خَائِفِيْنَ فَكَذَالِكَ هٰؤُلَاءِ اٰمَنُوْا بِاِظْهَارِ كَلِمَةِ الْاِيْمَانِ فَاِذَا مَاتُوْا جَاءَهُمُ الْخَوْفُ وَالْعَذَابُ

১৭. তাদের উপমা সে মুনাফিকীতে তাদের দৃষ্টান্ত হলো যেমন এক ব্যক্তি অন্ধকারে অগ্নি প্রজ্বলিত করতে চাইল অর্থাৎ আগুন জ্বালাল যখন তার চতুর্দিক আলোকিত করল ফলে সে চারিদিক দেখতে পেল, তা হতে উষ্ণতা লাভ করল এবং ভীতি হতে নিরাপদ হলো আল্লাহ তখন তাদের জ্যোতি অপসারিত করলেন অর্থাৎ নির্বাপিত করে দিলেন। اَلَّذِىْ-এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে بِنُوْرِهِمْ-এর هُمْ [তাদের] সর্বনামটি বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। এবং তাদেরকে ঘোর অন্ধকারে ফেলে দিলেন, তারা কিছুই দেখতে পায় না তাদের চতুষ্পার্শ্বের পথ সম্পর্কে তারা বিভ্রান্ত, ভীত-সন্ত্রস্ত। তেমনি তারাও মুনাফিকগণ বাহ্যত কালিমা উচ্চারণ করে ঈমান আনয়ন করেছে বলে প্রদর্শন করছে; কিন্তু যখন তারা মারা যাবে ভীতি ও শাস্তি তাদের উপর এসে আপতিত হবে।

١٨. هُمْ صُمٌّ عَنِ الْحَقِّ فَلَا يَسْمَعُوْنَهُ سِمَاعَ قَبُوْلٍ بُكْمٌ خُرْسٌ عَنِ الْخَيْرِ فَلَا يَقُوْلُوْنَهُ عُمْيٌ عَنْ طَرِيْقِ الْهُدٰي فَلَا يَرَوْنَهُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ عَنِ الضَّلَالَةِ.

১৮. তারা সত্য সম্পর্কে বধির গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে তা শ্রবণ করে না, মুক কল্যাণকর বিষয় সম্পর্কে অতএব তারা তা উচ্চারণ করে না, অন্ধ হেদায়েতের পথ সম্পর্কে, ফলে তারা তা দর্শন করে না সুতরাং তারা ফিরবে না পথভ্রষ্টতা হতে।

তাহকীক ও তরকীব

مَثَل ـ مِثْل ـ مَثِيْل -এ শব্দগুলো شَبَه ـ شِبْه ـ شَبِيْه-এর ন্যায় তিন পদ্ধতিতে আসে, تَشْبِيْه -এর অর্থের মধ্যে পরে উপমা এবং কোনো আশ্চর্যময় ও বিরল প্রসিদ্ধ ঘটনাবলির সাথে তুলনা দেওয়ার জন্য ব্যবহার হতে লাগলো। ইলমে বালাগাতে পণ্ডিতগণের দৃষ্টিতে مَثَل শুধু كَلَام مُرَكَّب -এ এবং تَشْبِيْه মুফরাদ ও মুরাক্কাব উভয়টির জন্য ব্যবহার হয়। এর দ্বারা একটি কাল্পনিক ও অনুভবযোগ্য নয় এমন বস্তুও অনুভবযোগ্য হয়ে সামনে এসে যায়। তাই [ভাষার] অলঙ্কার শাস্ত্রবিদগণ এর বাক্যে এবং অতীতের [আসমানি] কিতাবগুলোতেও পবিত্র কুরআনের মত অনেক উপমা পাওয়া যায়। মুফাস্‌সির (র.) مَثَل -এর পরে صِفَة এনে এর অর্থের দিকে ইঙ্গিত করেছেন اِسْتَوْقَدَ -এর পরে اَوْقَدَ লিখে বলে দিয়েছেন যে, এর মধ্যে س ও ت -এর طَلَب -এর জন্য নয়। نَار থেকে نُوْر মুশতাক হয়েছে। اَضَاءَتْ -এর পরে اَنَارَتْ বলে মুফাস্‌সির (র.) ইঙ্গিত করেছেন যে, اَضَاءَتْ ফেয়লে মুতাআদ্দী যমীর ফায়েল। مَا حَوْلَهُ -এর মধ্যে مَا মউসূলা অর্থাৎ مَكَان মাফউল। صُمٌّ শব্দ থেকে পূর্বে هُمْ বের করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা মুবতাদা মাহ্‌যূফ عَنِ الضَّلَالَةِ বের করে ইঙ্গিত করেছেন যে, لَا يَرْجِعُوْنَ

ফেয়েল লাযিম, আর কেউ কেউ مُتَعَدِّيْ বলেন مَفْعُوْل মাহযূফ ;ذَهَبَ اَيْ لَا يَرْجِعُوْنَ قَوْلًا -এর সম্পর্ক এখানেও আল্লাহর দিকে حَقِيْقِي তাই মু'তাযিলাদের উপর রদ হয়ে গেল مَثَلُهُمْ মুবতাদা مَا بَعْد খবর, اَضَاءَتْ ফে'লে মুতাআদ্দী ت যমীর ফায়েল এবং مَا حَوْلَهٗ মাফ্‌উল নতুবা مَا حَوْلَ ফায়েল اَضَاءَتْ -কে مونث আনা হয়েছে مَا -এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে। উদ্দেশ্য اَمْكِنَة ও اَشْيَاء ' ما মউসূলাও হতে পারে এবং মাউসূফা কিংবা زَائِدَه -ও হতে পারে।

এসব মিলে শর্ত। ذَهَبَ اللّٰهُ হতে দুটি জুমলাই মা'তুফ মা'তূফ আলাই হয়ে জওয়াবে لَمَّا ; صُمٌّ মুবতাদা মাহযূফ هُمْ -এর খবর এবং فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ জুমলায়ে মুস্তানিফাহ্।

صُمٌّ : এটি اَصَمُّ -এর বহুবচন। অর্থ- বধির। স্ত্রীলিঙ্গ - صَمَّاءُ । صَمَمًا (س) صَمِمَتِ ـ الْاُذُنُ দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হলো।

بُكْمٌ : এটি اَبْكَمُ -এর বহুবচন। অর্থ- মুক, বোবা। اَخْرَس ـ بَكِمَ (س) يَبْكَمُ - বোবা হলো।

عُمْيٌ : এটি اَعْمٰى -এর বহুবচন। অর্থ- অন্ধ। স্ত্রী লিঙ্গ- عَمْيَاء বহুবচন- عُمْيَان ও আসে। عَمِيَ يَعْمٰى عُمْيًا অন্ধ হলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ مَثَلُهُمْ : এখান থেকে দুটি উদাহরণ দিয়ে মুনাফিকদের কার্যকলাপকে সুস্পষ্টরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। পূর্বের আয়াতে মুনাফিকদের পরিচয় ও স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। যার দ্বারা عَقْلِي ভাবে মুনাফিকদের সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন হয়েছে। যেহেতু عَقْل -এর তুলনায় اِحْسَاس -এর সাথে মানুষের সম্পর্কে বেশি। এজন্য উপমা ও দৃষ্টান্ত দিয়ে পুনরায় তাদের স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। মুনাফিকদের দু'শ্রেণির লোকের পরিপ্রেক্ষিতেই এখানে পৃথক দুটি উপমা পেশ করা হয়েছে। প্রথম উদাহরণটি ঐ শ্রেণির লোকদের বেলায় প্রযোজ্য যারা কুফরিতে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের কাছ থেকে আর্থিক স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে মুখে ঈমানের কথা প্রকাশ করত। আর দ্বিতীয় উদাহরণটি ঐ শ্রেণির মুনাফিকদের সম্পর্কে যারা ইসলামের সত্যতায় প্রভাবিত হয়ে কখনো প্রকৃত মু'মিন হওয়ার ইচ্ছা করতো; কিন্তু দুনিয়ার উদ্দেশ্য তাদেরকে এ ইচ্ছা থেকে বিরত রাখতো। এভাবে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দিনাতিপাত করতো।

প্রথম উপমার বিশ্লেষণ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বর্ণনার আলোকে প্রথম উদাহরণের মর্ম এই যে, রাসূল ﷺ হিজরত করে মদীনায় আগমনের পর কুফর শিরক ও জুলুমের আঁধার কাটতে শুরু হয়। ফলে সত্য-মিথ্যা হেদায়েত-গোমরাহীর মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য সূচিত হয়। চক্ষুষ্মানের সামনে সকল বাস্তবতা পরিষ্কার হয়ে ধরা দেয়। কিন্তু মুশরিকরা অন্ধের মতো আত্মপূজার মাঝে ডুবে থাকে। এ উজ্জ্বল আলোর মাঝে তারা কিছুই দেখতে পেল না। তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক মুসলমান হয়ে আবার দ্রুত মুরতাদ ও মুনাফিক হয়ে যায়। তাদের দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির মতো যে অন্ধকারে নিপতিত ছিল। ইতোমধ্যে সে অগ্নি প্রজ্বলিত করল ফলে আশপাশ আলোকিত হলো। উপকারী ও ক্ষতিকর জিনিসসমূহ তার সামনে উদ্ভাসিত হলো। অতঃপর হঠাৎ করে সে আলোক রশ্মি নিভে গেলে সে,. প্রচণ্ড অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়ল। মুনাফিকদের অবস্থাও হুবহু অনুরূপ ছিল। প্রথমে তারা শিরকের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়ল। যখন মুসলমান হয় তখন যেন আলোতে প্রবেশ করল। সে আলোতে হালাল-হারাম, ভালো-মন্দের পরিচয় লাভ করল। অতঃপর আবার কুফর ও নিফাকের দিকে ফিরে গেল। যেন পুনরায় সকল আলো দূর হয়ে গেল। -[জামালাইন খ. ১, পৃ. ৬৪, ৬৫]

فَقَدْ اٰمِنُوْا مِنَ الْقَتْلِ وَالسَّبْيِ وَانْتَفَعُوْا بِاَخْذِ الْغَنَائِمِ وَالزَّكٰوةِ فَاِذَا مَاتُوْا فَقَدْ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ فَلَمْ يَأْمَنُوْا مِنَ النَّارِ وَلَمْ يَنْتَفِعُوْا بِالْجَنَّةِ وَتَرَكَهُمْ فِيْ ظُلُمٰتٍ ثَلَاثٍ : ظُلْمَةِ الْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ وَالْقَبْرِ (صاوى ـ ١. ١٩)

قَوْلُهٗ «مَثَلُهُمْ» صِفَتُهُمْ فِيْ نِفَاقِهِمْ : এখানে مَثَلُهُمْ -এর ব্যাখ্যায় صِفَتُهُمْ শব্দ উল্লেখ করে এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে مَثَل দ্বারা প্রচলিত مَثَل উদ্দেশ্য নয়; বরং তাদের হাল অবস্থা উদ্দেশ্য

قَوْلُهُ اِسْتَوْقَدَ اَوْقَدَ : اِسْتَوْقَدَ-এর ব্যাখ্যায় اَوْقَدَ উল্লেখ করে এ কথা বুঝালেন যে, اِسْتَوْقَدَ-এর মাঝে س এবং تَاءٌ হরফ দুটি طَلَبٌ-এর অর্থ প্রকাশের জন্য নেওয়া হয়নি; বরং এগুলো زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত। এ রকম ব্যবহার আরবিতে করা হয়।

قَوْلُهُ «اَضَاءَتْ» اَنَارَتْ : اَضَاءَتْ-এর ব্যাখ্যায় اَنَارَتْ উল্লেখ করে فِعْل টির مُتَعَدِّى হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এ সূরতে فَاعِل হবে ضَمِيْر مُسْتَتِرْ আর مَا حَوْلَهُ জুমলা হয়ে مَفْعُوْل بِهٖ আর مَا টি ইসমে মাওসূলটি مَكَان অর্থে ব্যবহৃত اَىْ اَضَاءَتِ النَّارُ الْمَكَانَ الَّذِىْ حَوْلَهُ

তাফসীরে আবুস সাউদ -এ উল্লেখ আছে- اَلْاِضَاءَةُ فَرْطُ الْاِنَارَةِ অর্থাৎ اَلْاِضَاءَةُ অর্থ- অধিক আলোকিত করা। কুরআনের আয়াতেও এর প্রমাণ রয়েছে। যেমন- هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوْرًا (يُوْنُس : ٥)

আর اَضَائَتْ শব্দটিকে مُؤَنَّثٌ ব্যবহার করা হয়েছে نَار কে ফায়েল সাব্যস্ত করে। اَىْ اَضَائَتِ النَّارُ نَفْسَهَا অথবা اَمَاكِنَ وَاَشْيَاءُ-কে ফায়েল সাব্যস্ত করে। اَىْ اَضَائَتِ الْاَشْيَاءُ وَالْاَمَاكِنَ

قَوْلُهُ اِسْتَدْفَأَ : উপকার লাভ করল, উষ্ণতা লাভ করল। يَدْفَأُ (س) دَفِئَ الْبَيْتُ থেকে নির্গত। অভিধানে دِفْءٌ বলা হয় উটের শাবক, দুধ ও তা থেকে আরো যা যা উপকার লাভ করা হয়। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-(اَلنَّحْلُ : ٥) لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ

قَوْلُهُ وَاَمِنَ مِمَّا يَخَافُهُ : اَىْ مِنْ عَدُوٍّ وَسِبَاعٍ وَحَيَّاتٍ وَغَيْرِ ذٰلِكَ مِمَّا يَضُرُّ

قَوْلُهُ وَ جَمْعُ الضَّمِيْرِ مُرَاعَاةً الْمَعْنٰى يَخَافُهُ : অর্থাৎ আয়াতের শুরুতে مَثَلُهُ একবচন শব্দ ব্যবহার করে শেষে بِنُوْرِهِمْ-এর মাঝে هُمْ সর্বনামটি বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে اَلَّذِىْ-এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে।

قَوْلُهُ فِىْ ظُلُمَاتٍ : ظُلُمَاتٌ - ظُلْمَةٌ-এর বহুবচন অর্থ অন্ধকার। এখানে ইশকাল হয় ظُلُمَاتٌ বহুবচন ব্যবহারের দ্বারা বুঝা যায় সেখানে অনেকগুলো অন্ধকার ছিল। সেগুলো কি?

উত্তর: এর উত্তরে নিম্নোক্ত জবাব দেওয়া হয়-

١. بِاعْتِبَارِ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ وَظُلْمَةِ تَرَاكُمِ الْغَمَامِ وَظُلْمَةِ انْطِفَاءِ النَّارِ.

٢. وَفِى الْبَيْضَاوِىْ : وَظُلُمَاتُهُمْ ظُلْمَةُ الْكُفْرِ وَ ظُلْمَةُ النِّفَاقِ وَظُلْمَةُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَمَا لِلْمُؤْمِنِيْنَ نُوْرٌ. قَالَ تَعَالٰى. يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ.

٣. أَوْ ظُلْمَةُ الضَّلَالِ وَظُلْمَةُ سَخَطِ اللّٰهِ وَظُلْمَةُ الْعِقَابِ السَّرْمَدِىْ.

٤. اَوْ ظُلْمَةٌ شَدِيْدَةٌ كَاَنَّهَا ظُلُمَاتٌ مُتَرَاكِمَةٌ. (جَمَل : ص٣٢ ج١)

قَوْلُهُ لَا يُبْصِرُوْنَ : এটি ظُلُمَا-এর حَال مُؤَكِّدَه হয়েছে।

قَوْلُهُ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ : صُمٌّ হলো مُبْتَدَأ مَحْذُوْف-এর خَبَر এবং جُمْلَة مُسْتَانِفَة আর بُكْمٌ হলো خَبَر ثَانِى এবং عُمْىٌ হলো خَبَر ثَالِثٌ উপরিউক্ত তিনটি خَبَر যদিও শব্দের দিক দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন; কিন্তু অর্থ ও মর্মের দিক দিয়ে এক ও অভিন্ন। আর তা হলো শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অনুধাবন ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার পরও সত্য গ্রহণ না করা। সুতরাং এর দ্বারা তাদের বাহ্যিক অনুভূতির নাকচ করা উদ্দেশ্য নয়। যেমনটি মুফাসসির (র.) عَنْ - صِلَه উল্লেখ করে ইঙ্গিত করেছেন।

অনুবাদ :

১৯. أَوْ مَثَلُهُمْ كَصَيِّبٍ أَيْ كَأَصْحَابِ مَطَرٍ وَأَصْلُهُ صَيْوِبٌ مِنْ صَابَ يَصُوبُ أَيْ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ أَيِ السَّحَابِ فِيهِ أَيِ السَّحَابِ ظُلُمَاتٌ مُتَكَاثِفَةٌ وَرَعْدٌ هُوَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ وَقِيلَ صَوْتُهُ وَبَرْقٌ لَمَعَانُ سَوْطِهِ الَّذِي يَزْجُرُهُ بِهِ يَجْعَلُونَ أَيْ أَصْحَابُ الصَّيِّبِ أَصَابِعَهُمْ أَيْ أَنَامِلَهَا فِي آذَانِهِمْ مِنْ أَجْلِ الصَّوَاعِقِ شِدَّةِ صَوْتِ الرَّعْدِ لِئَلَّا يَسْمَعُوهَا حَذَرَ خَوْفَ الْمَوْتِ مِنْ سِمَاعِهَا كَذَٰلِكَ هَؤُلَاءِ إِذَا نُزِلَ الْقُرْآنُ وَفِيهِ ذِكْرُ الْكُفْرِ الْمُشَبَّهِ بِالظُّلُمَاتِ وَالْوَعِيدِ عَلَيْهِ الْمُشَبَّهِ بِالرَّعْدِ وَالْحُجَجِ الْبَيِّنَةِ الْمُشَبَّهَةِ بِالْبَرْقِ يَسُدُّونَ آذَانَهُمْ لِئَلَّا يَسْمَعُوهُ فَيَمِيلُوا إِلَى الْإِيمَانِ وَتَرْكِ دِينِهِمْ وَهُوَ عِنْدَهُمْ مَوْتٌ وَاللّٰهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ عِلْمًا وَقُدْرَةً فَلَا يَفُوتُونَهُ

১৯. কিংবা তাদের উপমা যেমন মুষলধারে বৃষ্টি অর্থাৎ বৃষ্টির মাঝে নিপতিত ব্যক্তিবর্গের ন্যায় صَيِّبٌ [মুষলধারে বৃষ্টি] শব্দটি মূলত صَيْوِبٌ ছিল। এটি صَابَ . يَصُوبُ [নামা, অবতরণ করা] ক্রিয়াপদ হতে উদগত শব্দ। অর্থাৎ যা বর্ষিত হচ্ছে। আকাশ অর্থাৎ মেঘমালা হতে; তাতে অর্থাৎ ঐ মেঘে রয়েছে নিবিড় অন্ধকার, রা'দ রা'দ হলো মেঘ-বৃষ্টির দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা। কেউ কেউ বলেন, তার ধ্বনি ও বিদ্যুৎ অর্থাৎ যে বেত্রদণ্ড দ্বারা ঐ ফেরেশতা মেঘ হাঁকিয়ে নিয়ে যান তার ছটা। তারা অর্থাৎ বৃষ্টির মাঝে নিপতিত ব্যক্তিরা অঙ্গুলি প্রবেশ করায় অর্থাৎ আঙ্গুলের অগ্রভাগ তাদের কর্ণে বজ্রধ্বনিতে রা'দের প্রচণ্ড নিনাদের কারণে যেন তা আর তাদেরকে শুনতে না হয়। মৃত্যু ভয়ে মৃত্যুর আশঙ্কায় তা শুনে। তদ্রূপ তারাও [মুনাফিকরা] যখন কুরআন [আয়াত] নাজিল হয় আর এতে রয়েছে কুফরের আলোচনা যার উপমা হলো ঘোর অন্ধকার, এতদসম্পর্কে হুমকির -যার উপমা হলো রা'দ [বজ্রধ্বনি] আরো রয়েছে সুস্পষ্ট ও অখণ্ডনীয় প্রমাণাদির বর্ণনা যেগুলোর উপমা হলো 'বারক' [বিদ্যুৎ প্রভা] তখন তারা নিজেদের কান বন্ধ করে ফেলে যেন তা শুনতে না পায় এবং ঈমান আনয়নের প্রতি কোনোরূপ অনুরাগের সৃষ্টি না হয়। আর এটা [অর্থাৎ স্বধর্ম ত্যাগ করা] তাদের নিকট মৃত্যুর শামিল। আল্লাহ তা'আলা সত্য- প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন জ্ঞান ও শক্তি উভয়বিদভাবে। সুতরাং তারা তাঁকে কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারবে না।

২০. يَكَادُ يَقْرُبُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ـ يَأْخُذُهَا بِسُرْعَةٍ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ ـ أَيْ فِي ضَوْئِهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَقَفُوا تَمْثِيلٌ لِإِزْعَاجِ مَا فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْحُجَجِ قُلُوبَهُمْ وَتَصْدِيقِهِمْ بِمَا سَمِعُوا فِيهِ مِمَّا يُحِبُّونَ وَوُقُوفِهِمْ عَمَّا يَكْرَهُونَ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ بِمَعْنَى أَسْمَاعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمُ الظَّاهِرَةِ كَمَا ذَهَبَ بِالْبَاطِنَةِ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَاءَهُ قَدِيرٌ ـ وَمِنْهُ إِذْهَابُ مَا ذُكِرَ ـ

২০. বিদ্যুৎ চমক তাদের দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়ে লয় অর্থাৎ দ্রুত যেন ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। যখনই বিদ্যুতালোকে তাদের সম্মুখের বস্তু উদ্ভাসিত হয় তারা তখনই চলে অর্থাৎ এর আলোকে এবং যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় তখন থমকে দাঁড়ায় থেমে পড়ে। কুরআনে বর্ণিত প্রমাণসমূহ তাদের হৃদয় আন্দোলিত করে তোলে, এতে নিজেদের পছন্দনীয় বিষয়াবলির বর্ণনা শুনে তৎপ্রতি তাদের যে বিশ্বাস এবং তাদের নিকট অনভিপ্রেত বিষয়সমূহ সম্পর্কে তাদের যে বিরতি এস্থানে তাদের ঐ অবস্থারই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে তাদের বাহ্যিক শ্রবণ শক্তি অর্থাৎ শ্রবন্দ্রিয়সমূহ ও দৃষ্টি হরণ করে নিতেন। যেমন তিনি তাদের অন্তর-চক্ষু হরণ করে নিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা সকল বিষয়ে যাতে তিনি চান সর্বশক্তিমান তন্মধ্য হতে উল্লিখিত ইন্দ্রিয়সমূহের বিনাশও অন্যতম।

তাহকীক ও তরকীব

أَوْ -এর ব্যাপারে ৫টি মন্তব্য রয়েছে কিন্তু উত্তম এটা যে, أَوْ সন্দেহের জন্য নয়, বরং সাধারণত দুটি বস্তুর মধ্যে সমকক্ষতার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন جَالِسُ الْحَسَنِ أَوِ ابْنَ سِيْرِيْنَ

صَيِّبٌ এটা فَيْعِلٌ -এর ওজনে صَوْبٌ অর্থ- نُزُوْلٌ থেকে বের হয়েছে। বৃষ্টি মেঘকে বলা হয়। মুফাস্সির জালাল (র.) كَأَصْحَابِ مَطَرٍ প্রকাশ করে এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, مُضَافٌ মাহ্যূফ এবং صَيِّبٌ অর্থ মেঘ নয়, বরং বৃষ্টি। মূলে صَيْوِبٌ ছিল, يَاء - وَاو এক শব্দে একত্র হয়েছে এবং وَاو মাকসূর তাই يَاء দ্বারা পরিবর্তন করে إِدْغَام করা হয়েছে।

اَلسَّمَاءُ -এর কয়েকটি অর্থ- أُفُقٌ [দিগন্ত সুদূর প্রান্ত] بَادِل [মেঘ] أَسْمَان এমন প্রতিটি বস্তু যা উপরে হয় বা থাকে। এ স্থানে উক্ত তিনটি অর্থই যথাযথ। মুফাস্সির (র.) بَادِل [মেঘ] -এর অর্থ ব্যক্ত করেছেন। رَعْدٌ - মেঘের গর্জন যা বায়ু চলার ও পরস্পর ঘর্ষণ দ্বারা জন্মে। بَرْقٌ -মেঘের ঘর্ষণে যে চমক বিদ্যুৎ জন্মে। فِيْهِ যমীরের مَرْجِع মুফাস্সির (র.) ظَاهِر -এর বিপরীত سَحَاب -কে বলেছেন, কিন্তু অন্যান্য মুফাস্সিরগণ (র.) صَيِّب -কে বলেছেন فِيْ ; مَعَ বমা'না اَلسَّمَاءُ শব্দটি مُؤَنَّث এবং اَلسَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ - যেমন- اَلسَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ও যেমন- رَعْد -এর পরে إِذَا ও ব্যবহৃত হয়। যেমন - مُذَكَّر -ও মুফাস্সির (র.) اَلْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ উল্লেখ করেছে, যেমন- ইমাম তিরমিযী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে مَوْقُوْعًا হাদীস বর্ণনাও করেছেন। এমনিভাবে بَرْق -এর যে ব্যাখ্যা করেছেন তা ইবনে জারীর (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। أَصَابِعَهُمْ -এর ব্যাখ্যা أَنَامِلُ -এর দ্বারা এ জন্য করেছেন, যাতে مَجَاز نَقْلِي হিসেবে مُبَالَغَه -এর জন্য جُزْء -এর উপর كُلّ -এর প্রয়োগ বুঝে আসে। كَذٰلِكَ هٰؤُلَاءِ দ্বারা মুফাস্সির (র.) مُشَبَّه [মুশাব্বাহ] -এর অবস্থা বর্ণনা করেছেন। যাতে مُفْرَد -এর সাথে مُفْرَد -এর উদাহরণ বুঝা যায় এবং কাজী বায়যাবী (র.) এ উদাহরণকে تَشْبِيْه মুফরাদ মুরাক্কাব উভয়ের উপর প্রয়োগের অনুমতি দিয়েছেন। مُحِيْط এটা প্রকৃত পক্ষে مُحْوِطٌ ছিল। حَاطَ - يَحُوْطُ থেকে। وَاو -এর কাসরা পরিবর্তন করে حَاء -কে দিয়েছে এবং وَاو -কে يَاء দ্বারা পরিবর্তন করেছে, مُحِيْط হয়ে গেছে।

لَا يَفُوْتُوْنَهُ বের করে এটা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য যে, এ আয়াতে إِسْتِعَارَه تَمْثِيْلِيَّة হচ্ছে شَاءَ -এর মাফঊল মাহযূফ, যার উপর لَوْ এর উত্তর নির্দেশনা করছে لَذَهَبَ أَيْ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَذْهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ [যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি নিয়ে যেতে তবে অবশ্যই নিয়ে যেতেন।]

شَيْءٍ এর পরে شَاءَهُ দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, شَيْءٌ শব্দটি [যা ইস্মে] এটা ইস্মে مَفْعُوْل -এর অর্থে, আর এর দ্বারা সমস্ত أَشْيَاء এমনভাবে উদ্দেশ্য নয় যে, আল্লাহ তা'আলার জাতও এর মধ্যে গণ্য হয়ে যাবে। বরং আল্লাহর জাতিকে বাদ দিয়ে অন্যান্য সকল বস্তু (أَشْيَاء) উদ্দেশ্য হবে। অর্থাৎ আল্লাহ নিজ সত্ত্বাকে ব্যতীত সকল বস্তুসমূহের উপর ক্ষমতা রাখেন। সত্ত্বা ও গুণাবলির মধ্যে পরিবর্তন যেহেতু দোষ ত্রুটিকে অবধারিত করে। তাই সেটা ক্ষমতা থেকে বাহিরে থাকবে।

كَأَنَّ : أَوْ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ أَصْحَابِ صَيِّبٍ মুবতাদা মাহ্যূফ, مَثَلُهُمْ -এর খবর। বাক্যটির প্রকৃত রূপ এমন হবে كَصَيِّبٍ রফার স্থানে كَائِنٌ - مِنَ السَّمَاءِ মুক্বাদ্দারের সাথে مُتَعَلِّق হয়ে صَيِّب -এর সিফত। ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ মুবতাদা مُؤَخَّر - فِيْهِ খবরে মুক্বাদ্দাম। জুমলা মিলে জরফ يَجْعَلُوْنَ - مِنَ الصَّوَاعِقِ -এর সাথে مُتَعَلِّق এবং حَذَرَ الْمَوْتِ -এর মাফঊলে লাহু, এটা জুমলায়ে مُسْتَأْنِفَه হয়েছে এবং فِيْهِ -এর যমীর থেকে حَال -ও হতে পারে। وَاللّٰهُ مُحِيْطٌ জুমলায়ে مُعْتَرِضَه بِالْكَافِرِيْنَ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কুরআনের উপমাসমূহের সম্পর্ক ও ব্যাখ্যা : এ উপমা দ্বিতীয় প্রকারের মুনাফিকদের সম্পর্কে যারা প্রকাশ্যভাবে তো ইসলাম ধর্মকে গ্রহণ করেছে কিন্তু অন্তরে সন্দিহান। যখনই তারা ইসলাম ও মুসলমানদের কোনো সৌন্দর্য ও বিজয় দেখতো তখন অন্তর কিছু কিছু ইসলামের দিকে ধাবিত হতে লাগতো। পরে যখন স্বার্থের বিরোধিতার প্রকটতা কিংবা কষ্ট ও বিপদসমূহের সম্মুখীন হতো, তখন ঐ অগ্রসরতা অস্বীকারের রূপ নিত। সুতরাং যেমনিভাবে কেউ তুফান ও ঝড়ে পড়ে গেলে কখনো সুযোগ পেলে বিদ্যুৎ চমকিলে আগে বাড়তে থাকে। আবার কখনো অন্ধকারে গর্জনে ভীতু হয়ে চলা থেকে বিরত থাকে, ঠিক এ অবস্থাই এ মুনাফিক্বদের। কেননা যখনই এরা ইসলামের আলোর উজ্জ্বলতা দেখতে পায়, তখন সত্যের দিকে আগে বাড়তে থাকে। কিন্তু হীনস্বার্থ ও মনের চাহিদার অন্ধকারে পড়ে পুনরায় সত্য থেকে ফিরে যায়।

وَاللّٰهُ مُحِيْطٌ بِالْكَافِرِيْنَ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ الخ ধমক এজন্য যে, যদি ফিরে না আসে। তবে স্মরণ রাখো আমার ক্ষমতার বাইরে যেতে পারবে না।

اَلْاَسْبَابُ التَّكْوِيْنِيُّ وَالتَّشْرِيْعِيُّ **[সৃষ্টিগত ও আইনগত সূত্রসমূহ]** : এস্থানে একটি প্রশ্ন হচ্ছে যে, প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিবর্গ ও দার্শনিকগণের বর্ণনা অনুযায়ী সূর্যের তাপ যখন পানি ও জমিনে পড়ে, তখন বাষ্পগুলো আকাশে উঠে যায়। এ পানির বাষ্পগুলো যদি সূক্ষ্ম ও মিহীন হয়ে তীব্র ঠাণ্ডার মঞ্জিলে অনেক উপরে চলে যায়। তখন সেখানকার ঠাণ্ডার সাথে মিশ্রিত হয়ে মেঘ হয়ে যায়। ওগুলো থেকে যে ফোটাগুলো পড়ে সেগুলোকে বৃষ্টি বলে। এ সেগুলো যদি ঠাণ্ডার কারণে জমে যায়। তবে শিলা ও বরফের রূপ ধারণ করে। কিন্তু যদি জল বাষ্পগুলো তীব্র ঠাণ্ডার স্তর থেকে নীচে রয়ে যায়, তবে এগুলোর দ্বারা শিশির তৈরি হয়। এমনিভাবে ঐ বাষ্পগুলোর সাথে যদি ধোঁয়ার অংশসমূহও মিলে যায় তখন সেটা মেঘকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে উপরে বের হওয়ার চেষ্টা করে, যার থেকে صَاعِقَة ও بَرْق - رَعْد জন্মে। মোদ্দাকথা, কুরআনের বর্ণনা "বৃষ্টি আকাশ থেকে আসে" প্রকাশ্যভাবে ও বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিজ্ঞানীদের বর্ণনার বিপরীত। অর্থাৎ বৃষ্টি মেঘ থেকে বের হয় এবং মেঘ জমিন ও পানির অংশ থেকে তৈরি হয়। "আকাশ থেকে বৃষ্টি আসে না"। এমনভাবে উপরে উল্লিখিত صَاعِقَة - بَرْق - رَعْد সূত্র ও উপকরণসমূহ থেকে তৈরি হয়।" "ফেরেশতা কিংবা ফেরেশতার আওয়াজও ফেরেশ্তার চাবুককে বলা হয় না।" এর কয়েকটি উত্তর দেওয়া যায়–

১. উভয় মন্তব্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন। আর তা হচ্ছে উভয় মন্তব্যই সঠিক। অর্থাৎ আমাদের সামনে অনুভব হয় বৃষ্টি মেঘ থেকে আসছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে স্বয়ং মেঘসমূহের মধ্যে আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ছে। গর্শন করা নিকটের প্রকাশ্য সূত্রসমূহকে বর্ণনা করছে। আর পবিত্র কুরআন ও শরিয়ত দূরের প্রকৃত সূত্রসমূহকে বর্ণনা করছে।

২. বৃষ্টি কখনো মেঘ থেকে বর্ষিত হয়। আবার কখনো আকাশ থেকে। এক প্রকারকে অর্থাৎ প্রাকৃতিক সূত্রগুলোকে দর্শন শাস্ত্র বর্ণনা করছে, আর অন্য প্রকারকে অর্থাৎ মৌলিক সূত্রসমূহকে শরিয়ত বর্ণনা করছে এবং সূত্রসমূহের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা হয় না। কেননা এক বস্তুর বিভিন্ন সূত্র ও উপকরণসমূহ হতে পারে। বৃষ্টির সূত্রগুলোও বিভিন্ন ও অনেক। এক প্রকার শরিয়ত বর্ণনা করেছে। অন্য প্রকারকে বিজ্ঞান বর্ণনা করেছে। প্রথম নির্দেশনার উপর সূত্র ও সূত্রের কথা বলা যায় এবং দ্বিতীয় নির্দেশনার উপর দুটি সমকক্ষের সূত্র মেনে নেওয়া যায়। অথবা এমন বলা যায় যে, প্রত্যেক বস্তুর দুটি দিক থাকে। একটি প্রকাশ্য অপরটি গোপন। বৃষ্টির প্রকাশ্য ও বাহ্যিক সূত্রকে দর্শন বর্ণনা করছে এবং পবিত্র কুরআন মূল ও প্রকৃত সূত্রকে বর্ণনা করছে।

৩. বৃষ্টি শুধু মেঘ থেকে আসে। যেমনটি দেখা যায়। আর মেঘের জন্য আকাশের অর্থ লওয়া যায় এবং আভিধানিকভাবে এর সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা প্রত্যেক উপরের বস্তুকে আকাশ বলা হয়।

একটি সন্দেহ এবং তার উত্তর : এ সন্দেহটি রয়ে গেল যে, আধুনিক বিজ্ঞান তো আকাশের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে এবং কুরআন দ্বারা আকাশ বরং আকাশসমূহের অস্তিত্ব ও সংখ্যাধিক্যতা বুঝা যায়। সুতরাং উত্তরে শুধু এতটুকু বলাই যথেষ্ট هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ [যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে প্রমাণ পেশ কর]

قَوْلُهُ وَاللّٰهُ مُحِيْطٌ بِالْكَافِرِيْنَ : এটি جُمْلَة مُعْتَرِضَة হয়েছে। مُحِيْطٌ শব্দটি মূলত مُحْوِطٌ ছিল। وَاو مُتَحَرِّك তার পূর্বে হরফে সহীহ সাকিন বিধায় وَاو -এর কাসরাকে পূর্বাক্ষর দিয়ে وَاو-কে يَاء দ্বারা পরিবর্তন করার পর مُحِيْطٌ হয়েছে। অর্থাৎ কাফেরদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। তারা আল্লাহ্ তা'আলার নাগালের বাইরে নয়। সব সময় সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তাদের ধ্বংস করতে পারেন।

قَوْلُهُ شَاءَ : شَيْءٌ-এর ব্যাখ্যায় شَاءَ উল্লেখ করে একটি سُوَال مُقَدَّر -এর জবাবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রশ্ন: شَيْءٌ ঐ বস্তুকে বলা হয়, যা বিদ্যমান থাকে। আল্লাহ্ তা'আলাও স্বীয় জাত ও সিফাতসহ বিদ্যমান আছেন। এখন প্রশ্ন উঠে আল্লাহ্ তা'আলা اَشْيَاء -এর অন্তর্ভুক্ত কিনা। যদি না থাকেন, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা لَا شَيْءٌ হওয়ার লাজিম আসে। যা স্পষ্টই বাতিল। কারণ তিনি তো বিদ্যমান আছেন। আর তিনি شَيْءٌ -এর মাঝে দাখিল হলেও প্রশ্ন থেকে যায়। তা হলো كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ এ মূলনীতির আলোকে আল্লাহ্ তা'আলাও هَالِك বা ধ্বংসশীল হওয়া লাজিম আসে।

উত্তর: বস্তুর شَيْءٌ দ্বারা ঐ شَيْءٌ -কে বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ্ তা'আলার مَشِيْئَت বা ইচ্ছার অধীন। আর আল্লাহ্ তা'আলার জাত তাঁর مَشِيْئَتٌ -এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা যে বস্তু مَشِيْئَت বা ইচ্ছার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে সেটা حَادِث নশ্বর হবে আর আল্লাহ্ তা'আলা হলেন কাদীম ও অবিনশ্বর।

অনুবাদ :

٢١. يَآيُّهَا النَّاسُ اَيْ اَهْلُ مَكَّةَ اعْبُدُوْا وَحِّدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ اَنْشَأَكُمْ وَلَمْ تَكُوْنُوْا شَيْئًا وَ خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ـ بِعِبَادَتِهِ عِقَابَهُ وَلَعَلَّ فِى الْاَصْلِ لِلتَّرَجِّيْ وَفِيْ كَلَامِهِ تَعَالٰى لِلتَّحْقِيْقِ

২১. হে মানুষ অর্থাৎ হে মক্কাবাসীগণ! তোমরা ইবাদত কর এক ও অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস স্থাপন কর তোমাদের সেই প্রতিপালকের, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে তোমাদের উদ্ভব ঘটিয়েছেন এমন অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই ছিলে না। এবং সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে যাতে তোমরা আত্মরক্ষা করতে পার তাঁর ইবাদত করে তাঁর শাস্তি হতে। এ স্থানে لَعَلَّ মূলত تَرَجِّيْ [আশাব্যঞ্জক] অর্থবোধক শব্দ। তবে অল্লাহ তা'আলার কালামে তা নিশ্চয়তা অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

٢٢. اَلَّذِيْ جَعَلَ خَلَقَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا حَالٌ بِسَاطًا يَفْتَرِشُ لَا غَايَةَ لَهَا فِى الصَّلَابَةِ اَوِ اللَّيُوْنَةِ فَلَا يُمْكِنُ الْاِسْتِقْرَارُ عَلَيْهَا وَالسَّمَآءَ بِنَآءً سَقْفًا وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهِ مِنَ اَنْوَاعِ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ تَاْكُلُوْنَهُ وَتَعْلِفُوْنَهُ بِهِ دَوَابَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا شُرَكَاءَ فِي الْعِبَادَةِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْخَالِقُ وَلَا يَخْلُقُوْنَ وَلَا يَكُوْنُ اِلٰهًا اِلَّا مَنْ يَخْلُقُ ـ

২২. যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা فِرَاشًا শব্দটি حَال [ভাব ও অস্থাবাচক পদ]। অর্থাৎ উপযোগী শয্যারূপে বিছিয়ে দিয়েছেন। অতি কঠিন নয়, কোমলও নয় যাতে তঅবস্থান করা অসম্ভব। এবং আকাশকে ছাদরূপে গঠন করেছেন এ স্থানে بِنَاءً অর্থ ছাদ। এবং আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন। অনন্তর তা দ্বারা তোমাদের জীবিকা হিসাবে বিভিন্ন প্রকারের ফল-মূল উৎপাদন করেন তোমরা যা নিজেরাও আহার কর এবং তোমাদের পশুদেরও তৃণরূপে আহার দান কর। সুতরাং কাউকেও তার সমকক্ষ দাঁড় করো না। উপাসনায় শরিকরূপে, অথচ তোমরা জান যে, তিনিই সৃষ্টিকর্তা আর **এগুলো দেব-দেবী কিছুই সৃষ্টি করে না। আর একমাত্র তিনিই আল্লাহ তা'আলা হতে পারেন, যিনি সৃষ্টি করেন [তিনি ব্যতীত আর কেউ ইলাহ বা উপাস্য হতে পারে না।]**

তাহকীক ও তারকীব

يَا হরফে নেদা, اَيُّهَا النَّاسُ মুনাদা اعْبُدُوْا رَبَّكُمْ জুমলা মাউসূফ, الَّذِيْ মাউসূল, خَلَقَكُمْ সেলাহ. জুমলায়ে فَعَلَيْهِ হয়ে رَبَّكُمْ মা'তূফ আলাইহি। اَلَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ ـ اَيِ الَّذِيْنَ مَنْ خَلَقَهُمْ مِنْ قَبْلِ خَلْقِكُمْ এ জুমলাটি মা'তূফ, উভয় জুমলা -এর সিফত হয়েছে। لَعَلَّ টি مُشَبَّه بِالْفِعْلِ, كُمْ ইস্‌ম, تَتَّقُوْنَ খবর। اَلَّذِيْنَ থেকে শেষ পর্যন্ত মাউসূল- সেলার মিলে দ্বিতীয় সিফত হয়েছে। لَعَلَّ দ্বিধা ও সন্দেহ, দোদুল্যতা ও আকাঙ্ক্ষার স্থানসমূহে আসে। اَنْدَادٌ বহুবচন نِدٌّ এর , যার অর্থ -সমকক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বী। بِنَاءً মাসদার, উঁচুস্থান, তাঁবু। اَلَّذِيْ নসবের স্থান- সিফতের উপর ভিত্তি করে এবং মহল্লে رَفْع ও হতে পারে মুবতাদাকে মাহযূফ নির্ধারণের মাধ্যমে।

يَاَيُّهَا النَّاسُ : يَاء হলো حَرْف نِدَاء ; কুরআনে কারীমে نِدَاء -এর জন্য একমাত্র يَاء হরফটিই ব্যবহৃত হয়েছে। খালেক মাখলুক নির্বিশেষে সকলের ক্ষেত্রেই এটি ব্যবহৃত হয়েছে। اَيُّ মুনাদাটি শব্দগত দিক দিয়ে ضَمَّه -এর উপর মবনী। আর ই'রাবের ক্ষেত্রে نَصْب -এর স্থলে। আর هَاء হরফটি تَنْبِيْه বা সতর্কতা স্বরূপ আর اَلنَّاسُ হলো اَيُّ -এর صِفَت বা بَدَل শব্দটির মূল হলো أُنَاسٌ 'ফা' কালিমার হামজাটি হযফ করে তার বদলে ال আনা হয়েছে। হামজা এবং আলিফ লাম -এর যে কোনো একটি ব্যবহৃত হবে। উভয়টি একত্র হবে না।

فَائِدَةٌ : إِنَّ النِّدَاءَ عَلٰى سَبْعَةِ مَرَاتِبَ : نِدَاءُ مَدْحٍ وَ نِدَاءُ ذَمٍّ، تَنْبِيْهٍ، وَنِدَاءُ إِضَافَةٍ، وَ نِدَاءُ نِسْبَةٍ، وَ نِدَاءُ تَسْمِيَةٍ، وَ نِدَاءُ تَعْنِيْفٍ ـ فَالْأَوَّلُ كَقَوْلِهِ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ، يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ، وَالثَّانِيْ : كَقَوْلِهِ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْا، يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا، وَالثَّالِثُ : كَقَوْلِهِ يَاأَيُّهَا الْإِنْسَانُ، يَاأَيُّهَا النَّاسُ وَالرَّابِعُ كَقَوْلِهِ يَا عِبَادِيْ وَالْخَامِسُ: كَقَوْلِهِ يَا بَنِيْ آدَمَ، يَا بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ، وَالسَّادِسُ : كَقَوْلِهِ يَا دَاوُدُ يَا إِبْرَاهِيْمُ، وَالسَّابِعُ : كَقَوْلِهِ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ ـ (جَمَل : ٣٧)

প্রশ্ন : পবিত্র কুরআনে يَاَيُّهَا النَّاسُ বলে মক্কাবাসীকে এবং يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বলে মদীনাবাসীকে সম্বোধন করে থাকে। সূরা বাকারা হলো মাদানী সূরা। যাতে মদীনাবাসীকে সম্বোধন করে يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ব্যবহার হওয়া উচিত ছিল। অথচ يَاَيُّهَا النَّاسُ বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এমনটি কেন করা হলো?

উত্তর : উক্ত কায়দাটি يَاَيُّهَا النَّاسُ তথা অধিকাংশের উপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে। كُلِّيْ বা সামগ্রিক দৃষ্টিতে নয়।

أَهْلَ : এর মাঝে رَفْع এবং نَصْب উভয় ই'রাব হতে পারে। نَصْب এ হিসেবে যে, এটি بِاعْتِبَارِ مَحَلٍّ বা স্থান বিচারে اَلنَّاسُ -এর ব্যাখ্যা। আর اَلنَّاسُ শব্দটি স্থান বিচারে اَيُّ -এর সিফত হিসেবে নসবের স্থলে রয়েছে। তাই তার ব্যাখ্যা তথা أَهْل -ও মানসূব হবে। আর رَفْع এ হিসেবে হবে যে, এটি শব্দগত দিক দিয়ে اَلنَّاسُ -এর তাফসীর। আর اَلنَّاسُ শব্দগত দিক দিয়ে مَرْفُوْع তাই أَهْل -ও مَرْفُوْع হবে। -[হাশিয়ায়ে জামাল : খ. ১, পৃ. ৩৭]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচনা ও যোগসূত্র : প্রথমে তিনটি দলের অবস্থা পৃথক পৃথক বর্ণনা করার পর এখন ঐ সবগুলোকে সম্মিলিতভাবে সম্বোধনের সাথে ইসলামের দুটি মৌলিক ভিত্তি অর্থাৎ একত্ববাদ ও রিসালাতের দিকে আহ্বান করা হচ্ছে।

আল্লাহর ইবাদত ও অনুগ্রহসমূহের ব্যাখ্যা : প্রথম তাওহীদের আলোচনা, যা স্বাভাবিক ও পরিষ্কার মর্মস্পর্শী ভাব-ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, মহৎ লোক স্বভাবত ও স্বাভাবিকভাবে অনুগ্রহকারীর দিকে ধাবিত হয় এবং অনুগ্রহকারীও তিনিই যিনি অস্তিত্বের ন্যায় বিরাট দৌলত দান করেছেন যে, এটা ব্যতীত সকল নিয়ামত তুচ্ছ এবং তারপর অস্তিত্বের টিকে থাকার সকল সামানাদি দান করেছেন। চাই ঐ নিয়ামতগুলো প্রকাশ্য ও শারীরিক হোক, যেমন– পানাহারের বস্তুসমূহ অথবা আধ্যাত্মিক ও বাতেনী আহারাদি হোক, অর্থাৎ আহকামে শরিয়ত, যেগুলো রিসালাত ও নুবয়তের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ যখন একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, স্রষ্টা শুধু আল্লাহ। তবে মা'বূদ ও শুধু আল্লাহই হওয়া চাই। মা'বূদ হওয়া শুধু স্রষ্টার জন্য খাছ, আর দাস হওয়া সৃষ্টির অবস্থারযোগ্য।

اَلنَّاسُ -এর ব্যাখ্যা মক্কাবাসী দ্বারা করা সূরা বাক্বারার বিপরীত নয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর যে রেওয়ায়েত হাকিম (র.) পেশ করেছেন যে, اَلنَّاسُ দ্বারা সম্বোধন মক্কাবাসীকে এবং الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا দ্বারা সম্বোধন মদীনাবাসীকে সম্বোধন করা হয়। এর উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ সংবিধান নয়; বরং অধিকাংশ রীতিনীতি উদ্দেশ্য হয়। তাই এ রেওয়ায়েতটিও উক্ত ব্যাখ্যার বিপরীত নয়।

তাওহীদই [একত্ববাদই] ইবাদতের উৎস : اُعْبُدُوْا -এর ব্যাখ্যা وَحِّدُوْا -এর দ্বারা এ জন্য করেছেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ইরশাদ করেন كُلُّ مَا وَرَدَ فِي الْقُرْاٰنِ مِنَ الْعِبَادَةِ فَمَعْنَاهُ التَّوْحِيْدُ কুরআনে যে কোনোস্থানে عِبَادَت শব্দটি এসেছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য তাওহীদ। কেননা কোনো ইবাদত তাওহীদ ব্যতীত সম্ভব নয়। তাওহীদই ইবাদতের উৎস। তাই তাওহীদকে عِبَادَت -এর শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা মাজায হয়েছে অথবা এ অর্থ লওয়া যায় যে, শুধু এক এর ইবাদত কর, অন্যকে এর মধ্যে অংশীদার করবে না এবং ইবদতের অর্থ শুধু উপাসনা নয়; বরং আনুগত্য ও ভক্তি। যার মধ্যে নামাজ, রোজা, হজ, জাকাতও এসে গেছে, এবং বিয়ে, ত্বালাক্ব, আদান-প্রদান, ক্রয়- বিক্রয় ইত্যাদি সকল বিধানাবলি এসে গেছে।

রাজকীয় পরিভাষাসমূহ : لَعَلَّ যেহেতু সন্দেহ ও সংশয়ের জন্য রচিত, তাই কালামে এলাহীর মধ্যে এর ব্যবহার আপত্তির কারণ, মুফাস্সির আল্লাম (র.) لِلتَّحْقِيْقِ -এর নির্দেশনার দ্বারা -এর অপসারণ করেছেন। অর্থাৎ কুরআন কারীমে এটাকে اِنَّ تَحْقِيْقِيَّة -এর সমার্থবোধক বুঝতে হবে। অর্থাৎ সন্দেহের জন্য নয়; বরং 'নিশ্চিত' এর জন্য, কিন্তু মুফাস্সির (র.) -এর এ বর্ণনা অধিকাংশের হিসেবে তো বিশুদ্ধ; কিন্তু অকাট্যের উপকারী নয়। তাই কেউ কেউ এ নির্দেশনা দিয়েছেন যে,

لَعَلَّ কুরআন কারীমে كَيْ তা'লীলিয়্যার অর্থে। আবার কেউ لَعَلَّ -কে আসল তারাজ্জী ও আশার অর্থেই মেনে নিয়েছেন, কিন্তু সম্বোধিত ব্যক্তিদের আস্থা ও বিবেচনা হিসেবে। অর্থাৎ কালামে এলাহী যেহেতু মানুষের স্বভাব ও রীতিনীতির উপর যেমনভাবে খবর, مُسْتَقْبِل ـ حَال ـ مَاضِي ـ اِنْشَاء ইত্যাদি। হুকুমাবলি মানুষের কালামের পদ্ধতিতে প্রচলিত। এমনিভাবে كَادَ ـ لَعَلَّ ইত্যাদি শব্দগুলোও ঐ সকল বৈশিষ্ট্যসমূহের সাথে আল্লাহর কালামে পাওয়া যাচ্ছে। আর কেউ কেউ এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, এ لَعَلَّ (تَعَرُّض شَيْء) কোনো কিছুকে ফিরানোর জন্য। অর্থাৎ ইবারত এরূপ ছিল اُعْبُدُوا رَبَّكُمْ مُعْتَرِضِيْنَ لِأَنْ تَتَّقُوا কিন্তু সবচেয়ে উত্তম ব্যাখ্যা এটা যে, এটাকে রাজকীয় পরিভাষার উপর চাপিয়ে দেওয়া। যেমন- বলা হয় যে, আমরা ভাগ্যের উপর ভরসা করে এ আশা রাখি যে, তোমরা আমাদের নির্দেশাবলির বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিরত থাকবে। এমনিভাবে বিস্ময়কর নয়" এটাও রাজকীয় পরিভাষা হতে পারে। বড়দের সামান্য আশার ঝলকও আলো দেখিয়ে দেওয়া ও অন্যান্যদের হাজার নিশ্চয়তা থেকে অনেক বেশি মূল্যায়ন যে, كَلَامُ الْمُلُوْكِ مُلُوْكُ الْكَلَام [বাদশাগণের কথা হলো কথার বাদশা।]

قَوْلُهُ اَلَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا : এ আয়াতাংশের মূল প্রাণ হচ্ছে جَعَلَ لَكُمْ এখানে কোন পর্যায়েই আকাশ ও পৃথিবীর আকৃতি বর্ণনা করা বা নভোমণ্ডলীয় ও ভূমণ্ডলীয় রহস্য-প্রকৃতি বর্ণনা কর উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য শুধু এ কথা বুঝিয়ে দেওয়া যে, আকাশ বা পৃথিবী কারো জন্য মানুষকে সৃষ্টি করা হয়নি। আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ। কোনো কিছু নিজে নিজে সৃষ্টি হয়নি। সবই আল্লাহর সৃষ্টি এবং সেই সর্বসময় ক্ষমতাবানেরই অধীনে। সুতরাং যে আসমান জমীন আল্লাহর নির্দেশে মানুষের খেদমতে নিয়োজিত সেই সেবকের সামনেই মাথানত করা এবং তাকে ইলাহর মর্যাদায় পূজা করা কেমন ভীষণ বোকামী, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। –[মাজেদী]

قَوْلُهُ حَالٌ : অর্থাৎ فِرَاشًا শব্দটি اَلْاَرْضَ থেকে حَال হয়েছে। তবে ঐ সূরতে যখন جَعَلَ ফে'লটি خَلَقَ -এর অর্থে এক মাফউলের দিকে مُتَعَدِّيْ হবে। যেমন মুফাসসির (র.) جَعَلَ -এর ব্যাখ্যায় خَلَقَ ব্যবহার করে ইঙ্গিত করেছেন। আর جَعَلَ بِمَعْنٰى صَيَّرَ হলে مُتَعَدِّيْ بَدُو مَفْعُوْل হবে। এ সূরতে اَلْاَرْضَ হবে مَفْعُوْل اَوَّل আর فِرَاشًا হবে مَفْعُوْل ثَانِيْ –[জামাল]

بِسَاطًا يَفْتَرِشُ الخ : ভূমি হলো আমাদের বিছানা বা এমন সমতল স্থান, যাতে আমরা পা রাখতে পারি, চলাফেরা করতে পারি। এমন অসমতল বা খাড়াভাবে তা সৃষ্টি করা হয়নি যেখানে পা রাখা বা চলাফেরা করা আমাদের জন্য সম্ভব নয়। পৃথিবী গোলাকার বা ডিম্বাকার যাই হোক, মানুষ ও মানবতার আবাসভূমি হিসেবে তার এর চেয়ে সুন্দর আর কোনো পরিচয় হতে পারে না যে, পৃথিবী মানুষের জন্য একটা বিছানা। তদ্রূপ আসমান উপর থেকে আমাদের ঢেকে রেখেছে এবং মানুষের সেবায় আল্লাহই তাকে নিয়োজিত করেছেন।

ফায়দা : এ আয়াতে জমীনকে فِرَاش [চাদর] বলা হয়েছে। আর চাদর চতুষ্কোণ বিশিষ্ট হয়ে থাকে। তাই فِرَاش শব্দের ব্যবহারে এ কথা আবশ্যক হবে না যে, জমীন গোলাকার নয়। কেননা, ভূ-পৃষ্ঠের এ বিশাল আয়তন গোলাকার হওয়া সত্ত্বেও দেখতে বিস্তৃত (مُسَطَّح) মনে হয়। আর কুরআনের বর্ণনাধারার আকর্ষণীয় পদ্ধতি এই যে, কুরআন প্রত্যেক বস্তুর ঐ অবস্থাটি বর্ণনা করে, থাকে যা আলেম-জাহিল নির্বিশেষে সকলেই অনুভব করতে সক্ষম হয়। মোটকথা, জমীনের আয়তন বড় হওয়ায় গোলাকার হওয়া সত্ত্বেও বিস্তৃত ও ছড়ানোই মনে হবে। এ হিসেবে জমীনকে গোলাকার এবং مُسَطَّح বা বিস্তৃতও বলা যাবে। –[জামালাইন]

قَوْلُهُ سَقْفًا : অন্য আয়াতে এ শব্দ এসেছে। আর এখানে بِنَاءً এসেছে–

وَالْبِنَاءُ مَصْدَرٌ بُنِيَتْ وَاِنَّمَا قُلِبَتِ الْيَاءُ هَمْزَةً لِتَطَرُّفِهَا بَعْدَ اَلِفٍ زَائِدَةٍ ـ

قَوْلُهُ مِنَ السَّمَاءِ : এখানে سَمَاء দ্বারা আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ فَوْقَ বা উর্ধ্বলোক। যেমন বলা হয়– مَا عَلَاكَ وَاَظَلَّكَ فَهُوَ سَمَاءٌ আর سَحَاب তথা মেঘমালাও যেহেতু উপরেই অবস্থিত তাই سَمَاء দ্বারা سَحَاب বা মেঘমালা উদ্দেশ্য। সুতরাং এ আপত্তি দূর হয়ে গেল যে, বৃষ্টি তো মেঘমালা থেকে বর্ষিত হয়, আসমান থেকে নয়।

تَعْلِفُوْنَ بِهٖ دَوَابَّكُمْ : عَلَفَ الدَّابَّةَ (ض) عَلْفًا [পশুকে ঘাস খাওয়ানো] اَعْلَافٌ (ج) عُلُوْفَةٌ ، عَلَفٌ ঘাস, গবাদি পশুর খাদ্য, তৃণ। এ বাক্যটুকু উল্লেখ্য করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اَلثَّمَرَاتُ দ্বারা জমীনের সব ধরনের উদ্ভিদ ও উৎপন্ন বস্তু বুঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا : এ বাক্যের সম্পর্ক পূর্বে উল্লিখিত اُعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ -এর সাথে। এখানে جَعَلَ ফে'লটি صَيَّرَ -এর অর্থে। আবুল বাকা (র.) سَمّٰى অর্থেরও অবকাশ আছে বলে মত দিয়েছেন। যাহোক, جَعَلَ দুটি মাফউলের দিকে মুতআদ্দী হবে। প্রথমটি হলো اَنْدَادًا আর দ্বিতীয়টি তার পূর্বের جَار ও مَجْرُوْر এখানে দ্বিতীয় মাফউলটি প্রথমটির পূর্বে হওয়া ওয়াজিব।

أَنْدَادً : এটা **نِدٌّ** -এর বহুবচন। অর্থ– সমান সমান, প্রতিদ্বন্দ্বী, শরীক। যাত বা সত্তাগত অংশিদারীত্বকে **نِدٌّ** বলা হয় আর সব ধরনের সাধারণ অংশিদারিত্বকে **مِثْل** বলা হয়।

وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْخَالِقُ : এটি **فَلَا تَجْعَلُوْا** -এর জমীর থেকে **حَال** হয়েছে। অর্থাৎ স্বভাবসুলভ ইলহাম এবং সাধারণ মানবীয় অনুভূতির মাধ্যমেই তোমাদের এটা জানা যে, সকলের সৃষ্টিকর্তা (**خَالِق**) এবং সকলের শাসকর্তা (**حَاكِم**) তিনিই। প্রতিটি মানবহৃদয়ে এতটুকু বিচার ও বোধশক্তি গচ্ছিত রাখা হয়েছে, যা তাকে তাওহীদ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে যদি না ভুল শিক্ষা ও দূষিত পরিবেশ মূল স্বভাবকেই বিকৃত করে না ফেলে। –[মাজেদী]

প্রত্যেক বস্তুর আসল হচ্ছে হালাল হওয়া : لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا -এর মধ্যে আলেমগণ দুটি সূক্ষ্মতা বর্ণনা করেছেন। প্রথমটি হচ্ছে, লামে **نَفْع** দ্বারা ইঙ্গিত এ দিকে যে, শরিয়তের দৃষ্টিতে সকল বস্তুর ক্ষেত্রে আসল হচ্ছে হালাল ও বৈধ হওয়া। হারাম হওয়া আকস্মিক ও দলিলের মুখাপেক্ষী।

আল্লামা যমখশারী ও মাদাররিক গ্রন্থকার (র.) এটাকে আবূ বকর রাযী (র.) এবং মু'তাযিলাদের দলিল হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম ফখরুল ইসলাম (র.) বিরোধিতার আলোচনায় বলেছেন যে, হালাল ও হারামের বিষয়টি যখন পরস্পর বিরোধ হয়ে যায়। তখন হারাম, পশ্চাদ্ভাগ ও রহিতকারী মনে করে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এবং "হালাল" মূল হওয়ার কারণে অগ্রবর্তী ও রহিত হবে। নতুবা "হারাম" কে মূল ধরলে দু'বার নস্‌খ [রহিত করা] স্বীকার করতে হবে। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য **مَبْسُوْطَات** কিতাবসমূহ মুতালা'আহ করা দরকার।

জমিন গোল না চেপ্টা : আর দ্বিতীয় সূক্ষ্মতাটি হচ্ছে, **فِرَاش** শব্দ দ্বারা জমিনের আকৃতি গোল হওয়া কিংবা সমতল হওয়া জরুরি হয় না। আর এ **فِرَاش** হওয়াটা ঐগুলো থেকে কোনোটির বিপরীত নয়। জমিন **فِرَاش** -এর রূপে হওয়া আর এর উপর উঠা, বসা, শোয়া উক্ত দুটি রূপে সাধন হতে পারে। যে পৃষ্ঠের পুরত্ব অনেক ছোট হয়, ওটার **فِرَاش** মুশকিলের কারণ হতে পারে। কিন্তু যখন বিরাট আকারের পৃষ্ঠ হয়। তখন এর উপর অগণিত সৃষ্টি সুবিধা মতো থাকতে পারে। সুতরাং সাগরের পৃষ্ঠদেশ থেকে উঁচু জমিনের একটি বিরাট অংশ বিষুব রেখা থেকে উত্তর দিকে এবং সামান্য অংশ দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। যার মধ্যে সকল সৃষ্টি বসবাস করছে। এ জমিন মূলত গোল বানানো হয়ে ছিল, কিন্তু বোঝা-চাপা ও জলোচ্ছ্বাসের আকস্মিক ঘটনাবলির কারণে জমিনের মধ্যে উঁচুতা ও নীচুতা সৃষ্টি হয়ে গেছে এবং প্রকৃত গোল আকৃতি স্ব অবস্থায় রয়নি।

পৃথিবীর বিস্তৃতি : পৃথিবীর বিস্তৃতির অনুমান নিম্নোক্ত আলোচনা দ্বারা করা যেতে পারে। পূর্ব-পশ্চিমে এর ব্যাস হলো ১২৭৫২ কিঃ মিঃ এবং উত্তর-দক্ষিণে ১২৭০৯কিঃমিঃ। এর আয়তন প্রায় ১৯ কোটি ২০ লক্ষ বর্গমাইল বা ৪৯৭২৬০৮০০ বর্গ কিঃ মিঃ এর পরিধি হলো ২৫০০০ মাইল। পৃথিবীর ব্যাস এত বিশাল হওয়ায় দর্শকের নজরে তা সমতল অনুভব হয়। এ কারণেই পৃথিবীকে গোল এবং সমতল উভয় বলা যেতে পারে।

قَوْلُهُ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً : উদ্দেশ্য হলো এ বাস্তব বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যে, আসমান, জমিন, প্রাণী, সবই এক আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি। এ সকলের সৃষ্টিতে না কোনো দেব-দেবীর দখল আছে, আর না কোনো পীর বা পয়গাম্বরের। যখন এ বিষয়টি প্রমাণিত ও স্বীকৃত যা তোমরা নিজেরাও স্বীকার কর, তাহলে তোমাদের ইবাদত-বন্দেগী তার জন্যই হওয়া উচিত। অন্য কেউ এর হকদার হতে পারে না। তোমরা তার উপাসনা করবে এবং অন্যদেরকে আল্লাহ তা'আলার শরিক বা তার সমকক্ষ স্থির করবে। আল্লাহ তা'আলার খলিফা যখন তার নিজ স্থান ও মর্যাদা বিচ্যুত হয়ে অধঃপতনের শিকার হয়েছেন, তখন সে লাঞ্ছনার ও অবনতির সমস্ত সীমা পার হয়ে গিয়েছে। সে তার সেজদার বস্তু বানিয়েছিল কখনও চন্দ্র-সূর্যকে, কখনও নদ-নদীকে, কখনও আকাশ ও মাটিতে, কখনও বৃক্ষরাজিকে, কখনও পশু ও নির্জীব বস্তুকে, কখনও সাপও আগুনকে। মোটকথা তারা নদ-নদীকেও ছাড়েনি, এমনকি লজ্জাস্থানকেও ছাড়েনি। কুরআন সমস্ত বোকামী ও মনগড়া বিষয়াদির ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করেছে।

কুরআনের আলোচ্য বিষয় : কিন্তু এসব তদন্তের ময়দান ভূগোল ও দর্শন হতে পারে। জমিন গোল কিংবা সমতল। জমিন চলমান কিংবা স্থির। আকাশের অস্তিত্ব আছে কিংবা নেই। সূর্য, চন্দ্র, তারকা ও নক্ষত্রসমূহের চলন এবং পরিমাপের সমস্যাবলি। মোটকথা যে সকল বিষয়টি কুরআনের আলোচ্য বিষয় থেকে বহির্ভূত, ঐগুলোর জন্য কুরআনকে আসল বানানো কোথাকার ইনসাফ? এ অনুসন্ধান তো দৈনন্দিন পরিবর্তন হতে থাকে। সঠিক কথা অশুদ্ধ এবং অশুদ্ধ কথা শুদ্ধ হচ্ছে। তবে কি! আল্লাহর কালামও এমনি ধরনের যে, যখন ইচ্ছা করবে ও যতটুকু ইচ্ছা টেনে লম্বা করবে এবং যখন ইচ্ছা কুঞ্চিত করবে

مِنْ اَنْوَاعِ الثَّمَرَاتِ দ্বারা জালাল মুফাস্‌সির (র.) **مِنْ** বয়ানিয়া হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, ব্যাপক বস্তুসমূহ উদ্দেশ্য। চাই মানুষের খোরাকের হোক কিংবা পশুর আহার হোক। আর কারো কারো দৃষ্টিতে **مِنْ** তাবয়ীযিয়া, অর্থাৎ কোনো কোনো ফল

অনুবাদ :

২৩. وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ شَكٍّ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا مُحَمَّدٍ مِنَ الْقُرْاٰنِ اَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِنْ مِثْلِهِ اَيِ الْمُنَزَّلِ وَمِنْ لِلْبَيَانِ اَيْ هِيَ مِثْلُهُ فِي الْبَلَاغَةِ وَحُسْنِ النَّظْمِ وَالْاِخْبَارِ عَنِ الْغَيْبِ وَالسُّوْرَةُ قِطْعَةٌ لَهَا اَوَّلٌ وَاٰخِرٌ وَاَقَلُّهَا ثَلٰثُ اٰيَاتٍ وَادْعُوْا شُهَدَاءَكُمْ اٰلِهَتَكُمُ الَّتِيْ تَعْبُدُوْنَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَيْ غَيْرِهِ لِتَعِيْنَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ . فِيْ اَنَّ مُحَمَّدًا قَالَهُ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ فَافْعَلُوْا ذٰلِكَ فَاِنَّكُمْ عَرَبِيُّوْنَ فُصَحَاءُ مِثْلُهُ

২৩. যদি তোমাদের সন্দেহ সংশয় হয়, আমি আমার বান্দার মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে অর্থাৎ আল-কুরআন সম্পর্কে। এ মর্মে যে এটা আল্লাহ তা'আলার তরফ হতে অবতীর্ণ, তাহলে তোমরা তার অনুরূপ সূরা আনয়ন কর অর্থাৎ অবতীর্ণ কুরআনের মতো। مِنْ শব্দটি بَيَان বা বিবরণমূলক। অর্থাৎ সেটি [অস্বীকারকারীগণ রচিত সূরা] ভাষালংকার, বাক্যের মনোহর বিন্যাস এবং অজানা ও গায়েব সম্পর্কে সত্য সংবাদ দানে তার [আল-কুরআনের] অনুরূপ হবে। سُوْرَة আল কুরআনের একটি খণ্ডিত অংশের নাম; যার সুনির্দিষ্ট শুরু ও শেষ রয়েছে। ন্যূনতমপক্ষে তা তিন আয়াত বিশিষ্ট হয়ে থাকে। তোমরা আহ্বান কর তোমাদের সকল সাক্ষীকে তোমাদের ইলাহগণকে যাদের তোমরা উপাসনা করে থাক, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অর্থাৎ তাঁকে ছাড়া অন্যদেরকে, তোমাদের সাহায্য করার জন্য তোমরা যদি সত্যবাদী হও এই কথায় যে, মুহাম্মদ ﷺ নিজে রচনা করে এই কথা বলেছেন তাহলে তোমরাও তা করে দেখাও। কারণ তোমরাও তো তাঁর মতো আরবি ভাষা-ভাষী এবং অলঙ্কার-শাস্ত্রবিজ্ঞ।

২৪. وَلَمَّا عَجَزُوْا عَنْ ذٰلِكَ قَالَ تَعَالٰى فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا مَا ذُكِرَ لِعَجْزِكُمْ وَلَنْ تَفْعَلُوْا ذٰلِكَ اَبَدًا لِظُهُوْرِ اِعْجَازِهِ اِعْتِرَاضٌ فَاتَّقُوْا بِالْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ وَاَنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ الْبَشَرِ النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ اَلْكُفَّارُ وَالْحِجَارَةُ كَاَصْنَامِهِمْ مِنْهَا يَعْنِيْ اَنَّهَا مُفْرِطَةُ الْحَرَارَةِ تُتَّقَدُ بِمَا ذُكِرَ لَا كَنَارِ الدُّنْيَا تُتَّقَدُ بِالْحَطَبِ وَنَحْوِهِ اُعِدَّتْ هُيِّئَتْ لِلْكَافِرِيْنَ يُعَذَّبُوْنَ بِهَا جُمْلَةٌ مُسْتَاْنِفَةٌ اَوْ حَالٌ لَازِمَةٌ .

২৪. [শত চেষ্টার পরও] যখন তারা তা হতে [এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণে] অপারগ হয়ে গেল তখন আল্লাহ তা'আলা এতদসম্পর্কে ইরশাদ করেন, যদি তোমরা তা আনয়ন না কর উল্লিখিত অপারগতার দরুন আর কখনই তোমরা করতে পারবে না তা কোনো কালেই সম্ভব নয় কুরআনের ইজায প্রকাশ পেয়ে যাওয়ায়। وَلَنْ تَفْعَلُوْا বাক্যটি এই স্থানে جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ বা বিচ্ছিন্ন বাক্যরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে তোমরা আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান এবং কুরআন যে মানব রচিত না এই কথার উপর বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক সেই আগুন হতে আত্মরক্ষা কর, মানুষ অর্থাৎ সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীগণ ও পাথর অর্থাৎ পাথর নির্মিত তাদের প্রতিমাসমূহ যার ইন্ধন অর্থাৎ এই অগ্নি সীমাতিরিক্ত উষ্ণ হবে। তা দুনিয়ার আগুনের মতো কাষ্ঠ ইত্যাদি দ্বারা প্রজ্বলিত করা হবে না; বরং উল্লিখিত দ্রব্যসমূহ হলো তার ইন্ধন। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণের জন্য তা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। এর মাধ্যমে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা হবে। اُعِدَّتْ অর্থ প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। এই বাক্যটি جُمْلَةٌ مُسْتَاْنِفَةٌ নবগঠিত বাক্য বা حَالٌ لَازِمَةٌ [এমন ভাবও অবস্থাবাচক বাক্য, যে অবস্থা তাদের জন্য অবশ্যম্ভাবী।]

তাহকীক ও তারকীব

فِىْ رَيْبٍ-এর মধ্যে فِىْ জরফিয়া, যা মুবালাগার জন্য। অর্থাৎ সন্দেহ বেষ্টন করে রেখেছে। مِنْ مِثْلِهٖ-এর যমীর যদি مَا نَزَّلْنَا-এর দিকে ফিরে যা দ্বারা উদ্দেশ্য কুরআন, তবে مِنْ-এর তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে। আখফাশের রায় অনুযায়ী। بَيَانِيَة কিংবা তাব্য়ীযিয়্যা অথবা যায়েদাহ। দ্বিতীয় সূরত হলো যমীর عَبْد-এর দিকে ফিরবে। যা দ্বারা উদ্দেশ্য নবী করীম ﷺ -এর সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। এমতাবস্থায় مِنْ এব্তেদাইয়া হবে অথবা فَاْتُوْا-এর সেলাহ্ হবে দ্বিতীয় পদ্ধতিতে যেহেতু غَيْر اُمِّى থেকে কুরআনের প্রকাশনার সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই প্রথম পদ্ধতিটি উত্তম।

قَوْلُهٗ وَاِنْ كُنْتُمْ : كُنْتُمْ শব্দগতভাবে মাজির সীগা হলেও অর্থ হবে ভবিষ্যৎ কালের।

قَوْلُهٗ فِىْ رَيْبٍ : এখানে رَيْب-কে মাজাযীভাবে ظَرْف বানানো হয়েছে। যেহেতু কাফেরদের পক্ষ থেকে অধিক পরিমাণে সন্দেহ প্রকাশ পেত তাই رَيْب-কে بِمَنْزِلَةِ مَكَانٍ সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেন সন্দেহ তাদেরকে পরিবেষ্টন করে আছে। –[জামাল]

قَوْلُهٗ مِمَّا نَزَّلْنَا : مِنْ এখানে سَبَبِيَّه বা اِبْتِدَاءُ الْغَايَةِ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এটাকে تَبْعِيْضِيَّة ধরা যাবে না। اَىْ اِرْتَبْتُمْ لِاَجْلِ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এই পবিত্র কালামে [কুরআনে] সন্দেহের কারণ হয়ত এ হতে পারত যে, খোদ এ বাণীর মাঝেই কোনো সংশয়পূর্ণ কথা থেকে থাকবে, যা দূরীভূত করার জন্য لَا رَيْبَ فِيْهِ বলা হয়েছে। অথবা তার কারণ এ হতে পারত যে, কারও অন্তরে স্বীয় উপলব্ধির ত্রুটির কারণে অথবা তীব্র বিদ্বেষ ও শত্রুতার কারণে সন্দেহের সৃষ্টি হয়ে থাকবে। এ আয়াতে শেষোক্ত কারণটির প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। যেহেতু এটা সম্ভবপর, বরং এটা বাস্তবেই বিদ্যমান ছিল, তাই তা দূর করার একটি সহজ ও উৎকৃষ্ট পদ্ধতি বলে দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের ধারণায় এ কুরআন আল্লাহ তা'আলা বাণী না হলে অবশ্যই তা মানব রচিত হবে। আর একজন মানুষের পক্ষে যখন এমন রচনা সম্ভব, তখন অন্যদের পক্ষেও তা সম্ভব হবে নিঃসন্দেহে। আর সেখানে জ্ঞান, মেধা ও প্রজ্ঞায় শ্রেষ্ঠ মানব দলের সমাবেশ হলে তো কথাই নেই। সুতরাং তোমরাও এরূপ বিশুদ্ধ ও সাহিত্যালংকার পূর্ণ অন্তত তিন আয়াত সম্বলিত একটি সূরা রচনা কর তো দেখি! তোমরা ভাষা ও সাহিত্যালংকারে সুদক্ষ হওয়া সত্ত্বেও যখন একটি ক্ষুদ্র সূরার মোকাবিলা করতেও অক্ষম হয়ে পড়েছে, তখন হৃদয়াঙ্গম কর যে, এটা আল্লাহ তা'আলারই বাণী, কোনো মানুষের রচনা নয়। –[তাফসীরে উসমানী, তাফসীরে মাজেদী]

শানে নুযূল : তাওহীদের পর এখান থেকে নবুয়ত ও রিসালাতের মাসআলা আরম্ভ হচ্ছে। নবুয়তের উজ্জ্বল প্রমাণ যেহেতু মু'জিযা হয়। অন্যান্য আম্বিয়া (আ.)-কে নিজ নিজ কালের উপযোগী যেমনিভাবে হাজার হাজার মু'জিযা দেওয়া হয়েছে। যেগুলো তাদের জন্য নবুয়তের দলিল হয়েছে। এমনিভাবে নবী করীম ﷺ -কে অসংখ্য মু'জিযা দেওয়া হয়েছে। এগুলোর মধ্যে থেকে সবচেয়ে বড় ইলমী মু'জিযা হচ্ছে পবিত্র কুরআন, যা তাঁর নবুয়তের সবচেয়ে বড় প্রমাণ, পবিত্র কুরআন দলিল হওয়ার ব্যাপারে বিরোধীদের যেহেতু এ সন্দেহ ছিল যে, মুহাম্মদ ﷺ সাধারণ রচনাকারীদের ন্যায় কুরআনকে নিজেই অল্প অল্প করে রচনা করেছেন। যে কারণে পবিত্র কুরআন কালামে ইলাহী ও মুজিযা হওয়ার বিষয়টি সন্দেহ এবং সমালোচনার পাত্র হয়ে গেছে। তাই নবুয়তের দলিলই ধরতে গেলে সন্দেহযুক্ত হয়ে গেছে। এ আয়াতে ঐ সন্দেহকে দলিল থেকে উৎখাত করছেন। যাতে নবুয়তের দলিল পরিষ্কার হয়ে যায়।

اِنْزَال ও تَنْزِيْل-এর পার্থক্য : اِنْزَال বলা হয় -সম্মিলিতভাবে একবার অবতীর্ণ করাকে। আর تَنْزِيْل বলা হয় প্রয়োজন অনুপাতে অল্প অল্প করে ধীরে ধীরে অবতীর্ণ করাকে। পবিত্র কুরআনের উক্ত দু'টি গুণই রয়েছে। এর অবতরণ প্রথম লওহে মাহ্ফূয থেকে দুনিয়ার আকাশে সমষ্টিগত ও পরিপূর্ণভাবে একবারেই হয়েছে। তাই কোনো কোনো স্থানে তাকে اِنْزَال দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। আর তাবলীগ ও নবুয়ত পূর্ণ সময়ে অর্থাৎ ২৩ বৎসরে অল্প অল্প করে অবতরণ হতে রয়েছে। তাই তাকে تَنْزِيْل দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। সন্দেহের উৎস ও উদ্দেশ্য তাদের জন্য এমনই হয়েছে যে, যেমনিভাবে কবিগণ তাদের কাব্যগ্রন্থ, গজল, দীর্ঘ কবিতাসমূহকে অল্প অল্প করে পূর্ণ করেন। হযরত রাসূল ﷺ -ও যেহেতু এমনি করছেন, তাই কাফেররা মনে করেছে যে, এটা মুহাম্মদ ﷺ-এর কালাম। কালামে ইলাহী যদি হতো, তবে এটাকে পূর্ণ অবতীর্ণ করার উপর

ক্ষমতাও আছে এবং তাঁর অভ্যাসও এটাই। যেমন-তাওরাত একবারই লিখে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অতএব, তারা বলতো لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً [কেন নবী করীম ﷺ -এর উপর কুরআন শুধু একবারে অবতীর্ণ করা হয়নি?] চ্যালেঞ্জেরে মধ্যে এ সন্দেহটাকেই দূর করা উদ্দেশ্য, اَنْزَلْنَا -এর স্থানে نَزَّلْنَا বলা হয়েছে। عَبْدِنَا -এর মধ্যে রাসূল ﷺ -এর ব্যক্তিত্বকে عَبْد দ্বারা ব্যক্ত করে এবং এটাকে যমীর مُتَكَلِّم -এর দিকে مُضَاف করে রাসূল ﷺ -এর সম্মান, মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শনের সামঞ্জস্যতার প্রতি ইঙ্গিত করে দিয়েছেন। অর্থাৎ রাসূল ﷺ মা'বূদিয়াতের স্থানে নন; বরং আব্দিয়াতের [গোলামিয়াতের] স্থানে আছেন। যা সকল স্থানের মধ্যে সর্বোচ্চতর স্থান এবং আমার বিশেষ বান্দা বা গোলাম। আল্লাহ যাকে আপন আখ্যায়িত করেন। তার উপাসনার ব্যাপারে আর কি প্রশ্ন করার থাকে।

قَوْلُهُ مِنَ الْقُرْاٰنِ : এটি مَا -এর بَيَان

قَوْلُهُ اَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ : اَىْ فِىْ اَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ أَوْ اَنَّهُ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ (جَمَل : ٤٠)

قَوْلُهُ فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ : এটি পূর্বোক্ত শর্তের জওয়াব।

مِنْ مِّثْلِهِ : **সমতুল্যতার ভিত্তি :** এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরদের মতামত সাধারণভাবে অলংকার ও সুবিন্যাসের মধ্যেই নিবদ্ধ বটে, কিন্তু কুরআনের ভাব ও মর্মগত দিকটাও তার সার্বজনীন চ্যালেঞ্জের অন্তর্ভুক্ত; বরং এটিই মূখ্য, এছাড়া অন্য সবকিছু তার আনুষঙ্গিক রূপ মাত্র। কেননা কুরআন শুরুতেই নিজের কেন্দ্রীয় পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছে- هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ -এ এক হেদায়েতগ্রন্থ। তাই এখানেও নিজের কেন্দ্রীয় চরিত্রটি তুলে ধরেই উদাত্ত ভাষায় ঘোষণা করছে- আমার এক একটি সূরায় সত্যের যে আলোক বিচ্ছুরণ আছে, সম্মিলিত প্রচেষ্টাযোগেও যদি তোমরা তার সমতুল্য কিছু পেশ করতে পার, তাহলে কর দেখি। কুরআনের আরেকটি আয়াত থেকেও সমতুল্যতার ভিত্তি সম্পর্কে জানা যায়। ইরশাদ হচ্ছে-

قُلْ فَأْتُوْا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَا اَتَّبِعْهُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ـ (قَصَص : ٤٩) [মাজেদী থেকে সংকলিত]

قَوْلُهُ شُهَدَاۤءَكُمْ اٰلِهَتَكُمْ : উপাস্যদেরকে شُهَدَاء বলার কারণ হলো কাফেরদের ভ্রান্ত ধারণা মতে এরা আল্লাহ তা'আলার সামনে তাদের ইবাদত বিশুদ্ধতার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে।

وَفِى الْبَيْضَاوِىْ : اَلشُّهَدَاءُ جَمْعُ شَهِيْدٍ بِمَعْنَى الْحَاضِرِ أَوِ الْقَائِمِ بِالشَّهَادَةِ أَوِ النَّاصِرِ أَوِ الْإِمَامِ وَكَأَنَّهُ سُمِّىَ بِهِ لِأَنَّهُ يَحْضُرُ الْمَجَالِسَ وَتُبْرَمُ بِمَحْضَرِهِ الْأُمُوْرُ ـ

مَعْنَى الْاٰيَةِ : وَادْعُوْا اِلٰى مُعَارَضَةِ مَنْ حَضَرَكُمْ أَوْ رَجَوْتُمْ مَعُوْنَتَهُ مِنْ اِنْسِكُمْ وَجِنِّكُمْ وَاٰلِهَتِكُمْ غَيْرَ اللّٰهِ أَوِ ادْعُوا الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ لَكُمْ بَيْنَ يَدَىِ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلٰى زَعْمِكُمْ ـ (جَمَل)

اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ : এটি শর্ত। তার জবাব মাহযূফ আছে। তাহলো- فَافْعَلُوْا ذٰلِكَ

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ এটা اُدْعُوْا কিংবা شُهَدَاء -এর সাথে সংযুক্ত। এ আদেশ দ্বারা উদ্দেশ্য অক্ষম করা। فَافْعَلُوْا ذٰلِكَ সম্পর্কে মুফাস্সির (র.) ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ শর্তের জাযায়ে মাহযূফ। وَقُوْد জমহুরের দৃষ্টিতে وَاو -এর ফাতহার সাথে পঠন, অর্থাৎ ইন্ধন [কাঠ] এবং অন্য এক পঠনে وَاو-এর জুম্মার সাথে- অর্থ আগুন জ্বালানো। যেমন وَضُوْء শব্দে ও وُضُوْء-এর মধ্যে পার্থক্য হুবহু ঐ পার্থক্য।

قَوْلُهُ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا -এর মধ্যে اِنْ -এর উল্লেখ করা উপহাস করা হিসেবে অথবা মানুষের অভ্যাসের উপর ভিত্তি করে। কেননা চিন্তা-ভাবনার পূর্বে তাদের অক্ষমতা প্রমাণিত হয়নি। নতুবা প্রকৃত পক্ষে কালামে ইলাহীর মধ্যে এ ধরনের সন্দেহের শব্দ আসা প্রশ্নের কারণ হবে। اَلنَّارُ সূরায়ে বাক্বারাহ যেহেতু মাদানী। তাই এ স্থানে مَعْرِفَه আনাটা বিশুদ্ধ। আর সূরায়ে তাহরীম মক্কী। সেখানে প্রথমবার نَار উল্লেখ করা হয়েছে। তাই نَكِرَه -এর সাথে উল্লেখ করেছ। مُعَرَّفٌ بِاللَّامِ আনার কোনো প্রশ্নই আসে না।

فَاتَّقُوْا -এর পরে জালাল (র.) যে عِبَارَتٌ প্রকাশ করেছেন এর উদ্দেশ্য হচ্ছে তাক্বওয়ার মাধ্যম যে ঈমানকে নির্ধারণ করা হয়েছে। সেটার মু'মানবিহী [যার সাথে ঈমান আনতে হবে] দুটি, একটি হচ্ছে- আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে- কুরআন আল্লাহর কালাম হওয়া এবং মানুষের অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ -এর কালাম না হওয়া। اَوْ حَالٌ لَازِمَةٌ এ এবারতের সারাংশ

হলো, وَقُوْدُهَا এর যমীর থেকে এটাকে حَال বানানো যাবে না। কেননা যমীর মুযাফ ইলাইহি এবং মুযাফ ইসমে جَامِد হওয়ার কারণে عَامِل হতে পারে না। جَرّ -এর যমীরকে হযফ করার সাথে مِمَّا نَزَّلْنَا জাযা, فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ শর্ত, اِنْ كُنْتُمْ স্থানে رَيْب -এর সিফত مَا মাউসূলা, مِنْ مِثْلِهِ সিফত اَىْ بِسُوْرَةٍ كَائِنَةٍ مِثْلَهُ وَادْعُوْا شُهَدَاءَ كُمْ জুমলায়ে اِنْشَائِيَّه মা'তূফ فَأْتُوْا -এর উপর। مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ এটা شُهَدَاء থেকে حَال -এর স্থানে اَىْ شُهَدَاءُ كُمْ مُتَفَرِّدِيْنَ عَنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ শর্তের জওয়াব মাহযূফ। فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا শর্ত আর فَاتَّقُوْا জাযা, لَنْ تَفْعَلُوْا জুমলায় مُعْتَرِضَه আর اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ النَّار থেকে حَال এর স্থানে এবং এর আমেল হলো- فَاتَّقُوْا -

আল্লাহপ্রদত্ত চ্যালেঞ্জ এবং শত্রুদের পরাজয় স্বীকার -এর ব্যাখ্যা : এ চ্যালেঞ্জ বিভিন্নস্থানে বার বার করা হয়েছে। অবতীর্ণ করার ধারায় যার ধারাবাহিকতা এরূপ যে, প্রথম আয়াত قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّأْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا দ্বারা পূর্ণ কুরআনের ন্যায়ের চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এর কোনো তৎপরতা হয়নি। তখন আহ্বানে সহজ করে বলা হয়েছে فَأْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيٰتٍ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ এর উপরও যখন কেউ পারলো না। তখন এ আয়াত فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِنْ مِثْلِهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ বলে পুনঃ পুনঃ ঘোষণা দেওয়া হলো; কিন্তু তারপরও কিছুই উত্তর বের হলো না। তখন فَلْيَأْتُوا بِحَدِيْثٍ مِثْلِهِ اِنْ كَانُوْا صَادِقِيْنَ বলে আহ্বান শেষ করেছে।

অতঃপর রাসূল ﷺ পবিত্র কুরআনের সবচেয়ে ছোট আয়াত বিশিষ্ট সূরা কাউছার লিপিবদ্ধ করিয়ে আরবের প্রথানুযায়ী পবিত্র কা'বার দু-দরজায় লটকিয়ে দিলেন। অনেকদিন অনবরত লট্‌কানো ছিলো। কিন্তু কারো কোনো উত্তর নেই। মনে হয় সকলকে বিষধর সাপে ছোবল দিয়ে অজ্ঞান করে ফেলেছে। অবশেষে কোনো এক বাগ্মী কবি একটি বাক্য لَيْسَ هٰذَا مِنْ طَاقَةِ الْبَشَرِ বৃদ্ধি করে নিজ অক্ষমতা প্রকাশ্য ভাবে স্বীকার করেছে।

وَلَنْ تَفْعَلُوْا -এর মধ্যে যেহেতু অদৃশ্যের সংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। তাই এটা পৃথক পরাজয়ের সংবাদ দেওয়া হয়েছে। পরে বারংবার তাদেরকে ডাকা হয়েছে। উত্ত্যক্ত করা হয়েছে। লজ্জা দেওয়া হয়েছে। অপমান করা হয়েছে এবং এসব শুনেও তাদের মধ্যে কিছু মাত্র উত্তেজনারও সৃষ্টি হয়নি।

প্রাণ ও সম্পদের সীমাহীন উৎসর্গকারী জাতি- যারা অতি স্নেহের যুবক সন্তান ও অতি মূল্যবান সম্পদসমূহ মুহাম্মদ ﷺ -এর বিরোধিতায় লেলিয়ে দিয়েছে। আর যারা এ ধরনের সুবর্ণ সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। তারা আল্লাহপ্রদত্ত চ্যালেঞ্জের কোনো মোকাবিলাই করতে পারল না।

হযরত আম্বিয়া (আ.)-এর আলৌকিক ঘটনাবলি : প্রত্যেক যুগের পয়গাম্বরগণ (আ.) ঐ সকল বিষয় দ্বারাই নিজ নিজ উম্মতকে পরাজিত করেছেন যে, বিষয়ের উপর উম্মতগণ পরিপূর্ণ পারদর্শী ও প্রসিদ্ধ ছিল। হযরত দাঊদ (আ.)-এর যুগে লোহার কারুকার্য সফলতার চূড়ান্ত সীমায় ছিল। কিন্তু وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ দ্বারা এ ব্যাপারে তার সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রকাশ করা হয়েছে। ঐ যুগের গোটা পৃথিবী তাঁর লোহার কারুকার্যের সামনে হার মেনেছে।

হযরত মূসা (রা.) যুগে যাদু ও যাদুকরদের বিস্ময়কর কার্যকলাপ চালু ছিল। কিন্তু হযরত মূসা (আ.) এর يَد بَيْضَة ও عَصٰى -এর সামনে وَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سَاجِدِيْنَ -এর বিকাশ জগদ্বাসী দেখেছে।

হযরত ঈসা (আ.) এর যুগ- ডাক্তারী, চিকিৎসা ও ঝাড়ফুঁকের উর্ধ্বগমনের যুগ ছিল। কিন্তু যে রুগীদের কোনো চিকিৎসা ছিল না [যে রুগীদের চিকিৎসা ক্ষেত্রে জগদ্বাসী অক্ষম ছিল]। হযরত ঈসা (আ.) কোনো ঔষধ ও পথ্য ব্যতীত ঐ রুগীদেরকে শুধু সুস্থই করেননি; বরং মৃতদেরকে পর্যন্ত জীবিত করে সমস্ত বাহ্যিক চিকিৎসার রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন। হ্যাঁ এসব আমলী কার্যাবলি ছিল। যা নির্দিষ্ট একটি সময় পর্যন্ত ছিল, বিশেষ লোকেরা দেখেছেন। পরবর্তী সময়ে এগুলো ইতিহাস হিসেবে রয়ে গেছে।

আল্লাহর শত্রুদের মধ্যে ব্যাকুলতা : কিন্তু রাসূল ﷺ -এর কল্যাণময় যুগ, তিনি যে দেশে ও যে গোত্রে ভূমিষ্ট হয়েছেন তাদের বাক-শক্তি ও জ্বালাময়ী ভাষণের এ অবস্থা ছিল যে, তারা নিজেদের মোকাবিলায় সমস্ত জগদ্বাসীকে বোবা ও নির্বাক মনে করতো এবং বলতো তাদের যুবক ও বৃদ্ধ পুরুষরা তো ছিলই। অপর দিকে তাদের সমাজের নারীরাও অগ্নিবর্ষি বক্তা ও কবি ছিল।

কিন্তু রাসূল ﷺ -এর অবস্থা এই ছিল যে, শিক্ষা-দীক্ষা তো দূরের কথা এর প্রকাশ্য উপকরণ থেকেও তিনি বঞ্চিত ছিলেন। না মাতা, না পিতা, না বোন, না ভাই, দাদা এবং চাচাও তার পক্ষে ছিলেন না। তারাও বিরোধীই ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি সাহিত্যের ও দর্শনের নজিরবিহীন মু'জিযা পেশ করেছেন। যা নিঃসন্দেহে তিনি তার নবুয়তের দলিলকে পরিপূর্ণকারী ও প্রমাণকে শক্তিশালী কারী হিসেবে গণ্য হবেন যে, সকলে তার এ চ্যালেঞ্জকে সামনে নিয়ে বসে আছে। এটা অকাট্য দলিল পবিত্র মুকাবিলায় কেউ কিছু লিখে ছিল এবং ওটা বিনষ্ট হয়ে গেছে। কেননা বর্তমানের ন্যায় সর্বযুগেই পবিত্র কুরআনের হেফাজতকারীর সংখ্যা কম ও বিরোধী বেশি রয়েছে। তবে কুরআন এর হেফাজতকারী কম হওয়া সত্ত্বেও যখন কুরআন সংরক্ষিতাবস্থায় চলে আসছে? তবে যে বিরোধী লেখার হেফাজতকারী অধিক এটা বিনষ্ট হয় কিভাবে? তাই এ সম্ভাবনা অনর্থক ও অযথা। আর যার মনে চায় আজও পরীক্ষা করতে পারে; বরং নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখতে পারে। আর যারা পরীক্ষা করেছে, তাদের মুখে দাগ পড়েছে।

কাক চলেছে হাসের চলনে : সুতরাং ইয়ামামার এক ব্যক্তি মুসাইলামা কায্যাব কুরআনের ধারায় কিছু আয়াত পেশ করার অশুভ প্রচেষ্টা চালিয়েছে। যেমন–

١. وَالنِّسَاءِ ذَاتِ الْفُرُوْجِ . ٢. اَلْفِيْلُ وَمَا اَدْرٰكَ مَا الْفِيْلُ ذَنَبُهٗ قَلِيْلٌ وَخُرْطُوْمُهٗ طَوِيْلٌ وَاِنَّهٗ مِنْ خِلْقَةِ رَبِّكَ لَقَلِيْلٌ

তখন তার উপর তার এলাকাবাসী লোকেরাই ঠাট্টা করেছে। কারণ এতে কোথাও কালামে নবী ﷺ এবং কোথাও কালামে মুতানাব্বী রয়েছে।

এমনিভাবে শিয়া সম্প্রদায়ের কোনো কোনো আলেম সূরা ফাতেমা ও সূরা হাসানাইন তৈরি করে পবিত্র কুরআনে সংযোজন করার অশুভ চেষ্টা করেছে। কিন্তু ইলম ও আদবের জগৎ থেকে তাদের চেহারা চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে।

কোনো কোনো বুদ্ধিহীন লোকেরা মাক্বামাতে হারীরীর ন্যায় সাহিত্যের পুস্তকগুলোকে কুরআনের সমকক্ষ হিসেবে রাখার পরামর্শ দিয়েছে। যে পরামর্শের মূল্য مدعی چست وگواه چست থেকে অধিক নয়। বাস্তব ও সত্য এটা যে, আল্লাহ তাআলার কার্যাবলি যেমনভাবে অতুলনীয়। তার কালামও নজিরবিহীন। আমরা কাগজ ইত্যাদি দ্বারা গোলাপ বানাতে পারি এবং অনেক সুন্দর বানাতে পারি বটে, কিন্তু পানির একটি ফোঁটা যদ্দারা খোদায়ী কুদরতী গোলাপের উজ্জ্বলতা ও সৌন্দর্যতা ফুটে উঠে– আমাদের কাগজের তৈরি গোলাপের সৌন্দর্যকে নষ্ট করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। এ কাগজের গোলাপে এক ফোঁটা শিশির পড়লে তা কুঞ্চিত হয়ে যায়। আর কুদরতী গোলাপের লাল বর্ণ আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠে এবং সুঘ্রাণ আরো ছড়িয়ে পড়ে। এর দ্বারা আসল ও নকলের পার্থক্য প্রকাশ হয়ে সামনে আসে। এ অবস্থাই কালামে ইলাহীর كَلَامُ الْمُلُوْكِ مُلُوْكُ الْكَلَامِ

কুরআনের নবীন বাহার : পবিত্র কুরআনের এ মু'জিযা অন্যান্য সাময়িক ও মামুলী মু'জিযাসমূহের ন্যায় নয়; বরং এটি একটি ব্যাপক ও চিরস্থায়ী মু'জিযা। এর সুন্দর বাহার, যা প্রথম দিন ছিল তা আজো আছে।

اُعِدَّتْ মাজির সীগা, এর প্রকৃত অর্থের হিসেবে প্রমাণ করেছে যে, বেহেশত ও দোজখ উভয়টিই সৃষ্টি হয়ে গেছে অতঃপর মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের এটা বলা যে, পুরস্কার ও শাস্তির সময়ের পূর্বে এগুলোকে সৃষ্টি করা অযথা ও নিষ্প্রয়োজন আর নিষ্প্রয়োজন কাজ করা থেকে আল্লাহ তা'আলা মুক্ত। তাদের এ দলিল পেশ করা একেবারে বাতিল ও অবৈধ

আর পূর্ব থেকে সৃষ্টি করে রাখা অযথাও নয়। এটা কি কম উপকার যে, মানুষকে উৎসাহিত করার ও ভয়-ভীতি প্রদর্শনের কাজ নেওয়া হচ্ছে। যেমন বাদশাহ নিজ রাষ্ট্র শক্তিশালী করার লক্ষ্যে পূর্ব থেকেই জেলখানা তৈরি করান। ঐ সময় তো কেউ সন্দেহ ও আপত্তি করে না যে, যখন কেউ চুরি করবে, তখন জেলখানা তৈরি করা হবে। যখন কেউ বিদ্রোহ করবে, তখন ফাঁসির কাষ্ঠ ঝুলানো হবে।

عَطْف টি وَاو এর ; অর্থাৎ وَلَنْ تَفْعَلُوْا : اِعْتِرَاض জুমলাটি شَرْط এবং جَزَاء -এর মাঝে جُمْلَة مُعْتَرِضَة রূপে এসেছে। -এর জন্য নয়, বরং اِسْتِيْنَاف -এর জন্য। অনুরূপভাবে এটি وَاو حَالِيَه -ও হতে পারবে না। কেননা وَاو الْحَال জুমলায়ে মুস্তানিফার শুরুতে আসতে পারে না। আর جُمْلَة مُعْتَرِضَة সাধারণ তাকীদ-এর জন্য আসে এবং ক্ষেত্র বিশেষ অন্য কারণেও আসে –[জামাল : ৪২]

قَوْلُهُ فَاتَّقُوا النَّارَ : এটি পূর্বোক্ত শর্তের জওয়াব। এখানে اِتِّقَاءُ النَّارِ দ্বারা اِحْتِرَازٌ مِنَ الْفَسَادِ উদ্দেশ্য। কেননা ফেতনা-ফাসাদ ইত্যাদি জাহান্নামের দিকে ধাবিত করে। ف হরফটি পরিণতি নির্দেশ করছে। অর্থাৎ কুরআনের দাবি ও প্রমাণ খণ্ডন করতে এবং নিজেদের দাবির সপক্ষে প্রমাণ তুলে ধরতে যেহেতু ব্যর্থ হলে, সেহেতু এখনো সত্যকে অস্বীকার করা থেকে বিরত থাক। আর যদি বিরত না থাক, তাহলে এ বিদ্বেষপ্রসূত সত্য প্রত্যাখ্যানের স্বাভাবিক অনিবার্য শাস্তি জাহান্নাম ছাড়া আর কি হতে পারে। –[তাফসীরে আবুস সাউদ]

قَوْلُهُ وَقُودُهَا : وَاو হরফে ফাতহাযুক্ত অবস্থায় অর্থ مَا تُوقَدُ بِهٖ অর্থাৎ ইন্ধন। আর وَاو -এ যম্মাযুক্ত অবস্থায় এটি মাসদার। এ ওজনে আসা সকল ছিগাগুলোরই এই দুই সূরত হয়ে থাকে। যেমন– طُهُوْر ـ سُحُوْر ـ وُضُوْء ইত্যাদি। আর কায়দা হলো فَعُوْل -এর ওজনে আসা প্রত্যেক শব্দ ফাতহাযুক্ত হলে آلہ -এর অর্থ হবে। আর যাম্মাযুক্ত হলে মাসদার হবে। কেউ কেউ বলেন, একটি অপরটির স্থানেও ব্যবহৃত হয়।

قَوْلُهُ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ : حِجَارَة পাথর। حَجَرَةٌ -এর বহুবচন। আল্লামা সুয়ূতী (র.)-এর মতে পাথর দ্বারা ঐ সকল মূর্তিকে বুঝানো হয়েছে, কাফেররা যেগুলোকে পূঁজা করত। যেমন কুরআনের অন্য আয়াতে এসেছে–

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَطَبُ جَهَنَّمَ .

জাহান্নামের আসল খোরাক তো হবে খোদ কাফের-মুশরিকরাই। শাস্তি ভোগও করতে হবে তাদেরই। তবে শাস্তির প্রচণ্ডতা বৃদ্ধির এটাও একটি উপায় যে, তাদের ঠাকুর মূর্তিগুলোকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করে বলা হবে, নাও! দুনিয়াতে যাদের পূজা করেছো, তাদের বলো এখান থেকে উদ্ধার করতে। –[মাজেদী]

قَوْلُهُ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ : এটি جُمْلَة مُسْتَانِفَة আর প্রত্যেক جُمْلَه مُسْتَانِفَة সর্বদা কোন سُوَال مُقَدَّر -এর জবাবে হয়ে থাকে। তাহলে জানা যাক এখানে কোনো প্রশ্নের জবাবে হয়েছে।

যেন প্রশ্ন করা হয়েছে– لِمَنْ اُعِدَّتْ هٰذِهِ النَّارُ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ؟ –তার জবাবে বলা গয়েছে–

اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ .

قَوْلُهُ اَوْ حَالٌ : অর্থাৎ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ বাক্যটি اَلنَّارُ শব্দ থেকে حَال হয়েছে। وَقُوْدُهَا -এর জমীর থেকে حَال হওয়া সহীহ নয়। কেননা مُضَاف তথা مُضَاف اِلَيْهِ আর مُضَاعِف اِلَيْهِ কোন مَقْصُود বা উদ্দিষ্ট হয় না। অথবা مُضَاف اِلَيْهِ হলো ضَمِيْر হলে جَامِد যা عَيْن হলো وَقُوْدُهَا بِمَعْنٰى حَطَب আমেল হতে পারে না। –[সামীন সূত্রে জামাল : ৪৩]

قَوْلُهُ لَازِمَةً : এ শব্দটি বৃদ্ধি করে একটি সংশয়ের অবসান করা হয়েছে। সুতরাং মুসলমানদের আর চিন্তিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। যদিও তারা ফাসেক-ফাজের হোক না কেন।

উত্তর. حَال لَازِمَة মূলত ذُو الْحَالِ -এর জন্য بِمَنْزِلَه صِفَت হয়ে থাকে এবং ذُو الْحَال থেকে পৃথক হয় না। যেমন اَبُوْكَ عَطُوْفًا -এর মাঝে পিতার স্নেহকে ছেলের জন্য আবশ্যক কিন্তু খাস নয় যে, ছেলে ছাড়া অন্য কারো প্রতি পিতার স্নেহ-মমতা নিষিদ্ধ হবে।

অনুরূপভাবে জাহান্নামের আগুন কাফেরদের জন্য লাজেম কিন্তু খাস নয়। অর্থাৎ জাহান্নামের আগুন তো دَوَامًا ও اِصَالَةً কাফেরদের জন্যই প্রস্তুত করা হয়েছে। তথাপিও عَرَضِى ভাবে পরিশুদ্ধ করার জন্য ফাসিক-ফাজি মুমিনদেরকেও তাতে প্রবেশ করানোটা তার প্রতিবন্ধক নয়। –[তাফসীরে মাজেদী]

যেমন রূহুল মাআনীতেও উল্লেখ আছে– وَكَوْنُ الْاِعْدَادِ لِلْكَافِرِيْنَ لَا يُنَافِىْ دُخُوْلُ غَيْرِهِمْ فِيْهِ عَلٰى جِهَةِ التَّطَفُّلِ

উত্তর : اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ -এর মাঝে কাফের দ্বারা সাধারণ কাফের তথা আভিধানিক ও পারিভাষিক উভয়টি ধরা হলে কোনো আপত্তিই থাকে না। পারিভাষিক কাফেরের প্রবেশটা স্থায়ী হবে আর আভিধানিক কাফের তথা অকৃতজ্ঞ ও নাফরমানের প্রবেশটা হবে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করণার্থে সাময়িকভাবে

٢٥. وَبَشِّرِ اَخْبِرْ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَدَّقُوْا
بِاللّٰهِ وَعَمِلُوا الصّٰلِحَاتِ مِنَ الْفُرُوْضِ
وَالنَّوَافِلِ اَنَّ اَىْ بِاَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ حَدَائِقَ
ذَاتَ شَجَرٍ وَمَسَاكِنَ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا
اَيْ تَحْتَ اَشْجَارِهَا وَقُصُوْرِهَا الْاَنْهَارُ
اَيِ الْمِيَاهُ فِيْهَا وَالنَّهْرُ الْمَوْضِعُ الَّذِىْ
يَجْرِىْ فِيْهِ الْمَاءُ لِاَنَّ الْمَاءَ يَنْهَرُهُ اَيْ
يَحْفِرُهُ وَاِسْنَادُ الْجَرْيِ اِلَيْهِ مَجَازٌ
كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا اُطْعِمُوْا مِنْ تِلْكَ
الْجَنَّاتِ مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوْا هٰذَا الَّذِىْ
اَيْ مِثْلُ مَا رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ اَيْ قَبْلَهُ فِى
الْجَنَّةِ لِتَشَابُهِ ثِمَارِهَا بِقَرِيْنَةِ وَاُتُوْا
بِهٖ جِيْئُوْا بِالرِّزْقِ مُتَشَابِهًا يَشْبَهُ
بَعْضُهُ بَعْضًا لَوْنًا وَيَخْتَلِفُ طَعْمًا
وَلَهُمْ فِيْهَا اَزْوَاجٌ مِنَ الْحُوْرِ وَغَيْرِهَا
مُّطَهَّرَةٌ مِنَ الْحَيْضِ وَكُلِّ قَذَرٍ وَّهُمْ
فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ـ مَاكِثُوْنَ اَبَدًا لَا يَفْنُوْنَ
وَلَا يَخْرُجُوْنَ ـ

অনুবাদ :

২৫. আর সুসংবাদ দাও তাদেরকে, যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তা'আলার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে [ও] ফরজ, নফল সব ধরনের সৎকর্ম করেছে اَنَّ শব্দটি এস্থানে মূলত بِاَنَّ অর্থে ব্যবহৃত এ সুসংবাদ যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত সৌধমালা ও বৃক্ষরাজি সুশোভিত উদ্যানসমূহ যার নিম্নদেশে প্রবাহিত অর্থাৎ তার সৌধ ও বৃক্ষরাজির তলদেশে নদী তার বারিরাশি। যে স্থান দিয়ে নদীর পানি প্রবাহিত হয় সেই স্থানটিকে 'নহর' বলে। কারণ পানি এই স্থানটিকে 'নাহারা' অর্থাৎ খুঁড়িয়ে ফেলে। এখানে "প্রবাহিত হওয়া" ক্রিয়ার সম্বন্ধ নাহরের দিকে মাজায বা রূপকার্থে করা হয়েছে। কেননা মূলত প্রবাহিত হয় পানি, নহর নয়।

যখনই তাদেরকে উক্ত উদ্যানরাজির ফলমূল আহার করতে দেওয়া হবে, তখনই তারা বলবে, আমাদেরকে পূর্বে ইতোঃপূর্বে জান্নাতে জীবিকারূপে যা দেওয়া হয়েছে তা তো এটাই অর্থাৎ এরই অনুরূপ ছিল। কেননা বেহেশত-উদ্যানের ফলসমূহ দেখতে একটি আরেকটির ন্যায় হবে। বস্তুত তাদের নিকট আনা হবে অর্থাৎ তাদেরকে জীবিকারূপে প্রদান করা হবে একই ধরনের ফল এইগুলোর রঙ হবে একটি আরেকটির মতো, তবে স্বাদ হবে বিভিন্ন ধরনের। এবং সেখানে তাদের জন্য রয়েছে ঋতুস্রাব এবং সকল প্রকার আবিলতা হতে সুপবিত্রা সঙ্গিনী হুর ইত্যাদি; তারা সেখানে স্থায়ী হবে সর্বদা তারা সেখানে অবস্থান করবে। ধ্বংস হবে না তাদের এবং সে স্থান হতে তারা কখনো বহিষ্কৃতও হবে না।

তাহকীক ও তারকীব

بَشِّرْ : بَشَارَةٌ (اَمر : وَاحِد مُذَكَّر حَاضِر) সুসংবাদ প্রদান করুন। اَلْبِشَارَةُ শব্দ থেকে নির্গত। بَشَارَة এমন গুণবাচক বিশেষ সংবাদ যা ব্যক্তিকে আনন্দ ও সুখ দেয়। প্রথম আনন্দদায়ক সংবাদকে بَشَارَة বলার কারণ এই যে, সে সুংবাদের প্রভাবটি بَشَرَة তথা চেহারার মাঝে প্রকাশ পায়। সু-সংবাদের ফলশ্রুতিতে শ্রোতার মুখমণ্ডলে আনন্দ ও মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। অবশ্য কখনও সাধারণ সংবাদের অর্থেও তা ব্যবহৃত হয়, শর্তাধীন হয়ে। যেমন– فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

اَلْبَشَارَةُ : اَلْخَبَرُ الْاَوَّلُ السَّارُّ الَّذِىْ يَظْهَرُ بِهٖ اَثَرُ السُّرُوْرِ فِى الْبَشَرَةِ ই'রাবুল কুরআনে উল্লেখ রয়েছে-

بَشَارَة -এর বিপরীত শব্দ اِنْذَار

بَشِّر এর পরে اَخْبِر বলে প্রশ্নকে প্রতিহত করার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। بَشَارَت খুশির সংবাদকে বলা হয়। এ স্থানে তো এর কেন্দ্র শুদ্ধ ও বাস্তব। কিন্তু فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ -এর মতো স্থানে মাজায হিসেবে اَخْبِر -এর অর্থে নিতে হবে কিংবা পরিহাস ও ঠাট্টা উদ্দেশ্য হবে।

اَنَّ -এর ব্যাখ্যায় بِاَنَّ বলে এদিকে ইঙ্গিত করছে যে, "بَشِّر" -এর মা'মূল হরফে জার মুকাদ্দারের সাথে- যখন হরফ حَذْف হয়ে গেছে। তখন فِعْل -এর আমল সরাসরি হয়ে গেছে।

بَشِّر ফেয়েল بَا ফায়েল اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا জুমলা এর মাফউল جَنّٰتٍ মাউসূফ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ জুমলা এর ছিফতে مُتَعَلِّق হয়েছে। كُلَّمَا মিলে اَنَّ এর ইসম এবং لَهُمْ খবরে মুক্বাদ্দাম, জুমলা بِاَنَّ মুক্বাদ্দাম মানার সাথে بَشِّر -এর مُتَعَلِّق হয়েছে। رُزِقُوْا الخ জুমলায়ে শর্তিয়া দ্বিতীয় ছিফত কিংবা মুবতাদায়ে মাহযূফের খবর অথবা জুমলায়ে وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا . مُسْتَاْنِفَة জুমলায়ে مُعْتَرِضَة . اَزْوَاج মাউছুফ। مُطَهَّرَة ছিফত মিলে মুবতাদা لَهُمْ খবরে مُقَدَّمْ জুমলায়ে مُسْتَاْنِفَة হয়েছে। هُمْ মুবতাদা خَالِدُوْنَ খবর فِيْهَا এর مُتَعَلِّق জুমালায়ে مُسْتَاْنِفَه কিংবা لَهُمْ থেকে حَال।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

جَنّٰت -এর মূল হরফ ج - ن - ن যেখানেই হবে -এর মধ্যে গোপনের অর্থ অবশ্যই থাকবে। সুতরাং جَنَّة অর্থ ও দৃষ্টি থেকে লুকানো। বাগ কিংবা বাগান বৃক্ষরাজি দ্বারা ঠাসা থাকে। জিন জাতিকেও মানুষের তুলনায় লুকানো [গোপন] মনে করা হয়। جُنَّة ঢাল ও গোপনকারী-আড়ালকারী হয়। جَنَانٌ ক্বলব, অন্তর, جَنَاح বাজু, সম্পর্ক, স্পষ্ট।

تَحْتِهَا এর পরে اَشْجَارِهَا وَقُصُوْرِهَا বের করে [প্রকাশ করে] জালাল (র.) একটি সন্দেহকে প্রতিহত করতে চাচ্ছেন যে, বাগান থেকে নীচে নহর প্রবাহিত হওয়া এত অধিক সৌন্দর্যও আনন্দদায়ক হয় না। যতটুকু চিত্তাকর্ষক বাগানের ভিতর নহর প্রবাহিত হলে হয়। প্রতিরোধের কারণ স্পষ্ট যে, এবারতটি মুযাফ مُقَدَّر -এর সাথে, অর্থাৎ বাগানের ভিতর বৃক্ষরাজি ও বালাখানাসমূহের নীচে প্রবাহিত হওয়া উদ্দেশ্য। اَلْاَنْهَار -এর পরে اَلْمِيَاهُ -এর عِبَارَت দ্বারা ঐ দিকে ইঙ্গিত যে, নহর প্রবাহের মধ্যে মাজাযে عَقْل -ইসনাদে مَجَازِى রয়েছে। অর্থাৎ উদ্দেশ্য নহরের পানি প্রবাহিত। সামনে নহরের নামকরণের কারণ বলছেন যে, যেহেতু নহর -এর অর্থ খনন করা, পানি অনবরত চলার ও উঠা নামার দ্বারা কাঁচা মাটির মধ্যে গর্ত হতেই থাকে, তাই নহরকে "নহর" বলা হয়েছে।

اَىْ مِثْل مِنْ تِلْكَ الْجَنَّاتِ এ জন্য বলেছেন, যাতে مِنْهَا -এর মধ্যে مِنْ ইবতেদাইয়্যা হওয়া বুঝা যায়। هٰذَا -এর পরে দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন, তাই প্রয়োজন দেখা দিয়েছে যে, هٰذَا শব্দ দ্বারা উভয় খাবার হুবহু এক হওয়া অপরিহার্য হয়ে যায়। যা বাস্তবের পরিপন্থি। কিন্তু উদ্দেশ্য হলো সাদৃশ্য। اَىْ قَبْلَهٗ فِي الْجَنَّةِ বলে জালাল (র.) এটা বলতে চান যে, قَبْلِيَت দ্বারা উদ্দেশ্য قَبْلِيَت فِي الْجَنَّة দুনিয়াবী ক্বাবলিয়্যাত উদ্দেশ্য নয়। যেমন অন্যান্য মুফাস্‌সিরগণের রায় ব্যাপক ও সাধারণ রাখার। চাই বেহেশ্‌তের পূর্বে দুনিয়াতে হওয়া উদ্দেশ্য হোক কিংবা স্বয়ং বেহেশতে হোক। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এটা যে, মুফাস্‌সির (র.) পূর্বে নিজ দলিলে যে নিদর্শন اُتُوْا بِهٖ শব্দ দ্বারা পেশ করছেন। এটাই সাধারণ কিংবা ব্যাপক" দাবিকারীগণের দলিলও হতে পারে।

مُتَشَابِهًا -এর একটি পদ্ধতি তো এটা যে, স্বাদ ও আকৃতি একই হবে। এটা এত অধিক আশ্চর্যময় নয়, যতটুকু আশ্চর্যতা রয়েছে রং এক রকম হওয়া এবং স্বাদ ভিন্ন হওয়ার মধ্যে। مُطَهَّرَة -কে আম বা ব্যাপক রাখা উত্তম, যা সর্বপ্রকার অপবিত্রতা

ও নাপাকী থেকে। প্রকাশ্য পবিত্রতা হোক কিংবা অসৎ চরিত্রসমূহ থেকে পাক পবিত্র হোক। কেননা উভয়টিই দোষের মধ্যে গণ্য। বিশেষভাবে মহিলাদের মধ্যে চারিত্রিক অবনতি কষ্ট ও বিপদের কারণ হয়।

যোগসূত্র ও শানে নুযূল : পূর্বের আয়াতে অস্বীকারকারীদের জন্য দোজখের ভীতিপ্রদর্শনের বর্ণনা ছিল। উক্ত আয়াতে স্বীকারকারীদের জন্য বেহেশতে সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছে, যাতে وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْاَشْيَاءُ এর রীতি-নীতি দ্বারা কথার উভয়দিক পরিপূর্ণ হয়ে যায়। আর যাতে করে রাব্বুল আলামীন থেকে বাধ্যগত বান্দাগণ কখনো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও বিরক্ত না হয়ে যায়। তাই পবিত্র কুরআনের সাধারণ অভ্যাস যে, কুরআন তরগীবও তারহীব উভয়টিকে সমপর্যায়ে রাখে। যাতে আল্লাহর উভয় শান জালালী ও জামালী প্রকাশ হতে থাকে।

প্রত্যেক শুরুর শেষ আছে। সুতরাং এ জগতের যখন শুরু আছে, তবে এর শেষ ও অবশ্যই হবে। যাকে শরিয়তে আলমে আখিরাত বলা হয়।

জগতে ভালো ও মন্দ এর ব্যাখ্যা : এ জগতে যে পরিমাণ ভালো ও মন্দ অথবা নিয়ামত ও মসিবত এর সংখ্যা রয়েছে- সবই একটি অপরটির প্রভাবের সাথে সংযুক্ত। একটি জিনিস এক হিসেবে ভালো, তবে অন্য হিসেবে ওটাই মন্দও হয়। অথবা যে বস্তুটি এক হিসেবে মন্দ ও বিপদের কারণ। ঐ বস্তুটিই অন্য হিসেবে নিয়ামত এবং ভালোও হয়। কোনো বস্তু নিজ সত্ত্বার দিক দিয়ে একেবারে শুধু ভালোও না এবং একেবারে শুধু মন্দও না।

তাই অতি জরুরি যে, এগুলোর জন্য এমন কিছু উৎস থাকা যেখানে ভালোই থাকবে। ওখানে মন্দের নাম-নিশানা ও যেন না থাকে। এমনইভাবে যেখানে মন্দ-থাকবে, সেখানে ভালোই কখানো না থাকে। উক্ত দুটি কেন্দ্রকে শরিয়তের পরিভাষায় জান্নাত ও জাহান্নাম বলা হয়। এ জান্নাত ও জাহান্নাম দার্শনিক ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ব্যানানো শুধু কাল্পনিক ও আধ্যাত্মিক নয়; বরং প্রাকৃতিক ও সত্তাগত। এ জগতের মূল ও আকৃতির স্থায়িত্ব নেই এবং এগুলো ঘটমান ও নতুন হওয়ার কারণে পরিবর্তন ও ধ্বংস হচ্ছে। কিন্তু ঐ চিরস্থায়ী জগতের প্রতিটি বস্তু স্থায়ী। ঐ জগৎকে এ জগতের উপর অনুমান করাটা قِيَاسٌ مَعَ الْفَارِقِ

জান্নাত ও জাহান্নামের বাস্তবতা : জান্নাতে সকল সুস্বাদু, শান্তি ও নিয়ামতের সমাপ্তি হবে। আর জাহান্নামের সকল কঠোরতা ও বিপদের সমাপ্তি ঘটবে। হাদীস مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ خَطَرَتْ اَوْ كَمَا قَالَ এবং আয়াতে কারীমা وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْاَنْفُسُ জীবনযাত্রার সামগ্রীসমূহের সংবাদ দিচ্ছে। এ আয়াতে পানাহারের স্বাদ, বাগান, আনন্দ এবং সুন্দর ও সুদর্শন স্ত্রীগণের মহাসমাগমের সুসংবাদ শুনানো হচ্ছে। বিভিন্ন রকমের ফল-ফলাদি যেগুলোর রং একই হবে। যেগুলোকে দেখে সন্দেহ হবে যে, ইতিপূর্বে এখানে কিংবা দুনিয়াতে আমরা খেয়েছি। এখন এগুলোকে খাওয়ার মধ্যে শুধু মিষ্টি দ্বিতীয়বার খাওয়ার স্বাদ পাওয়া যাবে। কিন্তু ইহজগতে খাওয়ার পর যখন নতুন জগত সামনে আসবে, তখন স্বাদ দ্বিগুণ হয়ে যাবে। মজা ও আনন্দের এক নতুন অবস্থা সৃষ্টি হবে।

দুনিয়াদার কিংবা মূর্খ সাধক : মানুষ দুনিয়াদার হওয়ার কারণে অথবা নির্বোধ সাধক হওয়ার কারণে জান্নাত কিংবা জান্নাতের সুস্বাদু নিয়ামতসমূহ থেকে নাসিকা ও ভ্রুকুঞ্চন করার সঠিক কোনো ভিত্তি নেই। হ্যাঁ, যে সকল সুভাগ্যবান ব্যক্তিদের গায়ে খাঁটি আধ্যাত্মিকতার বাতাস লেগে যায়, তারা এ দুনিয়ায় থেকেও জ্ঞান ও গুণসমূহের দ্বারা জান্নাতের বালাখানার স্বাদ আস্বাদন করতেন। কোনো কোনো বর্ণনা দ্বারা তা মনে হয় যে, জান্নাত একটি খালি মাঠ, দুনিয়ার আমলসমূহ জান্নাতের নিয়ামতসমূহের রূপ ধারণ করবে। এটার এ উদ্দেশ্য নয় যে, জান্নাতে বাস্তবে শূন্য; বরং উদ্দেশ্য এটা যে, আমলকারীর ক্ষেত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত সে আমল না করবে, শূন্য অবস্থায় থাকবে। সে নিজের জন্য আমল করেও জান্নাত সুসজ্জিত করতে পারবে।

সূরার শুরুতে ও ঈমানের আলোচনা এসেছিল, কিন্তু প্রসঙ্গত ও সংক্ষিপ্তভাবে এসেছিল। মূল উদ্দেশ্য ছিল কুরআনের ফজিলত ও মর্যাদা এবং হেদায়েতের পরিপূর্ণতা বর্ণনা করা। কিন্তু এ স্থানে ঈমানের ফজিলত ও ফলাফলের বর্ণনাই মূল উদ্দেশ্য। তাই প্রকৃত পক্ষে পুনরুক্তিতে গণ্য নয়। হ্যাঁ, ঈমান শুধু আন্তরিক সত্যায়ন, বিশ্বাস ও বশবর্তী হওয়ার নাম। মুখ দ্বারা স্বীকার করা- মূলত আল্লাহর নিকট ঈমানের জন্য তো শর্ত নয়। হ্যাঁ, প্রকাশ্য ঈমানের জন্য শর্ত। আর নেক আমলসমূহ করা একটি পৃথক বিষয়। এগুলোকে ঈমানের জন্য পরিপূরক বলা যায়। কিন্তু এগুলোকে শর্ত অথবা ঈমানের শর্ত বলা যাবে না। ঈমান ও ইসলাম -এর পার্থক্য এবং ঈমানের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটার আলোচনা অন্যকোনো স্থানে ইন্‌শা-আল্লাহ আসবে।

٢٦. وَنَزَلَ رَدًّ القَوْلِ الْيَهُوْدِ لَمَّا ضَرَبَ اللّٰهُ الْمَثَلَ بِالذُّبَابِ فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا وَالْعَنْكَبُوْتَ فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ مَا اَرَادَ اللّٰهُ بِذِكْرِ هٰذِهِ الْاَشْيَاءِ الْخَسِيْسَةِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيٖ اَنْ يَّضْرِبَ يَجْعَلَ مَثَلًا مَفْعُوْلٌ اَوَّلٌ مَا نَكِرَةٌ مَوْصُوْفَةٌ بِمَا بَعْدَهَا مَفْعُوْلٌ ثَانٍ اَيْ اَيُّ مَثَلٍ كَانَ اَوْ زَائِدَةٌ لِتَاكِيْدِ الْخِسَّةِ فَمَا بَعْدَهَا الْمَفْعُوْلُ الثَّانِيْ بَعُوْضَةً مُفْرَدُ الْبَعُوْضِ وَهُوَ صِغَارُ الْبَقِّ فَمَا فَوْقَهَا اَيْ اَكْبَرَ مِنْهَا اَيْ لَا يَتْرُكُ بَيَانَهٗ لِمَا فِيْهِ مِنَ الْحِكَمِ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ اَيِ الْمَثَلُ الْحَقُّ الثَّابِتُ الْوَاقِعُ مَوْقِعَهٗ مِنْ رَّبِّهِمْ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ـ تَمْيِيْزٌ اَيْ بِهٰذَا الْمَثَلِ وَمَا اِسْتِفْهَامُ اِنْكَارٍ مُبْتَدَأٌ وَذَا بِمَعْنَى الَّذِيْ بِصِلَتِهٖ خَبَرُهٗ اَيْ اَيُّ فَائِدَةٍ فِيْهِ قَالَ تَعَالٰى فِيْ جَوَابِهِمْ يُضِلُّ بِهٖ اَيْ بِهٰذَا الْمَثَلِ كَثِيْرًا عَنِ الْحَقِّ لِكُفْرِهِمْ بِهٖ وَيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لِتَصْدِيْقِهِمْ بِهٖ وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفَاسِقِيْنَ ـ الْخَارِجِيْنَ عَنْ طَاعَتِهٖ

অনুবাদ :

২৬. এবং নাজিল হয়েছে ইহুদিদের ঐ শ্লেষের প্রতিবাদে যখন আল্লাহ তা'আলা [বিভিন্ন আয়াতে কতিপয় বিষয়কে] মাছির সাথে যেমন .... وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا তাদের প্রতিমাদের নিকট হতে মাছি যদি কিছু নিয়ে চলে যায় তবে তারা এত অসহায় ও অক্ষম যে, তাও তারা তার নিকট হতে উদ্ধার করতে পারবে না। [সূরা হজ্জ : ৭৩] এবং মাকড়সার সাথে যেমন كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ [যারা আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সা, সে নিজের জন্য ঘর বানায় এবং ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতম, যদি তারা জানত। [সূরা আনকাবূত: ৪১] এসব উপমা দিয়েছেন। ইহুদীগণ [শ্লেষভরে] বলত এই ধরনের হীন বিষয়ের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা কি বুঝাতে চাচ্ছেন? [ইহুদিদের এই শ্লেষের প্রতিবাদে আল্লাহ পাক নাজিল করেন] আল্লাহ মশা কিংবা তার উচ্চপর্যায়ের অর্থাৎ তা হতে বড় যে কোনো বস্তুর উপমা দিতে সংকোচ বোধ করেন না। অর্থাৎ এ সকল উপমায় যেহেতু শিক্ষা ও তাৎপর্য বিদ্যমান তাই আল্লাহ তা'আলা এই সকল বিষয়েরও উপমা প্রদান পরিত্যাগ করেন না। اَنْ يَّضْرِبَ বা مَفْعُوْل اَوَّل ক্রিয়ার اَنْ يَّضْرِبَ শব্দটি مَثَلًا -এর مَثَلًا প্রথম কর্ম। مَا শব্দটি نَكِرَة বা অনির্দিষ্টবাচক শব্দ। তা তৎপরবর্তী বিশ্লেষণ (بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا) -এর সহিতযুক্ত হয়ে উক্ত ক্রিয়ার مَفْعُوْل ثَانِي বা দ্বিতীয় কর্ম। অর্থাৎ মশা বা তদূর্ধ্ব যে কোনো উপমা হোক না কেন? অথবা مَا শব্দটি زَائِدَة বা অতিরিক্ত। বস্তুটির তুচ্ছতার تَاكِيْد [জোর ও নিশ্চয়তা] বুঝানোর জন্য এই স্থানে এর ব্যবহার করা হয়েছে। এমতাবস্থায় পরবর্তী শব্দ (بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا) উক্ত ক্রিয়ার مَفْعُوْل ثَانِي বা ক্রিয়ারূপে গণ্য হবে। যে بَعُوْضَةً শব্দটি بَعُوْض -এর একবচন; ছোট কীট, মশক। সুতরাং যারা বিশ্বাস করে তারা জানে যে, নিশ্চয়ই এটা অর্থাৎ এই উপমা সত্য, অর্থাৎ সঠিক ও যথার্থস্থানে ব্যবহৃত তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এসেছে; কিন্তু যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে তারা বলে যে, এই উপমা দানে আল্লাহ তা'আলা কি অভিপ্রায় রাখেন? بِهٰذَا مَثَلًا -এর مَثَلًا শব্দটি تَمْيِيْز বা বিশেষাত্মক পদ। مَا -এর مَاذَا। শব্দটি اِسْتِفْهَام اِنْكَار বা অসম্মতি সূচক প্রশ্নবোধক শব্দ। এটা এস্থানে مُبْتَدَأ বা উদ্দেশ্য। ذَا শব্দটি اَلَّذِيْ [সংযোগ বাচক সর্বনাম] -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এটা তার صِلَه বা সংযোজনীয় ক্রিয়া (اَرَادَ) -এর সাথে যুক্ত হয়ে উক্ত مُبْتَدَأ [উদ্দেশ্যের] -এর خَبَر বা বিধেয়। অর্থাৎ এ ধরনের উপমা প্রদানে কি আর উপকারিতা নিহিত রয়েছে? আল্লাহ তা'আলা তাদের উত্তরে ইরশাদ করেন, এটা এই উপমা দ্বারা এতদ্বিষয় অস্বীকার করার কারণে অনেককেই তিনি সত্য সম্পর্কে বিভ্রান্ত করেন, আবার বহু লোককে মু'মিনদেরকে এতদ্বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপনের দরুন সৎ পথে পরিচালিত করেন। বস্তুত তিনি সত্য-পথ পরিত্যাগকারীরা অর্থাৎ যারা আল্লাহ তা'আলার অনুগত্যের গণ্ডি থেকে বের হয়ে গেছে, তাঁরা ব্যতীত আর কাউকেও বিভ্রান্ত করেন না।

২৭. اَلَّذِيْنَ نَعْتٌ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مَا عَهِدَهُ اِلَيْهِمْ فِى الْكِتَابِ مِنَ الْاِيْمَانِ بِمُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ ـ تَوْكِيْدِهٖ عَلَيْهِمْ وَيَقْطَعُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ مِنَ الْاِيْمَانِ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَالرَّحْمِ وَغَيْرِ ذَالِكَ اَنْ بَدَلٌ مِنْ ضَمِيْرِ بِهٖ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ـ بِالْمَعَاصِيْ وَالتَّعْوِيْقِ عَنِ الْاِيْمَانِ اُولٰئِكَ الْمَوْصُوْفُوْنَ بِمَا ذُكِرَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ ـ لِمَصِيْرِهِمْ اِلَى النَّارِ الْمُؤَبَّدَةِ عَلَيْهِمْ ـ

২৭. যারা اَلَّذِيْنَ শব্দটি [পূর্ববর্তী اَلْفَاسِقِيْنَ -এর] বিশেষণ ভঙ্গ করে আল্লাহ তা'আলার সাথে কৃত অঙ্গীকার মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর ঈমান আনা সম্পর্কে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে তাদের নিকট হতে যে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল দৃঢ়বদ্ধ হওয়ার পরও জোরদার করার পরও এবং ছিন্ন করে যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছেন, তা অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর ঈমান আনা, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা ইত্যাদি। এ স্থানে اَنْ শব্দটি بِهٖ -এর ضَمِيْر [সর্বনাম] হতে بَدَل বা يُّوْصَلَ স্থলাভিষিক্ত পদ। এবং দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় পাপকর্ম করে ও ঈমান হতে বাধা প্রদানের মাধ্যমে তারাই উল্লিখিত বিশেষণে যুক্ত ব্যক্তিগণই ক্ষতিগ্রস্ত। চিরস্থায়ী জাহান্নামের আগুনের দিকে প্রত্যার্পিত হওয়ায়।

তাহকীক ও তারকীব

ضَرْبُ الْخَاتَمِ ـ ضَرْبُ اللَّبِنِ ـ ضَرْبُ الْمَثَلِ আরবিতে বলে থাকে -এর মূল হচ্ছে একটি বস্তুকে অপর একটি বস্তুর উপর সংঘটিত করা। (حَيَاءٌ) লজ্জা -মানুষের ঐ মিতাচারী অভ্যাস কে বলা হয়, যার মাধ্যমে দুর্নাম ও মন্দের ভয়ে স্বয়ং ব্যক্তিত্বের মধ্যে পরিবর্তন ঘটে। خَجَالَتٌ অনুতপ্ত হওয়া এর চেয়ে নিম্নস্তরের এবং وَقَاحَتٌ ধৃষ্টতা -এর চেয়ে উপরের বিশেষণ যে, মানুষ মন্দকাজের উপর দুঃসাহসী ও নির্লজ্জ হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলার শানে এর ব্যবহার প্রকৃত পক্ষে জায়েজ নেই। তাই মুফাস্‌সির (র.) لَا يَتْرُكُ بَيَانَهٗ দ্বারা এর অনুবাদ করেছেন। বলা যায় যে, مَلْزُوْم বলে لَازِم উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে।

بَعُوْضَة নির্গত হয়েছে بَعْضٌ থেকে, যার অর্থ হচ্ছে قَطْع এটা মূলে মাফউলের ওজনে সিফতের অর্থে ছিল। অর্থাৎ قُطُوْع পরবর্তীতে এর মধ্যে اِسْمِيَّتْ গালেব এসেছে। تَاء এর মধ্যে ওয়াহ্‌দাতের। اَنْ يَضْرِبَ ব-ত্বাকদীরে مِنْ মাজরুর, খলীল ও সীবওয়াই (র.)-এর দৃষ্টিতে مَنْصُوْب - مَا এব্‌হামিয়্যাহ অথবা অতিরিক্ত। بَعُوْض মাছালান -এর আত্‌ফে বয়ান। مَاذَا اَرَادَ -এর মধ্যে مَا এস্তেফ্‌হামিয়া মুব্‌তাদা এবং ذَا বমা'না اَلَّذِيْ ছেলার সাথে মিলে খবর مَثَلًا মানসূব তাময়ীব হিসেবে। اللّٰهُ فَسَقَتِ الرُّطَبَةُ عَنْ قِشْرِهَا খেজুর নিজ ছিলকা [আবরণ] থেকে বের হয়েছে فِسْق ـ فَاسِقِيْنَ বের হওয়াকে বলা হয়। فَاسِق যেহেতু আল্লাহর অনুগত্য থেকে বের হয়ে যায়। মুফাস্‌সির (র.) اَلْخَارِجِيْنَ বলে নামকরণের কারণের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। এর তিনটি স্তর হয়। যথা–

১. تَغَالِى অর্থাৎ মন্দ জানা সত্ত্বেও গুনাহের কাজে লিপ্ত হওয়া।

২. اِنْهِمَاك অর্থাৎ গুনাহ করার অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া এবং কোনো ভ্রূক্ষেপ না করা।

৩. جُحُوْد অর্থাৎ গুনাহের মন্দতা অন্তর থেকে দূর হয়ে যাওয়া এবং এর সৌন্দর্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া। এ তৃতীয় স্তরটি **কুফর** -এর সাথে সংযুক্ত।

أَمَّا الَّذِيْنَ এটা نَفِي -কে অন্তর্ভুক্তকারী শর্তের জন্য, তাই খবরের উপর ফায়ে জাযাইয়া নেওয়া অত্যাবশ্যক। يُضِلُّ ও يَهْدِى -এর মধ্যে আল্লাহ তা'আলার দিকে সম্পৃক্তকরণ বাস্তব ও সঠিক, মাজাযী নয়। তাই ফেরকায়ে মু'তাযিলার উপর খণ্ডন করা হতে পারে। عَهْد সংরক্ষণযোগ্য ও হেফাজতযোগ্য বস্তু। তাই আরববাসী تَارِيْخ - وَصِيَّت - قَسْم - مَكَان সব অর্থসমূহে عَهْد শব্দ ব্যবহার করে। نَقْض রশির মোচড় [পেঁচ] খোলার জন্য ব্যবহার করা হয়, এখানে اِسْتِعَارَة تَخْيِيْلِيَّة হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র ও শানে নুযূল : পূর্বে উল্লিখিত আয়াতে পবিত্র কুরআন কালামে এলাহী হওয়া দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। দাবিদারের দায়িত্ব দাবিকে প্রমাণিত করার জন্য যেমনভাবে দলিল পেশ করা জরুরি, তেমনিভাবে প্রতিপক্ষের সন্দেহগুলোর উত্তর দেওয়া জরুরি। অতএব কোনো কোনো প্রতিপক্ষ সন্দেহ প্রকাশ করতো যে, যদি এ কুরআন কালামে ইলাহী হয়, তবে এর পবিত্রতা , শোভা ও প্রাঞ্জলতা এ বিষয়ের দাবিদার হবে যে, এর মধ্যে হীন ও তুচ্ছ বিষয়াদির আলোচনা মোটেই না আসা চাই। মশা ইত্যাদির উপমা বর্ণনা করতে আল্লাহ তা'আলার লজ্জা লাগলো না? সুতরাং এ স্থানের চাহিদা এটা যে, নিজ দলিল পেশ করে প্রতিপক্ষের ঐ আপত্তিকর দলিলের উত্তর দেওয়া হোক। অতএব এর জন্য উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

উপমার প্রকৃত অবস্থা ও এর উপকারিতার ব্যাখ্যা : স্পষ্ট কথা হচ্ছে, উপমা দ্বারা উদ্দেশ্য ও চাহিদার বিশ্লেষণ করা জরুরি। এ জন্য উপমার মধ্যে ঐ বস্তুর সাথে সম্পর্ক তালাশ করতে হবে। যে বস্তুর জন্য এ উপমা, উপমা পেশকারীর সাথে উপমার সম্পর্ক হওয়া জরুরি নয়। যেমন যখন কারো দুর্বলতার কথা বর্ণনা করতে হয় তখন আরশ, কুরসি, আকাশ-জমিন, বাঘ-হাতি উপমার মধ্যে আনা যাবে না; বরং পিপীলিকা ও মশার আলোচনা করা সুন্দর বাচনভঙ্গি ও বাগ্মিতা হবে। সুতরাং পবিত্র কুরআন ও মূর্তিগুলোর অসহায় হওয়া এবং মূর্তিপূজা অথর্ব হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত করার জন্য মাকড়সা ও তার বিস্তৃত করা জালের বর্ণনা করতে হবে।

সকল আম্বিয়া (আ.) এবং সকল বিজ্ঞ ও অলঙ্কার শাস্ত্রবিদগণের কথাবার্তায় এ ধরনের উপমাসমূহ ভরপূর রয়েছে এবং اَنَّهُ الْحَقُّ -এর অর্থ এটাই যার দিকে মুসান্নেফ (র.) ইঙ্গিত করেছেন। যেমনিভাবে أَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এরপরে فَيَعْلَمُوْنَ বলা হয়েছে। أَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا -এর পরে فَلَا يَعْلَمُوْنَ বলা উচিত ছিল। যাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুদ্ধ হয়। কিন্তু এর পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা فَيَقُوْلُوْنَ বলেছেন, যাতে এর দ্বারা ওদের নির্বুদ্ধিতা ও মূর্খতা প্রকাশ হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও চুক্তি : প্রতিশ্রুতি দ্বারা উদ্দেশ্যব্যাপক নেওয়া যায়। যার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা ও বান্দার মাঝে যে عَهْد اَلَسْتُ হয়েছে তাও এসে যাবে এবং অতীতের পয়গাম্বরগণ (আ.) থেকে যে অঙ্গীকার রাসূল ﷺ -কে সমর্থন ও সাহায্যের ব্যাপারে নেওয়া হয়েছিল তাও শামিল হয়ে যায়। অথবা পরস্পর বান্দাদের মধ্যে চাই শরীয়া হোক, যেমন আত্মীয়ের সাথে সদ্ব্যবহার ইত্যাদি, কিংবা ব্যক্তিগত হোক, যেমন– ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া, ঋণ ইত্যাদি আদান-প্রদানের মাঝে যে চুক্তি হয়।

সম্বোধিত ব্যক্তি যদি ন্যায়পরায়ণ ও সত্যের অনুসন্ধানী হয়, তবে উত্তর জ্ঞানীসুলভ হওয়া সময় উপযোগী হয়। কিন্তু সম্বোধিত ব্যক্তি যদি গোঁয়াড়-হিংসুটে ও দুষ্ট হয়, তবে তার জন্য জ্ঞানীসুলভ উত্তর যথেষ্ট ও উপকারী হয় না। এস্থানেও সম্বন্ধ ও ইতিহাস এ ধরনের লোকদের সাথেই হয়েছে। তাই উত্তরের পদ্ধতি পরিবর্তন করে বিদ্রূপ বচন ও বাক-ভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে, তোমরা জেনে বুঝে এটা জিজ্ঞেস করছ, এ উপমা বর্ণনা করা দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্য কি হতে পারে। অতঃপর শুন! আমার উদ্দেশ্য এর দ্বারা এটা يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا الخ উত্তরের তিক্ততা বলার জন্য ক্ষতির দিকটিকে উপকারের দিকের পূর্বে আনা

হয়েছে। যাতে স্থানটির অপছন্দনীয়তা প্রকাশ হয়ে যায়। এটা এমনই- যেমন কোনো বিবেকহীনকে বারংবার বুঝানোর পর বলে দেওয়া হয় যে, এ বস্তুটি আমি অমুক অমুক উপকারের জন্য তৈরি করেছি। কিন্তু তারপরও একগুঁয়েমীর কারণে ফিরে না আসলে এটাই বলে দেওয়া হবে যে, তোমার মাথায় আঘাত করার জন্য আমি এ বস্তু বানিয়েছি। উক্ত আয়াতই সূফীগণের ঐ অভ্যাসের মূল যে, তারা ঐ উপমা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে মোটেই ভ্রুক্ষেপ করেন না।

قَوْلُهُ يُضِلُّ بِهِ كَثِيْرًا : -এর অর্থ শুধু এতটুকই যে, বান্দা যখন স্বেচ্ছায় ভ্রান্তপথের পথিক হতে চায়, তখন আল্লাহ তা'আলা তার উপকরণ যুগিয়ে দেন। -[তাফসীরে মাজেদী]

بِهٖ -এর সর্বনামের উদ্দেশ্য مَثَلًا শব্দটি। অর্থাৎ এর দ্বারা এবং এ ধরনের অন্যান্য কুরআনী উদাহরণ দ্বারা অনেককে গোমরাহ করেন এবং অনেককে হেদায়েত করেন।

بِهٖ -এর হরফটি ب سَبَبِيَّة বা হেতু প্রকাশক। এখন কথা হলো এ জুমলাদ্বয়ের مَحَلّ إِعْرَاب কি? কেউ বলেন, কোনো مَحَلّ إِعْرَاب নেই। কেননা উভয়টি পূর্বের أَمَّا দ্বারা শুরুকৃত বাক্যের বয়ান হয়েছে এবং এ দুটি আল্লাহ তা'আলার কথা বলে গণ্য হবে। কেউ বলেন, জুমলাদ্বয়ের مَحَلّ إِعْرَاب হলো নসব। কেননা তা مَثَلًا -এর সিফত হয়েছে। اَىْ مَثَلًا يَفْتَرِقُ النَّاسُ بِهٖ مَا اِلٰى ضَالِّيْنَ وَمُهْتَدِيْنَ তখন তা কাফেরদের কথা বিবেচ্য হবে। আল্লামা আবুল বাকা (র.) বলেন, الله শব্দ থেকে حال হওয়ারও অবকাশ আছে- اَىْ مُضِلًّا بِهٖ كَثِيْرًا وَهَادِيًا بِهٖ

قَوْلُهُ وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ : আয়াত নিজেই পরিষ্কার বলে দিয়েছে যে, গোমরাহী শুধু তাদেরই ললাটে লিখেন, যারা নিজেরাই গোমরাহ থাকতে চায়' নিজের থেকে আল্লাহ তা'আলা কারো উপর গোমরাহী চাপিয়ে দেন না। অব্যাহতভাবে স্বেচ্ছাকৃত অবাধ্যতার পরিণতিতে অন্তরের আলো নিভে যায় এবং স্বভাব থেকে সত্যের অনুসন্ধিৎসা বিলুপ্ত হয়ে যায়। এমনকি বিপরীতগামী হয়ে তাতে মিথ্যা ও অসত্য জমাট বাঁধতে শুরু করে এবং কুফরির পর্যায়ে তার পরিণতি ঘটে।

-[তাফসীরে মাজেদী]

ই'রাব : اَلْفٰسِقِيْنَ শব্দটি لِيُضِلَّ -এর মাফঊল এবং এটি اِسْتِثْنَاء مُفَرَّغ হয়েছে। ইমাম ফাররার মতে এটি اِسْتِثْنَاء হিসেবে মানসূব হতে পারে। তখন مُسْتَثْنٰى مِنْهُ উহ্য থাকবে। তাকদীরী ইবারত হবে- وَمَا يُضِلُّ بِهٖ أَحَدًا إِلَّا الْفٰسِقِيْنَ -[হাশিয়ায়ে জামাল : ১/৪৯]

قَوْلُهُ اَلْخَارِجِيْنَ عَنِ الطَّاعَةِ : অংশটুকু اَلْفٰسِقِيْنَ -এর ব্যাখ্যা। এ থেকে فَاسِق -এর সংজ্ঞাও জানা গেল। অর্থাৎ فَاسِق বলা হয় আনুগত্যের পরিধি বারবার যে লঙ্ঘন করে সেই হলো ফাসিক। আর আয়াতে মুনাফিকও কাফেরকে ফাসেক বলার কারণ হলো এরা তাদের রবের অনুগত্য থেকে বেরিয়ে গেছে। -[ইবনে জারীর সূত্রে তাফসীরে মাজেদী]

উল্লেখ্য যে, ফাসেকের তিনটি স্তর রয়েছে-

১. কখনো কখনো কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়। তবে তা খারাপ ও গুনাহ মনে করেই।

২. বেপরওয়াভাবে তাতে মগ্ন হয়।

৩. হঠকারিতার সাথে কাজটি সঠিক মনে করে তাতে লিপ্ত হয়। এ স্তরের ফাসিক হলো কাফের। আয়াতে এদের কথাই বলা হচ্ছে। যেমন জামালাইনে উল্লেখ আছে- এখানে فَاسِق দ্বারা فَاسِق كَامِل উদ্দেশ্য। আর فَاسِق كَامِل হলো কাফের মুশরিকরা। গুনাহগার মু'মিন ফাসিকে কামিল নয়। অর্থাৎ এখানে فِسْق -এর আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য। পারিভাষিক অর্থ নয়। যেমন কুরআনের অপর আয়াত اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ -এর মাঝে মুনাফিককে ফাসিক বলা হয়েছে। অথচ মুনাফিকরা সম্পূর্ণভাবে ইসলামের গণ্ডি বহির্ভূত।

قَوْلُهُ اَلَّذِيْنَ نَعْتٌ : অর্থাৎ اَلْفَاسِقِيْنَ -এর সিফত বা বিশেষণ। এ হিসেবে এটি নসবের স্থলে হবে। কেননা اَلْفَاسِقِيْنَ শব্দটি يُضِلُّ -এর মাফঊল হিসেবে নসবযুক্ত।

يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ الخ : মুফাসসিরীনে কেরাম এ আয়াতে বর্ণিত عَهْد -এর বিভিন্ন মর্ম ও ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন। যেমন عَهْد মানে ঐ সকল অসিয়ত যা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় আদেশ পালন ও নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকার জন্য নবীগণের মাধ্যমে মাখলুকের সাথে করেছেন। দ্বিতীয়ত ঐ অঙ্গীকার যা তাওরাত কিতাবে আহলে কিতাবীদের থেকে নেওয়া হয়েছিল যে, আখেরী জমানার নবীর আগমনের পর তাঁকে সত্য বলে মানা ও তাঁর নবুয়তে বিশ্বাসী হওয়া তোমাদের উপর আবশ্যক হবে। তৃতীয়ত অঙ্গীকার বলতে عَهْد اَلَسْتُ বা রূহ জগতের ঐ অঙ্গীকার বোঝানো হয়েছে, যা হযরত আদম (আ.) -এর পৃষ্ঠদেশ হতে বের হওয়ার পর সকল আদম সন্তানদের থেকে নেওয়া হয়েছে। যার আলোচনা নিম্নোক্ত আয়াতে এসেছে- وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ আর অঙ্গীকার ভঙ্গ করা বলতে অঙ্গীকারের প্রতি পরওয়া না করা।

বাদশাহ তাঁর অধিনস্ত এবং প্রজাদের প্রতি যে হুকুম জারি করেন আরবি ভাষায় তাকে عَهْد শব্দে ব্যক্ত করা হয়। আর তা পালন করা প্রজাদের উপর আবশ্যক হয়ে থাকে। এখানে عَهْد এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলার অঙ্গীকার বলতে তার ঐ সকল স্বতন্ত্র ফরমানকে বুঝানো হয়েছে যেগুলোর আলোকে তাবৎ মানবজাতি কেবল তাঁরই বন্দেগি করার প্রতি আদিষ্ট।

قَوْلُهُ مِنَ الْاِيْمَانِ بِالنَّبِيِّ ﷺ : এ অংশটুকু مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ -এর مَا -এর بَيَان [বিবরণ]। অর্থাৎ তারা ঐ বস্তুকে বিচ্ছিন্ন করে, যেটা জুড়ে দেওয়ার হুকুম করা হয়েছিল। আর তা হলো নবী করীম ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করা।

قَوْلُهُ وَاَنْ يُّوْصَلَ بَدْلٌ مِنْ ضَمِيْرِ بِهٖ : এখানে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَنْ يُّوْصَلَ বাক্যটি بِهٖ -এর যমীর থেকে بَدْل হওয়ার কারণে مَجْرُوْر হয়েছে। مَا থেকে بَدْل হওয়ার কারণে مَنْصُوْب নয়।

قَوْلُهُ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ : এটি يَنْقُضُوْنَ -এর সাথে مُتَعَلِّق হয়েছে। অর্থ- মজবুত অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও। مِيْثَاقِهٖ -এর যমীর عَهْد -এর দিকেও ফিরতে পারে এবং اَللّٰه লফজের দিকেও। প্রথম সূরতে এটি মাসদার হবে এবং মাফউলের দিকে اِضَافَت হবে। আর দ্বিতীয় সূরতে فَاعِل -এর দিকে اِضَافَت হবে।

يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ تَوْكِيْدِهٖ عَلَيْهِمْ এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে একটি سُوَال مُقَدَّر -এর জবাব দেওয়া হয়েছে। তা হলো بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ -এ আয়াতে عَهْد এবং مِيْثَاق শব্দ দুটির অর্থ একই। অর্থ এভাবে হবে যে, তারা আল্লাহ তা'আলার অঙ্গীকারের পর। বলাবাহুল্য এ কথার কোনো মর্ম হয় না। প্রশ্ন হচ্ছে- এখানে সমার্থবোধক দুটি শব্দ একত্রে আনার হেতু কি?

উত্তর : এখানে مِيْثَاق অর্থ তাকিদ এবং মজবুতী। অর্থাৎ তারা আল্লাহ তা'আলার অঙ্গীকারকে মজবুত করার পর ভঙ্গ করে দেয়। আর এ অর্থটি সঠিক ও যথার্থ। এ প্রসঙ্গে হাশিয়ায়ে জামালে উল্লেখ রয়েছে-

وَالْمِيْثَاقُ اِسْمٌ لِمَا تَقَعُ بِهِ الْوَثَاقَةُ وَهِيَ الْاَحْكَامُ وَالْمُرَادُ بِهٖ مَا وَثَقَ اللّٰهُ بِهٖ اَيْ قَوّٰى بِهٖ عَهْدَهٗ مِنَ الْاٰيَاتِ وَالْكُتُبِ اَوْمَا وَثَقُوْهُ بِهٖ مِنَ الْاِلْتِزَامِ وَالْقَبُوْلِ وَيَحْتَمِلُ اَنْ يَكُوْنَ بِمَعْنَى الْمَصْدَرِ (جَمَل)

قَوْلُهُ وَغَيْرِ ذٰلِكَ : যেমন মু'মিনদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা, সত্যায়নের ক্ষেত্রে আসমানি কিতাব ও রাসূলগণের মাঝে ভিন্নতা সৃষ্টি না করা।

قَوْلُهُ اَلْخٰسِرُوْنَ : خَاسِر বলা হয় সম্পদ, শরীর এবং আকল এ তিনটির যে কোনো একটিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে। এরা আকলের দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত। خُسْرٌ অর্থ- ত্রুটি, অপূর্ণতা। -[জামাল]

قَوْلُهُ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ : অর্থাৎ তাদের এসব তৎপরতায় তাদেরই ক্ষতি। ইসলামের সুনাম কিংবা উম্মতের পুণ্যতা অর্জনের মর্যাদা নষ্ট হবে না। -[তাফসীরে উসমানী]

অনুবাদ :

٢٨. كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ يَا اَهْلَ مَكَّةَ بِاللّٰهِ وَقَدْ كُنْتُمْ اَمْوَاتًا نُطَفًا فِى الْاَصْلَابِ فَاَحْيَاكُمْ ـ فِى الْاَرْحَامِ وَالدُّنْيَا بِنَفْخِ الرُّوْحِ فِيْكُمْ وَالْاِسْتِفْهَامُ لِلتَّعَجُّبِ مِنْ كُفْرِهِمْ مَعَ قِيَامِ الْبُرْهَانِ وَالتَّوْبِيْخِ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ عِنْدَ اِنْتِهَاءِ اٰجَالِكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ بِالْبَعْثِ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ تُرَدُّوْنَ بَعْدَ الْبَعْثِ فَيُجَارِيْكُمْ بِاَعْمَالِكُمْ ـ

২৮. হে মক্কাবাসীগণ! তোমরা কিভাবে আল্লাহকে অস্বীকার কর অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন অর্থাৎ পিতার পৃষ্ঠদেশে শুক্রাকারে তিনি তোমাদেরকে তোমাদের দেহে প্রাণ সঞ্চার করে মাতার গর্ভথলিতে এবং এই পৃথিবীতে জীবন দান করেছেন। সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রতিষ্ঠার পরও তাদের কুফরি ও অস্বীকৃতির উপর বিস্ময় ও ভর্ৎসনা প্রকাশের উদ্দেশ্যে এস্থানে প্রশ্নবোধক كَيْفَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আবার তোমাদের নির্দিষ্ট বয়সসীমা শেষ হওয়ার পর মৃত্যু ঘটাবেন। অতঃপর পুনরুত্থানের মাধ্যমে পুনরায় তোমাদেরকে জীবিত করবেন, অতঃপর পুনরুত্থানের পর তাঁর দিকেই তোমরা ফিরে যাবে প্রত্যার্পিত হবে। অতঃপর তিনি তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দিবেন।

٢٩. وَقَالَ تَعَالٰى دَلِيْلاً عَلَى الْبَعْثِ كَمَا اَنْكَرُوْهُ هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ اَىِ الْاَرْضِ وَمَا فِيْهَا جَمِيْعًا ـ لِتَنْتَفِعُوْا بِهٖ وَتَعْتَبِرُوْا ثُمَّ اسْتَوٰى بَعْدَ خَلْقِ الْاَرْضِ اَىْ قَصَدَ اِلَى السَّمَاءِ فَسَوّٰهُنَّ الضَّمِيْرُ يَرْجِعُ اِلَى السَّمَاءِ لِاَنَّهَا فِى الْجَمْعِ الْاٰئِلَةِ اِلَيْهِ اَىْ صَيَّرَهَا كَمَا فِىْ اٰيَةٍ اُخْرٰى فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ـ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ مُجْمَلاً وَمُفَصَّلاً اَفَلَا تَعْتَبِرُوْنَ اَنَّ الْقَادِرَ عَلٰى خَلْقِ ذٰلِكَ اِبْتِدَاءً وَهُوَ اَعْظَمُ مِنْكُمْ قَادِرٌ عَلٰى اِعَادَتِكُمْ ـ

২৯. এবং আল্লাহ তা'আলা পুনরুত্থানের প্রমাণ স্বরূপ ইরশাদ করেন যখন তারা তা অস্বীকার করেছে। তিনি ঐ সত্তা যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে অর্থাৎ পৃথিবী এবং এতে যা কিছু বিদ্যমান যাবতীয় সবকিছু যেন এগুলোর মাধ্যমে তোমরা উপকৃত হতে পার এবং শিক্ষা গ্রহণ করতে পার। তারপর পৃথিবী সৃষ্টির পর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দেন অর্থাৎ আকাশ সৃষ্টির অভিপ্রায় করলেন। তারপর তাকে সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করলেন অর্থাৎ গঠন করলেন। যেমন, অন্য একটি আয়াতে উল্লেখ রয়েছে فَقَضٰهُنَّ [অনন্তর তিনি তৈরি করলেন] هُنَّ [তাদেরকে] সর্বনামটি এ স্থানে اَلسَّمَاءِ বিশেষ্যের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। اَلسَّمَاءِ শব্দটি যদিও একবচন তবুও আগত অবস্থা হিসেবে তাকে বহুবচন অর্থে গণ্য করা হয়েছে। আর তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত সকল বিষয়ে। এই বিষয়টি কি তোমরা লক্ষ্য কর না যে, তোমাদের অপেক্ষা বৃহৎ এই সকল কিছু যিনি শুরুতে সৃষ্টি করতে সক্ষম ও ক্ষমতাশীল তিনি তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করতেও সক্ষম?

তাহকীক ও তারকীব

وَكُنْتُمْ-এর মধ্যে জালাল (র.) قَدْ শব্দ মুকাদ্দার রেখে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন حَال এবং এর নিয়ম নীতির প্রতি যে, مَاضِي তা যখন حَال হয়, তখন قَدْ শব্দ আনা অত্যাবশ্যক। প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপন। اَلرُّوْحُ-এর تَعَلُّق শুধু اَلْاَرْحَامُ-এর সাথে, وَالدُّنْيَا-এর সাথে নয়। اِسْتَوٰى অর্থের দিক দিয়ে اِعْتِدَال ও اِسْتِقَامَة আরবরা اِسْتَوَى الْعَوْدُ বলে থাকে। اِسْتَوٰى اِلَيْهِ كَالسَّهْمِ الْمُرْسَلِ অর্থাৎ সেরা প্রকৃতি ইত্যাদি ফেলে সোজা করা হোক, فَسَوّٰهُنَّ-এর অর্থও এটাই যে, টেরা কিংবা ভাঙ্গা ফাটা ফেলে ঠিক করে দিয়েছেন। যেমন যমীর বহুবচন এবং মারজা, [ফেরার স্থান] اَلسَّمَاء একবচন। মুফাস্সির (র.) এর নির্দেশনা করছেন যার সারাংশ হচ্ছে– এটা শব্দ হিসেবে যদিও একবচন; কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য সমন্বিত সত্যায়নের হিসেবে যা অর্থগত দিক দিয়ে বহুবচন, অর্থাৎ সপ্তাকাশ। যেমন অন্য আয়াতকে প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃতি দিতে যেয়ে পেশ করেছেন। كَيْفَ হামযায়ে اِسْتِفْهَام-এর অর্থে اَىْ كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ اَيْ اَتَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَمَعَكُمْ مَا يَصْرِفُ عَنِ الْكُفْرِ। এটা এমনই, যেমন– اَتَطِيْرُ بِغَيْرِ جَنَاحٍ وَكَيْفَ تَطِيْرُ بِغَيْرِ جَنَاحٍ

فَاَحْيَاكُمْ শুধু এক স্থানে فَ এবং তিন স্থানে ثُمَّ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন, যাতে বুঝা যায় যে, প্রথম وُجُوْد ও عَدَم-এর মাঝে সংযুক্ত ও সম্পর্ক রয়েছে এবং অন্যান্য অবস্থাগুলোর মধ্যে কিছু না কিছু দূরত্ব ও বিরতি হবে। كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ জুমলায়ে اِسْتِفْهَامِيَّه। যমীর اَنْتُمْ জুমলাহ এবং তার পরের জুমলা حَال

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব তাওহীদ এবং রেসালাতের সুস্পষ্ট দলিলসমূহ এবং অস্বীকারকারীদের ভ্রান্ত চিন্তাধারার খণ্ডন সম্পর্কিত আলোচনা ছিল। এ দুটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইহসান এবং অনুগ্রহসমূহের আলোচনা করে এ বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে, এতসব অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়েও এরা কিরূপে কুফর এবং অস্বীকারের দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করে? সেই সঙ্গে এ ব্যাপারেও সতর্ক করা হয়েছে যে, যদি দলিল প্রমাণের প্রতি চিন্তা-ভাবনার সুযোগ না হয়, তাহলে কমপক্ষে অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহ স্বীকার করা, তবে সম্মান ও আনুগত্য করাও তো প্রত্যেক ভদ্রতাও সুস্থ মস্তিষ্কের দাবি। এমনকি একটি বিবেকহীন প্রাণীও তার অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে থাকে। কিন্তু এ সকল মানুষ আকল ও বুদ্ধির দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও স্বীয় প্রকৃত অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহ অস্বীকার করার দুঃসাহকিতা কিভাবে করে?

قَوْلُهُ كَيْفَ : كَيْفَ প্রশ্নসূচক হরফ। অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কুরআনে অস্বীকার ও দুঃসাহসিকতার উপর বিস্ময় প্রকাশের জন্য এর অধিকতর ব্যবহার হয়েছে।

فَكَاَنَّهُ قَالَ : لَا يَنْبَغِيْ اَنْ تُوْجَدَ فِيْكُمُ الصِّفَاتُ الَّتِيْ يَقَعُ عَلَيْهِ الْكُفْرُ فَلَا يَنْبَغِيْ اَنْ يَصْدُرَ مِنْكُمُ الْكُفْرُ (جَمَل : ٥٠)

قَوْلُهُ كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا : আয়াতের মর্ম এই যে, মানুষ তার সৃষ্টির মূল উৎস সম্পর্কে নিবিষ্ট মনে চিন্তা করলে বুঝতে পারবে যে, সৃষ্টির সূচনা এ নিষ্প্রাণ অণুকণাসমূহ থেকেই হয়েছে যা আংশিকভাবে জড় বস্তুর আকৃতিতে আংশিকভাবে প্রবহমান বস্তুর আকৃতিতে আংশিকভাবে খাদ্যের আকৃতিতে সারা বিশ্বে জুড়িয়ে আছে। মহান আল্লাহ তা'আলা সেসব বিক্ষিপ্ত নিষ্প্রাণ অণূকণাসমূহকে বিভিন্ন স্থান থেকে একত্র করেছেন। অবশেষে সেগুলোতে প্রাণ সংযোগ করে জীবন্ত মানুষে রূপান্তরিত করেছেন। এ হলো মানব সৃষ্টির সূচনা পূর্বের কথা। অতঃপর তিনি তাদের নির্ধারিত কাল পেরিয়ে গেলে তোমাদের জীবনশিখা নিভিয়ে দিবেন এবং এক নির্ধারিত সময়ের পর কেয়ামতের দিন দেহের নিষ্প্রাণ বিক্ষিপ্ত কণাগুলোকে আবার সমন্বিত করে তাদের পুনরুজ্জীবিত করবেন। প্রথম মৃত্যু হলো সৃষ্টিধারায় সূচনাপর্বের নিষ্প্রাণ ও জড় অবস্থা যা থেকে আল্লাহ পাক তোমাদের জীবন দান করেছেন। আর দ্বিতীয় মৃত্যু হলো মরজগতে মানুষের আয়ু শেষ হয়ে যাওয়াকালীন মৃত্যু। বস্তুত তৃতীয়বার জীবন লাভ হবে কিয়ামতের দিন। –[তাফসীরে মা'আরিফুর কুরআন : মুফতী শফী (র.)]

وَقَدْ كُنْتُمْ اَمْوَاتًا : এখানে শুরুর وَاو টি حَالِيَه আর كُنْتُمْ اَمْوَاتًا হলো تَكْفُرُوْنَ-এর যমীর থেকে حَال বা অবস্থা ও ভাববাচক এই দিকে ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্যে মাননীয় তাফসীরকার এই স্থানে قَدْ শব্দটির উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ বিজ্ঞ মুফাসসির قَدْ শব্দটি বৃদ্ধি করে একটি سُؤَال مُقَدَّر-এর জবাব দিয়েছেন।

প্রশ্ন : فِعْل مَاضِى -কে حَال বানাতে হলে قَدْ যোগ করতে হয়। قَدْ ছাড়া فِعْل مَاضِى হাল হওয়া সঠিক নয়। এখানে কিভাবে হলো?

উত্তর : قَدْ শব্দগতভাবে থাকা জরুরি নয়। উহ্য থেকেও حَال হতে পারে। এখানে قَدْ উহ্য রয়েছে। এদিকে ইঙ্গিত করেই মুফাসসির (র.) قَدْ উল্লেখ করেছেন। আরেকটি জবাব এটাও হতে পারে যে, قَدْ উহ্য থাকা ব্যতিরেকেও حَال হওয়া সঠিক আছে। কারণ এখানে শুধু كُنْتُمْ اَمْوَاتًا বাক্যটিই হাল নয়; বরং তার পরবর্তী বাক্য تُرْجَعُوْنَ পর্যন্ত জুমলা হয় حَال হয়েছে। যেন বলা হয়েছে كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَ قِصَّتُكُمْ هٰذِهٖ –[ফতহুল কাদীর সূত্রে জামালাইন]

اَمْوَاتًا : لَا بُدَّ مِنَ التَّاوِيْلِ عَلٰى مَا فَسَّرَهُ أَىْ وَكَانَتْ مَوَادُّ أَبْدَانِكُمْ أَوْ أَجْزَائِهَا أَمْوَاتًا وَالظَّاهِرُ الْحَمْلُ عَلَى التَّشْبِيْهِ فَيَكُوْنُ الْمَعْنٰى كُنْتُمْ كَالْاَمْوَاتِ ـ فَلَا يَرِدُ السُّؤَالُ كَيْفَ قِيْلَ اَمْوَاتًا فِىْ حَالِ كَوْنِهِمْ جَمَادًا اِنَّمَا يُقَالُ مَيِّتٌ فِيْمَا تَصِحُّ فِيْهِ الْحَيَاةُ مِنَ الْبِنْيَةِ ـ (جَمَل : ٥١)

قَوْلُهُ نُطْفًا فِى الْاَصْلَابِ : نُطْفًا এটি نُطْفَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ পরিষ্কার ও স্বচ্ছ পানি। এমন বস্তু যা টপকে পড়ে। এখানে نُطْفَةَ مَنِى বা বীর্য বুঝানো হয়েছে। نُطْفَة -এর সাথে عَلَق এবং مُضْغَة -ও শামিল আছে।

قَوْلُهُ فَاَحْيَاكُمْ : এটি مَحْذُوْف -এর উপর مُرَتَّبْ হয়েছে। তাকদীরী ইবারত এরূপ وَكُنْتُمْ عَلَقَةً فَمُضْغَةً فَاَحْيَاكُمْ এভাবে তাকদীরী ইবারত উল্লেখ করার প্রয়োজন ও কারণে দেখা দিয়েছে যে, বীর্য তৎক্ষণাৎ জীবন প্রাপ্ত হয় না; বরং মাতৃগর্ভে ১২০ দিন সময়ের পরিসরে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করার পর জীবন লাভ করে থাকে।

قَوْلُهُ وَالْاِسْتِفْهَامُ لِلتَّعَجُّبِ مِنْ كُفْرِهِمْ مَعَ قِيَامِ الْبُرْهَانِ وَلِلتَّوْبِيْخِ : অর্থাৎ এতসব নিয়ামত পাওয়ার পরও কুফরি বা অকৃতজ্ঞতা করার দুঃসাহস প্রদর্শন করা বিস্ময়ের ব্যাপার। অথবা استفهام টি توبيخ বা ধমক ও ভর্ৎসনার জন্য এসেছে। কারণ বিস্ময় তো ঐসব স্থানে প্রকাশ করা হয় যেখানে اَسْبَابْ বা কারণসমূহ লুকায়িত থাকে। আর আল্লাহ তা'আলার কাছে তো কোনো বস্তুর কারণ গোপন নেই। সুতরাং এখানে ভর্ৎসনা করার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়েছেন।

قَوْلُهُ مَعَ قِيَامِ الْبُرْهَانِ : এটিই হলো مَنْشَأُ التَّعَجُّبِ বা বিস্ময়ের মূল কারণ। কেননা আল্লাহ তা'আলার এককত্বের দলিল প্রমাণ সাব্যস্ত হওয়ার পরও কুফর বা তার সাথে শরিক করা বিস্ময়ের ব্যাপার। আর بُرْهَان দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহর বাণী– وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا الخ অর্থাৎ যিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেছেন, একমাত্র তিনিই ইলাহ হওয়ার যোগ্য। তিনি ছাড়া অন্য কেউ বা কোনো মূর্তি ইলাহ হতে পারে না। –[হাশিয়ায়ে জামাল : খ. ১, পৃ. ৫১]

قَوْلُهُ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ : প্রশ্ন : আলোচ্য আয়াতে ইহলৌকিক জীবন ও মৃত্যুর পরবর্তী এমন এক জীবনের বর্ণনা রয়েছে, যার সূচনা হবে কিয়ামতের দিন থেকে। কিন্তু যে কবরদেশের প্রশ্নোত্তর এবং পুরস্কার ও শাস্তির কথা কুরআন পাকের বিভিন্ন আয়াতে এবং বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত- এখানে তার কোনো উল্লেখ নেই কেন?

উত্তর : উক্ত প্রশ্নের জবাব আয়াতের শব্দের মাঝেই নিহিত আছে। একটু চিন্তা করলেই উত্তর বেরিয়ে আসবে। অবশ্য আয়াতে সে জীবনের কথা সরাসরি না বলে ইঙ্গিতে বলা হয়েছে। এভাবে যে, فَاَحْيَاكُمْ -এর পর বলা হয়েছে– ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ আর ثُمَّ এ কথার দালালত করে যে, রূহ প্রদান ও মৃত্যু প্রদানের মাঝে সময়ের একটি পরিসর অতীত হয়েছে। আর তা হলো দুনিয়ার জীবন। এমনিভাবে ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ -এর ثُمَّ থেকেও এ কথা বোঝা যায় যে, মৃত্যু এবং তারপর পুনরায় জীবন লাভের মাঝে একটি সময় ছিল। আর তাহলো বরজখী বা কবরের জীবন। অনুরূপভাবে ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ -এর মাঝেও আরেকটি সময়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। তা হলো হাশর-নাশর ও হিসাব কিতাব। সুতরাং আর ইশকাল থাকল না। তবে সে সময়গুলোর উল্লেখ ভিন্নভাবে করা হয়নি। গুরুত্বপূর্ণগুলোর উল্লেখ করেই ক্ষান্ত করা হয়েছে।

وَقَالَ دَلِيْلًا عَلَى الْبَعْثِ : অর্থাৎ পূর্বে প্রদত্ত দলিল যেহেতু ভূমিকা স্বরূপও সংক্ষিপ্ত ছিল তাই সেটা কাফেরদের পছন্দ হয়নি। বিধায় এখানে সে বিষয়টি বিশদভাবে দলিল দ্বারা প্রমাণিত করা হয়েছে। আর دَلِيْلًا শব্দটি مَفْعُول بِه হিসেবে أَىْ لِأَجْلِ الدَّلِيْلِ أَوِ الْاِسْتِدْلَالِ। مَنْصُوْب হয়েছে।

এখানে এমন এক সাধারণ ও ব্যাপক অনুগ্রহের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যা মানুষের জন্য সীমাবদ্ধ নয়; বরং সমগ্র প্রাণীজগত সমভাবে এর দ্বারা উপকৃত। এ জগতে মানুষ যত অনুগ্রহ লাভ করেছে বা করতে পারে তা এই একটি শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা মানুষের আহার-বিহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, ঔষধপত্র, বসবাস ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপকরণ ও মাটি থেকেই উৎপন্ন ও সংগৃহীত হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ : لَكُمْ এটি خَلَقَ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। আর لَامْ টি হলো تَعْلِيْل -এর অর্থে। أَىْ لِأَجْلِكُمْ কেউ বলেন, এটি تَمْلِيْكْ وَالْإِبَاحَة -এর জন্য। অবশ্য تَمْلِيْك টি শুধু উপকার লাভযোগ্য বস্তুর সাথেই খাস হবে। আর কেউ বলেন, إخْتِصَاص -এর অর্থে।

مَا : এটি مَا مَوْصُوْلَة এবং তার صِلَه হলো فِى الْاَرْضِ আর مَا فِى الْاَرْضِ হলো خَلَقَ -এর مَفْعُوْل بِه

جَمِيْعًا : এটি حَال مُؤَكِّدَة তথা مَفْعُوْل مَا فِى الْاَرْضِ থেকে حَال হয়েছে এবং এটি كُلّ -এর অর্থে। কেউ বলেন, এটি حَال হয়েছে। কেননা مَا فِى الْاَرْضِ বাক্যটাই ব্যাপক।

জগতের চার অবস্থা : যেমন একটি দলিল এটা যে, মানুষের চারটি অবস্থা, দুটি অনস্তিত্ববান আর দু'টি অস্তিত্ববান। এটা দুনিয়াবী অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের মাঝে সীমিত। তারপর পরজগতের অস্তিত্ব স্থায়ী হবে, এর উপর অনস্তিত্বের আবরণ আসতে পারবে না। এ বিভিন্ন অবস্থাদির উপরে মানুষকে লক্ষ্য করতে হবে যে, কে এ পরিবর্তন করছে? সে মালিক ও খালিক্বকে চিনো! আচ্ছা আর যদি ঐ প্রমাণাদির ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে না পারো, কেননা এগুলো মধ্যে বিবেক শক্তি ব্যয় করতে হয়। আর অত মেহনতের কাজ কে করে। ভাল কথা, তবে অবদান কারীর অধিকারকে স্বীকার করা তো প্রাকৃতিক বিধান। শুধু এটা ভেবে আল্লাহর দিকে ধাবিত হয়ে যাও!

সামনে সাধারণ ও বিশেষ নিয়ামতসমূহের বর্ণনা শুরু হচ্ছে, জগতে বিদ্যমান সকল বস্তু কোনো না কোনো উপকারের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। যেগুলোর মধ্য থেকে অধিকাংশের মেনে নেওয়া যায় যে, কোনো বস্তুর উপকারিতা জানাও না যায়। তবে এর দ্বারা ঐ বস্তুটির উপকার থেকে খালি হওয়া তো অপরিহার্য হয়ে পড়ে না। জানা না থাকাবস্থায়ই এর দ্বারা উপকার হচ্ছে, হ্যাঁ সকল বস্তুর উপকারিতা সম্পর্কে আল্লাহ জানেন। خَلَقَ لَكُمْ -এর "লাম" উপকারের জন্য, এর দ্বারা আলেমগণ এটা বুঝেছেন যে, প্রতিটি বস্তুর মধ্যে (اِبَاحَتْ) বৈধ ঘোষণা হচ্ছে আসল। আর নিষিদ্ধতা আসল নয়। অর্থাৎ শরিয়ত যে বস্তুকে ক্ষতিকারক বুঝবে, সেটাকে নিষেধ করে দেবে।

একটি সন্দেহ এবং এর উত্তর : এক্ষেত্রে কেউ এ সন্দেহ করবে না যে, যখন সকল বস্তুই উপকারী, তবে সকল বস্তুই হালাল হওয়া উচিত। মূল কথা হচ্ছে এটা যে, কোনো বস্তুউপকারী হলে ওটা ব্যবহারযোগ্য হওয়া জরুরি নয়। সর্বশেষ বিষ ইত্যাদির মধ্যেও কিছু না কিছু উপকারিতা অবশ্যই আছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এর অপকারিতা অধিক হওয়ার প্রতি লক্ষ্য করে এর ব্যবহার থেকে বাধা দেওয়া হয়। এ অবস্থাই শরয়ী দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ বস্তুসমূহের। এগুলোর মধ্যে কিছু না কিছু উপকারিতাও রয়েছে বটে। কিন্তু ক্ষতি অধিক হয়। তাই ওগুলোকে নিষিদ্ধ সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং এ ব্যাপারে যেমনিভাবে চিকিৎসক অথবা ডাক্তারের জানা যথেষ্ট মনে করা হয়, তদ্রূপ শুধু বিধানকর্তার জানাই যথেষ্ট, সাধারণদের অবগত হওয়া জরুরি নয়।

قَوْلُهُ أَىِ الْاَرْضِ وَمَا فِيْهَا : জমীন দ্বারা উদ্দেশ্য ভূ-পৃষ্ঠ। আর مَا فِيْهَا দ্বারা জীব-জন্তু, উদ্ভিদ ইত্যাদি উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ وَتَعْتَبِرُوْا : এখানে خَاص -কে عَام -এর সাথে عَطْف করা হয়েছে। কেননা اِنْتِفَاع -এর মাঝে দুনিয়াবী ও পরকালীন সকল انتفاع -ই শামিল আছে। সে হিসেবে اِعْتِبَار -ও তাতে অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهُ ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ فَسَوّٰهُنَّ : প্রশ্ন: ثُمَّ -এর মূল অর্থে تَرَاخِى زَمَان দাবি করে। অথচ তখন কোনো জমানা বা কাল ছিল না।

উত্তর : নিম্নের আরবি ইবারত দ্রষ্টব্য−

১. قِيْلَ : هِىَ اِشَارَةُ التَّرَاخِىْ بَيْنَ رُتْبَتَىْ خَلْقِ الْاَرْضِ وَالسَّمَاءِ .

২. وَقِيْلَ : لَمَّا كَانَ بَيْنَ خَلْقِ الْاَرْضِ وَالسَّمَاءِ أَعْمَالٌ اُخَرُ مِنْ جَعْلِ الْجِبَالِ رَوَاسِىَ وَتَقْدِيْرِ الْاَقْوَاتِ . كَمَا اَشَارَ اِلَيْهِ فِى الْاٰيَةِ الْاُخْرٰى . عَطَفَ بِثُمَّ، اِذْ بَيْنَ خَلْقِ الْاَرْضِ وَالْاِسْتِوَاءِ اِلَى السَّمَاءِ تَرَاخٍ .

২. قَالَ الْقُرْطُبِىُّ ثُمَّ اسْتَوٰى لِلتَّرْتِيْبِ الْاِخْبَارِىْ لَا الزَّمَانِىْ، وَذٰلِكَ لِأَنَّ خَلْقَ مَا فِى الْاَرْضِ مُتَأَخِّرٌ عَنْ خَلْقِ السَّمَاءِ . (جَمَل)

قَوْلُهُ اِسْتَوٰى : استوى -এর আভিধানিক অর্থ- اِسْتَقَامَ وَاعْتَدَلَ [সমান হলো, ভারসাম্য পূর্ণ হলো]। বলা হয়- اِسْتَوَى الْعُوْدُ [কাঠ সমান হলো]। কেউ বলেন, عَلَا وَارْتَفَعَ [উঁচু হলো]। যেমন কুরআনের বাণী-

فَاِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ (مُؤْمِنُوْن : ٢٨) لِتَسْتَوُا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ (اَلزُّخْرُف : ١٣)

এখানে اِسْتَوٰى -এর অর্থ عَمَدَ وَقَصَدَ [ইচ্ছা করলেন]। আর তার ফায়েল হলো এমন জমীর, যা আল্লাহর দিকে ফিরবে। আর আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে ইচ্ছার অর্থ- تَعَلُّقُ اِرَادَتِهِ التَّنْجِيْزِيِّ اِلَى الْحَادِثِ

أَيْ ثُمَّ تَعَلَّقَتْ اِرَادَتُهُ تَعَلُّقًا حَادِثًا بِخَلْقِ السَّمٰوَاتِ اَيْ بِتَرْجِيْحِ وُجُوْدِهَا عَلٰى عَدَمِهَا فَتَعَلَّقَتِ الْقُدْرَةُ بِاِيْجَادِهَا .

قَوْلُهُ بَعْدَ خَلْقِ الْأَرْضِ : এখানে শুধু خَلْقِ الْأَرْضِ বলা হয়েছে। وَمَا فِيْهَا বলা হয়নি। যেমনটি পূর্বের আয়াতে রয়েছে। এদিকে ইঙ্গিত করার জন্য যে, জমীনের মধ্যস্থিত বস্তুগুলো আসমান সৃষ্টির পূর্বে সৃষ্টি হয়নি; বরং তার পরে হয়েছে।

উল্লেখ্য, আল্লাহ তা'আলার দু'দিনে জমীনের অবয়ব সৃষ্টি করেছেন। তারপর দু'দিনে আসমান সৃষ্টি করেছেন। তারপর দু'দিনে জমীনের মধ্যস্থিত সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন। যেমনটা সূরা আম্বিয়ার আয়াত থেকে বোঝা যায়। ইরশাদ হয়েছে-

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَنَّ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا (اَلْأَنْبِيَاءُ : ٢١)

[এ ব্যাপারে আরো ইশকাল জবাবের জন্য দ্রষ্টব্য হাশিয়ায়ে জামাল : ৫৩]

قَوْلُهُ لِاَنَّهَا فِيْ مَعْنَى الْجَمْعِ : এ ইবারত দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন: ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ فَسَوّٰهُنَّ -এর هُنَّ জমীরটি اَلسَّمَاءِ এর দিকে ফিরেছে। اَلسَّمَاءِ শব্দটি একবচন। কিন্তু জমীর ব্যবহৃত হয়েছে বহুবচনের। সুতরাং ضَمِيْر এবং مَرْجِع -এর মাঝে সামঞ্জস্যতা পাওয়া যাচ্ছে না।

উত্তর: اَلسَّمَاءِ শব্দটি مَا يَؤُوْلُ হিসেবে বহুবচন। কেননা اِسْتَوٰى -এরপর সাত আসমান অস্তিত্ব লাভ করে। অন্যত্র বলা হয়েছে- فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ

আরেকটি জবাব এও হতে পারে যে, اَلسَّمَاءِ -এর اَلِف لَامْ টি اَلِف لَام جِنْسِي তাই বহুবচনের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হওয়া সঙ্গত আছে।

قَوْلُهُ اَيْ صَيَّرَهَا : فَسَوّٰهُنَّ -এর অর্থ- عَلٰى خَلْقِ ذٰلِكَ : এটি اَيْ مُذَكَّرٌ مِنَ الْاَرْضِ وَمَا بَعْدَهَا

হযরত আদম (আ.) ও জগতের সৃষ্টি : অধিকাংশ আয়াত দ্বারা আকাশ ও জমিন এবং জগতের সৃষ্টি ছয়দিনে হয়েছে বুঝা যায়। মুসলিম শরীফের হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, সপ্তমদিন শুক্রবার আছর ও মাগরিব এর মধ্যবর্তী সময়ে হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। য দ্বারা জগতের সৃষ্টি সাত দিনে পরিপূর্ণ হওয়া বুঝা যায়।

কাজী ছানাউল্লাহ পানিপতী (র.) তাফসীরে মাযহারীতে এ জটিলতার সমাধান এভাবে করেছেন যে, এ শুক্রবার যার মধ্যে **হযরত** আদম (আ.)-এর সৃষ্টি বাস্তবায়িত **হয়েছে, জরুরি** নয় যে, ঐ ছয় দিনের সাথে ঐ শুক্রবার টি সংযুক্ত হবে, বরং হতে **পারে যে,** অনেক কাল পরে কোনো এক **শুক্রবার হযরত** আদম (আ.)-এর সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং জগতের সৃষ্টির জন্য ছয় **দিনই** সীমিত থাকবে। এ বিশ্লেষণ দ্বারা আরো একটি সন্দেহকেও দূর করা হয়ে গেল যে, হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টির পূর্বে এবং জমিন ও আকাশের সৃষ্টি পরে জিন জাতির দীর্ঘকাল পর্যন্ত জমিনে বসবাস করার বিষয়ে মারাত্মক সন্দেহ ছিল। কিন্তু এখন বলা যাবে যে, জমিন ও আকাশের সৃষ্টির পর জিন জাতির সৃষ্টি হয়েছে। এবং এর হাজার হাজার বছর ছিল। তখন কোনো এক শুক্রবারে হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে।

আকাশও জমিনের সৃষ্টির ধারাবাহিকতার বর্ণনা পবিত্র কুরআনে তিনটি স্থানে এসেছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে উক্ত আয়াতে। দ্বিতীয়টি حٰمٓ السَّجْدَة -তে এবং তৃতীয়টি وَالنّٰزِعٰتِ -তে। এ আয়াতগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিলে কিছুটা বোধগম্যের বিপরীত ও বুঝা যায়। কোনো কোনো আলেম এর উত্তম নির্দেশনা এ দিয়েছেন যে, সর্বপ্রথম জমিনের উৎসগিরি তৈরি করা হয়েছে। তারপর আকাশের উৎসগিরি যা ধোঁয়ার আকৃতিতে ছিল তৈরি করা হয়েছে। তারপর জমিনের উৎসগিরি দ্বারা বর্তমান আকৃতির উপর বিস্তৃত করা হয়েছে এবং এর পাহাড়, বৃক্ষ ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর ঐ বহমান উৎসগিরি দ্বারা সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন। অবশিষ্ট সৃষ্টিগুলোর প্রাথমিক অবস্থাদির বিস্তারিত ব্যাখ্যা শরিয়ত এ জন্য বর্ণনা করেনি যে, এগুলো প্রয়োজন ছিল না।

٣٠. وَاذْكُرْ يَا مُحَمَّدُ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ـ يَخْلُفُنِيْ فِيْ تَنْفِيْذِ اَحْكَامِيْ فِيْهَا وَهُوَ اٰدَمُ قَالُوْآ اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا بِالْمَعَاصِيْ وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ـ يُرِيْقُهَا بِالْقَتْلِ كَمَا فَعَلَ بَنُو الْجَانِّ وَكَانُوْا فِيْهَا فَلَمَّا اَفْسَدُوْا اَرْسَلَ اللّٰهُ اِلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةَ فَطَرَدُوْهُمْ اِلَى الْجَزَائِرِ وَالْجِبَالِ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ مُتَلَبِّسِيْنَ بِحَمْدِكَ اَيْ نَقُوْلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ وَنُقَدِّسُ لَكَ ـ نُنَزِّهُكَ عَمَّا يَلِيْقُ بِكَ فَاللَّامُ زَائِدَةٌ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ اَيْ فَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْاِسْتِخْلَافِ قَالَ تَعَالٰى اِنِّيْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ـ مِنَ الْمَصْلَحَةِ فِي اسْتِخْلَافِ اٰدَمَ وَاَنَّ ذُرِّيَّتَهٗ فِيْهِمُ الْمُطِيْعُ وَالْعَاصِيْ فَيَظْهَرُ الْعَدْلُ بَيْنَهُمْ فَقَالُوْا لَنْ يَخْلُقَ رَبُّنَا خَلْقًا اَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنَّا وَلَا اَعْلَمَ لِسَبْقِنَا لَهٗ وَرُؤْيَتِنَا مَا لَمْ يَرَهٗ فَخَلَقَ تَعَالٰى اٰدَمَ مِنْ اَدِيْمِ الْاَرْضِ اَيْ وَجْهِهَا بِاَنْ قَبَضَ مِنْهَا قَبْضَةً مِنْ جَمِيْعِ اَلْوَانِهَا وَعُجِنَتْ بِالْمِيَاهِ الْمُخْتَلِفَةِ وَسَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيْهِ الرُّوْحَ فَصَارَ حَيَوَانًا حَسَّاسًا بَعْدَ اَنْ كَانَ جَمَادًا ـ

অনুবাদ :

৩০. আর স্মরণ কর হে মুহাম্মদ! যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি যেজন এতে বিধি-বিধানসমূহ কার্যকরী করার বিষয়ে আমার প্রতিনিধিত্ব করবে। আর তিনিই হলেন হযরত আদম। তারা বলল, আপনি কি এমন কাউকেও সৃষ্টি করবেন যে অশান্তি ঘটাবে অবাধ্যচার করবে ও রক্তপাত ঘটবে হত্যা করবে রক্ত প্রবাহিত করবে? ইতিপূর্বে যেমন জিন সন্তানরা তা করেছিল। পূর্বে জিনেরা এই জনপদসমূহে বাস করত। তারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করলে আল্লাহ তা'আলা তাদের বিরুদ্ধে ফেরেশতা প্রেরণ করেন। তারা তাদেরকে দ্বীপপুঞ্জ ও পাহাড়-পর্বতের দিকে বিতাড়িত করেন। আমরাইতো আপনার হামদসহ তাসবীহ [স্তুতি] পাঠ করি অর্থাৎ আমরা "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী" পাঠ করি ও আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করি। অর্থাৎ যা আপনার উপর আরোপ করা ঠিক নয়, সেই সমস্ত জিনিস হতে আমরা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করি। وَنَحْنُ-এই বাক্যটি حَال বা ভাব ও অবস্থাবাচক বাক্য। وَنُقَدِّسُ لَكَ-এর ل অক্ষরটি অতিরিক্ত। মোটকথা আমরাই আপনার প্রতিনিধিত্ব করার অধিক যোগ্যতার অধিকারী। তিনি [আল্লাহ তা'আলা] বললেন, নিশ্চয় আমি যা জানি, তোমরা তা জান না। অর্থাৎ আদমকে প্রতিনিধি করার পিছনে কি কল্যাণ ও রহস্য বিদ্যমান, তা কেবল আমিই জানি। আদম-সন্তানের মধ্যে বাধ্য- অবাধ্য উভয় ধরনের ব্যক্তি থাকবে। সুতরাং তাদের মাঝেই আমার 'আদল ও ন্যায়ের প্রকাশ ঘটবে। যা হোক, ফেরেশতাগণ বলাবলি করলো, প্রভু কখনো আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও অধিক জ্ঞানের অধিকারী কোনো মাখলুক সৃষ্টি করবেন না। কারণ আমাদেরকে পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এমনসব জিনিস আমরা অবলোকন করেছি, যা অন্য কেউ করেনি। অনন্তর আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর উপরিভাগের [স্তরের] মাটি দ্বারা আদমকে সৃষ্টি করলেন। সকল প্রকার মাটি হতে এক মুঠ মাটি নিয়ে বিভিন্ন ধরনের পানির সাহায্যে মণ্ড [খামীরা] তৈরি করা হলো। তাকে সুগঠিত করে তাতে তিনি প্রাণ ফুৎকার করলেন। ফলে তা নিষ্প্রাণ অবস্থা হতে অনুভূতিশীল এক প্রাণীরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

তাহকীক ও তারকীব

إِذْ শব্দে পূর্বে اُذْكُرْ নিয়তি হিসেবে মানা এ জন্য জরুরি যে, إِذْ নসবের স্থানে রয়েছে এবং اُذْكُرْ-এর فَاعِل আর কেউ কেউ এটাকে মুবতাদায়ে মাহযূফের খবর বলেছেন- اَىْ اِبْتِدَاءُ خَلْقِيْ إِذْ قَالَ الخ -এবং কারো দৃষ্টিতে অতিরিক্ত। আর قَالُوْا-এর تَاءُ تَانِيْث কারণেও مَنْصُوْب হতে পারে। مَلَائِكَة হলো مَلْأَكٌ-এর বহুবচন। যেমন شَمَائِل বহুবচন شَمْأَلٌ-এর এবং تَاءُ বহুবচনের জন্য। যদি এটাকে مَلَكٌ তথা شِدَّة থেকে নির্গত মানা হয়। তবে হাম্‌যা" অতিরিক্ত হবে। আর যদি الوكة তথা رِسَالَة থেকে নির্গত করা হয়, তবে مَالِكٌ ছিল। পরে এটার পরিবর্তন করা হয়েছে।

اٰدَم তিনি اَبُو الْبَشَر এবং একজন ব্যক্তি, বস্তুবাদীদের ন্যায় তার মানবজাতির নাম বলা শুদ্ধ নয়। তার বয়স ৯৬০ বছর হয়েছে এবং নিজের এক লক্ষ সন্তান দেখে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছেন। قَالَ ফেয়েল رَبُّكَ ফায়েল اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ জুমলা মাকূলাহ অর্থাৎ মাফঊল جَاعِلٌ অর্থ خَالِقٌ হলে তবে এক مَفْعُوْل চাবে - তা হচ্ছে خَلِيْفَةً আর অর্থ مُصَيِّر ও হতে পারে। فِى الْاَرْضِ দ্বিতীয় مَفْعُوْل হবে। قَالُوْا-এর মাকূলাহ اَتَجْعَلُ فِيْهَا الخ - تَسْبِيْح ও تَقْدِيْس-এর মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য এটা যে, تَسْبِيْح আনুগত্য ও আমল -এর ক্ষেত্রে হয় এবং تَقْدِيْس ই'তেকাদের ক্ষেত্রে। সবগুলোর সারাংশ মুখ, অন্তর এবং অঙ্গসমূহ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে সত্তাগত ও সাধারণ নিয়ামতসমূহের বর্ণনা ছিল। এখান থেকে মৌলিক নিয়ামতসমূহের বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে ইলম এবং বুযুর্গী দান করেছেন। তাকে ফেরেশতাগণের সেজদার স্থান বানিয়ে সম্মানি করেছেন এবং তোমাদেরকে তার সন্তান হওয়ার গৌরব দান করেছেন।

আদম সৃষ্টি প্রসঙ্গ : এবারে একটি শ্রেষ্ঠ নিয়ামতের উল্লেখ করা হচ্ছে, যা সমগ্র মানব জাতিকে প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টি সংঘটন। -[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ : وَاو হরফটি اِسْتِيْنَافِيَه আর اِذْ হলো اُذْكُرْ উহ্য ফেলের مَفْعُوْل بِه কুরআনে কারীমের বর্ণিত ঘটনাসমূহের শুরুতে এই তারকীবই অধিক প্রযোজ্য।

اَلْمَلَائِكَةُ : এটি مَلَكٌ-এর বহুবচন। মূলত مَفْعَلٌ-এর ওজনে مَالِكٌ ছিল। সহজকরণার্থে هَمْزَة-কে হজফ করে مَلَكٌ করা হয়েছে। এ শব্দটি الوكة থেকে নির্গত। الوكة অর্থ পয়গাম্বরী, রিসালাত। তাহলে مَلَائِكَة-এর আভিধানিক অর্থ বার্তাবাহক। ফেরেশতারাও আল্লাহ তা'আলার পয়গাম মানুষের কাছে পৌঁছানোর কাজে নিয়োজিত এবং সৃষ্টির মাঝে সেতুবন্ধনের কাজ দেয় এই হিসেবে তাদেরকে مَلَائِكَة বলা হয়। -[হাশিয়ায়ে জামালাইন]

ফেরেশতার পরিচয় : ইসলামি পরিভাষায় ফেরেশতার পরিচিতি হলো- جِسْمٌ نُوْرَانِىٌّ مُتَشَكِّلٌ بِاَشْكَالٍ مُخْتَلِفَةٍ لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ অর্থাৎ এমন নূরানী মাখলুক যারা বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করতে পারেন। তাঁরা কখনো আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধাচারণ করেন না; বরং সর্বদা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালনে রত থাকেন'।

-[কাওয়াইদুল ফিকহ : ৫০৪]

বস্তুত ফেরেশতা নূর বা জ্যোতি থেকে সৃষ্টি। তাঁরা সাধারণত অদৃশ্য, তাঁদের কোনো আকার নেই। তবে তাঁরা বিভিন্ন আকার ধারণ করতে পারেন। তাঁরা আমাদের মতো রক্ত-মাংসের সৃষ্টি নন। তাঁদের কামনা-বাসনা, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, নিদ্রা-তন্দ্রা কিছুই নেই। তাঁরা সবসময় আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে মশগুল থাকেন। আল্লাহ তা'আলা যখন যা হুকুম করেন, তাঁরা তাই পালন করেন। এই পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রহমত অথবা শাস্তি যা কিছু নাজিল হয়, তা এই ফেরেশতাগণের মাধ্যমে নাজিল করা হয়। আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলগণের প্রতি যেসব কিতাব নাজিল করেছেন, তা তাঁদের মাধ্যমে করেছেন। তাঁরা বান্দার আমল লিপিবদ্ধ করেন এবং জান কবজ করেন। বিচার দিনে তাঁরা বান্দার ভালো-মন্দ আমলের সাক্ষ্য দিবেন।

ফেরেশতাদের সংখ্যা ও নাম : ফেরেশতাগণের প্রকৃত সংখ্যা সম্পর্কে কেবল আল্লাহ তা'আলাই অবগত আছেন। ইরশাদ হয়েছে- وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ অর্থাৎ আপনার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন।

-[সূরা মুদ্দাসসির : ৩১]

চারজন বড় বড় ফেরেশতাসহ কতিপয় ফেরেশতার নাম আমরা জানি। যেমন-

১. হযরত জিবরাঈল (আ.), তিনি নবী-রাসূলগণের নিকট আল্লাহ তা'আলার বাণী পৌঁছানোর দায়িত্বে নিয়োজিত। তাঁকে রূহ বা রূহুল আমীনও বলা হয়।

২. হযরত মীকাঈল (আ.), তিনি সকল জীবের জীবিকা বণ্টনের দায়িত্বে নিয়োজিত।

৩. হযরত আজরাঈল (আ.), তিনি সকল জীবের জীবন বা রূহ কবজ করার দায়িত্বে নিয়োজিত।
৪. হযরত ইসরাফীল (আ.), তিনি শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার হুকুমের সাথে সাথে শিঙ্গায় ফুঁক দিবেন এবং তৎক্ষণাৎ পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে, এরপর কিয়ামত কায়েম হবে।

উপরে বর্ণিত চারজন ফেরেশতা ছাড়াও আরো কতিপয় ফেরেশতার উল্লেখ রয়েছে। যেমন– কিরামান কাতিবীন, যারা **মানুষের** ভালো-মন্দ আমল লিপিবদ্ধ করেন। মুনকার ও নাকীর : তাঁরা মৃত্যুর পর কবরে প্রশ্ন করেন। জাহান্নামের রক্ষক ফেরেশতার নাম মালিক এবং জান্নাতের জিম্মাদার ফেরেশতার নাম রিজওয়ান। এমনিভাবে দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কাজ **আঞ্জাম** দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার অগণিত ফেরেশতা রয়েছেন।

خَلِيفَةً : وَالْخَلِيفَةُ مَنْ يَخْلُفُ غَيْرَهُ وَ يَنُوبُ مَنَابَهُ فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ وَالتَّاءُ لِلْمُبَالَغَةِ অর্থাৎ যে কারো স্থলাভিষিক্ত হয়, তাকে খলীফা বলা হয়।

এ স্থলাভিষিক্ত হওয়া বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকে– ১. অনুপস্থিতি ২. মারা যাওয়া ৩. অক্ষম হওয়া এবং ৪. **مُسْتَخْلِفٌ** -এর সম্মান প্রকাশ করা। ইমাম রাগিব (র.) -এর ভাষায়–

اَلْخِلَافَةُ النِّيَابَةُ مِنَ الْغَيْرِ اِمَّا لِغَيْبَةِ الْمَنُوْبِ عَنْهُ وَاِمَّا لِمَوْتِهٖ وَاِمَّا لِعَجْزِهٖ اِمَّا التَّشْرِيْفُ الْمُسْتَخْلِفُ ـ (رَاغِب)

এখানে শেষোক্তটি উদ্দেশ্য। সসীম বান্দার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার অসীম সত্তার কাছ থেকে উলূম ও আহকাম সরাসরি লাভ করার যোগ্যতা না থাকার কারণে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে তাঁর খলীফা নিযুক্ত করেছেন। রুটি যেমন সরাসরি আগুনে দিলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যায় এবং সঠিক উপায়ে রুটি ভাজার জন্য মধ্যখানে তাওয়া বা কড়াইয়ের মধ্যস্থতার প্রয়োজন হয়; অনুরূপভাবে বান্দারও সরাসরি আল্লাহ তা'আলার নূর তথা উলূম আহকাম লাভে অক্ষম বিধায় নবী-রাসূলদেরকে মধ্যস্থতা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ قَالُوْا أَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ الخ : ফেরেশতাদের আপত্তির রহস্য : ফেরেশতাদের এ উক্তিটি আপত্তি বা গোস্তাখীমূলক ছিল না। যেমনটি কেউ কেউ মনে করেছেন। কারণ ফেরেশতারা গোস্তাখী করতেই পারে না; বরং ফেরেশতা এ উক্তিতে পরিপূর্ণ সমর্পন, আত্মত্যাগ ও ওয়াফাদারীর পরিচয় ছিল। জনৈক মুহাক্কিক আলেম বলেন–

لَيْسَ عَلٰى وَجْهِ الْاِعْتِرَاضِ عَلَى اللّٰهِ وَلَا عَلٰى وَجْهِ الْحَسَدِ لِبَنِيْ اٰدَمَ كَمَا قَدْ يَتَوَهَّمُهُ بَعْضُ الْمُفَسِّرِيْنَ ـ (اِبْنِ كَثِيْر)

এ প্রসঙ্গে অধিকতর সুন্দর জবাব দিয়েছেন হাকীমুল উম্মাত আশরাফ আলী থানভী (র.)। তিনি লিখেন, কেউ না কেউ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ও খুনাখুনিকারী হবে। খেলাফতের দায়িত্ব আমাদেরকে দেওয়া হলে আমরা সর্বাত্মকভাবে তা আঞ্জাম দিব। আর মানবজাতির সকলে তা আঞ্জাম দিবে না; বরং যারা অনুগত হবে তারাই কেবল মনে প্রাণে দায়িত্ব পালন করবে; কিন্তু যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ও জালেম হবে, তাদের থেকে সে দায়িত্ব পালনের কি আশা করা যায়। সারকথা, যখন দায়িত্ব পালন করার মতো একটি দল বিদ্যমান রয়েছে, তখন একটি নতুন মাখলুক- যাদের কেউ দায়িত্ব পালন করবে কেউ করবে না- এ দায়িত্বের জন্য সৃষ্টি করার কি প্রয়োজন রয়েছে? এটা আপত্তি স্বরূপ বা নিজেদের অগ্রাধিকার দাবি স্বরূপ ছিল না; বরং বিষয়টি এমন যেমন কোনো হাকেম নতুন একটি প্রকল্প করে তার জন্য স্বতন্ত্র আমলা নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে পুরাতন আমলাদের সামনে ব্যক্ত করলেন, তখন তারা স্বীয় আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে নিবেদন করল- জাহাপনা! এ কাজের জন্য যাদেরকে নিযুক্ত করছেন, তাদের সম্পর্কে আমরা কোনো সূত্রে জানতে পেরেছি যে, তন্মধ্যে কতিপয় ভালোভাবে দায়িত্ব পালন করবে আর কতিপয় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। এতে জাহাপনা মন অপ্রসন্ন হবে। এ সবের কি দরকার। আমরাইতো আছি। সর্বদা জাহাপনার জন্য জান বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। যে কোনো কাজই হোক না কেন তা পালনে আমরা বদ্ধপরিকর। আমাদের উপর আরোপিত দায়িত্বসমূহ পালনসহ নতুন যে কোনো কাজ আমরা সানন্দে পালন করব। –[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ৭০]

قَوْلُهُ يُفْسِدُ فِى الْاَرْضِ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ : অর্থাৎ **قُوَّت شَهَوَاتِيَة** -এর চাহিদায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং **قُوَّت غَضَبِيَة** -এর চাহিদানুযায়ী খুনাখুনি করবে। প্রতিটি মানুষের মাঝে তিনটি শক্তি রয়েছে। তাহলো **شَهَوَاتِيَّه ـ غَضَبِيَّه ـ عَقْلِيَّه** প্রথম দুটির মাধ্যমে মানুষ **نَقْص** বা অপরাধমূলক কাজ করে আর শেষোক্তটি দ্বারা মর্যাদাপূর্ণ কাজ করে। ফেরেশতারা প্রথম দুটির চাহিদার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছে এবং শেষোক্তটির চাহিদার কথা ভুলে বসেছিল। –[হাশিয়ায়ে জামাল : খ. ১, পৃ. ৫৫]

قَوْلُهُ كَمَا فَعَلَ بَنُو الْجَانِّ الخ : প্রশ্ন : ফেরেশতারা আদমের ব্যাপারে যে বনী সকল মন্তব্য করেছিল, এটা কি **তারা গায়েব** জানার ভিত্তিতে বলেছিল?

উত্তর : ফেরেশতারা গায়েব জানে না। তারা গায়েবের ভিত্তিতে এ কথা বলেননি; বরং মানবজাতির পূর্বে পৃথিবীতে জিনদের বসবাস ছিল। তারা পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের অন্যায় অবিচার ও বিশৃঙ্খলামূলক কাজ করেছিল। জিনদের কর্মকাণ্ডের প্রতি কিয়াস বা ধারণা করেই তারা এ মন্তব্য করেছিল। আল্লামা সুয়ূতী (র.) **كَمَا فَعَلَ بَنُو الْجَانِّ الخ** বলে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন। তাফসীরে মা'আলিমুত তানজীলে এসেছে– **كَمَا فَعَلَ بَنُوا الْجَانِّ فَقَاسُوا الشَّاهِدَ عَلَى الْغَائِبِ**

ইবনে কাসীরে এসেছে– **وَاِنَّهُمْ قَاسُوْهُمْ عَلٰى مَنْ سَبَقَ**

بَنُو الْجَانِّ : মানুষের মাঝে আদমের অবস্থান যেমন, জিনদের মাঝে جَانٌّ -এর অবস্থানও তেমন। সে জিনদের আদি পিতা। যেমন হযরত আদম (আ.) মানবজাতির আদি পিতা। কেউ বলেন, তাদের আদি পিতা হলো ইবলীস। আর ইবলীসেরই আরেক নাম হলো শয়তান। -[হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১, পৃ. ৫৬]

আদম সৃষ্টি প্রসঙ্গে ফেরেশতাদের সাথে আলোচনার তাৎপর্য : একথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, ফেরেশতাদের সমাবেশে আল্লাহ পাকের এ ঘটনা প্রকাশ করার তাৎপর্য কি এবং এতে কি উদ্দেশ্য নিহিত ছিল? তাদের থেকে পরামর্শ গ্রহণ, না তাদেরকে এ সম্পর্কে নিছক অবহিত করণ না ফেরেশতাদের ভাষায় এ সম্পর্কে তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করানো?

একথা সুস্পষ্ট যে কোনো বিষয় বা সমস্যা সম্পর্কে পরামর্শের প্রয়োজনীয়তা তখনই দেখা দেয়, যখন সমস্যার সমস্ত দিক কারো কাছে অস্পষ্ট থাকে; নিজস্ব অভিজ্ঞান ও জ্ঞান সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা না থাকে। আর তখনই কেবল অন্যান্য জ্ঞানী-গুণীদের সাথে পরামর্শ করা হয়। অথবা পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সেখানেও হতে পারে, যেখানে অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ সমঅধিকার সম্পন্ন হয়। তাই তাদের অভিমত জানার উদ্দেশ্য পরামর্শ করা হয়। যেমনটি বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের সাধারণ পরিষদসমূহে প্রচলিত। কিন্তু একথা সুস্পষ্ট যে, এ দুটোর কোনোটাই এ ক্ষেত্রে প্রযোজন্য নয়। মহান আল্লাহ তা'আলা গোটা বস্তুজগতের স্রষ্টা এবং প্রতিটি বিন্দুবিসর্গ সম্পর্কে তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। তাঁর প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার সামনে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, দুশমনি ও অদৃশ্য সবকিছুই সমান। তাই তার পক্ষে কারো সাথে পরামর্শ করার কি প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে।

অনুরূপভাবে এখানে এমনও হয় যে, সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত- যেখানে প্রত্যেক সদস্য সমাধিকার সম্পন্ন বলে প্রত্যেকের পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যক হতে পারে। কেননা, আল্লাহ পাকই সবকিছুর স্রষ্টাও মালিক। ফেরেশতা ও মানব-দানব সবই তাঁর সৃষ্টি এবং সবই তার আয়ত্তাধীন। তাঁর কোনোকাজ বা পদক্ষেপ সম্পর্কে কারো কোনো প্রশ্ন তোলার অধিকার নেই যে এ কাজ কেন করা হলো বা কেন করা হলো না। لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ আল্লাহ পাকের কাজ সম্পর্কে কোনো প্রশ্নের অবকাশ নেই, কিন্তু অন্যান্য সবাইকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে প্রশ্নের সম্মুখীত হতে হবে।

সারকথা, প্রকৃত প্রস্তাবে এখানে পরামর্শ গ্রহণ উদ্দেশ্যও নয় এবং এর কোনো আবশ্যকতাও ছিল না। কিন্তু রূপ দেওয়া হয়েছে পরামর্শ গ্রহণের যাতে মানুষ পরামর্শরীতি এবং তার প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা লাভ করতে পারে। যেমন কুরআন পাকে রাসূলে কারীম ﷺ -কে বিভিন্ন কাজে ও ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অথচ তিনি ছিলেন ওহীর বাহক। তাঁর সব কাজকর্ম এবং তাঁর প্রত্যেক অধ্যায় ও দিক ওহীর মাধ্যমেই বিশ্লেষণ করে দেওয়া হতো। কিন্তু তাঁর মাধ্যমে পরামর্শ গ্রহণ রীতির প্রচলন করা এবং উম্মতকে তা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্য তাঁকেও পরামর্শ গ্রহণের তাকীদ দেওয়া হয়েছে। -[মাআরিফুল কুরআন : মুফতি মুহাম্মদ শফী (র.)]

قَوْلُهُ مُتَلَبِّسِيْنَ : এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে এদিকে যে, بِحَمْدِكَ বাক্যটি نُسَبِّحُ -এর যমীর থেকে حَال مُتَدَاخِلَه হয়েছে। কেননা এটি حَال -এর حَال হয়েছে। আর بَاء হরফটি مُلَابَسَت বা সহ অর্থ বুঝানোর জন্য এসেছে। অর্থাৎ পবিত্রতা বর্ণনার সাথে সাথে প্রশংসার সদা সঙ্গতা প্রকাশের জন্য (أَيْ تَسْبِيْحًا مُقَيَّدًا بِحَمْدِكَ وَ مُتَلَبِّسًا بِهِ)

قَوْلُهُ فَاللَّامُ زَائِدَةٌ : أَيْ وَالْكَافُ مَفْعُوْلُ نُقَدِّسُ

وَالْجُمْلَةُ حَالٌ : অর্থাৎ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ বাক্যটি اَتَجْعَلُ -এর যমীর থেকে حَال হয়েছে। আর نُقَدِّسُ -এর عَطْف হয়েছে نُسَبِّحُ -এর উপর। مَعْطُوْف এবং مَعْطُوْف عَلَيْه মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة হয়ে نَحْنُ মুবতাদার খবর হয়েছে।

نُسَبِّحُ ও نُقَدِّسُ -এর মাঝে পার্থক্য : تَسْبِيْح হলো জবান দ্বারা তাসবীহ পড়া আর تَقْدِيْس হলো অন্তরে আল্লাহ তা'আলার জাত ও সিফাত সম্পর্কে পবিত্রতার বিশ্বাস রাখা।

وَفَائِدَةُ الْجَمْعِ بَيْنَ التَّسْبِيْحِ وَالتَّقْدِيْسِ وَاِنْ كَانَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ تَرَادُفَهُمَا أَنَّ التَّسْبِيْحَ بِالطَّاعَاتِ وَالْعِبَادَاتِ، وَالتَّقْدِيْسِ بِالْمَعَارِفِ فِيْ ذَاتِ اللّٰهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ أَيِ التَّفَكُّرُ فِيْ ذٰلِكَ ـ (جَمَل ٥٦)

قَوْلُهُ لِسَبْقِنَا لَهُ : এ অংশটুকুর সম্পর্ক হলো اَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنَّا -এর সাথে। আর وَرُؤْيَتِنَا مَا لَمْ يَرَهُ -এর সম্পর্ক بِاَنْ
قَبْضَةً مِنْهُ ولا قَبَضَ : অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে মাটি দ্বারা আদমকে সৃষ্টি করলেন।

মাটির কান্না : হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলেন, তখন মাটিকে অবহিত করে বললেন, হে মাটি! আমি তোমার থেকে এমন এক জাতি সৃষ্টি করবো, যাদের মধ্যে আমার অনুগত ও নাফরমান উভয় ধরনের লোক হবে। যে আমার আনুগত্য করবে, আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর যে আমার নাফরমানি করবে, তাকে জাহান্নামে দিব। তখন মাটি বলল, হে আল্লাহ! আপনি আমার দ্বারা এমন জাতি সৃষ্টি করবেন, যারা জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হ্যাঁ। তখন মাটি কাঁদতে শুরু করে। তার কান্নার অশ্রুধারা থেকেই পৃথিবীতে ঝর্ণাসমূহ বয়ে চলছে। -[তাফসীরে খাজিনের সূত্রে হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১, পৃ. ৫৬]

অনুবাদ :

٣١. وَ عَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاۤءَ اَىْ اَسْمَاءَ الْمُسَمَّيَاتِ كُلَّهَا حَتَّى الْقَصْعَةَ وَالْقُصَيْعَةَ وَالْفَسْوَةَ وَالْفُسَيَّةَ وَالْمِغْرَفَةَ بِاَنْ اَلْقَى فِىْ قَلْبِهِ عِلْمَهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ اَيِ الْمُسَمَّيَاتِ وَفِيْهِ تَغْلِيْبُ الْعُقَلَاءِ عَلَى الْمَلٰۤئِكَةِ فَقَالَ لَهُمْ تَبْكِيْتًا اَنْۢبِـُٔوْنِىْ اَخْبِرُوْنِىْ بِاَسْمَاۤءِ هٰۤؤُلَاۤءِ الْمُسَمَّيَاتِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ . فِىْ اَنِّىْ لَا اَخْلُقُ اَعْلَمَ مِنْكُمْ اَوْ اَنَّكُمْ اَحَقُّ بِالْخِلَافَةِ وَجَوَابُ الشَّرْطِ دَلَّ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهُ .

৩১. এবং তিনি আদমকে যাবতীয় বিষয়ের নাম শিক্ষা দিলেন এমন কি বড় ছোট পেয়ালা, চামচ ও বাতকর্মের শব্দ সম্পর্কে পর্যন্ত তিনি শিক্ষা দিলেন। অর্থাৎ তাঁর হৃদয়ে এগুলোর বোধ ও জ্ঞান সঞ্চার করলেন। তৎপর প্রকাশ করলেন সে সমুদয় অর্থাৎ এ বিষয়সমূহ। এ স্থানে عَرَضَهُمْ -এর هُمْ সর্বনামটি ব্যবহার করা হয়েছে- تَغْلِيْبُ الْعُقَلَاءِ বা বোধসম্পন্ন প্রাণীসমূহের প্রাধান্য প্রদান করে। ফেরেশতাদের সম্মুখে এবং তাদেরকে নিশ্চুপ ও লাজা-ওয়াব করার উদ্দেশ্যে বললেন, এই সমুদয় বিষয়সমূহের নাম আমাকে বলে দাও আমাকে অবহিত কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও যে, তোমাদের অপেক্ষা অধিক জ্ঞানসম্পন্ন কোনো মাখলুক আমি সৃষ্টি করব না বা তোমরাই প্রতিনিধিত্ব করার অধিক যোগ্যতা রাখ।

اِنْ كُنْتُمْ -এই আয়াতে শর্তবাচক اِنْ -এর জবাবের উপর পূর্ববর্তী বাক্য اَنْۢبِـُٔوْنِىْ ইঙ্গিতবহ। সুতরাং পুনর্বার সর্বনামটি ব্যবহার করা হয়েছে।

٣٢. قَالُوْا سُبْحٰنَكَ تَنْزِيْهًا لَكَ عَنِ الْاِعْتِرَاضِ عَلَيْكَ لَا عِلْمَ لَنَاۤ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِيَّاهُ اِنَّكَ اَنْتَ تَاكِيْدٌ لِلْكَافِ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ الَّذِيْ لَا يَخْرُجُ شَيْءٌ عَنْ عِلْمِهِ وَحِكْمَتِهِ .

৩২. তারা বলল, আপনি মহান। আপনার কর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হতে আপনি পবিত্র! আমাদেরকে যা যে বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের তো কোনো জ্ঞান নেই। বস্তুত আপনিই জ্ঞানময় ও প্রজ্ঞাময়। কোনো বিষয়ই তার জ্ঞান ও সূক্ষ্মদর্শিতার বাইরে নয়। اِنَّكَ -এর اَنْتَ শব্দটি اِنَّكَ -এর দ্বিতীয় পুরুষবাচক সর্বনাম ك -এর تَاكِيْد বা জোর বুঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে।

٣٣. قَالَ تَعَالٰى يٰۤاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ اَيِ الْمَلٰۤئِكَةَ بِاَسْمَاۤئِهِمْ اَيِ الْمُسَمَّيَاتِ فَسَمَّى كُلَّ شَيْءٍ بِاِسْمِهِ وَذَكَرَ حِكْمَتَهُ الَّتِىْ خُلِقَ لَهَا فَلَمَّاۤ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَاۤئِهِمْ قَالَ تَعَالٰى لَهُمْ مُوَبِّخًا اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مَا غَابَ فِيْهِمَا وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ تُظْهِرُوْنَ مِنْ قَوْلِكُمْ اَتَجْعَلُ فِيْهَا الخ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ . تُسِرُّوْنَ مِنْ قَوْلِكُمْ لَنْ يَخْلُقَ رَبُّنَا خَلْقًا اَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنَّا وَلَا اَعْلَمَ

৩৩. আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে আদম! তাঁদেরকে ফেরেশতাদেরকে এগুলোর [এই বিষয়সমূহের] নাম বলে দাও। অনন্তর তিনি প্রতিটি জিনিসের নাম এবং তা সৃষ্টির তাৎপর্য বর্ণনা করে দিলেন। [যখন সে ফেরেশতাদেরকে সমস্ত বস্তুসমূহের নাম বলে দিলেন, তিনি [আল্লাহ তা'আলা] ভর্ৎসনার স্বরে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আকাশ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বস্তু অর্থাৎ এতদোভয়ের মাঝে যা কিছু অগোচর সেই সম্বন্ধে আমি অবহিত এবং তোমরা যা ব্যক্ত কর অর্থাৎ আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে' এই যে কথা তোমরা প্রকাশ করেছিলে তা এবং যা তোমরা গোপন কর লুকিয়ে রাখ, যেমন, তোমাদের এই ধারণা করা যে, আমাদের অপেক্ষা অধিক মর্যাদাসম্পন্ন ও জ্ঞানী কোনো কিছু আমাদের প্রভু সৃষ্টি করবেন না। তাও নিশ্চিতভাবে আমি জানি।

٣٤. وَ اذْكُرْ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ سُجُوْدَ تَحِيَّةٍ بِالْاِنْحِنَاءِ فَسَجَدُوْاۤ اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ ـ هُوَ اَبُو الْجِنِّ كَانَ بَيْنَ الْمَلٰئِكَةِ اَبٰى اِمْتَنَعَ مِنَ السُّجُوْدِ وَاسْتَكْبَرَ تَكَبَّرَ عَنْهُ وَقَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ فِىْ عِلْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى ـ

৩৪. আর স্মরণ কর যখন ফেরেশতাদের বললাম আদমকে সেজদা কর মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মানসূচক সেজদা কর। ইবলীস ব্যতীত সকলেই সেজদা করল; সে জিন সম্প্রদায়ের আদি পিতা। ফেরেশতাদের মাঝে বসবাসরত ছিল। সে অমান্য করল সেজদা করতে অস্বীকার করল ও অহংকার করল আত্মম্ভরিতা প্রদর্শন করল এবং বলল, আমি তার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আর আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে পূর্ব হতেই সে কাফেরদের অন্তরর্ভুক্ত ছিল।

তারকীব ও তাহকীক

تَبْكِيْتًا : اَىْ تَوْبِيْخًا وَاِسْكَاتًا يُقَالُ بَكَّتَهُ بِكَذَا وَ بَكَّتَهُ عَلَيْهِ اَىْ قَرَّعَهُ عَلَيْهِ ـ وَاَلْزَمَهُ حَتّٰى عَجَزَ مِنَ الْجَوَابِ (جَمَل)

قَوْلُهُ اَنْبِئُوْنِىْ : نَبَأٌ অর্থ গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। আর خَبَر অর্থ সাধারণ সংবাদ।

قَوْلُهُ تَحِيَّةً : حَيَّ يُحَيِّىْ -এর মাসদার। অর্থ সালাম বা অভিবাদন জ্ঞাপন করা। বলা হয় حَيَّاكَ اللّٰهُ

قَوْلُهُ اِبْلِيْسَ : এ শব্দটি مُشْتَق এবং غَيْر مُشْتَق হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। সঠিক মত হলো এটি অনারবি শব্দ। عُجْمَة এবং عَلَم হওয়ার কারণে غَيْر مُنْصَرِف আর যদি اِبْلَاس [নৈরাশ্য ও হতাশা] থেকে নির্গত হয়ে থাকে, তাহলে مُنْصَرِف হবে।

وَجَوَابُ الشَّرْطِ دَلَّ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهُ : অর্থাৎ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ -এর جَوَاب شَرْط উহ্য রয়েছে। আর دَال - عَلَى الْحَذْفِ বা উহ্য থাকার প্রতি দালালতকারী বাক্যটি হলো পূর্বের اَنْبِئُوْنِىْ ফেয়েল। ইবারতটি হবে এভাবে اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ اَنْبِئُوْنِىْ আর ইমাম সিবওয়াই -এর মতে যেহেতু شَرْط কে مُقَدَّم করা জায়েজ আছে সেহেতু جَوَابُ الشَّرْطِ -কে মাহজুফ ধরার প্রয়োজন নেই; বরং পূর্বে বর্ণিত اَنْبِئُوْنِىْ -ই তার جَوَابُ الشَّرْطِ হবে। মুসান্নিফ (র.) وَجَوَابُ الشَّرْطِ الخ বলে মূলত শেষোক্ত মতের খণ্ডন করেছেন।

اِسْتَكْبَرَ : শব্দটির عَطْف হয়েছে اَبٰى -এর সাথে। এটি عَطْفُ الْعِلَّةِ عَلَى الْمَعْلُوْلِ -এর মূলনীতির আলোকে হয়েছে। অর্থাৎ اِسْتَكْبَرَ হলো ইল্লত আর اَبٰى হলো مَعْلُوْل

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاۤءَ كُلَّهَا : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে ভূ-পৃষ্ঠের অন্তর্গত সৃষ্ট বস্তুসমূহের নাম, গুণাগুণ, বিস্তারিত অবস্থা ও যাবতীয় লক্ষণাদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান দান করলেন। এ শেখানোটা ছিল কোনো মাধ্যম ছাড়া সরাসরি ইলহামের মাধ্যমে।

اٰدَم : এটি অনারবি নাম। তার থেকে কোনো শব্দ নির্গত হয় না এবং গায়রে মুনসারিফ।

হযরত আদম (আ.)-এর পরিচয় : হযরত আদম (আ.) প্রথম মানব। এজন্য তাঁকে বলা হয় আবুল বাশার [মানবের পিতা]। খলীফাতুল্লাহ উপাধির প্রথম ধারক এই প্রথম মানব হযরত আদম (আ.) জান্নাত থেকে পৃথিবীতে আগমন করলেন, তখন সম্ভবত দাজলা-ফুরাত বিধৌত অঞ্চলে বসবাস করেন, বর্তমানে যাকে ইরাক বলা হয়। তাওরাতে হাবীল, কাবীল ও শীছ তাঁর এই তিন সন্তানের নাম পাওয়া যায়। একই সূত্র মতে তাঁর আয়ুষ্কাল ছিল ৯৩০ বছর। -[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ৭২]

আদম নামকরণের কারণ : আরবি ভাষায় প্রথম মানবের নামের সার্থকতা কি? কেউ বলেন, ভূ-ত্বক তথা أَدِيْم থেকে সৃষ্ট বলেই তিনি আদম। আর কারো কারো মতে দেহের পিংগল বর্ণের (أُدُوْمَةٌ) কারণে। –[প্রাগুক্ত]

اَلْأَسْمَاءُ দ্বারা কেবল বস্তুর নাম উদ্দেশ্য নয়; বরং তার তারা উদ্দেশ্য أَشْخَاص وَمُسَمَّيَات তথা ব্যক্তি বা বস্তুর নাম, গুণাগুণ, উপকারিতা ইত্যাদি। অর্থাৎ নামের সঙ্গে সঙ্গে গুণাগুণ ও উপকারিতা সম্পর্কে জ্ঞান দান করা হয়েছে। কেননা শুধু নামতো একটি ধ্বনিমাত্র। এ ধ্বনি শ্রবণে মনের মাঝে কোনো আকৃতি উদয় হয় না। আল্লামা রাগিব (র.) এ বিষয়টিই এভাবে বলেছেন– إِنَّ مَعْرِفَةَ الْأَسْمَاءِ لَا تَحْصُلُ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ الْمُسَمّٰى وَحُصُوْلِ صُوْرَتِهٖ فِى الضَّمِيْرِ .

আর নামের সঙ্গে বস্তুর আকৃতি ও লক্ষ্যণাদি শেখানোর ফলেই তো হযরত আদম (আ.) জিজ্ঞাসা করার সঙ্গে সঙ্গে সবকিছুর নাম বলতে সক্ষম হয়েছেন। –[প্রাগুক্ত]

قَوْلُهٗ أَسْمَاءَ الْمُسَمَّيَاتِ : এর দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اَلْأَسْمَاءُ-এর أَلِف لَامْ টি مُضَاف إِلَيْه-এর عِوَض হিসেবে। আর مُضَاف إِلَيْه টি হলো اَلْمُسَمَّيَاتِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন।

হাশিয়ায়ে জামালে উল্লেখ আছে, আল্লামা সুলায়মান (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে পৃথিবীর সকল ভাষাও শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু তার সন্তানরা তাতে ভিন্নতা সৃষ্টি করেছে। কেউ আরবি ভাষাকে গ্রহণ করেছে এবং বাকিগুলো ভুলে গেছে। কেউ তুর্কী ভাষা গ্রহণ করেছে এবং বাকিগুলো বর্জন করেছে।

حَتَّى الْقَصْعَةَ : كُلَّهَا এটি أَسْمَاء-এর তাকীদ। সকল বস্তুকে অন্তর্ভুক্ত না করার সন্দেহকে দূর করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা কারো সংশয় হতে পারত যে, সম্ভবত সম্মানিত ও বড় বড় বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন, তুচ্ছ ও ছোট ছোট বস্তুর ইলম তাকে দেননি। এই সংশয় নিরসনের জন্যই كُلَّهَا বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। মুফাসসির (র.)-ও حَتَّى الْقَصْعَةَ الخ বলে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

حَتَّى الْقَصْعَةَ الخ : أَيْ حَتَّى الْوَضِيْعَ وَالْحَقِيْرَ وَحَتَّى الذَّوَاتَ وَالْمَعَانِيْ .

قَصْعَة অর্থ বড় পাত্র, আর قُصَيْعَة অর্থ– ছোট পাত্র।

اَلْفَسْوَةَ : وَفِى الْمِصْبَاحِ : فَسَا يَفْسُوْ مِنْ بَابِ عَدَا يَعْدُوْ
وَالْإِسْمُ الْفُسَاءُ وَهُوَ رِيْحٌ يَخْرُجُ مِنْ غَيْرِ صَوْتٍ . (جَمَل : صـ٥٧ جـ١)

اَلْمِغْرَفَة এটি اِسْم اٰلَه-এর সীগাহ অর্থ– চামচ।

قَوْلُهٗ ثُمَّ عَرَضَهُمْ وَفِيْهِ تَغْلِيْبُ الْعُقَلَاءِ :

প্রশ্ন : আল্লাহ তা'আলা عَرَضَهُمْ বললেন কেন? এতে তো মনে হয় নামের জিনিসগুলো ذَوِى الْعُقُوْلِ বা বিবেকবান জাতীয়। কেননা هُمْ শব্দটি তাদের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়, বিবেক-বুদ্ধিহীন জিনিস সম্পর্কে ব্যবহৃত হয় না।

উত্তর : মূলত বিবেকবান ও বিবেক-বুদ্ধিহীন সব জিনিসকেই তাতে শামিল করা হয়েছে। আরবি নিয়মে একে তাগলীব তথা একটির উপর অপরটির প্রাধান্য দান বলা হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী–

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى بَطْنِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى رِجْلَيْنِ ـ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى أَرْبَعٍ (اَلنُّوْر : ٤٥)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সমস্ত জীব-জন্তুকে পানি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। পরে তাদের মধ্যে কেউ পেটের উপর ভর করে হামাগুড়ি দিয়ে চলে, কেউ দুই পায়ের উপর ভর দিয়ে চলে, আবার কেউ চলে চার পায়ের উপর ভর দিয়ে।

এতে বিবেকবান ও বিবেকহীন উভয় শ্রেণির সৃষ্টিই শামিল রয়েছে; কিন্তু সকলকেই বিবেকবান পর্যায়ের ধরা হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) وَفِيْهِ تَغْلِيْبُ الْعُقَلَاءِ দ্বারা এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهٗ ثُمَّ عَرَضَهُمْ :

বস্তুসমূহ কিভাবে পেশ করা হয়েছিল? : হাদীস শরীফে এসেছে, আল্লাহ তা'আলা বস্তুগুলোকে পিপীলিকার মতো ক্ষুদ্রাকারে পেশ করেছিলেন। ذَات বা বাহ্যিক অস্তিত্ব সম্পন্ন বস্তুসমূহের ক্ষেত্রে তো পদ্ধতিটা সুস্পষ্ট। কিন্তু যেগুলো مَعَانِى-এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন আনন্দ, জ্ঞান, অজ্ঞতা, শক্তি ইচ্ছা– সেগুলো পেশ করার অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-এর মনে সেগুলোর ধরন ও প্রকৃতি প্রক্ষেপন করেছিলেন। ফলে তিনি তা অনুভব ও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং আল্লাহ তা'আলা সেগুলোর নাম শিখিয়ে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ قَالُوْا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا : হযরত আদম (আ.)-কে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়ে এবং তার মুখে সেগুলোর নাম উচ্চারণ করিয়ে ফেরেশতাদের সামনে আদম সৃষ্টির রহস্য উন্মোচন করে দিয়েছেন। অপর দিকে পৃথিবী পরিচালনার জন্য ইলমের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যখন ফেরেশতাদের সামনে আদম সৃষ্টির রহস্য ও ইলমের গুরুত্ব উদ্ভাসিত হলো তখন তারা নিজেদের জ্ঞান ও অনুভবের অসম্পূর্ণতা স্বীকার করে নিল।

سُبْحَانَكَ : এটি মাসদার। এটি সবর্দা مُضَافٌ এবং مَنْصُوْبٌ হয়ে ব্যবহৃত।

سُبْحَانَكَ : وَسُبْحَانَ مَصْدَرٌ كَغُفْرَانٍ وَلَا يَكَادُ يُسْتَعْمَلُ إِلَّا مُضَافًا مَنْصُوْبًا بِإِضْمَارِ فِعْلِهِ . كَمَعَاذَ اللّٰهِ وَتَصْدِيْرُ الْكَلَامِ بِهِ إِعْتِذَارٌ عَنِ الْاِسْتِفْسَارِ وَالْجَهْلِ بِحَقِيْقَةِ الْحَالِ . وَلِذٰلِكَ جُعِلَ مِفْتَاحُ التَّوْبَةِ . فَقَالَ مُوْسٰى صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ . «سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ» (اَلْاَعْرَافُ : ١٤٣) وَقَالَ يُوْنُسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ . «سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ» (اَلْاَنْبِيَاءُ : ٨٧) جَمَل . بِحَوَالَةِ الْبَيْضَاوِيْ .

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ : **যোগসূত্র :** পূর্বের আয়াতে ফেরেশতা ও জিন জাতির উপর হযরত আদম (আ.)-এর ইলমি বা জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্ব সাব্যস্ত হয়েছে। তারপর আল্লাহ তা'আলা আমলী দিক দিয়েও হযরত আদম (আ.)-এর ফজিলত ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করার জন্য ফেরেশতা ও জিনদের মাধ্যমে তার বিশেষ ধরনের সম্মান দেখিয়েছেন। যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত আদম (আ.) উভয়দিক দিয়েই কামিল মুকাম্মাল। এ আয়াতে হযরত আদম (আ.)-এর আমলি সম্মান সাব্যস্ত করা হয়েছে।

سُجُوْدُ تَحِيَّةٍ بِالْاِنْحِنَاءِ : **অর্থাৎ হযরত আদম (আ.)-এর সেজদার তাৎপর্য :** সেজদার ব্যাখ্যায় إِنْحِنَاء শব্দ উল্লেখ করে এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে سَجْدَةٌ-এর আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য। তা হলো تَذَلُّلٌ مَعَ تَطَامُنٍ বা নত হওয়া। قَالَ اَبُوْ عَمْرٍو : سَجَدَ إِذَا طَأْطَأَ نَفْسَهُ

এমনিভাবে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভাই ও পরিবারবর্গ হযরত ইউসুফ (র.) প্রতি যে সেজদা করেছিল, তা ও এই পর্যায়েরই কাজ ছিল। সেজদার আভিধানিক অর্থই এখানে উদ্দেশ্য। কেননা ইবাদত আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্যের জন্য জায়েজ নেই। তবে সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন জায়েজ। নত হয়ে সম্মান করা পূর্ববর্তী জাতির মাঝে প্রচলন ছিল। উম্মতে মুহাম্মদিয়াতে তা জায়েজ নেই। হাদীস দ্বারা তা মানসূখ হয়ে গেছে। এ উম্মতের সম্মান প্রদর্শন ও অভিবাদন হলো সালাম-মোসাফাহা।

নবী করীম ﷺ বলেছেন– مَا يَنْبَغِيْ لِبَشَرٍ اَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ وَلَوْ صَلُحَ لِبَشَرٍ اَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْأَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَمِ حَقِّهٖ عَلَيْهَا .

অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির জন্য উচিত নয় অপর ব্যক্তিকে সিজদা করা। এক ব্যক্তির তারই মতো অপর ব্যক্তিকে সিজদা করা যদি ন্যায়সঙ্গত হতো, তাহলে আমি নিশ্চয় স্ত্রীকে হুকুম দিতাম তার স্বামীকে সেজদা করার জন্য। কেননা স্ত্রীর উপর স্বামীর তো অনেক অধিকার রয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, এখানে সেজদা দ্বারা শরয়ী অর্থ তথা– وَضْعُ الْجَبْهَةِ عَلَى الْاَرْضِ উদ্দেশ্য। তাহলে لِاٰدَمَ-এর মাঝে لَام টি إِلٰى-এর অর্থে হবে। অর্থাৎ সেজদা তো আল্লাহ তা'আলার জন্যই করা হয়েছিল, হযরত আদম (আ.) ছিলেন তাদের জন্য কিবলা স্বরূপ। যেমন বায়তুল্লাহর দিকে অভিমুখী হয়ে আল্লাহ তা'আলাকে সেজদা করা হয়ে থাকে। কিন্তু এ অভিমতটি দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য। কেননা তাহলে তাতে হযরত আদম (আ.)-এর প্রতি মর্যাদা প্রদানের ব্যাপারটি প্রমাণিত হয় না। অথচ এখানে হযরত আদম (আ.)-এর সম্মান প্রদর্শনই ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর এ জন্যই তো ইবলীস বলেছিল–

أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا . قَالَ اَرَاَيْتَكَ هٰذَا الَّذِيْ كَرَّمْتَ عَلَيَّ (اَلْاِسْرَاءُ : ٦١ - ٦٢) অর্থাৎ আমি কি সিজদা করবো তাকে যাকে তুমি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছো? তুমি কি লক্ষ্য করনি, এতে করে তুমি আমার উপর তাকে বেশি সম্মানিত করে দেবে।

একথা বলে ইবলীস জানিয়ে দিয়েছে যে, সে যে সিজদা করা থেকে বিরত থাকছে তার কারণ হচ্ছে হযরত আদম (আ.)-কে সেজদা করার জন্য আল্লাহ তা'আলার এই আদেশ দ্বারা হযরত আদম (আ.)-কে অধিক মর্যাদা ও সম্মান দেওয়া হবে।

হযরত আদম (আ.)-কে কেবলার স্থানে দাঁড় করিয়ে সেজদাকারীদেরকে সেজদা করার আদেশ করা হলে, তাতে হযরত আদম (আ.)-এর কোনো ব্যাপার থাকতো না, মর্যাদা দানের ব্যাপারও হতো না, যাতে করে ইবলীসের হিংসা হওয়ার কারণ হতো। যেমন– কাবাকে কিবলা হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তার প্রতি মুখ করেই তো নামাজ পড়া ও সিজদা দেওয়া হয়। তাতে কাবার কোনো মর্যাদা হয় না।

ফায়দা : সেজদার নির্দেশ প্রদানের পর সর্বপ্রথম সেজদা করেছিলেন যথাক্রমে হযরত জিবরাঈল (আ.), হযরত মিকাঈল (আ.), হযরত ইসরাফীল (আ.) ও হযরত আজরাঈল (আ.)। তারপর নিকটতম ফেরেশতা ও অন্যান্যরা। আর সেজদা প্রদানের দিনটি ছিল শুক্রবার দ্বিপ্রহর থেকে আসর পর্যন্ত। -[হাশিয়ায়ে জামাল : খ. ১, পৃ. ৫৯]

هُوَ اَبُو الْجِنِّ كَانَ بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ : এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে একথা বুঝালেন যে, اِلَّا اِبْلِيْسَ হলো مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِع অর্থাৎ ইবলীস ফেরেশতাগণের জিনস বা গোত্রভুক্ত ছিল না; বরং ফেরেশতাদের মাঝে বসবাস করত। تَغْلِيْبًا তাকে ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিজ্ঞ মুফাসসির كَانَ بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ বলে এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

কিন্তু অধিকাংশ মুফাসসির যেমন বগভী, ওয়াহেদী ও কাজি বায়জাভী প্রমুখ বলেন- اِسْتِثْنَاء টি اِسْتِثْنَاء مُتَّصِل হবে। অর্থাৎ ইবলীস ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অন্যথায় ফেরেশতাদের প্রতি নির্দেশিত সিজদার বিধান তাকে শামিল করত না এবং তাদের থেকে ইসতিসনা করাও সহীহ হতো না। অবশ্য সূরা কাহাফে যে اِلَّا اِبْلِيْسَ বলা হয়েছে তার জবাবে তারা বলেন, এর দ্বারা এ ব্যাখ্যার অবকাশ আছে যে, সে কর্মের দিক দিয়ে জিনদের অন্তর্ভুক্ত ছিল আর نَوْع বা ধরনের দিক দিয়ে ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা এর আরেকটি জবাব প্রদান করলেন যে, আভিধানিক অর্থে ফেরেশতাদেরকেও জিন বলা হয়; কেননা তারাও গোপন থাকেন। -[হাশিয়ায়ে জামাল : খ. ১, পৃ. ৬০]

ফেরেশতাদের মাঝে ইবলীসের বসবাস ও তার ঔদ্ধত্যের কারণ : তার এ ঔদ্ধত্যের কারণ এই ছিল যে, পৃথিবীতে জিন জাতির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। আসমানেও তাদের যাতায়াত ছিল। অবশেষে তারা ক্রমে ফেতনা-ফ্যাসাদ ও রক্তারক্তিতে জড়িয়ে পড়ে। ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে তাদের কতককে নিপাত করে এবং কতককে মরুভূমি, পাহাড় ও দ্বীপাঞ্চলে তাড়িয়ে দেয়। তাদের মধ্যে ইবলীস ছিল শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও ইবাদতগুজার। সে নিজে জিনদের অন্যায়-অনাচারে জড়িত ছিল না বলে প্রকাশ করল। ফলে ফেরেশতাগণ তার জন্য সুপারিশ করল। সে নিষ্কৃতি পেয়ে গেল। এরপর থেকে সে ফেরেশতাদের মাঝেই থাকতে লাগল। এবারে সমস্ত জিনের স্থলে সে একাই হবে পৃথিবীর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। এ লালসায় সে নিরলস পরিশ্রমে ইবাদত-বন্দেগী করে যেতে লাগল এবং পৃথিবীর খেলাফতের স্বপ্ন দেখতে থাকল। অবশেষে যখন আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.) সম্বন্ধে খেলাফতের ফরমান ঘোষণা করলেন, তখন সে নিরাশ হয়ে গেল এবং তার লোক দেখানো ইবাদত নিষ্ফল হওয়ার কারণে হিংসায় ও ক্ষোভে যা করার করল ও অভিশপ্ত হলো। -[উসমানী পৃ. ৮, টীকা-৫]

قَوْلُهُ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ : اَبٰى আদেশ মান্য করতে অস্বীকৃতি জানাল। وَاسْتَكْبَرَ শব্দটি স্পষ্ট করে দিল যে, আদেশ অমান্যকরণের ভিত্তি কোনো ভুল ধারণা কিংবা দ্বিধা-সংশয় নয়; বরং আত্ম-অহংকারই ছিলো এর ভিত্তি। শ্রেষ্ঠত্ববোধ থেকেই এসে ছিল এ অস্বীকৃতি। -[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ৭৮]

প্রশ্ন : নিয়ম অনুযায়ী عِلَّتْ টি مَعْلُوْل -এর উপর মুকাদ্দাম হয়ে থাকে। বিপরীতটি হয় না। এখানে اِبَاء -কে আগে এবং اِسْتِكْبَار -কে পরে এনে তারতীবের খেলাফ করা হয়েছে। কেননা অহংকার আগে করা হয় তারপর অস্বীকার করা হয়।

উত্তর : এখানে مَعْلُوْل তথা অস্বীকৃতি হলো প্রকাশ্য এবং অনুভূত বিষয় আর عِلَّتْ তথা تَكَبُّر হলো مَعْنَوِى এবং غَيْر مَحْسُوْس বিষয়। এ জন্য مَحْسُوْس -কে غَيْر مَحْسُوْس -এর উপর মুকাদ্দাম করা হয়েছে। -[হাশিয়ায়ে জামাল]

اِسْتَكْبَرَ : تَكَبَّرَ -এর ব্যাখ্যায় تَكَبَّرَ উল্লেখ করে এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে بَاب اِسْتِفْعَال -এর খাসিয়াত অনুযায়ী অর্থ হবে না; বরং তা مُبَالَغَة স্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। -[হাশিয়ায়ে জামাল]

وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ فِىْ عِلْمِ اللّٰهِ :

প্রশ্ন : আমরা জানি ইবলীস তো প্রথমে বড় আবেদ ছিল। অথচ এখানে বলা হচ্ছে সে কাফের ছিল। সমাধান কি?

উত্তর : এ প্রশ্নের উত্তরের প্রতি ইঙ্গিত করেই মুফাসসির (র.) فِىْ عِلْمِ اللّٰهِ অংশটি বৃদ্ধি করেছেন। অর্থাৎ মহান আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে সে পূর্ব থেকেই কাফের ছিল, যদিও অন্যদের কাছে প্রকাশ পেয়েছে এই ক্ষণে। আর কেউ কেউ বলেন- كَانَ بِمَعْنٰى صَارَ অর্থাৎ প্রথম থেকেই সে কাফের ছিল এমনটি নয়; বরং নাফরমানি ও আল্লাহ তা'আলার আদেশের অস্বীকৃতি তাকে এখন কাফেরদের দলভুক্ত করে দিয়েছে। নিছক আমল [সিজদা] তরক করার কারণে নয়; বরং অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যানের কারণেই ইবলীসকে কাফের আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কেননা আমল তরক করার কাজ যতই গুরুতর হোক, ঈমানের গণ্ডি থেকে বের করে কুফরির গণ্ডিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতে যথেষ্ট নয়।

-[তাফসীরে উসমানী পৃ. ৮, টীকা. ৬; তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ.৭৮]

সিজদার হুকুম কি জিনদের প্রতিও ছিল? : এ আয়াত যদিও ফেরেশতাদের প্রতি সেজদার নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় কিন্তু اِسْتِثْنَاء দ্বারা জানা যায় যে, এ নির্দেশ জিনদের প্রতিও ছিল। তবে ফেরেশতাদের কথা বলেই ক্ষান্ত করা হয়েছে। কারণ ফেরেশতারা তখন জিনদের থেকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ ছিল। আর যখন উত্তমকে সিজদার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তখন অনুত্তম এমনিতেই উক্ত নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যোগ্যতার মাপকাঠি : সারকথা এটা যে, পরিচালক ও সংশোধনকারীর জন্য ঐ কাজের তত্ত্ব এবং এর উত্থান ও পতন সম্পর্কে অবগত থাকা একটি জরুরি বিষয়। এ ছাড়া পরিপূর্ণভাবে পরিচালনা করা ও সংশোধন করা আদৌ সম্ভব নয়।

এমনিভাবে শরিয়তকে পরিচালনা করার জন্য হালাল ও হারাম, বস্তু -সামগ্রীর অপকারিতা, উপকারিতা, বিশিষ্টতা ও প্রভাব সমূহের অধ্যয়ন, বিভিন্ন পরিভাষা ও ভাষাসমূহ সম্পর্কে অবগতি -এ সমস্ত ব্যাপারে মানুষ যতদূর পর্যন্ত অবগত হতে পারে জিন কিংবা ফেরেশ্‌তা এর সংবাদও রাখতে পারে না। ফেরেশ্‌তাগণের মধ্যে তো ঐ পরিবর্তনসমূহই নেই। যা দ্বারা বিভিন্ন পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে। ফেরেশ্‌তাদের না ক্ষুধা লাগে, না কামভাব হয়। তারা তো ঐ সমস্ত স্বভাবসমূহ থেকে একেবারে অজ্ঞাত।

জিনদের মধ্যে অবশ্যই ঐ সমস্ত পরিবর্তন রয়েছে বটে; কিন্তু এদের স্বভাব মন্দের দিকে অত অধিক ধাবিত যে, মানুষের মতো ভালো দিকে অনুরাগ ও আকর্ষণ থেকে অনেক দূর।

আল্লাহ তা'আলার প্রতিনিধিত্বের যোগ্য মানুষ, ফেরেশ্‌তা নয় : তাই আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের বিরাট মর্যাদার যোগ্য এ অতিশয় জালিম ও অতিশয় অজ্ঞ মানুষই সাব্যস্ত হয়। এর উপর এ সন্দেহ করা ঠিক হবে না যে, ফেরেশতাগণের মধ্যে যখন এ ধরনের যোগ্যতাই নেই, তখন ওহীর বহন করা যা সংশোধনের ভিত্তি, তাদের কাছে কিভাবে অর্পিত হলো?

উত্তর হচ্ছে যে, ফেরেশ্‌তাদের এ ব্যাপারে শুধু বার্তা বহনেরই যোগ্যতা রয়েছে যার জন্য কোনো যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না। হ্যাঁ, হযরত আম্বিয়ায়ে কেরাম যাদের দায়িত্বে সংশোধন ও দাওয়াতের কাজ অর্পণ করা হয়। তাদের জন্য যোগ্যতা ও দায়িত্বের সাথে সম্পৃক্ত থাকার পর পূর্ণ অবগতি অত্যাবশ্যক এবং ঐসব তাদের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকে।

এমনিভাবে এ সন্দেহও করা যাবে না যে, যেমনিভাবে রুচিবোধ ভিন্ন হওয়ার কারণে জিনরা মানুষের সংশোধন করতে পারে না, মানুষও জিনদের সংশোধনের জন্য যথেষ্ট ও দরকারি হতে পারে না?

উত্তর এটা যে, এতদসত্ত্বেও মানুষ ও জিনের মধ্যে এ পার্থক্য রয়েছে যে, মানুষের মধ্যে যে পরিপূর্ণতা পাওয়া যায়, তা জিনদের মধ্যে নেই। তাই মানুষ জিনদেরকে সংশোধন করতে পারে। জিন মানুষকে সংশোধন করতে পারে না। যেমন মন্দের শক্তি তো উভয়ের মধ্যে সংমিশ্রিত আছে বটে; কিন্তু ভালোর গুণে জিন থেকে মানুষ আগে বেড়ে গেছে। অতএব জিনদের মন্দ সমূহের ব্যাপারে মানুষ অবগত। তাই এর সংশোধন ও পরিচর্যা করতে পারে। হ্যাঁ, কারো এ খটকা হয় যে, যেমনিভাবে হযরত আদম (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা বহু জ্ঞান দান করেছেন এবং তিনি প্রতিনিধিত্ব লাভ করেছেন। এমনিভাবে ফেরেশ্‌তাগণকেও যদি শিক্ষা দেওয়া হতো তবে তারাও হযরত আদম (আ.)-এর মোকাবিলায় সফলকাম হতে পারতেন এবং প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব বহন করতে পারতেন?

এর উত্তর হচ্ছে যে, ঐ ইলমের জন্য যে বিশেষ যোগ্যতার প্রয়োজন। তা মানুষের মধ্যে তো সৃষ্টি করা হয়েছে; কিন্তু ফেরেশ্‌তাদের ভাগ্যে জুটেনি। তাই আল্লাহর রীতি নীতি অনুযায়ী পরিপূর্ণ যোগ্যতাকেও তো দেখতে হবে, যা সবচেয়ে বড় শর্ত। এ জন্য আল্লাহর উপর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই এবং হযরত আদম (আ.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানও প্রমাণিত হয়ে গেল

সন্দেহসমূহের নিরসন : এর উপর এ সন্দেহ করা যে, ঐ বিশেষ ক্ষমতা ও যোগ্যতা যা আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের উৎস হয়েছে। ফেরেশ্‌তাদের মধ্যে কেন সৃষ্টি করা হয়নি? উত্তরে বলা যায় যে, ঐ যোগ্যতাটিও মানুষের বৈশিষ্ট্য। যেমন– অনুভূতি ও নড়া-চড়া জীব-এর বৈশিষ্ট্য। যদি ফেরেশতাদের মধ্যে সেটা সৃষ্টি করে দেওয়া হতো, তবে ফেরেশতা আর ফেরেশতা থাকতো না, বরং মানুষ হয়ে যেত। যেমন-প্রাণহীন বস্তুসমূহের মধ্যে অনুভূতি ও নড়া-চড়ার ক্ষমতা সৃষ্টি করে দিলে সেগুলো প্রাণহীন বস্তুর স্থলে প্রাণী হয়ে যেত। সারকথা হলো– আল্লাহ তা'আলা এ ফেরেশ্‌তাদেরকে মানুষ কেন বানাননি? এটা একটি অযথা প্রশ্ন। কেননা ফেরেশ্‌তাদেরকে সৃষ্টি করার মধ্যে তাৎপর্য ও যুক্তিসিদ্ধতা রয়েছে। তা এমতাবস্থায় নিষ্ফল হয়ে যেত। ঐ অযোগ্যতার ও অক্ষমতার কারণে হযরত আদম (আ.)-এর মতো ফেরেশতাদের কাছে ঐ নামগুলো পেশ করা সত্ত্বেও তারা পরীক্ষায় অকৃতকার্য রয়েছে। আর তারা স্পষ্ট ভাবে স্বীকার করেছে যে, [হে প্রতিপালক!] আপনার উপর কোনো অভিযোগ নেই; বরং আমাদের মধ্যে সৃষ্টিগত যোগ্যতা যতটুকু রয়েছে সে অনুযায়ী জ্ঞান প্রদান করুন। আপনার কাছে সর্বপ্রকারের ইলম রয়েছে আপনি প্রজ্ঞাময় যে যে কাজের যোগ্য, তাকে তা-ই দিয়েছেন

اَنْبِئْهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ -এর ব্যাপারে এ প্রশ্ন হতে পারে যে, ফেরেশ্‌তাদের মধ্যে যখন ঐ বিশেষ জ্ঞানের যোগ্যতা ও ক্ষমতাই নেই, তারপর তাদেরকে বলে দেওয়ার দ্বারা কি উপকারিতা রয়েছে? আর যদি উপকারিতা থাকে তবে অসঙ্গতের দাবি ভুল। মূলকথা হচ্ছে যে, কোনো সময় মানুষ কোনো বিষয়কে নিজে তো বুঝে না। কিন্তু ইঙ্গিতসমূহ ও হাবভাব দ্বারা অন্যের ব্যাপারে বিশ্বাস দ্বারা এটা বুঝে আসে যে, সে এ ব্যাপারে বিজ্ঞ এবং সে ভালোভাবে বুঝে গেছে। অতঃপর বলে দাও যে, এখানে এ অর্থ নয় যে, হে আদম (আ.)! ফেরেশ্‌তাদেরকে বুঝিয়ে দাও কিংবা শিখিয়ে দাও; বরং অর্থ এটা যে, এদের সামনে এটা প্রকাশ করো। যাতে তোমার পাণ্ডিত্ব অতি স্পষ্টভাবে তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে যায়। কমপক্ষে তারা এতটুকু বুঝে যায় যে, হযরত আদম (আ.) এ বিদ্যায় পণ্ডিত এবং আমরা অক্ষম।

পৃথিবীর সর্বপ্রথম মাদরাসা শিক্ষক ও ছাত্র : আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম শিক্ষক হওয়া. হযরত আদম (আ.) সর্ব প্রথম ছাত্র হওয়াটা, ভাষাতত্ত্ব সর্ব প্রথম ইল্‌ম হওয়া জানা গেল। এমনিভাবে জ্ঞানসংক্রান্ত পরীক্ষায় হযরত আদম (আ.)-এর সফলকাম এবং ফেরেশ্‌তাগণের বিফলকাম হওয়া জানা গেল যে, এটা হচ্ছে এ ব্যাপারে প্রমাণ যে, প্রতিনিধিত্বের পরিধি হচ্ছে বিদ্যা ও বুদ্ধি এ শর্তের সাথে যে, এর সাথে অপকর্ম মিশ্রণ হতে পারবে না। আমলী সাধনা ও প্রচেষ্টাসমূহ প্রতিনিধিত্ব লাভের পরিধি নয়। ত্বরীকতের মুরব্বীগণ খলীফা বানানোর ক্ষেত্রে এর প্রতিই অধিক লক্ষ্য রাখেন।

পুরস্কার বিতরণ কিংবা পাগড়ি বিতরণ উপলক্ষে জলসা : যখন এ সফলতার উপর হযরত আদম (আ.)-এর জন্য দস্তার নির্ধারিত হয়ে গেল। তখন পুরস্কার বিতরণী জলসা হওয়া জরুরি। যার মধ্যে হযরত আদম (আ.)-এর আমলী উঁচু মর্যাদার প্রকাশ হয়। তাই প্রতিনিধিত্বের আসনে বসার পূর্বে একটি দস্তারবন্দির জলসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যার মধ্যে ফেরেশতাদেরকে সরাসরি এবং কোনো কোনো বর্ণনা মোতাবেক জিনদেরকেও পরোক্ষভাবে বিশেষ বিশেষ রাজকীয় নিয়মাবলি পালনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ইবলীসকে ব্যতীত। সকলেই কর্মক্ষেত্রে হযরত আদম (আ.)-এর নেতৃত্ব ও সরদারি মেনে নিয়েছে। সাধারণ জিনদের আলোচনা পবিত্র কুরআনে সম্ভবত এজন্য করা হয়নি যে, জ্ঞানীরা নিজেরাই বুঝতে পারবে যে, ফেরেশ্‌তাদের উত্তম জামাতকে এ নির্দেশ [সিজদা করার হুকুম] দেওয়া হয়েছে, তবে জিন জাতি যারা ফেরেশতাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট নয়। তারা তো পরিপূর্ণরূপে এ নির্দেশের মধ্যে গণ্য হবে। পরিষ্কার ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। শয়তান হুকুম অমান্য করেছে। এ জন্য বিশেষভাবে তার নাম উল্লেখ করা হয়েছে; বরং এটা হচ্ছে জিন জাতি এ নির্দেশে গণ্য থাকার নিদর্শন। এমতাবস্থায় এস্তেস্‌না مُتَّصِلْ হবে। শয়তান যেহেতু আল্লাহর হুকুমের মোকাবিলা অহংকার দ্বারা করেছে, তাই সে চির বিতারিত হয়েছে। এর দ্বারা অহংকারের বিদ্বেষ আরো বৃদ্ধি হওয়া বরং সমস্ত গুনাহের মূল হওয়া বুঝা গেল। এখনো যদি কেউ শরিয়তের হুকুমের বিরোধিতা ও অস্বীকার করে তাকেও কাফের আখ্যা দেওয়া হবে। –[কামালাইন খ. ১, পৃ. ৫৩]

শয়তানি যুক্তি ও ফিকহ সম্বন্ধীয় যুক্তির পার্থক্য : এর ব্যাখ্যা অহংকার সম্বন্ধীয় অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, যা দ্বারা আল্লাহর ঐ হুকুমের বিরুদ্ধে বিচক্ষণতা ও যুক্তিসিদ্ধতা হওয়া ফুটে উঠে। যার সারাংশ কয়েকটি প্রস্তাবনা দ্বারা মিশ্রিত ক্বিয়াস।

১. প্রথম প্রস্তাবনা এটা যে, خَلَقْتَنِيْ مِنَ النَّارِ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ, অর্থাৎ আমাকে আগুন দ্বারা এবং হযরত আদম (আ.) কে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছ।

২. দ্বিতীয় প্রস্তাবনা এটা যে, আগুন মাটি থেকে উত্তম।

৩. উৎকৃষ্টের শাখা উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্টের শাখা নিকৃষ্ট হয়।

৪. উৎকৃষ্ট দ্বারা নিকৃষ্টের সম্মান করানো জ্ঞান ও বিচক্ষণতার পরিপন্থি।

ফলাফল এটা যে, আমাকে হযরত আদম (আ.)-এর সামনে সিজদা করার নির্দেশ দেওয়া বিচক্ষণতার খেলাফ। বিচক্ষণতার দাবি এটা যে, হুকুম এর বিপরীত হতো, অর্থাৎ হযরত আদম (আ.)-কে আমার সম্মান করার জন্য হুকুম দেওয়া উচিত ছিল।

অথচ এ যুক্তির প্রথম প্রস্তাবনা ব্যতীত সমস্ত প্রস্তাবনা বাতিল। তাই ক্বিয়াসটি অযৌক্তিক। তারপর ফলাফল কিভাবে বিশুদ্ধ বের হতে পারে? ঐ শয়তানী ভ্রান্ত ক্বিয়াস দ্বারা বিশুদ্ধ ও ফিক্‌হ সম্বন্ধীয় যুক্তিকে বাতিল করার উদ্দেশ্যে প্রমাণ পেশ করা সম্পূর্ণরূপে ভুল ও অশুদ্ধ। –[প্রাগুক্ত : ৫৫]

٣٥. وَقُلْنَا يَـٰٓادَمُ اسْكُنْ اَنْتَ تَاكِيْدٌ
لِلضَّمِيْرِ الْمُسْتَتِرِ لِيَعْطِفَ عَلَيْهِ وَ
زَوْجُكَ حَوَّاءُ بِالْمَدِّ وَكَانَ خَلَقَهَا مِنْ
ضِلْعِهِ الْاَيْسَرِ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا
اَكْلًا رَغَدًا وَاسِعًا لَا حَجْرَ فِيْهِ حَيْثُ
شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ
بِالْاَكْلِ مِنْهَا وَهِيَ الْحِنْطَةُ اَوِ الْكَرْمُ
اَوْ غَيْرُهُمَا فَتَكُوْنَا فَتَصِيْرَا مِنَ
الظّٰلِمِيْنَ الْعَاصِيْنَ.

অনুবাদ :

৩৫. এবং আমি বললাম, 'হে আদম! তুমি ও তোমার সঙ্গিনী হাওয়া, এটা মদ্দ ও দীর্ঘালয়ে পড়া হয়। তাঁকে আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-এর বাম পাঁজরের হাড় হতে সৃষ্টি করেছিলেন। জান্নাতে বসবাস কর এবং তার যেথা ইচ্ছা প্রচুর ও বাধাহীন আহার কর। اُسْكُنْ اَنْتَ -এই আয়াতটিতে اَنْتَ যমীর বা সর্বনামটি اُسْكُنْ নির্দেশক ক্রিয়া পদটিতে উহ্য اَنْتَ যমীর বা সর্বনামের تَاكِيْد [জোর সৃষ্টির জন্য] রূপে পরবর্তী শব্দ زَوْجُكَ -কে তার সহিত عَطْف বা অন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। رَغَدًا শব্দটি মূলত كُلَا ক্রিয়াপদের উহ্য مَفْعُوْل مُطْلَق বা সমধাতুজ কর্ম اَكْلًا -এর বিশেষণ। এই দিকে ইঙ্গিত করার জন্য মাননীয় তাফসীরকার رَغَدًا শব্দটির পূর্বে اَكْلًا -এর উল্লেখ করেছেন। আর আহার করতে এ বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না। এটা গম বা আঙ্গুর বা অন্য কোনো বৃক্ষ ছিল। নিকটবর্তী হলে তোমরা সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

٣٦. فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ اِبْلِيْسُ اَذْهَبَهُمَا
وَفِيْ قِرَاءَةٍ فَاَزَالَهُمَا نَحَّاهُمَا عَنْهَا
اَيِ الْجَنَّةِ بِاَنْ قَالَ لَهُمَا هَلْ اَدُلُّكُمَا
عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَقَاسَمَهُمَا بِاللّٰهِ
اَنَّهُ لَهُمَا لَمِنَ النَّاصِحِيْنَ فَاَكَلَا مِنْهَا
فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ. مِنَ النَّعِيْمِ
وَقُلْنَا اهْبِطُوْا اِلَى الْاَرْضِ اَيْ اَنْتُمَا
بِمَا اشْتَمَلْتُمَا عَلَيْهِ مِنْ ذُرِّيَّتِكُمَا
بَعْضُكُمْ بَعْضُ الذُّرِّيَّةِ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ.
مِنْ ظُلْمِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَلَكُمْ فِى
الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ مَوْضِعُ قَرَارٍ وَّمَتَاعٌ
مَا تَمَتَّعُوْنَ بِهِ مِنْ نَبَاتِهَا اِلٰى حِيْنٍ
وَقْتَ اِنْقِضَاءِ اٰجَالِكُمْ.

৩৬. কিন্তু শয়তান অর্থাৎ ইবলীস তা হতে অর্থাৎ জান্নাত হতে তাদের পদস্খলন ঘটাল অর্থাৎ তাদের উভয়কে সরিয়ে দিল। اَزَلَّهُمَا ক্রিয়াটি অপর এক কেরাতে فَاَزَالَهُمَا রূপে পঠিত হয়েছে। এর অর্থ হলো উভয়কে সরিয়ে নিয়ে গেল। তাদেরকে প্রতারণা করে ইবলীস বলেছিল, আমি কি তোমাদেরকে স্থায়ী করার বৃক্ষ প্রদর্শন করব? সে তাদের উভয়ের নিকট শপথ করে বলল, নিশ্চয় আমি তোমাদের হিতকামীদের একজন। ফলে তারা উভয়ে এই বৃক্ষ হতে ভক্ষণ করল। এবং তারা যে সুখ-স্বাচ্ছন্দের আবাসে ছিল সেখান হতে তাদেরকে বহিষ্কৃত করল। আমি বললাম, পৃথিবীর দিকে তোমরা তোমাদের অনাগত সন্তান-সন্ততিসহ নেমে যাও একজন অপরজনের উপর অত্যাচার-উৎপীড়ন করার কারণে একে অন্যের বংশধরদের একজন অপরজনের শত্রুরূপে এবং পৃথিবীতে তোমাদের বসবাস অবস্থানস্থল ও জীবিকা রইল অর্থাৎ তার উপর উদগত বৃক্ষলতা ও শস্যাদি যা তোমরা উপভোগ করবে তা কিছু কালের জন্য অর্থাৎ তোমাদের নির্দিষ্ট বয়ঃসীমা শেষ হওয়া পর্যন্ত।

তাহকীক ও তারকীব

قُلْنَا ফেয়েল ও ফায়েল يَآدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ জুমলা মা'তুফ আলাইহি وَكُلَا জুমলা মা'তুফ। رَغَدًا মাসদার মাহযূফের সিফত হওয়ার প্রতি মুফাস্‌সির (র.) ইঙ্গিত করেছেন। حَيْثُ যরফ। كُلَا আমিল এবং সম্ভাবনা রয়েছে جَنَّتَ থেকে بَدَل হয়ে مَفْعُوْل بِه হতে পারে।

وَلَا تَقْرَبَا জুমলা هٰذِهِ মউসূফ اَلشَّجَرَةَ সিফত উভয়ে মিলে مَفْعُوْل بِه - فَتَكُوْنَ জওয়াবে নাহী -এর نُوْن জযম -এর কারণে পড়ে গেছে। اَزَلَّ - زَلَّتَ অর্থ পদস্খলন কেউ কেউ زَوَالٌ থেকে মেনেছেন। هُمَا মাফ্‌উলে বিহী اَلشَّيْطٰنُ ফায়েল عَنْهَا -এর যমীর اَلشَّجَرَةَ -এর দিকে رَاجِع - اَىْ مُسَبَّبُ الشَّجَرَةِ এবং মুফাস্‌সির (র.) جَنَّت -এর দিকে رَاجِع করেছেন।

فَاَخْرَجَهُمَا জুমলায়ে مَعْطُوْفَه - مِمَّا অর্থ اَلَّذِىْ - اَىْ مِنْ نَعِيْمٍ - اِهْبِطُوْا - هُبُوْط অর্থ نُزُوْل যদি শয়তানের বহিষ্কার করা এখনো বেহেশ্‌ত থেকে হয়েছিল না। তবে বহুবচনের যমীর দ্বারা আদম, হাওয়া ও শয়তান উদ্দেশ্য। নতুবা আদম ও হাওয়া এবং তাদের সন্তানাদি উদ্দেশ্য হবে। بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ জুমলা হালের স্থানে اِهْبِطُوْا থেকে, اَىْ اِهْبِطُوْا مُتَعَادِيْنَ এ জুমলা মুব্‌তাদা -খবরও হতে পারে। আর عَدُوٌّ -কে একবচন আনা হয়েছে হয়তো بَعْض শব্দের কারণে– কিংবা مَصَادِر -এর ওজনে হওয়ার কারণে। যেমন "قَبُوْل" এবং مَصَادِر দু'বচন বা বহুবচন হয় না। مُسْتَقِرٌ মাসদারে مِيْمِى এবং ظَرْف উভয়ভাবে হতে পারে। حِيْن অর্থ– সময়, মৃত্যু।

قَوْلُهُ وَقُلْنَا يَا اٰدَمُ : এ জুমলাটি পূর্বের জুমলা اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ الخ -এর উপর عَطْف হয়েছে। শুধু قُلْنَا ফে'লের উপর নয়। কেননা উভয়টির সময়-কাল এক ছিল না। কিন্তু কেউ কেউ বলেন, عَطْفُ الْفِعْلِ عَلَى الْفِعْلِ তথা قُلْنَا -কে اِذْ -এর উপরও عَطْف করা সহীহ আছে। اِخْتِلَاف زَمَان বা সময়ের ভিন্নতা তার জন্য প্রতিবন্ধক নয়। কেননা اِذْ হলো قُلْنَا -এর মাফ্‌উলে বিহী। তাকদীরী ইবারত হবে নিম্নরূপ–

وَاذْكُرْ وَقْتَ قَوْلِنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا وَقَوْلِنَا لِاٰدَمَ اسْكُنْ اَىْ اُذْكُرِ الْوَقْتَيْنِ وَمَا وَقَعَ فِيْهِمَا (جَمَل : ٦١)

بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ -এর مَحَلِّ اِعْرَاب সম্পর্কে দুটি মত রয়েছে।

১. حَال হিসেবে মানসূব। اَىْ اِهْبِطُوْا مُتَعَادِيْنَ

২. جُمْلَةٌ مُسْتَانِفَةٌ হিসেবে কোনো مَحَلِّ اِعْرَاب নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَنْتَ تَاكِيْدٌ لِلضَّمِيْرِ الْمُسْتَتِرِ لِيَعْطِفَ عَلَيْهِ :

প্রশ্ন : اُسْكُنْ -এর পরে اَنْتَ যমীর আনা হলো কেন?

উত্তর : عَطْف এবং مَعْطُوْف عَلَيْه -এর মাঝে সামঞ্জস্য জরুরি। এ জন্য اُسْكُنْ ফে'লের পরে وَزَوْجُكَ -এর পূর্বে তাকিদ স্বরূপ ইসমে জমীর ব্যবহার করা হয়েছে। যাতে ইসমের عَطْف ইসমের সঙ্গে হয়।

قَوْلُهُ اُسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ : **মাসআলা :** اَنْتَ থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল যে, হযরত আদম (আ.)-ই ছিলেন মূল সম্বোধিত হযরত হাওয়া (আ.)-এর অবস্থান ছিলো تَابِع বা অনুবর্তিনীয়। উক্ত আয়াতে জান্নাত হযরত আদম ও হাওয়া (আ.) উভয়ের বসবাসের স্থান হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। যাকে আরবিতে সংক্ষেপে اُسْكُنَا الْجَنَّةَ বলা যেতো। যেমন وَكُلَا এবং لَا تَقْرَبَا ফে'লদ্বয়ের মাঝে উভয়কে একই সীগায় সম্বোধন করা হয়েছে। এখানে তা না করে اَنْتَ وَ زَوْجُكَ শব্দ ব্যবহার করে শুধু হযরত আদম (আ.)-কে সম্বোধিত সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং এ শব্দেই বলা হয়েছে যে, তোমার স্ত্রীও তোমার সাথে জান্নাতে থাকবে। এ থেকে নিম্নোক্ত দুটি মাসআলার ইঙ্গিত পাওয়া যায়–

দুটি মাসআলা :

১. স্ত্রীর বসবাসের ব্যবস্থা করা স্বামীর দায়িত্ব।

২. এই বসবাসের মাঝে স্ত্রী স্বামীর অনুবর্তিনীয়। যে ঘরে স্বামী থাকবে, স্ত্রীকে সেই ঘরেই থাকা উচিত। -[জামালাইন]

قَوْلُهُ الْجَنَّةَ : এর শাব্দিক অর্থ এমন যে কোনো বাগান, যার গাছগাছালি মাটি ঢেকে ফেলে।

كُلُّ بُسْتَانٍ ذِيْ شَجَرٍ يَسْتُرُ بِأَشْجَارِهِ الْأَرْضَ - (راغب)

শরিয়তের পরিভাষায় জান্নাত হলো অফুরন্ত নিয়ামতে পরিপূর্ণ সেই সুমহান উদ্যান, যা পরকালে পুণ্যবানদের জন্য নির্ধারিত, তবে ইহজগতে আমাদের দৃষ্টি থেকে আচ্ছাদিত। জান্নাত নামকরণ হয়ত এজন্য হয়েছে যে, দূরতম হলেও পৃথিবীর উদ্যানের সাথে তার সাদৃশ্য রয়েছে। কিংবা হয়ত এজন্য যে, জান্নাতের নিয়ামতরাজি আমাদের দৃষ্টি থেকে এখন আচ্ছাদিত আছে। ইমাম রাগিবের ভাষায়-

سُمِّيَتِ الْجَنَّةُ إِمَّا تَشْبِيهًا بِالْجَنَّةِ فِي الْأَرْضِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَإِمَّا لِسَتْرِ نِعَمِهَا عَنَّا -[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ مِنْ ضِلْعِهِ الْأَيْسَرِ : এজন্যই প্রতিটি পুরুষের বাম পাঁজরের একটি হার কম। প্রত্যেকের ডান পাশে ১৮টি হাড় থাকে এবং বাম পাশে থাকে ১৭টি। -[হাশিয়ায়ে জামাল : খ. ১, পৃ. ৬১]

হযরত হাওয়া (আ.)-এর সৃষ্টি যেভাবে হলো : আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-এর চোখে গভীর ঘুম দিয়ে দিলেন। তারপর বাম পাঁজর থেকে একটি হাড় খুলে নেন। সে হাড় থেকে সৃষ্টি করেন হযরত হাওয়া (আ.)-কে। আর হযরত আদম (আ.)-এর সে হাড়ের জায়গাটি গোশত দিয়ে ভরাট করে দেন। -[হাশিয়ায়ে জামাল : খ. ১, পৃ. ৬১]

قَوْلُهُ بِالْأَكْلِ مِنْهَا : বিজ্ঞ মুফাসসির এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে বুঝিয়েছেন যে, لَا تَقْرَبَا -এর মাঝে قُرْبُ مَكَانِي থেকে নিষেধাজ্ঞা উদ্দেশ্য নয়; বরং ভক্ষণ না করার অর্থকে জোরালো করা উদ্দেশ্য। মূলত ফল খাওয়াটাই ছিল নিষিদ্ধ কিন্তু সতর্কতা স্বরূপ বৃক্ষের কাছে ঘেষা থেকে বারণ করা হয়েছিল। যেমনটি রয়েছে আল্লাহ তাআলার বাণী- وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا -এর মাঝে। এজন্যই মাশায়েখে এজাম কখনো কখনো বৈধ বিষয় থেকে বারণ করে থাকেন, যাতে অসতর্কতাবশত অবৈধতার সীমায় প্রবেশ না ঘটে।

قَوْلُهُ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ : অর্থাৎ তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে যারা আল্লাহর হুকুমকে অপাত্রে রেখেছে। ظُلْم -এর মূল অর্থ হলো- وَضْعُ الشَّيْءِ فِيْ غَيْرِ مَحَلِّهِ কোনো বস্তুকে তার নির্ধারিত স্থানে না রাখাই হলো জুলুম।

এই স্পষ্ট ঘোষণা থেকে এটাও পরিষ্কার হয়ে গেল যে, এখনকার মতো তখন জান্নাত পুরস্কার বা অমরত্ব লাভের নিবাস ছিল না, বরং সেখানে আহকাম ও আদেশ-নির্দেশ ছিল। এই যখন ছিল জান্নাতের সে সময়ের স্বরূপ, তখন জান্নাতে শয়তানের প্ররোচনার অনুপ্রবেশ কিংবা আদমের সেখান থেকে বহিষ্কার ইত্যাদির কারণে কোনো প্রশ্ন উত্থাপনের অবকাশ নেই।

-[তাফসীর মাজেদী : খ. ১, পৃ. ৭৯]

قَوْلُهُ أَزَلَّهُمَا : ক্রিয়াটি زَلَّةٌ থেকে নির্গত। অর্থ স্থানচ্যুত করল, পদস্খলন ঘটাল। অবাধ্যতা কিংবা ইচ্ছাকৃত আদেশ লঙ্ঘনের অর্থ তাতে নেই। পিচ্ছিল পথে অনিচ্ছাকৃত পদস্খলনের মতোই এটা।

أَذْهَبَهُمَا وَأَزَالَهُمَا : এ উভয়টি শব্দ বৃদ্ধি করে أَزَلَّهُمَا -এর দুটি অর্থের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে-

১. পদস্খলন ঘটানো।

২. বের করে দেওয়া।

قَوْلُهُ زَلَّةٌ : অর্থ- পদস্খলন, হোঁচট। إِزْلَال অর্থ পদস্খলন ঘটানো। আয়াতের অর্থ হলো- শয়তান হযরত আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.)-এর পদস্খলন ঘটিয়েছে। কুরআনে কারীমের এ শব্দ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-এর এ বিরুদ্ধাচারণটি সাধারণ পাপীদের মতো ছিল না; বরং শয়তানের প্ররোচনায় কোনো ধোঁকায় লিপ্ত হয়েই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়ে ফেলেন।

প্রশ্ন ও জবাব : এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, শয়তান তো হযরত আদম (আ.)-কে সিজদা না করার পরিণতিতে পূর্ব থেকে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত ও বিতাড়িত হয়েছিল। এরপর হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-কে প্ররোচিত করার জন্য কিভাবে জান্নাতে পৌঁছল?

উত্তর : যদিও এ মর্মে কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই যে, শয়তান জান্নাতে প্রবেশ করে তাদেরকে সামনাসামনি প্ররোচিত করেছে, নাকি ওয়াসওয়াসার মাধ্যমে প্ররোচিত করেছে, তবুও প্ররোচিত করার কয়েকটি পদ্ধতি হতে পারে। যথা–

১. সাক্ষাৎ করা ছাড়াই তাঁদের মনে ওয়াসওয়াসা প্রদান করেছে। –[জামালাইন খ. ১, পৃ. ১০০]

২. শয়তান তার নিজস্ব আকৃতি পরিবর্তন করে জান্নাতের কোনো প্রাণীর আকৃতি ধারণ করে [কারো মতে ময়ূর ও সাপের সাথে যোগসাজস করে] প্রবেশ করেছে এবং তাঁদেরকে সামনাসামনি প্ররোচিত করেছে। আর قَاسَمَهُمَا اِنِّىْ لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِيْنَ দ্বারাও বাহ্যত এটি বুঝে আসে যে, শয়তান শুধু ওয়াসওয়াসা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি এবং মৌখিক কথাবার্তা বলে এবং কসম খেয়ে তাদেরকে প্রভাবিত করেছে। –[জামালাইন খ. ১, পৃ. ১০০]

৩. হযরত আদম ও হাওয়া (আ.) জান্নাতে পায়চারি করছিলেন। এক পর্যায়ে তারা জান্নাতের দরজার নিকটবর্তী হন। আর শয়তান বাহির থেকে জান্নাতের দরজার কাছে দণ্ডায়মান ছিল। তখন সে তাদের সাথে কথাবার্তা বলে তাদেরকে প্ররোচিত করে। –[হাশিয়ায়ে জামাল– খ. ১. পৃ. ৬২]

প্রশ্ন : এখানে প্রশ্ন উঠে, হযরত আদম (আ.) তো মাসুম ও নিষ্পাপ ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তিনি কিভাবে আল্লাহ তা'আলার নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করলেন?

উত্তর :

১. তিনি মনে করেছিলেন, نَهِىْ টা ছিল نَهِىْ تَنْزِيْهِى তাহরীমী নয়।

২. তিনি নিষেধাজ্ঞার কথা ভুলে গিয়েছিলেন।

৩. ইবলীস কর্তৃক আল্লাহর নামে কসম খাওয়ার কারণে তিনি মনে করেছিলেন নিষেধাজ্ঞাটি রহিত হয়ে গিয়েছে। কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন আল্লাহ তা'আলার নামে কেউ মিথ্যা কসম খেতে পারে না। –[হাশিয়ায়ে জামাল খ.১, পৃ. ৬৩]

قَوْلُهُ اَلشَّيْطَانُ : শয়তানের পরিচয় : শয়তান হলো সেই দুষ্ট সত্তা, যে আল্লাহ তা'আলার করুণা থেকে দূরে সরে গেছে।

شَيْطَنٌ اَىْ تَبَاعِدُ (رَاغِب) اَلشَّيْطَانُ فَيْعَالٌ مِنْ شَطْنٍ اَىْ بَعُدَ سُمِّىَ بِهِ لِبُعْدِهِ عَنِ الْخَيْرِ وَعَنِ الرَّحْمَةِ (مَعَالِم)

পূর্বোক্ত ইবলীসকেই এখানে গুণবাচক নামে উল্লেখ করা হয়েছে। নাফরমানির কারণে জান্নাত থেকে সে বহিষ্কৃত হয়েছে। মানবের প্রতি রয়েছে তার সুতীব্র বিদ্বেষ। এখন তার নাম হয়েছে শয়তান। পৃথক কোনো ক্ষমতা নেই তার। মানুষকে সে বিন্দুমাত্র মজবুর বা বাধ্য করতে সক্ষম নয়। তবে প্রচারণা ও প্ররোচনা শিল্পের সে শ্রেষ্ঠ শিল্পী। পাপকর্মে মানুষকে প্রলুব্ধ করা এবং অসুন্দরকে সুন্দরের মোড়কে তুলে ধরার কাজে সে অত্যন্ত সুনিপুণ। ওয়াসওয়াসা ও চিত্তবিক্ষেপ ঘটানোর ক্ষমতা তার তীব্র। দূর ও নিকট যে কোনো স্থান থেকেই উদ্দেশ্য সাধনে সে পারঙ্গম। দূরত্ব ও ব্যবধান তার জন্য কোনো সমস্যাই নয় এবং স্থূল প্রতিবন্ধকতা যে কোনো ধরনেরই হোক, তার উদ্দেশ্যের পথে তা অন্তরায় হতে পারে না। –[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ عَنْهَا : এর মাঝে عَنْ হরফটি سَبَب বা হেতু জ্ঞাপক, অর্থ হলো– তার কারণে। আর هَا সর্বনামটি شَجَرَة -এর সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ সেই গাছের কারণে এবং মাধ্যমে শয়তান হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-কে পদস্খলনে নিমজ্জিত করেছে।

কেউ কেউ هَا সর্বনামের উদ্দেশ্য জান্নাতও ধরেছেন। তখন অর্থ দাঁড়াবে, শয়তান তাদেরকে জান্নাত থেকে বিচ্যুত করল।

–[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ৭৯]

قَوْلُهُ وَقَاسَمَهُمَا : اَىْ قَسَمَ لَهُمَا فَالْمُفَاعَلَةُ لَيْسَتْ عَلَى بَابِهَا لِلْمُبَالَغَةِ

قَوْلُهُ مِمَّا كَانَا فِيْهِ : এর দু'ধরনের অনুবাদ হতে পারে, যে নিয়ামতের মাঝে তাঁরা ছিলেন, তা থেকে কিংবা যে মর্যাদায় তারা ছিলেন, তা থেকে। উভয় ব্যাখ্যাই বর্ণিত হয়েছে এবং তাৎপর্য উভয় ক্ষেত্রেই অভিন্ন। اَىْ مِنَ النَّعِيْمِ وَالْكَرَامَةِ اَوْ مِنَ الْجَنَّةِ. (كَشَّاف) –[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ৭৯]

قَوْلُهُ اِهْبِطُوْا : দ্বিবচনের পরিবর্তে বহুবচনের সর্বনাম ব্যবহার করে যেন বুঝিয়ে দেওয়া হলো যে, এ সম্বোধনের পাত্র এখন একা হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-ই নন; বরং তাদের অনাগত বংশধরও সম্বোধনের আওতাভুক্ত।

قَوْلُهُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ : পরস্পরে শত্রুতার মর্ম এও হতে পারে যে, শয়তান এবং বনী আদম পরস্পরে একে অপরের শত্রু হবে। আর এও হতে পারে যে, বনী আদম-ই পরস্পরে শত্রুতা ও দুশমনি রাখবে। -[জামালাইন, খ. ১, পৃ. ১০১]

হযরত আদম (আ.) যে অঞ্চলে অবতরণ করেছেন : হযরত আদম এবং হাওয়া (আ.) পৃথিবীর কোন ভূখণ্ডে অবতরণ করেছেন? এ ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের বর্ণনা রয়েছে।

অধিকাংশ বর্ণনা ভারত ভূখণ্ডের ব্যাপারে পাওয়া যায়। নিম্নে সেগুলোর বিবরণ দেওয়া হলো-

১. ইবনে আবী হাতেম ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আদম (আ.)-কে সাফা পাহাড়ে এবং হযরত হাওয়া (আ.) মারওয়া পাহাড়ে অবতরণ করানো হয়েছিল।
২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত আদম (আ.)-এর অবতরণ ভারত ভূখণ্ডে হয়েছে। -[ফাতহুল কাদীর, শাওকানী]
৩. অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত ইবনে আবী হাতেম থেকে বর্ণিত, মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী স্থানে হযরত আদম (আ.)-এর অবতরণ হয়েছে।
৪. আর ইবনে আবী সা'য়াদ এবং ইবনে আসাকির (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, যে হযরত আদম (আ.) ভারতে অবতরণ করেছেন এবং হযরত হাওয়া (আ.) জিদ্দায় অবতরণ করেছেন। পরবর্তীতে হযরত আদম (আ.) হাওয়া (আ.)-এর খোঁজে জিদ্দায় আগমণ করেন।
৫. তাফসীরে খাজিনে আছে হযরত আদম (আ.) ভারতের সরন্দীপ এ এবং হযরত হাওয়া (আ.) জিদ্দায় অবতরণ করেন। আর ইবলিস অবতরণ করে বসরার আয়লা নামক স্থানে। -[তাফসীরে খাজিন খ. ১, পৃ. ৫]

উপরিউক্ত বর্ণনাসমূহ ছাড়াও আরো অনেক পরস্পর বিরোধী বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু সেগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করাও সম্ভব। এ কথা স্পষ্ট যে, প্রকৃত অবতরণ এক-ই জায়গায় হয়েছে। পরবর্তীতে বিভিন্ন স্থানে স্থানান্তরিত হয়েছেন বিধায় জায়গার কথা বলেছেন। -[জামালাইন খ. ১. পৃ. ১০২]

বোকাদের বেহেশত : মু'তাযিলা সম্প্রদায় ও বস্তুবাদী সম্প্রদায় বেহেশতকে অস্বীকার করে। তাদের ধারণায় তো আদন বলতে সিরিয়া ও মিশরের কোনো বাগান উদ্দেশ্য। যেখানের আনন্দ থেকে এ দু'জনকে বের করা হয়েছে। এমনিভাবে যারা বেহেশত থেকে তাদের অবতরণ করাকে স্বীকার করে তারপর তারা এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত পোষণ করে যে, সর্বপ্রথম কোথায় অবতরণ করেছেন? কেউ বলে ইরান, কেউ বলে মিশর এবং অধিকাংশ ঐতিহাসিকগণ হিন্দুস্তানের ভূ-খণ্ড সরন্দীপের কথা বলেন। তারপরও আরাফাতে হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-এর সাক্ষাৎ হয়েছে। তাই এ স্থানকে আরাফাত বলা হয়। আর ওখানেই কোনো স্থানে হযরত হাওয়া (আ.)-এর ওফাত হয়েছে "জিদ্দাহ" তে তার কবরের চিহ্ন আছে। বলা হয় এ শহর এর নামকরণের কারণও এটাই। এ ব্যাপারে এটা একটি নিদর্শন যে, হযরত আদম (আ.)-ও হেজাযেই কোথাও হয়তো অবস্থান করেছেন এবং ইন্তেকালও করেছেন।

সীমানার সংরক্ষণ : وَلَا تَقْرَبَا الخ আয়াত দ্বারা প্রকৃত শায়খগণের ঐ অভ্যাসের মূলনীতি বের হয়ে আসে যে, কোনো কোনো সময় তারা শরিয়তের পক্ষ থেকে অনুমোদিত কার্যাবলি থেকেও বিরত থাকেন। যাতে করে অনুমতিবিহীন কাজের দিকে ধাবিত না হয়ে যায়। যেমন উল্লিখিত বৃক্ষের নিকটে যাওয়া সরাসরি কোনো প্রকার মন্দ কাজ ছিল না; বরং বৈধ ছিল। কিন্তু খাওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য এটাকেও নিষেধ করে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ الخ : আয়াতে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, যাকে নিষেধ করা হয়েছে সেও যেন নিজেকে শয়তানি ষড়যন্ত্র থেকে নিরাপদ মনে না করে

অনুবাদ :

৩৭. فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمَاتٍ اَلْهَمَهُ اِيَّاهَا وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِنَصْبِ اٰدَمَ وَرَفْعِ كَلِمَاتٍ اَيْ جَاءَتْهُ وَهِيَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا (اَلْاٰيَةُ) فَدَعَا بِهَا فَتَابَ عَلَيْهِ ط قَبِلَ تَوْبَتَهُ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ عَلٰى عِبَادِهِ الرَّحِيْمُ بِهِمْ ـ

৩৭. অতঃপর আদম তার প্রতিপালকের নিকট হতে কিছু বাণী প্রাপ্ত হলো। অর্থাৎ এই বাণীসমূহ আল্লাহ তা'আলা তার উপর ইলহাম করেন। অপর এক কেরাতে اٰدَمُ শব্দটি نَصْب এবং كَلِمَات শব্দটি رَفْع সহকারে পঠিত রয়েছে। এতদনুসারে এর মর্ম হলো হযরত আদম (আ.) -এর নিকট কিছু বাণী আসল। উক্ত বাণীসমূহ হলো رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি। যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর তাহলে অবশ্য আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো। অনন্তর হযরত আদম (আ.) এই বাণীসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করলেন। আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি ক্ষমাপরবশ হলেন অর্থাৎ তিনি তাঁর দোয়া কবুল করলেন। নিশ্চয় তিনি তার বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত ক্ষমা পরবশ এবং তাদের সাথে পরম দয়ালু।

৩৮. قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا مِنَ الْجَنَّةِ جَمِيْعًا كَرَّرَهُ لِيَعْطِفَ عَلَيْهِ فَاِمَّا فِيْهِ اِدْغَامُ نُوْنِ اِنِ الشَّرْطِيَّةِ فِيْ مَا الْمَزِيْدَةِ يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى كِتَابٌ وَرَسُوْلٌ فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَاٰمَنَ بِيْ وَعَمِلَ بِطَاعَتِيْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ فِي الْاٰخِرَةِ بِاَنْ يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ ـ

৩৮. আমি বললাম, তোমরা সকলেই এই স্থান অর্থাৎ জান্নাত হতে নেমে যাও। قُلْنَا পরবর্তী বাক্যটিকে এর সাথে عَطْف করার উদ্দেশ্যে এই বাক্যটির تَكْرَار বা পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। অনন্তর যখন আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সৎপথের কোনো নির্দেশ কিতাবও রাসূল আসবে, তখন যারা আমার সৎপথের নির্দেশ অনুসরণ করবে অর্থাৎ আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আমার আনুগত্য অবলম্বন করবে পরকালে তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না অর্থাৎ তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। اِمَّا শব্দটি শর্তবাচক শব্দ اِنْ-এর ن অক্ষরটিকে مَا زَائِدَة বা অতিরিক্ত مَا -এর م -এ اِدْغَام বা সন্ধি করা হয়েছে।

৩৯. وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيَاتِنَا كُتُبِنَا اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ مَاكِثُوْنَ اَبَدًا لَا يَفْنَوْنَ وَلَا يَخْرُجُوْنَ ـ

৩৯. যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে ও আমার নির্দেশসমূহকে আমার কিতাবসমূহকে অস্বীকার করে তারাই জাহান্নামবাসী। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। অনন্তকাল সেখানে তারা অবস্থান করবে। তাদের বিনাশও হবে না এবং তারা বের হতেও পারবে না।

তাহকীক ও তারকীব

فَتَلَقّٰى ফেয়েল اٰدَمُ ফায়েল كَلِمَاتٍ মাফউল মাউসূফ مِنْ رَّبِّهٖ সিফত। কিন্তু مُقَدَّم হওয়ার কারণে حَال এবং مَنْصُوْب

فَتَابَ عَلَيْهِ জুমলা اِنَّهُ هُوَ-এর মধ্যে যমীরে فَصْل তাকীদ مُتَّصِل ইসম। اَلتَّوَّابُ الرَّحِيْمُ -এর স্থানে রয়েছে

মউসূফ সিফত খবর। قُلْنَا এর مَقُوْلَه হচ্ছে اِهْبِطُوْا . كَرَّرَهُ দ্বারা জালাল (র.) এ বাক্যটিকে দ্বিতীয়বার আনার কারণ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ জুমলার عَطْف বিশুদ্ধ হওয়া বলছেন। আর এটাও হতে পারে যে, প্রথমটি হুকুম ছিল এবং এর উপর কার্যকর ব্যবস্থাও প্রয়োগ করানো হচ্ছে। কেননা দয়াশীল মনিব যখন কাউকে বহিষ্কারের নির্দেশ দেন, তখন সাথে সাথেই বিছানা-পাটি বাহিরে নিক্ষেপ করান না। অথবা শুধু হুকুমের তাকিদের জন্য দ্বিতীয়বার এনেছেন, কিংবা هُبُوْط اَوَّل দ্বারা উদ্দেশ্য বেহেশ্‌ত থেকে দুনিয়ার [নিম্নের] আকাশে অবতরণ এবং দ্বিতীয় هُبُوْط দ্বারা উদ্দেশ্য দুনিয়ার আকাশ থেকে জমিনে নেমে আসা। فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ এর মধ্যে إِنْ শর্তিয়ার তাকিদের জন্য مَا এসে এর মধ্যে সংযুক্ত হয়ে গেছে। ফেয়েল فَاعِل ও মাফ্‌উল এবং مَا জুমলায়ে শর্তিয়াহ। فَمَنْ تَبِعَ মুব্‌তাদা مُتَضَمِّن শর্ত ও জাযা فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ -এর জওয়াব। এসব মিলে مُتَعَلِّق -এর জওয়াব হয়েছে। وَالَّذِيْنَ জুমলা فَمَنْ تَبِعَ -এর উপর عَطْف হয়েছে।

خَوْف ও حُزْن -এর ব্যাখ্যা :

اَلْخَوْفُ غَمٌّ يَلْحَقُ الْاِنْسَانَ مِنْ تَوَقُّعِ أَمْرٍ فِى الْمُسْتَقْبِلِ وَالْحُزْنُ غَمٌّ يَلْحَقُهُ مِنْ فَوْتٍ فِى الْمَاضِى (جَمَل)

কোনো বিপদ আপতিত হওয়ার আগে তজ্জন্য যে কষ্ট ও আশঙ্কা হয়, তার নাম خَوْف আর আপতিত হওয়ার পর যে দুঃখ হয় তাকে বলা হয় حُزْن যেমন– কোনো রুগ্ন ব্যক্তির মরে যাওয়ার কল্পনায় যে কষ্ট অনুভূত হয়, সেটা خَوْف : আর মরে যাওয়ার পর যে বেদনা সঞ্চার হয় তাকে حُزْن বলা হয়। –[তাফসীরে উসমানী পৃ. ৯, টীকা. ৫]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَتَلَقَّى اٰدَمُ مِنْ رَبِّهٖ كَلِمَاتٍ : **আদম (আ.)-এর তওবা :** হযরত আদম (আ.) যখন লজ্জিত হয়ে দুনিয়াতে আগমন করলেন, তখন তিনি তওবা ইস্তিগফারে লিপ্ত হয়ে গেলেন। সে সময়েও আল্লাহ তা'আলা তাকে পথ-নির্দেশ দিয়ে ক্ষমা চাওয়ার কিছু বাক্য শিখিয়ে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ وَهِىَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا الخ : এটি বিশুদ্ধতম মত অনুযায়ী। কেউ বলেন, সে বাক্যটি ছিল নিম্নরূপ–

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ اِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ . (بَيْضَاوِى)

قَوْلُهُ فَتَابَ عَلَيْهِ : পূর্বে বর্ণিত কোনো এক কারণে যদিও **হযরত** আদম (আ.)-এর জন্য নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়াটা **গুনাহ ছিল না;** কিন্তু তা তার জন্য অনুমতি ছিল। তাই বাহ্যত সেটাকে مَعْصِيَت বা গুনাহ বলেই অভিহিত করা হয়েছে এবং **জান্নাত থেকে** বের করে দিয়ে সেই গুনাহের শাস্তি দেওয়া হয়েছে। মূলত এটি حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِيْنَ এ **মূলনীতির** আলোকে বিবেচ্য।

কেউ বলেন, হযরত আদম (আ.) পৃথিবীতে অবতরণ করার পর ৩০০ বৎসর পর্যন্ত লজ্জায় আকাশের দিকে মাথা উত্তোলন করেননি। **কেউ বলেন,** গোটা জমিনবাসীর চোখের অশ্রু একত্র করা হলেও হযরত দাউদ (আ.)-এর চোখের অশ্রু অধিক হবে। আর হযরত দাউদ (আ.)-সহ সকল মানুষের অশ্রু একত্র করা হলে হযরত আদম (আ.)-এর অশ্রু বেশি হবে

–[তাফসীরে খাযিন সূত্রে হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১, পৃ. ৬৪]

মানবজাতির আবাসস্থল দুনিয়া : আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-এর তাওবা কবুল করলেন, কিন্তু তখনই জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি দিলেন না; বরং দুনিয়াতে বসবাস করার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা বহাল রাখলেন। কেননা এটাই তার প্রস্তুত ও সার্বিক কল্যাণের অনুকূল ছিল। বলাবাহুল্য, তাঁকে পৃথিবীর জন্য খলিফা বানানো হয়েছিল, জান্নাতের জন্য নয়

–[তাফসীরে উসমানী]

প্রশ্ন : ভুল তো করেছিলেন দুজন। কিন্তু দোয়ার মাঝে তওবা ইস্তেগফারকে একজন তথা হযরত আদম (আ.)-এর প্রতি সম্পৃক্ত করা হলো কেন?

উত্তর : নারীগণ পুরুষের অনুগামী হয়ে থাকে। আর مَتْبُوْع-এর আলোচনায় تَابِع এমনিতেই অন্তর্ভুক্ত থাকে। তাই হযরত আদম (আ.)-এর কথা বলেই ক্ষান্ত করা হয়েছে। তবে সূরা আরাফের আয়াতে উভয়ের কথাই বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে- قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا (اَعْرَاف : ٢٣)

قَوْلُهُ كَرَّرَهُ لِيَعْطِفَ عَلَيْهِ : এ বাক্যে একটি দ্বারা سُؤَال مُقَدَّر-এর জবাব প্রদান করা করেছেন। প্রশ্নের ভূমিকা : আয়াতে قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا-কে দ্বিতীয়বার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম هُبُوْط দ্বারা মেহনত ও চেষ্টা সাধনার ক্ষেত্র দুনিয়ার দিকে অবতরণকে বুঝানো হয়েছে। যেখানে জীবিকা নির্বাহের জন্য বহু মেহনত করতে হবে। পরস্পরে একে অপরের লড়াই-ঝগড়া হবে। আর এ هُبُوْط টি হবে একটি নির্ধারিত সময়ের জন্য। আর দ্বিতীয় هُبُوْط টি দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ অস্থায়ী ও সাময়িক অবস্থানের মাঝে মানুষ শরিয়তের বিধি-বিধানের ও মুকাল্লাফ হবে। এ থেকে বুঝা গেল যে, দুবার অবতরণের উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন।

প্রশ্ন : উভয় মাকসাদকে একই هُبُوْط দ্বারা সম্পৃক্ত করা হলো কেন?

উত্তর : এমনকি করা সম্ভব ছিল। কিন্তু মধ্যখানে فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ জুমলায়ে মু'তারিজাটি এসেছে বিধায় هُبُوْط-কে তাকরার করা হয়েছে। যাতে দ্বিতীয় মাকসাদটি দ্বিতীয়টির সাথে এবং প্রথম মাকসাদটি প্রথমটির সাথে মিলিত হয়। এ উদ্দেশ্যের দিকে ইঙ্গিত করেই মুফাসসির (র.) لِيَعْطِفَ عَلَيْهِ বাক্যটি বৃদ্ধি করেছেন। এখানে عَطْف শব্দ দ্বারা পারিভাষিক عَطْف উদ্দেশ্য নয়; বরং عَطْف দ্বারা اِتِّصَال [সংযোগ] বুঝানো উদ্দেশ্য।

আর কেউ বলেন, প্রথম অবতরণের নির্দেশ ছিল জান্নাত থেকে দুনিয়ার আকাশে আর দ্বিতীয় অবতরণের নির্দেশ ছিল সেখান থেকে জমিনে।

فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ : যেন বলা হচ্ছে- আমি তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে দিলেও তোমাদেরকে আমার এমন হেদায়েত দ্বারা ধন্য করব, যা তোমাদেরকে পুনরায় জান্নাতে পৌছাবে। আর সে পৌছানোটা হবে চিরস্থায়ী।

-[খাজিন সূত্রে হাশিয়ায়ে জামাল]

اِمَّا মূলত اِنْ مَا ছিল। اِنْ হলো شَرْطِيَّة আর مَا অতিরিক্ত। তাকিদের জন্য আনা হয়েছে। আর এ কারণেই পরের ফে'লকেও তাকিদসহ আনা হয়েছে।

فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ : এ বাক্যটি جُمْلَة شَرْطِيَّه جَزَائِيَّة হয়ে اِنْ شَرْطِيَّه-এর جَوَاب হয়েছে।

بِاَنْ يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ : এর সম্পর্ক হলো فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ-এর সাথে।

وَالَّذِيْنَ-এর عَطْف হয়েছে فَمَنْ تَبِعَ الخ-এর সাথে। যেন বলা হয়েছে- وَمَنْ لَمْ يَتَّبِعْ بَلْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَكَذَّبُوْا بِاٰيَاتِهٖ

অনুবাদ :

٤٠. يٰبَنِىٓ اِسْرَآئِيْلَ اَوْلَادَ يَعْقُوْبَ اذْكُرُوا نِعْمَتِىَ الَّتِىٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ اَىْ عَلٰى اٰبَائِكُمْ مِنَ الْاِنْجَاءِ مِنْ فِرْعَوْنَ وَفَلْقِ الْبَحْرِ وَتَظْلِيْلِ الْغَمَامِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ بِاَنْ تَشْكُرُوْهَا بِطَاعَتِىْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِىْ الَّذِىْ عَهِدْتُهٗ اِلَيْكُمْ مِنَ الْاِيْمَانِ بِمُحَمَّدٍ ﷺ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ الَّذِىْ عَهِدْتُهٗ اِلَيْكُمْ مِنَ الثَّوَابِ عَلَيْهِ بِدُخُوْلِ الْجَنَّةِ وَاِيَّاىَ فَارْهَبُوْنِ خَافُوْنِ فِىْ تَرْكِ الْوَفَاءِ بِهٖ دُوْنَ غَيْرِىْ.

৪০. হে বনী ইসরাঈল! অর্থাৎ ইয়া'কুব সন্তানগণ আমার সেই অনুগ্রহকে তোমরা স্মরণ কর যা দ্বারা আমি অনুগ্রহ করেছি তোমাদেরকে তোমাদের পিতৃপুরুষদেরকে। যেমন– ফিরআউনের অত্যাচার হতে মুক্তি প্রদান, সমুদ্র বিদীর্ণ, মেঘের ছায়া প্রদান ইত্যাদি, অর্থাৎ আমার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করত, আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। এবং আমার অঙ্গীকার পূরণ কর মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর ঈমান আনয়ন সম্পর্কে আমার সাথে তোমাদের যে অঙ্গীকার হয়েছিল আমিও তোমাদের সাথে এর বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করানোর যে অঙ্গীকার করেছিলাম সেই অঙ্গীকার পূরণ করব, এবং তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর। অঙ্গীকার প্রতিপালন না করার বিষয়ে আমাকেই ভয় কর, অন্য কাউকে নয়।

٤١. وَاٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِنَ التَّوْرٰىةِ بِمُوَافَقَتِهٖ لَهٗ فِى التَّوْحِيْدِ وَالنُّبُوَّةِ وَلَا تَكُوْنُوْآ اَوَّلَ كَافِرٍ بِهٖ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لِاَنَّ خَلْفَكُمْ تَبَعٌ لَّكُمْ فَاِثْمُهُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا تَشْتَرُوْا تَسْتَبْدِلُوْا بِاٰيٰتِىْ الَّتِىْ فِىْ كِتَابِكُمْ مِنْ نَعْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ ثَمَنًا قَلِيْلًا. عِوَضًا يَسِيْرًا مِنَ الدُّنْيَا اَىْ لَا تَكْتُمُوْهَا خَوْفَ فَوَاتِ مَا تَأْخُذُوْنَهٗ مِنْ سُفْلَتِكُمْ وَاِيَّاىَ فَاتَّقُوْنِ خَافُوْنِ فِىْ ذٰلِكَ دُوْنَ غَيْرِىْ.

৪১. আর ঈমান আনয়ন কর তার প্রতি, যা আমি অবতীর্ণ করেছি অর্থাৎ আল কুরআন সমর্থকরূপে যা তোমাদের নিকট আছে তার অর্থাৎ তাওরাতের ; কারণ তাওহীদ ও নবুয়ত সম্পর্কে এই দুই কিতাব একটি আর একটির অনুরূপ। আর কিতাবীদের মধ্যে তোমরাই এর প্রথম প্রত্যাখ্যানকারী হয়ো না কেননা তোমাদের পরবর্তীগণ তোমাদের অনুগত ও অনুবর্তী সুতরাং তাদের পাপ তোমাদের উপরই বর্তাবে এবং তোমরা আয়াতের অর্থাৎ তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবে মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে যে প্রশংসা ও বিবরণ রয়েছে তার বিনিময় ক্রয় করো না অর্থাৎ এর পরিবর্তে গ্রহণ করো না তুচ্ছ মূল্য জগতের এই অতি সামান্য বিনিময়। অর্থাৎ ভক্ত ও অনুবর্তীগণের নিকট হতে যে উপঢৌকন পাও, তা হারাবার ভয়ে ঐ সমস্ত আয়াত গোপন করো না। তোমরা শুধু আমাকে ভয় কর অর্থাৎ এই বিষয়ে কেবল আমাকেই ভয় কর, অন্য কাউকে নয়।

٤٢. وَلَا تَلْبِسُوا تَخْلِطُوْا الْحَقَّ الَّذِىْ اَنْزَلْتُ عَلَيْكُمْ بِالْبَاطِلِ الَّذِىْ تَفْتَرُوْنَهٗ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ نَعْتَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ.

৪২. তোমরা সত্যকে যা আমি তোমাদের নিকট অবতীর্ণ করেছি, তা মিথ্যার সাথে যা তোমরা নিজেরা গড়, মিশ্রিত করো না অর্থাৎ তার সংমিশ্রণ করো না এবং সত্য অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রশংসা ও বিবরণসমূহ গোপন করো না, অথচ তোমরা জান যে, তা সত্য।

তাহকীক ও তারকীব

أَوْفُوا بِعَهْدِيْ أُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ইত্যাদি তারকীবে اُذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ জুমলা মা'তূফ আলাইহি। মুনাদা রَبِّيْ : بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ জুমলায়ে শর্তিয়ে মা'তূফ أُوْفِ মজযূম হওয়ার কারণে يْ পড়ে গেছে। يَّايَ মানসূব, فَارْهَبُوْنِ মাহযূফ থেকে اِرْهَبُوْا অমর حَاضِر مُذَكَّر جَمْع-এর সীগাহ, বেকায়া ইয়ায়ে مُتَكَلِّم মাফউল ছিল। وَقْف-এর কারণে يَا পড়ে গেছে। نِ-এর নীচে যের يَ-এর চিহ্ন হিসেবে বাকি রয়েছে। উক্ত تَعْلِيْل ই فَاتَّقُوْنِ-এর মধ্যে হবে এবং উভয় স্থানে التَّقَدُّمْ مَا مَا اَنْزَلْتُ اَيْ। আমার حَقُّهُ التَّاخِيْرُ يُفِيْدُ التَّخْصِيْصَ-এর বিধান অনুযায়ী حَصْر হবে। اٰمِنُوْا মা'তূফ হচ্ছে اَوْفُوْا-এর উপর। مَا اَنْزَلْتُهُ মাউসূল সেলা মিলে مَقُوْل - مُصَدِّقًا হলো مُؤَكِّد مَعَكُمْ - মানসূব عَلَى الظَّرْفِ এর মধ্যে فَاعِل হচ্ছে اِسْتِقْرَاء - لَا تَكُوْنُوْا ও اٰمِنُوْا-এর উপর মা'তূফ। اَوَّلَ সীবওয়াই -এর দৃষ্টিতে عَيْن কালিমায় وَاو-এর দ্বারা কোনো فِعْل হয় না। এর مُؤَنَّث হচ্ছে اُوْلٰى - بِكَافِر শব্দ হিসেবে একবচন অর্থ হিসেবে বহুবচন। لَا تَلْبِسُوْا ফেয়েল ও ফায়েল, الْحَقَّ মাফউল জুমলা مَاقَبْل-এর উপর عَطْف - تَكْتُمُوْا মাজযূম ও মা'তূফ تَلْبِسُوْا-এর উপর। তাই জালাল (র.) لَا نَهِي প্রথমে مُقَدَّر নিয়েছেন। حَقّ বলা হয় বাস্তব ও مُحْكِيْ عَنْهُ বর্ণনার মুওয়াফেক হওয়া। এটা بَاطِل-এর বিপরীত। আর صِدْق বলা হয় বর্ণনাটি مُحْكِيْ عَنْهُ-এর মুতাবেক এটা كِذْب-এর বিপরীত। মোটকথা حَقّ ও صِدْق - بَاطِل ও كِذْب-এর মধ্যে বিবেচনার ভিত্তিতে পার্থক্য রয়েছে। وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ জুমলা হবে حَال।

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ : অর্থাৎ হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর সন্তান ইবরানী বা হিব্রু ভাষায় ইয়াকূব (আ.)-এর নাম ইসরাঈল। اِسْرَائِيْل শব্দটি আরবি, না আজমি: এ নিয়ে মতভেদ আছে। বিশুদ্ধ মতে শব্দটি আজমি বা অনারবি। এটি عُجْمَة এবং عَلَم হওয়ার কারণে غَيْرُ مُنْصَرِف হয়েছে। اِسْرَائِيْل শব্দটি মুরাক্কাবে এজাফী বা দুটি শব্দের আরবি অর্থ– عَبْدُ اللّٰهِ বা আল্লাহর বান্দা। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পুত্র হযরত ইসহাক (আ.)-এর বংশধরগণ যারা হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর বংশোদ্ভূত, তাদেরকে তার ইবরানী নামানুসারে বনি ইসরাঈল বলা হয়।

اَوْفُوْا : তোমরা পূর্ণ কর। এ শব্দটি اِيْفَاء মাসদার থেকে اَمْر-এর جَمْع مُذَكَّر حَاضِر-এর সীগাহ।

اُوْفِ : আমি পূর্ণ করব। এটিও اِيْفَاء মাসদার থেকে مُضَارِع وَاحِد مُتَكَلِّم-এর সীগাহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র :

১. يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا-এর সম্বোধন ছিল ব্যাপক, তার অধীনে সেই সব নিয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছিল, যা সমগ্র মানব জাতির প্রতি ব্যাপক ছিল, যেমন পৃথিবী, আকাশ এবং অপরাপর বস্তু নিচয়ের সৃষ্টি। তারপর হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করে খলীফারূপে মনোনয়ন ও জান্নাতে ঠাঁই দান প্রভৃতি। এবারে বিশেষভাবে বনী ইসরাঈলকে বিভিন্ন সময়ে পুরুষানুক্রমে তাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করা হয় এবং তারা যে অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেছে, তা বিশদভাবে উল্লেখ করা হলো। কেননা মানব সন্তানের সকল শাখা-প্রশাখার মাঝে বনী ইসরাঈলকেই সবচেয়ে মর্যাদাবান জ্ঞান ও কিতাবের অধিকারী, নবুয়ত লাভকারী এবং আম্বিয়া (আ.) সম্পর্কে বেশি জানাশুনা সম্প্রদায়রূপে গণ্য করা হতো। হযরত ইয়াকুব (আ.) হতে হযরত ঈসা (আ.) পর্যন্ত প্রায় চার হাজার নবীর আবির্ভাব কেবল তাদের মধ্যেই হয়েছিল। আরব জাহানের দৃষ্টি তাদের দিকেই নিবদ্ধ ছিল যে, তারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, না তাকে প্রত্যাখ্যান করে। এ কারণেই তাদের প্রতি বর্ষিত অনুগ্রহরাজি ও তাদের দোষত্রুটি বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে, যাতে তারা লজ্জিত হয়ে ঈমান আনে, আর না হলে অন্যান্য লোক তাদের চরিত্র সম্পর্কে অবগত হয়ে তাদের কথার গুরুত্ব না দেয়। –[তাফসীরে উসমানী]

২. মু'মিন কাফের নির্বিশেষে সাধারণভাবে সকল মানব জাতিকে তাওহীদের প্রতি দাওয়াত প্রদান ও তাদের আদি উৎস সম্পর্কে আলোচনা করার পর এখানে বিশেষভাবে বনি ইসরাঈল তথা ইহুদিদেরকে দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে। এখান থেকে দ্বিতীয় পারা পর্যন্ত তাদের আলোচনাই চলবে। কখনো তাদেরকে নম্রভাবে এবং তাদের ও তাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি কৃত অনুগ্রহসমূহ স্মরণ করিয়ে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। কখনো ভয় দেখিয়ে, কখনো তাদের মন্দ কর্মের কারণে ধমক দিয়ে এবং তাদের শাস্তির কথা স্মরণ করিয়ে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে।

৩. প্রথম রুকুতে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে মানবজাতি দু'ভাগে বিভক্ত– ১. নেক ও মু'মিন ২. মন্দ ও কাফের। নেক ও মু'মিন তারাই, যারা কুরআনে কারীমকে জীবন পদ্ধতি হিসেবে বিশ্বাস করে। আর যারা তা অস্বীকার করে, তারাই হলো বদ ও কাফের। দ্বিতীয় রুকুতে কাফেরদেরই একটি বিশেষ শ্রেণির আলোচনা ছিল, যাদেরকে মুনাফিক বলা হয়। তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, এ সকল লোকও ঈমান এবং মুক্তি থেকে বঞ্চিত থাকবে। তৃতীয় রুকু'তে তাবৎ মানব গোষ্ঠীকে সম্বোধন করে কুরআন মাজীদের আসল পয়গাম তথা তাওহীদ রেসালাতের আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ রুকু'তে মানব

সৃষ্টির ইতিহাস ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হলো পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার বিধি-বিধানের বাস্তবায়ন এবং তাঁর খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু সামান্য অসতর্কতা ও উদাসীনতার সুযোগে মানবকে তার চিরশত্রু শয়তান পরাস্ত করতে পারে, সত্যের পথ থেকে অসত্যের পথে এবং আলোর রাজ্য থেকে অন্ধকারের রাজ্যে টেনে নিয়ে যেতে পারে। পক্ষান্তরে সামান্যতম মনোবল ও মনোযোগও যদি মানুষ নিবদ্ধ করে এবং নবী রাসূলদের প্রদর্শিত সিরাতুল মুস্তাকীমের সহজ সরল পথে অবিচল থাকতে সচেষ্ট হয়, তাহলে সেই হবে আল্লাহ তা'আলার মদদ পুষ্ট ও বিজয়ী। এখন পঞ্চম রুকূ' থেকে ধারাবাহিক কয়েকটি রুকূ'তে বিস্তারিতভাবে এ বিষয়ে আলোচনা শুরু হচ্ছে যে, দীর্ঘ কয়েক যুগ ধরে আল্লাহ তা'আলার এক প্রিয় ও মাকবুল বান্দার সন্তানাদির এক বিশেষ জনগোষ্ঠীকে তাওহীদের নিয়ামত দ্বারা ধন্য করা হয়েছিল। কিন্তু সে জাতি তাদের অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে। তাদেরকে বরাবর সুযোগ দেওয়ার পরও তারা সে নিয়ামতকে হাতছাড়া করেছে। এমনকি তাদের বংশধারার সর্বশেষ নবী হযরত ঈসা (আ.)-এর বিরোধিতায় চরমভাবে তারা সীমালঙ্ঘন করেছে। দীর্ঘ ও ধারাবাহিক শৈথিল্য প্রদর্শন ও সুযোগ দানের পর আল্লাহ তা'আলার বিধান এক নতুন পন্থা গ্রহণ করে এবং অবাধ্য অকৃতজ্ঞ ও অপরাধজীবী এ জাতিকে তাদের দায়িত্ব ও মর্যাদার আসন থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের নিকট থেকে উক্ত নিয়ামত ছিনিয়ে নিয়ে এক ইসমাঈলী পয়গাম্বরের মাধ্যমে পৃথিবীর সকল জাতি ও জনগোষ্ঠীর জন্য তা সার্বজনীন করে দেওয়া হয়। -[মাজেদী খ. ১, পৃ. ৮৫-৮৭]

বনী ইসরাঈলের ঐতিহাসিক পরিচয় : সুপ্রসিদ্ধ নবী হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বসবাস ছিল যথাক্রমে ইরাক, সিরিয়া ও হিজাযে [২১৬০-১৯৮৫ খ্রিস্টপূর্ব]। তার ঔরস থেকে সুপ্রসিদ্ধ দুটি বংশধারা নেমে এসেছে। প্রথমটি মিসরীয় স্ত্রী হাজেরার গর্ভে জন্মগ্রহণকারী হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে। এ বংশধারা বনূ ইসমাঈল নামে পরিচিত।

পরবর্তীতে তারই একটি শাখারূপে আত্মপ্রকাশ করেছে কুরাইশ। তাদের অধিবাস ছিল আরবে। দ্বিতীয়টি ইরাকী স্ত্রী সারার গর্ভে জন্মগ্রহণকারী হযরত ইসহাকের পুত্র হযরত ইয়াকুব ওরফে হযরত ইসরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে। এটি বনূ ইসরাঈল নামে পরিচিত। এ বংশের অধিবাস ছিলো সিরিয়া। প্রাচীন ভূগোলে ফিলিস্তীন নামে স্বতন্ত্র কোনো দেশের অস্তিত্ব ছিলো না. সিরিয়ারই অংশ ছিল তা। তৃতীয় একটি বংশধারাও নেমে এসেছিল তৃতীয় স্ত্রী কাতুরা -এর মাধ্যমে। তবে বনূ কাতুরা নামে পরিচিত এ বংশধারা ইতিহাসে তেমন গুরুত্ব লাভ করেনি।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পৈত্রিক জন্মভূমি ছিল ইরাক। তাঁর পৌত্র হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর ছেলে ইউসুফ (আ.) কুদরতিভাবে মিসর গমন করেন। এক পর্যায়ে তিনি মিসরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। মিসরের দুঃসময়ের সফল শাসক হিসেবে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন দেশে। হযরত ইউসুফ (আ.) পিতা হযরত ইয়াকূব (আ.)-কে মিসরে নিয়ে আসেন। সে সুবাদে বনী ইসরাঈলরা মিসরে অবস্থান করতে থাকে। সুদীর্ঘ চারশত বছর বনী ইসরাঈলরা মিসরের শাসনকার্য পরিচালনা করে। পরবর্তীতে শাসন ক্ষমতা চলে যায় ফিরআউনদের হাতে। ফিরআউন নামক মিসরের শাসকরা জালেম ছিল। বনী ইসরাঈলদের উপর নিপীড়ন নির্যাতন চালাতো নিয়মিত। একদা ফিরআউন নামধারী সর্বশেষ শাসক একটি স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী করণীয় ঠিক করতে হুকুম হয়, বনী ইসরাঈলদের বিরুদ্ধে। বনী ইসরাঈলের কোনো পুত্র সন্তান জন্মালে তাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করতে হবে। কারণ সে বিশ্বাস করত বনী ইসরাঈলের কোনো সাহসী সন্তানের হাতে তার পতন ঘটবে। এ অনিবার্য পতন ঠেকানোর জন্যই ছিল তার এমনি পাশবিক ঘোষণা। কিন্তু কুদরতের কারিশমা বোঝা বড় দায়। যার হাতে ফেরআউনের পতন হবে, তিনি ফিরআউনের হাতেই লালিত-পালিত হলেন।

সময়ের চাকা ঘুরে এক সময় হযরত মূসা (আ.) মুখোমুখী হন ফেরআউনের। নিপীড়িত বনী ইসরাঈলকে মুক্ত করার দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করেন। সংগঠিত করেন অবহেলিত ইসরাঈলীদের। ফেরাউনের কবল থেকে তাদেরকে নিয়ে তিনি হিজরত করেন। খবর পেয়ে সেনা বাহিনীসহ ফিরআউন হযরত মূসা (আ.)-এর পিছু নেয়। সামনে পড়ে লোহিত সাগর। হতোদ্যম হয় বনী ইসরাঈল। সাহস হারালেন না হযরত মূসা (আ.)। আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করে অগ্রসর হলেন সম্মুখ পানে। তিনি আল্লাহ তা'আলার করুণায় সমুদ্রের উপর দিয়ে মুহূর্তে রাস্তা হয়ে গেলেন। ঐ রাস্তা দিয়ে সমুদ্র পাড়ি দিল বনী ইসরাঈলরা। একই পথ অনুসরণ করতে গিয়ে সর্বস্ব হারাল ফেরাউন। নির্মমভাবে নিমজ্জিত হলো দলবলসহ সমূদ্রে।

সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সিনাই অঞ্চলে আশ্রয় নিল বনী ইসরাঈল। সিনাই মিসরেরই একটি দ্বীপাঞ্চল। এখানেই শুরু বনী ইসরাঈল -এর কাল যাপন।

মোটকথা বনী ইসরাঈলের উত্থান বহু শতাব্দী ধরে অব্যাহত ছিল এবং এ জাতিই পৃথিবীতে তাওহীদের পতাকাবাহী ছিল। একে একে বহু নবী-রাসূল তাদের মাঝে প্রেরিত হয়েছেন। বড় বড় আবিদ-জাহিদের আবির্ভাব যেমন হয়েছে, তেমনি নামী-দামী বাদশাহ এবং সেনাপতিও বরাবর জন্ম নিয়েছেন। স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে তারা ইরাক ও মিসর প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাদের কোনো কোনো গোত্র হিজায ও পার্শ্ববতী অঞ্চলে বিশেষত ইয়াছরিব [পরবর্তীতে মদীনা] ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে এসে আবাদ হয়েছিল। বনী ইসরাঈল ছিল তাদের জাতীয়ও বংশীয় পরিচয়। ধর্মত তারা ছিলো ইহুদী ও কিতাবী। বিকৃত আকারে হলেও তাওরাত কিতাব তাদের মাঝে বিদ্যমান ছিলো। ওহী ও নবুয়তের ধারা এবং শাস্তি-পুরস্কার সম্পর্কিত আকীদা-বিশ্বাসে কোনো না কোনোভাবে তারা বিশ্বাসী ছিল। নবী-ওলীদের জ্ঞান ও ইলমের ধারা তাদের মাঝে

অব্যাহত ছিলো। মহাজনি কারবারের অধিকারী সম্পদশালী সম্প্রদায়রূপে পরিচিত হলো। সেই সাথে জাদুটোনা ও অন্যান্য নীচ কর্মে পটু ছিলো। ব্যবসাকর্মে ও তাদের বেশ দক্ষতা ছিলো। এই ধর্মীয় ও পার্থিব শ্রেষ্ঠত্বের কারণে হিজায অঞ্চলে সে সময় তাদের গুরুত্ব ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। সাধারণ অধিবাসীরা ছিল মুশরিক ও মূর্তিপূজক। তারা একদিকে যেমন ইহুদিদের ধর্মজ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত ছিল, অন্যদিকে তেমনি প্রায়শ তাদের কাছে ঋণ আবদ্ধ থাকতো। ফলে জাগতিক ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রের বেশির ভাগ প্রয়োজনে তাদেরকেই তারা শেষ ভরসা মনে করতো। তাছাড়া সুসংগঠিত ও শক্তিশালী জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতি দ্বারা দুর্বল ও অসংগঠিত জাতিসমূহ প্রভাবিত হবে, এটাই হচ্ছে সাধারণ রীতি। আরবের মুশরিক সম্প্রদায়ও ইসরাঈলী রীতি, চরিত্র, ধর্ম ও বিশ্বাস দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত ছিল এবং বহু ক্ষেত্রে তাদেরকেই আদর্শ বিবেচনা করতো। সর্বোপরি ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ এবং পবিত্র লোক কাহিনীগুলোতে এক সমাগত নবীর সুসংবাদ বিদ্যমান ছিল এবং তারা তার আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় ছিল। –[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ بِاَنْ تَشْكُرُوْهَا بِطَاعَتِىْ : এ বাক্যটির সম্পর্ক হলো اُذْكُرُوْا -এর সাথে। এখানে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اُذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ দ্বারা শুধু নিয়ামতসমূহ গণনা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং সেসব নিয়ামতরাজির শুকরিয়া আদায় করা। অন্যথায় গণনা ও আলোচনা তো সকলেই করতে পারে। এমনকি কাফের মুশরিকরাও পারে।

এখানে এ প্রশ্নের জবাব হয়ে গেল যে, ইহুদিরা তো সর্বদাই এ সকল নিয়ামত স্মরণ করে আসছে। সুতরাং যে জিনিস তারা ভুলেনি, তা স্মরণ করানোর উদ্দেশ্য কি ছিল? জবাবে মুসান্নিফ (র.) এ ইবারতটুকু উল্লেখ করেছেন। উত্তরের সারকথা হলো, এখানে নিয়ামত স্মরণ করার দ্বারা তার শোকর আদায় করা উদ্দেশ্য। কেননা তারা তার যথাযথ শোকর আদায় করেনি। যেন তারা তা ভুলেই গিয়েছিল। এজন্য তাদেরকে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও বিস্মৃতদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ عَلٰى اٰبَائِهِمْ : এ অংশটি বৃদ্ধি করে একটি سُوَال مُقَدَّر -এর জবাব দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন : اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ দ্বারা রাসূল ﷺ -এর যুগের ইহুদিদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। আর এ বাক্যের ব্যাখ্যায় যে সকল নিয়ামতসমূহকে গণনা করা হয়েছে সেগুলো হতে একটিও নবী যুগের ইহুদিদের মাঝে বিদ্যমান ছিল না। এর পরও নবী যুগের ইহুদিদেরকে সম্বোধন করে اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ বলা কেমন করে শুদ্ধ হবে?

উত্তর : এখানে مُضَاف -কে حَذْف করা হয়েছে। মূল ইবারত এভাবে হবে– اَنْعَمْتُ عَلٰى اٰبَائِكُمْ সুতরাং এখন কোনো প্রশ্ন বাকি রইল না।

قَوْلُهُ دُوْنَ غَيْرِىْ : এখানে ঐ حَصْر -এর প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে যা وَاِيَّاىَ فَارْهَبُوْنِ -এর মাঝে মাফঊলকে মুকাদ্দম করার দ্বারা বুঝে আসে।

وَلَا تَكُوْنُوْا اَوَّلَ كَافِرٍۭ بِهٖ : 'কুফর' প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল অবস্থায় অত্যন্ত বীভৎস। সব মানুষকেই তা করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে প্রথম দিকে যারা কুফরি করে, পরবর্তী লোকেরা তারই অনুসরণ করে। এ কারণে প্রথম কুফরিকারীর অপরাধ সর্বাধিক বেশি। অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ (اَلْعَنْكَبُوْتُ) এবং তারা অবশ্যই তাদের বোঝাসমূহ বহন করবে, বহন করবে তাদের বোঝার সাথে আরও অনেক বোঝা।

–[আহকামুল কুরআন, খ. ১, পৃ. ৫৪]

قَوْلُهُ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ : এ অংশটি বৃদ্ধি করে একটি سُوَال مُقَدَّر -এর জবাব দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন : রাসূল ﷺ -এর আবির্ভাব ঘটেছে মক্কায় এবং তিনি সর্বপ্রথম মক্কায়ই নবুয়তের দাওয়াত দিয়েছেন। কুফফারে মক্কা তাঁর দাওয়াত অস্বীকার করেছে, এ হিসেবে তো সর্বপ্রথম অস্বীকারকারী হলো কুফফারে মক্কা মদীনার ইহুদিগণ নয় ইহুদীগণ নয়।

উত্তর : এখানে প্রথম অস্বীকারকারী দ্বারা আহলে কিতাবগণ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে প্রথম অস্বীকারকারী হয়ো না।

قَوْلُهُ «وَلَا تَشْتَرُوْا» تَسْتَبْدِلُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا : এখানে لَا تَشْتَرُوْا -এর তাফসীরে تَسْتَبْدِلُوْا উল্লেখ করার দ্বারা উদ্দেশ্য এদিকে ইঙ্গিত করা যে, এখানে বেচা-কেনার প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া সম্ভব নয়, কারণ بَاء হরফটি ثَمَن -এর উপর দাখেল হয়। এখানে দাখেল হয়েছে اٰيٰتِىْ -এর উপর। সুতরাং اٰيٰتِىْ ছামান হবে এবং ثَمَنًا 'মবী' হবে। অর্থাৎ আয়াতের বিনিময়ে ছামান খরিদ করো না। আর এটা বাস্তবে অসম্ভব। সুতরাং اِشْتِرَاء দ্বারা রূপক অর্থে اِسْتِبْدَال বা পরিবর্তন উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ ثَمَنًا قَلِيْلًا : পার্থিব ও বস্তুগত স্বার্থের বিনিময়ে সত্যকে বিসর্জন দেওয়া এবং আখিরাতের চিরস্থায়ী নিয়ামতকে দুনিয়ার সামান্য মূল্যের বিনিময়ে ক্রয় করা। তবে এর অর্থ এ নয় যে, অধিক মূল্যে তা বিক্রয় করা যাবে। কেননা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদও আখিরাতের মোকাবিলায় কিছু নয়। –[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ خَوْفَ فَوَاتِ مَا تَأْخُذُوْنَهُ : কা'ব ইবনে আশরাফসহ ইহুদি আলেম ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ সাধারণ জনগণ ও অশিক্ষিতদের থেকে বিভিন্ন হাদিয়া তোহফা গ্রহণ করত। প্রতি বছর তারা তাদের থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণে ফসল, ফলফলাদি ও নগদ অর্থ গ্রহণ করত। তাই তারা আশঙ্কা করল যে, যদি আমরা মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রকৃত গুণাবলি তাদেরকে বলে দিই তাহলে উক্ত পার্থিব স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে। ফলে তারা তাওরাতে তাঁর গুণাবলি বিকৃত করে লিখে রাখে। তাদের কাছে কেউ মুহাম্মদ ﷺ -এর বর্ণনা ও বিবরণ জানতে চাইলে তারা প্রকৃতরূপ গোপন করে বিকৃতভাবে বলে দিত। −[হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১, পৃ. ৬৮]

ঈসালে ছওয়াব উপলক্ষে খতমে কুরআনের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ নেই : পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মৃতদের ঈসালে ছওয়াবের উদ্দেশ্যে কুরআন খতম করানো বা অন্য কোনো দোয়াকালাম ও অজিফা পড়ানো হারাম। কারণ এর উপর কোনো ধর্মীয় মৌলিক প্রয়োজন নির্ভরশীল নয়। আর কুরআন শিক্ষাদান বা অনুরূপ অন্যান্য কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণের যে অনুমতি পরবর্তীকালের ফকীহগণ দিয়েছেন, তার কারণ এমন এক ধর্মীয় প্রয়োজন যে, তাতে বিচ্যুতি দেখা দিলে গোটা শরিয়তের বিধান-ব্যবস্থার মূলে আঘাত আসবে। সুতরাং এ অনুমতি এসব বিশেষ প্রয়োজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা আবশ্যক।

এখন যেহেতু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কুরআন পড়া হারাম। সুতরাং যে পড়বে এবং যে পড়াবে, তারা উভয়ই গুনাহগার হবে। বস্তুত পারিশ্রমিকের আশায় যে পড়ছে, সেই যখন কোনো ছওয়াব পাচ্ছে না, তখন মৃত আত্মার প্রতি সে কি পৌঁছাবে? কবরের পাশে কুরআন পড়ানো বা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে খতম করানোর রীতি সাহাবী, তাবেঈন এবং প্রথম যুগের উম্মতের কোথাও বর্ণিত বা প্রমাণিত নেই। সুতরাং এগুলো নিঃসন্দেহে বিদআত। −[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, মুফতি মুহাম্মদ শফী (র.)]

কুরআন শিখিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ : কুরআন শিক্ষা দিয়ে বিনিময় বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ কিনা? এ সম্পর্কে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) জায়েজ বলে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) প্রমুখ কয়েকজন ইমাম তা নিষেধ করেছেন। কেননা রাসূলে কারীম ﷺ কুরআনকে জীবিকা অর্জনের মাধ্যমে পরিণত করতে বারণ করেছেন।

অবশ্য পরবর্তী হানাফী ইমামগণ বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন যে, পূর্বে কুরআনের শিক্ষকমণ্ডলীর জীবন-যাপনের ব্যয়ভার ইসলামি বায়তুল মাল বা ইসলামি ধন-ভাণ্ডার হতে নির্বাহ হতো। কিন্তু বর্তমানে ইসলামি শাসন ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে এ শিক্ষকমণ্ডলী কিছুই লাভ করেন না। ফলে যদি তারা জীবিকার অন্বেষণে চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্য পেশায় আত্মনিয়োগ করেন, তবে ছেলে- মেয়েদের কুরআন শিক্ষার ধারা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাবে। এজন্য কুরআন শিক্ষার বিনিময়ে প্রয়োজনানুপাতে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে ইমামতি, আজান, হাদীস ও ফিকহ শিক্ষাদান প্রভৃতি যেসব কাজের উপর দীন ও শরিয়তের স্থায়িত্ব ও অস্তিত্ব নির্ভর করে, সেগুলোকেও কুরআন শিক্ষাদানের সাথে সংযুক্ত করে প্রয়োজন মতো এগুলোর বিনিময়েও বেতন গ্রহণ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। −[দুররে মুখতার ও শামীর সূত্রে তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.)]

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ : اَللَّبْسُ শব্দের মূল অর্থ হলো কোনো কিছুকে ঢেকে ফেলা। (اَللَّبْسُ سَتْرُ الشَّيْئِ (رَاغِبْ)) রূপক অর্থ হলো, অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট কথা বলা, যাতে বক্তব্য ও উদ্দেশ্য বিগড়ে যায়। কিংবা মিথ্যাকে শব্দের চাকচিক্যে সত্য বলে চালিয়ে দেওয়া, যা অনেক সময় নির্ভেজাল মিথ্যার চেয়ে মারাত্মক বিভ্রান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ঠিক এ ধরনের কর্মকাণ্ডকে বর্তমানের পরিভাষায় প্রোপাগান্ডা বা অপপ্রচার বলা হয়। আজকের ফিরিংগী জাতির মতো ইহুদিরাও এই অপপ্রচারণা শিল্পের নিপুণ শিল্পী ছিল। −[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ৮৯]

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শ্রোতা ও সম্বোধিত ব্যক্তিকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করে উপস্থাপন করা সম্পূর্ণ নাজায়েজ। অনুরূপভাবে কোনো ভয় বা লোভের বশবর্তী হয়ে সত্য গোপন করাও হারাম।

−[মা'আরিফুল কুরআন]

অঙ্গীকার পূর্ণ করা : অঙ্গীকার পূর্ণ করার বিভিন্ন স্তর রয়েছে। বান্দার পক্ষ থেকে সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে কালিমায়ে শাহাদাত এর স্বীকারোক্তি করা। আর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে জান ও মালের হেফাজত করা। বান্দাদের পক্ষ থেকে সর্বশেষ [সর্বোচ্চ] স্তর হচ্ছে নিজকে আল্লাহর পথে নিঃশেষ করে দেওয়া। আর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার সিফাত ও আসমার আলো দ্বারা বান্দাকে সুসজ্জিত করা। আর অন্যান্য স্তরগুলো মধ্য পর্যায়ের। অথবা এটা বলা যায় যে, বান্দাদের পক্ষ থেকে প্রথম স্তর হচ্ছে আমলসমূহ দ্বারা তাওহীদকে [আল্লাহর একত্ববাদকে] প্রমাণ করা। আর মধ্যম স্তর হচ্ছে গুণাবলি দ্বারা তাওহীদকে প্রকাশ করা। আর সর্বশেষ স্তর হচ্ছে সত্তার একত্ববাদ।

আর আল্লাহর পক্ষ থেকে ঐ পরিচয় ও আচরণ যা প্রতিটি স্তরের জন্য সামঞ্জস্যময়, তা ঐ স্তরের বান্দার উপর বর্ষণ করা।

অনুবাদ :

٤٣. وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ صَلُّوْا مَعَ الْمُصَلِّيْنَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَاَصْحَابِهٖ وَنَزَلَ فِيْ عُلَمَائِهِمْ وَقَدْ كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ لِاَقْرِبَائِهِمُ الْمُسْلِمِيْنَ اُثْبُتُوْا عَلٰى دِيْنِ مُحَمَّدٍ فَاِنَّهٗ حَقٌّ .

৪৩. তোমরা সালাত কায়েম কর ও জাকাত দাও এবং যারা অবনত হয় তাদের সাথে অবনত হও। মুসল্লিগণের সাথে অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের সাথে সালাত আদায় কর। তাদের সমাজের পুরোহিত ও আলেমদের সম্পর্কে এই আয়াত নাজিল হয়। তারা নিজেদের মুসলিম আত্মীয়বর্গকে বলত, মুহাম্মদের ধর্মের উপর সুদৃঢ় থাক। কারণ তা সত্য ধর্ম।

٤٤. اَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ بِالْاِيْمَانِ بِمُحَمَّدٍ ﷺ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ تَتْرُكُوْنَهَا فَلَا تَأْمُرُوْنَهَا بِهٖ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ط التَّوْرٰةَ وَفِيْهَا الْوَعِيْدُ عَلٰى مُخَالَفَةِ الْقَوْلِ الْعَمَلَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ سُوْءَ فِعْلِكُمْ فَتَرْجِعُوْنَ فَجُمْلَةُ النِّسْيَانِ مَحَلُّ الْاِسْتِفْهَامِ الْاِنْكَارِيِّ .

৪৪. কি আশ্চর্য! তোমরা মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর বিশ্বাস স্থাপনের আর নিজেরা বিস্মৃত হও অর্থাৎ নিজেরা তা পরিত্যাগ কর, নিজেদেরকে এতদ সম্পর্কে নির্দেশ দাও না অথচ তোমরা কিতাব অর্থাৎ তাওরাত অধ্যয়ন কর তাতে কথার সাথে কাজের বৈপরীত্যের শাস্তির হুমকি রয়েছে। তোমরা কি তোমাদের এই কাজ মন্দ হওয়া সম্পর্কে বুঝ না? বুঝলে তোমরা ফিরে আসতে। নিজেদের বিস্মৃত হওয়ার বিষয়টিই এই আয়াতে اِسْتِفْهَام اِنْكَارِى অর্থাৎ অসম্মতিসূচক প্রশ্নের অবতারণার মূল স্থান।

٤٥. وَاسْتَعِيْنُوْا اُطْلُبُوا الْمَعُوْنَةَ عَلٰى اُمُوْرِكُمْ بِالصَّبْرِ الْحَبْسِ لِلنَّفْسِ عَلٰى مَا تَكْرَهُ وَالصَّلٰوةِ ط اَفْرَدَهَا بِالذِّكْرِ تَعْظِيْمًا لِشَانِهَا وَفِي الْحَدِيْثِ كَانَ ﷺ اِذَا حَزَبَهٗ اَمْرٌ بَادَرَ اِلَى الصَّلٰوةِ وَقِيْلَ الْخِطَابُ لِلْيَهُوْدِ لَمَّا عَاقَهُمْ عَنِ الْاِيْمَانِ الشَّرَهُ وَحُبُّ الرِّيَاسَةِ فَاُمِرُوْا بِالصَّبْرِ وَهُوَ الصَّوْمُ لِاَنَّهٗ يُكَسِّرُ الشَّهْوَةَ وَالصَّلٰوةِ لِاَنَّهَا تُوْرِثُ الْخُشُوْعَ وَتَنْفِي الْكِبْرَ وَاِنَّهَا اَيِ الصَّلٰوةَ لَكَبِيْرَةٌ ثَقِيْلَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ السَّاكِنِيْنَ اِلَى الطَّاعَةِ .

৪৫. তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর অর্থাৎ তোমাদের বিষয়াদিতে সাহায্য চাও। সবর অর্থাৎ নাফসের নিকট অনভিপ্রেত বিষয়সমূহের উপর নিজেকে স্থির রেখে ও সালাতের মাধ্যমে। সালাতের গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাবার জন্য এই স্থানে আলাদাভাবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে রাসূল ﷺ যখনই কোনো সমস্যায় পড়তেন শীঘ্র সালাতের প্রতি ধাবিত হতেন। কেউ কেউ বলেন, এই আয়াতে মূলত ইহুদিদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। লোভ ও ক্ষমতার স্পৃহা ছিল তাদের ঈমানের পথে অন্তরায়। ফলে তোমাদেরকে সবর অর্থাৎ সওমের নির্দেশ দেওয়া হয়। কেননা সওমের মাধ্যমে লোভ প্রশমিত হয়। আর সালাতেরও নির্দেশ প্রদান করা হয়। কেননা এটা মানুষের মধ্যে বিনয়ের জন্ম দেয় এবং অহংকার বিদূরিত করে। এবং বিনয়ীগণ অর্থাৎ ইবাদতের প্রতি যারা আনুগত্য ও অনুরাগ রাখে, তারা ব্যতীত আর সকলের নিকট নিশ্চিতভাবে এটা সালাত কঠিন ভারি বোঝা।

٤٦. اَلَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ يُوْقِنُوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ بِالْبَعْثِ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ فِي الْاٰخِرَةِ فَيُجَازِيْهِمْ .

৪৬. তারাই যারা ধারণা করে বিশ্বাস করে যে, পুনরুত্থানের মাধ্যমে তাদের প্রতিপালকের সাথে নিশ্চিতভাবে তাদের সাক্ষাৎ ঘটবে এবং পরকালে তার দিকেই তারা ফিরে যাবে। অনন্তর তিনি তাদেরকে প্রতিফল দান করবে।

তাহকীক ও তারকীব

اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ জুমলায়ে ইন্‌শাইয়াহ মা'তূফ আলাইহি। اِقَامَةِ الصَّلٰوةِ। اِقَامَة শব্দ পরিপূর্ণ সংশোধনের জন্য বলা হয়। প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য বিধানাবলি ও শর্তাবলি, সুন্নত, ওয়াজিব ও ফরজ সবকিছুর লক্ষ্য ও সময়ের বাধ্যবাধকতা এবং নিরবচ্ছিন্নতার সাথে নামাজ আদায় করা। اٰتُوا الزَّكٰوةَ জুমলায়ে ইনশা-ইয়া মা'তূফ-আলাইহি। اِرْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ জুমলায়ে ইন্‌শা-ইয়া মা'তূফ, রুকূ' এর অর্থ– অবনত হওয়া। মুফাস্‌সির (র.) صَلُّوْا -এর সাথে অর্থ করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা تَسْمِيَةُ الْكُلِّ بِاِسْمِ الْجُزْءِ হয়েছে। আর যেহেতু ইহুদিদের নামাজ রুকূ ও সিজদা ছাড়া ছিল তাই বলেছেন যে, মুসলমানদের ন্যায় নামাজ পড়। আর জানাযার নামাজে রুকূ ও সিজদা নেই। তাই সেটা ফরজে কিফায়াহ। زَكٰوة [জাকাত] এর অর্থ অধিক হওয়া ও বৃদ্ধি হওয়া। যেমন বলা হয়– زَكَى الزَّرْعُ [শস্য বৃদ্ধি হয়েছে]। আর কারো কারো মতে زَكٰوة তাহারাত [পবিত্রতা] এর অর্থ থেকে নির্গত হয়েছে। জাকাত এর মধ্যে বরকত ও পবিত্র করা দুটি গুণ পাওয়া যায়। تَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ জুমলা মা'তূফ আলাইহি। وَتَنْسَوْنَ যা হাম্‌যার মাদখূল, মা'তূফ। وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتَابَ জুমলা حَال; اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ জুমলায়ে মু'তারিযা। اِسْتَعِيْنُوْا আত্‌ফ হয়েছে اُذْكُرُوْا -এর উপর। وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ জুমলা মুস্তাসনা মিনহু اِلَّا হরফে এস্তেস্‌না। عَلَى الْخَاشِعِيْنَ মাউসূফ, اَلَّذِيْنَ মউসূল ও সেলাহ মিলে সিফত, এসব মিলে تَنْسَوْنَ -এর মুস্তাসনা। মুফাস্‌সির (র.) تَتْرُكُوْنَهَا দ্বারা অর্থ করছেন مَلْزُوْم বলে لَازِم -এর ইচ্ছা করে। خَاشِعِيْنَ -এর অর্থ سَاكِنِيْنَ - خُشُوْع -এর মূল অর্থ سُكُوْن অর্থাৎ নীরব হওয়া। শান্তি পাওয়া خَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ اَيْ سَكَنَتْ এজন্যই خُشُوْع দ্বারা جَوَارِح অঙ্গ-প্রতঙ্গের সিফত নেওয়া হয় এবং خُضُوْع দ্বারা قَلْب -এর সিফত নেওয়া হয়। يُوْقِنُوْنَ -এর ব্যাখ্যা يَظُنُّوْنَ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, ظَنّ এ স্থানে يَقِيْن -এর অর্থে এবং এটা এ অর্থে অধিক ব্যবহার হয়। অন্য কেরাতে যে, يَعْلَمُوْنَ রয়েছে, এ অর্থ ঐ অর্থের পক্ষে। এ শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করার মধ্যে সূক্ষ্মতা হচ্ছে এটা যে, পরকালের ظَنِّى عِلْم ও যখন তাদের মধ্যে خُشُوْع সৃষ্টি করতে পারে, তখন جزم ও عِلْم يَقِيْن তো আরো উত্তমভাবে নামাজ সহজ হওয়ার উৎস হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : এ পর্যন্ত ঈমানের মূল মন্ত্রের আহ্বান ও কুফর থেকে বিরত থাকার উপদেশ ছিল, যেটাকে এক হিসেবে **উসূলই বলা যায়**। এখন কিছু গুরুত্বপূর্ণ শাখাসমূহের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। যাতে করে সমষ্টির পরিপূর্ণ ঈমান হওয়া বুঝা যায়।

ইবাদত ও পুণ্যবানদের মহব্বতের গুরুত্বের ব্যাখ্যা : শাখা-প্রশাখার বিধানাবলি দু'প্রকার। কোনো কোনো আমল প্রকাশ্য এবং কোনো কোনো আমল অপ্রকাশ্য। তারপর প্রকাশ্য আমাল ও দু'প্রকার, শারীরিক ইবাদত কিংবা আর্থিক ইবাদত উক্ত তিনটি মৌলিক ইবাদতের মধ্য থেকে এক একটি আনুষঙ্গিকভাবে এ স্থানে উল্লেখ করেছেন। নামাজ শারীরিক ইবাদত। জাকাত আর্থিক বা মালী ইবাদত। خُشُوْع এবং خُضُوْع আধ্যাত্মিক ও ক্বলবী ইবাদত। যেহেতু আধ্যাত্মিক পন্থিদেরকে সংজ্ঞাই এ ব্যাপারে কার্যকর ও খাঁটি স্বর্ণের মর্যাদা রাখে। তাই ওটাকেও হুকুমের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে।

ইকামাতে সালাতের অর্থ : اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ : কুরআনে কারীমে যতবার নামাজের তাকিদ দেওয়া হয়েছে, সাধারণত اِقَامَت শব্দের মাধ্যমেই দেওয়া হয়েছে। নামাজ পড়ার কথা শুধু দু'এক জায়গায় বলা হয়েছে। এজন্য اِقَامَت صَلٰوة [নামাজ কায়েম করা] -এর মর্ম অনুধাবন করা উচিত। اِقَامَت -এর শাব্দিক অর্থ সোজা করা, স্থায়ী করা। সাধারণত যেসব খুঁটি কোনো দেওয়াল বা গাছ প্রভৃতির আশ্রয়ে সোজাভাবে দাঁড়ানো থাকে, সেগুলো স্থায়ী থাকে এবং পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। এজন্য اِقَامَت স্থায়ী ও স্থিতিশীলকরণ অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় إِقَامَتُ الصَّلٰوةِ অর্থ- নির্ধারিত সময় অনুসারে যাবতীয় শর্তাদি ও নিয়মাবলি রক্ষা করে নামাজ আদায় করা শুধু নামাজ পড়াকে إِقَامَتُ الصَّلٰوةِ বলা হয় না। নামাজের যত গুণাবলি, ফলাফল, লাভ ও বরকতের কথা কুরআন হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, তা সবই إِقَامَتُ الصَّلٰوةِ [অর্থাৎ নামাজ কায়েম করা] -এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন- কুরআনে কারীমে আছে- إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ অর্থাৎ নিশ্চয় নামাজ মানুষকে যাবতীয় অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে।]

নামাজের এ ফল ও ক্রিয়ার তখনই প্রকাশ ঘটবে, যখন নামাজ উপরে বর্ণিত অর্থে প্রতিষ্ঠা করা হবে। এজন্য অনেক নামাজিকে অশ্লীল ও ন্যক্কারজনক কাজে জড়িত দেখে এ আয়াতের মর্ম সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা ঠিক হবে না। কেননা তারা নামাজ পড়েছে বটে; কিন্তু তা কায়েম করেনি।

صَلٰوة -এর শাব্দিক অর্থ প্রার্থনা বা দোয়া। শরিয়তের পরিভাষায় সে বিশেষ ইবাদত, যাকে নামাজ বলা হয়।

قَوْلُهُ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ : আভিধানিকভাবে জাকাতের অর্থ দু'রকম- পবিত্র করা বর্ধিত করা। শরিয়তের নির্দেশানুসারে সম্পদ থেকে জাকাত বের করা হয় এবং শরিয়ত মোতাবেক খরচ করা হয়। যদিও এখানে সমসাময়িক বনী ইসরাঈলদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু তাতে একথা প্রমাণিত হয় না যে, নামাজ ও জাকাত ইসলাম পূর্ববর্তী বনী-ইসরাঈলদের উপরই ফরজ ছিল। কিন্তু সূরা মায়েদার আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বনী-ইসরাঈলের উপর নামাজও জাকাত ফরজ ছিল। অবশ্য তার রূপ ও প্রকৃতি ছিল ভিন্ন।

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مِيْثَاقَ بَنِىْٓ اِسْرَاۤئِيْلَ الخ : অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈল থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন এবং আমি তাদের মধ্য থেকে বার জন দলপতি মনোনীত করে প্রেরণ করলাম। আর আল্লাহ পাক বললেন, যদি তোমরা নামাজ প্রতিষ্ঠা কর এবং জাকাত আদায় কর, তবে নিশ্চয়ই আমার সাহায্য তোমাদের সাথে থাকবে। -[সূরা মায়েদা : ১২]

قَوْلُهُ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ : رُكُوْع -এর শাব্দিক অর্থ ঝুঁকা বা নত হওয়া। এ অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে এ শব্দ সিজদার স্থলেও ব্যবহৃত হয়। কেননা সেটাও ঝুঁকারই সর্বশেষ স্তর। কিন্তু শরিয়তের পরিভাষায় ঐ বিশেষ ঝুঁকাকে রুকূ' বলা হয়, যা নামাজের মধ্যে প্রচলিত ও পরিচিত। আয়াতের অর্থ এই যে রুকূ'কারীগণের সাথে রুকূ' কর।

এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, নামাজের সমগ্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে রুকূ'কে বিশেষভাবে কেন উল্লেখ করা হলো?

উত্তর এই যে, এখানে নামাজের একটি অংশ উল্লেখ করে গোটা নামাজকেই বুঝানো হয়েছে। যেমন, কুরআন মাজীদের এক জায়গায় وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ [ফজর নামাজের কুরআন পাঠ।] বলে সম্পূর্ণ ফজরের নামাজকে বুঝানো হয়েছে। তাছাড়া হাদীসের কোনো কোনো রেওয়ায়েতে 'সিজদা' শব্দ ব্যবহার করে পূর্ণ এক রাকাত বা গোটা নামাজকেই বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এর মর্ম এই যে, নামাজিগণের মাঝে সাথে নামাজ পড়। কিন্তু এরপরেও প্রশ্ন থেকে যায় যে, নামাজের অন্যান্য অংশের মধ্যে বিশেষভাবে রুকূ'র উল্লেখের তাৎপর্য কি?

উত্তর : পূর্বের কোনো শরিয়তে জামাতের সাথে সালাতের বিধান ছিল না। আর ইহুদিদের নামাজে সিজদাসহ অন্যান্য সব অঙ্গই ছিল, কিন্তু রুকূ' ছিল না। রুকূ' মুসলমানদের নামাজের বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম। এজন্য رَاكِعِيْن শব্দ দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীর নামাজিগণকে বুঝানো হবে, যাতে রুকূ'ও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তখন আয়াতের অর্থ হবে এই যে, তোমরাও উম্মতে মুহাম্মদীর নামাজিগণের সাথে নামাজ আদায় কর। অর্থাৎ প্রথমে ঈমান গ্রহণ কর, পরে জামাতের সাথে নামাজ আদায় কর। -[তাফসীরে উসমানী]

নামাজের জামাত সম্পর্কিত নির্দেশাবলি : নামাজের হুকুম এবং তা ফরজ হওয়া তো وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ শব্দের দ্বারাই বুঝা গেল। এখানে مَعَ الرّٰكِعِيْنَ [রুকূ'কারীদের সাথে] শব্দের দ্বারা নামাজ জামাতের সাথে আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এ হুকুমটি কোন ধরনের? এ ব্যাপারে ওলামা ও ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সাহাবা (রা.), তাবেয়ীন এবং ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যে একদল নামাজের জামাতকে ওয়াজিব বলেছেন এবং তা পরিত্যাগ করাকে কঠিন পাপ বলে অভিহিত করেছেন। কোনো কোনো সাহাবা (রা.) তো শরিয়তসম্মত ওজর ব্যতীত জামাতহীন নামাজ জায়েজ নয় বলেও মন্তব্য করেছেন। যারা জামাত ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তা এ আয়াতটি তাদের দলিল।

অধিকাংশ আলেম, ফকিহ, সাহাবা ও তাবেয়ীনের মতে জামাত হলো সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। কিন্তু ফজরের সুন্নতের ন্যায় সর্বাধিক তাকীদপূর্ণ সুন্নত। ওয়াজিবের একেবারে নিকটবর্তী। -[মা'আরিফুল কুরআন : মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.)]

قَوْلُهُ اَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ : এখানে ইহুদীদেরকে-ই সম্বোধন করা হচ্ছে। আহলে কিতাব হওয়ার সুবাদে ইহুদী আলেম ও ধর্মনেতারা ছিলো আরব মুশরিকদের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র এবং অনুকরণীয় আদর্শ। ইয়াছরিবের [মদিনার] অধিবাসীরা প্রায়শ তাদের খিদমতে রাসূল ও তার নবুয়তের সত্যতা সম্পর্কে জানার আগ্রহ নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করতো এবং তাঁকে তারা গ্রহণ করবে কি করবে না, সে বিষয়ে পরামর্শ চাইতো। এ ধরনের ক্ষেত্রে ইহুদি আলেমরা অনেক সময় এমন পরামর্শ দিয়ে ফেলতো যে, আমাদের ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত আলামতগুলো তাঁর মাঝে পাওয়া তো যাচ্ছে, সুতরাং তোমরা তাঁর অনুগামী হও। এ ধরনের গোপন পরামর্শ দান প্রসঙ্গেই আয়াতটি নাজিল হয়েছে। -[তাফসীরে মাজেদী]

এ আয়াতে ইহুদি পণ্ডিতদের একটি বিভ্রান্তি নিরসন করা হয়েছে। তারা মনে করতো আমাদের দিক নির্দেশনায় যখন বহু লোক শরিয়ত মেনে চলছে বা ইসলাম গ্রহণ করছে, তখন اَلدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهٖ [ভাল কাজের পথ নির্দেশক ভাল কাজের কর্তা তুল্য] -এ নিয়ম অনুসারে তা আমাদের-ই কাজ বলে গণ্য হবে। এ আয়াতে তাদের এ বিভ্রান্তি নিরসন করা হয়েছে।

আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানী (র.) বলেন, 'আয়াতের মর্ম হলো উপদেশদাতার নিজকে তার উপদেশ অনুযায়ী কাজ অবশ্যই করতে হবে। পক্ষান্তরে এর অর্থ এ নয় যে, পাপী ব্যক্তি উপদেশ দিতে পারবে না। -[তাফসীরে উসমানী]

اَلْبِرُّ : اَلْبِرُّ-এর শাব্দিক অর্থ- পুণ্য। অর্থাৎ সকল প্রকার উত্তম আমল ও সৎকর্ম।

اَيِ التَّوَسُّعُ فِى الْخَيْرِ الْكَامِلِ (رَاغِب) هُوَ اِسْمٌ جَامِعٌ لِاَعْمَالِ الْخَيْرِ (كَبِيْر) يَتَنَاوَلُ جَمِيْعَ اَصْنَافِ الْخَيْرَاتِ . (اِبْن مَسْعُوْد)

এখানে اَلْبِرُّ বলতে উদ্দেশ্য হলো ইসলাম গ্রহণ এবং মুহাম্মাদী নবুয়তে বিশ্বাস স্থাপন। -[তাফসীরে উসমানী]

فَجُمْلَةُ النِّسْيَانِ مَحَلُّ الْاِسْتِفْهَامِ الْاِنْكَارِىْ : এ বাক্যের অর্থ হলো অস্বীকৃতির সম্পর্কটা تَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ -এর সাথে; تَأْمُرُوْنَ النَّاسَ -এর সাথে নয়। কারণ আমল না করেও সৎ কাজের আদেশ দান শরিয়তের কাম্য।

সম্মানের লোভ ও সম্পদের লোভের অতুলনীয় চিকিৎসা : নামাজ দ্বারা সম্মানের লোভ, জাকাত দ্বারা সম্পদের লোভ এবং বিনয় দ্বারা অহংকার ও ঈর্ষা [যা সকল অনিষ্টের মূল] হ্রাস পায়। তাই উক্ত বিধানাবলি অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত ও পরিমিত হয়েছে। কেননা তাদের অসুস্থার মূলে এ দুটি রোগই ছিল। অর্থাৎ সম্মানের লোভ এবং সম্পদের লোভ। এগুলোর কারণেই হিংসা ও অহংকার জন্মেছে যে, যখন আমরা রাসূল ﷺ -এর অনুকরণ ও আনুগত্য করবো। তখন এসব উপঢৌকন ও কৃতজ্ঞতা বখশিশ বন্ধ হয়ে যাবে। তাই ধৈর্য ও নামাজ দ্বারা উক্ত রোগ দুটির চিকিৎসা করা হয়েছে। صَبْر [ধৈর্য] দ্বারা সম্পদের মহব্বত এবং নামাজ দ্বারা সম্মানের মহব্বত হ্রাস পাবে। আর যখন এর অভ্যস্ত হয়ে যাবে, তখন সম্মানের মহব্বত [যা সমস্ত ঝগড়া ও অশান্তির মূল] কেটে যাবে। সবরের মধ্যে আরও অনেক কাজ করতে হয়। আর বুদ্ধিভিত্তিক নীতি হচ্ছে যে, কাজ করার তুলনায় কাজ ছেড়ে দেওয়া সহজ। তাই নামাজকে কঠিনতম মনে করা হয়েছে এবং এ কঠিনকে সহজ করার ব্যবস্থাপনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

اَفْرَدَهَا بِالذِّكْرِ : এটি একটি سُؤَال مُقَدَّر -এর জবাব।

প্রশ্ন : ইবাদতের মধ্যে শুধু নামাজকে পৃথকভাবে কেন উল্লেখ করা হলো?

উত্তর : মুসান্নিফ (র.) এ প্রশ্নের জবাবে বলেছেন- اَفْرَدَهَا بِالذِّكْرِ تَعْظِيْمًا لِشَانِهَا অর্থাৎ নামাজের গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য করে তা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

হাশিয়ায়ে জামালে আরো বিস্তারিত জবাব দেওয়া হয়েছে-

لِاَنَّهَا جَامِعَةٌ لِاَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ النَّفْسَانِيَّةِ وَالْبَدَنِيَّةِ مِنَ الطَّهَارَةِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَ صَرْفِ الْمَالِ فِيْهِمَا وَالتَّوَجُّهِ اِلَى الْكَعْبَةِ وَالْعُكُوْفِ فِى الْعِبَادَةِ وَاِظْهَارِ الْخُشُوْعِ بِالْجَوَارِحِ وَاِخْلَاصِ النِّيَّةِ بِالْقَلْبِ وَمُجَاهَدَةِ الشَّيْطَانِ وَمُنَاجَاةِ الْحَقِّ وَقِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ وَالتَّكَلُّمِ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَكَفِّ النَّفْسِ عَنْ شَهْوَتَيِ الْفَرْجِ وَالْبَطْنِ (جَمَل . ص١٨ ج١)

নামাজের কথা ভিন্নভাবে উল্লেখের কারণ হলো এটি বিভিন্ন রকমের ইবাদতের সমন্বয়কারী। তার মাঝে আত্মিক এবং শারীরিক ইবাদত তথা তাহারাত ও সতর আবৃত করা, সম্পদ ব্যয় করার অভিমুখী হওয়া, ইবাদতের জন্য অবস্থান করা, বিনয় নম্রতা, নিয়তের ইখলাস, শয়তানের সাথে লড়াই, কুরআন তেলাওয়াত, কালেমা পাঠ এবং নফসকে গুপ্তাঙ্গ এবং পেটের কামনা-বাসনা থেকে বিরত রাখা ইত্যাদি আমল রয়েছে।

وَإِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ : **নামাজ কঠিন হওয়ার কারণ** : নামাজ কঠিন বোধ হওয়ার কারণ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, মানবমন কল্পনারাজ্যে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে অভ্যস্ত। আর মুক্তভাবে বিচরণ করতে প্রয়াসী। নামাজ এরূপ স্বাধীনতার সম্পূর্ণ পরিপন্থি। না বলা, না হাসা, না খাওয়া, না চলা প্রভৃতি নানাবিধ বাধ্যবাধকতার ফলে মন অতিষ্ঠ হয়ে উঠে এবং মনের অনুগত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এ কষ্ট বোধ করতে থাকে।

সারকথা, নামাজের মধ্যে ক্লান্তি ও শ্রান্তি বোধের একমাত্র কারণ হচ্ছে মনের বিচ্ছিন্ন চিন্তাধারার অবাধ বিচরণ। এর প্রতিবিধান মনের স্থিরতার দ্বারাই হতে পারে خُشُوْع বা বিনয়ের অর্থ মূলত سُكُوْنُ قَلْب বা মনের স্থিরতা। কাজেই বিনয়কে নামাজ সহজসাধ্য হওয়ার কারণরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

এখন কথা হলো, মনের স্থিরতা অর্থাৎ বিনয় কিভাবে লাভ করা যায়? একথা অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত যে, যদি কোনো ব্যক্তি তার অন্তরের বিচিত্র চিন্তাধারা ও কল্পনাকে তার মন থেকে সরাসরি দূরীভূত করতে চায়, তবে এতে সফলতা লাভ করা অসম্ভব; বরং এর প্রতিবিধান এই যে, মানবমন যেহেতু একই সময়ে বিভিন্ন দিকে ধাবিত হতে পারে না, সুতরাং যদি তাকে একটি মাত্র চিন্তায় মগ্ন ও নিয়োজিত করে দেওয়া যায়, তবে অন্যান্য চিন্তা ও কল্পনা আপনা থেকেই বেরিয়ে যাবে। এজন্য خُشُوْع বা বিনয়ের বর্ণনার পর এমন এক চিন্তার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে, যাতে নিমগ্ন থাকলে অন্যান্য চিন্তা ও কল্পনা পদমিত ও বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং এগুলো দমে যাওয়ার ফলে হৃদয়ের অস্থিরতা দূর হয়ে স্থিরতা জন্মাবে। স্থিরতার দরুন নামাজ অনায়াসলব্ধ হবে এবং নামাজের উপর স্থায়িত্ব লাভ হবে। আর নামাজের নিয়মানুবর্তিতার দরুন গর্ব-অহঙ্কার এবং যশ-খ্যাতি মোহও হ্রাস পাবে। তাছাড়া ঈমানের পথে যেসব বাধা-বিপত্তি রয়েছে তা দূরীভূত হয়ে পূর্ণ ঈমান লাভ সম্ভব হবে।

–[মা'আরিফুল কুরআন : মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.)]

আয়াতগুলোর সূক্ষ্ম বিষয়াদি : নামাজ ও জাকাত আবশ্যিক হওয়া এ ধরনের অনেক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। এমনিভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও এগুলোর সময় এবং শর্তসমূহ, জাকাতের পরিমাণ ও শর্তাবলির বর্ণনা বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসের মধ্যে এসেছে। হ্যাঁ, اِرْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ দ্বারা কাজি বায়জাবী (র.) জামাতের সাথে নামাজ পড়া ফরজ হওয়ার ব্যাপারে দলিল পেশ করেছেন। হানাফীদের দৃষ্টিতে যেহেতু জামাত সুন্নতে মুয়াক্কাদা তবে ওয়াজিবের নিকটবর্তী অথবা বলা হবে যে আয়াত দ্বারা তো ওয়াজিবই মানা হয়; কিন্তু যেহেতু এ ব্যাপারে অপরের উপর নির্ভর হতে হয়। অর্থাৎ জামাত অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য ইমাম ও মুক্তাদির মুখাপেক্ষী হতে হয়। তাই কিতাবের বাহ্যিক ওয়াজিবকে ছেড়ে দিতে হবে। জুমার নামাজে যদিও অপরের উপর নির্ভর করতে হয়; কিন্তু জুমা সংঘটিত হওয়ার শর্তগুলোর মধ্য থেকে জামাত পাওয়া যাওয়াও ১টি শর্ত রয়েছে। তাই এটাকে ফরজ এবং ওয়াজিব বলা যায়।

ক্বাজী বায়জাবী (র.) স্বীয় শাফেয়ী মাযহাব মতে উক্ত আয়াত দ্বারা কাফেররা শরয়ী আহকাম ও ফুরূ' -এর দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ার ব্যাপারে দলিল পেশ করেছেন। যেমন– নামাজ, জাকাত ইত্যাদি ইবাদতের নির্দেশ আহলে কিতাব তথা কাফেরদেরকে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু হানাফিয়্যাদের পক্ষ থেকে সাহেবে মাদারিক (র.) বলেছেন যে, উক্ত আয়াতের পূর্বের আয়াত وَاٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ-এর মধ্যে ঈমান গ্রহণ করার আহ্বান উল্লেখ করা হয়েছে। তাই তাক্বদীরী ইবারত এমন যে اَسْلِمُوْا وَاعْمَلُوْا عَمَلَ اَهْلِ الْاِسْلَامِ অর্থাৎ কাফেররা পরকালের ধর-পাকড়ের হিসেবে তো উসূল ও ফুরূ' এর মুকাল্লাফ বা দায়িত্বপ্রাপ্ত। কিন্তু দুনিয়াতে শুধু মু'আমালাত [আদান-প্রদান] শাস্তির বিধানসমূহ এবং দুনিয়াবী শৃঙ্খলার মূলনীতিগুলোর দায়িত্বপ্রাপ্ত। ইবাদতের মুকাল্লাফ তারা নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ঈমান গ্রহণ না করবে। –[কামালাইন খ. ১. পৃ. ৬৩]

অনুবাদ :

٤٧. يٰبَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالشُّكْرِ عَلَيْهَا بِطَاعَتِىْ وَاَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ اَىْ عَلٰى اٰبَاءِكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ عَالَمِىْ زَمَانِهِمْ.

৪৭. হে বনী ইসরাঈল! আমার সেই অনুগ্রহ স্মরণ কর আমার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। যা দ্বারা আমি তোমাদেরকে অনুগৃহীত করেছি এবং তোমাদেরকে অর্থাৎ তোমাদের পিতৃ পুরুষদেরকে বিশ্বে অর্থাৎ তাদের সময়কার পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

٤٨. وَاتَّقُوْا خَافُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ فِيْهِ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا هُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُقْبَلُ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ مِنْهَا شَفَاعَةٌ اَىْ لَيْسَ لَهَا شَفَاعَةٌ فَتُقْبَلُ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ فِدَاءٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ يُمْنَعُوْنَ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ.

৪৮. তোমরা সেদিন সম্পর্কে সাবধান হও অর্থাৎ ভয় কর যেদিন কোনো প্রাণী কোনো প্রাণীর কাজে আসবে না অর্থাৎ কিয়ামত দিবস এবং কারও সুপারিশ স্বীকৃত হবে না তাদের পক্ষে কোনো সুপারিশই হবে না গৃহীত তো দূরের কথা। لَا يُقْبَلُ ক্রিয়া পদটি ى অর্থাৎ নাম পুরুষ পুংলিঙ্গ ও ت অর্থাৎ নাম পুরুষ স্ত্রীলিঙ্গ উভয় রূপেই পঠিত রয়েছে। অন্য এক আয়াতে রয়েছে যে, তারা বলবে فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ [হায়! আমাদের কোনো সুপারিশকারী নেই] এবং কারো নিকট হতে ক্ষতিপূরণ মুক্তিপণ গৃহীত হবে না এবং তারা কোনো প্রকার সাহায্য পাবে না। আল্লাহ তা'আলার আজাব হতে তাদেরকে রক্ষা করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : বনী ইসরাঈল, যাদের মধ্যে প্রায় ৭০ হাজার পয়গাম্বর হযরত মূসা ও ঈসা (আ.)-এর মধ্যবর্তী সময়ে পাঠানো হয়েছে এবং অসংখ্য বাদ্শাহ এ এক গোত্রেই সৃষ্টি করা হয়েছিল। পূর্বের রুকূ'তে এ খান্দানের উপর প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছিল। এখান থেকে ঐ নিয়ামতগুলোরই বিস্তারিত তালিকা আরম্ভ করা হচ্ছে। তৃতীয় يَا بَنِىْ পর্যন্ত প্রায় ৪০টি ঘটনা উল্লেখ করা হবে। যেগুলোর মধ্যে একদিকে আল্লাহর প্রতিদানের দৃষ্টিকোণ থাকবে এবং অপরদিকে তাদের অযোগ্যতাসমূহতের দৃষ্টিকোণ থাকবে।

সেই সাথে তাদেরকে কিয়ামত দিবসের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করানো হচ্ছে। যেদিন কেউ কারো কোনো কাজে আসবে না, কারো সুপারিশ গৃহীত হবে না এবং মুক্তিপণও গ্রহণ করা হবে না। বস্তুত বনী ইসরাঈলীদের বিপর্যয়ের বড় একটি কারণ এই ছিল যে, পরকাল সম্পর্কে তাদের আকিদা-বিশ্বাস খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তারা এমন চিন্তায় নিমজ্জিত ছিল যে, আমরা বিশিষ্ট নবীদের সন্তান, বড় বড় ওলী ও নেক বান্দাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক। তাঁদের অসিলাতেই আমাদের ক্ষমা হয়ে যাবে এবং কোনো শাস্তি হবে না। তাদের এহেন ভ্রান্ত চিন্তাধারা ও বিশ্বাসকে খণ্ডন করার জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি তাঁর নিয়ামত ও অনুগ্রহসমূহ উল্লেখ করার পর বলেন–

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ.

قَوْلُهُ عَالَمِي زَمَانِهِمْ : এখানে এদিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে যে, বনী ইসরাঈলের শ্রেষ্ঠত্বের অর্থ এই যে, বনী ইসরাঈলের জাতীয় সত্তার সূচনা হতে এ আয়াত নাজিল হওয়া পর্যন্ত তারাই ছিল সকল জাতির সেরা। অন্য কোনো সম্প্রদায় তাদের সম পর্যায়ের ছিল না। কিন্তু তারা যখন শেষ নবী ﷺ ও কুরআনের মোকাবিলায় অবতীর্ণ হলো, তখন তাদের সে শ্রেষ্ঠত্বের অবসান ঘটল এবং তাদেরকে অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট উপাধি প্রদান করা হলো। অপরপক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসারীগণ ভূষিত হলো خَيْرُ أُمَّةٍ তথা শ্রেষ্ঠ উম্মতের মহামূল্য ভূষণে। -[তাফসীরে উসমানী পৃ. ১০, টীকা. ৪]

قَوْلُهُ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِيْ الخ : বলা বাহুল্য, এখানে কিয়ামত দিবসের কথাই বলা হয়েছে। খুবই উপযুক্ত সময়ে কিয়ামতের কথা স্মরণ করানো হয়েছে। বিচার দিবসের শাস্তি-পুরস্কারের বিশ্বাসই হলো মানুষের মনে দায়িত্ববোধ সৃষ্টির একমাত্র নিয়ামক। কিন্তু ইসরাঈলীদের হৃদয় থেকেই শুধু নয়, বলা উচিত যে তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে পর্যন্ত মুছে গিয়েছিল এ বিশ্বাস। সামনে কিয়ামত দিবসের যে সকল বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে, সেগুলোর মাধ্যমে কোনো না কোনো ইসরাঈলী আকিদা ও বিশ্বাস খণ্ডন করাই হলো উদ্দেশ্য। لَا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ অংশটুকু দ্বারা সেই আকিদা ও বিশ্বাসকে আঘাত করা হয়েছে, যা আজ পর্যন্ত ইহুদিদের বিশ্বকোষে এভাবে লিখে আসা হচ্ছে। অনেকে তাদের পূর্ববর্তীদের আর অনেকে তাদের পরবর্তীদের পুণ্যকর্মের সুবাদে পরিত্রাণ লাভ করবে।

-[ইহুদি ধর্মের বিশ্বকোষ খ. ৬ পৃ. ২১ -এর বরাতে তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ لَا تُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ : এ অংশে এই আকিদা নাকচ করা হয়েছে যে, আমল ও আকিদা যেমনই হোক, পুণ্যাত্মা পূর্ববর্তীরা সুপারিশ করে তাদের পরিত্রাণের ব্যবস্থা অবশ্যই করবেন। সুপারিশের এই অতিরঞ্জিত ধারণাই খ্রিস্টধর্মে এসে চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করেছে। এভাবে পাপ মোচনের ন্যায় সুপারিশের ধারণার উপরই তৈরি হয়েছে গোটা খ্রিস্টধর্মের ভিত্তি।

قَوْلُهُ لَيْسَ لَهَا شَفَاعَةٌ : অর্থ نَفْسٌ كَافِرٍ -এর জন্য মূলত কোনো শাফায়াতের অধিকারই নেই। কবুল হওয়া তো দূরের কথা। এর ব্যাখ্যা এও হতে পারে যে, نَفْسٌ مُؤْمِنٍ কোনো কাফেরকে সুপারিশ করতে পারে না। -[হাশিয়ায়ে জামাল]

আর হাদীসে যে রয়েছে- اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ অর্থাৎ যে যাকে ভালোবাসবে সে তার সাথে থাকবে- এর অর্থ হলো যাকে ভালোবাসবে, সে যদি মু'মিন হয়, তাহলে একত্রে থাকবে, অন্যথায় নয়।

قَوْلُهُ لَا تُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ : এখানে মূলত ইহুদী ধর্ম ও খৃস্টধর্মের পাপ মোচন সংক্রান্ত আকিদাকেই আঘাত করা হয়েছে। খ্রিস্ট ধর্মের পাপ মোচন আকিদার গুরুত্ব তো বলাই বাহুল্য। এমনকি ইহুদিদেরও একটা বিরাট অংশ উপরিউক্ত ভ্রান্ত আকিদায় বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিল। -[ইহুদি ধর্মের বিশ্বকোষ খ.২ পৃ. ২৭৮-এর সূত্রে তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ : যাদের মৃত্যু ঈমানের সাথে হয়নি, তারা কোনো দিক থেকেই সাহায্য পাবে না, যাতে তাদের শাস্তি লাঘব হতে পারে, পুনঃ পরিত্রাণ তো দূরের কথা।

আয়াতের সারকথা : যখন কোনো ব্যক্তি কোনো বিপদে পড়ে, তখন তার বন্ধু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটাই করে যে, বন্ধু হিসেবে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য আদায়ে সচেষ্ট হয়। এটা নিষ্ফল হলে সুপারিশ দ্বারা তাকে রক্ষা করার তদবির করে। এটাও যদি ব্যর্থ হয়, তখন ক্ষতিপূরণ দিয়ে তাকে ছাড়িয়ে আনে। শেষ পর্যন্ত যদি এতেও কাজ না হয়, তখন তার সাহায্যকারীদের একত্র করে বাহুবলে তার মুক্তির ব্যবস্থা করে। আল্লাহ তা'আলা পর্যায়ক্রমে এসবের উল্লেখ করে ঘোষণা করেন, কোনো ব্যক্তি মহান আল্লাহ তা'আলার যতই নিকটতম হোক না কেন, উপরিউক্ত চার পদ্ধতির কোনো পদ্ধতিতেই মহান আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য কোনো কাফেরের উপকার করতে পারবে না। বনী ইসরাঈলরা বলত, আমরা যত পাপই করি, আমাদের শাস্তি হবে না। আমাদের পূর্বপুরুষ নবী-রাসূলগণ আমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করবেন। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, তোমাদের সে ধারণা ভ্রান্ত। তবে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত যে শাফাআতের কথা বলেন, এ আয়াত দ্বারা তা রদ হয় না। কারণ অন্যান্য আয়াতেও তার উল্লেখ আছে। -[তাফসীরে উসমানী পৃ. ১০, টীকা. ৫]

বনী ইসরাঈলকে প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের বিবরণ : পৃথিবীতে এমনটা খুব কমই ঘটে যে, দীন ও দুনিয়ার নেতৃত্ব উভয়টি কোনো এক স্থানে একত্র হয়ে যায়। এমনটি একেবারেই বিরল যে, উভয়টির মধ্যে এমন ধারাবাহিকতা হবে যে, কয়েক পুরুষ ও বংশ পরম্পরায় চলতে থাকবে। কিন্তু বনী ইসরাঈলের শত শত বৎসরের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তা'আলা এ জাতিকে এত দীর্ঘকাল পর্যন্ত গর্বিত করে রেখেছেন যে, এত দীর্ঘকাল পর্যন্ত সম্ভবত ঐ গর্ব পৃথিবীর অন্য কোনো জাতির ভাগ্যে জুটেনি। আর এটাও সম্ভবত তাদেরই ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য যে, যত বড় অপরাধী ও অবাধ্য এরা হয়েছে, সকল গোত্রের ইতিহাস এর তুলনা বা দৃষ্টান্ত পেশ করতেও অক্ষম রয়েছে। সৃষ্টিগতভাবে এত অধিক গর্বের পাত্র হওয়াটাই হয়তো এ জাতির ধ্বংসের কারণ হতে পারে। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। এ সত্যকে পবিত্র কুরআন অভিযোগের স্বরে ব্যক্ত করছে যে, إِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ [আমি তোমাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি সমগ্র বিশ্বের উপর]।

বিপদ থেকে মুক্তির চারটি পন্থা : প্রথম আয়াতে উৎসাহ প্রদানকারী বক্তব্য রয়েছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে ভীতি প্রদর্শন করছেন যে, দুনিয়াতে কোনো বিপদ থেকে রক্ষার চারটি পন্থা হতে পারে। যথা– ১. আবেদন ২. প্রতিদান ৩. সুপারিশ এবং ৪. সাহায্য। কিন্তু পরকালে ঈমান না থাকলে তোমাদের জন্য এ সব রাস্তা বন্ধ থাকবে। তাই এখন থেকে এর চিন্তা ও ব্যবস্থা করে নাও। কেননা মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বর্তমান অবস্থা দ্বারা তাদেরকে নিরাশ ও হতাশা করা।

সুপারিশকে অস্বীকার এবং এর উত্তর : উপরিউক্ত বক্তব্যের পর মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের জন্য উক্ত আয়াত দ্বারা এবং مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ আয়াত দ্বারা শাফায়াতকে অস্বীকার করার উপর দলিল পেশ করার কোনো সুযোগ নেই। যেমন মুফাস্সির (র.)-ও এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন। কেননা উক্ত আয়াতে তো স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, ব্যাপক সুপারিশের আলোচনা নয়; বরং বিশেষভাবে কাফেরদের জন্য সুপারিশ না হওয়া কিংবা কবুল না হওয়া বর্ণনা করা হয়েছে। আর অন্য আয়াত أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ -এর মধ্যে গুনাহগার মুমিনদের জন্য সুপারিশের সত্যায়ন করা হচ্ছে। এমনিভাবে شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي হাদীসও দাবির প্রমাণকারী। আর আয়াতুলকুরসীর যতটুকু সম্পর্ক এ ব্যাপারে রয়েছে, তা হচ্ছে অনুমতি ছাড়া সুপারিশকে নিষেধ করা হচ্ছে। সাধারণভাবে সুপারিশকে নিষেধ করা হয়নি। কিংবা অনুমতি সাপেক্ষে সুপারিশকে নিষেধ করা হয়নি।

আর বুদ্ধিভিত্তিকভাবেও মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের সুপারিশকে [শাফাআতকে] ইনসাফের পরিপন্থি বলা ঠিক নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলার হক বা অধিকার হলো– স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নিজ দয়া ও অনুগ্রহে ক্ষমা করে দেবেন এবং নিজ হককে ক্ষমা করা জুলুম নয়। আর একে জুলুম বলা হয় না; বরং দান ও বখশিশ এবং মুক্ত করা বলা হয়। হ্যাঁ, বান্দার হক তো আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন না; বরং হকদারকে এ পরিমাণ খুশি করে দেবেন যে, সে স্বয়ং সন্তুষ্ট হয়ে আনন্দচিত্তে ক্ষমা করে দেবে। এর মধ্যে মুতাযিলাদের কি ক্ষতি হচ্ছে?

মূল অসন্তুষ্টির শিকড় ও ভিত্তি : অতঃপর যখন ইহুদিদের মন-মানসিকতার মধ্যে সাহেবযাদাহ ও নবীযাদাহর গন্ধ ছিল। তাই বাতিল আশা সমূহের শিকড় কেটে দেওয়া হয়েছে যে, ঈমান ব্যতীত কোনো ভরসা কাজে আসবে না। হ্যাঁ, ঈমানদার ও নেককার হলে। তবে অল্প কিছু ত্রুটি ক্ষমা হতে পারে। ঈমান ও আমল ব্যতীত শুধু বংশের উপর অহংকারকারী পীরযাদাহদের উক্ত আয়াত থেকে সবক নেওয়া উচিত। তাই শাফায়াতকে এ আয়াতে প্রথম উল্লেখ করা হয়েছে। এবং শেষ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ আয়াতে শাফায়াতকে পরে উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে করে সেই অহংকারের একেবারে মূলোচ্ছেদ হয়ে যায়

٤٩. وَاذْكُرُوْا إِذْ نَجَّيْنٰكُمْ أَيْ اٰبَاءَكُمْ وَالْخِطَابُ بِهِ وَمَا بَعْدَهُ الْمَوْجُوْدِيْنَ فِيْ زَمَنِ نَبِيِّنَا ﷺ أُخْبِرُوْا بِمَا أَنْعَمَ عَلٰى اٰبَائِهِمْ تَذْكِيْرًا لَهُمْ بِنِعْمَةِ اللّٰهِ لِيُؤْمِنُوْا مِنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ يُذِيْقُوْنَكُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ أَشَدَّهُ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ مِنْ ضَمِيْرِ نَجَّيْنٰكُمْ يُذَبِّحُوْنَ بَيَانٌ لِمَا قَبْلَهُ أَبْنَاءَكُمُ الْمَوْلُوْدِيْنَ وَيَسْتَحْيُوْنَ يَسْتَبْقُوْنَ نِسَاءَكُمْ لِقَوْلِ بَعْضِ الْكَهَنَةِ لَهُ أَنَّ مَوْلُوْدًا يُوْلَدُ فِيْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ يَكُوْنُ سَبَبًا لِذَهَابِ مُلْكِكَ وَفِيْ ذٰلِكُمُ الْعَذَابِ أَوِ الْإِنْجَاءِ بَلَاءٌ اِبْتِلَاءٌ وَإِنْعَامٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ.

٥٠. وَاذْكُرُوْا إِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ بِسَبَبِكُمُ الْبَحْرَ حَتّٰى دَخَلْتُمُوْهُ هَارِبِيْنَ مِنْ عَدُوِّكُمْ فَأَنْجَيْنٰكُمْ مِنَ الْغَرَقِ وَأَغْرَقْنَا اٰلَ فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ مَعَهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ إِلٰى انْطِبَاقِ الْبَحْرِ عَلَيْهِمْ.

٥١. وَإِذْ وٰعَدْنَا بِالْفٍ وَدُوْنَهَا مُوْسٰى أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً نُعْطِيْهِ عِنْدَ انْقِضَائِهَا التَّوْرٰةَ لِتَعْمَلُوْا بِهَا ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ الَّذِيْ صَاغَهُ لَكُمُ السَّامِرِيُّ إِلٰهًا مِنْ بَعْدِهِ أَيْ بَعْدَ ذَهَابِهِ إِلٰى مِيْعَادِنَا وَأَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ بِاتِّخَاذِهِ لِوَضْعِكُمُ الْعِبَادَةَ فِيْ غَيْرِ مَحَلِّهَا.

অনুবাদ :

৪৯. আর স্মরণ কর যখন আমি নিষ্কৃতি দিয়েছিলাম তোমাদেরকে অর্থাৎ তোমাদের পিতৃ-পুরুষকে এখানে এবং পরবর্তীস্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কালে জীবিত ইহুদিদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং তাদের পিতৃ-পুরুষদের উপর যে অনুগ্রহ হয়েছে, সে সম্পর্কে তাদেরকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে যেন তারা ঈমান আনে। ফেরাউন সম্প্রদায় হতে, তারা তোমাদেরকে মর্মান্তিক যন্ত্রণা দিত ভোগ করাত। يَسُوْمُوْنَكُمْ বাক্যটি نَجَّيْنَاكُمْ -এর كُمْ সর্বনাম হতে حَال বা ভাব ও অবস্থাবাচক বাক্যরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে নবজাতক পুত্র সন্তানদেরকে জবাই করত ও তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রাখত ছেড়ে দিত। يُذَبِّحُوْنَ বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্য يَسُوْمُوْنَكُمْ -এর বিবরণ। জনৈক গণকের কথায়। [গণক ফেরাউনকে বলেছিল] বনী ইসরাঈলের মধ্যে এমন এক সন্তান ভূমিষ্ট হবে যে তোমার সাম্রাজ্য বিনাশের কারণ হবে। এবং তাতে উক্ত উৎপীড়ন বা উক্ত নিষ্কৃতিদানে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক মহাসংকট পরীক্ষা বা অনুগ্রহ ছিল।

৫০. আর স্মরণ কর যখন তোমাদের জন্য তোমাদের কারণে সাগরকে বিদীর্ণ করেছিলাম দ্বিধা বিভক্ত করেছিলাম। আর শত্রু-ভয়ে পলায়নপর অবস্থায় তোমরা তাতে প্রবেশ করলে অনন্তর তোমাদেরকে ডুবে যাওয়া হতে উদ্ধার করেছিলাম ও ফেরাউনকে তার সম্প্রদায়সহ করেছিলাম আর তোমরা তাদের সমুদ্রের দ্বারা আবৃত হওয়া প্রত্যক্ষ করছিলে।

৫১. যখন মূসার জন্য চল্লিশ রাত্রি নির্ধারিত করেছিলাম যে, এই সময়সীমার শেষে তাকে তাওরাত প্রদান করব, যেন এতদনুসারে তোমরা আমল করতে পার। তারপর অর্থাৎ আমার নির্ধারিত সময় পূরণার্থে মূসার প্রস্থানের পর তোমরা তখন গো-বৎসকে সামিরী যা তোমাদের জন্য গড়েছিল, তাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিলে। আর তাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করায় তোমরা হলে জালিম, সীমালঙ্ঘনকারী কারণ আল্লাহ তা'আলার জন্য যে ইবাদত তা তোমরা মাখলুকের জন্য নির্ধারণ করেছিলে।

এই আয়াতে وَعَدْنَا ক্রিয়াটি وَاو -এর পর اَلِف সহ (اَلْمُفَاعَلَةُ) এবং اَلِف ব্যতীত وَعَدْنَا (مُجَرَّد ـ بَاب ضَرَبَ) উভয়রূপেই পাঠ করা যায়।

٥٢. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مَحَوْنَا ذُنُوبَكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ الْاِتِّخَاذِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ نِعْمَتَنَا عَلَيْكُمْ.

৫২. এরপরও অর্থাৎ তাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করার পরও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছি তোমাদের পাপসমূহ বিলীন করে দিয়েছি। যাতে তোমরা তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

٥٣. وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ التَّوْرٰةَ وَالْفُرْقَانَ عَطْفُ تَفْسِيْرٍ اَيِ الْفَارِقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ بِهٖ مِنَ الضَّلَالِ.

৫৩. যখন আমি মূসাকে দান করেছিলাম কিতাব অর্থাৎ তাওরাত ও ফুরকান اَلْفُرْقَانُ শব্দটি عَطْف تَفْسِيْر বা বিবরণমূলক অব্যয়। অর্থাৎ এমন এক গ্রন্থ, যা সত্য ও অসত্য এবং হালাল ও হারামের মধ্যে পার্থক্য করে দেয়। যাতে তোমরা তার মাধ্যমে গুমরাহী হতে হেদায়েত লাভ করতে পার।

তাহকীক ও তারকীব

بَلَاءٌ - اِسْتِحْيَاء-এর অর্থ : দাসী বানানো অথবা লজ্জার পর্দা উঠানো, حِيَا যের এর সাথে মহিলার লজ্জাস্থানের অর্থে : آسلে اِخْتِيَار [বাছাই] এর অর্থে আসে। পরীক্ষা কখনো নিয়ামতের মধ্যে হয় এবং কখনো মসিবতের মধ্যে। وَاعَدْنَا **বাবে** مُفَاعَلَة থেকে যদি হয়, তবে উভয় পক্ষ থেকে অঙ্গীকার উদ্দেশ্য হবে। হযরত মূসা (আ.) উপস্থিতির অঙ্গীকার **করেছেন,** এবং আল্লাহ তা'আলা কিতাব দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন। আর যদি وَعَدْنَا ছুলাছী মুজাররাদ থেকে হয়, তবে শুধু এক পক্ষ থেকে অঙ্গীকার উদ্দেশ্য হবে।

مُوْسٰى এটা ইবরানী ভাষার শব্দ مُوْ অর্থ পানি, سٰى অর্থ- বৃক্ষ হযরত মূসা (আ.) ইমরানের ছেলে এবং قَهَاث -এর নাতি **ছিলেন**। যিনি হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর নাতি ছিলেন। ইরানের বাদশা মনূচেহের-এর জমানায় হযরত ঈসা (আ.)-এর ১৫৭১ **বৎসর** পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

نَجَّيْنٰكُمْ জুমলা مِنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ -এর মুতা'আল্লাক। يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ জুমলা হয়ে হাল হয়েছে اٰلِ فِرْعَوْنَ অথবা نَجَّيْنٰكُمْ থেকে কিংবা উভয় থেকে يُذَبِّحُوْنَ এবং يَسْتَحْيُوْنَ উভয় জুমলা বয়ান হচ্ছে يَسُوْمُوْنَكُمْ এর। তাই وَاو **عَاطِفَة** আনা হয়নি। بَلَاءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ মুবতাদায়ে مُؤَخَّر আর فِيْ ذٰلِكُمْ খবরে مُقَدَّم। فَرَقْنَا ফেয়েল ও ফায়েল **بِكُمُ মাফ'**উলে ছানী। الْبَحْرَ মাফউলে اَوَّل আর فَاَنْجَيْنٰكُمْ মা'তূফ আলাইহি وَاَغْرَقْنَا মা'তূফ। اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً **মাফ'**উলে ছানী। اَلْعِجْلَ মাফ'উলে আউয়াল হচ্ছে اِتَّخَذْتُمْ ফেয়েলের। اِلٰهًا মাফ'উলে ছানী মাহযূফ। اَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ **জুমলা** হাল ফায়েল। مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ মুতা'আল্লিক্ব হচ্ছে عَفَوْنَا ফেয়েলের সাথে। مُوْسٰى মাফউলে আউয়াল اٰتَيْنَا **ফেয়েলের**। আর اَلْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ মা'তূফ আলাইহি ও মা'তূফ মিলে মাফউলে ছানী।

قَوْلُهٗ نَجَّيْنَا : ক্রিয়াটি بَاب تَفْعِيْل -এর ক্রিয়ামূল থেকে নির্গত। পর্যায়ক্রমে হওয়া হলো تَفْعِيْل -এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কতিপয় ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, সকল ইসরাঈলী মিসর থেকে একসাথে বের হয়নি; বরং ধীরে ধীরে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে বেরিয়ে আসছিলো। সবার শেষে সবচেয়ে বড় দলটি বের হয়েছিলো হযরত মূসা (আ.)-এর নেতৃত্বে এবং পথ ভুলে তারা নদী পথে পার হয়েছিল।

قَوْلُهٗ اٰلِ فِرْعَوْنَ : اٰل ও اَهْل শব্দ দুটি আভিধানিকভাবে সমার্থক; পরিবার-পরিজন, অনুগত জন, স্বগোত্রীয় জন, কিংবা একই ধর্মমতের অনুসারী : اَهْلُ الرَّجُلِ عَالَةٌ وَاَتْبَاعُهٗ وَاَوْلِيَاۤئُهٗ তবে ব্যবহারগত পার্থক্য এই যে, لَا يُسْتَعْمَلُ الْاٰلُ اِلَّا مَا فِيْهِ شَرَفٌ غَالِبًا অর্থাৎ اهل শব্দটি সর্বত্র প্রযোজ্য; পক্ষান্তরে ال শব্দটি অভিজাত ও বিশিষ্ট জনদের বেলায়ই শুধু প্রযোজ্য হয়।

قَوْلُهُ يَسُوْمُوْنَكُمْ : এটি (ن) سَوْمٌ থেকে مُضَارِع جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ -এর সীগাহ। এর দু'টি অর্থ রয়েছে-

১. اَلطَّلَبُ অর্থাৎ কামনা করা, অন্বেষণ করা। এ থেকেই سَامَ السِّلْعَةَ إِذَا طَلَبَهَا -এর ব্যবহার রয়েছে। আয়াতের অর্থ হবে- يَبْغُوْنَ اَىْ يَطْلُبُوْنَ تَعْذِيْبَكُمْ

২. اَلدَّوَامُ অর্থাৎ স্থায়িত্ব এ থেকেই سَائِمَةُ الْعَذَابِ আয়াতের অর্থ হবে- يُدِيْمُوْنَ تَعْذِيْبَكُمْ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য বিষয় : পূর্বের আয়াতসমূহে বনী ইসরাঈলীদের প্রতি যেসব নিয়ামত ও অনুগ্রহের কথা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে, এখান থেকে ধারাবাহিকভাবে কয়েক রুকূ' পর্যন্ত তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হচ্ছে।

বনী ইসরাঈলের ঐতিহাসিক যাত্রা : ফেরাউন ও মিসরীয় প্রশাসনের উৎপীড়ন-নিপীড়ন বছরের পর বছর ভোগ করার পর অবশেষে হযরত মূসা (আ.)-এর নেতৃত্বে গোটা ইসরাঈলী সম্প্রদায় মিসর ত্যাগ করে পিতৃভূমি সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল এবং পূর্ণ গোপনীয়তা বজায় রেখে নৈশকালে যাত্রা শুরু করল। তখনকার যুগে বর্তমান কালের মতো নিয়মিত সড়ক পথ ও ল্যাম্প পোস্টের ব্যবস্থা ছিল না। ফলে রাতের আঁধারে ইসরাঈলীরা পথ ভুল করলো এবং উত্তর দিকে আরো কিছু দূর অগ্রসর হয়ে নিজেদের ডানে পূর্ব দিকে মোড় নেওয়ার পরিবর্তে প্রথমেই এদিকে মোড় নিয়ে বসলো। অন্যদিকে খবর পাওয়া মাত্র ফেরাউন স্বয়ং বাহিনী পরিচালনাপূর্বক প্রচণ্ড বেগে পিছু ধাওয়া করে এসে উপনীত হলো। এখন ইসরাঈলীদের সামনে অর্থাৎ পূর্ব দিকে সমুদ্র ছিলো, ডানে ও বামে তথা উত্তরে ও দক্ষিণে ছিলো পর্বতশ্রেণী এবং পশ্চাতে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে ছিলো মিসরীয় বাহিনী। উক্ত ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে উক্ত আয়াতে। তাওরাতে এটাকে ইসরাঈলীদের যাত্রা বলে অভিহিত করা হয়েছে। নিশ্চিত করে যাত্রার সময় ও কাল নির্ণয় দুরূহ ব্যাপার। আধুনিক গবেষণার আলোকে খৃস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেউ কেউ সাহস করে সন-বছরও উল্লেখপূর্বক এটাকে খ্রিস্টপূর্ব ১৪৪৭ সালের ঘটনা বলেছেন। -[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ৯৭-৯৮]

قَوْلُهُ فِرْعَوْنَ : [ফেরাউন] নির্দিষ্ট কোনো বাদশার ব্যক্তিগত নাম নয়; বরং এটা প্রাচীন মিসর অধিপতিদের উপাধি বিশেষ যেমন আমাদের যুগে এই সেদিনও জার্মান অধিপতিকে সিজার এবং রুশ অধিপতিকে জার বলা হতো। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের ধারণায় একজন নয়, বরং পরপর দু'জন বাদশা ছিল হযরত মূসা (আ.)-এর সমসাময়িক।

হযরত মূসা (আ.)-এর সমকালীন ফেরাউনের নাম : আহলে কিতাবদের মতে হযরত মূসা (আ.)-এর সমকালীন ফেরাউনের নাম ছিল قَابُوْس [কাবুস]। ওয়াহাব বলেন, তার নাম ছিল وَلِيْدُ بْنُ مَصْعَبِ ابْنِ رَيَّانَ [ওলীদ ইবনে মাসআব ইবনে রাইয়ান]।

قَوْلُهُ اَشَدَّهُ سُوْءَ الْعَذَابِ : এর ব্যাখ্যায় اَشَدَّهُ উল্লেখ করে একটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, আজাবতো পুরোটাই মন্দ। এর তো কোনো ভালো দিক নেই। তাহলে سُوْءَ الْعَذَابِ -এর অর্থ কি?

জবাবে মুসান্নিফ (র.) ইঙ্গিত করেছে سُوْءَ الْعَذَابِ দ্বারা اَشَدَّ الْعَذَابِ উদ্দেশ্য।

لِاَنَّهُ اَقْبَحُهُ بِالْاِضَافَةِ اِلٰى سَائِرِهٖ

قَوْلُهُ بَيَانٌ لِمَا قَبْلَهُ : অর্থাৎ এটি পূর্বে উল্লিখিত বিষয়ের ব্যাখ্যা ও বিবরণ। এখানে بَيَان দ্বারা নাহু শাস্ত্রের بيان উদ্দেশ্য নয়। এখানকার বিবরণটি পরিপূর্ণ নয়, আংশিক। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ বলেন, ফেরাউনের কর্মচারী হিসেবে বনী ইসরাঈলরা বিভিন্নভাগে বিভক্ত ছিল। যারা শক্তিশালী ও কর্মক্ষম ছিল তাদেরকে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করে রেখেছিল। কেউ পাহাড় থেকে পাথর কেটে আনত। কেউ ফেরাউনের প্রাসাদ নির্মাণের জন্য পাথর ও মাটি বহন করে আনত। কেউ ইট তৈরি করত। কেউ কাঠ মিস্ত্রি ও কামারের কাজ করত। আর যারা ছিল দুর্বল তাদের উপর আরোপ করা হয়েছিল বিভিন্ন কর ও ট্যাক্স। মহিলারা নিয়োজিত ছিল সূতাকাটা ও কাপড় বুনার কাজে। সুতরাং মুফাসসির (র.)-এর বক্তব্য بَيَانٌ لِمَا قَبْلَهُ -এর মর্ম হলো بَعْضُ بَيَانٍ لِمَا قَبْلَهُ অর্থাৎ তন্মধ্যে হতে কিছু বর্ণনা।

قَوْلُهُ لِقَوْلِ بَعْضِ الْكَهَنَةِ : **ফেরাউনের স্বপ্ন :** একবার ফেরাউন একটি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখল যে, বায়তুল মুকাদ্দাসের দিক থেকে একটি আগুনের কুণ্ডলি বের হয়ে গোটা মিসরকে ঘিরে ফেলেছে। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো সে আগুন কেবল মিসরের আদি অধিবাসী কিবতিদেরকেই জ্বালিয়ে দিচ্ছে; কিন্তু বনী ইসরাঈলের কাউকে স্পর্শ করছে না। গণকরা ভবিষ্যদ্বাণী করল যে,

ইসরাঈল বংশে এমন এক ছেলে জন্ম হবে যে, যার হাতে তোমার রাজ্যের পতন ঘটবে। এজন্য ফেরাউন নবজাতক পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করতে আরম্ভ করল। আর যেহেতু মেয়েদের দিক থেকে কোনো রকম আশঙ্কা ছিল, না তাই তাদের সম্পর্কে নিশ্চুপ রইল। এরপর হযরত মূসা (আ.)-এর মাধ্যমে বনী ইসরাঈলরা সে নিপীড়নের হাত থেকে রক্ষা পায়। বর্ণিত আয়াতে সে অনুগ্রহের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

قَوْلُهُ بَلَاءٌ : اِبْتِلَاءٌ وَاِنْعَامٌ : بَلَاءٌ-এর বিভিন্ন অর্থ আছে। ذٰلِكُمْ দ্বারা জবাই -এর দিকে ইঙ্গিত হলে এর অর্থ হবে বিপদ আর উদ্ধার করার প্রতি ইঙ্গিত হলে এর অর্থ হবে অনুগ্রহ। আর উভয়ের সমষ্টির প্রতি ইঙ্গিত করা হলে অর্থ নেওয়া হবে পরীক্ষা। -[তাফসীরে উসমানী]

বনী-ইসরাঈলের দাসত্বের যুগ : উক্ত তিনটি আয়াতে তিনটি ঘটনার দিকে সংক্ষিপ্তভাবে ইঙ্গিত করা হচ্ছে। প্রথম ঘটনা তো হযরত মূসা (আ.)-এর জন্মের পূর্বে কঠিন পরীক্ষার ছিল। যার মধ্যে পুরো জাতি আক্রান্ত ছিল। বনী-ইসরাঈলের গোত্র দাসত্বের জিঞ্জিরে পূর্ব থেকেই কষে বাঁধা ছিল। এর মধ্যে যা কিছু ত্রুটি ছিল, তা ঐ কঠোর প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থাপনা পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। যা হযরত মূসা (আ.)-এর আবির্ভাবের আশঙ্কাকে রোধ করার ব্যাপারে ফেরাউনের লোকজনের পক্ষ থেকে বনী ইসরাঈলের উপর আপতিত হয়েছিল। অজস্র নিষ্পাপ ও নিরপরাধ শিশুদেরকে শুধু হযরত মূসা (আ.) হতে পারেন- এ সন্দেহে হত্যা করা হয়েছিল।

আকবর এলাহাবাদী (র.) বুদ্ধিমত্তার ভাষায় বলেন- یوں تو قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا

افسوس کہ فرعون نے کالج کی نہ سوجھا ۔

অর্থ : এভাবে শিশুদের হত্যার কারণে যত অধিক দুর্ণাম তার হয়েছে, ততো অধিক দুর্নাম তার হতো না। আফসোস যে, ফেরআউন বর্তমান পাশ্চাত্যের ন্যায় কলেজ স্থাপন করে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার চিন্তা করেনি।

অর্থাৎ মূসা (আ.) ভূমিষ্ট হলে মানুষ হেদায়েতের পথে চলে আসবে। আর ফেরাউনের জুলুম ও কুফরের রাজত্ব ধ্বংস হবে। তাই ফেরাউন দেশবাসীকে পথভ্রষ্টতার ধোঁকার উদ্দেশ্যে হযরত মূসা (আ.) নামের সেই শিশুটি যাতে জন্ম না হতে পারে, সে পরিকল্পনা নিয়ে অসংখ্য শিশুকে হত্যা করে অনেক দুর্নামের ভাগী হয়েছে। তাই আল্লামা আকবর এলাহাবাদী (র.) আক্ষেপ করে বলেছেন যে, মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য ও পথভ্রষ্টতায় রাখার জন্য ফেরাউনের অসংখ্য শিশুকে হত্যা করার প্রয়োজন ছিল না; বরং বর্তমানে পাশ্চাত্যের ন্যায় কলেজ স্থাপন করেও দেশবাসীকে পথভ্রষ্ট করতে পারতো। যদি ফেরাউনের কলেজ স্থাপনের পদ্ধতি জানা থাকতো। শুধু তাই নয়; বরং দাসত্বের জিঞ্জিরগুলোকে আরো অধিক কষাণোর জন্য এবং নিজেদের কামনা-বাসনাসমূহের শিকার বানানোর জন্য মেয়েদেরকে জীবিতাবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হতো। সম্ভবত এর উদ্দেশ্য রাজনৈতিক সূত্র ও অস্ত্রগুলোকে অধিক শক্তিশালী করা। আর এটাও যে, যে সকল ঈর্ষান্বিত লোকদের ধমনীতে গরম রক্ত হবে। তাদের কোমর ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট সামানাদি তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল।

দাসত্ব থেকে মুক্তি : মোটকথা আল্লাহ তা'আলা ঐ নিকৃষ্ট বিপদ থেকে বনী ইসরাঈলকে মুক্তি দিয়েছেন। তারপর দ্বিতীয় আয়াতে সে দ্বিতীয় ঘটনার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.) বনী-ইসরাঈলকে সাথে নিয়ে তাদের পৈত্রিক জন্মভূমি সিরিয়ার অন্তর্গত কেনআনের দিকে [যা মিশর থেকে ৪০ দিনের পথ [দূরত্ব] উত্তর দিকে ছিল [ভ্রমণ করতেছিলেন। হযরত ইউসূফ (আ.) -এর বরকতময় লাশের বাক্সও সাথে ছিল। এমতাবস্থায় লোহিত সাগর সামনে পড়ল এবং ফেরাউনের বিরাট সৈন্যদল পেছন থেকে সসৈন্যে তাদেরকে গ্রেফতার করার জন্য চলে আসতেছিল। কঠোর হতবুদ্ধিতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। কিন্তু হযরত মূসা (আ.)-এর দোয়ার বরকতে ও তার লাঠির আঘাতে লোহিত সাগরের মাঝে বারটি খান্দানের জন্য বারটি শুষ্ক রাস্তা খুলে দেওয়া হলো। যেগুলোর দ্বারা বনী-ইসরাঈল তো নিরাপদে পার হয়ে গেল। কিন্তু ফেরাউনের বিরাট সৈন্য বাহিনী ডুবে মারা গেল। خس کم شد جہاں پاک شد অর্থ- খড়কুটু আবর্জনা কমেছে জগৎ পবিত্র হয়েছে] জালেম ও শত্রুদের ধ্বংসকে এমনভাবে নিজ নয়নে দর্শন করা দ্বিগুণ নিয়ামত।

قَوْلُهُ وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ : হযরত মূসা (আ.)-এর সঙ্গে বনী ইসরাঈল মিসর ত্যাগ করে যাওয়ার সময় ফেরাউন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। পথিমধ্যে পড়ে সাগর। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছায় সাগর দ্বিধাবিভক্ত হয়। মধ্যখানে সৃষ্টি হয় শুষ্ক রাস্তা। বনি ইসরাঈল পার হয়ে যায় আর ফেরাউন সে পথ ধরে পার হতে চাইলে দলবলসহ ডুবে মরে।

بِكُمْ : তোমাদের জন্য অর্থাৎ তোমাদের [রক্ষার] জন্য। তোমাদের পথ করে দেওয়ার জন্য।

فَرَقْنَا الْبَحْرَ . اَىْ فَرَقْنَا لَكُمْ (مَعَالِم) اَىْ فَرَقْنَا بِسَبَبِكُمْ وَبِسَبَبِ اِنْجَائِكُمْ . (كَشَّاف)

সমুদ্র বিভক্ত হওয়ার তাৎপর্য : এখানে فَرْقُ الْبَحْرِ বা সমুদ্রকে বিভক্ত করার যে কথা বলা হয়েছে, তা দ্বারা সমুদ্রের বিভক্ত হওয়া এবং মধ্যখানে শুষ্ক পথ হয়ে যাওয়া উদ্দেশ্য।

আল্লামা আব্দুল মাজেদ (র.) বলেন- এটা এমন খুব একটা অস্বাভাবিক ও প্রকৃতি বিরুদ্ধ ঘটনা নয়, যার দৃষ্টান্ত দূর ও নিকট অতীতে কোথাও পাওয়া যায় না। সামুদ্রিক ভূমিকম্পের [সুনামি] সময় এ ধরনের অবস্থা প্রায়ই দেখা দিয়ে থাকে। ১৯৩৪ সালের জানুয়ারীতে [রমজান ১৩৫২ হিজরি] ভারতের বিহার ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়েছিলো, তখন প্রদেশের কেন্দ্রীয় শহর পাটনায় দিনে দুপুরে প্রায় আড়াইটার সময় এক বিরাট জনসমষ্টি স্বচক্ষে দেখতে পেয়েছিল যে, গঙ্গার মত সুবিশাল নদীর পানি চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে শুষ্ক তলদেশ বেরিয়ে এলো এবং কয়েক সেকেন্ড নয়; বরং চার থেকে পাঁচ মিনিট স্থায়ী হয়েছিলো এ অস্বাভাবিক ও ভয়ঙ্কর দৃশ্য। অবশেষে একই রকম অবিশ্বাস্য গতিতে তলদেশ থেকে পানি বেরিয়ে এলো এবং নদী স্বাভাবিকভাবে পুনঃ প্রবাহিত হতে লাগল।

[লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত ইংরেজি দৈনিক পাইওনিয়ার ১৯৩৪ সালের ২০ জানুয়ারী সংখ্যায় ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ হয়েছে।] -[তাফসীরে মাজেদী খ.১, পৃ. ৯৮-৯৯]

قَوْلُهُ اَلْبَحْرَ : **বনী ইসরাঈল কোন নদী পাড়ি দিয়েছিল :** বাহর দ্বারা এখানে নীল নদের কথা বুঝানো হয়নি; বরং লোহিত সাগরের কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা ইসরাঈলীদের আবাসভূমির পশ্চিমে ছিল নীলনদের অবস্থান। পক্ষান্তরে ইসরাঈলীদের সিরিয়া অভিমুখী পথ ছিল পূর্ব দিকে। নীলনদের সাথে সে পথের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক ছিলো না। মিসর থেকে সিরিয়া অভিমুখী পথের নিকটেই ছিল লোহিত সাগর। এর সংকীর্ণ উত্তর মাথার প্রতিই এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মিসরের পূর্বাংশে যেখানে বর্তমানে 'সুয়েজ খাল' খনন করা হয়েছে, তার সংলগ্ন দক্ষিণ দিকের মানচিত্রে সমুদ্র দুই ত্রিভুজের আকারে বিভক্ত দেখা যায়। উক্ত ত্রিভুজদ্বয়ের পশ্চিম ত্রিভুজটিই এখানে উদ্দেশ্য। ইসরাঈলীরা সেটা পার হয়েই সিনাই উপদ্বীপে উপনীত হয়েছিলো। -[প্রাগুক্ত]

قَوْلُهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ : এ অংশটি উদ্দেশ্যহীন নয় কিংবা নিছক ছন্দ রক্ষার উদ্দেশ্য নয়; রবং অত্যন্ত জোরদারভাবে এ সত্য তুলে ধরা উদ্দেশ্য যে, এমন অমিত বিক্রম শক্রবাহিনীর ধ্বংসলীলার দুর্লভ দৃশ্য স্বচক্ষে অবলোকন করা আল্লাহ তা'আলার বিশেষ মদদ ছাড়া সম্ভব নয়। অথচ নিজের চোখেই তোমরা তা দেখছো।

হযরত মূসা (আ.)-এর তাওরাত প্রাপ্তি ও তাঁর অনুসারীদের ভ্রষ্টতা : এ ঘটনা ঐ সময়ের যখন ফেরাউন সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়ার পর বনী ইসরাঈলরা কারো কারো মতে মিসরে ফিরে এসেছিল। আবার কারো কারো মতে অন্য কোথাও বসবাস করছিল তখন হযরত মূসা (আ.)-এর খেদমতে বনী ইসরাঈলরা আরজ করলো যে, আমরা এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত। যদি আমাদের জন্য কোনো শরিয়ত নির্ধারিত হয়, তবে আমাদের জীবন বিধান হিসেবে আমরা তা গ্রহণ ও বরণ করে নেবো। হযরত মূসা (আ.)-এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক অঙ্গীকার প্রদান করলেন যে, তুমি তূর-পর্বতে অবস্থান করে একমাস পর্যন্ত আমার আরাধনা ও অতন্দ্র সাধনায় নিমগ্ন থাকার পর তোমাকে একটি কিতাব দান করবো। হযরত মূসা (আ.) তাই করলেন, ফলে তাওরাত লাভ করলেন। কিন্তু অতিরিক্ত দশ দিন উপাসনা-আরাধনায় মগ্ন থাকার নির্দেশ দেওয়ার কারণ ছিল এই যে, হযরত মূসা (আ.) একমাস রোজা রাখার পর ইফতার করে ফেলেছিলেন। আল্লাহ তা'আলার কাছে রোজাদারের মুখের গন্ধ অত্যন্ত পছন্দনীয় বিধায় হযরত মূসা (আ.)-কে আরো দশদিন রোজা রাখতে নির্দেশ দিলেন, যাতে পুনরায় সে গন্ধের উৎপত্তি হয়। এভাবে চল্লিশ দিন পূর্ণ হলো হযরত মূসা (আ.) তো ওদিকে তূর-পর্বতে রইলেন, এদিকে সামেরী নামক এক ব্যক্তি সোনা-রূপা দিয়ে গো-বৎসের একটি প্রতিমূর্তি তৈরি করলো এবং তার কাছে পূর্ব থেকে সংরক্ষিত হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ঘোড়ার খুরের তলার কিছু মাটি প্রতিমূর্তির ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়ার পর সেটি জীবন্ত হয়ে উঠলো এবং অশিক্ষিত বনি ইসরাঈলরা তারই পূজা করতে আরম্ভ করে দিল। -[মাআরিফুল কুরআন : মুফতি মুহাম্মদ শফী (র.)]

قَوْلُهُ مُوْسٰى : মূসা ইবনে ইমরান হলেন ইসরাঈলী সিলসিলার সর্বাধিক খ্যাত ও মর্যাদার অধিকারী পয়গাম্বর। তাওরাত মতে একশ বিশ বছর বয়স পেয়েছিলেন তিনি। ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনুমান মতে হযরত মূসা (আ.)-এর সময়কাল ছিলো খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী। জন্ম ও মৃত্যু সম্ভবত যথাক্রমে খ্রিস্টপূর্ব ১৫২০ ও ১৪০০ সালে। -[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً : অর্থাৎ দিবারাত্রি চল্লিশ দিন। কোনো কোনো তাফসীরকারের বর্ণনা মতে অবস্থানের সময়টা ছিল জিলকদের পূর্ণমাস এবং জিলহজের প্রথম দশদিন। হাকীমুল উম্মত থানভী (র.) বলেন, সুফী-সাধকদের সুপরিচিত চিল্লার উৎসমূল এটাই।

قَوْلُهُ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ : **বনী ইসরাঈলের মাঝে গো-বৎস পূজা যেভাবে এলো :** এ গুমরাহীর অনুপ্রবেশ ইসরাঈলীদের মধ্যে ঘটলো কিভাবে? এ প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর দেওয়া হয়েছে।এক বর্ণনা মতে মিসরীয়দের গো-পূজারই প্রতিবিম্ব ছিলো এটা। অন্যমতে এটা ছিল কেনানী [ফিলিস্তিনী] মুশরিক সম্প্রদায়ের প্রতিবেশি হওয়ার প্রভাব। তৃতীয় মতে গো-বৎস মূলত চন্দ্র দেবতার প্রতিমূর্তি ছিল এবং গো-বৎস পূজা চন্দ্র পূজারই সমার্থক ছিলো। অনুপ্রবেশের উৎস যাই হোক, কুরআন এটাকে জঘন্য শিরক বলেই আখ্যায়িত করেছে, হোক না তা [নাঊযুবিল্লাহ] এক আল্লাহর কল্পিত মূর্তিরূপেই নির্মিত।

قَوْلُهُ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ : [তোমাদের তওবা-ইসতিগফার এবং তোমাদের একটি বিশেষ দলের সাজা ভোগের পর] গো-বৎস পূজা ও শিরকের মতো জঘন্যতম অপরাধের শাস্তি তো গোটা সম্প্রদায়েরই পাওয়া উচিত ছিল। কেননা একদলের অপরাধ ছিল শিরক করা, পক্ষান্তরে অন্যদের অপরাধ ছিল দর্শকের ভূমিকা পালনপূর্বক অপরাধের সহযোগিতা করা। অথচ বাস্তবে নির্দিষ্ট একটা দলকেই শাস্তি দেওয়া হয়েছে। অবশিষ্টরা তওবা ও ইসতিগফারের মাধ্যমে নিস্তার লাভ করেছে।

قَوْلُهُ وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ . اَلتَّوْرَاةَ وَالْفُرْقَانَ : কিতাব তো ছিল তাওরাত, আর ফুরকান [সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী] দ্বারা সেই শরয়ী বিধানকে বুঝানো হয়েছে, যার দ্বারা বৈধ-অবৈধের জ্ঞান লাভ হয়। কিংবা হযরত মূসা (আ.)-এর মুজিজাসমূহকে ফুরকান বলা হয়েছে, যার দ্বারা সত্যবাদী মিথ্যাবাদী ও কাফের-মু'মিনের পার্থক্য বুঝা যায়। কিংবা তাওরাতকেই ফুরকান বলা হয়েছে। তাওরাত যেমন মহান আল্লাহ তা'আলার কিতাব, তেমনি তার দ্বারা সত্য-মিথ্যার পার্থক্যও হয়ে যায়। −[তাফসীর উসমানী]

قَوْلُهُ اَلْفُرْقَانَ : শব্দার্থের দিক থেকে ফুরকান মানে এমন যে কোনো বিষয়, যা দ্বারা সত্য-মিথ্যা ও হক-বাতিলের মাঝে পার্থক্য করা যেতে পারে, (لِسَان) كُلُّ مَا فُرِّقَ بِهٖ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ فَهُوَ فُرْقَانٌ কুরআনেরও অপর নাম হচ্ছে ফোরকান। হক-বাতিল তথা সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারী যে কোনো আসমানি গ্রন্থকেই ফোরকান বলা যেতে পারে। [রাগিব]। এখানে اَلْفُرْقَانُ-এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। اَلْكِتٰبُ ও اَلْفُرْقَانُ উভয়ের মাঝে عَطْف تَفْسِيْر-এর সম্পর্ক এবং উভয় শব্দেরই উদ্দেশ্য হচ্ছে তাওরাত। আর তাওরাতের দুটি গুণগত দিক। প্রথমত তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হিসেবে আল-কিতাব, দ্বিতীয়ত তো সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য সৃষ্টিকারী হিসেবে আল-ফুরকান।

কওমের দুজন মূসা, যাদের নাম এক এবং কর্ম ভিন্ন : পরের আয়াতে একটি তৃতীয় ঘটনার আলোচনা করা হয়েছে যে, লোহিত সাগর থেকে মুক্তি ও শত্রুদের ধ্বংসের পর গোত্রের লোকেরা হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে একটি আসমানি কিতাবের আবদার করেছে। অতঃপর তাদের আবদার গৃহীত হয়েছে এবং হযরত মুসা (আ.) চল্লিশ দিন পর্যন্ত তূর পর্বতে ভূষিত হয়ে তাওরাত কিতাব নিয়ে ফিরে এসেছেন। তখন [এ ৪০ দিনের মধ্যেও হযরত মূসা (আ.)-এর অনুপস্থিতিতে] মূসা সামিরী যার নাম হযরত মূসা (আ.)-এর নামের সাথে মিল ছিল। সে একটি গো-বৎসের প্রতিমূর্তি তৈরি করে দিল এবং বনী ইসরাঈলরা তার পূজা করতে লাগল।

قَوْلُهُ اَلسَّامِرِيُّ : সামিরীর আমল নাম মূসা। সে ছিল হযরত মূসা (আ.)-এর যুগের মুনাফিক। জন্মগতভাবে সে ছিল জারজ সন্তান। বংশগতভাবে ইসরাঈলী ছিল। তার মা লজ্জা এবং দুর্নামের ভয়ে তাকে পাহাড়ের গুহায় প্রসব করে সেখানেই ফেলে আসে। হযরত জিবরাঈল (আ.) তাকে লালন-পালন করেছিলেন এবং সে স্বর্ণকার ছিল। জাতিকে একটি নতুন হাঙ্গামায় লিপ্ত করে দিল। অর্থাৎ স্বর্ণ−রৌপ্য দ্বারা একটি গো-বৎস তৈরি করে জাতিকে এর উপাসনায় লাগিয়ে দিল। যা দ্বারা হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতিষ্ঠিত তাওহীদের ভিত্তি কম্পিত হয়ে গেল। সুতরাং ফিরে আসার পর হযরত মূসা (আ.) যখন এ দৃশ্য দেখেছেন, তখন অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে এবং অসন্তুষ্টির কারণে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন। হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে বুঝানোর পর গোত্রের লোকেরা তওবাকারী হয়েছে।

লক্ষ্য করুণ! কওমের মধ্যে একই নামের দু'জন মূসা, কিন্তু উভয়ের মাঝে জমিন ও আকাশের পার্থক্য রয়েছে। একজন আল্লাহর পুণ্যবান ও উচ্চ-মর্যাদাশীল পয়গাম্বর, অপরজন− কুচক্রী ও হারামজাদা। একজন তার শত্রু ফেরাউনের হাতে লালিত−পালিত এবং শত্রুর পাহারাদারীতে তাঁকে নিরাপদে রাখা হচ্ছে আল্লাহ তাঁর ক্ষমতা ও ফেরাউনের ক্ষমতা প্রকাশ করার জন্য। কিন্তু মূসা সামিরীর লালন-পালন হযরত জিব্রাঈল আমীন (আ.)-এর মতো সম্মানিত ফেরেশতা করেছেন। তারপরও সে হতভাগা রয়ে যায়। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, পরিচর্যা ও শিক্ষাদান ঐ সময়ই কার্যকর হয় যখন মাণিক্য যোগ্যতা সম্পন্ন প্রকৃতিতে আমানত রাখা হয়। اَلشَّقِيُّ مَنْ شَقِىَ فِىْ بَطْنِ اُمِّهٖ [হতভাগা সেই হয়, যে নিজ মায়ের উদরে হতভাগা থাকে]

تہی دستان قسمت را چہ سود از رہبر کامل [যোগ্য পথ প্রদর্শক দ্বারা শূন্য কিসমত ওয়ালার কি উপকার হবে?]

اِذِ الْمَرْءُ لَمْ يُخْلَقْ سَعِيْدًا مِنَ الْاَزَلِ * فَقَدْ خَابَ مَنْ رَبّٰى وَخَابَ الْمُؤَمَّلُ

অর্থ: যখন সে মানুষটিকে অবিনশ্বর এর পক্ষ থেকে সৌভাগ্যবান করে সৃষ্টি না করা হবে, তখন অবশ্যই ব্যর্থ হবে লালন পালনকারী এবং নিরাশ হবে আশার পাত্র।

فَمُوْسَى الَّذِىْ رَبَّاهُ جِبْرِيْلُ كَافِرٌ * وَمُوْسَى الَّذِىْ رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلُ .

অতএব ঐ মূসা যাকে লালন-পালন করেছেন হযরত জিব্রাঈল (আ.), সে হয়েছে কাফের আর ঐ মূসা (আ.) যাকে লালন-পালন করেছে ফেরাউন, তিনি হয়েছেন পয়গাম্বর।

অনুবাদ :

٥٤. وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ الَّذِيْنَ عَبَدُوا الْعِجْلَ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ اِلٰهًا فَتُوْبُوْآ اِلٰى بَارِئِكُمْ خَالِقِكُمْ مِنْ عِبَادَتِهٖ فَاقْتُلُوْآ اَنْفُسَكُمْ اَىْ لِيَقْتُلَ الْبَرِئُ مِنْكُمُ الْمُجْرِمَ ذٰلِكُمْ الْقَتْلُ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ـ فَوَفَّقَكُمْ لِفِعْلِ ذٰلِكَ وَاَرْسَلَ عَلَيْكُمْ سَحَابَةً سَوْدَاءَ لِئَلَّا يَنْصُرَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَرَحِمَهُ حَتّٰى قُتِلَ مِنْكُمْ نَحْوَ سَبْعِيْنَ اَلْفًا فَتَابَ عَلَيْكُمْ ـ قَبِلَ تَوْبَتَكُمْ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ـ

৫৪. যখন মূসা আপন সম্প্রদায়ের সেই লোকদেরকে বলল, যারা গো-বৎসের উপাসনা করেছিল হে আমার সম্প্রদায়! গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে তোমরা নিজেদের প্রতি অনাচার করেছ। সুতরাং তোমরা তাওবা কর তোমাদের প্রতিপালকের কাছে তোমাদের স্রষ্টার নিকট এর উপাসনা হতে এবং নিজেদেরকে তোমরা হত্যা কর অর্থাৎ তোমাদের নির্দোষজন দোষীজনকে যেন হত্যা করে। এটাই অর্থাৎ উক্তরূপে হত্যা করাই তোমাদের স্রষ্টার নিকট শ্রেয়। অনন্তর তিনি তোমাদেরকে এই কাজ করার তৌফিক দিলেন। হত্যা করার সময় একজন অপরজনকে দেখে যেন কোনোরূপ দয়ার উদ্রেক না হয়, সেই উদ্দেশ্যে ঘনকাল একখণ্ড মেঘ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর প্রেরণ করেন। ফলে প্রায় সত্তর হাজার লোক তখন তোমাদের নিহত হয়। অনন্তর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হলেন অর্থাৎ তোমাদের তওবা কবুল করলেন তিনি অত্যন্ত ক্ষমা পরবশ, পরম দয়ালু।

٥٥. وَاِذْ قُلْتُمْ وَقَدْ خَرَجْتُمْ مَعَ مُوْسٰى لِتَعْتَذِرُوْا اِلَى اللّٰهِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِجْلِ وَسَمِعْتُمْ كَلَامَهٗ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً عِيَانًا فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ الصَّيْحَةُ فَمُتُّمْ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ مَا حَلَّ بِكُمْ ـ

৫৫. যখন তোমরা বলেছিলে আর তখন তোমরা গো-বৎস উপাসনা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার নিকট ওজর ও কৈফিয়ত প্রদানের উদ্দেশ্যে মূসার সঙ্গে বের হয়েছিলে এবং আল্লাহ তা'আলার কালামও শুনতে সক্ষম হয়েছিলে। হে মূসা! আমরা আল্লাহকে প্রত্যক্ষভাবে সামনাসামনি দর্শন না করা পর্যন্ত তোমাকে কখনো বিশ্বাস করবো না। অনন্তর তোমাদেরকে বজ্র মহা হুঙ্কার গ্রাস করল। ফলে তোমরা মারা গেলে আর তোমাদের উপর কি আপতিত হলো তা তোমরা নিজেরাই দেখছিলে।

٥٦. ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ اَحْيَيْنَاكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ نِعْمَتَنَا بِذٰلِكَ ـ

৫৬. মৃত্যুর পর তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করলাম জীবন দান করলাম যাতে তোমরা আমার এ অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

٥٧. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ سَتَرْنَاكُمْ بِالسَّحَابِ الرَّقِيْقِ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ فِى التِّيْهِ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ فِيْهِ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى . هُمَا التُّرَنْجَبِيْنُ وَالطَّيْرُ السُّمَانِىْ بِتَخْفِيْفِ الْمِيْمِ وَالْقَصْرِ وَقُلْنَا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ . وَلَا تَدَّخِرُوْا فَكَفَرُوا النِّعْمَةَ وَادَّخَرُوْا فَقُطِعَ مِنْهُمْ وَمَا ظَلَمُوْنَا بِذٰلِكَ وَلٰكِنْ كَانُوْآ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ لِاَنَّ وَبَالَهُ عَلَيْهِمْ .

৫৭. আমি ছায়া বিস্তার করলাম তোমাদের উপর মেঘ দ্বারা তীহ ময়দানে সূর্য-তাপ হতে রক্ষা করার জন্য হালকা একখণ্ড মেঘ দ্বারা তোমাদের ঢেকে রেখেছিলাম, এবং তোমাদের নিকট সেখানে মাননা ও সালওয়া প্রেরণ করলাম এই দুইটি হলো তুরানজবীন [বরফের ন্যায় সাদা মধুর মতো এক প্রকার দ্রব্য] এবং সুনামী পক্ষি [কবুতর হতে কিছুটা ছোট পাখি বিশেষ] اَلسُّمَانِىْ শব্দটির . অক্ষর تَخْفِيْف লঘুভাবে এবং اَلِفْ অক্ষর قَصْر হ্রস্ব স্বরে পঠিত হয়। আর বলেছিলাম, তোমাদেরকে জীবনোপকরণরূপে যা দান করেছি, তা হতে পবিত্র বস্তু আহার কর আর তা সঞ্চয় করে রেখ না। কিন্তু তারা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের প্রতি অকৃজ্ঞতা প্রদর্শন করল এবং তা সঞ্চয় করে রাখল। ফলে তা বন্ধ হয়ে গেল। যাই হোক, তাদের এই কর্ম দ্বারা তারা আমার উপর কোনো জুলুম করেনি; বরং তারা নিজেদের প্রতিই অন্যায় করেছিল। কেননা তাদের এই আচরণের মন্দ পরিণাম তাদের নিজেদের উপরই বর্তাবে।

তাহকীক ও তারকীব

فَاقْتُلُوْا যা قَتْل থেকে বোধগম্য হচ্ছে। فَتُوبُوْا- এর মধ্যে فَا، সববিয়া এবং فَاقْتُلُوْا হচ্ছে مُشَارٌ اِلَيْهِ এর- ذٰلِكُمْ -এর فَا، তাকীবিয়া। আর এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, قَتْل তওবার পারিপূরক এবং فَتَابَ- এর মধ্যে فَا، মাহযূফের সাথে সম্পর্কিত اَىْ فَفَعَلْتُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ । لَكَ- এর মধ্যে لَام তা'লীলিয়া, তা'দিয়ার জন্য নয় তাই সন্দেহ করা যাবে না যে, ঈমান মুতাআদ্দী بِنَفْسِهٖ হয় بَا، -এর মাধ্যমে। لَام -এর মাধ্যমে مُتَعَدِّىْ হয় না। صَيْحَة অর্থাৎ জিবরাঈলী বজ্র এবং কেউ কেউ আসমানি বিজলী কিংবা বজ্র উদ্দেশ্য বলেছেন। تِيْه সিরিয়া ও মিশরের মাঝে ৯ মাইল এলাকা জুড়ে একটি বিরাট ময়দান যাতে ঘাস-দানা-পানির চিহ্ন ছিল না, যা হযরত মূসা (আ.) কেনআন যাওয়া পথে পড়তো। تُرَنْجَبِيْن বিশেষ এক প্রকার হালকা মিষ্টি খামির কে বলা হয়। سَلْوٰى কবুতরের চেয়ে ছোট চড়ুই-এর চেয়ে বড় এক প্রকার পাখী, যাকে بَثِير বলা হয়। যা তিতির পাখী জাতীয়। এ পাখী বিনা কষ্টে ধরে তারা নিজেরা ভক্ষণ করত। অথবা পাকানো বা ভুনা করা অবস্থায় পেয়ে থাকত। قَالَ এর ফায়েল মূসা, لِقَوْمِهٖ মুতা'আল্লিক, يَا قَوْمِ অর্থাৎ يَا قَوْمِىْ - يَا، -কে تَخْفِيْفًا মুনাদার স্থানে হযফ হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে مَقُوْلَه শেষ পর্যন্ত অবশিষ্ট তরকীব পরিষ্কার। قُلْتُمْ ফেয়েল বা ফায়েল يٰمُوْسٰى الخ مَقُوْلَه .

ظَلَّلْنَا মাফউলে مُطْلَق -ও হতে পারে এবং فَاعِل অথবা مَفْعُوْل থেকে حَال -ও হতে পারে। لَكَ اَىْ لِاَجْلِكَ جَهْرَةً ফেয়েল বা ফায়েল। اَلْغَمَامَ মাফউল, غَمَامَ জিন্‌স, একবচনের জন্য।

كُلُوْا - غَمَامَ -এর মাফউল شَيْئًا মাহযূফ। এর বয়ান مِنْ طَيِّبَاتِ الخ - طَيِّبَاتِ মুযাফ, مَا رَزَقْنٰكُمْ মুযাফ ইলাইহি। اَنْفُسَهُمْ হলো يَظْلِمُوْنَ ফেয়েলের মাফউল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : উক্ত আয়াতগুলোতে **পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম** ও নবম নিয়ামতের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

قَوْلُهُ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ : এখানে কওম দ্বারা বিশেষভাবে সেই লোকদের বুঝানো হয়েছে, যারা বাছুরকে পূজা করেছিল। -[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ فَتُوبُوا اِلٰى بَارِئِكُمْ : بَارِئ অর্থ خَالِق সৃষ্টিকারী। বলা হয় بَرَأَ اللّٰهُ الْخَلْقَ اَىْ خَلَقَهُمْ কেউ কেউ اَلْبَارِئُ এবং اَلْخَالِقُ -এর মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করে বলেন- بَارِئ অর্থ اَلْمُبْدِعُ الْمُحْدِثُ আর خَالِق অর্থ اَلْمُقَدِّرُ النَّاقِلُ مِنْ حَالٍ اِلٰى حَالٍ বস্তুত بَرِئَ শব্দমূলে একটি বস্তু থেকে আরেকটি বস্তু পৃথক হওয়ার অর্থ রয়েছে। যখন রোগী সুস্থ হয়, তখন বলা হয়- بَرِئَ الْمَرِيْضُ مِنْ مَرَضِهٖ আবার ঋণগ্রস্ত যখন ঋণ থেকে মুক্ত হয় তখন বলা হয় بَرِئَ الْمَدْيُوْنُ مِنَ الدَّيْنِ এ থেকেই আল্লাহ তা'আলার সিফতী নাম اَلْبَارِئُ নির্গত। কেননা তিনি সৃষ্টিকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন এবং عَدَم থেকে পৃথক করে وُجُوْد -এ এনেছেন। আবার এ থেকেই (اَلْبَرِيَّةُ بِمَعْنَى الْخَلِيْقَةِ (الْمَخْلُوْقِ -এর ব্যবহার রয়েছে। কেননা মাখলুক عَدَم থেকে পৃথক হয়ে وُجُوْد -এ এসেছে।

قَوْلُهُ اَىْ لِيَقْتُلِ الْبَرِئُ مِنْكُمُ الْمُجْرِمَ : **যেভাবে তওবার হত্যা সংঘটিত হয় :** উক্ত তাওবার হত্যার পদ্ধতি হলো- যারা বাছুরকে পূজা করেনি, তারা পূজাকারীদেরকে হত্যা করবে। উল্লেখ্য বনী ইসরাঈলে তিনদল লোক ছিল, একদল বাছুর পূজা হতে নিজেরাও বিরত থেকে ছিল অন্যদেরকেও বাধা দিয়েছিল। দ্বিতীয়দল, বাছুর পূজায় লিপ্ত হয়েছিল। তৃতীয় দল, নিজেরা পূজা করেনি, তবে অন্যদেরকে বাধাও দেয়নি। দ্বিতীয় দলকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তোমরা আত্মহত্যা কর। তৃতীয় দল সম্পর্কে নির্দেশ হয় যে, তাদেরকে হত্যা কর, যাতে তাদের নীরবতা অবলম্বনের তওবা হয়ে যায়। প্রথমদল এ তওবার অন্তর্ভুক্ত ছিল না, যেহেতু তাদের তওবার প্রয়োজন ছিল না। -[জামালাইন]

قَوْلُهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ قَبْلَ تَوْبَتِكُمْ : অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা নিহত হয়েছে, তাদের তওবা গৃহীত হয়েছে এবং অপরাধীদের মধ্যে যারা নিহত হয়নি, তাদেরকে হত্যা ছাড়াই ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।

যখন হযরত মূসা (আ.) অপরাধীদেরকে হত্যার নির্দেশ দিলেন তখন তারা বলল, আল্লাহ তা'আলার হুকুম মানার ধৈর্য আমাদের নেই। তখন হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে দুই হাতে হাঁটু বেঁধে বসার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, যে তার বাঁধন খুলবে কিংবা হত্যাকারীর দিকে তাকাবে, সে অভিশপ্ত হবে। তার তওবা গ্রহণ করা হবে না। ফলে সকলে সেভাবে বসলো এবং হত্যাকারীরা তাদেরকে হত্যার জন্য উদ্যত হলো। কিন্তু আত্মীয়তার খাতিরে অন্তরের দয়া-মমতার কারণে তাদের পক্ষে হত্যা করা সম্ভব হয়নি। তখন তারা হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে আবেদন করলেন, আমরা তো এ বিধান পালন করতে পারছি না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কালো মেঘমালা দিয়ে পুরো এলাকা ঢেকে দিলেন। যাতে হত্যাকারী নিহতকে চিনতে না পারে। এভাবে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ৭০ হাজার অপরাধীকে হত্যা করা হয়। সেদিন গোটা এলাকায় মাতম ও শোকের ছায়া বিরাজ করতে থাকে। এ করুণ অবস্থায় হযরত মূসা (আ.) এবং হযরত হারুন (আ.) আল্লাহ তা'আলা কাছে কায়মনোবাক্যে তাদের মুক্তির জন্য দোয়া করেন। ফলে মেঘমালা সরে যায় এবং তাদের তওবা গ্রহণের ঘোষণা প্রদান করা হয়। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে এ মর্মে ওহী প্রেরণ করলেন আপনি কি এতে সন্তুষ্ট নন যে, আমি নিহত ও হত্যাকারী উভয়কেই জান্নাত দান করব? এরপর যারা নিহত হলো তারা শহীদ হিসেবে আখ্যা পেলেন। অবশিষ্টরা ক্ষমা লাভে ধন্য হলো।

পঞ্চম নিয়ামত : পঞ্চম নিয়ামতের সারাংশ হচ্ছে এটা যে, গো-বৎসের উপাসনার শাস্তির ব্যাপারে। সকলের নিহত হওয়া জরুরি ছিল। কিন্তু আমি ছয় লক্ষ থেকে শুধু ৭০ হাজার হত্যা হওয়ার পর ক্ষান্ত করেছি এবং নিহত ও আহত সকলকে ক্ষমা করে দিয়েছি। উক্ত আয়াত দ্বারা তাদের সে সময়ের আকিদা যে বাতিল তা বুঝা যাচ্ছে। সম্ভবত -গরু, বলদ ও বিড়ালের পূজারী মিশরীয়দের এ বিশ্বাসই ছিল।

বনী-ইসরাঈল যেহেতু উগ্রপন্থি গোত্র ছিল এবং লাথির ভূত কথায় মান্য করত না। তাই কঠোর শাস্তির সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং তওবার পদ্ধতি "কতল" নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন আমাদের শরিয়তের কোনো কোনো অপরাধের শাস্তি তওবা সত্ত্বেও "কতল" নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন قَتْل عَمْد -এর শাস্তি قِصَاص আর কোনো কোনো অবস্থায় জিনার শাস্তি হচ্ছে পাথর মেরে হত্যা করা।

এ শাস্তির রহস্য এটা ছিল যে, শিরকে লিপ্ত হয়ে তোমরা চিরস্থায়ী জীবনকে ধ্বংস করে দিয়েছ। তাই এর শাস্তি স্বরূপ নিজ দুনিয়াবী জীবনকে বিলীন করে দাও।

লাত্বায়েফ-এর মধ্যে ইমাম কুশাইরী (র.) বলেন, এ উম্মতের ওলীগণ বর্তমানেও 'মন' কে বিসর্জন এবং নফসে আম্মারাকে বিলীন করতেছেন।

ষষ্ঠ নিয়ামত : ষষ্ঠ নিয়ামত সম্পর্কে আলেমদের মধ্যে ম'তভেদ রয়েছে, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক যিনি সীরাত ও মাগাযী বিষয়ের ইমাম, তার অভিমত হচ্ছে যে, 'কতলে তওবা'র এ হুকুম প্রয়োগের পূর্বে ক্ষমা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে হযরত মূসা (আ.) তার উম্মত থেকে ৭০ জন ওলী নির্বাচন করে তাদেরকে নিয়ে তূর পর্বতে উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু সুদ্দী (র.) বলেন যে, 'কতলে তওবা'র হুকুম প্রয়োগের পর হযরত মূসা (আ.) ওলীগণের সে জামাতকে নিয়ে তূর পর্বতে উপস্থিত হয়েছেন এবং সকলে মিলে আল্লাহর কালাম শুনেছেন- إِنِّىْ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا اَخْرَجْتُكُمْ مِنْ اَرْضِ مِصْرَ بِيَدٍ شَدِيْدَةٍ فَاعْبُدُوْنِىْ وَلَا تَعْبُدُوْا غَيْرِىْ এর পরিপ্রেক্ষিতে তারা সকলে একমত হয়ে প্রার্থনা করেছে لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً

قَوْلُهُ وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً :

ওজরখাহী করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলাকে দেখার ধৃষ্ঠতাপূর্ণ দাবি : এটা বাছুর পূজার পরবর্তী সময়ের ঘটনা। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন, বনী ইসরাঈলের কিছু লোককে নিয়ে তার কাছে বাছুর পূজার ব্যাপারে ওজরখাহী করার জন্য। হযরত মূসা (আ.) সত্তরজন লোক মনোনীত করে তাদেরকে মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে ওজরখাহী করার জন্য তূর পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী শুনে তারা সত্তরজনেই বলল, হে মূসা! আড়াল থেকে শুনা আমরা যথেষ্ট মনে করি না। তুমি আমাদেরকে মহান আল্লাহ তা'আলাকে চাক্ষুস দেখাও। এর ফলে তাদের উপর বজ্রপাত হয় এবং তারা ধ্বংস হয়ে যায়। মোটকথা এখানে قَائِل হলো হযরত মূসা (আ.)-এর নির্বাচিত সত্তরজন ব্যক্তি। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে- وَاخْتَارَ مُوْسٰى سَبْعِيْنَ رَجُلًا لِمِيْقَاتِنَا

قَوْلُهُ «فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ» : اَلصَّيْحَةُ অর্থ ভয়ঙ্কর বিকট শব্দ। সূরা আরাফে বর্ণিত হয়েছে, তারা اَلصَّيْحَةُ فَمُتُّمْ اَلرَّجْفَةُ তথা ভূ-কম্পনে মারা গিয়েছে। উভয়টির মাঝে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় যে, হয়তো বিকট শব্দ ও ভূ-কম্পন উভয়টিই হয়েছিল।

قَوْلُهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ : অর্থাৎ বজ্র পতিত হওয়ার প্রাথমিক অবস্থাসমূহ দেখছিলো। কিংবা তোমরা একজন অপরজনের দিকে দেখছিলে যে, কিভাবে তার মৃত্যু হচ্ছে। এরপর তোমাদের সকলেই মারা যায়।

কেউ কেউ اَخْذ صَاعِقَة দ্বারা বেহুঁশ হওয়া মুরাদ নিয়েছেন। তারা فَخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا فَلَمَّآ اَفَاقَ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন এবং وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ -কে তার قَرِيْنَة সাব্যস্ত করেছেন। কেননা اِفَاقَة তো غَشِى থেকেই হয়ে থাকে, মৃত্যু থেকে নয়। মুফাসসির (র.) اَخْذ صَاعِقَة দ্বারা মৃত্যু উদ্দেশ্য নিয়েছেন। এবং পরে উল্লিখিত ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ -কে তার قَرِيْنَة সাব্যস্ত করেছেন। এটিই রাজেহ বা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত অভিমত

قَوْلُهُ «ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ» اَحْيَيْنَاكُمْ «مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ» :

বজ্রাহতদের পুনর্জীবিত হওয়ার ঘটনা : হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার দরবারে নিবেদন করলেন, বনী ইসরাঈল এমনিতেই আমার প্রতি কুধারণা পোষণ করে থাকে। এখন তারা ভাববে যে, এই লোকগুলোকে কোথাও নিয়ে গিয়ে কোনো উপায়ে আমিই স্বয়ং ধ্বংস করে দিয়েছি। সুতরাং আমাকে মেহেরবানিপূর্বক এ অপবাদ থেকে রক্ষা করুন! তাই আল্লাহ পাক দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে পুনর্জীবিত করে দিলেন।

আল্লাহর দর্শন এবং মু'তাযিলা ও বস্তুবাদী সম্প্রদায় : মু'তাজিলারা فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ দ্বারা আল্লাহর দর্শন অসম্ভব হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ পেশ করেছে। অর্থাৎ যেহেতু অসম্ভবের আবদার করেছিল। তাই তাদের উপর এ বজ্র পড়েছে। কিন্তু ব্যাপার এটা নয়; বরং দুনিয়াতে আল্লাহর দীদার যুক্তির নিরিখে সম্ভব। যেমন হযরত মুসা (আ.) -এর আবদার رَبِّ أَرِنِي -এর উপর প্রমাণ বহন করেছে। হ্যাঁ, দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখার ক্ষমতা মানুষের মধ্যে নেই। এ ঔদ্ধত্যের কারণে যে, নিজ ক্ষমতার চেয়ে অধিক তারা নির্ভীকভাবে প্রশ্ন করেছে। তাই তারা এ শাস্তি পেয়েছে। তারপর বাস্তববাদীদের এ ব্যাখ্যা করা যে, তাদের মৃত্যু হয়নি; বরং বজ্রের আঘাতে তারা শুধু অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল এবং সে পাহাড়টি অগ্নি বিচ্ছুরণকারী পাহাড় ছিল বলে এর থেকে সর্বদা এমন অগ্নিশিখা বের হতে থাকত। এটা আল্লাহর তাজাল্লী [ঝলক] ছিল না; এসব দৃষ্টিদানের যোগ্য কল্পনা নয়। -[কামালাইন খ. ১, পৃ. ৭১]

তাওয়াক্কুল এবং গুদামজাত করণ : সপ্তম ও অষ্টম নিয়ামতের সারাংশ এটা যে, এ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ময়দানে তীহ্ যেখানে কোথাও কোনো বৃক্ষ ও ছায়া ছিল না এবং পানির কোনো চিহ্ন ছিল না, সেখানে আল্লাহ তা'আলা একটি হালকা মেঘকে তাদের উপর ছায়া বিস্তারকারী করে দিলেন। যার কারণে না রৌদ্রের তাপ স্পর্শ করেছিল, না অন্ধাকারের বিপদে অসুবিধায় পড়েছিল। আর ক্লেশ ব্যতীত পানাহারের এ ব্যবস্থা করেছেন যে, এক প্রকার মিষ্টি খামির ও ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী। অতি মোলায়েম ও অধিক সুস্বাদু নিয়ামতের দস্তরখান হিসেবে ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ দুটি বস্তুই পরিমাণ ও গুণ-মানের দিক দিয়ে যেহেতু অসাধারণ ছিল তাই এটা মুজিযা হয়েছে। কিন্তু এ নির্দেশও দেওয়া হয়েছে যে, গুদামজাত করা তাওয়াক্কুলের মর্যাদার পরিপন্থি। এ গায়েবী ভাণ্ডারের উপস্থিতিতে কক্ষনো এমনটি না করা চাই। এমন করলে নিয়ামতের না-শুক্‌রী হবে। কিন্তু তারা-এর কৃদর না করে হুকুমের বিরোধিতা করেছে। তাই আল্লাহ তাদের থেকে এসব নিয়ামত ছিনিয়ে নিয়েছেন। -[প্রাগুক্ত]

তীহ প্রান্তরের ঘটনা : বনি ইসরাঈলের আদি বাসস্থান ছিল শাম দেশে। হযরত ইউসূফ (আ.)-এর সময়ে তারা মিসরে এসে বসবাস করতে থাকে। আর 'আমালেকা' নামক এক জাতি শাম দেশ দখল করে নেয়। ফেরআউনের ডুবে মরার পর যখন এরা শান্তিতে বসবাস করতে থাকে, তখন আল্লাহ পাক আমালেকাদের সাথে জিহাদ করে তাদের আদি বাসস্থান পুনর্দখল করতে নির্দেশ দিলেন। বনি ইসরাঈল এতদুদ্দেশ্যে মিসর থেকে রওয়ানা হলো। শামের সীমান্তে পৌঁছার পর আমালেকাদের শৌর্য-বীর্যের কথা জেনে তারা সাহস হারিয়ে হীনবল হয়ে পড়লো এবং জিহাদ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলো। তখন আল্লাহ পাক তাদেরকে এ শাস্তি প্রদান করলেন। তারা একই প্রান্তরে চল্লিশ বছর হতবুদ্ধি হয়ে দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্যভাবে বিচরণ করতে থাকে। ঘরে ফেরা আর তাদের ভাগ্যে জোটেনি। সে সময় হযরত মূসা (আ.)-এর দোয়ায় আল্লাহ তা'আলা সে প্রান্তরে সাদা সাদা মেঘমালা দ্বারা তাদেরকে ছায়া প্রদান করেন। যাতে সূর্যের তাপযন্ত্রণা লাঘব হয়। আর সেখানে তাদের আহারের জন্য মান্না-সালওয়া নাজিল করেন। সেই সঙ্গে অন্ধকার রাতে পথ চলার জন্য একটি আলোর স্তম্ভও তৈরি করে দেন।

-[মাআরিফুল কুরআন : মুফতি মুহাম্মদ শফী (র.), কওমে ইয়াহুদ আওর হ্যাম।]

قَوْلُهُ فِى التِّيْهِ : هُوَ الْاَرْضُ بَيْنَ الشَّامِ وَالْمِصْرِ وَقَدْرُهُ تِسْعُ فَرَاسِخَ অর্থাৎ তীহ প্রান্তরটি শাম ও মিসরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত, তার পরিমাণ হলো নয় ফারসাখ।

قَوْلُهُ اَلْمَنَّ وَالسَّلْوٰى : مَنٌّ এক প্রকার সুস্বাস্থ্যকর খাদ্য, যা ধনিয়ার সদৃশ শিশির বিন্দুর ন্যায় তাদের চারপাশে পড়ে জমে থাকতো। سَلْوٰى এক প্রকার পাখি, যাকে বটের (بٹیر) বলা হয়। সন্ধ্যাকালে তাদের চারপার্শ্বে হাজার হাজার এসে জমা হতো। অন্ধকার হলে তারা সেগুলো ধরে আনত এবং কাবাব বানিয়ে খেত। বহুদিন যাবত এটাই ছিল তাদের খাদ্য।

-[তাফসীরে উসমানী পৃ. ১১, টীকা. ৭]

পাপের সাথে নিয়ামত এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে সুযোগ দেওয়া : উপরিউক্ত আয়াত এ ব্যাপারে প্রমাণ যে, গুনাহ্‌সমূহ থাকা সত্ত্বেও নিয়ামতসমূহ চালু থাকা প্রকৃত পক্ষে সুযোগ দেওয়া। যা চিন্তা ও ভয়ের কারণ, খুশি ও শান্তির উৎস নয়। যারা গুনাহ করা সত্ত্বেও সম্পদ ও সম্মানের আধিক্যেকে গৌরবের উৎস মনে করে তারা একেবারেই নির্বোধ।

অনুবাদ :

٥٨. وَاِذْ قُلْنَا لَهُمْ بَعْدَ خُرُوْجِهِمْ مِنَ التِّيْهِ ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ بَيْنَ الْمَقْدِسِ اَوْ اَرِيْحَا فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَاسِعًا لَا حَجَرَ فِيْهِ وَادْخُلُوا الْبَابَ اَىْ بَابَهَا سُجَّدًا مُنْحَنِيْنَ وَّقُوْلُوْا مَسْأَلَتُنَا حِطَّةٌ اَيْ اَنْ تُحِطْ عَنَّا خَطَايَانَا نَّغْفِرْ تَوفِىْ قِرَاءَةٍ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ مَبْنِيًا لِلْمَفْعُوْلِ فِيْهِمَا لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ بِالطَّاعَةِ ثَوَابًا

৫৮. আর যখন আমি তাদেরকে বললাম তীহ প্রান্তর হতে নিষ্ক্রমনের পর এই জনপদে বায়তুল মুকাদ্দাস কিংবা আরীহা প্রবেশ কর, যেথা ইচ্ছা স্বাচ্ছন্দ্যে প্রচুর আহার কর এতে কোনো বাধা নেই এবং তার দ্বারে প্রবেশ কর সেজদাবনতভাবে নতশিরে এবং বল আমাদের প্রার্থনা হলো, ক্ষমা অর্থাৎ আপনি আমাদের পাপসমূহ বিদূরিত করে দিন আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব এবং আনুগত্য প্রদর্শনের ফলশ্রুতি স্বরূপ সৎকর্ম পরায়ণ লোকদের পুণ্যফল বৃদ্ধি করব।

نَغْفِرْ ক্রিয়াটির ى নাম পুরুষ, পুংলিঙ্গ ও ت [নাম পুরুষ, স্ত্রীলিঙ্গ] সহকারে পাঠ করা হয়েছে। এই উভয় অবস্থায় ক্রিয়াটি مَجْهُوْل বা কর্মবাচ্যরূপে পড়া হবে।

٥٩. فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِىْ قِيْلَ لَهُمْ فَقَالُوْا حَبَّةٌ فِيْ شَعْرَةٍ وَدَخَلُوْا يَزْحَفُوْنَ عَلٰي اَسْتَاهِهِمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فِيْهِ وُضِعَ الظَّاهِرُ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ مُبَالَغَةً فِيْ تَقْبِيْحِ شَانِهِمْ رِجْزًا عَذَابًا طَاعُوْنًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ بِسَبَبِ فِسْقِهِمْ اَيْ خُرُوْجِهِمْ عَنِ الطَّاعَةِ فَهَلَكَ مِنْهُمْ فِيْ سَاعَةٍ سَبْعُوْنَ اَلْفًا اَوْ اَقَلُّ ـ

৫৯. কিন্তু তাদের যারা অন্যায় করেছিল তারা তাদেরকে যা বলা হয়েছিল, তার পরিবর্তে অন্য কথা বলল। তারা বলেছিল, আমাদের প্রার্থনা হলো যবের দানা। আর তারা নতশিরে প্রবেশ করার পরিবর্তে শিড়দাড়া সোজা রেখে নিতম্বের উপর ভর দিয়ে চেছড়িয়ে প্রবেশ করেছিল। সুতরাং অনাচারীদের প্রতি আমি প্রেরণ করলাম আকাশ হতে শাস্তি আজাব অর্থাৎ প্লেগ মহামারি কারণ তারা সত্য ত্যাগ করেছিল তাদের ফিসক অর্থাৎ আনুগত্য পরিত্যাগ করার কারণে এই অবস্থা হয়েছিল। ফলে মুহূর্তের মধ্যে তাদের সত্তর হাজার বা কিছু কম সংখ্যক লোক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

اَلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا তাদের অবস্থার হীনতার আধিক্য (مُبَالَغَة) প্রকাশার্থে এই স্থানে সর্বনাম ব্যবহার করার স্থলে [অর্থাৎ عَلَيْهِمْ না বলে] اِسْم ظَاهِر বা স্পষ্টভাবে বিশেষ্যের [অর্থাৎ اَلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا] ব্যবহার করা হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

تِيْه বাবে ضَرَبَ থেকে বিভ্রান্ত হওয়া। দিশেহারা হওয়া। যেহেতু এ নির্দিষ্ট ময়দানটি অত্যন্ত প্রশস্ত এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল। যার কারণে দর্শক লোকেরা অস্থির ও দিশেহারা হতো তাই এ নাম (تِيْه) পড়ে গেছে। سُجَّدًا-এর পরে مُنْحَنِيْنَ বলে মুফাস্সির (র.) حَال হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করছেন। حِطَّةٌ শব্দটি فِعْلَةٌ-এর ওজনে। جِلْسَةٌ-এর মত حِطَّةٌ শব্দটি মুব্তাদায়ে মাহ্যূফের খবর اَيْ مَسْأَلَتُنَا حِطَّةٌ যবর থেকে পেশ -এর দিকে সর্বদা ও স্থায়িত্বের জন্য পরিবর্তন করা হয়েছে। এটা তাদের কালিমায়ে ইস্তেগ্ফার তথা ক্ষমাপ্রার্থনার বাক্য ছিল] কিন্তু তারা حَبَّةٌ فِيْ شَعْرَةٍ দ্বারা পাল্টে দিয়েছে অর্থাৎ গমের দানা চুলের মধ্যে রয়েছে। مِنْهُمْ দ্বারা জানা গেল যে, সকলে এমন করেনি। فَقَالُوْا দ্বারা মুফাস্সির (র.) বলতেছেন যে, কথায় ও কাজে উভয়ভাবে বিরোধিতা করেছে। فِيْهِ وَضْعُ الظَّاهِرِ এ জন্য নির্বাচন করা হয়েছে যে, عَلَيْهِمْ সংক্ষিপ্ত যমীরের স্থানে দীর্ঘ ইবারত اَلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا এ জন্য নির্বাচন করা হয়েছে যে, তাদের মন্দতা প্রকাশ হয়ে সামনে এসে যায়। رِجْزًا-এর ব্যাখ্যা طَاعُوْن দ্বারা করেছেন। طَاعُوْن অর্থ– মহামারি। আর কোনো কোনো রেওয়ায়েত তাদের উপর আসমানি আগুন নাজিল হয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। اُدْخُلُوْا ফেয়েল-ফায়েল। هٰذِهِ الْقَرْيَةَ মউসূফ সিফত মিলে مَفْعُوْل فِيْه হয়েছে اُدْخُلُوْا ফেয়েলের এবং قُلْنَ-এর مَقُوْلَه - رَغَدًا মাফউলে مُطْلَق কিংবা حَال ;سُجَّدًا . سَاجِدٌ এর বহুবচন, حَال হয়েছে اُدْخُلُوْا-এর ফায়েল থেকে اَيْ مُتَوَاضِعِيْنَ - حِطَّةٌ মুবতাদা মাহযূফের খবর। সব মিলে قُوْلُوْا-এর مَقُوْلَه - نَغْفِرْ لَكُمْ মাজযূম। اَمْر-এর জওয়াব। فَبَدَّلَ ফেয়েল। اَلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ফায়েল। بِالَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ মাফউলে اَوَّل মাহ্যূফ, قَوْلًا মাউসূফ غَيْرَ الَّذِيْ সিফত, সবমিলে দ্বিতীয় মাফউল - مِنَ السَّمَاءِ মুতা'আল্লিক হয়ে رِجْزًا-এর সিফত। عَلٰى اَسْتَاهِهِمْ : اَسْتَاهٌ (ج) اِسْتٌ অর্থ– নিতম্ব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আল্লাহর নিয়ামতের অবমূল্যায়নের পরিণামের ব্যাখ্যা : কোনো কোনো মুফাস্সিরের মন্তব্যে এটাও ময়দানে তীহের ঘটনা। যখন মান্না ও সালওয়া খেতে খেতে তাদের মন নিরানন্দ ও বিরক্ত হতে লাগল, তখন তারা অভ্যাস মোতাবেক খানার জন্য আবদার করতে লাগল। তখন হুকুম হলো যে, তোমরা যে খাদ্যের আবদার করছ। সেটা নগরবাসীর খাদ্য। সেটা তো নগরেই পাওয়া সম্ভব। এ পরিষ্কার ময়দানে সে খাদ্য কোথায় পাবে? যদি তোমাদের সে খাদ্যের প্রয়োজন থাকে, তবে তোমাদের সামনে যে শহর রয়েছে, সেখানে যাও! কিন্তু প্রবেশকালে কথায় ও কাজে আদব রক্ষা করতে হবে। হ্যাঁ, শহরের মধ্যে গিয়ে পানাহারের প্রশস্ত ব্যবস্থা করে নেবে। আর কোনো কোনো মুফাস্সির এ ঘটনাকে সে শহরের সাথে সংযুক্ত মনে করেছেন, যে শহরে জিহাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজে জয় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। অতএব ৪০ বৎসর পর্যন্ত ময়দানে তীহের মধ্যে দিশেহারা ও অস্থির অবস্থায় ঘুরতেছিল। প্রায় ছয় লক্ষের এ বিশাল বাহিনী এ ময়দানেই মরে পচে শেষ হয়ে গেল। শুধু বিশজন বেঁচে ছিল। হযরত মূসা ও হারুন (আ.)-এর ওফাতও এখানেই হয়েছে। তাদের ওফাতের পর তাদের স্থলাভিষিক্ত হযরত ইউশা বিন নূন (আ.)-এর নেতৃত্বে এ জিহাদের গুরুদায়িত্ব সমাপ্ত হয়েছে। এবং আল্লাহ তা'আলা তার হাতে বিজয় দান করেছেন। যেন শহরে প্রবেশের এ নির্দেশ তার মাধ্যমে হয়েছে যে, অহংকারী ও বিজয়ীরূপে কক্ষণো প্রবেশ করবে না; বরং নম্র ও বিনীতভাবে ঢুকতে হবে। এমন করলে অতীতের গুনাহ্ আমি ক্ষমা করে দেব এবং ভবিষ্যতে একাগ্রতার সাথে নেক আমলকারীদেরকে অধিক পুরস্কার দেব। কিন্তু অবাধ্যতার মন্দ পরিণাম প্লেগ ও আসমানি বালারূপে ফুটে উঠেছে।

বর্ণিত আছে, এরা নিজেদের বাসস্থান মিসরে পৌঁছার জন্য সারা দিন চলার পর রাতে কোনো মঞ্জিলে অবস্থান করত; কিন্তু ভোরে উঠে দেখেতে পেত, যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিল সেখানেই রয়ে গেছে। এভাবে চল্লিশ বছর পর্যন্ত এ প্রান্তরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে শ্রান্ত ও ক্লান্তভাবে বিচরণ করছিল। -[কামালাইন খ. ১, পৃ. ৭২]

قَوْلُهُ وَادْخُلُوا الْبَابَ : الْبَابَ দ্বারা নগর প্রাচীরের প্রবেশদ্বার বুঝানো হয়েছে। প্রাচীনকালে নগরের চার পাশে সুউচ্চ প্রাচীর নির্মাণ করা হতো। শহরে প্রবেশ করতে হলে সে প্রবেশদ্বার দিয়েই প্রবেশ করতে হতো।

قَوْلُهُ سُجَّدًا : তাফসীরে খাজিনে উল্লেখ রয়েছে– এখানে সিজদা দ্বারা মাটিতে কপাল রাখা উদ্দেশ্য নয়; বরং রুকুর মত মাথা ঝুঁকানো উদ্দেশ্য। –[হাশিয়ায়ে জামাল]

قَوْلُهُ مُنْحَنِيْنَ : أَيْ مُتَوَا ضِعِيْنَ এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে বুঝানো হয়েছে যে, سُجَّدًا শব্দটি حَال হিসেবে নসব হয়েছে।

قَوْلُهُ مَسْاَلَتُنَا حِطَّةٌ : (أَيِ الَّذِيْ نَسْأَلُهُ حِطَّه) হুবহু حِطَّةٌ শব্দ বলাই উদ্দেশ্য নয়। কেননা এটি আরবি শব্দ। আর বনি ইসরাঈলের ভাষা ছিল ইবরানী। حِطَّةٌ অর্থ– তওবা-ইস্তিগফার। এর তাৎপর্য এই ছিল যে, অন্তরের বিনয়ের সাথে মুখেও তওবা-ইস্তিগফার করতে করতে প্রবেশ করবে। কেউ কেউ হুবহু حِطَّةٌ শব্দটিই উচ্চারণ করার কথা বলেছেন। তবে প্রথম অভিমতটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

قَوْلُهُ وَدَخَلُوْا يَزْحَفُوْنَ : زَحْفًا (ف) زَحَفَ হামাগুড়ি দিয়ে চলা। বুকে ভর করে চলা।

قَوْلُهُ مُبَالَغَةً فِيْ تَقْبِيْحِ شَانِهِمْ : এ থেকে বুঝা যায় যে, وَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ কোনো প্রয়োজনেই করা হয়ে থাকে। কখনো সম্মান বুঝানোর জন্য। যেমন– أُولٰئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ الخ কখনো অসম্মান ও তুচ্ছতা জ্ঞাপনের জন্য। যেমন– أُولٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ الخ আবার কখনো ভ্রম ও সন্দেহ নিরসনের জন্য ব্যবহার করা হয়। –[হাশিয়ায়ে জামাল]

قَوْلُهُ «رِجْزًا» عَذَابًا طَاعُوْنًا : সাধারণভাবে সব ধরনের আজাবকে رِجْز বলা হয়।

قَوْلُهُ مِنَ السَّمَاءِ : أَيْ مُقَدَّرٌ مِنَ السَّمَاءِ অর্থাৎ আসমান থেকে বৃষ্টি বা শিলাখণ্ডের মতো পতিত হয়নি কিংবা সে মহামারি প্রাকৃতিক কোনো কারণে সৃষ্টি হয়নি; বরং তা আসমানি প্রভুর পক্ষ থেকে আপতিত হয়েছে।

قَوْلُهُ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ : এ থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, মহামারির প্রকৃত কারণ প্রাকৃতিক ছিল না; বরং তার কারণ ছিল রূহানী ও আখলাকী বিপর্যয় এবং আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি। –[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ১১৩]

রোগ ও মহামারি ইত্যাদির প্রকৃত কারণ : মহামারী যেখানেই আসে সেখানে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে, প্রাকৃতিক অনেক কারণ হয়ে থাকে। সম্ভবত আল্লাহর নাফরমানি এবং গুনাহ্সমূহও এর প্রকৃত মৌলিক কারণ হতে পারে। যেমন–

১. فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ فِيْ .

২. ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ الخ

ইত্যাদি মূল সূত্রগুলো এর উপর প্রমাণ করছে এবং হাদীসের দৃষ্টিতে এ মহামারিসমূহ নেক লোকদের জন্য রহমত আর অপরাধীদের জন্য অশান্তির উৎস।

٦٠. وَاذْكُرْ إِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى أَيْ طَلَبَ
السُّقْيَا لِقَوْمِهٖ وَقَدْ عَطِشُوْا فِي التِّيْهِ
فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ط وَهُوَ
الَّذِيْ فَرَّ بِثَوْبِهٖ خَفِيْفٌ مُرَبَّعٌ كَرَأْسِ
رَجُلٍ رَخَامٌ أَوْ كَذَّانٌ فَضَرَبَهٗ فَانْفَجَرَتْ
اِنْشَقَّتْ وَسَالَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ
عَيْنًا ط بِعَدَدِ الْأَسْبَاطِ قَدْ عَلِمَ كُلُّ
أُنَاسٍ سِبْطٍ مِّنْهُمْ مَّشْرَبَهُمْ ط مَوْضِعَ
شُرْبِهِمْ فَلَا يُشْرِكُهُمْ فِيْهِ غَيْرُهُمْ
وَقُلْنَا لَهُمْ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ
اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ -
حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ لِعَامِلِهَا مِنْ عَثِيَ بِكَسْرِ
الْمُثَلَّثَةِ أَفْسَدَ -

অনুবাদ :

৬০. আর স্মরণ কর যখন মূসা (আ.) তার সম্প্রদায়ের জন্য পানি চাইলেন প্রার্থনা করলেন। তারা তীহ ময়দানে পিপাসিত হয়ে পড়েছিল। আমি বললাম, তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত কর। এটি সেই পাথর যে পূর্বে একবার তার [মূসা (আ.)-এর] কাপড়-চোপড়সহ পলায়ন করেছিল। তা ছিল মস্তকাকৃতির পাতলা, চতুষ্কোণ একটি সাদা বা মসৃণ পাথর। অনন্তর হযরত মূসা (আ.) তাতে আঘাত করলেন। ফলে তা হতে উপগোত্রসমূহের সংখ্যা হিসেবে বারোটি ঝর্না ধারা প্রবাহিত হলো অর্থাৎ তা ফেটে গেল এবং পানি বয়ে চলল। প্রত্যেক লোক তাদের প্রতিটি গোত্র নিজ নিজ স্থান পানি পান করার নির্ধারিত স্থান চিনে নিল। এতে একদল অপরদলের সাথে শরিক ছিল না। আর তাদেরকে বললাম আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত জীবিকা হতে তোমরা পানাহার কর এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী হয়ে পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে বেড়িয়ো না।

مُفْسِدِيْنَ শব্দটি এই স্থানে তার عَامِل অর্থাৎ لَا تَعْثَوْا হতে حَال مُؤَكَّدَة বা তাকিদসূচক ভাব ও অবস্থাবাচক পদরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

عَثِيَ ক্রিয়াটির মধ্যাক্ষর ث তে যের, যবর পেশ এই তিনটি হরকতেরই ব্যবহার রয়েছে। এর অর্থ, অনর্থ সৃষ্টি করা।

٦١. وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى
طَعَامٍ أَيْ نَوْعٍ مِّنْهُ وَّاحِدٍ - وَهُوَ الْمَنُّ
وَالسَّلْوٰى فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا
شَيْئًا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ لِلْبَيَانِ
بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُوْمِهَا حِنْطَتِهَا
وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ط قَالَ لَهُمْ مُوْسٰى
أَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِيْ هُوَ أَدْنٰى أَخَسُّ -

৬১. যখন তোমরা বলেছিলে, হে মূসা! আমরা একই খাদ্যে অর্থাৎ একই প্রকারের খাদ্য মান্না ও সালওয়ায় [কখনও ধৈর্য ধারণ করব না। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর! তিনি যেন আমাদের জন্য উৎপাদন করেন কিছু ভূমিজাত দ্রব্য, শাক-সবজি, কাঁকুর, ফুম গম মসুর ও পেয়াজ হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে বললেন, তোমরা কি উত্তম উৎকৃষ্টতর বস্তুকে নিম্নতর নিকৃষ্টতর বস্তুর সাথে বদল করতে চাও? অর্থাৎ তার পরিবর্তে এটা গ্রহণ করতে চাও? শেষ পর্যন্ত ইসরাঈলীগণ তাদের দাবি হতে ফিরে আসতে অসম্মতি জ্ঞাপন করল। তারপর হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া করলেন। আল্লাহ তা'আলা বললেন, তোমরা নেমে যাও অবতরণ কর শহরসমূহের কোনো একটি শহরে। তোমরা যা চাও অর্থাৎ শাক-সবজি ইত্যাদি তথায় তা আছে

بِالَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ ط اَشْرَفُ اَيْ تَأْخُذُوْنَهُ بَدَلَهُ وَالْهَمْزَةُ لِلْاِنْكَارِ فَاَبَوْا اَنْ يَرْجِعُوْا فَدَعَا اللّٰهَ فَقَالَ تَعَالٰى اِهْبِطُوْا اِنْزِلُوْا مِصْرًا مِنَ الْاَمْصَارِ فَاِنَّ لَكُمْ فِيْهِ مَّا سَاَلْتُمْ ط مِنَ النَّبَاتِ وَضُرِبَتْ جُعِلَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ الذُّلُّ وَالْهَوَانُ وَالْمَسْكَنَةُ اَيْ اَثَرُ الْفَقْرِ مِنَ السُّكُوْنِ وَالْخِزْيِ فَهِيَ لَازِمَةٌ لَهُمْ وَاِنْ كَانُوْا اَغْنِيَاءَ لُزُوْمَ الدِّرْهَمِ الْمَضْرُوْبِ لِسِكَّتِهِ وَبَاءُوْا رَجَعُوْا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ط ذٰلِكَ اَيِ الضَّرْبُ وَالْغَضَبُ بِاَنَّهُمْ اَيْ بِسَبَبِ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ كَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى بِغَيْرِ الْحَقِّ ط اَيْ ظُلْمًا ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ - يَتَجَاوَزُوْنَ الْحَدَّ فِي الْمَعَاصِيْ وَكَرَّرَهُ لِتَاكِيْدِ -

مِنْ بَقْلِهَا-এর مِنْ শব্দটি بَيَان বা বর্ণনাত্মক। أَتَسْتَبْدِلُوْنَ : এই স্থানে প্রশ্নবোধক أ [হামজাটি] اِنْكَار বা অসম্মতিসূচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

আর ছাপ মেরে দেওয়া হলো তাদের উপর লাঞ্ছনার অবমাননার ও দুর্বলতার এবং দরিদ্রের। اَلْمَسْكَنَةُ শব্দটি سُكُوْن হতে উদগত। অর্থাৎ দারিদ্র ও লাঞ্ছনার আছর তাদের উপর আপতিত থাকবে। মুদ্রার সাথে যেন তার ছাপ ওতপ্রোতভাবে জড়িত, বিচ্ছিন্ন হয় না কখনো; তেমনি তারা [বাহ্যত] সম্পদশালী হলেও এই অবস্থা [মানসিক দরিদ্রতা] সব সময় তাদের সাথে অবিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে। আর তারা আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ সহকারে প্রস্থান করল ফিরল এটা অর্থাৎ তাদের উপর এই ছাপ ও ক্রোধ এই জন্য যে, তারা আল্লাহ তা'আলার আয়াত অস্বীকার করত এবং নবীগণকে যেমন হযরত জাকারিয়া ও ইয়াহইয়া (আ.) অন্যায়ভাবে জুলুম করে হত্যা করত। অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘনের পাপাচারের সীমা অতিক্রম করার দরুন তাদের এই পরিণতি।

بِاَنَّهُمْ-এর ب অক্ষরটি হেতু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا এই স্থানে ذٰلِكَ [ঐ] শব্দটি تَاكِيْد বা জোর সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَلْحَجَرَ : হতে পারে এর দ্বারা বিশেষ কোনো পাথর বোঝানো হয়েছে। এ সূরতে اَلِف - لَام টি হবে আলিফ লামে আহদী। আবার নির্দিষ্ট কোনো পাথর না হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। এ সুরতে اَلِف - لَام টি আলিম লামে জিনসী। আর এমনটি হওয়াই মু'জিযার জন্য অধিক প্রযোজ্য।

আবূ ওয়াহ্যাব বলেন, এটি নির্দিষ্ট কোনো পাথর ছিল না; বরং হযরত মূসা (আ.) যে কোনো পাথরে আঘাত করলেই তা থেকে ঝর্না সৃষ্টি হতো। কেউ কেউ বলেন, সেটি নির্দিষ্ট পাথর ছিল। মূসা (আ.) সেটি তাঁর থলের ভেতর রাখতেন। পানির প্রয়োজন হলে তাতে লাঠি দিয়ে আঘাত করতেন। ফলে তা থেকে পানি নির্গত হতো। প্রয়োজন শেষে ফের আঘাত করলে পানির প্রবাহ বন্ধ হয়ে যেত।

قَوْلُهُ كُلُّ اُنَاسٍ : এখানে كُلّ দ্বারা كُلٌّ اَفْرَادِيْ উদ্দেশ্য। اَيْ بِالنِّسْبَةِ اِلَى الْاَسْبَاطِ

قَوْلُهُ مَوْضِعَ شُرْبٍ : مَشْرَبَ -এর ব্যাখ্যায় مَوْضِعَ شُرْبٍ উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, مَشْرَبَ শব্দটি ظَرْف হয়েছে, مَصْدَر مِيْمِى নয়। কেননা مَصْدَر -এর সূরতে অর্থ শুদ্ধ হয় না।

فَانْفَجَرَتْ -এর মধ্যে فَصِيْحَة فَا তাই এর পূর্বে فَضَرَبَ بِه মুক্বাদ্দার মানা হয়েছে এবং এ হযফের মধ্যে সূক্ষ্মতা হচ্ছে এই যে, এর মধ্যে ضَرْبِ كَلِيْم [হযরত মূসা (আ.)-এর আঘাতের] কোনো দখল নেই; বরং মূলস্বত্ব ও প্রভাব সৃষ্টিকারী হচ্ছে আমার নির্দেশ। হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর আওলাদ যেহেতু ১২ জন ছিলেন, যাদের থেকে এ বংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এ পর্যন্ত বিস্তার ঘটেছে যে,এ সময় ছয় লক্ষজন হয়েছে, যারা ১২ মাইল এলাকা জুড়ে তাঁবু গেড়ে ছিল। যারা বর্তমানে ব্রাহ্মণ ও নন ব্রাহ্মণ প্রশ্নে কূপ ও মন্দিরসমূহে দর্শন দিচ্ছে তারা সম্ভবত সে সংকীর্ণ সীমিত পরিবেশের ছায়াদৃশ্য হবে।

طَعَام وَاحِد -এর উপর যেহেতু এ আপত্তি রয়েছে যে, খাদ্য একটি ছিল না; বরং تُرَنْجَبِيْن এবং بَشِيْر দু' প্রকার খানা ছিল। মুফাসসির (র.) সে আপত্তিকে দূর করেছেন যে, উদ্দেশ্য হচ্ছে এক ধরন। অর্থাৎ طَعَام وَاحِد বলে স্বাদ উপভোগকারী সুখী ও ধনীদের খানা-খাদ্য উদ্দেশ্য কেননা গরিব মানুষ তো যা সহজে পায়, তার উপরই পরিতৃপ্তি করে নেয়। গরিবের কাছে রকম রকমের পোশাক ও রকমের খানা-খাদ্যের যোগান কঠিন ব্যাপার এর বিপরীত হচ্ছে ধনীদের ব্যাপার। যেমনটা কাজী বায়যাবী (র.) বলেছেন।

আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ (র.)-এর অভিমত হচ্ছে, طَعَام وَاحِد দ্বারা উদ্দেশ্য, উভয় বস্তুকে মিশ্রিত করে এক প্রকার খানা তৈরি করতো। شَيْأً শব্দ বের করে ইঙ্গিত করেছেন। مِنْ তাবঈযিয়্যাহ। فُوْم -এর অর্থ মুফাসসির (র.) গম বলেছেন। আর কোনো কোনো আভিধান বেত্তা এর দ্বারা "রসুন" এর অর্থ নিয়েছেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে ثُوْم -ও এসেছে এবং তাওরাত কিতাবে "রসুন" ই উদ্দেশ্য। مِصْر দ্বারা উদ্দেশ্য যে কোনো শহর, নির্দিষ্ট মিশর দেশ উদ্দেশ্য নয়। اَرِيْحَا একটি নিম্নাঞ্চল ও সবুজ শ্যামল এলাকা, যার মধ্যে ফসলাদি অধিক হতো, হযরত ইউশা এর হাতে এর বিজয় অর্জিত হয়েছিল। তাই اِهْبِطُوْا ব্যবহার করা হয়েছে। ضُرِبَتْ -এর মধ্যে اِسْتِعَارَة تَبْعِيْضَه تَصْرِيْحِيَّه অথবা اِسْتِعَارَه / لُزُوْمُ الدِّرْهَم মুযাফকে হযফের সাথে مَكْنِيَّه -এর ইবারতটি উল্টো হয়ে গেছে। মূলে এমন ছিল لُزُوْمَ السِّكَّةِ لِلدِّرْهَمِ الْمَضْرُوْبِ اَيْ لُزُوْمَ اَثَرِ السِّكَّةِ তার ইবারতকে قَلْب করা হয়েছে। سِكَّه [মুদ্রা] যার উপর সরকারি ছাপ লাগানো হয়। বহুবচনে سِكَكٌ যেমন سِدْرَةٌ -এর বহুবচন سِدَرٌ আসে। وَاِذِ اسْتَسْقٰى জুমলা فَا তারকিবিয়্যাহ قُلْنَ ফেয়েল বা ফায়েল اِضْرِبْ الخ এটা হচ্ছে مَقُوْلَه - اِنْفَجَرَتْ ফেয়েল اِثْنَتَا عَشْرَةَ ফায়েল মুমাইয়াজ, عَيْنًا তামঈয। مُفْسِدِيْنَ হালে মুয়াক্কাদাহ হচ্ছে لَا تَعْثَوْا থেকে। قُلْتُمْ ফেয়েল বা ফায়েল। يَامُوْسٰى الخ মাকূলা মিলে প্রথম জুমলার উপর আত্‌ফ। رَبَّكَ ফায়েল, يُخْرِجْ مَنْصُوْبُ الْمَحَلِّ عَلَى الْحَالِ مِنْ بَقْلِهَا বয়ান مِنْ বয়ানিয়্যাহ। مَا মাউসূলাহ্‌ تُنْبِتُ জুমলা সেলাহ্‌। شَيْأً মাহ্‌যূফ। উহ্য ইবারত مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ كَائِنًا مِنْ بَقْلِهَا এ সব মিলে شَيْأً -এর বয়ান হয়েছে। يُخْرِجْ জওয়াবে اَمْر হয়েছে اُدْعُ -এর। তাই মাজযূম হয়েছে। اِهْبِطُوْا জুমলায়ে ইনশা-ইয়্যাহ قَالَ ফেয়েলের। اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الخ পুরো জুমলা مَقُوْلَه হয়েছে بَاؤُا بِغَضَبٍ مِنَ اللّٰهِ, غَضَبٍ - مُسْتَانِفَه মউসূফ, সিফত। ضُرِبَتْ জুমলায়ে اِنَّ ইসমে مَا سَاَلْتُمْ - اِنَّ لَكُمْ খবরে মুব্‌তাদা بِاَنَّهُمْ الخ খবর بِغَيْرِ الْحَقِّ হাল হওয়ার কারণে মহল হিসেবে مَنْصُوْب - يَقْتُلُوْنَ -এর যমীর থেকে। উহ্য ইবারত হলো- يَقْتُلُوْنَهُمْ مُبْطِلِيْنَ। ذٰلِكَ মুব্‌তাদা بِمَا عَصَوْا খবর।

خَفِيْف : পাতলা। مُرَبَّع : চার কোনো বিশিষ্ট। চতুর্দিকে এক গজ দীর্ঘ। رُخَام : শুভ্র, সাদা। كَذَّان নরম, কোমল।

لَا تَعْثَوْا : (ن) عَثَا يَعْثُوْا এবং عَثِيَ يَعْثٰى (س) থেকে نَهِى حَاضِر مَعْرُوْف এর- جَمْع مُذَكَّر حَاضِر -এর صِيْغَه; অর্থ- তোমরা বিশৃঙ্খলা করো না।

بَقْلِهَا : بُقُوْلٌ (ج) بَقْلٌ প্রত্যেক ঐ উদ্ভিদ, যার কাণ্ড থাকে না। **قِثَّاءٌ** একবচন **قِثَّائَةٌ** অর্থ- কাকড়ি, শসা। **فُوْمٌ** রসুন, গম কিংবা ঐ শষ্য, যার দ্বারা রুটি বানানো যায়। **عَدَسٌ** : মশুরীর ডাল। **بَصَلٌ** পেঁয়াজ।

ضُرِبَتْ : ضُرِبَتْ হলো **مَاضِى مَجْهُوْل** -এর সীগাহ। **اَلذِّلَّةُ** হলো তার **نَائِب فَاعِل**

وَمَعْنٰى ضُرِبَتْ اَلْزَمُوْهُ وَتَحَقَّقَ عَلَيْهِمْ بِهَا .

وَالْمَسْكَنَةُ : اَلسُّكُوْنُ এটি থেকে নির্গত। এ থেকেই **مِسْكِيْنٌ** শব্দটি নির্গত। কেনন মিসকিনের চলাফেরায় চঞ্চলতা থাকে না।

بَاءُوْا : بَوْءٌ থেকে **مَاضِى جَمْع مُذَكَّر غَائِب** -এর সীগাহ। মাসদার **اَلْبَوَاءُ بِمَعْنَى الرُّجُوْعِ** অর্থ- তারা প্রত্যাবর্তন করেছে। এ থেকেই ব্যবহার রয়েছে- **بَاءَ الْمَبَاءَةَ اَىْ رَجَعَ اِلَى الْمَنْزِلِ**

এছাড়াও এর আরো বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। যেমন- **١. اِحْتَمَلُوْهُ . ٢. اِسْتَحَقُّوْهُ . ٣. اَقَرُّوْا بِهِ . ٤. لَازَمُوْهُ . وَهُوَ الْاَوْلٰى**

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

حَجَر দ্বারা উদ্দেশ্য সেই নির্দিষ্ট পাথর। যার দিকে মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করেছেন যে, হযরত মূসা (আ.) নিজ স্বভাবগত ও শরয়ী লজ্জার কারণে গোসল ইত্যাদির সময়ে কারো সামনে উলঙ্গ হতেন না। এদিকে মানুষ মনে করেছে যে, তার একশিরা রোগ [অণ্ডকোষ ফুলে যাওয়া] হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এ ভুল ধারণাকে দূর করার জন্য এ ব্যবস্থা করেছেন যে, একবার হযরত মূসা (আ.) গোসল করার জন্য কোনো প্রস্রবণে ঢুকেছেন এবং বস্ত্র-পরিধান খুলে কোনো সাধারণ পাথরের উপর কিংবা হযরত শোআইব (আ.) থেকে বরকত স্বরূপ যে পাথর তিনি পেয়েছিলেন ওটার উপর রেখেছেন। গোসল শেষ করে বাহিরে এসেছেন। আর সে পাথর বস্ত্র নিয়ে সে দিকে ত্বরিৎ চলেছে- যেখানে এলাকাবাসীর কাচারীতে লোকজন অভ্যাস অনুযায়ী সমবেত ছিল। হযরত মূসা (আ.) স্বভাবগতভাবে গরম মেযাজের ছিলেন। রাগান্বিত হয়ে পাথরের পেছনে বস্ত্রের জন্য উলঙ্গ অবস্থায় দৌড় দিয়েছেন এবং সে সভাস্থলে পৌঁছে গেলেন। যেখানে লোক সমবেত ছিল তারা হযরত মূসা (আ.)-কে দেখে নিজেদের অহেতুক ধারণাকে পাল্টে নিল। তারপর নির্দেশ হলো যে, এ পাথরটিকে সংরক্ষণ করে রেখে কাজে আসবে। এ পাথরটি সাদা ও নরম ছিল। এক হাত পরিমাণ চতুর্ভূজ কিংবা এর চেয়ে কিছু কম চতুষ্কোণ বিশিষ্ট, প্রতি কোণে তিন তিনটি উঁচু প্রান্ত যেগুলো থেকে ১২ টি প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়ে যেতো।

অন্য একটি মন্তব্য হচ্ছে যে, সাধারণ পাথর ছিল। আর এ মন্তব্যটিও আল্লাহর কুদরতকে প্রকাশ করার জন্য অধিক ন্যায়সঙ্গত। -[কামালাইন খ. ১, পৃ. ৭৪]

قَوْلُهُ وَاِذِا اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ : এটা সে মরুভূমির [তীহ প্রান্তরের] ঘটনা। পানির অভাবে মূসা (আ.) একটি পাথরে লাঠি দ্বারা আঘাত করলেন। ফলে তা থেকে বারটি ঝর্ণা প্রবাহিত হলো। বনী ইসরাঈলের মোট গোত্র ছিল বারটি। কোনো গোত্রে লোকসংখ্যা ছিল বেশি, কোনো গোত্রে কম, এক একটি ঝর্ণা ছিল প্রত্যেক গোত্রের লোক সংখ্যা অনুযায়ী। এ কারণেই সেগুলোকে পৃথক করে চেনা সম্ভব হয়েছিল। অথবা স্থির করে দেওয়া হয়েছিল যে, পাথরের অমুক দিক হতে যে ঝর্ণা প্রবাহিত হবে সেটি হবে অমুক গোত্রের।

যেসব হীনদৃষ্টি সম্পন্ন লোক এসব মু'জিযা অস্বীকার করে, প্রকৃতপক্ষে তারা মানুষ নয়, মানুষের খোলস মাত্র। চুম্বক যদি লোহাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে পারে, তাহলে পাথর কেন পানিকে আকর্ষণ করতে পারবে না? এতে আপত্তির কি আছে। -[তাফসীরে উসমানী পৃ. ১২, টী. ২]

قَوْلُهُ بِعَصَاكَ : হযরত আদম (আ.) জান্নাত থেকে একটি লাঠি নিয়ে এসেছিলেন। পরবর্তীতে উত্তরাধিকার সূত্রে নবীগণের কাছে তা পৌঁছে। এক পর্যায়ে তা হযরত শুআইব (আ.)-এর হস্তগত হয়। তিনি হযরত মূসা (আ.)-কে তা প্রদান করেন।

-[হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১, পৃ. ৮৫]

قَوْلُهُ وَهُوَ الَّذِىْ فَرَّ بِثَوْبِهِ :

اَىْ حِيْنَ رَمَوْهُ بِالْاُدْرَةِ وَ كَانَ بَنُوْا اِسْرَائِيْلَ لَا يُبَالُوْنَ بِكَشْفِ الْعَوْرَةِ فَاَرَادَ مُوْسَى الْغُسْلَ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى ذٰلِكَ الْحَجَرِ فَفَرَّ بِذٰلِكَ الثَّوْبِ فَخَرَجَ مُوْسٰى مِنَ الْمَاءِ وَقَالَ ثَوْبِى الْحَجَرِ فَنَظَرَ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ لِعَوْرَتِهِ فَلَمْ يَرَوْهُ كَمَا ظَنُّوْا ـ قَالَ تَعَالٰى فَبَرَّأَ اللّٰهُ مَا قَالُوْا ـ

যখন পাথরটি কাপড় নিয়ে ছুটছিল, তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) এসে হযরত মূসা (আ.)-কে বললেন, আল্লাহ তা'আলা এ পাথরটি আপনার সঙ্গে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। তখন হযরত মূসা (আ.) সে পাথরটি তাঁর থলের ভেতর তুলে নেন।

قَوْلُهُ بِعَدَدِ الْاَسْبَاطِ : গোত্র সংখ্যার সমপরিমাণ অর্থাৎ তারা বারোটি গোত্রে বিভক্ত হওয়ার কারণ হলো হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর সন্তান ছিলো বারো জন

قَوْلُهُ حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ لِعَامِلِهَا : এটি একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর, নিম্নে প্রশ্ন ও উত্তর উপস্থাপন করা হলো–

প্রশ্ন : حَال তার ذُو الْحَال -এর মাঝে অতিরিক্ত অর্থ নির্দেশ করে থাকে। যা এখানে অনুপস্থিত। কেননা عَثِى এবং مُفْسِدِيْنَ -এর অর্থ এক ও অভিন্ন।

উত্তর : অতিরিক্ত অর্থ নির্দেশ করার বিষয়টি حَال مُنْتَقِلَة -এর মাঝে আবশ্যক হয়। حَال مُؤَكِّدَة -এর মাঝে আবশ্যক নয়। আর এটি হলো حَال مُؤَكِّدَة সুতরাং কোনো আপত্তি থাকলো না।

قَوْلُهُ نَوْعٍ مِنْهُ : এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, নিম্নে প্রশ্ন ও উত্তর তুলে ধরা হলো–

প্রশ্ন : বনী ইসরাঈলের খাবার তো ছিল দুটি। যথা 'মান্না' ও 'সালওয়া'। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এখানে عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ কেন বললেন?

উত্তর : وَحْدَت দ্বারা وَحْدَت نَوْعِى উদ্দেশ্য; وَحْدَت فَرْدِى নয়। আর وَحْدَت نَوْعِى একাধিক হওয়ার পরিপন্থি নয়। তাই তো বলা হয়ে থাকে, খাবার খুব সুস্বাদু হয়েছে। যদিও বিভিন্ন রকমের খাবার থাকে।

قَوْلُهُ شَيْئًا : এখানে شيئا উহ্য ধরে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, مِنْ টি مِنْ تَبْعِيْضِيَّه অর্থাৎ بَيَانِيَه নয়।

قَوْلُهُ مِنَ الْاَمْصَارِ اَىْ بَلَدٍ كَانَ مِنَ الشَّام : এখানে مِصْر দ্বারা কোনো নির্দিষ্ট শহরকে বোঝানো হয়নি। এমনকি প্রসিদ্ধ মিসর শহরকেও বুঝানো হয়নি। এখানে উদ্দেশ্য হলো শাম দেশের যে কোনো একটি এলাকায় চলে যাও। مِصْر -এর تَنْوِين تَنْكِير -ও এদিকেই ইঙ্গিত করে।

اَلْهَمْزَةُ لِلْاِنْكَارِ : اَىْ لَا يَنْبَغِىْ مِنْكُمْ ذٰلِكَ وَلَا يَلِيْقُ

ইহুদিদের লাঞ্ছনা :

قَوْلُهُ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ : লাঞ্ছনা তো এই যে, তারা সর্বদা মুসলিম জাতি ও খ্রিস্টানদের অধীনস্থ প্রজা হিসেবে জীবনযাপন করছে। কারও কাছে ধনৈশ্বর্য থাকলেও রাজক্ষমতা হতে চিরদিনের জন্য তারা বঞ্চিত, অথচ সেটাই ছিল সম্মানের বিষয়। আর দারিদ্র এভাবে যে, একে তো তাদের কাছে ধন-সম্পদের প্রচণ্ড অভাব। ব্যক্তি বিশেষের কাছে কিছু থাকলেও শাসকশ্রেণিও অন্যান্যদের ভয়ে নিজেদেরকে দরিদ্র-অভাবীরূপেই প্রকাশ করে। তীব্র লালসা ও উৎকট কার্পণ্যের কারণে তাদেরকে অভাবীদের চেয়েও নিকৃষ্টতম মনে হয়। আর এটাও তো অনস্বীকার্য যে, تونگری بدل است نه بمال [ঐশ্বর্য থাকে অন্তরে, ধনে নয়।] তাই বিত্তবান হয়েও তারা ঐশ্বর্যহীন হয়েই থাকে। আর যে সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহ তা'আলা তাদের দান করেছিলেন, তা প্রত্যাহার করে নেওয়ায় এখন তারা তার গজব ও ক্রোধের পাত্র হয়ে গেছে।

–[তাফসীরে উসমানী পৃ. ১১]

قَوْلُهُ فَهِيَ لَازِمَةٌ لَهُمْ وَإِنْ كَانُوْا اَغْنِيَاءَ : এজন্যই এমন কোনো ইহুদি পাওয়া যাবে না, যে মনের দিক থেকে ধনী। পৃথিবীর সকল ধর্মালম্বীদের মাঝে ইহুদিদের চেয়ে সম্পদের প্রতি অধিক লোভী কাউকে দেখা যায় না।

قَوْلُهُ لُزُوْمَ الدِّرْهَمِ الْمَضْرُوْبِ لِسِكَّتِهِ : এ ইবারতটুকু مَقْلُوْب তথা পরিবর্তিত। এটি অভাবে হওয়া উচিত ছিল- لُزُوْمَ أَثَرِ السِّكَّةِ لِلدِّرْهَمِ الْمَضْرُوْبِ আর سِكَّة অর্থ এমন অঙ্কিত লোহা যা দ্বারা মুদ্রায় ছাপ দেওয়া হয়। سِكَّة -এর বহুবচন سِكَكٌ

قَوْلُهُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ : بَاءُوْا -এর فَاعِل থেকে حَال -এর স্থলে হয়েছে। আর ب হরফটি مُلَابَسَة -এর অর্থে। اَيْ رَجَعُوْا مَغْضُوْبًا عَلَيْهِمْ - (جَمَل ٨٨) وَغَضِبَ اللّٰهُ ذَمَّهُ إِيَّاهُمْ فِي الدُّنْيَا وَعُقُوْبَتُهُ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ

মোদ্দাকথা ইহুদিদের লাঞ্ছনা ও অসহায়তার মধ্যে এটাও একটি যে, ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাদের থেকে রাজত্ব ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। যদি অন্যায়ভাবে চিল্লা-ফাল্লা করে কোথাও জমিনের কোনো অংশ শুধু কাগজে বা পত্র-পত্রিকায় দখল করে নেয় এবং সেটাও অন্যান্য রাষ্ট্রের সাহায্যে ও উস্কানিতে রাজনৈতিক কোনো উদ্দেশ্যের অধীনে। তবে সেটাকে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি রাষ্ট্র বলতে পারে না। তা সত্ত্বেও জগদ্বাসীর দৃষ্টিতে অপদস্থাবস্থায় থাকা ইজ্জত ও সম্মানের ক্ষেত্রে স্থান না পাওয়া যা লাঞ্ছনার মূল। তারপরও তা থেকে যাবে। সুতরাং এ ভবিষ্যদ্বাণীকে আজো পর্যন্ত ইতিহাস মিথ্যা সাব্যস্ত করতে পারেনি।

[ইহুদিদের জন্য চিরস্থায়ী লাঞ্ছনার অর্থ ইহকালে চিরস্থায়ী লাঞ্ছনা-গঞ্জনা এবং ইহকাল ও পরকালে খোদায়ী গজবও রোষে পতিত থাকবে। আল্লামা ইবনে কাছীরের ভাষায়: তারা যত ধন সম্পদের অধিকারীই হোক না কেন, বিশ্ব সম্প্রদায়ের মাঝে তুচ্ছ ও নগণ্য বলে বিবেচিত থাকবে। যার সংস্পর্শে যাবে, সেই তাদেরকে অপমাণিত করবে এবং তাদেরকে দাসত্বের শৃঙ্খলে জড়িয়ে রাখবে।

প্রশ্ন: পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, ইহুদিদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কখনও সম্ভব হবে না। অথচ বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে, ফিলিস্তীনে তাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

উত্তর: বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কেননা ফিলিস্তীন ইহুদিদের বর্তমান রাষ্ট্রের নিগূঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে যারা সম্যক অবগত, তারা ভালোভাবে জানেন যে, এ রাষ্ট্র প্রকৃত পক্ষে ইসরাঈলের নয়; বরং আমেরিকা ও বৃটেনের একটি ঘাঁটি ছাড়া অন্য কিছু নয়। পাশ্চাত্যের খ্রিস্টান শক্তি ইসলামি বিশ্বকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে তাদের মাঝখানে ইসরাঈল নাম দিয়ে একটি সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করেছে। এটা আমেরিকা ও ইউরোপীয়দের দৃষ্টিতে একটি অনুগত আজ্ঞাবহ ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র ছাড়া অন্য কোনো গুরুত্ব বহন করে না। সুতরাং বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কারণে কুরআনে পাকের কোনো আয়াত সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহেরও অবকাশ সৃষ্টি হতে পারে না।

নবীগণ (আ.)-কে অন্যায়ভাবে হত্যা করা :

قَوْلُهُ بِغَيْرِ الْحَقِّ - اَيْ ظُلْمًا :

প্রশ্ন : নবী হত্যা তো সর্বদাই অন্যায়। তাহলে এ কয়েদটুকু জুড়ে দেওয়ার ফায়দা কি?

উত্তর : এ কয়েদটুকু জুড়ে দিয়ে দিয়ে এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা তাদের দৃষ্টিতেও অন্যায়ই ছিল। অর্থাৎ এ কাজটি নিতান্ত অন্যায় বলে নিজেরাও উপলব্ধি করত; কিন্তু হঠকারিতা, প্রতিহিংসা, পার্থিব মোহ তাদেরকে অন্ধ করে রেখেছিল। সামনের আয়াতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে- ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ

সাধারণ ও বিশেষ লোকদের পার্থক্য : আল্লাহপ্রেমিক ব্যক্তি উক্ত ঘটনা থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে হবে যে, যারা আল্লাহর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট হয় না এবং নিয়ামতের শোকর ও বিপদে ধৈর্য ধারণ করে না-, কিভাবে তাদের উপর লাঞ্ছনা ও নির্যাতন করে দুনিয়ার মহব্বত তাদের অন্তরে ঢেলে দেওয়া হয়। আর এ উপদেশ গ্রহণ করতে হবে যে, আল্লাহর প্রতি ভরসাকারীদেরকে উপার্জন করতে হবে এবং উপার্জনকারীরা অকারণে উপার্জন ছেড়ে দেওয়া বস্তুত আল্লাহ তা'আলার বিধি বিধানকে পরিবর্তন করা। আর এটা তাঁর অসন্তুষ্টির উৎস।

وَكَرَّرَهُ لِلتَّاكِيْدِ : অর্থাৎ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْ وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ -এর ذٰلِكَ ইসমুল ইশারাকে তাকীদের জন্য তাকরার করা হয়েছে, পূর্বেও ذٰلِكَ ছিল।

অনুবাদ :

٦٢. إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلُ وَالَّذِيْنَ هَادُوْا هُمُ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى وَالصَّابِئِيْنَ طَائِفَةٌ مِّنَ الْيَهُوْدِ اَوِ النَّصَارٰى مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فِىْ زَمَنِ نَبِيِّنَا وَعَمِلَ صَالِحًا بِشَرِيْعَتِهٖ فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ اَىْ ثَوَابُ اَعْمَالِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ رُوْعِيَ فِىْ ضَمِيْرِ اٰمَنَ وَعَمِلَ لَفْظُ مَنْ وَفِيْمَا بَعْدَهٗ مَعْنَاهَا .

৬২. নিশ্চয় যারা পূর্ববর্তী নবীগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে ও যারা ইহুদি হয়েছে অর্থাৎ ইহুদিগণ এবং খ্রিস্টান ও সাবিয়ীগণ ইহুদি মতান্তরে খ্রিস্টানদের একটি সম্প্রদায়। মোটকথা তাদের মধ্যে যারাই আমাদের নবীর এই যুগে আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে ও তার শরিয়ত অনুসারে সৎকাজ করে তাদের জন্য প্রতিদান রয়েছে। অর্থাৎ তাদের কর্মের পুণ্য ফল রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

এই স্থানে اٰمَنَ ও عَمِلَ ক্রিয়া দুইটিতে مَنْ শব্দটির শাব্দিক আঙ্গিকের প্রতি লক্ষ্য করে একবচনবোধক ضَمِيْر [সর্বনাম] ব্যবহার করা হয়েছে এবং পরবর্তী শব্দসমূহে لَهُمْ، اَجْرُهُمْ، رَبِّهِمْ ইত্যাদি] তার মর্মের প্রতি লক্ষ্য করে ضَمِيْر [সর্বনাম] সমূহকে বহুবচনরূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

٦٣. وَ اذْكُرُوْا اِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ عَهْدَكُمْ بِالْعَمَلِ بِمَا فِى التَّوْرٰةِ وَ قَدْ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ الْجَبَلَ اِقْتَلَعْنَاهُ مِنْ اَصْلِهٖ عَلَيْكُمْ لَمَّا اَبَيْتُمْ قَبُوْلَهَا وَقُلْنَا خُذُوْا مَا اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ بِجِدٍّ وَاجْتِهَادٍ وَاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ بِالْعَمَلِ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ النَّارَ اَوِ الْمَعَاصِىَ .

৬৩. আর তোমরা স্মরণ কর যখন আমি তোমাদেরকে অঙ্গীকার করিয়েছিলাম অর্থাৎ তাওরাত অনুসারে আমল করার যে অঙ্গীকার তোমরা করেছিলে তা আর তুর পাহাড় তোমাদের উপর তুলে ধরেছিলাম অর্থাৎ তোমরা তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালে তখন উক্ত পাহাড়টি সমূলে উঠিয়ে আয়াস স্বীকার করে গ্রহণ কর এবং স্বীয় আমলে রূপায়িত করার মাধ্যমে তাতে যা আছে তা স্মরণ কর যাতে তোমরা জাহান্নামাগ্নি বা পাপকার্য হতে রক্ষা পেতে পার।

وَ رَفَعْنَا বাক্যটি এই স্থানে حَال বা ভাব ও অবস্থাবাচক বাক্যরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এই দিকে ইঙ্গিত করার জন্য মাননীয় তাফসীরকার وَاو-এরপর قَدْ শব্দটির ব্যবহার করেছেন।

٦٤. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اَعْرَضْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ الْمِيْثَاقِ عَنِ الطَّاعَةِ فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَكُمْ بِالتَّوْبَةِ اَوْ تَاخِيْرِ الْعَذَابِ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ الْهَالِكِيْنَ .

৬৪. এর এই অঙ্গীকারের পরেও তোমরা এর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা হতে মুখ ফিরালে তা উপেক্ষা করলে। তওবা বা শাস্তি পিছিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তোমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও তোমাদের সাথে তাঁর দয়া যদি না থাকত, তবে নিশ্চয় তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ধ্বংস প্রাপ্তদের মধ্যে গণ্য হতে।

তাহকীক ও তারকীব

وَقَدْ رَفَعْنَا-এর মধ্যে শব্দ قَدْ মুকাদ্দার مُقَدَّر দ্বারা ইঙ্গিত হচ্ছে এর حَالِيَت-এর দিকে। طُوْر দ্বারা বিশেষ পাহাড় কিংবা সাধারণ পাহাড় উদ্দেশ্য। এর মধ্যে اَلِف لَام আহ্‌দে খারিজী কিংবা জেহনীর জন্য হতে পারে। وَقُلْنَا-এর মধ্যে ইঙ্গিত হচ্ছে যে, خُذُوْا মানসূব এর মহলে হাল হিসেবে। اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا মাউসূল সেলাহ মিলে ইস্‌মে اِنَّ ; مَنْ শর্তিয়া মুবতাদা اٰمَنَ بِاللّٰهِ খবর। فَلَهُمْ জুমলা জওয়ার হয়ে পুনরায় এটা মিলে খবরে اِنَّ যমীরে عَائِد মাহ্‌যূফ। اَىْ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ। مَنْ-এর দুটি দিক রয়েছে لَفْظًا একবচন এবং অর্থের দিক দিয়ে বহুবচন। اَجْرُهُمْ মুব্‌তাদা فَلَهُمْ খবর। আখফাশের দৃষ্টিতে اَجْرُهُمْ - مَرْفُوْع হওয়ার কারণে جَار এবং عِنْدَ জরফ। এর মধ্যে اِسْتِقْرَار হলো আমিল। اَخَذْنَا ফেয়েল বা-ফায়েল ও মাফউল। فَضْلُ : اَىْ خُذُوْهُ عَازِمِيْنَ হাল بِقُوَّةٍ ফেয়েল মাহযূফের قُلْنَا মাকূলাহ হচ্ছে خُذُوْا مَا اٰتَيْنٰكُمْ জুমলা হাল। وَرَفَعْنَا الخ اللّٰهِ। মুব্‌তাদা,খবর মাহ্‌যূফ اَىْ حَاضِر কূফীগণের দৃষ্টিতে لَوْلَا-এর مَابَعْد-এর ইস্‌ম হয়।

قَوْلُهُ هَادُوْا : اَىْ دَخَلُوْا فِى الْيَهُوْدِيَّةِ এ শব্দটি ফে'লে মাযী -এর جَمْع مُذَكَّر غَائِب-এর সীগাহ. অর্থ তারা ইহুদি মতবাদ বা ধর্ম গ্রহণ করল।

اَلَّذِيْنَ هَادُوْا : অর্থাৎ যারা ইহুদি ধর্মের অনুসারী পূর্ব থেকেই ইহুদি থাকুক, বংশগতভাবে ইহুদি হোক বা পূর্বে মুশারিক ইত্যাদি যা কিছু ছিল, আর এখন ইহুদি আকিদা ও ধর্মাচার অবলম্বন করে নিয়েছে।

هَادَ - يَهُوْدُ - هَوْدًا অর্থ– তওবা করা, বাছুর পূজা থেকে তওবা করার কারণে তাদেরকে ইহুদি বলা হয়। هُوْد ইহুদিদের দল।

اَلْيَهُوْدُ : শব্দটি আরবি হলে بِمَعْنٰى تَابَ থেকে নির্গত অর্থ তওবা করল। যেহেতু ইহুদিরা নিজের প্রাণনাশের মাধ্যমে বাছুর পূজা থেকে তওবা করেছিল, তাই তাদেরকে ইহুদি বলা হয়। আর শব্দটি অনারবি হলে হযরত ইয়াকূ (আ.)-এর ছেলে يَهُوْذَا। থেকে আরবি করা হয়েছে। আরবি বানাতে গিয়ে ذ -কে د দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : ইতিপূর্বে বনী ইসরাঈলের অবাধ্যতা, হঠকারিতা ও অন্যায় কর্মসমূহের বর্ণনা করা হয়েছে। যা দেখে পাঠক মনে করতে পারে যে, এহেন অবস্থায় যদি তারা ক্ষমা চেয়ে ঈমানও আনতে চায়, তাহলে সম্ভবত আল্লাহ তা'আলার নিকট তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এ ধারণা দূর করার জন্য এখানে একটি সূক্ষ্মনীতি বলে দেওয়া হচ্ছে- যে কোনো ব্যক্তি চাই সে মুসলমান হোক, নাসারা হোক, ইহুদি কিংবা সবয়ী হোক যদি সে আল্লাহ তা'আলার জাত ও সিফাতের উপর ঈমান আনে, দীনের আবশ্যকীয় বিষয়ে বিশ্বাস রাখে এবং শরিয়ত মোতাবেক নেক আমল করে, তাহলে সে কামিয়াব ও মুক্তিপ্রাপ্ত।

–[জামালাইন খ. ১, পৃ. ১৩৫]

قَوْلُهُ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا الخ : **আয়াতের সারমর্ম :** ছওয়াব ও প্রতিদান বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট নয়। কেবল বিশ্বাস ও সৎকর্ম শর্ত। যার মধ্যে এ শর্ত পাওয়া যাবে, সে ছওয়াবের অধিকারী হবে। এটা বলার কারণ হচ্ছে বনী ইসরাঈল এ আত্মম্ভরিতায় লিপ্ত ছিল যে, আমরা নবীগণের বংশধর আমরা সর্বোতভাবে আল্লাহ তা'আলার দরবারে উৎকৃষ্টতম।

–[তাফসীরে উসমানী পৃ. ১৩]

বনী ইসরাঈল ও ইহুদির মাঝে পার্থক্য : এ যাবৎ আলোচনা চলে আসছিল বনী ইসরাঈল নামের এক বিশেষ বংশ-গোষ্ঠী সম্পর্কে। তাদের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। এখন তাদের ধর্মমত এবং আকিদা-বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। এই প্রথমবারের মতো اَلَّذِيْنَ هَادُوْا। শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বনী ইসরাঈল একটা বংশগত নাম। একটি গোত্র-বংশ বা একটি জাতির নাম। উচ্চ বংশ মর্যাদার জন্য তারা গর্ব করতো। নিজেদের পূর্বপুরুষ সাধু-সজ্জন ছিল বলে তারা মহা আনন্দিত ছিল। ইতিহাস পুনরাবৃত্তিকালে এ বংশগত নাম নেওয়া প্রয়োজনীয় ছিল। এখন তাদের ধর্মমত ও

তাদের বিশ্বাসগত অবস্থার আলোচনা শুরু করা হচ্ছে। এখন এমন নাম নেওয়া প্রয়োজন, যাতে কোনো গুণ-পরিচয় প্রকাশ পায় যাতে বংশ গোত্র পরিবারের পরিবর্তে ধর্মমত ও ধর্মবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় اَلَّذِيْنَ هَادُوْا সে প্রয়োজন পূরণ করছে। কুরআনে আলংকারিক বৈশিষ্ট্যের কার্যকারণ অসংখ্য-অগণিত। সেগুলোর মধ্যে একটি এই যে, প্রায় কাছাকাছি কিন্তু একে অপর থেকে ভিন্ন অর্থের জন্য কুরআন মাজীদ ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে শব্দদ্বয়ের মধ্যকার সূক্ষ্ম পার্থক্যের প্রতিও লক্ষ্য রাখে।

আরবে এমন অনেক গোত্র ছিল, যারা জন্মগত এবং বংশগতভাবে ইহুদি ছিল না; বরং তারা ছিল আরব বা বনী ইসমাঈল হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর। কিন্তু ইহুদিদের সংসর্গ-সান্নিধ্যে প্রভাবিত এবং তাদের জ্ঞান-গরিমা দ্বারা চমৎকৃত হয়ে তারা প্রথমে ওদের আচার-আচরণ এবং পরে আকিদা-বিশ্বাস অবলম্বন করে নেয়। আর এভাবে ধীরে ধীরে তারাও ইহুদি জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে। اَلْيَهُوْد না বলে اَلَّذِيْنَ هَادُوْا বলার একটা সূক্ষ্ম রহস্য এই যে, এতে তাদের আকিদা-বিশ্বাস যে মৌলিক নয়; বরং পরবর্তীকালে গ্রহণ করা, সে কথা ভালোভাবে বুঝা যায়।

قَوْلُهُ اَلنَّصَارٰى : বহুবচন, একবচনে نَصْرَانِى শাম দেশে বর্তমান ফিলিস্তীনে Nazareth বা নাছেরা নামে একটা গোত্র আছে। বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে ৭০ মাইল উত্তরে রোম সাগরের ২০ মাইল পূর্বে গ্যালিলী অঞ্চলে। হযরত ঈসা (আ.-এর নিবাস এ অঞ্চলে অবস্থিত। এ কারণে তাকে ইয়াসূ নাছেরী বলা হয়। আরবি উচ্চারণে নাছেরাকে নাছরানও বলা হয়। এ অঞ্চলের সাথে সম্পৃক্ততার কারণে নাসরানী বলা হয়।

ইমাম রাগেব (র.) বলেন- سُمُّوْا بِذَالِكَ اِنْتِسَابًا اِلٰى قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا نَصْرَانُ (رَاغِب)

সাহাবী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও নাসারাদের নামকরণের কারণ সংক্রান্ত একটি বর্ণনা পাওয়া যায়-

سُمِّيَتِ النَّصَارٰى لِاَنَّ قَرْيَةَ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ كَانَتْ تُسَمّٰى نَاصِرَةً وَكَانَ اَصْحَابُ يُسَمُّوْنَ النَّاصِرِيِّيْنَ (اِبْن جَرِيْر)

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন-

سُمُّوْا بِذَالِكَ الْقَرْيَةِ تُسَمّٰى نَاصِرَةً كَانَ يَنْزِلُهَا عِيْسٰى فَلَمَّا يُنْسَبُ اَصْحَابُهُ اِلَيْهِ قِيْلَ النَّصَارٰى (قُرْطُبِى)

কেউ কেউ একে আরবি শব্দ মনে করে তা نُصْرَتٌ থেকে নিষ্পন্ন বলে মত প্রকাশ করেছেন। আবার কেউ বলেছেন, যেহেতু তারা বলেছিল- نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ তাই তাদেরকে নাসারা বলা হয়। কিন্তু পূর্বোক্ত উক্তিই ঠিক।

-[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ১২৩]

قَوْلُهُ اَلصَّابِئِيْنَ : সাবী-এর শাব্দিক অর্থ হলো- যে কেউ নিজের দীন ত্যাগ করে অপরের দীন গ্রহণ করে, বা অপরের দীনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। পরিভাষায় صَابِئُوْنَ [Sabians] নামে একটা ধর্মীয় ফেরকা ছিল, যারা আরবের উত্তর-পূর্ব দিকে শাম ও ইরাকের সীমান্তে বসবাস করতো। এরা তাওহীদ-রিসালাতে বিশ্বাসী ছিল। কারণ মূলত আহলে কিতাব ছিল। এরা নিজেদেরকে নাসারা-ই ইয়াহইয়া বলতো। যেমন এরা ছিল হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর উম্মত। হযরত ওমর (রা.)-এর মতো বিজ্ঞ খলিফা এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতো সত্যসন্ধানী সাহাবীও সাবেয়ীদেরকে আহলে কিতাবদের অন্তর্ভুক্ত মনে করতেন। আর হযরত ওমর (রা.) তো তাদের জবাই করা পশু হালাল মনে করতেন।

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَابْنُ عَبَّاسٍ هُمْ قَوْمٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَقَالَ عُمَرُ تَحِلُّ ذَبَائِحُهُمْ مِثْلَ ذَبَائِحِ اَهْلِ الْكَعْبَةِ (مَعَالِم)

বেশ বড় বড় কয়েকজন তাবেয়ীও তাদেরকে আহলে কিতাব বা তাওহীদবাদী মনে করতেন। যেমন ইবনে জারীর (র.) বলেন-

هُمْ طَائِفَةٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ (اِبْن جَرِيْر عَنِ السُّدِّى)

ইবনে যায়েদ (র.) তাদেরকে তাওহীদবাদী মনে করতেন। কাতাদা এবং হাসান বসরী (র.) থেকে তো এও বর্ণিত আছে যে, তারা কিতাবধারী এবং পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতো -[ইবনে জারীর]। আমাদের ইমাম আবূ হানীফা (র.) নিজেও ছিলেন ইরাকী। এ কারণে সাবেয়ীদের সম্পর্কে সরাসরি জানার তার সুযোগ ছিল। তার ফতোয়া এই যে, তাদের হাতে জবাই করা পশু হালাল এবং এদের নারীদের সাথে বিয়েও জায়েজ।

قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ اَلَا بَأْسَ بِذَبَائِحِهِمْ وَنِكَاحِ نِسَائِهِمْ (قُرْطُبِى)

قَوْلُهُ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার জাত-সিফাতের উপর ঈমান এনেছে, যেমন ঈমান আনার হক রয়েছে। আর সে ঈমান হতে হবে সব ধরনের শিরকের মিশ্রণ থেকে মুক্ত। আর এ ঈমান আনার অধীনে তার সকল আবশ্যকীয় বিষয় এবং তাতে যা যা অন্তর্ভুক্ত, সবই শামিল রয়েছে। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলার উপর শুধু ঈমান তো কোনো না কোনো রকমে প্রায় সব মানুষেরই আছে। আর ঈমানের আবশ্যিক বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু নাম্বারে রয়েছে রাসূলের প্রতি ঈমান। কারণ রাসূলই আল্লাহ তা'আলার সাথে বান্দাদের সুষ্ঠু সম্পর্ক স্থাপন করেন, এর সোজা পথ দেখান।

قَوْلُهُ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ : পরকালের প্রতি ঈমান আনার অর্থই হচ্ছে পরকাল সম্পর্কিত সকল বিধানের প্রতি ঈমান আনা। একে অপরের মধ্যে লীন হওয়া এবং বারবার জন্ম নেওয়ার ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাসের ভিত্তি তো কেবল এই যে, অন্যান্য ধর্মে পরকালের প্রতি ঈমান আনার সঠিক ধারণা বর্তমান ছিল না; তারা পুরস্কার ও শাস্তির নানাবিধ রূপ ও ধরন কল্পনা করে নিয়েছিল। –[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ فِىْ زَمَنِ نَبِيِّنَا : এ বাক্যটুকু বৃদ্ধি করে একটি ইশকালের জবাব দেওয়া হয়েছে। ইশকালটি হলো-উপরে বলা হয়েছে– اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا -এরপর আবার বলা হয়েছে مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ উভয়টি বাক্যের মর্ম তো একই। তাহলে تَخْصِيْصُ بَعْدَ التَّعْمِيْمِ -এর কি প্রয়োজন পড়ল?

উত্তর : উভয় বাক্যের উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন। اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا -এর مِصْدَاق হলো ঐ সকল লোক যারা فَتْرَة -এর জমানায় ঈমান আনয়ন করেছে। যেমন, ওয়ারাকা ইবনে নাওফাল, বোহায়রা রাহেব, সালমান ফারসি ও হাবীবে নাজ্জার প্রমুখ। তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ রাসূল ﷺ -এর জমানাও পেয়েছেন। আর কেউ হুজুর ﷺ নবী হওয়ার পূর্বেই ইন্তেকাল করেছে। এদিকে ইঙ্গিত করার জন্য-ই আল্লামা সুয়ূতী (র.) بِالْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلُ বাক্যটি উল্লেখ করেছেন। আর مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ শব্দ দ্বারা ঐ সকল ব্যক্তি উদ্দেশ্য, যারা হুজুর ﷺ -এর জমানায় তাঁর উপর ঈমান এনেছে। উক্ত আলোচনায় জানা গেল উভয়টির مِصْدَاق ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং তাকরার হওয়ার আপত্তি শেষ হয়ে গেল। এ ভিন্নতাটি বর্ণনা করার জন্যই আল্লামা সুয়ূতী (র.) দ্বিতীয় আয়াতের ব্যাখ্যায় فِىْ زَمَنِ نَبِيِّنَا উল্লেখ করেছেন। –[হাশিয়ায়ে জামাল]

قَوْلُهُ رُوْعِىَ فِىْ ضَمِيْرِ مَنْ اٰمَنَ :

প্রশ্ন : مَنْ اٰمَنَ এবং مَنْ عَمِلَ উভয় জায়গায় ضَمِيْر مُفْرَدْ -এর مَرْجِع হলো مَنْ আর এক-ই ভাবে فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ -এর هُمْ যমীরের – مَرْجِع ও হলো مَنْ ; যা বিশুদ্ধ নয়।

উত্তর : মুফাসসির (র.) رُوْعِىَ فِىْ ضَمِيْرِ مَنْ اٰمَنَ এ ইবারতটুকু বৃদ্ধি করে উক্ত প্রশ্নের-ই জবাব দিয়েছেন। অর্থাৎ প্রথমটির মাঝে مَنْ -এর শব্দগত দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং দ্বিতীয়টিতে مَنْ -এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। জানা দরকার مَنْ লফজের দিক দিয়ে مُفْرَدْ -এবং مَعْنٰى -এর দিক দিয়ে বহুবচন।

ইহুদিদের অধঃপতন ও প্রায়শ্চিত্ত : বলা হয় যে, তাওরাত নাজিল হলে বনী ইসরাঈল তাদের দূর্মতিবশে বলেছিল, তাওরাতের বিধান তো বেজায় কঠিন এর অনুসরণ আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তখন মহান আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে একটি পাহাড় তাদের উপরে উঠে আসল। তাদের সামনে আগুন সৃষ্টি হলো। কোনো রকমের অবাধ্যতার সুযোগ থাকল না। নিরুপায় হয়ে তারা তাওরাতের বিধান স্বীকার করে নিল।

প্রশ্ন : মাথার উপর পাহাড় স্থাপন করে তাওরাত স্বীকার করিয়ে নেওয়া তো স্পষ্ট চাপিয়ে দেওয়া ও জবরদস্তি করার নামান্তর, যা কুরআনের আয়াত لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ [দীনে কোনো জবরদস্তি নেই] বিধান আরোপের রীতি-নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। কেননা বিধান আরোপের ভিত্তি স্বাধীন ইচ্ছার উপর; আর জবরদস্তি তো সেই ইচ্ছাকে ক্ষুণ্ন করে।

উত্তর : এটি জবরদস্তি দীন কবুল করানোর জন্য নয় মোটেই। বনী ইসরাঈল তো দীন পূর্বেই কবুল করে নিয়েছিল। যদ্দরুন তারা বারংবার হযরত মূসা (আ.)-কে তাগাদা দিয়ে আসছিল যে, আমাদেরকে বিধান সম্বলিত কোনো কিতাব এনে দাও! আমরা তার অনুসরণ করি। তারা এর পক্ষে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। কিন্তু যখন তাওরাত দেওয়া হলো, তখন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে প্রস্তুত হয়ে গেল। তাঁদেরকে সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হতে ফেরানোই ছিল পাহাড় চাপানোর উদ্দেশ্য, দীন কবুল করানো নয়। –[তাফসীরে উসমানী পৃ. ১৩]

قَوْلُهُ وَقَدْ رَفَعْنَا : এখানে رَفَعْنَا -এর পূর্বে قَدْ শব্দটি উহ্য ধরে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে وَاو টি وَاو حَالِيَة হয়েছে عاطفة নয় এবং رَفَعْنَا শব্দটি قَدْ মুকাদ্দার মানার সঙ্গে সঙ্গে اَخَذْنَاهُمْ থেকে حَال হয়েছে, مَعْطُوْف নয়। কারণ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট مَعْطُوْف عَلَيْه এবং مَعْطُوْف -এর মাঝে تَرْتِيْب জরুরি।

اَلطُّوْرُ : وَالطُّوْرُ يُطْلَقُ عَلٰى اَيِّ جَبَلٍ كَانَ كَمَا فِى الْقَامُوْسِ وَفِىْ رُوْحِ الْبَيَانِ : اَلطُّوْرُ هُوَ الْجَبَلُ بِالسُّرْيَانِيَّةِ . (جَلَالَيْن)

قَوْلُهُ بِالْعَمَلِ : এই অংশটুকু বৃদ্ধি করে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন যে, জবানের জিকির ও আলোচনা যথেষ্ট নয়; বরং উদ্দেশ্য হলো– আমল করা। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহকে গণনা করা উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হলো আমল।

قَوْلُهُ اَلنَّارَ وَالْمَعَاصِىَ : এখানে ইঙ্গিত রয়েছে যে, تَتَّقُوْنَ -এর মাফঊল اَلنَّارَ অথবা اَلْمَعَاصِىَ উহ্য রয়েছে।

ইসলামের বিধানের দৃষ্টিতে সব সমান : মোটকথা কানূনের ব্যাপকতা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। মুসলমানদের কানূন ব্যাপক, চাই আমাদের অনুকূল ও আনুগত্যের বুলি বোলনে ওয়ালা হোক কিংবা বিরোধী হোক, সকলে ভালোভাবে শ্রবণ করে নাও যে, এখন মুক্তি মুহাম্মদ ﷺ -এর অনুকরণের মধ্যে সীমিত। এর দ্বারা কথার গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে যে, ইসলামের এ ব্যাপক ও সাধারণ বিধানে আমাদের ও তোমাদের পার্থক্য নেই। কালো ও সুন্দরের ব্যবধান নেই। ভৌগলিক কিংবা বংশের হিসেবে পৃথকতার কোনো প্রশ্ন নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে সকলে সমান। কারো সাথে না ব্যক্তিগত সখ্যতা রয়েছে। আর না কারো সাথে শত্রুতা রয়েছে। যেমন কোনো বাদশা ঘোষণা করে দেয় যে, আইনের দৃষ্টিতে সব সমান, মন্ত্রী হোক কিংবা ফকির, বাধ্যগত গোলাম হোক অথবা বিরোধী শত্রু। যে কানুনের সম্মান ঠিক রাখবে, সে দয়া ও মহাব্বতের পাত্র হবে। তা না হলে শাস্তির যোগ্য হবে। উক্ত বর্ণনার পর যদি اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا দ্বারা উদ্দেশ্য খালেছ মু'মিনগণও হয়, তবুও আয়াতে কারীমার অর্থ ও উদ্দেশ্য একেবারে পরিষ্কার হয়ে যায়। –[কামালাইন খ. ১, পৃ. ৭৮]

বিপথগামী ওলামা (عُلَمَاء سُوْء) এবং ভুল পথের মাশায়েখ : তওরাত নাজিল হওয়ার পর বনী ইসরাঈল সত্যায়ন ও আস্থা লাভের উদ্দেশ্যে বাছাই করে উম্মতের ৭০ আউলিয়াকে হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে তূর পাহাড়ে পাঠিয়ে ছিল। কিন্তু তারা কুদরতি বিভিন্ন আশ্চর্যময় বস্তু স্বচক্ষে দেখা সত্ত্বেও জাতির সামনে এসে ভুলমিশ্রিত বক্তব্য পেশ করল যে, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী যদি তোমাদের দ্বারা সে মুতাবেক আমল করা সহজভাবে সম্ভব হয়, তবে কর। নতুবা আমল না করলেও চলবে। কিছু তো তাদের জন্মগত দুষ্টামি, কিছু বিধানাবলির কঠোরতা। তাই আমর থেকে পরিত্রাণের জন্য এটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করল এবং স্পষ্টভাবে অস্বীকার করল যে, আমাদের দ্বারা সে হুকুম মুতাবেক আমল করা সম্ভব নয়। এ কারণে পাহাড়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশ্তাগণ তাদের মাথার উপর পাহাড় তুলে ধরে সাবধান করেছে যে, এ মুহূর্তে বিধানকে শক্তভাবে ধর এবং সে অনুযায়ী আমল কর। –[প্রাগুক্ত]

দুনিয়াবী রাজত্বের কর্ম পদ্ধতি : যেমন– সরকারিভাবে পুলিশে ভর্তি হওয়ার জন্য কাউকে বাধ্য করা হয় না। কিন্তু স্বইচ্ছায় যদি কেউ এ দায়িত্ব গ্রহণ করে, তবে ডিউটি আদায়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে বাধ্য করা হবে। ডিউটি আদায় না করলে সে শাস্তির যোগ্য ও বরখাস্তের যোগ্য হবে এবং এ পদ্ধতিকে ইন্সাফ বলা হবে। আল্লাহর ব্যাপক রহমত থেকে দুনিয়াতে মু'মিনদের ন্যায় কাফেররাও উপকৃত হচ্ছে, কিন্তু পরকালে আল্লাহর বিশেষ রহমতের যোগ্য শুধু মু'মিনগণ হবে এবং আল্লাহর ফযল ও রহমতের সত্যায়ন নবী করীম ﷺ -ও হতে পারেন, যার অস্তিত্বের অসিলায় অঙ্গীকার ভঙ্গকারী বর্তমান ইহুদি সম্প্রদায় দুনিয়াবী আজাব থেকে নিরাপদে রয়েছে। –[প্রাগুক্ত]

অনুবাদ :

٦٥. وَلَقَدْ لَامُ قَسَمٍ عَلِمْتُمْ عَرَفْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا تَجَاوَزُوْا الْحَدَّ مِنْكُمْ فِى السَّبْتِ بِصَيْدِ السَّمَكِ وَقَدْ نَهَيْنَاكُمْ عَنْهُ وَهُمْ اَهْلُ اَيْلَةٍ. فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خَاسِئِيْنَ . مُبْعَدِيْنَ فَكَانُوهَا وَهَلَكُوْا بَعْدَ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ

৬৫. তোমাদের মধ্যে যারা শনিবার মৎস শিকার করে এই সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করেছিল সীমালঙ্ঘন করেছিল। অথচ আমি এই সম্পর্কে তাদেরকে নিষেধ করে দিয়েছিলাম। তাদেরকে তোমরা নিশ্চিতভাবে চিন। তারা ছিল আয়লার অধিবাসী। আমি তাদেরকে বলেছিলাম তোমরা ঘৃণিত আল্লাহ তা'আলার রহমত হতে বিতাড়িত বানর হও। ফলে তারা বানরে রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং তিনদিন পর সকলেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। لَقَدْ-এর لَامْ অক্ষরটি কসম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٦٦. فَجَعَلْنٰهَا اَيْ تِلْكَ الْعُقُوْبَةَ نَكَالاً عِبْرَةً مَانِعَةً مِنْ اِرْتِكَابِ مِثْلِ مَا عَمِلُوْا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا اَيْ لِلْاُمَمِ الَّتِىْ فِيْ زَمَانِهَا وَبَعْدَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِيْنَ . اللّٰهَ وَخَصُّوْا بِالذِّكْرِ لِاَنَّهُمُ الْمُنْتَفِعُوْنَ بِهَا بِخِلَافِ غَيْرِهِمْ .

৬৬. আমি তা অর্থাৎ এই শাস্তি তাদের সমসাময়িক ও পরবর্তীগণের অর্থাৎ যে সকল উম্মত এই সময় বর্তমান ছিল এবং পরে যারা আগমন করবে, তাদের সকলের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষামূলক, অনুরূপ কাজে লিপ্ত হওয়ার প্রতিরোধক হিসেবে এবং আল্লাহ তা'আলাকে ভয়কারীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ করেছি।

এই স্থানে মুত্তাকীদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ তা দ্বারা কেবল তারাই উপকৃত হতে পারে, অন্যেরা পারে না।

তাহকীক ও তারকীব

نَكَالٌ বেড়ী ও বন্ধনকে বলা হয়, এ স্থানে উদ্দেশ্য পরিহার্য, অর্থাৎ নিষেধ করা। عَلِمْتُمْ শব্দটি عَرَفْتُمْ-এর অর্থে। ফেয়েল বা ফায়েল। قَوْلُهُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا : এটি عَلِمْتُمْ-এর প্রথম মাফউল। اَىْ عَرَفْتُمْ اَشْخَاصَ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا

কেউ কেউ বলেন- এখানে مُضَافٌ মাহফুয আছে। اَىْ عَرَفْتُمْ اِعْتِدَاءَ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا .

কেউ কেউ বলেন- এখানে اَحْكَامْ মুজাফ মাহযুফ আছে- اَىْ عَرَفْتُمْ اَحْكَامَ الَّذِيْنَ اِعْتَدَوْا

مِنْكُمْ : এটি اِعْتِدَاءٌ-এর জমির থেকে حَالٌ হয়েছে। اَىْ اِعْتَدَوْا كَائِنِيْنَ مِنْكُمْ

فِى السَّبْتِ এটার মুতা'আল্লাক হচ্ছে خَاسِئِيْنَ আর خَاسِئِيْنَ নির্গত হয়েছে خَسَاءٌ থেকে, লাঞ্ছিত হওয়া। قِرَدَةً-এর সিফত অথবা খবরে ছানী কিংবা كُوْنُوْا থেকে حَالٌ আর نَكَالاً মাফউলে ছানী। مُبْعَدِيْنَ : এটি خَاسِئِيْنَ-এর তাফসীর। বলা হয় خَسَأَ الْكَلْبَ اِذَا طَرَدَهُ

فَكَانُوْهَا : এখানে كَانَ ফে'লে নাকেসটি صَارَ-এর অর্থে। আর هَا জমিরে মানসূবটি قِرَدَةً-এর দিকে ফিরেছে।
اَىْ صَارُوْا قِرَدَةً خَاسِئِيْنَ .

قَوْلُهُ نَكَالاً : نَكَالٌ-এর বহুবচন। অর্থ- বেড়ী। লাজেমী অর্থ- এমন কঠিন-কঠোর শাস্তি যা অন্যদের জন্যও শিক্ষনীয়। কেননা তার লাজেমী অর্থ হলো اَلْمَنْعُ বারণ করা। যেহেতু مُقَيَّدٌ বন্দী বা مَمْنُوْعٌ বারণকৃত হয়ে যায়। সেহেতু এ আজাবও অন্যদেরকেও একাজ করতে বারণ করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الخ : যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে বনি ইসরাইলকে বলা হয়েছিল যে, তোমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহ না হলে তোমাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের দাবি এই ছিল যে, তৎক্ষণাৎ তোমাদেরকে আজাব দিয়ে ধ্বংস করে দেওয়া হতো। এখন এ আয়াতে দৃষ্টান্ত স্বরূপ শরিয়তের বিধান লংঘন ও অস্বীকার করার পার্থিব ক্ষতি ও কুফল বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে– পূর্ববর্তী উম্মতকে তাওরাতে শনিবার দিবসটি বন্দেগীতে কাটানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু তারা সে বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল ফলে তাদেরকে মসখ বা বিকৃতির আজাব দেওয়া হয়েছিল।

قَوْلُهُ لَامُ قَسَمٍ : মুফাসসির (র.) এদিকে ইঙ্গিত করলেন যে, এখানে مُقْسَمٌ بِهٖ মাহযুফ রয়েছে। اَىْ وَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ

قَوْلُهُ عَرَفْتُمْ : মুফাসসির (র.) এর দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন।

প্রশ্ন : عَلِمْتُمْ ফে'লটি দুটি মাফঊল দাবী করে। অথচ এখানে শুধু একটি মাফঊল উল্লেখ রয়েছে।

উত্তর : মুফাসসির (র.) উত্তরের প্রতি এভাবে ইঙ্গিত করেছেন যে, عَلِمْتُمْ এখানে عَرَفْتُمْ-এর অর্থে। সুতরাং এখন এক মাফঊলের দিকে মুতাআদ্দী হওয়া শুদ্ধ আছে।

عِلْم এবং مَعْرِفَتْ-এর মাঝে পার্থক্য :

১. مَعْرِفَتْ কেবল 'যাত' বা সত্তা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হওয়াকে বুঝায়। আর عِلْم যাত-এর সাথে সাথে তার অন্যান্য অবস্থা ও বিচরণ সম্পর্কে জানাকে বুঝায়। যেমন এর ব্যবহার এভাবে হয়– عَرَفْتُ زَيْدًا وَعَلِمْتُ زَيْدًا ضَاحِكًا ـ

২. مَعْرِفَتْ টি مَسْبُوْق بِالْجَهْلِ বা তার পূর্বে অজ্ঞতা আবশ্যক। পক্ষান্তরে عِلْم-এর পূর্বে অজ্ঞতা জরুরি নয়। এজন্য আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে مَعْرِفَتْ-এর ব্যবহার শুদ্ধ নয়।

৩. عِلْم-এর ব্যবহার اِدْرَاكُ كُلِّيَاتْ সম্পর্কে হয় আর مَعْرِفَتْ-এর ব্যবহার اِدْرَاكُ جُزْئِيَاتْ সম্পর্কে হয়।

৪. عِلْم-এর ব্যবহার مُدْرَكْ بِالْقَلْبِ বা অন্তর দিয়ে অনুভব করার ক্ষেত্রে হয় আর مَعْرِفَتْ-এর ব্যবহার مُدْرَكْ بِالْحَوَاسِّ বা পঞ্চন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করার ক্ষেত্রে হয়।

قَوْلُهُ فِى السَّبْتِ : এখানে اَلسَّبْتُ দ্বারা শনিবার উদ্দেশ্য। কেউ বলেছেন– اَلسَّبْتُ-এর অর্থ এখানে تَعْظِيْم বা সম্মান। اَىْ فِىْ تَعْظِيْمِ يَوْمِ السَّبْتِ

কেউ বলেন– فِىْ حُكْمِ يَوْمِ السَّبْتِ

এ ঘটনাটি হযরত দাঊদ (আ.)-এর আমলে সংঘটিত। বনী ইসরাঈলের জন্য শনিবার ছিল পবিত্র এবং সাপ্তাহিক উপাসনার জন্য নির্ধারিত দিন। এ দিন মৎস্য শিকার নিষিদ্ধ ছিল। তারা সমুদ্রোপকূলের অধিবাসী ছিল বলে মৎস শিকার ছিল তাদের প্রিয় কাজ। ফলে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই তারা মৎস শিকার করে। এতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে مَسْخ তথা বিকৃতি বা রূপান্তরের শাস্তি নেমে আসে। তিন দিন পর এদের সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এ ঘটনার দর্শক ও শ্রোতা দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। অবাধ্য শ্রেণি ও অনুগত শ্রেণি। অবাধ্যদের জন্য এ ঘটনাটি ছিল অবাধ্যতা থেকে তওবা করার উপকরণ। এ কারণে একে نَكَال শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টান্ত বলা হয়েছে। অপরদিকে অনুগতদের জন্য এটা ছিল আনুগত্যে অটল থাকার কারণ। এ জন্য একে مَوْعِظَةً অর্থাৎ উপদেশপ্রদ ঘটনা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আকৃতি রূপান্তরের ঘটনা : তাফসীরে কুরতুবীকে বলা হয়েছে, ইহুদিরা প্রথম প্রথম কলাকৌশলের অন্তরালে এবং পরে সাধারণ পদ্ধতিতে ব্যাপকভাবে মৎস্য শিকার করতে থাকে। এতে তারা দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল ছিল সৎ ও বিজ্ঞ লোকদের। তারা এ অপকর্মে বাধা দিলেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ বিরত হলো না। অবশেষে তারা এদের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে পৃথক হয়ে গেলেন। এমনকি বাসস্থানও দুই ভাগে ভাগ করে নিলেন। একভাগে অবাধ্যরা বসবাস করত আর অপরভাগে সৎ ও বিজ্ঞজনেরা বাস করতেন। একদিন তারা অবাধ্যদের বস্তিতে অস্বাভাবিক নীরবতা লক্ষ্য করলেন। অতঃপর সেখানে পৌঁছে দেখলেন যে, সবাই বিকৃত হয়ে বানরে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন, তাদের যুবকরা বানরে এবং বৃদ্ধরা শূকরে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। রূপান্তরিত বানররা নিজ নিজ আত্মীয় স্বজনদের চিনত এবং তাদের কাছে এসে অঝোরে অশ্রু বিসর্জন করত। –[মাআরিফুল কুরআন : মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.)]

রূপান্তরিত সম্প্রদায়ের বিলুপ্তি : সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, কয়েকজন সাহাবী একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, হুজুর! আমাদের যুগের বানর ও শূকরগুলো কি সেই রূপান্তরিত ইহুদি সম্প্রদায়? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো সম্প্রদায়ের উপর আকৃতি রূপান্তরের আজাব নাজিল

করেন. তখন তারা ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তিনি আরো বলেন, বানর ও শূকর পৃথিবীতে পূর্বেও ছিল. ভবিষ্যতেও থাকবে। এদের সাথে রূপান্তরিত বানর ও শূকরদের কোনো সম্পর্ক নেই। [মা'আরিফুল কুরআন, মুফতি মুহাম্মদ শফী (র.)]

قَوْلُهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ : ইলম শব্দটি তাহকীক বা নিশ্চিত করে জানা অর্থে কুরআন মাজীদে বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। এরপরও তার সঙ্গে জোর দেওয়ার জন্য আরো যুক্ত হয়েছে قَدْ ও لَ । যেখানে فِعْل বা ক্রিয়ার সঙ্গে لَقَدْ শব্দ যুক্ত হয়, সেখানে তাকিদের জোর দেওয়াই উদ্দেশ্য। যেন কুরআন বনী ইসরাঈলকে তাদের ইতিহাসের কোনো ঘটনা যা তাদের ভালো করেই জানা আছে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে এবং তাদেরকে বলছে. হে বনী ইসরাইল! যে ঘটনাটি এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে তা তোমাদের ইতিহাসের খুবই পরিচিত ও স্বীকৃত ঘটনা এবং তোমরা কোনো রকম সন্দেহ-সংশয় ছাড়াই সে ঘটনার কথা ভালো করেই জান। مِنْكُمْ মানে তোমাদের পূর্বসূরী বা পূর্বপুরুষদের মধ্য থেকে।

قَوْلُهُ فِى السَّبْتِ : অর্থাৎ শনিবারের বিধানের ব্যাপারে। سَبْت -এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে সপ্তাহের সপ্তম দিন শনিবার। اَلسَّبْتُ বা শনিবার দিনটি ইহুদিদের পরিভাষায় অতি পবিত্র দিন, যেমন খ্রিস্টানদের জন্য রবিবার। এ দিনটি কেবল আল্লাহ তা'আলার স্মরণ ও তাঁর ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট। এ দিন ব্যবসায়-বাণিজ্য, কায়-কারবার, চাষাবাদ, কৃষিকর্ম ও শিকার ইত্যাদি সবই ছিল নিষিদ্ধ। এ নিষেধাজ্ঞা ছিল অত্যন্ত কঠোরভাবে। এ নিষেধাজ্ঞা লজ্ঘনের শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড।

قَوْلُهُ اِعْتَدَوْا : বাড়াবাড়ি করতো, শরিয়তের মুসাবীর সীমালজ্ঘন করতো। বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, হযরত দাউদ (আ.)-এর সময়ে ইলিয়া নামক স্থানে বিপুল সংখ্যক ইহুদি ছিল। এখানে তাদের কথাই বলা হয়েছে। হযরত দাউদ (আ.)-এর শাসনকাল ছিল খ্রিস্টপূর্ব ১০১৪ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৯৭৩ অব্দ পর্যন্ত। ইলিয়া যদি সে স্থান হয়ে থাকে, তাওরাতে যাকে ইলাত [Elath] বলা হয়েছে [দ্বিতীয় বিবরণ ২ : ৮] তবে তা ফিলিস্তীনের দক্ষিণে আরবের ঠিক উত্তর সীমান্তে [প্রাচীন আদুম অঞ্চলে] নীল নদের পূর্বাঞ্চলে বর্তমানে সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত। আধুনিক ভূগোলে এটা আকাবা নামে পরিচিত। আর আকাবা হচ্ছে আকাবা উপসাগরের প্রসিদ্ধ বন্দর। ইলার ইহুদিরা তাদের শরিয়তের বিধান অব্যাহতভাবে লজ্ঘন করে বিশেষ চতুরতার সাথে মাছ শিকার করতো আর এটা করতো বাহ্যিক বৈধতার রূপ দিয়ে শনিবার দিনে। -[তাফসীরে মাজেদী খ. ১. পৃ. ১২৯]

قَوْلُهُ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ : এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, এখানে বানর হওয়ার কথা বলা হলো অথচ অন্য আয়াতে বলা হয়েছে- وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ অর্থাৎ শূকর হওয়ার বিবরণও রয়েছে।

উত্তর :

১. اَصْحَابُ السَّبْتِ বানর হয়েছিল আর اَصْحَابُ الْمَائِدَةِ শূকর হয়েছিল।

২. اَصْحَابُ السَّبْتِ -এর মধ্যে যারা যুবক ছিল, তারা বানর হয়েছিল আর যারা বৃদ্ধ ছিল. তারা শূকর হয়েছিল।

قَوْلُهُ وَهَلَكُوْا بَعْدَ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ : মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করলেন যে. বর্তমানে যে বানর দেখা যায়, এগুলো সে বানর নয়। যেমনটি বনী ইসরাইলদের বিকৃতির ফলে হয়েছিল; বরং বর্তমান কালের বানর ভিন্ন সৃষ্টি।

فَجَعَلْنَاهَا -এর هَا সর্বনাম দ্বারা عُقُوْبَتٌ তথা শাস্তিও উদ্দেশ্য হতে পারে. আবার সে আকৃতি বিকৃত উম্মতও অর্থ হতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই সারকথা এক ও অভিন্ন।

قَوْلُهُ مَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا : এখানে ইশকাল হয় যে, যখন مَا بَيْنَ يَدَيْهَا দ্বারা গ্রামবাসী বা পূর্ববর্তী উম্মত উদ্দেশ্য সেখানে مَا ব্যবহার করা হলো কেন? এটা তো غَيْرِ ذَوِى الْعُقُوْلِ -এর জন্য আসে।

উত্তর : এ উভয় স্থানেই مَا -কে مَنْ -এর স্থলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে مَا বলে প্রাণ ও জ্ঞান-বুদ্ধি আছে, এমন অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। مَا بَيْنَ يَدَيْهَا যা তাদের সামনে আছে 'সমকালীন' অর্থে مَا خَلْفَهَا যা তাদের পেছনে আছে, 'পরে যারা আসবে, তাদের' অর্থে। অর্থাৎ শাস্তি যেন এমনই ভয়ঙ্কর ছিল যে, পুরুষানুক্রমে তা আলোচিত হয়েছে এবং সে আলোচনা শুনে মানুষ রীতিমতো প্রকম্পিত হয়েছে।

দীনি ব্যাপারে হীলা বাহানার তাৎপর্য : এ আয়াতে ইহুদিদের যে সীমালজ্ঘনের কথা আলোচিত হয়েছে এবং যে কারণে তাদের উপর مَسْخ তথা বিকৃতির শাস্তি নেমে এসেছিল, বর্ণনার আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, সেটা শরয়ী হুকুমের সরাসরি বিরুদ্ধাচারণ ছিল না; বরং তা ছিল এমন হীলা বা কৌশল যা দ্বারা শরয়ী হুকুম অমান্য করা আবশ্যক হয়। যেমন সাপ্তাহিক ইবাদতের দিনে মাছের লেজে ডুরি বেঁধে সমুদ্রের এক কোনে ছেড়ে রাখা এবং পরের দিন অনায়াসে তা শিকার করা বা সমুদ্রের কিনারে গর্ত করে রাখা যাতে নিষিদ্ধ দিনে মাছ সেখানে ঢুকে পড়ে এবং পরের দিন তা শিকার করা যায়। এটা হচ্ছে ঐ ধরনের হীলা, যাতে শুধু শরয়ী হুকুমের লজ্ঘনই হয় না; বরং বিদ্রূপ ও উপহাসও হয়। তাই তো এ ধরনের হীলার আশ্রয় গ্রহণকারীদেরকে বড় রকমের অবাধ্য ও নাফরমান আখ্যা দিয়ে তাদেরকে আজাবে নিপতিত করা হয়েছে। -[জামালাইন : ১৪০]

ফিকহী হীলা : তবে উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা 'ফিকহী হীলা' হারাম প্রমাণিত হয় না। তন্মধ্যে হতে কিছু হীলা তো স্বয়ং রাসূল ﷺ -ও বাতলে দিয়েছেন। যেমন এক কেজি উত্তম দামী খেজুরের বদলায় দুই কেজি কম দামি খেজুর ক্রয়-বিক্রয় করা সুদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এ সুদ থেকে বাঁচার জন্য স্বয়ং রাসূল ﷺ একটি হীলা বাতলে দিয়েছেন। তা হলো জিনস -এর বিনিময়ে জিনস তাবাদুলা না করে মূল্যের বিনিময়ে বেচা-কেনা করা। যেমন দুই কেজি কম দামি খেজুর দুই দিরহামে বিক্রি করে দুই দিরহাম দ্বারা এক কেজি উত্তম খেজুর খরিদ করা জায়েজ আছে। কেননা এখানে উদ্দেশ্য হলো হুকুমে শরয়ী পালন করা, তা বাতিল ও অমান্য করা উদ্দেশ্য নয়। -[জামালাইন খ. ১, পৃ. ১৪০]

শরিয়তের দৃষ্টিতে হীলা : হীলা অর্থ- مَهَارَاتٌ تَدَابِيْر বা কৌশলের দক্ষতা। হারাম ও পাপ থেকে বাঁচার জন্যে শরিয়ত সমর্থিত কোনো পথ অনুসরণকে ফকীহগর্ণের পরিভাষায় 'হীলা' বলে। এজন্যই কেউ কেউ হারাম থেকে পলায়নের পথকে হীলা বলেছেন। إِنَّهَا هُوَ الْهَرَبُ مِنَ الْحَرَامِ .

সারকথা হলো, হারাম থেকে বাঁচার পথকে হীলা বলে। হারামের শিকার হওয়া অথবা নিজেকে কিংবা অন্য কাউকে প্রতারিত করাকে হীলা বলে না।

এটা অস্বীকার করা যাবে না, আমাদের ফিকহগ্রন্থগুলোর এমন কিছু হীলাও উল্লিখিত হয়েছে, দীনের মেজাজ ও রুচির সাথে যেগুলো খাপ খায় না। কিন্তু এর অর্থ এই নয়। তাঁরা এগুলোকে জায়েজ বলেছেন কিংবা উৎসাহিত করেছেন; বরং এই জাতীয় হীলা গ্রন্থবদ্ধ করার উদ্দেশ্য হলো যদি কোনো ব্যক্তি এমনটি করেই বসে, তাহলে তার বিধান কি হবে? কি হবে তার পরিণতি। কারো কারো আপত্তির জবাবে আল্লামা ইবনে নুজাইম (র.) একথাই লিখেছেন। ইমাম সারাখসী (র.) হীলার বৈধ-অবৈধ বিভিন্নরূপ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। শেষে সার নির্যাস হিসেবে লিখেছেন সারকথা হলো, হারাম থেকে মুক্তি ও হালাল পর্যন্ত পৌঁছার লক্ষ্যে গৃহীত হীলা উত্তম। যদি কারো হক নষ্ট করা কিংবা কোনো অন্যায় লোভে হীলার পথ গ্রহণ করা হয় তাহলে সেটা অপছন্দনীয়। মোটকথা দ্বিতীয় প্রকারের হীলা নাজায়েজ। আর প্রথমোক্তটি জায়েজ। যেমন কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি এমন 'ডেগ' রান্না না কর, যার অর্ধেক হালাল আর অর্ধেক হারাম, তাহলে তুমি তালাক। এমতাবস্থায় এই মাথা-গরম ব্যক্তির স্ত্রীকে হীলা বলে দেওয়া হয়েছে- মদের 'ডেগে' খোসাসহ ডিম রান্না করবে। খোসার কারণে ডিমের ভেতর মদ পৌঁছাতে পারবে না। ফলে তার আর্ধ হালার আর আর্ধ হারাম 'ডেগ' রান্না করা হয়ে যাবে। তালাকের মত 'নিকৃষ্ট মুবাহ' -এর অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে এই নারী। ভেঙ্গে পড়ার হাত থেকে রক্ষা পাবে তার খান্দান পরিবার।

আমরা লক্ষ্য করলে দেখব- ফিকাহ গ্রন্থে বর্ণিত হীলাগুলোর মূল প্রেরণা হলো হারাম থেকে রক্ষা পাওয়া, পাপের পথ বন্ধ করা এবং শরিয়তের গণ্ডির ভেতর থেকে ভালো করে বুঝতে হবে, যদি কেউ হীলার অন্তরালের পাপের পথে পা বাড়ায় হীলার খোলস পরে অন্যের প্রতি জুলুম ও অবিচারের চেষ্টা করে তাহলে তা নিশ্চিত হারাম, ও জঘন্য অপরাধ; বরং এটা আল্লাহ তা'আলাকে ধোঁকা দেওয়ারই নামান্তর। কিন্তু আল্লাহকে কি ধোঁকা দেওয়া যায়?

يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ .

তারা আল্লাহ ও ঈমানদারদের ধোঁকা দেয় অথচ তারা তো নিজেদেরকেই ধোঁকা দেয়। বনী ইসরাইলের প্রতি আল্লাহ তা'আলার আজাব নিপাতিত হয়েছিল এই কারণে যে, তারা আল্লাহর দেওয়া সীমানা লংঘন করে শনিবারে মাছ শিকার করেছিল। অথচ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এই দিনে মাছ শিকার করতে নিষেধ করেছিলেন তারা খোদার বিধান লংঙ্ঘন করে ছিল কৌশলের আড়ালে। পবিত্র কুরআনে [উক্ত আয়াতে] এই কাহিনী বিধৃত হয়েছে।

প্রনিধানযোগ্য যে, হীলা বিষয়টি সাধারণতো সাধারণ আলেম সম্প্রদায়ের জন্যও অত্যন্ত নাজুক। তাই চূড়ান্ত ঠেকা ছাড়া এই প্রাঙ্গনে পা রাখা সঙ্গত নয়। স্মরণ রাখতে হবে, আমাদের পূর্বসূরীগণ হীলার পথ দেখিয়ে গেছেন হারাম থেকে বাঁচার লক্ষ্যে, হীলাকে হালাল ও পবিত্র হিসেবে বরণ করার উদ্দেশ্যে নয়।

-[দেখুন, হালাল হারাম মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ রাহমানী, পৃ. ৪৬-৪৮]

মৌলিক ও আধ্যাত্মিক বিকৃতি : আর মুফাস্‌সিরগণের মধ্যে মুজাহিদ (র.)-এর অভিমত হচ্ছে এটা যে, বাহ্যিক বিকৃতি হয়নি; বরং মৌলিক বিকৃতি উদ্দেশ্য। আহ্‌মক ও নির্বোধ ব্যক্তিকে যেমনভাবে গরু ও গাধা বলা হয়, সেটাই এখানে উদ্দেশ্য; কিন্তু প্রয়োজন ব্যতীত প্রকৃত অর্থ ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। আধ্যাত্মিক জ্ঞানীগণ মনে করেন যে, যে ব্যক্তি শরিয়তকে প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব দেয় না। তার আধ্যাত্মিক নূর ধ্বংস হয়ে আত্মা বিকৃত হয়ে যায় এবং যে প্রাণীর বৈশিষ্ট্যসমূহ তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হবে, সে প্রাণীর স্বভাবই তার মধ্যে জন্মিবে। এটা হচ্ছে আধ্যাত্মিক বিকৃতি।

অনুবাদ :

٦٧. وَ اذْكُرْ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ وَقَدْ قُتِلَ لَهُمْ قَتِيْلٌ لَا يُدْرٰى قَاتِلُهٗ وَسَأَلُوْهُ اَنْ يَدْعُوَ اللّٰهَ اَنْ يُبَيِّنَهٗ لَهُمْ فَدَعَاهُ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ط قَالُوْا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ط مَهْزُوًّا بِنَا حَيْثُ تُجِيْبُنَا بِمِثْلِ ذٰلِكَ قَالَ اَعُوْذُ اَمْتَنِعُ بِاللّٰهِ مِنْ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ ـ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ ـ

৬৭. আর স্মরণ কর যখন মূসা আপন সম্প্রদায়কে বলেছিলেন– আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে একটি গরু জবাই করার আদেশ করেছেন। তাদের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছিল। কিন্তু হত্যাকারী সম্পর্কে কারো কিছু জানা ছিল না। তখন তারা হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট অনুরোধ জানালো যে, এই বিষয়টি পরিষ্কার করে দেওয়ার জন্য তিনি যেন আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করেন। অনন্তর তিনি সে জন্য দোয়া করলেন তারা বলল, তুমি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছ। আমাদেরকে উপহাসের পাত্র সাব্যস্ত করে নিয়েছ? তাইতো আমাদেরকে এধরনের উত্তর প্রদান করছ। সে বলল: আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় নিচ্ছি আমি আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে বিরত হচ্ছি। অজ্ঞদের উপহাসকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া হতে।

٦٨. فَلَمَّا عَلِمُوْا اَنَّهٗ عَزَمَ قَالُوْا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ط اَيْ مَا سِنُّهَا قَالَ مُوْسٰى اِنَّهٗ اَيِ اللّٰهُ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ مُسِنَّةٌ وَلَا بِكْرٌ ط صَغِيْرَةٌ عَوَانٌ نَصَفٌ بَيْنَ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرِ مِنَ السِّنَّيْنِ فَافْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ ـ بِهٖ مِنْ ذَبْحِهَا ـ

৬৮. যখন তারা বুঝতে পারল যে, হযরত মূসা (আ.) সত্যসত্যই এরূপ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তখন তারা বলল : আমাদের খাতিরে তোমার প্রভুর নিকট বল, তিনি যেন আমাদেরকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন তা কি? অর্থাৎ তার বয়স কি হবে? [তিনি] মূসা (আ.) বললেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তা এমন গাভী যা বৃদ্ধও না বয়স্ক না অল্প বয়স্কও না ছোটও না মধ্য বয়সী উল্লিখিত বয়সসমূহের মাঝামাঝি সুতরাং তা জবাই করা সম্পর্কে তোমরা যা আদিষ্ট হয়েছ, তা কর।

তাহকীক ও তারকীব

بَقَرَةٌ : শব্দটি মূলত শুধু গাভী বুঝায় এবং তা ثَوْرٌ -এর স্ত্রীলিঙ্গ। পুরুষ গরুকে ছাওর (ثور) বলা হয়। [রাগিব] তবে মুফাসসিরগণের অনেকে গাভী ও বলদ উভয়ের জন্য ব্যাপকার্থক রেখে এ স্থলে 'বলদ' অর্থ নিয়েছেন।

-[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ১৩২]

اَلْجَاهِلِيْنَ : এখানে جَهْل আভিধানিক অজ্ঞতার অর্থে। অর্থাৎ কোনো কাজ তার যথাযথ পন্থার পরিপন্থিরূপে সম্পাদন করা। اَلْجَهْلُ فِعْلُ الشَّيْئِ بِخِلَافِ مَا حَقُّهٗ يَفْعَلُ (راغب) আর আল্লাহ তা'আলার বাণী রটনার দুঃসাহস সে ব্যক্তিই দেখাতে পারে, যে আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞ ও উদাসীন কিংবা এমন ব্যক্তি করতে পারে, যে ধর্মীয় বিষয়ে উপহাস করার অশুভ পরিণতি ও শাস্তি সম্পর্কে অবগত নয়।

عَوَانٌ : মধ্যম, মধ্যবয়সী। বহুবচন اَعْوُنٌ সহজকরণার্থে وَاو -এর ضَمَّةٌ -কে হজফ করে দেওয়া হয়েছে।

نَصَفٌ : بِفَتْحِ النُّوْنِ وَالصَّادِ এটি عَوَانٌ -এর ব্যাখ্যা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى : যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে বনী ইসরাইলের অঙ্গীকার ভঙ্গের বিবরণ ছিল। সে সম্পর্কে আয়লার অধিবাসীদের ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে। এখন এ আয়াতে বনি ইসরাইলের গড়িমসি হঠকারিতার আরেকটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তারা আল্লাহর ওহীর প্রতি আশ্বস্ত না হয়ে এদিক সেদিকের নানা প্রশ্ন শুরু করে দিয়েছিল।

قَوْلُهُ قَتِيْلٌ : এটি فَعِيْل بِمَعْنٰى مَفْعُوْل -এর ওজনে। অর্থাৎ قَتِيْل অর্থ- مَقْتُوْلٌ নিহত। সেই নিহত ব্যক্তির নাম ছিল عَامِيْل [আমীল]।

قَوْلُهُ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖٓ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً : বনী ইসরাঈললের মধ্যে একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। **মিশকাতের টীকাগ্রন্থ মিরকাতের বর্ণনা অনুযায়ী** এর কারণ ছিল বিবাহজনিত। জনৈক ব্যক্তি নিহত ব্যক্তির কন্যার **পাণিগ্রহণ করার প্রস্তাব করে প্রত্যাখ্যাত হয় এবং এই পাণিপ্রার্থী** কন্যার পিতাকে হত্যা করে গা ঢাকা দেয়। ফলে হত্যাকারী **কে? তা জানা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।**

তাফসীরে জালালাইনের টীকায় রয়েছে, বনী ইসরাঈলের মাঝে একজন সম্পদশালী ব্যক্তি ছিল। তার ভাতিজারা বর্ণনান্তরে তার **চাচাত ভাইয়েরা সে ব্যক্তির মিরাসের প্রতি** লোভ করে তাকে হত্যা করে ফেলে এবং শহরের প্রবেশ দ্বারে তার মরদেহ **ফেলে রাখে। অতঃপর তারাই** আবার তার রক্তপণের দাবি তোলে। এ ব্যাপারে বিবাদ দেখা দিলে তারা হযরত মূসা (আ.)-এর **কাছে মকদ্দমা পেশ করে।** বিষয়টি হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে ঘোলাটে মনে হলে তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রকৃত **ঘাতকের সন্ধান** লাভের জন্য দোয়া করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে একটি গাভী জবাই করে তার গোশতের খণ্ড দিয়ে **মরদেহে** আঘাত করার নির্দেশ দেন। এ আয়াতে সে ঘটনাই আলোচিত হয়েছে।

গাভী জবাই করার নির্দেশ প্রদানের হেকমত : এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, হত্যাকারীর নাম বলে দেওয়ার জন্য এ পদ্ধতি **কেন গ্রহণ** করা হলো? হযরত মূসা (আ.) ওহীর মাধ্যমে জেনে তাদেরকে বলে দিলেই তো পারতেন। এ পদ্ধতি কেন গ্রহণ **করলেন?**

উত্তর :

১. যদি হযরত মূসা (আ.) ওহীর মাধ্যমে হত্যাকারীর নাম প্রকাশ করে দিতেন। তাহলে সম্ভাবনা ছিল তারা হযরত মূসা (আ.)-কে মিথ্যাবাদী বলে বসত এবং তাঁর কথা বিশ্বাস করত না; কিন্তু যখন একজন মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে সংবাদ দিতে শুরু করল, তখন মিথ্যা বলার কোনো অবকাশ নেই।

২. গাভী জবাই করার নির্দেশ প্রদানের মাঝে এ হিকমত নিহিত ছিল যে, বনী ইসরাইল বুঝতে পারবে, যে গরু এবং তার বাছুরকে তারা উপাস্য বানিয়ে ছিল তা পূজার যোগ্য নয়; বরং তা জবাই হওয়ার যোগ্য।

قَوْلُهُ اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا : ইহুদিরা গো-মাতার প্রতি ভক্তি ও মাহাত্ম্যপ্রকাশে গদগদ ছিল। তাদের বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে, এমন এক সম্মানিত ও পুণ্যাত্মা প্রাণী বধ করার আদেশ দেওয়া হবে। তাই তারা মনে করল যে, হযরত মূসা (আ.) তাদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করছেন। অথবা এর ব্যাখ্যা হলো– আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে নিহত ও ঘাতক সম্পর্কে অথচ আপনি আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন গাভী জবাই করার।

قَوْلُهُ مَهْزُوًّا : هُزُوًا -এর তাফসীরে مَهْزُوًّا উল্লেখ করে এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, هُزُوًا হলো مَصْدَرْ بِمَعْنٰى اِسْم مَفْعُوْل। এটিকে মুবালাগা স্বরূপ মাসদার হিসেবেও ব্যবহার করা সম্ভব, অথবা একটি মুযাফ উহ্যও ধরা যায়। অর্থাৎ ذوى هُزْء -[হাশিয়ায়ে জালালাইন পৃ. ১১, হাশিয়া নং ২০]

মাসআলা : ফকীহ ও মুফাসসিরগণ এ আয়াত হতে এ বিধান উদ্ভাবন করেছেন যে, দীন ও দীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উপহাস করা 'অজ্ঞতা' ও ভয়াবহ গুনাহ রূপে সাব্যস্ত হবে এবং এরূপ আচরণকারী ব্যক্তি কঠিন হুমকির যোগ্য হবে। −[কুরতুবী]

এ সম্পর্কে তাফসীরে কাবীরে বলা হয়েছে− يَدُلُّ عَلَى اَنَّ الْاِسْتِهْزَاءَ مِنَ الْكَبَائِرِ الْعِظَامِ

তবে মুফাসসিরগণ জরুরিরূপে এ বিষয়টির স্পষ্টতা বিধান করেছেন যে, পরিচ্ছন্ন কৌতুক ও নির্দোষ রসালাপের সঙ্গে উপহাস বা ঠাট্টার কোনোও সংযোগ নেই। এতদোভয়ের পার্থক্য মৌলিক খোশমেযাজী ও নির্দোষ কৌতুক তো স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছেন এবং পরবর্তীতে দীনের বরেণ্যগণের মাঝেও তা বরাবর প্রচলিত ছিল −[তাফসীরে মাজেদী খ. ১. পৃ. ১৩২]

قَوْلُهُ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ : মুফাসসির (র.)-এর দ্বারা নিম্নোক্ত سُوَالُ مُقَدَّرٌ [উহ্য প্রশ্ন]-এর জবাবের দিকে ইঙ্গিত করলেন−

প্রশ্ন : বনী ইসরাইল নবীর প্রতি هُزُوٌ বা ঠাট্টার অপবাদ আরোপ করেছিল। সে হিসেবে هُزُوٌ-কে নাকচ করা উচিত ছিল; কিন্তু তা না করে جَهَالَتٌ-এর নফী বা নাকচ কেন করা হলো?

উত্তর : এখানে نَفْيِ جَهَالَتٌ দ্বারা মূলত نَفْيِ اِسْتِهْزَاءِ-ই উদ্দেশ্য। এভাবে যে, তাবলীগের ব্যাপারে هُزُوٌ বা ঠাট্টা মূর্খতার নামান্তর। সুতরাং جَهَالَتٌ-কে নাকচ করার দ্বারা اِسْتِهْزَاءٌ-কেই নাকচ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ قَالُوْا اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ : হযরত মূসা (আ.) যখন اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ বলে নির্দেশের বাস্তবতার প্রতি সুদৃঢ় মনোভাব ব্যক্ত করলেন, তখন বনী ইসরাইল মনে করল যে, এ বিধান তো আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে এবং তা পালন করতে হবে। সেই সাথে তারা এটাও মনে করল যে, নিঃসন্দেহে গাভীটি একটি ব্যতিক্রম ধর্মী ও বিস্ময়কর গাভী হবে। তাই তারা এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল। তা কেমন? বয়স কত? রং কি? ইত্যাদি।

قَوْلُهُ مَا سِنُّهَا : مَا هِيَ-এর ব্যাখ্যায় مَا سِنُّهَا উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, مَا দ্বারা যদিও কোনো বস্তুর مَاهِيَّتْ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, কিন্তু এটা قَاعِدَهْ كُلِّيَّهْ নয়; বরং قَاعِدَهْ اَكْثَرِيَّهْ এখানে مَا দ্বারা গাভীর গুণাগুণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে। কেননা গাভীর حَقِيْقَتْ مَاهِيَّتْ বা স্বরূপ সম্পর্কে তারা পূর্ব থেকেই অবগত ছিল

কেউ কেউ বলেন, বনি ইসরাইল গাভীর গোশতের স্পর্শে মৃত ব্যক্তির জীবিত হওয়ার সংবাদ শুনে এত অধিক বিস্মিত হয়েছিল যে, মনে করেছিল এটি কোনো সাধারণ গাভী হবে না, তাই مَجْهُوْلُ الْوَصْفِ-কে مَجْهُوْلُ الْجِنْسِ-এর পর্যায়ে রেখে مَا শব্দটির দ্বারা প্রশ্ন করেছে।

قَوْلُهُ فَارِضٌ : অর্থাৎ এত বয়স্ক ও বৃদ্ধ নয়, যার প্রজনন ক্ষমতা রহিত হয়ে গিয়েছে। একেই فَارِضٌ বলা হয়। আবার এত কম বয়সেরও নয় যে, এখন পর্যন্ত কোনো বাচ্চা জন্ম দেয়নি। একেই بِكْرٌ বলা হয়। অবশ্য এ ব্যাখ্যা প্রতীয়মান করে যে, بَقَرَةٌ দ্বারা বলদ নয়, গাভীই উদ্দেশ্য। আর عَوَانٌ হলো [উপরিউক্ত] দুই বয়সের মধ্যবর্তী বয়সে উপনীত।

−[তাফসীরে মাজেদী খ. ১. পৃ. ১৩৩]

প্রশ্ন : فَارِضٌ শব্দটি بَقَرَةٌ-এর সিফত হয়েছে। সুতরাং শব্দটি তো فَارِضَةٌ হওয়া উচিত ছিল।

উত্তর : মুফাসসির (র.) فَارِضٌ-এর ব্যাখ্যায় مُسِنَّةٌ উল্লেখ করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটি مُسِنَّةٌ-এর নাম। بقرة-এর সিফত নয়। আর সিফত যখন اِسْم হয় তখন مُطَابَقَتْ জরুরি নয়। فَارِضٌ শব্দটি فَرَضٌ থেকে اِسْمِ فَاعِلْ-এর সীগাহ। অর্থ কর্তন করা। এখানে فَارِضٌ দ্বারা ঐ গাভী অথবা বলদকে বুঝানো হয়েছে, যা স্বীয় যৌবনের দিনগুলোকে অতিবাহিত করে বার্ধক্যে উপনীত হয়েছে। অথবা বয়োবৃদ্ধির কারণে তার দাঁত পড়ে গেছে।

অনুবাদ :

٦٩. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا ط قَالَ اِنَّهُ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا شَدِيْدُ الصُّفْرَةِ تَسُرُّ النَّاظِرِيْنَ ـ اِلَيْهَا بِحُسْنِهَا اَيْ تُعْجِبُهُمْ

৬৯. তারা বলল, তোমার প্রতিপালককে আমাদের জন্য স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে বল তার রং কি? সে বলল, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, সেটা হলুদবর্ণের গাভী তার রং উজ্জ্বল গাভী হলুদ বর্ণের, তার প্রতি দৃষ্টিদানকারীগণকে তার সৌন্দর্য আনন্দ দান করে তাদেরকে বিস্মিত করে।

٧٠. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ اَسَائِمَةٌ اَمْ عَامِلَةٌ اِنَّ الْبَقَرَةَ اَيْ جِنْسَهُ الْمَنْعُوتَ بِمَا ذُكِرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا لِكَثْرَتِهِ فَلَمْ نَهْتَدِ اِلَى الْمَقْصُوْدَةِ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ ـ اِلَيْهَا فِي الْحَدِيْثِ لَوْ لَمْ يَسْتَثْنُوْا لِمَا بُيِّنَتْ لَهُمْ اٰخِرَ الْاَبَدِ ـ

৭০. তারা বলল, আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে বল তা কি? অর্থাৎ তা কি সায়িমা বা মাঠে মুক্তভাবে বিচরণকারী না আমিলা বা কার্যে নিযুক্ত ধরনের গাভী। উল্লিখিত বিশেষণযুক্ত গাভীর জাত বহুসংখ্যক থাকায় গাভীর প্রদত্ত বিবরণ আমাদেরকে সন্দেহে উপনীত করেছে। সুতরাং অভিপ্রেত গাভীটি আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি না। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে নিশ্চয় আমরা তার দিশা পাব। হাদীসে উল্লেখ হয়েছে যে, তারা যদি ইনশাআল্লাহ না বলত, তবে কখনো আর তাদেরকে উক্ত গাভী সম্পর্কে পরিষ্কার কিছু বলে দেওয়া হতো না।

٧١. قَالَ اِنَّهُ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُوْلٌ غَيْرُ مُذَلَّلَةٍ بِالْعَمَلِ تُثِيْرُ الْاَرْضَ تُقَلِّبُهَا لِلزِّرَاعَةِ وَ وَالْجُمْلَةُ صِفَةُ ذَلُوْلٍ دَاخِلَةٌ فِي النَّفْيِ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ الْاَرْضَ الْمُهَيَّئَةَ لِلزَّرْعِ مُسَلَّمَةٌ مِنَ الْعُيُوْبِ وَاٰثَارِ الْعَمَلِ لَا شِيَةَ لَوْنَ فِيْهَا غَيْرَ لَوْنِهَا قَالُوا الْئٰنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ط نَطَقْتَ بِالْبَيَانِ التَّامِّ فَطَلَبُوْهَا فَوَجَدُوْهَا عِنْدَ الْفَتَى الْبَارِّ بِاُمِّهِ فَاشْتَرَوْهَا بِمِلْءِ مَسْكِهَا ذَهَبًا فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ ـ لِغَلَاءِ ثَمَنِهَا وَفِي الْحَدِيْثِ لَوْ ذَبَحُوْا اَيَّ بَقَرَةٍ كَانَتْ لَاَجْزَأَتْهُمْ وَلٰكِنْ شَدَّدُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ـ

৭১. সে বলল, তিনি বলেছেন, তা এমন এক গাভী যা কার্যে ব্যবহৃত নয় কাজ করিয়ে যাকে লাঞ্ছিত করা হয়নি। যা দ্বারা জমি কর্ষণ করা হয়নি চাষের উদ্দেশ্যে মাটি উলট-পালট করা হয়নি, এবং কৃষিক্ষেত্রে অর্থাৎ যে জমি কৃষির জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে তাতে পানি সেচ করা হয়নি। সকল দোষ ও কাজে ব্যবহারের চিহ্নাদি হতে নিখুঁত মিশ্রণমুক্ত অর্থাৎ তার রঙ অন্য কোনো রংয়ের মিশ্রণ হতে মুক্ত।

তারা বলল, এতক্ষণে তুমি সত্যসহ এসেছ অর্থাৎ পূর্ণ ও বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছ। অনন্তর তারা অনুসন্ধান করে মাতার প্রতি বাধ্য জনৈক যুবকের নিকট ঐ ধরনের একটি গাভী পেল ও তার চামড়া ভর্তি স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে তা ক্রয় করল। অতঃপর তারা তা জবাই করল যদিও অত্যধিক মূল্যের কারণে তারা তা করতে উদ্যত ছিল না। হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, প্রথমে যে কোনো একটি গাভী যদি তারা জবাই করত, তবে তা তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তারা নিজেদের উপর বিষয়টিকে [বার বার প্রশ্ন করে] কঠিন করে ফেলায় আল্লাহ তা'আলাও তাদের পক্ষে কঠিন করে দেন।

[قَوْلُهُ تُثِيْرُ الْاَرْضَ : এই বাক্যটি ذَلُوْلٌ-এর বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এটাও পূর্বোক্ত نَفْيٌ অর্থাৎ না অর্থব্যঞ্জক মর্মের অন্তর্ভুক্ত]

তাহকীক ও তারকীব

فَاقِعٌ : গাঢ় হলুদ। سَائِمَةٌ : মাঠে মুক্তভাবে বিচরণকারী। عَامِلَةٌ : কাজে নিযুক্ত ধরনের গাভী।

لَا ذَلُوْلٌ : اَيْ لَا تَذَلَّلَ لِلْحِرَاثَةِ অর্থাৎ যাকে চাষাবাদের কাজে ব্যবহার করা হয়নি।

لَوْ لَمْ يَسْتَثْنُوْا : اَيْ لَمْ يَقُوْلُوْا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ

قَوْلُهُ شِيَةَ : এ শব্দটি মূলত (ض) وَشْيٌ -এর মাসদার। অর্থ- এক বর্ণের প্রাণীর মাঝে অন্য বর্ণের দাগ থাকা। এখানে সরাসরি অর্থ হবে- চিহ্ন, দাগ। شِيَةَ শব্দটি মূলত وَشْيَةٌ ছিল। وَاوٌ-কে হযফ করে দেওয়া হয়েছে। যেমন- زِنَةٌ ও عِدَةٌ -এর মাঝে হযফকৃত وَاوٌ-এর পরিবর্তে শেষে هَا জুড়ে দেওয়া হয়েছে। বহুবচন شِيَاةٌ

مَسْكُهَا : مَسْكٌ অর্থ চামড়া। বহুবচন, مُسُوْكٌ উল্লেখ্য, সেসময় সাধারণভাবে অন্যান্য গরুর দাম ছিল ৩ দিরহাম। -[বায়জাবী]

قَوْلُهُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا : এর তারকীব সম্পর্কে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে।

১. فَاقِعٌ হলো صِبْغَةٌ صِفَتٌ এবং لَوْنُهَا তার ফায়েল।

২. فَاقِعٌ হলো خَبَرٌ مُقَدَّمٌ আর لَوْنُهَا হলো مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ

৩. فَاقِعٌ হলো صَفْرَاءُ -এর সিফত। আর لونها মুবতাদা এবং تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ খবর।

তৃতীয় সূরতে প্রশ্ন হয় যে, تَسُرُّ খবরটি مُؤَنَّثٌ হলো কিভাবে, অথচ মুবতাদা তথা لونها তো مذكر

উত্তর : যেহেতু مُضَافٌ اِلَيْهِ স্ত্রীলিঙ্গ, এ হিসেবে খবরকে مُؤَنَّثٌ আনা হয়েছে

আরেকটি জবাব হলো এখানে لَوْنٌ দ্বারা صُفْرَةٌ উদ্দেশ্য। এ হিসেবে مُؤَنَّثٌ আনা হয়েছে।

قَوْلُهُ تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ : এটি مَحَلًّا مَرْفُوْعٌ হয়েছে بَقَرَةٌ -এর সিফত হওয়ার কারণে। অথবা لَوْنُهَا এর খবর হওয়ার কারণে কেউ বলেন, এটি بَقَرَةٌ বা لَوْنُهَا -এর জমির থেকে حَالٌ হিসেবে মানসূব হয়েছে।

قَوْلُهُ بِحُسْنِهَا : بَاءٌ হরফটি سَبَبِيَّتٌ -এর অর্থে। اَيْ بِسَبَبِ حُسْنِهَا

قَوْلُهُ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ : পূর্বের আয়াতে গাভীর যে রঙ এবং গুণাবলি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তা অনেক গাভীর মাঝেই পাওয়া যায়। তাই তারা নির্দিষ্ট করণার্থে এবং অধিক সুস্পষ্টতার জন্য আবার প্রশ্ন করল।

قَوْلُهُ جِنْسَهُ : মুফাসসির (র.)-এর দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব প্রদান করলেন।

প্রশ্ন: এখানে تَشَابَهَ শব্দটি مُذَكَّرٌ -এর সীগাহ কেন ব্যবহৃত হলো, অথচ গাভী তো হলো مُؤَنَّثٌ

উত্তর : এখানে اَلْبَقَرَ দ্বারা جِنْسُ بَقَرٍ উদ্দেশ্য। এ হিসেবে تَشَابَهَ মুযাক্কার সীগাহ ব্যবহার করা হয়েছে।

اِلَى الْمَقْصُوْدَةِ : اَيِ الْمُرَادَةُ لِلّٰهِ اَيِ الَّتِيْ اَرَادَ اللّٰهُ تَعَالٰى ذَبْحَهَا وَاَمَرَ بِهِ

اٰخِرُ الْاَبَدِ : এখানে اٰخِرُ الْاَبَدِ দ্বারা উদ্দেশ্য اٰخِرُ حَيٰوةِ الدُّنْيَا মোবালাগা স্বরূপ ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা اَبَدٌ -এর শেষ নেই।

اِنْ شَاءَ اللّٰهُ : شَاءَ মুতাআদ্দী ফে'ল। তার মাফউল উহ্য রয়েছে। اَيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ هِدَايَتَنَا لِلْبَقَرَةِ অথবা جَزَاءٌ মাহযুফ আছে اَيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ هِدَايَتَنَا اهْتَدَيْنَا

প্রশ্ন : اِنْ شَاءَ اللّٰهُ -কে اِسْمُ اِنَّ এবং خَبَرُ اِنَّ -এর মাঝে কেন আনা হয়েছে?

উত্তর : رِعَايَتُ فَاصِلَةٍ বা আয়াতের শেষের শব্দের ছন্দ মিল অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য।

اَلْجُمْلَةُ صِفَةُ ذَلُوْلٍ : অর্থাৎ تُثِيْرُ الْاَرْضَ জুমলাটি ذَلُوْلٌ -এর সিফত। তাই مَحَلًّا مَرْفُوْعٌ হবে।

قَوْلُهُ دَاخِلَةٌ فِي النَّفْيِ : অর্থাৎ نَفِيْ যেমনিভাবে مَوْصُوْف -এর উপর আসে তেমনিভাবে صِفَتٌ -এর উপরও আসে। মুফাসসির (র.)-এ ইবারত দ্বারা বুঝাচ্ছেন যে, تُثِيْرُ الْاَرْضَ দ্বারা গাভী থেকে اِثَارَةُ الْاَرْضِ -এর نَفِيْ করা উদ্দেশ্য, ثَبُتْ করা উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهُ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ : وَاوٌ عَاطِفَةٌ আর لَا টি অতিরিক্ত। প্রথম لا -এর তাকীদের জন্য এসেছে আর لَا تَسْقِي الْحَرْثَ [illegible] ذَلُوْلٌ -এর দ্বিতীয় সিফত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ : পূর্বের আয়াতে গাভীর বয়স সম্পর্কে প্রশ্ন ছিল এখন এ আয়াতে তার বর্ণনা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হচ্ছে প্রথমটি ছিল مَعْقُولِي এর দ্বিতীয়টি مَحْسُوسِي অবস্থা

قَوْلُهُ الَيْهَا : اَمْرَنَ مِنْ اَجَلِهَا اَوْاِلَى الْحِكْمَةِ الَّتِى مِنْ اَجَلِهَا اَمْرَنَ : اَىْ اِلَى الْبَقَرَةِ الْمَقْصُوْدَةِ اَوْ اَىْ الْقَاتِلَ তন্মধ্যে হতে প্রথমটি সুস্পষ্ট এজন্য মুফাসসির (র.) তা গ্রহণ করেছেন।

قَوْلُهُ الْاَرْضَ الْمُهَيَّأَةُ لِلزَّرْعِ : মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করলেন যে, এখানে حَالٌ বলে مَحَلٌ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ক্ষেতি বা চাষাবাদ বলে চাষাবাদের স্থান তথা ক্ষেত উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ঐ জমিন যা চাষাবাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

اَلْمُهَيَّأَةُ : اَلتَّهَيُّأُ মাসদার থেকে ইসমে মাফউলের সীগাহ।

قَوْلُهُ غَيْرَ لَوْنِهَا : মুফাসসির (র.) এখানে একটি سُوَالٌ مُقَدَّرٌ-এর জবাব প্রদান করেছেন। প্রশ্নটি হলো যখন شِيَةٌ দ্বারা لَوْنٌ বা রঙ উদ্দেশ্য তখন لَاشِيَةَ দ্বারা সাধারনভাবে রঙের নফী করা হচ্ছে কেন? পূর্ব থেকেই তো গাভীর মাঝে রঙ প্রমাণিত করা হয়েছে। উত্তর: মুফাসসির (র.) জবাবের প্রতি এভাবে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে উদ্দেশ্য হলো তার নিজস্ব রঙ তথা গাঢ় হলুদ রঙ ছাড়া অন্য কোন রঙ থাকবে না।

এ ব্যাখ্যা এভাবে করা হয়েছে যে, شِيَةٌ-এর অর্থ হলো এক রঙ অপর রঙের সাথে মিশ্রিত করা। সুতরাং সাধারণভাবে রঙকে নাকচ করা হয়নি; বরং এমন রঙকে যা অন্যের সাথে মিশ্রিত হয়।

قَوْلُهُ غَيْرَ مُذَلَّلَةٍ بِالْعَمَلِ : এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে মুফাসসির (র.) একটি اِشْكَالٌ-এর জবাব দিয়েছেন। ইশকালটি হলো– لَا ذَلُوْلٌ হলো بَقَرَةٌ-এর সিফত। অথচ হরফ সিফতও হতে পারে না এবং সিফতের جُزْءٌ-ও হতে পারে না। সুতরাং لَا ذَلُوْلٌ শব্দটি সিফত হওয়া ঠিক নয়।

উত্তর : এখানে لَا بِمَعْنَى غَيْرِ আর غَيْر সিফত হতে পারে। সুতরাং কোনো আপত্তি থাকল না। এজন্যই মুসান্নিফ (র.) غَيْرُ مُذَلَّلَةٍ বাক্যটি ব্যবহার করেছেন।

اَلْئٰنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ : অর্থাৎ এখন বিশদ ও পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিলেন।

اَلْاٰنَ : مَنْصُوْبٌ بِجِئْتَ وَهُوَ ظَرْفُ زَمَانٍ يَقْتَضِى الْحَالَ وَهُوَ لَازِمٌ لِلظَّرْفِيَّةِ لَا يَتَصَرَّفُ غَالِبًا مُتَضَمِّنَةً مَعْنٰى حَرْفِ الْاِشَارَةِ كَانَّكَ قُلْتَ هٰذَا الْوَقْتُ وَاخْتَلَفَ فِى اَلْ الَّتِى فِيْهِ فَقِيْلَ لِلتَّعْرِيْفِ الْحُضُوْرِىِّ وَقِيْلَ زَائِدَةٌ لَازِمَةٌ (جُمَلٌ ١/٩٦)

نَطَقْتَ بِالْبَيَانِ التَّامِّ : এ ইবারতটুকু দ্বারা স্পষ্ট করে দেওয়া হলো যে, حَقٌّ দ্বারা بَاطِلٌ-এর বিপরীতার্থক حَقٌّ বুঝানো উদ্দেশ্য ছিল না এবং তারা এটাও বুঝাতে চায়নি যে, পূর্বে দুইবার যা বলা হয়েছিল তা বাতিল ছিল; বরং তাদের উদ্দেশ্য হলো, এখন আপনি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিলেন।

قَوْلُهُ فَوَجَدُوْهَا عِنْدَ الْفَتَى الْبَارِّ بِاُمِّهِ : অর্থাৎ তারা খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে সেই বিরল গুণে গুণান্বিত গাভীটি একজন এমন যুবকের কাছে পেল যে তার মায়ের সাথে সদাচারণকারী ও ভক্ত।

যুবকের পরিচয় ও ঘটনা : তার পিতা ছিলেন বনী ইসরাইলের একজন সৎ মানুষ। ইন্তেকালের সময় তার কাছে একটি গাভী ছিল। ইন্তেকালের পূর্বে স্ত্রীকে অসিয়ত করে গেলেন যে, আমার শিশু সন্তানটি বড় হলে এ গাভীটি তাকে দিবে। ছেলেটি তার পিতার ইন্তেকালের পর কাঠ সংগ্রহ করে বিক্রি করত এবং তা দিয়ে সংসারের ব্যয় নির্বাহ করত। কাঠ বিক্রির পয়সাগুলোকে যুবক তিনভাগে ভাগ করত। এক তৃতীয়াংশ নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করত। এক তৃতীয়াংশ তার মায়ের জন্য খরচ করত। বাকী এক তৃতীয়াংশ দান করত। অনুরূপভাবে ছেলেটি রাতকে তিনভাগে ভাগ করত। এক ভাগে ঘুমাত। একভাগে মায়ের খেদমত করত। একভাগে আল্লাহর ইবাদত করত। ছেলেটি বড় হওয়ার পর মা তাকে বললেন, তোমার বাবা তোমার জন্য মিরাস হিসেবে একটি গাভী রেখে গেছেন। সেটি অমুক মাঠে আল্লাহর তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হচ্ছে। তুমি সেখানে গিয়ে

কথা বলে আওয়াজ দাও যে, হে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকুব (আ.)-এর প্রভু! গাভী প্রদান করুন! সেই গাভীটির নিদর্শন হলো সেটি গাঢ় হলুদ বর্ণের খুবই চমৎকার গাভী। যুবক তার মায়ের নির্দেশে মাঠে গেল এবং দেখল গাভীটি সেখানে বিচরণ করছে। মায়ের বর্ণিত নিদর্শন ও গুণাবলি তার মাঝে প্রত্যক্ষ করল। মায়ের নির্দেশিত পদ্ধতিতে আহ্বান করার সাথে সাথে গাভীটি তার সামনে চলে আসে। যুবক যখন গাভীর ঘাড় ধরে টানতে লাগল, তখন গাভী বলল, হে মায়ের বাধ্য সন্তান তুমি আমার উপর আরোহণ কর! তোমার আরাম হবে। যুবক বলল, আমার জননীর নির্দেশ হলো তোমার গর্দান ধরে নিয়ে যাওয়া, আরোহণ করা নিষেধ আছে। গাভী বলল, হে যুবক তুমি যদি আমার কথামত আমার উপর সওয়ার হতে তাহলে কখনো আমি তোমার বাধ্য হতাম না। তোমার মায়ের আনুগত্যের কারণে তোমার এ মর্তবা হাসিল হয়েছে যে, পাহাড়কেও যদি নির্দেশ কর, তাহলে সেও তোমার সামনে চলতে শুরু করবে।

মোটকথা যুবক গাভীটি নিয়ে তার মায়ের কাছে পৌঁছল। মা বলল, হে ছেলে! তুমি তো খুব গরীব, দিনে কাঠ সংগ্রহ করে ফের রাতে দাঁড়িয়ে বন্দেগী করা তোমার জন্য কষ্টকর। তাই ভাল মনে করছি তুমি এ গাভীটি বিক্রি করে ফেল। যুবক সন্তান জিজ্ঞাসা করল, কত দামে বিক্রি করব? মা বললেন, তিন দিনার মূল্যে বিক্রি কর। এটি সে সময়ের বাজার দর ছিল। সেই সঙ্গে মা বলে ছিলেন বিক্রির পূর্ব মুহূর্তে ফের আমার কাছে জেনে নিবে। যুবক মায়ের নির্দেশ মত গাভীটি বিক্রি করার জন্য বাজারে নিয়ে গেল। এদিকে আল্লাহ তা'আলা যুবকের মাতৃভক্তি পরীক্ষা করার জন্য একটি ফেরেশতা প্রেরণ করলেন। ফেরেশতা এসে গাভীর দাম জিজ্ঞেস করল। যুবক বলল, গাভীর মূল্য তিন দিনার, তবে শর্ত হলো আমার মাকে জিজ্ঞেস করে নিব। ফেরেশতা বলল, আমার কাছ থেকে ছয় দিনার গ্রহণ কর এবং গাভীটি আমাকে দিয়ে দাও। জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন নেই। যুবক বলল, তুমি যদি গাভীর সমপরিমাণ স্বর্ণও আমাকে দান কর তবুও আমি আমার মায়ের অনুমতি ছাড়া বিক্রি করব না। একথা বলে মায়ের কাছে গমন করল এবং অবস্থা বর্ণনা করল। মা বললেন, সেতো ক্রেতা নয়; বরং ফেরেশতা। সে তোমার পরীক্ষা নিতে এসেছে। তাকে বরং জিজ্ঞাসা কর যে, আমরা এ গাভীটি বিক্রি করব কিনা?

যুবক তাকে বিক্রি করার ব্যাপারে পরামর্শ চাইলে ফেরেশতা বলেন, এখনই তা বিক্রি কর না। হযরত মূসা (আ.)-এর কওম তোমার কাছে একটি নিহত ব্যক্তির ব্যাপারে এটি খরিদ করবে। তুমি তাদের কাছে গাভীর চামড়া পরিপূর্ণ স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করবে। সুতরাং যাও, গাভী নিয়ে বাড়িতে ফিরে এসো।

ঐ দিকে বনী ইসরাইলের উপর এমন একটি গাভী জবাই করার নির্দেশ হলো। খুঁজতে খুঁজতে এসে যুবকের কাছ থেকে চামড়া ভর্তি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে খরিদ করে এবং জবাই করে। -[হাশিয়ায়ে ছাবী খ.১, পৃ. ৫১]

وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ : অর্থাৎ তাদের এ খুঁটিনাটি প্রশ্নধারা দৃষ্টে আজ্ঞা পালন সুদূর পরাহতই বুঝা যাচ্ছিল

وَفِى الصَّاوِىْ : وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ لِتَطْوِيْلِهِمْ وَكَثْرَةِ مَرَاجِعَاتِهِمْ وَلِخَوْفِ الْفَضِيْحَةِ فِىْ ظُهُوْرِ الْقَاتِلِ اَوْ لِغَلَاءِ ثَمَنِهَا .

আয়াতের মাঝে বিরোধ ও নিরসন : প্রথমে বলা হয়েছে, فَذَبَحُوْهَا অর্থাৎ বনী ইসরাঈল গাভী জবাই করেছে। পরে বলা হয়েছে وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ অর্থাৎ তারা গাভী জবাই করা তো দূরের কথা, জবাইয়ের কাছেও পৌঁছেনি। আয়াতের প্রথম ও শেষাংশে বাহ্যত বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। এর সমাধান কি?

সমাধান-১ : نَفْىٌ وَاِثْبَاتٌ- এর বিষয়টি اِخْتِلَافُ اَوْقَاتٌ বা সময়ের ভিন্নতা হিসেবে হয়েছে অর্থাৎ প্রথমে তো জবাই করার ধারে কাছেও ছিল না; বরং নানাবিধ হুজ্জতবাজি ও বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত ছিল। কিন্তু যখন আল্লাহ তা'আলা সবকিছু পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন এবং তাদের দলিল প্রমাণ শেষ হয়ে গিয়েছে এবং খোঁজ-তালাশের পর বর্ণিত গাভীরও সন্ধান পেয়ে গেছে তখন অগত্যা জবাই করতেই হয়েছে। اَىْ فَذَبَحُوْهَا فِى الزَّمَانِ الثَّانِىْ وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ فِى الزَّمَانِ الْاَوَّلِ .
সুতরাং সময়ের ভিন্নতার কারণে আর বিরোধ থাকলো না।

সমাধান-২ : نَفْىٌ وَاِثْبَاتٌ- এর বিষয়টি اِخْتِلَافُ اِعْتِبَارَيْنِ হিসেবে বিবেচ্য। অর্থাৎ এক দৃষ্টিতে তারা জবাই করার উপক্রম ছিল না। অপর দৃষ্টিতে জবাই করেছে। এখন কথা হলো, কোন দৃষ্টিকোণে তারা জবাই করতে চায়নি। এর কারণ সম্পর্কে মুফাসসিরীনে কেরামের একাধিক অভিমত রয়েছে। যথা-

১. হয়তো তারা লজ্জিত হওয়ার আশঙ্কায় জবাই করতে চায়নি। এতে প্রকৃত ঘাতকের সন্ধান মিলে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল।
২. অধিক মূল্যের কারণে। কেননা তার মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিল গাভীর চামড়া বরাবর স্বর্ণ; কিন্তু আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালন করার দৃষ্টিতে জবাই করতে হয়েছে। কেননা গাভীর দাম বেশি বা কম যাই হোক না কেন কিংবা লজ্জিত হতে হোক বা না হোক আল্লাহ তা'আলার হুকুম তো মানতেই হবে। সুতরাং দৃষ্টিকোণ ভিন্ন হওয়ার কারণে আর কোনো বিরোধ থাকলো না।

অনুবাদ :

٧٢. اِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهِ اِدْغَامُ التَّاءِ فِى الْاَصْلِ فِى الدَّالِ اَيْ تَخَاصَمْتُمْ وَتَدَافَعْتُمْ فِيْهَا وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مُظْهِرٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ مِنْ اَمْرِهَا وَهٰذَا اِعْتِرَاضٌ وَهُوَ اَوَّلُ الْقِصَّةِ ـ

৭২. আর স্মরণ কর যখন তোমরা জনৈক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে এবং একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করছিলে। অর্থাৎ তোমরা এ বিষয়ে পরস্পরে দোষারোপ ও বিবাদ করছিলে এই বিষয়ে তোমরা যা গোপন রাখছিলে আল্লাহ তা'আলা তা উদঘাটন প্রকাশ করেছেন। এটা বক্ষমাণ ঘটনাটির শুরুর কথা। اِدّٰرَءْتُمْ শব্দটি মূলত تَدَارَءْتُمْ ছিল اَلِفْ পরবর্তী অক্ষর ت -কে دَالْ -এর মধ্যে اِدْغَامْ বা সন্ধিভূত করে দেওয়া হয়েছে। وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ এই বাক্যটি مُتَعَرِّضَةٌ মু'তারিজা বা বিচ্ছিন্ন বাক্যরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

٧٣. فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ اَيِ الْقَتِيْلَ بِبَعْضِهَا فَضُرِبَ بِلِسَانِهَا اَوْ عَجْبِ ذَنَبِهَا فَحَيَّ وَقَالَ قَتَلَنِىْ فُلَانٌ وَفُلَانٌ لِاَ بْنَىْ عَمِّهِ وَمَاتَ فَحُرِمَا الْمِيْرَاثَ وَقُتِلَا قَالَ تَعَالٰى كَذٰلِكَ الْاِحْيَاءِ يُحْيِي اللّٰهُ الْمَوْتٰى وَيُرِيْكُمْ اٰيَاتِهِ دَلَائِلَ قُدْرَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ تَتَدَبَّرُوْنَ فَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ الْقَادِرَ عَلٰى اِحْيَاءِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ قَادِرٌ عَلٰى اِحْيَاءِ نُفُوْسٍ كَثِيْرَةٍ فَتُؤْمِنُوْنَ ـ

৭৩. অনন্তর আমি বললাম, এর কোনো অংশ দ্বারা তাকে নিহত ব্যক্তিটিকে আঘাত কর। অতঃপর তারা ঐ গাভীটির জিহ্বা বর্ণনান্তরে লেজের গোড়ার ভাগ দ্বারা মৃত ব্যক্তিকে আঘাত করল। এতে সে পুনরুজ্জীবিত হলো এবং বলল, অমুক অমুক জন আমাকে হত্যা করেছে। তারা দুইজন ছিল তার চাচাত ভাই। অতঃপর পুনরায় সে মারা গেল। ফলে তারা [হত্যাকারীরা] মিরাস থেকে বঞ্চিত হলো এবং উভয়কেই হত্যা করা হলো। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, এভাবে পুনর্জীবনদানের মতো আল্লাহ তা'আলা মৃতদেরকে জীবিত করেন এবং তার নিদর্শন অর্থাৎ তার কুদরতের প্রমাণাদি তোমাদেরকে প্রদর্শন করেন যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার অর্থাৎ চিন্তা করতে পার এবং জানতে পার যে, যিনি একটি প্রাণের পুনরুজ্জীবনদানের ক্ষমতা রাখেন বহু প্রাণের পুনরুজ্জীবনদানেও তিনি নিশ্চয় সক্ষম। এতে তোমরা তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ فَادّٰرَأْتُمْ : -এর মূলধাতু دَرْءٌ -এর মাঝে ঝগড়া করার অর্থ যেমন রয়েছে, তদ্রূপ প্রতিহত করা ও প্রতিরোধ করার অর্থও রয়েছে। পবিত্র কুরআনে একাধিক স্থানে দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যথা– وَيَدْرَءُ عَنْهَا الْعَذَابَ [সূরা নূর : ৮] وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ [সূরা কাসাস : ৫৪]

اِدّٰرَأْتُمْ : এখানে [اِفَّاعَلْتُمْ ওজনে] পরস্পর ঝগড়া কলহ ও একে অন্যকে দোষারূপ করার অর্থে।

فِيْهَا : اَيْ فِىْ وَاقِعَةِ قَتْلِ النَّفْسِ ـ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا : যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে গাভী জবাই করার নির্দেশ ছিল। এখন এ আয়াতে গাভী জবাইয়ের নির্দেশ কেন প্রদান করা হয়েছিল তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও পূর্বে দীনি ব্যাপারে ইহুদীদের **হঠকারিতার বিবরণ** ছিল। অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম মানার ক্ষেত্রে তা কিরূপ বাহানা করত। এ আয়াতে দুনিয়াবী ব্যাপার তাদের **আচরণ কিরূপ** ছিল তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে যে, পার্থিব সম্পদের লোভ তাদের মাঝে এ পরিমাণ প্রবল ছিল যে, সম্পদের লোভে **একটি সম্মানিত** প্রাণ হত্যা করতে দ্বিধা করেনি। তারপর আবার এ হত্যার দায়ভার অন্যের ঘরে চাপানোর চেষ্টা করেছে।

وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا-এর মাঝে اذ -এর আমেল উহ্য আছে। اَىْ اُذْكُرُوْا اِذْ قَتَلْتُمْ আর قَتَلْتُمْ -এর مُخَاطِبْ বা সম্বোধিত গোষ্ঠী হলো নবীযুগের ইহুদিগুণ। কিন্তু উদ্দেশ্য তাদের পূর্বপুরুষগণ।

قَوْلُهُ قَتَلْتُمْ نَفْسًا : এখানে ইশকাল হয় যে, قَاتِلْ বা হত্যাকারী তো একজনই ছিল। তারপরও **এখানে বহুবচনের** সীগা ব্যবহার করা হলো কেন? তার উত্তর হলো যেহেতু নির্দিষ্টভাবে হত্যাকারী জানা যায়নি, সেহেতু পূর্ণাজতির **প্রতিই তার** নিসবত করা হয়েছে।

কেউ বলেন, হত্যাকারী দু'জন ছিল। সে হিসেবে বহুবচন আনা হয়েছে। এখানে جَمْع فَوْقَ الْوَاحِدْ হয়েছে।

আবার কেউ বলেন– হত্যাকারী অনেক লোকই ছিল। কেননা মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ সকলে একমত **হয়ে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে** ছিল। তাই বহুবচন দ্বারা সকেলর প্রতি নিসবত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ : তোমাদের পূর্বপুরুষগণ আমীলকে হত্যা করেছিল। তারপর **তারা একে অন্যকে** দোষারোপ করছিল। তোমরা যা গোপন রাখছিলে [অর্থাৎ নিজেদের ঈমানী দুর্বলতা অথবা হত্যাকারীর **পরিচয়] আল্লাহ তা'আলা** তা প্রকাশ করে দেন।

قَوْلُهُ وَهٰذَا اعْتِرَاضٌ : অর্থাৎ وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ হলো مَعْطُوْف এবং مَعْطُوْف عَلَيْهِ -**এর মাঝখানে** একটি جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ সেই সাথে এটি একটি سَوَالْ مُقَدَّرْ -এর জবাব ৩১ আয়াতের শব্দ দ্বারা **বুঝা যায় যখন** তারা তর্ক-বিতর্ক করছিল তখন আল্লাহ তা'আলা হত্যার বিষয়টি প্রকাশকারী। অথচ প্রকাশ করার ঘটনা ঘটেছে **পরে।**

জবাব : ইশকাল তখন হতো, যদি وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ জুমলায়ে হাল হতো। কিন্তু এটি جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ তাই কোন **ইশকাল নেই।**

قَوْلُهُ هُوَ اَوَّلُ الْقِصَّةِ : অর্থাৎ اِدَّارَأْتُمْ থেকে ঘটনার শুরু অংশের বর্ণনা। পূর্বে **وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً** -এর মাঝে ঘটনার পরের অংশের বিবরণ ছিল। তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে শেষ অংশটিকে **পূর্বে উল্লেখ করা** হয়েছে। এ আগপিছের কারণ হলো, ইহুদিদের মন্দ কর্মসমূহ একত্রে বর্ণনা করা।

قَوْلُهُ فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ الخ : যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে প্রাণ হত্যা এবং ঘাতকের নির্ণয় সম্পর্কে **ঝগড়া ও** তর্ক-বিতর্কের আলোচনা ছিল। এখন এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঘাতকের নির্ণয়ের পদ্ধতি বলে দিচ্ছেন।

قَوْلُهُ الْقَتِيْلُ : এটি اِضْرِبُوْهُ -এর ، জমিরের مَرْجِعْ মুফাসসির (র.)-এর দ্বারা একটি سَوَالْ مُقَدَّرْ -এর **জবাব** দিচ্ছেন।

প্রশ্ন : পূর্বে نَفْس স্ত্রীলিঙ্গে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তারপর اِضْرِبُوْهُ -এর মাঝে مُذَكَّرْ জমির কিভাবে **আনা হলো?**

উত্তর : نَفْسْ দ্বারা যেহেতু قَتِيْل তথা নিহত ব্যক্তি উদ্দেশ্য সেহেতু قَتِيْل তথা নিহত ব্যক্তি **উদ্দেশ্য** সেহেতু قَتِيْل এর বিচারে এখানে مُذَكَّرْ জমির আনা হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, تَذْكِيْرُ الضَّمِيْرِ لِتَذْكِيْرِ الْمَعْنٰى অর্থাৎ কায়দা আছে যখন জমির مُذَكَّرْ **হয় এবং** مَعْنٰى বা অর্থ مُؤَنَّثْ হয় অথবা তার উল্টো হয়, তাহলে জমিরকে مُذَكَّرْ বা مُؤَنَّثْ আনা উভয় সূরত জায়েজ।

قَوْلُهُ فَضَرَبَ بِلِسَانِهَا : অর্থাৎ নিহত ব্যক্তিকে গাভীর কোন অংশ দ্বারা আঘাত করা হয়েছিল? এ ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। মুফাসসির (র.) তন্মধ্যে হতে দুটি অভিমত উল্লেখ করেছেন। যথা–

১. গাভীর জিহ্বা দ্বারা আঘাত করা হয়েছিল।

২. কেউ কেউ বলেন, লেজের গোড়া দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল। কেউ বেলছেন, যে কোনো একটি হাড্ডি দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল।

قَوْلُهُ فَحَيَّ : حَيَّ - بَابْ سَمِعَ থেকে অর্থাৎ তারপর সে জীবিত হলো। বর্ণিত আছে, যখন সে জীবিত হয়েছিল, তখন তার শিরা থেকে রক্ত বেয়ে পড়ছিল। তারপর সে তার দুই চাচাত ভাই সম্পর্কে বলেছিল– قَتَلَنِىْ فُلَانٌ وَفُلَانٌ আমাকে অমুক এবং অমুক হত্যা করেছে। একথা বলার পর সে সেখানেই ঢলে পড়ে।

জবাইকৃত প্রাণীর অংশ দিয়ে আঘাত করার তাৎপর্য : এখানে প্রশ্ন হতে পারে মৃত্যু প্রাণীর অংশ দিয়ে আঘাত করার হুকুম দেওয়া হলো কেন?

উত্তর: যদি জীবিত প্রাণীর অংশ দিয়ে আঘাত করার হুকুম দেওয়া হতো, তাহলে হয়তো এ সংশয় হতে পারত যে, সম্ভত জীবিত প্রাণীর রূহ মৃতের মাঝে প্রবেশ করার কারণে সে জীবিত হয়েছে। তখন এটা তেমন বিস্ময় প্রকাশ করত না।

قَوْلُهُ وَقُتِلَا : এখানে ইশকাল হয় যে, শুধু নিহত ব্যক্তির বক্তব্যকে কিসাস প্রমাণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট মনে করা হলো কেন? অথচ শরয়ী সাক্ষ্য ছাড়া কারো উপর قَتْل প্রমাণিত হয় না এবং কিসাসও আসে না।

উত্তর : হযরত মূসা (আ.) ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে, নিহত ব্যক্তি সঠিকই বলবে। এজন্য এ স্থানে শুধু নিহতের বর্ণনাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَتُؤْمِنُوْنَ : অর্থাৎ বিবেকের দাবিতো এই যে, এমন বিস্ময়কর ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পর ঈমান নসীব হবে। সুতরাং বুঝা গেল, এরপরও যারা ঈমান আনল না, তাদের বিবেক নেই।

মুফাসসির (র.) এখানে এদিকেও ইঙ্গিত দিলেন যে, كَذٰلِكَ এর সম্বোধন মক্কার মুশরিকদেরকে করা হয়েছে। যারা পুনরুত্থান অস্বীকার করত। এখানে আহলে কিতারা উদ্দেশ্য নয়। কেননা তারা পরকাল ও পুনরুত্থান বিশ্বাস করত। এ সূরতে كَذٰلِكَ الخ জুমলায়ে মুতারিজা হবে।

মৃত্যুর পর পুনর্জীবন : জীবন এবং আত্মার বাস্তবতা একটি সূক্ষ্ম বাল্বের হৃৎপিন্ড। যা প্লাগ বা সুইজ -এর মাধ্যমে সংরক্ষিত থাকে। সেটা যদি ফিউজ [অকেজো] হয়ে যায়, তখন ইঞ্জিনিয়ার [আল্লাহ] পুনরায় কানেকশান ঠিক করে দিতে পারেন। উক্ত ঘটনার মধ্যে সেটার উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। আর এটাই মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের বাস্তবতা। এ প্রমাণকে অসম্ভব মনে করার কিছুই নেই।

٧٤. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ أَيُّهَا الْيَهُودُ صَلُبَتْ عَنْ قَبُولِ الْحَقِّ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ الْمَذْكُورِ مِنْ إِحْيَاءِ الْقَتِيلِ وَمَا قَبْلَهُ مِنَ الْآيَاتِ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ فِي الْقَسْوَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ط مِنْهَا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ط وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فِيهِ إِدْغَامُ التَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الشِّينِ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ط وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ يَنْزِلُ مِنْ عُلُوٍّ إِلَى سِفْلٍ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَقُلُوبُكُمْ لَا تَتَأَثَّرُ وَلَا تَلِينُ وَلَا تَخْشَعُ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَإِنَّمَا يُؤَخِّرُكُمْ لِوَقْتِكُمْ وَفِي قِرَاءَةٍ بِالتَّحْتَانِيَّةِ وَفِيهِ الْتِفَاتٌ عَنِ الْخِطَابِ.

অনুবাদ :

৭৪. হে ইহুদিগণ! এরপর নিহত ব্যক্তিকে পুনঃজীবন দানের উল্লিখিত ঘটনা এবং তৎপূর্ববর্তী নিদর্শনসমূহ প্রদর্শনের পরও তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেল। সত্য গ্রহণ করা সম্পর্কে তা শক্ত হয়ে পড়ল। কাঠিন্য তা পাথর কিংবা তদপেক্ষা কঠিনতর। এগুলোর মধ্যেও কতক পাথর এমন যে তা হতে নদীনালা প্রবাহিত হয় এবং কতক এরূপ যে বিদীর্ণ হয়ে যায় ও পরে তা হতে পানি নির্গত হয়। আবার কতক এমন যা আল্লাহ তা'আলার ভয়ে ধ্বসে পড়ে উপর হতে নিচে গড়িয়ে পড়ে। আর তোমাদের হৃদয় এমন যে, এতে প্রভাবান্বিত হয় না, কোমল হয় না, বিনয়াবনত হয় না। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে অনবহিত নন। তোমাদের জন্য নির্ধারিত সময়ের অপেক্ষায় তিনি তোমাদের পাকড়াও করা পিছিয়ে রেখেছেন।

يَشَّقَّقُ শব্দটির আসল রূপ হলো يَتَشَقَّقُ -এর ت অক্ষরটিকে তৎপরবর্তী অক্ষর ش -এ إِدْغَامْ বা সন্ধিভূত করে দেওয়া হয়েছে।

تَعْلَمُونَ শব্দটি অপর এক কিরাতে يَعْلَمُونَ [নাম পুরুষ, বহুবচন] রূপে পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় خِطَابْ অর্থাৎ দ্বিতীয় পুরুষবাচক রূপ হতে নাম পুরুষবাচক রূপের দিকে এইস্থানে اِلْتِفَاتْ বা রূপান্তর সংঘটিত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

ثُمَّ এ স্থানে দীর্ঘকালের দূরত্বের জন্য নয়; বরং বর্তমানের দূরত্বের জন্য অর্থাৎ রূপকার্থে দূরে রাখতে চাওয়ার জন্য। مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ -ও ওটারই সাহায্যের জন্য। مِنْهَا অর্থাৎ قَسْوَةً - مَنْصُوْب তমঈয হিসেবে এবং مُفَضَّلْ عَلَيْهِ মাহযূফ। اَقْسٰى ও ইসমে تَفْضِيْل কিন্তু এ স্থানে اَشَدُّ قَسْوَةً -এর মধ্যে অধিক مُبَالَغَةْ রয়েছে মূল ও আকৃতি উভয় হিসেবে। لَمَّا -এর মধ্যে مَا মাউসূলা اَلَّذِىْ অর্থে نَصَبْ -এর স্থানে اِنْ হওয়ার কারণে এবং لَامْ তাকিদের জন্য। اَوْ সন্দেহের জন্য আসে। আল্লাহর কালাম তো সন্দেহের উদ্দীপক নয়।

উত্তর : এর কয়েকটি উত্তর রয়েছে– ১. وَاوْ -এর অর্থে, অথবা বণ্টন ও বিভক্তির জন্য। কিংবা بَلْ -এর অর্থে।

هِيَ মুতা'আল্লিক্ব। مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ ফায়েল। قُلُوْبُكُمْ ফেয়েল قَسَتْ -কে দূরে রাখতে চাওয়ার জন্য। ثُمَّ - قَسَاوَتْ মুবতাদা كَالْحِجَارَةِ মুতা'আল্লিক্ব হয়ে খবর, অথবা এর মধ্যে كَافْ তাম্ছীলিয়্যাহ, পুনরায় مُتَعَلِّقْ করার প্রয়োজন নেই اَشَدُّ মা'তূফ হয়েছে كَافْ -এর উপর اَيْ اَوْ هِيَ اَشَدُّ قَسْوَةً তমঈয, لَامْ তাকিদ, مَا মাউসূলা। ইসমে اَنْ -يَتَفَجَّرُ জুমলা-সেলাহ্। مِنَ الْحِجَارَةِ এটি اِنْ -এর খবর। مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ মানসূবুল মহল يَهْبِطُ থেকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্বে বনী ইসরাইলের মন্দ স্বভাব সম্পর্কে বিবরণ দেওয়া হয়েছে যে, তারা সর্বদা আল্লাহর বিধিবিধানে হীলা-বাহানা ও উদাসীনতা প্রদর্শন করত। এখন এ আয়াতে তার কারণ ও উৎস সম্পর্কে ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে। তাহলো তাদের قَسَاوَتْ قَلْبٌ বা অন্তরের রূঢ়তা। সেই সাথে এখানে তাদের উক্ত قَسَاوَتْ قَلْبٌ সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে যে, তোমরা দিন-রাত্র আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও নবীর মুজিযা প্রত্যক্ষ করছ; কিন্তু তারপরও অন্তর নরম হয় না। এটা কেমন কথা!

قَوْلُهُ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ : অর্থাৎ এসব কিছুর পরও তথা নিহত ব্যক্তির দ্বিতীয়বার জীবিত হওয়ার পর এবং আল্লাহ তা'আলার কুদরতের এরূপ নিদর্শন দেওয়ার পরও তোমাদের মন বিগলিত হলো না এবং সত্য গ্রহণ করার প্রতি বিন্দুমাত্র আকৃষ্ট হলো না। উল্টো তোমাদের অন্তরসমূহ পাথরের মতো কঠোর; বরং পাথরের চেয়েও কঠোর হয়ে গেল। কেননা পাথর এত শক্ত হওয়ার পরও কতক পাথর থেকে নদী-নালা প্রবাহিত হয়, কতক পাথর ফেটে ঝর্ণা নির্গত হয়, আবার কতক পাথর আল্লাহ তা'আলার ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে ধসে পড়ে। কিন্তু তোমাদের অন্তর এ তিন রকম পাথর অপেক্ষাও কঠিন।

প্রশ্ন : ثُمَّ অব্যয়টি تَرَاخِيْ زَمَانْ বা কালের দূরত্ব বুঝায়। যার দ্বারা বুঝা যায়, তাদের قَسَاوَتْ قَلْبٌ একটি সময় অতিবাহিত হওয়ার পর হয়েছে। অথচ ইহুদিদের قَسَاوَتْ قَلْبِيْ সে সময়ই বিদ্যমান ছিল, পরবর্তীতে সৃষ্টি হয়নি। সুতরাং মনে হচ্ছে ثُمَّ -এর ব্যবহার তার مَحَلْ বা উপযুক্ত স্থানে হয়নি।

উত্তর : এখানে ثُمَّ -এর ব্যবহার مَجَازْ হিসেবে اِسْتِبْعَادٌ -এর অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ এত সব দলিল প্রমাণ প্রত্যক্ষ করার পরও একজন আকেল বালেগের হৃদয়ে কাঠিন্য থাকা অসম্ভব। কেননা তার প্রত্যেকটি নিদর্শন হৃদয় বিগলিত হওয়ার পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাপত্র ছিল। বিশেষভাবে নিহতের জীবিত হওয়া ও ঘাতকের নাম বলা এক বিস্ময়কর নিদর্শন।

قَوْلُهُ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ : [তারপরও] এটি اِسْتِبْعَادْ -এর অধিক তাকিদ বুঝানোর জন্য। কেননা ثُمَّ দ্বারা যা বুঝা যাচ্ছে مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ দ্বারাও তাই বুঝাচ্ছে। অর্থাৎ তাদের হৃদয়ের পাষাণত্ব আরো প্রকট হওয়াকে দৃঢ়তার সাথে প্রকাশ করছে।

قَوْلُهُ الْمَذْكُوْرُ مِنْ اِحْيَاءِ الْقَتِيْلِ : মুফাসসির (র.) এখানে اَلْمَذْكُوْرُ শব্দটি উল্লেখ করে একটি سُوَالْ مُقَدَّرْ -এর জবাব দিয়েছেন। প্রশ্ন হলো, পূর্বে তো অনেক নিদর্শনের উল্লেখ করা হয়েছে। সেসবের প্রতি ذٰلِكَ একবচন শব্দ কিভাবে ব্যবহৃত হলো? উত্তর. মুফাসসির (র.) اَلْمَذْكُوْرُ শব্দ উল্লেখ করে তার জবাবের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, اَلْمَذْكُوْرُ -এর তাবীল দ্বারা مُتَعَدَّدْ বা একাধিক বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সেই সাথে মুফাসসির (র.) اَلْمَذْكُوْرُ শব্দে ইঙ্গিত করেছেন যে, ثُمَّ -এর عَطْفٌ পূর্বের সকল ঘটনার مَضْمُوْنْ বা বিষয়বস্তুর প্রতি হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمَا قَبْلَهُ مِنَ الْاٰيَاتِ : অর্থাৎ ঐ সকল নিদর্শন ও মুজিজা যেগুলোর আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। যেমন সমুদ্রের পানি দুভাগে বিভক্ত হওয়া এবং ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়া ইত্যাদি।

قَوْلُهُ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ : এখানে ইশকাল হয় যে, هِيَ একবচনের জমির। আর اَلْحِجَارَةُ হলো حِجْر -এর বহুবচন। مُفْرَدٌ -কে جَمْعٌ-এর সাথে কিভাবে তাশবীহ দেওয়া হলো?

উত্তর. هِيَ -এর مَرْجِعٌ হলো قُلُوْبٌ ; যা বহুবচন। এ হিসেবে حِجَارَةٌ বহুবচন আনা হয়েছে।

পাথরের সাথে উপমা দেওয়ার তাৎপর্য : পাথরের সাথে উপমা দেওয়া হলো কেন, লোহার সাথে দেওয়া হলো না কেন? অথচ লোহা পাথরের চেয়ে শক্ত ও কঠিন।

উত্তর : লোহা কখনো নরম হয়ে যায়, গলে যায়, যেমন পবিত্র কুরআনেই এসেছে- وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ অর্থাৎ আমি তার জন্য লোহাকে নরম করে দিলাম। সেজন্য পাথরের সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ فِى الْقَسْوَةِ : এটি হলো وَجْه شِبْه আর قَسَاوَتٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো عَدَمْ تَاَثُّرْ বা প্রতিক্রিয়া না হওয়া। অর্থাৎ তাদের অন্তর প্রভাব তথা নসিহত গ্রহণ না করার ক্ষেত্রে পাথরের মত।

قَوْلُهُ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً : এখানে اَوْ অব্যয়টি অথবা কিংবা অর্থে নয়, بَلْ বরং অর্থে -[তাফসীরে কাবীর]। কারো কারো মতে اَوْ এখানে বৈধতাবোধক। অর্থাৎ তাদের পাথর মনে করা কিংবা তার চেয়েও কঠিন মনে করা উভয়টিই বৈধ ও সঠিক। তবে اَوْ অব্যয়টিকে تَوْزِيْع প্রকরণবোধক সাব্যস্ত করা সর্বোত্তম। তখন অর্থ হবে তাদের হৃদয়গুলো দুই প্রকারের। ক. কিছু তো পাথরের ন্যায় কঠিন এবং খ. কিছু তার চেয়েও কঠিন। -[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ১৩৮]

قَوْلُهُ وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ الخ :

পাথরের শ্রেণীবিন্যাস ও ক্রিয়া : আয়াতে পাথরের তিনটি ক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে ঃ ১. পাথর থেকে বেশি পানি প্রসরণ ২. কম পানি নিঃসরণ। এ দুটি প্রভাব সবারই জানা। ৩. আল্লাহ তা'আলার ভয়ে নীচে গড়িয়ে পড়া। এ তৃতীয় ক্রিয়াটি কারও কারও অজানা থাকতে পারে। কারণ পাথরের কোনোরূপ জ্ঞান ও অনুভূতি নেই। কিন্তু জানা উচিত যে, ভয় করার জন্যে জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। জন্তু-জানোয়ারের জ্ঞান নেই। কিন্তু আমরা তাদের মধ্যে ভয়-ভীতি প্রত্যক্ষ করি। তবে চেতনার প্রয়োজন অবশ্য আছে। জড় পদার্থের মধ্যে এতটুকু চেতনাও নেই বলে কেউ প্রমাণ দিতে পারবে না। কারণ চেতনা প্রাণের উপর নির্ভরশীল। খুব সম্ভব জড় পদার্থের মধ্যে এমন সূক্ষ্ম প্রাণ আছে, যা আমরা অনুভব করতে পারি না। উদাহরণত বহু পণ্ডিত মস্তিষ্কের চেতনাশক্তি অনুভব করতে পারেন না। তারা একমাত্র যুক্তির ভিত্তিতেই এর প্রবক্তা। সুতরাং ধারণাপ্রসূত প্রমাণাদির চেয়ে কুরআনী আয়াতের যৌক্তিকতা কোনো অংশেই কম নয়।

এছাড়া আমরা এরূপ দাবিও করি না যে, পাথর সব সময় ভয়ের দরুনই নিচে গড়িয়ে পড়ে। কারণ আল্লাহ তা'আলা কতক পাথর বলেছেন। সুতরাং নিচে গড়িয়ে পড়ার জন্য আরও বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। তন্মধ্যে একটি হলো আল্লাহ তা'আলার ভয়। -[মাআরিফুল কুরআন : মুফতি শফী (র.)]

ইহুদিদের অন্তর পাথরের চেয়েও বেশি কঠিন : এখানে তিন রকমের পাথরের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সাবলীল ভঙ্গিতে এদের শ্রেণিবিন্যাস ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে। কতক পাথরের প্রভাবান্বিত হওয়ার ক্ষমতা এত প্রবল যে, তা থেকে নদী-নালা প্রবাহিত হয়ে যায় এবং এর দ্বারা সৃষ্টজীবের উপকার সাধিত হয়। কিন্তু ইহুদিদের অন্তর এমন নয় যে, সৃষ্টিজীবের দুঃখ-দুর্দশায় অশ্রুসজল হবে। কতক পাথরের মধ্যে প্রভাবান্বিত হওয়ার ক্ষমতা কম। ফলে সেগুলো দ্বারা উপকারও কম হয়। এ ধরনের পাথর প্রথম ধরনের পাথরের তুলনায় কম নরম হয়। কিন্তু ইহুদিদের অন্তর এ দ্বিতীয় ধরনের পাথর অপেক্ষাও বেশি শক্ত।

কতক পাথরের মধ্যে উপরিউক্ত রূপ প্রভাব না থাকলেও এতটুকু প্রভাব অবশ্যই আছে যে, খোদার ভয়ে নীচে গড়িয়ে পড়ে। এ পাথর উপরিউক্ত দুই প্রকার পাথরের তুলনায় অধিক দুর্বল। কিন্তু ইহুদিদের অন্তর এ দুর্বলতম প্রভাব থেকেও মুক্ত। -[মা'আরিফুল কুরআন : মুফতি শফী (র.)]

অনুবাদ :

৭৫. ٧٥. اَفَتَطْمَعُوْنَ اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا اَيِ الْيَهُوْدُ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ اَحْبَارُهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلَامَ اللّٰهِ فِي التَّوْرٰةِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهُ يُغَيِّرُوْنَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ فَهِمُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهُمْ مُفْتَرُوْنَ وَالْهَمْزَةُ لِلْاِنْكَارِ اَيْ لَا تَطْمَعُوْا فَلَهُمْ سَابِقَةٌ فِي الْكُفْرِ .

হে ঈমানদারগণ, তোমরা কি এই আশা কর যে, তারা ইহুদিগণ তোমাদেরকে বিশ্বাস করবে? যখন তাদের একদল এক সম্প্রদায় অর্থাৎ শিক্ষিত পুরোহিত সম্প্রদায়ে তাওরাতে আল্লাহ তা'আলার বাণী শ্রবণ করত এবং বুঝার পর হৃদয়াঙ্গম করার পরও তা বিকৃত করত পরিবর্তিত করে নিত অথচ তারা জানত যে, বিষয়ে মিথ্যা রচনাকারী।

اَفَتَطْمَعُوْنَ-এর প্রশ্নবোধক অক্ষর هَمْزَةٌ টি এই স্থানে অসম্মিতসূচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা এটার আশা করো না। কেননা পূর্ব হতেই তারা কুফরি করে আসেছে।

৭৬. ٧٦. وَاِذَا لَقُوْا اَيْ مُنَافِقُوا الْيَهُوْدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا . بِاَنَّ مُحَمَّدًا نَبِيٌّ وَهُوَ الْمُبَشَّرُ بِهِ فِيْ كِتَابِنَا وَاِذَا خَلَا رَجَعَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ قَالُوْا اَيْ رُؤَسَاؤُهُمُ الَّذِيْنَ لَمْ يُنَافِقُوْا لِمَنْ نَافَقَ اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ اَيِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ اَيْ عَرَّفَكُمْ فِي التَّوْرٰةِ مِنْ نَعْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ لِيُحَاجُّوْكُمْ لِيُخَاصِمُوْكُمْ وَاللَّامُ لِلصَّيْرُوْرَةِ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ فِي الْاٰخِرَةِ فَيُقِيْمُوْا عَلَيْكُمُ الْحُجَّةَ فِيْ تَرْكِ اِتِّبَاعِهِ مَعَ عِلْمِكُمْ بِصِدْقِهِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ اَنَّهُمْ يُحَاجُّوْنَكُمْ اِذَا حَدَّثْتُمُوْهُمْ فَتَنْتَهُوْا .

তারা অর্থাৎ ইহুদি মুনাফিকরা যখন মু'মিনগণের সংস্পর্শে আসে, তখন বলে আমরা বিশ্বাস করেছি যে মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর নবী এবং তাঁর সম্পর্কে আমাদের পতি অবতীর্ণ গ্রন্থ তাওরাতে সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। আর যখন নিভৃতে ফিরে যায় ও একে অন্যের সাথে মিলিত হয় তখন তাদের ঐ নেতাগণ যারা মুনাফিকরূপেও ঈমান আনেনি, তারা এই মুনাফিকদেরকে বলে, আল্লাহ তোমাদের কাছে যা ব্যক্ত করেছেন অর্থাৎ তাওরাতে মুহাম্মদ ﷺ-এর যে গুণাবলি তোমাদের অবহিত করেছেন, তোমরা কি তাদেরকে মু'মিনগণকে তা বলে দাও? পরিণামে যেন তারা পরকালে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট তোমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি পেশ করতে পারে। তোমাদের বিরুদ্ধে বিবাদ করতে পারে এবং তাঁর [নবুয়তের] সত্যতা সম্পর্কে তোমাদের জানা থাকা সত্ত্বেও তাঁর অনুসরণ পরিত্যাগ করার বিষয়ে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে এই কথা প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করাতে পারে। তোমরা কি অনুধাবন কর না যে, তাদেরকে যদি এই কথা বলে দাও, তবে তোমাদের বিরুদ্ধে তারা সেটা প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করবে? তাই তোমাদের এ কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত।

لِيُحَاجُّوْكُمْ-এর لَامٌ টি صَيْرُوْرَتْ বা শেষ পরিণাম অর্থ বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

٧٧. قَالَ تَعَالٰى أَوَلَا يَعْلَمُوْنَ الْاِسْتِفْهَامُ لِلتَّقْرِيْرِ وَالْوَاوُ الدَّاخِلَةُ عَلَيْهَا لِلْعَطْفِ أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ مَا يُخْفُوْنَ وَمَا يُظْهِرُوْنَ مِنْ ذٰلِكَ وَغَيْرِهٖ فَيَرْعَوُوْا عَنْ ذٰلِكَ.

৭৭. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তারা কি জানে না, যা তারা গোপন রাখে কিংবা ব্যক্ত করে, আল্লাহ তা'আলা নিশ্চিতভাবে তা জানেন? أَوَلَا -এর প্রশ্নসূচক هَمْزَةٌ হামজা টি এস্থানে تَقْرِيْرٌ বা বক্তব্যটির সুসাব্যস্তকরণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর তৎপরবর্তী وَاوْ অক্ষরটি ব্যবহৃত হয়েছে عَطْف -এর অর্থে। অর্থাৎ এই বিষয়েই হোক বা অন্য কোনো বিষয়েই হোক তারা যা গোপন রাখে বা প্রকাশ করে, সবকিছুই তিনি জানেন। সুতরাং তারা যেন উক্ত কাজ হতে তারা নিবৃত্ত হয়।

তাহকীক ও তারকীব

তিনটি হরুফে আতিফাহ্ فَا - وَاوْ এবং ثُمَّ এগুলো উপর হামযায়ে এস্তেফহাম প্রবেশ করে। হ্যাঁ, এর তারকীবের বেলায় মতানৈক্য রয়েছে। জমহুরের অভিমত হচ্ছে, হাম্যাহ যেহেতু صَدَارَتْ كَلَامْ বা বাক্যের শুরুতে আসতে চায়, তাই এটাকে শুরুতে উহ্য মেনে নিতে হবে এবং অন্যকিছুকে মাহ্যূফ মানা যাবে না। মূল ইবারত এরূপ হবে– وَلَا - فَاتَطْمَعُوْنَ وَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ - يَعْلَمُوْنَ আল্লামা যমখ্শারী (র.)-এর অভিমত হচ্ছে– হামযার مَدْخُوْلْ মাহ্যূফ হয় যার উপর سِيَاقْ তথা পাঠাংশের প্রসঙ্গ নির্দেশনা করছে। এস্থানে মূল পাঠাংশ এরূপ হবে أَتَسْمَعُوْنَ أَخْبَارَهُمْ فَتَطْمَعُوْنَ عِبَارَتْ

تَطْمَعُوْنَ : এর ধাতুমূল طَمْعٌ -এর ব্যাপক প্রচলিত অর্থ- লোভ করা, লালায়িত হওয়া। তবে দ্বিতীয় অর্থ হিসেবে আশা করা এবং ভরসা রাখাও ব্যবহার্য। এখানে দ্বিতীয় অর্থই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তার প্রতি লোভাতুর ও লালায়িত হয়েছে এবং তাতে আশাবাদী হয়েছে। –[লিসানুল আরব]।(اِبْنَ عَبَّاسٍ) أَفَتَرْجُوْ يَا مُحَمَّدُ হে মুহাম্মদ! আপনি কি আশা পোষণ করেছেন। শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) اُمِيْد [উম্মেদ] ও থানবী (র.) تَوَقُّعْ -এর তরজমা করেছেন [দু'টি শব্দের অর্থ আশা-ভরসা।] –[তাফসীরে মাজেদী]

لَامْ - لِيُحَاجُّوْكُمْ অতিরিক্ত অথবা لَامْ اَجَلِيَّةْ [অর্থাৎ নির্ধারণের জন্য] لَامْ - لَكُمْ শেষ পরিণাম এর অর্থে। অর্থাৎ لَامْ শেষ পরিণামের। যেমন لدو لِلْمَوْتِ عِنْدَ رَبِّكُمْ । আর এটা يحاجوا -এর সাথে সম্পৃক্ত এবং কাজী বায়যাবী (র.) এটাকে যমীরে به থেকে বদল সাব্যস্ত করেছেন। تَعْقِلُوْنَ এরপরে মুফাসসির (র.) মাফউলে মাহ্যূফ বের করেছে। أَوَلَا يَعْلَمُوْنَ হামযাহ্ স্বীকৃতি ও স্বীকারের জন্য, যার মধ্যে তিরস্কার উদ্দেশ্য। وَاوْ আতিফাহ্ আসলে এর পূর্বে আসা উচিত ছিল; কিন্তু শুরু কালাম হামযা হওয়ার কারণে وَاوْ -কে পরে করে দেওয়া হয়েছে। মূল পাঠাংশ এরূপ أَلَا يَتَأَمَّلُوْنَ وَلَا يَعْلَمُوْنَ - أَنَّ فَرِيْقٌ -এর رَفْع - مِنْهُمْ -এর স্থানে। أَيْ فِيْ أَنْ يُؤْمِنُوْا وَقَدْ كَانَ জুমলায়ে হালিয়াহ। يُؤْمِنُوْا হরফ নির্ধারণের সাথে খবর সিফত এবং يَسْمَعُوْنَ জুমলা كَانَ -এর খবর । আর فَرِيْقٌ ইস্ম। إِذَا হরফে শর্ত لَقُوْا الخ শর্ত। قَالُوْا اٰمَنَّا জওয়াবে শর্ত। আর এমনিভাবে إِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ الخ শর্ত قَالُوْا الخ জওয়াবে শর্ত। بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ -এর মধ্যে مَا মাউসূলা কিংবা মউসূফা অথবা মাসদারিয়া।

قَوْلُهُ لَكُمْ : এখানে প্রশ্ন হয় যে, يُؤْمِنُوْنَ -এর صِلَةْ হিসেবে সর্বদা بَا আসে। এখানে لَامْ কিভাবে এলো?

উত্তর : يُؤْمِنُوْنَ মূলত يَنْقَادُوْا -এর অর্থ পোষণ করে। সে হিসেবে لَامْ এসেছে।

قَوْلُهُ طَائِفَةٌ : এটি فَرِيْق -এর তাফসীর। فَرِيْق শব্দটি قَوْم এবং رَهْط -এর মতো اِسْم جَمْع যার শাব্দিক কোনো একবচন নেই। طَائِفَةٌ শব্দটিও অনুরূপ اِسْم جَمْع

قَوْلُهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ : وَاوْ حَالِيَةْ -এটি عَقَلُوْهُ -এর জমির থেকে حَالْ হয়েছে। সুতরাং এটি حَالْ مُؤَكَّدَةْ হবে। কেউ কেউ বলেন– يُحَرِّفُوْنَهُ -এর জমির থেকে حَالْ হয়েছে। أَيْ يُحَرِّفُوْنَهُ حَالَ عِلْمِهِمْ ذٰلِكَ

قَوْلُهُ إِنَّهُمْ مُفْتَرُوْنَ : يَعْلَمُوْنَ ফে'লটি মুতাআদ্দী। তাই তার মাফউলের দিকে ইঙ্গিত করে। এ অংশটুকুর চুক্তি করা হয়েছে।

প্রশ্ন : উক্ত ইবরাত দ্বারা একটি سُوَالْ مُقَدَّرْ -এর জবাবও প্রদান করা হয়েছে। প্রশ্নটি হলো وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ -এর অর্থ তো عَقَلُوْهُ দ্বারাই বুঝা যায়। তারপরও তা উল্লেখের কারণ কি?

উত্তর : উভয়টির مُتَعَلِّقْ ভিন্ন ভিন্ন।

١. عَقَلُوْهُ اَىْ عَقَلُوْا الْكَلَامَ اَوِ الْمَعْنٰى ـ
٢. وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهُمْ مُفْتَرُوْنَ ـ

সুতরাং এখানে কোনো তাকরার বা দ্বিরুক্তি নেই।

رَجَعَ «خَلَا» : প্রশ্ন : خَلَا -এর صِلَةْ হিসেবে اِلٰى আসে না। অথচ خَلَا بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ -এর মাঝে اِذَا -এর খَلَا -এর صِلَةْ হিসেবে اِلٰى -এর ব্যবহার হয়েছে। এর কারণ কি?

উত্তর : বস্তুত মুসান্নিফ (র.) خَلَا -এর তাফসীর رَجَعَ -এর দ্বারা করে এই আপত্তিরই জবাব দিয়েছেন যে, خَلَا শব্দের মাঝে رَجَعَ -এর অর্থ রয়েছে। তাই তার صِلَةْ হিসেবে اِلٰى অব্যয়ের ব্যবহার যথার্থ হয়েছে।

قَوْلُهُ لِيُحَاجُّوْكُمْ : এটি يُحَاجُّوْكُمْ -এর তাফসীর। مُحَاجَّةٌ (مُفَاعَلَةٌ) حَاجَّ ঝগড়া করা। এর সম্পর্ক হলো لِيُخَاصِمُوْا كُمْ -এর সাথে, فَتَحَ -এর সাথে নয়। আর بَابْ مُفَاعَلَةْ এখানে مُشَارَكَتْ -এর জন্য নয়; বরং مُبَالَغَهْ -এর জন্য। تُحَدِّثُوْنَ اَىْ لِيَحْتَجُّوْا بِهٖ عَلَيْكُمْ ـ

قَوْلُهُ فَتَنْتَهُوْا : এটি جَوَابُ اِسْتِفْهَامْ হওয়ার কারণে نُوْنِ اِعْرَابِىْ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কোনো নোসখায় نُوْنِ اِعْرَابِىْ বহাল আছে। এ সূরতে এটি تعقلون -এর সাথে عَطْفْ হবে।

فَيَرْعَوْا : اِثْبَاتْ فِعْل مُضَارِعْ مَعْرُوْفْ -এর جَمْعْ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ। (اَلرَّعْوُ(ن) বিরত থাকা। اَىْ فَيَرْجِعُوْا عَنْ ذٰلِكَ কোনো কোনো নোসখায় فَيَرْغَبُوْا আবার কোনো নোসখায় فَيَعْرِضُوْا عَنْ ذٰلِكَ রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : এ আয়াতের পূর্বে ইহুদিদের قَسَاوَتْ قَلْبْ বা অন্তরের রূঢ়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে ঐ সকল মুসলমানকে সম্বোধন করা হচ্ছে যারা দয়াপরশ হয়ে ইহুদিদেরকে উপযুপরি নসিহত করত এবং সদা এ চিন্তায় বিভোর থাকত যে, কোনোভাবে তারা ঈমান গ্রহণ করুক। আল্লাহ তা'আলা তাদের আশা ও কামনা বর্জন করার জন্য বলছেন– ইহুদিদের অন্তর কঠোরতা ও রূঢ়তায় চূড়ান্তে উপনীত হয়েছে। সুতরাং তাদের ঈমান গ্রহণের আশা করো না।

قَوْلُهُ اَفَتَطْمَعُوْنَ اَنْ يُؤْمِنُوْا الخ : এ আয়াতে মু'মিনদের সম্বোধন করে বনী ইসরাঈলদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে– তোমরা কি এ আশা কর যে, তারা তোমাদের কথা মানবে? অথচ তাদের মধ্যে একদল এমন ছিল যারা জেনে শুনে আল্লাহর কালাম বিকৃত করত। اَفَتَطْمَعُوْنَ -এর হামযা (أ) টি اِسْتِفْهَامْ اِنْكَارِىْ অর্থাৎ এমন লোকদের ঈমান আনার ব্যাপারে আদৌ আশা নেই। এরপর মুফাস্সির (র.) اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ বের করে ইঙ্গিত করেছেন যে, সম্বোধিত [ব্যক্তি] রাসূল ﷺ ও মুমিনগণ। আর কারো মতে শুধু রাসূল ﷺ -ই সম্বোধিত এবং বহুবচনের সীগাহ সম্মানার্থে আনা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ : এ দল দ্বারা সেই সব লোককে বুঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহর বাণী শুনার জন্য হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে তূর পাহাড়ে গিয়েছিল। তারা সেখান থেকে ফিরে এসে বনী ইসরাঈলের কাছে এ বিকৃত বক্তব্য দেয় যে, মহান আল্লাহ তা'আলার বাণীর শেষ কথা আমরা শুনেছি যে, এসব বিধান তোমরা পালন করতে সক্ষম হলে পালন করবে, অন্যথায় তোমাদের পালন না করারও ইখতিয়ার আছে। কেউ বলেন, মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী দ্বারা তাওরাত বুঝানো হয়েছে, আর বিকৃতি সাধন বলতে এর মাঝে শব্দ ও অর্থ বিকৃতি সাধন বুঝানো হয়েছে, যেটা তারা করত। কখনও তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিচয় সম্পর্কিত আয়াত নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। –[তাফসীরে উসমানী পৃ. ১৫]

এখানে كَانَ -এর দুটি অর্থ হতে পারে এবং অভিধান ও ব্যাকরণ (نَحْو) উভয় অর্থই অনুমোদন করে–

১. অর্থাৎ ইহুদিদের মাঝে এমন একটি দল ছিল তাহলে আলোচনা অতীত যুগ এবং সমসাময়িক ইহুদিদের পূর্বপুরুষ সম্পর্কিত।

২. অর্থাৎ তাদের মাঝে এমন একটি উপদলের অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে। তাহলে আলোচনার লক্ষ্য বর্তমান যুগ ও সমকালীন ইহুদিরা। তাফসীর সূত্রে উভয় প্রকার বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে। তবে বর্ণনাধারা দ্বিতীয় অর্থের অধিক উপযোগী। কেননা সমসাময়িকদের বিপক্ষেই প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে এবং তাদেরকেই অভিযুক্ত করা অধিক সমীচীন হবে। এখানে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর যুগে বিদ্যমান ইহুদিরাই উদ্দেশ্য এবং এটাই সহজবোধ্য। -[তাফসীরে কবীর সূত্রে তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ كَلَامَ اللّٰهِ : অর্থাৎ ইহুদিদের কাছে মওজুদ আসমানি সহীফাসমূহ مِنْ بَعْدِ عَقَلُوْهُ অর্থাৎ অজ্ঞতা ও অজ্ঞানবশত নয়, দেখে শুনে সবকিছু বুঝা ও শুনার পরে স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে।

قَوْلُهُ فِى التَّوْرَاةِ : এটি كَلَامَ اللّٰهِ থেকে حَالٌ হয়েছে। অর্থাৎ যে কালামুল্লাহ তাওরাতে আছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য রজম ও মুহাম্মদ ﷺ -এর গুণাবলি সম্পর্কিত তাওরাতের বিবরণ। কেউ বলেন- এখানে কালামুল্লাহ দ্বারা তূর পর্বতেরে পাশে দ্রুত আল্লাহর বাণী। এ সূরতে فَرِيْقٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হবে সত্তর জন ইহুদি।

ইমাম কালবী বর্ণনা করেন, বনী ইসরাইল হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে আল্লাহর কালাম শোনার দাবী করে। তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা ভালোভাবে গোসল করে পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান কর। নবীর নির্দেশে তারা তাই করল। তুর পাহাড়ের পাদদেশে গেল। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাঁর পবিত্র কালাম শুনালেন। আল্লাহর কালাম শ্রবণের পর বাড়ি ফিরে তারা নিজেদের থেকে বলেছিল, আল্লাহ বলেছেন এ বিধানের যতটুকু সহজ লাগে পালন করুন!

কেউ কেউ বলেন, এখানে كَلَامَ اللّٰهِ দ্বারা রাসূল ﷺ-এর প্রতি অবতীর্ণ ওহী উদ্দেশ্য। ইহুদিদের একটি গ্রুপ ওহী শ্রবণ করে গিয়ে তাতে তাহরীফ বা বিকৃতি সাধন করত দীনের মাঝে বিশৃঙ্খলা ঘটানোর জন্য।

قَوْلُهُ يُغَيِّرُوْنَهُ : এটি يُحَرِّفُوْنَهُ -এর তাফসীর। অর্থাৎ তাওরাতের মধ্যে রাসূল ﷺ -এর যে সকল গুণ ও অবস্থা বর্ণিত হয়েছে তাতে পরিবর্তন করত। যেমন তাওরাতে রাসূল ﷺ -এর গঠন প্রকৃতির বিবরণ এসেছে- كَحْلُ الْعَيْنِ رِبْعَةٌ جَعْلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ তদস্থলে তারা طَوِيْلٌ اَزْرَقُ الْعَيْنِ سِبْطُ الشَّعْرِ الشَّعْرِ লিখত।

قَوْلُهُ فَهُمْ سَابِقَةٌ بِالْكُفْرِ : অর্থাৎ কুফরীর ক্ষেত্রে তাদের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। এর মর্ম হলো মুহাম্মদ ﷺ-এর কুফরীর পূর্বেও তারা কুফরী করেছে।

ইহুদিদের তিনটি দলের ব্যাখ্যা : উপরিউক্ত দুটি আয়াতে ইহুদিদের তিনটি দলের উল্লেখ রয়েছে।

প্রথম দল : مُحَرِّفِيْنَ [বিকৃতকারী দল] যারা আল্লাহর কালাম অর্থাৎ তাওরাকে আম্বিয়া (আ.) থেকে শ্রবণ করা সত্ত্বেও এর মধ্যে পরিবর্তন পরিবর্ধন এবং কাট-ছাট করেছে। চাই শাব্দিক বিকৃতি করে থাকুক অথবা অর্থের দিক দিয়ে কিংবা উভয় দিক দিয়ে বিকৃতি করে থাকুক। এমনিভাবে তূর পর্বতের উপর যে ৭০ ব্যক্তি হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে থেকে আল্লাহর বাণী শ্রবণ করে এর মধ্যে সংস্কার করেছিল, তারাও এর মধ্যে গণ্য। আর যাদের পূর্বপুরুষদের অবস্থা এমন হয়। তাদের উত্তরাধিকারীরা কিভাবে তাদের বিরোধী হতে পারে। তাই এ সকল লোকদের সংশোধন ও হোদায়েতের কোনো আশা রাখবেন না।

দ্বিতীয় দল : দ্বিতীয় আয়াতে উল্লিখিত ইহুদি মুনাফিকদের যাদের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল।

তৃতীয় দল : প্রকাশ্য ইহুদি কাফেরদের যাদের কথাবার্তা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যদি কখনো তোমাদের মাধ্যমে পূর্বে বর্ণিত দলের কিছু লোক মুসলমানদের সামনে দু একটি সত্য কথা প্রকাশ করে দিতো, তবে ইহুদি নেতারা তাদেরকে নিন্দা ও তিরস্কার এবং তাদের থেকে প্রতিশোধ নেওয়া ছাড়া ছাড়ত না। সুতরাং যাদের অবস্থা এত শীর্ণ হয়। তাদের থেকে হেদায়েতের আশা করা অযথা।

সূরার প্রথমাংশে মুনাফিকদের সে শব্দগুলো মুসলমানদের সাথে আচার-আচরণ -এর হিসেবে করা হয়েছে। আর এ স্থানে তাদের ঈমান গ্রহণের ব্যাপারে নিরাশার ক্ষেত্রে বর্ণনা করা হচ্ছে। যেহেতু উদ্দেশ্য বদলে গেছে। তাই পুনরুক্তির সন্দেহ করা ঠিক হবে না।

ইহুদি মুনাফিকদের প্রসঙ্গ : قَوْلُهُ وَاِذَا لَقُوْا : পূর্বে ঐসব মুনাফিকদের আলোচনা ছিল যারা ইহুদি নয়। এখান থেকে ইহুদি মুনাফিকদের সম্পর্কে আলোচনা শুরু হচ্ছে। মদীনাবাসী ইহুদিদের একটি বড় অংশ তো প্রকাশ্যে ইসলামের দুশমন ছিল। তবে কিছু সুবিধাবাদী এমনও ছিল, যারা মুসলমানদের সামনে নিজেদের মুসলমান হওয়ার ঘোষণা দিত। [অথচ অন্তরে তারা মুসলমান ছিল না] এখানে এই মুনাফিকদের আলোচনাই করা হচ্ছিল। অর্থাৎ ইহুদিদের মধ্যে যারা মুনাফিক।

-[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ১৪১]

قَوْلُهُ اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ : ইহুদিদের মধ্যে যারা মুনাফিক ছিল, তারা খোশামুদি করে তাদের কিতাবে শেষ নবী সম্পর্কে যা আছে, তা মুসলমানদের কাছে প্রকাশ করে দিত। এ কারণে অন্যরা তাদের তিরস্কার করে বলত, নিজেদের

কিতাবের প্রমাণ তাদের হাতে তুলে দাও কেন? তোমরা কি জান না; মুসলিমগণ তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তোমাদের দেওয়া প্রমাণ দ্বারা তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলবে যে, তোমরা শেষ নবীর সত্যতা জেনেও তার প্রতি ঈমান আননি, ফলে তখন তোমাদেরকে নিরুত্তর হতে হবে? –[তাফসীরে উসমানী পৃ. ১৫]

ইহুদি পণ্ডিতদের জ্ঞান গভীরতা : যেন এ নির্বোধেরা মনে করছিল যে, ইসলামের রাসূল ﷺ ও ইসলামের অনুসারীরা যা কিছু [ধর্মীয়] জ্ঞান অর্জন করবে, তা শুধু ইহুদিদের বলে দেওয়ার সূত্রেই হতে পারে এবং এছাড়া অন্য কোনো সূত্র তাদের জন্য নেই। ইলম ও জ্ঞানের এসব দরজা তাদের জন্য রুদ্ধ। তাদের এ 'দ্বিবিধ অজ্ঞানতার অজ্ঞতা' (جَهْل مُرَكَّبْ) ঠিক তদ্রূপ, যেমন বর্তমানে গোটা ফিরিঙ্গি সমাজ [পাশ্চাত্যবাসী] অজ্ঞানতার আঁধারে নিমজ্জিত। এ বিশেষ অজ্ঞরা কুরআন শরীফ সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে লাগলে প্রথমে এই ধারণা বদ্ধমূল করে নেয় যে, কুরআনে যা কিছুই উল্লিখিত হয়েছে, তা ইহুদিদের প্রচলিত তাওরাত ও খ্রিস্টানদের প্রচলিত ইঞ্জীল এবং এ ধরনের অন্যান্য মানব রচিত সূত্র হতেই আহরিত ও উদ্ধৃত হয়েছে এবং এতে কোনো অদৃশ্য জাগতিক সংযোগ-সহায়তা ওহী ও ইলহাম [অন্তরে খোদায়ী বাণী উদ্ভাসন] জাতীয় কোনো কিছু সংশ্লিষ্ট থাকার ক্ষীণ সম্ভাবনাও নেই।

قَوْلُهُ وَاللَّامُ لِلصَّيْرُوْرَةِ : لَامْ صَيْرُوْرَتْ দ্বারা لَامْ عَاقِبَتْ উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন : উক্ত ইবারতটুকু বৃদ্ধি করে মুফাসসির (র.) একটি سَوَالْ مُقَدَّرْ -এর জবাবের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। প্রশ্নটি হলো– ইবরাতের বাহ্যিক রূপ থেকে বুঝা যায়, ইহুদিরা সে বিষয়টি এজন্য প্রকাশ করে যাতে মুসলমানগণ ঝগড়া করে। অথচ এ কথা বলার সময় তাদের মাথায় এ কথা ছিল না।

উত্তর : মুফাসসির (র.) উক্ত ইবারতের মাধ্যমে তার উত্তরের প্রতিই ইঙ্গিত করছেন যে, এখানে لَامْ টি تَعْلِيْل -এর জন্য নয়; বরং صَيْرُوْرَتْ তথা عَاقِبَتْ বা পরিণাম বুঝানোর জন্য অর্থাৎ এর ফলশ্রুতিতে মুসলমানরা তর্ক-বিতর্ক করার সুযোগ পাবে।

قَوْلُهُ فِى الْاٰخِرَةِ : এটি عِنْدَ رَبِّكُمْ -এর তাফসীর অর্থাৎ عِنْدَ رَبِّكُمْ দ্বারা يَوْمَ الْقِيَامَةِ -এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ لِيُحَاجُّوْكُمْ بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ : এর একটি অর্থ তো এই [সহজবোধ্য] যে এরা আখিরাত ও কিয়ামতের দিন তোমাদের স্বীকারোক্তি দানে বাধ্য করবে। মুফাসসিরগণের অনেকেই এ অর্থ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এখানে অধিক লাগসই অর্থ হবে– এই দুনিয়াতেই তোমাদের বিরুদ্ধে শক্ত প্রমাণ দাঁড় করিয়ে দেবে। কেননা প্রথমত ইহুদিরা তো আখিরাতে পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাসী ছিল না। দ্বিতীয়ত সেখানে প্রমাণ প্রতিষ্ঠার জন্য তো এ ধরনের বাহ্যিক উপদানের প্রয়োজনও নেই। সেখানে তো সব তথ্য ও তত্ত্ব স্বয়ংক্রিয়রূপে উম্মোচিত হয়ে থাকবে। এজন্যই এখানে যেন আল্লাহ তা'আলার কিতাব [সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য] দ্বারা প্রমাণ পেশ করাকে আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে [প্রতিপালকের নিকট হতে [عِنْدَ رَبِّكُمْ] দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।

–[তাফসীরে মাজেদী খ. ১. পৃ. ১৪২]

قَوْلُهُ اَوَلَا يَعْلَمُوْنَ : **যোগসূত্র :** পূর্বে বলা হয়েছে। ইহুদি মুনাফিকরা আল্লাহ তা'আলার সামনে জবাবদিহিতার আশংকায় মুমিনদের সম্মুখে ঈমানের কথা স্বীকারোক্তির ব্যাপারে একে অন্যকে ভর্ৎসনা করেছে। যার মর্ম হলো তাদের ধারণা এভাবে গোপন করার দ্বারা আল্লাহর নিকট তাদের বিরুদ্ধে কোনো দলিল প্রমাণ সাব্যস্ত হবে না। এ আয়াতে তাদের সে ধারণা সম্পর্কে ধমক দেওয়া হচ্ছে। আর اَوَلَا يَعْلَمُوْنَ -এর জমির এর মিসদাক মুনাফিক বা অমুনাফিক ইহুদি নেতৃবর্গ কিংবা উভয় গ্রুপ হতে পারে।

قَوْلُهُ الْاِسْتِفْهَامُ لِلتَّقْرِيْرِ : অর্থাৎ সম্বোধিত ব্যক্তিকে স্বীকার করতে বাধ্য করার জন্য।

قَوْلُهُ وَالْوَاوُ الدَّاخِلَةُ عَلَيْهَا لِلْعَطْفِ : অর্থাৎ যে واو টি لَا يَعْلَمُوْنَ الخ -এর আগে এসেছে, তা عَطْف -এর জন্য এবং اَىْ اَيَعْلَمُوْنَهُمْ عَلَى التَّحْدِيْثِ بِمَا ذُكِرَ وَلَا يَعْلَمُوْنَ الخ উহ্য রয়েছে। مَعْطُوْف عَلَيْهِ

জমহুরের মতে এখানে কিছু উহ্য নেই; বরং এটি পূর্বের সাথে عَطْف হয়েছে এবং হামযাটি মূলত وَاوْ -এর পরে ছিল। قُوَّتْ اِسْتِفْهَامْ -এর জন্য আগে আনা হয়েছে।

قَوْلُهُ اَوَلَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ : অর্থাৎ তাদের প্রকাশ্য ও গুপ্ত সবকিছুই তো মহান আল্লাহ তা'আলার জানা, তাদের কিতাবের যাবতীয় প্রমাণ তিনি মুসলিমগণকে অবহিত করতে পারেন এবং কার্যত কিছু কিছু জানিয়েও দিয়েছেন। রজমের আয়াত তারা গোপন করেছিল; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তো প্রকাশ করে দিয়ে তাদের লাঞ্ছিত করেছেন। এ ছিল তাদের পণ্ডিতদের অবস্থা, যারা জ্ঞান-বুদ্ধি ও আসমানী বিদ্যার দাবিদার ছিল।

অনুবাদ :

৭৮. وَمِنْهُمْ اَيْ الْيَهُوْدِ اُمِّيُّوْنَ عَوَامٌّ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتَابَ التَّوْرٰةَ اِلَّا لٰكِنَّ اَمَانِيَّ اَكَاذِيْبَ تَلَقَّوْهَا مِنْ رُؤَسَائِهِمْ فَاعْتَمَدُوْهَا وَاِنْ مَا هُمْ فِيْ جَحْدِ نُبُوَّةِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِ مِمَّا يَخْتَلِفُوْنَهُ اِلَّا يَظُنُّوْنَ - ظَنًّا وَلَا عِلْمَ لَهُمْ -

৭৮. তাদের ইহুদিদের মধ্যে কতক রয়েছে নিরক্ষর সাধারণ মানুষ কিছু মিথ্যা আশা ব্যতীত যা তাদের নিকট হতে তারা লাভ করে থাকে এবং তার প্রতি আস্থা পোষণ করে, কিতাব অর্থাৎ তাওরাত [সম্বন্ধে তাদের কোনো জানা নেই।] রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত অস্বীকার করা এবং তাদের অন্যান্য মনগড়া বিষয়ে তারা কেবল মিথ্যা ধারণা করে বেড়ায়, এই বিষয়ে কোনো সঠিক জ্ঞান নেই তাদের। حَرْف اِسْتِثْنَاء : اِلَّا اَمَانِيَّ তথা اِلَّا হরফটি এস্থানে اِسْتِثْنَاء مُنْقَطِعْ বা ছিন্ন ও বিজাত্য ব্যত্যয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, এই দিকে ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্যে মাননীয় তাফসীরকার اِلَّا -এর তাফসীরে لٰكِنَّ শব্দের উল্লেখ করেছেন।

وَاِنْ هُمْ এই স্থানে اِنْ শব্দটি مَا [না] অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৭৯. فَوَيْلٌ شِدَّةُ عَذَابٍ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ اَيْ مُخْتَلِقًا مِنْ عِنْدِهِمْ - ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ط مِنَ الدُّنْيَا وَهُمُ الْيَهُوْدُ غَيَّرُوْا صِفَةَ النَّبِيِّ ﷺ فِي التَّوْرٰةِ وَاٰيَةَ الرَّجْمِ وَغَيْرَهَا وَكَتَبُوْهَا عَلٰى خِلَافِ مَآ اُنْزِلَ فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ مِنَ الْمُخْتَلَقِ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا يَكْسِبُوْنَ - مِنَ الرُّشٰى -

৭৯. সুতরাং দুর্ভোগ কঠিন শাস্তি তাদের জন্য যারা নিজেদের তরফ হতে মিথ্যারোপ করে নিজ হস্তে কিতাব রচনা করে অতঃপর দুনিয়ার সামান্য বিনিময়ের জন্য বলে, এটা আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে। তারা হলো ইহুদি সম্প্রদায়। তাওরাতে উল্লিখিত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গুণাবলি এববং রাজম [বিবাহিত ব্যাভিচারী ও বিবাহিতা ব্যভিচারিণীকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করার বিধান] ও এই ধরনের অন্যান্য আয়াতসমূহ তারা বিকৃত ও পরিবর্তিত করত এবং আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক অবতীর্ণ নির্দেশের বিপরীত কথা [তাওরাতে] লিখে রাখত। তাদের হাত যা যে মনগড়া বিষয় রচনা করে তার জন্য কঠিন শাস্তি তাদের এবং তারা যা অর্থাৎ যে ঘুষ ইত্যাদি উপার্জন করে তদ্দরুন কঠিন শাস্তি তাদের।

তাহকীক ও তারকীব

তাহকীক : اَمَانِيُّ এটি اُمْنِيَّةٌ-এর বহুবচন اُفْعُوْلَةٌ -এর ওজনে। মানুষ অন্তরে যা কল্পনা করে। সেগুলো মিথ্যা এবং বাস্তবের উপরও সংযোজন হয়। এ স্থানেও তওরাতে উল্লিখিত নবী করীম ﷺ-এর গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যসমূহকে পরিবর্তন করে দেওয়া উদ্দেশ্য। আর নিজেদেরকে اَبْنَاءُ اللّٰهِ وَاَحِبَّاءُهٗ [আল্লাহর ছেলেও তার বন্ধু] মনে করা এবং এ কল্পনা করা যে, আমরা দোজখে প্রবেশ করব না, কিন্তু ক্ষণিকের জন্য। আর আল্লাহ আমাদের অপরাধসমূহ ধর-পাকড় করবেন না। এসব ভিত্তিহীন কথা اَمَانِيٌّ -এর অন্তর্ভুক্ত। اَلظَّنُّ -এর প্রয়োগ কখনো অকাট্য দলিল দ্বারা নিশ্চিত জানার বিপরীতও হয়ে থাকে। অর্থাৎ প্রমাণ ছাড়া ইল্‌মকে অথবা অশুদ্ধ দলিল দ্বারা জানাকে কিংবা অকাট্য দলিলহীন ইল্‌মকেও ظَنٌّ বলা হয়। وَيْلٌ আরবি ভাষায় এ শব্দটি অসন্তুষ্টি প্রকাশের জন্য ব্যবহার করা হয়। যেমন تف ইত্যাদি শব্দসমূহ ব্যবহার করা হয়। ইমাম আহমদ (র.) ইমাম

তিরমিযী (র.) এবং ইমাম আবূ য়ালা (র.) গং যে রেওয়ায়েত দ্বারা এটাকে দোজখের কূপ বলেছেন অথবা ইবনে জারীর (র.) দোজখের পাহাড় বলেছেন, এ সবগুলোতেই আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি প্রকাশ হচ্ছে, তাই সব অর্থই শুদ্ধ।

كِتَابُ দ্বারা উদ্দেশ্য তওরাত অথবা এর লেখা কিংবা উভয় অর্থ।

তারকীব : فَوَيْلٌ- أُمِّيُّوْنَ মুব্তাদা মাউসূফ لَا يَعْلَمُوْنَ সিফত। مِنْهُمْ খবরে মুকাদ্দাম إِلَّا اَمَانِيَّ এস্তেস্‌নায়ে মুনকাতি مِمَّا كَتَبَتْ এবং اَلَّذِيْنَ জুমলা। اَلْكِتَابُ মাফউলে বিহী। لِيَشْتَرُوْا সংযুক্ত হয়েছে يَقُوْلُوْنَ-এর সাথে। يَكْسِبُوْنَ মাফউলে বিহী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : উপরের আয়াতগুলোতে পড়ূয়া লোকদের আলোচনা ছিল। উপরিউক্ত এ দুটি আয়াত থেকে প্রথম আয়াতে মূর্খ ও সধারণ লোকদের অবস্থার চিত্র টানা হচ্ছে। দ্বিতীয় আয়াতে পুনরায় তাদের আলেমদের বদ্ অভ্যাস বর্ণনা করা হচ্ছে।

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ : **ইহুদি আম-জনতার চিন্তা-বিশ্বাস :** পূর্বে ইহুদিদের মধ্যে যারা শিক্ষিত ছিল, তাদের আলোচনা হয়েছে। এখন তাদের মূর্খদের আলোচনায় বলা হচ্ছে যে, ইহুদীদের মধ্যে যারা মূর্খ ছিল, তাদের তো খবরই ছিল না তাওরাতে কি লেখা আছে না আছে? তাদের ছিল কেবল কিছু মিথ্যা আশা, যা তাদের পণ্ডিতদের কাছ থেকে তারা শুনে রেখেছিল। যেমন, জান্নাতে ইহুদি ছাড়া আর কেউ প্রবেশ করবে না। আমাদের পূর্বপুরুষগণ অবশ্যই আমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করবেন। বস্তুত এসব তাদের অমূলক কল্পনা। এর কোনো দলিল প্রমাণ নেই।

أُمِّيُّوْنَ : এটি أُمِّيٌّ-এর বহুবচন। وَهُوَ الَّذِيْ لَا يَقْرَأُ وَلَا يَكْتُبُ

কেউ কেউ বলেন– أُمُّ الْقُرٰى-এর দিকে নিসবত করে উম্মী বলা হয়। কেননা মক্কার অধিবাসীরা পড়া এবং লেখা জানত না।

أُمِّيُّوْنَ : عَوَامٌ-এর ব্যাখ্যা عَوَامٌ দ্বারা করে একিটি سُؤَالٌ مُقَدَّرٌ-এর জবাবের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

প্রশ্ন : আরবে أُمِّيُّوْنَ বললে তো আরব জাতির প্রতি জেহেন চলে যায়। কেননা اُمَّةُ الْاُمِّيَّةِ আরবদেরকেই বলা হয়।

উত্তর : এখানে أُمِّيُّوْنَ দ্বারা সাধারণ ইহুদিদেরকে বুঝানো হয়েছে। اَحْبَارُ يَهُوْدَ বা ইহুদি পণ্ডিতদের ছাড়া সকলকেই عَوَامٌ বলা হয়। عَوَامٌ - عَامَّةٌ-এর বহুবচন। অর্থ– সাধারণ জনতা।

قَوْلُهُ اِلَّا اَمَانِيَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ : ইহুদিদের মিথ্যা আশাগুলো হলো– আমাদের পূর্বসূরী শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণ আমাদের ক্ষমা করিয়ে দিবেন," আমরা তো 'খোদার বিশিষ্ট প্রিয়জনদের সন্তান, আমাদের কিসের চিন্তা! ইত্যাদি। এ ধরনের ভিত্তিহীন ও আজেবাজে ধ্যানধারণা তারা পোষণ করত। এ অবস্থা সাধারণ ইহুদিদের। এসব লোক 'পশুতুল্য' না লিখক, না পাঠক; বাপ-দাদার তালুকাদারীর ধ্বজাধারি নিজেদের কল্পনার তৈরি খোশখেয়ালী ও মনে মনে পোলাও খেতে অভ্যস্ত ও কল্পনাভিলাষে গা ভাসিয়ে দিতে আত্মহারা ছিল। ইঞ্জীলে কোথাও মাসীহ ঈসা (আ.) জবানীতে এবং কোথাও [পোপ] পল -এর মুখে ইহুদিদের এ ধরনের অলীক কল্পনামত্ততার কথা বার বার উল্লিখিত হয়েছে। –[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ১৪৪]

قَوْلُهُ لٰكِنْ : اِسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ-এর প্রতি ইঙ্গিত করার হয়েছে। আর এটি اِسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ হওয়ার কারণ হলো এখানে মুসতাছনা তথা اَمَانِيَّ মুস্তাছনা মিনহু তথা কিতাবের جِنْسٌ নয়।

কেউ কেউ اِسْتِثْنَاءٌ مُتَّصِلٌ বলেছেন। তখন অর্থ হবে– لَا يَقْرَأُوْنَ الْكِتَابَ اِلَّا قِرَاءَةً عَارِيَةً عَنْ مَعْرِفَةِ الْمَعْنٰى

اَمَانِيْ : একবচন اُمْنِيَّةٌ-এর দুটি অর্থ রয়েছে।

১. এরা শুধু তাদের মিথ্যা বাসনাগুলোকে লালন-পালন করতে থাকে। বাস্তবতা ও তথ্যনির্ভর হওয়ার সঙ্গে যেগুলোর কোনো সংযোগ নেই। –[তাফসীরে কবীর, ইবনে জারীর]

২. মিথ্যা বিবরণ, অপ্রামাণ্য ও অবাস্তব কল্প-কাহিনীতে নিমগ্ন থাকে। অধিকাংশ পূর্বসূরী হতে এ অর্থ উদ্ধৃত হয়েছে। বিভিন্ন মিথ্যা [অবাস্তব] উক্তি, যা তারা তাদের বিদ্বানদের নিকট হতে শুনে অন্ধ অনুকরণ করে তা উদ্ধৃত করছে।

قَوْلُهُ اَكَاذِيْبُ : اَكَاذِيْبُ এটি اُكْذُوْبَةً -এর বহুবচন। অর্থ- মিথ্যা কথা। এটি اَمَانِيُّ -এর তাফসীর।

قَوْلُهُ تَلَقَّوْهَا : এটি مَاضِىْ جَمْعُ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ। অর্থাৎ যে মিথ্যা কথাগুলো তারা তাদের নেতৃস্থানীয়দের কাছ থেকে লাভ করেছিল, তাতেই তারা ভরসা করেছে।

قَوْلُهُ مَا : এটি اِنْ -এর তাফসীর মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করলেন যে, এখানে اِنْ টি نَافِيَه যার অর্থ مَا

قَوْلُهُ هُمْ : এটি مَحَلًّا مَرْفُوْعٌ ইবতিদার কারণে। অথবা اِسْم হওয়ার কারণে مَرْفُوْعٌ ; কেননা اِنْ শব্দটিও مَا -এর মত আমল করে।

قَوْلُهُ فِىْ جَحَدِ النَّبِىِّ ﷺ وَغَيْرِه : جَحْد অর্থ অস্বীকার করা।

قَوْلُهُ مِمَّا يَخْتَلِقُوْنَهُ : اِخْتِلَاقْ অর্থ নিজের পক্ষ থেকে রচনা করা। اَىْ يَفْتَرُوْنَهُ

قَوْلُهُ اِلَّا يَظُنُّوْنَ : اِلَّا হরফে ইস্তেফহাম। এখানে اِسْتِثْنَاءْ مُفَرَّغْ হয়েছে। আর يَظُنُّوْنَ ফে'লটি مَحَلًّا مَرْفُوْعٌ হয়েছে هُمْ মুবতাদার খবর হওয়ার ভিত্তিতে।

প্রশ্ন : ظَنٌّ এবং اَمَانِىْ তো একই জিনিস। তাহলে اَمَانِىْ -এরপর ظَنْ উল্লেখ করার কারণ কি?

উত্তর: মুফাসসির (র.) তার জবাবের প্রতি এভাবে ইঙ্গিত করেছেন যে, উভয়টির উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন। اَمَانِىْ দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ সকল বস্তু, যেগুলো তারা নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে প্রাপ্ত হতো। আর ظَنْ দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ সকল বস্তু, যেগুলো তারা নিজেদের পক্ষ থেকে রচনা করত।

فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الخ : **নেতৃস্থানীয় ইহুদিদের কর্মকাণ্ড পরিণাম :** পূর্ববর্তী আয়াতে সাধারণ ইহুদিদের আলোচনা ছিল। এখন বিশিষ্ট ও নেতৃস্থানীয় ইহুদিদের বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। এরা সে সব লোক, যারা তাদের মূর্খ জনগণের বিশ্বাস অনুযায়ী নিজেদের পক্ষ হতে কথা বানিয়ে লিখে দিত এবং তা মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী বলে চালিয়ে দিত। যেমন- তাওরাতে লেখা ছিল, শেষ নবী সুদর্শন, এবং কোঁকড়ানো চুল, কালো চোখ, মাঝারি গড়ন ও গৌরবর্ণের অধিকারী হবেন। তারা তদস্থলে লিখল, তিনি দীর্ঘ দেহী এবং নীল চোখ ও খাড়া চুল বিশিষ্ট হবেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল যাতে জনগণ তাকে বিশ্বাস না করে এবং তাদের পার্থিব স্বার্থ ক্ষুণ্ন না হয়।

قَوْلُهُ شِدَّةُ الْعَذَابِ : এটি وَيْلٌ -এর ব্যাখ্যা, রঈসূল মুফাসসিরীন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এমনই বর্ণিত রয়েছে। কোনো বর্ণনায় রয়েছে- اَلْوَيْلُ الْوَادِىْ فِىْ جَهَنَّمَ لَوْ سُيِّرَتْ فِيْهِ الْجِبَالُ لَانْمَاعَتْ وَلَذَابَتْ مِنْ حَرِّه

অর্থাৎ وَيْلٌ হলো জাহান্নামে একটি উপত্যকা, সেখানে পাহাড় নিক্ষেপ করা হলেও তার উষ্ণতায় তা বিগলিত হয়ে যায়।

قَوْلُهُ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ : اَلْكِتَابُ فَعَّالٌ بِمَعْنٰى مَفْعُوْل -এর মতো। এটি مَفْعُوْل بِه হিসেবে মানসূব।

قَوْلُهُ مُخْتَصِلقًا مِنْ عِنْدِه :

প্রশ্ন : লেখা তো হাত দ্বারাই সম্পাদন করা হয়। তারপরও يَكْتُبُوْنَ -এর পরে بِاَيْدِيْهِمْ উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা কি?

উত্তর : মুফাসসির (র.) উক্ত প্রশ্নের জবাবের প্রতি এভাবে ইঙ্গিত করছেন بِاَيْدِيْهِمْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তারা নিজেদের পক্ষ থেকে মনগড়াভাবে রচনা করে।

মনগড়াভাবে লেখার পদ্ধতি : এ সম্পর্কে দু'টি অভিমত রয়েছে-

১. তাওরাতে রাসূল ﷺ -এর যেসব গুণ ও চরিত্র বর্ণিত হয়েছে, তারা তার বিপরীত রচনা করত এবং আরবে প্রচার করত এবং তাওরাতের মূল কপি গোপন করে রাখত। রাসূল ﷺ সম্পর্কে কেউ জানতে চাইলে তারা সে বিকৃত কপিটি বের করে বলত- هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ

২. এখানে اِخْتِلَاقْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তারা শব্দের মধ্যে পরিবর্তন ও বিকৃতি করত না; বরং ব্যাখ্যার মধ্যে তাহরীফ করত এবং সে মর্মটি আল্লাহর দিকে নিসবত করত।

قَوْلُهُ ثَمَنًا : ثَمَنٌ শব্দটি শুধু নগদ অর্থ ও বিনিময় মূল্যই বুঝায় না; বরং কোনো কিছুর বিনিময়ে যা কিছু পাওয়া যায়, তাকেও **ثَمَنٌ** বলা হয়। ইমাম রাগেব বলেন– **كُلُّ مَا يَحْصُلُ عِوَضًا عَنْ شَيْءٍ فَهُوَ ثَمَنُهُ** মুফাসসিরগণও শব্দটি এখানে এই ব্যাপক অর্থ তথা যে কোনো পার্থিব বিনিময় অর্থে গ্রহণ করেছেন। **ثَمَنٌ** দ্বারা এখানে পার্থিব উপকরণই বুঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ قَلِيلًا : তুচ্ছ [স্বল্প] খোদায়ী বাণীর বিকৃতি ও রদবদলের ন্যায় জঘন্য ও কঠিন অপরাধের সূত্রে যে কোনো ধরন ও পরিমাণে জাগতিক জড় উপকরণ অর্জিত হোক না কেন? বাস্তবিকই তা হবে তুচ্ছ ও মূল্যহীন।

কুরআন বেচা-কেনার মাসআলা : এখানে বাহ্যবাদী (اَهْلُ الظَّاهِرِ) কোনো কোনো অনভিজ্ঞ আলেম বাহ্য শব্দ থেকে এরূপ ফতোয়া ছেড়ে দিয়েছে যে, পবিত্র কুরআনের বেচা-কেনা উভয়ই নাজায়েজ। কিন্তু যথার্থ মাযহাব অনুসারে উভয়ই বৈধ। কেননা এখানে বেচা-কেনা যাই হোক তা হয়ে থাকে কাগজ, অনুলিখন, মুদ্রণ ইত্যাদির বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলার আয়াত তো কেউ বেচা-কেনা করে না। তবে হ্যাঁ, এ হুমকি প্রযোজ্য হতে পারে ভুল ও মিথ্যা মাসআলা প্রদানকারী এবং জালহাদীস বর্ণনাকারীদের ক্ষেত্রে।

مِمَّا يَكْسِبُوْنَ : তারা তাদের অপকর্ম দ্বারা যা অর্জন করত; তা কি জিনিস? এর দুটি জবাব দেওয়া হয়েছে এবং দুটি জবাবই স্বস্থানে সঠিক–

১. তাদের পাপের সঞ্চিত ভাণ্ডার উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তারা তাদের কর্মতৎপরতা দ্বারা নিজেদের পাপের স্তূপ বাড়িয়ে চলছে।

২. তাদের স্বার্থান্ধতাপ্রসূত বিকৃতি ও [তাদের ভাষায়] কল্যাণপ্রসূ মিথ্যার বদৌলতে যা আর্থিক স্বার্থ [ঘুষ] হাসিল করে। সেটাই এখানে উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন : وَيْلٌ হলো মুবতাদা আর **لَهُمْ** হলো তার খবর। অথচ **وَيْلٌ** হলো **نَكِرَةٌ** যা মুবতাদা হওয়া ব্যাকরণের দৃষ্টিতে শুদ্ধ নয়।

উত্তর : وَيْلٌ মূলত বদদোয়াসূচক শব্দ। মূলত **هَلَكْتُ وَيْلًا** ছিল। যেমন– **سَلَّمْتُ سَلَامًا** -এর মাঝে ফে'ল হযফ করে 'নসব' থেকে 'রফার' দিকে **عُدُوْلٌ** করা হয়েছে **دَوَامٌ وَ ثُبَاتٌ** বুঝানোর জন্য।

স্বপ্নের বেহেশতের ব্যাখ্যা : প্রথম আয়াতে চতুর্থ দল। অর্থাৎ সাধারণ লোকদের অবস্থা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা ভিত্তিহীন ও অবাস্তব স্বপ্নের বেহেশতে বসবাস করছে এবং এ মন্দতাও মূলত তাদের আলেমদেরই সৃষ্টিকৃত। আর তা এভাবে যে, সঠিক ইল্ম এর সাথে তাদেরকে সম্পৃক্ত হতে দেয়নি; বরং কাল্পনিক প্রতারণার সবুজ বাগান দেখিয়ে এবং কাল্পনিক শরাব পান করিয়ে তাদেরকে এমন অজ্ঞান করে দিয়েছে যে তারা নিজেদের চতুর্দিকে বেষ্টিত জাল থেকে বের হয়ে আসতে কোনো অবস্থায়ই সচেষ্ট নয়। যার দৃষ্টান্ত বর্তমানকালে আত্মপূজারী পীরজাদাগণের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে।

قَوْلُهُ غَيَّرُوْا صِفَةَ النَّبِيِّ فِى التَّوْرَاةِ الخ : নবী করীম ﷺ -এর দেহ মোবারকের গঠন তওরাতে এ শব্দগুলো দ্বারা লেখা ছিল। **حَسَنُ الْوَجْهِ ـ جَعْدُ الشَّعْرِ ـ كَحْلُ الْعَيْنِ ـ رَبْعَةٌ** [সুন্দর চেহারা, কুকড়ানো চুল, সুরমা চুখ, মধ্যম দেহ] এ শব্দগুলো পরিবর্তন করে তারা লিখেছে– **طِوَالٌ ـ اَزْرَقُ ـ سِبْطُ الشَّعْرِ** অর্থাৎ লম্বা দেহ, নীল চোখ, সোজা চুল বিশিষ্ট। এমনিভাবে জেনার শাস্তি রজম অর্থাৎ পাথর নিক্ষেপে হত্যা লেখিত ছিল। এ হুকুমকে **جِلْدٌ** অর্থাৎ বেত্রাঘাত দ্বারা এবং **تَحْمِيْمٌ** অর্থাৎ মুখ কালো করা দ্বারা পাল্টে দিয়েছে।

قَوْلُهُ وَغَيْرُهُمَا : অর্থাৎ নবী ﷺ -এর গুণাবলি ও রজমের আয়াত ব্যতীত অন্যান্য আরো অনেক বিষয়। যেমন– তাদের উক্তি **لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا** এবং **لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَعْدُوْدَاتٍ**

অনুবাদ :

٨٠. وَقَالُوْا لَمَّا وَعَدَهُمُ النَّبِيُّ النَّارَ لَنْ تَمَسَّنَا تُصِيْبَنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَعْدُوْدَةً قَلِيْلَةً اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا مُدَّةَ عِبَادَةِ اٰبَائِهِمُ الْعِجْلَ ثُمَّ تَزُوْلُ قُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ اَتَّخَذْتُمْ حُذِفَ مِنْهُ هَمْزَةُ الْوَصْلِ اِسْتِغْنَاءً بِهَمْزَةِ الْاِسْتِفْهَامِ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا مِيْثَاقًا مِنْهُ بِذٰلِكَ فَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهُ بِهِ لَا اَمْ بَلْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ.

৮০. রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জাহান্নামের অগ্নির ভীতি প্রদর্শন করলে তারা বলে অল্প কতকদিন ব্যতীত আগুন আমাদেরকে কখনো স্পর্শ করবে না। আমাদের গায়ে তা লাগবে না। অর্থাৎ যে চল্লিশ দিন তাদের পিতৃ পুরুষরা গো-বৎসের উপাসনা করেছিল মাত্র সে কতক দিনই তা ভোগ করতে হতে পারে। পরে তা অপসৃত হয়ে যাবে। হে মুহাম্মদ ﷺ! তাদেরকে বল, তোমরা কি আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে এই বিষয়ে কোনো চুক্তি অঙ্গীকার নিয়েছ যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে না? না, বস্তুত এমন কোনো চুক্তি হয়নি; বরং আল্লাহ তা'আলা সম্বন্ধে তোমরা এমন কিছু বলছ, যা তোমরা জান না। اَتَّخَذْتُمْ শব্দটিতে هَمْزَةُ اِسْتِفْهَامٍ [প্রশ্নবোধক অক্ষর হামযা] -এর উল্লেখই যথেষ্ট বলে هَمْزَةُ وَصْلٍ টি বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। اَمْ تَقُوْلُوْنَ এইস্থানে اَمْ শব্দটি بَلْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٨١. بَلٰى تَمَسُّكُمْ وَتَخْلُدُوْنَ فِيْهَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً شِرْكًا وَاَحَاطَتْ بِهِ خَطِيْئَتُهُ بِالْاِفْرَادِ وَالْجَمْعِ اَىْ اِسْتَوْلَتْ عَلَيْهِ وَاَحْدَقَتْ بِهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ بِاَنْ مَاتَ مُشْرِكًا فَاُولٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ. رُوْعِىَ فِيْهِ مَعْنَى مَنْ.

৮১. হ্যাঁ নিশ্চয় জাহান্নামের আগুন তোমাদের স্পর্শ করবে এবং সেখানে তোমরা সর্বদা অবস্থান করবে। যে ব্যক্তি পাপ কার্য শিরক করে এবং যার পাপরাশি তাকে পরিবেষ্টন করে ফেলে অর্থাৎ তা তার উপর প্রবল হয়ে যায় এবং চতুর্দিক বেষ্টন করে ফেলে। অর্থাৎ মুশরিকরূপে যদি তার মৃত্যু হয় তারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। خَطِيْئَةٌ শব্দটির একবচন ও বহুবচন উভয়রূপ পাঠই রয়েছে। اُولٰئِكَ - خَالِدُوْنَ - هُمْ এই শব্দগুলো مَنْ -এর মর্মের প্রতি লক্ষ্য রেখে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে।

٨٢. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحٰتِ اُولٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ.

৮২. আর যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তারাই জান্নাতবাসী, তারা সেখানে স্থায়ী হবে।

তাহকীক ও তারকীব

তরকীব ও তাহকীক : فَلَنْ يُّخْلِفَ এটা শর্তে মুকাদ্দার -এর উত্তর। أَىْ إِنْ كُنْتُمْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا إِلَّا أَمْ بَلْ এ স্থানে أَمْ মুনকাতি'আহ بَلْ -এর অর্থে ব্যবহৃত এবং হামযায়ে এস্তেফ্হাম اِتِّخَاذْ -কে অস্বীকার করার জন্য আর بَلْ -এর অর্থ বিরত রাখা ও স্থানান্তরের জন্য হবে। তাই মুফাস্সির (র.) হামযার উত্তর لَاءِ نَافِيَةٌ দ্বারা সাব্যস্ত করেছেন। যেরূপ হামযার অধীনে نَفِيْ এবং أَمْ-এর অধীনে إِثْبَاتْ রয়েছে। আর বাক্যটি খবরই রয়েছে।

قَالُوْا : سَيِّئَةً মুসান্নিফ (র.) হযরত ইব্নে আব্বাস (রা.) ও মুজাহিদ (র.) এর মতে শিরক দ্বারা এর ব্যাখ্যা করেছেন। أَيَّامً মূলে أَيْوَامْ ছিল ফেয়েল বা ফায়েল لَنْ تَمَسَّنَا الخ জুমলা مَفْعُوْل الْأَيَّامْ। জরফিয়্যাতের কারণে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। يَوْمٌ এর বহুবচন। وَاوْ -কে يَاءٌ বানিয়ে اِدْغَامْ করা হয়েছে। بَلٰى হ্যাঁ-বাচক শব্দ مَنْ মুবতাদা, أَصْحَابُ النَّارِ খবর। জুমলা জওয়াবে শর্ত। أَنْ হামযায়ে এস্তেফ্হামের অর্থে أَىْ الْأَمْرَيْنِ كَائِنٌ এমতাবস্থায় أَمْ মুত্তাসিলা হবে। আর তা না হয় مُنْقَطِعَةٌ অর্থে بَلْ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে খুব জোরালোভাবে ইহুদিদের জন্য وَيْلٌ দোযখ প্রমাণিত করা হয়েছে। এখন এ আয়াতে বলা হচ্ছে যে, তারা উক্ত সতর্কবাণীকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি মিথ্যারোপ করে আরো একটি অপরাধ ও মন্দ তার বহিঃপ্রকাশ করছে।

وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ **: ইহুদিদের একটি ভ্রান্ত ধারণা :** ইহুদিরা এ কাল্পনিক প্রতারণা নিজেদের অন্তরে সংরক্ষণ করে রেখেছিল যে–

১. نَحْنُ أَبْنَاءُ اللّٰهِ وَأَحِبَّاءُهُ আমরা আল্লাহর প্রিয় ও মকবুল, তাই আমাদের সকল গুনাহ ক্ষমা করা হয়েছে।

২. পূর্বপুরুষগণ যেহেতু নবী ও রাসূল। তাই তারা আমাদেরকে দোজখ হতে রক্ষা করবেন।

৩. ধরে নেওয়া হয় যদি দোজখে যেতেই হয়। তবে অল্প কয়েক দিনের জন্য হবে।

৪. নবুয়ত পাওয়ার যোগ্য শুধু আমাদের গোত্র। প্রকৃতপক্ষে لَنْ تَمَسَّنَا الخ এ বিশ্বাসের ভ্রান্ত ভিত্তিতে তাদের এ ধারণা ছিল যে, তারা হযরত মূসা (আ.)-এর ধর্মকে স্থায়ী ও রহিত হবে না মনে করতেছিল। তাই হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান না আনার কারণে নিজেদেরকে কাফের মনে করত না। হ্যাঁ, যদি কোনো গুনাহের শাস্তিতে দোজখে যায়ও, তবু অল্পদিনের মধ্যেই তাদের মুক্তি হয়ে যাবে। অথচ এ সিদ্ধান্ত তাদের বেলায় সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। কাজেই হযরত ঈসা ও হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নবুয়তকে অস্বীকার করার কারণে তাদেরকে কাফেরই গণ্য করা হবে। আর অল্প কয়েকদিন পরে মুক্তির অঙ্গীকার আসমানি কোনো কিতাবেও তাদের জন্য নেই। তাই তাদের দাবি প্রমাণহীন; বরং দলিলের পরিপন্থি হওয়ার কারণে অগ্রহণযোগ্য।

قَالُوْا لَمَّا وَعَدَهُمُ النَّبِيُّ النَّارَ : অর্থাৎ নবী করীম ﷺ যখন ইহুদিদেরকে জাহান্নামের ওয়াদা দিলেন তখন তারা বলল.....।

ইশকাল : এখানে ইশকাল হয় যে, ওয়াদা তো কল্যাণ ও ভালো কাজের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। জাহান্নামের ওয়াদা হয় না; বরং তার জন্য وَعِيْدٌ বা সতর্কবাণী হয়ে থাকে। তবে এখানে ওয়াদা কেন বলা হলো?

উত্তর :

১. وَعْدَةٌ ভালো-মন্দ সকল কাজেই সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন– আল্লাহর বাণী–

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ الخ ـ

২. এখানে وَعَدَ ফে'লটি وَعِيْدًا মাসদার থেকে নির্গত। যার অর্থ ধমকী দেওয়া। فَلَا إِشْكَالَ

৩. কখনো وَعِيْد -কেও وَعْدٌ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। এ কথা বুঝানোর জন্য যে, وَعِيْد বা সতর্কবাণীও وَعْدٌ বা প্রতিশ্রুতির মতো বরখেলাফ হবে না, নিশ্চিত হবে।

قَوْلُهُ تُصِيْبَنَا : এটি تَمَسَّنَا -এর ব্যাখ্যা। মূলত مَسّ বলা হয় কোনো বস্তুর চামড়ার সাথে এ রকমভাবে মিলিত হওয়া যে, قُوَّت مَاسَّة বা স্পর্শশক্তি তার দ্বারা প্রভাবিত হয়। আর এর জন্য اِصَابَةٌ হলো লাজেমী জিনিস তাই মুফাসসির (র.) এখানে এ শব্দটি উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ اِلَّا اَيَّامًا مَعْدُوْدَةً : কেউ বলেন, সাতদিন, কেউ বলেন, চল্লিশ দিন। [যতদিন তারা বাছুর পূজা করেছিল] আবার কারো মতে চল্লিশ বছর [যে সময় তারা তীহ মরুভূমিতে বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরাফেরা করেছিল]। কেউ বলেন, প্রত্যেকের ইহলোকের আয়ুষ্কাল পরিমাণ। -[তাফসীরে উসমানী পৃ. ১৫]

قَوْلُهُ قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا : পরোক্ষভাবে প্রমাণকরণ ও যুক্তিতে তাকে লা-জবাব করার পন্থায় ইহুদিদের কাছে প্রশ্ন হচ্ছে যে, তোমরা যে নিজেদের সমগ্র জাতির বিশেষ প্রিয়ভাজন হওয়া, আখিরাতের আজাব হতে পরিত্রাণপ্রাপ্ত হওয়ার এবং জিজ্ঞাসিত না হওয়ার ধ্যানধারণা নিজেদের অন্তরে বদ্ধমূল করে রেখেছ, তবে বল তো অবশেষে তা কি তোমাদের মনগড়া নাকি তার কোনো সনদ প্রমাণও তোমাদের পবিত্র গ্রন্থ হতে দেখাতে পার? তা না হলে এ বিষয়ে এত জোরগলা কেন? -[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ১৪৭]

قَوْلُهُ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ : قَالَ ক্রিয়া عَلٰى অব্যয় দ্বারা যুক্ত হলে তার অর্থ হয় কারো নামে কোনো কথা তৈরী করা, মিথ্যা আরোপ করা,কাউকে অপবাদ দেওয়া। যেমন- قَالَ عَلَيْهِ অর্থ اِفْتَرٰى মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, রচনা করেছে।

-[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ১৪৭]

প্রশ্ন : এখানে প্রশ্ন জাগে যে, ইহুদিরা তো কেবল বলেছিল لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً এখানে তারা তো আল্লাহ তা'আলা প্রতি মিথ্যা আরোপ করেনি। তারপরও اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الخ কিভাবে বলা হলো?

উত্তর : যদিও তাদের একথা সরাসরি মিথ্যারোপ নয়; কিন্তু লাজেমীভাবে তাতে افتراء প্রমাণিত হয়। কেননা এ ধরনের নিশ্চয়তার সাথে আল্লাহর দিকে নিসবত না করে কেউ কোনো কথা বলতে পারে না। যেন তারা আল্লাহর দিকে নিসবত করেই বলেছে যে, তিনি আমাদেরকে কেবল এতদিন আজাব দিবেন।

قَوْلُهُ بَلٰى مَنْ كَسَبَ : যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে ইহুদিদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের আলোচনা হয়েছে, তারা জাহান্নামে কেবল কয়েক দিন থাকবে। এখন এ আয়াতে সে ভ্রান্ত বিশ্বাসের খণ্ডন করা হচ্ছে যে, কয়েক দিন নয়; বরং চিরদিন জাহান্নামে থাকবে।

قَوْلُهُ تَمَسُّكُمْ : بَلٰى ব্যবহৃত হয় نَفِيْ -এর জবাবে نَفِيْ -কে প্রমাণিত করার জন্য। যেহেতু لَنْ تَمَسَّنَا -এর মাঝে ইহুদিরা দীর্ঘ সময় জাহান্নামে জ্বলাকে নাকচ করে ছিল তাই এখন আল্লাহ তা'আলা بَلٰى -এর মাধ্যমে তা প্রমাণিত করছেন। মুফাসসির (র.) تَمَسُّكُمْ শব্দটি বৃদ্ধি করে সে দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً : مَنْ مَوْصُوْلَة দ্বারা ব্যাপকভাবে সকলকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ইহুদি এবং অ-ইহুদি সকলেই তাতে অন্তর্ভুক্ত যেন বলা হলো- تَمَسُّكُمْ وَغَيْرَكُمْ

قَوْلُهُ شِرْكًا : মুফাসসির (র.) سَيِّئَةً -এর তাফসীর شِرْكًا দ্বারা করে একটি سُوَالْ مُقَدَّرْ -এর জবাব দিয়েছেন।

প্রশ্ন : আয়াত থেকে বুঝে আসে যে, كَسَبَ سَيِّئَةً বা পাপ করলে চিরস্থায়ী জাহান্নামে জ্বলতে হবে। অথচ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মতে কবীরা গুনাহকারী চিরদিন জাহান্নামে থাকবে না।

উত্তর : এখানে سَيِّئَةً দ্বারা شِرْك উদ্দেশ্য; আর এটাই হলো অধিকাংশের মত।

خَطِيْئَةٌ وَسَيِّئَةٌ -এর পার্থক্য : سَيِّئَةٌ সাধারণত ঐ গুনাহের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়, যা করার জন্য ইচ্ছা করা হয়। আর خَطِيْئَةٌ -এর ব্যবহার অনিচ্ছার গুনাহের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যেমন কোন প্রাণীকে উদ্দেশ্য করে তীর ছুঁড়েছে; কিন্তু মানুষের গায়ে লেগে গেছে। এ পার্থক্য অধিকাংশের ভিত্তিতে, অন্যথায় একটির স্থলে অপরটি ব্যবহার হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ بِالْإِفْرَادِ وَالْجَمْعِ : অর্থাৎ خَطِيْئَةٌ শব্দটি এক কেরাতে বহুবচন রূপে এবং অপর কেরাতে একবচন রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

আখিরাতে নাজাত লাভের মূলনীতি : উভয় আয়াতে নাজাত ও মুক্তির পূর্ণাঙ্গ বিধি সংক্ষেপে এ সারগর্ভ ভাষায় বিবৃত হয়েছে যে, বংশধারা ও জাতিত্বের সঙ্গে মুক্তির কোনো সম্বন্ধ নেই। যে কেউ স্বেচ্ছায়-সজ্ঞানে অমূলক ও ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং অপকর্মের পথে পরিচালিত হবে, তার ঠাই হবে জাহান্নামে। আর যে কেউ স্বেচ্ছায়-স্বজ্ঞানে ঈমান ও সৎ কাজের পন্থা বেছে নেবে, তার মনজিল হবে জান্নাত। –[তাফসীরে মাজেদী খ.১, পৃ. ১৪৭]

اَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْئَتُهٗ : পাপাচারী মুমিন ক্ষমার যোগ্য : পাপের বেষ্টন মানে স্বেচ্ছায় পাপের পথ গ্রহণ করা এবং পাপাচারে এমনভাবে সম্পূর্ণ বেষ্টিত হয়ে যাওয়া যে, ঈমানের জন্য কোনোও অবস্থান-অবকাশ অবশিষ্ট থাকবে না। আর তা হতে পারে শুধু মাত্র সে সকল লোকের জন্য যারা সম্পূর্ণই বাতিলপন্থি এবং তাদের মৃত্যুও কুফরি ও ধর্মহীন অবস্থায় হবে। মু'মিন যতই পাপাচারী হোক না কেন, তারা কোনো অবস্থাই এ আয়াতের লক্ষ্য হবে না। কেননা অন্তত মুখে স্বীকৃতি ও অন্তরে বিশ্বাসের স্তর তো তার থাকবেই। আহলুস সুন্নাতের সকল মনীষীই এখানে কুফল [পাপে বেষ্টিত হওয়া] -কে উদ্দেশ্য করেছেন।

কোনো কোনো বাতিলপন্থি [মু'তাজিলা, খারিজী প্রভৃতি] রা যে এ আয়াত দ্বারা পাপাচারী মু'মিনের ক্ষমাযোগ্য না হওয়ার প্রমাণ গ্রহণের চেষ্টা করেছে, তা স্পষ্টতই বাতিল ও অসার। –[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ১৪৮]

قَوْلُهُ بِاَنْ مَاتَ مُشْتَرِكًا : এটি اِحَاطَةٌ -এর পদ্ধতি। অর্থাৎ বেষ্টন করার পদ্ধতি হলো মুশরিক অবস্থায় মারা যাওয়া। এটি মুমিনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কেননা তার কাছে ন্যূনতম পক্ষে ঈমান থাকে।

قَوْلُهُ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ : خُلُوْد -এর আভিধানিক অর্থ সুদীর্ঘ সময়ও রয়েছে। তবে পবিত্র কুরআনের যে যে স্থানে জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীদের ব্যাপারে এ শব্দ উল্লিখিত হয়েছে, আহলে সুন্নাতের সর্বসম্মত অভিমত অনুসারে তা দ্বারা স্থায়িত্ব ও অবিরামত্ব উদ্দেশ্য এবং পবিত্র কুরআনে এ অভিমতের দৃঢ়করণ ও সমর্থনে অনেক স্থানে خَالِدِيْنَ -এর সাথে اَبَدًا [চিরকাল] ও উল্লিখিত হয়েছে। কেউ কেউ خُلُوْد -কে তার প্রথম [মূল] অর্থ– সুদীর্ঘকাল অবস্থান -এ প্রয়োগ করেছেন, তা নিতান্তই অসার। কেননা তা ভয়াবহতা প্রকাশের ক্ষেত্রে বিষয়টিকে শিথিল করে দেওয়ার নামান্তর এবং সে জান্নাতের خُلُوْد -কে চিরস্থায়ী হওয়ার অর্থে প্রয়োগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। –[রূহুল মা'আনী সূত্রে তাফসীরে মাজেদী খ. ১, ১৪৮]

فَاُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ - اُولٰئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ : বাক্যদ্বয়ে فَاءْ উল্লেখ ও অনুল্লেখের কারণ : فَاُولٰئِكَ ও اُولٰئِكَ অর্থাৎ জাহান্নামীদের পরিণতি বর্ণনায় فاولئك اصحب النار 'ফা' পরিণতিবোধক অব্যয় সহকারে এবং জান্নাতীদের ক্ষেত্রে اُولٰئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ 'ফা' অব্যয় ব্যতিরেকে উল্লিখিত হয়েছে। অথচ উভয় ক্ষেত্রে অভিন্ন প্রকারের বিধান দান করা উদ্দেশ্য। এ ব্যবধান যদিও লঘু প্রকৃতির এবং তা শব্দের নয়, মাত্র একটি বর্ণের; তবুও এতটুকু পার্থক্যেরই বা কারণ কি? বিশ্লেষণ বিশেষজ্ঞগণ জবাবে বলেছেন যে, প্রথম [ফা যুক্ত] ক্ষেত্রটি জাহান্নামীদের জন্য হুমকির। আর হুমকির ক্ষেত্রে তার বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাই বিষয়টিতে [অতিরিক্ত] জোর দেওয়া হয়েছে। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্র শুধু ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতির, যাতে বিপরীত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। এ জন্য 'ফা' বিহীন শুধু اُولٰئِكَ -ই যথেষ্ট ছিল। আবার উক্ত জবাবের বিপরীত এরূপ দ্বিতীয় জবাবও দেওয়া হয়েছে যে, নাহব [ব্যাকরণবিদ] -দের মতে مَنْ دَخَلَ دَارِىْ اَكْرَمْهُ [যে আমার ঘরে প্রবেশ করবে (যদি তা করে) তাকে সম্মান-সমাদর করব] বাক্যে ঘরে প্রবেশকারীকে সমাদর না করার সম্ভাবনাও থেকে যায়। কিন্তু مَنْ دَخَلَ دَارِىْ اَكْرِمُ [যে আমার ঘরে প্রবেশ করবে .... তাকে সমাদর করব] বাক্যে সম্মান সমাদর করা [-এর নির্দেশ] সুনিশ্চিত হয়ে যায়। সমাদর না করার সম্ভাবনা অবশিষ্ট থাকে না। এ দৃষ্টান্ত বিচারে পুণ্যবানদের জন্য জান্নাত প্রাপ্তি সম্পূর্ণ নিশ্চিত।

–[রূহুল মা'আনী সুত্রে তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ১৪৯]

অনুবাদ :

٨٣. وَ اذْكُرْ إِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ فِي التَّوْرٰةِ وَقُلْنَا لَا تَعْبُدُوْنَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ اِلَّا اللّٰهَ خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ وَقُرِئَ لَا تَعْبُدُوْا وَ اَحْسِنُوْا بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا بِرًّا وَذِي الْقُرْبٰى الْقَرَابَةِ عَطْفٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ قَوْلًا حُسْنًا مِنَ الْاَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالصِّدْقِ فِيْ شَاْنِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَالرِّفْقِ بِهِمْ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِضَمِّ الْحَاءِ وَسُكُوْنِ السِّيْنِ مَصْدَرٌ وُصِفَ بِهِ مُبَالَغَةً وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ فَقَبِلْتُمْ ذٰلِكَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اَعْرَضْتُمْ عَنِ الْوَفَاءِ بِهِ فِيْهِ الْتِفَاتٌ عَنِ الْغَيْبَةِ وَالْمُرَادُ اٰبَائُهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُعْرِضُوْنَ ـ عَنْهُ كَاٰبَائِكُمْ ـ

৮৩. আর স্মরণ কর যখন তাওরাতে ইসরাঈলী সন্তানদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম আর বলেছিলাম, তোমরা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করবে না। আর পিতা মাতা নৈকট্যের অধিকারী আত্মীয়-স্বজন, এতিম ও দরিদ্রের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে এবং মানুষের সাথে সদালাপ করবে যেমন, সৎকাজের আদেশ দান, অসৎকাজের নিষেধ করার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সত্যতার কথা আত্মীয় স্বজনের সাথে কোমল ব্যবহার করা ইত্যাদি। সালাত কায়েম করবে ও জাকাত দিবে তোমরা এই অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলে অতঃপর স্বল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তোমরা অর্থাৎ ইহুদিদের পূর্ব পুরুষগণ মুখ ফিরিয়ে নিলে অর্থাৎ তা পূরণ করতে অবাধ্য হলে। আর তোমরাও তোমাদের পিতৃপুরুষগণের ন্যায় এর অবাধ্যচারী। تَعْبُدُوْنَ ক্রিয়াটির ت [مُخَاطَبٌ বা দ্বিতীয় পুরুষ] ও ى [غَائِبٌ বা নাম পুরুষ] উভয়রূপেই পাঠ রয়েছে। لَا تَعْبُدُوْنَ বাক্যটি যদিও خَبَرِيَّةٌ বা সংবাদ প্রকাশ করে, এমন বাক্য; কিন্তু এ স্থানে তা نَهْيٌ বা নিষেধার্থক রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। [অর্থাৎ ইবাদত করো না।] অপর এক কেরাতে لَا تَعْبُدُوْنَ [نَهْيٌ বা নিষেধার্থক] রূপেও এর পাঠ রয়েছে।

اِحْسَانًا শব্দটি এ স্থানে উহ্য অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়া। اَحْسِنُوْا [সদ্ব্যবহার কর]-এর مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ বা সমধাতুজ কর্ম। এদিকে ইঙ্গিত করার জন্য মাননীয় তাফসীরকার وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا -এর পূর্বে اَحْسِنُوْا শব্দটির উল্লেখ করেছেন।

ذِوِى الْقُرْبٰى শব্দটির اَلْوَالِدَيْنِ -এর সাথে عَطْفٌ হয়েছে। قَوْلًا حُسْنًا শব্দটি এ স্থানে উহ্য قَوْلًا -এর বিশেষণ। আর قَوْلًا হচ্ছে আজ্ঞাবাচক ক্রিয়া। قُوْلُوْا -এর مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ বা সমধাতুজ কর্ম। মাননীয় তাফসীরকার এই দিকে ইঙ্গিত করতে গিয়ে তাফসীরে قَوْلًا শব্দটির উল্লেখ করেছেন।

حُسْنًا শব্দটির অন্য এক কেরাতে مَصْدَرٌ বা ক্রিয়ার উৎস হিসেবে ح -এ পেশ ও س -এ সাকিন (حُسْنًا) সহ পাঠ রয়েছে। এমতাবস্থায় একে বিশেষণরূপে ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হলো مُبَالَغَةٌ বা অর্থে অতিশয়োক্তি বিধান।

تَوَلَّيْتُمْ ক্রিয়া পদটিতে غَيْبَةٌ বা নাম পুরুষ হতে اِلْتِفَاتٌ বা রূপান্তর সংঘটিত হয়েছে। 'তোমরা' বলে এ স্থানে মূলত তাদের [ইহুদিদের] পূর্বপুরুষগণকে বুঝানো হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

لَاتَعْبُدُوْنَ -এর পূর্বে মুসান্নিফ (র.) قُلْنَا নির্ধারণ মেনে اَخَذْنَا -এর উপর عَطْفٌ এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন। এ ব্যাপারে দুটি ক্বেরাত রয়েছে। প্রসিদ্ধ ক্বেরাত لَا تَعْبُدُوْنَ জুমলায়ে খবরিয়া। لَا تَعْبُدُوْا নাহীর অর্থে এবং নাহীকে খবরের রূপে আদায় করা স্পষ্ট নাহীর চেয়ে অধিক اَبْلَغُ মনে করা হয়। এমতাবস্থায় ইঙ্গিত হচ্ছে যে, নাহীর উপর বাস্তব আমলের এ পরিমাণ

উৎসাহ রয়েছে যে, ধরা যায় যে, বাস্তবে আমল করে সংবাদ দেওয়া হয়েছে। আর অন্য ক্বেরাতে لَا تَعْبُدُوْا স্পষ্ট সীগায়ে নাহীর সাথে রয়েছে। কিন্তু এ কেরাতে বিরল। যার দিকে قُرِئَ রুগন্ সীগা দ্বারা মুফাস্সির (র.) ইঙ্গিত করেছেন এবং মুফাস্সির (র.)-এর অধিক অভ্যাস এটা যে, وَفِيْ قِرَاءَةٍ -কে قِرَاءَتْ مُتَوَاتِرَةٌ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে থাকেন। আর قِرَاءَةٌ شَاذَةٌ -কে وَقُرِئَ দ্বারা । تُحْسِنُوْنَ اَوْ اَحْسِنُوْا اِحْسَانًا মুজমার -এর সাথে সম্পৃক্ত। নিয়মিত পঠন এমনভাবে إِحْسَانًا।

مِسْكِيْن -এর ওজনে مِفْعِيْل - سُكُوْن থেকে নির্গত। ধরা যায় যে, অভাব তাকে নীরব করে দিয়েছে। حُسْنًا - حَاء এর পেশ এবং حَاءْ -এর যবর উভয় অবস্থায় মাসদার। مُبَالَغَة -এর পদ্ধতিতে زَيْدٌ عَدْلٌ -এর ন্যায়। تَوَلَّيْتُمْ -এর পূর্বে قَبْلْتُمْ এ জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। যাতে এর عَطْف শুদ্ধ হয়। اَلْتِفَاتْ দ্বারা উদ্দেশ্য এটা যে, পূর্বের বাক্যের ধারাকে পরিবর্তন করে দেওয়া। যদ্দারা আনন্দ ও স্বাদ জন্মে এবং সম্বোধিত ব্যক্তির বিরক্তি দূর হয়ে যায়। لَا تَعْبُدُوْنَ الخ জওয়াবে কৃসম। যা اَخَذْنَا থেকে হাসিল হয়েছে। اَىْ اَحْلَفْنَاهُمْ وَقُلْنَا لَهُمْ অথবা ان -কে হযফের সাথে এবং হরফে জরকে মুক্বাদ্দার মানার সাথে اِلَّا بِهٰذَا الزَّاجِرِ اَخْفَرَ الْوَغٰى যেমন اَىْ عَلٰى اَنْ لَّا تَعْبُدُوْا -এর মধ্যে রয়েছে এবং নাহীর সীগাহ মানলে لَا تَعْبُدُوْا - مِيْثَاق থেকে بَدَلْ হয়ে যাবে কিংবা হরফে জরটি হযফের সাথে এর مَعْمُوْل হয়েছে। নাফি', ইবনে আমের, আবূ আমের এবং আছিম -এর ক্বেরাতে لَا تَعْبُدُوْنَ আছে এবং অবশিষ্ট ক্বারীগণ لَا يَعْبُدُوْنَ পড়েছেন।

قَوْلُهُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ : بَنِىْ শব্দটি মূলত بَنِيْنَ ছিল। (مُلْحَقٌ بِجَمْعِ مُذَكَّرٍ سَالِمٍ) مُضَافْ اِلَيْهِ হওয়ার কারণে حَالَتْ اِضَافَتْ -এর কারণে نُوْنْ হযফ হয়ে গেছে। আর اِسْرَائِيْلَ শব্দটি عَلَمْ এবং عُجْمَة **সহ হয়েছে।** يَاءْ نُوْنْ তে جَرِى **হওয়ায়** غَيْرُ مُنْصَرِفْ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ الخ : যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে ইহুদিদের ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে যে, তাদেরকে অল্প কয়েক দিন না; বরং চিরদিন জাহান্নামে জলতে হবে। এখন তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের আলোচনা করা হয়েছে। সেই সাথে এখানে এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অঙ্গীকার ভঙ্গে দাবি হলো তোমাদেরকে নির্দিষ্ট কয়েক দিন নয়; বরং চিরদিন আজাব দেওয়া হবে। বিশেষভাবে যখন এ অঙ্গীকার ভঙ্গ করা তাদের মজ্জাগথ স্বভাবে পরিণত হয়ে গেছে এবং সর্বদা এ পাপে লিপ্ত থাকার নিয়ত থাকে।

قَوْلُهُ اُذْكُرْ : মুফাসসির (র.) এখানে اُذْكُرْ শব্দটি বৃদ্ধি করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেনে যে, اذ হরফটি مَحَلًّا مَنْصُوْب তার আমেল উহ্য রয়েছে। আর اُذْكُرْ দ্বারা রাসূল ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে। اَىْ اُذْكُرْ يَا مُحَمَّدُ ﷺ

কেউ কেউ বলেন– পূর্বাপরের বিচারে এখানে اُذْكُرُوْا উহ্য ধরা উচিত এবং বনী ইসরাইলকে সম্বোধন করা হয়েছে।

কেউ বলেন– এখানে اُذْكُرْ দ্বারা বনী ইসরাইলকেই সম্বোধন করা হয়েছে।

قَوْلُهُ فِى التَّوْرَاةِ : অর্থাৎ এখানে যে অঙ্গীকারের কথা বলা হচ্ছে, তা তাদের থেকে তাওরাতে নেওয়া হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন– এ অঙ্গীকার হযরত মূসা ও অন্যান্য নবী (আ.)-এর যবানে নেওয়া হয়েছিল।

কেউ বলেন– اِنَّهُ مِيْثَاقٌ اَخَذَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ فِىْ اَصْلَابِ اٰبَائِهِمْ كَالذَّرِّ

قُلْنَا : প্রশ্ন : মুফাসসির (র.) এখানে لَا تَسْفِكُوْنَ -এর আগে قُلْنَا বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর : বক্তব্যকে পূর্বের সাথে তথা وَاِذْ اَخَذْنَا -এর সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য لَا تَسْفِكُوْنَ -এর আগে قُلْنَا বৃদ্ধি করা হয়েছে যাতে উভয় জায়গায় جَمْعُ مُتَكَلِّمْ -এর সীগাহ হয়ে যায়। অন্যথায় একই বক্তব্যে একই মুখাতাবের জন্য غَائِبْ এবং حَاضِرْ -এর সীগাহ ব্যবহার লাজেম আসে। কেননা بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ হলো اِسْمِ ظَاهِرْ আর اِسْمِ ظَاهِرْ গায়েবের হুকুমে হয় থাকে এরপর لَا تَعْبُدُوْنَ রয়েছে। এর মুখাতাবও হলো বনী ইসরাঈল। অথচ এটি হলো حَاضِرْ -এর সীগাহ।

সুতরাং এভাবে كَلَامٌ وَاحِدٌ -এর মাঝে خِطَابٌ بِالْحَاضِرِ এবং خِطَابٌ بِالْغَائِبِ লাজেম আসে। এ থেকে বাঁচার জন্য মুফাসসির (র.) قُلْنَا বৃদ্ধি করেছেন। যাতে اَخَذْنَا এবং قُلْنَا -এর মাঝে مُطَابَقَتْ হয়ে যায়। -[জামালাইন : খ. ১, পৃ. ১৫৯]

قَوْلُهُ لَا تَعْبُدُوْنَ : এটি শব্দরূপে মুযারে [বর্তমান ভবিষ্যত জ্ঞাপক] সংবাদবোধক ক্রিয়া হলেও অর্থে তা আজ্ঞাবোধক এবং স্পষ্ট আজ্ঞার চেয়ে এটি অধিক অর্থবহ ও কার্যকর। কেননা এ পদ্ধতি ইঙ্গিত করে যে, যেন আদিষ্ট বিষয় প্রতিপালিত হয়ে গিয়েছে, যেন আজ্ঞা পালনে দ্রুততা দেখানো হয়েছে। এ পদ্ধতি স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞার চেয়ে অধিক অর্থবহ। তাফসীরে বায়জাবী শরীফে রয়েছে- هُوَ اَبْلَغُ مِنْ صَرِيْحٍ لِمَا فِيْهِ مِنْ اِبْهَامِ الْمَنْهِيِّ سَارَعَ اِلَى الْاِنْتِهَاءِ فَهُوَ يُخْبِرُ عَنْهُ

قَوْلُهُ خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ : অর্থাৎ لَا تَعْبُدُوْنَ শব্দটি مُضَارِعٌ مَنْفِيٌّ جَمْعٌ مُذَكَّرٌ حَاضِرٌ হওয়ার কারণে جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ হয়েছে। এ কারণেই তার نُوْنِ اَعْرَابِيْ সাকেত হয়নি। কিন্তু অর্থগত দিক দিয়ে এটি جُمْلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ এবং لَا تَعْبُدُوْا -এর অর্থে।

প্রশ্ন : এখানে ইশকাল হয় যে, যখন এখানে خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ হয়েছে, তখন সরাসরি نَهْيٌ -এর সীগাহ আনা হলো না কেন?

উত্তর : جُمْلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ -কে جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ -এর মাধ্যমে ব্যক্ত করার উদ্দেশ্য এ দিকে ইঙ্গিত করা যে, তাদের দ্বারা গায়রুল্লাহর ইবাদত প্রকাশিত হওয়া খুবই দুষ্কর।

قَوْلُهُ وَاَحْسِنُوْا : প্রশ্ন : এখানে اَحْسِنُوْا উহ্য ধরার ফায়দা কি?

উত্তর : এখানে এ শব্দটি উহ্য ধরে মুফাসসির (র.) একটি আপত্তির জবাব দিয়েছেন। তা হচ্ছে- بِالْوَالِدَيْنِ [جَارٌ এবং مَجْرُوْرٌ] -এর عَطْف হয়েছে لَا تَعْبُدُوْنَ - (جَارٌ مَجْرُوْرٌ) -এর উপর। ব্যাকরণগত দিক দিয়ে যা অশুদ্ধ। যখন اَحْسِنُوْا উহ্য ধরা হয়েছে, তখন আপত্তি শেষ হয়ে গিয়েছে। এছাড়া মুফাসসির (র.) اَحْسِنُوْا আমরের সীগাহ উহ্য ধরে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, عَطْف টি হয়েছে لَا تَعْبُدُوْنَ -এর অর্থের উপর, শব্দের উপর নয়।

قَوْلُهُ بِرًّا : اِحْسَانًا -এর ব্যাখ্যায় بِرًّا শব্দের উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, اِحْسَانٌ দ্বারা শুধুমাত্র আর্থিক اِحْسَانٌ বুঝানো হয়নি; বরং এর দ্বারা কথা, কাজ সাধারণভাবে সব ধরনের সদ্ব্যবহারকে বুঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ الْقَرَابَةُ : মুফাসসির (র.) قُرْبٰى -এর তাফসীরে اَلْقَرَابَةُ উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, قُرْبٰى শব্দটি رَجْعِيٌّ -এর মতো মাসদার, বহুবচন নয়। اَىْ اَهْلُ الْقَرَابَةِ আর قَرَابَتْ দ্বারা رِحْمِيٌّ এবং صُلْبِيٌّ আত্মীয় উদ্দেশ্য।

اَلْيَتَامٰى : এটি يَتِيْمٌ -এর বহুবচন। মানুষের মধ্যে যেসব বাচ্চার পিতা মারা যায় এবং প্রাণীদের মধ্যে যেসব বাচ্চার মা মারা যায় তাদেরকে يَتِيْمٌ বলা হয়। وَالْيَتِيْمُ مِنَ الْاٰدَمِيِّيْنَ مِنْ فَقْدِ اَبَاهُ وَمِنْ غَيْرِهِمْ مِنْ فَقْدِ اُمِّهِ

-[জামালাইন খ. ১, পৃ. ১৫৯]

আল্লাহর ইবাদতের পর পিতা-মাতার অনুসরণ ও খেদমতের ব্যাখ্যা : একদিকে প্রকৃত স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা এবং অন্যদিকে সন্তান জন্মের উপকরণ বাহ্যিকভাবে পিতা-মাতা হন। তাই আল্লাহ তা'আলা নিজ হক -এর সাথে পিত-মাতার হক [অধিকার] ও খেদমতকেও বলে দিয়েছেন। আল্লাহর হক-এর অগ্রাধিকার এ দিকে ইঙ্গিতকারী যে, যদি উভয় হক -এর মধ্যে কোনো সময় প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে যায়, তখন প্রথমটিই অগ্রাধিকারযোগ্য থাকবে। এমনিভাবে اَلْاَقْرَبُ فَالْاَقْرَبُ -এর নীতি দ্বারা অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদের অধিকারসমূহেরও শিক্ষাদান করেছেন। এ পর্যন্ত যে, সাধারণ লোকেরাও যেন তোমাদের সাধারণ সহানুভূতি এবং উত্তম ব্যবহার থেকে বঞ্চিত না থাকে; কিন্তু হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.)-এর ন্যায় অনুকরণের প্রতীক ও প্রতিজ্ঞা রক্ষাকারী লোকদের ছাড়া অন্যান্য ইহুদিরা সে অঙ্গীকারের সীমার প্রতি লক্ষ্য রাখেনি এবং প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করা থেকে ফিরে গেছে। এ অঙ্গীকার যদিও বর্তমান ইহুদিদের পূর্বপুরুষদের থেকে নেওয়া হয়েছিল; কিন্তু যেহেতু বর্তমান ইহুদিদের কার্যাবলি তাদের পূর্ববর্তী ইহুদীদের কার্যাবলির সাথে একমত, তাই সম্বোধন ও তিরস্কারের মধ্যে তাদেরকেও অংশীদার গণ্য করা হয়েছে। -[কামালাইন খ. ১, পৃ. ৯১]

قَوْلُهُ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِضَمِّ الْحَاءِ وَسُكُوْنِ السِّيْنِ بِضَمِّ الْحَاءِ : অর্থাৎ এক কেরাতে حُسْنًا শব্দটি মাসদার হিসেবে এসেছে।

قَوْلُهُ وُصِفَ بِهِ لِلْمُبَالَغَةِ : এর দ্বারা একটি سُوَالٌ مُقَدَّرٌ-এর জবাব দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো– মাসদার দ্বারা তো সিফত আনা শুদ্ধ নয়। মুফাসসির (র.) জবাবের প্রতি এভাবে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে مُبَالَغَةً স্বরূপ মাসদাররের মাধ্যমে সিফত আনা হয়েছে। যেমন زَيْدٌ عَدْلٌ

দ্বিতীয় জবাব হলো– এখানে مُضَافٌ উহ্য রয়েছে اَىْ قَوْلاً ذَا حُسْنٍ

قَوْلُهُ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ : এখানে সালাত এবং জাকাত দ্বারা বনি ইসরাইলের প্রতি ফরজকৃত সালাত ও জাকাত উদ্দেশ্য। এখানে তাদের পূর্বপুরুষদের সম্বোধন করা হচ্ছে। কেউ বলেন– এখানে সম্বোধিত গোষ্ঠি হলো নবীযুগের ইহুদীরা এবং সালাত ও জাকাত দ্বারা ইসলামি শরিয়তের সালাত ও জাকাত উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন : এ সূরতে প্রশ্ন হয় যে, ঈমান ব্যতীত সালাত এবং জাকাতের কোনো মূল্য নেই। ইহুদীদেরকে এ **নির্দেশ কিভাবে প্রদান** করা হলো?

উত্তর : এখানে সালাত ও জাকাতের নির্দেশ দ্বারা ঈমান আনয়নের নির্দেশের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

কেউ বলেন, এর দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কাফেরের فُرُوْعِىْ বিধানের মুকাল্লাফ।

قَوْلُهُ فَقَبِلْتُمْ ذٰلِكَ : মুফাসসির (র.) এ অংশটুকু উহ্য ধরে একটি سُوَالٌ مُقَدَّرٌ-এর জবাবের দিকে **ইঙ্গিত করেছেন।**

প্রশ্ন : ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ হলো খবর। পূর্বের সবগুলো বাক্য হলো اِنْشَاءٌ-এর অন্তর্ভুক্ত। তাহলে جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ-এর عَطْفٌ **জুমলায়ে** اِنْشَائِيَّةٌ-এর **সাথে কিভাবে শুদ্ধ** হলো

উত্তর : মুফাসসির (র.) সে **প্রশ্নের জবাবের** দিকে ইঙ্গিত করেছেন এভাবে যে, এখানে مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ **উহ্য** আছে। আর তাহলো فَقَبِلْتُمْ ذٰلِكَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ

সূতরাং عَطْفٌ **সহীহ** আছে।

قَوْلُهُ اَعْرَضْتُمْ عَنِ الْوَفَاءِ : এটি تَوَلَّيْتُمْ-এর তাফসীর অর্থাৎ তোমরা অঙ্গীকার তো গ্রহণ করেছিলে; কিন্তু তা পূর্ণ করা থেকে বিমুখতা প্রদর্শন করেছ।

قَوْلُهُ فِيْهِ الْتِفَاتٌ عَنِ الْغَيْبَةِ : অর্থাৎ পূর্বে بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ غَائِبٌ ছিল। সুতরাং ثُمَّ تَوَلَّوْا বলা উচিত ছিল। **কিন্তু যখন** تَوَلَّيْتُمْ **বলা হয়েছে।** তাই বুঝা গেল এখানে غَيْبَةٌ থেকে خِطَابٌ-এর দিকে اِلْتِفَاتٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ الْمُرَادُ اٰبَائُهُمْ : অর্থাৎ যেহেতু تَوَلَّيْتُمْ-এর মধ্যে غَائِبٌ থেকে خِطَابٌ-এর দিকে اِلْتِفَاتٌ হয়েছে, সেহেতু তার দ্বারা ইহুদীদের পূর্ব পুরুষরা উদ্দেশ্য সমসাময়িক ইহুদিরা উদ্দেশ্য নয়

কেউ বলেন, এখানে সম্বোধন ব্যাপকভাবে হয়েছে উত্তরসূরি-পূর্বসূরি সকলেই তাতে শামিল আছে।

قَوْلُهُ اِلَّا قَلِيْلاً مِنْكُمْ : اَىْ مِنْ اٰبَائِكُمْ অর্থাৎ পূর্বপুরুষদের মধ্যে যারা সঠিক ইহুদি ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

কেউ কেউ বলেন– এখানে নবীযুগের কতিপয় ইহুদি উদ্দেশ্য, যারা ঈমান এনেছিল। যেমন– হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম এবং তাঁর সাথীবৃন্দ।

قَوْلُهُ كَاٰبَائِكُمْ : এর দ্বারা একটি سُوَالٌ مُقَدَّرٌ-এর জবাবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রশ্ন : وَاَنْتُمْ مُعْرِضُوْنَ এবং ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ-এর অর্থ তো একই। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাকরার করা হলো কেন?

উত্তর : উভয়টির সম্বোধিত গোষ্ঠী ভিন্ন ভিন্ন। تَوَلَّيْتُمْ-এর সম্বোধন পূর্বপুরুষদের প্রতি আর وَاَنْتُمْ مُعْرِضُوْنَ-এর সম্বোধন উত্তরসূরি ইহুদিদের প্রতি করা হয়েছে সুতরাং বস্তুত এখানে কোনো তাকরার নেই।

কেউ কেউ বলেন– وَاَنْتُمْ مُعْرِضُوْنَ হলো جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ অর্থাৎ اَىْ وَاَنْتُمْ قَوْمٌ عَادَتُكُمُ الْاِعْرَاضُ

অনুবাদ :

৮৪. وَاذْكُرْ اِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَقُلْنَا لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَاۤءَكُمْ تُرِيْقُوْنَهَا بِقَتْلِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا وَلَا تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ لَا يُخْرِجُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا مِنْ دَارِهِ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ قَبِلْتُمْ ذٰلِكَ الْمِيْثَاقَ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ـ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ ـ

৮৪. আর স্মরণ কর যখন তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম তোমরা পরস্পর রক্তপাত করবে না অর্থাৎ পরস্পরকে হত্যা করে তা [রক্ত] প্রবাহিত করবে না এবং তোমাদের নিজেদেরকে স্বীয় গৃহ হতে বহিষ্কার করবে না অর্থাৎ পরস্পরকে গৃহচ্যুত করবে না অতঃপর তোমরা তা স্বীকার করেছিলে উক্ত অঙ্গীকার গ্রহণ করে নিয়েছিলে আর নিজেদের উপর তোমরাই তার সাক্ষী।

৮৫. ثُمَّ اَنْتُمْ يَا هٰۤؤُلَاۤءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَّاهَرُوْنَ فِيْهِ اِدْغَامُ التَّاءِ فِى الْاَصْلِ فِى الظَّاءِ وَفِىْ قِرَاْءَةٍ بِالتَّخْفِيْفِ عَلٰى حَذْفِهَا تَتَعَاوَنُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ الْمَعْصِيَةِ وَالْعُدْوَانِ ط اَلظُّلْمِ وَاِنْ يَّأْتُوْكُمْ اُسٰرٰى وَفِىْ قِرَاءَةٍ اَسْرٰى تُفْدُوْهُمْ وَفِىْ قِرَاءَةٍ تُفَدُوْهُمْ تُنْقِذُوْهُمْ مِنَ الْاَسْرِ بِالْمَالِ اَوْ غَيْرِهِ وَهُوَ مِمَّا عُهِدَ اِلَيْهِمْ وَهُوَ اَىِ الشَّاْنُ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ مُتَّصِلٌ بِقَوْلِهِ وَتُخْرِجُوْنَ وَالْجُمْلَةُ بَيْنَهُمَا اِعْتِرَاضٌ اَىْ كَمَا حُرِّمَ تَرْكُ الْفِدَاءِ ـ

৮৫. অতঃপর হে ব্যক্তিগণ! তোমরাই তারা, যারা নিজেদের হত্যা করছ একজন অপরজনকে হত্যা করছ এবং তোমাদের নিজেদের এক দলকে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করছ। অন্যায় পাপ ও সীমালঙ্ঘনের মাধ্যমে জুলুমের মাধ্যমে [তোমরা তাদের বিরুদ্ধে পরস্পরকে সহযোগিতা করছ।] যদি তারা তোমাদের নিকট বন্দীরূপে আসে। তখন তাদের মুক্তিপণ দাও। অর্থাৎ তখন তোমরা অর্থ ইত্যাদি দিয়ে তাদেরকে বন্দী দশা হতে মুক্ত করে আন। এটাও তাদের উক্ত অঙ্গীকারভুক্ত একটি বিষয়। অথচ তাদের বহিষ্করণও তোমাদের জন্য অবৈধ ছিল মুক্তিপণ দান পরিত্যাগ করা যেমন অবৈধ ছিল [তেমনি এটাও অবৈধ ছিল।]

تَتَظَاهَرُوْنَ ক্রিয়াটি মূলত تَتَظَاهَرُوْنَ ছিল। দ্বিতীয় ت টিকে ظ অক্ষরে اِدْغَامٌ অর্থাৎ সন্ধিভূত করা হয়েছে। অপর এক কেরাতে تَخْفِيْف অর্থাৎ লঘু আকারেও [تَظَاهَرُوْنَ রূপে ظ -এর তাশদীদ ব্যতীত] পঠিত রয়েছে। اَسْرٰى শব্দটির اَسْرٰى রূপেও অপর এক পাঠ রয়েছে। تُفَادُوْهُمْ ক্রিয়াটি অপর এক কিরাতে تُفْدُوْهُمْ রূপেও পঠিত রয়েছে। هُوَ সর্বনামটি এস্থানে ضَمِيْر شَاْن রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। وَهُوَ .... اِخْرَاجُهُمْ বাক্যটি মূলত تخرجون -এর সাথে সংশ্লিষ্ট। এতদুভয়ের মধ্যবর্তী বাক্যটি (اَنْ يَّاْتُوْكُمْ ....) হলো مُعْتَرِضَةٌ মু'তারিজা বা বিচ্ছিন্ন বাক্য। يَعْلَمُوْنَ ক্রিয়াটি ى [নামপুরুষ] ت দ্বিতীয় পুরুষ] উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَقُلْنَا : মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করলেন যে, لَا تَسْفِكُوْنَ হলো مَحَلًّا مَنْصُوْب এবং উহ্য مَقُوْلَه -এর- قُلْنَا

قَوْلُهُ وَهُوَ اَىِ الشَّاْنُ : وَيُسَمّٰى ضَمِيْرُ الْقِصَّةِ وَلَا يَرْجِعُ اِلَّا عَلٰى مَا بَعْدَهُ وَفَائِدَتُهُ الدَّلَالَةُ عَلٰى تَعْظِيْمِ الْمُخْبَرِ عَنْهُ وَتَفْخِيْمِهِ ـ

قَوْلُهُ وَالْجُمْلَةُ بَيْنَهُمَا الخ : وَهُوَ بَيْنَ الْمَعْطُوْفِ اَىْ بَيْنَهُمَا وَقَوْلُهُ تُفْدُوْهُمْ وَاِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسَارٰى : وَالْجُمْلَةُ هِىَ قَوْلُهُ

قَوْلُهُ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَائَكُمْ : دَمٌ -এর বহুবচন। حَصَاءٌ শব্দটি مل دِمَاءٌ ছিল دِمَاءٌ। اَلِفْ زَائِدَةْ -এরপর وَاوْ হওয়ার কারণে তা হামযা হয়ে গেছে। যেহেতু এ হামযাটি وَاوْ থেকে রূপান্তরিত তাই এটি غَيْرُ مُتَصَرِّفْ হবে না। পক্ষান্তরে اَصْدِقَاءُ ও عُلَمَاءُ উভয়টি শব্দই غَيْرُ مُنْصَرِفْ

قَوْلُهُ تُرِيْقُوْنَهَا : এটি تَسْفِكُوْنَ دِمَائَكُمْ -এর তাফসীর। تَسْفِكُوْنَ ফে'লটি (ض) سَفَكَ থেকে নির্গত। অর্থ প্রবাহিত করা। تُرِيْقُوْنَهَا ফে'লটি اِرَاقَةً - اَرَاقَ [প্রবাহিত করা] থেকে নির্গত।

قَوْلُهُ يَا هٰؤُلَاءِ : মাঝখানে يَاءُ উহ্য ধরে ইঙ্গিত করলেন যে, هٰؤُلَاءِ শব্দটি মহল হিসেবে مُنَادٰى হয়ে মানসূব। তার حَرْفِ نِدَا উহ্য রয়েছে। এ সূরতে نِدَا مُنَادٰى মিলে جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ হবে। আর اَنْتُمْ হবে মুবতাদা এবং تَقْتُلُوْنَ হবে খবর।

قَوْلُهُ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْ دِيَارِهِمْ : এর عَطْفِ হয়েছে تَقْتُلُوْنَ -এর সাথে। আর مِنْ دِيَارِهِمْ -এর মাঝে জমিরটি فَرِيْقًا -এর দিকে ফিরেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে ইহুদিদের একটি অঙ্গীকার ভঙ্গের বিবরণ ছিল। এখানে আরেকটি অঙ্গীকার ভঙ্গের বিবরণ দেওয়া হচ্ছে। সেই সাথে তা এ কথার দাবী করে যে, তোমাদের শাস্তি অস্থায়ী নয়, স্থায়ী হওয়া উচিত।

আলোচ্য বিষয় ও শানে নুযূল : মদীনা শরিফে দুটি ইহুদি গোত্র বাস করত। একটি বনূ কুরাইজা অপরটি বনূ নাজীর। এ উভয় গোত্র পরস্পরে হানাহানি করত। মদীনা শরিফের মুশরিকরাও ছিল দু'দলে বিভক্ত। আওস ও খাজরাজ। এরাও একে অপরের শত্রু ছিল। বনূ কুরায়যা আওস গোত্রের সাথে মৈত্রী স্থাপন করল এবং বনূ নাযীর মৈত্রী স্থাপন করল খাযরাজ গোত্রের সাথে। যুদ্ধ বিগ্রহে প্রত্যেকেই সমমনা ও মিত্রের সাহায্য করত। একে অন্যের উপর জয়ী হতে পারলে দুর্বলদের নির্বাসিত করতো এবং তাদের ঘর-বাড়ি ধ্বংস করে দিত। আবার কেউ বন্দী হলে সকলে মিলে অর্থ সংগ্রহ করত এবং মুক্তিপণ দিয়ে তাকে ছাড়িয়ে আনতো। এ আয়াতে তাদের সে মন্দ কর্মের উল্লেখ করে তা থেকে বারণ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ الخ : অঙ্গীকার নেওয়া এখানেও আদেশ করা অর্থে। এখানে নবীযুগের ইহুদিদের সম্বোধন করা হয়েছে এবং তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের চরিত্রের বর্ণনা করা হচ্ছে। –[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ১৫২]

قَوْلُهُ بِقَتْلِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا : এর দ্বারা একটি سُوَالٌ مُقَدَّرٌ -এর জবাবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রশ্ন : لَاتَسْفِكُوْنَ دِمَائَكُمْ -এর মর্ম তো হলো নিজের রক্ত প্রবাহিত করো না। আর বাস্তবতা হলো কেউ নিজের খুন প্রবাহিত করে না; বরং অন্যের খুন প্রবাহিত করে। তাহলে এখানে নিজের খুন প্রবাহিত করতে নিষেধ করার মর্ম কি?

উত্তর : মুফাসসির (র.) উক্ত প্রশ্নের জবাবে বলেন– এখানে উদ্দেশ্য হলো একে অপরকে হত্যা করে নিজেদের রক্ত প্রবাহিত করো না।

প্রশ্ন : তারপর ইশকাল হয় যে, دِمَائَكُمْ -এর দিকে কতলের اِضَافَتْ করা হলো কেন? بَعْضٌ -এর দিকে اِضَافَتْ না করে

উত্তর : এজন্য যে, دَمُ الْاَخِ كَدَمِ النَّفْسِ অপর ভাইয়ের রক্ত যেন নিজের রক্তের মতই। কেউ বলেন– যে অন্যকে হত্যা করে তাকেও হত্যা করা হয়। এ হিসেবে كُمْ -এর দিক اِضَافَتْ হয়েছে।

প্রশ্ন : আয়াতে চুক্তি অঙ্গীকারের মধ্যে একে অপরকে মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করার কথাও ছিল। এখানে তার আলোচনা নেই কেন?

উত্তর : এ চুক্তিটি তারা পূর্ণ করত, বিধায় তা উল্লেখ করা হয়নি।

قَوْلُهُ ثُمَّ اَنْتُمْ هٰؤُلَاءِ : **যোগসূত্র :** পূর্বে তাদের চুক্তিও অঙ্গীকারের স্বীকারোক্তি বর্ণনা ছিল এ আয়াতে তা ভঙ্গ করার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন : এখানে একটি ইশকাল হয় যে, পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে لَا تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ অর্থাৎ ضَمِيْرِ حَاضِرْ ব্যবহার করা হয়েছে। আর এখানে مِنْ دِيَارِهِمْ বলে ضَمِيْرِ غَائِبْ ব্যবহার করা হয়েছে। এমনটি কেন হলো?

উত্তর : এখানে ضَمِيْرِ غَائِبْ ব্যবহার করার কারণ হলো যদি ضَمِيْرُ حَاضِرْ আনা হতো তাহলে এ সংশয় সৃষ্টি হতো যে, সম্ভবত তাদেরকে মোখাতাবদের বাড়ী থেকে বের করা হয়েছে, অথচ এখানে বহিষ্কৃতদেরকে নিজ ঘর থেকেই বের করা উদ্দেশ্য।

عَلٰى خَذْفِهَا : اَىْ عَلٰى حَذْفِ التَّاءِ الثَّانِيَةِ .

قَوْلُهُ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ : অর্থাৎ অন্যায় ও সীমালঙ্ঘন সহকারে অংশটুকু বাড়িয়ে দিয়ে পবিত্র কুরআন আরো খোলাসা করে দিয়েছে যে, এসব গৃহযুদ্ধ ও পৌত্তলিক-প্রীতি কোনো প্রকার সুখ্যাতি ও সৎ উদ্দীপনা এবং সদিচ্ছা ও ঐকান্তিকতার ভিত্তিতে ছিল না; বরং পার্থিব স্বার্থ পূজারী পেশাদার রাজনীতিকরা সাধারণতঃ যেসব জঘন্য ও পুতিগন্ধময় নীতিহীনতায় নিমজ্জিত থাকে এবং বিশেষত মুশরিকরা যাতে আকণ্ঠ ডুবে ছিল, সে সবই ছিল এ সকল হানাহানির উৎস।

وَكَانَتْ قُرَيْظَةُ حَالَفُوْا الْأَوْسَ وَالنَّضِيْرُ الْخَزْرَجَ فَكَانَ كُلُّ فَرِيْقٍ يُقَاتِلُ مَعَ حُلَفَائِهِ وَيُخَرِّبُ دِيَارَهُمْ وَيُخْرِجُهُمْ فَإِذَا أَسَرُوا أَفْدَوْهُمْ وَكَانُوا إِذَا سُئِلُوْا لِمَ تُقَاتِلُوْنَهُمْ وَتُفْدُوْنَهُمْ قَالُوْا أُمِرْنَا بِالْفِدَاءِ فَيُقَالُ فَلِمَ تُقَاتِلُوْنَهُمْ فَيَقُوْلُوْنَ حَيَاءً أَنْ يَسْتَذِلَّ حُلَفَاؤُنَا قَالَ تَعَالَى أَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَهُوَ الْفِدَاءُ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ - وَهُوَ تَرْكُ الْقَتْلِ وَالْإِخْرَاجِ وَالْمُظَاهَرَةِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ هَوَانٌ وَذُلٌّ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَقَدْ خُزُوْا بِقَتْلِ قُرَيْظَةَ وَنَفْيِ النَّضِيْرِ إِلَى الشَّامِ وَضَرْبِ الْجِزْيَةِ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ إِلٰى أَشَدِّ الْعَذَابِ ط وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ - بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ

٨٦. أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ بِأَنْ آثَرُوْهَا عَلَيْهَا فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ - يُمْنَعُوْنَ مِنْهُ -

অনুবাদ :

মদীনার বনূ কুরাইযা, আউস গোত্রের সাথে এবং বনূ নাযীর খাজরাজ গোত্রের সাথে পরস্পর সহযোগিতামূলক দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। [বনূ কুরাইযা ও বনূ নাযীর উভয় গোত্র ছিল ইহুদি আর অপরদিকে আউস ও খাযরাজ ছিল পরস্পর শত্রু। এদের পরস্পরে যুদ্ধ লেগেই থাকত।] এই যুদ্ধে ইহুদি গোত্র বনু কুরাইযা ও বনূ নাযীর উক্ত সহযোগিতা চুক্তি অনুসারে স্ব স্ব বন্ধু গোত্রের পক্ষ নিত। প্রত্যেক দলই বিপক্ষ দলের ঘর-বাড়ি ধ্বংস করত এবং তাদেরকে গৃহচ্যুত করত। আবার যখন কারো হাতে অন্য দলের কোনো বন্দী হতো উক্ত ইহুদি গোত্রদ্বয় পরস্পর মুক্তিপণ দিয়ে তাদেরকে মুক্ত করে আনত। যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হতো যে, কেনই বা লড়াই করলে আর কেনই বা পণ দিয়ে মুক্ত করে আনলে? তারা বলত, আমাদের মুক্তিপণের আদেশ করা হয়েছে। যদি বলা হতো তবে এদের সাথে লড়াই বাধাও কেন? তারা বলত, আমাদের সাথে চুক্তি আবদ্ধ বন্ধুগণ লাঞ্ছিত হবে এই লজ্জায় আমরা যুদ্ধ করি। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে মুক্তিপণের বিধানে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে হত্যা, বহিষ্কার ও অন্যায়কর্মে সহযোগিতা বর্জন করার বিধান প্রত্যাখ্যান কর? সুতরাং তোমাদের যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র ফল পার্থিব জীবনের হীনতা লাঞ্ছনা ও হেয়তা। তারা বাস্তবিকই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছিল। কুরাইযাকে করা হয়েছিল হত্যা আর বনূ নাযীরকে করা হয়েছিল শামের দিকে বহিষ্কার এবং তাদের উপর ধার্য করা হয়েছিল জিযিয়া কর। আর কিয়ামতের দিন তারা কঠিনতম শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত হবে। তারা যা করে, আল্লাহ তা'আলা সে সম্বন্ধে অনবহিত নন।

৮৬. তারাই পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করে নিয়েছে অর্থাৎ পরকালের উপর এটাকে প্রাধান্য দিয়েছে। সুতরাং তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তারা কোনো সাহায্যও পাবে না। অর্থাৎ তা হতে তাদেরকে রক্ষা করাও হবে না।

তাহকীক ও তারকীব

تَظَاهَرُوْنَ ক্রিয়াটি মূলত تَتَظَاهَرُوْنَ ছিল। দ্বিতীয় ت টিকে ظ অক্ষরে اِدْغَامْ অর্থাৎ সন্ধিভূত করা হয়েছে। অপর এক কেরাতে تَخْفِيْف অর্থাৎ লঘু আকারেও [تَظَاهَرُوْنَ রূপে ظ -এর তাশদীদ ব্যতীত] পঠিত রয়েছে। اَسْرٰى শব্দটির اَسْرٰى রূপেও অপর এক পাঠ রয়েছে। تُفَادُوهم ক্রিয়াটি অপর এক কিরাতে تَفْدُوْهُمْ রূপেও পঠিত রয়েছে। هُوَ সর্বনামটি এস্থানে ضَمِيْر شَانْ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। وَهُوَ ـ اِخْرَاجُهُمْ বাক্যটি মূলত تَخْرُجُوْنَ -এর সাথে সংশ্লিষ্ট। এতদুভয়ের মধ্যবর্তী বাক্যটি (اَنْ يَاْتُوْكُمْ ....) হলো مُعْتَرِضَةٌ মু'তারিজা বা বিচ্ছিন্ন। বাক্য। يَعْلَمُوْنَ ক্রিয়াটি ى [নামপুরুষ] এবং ت দ্বিতীয় পুরুষ] উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : আল্লাহ তা'আলা **ইহুদিদের যে অঙ্গীকার পূর্বের** আয়াতে আলোচনা করেছেন। এ আয়াতে সে অঙ্গীকারের পরিপূর্ণতা রয়েছে। আর তারপর তাদের **অঙ্গীকার ভঙ্গের আলোচনা করেছে** এবং সর্বশেষে তাদের শাস্তির চিত্র আঁকা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَكَانَتْ قُرَيْظَةُ : এখানে **থেকে মুফাসসির (র.)** ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করছেন এবং মোটামুটি পূর্ণ ঘটনাই সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন।

قَوْلُهُ اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ : বর্ণনাধারায় كِتَابٌ দ্বারা এখানে ইহুদিদেরই আসমানি কিতাব তাওরাত উদ্দেশ্য। **ইহুদিদের বিপক্ষে পরোক্ষ অভিযোগ সাব্যস্ত হচ্ছে যে, কুরআনকে বিশ্বাস** করার কথা তো স্বতন্ত্র ব্যাপার তোমরা তাওরাতের **আনুগত্যই বা কবে করেছ?** বরং তোমাদের বড় হুজুররা যেরূপ দুঃসাহসিকতায় তাওরাতের কোনো কোনো বিধান লঙ্ঘন করে **আসছে,** তাতে তো দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ কথা বলা যায় যে, তোমাদের ঈমান নেই। ঈমানে তো বিভক্তি সম্ভব নয়। কাজেই কতক বিধানকে অস্বীকারকারীও পূর্ণ কাফেরই গণ্য হবে। কতক বিধানে ঈমান আনার দ্বারা ঈমান লাভ হবে না মোটেই।

এ আয়াত দ্বারা স্পষ্ট জানা গেল যে, কোনো ব্যক্তি যদি শরিয়তের কতেক বিধান মেনে চলে এবং যেসব বিধান তার স্বভাব চরিত্র বা স্বার্থ বিরোধী হয়, তা মানতে দ্বিধা করে, তাহলে কতককে মেনে চলার দ্বারা তার কোনো উপকার লাভ হবে না।

فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَفْعَلُ ذٰلِكَ اِلَّا خِزْيٌ الخ : অর্থাৎ যারা এরূপ করে অর্থাৎ কতেক বিধান মানে এবং কতেক অস্বীকার করে, তাদের শাস্তির বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে।

এ ভবিষ্যদ্বাণী অল্প দিনের ব্যবধানে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছিল। হিজাযে ইহুদি তিনটি প্রতাপশালী গোত্র বনূ নাযীর, বনূ কুরায়যা ও বনূ কায়নুকার অধিবাস ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানে, বিদ্যা-প্রযুক্তি ও শক্তি-সম্পদ-প্রতিপত্তির অধিকারী তিন গোত্রই অল্প কয়েক বছরের সময়সীমায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হায়াতকালেই চরম ধ্বংসের শিকার হয়।

[বিস্তারিত বিবরণ কুরআনের আলোকে ইহুদি সম্প্রদায় বইয়ে রয়েছে।]

প্রতিজ্ঞার অবশিষ্ট কিস্তিসমূহের ব্যাখ্যা : সারকথা হলো– সে প্রতিজ্ঞার তিনটি অতিরিক্ত কিস্তি এ ছিল–

১. পরস্পরে খুনাখুনি করবে না।

২. কাউকে দেশান্তর করবে না।

৩. যদি কেউ বন্দী হয়ে যায়, তবে আর্থিক বিনিময় দিয়ে তাকে মুক্ত করাবে। অতএব উক্ত তিনটি কিস্তির মধ্যে অতি সহজ ছিল তৃতীয় কিস্তিটি। এর উপর তো কিছু আমল করছ; কিন্তু প্রথম দুটি কিস্তি যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি ছিল। এগুলোকে একেবারে ছেড়ে দিয়েছ এবং লক্ষণীয় মনে করলে না।

সুতরাং আউস ও বনূ কুরায়যা পরস্পর বন্ধু ছিল এবং খাযরাজ ও বনূ নাযীর পরস্পর সাহায্যকারী ছিল। আউস ও খাযরাজ এর মধ্যে যখন কখনো যুদ্ধ হতো, তখন বনূ কুরায়যা আউসের এবং বনূ নযীর খাযরাজের সহযোগী ও সাহায্যকারী হয়ে যেত।

অতএব সে যুদ্ধগুলোর মধ্যে হত্যা ও দেশান্তর উভয় বিপদ সম্মনে আসত, যে কারণে সকলে ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে থাকতো। হ্যাঁ, যুদ্ধ বন্দীদেরকে বড়ই আগ্রহের সাথে আর্থিক বিনিময় দিয়ে মুক্ত করত এবং বলত যে, এটা আল্লাহর নির্দেশ। কিন্তু যদি কেউ হত্যা, লুটতরাজ ও দেশ থেকে বিতাড়িত করার ব্যাপারে কোনো আপত্তি করত। তখন নিজ মৈত্রী ও বন্ধুদের থেকে লজ্জাকে গোপন করার চেষ্টা করতো। আল্লাহ তা'আলা সে দ্বিমুখী ষড়যন্ত্রের সমালোচনা করছেন যে, এমনভাবে যখন তোমরা এক গোত্রের সহানুভূতি ও সাহায্য কর, তখন অন্য গোত্রের বিরোধিতা ও ক্ষতি সাধনও তো অপরিহার্য হয়ে পড়ে এবং এর মধ্যে আল্লাহর হুকুমকেও লঙ্ঘন করা হয় আর মানুষকে কষ্ট দেওয়া হয়। এটাকেই أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক বিনিময়ের আমলটি যদি আল্লাহর হুকুমের কারণে কর, তবে হত্যা ও দেশ থেকে বিতাড়িত না করাও তো খোদায়ী বিধান! এর উপর আমল কেন করা হচ্ছে না? হুকুমের এক অংশকে মানা এবং অন্য অংশকে অস্বীকার কেন? অবশেষে এটা কোন মনগড়া ঠাট্টা। -[কামালাইন খ. ১, পৃ. ৯৪]

সংশয় ও তার নিরসন : كُفْر দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য ব্যবহারিক কুফর। কোনো বদ আমলকে ঘৃণা যোগ্য ও ঘৃণিত রূপে পেশ করার জন্য নিকৃষ্টতম শব্দসমূহ ব্যবহার করা হয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য প্রকৃত বাস্তবতা নয়; বরং রূপক অর্থ উদ্দেশ্য হয় مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ -এর মধ্যে সে অর্থই উদ্দেশ্য। এ স্থানে ইহুদিদের মধ্যে যদিও বিশ্বাস পোষণে কুফরও পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এ সময় উদ্দেশ্য তাদের সে বদ আমলের মন্দতা প্রকাশ করা। অতএব মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের জন্য এ আয়াত দ্বারা কবীরা গুনাহকারীকে ঈমানের সীমা থেকে বহিষ্কার করা এবং খারিজি সম্প্রদায়ের জন্য কবীরা গুনাহকারীকে কুফরে শামিল করার জন্য দলীল পেশ করার কোনো সুযোগ নেই। কেননা কুফর এর প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য নয়।

সংশয় ও তার নিরসন : عَلٰى هٰذَا اَشَدَّ الْعَذَابِ -এর ক্ষেত্রে ইমাম রাযী (র.) এ সন্দেহ করেছেন যে ইহুদিরা বেশির চেয়ে বেশি কাফের ছিল। তাদের শাস্তিকে যখন اَشَدّ [কঠিনতম] বলা হয়েছে। তবে দাহ্‌রিয়া সম্প্রদায় যারা ইহুদিদের চেয়েও অধিক অপরাধী। কেননা তারা সরাসরি আল্লাহকেই অস্বীকার করে। তাদের শাস্তি কিভাবে কম হবে?

আল্লামা আলুসী (র.) রূহুল মা'আনীতে এর উত্তর এভাবে দিয়েছেন যে, اَشَدِّيَّتْ দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান উদ্দেশ্য নয় যে, مُفَضَّلْ এবং مُفَضَّلٌ عَلَيْهِ -এর প্রয়োজন হবে। বরং اَشَدِّيَّتْ দ্বারা উদ্দেশ্য চিরস্থায়ী ও সর্বদা শাস্তি যা কাফির ও মুশরিক এবং দাহরিয়া সকলের জন্য হবে। অথবা কাফের থেকে নিম্ন শ্রেণির লোকদের প্রতি লক্ষ্য করে اِضَافِىْ اَشَدِّيَّتْ উদ্দেশ্য।

মোটকথা : দুনিয়াবী শাস্তি, লাঞ্ছনা ও অবমাননা ইহুদিদের উপর এভাবে হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ -এর বরকতময় জীবদ্দশায়ই অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে চতুর্থ হিজরিতে যখন রাসূল ﷺ -এর সত্তার উপর আউস ও খাযরাজ ইসলাম গ্রহণ করেছে, তখন হযরত সা'আদ ইবনে মুআয (রা.) এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বনূ কোরায়যার সাতশত যুবককে হত্যা করা হয়েছে এবং মহিলাও শিশুদেরকে বন্দী করা হয়েছে। বনু নযীরকে সিরিয়ার দিকে বহিষ্কার করা হয়েছে। সূরা আহ্‌যাব এবং সূরা হাশরের মধ্যে উল্লিখিত দুটি ঘটনার বাস্তবতা বিদ্যমান আছে। আর পরকালে শাস্তি দেওয়ার ওয়াদা পরকালে পতিত হবে।

-[কামালাইন খ. ১, পৃ. ৯৪]

অনুবাদ :

٨٧. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ التَّوْرٰةَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ ط اَيْ اَتْبَعْنَاهُمْ رَسُوْلًا فِيْ اَثَرِ رَسُوْلٍ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ الْمُعْجِزَاتِ كَاِحْيَاءِ الْمَوْتٰي وَاِبْرَاءِ الْاَكْمَهِ وَالْاَبْرَصِ وَاَيَّدْنٰهُ قَوَّيْنَاهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ مِنْ اِضَافَةِ الْمَوْصُوْفِ اِلَى الصِّفَةِ اَىِ الرُّوْحِ الْمُقَدَّسَةِ جِبْرَائِيْلَ لِطَهَارَتِهٖ يَسِيْرُ مَعَهٗ حَيْثُ سَارَ فَلَمْ تَسْتَقِيْمُوْا اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ بِمَا لَا تَهْوٰى تُحِبُّ اَنْفُسُكُمْ مِنَ الْحَقِّ اسْتَكْبَرْتُمْ عَنْ اتِّبَاعِهٖ جَوَابُ كُلَّمَا وَهُوَ مَحَلُّ الْاِسْتِفْهَامِ وَالْمُرَادُ بِهِ التَّوْبِيْخُ فَفَرِيْقًا مِنْهُمْ كَذَّبْتُمْ كَعِيْسٰى وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ . الْمُضَارِعُ لِحِكَايَةِ الْحَالِ الْمَاضِيَةِ اَىْ قَتَلْتُمْ كَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى .

৮৭. এবং নিশ্চয় মূসাকে কিতাব তাওরাত প্রদান করেছি এবং তার পরে পর্যায়ক্রমে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি এক রাসূলের পিছনে অপর রাসূলকে প্রেরণ করেছি এবং মারইয়াম তনয় ঈসাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট প্রমাণ অর্থাৎ মৃতকে জীবন দান, জন্মান্ধ ও শ্বেত-কুষ্ঠ রুগীর রোগমুক্ত করার মতো বহু মু'জিজা প্রদান করেছি। এবং পবিত্র আত্মা দ্বারা তার শক্তি যুগিয়েছি অর্থাৎ তাকে শক্তিশালী করেছি। رُوْحُ الْقُدُسْ অর্থ হযরত জিবরাঈল (আ.)। সাতিশয় পবিত্রতার জন্য তাকে এই নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। যে স্থানেই হযরত ঈসা (আ.) গমন করতেন হযরত জিবরাঈল (আ.) সঙ্গে থাকতেন। যা হোক এসব কিছু সত্ত্বেও তারা [ইহুদিরা] সত্য পথে কায়েম থাকল না। তবে কি যখনই কোনো রাসূল তোমাদের নিকট সত্য ও ন্যায়ের এমন কিছু এনেছে, যা তোমাদের মনঃপূত নয় তোমাদের পছন্দ নয় তখনই তোমরা অহংকার করেছ অর্থাৎ তা অনুসরণ করা হতে অহংকার প্রদর্শন করেছ। এটা (اِسْتَكْبَرْتُمْ) পূর্বোল্লিখিত كُلَّمَا -এর জবাব। প্রশ্নতব্য বিষয়টিও এটাই। প্রশ্নের মাধ্যমে তাদের তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করাই হলো মূল উদ্দেশ্য। এবং তাদের কতেককে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে যেমন হযরত ঈসা (আ.)-কে আর কতেককে হত্যা করেছে যেমন হযরত জাকারিয়া ও ইয়াহইয়া (আ.) -কে।

رُوْحُ الْقُدُسْ শব্দটিতে صِفَةٌ বিশেষণ-এর প্রতি مَوْصُوْف [বিশেষিতব্য] -এর اِضَافَتْ বা সম্বন্ধ সূচিত হয়েছে। মূলত ছিল اَلرُّوْحُ الْمُقَدَّسَةُ পবিত্র আত্মা। [اَلرُّوْحُ হলো مَوْصُوْف আর اَلْمُقَدَّسَةُ হলো صِفَةٌ বা বিশেষণ]।

تَقْتُلُوْنَ ক্রিয়াটি مُضَارِعْ বা বর্তমান কালবাচক। অতীতে সংঘটিত বিষয়টিকে বর্তমান ঘটমানরূপে চিহ্নিত করে বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে এ স্থানে এরূপ ব্যবহার হয়েছে।

٨٨. وَقَالُوْا لِلنَّبِيِّ اِسْتِهْزَاءً قُلُوْبُنَا غُلْفٌ جَمْعُ اَغْلَفَ اَىْ مُغَشَّاةٌ بِاَغْطِيَةٍ فَلَا نَعِىْ مَا تَقُوْلُ قَالَ تَعَالٰى بَلْ لِلْاِضْرَابِ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ اَبْعَدَهُمْ عَنْ رَحْمَتِهٖ وَخَذَلَهُمْ عَنِ الْقَبُوْلِ بِكُفْرِهِمْ وَلَيْسَ عَدَمُ قَبُوْلِهِمْ لِخَلَلٍ فِىْ قُلُوْبِهِمْ فَقَلِيْلًا مَا يُؤْمِنُوْنَ . مَا زَائِدَةٌ لِتَاكِيْدِ الْقِلَّةِ اَىْ اِيْمَانُهُمْ قَلِيْلٌ جِدًّا .

৮৮. তারা নবীকে উপহাস করে বলে আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত, সুতরাং তুমি যা বল তা সংরক্ষণ করতে পারি না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন বরং সত্য প্রত্যাখ্যানের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের লা'নত দিয়েছেন তাঁর রহমত হতে তাদেরকে বিতাড়িত করেছেন এবং সত্য গ্রহণ হতে তাদেরকে বঞ্চিত করেছেন। তাদের এই প্রত্যাখ্যান হৃদয়ের গঠন-ত্রুটির জন্য নয়। সুতরাং তাদের অল্প সংখ্যকই বিশ্বাস করে অর্থাৎ তাদের ঈমান অতি সামান্যই।

غُلْفٌ শব্দটি اَغْلَفُ -এর বহুবচন। অর্থাৎ পর্দায় আবৃত।

بَلْ لَعَنَهُمْ : এ স্থানে بَلْ শব্দটি اِضْرَابْ বা প্রসঙ্গ পরিবর্তন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। قَلِيْلًا مَا -এর مَا শব্দটি زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত। قِلَّةٌ বা সংখ্যাল্পতার تَاكِيْد বা জোর সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এর ব্যবহার হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا : وَاوْ হরফে আতফ, لَامْ উহ্য কসমের জবাবের উপর দাখিল হয়েছে এবং হরফে قَدْ حَرْف تَحْقِيق

قَفَّيْنَا : مَاضِى جَمْع مُتَكَلِّمْ -এর সীগাহ। تَقْفِيَة (تَفْعِيْل) قَفٌ পিছনে পাঠানো। قَفٌ ফেয়েলটি দু'টি **مَفْعُوْل** দাবি **করে। সাধারণত তার** مَفْعُوْل -এর উপর حَرْف جَرّ দাখিল হয় না। যেমন– قَفَّيْتُ زَيْدًا عَمْرًوا অর্থাৎ আমি যায়েদকে **ওমরের পিছনে প্রেরণ** করেছি। কখনো দ্বিতীয় مَفْعُوْل -এর উপর بِ দাখিল। কুরআন শরীফে এরূপ ব্যবহার রয়েছে। **যেমন–** وَقَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ অর্থাৎ আমি তার পরে রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছি।

قَوْلُهٗ اَلْبَيِّنَاتُ : উজ্জ্বল স্পষ্ট নিদর্শন। অলৌকিক ঘটনাবলি ও মু'জিজাসমূহ সবই অন্তর্ভুক্ত। কেউ কেউ এর দ্বারা **ইঞ্জিল শরীফ ও উদ্দেশ্য নিয়েছেন।**

قَوْلُهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ : হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর উপাধি। তদ্রূপ তার নাম اَلرُّوْحُ الْاَمِيْنُ -ও। যিনি সর্বদা **হযরত ঈসা (আ.) -এর সাথে থাকতেন। অথবা** 'রূহুল কুদুস' দ্বারা ইসমে আযম বুঝানো হয়েছে, যার বরকতে তিনি মৃতদের জীবিত **করতেন।**

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করার জঘন্যতম অপরাধ সম্পর্কে আলোচনা ছিল। এখানে তার চেয়ে জঘন্যতম অপরাধ তথা নবীদের হত্যা করার আলোচনা এসেছে।

قَوْلُهٗ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ : عِيْسٰى বনী ইসরাঈল নবুয়তধারার তিনি শেষ নবী। ঈসায়ী বর্ষ [ঈসাব্দ ও খ্রিস্টাব্দ] তাঁরই **নামে প্রচলিত**। তাঁর পরে শুধু মুহাম্মদী নবুয়তের অবশিষ্ট ছিল। শাম দেশের [বর্তমান সিরিয়া-ফিলিস্তিন] গালীল [পার্বত্য] অঞ্চলে **নাসিরা নামক স্থানে** ছিল তার পিতৃপুরুষের আবাস। তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের এক প্রান্তে জন্মলাভ করেছিলেন।

শাম দেশে তখন রোম সাম্রাজ্যের অধীন একটি আধা স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল ছিল। হেরোদ ছিল তখনকার শামের শাসক [রাজা]। **খ্রিস্ট বর্ষপঞ্জীতে** শুরু থেকেই তিন বছরের ভুল চলে আসছে। অর্থাৎ খ্রিস্ট বর্ষপঞ্জীর প্রথম বছর হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম **সন নয়; বরং তিন বছর** পরে তার জন্ম সন। সুতরাং বলা যায় যে, ৩য় খ্রিস্টাব্দে তার জন্ম। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের **বিশ্বাস মতে ৩৩ বছর** বয়সে তিনি জীবিত অবস্থায় [আর খ্রিস্টানদের মতে তিন দিন মৃত থাকার পর] আকাশে উত্থিত হয়েছেন।
–[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ১৫৫-১৫৬]

قَوْلُهٗ مَرْيَمَ : মারইয়াম বিনতে ইমরান ইবনে মাশান ইহুদি সম্প্রদায়ের একটি অভিজাত পরিবারের কন্যা ছিলেন। তিনি ছিলেন **অত্যন্ত বিদুষী**, সতী ও রূপসী সুন্দরী। খ্রিস্ট বর্ণনা মতে তাঁর মৃত্যু সন ৪৮ খ্রিস্টাব্দ। –[প্রাগুক্ত]

قَوْلُهٗ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ : মারইয়ামের পুত্র দ্বারা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ.) তার নবীসুলভ মাহাত্ম্য **সত্ত্বেও** একজন মানব সন্তানই ছিলেন, একজন [সাধারণ] নারীর গর্ভে তার জন্ম। সুতরাং তিনি খোদা [ঈশ্বর] বা ঈশ্বর তুল্য বা **ঈশ্বর** পুত্র– এ সবের কিছুই ছিলেন না।

قَوْلُهٗ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ الخ : এখানে প্রশ্ন হয় যে, পূর্বের ইবারত قَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ -এর মধ্যে তো হযরতঈসা (আ.) শামিল ছিলেন। তারপর বিশেষভাবে তাঁর কথা উল্লেখ করা হলো কেন?

উত্তর :

১. হযরত ঈসা (আ.)-এর অতিরিক্ত মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণে تَخْصِيْصٌ بَعْدَ التَّعْمِيْمِ করা হয়েছে।

২. যেহেতু তিনি স্বতন্ত্র শরিয়তের অধিকারী ছিলেন তাই ভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ اَيَّدْنَاهُ : শক্তি যোগান। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, হযরত ঈসা (আ.) মানুষ হওয়ার কারণে আল্লাহ তা'আলার **সাহায্যের মুখাপেক্ষী** ছিলেন এবং সে সাহায্য একজন ফেরেশতার মাধ্যমে তাকে দেওয়া হয়।

قَوْلُهُ اَيَّدْنَاهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ : উক্ত ইবারতের মাধ্যমে মুফাসসির (র.) একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন যে, জিবরাঈল (আ.) তো সকল নবীকেই শক্তি যুগিয়েছে। তাহলে এখানে বিশেষভাবে হযরত ঈসা (আ.)-এর কথা বলা হলো কেন?

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শিশুকাল থেকে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে সাহায্য করেছেন। এখানে তা-ই বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ جَوَابُ كُلَّمَا : অর্থাৎ اِسْتَكْبَرْتُمْ হলো كُلَّمَا مُتَضَمِّنْ شَرْط -এর جَوَاب

قَوْلُهُ وَهُوَ مَحَلُّ الْاِسْتِفْهَامِ وَالْمُرَادُ بِهِ التَّوْبِيْخُ : এই আয়াতের মাঝে اِسْتَكْبَرْتُمْ . مَحَلْ اِسْتِفْهَامْ অর্থাৎ অহংকার সম্পর্কেই প্রশ্নটি হয়েছে। আর اِسْتِفْهَامْ টি হলো اِسْتِفْهَامْ تَوْبِيْخِيْ। কেননা জানতে চাওয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলার প্রশ্ন করাটা অসম্ভব। তাঁর প্রশ্ন করাটা ধমক বা সতর্কীকরণ স্বরূপই হয়ে থাকে। অর্থাৎ ধমক ও ভৎর্সনা করা হচ্ছে যে, অহংকার কেন করলে?

فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ : গুরুত্ব বুঝানো বা আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে মাফউলকে মুকাদ্দাম করা হয়েছে। আর কতল গুরুত্বপূর্ণ ও জঘন্য হওয়া সত্ত্বেও تَكْذِيْبْ -কে আগে আনার কারণ হলো ইহুদিদের অবাধ্যতার সূচনা হয়েছে تَكْذِيْبْ দ্বারা। এ ছাড়াও تَكْذِيْبْ -এর সম্পর্ক সকল নবীর সাথেই রয়েছে। আর قَتْل বিশেষ বিশেষ নবীর সাথে।

قَوْلُهُ الْمُضَارِعُ لِحِكَايَةِ الْحَالِ الْمَاضِيَةِ : এই ইবারতটুকু বৃদ্ধি করে মূলত একটি سُوَالْ مُقَدَّرْ [উহ্য প্রশ্ন]-এর জবাব দিয়েছেন। যার মর্ম এই যে, تَقْتُلُوْنَ মুজারের শব্দ দ্বারা বুঝা যায় ইহুদিরা এই আয়াত নাজিল হওয়ার সময়ও নবীদেরকে হত্যা করছিল। অথচ এটা বাস্তবের পরিপন্থি। উচিত ছিল قَتَلْتُمْ ব্যবহার করা।

উত্তর : এখানে জঘন্যতা বুঝানোর জন্য অতীতকে مُضَارِعْ -এর স্থানের রাখা হয়েছে। যেন নবী হত্যার ঘটনা বর্তমানেও দৃষ্টির সামনে রয়েছে। এটাকেই حِكَايَتْ حَالْ مَاضِيَةْ বলা হয়।

قَوْلُهُ كَزَكَرِيَّا : হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর হত্যার ঘটনা : ইহুদিরা বায়তুল মুকাদ্দাসের গভর্নরের কাছে হযরত জাকারিয়া (আ.) সম্পর্কে নানা মিথ্যা কথা বলে গভর্নরকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে। ফলে সে হযরত জাকারিয়া (আ.)-কে ধাওয়া করে। হযরত জাকারিয়া (আ.) জঙ্গলের দিকে চলে যান এবং একটি বৃক্ষের ফাঁকে আত্মগোপন করেন ঘটনাক্রমে তাঁর চাদরের একটি কোনা বাইর থেকে দেখা যাচ্ছিল। হতভাগারা সংবাদ পেয়ে বৃক্ষসহ নবীকে চির শহীদ করে ফেলে। -[হাশিয়ায়ে ছাবী খ. ১. পৃ. ৬০]

قَوْلُهُ وَيَحْيٰى : হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর হত্যার ঘটনা : এক অসৎ নারীকে তার কোনো এক মাহরাম আত্মীয় বিবাহ করতে চাইলে হযরত ইয়াহইয়া (আ.) তাকে বারণ করেন। ফলে সে তাঁকে শহীদ করে ফেলে। বর্ণনায় রয়েছে সে লোকটি বায়তুল মুকাদ্দাসের গভর্নর ছিল। -[প্রাগুক্ত]

قَوْلُهُ وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ : যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতসমূহে পূর্ববর্তী নবী ও আসমানী কিতাবের সাথে ইহুদিদের আচরণের বিবরণ ছিল। এখানে রাসূল ﷺ এবং পবিত্র কুরআনের সাথে তাদের আচরণের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে।

قَوْلُهُ وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ : অর্থাৎ ইসলামের দাওয়াত আমাদের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারবে না। ইহুদিরা প্রকাশ্যে ও গর্বভরে বলে বেড়াত যে, এ নতুন নবী যা কিছুই করে ফেলুক না কেন, আমরা তার কথায় পড়ছি না।

غُلْفٌ : এর কয়েকটি অর্থ রয়েছে-

১. এটি غِلَافٌ [আচ্ছাদন] -এর বহুবচন। তখন অর্থ হবে, আমাদের হৃদয়গুলো জ্ঞানভাণ্ডার, যা হযরত মূসা (আ.) তথ্য ও তত্ত্বে পরিপূর্ণ। কাজেই নতুন কোনো তালীম গ্রহণে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই তোমার কাছে শেখার আমাদের প্রয়োজন নেই। আমাদের কাছে যা আছে, তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

২. কেউ কেউ বেলছেন- এটি اَغْلَفُ -এর বহুবচন। অর্থ- খতনা করা হয়নি যার। -[রাগিব]

قَوْلُهُ لَا تَعِيْ : وَعَايَةً (ض) وَعٰى সংরক্ষণ করা قَوْلُهُ تَحْفَظُ مَا تَقُوْلُهُ اَيْ لَا

قَوْلُهُ قَالَ تَعَالٰى : এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, بَلْ لَعَنَهُمُ الخ এটা আল্লাহর তা'আলার বাণী।

قَوْلُهُ لِلْاِضْرَابِ : অর্থাৎ بَلْ لَعَنَهُمُ الخ -এর মধ্যে بَلْ শব্দটি اِنْتِقَالْ বা প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা তাদের পূর্বের বক্তব্য খণ্ডন করা উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন : এখানে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ তা'আলাই যেহেতু তাদেরকে লানত করেছেন ফলে তারা ঈমান আনছে না। তাহলে তাদের দোষ কোথায়?

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে প্রথম থেকে হক গ্রহণেরযোগ্যতা দিয়েছিলেন; কিন্তু পরবর্তীতে কুফরীর কারণে আল্লাহ তা নষ্ট করে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ بَلْ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ : ইহুদিদের গর্বোদ্ধত উক্তির স্পষ্ট জবাব দিয়ে পবিত্র কুরআন বলছে যে, সুরক্ষিত হওয়ার ব্যাপারে তাদের এত আত্মম্ভরিতা তা বাস্তবে কোনো গর্ব-গৌরবের বিষয় নয়; বরং তা লক্ষণ হচ্ছে সত্য থেকে দূরে সরে যাওয়ার ও ন্যায় থেকে তাদের দূরত্বে অবস্থান নেওয়ার। এটাই লানতের মূলকথা। অর্থাৎ অন্তর জ্ঞানে পরিপূর্ণ থাকার কারণে তারা কুরআনী হেদায়েত গ্রহণ করেছেন। বিষয়টি এমন নয় এবং মূল কারণ হলো আল্লাহ তাদেরকে লানত করেছেন।

قَوْلُهُ بِكُفْرِهِمْ : কুফরির কারণে। বলে দেওয়া হলো যে, এ অভিশাপ ও গজবের শিকার হওয়া তাদের সজ্ঞান কুফরির কারণ এবং আল্লাহ তা'আলার নবীর বিরোধিতা ও হঠকারিতায় গোয়ার্তুমির কারণে হবে। ب [বা] অব্যয়টি কারণ ও উৎসবোধক। অর্থাৎ তাদের কুফরির কারণে اَىْ بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ

فَقَلِيْلًا مَا يُؤْمِنُوْنَ : [আর এ নামমাত্র অল্প ঈমান নাজাতের জন্য যথেষ্ট নয়।] এখানে অল্প (قَلِيْل) ঈমানের গুণবাচক; অর্থাৎ لَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا بِقَلِيْلٍ مِمَّا كُلِّفُوْا بِهٖ অর্থাৎ তাদের জন্য ধার্যকৃত বিষয়ের অল্পতেই তারা ঈমান রাখে।

কেউ ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে, এখানে فَاء হলো سَبَبِيَّتْ বা কারণদর্শানের জন্য। অর্থাৎ আল্লাহর লানতের কারণে তারা ঈমান আনতে পারে না। তাই খুব কম সংখ্যক লোকই ঈমান আনে যাদের অন্তর ঠিক আছে।

قَلِيْلًا : উহ্য মাসদারের সিফত। اَىْ اِيْمَانًا قَلِيْلًا

কেউ কেউ বলেন– زَمَانًا মওসুফের সিফত। اَىْ زَمَانًا قَلِيْلًا

কেউ কেউ বলেন– يُؤْمِنُوْنَ থেকে حَالْ হয়েছে। اَىْ يُؤْمِنُوْنَ حَالَ كَوْنِهِمْ جَمْعًا قَلِيْلًا

قَوْلُهُ وَمَا زَائِدَةٌ : مَا يُؤْمِنُوْنَ -এর مَا বাক্যবিন্যাসে অতিরিক্ত (زَائِدَة) অর্থে তা ঈমানের স্বল্পতাকে জোরদার করছে। অর্থাৎ খুবই অল্প ঈমান।

অবশ্য قَلِيْلًا শব্দ [يُؤْمِنُوْنَ হতে নির্গত] مُؤْمِنٌ -এর গুণবাচকও হতে পারে। তখন অর্থ দাঁড়াবে– তাদের স্বল্প সংখ্যকই ঈমান গ্রহণ করে। পূর্বসূরী [মুফাসসির]-গণের অনেকে এ অর্থও ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ لَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلٌ তাদের অল্প সংখ্যকই ঈমান আনে।

কেউ কেউ বলেছেন, তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে, তারা কম;ই কিন্তু আরবি বাচনভঙ্গিতে قَلِيْل শব্দের ব্যবহার সরাসরি ও সম্পূর্ণ নাস্তি বুঝাবার জন্যও হয়। স্বল্পতা নাস্তি অর্থেও হতে পারে। এ ব্যাখ্যানুসারে অর্থ হবে– ওরা সম্পূর্ণ ঈমানশূন্য।

قَوْلُهُ اِيْمَانُهُمْ قَلِيْلٌ جِدًّا : মুফাসসির (র.) এ ইবারতের দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে স্বল্পতা হলো مُؤْمَنٌ بِهٖ -এর দিক থেকে। আর সেটি হলো কিতাবের আংশিকের প্রতি তাদের ঈমান।

'আল্লাহর দেওয়া শক্তি ব্যতীত মু'জিযাসমূহও কার্যকর নয়' -এর ব্যাখ্যা : হযরত মূসা (আ.) ও ঈসা (আ.) এবং হাজার হাজার উচ্চমর্যাদাশীল নবী ও রাসূলগণ যে সকল দল বা জামাতে আগমন করেছেন এবং হাজার হাজার প্রমাণাদি ও মু'জিযাসমূহ আর আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহ দেখিয়েছেন এবং তারপরও তারা সঠিক পথে আসতে পারেনি, তবে তাদের সংশোধনের কি আশা করা যেতে পারে?

হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্য হযরত জিব্রাঈল (আ.)-এর সহযোগিতা বিভিন্ন সময়ে হয়েছিল ১. সর্বপ্রথম ফুঁকের মাধ্যমে মায়ের উদরে গর্ভধারণ করা। ২. ভূমিষ্টের সময় শয়তানি ক্রিয়া ও প্রভাবসমূহ থেকে সংরক্ষণ করা হয়েছে। ৩. জীবনভর ইহুদিদের শত্রুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা হয়েছে। ৪. অবশেষে যখন তাকে শহীদ করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, তখন আল্লাহর নির্দেশে জীবিত অবস্থায় নিরাপদে তাঁকে আকাশে পৌছে দেওয়া হয়েছে। –[কামালাইন খ. ১, পৃ. ৯৬]

৮৯. وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ مِنَ التَّوْرٰةِ هُوَ الْقُرْاٰنُ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ قَبْلَ مَجِيْئِهٖ يَسْتَفْتِحُوْنَ يَسْتَنْصِرُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَقُوْلُوْنَ اللّٰهُمَّ انْصُرْنَا عَلَيْهِمْ بِالنَّبِيِّ الْمَبْعُوْثِ اٰخِرِ الزَّمَانِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ وَهُوَ بِعْثَةُ النَّبِيِّ ﷺ كَفَرُوْا بِهٖ حَسَدًا وَخَوْفًا عَلَى الرِّيَاسَةِ وَجَوَابُ لَمَّا الْاُوْلٰى دَلَّ عَلَيْهِ جَوَابُ الثَّانِيَةِ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ ـ

৯০. بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بَاعُوْا بِهٖ اَنْفُسَهُمْ اَىْ حَظَّهَا مِنَ الثَّوَابِ وَمَا نَكِرَةٌ بِمَعْنٰى شَيْئًا تَمْيِيْزٌ لِفَاعِلِ بِئْسَ وَالْمَخْصُوْصُ بِالذَّمِّ اَنْ يَّكْفُرُوْا اَىْ كُفْرُهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْقُرْاٰنِ بَغْيًا مَفْعُوْلٌ لَهٗ لِيَكْفُرُوْا اَىْ حَسَدًا عَلٰى اَنْ يُنَزِّلَ اللّٰهُ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ مِنْ فَضْلِهٖ الْوَحْيِ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ لِلرِّسَالَةِ مِنْ عِبَادِهٖ فَبَآءُوْا رَجَعُوْا بِغَضَبٍ مِنَ اللّٰهِ بِكُفْرِهِمْ بِمَا اَنْزَلَ وَالتَّنْكِيْرُ لِلتَّعْظِيْمِ عَلٰى غَضَبٍ ط اِسْتَحَقُّوْهُ مِنْ قَبْلُ بِتَضْيِيْعِ التَّوْرٰةِ وَالْكُفْرِ بِعِيْسٰى وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ـ ذُوْ اِهَانَةٍ ـ

অনুবাদ :

৮৯. তাদের নিকট যা আছে অর্থাৎ তাওরাত আল্লাহর নিকট হতে যখন তার সমর্থক কিতাব আল কুরআন এলো আর পূর্বে অর্থাৎ তা আসার পূর্বে সত্য প্রত্যাখ্যান-কারীদের বিরুদ্ধে তারা এর অসিলায় বিজয় প্রার্থনা করত সাহায্য প্রার্থনা করত, বলত হে আল্লাহ! শেষ জমানার প্রেরিতব্য নবীজীর অসিলায় তুমি আমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য কর। [তারা] যে সত্য সম্পর্কে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রেরণ সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল তা যখন তাদের নিকট আসল তখন তারা হিংসা ও ক্ষমতা হারানোর আশঙ্কায় তা প্রত্যাখ্যান করল। সুতরাং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অভিসম্পাত।

আয়াতটির দ্বিতীয় স্থানে উল্লিখিত لَمَّا অর্থাৎ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوْا-এর জবাব [অর্থাৎ كَفَرُوْا بِهٖ টি প্রথমোক্ত لَمَّا [অর্থাৎ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ-এর জবাবের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

৯০. তা কত নিকৃষ্ট যার বিনিময়ে তারা নিজেদের আত্মা অর্থাৎ পুণ্যফলের স্বীয় হিস্যা বিক্রয় করেছে। তা এই যে, আল্লাহ তা'আলা যা অবতীর্ণ করেছেন অর্থাৎ কুরআন হিংসাপরায়ণ হয়ে তারা তা পরিত্যাগ করে তাদের এই পরিত্যাগ কত নিকৃষ্ট! শুধু এ কারণে যে আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের মধ্য হতে রেসালাতের জন্য [যাকে ইচ্ছা তার উপর স্বীয় অনুগ্রহ] অর্থাৎ ওহী অবতীর্ণ করেন। সুতরাং অবতীর্ণ ওহী প্রত্যাখ্যান করায় তারা আল্লাহ তা'আলার ক্রোধের উপর ক্রোধসহ ফিরল প্রত্যাবর্তন করল। অর্থাৎ তাওরাত বিনষ্ট বিকৃত করে ও হযরত ঈসা (আ.)-কে অস্বীকার করে তারা পূর্বে যে গজব ও ক্রোধের পাত্র হয়েছিল তার উপর বর্তমান অবতীর্ণ ওহীর অস্বীকার করায় আরো ক্রোধের পাত্র হলো। ক্রোধের বিরাটত্ব ও ভয়াবহতার প্রতি ইঙ্গিত করণার্থে غَضَبٌ শব্দটি نَكِرَةٌ [অনির্দিষ্ট] ব্যবহার করা হয়েছে। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক অবমাননাকর শাস্তি রয়েছে।

اِشْتَرٰى এইস্থানে বিক্রয় করা। بِئْسَمَا-এর مَا শব্দটি شَيْئًا [বিষয়, জিনিস] অর্থে ব্যবহৃত। এটা نَكِرَةٌ [অনির্দিষ্ট সূচক শব্দ।] এটা অর্থাৎ مَا শব্দটি بِئْسَ [কত নিকৃষ্ট] ক্রিয়ার কর্তার تَمْيِيْز আর اَنْ يَكْفُرُوْا হলো مَخْصُوْص بِالذَّمِّ বা নিন্দনীয় বিষয়টি।

بَغْيًا শব্দটি يَكْفُرُوْا ক্রিয়ার مَفْعُوْل لَهٗ বা হেতুবোধক কর্ম। অর্থাৎ ঈর্ষান্বিত হয়ে প্রত্যাবর্তন করল।

يُنَزِّلُ ক্রিয়াটি تَخْفِيْف [তাশদীদহীন লঘুরূপে] ও تَشْدِيْد [রূঢ় بَابُ تَفْعِيْل] উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

اِشْتَرٰى এইস্থানে বিক্রয় করা। بِئْسَمَا -এর مَا শব্দটি شَيْئًا [বিষয় জিনিস] অর্থে ব্যবহৃত। এটা نَكِرَةٌ [অনির্দিষ্টসূচক শব্দ।] এটা অর্থাৎ مَا শব্দটি بِئْس [কত নিকৃষ্ট] ক্রিয়ার কর্তার تَمْيِيْز আর اَنْ يَكْفُرُوْا হলো مَخْصُوْص بِالذَّمِّ বা নিন্দনীয় বিষয়টি। بَغْيًا শব্দটি يَكْفُرُوْا ক্রিয়ার مَفْعُوْل لَهٗ বা হেতুবোধক কর্ম। অর্থাৎ ঈর্ষান্বিত হয়ে প্রত্যাবর্তন করল।
يُنَزِّلَ ক্রিয়াটি تخفيف [তাশদীদহীন লঘুরূপে] ও تَشْدِيْد [রূঢ় بَابْ تَفْعِيْل] উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে।
قَوْلُهٗ وَلَمَّا جَاۤءَهُمْ الخ : جَاۤءَهُم -এর মধ্যে هُمْ দ্বারা উদ্দেশ্য নবী যুগের ইহুদিগণের এবং শুরুর وَاوْ টি عَطْف -এর ওয়াও। তার عَطْف হয়েছে قُلُوْبُنَا غُلْفٌ وَقَالُوْا -এর সাথে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ كِتٰبٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ : كِتٰبٌ -এর تَنْكِيْر তাজীম বা গুরুত্ব ও মর্যাদা বুঝানোর জন্য। আর مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ অংশটি ظَرْف مُسْتَقَرّ হয়ে كِتَابٌ -এর সিফত। এ সিফতটিও عَظِيْمٌ -এর জন্য আনা হয়েছে। সেই সাথে একথার প্রতি সতর্ক করার জন্য যে, এ কিতাবের মধ্যে যা কিছু রয়েছে তা গ্রহণ ও অনুসরণের যোগ্য। কেননা তা আল্লাহর পক্ষ থেকে।
قَوْلُهٗ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ : এটি কিতাবের দ্বিতীয় সিফত। পবিত্র কুরআন নিজের এ গুণের কথা বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছে এবং এ কথার প্রতি জোর দিয়েছেন যে, সে নিজে যেমন সত্য, তদ্রূপ বিগত আসমান কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী। আর বিগত কিতাবসমূহের মধ্যে তাওরাত সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। আর تَصْدِيْق বা সত্যায়ন করার অর্থ হলো اُصُوْل এবং অধিকাংশ فَرْع -এর মাঝে কুরআন তাওরাতের অনুযারী। কেউ কেউ বলেন– তাওরাতে পবিত্র কুরআনের যেসব গুণাবলি এসেছে, কুরআন সে গুণাবলি অনুযায়ীই নাজিল হয়েছে।
قَوْلُهٗ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ : **ঘটনার বিবরণ :** রাসূল ﷺ -এর আবির্ভাবের পূর্বে মদিনার বনু কুরাইজা ও বনুনাজিরের ইহুদিরা আউস ও খাজরাজের সাথে যুদ্ধ করার সময় রাসূল ﷺ -এর অসিলা দিয়ে বিজয় প্রার্থনা করে বলত–
اَللّٰهُمَّ انْصُرْنَا عَلَيْهِمْ بِالنَّبِيِّ الْمَبْعُوْثِ اٰخِرِ الزَّمَانِ ـ
এক আনসারী সাহাবীর বর্ণনায় রয়েছে ইসলামপূর্ব যুগে আমরা ইহুদিদের পরাজিত করলে তারা বলত আচ্ছা, একটু অপেক্ষা কর, অচিরেই একজন নবীর আবির্ভাব ঘটবে; আমরা তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে তোমাদের মেরে ঠাণ্ডা করব।
–[সীরাতে ইবনে হিশাম সূত্রে মাজেদী খ. ১, পৃ. ১৬০]
قَوْلُهٗ مَجِيْئُهٗ : যেহেতু قَبْلُ শব্দটি مَبْنِيّ সুতরাং বুঝা গেল যে, এখানে مُضَافْ اِلَيْهِ টি مَحْذُوْف مَنْوِى ; মুফাসসির (র.) مَجِيْئَهٗ উল্লেখ করে সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন।
قَوْلُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا : এখানে কাফের বলতে মদিনার আউস এবং খাজরাজ গোত্র উদ্দেশ্য।
قَوْلُهٗ وَهُوَ بَعْثَةُ النَّبِيِّ ﷺ : এটি مَا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ -এর তাফসীর। কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য কুরআন আসার পর। কেউ কেউ বলেন, রাসূলের মহান সত্তা। শেষ ফল একই দাঁড়াবে। অর্থাৎ ইহুদিরা তাদের ধর্মীয় পুস্তকাদির মাধ্যমে এ শেষ নবীর নবুয়ত ও নিদর্শনাবলি সম্পর্কে যথেষ্ট অবগতি লাভ করেছিল। নবীর আগমন কোনো অতর্কিত বা তাদের পূর্ব অবগতি ব্যতিরেকে হয়নি।
قَوْلُهٗ وَجَوَابُ لَمَّا الْاَوَّلِ : মুফাসসির (র.) উক্ত ইবারতটি একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর হিসেবে উল্লেখ করেছেন, প্রশ্ন ও উত্তর নিম্নে তুলে ধরা হলো–
প্রশ্ন : এখানে তো لَمَّا দুটি রয়েছে। অথচ جَوَابُ لَمَّا কেবল একটি। আরেকটির جَوَابٌ কোথায়?
উত্তর : كَفَرُوْا এটি দ্বিতীয় لَمَّا -এর جَوَابٌ আর প্রথম لَمَّا -এর جَوَابٌ উহ্য রয়েছে। দ্বিতীয় لَمَّا -এর جَوَابٌ -ই তার প্রতি ইঙ্গিত করে।
قَوْلُهٗ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ : এখানে জমিরের স্থলে ইসমে জাহের আনা হয়েছে। এর হিকমত হলো এ কথা বুঝানো যে, তাদের প্রতি লানত হওয়ার কারণ হলো কুফর।
যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে জেনে বুঝে নবী করীম ﷺ -এর প্রতি কুফরের আলোচনা ছিল। এখানে তার নিন্দা করা হচ্ছে।
قَوْلُهٗ بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖ اَنْفُسَهُمْ : অথাৎ সে ব্যবস্থা কতইনা নিকৃষ্ট, যা অবলম্বন করে তারা তাদের দাবি মতে আখিরাতের আজাব থেকে নিজেদের প্রাণগুলো রক্ষা করতে চায়। মানে কতই নিকৃষ্ট, যার বিনিময়ে তারা তাদের জীবনের লাভালাভ বিক্রি করে দিল। অর্থাৎ কুফর গ্রহণ করে নিজেদের জীবনগুলো জাহান্নামের আগুনের জন্য ব্যয় করল।

اِشْتَرَوْا : বিপরীত অর্থবোধক শব্দ (اَضْدَادٌ) কেনা ও বেচা উভয় অর্থের জন্য। এখানে বেচা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ بَاعُوْا : মুফাসসির (র.) اِشْتَرَوْا -এর তাফসীর بَاعُوْا দ্বারা করে একটি سُوَالْ مُقَدَّرْ [উহ্য প্রশ্ন]-এর জবাবের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। প্রশ্ন ও উত্তর নিম্নে উপস্থাপন করা হলো–

প্রশ্ন : তাদের নফসতো পূর্ব থেকেই তাদের কাছে বিদ্যমান ছিল। এদসত্ত্বেও তা খরিদ করার কি প্রয়োজন?

উত্তর : মুফাসরি (র.) উত্তর দিচ্ছেন যে, اِشْتَرَوْا এখানে بَاعُوْا -এর অর্থে। সুতরাং কোনো ইশকাল বাকী রইল না। আর নফস যেহেতু কোনো পণ্য নয়, তাই এখানে বাস্তব কেনাবেচা উদ্দেশ্য নয়; বরং নিজের নফস বিক্রির অর্থ হলো তারা ঈমানের উপর কুফরকে প্রাধান্য দিয়েছে এবং তাতে নিজের নফসকে ব্যয় করেছেন। যেন নফস হলো পণ্য আর কুফর হলো মূল্য।

قَوْلُهُ اَيْ حَظَّهَا : এর দ্বারা মুফাসসির (র.) একটি سُوَالْ مُقَدَّرْ [উহ্য প্রশ্ন]-এর জবাব দিয়েছেন–

প্রশ্ন : নফস তো তাদের সাথেই ছিল তাহলে তা বেচার অর্থ কি?

উত্তর : নফস বেচার অর্থ হলো যদি তারা ঈমান আনত, তাহলে তাদের নফস ঈমানের বিনিময়ে আখিরাতে যা কিছুর অধিকারী হতো, তার বিনিময়ে তা কুফরকে গ্রহণ করেছে।

قَوْلُهُ وَمَا نَكِرَةٌ بِمَعْنَى شَيْئًا : অর্থাৎ بِئْسَمَا -এর মাঝে مَا হলো نَكِرَةْ এবং شَيْئًا -এর অর্থে। তাহলে আর مَا হলো তমীয। اَيْ بِئْسَ هُوَ شَيْئًا بِمَعْنَى شَيْئًا

قَوْلُهُ تَمْيِيْزٌ لِفَاعِلِ بِئْسَ : অর্থাৎ مَا হলো بِئْسَ -এর ضَمِيْر فَاعِلْ -এর তমীয। এজন্য এটি মহল হিসেবে মানসূব।

قَوْلُهُ وَالْمَخْصُوْصُ بِالذَّمِّ اَنْ يَكْفُرُوْا : অর্থাৎ اَنْ يَكْفُرُوْا মাসদারের তাবীলে مَخْصُوْص بِالذَّمِ মূল ইবারত–

اَيْ بِئْسَ هُوَ شَيْئًا اِشْتَرَوْا بِهٖ اَنْفُسَهُمْ كُفْرُهُمْ.

بَغْيًا اَنْ يُنَزِّلَ اللّٰهُ : কুরআন বারবার এ তথ্যটি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, ইহুদিদের কুফর ও প্রত্যাখান কোনো গবেষণামূলক ভ্রান্তি (خَطَاءُ اِجْتِهَادْ) বা চিন্তাধারার প্রতারণা বা ভুল বুঝাবুঝির কারণে ছিল না; বরং তা ছিল শুধু এ ক্রোধ ও জিদের কারণে যে, নবুয়ত ইসরাঈলি বংশধারা থেকে সরে গিয়ে ইসমাঈল বংশীয় একজন কেন পেয়ে গেল? সে গোষ্ঠীতন্ত্র ও জাতীয়বাদের প্রাচীন অভিশপ্ত মানসিকতা যা আজ অবধি বিশ্বকে তছনছ করছে।

ইমাম রাজী (র.) লিখেছেন, ইহুদিরা নবুয়তকেও তাদের মিরাসী [পৈতৃক] কায়েমী অধিকার মনে করে আসছিল। তাই একজন আরবকে তার দাবিদার দেখতে পেয়ে [কায়েমী স্বার্থে আঘাতের ফলে] উল্টা এটাকে হিংসা ও বিদ্বেষের পরিণতি বানাতে লাগল। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, প্রতীক্ষিত নবুয়তের এ মহান মর্যাদা তাদের সম্প্রদায়ের ভাগ্যেই জুটবে, কিন্তু পরে যখন তা আরবদের মাঝে দেখতে পেল, তখন অবস্থাটি তাদের হিংসা ও জিদকে উস্কে দিল।

এ জঘন্য জিদ ও গর্হিত মনোবৃত্তির কী পরিসীমা থাকতে পারে যে, গোষ্ঠীপ্রেম এবং গোত্রীয় সাম্প্রদায়িকতার কারণে নবুয়তের সত্যতা পর্যন্ত তারা অস্বীকার করে ফেলল।

قَوْلُهُ بَغْيًا اَيْ حَسَدًا : بَغْيًا -এর তাফসীর করা হয়েছে حَسَدًا দ্বারা। মূলত بَغْيٌ অর্থ অন্বেষণ, কামনা। আর কামনার বিভিন্ন ধরন আছে। তন্মধ্যে কারো নেয়ামত দূর হয়ে যাওয়ার কামনাকে حَسَدْ বলে। অন্যের উপর সীমালংঘন করার কামনাকে ظُلْم বলে। طَلَبْ زِنَا -কে فُجُوْر বলে। যাহোক, এখানে بَغْيًا দ্বারা হিংসা উদ্দেশ্য।

مِنْ فَضْلِهٖ : এখানে অনুগ্রহ [ফজল] দ্বারা উদ্দেশ্য ওহীর অনুগ্রহ।

قَوْلُهُ فَبَاءُوْا بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ : [গজবের পর গজব ক্রোধের উপর ক্রোধ]-এর বিভিন্ন তাফসীর উদ্ধৃত হয়েছে।

১. হযরত ঈসা (আ.)-এর রিসালাত প্রত্যাখ্যান করে এ ইহুদিরা প্রথমবার 'মাগযূব' [গজবের ক্ষেত্র] হয়েছিল। এর দ্বিতীয় মাগযূব হওয়ার মূলে রয়েছে মুহাম্মদ ﷺ -এর রিসালাতের অস্বীকৃতি। এটি হযরত হাসান, শা'বী, ইকরামা, আবুল আলিয়া ও কাতাদা (র.) প্রমুখের অভিমত। –[তাফসীরে কাবীর]

২. প্রথম গজবের কারণ সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে ও অকারণে রিসালাতের অস্বীকৃতি ও প্রত্যাখ্যান এবং দ্বিতীয়বার গজবের কারণ তাদের হঠকারিতা বিদ্বেষ ও মনোবৃত্তি তাড়িত হওয়া। কেননা তারা সত্য নবীকে অস্বীকার করল এবং তাঁর বিরোধিতায় অবতীর্ণ হলো। (رُوْح، كَشَّاف، بَيْضَاوِىْ)

৩. কেউ কেউ বলেছেন, উদ্দেশ্য গজবের দ্বিরুক্তি দ্বারা পুনরাবৃত্তি নয়; বরং তাকিদ ও জোরদার করা ও প্রচণ্ডতা বুঝানো। (رُوْح، كَبِيْر)

قَوْلُهُ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ : لِلْكَافِرِيْنَ -এর لام টি لَامْ اِخْتِصَاصْ -এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সকল শাস্তি অপমানকর নয়। মুসলমানদেরকে তাদের পাপের জন্য যে শাস্তি দেওয়া হবে, তার উদ্দেশ্য হবে তাদেরকে পাপ হতে পবিত্র করা; তাদেরকে অপমান করা নয়। পক্ষান্তরে কাফেরদেরকে অপমান করার জন্যই শাস্তি দেওয়া হবে।

قَوْلُهُ ذُوْ اِهَانَةٍ : এটি مُهِيْن -এর তাফসীর। مُهِيْن হলো আযাবের দূত বা ফেরেশতা। আযাবের দিকে তার নিসবতটা مَجَازْ হিসেবে। কেননা প্রকৃতপক্ষে লাঞ্ছিতকার হলেন আল্লাহ তা'আলা। আযাব হলো সবব বা কারণ। এটাকে مَجَازْ عَقْلِىْ বলে মুফাসসির (র.) ذُوْ اِهَانَةٍ বলে এ দিকেই ইঙ্গিত করলেন।

অনুবাদ :

٩١. وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ وَغَيْرَهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا اَيْ اَلتَّوْرٰةَ قَالَ تَعَالٰى وَيَكْفُرُوْنَ وَالْوَاوُ لِلْحَالِ بِمَا وَرَآءَهٗ سِوَاهُ اَوْ بَعْدَهٗ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَهُوَ الْحَقُّ حَالٌ مُصَدِّقًا حَالٌ ثَانِيَةٌ مُؤَكِّدَةٌ لِمَا مَعَهُمْ ط قُلْ لَهُمْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَيْ قَتَلْتُمْ اَنْبِيَآءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ـ بِالتَّوْرٰةِ وَقَدْ نُهِيْتُمْ فِيْهَا عَنْ قَتْلِهِمْ وَالْخِطَابُ لِلْمَوْجُوْدِيْنَ فِيْ زَمَنِ نَبِيِّنَا ﷺ بِمَا فَعَلَ اٰبَاءُهُمْ لِرِضَاهُمْ بِهٖ ـ

৯১. এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ তা'আলা যা অবতীর্ণ করেছেন তাতে বিশ্বাস কর অর্থাৎ কুরআন ইত্যাদি। তারা বলেন, আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে অর্থাৎ তাওরাত আমরা তাতে বিশ্বাস করি। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন তারা প্রত্যাখ্যান করে وَيَكْفُرُوْنَ -এর وَاوْ অক্ষরটি حَالِيَةٌ বা ভাব ও অবস্থাবাচক। যা আছে তার পিছনে সবকিছুই অর্থাৎ তা ব্যতীত বা তৎপরবর্তী যা কুরআনে রয়েছে। অথচ তা সত্য وَهُوَ الْحَقُّ এই বাক্যটিও حَالٌ বা ভাব ও অবস্থাবাচক এবং সমর্থক مُصَدِّقًا শব্দটি দ্বিতীয় حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ বা ভাব ও অবস্থাবাচক শব্দ প্রথমটির تَاكِيْد বা জোর সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এটা ব্যবহৃত হয়েছে। যা তাদের নিকট আছে তার। তাদেরকে বল যদি তোমরা সত্যই তাওরাতে বিশ্বাসী হতে তবে কেন তোমরা ইতঃপূর্বে নবীগণকে হত্যা করছিলে?। অর্থাৎ হত্যা করছিলে। অথচ তাদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। এই গর্হিত কাজ যদিও তাদের পূর্বপুরুষদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল তবুও এই স্থানে রাসূলে কারীম ﷺ -এর যুগের ইহুদিদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ তারা পূর্বপুরুষদের এই কাজে সন্তুষ্ট ছিল।

٩٢. وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ اَيْ اَلْمُعْجِزَاتِ كَالْعَصَا وَالْيَدِ وَفَلْقِ الْبَحْرِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ اِلٰهًا مِنْ بَعْدِهٖ اَيْ بَعْدَ ذِهَابِهٖ اِلَى الْمِيْقَاتِ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ـ بِاتِّخَاذِهٖ.

৯২. এবং নিশ্চয় মূসা (আ.) তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণসহ মু'জিজাসহ যেমন লাঠি, হস্ত, সমুদ্র বিদারণ ইত্যাদি নিয়ে আগমন করেছেন। তার পরে অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের জন্য তার [তূরে] প্রস্থান করার পরে তোমরা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে নিলে। আর তা গ্রহণ করায় তোমরা হলে সীমা লঙ্ঘনকারী।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ وَرَائَهٗ : এটি ظَرْف مَكَانْ যা خَلْف [পিছনে] -এর অর্থে অধিক ব্যবহার হয় এবং اَمَامْ [সামনে] -এর অর্থে কম ব্যবহার হয়। বস্তুত এ শব্দটি اَضْدَادْ -এর অন্তর্ভুক্ত। এটি سِوٰى এবং بَعْد -এর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। মুফাসসির (র.) এখানে بَعْد এবং سِوٰى -এর অর্থ নিয়েছেন।

قَوْلُهٗ وَهُوَ الْحَقُّ : এ বাক্যটি পূর্বোল্লিখিত مَا থেকে حَالٌ হয়েছে।

قَوْلُهٗ مُصَدِّقًا حَالٌ ثَانِيَةٌ : এটি পূর্বোক্ত বাক্যের বিষয়বস্তুর تَاكِيْد স্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা حَقٌّ তো صَادِقٌ তথা সত্যই হয়ে থাকে। যেমন- زَيْدٌ اَبُوْكَ عَطُوْفًا -এর মাঝে عَطُوْفًا পূর্বোক্ত বিষয়ের تَاكِيْد স্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে।

حَالٌ ثَانِيَةٌ -এর মর্ম হলো تَاكِيْد হিসেবে حَالٌ ثَانِيَةٌ অন্যথায় এটি حَالٌ ثَالِثٌ কেননা وَيَكْفُرُوْنَ হলো حَالٌ اَوَّلٌ বা প্রথম অবস্থাজ্ঞাপক।

مُؤَكِّدَةٌ : যেহেতু আসমানী কিতাবসমূহ একটি আরেকটিকে সত্যায়ন করাটা আবশ্যক; তা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না, সেহেতু مُؤَكِّدَةٌ বলা হয়েছে।

فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ : শুরুর فَاءْ جَزَائِيَّةٌ টি فَاءْ এখানে شَرْط উহ্য রয়েছে। তা হলো اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ فَلِمْ الخ আর يَتِم -এর মাঝে مَا টি হলো প্রশ্নসূচক। শুরুতে لَامْ جَارَةٌ আসার কারণে তার থেকে اَلِفْ পড়ে গেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ أٰمِنُوْا بِمَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ : বনী ইসরাঈলের আলোচনা চলছিল। এখানে তাদেরকেই কুরআনের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে এবং তারা তাওরাতের অনুসারী বলে যে দাবি করত, তার খণ্ডন করা হয়েছে বিভিন্ন প্রমাণের মাধ্যমে। ইহুদিরা যেহেতু হযরত ঈসা (আ.) এবং তাদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব ইঞ্জিলের প্রতিও ঈমান রাখত না, তাই এ দাওয়াতে ইঞ্জিল এবং কুরআন উভয়টিই উদ্দেশ্য, যা بِمَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ থেকে বুঝা আসে। −[জামালাইন খ. ১, পৃ. ১৭৫]

قَوْلُهُ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ أَنْبِيَآءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ : ইহুদিদের প্রতি কুরআনের তৃতীয় জবাব, তোমরা যে তোমাদের স্বগোত্রীয় নবীগণের প্রতি ঈমানের দাবি করছ তার বাস্তবতা কতটুকু? ঈমান ও সত্য নবী মেনে নেওয়া তো দূরের কথা; তোমরা এত প্রবলভাবে তাদের অস্বীকার করেছ এবং তাদের বিরোধিতা ও শত্রুতায় এত হীন পর্যায়ে নেমে এসেছ যে, তাদের হত্যা করতেও তোমাদের হাত কাঁপেনি। তোমাদের জাতীয় ইতিহাসের পাতাগুলো তো নবীগণের রক্তেই রঞ্জিত। −[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ قَتَلْتُمْ : মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করলেন যে, এখানে تَقْتُلُوْنَ ফেলে মুজারে قَتَلْتُمْ মাজির অর্থে। যেহেতু নবীদের হত্যা করা একটি জঘন্যতম ব্যাপার, তাই সেই অবস্থাটির স্মৃতিচারণ করত حِكَايَتْ حَالْ -এর জন্য مُضَارِعْ -এর সীগাহ আনা হয়েছে।

দ্বিতীয় আরেকটি কারণ হলো এ কথা বুঝানোর জন্য مُضَارِعْ -এর শব্দ আনা হয়েছে যে, তাদের হত্যা অতীতকালে مُسْتَمِرْ বা অব্যাহত ছিল।

قَوْلُهُ بِمَا فَعَلَ اٰبَائُهُمْ : এটি مَجَازْ -এর عَلَاقَةْ -এর বর্ণনা। আর তা হলো مُلَابَسَةْ যেহেতু নবীযুগের ইহুদিরা তাদের পূর্বপুরুষদের কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্ট ছিল, তাই হত্যার নিসবতটি তাদের দিকেই করা হয়েছে। −[জামালাইন : খ. ১, প. ১৭৩]

قَوْلُهُ وَلَقَدْ جَآئَكُمْ مُوْسٰى : এখানে ইহুদিদের অস্বীকার ও হঠকারিতার প্রমাণ স্বরূপ বলা হচ্ছে যে, যেই মূসা (আ.)-এর শরিয়তের তোমরা অনুসারী এবং যার শরিয়তের কারণে তোমরা অন্যান্য সত্য শরিয়তসমূহকে অস্বীকার কর, খোদ তিনিই তোমাদেরকে বহু প্রকাশ্য মু'জিযা দেখিয়েছিলেন। যেমন লাঠি, সমুজ্জল হাত, সাগরের দ্বিধাবিভক্তি ইত্যাদি। কিন্তু তিনি যখন কয়েকদিনের জন্য তূর পাহাড়ে চলে গেলেন, তখন সেই ক'দিনের জন্য তোমরা বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করলে। অথচ হযরত মূসা (আ.) তখন জীবিত এবং নবুয়তের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। সেই সময় হযরত মূসা (আ.) ও তার শরিয়তের উপর তোমাদের বিশ্বাস কোথায় ছিল? আবার এখন শেষ নবীর প্রতি আক্রোশ ও বিদ্বেষবশত হযরত মূসা (আ.)-এর শরিয়তকে এমনভাবে আকড়ে ধরেছ যে, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ কর্ণপাত করছ না। নিশ্চয় তোমরাও জালিম, তোমাদের পিতৃ-পুরুষরাও জালিম। −[তাফসীরে উসমানী পৃ. ১৮]

قَوْلُهُ بِالْمُعْجِزَاتِ : অর্থাৎ এখানে بَيِّنَاتِ দ্বারা মুযিযা উদ্দেশ্য। যেগুলো হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়তের সত্যায়ন করে। আর সে সকল মুজিযা ছিল নয়টি, যা وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيَاتٍ بَيِّنَاتٍ -এর মাঝে বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ كَعَصَا : এ লাঠি সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা গেছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত এ লাঠির সাথে হযরত মূসা (আ.) পানি ও খাবার রাখতেন। এটা হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে চলত। তিনি তার সাথে কথা বলতেন। তা দিয়ে জমিনে আঘাত করলে এক দিনের খাবার বেরিয়ে আসত। জমিনে পুতে রাখতে তা থেকে পানি নির্গত হতো। অতপর জমিন থেকে তুলে ফেললে পানি বন্ধ হয়ে যেত। কোনো ফল খাওয়ার ইচ্ছা করলে সেটা জমিনে পুতে রাখতেন। তারপর তা থেকে দুটি শাখা বের হয়ে একটি গাছ হয়ে যেত। তারপর সেখানে ফল ধরত। কখনো কোনো কূপ থেকে পানি উত্তোলন করতে চাইলে সেটা কূপের ভিতর ঝুলিয়ে দিতেন এবং তার থেকে দুটি শাখা দুটি বালতির মতো হয়ে যেত। রাতের বেলা সেটি আলোকবর্তিকা হত। কোনো দুশমন সামনে পড়লে মোকাবেলা করত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, লাঠি ব্যবহার করা নবীদের সুন্নত। বুযুর্গদের শোভা, শত্রুর বিরুদ্ধে নিরাপত্তা দুর্বলের জন্য সাহায্য। মুনাফিকদের জন্য দুশ্চিন্তা। আরো বলা হয়, কোন মুমিনের সাথে লাঠি থাকলে তার কাছ থেকে শয়তান পলায়ন করে, পাপী ও মুনাফিক তাকে ভয় করে, নামাজের সময় সুতরার কাজ দেয় এবং দুর্বল বা ক্লান্ত হয়ে গেলে শান্তি দেয়।
−[দরসে জালালাইন খ. ১, ২৯২]

قَوْلُهُ وَالْيَدَ : বর্ণিত আছে, হযরত মূসা (আ.) যখন ডান হাত বগলের নীচে রাখতেন এবং যখন বের করতেন, তখন সেটা উজ্জ্বল হয়ে চমকাতে থাকত আবার যখন পকেটে প্রবেশ করাতেন, তখন আগের মত স্বাভাবিক হয়ে যেত।

قَوْلُهُ وَفَلَقَ الْبَحْرَ : সমুদ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা وَاِذْفَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ -এর মাঝে গতি হয়েছে।

قَوْلُهُ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ : এ ইবারতে প্রশ্ন হয় যে, اِتِّخَاذُ عِجْل তথা গরুর বাছুরকে উপাস্য বানানোর আলোচনা তো পূর্বে একবার বর্ণিত হয়েছে, এখানে ফের কেন আলোচনা করা হলো?

উত্তর : এখানে তাকরার উদ্দেশ্য নয়; বরং ইহুদিদের বক্তব্য نُؤْمِنُ بِمَا اَنْزَلَ -এর খণ্ডন করতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি তোমরা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি ঈমান রাখতে, তাহলে গরুর বাছুরকে মাবুদ বানালে কেন?

[illegible] قَوْلُهُ [illegible] শব্দটি উল্লেখ করে ইঙ্গিত করলেন যে, এখানে اتَّخَذْتُمْ দুইটি মাফউলের দিকে مُتَعَدِّيْ হয়েছে। তার [illegible]

অনুবাদ :

٩٣. وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ عَلَى الْعَمَلِ
بِمَا فِي التَّوْرٰةِ وَ قَدْ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ
الطُّوْرَ الْجَبَلَ حِيْنَ امْتَنَعْتُمْ مِنْ
قَبُوْلِهَا لِيَسْقُطَ عَلَيْكُمْ وَقُلْنَا خُذُوْا
مَا اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ بِجِدٍّ وَاجْتِهَادٍ
وَاسْمَعُوْا ط مَا تُؤْمَرُوْنَ بِهٖ سِمَاعَ قَبُوْلٍ
قَالُوْا سَمِعْنَا قَوْلَكَ وَعَصَيْنَا اَمْرَكَ
وَاُشْرِبُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ اَيْ
خَالَطَ حُبُّهُ قُلُوْبَهُمْ كَمَا يُخَالِطُ
الشَّرَابُ بِكُفْرِهِمْ ط قُلْ لَهُمْ بِئْسَمَا
شَيْئًا يَأْمُرُكُمْ بِهٖ اِيْمَانُكُمْ بِالتَّوْرٰاةِ
عِبَادَةَ الْعِجْلِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ - بِهَا
كَمَا زَعَمْتُمُ الْمَعْنٰى لَسْتُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ
لِاَنَّ الْاِيْمَانَ لَا يَاْمُرُ بِعِبَادَةِ الْعِجْلِ
وَالْمُرَادُ اٰبَائُهُمْ اَيْ فَكَذٰلِكَ اَنْتُمْ
لَسْتُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ - بِالتَّوْرٰاةِ وَقَدْ
كَذَّبْتُمْ مُحَمَّدًا ﷺ وَالْاِيْمَانُ بِهَا لَا
يَاْمُرُ بِتَكْذِيْبِهٖ -

৯৩. আর যখন তোমাদের নিকট হতে তাওরাত অনুসারে কাজ করার অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং যখন তোমরা তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালে তখন তূর পাহাড়কে তোমাদের মাথার উপর তুলে ধরলাম। যেন তোমাদের উপর তা ভেঙ্গে পড়ে। আর বললাম, যা দিলাম দৃঢ়ভাবে আয়াস ও অধ্যাবসায়সহকারে ধারণ কর এবং যে সকল বিষয়ে তোমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা গ্রহণ করার কর্ণ দ্বারা শ্রবণ কর। তারা বলল, আমরা শ্রবণ করলাম তোমার কথা ও অমান্য করলাম তোমার নির্দেশ। আর কুফরীর কারণে তাদের অন্তরে সিঞ্চিত হয়েছে গো-বৎসের ভালোবাসা অর্থাৎ শরাবের মিশ্রণের ন্যায় তাদের হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভালোবাসা সিঞ্চিত হয়ে গিয়েছিল। তাদেরকে বল তোমাদের ধারণানুসারে তোমরা যদি বিশ্বাসী হয়ে থাক তবে তোমাদের তাওরাত সম্পর্কে এই বিশ্বাস যার নির্দেশ দেয় অর্থাৎ গো বৎসের উপাসনা তা কত নিকৃষ্ট জিনিস আদতেই তারা [অর্থাৎ তোমাদের পিতৃপুরুষগণ] বিশ্বাসী নয়। কেননা, ঈমান কোনোদিন গো-বৎসের পূজার নির্দেশ দিতে পারে না। তোমরাও তোমাদের পিতৃপুরুষগণের ন্যায় মূলত তাওরাতের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী নও। কেননা তোমরা মুহাম্মদ ﷺ -কে অস্বীকার কর। তাওরাতে বিশ্বাস কখনো তাকে অস্বীকার করার নির্দেশ দেয় না।

[وَرَفَعْنَا এই বাক্যটি حَالٌ বা অবস্থা ও ভাববাচক এ দিকে ইঙ্গিত করার জন্য মাননীয় তাফসীরকার এইস্থানে قَدْ শব্দটি উল্লেখ করেছেন।]

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَقَدْ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ : এখানে قَدْ শব্দটি উহ্য ধরে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, مَاضِىْ হাল হতে পারে, যদি قَدْ উহ্য ধরে নেওয়া হয়। অর্থাৎ مَاضِىْ হাল হতে হলে قَدْ থাকা আবশ্যক, চাই لَفْظًا হোক বা تَقْدِيْرًا হোক।

قَوْلُهُ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ : পূর্বেও এ আলোচনা গেছে; কিন্তু এখানে ইহুদীদের বক্তব্য نُؤْمِنُ بِمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا -এর খণ্ডন করতে নতুন করে আনা হয়েছে।

قَوْلُهُ لِيَسْقُطَ عَلَيْكُمْ : এটি اَنْعَمْنَا -এর عِلَّتْ বা কারণ। اَىْ رَفَعْنَا الطُّوْرَ لِاَجَلِ السُّقُوْطِ عَلَيْكُمْ اِنْ لَّمْ تَمْشِلُوا

قَوْلُهُ قُلْنَا : ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, خُذُوْا الخ হলো উহ্য قُلْنَا -এর مَقُوْلَهْ -এর তারপর قَوْل এবং مَقُوْلَهْ মিলে اَخَذْ -এর বয়ান مِيْثَاقٌ -এর بَيَانْ

قَوْلُهُ مَا تُؤْمَرُوْنَ بِهِ : এর দ্বারা اِسْمَعُوْا -এর মাফউল মাহযুফ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ خَالَطَ حُبُّهُ قُلُوْبَهُمْ : এখানে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَلْعِجْل -এর পূর্বে حُبْ মুযাফ উহ্য রয়েছে। কেননা গরুর বাছুর অন্তরে সংকুলান হতে পারে না। আয়াতে মুযাফকে হযফ করে মুবালাগাহ স্বরূপ মুযাফ ইলাইহিকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ عِبَادَةُ الْعِجْلِ : এটি উহ্য مَخْصُوْصٌ بِالذَّمِّ এবং মহল হিসেবে مَرْفُوْعٌ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে একটি মন্দ কর্ম উল্লেখ করে প্রমাণ করা হয়েছে যে, ইহুদিদের نُؤْمِنُ بِمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا -এর দাবি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও মিথ্যা। এ আয়াতে আরো একটি মন্দ কর্ম উল্লেখ করে সে দাবিকে আরো শক্তভাবে খণ্ডন করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَ رَفَعْنَا : এই আয়াতটি ইহুদিদের কুফর এবং অস্বীকৃতির চূড়ান্ত সীমা বর্ণনা করেছে। কেননা পাহাড় তাদের মাথার উপর ঝুলন্ত অবস্থায় প্রাণের ভয়ে মুখে স্বীকার করেছে سَمِعْنَا অর্থাৎ আমরা আনুগত্য করব; কিন্তু অন্তরে নিয়ত করেছে যে আমল করব না কিংবা পরবর্তীতে অস্বীকার করেছে।

قَوْلُهُ عَلَى الْعَمَلِ بِمَا فِى التَّوْرَاةِ : এখান থেকে বুঝা যায় যে اَخْذ مِيْثَاقْ দ্বারা ঐ সাধারণ অঙ্গীকার উদ্দেশ্য নয়, যা আজলে বা রূহ জগতে বনূ আদম থেকে নেওয়া হয়েছিল।

قَوْلُهُ سَمِعْنَا قَوْلَكَ وَعَصَيْنَا اَمْرَكَ : এখানে প্রশ্ন হয় যে, এমন ভয়ানক অবস্থাতেও তাদের মুখ থেকে عَصَيْنَا শব্দ বের হওয়া বিশ্বাসযোগ্য হচ্ছে না। যদি ধরে নেওয়া হয় যে, তারা পাহাড় মাথার উপর ঝুলন্ত অবস্থায় তা কোনোভাবে বলেছে তাহলে পাহাড় ঝুলানোর ফায়দা কি হলো?

উত্তর : তারা তো মুখে سَمِعْنَا বলেছে; কিন্তু عَصَيْنَا মুখে বলেনি; বরং স্বীকার করার পরপরই অবাধ্যতা ও নাফরমানীতে লিপ্ত হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় উত্তর : عَصَيْنَا শব্দটি سَمِعْنَا -এর পর বলেনি তৎক্ষণাৎ বরং কিছুক্ষণ পরে বলেছে।

قَوْلُهُ خُذُوْا مَا اٰتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوْا : [এসব আইন ও বিধিবিধান হৃদয়ের কান দিয়ে শুন এবং সে মতে আমল কর] অর্থাৎ যা শুনলে তা কবুল কর।

قَوْلُهُ قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا : আয়াত একথা অপরিহার্য করে না যে, তারা মুখেও প্রত্যক্ষরূপে عَصَيْنَا [মানলাম না] বলে থাকবে। এমন হতে পারে যে, অর্থ হবে তারা তা শুনল এবং অবাধ্যতা নিয়ে তার মুখোমুখি হলো। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে বলা ভাবের ভাষায় তথা বলার রূপক অর্থে, জিহ্বার বলা উদ্দেশ্য নয়। কারো অবস্থা দ্বারা যা বুঝা যায়, তাকে বলেছে বলে ব্যক্ত করা যায়, যদিও সে মুখে তা বলেনি। যেহেতু তাদের এ কথাটি বাস্তব বিচারে হৃদয়ের কথা ছিল না। সুতরাং ভাব-ভঙ্গির ভাষায়ই তারা যেন একথা বলছিল– শুনলাম তো মানলাম না।

সাধারণভাবেও আরবি ভাষায় اَلْقَوْلُ শব্দ ব্যাপক অর্থবোধক। মুখে উচ্চারণ করা কখনো সে অর্থের জন্য অপরিহার্য নয়। কুরআন অভিধানবিদ ইমাম রাগিব (র.) পবিত্র কুরআনে এ শব্দের ব্যবহৃত বিভিন্ন অর্থের উল্লেখ করেছেন। চতুর্থ নাম্বারে তিনি লিখেছেন– অবস্থার অর্থাৎ ভাবের নির্দেশনা। (دَلَالَةُ الْحَالْ) । তিনি এর প্রমাণে জনৈক কবির পংক্তিও উল্লেখ করেছেন, কোনো কিছুকে নির্দেশ করার অর্থেও اَلْقَوْلُ বলা হয়। যেমন কবির ভাষায় اِمْتَلَاَ الْحَوْضُ وَقَالَ قَطْنِىْ [হাউজ পানিতে ভরে গেল এবং সে বলে উঠল ব্যাস হয়েছে। –[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ১৬৬]

قَوْلُهُ فَكَذٰلِكَ اَنْتُمْ لَسْتُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ بِالتَّوْرَاةِ : এই ইবারতটুকু উল্লেখ করে একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, পূর্বপুরুষদের অপরাধের কারণে উত্তরসূরিদের কাছে জবাবদিহিতা করা যায় না। তাই রাসূল ﷺ-এর যুগে বিদ্যমান ইহুদিদেরকে পিতৃপুরুষদের কর্মের কারণে ভর্ৎসনা করার কারণ কি?

উত্তর : এর উত্তর খুবই সুস্পষ্ট। রাসূল ﷺ-এর যুগের ইহুদিরা পূর্বসূরিদের কৃতকর্মে সন্তুষ্টও একমত ছিল এবং তারা সে কারণে লজ্জিত ও অনুশোচনাকারী ছিল না। আর অপরাধের প্রতি সন্তুষ্ট ও একমত হওয়াও অপরাধের মাঝে শামিল বলে গণ্য হবে।

قَوْلُهُ كَمَا زَعَمْتُمْ : তাদের ধারণা বলতে তাদের পূর্বের উক্তি نُؤْمِنُ بِمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا

قَوْلُهُ اَلْمَعْنٰى لَسْتُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ : মুফাসসির (র.)-এর দ্বারা ইহুদিদের বক্তব্য খণ্ডনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করলেন যে, উপরিউক্ত প্রমাণাদি সাক্ষ্য দেয় যে, তোমরা তাওরাতের প্রতি ঈমান রাখ না, শুধু মুখে বল।

قَوْلُهُ لِاَنَّ الْاِيْمَانَ : এটি لَسْتُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ-এর عِلَّتْ অর্থাৎ তোমাদের ঈমানের দাবী এজন্য সঠিক নয় যে, তাওরাত আল্লাহর কিতাব। তা কখনো গরুর বাছুর পূজার নির্দেশ দিতে পারে না। অথচ তোমরা তার পূজা করছ। যে জিনিসের হুকুম তাতে নেই তা পালন করা কি ঈমানের লক্ষণ?

قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ اٰبَائُهُمْ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এখানে اِسْنَادْ مَجَازِىْ হয়েছে, অর্থাৎ পূর্বপুরুষদের কর্মকে উত্তরসুরিদের প্রতি নিসবত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اَىْ فَكَذٰلِكَ اَنْتُمْ لَسْتُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ : এর দ্বারা একটি سُوَالْ مُقَدَّرْ-এর জবাবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রশ্ন : গরুর বাছুর পূজা তো ছিল ইহুদিদের পূর্বপুরষদের কর্ম। তা দ্বারা তাদের বংশধরদেরকে কেন ভর্ৎসনা করা হলো?

উত্তর : সে ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে তাদেকে এভাবে ভর্ৎসনা করা হচ্ছে যে, পূর্বপুরুষদের মত তোমরাও তাওরাতে বিশ্বাসী নও। কেননা তাওরাতে যেমনিভাবে বাছুর পূজার মত শিরক নিষিদ্ধ ছিল, তেমনি মুহাম্মদ ﷺ-কে নবী বলে বিশ্বাস করার নির্দেশও ছিল। যেহেতু তোমরা আখেরী নবীকে মিথ্যা বলছ, সেহেতু তোমরাও তাওরাতে বিশ্বাসী নও।

অনুবাদ :

٩٤. قُلْ لَّهُمْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ أَيِ الْجَنَّةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً خَاصَّةً مِنْ دُوْنِ النَّاسِ كَمَا زَعَمْتُمْ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ـ تَعَلَّقَ بِتَمَنِّيْهِ الشَّرْطَانِ عَلٰى أَنَّ الْاَوَّلَ قَيْدٌ فِى الثَّانِىْ أَىْ إِنْ صَدَقْتُمْ فِىْ زَعْمِكُمْ أَنَّهَا لَكُمْ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ يُؤْثِرُهَا وَ الْمُوْصِلُ إِلَيْهَا الْمَوْتُ فَتَمَنَّوْهُ ـ

৯৪. তাদের বল, যদি আল্লাহর নিকট পরকালের বাসস্থান অর্থাৎ জান্নাত অন্য লোক ব্যতীত কেবল বিশেষভাবে তোমাদের জন্যই হয় যেমন তোমরা ধারণা পোষণ কর তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর যদি সত্যবাদী হও। فَتَمَنَّوْا ক্রিয়াটি [যাতে তাদের কামনা প্রকাশিত] এস্থানে দুটি শর্তের সাথে বিজড়িত, [একটি হলো إِنْ كَانَتْ لَكُمْ অপরটি হলো إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ] প্রথমটি দ্বিতীয়টির قَيْد [সম্পূরক] রূপে বিবেচ্য। অর্থাৎ পরকালের আবাস কেবলমাত্র তোমাদের– এই ধারণায় যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক আর তা [জান্নাত] যার হবে সে নিশ্চয়ই তাকেই সবকিছুর উপর প্রাধান্য দিবে। সেস্থানে পৌঁছার পন্থা হচ্ছে মৃত্যুবরণ, সুতরাং তার কামনা কর [তো দেখি।]

٩٥. وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيْهِمْ ط مِنْ كُفْرِهِمْ بِالنَّبِيِّ ﷺ اَلْمُسْتَلْزِمُ لِكِذْبِهِمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ـ الْكَافِرِيْنَ فَيُجَازِيْهِمْ ـ

৯৫. কিন্তু তাদের কৃতকর্মের জন্য অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ কে অস্বীকার করায় যা তাদের [উক্ত ধারণায়] মিথ্যাবাদী হওয়ায় পরিচায়ক। তারা কখনো তা কামনা করবে না। এবং আল্লাহ্ সীমা লঙ্ঘনকারীদের সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের সম্বন্ধে অবহিত। অনন্তর তিনি তাদের প্রতিফল দিবেন।

তাহকীক ও তারকীব

إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ : **তারকীব.** এ জুমলাটি হলো شَرْط আর فَتَمَنَّوْا হলো তার جَوَاب এখানে دَارٌ হলো اِسْم كَانَ। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জান্নাত। উত্তম হবে যদি এর পূর্বে একটি مُضَاف উহ্য ধরা হয়। যেমন– نَعِيْمُ الدَّارِ কেননা পরকাল তো মু'মিন কাফের সকলের জন্যই হবে। কিন্তু পরকালের নিয়ামত সকলের জন্য নয়। আর اَلدَّار ইসমে كَانَ-এর خَبَرْ সম্পর্কে তিনটি মত রয়েছে। যথা–

১. খবর হবে لَكُمْ তখন তার مُتَعَلِّقْ হবে মাহযূফ এবং خَالِصَةً-কে حَالْ হিসেবে নসব প্রদান করবে।

২. খবর হবে لَكُمْ তখন عِنْدَ টি خَالِصَةً-এর জন্য ظَرْف হবে।

৩. খবর হবে عِنْدَ তখন خَالِصَةً শব্দটি حَالْ হবে।

قَوْلُهُ خَاصَّةً : خَالِصَةً-এর ব্যাখ্যা خَاصَّةً দ্বারা করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এখানে مَصْدَرٌ ইসমে ফায়েলের অর্থে। কেননা خَالِصَةً শব্দটি عَافِيَةٌ-এর ওজনে মাসদার। وَالْخَاصُّ لَا يَشُوْبُهُ شَيْئٌ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্বে বেশ কয়েকটি আয়াতে ইহুদিদের একটি ভ্রান্ত দাবিকে খণ্ডন করা হয়েছে। এখন এ আয়াতে আরেকটি দাবী খণ্ডন করা হচ্ছে।

ইহুদিরা বলত, আমরা ছাড়া আর কেউ জান্নাতে যাবে না এবং আমাদের কোনো শাস্তি হবে না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তোমরা যদি নিশ্চিত জান্নাতী হও, তাহলে মরতে কেন ভয় কর? –[তাফসীরে উসমানী পৃ. ১৮]

قَوْلُهُ أَيِ الْجَنَّةُ : আখিরাতের ব্যাখ্যায় جَنَّةٌ উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে– পরকাল তো ব্যাপক। তাতে জান্নাত এবং জাহান্নাম উভয়টি শামিল রয়েছে। কিন্তু তারা নিজেদেরকে শুধু জান্নাতেরই অধিকারী মনে করতো।

قَوْلُهُ كَمَا زَعَمْتُمْ : যেমন তোমরা বলে যে, ইহুদি ছাড়া কেউ জান্নাতে যাবে না।

قَوْلُهُ تَعَلَّقَ بِتَمَنِّيهِ الشَّرْطَانِ : এটি একটি আপত্তির জবাব। আপত্তিটি হলো এখানে شَرْط রয়েছে দুটি। অথচ جَزَاءٌ হলো একটি। এমনটি কেন হলো?

উত্তর : মুফাসসির (র.) একটি প্রসিদ্ধ কায়দার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন– যখন দুটি শর্তের মধ্যখানে جَزَاءٌ আসে তাহলে جَزَاءٌ টি উভয় শর্তের সাথে সম্পর্ক রাখবে এবং প্রথম شَرْط দ্বিতীয় شَرْط -এর قَيْد হবে। সে হিসেবে এখানে جَزَاءٌ হলো تَمَنَّوُا الْمَوْتَ এবং তার সাথে দুটি شَرْط -এর সম্পর্ক এভাবে যে, প্রথম শর্তটি দ্বিতীয় শর্তের মাঝে قَيْد হয়েছে।

قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ الْاَوَّلَ : অর্থাৎ প্রথম শর্তটি। আর তাহলো اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ

قَوْلُهُ قَيْدٌ فِي الثَّانِيْ : অর্থাৎ শর্তে ছানীর মাঝে, আর তা হলো– اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ

প্রকৃত ইবারত হবে এভাবে– اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ فِيْ زَعْمِكُمْ اَنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ خَاصَّةً فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ

এভাবেও উত্তর দেওয়া যায় যে, فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ হলো দ্বিতীয় শর্তের জবাব আর প্রথমটির জবাব মাহযূফ রয়েছে। দ্বিতীয়টির জবাব তার প্রতি ইঙ্গিত করে।

: بِتَمَنِّيهِ اَيْ بِتَمَنِّي الْمَوْتِ

قَوْلُهُ اَبَدًا : যেহেতু উল্লিখিত চ্যালেঞ্জ শুধু রাসূল ﷺ-এর সমকালীন **ইহুদিদের** জন্য, তাই اَبَدًا অর্থ এদের আজীবন অর্থাৎ ওদের জীবন থাকতে ওরা মৃত্যু কামনা করবে না। اَبَدًا দ্বারা উদ্দেশ্য হবে তাদের জীবনের ভবিষ্যত দিনগুলো অর্থাৎ যতদিন বেঁচে আছে, মৃত্যু বাসনা করবেই না।

قَوْلُهُ وَمَنْ كَانَتْ يُؤْثِرُهَا : كَانَتْ-এর ضَمِيْر مُسْتَتِرْ টি دَارُ الْاٰخِرَةِ-এর দিকে ফিরেছে। আর لَهُ ফিরেছে مَنْ-এর দিকে। আর يُؤْثِرُهَا-এর মধ্যে ضَمِيْر مُسْتَتِرْ ফিরেছে مَنْ-এর দিকে এবং ضَمِيْر مَنْصُوْب ফিরেছে دَارُ الْاٰخِرَةِ-এর দিকে। অর্থাৎ পরকালের সুখ-শান্তি যাদের জন্য নির্ধারিত, তারা তো সেটিই প্রাধান্য দিবে। কেননা আখিরাত হলো চিরস্থায়ী সুখের। যার অন্তরে এ কথার দৃঢ় বিশ্বাস থাকবে যে, সে জান্নাতী, তাহলে সে অবশ্যই তাকে প্রাধান্য দিবে এবং সেখানে যাওয়ার আগ্রহ ব্যক্ত করবে। যেমনটি হযরত আম্মার (রা.)-এর উক্তি– غَدًا نَلْقَى الْاَحِبَّةَ مُحَمَّدًا وَصَحْبَهُ

অনুরূপভাবে হযরত হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে– اِنَّهُ يَتَمَنَّى الْمَوْتَ فَلَمَّا احْتَضَرَ قَالَ حَبِيْبٌ جَاءَ عَلٰى فَاقَةٍ

প্রশ্ন : এখানে প্রশ্ন হয় যে, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) কিভাবে মৃত্যুর কামনা করলেন। অথচ হাদীসে এ থেকে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

لَا يَتَمَنَّيَنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهٖ وَاِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِيْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِيْ وَاَمِتْنِيْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِيْ .

উত্তর : হাদীসে দুনিয়ার কষ্টক্লেশের কারণে অতিষ্ট হয়ে মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু জান্নাতের নাজ-নিয়মতের আশায় মৃত্যু কামনা করা নিষেধ নয়।

قَوْلُهُ وَالْمُوْصِلُ اِلَيْهَا الْمَوْتُ : এর দ্বারা একটি سُؤَالٌ مُقَدَّرٌ [উহ্য প্রশ্ন]-এর জবাবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রশ্ন : এখানে شَرْط এবং جَزَا -এর মাঝে সামঞ্জস্য নেই। কেননা যদি পরকাল তাদের জন্য নির্দিষ্ট হয়, তাহলে পরকালের কামনা করবে। এখানে মৃত্যুর কামনা করার নির্দেশ কেন দেওয়া হলো?

উত্তর : মুফাসসির (র.) উক্ত প্রশ্নের জবাবের প্রতি এভাবে ইঙ্গিত করছেন যে, পরকালে পৌঁছার মাধ্যম হলো মৃত্যু। তা ব্যতীত সেখানে পৌঁছা সম্ভব নয়। এজন্য মৃত্যু কামনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মৃত্যু কামনা করার শরয়ী বিধান : হাদীস শরীফে বিনা প্রয়োজনে কিংবা দুনিয়ার বিপদাপদে অতিষ্ট হয়ে মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। বয়স বেশি হওয়ার দ্বারা তওবা এবং নেক আমল করার সুযোগ হওয়া বিরাট বড় নিয়ামত। হ্যাঁ, যদি অন্তরে আল্লাহর দীদারের আগ্রহ প্রবল হয়ে যায় তখন জায়েজ আছে।

হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর থেকে যেসব আকাংক্ষা বর্ণিত রয়েছে, তা ঐ সময় ছিল যখন মৃত্যুর আলামত প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল এবং দুনিয়ার জীবন থেকে তারা নিরাশ হয়ে গিয়েছিলেন।

قَوْلُهُ اَيْدِيْهِمْ : اَيْدِيْ - يَدٌ-এর বহুবচন। অর্থ– হাত। এখানে হাত দ্বারা নফস বুঝানো হয়েছে। কেননা অধিকাংশ কাজ হাত দ্বারাই সম্পাদিত হয়।

اَلْمُسْتَلْزِمُ لِكِذْبِهِمْ : অর্থাৎ ইহুদিদের মৃত্যু কামনা না করা পরকালের সুখ নিজেদের জন্য বরাদ্দ থাকার দাবিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

অনুবাদ :

٩٦. وَلَتَجِدَنَّهُمْ لَامُ قَسَمٍ اَحْرَصَ النَّاسِ
عَلٰى حَيٰوةٍ ج وَاَحْرَصَ مِنَ الَّذِيْنَ
اَشْرَكُوْا الْمُنْكِرِيْنَ لِلْبَعْثِ عَلَيْهَا
لِعِلْمِهِمْ بِاَنَّ مَصِيْرَهُمْ اِلَى النَّارِ دُوْنَ
الْمُشْرِكِيْنَ لِاِنْكَارِهِمْ لَهُ يَوَدُّ يَتَمَنّٰى
اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ ج لَوْ
مَصْدَرِيَّةٌ بِمَعْنٰى اَنْ وَهِيَ بِصِلَتِهَا فِيْ
تَاْوِيْلِ مَصْدَرٍ مَفْعُوْلُ يَوَدُّ وَمَا هُوَ
اَىْ اَحَدُهُمْ بِمُزَحْزِحِهٖ مُبْعِدِهٖ مِنَ الْعَذَابِ
النَّارِ اَنْ يُّعَمَّرَ ط فَاعِلُ مُزَحْزِحِهٖ اَىْ
تَعْمِيْرُهٗ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ـ
بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ فَيُجَازِيْهِمْ ـ

৯৬. তুমি তাদেরকে নিশ্চয় জীবনের প্রতি সমস্ত মানুষ এমন কি অংশীবাদী অপেক্ষা যারা পুনরুত্থানে বিশ্বাসী না, অধিকতর লোভী দেখতে পাবে। কেননা তারা জানে পরকালে তাদেরকে নিশ্চিতভাবেই জাহান্নামে যেতে হবে। পক্ষান্তরে অংশীবাদীরা পরকালেই বিশ্বাস করে না। সুতরাং এ সম্পর্কে তাদের কোনো ভয়ও নাই। তাদের এক একজন কামনা করে আকাঙ্ক্ষা করে যদি সে সহস্র বৎসর আয়ু পেত। কিন্তু দীর্ঘায়ু অর্থাৎ এই আয়ু লাভ তাকে তাদের একজনকেও শাস্তি হতেও জাহান্নামাগ্নি হতে সরিয়ে রাখতে দূরে রাখতে পারবে না। তারা যা করে আল্লাহ তার দ্রষ্টা। সুতরাং তিনি তাদেরকে প্রতিফল দিবেন।

لَتَجِدَنَّهُمْ -এর لَامْ টি قَسَمْ বা শপথ অর্থব্যঞ্জক। وَمِنَ الَّذِيْنَ -এর عَطْف বা অন্বয় হলো পূর্ববর্তী اَحْرَصَ -এর সাথে এই দিকে ইঙ্গিত করার জন্য মাননীয় তাফসীরকার এর পূর্বেও اَحْرَصَ শব্দটির উল্লেখ করেছেন।

لَوْ يُعَمَّرُ এই আয়াতে لَوْ শব্দটি اَنْ -এর ন্যায় مَصْدَرْ বা ক্রিয়ার ধাতু বা উৎস রূপ অর্থ প্রকাশ করে। এটা স্বীয় صِلَةْ বা সংযোজক শব্দ يُعَمَّرُ সহ مَصْدَرْ রূপে يَوَدُّ ক্রিয়ার مَفْعُوْل বা কর্মকারক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। اَنْ يُعَمَّرُ এটা مُزَحْزِحِهٖ -এর فَاعِل বা কর্তা। يَعْمَلُوْنَ ক্রিয়াটির ت [মধ্যম পুরুষরূপে] ও ى [নাম পুরুষরূপে] উভয় সহকারেই পাঠ রয়েছে।

٩٧. وَسَأَلَ ابْنُ صُوْرِيَا النَّبِيَّ ﷺ اَوْ عُمَرَ
رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَمَّنْ يَأْتِيْ بِالْوَحْيِ
مِنَ الْمَلٰئِكَةِ فَقَالَ جِبْرَئِيْلُ فَقَالَ هُوَ
عَدُوُّنَا يَأْتِيْ بِالْعَذَابِ وَلَوْ كَانَ
مِيْكَائِيْلُ لَاٰمَنَّا لِاَنَّهٗ يَأْتِيْ بِالْخَصْبِ
وَالسِّلْمِ فَنَزَلَ قُلْ لَّهُمْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا
لِجِبْرِيْلَ فَلْيَمُتْ غَيْظًا فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ
اَىِ الْقُرْاٰنَ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ بِاَمْرِ
اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ قَبْلَهٗ
مِنَ الْكِتٰبِ وَهُدًى مِنَ الضَّلَالَةِ
وَبُشْرٰى بِالْجَنَّةِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ـ

৯৭. ইবনে সুরিয়া নামক জনৈক ইহুদি রাসূলুল্লাহ ﷺ অথবা হযরত ওমর (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, কোন ফেরেশতা ওহী বহন করে নিয়ে আসেন? তিনি বললেন, হযরত জিবরাঈল (আ.)। সে বলল, সে তো আমাদের শত্রু। সে আমাদের উপর আল্লাহ তা'আলার আজাব নিয়ে আসে। যদি মিকাঈল ফেরেশতা ওহী বহন করে আনতেন, তবে নিশ্চয় আমরা ঈমান আনতাম। কেননা পৃথিবীতে তিনি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি আনয়ন করেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন, তাদের বল, যে কেউ জিবরাঈলের শত্রু সে ক্ষোভে মরে যাক, সে তো আল্লাহর অনুমোদনে আল্লাহর নির্দেশে তোমার হৃদয়ে তা আল কুরআন পৌঁছিয়ে দেয় বা তার সম্মুখ বিষয়ের তার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থক এবং বিশ্বাসীদের জন্য **গুমরাহী** হতে [হেদায়েত ও] জান্নাতের **শুভ সংবাদ**।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ لَامُ قَسَمٍ : ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এখানে لَتَجِدَنَّهُمْ হলো جَوَابُ قَسَمٍ আর قَسَمٍ উহ্য রয়েছে–

اَىْ وَاللّٰهِ لَتَجِدَنَّهُمْ الخ

قَوْلُهُ اَحْرَصَ النَّاسِ : এটি تَجِدَنَّهُمْ -এর দ্বিতীয় মাফউল। কেননা تَجِدَ দুটি مَفْعُولٌ এর দিকে مُتَعَدِّىْ হয়

قَوْلُهُ عَلٰى حَيٰوةٍ : حَيَاةٌ -এর تَنْكِيْر প্রকার বা ধরন বুঝানোর জন্য। অর্থাৎ এক প্রকারের হায়াত। আর তা হলো اَلْحَيٰوةُ **الْمُتَطَاوِلَةُ বা দীর্ঘ জীবন। আর কেউ বলেন– এখানে مُضَافٌ মাহযুফ আছে** اَىْ عَلٰى طُوْلِ حَيَاةٍ

কেউ বলেন– সিফত মাহযুফ আছে। اَىْ عَلٰى حَيٰوةٍ طَوِيْلَةٍ

قَوْلُهُ سَنَةٌ : سَنَةٌ অর্থ বছর। বহুবচন سِنُوْنَ মূলত سِنَوَةٌ ছিল। কেননা তার **বহুবচন** سَنَوَاتٌ -ও আসে। কেউ কেউ বলেন– **سَنَةٌ -এর মূলরূপ سَنَهَةٌ ছিল। অনুরূপভাবে** তার বহুবচন سَنَهَاتٌ ও আসে।

قَوْلُهُ مُزَحْزِحِهِ : এটি اِسْمُ فَاعِلٍ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ -এর সীগাহ। زَحْزَحَةٌ عَلٰى وَزْنِ فَعْلَلَةٍ [দূর করা] থেকে নির্গত। ثُلَاثِىْ مُجَرَّدٌ থেকেও ব্যবহার রয়েছে। যেমন– زَحَّ (ن) زَحًّا দূর করা।

قَوْلُهُ فَلْيَمُتْ غَيْظًا : এখানে এ বাক্যটি মাহযুফ মানার উদ্দেশ্য হলো এই যে, مَنْ كَانَ -এর মধ্যে مَنْ টি হলো مَنْ **شَرْطِيَّةٌ আর فَلْيَمُتْ হলো তার جَزَاءٌ مَحْذُوْفٌ ;** কেউ কেউ جَزَائِے مَحْذُوْفٌ হিসেবে ভিন্ন ইবারতও উল্লেখ করেছেন। যেমন– مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيْلَ فَلَا وَجْهَ لِعَدَاوَتِهِ

قَوْلُهُ فَاِنَّهُ نَزَّلَهُ : এটি পূর্বোক্ত শর্তের جَزَاءٌ নয়; বরং جَزَاءٌ -এর ইল্লত। **কেননা جَزَاءٌ জুমলা হলে তার একটি** عَائِدٌ হওয়া জরুরি, যা এখানে বিদ্যমান নেই।

قَوْلُهُ اَىِ الْقُرْاٰنَ : نَزَّلَهُ -এর জমীরটি হযরত জিবরাঈল (আ.) -এর প্রতি ফিরার সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে তা অশুদ্ধ বিধায় মুফাসসির (র.) اَلْقُرْاٰنُ উল্লেখ করে জমীরের মারজি' নির্ণয় করে দিয়েছেন যদিও পূর্বে কুরআন উল্লেখ নেই। কিন্তু **اَلْمَشْهُوْرُ كَالْمَذْكُوْرِ এ নীতিমালার আলোকে** اِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ লাজেম আসবে না।

قَوْلُهُ عَلٰى قَلْبِكَ : প্রশ্ন : এখানে قَلْبٌ -কে ضَمِيْرُ مُخَاطَبٌ -এর দিকে ইযাফত করা হলো কেন? বাহ্যিক বিন্যাসের দাবি অনুযায়ী তো عَلٰى قَلْبِىْ হওয়া উচিত ছিল।

উত্তর : এখানে রাসূল ﷺ আল্লাহর কথাটিই উদ্ধৃত করেছেন। হাশিয়ায়ে জামালে এর উত্তর এভাবে দেওয়া হয়েছে–

اَمَّا مُرَاعَاةً لِحَالِ الْاَمْرِ بِالْقَوْلِ فَيَرُدُّ لَفْظَهُ بِالْخِطَابِ وَاَمَّا لِاَنَّ ثَمَّ قَوْلًا آخَرَ مُضْمَرًا بَعْدَ قُلْ وَالتَّقْدِيْرُ قُلْ يَا مُحَمَّدُ قَالَ اللّٰهُ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيْلَ . (جمل : صـ١٢٣ جـ١)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে ইহুদিদের মৃত্যু কামনা না করার আলোচনা ছিল। এখন এ আয়াতে জীবন সম্পর্কে তাদের অবস্থা ও চিন্তাধারা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা জীবনের প্রতি খুবই লোভী।

قَوْلُهُ وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ : ইহুদিরা এত বেশি পাপ করেছে, যার ফলে তারা মৃত্যু হতে ভীষণভাবে পালিয়ে বেড়ায়। তাদের ভয় মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা তো সুখের দেখা যায় না। এমনকি বেঁচে থাকার লোভ তাদের মুশরিকদের চেয়ে বেশি। এর দ্বারা তাদের দাবির বিভ্রান্তি অতি সুন্দরভাবে সাব্যস্ত হয়ে গেছে। –[তাফসীরে উসমানী পৃ. ১৮]

قَوْلُهُ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا : অর্থাৎ যে বেচারাদের কাছে আসমানি কিতাব ও নবীগণের পয়গামের অমূল্য সম্পদ নেই, অর্থাৎ **মুশরিকরা** তো আখিরাতের জীবনের সুখ-সম্ভোগের কথা জানেই না। সুতরাং তারা যদি সে দিকে মনোযোগ না দিয়ে এ বস্তুতান্ত্রিক জীবনকেই নিজেদের জীবনের লক্ষ্য ও মনোযোগের কেন্দ্রে পরিণত করে, তবে তাতে তেমন বিস্ময়ের কিছু নেই। বিস্ময়ের চূড়ান্ত তো করে দিয়েছে এ [নবী বংশজাত] ইহুদিরা যারা আসমানি কিতাবও পয়গাম্বরী হেদায়েত সত্ত্বেও মুশরিক পৌত্তলিকদের চেয়েও অধিকহারে দুনিয়ার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে একটি চমৎকার তথ্য এই যে, বয়স ও আয়ু বৃদ্ধির যেসব মতবাদ বর্তমান ইউরোপ ও পাশ্চাত্যে আবির্ভূত হয়েছে এবং সে উদ্দেশ্যে যেসব কৌশল ও প্রক্রিয়া আবিষ্কার করা হচ্ছে, সেগুলোতেও অগ্রণী ভূমিকায় রয়েছে এ দুনিয়াখোর ইহুদি চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞানীরাই। -[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ১৬৯-১৭০]

তাহলে বুঝা গেল وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا হলো تَخْصِيْص بَعْدَ التَّعْمِيْم অর্থাৎ প্রথমে ব্যাপকভাবে বলার পর বিশেষভাবে বলা হয়েছে। এ বিশেষভাবে বলার কারণ হলো জীবনের প্রতি ইহুদিদের লোভের مُبَالَغَةٌ বুঝানো। কেননা মুশরিকরা তো কেবল দুনিয়ার জীবনকেই জীবন মনে করত। পরকালে বিশ্বাসী ছিল না। পক্ষান্তরে ইহুদিরা পরকালের প্রতিদানের আশাবাদী ছিল। এরপরও মুশরিকদরে চেয়ে তাদের লোভ বেশি হওয়া চূড়ান্ত লোভ ছাড়া আর কি।

قَوْلُهُ لِعِلْمِهِمْ بِاَنَّ مَصِيْرَهُمْ : এটি اَحْرَصَ -এর ইল্লত। এর দ্বারা একটি سُوَالْ مُقَدَّرْ [উহ্য প্রশ্ন]-এর উত্তরের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রশ্ন : মুশরিকদের বেঁচে থাকার লোভ বেশি ছিল। এমনকি তাদের পরস্পরে অভিবাদন ছিল عِشْ اَلْفَ سَنَةٍ তুমি হাজার বছর বেঁচে থাক। তারপরও ইহুদিদেরকে লোভ তাদের তুলনায় প্রবল হওয়ার কারণ কি?

উত্তর : ইহুদিরা ভালো করেই জানত যে, তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম। কেননা তারা অনেক পাপ করেছে। তাই পরকাল সুখের না দেখে মৃত্যু হতে মুশরিকরা পরকাল বিশ্বাসই করত না। ফলে সেখানকার শাস্তি সম্পর্কে নাজানার কারণে এত অস্থির ছিল না।

قَوْلُهُ لِاِنْكَارِهِمْ لَهُ : اَىْ لِاِنْكَارِ الْمُشْرِكِيْنَ لِلْبَعْثِ

قَوْلُهُ يَوَدُّ اَحَدُهُمْ : এখান থেকে ইহুদিদের অধিক লোভ হওয়ার অবস্থা তুলে ধরা হচ্ছে। এ সূরতে এটি جملة مستانفة এবং তার কোনো مَحَلْ اِعْرَابْ নেই। আর যদি اَلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا দ্বারা ইহুদিরা উদ্দেশ্য হয় তাহলে এ সূরতে এটি উহ্য مَوْصُوْف -এর صِفَتْ হবে। তখন তাকদীরী ইবারত এরূপ হবে- বাক্যটি مِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا খবর হয় এবং

اَىْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوا ـ اُنَاسٌ يَوَدُّ اَحَدُهُمْ الخ ـ

এ সূরতে অর্থাৎ اَلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا দ্বারা ইহুদিরা উদ্দেশ্য হলে এটি وَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ -এর অন্তর্ভুক্তি হবে। কেননা তখন وَمِنْهُمْ اُنَاسٌ হওয়া উচিত ছিল। ইসমে জাহের ব্যবহারের উদ্দেশ্য হবে ইহুদীদের শিরককে সুস্পষ্ট করে তোলা।

قَوْلُهُ اَحَدُهُمْ : هُمْ সর্বনাম দ্বারা ইহুদিরা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ইহুদিদের প্রত্যেকের বাসনা। কেউ কেউ যারা শিরক করে (اَلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا) উদ্দেশ্য হওয়ার কথা বলেছেন। কিন্তু উপস্থাপনা ধারা প্রথম মতকেই জোরদার করে।

قَوْلُهُ يَتَمَنّٰى : এটি يَوَدُّ -এর তাফসীর মূলত وُدٌّ অর্থ مُحَبَّةُ الشَّيْءِ مَعَ تَمَنِّيْهِ কোনো বস্তুকে পাওয়ার আশা করে মহববত করা। কখনো (مُحَبَّةٌ) وُدٌّ এবং تَمَنِّىْ একটি অপরটির অর্থে আসে। উভয়টির মাঝে পার্থক্য হলো مُحَبَّةٌ -এর মাফউল مُفْرَدْ হয় আর تَمَنِّىْ -এর মাফউল জুমলা হয়। এখানে যেহেতু لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ জুমলা হয়েছে, তাই মুফাসসির (র.)-এখানে يَوَدُّ -এর তাফসীরে يَتَمَنّٰى উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ اَلْفَ سَنَةٍ : হাজার বছর দ্বারা নির্দিষ্ট সংখ্যা উদ্দেশ্য নয়; বরং এর দ্বারা অধিক বছরের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ لَوْ مَصْدَرِيَّةٌ بِمَعْنٰى اَنْ : এর দ্বারা একটি سُوَالْ مُقَدَّرْ [উহ্য প্রশ্ন]-এর উত্তরের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রশ্ন : **يُعَمَّرُ** মাসদারের তাবীল হয়ে يَوَدُّ এর মাসউল। সুতরাং নিয়ম অনুযায়ী أَنْ يُعَمَّرَ হওয়া উচিত ছিল। لَوْ يُعَمَّرُ কেন বলা হলো?

উত্তর : এখানে **لَوْ** শব্দটি أَنْ مَصْدَرِيَّةٌ -এর অর্থে। কেননা নিয়ম আছে لَوْ যখন تَمَنِّيْ বা তার অর্থের পরে পতিত হয়, তাহলে সেটা أَنْ مَصْدَرِيَّةٌ -এর অর্থ দেয়।

কেউ কেউ বলেন– এখানে **لَوْ** শব্দটি **شَرْطِيَّةٌ** এবং তার جَزَا উহ্য রয়েছে أَىْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ لَسُرَّ بِذٰلِكَ এ সূরতে يَوَدُّ -এর মাফউল মাহযুফ হবে।

قَوْلُهُ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ : অর্থাৎ এই আয়ু লাভ তাদের একজনকেও জাহান্নামাগ্নি হতে সরিয়ে রাখতে দূরে রাখতে পারবে না। কেননা এত দীর্ঘ জীবন কেউ পেয়ে গেলে শেষ ফল কি দাঁড়াবে? সে সু-দীর্ঘ জীবনেরও তো একদিন পরিসমাপ্তি ঘটবেই এবং তখনও সেই পরকালীন জবাবদিহির মুখোমুখি। কাজেই এহেন অর্থহীন ও লক্ষ্যহীন কামনা-বাসনার মোহে পড়ে থাকা কোনো দীনদার ব্যক্তির জন্য সম্ভব হতে পারে কি করে?

যোগসূত্র : ১ পূর্বের আয়াতে ইহুদিদেরকে পবিত্র কুরআনের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দেওয়া হলে তারা গ্রহণ না করার জন্য نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا বলে বাহানা দিয়েছিল, আল্লাহ তাদের বাহানার খণ্ডন করেছেন। এখন এ আয়াতে ঈমান না আনার আরেকটি বাহানা উল্লেখ করে তা খণ্ডন করা হয়েছে।

যোগসূত্র : ২ পূর্বে তাদের একটি ভ্রান্ত দাবি তথা لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا -এর খণ্ডন করা হয়েছিল। এখানে, আরেকটি ভ্রান্ত দাবি খণ্ডন করা হচ্ছে।

قَوْلُهُ صُوْرِيَا : প্রকৃত নাম আব্দুল্লাহ ইবনে সুরিয়া। ফিদাক -এর অধিবাসী। ইহুদি আলেম। –[রুহুল বয়ান, জামাল]

قَوْلُهُ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيْلَ : শানে নুযূল : এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে বিভিন্ন ঘটনা বর্ণিত আছে। যার প্রতি মুসান্নিফ (র.) ইঙ্গিত করেছেন। নিম্নে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো–

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত। ইহুদিদের ধর্মপণ্ডিত ইবনে মুগিরা রাসূল ﷺ-এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করল, হে আবুল কাসিম! আমাদের এমন কিছু প্রশ্নের জবাব দিন, যা নবী করীম ﷺ ছাড়া অন্য কেউ দিতে সক্ষম নয়। রাসূল ﷺ বললেন, তোমাদের যা ইচ্ছা জিজ্ঞেস কর। জিজ্ঞাসাবাদের এক ফাঁকে তারা বলল– مَنْ وَلِيُّكَ مِنَ الْمَلٰۤئِكَةِ তিনি বললেন وَلِيِّيْ جِبْرِيْلُ ফেরেশতাদের মধ্যে আমার বন্ধু হলেন হযরত জিবরাঈল (আ.)। তিনি সকল নবীদেরই বন্ধু। তারা বলল, আমরা আপনার কথা মানব না। যদি জিবরাঈল ছাড়া অন্য কোনো ফেরেশতা আপনার বন্ধু হতো, তাহলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনতাম। রাসূল ﷺ বললেন, কি ব্যাপার? তারা বলল, জিবরাঈল তো আমাদের দুশমন। সেই প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাজিল হয়। –[ফাতহুল কাদীর]

২. হযরত আনাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) যখন রাসূল ﷺ-এর শুভাগমনের সংবাদ পান সে মুহূর্তে তিনি একটি বাগানে অবস্থান করেছিলেন। সেখান থেকে তিনি নবী ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন, আমি আপনাকে তিনটি প্রশ্ন করতে চাই, যার উত্তর নবী ছাড়া কেউ দিতে পারবে না। প্রশ্নগুলো হচ্ছে–

- কিয়ামতের প্রথম আলামত কি?
- জান্নাতীদেরকে সর্বপ্রথম কি খেতে দেওয়া হবে?
- কি কারণে সন্তান পিতা-মাতার মধ্য হতে কোনো একজনের সাদৃশ্যপূর্ণ হয়?

রাসূল ﷺ বললেন, এই মাত্র হযরত জিবরাঈল (আ.) এসে আমাকে এ ব্যাপারে বলে গেলেন। ইবনে সালাম বললেন, জিবরাঈল? তিনি বললেন, হ্যাঁ ইবনে সালাম (রা.) বললেন, সে তো ইহুদিদের দুশমন। তখন নবী ﷺ তেলাওয়াত করলেন– مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ .

৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত ইহুদি পণ্ডিত ইবনে সুরিয়া নবী ﷺ -কে বললো, আপনার কাছে কোন ফেরেশতা আসমান থেকে ওহী নিয়ে আসে? নবীজী ﷺ বললেন, হযরত জিবরাঈল (আ.)। সে বলল, সে তো আমাদের দুশমন। তদস্থলে যদি আজরাঈল হতো, তাহলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনতাম। কেননা জিবরাঈল কেবল আজাব-দুর্ভিক্ষ নিয়ে আসে, সে আমাদের সাথে বারবার শত্রুতামূলক আচরণ করেছে। -[হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১, পৃ. ১২৩]

হযরত ওমর (রা.)-এর ঘটনাটি হলো- মদীনার উঁচু অঞ্চলে হযরত ওমর (রা.)-এর একটি ভূমি ছিল। সেখানে ছিল ইহুদিদের বসবাস। তিনি সেখানে গেলে তাদের সাথে বসতেন এবং তাদের কথা-বার্তা শুনতেন। একদিন তারা হযরত ওমর (রা.)-কে বলল, মুহাম্মদ ﷺ -এর সাহাবীদের মধ্যে তুমিই আমাদের অধিক প্রিয়ভাজন। আমরা তোমার ব্যাপারে আশাবাদী। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি এখানে তোমাদের ভালোবাসায় আসিনি আর আমি যে তোমাদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করি, তা এজন্য নয় যে, আমি আমার ধর্মের ব্যাপারে সন্দিহান; বরং আমি তোমাদের সাথে উঠাবসা করি যাতে মুহাম্মদ ﷺ -এর ব্যাপারে বসীরত বৃদ্ধি হয় এবং তোমাদের কিতাবে বর্ণিত তার নিদর্শনাবলি সম্পর্কে অবগত হতে পারি। তখন তারা জিজ্ঞেস করল, মুহাম্মদ ﷺ -এর কাছে কোন ফেরেশতা আগমন করেন? তিনি বললেন, হযরত জিবরাঈল (আ.)। তারা বলল, সে তো আমাদের দুশমন। সে আমাদের গোপন তথ্যাবলি সম্পর্কে মুহাম্মদ ﷺ -কে অবগত করে দেয়। সে আজাব, দুর্ভীক্ষ ও কঠোরতার মালিক। আর মীকাঈল (আ.) শান্তি ও স্বচ্ছলতা নিয়ে আসেন।

–[হাশিয়ায়ে জামাল : খ. ১, পৃ. ১২৩]

قَوْلُهُ لِجِبْرِيْلَ : ইসলামি পরিভাষায় এক মহান ফেরেশতার নাম। একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ তথা নবীগণের কাছে আল্লাহ তা'আলার ওহী পৌছে দেওয়ার দায়িত্ব তার উপর অর্পিত। ইহুদিরা ফেরেশতার অস্তিত্বে বিশ্বাসী এবং হযরত জিবরাঈল (আ.)-কেও একজন বড় ফেরেশতারূপে স্বীকার করে। প্রচলিত তাওরাতেও তার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু তারা তাদের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতাবশত এরূপ ধারণা বদ্ধমূল করে নিয়েছে যে, তার দায়িত্ব ওহী বহন করা নয়; বরং তার কাজ হচ্ছে আজাব নিয়ে আসা। ওহী বহনের দায়িত্ব পালন করে অন্য এক ফেরেশতা হযরত মীকাঈল (আ.)। নিজেদের এ মনগড়া ধারণার ভিত্তিতে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সমালোচনায় লিপ্ত হতো যে, এ নবুয়তের দাবিদার তো নিজের কাছে ওহী আসা সম্পর্কে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর নাম নিয়ে থাকেন। অথচ সে তো ওহী- বাহক নয়। এখানে ইহুদিদের এ ভ্রান্ত পথ অনুসরণের বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ بِإِذْنِ اللّٰهِ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে। সুতরাং তাতে তার সঙ্গে শত্রুতা ও কুধারণা পোষণের যুক্তি ও অর্থ কি? তা তো প্রকারান্তরে আল্লাহ তা'আলার সঙ্গেই দুশমনী। এখানে ইহুদিদের অজ্ঞতা বিদূরিত করা হলো এবং জানিয়ে দেওয়া হলো যে, হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর নাম শুনেই চটে উঠার কি যুক্তি থাকতে পারে? তিনি তো আল্লাহ তা'আলার একজন নির্ভরযোগ্য দূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তাঁর কাজ তো শুধু আদেশ পালন করা। অভিধানে إِذْنٌ শব্দের অর্থ যেমন অনুমতি রয়েছে, তদ্রূপ হুকুম এবং নির্দেশও রয়েছে।

قَوْلُهُ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى الخ : পবিত্র কুরআন এখানে সুনির্দিষ্ট করে তার তিনটি গুণ উল্লেখ করেছে–

১. সত্যায়নকারী। বিগত সহীফাসমূহ ও পরবর্তী নবীগণকে সে সত্য বলে ঘোষণা করে অর্থাৎ তার আহ্বান কোনো অভিনব ও অভূতপূর্ব বিষয় নয়, তাওহীদেরই সে পুনরায় পাঠ, যা সব ওহীধারা সম্বলিত বাণী।

২. কুরআন নিজেই একটি হেদায়েতনামা ও পথনির্দেশিকা।

৩. ঈমানদারদের জন্য তা সুসংবাদের বাহক।

অনুবাদ :

٩٨. مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ بِكَسْرِ الْجِيْمِ وَفَتْحِهَا بِلَا هَمْزَةٍ وَبِهٖ بِيَاءٍ وَدُوْنَهَا وَمِيْكٰلَ عَطْفٌ عَلَى الْمَلَائِكَةِ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ وَفِيْ قِرَاءَةٍ مِيْكَائِيْلَ بِهَمْزٍ وَيَاءٍ وَفِيْ اُخْرٰى بِلَا يَاءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ . اَوْقَعَهٗ مَوْقَعَ لَهُمْ بَيَانًا لِحَالِهِمْ .

৯৮. যে কেউ আল্লাহ তা'আলা, তাঁর ফেরেশতাগণের, তার রাসূলগণের এবং জিবরাঈল ও মিকাঈল (আ.)-এর শত্রু। সে জেনে রাখুক আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয় সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের শত্রু।

جِبْرِيْل শব্দটির প্রথম অক্ষর ج -এ কাসরা বা ফাতাহ ر -এরপর হামজাসহ বা তা ব্যাতিরেকে এবং পরে ى সহ বা তা ব্যাতিরেকেও পাঠ করা যায়। مِيْكٰل শব্দটির অপর এক কেরাতে مِيْكَائِيْل আলিফের পর হামযা ও ى সহ এবং অপর এক কেরাতে ى ব্যতীতও পাঠ রয়েছে। اَلْمَلَائِكَةُ -এর সাথে مِيْكٰل ও جِبْرِيْل -এর عَطْف বা অন্বয় সংঘটিত হয়েছে। এটা عَطْفُ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ বা বিশেষ অর্থব্যঞ্জক শব্দের সাথে ব্যাপক অর্থজ্ঞাপক শব্দের অন্বয় পর্যায়ের عَطْف ।

اَلْكَافِرِيْنَ শব্দটি সুস্পষ্ট উল্লেখ করে তাদের প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে এই স্থানে لَهُمْ -এর স্থলে لِلْكَافِرِيْنَ ব্যবহার করা হয়েছে।

٩٩. وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ . وَاضِحَاتٍ حَالٌ رَدٌّ لِقَوْلِ ابْنِ صُوْرِيَا لِلنَّبِيِّ ﷺ مَا جِئْتَنَا بِشَيْءٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ . كَفَرُوْا بِهَا .

৯৯. হে মুহাম্মদ ﷺ! নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি স্পষ্ট পরিষ্কার নিদর্শনসমূহ অবতীর্ণ করেছি। ইবনে সুরিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেছিল, তুমি কিছু নিয়ে আমাদের কাছে প্রেরিত হওনি। এই আয়াতটি তার প্রতিবাদ। সত্য-ত্যাগীগণ ব্যতীত অন্য কেউ তা প্রত্যাখ্যান করে না। بَيِّنَاتٌ শব্দটি حَالٌ বা ভাব ও অবস্থাবাচক।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلّٰهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكَالَ : و [এবং/অথবা] : আভিধানিকগণ লিখেছেন যে, و [ওয়াও] অব্যয়টি সব সময়ই সংযোগরূপে ব্যবহৃত হয় না; বরং অনেক সময় তা [বিয়োজক] অথবা অর্থও দিয়ে থাকে। ওয়াও و। অর্থেও ব্যবহৃত হয় –[কামূস]। এখানেও চারটি স্থানেই সে অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ উল্লিখিত নামগুলোর সমষ্টি উদ্দেশ্য নয়; বরং যে কেউ এদের যে কোনো একটির বিরোধী হবে তাকেই বুঝানো উদ্দেশ্য। যে কেউ এদের যে কারো শত্রু হবে, সে সকলেরই শত্রু।

يَعْنِيْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِأَحَدٍ مِنْ هٰؤُلَاءِ فَاِنَّهٗ كَانَ عَدُوًّا لِلْجَمِيْعِ . (مَعَالِم)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এদের যে কোনো জনের শত্রু হবে সে সকলের শত্রু। –[হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১, পৃ. ১২৪]

قَوْلُهُ عَدُوًّا لِلّٰهِ : عَد বহুবচন اَعْدَاءٌ - اَلْعَدُوُّ ضِدُّ الصَّدِيْقِ وَهُوَ الَّذِيْ يُرِيْدُ اِنْزَالَ الْمَضَارَّةِ

অর্থাৎ عَدُوٌّ হলো صَدِيْق -এর বিপরীত শব্দ। عَدُوٌّ বলা হয় যে কারো ক্ষতি কামনা করে।

প্রশ্ন : এখানে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ তা'আলা হলেন মহা ক্ষমতাধর। তাঁর সাথেও কি শত্রুতা করা যায়?

উত্তর : এখানে عَدَاوَةُ اللّٰهِ দ্বারা রূপক অর্থে আল্লাহর বিরোধিতা উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় উত্তর : এখানে مُضَافٌ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ عَدَاوَةُ اللّٰهِ দ্বারা মাজাযীভাবে عَدَاوَةُ اَوْلِيَاءِ اللّٰهِ উদ্দেশ্য اَىْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا اَوْلِيَاءِ اللّٰهِ

قَوْلُهُ بِكَسْرِ الْجِيْمِ وَفَتْحِهَا : جِبْرِيْلُ শব্দটির প্রথম অক্ষর ج বর্ণে কাসরা দিয়ে পাঠ করা হলে তা قِنْدِيْل -এর ওজনে হবে। আর ফাতহা পাঠ করা হলে شَمْوِيْل -এর ওজনে হবে। -[হাশিয়ায়ে জামাল]

قَوْلُهُ بِلَا هَمْزَةٍ وَبِهِ بِيَاءٍ وَدُوْنَهَا : অর্থাৎ جِبْرِيْل শব্দটির ر -এর পর হামযাসহ বা হামযা ব্যতিরেকে এবং পরে ى সহ বা 'ইয়া' ব্যাতিরেকেও পাঠ করা যায়। بِلَا هَمْزَةٍ -এর সম্পর্ক কাসরা এবং ফাতহা উভয়টির সঙ্গে। আর وَبِهِ -এর সম্পর্ক শুধু مَفْتُوْح -এর সাথে। মোট কেরাত হবে চারটি। একটি হলো ج বর্ণে কাসরা অবস্থায় আর তিনটি ফাতহা অবস্থায়। তৃতীয়টি হলো سَلْسَبِيْل -এর ওজনে এবং চতুর্থটি جَحْمَرِشٌ -এর ওজনে। সবগুলোই সাত কেরাতের অন্তর্ভুক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে জীবরীল (আ.)-এর সাথে ইহুদিদের শত্রুতার বিবরণ ছিল, এখন এ আয়াতে সে শত্রুতার হুকুম ও পরিণাম বর্ণনা করা হচ্ছে।

قَوْلُهُ مِيْكَائِيْلُ : কেউ বলেছেন, এটি مَلَكُوْتُ اللّٰهِ থেকে নির্গত আবার কেউ বলেছেন, مِيْك অর্থ عَبْد বা বান্দা আর اِيْل অর্থ اَللّٰه অর্থাৎ مِيْكَائِيْل হচ্ছে- আব্দুল্লাহ।

قَوْلُهُ وَفِىْ قِرَاءَةٍ مِيْكَائِيْلُ بِهَمْزَةٍ وَيَاءٍ وَفِىْ اُخْرٰى بِلَا يَاءٍ : অর্থাৎ مِيْكَالُ -এর মাঝে সাতটি কেরাত রয়েছে। যথা-

১. مِيْكَالُ بِوَزْنِ مِفْعَالٌ
২. مِيْكَائِلْ
৩. مِيْكَائِيْلُ
৪. مِيْكَئِيْلُ بِوَزْنِ مِيْفَعِيْلُ
৫. مِيْكَئِلُ بِوَزْنِ مِيْفَعِلُ
৬. مِيْكَايِيْلُ
৭. مِيْكَائِلُ بِوَزْنِ اِسْرَائِلُ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত جَبْرٌ অর্থ عَبْد আর مِيْكَا অর্থ عُبَيْدٌ [তাসগীর রূপে] সুতরাং جِبْرَائِيْلُ অর্থ- عَبْدُ اللّٰه এবং مِيْكَائِيْلُ অর্থ عُبَيْدُ اللّٰهِ -[জামাল]

مِيْكَالُ : মীকাল বা মীকাঈল জিবরাঈল (আ.)-এর ন্যায় একজন মহান ফেরেশতার নাম। প্রসিদ্ধ বর্ণনাসমূহে রয়েছে যে, সৃষ্টি জগতে খাদ্য সরবরাহ ও বৃষ্টি বর্ষণ [আবহাওয়া] তাঁর দায়িত্বে অর্পিত। অর্থাৎ শরিয়ত [ও নীতি নির্ধারণী] বিষয়ক ক্ষেত্রে জিবরাঈল (আ.) আল্লাহ তা'আলা ও মানুষ নবীর মধ্যে] বিশেষ মাধ্যম, তদ্রূপ জাগতিক ও প্রাকৃতিক [ব্যবহারিক] বিষয়ের ক্ষেত্রে হযরত মীকাঈল (আ.) বিশেষ মাধ্যম। প্রথম জন যেন উলুহিয়্যাত [আল্লাহ তা'আলার নীতিগত প্রাধান্য ও উপাসনা সার্বভৌমত্ব] দফতরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং দ্বিতীয়জন যেন আল্লাহ তা'আলার রবুয়িব্যাত প্রতিপালন ও সৃষ্টি লালন -এর কর্ম] দফতরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তাওরাতে হযরত মীকাঈল (আ.) প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে অত্যন্ত সমীহ প্রকাশ করে। ইহুদিরা তার সঙ্গেই তাদের

যাবতীয় সম্পর্ক জুড়ে রেখেছে এবং তাকে তাদের জাতীয় রক্ষক মনে করে। ইহুদিরা হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ওহীবাহক হওয়ার কথা প্রত্যাখ্যানের সময় সঙ্গে সঙ্গে এ দুই ফেরেশতার সঙ্গে তার [যথাক্রমে] শত্রুতা ও আকর্ষণ অনুরাগের কথাও প্রকাশ করেছিল। এ দিকে লক্ষ্য রেখেই কুরআনি জবাবেও দু'জনের নাম বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

–[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ১৭২]

قَوْلُهُ عَطْفُ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ : এর সম্পর্ক **جِبْرِيْلَ** এবং **مِيْكَائِيْلَ** উভয়ের সাথে। কেননা তারা উভয়ে ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত। এভাবে **عَطْف** করার ফায়দা হলো অন্যান্য ফেরেশতাদের মধ্যে তাদের উভয়ের বিশেষ মর্যাদার প্রতি সতর্ক করা। আল্লামা কিরমানী (র.) বলেন, জিবরাঈল (আ.)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তার ব্যাপারে ইহুদিদের শত্রুতা পোষণের দাবি খণ্ডন করার জন্য। আর তার সাথে হযরত মীকাঈল (আ.)-এর নাম জুড়ে দেওয়ার কারণ হলো তিনি রিজিকের ফেরেশতা। আর রিজিক হলো শরীরের খাদ্য। তেমনিভাবে হযরত জিবরাঈল (আ.) হলেন ওহী বাহক ফেরেশতা। আর ওহী হলো রূহের খোরাক। হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর নাম পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে ওহীর মর্যাদার কারণে।

–[হাশিয়ায়ে জামাল : খ. ১, পৃ. ১২৫]

قَوْلُهُ فَإِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِيْنَ : অর্থাৎ এ ধরনের আচরণকারী যে কোনো ব্যক্তি কাফের বলে পরিগণিত হবে এবং তার সঙ্গে শত্রুর সঙ্গে শত্রুর আচরণ' -এর ন্যায় আচরণ করা হবে। ফকীহগণ এ আয়াত সূত্রে উদঘাটন করেছেন যে, মাসূম [পাপে নিরাপত্তা প্রাপ্ত]-দের আনুগত্য হুবহু আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য এবং মাসূমদের বিরুদ্ধাচারণ সরাসরি সত্যের বিরুদ্ধাচারণ। এ কথাও বলা হয়েছে যে, খুলাফা-ই রাশেদীন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ যাদের ফজিলত শ্রেষ্ঠত্বের বিবরণ বলা যায়, সত্যতা নিশ্চিত উপর্যুপরি বর্ণনা পরম্পরা [তাওয়াতুর] -এর স্তরে উপনীত, তাদের প্রতি বিদ্বেষ ও বিরুদ্ধাচারণও এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত। হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (র.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার বিশিষ্ট ওলীগণের [আহলুল্লাহ] সঙ্গে বিরোধ-বিদ্বেষ পোষণ প্রত্যক্ষরূপে আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে শত্রুতার কারণ হয়ে যায়।

قَوْلُهُ أَوْقَعَهُ مَوْقِعَ لَهُمْ بَيَانًا لِحَالِهِمْ : অর্থাৎ **عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِيْنَ** বলার স্থলে **عَدُوٌّ لَهُمْ** বলা যথেষ্ট ছিল। এ জন্য যে, পূর্বে তার আলোচনা হয়েছে। তবে যেহেতু এখানে তাদের এ অবস্থা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে– তারা ফেরেশতাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করার কারণে কাফের হয়ে গেছে, সেহেতু জমীরের স্থলে ইসমে জাহের ব্যবহার করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا الخ : যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে ইবনে সূরিয়ার একটি বক্তব্য খণ্ডন করা হয়েছিল। এখানে তার আরেকটি বক্তব্য খণ্ডন করা হয়েছে। সে নবী ﷺ-কে বলত **مَا جِئْتَنَا بِشَيْءٍ** আপনি আমাদের সামনে কোনো নির্দশন আনেননি। তার বক্তব্য খণ্ডন করে আল্লাহ তা'আলাও আয়াত নাজিল করেন।

رَدٌّ لِقَوْلِ ابْنِ صُوْرِيَا : এ ইবারতটুকু বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য **مَعْطُوْف عَلَيْهِ** তথা **مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيْلَ** এবং **مَعْطُوْف** তথা **وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْكَافِرُوْنَ** -এর মাঝে **جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ** আনার কারণ বর্ণনা করা। –[জামালাইন খ. ১, পৃ. ১৭৮]

قَوْلُهُ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفٰسِقُوْنَ : অর্থাৎ সেসব প্রকাশ্য ও উজ্জ্বল সাক্ষ্য-প্রমাণকে কোনো সুবোধ সম্পন্ন ও সুষ্ঠু বিবেকধারী ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারে না। তবে যারা আল্লাহ তা'আলার আইন ভঙ্গ করতে এবং রব্বানী শরিয়ত তথা স্রষ্টার দেওয়া জীবন বিধানের সঙ্গে বিদ্রোহ করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাদের কথা আলাদা। –[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ১৭৪]

অনুবাদ :

١٠٠. اَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوْا اللّٰهَ عَهْدًا عَلٰى الْاِيْمَانِ بِالنَّبِيِّ اِنْ خَرَجَ اَوِ النَّبِيَّ اَنْ لَا يُعَاوِنُوْا عَلَيْهِ الْمُشْرِكِيْنَ نَبَذَهٗ طَرَحَهٗ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بِنَقْضِهٖ جَوَابُ كُلَّمَا وَهُوَ مَحَلُّ الْاِسْتِفْهَامِ الْاِنْكَارِيْ بَلْ لِلْاِنْتِقَالِ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ .

১০০. তবে কি যখনই তারা আল্লাহ তা'আলার সাথে **কোনো** অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছে তাদের অঙ্গীকার **ছিল যখন** আবির্ভাব হবে, তখন তারা এই নবীর উপর **ঈমান** আনয়ন করবে বা মুশরিকদেরকে কোনোরূপ **সাহায্য** করবে না বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে তারা **যে** অঙ্গীকার করেছিল তা তখন তাদের কোনো একদল তা ছুড়ে ফেলেছে ভঙ্গ করেছে। نَبَذَهٗ এই বাক্যটি **হলো** পূর্বোক্ত শর্তবাচক শব্দ كُلَّمَا -এর জবাব। আর তা হচ্ছে اِسْتِفْهَامْ اِنْكَارِيْ বা উল্লিখিত অস্বীকৃতিসূচক প্রশ্নের مَحَلّ বা স্থান। বরং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না। بَلْ শব্দটি اِنْتِقَالْ বা প্রসঙ্গান্তর **অর্থে** ব্যবহৃত হয়েছে।

١٠١. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدٌ ﷺ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ ۙ كِتٰبَ اللّٰهِ اَيِ التَّوْرٰىةَ وَرَاءَ ظُهُوْرِهِمْ اَيْ لَمْ يَعْمَلُوْا بِمَا فِيْهَا مِنَ الْاِيْمَانِ بِالرَّسُوْلِ وَغَيْرِهٖ كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ . مَا فِيْهَا مِنْ اَنَّهٗ نَبِيٌّ حَقٌّ اَوْ اَنَّهَا كِتَابُ اللّٰهِ .

১০১. যখন আল্লাহর নিকট হতে তাদের নিকট যা আছে, তার সমর্থক রাসূল মুহাম্মদ ﷺ এলো, তখন যাদেরকে কিতাব দান করা হয়েছিল তাদের একদল আল্লাহর কিতাবকে তাওরাতকে পশ্চাৎদেশে ছুড়ে ফেলে। **অর্থাৎ** রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর ঈমান আনয়ন এবং এই জাতীয় অন্যান্য যে সমস্ত বিষয় ছিল তার উপর তারা আমল করল না। যেন তারা জানে না যে তিনি সত্য নবী বা তা আল্লাহ তা'আলার [প্রেরিত] কিতাব।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ اَكَفَرُوْا بِهَا : هَمْزَهٗ اِسْتِفْهَامْ- এর পরে كَفَرُوْا উহ্য ধরে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, وَكُلَّمَا -এর আতফ পূর্বের **সাথে নয়; বরং** مَعْطُوْف عَلَيْهِ উহ্য রয়েছে আর হামযাটি তার সাথেই সম্পৃক্ত।

قَوْلُهٗ اَوَ كُلَّمَا : اَوْ এখানে هَمْزَةْ টি হলো اِسْتِفْهَامْ اِنْكَارِيْ আর وَاوْ টি হলো عَاطِفَةْ . مَعْطُوْف عَلَيْهِ উহ্য রয়েছে মূলত **ইবারতটি** এভাবে হবে- اَكَفَرُوْا بِاٰيَاتِ اللّٰهِ الْبَيِّنَاتِ আর كُلَّمَا হলো ظَرْف زَمَانْ যা শর্তের অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে।

قَوْلُهٗ وَهُوَ مَحَلُّ الْاِسْتِفْهَامِ الْاِنْكَارِيْ : অর্থাৎ اوكلما -এর اِسْتِفْهَامْ -এর মহল হলো نَبَذَ فَرِيْقٌ অর্থাৎ তাদেরকে অঙ্গীকার ভঙ্গ থেকে বারণ করা হচ্ছে। আর মুফাসসির (র.) শুরুতে كَفَرُوْا বলে যে, مَعْطُوْف عَلَيْهِ উহ্য ধরেছেন, সেটিও اِسْتِفْهَامْ اِنْكَارِيْ -এর মহল। অর্থাৎ কুফরী থেকে বারণ করা হয়েছে।

بَلْ لِلْاِنْتِقَالِ : অর্থাৎ بَلْ এখানে প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্য; পূর্বের বক্তব্য বাতিল প্রমাণিত করার জন্য নয়।

قَوْلُهُ وَمِمَّا الخ : শুরুর وَاوْ টি عَاطِفَهْ পূর্বের জুমলার সাথে عَطْف হয়েছে এবং এটিও পূর্বের اِسْتِفْهَامْ اِنْكَارِيْ-এর অধীনে। অর্থাৎ এখানে আহলে কিতাবকে তাওরাতে বর্ণিত রাসূল ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশকে পিছনে ঠেলে দেওয়া থেকে বারণ করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَوَ كُلَّمَا عٰهَدُوْا الخ : ইহুদিদের ইতিহাস গাদ্দারী, বিশ্বাসঘাতকতা, অবাধ্যতা ও বিদ্রোহের এক চলমান ইতিহাস। তাওরাতের পৃষ্ঠা, ইঞ্জীলের পৃষ্ঠা এবং প্রাচীন ইহুদি ঐতিহাসিক জোসেফ প্রমুখের রচনাবলি এ সবের কাহিনীতেই পরিপূর্ণ। এখানে ইহুদিদের এ জাতীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اَوِ النَّبِىِّ : এখানে এ বাক্যের عَطْف আল্লাহ শব্দের সাথে হয়েছে। আর এছাড়াও দ্বিতীয় আরেকটি ব্যাখ্যার প্রতি ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্য রয়েছে। অর্থাৎ ইহুদিরা আল্লাহ তা'আলার সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, যখন আখেরী জমানার নবীর আবির্ভাব ঘটবে, তখন তার প্রতি ঈমান আনবে। অথবা এর ব্যাখ্যা এই যে, রাসূল ﷺ-এর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তার বিরুদ্ধে মুশরিকদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করবে না। –[জামালাইন খ. ১, পৃ. ১৭৯]

قَوْلُهُ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ : অর্থাৎ অঙ্গীকার রক্ষা তো পরের কথা, তাদের অনেক তো এ কথার স্বীকারোক্তিও করে না যে, তার সাথে কখনো অঙ্গীকার হয়েছিল। যেন এখানে لَا يُؤْمِنُوْنَ পারিভাষিক অর্থে নয়, আভিধানিক অর্থে– অঙ্গীকারের কথা বিশ্বাসই করে না, স্বীকারই করে না। অবশ্য لَا يُؤْمِنُوْنَ ঈমানের পারিভাষিক অর্থেও হতে পারে। অর্থাৎ এরা নিজেদের আসমানি কিতাবও সহীফার প্রতি ঈমান এনেছিলই বা কবে? ওরা ওদের কিতাবকেও সত্য বলে স্বীকার করে না। (مَدَارِكْ، كَبِيْر) উভয় অর্থের মর্ম দাঁড়ায় এই যে ওরা অঙ্গীকার রক্ষা, বিশেষত আখেরী নবীকে সত্য বলে মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার রক্ষা করার জন্য নিজেদের দায়ী মনে করেছিল কবে?

قَوْلُهُ وَلَمَّا جَاءَهُمْ الخ : **যোগসূত্র :** পূর্বের আয়াতে ইহুদিদের অঙ্গীকার ভঙ্গের আলোচনা ছিল। এখানে বিশেষ একটি অঙ্গীকার ভঙ্গের বিবচণ দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ مُصَدِّقٌ : রাসূল ﷺ এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাওরাতের সত্যায়নকারী যে, তাওরাতে তাঁর যে গুণাগুণ ও বিবরণ ছিল তিনি সেসব গুণাবলি অনুযায়ী আধিভুক্ত হয়েছেন।

কেউ বলেন– তিনি তাওরাতে বর্ণিত তাওহীদ, বিধিবিধান, পূর্ববর্তী জাতির সংবাদ উপদেশ ও হিকমতের সত্যায়ন করেন।

قَوْلُهُ نَبَذَهُ وَرَاءَ ظُهُوْرِهِمْ : কিতাব পিঠের পেছনে ঠেলে দেওয়া দ্বারা ব্যবহারিক ভাষায় তার সঙ্গে উপেক্ষার আচরণ ও কার্যক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধাচারণ বুঝায়। অর্থাৎ তাতে তাদের কম গুরুত্ব প্রদানের কারণে তা ছুড়ে ফেলে দিল। যেমন কেনো জিনিস অপ্রয়োজনীয় ও কম মনোযোগের যোগ্য বিবেচিত হওয়ায় তা পিছনে ফেলে রাখা।

অনুবাদ :

১০২. وَاتَّبَعُوْا عَطْفٌ عَلٰى نَبَذَ مَا تَتْلُوا اَىْ تَلَتْ الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى عَهْدِ مُلْكِ سُلَيْمَانَ مِنَ السِّحْرِ وَكَانَ دَفَنَتْهُ تَحْتَ كُرْسِيِّهِ لَمَّا نَزَعَ مُلْكَهُ اَوْ كَانَتْ تَسْتَرِقُ السَّمْعَ وَتَضُمُّ اِلَيْهِ اَكَاذِيْبَ وَتُلْقِيْهِ اِلَى الْكَهَنَةِ فَيُدَوِّنُوْنَهُ وَفَشَا ذٰلِكَ وَشَاعَ اَنَّ الْجِنَّ تَعْلَمُ الْغَيْبَ فَجَمَعَ سُلَيْمَانُ الْكُتُبَ وَدَفَنَهَا فَلَمَّا مَاتَ دَلَّتِ الشَّيَاطِيْنُ عَلَيْهَا النَّاسَ فَاسْتَخْرَجُوْهَا فَوَجَدُوْا فِيْهَا السِّحْرَ فَقَالُوْا اِنَّمَا مَلَكَكُمْ بِهٰذَا فَتَعَلَّمُوْهُ وَرَفَضُوْا كُتُبَ اَنْبِيَائِهِمْ ـ

১০২. আর তারা অনুসরণ করে সুলাইমানের রাজত্বে অর্থাৎ তার যুগে শয়তানরা যা অর্থাৎ যে যাদু সম্পর্কে আবৃত্ত করে আবৃত্ত করত। হযরত সুলাইমান (আ.) যখন সিংহাসনচ্যুত হয়েছিলেন তখন শয়তান তার সিংহাসনের তলদেশে যাদু সম্পর্কিত কিছু বিষয় পুতে রেখেছিল। অথবা শয়তান জিনরা আকাশে কান পেতে কিছু বিষয় [ফেরেশতাদের আলোচনা শুনে] জেনে নিত এবং তার সাথে বহু মিথ্যার সংমিশ্রণ করে গণকদেরকে তা অবহিত করত। তারা এগুলো সংকলন করে রাখত। হযরত সুলাইমান (আ.)-এর রাজত্বকালে তার খুবই প্রসার ঘটে এবং এ কথারও খুব প্রচার প্রসার হয় যে, জিনেরা গায়েবও অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে। তখন হযরত সুলাইমান (আ.) [এই বিশ্বাস ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে] ঐ যাদুটোনা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ একত্র করে পুঁতে রাখেন। তাঁর মৃত্যুর পর শয়তান মানুষজনকে ঐ লুকায়িত বিষয়সমূহের সন্ধান দেয়। তখন তারা এগুলোকে বের করে দেখতে পায় যে, এগুলোতে যাদু সম্পর্কিত কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে। তখন তারা বলতে লাগল, এই যাদুটোনার সাহায্যেই সুলাইমান তোমাদের উপর এত বড় রাজত্ব চালিয়ে গেছেন। অনন্তর তারা তা শিক্ষা গ্রহণ করল এবং তার পিছনে পড়ে নবীগণের উপর প্রেরিত গ্রন্থসমূহ পরিত্যাগ করে বসল। اِتَّبَعُوْا বাক্যটির পূর্বোল্লিখিত نَبَذَ ক্রিয়ার সাথে عَطْف বা অন্বয় সাধিত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ عَطْفٌ عَلٰى نَبَذَ : اَىْ نَبَذُوْا كِتَابَ اللّٰهِ وَاتَّبَعُوْا كُتُبَ السِّحْرِ : আল্লামা সুলাইমান জামাল (র.) বলেন, উত্তম হবে এ জুমলাটি পূর্বের জুমলার সমষ্টির সাথে عَطْف হওয়া عَطْفُ الْقِصَّةِ عَلَى الْقِصَّةِ হিসেবে। কেননা نَبَذَ-এর সাথে عَطْف হলে এটি وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ-এর جَوَابٌ হওয়ার তাকাজা করে। অথচ ইহুদিদের যাদু বিদ্যার অনুসরণ রাসূলের আগমনের সাথে সম্পৃক্ত নয়; বরং তাদের যাদুর অনুসরণ পূর্ব থেকেই চলে আসছে। –[হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১, পৃ. ১২৭]

قَوْلُهُ مَا تَتْلُوْا : مَا হলো مَوْصُوْلَهْ তার عَائِدٌ উহ্য রয়েছে। তাকদীরী ইবারত হলো تَتْلُوْهُ - এটি হয়ত تَلْوٌ থেকে নির্গত। اَىْ تَتَّبِعُ অনুসরণ করত। অথবা تِلَاوَةٌ থেকে নির্গত। اَىْ تَقْرَأُ পাঠ করত।

قَوْلُهُ مَا اَىْ تَلَتْ :

প্রশ্ন : تَتْلُوْ হলো مُضَارِعٌ-এর সীগাহ যা বর্তমানকাল বুঝায়। অথচ শয়তানরা আয়াত নাজিলের সময় তা তেলাওয়াত করত না। কেননা রাসূল ﷺ-এর আবির্ভাবের পর শয়তানদের আসমানে গমনাগমন নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

উত্তর : تَتْلُوْا মুজারের সীগাহ হলেও মাজির অর্থে তা حِكَايَتْ حَالْ مَاضِيَةْ হিসেবে مُضَارِعٌ ব্যবহৃত হয়েছে। যেন সে বিষয়টি এ সময় দৃষ্টির সামনে সংঘটিত হচ্ছে। আল্লামা সুয়ূতী (র.) تَتْلُوْا-এর তাফসীরে تَلَتْ উল্লেখ করে এ জবাবটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلَهُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمَانَ : হযরত সুলাইমান (আ.)-এর রাজত্বকালে। عَلٰى অব্যয় শুধু উপরিস্থ হওয়া বুঝাবার অর্থেই সীমিত নয়; বরং তা কারণ ও উৎস নির্ণয়, সংযুক্তি-সংশ্লিষ্টতা ইত্যাদির ন্যায় স্থান-কাল অর্থেও ব্যবহৃত হয়। فِىْ [মধ্যে] অর্থে এর ব্যবহার ব্যাপক। ইবনে জারীর (র.) লিখেছেন- وَالْعَرَبُ تَضَعُهُ فِىْ مَوْضَعِ عَلٰى وَعَلٰى فِىْ مَوْضِعِ فِىْ [আরবরা عَلٰى-এর স্থলে فِىْ এবং فِىْ-এর স্থলে عَلٰى ব্যবহার করে থাকে।

আর এরও সম্ভাবনা আছে যে, تَتْلُوْا শব্দটি تَتَقَوَّلُ [উদ্ভাবন করা] -এর অর্থে হবে। তখন عَلٰى তার স্বীয় অবস্থায় বহাল থাকবে। কেননা تَتَقَوَّلُ-এর صِلَةٌ হিসেবে عَلٰى আসে এবং এ সূরতে مُتَعَلِّقٌ উহ্য থাকবে। প্রকৃত ইবারতটি এভাবে হবে- وَاتَّبَعُوْا مَا تَتَقَوَّلُهُ الشَّيَاطِيْنُ عَلَى اللّٰهِ زَمَنَ مُلْكِ سُلَيْمَانَ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে ইহুদিদের مَرْغُوْبٌ عَنْهُ-এর আলোচনা ছিল। অর্থাৎ এ কথার বিবরণ ছিল যে, ইহুদীরা কুরআন থেকে বিমুখ ছিল। তাকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করত। এ আয়াতে তাদের مَرْغُوْبٌ اِلَيْهِ-এর আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা আল্লাহর কিতাব থেকে বিমুখ হয়ে যে দিক ঝুঁকে পড়েছিল তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوْا : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ওহীর অনুসরণ ও সত্য নবীর সত্যতা স্বীকার করার পরিবর্তে এ ইহুদিরা অন্য একটি বিদ্যার পেছনে ছুটছে। সে বিদ্যা কার? শয়তানের। পবিত্র কুরআন সমকালীন ইহুদিদের গোমর ফাঁক করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের অপরাধ তালিকায় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি শিরোনাম সংযোজিত করছে। তা এই যে, এরা আল্লাহ তা'আলার ওহীর অনুসরণ ছেড়ে দিয়ে একটি নীতি বিবর্জিত নিচু স্তরের বিদ্যার সাধনায় নিমগ্ন হয়েছে।

যাদু বিদ্যা ও ইহুদি সম্প্রদায় : আলোচ্য এ বিদ্যার নাম যাদু বিদ্যা। যাদু ও যাদুবিদ্যায় ইহুদিদের পারঙ্গমতা ইতিহাস স্বীকৃত বিষয়। তাদের প্রবীণ ও শ্রেষ্ঠগণ সব সময়ই এর স্বীকারোক্তি দিয়ে এসেছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই তা করেছে গর্বের সঙ্গে। পবিত্র কুরআন অন্যান্য ঐতিহাসিক তথ্যের ন্যায় এ ক্ষেত্রেও অহেতুক কিছু বর্ণনায় সময় ক্ষেপণ না করে শুধু ইঙ্গিতে বর্ণনা প্রদান যথেষ্ট মনে করেছে। ইহুদিদের এ শখ তাদের প্রাচীন যুগের পরেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগেও অব্যাহত ছিল।

আমাদের মুফাসসিরগণও যাদুপ্রেমের ক্ষেত্রে হযরত সুলাইমান (আ.)-এর সমকালীন ইহুদি ও মুহাম্মদ ﷺ-এর সমকালীন ইহুদিদের সমান অংশীদার সাব্যস্ত করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, হযরত সুলাইমান (আ.)-এর যুগের ইহুদিরা কেউ বলেছেন আমাদের [মুহাম্মদী] যুগের ইহুদিরা। শব্দটি সকলকে বুঝাবার জন্য ব্যাপক এবং সকলেরই সবম্ভাবনাযুক্ত। বস্তুত এদের সকলেই [দুই যুগের] এ বাতিল অথর্ব বিষয়টির পূজারী অনুগামী ছিল-

قِيْلَ يَهُوْدُ زَمَانِ سُلَيْمَانَ وَقِيْلَ يَهُوْدُ زَمَانِنَا وَاللَّفْظُ فِيْهِمْ عَامٌّ وَلِجَمِيْعِهِمْ مُحْتَمِلٌ وَقَدْ كَانَ الْكُلُّ مِنْهُمْ مُتَّبِعًا لِهٰذَا الْبَاطِلِ (اِبْنُ عَرَبِىْ) -[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ১৭৭]

قَوْلُهُ شَيَاطِيْنَ : বহুবচন হওয়ার কারণে এখানে বাহ্যত বিশেষ শয়তান অর্থাৎ ইবলীস উদ্দেশ্য হতে পারে না। আভিধানবিদ ও শ্রেষ্ঠ তাফসীরবিদ উভয় দলের মতে مَرَدَةُ الْجِنِّ তথা খবীছ ও উদ্ধত দুর্ধর্ষ জিনরাই যারা হযরত সুলাইমান (আ.)-এর বশীভূত ছিল, এখানে উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ঔদ্ধত জিনরা।

জিন জাতির পরিচয় : জিন জাতির বাস্তবতা কি? জিন অনুভূতি ও ইন্দ্রিয় শক্তি সম্পন্ন এক ধরনের সৃষ্টি, আগুনের তৈরি। তারা সাধারণত ও স্বভাবত মানুষের চোখে অদৃশ্য। মানবজাতির ন্যায় এরাও শরিয়তের বিধানাধীন (مُكَلَّفٌ) তবে অনুবিধি উপবিধির বিশদে গিয়ে তাদের শরিয়ত মানব শরিয়তই হওয়া জরুরি নয়। এ আগুনে সৃষ্টির অস্তিত্ব উক্তি ও যুক্তির প্রমাণে স্বতঃসিদ্ধ। এদের অস্তিত্বের অস্বীকৃতির অনুকূলে কোনো প্রকার প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত নয়। বাণী ও উক্তিমূলকও নয়, যৌক্তিক প্রমাণও নয় [একে কাল্পনিক বলাই কাল্পনিক]। কেউ কেউ এখানে মানুষ শয়তান উদ্দেশ্য বলে মত ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ সেসব অবাধ্য ও পিশাচ লোকেরা, যারা হযরত সুলাইমান (আ.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টিতে অগ্রণী ভূমিকাপালন করত এবং তার নামে বিভিন্ন ধরনের অপবাদ রটাত এবং যারা যাদু ও জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী। এটি মু'তাজিলা মুতাকল্লিমদের অভিমত। আহলে সুন্নত মুফাসসিরগণও উভয় অর্থের অবকাশ রেখেছেন অর্থাৎ জিন বা মানব শয়তান কিংবা উভয় সম্প্রদায়। (اَلشَّيَاطِيْنَ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَوْ مِنْهُمَا - (بَيْضَاوِىْ)

قَوْلُهُ عَهْد : মুফাসসির (র.) عَهْد শব্দ বৃদ্ধি করে এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে مُضَاف উহ্য আছে। আর কেউ বলেন, এখানে مُلْكٌ দ্বারা রূপক অর্থে عَهْد বা যুগ উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ مِنَ السِّحْرِ : এটি مَا تَتْلُوْ -এর بَيَانٌ হয়েছে। অর্থাৎ مَا تَتْلُوْ দ্বারা سِحْر উদ্দেশ্য। وَالسِّحْرُ مَا يُسْتَعَانُ فِيْ تَحْصِيْلِهِ بِالتَّقَرُّبِ اِلَى الشَّيَاطِيْنِ

হযরত সুলাইমান (আ.)-এর পরিচয় : হযরত সুলাইমান ইবনে দাউদ (আ.) [খ্রিস্টপূর্ব ৯৯০-৯৩০ আনু.] ইসরাঈলী ধারা সূত্রের একজন প্রখ্যাত নবী। তিনি পিতার ন্যায়, তবে আরো বৃহদাকার রাজত্বের অধিকারী ছিলেন। শাম ও ফিলিস্তীন [বৃহত্তর সিরিয়া] ছাড়িয়ে তার রাজ্যসীমা বিস্তৃত ছিল পূর্বে ইরাকের ফোরাত [ইউফ্রেটিস] নদীর তীর পর্যন্ত এবং পশ্চিমে মিসর সীমান্ত পর্যন্ত। তার রাজত্বের মাহাত্ম্য শ্রেষ্ঠত্ব শত্রু মিত্র সকলের নিকট স্বীকৃত। -[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ৭৮]

ইসলামের সম্পর্ক সকলের সাথে : এখানে উল্লেখ্য যে, ইসলাম শুধু দারিদ্রের সঙ্গেই চলতে পারে কিংবা সম্পদ ধনাঢ্যতার সঙ্গে ইসলামের সুসম্পর্ক চলতে পারে না এমন ধারনা ভ্রান্তিপূর্ণ। ইসলামের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক স্তর অর্থাৎ নবুয়ত রিসালাতের সঙ্গে যেভাবে দারিদ্র ও নিঃস্বতা সম্মিলিত হতে পারে তদ্রূপ সম্পদ, নেতৃত্ব রাষ্ট্র পরিচালনা এবং শাসন ক্ষমতাও এর অঙ্গীভূত হতে পারে। ইসলামের আল্লাহ শুধু শ্রেণিবিশেষের জন্য নন। তিনি গরিব ধনী, আমির ফকির সকলেরই আল্লাহ। তিনি নিঃস্ব, অসহায়ের যেমন আল্লাহ, তেমনি বিত্তবান প্রতাপশালীরও আল্লাহ।

এ আয়াতের সারকথা হচ্ছে- যেভাবে এ ইহুদিদের পূর্বপুরুষরা হযরত সুলাইমান (আ.)-এর যুগেও তন্ত্রমন্ত্রের শয়তানি কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিল, আজও তেমনিভাবে নবী করীম ﷺ -এর হেদায়েত অনুসরণ করার পরিবর্তে সেসব নীচতায় নিমগ্ন রয়েছে। -[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ১৭৮-১৭৯]

قَوْلُهُ وَكَانَ دُفِنَتْ تَحْتَ كُرْسِيِّهِ : হযরত সুলাইমান (আ.) যখন সিংহাসনচ্যুত হয়েছিলেন, তখন শয়তান তার সিংহাসনের তলদেশে যাদু সম্পর্কিত কিছু বিষয় পুতে রেখেছিল। কিন্তু তিনি জানতেন না। অথবা হযরত সুলাইমান (আ.)-এর রাজত্বকালে যাদুর খুবই প্রসার ঘটল এবং এ কথারও খুব প্রচার-প্রসার হলো যে, জিনেরা গায়ব ও অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে। তখন হযরত সুলাইমান (আ.) [এই বিশ্বাস ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে] ঐ যাদুটোনা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ একত্র করে পুঁতে রাখেন। তার মৃত্যুর পর শয়তান মানুষজনকে ঐ লুকায়িত বিষয়সমূহের সন্ধান দেয়। তখন তারা এগুলোকে বের করে দেখতে পায় যে, এগুলোর যাদু সম্পর্কিত কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে। তখন তারা এগুলোকে বের করে দেখতে পায় যে, এগুলোতে যাদু সম্পর্কিত কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে। তখন তারা বলতে লাগল, এই যাদুটোনার সাহায্যেই সুলাইমান তোমাদের উপর এত বড় রাজত্ব চালিয়ে গেছেন। অনন্তর তারা তা শিক্ষা করল এবং তার পিছনে পড়ে নবীগণের উপর প্রেরিত গ্রন্থসমূহ পরিত্যাগ করে বসল। তারপর থেকে এ অবস্থা চলে আসছিল। এমনকি রাসূল ﷺ আগমন করলেন। তাঁর আগমনের পর আল্লাহ তা'আলা হযরত সুলাইমান (আ.)-এর নির্দোষিতা বর্ণনা করে আয়াত নাজিল করেন।

قَوْلُهُ لَمَّا نَزَعَ مُلْكَهُ : রাজত্ব ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনা : হযরত সুলাইমান (আ.)-এর সিংহাসনচ্যুত হওয়ার সময়সীমা ছিল ৪০ দিন। এর কারণ, হযরত সুলাইমান (আ.)-এর কোনো স্ত্রী ৪০ দিন মূর্তির পূজা করেছিল। কিন্তু তিনি টের পাননি। তাই আল্লাহ তা'আলা নবীর অবস্থান বিবেচনায় সমসংখ্যক দিন ভর্ৎসনা স্বরূপ সিংহাসন থেকে দূরে রেখেছেন। সিংহাসনচ্যুতের ঘটনাটি নিম্নরূপ-

হযরত সুলাইমান (আ.)-এর রাজত্ব ছিল মূলত একটি আংটির মধ্যে। সেটি ছিল জান্নাত থেকে প্রাপ্ত একটি আংটি। হযরত সুলাইমান (আ.) বাথরুমে যাওয়ার প্রাক্কালে সেটি খুলে রেখে যেতেন। একদিনের ঘটনা তিনি আংটিটি খুলে আমীনা নামে তার এক স্ত্রীর কাছে রেখে বাথরুমে গেলেন। ইত্যবসরে صَخْرُ الْمَارِد নামক একটি জিন হযরত সুলাইমান (আ.)-এর আকৃতি ধারণ করে তার স্ত্রীর কাছে এসে বলল, আমার আংটিটি দাও তো! তিনি তাকে তা দিয়ে দিলেন। আংটি হস্তগত হওয়ার কারণে জিন ইনসান, পশু-পাখী, হাওয়া-বাতাস সবকিছুই তার অনুগত হয়ে যায়। এমনকি সে হযরত সুলাইমান (আ.)-এর সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়। এদিকে হযরত সুলাইমান (আ.) বাথরুম থেকে বের হয়ে স্ত্রীর কাছে আংটি চাইলেন। স্ত্রী তাকে চিনতে পারছিলেন না। তাই বললেন, তুমি সুলাইমান নও। সুলাইমান তো আংটি নিয়ে গেছে। তখন হযরত সুলাইমান (আ.) বুঝলেন এটি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে পরীক্ষা। যাই হোক ৪০ দিন পূর্ণ হলে সে জিন সিংহাসন থেকে উড়ে যায় এবং সমুদ্রের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় আংটিটি সমুদ্রে ফেলে দেয়। একটি মাছ তা গিলে ফেলে। ঘটনাক্রমে মাছটি হযরত সুলাইমান (আ.)-এর হাতে ধরা পড়ে। তিনি মাছের পেট থেকে আংটিটি নিয়ে পরিধান করেন এবং এর ফলে তার রাজত্ব ফিরে আসে। তারপর তিনি صَخْرُ الْمَارِدْ নামক জিনকে ডেকে পাঠান। সে হাজির হলে তাকে একটি পাথরের ভিতর গর্ত করে বন্দি করেন এবং শিষা ও লোহা গালা দিয়ে তার মুখ বন্ধ করে দেন। তারপর সেটি সমুদ্রের তলদেশে নিক্ষেপ করেন।

-[তাফসীরে খাজিনের সূত্রে হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১, পৃ. ১২৮]

এ ঘটনাটি ইসরাইলী বর্ণনা, যা ইহুদিরা রচনা করেছে। সম্পূর্ণ মনগড়া ও ভ্রান্ত কাহিনী। বিবেক এবং শরিয়তের উসূল অনুযায়ী কোনোভাবেই তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না; বরং নবীদের ব্যাপারে এমন জিনিসের বিশ্বাস করা কুফর। কেননা নবীগণ মাসূম, তাদের ইসমত অপরিহার্য বিষয়। আর নবুয়থ আল্লাহর প্রদানকৃত। এটা কিভাবে সম্ভব যে, আল্লাহ প্রদানকৃত নবুয়ত ও রাজত্ব কোনো জিন সুলায়মান (আ.)-এর আকৃতি ধারণ করে এসে ছিনিয়ে নিয়েছে। জিনেরা তো নবীদের রূপ ধারণ করার ক্ষমতা রাখে না।

রাসূল ﷺ বলেছেন- مَنْ رَاٰنِىْ فِى الْمَنَامِ فَقَدْ رَاٰنِىْ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِىْ

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবুয়তের মর্যাদা এত উঁচু যে, স্বপ্নেও কোনো জিন বা শয়তান নবরি সূরত ধরে আসতে পারে না। সেখানে এটা কিভাবে সম্ভব যে, একটি দানব হযরত সুলায়মান (আ.)-এর আকৃতি ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং তাঁর রাজত্ব এবং নবুয়তী ছিনিয়ে নিয়েছে।

قَالَ الْقَاضِىْ عِيَاضُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْمُحَقِّقِيْنَ لَا يَصِحُّ مَا نَقَلَهُ الْاَخْبَارِيُّوْنَ مِنْ تَشَبُّهِ الشَّيْطَانِ بِسُلَيْمَانَ وَتَسَلُّطِهٖ عَلٰى مُلْكِهٖ وَتَصَرُّفِهٖ فِىْ اُمَّتِهٖ بِالْجَوْرِ فِىْ حُكْمِهٖ وَاِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَا يَتَسَلَّطُوْنَ عَلٰى مِثْلِ هٰذَا اَوْ قَدْ عَصَمَ اللّٰهُ تَعَالٰى الْاَنْبِيَاءَ مِنْ مِثْلِ هٰذَا .

وَقَالَ الزَّمَخْشَرِىُّ اَنَّ مَا يُرْوٰى مِنْ حَدِيْثِ الْخَاتَمِ وَالشَّيْطَانِ وَعِبَادَةَ الْوَثَنِ فِىْ بَيْتِ سُلَيْمَانَ فَمِنْ اَبَاطِيْلِ الْيَهُوْدِ .

وَقَالَ اِبْنُ كَثِيْرٍ هٰذَا كُلُّهٗ مِنَ الْاِسْرَائِيْلِيَّاتِ الَّتِىْ لَا نُصَدِّقُهَا وَلَا نُكَذِّبُهَا .

–[দরসে জালালাইন খ. ১, পৃ. ৩১৮]

قَوْلُهٗ اَوْ كَانَتْ تَسْتَرِقُ السَّمْعَ : এখানে اَوْ শব্দটি تَنْوِيْع তথা প্রকরণ বুঝানোর জন্য। **مَعْنَوِىْ** ভাবে এর **عَطْف** হয়েছে مِنَ السِّحْرِ-এর সাথে। অর্থাৎ শয়তানেরা মানুষদেরকে যাদু পড়ে পড়ে শোনাত। **অথবা শয়তানরা যে সমস্ত কথা আসমানে** উঠে চুরি করে শুনে আসত, তা মানুষকে শোনাত।

قَوْلُهٗ تَسْتَرِقُ السَّمْعَ : تَسْتَرِقَا এটি بَابُ اِفْتِعَالْ থেকে نَخْطَفُ السَّمْعَ আর **اَلسَّمْعُ ইসমে মাফউলের অর্থে** মাসদার। اَىِ الْمَسْمَعُ مِنَ الْكَلَامِ الْمَلَائِكَةِ فِيْمَا يَكُوْنُ فِى الْاَرْضِ مِنْ مَوْتٍ وَغَيْرِهٖ .

বর্ণিত আছে যে, শয়তানরা একজন আরেকজনের উপর আরোহণ করে আসমান পর্যন্ত পৌছে যায়। তারপর ফেরেশতাদের কথা-বার্তা চুরি করে শ্রবণ করে।

قَوْلُهٗ اَلْكَهَنَةُ : এটি كَاهِنٌ-এর বহুবচন। অর্থ জ্যোতিষ।

قَوْلُهٗ يُدَوِّنُوْنَهٗ : تَدْوِيْنًا (تَفْعِيْل) دَوَّنَ সংকলন বা জমা করা।

قَوْلُهٗ وَفَشَا ذٰلِكَ : অর্থাৎ যেসব মিথ্যা কথাগুলো এবং জিনরা যা চুরি করে শুনে এসেছে তা প্রচার লাভ করল।

قَوْلُهٗ فَلَمَّا مَاتَ دَلَّتِ الشَّيَاطِيْنُ عَلَيْهَا النَّاسَ فَاسْتَخْرَجُوْهَا : **শয়তান যেভাবে মানুষকে অবহিত করল** : এর একটি ঘটনা রয়েছে। শয়তান মানুষের আকৃতি ধরে বনী ইসরাঈলের কিছু মানুষের কাছে এলো। এসে বলল, আমি কি তোমাদেরকে এমন ভাণ্ডারের সন্ধান দিব, যা তোমরা কোনো দিন খেয়ে শেষ করতে পারবে না। তারা বলল, অবশ্যই। সে বলল, তোমরা সিংহাসনের নিচে গর্ত কর। তবেই সে ভাণ্ডারের সন্ধান পাবে। লোকজন খোড়ার জন্য গেল। শয়তানও তাদের সাথে গেল। শয়তান জায়গা দেখিয়ে দিয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইল। তারা বলল, তুমি কাছে এসো। সে বলল, আমি কাছে আসব না। আর আমি কাছে না আসার কারণ হলো কোনো শয়তান কুরসির নিকটবর্তী হলে জ্বলে পুরে ভস্ম হয়ে যায়। শয়তানের কথা মতো তারা সিংহাসনের নিচে গর্ত করে ঐ সবকিছু পেল, যা হযরত সুলাইমান (আ.) পুতে রেখেছিলেন। তখন শয়তান বলল, নিশ্চয় সুলাইমান এগুলোর সাহায্যেই জিন, ইনসান, পাখি ইত্যাদি বশ করে রাজত্ব করত। একথা বলে শয়তান উধাও হয়ে গেল। এ ঘটনার পর মানুষের মাঝে প্রচারিত হলো যে, হযরত সুলাইমান (আ.) যাদুকর ছিলেন। ফলে বনী ইসরাঈলরা সেসব গ্রন্থ থেকে যাদু চর্চা শুরু করে দিল। তাই বনী ইসরাঈলের মধ্যে অধিক পরিমাণে যাদুকর দেখা যায় এক পর্যায়ে যখন রাসূল ﷺ-এর আবির্ভাব ঘটল, তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত সুলাইমান (আ.)-এর নির্দোষ প্রমাণ করে আয়াত নাজিল করেন– وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ –[হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১, পৃ. ১২৯]

قَالَ تَعَالٰى تَبْرِئَةً لِسُلَيْمَانَ وَرَدًّا عَلَى الْيَهُوْدِ فِىْ قَوْلِهِمْ اُنْظُرُوْا اِلٰى مُحَمَّدٍ يَذْكُرُ سُلَيْمَانَ فِى الْاَنْبِيَاءِ وَمَا كَانَ اِلَّا سَاحِرًا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ اَىْ لَمْ يَعْمَلِ السِّحْرَ لِاَنَّهُ كُفْرٌ وَلٰكِنَّ بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ الْجُمْلَةُ حَالٌ مِنْ ضَمِيْرِ كَفَرُوْا وَ يُعَلِّمُوْنَهُمْ مَا اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ اَىْ اُلْهِمَاهُ مِنَ السِّحْرِ وَقُرِئَ بِكَسْرِ اللَّامِ الْكَائِنَيْنِ بِبَابِلَ بَلَدٌ فِى سَوَادِ الْعِرَاقِ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ بَدَلٌ اَوْ عَطْفُ بَيَانٍ لِلْمَلَكَيْنِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (رض) هُمَا سَاحِرَانِ كَانَ يُعَلِّمَانِ السِّحْرَ وَقِيْلَ مَلَكَانِ اُنْزِلَا لِتَعْلِيْمِهِ اِبْتِلَاءً مِنَ اللّٰهِ لِلنَّاسِ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ زَائِدَةٌ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَا لَهُ نُصْحًا اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ بَلِيَّةٌ مِنَ اللّٰهِ لِلنَّاسِ لِيَمْتَحِنَهُمْ بِتَعْلِيْمِهِ فَمَنْ تَعَلَّمَهُ كَفَرَ وَمَنْ تَرَكَهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا تَكْفُرْ بِتَعَلُّمِهِ فَاِنْ اَبٰى اِلَّا التَّعَلُّمَ عَلَّمَاهُ.

অনুবাদ : ইহুদিরা বলত, সুলাইমান (আ.) একজন যাদুকর ছিল। আর মুহাম্মদকে দেখ, তিনি সুলাইমানকে নবীদের অন্তর্ভুক্ত করে তার আলোচনা করেন। তাদের এই অভিযোগের প্রতিবাদ ও হযরত সুলাইমান (আ.)-এর নির্দোষিতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন সুলায়মান কুফরি করেনি অর্থাৎ তিনি যাদুর আমল করেননি, কেননা তা কুফরি; বরং শয়তানরাই সত্য-প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত আর যাহা বাবিলে ইরাকের একটি শহর হারূত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয়ের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। অর্থাৎ যে যাদুবিদ্যা তাদের উপর ইলহাম করা হয়েছিল তা শিক্ষা দিত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, হারূত ও মারূত ছিল দুই যাদুকর। মানুষকে তারা যাদু শিক্ষা দিত। কেউ কেউ বলেন, তারা হলো দুই ফেরেশতা। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মানুষের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ যাদু শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে তারা অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কাউকে উপদেশাচ্ছলে এই কথা না বলে তারা কাউকেও শিক্ষা দিত না যে আমরা মানুষের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে পরীক্ষাস্বরূপ' তা শিক্ষাদানের মাধ্যমে মানুষের পরীক্ষার জন্য আমরা প্রেরিত হয়েছি। যে ব্যক্তি তা শিক্ষা করবে সে কাফের হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি তা শিক্ষা করবে না সে মু'মিন বলে গণ্য হবে। সুতরাং তোমরা তা শিক্ষা গ্রহণ করে কুফরি করো না তবে কেউ কেউ যদি সকল কিছু প্রত্যাখ্যান করে শুধু তা শিক্ষা গ্রহণে বদ্ধপরিকর হতো, তবে তারা তাকে তা শিক্ষা দিতেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى : সংযোজক অব্যয় ওয়াও (وَاوْ) কখনো এক বাক্যাংশকে অপর বাক্যাংশের সঙ্গে, কখনো এক শব্দকে অপর শব্দের সঙ্গে এবং কখনো বা এক বাক্যাংশকে অপর শব্দের সঙ্গে যুক্ত করে। এখানে مَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ-কে পূর্ববর্তী আয়াতাংশ مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ-এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে এবং উভয় অংশ اِتَّبَعُوْا ক্রিয়ার কর্ম হয়েছে। যেমন উহ্য ভাষ্যরূপ ছিল اِتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ، وَاتَّبَعُوْا مَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ অর্থাৎ তারা অনুসরণ করল শয়তান যা আবৃত্তি করত তার এবং তারা অনুসরণ করল, যা অবতীর্ণ হয়েছিল দুই ফেরেশতার উপরে তা ....।

কেউ কেউ مَآ اُنْزِلَ-কে পূর্ববর্তী একক শব্দ اَلسِّحْرُ-এর সঙ্গে যুক্ত করেছেন। اَلسِّحْرُ-এর সঙ্গে যুক্ত কেউ কেউ বলেছেন مَا تَتْلُوْا-এর সঙ্গে যুক্ত অর্থাৎ وَاتَّبَعُوْا مَآ اُنْزِلَ [কাশশাফ]। এ বিন্যাস ব্যবধানে অর্থের তেমন কোনো তারতম্য হয় না। কেননা اَلسِّحْرُ-এর সঙ্গে যুক্ত করলে অর্থ দাঁড়ায় শয়তানরা মানুষদের যাদু শেখাত এবং দুই ফেরেশতার উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছিল তা শেখাত। সুতরাং লোকেরা যেমন শয়তানের শেখানো [প্রথম প্রকার] যাদুর অনুসরণ করত, তদ্রূপ [ব্যবিলনীয় প্রথার অর্থাৎ] দুই ফেরেশতাদের মাধ্যমে পাওয়া যাদুরও অনুসরণ করত। কাজেই দুই বিন্যাসের মর্ম অভিন্নই থাকছে।

قَوْلُهُ الْمَلَكَيْنِ : সৃষ্টিজগত পরিচালনা প্রক্রিয়ার অধীনে ফেরেশতাদের প্রতি মৌলিক যাদু অবতরণ তাদের পবিত্রতার বিন্দুমাত্র পরিপন্থি নয়। বিশেষত যখন তাদের প্রতি এ বিষয়টি অবতারণের [অন্তরে ঢেলে দেওয়ার] লক্ষ্য ছিল সম্পূর্ণরূপে সৃষ্টির সংস্কার। অর্থাৎ মানুষদের যাদু ও জ্যোতিষী তন্ত্রমন্ত্র থেকে রক্ষা করা, এতে উদ্বুদ্ধ করা নয়। ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ কর্মকর্তারা যে বিভিন্ন অপরাধবৃত্তির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকেন, তা কে না জানে? বলা বাহুল্য তাতে তারা অপরাধ করুক, এটা উদ্দেশ্য থাকে না, উদ্দেশ্য থাকে নিজেদের অপরাধ দমন ও অপরাধীদের অপরাধ সংঘটন থেকে বিরত রাখার ক্ষেত্রে নিজেদের বাস্তব অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো।

قَوْلُهُ اَىْ اُلْهِمَاهُ : اُنْزِلَ এটি اُنْزِلَ-এর তাফসীর। اُنْزِلَ-এর তাফসীরে اُلْهِمَ উল্লেখ করার কারণ এ দিকে ইঙ্গিত করা যে, اُنْزِلَ দ্বারা ওহীর পদ্ধতি اِنْزَالٌ উদ্দেশ্য নয়, বরং এখানে সাধারণ অর্থে শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য। কেননা ওহীর পদ্ধতি اِنْزَالٌ উদ্দেশ্য হলে যাদুর সম্মান ও গুরুত্ব প্রমাণিত হবে। –[জামালাইন খ. ১, পৃ. ১৮৩]

مُتَعَلِّقٌ : الْكَائِنَيْنِ : মুফাসসির (র.) এটি উহ্য ধরে ইবাদত করলেন যে, সামনের ظَرْف مُسْتَقَرٌّ بِبَابِلَ হয়েছে। তার مُتَعَلِّقٌ উহ্য রয়েছে। بِبَابِلَ জার মাজরুর এবং مُتَعَلِّقٌ মিলে اَلْمَلَكَيْنِ-এর সিফত।

قَوْلُهُ يُعَلِّمٰنِ : শেখানো বা তালিমের প্রচলিত অর্থের ভিত্তিতে শুধু শব্দের দিকে লক্ষ্য করে এমন সন্দেহে পড়া সমীচীন হবে না যে, ফেরেশতাগণ যথারীতি যাদুর পাঠ ও সবক দিতেন। [আসতাগফিরুল্লাহ]! শেখানোও পাঠদান ব্যতীত তা'লীম অর্থ অবগত করা বা অবহিত করাও হয়ে থাকে। اَلتَّعْلِيْمُ অনেক সময় اَلْاِعْلَامُ [অবগত করানোর] অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

সুতরাং يُعَلِّمَانِ অর্থ يُعَلِّمَانِ জানাতেন, অবগত করাতেন।

قَوْلُهُ مِنْ اَحَدٍ : কেউ কেউ مِنْ বিন্যাস অতিরিক্ত (زَائِدَةٌ) সর্বব্যাপকতাকে দৃঢ়করণ অর্থে অর্থাৎ কাউকেও বা কোনো একজনকেও। مِنْ জাতিকে পরিব্যাপ্ত করার দৃঢ়তা ও তাকিদের জন্য। (مِنْ زَائِدَةٌ لِتَاكِيْدِ اِسْتِغْرَاقُ الْجِنْسِ - بَحْر)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযূল : মুফাসসির (র.) قَالَ تَعَالٰى تَبْرِئَةً لِسُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ বলে আয়াতের শানে নুযূলের প্রতি ইঙ্গিত করছেন।

قَوْلُهُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ : অর্থাৎ **সুলায়মান কুফরি করেনি।** যেরূপ অপপ্রচার করে রেখেছে অকৃতজ্ঞ, কাফের ও অপবাদ রটনায় পারঙ্গমেরা]।

আয়াতের এ অংশে এসে একজন ঈমানদারের মনে এ খটকা দেখা দিতে পারে যে, কুরআন এখানে এমন কি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করল? হযরত সুলায়মান (আ.) যখন একজন সত্য নবী ছিলেন, তখন তো এটা একান্ত সুস্পষ্ট বিষয় যে, তিনি কুফরির যে কোনো প্রকার দ্বিধা, সংশয় ও সূক্ষ্ম স্পর্শ থেকে বহু দূরে অবস্থান করবেন। কোনো সত্য নবী সম্পর্কে তিনি কুফরির অপবাদ থেকে মুক্ত ঘোষণা দেওয়া তো যেন এমনই ব্যাপার হলো যে, কোনো দেশের সম্রাট বা রাষ্ট্রপ্রধান ঘোষণা দিয়ে প্রজাসাধারণ ও নাগরিকদের জানিয়ে দিলেন যে, আমাদের নাইব-ই সালতানাত তথা যুবরাজ বা উপ-রাষ্ট্রপতি বিদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক নন। কিন্তু পবিত্র কুরআনও অপ্রয়োজনে ও গুরুত্বহীন বিষয়ে এ ঘোষণাও অবগতি প্রদানকে অপরিহার্য মনে করেছে কেন? কিন্তু সে প্রয়োজনের কারণ অবগত হওয়া একজন সরলমনা মুসলমানের কিভাবে হতে পারে? তার জ্ঞান রয়েছে সে মহান সত্তার, যিনি জানেন, সবকিছু দেখেন সবকিছু। হযরত সুলায়মান (আ.)-কে মুসলমানদের আগেও দুটি সম্প্রদায় নবী মেনে এসেছে। এ দুটি হলো সে সনামধন্য কিতাবী দল ইহুদি ও খ্রিস্টান। কিন্তু এ দুই সম্প্রদায়ের পুর্বসূরীদের বুকের পাটা

দেখুন এক দিকে এরা হযরত সুলাইমান (আ.)-এর নবুয়ত ও মাহাত্ম্য স্বীকার করছে, অপর দিকে তার কর্ম তালিকায় [আমলনামায়] এমন পঙ্কিল ও জঘন্য অপবাদের কথা জুড়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহ রক্ষা করুন। তার নামে কুফরি-শিরকি পর্যন্ত আরোপ করে ছেড়েছে, যার চেয়ে বড় ও জঘন্য কোনো অপরাধ এমনকি সমতুল্য মারাত্মক অপরাধের কথা কল্পনাও করা যায় না। −[তাফসীরে মাজেদী খ.১, পৃ. ১৭৯]

قَوْلُهُ لَمْ يَعْمَلِ السِّحْرَ : এ ইবারতটুকু বৃদ্ধি করে একটি سُوَالٌ مُقَدَّرٌ [উহ্য প্রশ্ন]-এর জবাবের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, ইহুদিরা তো সুলায়মান (আ.)-কে যাদুকর বলেছিল তাই وَمَا سَحَرَ سُلَيْمَانُ বলা উচিত ছিল।

উত্তর : এখানে مَا كَفَرَ দ্বারা مِمَّ يَعْمَلُ السِّحْرَ উদ্দেশ্য। সেই সাথে বুঝা গেল শুধু تَعْلِيْمُ السِّحْرِ যাদুবিদ্যা শিক্ষা কুফরি নয়; বরং عَمَلٌ بِالسِّحْرِ বা সে অনুযায়ী আমল করা হলো কুফরি।

لِاَنَّهُ كُفْرٌ যাদুর শরয়ী বিধান : হযরত সুলাইমান (আ.)-এর শরিয়তে যাদু নিঃশর্তভাবে কুফরি ছিল। আর আমাদের শরিয়তে তাতে সামান্য বিশ্লেষণ আছে। তাহলো যাদু করা হালাল মনে করা কুফরি। আর যাদু বিদ্যা শিক্ষা করাকে কেউ বলেন হারাম, কেউ বলেন মাকরূহ আবার, কেউ মুবাহও বলেন। সমাধানমূলক কথা হলো যাদু করার নিয়তে শিখলে তা হারাম হবে কিন্তু কেউ আত্মরক্ষার জন্য শিখলে তা মুবাহ হবে অন্যথায় মাকরূহ। −[হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১, পৃ. ১২৯]

قَوْلُهُ يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ : اَلسِّحْرَ যাদুর পরিচয় : গোপন অদৃশ্য উপকরণ [যথা গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব, জিন শয়তানদের সহায়তা গ্রহণ ইত্যাদি ও অন্যান্য উপকরণ] কাজে লাগিয়ে অভিনব কারিশমা দেখানোকে যাদু বলা হয়। বিশেষ ধরনের সাধনা ও যোগ ব্যায়াম ইত্যাদির সাহায্যে এ বিদ্যা অর্জিত হয়ে থাকে। তা মুশরিক ও জাহিল [অ-কিতাবী] সম্প্রদায়গুলোতে প্রাচীন যুগ থেকেই বহুল পরিমাণে প্রচলন ছিল এবং এখনও রয়েছে। ইসলামি শরিয়তে এটিকে হারাম ও চরম অবৈধ ঘোষণা করেছে। −[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ১৮১]

قَوْلُهُ يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ : [মানুষের শিক্ষা দিত] يُعَلِّمُوْنَ-এর فَاعِلٌ [কর্তা] শয়তানরা হওয়াই স্বপ্রকাশ। অধিকাংশ মুফাসসির এ বিন্যাসই গ্রহণ করেছেন। এখানেও সেই বিন্যাসেরই ভাষান্তর করা হয়েছে। তবে শয়তান স্থলে ইহুদিদেরকেও কর্তা বলার অবকাশ রয়েছে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী فَرِيْقٌ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ অর্থাৎ কিতাবীদের একদল]-এর জন্য সর্বনাম ব্যবহৃত হবে। এ বিন্যাসে আয়াতের অর্থ অতীতকালীন না করে ঘটমান বর্তমান করা সাজুয্যপূর্ণ হবে। অর্থাৎ ইহুদিরা মানুষকে যাদু বিদ্যার তা'লীম দিতে থাকে। −[প্রাগুক্ত]

যাদুবিদ্যা ও মু'জিযার মাঝে পার্থক্য : পয়গাম্বরদের মু'জিজা ও ওলীদের কারামত দ্বারা যেমন অস্বাভাবিক ও অলৌকিক ঘটনাবলি প্রকাশ পায়, যাদুর মাধ্যমেও বাহ্যত তেমনি প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। ফলে মূর্খ লোকেরা বিভ্রান্তিতে পতিত হয়ে জাদুকরদেরকেও সম্মানিত ও মানবীয় মনে করতে থাকে। এ কারণে এতদুভয়ের পার্থক্য রয়েছে। সত্তার পার্থক্য এই যে, যাদুর প্রভাবে সৃষ্ট ঘটনাবলিও কারণের আওতাবহির্ভূত নয়। পার্থক্য শুধু কারণটি দৃশ্য কিংবা অদৃশ্য হওয়ার মধ্যে। যেখানে কারণ দৃশ্যমান, সেখানে ঘটনাকে কারণের সাথে সম্পৃক্ত করা হয় এবং ঘটনাকে মোটেই বিস্ময়কর মনে করা হয় না। কিন্তু যেখানে কারণ অদৃশ্য, সেখানেই ঘটনাকে অদ্ভুদ ও আশ্চর্যজনক মনে করা হয়। সাধারণ লোক কারণ না জানার দরুন এ ধরনের ঘটনাকে অলৌকিক মনে করতে থাকে। অথচ বাস্তবে তা অন্যান্য অলৌকিক ঘটনার মতো। কোনো দূরপ্রাচ্য থেকে আজকের লেখা পত্র হঠাৎ সামনে পড়লে দর্শক মাত্রই সেটাকে অলৌকিক বলে আখ্যায়িত করবে। অথচ জিন ও শয়তানরা এ জাতীয় কাজের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছে। মোটকথা জাদুর প্রভাবে দৃষ্ট ঘটনাবলিও প্রাকৃতিক কারণের অধীন। তবে কারণ অদৃশ্য হওয়ার কারণে মানুষ অলৌকিকতার বিভ্রান্তিতে পতিত হয়।

মু'জিযার অবস্থা এর বিপরীত। মু'জিযা প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ তা'আলার কাজ। এতে প্রাকৃতিক কারণের কোনো হাত নেই। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্যে নমরূদের জ্বালানো আগুনকে আল্লাহ তা'আলাই আদেশ করেছিলেন যে, ইবরাহীমের জন্য সুশীতল হয়ে যাও। কিন্তু এতটুকু শীতল নয় যে, তাতে হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর কষ্ট অনুভূত হয়। আল্লাহ তা'আলার এই আদেশের ফলে আগুন শীতল হয়ে যায়।

ইদানিং কোনো কোনো লোক শরীরে ভেষজ প্রয়োগ করে আগুনের ভেতরে চলে যায়। এটা মু'জিযা নয়; বরং ভেষজের প্রতিক্রিয়া। তবে ভেষজটি অদৃশ্য, তাই মানুষ একে আলৌকিক বলে ধোঁকা খায়।

স্বয়ং কুরআনের বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, মোজেযা সরাসরি আল্লাহ তা'আলার কাজ। বলা হয়েছে– وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى তথা আপনি যে একমুষ্টি কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তা আপনি নিক্ষেপ করেননি, আল্লাহ তা'আলা নিক্ষেপ করেছেন। অর্থাৎ এক মুষ্টি যে সমবেত সকলের চোখে পৌঁছে গেল, এতে আপনার কোনো হাত ছিল না; বরং এটা ছিলো একান্তভাবেই আল্লাহ তা'আলার কাজ। এই মোজেজাটি বদর যুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ একমুষ্টি কঙ্কর কাফের বাহিনীর প্রতি নিক্ষেপ করেছিলেন, যা সবার চোখেই পড়েছিল।

মোজেযা প্রাকৃতিক কারণ ছাড়াই সরাসরি আল্লাহ তা'আলার কাজ আর যাদু অদৃশ্য প্রাকৃতিক কারণের প্রভাব। এ পার্থক্যটিই মুজেযা ও যাদুর স্বরূপ বুঝার পক্ষে যথেষ্ট।

কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, সাধারণ লোক এই পার্থক্যটি কিভাবে বুঝবে? কারণ বাহ্যিক রূপ উভয়েরই এক। এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, সাধারণ লোকদের বুঝার জন্য আল্লাহ তা'আলা কয়েকটি পার্থক্য প্রকাশ করেছেন।

প্রথমত মোজেযা কারামত এমন ব্যক্তিবর্গের দ্বারা প্রকাশ পায় যাদের খোদাভীতি, পবিত্রতা, চরিত্র ও কাজকর্ম সবার দৃষ্টির সামনে থাকে। পক্ষান্তরে যাদু তারাই প্রদর্শন করে যারা নোংরা, অপবিত্র এবং আল্লাহ তা'আলার জিকির থেকে দূরে থাকে। এসব বিষয় চোখে দেখে প্রত্যেকেই মু'জেযা ও জাদুর পার্থক্য বুঝতে পারে।

দ্বিতীয়ত আল্লাহ তা'আলার চিরাচরিত রীতি এই যে, যে ব্যক্তি মু'জেযা ও নবুয়ত দাবি করে যাদু করতে চায়, তার যাদু প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। অবশ্য নবুয়তের দাবি ছাড়া যাদু করলে তা প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

পয়গাম্বরগণের উপর যাদু ক্রিয়াশীল হয় কিনা? এ প্রশ্নের উত্তর হবে ইতিবাচক। কারণ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, যাদু প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতিক কারণের প্রভাব। পয়গাম্বরগণ প্রাকৃতিক কারণের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হন। এটি নবুয়তের মর্যাদার পরিপন্থি নয়। সবাই জানেন, বাহ্যিক কারণ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পয়গাম্বরগণ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হন, রোগাক্রান্ত হন এবং আরোগ্য লাভ করেন। তেমনিভাবে যাদুর অদৃশ্য কারণ দ্বারাও তারা প্রভাবান্বিত হতে পারেন। সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর যাদু করেছিল এবং সে জাদুর কিছু প্রতিক্রিয়াও প্রকাশ পেয়েছিল। ওহীর মাধ্যমে তা জানা সম্ভব হয়েছিল এবং যাদুর প্রভাব দূরও হয়েছিল। যাদুর প্রভাবে হযরত মূসা (আ.)-এর প্রভাবান্বিত হওয়া কুরআনেই উল্লিখিত রয়েছে– يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعٰى এবং فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسٰى

যাদুর কারণেই হযরত মূসা (আ.)-এর মনে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল –[মা'আরিফুল কুরআন : মুফতি শফী (র.)]

قَوْلُهُ بَابِلَ : بَاءٌ শব্দটি فِيْ -এর অর্থে। প্রাচীন যুগের যে দেশটি বাবিল নামে পরিচিতি ছিল, সেটি বর্তমান চিত্রে ও ভূগোলে আরব ইরাক [ইরাকের আরব অঞ্চল] নামে অভিহিত। রাজ্যের রাজধানীও ছিল এ নামে। বাবিল নগরী অবস্থিত ছিল ফোরাত [ইউফ্রেটি] নদীর তীরে বর্তমান বাগদাদের প্রায় ৬০ মাইল [১০০ কি. মি.] দক্ষিণে, এখনকার 'হালকা'র কাছাকাছি। শহরটি বেশ বড়, আয়তন কয়েক বর্গমাইল। উন্নতি-অগ্রগতির যুগে দেশটি বেশ সুজলা-সুফলা ছিল এবং সম্পদ সভ্যতা-সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ ছিল। নদী-নালা, পানি সেচ ব্যবস্থা, ভবন ও সৌধ এবং বড় বড় দুর্গের চিহ্নাবশেষ এখনও দেখতে পাওয়া যায়। এতে অন্তত এতটুকু প্রমাণিত হয় যে, দেশে সুদক্ষ প্রকৌশলীর অভাব ছিল না। দাজলা ও ফোরাতের ন্যায় বিখ্যাত নদী দুটি এর সমগ্র অঞ্চল বিধৌত করছিল। এ রাজ্যের সমৃদ্ধি কাল ছিল আনুমানিক ৩০০০ খ্রিস্টপূর্ব অব্দে। যাদু বিদ্যা, ঝাড়-ফুঁক টোনা-টোটকা ও তন্ত্রমন্ত্রের কুসংস্কারমূলক কাজের জন্য দেশটির বিশেষ খ্যাতি ছিল। এক কথায় যে বিষয়গুলোকে বর্তমান ইংরেজি পরিভাষায় [Occult Science] বা অদৃশ্য বিজ্ঞান বা মহাজাতক বিজ্ঞান বলা হয়। এ দেশটির আর একটি প্রাচীন নাম কালদীর [কালদানিয়া] ও রয়েছে। এমনকি আজও ইংরেজিতে কালডিন [কালদনী] শব্দ যাদুকর-এর সমার্থক রূপে বিবেচিত।

–[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ১৮৫]

فِيْ سَوَادِ الْعِرَاقِ : ইরাকের আশে পাশের অঞ্চলে।

قَوْلُهُ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ : হারুত মারুত। দুই ফেরেশতার নাম। মূল প্রকৃতিতে তারা ফেরেশতাই ছিলেন। কিন্তু একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে যখন মানব সমাজে বসবাসের জন্য পাঠানো হলো, তখন স্বভাবতই তারা আকৃতি-অবয়ব, রং-রূপ ও সাদৃশ্য মানুষেরই ধারণ করে থাকবেন এবং তাদের স্বভাব-প্রকৃতি, অভ্যাস আচরণ এবং আবেগ-অনুভূতিও মানুষের ন্যায় হওয়াই স্বাভাবিক।

قَوْلُهُ بَدَلٌ اَوْ عَطْفُ بَيَانٍ : অর্থাৎ هَارُوْتَ مَارُوْتَ এ দুটি শব্দ মহল হিসেবে اَلْمَلَكَيْنِ থেকে بَدَلٌ হয়ে মাজরুর। অথবা عَطْفُ بَيَانٍ হয়েছে। আর بَدَلٌ দ্বারা بَدَلُ الْكُلِّ উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُمَا سَاحِرَانِ : হারুত-মারুত কে? এ সম্পর্কে একাধিক মতামত রয়েছে। মুফাসসির (র.) তন্মধ্যে দুটি অভিমত বর্ণনা করেছেন। প্রথম অভিমতটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, হারুত মারুত উভয়ে দু'জন জাদুকর ছিল। মানুষকে জাদবিদ্যা শিক্ষা দিত। এ সূরতে প্রশ্ন হয় যে, তাহলে আয়াতে اَلْمَلَكَيْنِ শব্দ ব্যবহার করা হলো কেন? উত্তরে বলা হয় যেহেতু দু'জন পূর্বে সৎ ছিল। তাই পূর্বের সততার বিচারে مَلَكَيْنِ বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَقِيْلَ مَلَكَانِ : এটি দ্বিতীয় অভিমত। কেউ বলেন– হারুত মারুত মানুষ নয়; বরং দু'জন ফেরেশতা ছিল। আল্লাহর পক্ষ থেকে মানব জাতির পরীক্ষা স্বরূপ জাদু বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য নাজিল করা হয়। এ অভিমতটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ।

হারূত-মারূত ও যুহরার ঘটনা : কোনো কোনো তাফসীরকার এখানে ইহুদিদের বর্ণিত ইরাকের নামকরা নর্তকী ও বেশ্যা যুহরার কাহিনী উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কথা হলো প্রথমত আয়াতের তাফসীর কোনো অংশেই এবং কোনো দিক দিয়ে সে কাহিনীর প্রতি নির্ভরশীল নয়। দ্বিতীয়ত ওলামায়ে কেরামের মাঝে এর প্রামাণ্যতা সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। মুহাদ্দিসগণ সে কাহিনীর প্রামাণ্যতা প্রত্যাখ্যান করেছেন, তারা পরিষ্কার লিখেছেন যে, কাহিনীটি সম্পূর্ণ বানোয়াট অলীক ও প্রত্যাখ্যাত।

–[প্রাগুক্ত]

আর একান্ত যদি ঘটনাটি সঠিক মেনেও নেওয়া হয়, তবুও কোনো বিশেষ লক্ষ্যে কোনো ফেরেশতাকে মানব আকৃতি-প্রকৃতিও আবেগ-অনুভূতি দিয়ে দেওয়ার পরে সে মূল প্রকৃতির ফেরেশতার মানবিক আবেগ-অনুভূতির শিকার হয়ে গিয়ে থাকলে তাতে অসম্ভাব্যতার কোনো দিক নেই, শরিয়তের দৃষ্টিতেও নয়, যুক্তির বিচারেও নয়। –[মা'আরিফুল কুরআন : মুফতি শফী (র.)]

আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী (র.) এ ব্যাপারে বিস্তারিত ও গঠনমূলক আলোচনা করেছেন তা মুতালা করা যেতে পারে।

–[দেখুন, তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন : কান্ধলভী (র.) খ. ১, পৃ. ১৯০]

قَوْلُهُ ابْتِلَاءً مِنَ اللّٰهِ لِلنَّاسِ : তাদেরকে এ বিষয়ে পরীক্ষা করার জন্য যে, তারা এ বিদ্যা শিখে কিনা? যেমনিভাবে তালুত সম্প্রদায়কে নদীর মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন, মুজেজা এবং যাদুর মাঝে পার্থক্য বিধানের জন্য তা শিক্ষা দেওয়ার জন্য ফেরেশতা পাঠানো হয়েছিল। যাতে মানুষ তার দ্বারা প্রতারিত না হয়। কেননা সে যুগে যাদু চর্চার খুব প্রচলন ছিল। এমনকি এ যাদুর জোরে কেউ কেউ নবী দাবি করত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা দুজন ফেরেশতা পাঠিয়েছেন যাদুর বিভিন্ন ধরণ-প্রকৃতি সম্পর্কে অবগত করানোর জন্য। যাতে তারা ঐসব মিথ্যুক ও ভণ্ডদের সাথে মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়।

–[হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১, পৃ. ১৩০]

قَوْلُهُ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ : অর্থাৎ যাদু ও জ্যোতিষী বিদ্যা থেকে কে কে আত্মরক্ষা করল এবং কে কে তাতে নিমগ্ন হলো, তার পরীক্ষা। فِتْنَةٌ অর্থ পরিক্ষা, নিরীক্ষণ, যাচাই বাছাই,তলিয়ে দেখা ইত্যাদি হয়ে থাকে। কখনো পরীক্ষা اَلْاِخْتِبَارُ অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানেও পরীক্ষাই উদ্দেশ্য।

وَاِفْرَادُهَا مَعَ تَعَدُّدِهِمَا لِكَوْنِهِمَا مَصْدَرًا وَحَمْلُهَا عَلَيْهِمَا حَمْلَ مُوَاطَاةٍ لِلْمُبَالَغَةِ كَاَنَّهُمَا نَفْسُ الْفِتْنَةِ (جمل : ١٣٢)

আয়াতের মর্ম : আয়াতের মর্ম হলো এই যে, মানবরূপী এ ফেরেশতাগণ কারো কাছে যাদু রহস্য উন্মোচন করতেন না এবং কাউকে কোনো যাদু বাক্য বা মন্ত্র শিখিয়ে দিতেন না যতক্ষণ না তাকে [এ মর্মে] সতর্ক করে দিতেন [যে, এগুলো বর্জনীয় বিষয় এবং এগুলোর ব্যবহার আজাবের কারণ]। কিন্তু ব্যাপার এরূপ হতো যে, দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা হারূত মারূতকে ঘিরে ধরত এবং বারবার কাকুতি-মিনতি করে বলত, আপনারা আমাদের যাদু থেকে বিরত থাকার কথা তো বলেই যাচ্ছেন, অথচ যাদু কাকে বলে ও কিভাবে হয়? কোন কোন কাজ বা কি ধরনের উক্তিকে যাদু বলা হয়, তা তো আমাদের বলে দিচ্ছেন না। [সুতরাং আমরা তা থেকে বাঁচব কি করে?] "এ বিষয়টি কাজে লাগানো কুফরি" ফেরেশতাগণ তাদের এ মর্মে সতর্ক করে দেওয়ার পরে যখন সেসব কাজ, উক্তি ও মন্ত্র নকল ও আবৃত্তি করে তাদের শোনাতেন, তখন এ দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা এ বিষয় বিষয়টি শিখে নেওয়ার স্বার্থই উদ্ধার করত। এ যেন এমন যে, আজ যদি কোনো মুফতি ফকীহের কাছে কেউ জিজ্ঞাসা করে যে, ঘুষ ও সুদ কোনো কোনো ধরনের আয়কে বলা হয়? এবং তা জেনে নেওয়ার পরে সেগুলো বর্জন করার পরিবর্তে উল্টো সে পন্থাগুলোর মাধ্যমে অর্থ উপার্জন শুরু করে দেয়।

হযরত আলী (রা.)-এর একটি বাণী হুবহু এরূপ অর্থেই বর্ণিত হয়েছে?

كَانَا يُعَلِّمَانِ تَعْلِيْمَ إِنْذَارٍ لَا تَعْلِيْمَ دُعَاءٍ إِلَيْهِ كَأَنَّهُمَا يَقُوْلَانِ لَا تَفْعَلْ كَذَا كَمَا لَوْ سَأَلَ سَائِلٌ عَنْ صِفَةِ الزِّنَا وَالْقَتْلِ فَأُخْبِرَ بِصَفَتِهِ لِيَجْتَنِبَهُ (بحر)

অর্থাৎ তারা দুজন হুশিয়ারীমূলক [অর্থাৎ আত্মরক্ষার প্রয়োজনে] শিক্ষা দিতেন, এ বিষয়ের প্রতি আহ্বান অনুপ্রেরণামূলক শিক্ষা **দিতেন না। যেন তারা বলতেন এমন** [কাজ বা কথা] কিন্তু কর না। যেমন কেউ জেনা [ব্যভিচার] বা হত্যার পরিচয় জানতে **চাইলে** সে সম্পর্কে **অবহিত করা হয়** তা থেকে বেঁচে থাকার জন্য"। –[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ১৮৮]

قَوْلُهُ فَلَا تَكْفُرْ : ফেরেশতাগণ এ বিষয়টিতে এতই সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন যে, নিজেদের পক্ষ থেকে **শেখানো-বুঝানো তো পরের কথা, যারা** তা জানতে চাইত, তাদেরও প্রথমে সতর্ক করে দিতেন, তাদের **উপদেশ না দিয়ে শেখাতেন না। অর্থাৎ তারা বলতেন, আমাদের কাছে** যা শুনছ, তাকে কুফরিরর উপকরণ বা **মাধ্যম বানিয়ো না।** তা **শিখে আমল কর না।**

মাসআলা : ফকীহগণ এখান **থেকেই** এ মাসআলা আহরণ করেছেন যে, জাদু বিষয়ক কর্মকাণ্ড ও তন্ত্রমন্ত্র **বিশ্বাস** ও আদর্শের **পর্যায়ে গ্রহণ করাও কুফর। অর্থাৎ জাদুর কাজ করে** ও তার প্রতি বিশ্বাস রেখে কুফরি করো না। সুতরাং সাব্যস্ত হলো যে, **কাজে পরিণত করলে কিংবা আকীদা বিশ্বাসের** [নীতিগত] পর্যায়ে গ্রহণ করলেও তা কুফর হবে।

যাদুর শরয়ী হুকুম : বিষয়টি নিয়ে **শুরু থেকেই উম্মতের** ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ চলে আসছে। অর্থাৎ যাদু মৌলিকভাবে **শুধু শেখার পর্যায়েও হারাম, নাকি তা কাজে লাগানো হারাম?** প্রথম থেকে উভয় ধরনের মতামত পাওয়া যায়। কেউ কেউ **শেখার স্তর পর্যন্ত সম্পূর্ণ** বৈধ **এবং কাজে পরিণত করা** তথা ব্যবহারকে হারাম বলেছেন। অন্যরা যাদু শেখাকেও **হারাম বলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, তা কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে** শেখবে না।

অনেকে তো অবৈধকে এ পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেছেন **যে,** যে কোনো অবস্থা ও লক্ষ্যে এমনকি কাফের যাদুকরদের প্রতিহত **করার উদ্দেশ্য নিয়ে শেখাও হারাম পর্যায়ভুক্ত।** কেননা আল্লাহ তা'আলার কালামের فَلَا تَكْفُرْ অন্তর্ভুক্ত বিষয় নিঃশর্তরূপে (عَلَى الْإِطْلَاقِ) **নিষিদ্ধ হওয়া বুঝায়। আর সে** বিষয়টি হচ্ছে যাদু [শেখা হোক কিংবা ব্যবহার করা হোক উভয়ই।

–[রদ্দুল মুখতার]

হাকীমুল উম্মত থানভী (র.)-এর গবেষণা ও উদ্ভাবিত তত্ত্ব ও তথ্য এ ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ও মূল্যবান। তিনি লিখেছেন, **"যাদু কুফরি ও ফাসিকী [কবিরা গুনাহ] হওয়ার ব্যাপারে** তাফসীল এই যে, যদি তাতে কুফরি বাক্য থাকে তথা শয়তানের কাছে **সাহায্য প্রার্থনা এবং গ্রহ-নক্ষত্রে শরণাপন্ন হ**ওয়া ইত্যাদি, তবে তা কুফর হবে, তা দিয়ে কারো ক্ষতি সাধন করা **হোক বা উপকার করা হোক। আর বাক্য ও মন্ত্রগুলো মুবাহ** [নির্দোষ] ধরনের হলে সে ক্ষেত্রে শরিয়ত অনুমোদিত নয়, এমন **পন্থায় বা ধরনে কারো ক্ষতি সাধন করা হলে কিংবা** কোনো অবৈধ ও অসৎ উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হলে তা হবে ফাসিকী ও পাপ। **আর ক্ষতি সাধন না করা হলে কিংবা কোনো অবৈধ** উদ্দেশ্য প্রয়োগ না করা হলে তাকে প্রচলিত ভাষায় যাদু বলা হয় না, **বরং তা 'আমল' 'আজীমাত' 'তদ্বির' 'তাবীজ' মাদুলী** ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়। এগুলো মুবাহ ও অনুমোদিত। আর **মন্ত্রের বাক্যগুলো দুর্বোধ্য হলে কুফর হওয়ার সম্ভাবনার** ক্ষেত্র বিচারে অবশ্য পরিহার্য হবে। এ ছাড়া **যে কোনো নাজায়েজ কাজকেই কার্যত কুফর (عَمَلِيْ كُفْر) বলার** বৈধতা রয়েছে।"– [তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ১৮৯]

فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ط بِاَنْ يُبْغِضَ كُلًّا اِلَى الْاٰخَرِ وَمَا هُمْ اَىِ السَّحَرَةُ بِضَارِّيْنَ بِهٖ بِالسِّحْرِ مِنْ زَائِدَةٌ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ط بِاِرَادَتِهٖ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَهُوَ السِّحْرُ وَلَقَدْ لَامُ قَسَمٍ عَلِمُوْا اَىِ الْيَهُوْدُ لَمَنِ لَامُ اِبْتِدَاءٍ مُعَلِّقَةٌ لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الْعَمَلِ وَمَنْ مَوْصُوْلَةٌ اِشْتَرٰهُ اِخْتَارَهُ اَوِ اسْتَبْدَلَهُ بِكِتَابِ اللّٰهِ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ط نَصِيْبٍ فِى الْجَنَّةِ وَلَبِئْسَ مَا شَيْئًا شَرَوْا بَاعُوْا بِهٖ اَنْفُسَهُمْ اَىِ الشَّارِيْنَ اَىْ حَظَّهَا مِنَ الْاٰخِرَةِ اَنْ تَعَلَّمُوْهُ حَيْثُ اَوْجَبَ لَهُمُ النَّارَ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ . حَقِيْقَةَ مَا يَصِيْرُوْنَ اِلَيْهِ مِنَ الْعَذَابِ مَا تَعَلَّمُوْهُ .

অনুবাদ : অনন্তর তারা তাদের নিকট হতে শিক্ষা গ্রহণ করত যা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে একজনকে অপরজনের প্রতি বিদ্বেষভাব করে তোলে। অথচ আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত ইচ্ছা ব্যতীত তারা যাদুকরগণ যাদুবিদ্যা দ্বারা কারো কোনো ক্ষতিসাধন করতে পারে না। আর তারা শিক্ষা করে যা অর্থাৎ যাদু বিদ্যা পরকালে তাদের জন্য ক্ষতিকর এবং কোনো উপকারে আসবে না। আর নিশ্চিতভাবে তারা ইহুদিরা জানে যে, যে কেউ তা ক্রয় করে গ্রহণ করে বা আল্লাহ তা'আলার কিতাবের বিনিময়ে এটা বদলিয়ে নেয় পরকালে তার কোনো হিস্যা জান্নাতের কোনো অংশ নেই। এখানে وَلَقَدْ-এর لَامْ টি لَامْ قَسَمْ এবং لِمَنْ-এর لَامْ টি لَامْ اِبْتِدَاءْ

তা কত নিকৃষ্ট জিনিস যার বিনিময়ে তারা নিজেদের ক্রয়কারীদের আত্মাকে অর্থাৎ পরকালে নিজের [পুণ্যের] যে অংশ ছিল তার শিক্ষা লাভ করে তা বিক্রয় করে দিয়েছে অর্থাৎ পরিণামে জাহান্নামাগ্নিকে তারা নিজেদের জন্য নির্ধারণ করে নিয়েছে। যদি তারা জানত যে, বাস্তবিক কি আজাবের দিকে তারা এগিয়ে যাচ্ছে তবে আর তারা তা শিক্ষা লাভ করত না।

١٠٣. وَلَوْ اَنَّهُمْ اَىِ الْيَهُوْدَ اٰمَنُوْا بِالنَّبِيِّ وَالْقُرْاٰنِ وَاتَّقَوْا عِقَابَ اللّٰهِ بِتَرْكِ مَعَاصِيْهِ كَالسِّحْرِ وَجَوَابُ لَوْ مَحْذُوْفٌ اَىْ لَاُثِيْبُوْا دَلَّ عَلَيْهِ لَمَثُوْبَةٌ ثَوَابٌ وَهُوَ مُبْتَدَاٌ وَاللَّامُ فِيْهِ لِلْقَسَمِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ط خَبَرُهٗ مِمَّا شَرَوْا بِهٖ اَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ . اَنَّهٗ خَيْرٌ لِمَا اٰثَرُوْهُ عَلَيْهِ .

১০৩. যদি তারা ইহুদিরা নবী ও কুরআনের উপর বিশ্বাস করত এবং পাপাচার যেমন যাদুবিদ্যা ইত্যাদি পরিত্যাগ করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার শাস্তিকে ভয় করত তবে নিশ্চিতভাবে তার ছওয়াব প্রতিফল আল্লাহ তা'আলার নিকট যার বিনিময়ে তারা স্বীয় আত্মা বিক্রয় করেছে তদপেক্ষা অধিক কল্যাণকর হতো। যদি তারা জানত যে, এটাই তাদের পক্ষে কল্যাণকর তবে তারা এটাকে তার উপর [আল্লাহ প্রদত্ত পূণ্যফলের উপর] প্রাধান্য দিত না।

لَوْ শর্তবাচক শব্দটির জবাব এস্থানে উহ্য। لَمَثُوْبَةٌ শব্দটি তার প্রতি ইঙ্গিতবহ জবাবটি হলো। لَاُثِيْبُوْا। لَمَثُوْبَةٌ-এর لَامْ টি قَسَمْ বা কসম অর্থব্যঞ্জক এবং এটা مُبْتَدَاٌ বা উদ্দেশ্য। خَيْرٌ হলো তার خَبَرٌ বা বিধেয়।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا : **তারকীব :** শুরু মَا টি عَاطِفَة তার عَطْف হয়েছে مَا يُعَلِّمَانِ -এর সাথে এবং يَتَعَلَّمُونَ -এর জমিরটি اَحَد -এর দিকে ফিরেছে। অবশ্য প্রশ্ন হয় যে, اَحَد তো একবচন, তাহলে يَتَعَلَّمُونَ -কে বহুবচন কেন আনা হলো? উত্তরে বলা হয় اَحَد শব্দটি نَكِرَة تَحْتَ النَّفْي হিসেবে عُمُوْم -এর জন্য। সে হিসেবে অর্থের দিক দিয়ে বহুবচন। অর্থের দিকে লক্ষ্য করেই يَتَعَلَّمُونَ বহুবচনের সীগাহ আনা হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে–

فَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ ـ

তারপর আবার প্রশ্ন হয় যে, এখানে مَعْطُوْف عَلَيْهِ তো হলো مَنْفِيْ বা না-বাচক সে হিসেবে مَعْطُوْف ও مَنْفِيْ হওয়া উচিত ছিল।

উত্তর : مَعْطُوْف عَلَيْهِ তথা مَا يُعَلِّمَانِ যদিও مَنْفِيْ কিন্তু অর্থগতভাবে তা مُثْبَتْ বা হ্যাঁ-বাচক। পরে لا -এর কারণে। তাহলে অর্থ দাঁড়াল– وَيُعَلِّمَانِ السِّحْرَ بَعْدَ قَوْلِهِمَا اِنَّمَا نَحْنُ الخ ـ

এখন عَطْف সঠিক হয়েছে।

কেউ বলেছেন– এখানে مَعْطُوْف عَلَيْهِ উহ্য রয়েছে। তাহলো– يُعَلِّمَانِ সুতরাং কোনো প্রশ্নের অবকাশ নেই।

قَوْلُهُ بَيْنَ الْمَرْءِ : مَرْء অর্থ পুরুষ তার مُؤَنَّثْ হলো مَرْاَةٌ

قَوْلُهُ زَوْجَهُ : زَوْجٌ অর্থ اِمْرَاَةُ الرَّجُلِ বা স্ত্রী এখানে ও হাকীকী অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ لَامُ اِبْتِدَاءٍ مُعَلِّقَةٌ لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الْعَمَلِ : لَمَنِ -এর মধ্যকার لَامْ টি لَامُ اِبْتِدَائِيَّةٌ এটি সাধারণ مُبْتَدَاء অথবা مُضَارِعْ -এর উপর দাখিল হয়। কিন্তু যখন মাজির উপর দাখিল হয়, তখন শব্দ অথবা অর্থগতভাবে قَدْ ব্যবহার করা জরুরি। لَمَنْ -এর لَامُ اِبْتِدَاءٍ টি পূর্বোক্ত عَلِمُوْا -কে عَمَلْ করা থেকে বিরত রেখেছে।

قَوْلُهُ اَلشَّارِيْنَ : এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اَنْفُسَهُمْ -এর মধ্যে জমিরের مَرْجِعْ এটাই যা شَرَوْا -এর ضَمِيْر مَرْفُوْع -এর মিসদাক।

شَارِيْن এটি اِسْمُ فَاعِلْ جَمْعُ مُذَكَّرْ -এর সীগাহ মুলত شَارِيْن ছিল।

قَوْلُهُ اَىْ حَظَّهَا اَىْ حَظَّ اَنْفُسَهُمْ : এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করলেন যে, اَنْفُسَهُمْ -এর শুরুতে مُضَاف মাহযুফ আছে।

قَوْلُهُ اَنْ تَعَلَّمُوْهُ : মুফাসসির (র.) এই বাক্যটুকু উহ্য ধরে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, مَخْصُوْص بِالذَّمِّ উহ্য রয়েছে। সুতরাং এ আপত্তি শেষ হয়ে যায় যে, مَا بِمَعْنَى شَيْئًا হওয়ার কারণে نَكِرَة যার কারণে مَخْصُوْص بِالذَّمِّ হতে পারে না। কেননা مَخْصُوْص টা مَعْرِفَة হওয়া জরুরি। মুফাসসির (র.) এর জবাবই দিয়েছেন যে, مَا শব্দটি شَيْئًا -এর অর্থে হয়ে بِئْسَ -এর মাঝে লুক্কায়িত ফায়েল-এর যমীর هُوَ -এর تَمْيِيْز । আর مَخْصُوْص بِالذَّمِّ (اَنْ تَعَلَّمُوْهُ) উহ্য আছে।

قَوْلُهُ حَقِيْقَةَ مَا يَصِيْرُوْنَ اِلَيْهِ : এ ইবারতটুকু বৃদ্ধি করে একটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন।

প্রশ্ন : পূর্বোল্লিখিত وَلَقَدْ عَلِمُوْا দ্বারা বুঝা যায় যে, তারা জানত। আর لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ দ্বারা বুঝা যায় যে, তারা জানত না। সুতরাং উভয়টির মধ্যে বৈপরীত্ব পরিলক্ষিত হয়।

উত্তর : তারা আল্লাহ তা'আলার আজাবের কথা জানত; কিন্তু আজাবের হাকিকত ও প্রচণ্ডতা সম্পর্কে কিছুই জানত না। সুতরাং আর কোনো বৈপরীত্ব থাকল না।

قَوْلُهُ مَا تَعَلَّمُوْهُ : এটি لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ -এর جَوَابُ مَحْذُوْف

قَوْلُهُ وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا الخ : যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে ইহুদিদেরকে কুফর সম্পর্কে ভীতি প্রদশর্ন করা হয়েছে। এখন এ আয়াতে ঈমানের প্রতি উৎসাহিত করা হচ্ছে।

قَوْلُهُ وَجَوَابُ لَوْ مَحْذُوْفٌ : এটিও একটি سُوَالٌ مُقَدَّرٌ [উহ্য প্রশ্ন]-এর জবাব। **প্রশ্ন :** لَوْ -এর جَوَابْ ফেয়েলে মাযী হওয়া আবশ্যক। এখানে জবাবটি হলো لَمَثُوْبَةٌ [জুমলায়ে ইসমিয়া] যা সঠিক নয়।

উত্তর : لَوْ -এর جَوَاب ـ لَمَثُوْبَةٌ নয়, বরং جَوَابْ টি মাহযূফ রয়েছে। আর তা হলো لَاُثِيْبُوْا আর এ উহ্য থাকার প্রতি لَمَثُوْبَةٌ দালালত করছে।

قَوْلُهُ لَمَا اٰثَرُوْهُ : এটি لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ -এর جَوَابُ مَحْذُوْف

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ : [অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার বিশ্ব পরিচালনা (تَكْوِيْن) সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত ব্যতীত]। ইসলাম যেরূপে শিরক ও অংশীবাদের শিকড় কেটে চলেছে, সেদিকে লক্ষ্য করলে এখানে স্পষ্টভাবে এ কথাটি বলার প্রয়োজন ছিল। ইরশাদ হচ্ছে এ যাদুকর্ম ফুঁ-মন্তর, টোন-টোটকাগুলোকেই প্রকৃত ক্রিয়াবান মনে করে বস না। এগুলোর বিন্দুমাত্র ক্ষমতা ছিল না। অন্য যে কোনো ক্ষেত্রে ও যে কোনো অবস্থা পরিস্থিতিতে যেরূপ আমার মর্জী আমার জগত পরিচালনা সংক্রান্ত জ্যোতিময় ইচ্ছাই শুধু প্রকৃত কর্তাও বাস্তব ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। এখানে اِذْنِ اللّٰهِ অর্থ [আদেশ নয়] আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত [তাকদীর] তাঁর পরিচালনা মর্জি এবং তার ফায়সালা ও নির্ধারণই। এর অর্থ তার ফয়সালায়ও কুদরতেই। -[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ১৯০]

قَوْلُهُ وَلَقَدْ عَلِمُوْا : এখানে ইঙ্গিত করা হচ্ছে রিসালাত যুগের ইহুদিদের প্রতি। এ বক্তব্য পূর্ব আয়াত وَلَمَّا جَاۤءَهُمْ رَسُوْلٌ -এর সঙ্গে সংযুক্ত। মাঝখানে সুলাইমানী যুগের ইহুদি ও তাদের যাদুচর্চা প্রসঙ্গ আলোচিত হলো। এখন পুনরায় মূল আলোচনায় ফিরে যাওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ পরবর্তী প্রসঙ্গ রিসালাত যুগের সমকালীন ইহুদিদের। এ অংশ وَلَمَّا جَاۤءَهُمْ -এর সঙ্গে যুক্ত, যাদু প্রসঙ্গে মধ্যবর্তী প্রাসঙ্গিক আলোচনা ছিল। সুতরাং عَلِمُوْا -এর কর্তা সর্বনাম সে [প্রথমে উল্লিখিত] ইহুদিদের নির্দেশ করবে। তাফসীরে রূহুল মা'আনীর ভাষ্যে লক্ষ্য করুন–

(مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ تَعَالٰى وَلَمَّا جَاۤءَهُمْ وَقِصَّةٌ مُسْتَطْرَدَةٌ فِى الْبَيْنِ فَالضَّمِيْرُ لِاُولٰئِكَ الْيَهُوْدِ . روح)

কুরআন কি রকম জোরদার দাবি করে দিল– وَلَقَدْ عَلِمُوْا বলে যে, এ ইহুদিরা ভালো করেই জানে যে, যাদু টোনা, তন্ত্র-মন্ত্র কত কদাকার বিষয়। ইহুদিরা তো বলতে পারত যে, আমরা কি করে জানব? কে আমাদের অবহিত করল? আমাদের পবিত্র গ্রন্থগুলোতে এসব কথা কোথায়? কিন্তু না, তারা তেমন করে বলতে পারেনি। কেননা যুগ যুগের বিকৃত, রদবদলের পরেও বর্তমান তাওরাতে এ ধরনের স্পষ্ট ভাষ্য বিদ্যমান রয়েছে। -[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ১৯১]

নাহু শাস্ত্রের পরিভাষায় تَعْلِيْق অর্থ শুধু শব্দগতভাবে আমল বাতিল করাকে বলে, মহলগতভাবে নয়। আর যখন اَفْعَالُ قُلُوْب এর পর لَامُ اِبْتِدَا বা حَرْفُ اِسْتِفْهَام বা حَرْفُ نَفْى আসে, তাহলে اَفْعَالُ قُلُوْب -কে আমল থেকে مُعَلَّق করে দেয়।

قَوْلُهُ اِشْتَرَاهُ : তা খরিদ করল "ه" সর্বনাম যাদু (سِحْر) বুঝায়। اِشْتَرَا এখানে হাকীক অর্থে নয়; বরং মাজাযী অর্থে। অর্থাৎ যাদুকে গ্রহণ করল অর্থাৎ শয়তানরা যা আবৃত্তি করত; যা গ্রহণ করল অর্থাৎ শয়তানরা যা আবৃত্তি করত, তা গ্রহণ করল আল্লাহ তা'আলার কিতাবের বিনিময়ে এবং যাদু গ্রহণ করল আল্লাহ তা'আলার দীনের বিনিময়ে। ইহুদিদের সত্যের আহ্বানে জানানো হচ্ছিল, তাদের কাছে একত্ববাদী ধর্মের পয়গাম পৌঁছে দেওয়া হচ্ছিল। অথচ তাদের এদিকে ছিল না কোনো মনোযোগ, কোনো আগ্রহ, তারা ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন, বেপরোয়া, একান্ত অমনোযোগী ও নিশ্চিন্ত। নিজেদের যাদুটোনা ও তন্ত্রমন্ত্রে মশগুল এবং সেসব গর্হিত বিষয়কে জীবনে পূর্ণাঙ্গতা দানের স্তরে ভাববার ধান্দায় বিভোর। এদের এ বঞ্চনা ও দুর্ভাগ্যের প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে আয়াতের এ অংশে।

قَوْلُهُ لَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖ اَنْفُسَهُمْ : নিজেরা নিজেদের বিকিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ নিজেদের জীবনকে আজাব ও ধ্বংসের মাঝে নিক্ষেপ করেছে। بِئْسَمَا شَرَوْا بِهٖ কতই নিকৃষ্ট। সে নিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে কুফরি ও যাদু ভেল্কী জাতীয় কাজকর্ম, যা উপরে উল্লিখিত হয়েছে। বান্দাদের অবস্থার প্রতি পূর্ণ আক্ষেপ ও পরিতাপের ভাষায় ইরশাদ হচ্ছে যে, সত্য দীনের ন্যায় মহা নিয়ামত উপেক্ষা করে এরা কুফরি ও যাদু গ্রহণ করে রয়েছে। যেন জাহান্নাম কিনে নেওয়ার ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছে। যখন তারা যাদু ও কুফরিকে দীন ও সত্যের উপর প্রাধান্য দিল।

যাদু বিদ্যা এবং মু'তাযিলা সম্প্রদায় : মু'তাযিলারা যাদুর ক্রিয়া পতিত হওয়াকে অস্বীকার করে। অথচ পবিত্র কুরআনে হযরত মূসা (আ.) ও যাদুকর কওমের ঘটনাকে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে এবং উক্ত আয়াতগুলোতেও যাদুর ক্রিয়া ও আছরকে অস্বীকার করা দুষ্কর। এমনিভাবে নবী করীম ﷺ -এর উপর লবীদ নামক ইহুদির যাদু করা এবং এ বিষয়ে সূরা নাস ও সূরা ফালাক অবতীর্ণ হওয়ার কথা বিভিন্ন রেওয়ায়েতে বর্ণনা করা হয়েছে, যেগুলোকে অস্বীকার করা কঠিন ব্যাপার। এমনিভাবে কতেক লোক উক্ত আয়াতের কারণে বুঝে গেছে যে, যাদুর ক্রিয়া শুধু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা। অন্যান্য বিষয়ে যাদুর ক্রিয়া নেই অথচ এটাও সঠিক নয়। কেননা উল্লেখের মধ্যে কোনো একটি বিষয়কে নির্দিষ্ট করার অর্থ এ নয় যে, সে বিষয় ব্যতীত অন্যান্য বিষয়কে গণ্য করবে না। যদিও কোনো বিশেষ কারণে এ স্থানে যাদুর একটি বিশেষ ক্রিয়াকে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। তবে এর দ্বারা এটা কিভাবে বুঝা গেল যে, অন্যান্য ক্রিয়াসমূহ যাদুর মধ্যে একেবারেই হয় না।

অনুবাদ :

১০৤ . يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا لِلنَّبِيِّ ﷺ اَمْرٌ مِنَ الْمُرَاعَاةِ وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ لَهُ ذٰلِكَ وَهِيَ بِلُغَةِ الْيَهُوْدِ سَبٌّ مِنَ الرَّعُوْنَةِ فَسُرُّوْا بِذَالِكَ وَخَاطَبُوْا بِهَا النَّبِيَّ فَنُهِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ عَنْهَا وَقُوْلُوْا بَدْلَهَا اُنْظُرْنَا اَيْ اُنْظُرْ اِلَيْنَا وَاسْمَعُوْا ط مَا تُؤْمَرُوْنَ بِهِ سِمَاعَ قَبُوْلٍ وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ مُؤْلِمٌ هُوَ النَّارُ ـ

১০৪. হে বিশ্বাসীগণ! নবীকে রায়িনা বলো না رَاعِنَا শব্দটি اَلْمُرَاعَاةُ হতে উদগত আজ্ঞাসূচক শব্দ। তারা এই বলে নবীকে সম্বোধন করতেন। [আরবিতে এর অর্থ আমাদের দিকে লক্ষ্য করুন, সাহাবীগণ এই অর্থেই শব্দটির ব্যবহার করতেন] ইহুদিদের ভাষায় ইহা ভর্ৎসনা অর্থে ব্যবহার হতো। رَعُوْنَةٌ হতে নির্গত শব্দটির অর্থ বোকা। ইহুদিগণ নবী করীম ﷺ কে সম্বোধনের বেলায় শব্দটিকে এই অর্থে ব্যবহার করে আনন্দ লাভ করত। সুতরাং মু'মিনগণকে এই শব্দের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। বরং এর স্থলে উনযুরনা অর্থাৎ আমাদের প্রতি দৃষ্টি দিন বলিও আর তোমাদেরকে যে সমস্ত বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয় তা গ্রহণ করার কানে শ্রবণ করিও। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ যন্ত্রণাকর শাস্তি অর্থাৎ জাহান্নাম।

১০৫ . مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ مِنَ الْعَرَبِ عَطْفٌ عَلٰى اَهْلِ الْكِتٰبِ وَمِنْ لِلْبَيَانِ اَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ زَائِدَةٌ خَيْرٍ وَحْيٍ مِنْ رَبِّكُمْ حَسَدًا لَكُمْ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ نُبُوَّتِهِ مَنْ يَشَاءُ ط وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ـ

১০৫. কিতাবীদের মধ্যে যারা সত্য-প্রত্যাখ্যান করেছে তারা এবং আরবের অংশীবাদীগণ তোমাদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণতার দরুন এটা চায় না যে, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের প্রতি কোনো কল্যাণ ওহী অবতীর্ণ হোক। অথচ আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা নিজ অনুকম্পার জন্য নবুয়তের জন্য বিশেষরূপে মনোনীত করেন এবং আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।
مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ -এর مِنْ টি এ স্থানে بَيَانْ বা বিবরণমূলক। اَهْلُ الْكِتَابِ -এর সাথে وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ -এর عَطْف বা অন্বয় সাধিত হয়েছে। مِنْ خَيْرٍ -এর مِنْ টি এইস্থানে زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত।

তাহকীক ও তারকীব

مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ -এর مِنْ টি এ স্থানে بَيَانْ বা বিবরণমূলক। اَهْلُ الْكِتَابِ -এর সাথে وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ -এর عَطْف বা অন্বয় সাধিত হয়েছে। مِنْ خَبَرٍ -এর مِنْ টি এইস্থানে زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত।

قَوْلُهُ اَمْرٌ مِنَ الْمُرَاعَاةِ : অর্থাৎ رَاعِنَا -এর মধ্যে ضَمِيْر مَنْصُوْب مُتَّصِلْ তথা نَا শব্দটি মহল হিসেবে মানসূব। আর دَاعٍ শব্দটি مُرَاعَاةٌ মাসদার থেকে اَمْر -এর সীগাহ। অর্থ আমাদের প্রতি খেয়াল রাখুন।

قَوْلُهُ مِنَ الرَّعُوْنَةِ : অর্থাৎ رَاعِنَا শব্দটি ইহুদিরে ভাষ্যমতে رَعُوْنَة [আহমক] থেকে নির্গত। ইহুদিরা কাউকে বোকা ও নির্বোধ বলতে চাইলে رَاعِنَا বলত। এর শুরুতে حَرْف نِدَاءٌ উহ্য রয়েছে এবং শেষে اَلِف مَدَّةٌ অতিরিক্ত।

قَوْلُهُ فَسُرُّوْا بِذٰلِكَ : سُرُّوا মাজহুলের সীগাহ। سِيْن-এ পেশ এবং ر-এ পেশ ও তাশদীদ। অর্থাৎ ইহুদিরা এটি শুনে খুশি হত। اَىْ يَكُوْنُوْنَ مَسْرُوْرِيْنَ لِقَوْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِلنَّبِيِّ ﷺ رَاعِنَا .

قَوْلُهُ مُؤْلِمٌ : صِيْغَةُ صِفَتْ (بِفَتْحِ اللَّامِ) ইসমে মাফউলের সীগাহ। بَابْ اِفْعَالْ থেকে। মূলত এটি بَاب سَمِعَ থেকে এবং লাজেম। এখন بَابْ اِفْعَالْ থেকে مُتَعَدِّىْ হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ هُوَ النَّارُ : هُوَ-এর مَرْجِعْ হলো– عَذَابٌ اَلِيْمٌ এখানে প্রশ্ন হয় যে, هُوَ মুবদাতা এবং اَلنَّارُ খবর। মুবতাদা-খবরের মধ্যেতো مُطَابَقَتْ নেই। কেননা اَلنَّارُ হলো مُؤَنَّثْ এবং هُوَ হলো مُذَكَّرْ

উত্তর : هُوَ-এর مَرْجِعْ হলো عَذَاب এবং مَرْجِعْ-এর সামঞ্জস্যতায় هُوَ-কে مُذَكَّرْ আনা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্বে ইহুদিদের যাদু চর্চা ও অনুসরণের বিবরণ ছিল। এ আয়াতে বলা হচ্ছে যে, যাদুর অনুসরণ ইহুদিদের স্বভাব প্রকৃতিতে এ পর্যায়ে মিশ্রিত ছিল যে, তাদের কথা-বার্তা এবং সম্বোধনও যাদুর প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না। তাদের কথা-বার্তা বাহ্যত সম্মানজনক হলেও বাস্তবে তা ছিল তাচ্ছিল্যপূর্ণ।

قَوْلُهُ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا **শানে নুযূল :** ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মজলিসে এসে বসত এবং তাঁর কথাবার্তা শুনত। যে কথা ভালো করে শুনতে পেত না সেটা দ্বিতীয়বার শুনতে চেয়ে বলত رَاعِنَا অর্থাৎ আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন। শব্দটি তাদের দেখাদেখি অনেক মুসলিমগণও উচ্চারণ করতেন। আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করে নিষেধ করলেন যে, তোমরা এটা বলো না। বলতে হলে বরং اُنْظُرْنَا বলো। এরও এই একই অর্থ। আর শুরু হতেই তোমরা মনোযোগী হয়ে কথাবার্তা শুনো, যাতে দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করতে না হয়। ইহুদিরা এটা অসদুদ্দেশ্যে ধোঁকা দেওয়ার জন্যই উচ্চারণ করত। তারা একটু টেনে উচ্চারণ করতো رَاعِيْنَا অর্থাৎ আমাদের রাখাল। ইহুদিদের ভাষায় رَاعِنَا শব্দটি বোকা অর্থেও ব্যবহৃত হতো। যেমনটি মুফাসসির (র.) وَهِىَ بِلُغَةِ الْيَهُوْدِ سَبٌّ مِنَ الرَّعُوْنَةِ বলে ইঙ্গিত করেছেন।

আয়াত দ্বারা স্পষ্টত প্রতিভাত হয় যে, রিসালাতের মর্যাদা অধিকারীর প্রতি শুধু আন্তরিক আদব– ভক্তিই যথেষ্ট নয়; বরং বাহ্যিক আচরণ-উচ্চারণেও সম্মান-শ্রদ্ধা প্রকাশ অপরিহার্য। ফকীহগণ লিখেছেন, যেসব শব্দে অমর্যাদার সম্ভাব্য অর্থও বিদ্যমান থাকে, সেগুলো পরিহার করাও আবশ্যকীয়। আল্লামা ইবনুল আরাবী (র.) লিখেন– وَهُوَ دَلِيْلٌ عَلٰى تَجَنُّبِ الْاَلْفَاظِ الْمُحْتَمِلَةِ الَّتِىْ فِيْهَا التَّعَرُّضُ لِلتَّنْقِيْصِ অর্থাৎ এতে প্রমাণ রয়েছে দ্ব্যর্থবোধক সেসব শব্দ পরিহারের, যাতে মানহানি করার অবকাশ রয়েছে। ইমাম মালেক (র.)-এর মতে তো এ ধরনের শব্দ ব্যবহারে হদ্দ [নির্ণীত বিশেষ দণ্ড] সাব্যস্ত হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ لَهُ ذٰلِكَ : كَانُوْا-এর ضَمِيْرِ مَرْفُوْع-এর মিসদাক মুমিনগণ, لَهُ-এর মিসদাক রাসূল ﷺ আর ذٰلِكَ দ্বারা رَاعِنَا-এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। اَىْ كَانَ الْمُسْلِمُوْنَ يَقُوْلُ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاعِنَا মুফাসসির (র.) এ ইবারত দ্বারা আয়াতের শানে নুজুলের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

وَهِىَ بِلُغَةِ الْيَهُوْدِ سَبٌّ : অর্থাৎ رَاعِنَا শব্দটি ইহুদিদের ভাষায় একটি গালি। মূলত মুফাসসির (র.) এ ইবাদরত দ্বারা لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا-এর নিষেধাজ্ঞার কারণ বর্ণনা করেছেন যে, যদিও رَاعِنَا-এর বাহ্যিক অর্থ খুবই ভাল; কিন্তু যেহেতু ইহুদিদের ভাষায় এটি একটি গালি তাই মুসলমানদেকে এ থেকে বারণ করা হয়েছে। বর্ণিত আছে হযরত সা'দ ইবনে মায়াজ (রা.) ইহুদিদের ভাষা জানতেন। একদিন তিনি তাদেরকে এ শব্দটি বলতে শুনে বললেন–

يَا اَعْدَاءَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَئِنْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَجُلٍ مِنْكُمْ يَقُوْلُهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاَضْرِبَنَّ عُنُقَهٗ .

অর্থাৎ হে আল্লাহর দুশমনেরা! তোদের প্রতি আল্লাহর লানত। যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তার কসম করে বলছি– যদি তোমাদের কাউকে আর কোনোদিন এ শব্দটি রাসূল ﷺ-এর শানে বলতে শুনি, তাহলে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিব। তখন তারা বলল তোমরাও তো বল। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

قَوْلُهُ وَقُوْلُوْا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا : [অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী প্রবচনসমূহ তার প্রতি যথাযোগ্য আদব ও সম্মান বোধের সঙ্গে শুনতে থাক] আমাদের সমকালীন কোনো কোনো ভ্রান্ত দল উপদল ঈমান ও ইসলামের জন্য রাসূল ﷺ-এর মহান ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে শুধু কুরআনের অনুসরণকেই যথেষ্ট মনে করে নিয়েছে। এ আয়াত স্পষ্টরূপে তাদের ভ্রষ্টতা খণ্ডন করছে।

ফায়দা :

১. যে শব্দের ব্যাখ্যার দ্বারা খারাপ আচরণ করার সম্ভাবনা থাকে, তা ব্যবহার না করা উচিত। যদিও বক্তার উদ্দেশ্য ভালো থাকে।

২. ইঙ্গিতেও নবী করীম ﷺ-এর অসম্মান ও তুচ্ছতা কুফর। কেননা ইহুদিরা এখানে ইঙ্গিতেই নবী করীম ﷺ -এর প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করেছে। –[মা'আরিফুল কুরআন : ইদরীস কান্ধলভী (র.) খ. ১, পৃ. ১৯৫]

قَوْلُهُ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ : এখানে لِلْكَافِرِيْنَ -এর اَلِفْ لَامْ হলো عَهْد خَارِجِىْ -এর দ্বারা উদ্দেশ্য ঐসব ইহুদি যারা রাসুল ﷺ -কে গালি দিত, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করত এবং এ অর্থে رَاعِنَا বলত। তাদের আলোচনা পূর্বে সরাসরি না হলেও পরোক্ষভাবে অতিক্রান্ত হয়েছে। وَلِلْكٰفِرِيْنَ -এর স্থলে وَلَهُمْ বলা উচিত ছিল। সে হিসেবে এটি وَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ -এর অন্তর্ভুক্ত। আর এভাবে ইসমে জাহের দ্বারা বলার উদ্দেশ্য এদিকে ইঙ্গিত করা যে, নবী ﷺ -কে হেয় ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা কুফরী এবং আযাবের কারণ।

قَوْلُهُ مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا : যোগসূত্র : পূর্বে আহলে কিতাবের কুফরী এবং মন্দতার আলোচনা হয়েছে। এখন এ আয়াতে তার কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তোমাদের ঈমান না আনার এবং অসৌজন্যমূলক আচরণের মূল কারণ হলো তোমরা হিংসা কর।

قَوْلُهُ مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ الخ : [অর্থাৎ ইহুদি-মুশরিক নির্বিশেষে কোনো কাফেরই তোমাদের উপর কুরআন অবতীর্ণ হওয়াটা পছন্দ করে না; বরং ইহুদিদের কামনা হলো শেষ নবীর আবির্ভাব বনী ইসরাঈলের মাঝেই হোক। মক্কা শরীফের মুশরিকদেরও কামনা তাদের মাঝেই হোক। কিন্তু এটা তো আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের ব্যাপার। তিনি নিরক্ষর সম্প্রদায়কেই এ সৌভাগ্যের অধিকারী করেছেন। –[তাফসীরে উসমানী পৃ. ২০]

قَوْلُهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا : যারা কাফের অর্থাৎ ইসলামের জীবন বিধান অস্বীকারকারীদের বড় দল দুটি–

১. **মুশরিক :** যারা তাওহীদ রিসালাত, ফেরেশতা, জিন ইত্যাদিতে মোটেই বিশ্বাসী নয়; বরং এসবের পরিবর্তে অদ্ভুতও বিস্ময়কর বিভিন্ন কাল্পনিকও অলিক বিষয় তারা তৈরি করে নিয়েছে।

২. **আহলে কিতাব :** যারা উল্লিখিত মৌলিক বিষয়গুলোকে আক্ষরিক [ও তাত্ত্বিক] পর্যায়ে বিশ্বাসী হলেও বাস্তবে ও কার্যত এগুলোর প্রতিটির বাস্তবতাকে বিকৃত করে রেখেছিল। বর্তমান বাক্যের জন্য আগত বিধেয় এর উদ্দেশ্যেও اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا। অধিক স্পষ্ট করার লক্ষ্যে কাফেরদের দুই শ্রেণির খোলাখুলি বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ اَهْلُ الْكِتَابِ : পবিত্র কুরআনে এখানেই শব্দটির প্রথম উল্লেখ হলো। কুরআনী পরিভাষায় শব্দটি মু'মিন ও মুশরিক-এর মধ্যবর্তী একটি স্তর বুঝায় এবং এটি দিয়ে ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরই বুঝানো হয়ে থাকে। এরা মূলত তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত বিশ্বাসী ছিল। তাদের কাছে আসমানি কিতাব সহীফাও ছিল। যদিও তা ছিল বাহ্য ভাষ্য ও বিষয়গতরূপে চরম রদবদল ও বিকৃতির শিকার। এরা কুরআন ও তার বাহক নবীকে অস্বীকার করত।

قَوْلُهُ الْمُشْرِكِيْنَ : মুশরিক-অংশীবাদী যারা তাওহীদ ও নবুয়তে মোটেই বিশ্বাসী ছিল না। তারা এক আল্লাহ তা'আলার বদলে বিভিন্ন ফেরেশতা বিভিন্ন ক্ষমতার স্বাধীন ধারক ও অধিকারী মনে করত এবং এদেরকেই বিভিন্ন দেব-দেবীর নামে আখ্যায়িত করত ও তাদের পূজা-অর্চনা করত। তারা বিভিন্ন পদার্থ ও প্রাকৃতিক শক্তিকে উপাস্যের আসনে অধিষ্ঠিত করত।

قَوْلُهُ الْخَيْرِ : [কল্যাণ] দ্বারা সাধারণত ওহী ও নবুয়ত উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তবে এ স্থানে 'খায়র' কে সব রকমের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সাফল্যের সমষ্টি মনে করা এবং এর অধীনে জ্ঞান, গায়েবি সাহায্য, রাজ্যজয় ইত্যাদি সবকিছু অন্তর্ভুক্ত মনে করাই উত্তম হবে। –[রূহুল মা'আনী, বায়যাবী]

قَوْلُهُ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ : ইহুদিদের মূল হিংসার বিষয় ছিল এই যে, নবুয়ত নিয়ামতের অধিকারী তো আমরা অর্থাৎ ইসরাঈল সন্তানেরা। এ [উম্মী] আরবীরা যারা হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর, এরা এ নবুয়ত সম্পদ পেয়ে যাচ্ছে কোন সূত্রে এবং কোনো যুক্তিযোগ্যতা বলে? اَهْلُ الْكِتٰبِ দ্বারা প্রায়শ এদের প্রতিই ইঙ্গিত হয়ে থাকে। আয়াতের অর্থ আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলগণকে হযরত ইসহাক (আ.)-এর বংশধরদের মধ্য হতে পাঠিয়ে আসছিলেন, পরে [শেষ] নবী ﷺ হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধরদের মধ্য হতে পাঠানো হলে তা ইহুদিদের মনঃপূত হলো না।

অনুবাদ :

١٠٦. وَلَمَّا طَعَنَ الْكُفَّارُ فِي النَّسْخِ وَقَالُوا اِنَّ مُحَمَّدًا يَأْمُرُ اَصْحَابَهُ الْيَوْمَ بِاَمْرٍ وَيَنْهٰى عَنْهُ غَدًا اُنْزِلَ مَا شَرْطِيَّةٌ نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَيْ نُزِلَ حُكْمُهَا اِمَّا مَعَ لَفْظِهَا اَوْلَا وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِضَمِّ النُّوْنِ مِنْ اَنْسَخَ اَيْ نَأْمُرُكَ اَوْ جِبْرَئِيْلَ بِنَسْخِهَا اَوْ نُنْسِأْهَا نُؤَخِّرُهَا فَلَا نُزِلَ حُكْمَهَا وَنَرْفَعُ تِلَاوَتَهَا وَنُؤَخِّرُهَا فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِلَا هَمْزٍ مِنَ النِّسْيَانِ اَيْ نُنْسِكُهَا وَنَمْحُهَا مِنْ قَلْبِكَ وَجَوَابُ الشَّرْطِ نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَنْفَعَ لِلْعِبَادِ فِي السُّهُوْلَةِ اَوْ كَثْرَةِ الْاَجْرِ اَوْ مِثْلِهَا فِي التَّكْلِيْفِ وَالثَّوَابِ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. وَمِنْهُ النَّسْخُ وَالتَّبْدِيْلُ وَالْاِسْتِفْهَامُ لِلتَّقْرِيْرِ.

১০৬. কুরআনের নসখ অর্থাৎ এক আয়াতকে অপর এক আয়াতের মাধ্যমে বা এক হুকুমকে পরবর্তী অন্য এক হুকুমের মাধ্যমে রহিতকরণ সম্পর্কে কাফেররা যখন বিদ্রূপমূলক উক্তি করতে লাগল যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর সাথীগণকে আজ এক ধরনের হুকুম দেয়, কাল আবার তা নিষেধ করে দেয়। তখন আল্লাহ তা'আলা এর জবাবে নাজিল করেন : আমি কোনো আয়াত রহিত করলে অর্থাৎ কোনো নির্দেশ আয়াতে বর্ণিত শব্দাবলিসহ বা কেবলমাত্র হুকুমটিকে অপসৃত করি।

نَنْسَخْ শব্দটি অপর এক কিরাতে نُوْن-এ পেশসহ অর্থাৎ اَنْسَخَ হতে গঠিত ক্রিয়ারূপ হিসেবেও পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় এর অর্থ হবে, আপনাকে বা জিবরাঈল (আ.)-কে যদি তা রহিতকরণের নির্দেশ দেই। বা পিছনে রেখে দিলে। অর্থাৎ এর নির্দেশ যদি অপসৃত না করি আর কেবল পাঠ [তেলাওয়াত] রহিত করে দেই বা তাকে লাওহে মাহফূজে ছেড়ে রাখি।

অপর এক কেরাতে نُنْسِهَا শব্দটি হামযা ব্যাতিরেকেও পঠিত রয়েছে। তখন এটা نِسْيَانٌ [বিস্মৃত হওয়া] ধাতু হতে গঠিত শব্দটিরূপে গণ্য হবে। অর্থ হবে তা আপনার হৃদয়পট হতে যদি বিস্মৃত করে দেই, বিলুপ্ত করে দেই। তা হতে উত্তম সহজ হওয়ায় বা ছওয়াবের সংখ্যাধিক্য হিসেবে মানুষের জন্য অধিক লাভজনক কিংবা কষ্ট ও পুণ্যফলে তার সমতুল্য কোনো আয়াত আনয়ন করি। তুমি জান না যে, আল্লাহ তা'আলা সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান? নাসখ বা কোনো হুকুম রহিতকরণ ও পরিবর্তন করাও তার কুদরতের অন্তর্ভুক্ত।

مَا نَنْسَخْ-এর مَا শব্দটি এই স্থানে শর্তবাচক। এর জবাব হলো نَأْتِ بِخَيْرٍ।

اَلَمْ تَعْلَمْ এইস্থানে تَقْرِيْر বা বক্তব্যটি অধিক সুসাব্যস্ত করণার্থে প্রশ্নবোধক রূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

١٠٧. اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَفْعَلُ فِيْهِمَا مَا يَشَاءُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَيْ غَيْرِهِ مِنْ زَائِدَةٌ وَلِيٍّ يَحْفَظُكُمْ وَلَا نَصِيْرٍ. يَمْنَعُ عَذَابَهُ عَنْكُمْ اِنْ اَتٰكُمْ.

১০৭. তুমি কি জান না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই? এতদুভয়ের মধ্যে যা ইচ্ছা তাই তিনি করেন। এবং আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অর্থাৎ তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই যে তোমাদেরকে রক্ষা করবে। এবং সাহায্যকারীও নেই যে তোমাদের উপর যদি তার শাস্তি আপতিত হয় তবে তা ফিরিয়ে রাখতে পারবে।

مِنْ وَلِيٍّ-এর مِنْ টি এই স্থানে زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَلَمَّا طَعَنَ الْكُفَّارُ الخ : এ ইবারাত দ্বারা মুফাসসির (র.) উক্ত আয়অতের শানে নুযূলের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যা পূর্বে বর্ণিত হলো।

اَلْكُفَّارُ : এখানে اَلْكُفَّارُ দ্বারা ইহুদিরা উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ مَا نَنْسَخْ : যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে এ আলোচনা ছিল যে সাহাবা (রা.) একটি সময় পর্যন্ত رَاعِنَا বলতেন। তারপর তদস্থলে اُنْظُرْنَا বলার নির্দেশ এবং এ সংক্রান্ত নিন্দা-ভর্ৎসনার জবাব প্রদান করা হচ্ছে।

قَوْلُهُ نَنْسَخْ : نَسْخًا (ف) نَسَخَ বিদূরিত করা, মিটিয়ে দেওয়া, রহিত করা। نَسَخَتِ الشَّمْسُ الظِّلَّ সূর্য ছায়া দূর করে দিয়েছে। نَسَخْتُ الْكِتَابَ অর্থাৎ আমি কিতাবের কপি করেছি।

আর পরিভাষায় نَسْخ বলা হয়- بَيَانُ انْتِهَاءِ التَّعَبُّدِ بِقِرَائَتِهَا اَوِ الْحُكْمِ الْمُسْتَفَادِ مِنْهَا اَوْ بِهِمَا جَمِيعًا

قَوْلُهُ اَىْ نَزَلَ حُكْمَهَا : মুফাসসির (র.)-এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে نَسْخ-এর দুটি অর্থের رَفْعٌ وَاِزَالَةٌ [দূর করা] উদ্দেশ্য; نَقْلٌ وَتَحْوِيْلٌ উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهُ اِمَّا مَعَ لَفْظِهَا : অর্থাৎ اِزَالَةُ الْحُكْمِ বা বিধান রহিতকরণটা দুই সূরতে হতে পারে। ১. مَعَ اللَّفْظِ ২. بِغَيْرِ اللَّفْظِ প্রথমটিকে مَنْسُوْخُ الْحُكْمِ مَعَ التِّلَاوَةِ বলা হয়। যেমন- عَشَرَ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ يُحَرِّمْنَ এটি তেলাওয়াতসহ মানসূখের উদাহরণ।

قَوْلُهُ وَفِىْ قِرَاءَةٍ نُنْسِخْ : অর্থাৎ بَابُ اِفْعَالٌ থেকে হবে। এ অবস্থায় نُنْسِخْ মুতা'আদ্দী হবে। তখন অর্থ হবে আমরা মিটিয়ে দেওয়া বা মুছে দেওয়ার নির্দেশ করি। মুফাসসির (র.) نَأْمُرُكَ اَوْ جِبْرِيْلَ উহ্য ধরে এই কেরাতের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ اَوْ نُنْسِأْهَا : এর عَطْف হয়েছে نَنْسَخْ-এর সাথে। মুফাসসির (র.) نُؤَخِّرْهَا দ্বারা এর তাফসীর করেছেন

ফায়দা : ভারত উপমহাদেশীয় প্রায় নোসখায় এখানে نَنْسَأْهَا-এর স্থলে نُنْسِهَا রয়েছে। তা ঠিক নয়, কেননা نُؤَخِّرْهَا হলো نَنْسَأْهَا-এর ব্যাখ্যা; نُنْسِهَا-এর নয়।

قَوْلُهُ نُؤَخِّرْهَا : এটি نَنْسَأْهَا-এর তাফসীর نَنْسَأْهَا শব্দটি نَسَأَ থেকে নির্গত অর্থ تَاخِيْر বা বিলম্বিত করা। এখানে تَاخِيْر দ্বারা কি উদ্দেশ্য? এ ব্যাপার দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। যা মুফাসসির (র.) উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ فَلَا نَزَلَ حُكْمَهَا وَنَرْفَعُ تِلَاوَتَهَا : এটি تَاخِيْر-এর প্রথম সম্ভাবনা অর্থাৎ আয়াতের বিধান তুলে নিব না; বরং বাকী রাখব এবং তেলাওয়াত উঠিয়ে নিব। যেমন- اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ اِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا

এ আয়াতটির তিলাওয়াত রহিত হয়ে গেছে কিন্তু হুকুম রয়ে গেছে।

اَوْ نُؤَخِّرْهَا فِى اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ : এটি تَاخِيْر-এর দ্বিতীয় সম্ভাবনা। অর্থাৎ تَاخِيْر দ্বারা উদ্দেশ্য লাওহে মাহফূজে আয়াত নাজিলহীন রেখে দেওয়া। ঐ সময় পর্যন্ত যখন আল্লাহ তা নাজিল করতে চান।

قَوْلُهُ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِلَا هَمْزٍ نَنْسَأْهَا : এ থেকে বুঝা যায়, মুফাসসির (র.)-এর সামনে কুরআনের যে নুসখাটি ছিল তাতে لَا هَمْز লেখা ছিল। এ জন্যই তিনি বলেছেন بِلَا هَمْزٍ আমাদের সামনে যে নুসখা রয়েছে, তাতে শব্দটি بِلَا هَمْزٍ-ই লেখা আছে।

قَوْلُهُ نَنْسَأْهَا : এটি نَسَأَ থেকে নির্গত। অর্থ- বিলম্বিত করা, পিছনে রাখা। বলা হয় نَسَأَ اللّٰهُ فِىْ اَجَلِهِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তার হায়াত বিলম্বিত করুন। অর্থাৎ আয়ু বাড়িয়ে দিন। কুরআনের অন্য আয়াতে এসেছে اِنَّمَا النَّسِىْءُ زِيَادَةٌ فِى الْكُفْرِ এ আয়াতে نَسِىْ অর্থ বিলম্বিত করা। মুশরিকরা আশহুরে হারামকে তার নির্ধারিত স্থান থেকে বিলম্বিত করে দিত অর্থাৎ অন্য মাসে নিয়ে যেত। এ হলো هَمْز সম্বলিত কেরাতের ব্যাখ্যা। -[লুগাতুল কুরআন]

قَوْلَهُ وَنَمْحُهَا مِنْ قَلْبِكَ : نُنْسِهَا শব্দটি نِسْيَانٌ মাসদার থেকে নির্গত হলে مُتَعَدِّىْ بَيكْ مَفْعُوْل হবে। অর্থ হবে- আমরা তা ভুলে যাই। আর اِنْسَاءٌ থেকে নির্গত হলে مُتَعَدِّىْ بَدُوْ مَفْعُوْل হবে। অর্থ হবে আমরা তোমাকে ঐ আয়াত ভুলিয়ে দিই। মুফাসসির (র.) وَنَمْحُهَا مِنْ قَلْبِكَ উল্লেখ করে এ অর্থের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযূল : ইহুদিরা তাওরাতকে 'নসখ' -এর অযোগ্য মনে করত। তারা কুরআনেরও অনেক বিধান রহিত হওয়ার ব্যাপারে আপত্তি করেছে। ভর্ৎসনা করে বলেছে মুহাম্মদ তার অনুসারীদেরকে একবার এক হুকুম প্রদান করে আবার তা থেকে বারণ করে। এ ধরনের কথা বলে ইহুদিরা মুসলমানদের অন্তরে এ সন্দেহ সৃষ্টির পাঁয়তারা করত যে, তোমরা তো বল- আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমাদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার সবটুকুই 'খায়ের' বা কল্যাণকর। যদি তাই হয়, তাহলে তা রহিত হওয়ার অর্থ কি? যদি প্রথম হুকুমটি ভালো হয়ে থাকে, তাহলে দ্বিতীয়টি খারাপ হবে। আর দ্বিতীয়টি ভালো হলে প্রথমটি খারাপ হবে। অথচ আল্লাহ তা'আলার ওহী এবং হুকুম খারাপ হওয়া অসম্ভব। তাদের এহেন বক্তব্য খণ্ডন করার জন্য আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, আসমান জমিনের রাজত্ব একমাত্র আল্লাহ তা'আলার হাতে। তিনি যা ভালো মনে করেন, যে সময় যে বিধান তাঁর হিকমত অনুযায়ী হয়, তা-ই প্রয়োগ করেন এবং পূর্বের কোনো বিধান রহিতও করেন। এটি তার কুদরতের বহিঃপ্রকাশ। -[তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদরীস কান্দলভী (র.) খ. ১, পৃ. ১৯৬]

قَوْلَهُ اَوَّلاً : অর্থাৎ শব্দসহ মানসুখ হবে না; বরং শুধু বিধানটি মানসুখ হবে। তেলাওয়াত বাকী থাকবে। এটি اِزَالَةُ الْحُكْمِ -এর দ্বিতীয় সূরত। একে مَنْسُوْخُ الْحُكْمِ دُوْنَ التِّلَاوَةِ বলা হয়। যেমন- وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ এটির তেলাওয়াত বাকি আছে; কিন্তু বিধানটি রহিত হয়ে গেছে।

نَسْخٌ : দু'প্রকার : কুরআনে কারীমে নসখ দু'রকম হয়েছে-

১. একটি মানসুখ হুকুমের স্থলে অন্য বিধান নাজিল করা। যেমন- এক বছরের ইদ্দত রহিত করে চার মাস দশ দিনের বিধান দেওয়া হয়েছে।

২. প্রথম বিধান রহিত করে আর কোনো নতুন বিধান না দেওয়া। যেমন প্রথম দিকে মুহাজির নারীকে পরীক্ষা করার বিধান ছিল। পরবর্তীতে তা রহিত করা হয়েছে।

ফায়দা : যদি মুফাসসির (র.) وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِضَمِّ النُّوْنِ وَكَسْرِ السِّيْنِ -এর স্থলে وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِلَا هَمْزٍ বলতেন, তাহলে বক্তব্যটি অধিকতর সুস্পষ্ট হতো। কেননা মুফাসসির (র.)-এর ইবারতে অপর একটি কেরাতেরও সম্ভাবনা রয়েছে, যা অশুদ্ধ। আর তা হলো نُنَسِّهَا এই সূরতটি শব্দ ও অর্থ উভয় দিক থেকেই অসঠিক। শব্দগতভাবে এ জন্য যে, এই কেরাতটি বর্ণিত নেই। আর অর্থগতভাবে অসঠিক এ জন্য যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে نِسْيَانٌ তথা ভুলে যাওয়ার বহিঃপ্রকাশ হতে পারে না। -[জামালাইন খ. ১, পৃ. ১৯৭]

قَوْلُهُ مِنَ النِّسْيَانِ : মুফাসসির (র.) যদি مِنَ النِّسْيَانِ না বলে مِنَ الْاِنْسَاءِ বলতেন, তাহলে ভালো হতো। কেননা শব্দটি رُبَاعِيْ এবং তা اِنْسَاءٌ মাসদার থেকে নির্গত; نِسْيَانٌ থেকে নয়। সুতরাং বলা হবে نِسْيَانٌ মূলবর্ণ থেকে নির্গত।

-[হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১, পৃ. ১৩৭]

يَأْمُرُكَ اَوْ جِبْرِيْلَ : উভয়ের মাঝে تَلَازُمٌ -এর সম্পর্ক। হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে নসখের হুকুম দেওয়া মানে নবীজীকেই হুকুম দেওয়া। আর নবীজীকে হুকুম দেওয়া মানে হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে হুকুম দেওয়া।

قَوْلَهُ اَنْفَعُ لِلْعِبَادِ : বান্দাদের জন্য অধিকতর উপকারী। এর দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আয়াতে বর্ণিত خَيْرِيَّتْ বা উত্তম হওয়াটা বান্দাদের উপকারের ভিত্তিতে। এ ভিত্তিতে নয় যে, কুরআনের কোনো আয়াত অপর আয়াতের তুলনায় উত্তম। কেননা আল্লাহ তা'আলার কালাম পুরোটাই কল্যাণ। -[হাশিয়ায়ে জালালাইন, পৃ. ১৬]

إِشَارَةً إِلَى أَنَّ الْخَيْرِيَّةَ بِاعْتِبَارِ تَقَعُ الْعِبَادُ وَلَا أَنَّ آيَةً خَيْرٍ مِنْ آيَةٍ لِأَنَّ كَلَامَ اللّٰهِ وَاحِدٌ وَكُلُّهُ خَيْرٌ (حَاشِيَةُ جَلَالَيْنِ، ح٢٧، ص١٦)

قَوْلُهُ فِي السُّهُوْلَةِ : সহজের ক্ষেত্রে উত্তম। যেমন ইসলামের প্রথম দিকে যুদ্ধের বিধান এই ছিল যে, একজন মুসলমান **দশজন কাফেরের** মোকাবিলায় ধৈর্য ধারণ করে যুদ্ধ করতে হবে; পলায়ন করা যাবে না। পরবর্তীতে এ বিধান রহিত করে সহজ বিধান দেওয়া হয়। তাহলো একজন মুসলমান দুজন কাফেরের মোকাবিলায় ধৈর্য ধারণ করে যুদ্ধ করবে। শত্রুপক্ষ দ্বিগুণের বেশি হলে রণাঙ্গণ ছেড়ে চলে আসার অনুমতি রয়েছে। প্রথম বিধানের চেয়ে এ বিধানটি অনেক সহজ।

قَوْلُهُ أَوْ كَثْرَةُ الْأَجْرِ : ছওয়াব বেশির হওয়ার দিক দিয়ে উত্তম। যেমন– প্রথম দিকে রোজা রাখা কিংবা না রেখে ফিদয়া দেওয়া উভয়টিই অনুমতি ছিল। পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে শুধু রোজা নির্ধারিত হয়ে যায়। আর রোজা রাখার মাঝেই ছওয়াব বেশি।

قَوْلُهُ أَوْ مِثْلِهَا : সমমানের। যেমন– বায়তুল মুকাদ্দাসের অভিমুখী হয়ে নামাজ পড়ার বিধান রহিত করে কা'বার অভিমুখী হয়ে নামাজ পড়ার বিধান দেওয়া হয়। কেননা ছওয়াবের দিক দিয়ে উভয়টিই বরাবর।

نَسْخ -কে অস্বীকারের ব্যাখ্যা : আবূ মুসলিম ইবনে বাহর প্রমুখ আলেমগণ তো نَسْخ -কে একেবারেই অস্বীকার করেছেন। কেননা আকিদাগত বিষয় যেমন– আল্লাহর জাত ও সিফাতসমূহের মাসায়েল কিংবা ফেরেশতাগণ ও পয়গাম্বরগণ, আজাব ও ছওয়াব, কবরের জীবন, হাশর ও নশর, বেহেশত ও দোজখ ইত্যাদি বিষয়সমূহ তো স্পষ্ট রয়েছে যে, এগুলো স্থায়ী। এগুলোর ব্যাপারে কোনো نَسْخ কিংবা পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। আর এগুলোর মধ্যে সে সমস্ত বিধানাবলি, যেগুলো সমস্ত শরিয়তে শরয়ী ভিত্তি এবং যেগুলোর সম্পর্কে কোনো প্রকার মতানৈক্য নেই। যেমন মূর্তি পূজা, জুলুম ইত্যাদি হারাম হওয়া এবং ন্যায় নীতি, সততা ধার্মিকতা ও বিশ্বস্ততা উত্তম হওয়া এগুলোর পরিবর্তনেরও কোনো সম্ভাবনা নেই। এখন রয়ে যাচ্ছে শুধু আংশিক বিধানাবলি; তবে আবূ মুসলিম (র.)-এর বক্তব্যে সেগুলোর মধ্যেও نَسْخ নেই। কেননা সূত্র এক হওয়া শর্ত। অথচ রহিতকারী হয় এক সূত্রে এবং রহিত হয় আরেক সূত্রে। আর উভয়টি নিজ নিজ সূত্রে সহীহ ও বিশুদ্ধ হয়। এমনিভাবে তার দৃষ্টিতে আয়াতের মধ্যে নসখ নেই। অর্থাৎ কোনো আয়াতের তেলাওয়াত রহিত নেই। কেননা আয়াতের জন্য মুতাওয়াতির হওয়া শর্ত। যে আয়াত মানসূখ [রহিত] হয়ে গেছে, সে আয়াতের বেলায় তাওয়াতুর বর্ণনাই পাওয়া যাচ্ছে না। সেগুলো হয়তো আখবারে আহাদ হয় অথবা মউযূ ও যঈফ কিংবা এদ্‌রাজে রাবীর প্রকার থেকে হয়। যখন রাসূল ﷺ সেগুলোকে গ্রহণই করেননি, তবে সগুলোকে আয়াত কিভাবে বলা যাবে?

আয়াতে কুরআন শুধু সেগুলোকে বলা যাবে যেগুলোকে রাসূল ﷺ সংরক্ষণ করেছেন, অন্যদেরকে হেফজ করিয়েছেন এবং লেখক দ্বারা লিখিয়েছেন। অর্থাৎ বর্তমান কুরআন যা সংরক্ষিত ও মুতাওয়াতির এর বিকৃত করার কোনো পথ নেই। রয়ে গেল এ ব্যাপারটি যে, উক্ত আয়াত দ্বারা নসখ-এর উপর দলিল পেশ করা? অতএব এটা এ জন্য সঠিক নয় যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য তওরাত ও ইঞ্জিল-এর বিধানাবলি। অর্থাৎ সেগুলোতে পরিবর্তন হয়েছে। আর আয়াত কুরআনের শব্দের সাথে নির্দিষ্ট নয়; বরং আহকামের উপর এর প্রয়োগ সচরাচর।

সাধারণ আলেমগণের অভিমত : সাধারণ আলেমগণ নসখ এর প্রবক্তা। কিন্তু কয়েকটি শর্তের সাথে। সুতরাং পবিত্র কুরআনে এ মাসআলা সম্পর্কে দু জায়গায় পর্যালোচনা করা হয়েছে–

১. সূরা বাকারার এ আয়াত مَا نَنْسَخْ مِنْ الخ -এর মধ্যে।

২. সূরা নাহল -এর আয়াত وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ - এর মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকু, যে সূরা বাকারার আয়াতের মধ্যে نَسْخ এবং إِنْسَاء শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং সূরা নহল -এর আয়াতের মধ্যে تَبْدِيل শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বাকি উভয় আয়াতে أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ এবং اللّٰهُ بِمَا يُنَزِّلُ আর بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ বলে একই পদ্ধতিতে نَسْخ -এর রহস্যাদির ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। –[কামালাইন খ. ১, পৃ. ১১৪]

নসখ -এর দু অর্থ : সর্বপ্রথম এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, বিধানাবলির মধ্যে পরিবর্তন দু ভাবে হয়ে থাকে।

১. কোনো সময় তো এ কারণে যে, নিয়ম ও বিধানের মধ্যে প্রথমে কোনো ত্রুটি রয়ে গিয়েছিল। বিধায় এখন সংস্কার করে পূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের পরিবর্তন খোদায়ী বিধানাবলিতে অসম্ভব। কেননা এর দ্বারা নিঃসন্দেহে নির্বুদ্ধিতা ও দোষ প্রমাণিত হয়ে যায়। আপত্তিকারীরা নসখ -এর এ অর্থ বুঝেই আপত্তি করছে।

২. কখনো শাসিত লোকদের অবস্থার পরিবর্তনের বিধানবাবলির মধ্যে পরিবর্তন ভিত্তিতে হয়ে থাকে।

-[কামালাইন খ. ১, পৃ. ১১৫]

ঔষধের ব্যবস্থাপত্রের ন্যায় বিধানাবলির মধ্যেও পরিবর্তন অত্যাবশ্যক : এ পরিবর্তন এমনই বিশুদ্ধ ও বৈধ; বরং অত্যাবশ্যক। যেমন- বিজ্ঞ চিকিৎসকের ঔষধের ব্যবস্থাপত্রসমূহের মধ্যে রোগী ও রোগের পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তন হয়ে থাকে। যা বুদ্ধিভিত্তিক ও বর্ণনাভিত্তিক মেনে নেওয়া ওয়াজিব। এ কারণেই নির্ভরশীল আলেমগণ বিশ্লেষণ করে দিয়েছেন যে, নসখ দু কারণে হয়ে থাকে-

১. আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে উক্ত বিধানের সময়সীমা শেষ হয়ে গেছে বলে বর্ণনা করা হয়। ফলে উক্ত বিধান মানসুখ হয়ে যায়।

২. বান্দার অবস্থার পরিবর্তনের কারণে পূর্ববর্তী বিধান মানসুখ হয়ে নতুন বিধান জারী হওয়া।

অর্থাৎ বাস্তবে হুকুমের পরিবর্তন হয়নি; বরং সেটা একটি সাময়িক হুকুম ছিল, সময় শেষ হওয়ার পর হুকুম নিজে নিজেই শেষ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, প্রথম থেকে আমাদের এ কথা জানা ছিল না। এ কারণে বাহ্যিকভাবে দেখার মধ্যে আমাদের দৃষ্টিতে পরিবর্তন হয়েছে। যেমন কাউকে হঠাৎ তলোয়ার দ্বারা যদি হত্যা করা হয়। তবে বাহ্যিক দৃষ্টিতে তার মৃত্যু সময়ের পূর্বে বুঝা যায়। যে কারণে হত্যাকে জঘন্যতম অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এবং খোদায়ী নির্ধারণের হিসেবে নির্দিষ্ট সময়ের উপরই মৃত্যুকে গণ্য করা হবে। -[প্রাগুক্ত]

نَسْخ -এর শর্তাবলি : এ কারণেই ফকীহগণ نَسْخ -এর শর্তসমূহের ব্যাপারে বলেছেন যে, যে হুকুম নসখ -এর স্থানে পতিত হয়, সেটা স্বয়ং ওয়াজিব লিজাতিহী হতে পারে না। যেমন- ঈমান বিল্লাহ। আর সেটা স্বয়ং নিষিদ্ধও হতে পারবে না। যেমন- কুফর ও শিরক; বরং স্বয়ং হওয়ার ও না হওয়ার সম্ভাবনাময় হতে হবে। এমনিভাবে সে হুকুম সাময়িক কিংবা সর্বদার জন্য হতে পারবে না। চাই সেটার স্থায়িত্ব نَصّ -এর দ্বারা হোক যেমন- خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا এর সাথে নির্ধারিত হোক। অথবা دَلَالَتْ দ্বারা হোক। যেমন রাসূল ﷺ -এর ওফাতের পর পবিত্র শরিয়ত আর পরিবর্তন যোগ্য না হওয়া। অর্থাৎ শরয়ী বিধানাবলিতে রদবদলের সম্ভাবনা রাসূল ﷺ -এর জীবদ্দশায় ছিল। কিন্তু তার ওফাতের পর এখন শরিয়ত স্থায়ী হয়ে গেছে। ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে গেছে। সংস্কার ও পরিবর্তনের সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, সময় ও স্থান হিসেবে আংশিকভাবে ফকীহগণের ফতোয়ায় জায়েজ ও নাজায়েজ। হালাল ও হারামের দ্বন্দ্ব এবং বিধানাবলিতে সামান্য পরিবর্তনের ন্যায় যা মনে হয়। এটার কোনো সম্পৃক্ততা সেটার সাথে নেই। আর এ সামান্য দ্বন্দ্ব পবিত্র শরিয়তের স্থায়িত্বে কোনো প্রভাব ফেলে না। মোটকথা نَسْخ -এর সাথে এমন হুকুম হবে না, যা প্রথম থেকেই সাময়িক কিংবা সর্বদার জন্য হয়। কেননা যেটা সাময়িক সেটা তো সময় শেষ হওয়ার সাথে সাথে নিজে নিজেই শেষ হয়ে যায়। তাই সেটার জন্য نَسْخ অর্থহীন। এমনিভাবে হুকুম যদি স্থায়ী হয় তবে এর ক্ষেত্রে نَسْخ -এর অর্থ মিথ্যা বর্ণনা হবে। কেননা প্রথমে সেটাকে পরিবর্তনযোগ্য নয় বলে মেনে নেওয়া হয়েছিল। যা এখন পরিবর্তনের পর ভুল হয়ে গেল। -[প্রাগুক্ত]

মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব : তাদের মতে نَاسِخْ [রহিতকারী] ও مَنْسُوْخ [রহিত] উভয়ের মাঝে এতটুকু সময় থাকতে হবে [শর্ত] যে বান্দা রহিত হুকুম -এর উপর বাস্তবে আমলের সুযোগ পেয়ে যায়। তারপরে نَسْخ শুদ্ধ হবে। কিন্তু আহলুস সুন্নত ওয়াল জামাতের মতে রহিতের ব্যাপারে শুধু বাস্তবতার বিশ্বাসের সুযোগ পাওয়াই যথেষ্ট, বাস্তবে আমলের শর্ত নেই এবং বিশ্বাসও সরাসরি হোক কিংবা পরোক্ষভাবে স্থলাভিষিক্ততার মাধ্যমে হোক। যেমন মেরাজে ৫০ ওয়াক্ত নামাজ রহিত হয়ে শুধু পাঁচ ওয়াক্ত রয়ে গেছে। পূর্বের [পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজের] হুকুমের উপর না বাস্তবে আমলের সুযাগ পাওয়া গেছে। আর না বাস্তবতার বিশ্বাসের সময় সুদৃঢ়ভাবে সরাসরি উম্মত পেয়েছে; হ্যাঁ, রাসূল ﷺ মৌলিকভাবে ও প্রতিনিধি হিসেবে বাস্তব এতেকাদকে আঞ্জাম দিয়েছিলেন। আর সেটাই সকলের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেছে। -[প্রাগুক্ত ১১৭]

নসখ-এর সীমা : আয়াতে যেহেতু نَاْتِ بِخَيْرٍ -এর কয়েদ রয়েছে, তাই পবিত্র কুরআনের জন্য قِيَاسْ -কে নসখকারী মানা যাবে না এবং অধিকাংশের মতে اِجْمَاعْ -ও নসখকারী হতে পারে না। হ্যাঁ, পবিত্র কুরআন ও নবী করীম ﷺ -এর হাদীস হানাফীগণের দৃষ্টিতে একে অপরের জন্য রহিতকারী হতে পারে। কিন্তু শাফেয়ীগণ এ ব্যাপারে চিন্তিত যে, এতে বিরোধীরা প্রতিবাদের সুযোগ পেয়ে যায় যে, লক্ষ্য কর আল্লাহর বাণীকে তো সর্বপ্রথম তারই পয়গাম্বর অথবা নবীর হাদীসকে তো সর্বপ্রথম আল্লাহই মিথ্যা সাব্যস্ত করেছেন ও খণ্ডন করেছেন। কিন্তু হানাফীগণ এ সম্ভাবনাকে অযথা মনে করেন। কেননা

প্রথমত বিরোধীদের প্রতিবাদ থেকে এ স্থানেই পরিত্রাণ কঠিন আর যেখানে কুরআনের এক আয়াত অন্য আয়াতকে কিংবা এক **হাদীস অন্য হাদীসকে রহিত করেছে,** সেখানেও তো তাদের প্রতিবাদের আরো বড় সুযোগ রয়েছে যে, স্বয়ং কুরআন নিজের **কথাকে নিজেই প্রত্যাখ্যান** ও মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে তদ্রূপ হাদীসও। -[প্রাগুক্ত]

দ্বিতীয়ত নসখ -এর অর্থ যখন সময় সীমা বর্ণনা করে দেওয়া, তখন তো প্রতিবাদের কোনোই অবকাশ থাকে না; বরং বলা হবে যে, আল্লাহ তাঁর রাসূল -এর হুকুমের শেষ সময় সীমা এবং রাসূল ﷺ আল্লাহর হুকুমের শেষ সময় সীমা বলে দিয়েছেন। আর যেহেতু نَاسِخٌ এবং مَنْسُوْخٌ -এর মধ্যে সাদৃশ্য হওয়া কিংবা সহজ ও ছওয়াবের দিক দিয়ে نَاسِخٌ টি উত্তম হওয়া। শব্দের উত্তমতা অথবা সমকক্ষতা উদ্দেশ্য নয়। তাই কুরআন ও হাদীসের শাব্দিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একটি অপরটির জন্য نَاسِخٌ হওয়া আপত্তির কারণ না হওয়াই যথাযথ। এমনিভাবে نَاسِخٌ টি সমকক্ষ হওয়া কিংবা مَنْسُوْخٌ থেকে উত্তম হওয়া ও আপত্তির কারণ হতে পারে না। কেননা এ বিষয়গুলো উপকার এবং ছওয়াবের দিক দিয়ে উত্তম হওয়ার পরিপন্থি নয়। مَنْسُوْخٌ টি نَاسِخٌ -এর তুলনায় অতি সহজ হওয়া যেমন পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজের স্থলে শুধু পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কিংবা مِيْرَاثٌ بِالْقَرَابَةِ দ্বারা مِيْرَاثٌ بِالْهِجْرَةِ রহিত হওয়া অথবা দিবারাত্রির রোজার হুকুম দিনের রোজার দ্বারা রহিত হয়ে যাওয়া বা যুদ্ধে একজন মুসলিম সৈন্য দশজন কাফের যুদ্ধার প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার হুকুম একজন মুসলিম যোদ্ধা দুজন কাফের যোদ্ধার প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার হুকুম দ্বারা রহিত হয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

আর نَاسِخٌ এবং مَنْسُوْخٌ উভয়টি সাদৃশ্য হওয়ার উপমা হলো যেমন- বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে নামাজ পড়ার হুকুম বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে নামাজ পড়ার হুকুম দ্বারা রহিত হয়ে যাওয়া।

পরিবর্তন ব্যতীত নসখ -এর উপমা যেমন فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰكُمْ صَدَقَةً আর نَاسِخٌ কঠিনতম হওয়ার উপমা যেমন ক্ষমা বিষয়ের আয়াতগুলো যুদ্ধের আয়াতগুলো দ্বারা রহিত হওয়া। অথবা ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় রোজা রাখা/ রোজা না রেখে ফেদিয়া দেওয়ার অনুমতি রোজা রাখাকে নির্দিষ্ট করে দেওয়ার হুকুম দ্বারা রহিত করে দেওয়া। -[প্রাগুক্ত]

নসখ -এর জন্য তারিখের পূর্বাপর হওয়া : এমনিভাবে নসখকে নির্ধারণের জন্য আয়াতসমূহের অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ জানা অত্যাবশ্যক। যাতে করে পরবর্তী আয়াতকে نَاسِخٌ [রহিতকারী] এবং পূর্বের আয়াতকে মনসূখ বলা যায়। তাই কোন সূরাগুলো মক্কী, কোন সূরাগুলো মদনী, কোন সূরাগুলো সফরাবস্থায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং কোন সূরাগুলো সফর ব্যতীত অন্যাবস্থায় অবতীর্ণ হয়েছে এ সম্পর্কে অবগতিও জরুরি। যাতে করে আয়াত পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী হওয়ার ব্যাপারে সঠিকভাবে জানা যায়।

সুতরাং যে সূরাগুলোতে শুধু نَاسِخٌ আয়াতসমূহ রয়েছে, সেগুলো সর্বমোট ৬টি সূরা, যে সূরাসমূহে نَاسِخٌ ও مَنْسُوْخٌ উভয় প্রকারের আয়াতসমূহ রয়েছে, এমন সূরা ২৫টি, যে সূরাসমূহে শুধু مَنْسُوْخٌ আয়াতসমূহ রয়েছে, এমন সূরা ৪০টি, তবে যে সমস্ত সূরা نَاسِخٌ ও مَنْسُوْخٌ উভয় প্রকার আয়াতসমূহ থেকে শূন্য এমন সূরা ৪৩টি; যেগুলোর ব্যাখ্যা পূর্বে চলে গেছে।

অগ্রবর্তী ও পশ্চাৎবর্তীগণের পরিভাষাসমূহের পার্থক্য : এ বিষয়ে مُتَقَدِّمْ ও مُتَأَخِّرْ আলেমগণের পরিভাষায়ও কিছুটা ব্যবধান রয়েছে। অগ্রবর্তীগণের মতে নসখ -এর ক্ষেত্রে এতবেশি প্রশস্ততার সাথে কাজ নেওয়া হয়েছে যে, বিন্দু পরিমাণ পরিবর্তনের বেলায়ও তারা نَسْخٌ শব্দ প্রয়োগ করেছেন। তাই نَسْخٌ -এর পরিমাণ তাদের দৃষ্টিতে স্বাভাবিকভাবেই বেশি হবে। আর পশ্চাদ্বর্তীগণের পরিভাষার সীমা অত্যন্ত সংকীর্ণ। তাই তাদের মতে নসখ -এর সংখ্যাও অনেক কম। হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র.) মোট পাঁচটি আয়াত مَنْسُوْخٌ মানেন। দ্বিতীয় হুকুম নাসিখ -এর জন্য যৌক্তিক হিসেবে যে বিষয়গুলো থাকা অত্যাবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা সে আয়াতগুলোতে সে বিষয়গুলোর ইঙ্গিত করেছেন-

১. এর ভিত্তি কল্যাণের উপর হওয়া।

২. নির্দেশদাতা ক্ষমতাশালী হওয়া।

৩. অন্য কেউ বিরোধিতা করে তবে তাদেরকে সাহায্য করা, উক্ত আয়াত সে দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। যা আগন্তুক ও তরিকাপন্থির ইচ্ছা ব্যতীত ধ্বংসশীল কিংবা পরাজিত হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা সেটার চেয়ে উত্তম অথবা সেটার তুল্য প্রদান করেন। ধ্বংসশীল বস্তুর ব্যাপারে বান্দার আক্ষেপ করা ঠিক নয়। -[কামালাইন খ. ১. পৃ. ১১৭]

অনুবাদ :

١٠٨. وَنَزَلَ لَمَّا سَأَلَهُ اَهْلُ مَكَّةَ اَنْ يُوَسِّعَهَا وَيَجْعَلَ الصَّفَا ذَهَبًا اَمْ بَلْ أَ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْئَلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى اَىْ سَأَلَهُ قَوْمُهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ قَوْلِهِمْ اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً وَغَيْرَ ذٰلِكَ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ اَىْ يَأْخُذْ بَدْلَهُ بِتَرْكِ النَّظْرِ فِي الْاٰيَاتِ الْبَيِّنَاتِ وَاقْتِرَاحِ غَيْرِهَا فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ ـ اَخْطَأَ طَرِيْقَ الْحَقِّ وَالسَّوَاءُ فِى الْاَصْلِ الْوَسَطُ ـ

১০৮. মক্কাবাসীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট সাফা পাহাড়টিকে স্বর্ণে পরিণত করার এবং তাদেরকে আর্থিক সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করার আবেদন জানালে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন তোমরা কি তোমাদের রাসূলকে সেরূপ প্রশ্ন করতে চাও যেরূপ মূসাকে করা হয়েছিল? অর্থাৎ যেরূপ তাঁকে তাঁর সম্প্রদায় করেছিল? যেমন বলেছিল, আল্লাহ তা'আলাকে আমাদের স্বচক্ষে প্রদর্শন কর, ইত্যাদি। এবং যে কেউ ঈমানের স্থলে কুফরির বিনিময় করে অর্থাৎ সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহের উপর পর্যবেক্ষণ ত্যাগ করে এবং অন্য কিছুর আবদার তুলে ঈমানের পরিবর্তে কুফরি গ্রহণ করে নিশ্চিতভাবে সে সরল পথ হারায়। সত্য পথকে ভুলে যায়।

اَمْ تُرِيْدُوْنَ এই আয়াতে اَمْ শব্দটি بَلْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। اَلسَّوَاءُ -এর মূল অর্থ হলো মাঝামাঝি [পথ] মধ্য [পথ]।

١٠٩. وَدَّ كَثِيْرٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ مَصْدَرِيَّةٌ يَرُدُّوْنَكُمْ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مَفْعُوْلٌ لَهُ كَائِنًا مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ اَىْ حَمَلَتْهُمْ عَلَيْهِ اَنْفُسُهُمُ الْخَبِيْثَةُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ فِى التَّوْرَاةِ الْحَقُّ ـ فِىْ شَاْنِ النَّبِيِّ ﷺ فَاعْفُوْا عَنْهُمْ اَيْ اُتْرُكُوْهُمْ وَاصْفَحُوْا اَعْرِضُوْا فَلَا تُجَازُوْهُمْ حَتّٰى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهِ ط فِيْهِمْ مِنَ الْقِتَالِ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ

১০৯. ঈর্ষামূলক মনোভাববশত তাদের নিকট তাওরাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও কিতাবীদের মধ্যে অনেকেই কামনা করে ঈমান আনয়নের পর পুনরায় তোমাদেরকে কাফেররূপে ফিরিয়ে নিতে। অর্থাৎ তাদের হীন মানসিকতা এরূপ বিষয়ে তাদের উৎসাহিত করে। তোমরা তাদের ক্ষমা কর তাদের ছেড়ে দাও এবং উপেক্ষা কর বর্তমানে তাদের কোনো প্রতিফল দিও না যতক্ষণ না তাদের বিষয়ে আল্লাহ কোনো নির্দেশ অর্থাৎ জিহাদের নির্দেশ দেন, আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

لَوْ শব্দটি এই স্থানে مَصْدَرِيَّةٌ অর্থাৎ এর পরবর্তী ক্রিয়াটি ক্রিয়ার ধাতু অর্থে ব্যবহৃত।

حَسَدًا শব্দটি مَفْعُوْلٌ لَهُ বা হেতুবোধক কর্মকারক।

مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ এটা উহ্য كَائِنًا -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট।

١١٠. وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ طَاعَةٍ كَصَلٰوةٍ وَصَدَقَةٍ تَجِدُوْهُ اَىْ ثَوَابَهُ عِنْدَ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ - فَيُجَازِيْكُمْ بِهٖ -

১১০. তোমরা সালাত কায়েম কর, জাকাত দাও এবং উত্তম কাজের আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও ফরমাবরদারীর কাজের যেমন- সালাত, সাদকা ইত্যাদি যা কিছু পূর্বে প্রেরণ করবে, আল্লাহর নিকট তা অর্থাৎ তা পুণ্যফল পাবে। তোমারা যা কর আল্লাহ তার প্রতি দৃষ্টি রাখেন। অনন্তর তিনি তোমাদেরকে এর প্রতিফল দিবেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَنْ يُوَسِّعَهَا : এর মর্ম হলো আমাদের নগর থেকে পাহাড়গুলোকে সরিয়ে দাও, যাতে শহর প্রশস্ত হয়ে যায়।

قَوْلُهُ بَلْ : এ দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে যে, এখানে اَمْ শব্দটি مُنْقَطِعَةٌ যা بَلْ এবং هَمْزَهْ اِسْتِفْهَامْ -এর অর্থে।

قَوْلُهُ اَنْ تَسْئَلُوْا : اَنْ نَاصِبَةٌ এবং اَنْ تَسْئَلُوْ মহল হিসেবে مَنْصُوْب তথা تُرِيْدُوْنَ ফে'লের মাফউল।

اَىْ تُرِيْدُوْنَ سُوَالَ رَسُوْلِكُمْ

قَوْلُهُ كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى : এটি مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ হিসেবে مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ এবং উহ্য মাসদারের সিফত

اَىْ تَسْئَلُوْا سُوَالًا مِثْلَ سُوَالِ مُوْسٰى .

কেউ কেউ বলেন, এটি حَالٌ -এর ভিত্তিতে মানসূব।

اَنْ تَسْئَلُوْا মাসদার হয়ে تُرِيْدُوْنَ -এর মাফউল। সে মাফউল থেকে كَمَا سُئِلَ হাল অর كَمَا -এর মধ্যে كَافْ হরফে জার مِثْلِ -এর অর্থে এবং مَا হলো مُقَدَّرِيَّةٌ

قَوْلُهُ وَالسَّوَاءُ فِى الْاَصْلِ الْوَسَطُ : অর্থাৎ سَوَاءٌ শব্দটি وَسَطٌ -এর অর্থে। কেউ বলেন سَوَاءٌ ইসমে ফায়েলের অর্থে মাসদার। اَىْ مُسْتَوِىْ - সুতরাং سَوَاءَ السَّبِيْلِ -এর অর্থ হবে- اَلطَّرِيْقُ الْمُسْتَوِىْ

قَوْلُهُ وَدَّا : مَاضِىْ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ -এর সীগাহ। وَدًّا - مَوَدَّةً (س) وَدَّ কামনা করা, আশা করা

قَوْلُهُ لَوْ مَصْدَرِيَّةٌ : لَوْ - حَرْفِ مَصْدَرِىْ ফেয়েলের পরে ব্যবহৃত হলে تَمَنِّىْ বা আশা আকাঙ্ক্ষার অর্থ দেয়। মূল ইবারত হবে এভাবে- وَدَّ كَثِيْرٌ رَدَّ كُمْ الخ - وَدَّ যেহেতু صَيَّرَ -এর অর্থে তাই দুটি মাফউলকে নসব দেয়। প্রথম মাফউলটি হলো كُمْ আর দ্বিতীয়টি হলো كُفَّارًا

قَوْلُهُ كَائِنًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ : মুফাসসির (র.) كَائِنًا -কে উহ্য ধরে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ বাক্যাংশটি كَائِنًا মাহযূফের مُتَعَلِّقٌ হয়ে حَسَدًا -এর সিফত হয়েছে।

حَسَدًا : حَسَدٌ অর্থ হিংসা। পরিভাষায় حَسَدٌ বলা হয় اَلْحَسَدُ تَمَنِّىْ زَوَالِ نِعْمَةِ الْاِنْسَانِ কারো নিয়ামত দূর হয়ে যাওয়ার কামনা করা।

قَوْلُهُ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ : مِنْ بَعْدِ টি وَدَّ -এর مُتَعَلِّقٌ আর مَا হলো مَصْدَرِىْ - اَىْ بَعْدَ تَبَيُّنِ الْحَقِّ لَهُمْ

اِعْتِرَاضٌ : مَنْ كَانَ هُوْدًا বাক্যের كَانَ -এর ضَمِيْرٌ مُفْرَدٌ এর- كَانَ টি اِسْمٌ এর- আর هُوْدًا টি كُنْ -এর خَبَرٌ হয়েছে। যা বহুবচন। অথচ اِسْمُ كَانَ ও خَبَرُ كَانَ -এর মাঝে مُطَابَقَتْ হওয়া আবশ্যক।

উত্তর : এখানে كَانَ -এর ইসমে মুফরাদ আনার ক্ষেত্রে لَفْظِ مَنْ -এর প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে। আর খবর তথা هُوْدًا বহুবচন আনার ক্ষেত্রে مِنْ -এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে। এতে কোনো দোষ নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْئَلُوْا الخ : **আয়াতের যোগসূত্র :** পূর্বে নসখ সম্পর্কে ইহুদি ও মুশরিকদের সমালোচনা ও আপত্তির খণ্ডন করা হয়েছে। এখন এ আয়াতে মুসলমানদেরকে রাসূল ﷺ-এর উপর ভরসা ও আস্থা রাখার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। যেন বলা হয়েছে–

لَا تَكُوْنُوْا فِيْمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنَ الْقُرْاٰنِ مِثْلَ الْيَهُوْدِ فِيْ تَرْكِ الثِّقَةِ بِالْاٰيَاتِ الْبَيِّنَةِ وَاقْتِرَاحِ غَيْرِهَا فَتَضِلُّوْا وَتَكْفُرُوْا بَعْدَ الْاِيْمَانِ ـ

قَوْلُهُ وَدَّ كَثِيْرٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ : যোগসূত্র : পূর্বে বলা হয়েছে যে, তারা ঈমানের স্থলে কুফর গ্রহণ করেছিল। এখন এ আয়াতে বলা হচ্ছে তারা মুসলমানদের ব্যাপারেও এ কামনা করে যে, মুসলমানরা ঈমানের পর কাফের হয়ে যাক।

وَدَّ كَثِيْرٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ الخ **শানে নুযূল :** হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.) এবং হযরত হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) যুদ্ধক্ষেত্রে উহুদ থেকে ফেরার পথে ইহুদিদের এক জামাতের সাথে সাক্ষাৎ হয়। তাদেরকে দেখে ইহুদিরা বলতে লাগল, আমরা কি তোমাদেরকে বলিনি যে, ইহুদি ধর্মই সঠিক? ইহুদি ধর্ম ছাড়া যা কিছু আছে সবই বাতিল। যদি মুহাম্মদ ﷺ হকের উপর থাকতেন তাহলে তার সাথী-সঙ্গীরা নিহত হতো না। অথচ মুহাম্মদ ﷺ দাবি করে যে যখন সে যুদ্ধ করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার সাথে থাকেন। ইহুদিদের একটানা এ কথাগুলো শুনে হযরত আম্মার (রা.) বললেন, আচ্ছা বলো দেখি, তোমাদের ধর্মে অঙ্গীকার ভঙ্গের কি বিধান? ইহুদিরা জবাব দিল, এটাতো অত্যন্ত জঘন্য কাজ। হযরত আম্মার (রা.) বললেন, আমরা তো হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর সাথে আমৃত্যু তাঁর আনুগত্যের অঙ্গীকার করছি। সেটা কখনো ভঙ্গ করবো না। ইহুদি বলল, আম্মার বেদীন হয়ে গেছে। তখন হযরত হুজায়ফা (রা.) জবাব দিলেন, رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَالْكَعْبَةِ قِبْلَةً وَالْقُرْاٰنِ اِمَامًا وَالْمُؤْمِنِيْنَ اِخْوَانًا যাহোক, তাঁরা ফিরে এসে রাসূল ﷺ -এর কাছে এ ঘটনার বিবরণ দিলে রাসূল ﷺ বলেন– اَصَبْتُمَا الْخَيْرَ وَاَفْلَحْتُمَا অর্থাৎ তোমরা কল্যাণ করেছো এবং সফল হয়েছো। তারপর আয়াত নাজিল হয় ...... وَدَّ كَثِيْرٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ –[ছাবীর সূত্রে জামালাইন খ. ১, পৃ. ২০২]

বর্তমানে খ্রিস্টান জগতের পক্ষ থেকে ইসলামি আকিদাসমূহের পরিপন্থি যে উন্মুক্ত সুপরিকল্পিত ও সম্প্রসারিত আকারের এবং ইহুদি বিদ্বানদের পক্ষ হতে তুলনামূলক লঘু ও গোপন রাজনৈতিক, আর্থ সামাজিক ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক প্রবন্ধ-নিবন্ধের যে প্রচারণা [ও অন্যান্য প্রচারমাধ্যম সূত্রে] মুসলিম দেশগুলোতে অহরহ ও অবিরাম চালানো হচ্ছে, এর সবগুলোই তাদের সে সুপ্ত বাসনারই বহিঃপ্রকাশ। এসব প্রচেষ্টা ও তৎপরতার শেষ লক্ষ্য থাকে এটাই যে, মুসলমানরা যদি এতটুকুও ইহুদি বা খ্রিস্টান মতবাদ [কালচার-সংস্কৃতি] গ্রহণ করে, তাতে অন্তত এতটুকু লাভ হবে যে, তারা নিজেদের ধর্মের প্রতি অবশ্যই বীতশ্রদ্ধ ও আস্থাহীন হয়ে পড়বে। –[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ২০০]

قَوْلُهُ وَنَزَلَ لَمَّا الخ : এর দ্বারা মুফাসসির (র.) اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْئَلُوْا الخ আয়াতের শানে নুযুলের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ মক্কাবাসী যখন মক্কা নগরীকে প্রশস্ত করে দেওয়া এবং সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করার দাবী করল, তখন উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

قَوْلُهُ حَسَدًا مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ : অর্থাৎ এসব চেষ্টা-তৎপরতার পেছনে ঐকান্তিকতা ও কল্যাণ কামনা কার্যকর ছিল না। এগুলোর উৎস ছিল হিংসা ও বিদ্বেষ। ইহুদিদের স্বভাব বিদ্বেষ তো তাদের নবী ও পথ প্রদর্শকদের পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে এবং তারা তাদেরও রেহাই দেয়নি।

قَوْلُهُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ : অর্থাৎ কিতাবীদের এ প্রত্যাখ্যান ও বিরোধিতার কারণ কোনো দ্বিধা-সংশয় বা যৌক্তিক বিভ্রান্তি নয়। এর কারণ শুধুই জিদ, হঠকারিতা ও অহংকার। কেননা সত্য তাদের কাছে পরিপূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হয়েছে।

قَوْلُهُ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتّٰى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ : এখনই হে মুসলমানগণ! তাদের কোনো প্রতিশোধ নিতে যেয়ো না। ইহুদিদের বিদ্বেষ ও উস্কানিমূলক তৎপরতায় মুসলমানদের মাঝে উত্তেজনা দেখা দেওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। তাই তাদের আদেশ-উপদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, এ মুহূর্তে [ধৈর্য ধারণকর] ক্ষমা মার্জনা করে যেতে থাক, প্রতিশোধ ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থার এখনই সূচনা করে দিয়ো না।

قَوْلُهُ وَمَا تُنْفِقُوا لِاَنْفُسِكُمْ : لِاَنْفُسِكُمْ নিজেদের জন্য। এখানে সম্বন্ধপদ (مُضَاف) উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ لِنَجَاةِ اَنْفُسِكُمْ নিজেদের কল্যাণ, নিজেদের নাজাত ও মাগফিরাতের জন্য। −[তাফসীরে বাহরে মুহীত]

قَوْلُهُ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ : আল্লাহ তা'আলার কাছে তা পেয়ে যাবে। অর্থাৎ ছওয়াব ও প্রতিদান পেয়ে যাবে। হুবহু সে আমলগুলো বিদ্যমান দেখা যাওয়া উদ্দেশ্য নয়।

দরখাস্তকৃত এবং দরখাস্ত ছাড়া উভয় মুজিযাসমূহের পার্থক্যের বিবরণ : মক্কার কাফের ও আরবের মুশরিকদের মধ্যে মুষ্টিমেয় এমন উৎসুক যুবকও ছিল, যাদের কাজ ছিল শুধু হাঙ্গামা ও বিরোধকে দমন করা। তারা বিভিন্ন রকমের দরখাস্তকৃত মুজিযাসমূহ তলব করত। যেগুলোর ব্যাখ্যা সূরা আনআমে আসবে।

প্রত্যেক কাজের রহস্য ও কল্যাণ যেহেতু আল্লাহ তা'আলা জানেন। অন্য কারোও কর্ম নির্ধারণের অধিকার নেই। তাই এ ধরনের দরখাস্তসমূহ সর্বদাই প্রত্যাখ্যান করা হতো। আর যেহেতু আবদেনকারীদের উদ্দেশ্য অধিকাংশই ভুল ছিল এবং তাদের রীতি-নীতি বৈরিতা ছিল। এ কারণে আল্লাহর বিধান ও নিয়ম এটাই ছিল যে, এধরনের আবদারসমূহকে প্রত্যাখ্যান করে দেওয়া হতো।

আর যদি দরখাস্ত পূর্ণ করা হতো। তবে এ শর্তের সাথে যে, তারপরও ঈমান গ্রহণ না করলে তা হলে প্রমাণ পূর্ণ হওয়ার পর আল্লাহর আজাব আসা নিশ্চিত হয়ে যায়।

এ স্থানে ব্যাপারটি যেহেতু আখেরী উম্মতের, তাদেরকে হালাক ও ধ্বংস করা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা নেই। আর এ দিকে বিরোধীদের ভাগ্যে ঈমান গ্রহণের তৌফিকও নেই। তাই তাদের দরখাস্তসমূহ পূর্ণ করা কল্যাণজনক হিসেবে গণ্য করা যায়নি। −[কামালাইন খ. ১, পৃ. ১১৮]

যুদ্ধ ক্ষমা ও উপেক্ষা করা দেওয়া : যেহেতু মুসলমানদের সে সময়ের অবস্থার চাহিদা এটাই ছিল যে, পরিপূর্ণ ধৈর্য ধারণ এবং কঠোরতা ব্যতীত সময়কে অতিবাহিত করা, বিরোধীদের অপকর্মের শাস্তি উপযুক্ত সময়ে অর্থাৎ হত্যা ও ট্যাক্স -এর বিধানের মাধ্যমে করা হবে। তাই আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে সহানুভূতি এবং দেখেও না দেখার ভান করার পরামর্শ দিয়েছেন। আর জাতির প্রকৃত ও ভিতরগত ক্ষমতা ও শক্তি সঞ্চয়ের জন্য এর চেয়ে উত্তম পদ্ধতি অন্য কিছু সম্ভব নয়। কেননা প্রতিকূল পরিবেশ ও বিস্বাদ অবস্থা সহ্য করার অভ্যাস সৃষ্টি দ্বারা চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং বড়র চেয়ে বড় কঠিন ও সংকটময় অবস্থাসমূহ হাসিমুখে সহ্য করার ট্রেনিং হয়ে যায়। প্রকৃত যুদ্ধ ও মারামারির অবস্থাতেও এ ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। যেগুলোর মধ্যে ক্ষমা ও ছাড় দেওয়ার প্রয়োজন হয়। অতএব আয়াতকে সাময়িক অবস্থাদির উপর ভিত্তি করে مَنْسُوْخٌ [রহিত] মেনে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা عَفْو এবং صَفْح দ্বারা উদ্দেশ্য শুধু যুদ্ধ না করা নয়; বরং ব্যাপক অর্থ। যা যুদ্ধ করা ও যুদ্ধ না করা উভয় অবস্থাই গণ্য। আর যেহেতু শত্রুদের বিরোধী কার্যকলাপ দেখে উত্তেজনা আসতে পারে, তাই শুধু বসে থাকাও ন্যায়সঙ্গত নয়। এ যুক্তিসিদ্ধতা দ্বারা আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক শক্তির প্রস্রবণ -এর দিকে লক্ষ্যকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য নামাজ, রোজা, জাকাত ইত্যাদি ইবাদতের বিধানাবলির প্রোগ্রামসমূহ বলে দিয়েছেন যে, বর্তমানে নিজেকে শারীরিক ও আর্থিক কষ্টসমূহ সহ্যের অভ্যস্ত বানাও। যাতে করে যুদ্ধের বিধানাবলি মেনে নেওয়ার জন্য নিজকে তৈরি করতে পার। নতুবা প্রস্তুতি ছাড়া যুদ্ধের নির্দেশাবলি নিষ্ফল হয়ে থাকবে। −[কামালাইন খ. ১, পৃ. ১১৯]

অনুবাদ :

١١١. وَقَالُوا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا جَمْعُ هَائِدٍ اَوْ نَصٰرٰى قَالَ ذٰلِكَ يَهُوْدُ الْمَدِيْنَةِ وَنَصَارٰى نَجْرَانَ لَمَّا تَنَاظَرُوْا بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ اَىْ قَالَ الْيَهُوْدُ لَنْ يَدْخُلَهَا اِلَّا الْيَهُوْدُ وَقَالَ النَّصَارٰى لَنْ يَدْخُلَهَا اِلَّا النَّصَارٰى تِلْكَ الْمَقُوْلَةُ اَمَانِيُّهُمْ شَهَوَاتُهُمُ الْبَاطِلَةُ قُلْ لَهُمْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ حُجَّتَكُمْ عَلٰى ذٰلِكَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ - فِيْهِ -

১১১. এবং তারা বলে ইহুদি বা খ্রিস্টান ব্যতীত অন্য কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে একবার মদীনার ইহুদি ও নাজরানের খ্রিস্টানরা বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়েছিল। তখন তারা এ কথা বলেছিল। ইহুদিরা বলেছিল যে, ইহুদি ব্যতীত আর কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর খ্রিস্টানরা বলেছিল যে, খ্রিস্টান ছাড়া জান্নাতে আর কেউ প্রবেশ করবে না। এটা এই বক্তব্য তাদের আশা মাত্র মিথ্যা কামনা মাত্র। তাদেরকে বল এতে যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে এই কথার উপর তোমাদের প্রমাণ পেশ কর هُوْدٌ শব্দটি هَائِدٌ -এর বহুবচন।

١١٢. بَلٰى يَدْخُلُ الْجَنَّةَ غَيْرُهُمْ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ اَىْ اِنْقَادَ لِاَمْرِهٖ وَخُصَّ الْوَجْهُ لِاَنَّهٗ اَشْرَفُ الْاَعْضَاءِ فَغَيْرُهٗ اَوْلٰى وَهُوَ مُحْسِنٌ مُوَحِّدٌ فَلَهٗ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ اَىْ ثَوَابُ عَمَلِهِ الْجَنَّةُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ - فِى الْاٰخِرَةِ -

১১২. হ্যাঁ নিশ্চয় অন্যান্যরাও জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে কেউ আল্লাহ তা'আলার নিকট স্বীয় চেহারা সমর্পণ করে। অর্থাৎ তাঁর নির্দেশের সামনে আত্মসমর্পণ করে। এই আয়াতে চেহারার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো মানব শরীরের সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ এটাই। সুতরাং এটা যদি অনুগত হয় তবে অন্য অঙ্গসমূহের তো কথাই নেই। আর সে হয় সৎকর্ম পরায়ণ অর্থাৎ তাওহীদপন্থি স্বীয় প্রতিপালকের নিকট রয়েছে তার ফল তাঁর কর্মের পুণ্যফল জান্নাত এবং তাদের কোনো ভয় নেই ও তারা দুঃখিত হবে না পরকালে।

তাহকীক ও তারকীব

هُوْدًا : এটা هَائِدٌ এর বহুবচন। যেমন عَائِذٌ -এর বহুবচন عُوْذٌ - هَادَ - يَهُوْدُ তখনি বলা হয় যখন اِذَا دَخَلَ فِى الْيَهُوْدِيَّةِ যখন ইহুদি ধর্মে দীক্ষিত হয়। هَائِدٌ: এটা تَائِبٌ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন اِنَّا هُدْنَا اِلَيْكَ অর্থাৎ اِنَّا تُبْنَا اِلَيْكَ প্রকৃত পক্ষে গো-বৎস পূজা থেকে তওবাকারী হয়েছিল তাদের ক্ষেত্রে এ শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে নামকরণের মধ্যে প্রশস্ততা হয়ে গেছে এবং একটি দলের আস্থা ছিল যে, প্রতিটি বাক্যকে এর প্রবক্তা দলের সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া হবে। তাই উভয় বাক্যকে এজমালীভাবে মিশ্রিত করে দেওয়া হয়েছে।

نَجْرَانُ : ইয়েমেনের একটি শহরের নাম। যেখান থেকে খ্রিস্টানদের এ প্রতিনিধি দলটি রাসূল ﷺ -এর দরবারে এসেছিল, ইবনে জারীর (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এটাই বর্ণনা করেছেন।

تِلْكَ : এর مُشَارٌ اِلَيْهِ মুফরাদ ও مَقُوْلَةٌ নির্ধারণ করা হয়েছে এর খবর اَمَانِيُّ কেননা প্রকৃত পক্ষে সেটা অনেকগুলো আশাসমূহের উপর গণ্য ছিল অথবা তাবীলের সাথে مَقُوْلَةٌ كُلِّ قَائِلٍ عَلٰيحِدَةٌ হতে পারে। আর তৃতীয় নির্দেশনা এটা যে, اِمْتِيَالُ تِلْكَ الْمَقُوْلَةِ اَمَانِيَّهُمْ অর্থাৎ হবে عِبَارَتْ মেনে مُقَدَّرْ কে- مُضَافْ দ্বারা هَاءْ হামযাকে اٰتُوْا মূলে ছিল هَاتُوْا । পরিবর্তন করেছে। এটাকে اَمْرِ تَعْجِيْزِيْ বলা হয়। অর্থে اَحْضِرُوْا / بُرْهَانٌ . بُرْهَةٌ অর্থে قَطْعَةٌ থেকে নির্গত। অর্থাৎ বিপক্ষের কথা বা প্রমাণ এর দ্বারা খণ্ডিত হয়ে যায়। কিংবা بَرْهَنَ থেকে নির্গত। অর্থ-বয়ান ও বর্ণনা। প্রথম অবস্থায় এ শব্দটি غَيْرُ مُنْصَرِفْ আর দ্বিতীয় অবস্থায় مُنْصَرِفْ হবে। بَلٰى যেহেতু নাবাচককে হ্যাঁ-বাচক করার জন্য আসে, এ কারণে মুফাস্সির (র.) يَدْخُلُ الْجَنَّةَ غَيْرُهُمْ ইবারত নির্ধারণ করেছেন। আর এজন্যই بَلٰى- এর উপর وَقْف করা حَسَنْ অর্থাৎ তারপর مَنْ اَسْلَمَ থেকে নতুন [পৃথক] বাক্য। وَجْه-কে- اَشْرَفُ الْاَعْضَاءِ [সমস্ত অঙ্গসমূহ থেকে উৎকৃষ্ট] এ জন্য বলা হয়েছে যে,এটা সেজদার স্থান। যা সমস্ত একাগ্রতার ভিত্তি ও অনুভূতিসমূহের এবং চিন্তা ও ভাবনার খনি। فَلَهٗ যেহেতু مَنْ মুবতাদা مُتَضَمِّنْ مَعْنٰى شَرْط তাই খবরের উপর فَاءْ জাযাইয়া আনা দুরস্ত রয়েছে। চাই مَنْ -কে- شَرْطِيَّة বলা হোক অথবা مَوْصُوْلَة বলা হোক। আর একটি পদ্ধতি এটাও হতে পারে যে, مَنْ اَسْلَمَ ফেয়েলে মাহযূফের فَاعِلْ হবে। অর্থাৎ بَلٰى يَدْخُلُهَا مَنْ اَسْلَمَ আসল عِبَارَتْ হবে। এখন فَلَهٗ اَجْرُهٗ কালামে মাতূফ হয়ে যাবে। فِى الْاٰخِرَةِ- এর কয়েদ মুসান্নিফ (র.) এজন্য লাগিয়েছেন যে, দুনিয়াতে তো اَشَدُّ بَلَاءِ الْاَنْبِيَاءِ ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَالْاَمْثَلُ দৃষ্টিতে মুমিনগণ ভয়, চিন্তা দুঃখ ও কষ্টের মধ্যে বেষ্টিত থাকেন। যদিও সেগুলোর প্রভাব প্রকৃতভাবে কলব পর্যন্ত পৌঁছে না।

اَمَانِيُّ : এটি اُمْنِيَّةٌ -এর বহুবচন। অর্থ আশা বাসনা। (م ـ ن ـ ى) [ধাতুমূল] থেকে নির্গত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ : ইহুদিদের এ আশা কখনো পূর্ণ হবার নয় এবং এ বক্তব্যের সমর্থনে কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক ও যুক্তিভিত্তিক প্রমাণও নেই, কোনো উদ্ধৃতিমূলক ও বাণীভিত্তিক প্রমাণও নেই। এখানে লক্ষণীয় শুধু বুযার্গযাদা [মহা মনীষীর সন্তান] হওয়া এবং বংশধারা ও জন্মসূত্রীয় আভিজাত্য যখন নবীগণের বংশধরদের ক্ষেত্রে কোনো সুফলদায়ক হতে পারল না, সে ক্ষেত্রে আমাদের সমকালীন পীরজাদা ও শায়খজাদাদের শুধু জন্মগত আভিজাত্যে তুষ্ট হয়ে থাকা যে কতখানি বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক, তা অবশ্যই ভেবে দেখার বিষয়।

بَلٰى : অর্থাৎ মুক্তির সঠিক বিধি এই যা এখন বর্ণিত হচ্ছে। بَلٰى শব্দটি পূর্ববর্তী বিষয়ের খণ্ডন ও প্রত্যাখ্যান বুঝায়। অর্থাৎ তোমাদের দাবি নিরেট ভ্রান্ত দাবি। প্রামাণ্য তা-ই যা এখনই বর্ণিত হচ্ছে।

وَجْهٗ : অর্থাৎ তার আমল এবং বাস্তব জীবনেও সে তাওহীদ মতবাদের অনুসারী হবে। যেন ঈমান ও ভালো আমল [সৎকর্ম] উভয় একত্র হবে। وَجْهٗ -এর শাব্দিক অর্থ চেহারা অবয়ব। কিন্তু ব্যবহারিক ভাষায় প্রায়শ সত্তা বা মূল অস্তিত্ব উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এখানেও অনুরূপই উদ্দেশ্য। অনেক সময় গোটা সত্তাকে وَجْهٗ বলে ব্যক্ত করা হয়। তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে রয়েছে- وَجْهٗ শব্দ হয়তো রূপক অর্থে সত্তা বুঝাবার জন্য, কিংবা পরোক্ষ অর্থে ইচ্ছা বুঝাবার জন্য।

(وَقَالُوْا وَجه اِمَّا مُسْتَعَارٌ لِلذَّاتِ وَاِمَّا مَجَازٌ عَنِ الْقَصْدِ . رُوْحُ الْمَعَانِيْ)

قَوْلُهٗ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ : আল্লাহ তা'আলা এতে অবনমিত আত্মসমর্পিত অর্থাৎ শিরকের সংমিশ্রণ ব্যতীত পুরোপুরি তাওহীদের মতবাদ গ্রহণ করা। اَخْلَصَ نَفْسَهٗ لَا يُشْرِكُ بِهٖ غَيْرَهٗ অর্থাৎ নিজেকে একনিষ্ঠ করে তার সঙ্গে কাউকে শরিক করে না। -[কাশশাফ]। তাঁকে ছাড়া কাউকে উদ্দেশ্য [মাকসূদ] বানায় না। -[রূহুল মা'আনী]

অনুবাদ :

١١٣. وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ مُعْتَدٍّ بِهٖ وَكَفَرَتْ بِعِيْسٰى وَقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ مُعْتَدٍّ بِهٖ وَكَفَرَتْ بِمُوْسٰى وَهُمْ اَيِ الْفَرِيْقَانِ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ط الْمُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ وَفِيْ كِتَابِ الْيَهُوْدِ تَصْدِيْقُ عِيْسٰى وَفِيْ كِتَابِ النَّصَارٰي تَصْدِيْقُ مُوْسٰى وَالْجُمْلَةُ حَالٌ كَذٰلِكَ كَمَا قَالَ هٰؤُلَاءِ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ اَيِ الْمُشْرِكُوْنَ مِنَ الْعَرَبِ وَغَيْرِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ بَيَانٌ لِمَعْنٰى ذٰلِكَ اَيْ قَالُوْا لِكُلِّ ذِيْ دِيْنٍ لَيْسُوْا عَلٰى شَيْءٍ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ . مِنْ اَمْرِ الدِّيْنِ فَيُدْخِلُ الْمُحِقَّ الْجَنَّةَ وَالْمُبْطِلَ النَّارَ .

১১৩. ইহুদিরা বলে, খ্রিস্টানরা কোনো উল্লেখযোগ্য বিষয়ের উপর নেই আর তারা হযরত ঈসা (আ.)-এর অস্বীকার করে এবং খ্রিস্টানরা বলে, ইহুদিরা কোনো উল্লেখযোগ্য বিষয়ের উপর নেই আর তারা হযরত মূসা (আ.)-এর অস্বীকার করে অথচ তারা উভয় দলই তাদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব পাঠ করে ইহুদিদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবে হযরত ঈসা (আ.)-এর সত্যায়ন রয়েছে আর খ্রিস্টানদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবে হযরত মূসা (আ.)-এর সত্যায়ন বিদ্যমান। وَهُمْ এই বাক্যটি حَالٌ বা ভাব ও অবস্থাবাচক।

তারা যেরূপ তদ্রূপ যারা কিছুই জানে না তাও অর্থাৎ আরববাসী মুশরিক এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরাও অনুরূপ কথা বলে। مِثْلَ قَوْلِهِمْ এটা প্রথমোক্ত ذٰلِكَ -এর مَعْنٰى বা মর্মের بَيَانٌ বা ভাষ্যরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীই প্রতিপক্ষকে বলে যে, তাদের ধর্মে উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই। সুতরাং ধর্ম সম্পর্কে যে বিষয়ে তাদের মতভেদ আছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার মীমাংসা করবেন। অনন্তর সত্যপন্থিদের জান্নাতেও বাতিলপন্থিদের জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।

তাহকীক ও তারকীব

وَهُمْ অথচ তারা। ওয়াও হরফটি حَالِيَةٌ [অবস্থা প্রকাশক] عَاطِفَةٌ [সংযোজক] নয়।

قَوْلُهُ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ : كَذٰلِكَ اَيْ مِثْلَ ذٰلِكَ الَّذِيْ سَمِعْتَ بِهٖ : এখানে كَافٌ টি نَصَبٌ -এর স্থলে পতিত হয়েছে। অথবা مَصْدَرٌ مَحْذُوْفٌ -এর সিফত হিসেবে اَفَادَهٗ حَصْرٌ -এর জন্য মুকাদ্দাম করা হয়েছে– اَيْ قَوْلًا ذٰلِكَ الْقَوْلِ بِعَيْنِهٖ لَا قَوْلًا مُغَايِرًا لَهٗ

বিশেষ জ্ঞাতব্য : এস্থলে প্রশ্ন জাগে যে, كَذٰلِكَ বলার পর مِثْلَ قَوْلِهِمْ বলার কি প্রয়োজন ছিল? কোনো কোনো তাফসীরকার এর জবাব দিয়েছেন যে, مِثْلَ قَوْلِهِمْ হলো كَذٰلِكَ -এর ব্যাখ্যা ও শক্তিবর্ধক। যেমন আল্লামা সুয়ূতী (র.) مِثْلَ كَذٰلِكَ قَالَ -এর পরে قَوْلِهِمْ بَيَانٌ لِمَعْنٰى ذٰلِكَ উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন– مِثْلَ قَوْلِهِمْ হলো كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ -এর বদল।

কেউ বলেন, এ স্থলে পৃথক দু'টি উপমা আছে। তাই দু'টি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। একটি উপমা দ্বারা তো এই কথা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, তাদের উক্তি ইহুদি-খ্রিস্টানদেরই অনুরূপ। অর্থাৎ তারা যেমন অন্যদের পথভ্রষ্ট বলে, এরাও তেমনি

নিজেদের ছাড়া অন্যদের পথভ্রষ্ট বলে। দ্বিতীয় উপমার উদ্দেশ্য এই যে, আহলে কিতাব যেমন এ দাবি কোনো রকম দলিল ছাড়া কেবল নিজেদের কু-প্রবৃত্তি ও বিদ্বেষবশত করে, তদ্রূপ পৌত্তলিকেরা ও বিনা দলিলে কেবল নিজেদের খেয়াল খুশিমতো এরূপ দাবি করে।

وَغَيْرُهُمْ : غَيْرُهُمْ -এর শেষে رَفْع হবে এবং اَلْمُشْرِكُوْنَ -এর সাথে তার عَطْف হবে اَلْعَرَبَ -এর সাথে নয়। অর্থাৎ মুশরিকরা ছাড়াও অন্যান্য কাফেরদেরকেও একই বক্তব্য ছিল।

قَوْلُهُ بَيَانٌ لِمَعْنَى ذٰلِكَ : অর্থাৎ مِثْلَ قَوْلِهِمْ টা হলো كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ -এর বদল। অর্থাৎ পূর্বের বাক্যে বর্ণিত বিষয়টিই এ বাক্যে আরও সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ لَيْسُوْا : لَيْسُوْا -এর বহুবচনের যমীর অর্থগতভাবে كُلٌّ -এর দিকে ফিরেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتْ ..... وَهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ : এখানে কিতাব বলতে বনী ইসরাঈলের নবীগণের সহীফাসমূহের সমষ্টি-সংকলন উদ্দেশ্য, যা এখন বাইবেল পুরাতন নিয়ম [ওল্ড টেস্টমেন্ট] নামে পরিচিত। ইহুদি ও খ্রিস্টান উভয় সম্প্রদায়ই এ সহীফাগুলো ইলহামী ও পবিত্র হওয়ার দাবিদার।

বর্তমান মুসলমানদের কাঁদা ছোড়াছুড়ি অবস্থা : আক্ষেপের বিষয় এই যে, এ ভ্রান্ত সম্প্রদায়গুলোর দেখাদেখি মুসলমানরাও তাদের অভিন্ন গ্রন্থ আল কুরআন নিয়ে দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে একে অন্যকে অবজ্ঞাও হেয় প্রতিপন্ন করা, এমনকি ফাসিক ও ভ্রান্ত বলতে শুরু করেছে এবং কাফের বলার পরিস্থিতিও এসেই যেতে চাচ্ছে।

قَوْلُهُ لَا يَعْلَمُوْنَ : অর্থাৎ জানে না ওহী ও নবুয়ত সংক্রান্ত কিছু। তারাও বলতে শুরু করেছে, কিতাবীদের কেউই সত্যে প্রতিষ্ঠিত নয়। এ আয়াতে ইলম (عِلْم) দ্বারা উদ্দেশ্য আসমানি কিতাবের ইলম। উল্লিখিত উক্তি কাদের ছিল? সাধারণত আরব মুশকিরদেরই এর বক্তব্য ছিল ধরে নেওয়া হয়েছে। তবে কোনো আসমানী কিতাবের উপর ভিত্তিকৃত নয়, এমন যে কোনো ধর্মের অনুসারী ও যে কোনো জাহিলী ধর্মের অনুসারীদের এর ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত বলা যায়।

ইলম ও জ্ঞানের পার্থক্য : পবিত্র কুরআন ইলম [ক্রিয়ামূল عِلْم] ও তার বিভিন্ন ক্রিয়ারূপ ও বিশেষ্য রূপ যথা يَعْلَمُوْنَ ইত্যাদি যেখানে যেখানে ব্যবহার করেছে তা দিয়ে প্রায়শ প্রকৃত জ্ঞান ওহী ও নবুয়তের জ্ঞানই উদ্দেশ্য করেছে। এ ধরনের আয়াত দিয়ে বর্তমানের প্রথাগত বিদ্যা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থাকে তালীম রূপে প্রমাণিত করা পবিত্র কুরআনের প্রতি এবং সুবুদ্ধির প্রতি কত বড় অনাচার।

فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ : মীমাংসার দ্বারা এখানে কার্যত বাস্তব মীমাংসা উদ্দেশ্য। আর বিতর্ক, আলোচনা ও যুক্তি প্রমাণভিত্তিক মীমাংসা অর্থাৎ হক ও বাতিল এবং ঈমান ও কুফরের মাঝে অকাট্য মীমাংসা তো এ পৃথিবীর বুকেই হয়ে রয়েছে।

قَوْلُهُ بَيْنَهُمْ : তাদের মাঝে একদল হকপন্থি ও ঈমানদার এবং অপরদল বাতিলপন্থি ও কাফের উদ্দেশ্য। হকপন্থি ও বাতিলপন্থিদের মাঝে আল্লাহ ফয়সালা করে দেবেন।

অযথা দলভুক্ত হওয়ার মন্দতার বিশ্লেষণ : আল্লাহ তা'আলা এমন ধর্মীয় গোঁড়ামি ও দলভুক্তি থেকে হেফাজত করুন। যাতে করে كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ -এর শিকার না হয় এবং নিজকে ছাড়া অপরের ভালো কাজগুলোকে অস্বীকার না করে। স্বজনপ্রীতির পট্টি যখন চোখে বাধে, তখন মানুষ অন্ধ হয়ে যায়। নিজের মন্দসমূহ ভালো হয়ে এবং অপরের ভাল কাজগুলো মন্দরূপ ধরে সামনে আসে। এ বিনাশ ও দলভুক্তির চাহিদা তো এটাই যে إِذَا تَعَارَضَا تَسَاقَطَا অর্থাৎ স্বয়ং উক্ত উক্তির দ্বারাই উভয় ধর্মকে বাতিল করা হয়ে গেছে। আর রহিত হওয়ার কারণে মুসলমানদের হিসেবে এক পর্যায়ে যদিও এ কথা সঠিক যে, উক্ত দুটি ধর্ম বর্তমানে কার্যকর নয়; কিন্তু স্বয়ং তাদের উদ্দেশ্যে এ বলার দ্বারা এটা নয় যে, তাদের ধর্ম ভিত্তিহীন ছিল বা তাওরাত ও ইঞ্জীল কিতাব-এর তালীম হিসেবে বিশুদ্ধ ছিল না; কিন্তু এ ইলমি ফয়সালা যখন আহলে ইলম হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য যথেষ্ট নয়। তবে কিয়ামতের দিন বাস্তব কার্যকর ফয়সালা করে দুধ এবং পানি পৃথক করে দেওয়া হবে এবং সত্য ও মিথ্যার লড়াই সমাপ্তি করে দেওয়া হবে। -[কামালাইন খ. ১, পৃ. ১২২]

মাশায়েখে কেরামের জন্য চিন্তার সূক্ষ্মতা : যে সকল আলেম ও মাশায়েখ নিজ নিজ তরীকার উপর এত মগ্ন ও আস্থাশীল যে, অন্যের হক ও সত্যকে দোষারোপ এবং তুচ্ছ করতেও লজ্জা করেন না। তাদের উচিত উক্ত আয়নায় নিজ চিত্রকে দেখে নেওয়া।

١١٤. وَمَنْ اَظْلَمُ اَيْ لَا اَحَدَ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهُ بِالصَّلٰوةِ وَالتَّسْبِيْحِ وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهَا ط بِالْهَدْمِ اَوِ التَّعْطِيْلِ نَزَلَتْ اِخْبَارًا عَنِ الرُّوْمِ الَّذِيْنَ خَرَّبُوْا بَيْتَ الْمَقْدِسِ اَوْ فِي الْمُشْرِكِيْنَ لَمَّا صَدُّوا النَّبِيَّ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ عَنِ الْبَيْتِ اُولٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَدْخُلُوْهَا اِلَّا خَائِفِيْنَ . خَبَرٌ بِمَعْنَى الْاَمْرِ اَيْ اَخِيْفُوْهُمْ بِالْجِهَادِ فَلَا يَدْخُلُهَا اَحَدٌ اٰمِنًا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ هَوَانٌ بِالْقَتْلِ وَالسَّبْيِ وَالْجِزْيَةِ وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ . هُوَ النَّارُ .

অনুবাদ :

১১৪. যে কেউ আল্লাহর মসজিদে সালাত, তাসবীহের মাধ্যমে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাধা প্রদান করে ও সেটাকে ধ্বংস করে বা রুদ্ধ করে তা ধ্বংস সাধনে প্রয়াসী হয় তদপেক্ষা বড় জালিম আর কে হতে পারে? না তার চেয়ে অধিক সীমা লঙ্ঘনকারী আর কেউ নেই। রোমকরা বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। তাদের সম্পর্কে অথবা মুশরিকরা যখন হুদায়বিয়ার সন্ধির বৎসরে রাসূলে কারীম ﷺ ও তার সঙ্গীগণকে বায়তুল্লাহ জেয়ারত হতে বাধা প্রদান করেছিল তখন তাদের সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। অথচ ভয়-বিহ্বল না হয়ে তাদের জন্য মসজিদে প্রবেশ করা সঙ্গত ছিল না। اُولٰئِكَ مَا كَانَ এই বাক্যটি যদিও خَبَرِيَّةٌ বা বার্তামূলক তবে এইস্থানে তা اَمْر বা অনুজ্ঞা অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ তোমরা জিহাদের মাধ্যমে তাদেরকে ভয় প্রদর্শন কর। তাদের কেউ যেন নির্বিঘ্নে নিরাপদে এই স্থানে প্রবেশ করতে না পারে। পৃথিবীতে রয়েছে তাদের জন্য লাঞ্ছনা ভোগ হত্যা, গ্রেফতারি, জিযিয়া আরোপের অবমাননা, আর পরকালে রয়েছে তাদের জন্য মহা শাস্তি অর্থাৎ জাহান্নাম।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَمَنْ اَظْلَمُ : مَنْ হলো মুবতাদা। مَحَلًّا مَرْفُوْعٌ আর اَظْلَمُ [ইসমে তাফযীল] হলো তার খবর। আর اِسْتِفْهَامْ টি হলো اِسْتِفْهَامْ اِنْكَارِيْ অর্থাৎ لَا اَحَدَ اَظْلَمَ مِنْهُ

قَوْلُهُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ : مَسَاجِدْ হলো مَنَعَ -এর مَفْعُوْل اَوَّلْ এবং اَنْ يَذْكُرَ হলো مَفْعُوْل ثَانِيْ - (بِتَاوِيْل مَصْدَرْ) উচিত ছিল। কেননা যে ফে'লের مُضَارِعْ -এর আইন কালিমায় رَفْع হয় তার ظَرْف مَكَانٌ হয় مَفْعَلْ -এর ওজনে। এখানে مَسْجِدْ -এর جِيْمْ -এ কাসরা হয়েছে خِلَافْ قِيَاسْ হিসেবে।

قَوْلُهُ مَسَاجِدَ : **প্রশ্ন :** مَسَاجِدْ কে বহুবচন কেন ব্যবহার করা হলো? অথচ এ আয়াতে مَسَاجِدْ দ্বারা হয়তো বায়তুল মুকাদ্দাসকে বুঝানো হয়েছে। কেননা রোমের অগ্নিপূজক রাজা বুখতে নছর একে ধ্বংস করে দিয়েছিল। অথবা مَسَاجِدْ দ্বারা মসজিদে হারামকে বুঝানো হয়েছে। কেননা মক্কার মুশরিকরা রাসূল ﷺ -কে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় ওমরা করতে নিষেধ করেছিল।

উত্তর : আলোচিত দুটি মসজিদই যেহেতু অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও বেশি বরকতপূর্ণ তাই এ মসজিদে ইবাদত করতে বাধা প্রদান বা তা ধ্বংস ও বিরান করে দেওয়া যেন সকল মসজিদকে ধ্বংস করার নামান্তর। এ জন্য مَسْجِدْ -এর স্থলে مَسَاجِدٌ ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ اَنْ يَذْكُرَ فِيْهَا اسْمُهُ : এখানে اِعْرَابْ -এর দিক দিয়ে চারটি সূরত হতে পারে। যথা–

১. مَنَعَ -এর مَفْعُوْل ثَانِيْ যেমন বলা হয় مَنَعْتُهُ كَذَا

২. مَنَعَ -এর مَفْعُوْلٌ لَهُ অর্থাৎ مَنَعَ كَرَاهَةً اَنْ يَذْكُرَ اَوْ مَنَعَ دُخُوْلَ مَسَاجِدِ اللّٰهِ

৩. مَسَاجِدَ اللّٰهِ থেকে بَدْلُ الْاِشْتِمَالْ অর্থাৎ مَنَعَ ذِكْرَ اسْمِهِ فِيْهَا

৪. حَرْفُ الْجَرِّ হযফ করার কারণে مَنْصُوْبٌ অর্থাৎ مَنَعَ مَسَاجِدَ مِنْ اَنْ يَذْكُرَ

اَوْ : এখানে اَوْ হরফটি تَنْوِيْعٌ বা প্রকরণ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, সন্দেহের জন্য নয়।

خَرَابِهَا : কেউ বলেছেন خَرَابٌ শব্দটি تَخْرِيْبٌ -এর অর্থে اِسْمُ مَصْدَرٍ যা তার مَفْعُوْلٌ -এর দিকে مُضَافٌ হয়েছে। যেমন سَلَامٌ শব্দটি تَسْلِيْمٌ -এর ওজনে। আর কেউ বলেন, এটি خَرِبَ -এর মাসদার, যা خَرِبَ بِالْمَكَانِ থেকে নির্গত হয়েছে। অর্থাৎ সেটির রক্ষণাবেক্ষণ বাদ দিয়েছে। যাতে তা নিজে নিজেই বিরান এবং বরবাদ হয়ে যায়।

قَوْلُهُ خَبَرٌ بِمَعْنَى الْاَمْرِ : অর্থাৎ এ জুমলাটি শব্দগতভাবে خَبَرِيَّةٌ এবং অর্থগত ভাবে اِنْشَائِيَّةٌ হবে। মূলত একটি প্রশ্নের জবাব প্রদানের জন্যই এ অংশটুকু বৃদ্ধি করা হয়েছে।

প্রশ্ন : لَا يَدْخُلُوْهَا اِلَّا خَائِفِيْنَ -এর মাঝে সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, বিধ্বংস ও বিরানকারী বায়তুল মুকাদ্দাসে ভীতশন্ত্রস্ত অবস্থায় প্রবেশ করেছে। অথচ সে অত্যন্ত নির্ভয়ে সেখানে প্রবেশ করছিল এবং এক বছরের অধিক সময় তা দখল করেছিল।

উত্তর : এখানে خَبَرٌ টি اَمْرٌ -এর অর্থে। অর্থাৎ তাদেরকে বায়তুল মুকাদ্দাসে আল্লাহ তা'আলার ভয় নিয়ে প্রবেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। –[হাশিয়ায়ে জামাল]

কিন্তু এ জবাবটি সুন্দর নয়। কেননা এখানে كَانَ -এর স্থলে تَعْبِيْرٌ করা হয়েছে। আল্লামা বায়জাবী (র.) বলেন, এ আয়াতের উদ্দেশ্য হলো মসজিদে প্রবেশ করার অনুমতি প্রদান থেকে বারণ করা।

(مَعْنَاهُ النَّهْىُ عَنْ تَمْكِيْنِهِمْ مِنَ الدُّخُوْلِ فِى الْمَسْجِدِ ـ جُمَلْ)

বি. দ্র. সুলতান সালাহুদ্দীন এর যুগে মুসলমানরা বায়তুল মুকাদ্দাসে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে প্রবেশ করেছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ اَظْلَمُ :

প্রশ্ন : এখানে একটি প্রশ্ন জাগে, তাহলো, কুরআনে কারীমের মাঝে فَمَنْ اَظْلَمُ বাক্যটি বারংবার এসেছে। যেমন–

১. وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى ـ ٢. وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ـ ٣. فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ عَلَى اللّٰهِ ـ ٤. وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ ـ

উক্ত বাক্যসমূহের মধ্যে প্রতিটির দাবিই হলো حَصْرٌ তথা সীমাবদ্ধতা। অর্থাৎ তাতে উল্লিখিত কর্ম সম্পাদনকারী থেকে বড় জালেম কেউ নেই। এ অবস্থায় দ্বিতীয় কেউ তার চেয়ে বড় জালেম কিভাবে হবে? অর্থাৎ اَظْلَمِيَّتْ বা অধিক বড় জালেম হওয়ার সঙ্গে যখন কোনো একটি দলকে বিশেষিত করা হয়েছে, তখন দ্বিতীয় কোনো দলকে اَظْلَمِيَّتْ -এর বিশেষণে বিশেষিত করা কিভাবে সঠিক হবে?

উত্তর :

১. প্রত্যেকে তার صِلَةٌ -এর অর্থের দিক দিয়ে খাস। যেমন– كَاَنَّهٗ قَالَ لَا اَحَدَ مِنَ الْمَانِعِيْنَ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ

وَلَا اَحَدَ مِنَ الْمُفْتَرِيْنَ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ ـ

وَلَا اَحَدَ مِنَ الْكَذَّابِيْنَ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ عَلَى اللّٰهِ وَعَلٰى هٰذَا الْقِيَاسِ ـ (جُمَلْ)

মোটকথা اَظْلَمِيَّتْ -এর বহুদিক ও ক্ষেত্র রয়েছে। সংশ্লিষ্ট দিক ও ক্ষেত্রে অমুকে বড় জালেম হবে। এতে কোনো প্রশ্নই থাকে না

২. মুফাসসিরগণ উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর এভাবেও দিয়েছেন যে, পূর্ণ কুরআন মাজীদে যেসবস্থানে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন وَمَنْ اَظْلَمُ শব্দ উল্লেখ করেছেন সবগুলো কর্মই বড় ধরনের অন্যায় এবং এসব অন্যায় কর্ম যে করবে তার থেকে বড় জালেম আর হতে পারে না, অতএব মসজিদে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে বাধা প্রদান করাও একটি বড় অন্যায় কাজ। তাই আল্লাহ وَمَنْ اَظْلَمُ শব্দ প্রয়োগ করে বলেছেন যে, তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে? সুতরাং উক্ত প্রশ্ন করা অবান্তর বৈ আর কিছুই হতে পারে না।

শানে নুযূল : বিধর্মীরা ব্যতীত কেউ আল্লাহ তা'আলার কিতাব, তার গ্রন্থ ও মসজিদ ধ্বংস করতে পারে না। খ্রিস্টান সম্প্রদায় সম্পর্কে এ আয়াত অবতীর্ণ। তারা ইহুদিদের সাথে যুদ্ধ করে তাওরাত পুড়ে ফেলে এবং বায়তুল মুকাদ্দাস ধ্বংস করে দেয়। অথবা এটা মক্কার মুশরিকদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তারা নিছক বিদ্বেষ ও হঠকারিতার বশবর্তীতে হুদায়বিয়ার ঘটনায় মুসলিমগণকে বায়তুল্লাহ শরীফে যেতে বাধা দেয়। এ ছাড়া যে কেউ কোনো মসজিদ বিরান বা ধ্বংস করে সে এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে।

প্রশ্ন : مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ -এর মাঝে مَنَعَ -এর নিসবত مَسَاجِدُ -এর প্রতি কেন করা হলো অথচ প্রকৃত পক্ষে مَمْنُوْعٌ বা বারণকৃত হলো মানুষেরা। মানুষকে বন্দেগী করতে বাধা দেওয়া হয়, মসজিদকে নয়।

উত্তর : مَانِعِيْن বা বারণকারীদের কর্মকাণ্ড যেহেতু মসজিদকে ঘিরেই ছিল যেমন মসজিদে ময়লা আবর্জনা নিক্ষেপ বা ধ্বংস করা, তাই مَنَعَ -এর নিসবত করা হয়েছে مَسَاجِدُ -এর দিকে।

মাসআলা : ফকীহগণ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন জিকির করা ও প্রবেশে বাধাদান যদি কোনো ধর্মীয় প্রয়োজন ও শরিয়তসম্মত স্বার্থ রক্ষার জন্য হয়, তবে তা সম্পূর্ণ বৈধ। কেননা এরূপ ক্ষেত্রে এ ধরনের ব্যবস্থা মসজিদের বিনাশসাধান ও তা অনাবাদ করা নয়; বরং তা-ই প্রত্যক্ষ সংস্কার ও আবাদ রাখার পদ্ধতিভুক্ত।

ফকীহগণ ও আয়াত প্রসঙ্গে নিম্নের মাসআলাগুলোও উল্লেখ করেছেন–

১. মসজিদের জন্য গণ-অনুমতি অর্থাৎ সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার (اِذْنِ عَامٌ) থাকা।

২. মসজিদের দরজা ও প্রবেশপথ, কোনো ব্যক্তি মালিকানার ভূমিতে না হওয়া। ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা, সত্য ধর্ম প্রচারে বিঘ্ন দাঁড় করানো ও সমস্যা উস্কে দেওয়া– এ সবই এ বিধির অন্তর্ভুক্ত।

মসজিদসমূহ বিনাশের ব্যাখ্যা : মুসান্নেফ (র.) আয়াতের শানে নুযূল দ্বারা তো মসজিদে হারাম ও মসজিদে বায়তুল মাকদিস বিনাশের সূত্র বের হয়ে আসে। কিন্তু কিবলা পরিবর্তনের ব্যাপারে ইহুদিদের ঔদ্ধত্য সন্দেহসমূহকে মিশ্রিত করে নিলে এবং সে সন্দেহগুলো স্বাভাবিকভাবে যদি মানুষের অন্তরে স্থান পেয়ে যায় তবে তাওহীদ ও রিসালাতের সাথে নামাজ রোজাকেও মানুষ বিদায় দিয়ে দিত। যা দ্বারা মসজিদে নববী ও সকল মসজিদসমূহ বিনাশ হয়ে যেত। মোটকথা সে বিভিন্ন প্রকার কুচক্রের ফলাফল দ্বারা সাধারণ ও বিশেষ মসজিদসমূহ বিনাশ ও ধ্বংস হয়ে যেত।

মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ : অথচ মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ খোদাভীরু লোকদের কাজ। অতএব কোথায় এ ইহুদিদের আহলে হক হওয়ার জোড়ালো দাবি ও ডোল পিটানো। আর কোথায় তাদের এ অপকর্মসমূহ? লজ্জা লাগে না?

মোটকথা ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুশরিক সকলেরই নির্লজ্জ আচরণ সামনে এসেছে এ কারণেই দুনিয়াতে তাদের লাঞ্ছনা হয়েছে যে, সকলেই ইসলামের নির্দেশে ট্যাক্সদাতা ও মুসলমানদের প্রজা হয়েছে। আর পরকালের ভরপুর সমাবেশে কুফর ছাড়া মসজিদসমূহ বিনাশের ব্যাপারে যা কিছু লাঞ্ছনা হবে, তা তো অতিরিক্ত।

মসজিদসমূহে তালা লাগানো : মসজিদকে বিনাশ ও ধ্বংস করা এবং নামাজ পড়া ও অন্যান্য ইবাদত থেকে মানুষকে বাধা দেওয়া যদিও উক্ত আয়াতের দৃষ্টিতে নিষেধ ও নাজায়েজ প্রমাণিত হয়; কিন্তু মসজিদের সামানাদির হেফাজতের জন্য তালা লাগানো একটি পৃথক ব্যাপার। হ্যাঁ, মসজিদের বিনাশ ও রক্ষণাবেক্ষণের বিস্তারিত বিধানাবলি মাসায়েলের কিতাবাদিতে উল্লেখ রয়েছে।

مَاكَانَ لَهُمْ اَنْ يَدْخُلُوْهَا বাক্যটির কারণে **ইমামগণের** মধ্যে মতভেদ রয়েছে যে, কাফেরের জন্য মসজিদে প্রবেশের **অনুমতি** আছে। নাকি নেই?

তবে ইমাম মালেক (র.)-এর অভিমত **হচ্ছে কোনো মসজিদেই প্রয়োজন** ব্যতীত কাফের এর জন্য প্রবেশের অনুমতি নেই। **ইমাম শাফেয়ী (র.)**-এর মতে মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী এবং বায়তুল মাকদিসে সর্বাবস্থায় কাফের এর জন্য **প্রবেশ করা নাজায়েজ ও নিষেধ** এবং উক্ত তিন মসজিদ ব্যতীত অন্যান্য মসজিদে মুসলমানদের অনুমতি সাপেক্ষে **প্রবেশ** করতে পারবে। **ইমাম আবূ হানীফা (র.)**-এর মতে মসজিদসমূহের আদব ও সম্মান রক্ষা করে সকল মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে। উক্ত আয়াত **ইমাম আবূ হানীফা (র.)**-এর পক্ষে দলিল।

ইমাম যাহেদ (র.) اَنْ يُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ দ্বারা আল্লাহর নাম ও তাঁর সত্তা এক হওয়ার ব্যাপারে মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের বিপক্ষে দলিল পেশ করেছেন। **মুতাযিলারা** আল্লাহর জান ও তার (اِسْم) নাম এর মধ্যে পৃথকতার দাবি করে।

قَوْلُهٗ بِالْهَدْمِ اَوِ التَّعْطِيْلِ : هَدْم দ্বারা বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা অগ্নিপূজক রাজা বুখতে নছর সেটি ধ্বংস করে দিয়েছিল। আর **تَعْطِيْل দ্বারা** মসজিদুল হারামের **প্রতি ইঙ্গিত** করা হয়েছে। কেননা মক্কার মুশরিকরা রাসূল ﷺ -কে বাধা দিয়ে যেন মসজিদে হারামকে **مُعَطَّل** [বিরান] করে দিয়েছিল।

قَوْلُهٗ اَخِيْفُوْهُمْ بِالْجِهَادِ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মসজিদে হারাম এবং বায়তুল মুকাদ্দাসে কাফেরদের প্রবেশকে জিহাদের মাধ্যমে বারণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। –[হাশিয়ায়ে ছাবী]

অথবা আয়াতের ব্যাখ্যা এও হতে পারে যে, আয়াতটি **لَفْظًا وَ مَعْنًا** উভয়ভাবেই **جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ** হবে। মর্ম হবে আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ এবং হযরত ওমর (রা.)-এর যুগে সংঘটিতব্য অবস্থার সংবাদ দিয়েছেন। এ ব্যাখ্যাটিই অধিকতর কাছাকাছি মনে হয়। –[হাশিয়ায়ে ছাবী]

قَوْلُهٗ اُولٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ الخ : অর্থাৎ এ কাফিরদের জন্য তো এটাই সমীচীন ছিল যে, তারা ভীত অবনত অবস্থায় ও আদব সহকারে মহান আল্লাহ তা'আলার ঘর মসজিদে প্রবেশ করবে। এর বিপরীতে তারা মসজিদের যে অমর্যাদা করেছে, এটা তাদের জঘন্যতম অপরাধ। অথবা এর অর্থ, তারা সে দেশে সম্মান ও রাজত্বসহ বাস করার উপযুক্ত নয়। কাজেই পরবর্তীতে অবস্থা তাই হয়। সিরিয়া ও মক্কা শরীফের শাসন ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলা মুসলিমগণের হাতে অর্পণ করেন।

অনুবাদ :

١١٥. وَنَزَلَ لَمَّا طَعَنَ الْيَهُوْدُ فِيْ نَسْخِ الْقِبْلَةِ اَوْ فِيْ صَلٰوةِ النَّافِلَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِيْ سَفَرٍ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اَيِ الْاَرْضُ كُلُّهَا لِاَنَّهُمَا نَاحِيَتَاهَا فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ فِي الصَّلٰوةِ بِاَمْرِهِ فَثَمَّ هُنَاكَ وَجْهُ اللّٰهِ قِبْلَتُهُ الَّتِيْ رَضِيَهَا اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ يَسَعُ فَضْلُهُ كُلَّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ . بِتَدْبِيْرِ خَلْقِهِ .

১১৫. কিবলার নসখ [বায়তুল মুকাদ্দাস হতে বায়তুল্লাহর দিকে কিবলা পবির্তন করা সম্পর্কে বা সফরে যানবাহনে আরোহণ করে যেদিকে ইচ্ছা সেই দিকে মুখ ফিরিয়ে নফল পড়ার অনুমতি দান প্রসঙ্গে ইহুদিরা সমালোচনা করলে তার জবাবে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন, কেবল আল্লাহরই পূর্ব ও পশ্চিম অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবী। [পূর্ব ও পশ্চিমে এই দুই প্রান্ত সীমার উল্লেখ করে সমস্ত পৃথিবীকে বুঝানো হয়েছে] কেননা পূর্ব পশ্চিম পৃথিবীর দুই প্রান্ত সুতরাং তাঁর নির্দেশানুসারে সালাতে যে দিকেই তোমরা তোমাদের মুখ ফিরাও না কেন সে দিকই সেখানেই আল্লাহর দিক অর্থাৎ সন্তুষ্টির কিবলা বর্তমান। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সর্বব্যাপী সকল কিছুর উপর তাঁর অনুগ্রহ বিস্তৃত এবং তিনি তাঁর সৃষ্টি পরিচালনা সম্পর্কে মহাজ্ঞানী।

١١٦. وَقَالُوْا بِوَاوٍ وَدُوْنَهَا اَيِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى وَمَنْ زَعَمَ اَنَّ الْمَلٰئِكَةَ بَنَاتُ اللّٰهِ اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا قَالَ تَعَالٰى سُبْحٰنَهُ ط تَنْزِيْهًا لَهُ عَنْهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مِلْكًا وَخَلْقًا وَعَبِيْدًا وَالْمَلَكِيَّةُ تُنَافِي الْوِلَادَةَ وَعَبَّرَ بِمَا تَغْلِيْبًا لِمَا لَا يَعْقِلُ كُلٌّ لَهُ قَانِتُوْنَ . مُطِيْعُوْنَ كُلٌّ بِمَا يُرَادُ مِنْهُ وَفِيْهِ تَغْلِيْبُ الْعَاقِلِ .

১১৬. এবং তারা ইহুদি, খ্রিস্টান এবং ফেরেশতাগণকে আল্লাহ তা'আলার কন্যা বলে ধারণা করে বলে আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি পবিত্র। এই সবকিছু থেকে আমরা তার পবিত্রতা ঘোষণা করি। বরং মালিকানা, সৃষ্টি ও দাস সকলরূপেই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর যা কিছু আছে সব আল্লাহর। আর মালিকানা অধিকার সন্তান হওয়ার অন্তরায়, সুতরাং তারা কেউ আল্লাহর সন্তান হতে পারে না। সবকিছু তাঁরই একান্ত অনুগত। প্রতিটি বস্তুই তার বাধ্যগত যে কোনো বিষয়েই তার নিকট তলব করা হোক না কেন।

قَالُوْا ক্রিয়াটির পূর্বে وَاوْ সহ এবং তা ব্যতিরেকেও পাঠ রয়েছে। مَا فِي السَّمٰوٰتِ এইস্থানে বোধহীন প্রাণীর প্রাধান্য প্রদান করে ما -এর ব্যবহার করা হয়েছে।

قَانِتُوْنَ শব্দটির মধ্যে বোধ সম্পন্ন প্রাণীর প্রাধান্য প্রদান করা হয়েছে। তাই وَاوْ ও نُوْن -এর মাধ্যমে এর বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে।]

مُطِيْعُوْنَ كُلٌّ بِمَا يُرَادُ مِنْهُ : অর্থাৎ প্রতিটি মাখলুক ঐ উদ্দেশ্যের অনুগত, যা তার কাছ থেকে চাওয়া হচ্ছে। بِمَاء -এর بَاء টি لَام -এর অর্থে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَلِلّٰهِ : لِلّٰهِ -এর লাম (ل) اَلْاِخْتِصَاصُ বিশিষ্টতা জ্ঞাপক। নাহু [আরবি ব্যাকরণ] এ ক্রিয়াকে বিশেষ সংযোজক লাম এসব প্রকারের অন্যতম। অর্থাৎ মাশরিক-মাগরিব, পূর্ব-পশ্চিম সবই তার। তিনিই এ সৃষ্টির খালিক ও মালিক তথা স্রষ্টা ও অধিপতি। উম্মতে মুহাম্মদী যা অচিরেই সমগ্র বিশ্বের জন্য নিরাপত্তা বিধানকারী [নিরপেক্ষ] উম্মতরূপে প্রতিষ্ঠা পেতে যাচ্ছিল, তাদের কেন্দ্রীকতা কিবলারূপে স্থির হতে যাচ্ছিল এবং কিতাবীরা [তার আভাস পেয়ে] বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপনও বিরূপ সমালোচনা করে দিয়েছিল। এখানে তাদের সমালোচনা উদ্ধৃত করে তার জবাব দেওয়ার ভূমিকা তৈরি করা হয়েছে।

বিরল তথ্য বিশ্লেষণ : كُنْ বলার দ্বারা যদি উদ্দেশ্য হয় রূপকার্থে কোনো কাজ সত্বর ও অনতিবিলম্বে হওয়া তবে তো উত্তম এতে কোনো রূপ সন্দেহ নেই এবং হবেও না। কিন্তু যদি كُنْ দ্বারা উদ্দেশ্য এটা হয় যে, প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ তা'আলার রীতিই হচ্ছে এটা যে, কোনো কিছুকে সৃষ্টি করার পূর্বে এ (كُنْ) শব্দ বলেন, তবে এ প্রসঙ্গে দুটি সন্দেহ হতে পারে। প্রথম সন্দেহ এটা যে, যখন সে বস্তু বা জিনিসটির অস্তিত্বই ছিল না। তখন كُنْ শব্দটি কাকে বলা হয়ে ছিল? এর উত্তর হচ্ছে আল্লাহর ইলম -এর মধ্যে সে বস্তুটি বিদ্যমান ছিল। সেটাকেই বাস্তব বা বিদ্যমান হিসেব করে সম্বোধন করা হয়েছে। দ্বিতীয় সন্দেহ এটা যে, অন্যান্য বস্তুসমূহের ন্যায় স্বয়ং كُنْ শব্দটিও তো حَادِثْ [নতুন বা ঘটমান] তবে তো সে রীতি অনুসারে كُنْ -এর জন্যেও অন্য আরেকটি كُنْ -এর প্রয়োজন হবে এবং এ দ্বিতীয় كُنْ -এর জন্য তৃতীয় كُنْ -এর প্রয়োজন হবে। এমনিভাবে ক্রমানুসারে হওয়া অপরিহার্য হয়ে যাবে। অর্থাৎ এক كُنْ -এর জন্য অগণিত كُنْ মেনে নিতে হবে। তা না হয় مُكَوَّنْ আদি হতে থাকা অত্যাবশ্যক হয়ে যাবে। আর এ উভয় প্রকারই অসম্ভব।

এর উত্তর দুটি হতে পারে। একটি হচ্ছে এটা যে, এসমস্ত কিছুকে كُنْ শব্দ দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং স্বয়ং كُنْ -কে অন্য কোনো كُنْ ব্যতীত সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই ক্রমানুসারে হওয়া অপরিহার্য হবে না।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে এটা যে, যদি শুধু এ كُنْ শব্দটিকে প্রাচীন বা সনাতন মেনে নেওয়া হয় এবং এর সম্পর্ক حَادِثْ হওয়ার কারণে এটা স্বয়ংও حَادِثْ হয়, তবে مُكَوَّنْ সনাতন হওয়া অত্যাবশ্যক হবে না। এখন রয়ে গেল সে সম্পর্কের অবস্থা বা ধরন? তবে যেহেতু সে সম্পর্ক অস্তিত্বহীন ও অবিদ্যমান তাই এ নতুন সম্পর্কের আবিষ্কারের প্রয়োজন আছে। আর না এর কারণ আবিষ্কারের ব্যাপারে কোনো আপত্তি বা প্রশ্ন আছে। কিছুই নেই। হ্যাঁ, সে সম্পর্কের জন্য আল্লাহ তা'আলার জাত বা সত্তা অগ্রাধিকারযোগ্য হবে। তার ইচ্ছা যার শান ও গুণ প্রাধান্য এবং নির্দিষ্টকরণ এখতেয়ারী। তিনি স্বয়ং অগ্রাধিকার যোগ্য থাকবেন। তাই অন্য কোনো অগ্রাধিকার দাতা কিংবা নির্ধারণকারীর প্রশ্নই আসে না। কেননা এর দ্বারা অন্য আরেকটি শক্তিকে মেনে নেওয়া অপরিহার্য হয়ে যায়। যা জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে অগ্রহণযোগ্য ও রহিত। –[বয়ানুল কুরআন থেকে সংক্ষেপিত]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কিবলা নিয়ে বিতর্ক : কিবলা সম্পর্কে ইহুদি ও খ্রিস্টানরা দ্বিধা-বিভক্ত। এটাও ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বিতর্কিত বিষয়। তাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ কিবলাকে শ্রেষ্ঠ বলত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা তো বিশেষ কোনো দিকের নন; বরং তিনি সমগ্র স্থানও দিক হতে পবিত্র ও মুক্ত। তবে তোমরা তার নির্দেশে যে কোনো দিকেই মুখ ফেরাবে, সেদিকেই তার দৃষ্টি আছে। তিনি তোমাদের ইবাদত কবুল করে নিবেন। কেউ বলেন, এ আয়াত সফরে নফল সালাত আদায় সম্পর্কে অবতীর্ণ। অথবা সফরে যখন কিবলা নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল, তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

قَوْلُهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ : পূর্ব পশ্চিম দুই দিকই, আর শুধু এ দুই দিকই কেন, সবদিক সব অভিমুখই আল্লাহ তা'আলার জন্য সমান। তিনি সবগুলোরই সমভাবে স্রষ্টা, শাসনাধিকারী, মালিকানাধিপতি। কোনো বিশেষ দিকের পবিত্রতা, মাহাত্ম্য উপাস্য হওয়ার কোনো নামগন্ধ এবং সত্য দিক দর্শানোর কোনো বৈশিষ্ট্য মর্যাদা নেই।

দিক পূজার রহস্য : জাহেলী ধর্মমতগুলোর ইতিহাস মানুষের আহমকী নির্বুদ্ধিতা, মূর্খতা ও কুসংস্কার পূজার এক ধারাবাহিক ইতিহাস। পৌত্তলিক ধর্মগুলোতে এক সম্মিলিত ভ্রষ্টতা এরূপ প্রচলিত ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা যেহেতু কোনো অবস্থানে আসীন ও দেহধারী, সুতরাং তার অস্তিত্ব কোনো না কোনো নির্দিষ্ট দিকে ও অবস্থানে থাকা অনিবার্য এবং এ ভ্রান্ত ধারণার শিকার হয়ে সে অবস্থান ও দিকটিকেও কোনো না কোনো নির্দিষ্ট দিক ও অবস্থানে সাব্যস্ত করে সে দিকটিকেই পবিত্র ও পূজনীয় স্থির করেছে। যেহেতু [দেবতাকূলে] সূর্য দেবতার মর্যাদা সব পৌত্তলিক ধর্মের সাধারণভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রগণ্য ছিল কাজেই এ প্রাচ্য সম্রাট এর বদৌলতে পূর্ব দিকটিকে সাধারণভাবে পবিত্র মনে করা হলো এবং দুনিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তা পূজা পেতে লাগল।

পক্ষান্তরে মুসলিম জাতি যারা তাওহীদের কোলে এবং এক আল্লাহ তা'আলার বিশ্বাসের নীড়ে লালিত পালিত, সে কথা কল্পনায়ও বিশ্বাস করতে পারে না যে, দিক ও অবস্থানের ন্যায় কোনো কাল্পনিক বিষয়ও কোনো জাতি-সম্প্রদায়ের উপাস্য হতে পারে। মুশরিকের প্রভাবই এ দিক পূজার শিরক কিতাবীদের মধ্যে সংক্রমিত হয়েছিল এবং খ্রিস্টধর্ম যেহেতু আকিদা-বিশ্বাস ও

ইবাদতে সমকালীন প্রভাবশালী ও প্রচলিত রোমান ধর্মের দ্বিতীয় সংস্করণ ও প্রতিচ্ছবি হয়ে দেখা দিয়েছিল, এ কারণে এ ধর্মানুসারীরাও প্রকাশ্যে 'পূর্ব দিকের' পূজায় ডুবে গেল। অন্যদিকে একত্ববাদের গর্বে গর্বিত ইহুদিরাও পুরোপুরি আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হলো না; বরং তাদের কোনো কোনো উপদল তো পূর্ণরূপে বিপরীত সারিতে শামিল হলো। কোনো কোনো দল উপদল পূর্বের বিকল্পরূপে পশ্চিমের পবিত্রতার গীত গাইতে লাগল। তাদের মাথায় এ যুক্তি খেলা করল যে, পূর্বদিক যদি জীবনের সূত্র ও উৎস হওয়ার কারণে পবিত্রও সম্মানযোগ্য হয়ে থাকে, তবে পশ্চিম দিকই বা মৃত্যুদ্বার ও বিনাশভূমি হওয়ার কারণে শ্রদ্ধার পাত্র হবে না কেন? প্রাচ্য সম্রাট [আলোক রাজা] যদি এ দিক থেকে উদয় হচ্ছেন, তবে প্রতিদিনও দিকটিতেই তো অস্তাচলে গমন ও আত্মবিলোপ করছেন। সুতরাং ওদিকটিরও পবিত্রতায় বিশ্বাসী না হওয়ার কি যুক্তি রয়েছে? মোটকথা এ দুটি দিক বেশ পূজা পেতে লাগল। তবে তুলনা মূলকভাবে পূর্ব দিকের পূজা একটু বেশি আর পশ্চিমের পূজা একটু কম।

এক দুনিয়া যখন এহেন দিক পূজার শিরক ও পূর্বদিকের পূজা ও পশ্চিম দিকের পূজার গোমরাহীতে ভেসে যাচ্ছিল, তখনই একদিন কুরআনী তাওহীদ আত্মপ্রকাশ করে সমগ্র বিশ্বের মতবাদগুলোকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে তার অংশীবাদমূলক ধ্যানধারণায় প্রচণ্ড আঘাত হেনে এ বিশাল জগতকে হতচকিত করে দিল। প্রাচীন ধর্মমতগুলো এ নতুন ঘোষণার ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে হতভম্ব-দিশেহারা হয়ে পড়ল। −[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ২০৮-২০৯]

قَوْلُهُ فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ : অর্থাৎ সে এক আল্লাহ, যিনি স্থান-কাল পাত্রের পরিবেষ্টন ও দিক অবস্থানের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত পবিত্র, যার পবিত্র সত্তার [অশরীরী] জ্যোতি বিকীরণ সবদিকে, চারদিকে, যে দিকেই মুখ ঘুরাবে, তুমি পাবে তারই জ্যোতির বিকীরণচ্ছটা। তার তাজাল্লী ও নূর প্রসারণকে কোনো বিশেষ দিকের সঙ্গে নির্দিষ্ট করে দেওয়া প্রত্যক্ষ মূর্খতাই বটে।

قَوْلُهُ وَجْهُ : শাব্দিক অর্থে চেহারা, অবয়ব, দ্বিতীয় ও পরোক্ষ অর্থে পূর্ণ সত্তা ও অস্তিত্ব। وَجْهُ اللّٰهِ যখনই উল্লিখিত হবে, সত্তাই উদ্দেশ্য হবে। এখানেও এরূপই উদ্দেশ্য। আয়াতে [স্রষ্টার] সাকারবাদ ও সাদৃশ্যবাদের পূর্ণ খণ্ডন হয়ে গিয়েছে। পূর্বসূরীগণও আয়াতটিকে এ অর্থেই গ্রহণ করেছেন।

আয়াতটি তাজসীম, স্রষ্টার দেহধারী ও শরীরী হওয়া প্রত্যাখ্যান এবং আকার সাদৃশ্যতা হতে তার পবিত্রতা সাব্যস্ত করণে অন্যতম সবল প্রমাণ।

খ্রিস্টানদের ধর্মে আজও পূর্বমুখিতা [ও পূর্বগামিতা Orientation] -এর একটি ধর্মীয় পরিভাষা প্রচলিত রয়েছে এবং গীর্জা ইত্যাদি পূর্বমুখীই নির্মাণ করা হচ্ছে। −[প্রাগুক্ত]

فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ : [সে দিকেই আল্লাহ] কোনো কোনো সূফী আধ্যাত্মবিদ বলেছেন, আমরাও বিশ্বজগতের যে কোনো বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করি, অনুরূপভাবে সত্য সত্তার নূরেরই ঝিলিক দেখতে পাই। যে দিকেই তাকাই তোমাকেই দেখতে পাই−

جدھر دیکھتا ہوں ادھر توہی تو ہے -

قَوْلُهُ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ : وَاسِعٌ অর্থাৎ তার অনুগ্রহ সর্বত্র ব্যাপক বিশেষ কোনো জায়গার মাঝে সীমিত নয়। অথবা তিনি নিজেই অসীম-অপরিসীম প্রশস্ততা সম্পন্ন। বড় হতেও বড় প্রসারিত তাতেই বিলীন। সুতরাং কোনো স্থান-পাত্র অবস্থা কি করে তাকে সংকুলান করতে পারে? পাত্র যতই বিশাল হোক, স্থান যতই বিস্তীর্ণ হোক, তাকে কেমনে ধারণ করতে পারে? সব দিক-দিগন্ত, অবস্থান-প্রান্ত তো তারই সৃষ্টি দাসানুদাস, তিনি অসীম নিরাকার। কোনো সসীম দিক প্রান্ত কেমনে বেষ্টিবে তাঁরে?

قَوْلُهُ عَلِيْمٌ : অর্থাৎ তিনি বান্দাদের হিতাহিত তাদের নিয়ত ও তাদের ক্রিয়াকলাপ সবকিছুই সম্যক অবগত। তাদের জন্য কোনটি উপকারী, কোনটি অপকারী তাও তিনি পূর্ণ অবগত। সে হিসেবেই তিনি বিধান দিয়ে থাকেন। এভাবেও বলা যায় যে, তিনি তার পূর্ণ জ্ঞানও পরিপূর্ণ হিকমত কুশলতায় যে কিবলা [এবং যে দিককে ইচ্ছা কিবলা] নির্ণীত করতে পারেন। তার হিকমত, মহা জ্ঞান ও কল্যাণ ও দ্রষ্টতা বেষ্টন করতে পারে কে? তিনি উম্মতের ঐক্যের জন্য যখন কিবলা স্থির করবেন, তখন যথার্থই করবেন, তাতে কোনো দিকের পবিত্র হওয়ার মূলতই কোনো দখল নেই।

قَوْلُهُ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا : অর্থাৎ ইহুদিরা হযরত উযায়ের (আ.)-কে এবং খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-কে মহান আল্লাহ তা'আলার ছেলে বলত। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন। তাঁর সত্তা এসব কিছু হতে পবিত্র। সকলেই তাঁর অধীনস্থ তাঁর অনুগত ও তাঁর সৃষ্টি।

سُبْحَانَهُ : [তিনি পবিত্র যে কোনো ধরনের আত্মীয়তা বন্ধন থেকে যা যে কোনো অবস্থায় তার জন্য নীচতা ও হীনতার কারণ।]

খ্রিস্টবাদীদের হুশিয়ারী দেওয়া হচ্ছে যে, নাউযুবিল্লাহ, আল্লাহ তা'আলাকে আল্লাহ বলে স্বীকার করার পরেও তাঁর সঙ্গে সাধারণ মানুষের ন্যায় এ আত্মীয়তা সম্বন্ধের দাবি করে চলছে। আল্লাহ ও মা'বুদ হওয়ার ক্ষেত্রে তোমাদের ধ্যানধারণা কতই না নীচ ও গর্হিত।

قَوْلَهُ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُوْنَ : [ইচ্ছায় অনুগত না হতে চাইলেও সৃষ্টিগত স্বভাবে এবং বাধ্য হয়ে অবশ্য] আল্লাহ তা'আলার বিশ্ব পরিচালন সংক্রান্ত উর্ধ্ব জাগতিক বিধির অধীনতা ও তার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি কারোরই নেই।

كُلٌّ : সকলেই অর্থাৎ সৃষ্টি মু'মিন ও কাফের, উঁচু-নীচু ছোট-বড় প্রাণধারী ও নিষ্প্রাণ যাই হোক।

قَوْلَهُ قَانِتُوْنَ : সবই তাঁর সকাশে অবনত, অবনমিত। সবাই তাঁর নির্ধারিত তাকদীর ও নিরূপণের সঙ্গে জড়িত।

অর্থাৎ مُنْقَادُوْنَ لَا يَمْتَنِعُ شَيْءٌ مِنْهُمْ عَلٰى تَكْوِيْنِهِ وَتَقْدِيْرِهِ وَمَشِيْئَتِهِ তারা সবাই আল্লাহর অনুগত তাদের কোনো কিছুই তাঁর পরিচালন বিধি, তাঁর নিরূপণ ও মর্জি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে বা সরিয়ে রাখতে পারে না। -[তাফসীরে কাশশাফ]

قُنُوْتٌ : [قَانِتُوْنَ -এর মূল ধাতু] এর উত্তম অর্থ এভাবেই করা হয়েছে যে, দেহ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য দ্বারা ও অবস্থা [ভাবের] ভাষায় আল্লাহ তা'আলার বান্দা হওয়ার ও তাঁর প্রতি আনুগত্যের স্বীকৃতি দেবে। -[ইবনু জারীর সূত্রে মাজেদী পৃ. ২১২]

আয়াতের বাস্তবতা : বড় হোক কিংবা ছোট, অনুন্নত হোক কিংবা উন্নত, কোন সৃষ্টির এমন দুঃসাহস রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার বানানো দিন ও রাতের চব্বিশ ঘন্টার বাইরে কোনো ঘন্টা, মিনিট সেকেণ্ড মুহূর্ত নিজের জন্য তৈরি করে নিতে পারে? দক্ষ হতে দক্ষতর কোনো বিজ্ঞানীর বুকের পাটা রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত সৃষ্টি পরিসীমা [মহাশূন্য]-এর বাইরে এক গজ এক ফুট, এক ইঞ্চি স্থান নিজের জন্য খুঁজে নিতে পারে? এমন কে আছে, যে আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত স্থান ও কালের পরিসীমা লঙ্ঘন করে তার বাইরে পদচারণা করতে পারে? এমন কেউ কি আছে, যে তার সৃজনকৃত তাপ-হিম আর্দ্রতা বিধি থেকে বেপরোয়া হয়ে থাকতে পারে? এমন কে হিম্মতওয়ালা আছে, যে তাঁর ওজন, স্তর ও মধ্যাকর্ষণ শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে? সংখ্যা, ওজন, পরিমাণ ও পরিধির যে বিধান আল্লাহ তা'আলা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, এমন সাহসী পুরুষ কেউ আছে কি যে, তাতে লঙ্ঘন বা ব্যতিক্রম ঘটাবার সুযোগ বা অবকাশ খুঁজে পাবে? শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠতম আবিষ্কারক হোন, যত বড় প্রযুক্তিবিদ হোন, তাদের গুণের বাহার তো শুধু এতটুকুই যে, বিশ্ব পরিচালন ব্যবস্থার মূল বিধি ও নীতিমালার ভাব ও স্বভাব উপলব্ধিতে তিনি উল্লেখযোগ্য যোগ্যতা অর্জন করেছেন। [পদার্থের ধর্ম ও বিশ্বনীতির সবক তিনি কঠিনভাবে রপ্ত করেছেন]। এমন লোক তো সব কারণের মহা কারণ ও সব নীতি-বিধির প্রয়োগকর্তা নিয়ন্তার সকাশে অন্য সকলের চেয়ে অধিক পরিমাণে অনুগত ও বাধ্য দাস হয়ে থাকবে। -[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ২১২-২১৩]

قَوْلَهُ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُوْنَ : এতে সব মুশরিক ও অংশীবাদে বিশ্বাসী জাতি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ রয়েছে যে, তোমরা যাকে আল্লাহ তা'আলার পুত্র দেব-দেবতা অবতার মানছ, তারা আল্লাহ তা'আলার শরিক, সম অংশীদার ও সমকক্ষ সমতুল্য হওয়া তো যে কোনো বিচারে কল্পনাতীত অলীক বিষয় সকলেই বরং তাঁর আইনধারী শাসনাধীন, তাঁর সৃষ্টি এবং তাঁর বিশ্ব পরিচালন পরিক্রমার কোনো না কোনো দফতরের আজ্ঞাধীন ও বশীভূত। -[প্রাগুক্ত]

কাবা পূজা ও মূর্তি পূজার মধ্যে পার্থক্য : ইসলামি ইবাদতসমূহে মূল উপাসনা তো শুধু আল্লাহ তা'আলারই হয়। কোনো মসজিদ বা বায়তুল্লাহ কিংবা বায়তুল মাকদিসের উপাসনা মুসলমানগণ করেন না; বরং মসজিদ হচ্ছে ইবাদতে অন্তর ও দিমাগের একাগ্রতা সৃষ্টির জন্য যা প্রকৃত কাম্য পর্যন্ত পৌঁছতে এবং সফলতা লাভের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। আর সমগ্র ইসলামি জগতে একতার অবস্থা সৃষ্টির লক্ষ্যে এবং সমস্ত দুনিয়ার মুসলমানদেরকে একটি কেন্দ্রীয় বিন্দুতে সমবেত করার লক্ষ্যে আল্লাহ তা'আলা একটি দিককে কিবলা নির্দিষ্ট করেছেন, যা আল্লাহর একত্ববাদের যোগ্য ও দীনের কেন্দ্র হওয়ার উপযুক্ত। এখন রয়েছে একটি বিষয় তা হচ্ছে এ দিকটিকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করা যে, সেটা বিশেষভাবে পবিত্র মক্কার মসজিদে হারাম। এ রহস্যের ব্যাপারে সামনে আলোচনা আসছে।

মোটকথা এ যুক্তিসিদ্ধতা ও নিপুণতার বয়ান -এর কারণে অমুসলিমদের এ আপত্তি যে, মুসলমানগণ কাবার পূজারী- এমন ধরনের সন্দেহের বিন্দুমাত্র স্থান নেই। কিন্তু তারপর যদি কোনো মূর্তিপূজক উক্ত বয়ানকে নিজের পক্ষে মনে করে মূর্তিপূজাকে বৈধ করার জন্য সে ব্যাখ্যাই দিতে থাকে যে, আমরাও প্রকৃত পক্ষে পূজা আল্লাহরই করি এবং মূর্তিগুলোকে সামনে রাখি শুধু একাগ্রতা সৃষ্টির উদ্দেশ্য। -[কামালাইন খ. ১, পৃ. ১২৬]

মূর্তি পূজার বৈধতা এবং এর তিনটি উত্তর : প্রথমে তো এ মুক্ততার দাবি সত্ত্বেও মুসলমানদের উপর থেকে আপত্তি ও প্রশ্ন সর্বাবস্থায় উঠে যায়, যা এ স্থানে উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়তো সাধারণ মুসলমান এবং সাধারণ মূর্তি পূজকদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিলে এবং তাদের অবস্থাদির সার্বিক অনুসন্ধান করলে উক্ত দুটি দলের মধ্যে সর্বদাই পার্থক্য প্রকাশ হচ্ছে যে, মুসলমান আল্লাহর একত্ববাদের দাবিতে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য করো উপাসনা না করার মধ্যে সত্যবাদী। আর অন্যান্য লোকদের মিথ্যা ও ধোঁকা প্রকাশ পায় সর্বশেষ স্তরে তৃতীয় কথাটি হচ্ছে কোনো বিধান এবং এর যুক্তিসিদ্ধতাকে নির্ধারণের জন্যও কোনো অরহিত এবং চালু শরয়ী বিধান পেশ করা অপরিহার্য। অন্যের দেখা-দেখি নিজ মতে কিংবা রহিত ধর্মের দৃষ্টিতে কোনো কাজ করা বৈধ হিসেবে গণ্য করা যায় না। এ হিসেবেও শুধু

মুসলমানগণই নিজ ধর্মীয় বিধান পেশ করতে পারে। অন্যান্য ধর্ম বিলুপ্ত ও রহিত হয়ে গেছে। তাই তাদের বিধানাবলি চালু ও **গ্রহণযোগ্য নয়। আর কিবলা নির্ধারণের** উল্লিখিত যুক্তিসিদ্ধতা শুধু উপমাস্বরূপ পেশ করা হয়েছে। নতুবা আল্লাহ তা'আলার **অসংখ্য যুক্তিসিদ্ধতাকে আয়ত্ত করতে পারে কে?** –[প্রাগুক্ত]

আয়াতের নির্দেশনাসমূহ : أَيْنَمَا শব্দটিকে যদি مَفْعُوْل بِهٖ সাব্যস্ত করা হয়। তবে এ আয়াতকে فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ দ্বারা রহিত মানতে হবে। যেমন ইমাম যাহিদ (র.)-এর সিদ্ধান্ত যে, পবিত্র কুরআনে সর্বপ্রথম এ আয়াতটি রহিত **হয়েছে।** اِتْقَانٌ -এর গ্রন্থকার এবং কাজী বায়যাবী (র.)-ও এ দিকেই ধাবিত হয়েছেন। কিংবা এ আয়াতে ব্যাখ্যা করে أَيْنَمَا صَلٰوةَ النَّفْلِ عَلَى الرَّاحِلَةِ অথবা কিবলার দিক সম্পর্কে সন্দেহ ইত্যাদি অবস্থার উপর চাপিয়ে দেওয়া যায়। আর যদি **শব্দটিকে** مَفْعُوْل فِيْهٖ সাব্যস্ত করা হয় মূলে। তবে এ আয়াতকে রহিত বা অন্য কোনো মন্তব্য করার প্রয়োজন নেই; বরং কিবলার ক্ষেত্রে সাহায্যকারী হবে।

আল্লাহর জন্য সন্তান সাব্যস্তের দাবি এবং তা প্রত্যাখ্যান : আয়াত وَقَالُوْا -এর মধ্যে আল্লাহর জন্য সন্তান সাব্যস্তের ব্যাপারে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসকে চারটি পন্থায় বাতিল করা হয়েছে। প্রথম لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ দ্বারা। দ্বিতীয় كُلٌّ لَّهٗ قَانِتُوْنَ দ্বারা। তৃতীয় بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ দ্বারা। চতুর্থ وَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا দ্বারা। আর এ চারটি বিষয়ই আল্লাহর সাথে নির্দিষ্ট হওয়া বিরোধীদের মতেও স্বীকৃত। তাই প্রমাণ পরিপূর্ণ হয়ে ইবনিয়াত তথা পুত্রত্বের দাবি বাতিল হয়ে গেছে।

আল্লাহর জন্য সন্তান হওয়া বিবেকের দিক দিয়েও বাতিল। কেননা সেটা দু অবস্থা থেকে খালি নয়। হয়তো সন্তান সে একই জাতের হবে। তা না হলে ভিন্ন জাতের হবে। সন্তান পিতার জাত থেকে ভিন্ন হওয়া তো দূষণীয় অথচ আল্লাহ সমস্ত দোষ থেকে পবিত্র। তাই আল্লাহ ভিন্ন জাতের সন্তান থেকে পবিত্র। سُبْحَانَهٗ শব্দের মধ্যে এ দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। আর সন্তান এক জাতের হওয়া অসম্ভব। কেননা আল্লাহ তা'আলার সমকক্ষ কোনো জাত নেই। এজন্য যে, আল্লাহর পরিপূর্ণ গুণাবলি যা তার জাতের জন্য অবধারিত তা তার সাথে খাছ। অন্য কারো মধ্যে সে গুণাবলি পাওয়া যায় না। যেমন এখন উল্লেখ করা হয়েছে। لَازِمٌ -এর নফী مَلْزُوْمٌ-এর নফীকে চায়। অর্থাৎ সফলতার নফী সফলতা লাভকারীর নফীর প্রমাণ হবে। তাই আল্লাহ ব্যতীত এমন কোনো ওয়াজিব [অপরিহার্য] নেই যে, তার মত বা তার সত্তার অংশীদার হতে পারে। আর যখন তাঁর মতো ও তার সাদৃশ্য কিছুই নেই। তখন তাঁর সন্তানাদিও নেই। –[কামালাইন খ. ১, পৃ. ১২৮]

আক্বীদায়ে ইবনিয়াতের মূল : প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ এবং বান্দার সম্পর্ককে বুঝানোর জন্য লোকেরা প্রাথমিক অবস্থায় বিভিন্ন উপমাও রূপকালঙ্কার দ্বারা কাজ নিয়ে থাকতো। কোথাও পিতা-পুত্রের সম্পর্ক দ্বারা বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছিল, কোথাও স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে সামনে ধরে মনের দাবি প্রকাশ করা হয়েছে। দর্শনপন্থিগণ প্রথম কারণ এবং প্রথম মাধ্যম বলেছেন। এ দুটি শব্দ দ্বারা প্রকৃত অর্থ তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণে পরবর্তী লোকেরা উক্ত শব্দগুলোকে প্রকৃত অর্থে ব্যবহার করেছে এবং সে ভিত্তির উপর نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ [আমরা আল্লাহর ছেলে ও তার বন্ধু] এ বিশেষ দাবি আরম্ভ করেছে। ইসলাম সে সকল ছিদ্রকে বন্ধ করার জন্য পূর্ণ ক্ষমতা ও প্রমাণাদির শক্তির সাথে সেই বাতিলের ভিত্তি ও শিকড় এর উপর আঘাত করেছে এবং সে আকীদায়ে ইবনিয়াতের মূল শিকড় উৎপাটন করেছে।

স্বাধীনতার মাস্‌আলাসমূহ : ফকীহগণ এ মালিকানা ও সন্তানের বিরোধ থেকে মুক্ত করা ও স্বাধীনতার অনেক মাসআলা বের করেছেন। এ প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ হাদীস مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عُتِقَ عَلَيْهِ [যে ব্যক্তি কোনো রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়ের মালিক হবে, সে তার পক্ষ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে] হানাফীগণের দৃষ্টিতে মুক্ত হওয়ার কারণ হচ্ছে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তার সাথে মালিকানা সত্ত একত্র হওয়া। কিন্তু হাদীসে পাকে সর্বশেষ অংশ কারণ হওয়ার দরুন মুক্ত হওয়ার সম্পর্ক মালিকানা সত্তের দিকে করা হয়েছে। কেননা হুকুম নির্ভর করে সর্বশেষ অংশের উপর। সুতরাং হানাফীগণের দৃষ্টিতে আপন নিকটতম বা রক্তসম্পর্কীয় নয় যেমন– দুধ শরিক [রেজাঈ] এবং এমনিভাবে নিকটতম আত্মীয় আপন বা মাহরাম নয় যেমন– চাচাতো ভাই এ মুক্ত হওয়ার কারণ থেকে বহির্ভূত হবে। তার মালিক হওয়ার কারণে মুক্তি পাবে না। হ্যাঁ, জন্ম ও ভ্রাতৃত্বের ঘনিষ্ঠতা বা আত্মীয়তা সর্বাবস্থায় থাকবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দৃষ্টিতে মুক্ত হওয়ার কারণ হলো শুধু আংশিকতা। অতএব পিতা-নিজ সন্তানের মালিক হলে পিতার পক্ষ থেকে সন্তান মুক্ত হয়ে যাবে এবং সন্তান পিতার মালিক হলে সন্তানের পক্ষ থেকে পিতা মুক্ত হয়ে যাবে। হ্যাঁ, যদি ভাই নিজ ভাইয়ের মালিক হয় তবে আংশিকতা না থাকার কারণে ভাই মুক্ত হবে না।

অনুবাদ :

١١٧. بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مُوْجِدُهُمَا لَا عَلٰى مِثَالٍ سَبَقَ وَاِذَا قَضٰى اَرَادَ اَمْرًا اَيْ اِيْجَادَهُ فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ اَيْ فَهُوَ يَكُوْنُ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالنَّصْبِ جَوَابًا لِلْاَمْرِ .

১১৭. তিনি আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা পূর্ব নমুনা ব্যতিরেকে এতদুভয়কে তিনি অনস্তিত্ব হতে অস্তিত্ব দান করেছেন এবং যখন তিনি কিছু করতে সিদ্ধান্ত করেন তার অস্তিত্বদানের ইচ্ছা করেন শুধু বলেন হও আর তা হয়ে যায়।

يَكُوْنُ ক্রিয়াটি উহ্য مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্যের خَبَرٌ বা বিধেয়। অপর এক কেরাতে তা جَوَابُ اَمْرٍ হিসেবে نَصَبٌ সহ পঠিত রয়েছে।

١١٨. وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ اَيْ كُفَّارُ مَكَّةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ لَوْلَا هَلَّا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ بِاَنَّكَ رَسُوْلُهُ اَوْ تَاْتِيْنَا اٰيَةٌ ط مِمَّا اقْتَرَحْنَاهُ عَلٰى صِدْقِكَ كَذٰلِكَ كَمَا قَالَ هٰؤُلَاءِ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ كُفَّارِ الْاُمَمِ الْمَاضِيَةِ لِاَنْبِيَائِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ مِنَ التَّعَنُّتِ وَطَلَبِ الْاٰيَاتِ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ فِى الْكُفْرِ وَالْعِنَادِ فِيْهِ تَسْلِيَةٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيَاتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ . يَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا اٰيَاتٌ فَيُؤْمِنُوْنَ بِهَا فَاقْتِرَاحُ اٰيَةٍ مَعَهَا تَعَنُّتٌ .

১১৮. এবং যারা কিছু জানে না, তারা বলে অর্থাৎ মক্কার কাফেরগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলে, আল্লাহ আমাদের সাথে কথা বলেন না কেন? যে তুমি তাঁর রাসূল। কিংবা তোমরা সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ আমরা যে ধরনের নির্দেশ চাই সেই নিদর্শন আমাদের নিকট আসে না কেন? এভাবে তারা যেমন বলে তাদের পূর্ববর্তীগণও অর্থাৎ অতীত জাতিসমূহও তাদের নবীগণকে [অনুরূপ] ধৃষ্টতামূলক কথা এবং নিদর্শনও মু'জেজার দাবি সম্বলিত কথা বলতো। কুফরি ও অবাধ্যতার বিষয়ে তাদের অন্তর একই রকম। এই আয়াতটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সান্ত্বনা স্বরূপ। আমি দৃঢ় প্রত্যয়শীলদের জন্য অর্থাৎ যারা জানে যে, এগুলো আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন এবং বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের জন্য নিদর্শনাবলি স্পষ্টভাবে বিবৃত করে দিয়েছি। সুতরাং এর পরও নিদর্শনের দাবি করা অন্যায় জেদ ছাড়া কিছুই নয়।

لَوْلَا শব্দটি এই স্থানে هَلَّا অর্থে ব্যবহৃত।

١١٩. اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ يَا مُحَمَّدُ بِالْحَقِّ بِالْهُدٰى بَشِيْرًا مَنْ اَجَابَ اِلَيْهِ بِالْجَنَّةِ وَنَذِيْرًا مَنْ لَمْ يُجِبْ اِلَيْهِ بِالنَّارِ وَلَا تُسْئَلُ عَنْ اَصْحَابِ الْجَحِيْمِ . النَّارِ اَيِ الْكُفَّارِ مَا لَهُمْ لَمْ يُؤْمِنُوْا اِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِجَزْمِ تَسْئَلْ نَهْيًا .

১১৯. হে মুহাম্মদ ﷺ! আমি তোমাকে সত্যসহ অর্থাৎ হেদায়েতসহ যারা তা গ্রহণ করে তাদের জন্য জান্নাতের শুভ সংবাদদাতা ও যারা তা গ্রহণ করে না তাদের জন্য জাহান্নামের সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি। জাহীম জাহান্নাম [বাসীদের] অর্থাৎ কাফেরদের সম্বন্ধে তোমাকে কোনো প্রশ্ন করা হবে না। কেন তারা সত্য স্বীকার করেনি, কেন ঈমান আনেনি, এই সম্পর্কে আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে না। সত্য পৌঁছিয়ে দেওয়া কেবল আপনার দায়িত্ব। অপর এক কেরাতে لَا تَسْئَلْ ক্রিয়াটি جَزْمٌ জযমসহও পঠিত রয়েছে نَهْى বা নিষেধার্থক শব্দরূপে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلَهُ اَىْ فَهُوَ يَكُوْنُ وَفِىْ قِرَاءَ ةٍ بِالنَّصَبِ جَوَابًا لِلْأَمْرِ :

প্রশ্ন : فِعْلُ مُضَارِعْ যখন فَاءْ -এর পরে আসে এবং তার পূর্বে اَمْر বা نَهْى না থাকে, তখন তার শেষে نَصَبْ আবশ্যক হয়। অথচ এখানে فَيَكُوْنُ -এর উপর رَفْع হয়েছে। এর কারণ কি?

উত্তর : প্রকৃতপক্ষে جُمْلَةْ اِسْمِيَّةْ -এর মুবতাদা উহ্য রয়েছে। মূলত ইবারতটি হবে فَهُوْ يَكُوْنُ জুমলায়ে ইসমিয়া হয়ে جُمْلَةْ হওয়ার কারণে نَصَبْ -এর স্থলে رَفْع হয়েছে। এখানে এ দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, فَيَكُوْنُ হলো جَوَابُ اَمْر আর هُوَ হলো مُبْتَدَا مَحْذُوْف -এর خَبر । আর অপর একটি কেরাতে فَيَكُوْنَ নসবসহও রয়েছে। সে সূরতে فَاءْ سَبَبِيَّةْ -এরপর اَنْ মুকাদ্দার মানতে হবে।

فِىْ قِرَاءَ ةٍ بِجَزْمِ تَسْئَلْ نَهْيًا : অর্থাৎ এক কিরাতে تُسْئَلُ -এর স্থলে لَا تَسْئَلْ রয়েছে। অর্থাৎ আপনি জাহান্নামীদের সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না। তাদের অবস্থা হবে খুবই মন্দ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلَهُ اَىْ كُفَّارُ مَكَّةَ : এ সূরাটি মাদানী সূরা হওয়ার পরও اَلَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ -এর তাফসীরে كُفَّارُ مَكَّةَ **বলার কারণ** কয়েকটি হতে পারে–

১. পূর্ণ সূরা মদনী কিন্তু এ আয়াতটি মক্কী। কিন্তু এ জবাবটি দূরবর্তী

২. এও হতে পারে যে, মক্কার কাফেররা রাসূল ﷺ-এর কাছে মদীনার ইহুদিদের সম্পর্কে পরিচয় লাভ করেছে।

قَوْلَهُ بَدِيْعُ : তিনিই যিনি কোনো অস্ত্র-যন্ত্রের মুখাপেক্ষী নন, যাঁর কোনো মাল-মসলা বা উপকরণ-সরঞ্জামের প্রয়োজন হয় না, যিনি স্থান-অবস্থান ও পরিস্থিতির নিগড়ে আবদ্ধ নন, যিনি সময় বন্ধনের উর্ধ্বে; যিনি কোনো নমুনা স্যাম্পল দেখে বানাবার প্রয়োজন অনুভব করেন না, যার কোনো উস্তাদ প্রশিক্ষকের দিকনির্দেশনার প্রয়োজন হয় না। তিনি সৃজনশীল প্রকৌশলী, তিনি উপকরণ সংযোজক কারিগর নন। প্রকৃত ও বাস্তব অর্থে, আক্ষরিক অর্থে যিনি স্রষ্টা, আবিষ্কারক, অস্তিত্ব বিধায়ক। কারো সহায়তা-সহযোগিতা ছাড়াই আরো কোনোরূপ অংশগ্রহণ ব্যতীতই যিনি নাস্তিজগত থেকে অস্তিত্বে নিয়ে আসেন।

بَدِيْعُ শব্দের উল্লেখ সেসব মুশরিক পৌত্তলিক সম্প্রদায়ের মতবাদ খণ্ডনের জন্য হয়েছে, যারা আল্লাহকে শুধু কারিগর [ও মিস্ত্রি] -এর মর্যাদা দিত এবং আত্মা ও মূল উপকরণকে কোনো না স্তরে তাঁর সহযোগী সহাধ্যায়ী ভাবত। অর্থাৎ যেন মূল ধাতু ও উপকরণ আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল এবং তা ছিল অনাদিও নিত্য। কিংবা আত্মা ও তার সঙ্গে সঙ্গে ছিল অনাদি ও নিত্য। আল্লাহ তা'আলার কাজ ছিল শুধু এতটুকু যে তিনি একজন সুদক্ষ কেমিষ্ট রসায়নবিদের ন্যায় বিদ্যমান উপকরণ কেবল আত্মার সংযোজন ও বিন্যাসের কাজটি সুচারুরূপে সমাধা করে নতুন নতুন রূপ ও আকৃতিতে না বিরাজ করেন। কেবল اِبْدَاعْ শব্দটিই মুশরিকদের কল্পিত কল্পনা খণ্ডনের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তা'আলার জন্য অন্যান্য পূর্ণাঙ্গ সর্বাঙ্গীন গুণের অনুরূপ সত্তাগত অনাদিত্বের সাথে সাথে সময় কালগত অনাদিত্ব (تَقَدُّمْ) সাব্যস্ত রয়েছে। কাল বলতে যা বুঝায়, তিনি তার চেয়েও আদি অগ্রবর্তী। এমন একটি সময় [ও কাল] ছিল যখন [কাল বলতে কিছুই ছিল না এবং মহাকাল নামের সে অকালে] শুধু তিনিই ছিলেন, আর কিছুই ছিল না, প্রান্ত দিগন্ত, সত্তা অস্তিত্ব [জড় অজড়, দেহ, অদেহ] কিছুই ছিল না।

–[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ২১৪]

قَوْلَهُ وَاِذَا قَضَى اَرَادَ : মুফাসসির (র.) قَضَى -এর ব্যাখ্যায় اَرَادَ উল্লেখ করে একটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন।

প্রশ্ন : قَضَى -এর অর্থ হলো اِتْمَامُ شَيْءٍ বা কোনো বস্তুকে পরিপূর্ণ করা। চাই সেটা قَوْلًا হোক। যেমন– وَقَضَى رَبُّكَ কিংবা فِعْلًا হোক। যেমন– فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ এখন কথা হলো اِتْمَامُ شَيْءٍ -এর পরে আবার যে বস্তুর জন্য كُنْ বলার কোনো প্রয়োজন নেই। অধিকন্তু সঠিকও নয়। কেননা এতে تَحْصِيْلُ حَاصِلْ লাজেম আসে। যা নিষিদ্ধ এবং مُكَوِّنْ وَاحِدْ -এর

জন্য দুটি كَوْن অথবা বলা যায় مَوْجُوْد وَاحِدْ-এর জন্য দুটি وُجُوْد হওয়া লাজেম আসে। কেননা মুখাতাব হওয়ার জন্য কোনো বস্তুর বিদ্যমান থাকা জরুরি। অন্যথায় অনুপস্থিত ও অবিদ্যমান বস্তুকে সম্বোধন করা লাজেম আসবে, যা সঠিক নয়।

উত্তর : উত্তরের সারকথা হলো, قَضٰى শব্দটি اَرَادَ-এর অর্থে।

কুন বলা দ্বারা শুধু এতটুকু বুঝানো উদ্দেশ্য যে, ওদিকে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হলো আর তৎক্ষণাৎ এদিকে কোনো মাধ্যম ও বিরতি ছাড়াই তা বাস্তবে প্রকাশমান হলো। তাফসীরে মাদারিকে আছে–

وَهٰذَا مَجَازٌ عَنْ سُرْعَةِ التَّكْوِيْنِ وَالتَّمْثِيْلِ اِذْ لَا قَوْلَ ثَمَّ

অর্থ : এটি আজ্ঞা পালন ও সৃষ্টি হওয়া এর দ্রুততা বুঝাবার রূপক। কেননা সেখানে তো আর কোনো কথা [বা বলা]-র অস্তিত্ব নেই। –[তাফসীরে মাদারিক]

قَوْلُهُ كُنْ : অর্থাৎ নিরেট অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ববান হয়ে যাও, 'না' থেকে 'হ্যাঁ' হয়ে যাও। এর অর্থ এমন নয় যে, আল্লাহ **তা'আলা আপনার আমার মতো এ দুই বর্ণের 'কুন'** (كُنْ) হও শব্দটি উচ্চারণ করেন। কেননা বর্ণ এবং শব্দও তো সৃষ্ট **(حَادِثٌ) অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বপ্রাপ্ত অনিত্য]** এবং আল্লাহ পাক জিহ্বা, ওষ্ঠ ও ধমনী কোষাশ্রয়ী উচ্চারণের মুখাপেক্ষীও নন। **তবে তার সৃজন প্রক্রিয়াকে বান্দাদের বুঝ উপযোগী ও তাদের বোধ -এর যথাসম্ভব নিকটবর্তী** বর্ণনা পদ্ধতি ও প্রকাশভঙ্গি আর **কি গ্রহণ করা যেত?**

لَهُ [তাকে] সর্বনামটি সে বিষয়ের জন্য যা এখনও বাহ্য অস্তিত্ব লাভ করেনি, তবে আল্লাহ তা'আলার ইলমে তো তা যথারীতি বিদ্যমানই রয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলার আদেশের অভিমুখে আদিষ্টও বিদ্যমান-এর মাঝে সময়ের বিচারে কোনো ব্যবধান নেই। যে কোনো আদিষ্ট অর্থই বিদ্যমান হওয়া এবং বিদ্যমান মানেই আদিষ্ট হওয়া।

اَمْرَهُ لِلشَّيْءِ بِكُنْ لَا يَتَقَدَّمُ الْوُجُوْدَ وَلَا يَتَاَخَّرُ عَنْهُ فَلَا يَكُوْنُ مَامُوْرًا بِالْوُجُوْدِ اِلَّا وَهُوَ مَوْجُوْدٌ بِالْاَمْرِ وَلَا مَوْجُوْدًا بِالْاَمْرِ اِلَّا وَهُوَ مَامُوْرٌ بِالْوُجُوْدِ.

অর্থাৎ কুন দ্বারা কোনো কিছুকে তাঁর আদেশ ঐ বিষয়ের অস্তিত্বের আগেও নয় অস্তিত্বের পরেও নয়। যা কিছু অস্তিত্ব লাভে আদিষ্ট তা আদেশ সংযোগে [আদেশ জগতে] বিদ্যমানই; এবং যা-ই আদেশে বিদ্যমান, তাই অস্তিত্ব লাভে আদিষ্ট। অর্থাৎ এখানে আদিষ্টও অস্তিত্ব সম্পন্ন বলে কোনো ভেদরেখা কার্যত টানা যায় না। –[ইবনু জারীর সূত্রে মাাজেদী খ. ১, পৃ. ২১৫]

قَوْلُهُ كُنْ فَيَكُوْنُ : এখানে كَانَ টি সম্পূর্ণ ক্রিয়া (تَامَّةٌ) ; অসম্পূর্ণ (نَاقِصَةٌ) নয়। অর্থাৎ হয়ে যা, অস্তিত্বে এসো– এর সমার্থক, অমুক বিষয়রূপে হয়ে যা -এর সমার্থক নয়। এটি تَامَّةٌ জাতীয় كَانَ অর্থাৎ اَحْدَثَ অস্তিত্বে আয়, হও ফলে তখনই তা অস্তিত্ববান হয়।

قَوْلُهُ فَيَكُوْنُ : অর্থাৎ ব্যাস, তখনই ঐ বিষয়টি অস্তিত্বে এসে যায়। হয়ে যেতে কোনোও বিলম্ব হয় না এবং তার জন্য কারো সহায়তা, মাধ্যম হওয়া, অংশগ্রহণ করা ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না। এ শব্দটি দ্বারা উদ্দেশ্য বিষয়বস্তুর অস্তিত্ব বিধানে আল্লাহ তা'আলার কুদরতের অতি দ্রুত বাস্তবায়ন বুঝানো–

اَلْمُرَادُ مِنْ هٰذِهِ الْكَلِمَةِ سُرْعَةُ نِفَاذِ قُدْرَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى فِىْ تَكْوِيْنِ الْاَشْيَاءِ . (كبير)

এ যেন মুশরিকদের প্রতিই সম্বোধন যে, আল্লাহ তা'আলার সৃজন প্রক্রিয়া তোমাদের বোধগম্য হলো কি? তাতে তো আল্লাহ তা'আলার ইরাদা ব্যতীত অন্য কোনো কিছুরই অংশ গ্রহণের অবকাশ নেই। সুতরাং এতে তোমাদের অংশীবাদের ভিত্তিই ধ্বংস যায়।

প্রশ্ন : فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ : দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা কোনো অবিদ্যমান বস্তুকে অস্তিত্বে আনার ইচ্ছা করলে তাকে كُنْ বলেন। ফলে সে অস্তিত্বহীন বস্তু অস্তিত্বশীল হয়ে যায়। এতে তো مَعْدُوْم বস্তুকে সম্বোধন করা লাজেম আসে।

উত্তর : আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাতেই সে অস্তিত্বহীন বস্তু অস্তিত্বশীল বস্তুর হুকুমে হয়ে যায়। সুতরাং সম্বোধন করা সঠিক আছে। ২ ছাড়াও كُنْ فَيَكُوْنُ দ্বারা তাড়াতাড়ি উদ্দেশ্য, উদ্ভাবন উদ্দেশ্য নয়।

অনুবাদ :

১২০. وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصَارٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ دِيْنَهُمْ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ الْاِسْلَامَ هُوَ الْهُدٰى وَمَا عَدَاهُ ضَلَالٌ وَلَئِنْ لَامُ قَسَمٍ اتَّبَعْتَ اَهْوَاۤءَهُمْ الَّتِيْ يَدْعُوْنَكَ اِلَيْهَا فَرْضًا بَعْدَ الَّذِيْ جَاۤءَكَ مِنَ الْعِلْمِ الْوَحْيِ مِنَ اللّٰهِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ يَحْفَظُكَ وَلَا نَصِيْرٍ . يَمْنَعُكَ مِنْهُ .

১২০. ইহুদি ও খ্রিস্টানগণ তোমাদের প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ না তুমি তাদের মিল্লাতে ধর্মাদেশের অনুসারী হও। বল, আল্লাহ তা'আলার পথ-নির্দেশই অর্থাৎ ইসলামই প্রকৃত পথ-নির্দেশ। এটা ব্যতীত আর সবকিছু গুমরাহী, পথ ভ্রষ্টতা। জ্ঞান আসার পর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ওহী আসার পর ধরে নিলাম তুমি যদি তাদের খেয়াল খুশির যে দিকে তারা তোমাকে আহ্বান করছে এর অনুসরণ কর তবে আল্লাহর মোকাবিলায় তোমার কোনো অভিভাবক হবে না যে তোমাকে রক্ষা করবে এবং কোনো সাহায্যকারীও হবে না যে তোমাকে তাঁর আজাব হতে ফিরিয়ে রাখবে।

لَئِنْ-এর لَامْ টি এইস্থানে قِسْمَةٌ বা কসম অর্থব্যঞ্জক।

১২১. اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مُبْتَدَأٌ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ . اَيْ يَقْرَءُوْنَهٗ كَمَا اُنْزِلَ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ وَحَقَّ نُصِبَ عَلَى الْمَصْدَرِ وَالْخَبَرُ اُولٰۤئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ط نَزَلَتْ فِيْ جَمَاعَةٍ قَدِمُوْا مِنَ الْحَبْشَةِ وَ اَسْلَمُوْا وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ اَيْ بِالْكِتَابِ الْمُؤْتٰي بِاَنْ يُحَرِّفَهٗ فَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ . لِمَصِيْرِهِمْ اِلَى النَّارِ الْمُؤَبَّدَةِ عَلَيْهِمْ .

১২১. যাদেরকে কিতাব প্রদান করেছি তাদের যারা এটা যথাযথভাবে তেলাওয়াত করে যেমন অবতীর্ণ হয়েছে ঠিক তেমনি এটা পাঠ করে কোনোরূপ বিকৃত না করে তারাই এতে বিশ্বাস স্থাপন করে। হাবশা [আবিসিনিয়া] হতে একদল লোক মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তাদের সম্পর্কে এই আয়াত নাজিল হয়। আর যারা এটা অর্থাৎ তাদের প্রদত্ত কিতাব প্রত্যাখ্যান করে যেমন এতে তাহরীফ বা বিকৃতি সাধন করে তারাই চিরকালের জন্য জাহান্নামাগ্নিতে যাত্রার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত।

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ এটা مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য। তার خَبَرٌ বা বিধেয় হলো اُولٰۤئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ।

يَتْلُوْنَهٗ এই বাক্যটি حَالٌ বা ভাব ও অবস্থাবাচক।

حَقَّ শব্দটিতে مَصْدَرٌ অর্থাৎ مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ বা সমধাতুজ কর্মরূপ نَصَبٌ ব্যবহৃত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ এটা مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য। তার خَبَرٌ বা বিধেয় হলো اُولٰۤئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ

يَتْلُوْنَهٗ এই বাক্যটি حَالٌ বা ভাব ও অবস্থাবাচক।

حَقَّ শব্দটিতে مَصْدَرٌ অর্থাৎ مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ বা সমধাতুজ কর্মরূপ نَصَبٌ ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَحَقَّ نُصِبَ عَلَى الْمَصْدَرِ : حَقَّ تِلَاوَتِهِ মাসদারে মাহযুফের সিফত হওয়ার কারণে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। মূলত ইবারতটি হবে এভাবে- يَتْلُوْنَهُ تِلَاوَةً সিফতকে আগে এনে মওসূফের দিকে اِضَافَتْ করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ : আপনি তাদের যতই মন যুগিয়ে চলুন না কেন এবং তাদের সাথে সমবেদনা ও সহমর্মিতার আচরণই করুন না কেন তারা কিছুতেই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না। কেননা তাদের অসন্তুষ্টির কারণ হলো বিদ্বেষ এবং হিংসা। এর কোনো চিকিৎসা নেই। আপনি তাদের মনতুষ্টির জন্য বায়তুল মুকাদ্দাসের অভিমুখী হয়ে নামাজ পড়েছেন। এতে তাদের হিংসা ও বিদ্বেষের সীমা বৃদ্ধি হওয়া ছাড়া আর কোনো ফল হয়নি। তাদের অসন্তুষ্টির কারণ তো এটা নয় যে, তারা প্রকৃত সত্যের সন্ধান করছে আর আপনি তাদের সামনে সত্য প্রকাশ করতে কৃপণতা করছেন; বরং তাদের মনোবাসনা হলো আপনিও তাদের রঙ্গে রঞ্জিত হয়ে যান। আপনিও তাদের চরিত্রে চরিত্রবান হোন। তবেই তারা আপনাকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে। সুতরাং যারা প্রকাশ্য মুশরিক এবং ইসলামি আকিদা-বিশ্বাসে যাদের সঙ্গে কোনো স্তরেই সমদর্শিতা-সংযোগ নেই, তাদের তুষ্টি কামনা ও তাদের সঙ্গে আপস-মিল রক্ষা করে চলার চেষ্টা সম্পর্কে কি বিধান হতে পারে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। -[জামালাইন : খ. ১, পৃ. ২১৫]

قَوْلُهُ حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ : এখানে مِلَّةٌ বলতে সে ধর্মমত বুঝানো হয়েছে, যা তারা নিজেরা তৈরি করে রেখেছিল। مِلَّةٌ অর্থ মাযহাব-ধর্মমত ও জীবনবিধান। -[কামূস]

دِيْن ও مِلَّتْ-এর মাঝে পার্থক্য এই যে, আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে ও উম্মতের একক ব্যক্তির সঙ্গে সম্বন্ধ করে দীন ব্যবহৃত হয়। যেমন- دِيْنُ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার দীন। دِيْنُ زَيْدٍ অর্থাৎ যায়েদের দীন। আর মিল্লাত ব্যবহৃত হয় নবী ও সমষ্টি [জামাত] এর সঙ্গে যুক্ত করে। যেমন- مِلَّةُ اِبْرَاهِيْمَ ইবরাহীমি মিল্লাত, ইহুদি মিল্লাত, মুসলিম মিল্লাত। -[রাগিব]

قَوْلُهُ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ : اَهْوَاءٌ দ্বারা উদ্দেশ্য সেসব মতধারা ও ধ্যান-ধারণা যার ভিত্তি জ্ঞানও বাস্তব সত্যের পরিবর্তে প্রবৃত্তির চাহিদাও খেয়ালখুশির উপরে। আর ইলম দ্বারা উদ্দেশ্য ওহীভিত্তিক ইলম, যা যে কোনো বিচারে নিশ্চয়তা ও প্রামাণ্যতা বহন করে এবং যা যে কোনো দ্বিধা-সংশয়ের ঊর্ধ্বে। -[বায়যাবী]

قَوْلُهُ بَعْدَ الَّذِيْ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ : এখানে বাতিল অনুসরণের ক্ষেত্রে যে হুমকি প্রদান করা হয়েছে তার সঙ্গে আপনার কাছে বাস্তব ইলম আসার পর শর্ত যুক্ত করা হয়েছে। এ শর্তের আলোকে ইমাম রাজী (র.) মত প্রকাশ করেছেন যে, হুমকি প্রদান সব সময়ই সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ সরবরাহ করার পরেই হতে পারবে।

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُوْنَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ : অন্তর দিয়ে তার শ্রদ্ধা-সম্মান, তার বিধানমতে জীবন গড়ে আমল করে তাকে রদবদল, সংযোজন বিয়োজন ও বিকৃতি সাধানের অবকাশ দেয় না। যথাযথ তেলাওয়াত ও তেলাওয়াতের হক আদায় করার মাঝে এ সবই অন্তর্ভুক্ত। اَلْكِتَابُ দ্বারা এখানে তাওরাত উদ্দেশ্য।

وَلَنْ تَرْضٰى الخ আয়াতের শানে নুযূল : وَلَنْ تَرْضٰى আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে مَعَالِمُ -এর বর্ণনা হচ্ছে- লোকেরা রাসূল ﷺ -এর কাছে প্রশ্নাদি করে যেগুলোর উত্তর তিনি তো এ মনে করে দেন, যাতে করে লোকেরা ইসলামের দিকে ধাবিত হয়ে যায়। অথচ তাদের উদ্দেশ্য ছিল স্বয়ং রাসূল ﷺ-কে নিজেদের দিকে ধাবিত করা। অথবা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, নবী করীম ﷺ যখন বায়তুল মাকদিসকে কিবলারূপে গ্রহণ করেছেন, তখন ইহুদি ও নাজরানের খ্রিস্টানদের এ আশা হয়েছিল যে, অবশেষে তিনি তাদের ধর্মকেই গ্রহণ করে নেবেন। কিন্তু বায়তুল্লাহ শরীফ এর দিকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ হলো তখন, সে আশা নিরাশায় রূপান্তরিত হয়ে গেল এবং তারা নিরাশ হয়ে গেল। রূহুল মা'আনীতে এটা লেখা হয়েছে যে, রাসূল ﷺ সর্বশ্রেণির লোকদের অন্তর সংযুক্ত করতেন এ আশায় যে, হতে পারে এ লোকগুলো মুসলমান হয়ে যাবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

আর اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ আয়াতের শানে নুযূল হচ্ছে এটা যে, একটি প্রতিনিধিদল [যার লোক সংখ্যা ৪০] রাসূল ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়েছেন। তন্মধ্যে ৩২ জন হাব্‌শার ছিলেন এবং ৮ জন সিরিয়ার পাদ্রীদের মধ্য থেকে ছিলেন। এ দলটি হযরত জা'ফর ইবনে আবী তালিবের নেতৃত্বে এসেছিল, যিনি রাসূল ﷺ -এর চাচাতো ভাই এবং হযরত আলী (রা.)-এর আপন ভাই ছিলেন। তারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন।

হিংসুটে লোকদের অযথা বিতর্ক : হিংসুটে লোকদের উদ্দেশ্য এটা ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা সরাসরি স্বয়ং আমাদের সাথে কথা বলুক এবং এমনিভাবে দীনের বিধানাবলির ব্যাপারে অন্য কোনো পয়গাম্বরের মাধ্যমের প্রয়োজন না থাকে কিংবা পরবর্তীতে অবতরণের দিক দিয়ে নবী করীম ﷺ -এর নবুয়ত ও রিসালাতের সত্যায়ন আমাদের দ্বারা করানো হোক। অথবা পরবর্তীতে ওহীর মাধ্যমে কালাম ব্যতীত অন্য কোনো নিদর্শন আমাদেরকে দেখানো হোক, যা দ্বারা আমরা সান্ত্বনা পেয়ে যাই।

আল্লাহ তা'আলা তাদের উক্ত দাবিকে দু'ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্রথমটি হচ্ছে যে, উক্ত দাবি মুর্খতার ও অজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ, যা তাদের পূর্বের ও পরের নির্বোধ লোকদের পক্ষ থেকে চলে আসছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে যে, এসব একই থলির খেলনা। তাদের অন্তর পরস্পর সংযুক্ত। সকলে এক ধরনের কথাই চিন্তা করে যে, তাদের সাথে আল্লাহ তা'আলার সরাসরি কথা হওয়ার সম্পর্ক। এটা তো এমন অজ্ঞতাও মূর্খতার কথা যে, উত্তরের অপেক্ষাই রাখে না। হ্যাঁ, যে স্থানে প্রমাণের প্রয়োজন সেখানে শুধু একটি প্রমাণই নিয়ে ঘুরেছে। আর তা হচ্ছে মনের সান্ত্বনা চায়। অথচ আল্লাহ পাক সান্ত্বনাদায়ক অনেক প্রমাণাদিই পেশ করেছেন; কিন্তু যদি কেউ সঠিক রাস্তাই না চায় এবং একগুয়েমী ও বিরোধিতায়ই লিপ্ত থাকে তবে সান্ত্বনা তার ভাগ্যে কোথা থেকে আসবে? তাই ইহুদি ও খ্রিস্টান আহলে ইলম হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে মূর্খ বলা হয়েছে। কেননা ইল্‌ম থাকা ও না থাকা তাদের বেলায় সমান। -[কামালাইন খ. ১, পৃ. ১৩১]

উল্টো আচরণ : ইহুদিগণের উক্ত ৪০টি বিভৎসতা বর্ণনা করে নবী করীম ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়া যে, যারা এত অধিক বক্র স্বভাবের ও স্বল্প বুদ্ধির অধিকারী তারা আপনার প্রতি সহানুভূতিশীল ও আপনার ব্যথার মূল্যায়ন করে। আপনার কাছ থেকে হেদায়েত অর্জন করা তো দূরের কথা; বরং তাদের উচ্চাভিলাষ হচ্ছে উল্টো তাদের পথে আপনাকে পরিচালনা করার চিন্তায় তারা সর্বদা মগ্ন থাকতো এবং ইসলাম গ্রহণের আশায় বৈধ কোনো পন্থায় রাসূল ﷺ -এর নরম আচরণকে ভুল দৃষ্টিতে দেখে নিজেদের মনের চাহিদা ও উদ্দেশ্য পূরণ করা সূত্র বানাতে চেষ্টা করতো। আর যেহেতু রাসূল ﷺ স্বয়ং তাদের অনুসরণ করাটা অসম্ভব। তাই তাদের উক্ত চিন্তা-ধারাও অসম্ভব। কেননা তাদের বর্তমান ধর্ম রহিত ও বিকৃত হওয়ার কারণে শুধু একটি অকেজোর সমষ্টি হয়ে রয়েছে। অকাট্য ইল্‌ম ও ওহী আগমন সত্ত্বেও রাসূল ﷺ -এর জন্য সেটার অনুকরণ করা বলা যায় যে, আল্লাহর অসন্তুষ্টির দিকে আহ্বান করা এবং নবী করীম ﷺ -এর জন্য এ কাজ অসম্ভব। তাই রাসূল ﷺ -এর জন্য তাদের অনুকরণ অসম্ভব। আর তাদের অনুকরণ না করলে তাদের জন্য রাসূল ﷺ -এর প্রতি সন্তুষ্ট হওয়াটাও অসম্ভব। -[প্রাগুক্ত]

সংশোধন ও হেদায়েতের জন্য যোগ্য মাণিক্যের প্রয়োজন : সারকথা হচ্ছে এটা যে তাদের পক্ষ থেকে [অর্থাৎ তারা ঈমান গ্রহণ করবে এ ব্যাপারে] রাসূল ﷺ -কে একেবারে নৈরাশ হয়ে যাওয়া অপরিহার্য। হ্যাঁ, কিন্তু রাসূল ﷺ -এর মূল দায়িত্ব হচ্ছে তাবলীগ [দীনের প্রচার] ও চেষ্টা করা এর থেকে তিনি মুক্ত হতে পারবেন না। যোগ্য মাণিক্য এবং উপযুক্ত পদার্থ তার আহ্বানের দিকে আগে বেড়ে স্বয়ং লাব্বাইক বলবে। সুতরাং যে চির বঞ্চিত সে রাসূলের নিকটে থেকেও ঈমান গ্রহণ থেকে মাহরূম থাকবে। আর যে সুভাগ্যবান সে দূরে থাকা সত্ত্বেও তার কাছে চলে আসবেন।

হাফেজ শীরাজী (র.) বলেন- حسن زبصره بلال از حبش صهيب زروم

زخاك مكه ابو جهل ايں چه بو العجبى ست

অর্থ- হযরত হাসান বসরী (র.) বসরা থেকে, হযরত বিলাল (রা.) হাব্‌শা থেকে এবং হযরত সুহাইব (রা.) রোম থেকে এসে ঈমান গ্রহণ করেছেন। অথচ পবিত্র মক্কার জমিনে থেকে আবূ জাহেলের কি আশ্চর্যময় আচরণ। -[প্রাগুক্ত]

অনুবাদ :

١٢٢ . يٰبَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ . تَقَدَّمَ مِثْلُهٗ .

১২২. হে ইসরাঈল সন্তানগণ! আমার সেই অনুগ্রহকে স্মরণ কর যা দ্বারা আমি তোমাদেরকে অনুগৃহীত করেছি এবং বিশ্বে সকলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। এই ধরনের আয়াত পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

١٢٣ . وَاتَّقُوْا خَافُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ تُغْنِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ فِيْهِ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ فِدَاءٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ . يُمْنَعُوْنَ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ .

১২৩. এবং তোমরা সেই দিনকে ভয় কর সন্ত্রস্ত হও যেদিন কেউ কারো উপকারে আসবে না কাজে আসবে না এবং কারো নিকট হতে কোনো ক্ষতিপূরণ ফিদয়া বা রক্তপণ গৃহীত হবে না এবং সুপারিশ কারো পক্ষে লাভজনক হবে না, আর তারা কোনো সাহায্যও পাবে না, আল্লাহ তা'আলার আজাব হতে তাদেরকে রক্ষা করা হবে না।

তাহকীক ও তারকীব

يَوْمًا لَا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ فِيْهِ : لَا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ জুমলা হয়ে يَوْمًا -এর صِفَتْ আর صِفَتْ জুমলা হলে عَائِدْ জরুরি। এখানে فِيْهِ বৃদ্ধি করে عَائِدْ মাহজুফ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : কুরআনের অলঙ্কারিত্ব ও পুনরাবৃত্তির পদ্ধতি : ইহুদিদের নিকৃষ্টতা ও নোংরামি সম্পর্কে প্রথমে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছিল। তারপরও ৪০টি মন্দতা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলোর সমাপ্তিতে পুনরায় সংক্ষিপ্তভাবে নিজ নিয়ামতসমূহ এবং উৎসাহ প্রদান ও আতঙ্কিতকরণের বিষয়ও পুনরাবৃত্তি করছেন। যাতে বিস্তারিত ও সংক্ষিপ্তভাবে সে সর্বসাকুল্যে সম্পূর্ণ আকারে সামনে এসে যায়। যাতে করে সেগুলোর ফলাফল ও আংশিকতাসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ করা সহজ হয়ে যায় এবং এ আলঙ্কারিক পদ্ধতি বক্তৃতা ও ভাষণসমূহে অনেক উঁচু হিসেবে গণ্য করা হয়। এ জন্য যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক ও কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুকে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত ২/৩ বার করে বর্ণনা করে অন্তরে বসিয়ে দেওয়া হয়। যেমন অনর্থক রাগ করা খুবই মন্দ কাজ। তারপর বলে দেওয়া হয় যে, এর মধ্যে অমুক-অমুক ক্ষতি ও মন্দতা রয়েছে এবং ক্ষতি ও অপকারিতা থেকে ১০/২০টি হিসেব করে বলে দেওয়ার পর অবশেষে পুনরায় বলে দেওয়া যে, মোটকথা অনর্থক রাগ করা খুবই মন্দ কাজ। এ ধরনের পুনরাবৃত্তি অবশ্যই উপকারে আসে। অর্থাৎ পরিপূর্ণভাবে এর সৌন্দর্যতা ও মন্দতা অন্তরে বসে যাবে।

قَوْلُهٗ اُذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ : ইহুদিদেরকে বার বার তাদের উন্নতি ও পথভ্রষ্টতার অতীত ধারা বিবরণী শুনিয়ে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্য-মাহাত্ম্যের রহস্য কি ছিল? এ শ্রেষ্ঠত্বের মূল একমাত্র এটাই ছিল যে, তারা ছিল তাওহীদ ও একত্ববাদের ধারক বাহক এবং তাওহীদবাদী হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উত্তরপুরুষ। এখন যদি তারা আবার সে নিয়ামতের অধিকারে ধন্য হতে চায়, তবে তাদের আবার ফিরে আসতে হবে প্রথম পুরুষ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দীনের দিকেই।

قَوْلُهٗ وَاتَّقُوْا يَوْمًا : ইহুদিরা এ সময় এক দিকে তো কিয়ামতের মৌল বিশ্বাস স্মরণ থেকে মুছে ফেলেছিল, তদুপরি শাস্তি প্রতিদান যা কিছু হওয়ার, তা এ পৃথিবীতেই সীমাবদ্ধ মনে করে নিয়েছিল। এজন্যই প্রচলিত তাওরাতেও [বাইবেলে পুরাতন নিয়ম] যেখানে যেখানে সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যের প্রতিফলনের আলোচনা রয়েছে, সেখানে শুধু পার্থিব শুভাবস্থা ও দুরবস্থার কথাই রয়েছে। এজন্য প্রথমে প্রথমে তাদের আখিরাত ও কিয়ামতের দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে একে একে তাদের মৌল বিশ্বাস তথা সুপারিশে মুক্তি, প্রায়শ্চিত্ত [কাফফারা]ও মুক্তিপণ দিয়ে মুক্তির ধ্যান-ধারণায় আঘাত হানা হয়েছে। আয়াতের শব্দসমূহ এতই ব্যাপক ও অর্থবহ যে, ইহুদিবাদের সঙ্গে সঙ্গে খ্রিস্টবাদেরও শিকড় কেটে যাচ্ছে। কেননা খ্রিস্টবাদের তো মূল কথাই হচ্ছে [যীশু কর্তৃক] সুপারিশ। প্রায়শ্চিত্ত ও মুক্তিপণ নামের বাতিল ও অলীক ধ্যান-ধারণা। অর্থাৎ যীশুই তার জীবন দানের মাধ্যমে তার অনুসারীদের পাপেরও প্রায়শ্চিত্ত করে দিয়েছেন।

অনুবাদ :

١٢٤. وَ اُذْكُرْ اِذِ ابْتَلٰى اخْتَبَرَ اِبْرٰهٖمَ وَفِىْ قِرَاءَةٍ اَبْرَاهَامَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ بِاَوَامِرَ وَنَوَاهٍ كَلَّفَهٗ بِهَا قِيْلَ هِىَ مَنَاسِكُ الْحَجِّ وَقِيْلَ الْمَضْمَضَةُ وَالْاِسْتِنْشَاقُ وَالسِّوَاكُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَ فَرْقُ الرَّأْسِ وَقَلْمُ الْاَظْفَارِ وَنَتْفُ الْاِبِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَالْخِتَانُ وَالْاِسْتِنْجَاءُ فَاَتَمَّهُنَّ اَدَّاهُنَّ تَامَّاتٍ قَالَ تَعَالٰى لَهٗ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ط قُدْوَةً فِى الدِّيْنِ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ط اَوْلَادِىْ اِجْعَلْ اَئِمَّةً قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى بِالْاِمَامَةِ الظّٰلِمِيْنَ ـ اَلْكَافِرِيْنَ مِنْهُمْ دَلَّ عَلٰى اَنَّهٗ يَنَالُهٗ غَيْرُ الظَّالِمِ ـ

১২৪. এবং স্মরণ কর, যখন ইবরাহীমকে ইবরাহীম শব্দটি অপর এক কেরাতে ইবরাহাম (ابراهام) রূপে পঠিত রয়েছে। তাঁর প্রতিপালক কয়েকটি কথা দ্বারা অর্থাৎ কিছু আদেশ ও নিষেধ প্রতিপালনের দায়িত্ব দিয়ে। কেউ কেউ বলেন, এগুলো ছিল হজপালনের বিধি-বিধানসমূহ। কেউ কেউ বলেন, এগুলো হলো, কুলি করা, নাকে পানি দেওয়া, মিসওয়াক করা, গোঁফ কর্তন করা, চুলে সিথি কাটা, নখ কাটা, বগলতলার লোম উৎপাটন করা, নাভির তলদেশের লোম মুণ্ডন করা, খাতনা করা এবং শৌচ করা। পরীক্ষা করলেন যাঁচাই করলেন অনন্তর সেগুলো সে পূর্ণ করল অর্থাৎ পরিপূর্ণভাবে সে এগুলো আদায় করল। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বললেন, আমি তোমাকে মানব জাতির নেতা ধর্মীয় পরিচালক করছি। সে বলল, আমার বংশধরগণের মধ্যে হতেও অর্থাৎ আমার অধঃস্তন সন্তানদেরকেও আপনি নেতা করুন। আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমার নেতা নির্বাচনের এই প্রতিশ্রুতি সীমালঙ্ঘনকারীদের অর্থাৎ তাদের মধ্যে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি প্রযোজ্য নয়। এতে প্রমাণ হয় যে, যারা সীমালঙ্ঘনকারী নয়, তারা তা পেতে পারে।

١٢٥. وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ الْكَعْبَةَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ مَرْجِعًا يَثُوْبُوْنَ اِلَيْهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَاَمْنًا مَأْمَنًا لَهُمْ مِنَ الظُّلْمِ وَالْاِغَارَاتِ الْوَاقِعَةِ فِىْ غَيْرِهٖ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقٰى قَاتِلَ اَبِيْهِ فَلَا يُهَيِّجُهٗ وَاتَّخِذُوْا اَيُّهَا النَّاسُ مِنْ مَقَامِ اِبْرٰهٖمَ هُوَ الْحَجَرُ الَّذِىْ قَامَ عَلَيْهِ عِنْدَ بِنَاءِ الْبَيْتِ مُصَلًّى ط مَكَانَ صَلٰوةٍ بِاَنْ تُصَلُّوْا خَلْفَهٗ رَكْعَتَىِ الطَّوَافِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِفَتْحِ الْخَاءِ خَبَرٌ وَعَهِدْنَا اِلٰى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَمَرْنَاهُمَا اَنْ اَىْ بِاَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ مِنَ الْاَوْثَانِ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ الْمُقِيْمِيْنَ فِيْهِ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ـ جَمْعُ رَاكِعٍ وَسَاجِدٍ اَلْمُصَلِّيْنَ ـ

১২৫. এবং স্মরণ কর যখন এই গৃহকে কাবাকে মানবজাতির জেয়ারতক্ষেত্র প্রত্যাবর্তনক্ষেত্র অর্থাৎ সকল দিক হতে এই দিকেই মানুষ ফিরবে ও নিরাপত্তাস্থল হিসেবে করেছিলাম। অর্থাৎ যে নিপীড়ন ও লুটতরাজ অন্যান্য শহরে পরিলক্ষিত হতো তা হতে নিরাপদ ভূমিরূপে তাকে বানিয়েছিলাম। মক্কার অবস্থা তখনো এরূপ ছিল যে, পিতার হত্যাকারীকে পেলেও সেখানে কেউ উস্কানিমূলক কিছু করত না।

হে লোকসকল! তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়াবার স্থানকে যে পাথরটিতে তিনি কাবাগৃহ নির্মাণকালে দাঁড়াতেন মুছল্লারূপে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর অর্থাৎ তার পিছনে তওয়াফ শেষে দুই রাকাত নামাজ আদায় কর। اِتَّخَذُوْا শব্দটি অপর এক কেরাতে خ অক্ষরটিতে যবরসহ خَبَر বা বার্তামূলক বাক্যরূপে পঠিত রয়েছে। ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আমার গৃহ তওয়াফ ও ইতেকাফকারী অর্থাৎ তাতে অবস্থানকারী এবং রুকূ' ও সিজদাকারীদের অর্থাৎ সালাত কায়েমকারীদের জন্য প্রতিমা হতে পবিত্র রাখতে ওয়াদা করিয়েছিলাম। অর্থাৎ তাদের উভয়কে এজন্য নির্দেশ দিয়েছিলাম। اَنْ طَهِّر এইস্থানে اَنْ শব্দটি মূলত بِاَنْ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। رُكَّع এটা رَاكِعٌ -এর বহুবচন। اَلسُّجُوْد এটা سَاجِدٌ -এর বহুবচন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَاذْكُرْ اِذِ ابْتَلٰى اِبْرَاهِيْمَ : এখানে اُذْكُرْ মাহযূফ মেনে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اِذْ হরফটি উহ্য ফে'ল اُذْكُرْ-এর মামূল, اِبْتَلٰى-এর নয়। এর দ্বারা ঐ সকল লোকদের বক্তব্যকে খণ্ডন করা হয়েছে যারা বলে এখানে اِذْ হরফটি اِبْتَلٰى-এর মামূল। কেননা এ সূরতে عَامِلْ-এর উপর مَعْمُوْلْ টা মুকাদ্দাম হওয়া লাজেম আসে।

قَوْلُهُ اِبْرَاهِيْمَ : এটি তারকীবে مَفْعُوْلْ مُقَدَّمْ হয়েছে। আর এটি হলো تَقْدِيْم وَاجِبْ কেননা কায়দা আছে- যখন فَاعِلْ-এর সাথে এমন জমীর মিলে আসে, যা মাফউলের দিকে ফিরে তখন মাফউলকে আগে আনা আবশ্যক। অন্যথায় اِضْمَارْ قَبْلَ الذِّكْرِ লাজেম আসবে, যা সঠিক নয়।

قَوْلُهُ اِبْرَاهِيْمَ : اِبْرَاهِيْمَ অপর এক কিরাতে اِبْرَاهَامْ রূপও পঠিত হয়। সুরইয়ানী ভাষায় اِبْرَاهِيْمَ অর্থ মেহেরবান পিতা।

قَوْلُهُ بِاَوَامِرَ ونواه : اَوَامِرْ এটি اَمْرَةٌ-এর বহুবচন আর نَوَاهٍ হলো نَاهِيَةٌ-এর বহুবচন। এখানে فَاعِلْ দ্বারা মাফউলের অর্থ উদ্দেশ্য اَىْ بِمَامُوْرَاتٍ وَمَنْهِيَاتٍ - অথবা এখানে اِسْنَادْ مَجَازِىْ হয়েছে। কেননা প্রকৃতপক্ষে اَمْرٌ বা নির্দেশ দাতাতো হলেন আল্লাহ তা'আলা। আর كَلِمَاتْ হলো مَامُوْرْ যেহেতু মাফউলের দিকে ইসনাদ করা হয়েছে তাই এটি مَجَازْ عَقْلِىْ হয়েছে।

قَوْلُهُ مَثَابَةً : এটি جَعَلْنَا-এর দ্বিতীয় মাফউল। যদি جَعَلَ بِمَعْنٰى صَيَّرَ হয়। আর যদি جَعَلَ بِمَعْنَي خَلَقَ হয় তাহলে এটি اَلْبَيْتَ থেকে حَالْ হবে।

مَرْجِعًا : এটি مَثَابَةً-এর তাফসীর। ইঙ্গিত করলেন যে, مَثَابَةً শব্দটি اِسْمِ ظَرْف-এর সীগাহ। কেউ কেউ مَصْدَرْ مِيْمِىْ বলেও মত দিয়েছেন। প্রথম সূরতে প্রশ্ন হয় যে, اِسْمِ ظَرْف-এর সীগাহ হলে مَثَابْ হওয়ার কথা ছিল। تَاءْ বৃদ্ধি করা হলো কেন?

উত্তর : এখানো মোবালাগা বুঝানোর জন্য تَاءْ বৃদ্ধি করা হয়েছে। وَقِيْلَ لِتَانِيْثِ الْبُقْعَةِ

قَوْلُهُ اِتَّخِذُوْا : এটি جَعَلْنَا-এর সাথে عَطْف হয়েছে এবং এটি قَوْل مَحْذُوْف-এর مَقُوْلَهْ -

اَىْ قُلْنَا لَهُمْ اِتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى.

قَوْلُهُ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِفَتْحِ الْخَاءِ خَبَرْ : এক কেরাতে اِتَّخَذُوْا-এর خ হরফে ফাতহাসহ সঠিক। তখন সীগাটি اَمْرٌ-এর না হয়ে مَاضِىْ-এর হবে এবং জুমলাটি সংবাদজ্ঞাপক হবে। অর্থাৎ মানুষেরা সেটিকে নিজেদের মুসাল্লা [নামাজের স্থান] বানিয়েছে।

قَوْلُهُ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ : [হে মুসলমানরা!] اِتَّخِذُوْا আমর বা অনুজ্ঞাজ্ঞাপক শব্দ। এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে সম্বোধন করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اُذْكُرْ : মুফাসসির (র.) اُذْكُرْ শব্দটি উহ্য মেনে এ দিকেও ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে রাসুল ﷺ-কে সম্বোধন করা হয়েছে। এ সূরতে অর্থ হবে-

اَىْ اُذْكُرْ يَا مُحَمَّدُ وَقْتَ اِبْتِلَاءِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِيَتَذَكَّرُوْا مَا وَقَعَ فِيْهِ مِنَ الْاُمُوْرِ الدَّاعِيَةِ اِلَى التَّوْحِيْدِ فَيَقْبَلُوْا الْحَقَّ وَيَتْرُكُوْا مَا هُمْ فِيْهِ مِنَ الْبَاطِلِ.

কেউ কেউ বলেন, এখানে বনী ইসরাইলকে সম্বোধন করা হয়েছে। এ সূরতে অর্থ হবে-

اَىْ اُذْكُرُوْا يَا بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَقْتَ اِبْتِلَاءِ اِبْرَاهِيْمَ.

আর তাদেরকে সম্ভোধন দ্বারা উদ্দেশ্য হবে তাদেরকে ধমক ও ভৎর্সনা করা। কেননা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মর্যাদা প্রত্যেক দলের কাজেই স্বীকৃত রয়েছে। এ পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কিত এমন বিষয়সমূহ উল্লেখ করেছেন, যা মুহাম্মদ ﷺ-এর বক্তব্য মানতে বাধ্য করে। কেননা রাসুল ﷺ-এর ধর্ম হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্মের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

قَوْلُهُ اِخْتَبَرَ : اِبْتَلٰى-এর তাফসীর করা হয়েছে اِخْتَبَرَ দ্বারা। অর্থ পরীক্ষা করা।

প্রশ্ন : اِبْتِلَاءُ তথা পরীক্ষা ও যাচাই-বাছাই করার পরিস্থিতি তো সেখানে হয়, যেখানে পরীক্ষকের সামনে কোনো ব্যাপার গোপন থাকে। সেটি জানার জন্য যে পরীক্ষা করে থাকে। এখানে আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে তো তা অসম্ভব।

জবাব : এখানে اَىْ فَعَلَ مَعَ اِبْرَاهِيْمَ فِعْلًا مِثْلَ الْمُخْتَبِرِ হিসেবে اِبْتِلَاءُ -এর ব্যবহার করা হয়েছে। اِسْتِعَارَةٌ تَبْعِيَّةٌ

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পরিচয় : পবিত্র কুরআনে এ নামের প্রথম আগমন। কুরআনের প্রথম শ্রোতাদল ছিল আরববাসীরা। তাদের পরিচিতি ও বিদিত মহান ব্যক্তিদের উল্লেখ পবিত্র কুরআন অনাড়ম্বরভাবে ও অতিরিক্ত পরিচিতির প্রলেপ ছাড়াই করে দেয়। তাছাড়া হযরত ইবরাহীম (আ.) তো সেই মহান ব্যক্তি যার সম্পর্কে আরব মুশরিক ব্যতীত ইহুদি-খ্রিস্টানরাও উত্তমরূপে অবহিত ছিল। সুতরাং তার আরো পরিচিতি দেওয়া অপ্রয়োজনীয় ছিল।

ইনি সে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম, যিনি ইসলামি আকিদার কথা না বললেও ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মবিশ্বাস মতেও একজন পয়গাম্বর ছিলেন। তাওরাতে তার নাম রয়েছে আব্রাম ও আব্রাহাম এ দু'ভাবে। তাওরাতের [বাইবেল পুরাতন নিয়ম] বর্ণনা মতে তার ও হযরত নূহ (আ.)-এর মাঝে দশ পুরুষের ব্যবধান ছিল অর্থাৎ তিনি হযরত নূহ (আ.)-এর একাদশ অধস্তন পুরুষ। তবে কতক সবল যুক্তির ভিত্তিতে তাওরাতের ব্যাখ্যাকারদের ধারণাতেই তাওরাতের বংশসূত্র বর্ণনার মাঝ থেকে কতক পুরুষের নাম বাদ পড়ে গিয়ে থাকবে। প্রত্নতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ স্যার চার্লস মরিস্টন -এর সর্বশেষ গবেষণা মতে তার জন্মসন খ্রিস্টপূর্ব ২১৬০ অব্দ এবং তাওরাতে তার বয়স উল্লিখিত হয়েছে ১৭৫ বছর। এ হিসেবে ওফাতের সন হবে খ্রিস্টপূর্ব ১৯৮৫। পিতার নাম ছিল তারাহ (تَارَحْ) আরবি উচ্চারণে আযার। প্রাচীন ভাষাগুলোতে এ নামটি বিভিন্ন শব্দে উচ্চারিত হয়েছে। তবে মুসলমানদের জন্য তো কুরআনে বর্ণিত আযার (اٰزَرْ) -ই যথেষ্ট। জন্মস্থান ব্যাবিলনের কালদানিয়া [ইংরেজি উচ্চারণে কালডিয়া] বর্তমান ভৌগলিক বিন্যাসে এটিই ইরাক নামে পরিচিত। যে নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাওরাত সেটি [টিজ] নামে উল্লেখিত হয়েছে।

ইসমাঈলী এবং ইবরাহীমী বংশধারায় এক ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনেক দিন থেকেই চলে আসছিল। হযরত ইবরাহীম (আ.) ছিলেন উভয় বংশধারার পূর্বপুরুষ। আল্লাহ তা'আলার সবিশেষ নিয়ামত অর্থাৎ তাওহীদের পতাকাবহন এখন ইসরাঈলী বংশধারার অব্যাহত নাফরমানির দণ্ডস্বরূপ ছিনিয়ে নিয়ে ইসমাঈলী বংশধারার নবীর মাধ্যমে সারা বিশ্বের জন্য ব্যাপক-বিস্তৃত হতে চলেছে। ইবরাহীমী ব্যক্তিত্ব [এবং এতদসঙ্গে ইসমাঈলী ব্যাক্তিত্বের] কেন্দ্রীয় গুরুত্ব সম্পর্কে দুনিয়াকে অবহিত করা প্রয়োজনী হয়ে পড়েছিল। সে কারণে এখানে তাই করা হচ্ছে। –[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ২২৪-২২৫]

قَوْلُهُ بِكَلِمَاتٍ : কয়েকটি কথায়, কয়েকটি বিষয়ে। এ বিষয়গুলো কি ছিল, তা নির্ণয়ে বিরাট মতভেদ রয়েছে। মুসান্নিফ (র.) নিম্নোক্ত ইবারতে এ মতভেদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন–

قِيْلَ هِىَ مَنَاسِكُ الْحَجِّ وَقِيْلَ الْمَضْمَضَةُ وَالْاِسْتِنْشَاقُ وَالسِّوَاكُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَفَرْقُ الرَّأْسِ وَقَلْمُ الْاَظْفَارِ وَنَتْفُ الْاِبِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَالْخِتَانُ وَالْاِسْتِنْجَاءِ .

قَوْلُهُ فَاَتَمَّهُنَّ : অর্থাৎ তিনি সেসব পরীক্ষায় পুরোপুরি উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং সেসব বিধান পালন করেছেন।

قَوْلُهُ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا : এটি جُمْلَةٌ مُسْتَاْنِفَةٌ এবং একটি سُوَالٌ مُقَدَّرٌ -এর জবাব। প্রশ্নটি হলো এই, হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন সকল আদেশ-নিষেধ সুন্দররূপে সম্পন্ন করেন, তখন কি হলো? উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমি তোমাকে মানুষের দীনি নেতা বানাব।

اِمَامٌ : ইমাম বলাই হয় তাকে, যার আনুগত্য করা হয় অভিধানে এবং শরিয়তের পরিভাষায় এটাই ইমামের অর্থ।

اِسْمُ اَمَامَة مُسْتَحِقٌّ لِمَنْ يَلْزَمُ اِتِّبَاعَهُ وَالْاِقْتِدَاءُ بِهٖ فِىْ اُمُوْرِ الدِّيْنِ اَوْ مَا فِىْ شَيْئٍ مِنْهَا (جصاص)

আয়াতের বাস্তবতা : এই দীনি নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব এবং বিশ্বের এক বিরাট অংশের ইমামত এখন পর্যন্ত তার হিস্যায়ই চলে আসছে। ইসলাম ছাড়াও তাওহীদের সঙ্গে যেসব ধর্মের কিছুটা হলেও সম্পর্ক রয়েছে অর্থাৎ ইহুদিবাদ ও খ্রিস্টবাদ, তার ইমামতের ব্যাপারে তারা একমত।

قَوْلُهُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ : বিশ্বের নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব এবং ইমামতের সুসংবাদ পেয়ে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর অন্তর স্বাভাবিকভাবেই খুশিতে বাগবাগ হয়ে যায়। আর এই খুশির যোশে তিনি জিজ্ঞেস করেই বসেন যে, এই ইনআম ও পুরস্কারে আমার বংশ এবং আমার অধস্তন পুরুষরাও আছে কিনা?

ذُرِّيَّةٌ সন্তান-বংশপরম্পরা। গোটা বংশধারা এর অন্তর্ভুক্ত। আর এই ইবরাহীমী বংশধারায় ইসরাঈলী এবং ইসমাঈলী উভয় শাখাই শামিল রয়েছে। ইসরাঈলরা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়ার যে দাবি করতো, এখান থেকে তার শিকড়ও উৎপাটিত হয়ে গেছে। مِنْ ذُرِّيَّتِىْ শব্দে مِنْ تَبْعِيْضِيَّةٌ অংশবিশেষ অর্থে। বাক্যাংশর বিন্যাস ও গঠন প্রক্রিয়া এটা স্পষ্ট করে দেয় যে, প্রশ্নের ভঙ্গিতে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এ দোয়া তার গোটা বংশধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, বরং তার একটা অংশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

قَوْلُهُ اَوْلَادِىْ : এটি ذُرِّيَّةٌ-এর তাফসীর। মূলত ذُرِّيَّةٌ বলা হয় نَسْلُ الرَّجُلِ তথা পুরুষের বংশ ধারাকে এবং তার মূল ব্যবহার اَوْلَادُ صِغَارٍ বা ছোট ছোট সন্তানদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তারপর ব্যবহারে ব্যাপকতা এসেছে এবং ছোট বড় সকলের ক্ষেত্রেই ব্যবহার হতে থাকে। মুফাসসির (র.) اَوْلَادِىْ বলে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে মূল অর্থ তথা اَوْلَادُ صِغَارٍ উদ্দেশ্য নয়; বরং সাধারণ ও ব্যাপক অর্থ উদ্দেশ্য। যার মাঝে বড়রা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

قَوْلُهُ جَاعِلُكَ : جَاعِلُكَ -এর ك -এর উপর (عَطْف) করা হয়েছে وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ বাক্যাংশকে। বাক্যের পূর্ণরূপ যেন এই وَجَاعِلُكَ بَعْضَ ذُرِّيَّتِىْ এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, আনন্দ ও নিয়ামতে নিজের সন্তানদেরকে শরিক করা কেবল স্বাভাবিক ব্যাপারই নয়; বরং এটা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের সুন্নতও।

قَوْلُهُ اِجْعَلْ اَئِمَّةً : মুফাসসির (র.) এ ইবরাত দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করলেন যে, مِنْ ذُرِّيَّتِىْ -এর عَامِلْ এর উহ্য রয়েছে। আর তাহলো اِجْعَلْ এবং তার مَفْعُوْل ثَانِىْ -ও উহ্য রয়েছে। اَىْ اِجْعَلْ مِنْ ذُرِّيَّتِىْ اَئِمَّةً

قَوْلُهُ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ : এটি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আবেদনের জবাব। তিনি তাঁর কিছু সংখ্যক সন্তানের ইসমতের আবেদন করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা এখানে তাঁর আবেদন কবুল করার ঘোষণা দিয়েছেন। সেই সাথে কতক সন্তানকে নির্ধারণও করেছেন। অর্থাৎ বরকত ও মর্যাদার ধারা তোমার বংশেও অবশ্যই থাকার কথা; কিন্তু তা লাভ করার জন্য কেবল উত্তরাধিকার সূত্র আর বংশ-পরম্পরাই যথেষ্ট নয়; বরং এজন্য ঈমান আর নেক আমলও অর্জন করতে হবে। যেন সৎ সন্তানের পক্ষে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া কবুল হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, জালিম নয়, এমন বংশধর তা লাভ করবে। খবর দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আপনার বংশে উভয় ধরনের লোক হবে। কিছু লোক হবে সৎ এবং অনুগত। আর কিছু লোক হবে জালিম ও নাফরমান। সৎ লোকেরা ইমামতের সুসংবাদ লাভ করেছে আর জালিমদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হয়েছে। এতে এ মর্মে সতর্ক করে দেওয়া হয় যে, তার বংশধরদের মধ্যে জালিমও হবে। তারা ইমামত বা নেতৃত্ব পাবে না, বরং ইমামত পাবে তাদের মধ্যকার সৎ সত্যনিষ্ঠ মুত্তাকীরা। عَهْد মানে ইমামতের অঙ্গীকার।

قَوْلُهُ بِالْاِمَامَةِ : এটি একটি سُوَالْ مُقَدَّرْ -এর জবাব। প্রশ্ন : হযরত ইবরাহীম (আ.) তো আবেদন করেছিলেন اِمَامَتْ সম্পর্কে; কিন্তু জবাব দেওয়া হচ্ছে عَهْد সম্পর্কে। প্রশ্ন ও উত্তরের মাঝে মিল পাওয়া যাচ্ছে না।

উত্তর : এখানে عَهْد দ্বারা اِمَامَتْ উদ্দেশ্য। সুতরাং প্রশ্ন ও উত্তরের মাঝে সামঞ্জস্য পাওয়া গেছে।

প্রশ্ন : পুনরায় প্রশ্ন জাগে, যখন عَهْد দ্বারা اِمَامَتْ উদ্দেশ্য, তখন সরাসরি اِمَامَتْ শব্দই উল্লেখ করা হলো না কেন?

উত্তর : এতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইমামত মূলত আল্লাহর পক্ষ হতে একটি আমানত ও অঙ্গীকার। তা ঐ ব্যক্তির পক্ষেই আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব, যার ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছা হয়ে থাকে।

কেউ কেউ عَهْد -এর তাফসীর করেছেন নবুয়ত দ্বারা। উভয়টির সারকথা একই। কেননা اِمَامَتْ দ্বারা نُبُوَّتْ উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ الظّٰلِمِيْنَ : এখানে জুলুমের অর্থ কুফর এবং ফিসক করা হয়েছে। কাফেররা দীনি ইমামত লাভ না করার বিষয়টি নিতান্ত স্পষ্ট এবং সর্বসম্মত। কেউ কেউ এ মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্য ফিসককেও যথেষ্ট মনে করেন।

قَوْلُهُ وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ : যোগসূত্র : পূর্বে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ইমামত ও মর্যাদার বর্ণনা ছিল। আর ইমামত তথা নবুতের অধিকারীর জন্য কেবলা হওয়া জরুরি। এজন্য এ আয়াতে ইবরাহীম (আ.)-এর কেবলার বিবরণ এসেছে। এখানে বনী ইসরাঈলকে সতর্ক করা হয়েছে যে, আখেরী যমনার নবী সেই ইবরাহীম ও ইসমাইল (আ.)-এরই বংশধর। সুতরাং তাঁর ব্যাপারে সাবধানে মুখ খুলবে।

مَقَامُ اِبْرَاهِيْمَ : এটা বেহেশতী পাথর। যার বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, নির্মাণস্থল উঁচু হলে সে অনুযায়ী উঁচু হয়ে তা যেত এবং উঁচু সিঁড়ির কাজ দিত। আর পুনরায় মানুষ নেমে গেলে পরে নীচু হয়ে যেত। এ পাথরে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর পায়ের চিহ্ন অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল, যা আজও বিদ্যমান। এ পাথরটি কা'বার দরওয়াজা ও মুলতাজিম এর সংলগ্ন ছিল। কিন্তু হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতের জমানায় পানিতে ভেসে যাওয়ার কারণে পুনরায় সে পাথরটিকে মজবুতভাবে বায়তুল্লাহ থেকে অল্প দূরে পুরাতন بَابُ السَّلَامِ ও মিম্বারে حَرَم এবং জমজম এর মধ্যবর্তী স্থানে স্থাপন করা হয়েছে। তওয়াফ শেষে দু রাকআত নামাজ পড়া হানাফিয়া ও মালিকিয়াদের মতে ওয়াজিব, আর শাফিইয়া ও হানাবিলাদের মতে সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্।

مِنْ مَقَامِ -এ مِنْ শব্দটি تَبْعِيْضِيَّةٌ অর্থাৎ এর একাংশ বুঝাবার জন্য مِنْ ব্যবহার করা হয়েছে। কেউ কেউ مِنْ অর্থ فِىْ করেছেন আবার কেউ কেউ مِنْ কে অতিরিক্ত বলেছেন- (روح) وَمِنْ لِلتَّبْعِيْضِ اَوْ بِمَعْنَى فِىْ اَوْ زَائِدَةٌ وَالْاَظْهَرُ الْاَوَّلُ

قَوْلُهُ مُصَلًّى : অর্থ সালাতের স্থান বা দোয়ার স্থান। কারণ صَلَّيْتُ অর্থ আমি দোয়া করেছিও করা হয়। মূল উৎসের দিক থেকে সালাতের স্থান আর দোয়ার স্থানের মধ্যে খুব একটা তফাতও নেই।

কুরআনের সম্বোধন ধারা : একথা আগেও বলা হয়েছে আর এখন কথাটি আরো স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, কুরআন মাজীদ তার সম্বোধনধারায় মানব ইতিহাসের ক্রমিকধারা মেনে চলতে বাধ্য নয়। বহুবার আশপাশের আয়াতে বরং কখনো এক আয়াতেই অর্থের মিলের কারণে এমন দুটি ঘটনার সমাবেশ ঘটানো হয়, যার মধ্যে সময়ের বিচারে শত শত বছরের ব্যবধান রয়েছে। আর এতে এটাও অন্তর্ভুক্ত থাকে যে, অতীত ঘটনা বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে এবং যেন তার প্রসঙ্গেই বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জন্য কোনো স্বতন্ত্র নির্দেশ দেওয়া হয় এবং এজন্য অনুজ্ঞাজ্ঞাপক শব্দ ব্যবহার করে তার আতফ করা হয় অতীতজ্ঞাপক শব্দের উপর। মূলত কুরআন হচ্ছে কেবল হেদায়েতের কিতাব। এ লক্ষ্য উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে কুরআন কোনো মনবীয় সীমারেখা বা কোনো কৃত্রিম এবং নিজেদের গড়ে দেওয়া ধ্যানধারণার পরোয়া কখনো করে না। -[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ২৩১]

قَوْلُهُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ : মুফাসসির (র.) এ ইবারত দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করলেন যে, এখানে صَلٰوة দ্বারা তওয়াফের দু'রাকাত নামাজ উদ্দেশ্য। এটি শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযাহাবে সুন্নতে মুয়াক্কাদা। আর হানাফী এবং মালেকী মাযহাবে ওয়াজিব; কিন্তু মাকামে ইবরাহীমে পড়াই আবশ্যক নয়; বরং মসজিদে হারামের যেখানে ইচ্ছা আদায় করতে পারবে। তবে মাকামে ইবরাহীমে পড়ার ফজিলত বেশি। এ হিসেবে اِتَّخِذُوْا -এর নির্দেশটি أَمْر اِسْتِحْبَابِيْ

কেউ কেউ বলেন, এখানে صَلٰوة দ্বারা সাধারণ নামাজ উদ্দেশ্য। কেউ বলেন, এখানে صَلٰوة দ্বারা দোয়া উদ্দেশ্য এবং মাকামে ইবরাহীম দ্বারা হরম উদ্দেশ্য।

মুফাসসির (র.) رَكْعَتَي الطَّوَافِ উদ্দেশ্য নেওয়ার قَرِيْنَة হলো আয়াতের শানে নুযূল। বর্ণিত আছ রাসুল ﷺ একদিন হযরত ওমর (রা.)-এর হাত ধরে বলতে লাগলেন- هٰذَا مَقَامُ اِبْرَاهِيْمَ [এটা ইবরাহীম (আ.)-এর অবস্থানস্থল। একথা শুনে হযরত ওমর (রা.) আরজ করলেন- اَفَلَا نَتَّخِذُهُ مُصَلًّى তবে কি আমরা সে স্থানটি নামাজের স্থান নির্ধারণ করব না?] সুতরাং সেদিন সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বেই উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। যা দ্বারা হযরত ওমর (রা.)-এর সঠিক চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটেছে।

قَوْلُهُ اَمَرْنَا هُمَا : عَهِدْنَا ফেয়েলটি اَمَرْنَا -এর অর্থে হবে। সুতরাং তখন আর কোনো প্রশ্ন থাকল না।

بِاَنْ : এ اَنْ টি اَنْ مَصْدَرِيَّة তাফসীরী নয়। এটি فِعْل اَمْر -এর শুরুতে مَامُوْرٌ بِهٖ করার জন্য এসেছে।

قَوْلُهُ اِسْمَاعِيْل : ইসমাঈল (আ.) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জ্যেষ্ঠপুত্র। তাঁর মিসরীয় স্ত্রী হাজেরার গর্ভজাত। তাঁর জন্মসন আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২০৭৪ অব্দ। আর মৃত্যু আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৯২৭ অব্দ। তাওরাতের বর্ণনা মোতাবেক তিনি ১৩৭ বৎসর বয়স পেয়েছিলেন। তার ১২ জন সন্তান ছিল এবং তাদের মাধ্যমে ১২টি বংশধারায় শুরু হয়।

-[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ২৩২]

قَوْلُهُ طَهِّرَا : সকল ধরনের শিরক এবং মূর্তিপূজার পঙ্কিলতা। 'তাহারাত' শব্দটি طَهِّرَا [পবিত্রতা] শব্দ থেকে উৎপন্ন। মূলত এখানে অর্থ হচ্ছে অর্থগত এবং বিশ্বাসগত অপবিত্রতা থেকে দূরে থাক এবং তাওহীদের আলোচনা ও আল্লাহ তা'আলার ইবাদত দ্বারা পরিপূর্ণ রাখ। প্রাসঙ্গিকভাবে বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতার নির্দেশও এসে যায়। -[প্রাগুক্ত]

هُوَ تَطْهِيْرُهُ مِنَ الْاَصْنَامِ وَعِبَادَةِ الْاَوْثَانِ فِيْهِ مِنَ الشِّرْكِ بِاللّٰهِ (ابْنُ جَرِيْر عَنْ مُجَاهِدٍ وَقَتَادَةَ وَابْنِ زَيْدٍ) مِنَ الْاَوْثَانِ الْخَبَائِثِ وَالْاَنْجَاسِ كُلِّهَا (مَدَارِكْ) وَالتَّطْهِيْرُ الْمَامُوْرُ بِهٖ هُوَ التَّنْظِيْفُ مِنْ كُلِّ مَا لَا يَلِيْقُ بِهٖ.

طَهِّرَا : দ্বিবচনের শব্দ। হুকুম দেওয়া হচ্ছে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সঙ্গে হযরত ইসমাঈল (আ.)-কেও। আর তাওহীদ প্রতিষ্ঠায় তাকেও সমভাবে শরিক করা হচ্ছে। ফিকহবেত্তাগণ সম্বোধনের এ ধারার ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব সকলের, সে ইবরাহীমের মতো নেতা হোক বা ইসমাঈলের মতো নেতার অনুসারী। এ শব্দটিতে আধিক্যের অর্থও রয়েছে। অর্থাৎ খুব ভালোভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করবে। ফকীহগণ বলেছেন, মসজিদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা ফরজ।

-[প্রাগুক্ত]

প্রশ্ন : এখানে তো طَهِّرَا দ্বিবচনের সীগাহ এসেছে; কিন্তু সূরা হজে এক বচনের সীগাহ এসেছে। (وَطَهِّرْ بَيْتِيَ الخ) উভয় আয়াতের মাঝে সামঞ্জস্য কিভাবে হবে?

উত্তর : সূরা হজের নির্দেশ ছিল কাবা নির্মাণের পূর্বেকার। সে সময় হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে সম্বোধন করা হয়নি। কিন্তু এখানে তাঁকেও সম্বোধন করা হয়েছে।

قَوْلُهُ بَيْتِيَ : আমার ঘর বলা হয়েছে সম্মানার্থে। কথাটা ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে। ইসলামের আল্লাহ তো কোনো দৃশ্যমান দেহধারী দেবতা নয় যে, বসবাস করা এবং চলাফেরা কিংবা উঠাবসা করার জন্য গৃহ বা স্থানের প্রয়োজন হবে। সুতরাং

আমার ঘর অর্থ আমার বসবাসের ঘর তো হতেই পারে না। আমার ঘর অর্থ কেবল এই হতে পারে সে ঘর, যা আমার স্মরণ ও ইবাদতের জন্য চিহ্নিত নির্ণীত এবং নির্ধারিত। আল্লাহ তা'আলার ঘর বলার উদ্দেশ্য কেবল তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা। সুতরাং আয়াতে কাবার প্রতি বিশেষ কোনো ইঙ্গিত নেই। বরং তাতে উল্লেখ করা হয়েছে بَيْتٌ -এর গুণ। ফকীহগণ এ থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, আল্লাহর যে কোনো ঘর অর্থাৎ মসজিদের জন্যই এই হুকুম। –[প্রাগুক্ত]

قَوْلُهُ عَاكِفِيْنَ : عُكُوْف অর্থ হচ্ছে সম্মানার্থে কোনো স্থানে অবস্থান করাকে বাধ্যতামূলক করে নেওয়া। –[রাগেব]

আর শরিয়তে إِعْتِكَاف বলা হয়– هُوَ الْاِحْتِبَاسُ فِى الْمَسْجِدِ عَلٰى سَبِيْلِ الْقُرْبَةِ (رَاغِبْ) অর্থাৎ ইবাদতের নিয়তে কোনো বিশেষ সময় মসজিদে অবস্থান বাধ্যতামূলক করাকে ই'তিকাফ বলে।

قَوْلُهُ الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ : রুকূ' ও সিজদা সালাতের দুটি প্রসিদ্ধ ও পরিচিত অবস্থা-আকৃতি। চারটি শব্দ ব্যবহার না করে কেবল আবিদীন জাকিরীনও বলা যেত। কিন্তু বিস্তারিত এবং নির্দিষ্ট করা দ্বারা একেকটি ইবাদতের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

প্রশ্ন : طَائِفِيْنَ এবং عَاكِفِيْنَ -এর মাঝে একটিকে অপরটির সাথে عَطْف করে لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ বলা হলো কিন্তু اَلرُّكَّعِ السُّجُوْدِ -এর মাঝে عَطْف -কে বর্জন করা হলো কেন?

উত্তর : তওয়াফ এবং ই'তিকাফ দুটি ভিন্ন ভিন্ন আমল। এজন্য وَاوْ عَاطِفَهْ -এর মাধ্যমে বলা হয়েছে। আর রুকু-সিজদা উভয়টি মিলে একটি ইবাদত। তাই একত্রে বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ جَمْعُ رَاكِعٍ وَسَاجِدٍ : অর্থাৎ رُكَّعٌ হলো رَاكِعٌ -এর বহুবচন। আর سُجُوْدٌ হলো سَاجِدٌ -এর বহুবচন। উভয়টি جَمْعُ تَكْسِيْر -এর শব্দ। আর পূর্বের طَائِفِيْنَ এবং عَاكِفِيْنَ উভয়টি ছিল جَمْعُ مُذَكَّرْ سَالِمْ এতে تَنْوِيْعٌ فِي الْمُضَاحَةِ তথা অলংকারিক সৌন্দর্য বিদ্যমান রয়েছে। অন্যথায় طَائِفِيْنَ ও عَاكِفِيْنَ -এর মতো رُكَّعٌ وَسُجُوْد -কেও رَاكِعِيْنَ ও سَاجِدِيْنَ আনা যেত।

এখানে আরও একটি প্রশ্ন হয় যে, দুটি جَمْعُ مُكَسَّر -কে দুই ওজনে কেন আনা হলো? **উত্তর :** এটিও বালাগাতের একটি ধরণ।

আরো ইশকাল হয় যে, দুটি ওজনের মধ্যে فُعُوْل -কে তথা سُجُوْد -কে পরে আনা হলো কেন?

উত্তর : প্রথম জবাব হলো রুকু আগে হয় এবং সেজদা পরে হয়। তাই سُجُوْد -কে পরে আনা হয়েছে। দ্বিতীয় জবাব হলো رِعَايَت فَاصِلَهْ তথা আয়াতের শেষ শব্দের মিল রাখতে গিয়ে এমনটি করা হয়েছে। কেননা এ আয়াতের পূর্বাপর এমন শব্দ দিয়ে শেষ হয়েছে। যার পূর্বের হরফটি মদের হরফ।

قَوْلُهُ الْمُصَلِّيْنَ : এটি اَلرُّكَّعُ السُّجُوْد -এর তাফসীর। মুফাসির (র.)-এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে جُزْ বলে كُلْ বুঝানো হয়েছে। সুতরাং مَجَازْ مُرْسَلْ হিসেবে رُكَّعٌ سُجُوْد দ্বারা মুসল্লি উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন : رُكَّعٌ سُجُوْد দ্বারা যখন মুসল্লি উদ্দেশ্য তখন সরাসরি اَلْمُصَلِّيْنَ বললেই তো হতো। অধিকন্তু এটি সংক্ষেপও হতো। তা না করে اَلرُّكَّعِ السُّجُوْدِ বলা হলো কেন?

উত্তর : এভাবে বলে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মুসল্লির ঐ নামাজই গ্রহণযোগ্য যাতে রুকু এবং সিজদা রয়েছে। ইহুদিদের মতো রুকুহীন নামাজ গ্রহণযোগ্য নয়। এ ছাড়াও যেহেতু রুকু এবং সিজদা নামাজের দুটি বড় রোকন তাই বিশেষভাবে সেগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষার ব্যাখ্যা : এ পরীক্ষার উদ্দেশ্য কখনো পরীক্ষাদাতার ক্ষমতা ও যোগ্যতা সম্পর্কে অবগতি লাভ করা হয়ে থাকে। এটাতো আল্লাহ তা'আলার শানে প্রযোজ্য নয়। কেননা তিনি তো সর্বজ্ঞাত ও মহাবিজ্ঞ। হ্যাঁ, পরীক্ষার অন্য একটি উদ্দেশ্য এটাও হয় যে,অন্য অনবগত ব্যক্তি এ নিয়ামত বা পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির মর্যাদা ও স্তর এবং যোগ্যতা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। যাতে করে তাকে যে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে সেটাকে লোকেরা অযথা মনে না করে। আর যার পরীক্ষা নেওয়া হয় সে যদি অযোগ্য বা অপারগ হয়। তবে সে নিজেও নিজ বিবেক দ্বারা ইনসাফ করতে পারবে এবং অন্যরাও তার সাথে যে আচরণ করা হয়েছে, সেটাকে অন্যায় হিসেবে গণ্য না করতে পারে।

সুতরাং এ স্থানে এবং কুরআনের অন্যান্য স্থানে যেখানেই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কাউকে পরীক্ষা করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে, এর দ্বারা এ অর্থই উদ্দেশ্য হবে। –[কামালাইন খ. ১, পৃ. ১৩৫]

হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর পরীক্ষা : সে পরীক্ষা হয় তো উল্লিখিত বিধানাবলির ব্যাপারে ছিল যে, দেখা যাক কতটুকু পর্যন্ত এগুলোর ব্যাপারে তিনি সফলকাম হতে পারেন। অথবা মহব্বতের পরীক্ষা উদ্দেশ্য ছিল যে, জীবনের বড় কঠিন চক্কর ও দুষ্কর স্থানগুলো এসেছে। শৈশবকাল থেকেই তাওহীদের [আল্লাহর একত্ববাদের] বাসনা অন্তরে জন্মেছে তখন ঘরের লোকজন ও গোত্রের লোকদের সাথে কঠোর বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে, তারপর বয়স বৃদ্ধির পর নবুয়ত দ্বারা সম্মানিত হয়েছেন। তখন জাতি ও দেশবাসীর সাথে দ্বন্দ্ব হয়েছে এবং নমরূদের অপশক্তির সাথে মোকাবিলা হয়েছে যে মোকাবিলায় প্রাণের বাজি লাগানো হয়েছে। এক সময় এখনও এসেছে যে, নিজ স্ত্রী ও সম্মানের উপর আঘাত এসেছে। তারপর সবচেয়ে বড় পরীক্ষা এটা এসেছে যে, বার্ধক্যকালে নিজ প্রাণ ও সম্পদের চেয়ে অধিক প্রিয় স্নেহের সন্তান আর তাও একমাত্র এবং অতি আদরের দুলাল, যাকে জীবনের একমাত্র মূলধন বলা যায়– তাকে কুরবানির স্থানে উপঢৌকন দিতে হয়েছে। হ্যাঁ, জমানা স্বচোখে দেখেছে যে, এক একটি করে সবগুলো পরীক্ষায় আল্লাহর খলীল হযরত ইব্রাহীম (আ.) সফলকাম হয়েছেন। হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর বিয়ে আপন চাচাতো বোন হারুন এর কন্যা হযরত সারা (আ.)-এর সাথে হয়েছে এবং মিশরের তৎকালীন বাদশাহ রাকইউন -এর কন্যা হাজেরা (আ.)-এর সাথে হয়েছে।

হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর ৯২ বছর বয়সে হযরত হাজেরার উদর থেকে হযরত ইসমাঈল (রা.) ভূমিষ্ট হয়েছেন। ১৭৫ বছর বয়সে হযরত ইব্রাহীম (আ.) ইন্তেকাল করেছেন। হযরত সারা (আ.) এর কবরের পার্শ্বেই তাকে দাফন করা হয়েছে। –[প্রাগুক্ত]

اِمَامَتْ كُبْرٰى -এর অর্থ : এ পরীক্ষা যদি নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে হয়ে থাকে, তবে ইমামতে কুবরা দেওয়ার অর্থ নবুয়ত দ্বারা সম্মানিত করা হবে। যেমন বলা যায় যে, ইতিপূর্বে তো হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর কাছে ওহী এসেছিল। কিন্তু এর তাবলীগ বা প্রচার এবং নবুয়তের দায়িত্ব পালনের আদেশ এখন এসেছে। আর যদি এ পরীক্ষা নবুয়তপ্রাপ্তির পর হয়ে থাকে, তবে ইমামতে কুবরা এর অর্থ এ হবে যে, তাঁর নবুয়তের সীমাকে প্রশস্ত করে দেওয়া হবে। তাঁর নবুয়তকে স্বীকারকারী পৃথিবীর আনাচ-কানাচের লোকেরা হবে এবং অন্যান্য ধর্মের লোকেরাও তাঁর মতাদর্শের সামনে মাথা নত করবে। –[প্রাগুক্ত]

মু'তাযিলা ও রাওয়াফিজ সম্প্রদায়ের আকিদা ও প্রমাণাদি : মু'তাযিলা সম্প্রদায় لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِيْنَ বাক্য দ্বারা ফাসিক [পাপাচারী] ইমাম হওয়ার যোগ্য নয় এ ব্যাপারে দলিল পেশ করছে।

আহলে বায়ত -এর ইমামগণ নিষ্পাপ হওয়ার ব্যাপারে রাওয়াফিয ও শীয়া সম্প্রদায় উক্ত বাক্য দ্বারা দলিল পেশ করেছে।

রাওয়াফিযদের বিশ্বাস হচ্ছে ইমামতি আল্লাহ তা'আলা কার্যাবলির সিফতসমূহ থেকে। তাই তারা ইমাম নিষ্পাপ হওয়াকে অপরিহার্য মনে করে। অথচ দুটি কথাই ভুল।

اِمَامَتْ দ্বারা উদ্দেশ্য যদি প্রচলিত অর্থ হয়। তবে তো ظَالِمْ দ্বারা উদ্দেশ্য কাফের ও মুশরিক। আর আয়াতের অর্থ হবে কোনো কাফের মুসলমানের ইমাম বা পথপ্রদর্শক ও শাসক হতে পারে না। আর اِمَامَتْ দ্বারা উদ্দেশ্য যদি اِمَامَتْ كُبْرٰى অর্থাৎ নবুয়ত ও রিসালত এর দায়িত্ব নেওয়া হয়, তবে ظَالِمْ নিজ সাধারণ অর্থে থেকে যাবে এবং এর দ্বারা عِصْمَتْ اَنْبِيَاءْ প্রমাণিত হবে, যা সর্বসম্মত। অর্থাৎ নবীর জন্য সম্ভব নয় যে, তিনি জালিম ও ফাসিক হবেন। এটা মুতাযিলা সম্প্রদায়ের দলিলের উত্তর।

আর আহলে বায়ত-এর ইমামগণের নিষ্পাপ হওয়ার ক্ষেত্রে উত্তর হচ্ছে এটা যে, "عَهْد" শব্দটি যা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ইমামতে কুবরা আল্লাহ তা'আলা -এর সম্পর্ক স্বয়ং নিজের দিকে করেছেন। বলার অবকাশ রাখে না যে, এটাই হচ্ছে নবুয়তের দায়িত্ব যা আল্লাহর পক্ষ থেকে উপঢৌকন স্বরূপ অর্পণ করা হয়।

আর যদি এর দ্বারা শুরা কর্তৃক অর্পিত ইমামতির দায়িত্ব উদ্দেশ্য হয়, তবে সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়; বরং উপদেষ্টা পরিষদের পক্ষ থেকে নির্দিষ্টকৃত হয়। মোটকথা উক্ত আয়াত দ্বারা আম্বিয়া (আ.) নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়টি তো স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে। কিন্তু اِمَامَتْ صُغْرٰى [মজলিসে শুরার পক্ষ থেকে অর্পিত ইমামতির দায়িত্ব] বা اِمَامَتْ كُبْرٰى অর্থাৎ হুকুমত ও রাজত্ব [দেশের রাজা বা রাষ্ট্রনায়ক] এর নিষ্পাপ হওয়া এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে না।

পয়গাম্বরগণ (আ.)-এর ইসমত বা নিষ্পাপতা : আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে পয়গাম্বরগণ (আ.) নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে ও পরে সর্বপ্রকার ছোট ও বড় গুনাহসমূহ থেকে [যা ইচ্ছাকৃত হয়ে থাকে] পবিত্র। মু'তাযিলা সম্প্রদায়ও এ ব্যাপারে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতের সাথে একমত পোষণ করেছে। কিন্তু নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বেই নবীর দ্বারা কিছু ছোট গুনাহ হয়ে যাওয়া কেউ কেউ জায়েজ মনে করেছেন। অথবা স্খলন, ত্রুটি, ভ্রান্তি এবং ইজতেহাদী পদচ্যুতিসমূহ কতক মুহাক্কিগণের মতে ওগুলোর উপর পয়গাম্বরকে স্থায়ী রাখা হয় না; বরং সাথে সাথে সতর্ক করে দিয়ে তা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু শীয়া সম্প্রদায়ের আকিদা বা বিশ্বাসের উপর হতবুদ্ধিতা প্রকাশ পাচ্ছে যে, তারা এক দিকে আম্বিয়া (আ.)-কে সমস্ত গুনাহ থেকে পবিত্র মানে। আর অপর দিকে ধার্মিকতা তাদেরকে কুফরি করারও অনুমতি দেয়।

নবীগণ (আ.)-এর পবিত্রতার পরিপন্থি ঘটনাবলির তাৎপর্য : যখনি কোনো কথা প্রকাশ্যভাবে নবীগণের পবিত্রতার বিরোধী বুঝা যাবে, তখন সে ব্যাপারে নিম্নোক্ত তিনটি পদ্ধতিতে নির্দেশনা চালু করা হবে–

১. যদি সেটা খবরে ওয়াহেদ হয়। যেমন হযরত ইব্রাহীম (আ.) বিশেষ কোনো এক স্থানে নিজ স্ত্রীকে 'বোন' বলে আখ্যায়িত করা। তবে নবীগণের পবিত্রতার অকাট্য আকিদার মোকাবিলায় সে ব্যাপারটিকে প্রত্যাখ্যান করা হবে।

২. আর যদি নকলে মুতাওয়াতিরের সাথে সে ঘটনা প্রমাণিত হয়, তবে সে অকাট্য আকিদাকে অটল রাখার জন্য সে ঘটনাকে বাহ্যিক অর্থ থেকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

৩. অথবা উক্ত কথা বা ঘটনাকে উত্তম পদ্ধতির পরিপন্থি এবং নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বের ঘটনা বলে বিবেচিত করা হবে। যেমন– হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-এর নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণের ঘটনা। তিনি সে নিষেধাজ্ঞাকে সহানুভূতিসুলভ নিষেধাজ্ঞা মনে করেছেন অথবা নাহীয়ে তানযীহী হিসেবে বিবেচনা করেছেন। কিংবা তার দ্বারা ভুলে এমন হয়ে গিয়েছিল বা এ ঘটনা নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বের ছিল। এ ধরনের সকল সম্ভাব্য নির্দেশনা এতে হতে পারে।

অথবা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ এবং اِنِّىْ سَقِيْمٌ বলাটা কোনো ক্ষেত্রে রূপক কিংবা নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বের ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

কিংবা হযরত মূসা (আ.) যে এক কিব্তীকে মেরে ফেলেছিলেন, সেটাকে নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে অথবা অনিচ্ছার উপর বিবেচনা করা হবে।

কিংবা হযরত দাউদ (আ.) সে মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন যাকে বিয়ে করার জন্য আওরিয়া নামক ব্যক্তি প্রস্তাব দিয়েছিল। আর এমন অন্যের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেওয়া মহিলাকে অপর যে কোনো পুরুষ বিয়ে করতে পারে। এতে কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, অন্যের বিবাহিতা স্ত্রীকে অপর কারো জন্য বিয়ে করা জায়েজ নেই বরং হারাম।

অথবা হযরত সোলায়মান (আ.)-এর আছরের নামাজ ছুটে যাওয়া তিনি ভুলে গিয়েছিলন হিসেবে বিবেচিত হবে।

হযরত ইউনুস (আ.) নিজ ক্বওমের উপর অধিক ক্রোধ হওয়া কিংবা নবী করীম ﷺ হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা.)-এর প্রতি আন্তরিকভাবে ধাবিত হওয়া অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়েছিল। যা ক্ষমার যোগ্য কিংবা এ ঘটনার সত্যতাকে অস্বীকার করা হবে ইত্যাদি-ইত্যাদি। –[কামালাইন খ. ১, পৃ. ১৩৭]

আল্লাহ তা'আলার শাহী, পবিত্র স্থান ও তার বিধানাবলি : 'মাকামে ইব্রাহীম' একটি বিশেষ পাথর, যার উপর দাঁড়িয়ে হযরত ইব্রাহীম (আ.) নির্মাণ কাজ করেছিলেন। সে স্থানকে দু' কারণে নিরাপত্তার স্থান বলা হয়েছে। এক তো হজের কার্যাবলি আদায়ের কারণে, যেগুলোর মধ্যে এ স্থানটিও গণ্য, পরকালের আজাব থেকে নিরাপদে থাকবে। দ্বিতীয়ত ইহজগতের নিরাপত্তাও উদ্দেশ্য। হেরেম এর সীমার ভিতরে কোনো বড়র চেয়ে বড় অপরাধী ও খুনী [কোনো এক মুফাস্সির (র.)-এর বক্তব্য অনুযায়ী] এমন কি! নিজ পিতার হত্যাকারীও যদি প্রবেশ করে, তবে সেই শুধু জানের নিরাপত্তা পাবে এমন নয়; বরং আল্লাহ তা'আলার সে শাহী, পবিত্র স্থানে ও আশ্রয়ের স্থানে সকল প্রাণী এবং বৃক্ষ-তরুলতারও নিরাপত্তা রয়েছে। হত্যাকারী অপরাধী থেকে হেরেম -এর সীমার ভিতরে কিসাস বা প্রতিশোধ নেওয়া যায় না। এদের জন্য প্রাণের ক্ষমা রয়েছে। হ্যাঁ, তার পানাহারের পণ্য সামগ্রীর সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হবে। যাতে করে সে স্বয়ং সেখান থেকে বের হয়ে আসতে বাধ্য হয়। তখন তাকে বন্দি করে কিসাস নেওয়া যাবে। অন্যান্য অপরাধীদের ক্ষেত্রে বিধানাবলি ভিন্ন রয়েছে। উপরিউক্ত ব্যাখ্যাটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে।

অন্যান্য ইমামগণের ভিন্ন মতামত রয়েছে। যার ব্যাখ্যা وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا আয়াতের অধীনে আসবে। আর এখানে আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য নিরাপত্তার বিধানাবলি বর্ণনা করা। এখন যদি কোনো জালিম ইনসাফকে ধ্বংস করে এবং বিধানাবলিকে ভঙ্গ করে কখনো নিরাপত্তায় বিঘ্নতা সৃষ্টি করে তবে এর দ্বারা বিধানাবলির কিছু আসে যায় না।

মসজিদে হারাম -এর সীমা ও বিধানসমূহের উপর কিয়াস করে কেউ কেউ হারামে মদীনার বিধান এবং সীমাসমূহ ও নির্ধারণ করেছেন। যার ব্যাখ্যাসমূহ কালাম ও ফিক্বহ শাস্ত্রের দিকে লক্ষ্য করলে জানা সম্ভব হতে পারে। –[প্রাগুক্ত]

অনুবাদ :

١٢٦. وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْمَكَانَ بَلَدًا اٰمِنًا ذَا اَمْنٍ وَقَدْ اَجَابَ اللّٰهُ دُعَاءَهٗ فَجَعَلَهٗ حَرَمًا لَا يُسْفَكُ فِيْهِ دَمُ اِنْسَانٍ وَلَا يُظْلَمُ فِيْهِ اَحَدٌ وَلَا يُصَادُ صَيْدُهٗ وَلَا يُخْتَلٰى خَلَاهُ وَارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ وَقَدْ فَعَلَ بِنَقْلِ الطَّائِفِ مِنَ الشَّامِ اِلَيْهِ وَكَانَ اَقْفَرُ لَا زَرْعَ فِيْهِ وَلَا مَاءَ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط بَدَلٌ مِنْ اَهْلِهٖ وَخَصَّهُمْ بِالدُّعَاءِ لَهُمْ مُوَافَقَةً لِقَوْلِهٖ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظّٰلِمِيْنَ قَالَ تَعَالٰى وَ ارْزُقْ مَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ فِى الدُّنْيَا بِالرِّزْقِ قَلِيْلًا مُدَّةَ حَيَاتِهٖ ثُمَّ اَضْطَرُّهٗ اُلْجِئُهٗ فِى الْاٰخِرَةِ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ ط فَلَا يَجِدُ عَنْهَا مَحِيْصًا وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ . اَلْمَرْجِعُ هِىَ .

১২৬. স্মরণ কর যখন ইবরাহীম বলেছিল হে আমার প্রতিপালক! এটাকে এই স্থানটিকে নিরাপদ নগরে অর্থাৎ নিরাপত্তার অধিকারী এক নগরে পরিণত কর আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এই দোয়া কবুল করেছিলেন। এর ফলশ্রুতিতে তিনি এই শহরটিকে হারাম [হত্যা ও বিশৃঙ্খলা যে স্থানে অবৈধ] রূপে নিরূপণ করেন। সুতরাং এইস্থানে কোনো মানুষের রক্ত প্রবাহিত করা, কারো উপর নিগ্রহ চালানো কোনো পশু শিকার করা, সজীব ঘাস উৎপাটন করা বৈধ না। আর তার অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করবে তাদেরকে ফল-ফলাদি দিয়ে রিজিক প্রদান করুন আল্লাহ তা'আলা এটাও কবুল করেছিলেন। মক্কা শস্যপত্রহীন, পানিশূন্য এক অনুর্বর বিরান ভূমি ছিল। তায়িফ ভূমিতে উর্বর শাম বা সিরিয়া অঞ্চল হতে এইস্থানে উঠিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল।

مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ বাক্যটি -اَهْلَهٗ -এর بَدَل বা স্থলাভিষিক্ত পদরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

পূর্বোল্লিখিত لَا يَنَالُ عَهْدِ الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ আমার প্রতিশ্রুতি সীমালঙ্ঘনকারীদের প্রতি প্রযোজ্য না এই আয়াতের মর্মের প্রতি লক্ষ্য করে তিনি [হযরত ইবরাহীম (আ.)] এই দোয়ায় কেবল মু'মিনের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বললেন, আর যে কেউ সত্য প্রত্যাখ্যান করবে, তাকেও জীবনোপকরণ দান করব। অনন্তর কিছুকালের জন্য অর্থাৎ জীবনকালের জন্য দুনিয়ার রিজিক দান করত জীবনোভোগ করতে দিব। অতঃপর তাকে পরকালে জাহান্নামের শাস্তির দিকে বাধ্য করে জবরদস্তি করে নিয়ে যাব। তারা এটা হতে আর কোনো মুক্তির জায়গা পাবে না। আর এটা কত নিকৃষ্ট পরিণাম। এটা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তস্থল।

اُمَتِّعُهٗ ক্রিয়াটির ت টি তাশদীদ বা রূঢ় ও তাখফীফ বা লঘু [তাশদীদ ব্যতিরেকে] উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ رَبِّ : মূলত শব্দটি يَا رَبِّىْ ছিল। শুরুতে حَرْفُ نِدَا يَاءَ এবং শেষের يَاءُ مُتَكَلِّمْ হযফ করা হয়েছে। رَبِّ হয়ে গেছে।

قَوْلُهٗ ذَا اَمْنٍ : এ ইবরাত দ্বারা মুফাসসির (র.) একটি سُوَالْ مُقَدَّرْ -এর জবাব দিয়েছেন। **প্রশ্নটি হলো** এখানে শহরের দিকে اَمْن বা নিরাপত্তার নিসবত করা হয়েছে অথচ নিরাপত্তার অধিকারী শহর হয় না; বরং শহরের অধিবাসীরা হয়ে থাকে।

জবাব : এখানে اِسْمُ فَاعِلْ টি صِيْغَةُ النِّسْبِىْ তথা فَاعِلْ ذِىْ كَذَا -এর জন্য ব্যবহৃত। **অর্থাৎ** ذَا اَمْنٍ কেউ কেউ বলেন- এখানে اِسْنَادْ مَجَازِىْ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَارْزُقْ : মুফাসসির (র.) এখানে وَارْزُقْ উহ্য ধরে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, مَنْ كَفَرَ এটি مَحَلًّا مَنْصُوْب এবং فِعْل مَحْذُوْف -এর মাফঊল এবং তার عَطْف হয়েছে مَنْ اٰمَنَ -এর উপর–

اَىْ وَارْزُقْ مَنْ كَفَرَ لِاَنَّ الرِّزْقَ نِعْمَةٌ دُنْيَوِيَّةٌ تَعُمُّ الْمُؤْمِنَ وَالْكَافِرَ بِخِلَافِ الْاِمَامَةِ .

অর্থাৎ পার্থিব নিয়ামত তথা রিজিকে কাফেরকেও শামিল করা হয়েছে। পক্ষান্তরে ইমামত বা নবুয়তের নিয়ামত মুমিনদের জন্যই খাস।

قَوْلُهُ بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ : অর্থাৎ فَاُمَتِّعُهُ -এর মাঝে দুটি কেরাত রয়েছে। একটি তাশদীদ দিয়ে, এটি জমহুরের কেরাত। অপরটি তাখফীফ করে। এটি ইবনে আমেরের কেরাত। প্রথম সূরতে بَابُ تَفْعِيْل থেকে مُضَارِعْ مُتَكَلِّمْ -এর সীগাহ। দ্বিতীয় সূরতে بَابُ اِفْعَال থেকে।

اَضْطَرُّهُ : اِضْطِرَارٌ হলো اِخْتِيَارٌ -এর বিপরীত। اِضْطِرَارٌ বলা হয় কারো থেকে কোনো কর্ম তার ইচ্ছা ছাড়া সংঘটিত হওয়া। যেমন ছাদ থেকে পড়ে যাওয়া। অনুরূপভাবে এমন স্থানেও اِضْطِرَارٌ ব্যবহৃত হয় যেখানে কাজটি নিজেই করে; কিন্তু তা থেকে বিরত থাকা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। বাধ্য হয়ে তা গ্রহণ করে। যেমন প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত অবস্থায় মৃত জন্তু ভক্ষণ করা।

قَوْلُهُ اُلْجِئُهُ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এখানে اِضْطِرَارٌ মাজাযী বা রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ فَلَا يَجِدُ عَنْهَا مَحِيْصًا : يَجِدُ -এর ضَمِيْر مُسْتَتِرْ - مَنْ -এর দিকে ফিরেছে এবং عَنْهَا -এর ضَمِيْر مَجْرُوْر টি اَلنَّارُ -এর দিকে ফিরেছে। مَحِيْص ইসমে জরফের সীগাহ। অর্থ– পলায়নের স্থান।

قَوْلُهُ اَلْمَرْجِعُ هِىَ : মুফাসসির (র.) এখানে هِىَ মাহযুফ ধরে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে مَخْصُوْصٌ بِالذَّمِّ উহ্য রয়েছে। আর সেটি হলো اَلنَّارُ -

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا الخ : **যোগসূত্র** : পূর্বে কা'বাগৃহের মর্যাদা-ফজিলত শ্রেষ্ঠত্ব এবং ইবরাহীম (আ.)-এর ইবাদতগৃহ হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। এখন এ আয়াতে সে শহর এবং শহরের অধিবাসীদের ব্যাপারে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়ার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও পূর্বে পরকাল সংক্রান্ত দোয়া ছিল আর এখানে পার্থিব নিয়ামত তথা রিজিকের দোয়া করা হয়েছে।

قَوْلُهُ هٰذَا الْمَكَانَ : মুফাসসির (র.) هٰذَا -এর مُشَارٌ اِلَيْهِ নির্ণয় করে এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে যে দোয়া করা হয়েছে তা শহর হওয়ার পূর্বেকার। এখানে শহর আবাদ হওয়া এবং সেই সাথে নিরাপত্তার দোয়াও করা হয়েছে। পক্ষান্তরে অপর আয়াতে যে اِجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا রয়েছে। সেখানে শুধু নিরাপত্তার জন্য দোয়া করা হয়েছে। কেননা সেটি শহর আবাদ হওয়ার পরের দোয়া। এজন্য সেখানে هٰذَا الْبَلَدَ এবং এ আয়াতে هٰذَا بَلَدًا বলা হয়েছে। সুতরাং বুঝা গেল, উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন দোয়া। কেউ কেউ উভয়টি একই দোয়া মনে করেছেন।

قَوْلُهُ اٰمِنًا : এখানে ইশকাল হয় যে, আল্লাহ তা'আলা তো পূর্বেই নিরপত্তার ঘোষণা দিয়ে বলেছেন– اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا তারপরও اَمْن নিরাপত্তার জন্য দোয়া করার কারণ কি?

উত্তর : পূর্বের নিরাপত্তা দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল اَلْاَمْنُ مِنَ الْاَعْدَاءِ وَالْخَسْفِ وَالْمَسْخِ তথা শত্রু, ধসে যাওয়া এবং বিকৃতি থেকে নিরাপত্তা। আর এখানে উদ্দেশ্য اَلْاَمْنُ مِنَ الْجَدْبِ وَالْقَحْطِ অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ ও অভাব অনটন থেকে নিরাপত্তা। তাইতো বলা হয়েছে– وَارْزُقْ اَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ -এর অধিকারীকে ফল-ফলাদি দ্বারা রিজিকের ব্যবস্থা করুন!

قَوْلُهُ فَجَعَلَهُ حَرَمًا : অর্থাৎ মক্কা শহর নিরাপদ হওয়ার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলা সে শহরকে হরম বানিয়েছেন। যেখানে কোনো মানুষের রক্ত ঝরবে না এবং কারো উপর জুলুম হবে না। সে শহরের ঘাস কর্তন করা যাবে না। কোনো শিকার ধরা যাবে না ইত্যাদি।

قَوْلُهُ لَا يَسْفِكُ فِيْهِ دَام اِنْسَان : এক্ষেত্রে মাসআলা হলো– যদি কেউ হরমের বাইরে হত্যা করে হরমে প্রবেশ করে, তাহলে হানাফী মাযহাব মতে তাকে হত্যা করা হবে না; কিন্তু তাকে সেখান থেকে বের হওয়ার জন্য বাধ্য করা হবে। খানাপিনাসহ আরাম-আয়েশের সামগ্রী বন্ধ করে দেওয়া হবে, যাতে সে হরম থেকে বের হতে বাধ্য হয়। সে বের হলে বাইরে গিয়ে তার কিসাস সম্পন্ন করা হবে।

শাফেয়ী মাযহাব মতে বাহির থেকে হরমে কিসাস নেওয়া হবে। আর যদি হরমের ভিতরেই হত্যা করে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে কিসাস গ্রহণ করা হবে। –[জামালাইন খ. ১, পৃ. ১৫৭]

قَوْلُهُ وَلَا يُصَادُ صَيْدُهُ : صَيْد শব্দটি **مَصِيْد**-এর অর্থে। صَيْد দ্বারা مُوْذِى বা ক্ষতিকর জন্তু খারেজ হয়ে গেছে। অর্থাৎ ক্ষতিকর প্রাণীকে মারা যাবে। যেমন– কাক, চিল, বিচ্ছু। এমনিভাবে যে প্রাণীকে মানুষ লালন পালন করে সেগুলোও খারেজ। যেমন– উট, গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি। এগুলো জবাই করা জায়েজ আছে।

قَوْلُهُ وَلَا يُخْتَلٰى خَلَاهُ : অর্থাৎ তার ভিজা ঘাস কর্তন করা যাবে না। এ ব্যাপারে মাসআলা হলো আহনাফের মতে যে সকল বৃক্ষ বা লতা পাতা নিজে নিজে জন্মে সেগুলো কাটা জায়েজ নেই। যেগুলো শুকিয়ে যায় বা ভেঙ্গে যায় তা কর্তন করা যাবে এবং বিশেষভাবে ইযখির ঘাস কাটার অনুমতি রয়েছে।

قَوْلُهُ وَقَدْ فَعَلَ بِنَقْلِ الطَّائِف : অর্থাৎ ইবরাহীম (আ.)-এর এ দোয়াটিও কবুল হয়েছিল। তাই তো আল্লাহ তা'আলা তায়েফকে শাম থেকে স্থানান্তরিত করে মক্কার অদূরে এনে আবাদ করে দিয়েছেন। এতো হলো একটি ব্যবস্থা। এছাড়াও আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চল হতে ফলমূল সারা বছর মক্কায় আসার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ بِنَقْلِ الطَّائِف : বর্ণিত আছে, যখন হযরত ইবরাহীম (আ.) দোয়া করে ছিলেন তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরীল (আ.)-কে শামের একটি অঞ্চলকে স্থানান্তরিত করে মক্কায় আনার হুকুম দিলেন। হযরত জিবরীল (আ.) শামের একটি উর্বর ভুখণ্ড তুলে এনে প্রথমে কাবা ঘরের চতুর্পার্শ্বে সাতবার তওয়াফ করালেন তারপর মক্কার অদূরে একটি স্থানে রেখে দিলেন। যাকে তায়েফ বলা হয়।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া ও তার বাস্তবতা : হযরত ইবরাহীম (আ.) এসব দোয়া বিস্ময়কর রূপে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে। প্রথম দোয়া ছিল মক্কা নগরীতে নিরাপত্তা সমৃদ্ধ করে দেওয়া। চারিদিকে লুটেরা ও খুনীদের অবাধ রাজত্ব, লুটতরাজ ছিনতাই ও খুন-খারাবি যেখানে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। যাতায়াত ও যোগাযোগের মাধ্যম একান্ত সীমিত ও বিপদসঙ্কুল; পথের কোনো নিরাপত্তা নেই, তদুপরি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে হজযাত্রী ও পুণ্যার্থীদের বিরামহীন আগমন। সময়ের ব্যবধানে সেখানেই এমন আমূল পরিবর্তন হয়েছে যে, শান্তি ও নিরাপত্তার মানদণ্ডে বর্তমান মক্কা ও তার পরিপার্শ্ব এলাকা নিজেই নিজের তুলনা। না আছে ডাকাতির নামগন্ধ, না আছে কাফেলা লুণ্ঠনের ঘটনা, না আছে ছটফট করা লাশের করুণ ও বিভৎস দৃশ্য। ইসলামি শরিয়তে তো শহরও শহরতলীকে হারাম ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ এ চতুঃসীমার মাঝে কোনো প্রাণীকেও শিকার করা যায় না। কোনো খুনী ব্যক্তিও কাবা ঘরে এসে আশ্রয় নিলে তাকে সেখানে হত্যা করা যায় না। মক্কা নগরী ও কাবা ঘরের এ মর্যাদা জাহেলী যুগের লোকরাও রক্ষা করে চলেছে।

দ্বিতীয় দোয়া ছিল মক্কাবাসীরা যেন ফলফলাদি খাদ্যরূপে পেতে থাকে। মক্কা এমন একটি ভূখণ্ডে অবস্থিত, যেখানকার সব ভূমি হয়ত ধু ধু বালুকাময় কিংবা কঠিন পাথুরে। বৃষ্টির পরিমাণ অতি অল্প। মোটকথা তাজা ফল ও ফলদার গাছ তো দূরের কথা, সাধারণ ফল, ফুলের গাছ বরং সবুজ ও তাজা ঘাস পর্যন্ত দেখা যায় না। এটি পানি ও আর্দ্রতাবিহীন এক ভুখণ্ড। কোথাও সমতল মরু। কোথাও পাহাড়-টীলার সারি। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও যত পরিমাণ তাজা ফলমূল, তরিতরকারী ও শস্য-ফসলের চাহিদা হোক তা আপনি শহর এলাকায় খরিদ করতে পারেন।

এইমাত্র হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে বলা হয়েছিল যে, বিশেষ মেহেরবানি ও বরকতের বিশেষ অঙ্গীকার ঈমান ও পুণ্যকর্মের সাথে শর্তযুক্ত। এ শর্ত পূরণ ব্যতীত হবে না। (لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ (ايت ١٢٤ এখন পুনরায় দোয়া করার সময় নিজেই এ শর্ত জুড়ে দিলেন যে, নিরাপদ শহর আর ফলমূল দ্বারা রিজিক দানের বরকত শুধু ঈমানদার ও আনুগত্যকারীদের জন্য কাম্য ও কাঙ্ক্ষিত।

মহান নবীগণের আদব ও শিষ্টাচার পালনের অতুলনীয় পরাকাষ্ঠা লক্ষণীয় যে, আল্লাহ তা'আলা তো শুধু এতুটুকু বলেছিলেন যে, ইমামত ও নেতৃত্ব ঈমানদার ও আনুগত্যশীলদের জন্য নির্দিষ্ট। মহান আল্লাহ এ ইঙ্গিতের মান রক্ষার্থে পার্থিব সম্মান ও উপভোগকেও ঈমানদার ও আনুগত্যশীলদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিলেন। অথচ এটির সম্পর্কে প্রতিপালন [রবুবিয়্যাত] -এর সঙ্গে, যা এ জগতে মু'মিন ও কাফের নির্বিশেষে সকলের জন্য ব্যাপক। তাফসীরে বায়যাবীতে রয়েছে–

فَنَبَّهَ سُبْحَانَهُ عَلٰى اَنَّ الرِّزْقَ رَحْمَةٌ دُنْيَوِيَّةٌ فَعَمَّ الْمُؤْمِنَ وَالْكَافِرَ بِخِلَافِ الْاِمَامَةِ وَالتَّقَدُّمِ فِى الدِّيْنِ . অর্থাৎ মহান আল্লাহ তা'আলা বাতলে দিলেন যে, রিজিক একটি পার্থিব দয়া, সুতরাং তা মু'মিন ও কাফের সকলের জন্য পরিব্যাপ্ত। ইমামত ও ধর্মীয় অগ্রবর্তিতা এর বিপরীত। –[বায়যাবী সূত্রে তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ২৩৫]

قَوْلُهُ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ : ঈমান সংশ্লিষ্ট দুটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। ১. আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান ও আখিরাতের প্রতি ঈমান। এ দুটির অন্তর্ভুক্ত হয়ে ঈমানের অন্যান্য জরুরি অঙ্গও উল্লিখিত হয়ে গিয়েছে। যেখানেই ঈমানের উল্লেখ হবে সেখানেই তার সংশ্লিষ্ট সবকিছু স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষরূপে উল্লেখ করতে হবে– এটা মোটেই আবশ্যকীয় নয়। যেহেতু আল্লাহ তা'আলার প্রতি ও আখিরাতের প্রতি ঈমান ঈমানযোগ্য সকল বিষয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে, তাই এ দুটির উল্লেখেই সীমিত রাখা হয়েছে। কেননা اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ -এর মাঝে مَبْدَأٌ -এর আলোচনা রয়েছে এবং يَوْمِ اٰخِر -এর সাথে مَعَادٌ -এর আলোচনা রয়েছে।

قَوْلُهُ قَلِيْلًا : কিছুদিন দ্বারা এখানে আজীবন উদ্দেশ্য। কেননা আখিরাতের জীবনের তুলনায় দুনিয়ায় জীবন অল্প ও নগণ্যই হয়ে থাকে। আয়াতের মর্মার্থ এই যে, করুণা ঈমানদার ও হেদায়েত অনুসারীদের জন্য নির্দিষ্ট এবং যা থেকে কাফের ও ভ্রান্তপন্থিরা বঞ্চিত থাকবে, তার সম্পর্ক ধর্মীয় নেতৃত্ব ও পরকালীন কল্যাণের সঙ্গে। আর এ পার্থিব দান-দাক্ষিণ্য, লাভালাভ এবং অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান ইত্যাদি থেকে কাফের ও ঈমান অস্বীকারকারীদেরও বঞ্চিত করা হবে না। কেননা রবুবিয়্যাত ও প্রতিপালন বিধির চাহিদাই অবিকল এরূপ।

قَوْلُهُ مُدَّةَ حَيَاتِهِ : মুফাসসির (র.) এ অংশটুক বৃদ্ধি করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, قَلِيْلًا তরকীবে مَفْعُوْل فِيْهِ হিসেবে মানসূব হয়েছে। اَىْ زَمَانًا قَلِيْلًا وَمُدَّةُ حَيَاتِهِ

অর্থাৎ রিজিকের স্বল্পতার সূরত হলো আল্লাহ তা'আলা তাদের রিযিক দুনিয়ার জীবনের সাথে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন।

কেউ কেউ বলেন, قَلِيْلًا শব্দটি উহ্য মাসদারের সিফত হয়ে مَفْعُوْل مُطْلَق হিসেবে মানসূব হয়েছে। اَىْ مَتَاعًا قَلِيْلًا

قَوْلُهُ اَضْطَرُّهُ : জাহান্নামের মতো স্থানে কেউ তো আর সানন্দে যেতে প্রস্তুত হবে না, প্রত্যেককে টেনে-হিঁচড়েই নিতে হবে। পবিত্র কুরআন এখানে জাহান্নামীদের এ বাস্তব অবস্থার স্পষ্ট বিবরণ দিয়েছে জাহান্নামের ভয়াবহতা ও বিপদ সঙ্কুলতার চিত্র তুলে ধরার লক্ষ্যেই।

অনুবাদ :

١٢٧. وَ اذْكُرْ اِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِمُ الْقَوَاعِدَ الْاُسُسَ اَوِ الْجُدُرَ مِنَ الْبَيْتِ يَبْنِيْهِ مُتَعَلِّقٌ بِيَرْفَعُ وَاِسْمٰعِيْلُ عَطْفٌ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ يَقُوْلَانِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ط بِنَاءَنَا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ لِلْقَوْلِ الْعَلِيْمُ بِالْفِعْلِ ـ

১২৭. আর স্মরণ কর যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.) কাবাগৃহের বুনিয়াদ ভিত্তি বা দেয়ালসমূহ উঠাচ্ছিল অর্থাৎ তা স্থাপন করছিল তখন তারা বলেছিল, হে আমাদের প্রতিপালক! এই ভিত্তি নির্মাণ গ্রহণ কর, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা সকল কথার, ও সর্বজ্ঞ সকল কাজ সম্পর্কে।

مِنَ الْبَيْتِ বা مُتَعَلِّقٌ শব্দটি يَرْفَعُ ক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট اِسْمَاعِيْل শব্দটির সাথে اِبْرَاهِيْم -এর عَطْف বা অন্বয় হয়েছে।

١٢٨. رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ مُنْقَادَيْنِ لَكَ وَاجْعَلْ مِنْ ذُرِّيَّتِنَا اَوْلَادِنَا اُمَّةً جَمَاعَةً مُسْلِمَةً لَّكَ ص وَمِنْ لِلتَّبْعِيْضِ وَاَتٰى بِهٖ لِتَقَدُّمِ قَوْلِهٖ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ وَاَرِنَا عَلِّمْنَا مَنَاسِكَنَا شَرَائِعَ عِبَادَتِنَا اَوْ حَجِّنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ـ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ـ سَالَاهُ التَّوْبَةَ مَعَ عِصْمَتِهِمَا تَوَاضُعًا وَتَعْلِيْمًا لِذُرِّيَّتِهِمَا ـ

১২৮. হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত বাধ্যগত কর এবং আমাদের বংশধর সন্তানদের হতে তোমার অনুগত এক উম্মত জামাত গঠন করিও আর আমাদেরকে মানসিক ইবাদতের নিয়ম কানুন হজের বিধিবিধান দেখিয়ে দাও শিখিয়ে দাও, এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হও, তুমি অতি ক্ষমাপরবশ, পরম দয়ালু। তাঁরা মাসুম ও নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও বিনয় প্রকাশ এবং বংশধরগণকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এইস্থানে তওবা প্রার্থনা করছেন।

مِنْ ذُرِّيَّتِنَا -এর مِنْ শব্দটি تَبْعِيْضِيَّةٌ বা ঐকদেশিক। لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ সীমালঙ্ঘনকারীদের প্রতি আমার প্রতিশ্রুতি প্রযোজ্য না আল্লাহ তা'আলার এই উক্তি অনুসারে তারা এই স্থানে ইহার (مِنْ تَبْعِيْضِيَّةٌ) ব্যবহার করেছেন।

١٢٩. رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ اَيْ اَهْلِ الْبَيْتِ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَقَدْ اَجَابَ اللّٰهُ دُعَاءَهٗ بِمُحَمَّدٍ ﷺ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ الْقُرْاٰنَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ الْقُرْاٰنَ وَالْحِكْمَةَ مَا فِيْهِ مِنَ الْاَحْكَامِ وَيُزَكِّيْهِمْ ط وَيُطَهِّرُهُمْ مِنَ الشِّرْكِ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْغَالِبُ الْحَكِيْمُ فِىْ صُنْعِهٖ ـ

১২৯. হে আমাদের প্রতিপালক! প্রেরণ করিও তাদের নিকট তাদের নিজেদের মধ্য হতে এক রাসূল এই পরিবারের নিকট। হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে প্রেরণ করত আল্লাহ তা'আলা তার এই দোয়া কবুল করেছিলেন। যে তোমরা আয়াতসমূহ অর্থাৎ আল-কুরআন তাদের নিকট আবৃত্তি করবে, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত আল কুরআন ও উহার মধ্যস্থিত হুকুম আহকাম এবং বিধি-বিধানসমূহ শিক্ষা দিবে এবং তাদেরকে পবিত্র করবে। শিরক হতে সুপবিত্র করবে। নিশ্চয় তুমি পরাক্রমশালী অতিপ্রবল ও কাজে ও কৌশলে প্রজ্ঞাময়।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ عَطْفٌ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ جُمْلَةٌ : এ ইবারত এর মাধ্যমে একটি সন্দেহ দূর করা হয়েছে। সেটি হলো اِسْمٰعِيْلُ শব্দটি **مُسْتَأْنِفَةٌ** । কেননা যদি اِسْمٰعِيْلُ শব্দটি اِبْرٰهِيْمُ -এর সাথে **عَطْف** হতো তাহলে اِسْمٰعِيْلُ -কে اَلْقَوَاعِدَ তথা مَفْعُوْلٌ -এর পূর্বে আনা হতো।

উত্তর : মূলত اِسْمٰعِيْلُ -এর **عَطْف** - اِبْرٰهِيْمُ -এর সাথেই হয়েছে। তবে اِسْمٰعِيْلُ -কে مُؤَخَّرْ করার উদ্দেশ্যে এই যে, বস্তুত হযরত ইসমাঈল (আ.) কা'বার নির্মাতা ছিলেন না; বরং তিনি সহযোগী ছিলেন। নির্মাতা তো হলেন হযরত ইবরাহীম (আ.) যেহেতু নির্মাণ কাজে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এরও সম্পৃক্ততা ছিল তাই প্রকৃত নির্মাতার সাথে সহযোগীকে **عَطْف** করা হয়েছে।

بِنَاءَنَا : এর দ্বারা تَقَبَّلْ ফেলে মুতাআদ্দীর مَفْعُوْلٌ بِهٖ মাহযুফ থাকার প্রতি ইঙ্গিত করলেন।

قَوْلُهُ يَقُوْلَانِ : এ ফেয়েলটি বৃদ্ধি করে একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন : رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا এ অংশটি **اِبْرَاهِيْم وَ اِسْمَاعِيْل থেকে حَالٌ হয়েছে।** আর جُمْلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ কখনো حَالٌ হয় না।

উত্তর : উত্তরের সারকথা হলো তার পূর্বে يَقُوْلَانِ মাহযূফ আছে। যার কারণে তা جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ হয়ে গেছে। সুতরাং এ অবস্থায় حَالٌ হওয়া শুদ্ধ হয়েছে।

يَقُوْلَانِ উহ্য ধারার দ্বিতীয় কারণ এই যে যদি يقولان মাহযূফ না মানা হয়, তাহলে একই সম্বোধনে একই ব্যক্তির **عَطْف** ছাড়াই غَائِبٌ এবং مُتَكَلِّمٌ হওয়া লাজেম আসে। কেননা يَرْفَعُ اِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ الخ হলো غَائِبٌ আর رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا **হলো مُتَكَلِّمٌ الخ** সুতরাং যখন يَقُوْلَانِ মুকাদ্দার মানা হয়েছে তখন উভয় জুমলা غَائِبٌ হয়ে গেছে।

প্রশ্ন : اَرِنَا এটি رَاٰى থেকে নির্গত। যা দুটি مَفْعُوْلٌ দাবি করে। আর যখন بَابُ اِفْعَالٌ থেকে ব্যবহার করা হয়েছে তখন তো **তিনটি مَفْعُوْلٌ দাবি** করছে অথচ এখানে দুটি মাফউলই উল্লেখ আছে। একটি হলো نَا আর অপরটি হলো مَنَاسِكَ

উত্তর : اَرٰى - عَلِمَ وَاَبْصَرَ -এর অর্থে যা একটি مَفْعُوْلٌ দাবি করে। بَابُ اِفْعَالٌ থেকে ব্যবহৃত হওয়ায় দুটি মাফঊল দাবি করেছে। **বলাবাহুল্য** আয়াতে দুটি মাফউল বিদ্যমান আছে।

قَوْلُهُ مَنَاسِكَنَا : অর্থাৎ সাধারণ ধর্মীয় নীতিসমূহ এবং বিশেষত হজ ও [বায়তুল্লাহ] জেয়ারতের নিয়ামবলি ও নিদর্শনাবলি। আমাদের দীনের বিধিবিধান ও হজের নিদর্শনসমূহ (اَىْ شَرَائِعَ دِيْنِنَا وَاَعْلَامَ حَجِّنَا - مَعَالِم)

اَرِنَا এখানে **اِرَاءَةٌ** [দেখানো] ক্রিয়ামূল চোখে দেখিয়ে দেওয়ার অর্থে নয়; বরং শিখিয়ে দেওয়া ও বুঝিয়ে দেওয়ার অর্থে **অর্থাৎ** **عَلِّمْنَا وَعَرِّفْنَا** আমাদের শিখিয়ে দিন ও পরিজ্ঞাত করে দিন –[মা'আলিম]। **কেননা** رَاٰى ক্রিয়া দুটি **مَفْعُوْلٌ** -এর **দিকে** **مُتَعَدِّىْ** বা সম্প্রসারিত হলে তখন তার অর্থ দর্শন [দেখা-দেখানো] না হয়ে [প্রদর্শন বা] শিক্ষাদান করা হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ اَهْلَ الْبَيْتِ : এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে একটি سُوَالٌ مُقَدَّرٌ -এর জবাবে প্রদান করেছেন। প্রশ্ন : وَابْعَثْ فِيْهِمْ -এর **هُمْ** এর যমীরটি **ذُرِّيَّةٌ** -এর দিকে ফিরেছে। অথচ ذُرِّيَّةٌ হলো مُؤَنَّثٌ তাই فِيْهَا হওয়া উচিত ছিল।

উত্তর : এখানে ذُرِّيَّةٌ দ্বারা **اَهْلُ الْبَيْتِ** উদ্দেশ্য। সুতরাং কোনো আপত্তি বাকি থাকে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ الخ : এখান থেকে কাবা নির্মাণের ইতিবৃত্ত আলোচনা করা হচ্ছে। সেই সাথে হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.)-এর মর্যাদা তুলে ধরে প্রকারান্তরে রাসূল ﷺ -এর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা তিনি ইবরাহীম (আ.)-এর বংশের নবী এবং উভয়ের ধর্মের মাঝেও সামঞ্জস্য রয়েছে।

يَرْفَعُ : উত্তোলন করা শব্দটি লক্ষণীয় অর্থাৎ এখানে প্রথমবার ভিত্তি স্থাপন করা হচ্ছিল না। কেননা তা তো হযরত আদম (আ.)-এর যুগেই স্থাপন করা হয়েছিল। নির্মাণ ধসে যাওয়ার পর এখন নতুন পর্যায়ে তা উত্তোলন করা হচ্ছিল। উঁচু করা

হচ্ছিল। আর এখানে حِكَايَاتُ حَالٍ مَاضِيْ হিসেবে মুজারের সীগাহ ব্যবহার করা হয়েছে। যাতে কাবার অপূর্ব ও বিরল নির্মাণ পদ্ধতি সকলের হৃদয়পটে জাগরূক থাকে এবং মানুষ কঠিনতম ইবাদত-বন্দেগী করার ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করে।

اَلْبَيْتَ তথা ঘর দ্বারা উদ্দেশ্য কা'বার ঘর এবং এতে কারো কোনো ভিন্নমত নেই। এমনিভাবে আল কিতাব বলতে যেভাবে পবিত্র কুরআন ও আন-নবী বলতে যেভাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ -কেই বুঝায় আল বায়ত বলতেও তদ্রূপ আল্লাহ তা'আলার ঘর [বায়তুল্লাহ]-কেই বুঝায়।

قَوْلُهُ الْقَوَاعِدَ : এটি قَاعِدَةٌ -এর বহুবচন। قَعُود بِمَعْنَى ثُبُوْت -থেকে নির্গত। তারপর তাতে اِسْمِيَّتْ বা নাম হওয়ার অর্থ প্রবল হওয়ার কারণে মওসুফ ছাড়াই ব্যবহৃত হওয়া শুরু হয়েছে।

قَوْلُهُ الْاَسَسُ : এটি قَوَاعِد -এর তাফসীর اُسُسٌ শব্দটি اَسَاسٌ -এর বহুবচন। অর্থ– ভিত্তি।

قَوْلُهُ الْجُدُرُ : এটি قَوَاعِد -এর দ্বিতীয় তাফসীর। আর جُدُرٌ হলো جِدَارٌ -এর বহুবচন। অর্থ– দেয়াল, প্রাচীর।

قَوَاعِدَ সম্পর্কে আরেকটি তাফসীর হলো তার দ্বারা ইট উদ্দেশ্য। কেননা প্রতিটি ইট তার উপরের ইটের জন্য ভিত্তি স্বরূপ। প্রথম সূরতে প্রশ্ন হয় যে, ভিত্তিতো একটি ছিল। তাহলে اُسُسٌ বহুবচন শব্দ আনা হলো কেন?

উত্তর : যেহেতু ভিত্তিটি ছিল চার কোণবিশিষ্ট এবং প্রত্যেকটি দেওয়াল যেন ভিন্ন ভিন্ন ভিত্তি। সে হিসেবে বহুবচন শব্দ আনা হয়েছে।

قَوْلُهُ يَبْنِيْهِ : এটি يَرْفَعُ -এর তাফসীর। মুফাসসির (র.)-এর দ্বারা ইঙ্গিত করলেন যে, يَرْفَعُ দ্বারা মাজাযী বা রূপক অর্থ নেওয়া হয়েছে। আসলে بَنِيْ উদ্দেশ্য। بِنَاءٌ [নির্মাণ] -কে رَفْعٌ [উত্তোলন] দ্বারা তাবীর করার কারণ হলো নির্মাণের পূর্বে ভিত্তিটি নীচু ছিল। নির্মাণের পর তা উঁচু হয়ে উঠে। তাই يَرْفَعُ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ عَطْفٌ عَلٰى اِبْرَاهِيْم : কাবা নির্মাণে হযরত ইসমাইল (আ.) পিতা ইবরাহীমের সাথে শরিক ছিলেন। কেউ কেউ বলেন– اِسْمَاعِيْل পূর্বের اِبْرَاهِيْم -এর উপর عَطْف নয়; বরং নতুন জুমলা হিসেবে মুবতাদা এবং তার খবর মাহযুফ রয়েছে। اَيْ وَاِسْمَاعِيْل يَقُوْلُ رَبَّنَا الخ কিন্তু সঠিক কথা হলো কাবা নির্মাণে উভয়েই শরিক ছিলেন। তাই মুফাসসির (র.) عَطْف বলেছেন।

قَوْلُهُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ الخ : নববী অন্তরের এ ভীতির কোনো তুলনা হয় না। নীতি চরিত্রের প্রতিকৃতি সত্যবাদিতার মূর্তপ্রতীক হওয়া সত্ত্বেও ভয় জাগে যে, নজরানা গৃহীত হবে কি হবে না?

تَقَبَّلْ ক্রিয়াটি تَفَعُّلْ বাব হতে নির্গত এবং এ বাবের একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে تَكَلُّف অর্থাৎ কোনো কিছুর বাস্তবতা না থাকলেও তার ভাব দ্বারা অভিনয় করা। কোনো কিছু গ্রহণ করার লৌকিকতা ও আনুষ্ঠানিকতা প্রদর্শন করা। এ কারণে কেউ কেউ এ তত্ত্ব উদঘাটন করেছেন যে, ক্ষেত্র ও পাত্র স্বকীয় অবস্থানে কবুল ও গ্রহণ করার উপযোগী নয়; বরং তা পুরোপুরি অপূর্ণাঙ্গ। গ্রহণীয়তা শুধু দয়া ও বদান্যতার কারণে হচ্ছিল, কোনো প্রকার অধিকার উপযোগিতার ভিত্তিতে নয়।

শ্রমিক ও নির্মাণ শিল্পীরা যখন নির্মাণকাজে লিপ্ত থাকে তখন তারা সাধারণত এবং অভ্যাসবশত কিছু একটা গুণ গুণ করতে থাকে। আল্লাহ তা'আলার ঘরের এ নির্মাতা রাজমিস্ত্রিও আল্লাহ তা'আলার ঘরের দেয়াল তুলবার সময় নীরব ছিলেন না। তিনিও [গুনগুনিয়ে] মুনাজাত করে যাচ্ছিলেন। ফকীহগণ বলেছেন, যে কোনো ভালো কাজের পরে দোয়া করা মোস্তাহাব। যেমন সালাত সমাপনান্তে দোয়া এবং সাওমের ইফতার করে দোয়াও এই শ্রেণির। –[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ২৩৮]

قَوْلُهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ : سَمِيْع অর্থাৎ জিহ্বা থেকে নিসৃত শব্দ ও কথার শ্রবণকারী। عَلِيْم অন্তরের নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার অবগতি লাভকারী। মুশরিক জাতিসমূহের জ্ঞানী-বিজ্ঞানী ও দার্শনিকবৃন্দ আল্লাহ তা'আলার ইলম গুণের ব্যাপারে অধিক ভ্রান্তির শিকার হয়েছে এবং মহান স্রষ্টার ইলমকে অপূর্ণাঙ্গ ও সীমিত মনে করেছে। পবিত্র কুরআন যে স্রষ্টার ইলম সর্বব্যাপী ও পূর্ণাঙ্গ হওয়া জোরেশোরে সাব্যস্ত করে এবং বার বার আল্লাহ তা'আলার سَمِيْع . بَصِيْر ও عَلِيْم হওয়ার কথা উপস্থাপন করেছে, তার অন্যতম লক্ষ্য দার্শনিকদের এ অসার ধারণা খণ্ডন করা।

قَوْلُهُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ : [আরো অধিক আনুগত্যশীল করুন]। এখানে مُسْلِمَيْنِ -এর দুই ধরনের অর্থ করা হয়েছে। এক. অংশীবাদ ও অংশীদারিত্বের দ্বিধা ব্যতিরেকে আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ ও একত্ববাদের স্বীকৃতি দানকারী অর্থাৎ مُوَحِّدَيْنِ مُخْلِصَيْنِ لَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاكَ অর্থাৎ আমরা একত্ববাদী ও একনিষ্ঠ। একমাত্র আপনি ব্যতীত আমরা আর কারো ইবাদত করি না –[কাবীর]।

দুই. ইসলামের সাধারণ বিধিমালা প্রতিপালনকারী قَائِمِيْنَ بِجَمِيْعِ شَرَائِعِ الْاِسْلَامِ ইসলামের সকল শরিয়তি বিধান বাস্তবায়নকারী -[কাবীর]। তবে অর্থদ্বয়ের একটি অন্যটির মোটেই পরিপন্থি নয়।

প্রশ্ন : দোয়া করার সময় কি তারা মুসলিম ছিলেন না?

উত্তর : এখানে مُسْلِمُوْنَ অর্থ সত্যের কাছে আত্মসমর্পণকারী ও তাতে আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনকারী। দোয়া করার সময়ও তারা মুসলিম তথা আনুগত্যশীল বান্দা ছিলেন। সুতরাং এ দোয়ার অর্থ শুধু এতটুকু যে, আমাদের আনুগত্যে আরো অধিক অগ্রগতি দান করুন। অর্থাৎ আমাদের ইখলাস ও আপনার প্রতি বিশ্বাস ঐকান্তিকতা বাড়িয়ে দিন (اَىْ زِدْنَا خَلَاصًا وَاِذْعَانًا لَكَ - كَشَّاف) এখানে উদ্দেশ্য নিষ্ঠা ও দৃঢ় বিশ্বাসের আধিক্য কিংবা তাতে অবিচলতা কামনা করা।

(اَلْمُرَادُ طَلَبُ الزِّيَادَةِ فِى الْاِخْلَاصِ وَالْاِذْعَانِ اَوِ الثَّبَاتِ عَلَيْهِ - بَيْضَاوِى)

قَوْلُهُ اُمَّةً مُّسْلِمَةً : এ দোয়া গৃহীত হওয়ার একটি বড় প্রমাণ এই যে, আজও সেই উম্মত ঐ নামে পরিচিত হয়ে আসছে এবং তা আপন-পর শত্রু-মিত্র সকলেরই মুখে।

قَوْلُهُ مِنْ ذُرِّيَّتِنَا : অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.)-এর সম্মিলিত বংশধারা। উদ্দেশ্য যেহেতু এ দুই মহান ব্যক্তি একত্রে দোয়া করছিলেন। সুতরাং এখানে বংশধর দ্বারা হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর সন্তানরাই হতে পারে।

قَوْلُهُ وَمِنْ لِلتَّبْعِيْضِ : وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا-এর مِنْ-কে تَبْعِيْضِيَّةٌ আখ্যা দেওয়ার কারণ হলো পূর্বে আল্লাহ তা'আলা বলেছিলেন- لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّالِمِيْنَ যার অর্থ হলো ইমামতের এ ওয়াদা সকল সন্তানাদির ক্ষেত্রে নয়; বরং তাদের মধ্যে যারা মু'মিন ও নেককার হবে তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যদি مِنْ কে تَبْعِيْضِيَّةٌ না মানা হয় তাহলে لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّالِمِيْنَ এবং وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا-এর মধ্যে تَعَارُضْ হবে

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া এবং এর সত্যায়ন : কা'বাগৃহ নির্মাণের সময় উক্ত দুই সম্মানিত পয়গাম্বরদের ছয়টি দোয়া আলোচনা করা হয়েছে। যেগুলোর মধ্য থেকে একটি দোয়া অনুর্বর উপত্যকাকে নিরাপত্তার শহর করে দেওয়ারও ছিল। যার মধ্যে মুসলিম ও কাফের বসবাস করবে এবং সকলেই রিজিক পাবে। যেহেতু কাফেররা আনুগত্যের বাইরে চলে এ বিষয়টি পূর্ব থেকেই জানা ছিল। তাই আদব রক্ষার্থে হযরত ইব্রাহীম (আ.) রিজিকের দোয়ার মধ্যে তাদেরকে গণ্য করেননি। পরবর্তী দোয়াগুলোতে কাবার ভিত্তি এবং ভিত্তি স্থাপনকারীর একাগ্রতার দোয়া এবং সর্বশেষে নবী করীম ﷺ ও তার উম্মতের জন্য বিশেষ দোয়া করেছেন। যা দ্বারা কাবার সাথে রাসূল ﷺ -এর বিশেষ সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে গেছে। কাবাগৃহের নির্মাণে অনুসারী হিসেবে হযরত ইসমাঈল (আ.)-ও শামিল ছিলেন। সময়ে তিনি নির্মাণ কাজও করতেন কিংবা শুধু গাঁথুনীর পাথর এনে দিতেন। সে দোয়াগুলোর সত্যায়ন এমন ব্যক্তিই হতে পারেন যিনি উভয়ের বংশধর হওয়ার মর্যাদা রাখেন। হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধরগণের মধ্যে এ উচ্চ মর্যাদা শুধু নবী করীম ﷺ -ই লাভ করেছেন। তাই তিনিই এর সত্যায়ন হতে পারেন। সুতরাং রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, আমি নিজ পিতা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর দোয়াসমূহের বহিঃপ্রকাশ। -[কামালাইন খ. ১, পৃ. ১৪০]

যোগ্য ছেলেই পিতার সম্পদের রক্ষণকারী হয় : اُمَّةً مُّسْلِمَةً-এর জন্য সন্তানদেরকে নির্দিষ্ট করা। এমনিভাবে সে খান্দান থেকেই পয়গাম্বর হওয়াকে নির্দিষ্ট করার যুক্তিসিদ্ধতা হচ্ছে এটা যে, অন্য খান্দানের কোনো লোকের অবস্থা সম্পর্কে মানুষ এত অধিক অবগত থাকে না, যত অধিক অবগত থাকে নিজ খান্দানের কোনো লোকের গুণাবলির ব্যাপারে। খান্দানের লোকদের জন্য সে লোকটির অনুসরণ করতে কোনো প্রকার অপরিচিতি ও লজ্জাবোধ মনে হবে না এবং পরবর্তী সময়ে তাদের দেখাদেখি অন্যান্য লোকেরা নিজ গোত্রের লোকটির প্রতি বিবেচনার ও লক্ষ্য রাখবে এবং সেটা তার অনুসরণের ক্ষেত্রে অধিক প্রচেষ্টাকারী ও অন্যদেরকে পথ প্রদর্শনের জন্য মূল উৎস হিসেবে প্রমাণিত হবে। -[প্রাগুক্ত]

اَلْاَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ [নেতৃত্ব কুরাইশ থেকে] : সুতরাং তাই হয়েছে যে, সম্পূর্ণ আরব উপদ্বীপ কুরাইশ এবং রাসূল ﷺ -এর খান্দানের ঈমান গ্রহণের অপেক্ষায় ছিল। যখনই তারা ঈমান গ্রহণ করল এবং পবিত্র মক্কা বিজয় হলো লোকেরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করল আর এটাই হচ্ছে খেলাফতের জন্য কুরাইশদের খাছ হওয়ার যুক্তিসিদ্ধতা। বস্তুত তাদের মনে দীনের জন্য যে পরিমাণ অন্তরিকতা ও ব্যথা হবে, অন্যদের এর দশভাগের একভাগও হবে না। -[প্রাগুক্ত]

قَوْلُهُ الْحِكْمَةَ : حِكْمَةٌ দ্বারা মুসান্নেফ (র.) কুরআনের বিধানাবলি উদ্দেশ্য নিয়েছেন। কিন্তু এর দ্বারা উদ্দেশ্য সুন্দর জ্ঞান এবং সঠিক বুঝও হতে পারে। আর সঠিক জ্ঞানের অনুভূতি হচ্ছে এটা যে, গবেষণামূলক প্রয়োগ ও পাণ্ডিত্য অর্জন হওয়া যেন মূল থেকে শাখাসমূহের হুকুম বের করতে পারে। কথা থেকে কথা বের করতে পারে এবং মূল বিষয়াদিকে ঠিক রেখে এক দৃষ্টান্তকে অপর দৃষ্টান্তের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারে। সুতরাং এ উম্মতের মধ্যে নবী করীম ﷺ -এর অনুসরণের অসিলায় অনেক বড় বড় আলেমগণের এ সৌভাগ্য হয়েছে। যাদের মাধ্যমে সাধারণ মুসলমান-ই নয়, বরং সর্ব সাধারাণও উপকৃত হচ্ছে।

নবী করীম ﷺ -এর চারটি বৈশিষ্ট্য উক্ত আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে–

১. পবিত্র কুরআনকে তেলাওয়াত করা, যা শুরু ও প্রাথমিক স্তর।

২. পবিত্র কুরআনের অর্থ ও তাৎপর্যের শিক্ষা দেওয়া, এটা দ্বিতীয় স্তর।

৩. বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার শিক্ষা দেওয়া এবং এ জ্ঞান ও আমলের সমষ্টির পর।

৪. সর্বশেষ পরিপূর্ণ স্তর অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক পবিত্রতা অর্জন করা। এ হচ্ছে জীবনের **চারটি গুরুত্বপূর্ণ দিক**।

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا .

কা'বা নির্মাণের ইতিহাস : হযরত আদম (আ.)-এর পৃথিবীতে অবতরণের পূর্বেই ফেরেশতাদের দ্বারা কাবাগৃহের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল। আদম ও আদম সন্তানদের জন্য কাবাকেই সর্বপ্রথম কেবলা সাব্যস্ত করা হয়। বলা হয়েছে–

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ .

নূহ (আ.)-এর সময়কার মহাপ্লাবনের সময় আল্লাহ তা'আলা কাবাগৃহকে চতুর্থ আসমানে তুলে নেন এবং হাজরে আসওয়াদটি জিবরীল (আ.) আবূ কুবাইস পাহাড়ে লুকিয়ে রাখেন। প্লাবনের পর হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর যুগ পর্যন্ত কাবার স্থানটি খালি ছিল। তারপর আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আ.)-কে কা'বা নির্মাণের হুকুম দিলে তিনি তার স্থানটি দেখিয়ে দেওয়ার আবদন করেন। তখন আল্লাহ তা'আলা কাবার স্থান দেখিয়ে দেন এবং হাজরে আসওয়াদের সংবাদও জানিয়ে দেন। আল্লাহর হুকুম পেয়ে ইবরাহীম (আ.) এবং ইসমাঈল (আ.) কাবা নির্মাণ করেন।

জ্ঞাতব্য : কা'বাগৃহ সর্বমোট দশবার নির্মিত হয়েছে–

১. ফেরেশতাদের নির্মাণ।

২. হযরত আদম (আ.)-এর নির্মাণ।

৩. হযরত শীস (আ.)-এর নির্মাণ।

৪. হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নির্মাণ।

৫. আমালেকা সম্প্রদায়ের নির্মাণ।

৬. জুরহাম গোত্রের নির্মাণ।

৭. কুসাই গোত্রের নির্মাণ।

৮. কুরাইশের নির্মাণ। সে নির্মাণে রাসূল ﷺ শরিক ছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৩৫ বছর।

৯. আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইয়ের নির্মাণ।

১০. হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের নির্মাণ। বর্তমনে সেভাবেই রয়েছে।

মনে রাখার সুবিধার্থে জনৈক কবির কবিতা–

بَنٰى بَيْتَ رَبِّ الْعَرْشِ عَشْرٌ فَخُذْهُمْ
مَلٰئِكَةُ اللّٰهِ الْكِرَامُ وَاٰدَمُ
فَشِيْثٌ فَاِبْرَاهِيْمُ ثُمَّ عَمَالِقٌ * قَصَىٰ قُرَيْشٌ قَبْلَ هٰذَيْنِ جُرْهُمُ
وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ بَنٰى كَذَا * بِنَاءُ الْحَجَّاجِ وَهٰذَا مُتَمِّمُ

–[হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১, ১৬০]

অনুবাদ :

١٣٠. وَمَنْ اَيْ لَا يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ اِبْرٰهِمَ فَيَتْرُكُهَا اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ط جَهِلَ اَنَّهَا مَخْلُوْقَةٌ لِلّٰهِ يَجِبُ عَلَيْهَا عِبَادَتُهُ اَوْ اِسْتَخَفَّ بِهَا وَامْتَهَنَهَا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ اِخْتَرْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ـ بِالرِّسَالَةِ وَالْخُلَّةِ وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ـ اَلَّذِيْنَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلٰى

১৩০. যে নিজেকে নির্বোধ করেছে অর্থাৎ সে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট সুতরাং তাঁরই ইবাদত ও উপাসনা করা তার কর্তব্য। এই সম্পর্কে যে ব্যক্তি অজ্ঞ অথবা এর অর্থ হলো যে ব্যক্তি নিজেকে নিকৃষ্ট ও হীন করে তুলেছে সে ব্যতীত ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ হতে আর কে বিমুখ হবে এবং তা ত্যাগ করে বসবে? আর কেউ এমন নেই। পৃথিবীতে তাকে আমি রিসালাত ও অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব দ্বারা মনোনীত করেছি গ্রহণ করে নিয়েছি। পরকালেও সে সৎকর্ম পরায়ণদের অন্যতম যাদের জন্য রয়েছে সুউচ্চ মর্যাদা।

١٣١. وَ اُذْكُرْ اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗ اَسْلِمْ انْقَدْ لِلّٰهِ وَاَخْلِصْ لَهٗ دِيْنَكَ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

১৩১. আর স্মরণ কর তার প্রতিপালক যখন বলেছিলেন অনুগত হও আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ কর এবং দীনকে তার জন্যই নিখাদ কর, সে বলেছিল, বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম।

١٣٢. وَوَصّٰى وَفِىْ قِرَاءَةٍ اَوْصٰى بِهَا بِالْمِلَّةِ اِبْرٰهِمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ط بَنِيْهِ قَالَ يٰبَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ دِيْنَ الْاِسْلَامِ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ نَهْىٌ عَنْ تَرْكِ الْاِسْلَامِ وَاَمْرٌ بِالثُّبَاتِ عَلَيْهِ اِلٰى مُصَادَفَةِ الْمَوْتِ ـ

১৩২. এবং ইবরাহীম ও ইয়াকূব এই সম্বন্ধে তাদের পুত্রগণকে অসিয়ত করে গিয়েছিল। বলেছিল, হে পুত্রগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য এ দীনকে ইসলাম ধর্মকে মনোনীত করেছেন। সুতরাং মুসলিম না হয়ে তোমরা কখনো মৃত্যুবরণ করো না। এই আয়াতটিতে আমৃত্যু ইসলামের উপর সুদৃঢ় থাকতে এবং তা পরিত্যাগ না করতে বলা হয়েছে। وَصّٰى ক্রিয়াটি অপর এক কেরাতে اَوْصٰى [বাবে اِفْعَالٌ হতে পঠিত ক্রিয়া] রূপে পঠিত রয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ وَمَنْ يَرْغَبُ : এখানে مَنْ হলো اِسْتِفْهَامْ اِنْكَارِىْ এবং মুবতাদা। আর يَرْغَبُ হলো খবর। তার মধ্যকার যমীরটি مَنْ -এর দিকে ফিরেছে।

قَوْلُهٗ اَىْ لَا يَرْغَبُ : মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করলেন যে, এখানে مَنْ হলো اِسْمِ اِسْتِفْهَامْ এবং اِسْتِفْهَامْ টি اِنْكَارْ বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন। সুতরাং এটি نَفِىْ -এর অর্থে। এজন্য তারপর لا আনা হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ : وَاوْ টি عَاطِفْ তার عَطْف হয়েছে لَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ -এর সাথে। সুতরাং এটিও جَوَابْ قَسَمْ হবে। দ্বিতীয় আরেকটি সম্ভাবনা হলো وَاوْ حَالِيَّةٌ এ সূরতে لَمِنَ الصَّالِحِيْنَ -এর لام টি اِبْتِدَا -এর لَام হবে।

قَوْلُهُ فَيَتْرُكُهَا : رَغْبٌ -এর صِلَةٌ হিসেবে যখন عَنْ আসে, তখন تَرْك وَاعْرَاضٌ বা বর্জন ও বিমুখতার অর্থ দেয়। মুফাসসির (র.) فَيَتْرُكُهَا উল্লেখ করে সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ : مَنْ -এর مَحَلِّ اِعْرَابٌ সম্পর্কে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। ১. مَوْصُوْلَةٌ ২. مَوْصُوْفَةٌ প্রথম সূরতে তার مَا بَعْدَ জুমলা হয়ে সেলাহ হওয়ার কারণে তার مَحَلِّ اِعْرَابٌ নেই। আর দ্বিতীয় সূরতে مَنْصُوْبٌ বা مَرْفُوْعٌ হবে।

قَوْلُهُ جَهِلَ اَنَّهَا مَخْلُوْقَةٌ لِلّٰهِ : এটি سَفِهَ -এর তাফসীর -এর দ্বারা মুফাসসির (র.) একটি سُوَالٌ مُقَدَّرٌ -এর জবাব দিয়েছেন। প্রশ্ন : سَفِهَ হলো লাজেম ফে'য়েল তারপর نَفْسَهُ মানসুব হলো কিভাবে?

উত্তর : এখানে سَفِهَ শব্দটি جَهِلَ -এর অর্থ পোষণ করে। আর جَهِلَ মুতাআদ্দী ফেয়েল। তার অর্থ পোষণ করার কারণে তার পরের মাফউল হওয়া শুদ্ধ আছে।

قَوْلُهُ اَنَّهَا مَخْلُوْقَةٌ : اَنَّهَا -এর ضَمِيْرٌ مَنْصُوْبٌ টি نَفْس -এর দিকে ফিরেছে। অর্থাৎ যে নিজের নফস সম্পর্কে অজ্ঞ হয় এবং এটা জানেন না যে, তার নফস একমাত্র আল্লাহর জন্যই সৃষ্টি হয়েছে, তার উপর আল্লাহর ইবাদত ওয়াজিব। কেননা যে পাথর, চন্দ্র, সূর্য কিংবা মূর্তির পূজা করছে, সে এগুলোর স্রষ্টাকে জানল না।

قَوْلُهُ اِسْتَخَفَّ بِهَا : এর দ্বারা দ্বিতীয় জবাবের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এর সারকথা হলো صِفَةٌ অন্য কোনো অর্থ পোষণ করা ছাড়াই مُتَعَدِّىْ بِنَفْسِهِ অর্থাৎ সেটি اِسْتَخَفَّ -এর অর্থে। কেননা, سَفِهَ -এর মূল অর্থে خِفَّتْ وَاِذْلَال তথা লাঞ্ছনা ও তুচ্ছতা রয়েছে। আয়াতের মর্ম হবে ইবরাহীমি ধর্ম থেকে কেবল সেই বিমুখ হতে পারে সে নিজের নসফকে লাঞ্ছিত করল।

فَاِنَّ مَنْ رَغِبَ عَمَّا يَرْغَبُ فِيْهِ فَقَدْ اَذَلَّ نَفْسَهُ ـ

কেননা যে প্রিয় বস্তু থেকে বিমুখ হলো যেন সে নিজের নফসকে লাঞ্ছিত করল।

قَوْلُهُ اِمْتَهَنَهَا : اَىْ اَذَلَّهَا অর্থাৎ হেয় ও তুচ্ছ করল।

قَوْلُهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ : এখান থেকে مَنْ يَرْغَبُ -এর কারণ বা প্রমাণ বর্ণনা করা হচ্ছে।

قَوْلُهُ اخْتَرْنَاهُ : এটি اِصْطَفَيْنَاهُ -এর তাফসীর প্রকৃত পক্ষে اصطفاء -এর অর্থ হলো اِتِّخَاذُ صَفْوَةِ الشَّيْئِ কোনো বস্তুর সার নির্যাস বা নির্বাচিত অংশ গ্রহণ করা। যেহেতু নির্ধারিত বস্তুর প্রতি মানুষের আগ্রহ থাকে এবং তারা সেটি গ্রহণ করে তাই মুফাসসির (র.) اِخْتَرْنَاهُ বলে ব্যাখ্যা করেছেন- اَىْ اِخْتَرْنَاهُ بِالرِّسَالَةِ لَوْ اِخْتَرْنَاهُ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْخَلْقِ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : ইতিপূর্বে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া- وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ -এর মাঝে ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্মের প্রতি ইঙ্গিত ছিল। এখন এ আয়াতে সে ধর্মের ফজিলত এবং তা অনুসরণের প্রতি তারগীব ও আগ্রহ উদ্দীপনা দেওয়া হচ্ছে। এতে ইহুদি নাসারাদেরও খণ্ডন করা হয়েছে যে, তারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে নেতা মানে কিন্তু তার ধর্মের অনুসরণ করে না। অথচ এ ধর্মের উপর অটল-অবিচল থাকার জন্য হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.) নিজেদের জন্য দোয়া করেছেন এবং পরবর্তী সন্তানদেরকে অসিয়ত করে গেছেন। অনুরূপভাবে হযরত ইয়াকুব (আ.)-ও নিজের সন্তানদেরকে এ ধর্মের উপর অটল অবিচল থাকার অসিয়ত করেছেন।

শানে নুযূল : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম তার দুই ভাতিজা সালিমা ও মুহাজিরকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়ে বললেন তোমাদের জানা আছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাওরাতে ইরশাদ করেছেন যে, বনী ইসমাঈলে একজন নবী সৃষ্টি করব যার নাম হবে আহমদ। যে ব্যক্তি তাকে নবী মানবে সে হেদায়েত পাবে। আর যে মানবে না সে অভিশপ্ত হবে। একথা শুনে সালিমা ইসলাম গ্রহণ করে এবং মুহাজির ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাজিল হয়।

ইসলাম ফিতরতের ধর্ম, তা থেকে বিমুখতা বোকামী : ইবরাহীমী মিল্লাত তো অবিকল ফিতরাতের দীন, স্বভাব ধর্ম। এ ধর্মের শিক্ষা-দীক্ষা হুবহু সুষ্ঠু স্বভাবের মুখপাত্র। এ ধর্ম পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা শুধু সেই করবে, যার স্বভাব-সুষ্ঠুতা অক্ষত

নেই, বরং তা বিকৃত হয়ে গিয়েছে। মানুষ এ দাবির সত্যতা শুধু বিশ্বাস ও মতাদর্শের বিচারেই নয়; বরং যখন ইচ্ছা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করে দেখতে পারে। ইসলাম সমাজ জীবনের জন্য যে বিধি স্থির করে রেখেছ, তাই সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সমাজবিধি। ব্যক্তি জীবনের জন্য তার স্থিরকৃত কর্মসূচি সর্বোত্তম ব্যক্তিনীতি। যুক্তি ও আবেগ, মেধা ও প্রজ্ঞা, দেহ ও আত্মা, ব্যক্তি ও সমাজ এবং স্বাধীনতা ও অধীনতা-আনুগত্যসহ মানব জীবনের পরস্পর প্রতিকূল ও বিপরীতধর্মী মূল উপাদানসমূহের মাঝে আন্তঃসুষমা বিধানের প্রতি ইসলামি শরিয়ত যতখানি লক্ষ্য রেখেছে, পৃথিবীর কোনো আইনে কোথাও তার নজির পাওয়া যায় না।

ইবরাহীমি দোয়ার সমাপ্তিলগ্নে ইবরাহীমি মিল্লাতের পরিচিতি উপস্থাপন করা হচ্ছে এভাবে যে, এটি কোনো নতুন ধর্ম নয়, এটি সেই তাওহীদী দীন, এক আল্লাহতে বিশ্বাসের ধর্ম, ইসলাম আজ যার আহ্বান পেশ করেছে এবং যা তোমরা সকলে নিজেদের অভিন্ন পূর্বপুরুষ ইবরাহীম (আ.)-এর অনুগামী হওয়ার একীভূত দাবি সত্ত্বেও বর্জন করে রয়েছে।

–[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ২৪৩]

قَوْلُهُ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ : পবিত্র কুরআনের অলঙ্কার ও শব্দ চয়ন মাধুর্য লক্ষণীয়। এখানে ইসলাম ধর্মের সম্বন্ধ আল্লাহ তা'আলার সঙ্গেও করেনি এবং সমকালীন রাসূল হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর সঙ্গে না করে; বরং তা স্থাপন করেছে ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ.)-এর সঙ্গে। এখানে সম্বোধিত জনগোষ্ঠী মূলত ইহুদি-খ্রিস্টান ও আরব মুশরিকরা। এ তিনটি সম্প্রদায়ই মুসলমানদের ন্যায় হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে নিজেদের মহান পুরোধা মান্য করে। এ অভিনব বর্ণনাভঙ্গি গ্রহণ করে যেন এ উপলব্ধি জাগরূক করা হলো যে, কুরআন তোমাদেরকে কোনো নতুন ধর্মের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে না। হুবহু ও সরাসরি তোমাদেরই সম্মানিত পূর্বপুরুষ ও মহান পুরোধা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্মের প্রতি তোমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছে। –[প্রাগুক্ত]

قَوْلُهُ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ : যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে বলেছেন যে, আমি তাকে দুনিয়াতে নির্বাচিত করেছি এবং আখিরাতে সে সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর এখন এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তার নির্বাচনের কারণ বর্ণনা করছেন যে, আনুগত্য ও সমর্পণের গুণে তাঁর এ মর্যাদা হাসিল হয়েছে।

قَوْلُهُ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ : এখানে নির্দেশ ও জবাব বাস্তবতার উপর প্রযোজ্য নয়; বরং উপমা স্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। আয়াতের মর্ম হলো আল্লাহ তা'আলা তাকে তাওহীদের দলিল প্রমাণের মাঝে চিন্তা করার নির্দেশ দিলে তিনি তৎক্ষণাৎ চিন্তা করে সমর্পিত হয়েছেন।

قَوْلُهُ اَنْقَدْ لِلّٰهِ : ইঙ্গিত করছেন এ দিকে যে, এখানে اَسْلِمْ দ্বারা মুসলমান হওয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং اِنْقِيَادٌ ظَاهِرٌ তথা বাহ্যিক আনুগত্য উদ্দেশ্য। কেননা নবী ইবরাহীম তো পূর্ব থেকেই মুসলমান ছিলেন। কেননা নবীগণ তো কুফর থেকে মুক্ত থাকেন। কেউ কেউ বলেছেন– ইসলাম গ্রহণ বলতে এখানে ইসলামের উপর অটল থাকার কথা বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ دِيْنَ الْاِسْلَامِ : اَلدِّيْنَ -এর ব্যাখ্যায় دِيْنُ الْاِسْلَامِ উল্লেখ করে বুঝানো হয়েছে যে, اَلدِّيْنَ -এর اَلِفْ لَامْ অর্থ বাছাই করা, মনোনীত করা, বেছে তুলে নেওয়া ও ভেজাল মিশ্রণ থেকে পবিত্র করে দেওয়া। لَكُمْ -এর (ل) নির্দিষ্টকরণ ও সীমাবদ্ধকরণ অর্থে। অর্থাৎ এ ধর্ম তোমাদের জন্য এবং তোমরা এ ধর্মের জন্য নির্দিষ্ট।

পূর্বসূরীদের অনুসরণের দাবি করলেও ইসলামই মানতে হবে : হযরত ইবরাহীম (আ.) আরবজাতি ও ইহুদি জাতি সকলের মহান পূর্বপুরুষ ছিলেন এবং খ্রিস্টানদেরও অনুসরণীয় পুরোধা ছিলেন। ওদিকে হযরত ইয়াকুব (আ.) যিনি ইসরাইলী বংশধরদের মহান পিতৃপুরুষ ছিলেন, এরা দুজন তো নিজেরাই নিজেদের সন্তানদের জন্য নিজেদের পছন্দনীয় ও আল্লাহ তা'আলার মনোনীত ধর্ম হস্তান্তর করে গিয়েছিলেন এবং বলে গিয়েছিলেন যে, ধর্মের সন্ধানে তোমাদের দিশেহারা হওয়ার কোনোই প্রয়োজন নেই। তোমাদের জন্য তো আল্লাহ তা'আলার বানানো ও শেখানো তাওহীদি ধর্ম বিদ্যমান রয়েছে। পবিত্র কুরআনের প্রথম দিককার সম্বোধিত লোকেরা সকলেই পূর্বপুরুষের অনুকরণের ধ্বজাধারী ছিল। সুতরাং তাদের জন্য এ সম্বোধন পন্থা কতই চমৎকার যে, আচ্ছা তোমরা যখন ধর্মের ব্যাপারে পূর্বপুরুষকেই মাধ্যম সূত্র ও মানদণ্ড বানাতে চাও, তবে তাদের বক্তব্যই লক্ষ্য করে দেখ।

قَوْلُهُ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ : এ আয়াতাংশ বাহ্যত মৃত্যু থেকে বারণ ও নিষেধাজ্ঞা মনে হয়। যা বান্দার এখতিয়ারভুক্ত নয়। তাই মুফাসসির (র.) বলেছেন– نَهْىٌ عَنْ تَرْكِ الْاِسْلَامِ অর্থাৎ এখানে নিষেধাজ্ঞাটা মৃত্যুর ব্যাপারে নয়; বরং ইসলাম বর্জন করার ব্যাপারে করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اَمْرٌ بِالثَّبَاتِ عَلَيْهِ : এ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, نَفْسُ اِيْمَانٌ বা মূল ঈমানটি তাদের হাসিল ছিল তাই তা হাসিল করার কোনো উদ্দেশ্য হয় না; বরং এখানে উদ্দেশ্য হলো ইসলামের উপর অটল থাকা।

অনুবাদ :

١٣٣. وَلَمَّا قَالَ الْيَهُوْدُ لِلنَّبِيِّ اَلَسْتَ تَعْلَمُ اَنَّ يَعْقُوْبَ مَاتَ اَوْصٰى بَنِيْهِ بِالْيَهُوْدِيَّةِ نَزَلَ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاۤءَ حُضُوْرًا اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ ـ اِذْ بَدْلٌ مِنْ اِذْ قَبْلَهٗ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِيْ ط بَعْدَ مَوْتِيْ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَائِكَ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحَاقَ عَدُّ اِسْمَاعِيْلَ مِنَ الْاٰبَاءِ تَغْلِيْبٌ وَلِاَنَّ الْعَمَّ بِمَنْزِلَةِ الْاَبِ ـ اِلٰهًا وَّاحِدًا بَدْلٌ مِنْ اِلٰهَكَ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ـ وَاَمْ بِمَعْنٰى هَمْزَةِ الْاِنْكَارِ اَيْ لَمْ تَحْضُرُوْهُ وَقْتَ مَوْتِهٖ فَكَيْفَ تَنْسِبُوْنَ اِلَيْهِ مَا لَا يَلِيْقُ بِهٖ ـ

১৩৩. ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলেছিল, ইয়াকূব (আ.) মারা যাওয়ার সময় তার সন্তানদেরকে ইহুদি ধর্ম সম্পর্কে বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন, এই কথা আপনি কি জানেন না? [সুতরাং আমরা কি করে মুসলমান হতে পারি?] এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন। ইয়াকূবের নিকট যখন মৃত্যু এসেছিল তোমরা কি তখন সমক্ষে ছিলে, উপস্থিত ছিলে? সে যখন পুত্রগণকে জিজ্ঞেস করেছিল, আমার পর অর্থাৎ আমার মৃত্যুর পর তোমরা কিসের ইবাদত করবে? তারা তখন বলেছিল, আমরা আপনার আল্লাহ ও আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের আল্লাহর ইবাদত করব, যিনি এক, অদ্বিতীয় এবং আমরা তার নিকট আত্মসমর্পণকারী। অর্থাৎ তার মৃত্যুর সময় তোমরা উপস্থিত ছিলে না। সুতরাং যে কথা তার পক্ষে সমীচীন না তার প্রতি তোমরা কেমন করে সে কথার আরোপ করছ?

اِذْ قَالَ বাক্যটি পূর্বোক্ত اِذْ حَضَرَ -এর بَدْل বা স্থলাভিষিক্ত পদ। تَغْلِيْب অর্থাৎ অধিক সংখ্যককে প্রাধান্য দেওয়া এর বিধানানুসারে এইস্থানে হযরত ইসমাঈলকেও তাদের পিতৃপুরুষদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, আর পিতৃব্যের স্থান পিতার মতোই; সুতরাং এই হিসেবেও তাকে ইহুদিদের পিতৃপুরুষদের মধ্যে গণ্য করা যায়।

اِلٰهًا وَاحِدًا বাক্যটি اِلٰهَكَ -এর بَدْل বা স্থলাভিষিক্ত পদ। اَمْ كُنْتُمْ এই আয়াতে اَمْ শব্দটি অস্বীকারসূচক প্রশ্নবোধক হামযা (هَمْزَةُ اِنْكَارٍ) -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

١٣٤. تِلْكَ مُبْتَدَأٌ وَ الْاِشَارَةُ اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَيَعْقُوْبَ وَبَنِيْهِمَا وَاُنِّثَ لِتَانِيْثِ خَبَرِهٖ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ سَلَفَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ مِنَ الْعَمَلِ اَيْ جَزَاءُهٗ اِسْتِيْنَافٌ وَلَكُمُ الْخِطَابُ لِلْيَهُوْدِ مَا كَسَبْتُمْ ـ وَلَا تُسْئَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ كَمَا لَا يَسْئَلُوْنَ عَنْ عَمَلِكُمْ وَالْجُمْلَةُ تَاكِيْدٌ لِمَا قَبْلَهَا ـ

১৩৪. এই উম্মত অর্থাৎ ইবরাহীম, ইয়াকূব ও তাদের পুত্রগণ অতিবাহিত হয়েছে অতীত হয়েছে তারা যা যে আমল অর্জন করেছে তা তাদের অর্থাৎ এর প্রতিফল তাদেরই হবে। আর তোমরা এই স্থানে ইহুদিদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে যা অর্জন করবে তা তোমাদের। তারা যা করত সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে কোনো প্রশ্ন করা হবে না। যেমন তোমাদের আমল সম্পর্কে তাদেরকে কোনো প্রশ্ন করা হবে না।

এই আয়াতে تِلْكَ শব্দটি مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য। ইবরাহীম, ইয়াকূব ও এতদুভয়ের সন্তানদের প্রতি এটা দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর خَبَرٌ বা বিধেয় (اُمَّةٌ) যেহেতু مُؤَنَّثٌ বা স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ সেহেতু এটাকেও স্ত্রীলিঙ্গরূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

لَهَا مَا كَسَبَتْ এটা مُسْتَأْنِفَةٌ বা নবগঠিত বাক্য। لَا تُسْئَلُوْنَ বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের تَاكِيْد বা জোর সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

আর أَمْ শব্দটি এখানে مُنْقَطِعَةٌ তথা بَلْ هَمْزَةٌ -এর অর্থে। আর بَلْ শব্দটি إِضْرَابٌ عَنِ الْكَلَامِ الْأَوَّلِ বা প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্য ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ অসিয়তের বিবরণ থেকে ইহুদিদের ভর্ৎসনা ও নিন্দার দিকে প্রত্যাবর্তনের জন্য। ইহুদিরা হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর ব্যাপারে ইহুদিবাদের যে দাবি করছে তার খণ্ডনের দিকে প্রত্যাবর্তনের জন্য। এ সূরতে হামযাটি اِسْتِفْهَامُ اِنْكَارٍ -এর জন্য হবে। أَيْ مَا كُنْتُمْ حَاضِرِيْنَ فَلِمَ تَدَّعُوْنَ .

কেউ কেউ বলেন, اِسْتِفْهَامُ تَقْرِيْرٍ -এর জন্য এবং সম্বোধিত গোষ্ঠী হলো তাদের পূর্বপুরুষগণ।

أَيْ كَانَتْ أَوَائِلُكُمْ حَاضِرِيْنَ حِيْنَ وَصّٰى بَنِيْهِ بِالتَّوْحِيْدِ وَالْإِسْلَامِ وَأَنْتُمْ عَالِمُوْنَ بِذٰلِكَ فَمَا لَكُمْ تَدَّعُوْنَ عَلَيْهِ خِلَافَ مَا تَعْلَمُوْنَ .

কেউ বলেন– সম্বোধিত গোষ্ঠী হলো মুসলমানগণ। যারা নবী যুগে হাজির ছিলেন। তখন অর্থ হবে অসিয়তের বিষয়টি তোমরা প্রত্যক্ষ করনি; বরং এ সম্পর্কে তোমরা ওহী এবং নবী ﷺ -এর সংবাদ দানের মাধ্যমে জানতে পেরেছ। সুতরাং তার অনুসরণ তোমাদের উপর আবশ্যক।

قَوْلُهُ حُضُوْرًا : মাধ্যমে করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে شُهَدَاءَ শব্দটি شَهِيْدٌ بِمَعْنٰى حَاضِرٍ থেকে নির্গত, شَاهِدٌ [সাক্ষ্যদাতা] থেকে নির্গত নয়।

قَوْلُهُ وَلَمَّا قَالَ الْيَهُوْدُ : এর দ্বারা সামনের আয়াতের শানে নুজুলের দিকে ইঙ্গিত করছেন। একবার জনৈক ইহুদি এসে রাসূল ﷺ -কে বলল– أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ يَعْقُوْبَ يَوْمَ مَاتَ أَوْصٰى بَنِيْهِ بِالْيَهُوْدِيَّةِ

আপনি কি জানেন না যে, হযরত ইয়াকুব (আ.) ইন্তেকালের দিন তাঁর সন্তানদেরকে ইহুদি ধর্মের অনুসরণের অসিয়ত করে গেছেন। তার এ কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য এ আয়াত নাজিল হয়। সেই সাথে হযরত ইয়াকুব (আ.) মৃত্যুর সময় কি বলেছিলেন তাও বর্ণনা করে দেওয়া হয়। যাতে তার মিথ্যা ও ভ্রান্ত দাবিটি সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

قَوْلُهُ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ : **যোগসূত্র :** পূর্বের আয়াতের সাথে এ আয়াতের যোগসূত্র এই যে, পূর্বে সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়েছিল যে, হযরত ইয়াকুব (আ.) স্বীয় সন্তানদেরকে ইসলাম ধর্ম অনুসরণের অসিয়ত করেছিলেন। আর এখানে সে অসিয়তটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে।

بَدَلٌ مِنْ إِلٰهَكَ : অর্থাৎ إِلٰهًا وَاحِدًا পূর্বের إِلٰهَكَ থেকে بَدَلْ হয়েছে। এখানে بَدَلْ উল্লেখ করার কারণ হলো পূর্বের إِلٰهَكَ وَإِلٰهَ آبَائِكَ দ্বারা বাহ্যত একাধিক ইলাহ হওয়ার যে সংশয় জাগে তা নিরসন করা।

قَوْلُهُ مَا تَعْبُدُوْنَ : مَا প্রশ্নজ্ঞাপক ইসিম। مَحَلًّا মানসূব হয়েছে تَعْبُدُوْنَ -এর مَفْعُوْلٌ مُقَدَّمٌ হিসেবে। أَيْ أَيَّ شَيْءٍ কেউ কেউ বলেছেন– مَا مَوْصُوْلَةٌ মহল হিসেবে مَرْفُوْعٌ এবং تَعْبُدُوْنَ -এর عَائِدْ মাহযুফ রয়েছে। تَعْبُدُوْنَهُ

প্রশ্ন : مَنْ শব্দটি বাদ দিয়ে مَا শব্দটিকে ব্যবহার করা হলো কেন?

উত্তর : সে সময় যত ভ্রান্ত উপাস্য ছিল সেগুলো সবই غَيْرُ ذَوِى الْعُقُوْلِ ছিল। যেমন– মূর্তি, চন্দ্র ও সূর্য ইত্যাদি। এজন্য مَا দ্বারা প্রশ্ন করা হয়েছে। আর এ ঘটনা সে সময়ের যখন ইয়াকুব (আ.) মিসরে গমন করেছিলেন এবং সেখানে অনেক মানুষকে আগুনের পূজা করতে দেখেন। তাই তিনি নিজ সন্তানদের ব্যাপারে আশংকা করে উক্ত অসিয়ত করে যান।

قَوْلُهُ وَإِلٰهَ آبَائِكَ : যেহেতু ضَمِيْرٌ مَجْرُوْرٌ مُتَّصِلٌ -এর উপর عَطْفٌ করতে হলে عَامِلٌ جَارٌ -কে إِعَادَهْ করা আবশ্যক হয় তাই إِلٰهَ -কে দুইবার ব্যবহার করা হয়েছে।

قَوْلُهُ قَدْ خَلَتْ : أُمَّةٌ -এর সিফত। আর ফে'লটি خُلُوٌّ থেকে নির্গত। আর اَلْخُلُوُّ অর্থ اَلْمُضُوُّ বা অতিবাহিত হওয়া।

قَوْلُهُ وَالْجُمْلَةُ تَاكِيْدٌ لِمَا قَبْلَهُ : وَلَا تُسْئَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ জুমলাটি পূর্বের জুমলা تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ -এর تَاكِيْدٌ স্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা তাকরার বা পুনরুক্তির ফায়দা সম্পর্কে বিবরণ দেওয়া হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ : তোমরা কি উপস্থিত ছিলে? আহলে কিতাবকে সম্বোধন করা হচ্ছে এবং প্রশ্নের অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন হুমকি নিহিত রয়েছে।

প্রশ্ন : এখানে হুমকি প্রদান ও গ্লানি উদ্রেক করার অর্থে এবং অবশেষে তা নেতিবাচক অর্থে। অর্থাৎ তোমরা যে হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর নামে আজেবাজে ও অসার কথা সম্পৃক্ত করছ, তোমাদের অস্তিত্বই বা তখন কোথায় ছিল? প্রামাণ্য ঘটনাবলি তো তাই, কুরআন যা বিবৃত করছে।

قَوْلُهُ حَضَرَ الْمَوْتَ : অর্থাৎ প্রতিশ্রুত সময় নিকটবর্তী হলো এবং তিনি তার আলামত অনুভব করতে লাগলেন। মৃত্যু তার উপর সওয়ার হয়ে বসল– এ অর্থ নয়। মৃত্যু দ্বারা পরোক্ষভাবে তার পূর্বলক্ষণ বুঝানো হয়েছে। কেননা খোদ মৃত্যুই এসে পড়লে মুমূর্ষ ব্যক্তি কিছুই বলতে পারে না। পবিত্র কুরআনেই অন্যত্র রয়েছে– يَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ সবদিক হতে তার কাছে আসবে মৃত্যু [যাতনা] কিন্তু তার মৃত্যু ঘটবে না।] এখানেও মৃত্যু দ্বারা তার উপকরণাদি ও মৃত্যু আহ্বানকারী পূর্ববর্তী বিষয়সমূহ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। وَحَضُوْرُ الْمَوْتِ كِنَايَةٌ عَنْ حُضُوْرِ اَسْبَابِهِ وَمُقَدَّمَاتِهِ

قَوْلُهُ عَدُّ اِسْمَاعِيْلَ مِنَ الْاٰبَاءِ تَغْلِيْبٌ : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) একটি سُوَالٌ مُقَدَّرٌ-এর জবাব দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো– ইসমাইল (আ.) তো ইয়াকুব (আ.)-এর বাবা নন; বরং চাচা ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তাকে اٰبَاءٌ -এর অন্তর্ভুক্ত করা হলো কেন?

উত্তর: মুফাসসির (র.) এ প্রশ্নের দুটি জবাব দিয়েছেন, তা নিম্নে উপস্থাপন করো হলো–

১. হযরত ইসমাঈল (আ.), হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর বড় চাচা ছিলেন। ইয়াকূব সন্তানগণ নিজেদের পূর্ণাঙ্গ ভাগ্যমন্ততা ও উত্তরসূরী হওয়ার পরিচয় দিয়ে تَغْلِيْبًا তাকেও ইয়াকূব (আ.)-এর পিতৃকুলে গণনা করেছিল। যেভাবে গণ-ভাষায় বাপ-চাচাকে একই স্তরেই পরিগণিত করা হয়। হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুবারক জবানে তাঁর চাচা হযরত আব্বাস (রা.)-এর জন্যও পিতা (اب) শব্দ উচ্চারিত হয়েছে– هٰذَا بَقِيَّةُ اٰبَائِىْ অর্থাৎ আমার মুরব্বী বা প্রবীণদের [বাপকুলের] মাঝে একমাত্র তিনিই এখন অবশিষ্ট রয়েছেন।

২. চাচা পিতার সমতুল্য। এ হিসেবে ইসমাইল (আ.)-কে পিতার কাতারে শামিল করা হয়েছে। প্রশ্ন : পুনরায় প্রশ্ন হয় যে, ইসহাক (আ.) ছিলেন প্রকৃতি পিতা। সে হিসেবে তাঁর কথা আগে আসা উচিত ছিল।

উত্তর : হযরতইসহাক (আ.)-এর উপর হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর দুটি কারণে শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। ১. ইসমাইল (আ.) ইসহাক (আ.)-এর চেয়ে বয়সে ১৪ বছর বড় ছিলেন। ২. আমাদের নবী ﷺ ইসমাইল (আ.)-এর বংশের। এ দুই কারণে ইসমাইল (আ.)-এর নাম আগে এসেছে।

قَوْلُهُ اِسْحٰقَ : এ নামটি প্রথমবারের মতো উল্লেখ হচ্ছে। তিনি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দ্বিতীয় সন্তান। প্রথমা পত্নী হযরত সারা (আ.)-এর গর্ভজাত সন্তান। জন্মসন আনুমানিক ২০৬০ এবং ওফাত আনুমানিক ১৮৮০ খ্রিস্টপূর্ব সালে। তাওরাতে তার বয়স ১৮০ বছর উল্লিখিত হয়েছে। তাতে এ কথাও উল্লিখিত হয়েছে যে, তার জন্মকালে হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর বয়স হয়েছিল ১০০ বছর। –[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ২৪৯]

قَوْلُهُ تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ : [এবং তাদের মাহাত্ম্য-শ্রেষ্ঠত্বও তাদের সঙ্গেই বিগত হয়ে গিয়েছে, সুতরাং তাদের নামের দোহাই পড়া যে, আমাদের পূর্বপুরুষ এমন ছিলেন, তেমন ছিলেন বলাতে] আমাদের কি লাভ?] تِلْكَ اُمَّةٌ দ্বারা ইহুদিদের ঐ পিতৃপুরুষই উদ্দেশ্য, যারা নবীগণের জামাতে পরিগণিত। এখানে বক্তব্যের লক্ষ্য ইহুদিরা, যারা পিতৃপুরুষের গৌরব, বংশগর্ব ও পয়গাম্বর-পুত্র হওয়ার নেশায় মদমত্ত ছিল। এতে সমকালীন পীরজাদা তথাকথিত মাশায়েখজাদা ও অন্যান্য বিদআতী ভ্রান্তপন্থিদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। ইসলাম আমল ও কর্মের সাধনাবিহীন শুধু পূর্বপুরুষের সম্বন্ধ মাহাত্ম্য দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের প্রবণতাকে মূল থেকেই উৎপাটিত করে দিয়েছে।

قَوْلُهُ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ الخ :

যোগসূত্র : পূর্বে হযরত ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক (আ.)-এর আলোচনা ছিল। ইহুদিরা তাঁদের নিয়ে সীমাহীনগর্ভ করে বেড়াত। এখানে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধমক দিচ্ছেন যে, নবীদের সাথে তোমাদের সম্পর্ক আছে বলে তোমরাও তাদের নেক আমলের দ্বারা পার পেয়ে যাবে এ আশা করবে না। বরং তোমাদের নেক আমলই তোমাদের উপকারে আসবে।

অনুবাদ :

١٣٥. وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا اَوْ لِلتَّفْصِيْلِ وَقَائِلُ الْاَوَّلِ يَهُوْدُ الْمَدِيْنَةِ وَالثَّانِيْ نَصٰرٰى نَجْرَانَ قُلْ لَهُمْ بَلْ نَتَّبِعُ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيْفًا حَالٌ مِنْ اِبْرَاهِيْمَ مَائِلًا عَنِ الْاَدْيَانِ كُلِّهَا اِلَى الدِّيْنِ الْقَيِّمِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ

১৩৫. আর তারা বলে, ইহুদি কিংবা খ্রিস্টান হও, সঠিক পথ পাবে প্রথম উক্তিটি হলো মদীনার ইহুদিদের আর দ্বিতীয় উক্তিটি হলো নাজরান অধিবাসী খ্রিস্টানদের। তাদেরকে বলো, বরং একনিষ্ঠ হয়ে সকল ধর্মাদর্শ হতে বিমুখ ও একমাত্র সঠিক ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হয়ে আমরা ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করি। এবং সে অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.) অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

اَوْ نَصٰرٰى এর اَوْ শব্দটি تَفْصِيْلٌ কল্পে ব্যবহৃত হয়েছে।
حَنِيْفًا শব্দটি اِبْرَاهِيْمَ-এর حَالٌ বা অবস্থা ও ভাববাচক পদরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

١٣٦. قُوْلُوْا خِطَابٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا مِنَ الْقُرْاٰنِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰى اِبْرٰهٖمَ مِنَ الصُّحُفِ الْعَشْرِ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ اَوْلَادِهٖ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى مِنَ التَّوْرَاةِ وَعِيْسٰى مِنَ الْاِنْجِيْلِ وَمَآ اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ مِنَ الْكُتُبِ وَالْاٰيَاتِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ فَنُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ كَالْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ـ

১৩৬. তোমরা বল এই স্থানে মু'মিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি অর্থাৎ আল-কুরআন, আরো যা ইবরাহীমের প্রতি অর্থাৎ তৎপ্রতি অবতীর্ণ দশটি সহিফা এবং ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও আসবাত অর্থাৎ তার বংশধরদের প্রতি ও মূসা অর্থাৎ তাওরাত ও ঈসা অর্থাৎ ইঞ্জীল এবং যা অর্থাৎ যে সকল কিতাব ও আয়াত অন্যান্য নবীগণের প্রতি তাদের প্রতিপালকের তরফ হতে দেওয়া হয়েছে তাতে। আমরা তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না। অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মতো কতকজনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম আর কতকজনকে অস্বীকার করলাম– আমরা এমন করি না। এবং আমরা তাঁর নিকট আত্ম সমর্পণকারী।

١٣٧. فَاِنْ اٰمَنُوْا اَيِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى بِمِثْلِ مِثْلِ زَائِدَةٌ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَاِنْ تَوَلَّوْا عَنِ الْاِيْمَانِ فَاِنَّمَا هُمْ فِيْ شِقَاقٍ خِلَافٍ مَعَكُمْ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ يَا مُحَمَّدُ شِقَاقَهُمْ وَهُوَ السَّمِيْعُ لِاَقْوَالِهِمْ الْعَلِيْمُ بِاَحْوَالِهِمْ وَقَدْ كَفَاهُ اِيَّاهُمْ بِقَتْلِ قُرَيْظَةَ وَنَفْيِ النَّضِيْرِ وَضَرْبِ الْجِزْيَةِ عَلَيْهِمْ

১৩৭. তোমরা যাতে বিশ্বাস করেছ তারা অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রিস্টানগণ যদি সেরূপ বিশ্বাস করে তবে নিশ্চয় তারা হেদায়েতের পথ পাবে। আর যদি তারা এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে নিশ্চয় তারা বিরুদ্ধভাবাপন্ন। তোমাদের সাথে বিরোধিতায় লিপ্ত। হে মুহাম্মদ! তাদের বিরোধিতার মুখে আল্লাই তোমার জন্য যথেষ্ট। তিনি তাদের সকল কথা সম্পর্কে অতি শ্রোতা এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে অতি অবহিত। বনূ কুরায়যাকে হত্যা, বনূ নাজিরকে বহিষ্কার ও তাদের উপর জিযিয়া কর আরোপ করে তাদের শত্রুতায় আল্লাহই যথেষ্ট এ কথা তিনি বাস্তবে দেখিয়ে দিয়েছেন।

بِمِثْلِ এই স্থানে مِثْلِ শব্দটি অতিরিক্ত।

তাহকীক ও তারকীব

حَنِيْفًا : তারকীব বা বাক্যবিন্যাসে পূর্বোক্ত মুজাফ [সম্বন্ধ পদ] اِبْرَاهِيْمَ -এর হাল [অবস্থাজ্ঞাপক বিশেষণ] এ অভিমত অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ মুফাসসিরবর্গের। দ্বিতীয় অভিমত হলো حَنِيْفًا শব্দ اِبْرَاهِيْمَ -এর নয়; বরং مِلَّةَ-এর গুণবাচক এবং তা মুযাফ ইলাইহি -এর না হয়ে এবং মুযাফ [সম্বন্ধ যুক্ত পদ] -এর হাল হয়েছে। [وَهُوَ حَالٌ مِنَ الْمُضَافِ بِتَاوِيْلِ الدِّيْنِ اَوْ تَشْبِيْهًا لَهُ بِفَعِيْلٍ بِمَعْنَى مَفْعُوْلٍ] অর্থাৎ শব্দটি [حَنِيْفًا] মুযাফ [مِلَّةَ] -এর হাল হবে [এবং ملة শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হলেও তাকে পু:] الدِّيْنَ -এর অর্থে নেওয়ার ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে কিংবা فعل শব্দরূপ [وزن] বিশিষ্ট حَنِيْف শব্দকে مَفْعُوْل শব্দরূপী গুণবাচক বিশেষ্যের তুলনায় সাব্যস্ত করে [যাতে مَفْعُوْل ওজনের ক্ষেত্রে পুং ও স্ত্রী সমতুল্য। –[রূহুল মা'আনী]। এক্ষেত্রে আয়াতের তরজমা হবে আমরা তো পেয়ে গেছি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্ম, যা সরল পথ। অবশ্য حَنِيْفًا অর্থ উভয় অবস্থায়ই مُسْتَقِيْمًا وَمَائِلًا اِلَى الْحَقِّ সরল পথের অবিচল অনুসারী ও সত্য ন্যায়ের প্রতি আকৃষ্ট ও ধাবিত। সুতরাং বাক্যটির মূল রূপ হবে এভাবে بَلْ نَتَّبِعُ مِلَّتَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ কিংবা نَكُوْنُ عَلٰى مِلَّتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

قَوْلُهُ وَمَا اُوْتِىَ مُوْسٰى : এ অংশটুকুর সম্পর্ক পূর্বের مَا اُنْزِلَ -এর সাথে। এখানে প্রশ্ন হয় যে, হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি কিতাব অবতীর্ণের বিষয়টি ভিন্নভাবে বলা হলো কেন, পূর্বের সাথে একত্রে বলা হলো না কেন?

উত্তর : হযরত মূসা (আ.)-এর উপর তাওরাত এবং হরত ঈসা (আ.)-এর উপর ইঞ্জিল সরাসরি অবতীর্ণ হয়েছে বিধায় আলাদাভাবে তাদের কথা বলা হয়েছে।

তারপর আবার প্রশ্ন হয় এখানে اِيْتَاءٌ শব্দ ব্যবহার হলো কেন اَنْزَلَ ব্যবহার হলো না কেন?

উত্তর : تَكْرَار صُوْرِىْ থেকে বাঁচার জন্য এখানে اِيْتَاءٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয় জবাব হলো এখানে اِسْم مَوْصُوْل দ্বারা তাওরাত ইঞ্জিল এবং ঐ সকল মুজিযা উদ্দেশ্য যা উক্ত দুই নবীর হাতে প্রকাশিত হয়েছিল। তাই عُمُوْم বুঝানোর জন্য اِيْتَاءٌ ব্যবহৃত হয়েছে।

তৃতীয় জবাব হলো ইহুদি-নাসারাদের ব্যাপরটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সে গুরুত্ব বুঝানোর জন্য اِيْتَاءٌ ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা اِنْزَالٌ -এর তুলনায় اِيْتَاءٌ -এর মাঝে মোবালাগা বেশি রয়েছে।

قَوْلُهُ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ : এটি اٰمَنَّا -এর উপর عَطْف কিংবা لَا نُفَرِّقُ -এর উপর عَطْف হয়েছে। দ্বিতীয় সূরতে এটি اٰمَنَّا -এর দ্বিতীয় حَال হবে।

مَا اٰمَنْتُمْ بِهٖ : اَىْ بِمِثْلِ اِيْمَانِكُمْ بِهٖ -- مَصْدَرِيَّهْ -ও হতে পারে- আবার اَىْ بِمِثْلِ الَّذِىْ اٰمَنْتُمْ بِهٖ হতে পারে مَا مَوْصُوْلَهْ এখানে

قَوْلُهُ فَعد اهْتَدَوْا : এটি جَوَابُ شَرْط আয়াতের শুরুতে যেহেতু اِنْ شَرْطِيَّةٌ রয়েছে তাই এখানে شَرْط এবং جَزَا উভয়টি মাজি হওয়া সত্ত্বেও মুজারের অর্থে হবে। اَىْ اَنْ يُؤْمِنُوْا يَهْتَدُوْا

قَوْلُهُ فِىْ شِقَاقٍ : شِقَاقٌ -এর تَنْوِيْن টি تَفْخِيْم বা গুরুত্ব বুঝানোর জন্য شَقٌّ [দিক বা পার্শ্ব] থেকে নির্গত।

لِاَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَشَاقِّيْنَ لِكَوْنٍ فِىْ شِقٍّ غَيْرِشِقِّ صَاحِبِهٖ .

قَوْلُهُ خِلَافٍ مَعَكُمْ : এটি شِقَاقٌ -এর তাফসীর। অভিধানে شِقَاقٌ নিম্নোক্ত তিনটি অর্থে আসে–

١. اَلْخِلَافُ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا .

٢. اَلْعَدَاوَةُ مِثْلُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى لَا يَحبر مِنْكُمْ شِقَاقٌ .

٣. اَلضَّلَالُ مِثْلُ : وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَفِىْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ .

মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করলেন যে, এখানে شِقَاقٌ প্রথম অর্থে ব্যবহৃত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصَارٰى الخ : ইহুদি ও খ্রিস্টান উভয় সম্প্রদায়ই নও মুসলিম ও আধা মুসলমানদের নিজ নিজ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করতে সচেষ্ট ছিল এই বলে যে, সাফল্য ও মুক্তি পেতে চাও তো আমাদের ধর্মে ঢুকে পড়। ঐ নতুন ধর্মে তেমন কি-ই বা আছে। মুসলমানদেরও এ জবাব শিখিয়ে দেওয়া হলো যেমন তোমাদের ওখানে রদবদল ও বিকৃতি ছাড়া আর

আছেই বা কি আর আমাদের ধর্ম তো কোনোক্রমেই নবজাত নয়, তা তো শুধু হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রাচীন তৌহিদী ধর্ম এবং আমরাই তার প্রকৃত ও অবিকৃত রূপরেখার ধারক ও বাহক।

قَوْلُهُ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ : এখানে কিতাবীদের প্রতি কটাক্ষ করা হচ্ছে যে, কোন মুখে তোমরা নিজেদেরকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সঙ্গে সম্বন্ধিত করছ? তিনি শিরক -এর ধারে কাছেও যাননি, অংশীবাদের পাশ দিয়েও ঘেষেননি। মূলত ইহুদি খ্রিস্টানরাও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নিষ্কলুষ একত্ববাদ অনুসরণের কথা একবাক্যে স্বীকার করত, যদিও কার্যত তাঁরা তার পন্থা বর্জন করে রেখেছিল। আর মসীহ [যীশু] -এর অনুসারী হওয়ার দাবিদাররাও প্রকাশ্য শিরকে নিমজ্জিত হয়েছিল।

قَوْلُهُ وَاِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ : এখানে প্রশ্ন হয় যে, উক্ত তিনজন নবীর কারো উপরই তো কোনো কিতাব বা সহীফা অবতীর্ণ হয়নি; বরং দশটি সহীফা যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শুধু হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উপর নাজিল হয়েছিল। তারপরও উক্ত তিনজনের عَطْف হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মাঝে কিভাবে হলো?

উত্তর : তাঁদের কিতাব বা সহীফা নাজিল না হলেও যেহেতু এ তিনজন নবী ইবরাহীম (আ.)-এর সহীফার মুকাল্লাদ ছিলেন তাই ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে তাঁদেরকেও আতফ করা হয়েছে। যেমন কুরআনের ব্যাপারে বলা হয়েছে- وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا অথচ আমাদের উপর কুরআন নাজিল হয়নি; বরং তা হযরত মুহাম্মদ (আ.)-এর উপর নাজিল হয়েছে। যেহেতু আমরা তার বিধানাবলির অনুসরণ করতে বাধ্য, তাই তা অবতীর্ণের নিসবত আমাদের প্রতি করা হয়েছে। অনুরূপভাবে এখানেও এমনটি হয়েছে।

قَوْلُهُ اَوْلَادُهٗ : এখানে اَوْلَادٌ দ্বারা হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর সন্তানাদি উদ্দেশ্য এবং তার اَوْلَادٌ صُلْبِيَّةٌ বা ঔরসজাত সন্তানাদি উদ্দেশ্য। কখনো ছেলের সন্তানকেও وَلَدٌ-কে বলা হয় তাই মুফাসসির (র.) اَلْاَسْبَاطُ-এর ব্যাখ্যা করেছেন اَوْلَادٌ দ্বারা।

قَوْلُهُ مِنَ الْكُتُبِ وَالْاٰيَاتِ : এটি مَا اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ-এর মিসদাক। অর্থাৎ অন্যান্য নবীদেরকে যে সকল কিতাব ও মুজিযা প্রদান করা হয়েছিল।

قَوْلُهُ فَنُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ : এখানে প্রশ্ন হয় যে, কতক রাসূলের উপর কতক রাসূলের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনেই অন্য আয়াতে রয়েছে تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ তাহলে এখানে لَانُفَرِّقُ-এর মর্ম কি? জবাব : মুফাসসির (র.) فَنُؤْمِنُ بِبَعْضٍ الخ বলে ইঙ্গিত করলেন যে, এখানে تَفْرِيْقٌ দ্বারা تَفْرِيْقٌ فِى الْاِيْمَانِ উদ্দেশ্য, تَفْرِيْقٌ فِى الْاَفْضَلِيَّةِ উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهُ كَالْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى : অর্থাৎ আমরা ইহুদি-নাসারাদের মত নবীদের মাঝে বিবেধ সৃষ্টি করি না। ইহুদিরা হযরত মুসা (আ.)-এর উপর ঈমান এনেছে এবং হযরত ঈসা ও রাসূল ﷺ-কে অস্বীকার করেছে। আর নাসারারা হযরত ঈসা (আ.)-এর উপর ঈমান এনেছে; কিন্তু রাসূল ﷺ এবং হযরত মূসা (আ.)-কে অস্বীকার করেছে।

فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَا اٰمَنْتُمْ بِهٖ : এ সম্বোধনের লক্ষ্য রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম (রা.)। আর এ লোকেরা দ্বারা উদ্দেশ্য সেই কিতাবী কাফের ও ইসলাম প্রত্যাখ্যানকারীরাই, যাদের ধারাবাহিক আলোচনা চলমান। এ আয়াতে এ মর্মে শুভ সংবাদ পরিবেশন করা হচ্ছে যে, এতদূর একগুয়েমী হঠকারিতা সত্ত্বেও যদি এখনও তারা ঈমান গ্রহণ করে, তবে তাদের বিগত কুফরি ও হঠকারিতা তাদের পথে অন্তরায় হতে পারে না।

সাহাবাদের ঈমান হলো মাপকাঠি : আয়াতে রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের ঈমানকে আদর্শ ঈমানের মাপকাঠি সব্যস্ত করে নির্দেশ করা হয়েছে যে, আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য ও স্বীকৃত ঈমান হচ্ছে সে রকম ঈমান, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবায়ে কেরাম অবলম্বন করেছেন। যে ঈমান ও বিশ্বাস এ থেকে চুল পরিমাণও ভিন্ন, তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

–[বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, মাআরিফুল কুরআন : মুফতি শফী (র.)]

قَوْلُهُ مِثْلِ زَائِدَةٌ : এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে একটি اِعْتِرَاضٌ-এর জবাব দিয়েছেন। তাহলো, আয়াতে ইহুদি-নাসারাদের বলা হয়েছে যে, যদি তারা 'তার অনুরূপ' এর উপর ঈমান আনে- যার উপর ঈমান এনেছে মুসলমানগণ, তাহলে তারা হেদায়েত পাবে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মুসলমানগণ একমাত্র আল্লাহর উপরই ঈমান এনেছে। এখন তার مِثْل-এর উপর ঈমান আনতে হলে তো আল্লাহর مِثْل হওয়া আবশ্যক হয়। অথচ আল্লাহর কোনো مِثْل নেই।

জবাব : এখানে مِثْل শব্দটি অতিরিক্ত এ জবাবের সমর্থন ঐ কেরাত দ্বারা হয় যার মাঝে بِمِثْلِ مَا اٰمَنْتُمْ-এর স্থলে بِمَا اٰمَنْتُمْ بِهٖ রয়েছে। –[জামালাইন]

অনুবাদ :

١٣٨. صِبْغَةَ اللّٰهِ مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ لِاٰمَنَّا وَنَصْبُهُ بِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ اَىْ صَبَغَنَا اللّٰهُ وَالْمُرَادُ بِهَا دِيْنَهُ الَّذِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهِ لِظُهُوْرِ اَثَرِهٖ عَلٰى صَاحِبِهٖ كَالصَّبْغِ فِى الثَّوْبِ وَمَنْ اَىْ لَا اَحَدَ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً تَمْيِيْزٌ وَنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ ـ

১৩৮. আল্লাহর রং অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তার রঙ্গে বিভূষিত করেছেন। এইস্থানে রং অর্থ আল্লাহপ্রদত্ত দীন এবং স্বভাব [যার উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন।] রং যেমন কাপড়ের সকল স্থানে গিয়ে প্রবেশ করে তেমনি স্বভাব ধর্মের প্রভাবও তার অধিকারী জনের সর্বত্রে গিয়ে প্রকাশ পায়। [এই সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য করে এই স্থানে স্বভাব ধর্মকে রং এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। রঙ্গে আল্লাহ অপেক্ষা কে অধিকতর সুন্দর? না, এমন কেউ আর নেই এবং আমরা তাঁরই ইবাদতকারী।

صِبْغَةَ اللّٰهِ এটা اٰمَنَّا -এর مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ বা জোর অর্থবোধক সমধাতুজ কর্ম উহ্য ক্রিয়া صَبَغَنَا -এর কারণে, এটা مَنْصُوْبٌ [দ্রষ্টব্য ভূমিকা কতিপয় পরিভাষা] রূপে ব্যবহৃত হয়েছে

١٣٩. قَالَ الْيَهُوْدُ لِلْمُسْلِمِيْنَ نَحْنُ اَهْلُ الْكِتَابِ الْاَوَّلِ وَقِبْلَتُنَا اَقْدَمُ وَلَمْ تَكُنِ الْاَنْبِيَاءُ مِنَ الْعَرَبِ وَلَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ نَبِيًّا لَكَانَ مِنَّا فَنَزَلَ قُلْ لَهُمْ اَتُحَاجُّوْنَنَا تُخَاصِمُوْنَنَا فِى اللّٰهِ اَنِ اصْطَفٰى نَبِيًّا مِنَ الْعَرَبِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ فَلَهٗ اَنْ يَّصْطَفِىَ مِنْ عِبَادِهٖ مَنْ يَّشَاءُ وَلَنَا اَعْمَالُنَا نُجَازٰى بِهَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ تُجَازَوْنَ بِهَا فَلَا يَبْعُدُ اَنْ يَّكُوْنَ فِىْ اَعْمَالِنَا مَا نَسْتَحِقُّ بِهِ الْاِكْرَامَ وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ ـ الدِّيْنَ وَالْعَمَلَ دُوْنَكُمْ فَنَحْنُ اَوْلٰى بِالْاِصْطِفَاءِ وَالْهَمْزَةُ لِلْاِنْكَارِ وَالْجُمَلُ الثَّلَاثُ اَحْوَالٌ

১৩৯. ইহুদিরা মুসলিমদেরকে বলত, আমরা প্রথম আল্লাহ প্রেরিত গ্রন্থের অধিকারী; আমাদের কেবলাও পূর্বের। আরবে পূর্বে কোনো নবী ও প্রেরিত হননি। সুতরাং মুহাম্মদ ﷺ যদি প্রকৃতই নবী হতেন, তবে আমাদের গোত্রেই তাঁর জন্ম হতো। এই সংশ্রবে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন, তাদের বলো, আল্লাহ সম্বন্ধে তোমরা কি আমাদের সাথে বিতর্কে বিবাদে লিপ্ত হতে চাও? যে তিনি আরব হতে একজন নবী মনোনীত করেছেন। অথচ তিনি আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক সুতরাং বান্দাদের হতে যাকে ইচ্ছা নবী হিসেবে মনোনীত করার অধিকার একমাত্র তাঁরই। [আমাদের কর্ম আমাদের আমাদেরকে তারই প্রতিদান দেওয়া হবে এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের তোমরা তারই প্রতিদান পাবে। সুতরাং আমাদের কর্মের মধ্যে এমন থাকা অসম্ভব নয় যে, যা দ্বারা আমরা সম্মানের অধিকারী হতে পারি। এবং দীন ও আমলের বিষয়ে তোমরা নও; বরং আমরাই তাঁর প্রতি অকপট। সুতরাং মনোনয়নের ব্যাপারে আমরাই অধিক যোগ্য।

اَتُحَاجُّوْنَنَا এই স্থানে هَمْزَةٌ টি اِنْكَارِىْ বা অস্বীকার অর্থব্যঞ্জক।

وَنَحْنُ لَهٗ এবং وَلَنَا اَعْمَالُنَا ও وَهُوَ رَبُّنَا এই বাক্যত্রয় এই স্থানে حَالٌ বা ভাব ও অবস্থাবাচক বাক্যরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلَهٗ دُوْنَكُمْ : বলে এ কথা বুঝিয়েছেন যে, وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ -এর মাঝে مُسْنَدْ اِلَيْهِ -এর মুকাদ্দম হওয়াটা قَصْر -এর জন্য হয়েছে।

قَوْلَهٗ الدِّيْنَ وَالْعَمَلَ : যেহেতু مُخْلِصُوْنَ শব্দটি اِخْلَاص তথা মুতাআদ্দী মাসদার থেকে নির্গত তাই মুফাসসির (র.) তার مَفْعُوْل -এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهٗ وَالْهَمْزَةُ لِلْاِنْكَارِ : অর্থাৎ اَتُحَاجُّوْنَ -এর মাঝে হামযাটি হলো اِنْكَار বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের জন্য। اَىْ لَا يَنْبَغِىْ لكم ان تحاجونا এ থেকে এ সংশয়ও দূর হয়ে যায় যে, প্রশ্ন করা আল্লাহর জন্য অনুচিত। কেননা তিনি সবকিছু জানেন।

قَوْلَهٗ وَالْجُمَلُ الثَّلَاثُ اَحْوَالٌ : اَحْوَالٌ শব্দটি حَالٌ -এর বহুবচন। অর্থাৎ তিনটি জুমলা حَالٌ হয়েছে। সে তিনটি জুমলা হলো–

١. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ . ٢. وَلَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ . ٣. وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ .

এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে একটি আপত্তির জবাব দিয়েছেন।

আপত্তি : وَاوْ -এর মাঝে মূল হলো عَطْف সুতরাং উক্ত তিনটি বাক্যেই وَاو আতফের জন্য ব্যবহৃত। তার مَعْطُوْف عَلَيْهِ হলো جُمْلَةُ الْاِنْشَائِيَّةُ যা تُحَاجُّوْنَنَا কে جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ আর তিনটি বাক্যই হলো جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ তাই এখানে اِنْشَائِيَّه -এর উপর عَطْف করা লাজেম আসছে, যা সঠিক নয়।

জবাব : وَاوْ ঐ স্থানে عَطْف -এর জন্য মূল হয় যেখানে عَطْف হওয়ার জন্য কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকে। আর এখানে প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান আছে। তাহলো جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ -কে جُمْلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ -এর উপর عَطْف করা। সুতরাং এখানে وَاوْ টি عَاطِفَةٌ নয়; বরং حَالِيَةٌ - اَتُحَاجُّوْنَنَا -এর জমির থেকে حال হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে ঈমানের পন্থা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এখন এ আয়াতে ঈমানী তরীকার বিরুদ্ধাচারণকারীদের চক্রান্তের জবাব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, ইহুদি নাসারাগণ প্রতিনিয়ত এ চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে যে, তোমরাদেরকেও তাদের রঙে রঞ্জিত করে দিবে। হে মুসলমানগণ! তোমরা তাদেরকে বলে দাও আমাদেরকে তো আল্লাহ নিজের রঙে রঞ্জিত করে দিয়েছেন, তোমাদের রঙের কোনো প্রয়োজন নেই।

مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ لِاٰمَنَّا : অর্থাৎ صِبْغَةٌ হলো فِعْل مُقَدَّرٌ -এর মাসদার এবং اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ الخ -এর বিষয়বস্তুর তাকিদ স্বরূপ। কেননা উক্ত বাক্যে অন্য কোনো বিষয়বস্তুর অবকাশ নেই। এজন্য তার আমেল হযফ করা হয়েছে। صِبْغَةَ اللّٰهِ মূলত صَبَغَنَا اللّٰهُ صِبْغَةً ছিল। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে– وَعْدَ اللّٰهِ وَصُنْعَ اللّٰهِ اَىْ وَعَدَ اللّٰهُ وَعْدًا وَصَنَعَ اللّٰهُ صُنْعًا

صِبْغَةَ اللّٰهِ **-এর মর্ম :** পূর্বের আয়াতে দীন ইসলামকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি নিসবত করে বলা হয়েছে- مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا এখানে সরাসরি আল্লাহ তা'আলার দিকে নিসবত করে বলা হচ্ছে প্রকৃত পক্ষে দীন তো হলো আল্লাহরই। কোনো পয়গাম্বরের দিকে তা রূপক অর্থে সম্পৃক্ত করা হয়ে থাকে। আর এখানে মিল্লাত বা ধর্মকে صِبْغَةَ اللّٰهِ শব্দে প্রকাশ করে দুটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে–

১. নাসারাদের খণ্ডন করা হয়েছে। তারা বড়াই করে বলতো, আমাদের এক প্রকার রং আছে, যা মুসলমানদের নেই। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের স্থিরীকৃত রং ছিল হলুদ। তাদের নিয়ম ছিল, যখন কোনো শিশুর জন্ম হতো, অথবা কেউ তাদের দীনে দীক্ষিত হতো, তখন তাকে সে রঙ্গে ডুব দেওয়ানো হতো। তারপর বলত, এবার সে খাঁটি খ্রিস্টান হয়ে গেল। আল্লাহ বলে দিলেন, হে মুসলমানগণ! তোমরা বলে দাও, তাদের পানির রং ধুলে শেষ হয় যায়। ধোয়ার পর এর কোনো প্রভাব বাকি থাকে না। প্রকৃত রং তো হলো আল্লাহর দীন ও মিল্লাতের রং আমরা আল্লাহর দীন কবুল করেছি। এ দীনে যে প্রবেশ করে সে সর্ব প্রকার মলিনতা থেকে পবিত্র হয়ে যায়।

২. দীনকে রং বলে এ এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রং যেরূপ চোখে অনুভব করা যায় অনুরূপ মুমিনের ঈমানেরও আলামত রয়েছে, যা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং সকল কাজ-কর্মে ফুটে উঠা উচিত। صِبْغَةَ اللّٰهِ এর দুটি অনুবাদ হয়- ১. আমরা আল্লাহর রং গ্রহণ করেছি; ২. তোমরা আল্লাহর রং গ্রহণ করো।

قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِهَا دِيْنُهُ :

১. আয়াতে বর্ণিত صِبْغَةَ اللّٰهِ দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহর দীন। যাকে অন্য এক আয়াতে فِطْرَتْ দ্বারা বুঝানো হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّذِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهِ

অর্থাৎ যে ফিতরী ধর্মের উপর আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এখানে সে دِيْنِ فِطْرَتْ -ই উদ্দেশ্য।

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, صِبْغَةَ اللّٰهِ দ্বারা খতনাকে বুঝানো হয়েছে, যা ইবরাহীম ধর্মের বিশেষ প্রতীক।

৩. কেউ কেউ বলেন, صِبْغَةَ اللّٰهِ দ্বারা উদ্দেশ্য تَطْهِيْرُ اللّٰهِ বা আল্লাহর পবিত্রকরণ।

قَوْلُهُ لِظُهُوْرِ أَثَرِهِ عَلٰى صَاحِبِهِ : মুফাসসির (র.) এ ইবারত দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, আয়াতে اِسْتِعَارَهْ تَصْرِيْحِيَّةٌ হয়েছে। এভাবে যে, আয়াতে دِيْنُ اللّٰهِ রঙ্গিন কাপড়ের সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে। আর مُشَبَّهْ উহ্য রয়েছে এবং مُشَبَّهْ بِهِ উল্লিখিত। আর উভয়ের মাঝে وَجْهُ شِبَهْ হলো ظُهُوْرِ اَثَرِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلٰى صَاحِبِهِ তাইতো ঈমানের প্রতিক্রিয়া মু'মিনের মাঝে প্রকাশ পায় যেমন কাপড়ে রঙ ফুটে উঠে।

قَالَ الْيَهُوْدُ : এ ইবারত দ্বারা মুফাসসির (র.) সামনে আয়াতের শানে নুজুলের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, একবার ইহুদীরা মুসলমানদেররকে বলল, আমরা আহলে কিতাবদের মধ্যে অগ্রবর্তী। আমাদের কেবলা সবার চেয়ে প্রাচীন এবং সকল নবী আমাদের মধ্য হতে, আরবের কোনো নবী নেই। যদি মুহাম্মদ নবী হতো, তাহলে আমাদের মধ্য থেকে হতো। এ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

قَوْلُهُ اَهْلُ الْكِتَابِ الْاَوَّلِ : اَلْكِتَابُ الْاَوَّلُ -এর মিসদাক হলো তাওরাত। আপত্তি জানায় তাওরাতের পূর্বেও তো বহু কিতাব অতীত হয়েছে। তারপরও তাওরাতকে প্রথম কিভাবে বলা হলো?

জবাব : তাওরাতের اَوَّلِيَّتْ বা প্রথমে হওয়াটা কুরআন এবং ইঞ্জিলের নিসবতে করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَقِبْلَتُنَا اَقْدَمُ : قِبْلَتُنَا -এর মিসদাক হলো বায়তুল মুকাদ্দাস। আর اَقْدَمُ শব্দটি اِسْمُ تَفْضِيْلٍ -এর সীগাহ। এখানে مُفَضَّلٌ عَلَيْهِ উহ্য রয়েছে। اَىْ اَقْدَمُ مِنَ الْكَعْبَةِ

قَوْلُهُ وَلَمْ يَكُنِ الْاَنْبِيَاءُ مِنَ الْعَرَبِ : اَىْ بَلْ كَانَتْ مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ بَعْدَ اِسْرَائِيْلَ

قَوْلُهُ لَهُ فِى اللّٰهِ : এখানে মুজাফ মাহযুফ রয়েছে- اَىْ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَوْ فِىْ شَاْنِ اللّٰهِ اَوِ اصْطَفَائِهِ نَبِيًّا مِنَ الْعَرَبِ

قَوْلُهُ هُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ : اَىْ اَتُجَادِلُوْنَنَا وَالْحَالُ اَنَّهُ لَا وَجْهَ لِلْمُجَادَلَةِ اَصْلًا لِاَنَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ اَىْ مَالِكُ اَمْرِنَا وَاَمْرِكُمْ

قَوْلُهُ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُوْنَ : وَاوْ আতফা, পূর্বের সাথে عَطْف হয়েছে। مُخْلِصُوْنَ শব্দটি اِخْلَاصْ থেকে নির্গত। اِخْلَاصْ -এর ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মতামত রয়েছে।

١. رُوِىَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ سَاَلْتُ جِبْرِيْلَ عَنِ الْاِخْلَاصِ مَا هُوَ فَقَالَ سَاَلْتُ رَبَّ الْعِزَّةِ فَقَالَ سِرٌّ مِنْ اَسْرَارِىْ اَسْتَوْدِعُهُ قَلْبَ مَنْ اَحْبَبْتُهُ مِنْ عِبَادِىْ -

٢. وَقَالَ حُذَيْفَةُ (رض) اَنْ تَسْتَوِىَ اَفْعَالُ الْعَبْدِ فِى الْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ -

٣. وَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ اَلْاِخْلَاصُ اَنْ لَا تُشْرِكَ فِىْ دِيْنِهِ وَلَا تُرَائِىْ اَحَدًا فِىْ عَمَلِهِ -

ইখলাসের বিপরীত বস্তু হলো رِيَاءٌ বা লোক দেখানো। তার তিনটি আলামত রয়েছে-

١. اَلْكَسَلُ عِنْدَ الْعِبَادَةِ فِى الْوَحْدَةِ -

٢. اَلنَّشَاطُ عِنْدَ الْعِبَادَةِ فِى الْكَثْرَةِ -

٣. حُبُّ الثَّنَاءِ عَلَى الْعَمَلِ -

অনুবাদ :

١٤٠. اَمْ بَلْ يَقُوْلُوْنَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ اِنَّ اِبْرٰهِمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ كَانُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى قَالَ لَهُمْ ءَ اَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ اَىِ اللّٰهُ اَعْلَمُ وَقَدْ بَرَّأَ مِنْهُمَا اِبْرَاهِيْمَ بِقَوْلِهٖ مَا كَانَ اِبْرَاهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَ لَا نَصْرَانِيًّا وَالْمَذْكُوْرُوْنَ مَعَهٗ تَبَعٌ لَهُمْ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ اَخْفٰى مِنَ النَّاسِ شَهَادَةً عِنْدَهٗ كَائِنَةً مِنَ اللّٰهِ اَىْ لَا اَحَدَ اَظْلَمُ مِنْهُ وَهُمُ الْيَهُوْدُ كَتَمُوْا شَهَادَةَ اللّٰهِ فِى التَّوْرَاةِ لِاِبْرٰهِيْمَ بِالْحَنِيْفَةِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ تَهْدِيْدٌ لَهُمْ ـ

১৪০. বরং তোমরা কি বল যে, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইয়াকূব ও তার বংশধরগণ ইহুদি কিংবা খ্রিস্টান ছিল। বল, তোমরা কি বেশি জান, না আল্লাহ? নিশ্চয় আল্লাহই অধিক জানেন। আর তিনি হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে এতদুভয় হতে মুক্ত বলে ঘোষণা করেছেন। ইরশাদ করেন, مَا كَانَ اِبْرَاهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا অর্থাৎ ইব্রাহীম (আ.) ইহুদি বা খ্রিস্টান কোনো সম্প্রদায়ভুক্তই ছিলেন না। আর এই আয়াতোক্ত অন্যান্য নবীগণ ছিলেন তাঁরই অনুসারী। [সুতরাং তাঁরাও ইহুদি ও খ্রিস্টান ছিলেন না।] আল্লাহর নিকট হতে তার কাছে যে প্রমাণ আছে তা যে গোপন করে। মানুষের নিকট লুকায় তদপেক্ষা অধিকতর সীমালজ্ঘনকারী আর কে হতে পারে? না, আর কেউ অধিকতর সীমালজ্ঘনকারী নেই। তারা হলো ইহুদি। হযরত ইবরাহীম (আ.) হানীফিয়্যাতের [সরল ধর্মের] অনুসারী ছিলেন বলে তাওরাতে আল্লাহ তা'আলা যে সাক্ষ্য উল্লেখ করেছেন তারা তা গোপন করে রেখেছিল। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্বন্ধে অনবহিত নন। এই আয়াতটি তাদের প্রতি ধমকি স্বরূপ।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ এ স্থানে اَمْ শব্দটি بَلْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। يَقُوْلُوْنَ ক্রিয়াটি ت [দ্বিতীয় পুরুষ] ও ى [নাম পুরুষ] উভয় অক্ষর সহকারেই পঠিত রয়েছে।

١٤١. تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْئَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ تَقَدَّمَ مِثْلُهٗ ـ

১৪১. এই উম্মত অতীত হয়েছে তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের; তোমরা যা অর্জন করেছ, তা তোমাদের। তারা যা করত সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে কোনো প্রশ্ন করা হবে না। পূর্বে এই ধরনের আয়াত উল্লিখিত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ بَلْ أَ : কোনো কোনো নোসখায় هَمْزَهْ اِسْتِفْهَامْ উল্লেখ্য নেই। সে সময় হামযাটি উহ্য ধরা হবে। মুফাসসির (র.) এখানে اَمْ-এর পরে بَلْ أَ উল্লেখ্য করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে اَمْ টি اَمْ مُنْقَطِعَةْ যা بَلْ এবং هَمْزَهْ اِسْتِفْهَامْ-এর অর্থে।–

فَيَكُوْنُ قَدْ اَنْتَقَلَ عَنْ قَوْلِهٖ اَتُحَاجُّوْنَنَا وَاَخَذَ فِى الْاِسْتِفْهَامِ عَنْ قَضِيَّةٍ اُخْرٰى ـ

কেউ কেউ বলেন– اَمْ টি اَمْ مُتَّصِلَةْ এ সময় اِسْتِفْهَامْ দ্বারা উদ্দেশ্য হবে উভয়টিকে অস্বীকার করা।

اَىْ كُلٌّ مِنَ الْاَمْرَيْنِ مُنْكَرٌ لَا يَنْبَغِىْ اَنْ يَكُوْنَ اِقَامَةُ الْحُجَّةِ وَلَا الْاِفْتِرَاءُ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

যেহেতু اَمْ مُتَّصِلَةْ-এর সূরতে এ সংশয় জাগে যে, সম্ভবত দুটি বাক্যের যে কোনো একটি বাক্য সংঘটিত হয়েছে এবং প্রশ্ন শুধু تَعْيِيْن বা নির্ধারণ সম্পর্কে। অথচ বিষয়টি এমন নয়। কেননা উভয়টি বিষয়ই সংঘটিত হয়েছে। এজন্য মুফাসসির (র.) مُنْقَطِعَةْ-কেই প্রাধান্য দিয়েছেন। যাতে সম্ভাবনা দূর হয়ে যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَمْ تَقُوْلُوْنَ الخ : **যোগসূত্র :** পূর্বের আয়াতে আল্লাহ এবং আখেরী জমানার নবী সম্পর্কে ইহুদিদের বিতর্ক ও হঠকারিতার আলোচনা ছিল। এখানে হযরত ইবরাহীম, ইসহাক, ইসমাইল ও ইয়াকুব (আ.) সম্পর্কে ইহুদিদের ভ্রান্ত দাবীর আলোচনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ قَوْلُهُ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً : আল্লাহর সাক্ষ্য এই যে, এরা সকলেই নিখুঁত ও খাঁটি একত্ববাদের অনুগামী ছিলেন। এখানে মূলত ঐ সকল ইহুদি আলেমদের প্রতি সম্বোধন করা হয়েছে, যারা একথা ভালো করেই জানত যে ইহুদি ধর্ম এবং খ্রিস্টধর্ম বর্তমান বৈশিষ্ট্যাবলিসহ অনেক পরে সৃষ্টি হয়েছে। এতদসত্ত্বেও তারা হককে নিজেদের মাঝেই সীমিত মনে করত। তারা প্রকাশ্যে বলে বেড়াত হযরত ইবরাহীম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.) ইহুদি ছিলেন। কুরআন নাজিলের সময়কার ইহুদি আলেমদেরকে তাদের এই নির্জলা মিথ্যা দাবির বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করে একজন নিরক্ষর ব্যক্তির মুখে বলানো হচ্ছে যে, তোমরা প্রকৃত ঘটনাকে বিকৃত করে এবং সত্য-ন্যায়ের অপমৃত্যু ঘটিয়ে যা কিছু বলে যাচ্ছ, কিন্তু প্রকৃত বাস্তব ও সত্য ঘটনা তো এই যে, পূর্বোক্ত মনীষীগণ একনিষ্ঠ তাওহীদবাদী ও সকলেই তাওহীদের বাণীর প্রচারক ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র আরও দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন- مَا كَانَ اِبْرَاهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا হযরত ইব্রাহীম (আ.) ইহুদি ছিলেন না এবং খ্রিস্টানও ছিলেন না।

قَوْلُهُ تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ : এ আয়াতের সাথে পূর্বের আয়াতের যোগসূত্র এই যে, পূর্বে আল্লাহ তা'আলা وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ দ্বারা ধমকী দিয়েছিলেন। এখন এ আয়াতে সে ধমকীর তাকীদ করা হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের আমলের বদলা দিবেন। তাদের আমল সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। অন্যদের সম্পর্কে নয়। تِلْكَ اُمَّةٌ দ্বারা ইসরাঈল জাতির পূর্বসূরী শ্রেষ্ঠ মনষীবর্গ বিশেষত: তিন পুরুষ হযরত ইবরাহীম, ইসহাম ও ইয়াকূব (আ.) উদ্দেশ্য, যাদের বংশধর হওয়ার সূত্রে ইহুদিরা সীমাহীন গর্বে গর্বিত ছিল। -[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ২৫৭]

একটু পূর্বেই এরূপ একটি আয়াত আলোচিত হয়েছে; কিন্তু আহলে কিতাবদের অন্তরে যেহেতু তাদের বংশীয় আভিজাত্যবোধের কারণে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, আমাদের ক্রিয়াকলাপ যতই মন্দ হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত আমাদের বাপ-দাদাগণ আমাদের নিষ্কৃতির ব্যবস্থা করবেনই। তাদের এ অবান্তর ধারণা রদ করার জন্য এ আয়াতের পুনরাবৃত্তি করে বক্তব্যকে আরো জোরদার করা হয়েছে। যেন পবিত্র কুরআন ইহুদিদের 'পৈত্রিক পরিত্রাণ' মতবাদের বিপক্ষে লাগাতার কঠোর আঘাত হেনে চলেছে। কিংবা বলুন, পূর্বের আয়াতে আহলে কিতাবকে সম্বোধন করা হয়েছিল আর এ আয়াতের সম্বোধন রাসূল ﷺ -এর উম্মতের প্রতি। তাদের বলা হয়েছে যে, এরূপ অবান্তর ধারণায় তারা যেন আহলে কিতাবের অনুসরণ না করে। নিজেদের পূর্বপুরুষদের প্রতি লক্ষ্য করে যে কারও মনে এরূপ ধারণা জন্ম নিতে পারে; কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। -[তাফসীরে উসমানী পৃ. ২৬]

قَوْلُهُ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ : অর্থাৎ তাদের ঈমান ও পুণ্যকর্ম দ্বারা তোমাদের কোনো লাভ হবে না এবং তোমাদের কুফরি ও পাপকর্ম দ্বারা তাদের কোনো ক্ষতি হবে না। -[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ২৫৭]

اَلْجُزْءُ الثَّانِى : দ্বিতীয় পারা

১৪২. سَيَقُوْلُ السُّفَهَاءُ اَلْجُهَّالُ مِنَ النَّاسِ الْيَهُوْدِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مَا وَلّٰهُمْ اَىُّ شَىْءٍ صَرَفَ النَّبِىَّ ﷺ وَالْمُؤْمِنِيْنَ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِىْ كَانُوْا عَلَيْهَا عَلٰى اِسْتِقْبَالِهَا فِى الصَّلٰوةِ وَهِىَ بَيْتُ الْمُقَدَّسِ وَالْاِتْيَانُ بِالسِّيْنِ الدَّالَّةِ عَلَى الْاِسْتِقْبَالِ مِنَ الْاِخْبَارِ بِالْغَيْبِ قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اَىِ الْجِهَاتُ كُلُّهَا فَيَأْمُرُ بِالتَّوَجُّهِ اِلٰى اَىِّ جِهَةٍ شَاءَ لَا اِعْتِرَاضَ عَلَيْهِ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ هِدَايَتَهٗ اِلٰى صِرَاطٍ طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ دِيْنِ الْاِسْلَامِ اَىْ وَمِنْهُمْ اَنْتُمْ دَلَّ عَلٰى هٰذَا ـ

অনুবাদ :

১৪২. নির্বোধ লোকগণ ইহুদি ও মুশরিকদের অজ্ঞলোকগণ বলবে যে, কিসে তাদেরকে বিমুখ করল? অর্থাৎ কোন জিনিস নবী ও মু'মিনগণকে ফিরিয়ে দিল? তাদের ঐ কিবলা হতে, তারা এ যাবৎ যে কিবলা অনুসরণ করে আসছিল অর্থাৎ সালাতের মধ্যে যাকে তারা কিবলা হিসেবে গ্রহণ করে আসছিল, আর তা ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস। سَيَقُوْلُ ক্রিয়াটির প্রারম্ভে ভবিষ্যতার্থক অক্ষর س ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং এটা গায়েব অজানা সম্পর্কিত সংবাদ প্রদানের অন্তর্ভুক্ত। বল, পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই অর্থাৎ সকল দিকই তাঁর। সুতরাং তিনি যে কোনো দিক ফিরবার নির্দেশ দিতে পারেন। এ ব্যাপারে কোনোরূপ অভিযোগ তোলা যেতে পারে না। তিনি যাকে ইচ্ছা যার হেদায়েত তিনি ইচ্ছা করেন তাকে সরল পথে অর্থাৎ দীন-ই ইসলামের প্রতি পরিচালিত করেন। তোমরাও মুসলিমগণও তাদের অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তী আয়াতটি তার ইঙ্গিতবহ।

১৪৩. وَكَذٰلِكَ كَمَا هَدَيْنَاكُمْ اِلَيْهِ جَعَلْنٰكُمْ يَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ اُمَّةً وَّسَطًا خِيَارًا عُدُوْلًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَنَّ رُسُلَهُمْ بَلَّغَتْهُمْ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا اَنَّهٗ بَلَّغَكُمْ ـ

১৪৩. এইভাবে অর্থাৎ যেমন তোমাদেরকে আমি এর প্রতি পরিচালিত করেছি তেমনিভাবে হে উম্মতে মুহাম্মদী তথা মুহাম্মদ ﷺ -এর অনুসারী সম্প্রদায়! আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থি শ্রেষ্ঠ ও ন্যায়পন্থি জাতি বানিয়েছি, যাতে তোমরা কিয়ামতের দিন মানব জাতির জন্যে এ কথার সাক্ষীস্বরূপ হতে পার যে, তাদের প্রতি প্রেরিত নবীগণ তাদের নিকট আল্লাহর নির্দেশসমূহ যথাযথভাবে পৌছিয়েছেন এবং রাসূল তোমাদের জন্যে এ কথার সাক্ষী স্বরূপ হবেন যে, তিনি তোমাদের নিকট আল্লাহর নির্দেশসমূহ পৌছিয়েছেন।

তাহকীক ও তারকীব

اَلسُّفَهَاءُ : এটি سَفِيْهٌ -এর বহুবচন। অর্থ দুর্বুদ্ধি বা স্বল্প বুদ্ধি সম্পন্ন।

وَهُوَ الْجَاهِلُ الضَّعِيْفُ الرَّأْيُ، اَلْقَلِيْلُ الْمَعْرِفَةُ بِالْمَنَافِعِ وَالْمَضَارِ۔

سَفِيْه বলা হয় মূর্খ ও দুর্বল সিদ্ধান্তের ব্যক্তিকে যার লাভ-ক্ষতি সম্পর্কে জ্ঞান কম। وَأَصْلُ السَّفْهِ الْخِفَّةُ وَالرِّقَّةُ বলা হয় ثَوْبٌ سَفِيْهٌ إِذَا كَانَ خَفِيْفَ النَّسْجِ

اَلْجُهَّالُ : جَاهِلٌ -এর বহুবচন ও মোবালাগাতের সীগাহ। অর্থ– মূর্খ, অজ্ঞ। مَا وَلّٰهُمْ : بَاب تَفْعِيْل হতে وَلّٰى ـ تَوْلِيَةً অর্থ– মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা। صَرَفَ : صَرَفَ (ض) صَرْفًا অর্থ– ফিরিয়ে দিয়েছে।

اَلْاِسْتِقْبَالُ : بَاب اِسْتِفْعَال -এর মাসদার। অর্থ– অভিমুখী হওয়া। اَلْاِتْيَانُ : اَتٰى يَاتِى اِتْيَانًا অর্থ– আনয়ন করা।

اَلدَّالَّةُ : دَلَّ (ن) دَلَالَةً ইসমে ফায়েল। অর্থ– দালালতকারী, যা বোঝায়। اَلْاِخْبَارُ : بَاب اِفْعَال -এর মাসদার। অর্থ– সংবাদ দেওয়া। اَلْمَشْرِقُ : পূর্বদিক। اَلْمَغْرِبُ : পশ্চিম দিক। اَلْجِهَاتُ : جِهَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ– দিক।

اَلتَّوَجُّهُ : باب تفعل -এর মাসদার। অর্থ– অভিমুখী হওয়া। اِعْتِرَاضٌ : আপত্তি।

قَوْلُهُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ : এখানে اَلنَّاسُ দ্বারা ইহুদি ও মুশরিকরা উদ্দেশ্য।

مِنَ النَّاسِ : এটি سُفَهَاءُ থেকে حَال হওয়ায় তার مَحَلّ اِعْرَاب হলো নসব। আমেল হলো سَيَقُوْلُ; এই حَال টির নাম حَال مُبَيِّنَة অর্থাৎ অন্যদের থেকে পৃথক করার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা سَفَاهَت বা নির্বুদ্ধিতা ও বেকুবি মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণী এমনকি বস্তুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য নয়।

قَوْلُهُ مَا وَلّٰهُمْ : مَا হলো اِسْتِفْهَامِيَّه এবং مُبْتَدَأ আর وَلّٰهُمْ হলো খবর ।

قَوْلُهُ قِبْلَةً : যেদিকে মুখ করে সালাত আদায় করা হয়। পরবর্তীতে সালাতের জন্যে অভিমুখকৃত সম্মুখবর্তী স্থানের নাম কিবলা হয়ে গিয়েছে। –[রাগিব]

قَوْلُهُ لِلّٰهِ : এর لِ অব্যয় মালিকানা ও কর্তৃত্ববোধক। মাশরিক ও মাগরিব তথা পূর্ব ও পশ্চিম সবই আল্লাহর মালিকানা। তাঁর সৃষ্ট ও অন্যান্য সকল সৃষ্টির ন্যায় তাঁরই অনুগত আজ্ঞাবহ।

اُمَّةٌ : এর বহুবচন اُمَمٌ অর্থ– উম্মত, জাতি। وَسَطٌ : মধ্যপন্থি, মধ্যবর্তী। خَيْرٌ: خِيَارٌ -এর বহুবচন। অর্থ– শ্রেষ্ঠ।

عَدُوْلٌ : ন্যায়পন্থি। شُهَدَاءُ : شَهِيْدٌ -এর বহুবচন। অর্থ– সাক্ষী। شَهِدَ (س) شَهَادَةً অর্থ– সাক্ষ্য দেওয়া।

بَلَّغْتُهُمْ : بلغ (تفعيل) تبليغا অর্থ– প্রচার করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ سَيَقُوْلُ السُّفَهَاءُ **কিবলা পরিবর্তন ও অমুসলিমদের আপত্তি :** বনী ইসরাঈলের নবীগণের কিবলা ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস। রাসূলুল্লাহ ﷺ -ও মক্কায় অবস্থানকালে সেদিকে ফিরে সালাত আদায়ের নিয়ম পালন করেন। [অর্থাৎ সালাতে এমনভাবে দাঁড়াতেন, যাতে কা'বা শরীফ ও বায়তুল মুকাদ্দাস সামনের দিকে থাকে।] এমনকি মদিনায় হিজরত করার পরেও এ কিবলা অপরিবর্তিত রাখলেন। কা'বাকে সামনে রাখা আর সম্ভব হয়নি। কেননা বায়তুল মুকাদ্দাস [মক্কা ও] মদিনার উত্তর দিকে অবিস্থত। এ বক্তব্য তখন প্রযোজ্য হবে যখন কিবলা পরিবর্তন দুবার সাব্যস্ত হবে। আর কিবলা পরিবর্তন একবার সাব্যস্ত হলে এভাবে বলতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরতের পূর্বে এই কা'বার প্রতি মুখ ফিরিয়ে সালাত আদায় করতেন। হিজরতের পর ইহুদিগণের হৃদয় জয়করণার্থে বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রতি মুখ ফিরিয়ে সালাত আদায় করতে তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়। তদনুসারে ষোলো বা সতের মাস তিনি ঐদিকে মুখ করে সালাত আদায় করেন।

মহানবী ﷺ -এর হৃদয়ে বারবার এ বাসনার উদ্রেক হতো যে, যদি মহান পিতৃপুরুষ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নির্মিত কা'বাকে কিবলা বানাবার ইলাহী হুকুম পেয়ে যেতেন। এ মর্মে ওহীপ্রাপ্তির আশায় তিনি বারবার আকাশ পানে দৃষ্টি মেলে তাকাতেনও। অবশেষে মদিনায় আগমনের ১৬ বা ১৭ মাস পরে এ মর্মে হুকুম পাওয়া গেল যে, এখন থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তে কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতে হবে। নাজিল হলো– فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ; অবিলম্বে আদেশ প্রতিপালিত হলো। কা'বা ঘর মদিনা থেকে সোজা দক্ষিণে অবস্থিত, ফলে মদিনায় সালাত আদায়কারীদের অভিমুখ এক মুহূর্তে উত্তর থেকে একেবারে দক্ষিণে ফিরে গেল।

অমুসলিমদের আপত্তি : পূর্বে বর্ণিত হয়েছে বায়তুল মুকাদ্দাস ছিল ইহুদিদের কিবলা। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুখেই এ কিবলা রহিত হওয়ার ঘোষণা ইহুদিদের খুবই অপছন্দ হলো। এমনিতেও তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তাদের শত্রু ও তাদের ধর্মের বিনাশ সাধনকারী মনে করতে শুরু করেছিল। কিবলা পরিবর্তন সংক্রান্ত এ ঘোষণাকে তারা ঐ ধারার গুরুত্বপূর্ণ ধাপ মনে করে বসল এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন ও বিরূপ সমালোচনা করতে লাগল। কেউ বলল, তিনি ইহুদিদের সাথে বিদ্বেষবশত এরূপ করেছেন। কেউ বলল, তিনি নিজের দীন নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ও পেরেশান আছেন, সে কারণে তার নবী হওয়ার বিষয়টি পরিস্ফুট হচ্ছে না। ধর্মবিমুখ ও মুনাফিকদের কিছু লোকও তাদের সহযোগী হলো। এদের প্ররোচনায় পড়ে কিছু সংখ্যক নওমুসলিমের মনেও সন্দেহ সৃষ্টি হচ্ছিল। বিরুদ্ধবাদীদের এসব মন্তব্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে তাঁর রাসূলকে অবহিত করে দিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে পরবর্তী আয়াতে এর জবাবও জানিয়ে দিয়েছেন, যাতে করে কোনো সংশয় বাকি না থাকে এবং উত্তর প্রদানেরও চিন্তা করতে না হয়। –[তাফসীরে মাজেদী ও উসমানী]

سَيَقُوْلُ : একটি উক্তি মতে যেহেতু আয়াতটি কিবলা পরিবর্তন সংক্রান্ত অধ্যাদেশের পূর্বে নয়, বরং পরেই নাজিল হয়েছিল, তাই মুফাসসিরগণের একদল এখানে অতীতকাল উদ্দেশ্য হওয়ার অভিমত গ্রহণ করেছেন। [বাংলা] ব্যবহারে যেরূপ কোনো বিগত ঘটনা সম্পর্কে এভাবে বলা হয়, আমরা তো জানতামই, এরা এ বিষয়ে অবশ্যই প্রশ্ন ও সমালোচনা করবে।

এ অভিমতের প্রায় অনুরূপ আরেকটি অভিমত হলো, কটাক্ষ ও বিরূপ সমালোচনার অবিরাম ধারা বুঝাবার জন্যে এখানে অতীতকালীন অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। অর্থাৎ এ লোকেরা বরাবর এরূপ বলতে থাকছে। ক্রিয়াটির বিরতিহীনতা ও ঘটমান হওয়া বুঝাবার উদ্দেশ্যে অতীত ক্রিয়াকে ভবিষ্যৎ ক্রিয়ারূপে ব্যক্ত করা হয়েছে।

তবে জমহূরের মতে, ক্রিয়াটি তার বাহ্যরূপ ভবিষ্যতের অর্থেই অবিকল প্রযোজ্য এবং আয়াতটি কিবলা পরিবর্তনের হুকুম হওয়ার আগে [ভবিষ্যদ্বাণীরূপে] নাজিল হয়েছিল। এতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাঁর নবী ﷺ -কে এ সংবাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ভবিষ্যতে তাদের মুখ থেকে এ উক্তি প্রকাশ পাবে। মুফাসসির (র.) وَالْاِتْيَانُ بِالسِّيْنِ বলে এ মতেরই সমর্থন করেছেন।

قَوْلُهُ قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ : এখানে সমালোচকদের জবাবে বলা হচ্ছে বলে দিন, কোনো বিশেষ দিক বা প্রান্তে কোনো পবিত্রতা-মাহাত্ম্য নেই। আল্লাহর জন্যে সব দিকই সমতুল্য। তিনি যেদিকে মর্জি এবং যে বস্তুকে ইচ্ছা সালাতের [কিবলা] অভিমুখ নির্দিষ্ট করে দিতে পারেন। আরও বলে দিন, আমরা না ইহুদিদের প্রতি বিদ্বেষে আর না সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি কিংবা নিজ খেয়াল-খুশির বশে কিবলা পরিবর্তন করেছি; বরং আমরা তা করেছি কেবল আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালনার্থে এবং সেটাই দীনের মূলকথা। প্রথমে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করার নির্দেশ ছিল, আমরা তা শিরোধার্য করে নিয়েছি। এখন কা'বার দিকে ফিরতে আদেশ করা হয়েছে, এটাও আমরা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছি। আমাদের নিকট এর হেতু জিজ্ঞাসা করা বা এ সম্পর্কে আপত্তি তোলা শুধু নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক । সুতরাং এ বিষয়টি মূলত কোনো প্রশ্ন হওয়ারই উপযোগিতা রাখে না। –[তাফসীরে উসমানী]

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব : وَسَطًا এ শব্দটি আরবি ভাষায় বিশেষ প্রশংসা প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হয়। আরবদের ভাষায় وَسَطٌ -এর অর্থ اَلْخِيَارُ তথা শ্রেষ্ঠ, সর্বোকৃষ্ট। শব্দটির অর্থ– মধ্যবর্তী এবং বাড়াবাড়ি ও কড়াকড়ির

অতিশয়তা [অর্থাৎ গোঁড়ামি ও ঢিলামি] -এর মধ্যবর্তী সুষম ও সুসমন্বয় উত্তম ও প্রশংসনীয় গুণাবলি অর্থে রূপক ব্যবহার করা হয়েছে [বায়যাবী]। হাদীস শরীফেও وَسَطًا -এর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে عَدْلًا –সঙ্গত ও ন্যায়ানুগ দ্বারা। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে اُمَّةً وَسَطًا -এর ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে عَدْلًا দ্বারা। অভিধানবিদদের সূত্রেও এ অর্থই উদ্ধৃত হয়েছে।

উম্মতে মুহাম্মদী ভারসাম্যপূর্ণ উম্মত হওয়ার প্রমাণ : এখানে আলোচনা হওয়া দরকার যে, বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে উম্মতে মুহাম্মদী ভারসাম্যপূর্ণ উম্মত হওয়ার প্রমাণ কি? এর বিস্তারিত বিবরণ দিতে হলে বিশ্বের সকল সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, কর্ম, চরিত্র ও কীর্তিসমূহ যাচাই করা একান্ত প্রয়োজন। নিম্নে নমুনাস্বরূপ কতিপয় বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে।

বিশ্বাসের ভারসাম্য : সর্বপ্রথম বিশ্বাসগত ভারসাম্য নিয়েই আলোচনা করা যাক। পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে একদিকে দেখা যায়, তারা পয়গাম্বরগণকে আল্লাহর পুত্র মনে করে তাঁদের উপাসনা ও আরাধনা করতে শুরু করেছে। যেমন এক আয়াতে রয়েছে– "ইহুদিরা বলেছে, ওযায়ের আল্লাহর পুত্র এবং খ্রিস্টানরা বলেছে মসীহ আল্লাহর পুত্র।" অপরদিকে এসব সম্প্রদায়েরই অনেকে পয়গাম্বরের উপর্যুপরি মু'জিযা দেখা সত্ত্বেও তাদের পয়গাম্বর যখন তাদেরকে কোনো ন্যায়যুদ্ধে আহ্বান করেছেন, তখন পরিষ্কার বলে দিয়েছে- "আপনি এবং আপনার পালনকর্তাই যান এবং শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করুন। আমরা এখানেই বসে থাকব।" আবার কোথাও পয়গাম্বরগণকে স্বয়ং তাঁদের অনুসারীদের হাতেই নির্যাতিতও হতে দেখা গেছে।

পক্ষান্তরে মুসলিম সম্প্রদায়ের অবস্থা তা নয়। তারা একদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি এমন আনুগত্য ও মহব্বত পোষণ করে যে, এর সামনে জানমাল, সন্তানসন্ততি, ইজ্জত-আবরু সবকিছু বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। অপরদিকে রাসূলকে রাসূল এবং আল্লাহকে আল্লাহই মনে করে। এতসব পরাকাষ্ঠা ও শ্রেষ্ঠত্ব সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তারা আল্লাহর দাস ও রাসূল বলেই বিশ্বাস করে এবং মুখে প্রকাশ করে। তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করতে গিয়েও তারা একটা সীমার ভেতরে থাকে।

কর্ম ও ইবাদতের ভারসাম্য : বিশ্বাসের পরই শুরু হয় আমল ও ইবাদতের পালা। এক্ষেত্রেও পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে একদিকে দেখা যায়, তারা শরিয়তের বিধিবিধানকে কানাকড়ির বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়, ঘুষ উৎকোচ নিয়ে আসমানি গ্রন্থকে পরিবর্তন করে অথবা মিথ্যা ফতোয়া দেয়, বাহানা ও অপকৌশলের মাধ্যমে ধর্মীয় বিধান পরিবর্তন করে এবং ইবাদত থেকে গা বাঁচিয়ে চলে। অপরদিকে তাদের উপাসনালয়সমূহে এমন লোকও দেখা যায়, যারা সংসারধর্ম ত্যাগ করে বৈরাগ্য অবলম্বন করেছে। তারা আল্লাহ প্রদত্ত হালাল নিয়ামত থেকেও নিজেদের বঞ্চিত রাখে এবং কষ্ট সহ্য করাকেই ছওয়াব ও ইবাদত বলে মনে করে।

পক্ষান্তরে উম্মতে মুহাম্মদী একদিকে বৈরাগ্যকে মানবতার প্রতি জুলুম বলে মনে করে এবং অপরদিকে আল্লাহ ও রাসূলের বিধিবিধানের জন্যে জীবন বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। তারা রোম ও পারস্য সম্রাটের সিংহাসনের অধিপতি ও মালিক হয়েও বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে যে, ধর্মনীতি ও রাজনীতির মধ্যে কোনো বৈরিতা নেই এবং ধর্ম কিবল মসজিদ ও খানাকায় আবদ্ধ থাকার জন্যে আসেনি; বরং হাট-ঘাট, মাঠ-ময়দান, অফিস-আদালত এবং মন্ত্রণালয়সমূহে এর সাম্রাজ্য অপ্রতিহত। তাঁরা বাদশাহির মাঝে ফকিরি এবং ফকিরির মাঝে বাদশাহি শিক্ষা দিয়েছেন।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভারসাম্য : এরপর সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি লক্ষ্য করুন। পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মধ্যে একদিকে দেখা যায়, তারা মানবাধিকারের প্রতি পরোয়াও করেনি; ন্যায়-অন্যায়ের তো কোনো কথাই নেই। নিজেদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাউকে যেতে দেখলে তাকে নিপীড়ন, হত্যা ও লুণ্ঠন করাকেই বড় কৃতিত্ব মনে করেছে। জনৈক বিত্তশালীর চারণভূমিতে অপরের উট প্রবেশ করে কিছু ক্ষতিসাধন করায় সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে শতাব্দীব্যাপী যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে যায়। এতে কত মানুষ যে নিহত হয়, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। মহিলাদের মানবাধিকার দান করা তো দূরের কথা, তাদের জীবিত থাকার অনুমতি পর্যন্ত দেওয়া হতো না। কোথাও প্রচলিত ছিল শৈশবেই তাদের জীবন্ত সমাহিত করার প্রথা এবং কোথাও মৃত স্বামীর সাথে স্ত্রীকে দাহ করার প্রথা। অপরদিকে এমন নির্বোধ দয়ার্দ্রতারও প্রচলন ছিল যে, পোকামাকড় হত্যা করাকেও অবৈধ জ্ঞান করা হতো। জীবহত্যাকে তো দস্তরমতো মহাপাপ বলে সব্যস্ত করা হতো। আল্লাহর হলাল করা প্রাণীর গোশত ভক্ষণকে মনে করা হতো অন্যায়।

কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায় ও তাদের শরিয়ত এসব ভারসাম্যহীনতার অবসান ঘটিয়েছে। তারা একদিকে মানুষের সামনে মানবাধিকারকে তুলে ধরেছে। শুধু শান্তি ও সন্ধির সময়ই নয়– যুদ্ধক্ষেত্রেও শত্রুর অধিকার সংরক্ষণে সচেতনতা শিক্ষা দিয়েছে। অপরদিকে প্রত্যেক কাজের একটা সীমা নির্ধারণ করেছে, যা লঙ্ঘন করাকে অপরাধ সাব্যস্ত করেছে। নিজ অধিকারের ব্যাপারে ক্ষমা, মার্জনা ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং অপরের অধিকার প্রদানে যত্নবান হওয়ার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে।

অর্থনৈতিক ভারসাম্য : এরপর অর্থনীতি বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ ক্ষেত্রেও অপরাপর সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তর ভারসম্যহীনতা পরিলক্ষিত হয়। একদিকে রয়েছে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা। এতে হালাল-হারাম এবং অপরের সুখ-শান্তি ও দুঃখ-দুরবস্থা থেকে চক্ষু বন্ধ করে অধিকতর ধনসম্পদ সঞ্চয় করাকেই সর্ববৃহৎ মানবিক সাফল্য গণ্য করা হয়। অপরদিকে রয়েছে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা। এতে ব্যক্তিমালিকানাকেই অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়। চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, উভয় অর্থব্যবস্থার সারমর্মই হচ্ছে ধনসম্পদের উপাসনা, ধনসম্পদকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও মূল উদ্দেশ্য জ্ঞান করা এবং এরই জন্যে যাবতীয় চেষ্টা-সাধনা নিয়োজিত করা।

মুসলিম সম্প্রদায় ও তাদের শরিয়ত এ ক্ষেত্রেও ভারসাম্যপূর্ণ অভিনব অর্থব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। ইসলামি শরিয়ত একদিকে ধনসম্পদকে জীবনের লক্ষ্য মনে করতে বারণ করেছে এবং সম্মান, ইজ্জত ও কোনো পদমর্যাদা লাভকে এর উপর নির্ভরশীল রাখেনি; অপরদিকে সম্পদ বণ্টনের নিষ্কলুষ নীতিমালা প্রণয়ন করে দিয়েছে যাতে কোনো মানুষ জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ থেকে বঞ্চিত না থাকে এবং কেউ সমগ্র সম্পদ কুক্ষিগত করে না বসে। এছাড়া সম্মিলিত মালিকানাভুক্ত বিষয়-সম্পত্তিকে যৌথ ও সাধারণ ওয়াকফের আওতায় রেখেছে। বিশেষ বস্তুর মধ্যে ব্যক্তিমালিকানার প্রতি সম্মান দেখিয়েছে। হালাল মালের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছে এবং তা রাখার ও ব্যবহার করার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে। –[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, মুফতি শফী (র.) থেকে সংক্ষেপিত]

قَوْلُهُ لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ **উম্মতে মুহাম্মদীর কিয়ামতের ময়দানে সাক্ষ্য প্রদান :** আলোচ্য আয়াতে মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে যে, তাদেরকে মধ্যবর্তী উম্মত করা হয়েছে। এর ফলে তারা হাশরের ময়দানে একটি স্বাতন্ত্র্য লাভ করবে। হাদীসে বর্ণিত আছে, সকল পয়গাম্বরের পূর্বেকার উম্মতগণের মধ্যে যারা কাফির তারা যখন তাদের নবীগণের হেদায়েত ও প্রচারকার্য অস্বীকার করে বলতে থাকবে– দুনিয়াতে আমাদের কাছে কোনো আসমানি গ্রন্থ পৌঁছেনি এবং কোনো পয়গাম্বরও আমাদের হেদায়েত করেননি তখন উম্মতে মুহাম্মদী পয়গাম্বরগণের পক্ষে সক্ষ্যদাতা হিসেবে উপস্থিত হবে এবং সাক্ষ্য দেবে যে, পয়গাম্বরগণ সব যুগেই আল্লাহর পক্ষ থেকে আনীত হেদায়েত তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, তাদেরকে সঠিক পথে আনার জন্যে তাঁরা সাধ্যমতো চেষ্টাও করেছেন। বিবাদী উম্মতরা মুসলিম সম্প্রদায়ের সাক্ষ্যে প্রশ্ন তুলে বলবে– আমাদের আমলে তো এ সম্প্রদায়ের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। আমাদের ব্যাপারাদি তাদের জানার কথা নয়, কাজেই আমাদের বিপক্ষে তাদের সাক্ষ্য কেমন করে গ্রহণযোগ্য হতে পারে?

মুসলিম সম্প্রদায় এ প্রশ্নের উত্তরে বলবে– নিঃসন্দেহে তখন আমাদের অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু আমাদের নিকট তাদের অবস্থা ও ঘটনাবলি সম্পর্কিত তথ্যাবলি একজন সত্যবাদী রাসূল ও আল্লাহর গ্রন্থ কুরআন সরবরাহ করেছে। আমরাও সে গ্রন্থের উপর ঈমান এনেছি এবং তাদের সরবরাহকৃত তথ্যাবলিকে চাক্ষুষ দেখার চেয়েও অধিক সত্য মনে করি; তাই আমাদের সাক্ষ্য সত্য। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উপস্থাপিত হবেন এবং সাক্ষীদের সমর্থন করে বলবেন– তারা যা কিছু বলেছে, সবই সত্য। আল্লাহর গ্রন্থ এবং আমার শিক্ষার মাধ্যমে তারা এসব তথ্য জানতে পেরেছে।

–[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, মুফতি শফী (র.) ও তাফসীরে উসমানী]

وَمَا جَعَلْنَا صَيَّرْنَا الْقِبْلَةَ لَكَ الْاٰنَ الْجِهَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اَوَّلًا وَهِىَ الْكَعْبَةُ وَكَانَ ﷺ يُصَلِّىْ اِلَيْهَا فَلَمَّا هَاجَرَ اُمِرَ بِاسْتِقْبَالِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ تَاَلُّفًا لِلْيَهُوْدِ فَصَلّٰى اِلَيْهِ سِتَّةَ اَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ حُوِّلَ اِلَّا لِنَعْلَمَ عِلْمَ ظُهُوْرٍ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ فَيُصَدِّقُهُ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ اَىْ يَرْجِعُ اِلَى الْكُفْرِ شَكًّا فِى الدِّيْنِ وَظَنًّا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ فِىْ حَيْرَةٍ مِنْ اَمْرِهٖ وَقَدِ ارْتَدَّ لِذٰلِكَ جَمَاعَةٌ وَاِنْ مُخَفَّفَةٌ مِّنَ الثَّقِيْلَةِ وَاسْمُهَا مَحْذُوْفٌ اَىْ وَاِنَّهَا كَانَتْ اَىِ التَّوْلِيَةُ اِلَيْهَا لَكَبِيْرَةً شَاقَّةً عَلَى النَّاسِ اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ مِنْهُمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ اَىْ صَلَاتَكُمْ اِلٰى بَيْتِ الْمَقْدِسِ بَلْ يُثِيْبُكُمْ عَلَيْهِ لِاَنَّ سَبَبَ نُزُوْلِهَا السُّؤَالُ عَمَّنْ مَاتَ قَبْلَ التَّحْوِيْلِ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ الْمُؤْمِنِيْنَ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ فِىْ عَدَمِ اِضَاعَةِ اَعْمَالِهِمْ وَالرَّأْفَةُ شِدَّةُ الرَّحْمَةِ وَقُدِّمَ الْاَبْلَغُ لِلْفَاصِلَةِ ـ

অনুবাদ : তুমি প্রথমে যে কিবলা অনুসরণ করছিলে অর্থাৎ কা'বা শরীফ। রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরতের পূর্বে এই কা'বার প্রতি মুখ ফিরিয়ে সালাত আদায় করতেন। হিজরতের পর ইহুদিগণের হৃদয় জয়ার্থে বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রতি মুখ ফিরিয়ে সালাত আদায় করতে তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়। তদনুসারে ষোলো বা সতের মাস তিনি ঐদিকে মুখ করে সালাত আদায় করেন। পরে তা পরিবর্তন করে নতুন নির্দেশ জারি করেন।

বর্তমানেও সেই দিককেই তোমার জন্যে কেবল এ উদ্দেশ্যই কিবলা বানিয়েছি, যাতে প্রকাশ্যভাবে জানতে পারি, কে রাসূলের অনুসরণ করে অনন্তর তাঁকে সত্য বলে বিশ্বাস করে এবং কে পিছনে ফিরে যায়? অর্থাৎ ইসলামের প্রতি সন্দেহ প্রবণ হয়ে এবং নবী করীম ﷺ নিজেই নিজের বিষয়ে বিভ্রান্ত– এই ধারণার বশবর্তী হয়ে কে কুফরির দিকে ফিরে যায়? কিবলা পরিবর্তনের এ নির্দেশের দরুন তখন একদল লোক মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল, ইসলাম হতে ফিরে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে আল্লাহ যাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন তারা ব্যতীত অপরের নিকট তা অর্থাৎ তার দিকে মুখ ফিরানো নিশ্চয় কঠিন। মানুষের জন্যে এটা পালন করা কষ্টকর।

আল্লাহ এরূপ নন যে, তোমাদের ঈমান অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে আদায়কৃত তোমাদের সালাতকে বিফল করবেন। বরং তিনি তারও পুণ্যফল দান করবেন। যারা কিবলা পরিবর্তনের এ নির্দেশের পূর্বে মারা গিয়েছিল তাদের সালাত কি হবে? এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে এ আয়াত নাজিল হয়েছিল। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতি মু'মিনদের প্রতি দয়ার্দ্র ও তাদের পুণ্য কাজসমূহ বিনষ্ট না করার বিষয়ে পরম দয়ালু।

তাহকীক ও তারকীব

جَعَلْنَا : অর্থ– বানিয়েছি, পরিণত করেছি। تَاَلُّفًا : হৃদয় জয় করার জন্য। حُوِّلَ : تَحْوِيْلًا - حَوَّلَ অর্থ– পরিবর্তন করা হয়। اَلتَّوْلِيَةُ : অভিমুখী হওয়া। عَقِبَيْهِ : عَقِبٌ-এর দ্বিবচন। অর্থ– পশ্চাৎ, পায়েরগোড়ালি। يَنْقَلِبُ : (اِفْعَال) اِنْقَلَبَ অর্থ– ফিরে যাওয়া। شَاقَّةٌ : কষ্টকর। يُضِيْعُ : اِضَاعَةً - اَضَاعَ নষ্ট করা। يُثِيْبُكُمْ : اِثَابَةً (اِفْعَال) اَثَابَ অর্থ– ছওয়াব দেওয়া, প্রতিদান দেওয়া।

وَاِنْ كَانَتْ -এর اِنْ শব্দটি এই স্থলে مُخَفَّفَةٌ مِنَ الْمُثَقَّلَةِ অর্থাৎ তাশদীদ সংবলিত রূঢ়রূপ হতে পরিবর্তন হয়ে তাশদীদহীন লঘুরূপে ব্যবহৃত। তার اِسْم এই স্থানে উহ্য। মূলত তার রূপ ছিল- اِنَّهَا

اَلرَّأْفَةُ : অর্থ- অতি দয়া। رَحْمَةٌ শব্দের তুলনায় তাতে অর্থের مُبَالَغَة বা অধিক জোর থাকা সত্ত্বেও এ স্থানে فَاصِلَة অর্থাৎ আয়াতসমূহের অন্ত্যমিল রক্ষার খাতিরে তাকে অগ্রে ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَا : আয়াতের মূলরূপ হলো- وَمَا جَعَلْنَا قِبْلَتَكَ الْاُوْلٰى قِبْلَةً لَكَ ثَانِيَةً اِلَّا لِنَعْلَمَ অর্থাৎ আপনার প্রথম কিবলাকে আপনার জন্যে দ্বিতীয়বার কিবলা বানিয়েছি......।

قَوْلُهُ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ **কিবলা পরিবর্তনের কারণ :** এ আয়াতে কিবলা পরিবর্তনের কারণ বর্ণনা করতে যেয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে নবী! প্রথম হতেই আপনার জন্যে কা'বা ঘর কিবলারূপে নির্দিষ্ট ছিল। মাঝখানে কিছুকালের জন্যে পরীক্ষাস্বরূপ বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলা বানিয়ে দেওয়া হয়। এটা সকলেরই জানা যে, পরীক্ষা এমন বিষয়েই হয়ে থাকে, যেটা মেনে নেওয়া কষ্টকর। কাজেই আল্লাহ তা'আলা বলেন, কা'বার পরিবর্তে বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলা নির্ধারণ করাটা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণ মুসলমানদের পক্ষে এ কারণে যে, তারা অধিকাংশই ছিল আরব এবং কুরাইশ। তারা কা'বার শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী ছিল। এই কিবলা পরিবর্তনের কারণে তাদেরকে নিজেদের বিশ্বাস ও অভ্যাসের বিপরীত করতে হয়। কিন্তু এখানে বুঝার ব্যাপার হলো, রাসূলে কারীম ﷺ -এর মাঝে সমস্ত নবী-রাসূলের মাহাত্ম্য ও গুণাবলি একীভূত হয়েছে। তাঁর রিসালত সমগ্র বিশ্ব ও সমস্ত উম্মতের জন্যে ব্যাপক, তাই একবার বাইতুল মুকাদ্দাসকেও কিবলার মর্যাদা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। -[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ اِلَّا لِنَعْلَمَ عِلْمَ ظُهُوْرٍ :

প্রশ্ন: এ আয়াতে ব্যবহৃত لِنَعْلَمَ ভবিষ্যৎ ক্রিয়াপদ এবং অনুরূপ অন্যান্য আয়াতে প্রযুক্ত حَتّٰى نَعْلَمَ اللّٰهُ ـ اِلَّا لِنَعْلَمَ ـ فَلَيَعْلَمَنَّ ـ لَمَّا يَعْلَمِ প্রভৃতি শব্দ দ্বারা ব্যহৃত এরূপ বোঝা যায় যে, এসব বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা পরবর্তীতে জানতে পেরেছেন, এগুলোর অস্তিত্বের পূর্বে তিনি এ সম্পর্কে জানতেন না। [নাউযুবিল্লাহ] অথচ যাবতীয় বস্তু সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান অনাদি। كَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا -আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

উত্তর: ওলামায়ে কেরাম বিভিন্নভাবে এর জবাব দিয়েছে-

১. এখানে عِلْم অর্থ- পরিচিতি লাভ ও সনাক্তকরণ, পৃথকীকরণ অর্থাৎ যাতে তার দীনের উপর আস্থাবানেরা দীন প্রত্যাখ্যানকারী ও নড়বড়েদের থেকে স্বতন্ত্র ও পৃথক হয়ে যায়।
আল্লাহর ইলম সর্বব্যাপী ও সামগ্রিক। যে কোনো ঘটনা সংঘটিত হওয়ার আগেও আল্লাহর স্বকীয় সামগ্রিক ইলমের আওতাভুক্ত। কিন্তু বাহ্য জগতে তা সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত তার জন্যে ঘটনা ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করা হয় না। পবিত্র কুরআনে যত স্থানে এ জেনে নেওয়া ধরনের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে, তার দ্বারা উদ্দেশ্য বাহ্য জাগতিক ও বাস্তব সংঘটন জ্ঞান, জাগতিক অবগতি নয়। এজন্যই মুসান্নিফ (র.) اِلَّا لِنَعْلَمَ -এর পরে عِلْمَ ظُهُوْرٍ উল্লেখ করেছেন।
২. কেউ এর অর্থ করেছেন- পরীক্ষাকরণ।
৩. কেউ বলেন, এসব জায়গায় ভবিষ্যৎ ক্রিয়া অতীত ক্রিয়ার অর্থে ব্যবহৃত।
৪. কেউ বলেন, এখানে مُضَاف উহ্য রয়েছে অর্থাৎ আল্লাহর জানা বলতে রাসূল ﷺ ও মু'মিনদের জানা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যাতে আমার রাসূল ও মু'মিনগণ জানতে পারে ...।

-[তাফসীরে উসমানী, মাজেদী ও মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী (র.) ১/২৪০]

عَقِبَيْهِ : عَقْبٌ -এর দ্বিবচন। অর্থ- পায়ের গোড়ালি। এখানে اِنْقِلَابُ عَقِبَيْهِ দ্বারা উদ্দেশ্য- হক থেকে বাতিলের দিকে ফিরে যাওয়া, মুরতাদ হয়ে যাওয়া।

কিবলা পরিবর্তনের ইতিহাস : কিবলা পরিবর্তনের বিধান দ্বিতীয় হিজরির রজব মাসে নাজিল হয়েছে। ইবনে সা'দের বর্ণনায় রয়েছে, নবী করীম ﷺ বিশর ইবনে বারা ইবনে মা'রূর (রা.) -এর বাড়িতে মেহমান হয়েছিলেন। সেখানে জোহরের নামাজের সময় হয়ে যায়। নবী করীম ﷺ সকলকে নিয়ে নামাজে দাঁড়িয়ে যান। দু রাকাত পড়েছেন; তৃতীয় রাকাতে ওহীর মাধ্যমে হঠাৎ এ আয়াত নাজিল হয়। তৎক্ষণাৎ সকলে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিক হতে কা'বার দিকে ফিরে যান। অতঃপর মদিনায় সাধারণ ঘোষণা দিয়ে দেওয়া হয়। হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.) বলেন, কোনো এক স্থানে

ঘোষণা এ অবস্থায় পৌঁছেছে যে, মুসল্লিগণ রুকু অবস্থায় ছিলেন। নির্দেশ শ্রবণের সাথে সাথে সকলে সে অবস্থায়ই কা'বার দিকে ফিরে যান। হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, বনূ সালিমার মসজিদে উক্ত ঘোষণা দ্বিতীয় দিন ফজরের সময় পৌঁছে। মুসল্লিগণ এক রাকাত পড়ে ফেলেছিলেন। এমতাবস্থায় ঘোষণা দেওয়া হলো যে, কিবলা পরিবর্তন করে কা'বার দিকে করা হয়েছে। ঘোষণা শ্রবণমাত্রই সকলে তাদের দিক ফিরিয়ে নেয়। -[জামালাইন : ২৩৮]

এখানে স্মর্তব্য যে, বাইতুল মুকাদ্দাস মদিনা হতে একেবারে উত্তরে অবস্থিত, আর কা'বা সম্পূর্ণ দক্ষিণে। জামাতসহকারে নামাজ পড়া অবস্থায় কিবলার দিক পরিবর্তন নিঃসন্দেহে ইমাম সাহেবকে মুক্তদীদের পিছনে আসতে হয়েছে এবং মুক্তাদীদেরকেও সমান্য নড়াচড়া করে কাতার সোজা করতে হয়েছে।

কিবলামুখী হওয়ার তাৎপর্য : প্রত্যেক ইবাদতে মু'মিনের মুখ এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর দিকেই থাকে। আল্লাহ পবিত্র; পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণের বন্ধন থেকে মুক্ত; তিনি কোনো বিশেষ দিকে অবস্থান করেন না। ফলে কোনো ইবাদতকারী ব্যক্তি যদি যেদিকে ইচ্ছা সেদিকেই মুখ করত কিংবা একই ব্যক্তি এক সময় একদিকে অন্য সময় অন্যদিকে মুখ করত, তবে তাও স্বাভাবিক নিয়মের পরিপন্থি হতো না। কিন্তু অপর একটি রহস্যের কারণে সমস্ত ইবাদতকারীর মুখ একদিকে করা হয়েছে। তা হলো, নামাজে সমষ্টিগত ঐক্য সৃষ্টি করা। এ উদ্দেশ্যে বিশ্ববাসীর মুখমণ্ডল একই দিকে নিবদ্ধ থাকা একটি উত্তম, সহজ ও স্বাভাবিক ঐক্য পদ্ধতি। এখন সমগ্র বিশ্বের মুখ করার দিক কোনটি হবে এর মীমংসা মানুষের হতে ছেড়ে দিলে তাও বিরাট মতনৈক্য এবং কলহের কারণ হয়ে যাবে। এ কারণে এর মীমংসা আল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়াই বিধেয়।

-[মা'আরিফুল কুরআন, সংক্ষিপিত]

قَوْلُهُ إِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ : বিদ্বান মনীষীবর্গের কেউ কেউ এ আয়াত দ্বারা এ বিষয়টি উদ্ঘাটন করেছেন যে, কিবলা অনুসারী সকলেই নিম্নতম পর্যায়ে হেদায়েতের পথে রয়েছে। কিবলাতে অবিচল থাকা একটা সুকঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সমতুল্য। এ আয়াত কিবলা বিশ্বাসীদের কাফির সাব্যস্ত না করার একটি ভিত্তি স্থির হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ إِيْمَانَكُمْ শানে নুযূল : ইহুদিদের অপপ্রচারের কারণে কিংবা নিজে নিজেই কোনো কোনো মুসলমানের মনে এরূপ দ্বিধা দেখা দিয়েছিল যে, আসল কিবলা যেহেতু কা'বা শরীফ এবং বায়তুল মুকাদ্দাস সাময়িক কিবলা ছিল। সুতরাং সেদিকে যত সালাত আদায় করা হয়েছে, তা তো বেকার হয়ে গিয়েছে এবং যে সকল মুসলমান এ নতুন বিধানের আগে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাদের তো সমূহ ক্ষতি হয়ে গেল। তাদেরকেই জবাব দেওয়া হচ্ছে যে, এ আবার কোন ধরনের দ্বিধা। ছওয়াব তো পাবে আদেশ পালনকারীরা, তাতে কিবলা যেটাই হোক না কেন। যারা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে সালাত আদায় করেছেন, তারাও তো সর্বাবস্থায় আল্লাহর হুকুমই পালন করেছেন। সুতরাং তাদের প্রতিদান পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণই সাব্যস্ত হয়েছে।

قَوْلُهُ إِيْمَانَكُمْ اَيْ صَلَاتَكُمْ : এখানে 'ঈমান' শব্দ দ্বারা ঈমানের প্রচলিত অর্থ নেওয়া হলে আয়াতের মর্ম হবে এই যে, কিবলা পরিবর্তনের ফলে নির্বোধেরা মনে করতে থাকে যে, এরা ধর্ম ত্যাগ করেছে কিংবা এদের ঈমান নষ্ট হয়ে গেছে। উত্তরে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ঈমান নষ্ট করবেন না। কাজেই তোমরা নির্বোধদের কথায় কর্ণপাত করো না। কোনো কোনো হাদীসে এবং মনীষীদের উক্তিতে এখানে ঈমানের অর্থ করা হয়েছে নামাজ। যেমনটি মুফাসসির (র.)ও করেছেন। তার মর্মার্থ হলো, সাবেক কিবলা বায়তুলমুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে যেসব নামাজ পড়া হয়েছে, আল্লাহ সেগুলো নষ্ট করবেন না; বরং তা শুদ্ধ ও কবুল হয়েছে। -[মা'আরিফ]

إِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ : অন্যান্য বিধিবিধানের ন্যায় কিবলা পরিবর্তন সংক্রান্ত এ হুকুমটি পরিপূর্ণরূপে তাঁর স্নেহশীলতা, দয়ার্দ্রতা, মহানুভবতা ও মায়ামমতারই পরিচায়ক।

قَوْلُهُ وَقَدَّمَ الْاَبْلَغَ لِلْفَاصِلَةِ : এটি একটি প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন: সাধারণ রীতি হলো, নীচের থেকে উপরের দিকে উন্নতি ঘটে, এর বিপরীত নয়। যেমন বলা হয়- عَالِم نَحْرِيْر পক্ষান্তরে نَحْرِيْر عَالِم বলা হয় না। এ রীতি অনুযায়ী رَحِيْمٌ رَءُوْفٌ বলা উচিত ছিল।

উত্তর: فَاصِلَة তথা আয়াতের অন্ত্যমিলের প্রতি লক্ষ্য করে এমনটি করা হয়েছে। কেননা পূর্বের আয়াতের শেষে এ ওজনের শব্দ রয়েছে। যদিও رَحِيْم-এর তুলনায় رَءُوْف-এর মধ্যে রহমত অতিমাত্রায় রয়েছে।

١٤٤. قَدْ لِلتَّحْقِيْقِ نَرٰى تَقَلُّبَ تَصَرُّفَ وَجْهِكَ فِي جِهَةِ السَّمَاءِ مُتَطَلِّعًا إِلَى الْوَحْيِ وَمُتَشَوِّقًا لِلْأَمْرِ بِاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ وَكَانَ يَوَدُّ ذٰلِكَ لِأَنَّهَا قِبْلَةُ إِبْرٰهِيْمَ وَلِأَنَّهُ أَدْعٰى إِلَى إِسْلَامِ الْعَرَبِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ نُحَوِّلَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا تُحِبُّهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ اسْتَقْبِلْ فِي الصَّلٰوةِ شَطْرَ نَحْوَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَيِ الْكَعْبَةِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ خِطَابٌ لِلْأُمَّةِ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ فِي الصَّلٰوةِ شَطْرَهٗ وَإِنَّ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ أَيِ التَّوَلِّيَ إِلَى الْكَعْبَةِ الْحَقُّ الثَّابِتُ مِنْ رَّبِّهِمْ لِمَا فِي كُتُبِهِمْ مِنْ نَعْتِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَنَّهُ يَتَحَوَّلُ إِلَيْهَا وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ بِالتَّاءِ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ مِنْ امْتِثَالِ أَمْرِهٖ وَبِالْيَاءِ أَيِ الْيَهُوْدُ مِنْ إِنْكَارِ أَمْرِ الْقِبْلَةِ.

অনুবাদ :

১৪৪. ওহীর প্রত্যাশায় এবং কা'বার **দিকে ফিরবার** নির্দেশপ্রাপ্তির আগ্রহে আকাশের দিকে তোমার বারবার তাকানো আমি লক্ষ্য করেছি। এ স্থানে **قَدْ** শব্দটি تَحْقِيْق অর্থাৎ বক্তব্যটি সুসাব্যস্ত করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তারই তীব্র আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন এজন্য যে, এটা অর্থাৎ কা'বা ছিল হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কিবলা। দ্বিতীয়ত হযরত ﷺ -এর আহ্বান ছিল আরবের ইসলামের দিকেই। [আরবের কিবলা ছিল এই কা'বা।] সুতরাং তোমাকে এমন কিবলার দিকে মুখ করিয়ে দিচ্ছি ফিরিয়ে দিচ্ছি [যা তুমি পছন্দ কর] ভালোবাস। অতএব তুমি মাসজিদুল হারামের অর্থাৎ কা'বার প্রতিই দিকেই তোমার মুখ ফিরাও অর্থাৎ সালাতের সময় ঐদিককেই তোমার কিবলা বানাও। তোমরা এ স্থানে উম্মতকে সম্বোধন করা হচ্ছে, যেখানেই থাক না কেন সালাতের সময় তার দিকে মুখ ফিরাও এবং যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তারা নিশ্চিতভাবে জানে যে এটা] অর্থাৎ কা'বার দিকে মুখ ফিরানো তাদের প্রতিপালকের প্রেরিত সত্য। সুপ্রতিষ্ঠিত একটি বিষয়। কেননা তাদের প্রতি প্রেরিত কিতাবসমূহে রাসূলে কারীম ﷺ -এর বিবরণে আছে যে, এই দিকে তাঁর কিবলা ফিরিয়ে দেওয়া হবে। আর তারা যা করে সে সম্বন্ধে আল্লাহ অনবহিত নন। تَعْلَمُوْنَ ক্রিয়াটি যদি ت সহ অর্থাৎ দ্বিতীয় পুরুষ বহুবচনরূপে গঠিত হয় তবে তার অর্থ হবে– হে মু'মিনগণ! তোমরা তাঁর নির্দেশ পালনার্থে যা কর সেই সম্পর্কে আল্লাহ অনবহিত নন। আর যদি ى সহ অর্থাৎ নাম পুরুষ বহুবচনরূপে পঠিত হয় তবে তার অর্থ হবে– কিবলা পরিবর্তনের বিষয়টি অস্বীকার করে ইহুদিগণ যা করছে সেই সম্পর্কে আল্লাহ অনবহিত নন।

তাহকীক ও তারকীব

لِلتَّحْقِيْقِ : বক্তব্য সুসাব্যস্ত করার জন্য। تَقَلُّبَ : বারবার তাকানো। مُتَطَلِّعٌ : প্রত্যাশী। مُتَشَوِّقٌ : আগ্রহী। كَانَ يَوَدُّ : কামনা করতেন, আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন। أَدْعٰى : অধিক আহ্বানকারী। نُوَلِّيَنَّكَ : মুখ করিয়ে দিচ্ছি; تَوْلِيَه মাসদার। نُوَلِّيَنَّكَ : মুযারের সীগাহ। অর্থ– অভিমুখি করিয়ে দিচ্ছি। আর كاف হলো মাফউলের যমীর। شَطْرٌ : অর্ধেক; شَطَرْتُ الشَّيْءَ জিনিসটি দ্বিখণ্ডিত করেছি। أَحْلِبُ حَلْبًا لَكَ شَطْرَهٗ আমি দুগ্ধ দোহন করব, তার অর্ধেক তোমার। نَحْوٌ : প্রতি, দিকে : اَلثَّابِتُ : সুপ্রতিষ্ঠিত : نَعْتٌ : এর বহুবচন نُعُوْتٌ অর্থ– গুণ, বিবরণ। اِمْتِثَالٌ : পালন করা, আদায় করা।

قَدْ نَرٰى : শব্দটি مُضَارِع বা বর্তমান জ্ঞাপক হলেও অতীত অর্থ সম্পন্ন। এরূপ ব্যবহারে এদিকেও ইঙ্গিত হয়ে গেল যে, আপনি অস্থির ও বিচলিত হচ্ছেন কেন? আমরা তো আপনার অন্তরের টান ভালো করেই দেখে নিয়েছি। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে পূর্ণাঙ্গ সান্ত্বনাও দেওয়া হয়েছে।

فِى السَّمَاءِ : এর فِىْ এর [মধ্যে, তে] অব্যয়টি اِلٰى [দিকে, প্রতি] অর্থে। فِىْ جِهَةِ السَّمَاءِ نَحْوَ السَّمَاءِ وَقِبَلَهَا আসমানের দিকে।

نُوَلِّيَنَّكَ : মুযারের সীগাহ, মাসদার تَوْلِيَةً আর كاف হলো মাফউলের যমীর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَدْ نَرٰى الخ **ওহীর অপেক্ষায় নবীজি ﷺ বারবার আকাশপানে তাকাতেন :** কা'বাই যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রকৃত কিবলা এবং তাঁর মর্যাদা ও বিশেষত্বের উপযোগী ছিল, সেই সঙ্গে এটা ছিল সকল কিবলার সেরা এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এরও অনুসৃত কিবলা অন্য দিকে ইহুদিরা আপত্তি করত যে, এই নবী শরিয়তে আমাদের বিরোধী ও ইবরাহীম ধর্মাদর্শের অনুসারী হয়ে আমাদের কিবলা কেন অবলম্বন করছে? অপর দিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -ও যথার্থ ধর্মীয় আবেগের অধীনে বিশ্বাস করতেন যে, এখন যেহেতু ইমামত ও ধর্মীয় নেতৃত্ব ইহুদিদের হাতছাড়া হয়ে গেছে, সুতরাং তাদের কিবলা আর [পরবর্তী] উম্মতের কিবলারূপে থাকতে পারে না, তাই বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে সালাত আদায়কালেও তাঁর আন্তরিক কামনা ছিল, কিবলা পরিবর্তনের হুকুম এসে যাক। এই আগ্রহে ওহীবাহক ফেরেশতার প্রতীক্ষায় বারবার তাঁর দৃষ্টি আকাশের দিকে উত্থিত হতে থাকত। আয়াতে এ অবস্থাটিরই বিবরণ দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ যদিও কখনো কোনো দিক-প্রান্তে সীমাবদ্ধ নন, কোনো স্থানে অবরুদ্ধ নন; তবুও বিশেষ তাজাল্লীকে আল কুরআনে আসমানের প্রতি সম্বন্ধিত করা হয়েছে। এজন্যই তত্ত্ববিদগণ লিখেছেন যে, দোয়া ও বিপদকালে আসমানের দিকে মুখ তুলে তাকানো দোয়া কবুল হওয়ার অন্যতম নির্দশন ও উপায়; বরং ঊর্ধ্বে জাগতিক এ সম্বন্ধ বিশ্বাসের পূর্ণতা ও আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জনে বিশেষ সহায়ক হয়ে থাকে। -[তাফসীরে মাজেদী ও উসমানী]

فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا **কা'বা কিবলা হোক- এ প্রসঙ্গে নবী করীম ﷺ -এর আগ্রহের কারণ :** নবী করীম ﷺ বিভিন্ন কারণে অন্তর দিয়ে ভালোবাসতেন এবং পছন্দ করতেন যে, আল্লাহ তা'আলা কা'বাকে তাঁর জন্যে কিবলা নির্দিষ্ট করে দিন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারণ হচ্ছে-

১. ইহুদিদের থেকে তাঁর কিবলা স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর হওয়া।
২. মহানবী ﷺ ওহী অবতরণ ও নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে স্বীয় স্বভাবগত ঝোঁকে দীনে ইবরাহীমীর অনুসরণ করতেন। ওহী অবতরণের পর কুরআনও তাঁর শরিয়তকে দীনে ইবরাহীমীর অনুরূপ বলেই আখ্যা দিয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর কিবলাও কা'বাই ছিল।
৩. তাতে আরবের লোকদেরকে ঈমানের দিকে নিয়ে আসা অধিক সহজ ছিল। কেননা আরবের গোত্রগুলো মৌখিকভাবে হলেও দীনে ইবরাহীমী স্বীকার করত এবং নিজেদেরকে তাঁর অনুসারী বলে দাবি করত।
৪. সাবেক কিবলা বায়তুল মুকাদ্দাস দ্বারা আহলে কিতাবদের আকৃষ্ট করা উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ষোলো / সতের মাসের অভিজ্ঞতার পর সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। কারণ মদিনার ইহুদিরা এর কারণে ইসলামের নিকটবর্তী হওয়ার পরিবর্তে দূরেই সরে যাচ্ছিল। -[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : মুফতি শফী (র.) ও আহকামুল কুরআন থেকে সংক্ষিপ্ত]

قَوْلُهُ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ **মাসজিদুল হারামের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি :** মর্যাদা ও অভিজাত্য সম্পন্ন মসজিদ দ্বারা মক্কা শরীফের সে মসজিদ উদ্দেশ্য, যার অভ্যন্তরে রয়েছে কা'বা ঘর। কা'বা ঘর অতি সংক্ষিপ্ত পরিধির একখানা পাকা ঘরের নাম। মাসজিদুল হারাম বা হেরেম শরীফের বর্তমান ইমারত কাঠামোর প্রথম অংশ আব্বাসী খলিফা মাহদীর যুগের। পরবর্তী খলিফা ও সুলতানগণ বারবার তা সম্প্রসারিত করতে থাকেন। তুর্কি সুলতানের ভূমিকা এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমান [অর্থাৎ সউদী শাসকের সম্প্রসারণের পূর্বেকার] রূপ কাঠামো সুলতান দ্বিতীয় সেলীম [মৃত্যু ১৫৭৭ খ্রি.] -এর শাসনামল হতে প্রায় অব্যাহত রয়েছে। এর খোলা চত্বরের পরিধি ৬০০ ফুট বলে বর্ণনা করা হয়েছে। চারদিকের একাধিক বিশালায়তন ও প্রশস্ত ইমারতরাজি এ হিসাবের অতিরিক্ত। প্রবেশ ফটকের [বাব] সংখ্যা একচল্লিশ এবং মিনারের সংখ্যা ছয়। আর ছোটবড় গম্বুজের সংখ্যা ১৫০-এর অধিক। অন্য একটি বর্ণনামতে উত্তর-পশ্চিম দিককার প্রশস্ততা ৫৪৫ ফুট, দক্ষিণ-পূর্ব দিককার ৫৫৩ ফুট, উত্তর-পূর্ব কোণের দিকে ৩৬০ ফুট এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ৩২৪ ফুট।

-[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ شَطْرَ الْمَسْجِدِ : شَطْرَ দ্বারা মাসজিদুল হারাম -এর প্রান্ত দিকে উদ্দেশ্য, সরাসরি কা'বা শরীফের সম্মুখ বরাবরে নয়। কেননা দূরবর্তী অঞ্চলে এরূপ হুকুম পালন করা সম্ভব নয়। ফকীহগণ লিখেছেন– সালাতে যে কিবলামুখী হওয়া ফরজ করা হয়েছে তা সিনার জন্যে, মুখমণ্ডলের জন্যে তা শুধু সুন্নত। সালাত হতে বের হয়ে আসা শুধু তখনই সাব্যস্ত হবে, যখন মুখমণ্ডলের সাথে বুকও কা'বার দিক হতে ফিরে যাবে। শুধু ঘাড় ঘুরে গেলেই সালাত বাতিল হয় না। –[তাফসীরে মাজেদী]

মসজিদে হারাম বলার কারণ : কা'বার চতুর্দিকে অবস্থিত মসজিদকে মসজিদে হারাম বলার কারণ হলো, সেখানে যুদ্ধবিগ্রহ করা, পশুপাখি শিকার করা, তৃণাদি কাটা ইত্যাদি সব কিছু নিষিদ্ধ। মাসজিদুল হারামের ন্যায় মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য আর অন্য কোনো মসজিদের নেই।

কা'বা না বলে মাসজিদুল হারাম বলার তাৎপর্য ও একটি মাসআলা : মদিনাবাসী ও অন্যান্য এলাকার লোকদের জন্যে সরাসরি কা'বা ঘরের দিক নির্ণয় খুবই কঠিন ছিল। তাই উম্মতের জন্যে সহজ করার উদ্দেশ্যে তুলনামূলকভাবে একখানা বড় ইমারতের নাম নেওয়া হয়েছে [মাদারিক, বায়যাবী]। কিবলা রূপে কা'বা ঘরের দিকটি উদ্দেশ্য, সরাসরি কা'বা ঘর উদ্দেশ্য নয়। –[মাদারিক] ইমাম মালেক (র.)-এর এরূপ উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে যে, মাসজিদুল হারাম সমগ্র বিশ্বের জন্যে কিবলা এবং কা'বা ঘর সে মসজিদের জন্যে কিবলা।

এখানে একটি ফিকহ-বিষয়ক সূক্ষ্মতত্ত্ব উল্লেখযোগ্য। আয়াতে কা'বা অথবা বায়তুল্লাহ বলার পরিবর্তে মসজিদে হারাম বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দূরবর্তী দেশসমূহে বসবাসকারীদের পক্ষে হুবহু কা'বাগৃহ বরাবর দাঁড়ানো জরুরি নয়, বরং পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণের মধ্য থেকে যে দিকটিতে কা'বা অবস্থিত সেদিকে মুখ করলেই যথেষ্ট হবে। তবে যে ব্যক্তি মসজিদে হারামে উপস্থিত রয়েছে কিংবা নিকটস্থ কোনো স্থান বা পাহাড় থেকে কা'বা দেখতে পাচ্ছে, তার পক্ষে এমনভাবে দাড়ানো জরুরি যাতে কা'বাগৃহ তার চেহারার বরাবরে থাকে। যদি কা'বাগৃহের কোনো অংশ তার চেহারা বরাবরে না পড়ে, তবে তার নামাজ শুদ্ধ হবে না। কা'বাগৃহ যাদের চোখের সামনে নেই, এ বিধান তাদের জন্যে নয়। তারা কা'বাগৃহ কিংবা মসজিদে হারামের দিকে মুখ করলেই যথেষ্ট। –[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

قَوْلُهُ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ : সংক্ষিপ্ত শব্দ إِلَى -এর পরিবর্তে شَطْرَ শব্দটি ব্যবহার করায় কিবলার দিকে মুখ করার বিষয়টি আরো সহজ হয়ে গেছে। شَطْر দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়– একটি অর্থ অর্ধেক। যেমন বলা হয়– شَطَرْتُ الشَّئَ 'জিনিসটিকে দ্বিখাণ্ডত করেছি।' আরবরা বলেন– اَحْلِبُ حَلْبًا لَكَ شَطْرَهٗ 'আমি দুগ্ধ দোহন করব, তার অর্ধেক তোমার'। আর দ্বিতীয় অর্থ হলো– দিক। এখানে এ দ্বিতীয় অর্থই গ্রহণীয়। এখানে প্রথম অর্থটি গ্রহণীয় হতে পারে না। কেননা অর্ধেক মসজিদে হারামকে কিবলা বানানোর কোনো অর্থ হয় না। –[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

قَوْلُهُ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ : [তোমরা যেখানেই থাক] এ থেকে ফকীহগণে এ বিধান আহরণ করেছেন যে, মানুষ যে স্থানে অবস্থান করুক না কেন, সেখানেই তার সালাত বৈধ। সালাতের বিশুদ্ধতার জন্যে মসজিদ হওয়ার শর্ত নেই।

قَوْلُهُ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ : অর্থাৎ আহলে কিতাব কিবলা পরিবর্তন সম্পর্কে যা কিছু আপত্তি করে, তার কোনোই পরোয়া করবেন না। কারণ তারা নিজেদের কিতাব দ্বারাই এটা জানে যে, শেষ নবী কিছু দিনের জন্যে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করবেন এবং তারা এটা জানে যে, তাঁর আসল ও স্থায়ী কিবলা হবে ইবরাহীমী ধর্মাদর্শ অনুযায়ী। এ কারণে তারাও কিবলা পরিবর্তনকে সত্যই জানে। তারা যা কিছু বলে তার উৎস কেবল হিংসা-বিদ্বেষ। –[তাফসীরে উসমানী]

مِنْ رَّبِّهِمْ : এ কথাটি এ তথ্য আরো স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, কা'বাকে কিবলা বানানো পরিপূর্ণ রূপে আল্লাহরই হুকুম, রাসূলুল্লাহ -এর ইজতিহাদ প্রসূত বিধান নয়।

অনুবাদ :

١٤٥. وَلَئِنْ لَامُ قَسَمٍ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ عَلٰى صِدْقِكَ فِىْ اَمْرِ الْقِبْلَةِ مَّا تَبِعُوْا اَىْ لَا يَتَّبِعُوْنَ قِبْلَتَكَ عِنَادًا وَمَآ اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ قَطْعٌ لِطَمْعِهٖ فِىْ اِسْلَامِهِمْ وَطَمْعِهِمْ فِىْ عَوْدِهٖ اِلَيْهَا وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ اَىِ الْيَهُوْدُ قِبْلَةَ النَّصَارٰى وَبِالْعَكْسِ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمُ الَّتِىْ يَدْعُوْنَكَ اِلَيْهَا مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ الْوَحْىِ اِنَّكَ اِذًا اِنِ اتَّبَعْتَهُمْ فَرْضًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ.

১৪৫. যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তুমি তাদের নিকট কিবলা সম্পর্কে সত্যবাদিতার সকল দলিল নিয়ে আস তবুও তারা তোমার কিবলার অনুসরণ করবে না অর্থাৎ জেদবশত তার অনুসরণ করবে না এবং তুমিও তাদের কিবলার অনুসারী নও। এ স্থানে لَئِنْ -এর لَام অক্ষরটি قَسَم বা শপথসূচক وَلَئِنْ اَتَيْتَ আয়াতটিতে তাদের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যে অতি আগ্রহ ছিল এবং তিনি পুনরায় বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকেই ফিরে আসবেন এ সম্পর্কে ইহুদিদের যে আশা ছিল, এ উভয়েরই খণ্ডন করা হয়েছে। এবং তাদের কতক পরস্পরের কিবলার অনুসারী নয়। অর্থাৎ ইহুদিগণ খ্রিস্টানদের এবং তার বিপরীত খ্রিস্টানগণ ইহুদিদের কিবলার অনুসারী নয়। তোমার নিকট জ্ঞান অর্থাৎ ওহী [আসার পর তুমি যদি তাদের খেয়াল-খুশির] যেদিকে তারা তোমাকে আহ্বান করছে তার অনুসরণ কর নিশ্চয়ই তখন অর্থাৎ যদি ধরে নেওয়া হয় যে, তুমি তার অনুসরণ কর তবে তুমি সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

١٤٦. اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ اَىْ مُحَمَّدًا كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ بِنَعْتِهٖ فِىْ كُتُبِهِمْ قَالَ ابْنُ سَلَامٍ لَقَدْ عَرَفْتُهٗ حِيْنَ رَاَيْتُهٗ كَمَا اَعْرِفُ ابْنِىْ وَمَعْرِفَتِىْ لِمُحَمَّدٍ اَشَدُّ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ نَعْتَهٗ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ.

১৪৬. যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা তাকে অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে তাদের প্রতি প্রেরিত কিতাবে তাঁর সম্পর্কে বিবরণের মাধ্যমে সেরূপ চিনে যেরূপ তারা তাদের সন্তানদেরকে চিনে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) বলেন, তাঁকে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আমি দেখা মাত্রই চিনে ফেলেছিলাম যেমন আমি আমার পুত্রকে চিনি। বস্তুত হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এরপরিচয় আমার নিকট আরও সুবিদিত ছিল [বুখারী] এবং তাদের একদল জেনেশুনে সত্য অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কিত বিবরণসমূহকে গোপন করে থাকে।

١٤٧. هٰذَا الَّذِىْ اَنْتَ عَلَيْهِ الْحَقُّ كَائِنًا مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ الشَّاكِّيْنَ فِيْهِ اَىْ مِنْ هٰذَا النَّوْعِ فَهُوَ اَبْلَغُ مِنْ لَا تَمْتَرِ.

১৪৭. যে পথে তুমি রয়েছ তা সত্য مِنْ رَّبِّكَ এটা উহ্য كَائِنًا -এর সাথে مُتَعَلِّق বা সংশ্লিষ্ট। তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে প্রেরিত। সুতরাং তুমি এ বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্তদের সন্দেহপোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। অর্থাৎ সন্দেহকারী সম্প্রদায়ের মধ্যে হয়ো না। لَا تَمْتَرِ [সন্দেহ করো না] রূপে এ বক্তব্যটি প্রকাশ করা অপেক্ষা আয়াতোক্ত বর্তমান রূপটিই [অর্থাৎ فَلَا تَكُوْنَنَّ] অধিক জোরালো ও مُبَالَغَة সম্পন্ন।

তাহকীক ও তারকীব

لَئِنْ اَتَيْتَ : যদি নিয়ে আসেন, পেশ করেন। اَتٰى يَأْتِى اِتْيَانًا নিয়ে আসা। اُوْتُوا : اِتْيَانٌ মাসদার থেকে মাযী মাযহুলের সীগাহ। অর্থ– প্রদান করা হয়েছে। اٰيَةٌ : এর বহুবচন اٰيَاتٌ অর্থ– নিদর্শন, মু'জিযা। عِنَادٌ : বিদ্বেষ, হঠকারিতা।

قِطْعٌ : কর্তন করা। طَمْعٌ : লোভ, লালসা। عُدْ : ফিরে আসা। فَرْضًا : যদি ধরে নেওয়া হয়।

اٰتَيْنَا : [আমরা দান করেছি] (اِفْعَال) اِيْتَاءٌ অর্থ– প্রদান করা। حِيْنَ رَأَيْتُهُ : যখন তাকে দেখেছি।

لِيَكْتُمُوْنَ : [তারা অবশ্যই গোপন করে] كَتَمَ (ن) كَتْمًا، كِتْمَانًا অর্থ– গোপন করা। اَلْمُمْتَرِيْنَ : مُمْتَرٍ -এর বহুবচন। অর্থ– সন্দেহকারী। اَلْاِمْتِرَاءُ : সন্দেহ করা। اِمْتَرٰى فِى الشَّيْءِ : شَكَّ فِيْهِ এ থেকেই مِرَاءٌ এবং اَبْلَغُ - مِرْيَةٌ : অধিক বালাগাতপূর্ণ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ **আহলে কিতাব কিবলা পরিবর্তন মানতে পারল না কেন?** আহলে কিতাব যখন কিবলা পরিবর্তনকে সত্য জেনেও কেবল হিংসা ও হঠকারিতাবশত সে সত্য গোপন করছে, তখন তাদের থেকে এই আশা করো না যে, তারা তোমাদের কিবলার অনুসরণ করবে। তারা তো এমনই হঠকারী যে, সম্ভাব্য সকল নিদর্শনও যদি তাদের দেখিয়ে দাও, তবুও তারা তোমাদের কিবলা স্বীকার করে নেবে না। তারা তো এ আশায় রয়েছে যে, কোনোক্রমে তোমাদেরকে নিজেদের অনুসারী বানিয়ে নিতে পারে কিনা। এজন্যই তারা বলত, তুমি যদি আমাদের কিবলায় স্থির থাকতে তাহলে বুঝতাম তুমিই প্রতিশ্রুত নবী, হয়তো পুনরায় আমাদের কিবলার দিকে ফিরে আসবে। বস্তুত এটা তাদের ভ্রান্ত ধারণা ও অবাস্তব লালসা। তুমি কখনোই তাদের কিবলার অনুসরণ করতে পার না। কিবলার বিধান এখন আর কিয়ামত পর্যন্ত কখনো রহিত হয়ে যাওয়ার নয়। –[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ قِطْعٌ لِطَمْعِهِ فِىْ اِسْلَامِهِمْ وَطَمْعِهِمْ فِىْ عَوْدِهٖ اِلَيْهَا : মুসান্নিফ (র.) وَمَا اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ -এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, এ আয়াতে ইহুদি-নাসারাদের সে মতবাদের খণ্ডন করাই উদ্দেশ্য যে, মুসলমানদের কিবলার কোনো স্থিতি নেই; ইতঃপূর্বে তাদের কিবলা ছিল খানায়ে কা'বা, পরিবর্তিত হয়ে বাইতুল মুকাদ্দাস হলো, আবার তাও বদলে গিয়ে পুনরায় খানায়ে কা'বা হলো। আবারও হয়তো বাইতুল মুকাদ্দাসকেই কিবলা বানিয়ে নেবে।

قَوْلُهُ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ : আহলে কিতাব অন্যদেরকে তাদের কিবলার অনুসারী বানানোর চেষ্টা কি আর করবে? তারাতো নিজেরাই আপসে কিবলার ব্যাপারে একমত নয়। ইহুদিদের কিবলা বায়তুল মুকাদ্দাসের গম্বুজ আর খ্রিস্টানরা কোনো স্থান বা ইমারতকে কিবলা স্থির না করলেও পূর্বদিককে কিবলা রূপে গ্রহণ করেছে, যেখানে হযরত ঈসা (আ). -এর রূহ ফুঁকা হয়েছিল। যখন তারা নিজেরাই একমত হতে পারছে না তখন তাদের এ পরস্পর বিরোধী কিবলায় মুসলমানদের পক্ষ থেকে অনুসরণের আশা করাটাতো নিতান্তই নির্বুদ্ধিতা। –[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ الخ : এখানে অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নিয়ে রাসূল ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে। এভাবে সম্বোধন দ্বারা মূলত মুহাম্মদীকে অবহিত করা হচ্ছে যে, উল্লিখিত নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ এতই কঠিন ব্যাপার যে, স্বয়ং নবীও যদি এমনটি করেন [অবশ্য তা অসম্ভব], তবে তিনিও সীমালঙ্ঘনকারী বলে সাব্যস্ত হবেন। –[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

আহলে কিতাব কিবলা পরিবর্তনের বিষয়টি জেনেশুনেও মানল না : এ আয়াতে আলোচনা ছিল– হে রাসূল! আপনি হয়তো মনে করে থাকবেন যে, মুসলিমগণের জন্যে কা'বা ঘর কিবলা হওয়াকে আহলে কিতাব যদি কোনোভাবে স্বীকার করে নিত এবং অন্যদেরকে বিভ্রমে ফেলার অপচেষ্টায় লিপ্ত না হতো, অহলে আপনি যে প্রতিশ্রুত নবী এতে কারো কোনো সন্দেহ থাকত না। তবে জেনে রাখুন! আপনার সম্পর্কে আহলে কিতাব সম্যক অবগত। আপনার বংশ, জন্মস্থান, বাসস্থান,

আকৃতি-প্রকৃতি যাবতীয় অবস্থা তাদের ভালো করেই জানা। আপনার সর্বিক বৃত্তান্ত ও আপনি যে প্রতিশ্রুত নবী, এ সম্পর্কে তাদের জ্ঞান নিশ্চিত, যেমন সন্তানসন্ততি সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান নিশ্চত হয়ে থাকে, যে কারণে তারা তাদেরকে কোনোরূপ দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই চিনে ফেলে। কিন্তু ইহুদিরা কেউ কেউ এ বিষয়টি প্রকাশ করলেও অধিকাংশই জেনেশুনে গোপন করে রাখে। কিন্তু তারা গোপন করলে হবে কী, সত্য তো তা-ই যা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়। আহলে কিতাব তা স্বীকার করুক আর নাই করুক– তাদের বিরোধিতার কারণে কোনো রকমের দ্বিধা করবেন না। –[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ يَعْرِفُوْنَهُ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَهُمْ : এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে রাসূল হিসেবে চেনার উদাহরণ সন্তানদের চেনার সাথে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এরা যেমন কোনোরকম সন্দেহসংশয়হীনভাবে নিজেদের সন্তানদেরকে জানে, তেমনিভাবে তাওরাত ও ইঞ্জীলে বর্ণিত রাসূলে কারীম ﷺ -এর সুসংবাদ, প্রকৃষ্ট লক্ষণ ও নিদর্শনাবলির মাধ্যমে তাঁকেও সন্দেহাতীতভাবেই চেনে। কিন্তু তাদের যে অস্বীকৃতি তা একান্তভাবেই হঠকারিতা ও বিদ্বেষপ্রসূত।

এখানে লক্ষণীয় হলো, পূর্ণাঙ্গরূপে চেনার উদাহরণ পিতামাতাকে চেনার সাথে না দিয়ে সন্তানসন্ততিকে চেনার সাথে দেওয়া হয়েছে। অথচ মানুষ স্বভাবত পিতামাতাকেও ভালো করেই জানে। এভাবে উদাহরণ দেওয়ার কারণ হলো, পিতামাতার নিকট সন্তানাদির পরিচয় সন্তানের নিকট পিতামাতার পরিচয় অপেক্ষা বহুগুণ বেশি হয়ে থাকে। কারণ, পিতামাতা জন্মলগ্ন থেকে সন্তানাদিকে নিজ হাতে লালনপালন করে। তাদের শরীরের এমন কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নেই, যা পিতামাতার দৃষ্টির অন্তরালে থাকতে পারে। পক্ষান্তরে পিতামাতার গোপন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সন্তানরা কখনো দেখে না। –[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন] আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) -এর বর্ণনা মতে ইহুদিরা রাসূল ﷺ -কে নিজ সন্তানাদির চেয়েও বেশি চিনত। যেমন তিনি বলেছেন– لَقَدْ عَرَفْتُهُ حِيْنَ رَأَيْتُهُ كَمَا اَعْرِفُ اِبْنِىْ وَمَعْرِفَتِىْ لِمُحَمَّدٍ اَشَدُّ

অর্থাৎ তাঁকে তথা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আমি দেখা মাত্রই চিনে ফেলেছিলাম যেমন আমি আমার পুত্রকে চিনি। বস্তুত তাঁর পরিচয় আমার নিকট আরও সুবিদিত ছিল। –[বুখারী]

قَوْلُهُ اَلْمُمْتَرِيْنَ : اِمْتِرَاءٌ থেকে ইসমে ফায়েল। অর্থ– সন্দেহে পতিত ব্যক্তি।

قَوْلُهُ اَبْلَغُ مِنْ لَا تَمْتَرْ : এটি একটি প্রশ্নের জবাব।

প্রশ্ন: اِيْجَاز তথা সংক্ষিপ্তকরণের দাবি হিসেবে وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ না বলে সংক্ষেপে لَا تَمْتَرْ বলা উচিত ছিল, তা না করে দীর্ঘ ইবারতে ব্যক্ত করা হলো কেন?

উত্তর: এখানে اِطْنَابٌ তথা দীর্ঘায়িত করাটা অহেতুক নয়। কারণবশতই এমনটি করা হয়েছে। কেননা এরূপ বাকধারা সংক্ষেপণের চেয়ে অধিক মোবালাগাপূর্ণ।

অনুবাদ :

١٤٨. وَلِكُلٍّ مِنَ الْأُمَمِ وِّجْهَةٌ قِبْلَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا وَجْهَهُ فِيْ صَلَاتِهِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ مُوَلَّاهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ بَادِرُوْا إِلَى الطَّاعَاتِ وَقُبُوْلِهَا أَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَأْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا يَجْمَعُكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَيُجَازِيْكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

১৪৮. প্রত্যেক জাতিরই এক একটি দিক অর্থাৎ কিবলা রয়েছে যেদিকে সে সালাতে তার মুখ ফিরায় مُوَلِّيْهَا শব্দটির এক কেরাতে مُوَلَّاهَا রূপেও পঠিত রয়েছে। অতএব তোমরা সৎকাজে এগিয়ে যাও আনুগত্য প্রদর্শন ও তা গ্রহণ করার বিষয়ে তোমরা সম্মুখে অগ্রসর হও। তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ তোমাদের সকলকে একত্র করবেন অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তিনি সকলকে জমায়েত করবেন। অনন্তর তিনি তোমাদের কর্মের প্রতিদান প্রদান করবেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

তাহকীক ও তারকীব

اَلْأُمَمُ : أُمَّةٌ-এর বহুবচন। অর্থ– উম্মত, জাতি। وِجْهَةٌ : যার দিকে মুখ করা হয়, কিবলা। مُوَلِّيْهَا : অভিমুখী। بَادِرُوْا : অগ্রসর হও, দ্রুত চল। اَلْخَيْرَاتُ : এটি اَلْخَيْرَةُ-এর বহুবচন اَلْفَاضِلَةُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ - يُجَازِيْكُمْ : তোমাদের প্রতিদান দেবেন। مُوَلَّاهَا : ইসমে মাফউল, مَصْرُوْفٌ إِلَيْهِ অর্থাৎ যাকে অভিমুখী করানো হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنَ الْأُمَمِ : মুফাসসির (র.) وَلٰكِن-এর পরে مِنَ الْأُمَمِ মাহযূফ মেনে مُضَاف إِلَيْه হযফের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আর مُضَاف-এর মতো مُضَاف إِلَيْه ও অহরহ হযফ হয়ে থাকে لِكُلٍّ-এর মূলরূপ হচ্ছে– لِكُلِّ أُمَّةٍ অর্থ– প্রত্যেক দীন ও ধর্মানুসারীদেরকে [চাই তা সত্য হোক কিংবা বাতিল হোক] একটি কেন্দ্রীয় দিক থাকে, যা তাদের কিবলা বলে আখ্যায়িত।

وِجْهَةٌ : এ শব্দটির আভিধানিক অর্থ এমন বস্তু, যার দিকে মুখ করা হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এর অর্থ– কিবলা। এ ক্ষেত্রে হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) وِجْهَةٌ-এর স্থলে قِبْلَةٌ ও পড়েছেন বলে বর্ণিত রয়েছে।

قَوْلُهُ هُوَ مُوَلِّيْهَا : এখানে هُوَ দ্বারা فَرِيْق [দল] উদ্দেশ্য, যা أُمَمٌ থেকে বুঝে আসে। كُلّ-এর মুনাসাবাতের কারণে هُوَ ব্যবহৃত হয়েছে। যদি মুফাসসির (র.) امم-এর পরিবর্তে فريق ব্যবহার করতেন তাহলে অধিক সুস্পষ্ট হতো। –[সাবী] مُوَلِّي - ইসমে ফায়েল। তৎসংশ্লিষ্ট هَا হলো প্রথম মাফউল, আর وِجْهَةٌ হলো দ্বিতীয় মাফউল। যেটি মুফাসসির (র.) স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ وَفِيْ قِرَاءَةٍ مُوَلَّاهَا : অর্থাৎ অপর কেরাতে ইসমে ফায়েলের বদলে ইসমে মাফউলের সীগাহ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এ সুরতে তার نَائِب فَاعِل হবে প্রথম মাফউল– مُوَلَّاهَا أَيْ مَصْرُوْف إِلَيْهَا

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ আয়াতের সারমর্ম : এ আয়াতের ব্যাখ্যায় দুটি অভিমত পাওয়া যায়–

১. কিবলা নিয়ে কলহ-বচসা অবান্তর। প্রত্যেক উম্মতের জন্যেই আল্লাহ এক একটি কিবলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তারা তার প্রতি মুখ করেই ইবাদত করে। অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর শরিয়তে কিবলা ছিল কা'বা শরীফ, আর হযরত মূসা (আ.) -এর শরিয়তে বাইতুল মুকাদ্দাস। অনুরূপভাবে তোমাদের জন্যেও একটি স্বতন্ত্র কিবলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যেমনিভাবে তোমাদের দীন স্বতন্ত্র, তেমনি তোমাদের কিবলাও স্বতন্ত্র হওয়া উচিত। আর এ ক্ষেত্রে কোনো দিক নিজেদের পক্ষ থেকে কিবলা সাব্যস্ত হতে পারে না। আল্লাহ যেটি কিবলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাই কিবলা হয়েছে। তাই এ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত না হয়ে আসল উদ্দেশ্য তথা ইবাদতে মগ্ন হও। কেননা ইবাদত হলো মূল, কিবলা তো তার একটি মাধ্যম মাত্র।

২. কিংবা এর অর্থ এই যে, মুসলমানদেরও সকল সম্প্রদায় কা'বার বিভিন্ন দিকে তথা কেউ পূর্বে কেউ পশ্চিমে অবস্থান করছিলেন, এমতাবস্থায় কারো কিবলা পূর্ব থেকে পশ্চিমে, কারো কিবলা পূর্ব থেকে দক্ষিণে ইত্যাদি দিকে হবে। তাই কা'বা নিয়ে কলহ-বিবাদের কোনো মানে হয় না, নিজের দিক নিয়ে জেদাজেদি শোভা পায় না। যে পুণ্য সাধনা, পুণ্য সঞ্চয় আসল উদ্দেশ্য– তাতে দ্রুতগামী হও, সাধনার উপলক্ষ কিবলা নিয়ে টানাটানি না করে স্বয়ং সাধনায় আত্মনিয়োগ কর। সকলকে ডিঙ্গিয়ে যাও। কিবলা নিয়ে তর্কবিতর্কে কোনো সার্থকতা নেই, কিবলার যে কোনো দিকে যেখানেই থাক না কেন, হাশরের ময়দানে কিন্তু আল্লাহ তোমাদের সকলকে জড় করবেন, একত্র ও সমবেত করবেন। তোমরা কিবলার বিভিন্ন দিকে মুখ করে থাকলেও প্রকৃতপক্ষে একই দিকে, একই কিবলার দিকে মুখ করেছ, তোমাদের নামাজও তাই একই দিকে পড়া হয়েছে বলে পরিগণিত হবে। অতএব দিক নিয়ে, কিবলা নিয়ে তর্ক-বচসা অনর্থক।

–[তাফসীরে তাহেরী ও উসমানী]

قَوْلُهُ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ : তোমরা সকলে কল্যাণসমূহের দিকে এগিয়ে যাও। এর অর্থ হলো– দ্রুত ও অবিলম্বে ইবাদত-বন্দেগিসমূহ পালন কর।

ইবাদত ও কল্যাণকর কাজ দ্রুত সম্পাদন করা উচিত : এ দলিলের ভিত্তিতে বলা হয়েছে, ইবাদত-আনুগত্যের কাজ অবিলম্বে করা উত্তম, তা বিলম্বিত করা অপেক্ষা। বিলম্বিত করার পক্ষে কোনো দলিল থাকলে ভিন্ন কথা। যেমন– ওয়াক্ত শুরু হতেই নামাজ পড়া , জাকাত ফরজ হতেই তা দিয়ে দেওয়া, হজ ফরজ হতেই তা আদায় করা– এমনিভাবে অন্যান্য যাবতীয় ফরজ তার জন্য নির্দিষ্ট সময় হতেই, তার কারণ সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আদায় করা যেমন কাম্য, তেমনি অতীব উত্তম। তার কারণ এসব কাজের আদেশ অবিলম্বে পালনীয়। এসব কাজ বিলম্বিত করা কেবল কোনো দলিলের ভিত্তিতেই জায়েজ হতে পারে। যেমন– আদেশ পালনের জন্যে যদি কোনো সময় নির্দিষ্ট না হয়ে থাকে তা সত্ত্বেও সকলেরই মত হচ্ছে সে আদেশটিই অবিলম্বে পালন করে ফেলা আবশ্যক ও কল্যাণময়। তাই আল্লাহর উক্ত আদেশের প্রেক্ষিতে সব ন্যায় কাজ, ভালো কাজ বা শরিয়তের নির্দেশ খুব শীঘ্র এবং অবিলম্বে পালন করা বাঞ্ছনীয়। কেননা তাঁর আদেশ তো এজন্যই দেওয়া হয়েছে যে, আদেশ শুনামাত্রই তা পালিত হবে। –[আহকামুল কুরআন, জাসসাস]

قَوْلُهُ إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ : এটি অনেক প্রশ্ন ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের মৌলিক জবাব। আল্লাহ কর্তৃক বিঘোষিত বিষয়াবলিতে মানুষ যে কোনো ক্ষেত্রেই যৌক্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জটিলতা উপলব্ধি করে, তার ভিত্তি সর্বদাই আল্লাহর শক্তি-সামর্থ্যের ব্যাপারে ভুল ধারণা পোষণ হয়ে থাকে। মানুষ নিজের সীমিত শক্তি-সামর্থ্যের তুলনায় আল্লাহর শক্তিকে সীমিত ও তাঁর কুদরত-সামর্থ্যকে স্থান-কালের পরিসীমায় গণ্ডিবদ্ধ ধারণা করে। মানুষের এই কূপমণ্ডূকতার সহজ মানসিকতা সামনে রেখে পবিত্র কুরআন বারবার তার উপর আঘাত হেনেছে এবং এ বাস্তবতার প্রতি মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে যে, আল্লাহর কর্ম সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্ত প্রদানের আগে তাঁর অসীম কুদরত ও কর্মক্ষমতার প্রতিও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

অনুবাদ :

١٤٩. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ لِسَفَرٍ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ تَقَدَّمَ مِثْلُهُ وَكَرَّرَهُ لِبَيَانِ تَسَاوِىْ حُكْمِ السَّفَرِ وَغَيْرِهٖ .

১৪৯. যেখান হতেই তুমি সফরের উদ্দেশ্যে বের হও না কেন মাসজিদুল হারামের দিকেই মুখ ফিরাও। এটা নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে প্রেরিত সত্য। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ অনবহিত নন। تَعْلَمُوْنَ ক্রিয়াটি ت [দ্বিতীয় পুরুষ বহুবচন] ও ى [নাম পুরুষ বহুবচন] উভয় রূপেই পঠিত রয়েছে। এ ধরনের বক্তব্য পূর্বেও উল্লিখিত হয়েছে। সফর এবং সফর ছাড়া সকল অবস্থায়ই এ বিষয়ের বিধান এক, এ কথার বর্ণনার জন্যে বক্তব্যটিকে পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে।

١٥٠. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ كَرَّرَهٗ لِلتَّاكِيْدِ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ الْيَهُوْدِ اَوِ الْمُشْرِكِيْنَ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ اَىْ مُجَادَلَةٌ فِى التَّوَلِّىْ اِلٰى غَيْرِهٖ اَىْ لِتَنْتَفِىَ مُجَادَلَتُهُمْ لَكُمْ مِنْ قَوْلِ الْيَهُوْدِ يَجْحَدُ دِيْنَنَا وَيَتَّبِعُ قِبْلَتَنَا وَقَوْلِ الْمُشْرِكِيْنَ يَدَّعِىْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ وَيُخَالِفُ قِبْلَتَهٗ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ بِالْعِنَادِ فَاِنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا تَحَوَّلَ اِلَيْهَا اِلَّا مَيْلًا اِلٰى دِيْنِ اٰبَائِهٖ وَالْاِسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلٌ وَالْمَعْنٰى لَا يَكُوْنُ لِاَحَدٍ عَلَيْكُمْ كَلَامٌ اِلَّا كَلَامُ هٰؤُلَاءِ .

১৫০. এবং তুমি যেখান হতেই বের হও না কেন মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক না কেন তার দিকে মুখ ফিরাবে। تَاكِيْد অর্থাৎ জোর সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এ বাক্যটির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। যাতে তাদের মধ্যে জেদের বশবর্তী হয়ে সীমালঙ্ঘনকারীগণ ভিন্ন তোমাদের বিরুদ্ধে অপর কোনো লোকের অর্থাৎ ইহুদি ও মুশরিকগণের কোনো দলিল না থাকে। এটা ব্যতীত অপর কিবলার দিকে মুখ ফিরাবার বিষয়ে তোমাদের সাথে যেন কোনো বিতর্ক না থাকে। অর্থাৎ ইহুদিরা যে বলে মুহাম্মদ আমাদের ধর্ম অস্বীকার করে অথচ আমাদের কিবলার অনুসরণ করে; আর মুশরিকরা বলে [মুহাম্মদ] দাবি করে মিল্লাতে ইবরাহীমের অথচ তাঁর অনুসৃত কিবলার বিপরীত কাজ করে– তোমাদের সাথে এ বিতর্কের যেন অবসান হয়ে যায়। তাবে যারা জালিম, যারা সীমালঙ্ঘনকারী তারা অবশ্য বলবে, স্বীয় পিতৃপুরুষের ধর্মের প্রতি অনুরাগবশত মুহাম্মদ এই দিকে [কা'বার দিকে] কিবলা পরিবর্তন করে নিয়েছে। اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا এটা এ স্থানে اِسْتِثْنَاء مُتَّصِل বা সমজাতিক ব্যত্যয়রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। তাদের অভিযোগ ভিন্ন এ বিষয়ে আর কারো কোনো কথা বা অভিযোগ থাকবে না।

فَلَا تَخْشَوْهُمْ تَخَافُوْا جِدَالَهُمْ فِي التَّوَلِّي اِلَيْهَا وَاخْشَوْنِي بِامْتِثَالِ اَمْرِيْ وَلِاُتِمَّ عَطْفٌ عَلَى لِئَلَّا يَكُوْنَ نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ بِالْهِدَايَةِ اِلَى مَعَالِمِ دِيْنِكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ اِلَى الْحَقِّ ـ

অনুবাদ : সুতরাং তাদেরকে ভয় করো না। অর্থাৎ এই দিকে [কা'বার দিকে] মুখ ফিরাতে যেয়ে তাদের বিতর্কের কোনো ভয় করো না। আর আমার নির্দেশ পালনের মাধ্যমে শুধু আমাকেই ভয় কর যাতে তোমাদেরকে ধর্মীয় হুকুম-আহকামের ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নিদর্শনাবলির হেদায়েত করে তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহের পূর্ণতা বিধান করতে পারি وَلِاُتِمَّ এটার لِئَلَّا يَكُوْنَ -এর সাথে এ স্থানে عَطْف বা অন্বয় হয়েছে। এবং যাতে তোমরা সত্যের দিকে পরিচালিত হতে পার।

তাহকীক ও তারকীব

كَرَّرَ : তাকরার করেছে, দ্বিরুক্তি করেছে। تَسَاوِيْ সমতা। حُجَّةٌ : বিতর্ক। مُجَادَلَةٌ : **তর্কবিতর্ক।**

فِي التَّوَلِّي : মুখ ফিরাবার বিষয়ে। لِتَنْتَفِيَ : নাকচ করার জন্য।

يَجْحَدُ : جَحَدَ(ف) جَحْدٌ ـ جُحُوْدًا অর্থ– অস্বীকার করা।

يَدَّعِيْ : اِدَّعَى (اِفْتِعَال) اِدِّعَاءٌ অর্থ– দাবি করা। بِالْعِنَادِ : জেদের বশবর্তী হয়ে। مَيْلٌ আকর্ষণ , টান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ **কিবলা পরিবর্তনের বিষয়টি বারবার উল্লেখের তাৎপর্য :** আলোচ্য আয়াতে কিবলা পরিবর্তনের বিষয়টি বলতে গিয়ে فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ বাক্যটি তিনবার এবং وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ বাক্যটি দুবার করে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এর কারণ বিভিন্ন।

১. কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশটি বিরোধীদের জন্যে তো এক হৈচৈয়ের ব্যাপার ছিলই, স্বয়ং মুসলমানদের জন্যেও তাদের ইবাদতের ক্ষেত্রে ছিল একটা বৈপ্লবিক ঘটনা। কারণ একতো কিবলার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, দ্বিতীয়ত মহান আল্লাহর বিধানে রহিতকরণের বিষয়টি নির্বোধদের বোধশক্তির উর্ধ্বের ব্যাপার। তার উপর কিবলা পরিবর্তনই হলো মুহাম্মদী শরিয়তের প্রথম রহিতকরণ। কাজেই এ নির্দেশটি যথার্থ তাকিদ ও গুরুত্ব সহকারে ব্যক্ত করাই যুক্তিযুক্ত। অন্যথায় মনের প্রশান্তি অর্জন হয়তো যথেষ্ট সহজ হতো না। আর সেজন্যই নির্দেশটিকে বারবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। তদুপরি এতে এরূপ ইঙ্গিতও রয়েছে যে, কা'বাই হলো চূড়ান্ত কিবলা। এরপর পুনঃ পরিবর্তনের আর কোনো সম্ভাবনাই নেই। মুফাসসির (র.) كَرَّرَهٗ لِلتَّاكِيْدِ অংশটুকু দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন যে, আয়াতাংশের পুনরুল্লেখ দৃশ্যত বিষয়বস্তুর দৃঢ়তা বিধানের লক্ষ্যে। এরূপ বাকপদ্ধতি আরববাসীদের সাধারণ কথনরীতির অন্তর্ভুক্ত।

২. তত্ত্ববিদ রহস্য বিশারদ আরিফগণ লিখেছেন যে, গভীরভাবে চিন্তা করলে এখানে মোট ছয়বার কিবলামুখী হওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিবারের আদেশ দ্বারা এক একটি বিশেষ লক্ষ্যের প্রতি ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য। ১. প্রথমবারের আদেশ নিরেট আবশ্যিকতা [ওজুব] বুঝাবার জন্যে। ২. দ্বিতীয়বার বুঝানো হয়েছে অবস্থার ব্যাপ্তি অর্থাৎ সফর হোক কিংবা ইকামত। ৩. তৃতীয়বারে রয়েছে স্থান-অবস্থানের ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত অর্থাৎ দূরবর্তী-নিকটবর্তী, উপস্থিত-অনুপস্থিত সকলের জন্যে বিধানের সামঞ্জস্য ও ব্যাপ্তি। ৪. চতুর্থবারের লক্ষ্য আদব শেখানো অর্থাৎ [সব সময়]

কিবলামুখী থাকার প্রয়াস মোস্তাহাব ও পছন্দনীয়। ৫. পঞ্চমবারে আত্মিক মনোযোগ অর্থাৎ যেদিকে প্রতিপালকের বিশেষ সুদৃষ্টি রয়েছে, দিল যেন সেদিকেই নিমগ্ন থাকে এবং ৬. ষষ্ঠবারের উদ্দেশ্য তাকিদ ও দৃঢ়তা প্রদান অর্থাৎ রহিত হওয়ার সম্ভাবনা রহিত করা। -[তাফসীরে মাজেদী]

৩. মুফাসসিরগণ নিজ নিজ রুচি ও কুরআনবোধের আলোকে পুনরুল্লেখ বিধানের আরো নানা তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছেন। যেমন-

* কেউ বলেন, প্রথমবার নবীজির মন খুশি করার জন্যে, দ্বিতীয়বার সকল উম্মতকে সম্বোধন করা হয়েছে, তৃতীয়বার বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তি নিরসনের জন্যে।

* কেউ বলেন, প্রথমবার হরমের অধিবাসীদের ব্যাপারে, দ্বিতীয়বার জাযীরাতুল আরবের অধিবাসীদের জন্যে এবং তৃতীয়বার সমগ্র পৃথিবীর অধিবাসীদের জন্যে। -[মা'আরিফুল করআন : আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী (র.) খ. ১, পৃ. ২৪৫]

قَوْلُهُ إِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ : কা'বার দিকে মুখ করে নামাজ পড়ার নির্দেশ এজন্য দেওয়া হয়েছে যে, তাওরাতে বর্ণিত আছে, হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর কিবলা ছিল কা'বা এবং শেষ নবীকেও এদিকেই মুখ করতে নির্দেশ দেওয়া হবে। কাজেই আপনাকে কা'বার দিকে ফেরার নির্দেশ না দেওয়া হলে ইহুদিরা অবশ্যই অভিযোগ তুলত। অপর দিকে মক্কা শরীফের মুশরিকরা বলত, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কিবলা ছিল কা'বা আর এই নবী ইবরাহীমী ধর্মাদর্শের দাবি করেন অথচ কিবলার ক্ষেত্রে করেন তাঁর বিরোধিতা। এখন তাদের কারোরই কথা বলার সুযোগ থাকল না।

তবে বেয়াড়া স্বভাব উল্টোরথীদের কথা আলাদা। ওরা এ প্রাঞ্জলতার পরেও প্রশ্নের ঝড় তুলে গোঁয়ার্তুমি করবে। যেমন কুরাইশরা বলবে- তিনি এখন জানতে পেরেছেন আমাদের কিবলা সত্য, তাই এটা অবলম্বন করেছেন। এভাবে আস্তে আস্তে আমাদের অন্যান্য রীতিনীতিও স্বীকার করে নেবেন। ইহুদিরা বলবে- আমাদের কিবলার সত্যতা জানার ও স্বীকার করে নেওয়ার পর এখন আবার আমাদের প্রতি বিদ্বেষ ও হিংসার কারণেই কেবল নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী তা ছেড়ে দিয়েছেন। কাজেই এরূপ অবিবেচকদের মন্তব্যের কোনো পরোয়া করবেন না। আমার আদেশ পালন করুন।

-[তাফসীরে উসমানী ও মাজেদী]

قَوْلُهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ : ইসলামি শরিয়ত পৃথিবীর বুকে সর্বাঙ্গীন পূর্ণাঙ্গ বাস্তবসম্মত জীবন বিধান। এর কিবলা স্থিরীকরণ ও কা'বামুখী হওয়ার বিধানও এ পূর্ণাঙ্গ ও বাস্তবসম্মত জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা। لَعَلَّكُمْ-এর لَعَلَّ অব্যয় كَيْ [যাতে করে] অব্যয়ের সমার্থক, সন্দেহ বা দ্বিধাবোধক নয়। এর অর্থ হবে- 'যাতে' বা 'যেন'। হযরত থানভী (র.) বলেছেন, যারা আগে হতে হেদায়েতপ্রাপ্ত, তাদের সম্পর্কে আবার হেদায়েতপ্রাপ্তিতে ধন্য হওয়ার কথা বলা এ বিষয়ের প্রমাণ বহন করে যে, আল্লাহর নৈকট্য লাভের স্তরসমূহ অসীম ও অপরিসীম।

অনুবাদ :

١٥١. كَمَا أَرْسَلْنَا مُتَعَلِّقٌ بِأُتِمَّ أَيْ إِتْمَامًا كَإِتْمَامِهَا بِإِرْسَالِنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ مُحَمَّدًا ﷺ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا الْقُرْآنَ وَيُزَكِّيكُمْ يُطَهِّرُكُمْ مِنَ الشِّرْكِ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ الْقُرْآنَ وَالْحِكْمَةَ مَا فِيهِ مِنَ الْأَحْكَامِ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ.

১৫১. যেমন আমি প্রেরণ করেছি كَمَا أَرْسَلْنَا পূর্বের لِأُتِمَّ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ বা যুক্ত। তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের নিকট একজন রাসূল মুহাম্মদ ﷺ-কে, যাতে আমার অন্যান্য অনুগ্রহের পূর্ণতা বিধানের মতো তোমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করে আমি আমার এই অনুগ্রহেরও পূর্ণতা বিধান করতে পারি। যে আমার আয়াতসমূহ অর্থাৎ আল কুরআন তোমাদের নিকট আবৃত্তি করে, তোমাদেরকে পবিত্র করে অর্থাৎ শিরক হতে তোমাদেরকে পাক করে এবং কিতাব আল-কুরআন ও হিকমত তাঁর আহকাম ও বিধিবিধানসমূহ শিক্ষা দেয় এবং তোমরা যা জনতে না তা শিক্ষা দেয়।

١٥٢. فَاذْكُرُونِي بِالصَّلَوةِ وَالتَّسْبِيحِ وَنَحْوِهِ أَذْكُرْكُمْ قِيلَ مَعْنَاهُ أُجَازِيكُمْ وَفِي الْحَدِيثِ عَنِ اللّٰهِ مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْ مَلَئِهِ وَاشْكُرُوا لِي نِعْمَتِي بِالطَّاعَةِ وَلَا تَكْفُرُونِ بِالْمَعْصِيَةِ.

১৫২. সালাত, তাসবীহ ইত্যাদির মাধ্যমে তোমরা আমাকে স্মরণ কর। আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব। বলা হয়, এর অর্থ হলো, আমি তোমাদেরকে এর প্রতিদান প্রদান করব। আল্লাহর পক্ষ হতে বর্ণিত হাদীসে [হাদীসে কুদসীতে] আছে, যে ব্যক্তি আমাকে মনে মনে স্মরণ করবে আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করবে। যে ব্যক্তি আমাকে কোনো সমাবেশে স্মরণ করবে আমিও তাকে তা হতে উৎকৃষ্টতর সমাবেশে স্মরণ করব। তোমরা আমার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে আমার **অনুগ্রহের** কৃতজ্ঞতা আদায় কর। আর পাপাচারে **লিপ্ত হয়ে** আমার অকৃতজ্ঞ হয়ো না।

তাহকীক ও তারকীব

إِتْمَامٌ : পূরিপূর্ণ করা। يُزَكِّيكُمْ : تَزْكِيَةٌ (تَفْعِيلٌ) زَكّٰى অর্থ- শুদ্ধ করা, পবিত্র করা।
أُجَازِيكُمْ : তোমাদেরকে প্রতিদান দেব। مَلَأٌ : সমাবেশ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : এ পর্যন্ত কিবলা পরিবর্তন সংক্রান্ত আলোচনা চলে আসছিল। এখানে বিষয়টিকে এমন এক পর্যায়ে এনে সমাপ্ত করা হয়েছে, যাতে এ বিষয়টির ভূমিকায় কা'বা নির্মাতা হযরত ইবরাহীমের দোয়ার বিষয়টিও প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর বংশধরদের মধ্যে এক বিশেষ মর্যাদায় মহানবী ﷺ-এর আবির্ভাব। এতে এ বিষয়েও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর আবির্ভাবে কা'বা নির্মাতার দোয়ারও একটা প্রভাব রয়েছে। কাজেই তাঁর কিবলা যদি কা'বা শরীফকে সাব্যস্ত করা হয় তাহলে তাতে বিস্ময়ের কিংবা অস্বীকারের কিছুই নেই।

قَوْلُهُ كَمَا أَرْسَلْنَا : এ বাক্যে উদাহরণসূচক যে 'কাফ' (ك) বর্ণটি ব্যবহার করা হয়েছে তার ব্যাখ্যা হলো, যেভাবে আমি কিবলার ব্যাপারে তোমাদের উপর إِتْمَام نِعْمَت করেছি এভাবে যে, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কিবলা তোমাদের জন্যে নির্ধারণ করেছি তেমনিভাবে আমি নবুয়ত, রিসালাত ও হেদায়েতের ব্যাপারেও তোমাদের উপর إِتْمَام نِعْمَت করেছি । এভাবে যে, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কামিল রাসূলকে তোমাদের হেদায়েতের জন্যে প্রেরণ করেছি। অধিকন্তু আরও একটা নিয়ামত হলো তিনি তোমাদেরই বংশ ও জাতি থেকেই আবির্ভূত হয়েছেন। এছাড়াও আরেকটি বিশ্লেষণ রয়েছে, যা কুরতুবী (র.) গ্রহণ করেছেন। তা হলো, কাফ -এর সম্পর্ক হলো পরবর্তী আয়াত فَاذْكُرُونِيْ -এর সাথে। অর্থাৎ আমি যেমন তোমাদের প্রতি কিবলাকে একটি নিয়ামত হিসেবে দান করেছি এবং অতঃপর দ্বিতীয় নিয়ামত দিয়েছি রাসূলের আবির্ভাবের মাধ্যমে, তেমনি আল্লাহর জিকিরও আরেকটি নিয়ামত। এসব নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় কর, যাতে এসব নিয়ামতের অধিকতর প্রবৃদ্ধি হতে পারে। কুরতুবী (র.) বলেন, এখানে كَمَا أَرْسَلْنَا -এর 'কাফ'টির ব্যবহার ঠিক তেমনি যেমনটি সূরা আনফালের كَمَا أَخْرَجَنَا এবং সূরা হিজরের كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِيْنَ -এর মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। -[মা'আরিফ]

قَوْلُهُ فَاذْكُرُونِيْ أَذْكُرْكُمْ **জিকির -এর সুফল ও পুরস্কার :** অর্থাৎ আমার পক্ষ হতে যখন তোমাদের প্রতি একাধিকবার আমার নিয়ামতের পূর্ণতা বিধান হয়ে গেছে, তখন তোমাদের কর্তব্য মুখে, হৃদয়ে, স্মরণে, চিন্তায় সর্বতোভাবে আমাকে মনে রাখা এবং আমার আনুগত্যে যত্নবান থাকা। তাহলে আমি তোমাদের স্মরণ রাখব অর্থাৎ তোমাদের প্রতি আমার নিত্যনতুন কৃপা ও রহমত বর্ষিত হতে থাকবে। কাজেই তোমরা যথাসম্ভব আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে থাক; আমার অকৃতজ্ঞতা ও অবাধ্যতা হতে বেঁচে থাক। -[তাফসীরে উসমানী]

হযরত থানভী (র.) বলেছেন, এদিকে বান্দা আল্লাহকে স্মরণ করতে শুরু করল তো ওদিক থেকে করুণা বর্ষণ হতে থাকবে এবং এটাই বান্দার আল্লাহকে স্মরণ করার প্রকৃত সুফল ও পুরস্কার। সুতরাং মনের মাঝে এ বিষয়টি জাগরূক থাকলে জিকির-ফিকিরে নিমগ্ন বান্দার জন্যে কখনো দুশ্চিন্তা-অমনোযোগিতা দেখা দিতে পারে না এবং ফলত কিছু না পাওয়ার অভিযোগও উঠতে পারে না। -[তাফসীরে মাজেদী]

জিকিরের তাৎপর্য : মুফাসসির কুরতুবী (র.) ইবনে খোয়াইয -এর আহকামুল কুরআনের বরাত দিয়ে এ সম্পর্কিত একখানা হাদীসও উদ্ধৃত করেছেন। হাদীসটির মর্মার্থ হচ্ছে, রাসূল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার অনুগত্য করে অর্থাৎ তাঁর হালাল ও হারাম সম্পর্কিত নির্দেশগুলো অনুসরণ করে, যদি তার নফল নামাজ-রোজা কিছু কমও হয়, সেই আল্লাহকে স্মরণ করে। অন্যদিকে যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশাবলির বিরুদ্ধাচরণ করে সে নামাজ, রোজা, তাসবীহ-তাহলীল প্রভৃতি বেশি করে করলেও প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহকে স্মরণ করে না।

হযরত যুননূন মিসরী (র.) বলেন, "যে ব্যক্তি প্রকৃতই আল্লাহকে স্মরণ করে সে অন্যান্য সব কিছুই ভুলে যায়। এর বদলায় স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই সবদিক দিয়ে হেফাজত করেন এবং সব কিছুর বদলা তাকে দিয়ে দেন।"

হযরত মু'আয (রা.) বলেন,"আল্লাহর আজাব থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে মানুষের কোনো আমলই যিকরুল্লাহর সমান নয়।"

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত এক হাদীসে কুদসীতে আছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, "বান্দা যে পর্যন্ত আমাকে স্মরণ করতে থাকে বা আমার স্মরণে যে পর্যন্ত তার ঠোঁট নড়তে থাকে, সে পর্যন্ত আমি তার সাথে থাকি।" -[মা'আরিফ]

قَوْلُهُ وَاشْكُرُوا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ : তাওহীদ আল্লাহর একত্ব ও এককত্ব, ঈমান ও ইসলামের দাবি পূরণ করতে থাকাই আল্লাহর শোকর আদায় করা। শোকরের উত্তম সংজ্ঞা হলো, আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতসমূহকে আল্লাহরই পছন্দনীয় কাজে ব্যয় করা। وَلَا تَكْفُرُوْنِ কুফরি, শিরক, ধর্মহীনতা, ধর্মবিধিতে সন্দেহ পোষণ, আইন লঙ্ঘন ও বিদ'আত আচরণই আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতা ও তাঁর নিয়ামতের প্রতি অবহেলা-অস্বীকৃতি। অকৃতজ্ঞতার অর্থ হলো, শক্তি-সামর্থ্যকে আল্লাহর নাফরমানিতে ব্যয় করা। -[তাফসীরে মাজেদী]

অনুবাদ :

১৫৩. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا عَلَى الْاٰخِرَةِ بِالصَّبْرِ عَلَى الطَّاعَةِ وَالْبَلَاءِ وَالصَّلٰوةِ خَصَّهَا بِالذِّكْرِ لِتَكَرُّرِهَا وَعَظْمِهَا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ بِالْعَوْنِ ـ

১৫৩. হে বিশ্বাসীগণ! আনুগত্য প্রদর্শন ও বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা পরকালের জন্যে সাহায্য প্রার্থনা কর। সালাত বারবার আদায় করা হয় এবং এর গুরুত্বও সমধিক, সেহেতু এ স্থানে পৃথকভাবে সালাতের উল্লেখ করা হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাহায্যসহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।

তাহকীক ও তারকীব

اِسْتَعِيْنُوْا : بَاب اِفْعَال -এর اَلْاِسْتِعَانَةُ মাসদার থেকে اَمْر حَاضِر -এর সীগাহ অর্থ- সাহায্য প্রার্থনা কর। اَلطَّاعَةُ : আনুগত্য। اَلْبَلَاءُ : বিপদ-আপদ। خَصَّهَا : বিশেষভাবে বলল تَكَرُّر : বারবার আদায় করা। اَلْعَوْنُ : সাহায্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ধৈর্য ও নামাজ যাবতীয় সংকটের প্রতিকার : وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ "ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর" এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষের দুঃখকষ্ট, যাবতীয় প্রয়োজন ও সমস্ত সংকটের নিশ্চিত প্রতিকার দুটি বিষয়ের মধ্যে নিহিত। একটি 'সবর' বা ধৈর্য এবং অন্যটি নামাজ। বর্ণনারীতির মধ্যে اِسْتَعِيْنُوْا শব্দটিকে বিশেষ কোনো বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট না করে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করার ফলে এখানে যে মর্মার্থ দাঁড়ায় তা এই যে, মানব জাতির যে কোনো সংকট বা সমস্যার নিশ্চিত প্রতিকারই ধৈর্য ও নামাজ। যে কোনো প্রয়োজনেই এ দুটি বিষয়ের দ্বারা মানুষ সাহায্য লাভ করতে পারে। -[মা'আরিফ]

'সবর' -এর তাৎপর্য : 'সবর' শব্দের অর্থ হচ্ছে- সংযম অবলম্বন ও নফস -এর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ। ইমাম রাগেব (র.) বলেন- اَلصَّبْرُ الْاِمْسَاكُ তথা সবর হলো সংকটকালে সংযম।

সবরের শাখা : কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় 'সবর' -এর তিনটি শাখা রয়েছে-

১. নফসকে হারাম এবং নাজায়েজ বিষয়াদি থেকে বিরত রাখা,
২. ইবাদত ও আনুগত্যে বাধ্য করা এবং
৩. যে কোনো বিপদ ও সংকটে ধৈর্যধারণ করা। অর্থাৎ যেসব বিপদ-আপদ এসে উপস্থিত হয় সেগুলোকে আল্লাহর বিধান বলে মেনে নেওয়া এবং এর বিনিময়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান প্রাপ্তির আশা রাখা। অবশ্য কষ্ট পড়ে যদি মুখ থেকে কোনো কাতর শব্দ উচ্চারিত হয়ে যায়, কিংবা অন্যের কাছে তা প্রকাশ করা হয়, তবে তা 'সবর' -এর পরিপন্থি নয়।

'সবর' -এর উপরিউক্ত তিনটি শাখাই প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। সাধারণ মানুষের ধারণায় সাধারণত তৃতীয় শাখাকেই সবর হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রথম দুটি শাখা যে এ ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ- সে ব্যাপারে মোটেও লক্ষ্য করা হয় না। এমনকি এ দুটি বিষয়ও যে 'সবর' -এর অন্তর্ভুক্ত এ ধারণাও যেন অনেকের নেই। কুরআন-হাদীসের পরিভাষায় ধৈর্যধারণকারী বা 'সাবের' সে সমস্ত লোককেই বলা হয়, যারা উপরিউক্ত তিন প্রকারেই 'সবর' অবলম্বন করে। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, হাশরের ময়দানে ঘোষণা করা হবে- "ধৈর্যধারণকারীরা কোথায়?" একথা শোনার সঙ্গে

সঙ্গে সেসব লোক উঠে দাঁড়াবে, যারা তিন প্রকারেই সবর করে জীবন অতিবাহিত করে গেছেন। এসব লোককে প্রথমেই বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে। 'ইবনে কাছীর' এ বর্ণনা উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন যে, কুরআনের অন্যত্র- إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ অর্থাৎ "সবরকারী বান্দাগণকে তাদের পুরস্কার বিনা হিসাবে প্রদান করা হবে"- এ আয়াতে সেদিকেই ইশারা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ خَصَّهَا بِالذِّكْرِ لِتَكَرُّرِهَا وَعِظَمِهَا : প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রকার ইবাদতই সবরের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এরপরেও নামাজকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে যে, নামাজ বারবার আদায় করা হয় এবং এর গুরুত্বও সমধিক। কেননা নামাজ এমনই একটি ইবাদত যাতে 'সবর' তথা ধৈর্যের পরিপূর্ণ নমুনা বিদ্যমান। নামাজের মধ্যে একাধারে যেমন নফস তথা রিপুকে আনুগত্যে রাখা হয়, তেমনি যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ, নিষিদ্ধ চিন্তা এমনকি অনেক হালাল ও মোবাহ বিষয় থেকেও সরিয়ে রাখা হয়। সেমতে নিজের 'নফস' -এর উপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করে সর্বপ্রকার গুনাহ ও অশোভন আচার-আচরণ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও নিজেকে আল্লাহর ইবাদতে নিয়োজিত রাখার মাধ্যমে 'সবর' -এর অনুশীলন করতে হয়, নামাজের মধ্যেই তার একটি পরিপূর্ণ নমুনা ফুটে উঠে।

قَوْلُهُ إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ : বাক্যের দ্বারা এদিকে ইশারা করা হয়েছে যে, নামাজি এবং সবরকারীগণের সাথে আল্লাহর সান্নিধ্য তথা খোদায়ী শক্তির সমাবেশ ঘটে। যেখানে বা যে অবস্থায় বান্দার সাথে আল্লাহর শক্তির সমাবেশ ঘটে, সেখানে দুনিয়ার কোনো শক্তি কিংবা কোনো সংকটই যে টিকতে পারে না, তা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন করে না। বান্দা যখন আল্লাহর শক্তিতে শক্তিমান হয়, তখন তার গতি অপ্রতিরোধ্য হয়ে যায়। তার অগ্রগমন ব্যাহত করার মতো শক্তি কারও থাকে না। বলাবাহুল্য, মকসুদ হাসিল করা এবং সংকট উত্তরণের নিশ্চিত উপায় একমাত্র আল্লাহর শক্তিতে শক্তিমান হওয়াই হতে পারে।

এ কথা নিত্য প্রত্যক্ষ যে, কোনো শক্তিধর ও বিরাট সত্তার সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেলে মন কত মজবুত ও শক্তিশালী থাকে। বিপদকালে পুলিশের আগমন কিংবা কোনো প্রতাপশালী আইন প্রয়োগকারীর উপস্থিতিতেও মন কতই ভাবনামুক্ত থাকে। কঠিন রোগের সময় কোনো খ্যাতিমান চিকিৎসকের আগমন নিরাশ হৃদয়ে কেমন আশার সঞ্চার করে। তাহলে সর্বদর্শী ও সর্বজ্ঞ প্রকৃত সহায়তাদাতা ও হেফাজতকারীর সঙ্গে অন্তরের সংযোগ হয়ে গেলে অসহায় মানব যে কতখানি মনে প্রশান্তি ও নিশ্চিন্ততা লাভ করতে পারে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আল্লাহ সাথে থাকার অর্থ : ব্যাপক অর্থে তো ঈমানদার, কাফির, পুণ্যবান ও পাপাচারী সকলের জন্যে আল্লাহর সঙ্গ প্রযোজ্য। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে- وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ "তোমরা যেখানেই থাক আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন।" কিন্তু এখানে এ ব্যাপকতাবোধক সঙ্গ উদ্দেশ্য নয় । এখানে উদ্দেশ্য বিশেষ ধরনের সঙ্গ-সান্নিধ্য, যার প্রতিক্রিয়া হলো বিশেষ করুণা ও বিশেষ দৃষ্টি। আল্লাহর এ বিশেষ সান্নিধ্যের অনুভূতিই রাসূলে কারীম ﷺ -এর সাহাবীগণ (রা.) -কে অপরিসীম শক্তি-সাহস ও ভীতিহীনতার অধিকারী বানিয়েছিল। আর বস্তব ব্যাপারও তা-ই। আল্লাহর সান্নিধ্যে থাকার আত্মিক ধ্যান [মুরাকাবা]-এর চেয়ে আত্মার জন্যে অধিক সুস্বাদু কোনো খাদ্য এবং আহত হৃদয়ের জন্যে অধিক কার্যকর প্রশান্তি-প্রলেপ অন্য কিছু হতে পারে না। একমাত্র এ ধ্যানই ঈমানদারদের জন্যে অপছন্দনীয় ও প্রতিকূলকে পছন্দনীয় ও অনুকূল, তিক্তকে মিষ্ট ও বিষকে মিঠায় [বিশ্রীকে মিছরিতে] রূপান্তরিত করতে যথেষ্ট হয়ে থাকে।

সালাত সবরকে অন্তর্ভুক্ত করে : অর্থের প্রসারতায় 'সবর' একটি ব্যাপক ও সমন্বিত অর্থবোধক শব্দ, সালাত তার একটি বিশিষ্ট রূপ। সুতরাং সবরকারীদের জন্যে আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্তির এ নিয়ামত সাব্যস্ত হলে তা সালাত আদায়কারীদের জন্যে আরও দৃঢ়ভাবে সাব্যস্ত হবে। এজন্য সালাত আদায়কারীদের কথা স্পষ্ট উল্লেখ করার প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। 'সালাত আদায়কারীদের সঙ্গে রয়েছেন' বলেননি, কেননা তিনি যখন সবরকারীদের সঙ্গে রয়েছেন, তখন সালাত আদায়কারীদের সঙ্গে তো উত্তমরূপেই রয়েছেন। কারণ সালাত সবরকে অন্তর্ভুক্ত করে রয়েছে। -[রূহুল মা'আনী সূত্রে মাজেদী]

অনুবাদ :

١٥٤. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ هُمْ أَمْوَاتٌ بَلْ هُمْ أَحْيَاءٌ أَرْوَاحُهُمْ فِي حَوَاصِلِ طُيُورٍ خُضْرٍ تَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ لِحَدِيثٍ بِذٰلِكَ وَلٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ تَعْلَمُونَ مَا هُمْ فِيهِ.

১৫৪. আল্লাহর পথে যারা নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত। এই মর্মে একটি হাদীস আছে যে, সবুজ পাখির পেটে তাদের রূহসমূহ অবস্থান করে এবং জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা তারা বিচরণ করে বেড়ায়। কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করতে পার না। কি [সুন্দর] অবস্থায় তারা আছে তোমরা তা জান না। أَمْوَاتٌ শব্দটি এ স্থানে خَبَر বা বিধেয়, তার مُبْتَدَأ বা উদ্দেশ্য হলো هُمْ যা এ স্থানে উহ্য।

তাহকীক ও তারকীব

يُقْتَلُ : [নিহত হয়] মুযারে মাজহুলের সীগাহ। قَتَلَ (ن) قَتْلًا অর্থ- হত্যা করা। أَمْوَاتٌ : مَيِّتٌ -এর বহুবচন। অর্থ- মৃত। أَحْيَاءٌ : حَيٌّ -এর বহুবচন। অর্থ- জীবিত। أَرْوَاحٌ : رُوحٌ -এর বহুবচন। অর্থ- আত্মা। حَوَاصِلُ : حَوْصَلَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ- পেট, পাকস্থলী। طُيُورٌ : طَيْرٌ -এর বহুবচন। অর্থ- পাখি। خُضْرٌ : সবুজ। تَسْرَحُ : বিচরণ করে। حَيْثُ شَاءَتْ : যেখানে ইচ্ছা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أَمْوَاتٌ -এর আলোচনা : বদর যুদ্ধে কতিপয় সাহাবী শাহাদাত বরণ করলে নির্বোধ কাফিররা বলতে লাগল যে, এরা অনর্থক নিজেদের জীবন নাশ করল, জীবনের স্বাদ আস্বাদন থেকে বঞ্চিত হলো। এদের জবাব দেওয়া হচ্ছে যে, তোমরা যে অর্থে তাদের মৃত মনে করছ, সে অর্থে তো তারা একেবারেই মৃত নয়; বরং তারা জীবিতদের চেয়েও অনেক উত্তম ও অধিকহারে স্বাদ আস্বাদন করছেন। পরিভাষায় এ ধরনের নিহতদের শহীদ বলা হয়।

قَوْلُهُ وَلٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ : তোমরা বুঝতে পার না। সে জীবন সম্পর্কে অনুভব করার মতো অনুভূতি তোমাদের দেওয়া হয়নি। কেননা বারযখ জগৎ জাগতিক ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুধাবনযোগ্য নয় এবং মানুষ তার বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা সে সূক্ষ্ম ও উন্নত জীবনের উপলব্ধি অর্জন করতে পারে না; বরং ওহী ও আল্লাহর বাণীতে তার সন্ধান পাওয়া যায়। -[তাফসীরে বায়যাবী]

আলমে বরযখে নবী এবং শহীদগণের হায়াত : ইসলামি রেওয়ায়েত মোতাবেক প্রত্যেক মৃত ব্যক্তি আলমে বরযখে বিশেষ ধরনের এক হায়াত বা জীবন প্রাপ্ত হয় এবং সে জীবনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কবরের আজাব বা ছওয়াব অনুভব করে থাকে। এ জীবন প্রাপ্তির ব্যাপারে মু'মিন-কাফির এবং পুণ্যবান ও গুনাহগারের কোনো পার্থক্য নেই। তবে বরযখের জীবনের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এক স্তরে সর্বশ্রেণির লোকই সমানভাবে শামিল। কিন্তু বিশেষ এক স্তর নবী-রাসূল এবং বিশেষ নেককার বান্দাদের জন্যে নির্ধারিত। এ স্তরেও অবশ্য বিশেষ পার্থক্য এবং পরস্পরের বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

যেসব লোক আল্লাহর রাস্তায় নিহত হন তাঁদেরকে শহীদ বলা হয়। অবশ্য সাধারণভাবে তাঁদের মৃত বলাও জায়েজ। তবে তাঁদের মৃত্যুকে অন্যান্যদের মৃত্যুর সমপর্যায়ভুক্ত মনে করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা মৃত্যুর পর প্রত্যেকেই বরযখের জীবন লাভ করে থাকে এবং সে জীবনের পুরস্কার অথবা শাস্তি ভোগ করতে থাকে। কিন্তু শহীদগণকে সে জীবনে অন্যান্য মৃতের তুলনায় একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদা দান করা হয়। তা হলো অনুভূতির বৈশিষ্ট্য, অন্যান্য মৃতের তুলনায় তাঁদের বেশি অনুভূতি দেওয়া হয়। যেমন- মানুষের পায়ের গোড়ালি ও হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগ- উভয় স্থানেই অনুভূতি থাকে, কিন্তু গোড়ালির তুলনায় আঙ্গুলের অনুভূতি অনেক বেশি তীক্ষ্ণ। তেমনি সাধারণ মৃতের তুলনায় শহীদগণ বরযখের জীবনে বহুগুণ বেশি অনুভূতি প্রাপ্ত হয়ে থাকে। এমনকি শহীদের এ জীবনানুভূতি অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের জড়দেহেও এসে পৌঁছে থাকে। অনেক সময় তাঁদের হাড়-মাংসের দেহ পর্যন্ত মাটিতে বিনষ্ট হয় না; জীবিত মানুষের দেহের মতোই অবিকৃত

থাকতে দেখা যায়। হাদীসের বর্ণনা এবং বহু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় এর যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছে। এ কারণেই শহীদগণকে জীবিত বলা হয়েছে। তবে সাধারণ নিয়মে তাঁদেরকেও মৃতই ধরা হয় এবং তাঁদের বিধবাগণ অন্যের সাথে পুনর্বিবাহ করতে পারে।

নবী ও শহীদগণের হায়াতের পার্থক্য : নবীগণ (আ.) এ ধরনের এক বিশেষ জীবনের অধিকার লাভে শহীদগণের উর্ধ্বে রয়েছেন এবং তাঁদের জীবনীশক্তি প্রবলতর ও অধিক বৈশিষ্ট্যময়। নবী-রাসূলগণ শহীদগণের চেয়েও অনেক বেশি মরতবার অধিকারী হয়ে থাকেন। তাঁদের পবিত্র দেহ সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় থাকার পরও বাহ্যিক হুকুম-আহকামে তার কিছু প্রভাব অবশিষ্ট থাকে। তাঁদের পরিত্যক্ত কোনো সম্পদ বণ্টন করার রীতি নেই। তাঁদের স্ত্রীগণ দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনেও আবদ্ধ হতে পারেন না।

এখানে শহীদগণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে তাদের বিশেষ সান্নিধ্য-সংযোগ এবং বিশেষ সজীবতা ও মাহাত্ম্য বুঝাবার জন্যে। যেমন তাফসীরে বায়যাবীতে উল্লেখ হয়েছে–

«تَخْصِيْصُ الشُّهَدَاءِ لِاخْتِصَاصِهِمْ بِالْقُرْبِ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَزِيْدِ الْبَهْجَةِ وَالْكَرَامَةِ - بَيْضَاوِىْ»

মোটকথা, বরযখের এ জীবনে সর্বাপেক্ষা শক্তিসম্পন্ন হচ্ছেন নবী-রাসূলগণ, অতঃপর শহীদগণ এবং তারপর অন্যান্য সাধারণ মৃত ব্যক্তিবর্গ। অবশ্য কোনো কোনো হাদীসের দ্বারা জানা যায় যে, ওলী-আওলিয়া এবং নেককার বান্দাগণের অনেকেই বরযখের হায়াতের ক্ষেত্রে শহীদগণের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে থাকেন। কেননা আত্মশুদ্ধির সাধনায় রত অবস্থায় যাঁরা মৃত্যুবরণ করেন, তাঁদের মৃত্যুকেও শহীদের মৃত্যু বলা যায়। ফলে তাঁরাও শহীদগণেরই পর্যায়ভুক্ত হয়ে যান। আয়াতের মর্মার্থ অনুযায়ী নিঃসন্দেহে অন্যান্য নেককার সালেহগণের তুলনায় শহীদগণের মর্যাদা বেশি।

সন্দেহের অপনোদন : যদি কোনো শহীদের লাশ মাটিতে বিনষ্ট হতে দেখা যায়, তাহলে এমন ধারণা করা যেত পারে যে, আল্লাহর পথে সে নিহত হয়েছে সত্য, তবে হয়তো নিয়ত বিশুদ্ধ না থাকায় তার সে মৃত্যু যথার্থ মৃত্যু হয়নি। কিন্তু এমন কোনো শহীদের লাশ যদি মাটির নীচে বিনষ্ট অবস্থায় পাওয়া যায়, আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার ব্যাপারে যার নিষ্ঠায় কোনো সন্দেহ নেই, তবে সেক্ষেত্রে অবশ্য এমন ধারণা করা উচিত হবে না যে, তিনি শহীদ নন অথবা কুরআনের আয়াতের মর্মার্থ এখানে টিকছে না। কেননা মানুষের লাশ যে কেবলমাত্র মাটিতেই বনষ্ট হয় তাই নয়। অনেক সময় ভূমিস্থ অন্যান্য ধাতু কিংবা অন্য কোনো কিছুর প্রভাবেও জড়দেহ বিনিষ্ট হওয়া সম্ভব। নবী-রাসূল ও শহীদগণের লাশ মাটি ভক্ষণ করে না বলে হাদীসে যে বর্ণনা রয়েছে, তাতে একথা বুঝা যায় না যে, মাটি ছাড়া তাদের লাশ অন্য কোনো ধাতু কিংবা রাসায়নিক প্রভাবেও বিনষ্ট হতে পারে না। সুতরাং মাটির সাথে মিশ্রিত অন্য কোনো রাসায়নিক পদার্থ কিংবা অন্য কোনো উপাদানের প্রভাবে যদি শহীদের লাশে কোনো প্রকার বিকৃতি ঘটে যায়, তবে এর দ্বারা 'মাটি শহীদের লাশে বিকৃতি ঘটাতে পারে না'– এ হাদীসের যথার্থতা বিঘ্নিত হয় না।

যেহেতু বরযখের অবস্থা মানুষের সাধারণ পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভব করা যায় না সেহেতু কুরআনে শহীদের সে জীবন সম্পর্কে لَا تَشْعُرُوْنَ [তোমরা বুঝতে পার না] বলা হয়েছে। এর মর্মার্থ হলো এই যে, সে জীবন সম্পর্কে অনুভব করার মতো অনুভূতি তোমাদের দেওয়া হয়নি।

মাসআলা : ইবনুল আরাবী মালিকী (র.) বলেছেন, এ আয়াত থেকে প্রমাণ গ্রহণ করে কোনো কোনো ইমাম শহীদের জন্যে জানাজা ও গোসল উভয়কে অপ্রয়োজনীয় সাব্যস্ত করেছেন। কেননা শাহাদাতই তো তাদের পূত-পবিত্র করে দিয়েছে। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) জানাজার প্রয়োজনীয়তাকে অপরিবর্তিত রেখেছেন। –[আহকামুল কুরআন]

বরযখী জীবনের স্বরূপ : এ জীবন সম্পর্কে একদল মনীষী শুধু আত্মিক হওয়ার অভিমত পোষণ করেছেন। তবে আত্মিক ও জড় এ উভয়বিধ হওয়ার অভিমতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। পূর্বসূরিদের অনেকেই এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, এ জীবনটি দেহ ও আত্মার বাস্তবতাসমৃদ্ধ। কারো কারো মতে এটি শুধু আধ্যাত্মিক। তবে প্রথম অভিমতটির প্রাধান্য সুপ্রসিদ্ধ। –[রূহুল মা'আনী]

অনুবাদ :

١٥٥. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ لِلْعَدُوِّ وَالْجُوعِ الْقَحْطِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ بِالْهَلَاكِ وَالْاَنْفُسِ بِالْقَتْلِ وَالْاَمْرَاضِ وَالْمَوْتِ وَالثَّمَرٰتِ بِالْجَوَائِحِ اَىْ لَنَخْتَبِرَنَّكُمْ فَنَنْظُرَ اَتَصْبِرُوْنَ اَمْ لَا وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ عَلَى الْبَلَاءِ بِالْجَنَّةِ هُمْ.

১৫৫. আমি তোমাদেরকে শত্রুর ভয়, ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষ, সম্পদ ধ্বংস করে এবং রাগ, মৃত্যু ও হত্যার মাধ্যমে জীবন নাশ করে ও বিভিন্ন বিপদাপদের মাধ্যমে ফল-ফসলের স্বল্পতা দ্বারা অবশ্য পরীক্ষা করব। তোমাদেরকে যাচাই করে নেব। অনন্তর দেখব তোমরা ধৈর্যধারণ কর কিনা। আর বিপদে ধৈর্যশীলদের জান্নাতের সুসংবাদ দাও।

١٥٦. الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ بَلَاءٌ قَالُوْآ اِنَّا لِلّٰهِ مِلْكًا وَعَبِيْدًا يَفْعَلُ بِنَا مَا يَشَاءُ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ فِى الْاٰخِرَةِ فَيُجَازِيْنَا فِى الْحَدِيْثِ مَنِ اسْتَرْجَعَ عِنْدَ الْمُصِيْبَةِ اَجَرَهُ اللّٰهُ فِيْهَا وَاَخْلَفَ عَلَيْهِ خَيْرًا وَفِيْهِ اَنَّ مِصْبَاحَ النَّبِىِّ ﷺ طَفِئَ فَاسْتَرْجَعَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ (رضـ) اِنَّمَا هٰذَا مِصْبَاحٌ فَقَالَ كُلُّ مَا سَاءَ الْمُؤْمِنَ فَهُوَ مُصِيْبَةٌ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ فِىْ مَرَاسِيْلِهِ.

১৫৬. তারা হলো যারা বিপদে পতিত হলে কষ্টে পড়লে বলে দাস ও মালিকানা সকল রূপেই নিশ্চয় আমরা আল্লাহর তিনি আমাদের নিয়ে যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন এবং আমরা নিশ্চিতভাবে পরকালে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী। অনন্তর তিনি আমাদেরকে প্রতিদান প্রদান করবেন। হাদীসে আছে– বিপদের সময় "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" পাঠ করলে আল্লাহ তাকে পূর্ণফল দান করেন ও এর ফলে এতদপেক্ষা কোনো উত্তম বস্তু তাকে দেন। আরো আছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘরের বাতি নিভে গেলে তিনি 'ইন্না লিল্লাহ' পাঠ করলেন। এতে হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, এটাতো সামান্য একটি বাতিমাত্র। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যে বস্তুতে মু'মিন কষ্টপায়, তার খারাপ লাগে তা-ই তার জন্যে বিপদ। ইমাম আবূ দাউদ তৎপ্রণীত মারাসীলে এ হাদীসটির বর্ণনা করেছেন।

١٥٧. اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ نِعْمَةٌ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ اِلَى الصَّوَابِ.

১৫৭. এরাই তারা যাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে সালাত অর্থাৎ ক্ষমা ও রহমত অনুগ্রহ বর্ষিত হয়, আর তারাই সত্য ও সঠিকপথে পরিচালিত।

তাহকীক ও তারকীব

لَنَبْلُوَنَّكُمْ : [আমি তোমাদের অবশ্য পরীক্ষা করব] بَلٰى (ن) بَلَاءً অর্থ– পরীক্ষা করা, যাচাই করা।

اَلْخَوْفُ : ভয়। خَافَ (ف) خَوْفًا অর্থ– ভয় পাওয়া। اَلْجُوْعُ : ক্ষুধা। اَلْقَحْطُ : দুর্ভিক্ষ। نَقْصٌ : ত্রুটি, ক্ষতি।

اَلْجَوَائِحُ : বিপদাপদ। اَصَابَتْ : [আক্রান্ত করল] اِصَابَةٌ অর্থ– আক্রান্ত করা। মাদ্দাহ صَوْبٌ -

اَصَابَ شَيْئًا : কোনো কিছু তাকে আক্রান্ত করল।

مُصِيْبَةٌ : اَلْمُصِيْبَةُ كُلُّ مَا يُؤْذِي الْمُؤْمِنَ وَيُصِيْبُهُ فِيْ نَفْسِهٖ اَوْ مَالِهٖ اَوْ وَلَدِهٖ

اِسْتَرْجَعَ : اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পড়ল। طَفِئَ : নিভে গেল।

سَاءَ : কষ্ট দিল। مَرَاسِيْلُ : مُرْسَلٌ -এর বহুবচন। উলূমুল হাদীসের পরিভাষা।

صَلَوَاتٌ : এটি صَلٰوةٌ -এর বহুবচন। অর্থ– করুনা, প্রার্থণা, নামাজ। اَلْمُهْتَدُوْنَ : [হেদায়েত প্রাপ্তগণ] مُهْتَدٍ [ال যোগে

اَلْمُهْتَدِيْ] -এর বহুবচন। اِهْتَدٰى يَهْتَدِيْ اِهْتِدَاءً অর্থ– হেদায়াতপ্রাপ্ত হওয়া, পথপ্রাপ্ত হওয়া।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ **যোগসূত্র :** যাঁরা ধৈর্যের চরম উৎকর্ষ দেখাতে পেরেছেন উপরে সেই শহীদান সম্পর্কে আলোচনা ছিল। এবার ঘোষণা করা হয়েছে যে, সাধারণভাবে তোমাদের সকলের উপরই বালামুসিবত ও বিপদাপদ নিশ্চয় আপতিত হবে তবে তা শাস্তি ও আজাব রূপে নয়, বরং পরীক্ষা রূপে হবে এবং তোমাদের ধৈর্য যাচাই করা হবে। ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া অত সহজ নয়। এ কারণে এ বাণী দ্বারা আগেভাগে সাবধান করে দিয়ে তাদের সান্ত্বনা ও নির্ভাবনার উত্তম উপকরণ সরবরাহ করা হলো। আর আল্লাহর পরীক্ষা করার লক্ষ্য হলো ফলাফল পৃথিবীবাসীর সামনে প্রকাশ করে দেওয়া। অন্যথায় এ বিষয়টিও যে আল্লাহ সর্বদা বিদিত রয়েছেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

–[তাফসীরে মাজেদী ও উসমানী]

قَوْلُهٗ بِشَيْءٍ : [কিছু] দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হলো যে, পরীক্ষা খুব কঠিন হবে না; মালিকানাভুক্ত যে কোনো বিষয়ের নগণ্য পরিমাণ ও ক্ষুদ্র অংশ দ্বারা হবে, পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ বিষয় দ্বারা নয়।

قَوْلُهٗ اَلْخَوْفِ : اَلْخَوْفُ শব্দটি ব্যাপ্তিসম্পন্ন জীবন, সম্পদ ও সম্মান -এর সব কিছুর ব্যাপারে শঙ্কা ও সংকট -এর অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهٗ اَلْجُوْعِ : اَلْجُوْعُ দ্বারা পরীক্ষা হলো, প্রয়োজন দেখা দেওয়া সত্ত্বেও হারাম ও অবৈধ সম্পদ থেকে আত্মরক্ষা করবে, সিয়াম পালনে অস্থির চঞ্চল হবে না এবং ক্ষুধা-দারিদ্র্যে শঙ্কিত হবে না।

قَوْلُهٗ اَمْوَال : সম্পদে সুদ-ঘুষ, আত্মসাৎ, অবৈধ বেচাকেনা এবং সম্পদ অর্জনের শরিয়ত পরিপন্থি যে কোনো উপায় বর্জন করবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্বিপাকে সম্পদের ক্ষতি সাধিত হলে, চুরি গেলে, আগুন লেগে পুড়ে গেলে, সর্ব ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করবে।

قَوْلُهٗ اَلْاَنْفُسِ : اَلْاَنْفُسُ জীবন-মৃত্যু, রোগ-ব্যাধি ও জিহাদের আঘাত-প্রত্যাঘাতে ধৈর্যশীল হবে।

قَوْلُهٗ اَلثَّمَرَاتِ : ফল-ফসল দ্বারা সন্তানসন্ততিও উদ্দেশ্য হতে পারে। এছাড়া ব্যবসাবাণিজ্য, ক্ষেত-কৃষি ইত্যাদির লাভ ও উৎপাদন এবং সব ধরনের সুনাম-সুখ্যাতির ক্ষেত্রগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত। বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, বান্দার পরীক্ষা তাওহীদ ও শিরকের মাঝে ব্যবধান রেখা টেনে দেয়। সাধারণ মানুষের পরীক্ষা হয় প্রকাশ্য শিরক সম্পর্কিত আর বিশিষ্টদের পরীক্ষা নেওয়া হয় সূক্ষ্ম শিরক সম্পর্কে। হযরত থানভী (র.) বলেছেন, এ আয়াতটি অনিচ্ছাকৃত সাধনা [মুজাহাদা]ও উপকারী ও কার্যকর হওয়ার সুস্পষ্ট ভাষ্য।

قَوْلُهُ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ : বিপদ-আপদে এ আয়াতের উচ্চারণের অভ্যাস আজও অনেক মুসলিম পরিবারে **পরিদৃষ্ট হয়**। কিন্তু সবর অর্জিত হওয়ার জন্যে শুধু মৌখিক আবৃত্তি যথেষ্ট নয়, অন্তরেও অবশ্যই এ মর্মের পূর্ণাঙ্গ উপস্থিতি **অপরিহার্য**। তাফসীরে বায়যাবীতে এসেছে- وَلَيْسَ الصَّبْرُ بِالْاِسْتِرْجَاعِ بِاللِّسَانِ بَلْ بِهٖ وَبِالْقَلْبِ অর্থাৎ শুধু **মুখে ইন্নালিল্লাহ** .... পড়ার নাম সবর নয়, বরং মুখ ও মন দিয়ে পড়তে হবে।

قَوْلُهُ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ : আমরা সকলেই শুধু বান্দা-মালিকানাভুক্ত দাসানুদাস। সব কিছুতেই তাঁর মালিকানা। আমরা নিজেরা আমাদের সব বিষয়বস্তু এর কোনো কিছুই আমার নয়, স্ত্রী নয়, সন্তান নয়, সম্পদ নয়, সম্পত্তি নয়, স্বদেশ নয়, স্বজাতি নয়, দেহ নয়, প্রাণ নয়।

মৌলিক তিনটি বিশ্বাস সবরের জন্যে সহায়ক : প্রথমত মানুষের সব দুঃখ-দুশ্চিন্তা, সকল বেদনা ও আক্ষেপ এবং সকল জ্বালার মূল কথা শুধু এতটুকু যে, সে তার প্রিয় বিষয়বস্তুগুলোকে নিজস্ব সাব্যস্ত করে রেখেছেন। কিন্তু এই ব্যাপক বিভ্রান্তি হতে হৃদয়-মনকে মুক্ত করতে পারলে তখন যে কোনো জিনিস যতই প্রিয় হোক না কেন, তা তো বিন্দুমাত্র নিজের রইল না। অতএব তখন আর দুঃখকষ্ট, বিষণ্নতা ও হায়-আফসোসের অবকাশ কোথায়? **দ্বিতীয়ত** পৃথিবীর যে কোনো দুঃখ-বেদনা, যে কোনো মনঃকষ্ট এবং যে কোনো মর্মজ্বালার তা যতই বিস্তৃত ও গভীর হোক না কেন- এ সবই সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী। এর কোনোটিই অক্ষয় চিরন্তন নয়। কেননা অনতিবিলম্বে এসব ছেড়ে প্রকৃত মালিকের দরবারে হাজিরা দিতে হবে। **তৃতীয়ত** সেখানে পৌঁছামাত্র সমুদয় বকেয়া উসুল হয়ে যাবে, সব হারানোর প্রাপ্তি ঘটবে, সকল বিচ্ছেদের অবসানে চির মিলন সূচিত হবে। মৌলিক বিশ্বাসের এ তিনটি ধারা যার হৃদয়ে যতখানি সুদৃঢ় হবে, পৃথিবীর বুকে সে তত পরিমাণ নিরাপত্তা ও স্থিরতা ভোগ করবে। -[তাফসীরে মাজেদী]

সবরের তিনটি স্তর : বিষয়াভিজ্ঞদের মতে আয়াতে বর্ণিত সবর প্রতিপালনের তিনটি স্তর রয়েছে-

ক. উচ্চস্তর : অন্তরে আয়াতের মর্ম চিত্রিত থাকবে এবং মুখেও এর শব্দমালা উচ্চারিত হবে।

খ. মধ্যমস্তর : মনে মনে এর অর্থ ভেবে নেবে, মুখে উচ্চারণ করবে না।

গ. নিম্নস্তর : মনে মর্মের উপস্থিতি ব্যতিরেকে শুধু মুখে উচ্চারণ করবে। একটি সম্ভাব্য চতুর্থ স্তরও রয়েছে। তা হলো, মনে বিশ্বাসের পর্যায়েও বিদ্যমান নেই, শুধু মুখে রটাতে থাকবে। এটি মূলত নিফাক বা কপটতা এবং এ অবস্থা ঈমানদারদের পরিসীমা বহির্ভূত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে ইতিহাসের বর্ণনা রয়েছে যে, সাধারণ ও নগণ্য দুঃখকষ্ট ও অপছন্দনীয়তার ক্ষেত্রে তিনি বারবার এ বাক্য আবৃত্তি করতেন। তাঁর সাহাবীগণ (রা.) ও এরূপ অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়েছিলেন। -[তাফসীরে মাজেদী]

١٥٨. إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ جَبَلَانِ بِمَكَّةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ أَعْلَامِ دِيْنِهِ جَمْعُ شَعِيْرَةٍ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ أَيْ تَلَبَّسَ بِالْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ وَأَصْلُهُمَا الْقَصْدُ وَالزِّيَارَةُ فَلَا جُنَاحَ إِثْمَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ فِيْهِ إِدْغَامُ التَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الطَّاءِ بِهِمَا بِأَنْ يَسْعٰى بَيْنَهُمَا سَبْعًا نَزَلَتْ لَمَّا كَرِهَ الْمُسْلِمُوْنَ ذٰلِكَ لِأَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوْا يَطُوْفُوْنَ بِهِمَا وَعَلَيْهِمَا صَنَمَانِ يَمْسَحُوْنَهُمَا وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) أَنَّ السَّعْيَ غَيْرُ فَرْضٍ لِمَا أَفَادَهُ رَفْعُ الْإِثْمِ مِنَ التَّخْيِيْرِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ رُكْنٌ وَبَيَّنَ ﷺ فَرْضِيَّتَهُ بِقَوْلِهِ إِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ اِبْدَؤُوْا بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهِ يَعْنِي الصَّفَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَمَنْ تَطَوَّعَ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالتَّحْتَانِيَّةِ وَتَشْدِيْدِ الطَّاءِ مَجْزُوْمًا وَفِيْهِ إِدْغَامُ التَّاءِ فِيْهَا خَيْرًا أَيْ بِخَيْرٍ أَيْ عَمَلٍ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافٍ وَغَيْرِهِ فَإِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ لِعَمَلِهِ بِالْإِثَابَةِ عَلَيْهِ عَلِيْمٌ بِهِ.

অনুবাদ :

১৫৮. নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া মক্কার দুটি পাহাড় আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। [দেবদেবীর স্মরণিকা নিদর্শন নয়] شَعَائِرُ শব্দটি شَعِيْرَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ তাঁর ধর্মীয় নিদর্শনসমূহ। সুতরাং যে ব্যক্তি কাবাগৃহের হজ কিংবা উমরা সম্পন্ন করে অর্থাৎ হজ ও উমরার সাথে তার ইচ্ছা বিজড়িত করে এতদুভয়ের তওয়াফ করলে এ দুয়ের মাঝে সাত চক্কর দৌড়ালে তার কোনো অপরাধ পাপ নেই। يَطَّوَّفَ মূলত ছিল يَتَطَوَّفَ ; এর ط -এর মধ্যে ت -এর ادغام বা সন্ধি সূচিত হয়েছে। হজ ও উমরার আসল আভিধানিক অর্থ যথাক্রমে ইচ্ছা করা ও জেয়ারত করা। মুসলিমগণ সাফা ও মারওয়ার মাঝে সায়ী [দৌড়ানো] অপছন্দ করত। কারণ জাহিলি যুগে এতদুভয়ের মধ্যে [আসাফ ও নায়িলা নামক] দুটি মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। সায়ী বা দৌড়ানো ও তওয়াফ করার সময় কাফিরগণ এ দুটিকে ভক্তিসহকারে স্পর্শ করত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাফা ও মারওয়ার সায়ী ফরজ নয়। কেননা [এ আয়াতটিতে বলা হয়েছে সাফা ও মারওয়ার তওয়াফে কোনো পাপ নেই] 'পাপ নেই' দ্বারা বান্দাকে এ বিষয়ে এখতিয়ার প্রদান করা বুঝায়। হযরত শাফেয়ী ও কতিপয় ইমাম এটাকে হজ ও উমরার অন্যতম 'রুকন' বা অবশ্য করণীয় বুনিয়াদ বলে মনে করেন। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ তা ওয়াজিব বা অবশ্য করণীয় হওয়া সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে গেছেন। তিনি ইরশাদ করেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর সাফা ও মারওয়ার মাঝে সায়ী বা দৌড়ানো ফরজ করেছেন। ইমাম বায়হাকী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম মুসলিম (র.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, আল্লাহ যে স্থান হতে শুরু করেছেন অর্থাৎ সাফা তোমরাও সে স্থান হতে শুরু কর। এবং যে কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করবে تَطَوَّعَ ক্রিয়াটির ط مُشَدَّد [তাশদীদযুক্ত ط] ও শেষে جَزْم যুক্ত রূপে ى সহ নাম পুরুষ একবচন বর্তমানকাল রূপেও অপর এক পাঠ রয়েছে। এমতাবস্থায় ط অক্ষরটিতে ت -এর اِدْغَام বা সন্ধি সূচিত হয়েছে বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ তওয়াফ ইত্যাদি যা তার উপর অবশ্য করণীয় নয় এমন কোনো কাজ করবে নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা পুণ্যফল দান করে তার এই কার্যের মর্যাদা দেবেন। তিনি এতদসম্পর্কে অতি জ্ঞানবান।

خَيْرًا শব্দটি মূলত مَنْصُوْبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ অর্থাৎ কাসরা প্রদানকারী অক্ষরটি অপসারণের দরুন মানসূবরূপে ব্যবহৃত হয়েছে— এদিকে ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্যে মাননীয় তাফসীরকার এ স্থানে তাফসীরে بِخَيْرٍ -এর উল্লেখ করেছেন।

তাহকীক ও তারকীব

شَعَائِرُ : شَعِيْرَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ- চিহ্ন, আলামত। এ থেকেই شِعَار -এর ব্যবহার। أَعْلَامٌ : عَلَمٌ -এর বহুবচন। **অর্থ- চিহ্ন**, নিদর্শন। تَلَبَّسَ : বিজড়িত করল। اَلْحَجُّ : فِى الشَّرْعِ قَصْدُ الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ لِأَدَاءِ الْمَنَاسِكِ **اَلْقَصْدُ : ইচ্ছা**। اَلزِّيَارَةُ : দর্শন। جُنَاحٌ : পাপ, إِثْمٌ : পাপ। جَنَحَ إِلَى كَذَا إِذَا مَالَ - اَلْجُنَاحُ الْمَيْلُ إِلَى الْإِثْمِ
يَسْعَى : সাঈ করবে, দৌড়াবে। صَنَمَانِ : صَنَمٌ -এর দ্বিবচন। অর্থ- মূর্তি।
يَمْسَحُوْنَ : স্পর্শ করত। مَسْحًا (ف) مَسَحَ অর্থ- স্পর্শ করা। اِبْدَؤُوْا : [শুরু কর] بِدَايَةً (ف) بَدَأَ অর্থ- শুরু করা।
اَلْإِثَابَة : ছওয়াব প্রদান করা, প্রতিদান দেওয়া।
قَوْلُهُ تَطَوَّعَ : ফরজ আমল ব্যতীত মানুষ স্বেচ্ছায় যেসব কাজ সম্পাদন করে তাকেই تَطَوُّع [সেচ্ছা প্রণোদিত] বলা হয়।
قَوْلُهُ خَيْرًا : যে কোনো ভালোকে বুঝায়। এখানে خَيْرٌ দ্বারা উদ্দেশ্য সব রকমের ইবাদত-আনুগত্য। আর এটাই অধিক **সমীচীন। কেননা** তা শব্দের ব্যাপকতার অনুকূল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতের সাথে এ আয়াতের কয়েক দিক থেকে সম্পর্ক রয়েছে-

১. **ইতঃপূর্বে কা'বার** দিকে কিবলা পরিবর্তন ও কিবলাসমূহের মধ্যে কা'বার শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা ছিল। এবারে কা'বা যে হজ ও **উমরা পালনের** স্থান তা বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে পূর্ণাঙ্গরূপে وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِىْ عَلَيْكُمْ -এর প্রত্যয়ন ও বিশ্লেষণ সাধিত হয়।

২. **এর আগে** ধৈর্যের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছিল। এবারে বলা হয়েছে যে, দেখ সাফা ও মারওয়া যে মহান আল্লাহর **নির্দশনাবলির** অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং হজ ও উমরায় তার প্রদক্ষিণকে আবশ্যিক করা হয়েছে, তার কারণ তো এটাই যে, **এ কাজ হযরত** বিবি হাজেরা (আ.) ও তাঁর ছেলে হযরত ইসমাঈল (আ.) -এর ন্যায় পরম ধৈর্যশীলদ্বয়ের স্মৃতিবাহী। **হাদীস**, তাফসীর ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহে এ ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত আছে, যা দেখলে إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ -এর সমর্থন পাওয়া যায়।-[তাফসীরে উসমানী]

৩. **উপরে একটু** আগেই সবরের মাহাত্ম্য ও গুরুত্বের বিবরণ দেওয়া হচ্ছিল। তার পরপরই হজের আলোচনা শুরু করাতে **সবর ও হজের** মাঝে একটি বিশেষ সংযোগ-সামঞ্জস্যও রয়েছে। কেননা হজ সম্পাদন ক্ষেত্রে নিত্য দিনের ভিড়-হাঙ্গামা, **টানাহ্যাঁচড়া**, লাগাতার সফর ও খণ্ডিত অবস্থান ইত্যাদি মিলিয়ে শুধু ফরজগুলো যথারীতি আদায় করে যাওয়াই একটি **কঠিন সংগ্রামতুল্য**। সুন্নত ও মোস্তাহাব তো কল্পনায়ই রেখে দিতে হয়। প্রতি মুহূর্তের ব্যস্ততায় উত্তেজনার উপকরণ থাকা সত্ত্বেও জিহ্বা সংযত রাখুন, হাত-পা সামলে রাখুন, চোখ-কান নিয়ন্ত্রণে রাখুন। মোটকথা সবরের পরিপূর্ণ পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। -[তাফসীরে মাজেদী]

জালালাইনের হাশিয়াতে রয়েছে-

وَوَجْهُ ارْتِبَاطِ الْاٰيَةِ بِمَا قَبْلَهُ هُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْجِهَادِ لِأَنَّ فِيْهِمَا شَقُّ الْأَنْفُسِ وَالْأَمْوَالِ (ج ٢، ص ٢٣)

অর্থাৎ পূর্বে জিহাদের কথা আলোচিত হয়েছে এবার হজের আলোচনা করা হলো। কেননা উভয়টির মাঝেই জানমালের কষ্ট রয়েছে।

قَوْلُهُ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ : সাফা ও মারওয়া এক সময় মাসজিদুল হারামের সন্নিকটে দুটি ছোট পাহাড় ছিল। এখন তা শুধু পাথরখণ্ডরূপে সামান্য উঁচু রয়েছে। সাফা হরাম শরীফের ডানদিকে এবং মারওয়া বামদিকে অবস্থিত। এ দুটির মাঝে দূরত্ব হবে ৪৯৩ কদম বা প্রায় ৭ ফার্লং। সাফা শব্দের আভিধানিক অর্থ- পরিচ্ছন্ন পাথর বা নিরেট প্রস্তরখণ্ড বা পাথরের চাঁই। মারওয়া'র আভিধানিক অর্থ- সাদা বর্ণের কোমল পাথর।

سُمِّىَ الصَّفَا لِأَنَّهُ جَلَسَ عَلَيْهِ آدَمُ صَفِىُّ اللّٰهِ وَسُمِّىَ الْمَرْوَةُ لِأَنَّهُ جَلَسَ عَلَيْهِ امْرَأَةُ آدَمَ حَوَّاءُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ.
(حَاشِيَةُ جَلَالَيْن)

সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইসমাঈল (আ.) -এর দুধ খাওয়ার বয়সে মা হাজেরা (রা.) দুগ্ধপোষ্য শিশুকে একাকী ও পিপাসা-কাতর রেখে এ উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন যে, কোথাও কোনো কাফেলা দেখা গেলে তাদের নিকট হতে পানি পাওয়া যেতে পারে। এ সময় অস্থিরতার কারণে তিনি দৌড়ে এ পাহাড় থেকে সে পাহাড়ে চড়তেন, আবার সে পাহাড় থেকে এ পাহাড়ে চলে আসতেন যাতে পাহাড়ের উঁচু স্থান থেকে কোনো কাফেলা দৃষ্টিগোচর হয়।

قَوْلُهُ شَعَائِرُ اللّٰهِ : شَعَائِرُ শব্দটি شَعِيْرَةٌ -এর একবচন। অর্থ- আলামত, চিহ্ন। شَعَائِرُ اللّٰهِ -আল্লাহর নিদর্শন অর্থাৎ আল্লাহর দীনের চিহ্ন ও নিদর্শনাদি। আল্লাহর দীনের সেসব আলামত, যা ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রতীক সাব্যস্ত হতে পারে। -[তাফসীরে মাজেদী]

আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (র.) বলেন, শরিয়তের পরিভাষায় ঐ সমস্ত বস্তুকে شَعَائِرُ اللّٰهِ বলা হয় যার মাধ্যমে সাধারণত কুফর ও ইসলামের মাঝে পার্থক্য নির্ণীত হয়। -[মা'আরিফুল কুরআন-১/২৫৩]

قَوْلُهُ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ হজের বিধান : হজ ইসলামি ইবাদত তালিকায় চতুর্থ স্তম্ভ। কিংবা সালাত, সাওম ও জাকাতের পরবর্তী চতুর্থ ফরজ। উম্মতের যে কোনো সদস্য, চাই সে পৃথিবীর যে কোনো অঞ্চলের বাসিন্দা হোক না কেন- আর্থিক সামর্থ্য, পথের নিরাপত্তা ও শরীরিক সামর্থ্যের শর্তে জীবনে একবার তার জন্যে হজ সম্পাদন ফরজ।

হজের আরকান অর্থাৎ হজের ফরজসমূহ তিনটি-

১. ইহরাম বাঁধা অর্থাৎ হেরেমের পরিসীমায় প্রবেশের পূর্বে সাধারণ ব্যবহার্য পোশাক খুলে ফেলে ইহরাম বা হজের জন্যে বিশেষ ধরনের সেলাইবিহীন পোশাক পরিধান করা।
২. জিলহজ মাসের ৯ তারিখে আরাফা প্রান্তরে উপস্থিতি, যাকে পরিভাষায় বলা হয় উকূফ [অবস্থান] এবং
৩. তাওয়াফে যিয়ারত বা প্রধান তওয়াফ অর্থাৎ উকূফের পরে পবিত্র কা'বা ঘর প্রদক্ষিণ বা তওয়াফ করা।

হজের ওয়াজিব ৫টি-

১. মুযদালিফায় অবস্থান করা অর্থাৎ আরাফার ময়দান থেকে মিনায় ফেরার পথে মুযদালিফা নামক স্থানে রাত্রি যাপন করা।
২. ১০. ১১ ও ১২ জিলহজে মিনায় অবস্থান করে কঙ্কর নিক্ষেপ, পরিভাষায় যাকে বলা হয় রাময়ুল জামারাত বা সংক্ষেপে রামী।
৩. মাথা মুণ্ডন করা বা চুল কাটা অর্থাৎ মিনায় শয়তানকে কঙ্কর মারার পর কুরবানি আদায় করে মাথার চুল মুণ্ডন করা।
৪. সাফা-মারওয়া পর্বতদ্বয় সাঈ করা অর্থাৎ ১০ জিলহজ বায়তুল্লাহ শরীফে তাওয়াফে যিয়ারতের পর সাফা-মারওয়া পর্বতদ্বয় সাতবার সায়ী করা।
৫. কা'বা তওয়াফ [অর্থাৎ ফরজ তওয়াফের অতিরিক্ত বিদায়ী তওয়াফ পরিভাষায় যাকে বলা হয় তাওয়াফই সাদর]।

উমরার বিধান : 'উমরা' যার অপর নাম 'আল হাজ্জুল আসগার' বা ছোট হজ। এতে অবশ্য হজের ন্যায় মাস-তারিখের শর্ত নেই এবং আরাফার ময়দানে উকূফ, মুযদালিফায় অবস্থান, মিনা গমন ইত্যাদি নেই। বছরের যে কোনো মাসে এবং যে কোনো সময় উমরা পালন করা যায়। উমরার কার্যক্রম হচ্ছে হেরেমের বাইরে থেকে উমরার নিয়তে ইহরাম বাঁধবে, অতঃপর কা'বা ঘর তওয়াফ করবে এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সায়ী করার পর মাথা কামিয়ে ফেলবে [বা চুল ছেঁটে ফেলবে]। এতেই উমরা সম্পাদিত হবে এবং ইহরাম থেকে মুক্ত হতে পারবে।

قَوْلُهُ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ : সাফা-মারওয়ার মূল সম্বন্ধ তো ছিল একত্ববাদের বিশিষ্টতম পরিবার অর্থাৎ হযরত হাজেরা, হযরত ইসমাঈল ও হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর সঙ্গে। কিন্তু জাহেলিয়াতের যুগে এগুলোতেও মুশরিকরা অবৈধ দখল জমিয়েছিল এবং প্রতিটি পাহাড়ে এক একটি প্রতীক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তীর্থযাত্রায় গেলে দৌড়ে দৌড়ে এগুলোও স্পর্শ করত, চুমো খেত। প্রথম যুগের মুসলমান সাহাবীগণের হৃদয়ে শিরকের প্রতি ঘৃণা এত দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়েছিল যে, স্বভাবতই তাদের মনে এরূপ আশঙ্কা দেখা দিল যে, এ পাহাড়দ্বয়ের মাঝে যাতায়াত করা আবার না শিরক ও অংশীবাদের পরিচায়ক হয়ে যায়। তাই তাঁরা সাফা-মারওয়া গমনে দ্বিধান্বিত ছিলেন।

আয়াতে তাদের এ দ্বিধা বিদূরিত করার লক্ষ্যে ইরশাদ হয়েছে- এগুলো জাহিলি যুগের তো নয়-ই; বরং এগুলো প্রকৃত তাওহীদের নিদর্শন ও স্মরণিকা প্রতীক। সুতরাং এদের মাঝে যাতায়াতকে ইসলামি ও তাওহীদী হজের অঙ্গ সাব্যস্ত করা হলে তাতে কোনো প্রকারের ক্ষতি বা অন্যায় হবে না।

قَوْلُهُ يَطَّوَّفَ بِهِمَا সায়ী -এর বিধান : তওয়াফের মূল অর্থ হলো কোনো কিছুর চারদিক প্রদক্ষিণ করা ও চক্কর দেওয়া। [اَلطَّوَافُ الْمَشْيُ حَوْلَ الشَّيْءِ ـ رَاغِب] তবে সম্প্রসারিত অর্থরূপে কোনো কিছুর আশপাশে যাওয়াকেও তওয়াফ বলা যেতে পারে। এখানে উদ্দেশ্য হলো, দুটি স্থানের মাঝে সায়ী বা যাতায়াত করা।

মাযহাব ও ইখতিলাফ : সাফা-মারওয়ার মধ্যকার এ সায়ী হানাফীদের মতে ওয়াজিব, ইমাম আহমদ (র.) -এর মতে সুন্নত এবং মালেকী ও শাফেয়ীগণের মতে ফরজ। এ যাতায়াত হবে সাতবার। মাঝের কিছু দূরত্ব প্রায় দুই ফার্লং স্থান একটু দৌড়ে চলতে হয়। এজন্যই বিষয়টিকে সায়ী [দৌড়] নামে অভিহিত করা হয়েছে। মধ্যবর্তী এ দূরত্বের পরিচিতি চিহ্নস্বরূপ সড়কের পাশে দুই প্রান্তে দুটি সবুজ বর্ণের ফলক স্থাপন করা হয়েছে। এক সময় এ স্থানটি ছিল অনাবাদি, এখন তো দস্তুরমতো বাজারে পরিণত হয়েছে এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে এখন সমাগম ও জীবনের স্পন্দন পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। –[তাফসীরে মাজেদী]

আয়াতের প্রকৃত মর্ম : বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, হযরত ওরওয়া ইবনে যুবাইর (রা.) হযরত আয়েশা (রা.) -এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন– فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا দ্বারা তো বোঝা যায়, সাফা-মারওয়ার সায়ী ওয়াজিব নয়। জবাবে হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, ওহে আমার ভাগ্নে আয়াতের মর্ম এমন নয় যেমনটি তুমি বুঝেছ। যদি আয়াতের মর্ম এমনই হতো, তাহলে কুরআনের ইবারত এভাবে হতো– فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ لَّا يَطَّوَّفَ بِهِمَا

অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির জন্যে কোনো গুনাহ নেই যে সাফা-মাওয়ার সায়ী না করে।

তিনি আরো বলেন, এ আয়াত আনসারদের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে। যার ঘটনা হলো, ইসলামের পূর্বে আনসারগণ 'মানাত' -এর পূজা করত। মুসলমান হওয়ার পর যখন সাফা-মারওয়ার মাঝে সায়ী করার হুকুম দেওয়া হলো তখন তারা কাফেরদের সাথে সাদৃশ্যতার কারণে মনে সংকোচবোধ করল। সে প্রসঙ্গে এ আয়াত নাজিল হয়। –[বুখারী ও মুসলিম]

মোটকথা আনসারদের সংকোচ ও দ্বিধা নিরসনের জন্যে فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا বলা হয়েছে। এতে সাফা-মারওয়ার সায়ী বর্জনের অনুমতি দেওয়া উদ্দেশ্য নয়। যদি তাই হতো তাহলে فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ لَّا يَطَّوَّفَ بِهِمَا বলা হতো। অর্থাৎ لَا جُنَاحَ শব্দটি সাফা-মারওয়ার মাঝে সায়ী করার ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়েছে। বর্জন করার ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়নি।

আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (র.) বলেন, এতদসত্ত্বেও যদি এটা মেনে নেওয়া হয় যে, لَا جُنَاحَ শব্দটি শুধু اِبَاحَت-এর প্রতি দালালত করে, তাহলে তার মর্ম হলো আসাফ এবং নায়েলা তথা মূর্তি থাকাবস্থায়ও সাফা-মারওয়ার সায়ী করা জায়েজ। যেমন ধরুন, কেউ মাসআলা জিজ্ঞেস করল যে, কাপড়ে এক দিরহাম পরিমাণ নাপাকি লেগে থাকলে তা পরে নামাজ আদায় করা যাবে কিনা। তখন জবাব দেওয়া হবে– لَا جُنَاحَ عَلَيْكَ اَنْ تُصَلِّيَ فِيْهِ অর্থাৎ এমন কাপড়ে নামাজ পড়তে কোনো অসুবিধা নেই। এখানে উক্ত ইবারত দ্বারা নিছক নামাজের اباحت বা বৈধতা এবং অনুমতি বুঝা যায় না; বরং কাপড়ে সামান্য নাপাকি লেগে থাকাবস্থায় নামাজ পড়ার অনুমতি বুঝা যায়। কেননা নামাজের বিধান তো পূর্ব থেকেই রয়েছে। অনুরূপভাবে মূল সায়ী তা পূর্ব থেকেই ওয়াজিব ছিল। এখন বলা হচ্ছে এতে মূর্তি থেকে থাকলেও সায়ী করা যাবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। –[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : কান্ধলভী খ. ১, পৃ. ২৫৪]

আয়াতের মর্ম এই দাঁড়ায় যে, যে কোনো নেককাজ হোক এবং তার স্তর ও প্রকরণ যাই হোক মানুষ স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে যা কিছু সম্পাদন করবে তার বিনিময় প্রতিদান সে পেয়েই যাবে।

قَوْلُهُ شَاكِرًا : শুকর শব্দ আল্লাহর দিকে প্রযোজ্য হলে তার অর্থ হবে এরূপ যে, তিনি বান্দার সামান্য মেহনতেও অনেক বেশি বিনিময় দিয়ে থাকেন।

(اَلشُّكْرُ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى اَنْ يُعْطِيَ لِعَبْدِهٖ فَوْقَ مَا يَسْتَحِقُّهٗ بِشُكْرِ الْيَسِيْرِ وَ يُعْطِى الْكَثِيْرَ- مَعَالِم)

অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষে শোকর হলো এই যে, তিনি বান্দাকে তার প্রাপ্যের উর্ধ্বে দান করেন এবং অল্পের বিনিময়ে অনেক দিয়ে দেন অর্থাৎ বান্দার নিয়ত সম্পর্কে তো তিনি অবহিত রয়েছেন।

অনুবাদ :

١٥٩. وَنَزَلَ فِي الْيَهُودِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ النَّاسَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى كَاٰيَةِ الرَّجْمِ وَنَعْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتٰبِ التَّوْرَاةِ أُولٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ يُبْعِدُهُمْ مِنْ رَّحْمَتِهِ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُونَ الْمَلَائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ أَوْ كُلُّ شَيْءٍ بِالدُّعَاءِ عَلَيْهِمْ بِاللَّعْنَةِ.

১৫৯. ইহুদিদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন যে, আমি যেসব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথ নির্দেশ অবতীর্ণ করেছি যেমন রাজম [ব্যভিচারের শাস্তি প্রস্তর নিক্ষেপ দ্বারা হত্যা] সম্পর্কিত আয়াত ও হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রশংসা সংবলিত বিবরণাদি মানুষের জন্যে কিতাবে অর্থাৎ তাওরাতে তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যারা তা লোকদের নিকট গোপন করে আল্লাহ তাদেরকে লানত করেন অর্থাৎ তাঁর রহমত হতে তাদেরকে বিদূরিত করে দেন এবং অভিশাপকারীগণও অর্থাৎ ফেরেশতা ও মু'মিনগণ বা প্রতিটি জিনিস তাদের লানতের বদদোয়া করে অভিশাপ দেয়।

١٦٠. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا رَجَعُوا عَنْ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُوا عَمَلَهُمْ وَبَيَّنُوا مَا كَتَمُوهُ فَأُولٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ أَقْبَلُ تَوْبَتَهُمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بِالْمُؤْمِنِينَ.

১৬০. কিন্তু যারা তওবা করে তা হতে ফিরে আসে এবং নিজেদের কার্যকলাপ সংশোধন করে এবং যা গোপন করে রেখেছিল তা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে এরাই তারা যাদের প্রতি আমি ক্ষমাপরবশ হই। অর্থাৎ তাদের তওবা কবুল করি। আর আমি মু'মিনদের প্রতি অতিশয় তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।

١٦١. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ حَالٌ أُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ أَيْ هُمْ مُسْتَحِقُّوا ذٰلِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالنَّاسُ قِيلَ عَامٌّ وَقِيلَ الْمُؤْمِنُونَ.

১৬১. যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরূপে মৃত্যু মুখে পতিত হয় وَهُمْ كُفَّارٌ এটা حَال বা ভাব ও অবস্থাবাচক পদ। তাদের উপর আল্লাহর ফেরেশতা এবং মানুষ সকলেরই অভিশাপ। অর্থাৎ ইহকাল ও পরকালে তারা তারই যোগ্য হবে। কেউ কেউ বলেন اَلنَّاسِ [মানুষ] শব্দটি এ স্থলে عَام বা ব্যাপক। আর কেউ কেউ বলেন, এ শব্দটি দ্বারা এ স্থলে কেবল মু'মিনদেরকেই বুঝানো হয়েছে।

١٦٢. خٰلِدِينَ فِيهَا أَيِ اللَّعْنَةِ أَوِ النَّارِ الْمَدْلُولِ بِهَا عَلَيْهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ يُمْهَلُونَ لِتَوْبَةٍ أَوْ مَعْذِرَةٍ.

১৬২. তাতে অর্থাৎ লানতের মধ্যে বা লানত শব্দটি দ্বারা ইঙ্গিতকৃত জাহান্নামের মধ্যে তারা স্থায়ী হবে। তাদের শাস্তি পলকমাত্র সময়ের জন্যেও লঘু করা হবে না আর তওবা করার জন্যে বা ওজর পেশ করার জন্যেও তাদেরকে বিরাম দেওয়া হবে না। অবকাশ দেওয়া হবে না।

তাহকীক ও তারকীব

يَكْتُمُوْنَ : [গোপন করে] كَتَمَ (ن) كَتْمًا ـ كِتْمَانًا অর্থ- গোপন করা। اَلرَّجْمُ : পাথর দিয়ে আঘাত করা। مُسْتَحِقٌّ : ذٰلِكَ مُسْتَحِقُّوا -এর বহুবচন। অর্থ- অধিকারী, যোগ্য। اَلْمَدْلُوْلُ : ইঙ্গিতকৃত। خٰلِدِيْنَ : خُلُوْدٌ অর্থ- লেগে থাকা, জড়িয়ে থাকা অর্থাৎ সে শাস্তি ও লানত- চিরকাল তারা তাতেই পড়ে থাকবে। طَرْفَةَ عَيْنٍ : চোখের পলক। لَا يُنْظَرُوْنَ : সুযোগ দেওয়া হবে না। (اِفْعَال) اَنْظَرَ অর্থ- ঢিল দেওয়া, অবকাশ দেওয়া।

قَوْلُهُ اَيِ اللَّعْنَةِ اَوِ النَّارِ الْمَدْلُوْلِ بِهَا عَلَيْهَا : এর দ্বারা فِيْهَا -এর مَرْجِعْ -এর ক্ষেত্রে সম্ভাবনা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তারা সব সময় থাকবে লানতে বা লানত দ্বারা ইঙ্গিতকৃত দোজখে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র ও আলোচনা : পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, ইহুদিরা হক তথা সত্যকে জানত ও চিনত- যেমনিভাবে পিতা সন্তানকে চিনে। এ চেনাজানার পরও তারা হক গোপন করত। যেমন আয়াতে বলা হয়েছে- اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ এখন এ আয়াতে তাদের সে কিতমানে হক বা সত্য গোপন করার ব্যাপারে সতর্কবাণী প্রদান করা হচ্ছে এবং তা থেকে তওবাকারীদের জন্যে ক্ষমা ও রহমতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে।

يَكْتُمُوْنَ : গোপন করে এবং এ সত্য গোপনও এত দুঃসাহসিকতার সাথে যে, তা শুধু নীরবতা অবলম্বন পর্যন্তই সীমিত থাকেনি; বরং সত্যের বিপরীত সাক্ষ্যদানে সদা প্রস্তুত। كِتْمَان স্বেচ্ছাকৃত ও প্রকাশের প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে গোপন রাখাকে বলে। তাফসীরে রুহুল মা'আনীতে এর সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া হয়েছে-

تَرْكُ اِظْهَارِ الشَّيْءِ قَصْدًا مَعَ مَسَاسِ الْحَاجَةِ اِلَيْهِ (روح)

অর্থাৎ كِتْمَان হলো ইচ্ছা করে কোনো কিছু গোপন করা তা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়া সত্ত্বেও।

قَوْلُهُ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ : লানতের তাৎপর্য :

* আল্লাহর লানত অর্থ- তিনি তাদের নিজ সান্নিধ্য হতে দূরে সরিয়ে দেন এবং দয়া-মেহেরবানিতে তাদের পরিত্যক্ত রাখেন। ইমাম রাগিব (র.) বলেন-

  وَذٰلِكَ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى فِى الْاٰخِرَةِ عُقُوْبَةٌ وَفِى الدُّنْيَا اِنْقِطَاعٌ عَنْ قُبُوْلِ رَحْمَتِهٖ وَتَوْفِيْقِهٖ ـ

  অর্থাৎ "আর তা আল্লাহর পক্ষ থেকে আখিরাতে শাস্তি এবং দুনিয়ায় তাঁর রহমত ও তৌফিক [কল্যাণ উপকরণ] প্রাপ্তিতে বিচ্ছিন্নতা। -[রাগিব]
* সৃষ্ট জীবের লানত হলো, এ পাপাচারী দুর্ভাগাদের জন্যে বদদোয়া করা, তাদের জন্যে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে থাকা ও তাঁর দয়া-করুণা থেকে বঞ্চিত থাকার প্রার্থনা করা । -**[রুহুল মা'আনী ও রাগিব]**

ফকীহগণ পূর্ববর্তী আয়াত দ্বারা এ বিষয়টি আহরণ করেছেন যে, আলিমের জন্যে সত্য প্রচার [তাবলীগ] ও তাঁর জানা বিষয় অন্যদের পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া অবশ্য কর্তব্য।

قَوْلُهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ اَيِ الْمَلٰئِكَةُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ اَوْ كُلُّ شَيْءٍ : আয়াতে লানতকারীদের নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়নি। এভাবে বিষয়টি অনির্ধারিত রাখাতে ইঙ্গিত পওয়া যাচ্ছে যে, দুনিয়ার প্রতিটি বস্তু এবং প্রতিটি সৃষ্টিই তাদের উপর অভিসম্পাত করে থাকে। এমনকি জীব-জন্তু ও কীটপতঙ্গও তাদের প্রতি অভিসম্পাত করে। মুফাসসির (র.) -এর وَيَلْعَنُهُمْ পরবর্তী اللّٰعِنُوْنَ بِاللَّعْنَةِ بِالدُّعَاءِ اَلْمَلٰئِكَةُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ اَوْ كُلُّ شَيْءٍ এ ইবারত দ্বারা এমনটিই বুঝা যায়।

প্রত্যেকের লা'নত করার কারণ : আল্লাহ তা'আলা লানত করেন এজন্য যে, সত্য গোপনকারীরা প্রকারান্তরে আল্লাহর মোকাবিলা করে থাকে। কেননা আল্লাহ চান হেদায়েতের বিস্তার করতে এবং মূর্খতা দূর করতে। আর ওরা চায় গোমরাহি ও মূর্খতার প্রসার ঘটাতে।

ফেরেশতা, নবী এবং মু'মিনরা এজন্য লানত করে যে, তাদের সার্বক্ষণিক চেষ্টা হলো বান্দাদের কাছে আল্লাহর হুকুম বর্ণনা করা। আর এসব লোক তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ করতে চায়।

আর তাদের সত্য গোপনের পরিণামে যখন দুনিয়ায় দুর্ভিক্ষ, মহামারি ইত্যাকার বিপদাপদ নেমে আসে তখন পুরো প্রাণিজগৎ এমনকি জড়পদার্থের পর্যন্ত কষ্ট হয়। ফলে সকলেই তাদের উপর অভিশাপ দেয়।

–[কান্ধলভী : খ. ১, পৃ. ২৫৫, তাফসীরে উসমানী]

تَابُوْا তওবা করা কথাটির উদ্দেশ্য– ক. বিরত থাকা, খ. অনুতপ্ত হওয়া এবং গ. বর্জনের সংকল্প নিয়ে অনুনয়-বিনয় করা।

اَجْمَعِيْنَ শব্দটি দ্বারা বক্তব্যে জোর [তাকিদ] দেওয়া হয়েছে এবং এটি শুধু 'মানুষ' [اَلنَّاسُ] -এর সাথে সম্পৃক্ত নয়, বরং এর সংযোগ রয়েছে আল্লাহ, ফেরেশতা ও মানুষ এসব শব্দের সাথে। اَجْمَعِيْنَ পূর্বোল্লিখিত সকল শব্দের জন্যে 'তাকিদ', শুধু اَلنَّاسُ শব্দের জন্য নয়। –[রূহুল মা'আনী]

লানতের বিধান :

قَوْلُهُ وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ : 'কাফের অবস্থায় মারা গিয়েছে' এ কায়েদ বা সংযুক্তি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, এখানে উদ্ধৃত লানতও সে সকল কাফিরের জন্য যারা কাফির অবস্থায়ই মারা গিয়েছিল। কেননা মূল মানদণ্ড শেষ আমল ও মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত। সুতরাং যে কাফের কুফর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে বলে নিশ্চিত নয়, তার প্রতি লানত করা বৈধ নয়। আর আমাদের পক্ষে যেহেতু কারো শেষ পরিণতির [মৃত্যুর] নিশ্চিত অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার কোনো উপায় নেই, সেহেতু কোনো কাফেরের নাম নিয়ে তার প্রতি লানত করাও জায়েজ নয়। আর রাসূল ﷺ যে সমস্ত কাফেরের নাম উল্লেখ করে তার প্রতি লানত করেছেন কুফর অবস্থায় তাদের মৃত্যু সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তিনি অবহিত হয়েছিলেন।

লানতের ব্যাপারটি যখন এতই কঠিন ও নাজুক যে, কুফর অবস্থায় মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে কোনো কাফেরের প্রতিও লানত করা বৈধ নয়, তখন কোনো মুসলমান কিংবা কোনো জীবজন্তুর উপর কেমন করে লানত করা যেতে পারে? তাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতে সুনির্দিষ্টভাবে কোনো মু'মিন পাপী ব্যক্তিকে লানত করা সম্পূর্ণ নাজায়েজ। তবে কোনো ব্যক্তিকে নির্ণীত না করে অনির্দিষ্ট ও ব্যাপক শব্দে লানত করার বৈধতা রয়েছে। যথা– চোরকে অভিশাপ! সুনির্দিষ্ট পাপীকে লানত করা জায়েজ নয়, তবে অনির্ণীতরূপে পাপীদের জাতি-গোষ্ঠীকে লানত করা সকলের মতে বৈধ [ইবনুল আরাবী]। বরং সহীহ হাদীসে কোনো মু'মিনকে লানত করা তাকে হত্যা করার সমতুল্য বলা হয়েছে– لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهٖ "মু'মিনকে লানত করা তাকে হত্যা করার ন্যায়" [ইবনুল আরাবী, মুসলিম শরীফের বরাতে]। যে মুসলমানরা তার কোনো মুসলমান ভাইকে কোনো অন্যায়-বিচ্যুতিতে লিপ্ত দেখামাত্র অবলীলায় লানত দিতে শুরু করে, তাদের এ আয়াত হতে শিক্ষা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

قَوْلُهُ اَلْمَدْلُوْلِ بِهَا عَلَيْهَا : লানত দ্বারা ইঙ্গিতকৃত দোজখে। এটি একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন : فِيْهَا -এর مَرْجِع তো اَلنَّار হতে পারে না। কেননা পূর্বে তার কোনো উল্লেখ নেই। অন্যথায় اِضْمَارٌ قَبْلَ الذِّكْرِ সাব্যস্ত হবে।

উত্তর : যদিও শব্দটি প্রকাশ্যে উল্লেখ নেই, তবে অন্য শব্দের অধীনে উল্লেখ হয়েছে। কারণ اَللَّعْنَةُ শব্দটি اَلنَّارُ বোঝায়। অর্থাৎ যারা চিরতরে অভিশপ্ত হওয়ার যোগ্য তাদের জন্যে দোজখ অবধারিত। –[জামালাইন]

قَوْلُهُ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ : 'লঘু করা'র ব্যাপারটি আজাব শুরু হয়ে যাওয়ার পরের। আর সুযোগ-অবকাশের ক্ষেত্র আজাব শুরু হওয়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত। অর্থাৎ দোজখে নিপতিত হওয়ার পরে তাদের আজাবের প্রচণ্ডতা বিন্দুমাত্র শিথিল করা হবে না এবং আজাবে নিপতিত হওয়ার আগেও তারা কোনো প্রকার সুযোগ-সুবিধা ও অবকাশ পাবে না।

অনুবাদ :

١٦٣. وَنَزَلَ لَمَّا قَالُوا صِفْ لَنَا رَبَّكَ وَإِلٰهُكُمْ أَيِ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ مِنْكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَا نَظِيْرَ لَهُ فِيْ ذَاتِهِ وَلَا فِيْ صِفَاتِهِ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ -

১৬৩. তারা [আরব মুশরিকগণ] রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলেছিল, আমাদেরকে আপনার প্রভুর পরিচয় বর্ণনা করুন। তখন আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন, তোমাদের ইলাহ অর্থাৎ তোমাদের ইবাদতের উপযুক্ত সত্তা তিনিই এক ইলাহ তাঁর সত্তা ও গুণের কোনো নজির কোনো তুলনা নেই। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই তিনি অতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

١٦٤. وَطَلَبُوْا اٰيَةً عَلٰى ذٰلِكَ فَنَزَلَ إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيْهِمَا مِنَ الْعَجَائِبِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِالذَّهَابِ وَالْمَجِيْءِ وَالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ وَالْفُلْكِ السُّفُنِ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ وَلَا تَرْسُبُ مُوْقَرَةً بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ مِنَ التِّجَارَاتِ وَالْحَمْلِ وَمَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ مَطَرٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بِالنَّبَاتِ بَعْدَ مَوْتِهَا يُبْسِهَا وَبَثَّ فَرَّقَ وَنَشَرَ بِهِ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ لِأَنَّهُمْ يَنْمُوْنَ بِالْخِصْبِ الْكَائِنِ عَنْهُ وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ تَقْلِيْبِهَا جُنُوْبًا وَشِمَالًا حَارَّةً وَبَارِدَةً وَالسَّحَابِ الْغَيْمِ الْمُسَخَّرِ الْمُذَلَّلِ بِأَمْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى يَسِيْرُ إِلٰى حَيْثُ شَاءَ اللّٰهُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ بِلَا عِلَاقَةٍ لَاٰيٰتٍ دَالَّاتٍ عَلٰى وَحْدَانِيَّتِهِ تَعَالٰى لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ يَتَدَبَّرُوْنَ -

১৬৪. এতদ্বিষয়ে অর্থাৎ আল্লাহর ক্ষমতা ও গুণাবলি সম্পর্কে তারা প্রমাণ দাবি করলে তিনি নাজিল করেন– আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর এবং এতদুভয়ের অত্যাশ্চর্য বিষয়সমূহের সৃষ্টিতে, আগমন-নির্গমন, বৃদ্ধি ও হ্রাস ইত্যাদির মাধ্যমে দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে, ব্যবসায় ও পরিবহন সংক্রান্ত যা মানুষের হিত সাধন করে তা সহ সমুদ্রে বিচরণশীল জলযানসমূহে নৌকা ইত্যাদিতে যা বোঝায় ভারি হওয়া সত্ত্বেও নীচে তালিয়ে যায় না এবং আকাশ হতে আল্লাহ যে বারি বৃষ্টি বর্ষণ করেন তাতে, অনন্তর তিনি এর মাধ্যমে ধরিত্রীকে মৃত্যুর পর বিশুষ্ক হয়ে যাওয়ার পর বৃক্ষলতাদি দ্বারা পুনরুজ্জীবিত করেন এবং তাতে উহার মধ্যে যে তিনি সকল প্রকার জীবজন্তু বিস্তার করে রেখেছেন ইতস্তত ছড়িয়ে রেখেছেন তাতে, কেননা আকাশ হতে বর্ষিত বারির মাধ্যমে সৃষ্ট শ্যামল ফলনের সাহায্যেই এ সকল জীবজন্তু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; বায়ুর দিক পরিবর্তনে, উত্তর-দক্ষিণ, উষ্ম-শীতল ইত্যাদি রূপে এর ঘূর্ণনে, আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে কোনোরূপ কীলক ও বন্ধন ব্যতিরেকে বিদ্যমান অনুগত আল্লাহর নির্দেশের বাধ্য মেঘ পুঞ্জে, বারি-রাশিতে; আল্লাহ তা'আলা যেদিকে ইচ্ছা করেন সেদিকেই তা ভেসে যায়, জ্ঞানবান জাতির জন্যে অর্থাৎ চিন্তাশীল জাতির জন্যে আল্লাহ তা'আলার একত্বের নিদর্শন প্রমাণ রয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

صِفْ : [বর্ণনা কর, গুণকীর্তন কর] وَصْفًا (ض) وَصَفَ থেকে أَمْر-এর সীগাহ। أَيْ أُذْكُرْ أَوْصَافَ رَبِّكَ - نَظِيْرٌ : বহুবচন نُظَرَاءُ অর্থ– তুলনা। ذَاتٌ : বহুবচন ذَوَاتٌ অর্থ– সত্তা। صِفَاتٌ : صِفَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ– গুণ।
اَلْعَجَائِبُ : عَجِيْبٌ-এর বহুবচন। অর্থ– আশ্চর্যকর বিষয়।
اِخْتِلَافٌ : ভিন্নতা, পরিবর্তন। اَلذَّهَابُ : যাওয়া– ذَهَابًا (ف) ذَهَبَ - اَلْمَجِيْءُ : আসা। (ض) جَاءَ يَجِيْءُ -
اَلْفُلْكُ : এটি একবচন এবং বহুবচন উভয়টি হতে পারে। একবচন হলো قُفْلٌ-এর ওযনে, আর বহুবচন হলো أُسْدٌ-এর ওযনে। অর্থ– জাহাজ। لَا تَرْسُبُ : (ن، لا) رَسَبَ ডুবে যাওয়া।
مُوَقَّرَةٌ : এটি بَاب تَفْعِيْل থেকে اِسْم مَفْعُوْل-এর সীগাহ। وَقَّرَ - تَوْقِيْرٌ অর্থ– বোঝাই করা, ভারী করা। يُبْسٌ : শুষ্ক।
بَثَّ : বিস্তার করেছে। فَرَّقَ : ছড়িয়ে দিয়েছে। دَابَّةٌ : অভিধানে دَابَّةٌ বলা হয়– كُلُّ مَا يَدُبُّ عَلَى الْاَرْضِ যা জমিনে বিচরণ করে। يَنْمُوْنَ : বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, বড় হয়। نُمُوًّا (ن) نَمَى অর্থ– বৃদ্ধি হওয়া।
اَلْخِصْبُ : (بِكَسْرِ الْخَاءِ وَسُكُوْنِ الصَّادِ) সবুজ ঘাসের আধিক্য, উর্বরতা। تَقْلِيْبٌ : পরিবর্তন।
اَلْغَيْمُ : মেঘ। عِلَاقَةٌ : সম্পর্ক।

قَوْلُهُ إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ الخ -এর **তারকীব :** إِنَّ হরফুল মুসাব্বাহ বিল'ফেল فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الخ এটি كَائِنَةٌ-এর সাথে مُتَعَلِّق হয়ে إِنَّ-এর خَبَر مُقَدَّم আর لَاٰيٰتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ তার اِسْم مُؤَخَّر
قَوْلُهُ مِنَ التِّجَارَةِ : এখানে ইঙ্গিত রয়েছে যে, بِمَا يَنْفَعُ-এর মাঝে مَا শব্দটি مَوْصُوْلَة হিসেবে ব্যবহৃত। কেউ কেউ مَا শব্দটিকে مَصْدَرِيَّة হিসেবেও ধরে তার ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন– أَيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِنَفْعِ النَّاسِ –[জামালাইন]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযূল : মুফাসসির (র.) وَنَزَلَ لَمَّا قَالُوْا বলে আয়াতের শানে নুযূলের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যার বিস্তারিত বিবরণ হলো, একবার কুরাইশের কাফেররা রাসূল ﷺ-কে বলেছিল– يَا مُحَمَّدُ صِفْ لَنَا رَبَّكَ وَانْسُبْهُ
অর্থাৎ 'হে মুহাম্মদ! তোমরা রবের গুণাবলি ও বংশধারা বর্ণনা কর।' তখন এ আয়াত এবং সূরা ইখলাস নাজিল হয়।

যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে রিসালাত প্রমাণিত করা হয়েছে। এ আয়াতে তাওহীদ প্রমাণিত করা হচ্ছে।

قَوْلُهُ وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ : শুরুর وَاو টি عَاطِفَة তার عَطْف হয়েছে إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ الخ-এর সাথে। আর وَاِلٰهُكُمْ-এর মাঝে সম্বোধন ব্যাপকভাবে করা হয়েছে। শানে নুযূলের সাথে সীমাবদ্ধ নয়।

قَوْلُهُ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ : অর্থাৎ এখানে اِلٰهٌ শব্দটি كُمْ-এর দিকে اِضَافَتْ হওয়াটা وُقُوْع বা সে সময়ের অবস্থা হিসেবে নয় বরং اِسْتِحْقَاق বা অধিকারী ও যোগ্য হিসেবে। অর্থাৎ ইবাদতের যোগ্য উপাস্য একজনই। যদিও ভ্রান্ত ইলাহ হাজারটা থাকুক।

قَوْلُهُ وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ **তাওহীদের মর্মার্থ :** এ আয়াতে বিভিন্নভাবেই আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ বা একত্ববাদ সপ্রমাণিত রয়েছে। যথা– **প্রথমত** তিনি একক, সমগ্র বিশ্বের না আছে তাঁর তুলনা, না আছে কোনো সমকক্ষ। সুতরাং একক উপাস্য হওয়ার অধিকারও একমাত্র তাঁরই।

দ্বিতীয়ত উপাস্য হওয়ার অধিকারেও তিনি একক। অর্থাৎ তাঁকে ছাড়া অন্য আর কেউই ইবাদতের যোগ্য নয়।

তৃতীয়ত সত্তার দিক দিয়েও তিনি একক। অর্থাৎ অংশীবিশিষ্ট নন। তিনি অংশী ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে পবিত্র। তাঁর বিভক্তি কিংবা ব্যবচ্ছেদ হতে পারে না।

চতুর্থত তিনি তাঁর আদি ও অনন্ত সত্তার দিক দিয়েও একক। তিনি তখনও বিদ্যমান ছিলেন, যখন অন্য কোনো কিছুই ছিল না এবং তখনও বিদ্যমান থাকবেন যখন কোনো কিছুই থাকবে না। অতএব, তিনিই একমাত্র সত্তা যাঁকে وَاحِد বা 'এক' বলা যেতে পারে। وَاحِد শব্দটিতে উল্লিখিত যাবতীয় দিকের একত্বই বিদ্যমান রয়েছে।

–[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, মুফতি শফী (র.)]

قَوْلُهُ وَطَلَبُوْا اٰيَةً عَلٰى الخ তাওহীদের **বাস্তব প্রমাণাদি :** মুশরিকদের পক্ষ থেকে আল্লাহ তা'আলার সিফত বা **গুণাবলির** দাবির জবাবে যখন আল্লাহ তা'আলা وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ নাজিল করেন তখন আরবের মুশরিকরা যেহেতু নিজেদের **বিশ্বাসের** পরিপন্থি ঘোষণা শুনল, তাই বিস্মিত হয়ে বলতে লাগল– সারা বিশ্বেরই কি একজন মাত্র উপাস্য হতে পারে? যদি এ দাবি যথার্থ হয়ে থাকে, তবে তার কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করা উচিত। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তারই প্রমাণ **পেশ করে** কুরআনে নাজিল করেন– اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِىْ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ

এখানে আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত একত্ব সম্পর্কে বাস্তব লক্ষণ ও প্রমাণাদি উপস্থাপিত করা হয়েছে, যা জ্ঞানী-নির্জ্ঞান নির্বিশেষে যে কেউই বুঝতে পারে। যেমন– আসমান ও জমিনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের চিরাচরিত বিবর্তন **তাঁরই** ক্ষমতার পরিপূর্ণতা এ একত্ববাদের প্রকৃত প্রমাণ।

তেমনিভাবে পানির উপর নৌকা ও জাহাজ তথা জলযানসমূহের চলাচলও একটি বিরাট প্রমাণ। পানিকে **আল্লাহ তা'আলা** এমন এক তরল পদার্থ করে সৃষ্টি করেছেন যে, তরল ও প্রবহমান হওয়া সত্ত্বেও তার পিঠের উপর লক্ষ লক্ষ মণ **ওজনবিশিষ্ট** বিশালকায় জাহাজ বিরাট ওজনের চাপ নিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলাচল করে। তদুপরি এগুলোকে গতিশীল **করে তোলার** জন্যে বাতাসের গতি ও নিতান্ত রহস্যপূর্ণভাবে সে গতির পরিবর্তন করতে থাকা প্রভৃতি বিষয়ও এদিকেই **ইঙ্গিত করে যে,** এগুলোর সৃষ্টি ও পরিচালনার পেছনে এক মহাজ্ঞানী ও মহাবিজ্ঞ সত্তা বিদ্যমান। পানীয় পদার্থগুলো তরল না **হলে যেমন** এ কাজটি সম্ভব হতো না তেমনি বাতাসের মাঝে গতি সৃষ্টি না হলেও জাহাজ চলতে পারত না, এগুলোর **পক্ষে সুদীর্ঘ পথ** অতিক্রম করারও সম্ভব হতো না। এ বিষয়টিই কুরআনে হাকীম এভাবে উল্লেখ করেছে–

اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ ـ

অর্থাৎ "আল্লাহ ইচ্ছা করলে বাতাসের গতিকে স্তব্ধ করে দিতে পারেন এবং তখন এ সমস্ত জাহাজ সাগর **পৃষ্ঠে ঠায় দাঁড়িয়ে** যাবে।"

قَوْلُهُ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ : শব্দের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সামুদ্রিক জাহাজের মাধ্যমে এক দেশের **মালামাল অন্য দেশে** আমদানি-রপ্তানি করার মাঝেও মানুষের এত বিপুল কল্যাণ নিহিত রয়েছে যা গণনাও করা যায় না। আর এ **উপকারিতার** ভিত্তিতেই যুগে যুগে দেশে দেশে নতুন নতুন বাণিজ্যপন্থা উদ্ভাবিত হয়েছে।

এমনিভাবে আকাশ থেকে এভাবে পানিকে বিন্দু বিন্দু করে বর্ষণ করা, যাতে কোনো কিছুর ক্ষতিসাধিত না **হয়**। যদি এ পানি প্লাবনের আকারে আসত, তাহলে কোনো মানুষ, জীব-জন্তু কিংবা অন্যান্য জিনিসপত্র কিছুই থাকত **না। অতঃপর পানি** বর্ষণের পর ভূপৃষ্ঠে তাকে সংরক্ষণ করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত ব্যাপার ছিল না। যদি তাদেরকে বলা হতো, **তোমাদের সবাই** নিজ নিজ প্রয়োজন মতো ছয় মাসের প্রয়োজনীয় পানি সংরক্ষণ করে রাখ, তাহলে তারা পৃথক পৃথকভাবে কি সে ব্যবস্থা করতে পারত? আর কোনোক্রমে রেখে দিলেও সেগুলোকে পচন কিংবা বিনষ্ট হওয়ার হাত থেকে কেমন **করে রক্ষা করত?** কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজেই সে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে– فَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ، وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍۢ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ অর্থাৎ "আমি পানিকে ভূমিতে ধারণ করিয়েছি, যদিও বৃষ্টির পানি পড়ার পর তাকে প্রবাহিত **করেই নিঃশেষ করে** দেওয়ার ক্ষমতা আমার ছিল।"

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা পানিকে বিশ্ববাসী মানুষ ও জীবজন্তুর জন্যে কোথাও উন্মুক্ত খাদ-খন্দে সংরক্ষিত **করেছেন, আবার** কোথাও ভূমিতে বিস্তৃত বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে ভূমির অভ্যন্তরে সংরক্ষণ করেছেন। তারপর এমন এক **ফল্গুধারা সমগ্র জমিনে** বিছিয়ে দিয়েছেন, যাতে মানুষ যে কোনোস্থানে খনন করে পানি বের করে নিতে পারে । আবার এ **পানিরই একটা অংশকে** জমাট-বাঁধা সাগর বানিয়ে তুষার আকারে পাহাড়ের চূড়ায় চাপিয়ে দিয়েছেন যা পতিত কিংবা নষ্ট **হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে** একান্ত সংরক্ষিত, অথচ ধীরে ধীরে গলে প্রাকৃতিক ঝরনাধারার মাধ্যমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। **সারকথা, উল্লিখিত** আয়াতে আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ ক্ষমতার কয়েকটি বিকাশস্থলের বর্ণনার মাধ্যমে তাওহীদ বা **একত্ববাদই প্রমাণ করা** হয়েছে। –[মা'আরিফ]

قَوْلُهُ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ : আকাশ হোক কিংবা পৃথিবী– সব মাখলুক সৃষ্টিই হবে; অসৃষ্ট বা স্বগত স্বয়ং সত্তাবান এদের কোনোটিই নয়। মুশরিক পৌত্তলিকরা এগুলোকে পূজ্য সাব্যস্ত করেছে এবং ক্ষমতাধর ও প্রয়োজন নির্বাহী দেবদেবীর মর্যাদা দিয়ে এগুলোর পূজা-অর্চনা করেছে। পবিত্র কুরআন 'সৃষ্টি' শব্দ দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করেছে যে, এসব অস্তিত্ববান বিষয় যতই বিরাট-বিশালকায় হোক না কেন, এগুলোও সৃষ্টি জগতের অণুপরমাণুবৎ সৃষ্টি মাত্র 'আকাশ দেবতা' 'ধরিত্রী মাতা' ইত্যাদি শ্রেণির শব্দ শুধু অর্থহীন ধ্বনি মাত্র। –[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ اَلَّيْلِ وَالنَّهَارِ : পৃথিবীতে এমন অংশীবাদীদের অস্তিত্বও ছিল, যারা দিন ও রাতকে প্রাণধারী, ইচ্ছাশক্তি ও ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী বিশ্বাস করে এগুলোকেও দেবদেবীর আসনে অধিষ্ঠিত করেছে এবং এসবের পূজা করেছে। এখানে এগুলোর পরিবর্তন ও হ্রাসবৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের অসৃষ্ট বা স্বগত সৃষ্ট হওয়া তো দূরের কথা, সময় ও কালের এ নিষ্প্রাণ ও চেতনাহীন খণ্ডগুলো তো নিজেদের আন্দোলন-সঞ্চালনের ক্ষমতাও রাখে না, সার্বিক ও একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী সত্তাই রাতদিনকে আবর্তিত করেন

قَوْلُهُ وَالْفُلْكِ الَّتِىْ تَجْرِىْ : فُلْك এ শব্দটির مُذَكَّر ও مُؤَنَّث এবং مُفْرَد ও جَمْع একই রূপে ব্যবহৃত হয়। একবচনে مُذَكَّر এবং বহুবচনে مُؤَنَّث হিসেবে ধর্তব্য। কেননা আয়াতে الَّتِىْ تَجْرِىْ তার সিফত হয়েছে, যা مُؤَنَّث,

হযরত মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী (র.) বলেন, উপমহাদেশে প্রথম প্রথম রেলগাড়ি চলতে শুরু করলে গ্রামাঞ্চলে এটিরও পূজা শুরু হয়ে গেল এবং অনেক 'সরল বিশ্বাসী' মুশরিক তাদের দেবতাদের তালিকায় 'ইঞ্জিন দেবতা' নামে নতুন এক দেবতার নাম সংযোজিত করল। সুতরাং কল্পনা পূজারীরা যে কোনো এক সময় পালের জাহাজ বা বাষ্পীয় জাহাজেরও পূজা করে থাকবে, তাদের আর বিস্ময়ের কি আছে? فُلْك -এর ব্যাপকতা স্টিমার, লঞ্চ, সীট্রাক ইত্যাদি ছোট বড় সব জাহাজ এবং সাবমেরিন ও ডেস্ট্রয়ার ধরনের সামরিক জাহাজ, মোটকথা সব ধরনের নৌযানকে অন্তর্ভুক্ত করে। বর্তমানে বিদ্যমান, ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত আবিষ্কার সম্ভাব্য সামরিক যান হোক কিংবা বাণিজ্যিক পোত বা বিনোদ-তরি সবই এর অন্তর্ভুক্ত। –[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ مَا يَنْفَعُ النَّاسَ : এ গুণটি সব কিছুতে সম্মিলিত ও পরিব্যাপ্ত মানুষের জন্যে উপকারী এর ব্যাপ্তির প্রসারতা লক্ষণীয়। মানুষের জন্য উপকারী ও কল্যাণকর হওয়ার সম্ভবনাময় সব কিছু এতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্য, অন্য সব উপায়-উপকরণ যা তাদের ধনসম্পদের কার্যকারিতা বর্তায় এ ধরনের উপকারী সব কিছুই ..। –[কুরতুবী]

কুরআন সর্বব্যাপী হওয়ার প্রমাণ : আল্লামা কুরতুবী (র.) আরো লিখেছেন, এক সমালোচক প্রশ্ন করে বসল, কুরআনের সর্বব্যাপী হওয়ার দাবি করা হয়ে থাকে, তবে তাতে লবণ, মরিচ ইত্যাদি স্বাদব্যঞ্জক মসলার কথা কোথায় রয়েছে? এর জবাব হলো এই যে, যা মানুষের জন্যে উপকারী, এর ব্যাপ্তি এ ধরনের সব কিছুকে শামিল করে।

قَوْلُهُ دَابَّةٍ : ব্যাপকভাবে সব ধরনের জীবজন্তুকে বুঝায়। ইতিহাসের সকল যুগেই জীবজন্তুর পূজা অংশীবাদের গুরুত্বপূর্ণ অংশরূপে চলমান রয়েছে। ব্যবিলন, মিসর, ভারত ও অন্যান্য পৌত্তলিক দেশে গরু [গো-মাতা], বানর, হনুমান, বিড়াল, সাপ ও কচ্ছপ ইত্যাদির পূজা সর্বকালেই হয়েছে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : لَّا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ -এর মাঝে মহান আল্লাহর সত্তার একত্ব আর اَلرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ -এর মাঝে তাঁর গুণাবলির একত্ব এবং خَلْقِ السَّمٰوٰتِ -এর মাঝে তাঁর কর্মগত একত্ব প্রমাণিত হলো। ফলে মুশরিকদের সন্দেহাবলির সম্পূর্ণ নিরসন হয়ে গেছে। –[তাফসীরে উসমানী]

١٦٥. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَىْ غَيْرِهٖ اَنْدَادًا اَصْنَامًا يُحِبُّوْنَهُمْ بِالتَّعْظِيْمِ وَالْخُضُوْعِ كَحُبِّ اللّٰهِ اَىْ كَحُبِّهِمْ لَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ مِنْ حُبِّهِمْ لِلْاَنْدَادِ لِاَنَّهُمْ لَا يَعْدِلُوْنَ عَنْهُ بِحَالٍ مَّا وَالْكُفَّارُ يَعْدِلُوْنَ فِى الشِّدَّةِ اِلَى اللّٰهِ وَلَوْ تَرَى تُبْصِرُ يَا مُحَمَّدُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِاتِّخَاذِ الْاَنْدَادِ اِذْ يَرَوْنَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُوْلِ يُبْصِرُوْنَ الْعَذَابَ لَرَأَيْتَ اَمْرًا عَظِيْمًا وَاِذْ بِمَعْنٰى اِذَا اَنَّ اَىْ لِاَنَّ الْقُوَّةَ الْقُدْرَةَ وَالْغَلَبَةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا حَالٌ وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ يَرٰى بِالتَّحْتَانِيَّةِ وَالْفَاعِلُ فِيْهِ قِيْلَ ضَمِيْرُ السَّامِعِ وَقِيْلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَهِىَ بِمَعْنٰى يَعْلَمُ وَاَنَّ وَمَا بَعْدَهَا سُدَّتْ مَسَدَّ الْمَفْعُوْلَيْنِ وَجَوَابُ لَوْ مَحْذُوْفٌ وَالْمَعْنٰى لَوْ عَلِمُوْا فِى الدُّنْيَا شِدَّةَ عَذَابِ اللّٰهِ وَاَنَّ الْقُدْرَةَ لِلّٰهِ وَحْدَهٗ وَقْتَ مُعَايَنَتِهِمْ لَهٗ وَهُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَمَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَنْدَادًا .

অনুবাদ :

১৬৫ লোকদের মধ্যে কেউ কেউ এমন যারা আল্লাহ ছাড়া অপরকে শরিকরূপে প্রতিমারূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে ভালোবাসার ন্যায় অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি তাদের ভালোবাসার মতো তাদেরকেও তারা সম্মান ও বিনয় প্রদর্শনের মাধ্যমে ভালোবাসে; কিন্তু যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি তাদের ভালোবাসা প্রতিমাসমূহের প্রতি তাদের ভালোবাসার তুলনায় অধিক দৃঢ়। কেননা মু'মিনগণ কোনো অবস্থাতেই আল্লাহ ছাড়া আর কোনো কিছুর দিকে মুখ ফিরায় না, পক্ষান্তরে মুশরিকগণ বিপদে পড়লে আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। প্রতিমাসমূহকে আল্লাহর সমকক্ষ বলে গ্রহণ করে যারা সীমালঙ্ঘন করেছে হে মুহাম্মদ! আপনি যদি তাদেরকে সেই সময় দেখতেন, তাদের অবস্থা অবলোকন করতেন যে সময় তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, اِذْ يَرَوْنَ -এর اِذْ শব্দটি এ স্থলে اِذَا অর্থাৎ ظَرْفِيَّة বা কালাধিকরণ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। আর يَرَوْنَ ক্রিয়াটি بِنَاء لِلْفَاعِل অর্থাৎ কর্তৃবাচ্য এবং لِلْمَفْعُوْل অর্থাৎ কর্মবাচ্য, উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। তা অবলোকন করবে তবে সাংঘাতিক এক বিষয় প্রত্যক্ষ করতেন। যে, اَنَّ الْقُوَّةَ শব্দটি এ স্থানে হেতুবোধক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এদিকে ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্যে মাননীয় তাফসীরকার এর তাফসীরে لِاَنَّ [কেননা যে,] উল্লেখ করেছেন। কেননা যে, নিশ্চয় সকল শক্তি ক্ষমতা ও বিজয় আল্লাহরই, جَمِيْعًا শব্দটি এ স্থলে حَال বা ভাব ও অবস্থাবাচক পদ। আর আল্লাহ শাস্তিদানে অতি কঠোর।

تَرٰى ক্রিয়াপদটি অপর এক পাঠে يَرٰى অর্থাৎ নামপুরুষ ও একবচনরূপে ব্যবহৃত রয়েছে। এমতাবস্থায় কেউ কেউ বলেন, এর কর্তা হলো এতে বিদ্যমান هُوَ সর্বনাম; যার মর্ম হলো– প্রত্যেক শ্রোতা বা পাঠক।

আর কেউ কেউ বলেন এর কর্তা হলো اَلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ; তখন এ ক্রিয়াটি يَعْلَمُ [জানত] অর্থে ব্যবহৃত বলে গণ্য হবে এবং اَنَّ ও তৎপরবর্তী শব্দাবলি এর দুটি مَفْعُوْل বা কর্মপদের স্থলাভিষিক্ত বলে ধরা হবে। আর শর্তবাচক শব্দ لَوْ -এর জওয়াব এ স্থানে উহ্য বলে গণ্য হবে।

সম্পূর্ণ বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে– তারা যদি দুনিয়ায় এ কথা জানত যে, আল্লাহর আজাব অতি কঠোর এবং সকল ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই যেমন এটা প্রত্যক্ষ করার সময় অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তারা বাস্তবভাবে জানতে পারবে তবে তারা আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকেই শরিক বলে গ্রহণ করত না।

তাহকীক ও তারকীব

أَنْدَادٌ : نِدٌّ-এর বহুবচন। অর্থ– সমকক্ষ। اَلْخُضُوْعُ : নত হওয়া। لَا يَعْدِلُوْنَ عَنْهُ : তার থেকে ফিরে না।

بِحَالٍ مَّا : কোনো সময়েই। اَلْغَلَبَةُ : বিজয়। مُعَايَنَةٌ : প্রত্যক্ষ করা।

سُدَّتْ مَسَدَّ الْمَفْعُوْلَيْنِ : অর্থাৎ يَرٰى হলো اَفْعَالُ قُلُوْبٍ আর اَفْعَالُ قُلُوْبٍ-এর জন্য যেহেতু দুটি মাফঊল দরকার। এজন্য মুফাসসির (রা.) বলেন, প্রথম اَنَّ তার مَعْمُوْل সহ এবং দ্বিতীয় اَنَّ তার مَعْمُوْل সহ দুই মাফউলের স্থলাভিষিক্ত।

قَوْلُهُ وَلَوْ تَرٰى : প্রশ্ন. ১. لَوْ تَرٰى এবং إِذْ মাযীর শুরুতে আসে, অথচ এখানে মুযারের শুরুতে এসেছে এর কারণ কি?

উত্তর. إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ-এর মধ্যে বাস্তব দর্শন ঘটা যেহেতু নিশ্চিত বিষয় এ কারণে মুযারের শুরুতে إذ আনা হয়েছে, যাতে মাযীর তাবিলে হয়ে নিশ্চিত বাস্তবায়ন বুঝায়।–[জামালাইন]

প্রশ্ন.২. তাহলে মুযারের স্থলে মাযীর সীগাহ আনা উচিত ছিল যাতে প্রকৃতভাবে নিশ্চিত বাস্তবায়ন বুঝায়?

উত্তর. দর্শন যেহেতু প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্যতে তথা কিয়ামতের দিন ঘটবে, এ কারণে মুযারের সীগাহ দ্বারা সেদিক ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ لِاَنَّ : এ শব্দটুকু উল্লেখ করে جَوَاب مَحْذُوْف তথা رَأَيْتَ اَمْرًا عَظِيْمًا-এর تَعْلِيْل বা কারণ বর্ণনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ حَالٌ : اَىْ حَالٌ مِنَ الضَّمِيْرِ الْمُسْتَكِنِ فِى الْجَارِ وَالْمَجْرُوْرِ الْوَاقِعِ خَبَرًا لِاَنَّ تَقْدِيْرَهُ اَنَّ الْقُوَّةَ كَائِنَةٌ لِلّٰهِ جَمِيْعًا (مِنَ الْكَرْخِى)

قَوْلُهُ فَهِىَ بِمَعْنٰى يَعْلَمُ : অর্থাৎ يَرٰى-এর ফায়েল اَلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا হলে এটি يَعْلَمُ-এর অর্থে হবে। কেননা জালেমদের জন্যে আল্লাহর আজাবের প্রচণ্ডতা দুনিয়ায় স্বচক্ষে দেখা সম্ভব নয়। কেননা আজাবের বাস্তবায়ন ঘটবে পরকালে। অতএব এখানে দেখা দ্বারা আত্মিকভাবে দেখা উদ্দেশ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে শিরকের কারণে প্রাপ্য আজাবের ভয়াবহতা ও প্রচণ্ডতার বিবরণ ছিল। এ আয়াতে সে প্রচণ্ডতার كَيْفِيَت বা ধরন বর্ণনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اَنْدَادًا : এটি نِدٌّ-এর বহুবচন। সাধারণত اَنْدَادٌ দ্বারা মূর্তি, প্রতিমা ও দেবদেবী উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যেগুলোর তারা পূজা করত। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মূর্তি। এটাই কুরআনের বহুল ব্যবহৃত অর্থ এবং হযরত কাতাদা, মুজাহিদ প্রমুখ অধিকাংশ মুফাসসিরের অভিমতরূপে উদ্ধৃত। –[রূহুল মা'আনী] অনেকে সর্দার, নেতা ও গোত্র-সম্প্রদায়ের পুরোধাদেরও উদ্দেশ্য বলেছেন। অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে যে, সে সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, যাদের তারা প্রভুতুল্য আনুগত্য করত। –[রূহুল মা'আনী] তৃতীয় একটি ব্যাপকতা সমৃদ্ধ অভিমত হলো, শব্দ তার ব্যাপ্তিতে অন্তরে প্রতিপত্তি বিস্তারকারী আল্লাহ ব্যতীত অন্য সব কিছুকে বলা হবে। ইমাম রাযী (র.) এ অভিমতটি সূফী ও আধ্যাত্মবাদীদের সাথে সম্পর্কিত করেছেন। চতুর্থ অভিমত সূফী ও আরিফগণের। তা হলো, আল্লাহ ব্যতীত যা কিছুতে তোমরা মন নিমগ্ন করলে, তাতে তুমি আল্লাহর শরিক ও সমকক্ষ সাব্যস্ত করলে। –[তাফসীরে কাবীর]

قَوْلُهُ يُحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ : অর্থাৎ তারা কেবল কথা ও শখাগত কর্মেই তাদেরকে মহান আল্লাহর শরিক সাব্যস্ত করে না; বরং হৃদয়ের ভালোবাসা, যা কিনা সমুদয় কর্মের উৎসস্থল, সেখানে পর্যন্ত শিরক ও সমকক্ষতার শিকড় পৌঁছে গেছে। আর তা শিরকের উচ্চস্তর। কর্মগত শিরক তো তার সেবক ও অধীন মাত্র। –[তাফসীরে উসমানী]

আজও খ্রিস্টান জগতের আকর্ষণ ও ভালোবাসা আল্লাহকে ছেড়ে 'ঈশ্বরের পুত্র', 'রূহুল কুদুস' [পবিত্রাত্মা] ও 'কুমারী মেরী'র **প্রতি অধিক। ওদিকে হিন্দুদের পক্ষপাতিত্ব ও প্রেম** তাদের ঈশ্বর ও পরমাত্মার চেয়ে দুর্গা দেবী, লক্ষী দেবী, অগ্নি দেবতা ইত্যাদি দেবীর সঙ্গে এবং ঋষি মুনি ও সাধুদের সঙ্গে অনেক অধিক হারে লক্ষণীয়।

كَحُبِّ اللّٰهِ বলে একটি বিষয় স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর প্রতি আকর্ষণ ভালোবাসা **সরাসরি নিষিদ্ধ নয়;** বরং মা-বাবা, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের প্রতি ভালোবাসাকে স্বভাবজাত **স্তরে রেখে দেওয়া হয়েছে।** তদ্রূপ শরিয়তের ইমামগণ, তরীকতের পীর-মুরশিদগণ [এবং শায়খ উস্তাদগণ] -এর প্রতি ভালোবাসাও মোস্তাহাব বরং একটি বিশেষ স্তর পর্যন্ত ওয়াজিব। কিন্তু প্রিয়জন ও প্রেমাস্পদকে স্রষ্টার স্তরে উন্নীত করা পর্যায়ের ভালোবাসা হারাম। 'ইয়া আলী', 'ইয়া হুসাইন', 'ইয়া খাজা', 'ইয়া গাওছ', 'ইয়া ওয়ারিছ' ইত্যাদি শ্লোগানের ভক্তির অর্ঘ্য প্রকাশকারীরা একটু নিজেদের মনের গভীরে তলিয়ে দেখবেন- ভালোবাসার কতটুকু আল্লাহর জন্যে অবশিষ্ট রেখেছেন, আর কতখানি গাইরুল্লাহর জন্য নিবেদিত করে ছেড়েছেন।

قَوْلُهُ اَىْ كَحُبِّهِمْ لَهُ : এর দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে-

১. **يُحِبُّوْنَ الْاَصْنَامَ كَمَا يُحِبُّوْنَ اللّٰهَ يَعْنِىْ يَسَوُّوْنَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ فِىْ مَحَبَّتِهِمْ لِاَنَّهُمْ يُقِرُّوْنَ بِاللّٰهِ** অর্থাৎ তারা মূর্তিকে ভালোবাসে যেমনিভাবে আল্লাহকে ভালোবাসে।

২. **يُحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اللّٰهَ** অর্থাৎ মু'মিনরা আল্লাহকে যেভাবে **ভালোবাসে** তারা মূর্তিকে সেভাবে ভালোবাসে। -[হাশিয়ায়ে জালালাইন]

قَوْلُهُ اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ : দেবদেবীর প্রতি মুশরিকদের যে ভালোবাসা- **মহান আল্লাহর** প্রতি মু'মিনগণের ভালোবাসা তার চেয়ে অনেক বেশি ও সুদৃঢ়। কেননা পার্থিব বিপদ-আপদে মুশরিকদের সে **ভালোবাসা** অনেক সময়ই দূরীভূত হয়ে যায়, আর আখেরাতের আজাব দেখে তো তারা নিজেদেরকে দেবদেবীর **ভালোবাসা হতে সম্পূর্ণরূপে** মুক্ত এবং তাদের প্রতি নিজেদের ঘৃণাই প্রকাশ করবে, যেমন পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে **মু'মিনগণের অন্তরে** মহান আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা সুখে-দুঃখে, সুস্থকালে-অসুস্থাবস্থায়, দুনিয়ায়-আখেরাতে সর্বদা অটুট **ও একই রকম** বিরাজমান। এমনকি মহান আল্লাহর প্রতি মু'মিনগণের যে ভালোবাসা তা নবী, ওলী, ফেরেশতা, **বুযুর্গানে দীন, আলিম**-ওলামা, বাপ-দাদা, সন্তানসন্ততি, ধনসম্পদ তথা মহান আল্লাহ ভিন্ন আর যা কিছুকে তারা ভালোবাসে তারও **অধিক। কারণ** মহান আল্লাহর শান ও মর্যাদা অনুযায়ী তাঁর প্রতি তাদের ভালোবাসা মৌলিক ও প্রত্যক্ষ, কিন্তু **অন্যদের প্রতি তাদের ভালবাসা পরোক্ষ।** মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তারা সব কিছুকে নির্দিষ্ট পরিমাপে ভালোবাসে। সে **ভালোবাসায়** তারতম্য না করলে ধর্মদ্রোহিতারই পরিচায়ক হবে। আল্লাহ তা'আলা ও গায়রুল্লাহর ভালোবাসাকে **বরাবর সাব্যস্ত করা,** তা সে গায়রুল্লাহ যেই হোক না কেন এটা মুশরিকদেরই কাজ। -[তাফসীরে উসমানী]

অনুবাদ :

١٦٦. إِذْ بَدَلٌ مِنْ إِذْ قَبْلَهُ تَبَرَّأَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا أَيِ الرُّؤَسَاءُ مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا أَيْ أَنْكَرُوْا إِضْلَالَهُمْ وَقَدْ رَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ عَطْفٌ عَلٰى تَبَرَّأَ بِهِمْ عَنْهُمْ الْاَسْبَابُ الْوُصَلُ الَّتِيْ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْاَرْحَامِ وَالْمَوَدَّةِ ـ

১৬৬. যখন অনুসৃতগণ تَبَرَّأَ إِذْ-এর إِذْ শব্দটি এস্থলে পূর্ববর্তী إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ-এর إِذْ হতে بَدَل বা স্থলাভিষিক্ত পদ। অর্থাৎ নেতাগণ অনুসারীগণের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করবে অর্থাৎ তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার অভিযোগ তারা অস্বীকার করবে আর অনুসারীরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে এবং সকল সম্পর্ক অর্থাৎ আত্মীয়তা ও ভালোবাসার যে সম্পর্ক দুনিয়ায় তাদের পরস্পরে ছিল তা ছিন্ন হয়ে পড়বে। وَرَأَوُا الْعَذَابَ বাক্যটি حَالِيَة বা ভাব ও অবস্থাবাচক পদ এদিকে ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্যে মাননীয় তাফসীরকার এর পূর্বে قَدْ শব্দটি ব্যবহার করেছে। وَتَقَطَّعَتْ এটার تَبَرَّأَهُمْ-এর সাথে عَطْف বা অন্বয় সংঘটিত হয়েছে। بِهِمْ-এর ب শব্দটি عَنْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সেদিকে ইঙ্গিত করে بِهِمْ-এর তাফসীর عَنْهُمْ করা হয়েছে।

١٦٧. وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً رَجْعَةً إِلَى الدُّنْيَا فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ أَيِ الْمَتْبُوْعِيْنَ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا الْيَوْمَ وَلَوْ لِلتَّمَنِّيْ وَفَنَتَبَرَّأَ جَوَابُهُ كَذٰلِكَ كَمَا أَرَاهُمْ شِدَّةَ عَذَابِهِ وَتَبَرِّيْ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ أَعْمَالَهُمْ السَّيِّئَةَ حَسَرٰتٍ حَالٌ نَدَامَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ بَعْدَ دُخُوْلِهَا ـ

১৬৭. এবং যারা অনুসরণ করেছিল তারা বলবে– হায়! যদি একবার আমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটত অর্থাৎ দুনিয়ায় পুনরাবর্তন হতো তবে আমরাও তাদের অর্থাৎ অনুসৃতদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম যেমন তারা আজ আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল। لَوْ أَنَّ لَنَا-এর لَوْ শব্দটি تَمَنِّي বা আশা প্রকাশ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, فَنَتَبَرَّأَ বাক্যটি হলো তার জবাব। এভাবে অর্থাৎ তাঁর [আল্লাহর] শাস্তির কঠোরতা এবং তাদের পরস্পরের সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা প্রদর্শনের মতো আল্লাহ তাদের মন্দ কার্যাবলি তাদের পরিতাপরূপে মনস্তাপরূপে প্রতিভাত করবেন আর তারা কখনো জাহান্নামাগ্নি হতে তাতে প্রবেশ করার পর বের হতে পারবে না। حَسَرَاتٍ এটা এ স্থানে حَال বা ভাব ও অবস্থাবাচক পদ; অর্থ মনস্তাপরূপে।

তাহকীক ও তারকীব

إِذْ تَبَرَّأَ : [সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করবে] بَاب تَفَعُّل থেকে مَاضِي وَاحِد مُذَكَّر غَائِب-এর সীগাহ। اَلتَّبَرُّءُ পৃথক হয়ে যাওয়া।

اُتُّبِعُوْا : [অনুসৃত ব্যক্তিগণ] تَبِعَ (س) تَبَعًا অনুসরণ করা। এ থেকে مَاضِي مَجْهُوْل-এর সীগাহ।

إِذْ تَقَطَّعَتْ : [ছিন্ন হয়ে পড়বে] بَاب تَفَعُّل-এর اَلتَّقَطُّعُ [কর্তন করা] মাসদার থেকে مَاضِي مَعْرُوْف مُؤَنَّث-এর সীগাহ।

اَلْاَسْبَابُ : اَلسَّبَبُ-এর বহুবচন। অর্থ– রশি।

اَلسَّبَبُ فِي الْاَصْلِ الْحَبْلُ الَّذِيْ يُرْتَقٰى بِهِ لِلشَّجَرَةِ ثُمَّ أُطْلِقَ عَلٰى كُلِّ مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلٰى شَيْءٍ.

اَلْوُصَلُ : وُصْلَةٌ . وُصَلٌ-এর বহুবচন। অর্থ– সংযোগ সম্পর্ক। اَلْاَرْحَامُ : رَحِم-এর বহুবচন। অর্থ– গর্ভের সম্পর্ক।

اَلْمَوَدَّةُ : বন্ধুত্ব, হৃদ্যতা। كَرَّةً : একবার। كَرَّةً أُخْرٰى আরেকবার। رَجْعَةً : পূর্বের অবস্থায় প্রত্যাবর্তন। فَنَتَبَرَّأَ : তাহলে

আমরাও সম্পর্ক ছিন্ন করতাম। حَسَرَاتٍ : حَسْرَةٌ -এর ব-ব। হারানো বস্তুর প্রতি বেশি পরিমাণ আফসোসকে **حَسْرَة বলা** হয়। نَدَامَاتٍ : আফসোস।

قَوْلُهُ وَقْتَ مُعَايَنَتِهِمْ لَهُ : এটি إِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ -এর যরফ।

قَوْلُهُ وَقَدْ رَاَوُا الْعَذَابَ : এখানে قَدْ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, وَاو টি حَالِيَه এবং الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا ও **الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا** উভয়ের যমীর থেকে قَدْ رَاَوُا الْعَذَابَ হাল হয়েছে এবং رَائِيْنَ যেমন- لَقِيْتُ زَيْدًا رَاكِبَيْنِ আর যেহেতু **قَدْ বিহীন মাযী** হাল হতে পারে না চাই প্রকাশ্য হোক বা গোপনভাবে। এ কারণে قَدْ টা উহ্য ধরা হয়েছে।

قَوْلُهُ لَوْ لِلتَّمَنِّيْ : لَوْ আকাঙ্ক্ষার জন্যে আর فَنَتَبَرَّأَ হলো এর জবাব। এখানে দুটি প্রশ্ন সৃষ্টি হয়-

প্রশ্ন : ১. لَوْ -এর জাযা لَامْ যোগে হয়, فَاء যোগে নয়। অথচ এখানে فَاء যোগে হয়েছে?

প্রশ্ন. ২. فَنَتَبَرَّأَ মানসূব হওয়ার কারণ কি? অথচ এখানে কোনো عَامِلِ نَصِبْ নেই।

উত্তর. মুসান্নিফ (র.) لَوْ لِلتَّمَنِّيْ বলে উভয় প্রশ্নর উত্তর দিয়েছেন এভাবে যে, উভয় বিষয় لَوْ شَرْطِيَّة **-এর জন্যে জরুরি** আর এটা لَوْ تَمَنِّيْ -এর পরে أَنْ উহ্য হওয়ার কারণে جَوَاب تَمَنِّيْ মানসূব হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচনা : এখানে কিয়ামতের একটি বিশেষ দৃশ্যের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। কিয়ামতে যখন মুশরিক **নেতারা, তাদের** বিদ্বানবর্গ, শাসকবর্গ ও বিশিষ্টরা অনুগামী, শাসিত ও সাধারণ লোকদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দিয়ে **তাদের অসহায়** নিরুপায় অবস্থায় ফেলে রাখবে এখানে সে সময়টির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

قَوْلُهُ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَاَوُا الْعَذَابَ : অর্থাৎ যে জালিমরা মহান আল্লাহর জন্যে **শরিক স্থির করে** তারা যদি সেই অবশ্যম্ভাবী সময় দেখে নিত, যখন তারা মহান আল্লাহর শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে যে, সমস্ত **শক্তি মহান** আল্লাহরই এবং মহান আল্লাহর শাস্তি হতে কেউ বাঁচতে পারবে না, তাঁর শাস্তি বড়ই কঠোর তাহলে তারা **মহান আল্লাহর** ইবাদত ছেড়ে অন্যের প্রতি কিছুতেই মনোনিবেশ করত না এবং অন্যের থেকে কোনো উপকার লাভের প্র**ত্যাশা করত না।** -[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ : বাতিলপন্থিদের পারস্পরিক সম্পর্কের যত দিক ও সূত্র রয়েছে- উস্তাদী-**শাগরিদী হোক,** নেতা-অনুগামী হোক, বংশ ও রক্ত বন্ধনের হোক, স্বদেশী-স্বজাতীয়তার হোক কিংবা বন্ধুত্বের হোক- **এ সবই এ পৃথিবী** পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। বাস্তবতা প্রত্যক্ষ ও চাক্ষুষ হয়ে দেখা দেওয়ার জগৎ কিয়ামতে সকলেই পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন **বরং পরস্পর** বিরোধী মনে হবে। এ বিষয়টি পবিত্র কুরআনের ভাষ্যেও স্পষ্ট রয়েছে- **اَلْاَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ** [সেদিন মুত্তাকীগণ ব্যতীত আর সকলে একে অন্যের শত্রু হবে।] بِهِمْ -এর ب অব্যয়টি عَنْ অর্থেও নেওয়া **হয়েছে। بِهِمْ অর্থ** **عَنْهُمْ** সম্পর্কচ্ছেদ হবে কুফরির কারণে। বা এখানে মাধ্যম ও কারণবোধক। বক্তব্যের মূলরূপ হবে- **بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ الْاَسْبَابُ الَّتِيْ كَانُوْا يَرْجُوْنَ مِنْهَا النَّجَاةَ** "তাদের কুফরির কারণে সেসব সূত্র ছিন্ন হয়ে যাবে, যা দিয়ে **তারা মুক্তির স্বপ্ন** দেখছিল।" -[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ : মহান আল্লাহর আজাব ও নিজেদের উপাস্যদর **উপেক্ষাভাব দেখে** সেদিন মুশরিকদের যেমন ভীষণ আফসোস হবে, তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা তাদের সমুদয় কর্মকেও **তাদের পরিতাপের** কারণ বানিয়ে দেবেন। কেননা তাদের হজ, উমরা ও দান-খয়রাতসহ আরও যত ভালো কাজ হবে তা **সবই তো শিরকের** কারণে প্রত্যাখ্যাত হবে। আর শিরকসহ আর যত পাপচার তারা করেছে তার বদলে শাস্তি ভোগ করবে। **এভাবে তাদের** ভালোমন্দ যাবতীয় কর্মই তাদের দুঃখের কারণ হয়ে যাবে। কোনো প্রকার কর্মেই কোনো লাভ তাদের **হবে না; বরং** স্থায়ীভাবে জাহান্নামবাসী হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে তাওহীদপন্থি মু'মিনগণ যদি গুনাহের কারণে জাহান্নামে প্রবে**শ করেও, তবুও** শেষ পর্যন্ত তারা মুক্তি পেয়ে যাবে। -[তাফসীরে উসমানী]

অনুবাদ :

١٦٨. وَنَزَلَ فِيْمَنْ حَرَّمَ السَّوَائِبَ وَنَحْوَهَا يَاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا حَالٌ طَيِّبًا صِفَةٌ مُؤَكَّدَةٌ اَيْ مُسْتَلِذًّا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ طُرُقَ الشَّيْطٰنِ اَيْ تَزْيِيْنَهُ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ بَيِّنُ الْعَدَاوَةِ.

১৬৮. যারা সায়িবা ইত্যাদি প্রাণী [স্বকপোল-কল্পিতভাবে] হারাম করে রেখেছিল তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন– হে লোক সকল! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ حَلٰلًا শব্দটি حَال বা ভাব ও অবস্থাবাচক পদ। ও পবিত্র طَيِّبًا শব্দটি صِفَة مُؤَكِّدَه বা তাকিদব্যক বিশেষণ। উপভোগ্য খাদ্যবস্তু রয়েছে তা হতে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক তার পথ অর্থাৎ তৎকর্তৃক সাজানো পথের অনুরসরণ করো না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু, সুস্পষ্ট শত্রুতা পোষণকারী।

١٦٩. اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ الْاِثْمِ وَالْفَحْشَاۤءِ الْقَبِيْحِ شَرْعًا وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ مِنْ تَحْرِيْمِ مَا لَمْ يُحَرَّمْ وَغَيْرِهٖ.

১৬৯. সে তো কেবল তোমাদেরকে মন্দ পাপকার্য ও অশ্লীল অর্থাৎ শরিয়তের দৃষ্টিতে যা নিন্দনীয় সেই কাজের এবং আল্লাহ সম্বন্ধে তোমরা জান না এমন সব বিষয় বলার অর্থাৎ যা তিনি হারাম করেননি তা হারাম বলে বিধান দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ের নির্দেশ দেয়।

١٧٠. وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَيِ الْكُفَّارِ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ التَّوْحِيْدِ وَتَحْلِيْلِ الطَّيِّبَاتِ قَالُوْا لَا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَاۤءَنَا مِنْ عِبَادَةِ الْاَصْنَامِ وَتَحْرِيْمِ السَّوَائِبِ وَالْبَحَائِرِ قَالَ تَعَالٰى أَيَتَّبِعُوْنَهُمْ وَلَوْ كَانَ اٰبَاۤؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا مِنْ اَمْرِ الدِّيْنِ وَلَا يَهْتَدُوْنَ اِلَى الْحَقِّ وَالْهَمْزَةُ لِلْاِنْكَارِ.

১৭০. যখন তাদেরকে কাফিরদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন যেমন– তাওহীদ ও পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল বলে মনে করা ইত্যাদি তা তোমরা অনুসরণ কর। তারা বলে, না, বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে প্রতিমা পূজা, সায়িবা ও বাহীরা হারামকরণ ইত্যাদি যাতে পেয়েছি বিদ্যামান দেখেছি তার অনুসরণ করব। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, এমনকি তাদের পিতৃপুরুষগণ দীন ও ধর্ম বিষয়ে কিছুই বুঝত নয় এবং সৎপথে পরিচালিতও নয় তথাপিও তারা তাদের অনুসরণ করবে? اَوَلَوْ كَانَ-এর প্রশ্নবোধক هَمْزَه [হামযা] টি এ স্থানে اِنْكَار বা অসম্মতি ও অস্বীকৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

حَرَّمَ : [হারাম করেছে] মাসদার (تَفْعِيْل) اَلتَّحْرِيْمُ - اَلسَّوَائِبُ : এটি سَائِبَةٌ -এর বহুবচন। ঐ উষ্ট্রীকে سَائِبَة বলা হয়, যাকে কোনো মূর্তির নামে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং সম্মানার্থে তার থেকে কোনো ধরনের উপকার লাভ করা হয় না। طَيِّبٌ : পবিত্র। مُسْتَلِذٌّ : সুস্বাদু। خُطُوَاتٌ : এটি خُطْوَةٌ -এর বহুবচন।

وَهِيَ إِسْمٌ لِمَسَافَةٍ بَيْنَ الْقَدَمَيْنِ وَتُسْتَعْمَلُ مَجَازًا فِيْ تَتَبُّعِ الْأثَارِ .

অর্থাৎ خُطْوَة বলা হয় পায়ের দুই ধাপের মধ্যবর্তী ব্যবধানকে, পদাঙ্ক। সুতরাং خُطُوَاتُ الشَّيْطَانِ -এর অর্থ হচ্ছে- শয়তানি কাজকর্ম। طُرُقٌ : এটি طَرِيْقٌ -এর বহুবচন। অর্থ- পথ।

تَزْيِيْنَهُ : بَابِ تَفْعِيْل -এর মাসদার। অর্থ- সুসজ্জিতকরণ। بَيْنَ الْعَدَاوَةِ : শক্রতায় সুস্পষ্ট। اَلسُّوْءُ : سُوْء বলা হয় যা মানুষকে দুঃখ দেয়। এটি গুনাহের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কেননা তা ব্যক্তিকে বর্তমানে বা পরিণামে দুঃখ দেয়। اَلْقُبْحُ : খারাপ, বিশ্রী। اَلْفَيْنَا : আমরা পেয়েছি। اَلْبَحَائِرُ : بَحِيْرَةٌ -এর বহুবচন। بَحِيْرَة ঐ প্রাণীকে বলা হয়, যা গায়রুল্লাহর নামে মুক্ত করে দেওয়া হয় এবং নিদর্শন স্বরূপ তার কান ছিদ্র করে দেওয়া হয়।

قَوْلُهُ وَنَحْوُهَا : এখানে نَحْو দ্বারা بَحِيْرَة ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে। بَحِيْرَة বলা হয় ঐ প্রণীকে যা গায়রুল্লাহর নামে মুক্ত করে দেওয়া হয় এবং নিদর্শন স্বরূপ তার কান ছিদ্র করে দেওয়া হয়।

قَوْلُهُ مِمَّا فِي الْأَرْضِ : এখানে مِنْ অব্যয় আংশিকতা বোধক। কেননা পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সবই খাওয়ার যোগ্য বা আহার্য নয়। –[তাফসীরে বায়যাবী]

قَوْلُهُ حَلَالًا তারকীব : حَلَالًا শব্দটি مِمَّا فِي الْأَرْضِ থেকে حَال হয়েছে; كُلُوْا -এর مَفْعُوْل নয়। যেমনটি কেউ কেউ বলেছেন। কেননা এ সুরতে مِمَّا فِي الْأَرْضِ অংশটি حَلَالًا থেকে সিফত অথবা حَال হবে আর صِفَت তার مَوْصُوْف -এর পূর্বে হওয়া এবং حَال তার ذُوالْحَال -এর আগে خِلَاف ظَاهِر বা সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত

حَلَال শব্দটি حَلٌّ থেকে নির্গত। حَلٌّ শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো- গিঁঠ খোলা। যেসব বস্তু-সামগ্রীকে মানুষের জন্য হালাল করে দেওয়া হয়েছে তাতে যেন একটা গিঁঠই খুলে দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলোর উপর থেকে বাধ্যবাধকতা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। –[মা'আরিফ]

এখানে حَلَالًا দ্বারা বুঝানো উদ্দেশ্য- যেসব খাদ্য স্বভাবত ও নিজস্ব সত্তায় বৈধ এবং [কখনো তা] হারাম করা হয়নি।
–[তাফসীরে কাবীর]

قَوْلُهُ طَيِّبًا : যেসব হালাল খাদ্য বৈধ মাধ্যমে আহরণ-উপার্জন করা হয়েছে এবং যাতে অপরের কোনো অধিকার-দাবি নেই। যেমন- অবৈধ [فَاسِد] বেচাকেনার মাধ্যমে না হওয়া, অবৈধ মজুরি চুক্তিতে না হওয়া ইত্যাদি।

قَوْلُهُ صِفَةٌ مُؤَكِّدَةٌ : এ অংশটি একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তরে বৃদ্ধি করা হয়েছে প্রশ্নটি হলো, যখন حَلَالًا দ্বারাই শরয়ী দৃষ্টিকোণে পবিত্র বস্তু উদ্দেশ্য, [কেননা যা শরয়ীভাবে হালাল হয় তা পবিত্রই হয়ে থাকে] তখন طَيِّبًا -কে উল্লেখ করার লাভ কী?

উত্তর: উত্তরের সারকথা হলো, এখানে طَيِّبًا -এর উল্লেখ صِفَت مُؤَكِّد হিসেবে, اِحْتِرَازِيَه হিসেবে নয়।

قَوْلُهُ أَوْ مُسْتَلِذًّا : [مَفْعُوْل -এর সীগাহ হিসেবে] যে জিনিস পছন্দনীয় ও উপভোগ্য হবে। এ সুরতে طَيِّبًا صِفَت مُقَيِّدَة হবে, যা থেকে অপছন্দনীয় যথা তিক্ত ও স্বাদহীন বস্তু বের হয়ে যাবে। –[জামালাইন খ. ১, পৃ. ২৬২]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يَاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا الخ : -এর আলোচনা : অংশীবাদমুক্ত একত্ববাদের ইবরাহীমী ধর্মবালম্বীদের ব্যতীত ইহুদি-খ্রিস্টান, পৌত্তলিক সকলেই পানাহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ভ্রান্তি ও বক্রতার শিকার হয়েছিল এবং হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম সব্যস্ত করে সব গুলিয়ে দিয়েছি। এখানে সেসব ভ্রান্তির দু একটির বিরবরণ এসেছে।

আরববাসীরা মূর্তিপূজা করত তারা মূর্তির নামে ষাঁড় ছেড়ে দিত এবং তার দ্বারা কোনো প্রকার উপকার লাভকে অবৈধ মনে করত। বস্তুত এটাও একপ্রকারের শিরক। কেননা হালাল ও হারাম সব্যস্ত করার ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কারো নেই। এ ক্ষেত্রে আর কারো হুকুম মানার অর্থ তাকে মহান আল্লাহর শরিক স্থির করা। তাই পূর্বের আয়াতে শিরকের

সর্বনাশা অনিষ্টের বর্ণনা করার পর এবার হালালকে হারাম করতে নিষেধ করা হয়েছে। যার সারমর্ম হলো, তোমরা ভূমিজাত যাবতীয় বস্তু আহার কর, কেবল শরিয়তের দৃষ্টিতে তা হালাল ও পবিত্র হলেই চলবে। যা মূলেই অবৈধ কিংবা প্রাসঙ্গিক কোনো কারণে অবৈধ হয়ে গেছে তা খেয়ো না। মূলেই যা হারাম তার দৃষ্টান্ত মৃত জন্তু ও শূকর এবং مَا أُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কারো সন্তুষ্টি বিধানের জন্যে তার নামে যে পশু জবাই করা হয়। প্রাসঙ্গিক কারণে যা অবৈধ তা হলো, চুরি, ছিনতাই, সুদ, ঘুষ ইত্যাদি উপায়ে অর্জিত দ্রব্য। এসব পরিহার করে চলা অবশ্য কর্তব্য। তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কখনই এমন করে বসো না যে, যা ইচ্ছা হারাম করলে, যেমন– মূর্তির নামে ষাঁড় ইত্যাদি। কিংবা যা ইচ্ছা হালাল করে নিলে, যেমন– مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ প্রভৃতি। –[তাফসীরে উসমানী]

হালাল আহারের গুরুত্ব : পবিত্র কুরআনের বিশিষ্ট ভাষ্যকার হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, সাহাবী সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) হযরত নবী করীম ﷺ -এর সমীপে আরজ করলেন, আপনি দোয়া করুন, যেন আল্লাহ আমাকে 'মুস্তাজাবুদ দাওয়াত' [দোয়া কবুল হয় এমন] করে দেন। নবী করীম ﷺ জবাবে ইরশাদ করলেন, হালাল গ্রাসের নীতি অপরিহার্য করে নাও, তবে আপনাতেই দোয়া গৃহীত হওয়ার মর্যাদা পেয়ে যাবে [স্বতন্ত্র দোয়ার প্রয়োজন হবে না]। ইসলামে হালাল আহারের এ গুরুত্ব অনুধাবনীয়।

قَوْلُهٗ بِالسُّوْءِ وَالْفَحْشَاءِ : শব্দ দুটি প্রায় সামর্থক। তবে সম্পূর্ণ অভিন্ন অর্থবোধক নয়। سُوْء সেসব বিষয় যা যুক্তি ও বুদ্ধি-বিবেকের বিচারেও গর্হিত। فَحْشَاء হলো শরিয়তের নির্দেশিত মন্দ ও কুৎসিত বিষয়। سُوْء ও فَحْشَاء হলো জ্ঞান যাকে গর্হিত ও শরিয়ত যাকে কুৎসিত বলে সাব্যস্ত করে। শব্দ দুটিকে অব্যয়যোগে সংযুক্ত [عَطْف] করা হয়েছে গুণগত ব্যবধানের কারণে [বায়যাবী]। কেউ কেউ এরূপ পার্থক্যও নিরূপণ করেছেন যে, سُوْء -এর বিপরীতে শরিয়তে কোনো 'হদ্দ' নির্ণীত নেই। আর فَحْشَاء -এর প্রতিকারে শরিয়তের নির্ণীত শাস্তি 'হদ্দ' রয়েছে। এ ব্যাখ্যাটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর নামে সম্বন্ধিত। –[কুরতুবী, ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ থেকে বর্ণিত]

আবার অনেকে বলেন, سُوْء অর্থ– সগীরা [ক্ষুদ্র] গুনাহ এবং فَحْشَاء অর্থ– কবীরা বা বড় গুনাহ। অর্থাৎ সাধারণ গুনাহ এবং কবীরা গুনাহ। –[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهٗ اَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ : অর্থাৎ নিজেদের উদ্ভাবিত বিষয়গুলোকে আল্লাহর আইন মনে করতে থাকবে [এমন যেন না হয়]। অর্থাৎ মাসআলা-মাসাইল ও শরিয়তের বিধান নিজেদের পক্ষ হতে বানিয়ে নাও। বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় কেবল শাখাগত বিষয়ই নয়; বরং আকিদা-বিশ্বাসে পর্যন্ত শরিয়তের স্পষ্ট নির্দেশ বর্জন করে নিজেদের পক্ষ হতে হুকুম গড়ে নেওয়া হয় এবং কুরআন হাদীসের দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য ও পূর্বসূরি বুযুর্গানে দীনের মতামতের ভুল সাব্যস্ত করা হয়। –[তাফসীরে উসমানী]

قَوْل ক্রিয়ামূলক عَلٰى অব্যয় সংযোগের ব্যবহৃত হলে তার অর্থ হয়– করো নামে রটনা করা, অপবাদ দেওয়া, নিজের কথা অন্যের নামে চালিয়ে দেওয়া।

قَوْلُهٗ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ : এখানে عِلْم [জানা] দ্বারা উদ্দেশ্য নিশ্চিত জ্ঞান কিংবা ওহীর সূত্রে প্রাপ্ত অকাট্য জ্ঞান। সুতরাং এ হুমকি শুধু কুফরির ক্ষেত্রেই সীমিত নয়, বরং বিদ'আতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অতএব সকল কাফির ও সকল বিদ'আতিও এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। –[ইবনে কাছীর] আর এতে সেসব বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত হবে যা আল্লাহর নামে সম্পর্কিত করা হয়, অথচ তা তাঁর পক্ষ থেকে হওয়ার বৈধতা নেই। –[মাদারিক]।

অন্ধ অনুসরণের নিন্দা : وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَاۤ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার বিধি-নিষেধের বিপরীতে বাপ-দাদাদের অনুসরণ করে এটাও শিরক। –[তাফসীরে উসমানী]

এ আয়াতের দ্বারা বাপ-দাদা, পূর্বপুরুষের অন্ধ অনুসরণের যেমন নিন্দা প্রমাণিত হয়েছে, তেমনি বৈধ অনুসরণের জন্যে কতিপয় শর্ত এবং একটা নীতিও জানা যাচ্ছে। যেমন দুটি শব্দে বলা হয়েছে لَا يَعْقِلُوْنَ এতে প্রতীয়মান হয় যে, বাপ-দাদা পূর্বপুরুষদের আনুগত্য ও অনুসরণ এজন্য নিষিদ্ধ যে, তাদের মধ্যে না ছিল জ্ঞান-বুদ্ধি, না ছিল কোনো খোদায়ী হেদায়েত। হেদায়েত বলতে সে সমস্ত বিধিবিধানকে বোঝায় যা পরিষ্কারভাবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নাজিল করা হয়েছে। আর জ্ঞান-বুদ্ধি বলতে সে সমস্ত বিষয়কে বোঝানো হয়েছে, যা শরিয়তের প্রকৃষ্ট 'নস' বা নির্দেশ থেকে গবেষণা করে বের করা হয়।

অতএব, তাদের আনুগত্য ও অনুসরণ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণটি সাব্যস্ত হলো, তাদের কাছে না আছে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নাজিলকৃত কোনো বিধিবিধান, না আছে তাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার বাণীর পর্যালোচনা-গবেষণা করে তা থেকে বিধিবিধান বের করে নেওয়ার মতো কোনো যোগ্যতা। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, কোনো আলেমের ব্যাপারে এমন নিশ্চিত বিশ্বাস হলে যে, কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানের সাথে সাথে তার মধ্যে ইজতিহাদ [উদ্ভাবন] -এর যোগ্যতাও রয়েছে, তবে এমন মুজতাহিদ আলেমের আনুগত্য-অনুসরণ করা জায়েজ। অবশ্য এ আনুগত্য তার ব্যক্তিগত হুকুম মানার জন্য নয়, বরং আল্লাহর এবং তাঁর হুকুম-আহকাম মানার জন্যেই হতে হবে। যেহেতু আমরা সরাসরি আল্লাহ সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হতে পারি না, সেহেতু কোনো মুজাতাহিদ আলেমের অনুসরণ করি, যাতে করে আল্লাহর বিধিবিধান অনুযায়ী আমল করা যায়।

অন্ধ অনুসরণ এবং মুজতাহিদ ইমামগণের অনুসরণের মধ্যে পার্থক্য : উপরিউক্ত বর্ণনার দ্বারা বুঝা যায় যে, যারা সাধারণভাবে মুজতাহিদ ইমামদের অনুসরণের বিরুদ্ধে এ আয়াতটি উপস্থাপন করেন তারা নিজেরাই এ আয়াতের আসল প্রতিপাদ্য সম্পর্কে ওয়াকেফহাল নন।

এ আয়াতের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবী (র.) লিখেছেন, আয়াতে যে পূর্বপুরুষের আনুগত্য ও অনুসরণের কথা নিষেধ করা হয়েছে, তার প্রকৃত মর্ম হলো ভ্রান্ত এবং মিথ্যা বিশ্বাস ও কার্যকলাপের ক্ষেত্রে বাপ-দাদা ও পূর্বপুরুষের অনুকরণ। যথার্থ ও সঠিত বিশ্বাস এবং সৎকর্মে তাদের অনুসরণ করা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন সূরা ইউসুফে হযরত ইউনুস (আ.) -এর সংলাপ বর্ণনা প্রসঙ্গে এ দুটি বিষয়ের বিশ্লেষণ করা হয়েছে–

اِنِّىْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كَافِرُوْنَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَائِىْ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ .

অর্থাৎ "আমি সে জাতির ধর্মবিশ্বাসকে পরিহার করেছি, যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে না এবং যারা আখেরাতকে অস্বীকার করে। পক্ষান্তরে আমি অনুসরণ করেছি আমাদের পিতা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূব (আ.) -এর ধর্মবিশ্বাসের।"

এ আয়াতের দ্বারা প্রকৃষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, মিথ্যা ও ভ্রান্ত বিষয়ে বাপ-দাদাদের অনুসরণ করা হরাম, কিন্তু বৈধ ও সৎকর্মের বেলায় তা জয়েজ; বরং প্রশংসনীয়।

ইমাম কুরতুবী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুজতাহিদ ইমাগণের আনুগত্য ও অনুসরণ সম্পর্কিত মাসআলা-মাসায়েল এবং অন্যান্য বিধিবিধানেরও উল্লেখ করেছেন। –[মা'আরিফ]

١٧١. وَمَثَلُ صِفَةُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَنْ يَدْعُوْهُمْ إِلَى الْهُدٰى كَمَثَلِ الَّذِيْ يَنْعِقُ يَصُوْتُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً أَيْ صَوْتًا لَا يَفْهَمُ مَعْنَاهُ أَيْ هُمْ فِيْ سِمَاعِ الْمَوْعِظَةِ وَعَدَمِ تَدَبُّرِهَا كَالْبَهَائِمِ تَسْمَعُ صَوْتَ رَاعِيْهَا وَلَا تَفْهَمُهُ هُمْ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ الْمَوْعِظَةَ.	**অনুবাদ :** ১৭১. যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে আর যারা তাদেরকে সত্যের দিকে আহ্বান করে তাদের উপমা বিবরণ হলো এমন এক ব্যক্তির ন্যায় যে ব্যক্তি আহ্বান করে ডাকে এমন কিছুকে যা হাঁকডাক ভিন্ন আর কিছুই শুনে না অর্থাৎ কেবল শব্দ শুনে মাত্র কিন্তু সে তার অর্থ বুঝে না। ওয়াজ-নসিয়ত ও উপদেশ শ্রবণ করার পর তাতে চিন্তাভাবনা না করার বিষয়ে তারা পশুর ন্যায়। পশু কেবল রাখালের হাঁকডাকই শুনতে পায় কিন্তু তার অর্থ কিছুই বুঝতে পারে না। তারা বধির, মূক, অন্ধ সুতরাং তারা উপদেশের কিছুই বুঝবে না।

তাহকীক ও তারকীব

يَنْعِقُ : نَعَقَ (س) نَعَقًا অর্থ– আওয়াজ দেওয়া। রাখাল ছাগল পালকে আওয়াজ দিলে এবং ধমক দিলে বলা হয়– نَعَقَ الرَّاعِيْ بِغَنَمِهِ نَعِيْقًا - اَلْبَهَائِمُ : بَهِيْمَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ– চতুষ্পদ জন্তু। رَاعِيْ : রাখাল। صُمٌّ : বধির। بُكْمٌ : মূক। عُمْيٌ : অন্ধ। لَا يَعْقِلُوْنَ : অনুভব করে না।

قَوْلُهُ كَمَثَلِ الَّذِيْ يَنْعِقُ : **প্রশ্ন:** এখানে كَاف تَشْبِيْه টির কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা مَثَلُ শব্দের পর তার উল্লেখ অপ্রয়োজনীয় تَكْرَار বা দ্বিরুক্তি।

উত্তর: প্রথম مَثَلُ -এর অর্থ উপমা নয়; বরং তা সিফতের অর্থে। সুতরাং আর কোনো তাকরার নেই।

صُمٌّ : অর্থাৎ সত্যের আওয়াজের ব্যাপারে। সত্যের ব্যাপারে বধির, তাই তা শুনে না এবং তা দিয়ে উপকৃত হয় না।

بُكْمٌ : অর্থাৎ সত্যের স্বীকারোক্তি দানে তাদের জিহ্বা অচল, সত্য কথনে বোবা, তাই তা উচ্চারণ করে না।

عُمْيٌ : নিজের লাভ-ক্ষতির ব্যাপারে, হেদায়েত ও পথপ্রাপ্তিতে অন্ধ, তাই তা দেখতে পায় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কাফেরদেরকে হেদায়েতের দিকে ডাকার দৃষ্টান্ত : সত্যের পথে আহ্বানকারীর আহ্বানের বিষয় আলোচনা চলছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর আহূত উম্মতের আচরণের উপমা দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ ঐ কাফেরদেরকে হেদায়েতের পথে ডাকার দৃষ্টান্ত ঠিক এই রকমের যেমন কোনো ব্যক্তি বনের পশুদের ডাকে, অথচ তারা তার আওয়াজই শোনে– এর বেশি কিছু নয়। যারা নিজেরা আলেম নয়, আবার আলেমদের কথা শুনেও না, তাদেরও অবস্থা এ রকমই। –[তাফসীরে ওসমানী]

مَثَلُ বা বাক্য বিন্যাসে دَاعِيْ [আহ্বানকারী] সম্বন্ধপদ (مُضَاف) উহ্য রয়েছে। মূল বক্তব্য হবে– مَثَلُ دَاعِي الَّذِيْنَ كَفَرُوْا دَاعِيْهِمْ إِلَى الْإِيْمَانِ অর্থাৎ কাফিরদের ঈমানের প্রতি আহ্বানদাতার অবস্থা।

قَوْلُهُ وَمَنْ يَدْعُوْهُمْ إِلَى الْهُدٰى : এ ইবারতটুকু বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া।

প্রশ্ন: আয়াতে কাফেরদেরকে نَاعِق বা রাখালের সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। কেননা আয়াতের অনুবাদ হলো, এবং কাফেরদের উপমা ঐ রাখালের মতো যে চতুষ্পদ জানোয়ারকে ডাকে, অথচ বিষয়টি এমন নয়। কেননা রাখাল হলো دَاعِيْ [হেদায়েতের প্রতি আহ্বানকারী রাসূল বা মুসলমান] আর কাফেররা হলো مَدْعُو [চতুষ্পদ জানোয়ারের মতো]।

উত্তর: এখানে مَعْطُوف উহ্য রয়েছে। আর তা হলো– مَنْ يَدْعُوْهُمْ إِلَى الْهُدٰى সুতরাং এখানে কাফের এবং তাদের আহ্বানকারীকে একত্রে রাখাল এবং চতুষ্পদ জানোয়ারের সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ কাফের এবং তাদের আহ্বানকারী হলো مُشَبَّه আর চতুষ্পদ জানোয়ার ও তার রাখাল হলো مُشَبَّه بِه যেন এখানে تَشْبِيْه الْمُرَكَّب টি تَشْبِيْه بِالْمُرَكَّب -এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এখন আর কোনো প্রশ্ন বাকি রইল না।

قَوْلُهُ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ : অর্থাৎ সে পশুর ন্যায়, যার কানে হাঁকডাকের শব্দ ধ্বনি তো পৌঁছে থাকে, তবে সে তার অর্থ ও মর্ম কিছুই বুঝে না। এ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরাও অনুরূপ আচরণই করছে সত্যের আহ্বানের সাথে। আহ্বানকারীর শব্দ ও ধ্বনি তো শুনতে পায়, কিন্তু তাতে চিন্তাভাবনা ও মনোযোগ দেওয়ার অবকাশ তারা পাচ্ছে না। যেমন– পশু, যাকে ডাক দেওয়া হয়, সে তা শুনতে পায় তবে বুঝে না, তদ্রূপ কাফের শুনতে পায় কিন্তু বুঝে না।

–[হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বরাতে ইবনে জারীর]।

অনুবাদ :

١٧٢. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ حَلَالَاتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ عَلٰى مَا اُحِلَّ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ .

১৭২. হে মু'মিনগণ! তোমাদেরকে আমি যা দিয়েছি তা হতে পবিত্র অর্থাৎ হলাল বস্তু আহার কর এবং তিনি তোমাদের জন্যে যে এসব হালাল করে দিয়েছেন সে কথার উপর আল্লাহর শোকর কর, যদি তোমরা শুধু তাঁরই ইবাদত কর।

١٧٣. اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ اَىْ اَكْلَهَا اِذِ الْكَلَامُ فِيْهِ وَكَذَا مَا بَعْدَهَا وَهِىَ مَا لَمْ تُذَكَّ شَرْعًا وَاُلْحِقَ بِهَا بِالسُّنَّةِ مَا اُبِيْنَ مِنْ حَيٍّ وَخُصَّ مِنْهَا السَّمَكُ وَالْجَرَادُ وَالدَّمَ اَيِ الْمَسْفُوْحَ كَمَا فِى الْاَنْعَامِ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ خُصَّ اللَّحْمُ لِاَنَّهُ مُعْظَمُ الْمَقْصُوْدِ وَغَيْرُهُ تَبْعٌ لَهُ وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ اَىْ ذُبِحَ عَلٰى اِسْمِ غَيْرِهٖ تَعَالٰى وَالْاِهْلَالُ رَفْعُ الصَّوْتِ وَكَانُوْا يَرْفَعُوْنَهُ عِنْدَ الذَّبْحِ لِاٰلِهَتِهِمْ فَمَنِ اضْطُرَّ اَىْ اَلْجَاَتْهُ الضَّرُوْرَةُ اِلٰى اَكْلِ شَىْءٍ مِمَّا ذُكِرَ فَاَكَلَهُ غَيْرَ بَاغٍ خَارِجٍ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا عَادٍ مُتَعَدٍّ عَلَيْهِمْ بِقَطْعِ الطَّرِيْقِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ فِىْ اَكْلِهٖ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ لِاَوْلِيَائِهٖ رَحِيْمٌ بِاَهْلِ طَاعَتِهٖ حَيْثُ وَسَّعَ لَهُمْ فِىْ ذٰلِكَ وَخَرَجَ الْبَاغِىْ وَالْعَادِىْ وَيَلْحَقُ بِهِمَا كُلُّ عَاصٍ بِسَفَرِهٖ كَالْاٰبِقِ وَالْمَكَّاسِ فَلَا يَحِلُّ لَهُمْ اَكْلُ شَىْءٍ مِنْ ذٰلِكَ مَا لَمْ يَتُوْبُوْا وَعَلَيْهِ الشَّافِعِىُّ .

১৭৩. নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন মৃত, অর্থাৎ তা আহার করা। কেননা এ স্থানে এ সম্পর্কে আলোচনা করা উদ্দেশ্য। পরবর্তী বিষয়সমূহেও এ কথা প্রযোজ্য। اَلْمَيْتَةُ বলা হয় যা শরিয়তের বিধানানুসারে জবাই করা হয়নি। হাদীসের বাক্য অনুযায়ী জীবিত প্রাণী হতে যদি কোনো অঙ্গচ্ছেদ করে দেওয়া হয় তবে তাও এ নির্দেশের হারামের অন্তর্ভুক্ত। মৃত পঙ্গপাল এবং মৃত মৎস্যের বিষয়টি এ বিধান হতে বিশেষভাবে ব্যতিক্রম। অর্থাৎ এগুলো মৃত হলেও তা আহার করা হালাল রক্ত, অর্থাৎ প্রবাহিত রক্ত, সূরা আন'আমে এ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে; শূকর-মাংস, মাংসই যেহেতু প্রধানত উদ্দেশ্য আর অন্য বস্তুসমূহ তার অধীন সেহেতু মাংসের কথা এ স্থানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর যাতে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নাম উচ্চারিত হয়েছে তা অর্থাৎ আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্যের নামে যা জবাই করা হয়েছে। اَلْاِهْلَالُ [ইহলাল] অর্থ– উচ্চকণ্ঠে শব্দ করা। মুশরিকগণ জবাই করার সময় উচ্চকণ্ঠে তাদের দেবদেবীর নাম কীর্তন করত। কিন্তু যে অনন্যোপায় প্রয়োজন যদি কাউকেও উল্লিখিত বস্তুসমূহ গ্রহণ করতে বাধ্য করে এবং তার কিছু আহার করে অথচ মুসলিমগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে অন্যায়কারী এবং ডাকাতির মাধ্যমে তাদের উপর জুলুম করে সীমালঙ্ঘকারী নয় তার জন্যে তা আহারে কোনো পাপ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর ওলীদের প্রতি অতি ক্ষমাশীল এবং অনুগতদের জন্যে পরম দয়ালু। আর তাই তিনি তাদের জন্যে এ বিষয়ে উদার অবকাশ দিয়েছেন। অনন্যোপায় অবস্থায় উক্ত হারাম জিনিসসমূহ হলাল হওয়ার বিধান হতে بَاغٍ [অন্যায়কারী] এবং عَادِى [সীমালঙ্ঘনকারী] খারিজ হয়ে গেছে। এমনিভাবে যারা পাপ উদ্দেশ্যে সফরে বের হয় যেমন মালিকের গৃহ হতে পলায়নকারী দাস, অন্যায়ভাবে শুল্ক আদায়কারী প্রভৃতিরাও بَاغٍ [অন্যায়কারী] ও عَادِى [সীমালঙ্ঘনকারী] -এর সাথে একই দলভুক্ত। সুতরাং তওবা না করা পর্যন্ত তাদের কারো জন্যে উক্ত বস্তুসমূহের কিছু [অনন্যোপায় হয়েও] আহার করা হালাল নয়। এটাই ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর অভিমত।

তাহকীক ও তারকীব

لَمْ تُذَكَّ : [জবাই করা হয়নি] ذَكَاةً (ن) ذَكَّى অর্থ– জবাই করা। شَرْعًا : শরিয়ত অনুযায়ী। أُلْحِقَ بِهِ : [এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে] مَاضِى مَجْهُوْل -এর সীগাহ। (إِفْعَال) اَلْإِلْحَاقُ অর্থ– অন্তর্ভুক্ত করা। مَا اُبِيْنَ : [যা পৃথক করা হয়] - مَاضِى مَجْهُوْل (إِفْعَال) أَبَان (إِفْعَال) إِبَانَةً অর্থ– পৃথক করা। حَيٌّ বহুবচন أَحْيَاءٌ অর্থ– জীবিত। خُصَّ : [খাস করা হয়েছে] السَّمَكُ : বহুবচন أَسْمَاكٌ অর্থ– মাছ। اَلْجَرَادُ : টিডিড। اَلْمَسْفُوْحُ : প্রবাহিত। اِسْم مَفْعُوْل - مُعَظَّمٌ গুরুত্বপূর্ণ, বড়। تَبِعٌ : অনুসারী। বহুবচন أَتْبَاعٌ - أُهِلَّ : মাযী মাজহুলের সীগাহ। মাসদার اَلْإِهْلَالُ অর্থ– আওয়াজ উঁচু করা, ডাকাডাকি করা। হাজী সাহেব যখন তালবিয়া পাঠ করে তখন বলা হয় أَهَلَّ الْمُحْرِمُ এমনিভাবে শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় যে আওয়াজ বা চিৎকার করে তাকে إِهْلَالُ الصَّبِيِّ বলা হয়। اُضْطُرَّ : مَاضِى مَجْهُوْل وَاحِد مُذَكَّر غَائِب -এর সীগাহ। بَاب إِفْتِعَال (مُضَاعَف) -এর মাসদার اَلْإِضْطِرَارُ থেকে নির্গত। অর্থ– বাধ্য করা। بَاغٍ وَلَا عَادٍ : بَاغِى - بَغْىٌ থেকে । আর عَادِى শব্দটি اَلْعُدْوَانُ থেকে। উভয়টিই জুলুম এবং সীমালঙ্ঘনের অর্থ দেয়। وَسَّعَ : উদার অবকাশ দিয়েছেন। عَاصٍ : গুনাহগার, অবাধ্য। عِصْيَانٌ থেকে। اَلْآبِقُ : পলায়নকারী, পলাতক গোলাম। اَلْمَكَّاسُ : অন্যায়ভাবে চাঁদা আদায়কারী।

قَوْلُهُ فَمَنِ اضْطُرَّ : [হারাম খাদ্য গ্রহণ করার ব্যাপারে নিরুপায় হলে]। اِضْطِرَار শব্দটি ضَرَرٌ [ক্ষতি, অনিষ্ট] ধাতুমূল থেকে নির্গত এবং এ ধাতুমূল হতে বাবে اِفْتِعَال -এর শব্দ।

غَيْرَ بَاغٍ -এর وَلَا عَادٍ -এর এ ব্যাখ্যা ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে, আহনাফের মতে তার ব্যাখ্যা ওসমানীর বরাতে যা লেখা হয়েছে।

قَوْلُهُ غَفُوْرٌ : এত বড় ক্ষমাশীল যে, অনেক ক্ষেত্রে অপরাধের জন্যেও কৈফিয়ত তলব করেন না বা শাস্তি দেন না; বরং অপরাধকে অপরাধের তালিকাভুক্তই রাখেন না।

قَوْلُهُ رَحِيْمٌ : এমন দয়াবান যে, সংকটের মুহূর্তগুলোতে সহজ ব্যবস্থা নির্দেশ করেন। –[জামালাইন - ২৪৭]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا الخ : ইতঃপূর্বে পবিত্র বস্তু খাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মুশরিকরা যেহেতু শয়তানের অনুসরণ হতে বিরত হয় না নিজেদের পক্ষ হতে বিধিনিষেধ তৈরি করে মহান আল্লাহর নামে চালিয়ে দেয়, নিজেদের বাপদাদাদের কুসংস্কার পরিহার করে না এবং তাদের পক্ষ হতে সত্য উপলব্ধি করার কোনো সম্ভাবনা নেই, তাই এখন উপেক্ষা করে কেবল মুসলিমগণকে পবিত্র বস্তু খাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং নিজ অনুগ্রহ প্রকাশ করে তাদেরকে শোকর আদায়ের আদেশ করা হয়েছে। এর দ্বারা এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়ে গেছে যে, মু'মিনগণ মহান আল্লাহর প্রিয় ও অনুগত এবং মুশরিকরা তাঁর প্রত্যাখ্যাত, নিন্দিত ও নাফরমান। –[তাফসীরে ওসমানী]

قَوْلُهُ كُلُوْا : আজ্ঞাবোধক শব্দরূপ এখানে অনুমতি বুঝাবার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে– আদেশ বুঝাবার জন্যে নয়। তদ্রূপ 'খাও' দ্বারা শুধু আহার করা উদ্দেশ্য নয়, বরং বস্তুকে কাজে লাগাবার সব বৈধ পদ্ধতিই এর অন্তর্ভুক্ত। আহার দ্বারা উদ্দেশ্য সব পন্থায় কাজে লাগানো। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الخ : এখানে লক্ষ্য মুশরিকদের মনগড়া হারাম সাব্যস্তকৃত বিষয়গুলোকে খণ্ডন করা। বলা হচ্ছে– اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الخ অর্থাৎ প্রাণীকুলের মধ্যে শরিয়তের হারাম ধার্যকৃত শুধু এগুলোই। তোমরা যেগুলোকে হারাম সাব্যস্ত করে রেখেছ, সেগুলো নয়। হারাম বস্তু কি এ কয়েকটিই?

প্রশ্ন : এ স্থানে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, আয়াতে হারাম ঘোষণা তো উল্লিখিত বস্তুগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে বর্ণনা করা হয়েছে, কেননা اِنَّمَا শব্দটি حَصْر বা সীমাবদ্ধতা জ্ঞাপক । যার অর্থ দাঁড়ায়– এ ছাড়া আর কোনো জন্তু হারাম নয়। অথচ সহীহ হাদীস বা শরিয়তের অন্য কোনো প্রমাণের মাধ্যমে আরো অনেক কিছুই হারাম ঘোষিত হয়েছে। যেমন– সমস্ত হিংস্র প্রাণী, গাধা, কুকুর ইত্যাদির গোশতও হারাম।

উত্তর : সহীহ হাদীস বা শরিয়তের অন্য কোনো প্রমাণের মাধ্যমে যা হারাম ঘোষিত হয়েছে, তা এ আয়াতের আলোচ্য বিষয় নয়। যেমন রূহুল মা'আনীতে রয়েছে–

لَيْسَ الْمُرَادُ مِنَ الْاٰيَةِ قَصْرُ الْحُرْمَةِ عَلٰى مَا ذُكِرَ مُطْلَقًا بَلْ مُقَيَّدٌ بِمَا اعْتَقَدُوْهُ حَلَالًا ـ

অর্থাৎ এখানে উদ্দেশ্য হারামকে উল্লিখিত ক্ষেত্রেসমূহে সার্বিকরূপে সীমিত করে দেওয়া নয়, বরং কাফিরদের হালাল ধারণাকৃত বিষয়ে আলোচনা আয়াতের বিশেষ লক্ষ্য। –[রূহুল মা'আনী]

তাফসীরে ওসমানীতে এর জবাবে বলা হয়েছে– এ সীমাবদ্ধতাকে আপেক্ষিক ধরা হবে অর্থাৎ কেবল সেই সব বস্তুর সাথে তুলনা করে, যেগুলোকে মুশরিকরা নিজেদের পক্ষ হতে হারাম করে রেখেছে যেমন– বাহীরা, সাইবা প্রভৃতি সামনে যার আলোচনা আসবে। এ হিসেবে আয়াতের অর্থ হবে– আমি তো কেবল মৃত বস্তু ও শূকর ইত্যাদি তোমাদের প্রতি নিষিদ্ধ করেছিলাম, তোমরা যে ষাঁড় প্রভৃতির নিষিদ্ধতা ও মর্যাদায় বিশ্বাসী এটা তোমাদের নিছক মনগড়া। বাকি থাকল হিংস্র ও কদর্য প্রাণী, কিন্তু এগুলো যে নিষিদ্ধ তাতে মুশরিকদেরও কোনো দ্বিমত ছিল না। সুতরাং আয়াতের সীমাবদ্ধতা কেবল সেসব বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করেই করা হয়েছে, যেগুলোকে মুশরিকরা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের বিপরীতে কেবল নিজেদের পক্ষ হতে নিষিদ্ধ করেছিল। –[তাফসীরে ওসমানী]

قَوْلُهُ اَلْمَيْتَةَ : মৃত; এর অর্থ যে প্রাণী কারো আঘাত করা ছাড়াই নিজে নিজে মারা যায় কিংবা শরিয়তের নির্ণীত জবাই পদ্ধতি ব্যতীত অন্য কোনো প্রকার আঘাতে মেরে ফেলা হয়। যেমন– শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা, জীবিত প্রাণীর কোনো অঙ্গ কেটে নেওয়া, কাঠ ও পাথরের আঘাতে কিংবা গুলতি ও বন্দুকের গুলিতে হত্যা করা, উপর হতে নিম্নে পতনে বা শিংয়ের আঘাতে মৃত্যু ঘটা, হিংস্র পশু কর্তৃক বধ হওয়া, জবাইকালে ইচ্ছাকৃতভাবে মহান আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করা ইত্যাদি। এ সকল অবস্থায় জন্তুটি মৃত ও হারাম সাব্যস্ত হবে। অবশ্য হাদীস দ্বারা দুটি মৃত প্রাণীকে এ বিধান হতে পৃথক করে আমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে, আর তা হলো মাছ ও পঙ্গপাল। –[তাফসীরে ওসমানী]

জীবন্ত পশুর দেহ হতে কোনো অঙ্গ বা গোশতের টুকরো কেটে নিলে তাও মৃতরূপে পরিগণিত হবে।

হানাফীদের মতে মৃত প্রাণী [বা তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ] দ্বারা কোনো প্রকার উপকার লাভ করা জায়েজ নয়। এমনকি মৃত প্রাণীর গোশত কুকুর, শিকারি পাখি [বা অন্য কোনো প্রাণীকে] খাওয়ানো [বা অন্য কোনো প্রকারে ব্যবহার করা]ও বৈধ নয়। কেননা তাও 'মৃত থেকে উপকার লাভ'-এর শামিল। অথচ পবিত্র কুরআন মৃতকে শর্তহীনরূপে হারাম সাব্যস্ত করেছে। আমাদের [হানাফী] ইমামগণ বলেছেন, মৃত প্রাণী দ্বারা কোনো প্রকার উপকার লাভ করা জায়েজ নয়; তা কুকুর বা অন্য কোনো পশুপাখিকে খাওয়ানো চলবে না। কেননা তাও তো এক ধরনের উপকার লাভ। অথচ আল্লাহ তো মৃতকে প্রত্যক্ষরূপে কোনো কাজে লাগানো সম্পূর্ণ ও নিঃশর্তরূপে হারাম করে দিয়েছেন। –[জাসসাস]

তবে চামড়া পাকা [দাবাগাত] করে নিলে মৃত প্রাণীর চামড়া, অস্থি ইত্যাদি পাক হয়ে যাবে এবং তখন মৃত পরিগণিত হবে না। মাসআলাটি বিভিন্ন হাদীস ও সাহাবীগণের বাণী দ্বারা প্রমাণিত। হানাফীগণ ও অন্যান্য ইমামগণের অনেকে এ অভিমত পোষণ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও তাঁর সহচরবর্গ এবং হাসান ইবনে সালিহ, সুফিয়ান ছাওরী, আব্দুল্লাহ ইবনুল হাসান আল আম্বারী, আওযায়ী, শাফেয়ী (র.) প্রমুখ বলেছেন, চামড়া পাকা করার পরে তা বিক্রি করা ও অন্যান্য কাজে লাগানো জায়েজ হবে। এভাবে পাক হওয়ার দাবিদারগণের প্রমাণ হলো বিভিন্ন সূত্রে ও বিভিন্ন ভাষ্যে নবী করীম ﷺ থেকে প্রাপ্ত বহুল প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ হাদীসমূহ যা দাবাগাত দ্বারা মৃত প্রাণী পবিত্র হওয়ার এবং দাবাগাত এ ক্ষেত্রে জবাই সূত্রে পবিত্রতার স্থলবর্তী হওয়া সাব্যস্ত করে [জাসসাস]। সেসব হাদীস ভাষ্যের নমুনা নিম্নরূপ– اَيُّمَا اِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ অর্থাৎ 'যে কোনো [কাঁচা চামড়া] পাকা [দাবাগাত] করা হলে তা পবিত্র হয়ে গেল।' –[হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সূত্রে]

دِبَاغُ جُلُوْدِ الْمَيْتَةِ طُهُوْرُهَا অর্থাৎ 'মৃতপ্রাণীর চামড়া দাবাগাত করাই তার পবিত্রতা।' [যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.) সূত্রে]।

زَكَاةُ الْاَدِيْمِ دِبَاغَتُهُ ـ অর্থাৎ 'চামড়ার পবিত্রতা হয় তার দাবাগাত পাকা করা। –[হযরত সালমা ইবনুল মুহাব্বাক]

তবে প্রাণীকুলের মধ্যে দুটি প্রাণী এমন যা সহীহ হাদীসের আলোকে জবাই করা ব্যতীতও হালাল। একটি হলো মাছ এবং অন্যটি টিড্ডী [পঙ্গপাল]।

হাদীস সূত্রে দুধরনের মৃত হালাল সাব্যস্ত হয়েছে– মাছ ও টিড্ডী [মাদারিক]। সুতরাং দারাকুতনী-এর আহরিত মাছ ও টিড্ডী– এ দু মৃত আমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে– হাদীসের কারণে এ আয়াত নির্দিষ্টকরণ (تَخْصِيْص) প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে। –[কুরতুবী]

মাসআলা : ফকীহ মুফাসসিরগণ এ বর্ণনাধারায় আরও একটি মাসআলা উল্লেখ করেছেন। তা হলো, যেসব খাদ্যে জবাইয়ের প্রশ্ন নেই [অর্থাৎ গোশত ব্যতীত অন্যান্য খাবার] তা পৌত্তলিক আগুন পূজারী [মাজূসী] ও অন্যান্য অ-কিতাবীদের নিকট হতে সংগৃহীত হলেও তা খাওয়া বৈধ হবে। -[কুরতুবীর সূত্রে মাজেদী]

قَوْلُهُ اَلدَّمُ : রক্ত দ্বারা শিরায় প্রবহমান রক্ত উদ্দেশ্য। এ রক্ত খাওয়া যেমন জায়েজ নয়, অন্য কোনোরূপে ব্যবহার করাও বৈধ নয়। যে রক্ত গোশতে লেগে থাকে তা হালাল ও পবিত্র। গোশত যদি না ধুয়ে রান্না করা হয় তবে তা খাওয়া জায়েজ, যদিও একটি রুচিবিরোধী কাজ। আবার প্রামাণ্য হাদীসের আলোকে দু ধরনের 'জমাট রক্ত' হালাল। ১. কলিজা, ২. যকৃত বা প্লীহা। (أُحِلَّتْ لَنَا دَمَانِ الْكَبِدُ وَالطِّحَالُ) এ বিষয়টিও উম্মতের ফকীহগণের ঐকমত্য সমৃদ্ধ। অবশ্য আলিমগণ এ কথাও বলেছেন যে, কলিজা ও যকৃত মূলত গোশত জাতীয়, রক্ত জাতীয় নয়। [কেননা রক্ত থেকে তার রূপান্তর সংঘটিত হয়েছে] রক্তের সংজ্ঞা এ দুটির জন্যে প্রযোজ্য হয় না। সুতরাং এ দুটিকে বিশিষ্ট বা ব্যত্যয় করারও কোনো প্রয়োজন নেই। [তবুও সাধারণ ধারণার প্রতি লক্ষ্য রেখে হাদীসে এ দুটিকে পৃথক করে দেওয়া হয়েছে।]

قَوْلُهُ لَحْمَ الْخِنْزِيْرِ শূকর হারাম হওয়ার রহস্য : শূকর জীবিত হোক কিংবা মৃত সর্বাবস্থায় হারাম। এমনকি শরিয়তসম্মত পন্থায় জবাই করা হলেও তা হারাম। এর অস্থি, মাংস, চর্বি, নখ, পশম, শিরা তথা দেহের যাবতীয় অংশ অপবিত্র। এর দ্বারা কোনো প্রকার উপকার লাভ ও একে কোনো কাজে লাগানো জায়েজ নয়। এ স্থলে যেহেতু খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে তাই কেবল গোশতের বিধান বলে দেওয়া হয়েছে। নয়তো এটা উম্মতের সর্বসম্মত রায় যে, শূকর যেহেতু নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা, লোভ ও অপবিত্র বস্তুর প্রতি আসক্তিতে সকল প্রাণীর শীর্ষে, সে জন্য আল্লাহ তা'আলা এর সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন- فَإِنَّهُ رِجْسٌ 'এটা অবশ্যই অপবিত্র', তাই এটা নিঃসন্দেহে আমূল অপবিত্র। এর কোনো অংশই পবিত্র নয় এবং এর দ্বারা কোনো প্রকারে উপকৃত হওয়া জায়েজ নয়। যারা এর গোশত বেশি খায় এবং এর অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে কাজে লাগায় তাদের মাঝে উপরিউক্ত স্বভাবগুলোও কদর্যরূপে প্রকাশ পায়। -[তাফসীরে ওসমানী]

قَوْلُهُ خُصَّ اللَّحْمُ لِاَنَّهُ مُعْظَمُ الْمَقْصُوْدِ وَغَيْرُهُ تَبَعٌ لَهُ : কুরআনের প্রত্যক্ষ বর্ণনায় হারাম করা হয়েছে শূকরের গোশত [لَحْم]। কিন্তু উম্মতের ফকীহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, শূকরের শুধু গোশতই হারাম নয়, বরং তার চর্বি, অস্থি, চামড়া, লোম, চুল ইত্যাদি সবই হারাম। আয়াতে স্পষ্টত لَحْم শব্দের উল্লেখের কারণ হলো, গোশতই পশুর প্রধান ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সুতরাং মূল অংশ গোশতের কথা বলা হলে আনুষঙ্গিক রূপে অন্য সবই তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় অর্থাৎ শূকর তার যাবতীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সহকারে অপবিত্র। বিজ্ঞ মুফাসসির (র.) তাঁর নিম্নোক্ত ইবারতে এ কথাই বলেছেন-

خُصَّ اللَّحْمُ لِاَنَّهُ مُعْظَمُ الْمَقْصُوْدِ وَغَيْرُهُ تَبَعٌ لَهُ.

قَوْلُهُ مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ : إِهْلَال -এর মূল অর্থ- আওয়াজ উঁচু করা, ডাকাডাকি করা, ঘোষণা দিয়ে দেওয়া ইত্যাদি এখানে উদ্দেশ্য হলো, কোনো পশুকে কারো প্রতি সম্মান প্রদান, পূজা নিবেদন বা সান্নিধ্য অর্জন মানসে কোনো সৃষ্টির নামে উৎসর্গিত করা। এভাবে কোনো পশুকে জবাই করা হলে এবং তাতে কোনো সৃষ্টির জন্যে নজর-নিয়াজ বা অর্থ নিবেদনের উদ্দেশ্যে হলে সে পশু হারাম হয়ে যাবে, এমনকি তা জবাই করার সময় বিসমিল্লাহ উচ্চারণ করা হলেও। কেননা প্রাণের স্রষ্টা ছাড়া আর কারো জন্যে কোনো প্রাণ উৎসর্গিত হতে পারে না। যেমন- কোনো পীর-বুজুর্গের নামে ষাঁড় বা অন্য কোনো পশু উৎসর্গ করা বা খোদায়ী ষাড় [নাউযুবিল্লা] নামে ষাঁড় ছেড়ে দেওয়া, কোনো বাদশার আগমনে তাকে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কোনো পশু জবাই করা, কোনো জিনের অত্যাচার হতে বাঁচার জন্যে তার নামে কোনো পশু জবাই করা, ইটের পাঁজা ভালো করে পোড়ার জন্যে ভেটস্বরূপ কোনো পশু জবাই করা ইত্যাদি সবই হারাম ও মৃত বলে গণ্য এবং এরূপ যে করবে সে মুশরিক সাব্যস্ত হবে। -[জাসসাস ও ওসমানী]

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, مَلْعُوْنٌ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ [আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর নামে যে জবাই করে, সে অভিশপ্ত।] অর্থাৎ যে ব্যক্তি পশু জবাই করে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সান্নিধ্য পেতে চায় সে অভিশপ্ত, এমনকি জবাই করার সময় আল্লাহর নাম নিলেও। কেননা যখন সে ঘোষণা দিয়ে রেখেছে যে, এ পশুটি অমুকের জন্যে, এখন যতই আল্লাহর নাম নেওয়া হোক কাজে আসবে না। -[তাফসীরে ফাতহুল আযীয]

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্যে যদি এ নিয়তে কোনো পশু নির্দিষ্ট করা হয় যে, তিনি তুষ্ট হয়ে আমার বাসনা পূরণ করে দেবেন, যেমন- সাধারণ অজ্ঞ মানুষদের মাঝে এমন রীতি প্রচলিত রয়েছে যে, তারা এরূপ নিয়তে বকরি মুরগি ইত্যাদি

মানত করে থাকে; এ পশু হারাম হয়ে যায়। যদিও পরবর্তীতে জবাই করার সময় তা আল্লাহর নামেই করে থাকে। তবে হ্যাঁ, এরূপ মানত করার পরে যদি তওবা করে, তাহলে পশুটি হালাল হয়ে যাবে। –[বয়ানুল কুরআন]

এক শ্রেণির কুসংস্কারগ্রস্ত মুসলমানকেও পীর-বুজুর্গের মাজারে ছাগল মুরগি ইত্যাদি ছেড়ে আসতে দেখা যায়। মাজারের খাদেমরাই সাধারণত উৎসর্গীকৃত সেসব জন্তু ভোগদখল করে। যেহেতু মূল মালিক খাদেমদের হাতে এগুলো ছেড়ে যায় এবং এগুলোর ব্যাপারে খাদেমদের পূর্ণ এখতিয়ার থাকে, সেহেতু এ শ্রেণির জীবজন্তু ক্রয় করা, জবাই করে খাওয়া, বিক্রয় করে লাভবান হওয়া সম্পূর্ণ হলাল। –[মা'আরিফুল কুরআন]

মহান আল্লাহর নামে পশু জবাই করার পর যদি গরিব-মিসকিনকে খাইয়ে দেওয়া হয় এবং তার ছওয়াব কোনো আত্মীয় বা পীর-বুজুর্গের নামে বখশিশ করা হয় অথবা কোনো মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে কুরবানি করে তার নামে যদি তার ছওয়াব বখশিশ করা হয়, তবে কোনো দোষ নেই। কেননা এটা গায়রুল্লাহর জন্যে জবাই আদৌ নয়।

কতক লোক স্বভাবগত ধৃষ্টতার কারণে এসব ক্ষেত্রে এরূপ একটা বাহানা দেখায় যে, পীরের নামে নজরানা ইত্যাদিতেও তো আমাদের উদ্দেশ্য এটাই থাকে যে, খাবার তৈরি করে মৃত ব্যক্তির নামে তা সদকা করা হবে। এর উত্তরে প্রথমত ভালো করে জেনে রাখুন যে, মহান আল্লাহর সামনে মিথ্যা অজুহাত প্রদর্শনে ক্ষতি ছাড়া কোনো লাভ হতে পরে না। দ্বিতীয়ত তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হোক, তোমরা গায়রুল্লাহর জন্যে যে পশু মানত করেছ যদি সে পশুর বদলে তার সমপরিমাণ গোশত খরিদ করে রান্না কর এবং তা ফকির-মিসকিনকে খাইয়ে দাও তাহলে কোনোরূপ দ্বিধা-সন্দেহ ছাড়া তোমাদের মতে সে মানত আদায় হবে কিনা? যদি নির্দ্বিধায় তোমরা এটা করতে পার এবং নিজ মানত সম্পর্কে এতে তোমাদের মনে কোনো খটকা না জাগে, তাহলে তোমরা সাচ্চা বটে। আর তা না হলে তোমরা মিথ্যুক এবং তোমাদের এ কাজ শিরক, পশুটি মৃত ও হারাম। –[তাফসীরে ওসমানী]

আয়াতের মর্ম হলো, চরম প্রয়োজন ও ঠেকার মুহূর্তে উল্লিখিত হারাম খাদ্যসমূহও ন্যূনতম পরিমাণে আহার করতে পারে। চরম প্রয়োজন দুভাবে হতে পারে–

১. ক্ষুধার তাড়নায় জীবনের শেষ নিঃশ্বাস বের হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হওয়া এবং হালাল খাবার কোনো উপায়ে সংগৃহীত না হওয়া কিংবা সীমাহীন দারিদ্র্যের কারণে হালাল খাদ্য সংগ্রহের সামর্থ্য না হওয়া কিংবা কোনো রোগ-ব্যাধির কারণে বিদ্যমান হালাল খাবার আহারের অযোগ্য হওয়া।

২. কোনো শাসক বা সবল প্রতিপক্ষ সে হারাম খাদ্য গ্রহণে বাধ্য করলে। মোটকথা এ উপায়হীনতার সূত্র দুটি। এক. প্রচণ্ড ক্ষুধা; দুই. হারাম খেতে বাধ্য করা। –[তাফসীরে কাবীর]

قَوْلُهُ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ : অর্থাৎ হারাম খাওয়ার সময় তার মনের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘন না হতে হবে। আর তার প্রয়োজন হতে হবে বাস্তব। অবধ্যতা তো এভাবে যে, অনন্যোপায় অবস্থায় না পৌঁছতেই খেয়ে নিল। আর সীমালঙ্ঘন হলো প্রয়োজনের অতিরিক্ত উদরপূর্তি করে খাওয়া। কেবল প্রাণে বাঁচে পরিমাণই খাওয়া যাবে।
–[তাফসীরে ওসমানী]

ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও তাঁর সহচরবর্গ বলেছেন– لَا يَأْكُلُ الْمُضْطَرُّ مِنَ الْمَيْتَةِ إِلَّا قَدْرَ مَا يُمْسِكُ رَمَقَهُ অর্থাৎ "অনন্যোপায় ব্যক্তি মৃত প্রাণীর ততটুকুই খাবে, যতটুকু দিয়ে সে তার জীবন [শেষ নিঃশ্বাসটুকু] ধরে রাখতে পারে।" –[তাফসীরে কাবীর]

وَقَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ وَالْجُمْهُوْرُ الْمَعْصِيَةُ الْعَارِضَةُ لَا يَمْنَعُ الرُّخْصَةَ وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَالْبَغْيُ هُوَ طَلَبُ اَنْ يُوْثِرَ نَفْسَهُ عَلٰى مُضْطَرٍّ آخَرَ بِاَنْ يَنْفَرِدَ بِتَنَاوُلِهِ فَيَهْلَكَ الْآخَرُ وَالْعَدْوُ وَهُوَ التَّعَدِّىْ وَالتَّجَاوُزُ عَنْ قَدْرِ الْحَاجَةِ وَهُوَ سَدُّ الرَّمَقِ . (حَاشِيَة)

قَوْلُهُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ : [সে হারাম বস্তু খেয়ে ফেললে গুনাহ নেই।] বরং অনেক ক্ষেত্রে তো এ রকম অবস্থায় না খেলে [এবং মৃত্যু মুখে পতিত হলে] গুনাহ হবে। তথা খাওয়া পরিহার করার কারণে গুনাহগার হবে [রূহুল মা'আনী]। কেননা জীবন রক্ষা প্রথম স্তরের ফরজসমূহের অন্যতম। আর এরূপ চরম সংকটজনক পরিস্থিতিতে খাদ্য গ্রহণ না করা আত্মহত্যারই নামান্তর; যা হারাম খাওয়ার চেয়ে জঘন্যতর।

١٧٤. إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ الْمُشْتَمِلِ عَلٰى نَعْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَهُمُ الْيَهُوْدُ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا مِنَ الدُّنْيَا يَأْخُذُوْنَهٗ بَدْلَهٗ مِنْ سَفْلَتِهِمْ فَلَا يُظْهِرُوْنَهٗ خَوْفَ فَوْتِهٖ عَلَيْهِمْ أُولٰئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ إِلَّا النَّارَ لِأَنَّهَا مَالُهُمْ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ غَضَبًا عَلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ يُطَهِّرُهُمْ مِنْ دَنَسِ الذُّنُوْبِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ مُؤْلِمٌ هُوَ النَّارُ.

১৭৫. أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى أَخَذُوْهَا بَدْلَهٗ فِي الدُّنْيَا وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ الْمُعَدَّةِ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ لَوْ لَمْ يَكْتُمُوْا فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ أَيْ مَا أَشَدَّ صَبْرَهُمْ وَهُوَ تَعْجِيْبٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ مِنِ ارْتِكَابِهِمْ مُوْجِبَاتِهَا مِنْ غَيْرِ مُبَالَاةٍ وَإِلَّا فَأَيُّ صَبْرٍ لَهُمْ.

١٧٦. ذٰلِكَ الَّذِيْ ذُكِرَ مِنْ أَكْلِهِمُ النَّارَ وَمَا بَعْدَهٗ بِأَنَّ بِسَبَبِ أَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُتَعَلِّقٌ بِنَزَّلَ فَاخْتَلَفُوْا فِيْهِ حَيْثُ اٰمَنُوْا بِبَعْضِهٖ وَكَفَرُوْا بِبَعْضِهٖ بِكَتْمِهٖ وَإِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِي الْكِتٰبِ بِذٰلِكَ وَهُمُ الْيَهُوْدُ وَقِيْلَ الْمُشْرِكُوْنَ فِي الْقُرْاٰنِ حَيْثُ قَالَ بَعْضُهُمْ شِعْرٌ وَبَعْضُهُمْ سِحْرٌ وَبَعْضُهُمْ كَهَانَةٌ لَفِيْ شِقَاقٍ خِلَافٍ بَعِيْدٍ عَنِ الْحَقِّ.

অনুবাদ :

১৭৪. রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিবরণ সংবলিত যে কিতাব আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেছেন যারা তা গোপন রাখে তারা হলো ইহুদিগণ, ও এর বিনিময়ে দুনিয়ার [তুচ্ছ মূল্য ক্রয় করে] অর্থাৎ অনুগত ছোট লোকদের নিকট হতে তারা বিনিময় গ্রহণ করে। আর এই স্বার্থ বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় তারা তা [রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কিত বিবরণাদি] প্রকাশ করে না তারা নিজেদের জঠরে অগ্নি ব্যতীত আর কিছুই পুরে না। কেননা এ জাহান্নামাগ্নিই তাদের ভবিষ্যৎ পরিণাম। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের প্রতি ক্রোধবশত তাদের সাথে কোনো কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পাপ-পঙ্কিলতা হতে তাযকিয়া করবেন না; পবিত্র করবেন না, আর তাদের জন্যে রয়েছে মর্মন্তুদ বেদনাকর শাস্তি। তা হলো জাহান্নাম।

১৭৫. তারাই ক্রয় করে নিয়েছে সৎপথের বিনিময়ে ভ্রান্ত পথ অর্থাৎ দুনিয়াতে তারা হেদায়েত ও সৎপথের বিনিময়ে ভ্রান্তপথ গ্রহণ করে নিয়েছে এবং যদি সত্য গোপন না করত তবে পরকালে যে ক্ষমা তাদের জন্যে রাখা হয়েছিল সেই ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি। আগুন সহ্য করতে তাদের কি ধৈর্য! অর্থাৎ কি ভীষণ তাদের এই ধৈর্য! বেপরোয়া ও দ্বিধাহীনভাবে জাহান্নাম-প্রবেশের কারণসমূহ তাদেরকে অবলম্বন করতে দেখে মু'মিনদের পক্ষ হতে হলো এ বিস্ময়। বস্তুত জাহান্নামাগ্নির উপর তাদের আর কি ধৈর্য হতে পারে?

১৭৬. তা অর্থাৎ জঠরে অগ্নি পুরা এবং যে সমস্ত বিষয় তাদের সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে তা এ কারণে যে, আল্লাহ সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছিলেন। অনন্তর তাতে তারা মতভেদ সৃষ্টি করে। কিছু অংশের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে আর কিছু অংশ গোপন করে তা প্রত্যাখ্যান করে। এবং এরূপভাবে অর্থাৎ কিছু বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে আর কিছু বিষয় প্রত্যাখ্যান করে যারা কিতাব সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করে তারা হলো ইহুদি সম্প্রদায়। কেউ কেউ বলেন, তারা হলো মুশরিক সম্প্রদায়। কুরআন সম্পর্কে তারা মতভেদ সৃষ্টি করেছিল। তাদের কয়েকজন বলেছিল যে, এটা [আল কুরআন] কবিতা, কয়েকজন বলেছিল যে, এটা যাদু, আর কয়েকজন বলেছিল যে, এটা গণনাশাস্ত্রের বই। নিঃসন্দেহে তারা জিদের মধ্যে অর্থাৎ তার বিরোধিতায় সত্য হতে বহুদূরে পতিত।

بِأَنَّ اللّٰهَ -এর ب টি এ স্থানে سَبَبِيَّة বা হেতুবোধক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। بِالْحَقِّ শব্দটি نَزَّلَ ক্রিয়ার সাথে مُتَعَلِّقٌ অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট।

তাহকীক ও তারকীব

اَلْاِشْتِمَالُ : সংবলিত, শামিলকারী। اَلْمُشْتَمِلُ : অর্থ– গোপন করা। كَتَمَ (ن) كَتْمًا وَكِتْمَانًا [গোপন করে] : يَكْتُمُوْنَ : তা প্রকাশ করত না। لَا يُظْهِرُوْنَهُ : নিম্ন শ্রেণির লোক। سَفْلَتِهِمْ : سُفْلَةٌ অর্থ– শামিল করা, অন্তর্ভুক্ত করা। (اِفْتِعَال)

اَعَدَّ অর্থ– প্রস্তুত করা। (اِفْعَال) اِعْدَادًا। اَلْمُعَدَّةُ প্রস্তুতকৃত। دَنَسٌ : ময়লা। مَآلٌ : পরিণতি। فَوْتٌ : ছুটে যাওয়া।

مُوْجِبَاتٌ : আবশ্যককারী। مُبَالَاةٌ : পরোয়া। شِعْرٌ : কবিতা। ব-ব اَشْعَارٌ - سِحْرٌ : যাদু।

كَهَانَةٌ : গননাশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র شِقَاقٌ : শত্রুতা, বিরোধিতা। بِحَيْثُ يَكُوْنُ كُلُّ وَاحِدٍ فِىْ شَقٍّ اَىْ طَرَقٍ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নযূল : এ আয়াতটি ঐ সকল ইহুদি আলেমদের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে, যারা তাওরাতের বিধিবিধানকে এবং বিশেষ করে রাসূল ﷺ -এর বিবরণ সাধারণ মানুষ থেকে গোপন করত। এমনকি বর্ণিত গুণাবলির বিপরীত তথ্য পরিবেশন করত এবং সাধারণ জনগণ থেকে হাদিয়া-তোহফা আদায় করত।

ইহুদি আলেমদের ধারণা ছিল যে, শেষ নবী তাদের বংশধারা থেকেই হবেন। কিন্তু যখন বনী ইসরাঈলের পরিবর্তে বনী ইসমাঈল থেকে শেষ নবীর আবির্ভাব হলো তখন তারা হিংসা, কায়েমী স্বার্থ ও উপহার-উপঢৌকনের লিপ্সায় তাওরাতে বর্ণিত রাসূল ﷺ -এর বিবরণ গোপন করতে থাকে। –[বয়ানুল কুরআনের টীকা]

উক্ত আয়াতের শানে নুযূল যদিও একটা বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত কিন্তু তার আবেদন ব্যাপক। অর্থাৎ এখনো যদি কেউ সত্যকে গোপন করে এবং দীন বিক্রি করে সেও উক্ত ধমকির অধিকারী হবে।

قَوْلُهُ ثَمَنًا قَلِيْلًا : এর অর্থ এমন নয় যে, বিনিময়ের পরিমাণ অধিক হলে বা তা খুব দামি কিছু হলে দীন বিক্রি বৈধ হয়ে যাবে; বরং পার্থিব যে কোনো পরিমাণের বিনিময়ই তুচ্ছ ও নগণ্য। কেননা আখেরাতের স্থায়ী কল্যাণের তুলনায় দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী লাভ তা যতই বিশাল হোক না কেন, সব সময় অল্প ও তুচ্ছই থাকবে।

قَوْلُهُ اِخْتَلَفُوْا فِى الْكِتَابِ : অর্থাৎ অকারণে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে নিজেদেরই আসমানি কিতাবে কলহ-বিসম্বাদ সৃষ্টি করেছে। অন্যথায় আল্লাহর বাণী পূর্ণাঙ্গ, স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল বিধায় তাতে মতপার্থক্যের কোনো অবকাশই ছিল না।

قَوْلُهُ فِىْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ : অর্থাৎ বিভ্রান্ত হয়ে সত্য ও ন্যায় হতে অনেক দূরে নিপতিত হয়েছে। অর্থ এরূপও করা যেতে পারে যে, তাদের মাঝে পরীক্ষিত এ চরম উদাসীনতার কারণ হলো, তারা আত্মগরযে ও স্বার্থ সিদ্ধির মানসে অযথা আল্লাহর সত্য বাণীতে বিরোধে লিপ্ত হয়েছিল। পরিণতিতে তারা আরো মারাত্মক ভ্রান্তির শিকার হলো।

١٧٧. لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ فِى
الصَّلٰوةِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ نَزَلَ رَدًّا
عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى حَيْثُ زَعَمُوْا
ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ اَىْ ذَا الْبِرِّ وَقُرِئَ الْبَارُّ
مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ
وَالْكُتُبِ اَيِ الْكُتُبِ وَالنَّبِيّٖنَ وَاٰتَى
الْمَالَ عَلٰى مَعَ حُبِّهٖ لَهٗ ذَوِى الْقُرْبٰى
الْقَرَابَةِ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ
السَّبِيْلِ الْمُسَافِرِ السَّائِلِيْنَ الطَّالِبِيْنَ
وَفِى فَكِّ الرِّقَابِ الْمُكَاتَبِيْنَ وَالْاَسْرٰى
وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ الْمَفْرُوْضَةَ
وَمَا قَبْلَهٗ فِى التَّطَوُّعِ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ
اِذَا عٰهَدُوْا اللّٰهَ اَوِ النَّاسَ وَالصّٰبِرِيْنَ
نَصَبٌ عَلَى الْمَدْحِ فِى الْبَاْسَاءِ شِدَّةِ الْفَقْرِ
وَالضَّرَّاءِ الْمَرْضِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ وَقْتَ شِدَّةِ
الْقِتَالِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰئِكَ الْمَوْصُوْفُوْنَ
بِمَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا فِىْ اِيْمَانِهِمْ اَوْ
اِدِّعَاءِ الْبِرِّ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ اللّٰهَ.

অনুবাদ :

১৭৭. সালাতে পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোনো পুণ্য নেই। ইহুদি ও খ্রিস্টানগণের এহেন ধারণা প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেন। পক্ষান্তরে পুণ্য হলো اَلْبِرَّ শব্দটি اَلْبَارُّ [অর্থাৎ পুণ্যবান] রূপেও অপর এক পাঠ রয়েছে। অর্থাৎ পুণ্যের অধিকারী হলো সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতাগণ, কিতাব অর্থাৎ সকল কিতাব এবং নবীগণে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তার অর্থাৎ সম্পদের প্রতি ভালোবাসা সত্ত্বেও عَلٰى حُبِّهٖ-এর عَلٰى শব্দটি এ স্থানে مَعَ [সহ] অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আত্মীয়স্বজন, নিকট সম্পর্কের অধিকারী জন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পথ-সন্তান অর্থাৎ মুসাফির প্রার্থী যাচনাকারী এবং গ্রীবা সম্পর্কে অর্থাৎ মুকাতাব দাস ও বন্দীদের মুক্তকরণে অর্থদান করে আর সালাত কায়েম করে, জাকাত অর্থাৎ ফরজ জাকাত প্রদান করে। পূর্বে যে দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো নফল অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যা আদায় করে। আল্লাহ বা মানুষের সাথে যখন তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় তারা তা পূরণ করে। সংকটে কঠিন দারিদ্র্যকষ্টে [দুঃখকষ্টে] অর্থাৎ অসুখ-বিসুখে এবং যুদ্ধকালে অর্থাৎ আল্লাহর পথে কঠিন লড়াইয়ে লিপ্ত যখন তখন যারা ধৈর্যধারণ করে। اَلصَّابِرِيْنَ শব্দটি نَصَبٌ عَلَى الْمَدْحِ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। তারা অর্থাৎ উল্লিখিত গুণের অধিকারী যারা তারাই তাদের ঈমানের ও পুণ্যকর্মের দাবিতে সত্যবাদী এবং তারাই আল্লাহকে ভয়কারী।

তাহকীক ও তারকীব

اَلْبِرُّ : পুণ্য اِسْمٌ جَامِعٌ لِلطَّاعَاتِ وَأَعْمَالِ الْخَيْرِ - اَنْ تُوَلُّوْا : মুখ ফিরানো। قِبَلَ : দিকে। فَكٌّ : যুক্ত করা।
اَلرِّقَابُ : رَقَبَةٌ-এর ব-ব। অর্থ– গর্দান, গ্রীবা। وَهِيَ فِي الْأَصْلِ الْعُنُقُ وَتُطْلَقُ عَلَى الْبَدَنِ كُلِّهِ
اَلْمُكَاتَبِيْنَ : مُكَاتَبٌ-এর ব-ব। অর্থ– মুকাতাব দাস। اَلْأَسْرٰى : বন্দী। اَسِيْرٌ-এর বহুবচন।
اَلْمُوْفُوْنَ : পূরণকারী। اِسْم فَاعِل جَمْع مُذَكَّر-এর সীগাহ। (اِفْعَال) اَلْاِيْفَاءُ অর্থাৎ পূরণ করা। মূলত مُوْفِيُوْنَ ছিল।

اَلْبَأْسَاءُ : সংকট, দারিদ্র্যকষ্ট। اَلضَّرَّاءُ : অসুখ-বিসুখ। اَلْبَأْسُ : যুদ্ধ। وَأَصْلُ الْبَأْسِ فِي اللُّغَةِ الشِّدَّةُ

قَوْلُهُ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ.... : لَيْسَ এটি فِعْل نَاقِص এবং مَاضِي جَامِد তার মুযারের ব্যবহার নেই। কেননা لَيْسَ যদিও মাযীর সীগাহ কিন্তু তার অর্থটি حَال তথা বর্তমানকালের نَفِي বুঝায়।

قَوْلُهُ اَلْبِرَّ بِالنَّصْبِ : اَلْبِرَّ শব্দটি لَيْسَ -এর خَبَر مُقَدَّم হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে, আর أَنْ تُوَلُّوا মাসদার হয়ে لَيْسَ -এর اِسْم مُؤَخَّر হয়েছে। কোনো কোনো কেরাতে اَلْبِرُّ -কে لَيْس -এর اِسْم সাব্যস্ত করে مَرْفُوْع রূপেও পড়া হয়েছে।

اَلْبِرُّ : এ শব্দটি আরবি অভিধানের একটি ব্যাপক বিস্তৃত অর্থবোধক শব্দ, যা পুণ্যের সকল প্রকার ও প্রকরণকে অন্তর্ভুক্ত করে। উর্দুতে এর যথার্থ মর্ম প্রকাশ করা যায় طَاعَت [আনুগত্য, পুণ্য] শব্দ দিয়ে [এবং বাংলায় এর প্রতিশব্দ হবে পুণ্য ও সৎকাজ]। اَلْبِرُّ হলো ভালো কাজে বিস্তৃত অবকাশ। সুতরাং তা আল্লাহর পক্ষ থেকে হবে ছওয়াব এবং বান্দার পক্ষে হবে আনুগত্য। -[রাগিব]

قَوْلُهُ أَنْ تُوَلُّوا : তোমরা অভিমুখী হও, মুখ ফিরাও। এ শব্দটি تَوْلِيَة মাসদার থেকে جَمْع مُذَكَّر حَاضِر -এর সীগাহ। أَنْ -এর কারণে نُوْن إِعْرَابِي পড়ে গেছে। শব্দটি أَضْدَاد -এর অন্তর্ভুক্ত। তার অর্থ- অভিমুখী হওয়া এবং মুখ ফিরিয়ে নেওয়া উভয়টি হতে পারে।

قَوْلُهُ ذَا الْبِرِّ وَقُرِئَ الْبَارَّ : এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন: প্রশ্নটি হলো- لَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ -এর মাঝে মাসদারের হামল যাতের উপর হচ্ছে, যা শুদ্ধ নয়। কেননা বাক্যটির তরজমা হচ্ছে- পুণ্য হলো তা, যে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে। অথচ এটি অশুদ্ধ কথা।

উত্তর: উক্ত প্রশ্নের দুটি উত্তর দেওয়া হয়েছে-

১. মাসদারের পূর্বে ذُو উহ্য ধরা হবে। অর্থাৎ ذَا الْبِرِّ এভাবে মাসদার اِسْم فَاعِل হয়ে যাবে। এখন অনুবাদ হবে- কিন্তু পুণ্যের অধিকারী হলো ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে।

২. بِرّ মাসদারটি بَارّ ইসমে ফায়েলের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

কেউ কেউ তৃতীয় আরেকটি উত্তর এভাবে দিয়েছেন যে, খবরের পূর্বে একটি মাসদার মাহযূফ মানা হবে। তাকদীরী ইবারত হবে- وَلَكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنْ آمَنَ অর্থাৎ আনুগত্য তো [গ্রহণযোগ্য] তার আনুগত্য, যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে।

قَوْلُهُ نَصْبٌ عَلَى الْمَدْحِ : এ ইবারত দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন: প্রশ্নটি হলো, وَالصّٰبِرِيْنَ শব্দটি مَرْفُوْع রূপে وَالصّٰبِرُوْنَ পড়া উচিত ছিল। কেননা এটি اَلْمُوْفُوْنَ -এর সাথে عَطْف হয়েছে।

উত্তর: اَلْمُوْفُوْنَ -এর সাথে عَطْف হওয়ার কারণে যদিও مَرْفُوْع রূপে وَالصّٰبِرُوْنَ পড়া উচিত ছিল তথাপিও নসব দিয়ে পড়ার কারণ হলো, এর পূর্বে أَمْدَحُ শব্দ উহ্য রয়েছে। এ কারণেই وَالصّٰبِرِيْنَ পড়া হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

দিক পূজার রহস্য : ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে পৃথিবীর বুকে বিরাজমান অগণিত ভ্রান্তির মাঝে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ভ্রান্তি ছিল 'দিক পূজা'। অর্থাৎ প্রাণহীন দেবদেবী, প্রতিমা, পাথর, গাছ, পাহাড়, সাগর ইত্যাদি ছাড়াও [কোনো বিশেষ বস্তুর] দিক, প্রান্তের পূজাও প্রচলিত ছিল। অন্ধকার যুগের অনেক সম্প্রদায় বিশ্বাস জমিয়ে নিয়েছিল যে, অমুক বিশেষ দিক যথা- পূর্বদিক পবিত্র, কিংবা অমুক নির্দিষ্ট দিক পূজনীয়।

পবিত্র কুরআন এখানে শিরক-এর এ বিশেষ দিকটি খণ্ডন করে ঘোষণা করছে- নিছক কোনো দিক কি করে পবিত্র ও শ্রদ্ধার পাত্র হতে পারে? যে কোনো দিক শুধু 'দিক' হওয়ার বিচারে কখনোই সম্মান বা পবিত্রতার পাত্র হতে পারে না এবং পুণ্য ও ইবাদতের সঙ্গে এর কোনোই সম্পর্ক নেই।

অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের এ ভ্রান্তির বিষয়টি দৃষ্টিতে না থাকলে এ আয়াতে বাহ্যত জটিলতার সম্মুখীন হতে হবে।

এ কথাও স্পষ্ট যে, ইসলাম ধর্মে সালাতের কিবলারূপে নির্ণীত দিক শুধু দিক হওয়ার মানদণ্ডে নির্ণীত হয়নি; বরং ইসলাম তো কা'বা ঘরকে একটি কেন্দ্রীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে তাকে কিবলা [মুখ করার দিক] সাব্যস্ত করেছে, কোনো বিশেষ দিককে নয়। সুতরাং সালাত যে কোনো দিকেই হতে পারে, যদি সে দিকে কিবলা থাকে। এজন্যই সারা মুসলিম বিশ্বে এটা

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয় যে, মিসর, ত্রিপোলী ও আবিসিনিয়া [ইথিওপিয়া ও ইরিত্রিয়া] থেকে কা'বা পূর্বদিকে [হওয়ায় এসব দেশের লোকেরা পূর্বদিকে মুখ করে সালাত আদায় করে]। আবার ভারত, চীন ও আফগানিস্তান থেকে কা'বা পশ্চিম দিকে, সিরিয়া, ফিলিস্তীন ও মদিনা থেকে দক্ষিণ দিকে এবং ইয়েমেন ও লোহিত সাগরের দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চল থেকে উত্তর দিকে অবস্থিত। এছাড়া আরো বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন দিকের বিভিন্ন কোণে [দক্ষিণ-পশ্চিম, দক্ষিণ-পূর্ব ইত্যাদি] কিবলা সব্যস্ত হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ فِى الصَّلَاةِ : এ অংশটুকু বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য হলো, নামাজের বাইরে বিশেষ কোনো দিকে মুখ করা কোনো ধর্মাবলম্বীদের কাছেই প্রশংসনীয় কিংবা কাম্য নয়।

قَوْلُهُ الْمَشْرِقِ : সূর্য দেবতা শিরক জগতে 'বড় খোদা'র মর্যাদা পেয়ে আসছে। বিভিন্ন পৌত্তলিক সম্প্রদায় ব্যাপকহারে সূর্যপূজা করেছে। সূর্য যেহেতু পূর্বদিকে উদিত হতে দেখা যায়, তাই জাহিলি যুগের সম্প্রদায়গুলোর প্রায় সকলেই পূর্বদিককেও পূত-পবিত্র মনে করেছে এবং পূর্বদিকে মুখ করা ইবাদতের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সাব্যস্ত হয়েছে। পবিত্র কুরআন এ পূর্বমুখীতার উপর তীব্র আঘাত হেনে বলে দিয়েছে যে, দিক-বলয়ের পবিত্রতার ধারণা কোনোক্রমেই ইবাদত-আনুগত্য হতে পারে না; বরং আয়াতের পরবর্তী অংশে বিবৃত বিষয়গুলোই ইবাদত-বন্দেগির মর্যাদায় ভূষিত। –[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ الْمَغْرِبِ : পশ্চিম দিককে পূজাযোগ্য মনে করার ধারণাটি অবশ্য পূর্বদিকের তুলনায় অনেক কম। তবে মোটামুটি ব্যাপক হারে পশ্চিম পূজার মহামারি শিরক জগতে বিদ্যমান ছিল। সূর্যের উদয় ও অস্তের প্রতি লক্ষ্য করে মুশরিক সম্প্রদায়গুলোর চিন্তাধারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, জীবনের উৎস যদি পূর্বদিকে হয়ে থাকে তবে পশ্চিম দিকেও তো জীবনের স্থিতি কেন্দ্র ও জীবনাবসানের প্রান্ত দিক। সুতরাং এটিও শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের পাত্র হবে। পূর্ব ও পশ্চিম নাম দুটির উল্লেখ দৃষ্টান্তস্বরূপ। উদ্দেশ্য যে কোনো দিক বুঝানো, শুধু দুটি দিক নির্দিষ্ট করে বুঝানোই উদ্দেশ্য নয়। –[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ الخ : পৌত্তলিক ধ্যানধারণা খণ্ডন করার পর এখন প্রকৃত ইবাদতের ফিরিস্তি উপস্থাপন করা হচ্ছে। এতে উক্ত বিতর্কের ইতি টানা হয়েছে। সারমর্ম হলো, দিক বলয়ের পবিত্রতার ধারণা কোনোক্রমেই ইবাদত-আনুগত্য হতে পারে না; বরং আয়াতের পরবর্তী অংশে বিবৃত বিষয়গুলোই ইবাদত-বন্দেগির মর্যাদায় ভূষিত।

প্রথমে আকিদা ও আদর্শ সংস্কারে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কেননা এটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আকিদা বিশুদ্ধ না হলে কোনো আমলই গ্রহণযোগ্য হবে না। আকাইদের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রগণ্য হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান। مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ -এর মাঝে তার আলোচনা করা হয়েছে। এরপর ঈমানের অবশিষ্ট অংশের আলোচনা এসেছে– وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّيْنَ -এর মাঝে। ঈমানের পর ইবাদতের স্তর। وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ -এর মাঝে এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অতঃপর وَالْمُوْفُوْنَ থেকে মুআমালাতের আলোচনা স্থান পেয়েছে।

قَوْلُهُ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ : এখানে ہ সর্বনাম সম্পর্কে তিনিটি সম্ভবনা রয়েছে–

১. اَللّٰهُ [আল্লাহ তা'আলা]। সুতরাং 'তার প্রেমে' অর্থ– আল্লাহর প্রেমে। অর্থাৎ তাঁর সন্তুষ্টি অন্বেষায়।

২. مَال [সম্পদ] তখন অর্থ এভাবে করা হবে যে, সম্পদ ব্যয় করা সম্পদের মোহ ও আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও হবে। অর্থাৎ সর্বনাম দ্বারা 'আল্লাহ' স্থলে নিকটবর্তী اَلْمَال [সম্পদ] শব্দ উদ্দেশ্য হবে। অভিমতটি অধিকাংশের।

৩. اِتْيَان যা اٰتٰى থেকে বুঝে আসে। অর্থ– আল্লাহর পথে দান করাকে প্রিয় মনে করে অভাবীদের দান করে।

দ্বিতীয় অভিমতের মর্ম : অর্থাৎ ধনসম্পদের প্রতি মোহ ও আকর্ষণ তার অন্তরে বিদ্যমান, বাস্তব জীবনে সম্পদের প্রয়োজন ও মূল্যমানের কথাও তার জানা রয়েছে; তার কামনা-বাসনাগুলোও সদা জাগ্রত রয়েছে। নিজের জন্যে নিজের প্রিয় ও পছন্দনীয় ক্ষেত্রে ব্যয় করার পরিকল্পনা ও ইচ্ছাও তার পূর্ণরূপে বিদ্যমান। এত কিছুর পরেও আল্লাহর হুকুমের সামনে সে মাথা নত করে দেয়। নিজের কামনা-বাসনাগুলো প্রদমিত রেখে নিজের শখ ও চাহিদাগুলো আল্লাহর নির্দেশ পালনে উৎসর্গিত করে দেয়, সে তো করার সে কাজ, যা তার আল্লাহর হুকুম। তার ব্যয়ক্ষেত্র হবে শরিয়ত নির্দেশিত ব্যয়ের ক্ষেত্রসমূহ।

قَوْلُهُ ذَوِى الْقُرْبٰى : এতে ইসলামের নির্দেশিত সুষম ও প্রজ্ঞাপূর্ণ উত্তম ক্ষেত্রের বিন্যাস লক্ষণীয়। আয়াতের এ অংশে উন্নতের আর্থসামাজিক ব্যবস্থাপনার একটি সংক্ষিপ্ত রূপ পরিগ্রহ করেছে। আর্থিক সহায়তার সূচনা করতে হবে আত্মীয় ও আপনজনকে দিয়ে। এরাই কোনো বিত্তশালীর সহায়তা পাওয়ার সর্বাগ্র অধিকারী।

ভাইয়ের আকাশচুম্বী প্রাসাদ নির্মিত হবে আর বোন কুঁড়ে ঘর তৈরির জন্যে হিমশিম খাবে, সাহায্যপ্রার্থী হয়ে দুয়ারে দুয়ারে ধন্না দেবে। চাচা ব্যক্তিগত অত্যাধুনিক গাড়িতে চড়বেন, আর ভাইপো একটা রিকশার ভাড়া যোগাড় করতে প্রাণান্ত হবে– এমন হতে পারে না। যে কোনো বিত্তবানকে তার অভাবগ্রস্ত আত্মীয়, জ্ঞাতি, ভাই-বোন, ভাইপো-ভাগ্নে এবং অন্যান্য আত্মীয়ের খোঁজখবর নিতে হবে সবার আগে। এর পরের নম্বর আসবে নিজের বস্তির, নিজের পাড়া ও মহল্লার ; ক্রমান্বয়ে নিজের গ্রাম, ইউনিয়ন ও শহরের এতিম ছেলে মেয়েদের, যাদের কোনো অভিভাবক নেই, কোনো সম্পদশালী পূর্বপুরুষ, কোনো তত্ত্বধায়ক নেই। পরবর্তী স্তরে ক্রম অনুসারে আসবে উম্মতের নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও সাধারণ গরিবদের অধিকারের পালা। অতঃপর মুসাফির, প্রবাসী, পথচারী ও ফুটপাতের বাসিন্দারা, যারা পথ চলার খরচ-পাথেয় হতে বঞ্চিত এবং সে কারণে তার প্রয়োজনীয় সফর সম্পাদনে অপারগ। কিংবা বস্তিতে কোনো বহিরাগত- যার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্যে কেউ এগিয়ে আসছে না, কেউ তার দুরবস্থার সন্ধান ও তা লাঘরের ব্যবস্থা নিচ্ছে না। সবশেষে রয়েছে অনটনের শিকার সাহায্যপ্রার্থী ভিক্ষুক। এ পূর্ণাঙ্গ আর্থসমাজিক কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন হলে উম্মতের কোথাও কি দারিদ্র্য-অনটন, জীবনধারণ সংকট ও বেকার সমস্যা জনিত উপার্জন সংকটের অস্তিত্ব থাকতে পারে? –[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ الرِّقَابِ : এটি رَقَبَةٌ-এর বহুবচন। আভিধানিক অর্থ– ঘাড়, গর্দান। পরিভাষায় সেসব লোক যাদের মাথা পারাধীন কিংবা আবদ্ধ। অর্থাৎ দাস [দাসী] যারা অন্যর মালিকানাধীন কিংবা বন্দী। যে কোনো ফৌজদারি বা দেওয়ানি মকদ্দমায় গ্রেফতার হয়ে কারারুদ্ধ জীবনযাপন করছে। اَلرَّقَبَةُ مَجَازٌ عَنِ الشَّخْصِ অর্থাৎ রূপক অর্থে ব্যক্তি, মানুষ।–[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ الخ : আদর্শ ও আকিদা সংস্কারের পরে লেনদেন বিষয়েরও সংস্কার-সংশোধন করা হলো। এখন ক্রমিকে রয়েছে ইবাদত। ইবাদত তো অসংখ্য রয়েছে। তবে প্রধানত মৌলিকভাবে তা দুভাগ করা যায়। ১. দৈহিক ২. আর্থিক বা সম্পদ দ্বারা ইবাদত। এখানে اَلزَّكٰوةُ ও اَلصَّلٰوةُ বলে উভয়ের মৌলিক দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ সালাত সব ধরনের দৈহিক ইবাদতের প্রতীক এবং জাকাত সব ধরনের আর্থিক ইবাদতের প্রতীক। اَقَامَ الصَّلٰوةَ সালাত কায়েম অর্থাৎ যথা সময়ে যথানিয়মে যথার্থরূপে আদায় করতে থাকে। اٰتَى الزَّكٰوةَ অর্থাৎ শরিয়তের নির্ধারিত নীতি-পদ্ধতি অনুসারে নিয়মিত জাকাত আদায় করতে থাকে।

قَوْلُهُ الْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ : আকিদা, মুআমালা ও ইবাদতের পরে এখন আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আখলাক নৈতিকতা বা নীতি চরিত্র। عهد সব ধরনের অঙ্গীকার ও চুক্তিকে সমন্বিত করে, তা স্রষ্টার সাথে বান্দার অঙ্গীকার হোক কিংবা বান্দাদের পারস্পরিক অঙ্গীকার হোক। মু'মিন তো মিথ্যা প্রতিশ্রুতি বা মিথ্যা অঙ্গীকার নামে কোনো কিছুর সাথে পরিচিত নয়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ও বান্দার মাঝে এবং তাদের ও অন্য মানুষদের মাঝে। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ : অর্থাৎ প্রকৃত যোগ্যতা ও মাহাত্ম্যে সমৃদ্ধ এবং আনুগত্য ও আল্লাহভীতিতে পুরোপুরি উত্তীর্ণ হওয়ার নিদর্শন এগুলোই যা উপরে বর্ণিত হলো। এ মানদণ্ডে যাকে ইচ্ছা যাচাই ও পরখ করে দেখতে পার।

আয়াতের গুরুত্ব ও সারমর্ম : পবিত্র কুরআনের প্রতিটি আয়াত স্বকীয় মান-মর্যাদা ও মাহাত্ম্যপূর্ণ এবং অবশ্য পালনীয়। তবুও এ আয়াত সম্পর্কে নবী করীম ﷺ -এর হাদীসে এরূপ স্পষ্ট ভাষ্য বিদ্যমান– مَنْ عَمِلَ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ অর্থাৎ "এ আয়াত অনুসারে যে ব্যক্তি আমল করবে, সে তার ঈমান পূর্ণাঙ্গ করে নিল।"

বিষয়াভিজ্ঞগণ বলেছেন, এ আয়াতটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আয়াতসমূহের একটি এবং এতে দীনের ষোলোটি আমল সমন্বিত হয়েছে– ১. আল্লাহ এবং তার নাম ও গুণাবলিতে বিশ্বাস। ২. হাশর-নশর ও কিয়ামতে বিশ্বাস। ৩. মীযান তথা আমলের পরিমাপে বিশ্বাস। ৪. হাওযে কাওছার -এ বিশ্বাস। ৫. শাফাআতে বিশ্বাস। ৬. জান্নাত-জাহান্নামে বিশ্বাস। ৭. ফেরেশতায় বিশ্বাস। ৮. আসমানি গ্রন্থসমূহে এবং তা আল্লাহর পক্ষ হতে নাজিল হওয়াতে বিশ্বাস। ৯. নবীগণের প্রতি বিশ্বাস। ১০. আবশ্যকীয় ও পছন্দনীয় [ওয়াজিব ও মোস্তাহাব] ক্ষেত্রসমূহে সম্পদ ব্যয় করা। ১১. আত্মীয়তা সংযোগ ও বিছিন্নতা বর্জন [সম্পদ ব্যয়ের সূত্রে]। ১২. এতিমের খোঁজখবর রাখা ও তাকে ছন্নছাড়া করে না রাখা। ১৩. তদ্রূপ মিসকিনের খোঁজখবর। ১৪. পথচারী-প্রবাসীদের খোঁজখবর। ১৫. সাহায্যপ্রার্থী ভিক্ষুকের সহায়তা ও ১৬. দাসী বন্দী-মুক্তির ব্যবস্থা। –[কুরতুবী]

কোনো কোনো আধ্যাত্মবাদী বুজুর্গ এ আয়াতের অংশগুলোর সারবত্তা ও ব্যাপ্তির প্রতি লক্ষ্য করে বলেছেন যে, এ আয়াতটি শরিয়ত ও তরিকতের মূল ও মাপকাঠি। কেননা এ আয়াত প্রমাণ করে যে, মু'মিনের জন্যে শুধু মনের বিশ্বাসই যথেষ্ট নয়। আবার শুধু বাহ্য কর্মও যথেষ্ট নয়, বরং অন্তরে ঈমান থাকা যেমন জরুরি, বাইরে আহকাম ও বিধিবিধান পালনও অপরিহার্য।

অনুবাদ :

১৭৮ . يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ الْمُمَاثَلَةُ فِى الْقَتْلٰى وَصْفًا وَفِعْلًا اَلْحُرُّ يُقْتَلُ بِالْحُرِّ وَلَا يُقْتَلُ بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى وَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ اَنَّ الذَّكَرَ يُقْتَلُ بِهَا وَاَنَّهُ تُعْتَبَرُ الْمُمَاثَلَةُ فِى الدِّيْنِ فَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ وَلَوْ عَبْدًا بِكَافِرٍ وَلَوْ حُرًّا ـ

১৭৮. হে মু'মিনগণ! নরহত্যার ব্যাপারে তোমাদের উপর কিসাসের অর্থাৎ কার্যের পরিমাণ ও গুণ উভয়বিদ সমতার [হত্যার বা যখমের বদলায় সমতার] বিধান দেওয়া হয়েছে। ফরজ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে হত্যা করা হবে স্বাধীন ব্যক্তি দাসের বদলে স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে না দাসের বদলে দাস ও নারীর বদলে নারী। সুন্নায় বর্ণিত হয়েছে যে, নারীর বদলে পুরুষকে হত্যা করা যাবে। আর ধর্ম বিশ্বাসের বেলায়ও এ সমতায় খেয়াল করা হবে। সুতরাং কাফের যদি স্বাধীনও হয় তবু তার বদলে কোনো মুসলিম সে দাস হলেও তাকে হত্যা করা যাবে না।

তাহকীক ও তারকীব

كُتِبَ فُرِضَ عَلٰى : وَاَصْلُ الْكِتَابَةِ الْخَطُّ كُنِيَ بِهٖ عَنِ الْاِلْزَامِ بِقَرِيْنَةِ عَلٰى অর্থাৎ كِتَابَت শব্দের মূল অর্থ হলো, লেখা। যেহেতু তার পূর্বে عَلٰى হরফ এসেছে আর এটি اِلْزَام [চাপিয়ে দেওয়া, আরোপ করা] নির্দেশ করে, সেহেতু এখানে তা فَرْض করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

قِصَاص : এ শব্দটি قَصُّ الْاَثَرِ [সে পদচিহ্নের অনুসরণ করল] থেকে নির্গত। অনুরূপভাবে কাতেল বা হত্যাকারীও এমন পথে চলেছে, যাতে তার অনুসরণ করা হয় অর্থাৎ তাকেও হত্যা করা হয়।

اَلْقِصَاصُ مَاخُوْذٌ مِنْ قَصِّ الْاَثَرِ فَكَاَنَ الْقَاتِلُ سَلَكَ طَرِيْقًا يُخْتَصُّ اَثَرُهٗ فِيْهَا اَيْ يُتَّبَعُ وَيُمْشٰى عَلٰى سَبِيْلِهٖ فِىْ ذٰلِكَ وَمِنْهُ سُمِّىَ قِصَّةٌ لِاَنَّ الْقِصَصَ الْحِكَايَةُ يُسَاوِى الْمَحْكِىْ ـ

اَلْمُمَاثَلَةُ : এ শব্দ বৃদ্ধির দ্বারা এ সন্দেহের নিরসন করা হয়েছে যে, قِصَاص -এর صِلَه হিসেবে فِىْ আসে না। অথচ এখানে فِىْ ব্যবহৃত হয়েছে। জবাব : قِصَاص শব্দে مُمَاثَلَة -এর অর্থ নিহিত রয়েছে, তাই صِلَه হিসেবে فِىْ ব্যবহার করা সঠিক আছে। (وَلِتَضَمُّنِهٖ مَعْنَى الْمُمَاثَلَةِ عُدِّىَ بِفِىْ وَقِيْلَ فِىْ لِلسَّبَبِيَّةِ اَىْ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى : যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে সৎকর্ম ও পুণ্যের মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে যার উপর হেদায়েত ও মুক্তি নির্ভরশীল ছিল। সেই সঙ্গে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আহলে কিতাব সেসব গুণ হতে বঞ্চিত। স্পষ্ট ভাষায় বলে দেওয়া হয়েছে যে, সে গুণাবলি ব্যতীত দীনে সত্যবাদী ও মুত্তাকী কেউ হতে পারে না। কাজেই এখন একমাত্র মুসলিম ব্যতীত আর কেউ সে মর্যাদায় ভূষিত হতে পারে না, আহলে কিতাবও নয়, অজ্ঞ আরববাসীও নয়। তাই আর সকলকে উপেক্ষা করে কেবল মু'মিনগণকে সম্বোধন করে পুণ্য ও সৎকর্মের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা তথা কায়িক ও আর্থিক ইবাদতসমূহ এবং বিবিধ রকম লেনদেন ইত্যাদি বিষয়ে তা'লীম দেওয়া হয়েছে। কেননা এসব শাখা-প্রশাখা পালন করা তার পক্ষেই সম্ভব যে উপরিউক্ত মূলনীতিসমূহে পরিপক্বতা অর্জন করেছে। অন্যসব লোককে এ বিষয়ে সম্বোধন করা'র উপযুক্তই মনে করা হয়নি। এজন্য তাদের ভীষণভাবে লজ্জিত হওয়া উচিত। এবারে এসব শাখাগত বিধিবিধান বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে মু'মিনগণের হেদায়েত ও তা'লীমই মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে প্রসঙ্গত কোথাও

স্পষ্টভাষায় এবং কোথাও ইঙ্গিতে অন্যদের ত্রুটিও দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন- كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى -এর মাঝে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ইহুদি প্রভৃতি সম্প্রদায় কিসাসের ক্ষেত্রে যে নীতি অবলম্বন করেছে, তা আল্লাহর আইনের বিপরীতে তাদের মনগড়া বিষয়, যাতে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, পূর্বের মৌলিক বিষয়সমূহের মধ্যে না আসমানি কিতাবে তাদের বিশ্বাস পূর্ণাঙ্গরূপে অর্জিত ছিল, না নবীগণের প্রতি তাদের ঈমান পরিপক্ব ছিল। এমনিভাবে না তারা মহান আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে, না দুঃখকষ্ট ও বিপদ-আপদে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে, অন্যথায় তারা নিজেদের কোনো আত্মীয় বা আপনজন নিহত হয়ে গেলে এরূপ অধৈর্য ও খামখোয়ালীপনার পরিচয় দিত না যে, তারা মহান আল্লাহর আইন, রাসূলের নির্দেশ ও কিতাবের তা'লীম সব কিছু বিসর্জন দিয়ে নিরপরাধ লোকে হত্যা করার আদেশ করত। –[তাফসীরে উসমানী]

এ থেকে একথাও বুঝে আসে যে, ইসলাম তার অনুগামীদের ব্যাপারে পার্থিব জীবনেও সমুন্নত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকার আশাবাদী। এ উম্মত পর্থিব ক্ষমতার অীধকারী হবে, এটি একটি স্বীকৃত মূলনীতি। মুসলিম জাতির শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে লাগাতার কাফেরদের প্রভাব-প্রতিপত্তির অধীন হয়ে থাকা যেমন ইসলামের প্রাথমিক স্বীকৃত নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত-ই নয়। [কিন্তু] ফৌজাদারি হোক কিংবা দেওয়ানি, উভয় শ্রেণির দণ্ডবিধির অধিকাংশ ধারাই তো এমন, যার বাস্তবায়ন প্রতিষ্ঠিত শাসন ব্যবস্থা ইসলামি হওয়ার উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ এসব বিধান ও ধারা প্রয়োগের জন্য উম্মতের অধিকারে যথাযথ ক্ষমতাও তো থাকতে হবে।

শানে নুযূল : জাহিলি যুগে তো আইনের শাসন ছিল না বললেই চলে। তাই 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতিই বিরাজমান ছিল। শক্তিমান গোত্র দুর্বল গোত্রকে যেভাবে ইচ্ছা জুলুম করত। জুলুমের একটি সুরত এই ছিল যে, কোনো শক্তিশালী গোত্রের কোনো লোক নিহত হলে শুধু হত্যাকারীর বদলে তার গোত্রের একাধিক লোককে হত্যা করে ফেলত। কখনো পূর্ণ গোত্রকেই ধ্বংস করে দেওয়ার চেষ্টা করত। পুরুষের স্থলে মহিলাকে এবং গোলামের বদলে আজাদকে হত্যা করে ফেলত।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) ইবনে আবী হাতিমের সূত্রে বর্ণনা করেন, ইসলামের আবির্ভাবের কিছুকাল পূর্বে দুটি গোত্রের মাঝে যুদ্ধ বাঁধে। উভয় পক্ষের বহু নারী-পুরুষ ও স্বাধীন-পরাধীন লোকজন নিহত হয়। তাদের মকদ্দমার মীমাংসা না হতেই ইসলামের আবির্ভাব ঘটে। বিবদমান উভয় গোত্রই ইসলামের গণ্ডিভুক্ত হয়ে যায়। মুসলমান হওয়ার পর পরস্পরের নিহতদের রক্তপণ গ্রহণের আলাপ-আলোচনা শুরু হয়। তন্মধ্যে যে গোত্রটি ছিল শক্তিশালী তারা বলল, আমরা যতক্ষণ আমাদের গোলামদের বদলে তাদের আজাদ ব্যক্তিকে এবং নারীদের বদলে পুরুষকে হত্যা না করব ততক্ষণ রাজি হব না। তাদের এহেন জাহিলি কর্মকাণ্ডের খণ্ডনে এ আয়াত নাজিল হয়- اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ

যার সারমর্ম হলো তাদের দাবির খণ্ডন করা। ইসলাম সে যুগের নিপীড়নমূলক প্রথাগুলোর সমাধি রচনা করে নিজের ইনসাফপূর্ণ এ আইন বাস্তবায়ন করেছে যে, যে কতল করেছে, কেবল তাকেই কতল করা হবে। কোনো নারী কাউকে কতল করলে তার বদলে কোনো নির্দোষ পুরুষকে হত্যা করা হবে না। অনুরূপভাবে কোনো গোলাম কাউকে কতল করলে তার বদলে কোনো নির্দোষ পুরুষকে হত্যা করা হবে না।

আয়াতের ব্যাখ্যা কিছুতেই এমন নয় যে, কোনো নারীকে যদি কোনো পুরুষ কতল করে অথবা গোলামকে কোনো আজাদ ব্যক্তি কতল করে তাহলে তার থেকে কিসাস গ্রহণ করা হবে না; বরং কিসাসে [হত্যাকারী ও নিহতের মাঝে] সমতা লক্ষণীয় হবে এবং খুন ও জীবনের বিচারে সকলেই সমান সাব্যস্ত হবে। অর্থাৎ এমন হবে না যে উঁচু স্তরের কোনো ব্যক্তির জীবনের মূল্য সাধারণ স্তরের কোনো ব্যক্তির চেয়ে অধিক ধার্য হবে। যেমনটি জাহিলি যুগের আরবদের রীতি ছিল।

জাহিলি যুগের আরবে এরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল যে, কোনো স্বাধীন ব্যক্তি কোনো ক্রীতদাসকে মেরে ফেললে কিসাস স্বরূপ সেই অপরাধী স্বাধীন ব্যক্তির জীবননাশ করার পরিবর্তে কোনো গোলামের জীবননাশ করা হতো। এটা শুধু প্রাচীন জাহেলিয়াতেই নয়; বরং বর্তমান পৃথিবীর তথাকথিত সভ্য জাতির মাঝেও এরূপ দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। আমেরিকার ন্যায় তথাকথিত সভ্য দেশে তো আজ অবধি একজন সাদা [white] মানুষের রক্ত একজন নিগ্রো [কালো মানুষ negro] -এর রক্তের চেয়ে অনেক অনেক দামি। ওদিকে ফিরিংগী [ইউরোপীয়] শাসকরা তো তাদের একজন নিহত ব্যক্তির বিনিময়ে হত্যাকারীদের অনেকজনের জীবন অবলীলায় বিনাশ করে থাকে।

قَوْلُهُ الْمُمَاثَلَةُ : উদ্দেশ্য হলো কিসাসে [হত্যাকারী ও নিহতের মাঝে] সমতা লক্ষণীয় হবে এবং খুন ও জীবনের বিচারে সকলেই সমান সাব্যস্ত হবে। অর্থাৎ এমন হবে না যে, উঁচু স্তরের কোনো ব্যক্তির জীবনের মূল্য সাধারণ স্তরের কোনো ব্যক্তির চেয়ে অধিক ধার্য হবে।

قَوْلُهُ الْحُرُّ بِالْحُرِّ : অর্থাৎ প্রত্যেক স্বাধীন নিহত ব্যক্তির বদলে কেবল সেই স্বাধীন এক ব্যক্তিকেই হত্যা করা যেতে পারে, যে এই নিহতের হত্যাকারী। এমন হতে পারে না যে, সেই একজনের বদলে হত্যাকারী গোত্র হতে নিজেদের ইচ্ছামতো দুই বা ততোধিক ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে।

قَوْلُهُ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ : অর্থাৎ প্রত্যেক গোলামের বদলে সেই এক গোলামকেই হত্যা করা হবে যে তার হত্যাকারী। এরূপ করা যাবে না যে, অভিজাত শ্রেণির গোলামের বদলে নিম্নশ্রেণির একজন পুরুষকে হত্যা করবে, অথচ হত্যাকারী তাদের একজন গোলাম।

قَوْلُهُ الْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى : অর্থাৎ প্রত্যেক নারীর বদলে সেই নারীকেই হত্যা করা যাবে, যে তাকে হত্যা করেছে। এটা হতে পারে না যে, উচ্চশ্রেণির নারীর বদলে নিম্নশ্রেণির একজন পুরুষকে হত্যা করবে, অথচ হত্যাকারী তাদের একজন নারী। সারকথা, কিসাস গ্রহণে প্রত্যেক গোলাম অপর গোলামের সমতুল্য, এই সমতুল্যতা রক্ষা করতে হবে। আহলে কিতাব ও অজ্ঞ আরবরা যে বাড়াবাড়ি করত তা পরিত্যাজ্য।

মাসআলা : এক্ষেত্রে হানাফী ফিকহের দুটি ধারা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য–

১. নিহত ব্যক্তি কাফের হয়েও যদি জিম্মি [ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিক] হয়, তবে তাকে হত্যা করার কিসাসও হত্যাকারীর উপর বর্তাবে, এমনকি হত্যাকারী মুসলমান হলেও। তবে হ্যাঁ, নিহত কাফের যদি হারবী [অমুসলিম দেশের বিধর্মী নাগরিক] হয়, সে ক্ষেত্রে হারবী কাফের যেহেতু বিদ্রোহী ও শত্রু তালিকাভুক্ত এবং ইসলামি রাষ্ট্রের দুশমন এবং এ কারণে তার নাম দেওয়া হয়েছে হারবী حَرْبِى [যুদ্ধরত প্রতিপক্ষ] সুতরাং স্পষ্টতই তাকে হত্যা করা হলে তার হত্যাকারীর জন্যে কিসাস সাব্যস্ত হবে না।

২. সজ্ঞান হত্যার ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির বদলে স্বাধীন হত্যাকারীকে তো হত্যা করা হবেই, এমনকি গোলাম ও ক্রীতদাসের হত্যাকারী [তার মনিব ব্যতীত] কোনো স্বাধীন ব্যক্তি হলেও কিসাস স্বরূপ হত্যাকারী স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে। তদ্রূপ নিহত নারীর কিসাসে হত্যাকারিণী নারীকে তো হত্যা করা হবেই এমনকি নিহত নারীর বদলে তার হত্যাকারী পুরুষ হলে তাকেও হত্যা করা হবে।

قَوْلُهُ الْقَتْلٰى : এটি قَتِيْلٌ-এর বহুবচন। অর্থ– নিহত ব্যক্তি।

স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে হত্যা (قَتْل عَمْد) -এর শাস্তি পৃথিবীর প্রায় সব আইনেই মৃত্যুদণ্ডই রয়েছে। অবশ্য সজ্ঞান হত্যার সংজ্ঞা **নির্ণয়ে** যথেষ্ট মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় সজ্ঞান [عَمْد] হত্যা হলো, কেউ কাউকে স্বেচ্ছায় লৌহাস্ত্র **[মারণাস্ত্র]** দ্বারা কিংবা চামড়া ও গোশত কেটে ফেলে এমন কোনো মারাত্মক অস্ত্রের আঘাতে মেরে ফেলা।

قَوْلُهُ وَصْفًا وَفِعْلًا : مُمَاثَلَت فِى الْوَصْف -এর মর্ম হলো, স্বাধীন এবং গোলামের পার্থক্য হবে না। আর **مُمَاثَلَت فِى الْفِعْل** -এর মর্ম হলো, যে পদ্ধতিতে এবং যে অস্ত্র দ্বারা নিহতের হত্যা করা হয়েছে হত্যাকারীকেও সে পদ্ধতি ও সে অস্ত্র **দ্বারাই** হত্যা করা হবে। আগুনে জ্বলিয়ে হত্যা করলে ঘাতককেও জ্বালিয়ে মারা হবে। পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করা হলে ঘাতককেও ডুবিয়ে মারা হবে। অনুরূপভাবে অন্যান্য ক্ষেত্রে। তবে এটা ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক (র.)-এর মাযহাব অনুযায়ী। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে فَلَا قَوَدَ اِلَّا بِالسَّيْفِ অর্থাৎ 'তরবারি ছাড়া কিসাস প্রয়োগ করা যাবে না।' যে কোনো অস্ত্র দ্বারাই সে কাউকে হত্যা করুক তাকে তরবারি দ্বারাই হত্যা করা হবে।

আহনাফের ব্যাখ্যা ও মাযহাব : এখানে প্রশ্ন হলো স্বাধীন ব্যক্তি যদি কোনো গোলামকে কিংবা পুরুষ কোনো নারীকে হত্যা করে তাহলে কিসাস গ্রহণ করা হবে কিনা? এ আয়াত সে ব্যাপারে নীরব। এ নিয়ে ইমামগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। এক আয়াতে আছে– اِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ অর্থাৎ প্রাণের বদলে প্রাণ [৫ : ৪৫] এক হাদীসে আছে– اَلْمُسْلِمُوْنَ

تَتَكَافَأُ دِمَائُهُمْ অর্থাৎ 'মুসলিমগণের পরস্পরের রক্ত সমান সমান।' এর ভিত্তিতে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, উভয় অবস্থায় কিসাস জারি হবে। অর্থাৎ শক্তিমান ও দুর্বল, সুস্থ ও পীড়িত, সুস্থ ও পঙ্গু প্রমুখ পক্ষ যেমন কিসাসের ক্ষেত্রে বরাবর গণ্য হয় তেমনি স্বাধীন ও গোলাম এবং পুরুষ ও নারী এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট সমপর্যায়ের। তবে শর্ত হলো নিহত গোলাম স্বাধীন ব্যক্তির মালিকানাধীন হতে পারবে না। কেননা এ অবস্থা তার নিকট কিসাসের বিধান হতে ব্যতিক্রম। কোনো মুসলিম যদি কাফের জিম্মিকে হত্যা করে তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তার উপর কিসাস জারি হবে না। তবে মুসলিম ও কুফরি রাষ্ট্রের কাফিরের মধ্যে কারো মতেই কিসাস জারি হবে না। -[তাফসীরে উসমানী]

قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ : لاَ دَلَالَةَ فِي الْآيَةِ عَلَى اَنْ لَا يُقْتَلَ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ كَمَا لَا يَدُلُّ عَلَى عَكْسِهِ لِأَنَّ الْمَفْهُوْمَ اِنَّمَا يُعْتَبَرُ حَيْثُ لَمْ يَظْهَرْ لِلتَّخْصِيْصِ غَرَضٌ سِوَى اِخْتِصَاصِ الْحُكْمِ وَقَدْ بَيَّنَّا مَا كَانَ الْغَرَضُ وَهُوَ اَنَّ نُزُوْلَ هٰذِهِ الْآيَةِ فِيْ حَيَّيْنِ مِنْ اَحْيَاءِ الْعَرَبِ بَيْنَهُمَا دِمَاءٌ وَكَانَ لِاَحَدِهِمَا طَوْلٌ عَلَى الْآخَرِ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ حَتّٰى اَسْلَمُوْا فَاَقْسَمُوْا لَيُقْتَلَنَّ الْحُرُّ مِنْكُمْ بِالْعَبْدِ وَالذَّكَرُ بِالْاُنْثٰى فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ رَدًّا لِمَا قَالُوْهُ وَاُمِرُوْا اَنْ يَتَبَاوَؤُا اَىْ يَتَكَافَئُوْا -(حَاشِيَة جَلَالَيْن صَفْحَه ٢٥، حَاشِيَة ١٨)

ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী (র.) عَبْد -এর মোকাবিলায় حُرّ -কে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন এবং এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন- لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيْ ; এমনিভাবে তাঁরা কিয়াস দ্বারাও দলিল পেশ করেছেন।

فَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ وَلَوْ عَبْدًا بِكَافِرٍ وَلَوْ حُرًّا এ মতটি ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মাযহাব অনুযায়ী। আহনাফের মত হলো, মুসলমানকে জিম্মি কাফেরের মোকাবিলায় হত্যা করা হবে।

শাফেয়ীদের দলিল : নবী করীম ﷺ -এর হাদীস- لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ **আহনাফের দলিল :** হাদীস শরীফে এসেছে اِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَتَلَ مُسْلِمًا بِذِمِّيٍّ **শাফেয়ীদের দলিলের জবাব :** সে হাদীসে كَافِر حَرْبِي উদ্দেশ্য; كَافِر ذِمِّيْ নয়। কেননা كَافِر حَرْبِي যেন মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত, তাই তাকে হত্যা করলে কিসাস আসবে না।

قَوْلُهُ وَلَا يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ : এ ব্যাখ্যাটি করা হয়েছে مَفْهُوم مُخَالِف হিসেবে। অবশ্য اَلْعَبْدُ بِالْعَبْدِ -এর মাঝে مَفْهُوم مُخَالِف -এর اِعْتِبَار করেননি। কেননা مَفْهُوم مُوَافِق এবং কিয়াস حُرّ -এর মোকাবিলায় عَبْد -এর কিসাস ওয়াজিব হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে। অর্থাৎ যখন عَبْد -এর মোকাবিলায় عَبْد -কে হত্যা করা হয় তখন حُرّ -এর মোকাবিলায় عَبْد -কে بِطَرِيْقِ اَوْلٰى হত্যা করা হবে। আর তাদের নিকট [শাফেয়ী মতে] مَفْهُوم مُخَالِف -এর উপর কিয়াস অগ্রগণ্য। অনুরূপভাবে اَلْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى -এর মাঝেও مَفْهُوم مُخَالِف -এর اِعْتِبَار করেননি। কেননা পুরুষের মোকাবিলায় মহিলাকে হত্যা করার ব্যাপারে ইজমা রয়েছে। এমনিভাবে মহিলার মোকাবিলায়ও পুরুষকে হত্যা করা হবে। কেননা এ সম্পর্কে হাদীসের প্রমাণ রয়েছে- وَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ اَنَّهُ ﷺ قَتَلَ يَهُوْدِيًّا بِاَمْرِهِ

মু'তাযিলাদের মতের খণ্ডন : আয়াতের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, এতে ভ্রান্ত উপদল মু'তাযিলাদের মতের খণ্ডন রয়েছে। কেননা মু'তাযিলারা কবীরা গুনাহ সম্পাদনকারীকে কাফির ও ইসলামের গণ্ডিবহির্ভূত সাব্যস্ত করে । এ আয়াতে সর্বোচ্চ কবীরা গুনাহ অর্থাৎ কোনো মুসলমানকে হত্যার বিবরণ রয়েছে। অথচ হত্যাকারী মুসলমানই পরিগণিত হয়েছে, তাকে ইসলামের পরিবেষ্টন হতে বহিষ্কৃত ঘোষণা করা হয়নি।

فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنَ الْقَاتِلِيْنَ مِنْ دَمِ اَخِيْهِ الْمَقْتُوْلِ شَىْءٌ بِاَنْ تُرِكَ الْقِصَاصُ مِنْهُ وَتَنْكِيْرُ شَىْءٌ يُفِيْدُ سُقُوْطَ الْقِصَاصِ بِالْعَفْوِ عَنْ بَعْضِهِ وَمِنْ بَعْضِ الْوَرَثَةِ وَفِىْ ذِكْرِ اَخِيْهِ تَعَطُّفٌ دَاعٍ اِلَى الْعَفْوِ وَاِيْذَانٌ بِاَنَّ الْقَتْلَ لَا يَقْطَعُ اُخُوَّةَ الْاِيْمَانِ وَمَنْ مُبْتَدأٌ شَرْطِيَّةٌ اَوْ مَوْصُوْلَةٌ وَالْخَبَرُ فَاتِّبَاعٌ اَىْ فَعَلَى الْعَافِىْ اِتِّبَاعٌ لِلْقَاتِلِ بِالْمَعْرُوْفِ بِاَنْ يُطَالِبَهُ بِالدِّيَةِ بِلَا عُنْفٍ وَتَرْتِيْبُ الْاِتِّبَاعِ عَلَى الْعَفْوِ يُفِيْدُ اَنَّ الْوَاجِبَ اَحَدُهُمَا وَهُوَ اَحَدُ قَوْلَىِ الشَّافِعِىِّ وَالثَّانِى الْوَاجِبُ الْقِصَاصُ وَالدِّيَةُ بَدْلٌ عَنْهُ فَلَوْ عَفَا وَلَمْ يُسَمِّهَا فَلَا شَىْءَ وَرَجَّحَ وَ عَلَى الْقَاتِلِ اَدَاءٌ لِلدِّيَةِ اِلَيْهِ اِلَى الْعَافِىْ وَهُوَ الْوَارِثُ بِاِحْسَانٍ بِلَا مَطْلٍ وَلَا بَخْسٍ -

অনুবাদ : নিহত ভাইয়ের খুন হতে হত্যাকারীর পক্ষে কিছু ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির পক্ষ হতে কিসাসের দাবি পরিত্যাগ করা হলে, مِنْ اَخِيْهِ شَىْءٌ এ স্থানে شَىْءٌ শব্দটি نَكِرَه অর্থাৎ অনির্দিষ্টবাচক রূপে ব্যবহার করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কিসাসের কিছু অংশ মার্জনা করা বা উত্তরাধিকারীগণের কারো কর্তৃক তা মার্জনা করা দ্বারা পুরো কিসাসের দাবিই রহিত হয়ে যায়। اَخِيْهِ [তার ভাইয়ের] শব্দটি তৎপ্রতি করুণা উদ্রেকের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। আর এটা ক্ষমা প্রদর্শনের প্রতি একজনকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারে। এদিকে ইঙ্গিত করাও এর উদ্দেশ্য যে, হত্যা পরস্পর ঈমানী ভ্রাতৃত্বকে বিনষ্ট ও বিচ্ছিন্ন করে না। فَمَنْ عُفِىَ -এর- مَنْ শব্দটি شَرْطِيَّة বা শর্তবাচক কিংবা مَوْصُوْلَة বা সংযোগবাচক শব্দ। এটা مُبْتَدَأ বা উদ্দেশ্য। তার خَبَر বা বিধেয় হলো فَاتِّبَاعٌ তখন তা অনুরসণ করা উচিত অর্থাৎ মার্জনাকারীর উচিত হত্যাকারীর অনুসরণ করা সদয়ভাব, অর্থাৎ রুক্ষভাব না দেখিয়ে দিয়ত বা রক্তপণের অর্থের তাগাদা করা عَفْو বা ক্ষমার পর তার অনুবর্তীতে ক্রমিকভাবে اِتِّبَاع বা হত্যাকারীকে অনুসরণ সংক্রান্ত বিধানের উল্লেখ করা দ্বারা বুঝা যায়, এ দুটি বিধান অর্থাৎ কিসাস ও দিয়তের যে কোনো একটিই বিধেয়। এটাই ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত। তাঁর অপর একটি অভিমত হলো, এ বিষয়ে মূলত ওয়াজিব হলো কিসাস আর দিয়ত হলো তার বদল। সুতরাং কেউ যদি দিয়তের কোনো উল্লেখ না করে হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেয় তবে তার উপর কিছুই আর ধার্য হবে না। এ মতটিকেই অধিক গ্রহণীয় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং হত্যাকারীর কর্তব্য হলো তাকে মার্জনাকারীকে অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর নিকট ভালোভাবে অর্থাৎ টালবাহানা বা তার ক্ষতি না করে উক্ত দিয়ত আদায় করে দেওয়া।

তাহকীক ও তারকীব

عُفِىَ : ক্ষমা করা হলো। تَعَطُّفٌ : করুণা উদ্রেক। دَاعٍ : আহ্বানকারী, উদ্বুদ্ধকারী। اِيْذَانٌ : ইঙ্গিত করা, ঘোষণা দেওয়া। اُخُوَّةُ الْاِيْمَانِ : ঈমানী ভ্রাতৃত্ব। اَلْعَافِىْ : মার্জনাকারী। عُنْفٌ : রুক্ষতা, কঠোরতা। مَطْلٌ : টালবাহানা। بَخْسٌ : ক্ষতি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَمَنْ عُفِىَ لَهُ : অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশদের মধ্যে যদি রক্তের দাবি ক্ষমা করে দেয়, তবে হত্যাকারীকে কিসাস স্বরূপ হত্যা করা যাবে না। এখন দেখতে হবে তারা তাকে কোন প্রকারে ক্ষমা করেছে। কোনো রকম আর্থিক বিনিময় ব্যতীত কেবল ছওয়াবের উদ্দেশ্য ক্ষমা করেছে, নাকি শরয়ী দিয়ত ও আপস-রফা করেছে? প্রথম অবস্থায় হত্যাকারীর

ওয়ারিশদের দাবিদাওয়া হতে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় অবস্থায় তার জন্য উচিত বিনিময়ের সে অর্থ কৃতজ্ঞতার সাথে খুশিমনে আদায় করে দেওয়া।

قَوْلُهُ مِنْ أَخِيْهِ : أَخِيْهِ ভাই শব্দের আলঙ্কারিক ব্যবহার এ বর্ণনাধারার চমকপ্রদ লক্ষণীয় বিষয়। হত্যাজনিত পরিস্থিতির চেয়ে অধিক উত্তেজনা ও প্রতিশোধ স্পৃহা অন্য কোনো ক্ষেত্রে হতে পারে না। এহেন চরম মুহূর্তেও ভাই শব্দ উল্লেখ করে বুঝিয়ে দেওয়া হলো যে, কোনো হত্যাকারী খুনের ন্যায় মারাত্মক অপরাধ সত্ত্বেও কাফির হয়ে যায় না, ইসলামি ভ্রাতৃত্বের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যায় না। নিহতের অভিভাবক ও উত্তরাধিকারী তখনও হত্যাকারীর ধর্মীয় ভাই-ই থেকে যায়।

قَوْلُهُ شَىْءٌ : [কিছুটা] শব্দটি খুবই গুরুত্ববহ। অপরিহার্য দণ্ডের অংশবিশেষ ছাড় দেওয়া; সম্পূর্ণ ক্ষমা করে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে না। এর মর্ম হলো, নিহত ব্যক্তির আপনজন ও উত্তরাধিকারীরা যদি মনে করে যে, তারা হত্যাকারীর প্রাণদণ্ড দাবি করবে না, বরং এর চেয়ে লঘু কোনো দণ্ড হওয়া পছন্দ করবে। কিংবা তারা [রক্তপণ নেবে, কিংবা] রক্তপণের [দিয়ত] পূর্ণ পরিমাণ থেকে অংশবিশেষ মাফ করে দিয়ে দায়মুক্ত করতে উদ্যত হবে।

قَوْلُهُ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ : [এবং অহেতুক উত্তেজনা ও হাঙ্গামা সৃষ্টির সুযোগ গ্রহণ না করা বাঞ্ছনীয়।] অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির পক্ষে যারা এখন বাদী ও ফারিয়াদির ভূমিকায় অবতীর্ণ, তারা তাদের প্রাপ্য রক্তপণের দাবির পরিমাণ ও তা আদায় করার ব্যবস্থা যুক্তিসঙ্গতরূপে ও মানবতাসম্মত পন্থায় সম্পাদন করবে। অহেতুক একগুঁয়েমি ও উত্তেজনা সৃষ্টির মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে সংকটে ফেলবে না কিংবা তারাও উত্তেজনা বৃদ্ধির কারণ হবে না। কেননা এতে হাঙ্গামা ও অশান্তিই বৃদ্ধি পাবে।

পরিপূর্ণ উত্তেজনা ও পরিস্থিতির উত্তপ্ততার স্পর্শকাতর সময়ে এভাবে স্থিরতা, উদারতা ও ঠাণ্ডা মাথায় সতর্কতার সাথে ও পারস্পরিক সৌহার্দের ভিত্তিতে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার প্রতি গুরুত্ব প্রদান একমাত্র ইসলামি শরিয়তেরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

قَوْلُهُ وَتَرْتِيْبُ الْاِتِّبَاعِ عَلَى الْعَفْوِ الخ : এ ইবারত দ্বারা একথা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, দিয়তটা কিসাসের বদল বা (تَابِع) অনুগামী নয়; বরং তা স্বতন্ত্রভাবে ওয়াজিব হয়। কেননা কুরআনে কারীম اِتِّبَاع তথা দিয়তের দাবি করাকে عَفْو قِصَاص বা কিসাস ক্ষমা করার উপর মুরাত্তাব (مُرَتَّب) করেছে। অর্থাৎ প্রথম স্তর হলো কিসাসের। যদি কোনোভাবে কিসাস সাকেত হয়ে যায়, তাহলে এমনিতেই দিয়ত ওয়াজিব হয়ে যাবে। এ থেকে বুঝা গেল যে, দিয়ত কিসাসের বদল নয় যে, কিসাস ক্ষমা করা হলে দিয়তও এমনিতেই ক্ষমা হয়ে যাবে; বরং উভয়টির মধ্যে একটি ওয়াজিব। তন্মধ্যে কিসাস মুকাদ্দম হবে। এটি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর প্রথম অভিমত। যদি শুধু কিসাস ওয়াজিব হতো এবং দিয়ত তার বদল হতো, তাহলে সাধারণভাবে কিসাস ক্ষমা করার দ্বারা দিয়তের কথা উল্লেখ না করলে তা ওয়াজিব হবে না। অথচ দিয়ত উল্লেখ ছাড়াই ওয়াজিব হয়।

قَوْلُهُ وَالثَّانِى الْوَاجِبُ الْقِصَاصُ وَالدِّيَةُ عَنْهُ : এটি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দ্বিতীয় অভিমত । এ মতের সারকথা হলো, মূলত ওয়াজিব হলো কিসাস, আর দিয়ত তার বদল। যদি মৃতের ওয়ারিশগণ কিসাস ক্ষমা করে দেয় এবং দিয়তের কথা উল্লেখ না করে, তাহলে দিয়তও এমনিতেই ক্ষমা হয়ে যাবে । আর এটিই হলো قَوْل رَاجِح বা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মত। কেননা নির্দিষ্টভাবে কিসাস ওয়াজিব হওয়ার নস বিদ্যমান রয়েছে।

قَوْلُهُ وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ : এ বক্তব্যের লক্ষ্য হত্যাপরাধী ও তার পক্ষের লোকেরা। অর্থাৎ বিবাদী বা অপরাধী পক্ষের কর্তব্য হবে [আলোচনার মাধ্যমে] যে পরিমাণ অর্থদণ্ড স্থির হয়ে গিয়েছে, তাতে কোনো প্রকার টালবাহানা, গড়িমসি ও মারপ্যাঁচের আশ্রয় না নিয়ে এবং পরিস্থিতির তিক্ততা সৃষ্টি না করে তা ফরিয়াদি পক্ষ ও নিহতের উত্তরাধিকারীদের হাতে সুন্দর ও ভদ্রভাবে পৌছে দেবে। اِلَيْهِ-এর সর্বনাম নিহতের পক্ষকে নির্দেশ করে। اِلَيْهِ-এর সর্বনাম اَخٌ ভাই -এর জন্য [মাদারিক]। মানব চরিত্রের এসব সূক্ষ্ম ও নাজুক বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে হত্যাকারী ও নিহত উভয় পক্ষের মনের অবস্থা ও তাদের স্বার্থ ও কল্যাণের প্রতি নজর রেখে সুষ্ঠু ও সুষম আইন প্রণয়ন মনুষ্য সাধ্যের বহির্ভূত। কেননা আইন প্রণয়নের জন্য কলমধারীর হাত তো অবশেষে একটা শুকনো ও ঠুনকো মানুষেরই হাত। এতে বিভিন্নমুখী সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে আইন প্রণয়ন একমাত্র মানব স্রষ্টা মহান সত্তার পক্ষেই সম্ভব।

ذٰلِكَ الْحُكْمُ الْمَذْكُوْرُ مِنْ جَوَازِ الْقِصَاصِ وَالْعَفْوِ عَنْهُ عَلَى الدِّيَةِ تَخْفِيْفٌ تَسْهِيْلٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةٌ بِكُمْ حَيْثُ وَسَّعَ فِيْ ذٰلِكَ وَلَمْ يَحْتِمْ وَاحِدًا مِنْهُمَا كَمَا حَتَمَ عَلَى الْيَهُوْدِ الْقِصَاصَ وَعَلَى النَّصَارٰى الدِّيَةَ فَمَنِ اعْتَدٰى ظَلَمَ الْقَاتِلَ بِاَنْ قَتَلَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَيِ الْعَفْوِ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيْمٌ مُؤْلِمٌ فِى الْاٰخِرَةِ بِالنَّارِ اَوْ فِى الدُّنْيَا بِالْقَتْلِ.

অনুবাদ : এটা কিসাস গ্রহণ বা তদস্থলে দিয়ত প্রদান করতঃ কিসাস হতে ক্ষমা লাভ করার উল্লিখিত বিধান তোমাদের উপর তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে ভার লাঘব অর্থাৎ বিধানকে আরো সহজসাধ্য করা ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ। তাই এ বিষয়ে তিনি তোমাদেরকে বেশ কিছু সুবিধা দিয়েছেন। ইহুদি সম্প্রদায়ের উপর যেমন কেবল কিসাসের বিধান আর খ্রিস্টানদেরকে কেবল দিয়তের বিধান দেওয়া হয়েছিল, এ স্থানে তোমাদের জন্য এতদুভয়ের একটিকে অত্যাবশ্যক ও জরুরি বলে সাব্যস্ত করা হয়নি। এর অর্থাৎ ক্ষমা করার পরও যে সীমালঙ্ঘন করে অর্থাৎ হত্যাকারীর উপর জুলুম করে, যেমন তাকে হত্যা করে ফেলল তার জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ বেদনাকর শাস্তি। আখিরাতে জাহান্নামের, দুনিয়াতে নিহত ও খুন হওয়ার।

তাহকীক ও তারকীব

جَوَازُ الْقِصَاصِ : কিসাসের বৈধতা। تَخْفِيْفٌ : সহজসাধ্য করা, লাঘব করা। وَلَمْ يَحْتِمْ : অত্যাবশ্যক করা হয়নি।।

اِعْتَدٰى : সীমালঙ্ঘন করেছে।

اَلْحُكْمُ الْمَذْكُوْرُ : এ ইবারতের মাধ্যমে একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি হলো– ذٰلِكَ এখানে اِسْمِ اِشَارَه وَاحِد কিন্তু তার মধ্যে مُشَارٌ اِلَيْهِ তিনটি। যথা– ১. কিসাসের বৈধতা ২. ক্ষমা ৩. দিয়ত।

জবাব হলো, ذٰلِكَ -এর মারজি' হলো উল্লিখিত বিধান, যার মধ্যে এ তিনটি বিধান অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ ذٰلِكَ : ঐ পন্থা অর্থাৎ فَمَنْ عُفِىَ -তে উল্লিখিত বিধান অর্থাৎ ক্ষমা ও দিয়ত গ্রহণ সংক্রান্ত উল্লিখিত বিধান [মাদারিক]। একদিকে কিসাস বিধানের বাহ্য কঠোরতা এবং অন্যদিকে ক্ষমা ও দিয়ত গ্রহণের কোমলতা ও উদারতা এ অভিনব সংমিশ্রণ ও দুই বিপরীত মেরুতে সুষম সমন্বয় বিধান করে ভারসাম্যপূর্ণ কাঠামো নির্মাণ শুধু সে আইনের ভাগ্যেই জুটতে পারে, যা মানব-মস্তিষ্ক প্রসূত নয়, যা সব মস্তিষ্কের স্রষ্টা প্রাজ্ঞ সত্তার প্রজ্ঞা প্রসূত।

قَوْلُهُ اِعْتِدَاءٌ : বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন-এর রূপ ও ধরন বিভিন্ন হতে পারে। যথা কোনো নিরপরাধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে খুনের মিথ্যা দাবি উত্থাপন করা। কিংবা হত্যাকারীকে একবার ক্ষমা করার পর আবার কেসাস [প্রাণদণ্ডের] পাঁয়তারা করা। [কিংবা ক্ষমা পেয়ে যাওয়ার সুযোগে বিবাদী পক্ষের দুর্ব্যবহার, গড়িমসি বা নতুন করে হুমকি প্রদান ইত্যাদি]। এ ধরনের দুরাচার ও আল্লাহর ভয়শূন্য অতি সাহসীদের অন্যায় ও জঘন্য দুঃসাহস হতে ফেরাতে পারে একমাত্র আখিরাতের আজাবের ভয়ই।

অনুবাদ :

১৭৯. وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ اَىْ بَقَاءٌ عَظِيْمٌ يٰاُولِى الْاَلْبَابِ ذَوِى الْعُقُوْلِ لِاَنَّ الْقَاتِلَ اِذَا عَلِمَ اَنَّهُ يُقْتَلُ اِرْتَدَعَ فَاَحْيَا نَفْسَهُ وَمَنْ اَرَادَ قَتْلَهُ فَشُرِعَ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ الْقَتْلَ مَخَافَةَ الْقَوْدِ ـ

১৭৯. হে বোধসম্পন্ন বুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তিগণ! কিসাসের মধ্যেই রয়েছে তোমাদের জীবন অর্থাৎ অধিক স্থায়িত্ব ও বাঁচোয়া। কেননা হত্যাকারী যদি জানতে পারে যে, পরিণামে তাকেও হত্যা করা হতে পারে তবে সে ভয় পাবে এবং তা হতে বিরত থাকবে। এভাবে সে নিজের জীবনও রক্ষা করতে সক্ষম হলো এবং যাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল তার জীবনও বাঁচাতে পারল। সুতরাং ইত্যাকার বিধান তোমাদের জন্যই প্রচলিত করা হয়েছে, যাতে তোমরা কিসাসের ভয়ে খুন ও হত্যা হতে বেঁচে থাকতে পার।

তাহকীক ও তারকীব

اُولِى : اُوْلُ-এর মাজরুর রূপ, অর্থ- অধিকারী। اَلْاَلْبَابُ : لُبٌّ-এর ব-ব। অর্থ- বিবেক-বুদ্ধি। لُبُّ النَّخْلَةِ থেকে নির্গত।
ذَوِى : ذُوْ-এর বহুবচন। মূলত ذَوُوْنَ ছিল। ইযাফতের কারণে ن পড়ে গেছে। অর্থ- অধিকারী।
اِرْتَدَعَ : ভয় পাবে, কেঁপে উঠবে। اَحْيَا : বাঁচাল, রক্ষা করল। شُرِعَ : বিধান প্রচলিত করা হলো।
مَخَافَةَ : আশঙ্কা, ভয়। اَلْقَوْدُ : কিসাস।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ : বস্তুত কিসাস প্রত্যক্ষ্যরূপে ইনসাফ ও সাম্যের বিধি। এ বিধি সামাজিক ও সংঘবদ্ধ জীবনের সংহতি ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার চাবিকাঠি, নিরাপত্তার সর্বোত্তম নিশ্চয়তা বিধায়ক। কেউ কাউকে জুলুম-নিপীড়ন করবে না; সবল-দুর্বল সকলের অধিকারই সংরক্ষিত থাকবে, সবল ও পেশীধারীরা দুর্বল অসহায়দের শোষণ-নিষ্পেষণ করে ছাড়া না পাওয়ার নিশ্চয়তা প্রদানকারী এবং উম্মত ও জাতির সর্বস্তরের লোকদের মাঝে নিরাপত্তা ও স্বস্তি উদ্ভাবনকারী আইন একমাত্র এটিই। একটি বিশেষ সময় ধরে এ আইনের বাস্তবায়ন চলতে থাকলে এ আইনের মূল চেতনা উম্মতের মাঝে মজ্জাগত হয়ে সমগ্র জাতির স্বভাব ও রুচিবোধ সুষ্ঠু রূপ লাভ করবে এবং আইনের শাসন, পরস্পরে আপস-সমঝোতা, সৌহার্দ-সম্প্রীতি ও সেবা-সহায়তা জীবনের অঙ্গে পরিণত হয়ে দেখতে না দেখতেই এ উম্মত সুনাগরিক, পুণ্যবান ও ন্যায়পরায়ণ জাতিরূপে অভিহিত হওয়ার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবে। –[তাফসীরে মাজেদী]

কিসাস জীবনের নিরাপত্তার বিধান করে : কিসাসের নির্দেশ দৃশ্যত কঠিন মনে হলেও যারা বিবেকবান, তারা বুঝতে সক্ষম যে, এ নির্দেশ দীর্ঘ জীবনের কারণ। কেননা কিসাসের ভয়ে প্রত্যেকেই অপরকে হত্যা করা হতে বিরত থাকবে। ফলে উভয়ের প্রাণ রক্ষা পাবে। এভাবে কিসাসের ফলে নিহত ব্যক্তি ও হত্যাকারী উভয়ের খান্দানও হত্যা হতে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত থাকবে। আরবে কে হত্যাকারী আর কে হত্যকারী নয়, তার কোনো বিচার করা হতো না। যাকেই ভাগে পেত, নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশরা তাকেই হত্যা করত। ফলে উভয় পক্ষে একটি খুনের দায়ে হাজারো প্রাণ নিপাত যেত। কিন্তু ইসলামের এ বিধান অনুযায়ী যখন কেবল হত্যাকারীর থেকেই কিসাস গ্রহণ করা হলো, তখন আর সকলের প্রাণ রক্ষা পেল। এ অর্থও করা যেতে পারে যে, কিসাস হত্যাকারীর জন্য পরকালীন জীবনের কারণ। –[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ : অর্থাৎ কিসাসের ভয়ে কাউকে হত্যা করা হতে বেঁচে থাক অথবা কিসাসের কারণে আখিরাতের আজাব হতে বেঁচে থাক। অথবা এর অর্থ যেহেতু কিসাসের বিধান দেওয়ার তাৎপর্য তোমরা জানতে পেরেছ, তাই এখন এর বিরোধিতা অর্থাৎ কিসাস পরিত্যাগ করা হতে বেঁচে থাক।

অনুবাদ :

١٨٠. كُتِبَ فُرِضَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ أَيْ أَسْبَابُهُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا مَالًا الْوَصِيَّةُ مَرْفُوعٌ بِكُتِبَ وَمُتَعَلِّقٌ بِإِذَا إِنْ كَانَتْ ظَرْفِيَّةً وَدَالٌّ عَلَى جَوَابِهَا إِنْ كَانَتْ شَرْطِيَّةً وَجَوَابُ إِنْ مَحْذُوفٌ أَيْ فَلْيُوْصِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ بِالْعَدْلِ بِأَنْ لَا يَزِيْدَ عَلَى الثُّلُثِ وَلَا يُفَضِّلُ الْغَنِيَّ حَقًّا مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ لِمَضْمُوْنِ الْجُمْلَةِ قَبْلَهُ عَلَى الْمُتَّقِيْنَ اللّٰهَ وَهٰذَا مَنْسُوْخٌ بِاٰيَةِ الْمِيْرَاثِ وَبِحَدِيْثِ (لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

১৮০. তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যুকাল অর্থাৎ তাঁর কারণসমূহ উপস্থিত হলে সে যদি খায়র অর্থাৎ ধন-সম্পদ রেখে যায়, তবে সৎভাবে অর্থাৎ ইনসাফানুসারে যেমন এক তৃতীয়াংশের অতিরিক্ত অসিয়ত না করা, ধনীদের প্রাধান্য দান না করা। পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের জন্য অসিয়ত করার বিধান দেওয়া হলো ফরজ করা হলো। اَلْوَصِيَّةُ শব্দটি كُتِبَ ক্রিয়ার نَائِب فَاعِل বা উপকর্তা হিসেবে مَرْفُوْع রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

اِذَا حَضَرَ -এর اِذَا শব্দটি যদি ظَرْفِيَّة অর্থাৎ স্থান ও কালবাচক বলে বিবেচ্য হয়, তবে এটা اِذَا -এর সাথে مُتَعَلِّق বা সংশ্লিষ্ট। আর যদি شَرْطِيَّة বা শর্তবাচক হয়, তবে এটা উক্ত شَرْطِيَّة -এর জওয়াবের প্রতি ইঙ্গিতবহ বলে গণ্য হবে। আর اِنْ تَرَكَ -এর اِنْ -এর জওয়াব এ স্থানে উহ্য বলে ধর্তব্য হবে। আর তা হলো فَلْيُوْصِ অর্থাৎ তাহলে সে যেন অসিয়ত করে। এটা আল্লাহকে ভয়কারীদের উপর একটি কর্তব্য। حَقًّا শব্দটি পূর্ববর্তী বক্তব্যের مَصْدَر مُؤَكِّدَة বা তাগিদবাচক সমধাতুজ পদ।

মিরাস সম্পর্কিত আয়াত ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পবিত্র ইরশাদ– "ওয়ারিশদের জন্য অসিয়ত হতে পারে না" [তিরমিযী] দ্বারা এ আয়াতোক্ত অসিয়তের নির্দেশ মানসূখ বা রহিত বলে বিবেচ্য।

١٨١. فَمَنْ بَدَّلَهُ أَيِ الْإِيْصَاءَ مِنْ شَاهِدٍ وَوَصِيٍّ بَعْدَمَا سَمِعَهُ عَلِمَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ أَيِ الْإِيْصَاءِ الْمُبَدَّلِ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهُ فِيْهِ إِقَامَةُ الظَّاهِرِ مَقَامَ الْمُضْمَرِ إِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ لِقَوْلِ الْمُوْصِيْ عَلِيْمٌ بِفِعْلِ الْوَصِيِّ فَمُجَازٍ عَلَيْهِ -

১৮১. তা শ্রবণ করার পর অর্থাৎ তা অবহিত হওয়ার পর সাক্ষী ও অছির কেউ যদি তার অসিয়তের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে তবে যারা পরিবর্তন করবে, তার অর্থাৎ পরিবর্তিত অসিয়তের পাপ তাদেরই। عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهُ -তে اِقَامَةُ الظَّاهِرِ مَقَامَ الْمُضْمَرِ অর্থাৎ সর্বনাম هُمْ ব্যবহারের স্থলে প্রকাশ্যভাবে বিশেষ্য اَلَّذِيْنَ -এর ব্যবহার হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অসিয়তকারীর কথা সব শুনেন অছির কার্য সম্পর্কে সব জানেন; অনন্তর তিনি এর প্রতিফল দান করবেন।

অনুবাদ :

١٨٢. فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ مُخَفَّفًا وَمُثَقَّلًا جَنَفًا مَيْلًا عَنِ الْحَقِّ خَطَأً أَوْ إِثْمًا بِأَنْ تَعَمَّدَ ذٰلِكَ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الثُّلُثِ أَوْ تَخْصِيصِ غَنِيٍّ مَثَلًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ بَيْنَ الْمُوصِي وَالْمُوصَى لَهُ بِالْأَمْرِ بِالْعَدْلِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فِي ذٰلِكَ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

১৮২. যদি কেউ অসিয়তকারীর مُوصٍ শব্দটি مُخَفَّفَة [লঘু, তাশদীদহীন] ও مُثَقَّلَة [রূঢ়, তাশদীদসহ] উভয় রূপে পাঠ করা যায়। পক্ষ হতে বক্রতা অর্থাৎ ভুলক্রমে ন্যায়পথ হতে সরে যাওয়ার কিংবা পাপাচারের অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে ন্যায়-পথ ত্যাগ করার, যেমন এক তৃতীয়াংশ হতে বেশি পরিমাণের অসিয়ত করা বা কেবল ধনীদের প্রাধান্য দান করার আশঙ্কা করে অতঃপর সে তাদের মধ্যে অর্থাৎ অসিয়তকারী ও যার জন্য অসিয়ত করা হয়েছে তাদের মধ্যে ন্যায় ও ইনসাফের নির্দেশ দান করতঃ কোনোরূপ মীমাংসা করে দেয়, তবে এতে তার কোনো পাপ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।

তাহকীক ও তারকীব

فَلْيُوصِ : اَلْاِيْصَاءُ মাসদার থেকে اَمْر غَائِب-এর সীগাহ। অর্থ– সে যেন অসিয়ত করে। اَلْاَقْرَبِيْنَ : আত্মীয়স্বজন। بِالْمَعْرُوْفِ : সৎভাবে, ন্যায়সঙ্গতভাবে। لَا يَزِيْدُ : বৃদ্ধি করা হবে না। لَا يُفَضَّلُ : প্রাধান্য দান করা হবে না। حَقًّا : কর্তব্য। شَاهِد : সাক্ষী। وَصِي : যাকে অসিয়ত করা হয়। بَعْدَمَا سَمِعَهُ : শ্রবণের পর। اَلْمُبَدَّلُ : পরিবর্তিত। مُجَازٌ : প্রতিদানপ্রাপ্ত হবে। مُوْصِيْ : অসিয়তকারী। جَنَفًا : جَنَفٌ বলা হয় ভুলক্রমে বা অজ্ঞতাবশত সত্যপথ থেকে সরে যাওয়া। تَعَمَّدَ : ইচ্ছা করল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ : **অসিয়তের বিধান :** প্রথম আদেশ হলো কিসাস তথা মৃত ব্যক্তির প্রাণ সম্পর্কে। এবার দ্বিতীয় আদেশ হলো তার অর্থ-সম্পদ সম্পর্কে। আর এটা পূর্বোক্ত মূলনীতির অন্যতম وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِي الْقُرْبٰى-এর ব্যাখ্যা স্বরূপ। আরবদের মধ্যে নিয়ম ছিল মৃত ব্যক্তির সমুদয় অর্থ-সম্পত্তি তার স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি নয়; বরং কেবলমাত্র ছেলেগণ লাভ করত। পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজন বঞ্চিত থাকত। এ আয়াতের ইরশাদ হয়েছে যে, পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনকে ন্যায়নুগভাবে দেওয়া উচিত। এ হিসেবেই মুমূর্ষ ব্যক্তির অসিয়ত ফরজ করা হয়েছে। এ অসিয়ত সেই সময় ফরজ ছিল যখন পর্যন্ত মিরাসের আয়াত নাজিল হয়নি। অবশেষে সূরা নিসায় যখন মিরাসের আয়াত নাজিল হলো এবং আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকের অংশ নির্দিষ্ট করে দেন, তখন থেকে আর এ অসিয়ত ফরজ থাকেনি; বরং এ প্রয়োজনই মিটে যায়। হ্যাঁ, মোস্তাহাব পর্যায়ে এখনও সে আদেশ বহাল আছে, কিন্তু সে ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ওয়ারিশের জন্য অসিয়ত জায়েজ নয় এবং এ অসিয়ত যেন এক তৃতীয়াংশ মালের বেশিতে না হয়। হ্যাঁ কারো ব্যাপারে যদি ঋণ, আমানত ইত্যাদি দেওয়া-নেওয়ার বিতর্ক থাকে, তবে তার উপর এখনো অসিয়ত ফরজ।

وَصِيَّة : এর শাব্দিক অর্থ– উপদেশ। শরিয়তের পরিভাষায় অসিয়তকারীর [মৃত্যুপথ যাত্রীর] সেসব নির্দেশ, যা তার মৃত্যুর পর বাস্তবায়নযোগ্য হয়ে থাকে। ফকীহগণ অসিয়তের বিভিন্ন প্রকারভেদের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা–

১. কোনো কোনো অসিয়ত ওয়াজিব অর্থাৎ অবশ্য পালনীয় স্তরের। যথা– জাকাত ও কাফফারা আদায় করার অসিয়ত, আমানত [গচ্ছিত সম্পদ] ফেরত দেওয়া ও কর্জ আদায়ের অসিয়ত।
২. কোনো কোনোটি মোস্তাহাব ও পছন্দনীয় স্তররের। যথা– ছওয়াবের কাজের জন্য অসিয়ত করে যাওয়া, যে আত্মীয় মিরাসের অধিকারী হবে না তার জন্যে মিরাস [পরিমাণ বা কমবেশি] -এর অসিয়ত করে যাওয়া।

৩. কোনো কোনটি শুধু অনুমোদনযোগ্য মুবাহ হয়ে থাকে, যথা– কোনো বৈধ কাজের জন্য অসিয়ত করে যাওয়া।

৪. কোনো কোনোটি এমনও হতে পারে যার বাস্তবায়ন নিষিদ্ধ। এ ধরনের অসিয়ত বস্তুত অসিয়ত না করে যাওয়ার শামিল সাব্যস্ত হবে। যেমন– কোনো হরবী [অমুসলিম শত্রুদেশীয়] কাফিরের জন্য কিংবা কোনো অবৈধ কাজের জন্য অসিয়ত করে যাওয়া।

৫. কোনো কোনো অসিয়ত স্থগিত বা মুলতবি বলেও অভিহিত হয়। এগুলোর বাস্তবায়ন শর্ত সাপেক্ষ হয়ে থাকে। যেমন– পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের অধিক পরিমাণের [কিংবা কোনো ওয়ারিশের জন্য] অসিয়ত করা। এ ধরনের অসিয়তের বাস্তবায়ন সম্পদের অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের সন্তুষ্টি ও অনুমোদন [অসিয়তকারীর মৃত্যুর পরে] -এর উপরে নির্ভর করে।

জ্ঞাতব্য : اَلْوَصِيَّةُ শব্দটি এখানে [বাক্য বিন্যাসে] اَلْإِيْصَاءُ ক্রিয়ামূল অর্থে এবং এ অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই তার ক্রিয়া كُتِبَ পুংবাচক ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যথায় মূল বিধি অনুসারে كُتِبَتْ [স্ত্রীবাচক] হওয়ার কথা ছিল। অবশ্য স্ত্রীবাচক تَا [তা] বিলুপ্ত করার অন্য একটি কারণ এভাবেও বিবৃত হয়েছে যে, وَصِيَّةٌ [কর্তা] বিশেষ্যটি তার ক্রিয়া থেকে বেশ দূরত্বের ব্যবধানে রয়েছে এবং এ ধরনের দূরত্ব অন্তরায় হলে ক্রিয়ার স্ত্রীবাচক 'তা' উহ্য হয়ে যায়। –[তাফসীরে কুরতুবী]

قَوْلُهُ خَيْرًا : শব্দটি প্রসিদ্ধ অর্থ [ভালো, কল্যাণ] ছাড়া পবিত্র মাল অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পবিত্র কুরআনে এ অর্থে ব্যবহারের অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে, যথা– قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ অর্থাৎ তোমরা যে সম্পদ ব্যয় করবে [বাকারা]। وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ ইত্যাদি মোটকথা এখানে خَيْر শব্দটি সম্পদ অর্থে হওয়া সর্বসম্মত।

قَوْلُهُ فَمَنْ بَدَّلَهُ : অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি তো ন্যায়ানুগভাবে অসিয়ত করেই মারা গিয়েছিল, কিন্তু আদায়কারীরা তা রক্ষা করেনি, তবে সে ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির কোনো গুনাহ হবে না। সে তার দায়িত্ব হতে মুক্ত হয়ে গেছে। যারা অসিয়ত লঙ্ঘন করেছে, গুনাহগার তারাই হবে। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সকলের কথা শোনেন এবং সকলের নিয়ত জানেন। [তাফসীরে উসমানী]

بَدَّلَهُ : এর কর্মকারক সর্বনাম দ্বারা অসিয়ত উদ্দেশ্য। بَدَّلَهُ -এর সর্বনাম اَلْإِيْصَاءُ [অসিয়ত করা] -কে নির্দেশ করে। তদ্রূপ سَمِعَهُ -এর সর্বনাম -[তাফসীরে কুরতুবী]। অর্থাৎ যে সাক্ষীদের সামনে অসিয়ত করা হয়েছিল যে, অমুক অমুক আত্মীয় এত এত অংশ পাবে। পরে সাক্ষীরা তাতে ছাঁটকাট করল এবং তাতে কারো হক নষ্ট হয়ে গেল। إِثْمُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهُ [পাপ হবে রদবদলকারীদের]। বিচারকর্তা ও কাজিদের আশ্বস্ত করা হলো যে, অসিয়তের গলদ বাস্তবায়নে তোমাদের অপরাধ হবে কেন? অপরাধ তো হবে মিথ্যুক সাক্ষীদের।

قَوْلُهُ سَمِيْعٌ : তিনি ভালো করে জানেন যে, সাক্ষীরা কি কি উপায়ে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে এবং মূল অসিয়তকে কিরূপ বিকৃত করেছে। عَلِيْمٌ : তিনি এ কথাও জানেন যে, বিচারক বা মীমাংসাকারীগণ এরূপ ক্ষেত্রে কেমন অপরাগ ও নিরুপায় হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا : অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে কারো যদি এ আশঙ্কা থাকে বা জানতে পারে যে, সে কোনো কারণে ভুল করেছে এবং কারো প্রতি অন্যায় পক্ষপাতিত্ব করেছে কিংবা সে জেনেশুনে মহান আল্লাহর আইনের খেলাফ কাউকে সম্পত্তি দিয়ে গেছে, তাহলে সেই অসিয়তকৃত ব্যক্তি ও ওয়ারিশদের মাঝে এরূপ রদবদল জায়েজ; বরং উত্তম।

قَوْلُهُ خَافَ : আরবি ভাষায় خَوْف সর্বদা ভয় পাওয়া ও আশঙ্কা করার অর্থেই ব্যবহৃত হয় না, বরং অবগতি ও বিদিত হওয়া অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং এখানে এ অর্থই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যার মনে হলো এবং বুঝতে পারল। অর্থাৎ [মৃত্যু পথযাত্রী] অসিয়তকারীর ভাবগতি দেখে তার কাছে প্রতিভাত হলো যে, সে হয়তো জুলুম করা বা মিরাসের অধিকারী কাউকে মিরাস থেকে বঞ্চিত করার পাঁয়তারা করছে। –[জাসসাস]

قَوْلُهُ جَنَفًا : جَنَفٌ বলা হয় না বুঝে ভুল করাকে কিংবা অনিয়ম করাকে। উদ্দেশ্য অনিচ্ছাকৃত ভুল কিংবা বুঝের ভুলের কারণে বাড়াবাড়ি।

اِثْمًا : এটা হলো জেনেশুনে ভুল, প্রকাশ্যভাবে কারো হক বিনষ্ট করা-যাকে পাপ বলা যেতে পারে। اَلْإِثْمُ হলো ইচ্ছাকৃত........[হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে ইবনু জারীর]

١٨٣. يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْاُمَمِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ الْمَعَاصِيْ فَاِنَّهُ يُكْسِرُ الشَّهْوَةَ الَّتِيْ هِيَ مَبْدَؤُهَا ـ

অনুবাদ :

১৮৩. হে মু'মিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেওয়া হলো তা ফরজ করা হলো যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উপর ফরজ করা হয়েছিল, যাতে তোমরা পাপাচার হতে বেঁচে থাকতে পার। কেননা এটা সিয়াম পাপাচারের উৎস কুপ্রবৃত্তির বিনাশ করে।

١٨٤. اَيَّامًا نُصِبَ بِالصِّيَامِ اَوْ بِصُوْمُوْا مُقَدَّرًا مَّعْدُوْدٰتٍ اَىْ قَلَائِلَ اَوْ مُؤَقَّتَاتٍ بِعَدَدٍ مَعْلُوْمٍ وَهِىَ رَمَضَانُ كَمَا سَيَأْتِىْ وَقَلَّلَهُ تَسْهِيْلًا عَلَى الْمُكَلَّفِيْنَ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ حِيْنَ شُهُوْدِهٖ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَىْ مُسَافِرًا سَفَرَالْقَصْرِ وَأَجْهَدَهُ الصَّوْمُ فِى الْحَالَيْنِ فَاَفْطَرَ فَعِدَّةٌ فَعَلَيْهِ عَدَدُ مَا اَفْطَرَ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ يَصُوْمُهَا بَدْلَهُ وَعَلَى الَّذِيْنَ لَا يُطِيْقُوْنَهُ لِكِبَرٍ اَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجٰى بُرْؤُهٗ فِدْيَةٌ هِىَ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ اَىْ قَدْرَ مَا يَأْكُلُهُ فِىْ يَوْمٍ وَهُوَ مُدٌّ مِنْ غَالِبِ قُوْتِ الْبَلَدِ لِكُلِّ يَوْمٍ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِاِضَافَةِ فِدْيَةِ وَهِىَ لِلْبَيَانِ وَقِيْلَ لَا غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ ـ

১৮৪. গণনার অল্প কিছু দিনের জন্য اَيَّامًا শব্দটি صِيَام -এর মাধ্যমে বা উহ্য صُوْمُوْا ক্রিয়ার মাধ্যমে مَنْصُوْب রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সংখ্যক কয়েকটি দিনের জন্য। সামনে উল্লেখ হচ্ছে যে, এ দিনগুলো হলো রমজান মাস। মুকাল্লাফ বা আমল করার দায়িত্ব যে সমস্ত মানুষের উপর ন্যস্ত, তাদের সামনে বিষয়টি সহজসাধ্য করে তোলার জন্য এ দিনগুলোকে এত কম করে দেখানো হয়েছে।

এর [এ দিনগুলোর] উপস্থিত কালে তোমাদের কেউ অসুস্থ হলে বা সফরে থাকলে সালাত কসর হয়, এতটুকু দূরত্বের সফর হলে এবং এ উভয় অবস্থায় সিয়াম তার পক্ষে ক্লেশকর হওয়ায় তা ভেঙ্গে ফেললে অন্য দিনসমূহে এই সংখ্যা অর্থাৎ যতদিন সওম সে পরিত্যাগ করেছিল ততদিনের সওম তার উপর জরুরি হবে অর্থাৎ তার পরিবর্তে সে অন্য দিনসমূহে সওম পালন করবে। জরাগ্রস্ততা বা এমন অসুস্থতা, যা ভালো হওয়ার আশা করা যায় না, সে কারণে যারা সওম পালনের শক্তি রাখে না তাদের ফিদয়া দান কর্তব্য। তা হলো অভাগ্রস্তকে অন্নদান করা অর্থাৎ একদিনে যতটুকু পরিমাণ একজন আহার করে এক এক দিনের বিনিময়ে ততটুকু খাদ্য দান করা কর্তব্য। তা হলো প্রতিদিনের বিনিময়ে তদঞ্চলের প্রচলিত প্রধান খাদ্যের এক 'মুদ' পরিমাণ খাদ্য দান।

অপর এক কেরাতে فِدْيَةٌ শব্দটি পরবর্তী শব্দের দিকে اِضَافَة বা সম্বন্ধ পদরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এমতাবস্থায় এ اِضَافَة বা সম্বন্ধ بَيَانِيَة বা বিবরণমূলক বলে বিবেচ্য হবে।

কেউ কেউ বলেন, يُطِيْقُوْنَهُ [যারা সওম পালনে সক্ষম] -এর পূর্বে না অর্থবোধক لَا শব্দটি [সক্ষম নয়] উহ্য মানার প্রয়োজন নেই।

وَكَانُوْا مُخَيَّرِيْنَ فِىْ صَدْرِ الْاِسْلَامِ بَيْنَ الصَّوْمِ وَالْفِدْيَةِ ثُمَّ نُسِخَ بِتَعْيِيْنِ الصَّوْمِ بِقَوْلِهِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (رضـ) اِلَّا الْحَامِلَ وَالْمُرْضِعَ اِذَا اَفْطَرَتَا خَوْفًا عَلَى الْوَلَدِ فَاِنَّهَا بَاقِيَةٌ بِلَا نَسْخٍ فِىْ حَقِّهِمَا فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا بِالزِّيَادَةِ عَلَى الْقَدْرِ الْمَذْكُوْرِ فِى الْفِدْيَةِ فَهُوَ اَىِ التَّطَوُّعُ خَيْرٌ لَّهُ وَاَنْ تَصُوْمُوْا مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنَ الْاِفْطَارِ وَالْفِدْيَةِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ خَيْرٌ لَّكُمْ فَافْعَلُوْهُ تِلْكَ الْاَيَّامَ ـ

অনুবাদ : মূলত ব্যাপার হলো, ইসলামের শুরুতে সওম পালন করা তদস্থলে ফিদিয়া প্রদানের এ বিধানদ্বয়ের যে কোনো একটি করার এখতিয়ার সাধারণ- ভাবে মুসলিমদের ছিল। পরে فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যে রমজানের মাস পাবে, সে যেন তার সওম পালন করে] এ আয়াতের মাধ্যমে ঐ বিধান মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, গর্ভবতী বা দুগ্ধদানকারিণী মহিলা যদি সন্তান সম্পর্কে কোনো আশঙ্কা করে এবং সে সওম পালন না করে তার বেলায় এ বিধানটি মানসূখ বা রহিত বলে বিবেচ্য নয়; বরং এখনও তা প্রযোজ্য বলে গণ্য। যদি কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফিদয়ার বেলায় উল্লিখিত পরিমাণের চেয়ে বেশি দান করে সৎকাজ করে তবে তা অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্তভাবে দান করা তার পক্ষে অধিক কল্যাণকর। সওম পালন করা তোমাদের জন্য সওম পালন না করা ও ফিদয়া প্রদান করা অপেক্ষা অধিকতর কল্যাণকর। اَنْ تَصُوْمُوْا এটা مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য। خَيْرٌ لَّكُمْ এটা خَبَر বা বিধেয়। যদি তোমরা জানতে যে, এটা তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণপ্রসূ তবে ঐ দিনগুলোতে [মাহে রমজানে] সওম পালন করতে। অর্থাৎ তোমাদের সওম পালন করাই উচিত।

তাহকীক ও তারকীব

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ : [তোমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে] صَوْم -এর ব-ব। অভিধানে কোনো কিছু হতে বিরত থাকাকে صَوْم বলে। قَالَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ : كُلُّ مُمْسِكٍ عَنْ طَعَامٍ اَوْ كَلَامٍ اَوْ سَيْرٍ فَهُوَ صَائِمٌ শরিয়তের দৃষ্টিতে সওম হলো–

اَلْاِمْسَاكُ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْجِمَاعِ فِى النَّهَارِ مَعَ النِّيَّةِ ـ

كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ شَيْئًا : আল্লাহ তার উপর কোনো কিছু ফরজ করেছেন। عَلٰى যোগে كُتِبَ -এর অর্থ হয় فُرِضَ বা ফরজ করা। اَلْاُمَمُ : اُمَّةٌ -এর ব-ব অর্থ- উম্মত, জাতি। يُكْسِرُ الشَّهْوَةَ : কু-প্রবৃত্তি বিনাশ করে। اَلْمُكَلَّفِيْنَ : আমল করার দায়িত্ব যে সমস্ত মানুষের উপর ন্যস্ত اَجْهَدَهُ الصَّوْمُ : রোজা তার জন্য কষ্টকর হলো। يُطِيْقُوْنَهُ : অতিকষ্টে রোজা রাখে। ইমাম রাগিব বলেন– طَاقَة বলা হয় এমন পরিমাণ সমর্থকে যা মানুষ কষ্টের সাথে করে। لَا يُطِيْقُوْنَهُ : রোজার শক্তি রাখে না। لَا يُرْجٰى : আশা করা যায় না। بُرْؤٌ : ভালো, সুস্থতা। فِدْيَةٌ : মানুষ সম্পদ বা অন্য যা কিছুর মাধ্যমে নিজেকে মুক্ত করে। مُدٌّ : মুদ, পরিমাপ। قُوْتٌ : খাদ্য।

اَلْمَعَاصِىْ : এ শব্দটি উল্লেখ করে বোঝাতে চেয়েছেন যে, تَتَّقُوْنَ দ্বারা তাকওয়ার আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য। اَلْمَعَاصِىْ হচ্ছে তার মাফউলে বিহী। –[জামালাইন]

قَوْلُهُ نُصِبَ بِالصِّيَامِ اَوْ يَصُوْمُوْنَ : এখানে اَيَّامًا -এর মানসূব হওয়ার দুটি সূরতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। একটি সূরত হলো– اَيَّامًا এটি اَلصِّيَام -এর কারণে মানসূব। কিন্তু এতে আপত্তি আছে। আর তা হলো, مَعْمُوْل ও عَامِل -এর মাঝে كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ -এর দ্বারা فَاصِلَه بِالْاَجْنَبِىْ হয়েছে। তাই اَلصِّيَام আমেল হতে পারে না। ইমাম রাযী (র.)-এর জবাবে বলেন, مَعْمُوْل যদি ظَرْف হয়, তাহলে فَاصِلَةٌ بِالْاَجْنَبِىْ সত্ত্বেও عَمَل করা শুদ্ধ আছে।

দ্বিতীয় সুরত হলো– এর পূর্বে يَصُوْمُوْا উহ্য রয়েছে। এ সুরতে কোনো প্রশ্ন বা আপত্তি নেই। –[জামালাইন]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ : **সিয়ামের বিধান :** রোজা ইসলামের একটি অন্যতম রুকন [স্তম্ভ]। যারা মনের গোলাম ও খেয়াল-খুশির পূজারী তাদের জন্য রোজা অত্যন্ত কঠিন। তাই এ বিধানটি খুবই জোরদার ও দৃঢ়াত্মক শব্দে বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত আদম (আ.) হতে অদ্যাবধি এ বিধানটি বরাবর চলে আসছে, যদিও দিনক্ষণ নির্ধারণের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। পূর্বোক্ত মূলনীতিসমূহের মাঝে যে ধৈর্যের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, রোজা তার একটি বৃহত্তম শাখা। হাদীসে রোজাকে ধৈর্যের অর্ধেক বলা হয়েছে। -[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ صِيَام : صِيَامٌ শব্দটি صَوْمٌ -এর বহুবচন। আবার মাসদার হিসেবেও অর্থ হয়। অর্থাৎ, রোজা রাখা। ফজর [সুবহে সাদিক] -এর শুরু হতে সূর্য ডুবে যাওয়া পর্যন্ত সময় পানাহার ও স্ত্রী-সঙ্গম থেকে বিরত থাকাকে শরিয়তের পরিভাষায় সওম বা রোজা বলা হয়। ফরজ ও অবশ্য পালনীয় সওম হলো রমজান মাসের রোজা। গিবত, পরনিন্দা, অশ্লীল কথা ও কাজ, কু-কথা, কু-ব্যবহার ইত্যাদি জিহ্বা দ্বারা সম্পাদনযোগ্য যাবতীয় পাপ থেকে সওম পালনের সময় বিরত থাকার ব্যাপারে হাদীসে কঠোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে। আধুনিক ও প্রাচীন চিকিৎসা বিজ্ঞানসমূহের সবগুলোই এ বিষয়ে একমত যে, সওম দৈহিক রোগব্যাধি দূর করার জন্য উত্তম চিকিৎসা ও মানবদেহের জন্য উত্তম পরিষোধক। তাছাড়া সিয়াম পালনে সমগ্র উম্মতের অভ্যন্তরে সৈনিকসুলভ সাহসিকতা, সংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে যে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়, সেদিক লক্ষ্য করলে মাত্র এক মাসের এ বার্ষিক প্রশিক্ষণ একটি সুষ্ঠু কর্মসূচি।

পৃথিবীর প্রায় সব ধর্ম ও সকল সম্প্রদায়ের মাঝে কোনো না কোনো প্রকারের সওমের সন্ধান পাওয়া যায় [দ্র. ব্রিটানিকা বিশ্বকোষের ৯ খ.১০৬ পৃ. ও ১০ খ. ১৯৩ পৃ. চতুর্দশ সংস্করণ]। তবে এখানে পৌত্তলিক ধর্মাবলম্বীরা কুরআনের লক্ষ্য নয়। قَوْلُهُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ : যারা তোমাদের আগে...] এর মূল লক্ষ্য কিতাবী সম্প্রদায়গুলোই হতে পারে। যেমন- সওম হযরত মূসা (আ.) -এর শরিয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ছিল।

قَوْلُهُ مِنَ الْاُمَمِ : পূর্বোক্ত الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ -এর ব্যাপকতাকে প্রকাশ করার জন্য এবং যারা الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ দ্বারা নাসারাদের উদ্দেশ্য নিয়েছে তাদের মত খণ্ডনের জন্য مِنَ الْاُمَمِ অংশটি বৃদ্ধি করা হয়েছে। -[জামালাইন ২৮৯]

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ এ বাক্য দ্বারা সিয়ামের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যর স্পষ্ট বিবরণ পাওয়া গেল। রোজার আসল উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া অর্থাৎ আল্লাহ-ভীতির স্বভাব গড়ে তোলা এবং উম্মত ও তার সদস্যদের মুত্তাকী বানানো।

তাকওয়া মানব প্রবৃত্তির একটি বিশেষ অবস্থা। ক্ষতিকর খাদ্য, পানীয় ও ক্ষতিকর অভ্যাসগুলোতে সংযম অবলম্বনের মাধ্যমে যেভাবে শারীরিক সুস্থতা অর্জিত হয় এবং জড় জগতের আস্বাদনীয় বিষয়বস্তু আস্বাদনের আনন্দ উপভোগ করার উপযোগিতা অর্জিত হয়, ক্ষুধার মাত্রা পরিমিত হয় এবং নির্দোষ রক্ত তৈরি হতে থাকে, তদ্রূপ পৃথিবীর বুকে তাকওয়া অবলম্বন করলেও। [অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ও অভ্যন্তরীণ স্বাস্থ্য ও নৈতিক জীবনের জন্য ক্ষতিকর বিষয়গুলোতে সংযম অবলম্বন করলে] আখিরাতের আস্বাদনী বিষয়গুলো ও নিয়ামতসমূহ উপভোগ করে আনন্দ লাভের পূর্ণাঙ্গ উপযোগিতা মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে যায়।

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের এ স্তরে এসেই অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর সিয়ামের চেয়ে ইসলামের সিয়ামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। পৌত্তলিকদের অপূর্ণাঙ্গ ও নাম সর্বস্ব সিয়ামের তো আলোচনাই অপ্রয়োজনীয়। কিতাবী খ্রিস্টান ও ইহুদিদেরও সিয়ামের গূঢ়তত্ত্ব শুধু এতটুকুই যে, তা পালন করা হয় কোনো বিপদাপদ দূরে সরিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে কিংবা সাময়িক ও তাৎক্ষণিক কোনো বিশেষ আত্মিক অবস্থা অর্জনের মানসে। ইহুদিদের প্রধান শব্দকোষ জিয়ূশ ইনসাইক্লোপেডিয়ায় রয়েছে- "প্রাচীন যুগে হয়তো কোনো শোক পালনের চিহ্নস্বরূপ সাওম পালন করা হতো কিংবা কোনো সংকট আসন্ন হলে কিংবা আধ্যাত্ম পথচারী [ভাববাদী] নিজের মাঝে ভাববাণী [ইলহাম] গ্রহণের যোগ্যতা অর্জনের উদ্দেশ্য পালন করত।" [দ্র. ৫ খ. ৩৪৭ পৃ.] পক্ষান্তরে ইসলামে সিয়াম বলা হয় নিজের ইচ্ছায় ও খুশিতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিজের জন্য বৈধ এবং রুচি ও স্বভাবসম্মত কামনা-বাসনা পরিপূর্ণ পরিহার করাকে। এতে একদিকে দেহ ও স্বাস্থ্যের এবং অন্যদিকে আত্মার কল্যাণ সাধিত হয়। -[তাফসীরে মাজেদী]

জ্ঞাতব্য : ইহুদী ও খ্রিস্টানদের উপরও রমজানের রোজা ফরজ করা হয়েছিল, কিন্তু তারা নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো তাতে রদবদল করে ফেলেছে। তাই لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ দ্বারা তাদেরকে কটাক্ষ করা হয়েছে। অর্থাৎ হে মুসলিমগণ! তোমরা নাফরমানি হতে দূরে থাক। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মতো এ বিধান রদবদল করে ফেলো না।

قَوْلُهُ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ : অর্থাৎ এ ফরজ সিয়ামেরও একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা-পরিমাণ রয়েছে। কেননা এটাই শৃঙ্খলার [ডিসিপ্লিন ও নিয়মানুবর্তিতার] দাবি। এমন নয় যে, যখন যার মন চাইল এবং যত দিন মনে চাইল, সিয়াম পালন করব। উম্মতের একসূত্রতা ও ঐক্যের প্রতি লক্ষ্য করলেও সমগ্র উম্মতর জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট পরিসংখ্যার সাথে হওয়াই অপরিহার্য ছিল। আনুষঙ্গিকরূপে এ দিকটিও পরিস্ফুটিত হলো যে, ফরজ সিয়ামের পরিমাণ খুব ভারি কিছু নয়। পুরো এক বছর বা ছয় মাস কিংবা তিন মাসও নয়, বরং সারা বছরে ২৯ বা ৩০ দিন মাত্র এর দ্বারা রমজানের একমাস বোঝানো হয়েছে। যেমনটা পরবর্তীতে আসছে। -[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ قَلَّلَهُ تَسْهِيْلًا : রমজান মাসের রোজা মূলত বেশি হলেও মুকাল্লাফ বা আমল করার দায়িত্ব যে সমস্ত মানুষের উপর ন্যস্ত, তাদের সামনে বিষয়টি সহজসাধ্য করে তোলার জন্য এবং উদ্বুদ্ধ করণার্থে এ দিনগুলোকে এত কম করে দেখানো হয়েছে।

قَوْلُهُ اَجْهَدَهُ الصَّوْمُ فِى الْحَالَيْنِ : অর্থাৎ মুসাফির এবং অসুস্থ উভয় অবস্থায় রোজা ভাঙ্গার জন্য ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে কষ্ট হওয়ার শর্ত রয়েছে। আহনাফের মতে সফরে রোজা ভাঙ্গার জন্য কষ্টের কোনো শর্ত নেই। সফর আরামদায়ক হলেও রোজা ভাঙ্গার অনুমতি আছে। আর অসুস্থ অবস্থায় রোজা ভাঙ্গার জন্য কষ্ট হওয়ার শর্ত রয়েছে। কেননা কোনো কোনো রোগের জন্য রোজা উপকারীও হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে সফরের অবস্থা এর ব্যতিক্রম। মূল সফরকেই কষ্টের স্থলাভিষিক্ত ধরা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ : [এবং অসুস্থতার কারণে সিয়াম পালন তার জন্য কষ্টকর হয়.....] অসুস্থতার অবস্থায় অবস্থা বিভিন্ন রকমের হতে পারে। অসুস্থতা বেশ কঠিনও হতে পারে। আবার নামমাত্রও হতে পারে। তাছাড়া ঋতু, বয়স ও দৈহিক [কাঠামোগত] অবস্থার বিভিন্নতাও অসুস্থতার ব্যাপারে ক্রিয়াশীল হতে পারে। এখানে উদ্দেশ্য এমন অসুস্থতা, যা সিয়াম পালনে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী হয়। শুধু নামমাত্র অসুস্থ হওয়া সিয়াম পালন না করার অনুমতি পাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। অর্থাৎ এমন অসুস্থ যে, তা নিয়ে সিয়াম পালন তার জন্য কঠিন। -[রূহুল মা'আনী]

আলেমগণ বলেছেন, তার অসুস্থতা যদি এমন হয় যে, যা [সিয়াম পালনে] তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক কিংবা তা দীর্ঘমেয়াদি বা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, তার জন্য সিয়াম পালন না করা [ও ফিদয়া দেওয়া] বৈধ হবে।

قَوْلُهُ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ : **রোজা পালনে অক্ষম লোকদের জন্য অবকাশ :** ইসলামের প্রথম দিকে যেহেতু রোজা রাখার অভ্যাস ছিল না, তাই অনবরত একমাস রোজা রেখে যাওয়া তাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই রোজা রাখতে সক্ষম ব্যক্তিদেরকে এ সুযোগ দেওয়া হয় যে, অসুখ বা সফরের কোনো ওজর না থাকলেও কেবল অনভ্যাসের কারণেও যদি তোমাদের জন্য রোজা রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়ায় তবু তোমাদের এখতিয়ার আছে। ইচ্ছা হলে রোজা রাখতেও পার, ইচ্ছা হলে রোজার বিকল্পও আদায় করতে পার। আর তা হলো এক একটি রোজার বদলে এক একজন দরিদ্রকে দুবেলা পেট ভরে খাওয়ানো। কেননা সে যখন একদিনের খাবার অন্যকে দিয়ে দিল, তখন যেন নিজেকে এক দিনের পানাহার হতে নিবৃত্ত রাখল। ফলে এক পর্যায়ে রোজার সাথে মিল বা সংযোগ রক্ষা হলো। তারপর তারা যখন রোজা রাখতে অভ্যস্ত হয়ে গেল, তখন আর এ অনুমতি বাকি থাকেনি, যা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে। কোনো কোনো তাফসীরবেত্তা طَعَامُ مِسْكِيْنٍ অর্থ করেছেন সদকায়ে ফিতর। তখন অর্থ হবে, যারা ফিদইয়া দিতে সক্ষম, তারা একজন অভাবী ব্যক্তিকে তার পরিমাণ মতো খাদ্য দিয়ে দিবে। আর শরিয়তে এর পরিমাণ হলো আধা সা' গম বা এক সা' যব। এ অর্থে আয়াতখানা রহিত হবে না। যারা এখনও একথা বলে যে, যার ইচ্ছা রমজানের রোজা রাখবে আর যার ইচ্ছা ফিদইয়া দিবে, কেবল রোজাই যে রাখতে হবে এরূপ কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, বস্তুত তারা হয় মূর্খ, নয়তো বেদীন। -[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ يُطِيْقُوْنَهٗ : [তাতে সমর্থ হয়] ة সর্বনাম দ্বারা সওম উদ্দেশ্য অর্থাৎ এমন অবস্থা যে হিম্মত করে সাওম পালন করলে তো করেই, কিন্তু তাতে জানের কষ্ট হয় এবং সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হয়, যেমন অশীতিপর বৃদ্ধি বা গর্ভবতী নারী ও দুগ্ধপায়ী শিশুর মা। طَاقَة ও وُسْعَة [শক্তি-সামর্থ্য ও সঙ্গতি সাধ্য] শব্দ দুটিতে ভাষাবিদগণ পার্থক্য করেছেন। وُسْعَت যেমন সম্ভাব্যতার সমার্থক। আর طَاقَتْ -এর অর্থে কর্ম সম্পাদনকারীর সামর্থ্য তো রয়েছে; কিন্তু তাতে অনেক বেশি কষ্ট স্বীকার করতে হয়। অর্থাৎ কাজ তো হয়ে যায়ই, তবে কিনা খুব কষ্ট-ক্লেশে।

١٨٥. شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنْهُ هُدًى حَالٌ هَادِيًا مِنَ الضَّلَالَةِ لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ اٰيَاتٍ وَاضِحَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى مِمَّا يَهْدِىْ اِلَى الْحَقِّ مِنَ الْاَحْكَامِ وَمِنَ الْفُرْقَانِ مِمَّا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ فَمَنْ شَهِدَ حَضَرَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ تَقَدَّمَ مِثْلُهُ وَكَرَّرَهُ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ نَسْخُهُ بِتَعْمِيْمِ مَنْ شَهِدَ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِذَا اَبَاحَ لَكُمُ الْفِطْرَ فِى الْمَرَضِ وَالسَّفَرِ وَلِكَوْنِ ذٰلِكَ فِىْ مَعْنَى الْعِلَّةِ اَيْضًا لِلْاَمْرِ بِالصَّوْمِ عَطْفٌ عَلَيْهِ وَلِتُكْمِلُوا بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ الْعِدَّةَ اَىْ عِدَّةَ صَوْمِ رَمَضَانَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عِنْدَ اِكْمَالِهَا عَلٰى مَا هَدٰكُمْ اَرْشَدَكُمْ لِمَعَالِمِ دِيْنِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ اللّٰهَ عَلٰى ذٰلِكَ.

অনুবাদ :

১৮৫. রমজান মাস হলো ঐ মাস যাতে অর্থাৎ লায়লাতুল কদরে লওহে মাহফূয হতে প্রথম আকাশে অবতীর্ণ হয়েছে আল কুরআন যা মানুষের জন্য পথভ্রষ্টতা হতে সৎপথের দিশারী এখানে هُدًى শব্দটি حَال বা ভাব ও অবস্থাবাচক পদ। এবং হেদায়েতের অর্থাৎ যে সমস্ত বিধানের সাহায্যে মানুষ সত্যের দিকে পরিচালিত হয় তার উজ্জ্বল বিবরণ সুস্পষ্ট নিদর্শন এবং প্রভেদকারী অর্থাৎ যা হক ও বাতিল, সত্য ও অসত্যের মাঝে পার্থক্য নির্ণয়কারী।

তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে তারা যেন এর সিয়াম পালন করে এবং কেউ পীড়িত হলে কিংবা ভ্রমণে থাকলে অন্য সময় তাকে সংখ্যা পূরণ করতে হবে। এ ধরনের আয়াত পূর্বেও উল্লিখিত হয়েছে। مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ। আয়াতটি দ্বারা সওম পালন না করে ফিদয়া দেওয়ার এখতিয়ার সম্পর্কিত বিধানটি সাধারণভাবে সকলের ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য ছিল তা মানসূখ বা রহিত হওয়ায় পীড়িত ও মুসাফিরের প্রতি একই হুকুম প্রযোজ্য হবে এ ধারণা নিরসনের জন্য এস্থানে তাদের বিষয়টির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। অর্থাৎ অনাদায়কৃত সওম অন্য সময়ে পূরণ করতে হবে।

আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ, তা চান এবং যা তোমাদের জন্য ক্লেশকর, তা চান না। আর তাই পীড়া ও ভ্রমণকালে তিনি তোমাদের জন্য সওম পালন না করারও অনুমতি প্রদান করেছেন।

সাওম পালন সম্পর্কে নির্দেশ দানের পিছনে যেহেতু এটাও [উক্ত মনোভাবটি] কারণ হিসেবে কার্যকর সেহেতু তার সাথে عَطْف বা অন্বয় করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– এবং এ জন্য যে, তোমরা রমজান মাসের সওম সংখ্যা পূরণ করবে। تُكْمِلُوْا ক্রিয়াটির تَخْفِيْف [লঘু, তাশদীদ ব্যতিরেকে] ও تَشْدِيْد [রূঢ়, তাশদীদসহ] উভয়রূপ পাঠ রয়েছে। আর তার সমাপ্তিতে তোমরা আল্লাহর মহিমা কীর্তন করবে যে, তিনি তোমাদেরকে হেদায়েত করেছেন। তাঁর [মনোনীত] ধর্মের নিদর্শনাদির প্রতি তোমাদের পরিচালিত করেছেন। আর এজন্য যে তোমরা যেন এ সম্পর্কে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

তাহকীক ও তারকীব

شَهْرٌ : মাস। شَهْرٌ শব্দটি اَلْاِشْتِهَارُ তথা প্রকাশিত হওয়া থেকে নির্গত। رَمَضَانُ : اَلرَّمْضُ থেকে নির্গত। اَلرَّمْضُ অর্থ- شِدَّةُ الْحَرِّ বা প্রচণ্ড গরম। اَلرَّمْضَاءُ অর্থ- সূর্যের তীব্র তাপ। رَمَضَان নামকরণের কারণ হলো, এটি গুনাহকে জ্বালিয়ে দেয়। لِاَنَّهٗ يَرْمِضُ الذُّنُوْبَ

مِمَّا يَهْدِىْ : যার দ্বারা পথ পাওয়া যায়। كُرِّرَةٌ পুনর্বার উল্লেখ করা হয়েছে। لِئَلَّا يُتَوَهَّمُ : যাতে ধারণা না করা হয়।

تَعْمِيْمٌ : ব্যাপকতা। اَبَاحَ : মুবাহ বা বৈধ রেখেছেন। مَعَالِمُ : مَعْلَمٌ -এর ব-ব অর্থ- নিদর্শন।

قَوْلُهٗ وَلٰكِنْ ذٰلِكَ فِىْ مَعْنَى الْعِلَّةِ عَطْفٌ : এটি একটি প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নটি হলো- يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ الخ.... জুমলা فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ হলো جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ আর তার উপর لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ অংশটির عَطْفٌ হয়েছে। আর এটি হলো جُمْلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ আর جُمْلَهٗ فِعْلِيَّهٗ -এর আতফ جُمْلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ -এর উপর শুদ্ধ নয়।

উত্তর: مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ তথা يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ইল্লতের অর্থে। আর لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ -ও ইল্লতের অর্থে। সুতরাং ইল্লতের উপর ইল্লতের আতফ হয়েছে। আর এটি শুদ্ধ আছে। -[জামালাইন : ২৭৯]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ : পূর্ণ কুরআন মাজীদের অবতরণ তো বেশ ধীর গতিতে প্রায় ২১-২২ বছরের দীর্ঘ মেয়াদে সম্পন্ন হয়েছিল। এখানে উদ্দেশ্য হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট কুরআন নাজিল করার সূচনা হয়েছিল রমজান মাসে। কুরআনী ওহীর একেবারে সূচনার আয়াতসমূহ হচ্ছে সূরা আল আলাক -এর প্রথম অংশ এবং তা এ মাসেই [নবুয়তের ১ম বর্ষে] হেরা গুহায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর নাজিল হয়েছিল। অনেক মুফাসসির এরূপ অভিমতও পোষণ করেছেন যে, পূর্ণ কুরআন মাজীদ দুনিয়ার [প্রথম] আসমানে এ মাসেই [একবারে] নাজিল হয়েছিল, পরে সেখান থেকে ওহীবাহক ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ.) -এর মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর নাজিল হতে থাকে।

اَلْقُرْاٰنُ : যেভাবে اَرْض শব্দ দ্বারা গোটা পৃথিবীকে বুঝানো হয়, আবার প্রতিটি ভূখণ্ডকেও বুঝানো হয়; তদ্রূপ কুরআন শব্দ পূর্ণ ৩০ পারা কুরআনকেও বুঝায়, আবার তার প্রতিটি অংশকেও বুঝায়।

قَوْلُهٗ رَمَضَان : এটি ইসলামি পঞ্জিকায় চান্দ্র বছরের নবম মাস। শরিয়ত চাঁদের মাসের হিসাবকে গ্রহণ করেছে এবং সব হিসাবপত্রের জন্য চাঁদের দিনপঞ্জীকে কাজে লাগিয়েছে। চান্দ্র মাস যেহেতু ঋতু বদলের সাথে ঘুরেফিরে আসতে থাকে, তাই সিয়াম পালনকারী মুসলমানগণও এ আবর্তনের সাথে সাথে কখনও অল্প গরম, কখনো অল্প শীত, কখনও প্রচন্ড গরম ও প্রচণ্ড শীত, কখনও শুষ্ক আবহাওয়া, কখনও আর্দ্র আবহাওয়া মোটকথা সব ঋতুতে ক্ষুধা-পিপাসা সহন ও নিয়ন্ত্রণে অভ্যস্ত হয়ে যায়। সিয়ামের সংখ্যা নির্ধারণের সাথে সাথে শরিয়ত তার সময়ও নির্ণীত করে দিয়েছে। যখন যার মনে চায় শুধু সংখ্যাপূর্তির অধিকার দেওয়া হয়নি। কেননা এভাবে যার যার মর্জি মতে সিয়াম পালনে ব্যক্তি পর্যায়ের সংস্কার ও পরিশুদ্ধি হয়তো বা সম্ভবপর ছিল, কিন্তু সামগ্রিক ও সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য সংখ্যা নির্ণয়ের সাথে সাথে সময় নির্ধারণও জরুরি বিষয়। উম্মতের মাঝে ঐক্যবোধ সৃষ্টির জন্য আরব ও চীন, মিসর ও হিন্দুস্তান, ত্রিপোলী ও জাপান, ইথিওপিয়া ও অস্ট্রেলিয়া, আফগানিস্তান ও কানাডা, নাইজেরিয়া ও মেক্সিকো, বৃটেন ও অস্ট্রিয়া মোটকথা সারা বিশ্বের যেখানেই মুসলিম জনবসতি রয়েছে, সকলেরই এক অভিন্ন সময়ে এ আত্মিক ও আধ্যাত্মিক প্যারেডে অংশগ্রহণ করা অপরিহার্য। সমাজ বিজ্ঞানীগণ অবগত রয়েছেন যে, উম্মাহর ঐক্য ও জাতীয় সংহতি সৃষ্টির জন্য এভাবে একসঙ্গে এক সময় করা অত্যন্ত কার্যকর ও ফলপ্রদ। -[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهٗ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ : অর্থাৎ এ মুবারক মাসের বিশেষ ফজিলত ও গুরুত্ব যখন তোমরা জানতে পারলে, তখন যে কেউ এ মাস পায়, সে যেন অবশ্যই রোজা রাখে। ইতঃপূর্বে সহজীকরণের উদ্দেশ্যে ফিদয়া প্রদানের যে সাময়িক সুবিধা দেওয়া হয়েছিল তা এখন রহিত করা হলো।

ইসলাম স্বভাব ধর্ম : ইসলাম স্বভাব ধর্ম [অর্থাৎ এ ধর্মের প্রতিটি বিষয়ে মানুষের জন্মগত অবস্থা ও স্বভাবজাত চাহিদার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়েছে] এবং এ বৈশিষ্ট্য তার নৈতিক, সামাজিক ও ইবাদত নীতিতে ছোট-বড়, একক ও সার্বিক সব ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। ইবাদত-বন্দেগির ক্ষেত্রে একদিকে নিয়মানুবর্তিতা ও সময়ানুবর্তিতার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। সেখানে আবার সময় বা ওয়াক্তের পরিমাণ নির্ধারণের ব্যাপারটি জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের হিসাব-নিকাশের বাঁধাধরা নিয়মের মুখাপেক্ষী করা হয়নি। সৌরপঞ্জীর অনুসারীরা তাদের ঘড়ি ও ঘণ্টা-মিনিটের জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও সৌরজগতের হিসাব-নিকাশে অভিজ্ঞদের শরণাপন্ন হয়ে থাকতে বাধ্য। কোনো দেশ বা জাতি যদি জ্ঞানবিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতিতে এমন স্তরে পৌঁছে না থাকে যে, তাদের কাছে মানমন্দির [গ্রহ-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করার গৃহ] ও তার প্রয়োজনীয় উপকরণ

ইত্যাদি থাকবে এবং অন্যান্য নানাবিধ যন্ত্র-উপকরণ ব্যবহারে কাজ সমাধা করা হবে। গণিত শাস্ত্রীয় লম্বা-চওড়া ফিরিস্তির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা থাকবে, তবে তো ঐ বেচারাদের নিজেদের ধর্ম পালনের জন্যও অন্যের মুখপানে তাকিয়ে থাকতে হবে; বরং ইসলাম এমন এক সাদাসিধে হিসাবের কথা বলেছে, যা কোনো প্রকার যান্ত্রিক উপকরণ ব্যতিরেকে এবং গাণিতিক উচ্চতর মাধ্যম ব্যতিরেকে সহজেই পালনযোগ্য। শুধু চোখে চাঁদ দেখা হলো, সিয়াম শুরু করে দাও। [পঞ্জিকা-ক্যালেন্ডারের পৃষ্ঠায় তাকিয়ে তাকিয়ে ও আহকামে রমজানের উপর ভরসা রেখে ক্লান্তশ্রান্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই।]

قَوْلُهُ شَهِدَ : ব্যাপক অর্থে। অর্থাৎ রমজান মাস শুরু হয়ে যাওয়ার কথা জানা গেলেই, তা নিজে চাঁদ দেখে হোক কিংবা অন্য কারো চাঁদ দেখার খবর শুনে হোক, অসুস্থ সফরকারী ও অন্যান্য অপারগদের বাদ দিয়ে সকলেই সিয়াম পালন শুরু করবে। شَهِدَ এখানে شُهُوْدٌ [উপস্থিতি] ধাতুমূল থেকে উপস্থিতির অর্থ নির্দেশ করে তা সরাসরি [নিজ চোখে দেখে] হোক কিংবা অবগতি সূত্রে হোক [তাফসীরে রূহুল মা'আনী]। হয় দেখে, নয় তো শুনে। -[তাফসীরে কাবীর]

চাঁদ দেখার মাসআলা : কোথাকার চাঁদ দেখা কত দূরের লোকের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে? ফকীহগণ এ প্রশ্নের জবাবে অনেক বেশি চুলচেরা বিশ্লেষণে সময় খুইয়েছেন। কিন্তু সহজ সরল কথা হলো, যেখানে চাঁদ দেখা গেল, সে শহর ও জনবসতির জন্য, বা আশপাশের জনবসতিগুলোর জন্য। শত শত ও হাজার হাজার মাইল দূরের চাঁদ দেখার খবর তার-বেতারের ফরমায়েশী খবর সংগ্রহের ব্যবস্থাপনা, বোম্বাইয়ের চাঁদ দেখাকে ৯০০ মাইল দূরের কলকাতার জন্য প্রমাণ ঠাওরানো ইসলামি শরিয়তের মূলধারাকে নিপীড়ন করার শামিল। উদয়ক্ষেত্রের বিভিন্নতা (اِخْتِلَافُ مَطَالِعِ) সারা পৃথিবীতে একই দিনে, একই সময় চাঁদ দেখা না যাওয়ার ব্যাপারটি তো একটি সর্বজনবিদিত সুস্পষ্ট ব্যাপার, তা প্রত্যাখ্যান করা কোনো প্রকাশ্য সত্যকে অস্বীকার করার নামান্তর। উম্মতের ঐক্য তথা সিয়াম ও ঈদুল ফিতরে ঐক্যবদ্ধতা নিঃসন্দেহে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু সে জন্য এভাবে উঠেপড়ে লাগাটাও স্বাভাবিক বিষয়কে স্বভাববিরুদ্ধ অস্বাভাবিকে-দিনকে রাত ও সহজকে কঠিন করারই ব্যর্থ প্রয়াস। ইমাম কুরতুবী (র.) লিখেছেন, কোনো সংবাদদাতা কোনো এলাকায় চাঁদ দেখার সংবাদ দিলে তার হুকুম কি হবে, সে বিষয়ে ফকীহগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কেননা সে এলাকাটি হয়তো সংবাদপ্রদত্ত এলাকার কাছের হবে, কিংবা দূরের। কাছের হলে অভিন্ন হুকুম অর্থাৎ চাঁদ দেখার হুকুম সাব্যস্ত হবে। আর দূরের হলে তখন প্রতিটি এলাকার জন্য তাদের চাঁদ দেখা ধর্তব্য হবে। -[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ : প্রথম দিকে বিধান শুধু এতটুকু ছিল যে, সুস্থ ও অবস্থানরত [অর্থাৎ মুসাফির নয়, মুকীম] ব্যক্তি ইচ্ছা করলে নিজে সিয়াম পালন না করে ফিদয়া দিতে পারত। فَمَنْ شَهِدَ আয়াত নাজিল হওয়ার পর থেকে সুস্থ ও মুকীমদের এ সুযোগ রহিত করা হলো এবং রমজানের সিয়াম তাদের জন্য আর ঐচ্ছিক রইল না; বরং আবশ্যিক হয়ে গেল। তবে অসুস্থ, অক্ষম ও মুসাফিরদের জন্য নগদ সিয়াম পালন না করে কাযা করার সুযোগ যথারীতি বহাল রইল। এ কারণেই مَنْ كَانَ مَرِيْضًا আয়াতাংশ পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে مَنْ شَهِدَ- এর শর্তহীন ও ব্যাপক আদেশে কেউ মনে না করে যে, অক্ষম অপারগদের সুযোগও রহিত করা হয়েছে। মোটকথা, বিধানটির পুনরুক্তি শুধু বাহ্যিক পুনরুল্লেখ, কোনো তাত্ত্বিক ও মৌলিক কারণে নয়। পুনরুল্লেখ করা হয়েছে যাতে বিধানের ব্যাপকতা দ্বারা সকলেরই সুযোগ রহিত করার ধারণা না জন্মে। এ কথাটিই মুসান্নিফ (র.) كَرَّرَهُ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ نَسْخُهُ بِتَعْمِيْمِ مَنْ شَهِدَ উক্ত ইবারতে উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ : [কাজার দিনগুলোর গণনা] অর্থাৎ যত দিনের রোজা কাজা হয়ে যাবে, সেগুলো পূর্ণ করে দিলে রোজা আদায়ের পরিপূর্ণ ছওয়াবই পেয়ে যাবে।

সফর অবস্থায় রোজা রাখা উত্তম, না ভঙ্গ করা উত্তম : হাদীস শরীফের আলোকে তো এটাই জানা যায় যে, সফর অবস্থায় রোজা না রাখাই উত্তম। এমনকি কখনো রোজা রাখা মুসাফিরের জন্য অপরাধ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, মক্কা বিজয়ের বছর রাসূল ﷺ রমজান মাসে মক্কার উদ্দেশ্যে সফর করেন। সফর অবস্থায় তিনি রোজা ছিলেন। তার সফরসঙ্গীরাও রোজা ছিলেন। চলতে চলতে 'কুরাউল গাইম' নামক স্থানে পৌঁছলে তিনি পানির পেয়ালা চাইলেন। তিনি সকলের সামনে পেয়ালাটি উঁচু করে ধরে পানি পান করলেন। সকলেই তাকে পানি পান করতে দেখল। ক্ষণিক পর তিনি জানতে পেলেন যে, কিছুলোক এখনও রোজা ভাঙ্গেনি। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, তারা গুনাহগার, তারা গুনাহগার। -[মুসলিম ও তিরমিযী]

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) হতে বর্ণিত-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَائِمُ رَمَضَانَ فِى السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِى الْحَضَرِ (اِبْنُ مَاجَة)

অর্থাৎ সফর অবস্থায় রোজাকারী ঘরে বসে রোজা ভঙ্গকারীর সমতুল্য

সফর অবস্থায় রোজা না রাখার বৈধতার ব্যাপারে সকলেই একমত। কিন্তু রাখা উত্তম, না ভঙ্গ করা উত্তম- এ ব্যাপারে সাহাবা ও তাবেঈনের সামান্য মতভেদ রয়েছে।

١٨٦. وَسَأَلَ جَمَاعَةُ النَّبِيَّ ﷺ أَقَرِيْبٌ رَبُّنَا فَنُنَاجِيْهِ اَمْ بَعِيْدٌ فَنُنَادِيْهِ فَنَزَلَ وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ مِنْهُمْ بِعِلْمِىْ فَاَخْبِرْهُمْ بِذٰلِكَ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ بِاِنَالَتِهِ مَا سَأَلَ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ دُعَائِىْ بِالطَّاعَةِ وَلْيُؤْمِنُوْا يُدِيْمُوْا عَلَى الْاِيْمَانِ بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ يَهْتَدُوْنَ ـ

অনুবাদ :

১৮৬. কতিপয় লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেছিল "আমাদের প্রভু নিকটে না দূরে? যদি নিকটে হন তবে তাঁকে আমরা চুপি চুপি ডাকব, আর যদি দূরে হন তবে তাঁকে আমরা উচ্চৈঃস্বরে ডাকব।"
এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন– আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে [বল] আমিতো আমার জ্ঞান হিসেবে তাদের নিকটেই আছি, তুমি এ সম্পর্কে তাদেরকে সংবাদ দিয়ে দাও। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে তার যাচনা পূরণ করে তার এ আহবানে সাড়া দেই। সুতরাং তারাও যেন আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে আমার আহ্বানে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান স্থাপন করে অর্থাৎ ঈমানের উপর সর্বদা যেন কায়েম থাকে যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে সত্যপথে পরিচালিত হতে পারে।

তাহকীক ও তারকীব

نُنَاجِيْهِ : চুপি চুপি ডাকব। نُنَادِيْهِ : উচ্চৈঃস্বরে ডাকব। اُجِيْبُ : আমি সাড়া দিই।
بِاِنَالَتِهِ مَا سَأَلَ : তার প্রার্থিত বিষয় পূরণ করার জন্য। فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ : তারা যেন আমার সাড়া দেয়।
يُدِيْمُوْا : সর্বদা স্থির থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : ইসলামের প্রাথমিক যুগে রমজান মাসের রাতসমূহের প্রথমাংশে পানাহার ও স্ত্রীগমনের অনুমতি ছিল; কিন্তু শুয়ে পড়ার পর এসব নিষিদ্ধ ছিল। কতিপয় লোকের পক্ষ হতে এর অন্যথা হয়ে যায়। তারা শয়নের পর স্ত্রীগমন করে বসে। তারপর তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট নিজেদের ত্রুটি স্বীকার করে এবং তজ্জন্য ভীষণ অনুতপ্ত হয়। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এর তওবা সম্পর্কেও জানতে চায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাজিল হয়। এতে তাদের তওবা কবুল হওয়ার কথা জানিয়ে দেওয়া হয় এবং মহান আল্লাহর আদেশ পালনে যত্নবান থাকার তাগিদ করা হয়। সেই সঙ্গে আগের হুকুম রহিত করে ভবিষ্যতের জন্য রমজানে সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত রাতভর পানাহার ইত্যাদি হালাল করে দেওয়া হয়, যা সামনের আয়াতে আলোচিত হয়েছে। পূর্বের আয়াতে বান্দাদের প্রতি যে অবকাশ ও অনুগ্রহের উল্লেখ ছিল এই নৈকট্য, সাড়া দান ও বৈধকরণ দ্বারা তার আরও দৃঢ় সমর্থন হয়ে গেল।

আরেকটি যোগসূত্র এও যে, পূর্বের আয়াতে তাকবীর ও মহান আল্লাহর মহিমা বর্ণনার নির্দেশ ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট কয়েকজন সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের প্রতিপালক আমাদের থেকে দূরে, না কাছে? দূরে হলে উচ্চৈঃস্বরে ডাকব আর কাছে হলে নিম্নস্বরে ডাকব। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাজিল হয় এবং এতে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, তিনি তোমাদের নিকটে। তিনি প্রত্যেকের কথা শোনেন, চাই আস্তে ডাকুক, চাই উচ্চৈঃস্বরে। যেসব স্থানে উচ্চৈঃস্বরে ডাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার কারণ ভিন্ন, এমন নয় যে, আস্তে ডাকলে শোনবেন না। –[তাফসীরে উসমানী]

١٨٧. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ بِمَعْنَى الْإِفْضَاءِ إِلَى نِسَائِكُمْ بِالْجِمَاعِ نَزَلَ نَسْخًا لِمَا كَانَ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ مِنْ تَحْرِيْمِهِ وَتَحْرِيْمِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ بَعْدَ الْعِشَاءِ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ كِنَايَةٌ عَنْ تَعَانُقِهِمَا أَوْ اِحْتِيَاجِ كُلٍّ مِنْهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ عَلِمَ اللّٰهُ أَنَّكُمْ تَخْتَانُوْنَ تَخُوْنُوْنَ أَنْفُسَكُمْ بِالْجِمَاعِ لَيْلَةَ الصِّيَامِ وَقَعَ ذٰلِكَ لِعُمَرَ وَغَيْرِهِ وَاعْتَذَرُوْا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَتَابَ عَلَيْكُمْ قَبْلَ تَوْبَتِكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْئٰنَ إِذَا أُحِلَّ لَكُمْ بَاشِرُوْهُنَّ جَامِعُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا اُطْلُبُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ أَيْ أَبَاحَهُ مِنَ الْجِمَاعِ أَوْ قَدَّرَهُ مِنَ الْوَلَدِ .

অনুবাদ :

১৮৭. সিয়ামের রাত্রে তোমাদের জন্য স্ত্রীদের সাথে বাধাহীন ব্যবহার সহবাস বৈধ করা হয়েছে ইসলামের প্রথম যুগে সিয়ামের সময় ইশার পরই খানা-পিনা ও স্ত্রীসম্ভোগ ছিল হারাম। উক্ত বিধান মানসূখ করে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেন।

তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ এ স্থানে পরস্পরকে পরিচ্ছদরূপে আখ্যায়িত করে পরস্পরের নিবিড় সম্পর্ক এবং একজন অন্যজনের প্রতি মুখাপেক্ষিতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহ জানতেন যে সিয়ামের রাত্রে স্ত্রীসম্ভোগ করে তোমরা নিজেদের সাথে প্রতারণা খেয়ানত করছিলে। [নিষিদ্ধকালীন সময়ে] হযরত ওমর ও কতিপয় সাহাবীর তরফ হতে এ ধরনের কাজ সংঘটিত হয়েছিল। তাঁরা তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এ বিষয়ে ওজর পেশ করেন।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, অতঃপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমা পরবশ হয়েছেন, তোমাদের তওবা কবুল করেছেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করেছেন। সুতরাং এখন তোমাদের জন্য যখন বৈধ করে দেওয়া হয়েছে তাদের সাথে সঙ্গত হও সহবাসে লিপ্ত হও এবং আল্লাহ যা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন অর্থাৎ স্ত্রীসম্ভোগ বৈধ করা বা যে সন্তান তোমাদের তকদীরে রাখা হয়েছে তা কামনা কর, অনুসন্ধান কর।

তাহকীক ও তারকীব

اَلرَّفَثُ : এর মূল অর্থ হলো– অশ্লীল কথা। পরবর্তীতে সহবাস ও তার কাছাকাছি বিষয়কে বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। اَلْاِفْضَاءُ : স্ত্রীসম্ভোগ। تَعَانُقٌ : নিবিড় সম্পর্ক, গলায় জড়িয়ে ধরা। تَخْتَانُوْنَ : প্রতারণা করছ। وَقَعَ : সংঘটিত হয়েছিল। اِعْتَذَرُوْا : ওজর পেশ করল।

قَوْلُهُ بِمَعْنَى الْاِفْضَاءِ : প্রশ্ন. رَفَثٌ-এর صِلَةٌ হিসেবে তো فِيْ কিংবা ب আসে। কিন্তু এখানে اِلٰى ব্যবহৃত হলো কেন? উত্তর. رَفَثٌ-এর মধ্যে যেহেতু اِفْضَاءٌ-এর অর্থও রয়েছে তাই صِلَةٌ হিসেবে اِلٰى আসা শুদ্ধ হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) بِمَعْنَى الْاِفْضَاءِ বলে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। –[জামালাইন খ. ১, পৃ. ২৯৫]

قَوْلُهُ تَخْتَانُوْنَ تَخُوْنُوْنَ : প্রশ্ন: تَخْتَانُوْنَ-এর তাফসীরে تَخُوْنُوْنَ উল্লেখ করে লেখক একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, تَخْتَانُوْنَ বাবে اِفْتِعَال থেকে নির্গত। আর এটি সাধারণত লাযিম হয়ে থাকে। অথচ এখানে এটি اَنْفُسَكُمْ-এর দিকে مُتَعَدِّىْ হয়েছে। উত্তর : মূলত تَخْتَانُوْنَ-এর তাফসীরে تَخُوْنُوْنَ উল্লেখ করে এ প্রশ্নেরই উত্তর প্রদান করেছেন। অর্থাৎ بَاب اِفْتِعَال এখানে مُجَرَّد-এর অর্থে। আর بَاب اِفْتِعَال ব্যবহার করা হয়েছে كَثْرَتِ خِيَانَتِ-এর প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য। –[জামালাইন : ২৯৬]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ : বর্তমান বিধানের ন্যায় ইসলামের প্রথম দিকে এরূপ অনুমতি ছিল না। প্রথম দিকে সিয়ামরত অবস্থায় দিনের মতো রাতের বেলায়ও স্ত্রীদের থেকে পৃথক অবস্থানের নির্দেশ ছিল। মূলত ইসলামি শরিয়ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হায়াতে ক্রমান্বয়ে অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন হয়েছে যে, প্রথম দিকে সহজ ও কোমল বিধান দেওয়া হয়েছে, পরে ধীরে ধীরে কঠোর ও শক্ত করা হয়েছে। যেমন– মদ খাওয়া প্রথমে শুধু অপছন্দনীয় হওয়ার কথা বলা হয়েছে এবং অগ্রসর হতে

হতে অবশেষে তো সরাসরি হারাম ও চিরনিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর বিপরীত কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে অর্থাৎ প্রথম দিকে শক্ত ও কঠিন বিধান দিয়ে ধীরে ধীরে তাতে সহজতা ও ছাড় সংযোজিত হয়েছে। যেমন- এ সিয়ামের ব্যাপারটি। প্রথম দিকে রাতেও স্ত্রীসহবাস হারাম ছিল, পরে তার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ اَلرَّفَثُ : এর শাব্দিক অর্থ কামোদ্দীপক ও অশ্লীল কথাবার্তা । কিন্তু এটি সকর্মক ক্রিয়ারূপে ব্যবহার করা হলে তার অর্থ দাঁড়ায় সহবাস ও সহশয্যাবাস। এখানেও اَلرَّفَثُ اِلٰى نِسَآءِ -এর মধ্যে اِلٰى অব্যয় দ্বারা সকর্মক করা হয়েছে। কেননা এটি সহবাস অর্থে [লিসানুল আরব]। পরোক্ষরূপে [প্রচ্ছন্ন] 'সহবাস' বুঝানো হয়েছে এবং সহবাসের অর্থ অন্তর্ভুক্ত করার কারণেই اِلٰى দ্বারা সকর্মক করা হয়েছে [রাগিব]। প্রচ্ছন্নরূপে সহবাস বুঝানো হয়েছে [কাশ্‌শাফ]। এখানে رَفَثْ দ্বারা উদ্দেশ্য সঙ্গম ও সহবাস। -[ইবনুল আরাবী]

এতে আরও একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেল যে, স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ ও চাহিদা আধ্যাত্মিকতা ও আত্মশুদ্ধির [তাযকিয়ার] বিন্দুমাত্র পরিপন্থি নয়। যেমনটা অনেক পৌত্তলিক ও জাহিলি যুগের ধর্মধারীরা মনে করে রেখেছে। তদ্রূপ রমজান মাসের সিয়াম ও বেশি বেশি ইবাদতে লিপ্ত থাকা এবং স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে বসবাস ও মিলন সম্ভোগের মাঝে বিন্দুমাত্র বিরোধ নেই। যদিও যোগী-সন্ন্যাসী সাধুদের অলীক কর্মকাণ্ড তেমন ধারণা জন্ম দিয়েছে। ইসলামি শরিয়ত যে বিষয়টির নিয়ন্ত্রণে কড়া পাহারা বসিয়েছে, তা হলো কাম চরিতার্থ করার হারাম ও অবৈধ ক্ষেত্র ও উপায়সমূহ এবং সেসবের উপক্রমণিকা ও প্রাথমিক সূত্রগুলো। মূল কামচাহিদা নিষিদ্ধ করা হয়নি। কেননা ক্ষুধা, পিপাসা, বিশ্রাম ও নিদ্রার ন্যায় কামক্ষুধাও মানুষের স্বভাবজাত এবং যতক্ষণ তা যথাযথ সীমা লঙ্ঘন না করে, ততক্ষণ তা অকল্যাণকর নয়। নিজের ইচ্ছায় ও শরিয়তসম্মত প্রয়োজন ব্যতিরেকে রমজানের এক একটি সিয়াম ভঙ্গ করার ক্ষেত্রে শরিয়ত লাগাতার দুই মাস অর্থাৎ ষাট দিন সিয়াম পালনের শাস্তি নির্ধারণ করেছে। স্বামী-স্ত্রী সম্মিলিত ইচ্ছায় সিয়াম ভঙ্গ করলে উভয়ের জন্য এ শাস্তি প্রযোজ্য হবে। আর যদি স্ত্রীর অসম্মতিতে স্বামী তাকে সহবাসে বাধ্য করে, তখন স্ত্রীর পাপ হবে না, তবে জোর জবরদস্তি ও বাধ্য করার বিষয়টি বাস্তবিক হতে হবে। সে ক্ষেত্রে স্ত্রীর জন্য একদিনের কাজা যথেষ্ট হবে। কাফ্‌ফারা [ষাট দিনের সিয়াম] সাব্যস্ত হওয়ার স্বেচ্ছায়-সজ্ঞানে হওয়ার উপর নির্ভরশীল।

قَوْلُهُ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ : পরিচ্ছদ ও আচ্ছাদনের [لِبَاس] সঙ্গে উপমার যুক্তি কি? এ প্রশ্নের জবাবে বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন তথ্য ও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেছেন, একে অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়ার বিচারে। কারো মতে দৈহিক ঘনিষ্ঠতা ও স্পর্শ-সংযোগের বিচারে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু মনোযোগ সহকারে চিন্তা করলে প্রতিভাত হবে যে, মানুষের পোশাক ও আচ্ছাদনের একটি বিশেষ দিক হলো তাকে পর্দাবৃত রাখা। দেহের দোষ ও খুঁতগুলো গোপন রেখে তার শোভা ও সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা। এ উপমায় বিশেষভাবে এ দিকটির প্রতি ইঙ্গিত প্রতিভাত হয়। যেন বলে দেওয়া হলো যে, প্রতিটি ইসলামি পরিবারে স্বামী-স্ত্রী হবে একে অন্যের আবরণ; দোষ গোপনকারী ও পরস্পর সৌন্দর্য-শোভার সুষমা সৃষ্টিকারী। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার গভীর ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে তাদের যেভাবে একজন অন্যজনের দৈহিক, নৈতিক ও আত্মিক দোষ ও দুর্বলতা সম্পর্কে অবগত হওয়ার সুযোগ রয়েছে, বলাই বাহুল্য অন্য কোনো আত্মীয় বা বন্ধুর পক্ষে সে যত অধিক ঘনিষ্ঠই হোক না কেন তেমন সুযোগ নেই। স্বামী-স্ত্রী কারো কাছে অন্যের কোনো গোপন বিষয় গোপন থাকে না। এরূপ পরিস্থিতিতে স্ত্রীর সততা ও নৈতিকতার পরিপূর্ণতা হবে এতেই যে, সে প্রতিটি দোষ-দুর্বলতা গোপন করে রাখবে, তাতে সহিষ্ণুতার পরিচয় দেবে এবং স্বামী সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো যথাসাধ্য উত্তমরূপে উপস্থাপন করবে। পক্ষান্তরে স্বামীও নৈতিকতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করবেন একইভাবে। ইসলাম কোনো প্রকার কঠিন কর্মসূচি ও ক্লান্তিকর সাধনায় ঠেলে না দিয়ে দৈনন্দিন জীবনের সাবলীল ধারায় কথায় কথায় স্বামী-স্ত্রীর নৈতিকতার পূর্ণাঙ্গতা বিধানের সরল-সহজ ও সর্বাধিক কার্যকর ব্যবস্থাপত্র তুলে ধরেছে। এ হলো সে ধর্মের শিক্ষা, যাতে নারীদের অবজ্ঞার পাত্র বানিয়ে রাখার অভিযোগে ফিরিঙ্গি বিশেষজ্ঞগণ তা নিম্নমানের হওয়ার ফতোয়া দিয়েছেন। হায় কপাল! প্রোপাগান্ডার বলে মিথ্যাও সত্য হয়ে যায়! তা না হলে এর চেয়ে জঘন্য মিথ্যা ও এর চেয়ে মারাত্মক অপবাদ আর কি হতে পারে? সীতা-সাবিত্রি ও স্বরস্বতী-ভগবতীদের ধর্মের কথা না হয় বাদই দিলাম। নতুন নিয়ম ও পুরাতন নিয়মের ধারক-বাহক ইহুদি-খ্রিস্ট ধর্মের ধ্বজাধারীদের প্রশ্ন করছি- তাদের সমগ্র গ্রন্থভাণ্ডার ও পুস্তকাবলিতে স্বামী-স্ত্রীর প্রেম, বিশ্বাস ও পারস্পরিক সৌহার্দ সম্প্রীতির এমন উচ্চাঙ্গ শিক্ষা কি কোথাও রয়েছে?

قَوْلُهُ وَابْتَغُوْا : কেউ وَابْتَغُوْا দ্বারা শবে কদরের সন্ধান করা এবং مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ দ্বারা শবে কদরের বিশাল ছওয়াব উদ্দেশ্য নিয়েছেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করেছেন। এ ব্যাখ্যাকে তাফসীরে বিদ'আত ও অভিনবত্বের কাছাকাছি বলা যায় [কাশশাফ]। কেননা وَابْتَغُوْا দ্বারা স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, বংশবৃদ্ধিই উদ্দেশ্য; স্বেচ্ছাকৃত সন্তানহীনতা বা 'আযল' [অর্থাৎ জন্মনিরোধ] নয়। কারো কারো মতে, এতে আযলের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে [কাশশাফ]। গর্ভনিরোধ ও জন্মনিয়ন্ত্রণের যে সমকালীন আন্দোলন খুব জোরেশোরে চালানো হচ্ছে এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ [ও সুখী পরিবার গঠন] ইত্যকার আকর্ষণীয় লেবেল লাগিয়ে উপস্থাপন করা হচ্ছে এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের বক্তব্যধারা দ্ব্যর্থতামুক্ত। পবিত্র কুরআন তার বাগ্মীতাপূর্ণ ও অনন্য বর্ণনাধারায় এসব প্রত্যাখ্যান করে স্পষ্ট ব্যক্ত করেছে যে, স্বামী-স্ত্রী মিলনের প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক পরিণতির প্রতি আশাবাদী ও আস্থাশীল থাকাই বাঞ্ছনীয়, তার প্রতীক্ষায় থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। প্রকৃতির সাধারণ ও ব্যাপক বিধি এমনই। আর স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনের প্রাকৃতিক ফলাফলকে চরম প্রয়োজন ও সবিশেষ কারণ ব্যতিরেকে কৃত্রিম পন্থা ও স্বভাববিরুদ্ধ উপায়ে প্রতিহত করা, কনডম ইত্যাদি উপকরণ ব্যবহার করা [তথাকথিত] বিপদ দূর করা নয়; বরং তা শরীরের রোগ-যাতনা ও নৈতিক ব্যাধি-অবক্ষয় বাড়ানো, ব্যক্তি ও সমষ্টির জন্য নিত্য নতুন সমস্যা, বহুবিধ বিপদ ও নতুন নতুন ব্যাধি জন্ম দেওয়া এবং সর্বোপরি ব্যক্তি ও সমাজের জন্য নতুন নতুন বিপদ ও সমস্যা ডেকে আনা [এক কথায় সামাজিক শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিধ্বংসী মারাত্মক বিস্ফোরণ ঘটানো] -রই নামান্তর।

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوا اللَّيْلَ كُلَّهُ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ يَظْهَرَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ اَيِ الصَّادِقِ بَيَانٌ لِلْخَيْطِ الْاَبْيَضِ وَبَيَانُ الْاَسْوَدِ مَحْذُوْفٌ اَىْ مِنَ اللَّيْلِ شَبَّهَ مَا يَبْدُوْ مِنَ الْبَيَاضِ وَمَا يَمْتَدُّ مَعَهُ مِنَ الْغَبْشِ بِخَيْطَيْنِ اَبْيَضَ وَاَسْوَدَ فِى الْاِمْتِدَادِ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ مِنَ الْفَجْرِ اِلَى اللَّيْلِ اَىْ اِلٰى دُخُوْلِهِ بِغُرُوْبِ الشَّمْسِ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ اَىْ نِسَاءَكُمْ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ مُقِيْمُوْنَ بِنِيَّةِ الْاِعْتِكَافِ فِى الْمَسٰجِدِ مُتَعَلِّقٌ بِعَاكِفُوْنَ نَهْىٌ لِمَنْ كَانَ يَخْرُجُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَيُجَامِعُ اِمْرَأَتَهُ وَيَعُوْدُ تِلْكَ الْاَحْكَامُ الْمَذْكُوْرَةُ حُدُوْدُ اللّٰهِ حَدَّهَا لِعِبَادِهِ لِيَقِفُوْا عِنْدَهَا فَلَا تَقْرَبُوْهَا اَبْلَغُ مِنْ لَا تَعْتَدُوْهَا الْمُعَبَّرُ بِهِ فِىْ اٰيَةٍ اُخْرٰى كَذٰلِكَ كَمَا بَيَّنَ لَكُمْ مَا ذُكِرَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ مَحَارِمَهُ.

অনুবাদ : সারা রাত্র তোমরা আহার কর, পান কর যতক্ষণ রাত্রির কৃষ্ণরেখা হতে ফজরের সুবহে সাদিক বা আসল উষার শুভ্ররেখা স্পষ্ট রূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। সুস্পষ্ট না হয়। مِنَ الْفَجْرِ এটা اَلْخَيْطُ الْاَبْيَضُ বা শুভ্ররেখার বিবরণ। اَلْخَيْطُ الْاَسْوَدُ কৃষ্ণরেখার বিবরণ এ স্থানে উহ্য। তা হলো مِنَ اللَّيْلِ অর্থাৎ রাত্রির কৃষ্ণরেখা। উষার শুভ্রতা এবং তৎসঙ্গে রাত্রির শেষলগ্নের [অপসৃয়মান] যে আঁধার ছড়িয়ে থাকে, এতদুভয়কে এস্থানে তাদের বিস্তৃতি হিসেবে সাদা কালো দুটি রেখার সাথে তুলনা করা হয়েছে। অতঃপর ফজর হতে [রাত্র পর্যন্ত] অর্থাৎ সূর্যাস্তের মাধ্যমে নিশাগম পর্যন্ত তোমরা সিয়াম পূর্ণ কর। তোমরা মসজিদে ই'তিকাফকালে অর্থাৎ ই'তিকাফের নিয়তে মসজিদে অবস্থানরত থাকাকালে তাদের সাথে তোমাদের স্ত্রীগণের সাথে সঙ্গত হয়ো না। এ স্থানে ই'তিকাফরত অবস্থায় মসজিদ হতে বের হয়ে স্ত্রীসম্ভোগ করতঃ মসজিদ প্রত্যাবর্তন করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। فِى الْمَسٰجِدِ এটা عَاكِفُوْنَ -এর مُتَعَلِّق বা এর সাথে সংশ্লিষ্ট।

এগুলো অর্থাৎ উল্লিখিত বিধানসমূহ আল্লাহর সীমারেখা তাঁর বান্দাদের জন্য। তিনি এটা নির্ধারণ করে দিয়েছেন যাতে তারা তার নিকট এসে নিজেদের গতিরুদ্ধ করে, এই সীমারেখা লঙ্ঘন না করে সুতরাং এগুলোর নিকটবর্তী হয়ো না। অপর একটি আয়াতে এ স্থানে لَا تَعْتَدُوْهَا [তা লঙ্ঘন করো না] উল্লেখ হয়েছে। তা অপেক্ষা এ আয়াতটিতে ব্যবহৃত لَا تَقْرَبُوْهَا [তার নিকটবর্তী হয়ো না] এ বর্ণনারীতিতে অধিক مُبَالَغَة বা জোর বিদ্যমান। এভাবে অর্থাৎ তোমাদের জন্য যেমন উল্লিখিত বিষয়সমূহ বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে তেমনি আল্লাহ তাঁর নিদর্শনাবলি মানবজাতির জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অবৈধ কার্যাবলি হতে বেঁচে থাকতে পারে।

তাহকীক ও তারকীব

شُبِّهَ : উপমা দেওয়া হয়েছে। مَا يَبْدُوْ : যা প্রকাশিত হয়। اَلْبَيَاضُ : শুভ্রতা। يَمْتَدُّ : **বিস্তৃত হয়।**

اَلْغَبْشُ : আঁধার। اَلْاِمْتِدَادُ : বিস্তৃতি। عٰكِفُوْنَ : অবস্থানরত।

اَلْاِعْتِكَافُ فِى اللُّغَةِ : اَللُّبْثُ وَاللُّزُوْمُ وَفِى الشَّرْعِ : اَلْمَكْثُ فِى الْمَسْجِدِ لِلْعِبَادَةِ.

اَلْحَدُّ فِى اللُّغَةِ : اَلْمَنْعُ وَأَصْلُهُ الْحَاجِزُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ الْمُتَقَابِلَيْنِ। অর্থ– সীমারেখা। حُدُوْدٌ : حَدٌّ -এর ব-ব। আর আহকাম বা বিধানকে حَدٌّ বলার কারণ হলো, এটি হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য করে দেয়। لِيَقِفُوْا : তারা যেন গতিরুদ্ধ করে। اَلْمُعَبَّرُ : ব্যক্তকৃত, বর্ণনারীতি। مَحَارِمَهُ : অবৈধ কাজসমূহ।

قَوْلُهُ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا : এ অংশটির عَطْف হয়েছে পূর্বের بَاشِرُوْا -এর সাথে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ : অর্থাৎ সুবহে সদিক [প্রথম উষা] উদিত হওয়া পর্যন্ত পানাহার ও সহবাসের অনুমতি রয়েছে।

اَلْخَيْطُ الْاَسْوَدُ مِنَ الْاَبْيَضِ : ফজরের সাদারেখাটি কালোরেখা থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া দ্বারা পরোক্ষ অর্থে রাতের আঁধার মিলিয়ে গিয়ে সকালের আলো প্রকাশ পাওয়া অর্থাৎ ফজর হয়ে যাওয়া বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ দিনের সাদা আভা রাতের কালো বর্ণ থেকে [মাআলিম]। খোদ শরিয়ত প্রবর্তক নবী করীম ﷺ থেকে এ ব্যাখ্যাই বর্ণিত হয়েছে– هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ : তা হলো রাতের কালো বর্ণ [আঁধার] ও দিনের সাদা বর্ণ [আলো]। –[বুখারী]

خَيْط [সূত্র] শব্দ দ্বারা রূপক অর্থে বর্ণ বুঝানো হয়। আর এখানে তো বাস্তবও অনেকটা তাই। কেননা প্রথম দিকের আলো রেখারূপেই প্রতিভাত হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ مِنَ الْفَجْرِ : শরিয়তের ফজর সুবহে কাযিব [প্রতারক উষা] নয়, যখন কিছু সময়ের জন্য উত্তর-দক্ষিণে প্রলম্বিত আলোকরশ্মি দেখা যায়; বরং এ মিথ্যা উষার একটু পরেই যে ঝলক দেখা যায় এবং যা পূর্ব-পশ্চিমে প্রলম্বিত হয়ে ক্রমান্বয়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে তা-ই হলো শরিয়তি ফজর বা সুবহে সাদিক। জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, সে হলো ডানে বামে বিস্তীর্ণ ফজর-উষা রেখা।

قَوْلُهُ شُبِّهَ مَا يَبْدُوْ مِنَ الْبَيَاضِ وَمَا يَمْتَدُّ مَعَهُ : লেখক এ ইবারতটুকু বৃদ্ধি করে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, এখানে সুবহে সাদিককে خَيْط اَبْيَض -এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। অথচ এ উপমাটি সুবহে কাযিবের সঙ্গে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা সেটি সুতার মতো দৈর্ঘ্যে বিস্তৃত হয়, আর সুবহে সাদিক প্রস্থে বিস্তৃত হয়। উক্ত ইবারতে এ প্রশ্নের উত্তর এভাবে দিয়েছেন যে, সুবহে সাদিক যখন প্রথমে উদয় হয়, তখন তার উপরিভাগের কোনাটা خَيْط اَبْيَض -এর মতো হয়। এ থেকে জানা গেল, মূলত প্রথম প্রকাশমান সুবহে সাদিকের কোনাকে خَيْط اَبْيَض -এর সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। –[জামালাইন]

اَلْغَلَسُ : এর অর্থ– غَلَسٌ بَقِيَّةِ اللَّيْلِ বা শেষ রাতের আঁধার।

قَوْلُهُ اِلَى اللَّيْلِ : রাত পর্যন্ত অর্থাৎ যখন থেকে রাত শুরু হয় অর্থাৎ সূর্যগোলক সম্পূর্ণ অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত। এরূপ উদ্দেশ্য নয় যে, রাতের আঁধার ছেয়ে যাওয়া পর্যন্ত সিয়াম অব্যাহত রাখবে। রাতের আগমন শুরু হওয়া মাত্র সিয়াম পালন সমাপ্ত হতে হবে। রাতের কোনো অংশ সিয়ামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়া চলবে না।

'সাওমে বেসাল' [বিরতিহীন সাওম] অর্থাৎ দিনরাতের মাঝে একবারও ইফতার না করে অবিরাম সিয়াম পালন নিষিদ্ধ হওয়ার বিধানও অনেক ফকীহ এ আয়াত থেকেই আহরণ করেছেন। হাদীসে তো পরিষ্কার নিষেধাজ্ঞা বিদ্যমান রয়েছেই। এতে নিরবচ্ছিন্ন [সিয়াম পালন] নিষিদ্ধ হওয়ার দাবি রয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) ও তা বলেছেন। –[কুরতুবী] সুতরাং আয়াত নির্দেশ করল যে, রাত সিয়ামের ক্ষেত্রে নয় এবং [নিরবচ্ছিন্নভাবে] দুদিনের সিয়াম পালন একটি সাওম রূপেই সাব্যস্ত হবে। নবী করীম ﷺ-ও তো এ আয়াত সূত্রে নিরবচ্ছিন্নতা হারাম হওয়া উদ্ঘাটন করেছেন। –[রুহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ اَىْ اِلٰى دُخُوْلِهِ بِغُرُوْبِ الشَّمْسِ : এ অংশটুকু উল্লেখ করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে غَايَة টা مُغَايَه -এর মাঝে অন্তর্ভুক্ত নয়। –[জামালাইন]

قَوْلُهُ عَاكِفُوْنَ : ই'তিকাফ-এর আভিধানিক অর্থ হলো– নিজেকে কোনো কিছুতে নিরত রাখা বা লাগিয়ে রাখা। **শরিয়তের** পরিভাষায় মসজিদে অবস্থান করে নিজেকে ইবাদতের জন্য আবদ্ধ করে নেওয়া। সব সময়ের জন্য মসজিদে **থাকা, শোয়া,** পানাহার করা, শয়ন ও জাগরণ, পান ও ভোজন সব মসজিদ থেকে সম্পাদন করা এবং শরিয়ত সমর্থিত বা প্রাকৃতিক **জরুরি** প্রয়োজন ব্যতিরেকে মসজিদের বাইরে বের না হওয়া ই'তিকাফকারীর অপরিহার্য কর্তব্য। মানবিক [প্রাকৃতিক] **প্রয়োজন ও** জুমার ফরজ আদায়ের প্রয়োজন ব্যতীত বের না হওয়া তার জন্য ওয়াজিব [জাসসাস]। তার ই'তিকাফের **সময়সীমা** সর্বাধিক কত হতে পারে তা নির্ণীত নয়। তবে সর্বনিম্ন সময় ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এক মুহূর্ত [অর্থাৎ **স্বল্পক্ষণ] ও** হতে পারে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালেক (র.) -এর মতে অন্তত একদিন একরাত [অর্থাৎ **পূর্ণ একদিন]** হতে হবে।

قَوْلُهُ فِى الْمَسَاجِدِ : এ থেকে আহরণ করা হয়েছে যে, ই'তিকাফ সর্বদা মসজিদেই হতে হবে। আলেমগণ **একমত হয়েছে** যে, ই'তিকাফ মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও হবে না। –[কুরতুবী] তবে মহিলাদের ই'তিকাফ মসজিদের **পরিবর্তে ঘরের** কোনো কোণে যেটি সালাত ও ইবাদতের জন্য সুনির্দিষ্ট করে নেওয়া হবে, সেখানেও হতে পারে। **মসজিদে তাদের** ই'তিকাফ করাকে ফকীহগণ মাকরুহ লিখেছেন। আর নারী তার ঘরের মসজিদে ই'তিকাফ করবে। যদি **ঘরে তার জন্য** কোনো মসজিদ [সালাতের নির্দিষ্ট স্থান] না থাকে, তবে সেখানে [মসজিদরূপে] কোনো স্থান নির্দিষ্ট করে **নিয়ে ই'তিকাফ** করবে। –[হিদায়া]

সুন্নত ই'তিকাফ এ [রমজানের] ই'তিকাফই। পরিভাষায় এটি সুন্নতে কিফায়া অর্থাৎ কোনো জনপদের **যে কেউ এভাবে** ই'তিকাফ করলে সকলে দায়মুক্ত হবে এবং জনপদের পক্ষে সুন্নতটি প্রতিপালিত সাব্যস্ত হবে। তবে মূল **ই'তিকাফ শুধু** রমজানেই সীমাবদ্ধ নয়, তা যে কোনো সময় যে কোনো অবস্থায় মোস্তাহাব ও যথেষ্ট ফজিলতের কাজ।

قَوْلُهُ فَلَا تَقْرَبُوْهَا: أَبْلَغُ مِنْ لَا تَعْتَدُوْهَا الْمُعَبَّرُ بِهِ فِىْ اٰيَةٍ أُخْرٰى لَا تَعْتَدُوْهَا -এর মাঝে সুস্পষ্টভাবে **নিষেধ করা** হয়েছে। আর فَلَا تَقْرَبُوْهَا -এর মাঝে كِنَايَة বা ইঙ্গিতমূলকভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আর প্রসিদ্ধ নিয়ম **হলো–**

اَلْكِنَايَةُ اَبْلَغُ مِنَ التَّصْرِيْحِ .

قَوْلُهُ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيَاتِهٖ لِلنَّاسِ : অর্থাৎ এখানে যেভাবে তিনি সিয়াম ও তার সীমা-পরিধি, সময় **ইত্যাদি** এবং ই'তিকাফ ও আনুষঙ্গিক বিধিমালা বিশদরূপে বর্ণনা করে দিলেন, তদ্রূপ মানুষের সাফল্য ও কল্যাণের লক্ষ্যে **প্রদত্ত তার** অন্যান্য নীতি-বিধানও বিশদভাবেই বর্ণনা দিতে থাকেন। মর্ম হলো, তিনি যেভাবে এখানে তাঁর আদেশ ও **নিষেধের** পরিষ্কার বর্ণনা দিলেন, অনুরূপভাবে তাঁর দীন ও শরিয়তের অন্যান্য যুক্তিপ্রমাণ ও নিদর্শনসমূহও স্পষ্ট ভাষায় **ব্যক্ত করেন।** **–[তাফসীরে কাবীর]**

অনুবাদ :

١٨٨. وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ اَيْ لَا يَأْكُلْ بَعْضُكُمْ مَالَ بَعْضٍ بِالْبَاطِلِ الْحَرَامِ شَرْعًا كَالسَّرِقَةِ وَالْغَصَبِ وَ لَا تُدْلُوْا تُلْقُوْا بِهَا اَيْ بِحُكُوْمَتِهَا اَوْ بِالْاَمْوَالِ رِشْوَةً اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا بِالتَّحَاكُمِ فَرِيْقًا طَائِفَةً مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ مُتَلَبِّسِيْنَ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّكُمْ مُبْطِلُوْنَ ـ

১৮৮. তোমরা নিজেদের মধ্যে অর্থসম্পদ অন্যায়ভাবে শরিয়তের বিধানানুসারে যা হারাম তদ্রূপ পদ্ধতিতে যেমন– চুরি, অপহরণ ইত্যাদি উপায়ে গ্রাস করো না অর্থাৎ একজন অপরজনের অর্থসম্পদ লুটপাট করে ফেলো না।

মানুষের ধন-সম্পত্তির এক অংশ কিয়দংশ পাপের সাথে মিশ্রণ করে এবং তোমরা যে অন্যায়কারী তা জেনেশুনে বিচারের মাধ্যমে তা গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকগণের নিকট এর বিচার নিয়ে যেয়ো না বা উৎকোচস্বরূপ কোনো সম্পদ বিচারকদের দিয়ো না। بِالْاِثْمِ শব্দটি এ স্থানে উহ্য مُتَلَبِّسِيْنَ -এর مُتَعَلِّق; তার সাথে সংশ্লিষ্ট।

তাহকীক ও তারকীব

اَلسَّرِقَةُ : চুরি। اَلْغَصَبُ : অপহরণ। لَا تُدْلُوْا : নিক্ষেপ করো না। বিচার দায়ের করোনা। اِدْلَاءٌ -এর মূল অর্থ হলো– কূপের ভিতর বালতি ফেলা। তারপর সকল প্রকার নিক্ষেপের অর্থে ব্যবহৃত হয়। حُكُوْمَةٌ : বিচার। رِشْوَةٌ : ঘুষ ব-ব رِشًى - اَلْحُكَّامُ : حَاكِمٌ -এর ব-ব। অর্থ– বিচারক। اَلتَّحَاكُمُ : বিচার, ফয়সালা। مُتَلَبِّسِيْنَ : মিশ্রিত করে।

قَوْلُهُ لَا تُدْلُوْا بِهَا : এখানে لَا মুকাদ্দার ধরে ইঙ্গিত করেছেন যে, এর عَطْف হয়েছে لَا تَاْكُلُوْا -এর সাথে। সুতরাং لِ **তাকুলু যেরূপ** مَجْزُوْمٌ بِالْجَازِمِ অনুরূপ تُدْلُوْا -ও مَجْزُوْمٌ بِالْجَازِمِ হবে। পার্থক্য শুধু এই যে, এখানে جَازِم উহ্য আছে আর ওখানে **প্রকাশ রয়েছে।**

اِدْلَاءٌ -এর মূল অর্থ কূপে বালতি ঝুলিয়ে দেওয়া। রূপক অর্থে কোনো কিছু কোথাও পৌঁছে দেওয়া এবং উপায় ও মাধ্যম **রূপে ব্যবহার করা ইত্যাদি বুঝিয়ে থাকে।** আয়াতের অর্থ হবে– সম্পদকে বিচারপতিদের পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য, নিজের **প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারের জন্য মাধ্যম বানিও না; ঘুষ উপহার** ইত্যাদি দিয়ে বিচারকদের প্রভাবিত করবে না। এখানে هَا **যমীর দ্বারা সম্পদ [اَمْوَال] উদ্দেশ্য।**

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : রোজা দ্বারা আত্মার পরিশুদ্ধি উদ্দেশ্য ছিল। এবার অর্থসম্পদের পবিত্রকরণ সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে। এর দ্বারা জানা গেল যে, হালাল মাল তো **কেবল** রোজা **অবস্থায় খাওয়া** নিষেধ। **কিন্তু** হারাম মালামালের ক্ষেত্রে সারাজীবন রোজা রাখতে হবে। অর্থাৎ হারাম মাল জীবনে কখনো খাওয়া যাবে না। এর জন্য কোনো সময়সীমা নেই। চুরি, খিয়ানত, প্রতারণা, ঘুষ, ছিনতাই, জুয়া, অবৈধ লেনদেন ও সুদ ইত্যাদি উপায়ে অর্থোপার্জন সম্পূর্ণ হারাম ও অবৈধ।

قَوْلُهُ لَا تَاْكُلُوْا : 'খাওয়া' এখানে শাব্দিক অর্থে নয়। অর্থাৎ শুধু আহার করা উদ্দেশ্য নয়; বরং যে কোনো উপায়ে [গ্রাস করা, আত্মসাৎ করা] ও নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসা। ব্যবহারিক ভাষায়ও এরূপ ক্ষেত্রে বলা হয়, অমুক ভদ্রলোক টাকা খেয়ে ফেলেছে, মুদ্রাগুলো হজম করে ফেলেছে ও গিলে ফেলেছে ইত্যাদি ফকীহগণ তো বাতিল পন্থায় ভক্ষণের যে তাফসীল দিয়েছেন, তাতে জুয়া, অপহরণ, ছিনতাই, কারো হক মেরে দেওয়ার সাথে আরো একটি খাতকে বাতিল তালিকাভুক্ত করেছেন; সে সম্পদও বাতিলের বিধানভুক্ত, যাতে মালিকের মনের তুষ্টি নেই কিংবা মালিকের মনের তুষ্টি থাকলেও শরিয়ত যা হারাম ঘোষণা করেছে।–[কুরতুবী]

قَوْلُهُ اَمْوَالَكُمْ : সম্বোধনের লক্ষ্য সকল ঈমানদার; বিধানটি উম্মতের প্রতিটি সদস্যের জন্য। اَمْوَالَكُمْ -এর যথার্থ অনুবাদ 'নিজের সম্পদ' দ্বারা প্রকাশ সম্ভব নয়; বরং সেজন্য বলতে হবে একে অন্যের সম্পদ, যেমন- اُقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ দ্বারা একে অন্যকে খুন করা অর্থ উদ্দেশ্য। অর্থ হবে তোমাদের একে অন্যের মাল অন্যায়ভাবে [ও অধিকারবিহীন রূপে] খাবে না। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ بَيْنَكُمْ : ফকীহগণ সমগ্র মানবজাতিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, অর্থাৎ বিধানটি শুধু মুসলমানদের অর্থসম্পদের ক্ষেত্রেই সীমিত নয় মুসলমান হোক কিংবা কাফের বিধর্মী হোক কারো অর্থ-সম্পদই ধাপ্পাবাজী, চক্রান্ত ও জুলুমবাজির মাধ্যমে আত্মসাৎ করা বৈধ নয়। শুধু 'হারবী' [শত্রু পক্ষীয়] কাফেরদের সম্পদে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও তসরুফ বৈধ রয়েছে। কেননা তার সাথে তো যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়াই রয়েছে। তবুও এ ক্ষেত্রে বিষয়টি উন্মুক্ত অনুমোদন প্রদত্ত নয়; বরং তাতেও বিশেষ বিশেষ শর্ত সংযুক্ত ও বিধিনিষেধ রয়েছে। যেমন- ঘুষ, জালিয়াতি, খেয়ানত, বিশ্বাস ভঙ্গ করা এবং হারবী কাফেরের সাথে লেনদেন ক্ষেত্রেও বৈধ নয়।

قَوْلُهُ وَتُدْلُوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ : অর্থাৎ জালিম বিচারককে কারও অর্থ-সম্পদ সম্পর্কে জানিও না। অথবা বিচারককে নিজের পক্ষে এনে অন্যের মাল গ্রাস করার জন্য নিজের মাল তাকে ঘুষ দিয়ো না। কিংবা মিথ্যা সাক্ষ্য ও মিথ্যা শপথ করে অথবা মিথ্যা দাবি করে অন্যের অর্থ-সম্পত্তি আত্মসাৎ করো না, বিশেষ করে নিজের অন্যায় সম্পর্কে যখন জানাও থাকে। -[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ بِالْاِثْمِ : اِثْم শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। আদালতের কার্যক্রম ও লেনদেনের তদবিরের ক্ষেত্রে যত ধরনের অন্যায় পন্থা অবলম্বন করা হয়, সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

আদালতের রায় প্রসঙ্গ : পৃথিবীর যে কোনো আদালত যতই উন্নত হোক না কেনো বিচারক যতই ন্যায়পরায়ণ হোক না কেন, পৃথিবীর বুকে কোনো ফয়সালা তো আর অদৃশ্য জগতের জ্ঞান আহরণের সূত্র হতে পারে না, মামলার বিবরণ ও তথ্যের ভিত্তিতেই বিচারকদের রায় দিতে হয়। সুতরাং তাতে ত্রুটি-বিচ্যুতি, অন্যায়-অবিচার ও ভুল তথ্যের শিকার হওয়ার সম্ভবনা সর্বদাই থেকে যায়। এ আয়াতে সে বাস্তবতাই ব্যক্ত করেছে যে, ন্যায় ও বাস্তব সত্য তো আল্লাহর নিকটেও সত্য সঠিক সাব্যস্ত হবে, আর অন্যায় অসত্য আল্লাহর নিকট অন্যায়ই থেকে যাবে, যদিও বিচারকর্তাদের সিদ্ধান্ত তার বিপরীতেও হয়। বিচারকের রায় ন্যায়কে অন্যায়, অন্যায়কে ন্যায় বানিয়ে দিতে পারে না। কেননা সে তো বাহ্যিক [সাক্ষ্য-প্রমাণের] ভিত্তিতে ফয়সালা দিতে থাকে। হাদীসে জোরদার ভাষায় এ বিষয়টির স্পষ্ট বিবৃত হয়েছে-

اِعْلَمِ ابْنَ اٰدَمَ اَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِيْ لَا يُحِلُّ لَكَ حَرَامًا وَيُحِقُّ لَكَ بَاطِلًا اِنَّمَا يَقْضِي الْقَاضِيْ بِنَحْوِ مَا يَرٰى وَيَشْهَدُ بِهِ الشُّهُوْدُ وَالْقَاضِيْ بَشَرٌ يُخْطِئُ وَيُصِيْبُ.

অর্থাৎ "আদম সন্তান! জেনে রাখ, বিচারকের রায় তোমার জন্য হারামকে হালাল ও অন্যায়কে ন্যায় করে দেয় না। বিচারক তো তাঁর উপলব্ধি ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য অনুসারে রায় দিয়ে থাকেন। আর বিচারক একজন মানুষই, সে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, আবার ভুল সিদ্ধান্তও দিতে পারে।" -[ইবনু জারীর]

আল্লাহর মনোনীত রাসূল ﷺ -ও অজানা প্রকৃত অবস্থায় অবগতি থাকার ব্যাপারে নিজেকে দায়মুক্ত ঘোষণা করেছেন। সুতরাং অন্যরা কি করে তাতে পরিবর্তন সাধন করবে [ইবনুল আরাবী]; বরং যারা চাপাবাজি করে, কথার ফুলঝুরি ছড়িয়ে নিজের প্রভাব বা তদবিরের জোরে মামলা জিতে গেলেন, তাদের আরো বেশি ভীত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে এ কারণে যে, তারা প্রতিপক্ষের অধিকার নষ্ট করা ও অন্যান্য অপরাধের পাশাপাশি অবশেষে বিচারককে প্রতারিত করার অপরাধও করলেন।

١٨٩. يَسْئَلُوْنَكَ يَا مُحَمَّدُ عَنِ الْاَهِلَّةِ جَمْعُ هِلَالٍ لِمَ تَبْدُوْ دَقِيْقَةً ثُمَّ تَزِيْدُ حَتّٰى تَمْتَلِئَ نُوْرًا ثُمَّ تَعُوْدُ كَمَا بَدَتْ وَلَا تَكُوْنُ عَلٰى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ كَالشَّمْسِ قُلْ لَهُمْ هِىَ مَوَاقِيْتُ جَمْعُ مِيْقَاتٍ لِلنَّاسِ يَعْلَمُوْنَ بِهَا اَوْقَاتَ زَرْعِهِمْ وَمَتَاجِرِهِمْ وَعِدَّةَ نِسَائِهِمْ وَصِيَامِهِمْ وَاِفْطَارِهِمْ وَالْحَجِّ عَطْفٌ عَلَى النَّاسِ اَىْ يُعْلَمُ بِهَا وَقْتُهُ فَلَوِ اسْتَمَرَّتْ عَلٰى حَالَةٍ لَمْ يُعْرَفْ ذٰلِكَ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا فِى الْاِحْرَامِ بِاَنْ تَنْقُبُوْا فِيْهَا نَقْبًا تَدْخُلُوْنَ مِنْهُ وَتَخْرُجُوْنَ وَتَتْرُكُوا الْبَابَ وَكَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ذٰلِكَ وَيَزْعَمُوْنَهُ بِرًّا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ اَىْ ذَا الْبِرِّ مَنِ اتَّقَى اللّٰهَ بِتَرْكِ مُخَالَفَتِهِ وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا فِى الْاِحْرَامِ كَغَيْرِهِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ تَفُوْزُوْنَ.

অনুবাদ :

১৮৯. হে মুহাম্মদ ! লোকে তোমাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে اَهِلَّةٌ শব্দটি هِلَالٌ [নতুন চাঁদ] -এর বহুবচন। প্রশ্ন করে যে, এটা শুরুতে কেন এমন সরু হয়ে আকাশে প্রকাশ পায় অতঃপর ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে একদিন আলোয় আলোয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠে পরে আবার ক্রমান্বয়ে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সূর্যের মতো একই রূপে কেন বিদ্যমান থাকে না? তাদেরকে বল, এটা সময় নির্দেশক مَوَاقِيْتُ শব্দটি مِيْقَاتٌ [সময় নির্দেশক] -এর বহুবচন। মানুষের ও হজের জন্য اَلْحَجّ -এর اَلنَّاسِ -এর সাথে عَطْف বা অন্বয় সংঘটিত হয়েছে। অর্থাৎ এর মাধ্যমেই মানুষ জানতে পারে, কৃষি, ব্যবসায়, স্ত্রীগণের ইদ্দত, সাওম ও ইফতারের সময়। আর হজের নির্ধারিত সময়ও তারা এটার দ্বারা জানে। তা যদি সর্বদা একই রূপে বিদ্যমান থাকত তবে এসব কিছুই জানা যেত না। ইহরামের সময় পশ্চাৎ দিক দিয়ে তোমাদের গৃহ-প্রবেশ করাতে অর্থাৎ ইহরামকালে দ্বার পরিত্যাগ করে গৃহের পশ্চাৎদেশে ছিদ্র করতঃ এতে যে তোমরা প্রবেশ কর তাতে কোনো পুণ্য নেই।] জাহিলি যুগে আরবদের মধ্যে এ ধরনের প্রথা প্রচলিত ছিল এবং এতে পুণ্য হয় বলে তারা ধারণা করত। কিন্তু পুণ্য হলো তার অর্থাৎ পুণ্যের অধিকারী হলো সে ব্যক্তি যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে চলে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ পরিত্যাগ করে। অন্যান্য সময়ের মতো ইহরামকালেও তোমরা দরজা দিয়ে গৃহে প্রবেশ কর, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা কল্যাণ প্রাপ্ত হতে পার। সফলকাম হতে পার।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ الْاَهِلَّةِ : اَلْاَهِلَّةُ শব্দটি هِلَالٌ -এর বহুবচন। মূলত اَهْلِلَةٌ ছিল। لَام -এর কাসরাটি পূর্বের সুকূনযুক্ত هَا -কে দেওয়া হয়েছে। তারপর لَام -কে لَام -এর মাঝে ইদগাম করা হয়েছে। তৃতীয় রাত পর্যন্ত উদীয়মান চাঁদকে হেলাল বলা হয়। তারপর قَمَر এবং পূর্ণ চাঁদকে بَدْر বলা হয়।

কেউ কেউ বলেন, প্রথম এবং শেষ দু রাতের চাঁদকে হেলাল বলা হয়। هِلَال -এর মূল অর্থ رَفْعُ الصَّوْتِ বা স্বর উঁচু করা, হৈ চৈ করা। নতুন চাঁদ দেখে মানুষ হৈ চৈ করে বিধায় একে এ নামকরণ করা হয়েছে।

تَبْدُوْ : [প্রকাশিত হয়] بُدُوًّا (ن) بَدَا অর্থ– প্রকাশিত হওয়া। دَقِيْقَةً : সরু বা চিকন হয়ে। تَمْتَلِئُ : [পরিপূর্ণ হয়ে উঠে] اِمْتَلَأَ (اِفْتِعَال) অর্থ– পরিপূর্ণ হওয়া। تَعُوْدُ : ফিরে যায়। كَمَا بَدَتْ : যেমনভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। مَوَاقِيْتُ : এটি مِيْقَاتٌ -এর বহুবচন অর্থ– সময়, নির্দিষ্ট ও প্রতিশ্রুত সময়। কেউ বলেন, مُنْتَهَى الْوَقْتِ বা সময়ের প্রান্তসীমা। মূলত

مِوْقَاتٌ ছিল। কাসরার পরে হওয়ার কারণে وَاو -কে يَاء দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। مَتَاجِرُ : এটা مَتْجَرٌ -এর বহুবচন। এটি মাসদার, যরফে যমান নয়। অর্থ– ব্যবসায়। عَدَدٌ : এটি عِدَّةٌ -এর বহুবচন। অর্থ– মহিলাদের ইদ্দত। لَوِ اسْتَمَرَّتْ : যদি অব্যাহত থাকত। تَنْقُبُوْا : نَقْبًا : نَقَبَ (ن) نَقْبًا অর্থ– ছিদ্র করা। نَقْبٌ : نَقْبًا ব-ব اَنْقَابٌ অর্থ– ছিদ্র, গিরিপথ।

عَطْفٌ عَلَى النَّاسِ : মুফাস্সির (র.) এ ইবারত দ্বারা সেসব লোকদের সন্দেহ দূর করেছেন, যারা বলেন, وَالْحَجِّ -এর عَطْف হয়েছে مَوَاقِيْتُ -এর উপর। কেননা مَوَاقِيْت শব্দটি اَهِلَّه -এর যমীর هِيَ -এর উপর প্রয়োগ করা হয়েছে। বাক্যটি এমন হবে– اَيِ الْاَهِلَّةُ هِيَ الْمَوَاقِيْتُ যদি اَلْحَجّ -এর আতফ مواقيت শব্দটির উপর করা হয়, তখন هِيَ যমীরের উপর তার প্রয়োগ ঘটবে। বাক্যটি তখন এমন হবে– اَلْاَهِلَّةُ هِيَ الْحَجُّ অথচ এ অর্থ ঠিক নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ :

প্রশ্ন: নতুন চাঁদ বা 'হিলাল' তো একই সময় একটিই হয়ে থাকে, অথচ প্রশ্ন হয়েছে 'চাঁদগুলো' [বহুবচন] শব্দ দ্বারা। এর কারণ কি?

উত্তর:

১. চাঁদগুলো সংক্রান্ত প্রশ্নের অর্থই হবে চাঁদের মাসগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা। আর প্রত্যেক মাসে চাঁদ ভিন্ন হয়ে থাকে। –[তাফসীরে মাজেদী]

২. প্রতি রাতের চাঁদ পূর্বের তুলনায় ভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। অতএব যেন তা পূর্বের রাতের ভিন্ন একটি চাঁদ। এভাবে তাতে তারতম্য হয় বিধায় বহুবচন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। –[জামালাইন]

প্রশ্ন: চাঁদের মতো সূর্যও তো কমে বাড়ে। শুধু চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন হলো কেন?

উত্তর: চাঁদের প্রতি দিনের [বরং প্রতি রাতের] পরিবর্তন চাক্ষুষ বিষয়। এ কারণে এ বিষয়ে সহজেই প্রশ্ন দেখা দেয়। সূর্যের পরিবর্তন তো আর সাধারণ দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ নয়। –[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ : মানুষের জন্য সময় অর্থাৎ তাদের পার্থিব লেনদেনের জন্যেও এবং শরিয়তের বিধিবিধান সংক্রান্ত হিসাবপত্রের জন্যও। চাঁদের মাসে চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধির সাহায্যে দিন, তারিখ ও মাসের হিসাবের বিষয়টি বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না।

قَوْلُهُ وَالْحَجِّ : [এবং হজের সময়] চাঁদের মাসের হিসাব মানব সমাজের সাধারণ লেনদেন ও কায়-কারবারে তো লেগেই থাকে। এ ছাড়াও হজ ও অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগির জন্যও চাঁদের হিসাবই মাপকাঠি ও সময় নিয়ন্ত্রক। বিশেষভাবে হজের নাম উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, আরব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমাজ ও নগর জীবনের গুরুত্ব ছিল দর্শনীয়। কিংবা অন্যান্য ইবাদতের চেয়ে হজের মধ্যে সময় চিনার প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। কেননা হজ তার নির্ধারিত সময় ছাড়া আদায় বা কাজা কোনোটাই করা যায় না। পক্ষান্তরে অন্যান্য ইবাদত সে সময়েই আদায় করা জরুরি নয়।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর :

প্রশ্ন: يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ -এর মধ্যে চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে। অথচ জবাবে তার হেকমত ও উপকারিতা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃত জবাব দেওয়া হলো না কেন?

উত্তর: প্রশ্নের জবাবে চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ বর্ণনা করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রশ্নকারীর জন্য হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ বা রহস্য সম্পর্কে অবগত হওয়ার তুলনায় স্বয়ং চাঁদের হেকমত ও উপকারিতা সম্পর্কে অবগত হওয়া উচিত। কেননা বাহ্যিক হুকুম ও হেকমত বর্ণনাই রাসূলের শান। পক্ষান্তরে পরিবর্তনের রহস্য হলো গায়েবের অন্তর্ভুক্ত। বান্দাদের এ ব্যাপারে জানার কোনো প্রয়োজন নেই এবং তাদেরকে তা জানানোরও প্রয়োজন নেই। –[হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১, পৃ. ২২৮]

তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআনে আরো বিস্তারিতভাবে এ জবাবটি দেওয়া হয়েছে। তা হলো, উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) রসূলুল্লাহ ﷺ -কে 'আহিল্লা' বা নতুন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। কারণ, চাঁদের

আকৃতি-প্রকৃতি সূর্য থেকে ভিন্নতর। সেটা এক সময় সরু বাঁকা রেখার আকৃতি ধারণ করে অতঃপর ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে; অবশেষে সম্পূর্ণ গোলকের মতো হয়ে যায়। এরপর পুনরায় ক্রমান্বয়ে হ্রাসপ্রাপ্ত হতে থাকে। এই হ্রাস-বৃদ্ধির মূল কারণ অথবা এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে তাঁরা প্রশ্ন করেছিলেন। এই দু প্রকার প্রশ্নেরই সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু যে উত্তর প্রদান করা হয়েছে, তাতে কেবল চাঁদের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কেই বর্ণিত হয়েছে। যদি প্রশ্ন এই হয়ে থাকে যে, চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি? তবে তো প্রশ্ন অনুযায়ী উত্তর হয়েই গেছে। আর যদি প্রশ্নে এই হ্রাস-বৃদ্ধির অন্তর্নিহিত রহস্য জানবার উদ্দেশ্য থেকে থাকে, যা ছিল সাহাবায়ে কেরামের স্বভাববিরুদ্ধ, তবে চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির মৌল তত্ত্ব বর্ণনার পরিবর্তে তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনার দ্বারা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আকাশের গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডলীর মৌলিক উপাদান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা মানুষের ক্ষমতার ঊর্ধ্বে। আর মানুষের ইহলৌকিক বা পারলৌকিক কোনো বিষয়ই এ জ্ঞান লাভের উপর নির্ভরশীল নয়। কাজেই চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির মূল কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা নিরর্থক। এ প্রসঙ্গে প্রকৃত জিজ্ঞাস্য ও জবাব হলো, চন্দ্রের এরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি এবং উদয়াস্তের মধ্যে আমাদের কোন কোন মঙ্গল নিহিত রয়েছে? সে জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ওহীর মাধমে বলে দিয়েছেন যে, আপনি তাদেরকে বলে দিন, চাঁদের সঙ্গে তোমাদের যেসব মঙ্গল ও কল্যাণ সম্পৃক্ত, তা এই যে, এতে তোমাদের কাজকর্ম ও চুক্তির মেয়াদ নির্ধারণ এবং হজের দিনগুলোর হিসাব জেনে রাখা সহজতর হবে। –[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : মুফতি মুহাম্মদ শফী (র.)]

فَائِدَةٌ : اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْوَقْتِ وَبَيْنَ الْمُدَّةِ وَالزَّمَانِ : أَنَّ الْمُدَّةَ الْمُطْلَقَةَ اِمْتِدَادُ حَرَكَةِ الْفَلَكِ مِنْ مَبْدَئِهَا اِلٰى مُنْتَهَاهَا، وَلِلزَّمَانِ مُدَّةٌ مُنْقَسِمَةٌ اِلَى الْمَاضِىْ وَالْحَالِ وَالْمُسْتَقْبِلِ وَالْوَقْتُ الزَّمَانُ الْمَفْرُوْضُ لِأَمْرٍ . (جَمَل - ٢٢٨)

চান্দ্র মাসের হিসাব রাখা ফরজে কিফায়া : হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) এখান থেকে এ তত্ত্বটি সুন্দরভাবে আহরণ করেছেন যে, যেহেতু শরিয়তের আমলগুলোর মাপকাঠি চাঁদের হিসাবে হওয়া স্থির হলো, তাই এ চাঁদের মাস, তারিখের হিসাব নিয়ন্ত্রণ ও তাতে গুরুত্ব প্রদানও ফরজে কিফায়া সাব্যস্ত হলো। ইংরেজি [খ্রিস্টাব্দ] মাস অনুসারে কায়কারবার করা যাদের অপরিহার্য, তাদের জন্য তো কিছুটা অপারগতা স্বীকৃত। কিন্তু প্রয়োজন ব্যতিরেকে ইসলামি হিজরি ও চান্দ্র বর্ষের হিসাব বর্জন করে খ্রিস্টীয় ও ইংরেজি সৌরবর্ষের হিসাব গ্রহণ করা অতি আক্ষেপের বিষয়।

বাড়ন্ত চাঁদকে শুভ আর হ্রাসমুখী চাঁদকে অশুভ ধারণা করা ঠিক নয় : পবিত্র কুরআনের এক একটি আয়াতাংশ তাওহীদ ও একত্ববাদের ঘোষণা এবং শিরক ও অংশীবাদের খণ্ডনে সোচ্চার। পৃথিবীতে চন্দ্র পূজারী পৌত্তলিক সম্প্রদায়ের সংখ্যা অনেক। এদের অনেকে আবার 'নবশশী' -কে দেবতা মান্য করে পূজা করে। বাড়ন্ত [শুক্লপক্ষের] চাঁদকে শুভ ও হ্রাসমুখী [কৃষ্ণপক্ষের] চাঁদকে অশুভ মনে করার রীতি বিধর্মী তো বটেই অনেক মুসলিম পরিবারেও বিদ্যমান। ভারতীয় উপমহাদেশে মুদ্রিত যে কোনো পঞ্জিকা তুলে দেখুন তার অসংখ্য ঘর ভর্তি রয়েছে এ বিষয়ের লেখায় যে, অমুক তারিখ–দিনটি অমুক কাজের জন্য শুভ আর অমুক তারিখ অশুভ! পবিত্র কুরআনে চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কে এ কথা বলে দেওয়া হয়েছে যে, তা مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ 'মানুষের জন্য কাজে লাগার বিষয়।' আল্লাহর এ আয়াত শশী পূজা ও তার সূত্র ধরে গজিয়ে উঠা সব অর্থহীন কাজের মূল কেটে দিয়েছে। নির্বোধ মানুষ, তুই চাঁদকে পূজা করছিস কি? চাঁদ তো তোরই সেবার জন্য।

শরিয়তের দৃষ্টিতে চান্দ্র ও সৌর হিসাবের গুরুত্ব : এ আয়াতে এতটুকু বুঝা গেল যে, চন্দ্রের দ্বারা তোমরা তারিখ ও মাসের হিসাব জানতে পারবে, যার উপর তোমাদের লেনদেন, আদান-প্রদান ও হজ প্রভৃতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। এ প্রসঙ্গটিই সূরা ইউনুসে বিবৃত হয়েছে। وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ এ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, বিভিন্ন পর্যায় ও বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে চন্দ্রের পরিক্রমণের উপকারিতা হলো, এর দ্বারা বর্ষ, মাস ও তারিখের হিসাব জানা যায়, কিন্তু সূরা বনী ইসরাঈলের আয়াতে বর্ষ, মাস ও দিন-ক্ষণের হিসাব যে সূর্যের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত তাও বিবৃত হয়েছে। বলা হয়েছে– فَمَحَوْنَا اٰيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَا اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ

অর্থাৎ অতঃপর আমি রাতের চিহ্ন তিরোহিত করে দিনের চিহ্নকে দর্শনযোগ্য করলাম, যাতে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহের দান রুজিরোজগারের অনুসন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা বর্ষপঞ্জী ও দিন-ক্ষণের হিসাব অবগত হতে পার।

এ তৃতীয় আয়াত দ্বারা যদিও প্রমাণিত হলো যে, বর্ষ ও মাস ইত্যাদির হিসাব সূর্যের আহ্নিক গতি এবং বার্ষিক গতি দ্বারাও নির্ণয় করা যায়, কিন্তু চন্দ্রের ক্ষেত্রে কুরআন যে ভাষা প্রয়োগ করেছে তাতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামি শরিয়তে চান্দ্রমাসের হিসাবই নির্ধারিত। রমজানের রোজা, হজের মাস ও দিনসমূহ, আশুরা, ঈদ, শবেবরাত ইত্যাদির সঙ্গে যেসব বিধিনিষেধ সম্পৃক্ত সেগুলো সবই 'রুইয়াতে হেলাল' বা নতুন চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল। কেননা এ আয়াতে هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ 'এটি মানুষের হজ ও সময় নির্ধারণের উপায়' বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যদিও এ হিসাব সূর্যের দ্বারাও অবগত হওয়া যায়, তবু আল্লাহর নিকট চান্দ্রমাসের হিসাবই নির্ভরযোগ্য।

ইসলামি শরিয়ত কর্তৃক চান্দ্রমাসের হিসাব গ্রহণ করার কারণ হলো, প্রত্যেক দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিই আকাশে চাঁদ দেখে চান্দ্রমাসের হিসাব অবগত হতে পারে পণ্ডিত, মূর্খ, গ্রামবাসী, মরুবাসী, পার্বত্য এলাকার উপজাতি ও সভ্য-অসভ্য নির্বিশেষে সবার জন্যই চান্দ্রমাসের হিসাব সহজতর । কিন্তু সৌরমাস ও সৌরবৎসর এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। এর হিসাব জ্যোতির্বিদদের ব্যবহার্য দূরবীক্ষণ যন্ত্রসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি এবং ভৌগোলিক জ্যামিতিক ও জ্যোতির্বিদ্যার সূত্র ও নিয়ম-কানুনের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। এ হিসাব প্রত্যেকের পক্ষে সহজে অবগত হওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া ইবাদত-বন্দেগির ক্ষেত্রে চান্দ্রমাসের হিসাব বাধ্যতামূলক করা হলেও সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রেও এ হিসাবেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। চাঁদ ইসলামি ইবাদতের অবলম্বন। চাঁদ এক হিসেবে ইসলামের প্রতীক বা শে'আরে ইসলাম। ইসলাম যদিও সৌরপঞ্জী ও সৌর হিসাবকে এই শর্তে নাজায়েজ বলেনি, তবুও এতটুকু সাবধান অবশ্যই করেছে যেন সৌর হিসাব এত প্রাধান্য লাভ না করে, যাতে লোকেরা চান্দ্রপঞ্জী ও চান্দ্রমাসের হিসাব ভুলেই যায়। কারণ, এরূপ করতে রোজা, হজ ইত্যাদি ইবাদতে ত্রুটি হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

قَوْلُهُ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا : জাহিলি যুগের আরবরা হজের ইহরামে থাকা অবস্থায় বাড়িঘরে আসতে হলে তখনো সামনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করাকে অশুভ ও কুলক্ষণ মনে করত। এজন্য তারা পেছনের দেয়ালে একটি দরজা খুলে নিত এবং সেখান দিয়ে বাড়িঘরে ঢুকত। কিংবা পিছন দিককার ছাদে চড়ে সেখান থেকে লাফিয়ে পড়ত বা দেয়াল টপকাত। এসব হতচ্ছাড়া কাণ্ড তাদের দৃষ্টিতে ইবাদত ও কা'বা ঘরের প্রতি শ্রদ্ধারূপে বিবেচিত হতো।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে নও মুসলিম সাহাবীও এ ভুল ধারণার শিকার হয়ে গেলেন। তাদের এ ভুল ধারণার মূলোৎপাটনের লক্ষ্যেই এ আয়াত নাজিল হলো। ফলে জাহিলি কুসংস্কারের সংশোধন হয়ে গেল। এ আয়াতটি নবী করীম ﷺ -এর কতিপয় সাহাবী সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, যারা ইহরামে নিজেদের বাড়িঘরে প্রবেশ করতেন পিছন দিক দিয়ে কিংবা ছাদে উঠে যেমনটা তাদের নিয়ম ছিল জাহিলি যুগে। -[তাফসীরে মাজেদী]।

فِى الْمِصْبَاحِ : نَقَبْتُ الْحَائِطَ «ن» نَقْبًا-خَرَقْتُهُ : بِاَنْ تَنْقُبُوْا فِيْهَا نَقْبًا .

قَوْلُهُ ذَا الْبِرِّ : **প্রশ্ন:** فِى الْاِحْرَامِ -এর বৃদ্ধির কারণ কি?

উত্তর: এর দ্বারা মূলত একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন: وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا এবং لِلنَّاسِ -এর মধ্যে বাহ্যত তো কানো যোগসূত্র নেই।

উত্তর: যোগসূত্র অবশ্যই আছে। আর তা হচ্ছে مَوَاقِيْتُ হলো হজের বিশেষ সময়। আর ইহরাম অবস্থায় ঘরের পশ্চাৎ দিক দিয়ে ঘরে প্রবেশ করা তাদের নিকট হজের আমলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কাজেই যোগসূত্র সুস্পষ্ট।

বিদ'আতের মূল ভিত্তি : এ আয়াত দ্বারা এ কথা ও জানা গেল যে, শরিয়তে যে কাজকে জরুরি আখ্যা দেয়নি বা ইবাদতরূপে গণ্য করেনি– উক্ত কাজ নিজ পক্ষ থেকে জরুরি বা ইবাদত মনের করা জায়েজ নয়। একইভাবে যে বস্তু শরিয়তে জায়েজ তাকে গুনাহ্ মনে করাও গুনাহ্। বিদ'আত নাজায়েজ হওয়ার মূল কারণ হলো, যা জরুরি নয়, তাকে ফরজ বা ওয়াজিব মনে করা হয় বা কোনো কাজকে হারাম বা নাজায়েজ বলা হয়। এ আয়াতে শুধু ভিত্তিহীন দুটি রসমই খণ্ডন করা হয়নি; বরং সমস্ত অমূলক ধারণার উপর এ কথা বলে আঘাত করা হয়েছে যে, মূলত নেকী হলো আল্লাহকে ভয় করা এবং তার বিধানের বিরোধিতা থেকে বিরত থাকা। এ ধরনের অর্থহীন কোনো প্রথার সাথে বাস্তব নেকীর কোনো সম্বন্ধ নেই, যা প্রাচীনকাল থেকে পূর্বপুরুষদের অনুকরণে করে আসা হচ্ছে এবং মানুষের সৌভাগ্যবান বা দুর্ভাগা হওয়ার সাথেও কোনো সম্বন্ধ নেই। -[জামালাইন]

١٩٠. وَلَمَّا صُدَّ ﷺ عَنِ الْبَيْتِ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ وَصَالَحَ الْكُفَّارَ عَلٰى اَنْ يَعُوْدَ الْعَامَ الْقَابِلَ وَيَخْلُوْا لَهُ مَكَّةَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَتَجَهَّزَ لِعُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَخَافُوا اَنْ لَا تَفِىَ قُرَيْشٌ وَيُقَاتِلُوْهُمْ وَكَرِهَ الْمُسْلِمُوْنَ قِتَالَهُمْ فِى الْحَرَمِ وَالْاِحْرَامِ وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ نَزَلَ وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَىْ لِاِعْلَاءِ دِيْنِهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلَا تَعْتَدُوْا عَلَيْهِمْ بِالْاِبْتِدَاءِ بِالْقِتَالِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ الْمُتَجَاوِزِيْنَ مَا حُدَّ لَهُمْ.

١٩١. وَهٰذَا مَنْسُوْخٌ بِاٰيَةِ بَرَاءَةٍ اَوْ بِقَوْلِهِ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ اَىْ مِنْ مَكَّةَ وَقَدْ فُعِلَ بِهِمْ ذٰلِكَ عَامَ الْفَتْحِ وَالْفِتْنَةُ الشِّرْكُ مِنْهُمْ اَشَدُّ اَعْظَمُ مِنَ الْقَتْلِ لَهُمْ فِى الْحَرَمِ اَوِ الْاِحْرَامِ الَّذِىْ اِسْتَعْظَمْتُمُوْهُ وَلَا تُقَاتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَىْ فِى الْحَرَمِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فِيْهِ فَاقْتُلُوْهُمْ فِيْهِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِلَا اَلِفٍ فِى الْاَفْعَالِ الثَّلٰثَةِ كَذٰلِكَ الْقَتْلُ وَالْاِخْرَاجُ جَزَاءُ الْكٰفِرِيْنَ.

অনুবাদ :

১৯০. হুদায়বিয়ার বৎসর [৬ষ্ঠ হিজরি সনে] রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে [কা'বা জিয়ারত করতে] মক্কা প্রবেশে কুরাইশগণ কর্তৃক যখন বাধা প্রদান করা হয়েছিল তখন কাফিরদের সাথে তাঁর এই মর্মে সন্ধি হয় যে, তিনি আগামীবার এসে [ওমরা] সমাপন করবেন। আর কাফেরগণ তখন তিনদিনে জন্য মক্কা নগরী খালি করে দেবে। তদনুসারে রাসূলুল্লাহ ﷺ [সাহাবীগণসহ] 'কাজা ওমরা' পালন করার প্রস্তুতি নিলেন। তাঁদের তখন এই আশঙ্কা হলো যে, কুরাইশরা হয়তো সান্ধি পলন করবে না; বরং পুনরায় যুদ্ধে লিপ্ত হবে। হেরেম শরীফে ইহরামে থাকা অবস্থায় নিষিদ্ধ মাসে তাদের সাথে কোনো সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া মুসলিমগণ পছন্দ করছিলেন না। এ উপলক্ষে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন– কাফেরদের মধ্যে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহর পথে তাঁর দীনকে সমুচ্চ করার উদ্দেশ্যে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; কিন্তু প্রথম আক্রমণ শুরু করে তাদের উপর তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে অর্থাৎ তাদের জন্য যে সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে তা অতিক্রমকারীদেরকে ভালোবাসেন না।

১৯১. [প্রথম আক্রমণ না করার] এ হুকুমটি সূরা বারাআতের আয়াত এবং তা পরবর্তী এই বাক্য وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ [তাদের যেখানে পাও, হত্যা কর] দ্বারা মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে।

যেখানে তাদের ধরতে পারবে অর্থাৎ তাদেরকে পাবে হত্যা কর। যে স্থান হতে তারা তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করেছে অর্থাৎ মক্কা নগরী তোমরাও সেই স্থান হতে তাদেরকে বহিষ্কৃত কর। মক্কা বিজয়ের বৎসর তাদের সাথে এই [হত্যা ও বহিষ্কার করার] আচরণ করা হয়েছিল। হেরেম শরীফে ইহরামরত অবস্থায় হত্যা করা যাকে তোমরা গুরুতর পাপ বলে ধারণা করছ, তা হতে ফিতনা বা বিশৃঙ্খলা অর্থাৎ এদের এই শিরক বা অংশীবাদে বিশ্বাস নিকৃষ্টতর। অধিক গুরুতর। মাসজিদুল হারামের অর্থাৎ হেমের শরীফের নিকট তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না যে পর্যন্ত তারা সেখানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে। যদি সেখানে তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তবে তোমরা তাদেরকে সেখানে হত্যা কর। اِنْ قَاتَلُوْا - حَتّٰى يُقَاتِلُوْا - لَا تُقَاتِلُوْا এ তিনটি ক্রিয়া অপর এক কেরাতে اَلِف ব্যতীত [অর্থাৎ قَتَلُوْ - يَقْتُلُوْ - تَقْتُلُوْ] রূপে পঠিত রয়েছে। এটাই হত্যা ও বহিষ্কার সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণাম।

١٩٢. فَإِنِ انْتَهَوْا عَنِ الْكُفْرِ وَأَسْلَمُوْا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ لَهُمْ رَّحِيْمٌ بِهِمْ -

১৯২. যদি তারা কুফর ও সত্যপ্রত্যাখ্যান হতে বিরত হয় এবং ইসলাম গ্রহণ করে তবে নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে ক্ষমাশীল, তাদের প্রতি পরম দয়ালু।

١٩٣. وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ تُوْجَدَ فِتْنَةٌ شِرْكٌ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ الْعِبَادَةُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ لَا يُعْبَدُ سِوَاهُ فَإِنِ انْتَهَوْا عَنِ الشِّرْكِ فَلَا تَعْتَدُوْا عَلَيْهِمْ دَلَّ عَلٰى هٰذَا فَلَا عُدْوَانَ إِعْتِدَاءَ بِقَتْلٍ أَوْ غَيْرِهِ إِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ وَمَنِ انْتَهٰى فَلَيْسَ بِظَالِمٍ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيْهِ -

১৯৩. তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক যাবৎ এ ফিতনা অর্থাৎ শিরক নিশ্চিহ্ন না হয়ে যায় এর অস্তিত্ব আর না পাওয়া যায় এবং এক আল্লাহর জন্য-ই যেন হয় সকল দীন অর্থাৎ সকল ইবাদত-উপাসনা। তিনি ব্যতীত আর কারো যেন কোথাও উপাসনা না হয়। যদি তারা শিরক হতে বিরত হয় তবে আর তোমরা তাদের সাথে সংগ্রামে লিপ্ত হয়ো না। পরবর্তী বাক্য فَلَا عُدْوَانَ উক্ত কথার প্রতি ইঙ্গিতবহ। অনন্তর সীমালঙ্ঘনকারী ব্যতীত আর কারো উপর বাড়াবাড়ি নেই অর্থাৎ হত্যা ইত্যাদির মাধ্যমে আর কারো প্রতি কঠোর আচরণ ও বাড়াবাড়ি চলতে পারে না। যে ব্যক্তি শিরক হতে বিরত রইল সে জালিম ও সীমালঙ্ঘনকারী বলে গণ্য নয়। সুতরাং তার উপর কোনোরূপ আক্রমণ ও পীড়ন চলতে পারে না।

তাহকীক ও তারকীব

لَمَّا صُدَّ : [যখন বাধা প্রদান করা হলো] صُدَّ মাযী মাজহুলের সীগাহ। صَدَّ (ن) صَدًّا অর্থ– বাধা দেওয়া, বারণ করা। عَامٌ : বছর। يُخْلُوْا : খালি করে দেবে। تجهز : প্রস্তুতি নিলেন। لَا تَفِيَ : পূরণ করবে না। وَفٰى (ض) وَفَاءً অর্থ– পূর্ণ করা। إِعْلَاءٌ : উঁচু করা, সমুচ্চ করা। لَا تَعْتَدُوْا : [সীমালঙ্ঘন করো না] إِعْتَدٰى يَعْتَدِيْ إِعْتِدَاءً অর্থ– লঙ্ঘন করা।

إِعْتَدَى الْحَقَّ/ عَنِ الْحَقِّ - সত্যের সীমালঙ্ঘন করল। عَلٰى অব্যয়যোগে–জুলুম করা। مَا حُدَّ لَهُمْ : তাদের জন্য যে সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছিল।

ثَقِفْتُمُوْهُمْ : ثَقِفَ الشَّيْءَ إِذَا ظَفَرَ بِهِ وَجَدَهُ عَلٰى جِهَةِ الْاَخْذِ وَالْغَلَبَةِ وَرَجُلٌ ثَقِفٌ سَرِيْعُ الْاَخْذِ لِأَقْرَانِهِ

(س) ثَقْفًا অর্থ– ধরা, পাকড়াও করা। إِسْتَعْظَمُوْهُ : গুরুতর পাপ বলে ধারণা করেছে, মারাত্মক মনে করেছে।

فَإِنِ انْتَهَوْا : যদি তারা বিরত থাকে। إِنْتَهٰى شَيْءٌ কোনো কিছু শেষ হলো। إِنْتَهٰى عَنْ شَيْءٍ - কোনো কিছু থেকে বিরত হলো। إِنْتَهٰى مِنْ شَيْءٍ কোনো কিছু থেকে অবসর হলো। إِنْتَهٰى إِلَيْهِ الْخَبَرُ তার কাছে খবরটি পৌঁছল।

قَوْلُهُ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِلَا اَلِفٍ فِي الْاَفْعَالِ الثَّلٰثَةِ : উক্ত ফে'ল তিনটি হলো–

১. لَا تَقْتُلُوْهُمْ - তাদেরকে হত্যা করো না।
২. يَقْتُلُوْكُمْ - তারা তোমাদের হত্যা করে।
৩. اُقْتُلُوْهُمْ - তোমরা তাদেরকে হত্যা কর।

تَكُوْنَ : تُوْجَدَ -এর ব্যাখ্যায় تُوْجَدَ উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এখানে كَانَ শব্দটি تَامَّةٌ নাকেসা নয়।

قَوْلُهُ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ : কুফরিকে ফিতনা নাম দেওয়ার কারণ হচ্ছে তা ধ্বংসে উপনীত করে, যেভাবে ফিতনাও ধ্বংসে উপনীত করে। –[জাসসাস]

عُدْوَانَ : এর শাব্দিক অর্থ– বাড়াবাড়ি এখানে অর্থ– শাস্তি ও শাস্তিরূপে হত্যা। –[ইবনে কাছীর, রূহুল মা'আনী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচনা ও যোগসূত্র : ষষ্ঠ হিজরি সনের জিলকদ মাসে রাসূলে কারীম ﷺ ওমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে মক্কাভিমুখে যাত্রা করলেন। তখন মক্কা ছিল মুশরিকদের দখলে তারা হুদাইবিয়া নামক স্থানে নবী করীম ﷺ -এর সাহাবীদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দিল। অবশেষে অনেক আলাপ-আলোচনার পর এ সন্ধি হলো যে, আগামী বছর তারা এসে ওমরা করবে। সুতরাং সপ্তম হিজরি সনের জিলকদ মাসে ওমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ যাত্রা করলেন। সাহাবীদের আশঙ্কা হলো যে, মক্কার মুশরিকরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে আক্রমণ না করে বসে, তাহলে এমন ক্ষেত্রে নীরবতাও কল্যাণকর হবে না। আর যদি তাদের মোকাবিলা করা হয়, তাহলে সম্মানিত মাসে অর্থাৎ যে মাসে যুদ্ধবিগ্রহ নিষেধ সে মাসেও যুদ্ধ করা অপরিহার্য হবে। আর নিষিদ্ধ চার মাস তথা জিলকদ, জিলহজ, মহররম ও রজব মাসের একটি হলো জিলকদ। এ কারণে মুসলমানগণ অত্যন্ত বিচলিত ছিলেন। এ প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন যে, এ সন্ধিচুক্তিকারীদের সাথে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তোমরা নিজেদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটাবে না। তবে তারা যদি অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তোমাদের উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হয়, তখন তোমরা কোনোরূপ সঙ্কোচ না করে নির্দ্বিধায় তাদের মোকাবিলা করবে।

এ আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কেবল ঐসব কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করবে, যারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়। এর উদ্দেশ্য হলো, নারী, শিশু, ধর্মযাজক অর্থাৎ যারা দুনিয়াবিমুখ হয়ে ধর্মের ব্যাপারে নিয়োজিত যেমন- পাদ্রি, এভাবে বিকলাঙ্গ, মাজুর অথবা যেসব লোক কাফেরদের নিকট শ্রমিকরূপে কর্মরত, তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না। অর্থাৎ আয়াতে ঐসব মানুষের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তবে উল্লিখিত লোকদের মধ্য থেকে কেউ যদি কোনো প্রকার কাফেরদের সহায়তা করে তাহলে তাকেও হত্যা করা জায়েজ। কেননা তারা اَلَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ -এর অন্তর্ভুক্ত। -[মাযহারী, জাসসাস, মা'আরিফ]

ইসলাম শুধু ঐ সকল মানুষের সাথে যুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছে, যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না বা সাধারণ জনগণ, তাদের সাথে যুদ্ধের কোনো সম্পর্ক নেই। বর্তমানে সাধারণ জনগণের মাথার উপর বোমাঘাত করা, নিরাপদ শহরে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো এবং তাদের উপর বিষাক্ত গ্যাস ছোড়া, অগ্নিবোমা [নেপাম বোমা] নিক্ষেপ করার আইন মানবতা ও ইসলামের যুদ্ধনীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। শত শত নয় বরং হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষকে মুহূর্তের মধ্যে মৃত্যুর কোলে ফেলে দেওয়ার পর কেবল সরি [sorry] বলা বর্তমান সভ্য বিশ্বের জন্য শোভা পায়, ইসলামের জন্য তা আদৌ শোভা পায় না। -[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ قَاتِلُوْا : যুদ্ধ করার এ হুকুম দেওয়া হচ্ছে কাদের? সে নিপীড়িত অসহায় মুসলমানদের, যারা দু-চার দশদিন বা দু-চার মাস নয়- দীর্ঘ তেরটি বছর যাবৎ দিনের পর দিন শিকার হয়েছেন মক্কার কাফেরদের নির্যাতনের পর নির্যাতনের; বরং বলুন! যারা হায়েনার নখরাঘাত ও নরপশুদের বর্বরতা সইবার কঠিন পরীক্ষায় হয়েছিলেন সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ, আর এখন স্বদেশ ছেড়ে পরদেশে গিয়েও, জন্মভূমি ও বাড়িঘরের মায়া ত্যাগ করেও যারা মদিনায় স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারছিলেন না।

قَوْلُهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ : তা হতে হবে আল্লাহরই পথে। শিরক দূরীভূত করে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, সত্য ধর্মের ঝাণ্ডা উড্ডীন করা ও ন্যায় ধর্মের সহায়তার লক্ষ্যে। আত্মগরজে নয়- 'আত্মা'র স্বার্থে, অহং-এর নৈবেদ্যে নয়- অহং মিটাবার উদ্দেশ্যে। গোত্র-গোষ্ঠীর স্বার্থে নয়, প্রভাব-বলয় সম্প্রসারণে নয়, 'পণ্য বাজার' রক্ষার নামে, সামুদ্রিক নিরাপত্তা রক্ষার অজুহাতে, উপনিবেশ রক্ষার স্বার্থে কিংবা রফতানি বাজার তৈরির স্বার্থে- মোটকথা নতুন পুরাতন যত গোষ্ঠী ও বলয় স্বার্থ রয়েছে এ ধরনের জাহিলি পতাকার অধীনে জিহাদ নয়। পরিচ্ছন্ন ও দ্ব্যর্থহীনভাবে আল্লাহর পথে জিহাদ হতে হবে। আর আল্লাহর পথে হওয়ার অর্থ হলো আল্লাহর দীনের মর্যাদা বিকাশে জিহাদ হবে আল্লাহর কালেমার অগ্রগতি বিধান ও দীনের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে [اَلْجِهَادُ لِاِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللّٰهِ وَاِعْزَازِ الدِّيْنِ - مَدَارِك] অর্থাৎ তোমরা জিহাদ করবে আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করা ও তাঁর দীনের মর্যাদা বিধানে [اَىْ جَاهِدُوْا لِاِعْلَاءِ كَلِمَتِهٖ وَاِعْزَازِ دِيْنِهٖ - بَيْضَاوِى] অর্থাৎ দীনের স্বার্থে ও কালেমা প্রসারে অর্থাৎ তার আনুগত্য ও সন্তুষ্টি অন্বেষায়। -[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ : যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়..... এর ভাষ্য কি বিবৃতি দিচ্ছে? দুটি বিষয় সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।

ক. যুদ্ধের সূচনা মুসলমানগণ নয়- অন্যপক্ষই করছিল। ((أَيِ الَّذِيْنَ يَبْدَءُوْنَكُمْ بِالْقِتَالِ ـ اِبْنُ عَبَّاس (رض) অর্থাৎ যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সূচনা করে। (أَيْ يُنَاجِزُوْنَكُمُ الْقِتَالَ دُوْنَ الْمُحَاجِزِيْنَ ـ مَدَارِك) অর্থাৎ যারা আক্রমণাত্মক ভূমিকায় রয়েছে, যারা সন্ধিকামী বা আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে রয়েছে তারা নয়। [أَيْ يَحِلُّ لَكُمُ الْقِتَالُ اِنْ قَاتَلَكُمْ الْكُفَّارُ- قُرْطُبِي] অর্থাৎ যুদ্ধ করা তোমাদর জন্য হলাল ও বৈধ হবে- যদি কাফেররা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়–

খ. যুদ্ধের বিধান শুধু তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যারা বাস্তবিক যুদ্ধরত, কিংবা আধুনিক সামরিক পরিভাষায় বললে যারা সারিবদ্ধ ও সেনা সামাবেশকারী [combatants] তাদের মোকাবিলায়; সামরিক অবস্থানের নয় [Non - combatants] অসামরিক অবস্থানকে বোমা বর্ষণের লক্ষ্য নির্ধারণ করা, শান্তিপ্রিয় নগরবাসীদের উপর বিমান হামলা চালানো এবং তাদের উপর বিষাক্ত গ্যাস ও বিস্ফোরক বর্ষণের 'অতি সভ্যতাসমৃদ্ধ' সামরিক বিধির সঙ্গে ইসলামের জিহাদ নীতির আদৌ কোনো পরিচয় নেই। বয়োবৃদ্ধ, নারী, পুরুষ, বিকলাঙ্গ, অসুস্থ-ব্যাধিগ্রস্ত, নিঃসঙ্গ জীবনযাপনকারী সাধু-সন্ন্যাসী- মোটকথা যুদ্ধে অপারগ বা যুদ্ধ সম্পর্ক রহিত সব শ্রেণির মানুষকে রাসূল ﷺ-এর প্রথম খলিফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) তো দ্ব্যর্থহীন ভাষায় যুদ্ধ বহির্ভূত ঘোষণা করেই দিয়েছিলেন। সেই সাথে উক্ত আয়াতও সে ব্যতিক্রমের ইঙ্গিত প্রদান করছে–

لَا تَقْتُلُوا النِّسَاءَ وَلَا الصِّبْيَانَ وَلَا الشَّيْخَ الْكَبِيْرَ وَلَا مَنْ اَلْقٰى اِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَكَفَّ يَدَاهُ (اِبْنُ عَبَّاس (رض)

অর্থাৎ নারীদের হত্যা করো না, শিশুদেরও নয়, বায়োবৃদ্ধদেরও নয় এবং যারা তোমাদের সঙ্গে সন্ধি-সমঝোতা প্রয়াসী হয়ে অস্ত্র থেকে হাত তুলে নিয়েছে, তাদেরও নয়।

অর্থাৎ যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধংদেহী হয় না, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো না [তাদের হত্যা কর না]। [অর্থাৎ নারী, শিশু ও রাহিব-পাদ্রী-সন্ন্যাসী।]

হযরত ওমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -এর কোনো যুদ্ধে এক নারীকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ নারী ও শিশু হত্যার প্রতি তাঁর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

হযরত বুরায়দা (রা.) সূত্রে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ যখন কোনো বাহিনী অভিযানে পাঠাতেন, তখন বলতেন– بِسْمِ اللّٰهِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تَقْتُلُوْا اِمْرَأَةً وَلَا وَلِيْدًا وَلَا شَيْخًا كَبِيْرًا অর্থাৎ লড়াই কর আল্লাহর নামে ও আল্লাহর পথে এবং কোনো নারীকে, কোনো শিশুকে, কোনো বৃদ্ধকে হত্যা করবে না।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর মূল ফরমানে তো ফলদার গাছ কাটারও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তিনি এ হুকুম দিয়েছিলেন ইসলামি খেলাফতের সেনাবাহিনীর প্রথম সিপাহসালার [কমাণ্ডার ইন চীফ] ইয়াযীদ ইবনে আবূ সুলায়মান (রা.)-কে। তিনি তাঁকে বিদায় জানিয়েছিলেন পায়ে হেঁটে হেঁটে এগিয়ে গিয়ে। তার ফরমানের শব্দমালা এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে–

وَاِنِّيْ اُوْصِيْكَ بِعَشَرٍ لَا تَقْتُلْ اِمْرَأَةً وَلَا صَبِيًّا وَلَا كَبِيْرًا وَلَا هَرَمًا وَلَا تَقْطَعَنَّ شَجَرًا مُثْمِرًا لَا تَضْرِبَنَّ عَامِرًا وَلَا تَعْقِرَنَّ شَاةً وَلَا بَعِيْرًا اِلَّا لِمَاكِلِهٖ وَلَا تَحْرِقَنَّ نَضْلًا وَلَا تُغْرِقَنَّهُ ـ

অর্থাৎ আমি তোমাদের দশটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি- অবশ্যই কোনো নারীকে হত্যা করবে না, কোনো শিশুকে নয়, কোনো বয়োবৃদ্ধকে নয়, অবশ্যই কোনো ফলদার গাছ কাটবে না; অবশ্যাই বসতি ধ্বংস করবে না, অবশ্যই কোনো ছাগল মেরে ফেলবে না, কোনো উটও নয় তবে [বাহিনীর] খাদ্য প্রয়োজনে এবং অবশ্যই কোনো খেজুর বাগান জ্বলিয়ে দেবে না, তছনছ করবে না। –[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ وَلَا تَعْتَدُوْا : অভিধানে [لَا تَعْتَدُوْا -এর ক্রিয়ামূল] -এর অর্থ ন্যায় ও অধিকারে সীমা অতিক্রম করা [مُجَاوَزَةُ الْحَقِّ]। এ অতিক্রমণের বিভিন্নরূপ হতে পারে। যথা–

ক. সীমা [حَدٌّ] দ্বারা শরিয়তের নির্ণীত সীমা উদ্দেশ্য হতে পারে। অর্থাৎ প্রতিশোধ স্পৃহা বা বিজয় উল্লাসে নির্বিচারে শত্রুপক্ষের যোদ্ধা-অযোদ্ধা নির্বিশেষে সকলকে হত্যা করতে লেগে যাওয়া, তাদের ক্ষেত-খামার, বাগ-বাগিচা, [বনভূমি] তৃণভূমিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া, তাদের অবলা পশুগুলো ধ্বংস করা ইত্যাদি। কুরআন পৃথিবীকে এ শিক্ষা দিয়েছে যে, শক্তির ব্যবহার শুধু ততটুকু বৈধ, যতটুকু না হলেই নয়।

খ. সীমা দ্বারা চুক্তির সীমাও উদ্দেশ্য হতে পারে। যেমন, চুক্তি ভঙ্গকারী ও অঙ্গীকার পদদলনে অভ্যস্ত সম্প্রদায়ের দেখাদেখি চুক্তির তোয়াক্কা না করে নিজেরাই প্রথমে আক্রমণ করে বসা। এ ধরনের আরো বিভিন্নরূপে সীমালঙ্ঘন হতে পারে। বস্তুত إِعْتِدَاء শব্দ বাড়াবাড়ির সবগুলো দিককেই অন্তর্ভুক্ত করে এবং যে কোনো ধরনের বাড়াবাড়ি এ নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ আক্রমণের সূচনা করে সীমালঙ্ঘন করো না কিংবা চুক্তিবদ্ধদের উপর আক্রমণ করে বা হুমকি প্রদান ও সতর্কীকরণ ব্যতিরেকে অতর্কিত আক্রমণ কিংবা অঙ্গ বিকৃত [হাত, পা, নাক, কান ইত্যাদি কর্তন] কিংবা যাদের হত্যা নিষিদ্ধ,তাদের হত্যা করে সীমা লঙ্ঘন। অর্থাৎ সম্ভাব্য কোনো ধরনের বাড়াবাড়ি করো না। –[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ : এ আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে নিঃসন্দেহে মানুষের রক্তপাত ঘটানো অতি জঘন্য কাজ। কিন্তু যখন কোনো দল বা পার্টি নিজেদের ভ্রান্ত চিন্তা-ধারণাকে অন্যদের উপর চাপাতে চায় এবং মানুষকে সত্য গ্রহণ থেকে জোরপূর্বক বাধা দেয়, কোনো সমস্যার সমাধান বৈধ ও যুক্তিযুক্ত উপায়ে করার স্থলে পাশবিক শক্তি কাজে লাগায়, তখন তারা হত্যার তুলনায় আরও জঘন্য অন্যায়ের লিপ্ত হয়। এ ধরনের লোকদেরকে হত্যা করে তাদের এহেন কর্মকাণ্ড হতে দেশবাসীকে রক্ষা করা সম্পূর্ণরূপে বৈধ।

মক্কী জীবনে কাফের গোষ্ঠী কর্তৃক সীমাহীন অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করা সত্ত্বেও মুসলমানদের নির্দেশ ছিল তারা যেন ক্ষমা দ্বারা কাজ নেয়। মক্কী জীবনে এমন কোনো দিন আসেনি যে, সূর্য উদয়ের সাথে সাথে মুসলমানদের বিপক্ষে নতুন কোনো মসিবত না এসেছে। কিন্তু মুসলমানদের কঠোরভাবে বলা ছিল তারা যেন সদা ক্ষমার গুণ প্রদর্শন করে। আয়াতের ব্যাপকতা দ্বারা যে বিষয়টি প্রতিভাত হচ্ছে তা হলো, কাফেররা যেখানেই থাকুক তাদেরকে হত্যা করা বৈধ, মূলত এর উদ্দেশ্য এমন নয়; বরং প্রথম বিধান যুদ্ধের ক্ষেত্রে, দ্বিতীয়ত এ আয়াত তার ব্যাপকতার উপর বহাল নয়। কারণ সামনেই এ থেকে বিশেষ ব্যক্তিবর্গকে খাস করা হয়েছে।

وَاقْتُلُوْهُمْ-এর শব্দরূপ বহুবচন হওয়ার সূত্রে হানাফী ফকীহগণও এ তত্ত্ব আহরণ করেছেন যে, জিহাদে অবতীর্ণ হওয়ার অপরিহার্যতা [ফরজ] ব্যক্তিগত নয়; বরং সামগ্রিক ও সমষ্টিগত। অর্থাৎ ইমাম বা নেতার নেতৃত্বে। বাহিনী বিদ্যমান থাকার অপরিহার্যতা যেন ভাষ্যের প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি (عِبَارَةُ النَّصِّ)। আর ইমাম অর্থাৎ মুসলিম জননেতার [রাষ্ট্রীয়] উপস্থিতি ভাষ্যের অন্তর্নিহিত দাবি (اِقْتِضَاءُ النَّصِّ)। কেননা ইমাম বা পরিচালক ব্যতীত বাহিনী সংগঠন ও তার শৃঙ্খলা বিধান সম্ভব নয়। –[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ : অর্থাৎ হেরেম শরীফে হত্যা ও হানাহানির চেয়েও জঘন্যতম কাজে হচ্ছে তাওহীদ ও ঈমানের এ কেন্দ্রভূমিতে শিরক করা এবং শিরকের প্রচার-প্রসার ঘটানো। এর আরেকটি অর্থ এও হতে পারে যে, মসজিদুল হারামে গমনে তোমাদেরকে তাদের বাধাদান হারামে তোমরা তাদেরকে হত্যা করার চেয়ে গুরুতর অপরাধ।

–[মাদারেক ও কাশশাফ]

قَوْلُهُ وَلَا تُقَاتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقَاتِلُوْكُمْ فِيْهِ : মসজিদে হারামে তাদেরকে হত্যা করো না, যতক্ষণ তারা তোমাদেরকে হত্যা না করে।

মাসআলা : হেরেম শরীফে মানুষ তো দূরের কথা কোনো শিকারি প্রাণীকে বধ করাও জায়েজ নয়। তবে এ আয়াত দ্বারা এ বিষয়টি প্রতীয়মান হলো যে, হেরেমের অভ্যন্তরে কেউ যদি অন্য কাউকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, তাহলে মোকাবিলা স্বরূপ তাকে হত্যা করা বৈধ। –[মা'আরিফুল কুরআন]

قَوْلُهُ مَنْسُوْخٌ بِاٰيَةِ بَرَاءَةٍ : সূরা বারাআতের সে আয়াতটি হলো- فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ الخ

قَوْلُهُ فِى الْحَرَمِ : عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ -এর ব্যাখ্যা فِى الْحَرَمِ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে অংশ বলে মূলত পূর্ণ জিনিসটিই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ মসজিদে হারাম দ্বারা সম্পূর্ণ হেরেম শরীফ উদ্দেশ্য। কারণ শুধু মসজিদে হারামেই যুদ্ধ নিষিদ্ধ নয়; বরং গোটা হেরেমেই নিষিদ্ধ।

قَوْلُهُ عَنِ الْكُفْرِ وَاَسْلَمُوْا : মুফাসসির (র.) এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে এদিকে ইঙ্গিত দিলেন যে, শুধু ঐ যুদ্ধ থেকে বিরতি নয় যার সূচনা তারা করেছিল; বরং সে যুদ্ধের মূল কারণ ও উৎস অর্থাৎ কুফরি ও শিরকি ধ্যানধারণা ও মতবাদ থেকে বিরত থাকতে হবে।

قَوْلُهُ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ : আয়াতের এ অংশটুকু স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, পূর্ববর্তী اِنْتَهَوْا অংশে বিরতি দ্বারা কুফুর ও শিরক হতে বিরতি উদ্দেশ্য, শুধু যুদ্ধ বিরতি উদ্দেশ্য নয়। কেননা ক্ষমা ও দয়া গুণের প্রকাশ ঘটতে পারে কুফর থেকে প্রত্যাবর্তনকারী হওয়ার ক্ষেত্রেই, শুধু যুদ্ধ বর্জন করার ক্ষেত্রে নয়। অর্থাৎ কুফরি থেকে যে তওবা করবে, তার বিগত পাপ ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে ভবিষ্যতেও তার সঙ্গে দয়ার আচরণ করা হবে। পবিত্র কুরআনেরই অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ অর্থাৎ যারা কুফরি করে তাদের বলে দিন, তারা যদি [কুফর থেকে] বিরত হয়, তবে তাদের জন্য অতীতে যা হয়েছে, তা ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

হত্যাকারীর তওবা কবুল হবে : ফুকাহায়ে কেরাম ও মুফাসসিরগণ এ আয়াত থেকে হত্যাকারীর তওবা কবুল হওয়ার মাসআলাটিও উদ্ভাবন করেছেন। তাদের বক্তব্য হলো, কুফরি থেকে তওবা যেহেতু কবুল হতে পারে, আর স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে হত্যা [অতি মারাত্মক সন্দেহ নেই, তবুও তা] কুফরির চেয়ে তুলনামূলক লঘুপাপ। সুতরাং হত্যার অপরাধে তওবা কবুল না হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে? -[আহকামুল কুরআন : জাসসাস]

মক্কার কাফের ও অন্য ভূখণ্ডের কাফেরের মাঝে পার্থক্য : যদি এরা ইসলাম গ্রহণ না করে, তখন অন্য কাফেরদের ক্ষেত্রে যদিও জিযয়া দেওয়ার স্বীকারোক্তিতে যুদ্ধ বিরতির বিধান রয়েছে, কিন্তু বিশেষভাবে মক্কার এ কাফেররা আরবের বাসিন্দা হওয়ার কারণে তাদের জন্য জিজিয়া বিধি প্রযোজ্য হবে না। তাদের জন্য বিধান হলো- হয় ইসলাম, নয় হত্যা। ইসলাম যেহেতু একটি বিশ্বজনীন ধর্ম এবং সেহেতু তার জন্য একটি ভৌগোলিক কেন্দ্র ও নিজস্ব পরিমণ্ডল অপিরিহার্য ছিল। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের অন্তত একটি স্থান তো এমন হওয়ার ছিল, যা হবে কুফরি ও শিরক হতে সম্পূর্ণ পবিত্র এবং তাওহীদপন্থিদের জন্য [ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা বাস্তবায়নের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র] যথার্থ অর্থে পাক স্থান [আক্ষরিক অর্থে পবিত্র ভূমি]। আর এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে রাসূল ﷺ -এর জন্মভূমি ওহী অবতরণক্ষেত্র [ও আল্লাহর পবিত্র ঘরের চৌহদ্দি] এর চেয়ে অধিক সমীচীন আর কোন ভূখণ্ড। ... [এজন্য] আরবের কাফেররা ইসলাম গ্রহণ না করলে তাদের জন্য শুধুই হত্যা বিধিই প্রযোজ্য হবে। তাদের জিজিয়া দেওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হবে। -[তাফসীরে মাজেদী]

অনুবাদ :

١٩٤. اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ الْمُحَرَّمُ مُقَابِلٌ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ فَكَمَا قَاتَلُوكُمْ فِيهِ فَاقْتُلُوهُمْ فِي مِثْلِهِ رَدٌّ لِاسْتِعْظَامِ الْمُسْلِمِيْنَ ذٰلِكَ وَالْحُرُمٰتُ جَمْعُ حُرْمَةٍ مَا يَجِبُ احْتِرَامُهُ قِصَاصٌ اَىْ يُقْتَصُّ بِمِثْلِهَا اِذَا انْتَهَكَتْ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ بِالْقِتَالِ فِى الْحَرَمِ اَوِ الْاِحْرَامِ اَوِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ سُمِّىَ مُقَابَلَتُهُ اِعْتِدَاءً لِشِبْهِهَا بِالْمُقَابِلِ بِهٖ فِى الصُّوْرَةِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ فِى الْاِنْتِصَارِ وَتَرْكِ الْاِعْتِدَاءِ وَاعْلَمُوْآ اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ بِالْعَوْنِ وَالنَّصْرِ ـ

১৯৪. হারাম সম্মানিত ও নিষিদ্ধ মাস হারাম মাসের বিনিময়। সুতরাং তারা যখন এ মাসসমূহে তোমাদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তোমরাও তদ্রূপ এগুলোতে তাদেরকে হত্যা করতে পার। মুসলমানগণ যেহেতু নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা গুরুতর অন্যায় বলে ধারণা করত সেহেতু এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তার রদ ও অপনোদন করছেন। সকল সম্মানিত বিষয়ের জন্য রয়েছে حُرُمٰتٌ শব্দটি حُرْمَةٌ -এর বহুবচন। অর্থাৎ যে সমস্ত বিষয়ের সম্মান প্রদান অবশ্য কর্তব্য। কিসাস। অর্থাৎ তার সম্মান লঙ্ঘন করা হলে তদ্রূপভাবে তার বদলা নেওয়া হবে। সুতরাং হেরেম শরীফে বা ইহরামরত অবস্থায় বা নিষিদ্ধ মাসসমূহে যুদ্ধ-দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে যে কেউ তোমাদের উপর বাড়াবাড়ি করবে তোমরা তার উপর অনুরূপ বাড়াবাড়ি করবে যেরূপ সে তোমাদের উপর বাড়াবাড়ি করেছে। বাড়াবাড়ি ও প্রতিশোধ গ্রহণ পরিত্যাগ করার দ্বারা যেহেতু তাদের পক্ষ হতে এটা বাড়াবাড়ি, সেহেতু اِعْتِدَاء ও বাড়াবাড়ির মোকাবিলা করাকেও বাহ্যত এ স্থানে اِعْتِدَاء [বাড়াবাড়ি] শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ! নিশ্চিয় আল্লাহ সাহায্য ও সহযোগিতাসহ ভয়কারী ও মুত্তাকীদের সাথে থাকেন।

١٩٥. وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ طَاعَتِهٖ الْجِهَادِ وَغَيْرِهٖ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اَىْ اَنْفُسَكُمْ وَالْبَاءُ زَائِدَةٌ اِلَى التَّهْلُكَةِ الْهَلَاكِ بِالْاِمْسَاكِ عَنِ النَّفَقَةِ فِى الْجِهَادِ اَوْ تَرْكِهٖ لِاَنَّهٗ يَقْوِى الْعَدُوَّ عَلَيْكُمْ وَاَحْسِنُوْا بِالنَّفَقَةِ وَغَيْرِهَا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ اَىْ يُثِيْبُهُمْ ـ

১৯৫. এবং আল্লাহর পথে অর্থাৎ তাঁর আনুগত্যে অর্থাৎ জিহাদ ইত্যাদিতে ব্যয় কর। তোমরা নিজের হাত بِاَيْدِيْهِمْ -এর بَا হরফটি অতিরিক্ত। অর্থাৎ নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না। অর্থাৎ জিহাদের মধ্যে ব্যয় করা হতে বিরত থেকে বা জিহাদ করা পরিত্যাগ করে নিজেদের ধ্বংস করো না। কেননা এটা তোমাদের বিরুদ্ধে তোমাদের শত্রুদেরকেই শক্তি যোগাবে। আল্লাহর পথে ব্যয় ইত্যাদি করে পুণ্য সাধন কর, নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্ম পরায়ণদের ভালোবাসেন. অর্থাৎ তিনি তাদের পুণ্যফল দান করবেন।

তাহকীক ও তারকীব

اَلْمُحَرَّمُ : নিষিদ্ধ, সম্মানিত। مُقَابِلٌ : বিনিময়। اِذَا انْتُهِكَتْ : যখন লঙ্ঘন করা হবে। اَلْاِنْتِصَارُ : প্রতিশোধ গ্রহণ করা। اَلْاِعْتِدَاءُ : বাড়াবাড়ি।

اَلتَّهْلُكَةُ : এটি (خِلَافُ قِيَاسٍ) বিরল মাসদারের অন্তর্ভুক্ত। বাবে ضَرَبَ থেকে এর ব্যবহার। অর্থ- ধ্বংসে নিপতিত করা। اَلتَّهْلُكَةُ যেহেতু একটি বিরল মাসদার, তাই اَلْهَلَاكُ প্রসিদ্ধ মাসদার উল্লেখ করে তা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। هَلَكَ (ض) -এর তিনটি মাসদার হচ্ছে- هَلَاكًا ـ تَهْلُكًا ـ تَهْلُكَةً -

اَحْسِنُوْا : তোমরা নেক আমল কর। اِحْسَانٌ সদাচরণ করা, নেক কাজ করা, উত্তমরূপে করা। [اِلٰى অব্যয় যোগে] কারো প্রতি সদাচরণ করা, অনুগ্রহ করা। -[জামালাইন খ. ১, পৃ. ৩০৯]

يُحِبُّ : اَىْ يُثِيْبُهُمْ -এর ব্যাখ্যা يُثِيْبُ দ্বারা করাটা تَفْسِيْر بِاللَّازِم বা লাযেমী বস্তু দ্বারা তাফসীর করা হয়েছে। কেননা حُبّ -এর অর্থ হচ্ছে مَيَلَانُ الْقَلْبِ বা অন্তরের আকর্ষণ, ঝোঁক, টান ইত্যাদি, যা আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে تَصَوُّرْ করা যায় না। যেমন رَحْمَة -এর তাফসীর করা হয় اِحْسَانٌ দ্বারা। কেননা رَحْمَة অর্থ رِقَّةُ الْقَلْبِ যা আল্লাহ তা'আলার জাতের ক্ষেত্রে تَصَوُّرْ করা যায় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচনা ও শানে নুযূল : সাহাবীগণের মনে এই সন্দেহ ছিল যে, এটা জিলকদ মাস এবং তা সে চার মাসেরই অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোকে 'আশহুরে হুরুম' বা সম্মানিত মাস বলা হয়। এ মাসসমূহে কোথাও কারো সঙ্গে যুদ্ধ করা জায়েজ নয়। এমতাবস্থায় যদি মক্কার মুশরিকরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে, তবে আমরা এ মাসে তার প্রতিরোধকল্পে কিভাবে যুদ্ধ করব? তাদের এ দ্বিধা দূর করার জন্যেই আয়াতটি নাজিল করা হয়েছে। অর্থাৎ মক্কার হেরেম শরীফের সম্মানার্থে শত্রুর হামলা প্রতিরোধকল্পে যুদ্ধ করা যেমন শরিয়তসিদ্ধ, তেমনিভাবে হারাম মাসে [সম্মানিত মাসেও] যদি কাফেররা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তবে তার প্রতিরোধকল্পে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাও জায়েজ।

قَوْلُهُ اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ : কোনো মাসের পবিত্রতা বা মর্যাদা রক্ষার ভিত্তি হতে পারে মাত্র একটি বিষয়। তা হলো উভয় পক্ষ সে মর্যাদা রক্ষা করে চলবে তা না হলে তো কোনো মাসের পবিত্রতার ভিত্তিই থাকে না। কেননা বিষয়টি দুই প্রতিপক্ষের পারস্পরিক আচরণবিধি ও সমঝোতার উপরেই নির্ভরশীল।

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ -এর শাব্দিক অর্থ- মর্যাদাসম্পন্ন মাস। আরবের গোত্রগুলো পরস্পরের প্রতি যুদ্ধংদেহী রূপে চলে আসছিল। এতদসত্ত্বেও এরূপ পারস্পরিক সমঝোতাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, বছরে চার মাস যুদ্ধ ও সংঘাত বন্ধ থাকবে এবং এ মাসগুলো শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গেই অতিবাহিত হবে। মাস চারটি ছিল- ১. মহররম: চান্দ্রবর্ষের প্রথম মাস, ২.রজব: চান্দ্রবর্ষের সপ্তম মাস। ৩.জিলকদ : চান্দ্রবর্ষের একাদশ মাস ও ৪. জিলহজ: চান্দ্রবর্ষের দ্বাদশ মাস।

এখানে ৭ম হিজরির জিলকদ মাসের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ ওমরার উদ্দেশ্যে সাহাবীদের একটি দল সঙ্গে নিয়ে [মক্কা অভিমুখে] রওয়ানা করেছিলেন। কিন্তু ওদিকে মুশরিকরা যুদ্ধের জন্য উদ্যত হয়ে পড়েছিল এবং চোরগোপ্তাভাবে তীর বর্ষণ পাথর নিক্ষেপ শুরু করে দিয়েছিল। -[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ قِصَاصٌ : এর শাব্দিক অর্থ-বদলা বা প্রতিদান, তা কথায় হোক বা কাজেকর্মে কিংবা দৈহিক আচরণরূপে। এখানে উদ্দেশ্য কাজেকর্মে প্রতিদান। অর্থাৎ তোমাদের প্রতিপক্ষ তোমাদের সাথে যেমন কাজ করেছে তোমরাও তাদের সঙ্গে তেমনই কর।

قَوْلُهُ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ : অর্থাৎ প্রতিপক্ষ তোমাদের প্রতি বাড়াবাড়ি করলে তথা পবিত্র মাসগুলোর মর্যাদা রক্ষা না করে যুদ্ধ শুরু করলে তোমরাও সামান তালে পাল্টা হামলা করবে। এখানে মুসলমানদের প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষামূলক জবাবি ব্যবস্থাকে শুধু রূপক অর্থেই এবং আরবি বাকরীতি অনুযায়ী مُشَاكَلَة হিসেবেই করা হয়েছে। -[তাফসীরে মাজেদী]

سُمِّىَ مُقَابَلَةً -এর দ্বারা একটি প্রশ্নের নিরসন করা হয়েছে। প্রশ্ন: যদি জালেমের কাছ থেকে জুলুমের প্রতিশোধ নেওয়া হয়, তাহলে তাকে জুলুম বলা হয় না। কারণ এটা তার অধিকার। অথচ এখানে প্রতিশোধ গ্রহণকে اِعْتِدَاء [জুলুম] দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে।

উত্তর. উভয়টি বাহ্যিকভাবে একই ধরনের হওয়ায় এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমনটি করা হয়েছে- جَزَاءُ السَّيِّئَةِ سَيِّئَةٌ -এর মাঝে।

আরবি বাকধারায় একটি রীতি আছে যে, কোনো কাজের জন্য যে শব্দ ব্যবহার করা হয়, সে কাজের প্রতিদান ও শাস্তির জন্যও হুবহু ঐ একই শব্দ ব্যবহার করা হয়। যেমন 'চক্রান্ত' বুঝাবার জন্য مَكْر শব্দ এবং তার পাল্টা ব্যবস্থার জন্যও এ শব্দই, তদ্রূপ كَيْد [ষড়যন্ত্র] -এর শাস্তির জন্যও হুবহু كَيْد শব্দ; উপহাসের (اِسْتِهْزَاءٌ) পাল্টা ব্যবস্থার জন্যও একই اِسْتِهْزَاءٌ শব্দের ব্যবহার। এ বর্ণনাশৈলী مُشَاكَلَةٌ [সাদৃশ্য] নামে পরিচিত। পবিত্র কুরআনে আরবি অলংকার بَلَاغَتْ শাস্ত্রের অন্যান্য রীতি-পদ্ধতির ন্যায় এ পদ্ধতিটিরও বহুল ব্যবহার রয়েছে। -[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ بِالْعَوْنِ وَالنَّصْرِ : মুত্তাকীগণের সাথে আল্লাহর সঙ্গ-এর অর্থ কি? এর ধরনই বা কি? মুফাসসির (র.) بِالْعَوْنِ وَالنَّصْرِ শব্দ বৃদ্ধি করে তার জবাব দিয়েছেন যে, আল্লাহর সঙ্গে-এর রূপ হলো তাঁর সাহায্য, সহায়তা, তাঁর সংরক্ষণ [ও অবগতি] ইত্যাদি। ইমাম রাযী (র.) এখান থেকে এ তত্ত্ব আহরণ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা জড় দেহধারী [সাকার] জড়বস্তু নন, কোনো স্থানে তিনি অবস্থিত নন, যেমন সব দেহধারী জড়বস্তু কোনো না কোনো শূন্যস্থানকে পূরণ করে রাখে। তাফসীরে কাবীরে রয়েছে- وَهٰذَا مِنْ اَقْوَى الدَّلَائِلِ عَلٰى اَنَّهُ لَيْسَ بِجِسْمٍ وَلَا فِىْ مَكَانٍ অর্থাৎ এটাই অন্যতম প্রবল প্রমাণ যে, তিনি কোনো স্থানে আবদ্ধ নন।

قَوْلُهُ وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ যোগসূত্র : জীবন উৎসর্গ করার হুকুম তো জিহাদের হুকুমের অন্তর্ভুক্তরূপে প্রদত্ত হয়েছে। এখন সম্পদ ব্যয় করার হুকুম পাওয়া গেল।

فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ [আল্লাহর রাহে] শর্তটির প্রতি গভীর দৃষ্টি দিতে হবে। শুধু জীবন দিয়ে দেওয়াই যেমন ইসলামে কাম্য ও উদ্দেশ্য নয়, বরং কাম্য ও উদ্দেশ্য সে জীবনদান, যা হবে আল্লাহর পথে, আল্লাহর দীনের শ্রেষ্ঠত্ব বিধানের লক্ষ্যে; তদ্রূপ যে কোনো প্রকারে শুধু মাল খরচ করার কোনো মূল্য ও গুরুত্ব ইসলামে নেই। এখানে মূল্য ও মহিমা রয়েছে সে সম্পদ ব্যয়ের, যা হবে সত্য ন্যায়ের পথে, অসত্য-অন্যায়ের পথে নয়, যা হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানে, প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণে নয়। বর্ণনাধারায় এখানে যদিও যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রয়োজনে ব্যয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, তবুও ফী সাবীলিল্লাহ তথা আল্লাহর পথের ব্যাপ্তি যে কোনো দীনি কাজে সম্পদ ব্যয় করাকে এর অন্তর্ভুক্ত করবে। -[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ : প্রকৃত রূপ ছিল- وَلَا تُلْقُوْا اَنْفُسَكُمْ بِاَيْدِيْكُمْ অর্থাৎ নিজেদের হাতে নিজেদের ধ্বংস করো না।' اَىْ لَا تُلْقُوْا اَنْفُسَكُمْ فِى الْهَلَاكِ অর্থাৎ 'নিজেদের অস্তিত্বকে তোমরা ধ্বংসে নিপতিত করো না।' -[বায়যাবী] এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে উম্মতের জাতীয় প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কৃপণতা করে উম্মতকে ধ্বংসে নিপতিত করো না।

وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ [এবং স্বহস্তে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ো না।] আয়াতাংশের শাব্দিক অর্থ অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন ও স্পষ্ট। এতে স্বেচ্ছায় নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করতে বারণ করা হয়েছে।

'ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করা' বলতে এক্ষেত্রে কি বুঝানো হয়েছে? এখন কথা হলো যে, 'ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করা' বলতে এ ক্ষেত্রে কি বুঝানো হয়েছে, এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যাতাগণের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। যথা-

১. ইমাম জাসসাস রাযী (র.) বলেছেন, আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত বিভিন্ন উক্তির মাঝে কোনো বিরোধ নেই। প্রত্যেকটি উক্তিই গৃহীত হতে পারে।

২. হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.) বলেন, এ আয়াত আমাদের সম্পর্কেই নাজিল হয়েছে। আমরা এর ব্যাখ্যা উত্তমরূপেই জানি। কথা হলো, আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে যখন বিজয়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন, তখন আমাদের মধ্যে আলোচনা হলো যে, এখন আর জিহাদের কি প্রয়োজন? এখন আমরা আপন গৃহে অবস্থান করে বিষয়-সম্পত্তির দেখাশোনা করি। এ প্রসঙ্গেই আয়াতটি নাজিল হলো।

এতে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, ধ্বংসের দ্বারা এখানে জিহাদ পরিত্যাগ করাকেই বুঝানো হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, জিহাদ পরিত্যাগ করা মুসলমানদের জন্য ধ্বংসেরই কারণ। সেজন্যই হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.) সারা জীবনই জিহাদ করে গেছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ইস্তাম্বুলে শহীদ হয়ে সেখানেই সমাহিত হয়েছেন।

অনুবাদ :

١٩٦. وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ اَدُّوْهُمَا بِحُقُوْقِهِمَا فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ مُنِعْتُمْ عَنْ اِتْمَامِهَا بِعَدُوٍّ اَوْ نَحْوِهِ فَمَا اسْتَيْسَرَ تَيَسَّرَ مِنَ الْهَدْيِ عَلَيْكُمْ وَهُوَ شَاةٌ وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ اَىْ لَا تَتَحَلَّلُوْا حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ الْمَذْكُوْرُ مَحِلَّهُ حَيْثُ يَحِلُّ ذَبْحُهُ وَهُوَ مَكَانُ الْاِحْصَارِ عِنْدَ الشَّافِعِىِّ (رحـ) فَيُذْبَحُ فِيْهِ بِنِيَّةِ التَّحَلُّلِ وَيُفَرَّقُ عَلٰى مَسَاكِيْنِهِ وَيُحْلَقُ وَبِهِ يَحْصُلُ التَّحَلُّلُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ بِهِ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهِ كَقُمَّلٍ وَصُدَاعٍ فَحَلَقَ فِى الْاِحْرَامِ فَفِدْيَةٌ عَلَيْهِ مِنْ صِيَامٍ لِثَلٰثَةِ اَيَّامٍ اَوْ صَدَقَةٍ بِثَلٰثَةِ اَصُعٍ مِنْ غَالِبِ قُوْتِ الْبَلَدِ عَلٰى سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ اَوْ نُسُكٍ اَىْ ذَبْحِ شَاةٍ وَاَوْ لِلتَّخْيِيْرِ وَاُلْحِقَ بِهِ مَنْ حَلَقَ بِغَيْرِ عُذْرٍ لِاَنَّهُ اَوْلٰى بِالْكَفَّارَةِ وَكَذَا مَنِ اسْتَمْتَعَ بِغَيْرِ الْحَلْقِ كَالطِّيْبِ وَاللُّبْسِ وَالدُّهْنِ لِعُذْرٍ اَوْ غَيْرِهِ ـ

১৯৬. তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ ও ওমরা পূর্ণ কর অর্থাৎ এতদুভয়ের হকসহ যথাযথভাবে এগুলো আদায় কর। কিন্তু তোমরা যদি বাধাপ্রাপ্ত হও অর্থাৎ শত্রু ইত্যাদির কারণে তা পূরণ করতে বাধাগ্রস্ত হও তবে তোমাদের উপর কর্তব্য হবে সহজলভ্য যা সহজ হয় তা কুরবানি করা। আর তা হলো কমপক্ষে একটি ছাগী। যে পর্যন্ত উল্লিখিত কুরবানির পশু তার স্থানে অর্থাৎ যে স্থানে তা জবাই করা বৈধ সেই স্থানে; ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত হলো, যে স্থানে সে বাধাপ্রাপ্ত হবে সে স্থানই হলো জবাই করার স্থান। না পৌঁছে তোমরা মস্তক মুণ্ডন করো না অর্থাৎ ইহরাম হতে হলাল হয়ো না। জবাইয়ের স্থানে পৌঁছার পর ইহরাম হতে হলাল হওয়ার নিয়তে উক্ত পশু জবাই করা হবে এবং মিসকিনদের মাঝে তা বণ্টন করে দেওয়া হবে, আর সে তার মস্তক মুণ্ডন করবে এভাবে সে ইহরাম হতে হালাল হয়ে যেতে পারবে। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয় কিংবা মাথায় ক্লেশ থাকে যেমন– উকুন, মাথাব্যথা ইত্যাদির ফলে ইহরামরত অবস্থায়ই সে মাথা মুণ্ডন করে তবে তিন দিনের সিয়াম কিংবা তদঞ্চলের প্রধান খাদ্য হতে তিন সা' [এক এক সা' প্রায় সাড়ে তিন সের] পরিমাণ খাদ্য ছয়জন মিসকিনকে সদকা কিংবা কুরবানি করে একটি বকরি জবাই করে। ফিদয়ার বিবরণ দিতে গিয়ে আয়াতটিতে যে اَوْ [কিংবা] শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা تَخْيِيْر বা এখতিয়ারবাচক। তার ফিদয়া দেবে কোনোরূপ ওজন ব্যতিরেকে যদি কেউ মাথা মুণ্ডন করে, তবে সেও [ফিদয়া দানের] এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত। কেননা কাফফারা দানের বিধান এ ব্যক্তির জন্য আরো অধিক প্রাযোজ্য।

মাথা মুণ্ডন ব্যতীত যদি কেউ [তখনকার মতো অবৈধ] কিছু করে যেমন সুগন্ধি, সেলাই করা কাপড়, তৈল ইত্যাদি ব্যবহার করে, তবে ওজরবশত হোক বা ওজর ব্যতীত হোক সর্বাবস্থায় তার উক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে

তাহকীক ও তারকীব

اَتِمُّوا : পূর্ণ কর। اَلْاِتْمَامُ মাসদার থেকে اَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف -এর সীগাহ।

اُحْصِرْتُمْ : [যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও] مَاضِى مَجْهُوْل جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ -এর সীগাহ। اَلْاِحْصَارُ (اِفْعَالٌ) অর্থ- বাধা দেওয়া, আটকিয়ে রাখা। বলা হয়- حَصَرَهُ عَنِ السَّفَرِ وَاَحْصَرَهُ [তাকে সফর থেকে বারণ করেছে।] اِسْتَيْسَرَ : সহজ হয়েছে। مَا اسْتَيْسَرَ যা সহজ হয়। اَلْهَدْىُ : বাইতুল্লাহ শরীফের জন্য হাদিয়া হিসেবে যেসব জন্তু প্রেরণ করা হয়। যেমন- গরু, ছাগল, উট। مَحِلَّهُ : مَحِلٌّ এমন স্থান যেখানে হাদীর জন্তু জবাই বা নহর করা বৈধ। يُفَرِّقُ : বণ্টন করে দেবে।

اِسْتَيْسَرَ : تَيَسَّرَ -এর ব্যাখ্যায় تَيَسَّرَ উল্লেখ করার দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, اِسْتَيْسَرَ শব্দটি تَيَسَّرَ -এর অর্থে اِسْتِفْعَالٌ -এর খাসিয়ত হিসেবে প্রার্থনার অর্থ উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهُ عَلَيْكُمْ : এখানে এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে নিম্নোক্ত উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন. فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ হলো جَوَابْ شَرْط অথচ এটি جُمْلَةٌ تَامَّةٌ বা পূর্ণ জুমলা নয়। আর جَوَابْ شَرْط হওয়ার জন্য জুমলা হওয়া শর্ত।

উত্তর: এখানে عَلَيْكُمْ মাহযূফ মেনে এদিকে ইশারা করেছেন যে, আয়াতে ما মুবতাদার খবরটি মাহযূফ রয়েছে, যাতে মুবতাদা তার খবরের সাথে মিলে জুমলা হয়ে শর্তের جَزَاءٌ হতে পারে। ইবারতের প্রকৃত রূপ হলো- فَعَلَيْكُمْ مَا اسْتَيْسَرْتُمْ

اَذًى : ক্লেশ, কষ্ট। قُمَّلٌ : উকুন। صُدَاعٌ : মাথাব্যথা। اَصُعٌ : صَاعٌ -এর বহুবচন। পরিমাপ বিশেষ। قُوْتٌ : খাদ্য। نُسُكٌ : এটি نَسِيْكَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ- কুরবানি। মাসদার হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ কুরবানি করা। اِسْتَمْتَعَ : উপকার লাভ করল, তখনকার মতো অবৈধ কিছু করল।

قَوْلُهُ فَفِدْيَةٌ عَلَيْهِ : فَفِدْيَةٌ -এর মূলপাঠ ছিল فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ; এখানে فَفِدْيَةٌ মুবতাদা আর عَلَيْهِ তার খবর, যা মাহযূফ রয়েছে। মুফাসসির (র.) عَلَيْهِ বৃদ্ধি করে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

لِثَلَاثَةِ اَيَّامٍ : এটি প্রথম ফিদয়া রোজার পরিমাণ। অর্থাৎ রোজার মাধ্যমে ফিদয়া দিলে তার পরিমাণ হলো তিনদিন রোজা রাখা। হাদীস শরীফে এ পরিমাণ বর্ণিত হয়েছে بِثَلَاثَةِ اَصُعٍ : এখানে সদকার পরিমাণ বর্ণিত হয়েছে। এ পরিমাণও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। قُوْتُ الْبَلَدِ : بَلَدْ বলতে এখানে মক্কা নগরীকে বুঝানো হয়েছে। আর এটি তিন ইমামের মাযহাব। আহনাফের মতে যে কোনো খাবার দেওয়া যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচনা ও যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতসমূহে সওমের বিধিবিধান ছিল। এখানে হজ ও ওমরা পরিপূর্ণ রূপে আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তারপর কেউ ইহরাম বাঁধার পর কোনো কারণবশত হজে বাধাপ্রাপ্ত হলে বা পূর্ণ করতে না পারলে তার করণীয় কি? তা বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ اَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ اَدُّوْهُمَا بِحُقُوْقِهِمَا : অর্থাৎ হজ ও ওমরাকে আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে আদায় করবে এদের যাবতীয় শর্ত ও হক আদায় করে। বিশিষ্ট তাবে-তাবেয়ী হযরত মুকাতিল (র.) এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ সময়ে এমন কিছু করো না, যা এ ইবাদত দুটির জন্য সমীচীন ও সঙ্গত নয়। [কুরতবীর সূত্রে মাজেদী]

প্রশ্ন: ইবারত দ্বারা হজ ও ওমরা উভয়টিই ফরজ কিংবা ওয়াজিব হওয়া বুঝে আসে। যেমনটি ইমাম শাফেয়ী (রা.)-এর মাযহাব। আবার উভয়টি নফল হওয়াও বুঝে আসে। কেননা اَمْرٌ টা وُجُوْبْ -এর জন্য তাই হজ ও ওমরা উভয়টিই ওয়াজিব হবে। আর نُدُبْ -এর জন্য হলে উভয়টিই مَنْدُوْبْ হবে, যা মাযহাবসমূহের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

উত্তর:

১. ইসলামের শুরুলগ্নে হজ ও ওমরা উভয়টিই নফল ছিল। অতঃপর وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ দ্বারা হজের فَرْضِيَّتْ সাব্যস্ত হয়েছে। আর ওমরা আপন অবস্থায়ই রয়ে গেছে।

২. اَتِمُّوا -এর অর্থ হলো- اَدُّوْهُمَا بِحُقُوْقِهِمَا تَامَّيْنِ كَامِلَيْنِ بِاَرْكَانِهِمَا وَشُرُوْطِهِمَا অর্থাৎ এ আয়াতে হজ ও ওমরা ওয়াজিব হওয়ার কথা বলা হয়নি; বরং এখানে সকল রোকন ও শর্তসহ পরিপূর্ণভাবে আদায়ের কথা বলা হয়েছে।

«لِاَنَّ الْاَمْرَ بِالْاِتْمَامِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْاَمْرِ بِاَصْلِ الْفِعْلِ الَّذِىْ اُمِرَ بِاِتْمَامِهِ - حَاشِيَةُ جَلَالَيْنِ» .

৩. আর যদি أَتِمُّوا শব্দকে তার বাহ্যিক অর্থেই রাখা হয়, তাহলে আয়াতের মর্ম হবে– আরম্ভ করার পর তা পূর্ণ করা ওয়াজিব হবে। কেননা আহনাফের মতে নফল ইবাদত শুরু করার দ্বারা ওয়াজিব হয়ে যায়।

৪. আরেকটি জবাব এও হতে পারে যে, এখানে হজ ও ওমরার নির্দেশটি মূলত উভয়টির মাঝে ফরজকৃত শর্তাবলির প্রতি লক্ষ্য রেখে দেওয়া হয়েছে। কেননা ওমরা সুন্নত হলেও তাতে কিছু বিধান ফরজ রয়েছে। যেমনিভাবে নফল নামাজের মাঝে কেরাত পড়া হলো ফরজ। –[জামাল]

قَوْلُهُ لِلّٰهِ : 'আল্লাহর জন্য।' এর ব্যাখ্যায় ফকীহ-মুফাসসির ইবনুল আরাবী একটি অত্যন্ত সুন্দর তত্ত্ব উদ্ঘাটন করেছেন যাবতীয় ইবাদত ও কর্ম তো আল্লাহর সঙ্গেই সম্বন্ধিত হয়- তাঁর জ্ঞান-অবগতি, তাঁর ইচ্ছা-সংকল্প ইত্যাদির বিচারে। এতদসত্ত্বেও এখানে এভাবে নির্দিষ্টকরণের উদ্দেশ্য হলো একটি বিষয়ে সতর্কীকরণ যে, হজ ও ওমরায় উপস্থিতি কোনো মেলা-অনুষ্ঠানে, কোনো সমাবেশ-সম্মেলন মনে করে, গৌরব, প্রতিযোগিতা, দেনদরবার কিংবা শুধু ব্যবসায়িক স্বার্থোদ্ধারের জন্য যেন না হয়; বরং পূর্ণাঙ্গ নিষ্ঠার সঙ্গে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তেই যেন হয়। এ নির্দিষ্টকরণের রহস্য এই যে, আরববাসীরা হজ পালনে যেত সম্মিলন, পারস্পরিক যোগ-সংযোগ, সহায়তা-মৈত্রী, বিরোধ-সংঘাত, গৌরব-প্রতিযোগিতা ও অন্যান্য প্রয়োজন পূরণ এবং বাজার-মেলায় উপস্থিতি বিভিন্ন জাগতিক উদ্দেশ্য নিয়ে। এতে তাদের দৃষ্টিতে আল্লাহর জন্য কোনো অংশ ছিল না বা তারা ছওয়াব ও নৈকট্য অর্জনের বিষয় মনে করে হজ পালন করত না। তাই আল্লাহ তা'আলা হুকুম করলেন যে, হজ ও ওমরা যেন আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাঁর হুকুম পালনার্থে ও তাঁর হক আদয়ের লক্ষ্যে আদায় করা হয়। –[তাফসীরে মাজেদী]

এখন প্রশ্ন উঠে, যদি কোনো ব্যক্তি ওমরা শুরু করার পর কোনো অসুবিধায় পড়ে তা আদায় করতে না পারে তাহলে কি হবে? এর উত্তর পরবর্তী فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ বাক্যে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ **শানে নুযূল :** এ আয়াতটি হোদায়বিয়ার ঘটনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তখন রাসূল ﷺ এবং সাহাবীগণ ইহরাম অবস্থায় ছিলেন; কিন্তু মক্কার কাফেররা তাঁদেরকে হেরেমের সীমায় প্রবেশ করতে দেয়নি। ফলে তাঁরা ওমরা আদায় করতে পারেননি। তখন আদেশ হলো, ইহরামের ফিদিয়াস্বরূপ একটি করে কুরবানি কর। কুরবানি করে ইহরাম ভেঙ্গে ফেল। কিন্তু সাথে সাথে পরবর্তী আয়াত وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ -এ বলে দেওয়া হয়েছে যে, ইহরাম খোলার শরিয়তসম্মত ব্যবস্থা মাথা মুণ্ডানো ততক্ষণ পর্যন্ত জায়েজ নয়, যতক্ষণ না ইহরামকারীর কুরবানি নির্ধারিত স্থানে পৌঁছাবে।

হজে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার মর্ম :

قَوْلُهُ بِعَدُوٍّ : এটি ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র.)-এর মাযহাব অনুযায়ী। কেননা তাঁদের মতে, একমাত্র দুশমনের দ্বারাই إِحْصَارٌ শুদ্ধ হতে পারে। পক্ষান্তরে আহনাফের মতে এটি ব্যাপক। দুশমন ছাড়াও অসুস্থতা, রোগ-ব্যাধি, পথ-খরচ ফুরিয়ে যাওয়া ইত্যাদি দ্বারাও إِحْصَارٌ হতে পারে। কেননা হাদীসে এসেছে– مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ

قَوْلُهُ الْهَدْيُ : শাব্দিক অর্থে যে কোনো উপঢৌকন, যা কা'বা ঘরের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী (র.)সহ আরো অনেকে উট, গরু, ছাগল ও দুম্বা জাতীয় পশুর কথা বলেছেন। কেউ কেউ অবশ্য শুধু উটের কথা বলেছেন।

قَوْلُهُ مَحِلَّهُ : তার অবতরণ ক্ষেত্র অর্থাৎ হেরেম শরীফের এলাকা। কেননা এটিই কুরবানির মূলকেন্দ্র।

قَوْلُهُ وَهُوَ مَكَانُ الْاِحْصَارِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ : এটি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, নির্ধারিত স্থানের সীমানা হচ্ছে হেরেমের এলাকা। সেখানে পৌঁছে কুরবানি করতে হবে। নিজে না পারলে, অন্যের দ্বারা পাঠিয়ে জবাই করাতে হবে।

قَوْلُهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا الخ : **যোগসূত্র :** পূর্বে জানা গেছে যে, ইহরাম অবস্থায় মাথামুণ্ডন বা চুল খাটো করা নিষিদ্ধ। কিন্তু যদি ইহরাম অবস্থায় কোনো ওজরবশত মাথামুণ্ডন কিংবা চুল খাটো করার প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে কি করবে? এখান থেকে সে আলোচনা করা হচ্ছে যে, যদি কোনো রোগ-ব্যাধির কারণে মাথা কিংবা শরীরের অন্য কোনো স্থানের চুল বা পশম কর্তন করতে বা মুণ্ডাতে হয় তাহলে প্রয়োজন মতো মুণ্ডানো জায়েজ আছে।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ مِنْكُمْ مَرِيْضًا : এখানে أَيْ مَرِيْضًا مُحْتَاجًا إِلَى الْحَلْقِ উহ্য রয়েছে। صِفَتٌ আর مِنْكُمْ এটি ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ হয়ে مَرِيْضًا -এর حَالٌ আর مِنْ হলো تَبْعِيْضِيَّةٌ

فَاِذَا اَمِنْتُمْ الْعَدُوَّ بِاَنْ ذَهَبَ اَوْ لَمْ يَكُنْ فَمَنْ تَمَتَّعَ اسْتَمْتَعَ بِالْعُمْرَةِ اَىْ بِسَبَبِ فَرَاغِهِ مِنْهَا بِمَحْظُوْرَاتِ الْاِحْرَامِ اِلَى الْحَجِّ اَىْ اَلْاِحْرَامِ بِهِ بِاَنْ يَكُوْنَ اَحْرَمَ بِهَا فِىْ اَشْهُرِهٖ فَمَا اسْتَيْسَرَ تَيَسَّرَ مِنَ الْهَدْيِ عَلَيْهِ وَهُوَ شَاةٌ يَذْبَحُهَا بَعْدَ الْاِحْرَامِ بِهٖ وَالْاَفْضَلُ يَوْمَ النَّحْرِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ الْهُدٰى لِفَقْدِهٖ اَوْ فَقْدِ ثَمَنِهٖ فَصِيَامُ اَىْ فَعَلَيْهِ صِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ اَىْ فِىْ حَالِ اِحْرَامِهٖ بِهٖ فَيَجِبُ حِيْنَئِذٍ اَنْ يُحْرِمَ قَبْلَ السَّابِعِ مِنْ ذِى الْحَجَّةِ وَالْاَفْضَلُ قَبْلَ السَّادِسِ لِكَرَاهَةِ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ لِلْحَاجِّ وَلَا يَجُوْزُ صَوْمُهَا اَيَّامَ التَّشْرِيْقِ عَلٰى اَصَحِّ قَوْلَيِ الشَّافِعِىِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلٰى وَطَنِكُمْ مَكَّةَ اَوْ غَيْرِهَا وَقِيْلَ اِذَا فَرَغْتُمْ مِنْ اَعْمَالِ الْحَجِّ وَفِيْهِ الْتِفَاتٌ عَنِ الْغَيْبَةِ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ جُمْلَةٌ تَاكِيْدٌ لِمَا قَبْلَهَا .

অনুবাদ : যখন তোমরা শত্রু হতে নিরাপদ হবে যেমন শত্রু চলে গেল বা বাস্তবেই তার কোনো শত্রু ছিল না, তখন তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজের সাথে ওমরা দ্বারা অর্থাৎ তার ইহরাম করে, যেমন হজের জন্য নির্ধারিত মাসসমূহে সে তারও ইহরাম করল লাভবান হতে চায় তামাত্তুর মাধ্যমে অর্থাৎ ওমরা সম্পন্ন করে এবং তা হতে হালাল হয়ে ইহরামের মধ্যে নিষিদ্ধ বস্তু ভোগ করে লাভবান হতে চাইবে তার উপর কর্তব্য হবে সহজলভ্য যা তার জন্য সহজ হয় তা কুরবানি করা। তা হলো একটি বকরি জবাই করা। হজের ইহরাম করার পর এ কুরবানি করবে, তবে 'ইয়াওমুন নাহরে' [১০ই জিলহজ তারিখে] জবাই করা সর্বোত্তম। কিন্তু বাজারে না থাকায় বা মূল্য না থাকায় যদি কোনো ব্যক্তি তা উক্ত হাদী বা কুরবানির পশু না পায় তবে তার উপর কর্তব্য হলো হজের সময় অর্থাৎ ইহরামরত অবস্থায় তিন দিন ইহরামরত অবস্থায় যে তিন দিন সিয়াম পালন করবে এর জন্য অবশ্য কর্তব্য হলো জিলহজ মাসের সপ্তম তারিখের পূর্বেই ইহরাম বেঁধে নেওয়া। এমনকি ষষ্ঠ তারিখের পূর্বে বাঁধা আরও উত্তম। কেননা হজ পালনকারীর জন্য আরাফার দিন [নবম তারিখ] সিয়াম পালন করা পছন্দনীয় নয়। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বিশুদ্ধতম অভিমত হলো আইয়ামে তাশরীক -এ সিয়াম পালন করা জায়েজ নয়। এবং যখন তোমাদের গৃহে মক্কা বা অন্য কোথাও হোক প্রত্যাবর্তন করবে কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো যখন তোমরা হজের কার্যাদি সমাপন করে অবসর হবে। اِذَا رَجَعْتُمْ এতে غَائِبٌ বা নাম পুরুষ হতে [দ্বিতীয় পুরুষের দিকে] اِلْتِفَاتٌ [রূপান্তর] সংঘটিত হয়েছে। তখন সাত দিন– এই পূর্ণ দশ দিন সিয়াম পালন করা। تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ বাক্যটি পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর تَاكِيْد বা জোর সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

مَحْظُوْرَاتٌ : مَحْظُوْرٌ -এর বহুবচন। অর্থ– নিষিদ্ধ বস্তু। فَقْد না থাকা, হারিয়ে যাওয়া।

اَلتَّشْرِيْقُ : يَوْمَ النَّحْرِ -এর পরবর্তী তিন দিনকে اَيَّامُ تَشْرِيْقٍ বলা হয়। تَشْرِيْقٌ শব্দের অর্থ– গোশত শুকানো। যেহেতু সাধারণত এ দিনগুলোতে গোশত শুকানো হয় সেহেতু তার এ নাম রাখা হয়েছে।

قَوْلُهُ بِاَنْ ذَهَبَ اَوْ لَمْ يَكُنْ : এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে اَمِنْتُمْ -এর উভয় অর্থের দিকে ইশারা করা হয়েছে। কেননা اَمِنْتُمْ -এর مُشْتَقّ দুটি। ১. اَمْنَةٌ অর্থ– ভয় দূরীভূত হওয়া। ২. اَمْنٌ স্বস্তি, শান্তি, যা خَوْفٌ -এর বিপরীত। সুতরাং যদি اَمْنَةٌ مِنْهُ থেকে ব্যবহার হয়ে থাকে, তাহলে অর্থ হবে– فَاِذَا زَالَ عَنْكُمْ خَوْفُ الْعَدُوِّ ; এ সুরতে এটা ঐ ব্যক্তির হুকুম হবে, যার বাধা দূর হয়ে গেছে। আর যার বাধা ছিল না সে তো এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত আছেই। আর যদি اَمْنٌ থেকে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তাহলে অর্থ হবে– যদি তোমরা শান্তি ও স্বস্তিতে থাক। –[تَرْوِيْحُ الْاَرْوَاحِ সূত্রে জামালাইন]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِذَا اَمِنْتُمْ : আয়াতের শুরু অংশে উল্লিখিত সংকট ও ব্যাধির বিপরীতে এখানে শান্তি ও নিরাপত্তার অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে এবং হজের সময় ওমরা করার বিধান বর্ণনা করা হচ্ছে। ওখানে حِصَارٌ দ্বারা যেমন ব্যাপক ও বিস্তৃত অর্থ নেওয়া হয়েছিল, এখানেও اَمْنٌ শব্দ দ্বারা ব্যাপক অর্থ বুঝাবে। অর্থাৎ শত্রু জনিত সংকট দূর হওয়ার অর্থ যেমন বুঝাবে, তদ্রূপ ব্যাপকতার অর্থে রোগ-ব্যাধি উপশম হয়ে যাওয়াও বুঝাবে।

قَوْلُهُ الْعَدُوُّ : মুসান্নিফ (র.) যেহেতু শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী, তাই তিনি শুধু দুশমন থেকে নিরাপদ হওয়ার কথাই উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ فَمَنْ تَمَتَّعَ : تَمَتُّعٌ-এর শাব্দিক অর্থ– উপকার হাসিল করা। ফিকহের পরিভাষায় এর অর্থ হজ ও ওমরা একত্র করা। অর্থাৎ হজের মাসগুলোতে একবার ইহরাম বেঁধে ওমরা আদায় করার পর তা খুলে হালাল হয়ে পুনরায় দ্বিতীয়বার ইহরাম বেঁধে হজ করে নেওয়া। যেহেতু দুই ইহরামের মধ্যবর্তী সময়ে ইহরামকালীন নিষিদ্ধ বিষয়গুলো উপভোগ করা যায় তাই একে تَمَتُّعٌ বলা হয়।

হজ ও ওমরা একত্রে আদায় করার বিধান : ইবরাহীমী ধর্ম ত্যাগ করে জাহিলি যুগের আরবরা যেসব কুসংস্কারে নিমজ্জিত হয়েছিল, সেগুলোর মধ্যে একটি ছিল এই যে, তারা মনে করত হজের মৌসুমে ওমরা করা কঠিন পাপ। –[জাসসাস]

এ আয়াতে তাদের সে ধারণার সংশোধন এভাবে করা হয়েছে যে, মীকাতের সীমায় বসবাসকারীদের জন্য তো হজের মাসে হজ ও ওমরা একত্রে আদায় করা নিষিদ্ধ। কেননা তাদের হজের মাসের পরে দ্বিতীয়বার ওমরার জন্য আসা কঠিন ব্যাপার নয়, কিন্তু মীকাতের বাইরের অধিবাসীদের জন্য দ্বিতীয়বার আসা কঠিন ব্যাপার, তাই দূরবর্তী এলাকার লোকজনের জন্য হজ ও ওমরা একত্রে আদায় করা জায়েজ। –[জামালাইন খ. ১, পৃ. ৩১২]

মীকাত : সে সমস্ত নির্ধারিত স্থানসমূহকে মীকাত বলা হয়, যা সারা বিশ্বের হজযাত্রীগণ যিনি যেদিক থেকে আগমন করেন, সেসব রাস্তার প্রত্যেকটিতে একটি স্থান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে। যখনই মক্কায় আগমনকারীরা এ স্থানে আসবে, তখন হজ অথবা ওমরার নিয়তে ইহরাম বাঁধা আবশ্যক। ইহরাম ব্যতীত নির্ধারিত এ স্থান অতিক্রম করা গুনাহের কাজ। যেমন বলা হয়েছে– لَمْ يَكُنْ اَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ-এর অর্থ তা-ই। অর্থাৎ যাদের পরিবার-পরিজন মীকাতের সীমারেখার অভ্যন্তরে বসবাস করে, না তাদের জন্য হজ ও ওমরা হজের মাসে একত্রে আদায় করা জায়েজ।

অবশ্য যারা হজের মৌসুমে হজ ও ওমরাকে একত্রে আদায় করে, তাদের উপর এ দুটি ইবাদতের শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব। তা হচ্ছে কুরবানি করার সামর্থ্য যাদের রয়েছে, তারা বকরি, গাভী, উট প্রভৃতি যা তাদের জন্য সহজলভ্য হয়, তা থেকে কোনো একটি পশু কুরবানি করবে। কিন্তু যাদের কুরবানি করার মতো আর্থিক সঙ্গতি নেই, তারা দশটি রোজা রাখবে। হজের ৯ তারিখ পর্যন্ত তিনটি আর হজ সমাপনের পর সাতটি রোজা রাখতে হবে। এ সাতটি রোজা যেখানে এবং যখন সুবিধা, তখনই আদায় করতে পারে । হজের মধ্যে যে ব্যক্তি তিনটি রোজা পালন করতে না পারে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট সাহাবীর মতে তাদের জন্য কুরবানি করাই ওয়াজিব। যখন সমর্থ হয়, তখন কারো মাধ্যমে হেরেম শরীফে কুরবানি আদায় করবে। –[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

তামাত্তু ও কিরান : হজের মাসে হজের সাথে ওমরাকে একত্রকরণের দুটি পদ্ধতি রয়েছে। একটি হচ্ছে মীকাত হতে হজ ও ওমরার জন্য একত্রে ইহরাম বাঁধা। শরিয়তের পরিভাষায় একে 'হজ্জে কিরান' বলা হয়। এর ইহরাম হজের ইহরামের সাথেই ছাড়তে হয়, হজের শেষদিন পর্যন্ত তাকে ইহরাম অবস্থায়ই কাটাতে হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে, মীকাত হতে শুধু ওমরার ইহরাম বাঁধবে। মক্কা আগমনের পর ওমরার কাজকর্ম শেষ করে ইহরাম খুলবে এবং ৮ জিলহজ তারিখে মিনা যাবার প্রাক্কালে হেরেম শরীফের মধ্যেই ইহরাম বেঁধে নেবে। শরিয়তের পরিভাষায় একে বলা হয় তামাত্তু'; কিন্তু فَمَنْ تَمَتَّعَ এ সাধারণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَقِيْلَ اِذَا فَرَغْتُمْ مِنْ اَعْمَالِ الْحَجِّ : এখানে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ প্রত্যাবর্তন দ্বারা উদ্দেশ্য হজের কার্যাবলি থেকে অবসর হওয়া। অবসরের পর বাস্তবে কেউ নিজ বাড়িতে আসুক বা তখনও সেখানে অবস্থান করুক। ইমাম শাফেয়ী (র.) সহ অন্যান্য ইমামদের মতে মক্কা থেকে [প্রত্যক্ষ অর্থে] স্বদেশে প্রত্যাবর্তন উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ جُمْلَةٌ تَاكِيْدٌ لِمَا قَبْلَهَا : এ বাক্যটি পূর্ববর্তী বক্তব্যের দৃঢ়তা বিধানের জন্য। যেমন কেউ এভাবে বলে– سَمِعْتُهُ بِاُذُنَىَّ - আমার দুই কানে তা শুনেছি। رَأَيْتُهُ بِعَيْنَىَّ - আমার দুই চোখে তা দেখেছি। كَتَبْتُ بِيَدَىَّ - আমি আমার হাতে লিখেছি।

ذٰلِكَ الْحُكْمُ الْمَذْكُوْرُ مِنْ وُجُوْبِ الْهَدْيِ اَوِ الصِّيَامِ عَلٰى مَنْ تَمَتَّعَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِاَنْ لَمْ يَكُوْنُوْا عَلٰى دُوْنَ مَرْحَلَتَيْنِ مِنَ الْحَرَمِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَاِنْ كَانَ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ وَلَا صِيَامَ وَاِنْ تَمَتَّعَ وَفِىْ ذِكْرِ الْاَهْلِ اِشْعَارٌ بِاشْتِرَاطِ الْاِسْتِيْطَانِ فَلَوْ اَقَامَ قَبْلَ اَشْهُرِ الْحَجِّ وَلَمْ يَسْتَوْطِنْ وَتَمَتَّعَ فَعَلَيْهِ ذٰلِكَ وَهُوَ اَحَدُ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَالثَّانِىْ لَا وَالْاَهْلُ كِنَايَةٌ عَنِ النَّفْسِ وَاُلْحِقَ بِالْمُتَمَتِّعِ فِيْمَا ذُكِرَ بِالسُّنَّةِ الْقَارِنُ وَهُوَ مَنْ يُّحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ مَعًا اَوْ يُدْخِلُ الْحَجَّ عَلَيْهَا قَبْلَ الطَّوَافِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ فِيْمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖ وَيَنْهَاكُمْ عَنْهُ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ لِمَنْ خَالَفَهٗ ـ

অনুবাদ : এটা অর্থাৎ তামাত্তু'কারীর জন্য সিয়াম পালন করার বা কুরবানি ওয়াজিব হওয়ার উল্লিখিত বিধান তাদের জন্য, যাদের পরিজনবর্গ মাসজিদুল হারামে উপস্থিত নেই। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত হলো, যদি তার পরিজনবর্গ হেরেম শরীফের দুই মারহালার [হেঁটে চললে দু-দিনের পথ] ভিতরে না হয়, তবে এ বিধান প্রযোজ্য হবে। আর যদি এতটুকু পরিমাণের ভিতর তারা বাস করে তবে তামাত্তু' করলেও তার উপর কুরবানি বা সিয়াম পালন করতে হবে না। আয়াটিতে اَهْل [পরিবারবর্গ] শব্দটির উল্লেখ দ্বারা বুঝা যায় উক্ত স্থানকে আবাস হিসেবে গ্রহণ করা শর্ত। সুতরাং হজের মাসসমূহের পূর্বে যদি কেউ এ স্থানে এসে বসবাস করে; কিন্তু এটাকে আবাসভূমিরূপে গ্রহণ না করে আর তামাত্তু' করে তবে তাকে তা [কুরবানি বা উক্ত নিয়মে সওম পালন] করতে হবে। এটা আমাদের শাফেয়ী মাযহাবের দুটি মতের একটি। আর দ্বিতীয় অভিমত হলো, এমতাবস্থায় তাকে তা করতে হবে না। তখন اَهْل শব্দ দ্বারা তার নিজেকে বুঝাবে।

সুন্নাহর উল্লেখ হিসেবে এ বিষয়ে তামাত্তু'কারীর সাথে কিরানও অন্তর্ভুক্ত হবে। যে ব্যক্তি একই সাথে হজ ও ওমরার ইহরাম বাঁধে বা ওমরার তওয়াফ সমাপনের পূর্বেই এর সাথে হজেরও ইহরাম করে নেয়, তাকে 'কিরান' বলা হয়। আল্লাহকে অর্থাৎ তিনি যে সকল বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন এবং যে সকল বিষয় নিষেধ করেছেন, সে সকল বিষয়ে তাঁকে ভয় কর ও জেনে রাখ নিশ্চয় আল্লাহ যে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে তার শাস্তিদানে অতি কঠোর।

তাহকীক ও তারকীব

عَلٰى دُوْنَ مَرْحَلَتَيْنِ مِنَ الْحَرَمِ : হেরেম শরীফের দুই মারহালার ভিতরে না হয়।
مَرْحَلَةٌ : হেঁটে চললে দুই দিনের পথ। اَلْاَهْلُ : পরিবার। اِشْعَارٌ : বুঝানো, সংবাদ দেওয়া।
اَلْاِسْتِيْطَانُ : আবাস হিসেবে গ্রহণ করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ «ذٰلِكَ» اَلْحُكْمُ الْمَذْكُوْرُ مِنْ وُجُوْبِ الْهَدْيِ اَوِ الصِّيَامِ عَلٰى مَنْ تَمَتَّعَ : এ ব্যাখ্যা তথা ذٰلِكَ -এর مَرْجِع বা ইঙ্গিত কুরবানি ওয়াজিব হওয়ার প্রতি সাব্যস্ত করাটা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব মতে। আহনাফের মতে ذٰلِكَ দ্বারা পূর্বোক্ত تَمَتُّعْ বা উপকার লাভ তথা হজের মৌসুমে হজ ও ওমরা একত্রে করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা আহনাফ হজের সময় তামাত্তু' ও কিরান অর্থাৎ হজ মওসুমে হজ ও ওমরা একত্রে করার দুটি পন্থাই বহিরাগতদের জন্য বৈধ হওয়ার এবং মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বাসিন্দাদের জন্য বৈধ না হওয়ার অভিমত পোষণ করেছেন। –[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهٗ بِاَنْ لَّمْ يَكُوْنُوْا عَلٰى دُوْنَ مَرْحَلَتَيْنِ مِنَ الْحَرَمِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ : এ ইবারতটুকুর উদ্দেশ্য হলো তামাত্তু'কারীর উপর কুরবানি ওয়াজিব হওয়ার দুটি সুরত বর্ণনা করা। সারকথা হলো, তামাত্তু'কারী যদি اٰفَاقِىْ তথা বহিরাগত হয়, তাহলে তার উপর دَمِ تَمَتُّعْ বা কুরবানি ওয়াজিব হবে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, হেরেম থেকে কমপক্ষে দুই মারহালা দূরত্বে বসবাসকারীকে اٰفَاقِىْ বলা হয়। আর তা থেকে কম দূরত্বের বাসিন্দা তাঁর মতে حَضَرِىْ তথা স্থানীয় বলে বিবেচ্য। حَضَرِىْ ব্যক্তির উপর দমে তামাত্তু' এমনকি তার স্থলাভিষিক্ত রোজাও ওয়াজিব নয়।

قَوْلُهٗ وَفِىْ ذِكْرِ الْاَهْلِ : এখানে لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ -এর ব্যাখ্যা করা উদ্দেশ্য। এ আয়াতের মর্ম হলো, دمِ تَمَتُّعْ সাকেত বা রহিত হওয়ার জন্য শরয়ী মুকীম হওয়া জরুরি। যদি কেউ اَشْهُرِ حُرُمْ -এর পূর্বে মক্কায় অবস্থান করে; কিন্তু তাকে বসবাসের স্থান না বানায় অর্থাৎ ১৫ দিন অবস্থানের ইচ্ছা করে থাকে, তাহলে তার থেকে دَمِ تَمَتُّعْ সাকেত হবে না। কেননা শরয়ী ইকামতের নিয়ত ছাড়া সে আফাকী [দূরের অধিবাসী] হিসেবেই গণ্য হবে। আর এ ধরনের ব্যক্তির উপর دَمِ تَمَتُّعْ ওয়াজিব হয়। –[জামালাইন] খ. ১, পৃ. ৩১০]

١٩٧. اَلْحَجُّ وَقْتُهُ اَشْهُرٌ مَعْلُوْمَاتٌ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرُ لَيَالٍ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ وَقِيْلَ كُلُّهُ فَمَنْ فَرَضَ عَلٰى نَفْسِهِ فِيْهِنَّ الْحَجَّ بِالْاِحْرَامِ بِهِ فَلَا رَفَثَ جِمَاعَ فِيْهِ وَلَا فُسُوْقَ مَعَاصِيَ وَلَا جِدَالَ خِصَامَ فِي الْحَجِّ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِفَتْحِ الْاَوَّلَيْنِ وَالْمُرَادُ فِي الثَّلٰثَةِ النَّهْيُ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ كَصَدَقَةٍ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ فَيُجَازِيْكُمْ بِهِ .	**অনুবাদ :** ১৯৭. হজ অর্থাৎ এর সময় হলো সুবিদিত কতিপয় মাস। শাওয়াল, জিলকদ এবং জিলহজ মাসের দশরাত; কেউ কেউ বলেন, জিলহজ মাসের পুরোটাই এর অন্তর্ভুক্ত। যে কেউ এই মাসগুলোতে নিজের উপর হজ করা তার ইহরাম বাঁধার মাধ্যমে ফরজ করে নেয়, তার জন্য হজের সময় স্ত্রী ব্যবহার, অর্থাৎ স্ত্রীসহবাস অন্যায় আচরণ পাপাচার ও বিবাদ কলহ বৈধ নয়। অপর এক কেরাতে প্রথম দুটি শব্দ অর্থাৎ رَفَثَ ও فُسُوْقَ-এ ফাতহা সহকারে পঠিত রয়েছে। فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ এ তিনটিতে لَا [না-বাচক শব্দ] نَهْى [নিষেধাজ্ঞা] অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তোমরা উত্তম যা কিছু কর। যেমন– সদকা ইত্যাদি আল্লাহ তা জানেন অনন্তর তিনি তোমাদেরকে এর প্রতিফল দান করবেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَعْلُوْمَاتٌ : অর্থাৎ ওমরা তো সারা বছরই জায়েজ আছে এবং এর জন্য সবসময়ই ইহরাম বাঁধতে পারবে। কিন্তু হজ নির্ধারিত কয়েক মাসেই হয়ে থাকে। তার জন্য ইহরাম বাঁধার সময় হলো এ কয়েক মাস। কেউ যদি এ সময়ের মধ্যে ইহরাম বাঁধে, তাহলে তা হজের ইহরাম হিসেবে গণ্য হবে এবং তার সফরটিও হজের সফর রূপে বিবেচ্য হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে তো শাওয়ালের পূর্বে ইহরাম বাঁধা জায়েজ নেই। কেউ বাঁধলে তার হজই হবে না। কেননা তাঁর মতে ইহরাম বাঁধা হজের অঙ্গীভূত রুকন এবং হজের কোনো রুকনই মৌসুমের পূর্বে আদায় করার বৈধতা নেই। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ইহরাম বাঁধা জায়েজ আছে। কেউ বাঁধলে তার হজ হয়ে যাবে; কিন্তু হজের সময়ের পূর্বে ইহরাম বাঁধা মাকরূহ। জায়েজের যুক্তি হলো হানাফীদের মতে ইহরাম হজের রুকন নয়, বরং এটি হজের শর্ত। যেমন অজু নামজের রুকন নয়, পূর্বশর্ত মাত্র।

قَوْلُهُ «اَلْحَجُّ» وَقْتُهُ : وَقْتُهُ বৃদ্ধি করে مُضَافٌ মাহযূফ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যদি মুযাফ মাহযূফ ধরা না হয়, তাহলে মাসদারকে তার জাতের উপর প্রয়োগ করা আবশ্যক হয়। কেননা اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ অর্থ–হজের কতগুলো মাস। অথচ মাস হজ নয়; বরং হজের সময়। মুযাফ মাহযূফ ধরা হলে আর আপত্তি থাকে না। –[জামালাইন: ৩১৫/ ১৫]

قَوْلُهُ اَشْهُرٌ مَعْلُوْمَاتٌ : এ আয়াত পূর্বে বর্ণিত يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ الخ আয়াতের ব্যাপকতাকে সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে। কেননা সে আয়াত থেকে বুঝা যায় চাঁদের মাস সবগুলোই বুঝি হজের সময়।

قَوْلُهُ وَقِيْلَ كُلُّهُ : এখানে قِيْلَ -এর প্রবক্তা হলেন ইমাম মালেক (র.)। কেননা তাঁর মতে জিলহজের পূর্ণ মাসই হজের মধ্যে শামিল।

قَوْلُهُ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ : فَرَضَ -এর মূল কথা হলো কোনো কিছু সাব্যস্ত হওয়া, কোনো কিছুর অপরিহার্যতা। তবে নিজের জন্য অপরিহার্য করে নেওয়ার বাস্তব নিদর্শন কি?

قَوْلُهُ بِالْاِحْرَامِ بِهِ : এ অংশটুকু দ্বারা ইমামগণের এখতেলাফের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে নিয়ত করা এবং ইহরাম বাঁধার দ্বারা হজ আবশ্যক হয়ে যায়; কিন্তু ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তালবিয়া এবং سُوْقُ هَدْىٍ [হাদী প্রেরণের] দ্বারা হজ আবশ্যক হয়।

قَوْلُهُ وَلَا فُسُوْقَ : এর অধীনে ছোট বড় সব ধরনের পাপ এসে যায়। ইহরাম অবস্থায় যখন অনেক বৈধ কাজও [যথা– শিকার করা ইত্যাদি] নাজায়েজ হয়ে যায়, তাহলে তখন বড় হোক বা ছোট হোক, কোনো পাপের অবকাশ থাকবে কি করে? সুতরাং বিষয়টির উল্লেখ শুধু দৃঢ়তা প্রদানের জন্য।

قَوْلُهُ وَلَا جِدَالَ : جِدَالٌ তার ব্যাপক বিস্তৃত অর্থে। মারামারি, ধরাধরি, হাতাহাতি, কলহ এমনকি বাকবিতণ্ডা যা সাধারণত গৌরব ও গর্ব-প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে হয়েই থাকে, সবকিছু ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ।

হজের সময় সারা বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অধিবাসীরা এক দুর্নিবার আকর্ষণে ছুটে আসে। এখানে সমবেত হয় সব শ্রেণির, সব বয়সের এবং হরেক পেশার ও হরেক মেজাজের লোক। বৃদ্ধ-যুবক, শিশু-কিশোর যেমন থাকে, তেমনি থাকে তেজস্বী গরম মেজাজের লোক। অস্থির প্রকৃতির, লোভী, সুবিধাবাদী ও আবার সুন্দরী তন্বী তরুণীও। সেই সাথে রয়েছে বিভিন্ন কষ্ট ও সমস্যা, পথে ঘাটে চলাচলের ক্ষেত্রে ও বাসস্থানে সর্বত্র এক দুর্বিসহ অবস্থা। পরম সহিষ্ণু ব্যক্তিও এ সময় ধৈর্যের বাঁধন হারিয়ে ফেলেন। ঈর্ষা-বিদ্বেষ, মুনাফিকী-স্বার্থপরতা, কুদৃষ্টি, কুকর্ম ও ঝগড়াঝাটি, কলহ-বিবাদের সম্ভাবনা থাকে কদমে কদমে। মহাপ্রজ্ঞাময়ের প্রজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি মানুষের অশ্লীলতা ও বেআইনী (فُسُوْق ও رَفَث) কাজের সাথে সাথে স্পষ্ট করে ঝগড়াঝাটির নিষিদ্ধতা উল্লেখ করে দুর্বল বান্দাদের জন্য কত উত্তম ব্যবস্থা দিয়েছেন।

বিষয়াভিজ্ঞ গবেষকগণ একথাও বলেছেন যে, আয়াতাংশের শেষে যে সর্বনাম অর্থাৎ فِيْهِ [তাতে] না বলে প্রত্যক্ষ উল্লেখ করে فِى الْحَجِّ [হজের মধ্যে] বলেছেন, তাও এর দৃঢ়তা প্রকাশ ও হজের মাহাত্ম্য বিধানের লক্ষ্যে। সর্বনাম স্থলে প্রকাশ্য বিশেষ্য ব্যবহার বিষয়টির মর্যাদার প্রতি পূর্ণ গুরুত্ব প্রদান বুঝাবার লক্ষ্যে। কেননা বায়তুল্লাহর জেয়ারত এবং তার মাধ্যমে নৈকট্য লাভ করার আবশ্যকীয় কাজ হলো সেসব গর্হিত কাজ বর্জন করা। –[হাশিয়ায়ে জামাল, তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ فِى الْحَجِّ : اَىْ فِىْ اَيَّامِهِ অথাৎ এখানে হজ বলে হজের দিনসমূহ বুঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِفَتْحِ الْاَوَّلَيْنِ : এর দ্বারা কেরাতের বিভিন্নতা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। لَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ -এর মঝে মূলত চারটি কেরাত রয়েছে, কিন্তু মুফাসসির (র.) তন্মধ্য হতে দুটি কেরাতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আর সম্ভবত মুফাসসির (র.)-এর সামনে তখন ঐ নোসখাটি ছিল যার মধ্যে তিনটির উপর পেশ ছিল। এজন্যই তিনি বলেছেন, অপর এক কেরাতে প্রথম দুটি শব্দ অর্থাৎ رَفَثْ ও فُسُوْق -এ ফাতহ সহকারে পঠিত রয়েছে এবং جِدَالٌ -এর মাঝে পেশ-ই রয়েছে।

চারটি কেরাত নিম্নরূপ– ১. তিনটির মধ্যে نَصَبْ ২. তিনটির মধ্যে رَفْع ৩. প্রথম দুটির মধ্যে نَصَبْ এবং তৃতীয়টির মধ্যে رَفْعْ ৪. প্রথম দুটির মধ্যে رَفْع এবং তৃতীয়টির মধ্যে نَصَبْ।

قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ فِى الثَّلٰثَةِ النَّهْىُ : এখানে নিম্নোক্ত উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন: আয়াতে বর্ণিত لَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ এ তিনটি শব্দই نَفْىٌ -এর সীগাহ। এতে খবর দেওয়া হয়েছে যে, হজের মধ্যে অশ্লীলতা, পাপাচার ও কলহ-বিবাদ নেই, অথচ তিনটি বস্তুই হজের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

উত্তর: এখানে نَفِىْ দ্বারা نَهِىْ উদ্দেশ্য। اَىْ لَا تَرْفُثُوْا وَلَا تَفْسُقُوْا وَلَا تُجَادِلُوْا فِى الْحَجِّ অর্থাৎ হজের মধ্যে উক্ত তিনটি বস্তু করো না।

প্রশ্ন: এখন আরেকটি প্রশ্ন জাগতে পারে, نَهِىْ -কে نَفِىْ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণ কি?

উত্তর: মূলত نَهِىْ -এর মাঝে মোবালাগা বা অতিশয়োক্তি বুঝানো উদ্দেশ্য এবং এদিকে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, উক্ত বিষয়গুলো হজের মধ্যে কিছুতেই হওয়া উচিত নয়। মোটকথা, আয়াত বাহ্যত خَبَرِيَّةٌ [সংবাদসূচক] হলেও এর মর্ম نَهِىْ [নিষেধাজ্ঞা]-এর; বরং দৃঢ়তার সাথে নিষেধাজ্ঞার লক্ষ্যেই এর রূপধারা পরিবর্তিত। অর্থাৎ এসব বিষয়ের নিষেধাজ্ঞা চূড়ান্ত।

قَوْلُهُ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ : হজের সময় অশ্লীল কাজকর্ম তথা পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ প্রদানের পর আল্লাহ তা'আলা এখানে সৎ আমল করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। আর সৎ আমল এভাবে করবে যে, মন্দকথার বদলে উত্তম কথা বলবে, ঝগড়া-ঝাটির বদলে সদাচারপূর্ণ আচরণ করবে এবং গুনাহের বদলে তাকওয়া অবলম্বন করবে।

وَنَزَلَ فِى اَهْلِ الْيَمَنِ وَكَانُوا يَحُجُّوْنَ بِلَا زَادٍ فَيَكُوْنُوْنَ كَلًّا عَلَى النَّاسِ وَتَزَوَّدُوا مَا يُبَلِّغُكُمْ لِسَفَرِكُمْ فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى مَا يُتَّقٰى بِهٖ سُؤَالُ النَّاسِ وَغَيْرِهٖ وَاتَّقُوْنِ يٰاُولِى الْاَلْبَابِ ذَوِى الْعُقُوْلِ.

অনুবাদ : ইয়েমেনবাসীগণ কোনোরূপ পাথেয় না নিয়েই হজ করতে বের হয়ে যেত। ফলে তারা [খরচাদির বিষয়ে] মানুষের উপর বোঝা হয়ে দাঁড়াত। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন– তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা কর যা দ্বারা তোমরা তোমাদের সফর সম্পন্ন করতে পার। নিশ্চয় তাকওয়াই শ্রেষ্ঠ পাথেয় যা দ্বারা মানুষের নিকট যাচনা ইত্যাদি হতে বেঁচে থাকা যায়। হে বোধশক্তি সম্পন্নগণ! জ্ঞান ও বুদ্ধির অধিকারীগণ। তোমরা আমাকে ভয় কর।

তাহকীক ও তারকীব

كَانُوا يَحُجُّوْنَ : তারা হজ করত। زَادٌ : পাথেয়, পথের খরচ। كَلًّا : বোঝা, চাপ। تَزَوَّدُوْا : তোমরা পাথেয় গ্রহণ কর। مَا يُبَلِّغُكُمْ لِسَفَرِكُمْ : যা দ্বারা তোমাদের সফরের জন্য যথেষ্ট হবে। مَا يُتَّقٰى بِهٖ : যা দ্বারা বেঁচে থাকা যায়

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَنَزَلَ فِى اَهْلِ الْيَمَنِ الخ শানে নুযূল : উক্ত আয়াতের মর্ম উপলব্ধি করার জন্য জাহিলি যুগের হজযাত্রীদের মন-মানসিকতার অভিজ্ঞতা পূর্বশর্ত। তাই মুসান্নিফ (র.) শুরুতে আয়াতের শানে নুযূলের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আরব জাহেলিয়াতের ইতিহাস লক্ষণীয়। এমনকি আজকের যুগেও ভারতবর্ষে এমন অনেক সম্প্রদায় রয়েছে যারা তীর্থযাত্রাকালে অর্থশূন্য হাতে বের হওয়াকে আধ্যাত্মিকতার শেষ মার্গ মনে করে থাকে। ওরা পথে পথে ভিক্ষার হাত বাড়াবে, অন্য কারো গলগ্রহ হয়ে উদরপূর্তি করবে আর নিজের সন্ন্যাসী ফকির হওয়াতে গর্ববোধ করবে। ইসলাম এ ধরনের কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ করে হুকুম দিয়েছে, হজ ও জেয়ারতের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় প্রয়োজনীয় অর্থসমগ্রী সঙ্গে নিয়ে যাবে। অপরের গলগ্রহ হওয়ার মনোবৃত্তি ত্যাগ করতে হবে। জাহিলি আরব যুগে এ ব্যাধি ছিল আরো বিস্তৃত। কোনো কোনো গোত্রে তো এরূপ বাড়াবাড়ি ছিল যে, ইহরামের ব্যবস্থা করার পরে যা কিছু সামগ্রী থাকত তা তারা ছুড়ে ফেলে দিত। তারা পাথেয় সঙ্গে না নিয়ে হজে যেত। এমনকি অনেকে ইহরাম বাঁধার পর তার অবশিষ্ট অর্থসামগ্রী ছুঁড়ে ফেলে দিত। ইয়েমেনবাসীদের নিয়ম ছিল, তারা হজে যাওয়ার সময় পাথেয় নিত না। তারা বলত, আমরা আল্লাহর উপর ভরসাকারী। ওদিকে মক্কায় পৌছে তারা ভিক্ষায় নেমে যেত। আরবের এক শ্রেণির লোক পথখরচ সঙ্গে না নিয়ে হজে যেত। কেউ কেউ এমনও বলত, আল্লাহর ঘরে হজে যাওয়া হবে আর তিনি আমাদের খাওয়াবেন না, তা কি করে হয়! পরে তারা মানুষের দুয়ারে দুয়ারে দারিদ্র্যের বোঝা নিয়ে রাত যাপন করত। এ ধরনের কুসংস্কার, যা মিথ্যা অহমিকা ও প্রদর্শনীমূলক আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে সৃষ্ট এবং সেই সাথে যা একদিকে স্বনির্ভরতা ও আত্মমর্যাদাবোধের পরিপন্থি এবং অন্যদিকে আর্থসমাজিক ক্ষেত্রে যা অহেতুক বোঝা ও সমস্যা, ইসলামের মতো বাস্তববাদী ও গতিশীল ধর্ম এ ধরনের কুপ্রথা ও কুরীতি কি করে অনুমোদন করতে পারে? –[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهٗ فَيَكُوْنُوْنَ كَلًّا عَلَى النَّاسِ : তারা বলত আমরা তাওয়াক্কুলকারী। আমরা আমাদের রবের ঘরে হজ করতে এসেছি, তিনি কি আমাদেরকে আহার দেবেন না। কিন্তু মক্কায় এসে তারা মানুষের কাছে হাত ছড়িয়ে দিত। এমনকি তা চুরি ডাকাতির পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াত। –[হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১, পৃ. ২৩৯]

مَا يُبَلِّغُكُمْ : এটি উহ্য মাফউল।

অনুবাদ :

١٩٨. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِىْ اَنْ تَبْتَغُوْا تَطْلُبُوْا فَضْلًا رِزْقًا مِّنْ رَبِّكُمْ بِالتِّجَارَةِ فِى الْحَجِّ نَزَلَ رَدًّا لِكَرَاهَتِهِمْ ذٰلِكَ فَاِذَا اَفَضْتُمْ دَفَعْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ بَعْدَ الْوُقُوْفِ بِهَا فَاذْكُرُوا اللّٰهَ بَعْدَ الْمَبِيْتِ بِمُزْدَلِفَةَ بِالتَّلْبِيَةِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالدُّعَاءِ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ هُوَ جَبَلٌ فِىْ اٰخِرِ الْمُزْدَلِفَةِ يُقَالُ لَهُ قُزَحُ وَفِى الْحَدِيْثِ اَنَّهُ ﷺ وَقَفَ بِهِ يَذْكُرُ اللّٰهَ وَيَدْعُوْ حَتّٰى اَسْفَرَ جِدًّا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰكُمْ لِمَعَالِمِ دِيْنِهِ وَمَنَاسِكِ حَجِّهِ وَالْكَافُ لِلتَّعْلِيْلِ وَاِنْ مُخَفَّفَةٌ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ قَبْلَ هُدَاهُ لَمِنَ الضَّالِّيْنَ .

১৯৮. হজের সময় ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ তাঁর নিকট হতে জীবিকা চাইতে সন্ধান করতে তোমাদের কোনো পাপ নেই।

কেউ কেউ এটাকে [হজের সময় উপার্জন করাকে] নিন্দনীয় মনে করত বিধায় তাদের প্রত্যুত্তরে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেন। যখন তোমরা আরাফা হতে সেখানে উকূফ বা অবস্থান করার পর চলে আসবে দ্রুত প্রত্যাবর্তন করবে তখন মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করার পর তালবিয়া অর্থাৎ লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা...., .তাহলীল অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ.... এবং দোয়া পাঠ করার মাধ্যমে মাশআরুল হারামের নিকট আল্লাহকে স্মরণ করবে। 'মাশআরুল হারাম' মুযদালিফার শেষ প্রান্তরে অবস্থিত একটি পাহাড়। এটাকে 'কুযাহ'ও বলা হয়ে থাকে। হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ স্থানে উকূফ [অবস্থান] করেছিলেন এবং [রাত্রি] অতি ফর্সা না হওয়া পর্যন্ত সে স্থানে দোয়া ও জিকির করেন। -[মুসলিম শরীফ]

এবং তাঁকে স্মরণ করবে কেননা, তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাদি এবং হজের বিধিবিধানের হেদায়েত করেছেন। كَمَا هَدٰكُمْ -এর كَاف অক্ষরটি تَعْلِيْلَة বা হেতুবোধক। ان كنتم -এর ان শব্দটি এ স্থানে مُثَقَّلَة [রূঢ় রূপ, তাশদীদসহ] হতে مُخَفَّفَةٌ [লঘু বা তাশদীদহীন] রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। নিশ্চয় এর পূর্বে তাঁর হেদায়েত ও পথ প্রদর্শনের পূর্বে তোমরা বিভ্রান্তদের মধ্যে ছিলে।

١٩٩. ثُمَّ اَفِيْضُوْا يَا قُرَيْشُ مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ اَىْ مِنْ عَرَفَةَ بِاَنْ تَقِفُوْا بِهَا مَعَهُمْ وَكَانُوْا يَقِفُوْنَ بِالْمُزْدَلِفَةِ تَرَفُّعًا عَنِ الْوُقُوْفِ مَعَهُمْ وَثُمَّ لِلتَّرْتِيْبِ فِى الذِّكْرِ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ مِنْ ذُنُوْبِكُمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمٌ بِهِمْ .

১৯৯. অতঃপর হে কুরাইশ সম্প্রদায়! অন্যান্য লোক যে স্থান হতে দ্রুতগতিতে প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সেই স্থান হতে আরাফার ময়দান হতে দ্রুতগতিতে প্রত্যাবর্তন কর। অর্থাৎ অন্যান্য লোকদের সাথে তোমরাও সেই স্থানে উকূফ [অবস্থান] কর। কুরাইশরা অহংকারবশত অন্যান্য লোকদের সাথে আরাফার ময়দানে উকূফ করত না। মুযদালিফায় উকূফ করে চলে আসত। তাই আল্লাহ তা'আলা এ স্থানে কুরাইশদের এরূপ নির্দেশ দিয়েছেন। এ আয়াতে ثُمَّ শব্দটি কেবলমাত্র বর্ণনানুক্রম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। আর আল্লাহর নিকট তোমাদের পাপসমূহের ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের প্রতি ক্ষমাশীল, তাদের প্রতি পরম দয়ালু।

তাহকীক ও তারকীব

فَاِذَا اَفَضْتُمْ : যখন তোমরা দ্রুত প্রত্যাবর্তন করবে। اَفَضْتُمْ শব্দটি فَاضَ الْمَاءُ থেকে নির্গত। অর্থ– পানি খুব প্রবল বেগে প্রবাহিত হওয়া। হাজী সাহেবগণ যেহেতু আরাফা থেকে দ্রুত প্রত্যাবর্তন করে তাই তাকে পানি প্রবাহিত হওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। اَلْوُقُوْفُ : অবস্থান করা। اَلْمَبِيْتُ : রাত্রি যাপন করা। حَتّٰى اَسْفَرَ جِدًّا : অতি ফর্সা না হওয়া পর্যন্ত। اَفِيْضُوْا : তোমরা দ্রুত গতিতে প্রত্যাবর্তন কর। بِاَنْ تَقِفُوْا بِهَا : তোমরা তাদের সাথে অবস্থান কর। تَرَفُّعًا : অহংকারশত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا শানে নুযূল : প্রাচীন আরবের জাহিলি চিন্তাধারার অন্যতম একটি এও ছিল যে, হজের সফরে জীবিকা উপার্জনকে তারা খারাপ মনে করত। পবিত্র কুরআন স্পষ্ট ভাষায় এ ভ্রান্তি অপনোদন করে দিল।

ইসলামে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টির সফলতা রয়েছে : বস্তুত ইসলাম যেভাবে মানুষের পরকালীন সাফল্যের নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে, তদ্রূপ ইহকালীন সাফল্যও তার আহ্বানে সাড়া দেওয়ার ফলাফলের অন্তর্ভুক্ত। ইসলামের এই ইহ-পরকালের সমন্বয় ঘটেছে তার নির্ধারিত প্রতিটি ইবাদতে। অজু, সালাত, সালাতের জামাত, সিয়াম, জাকাত ইত্যাদি সব ইবাদতই আত্মাকে সমুজ্জ্বল করা এবং অভ্যন্তরকে পরিচ্ছন্ন করার সাথে সাথে পার্থিব, দৈহিক, বস্তুতান্ত্রিক ও আর্থসামাজিক উপকারিতা ও কল্যাণে পরিপূর্ণ। হজের ক্ষেত্রেও এ মূলনীতি পুরোপুরি কার্যকর। হজের সুদীর্ঘ সফর, জল, স্থল ও বিমান পথে বন্দরের পর বন্দর ও দেশের পর দেশ অতিক্রম করা, উম্মতের বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার লোকদের পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগমন করে এ বিশাল মহাসম্মিলনে সমবেত হওয়া শুধু [ভ্রমণ বা] একটু 'শুকনো ইবাদত' ও কতক্ষণ আল্লাহকে স্মরণ করার মধ্যে সীমিত নয়। ব্যক্তি ও জাতি উভয়ের জন্য এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক সব ধরনের কল্যাণ এটা দিয়ে হাসিল করা যেতে পারে এবং তা করাই বাঞ্ছনীয়।

قَوْلُهُ فَضْلًا : এক্ষেত্রে মানুষের বিরূপ ধারণা ও মন্তব্যে এত বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল যে, কোনো ব্যবসায়ী তার ব্যবসার মালপত্র নিয়ে মক্কা ও মিনার বাজারে উপস্থিত হলে কিংবা কোনো উটের মালিক তার উট আরাফা, মুযদালিফা ও মিনার বাজারে নিয়ে গেলে মনে করা হতো যে, তার হজই আদায় হয়নি এবং যদি ব্যবসাই করা হলো, তবে আর ইবাদত রইল কোথায়? পবিত্র কুরআন স্পষ্ট ভাষায় এ ভ্রান্তি অপনোদন করে দিল। –[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ نَزَلَ رَدًّا لِكَرَاهَتِهِمْ ذٰلِكَ : অর্থাৎ হজের সময় ব্যবসা করাতে কোনো সমস্যা নেই। আয়াতের মাঝে ব্যবসাকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধও করা হয়নি এবং তার প্রতি উৎসাহিতও করা হয়নি; বরং অন্যান্য জায়েজ কাজের মতো এটাও একটি জায়েজ কাজ। তবে এখলাসের পরিপন্থি হওয়া না হওয়ার মাপকাঠি হলো নিয়ত। যদি ব্যবসাই প্রধান ব্যাপার হয়ে থাকে, তাহলে ফরজ আদায় হয়ে যাবে; কিন্তু খালেসভাবে হজকারীর সমপরিমাণ ছওয়াব হবে না। আর যদি উভয়টি সমান সমান হয়, তাহলে খারাপ ভালো কোনোটারই অধিকারী নয়। আর যদি হজই মুখ্য হয়ে থাকে এবং ব্যবসাটি হজের অনুগামী হয়, তাহলে ইখলাসের পরিপন্থি হবে না; বরং যদি ব্যবসার লাভের দ্বারা হজের আমলে সহযোগিতা পাওয়া যায়, তাহলে তো অতিরিক্ত ছওয়াব মিলবে। আর এর ফলে হজ পালনকারী দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টির কল্যাণ হাসিল করল।

–[সাবী খ. ১, পৃ. ১২৩, কামালাইন খ. ২, পৃ. ৭৩]

قَوْلُهُ فَاِذَا اَفَضْتُمْ : اِفَاضَةٌ-এর শাব্দিক অর্থ– দলে দলে চলা বা প্রত্যাবর্তন করা। ফিকহের পরিভাষায় اِفَاضَةٌ বলা হয় আরাফা থেকে মুযদালিফায় গমনকে। আরাফায় হলো মক্কা মোয়ায্যামা ও তায়েফগামী পূর্বমুখী সড়কে মক্কা থেকে প্রায় ১০/১২ মাইল দূরত্বে অবস্থিত কয়েক বর্গমাইলের প্রশস্ত ও উন্মুক্ত একটি প্রান্তর। প্রান্তবর্তী আরাফায় নামক একটি ছোট পাহাড় থেকে এ নামের উৎপত্তি।

مَشْعَرُ الْحَرَامِ : مَشْعَرٌ শব্দের অর্থ– আলামত, চিহ্ন, প্রতীক আর اَلْحَرَامُ অর্থ– সম্মানিত ও পবিত্র। এটি সম্মানসূচক বিশেষণ। এটি মুযদালিফার দুই ক্ষুদ্র পাহাড়ের মধ্যবর্তী বিশেষ স্থানটির [উপত্যকার] নাম। অবশ্য সমগ্র মুযদালিফাকেও 'আল মাশআরুল হারাম' বলা হয়। বিদ্বান সমাজে এতে দ্বিমত নেই যে, 'আল মাশআরুল হারাম' দ্বারা মুযদালিফাকেই বুঝানো হয়। প্রসিদ্ধ মতে সমগ্র মুযদালিফা-ই আল মাশআর। মুযদালিফা হচ্ছে মক্কা শরীফ থেকে ৬ মাইলের দূরত্বে। মিনা থেকে আরাফায় যাওয়ার জন্য রয়েছে একটি সোজা পথ। হাজীগণ ৯ তারিখে সে পথেই গিয়ে থাকেন। ফিরে আসার সময় বিকল্প পথ ধরে আসার হুকুম রয়েছে। একটু ঘুরে অন্য পথে আসলেই পথে পড়বে মুযদালিফা। হাজীদের সব কাফেলা ১০ তারিখের প্রথমাংশে [চাঁদের হিসাব অনুযায়ী রাত আগে দিন পরে হওয়ার ভিত্তিতে] এখানে পৌঁছে যায় এবং তাসবীহ-তাহলীল, যিকির-আযকার, সালাত-ইসতিগফার করে এখানকার রাতটি কাটিয়ে দেয়। এখানে মসজিদ রয়েছে পাহাড়ের উপরে, একটি পাহাড়িকা, যেখানে ইমাম অবস্থান করেন। এটির নাম এ কারণে আল মাশআর যে, এটি ইবাদতের আলামত ও প্রতীক। আর আল হারাম বিশেষণ তার মর্যাদার কারণে। –[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ وَالْكَافُ لِلتَّعْلِيْلِ : অর্থাৎ كَمَا هَدٰكُمْ -এর মাঝে كَافْ বর্ণটি تَشْبِيْه বা উপমা প্রকাশের জন্য নয়, বরং তা تَعْلِيْل -এর জন্য। **اِيَّاكُمْ اَيْ اُذْكُرُوْهُ لِاَجْلِ هِدَايَتِهِ** অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর জিকির করো এজন্য যে, তিনি তোমাদেরকে দীনের আহকাম শিক্ষা দিয়েছেন। –[জামালাইন খ. ১, পৃ. ৩১৬]

قَوْلُهُ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ ..... وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰكُمْ : এখানে একদিকে যেমন নিরবচ্ছিন্নভাবে আল্লাহর স্মরণে লেগে থাকার তাগিদ করা হয়েছে, তদ্রূপ অন্যদিকে এ কথাও দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে, স্মরণ করার পন্থা নিজেদের আবিষ্কৃত হলে চলবে না, তা হতে হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলেরই নির্দেশিত। জিকির-এর হুকুমের পুনরুক্তি তাকিদের জন্য।
–[তাফসীরে মাজেদী]

مُخَفَّفَةٌ : اَيْ مِنَ الثَّقِيْلَةِ وَالْاَصْلُ وَاِنَّكُمْ فَحُذِفَ الْاِسْمُ وَخُفِّفَتْ وَلَزِمَتِ اللَّامُ فِيْ حَذْفِهَا

قَوْلُهُ الضَّالِّيْنَ : [ইবাদত ও আল্লাহর জিকিরের সঠিক পন্থাসমূহের ব্যাপারে।] ضَالٌّ (ضَالِّيْنَ -এর একবচন) সব সময়ই পথাহারা বিভ্রান্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়; অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ অর্থেও ব্যবহৃত হয় এবং ضَلَالٌ দ্বারা আল্লাহর বিধানসমূহ সম্পর্কে অজ্ঞতা অর্থ হতে পারে। আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র.) বলেন, [اَلضَّلَالُ ضَرْبَانِ ضَلَالٌ فِى الْعُلُوْمِ النَّظَرِيَّةِ وَضَلَالٌ فِىْ الْعُلُوْمِ الْعَمَلِيَّةِ كَمَعْرِفَةِ الْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِىْ هِىَ الْعِبَادَاتُ– (رَاغِبْ) অর্থাৎ اَلضَّلَالُ দু প্রকার : ১. তথ্যগত ও তাত্ত্বিক জ্ঞানে ভ্রান্ত অজ্ঞতা ২. প্রায়োগিক [প্র্যাকটিকাল] জ্ঞানে অজ্ঞতা। যেমন শরিয়তের বিধিমালা অর্থাৎ ইবাদতের ক্ষেত্রে এখানে এ দ্বিতীয় অর্থ উদ্দেশ্য। –[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ : কুরাইশের মনগড়া ধ্যানধারণাগুলোর একটি ছিল এরূপ যে, হজের সময় আমাদের আরাফায় যাওয়া কেন? সবার [সাধারণ মানুষের] সঙ্গে সেখানে যাওয়া আমাদের আভিজাত্যের পরিপন্থি। আমাদের জন্য মুযদালিফায় যাওয়াই যথেষ্ট। কুরাইশ ও তাদের অনুগামীরা মুযদালিফায় উকূফ [অবস্থান] করত, তারা, নিজেদের اَلْحُمْسُ বীররক্ষী [সম্ভবত কা'বা শরীফের রক্ষী] নামে অভিহিত করত। অন্যান্য আরবরা আরাফায় উকূফ করত। কুরাইশ এবং অন্য যারা তাদের ধর্ম অনুসারী ছিল, অর্থাৎ اَلْحُمْسُ সম্প্রদায় মুযদালিফায় অবস্থান করত এবং বলত যে, আমরা তো আল্লাহর হেরেমের বাসিন্দা-খোদায়ী খিদমতগার। তারা বলত, আমরা হেরেমের বাইরে যাব না। [উল্লেখ্য আরাফায় হেরেম পরিসীমার বাইরে।] সুতরাং তারা সাধারণ জনতার সাথে আরাফায় অবস্থান পছন্দ করত না। তারা বলত, আমরা হেরেমের বাসিন্দা, হেরেমরক্ষী। আমাদের জন্য সমীচীন শুধু হেরেমকে শ্রদ্ধা করা; আমরা হিল্ল [হেরেমের বাইরের স্থান] -কে সম্মান দেখাতে পারি না। এ আয়াত এদেরই সংস্কারের লক্ষ্যে। اَلنَّاسُ দ্বারা মানবজাতি উদ্দেশ্য।
–[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ وَثُمَّ لِلتَّرْتِيْبِ فِى الذِّكْرِ : ثُمَّ এখানে সময়ের বিলম্ব বা কর্ম সম্পাদনের সময় বিন্যাসের ক্রমিকতা বুঝাবার জন্য নয়, বরং বক্তব্যে বিচ্ছিন্নতা বুঝাবার জন্য। অর্থাৎ একটি কথা শেষ হলো, এখন দ্বিতীয় নিদেশ শোন।

বস্তুত এর দ্বারা একটি আপত্তির নিরসন করা হয়েছে। তা হলো- ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ -এর মাঝে ثُمَّ ব্যবহার দ্বারা বোঝা যায় যে, কুরাইশদেরকে প্রদত্ত আরাফায় অবস্থান করার নির্দেশটি হলো লোকজন আরাফা থেকে ফিরে মিনায় পৌঁছার পর। অথচ বাস্তবে ব্যাপারটি এমন নয়। কেননা বিধান হলো সকলে عَرَفَاتٌ থেকে একই সময় রওয়ানা হবে। তাই মুফাসসির (র.) উপরিউক্ত ইবারতে জবাব দিয়েছেন। আরও একটি জবাব এভাবে দেওয়া হয় যে, বাক্যের মাঝে تَقْدِيْم تَاخِيْر হয়েছে। সুতরাং ثُمَّ اَفِيْضُوْا অংশটি পূর্বের وَاتَّقُوْنِ -এর সাথে مَعْطُوْف হবে আর فَاِذَا اَفَضْتُمْ তার সাথে সম্পৃক্ত হবে। তখন সাধারণভাবে সকল মানুষই তার মোখাতাব হবে। -[হাশিয়ায়ে সাবী খ. ১, পৃ. ১২৩]

قَوْلُهُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ : যেহেতু সে পবিত্র স্থানটি হলো আল্লাহর রহমত অবতরণের অন্যতম স্থান এবং দোয়া কবুলের বিশেষ জায়গা তাই এখানে ইস্তিগফারের কথা বলা হয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, কোনো দিন এমন নেই, যে দিন আরাফা দিবসের চেয়ে অধিক সংখ্যক বান্দাকে দোজখ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।

হজ : আদ্যপান্ত আত্মার পরিশুদ্ধির অপূর্ব ব্যবস্থা : হজের বর্ণনার শুরু থেকে লক্ষ্য করুন। আত্মার পরিশুদ্ধির ব্যাপারে একটু পরপর কি পরিমাণ গুরুত্ব প্রকাশ করা হয়েছে। হেরেম শরীফ বরং হেরেমের চৌহদ্দি যখন অনেক মনজিল দূরে, তখন থেকেই সারা জীবনের পরিচিত ও অভ্যস্ত পোশাক শরীর থেকে খুলে ফেলা হলো। এখন মাথায় টুপি নেই, কোনো পাগড়ি-পট্টিও নেই, শেরওয়ানি-সদরিয়া-কোট নেই, জামা-জুব্বা নেই, বাদশাহ ও ফকির, শাসক ও জনতা সকলেই দুই কাপড়ে এক লেবাসে। আর এ ইহরাম পরার সাথে সাথে সব সময়ের হারাম বিষয়গুলোর কথা তো বলাই বাহুল্য, এ তালিকায় আরো সংযুক্ত হলো এমন অনেক বিষয়, যা ইতঃপূর্বে হালাল ছিল এবং সাধারণত সেগুলো হালাল। এগুলো এক দীর্ঘ সময়ের জন্য নিষিদ্ধ হয়ে গেল। কতই পছন্দনীয়, আকর্ষণীয়, কতই অভ্যস্ত বিষয় হাতের নাগালে থাকা ও সহজলভ্য হওয়া সত্ত্বেও এ সময় বর্জন করতে হচ্ছেন। এতসব করেও মন ভরেনি। মুহুর্মুহু লাব্বাইক ধ্বনি উচ্চারণ করতে থাক। হাজির! বান্দা হাজির!! শ্লোগানে আকাশ-বাতাস, পাহাড়-টিলা গুঞ্জরিত করতে থাক। অবিরাম আল্লাহর জিকির করতে থাক। এখন শেষ প্রান্তের কাছাকাটি এসে হুকুম পাওয়া গেল ভুল-ভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতি, কুকর্ম-কুকীর্তিগুলো স্মরণ করে সেগুলোর জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করতে থাক।.........এত পূত-পবিত্র, এত পরিচ্ছন্ন এবং এত পরিশুদ্ধ সম্মিলনের সঙ্গে বিশ্বজগতের অন্য কোনো আনন্দ মেলা, অলীক ধ্যান-ধারণাপ্রসূত, কুসংস্কারমণ্ডিত, কাম স্বার্থতাড়িত মেলা অনুষ্ঠান, উৎসব আয়োজনের কোনোও তুলনা হতে পারে কি? বাস্তবতার চোখে ঠুলি পরে থাকলে কি আর করা! ইসলামকে অন্যান্য ধর্ম মতবাদের সমপর্যায়ে রেখে বিচার বিশ্লেষণকারী বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের বিদ্যা ও বুদ্ধির উপর এবং চোখ, কান, ও মেধার উপর কি জঘন্য অনাচারই না করে চলছে। -[তাফসীরে মাজেদী]

অনুবাদ :

২০০. فَاِذَا قَضَيْتُمْ اَدَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ عِبَادَاتِ حَجِّكُمْ بِاَنْ رَمَيْتُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَحَلَقْتُمْ وَطُفْتُمْ وَاسْتَقْرَرْتُمْ بِمِنًى فَاذْكُرُوا اللّٰهَ بِالتَّكْبِيْرِ وَالثَّنَاءِ كَذِكْرِكُمْ اٰبَاءَكُمْ كَمَا كُنْتُمْ تَذْكُرُوْنَهُمْ عِنْدَ فَرَاغِ حَجِّكُمْ بِالْمُفَاخَرَةِ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا مِنْ ذِكْرِكُمْ اِيَّاهُمْ وَنَصَبَ اَشَدَّ عَلَى الْحَالِ مِنْ ذِكْرِ الْمَنْصُوْبِ بِاُذْكُرُوْا اِذْ لَوْ تَأَخَّرَ عَنْهُ لَكَانَ صِفَةً لَهُ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَا اٰتِنَا نَصِيْبَنَا فِى الدُّنْيَا فَيُؤْتَاهُ فِيْهَا وَمَا لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ نَصِيْبٍ ـ

২০০. অতঃপর যখন তোমরা অনুষ্ঠানাদি অর্থাৎ হজের ইবাদতসমূহ সম্পন্ন করবে সামাধা করবে; অর্থাৎ যখন জামরা আকাবা, মস্তক মুণ্ডন, তাওয়াফ, মিনায় অবস্থান করে ফেলবে তখন তাকবীর ও ছানার [প্রশংসা করার] মাধ্যমে আল্লাহকে এমনভাবে স্মরণ করবে যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষকে স্মরণ করতে হজ সমাপন করার পর যেমন গর্ব সহকারে তোমরা তাদের আলোচনা করতে; অথবা তোমরা তাদের যে আলোচনা করতে তদপেক্ষা গভীরভাবে। اَشَدَّ এটা اُذْكُرُوْا ক্রিয়াপদের মাধ্যমে مَنْصُوْب রূপে ব্যবহৃত ذِكْرًا হতে حَالْ বা ভাববাচক পদ রূপে مَنْصُوْب হয়েছে। اَشَدَّ শব্দটি যদি ذِكْرًا-এর পর উল্লেখ হতো, তবে এটা তার صِفَةٌ বা বিশেষণ রূপে গণ্য হতো। মানুষের মধ্যে অনেকে বলে, হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে ইহকালেই আমাদের হিস্যা দিয়ে দাও। অনন্তর ইহকালে তাদেরকে তা দিয়ে দেওয়া হয়। আর পরকালে তাদের কোনো কিছুই অংশ নেই।

২০১. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً نِعْمَةً وَفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً هِىَ الْجَنَّةُ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ بِعَدَمِ دُخُوْلِهَا وَهٰذَا بَيَانٌ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُوْنَ وَلِحَالِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْقَصْدُ بِهِ الْحَثُّ عَلٰى طَلَبِ خَيْرِى الدَّارَيْنِ كَمَا وَعَدَ بِالثَّوَابِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ ـ

২০১. এবং তাদের মধ্যে অনেকে বলে, হে প্রভু! আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ নিয়ামত দাও এবং পরকালেও কল্যাণ জান্নাত দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুনের আজাব হতে তাতে প্রবেশ না করিয়ে রক্ষা কর। এ স্থানে মুশরিক এবং মু'মিনগণের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, উভয় জাহানের মঙ্গলার্থে দোয়া করায় উৎসাহ প্রদান করা। পরবর্তী আয়াতটিতে তিনি এর পুণ্যফল দানের ওয়াদা করেছেন। ইরশাদ করেন–

২০২. اُولٰئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ ثَوَابٌ مِنْ اَجْلِ مَا كَسَبُوْا عَمِلُوْا مِنَ الْحَجِّ وَالدُّعَاءِ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ يُحَاسِبُ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ فِىْ قَدْرِ نِصْفِ نَهَارٍ مِنْ اَيَّامِ الدُّنْيَا لِحَدِيْثٍ بِذٰلِكَ ـ

২০২. যা তারা অর্জন করেছে হজ ও দোয়ার যে আমল তারা করেছে তা দ্বারা তার প্রাপ্য অংশ অর্থাৎ পুণ্যফল তাদেরই। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা হিসাব গ্রহণে অতি দ্রুত। হাদীসে আছে, দুনিয়ার দিনের অর্ধ দিন পরিমাণ সময়ের মধ্যে তিনি সমস্ত সৃষ্টির হিসাব সমাধা করে ফেলবেন।

তাহকীক ও তারকীব

اَلْمَفَاخِرَةُ : مَفْخَرَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ- গর্ব, গৌরব গাথা يُؤْتَاهُ : তাকে প্রদান করা হয়। خَلَاقٌ : অংশ, হিসসা।

قِنَا : আমাদের রক্ষা করুন। وَقَى يَقِيْ (ض) وِقَايَةً অর্থ- রক্ষা করা। اَلْحَثُّ : উদ্বুদ্ধ করা।

وَعْد : ওয়াদা করা হয়েছে। يُحَاسِبُ : হিসাব গ্রহণ করবেন। اَلْخَلْقُ : মাখলুক।

قَوْلُهُ كَذِكْرِكُمْ اٰبَاءَكُمْ : এখানে ذِكْرُ মাসদার كُمْ ফায়েল -এর দিকে **ইজাফত হয়েছে।** اٰبَائَكُمْ হলো তার মাফউল।

قَوْلُهُ أَوْ : কেউ বলেন- أَوْ হলো بَلْ -এর অর্থে। আর কেউ বলেন- وَاوْ -**এর অর্থে** ، أَيْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا

قَوْلُهُ مَنْ ذِكْرِكُمْ اِيَّاهُمْ : এ ইবারতটুকু হলো مُفَضَّلٌ عَلَيْهِ

قَوْلُهُ وَنَصْبُ اَشَدَّ عَلَى الْحَالِ : এখানে اَشَدَّ -এর মাঝে নসব হওয়ার কারণ **বর্ণনা করা হচ্ছে। আলোচনার** সারকথা হলো, اَشَدُّ ذِكْرًا এটি مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ থেকে حَالٌ হওয়ার কারণে مَنْصُوْبٌ **হয়েছে। আর যদি اَشَدَّ শব্দটি ذِكْرًا থেকে** مُؤَخَّرٌ হতো, তাহলে صِفَةٌ হওয়ার কারণে مَنْصُوْبٌ হতো। مَوْصُوْفٌ نَكِرَةٌ -**এর উপর যখন সিফত মুকাদ্দাম হয়, তখন তা** حَالٌ হয়ে যায়। এখানেও এ সুরতই হয়েছে। -[জামালাইন খ. ১, পৃ. ৩১৭]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযূল : সাম্প্রদায়িক শ্রেষ্ঠত্ব জাতীয় ঐতিহ্য ও গৌরব, গোষ্ঠীর আভিজাত্য যেমন- আধুনিক জাহিলিয়াতের সভ্যতা-সংস্কৃতি (?) মৌলিক উপাদান, তদ্রূপ আরবের জাহিলি ধর্মেও তা ছিল শ্রেষ্ঠ উপাদান । আরবরা মিনায় সমবেত হলে প্রতিটি গোত্র স্বগোত্রের জয়সূচক শ্লোগান দিত, তাদের পূর্বপুরুষের কীর্তিগাথা অলঙ্কারপূর্ণ বর্ণনা দিয়ে মজলিস উত্তপ্ত করত। এখানে তা বর্জন করে আল্লাহর জিকির করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। -[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ فَاِذَا قَضَيْتُمْ اَدَّيْتُمْ : قَضَى -এর ব্যাখ্যায় اَدَّى আনার কারণ হলো قَضَى যখন نَفْس فِعْل -এর সাথে مُعَلَّقٌ হয়, তখন তার অর্থ হয় اَلْاِتْمَامُ وَالْفَرَاغُ - পরিপূর্ণ করা ও অবসর হওয়া। যেমন কুরআনের বাণী- فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ «فُصِّلَتْ : ١٢» আর যখন غَيْرُ فِعْل -এর সাথে مُعَلَّقٌ হয়, তখন অর্থ হয় اَلْاِلْزَامُ - আরোপ করা, চাপিয়ে দেওয়া। যেমন কুরআনের বাণী- وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ আর যখন তা اِعْلَامٌ -এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, তখনও তার অর্থ اِلْزَامٌ হবে। যেমন কুরআনের বাণী- وَقَضَيْنَا اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ اَيْ اَعْلَمْنَاهُمْ আয়াতে প্রথমোক্ত অর্থটি উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ مَنَاسِكَكُمْ : اَلنُّسُكُ [س ও ن] نُسُكًا (ن) نَسَكَ - تَطَوُّعٌ بِقُرْبَةٍ অর্থ- নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে ইবাদত করা। আর [উভয়টিতে পেশ দিয়ে] হলো তার থেকে اِسْمٌ; কুরআনে কারীমে এসেছে- اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ আর اَلْمَنْسَكُ হলো সীনে ফাতহা ও কাসরাসহ কুরবানির সময় বা স্থান। তখন তার অর্থ হবে ইবাদতের স্থান। -[হাশিয়ায়ে জামাল -২৪২]

قَوْلُهُ رَمَيْتُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ : جَمْرَةٌ -এর বহুবচন جَمَرَاتٌ এবং جِمَارٌ উভয়টি আসে। নিক্ষিপ্ত পাথর ও নিক্ষেপের স্থান উভয়টির ক্ষেত্রেই এর ব্যবহার রয়েছে। তাই رَمَيْتُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ -এর অর্থ হলো- তোমরা সেই স্থানের দিকে পাথর নিক্ষেপ করেছ।

قَوْلُهُ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا : তাদের জিকিরের চেয়ে আল্লাহর জিকির বেশি পরিমাণে হবে। কেননা বাপ-দাদার অনুগ্রহ কেবল এইটুকু যে, তারা তোমাদেরকে লালনপালন করেছে; কিন্তু তারা তোমাদের সৃষ্টিকর্তা নয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং এ পরিমাণ নিয়ামতে ধন্য করেছেন, যা তোমরা গণনা করে শেষ করতে পারবে না। সুতরাং এহেন পবিত্রতম স্থানে আল্লাহর নাম স্মরণ করা উচিত। বাপ-দাদাদের আলোচনা অর্থহীন।

-[মা'আরিফুল কুরআন : ইদ্রীস কান্দলভী (র.)]

অনুবাদ :

২০৩. وَاذْكُرُوا اللّٰهَ بِالتَّكْبِيْرِ عِنْدَ رَمْيِ الْجَمَرَاتِ فِيْ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدَاتٍ اَيْ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ الثَّلَاثَةِ فَمَنْ تَعَجَّلَ اَيْ اِسْتَعْجَلَ بِالنَّفَرِ مِنْ مِنًى فِيْ يَوْمَيْنِ اَيْ فِيْ ثَانِيْ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ بَعْدَ رَمْيِ جِمَارِهِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ بِالتَّعْجِيْلِ وَمَنْ تَاَخَّرَ بِهَا حَتّٰى بَاتَ لَيْلَةَ الثَّالِثِ وَرَمٰى جِمَارَهُ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ بِذٰلِكَ اَيْ هُمْ مُخَيَّرُوْنَ فِيْ ذٰلِكَ وَنَفْيُ الْاِثْمِ لِمَنِ اتَّقَى اللّٰهَ فِيْ حَجِّهِ لِاَنَّهُ الْحَاجُّ عَلَى الْحَقِيْقَةِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ فِي الْاٰخِرَةِ فَيُجَازِيْكُمْ بِاَعْمَالِكُمْ .

২০৩. রমীয়ে জিমার বা কঙ্কর নিক্ষেপের সময় তাকবীর পাঠ করে তোমরা নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনগুলোতে অর্থাৎ আইয়ামে তাশরীকের তিন দিন অর্থাৎ ১১, ১২, ১৩ই জিলহজ আল্লাহকে স্মরণ কর। যদি কেউ দুই দিনের ভিতর অর্থাৎ আইয়ামে তাশরীকের দ্বিতীয় দিন রমীয়ে জিমার বা কঙ্কর নিক্ষেপের কাজ সমাধা করার পর মিনা হতে চলে আসর ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করে শীঘ্র করে তবে এই তাড়াতাড়ি করায় তার কোনো পাপ নেই। আর যদি কেউ বিলম্ব করে এমনকি তৃতীয় রাতও সেখানে অতিবাহিত করে এবং রমীয়ে জিমার বা কঙ্কর নিক্ষেপের কাজ সমাধা করে তবে তাতেও তার কোনো পাপ নেই। অর্থাৎ এ বিষয়ে তাদের এখতিয়ার রয়েছে। এই পাপ না হওয়া তার জন্য যে হজের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করে চলেছে। কেননা প্রকৃতপক্ষে এ ব্যক্তিই হজ পালনকারী বলে গণ্য। আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, তোমদেরকে পরকালে তাঁর নিকট একত্র করা হবে। অনন্তর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল দান করবেন।

তাহকীক ও তারকীব

رَمْيٌ : নিক্ষেপ করা। اَلْجَمَرَاتُ : جَمْرَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ- কঙ্কর। تَعَجَّلَ : তাড়িতাড়ি করল।
اَلنَّفَرُ : রওয়ানা হওয়া, যাওয়া। تَاَخَّرَ : বিলম্ব করল। بَاتَ : রাত্রি যাপন করল।
مُخَيَّرُوْنَ : এখতিয়ারপ্রাপ্ত। نَفْيٌ : নাকচ করা। تُحْشَرُوْنَ : সমবেত করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : এদিকে হজের বয়ান চলছিল, ওদিকে আবার তখনই আল্লাহকে জিকির করার তাগিদ শুরু হয়ে গেল [কেননা অবশেষে শেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর স্মরণ]। মিনায় অবস্থানের দিনগুলোতে অধিকহারে তাকবীর পাঠ সেখানকার কর্মসূচির একটি বড় অঙ্গ।

রমীয়ে জিমার সংক্রান্ত বিধান :

رَمْيُ جِمَارٍ -এর তাৎপর্য : তিনটি জামরায় তিনবার সাতটি করে কঙ্কর নিক্ষেপের প্রসিদ্ধ কারণ হলো, হযরত ইবরাহীম (আ.) পুত্র ইসমাঈলকে জবাই করার জন্য মিনায় যাওয়ার মুহূর্তে মসজিদের সন্নিকটে শয়তান তাকে প্ররোচিত করতে চেয়েছিল। তখন তিনি সাতটি পাথর নিক্ষেপ করেন। এভাবে জামারায়ে আকাবার কাছে একই ঘটনা ঘটে। সেখান থেকেই এ আমলটি হাজীদের জন্য আবশ্যক করে দেওয়া হয়। -[হাশিয়্যায়ে সাবী খ. ১, পৃ. ১২৫]

মিনা : মক্কা মুয়াযযমা থেকে প্রায় চার মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত এমটি স্থান। এক সময় তো ধু-ধু প্রান্তর ছিল। এখন অবশ্য অনেক পাকা ইমারত ও প্রাসাদ নির্মিত হয়েছে। কিছু সরকারি ভবনও রয়েছে। এলাকাটি প্রায় সারা বছর জনশূন্য থাকে। তবে হজের মৌসুমে এখানে পূর্ণ জনসমাগম হয়। বিত্তবান হাজীগণ বড় বড় ভবন ভাড়া নিয়ে থাকেন। এ সময় বাজারও খুব জমজমাট হয়ে যায় এবং সমগ্র পৃথিবীর পণ্যসামগ্রী এখানে বেচাকেনা হয়। হাজীদের কাফেলা আরাফা ও মুযদালিফা থেকে ফিরতি পথে সকালের দিকে এখানে পৌঁছে যায়। ১১/১২ তারিখের সন্ধ্যা পর্যন্ত তো তারা এখানেই অবস্থানরত থাকেন এবং হজ সংক্রান্ত অনেক ওয়াজিব, সুন্নত ও মোস্তাহাব আমল এখানে পালন করা হয়। যেমন- কুরবানি করা, মাথা কামানো, শয়তানকে কঙ্কর নিক্ষেপ, ইহরামের পোশাক খুলে ফেলা ইত্যাদি।

قَوْلُهُ اَيَّامٌ مَعْدُوْدَاتٌ : এখানে اَيَّامٍ مَعْدُوْدَاتٍ দ্বারা জিলহজের ১১, ১২, ১৩ উদ্দেশ্য, যাকে আইয়ামে তাশরীক বলা হয়। যে দিনগুলোতে সবকটি জমারায় কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হয়। পক্ষান্তরে ১০ম তারিখে শুধু জামরায়ে আকাবাতেই পাথর মারতে হয়, তাই সেদিনটি এ বিধানের আওতায় পড়ে না। সে তিন দিনের নামাজের পর, রমীয়ে জিমারের পর এবং অন্য সময়েও বিশেষভাবে জিকির করতে হয়। মুসান্নিফ (র.) اَيْ اَيَّامُ التَّشْرِيْقِ الثَّلَاثَةُ বলে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ التَّشْرِيْقِ : তাশরীক অর্থ– কুরবানির গোশত শুকানো। আইয়ামে তাশরীক হচ্ছে ১০, ১১, ১২ জিলহজ।
জ্ঞাতব্য : أَيَّامٍ مَعْدُوْدَاتٍ দ্বারা **يَوْمُ النَّحْرِ** তথা জিলহজের ১০, ১১, ও ১২তম তারিখ উদ্দেশ্য। আর **فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ** দ্বারা ১০ম তারিখ ব্যতীত ১১ ও ১২ জিলহজ উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ عِنْدَ رَمْيِ الْجَمَرَاتِ : অর্থাৎ প্রতিটি কঙ্কর নিক্ষেপের সময় اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলবে। এমনিভাবে প্রত্যেক নামাজের পর তাকবীর পাঠ করা এবং হাদী বা কুরবানির পশু জবাই করার সময় বলবে– بِسْمِ اللّٰهِ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا مِنْكَ وَاِلَيْكَ
–[হাশিয়ায়ে সাবী খ. ১, পৃ. ১২৫]

قَوْلُهُ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ : অর্থাৎ মিনা থেকে মক্কা মুয়াযযমায় প্রত্যাবর্তনের জন্য দুটি পন্থাই অনুমোদিত। কেউ ১০ তারিখের পরে দুদিন অবস্থান করে ১২ তারিখ সন্ধ্যায় মক্কায় ফিরে আসতে চাইলে তা বৈধ। আবার কেউ ইচ্ছা করলে ১৩ তারিখ পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করাও বৈধ।

১২ তারিখে ফিরে আসতে চাইলে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে সূর্যাস্তের পূর্বেই জামরায় কঙ্কর মারার কাজ সম্পন্ন করতে হবে। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে ১৩ তারিখ পর্যন্ত এখানে অবস্থান করতে হলে সূর্যাস্তের [১৩ তারিখের] আগেই কঙ্কর মেরে নেবে। যদি মিনায় সূর্যাস্ত হয়ে যায়, তাহলে রাত সেখানে কাটাবে। ১৩ তারিখ আবার সবকটি জামরায় পাথর মেরে মক্কায় চলে যাবে।

قَوْلُهُ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ : অর্থাৎ ১০ তারিখের পর শুধু দুই দিন মিনায় অবস্থান করে মক্কায় চলে গেল।
قَوْلُهُ اَىْ فِىْ ثَانِىْ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ : অর্থাৎ শাফেয়ী মাযহাব মতে আইয়ামে তাশরীকের দ্বিতীয় দিন। অর্থাৎ ১২ তারিখে। এ অংশটুকু উল্লেখ করে এ সংশয়ের অপনোদন করা হয়েছে যে, দুই দিনের প্রতিদিনই **تَعَجَّلَ** করা যাবে কিনা? এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, কেউ আগে যেতে চাইলে কেবল ১২ তারিখেই যেতে পারবে, ১১ তারিখে পারবে না।

قَوْلُهُ بَعْدَ رَمْيِ جِمَارِهِ : তা হলো সূর্য হেলে যাওয়ার পর এবং সূর্যাস্তের আগে অর্থাৎ সূর্যাস্তের পূর্বে মিনা ত্যাগ করতে হবে। যদি সূর্যাস্তের আগে মিনা ত্যাগ করতে না পারে তাহলে সেই রাত সেখানেই যাপন করতে হবে ৩য় দিন রমী করার জন্য। –[হাশিয়ায়ে সাবী]

قَوْلُهُ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ : কেউ ১২ তারিখে রমীয়ে জিমার করে মক্কা পৌঁছে গেলে তার কোনো পাপ নেই, অর্থাৎ তার হজ পূর্ণ হয়ে যাবে। তার হজে কোনো ত্রুটি থাকবে না। আর যে আল্লাহর দেওয়া অবকাশ গ্রহণ না করে ১৩ তারিখের রমীয়ে জিমার করে গেল, তারও কোনো গুনাহ নেই। বস্তুত এখানে জাহেলিয়াতের একটি কুসংস্কার রহিত করা হয়েছে। সে যুগে কেউ তাড়াতাড়ি মক্কায় গমনকারীদেরকে পাপী মনে করত। আবার কেউ বিলম্বকারীদেরকে পাপী মনে করত। আল্লাহ তা'আলা আয়াতে বলে দিলেন, কাউকেই পাপী বলা যাবে না। কারণ উভয়টি পন্থাই বৈধ।

قَوْلُهُ اَىْ هُمْ مُخَيَّرُوْنَ : এ ইবারত দ্বারা নিম্নোক্ত উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে।
প্রশ্ন: **نَفِىْ اِثْمٌ** বা পাপ নাকচ করার বিষয়টি তো **تَقْصِيْرٌ** বা ত্রুটির ক্ষেত্রে বলা হয়। আর যে ব্যক্তি তৃতীয় দিন রমী করল সে তো কোনো ত্রুটি করল না, তারপরও এখানে **نَفِىْ اِثْمٌ** দ্বারা কি বুঝানো হলো?

উত্তর : মুসান্নিফ (র.) **هُمْ مُخَيَّرُوْنَ** বলে তার জবাব দিয়েছেন। অর্থাৎ এ আয়াত দ্বারা এখানে উভয় ক্ষেত্রেই পাপ না হওয়ার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ বৈধতার প্রশ্নে উভয় পন্থা সমান। সুতরাং এ কথার অর্থ উভয়টির কোনো একটি উত্তম অনুত্তম না হওয়া বুঝানো বা উত্তমের বিচারে দুটিই সমান হওয়া বুঝানো নয়। হানাফী ফকীহদের মতে ১৩ তারিখ পর্যন্ত অবস্থান অধিক উত্তম। –[তাফসীরে মাজেদী]

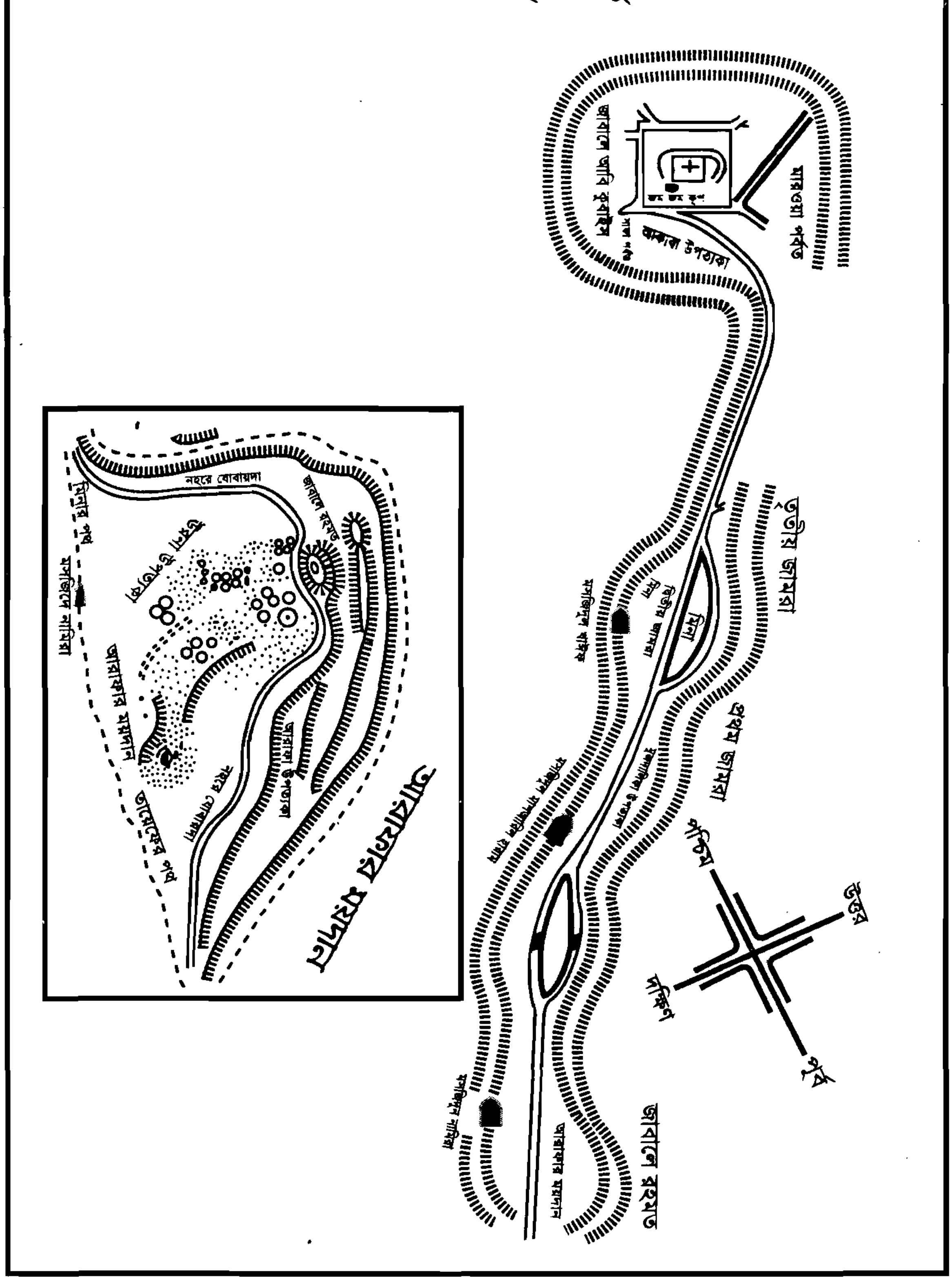
এ ব্যাখ্যায় হাশিয়ায়ে জামালের ইবারত লক্ষণীয়–

وَفِى الْمَقَامِ أَجْوِبَةٌ أُخْرَى . مِنْهَا مَا أَفَادَهُ السَّمِيْنُ، وَهُوَ اَنَّ هٰذَا مِنْ قُبَيْلِ الْمُشَاكَلَةِ عَلٰى حَدِّ قَوْلِهِ (تَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِىْ وَلَا اَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِكَ) (المائدة : ١١٦) وَمِنْهَا مَا يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَةِ الْكَرْخِىْ . فِيْهِ اِشَارَةٌ اِلٰى اَنَّ مَعْنٰى نَفْىِ الْاِثْمِ بِالتَّعْجِيْلِ وَالتَّاخِيْرِ التَّخَيُّرُ بَيْنَهُمَا وَالرَّدُّ عَلٰى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَاِنَّ مِنْهُمْ مَنْ أَثَّمَ التَّعَجُّلَ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَثَّمَ التَّاَخُّرَ فَنَهَى الْاِثْمَ عَنْ كُلٍّ مِنْهُمَا وَخَيَّرَهُ، وَاِنْ كَانَ التَّاْخِيْرُ اَفْضَلَ لِاَنَّهُ يَجُوْزُ اَنْ يَقَعَ التَّخْيِيْرُ بَيْنَ الْفَاضِلِ وَالْاَفْضَلِ كَمَا خَيَّرَ الْمُسَافِرُ بَيْنَ الصَّوْمِ وَالْاِفْطَارِ ، وَاِنْ كَانَ الصَّوْمُ اَفْضَلَ (حَاشِيَةُ الْجَمَلِ : ج ١، ص ٢٤٥)

قَوْلُهُ وَنَفْىُ الْاِثْمِ : এ অংশটুকু উহ্য মেনে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, لِمَنِ اتَّقٰى হলো উহ্য মুবতাদার খবর। আর মুবতাদাটি হলো– وَنَفْىُ الْاِثْمِ

قَوْلُهُ إِنَّهُ الْحَاجُّ : আয়াত থেকে এটাও জানা গেছে যে, ১২ কিংবা ১৩ তারিখের রমীয়ে জিমার করে যারা মক্কায় যায়, তাদের গুনাহ ক্ষমা করা হবে। তারপর বলা হয়েছে এ গুনাহ ক্ষমার বিষয়টি তাদের জন্য যারা আল্লাহকে ভয় করে। অর্থাৎ অশ্লীল কাজ বা কথা এবং ঝগড়াঝাটি থেকে বেঁচে থাকে। কেননা যে আল্লাহকে ভয় করল সেই হলো প্রকৃত হাজী। অর্থাৎ সেই তার হজ দ্বারা উপকৃত, অন্য কেউ নয়। –[মা'আরিফুল কুরআন : ইদ্রীস কান্ধলভী (র.)]

চিত্রে হজের স্থানসমূহ



অনুবাদ :

٢٠٤. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَا يُعْجِبُكَ فِي الْاٰخِرَةِ لِمُخَالَفَتِهِ لِاعْتِقَادِهِ وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِيْ قَلْبِهِ اَنَّهُ مُوَافِقٌ لَهُ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ شَدِيْدُ الْخُصُوْمَةِ لَكَ وَلِاَتْبَاعِكَ لِعَدَاوَتِهِ لَكَ وَهُوَ الْاَخْنَسُ بْنُ شَرِيْقٍ كَانَ مُنَافِقًا حُلْوَ الْكَلَامِ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَحْلِفُ اَنَّهُ مُؤْمِنٌ بِهِ وَمُحِبٌّ لَهُ فَيُدْنِيْ مَجْلِسَهُ فَاَكْذَبَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ ذٰلِكَ ـ

২০৪. মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তিও আছে যার পার্থিব জীবন সম্বন্ধে কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করে কিন্তু যেহেতু এটা তার বিশ্বাস ও আকিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, সেহেতু পরকালে তার কথা তোমাকে চমৎকৃত করবে না। এবং তার অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে সে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে যে, সেটি তার মুখের কথার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর সে হলো ঘোর কলহ প্রিয়। তোমার প্রতি শত্রুতাবশত তোমার অনুসারীগণও তোমার সাথে সে খুবই কলহপরায়ণ। এ লোকটি হলো অন্যতম মুনাফিক আখনাস ইবনে শারীক। সে রাসূল ﷺ -এর সাথে অতি মধুর কথা বলত। শপথ করে বলত যে, সে একজন মু'মিন এবং তাঁর প্রতি অতি ভালোবাসা পোষণ করে। এতে তিনি তাঁর মজলিসে তাকে নিকটে স্থান দেন। এ আয়াতে আল্লাহ তাকে [আখনাসকে] ঐ বিষয়ে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেন।

٢٠٥. وَمَرَّ بِزَرْعٍ وَحُمُرٍ لِبَعْضِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاَحْرَقَهُ وَعَقَرَهَا لَيْلًا كَمَا قَالَ تَعَالٰى وَاِذَا تَوَلّٰى اِنْصَرَفَ عَنْكَ سَعٰى مَشٰى فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ مِنْ جُمْلَةِ الْفَسَادِ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ اَيْ لَا يَرْضٰى بِهِ ـ

২০৫. একবার কোনো এক রাত্রে সে জনৈক মুসলমানের শস্যক্ষেত্র ও রক্তবর্ণের [মূল্যবান] উটের পাল অতিক্রম করে যাচ্ছিল। তখন সে হিংসার বশবর্তী হয়ে উক্ত শস্যক্ষেত্র জ্বালিয়ে দেয় এবং উটগুলোকে জবাই করে ফেলে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– যখন সে ফিরে যায় আপনার নিকট থেকে প্রস্থান করে তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির প্রয়াস পায়, অশান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিচরণ করে, শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্তু বিনাশ করে। এগুলো তার অশান্তি সৃষ্টির অন্যতম। কিন্তু আল্লাহ অশান্তি সৃষ্টি পছন্দ করেন না। অর্থাৎ তার এ কর্মে তিনি অসন্তুষ্ট হন।

٢٠٦. وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ فِيْ فِعْلِكَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ حَمَلَتْهُ الْاَنَفَةُ وَالْحَمِيَّةُ عَلَى الْعَمَلِ بِالْاِثْمِ الَّذِيْ اُمِرَ بِاتِّقَائِهِ فَحَسْبُهُ كَافِيْهِ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ الْفِرَاشُ هِيَ ـ

২০৬. যখন তাকে বলা হয় তুমি তোমার ক্রিয়াকর্মে আল্লাহকে ভয় কর, তখন তার আত্মাভিমান ঔদ্ধত্যপনা ও জাত্যাভিমান তাকে পাপাচারে উদ্বুদ্ধ করে। যা থেকে বেঁচে থাকার প্রতি তাকে নির্দেশ করা হয়েছে। সুতরাং জাহান্নামই তার জন্য উপযুক্ত তার জন্য যথেষ্ট, আর এটা কতই না মন্দ আশ্রয়স্থল শয্যা।

তাহকীক ও তারকীব

يُعْجِبُكَ : তোমাকে মুগ্ধ করে। يَشْهَدُ : সাক্ষী রাখে। مُوَافِقٌ : অনুকূল, সামঞ্জস্যপূর্ণ। اَلَدُّ : অতি ঝগড়াটে।
لِاَتْبَاعِكَ : তোমার অনুসারীদের জন্য। حُلْوُ الْكَلَامِ : মিষ্টভাষী। يَحْلِفُ : কসম করে। فَيُدْنِى : নিকটে স্থান দেন।
حُمُرٌ : রক্তবর্ণের উটের পাল। اَحْرَقَهُ : জ্বালিয়ে দিল। عَقَرَهَا : জবাই করে দিল। اَلْحَرْثُ : শস্যক্ষেত।
اَلنَّسْلُ : জীবজন্তু। اَلْعِزَّةُ : আত্মাভিমান। اَلْاَنَفَةُ : ঔদ্ধত্যপনা। اَنِفَ অর্থ– অহংকার করল, অপছন্দ করল।
اَلْحَمِيَّةُ : জাত্যাভিমান। اَلْمِهَادُ : শয্যা, আশ্রয়স্থল।

قَوْلُهُ يُعْجِبُكَ : اِعْجَابٌ অর্থ اِسْتِحْسَانُ الشَّيْءِ وَالْمَيْلُ اِلَيْهِ وَالتَّعْظِيْمُ لَهُ কোনো বস্তুকে ভালো মনে করা, তার প্রতি ঝুঁকে পড়া, সম্মান করা। ইমাম রাগেব (র.) বলেন–

اَلْعَجَبُ حَيْرَةٌ تَعْرِضُ لِلْاِنْسَانِ بِسَبَبِ الشَّيْءِ وَلَيْسَ هُوَ شَيْئًا فِىْ ذَاتِهِ حَالَةً حَقِيْقَةً، بَلْ هُوَ بِحَسْبِ الْاِضَافَةِ اِلٰى مَنْ يَعْرِفُ السَّبَبَ وَمَنْ لَا يَعْرِفُهُ ـ

অর্থাৎ عَجَبٌ শব্দের অর্থ এমন বিস্ময়, যা কোনো বস্তুর প্রকৃত কারণ না জানার দ্বারা হয়। অথচ বস্তুটা মূলত আশ্চর্যের নয়; বরং যে কারণ জানে না, তার কাছে আশ্চর্য মনে হয় আর যে জানে তার কাছে মনে হয় না। সুতরাং اَعْجَبَنِىْ كَذَا -এর অর্থ হলো– আমার সামনে ঐ বস্তুটি এমনভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে যে, আমি তার কারণ জানি না।

قَوْلُهُ يُشْهِدُ اللّٰهَ : شَهَادٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কসম করা। অর্থাৎ আল্লাহর নামে কসম করে বলে যে, তার মুখে যা আছে, সেটি তার মনেরও কথা। অথবা বলে যে, আল্লাহ সাক্ষী আছেন যে, আমার মুখের কথা অন্তরের কথার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

قَوْلُهُ اَلَدُّ الْخِصَامِ : لَدٌّ থেকে ইসমে তাফযীল তথা আধিক্যবাচক শব্দ। অর্থ– অধিক কলহপ্রিয়। خِصَامٌ শব্দটি خاصم -এর মাসদার। যুজায (র.) বলেন, এটা خَصْمٌ -এর বহুবচন। যেমন صَعْبٌ -এর বহুবচন আসে صِعَابٌ এবং ضَخْمٌ -এর বহুবচন আসে ضِخَامٌ -

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচনা ও যোগসূত্র : পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে প্রার্থনাকারীগণকে দু শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। এক শ্রেণি হচ্ছে কাফের ও পরকালে অবিশ্বাসী; এদের প্রার্থনার একমাত্র বিষয় হচ্ছে দুনিয়া। দ্বিতীয় শ্রেণি হচ্ছে মু'মিন; যারা পরকালের প্রতি বিশ্বাসে অটল। এরা পার্থিব কল্যাণ লাভের সঙ্গে সঙ্গে আখিরাতের কল্যাণ ও সমভাবে কামনা করে। এখানে 'নেফাক বা কপটতা ও 'এখলাস' বা আন্তরিকতার ভিত্তিতে বিভক্ত মানব শ্রেণি সম্পর্কে বলা হচ্ছে– কেউ মুনাফেক বা কপট আর কেউ মুখলেস বা আন্তরিকতাপূর্ণ। প্রথমে মুনাফিকদের প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে;

قَوْلُهُ وَمِنَ النَّاسِ : وَمِنَ النَّاسِ [কতক মানুষ] কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা একজন মাত্র হওয়া জরুরি নয়; একজনও হতে পারে, একাধিক ব্যক্তিও হতে পারে। কতকের [অনির্ণীত সংখ্যকের] প্রতি ইঙ্গিত। সুতরাং তা ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয়ের সম্ভাবনা রাখে। –[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ : এর আতফ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُوْلُ -এর উপর। وَمِنَ النَّاسِ তার উহ্য মুতা'আল্লিকের সাথে মিলে খবরে মুকাদ্দম। আর مَنْ يُعْجِبُكَ হলো তার মুবতাদা।

قَوْلُهُ شَدِيْدُ الْخُصُوْمَةِ : ব্যাখ্যাকার (র.) شَدِيْدٌ দ্বারা اَلَدُّ -এর ব্যাখ্যা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, শব্দটি ইসমে তাফজীল নয়। কেননা এর স্ত্রীবাচক শব্দ আসে لَدَّى এবং বহুবচন আসে لُدٌّ

قَوْلُهُ وَهُوَ الْاَخْنَسُ بْنُ شَرِيْقٍ : আখনাস হলো তার উপাধি। নাম হলো উবাই। اَخْنَسُ অর্থ– পিছনে থাকা। তাকে আখনাস উপাধি দেওয়ার কারণ হলো সে বদরের যুদ্ধে আবূ জেহেলের সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে যাওয়ার সময় বনু জোহরার তিনশত লোক নিয়ে পিছনে রয়ে গিয়েছিল। তাদেরকে বলেছিল, মুহাম্মদ হলো তোমাদের ভাগ্নে। যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে অন্যান্য লোকজনই তার জন্য যথেষ্ট। তোমাদের হাত তার রক্তে রঞ্জিত করার কি প্রয়োজন। আর

যদি সে সত্যবাদী হয়, তাহলে তোমরা তার কারণে সর্বাধিক ভাগ্যবান হবে। বনু জোহরার সকলে বলল, তোমার চিন্তাটি খুবই উত্তম। তখন সে বলেছিল– إِنِّى سَأَسْخَنُ بِكُمْ فَاتَّبِعُوْنِىْ অর্থাৎ "আমি তোমাদেরকে নিয়ে পিছনে রয়ে যাব আর তোমরা আমার অনুসরণ করবে।" সে থেকে তাকে আখনাস নামে উপাধি দেওয়া হয়। –[হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১, পৃ. ২৪৬]

قَوْلُهُ فَاَكْذَبَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَىْ بَيَّنَ كِذْبَهٗ

قَوْلُهُ عَقَرَهَا لَيْلًا : عَقَرَ (ض) عَقْرًا অর্থ– জখম করা। عَقَرَ الْبَعِيْرَ بِا سَيْفٍ অর্থ– উটের পা কেটে ফেলা।

قَوْلُهُ وَاِذَا تَوَلّٰى : এ বাক্যটি পূর্বের يُعْجِبُكَ -এর সাথে عَطْف হতে পারে, কিংবা مُسْتَاْنِفَةً হতে পারে। তখন স্বতন্ত্রভাবে তার অবস্থা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হবে।

قَوْلُهُ تَوَلّٰى : اِنْصَرَفَ عَنْكَ، تَوَلّٰى -এর তাফসীর اِنْصَرَفَ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা اِنْصِرَافٌ অর্থে –وِلَايَتْ অর্থে নয়। যেমন কেউ কেউ বলেছেন। কেননা আয়াতটি আখনাস ইবনে শারীকের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। সে কোনো গভর্নর ছিল না।

قَوْلُهُ يُهْلِكَ الْحَرْثَ : اَىْ بِالْاِحْرَاقِ অর্থাৎ জমিনের ফসল জ্বালিয়ে দিয়ে। اَلْحَرْثَ দ্বারা اَلزَّرْعُ কৃষিজাত ফসল উদ্দেশ্য। আর اَلنَّسْلَ দ্বারা গাধা উদ্দেশ্য। কেননা প্রাণী দ্বারা প্রাণীর বংশ বিস্তার ঘটে।

قَوْلُهُ مِنْ جُمْلَةِ الْخِصَامِ : এটা উহ্য মুবতাদার খবর। মুবতাদাটি হলো هٰذَا অর্থাৎ وَهٰذَا مِنْ جُمْلَةِ الْفَسَادِ

مِنْ جُمْلَةِ الْخِصَامِ বাক্যটি বৃদ্ধি করে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন–

প্রশ্ন: لِيُفْسِدَ فِيْهَا হলো ব্যাপকতাবোধক। এর মধ্যে সর্বপ্রকারের ফ্যাসাদ শামিল রয়েছে। এরপর وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ বলার প্রয়োজন কি?

উত্তর : এটা عَطْفُ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ -এর অন্তর্গত। مِنْ جُمْلَةِ الْفَسَادِ দ্বারা এ উত্তরের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, এগুলো ফ্যাসাদের অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهُ وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ : এ প্রসঙ্গে দুটি ঘটনা রয়েছে–

১. একবার হযরত ওমর (রা.) -কে লক্ষ্য করে জনৈক ব্যক্তি বলল– اِتَّقِ اللّٰهَ 'আল্লাহকে ভয় করুন।' হযরত ওমর (রা.) এ কথা শোনামাত্রই বিনয়ের সাথে নিজের গণ্ডদেশকে মাটিতে রাখলেন। তিনি আয়াতের বাহ্যিক হুকুমের উপর আমল করে নিলেন। কেননা যাকে একথা প্রথমে বলা হয়েছিল সে অহংকার দেখিয়েছিল, তাই অহংকারীদের দলভুক্ত না হওয়ার জন্য তিনিও এ কথা শুনে বিনয় প্রদর্শন করেছেন।

২. এমনিভাবে বাদশা হারুনুর রশীদ (র.) সম্পর্কেও এমন ঘটনা রয়েছে। জনৈক ইহুদি এক বছর পর্যন্ত কোনো প্রয়োজনে তার দরবারে উপস্থিত হতে লাগল। কিন্তু তার প্রয়োজন পূরণ হচ্ছিল না। একদিন বাদশা প্রাসাদ থেকে বের হয়ে সওয়ারিতে চড়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। এমন সময় ইহুদি এসে সামনে দাঁড়াল এবং তাকে লক্ষ্য করে বলল– اِتَّقِ اللّٰهَ 'আল্লাহকে ভয় করুন।' বাদশা তা শোনামাত্র সওয়ারি থেকে নেমে গেলেন এবং মাটিতে সেজদায় লুটিয়ে পড়লেন। সেজদা থেকে মাথা তোলার পর হুকুম দিলেন ইহুদির প্রয়োজন পূরণ করে দাও। তৎক্ষণাৎ তার প্রয়োজন পূরণ করা হয়। বাদশা প্রাসাদে ফেরার পর কেউ জিজ্ঞেস করল, হে আমীরুল মুমিনীন! একজন ইহুদির কথায় আপনি সঙ্গে সঙ্গে জমিনে লুটিয়ে পড়লেন, এর কারণ কি? বললেন, আমি ইহুদির কথায় এমনটি করিনি; বরং তখন আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ আমার মনে পড়ে গিয়েছিল। তা হলো– وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ 'তাই আমি সওয়ারি থেকে নেমে সেজদা করেছিলাম।' –[তাফসীরে কুরতুবীর সূত্রে মা'আরেফুল কুরআন : ইদ্রীস কান্ধলভী খ. ১, পৃ. ৩১০]

قَوْلُهُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ : এটি উহ্য কসমের জবাব। উহ্য কসমটি হচ্ছে– اَلْفِرَاشُ الْمُوَطَّأُ لِلنَّوْمِ

قَوْلُهُ هِىَ : এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এখানে مَخْصُوْصٌ بِالذَّمِ উহ্য রয়েছে। তাহলো هِىَ -

٢٠٧. وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِىْ يَبِيْعُ نَفْسَهُ اَىْ يَبْذُلُهَا فِىْ طَاعَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى ابْتِغَاءَ طَلَبَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ رِضَاهُ وَهُوَ صُهَيْبٌ لَمَّا اٰذَاهُ الْمُشْرِكُوْنَ هَاجَرَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَتَرَكَ لَهُمْ مَالَهُ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ حَيْثُ اَرْشَدَهُمْ لِمَا فِيْهِ رِضَاهُ .

অনুবাদ :

২০৭. মানুষের মধ্যে অনেকে আল্লাহর মর্জি লাভার্থে তাঁর সন্তুষ্টির সন্ধানে আত্ম-বিক্রয় করে দেয় يَشْرِىْ শব্দটি এ স্থানে বিক্রি করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্য ও বন্দেগিতে স্বীয় জানকে বিলীন করে দেয়। তিনি হলেন হযরত সুহাইব (রা.)। মুশরিকরা যখন তাঁকে নানাভাবে উৎপীড়ন করে, তখন তিনি মদীনায় **হিজরত** করে চলে গিয়েছিলেন। আর নিজের **সমস্ত অর্থ-সম্পদ** তাদের জন্য ছেড়ে গিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাগণের প্রতি অতি দয়ার্দ্র। তাই যে **বিষয়ে তাঁর সন্তুষ্টি বিদ্যমান,** সেই দিকে তাদেরকে **হেদায়েত করেন।**

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ :

আয়াতের যোগসূত্র ও শানে নুযূল : আয়াতের এ অংশে নিষ্ঠাবান মু'মিনগণের **অবস্থা বর্ণনা** করা **হয়েছে** যে, তারা **আল্লাহর** সন্তুষ্টির জন্য আত্মবিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। এ আয়াতটি **সে সমস্ত** নিষ্ঠাবান সাহাবায়ে কেরামের **শানে নাজিল** হয়েছে, যাঁরা আল্লাহর রাস্তায় সর্বদা ত্যাগ স্বীকার করেছেন।

মুসতাদরাকে হাকেম, ইবনে জারীর, মুসনাদে ইবনে আবী হাতেম **প্রভৃতি গ্রন্থে সহীহ** সনদের মাধ্যমে **বর্ণনা করা হয়েছে** যে, এ আয়াতটি হযরত সোহাইব রুমী (রা.)-এর এক ঘটনাকে **কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছিল। তিনি যখন মক্কা থেকে হিজরত** করে মদিনা অভিমুখে রওয়ানা হয়েছিলেন, তখন পথিমধ্যে **একদল কুরাইশ** তাঁকে **বাধা দিতে উদ্যত হলে তিনি সওয়ারি** থেকে নেমে দাঁড়ালেন এবং তাঁর তূণীতে রক্ষিত সবগুলো **তীর বের করে দেখালেন এবং কুরাইশদের লক্ষ্য করে বললেন,** হে কুরাইশগণ! তোমরা জান, আমার তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। **আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি. যতক্ষণ পর্যন্ত** তূনীতে **একটি** তীরও **অবশিষ্ট** থাকবে. ততক্ষণ তোমরা আমার ধারেকাছেও **পৌঁছতে পারবে না।** তীর **শেষ হয়ে** গেলে **আমি** তলোয়ার চালাব। **যতক্ষণ** আমার প্রাণ থাকবে ততক্ষণ আমি তলোয়ার চালিয়ে যাব। **তারপর** তোমরা যা চাও **করতে পারবে। আর** যদি তোমরা দুনিয়ার স্বার্থ কামনা কর, তাহলে শোন! আমি তোমাদেরকে **মক্কায় রক্ষিত** আমার **ধনসম্পদের সন্ধান বলে** দিচ্ছি, তোমরা তা নিয়ে নাও এবং আমার রাস্তা ছেড়ে দাও। তাতে কুরাইশদল রাজি **হয়ে** গেল **এবং হযরত সোহাইব রুমী** (রা.) নিরাপদে রাসূল ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন রাসূল ﷺ দুবার **ইরশাদ করলেন–** رَبِحَ الْبَيْعُ اَبَا يَحْيٰى، رَبِحَ الْبَيْعُ اَبَا يَحْيٰى [হে আবূ ইয়াহইয়া! তোমার ব্যবসা **লাভজনক হয়েছে।**]

কোনো কোনো তাফসীরকার অন্যান্য কতিপয় সাহাবীর বেলায় সংঘটিত **একই ধরনের কিছু ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়াতটি** অবতীর্ণ হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন। –[মা'আরিফুল কুরআন]

قَوْلُهُ مَنْ يَشْرِىْ نَفْسَهُ : ওলামায়ে কেরামের মধ্যে এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে **দুটি অভিমত পাওয়া যায়–১. কেউ বলেন,** يَشْرِىْ দ্বারা يَبِيْعُ তথা বিক্রয় করা উদ্দেশ্য। এ হিসেবে অর্থ হবে– কতিপয় **মানুষ জান্নাতের বদলায় নিজেদের জান** বিক্রি **করে** দেয়। ২. আর কেউ বলেন, يَشْرِىْ এর অর্থ يَشْتَرِىْ তথা ক্রয় করা। **এ হিসেবে অর্থ হবে– কতিপয় মানুষ নেক আমল করে** নিজেদের জানকে খরিদ করে নেয়। অর্থাৎ আশঙ্কাজনক এবং ভয়ানক **বস্তু থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে। কিন্তু রাজেহ** বা অগ্রাধিকার প্রাপ্ত মত এটাই যে, يَشْرِىْ দ্বারা يَبِيْعُ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ **কতিপয় মানুষ এমন রয়েছে যারা নিজেদের জানকে** আল্লাহর হাতে বিক্রি করে দেয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা দয়া করে তা আবার তাদের দায়িত্বেই **ফিরিয়ে দেন এবং তা** সংরক্ষণের জিম্মাদারিও তাদেরকেই দিয়ে থাকেন যে, এটি আমার আমানত। **আমার অনুমতি ছাড়া** তাতে **কোনো ধরনের** হস্তক্ষেপ করা যাবে না। –[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : ইদ্রীস কান্ধলভী খ. ১, পৃ. ২৪৮]

ফায়দা : فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُوْلُ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً থেকে **এ পর্যন্ত** মোট চার প্রকার লোকের কথা আলোচিত হয়েছে। যথা–

اَلْاَوَّلُ : رَاغِبٌ فِى الدُّنْيَا فَقَطْ ظَاهِرًا وَ بَاطِنًا .

اَلثَّانِىْ : رَاغِبٌ فِيْهِمَا وَ فِى الْاٰخِرَةِ كَذٰلِكَ .

اَلثَّالِثُ : رَاغِبٌ فِى الْاٰخِرَةِ ظَاهِرًا وَفِى الدُّنْيَا بَاطِنًا .

اَلرَّابِعُ : رَاغِبٌ فِى الْاٰخِرَةِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا مُعْرِضٌ عَنِ الدُّنْيَا كَذٰلِكَ . (جمل : ٢٤٥)

অর্থাৎ ১. বাহ্যিক ও আন্তরিকভাবে দুনিয়ামুখী। ২. দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টা কামনাকারী। ৩. বাহ্যিকভাবে আখিরাতমুখী এবং আন্তরিকভাবে দুনিয়ামুখী। ৪. বাহ্যিক ও আন্তরিকভাবে আখিরাতমুখী এবং দুনিয়াবিমুখ। –[হাশিয়ায়ে জামাল : ২৪৫]

অনুবাদ :

٢٠٨. وَنَزَلَ فِىْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ وَاَصْحَابِهٖ لَمَّا عَظَّمُوا السَّبْتَ وَكَرِهُوا الْاِبِلَ وَاَلْبَانَهَا بَعْدَ الْاِسْلَامِ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ بِفَتْحِ السِّيْنِ وَكَسْرِهَا الْاِسْلَامُ كَافَّةً حَالٌ مِنَ السِّلْمِ اَىْ فِىْ جَمِيْعِ شَرَائِعِهٖ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ طُرُقِ الشَّيْطٰنِ اَىْ تَزْيِيْنَهٗ بِالتَّفْرِيْقِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ بَيِّنُ الْعَدَاوَةِ.

২০৮. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম এবং তাঁর কতিপয় সঙ্গী [ইহুদি ধর্ম ত্যাগ করে] মুসলমান হওয়ার পরও [ইহুদি প্রথানুসারে] শনিবারের সম্মান প্রদর্শন করতেন এবং উট ও তার দুধ অপছন্দ করতেন। এ উপলক্ষে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন– হে মু'মিনগণ! তোমরা ইসলামে اَلسِّلْمُ -এর س হরফটি ফাতাহ ও কাসরা উভয়সহ পাঠ করা যায়। অর্থ– ইসলাম। সম্পূর্ণরূপে كَافَّةً এটা اَلسِّلْمُ হতে حَالٌ বা অবস্থা ও ভাববাচক পদ। অর্থাৎ তার সকল বিধিবিধানে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক তার পথসমূহের অর্থাৎ এ বিভেদ সম্পর্কে তৎসৃষ্ট মনোহারিতার অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু অর্থাৎ তার **শত্রুতা সুস্পষ্ট।**

٢٠٩. فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِلْتُمْ عَنِ الدُّخُوْلِ فِىْ جَمِيْعِهٖ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ الْحُجَجُ الظَّاهِرَةُ عَلٰى اَنَّهٗ حَقٌّ فَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ لَا يُعْجِزُهٗ شَىْءٌ عَنْ انْتِقَامِهٖ مِنْكُمْ حَكِيْمٌ فِىْ صُنْعِهٖ.

২০৯. **তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন অর্থাৎ** এটা সত্য, এ **কথার উজ্জ্বল প্রমাণাদি** আসার পরও যদি তোমাদের **পদস্খলন ঘটে অর্থাৎ** সম্পূর্ণরূপে এতে প্রবেশ করার **বিষয়টি** তোমরা উপেক্ষা কর তবে জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত, তোমাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে কোনো কিছুই তাঁকে অপারগ করতে **সক্ষম** নয়। তিনি তাঁর ক্রিয়-কর্মে প্রজ্ঞাময়।

٢١٠. هَلْ مَا يَنْظُرُوْنَ يَنْتَظِرُ التَّارِكُوْنَ الدُّخُوْلَ فِيْهِ اِلَّا اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ اَىْ اَمْرُهٗ كَقَوْلِهٖ اَوْ يَاْتِىَ اَمْرُ رَبِّكَ اَىْ عَذَابُهٗ فِىْ ظُلَلٍ جَمْعُ ظُلَّةٍ مِنَ الْغَمَامِ السَّحَابِ وَالْمَلٰۤئِكَةُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ تَمَّ اَمْرُ هَلَاكِهِمْ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُوْلِ وَالْفَاعِلِ فِى الْاٰخِرَةِ فَيُجَازِىْ.

২১০. তারা কেবল এরই অপেক্ষায় আছে هَلْ يَنْظُرُوْنَ -এর প্রশ্নবোধক শব্দ هَلْ এ স্থানে مَا [না-বাধক] অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ যারা সম্পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করা পরিত্যাগ করেছে, তারা কেবল এরই প্রতীক্ষায় আছে যে, আল্লাহ অর্থাৎ তাঁর নির্দেশ; অপর একটি আয়াতে উল্লেখ হয়েছে اَوْ يَاْتِىَ اَمْرُ رَبِّكَ [তোমার প্রভুর আজাব আসবে] এ স্থানে اَمْرٌ অর্থ– আজাব, শাস্তি। ও তাঁর ফেরেশতাগণ মেঘের ছায়ায় ظُلَلٌ এটা ظُلَّةٌ -এর বহুবচন। اَلْغَمَامُ অর্থ– মেঘ। তাদের নিকট উপস্থিত হবেন তৎপর সবকিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে। অর্থাৎ তাদের ধ্বংস পূর্ণ হবে। সমস্ত বিষয় পরকালে আল্লাহরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। تُرْجَعُ : এটা مَعْرُوْف অর্থাৎ কর্তৃবাচ্য ও مَجْهُوْل অর্থাৎ কর্মবাচ্য উভয়রূপেই পাঠ করা যায়। অনন্তর তিনি এর বিনিময় ফল দান করবেন।

তাহকীক ও তারকীব

عَظَّمُوا السَّبْتَ : শনিবারের সম্মান করল। كَافَّةً : সম্পূর্ণরূপে। فَإِنْ زَلَلْتُمْ : যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে। مِلْتُمْ : [যদি] উপেক্ষা কর। لَايُعْجِزُهُ شَيْئٌ : কোনো কিছুই তাকে অপারগ করতে সক্ষম নয়। اِنْتِقَامٌ : প্রতিশোধ। صُنْع : ক্রিয়া-কর্ম। اَلتَّارِكُوْنَ الدُّخُوْلَ فِيْهِ : সম্পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করা বর্জনকারীগণ।
ظُلَلٌ : ظُلَّةٌ -এর বহুবচন, অর্থ– ছায়া। اَلْغَمَامُ : মেঘ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَافَّةً :

আলোচনা ও যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে ঈমান এবং ইখলাসের আলোচনা ছিল। এখন এ আয়াতে বলা হচ্ছে– ঈমান এবং ইখলাসের দাবি হলো দীন ইসলামে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ করা। ইসলামে প্রবেশ করার পর পূর্বের ধর্ম তথা ইহুদি বা খ্রিস্টান ধর্মের অনুসরণ করে কোনো কাজ না করা। এক ধর্মে প্রবেশ করে অন্য ধর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখা ইখলাসের পরিপন্থি। শুধু তাই নয় এমনটি করা শাস্তিরও কারণ।

শানে নুযূল : হযরত ইবনে জারীর (র.) হযরত ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম এবং তাঁর সঙ্গীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে এ ব্যাপারে অনুমতি দান করুন যে, আমরা শনিবারকে সম্মান করব এবং উটের গোশত বর্জন করব। তখন এ আয়াত নাজিল হয়। ইহুদিদের নিকট শনিবার দিনটি সম্মানিত ছিল এবং উটের গোশত হারাম ছিল। ইসলাম গ্রহণের পর তাদের ধারণা হলো যে, হযরত মূসা (আ.)-এর শরিয়তে শনিবার ছিল মর্যাদাপূর্ণ দিবস। মুহাম্মদী শরিয়তে তার অমর্যাদা জরুরি নয়। অনুরূপভাবে হযরত মূসা (আ.)-এর শরিয়তে উটের গোশত হারাম; কিন্তু মুহাম্মদী শরিয়তে তা ভক্ষণ করা ফরজ নয়, তবে জায়েজ। অতএব আমরা যদি পূর্বের ন্যায় শনিবার দিবসটির সম্মান করি এবং উটের গোশত হালাল হওয়ার আকিদা রাখা সত্ত্বেও তা ভক্ষণ না করি, তাহলে হযরত মূসা (আ.)-এর শরিয়তেরও সম্মান প্রকাশ পাবে। অপরদিকে মুহাম্মদী শরিয়তেরও বিরোধিতা হবে না। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে তাদের এ ধারণার সংশোধন করেছেন। –[জামালাইন]

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন : এ আয়াত থেকে যে শিক্ষাটি বড় করে ধরা দেয়, তা হলো ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন। শুধু কতগুলো আকিদা-মতাদর্শ, অথবা শুধু কয়েকটি ইবাদত বা শুধু কিছু আইন-কানুনের নাম ইসলাম নয়; বরং ইসলাম হচ্ছে একটি স্বকীয় ও পরিব্যাপ্ত জীবনপদ্ধতি, একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন। মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র ও তার শাখা-প্রশাখায় পরিব্যাপ্ত। এর প্রতিটি অঙ্গ তাঁর পূর্ণ কাঠামোর সঙ্গে এবং অন্যান্য অঙ্গগুলোর সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে সংযুক্ত। এখানে কোনো প্রকার কাটছাটের অবকাশ নেই। এমন হতে পারে না যে, কেউ ইসলামের তাওহীদ [একত্ববাদ] দর্শন তো মেনে নিল, কিন্তু ইবাদতের ক্ষেত্রে সে মসজিদ-মন্দির গীর্জা-মঠকে একাকার করে ফেলল। কিংবা কেউ রিসালাতের প্রতি ঈমান স্থাপন করে অর্থনীতির জন্য কার্লমার্কস ও চরিত্রনীতির জন্য গৌতম বুদ্ধের দুয়ারে ধর্ণা দিল। পরকাল, ইহকাল, সমাজ বিজ্ঞান, নীতি বিজ্ঞান ও অর্থ ব্যবস্থা -এর সবই ইসলামের নিজস্ব, যা অন্য কোনো তন্ত্র দর্শন, অন্য কোনো ধর্ম মতবাদের সঙ্গে জোড়াতালি দিতে প্রস্তুত নয়। –[তাফসীরে মাজেদী]

এ আয়াতে ঐসকল লোকদের জন্য বিশেষ সতর্কবাণী রয়েছে, যারা ইসলামকে শুধু মসজিদ ও ইবাদতের মাঝে সীমাবদ্ধ করে রেখেছেন এবং লেনদেন ও সামাজিক বিধানকে ধর্মের কোনো অংশই ভাবেন না। বর্তমানে আধুনিক শিক্ষিতগণ যারা নিজেদেরকে মডার্ন জ্ঞান করে, তাদের মধ্যে এ ধরনের চিন্তাভাবনা বেশি পরিলক্ষিত হয়। –[জামালাইন]

قَوْلُهُ لَمَّا عَظَّمُوا السَّبْتَ : শনিবারকে সম্মানিত মনে করা মানে সেদিন শিকার করাকে হারাম মনে করা।

قَوْلُهُ وَكَرِهُوْا الْاِبِلَ : অর্থাৎ উটের গোশত খাওয়াকে অপছন্দ করল।

قَوْلُهُ وَاَلْبَانَهَا : এখানে اَلْاِبِلُ জিনস হওয়ার কারণে দুধের নিসবত তার প্রতি করা হয়েছে এবং স্ত্রীবাচক যমীর ব্যবহার করা হয়েছে।

ইহুদি ধর্মের উটের গোশত দুধ হারাম থাকার কারণ : হযরত ইয়াকুব (আ.) একবার 'আরকুন নাস' নামক রোগে আক্রান্ত হলেন। তিনি সুস্থতা লাভের মানত করেছিলেন যে, তিনি এ রোগ থেকে সুস্থ হলে তাঁর প্রিয় খাদ্য খাবেন না এবং প্রিয় পানীয় পান করবেন না। আর তাঁর প্রিয় খাদ্য ছিল উটের গোশত এবং প্রিয় পানীয় ছিল উটের দুধ। তিনি সুস্থ হলেন। ফলে নিজের উপর তা হারাম করে ফেলেন। এ হিসেবে তাঁর অনুসারী ও সন্তানদের জন্যও তা হারাম হয়ে যায়। সূরা আলে ইমরানের كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِيْ اِسْرَائِيْلَ -এর আয়াতের অধীনে এ বিষয়ে আলোচিত হবে।

–[জামালাইন খ. ১, পৃ. ২৪৮]

قَوْلُهُ السِّلْم : শাব্দিক অর্থ– সন্ধি, শান্তি, নিরাপত্তা। শব্দটি حَرْب যুদ্ধ ও সংঘাতের বিপরীত অর্থবোধক। কিন্তু এখানে السِّلْم। দ্বারা ইসলাম ধর্ম অর্থ নেওয়া হয়েছে।

قَالَ الْبَيْضَاوِيْ : اَلسِّلْمُ بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ اَلْاِسْتِسْلَامُ وَالطَّاعَةُ، وَلِذٰلِكَ يُطْلَقُ عَلَى الصُّلْحِ وَالْاِسْلَامِ ـ

قَوْلَهُ حَالٌ مِنَ السِّلْم : এর দ্বারা ঐ সকল লোকদের কথা খণ্ডন করেছেন যারা كَافَّة -কে বিলুপ্ত মাসদারের সিফত বলেন। বাক্যটিকে তারা এমন মনে করেছেন اُدْخَلاً كَافَّةً কেননা ইবনে হিশাম বলেন, كَافَّةً শব্দটি হাল ও নাকেরা হওয়ার জন্য খাস। اَلسِّلْم শব্দটি مُؤَنَّثٌ ও مُذَكَّرٌ উভয়ভাবে ব্যবহৃত হয় বিধায় তার حَالٌ স্ত্রীলিঙ্গ হতে পেরেছে।

قَوْلَهُ مِنَ السِّلْم : এটা ঐ সকল ব্যক্তিদের কথা প্রত্যাখ্যানকল্পে যারা বলেন, كَافَّةً হলো اُدْخُلُوْا -এর যমীর থেকে হাল, কিংবা এজন্য যে, শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ। আর سِلْم পুংলিঙ্গ অথবা এজন্য যে, سِلْم অর্থ ইসলামের কোনো অঙ্গ নয়। অথচ যুলহালটি শাখা তথা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হওয়া জরুরি। প্রথম দলিলের উত্তর اَلسِّلْم শব্দটি حَرْب -এর মতো। যা স্ত্রী ও পুরুষ উভয় লিঙ্গে ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় উত্তর হলো, ইসলাম দ্বারা শরিয়তের সকল আহকাম উদ্দেশ্য, আর শরিয়ত শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট। কাজেই سِلْم শব্দটি كَافَّةً থেকে হাল হওয়া সঙ্গত। ব্যাখ্যাকার (র.) স্বীয় উক্তি اَيْ فِيْ جَمِيْعِ شَرَائِعِهِ দ্বারা এ উত্তরের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। উল্লিখিত আয়াতটি আবদুল্লাহ ইবনে উসাইদ এবং সাঈদ ইবনে ওমর প্রমুখ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা সবাই ইহুদি ছিলেন, পরে ইসলাম গ্রহণ করেন।

قَوْلُهُ طُرُقٌ : خُطُوَاتِ -এর ব্যাখ্যা طُرُقٌ দ্বারা করে এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন যে, শয়তানের তো পা' নেই ।

উত্তর: এখানে হাল বলে مَحَلْ তথা রাস্তা উদ্দেশ্য।

تَزْيِيْنُهُ : اَيْ تَزْيِيْنُ الشَّيْطَانِ সুশোভিত করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, শয়তানের ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণা। যেমন– উটের গোশত হারাম করা এবং শনিবারকে বিশেষভাবে সম্মান দেওয়া।

زَلَلْتُمْ : زَلَّةٌ -এর শাব্দিক অর্থ– পিছলে যাওয়া, স্খলিত হওয়া, যা সাধারণত অনিচ্ছায়ই হয়ে থাকে। শব্দটি দ্বারা ভয় পাইয়ে দেওয়া হলো যে, ইচ্ছা করে ও জেনেশুনে বিরুদ্ধাচরণ তো কঠিন ব্যাপার, এমনকি ভুলক্রমে গাফলতিতে বিভ্রান্তি ক্ষেত্রেও পাকড়াও হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

قَوْلُهُ : مِلْتُمْ : যদি তোমরা উপেক্ষা কর। مَالَ عَنْ ـ مَيْلًا উপেক্ষা করা বা এড়িয়ে যাওয়া.

قَوْلُهُ بِالتَّفْرِيْقِ : اَيْ بِتَفْرِيْقِ الْاَحْكَامِ بِالْعَمَلِ بِبَعْضِهَا الْمُوَافِقِ لِشَرِيْعَةِ مُوْسٰى وَعَدَمِ الْعَمَلِ بِالْبَعْضِ الْاٰخَرِ الْمُخَالِفِ لَهَا

قَوْلُهُ هَلْ يَنْظُرُوْنَ : এটি اِسْتِفْهَامٌ اِنْكَارِيْ অর্থাৎ তাদের জন্য আজাবের অপেক্ষা করা উচিত নয়। অর্থাৎ তারা যখন এমন কাজ করল যা আজাব ডেকে আনে, তখন যেন প্রকারান্তরে তারা আজাবের অপেক্ষা করছে।

قَوْلُهُ اَنْ يَأْتِيَهُمُ اللّٰهُ اَيْ اَمْرُهُ : **আল্লাহর আগমন-এর মর্ম** : আকাইদ ও ইসলামি মতাদর্শের একটি মৌলিক ও স্বীকৃত ধারা এরূপ যে, আল্লাহর জন্য কোনো অবস্থানক্ষেত্র বা স্থান ও পাত্র সাব্যস্ত হতে পারে না। সুতরাং ইসলামি আকিদা কি দৃষ্টে আল্লাহর জন্য গমন ও আগমনের কোনো অর্থ হয় না। এ কারণে অধিকাংশ মুফাসসির আয়াতটি মুতাশাবিহের তালিকাভুক্ত করেছেন। হযরত থানবী (র.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার আগমন ইত্যাদির তত্ত্ব নির্ণয়ের জন্য ব্যস্ত হওয়া বৈধ নয়.......। তাফসীরে রূহুল মা'আনীর গ্রন্থকার শুধু এতটুকু লিখে ক্ষান্ত হয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে আসবেন, যেমনটা তাঁর মহান মহীয়ান সত্তার জন্য সমীচীন। (كَمَا يَلِيْقُ بِشَانِهِ)

অনেকে আবার আয়াতের يَأْتِيَهُمُ اللّٰهُ -এর মাঝে কোনো উপযুক্ত শব্দ যথা– اَمْر আদেশ অথবা بَأْس [দুর্যোগ] ইত্যাদি উহ্য ধরে নিয়ে এরূপ অর্থ করেছেন যে, আল্লাহর হুকুম এসে পড়া অর্থ– তাঁর আজাব এসে যাওয়া। বিজ্ঞ মুফাসসির (র.) ও তাদেরই অনুসরণ করে اَمْرُهُ শব্দ উল্লেখ করে আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন।

قَوْلُهُ يَعْنِيْ اَنَّ الْاِسْنَادَ مَجَازِيٌّ : আল্লামা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী (র.) বলেন, আয়াতের লক্ষ্য, সাধারণভাবে সকল প্রত্যাখ্যানকারী কাফের মুনাফিক ও কিতাবীদের ধরে নেওয়া। কিন্তু বর্ণনাধারা পূর্বাপর নজরে রেখে বক্তব্যের লক্ষ্য শুধু ইহুদিদের পর্যন্ত সীমিত রাখলে বিষয়টি একেবারে পরিষ্কার হয়ে যায়। তখন উল্লিখিত [জটিল] তাফসীরসমূহের স্থানে শুধু ইহুদিদের ধ্যানধারণা মতে কথাটুকু সংযোজন করাই যথেষ্ট হবে। কেননা ইহুদিরা [সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার] সাদৃশ্য ও দেহাবয়ব বৈশিষ্ট্যের মতবাদ পোষণ করত এবং স্পষ্টভাবে আল্লাহর দেহধারী হওয়ার কথা বলত এবং আল্লাহর জ্যোতির্ময় প্রকাশকে

মেঘমালার সঙ্গে বিশেষরূপে সম্পৃক্ত মনে করত; বরং তারা মেঘমালাকে যেন আল্লাহর বাহন সাব্যস্ত করে রেখেছিল তাদের পবিত্র গ্রন্থসমূহ ও পত্রাবলিতে আজ অবধি এ ধরনের বিবৃতি সংরক্ষিত রয়েছে। যেমন– তুমি বস্ত্রের ন্যায় দীপ্তি পরিধান করেছ। আকাশমণ্ডলকে চন্দ্রতাপের ন্যায় বিস্তার করেছ। তিনি জলে আপন উপরস্থ কক্ষের কড়ি কাষ্ঠ স্থাপন করেছেন। তিনি মেঘকে আপনার রথ করে থাকেন। বায়ু পক্ষের উপরে গমনাগমন করেন [গীত সংহিতা ১০৪ : ২৩]। দেখ সদাপ্রভু দ্রুতগামী মেঘে আরোহণ করে মিসরে গমন করেছেন। মিসরের প্রতিমাগণ তাঁর সক্ষাতে কাঁপবে [মিশাইয় পুস্তক ১৯ : ১] করূবগণ গৃহের দক্ষিণ পার্শ্বে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং ভিতরের প্রাঙ্গণ মেঘে পরিপূর্ণ ছিল। আর সদাপ্রভুর প্রতাপ করূপের উপর হতে উঠে গৃহের গোবরাটের উপরে দাঁড়াল। আর গৃহ মেঘে পরিপূর্ণ ও প্রাঙ্গণ সদাপ্রভুর প্রতাপের তেজে পরিপূর্ণ হল [যিহিস্কেল ১০ : ৩-৪]। মেঘের সাথে আল্লাহ তা'আলার বাহন বা সওয়ারিরূপে সম্বন্ধের কথা ইহুদি ধ্যানধারণায় বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। এমনকি ব্রিটানিকা বিশ্বকোষের সর্বশেষ সংস্করণে আধা ইহুদি ও আধা খ্রিস্টীয় ধ্যানধারণার মিশ্রণে আল্লাহ তা'আলার যে রূপ-প্রকৃতি অঙ্কন করা হয়েছে, তাতেও 'নাঊযুবিল্লাহ' আল্লাহ তা'আলাকে মেঘের উপর সওয়ার দেখানো হয়েছে।

সুতরাং পবিত্র কুরআন এ আয়াতে নিজেদের কোনো ধ্যানধারণা প্রকাশ করেনি; বরং ইহুদি ধ্যানধারণার বিশুদ্ধতা বা ভ্রান্তিকে আলোচনার বিষয় না বানিয়ে শুধু তার প্রতিধ্বনি করেছে যে, ইসরাঈলীরা এ ধারণায়ই ডুবে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরসহ মেঘের উপর সওয়ার হয়ে তাদের সামনে উপস্থিত হবেন এবং প্রতিটি অকাট্য বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান দেবেন।

ইমামুল মুফাসসিরীন ইমাম রাযী (র.) তাঁর তাফসীরে বিষয়টির শুধু উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হননি; বরং সেই সাথে পূর্বোক্ত সব ব্যাখ্যা হতে এটিকে অধিক প্রাঞ্জল এবং পূর্ববর্তী সবগুলোর চেয়ে এ ব্যাখ্যাটি স্পষ্টতর বলে এটিকেই সর্বোত্তম ব্যাখ্যা বলে আখ্যা দিয়েছেন। সুতরাং এখন আর আয়াতে কোনো রূপকতা বা অন্য কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন থাকে না। –[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ فِيْ ظُلَلٍ : فِيْ ظُلَلٍ হলো উল্লিখিত اِتْيَانٌ-এর ظَرْف - আয়াতের মর্ম হলো, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর রহমতের আকৃতিতে আজাব প্রেরণ করবেন। কেননা সাদা হালকা মেঘমালাতে সাধারণত বৃষ্টিই থেকে থাকে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি কৌশল মাত্র। কেননা তারা নিজেদের ভিতরগত অস্বীকৃতিকে বাহ্যিক স্বীকারোক্তির আবরণে ঢাকার চেষ্টা করেছে। এজন্য কিয়ামতের দিন আল্লাহর আজাব ও রহমতের পর্দা তথা সাদা মেঘমালার আকৃতিতে প্রকাশিত হবে। আর আজাবের এ পদ্ধতিটি ভীতিপ্রদর্শনের জন্য অধিক মোবালাগাপূর্ণ। কেননা যেখানে অপ্রত্যাশিতভাবে আজাব আসাটা খুবই কঠিন ব্যাপার, সেখানে রহমতের আকৃতিতে আসাটা তার চেয়েও কঠিন ব্যাপার হবে।

–[হাশিয়ায়ে জামাল, তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.)]

قَوْلُهُ وَالْمَلٰئِكَةُ : ফেরেশতা আসার কারণ হলো ফেরেশতারা আল্লাহর আজাব আসার মাধ্যম।

قَوْلُهُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ : اِسْتِيْنَافِيَّةٌ اَوِ الْجُمْلَةُ - فَكَاَنَّهُ قَدْ كَانَ . وَاِنَّمَا عُدِلَ عَلٰى صِيْغَةِ الْمَاضِىْ دَلَالَةً عَلٰى تَحَقُّقِهٖ

قَوْلُهُ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ : হরফে জার এবং লফযে আল্লাহ মাজরূর পরবর্তী ফে'লের সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। জার মাজরূরকে مُتَعَلِّقٌ-এর পূর্বে আনার কারণে اِخْتِصَاصٌ বুঝানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর দিকেই ...।

ফায়দা : হাফেজ ইবনে কাছীর (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা এবং ফেরেশতাদের আগমনের ঘটনা কিয়ামতের দিন ঘটবে। যেমন অন্য আয়াতে এসেছে–

كَلَّآ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيْٓءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِىَ اَمْرُ رَبِّكَ اَوْ يَاْتِىَ اٰيٰتُ رَبِّكَ .

হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে একত্র করবেন। সকলে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকবে এবং ফয়সালার অপেক্ষা করতে থাকবে। এমন সময় আল্লাহ তা'আলা মেঘমালার ছায়ায় আরশ থেকে কুরসীতে অবতরণ করবেন। –[ইবনে মারদুইয়া, তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) ৩১২ / ১৩]

অনুবাদ :

২১১. سَلْ يَا مُحَمَّدُ بَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ تَبْكِيْتًا كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كَمْ اِسْتِفْهَامِيَّةٌ مُعَلِّقَةٌ سَلْ مِنَ الْمَفْعُوْلِ الثَّانِيْ وَهِيَ ثَانِيْ مَفْعُوْلَيْ اٰتَيْنَا وَمُمَيِّزُهَا مِنْ اٰيَةٍ بَيِّنَةٍ ظَاهِرَةٍ كَفَلْقِ الْبَحْرِ وَاِنْزَالِ الْمَنِّ وَالسَّلْوٰى فَبَدَّلُوْهَا كُفْرًا وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ اَيْ مَا اَنْعَمَ بِهٖ عَلَيْهِ مِنَ الْاٰيَاتِ لِاَنَّهَا سَبَبُ الْهِدَايَةِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ كُفْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ لَهٗ ـ

২১১. জিজ্ঞাসা করুন, হে মুহাম্মদ বনী ইসরাঈলকে লা জওয়াব করতে গিয়ে আমি প্রদান করেছি তাদেরকে কত উজ্জ্বল কত স্পষ্ট নিদর্শন যেমন– সমুদ্র বিদীর্ণ হওয়া, মান্না ও সালওয়া প্রেরণ ইত্যাদি। এখানে كَمْ শব্দটি اِسْتِفْهَامِيَّةٌ বা প্রশ্নবোধক শব্দ। এটি سَلْ শব্দটিকে তার দ্বিতীয় মাফঊলে আমল করা থেকে বিরত রেখেছে। আর كَمْ হলো اٰتَيْنَا ক্রিয়াপদের দ্বিতীয় মাফঊল। এর مُمَيِّزْ হলো مِنْ اٰيَةٍ بَيِّنَةٍ - কিন্তু এতদনুসারে ঈমান আনয়ন না করে তারা কুফরির মাধ্যমে এসব কিছু পরিবর্তন করে নেয়। আল্লাহর অনুগ্রহ আসার পরও যে ব্যক্তি তা অর্থাৎ যে সমস্ত নিদর্শন দ্বারা তিনি অনুগ্রহ করেছেন তা কুফরির মাধ্যমে পরিবর্তন করবে আর এই নিদর্শনসমূহই তো হলো হেদায়েতের কারণ, নিশ্চয় আল্লাহ তাকে শাস্তি দানে কঠোর।

তাহকীক ও তারকীব

تَسَلْ : জিজ্ঞাসা করুন, মূল اِسْئَلْ ছিল। مُعَلِّقَةٌ : বিরতকারী, প্রতিবন্ধক। فَلَقَ الْبَحْرِ : সমুদ্র বিদীর্ণ হওয়া।
اَلْعِقَابُ : শাস্তি।

تَبْكِيْتًا : লা-জবাব করা, চুপ করিয়ে দেওয়া। আর اِسْتِفْهَامْ টি জানার উদ্দেশ্যে নয়; বরং তিরস্কার ও ভর্ৎসনার উদ্দেশ্যে।

قَوْلُهٗ كَمْ اِسْتِفْهَامِيَّةٌ مُعَلِّقَةٌ الخ : অর্থাৎ كَمْ اِسْتِفْهَامِيَّةٌ টি سَلْ -কে مَفْعُوْلْ ثَانِيْ -এর মাঝে আমল করা থেকে প্রতিবন্ধক এবং নিজেই مَفْعُوْلْ ثَانِيْ -এর স্থলাভিষিক্ত, যাতে তার صَدَارَتْ كَلَامْ বাকি থাকে। –[জামালাইন]

প্রশ্ন: سَلْ তো একটি মাত্র مَفْعُوْلْ দাবি করে তার দ্বিতীয় মাফঊলের প্রয়োজন নেই। তাহলে سَلْ -কে দ্বিতীয় মাফঊলে আমল করা থেকে বারণ করার অর্থ কি?

উত্তর: سُؤَالْ যেহেতু عِلْم -এর سَبَبْ হয় আর عِلْم - اَفْعَالْ قُلُوْب হওয়ার কারণে দুটি مَفْعُوْل -এর দিকে مُتَعَدِّىْ হয় ব সবব দুটি مَفْعُوْل দাবি করে থাকে। সুতরাং سُؤَالْ যেহেতু عِلْمْ -এর سَبَبْ আর عِلْم হলো তার مُسَبَّبْ এবং অনেক সময় সবব টি مُسَبَّبْ -এর قَائِمْ مَقَامْ হয়। এ কারণে এখানেও سَأَلْ যেহেতু عِلْم -এর قَائِمْ مَقَامْ তাই مُتَعَدِّىْ بَدُوْ مَفْعُوْل হয়ে গেছে

পূর্ণ তারকীব : سَلْ এটি ফে'লে আমর। ضَمِيْر اَنْتَ তার ফায়েল, بَنِيْ اِسْرَائِيْل হলো سَلْ -এর প্রথম মাফঊল। كَمْ তামীয হলো مُمَيِّزْ আর هُمْ হলো اٰتَيْنَا -এর প্রথম মাফঊল। مِنْ اٰيَةٍ হলো تَمْيِيْز আর (مُمَيِّزْ) كَمْ তার تَمْيِيْز হলো مُمَيِّزْ اِسْتِفْهَامِيَّةٌ -এর সাথে মিলে اٰتَيْنَا -এর مَفْعُوْل ثَانِيْ مُقَدَّمْ আর اٰتَيْنَا তার ফায়েল এবং উভয় মাফঊলের সাথে জুমলা হয়ে قَائِمْ -এর মাফঊলে ছানীর। سَلْ তার ফায়েল, মাফঊল এবং কায়েম মাকামে মাফঊল মিলে جُمْلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ মকাম হয়েছে -এর سَلْ মাকামে হয়েছে

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : ইতঃপূর্বে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ তা'আলার স্পষ্ট নিষেধের পর তার বিরোধিতা করলে শাস্তি অনিবার্য। এবারে তারই সমর্থনে বলা হচ্ছে– তোমরা বনী ইসরাঈলদেরকেই জিজ্ঞেস করে দেখ না, আমি তাদের নিকট কত রকমের স্পষ্ট নির্দেশাবলি পাঠিয়ে ছিলাম, কিন্তু তারা যখন তা অমান্য করতেই থাকে, তখন তারা শাস্তিতে নিপতিত হয়। আমি প্রথমেই তাদেরকে শাস্তি দেইনি। –[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ مِنْ اٰيَةٍ بَيِّنَةٍ : যখন كَمْ এবং তার مُمَيِّزْ -এর মাঝে فَصْل [দূরত্ব] হয়, তখন তার কারণে মাফঊল এবং তমীযের দূরত্ব হওয়ার কারণে مِنْ ব্যবহার করতে হয়। –[হাশিয়ায়ে জালালাইন হাশিয়া ৩৬, পৃ. ৩১]

قَوْلُهُ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ : [রদবদল ...]-এর ক্রিয়ামূল] تَبْدِيْل অর্থ কোনো কিছুর মূল সত্তাকে কোনো কিছু থেকে অন্য কিছু করে দেওয়া, তাতে বিকৃতি সাধন করা, রূপ পরিবর্তন করে দেওয়া। আল্লাহর নিয়ামতসমূহে বিকৃতি ও রদবদলের একটি প্রক্রিয়া এটিও যে, হেদায়েত ও কল্যাণ লাভের জন্য আগত বিষয় সামগ্রীকে উল্টে দিয়ে সেগুলোকেই ফাসিকী-ফাজিরী কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করা; কিংবা এভাবে যে, যেসব বক্তব্য হেদায়েতের উপকরণ হতো, সেগুলো রদবদল, বিকৃতি ও গোপন করা শুরু হয়ে গেল। তাফসীরবিদগণ এ উভয় দিকের কথাই বলেছেন।

قَوْلُهُ نِعْمَةَ اللّٰهِ : আল্লাহর নিয়ামত ব্যাপক অর্থে পার্থিব-অপার্থিব ও ধর্মীয় তথা সর্ববিধ নিয়ামতকে বুঝায়। এখানে যে কোনো নিয়ামতের বিকৃতি সাধনে কঠিন শাস্তির হুমকি উচ্চারিত হয়েছে। এখন ধর্মীয় নিয়ামতসমূহ যথা– আল্লাহর কিতাব বা নবীগণের আবির্ভাবের প্রকাশ ইত্যাদির বিকৃতি বা অস্বীকৃতি-অকৃতজ্ঞতায় আখিরাতে শাস্তির বিষয়টি সপ্রকাশ। তবে নিয়ামত পার্থিব হওয়ার ক্ষেত্রে যথা– স্বাস্থ্য, সম্পদ, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ইত্যাদির প্রতি অকৃতজ্ঞ আচরণ ও এগুলোর অপব্যবহারের মাসুল অসুস্থতা, ব্যর্থতা, অবমাননা, দারিদ্র্য, দেউলিয়াত্বের রূপে ভোগ করাও প্রত্যক্ষ বিষয়। –[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ لِاَنَّهَا سَبَبُ الْهِدَايَةِ : এখানে سَبَبْ বলে مُسَبَّبْ উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আয়াত যেহেতু হেদায়েতের কারণ এবং হেদায়েত হলো সবচেয়ে বড় নিয়ামত, তাই سَبَبْ বলে مُسَبَّبْ উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ : এর অর্থ– কঠিন শাস্তি। অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশাবলিতে পরিবর্তনের শাস্তি কঠোর। তাকে ইহজীবনে হত্যা করা হয়, তার অর্থসম্পদ লুণ্ঠিত হয় অথবা জিজিয়া আদায় করে লাঞ্ছনার জীবনযাপনে সে বাধ্য হয়। আর কিয়ামতে স্থায়ী জাহান্নামে প্রবেশ তো আছেই।

قَوْلُهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ لَهُ : প্রশ্ন জাগে এখানে لَهُ উহ্য ধরার প্রয়োজন কি? **উত্তর :** مَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ হলো مُبْتَدَأْ আর فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ জুমলা হয়ে খবর। অথচ খবর যখন জুমলা হয়, তখন তার একটি عَائِدْ থাকা জরুরি। এখানে لَهُ উহ্য ধরে সেই عَائِدْ مَحْذُوْف -এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। –[জামালাইন খ. ১, পৃ. ৩২৮]

অনুবাদ :

٢١٢. زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا بِالتَّمْوِيْهِ فَاَحَبُّوْهَا وَ هُمْ يَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِفَقْرِهِمْ كَعَمَّارٍ وَبِلَالٍ وَصُهَيْبٍ اَىْ يَسْتَهْزِءُوْنَ بِهِمْ وَيَتَعَالَوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْمَالِ وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا الشِّرْكَ وَهُمْ هٰؤُلَاءِ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ اَىْ رِزْقًا وَاسِعًا فِى الْاٰخِرَةِ اَوْ الدُّنْيَا بِاَنْ يُمَلِّكَ الْمَسْخُوْرَ مِنْهُمْ اَمْوَالَ السَّاخِرِيْنَ وَرِقَابَهُمْ ـ

২১২. মক্কাবাসীদের মধ্যে যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের নিকট পার্থিব জীবন সুশোভিত করায় তা সুসজ্জিত। ফলে তারা তাকে ভালোবাসে। তারা মুসলিমগণকে যেমন– আম্মার, বিলাল, সুহায়ব, প্রমুখকে দরিদ্রতার কারণে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তাদেরকে তারা উপহাস করে এবং অর্থসম্পদের অহংকার প্রদর্শন করে। আর যারা শিরক হতে সাবধান হয়ে চলে এ দরিদ্র মু'মিনগণও হলেন এরূপ কিয়ামদের দিন তারা তাদের ঊর্ধ্বে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন পরকালে তিনি প্রচুর রিজিক দান করবেন বা ইহজগতেই তিনি তাদেরকে তা দান করবেন। যেমন এই উপহাসকৃতরা একদিন উপহাসকারীদের ধন-সম্পদ ও গর্দানের [জানের] মালিক-মোক্তার হবে।

তাহকীক ও তারকীব

زُيِّنَ : সুসজ্জিত করা হয়েছে। اَلتَّمْوِيْهُ : اَىْ اَلزَّخْرَفَةُ وَالْبَهْجَةُ অর্থ– চাকচিক্য, ঔজ্জ্বল্য। فَاَحَبُّوْهَا : ফলে তারা তাকে ভালোবেসেছে। يَسْخَرُوْنَ : ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। يتعالون : অহংকার প্রদর্শন করে। اَلْمَسْخُوْرَ مِنْهُمْ : উপহাসকৃত। اَلسَّاخِرِيْنَ : উপহাসকারী। رِقَابٌ : رَقَبَةٌ -এর বহুবচন অর্থ– গর্দান, জান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا : [পার্থিব জীবন ও তার উপকরণ জাঁকজমক, বাগ-বাগিচা, ভবন-প্রাসাদ, মোটরকার, রেডিও, টিভি, শোরুম, সোফাসেট, ফার্নিচার ইত্যাদির অস্থায়ী ও ক্ষয়িষ্ণু হওয়া সত্ত্বেও তাদের দৃষ্টিতে অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মান-মর্যাদার মানদণ্ডসূচক পরিগণিত হয় এবং এগুলোর প্রতি তাদের মনে বিশেষ আকর্ষণ অনুভূত হয়।] যারা কাফের, তারা এ পার্থিব জীবনের বস্তুতান্ত্রিক ও জড়জ স্বাদ উপভোগে সম্পদের মোহ ও বিলাস বিনোদনে নিমগ্ন থাকে। এগুলোকেই গুরুত্বপূর্ণ মনে করে এরই মানদণ্ডে সবকিছুর পরিমাপ করে। মূলত ওদের দৃষ্টিসীমা অতি সংকীর্ণ ও সীমিত। ওরা নামমাত্র আয়েশ-আরামের পেছনে পড়ে চিরন্তন আয়েশ ও অক্ষয় অফুরন্ত সুখভোগকে বিসর্জন দিতে থাকে। –[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ : আল্লাহ তাদের জবাবে বলেন, তারা যে দুনিয়ার মাঝে এতটা মতোয়ারা এটা তাদের চরম মূর্খতা এবং ভ্রান্ত চিন্তা-চেতনার বতিহঃপ্রকাশ। তারা জানে না এই দীন-দরিদ্ররাই কিয়ামতের দিন তাদের ঊর্ধ্বে থাকবে। অর্থাৎ সম্মান ও মর্যাদার স্তরে তাদের চেয়ে হাজার হাজার গুণ ঊর্ধ্বে ও অগ্রে অবস্থান করবে। কেননা সেদিন সবকিছুর তত্ত্ব ও বাস্তবতা উন্মোচিত হয়ে যাবে। মু'মিনদের অবস্থান হবে ইল্লিয়্যীন-এ আর ওরা পড়ে থাকবে পৃথিবীর অতল তলে আসফালুস সাফিলীন [সিজ্জীন]-এ। –[তাফসীরে উসমানী : তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا : অর্থাৎ যারা শিরক হতে সাবধান হয়ে চলে তথা দরিদ্র মু'মিনগণ।

قَوْلُهُ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ : আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা ইহকাল ও পরকালে অপরিমিত রিজিক দান করেন। কাজেই যে দরিদ্রদের নিয়ে কাফেররা হাসি-ঠাট্টারত আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেই বনূ কুরাইযা ও বনূ নাযীরের ধনসম্পত্তি এবং রোম-পারস্যের অধিকারী করেন। –[তাফসীরে উসমানী]

অনুবাদ :

٢١٣. كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً عَلَى الْإِيْمَانِ فَاخْتَلَفُوْا بِأَنْ اٰمَنَ بَعْضٌ وَكَفَرَ بَعْضٌ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ اِلَيْهِمْ مُبَشِّرِيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِالْجَنَّةِ مُنْذِرِيْنَ مَنْ كَفَرَ بِالنَّارِ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِمَعْنَى الْكُتُبِ بِالْحَقِّ مُتَعَلِّقٌ بِاَنْزَلَ لِيَحْكُمَ بِهٖ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الدِّيْنِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اَىِ الدِّيْنِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ اَىِ الْكِتٰبَ فَاٰمَنَ بَعْضٌ وَكَفَرَ بَعْضٌ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ الْحُجَجُ الظَّاهِرَةُ عَلَى التَّوْحِيْدِ وَمِنْ مُتَعَلِّقَةٌ بِاخْتَلَفَ وَهِىَ وَمَا بَعْدَهَا مُقَدَّمٌ عَلَى الْاِسْتِثْنَاءِ فِى الْمَعْنٰى بَغْيًا مِنَ الْكٰفِرِيْنَ بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنْ لِلْبَيَانِ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ بِاِرَادَتِهٖ وَاللّٰهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاۤءُ هِدَايَتَهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ الطَّرِيْقِ الْحَقِّ .

২১৩. মানুষ এক মতাদর্শী ছিল অর্থাৎ সকলেই ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। অনন্তর তারা মতবিরোধিতার সৃষ্টি করে কেউ কেউ ঈমান আনয়ন করল আর কেউ কেউ সত্য প্রত্যাখ্যান করল। অতঃপর আল্লাহ তাদের প্রতি নবীগণকে মু'মিনদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদদাতা ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য জাহান্নামের ভয় প্রদর্শক রূপে প্রেরণ করেন এবং তাদের সাথে সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেন।

اَلْكِتٰبُ এটা একবচন হলেও এ স্থানে اَلْكُتُبُ বহুবচনের অর্থে ব্যবহৃত। بِالْحَقِّ এটা اَنْزَلَ ক্রিয়ার مُتَعَلِّقٌ বা তার সাথে সংশ্লিষ্ট।

মানুষের মধ্যে যে বিষয়ে যে ধর্ম বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল এতদ্বারা তার মীমাংসার জন্য এবং যাদেরকে কিতাব দেওয়ার হয়েছিল স্পষ্ট নিদর্শন তাওহীদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল প্রমাণাদি তাদের নিকট আসার পর مِنْ بَعْدِ এটা اِخْتَلَفَ ক্রিয়ার সাথে مُتَعَلِّقٌ অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট। এটা (مِنْ) এবং তৎপরবর্তী শব্দসমূহ অর্থগত দিক থেকে اِلَّا এই اِسْتِثْنَاءٌ বা ব্যত্যয়ের পূর্ববর্তী বলে বিবেচ্য। তারা কাফেররা পরস্পর বিদ্বেষ ও জেদবশত তাতে ধর্মে মতবিভেদ সৃষ্টি করে অনন্তর কেউ কেউ ঈমান আনয়ন করে, আর কেউ কেউ সত্য প্রত্যাখ্যান করে। যারা ঈমান আনয়ন করে তারা যে বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করে, আল্লাহ তাদেরকে সে বিষয়ে নিজ অনুমোদনে নিজ ইচ্ছায় সত্য পথে পরিচালিত করেন। مِنَ الْحَقِّ -এর مِنْ টি بَيَانِيَّةٌ বা বিবরণমূলক। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অর্থাৎ যার হেদায়েতের ইচ্ছা করেন, তাকে সরল পথে সত্য পথে পরিচালিত করেন।

তাহকীক ও তারকীব

وَمِنْ مُتَعَلِّقَةٌ بِاخْتَلَفَ অর্থাৎ مِنْ بَعْدِ -এর তা'আল্লুক হলো اِخْتَلَفَ -এর সাথে।

قَوْلُهُ وَهِىَ وَمَا بَعْدَهَا مُقَدَّمٌ عَلَى الْاِسْتِثْنَاءِ فِى الْمَعْنٰى : এখানে একটি প্রসিদ্ধ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। **প্রশ্ন :** একটি حَرْفُ اِسْتِثْنَاءٌ -এর মাধ্যমে একাধিক اِسْتِثْنَاءٌ সঠিক নয়। অথচ এখানে এ সুরতটিই সংঘটিত হয়েছে। কেননা وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ হলো مُسْتَثْنٰى مِنْهُ আর اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ হলো مُسْتَثْنٰى اَوَّلٌ এবং مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمْ হলো مُسْتَثْنٰى ثَانِىْ -

উত্তর. مِنْ এবং তৎপরবর্তী শব্দসমূহ তথা مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ **অর্থগত দিক থেকে** اِلَّا **তথা** اِسْتِثْنَاءٌ -এর পূর্ববর্তী বলে বিবেচ্য। সুতরাং اِسْتِثْنَاءٌ সঠিক হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً **আয়াতের সারমর্ম :** হযরত আদম (আ.) **থেকে কিছুকাল যাবৎ একই দীন চলে আসছিল।** তারপর তার বংশধরগণ দীন নিয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি করে। **তখন আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূল প্রেরণ করেন। তাঁরা মু'মিন ও** অনুগতদেরকে ছওয়াবের সুসংবাদ দিতেন **এবং কাফের ও অবাধ্যদেরকে শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করতেন। তাদের সঙ্গে সত্য** কিতাবও অবতীর্ণ করা হয়, যাতে **মানুষের মতবিরোধ ও কলহের নিরসন হয় এবং তাদের সে মতবিরোধ হতে সত্য দীন** নিরাপদ ও প্রতিষ্ঠিত থাকে। তারপর আল্লাহ তা'আলার বিধি-নিষেধ সম্পর্কে মতভেদ সেসব লোকই সৃষ্টি করে, যারা সে কিতাবসমূহ লাভ করেছিল। যেমন– ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় তাওরাত ও ইঞ্জীল নিয়ে মতভেদ ও তাতে বিকৃতি সাধন করেছিল। তাদের সে মতভেদ অজ্ঞতাপ্রসূত ছিল না; বরং জ্ঞাতসারেই কেবল দুনিয়ার ভালোবাসা এবং হিংসা-বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে তারা তাতে লিপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে মু'মিনদেরকে সত্য-সঠিক পথ দেখান এবং বিভ্রান্তিকর মতবিরোধ হতে তাদেরকে রক্ষা করেন। –[তাফসীরে উসমানী]

একটি ভ্রান্তির নিরসন : কতিপয় মূর্খ নিজেদের অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে ধর্মের ইতিহাস সংকলন করে বলে যে, মানুষ তার জীবন শুরু করেছে শিরকের অন্ধকার দ্বারা। তারপর ক্রমোন্নোতির মাধ্যমে এ অন্ধকার বিদূরিত হয়ে আলোর বৃদ্ধি ঘটেছে। এমনিভাবে মানুষ একত্ববাদে উপনীত হয়েছে। পক্ষান্তরে কুরআন বলে, পৃথিবীতে মানুষের সূচনা ঘটেছে আলোর মধ্যেই। আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম যে মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন তাকে বাতলে দিয়েছিলেন, তার জন্য সঠিক রাস্তা কোনটি এবং এ পৃথিবীর হাকিকত ও স্বরূপ কতটুকু, এরপর দীর্ঘকাল পর্যন্ত আদম জাতি সঠিক পথে অবিচল ছিল এবং একই উম্মত ছিল। এরপর মানুষ নিত্য নতুন পথের উন্মেষ ঘটাতে লাগল। বিভিন্ন পন্থা আবিষ্কার করতে শুরু করল। তাদের এ কর্মকাণ্ড এ কারণে নয় যে, তাদের সামনে হক বিষয়টি প্রকাশ করা হয়নি; বরং তারা হক জানা সত্ত্বেও এবং কিছু মানুষ তাদের বৈধ অধিকার থেকে অগ্রসর হয়ে আরো বেশি লাভ ও উপকারিতা অর্জন করতে চেয়েছিল। ফলে পরস্পরের উপর জুলুম নির্যাতন করতে শুরু করল। এ খারাবি দূর করার জন্য বিভিন্ন নবীর আবির্ভাব ঘটানো শুরু করল। নবীদেরকে এজন্য প্রেরণ করা হয়নি যে, প্রত্যেকে নিজের নামের উপর একটি নতুন উম্মত গড়বেন এবং নতুন ধর্মের গোড়াপত্তন করবেন; বরং তাদের প্রেরণের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তাদের সামনে তাদের হারানো পথকে সুস্পষ্ট করে পুনরায় তাদেরকে একই উম্মতে পরিণত করবেন। –[জামালাইন]

٢١٤. وَنَزَلَ فِىْ جَهْدٍ اَصَابَ الْمُسْلِمِيْنَ اَمْ بَلْ اَ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا لَمْ يَأْتِكُمْ مَثَلُ شِبْهُ مَا اَتٰى الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ الْمِحَنِ فَتَصْبِرُوْا كَمَا صَبَرُوْا مَسَّتْهُمْ جُمْلَةٌ مُسْتَاْنِفَةٌ مُبَيِّنَةٌ لِمَا قَبْلَهَا الْبَاْسَآءُ شِدَّةُ الْفَقْرِ وَالضَّرَّاءُ الْمَرَضُ وَزُلْزِلُوْا اُزْعِجُوْا بِاَنْوَاعِ الْبَلَاءِ حَتّٰى يَقُوْلَ بِالنَّصْبِ وَالرَّفْعِ اَىْ قَالَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ اِسْتِبْطَاءً لِلنَّصْرِ لِتَنَاهِى الشِّدَّةِ عَلَيْهِمْ مَتٰى يَاْتِىْ نَصْرُ اللّٰهِ الَّذِىْ وَعَدْنَاهُ فَاُجِيْبُوْا مِنْ قِبَلِ اللّٰهِ اَلَاۤ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ اِتْيَانُهٗ.

অনুবাদ :

২১৪. মুসলিমগণ কাফিরদের হাতে যে কষ্ট ও নিপীড়ন ভোগ করেন এতদসম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন– তোমরা কি মনে কর তোমারা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ তোমাদের নিকট তোমাদের পূর্ববর্তীদের অর্থাৎ পূর্বের মু'মিনগণ যে পরিশ্রম ও কষ্ট ভোগ করেছে তদ্রূপ অবস্থা আসেনি। সুতরাং তারা যেরূপ ধৈর্যধারণ করেছিল তোমরাও অনুরূপ ধৈর্যধারণ কর। তাদেরকে স্পর্শ করেছিল সংকট مَسَّتْهُمْ এ বাক্যটি পূর্ববর্তী বিষয়টির বিবরণমূলক مُسْتَاْنِفَةٌ বা নববাক্য। ভীষণ অভাব ও দুঃখ পীড়া এবং তারা প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল বিভিন্ন ধরনের বিপদ-আপদে তারা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল; [এমনকি] বিপদ ও কষ্টের চূড়ান্ত ক্ষণেও সাহায্য আসতে বিলম্ব দেখে রাসূল ও তাঁর সাথে মু'মিনগণ পর্যন্ত বলছিল حَتّٰى يَقُوْلَ ক্রিয়াটি رَفْع ও نَصْب উভয় রূপে পাঠ করা যায়। আর এটা مَاضِى বা অতীতকাল অর্থে এ স্থানে ব্যবহৃত। বলে উঠেছিল, আমাদের সাথে যে সাহায্যের ওয়াদা করা হয়েছে সেই আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে? অনন্তর আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের প্রত্যুত্তর হলো হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য অর্থাৎ তার আগমন অতি নিকটে।

তাহকীক ও তারকীব

جَهْدٌ : কষ্ট ও নিপীড়ন। اَصَابَ : আক্রান্ত করেছে। اَلْاِصَابَةُ পৌঁছা, আঘাত হানা। مَثَلٌ : যেরূপ, উপমা। اَلَّذِيْنَ خَلَوْا : পূর্ববর্তী, যারা অতীত হয়েছেন। خَلَوْا (ن) خَلٰى : খালি হওয়া, আক্রান্ত হওয়া। اَلْمِحَنُ : পরিশ্রম ও কষ্ট, مِحْنَةٌ -এর বহুবচন। مَسَّتْهُمْ : তাদেরকে স্পর্শ করেছিল। مَسًّا (ن) مَسٰى অর্থ– স্পর্শ করা। اَلْبَاْسَآءُ : ভীষণ অভাব। اَلضَّرَّاءُ : পীড়া, অসুখ-বিসুখ। زُلْزِلُوْا : مَاضِىْ مَجْهُوْل جَمْعُ مُذَكَّرٍ غَائِبٍ -এর সীগাহ (فَعْلَلَةٌ) اَلزَّلْزَلَةُ অর্থ– প্রকম্পিত করা। اُزْعِجُوْا : مَاضِىْ مَجْهُوْل جَمْعُ مُذَكَّرٍ غَائِبٍ -এর সীগাহ, اَلْاِزْعَاجُ অর্থ– হেলিয়ে দেওয়া। اَنْوَاعٌ : نَوْعٌ -এর বহুবচন, অর্থ– ধরন, প্রকার। اِسْتِبْطَاءً : বিলম্ব দেখে। لِتَنَاهِى الشِّدَّةِ : বিপদ ও কষ্টের চূড়ান্ত সময়ে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا لَمْ يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ : অর্থাৎ তোমরা কি মনে করেছ যে, এমনিতে বেহেশতে প্রবেশ করবে? তোমাদের উপর ঐ সকল বিষয় অতিবাহিত হবে না, যা প্রথম ঈমান গ্রহণকারীদের উপর অতিবাহিত হয়েছে।

শানে নুযূল : আব্দুর রাযযাক, ইবনে জারীর এবং ইবনে মুনযির (র.) কাতাদা (র.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, উক্ত আয়াত খন্দক যুদ্ধের সময় নাজিল হয়েছে। এর উদ্দেশ্য রাসূল ﷺ -এবং সাহাবায়ে কেরামকে সান্ত্বনা প্রদান করা।

গযওয়ায়ে আহযাব বা খন্দক যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : বিশুদ্ধ বর্ণনামতে ৫ম হিজরি সনে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত আবূ সুফিয়ান (রা.) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে দশ হাজার মুশরিকদের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মদিনায় আক্রমণ করেন। এ যুদ্ধে মুসলমানগণ অত্যধিক কষ্টের সম্মুখীন হন। এমনিতেই ছিলেন সহায়-সম্বলহীন সেই সাথে প্রচণ্ড শীতের ঋতু ছিল এবং মোকাবেলা ছিল দশ হাজার সুসজ্জিত যুদ্ধে পারদর্শী ব্যক্তিদের সাথে। এ কারণে মুসলমানগণ অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাদের নৈরাশ্যের অবস্থা এমন ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সান্ত্বনা প্রদানের জন্য ইরশাদ করলেন, তোমরা কি জান্নাতে প্রবেশ করাকে সহজ ভাবছ? তোমাদের পূর্বে যে সকল নবী এবং তাঁদের অনুসারীগণ অতিবাহিত হয়েছে, তাঁদের দুঃখকষ্টের কথা স্মরণ কর তাহলে তোমাদের নিজেদের কষ্টের অনুভব লাঘব হবে। পূর্বে এমন ঘটনা ঘটেছে যে, দীনের অনুসারীদের মাথার উপর করাত রেখে শরীরকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে। লোহার আংটা দ্বারা তাঁদের শরীর থেকে গোশত তুলে ফেলা হয়েছে। কিন্তু এসব জুলুম-অত্যাচার তাদেরকে ধর্ম থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। অতএব তাঁরা যেরূপ ধৈর্য ধারণ করেছে, তোমরাও তদ্রূপ ধৈর্যধারণ কর। অচিরেই আল্লাহর সাহায্য আসবে। রাসূল ﷺ -এর উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি করা এবং তাঁদেরকে অটল ও অবিচল রাখা। তিনি ইরশাদ করলেন, অচিরেই এমন সময় আসছে যে, একজন আরোহী একাকী সান'আ থেকে 'হাজারা মাউত' ভ্রমণ করবে– সে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় পাবে না। –[জামালাইন]

আয়াতের শিক্ষা : মু'মিনগণকে আল্লাহর সাহায্যের মুখাপেক্ষী হতে হবে এবং ধৈর্যধারণ করতে হবে। কেননা সব যুগেই আম্বিয়ায়ে কেরাম ও তাঁদের উম্মত শত্রুদের হাতে নিদারুণভাবে উৎপীড়িত হয়েছেন। সুতরাং পার্থিব জীবনের দুঃখকষ্ট ও শত্রুদের দাপট দেখে ঘাবড়ানো যাবে না।

قَوْلُهُ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ : অর্থাৎ মানবিক সীমাবদ্ধতার কারণে অস্থির হয়ে তাদের মুখ হতে এই নৈরাশ্যজনক কথা বের হয়ে গিয়েছিল। নবী ও মু'মিনগণের এ উক্তি কোনো সন্দেহপ্রসূত ছিল না। এতে তাদের প্রতি কোনো আপত্তি জাগতে পারে না। –[তাফসীরে উসমানী]

২১৫. يَسْئَلُوْنَكَ يَا مُحَمَّدُ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ اَىْ اَلَّذِىْ يُنْفِقُوْنَهُ وَالسَّائِلُ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوْحِ وَكَانَ شَيْخًا ذَا مَالٍ فَسَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ عَمَّا يُنْفِقُ وَعَلٰى مَنْ يُنْفِقُ قُلْ لَهُمْ مَاۤ اَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ بَيَانٌ لِمَا شَامِلٌ لِلْقَلِيْلِ وَالْكَثِيْرِ وَفِيْهِ بَيَانُ الْمُنْفَقِ اَلَّذِىْ هُوَ اَحَدُ شِقَّىِ السُّؤَالِ وَاَجَابَ عَنِ الْمَصْرَفِ اَلَّذِىْ هُوَ الشِّقُّ الْاٰخَرُ بِقَوْلِهِ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ اَىْ هُمْ اَوْلٰى بِهِ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ اِنْفَاقٍ وَغَيْرِهِ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيْمٌ فَمُجَازٍ عَلَيْهِ ـ

অনুবাদ :

২১৫ হে মুহাম্মদ! লোকেরা তোমাকে প্রশ্ন করে যে, তারা কি ব্যয় করবে? এ প্রশ্নকর্তা হলেন আমর ইবনে জামূহ। তিনি ছিলেন একজন সম্পদশালী বৃদ্ধ। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে প্রশ্ন করেছিলেন যে, কি এবং কার উপর তিনি অর্থ ব্যয় করবেন? বল, যে ধনসম্পদ ব্যয় করবে مِنْ خَيْرٍ -এটা مَاذَا يُنْفِقُوْنَ -এর مَا -এর بَيَانٌ বা বিবরণ। কম বা বেশি সকল পরিমাণ সম্পদই এর অন্তর্ভুক্ত। এতে প্রশ্নের একটি অংশ অর্থাৎ কি ব্যয় করবে তার বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ مَصْرَفٌ অর্থাৎ কাকে দেবে তার বর্ণনা সন্নিবেশিত হলো পরবর্তী فَلِلْوَالِدَيْنِ বাক্যটিতে। তা পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্ত এবং মুসাফিরদের জন্য। অর্থাৎ তারা তা পাওয়ার অধিক যোগ্য। উত্তম ব্যয় বা অন্য কিছু যা কিছু কর নিশ্চয় আল্লাহ সে সম্বন্ধে অবহিত। অনন্তর তিনি প্রতিফল দান করবেন।

তাহকীক ও তারকীব

عَمَّا يُنْفِقُ : কি খরচ করবেন। عَلٰى مَنْ يُنْفِقُ : কার উপর খরচ করবেন। شَامِلٌ : অন্তর্ভুক্তকারী।
بَيَانُ الْمُنْفَقِ : কি ব্যয় করবে তার বিবরণ। شِقَّىِ : شِقٌّ -এর দ্বিবচন। অর্থ- অংশ। اَلْمَصْرَفُ : ব্যয়ের খাত।
اِبْنُ السَّبِيْلِ: পথের ছেলে, মুসাফির।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতগুলোতে মৌলিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে কুফর ও মুনাফিকী ছেড়ে ইসলামে সর্বাত্মকভাবে দাখিল হওয়ার কথা বলা হয়েছিল। তারপর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য জান-মাল খরচ ও সর্বপ্রকার দুঃখকষ্টে ধৈর্যধারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এবারে সে মূলনীতির অন্তর্গত শাখা-প্রশাখা বিবৃত হয়েছে যা জান-মাল, বিবাহ, তালাক ইত্যাদি বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। উদ্দেশ্য উক্ত মূলনীতির বিশদ ব্যাখ্যা ও গুরুত্ব অন্তরে বদ্ধমূল করে তোলা । -[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ : এসব লোক আপনার নিকট প্রশ্ন করে যে, তারা কি খরচ করবে? একই প্রশ্ন এ রুকূ'তেই দু আয়াত পরে হুবহু উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ একই প্রশ্নের উত্তর দু আয়াতে কিছুটা ভিন্নতার সাথে প্রদান করা হয়েছে। প্রথমে একটি বিষয় জানা জরুরি যে, কিসের ভিত্তি করে একই প্রশ্নের ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দেওয়া হয়েছে। এর রহস্য, ঘটনা এবং পরিস্থিতির উপর চিন্তাভাবনা করলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কি প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। উক্ত আয়াতের শানে নুযূল হচ্ছে- হযরত ওমর ইবনে জামূহ (রা.) রাসূল ﷺ -এর নিকট প্রশ্ন করেছিলেন আমরা আমাদের সম্পদ থেকে কি খরচ করব এবং কোথায় খরচ করব? -[ইবনে মুনযির, তাফসীরে মাযহারী]

ইবনে জারীর (র.) -এর বর্ণনা মতে এ প্রশ্ন শুধু ইবনে জামূহ -এর নয়; বরং সাধারণ মুসলমানদেরও ছিল। এ প্রশ্নের দুটি অংশ রয়েছে- ক. আমাদের সম্পদ থেকে কি এবং কতটুকু খরচ করব? খ. কাদের জন্য খরচ করব?

দ্বিতীয় আয়াত যা পরবর্তীতে আসছে তাও এ প্রশ্ন সংবলিত। ইবনে আবী হাতিমের বর্ণনা মতে তার শানে নুযূল হলো, যখন কুরআনে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেওয়া হলো তোমরা আল্লাহর রাস্তায় তোমাদের সম্পদ খরচ কর, তখন কতিপয় সাহাবী রাসূল ﷺ -এর দরবারে নিবেদন করলেন, আমাদের উপর আল্লাহর পথে ব্যয়ের যে নির্দেশ রয়েছে, আমরা তার ব্যাখ্যা জানতে চাই, কোন ধরনের সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করব? এ প্রশ্নে কেবল একটি বিষয় রয়েছে অর্থাৎ কি ব্যয় করবে? ফলে উভয় প্রশ্নের ধরনের মধ্যে কিছুটা ভিন্নতা ঘটল। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে যা বলা হয়েছে তার দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ কোথায় খরচ করবে? সেটি অধিক গুরুত্ব দিয়ে তার উত্তরটি স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ কি খরচ করবে এর উত্তর অস্পষ্টভাবে দেওয়াকে যথেষ্ট মনে করা হয়েছে।

اَلَّذِىْ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, ذَا ইসমে ইশারা নয়; বরং ইসমে মওসূল। অর্থাৎ ذَا -এর তাফসীর হলো– اَلَّذِىْ টি مَا এর তাফসীর নয়। وَعَلٰى مَنْ يُنْفِقُ এ বাক্য উহ্য মানার উদ্দেশ্য হলো নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া।

প্রশ্ন: ওমর ইবনে জামূহ -এর প্রশ্ন অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলার উত্তর হয়নি। কারণ প্রশ্ন ছিল কি খরচ করবে সে সম্পর্কে, কার উপর খরচ করবে সে সম্পর্কে নয়। অথচ আল্লাহ তা'আলা فَلِلْوَالِدَيْنِ বলে ব্যয়ের খাত বর্ণনা করেছেন। অথচ এটা জিজ্ঞাসা ছিল না।

উত্তর : উভয় ব্যাপারেই প্রশ্ন ছিল, তবে সংক্ষিপ্ততার প্রতি লক্ষ্য রাখার কারণে আয়াতে উল্লিখিত প্রশ্নে ব্যয়ের খাত উল্লেখ করা হয়নি। উত্তর দ্বারা প্রশ্ন বুঝা যাবে এ লক্ষ্যে তা বিলুপ্ত করা হয়েছে। مِنْ خَيْرٍ হলো مَا -এর বর্ণনা যা কমবেশি উভয়কে শামিল করে। এর মধ্যে ইঙ্গিতস্বরূপ ব্যয়ের খাতের বর্ণনা রয়েছে। তা হলো প্রশ্নের দুটি শাখার একটি। আর فَلِلْوَالِدَيْنِ হলো খাতের বর্ণনা যা প্রশ্নের দ্বিতীয় শাখা। প্রশ্নে যে বিষয়টি স্পষ্ট উল্লেখ ছিল مَآ اَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ দ্বারা ইঙ্গিতস্বরূপ তার উত্তর দিয়েছেন। আর প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ যা বিলুপ্ত ছিল فَلِلْوَالِدَيْنِ দ্বারা স্পষ্ট আকারে তার উত্তর দিয়েছেন। ব্যয়ের খাত তথা কাদের উপর খরচ করবে, এ বিষয়টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কি খরচ করবে এবং কতটুকু খরচ করবে তা মানুষের অবস্থা ও সঠিক চিন্তার উপর মওকুফ থাকে। অবশ্য কাদের উপর খরচ করবে, এটা জানাই অধিক জরুরি, যাতে সম্পদ অপাত্রে ব্যয় না হয়। কারণ এতে সম্পদ বিনষ্ট করা হবে, উপরন্তু ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হতে হবে।

قَوْلُهُ فَلِلْوَالِدَيْنِ الخ : উৎকৃষ্ট ব্যয় খাতের তালিকাটি কত বিস্তৃত এবং তার ক্রমধারা কত হিকমতপূর্ণ তা অনুধাবনযোগ্য। মানুষের উপর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হক বা অধিকার হলো মাতাপিতার হক। সর্বপ্রথম সম্পদ দ্বারা মাতাপিতার সেবা করতে হবে। এরপর অন্যান্য আত্মীয়স্বজন। এর মধ্যে ভাই-বোন, চাচা-ফুফু সবই এসে গেল। শরিয়ত বংশগত সম্বন্ধকে যে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে, এ ব্যাপারে এ আয়াতটি সুস্পষ্ট প্রমাণ। এদের পরে উম্মতের ঐ সকল মানুষের অধিকার রয়েছে, যারা বেঁচে থাকার সর্বাধিক আশ্রয়স্থল তথা পিতামাতার স্নেহছায়া থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তারপর আল্লাহর ঐ সকল বান্দা, যারা কোনো প্রকার অক্ষমতার দরুন আয়-রোজগার থেকে বঞ্চিত রয়েছে কিংবা বঞ্চিতের নিকটবর্তী হয়েছে। অর্থাৎ যারা তাদের প্রয়োজনাদি পূর্ণ করার জন্য অন্যের সহায়তার মুখাপেক্ষী। সর্বশেষ খাত হলো ঐ সকল সাধারণ জনগণ যারা জন্মভূমি থেকে দূরে অবস্থানের কারণে সাময়িকভাবে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। নিকটতম এবং দূরসম্পর্কীয়, এভাবে ধর্মীয় সম্বন্ধ রাখে এমন ব্যক্তিবর্গ সবাই নিজ নিজ স্থানে কত সুন্দরভাবে একই সূত্রে গ্রথিত হয়েছে! শরিয়তের উদ্দেশ্য আদৌ এমন নয় যে, আমার প্রতিবেশী, ভাইবোন অনাহারে ছটফট করবে, আর আমরা তার প্রতি উদাসীন হয়ে চীন জাপানে দাতার রিলিফ তালিকায় নাম লেখাব।

قَوْلُهُ هُمْ اَوْلٰى بِهٖ : এতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, উল্লিখিত ব্যয়ের খাতসমূহ উত্তম হওয়ার দিক দিয়ে, নতুবা ব্যয়ের খাত এগুলোর মধ্যে সীমিত নয়। এসব ছাড়া ভিন্ন খাতেও ব্যয় করতে পারে। এর দ্বারা এ বিষয়টি বুঝা গেল যে, لِلْوَالِدَيْنِ -এর لَامْ অব্যয়টি اِخْتِصَاصْ -এর জন্য নয়।

قَوْلُهُ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ : এখানে خَيْر তথা মঙ্গল শব্দটি ব্যাপকতা সম্পন্ন। শারীরিক, আর্থিক, ক্ষুদ্র-বৃহৎ সর্বপ্রকার এবং সর্বস্তরের সৎকাজকে তা অন্তর্ভুক্ত করে। এর সম্বন্ধ শুধু ব্যয় করার সাথে নয়; বরং সকল প্রকার কাজকর্মের সাথে। এ অর্থে শব্দটি অনেক ব্যাপক।

অনুবাদ :

٢١٦. كُتِبَ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ لِلْكُفَّارِ وَهُوَ كُرْهٌ مَكْرُوهٌ لَكُمْ طَبْعًا لِمُشَقَّتِهِ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ لِمَيْلِ النَّفْسِ إِلَى الشَّهَوَاتِ الْمُوْجِبَةِ لِهَلَاكِهَا وَنُفُورِهَا عَنِ التَّكْلِيفَاتِ الْمُوْجِبَةِ لِسَعَادَتِهَا فَلَعَلَّ لَكُمْ فِي الْقِتَالِ وَإِنْ كَرِهْتُمُوهُ خَيْرًا لِأَنَّ فِيهِ إِمَّا الظَّفَرَ وَالْغَنِيمَةَ أَوِ الشَّهَادَةَ وَالْأَجْرَ وَفِي تَرْكِهِ وَإِنْ أَحْبَبْتُمُوهُ شَرًّا لِأَنَّ فِيهِ الذُّلَّ وَالْفَقْرَ وَحِرْمَانَ الْأَجْرِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ذٰلِكَ فَبَادِرُوا إِلَى مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ.

২১৬. তোমাদের উপর কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিধান দেওয়া হলো তা ফরজ করা হলো যদিও স্বভাবগতভাবে তা কষ্টকর বলে অপ্রিয় অপছন্দনীয়। কিন্তু তোমাদের নিকট যা অপ্রিয়, হতে পারে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর তোমাদের নিকট যা প্রিয়, হতে পারে তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। মানুষের মন প্রবৃত্তির অনুসরণের প্রতি অনুরক্ত অথচ তা ধ্বংসের কারণ এবং তা [নফস] কষ্টবরণ করা হতে পালায়নপর অথচ তা-ই [কষ্টবরণ] সৌভাগ্যের চাবিকাঠি বলে বিবেচ্য। সুতরাং যুদ্ধ, যদিও তা তোমাদের নিকট অপ্রিয় তাতে বহুবিধ কল্যাণ নিহিত থাকতে পারে। কেননা তাতে রয়েছে বিজয় ও গনিমতলব্ধ সম্পদ। আর তা না হলে রয়েছে শাহাদাত ও পুণ্যময় প্রতিদান। পক্ষান্তরে তা [যুদ্ধ] ত্যাগ করায় রয়েছে লাঞ্ছনা, দারিদ্র্য ও পুণ্যফল হতে বঞ্চনা, যদিও তোমাদের নিকট তা অর্থাৎ জেহাদ পরিত্যাগ করা বড় প্রিয়।

তোমাদের জন্য কি কল্যাণকর তা আল্লাহ জানেন, তোমরা তা জান না। সুতরাং তিনি তোমাদের যে বিষয়ের নির্দেশ দেন সেই দিকে তোমরা ধাবমান হও।

তাহকীক ও তারকীব

كُتِبَ عَلَيْكُمْ : তোমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে। كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ شَيْئًا - আল্লাহ তার উপর কোনো কিছু ফরজ করেছেন। عَلٰى যোগে كُتِبَ -এর অর্থ হয় فُرِضَ - كُرْهٌ : অপ্রিয়। طَبْعًا : স্বভাবগতভাবে। مَشَقَّةٌ : কষ্টকর। لِمَيْلِ النَّفْسِ : নফস অনুরক্ত হওয়ার কারণে। اَلْمُوْجِبَةُ لِهَلَاكِهَا : ধ্বংসের কারণ। نُفُوْرٌ : দূরত্ব, অনাকর্ষণ। اَلتَّكْلِيْفَاتُ : কষ্টবরণ। اَلظَّفَرُ : বিজয়। اَلذُّلُّ : লাঞ্ছনা। حِرْمَانٌ : বঞ্চনা। بَادِرُوْا : তোমরা ধাবমান হও। ذٰلِكَ : এটা لَا تَعْلَمُوْنَ -এর মাফঊল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য বিষয় ও যোগসূত্র : রাসূলুল্লাহ ﷺ যতদিন পবিত্র মক্কায় ছিলেন, ততদিন যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়নি। তিনি যখন, পবিত্র মদীনায় হিজরত করেন, তখন যুদ্ধ অনুমোদিত হয়। তবে কেবল সেই সকল কাফেরদের বিরুদ্ধে যারা নিজেরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আসে। পরবর্তী পর্যায়ে সাধারণভাবে সর্বস্তরের কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়। শত্রু যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালায়, তবে তো জিহাদ ফরজে আইন আর তা না হলে ফরজে কিফায়া। তবে ফিকহী কিতাবসমূহে জিহাদের যে সমস্ত শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে, তা পাওয়া যেতে হবে।

–[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ : মুসলমানদের ঐ সময় জিহাদ করা ফরজ যখন তার শর্তাবলি পাওয়া যাবে। এ পবিত্র কুরআনের দ্বিতীয় পারায় জিহাদের কতিপয় শর্ত ও নিয়মকানুন বর্ণিত হয়েছে। অবশিষ্ট বিষয়গুলো পরবর্তীতে স্বস্থানে বর্ণিত হবে।

قَوْلُهُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ : নিজের প্রাণ কার নিকট প্রিয় নয়? সকল পশু নিজেকে বিপদে ফেলতে সংকোচ বোধ করে। সবাই নিজেকে রক্ষা করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়: মক্কার গরিব মুহাজিরগণ যারা সবেমাত্র জন্মভূমি পরিত্যাগ করে মদিনায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন, তারা অর্থ-সম্পদ, মাল-আসবাব, সংখ্যাধিক্য এক কথায় কোনো দিক দিয়েই তাদের প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় আসতে পারে না। এসব ভগ্নহৃদয় অভাবক্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যদি যুদ্ধের নির্দেশ পেয়ে কিছুটা সংকোচবোধ করেন, তাহলে এটা তাদের ঈমানী শক্তির ক্ষেত্রে আদৌ ত্রুটি সৃষ্টি করবে না।

قَوْلُهُ طَبْعًا : এটি একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন: আল্লাহ তা'আলার হুকুম বিশেষভাবে যখন তা ফরজ হবে, অপছন্দ করা কুফরি।

উত্তর: স্বভাবজাত অপছন্দ কুফরি নয়। কারণ এটা মানুষের প্রকৃতিগত বিষয়।

উল্লিখিত আয়াত ঐ সকল মানবতাহীন আধুনিক চিন্তাবিদদের ধারণাকে সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করেছে যারা লিখেছেন যে, মুসলমানগণ গনিমতের মালের লালসায় যুদ্ধে আগ্রহী ছিল। كُرْهٌ শব্দটি মাসদার। এর অর্থ– অপছন্দনীয় অর্থাৎ মাফউল অর্থে। –[তাফসীরে মাজেদী]

অনুবাদ :

٢١٧. وَاَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ اَوَّلَ سَرَايَاهُ وَ اَمَّرَ عَلَيْهَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ جَحْشٍ فَقَاتَلُوا الْمُشْرِكِيْنَ وَقَتَلُوا ابْنَ الْحَضْرَمِيِّ فِيْ اٰخِرِ يَوْمٍ مِنْ جُمَادَى الْاٰخِرَةِ وَالْتَبَسَ عَلَيْهِمْ بِرَجَبَ فَعَيَّرَهُمُ الْكُفَّارُ بِاسْتِحْلَالِهِ فَنَزَلَ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ الْمُحَرَّمِ قِتَالٍ فِيْهِ بَدَلُ اشْتِمَالٍ قُلْ لَهُمْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ عَظِيْمٌ وِزْرًا مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ وَصَدٌّ مُبْتَدَأٌ مَنْعٌ لِلنَّاسِ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ دِيْنِهِ وَكُفْرٌ بِهِ بِاللّٰهِ وَ صَدٌّ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَىْ مَكَّةَ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهِ مِنْهُ وَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ وَالْمُؤْمِنُوْنَ خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ اَكْبَرُ اَعْظَمُ وِزْرًا عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الْقِتَالِ فِيْهِ وَالْفِتْنَةُ الشِّرْكُ مِنْكُمْ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ لَكُمْ فِيْهِ .

২১৭. রাসূল ﷺ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহশের নেতৃত্বে কাফেরদের মোকাবিলায় প্রথম সারিয়্যা অর্থাৎ যোদ্ধাবাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। যুদ্ধকালে ইবনুল হাযরামী তাদের হাতে নিহত হয়। আর ঐ দিনটি ছিল জুমাদাল উখরা মাসের শেষ দিন। কিন্তু ঐ দিন রজব মাসের প্রথম তারিখ বলে তাদের মাঝে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। [রজব মাস ছিল আরবে স্বীকৃত যুদ্ধ-নিষিদ্ধ মাসসমূহের অন্যতম মাস।] এতে কাফেরগণ মুসলমানরা নিষিদ্ধ মাসে হত্যাকাণ্ড বৈধ করে নিয়েছে বলে দোষারোপ করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন, শাহরে হারামে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে قِتَالٍ فِيْهِ এটা بَدَلُ اشْتِمَالٍ বা সন্নিবিষ্ট স্থলাভিষিক্ত পদ। তাদের বল, তাতে যুদ্ধ করা বিরাট জিনিস, ভীষণ অন্যায়। قِتَالٌ এটা مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য। كَبِيْرٌ এটা خَبَرٌ বা বিধেয়। কিন্তু আল্লাহর পথে অর্থাৎ দীনের পথে বাধা দান صَدٌّ এটা مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য। اَكْبَرُ এটা خَبَرٌ বা বিধেয়। সে পথ হতে মানুষকে ফিরিয়ে রাখা, তাঁকে আল্লাহকে অস্বীকার করা, মাসজিদুল হারাম মক্কা যেতে বাধা দান করা এবং এর বাসিন্দাকে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং মু'মিনদেরকে সে স্থান হতে বহিষ্কার করা তাতে অর্থাৎ নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা অপেক্ষা আল্লাহর নিকট আরো বিরাট, আরো ভীষণ পাপ। ফিতনা অর্থাৎ তোমাদের শিরক ঐ মাসে তোমাদের হত্যা করা অপেক্ষা ভীষণতর অন্যায়।

তাহকীক ও তারকীব

سَرَايَا : سَرِيَّةٌ-এর বহুবচন। অর্থ– যোদ্ধাবাহিনী। اَمَّرَ : আমির বানিয়েছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন। اِلْتَبَسَ : বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। عَيَّرَهُ : দোষারোপ করল, লজ্জা দিল। اِسْتِحْلَالٌ : হালাল ও বৈধ মনে করা। وِزْرٌ : অন্যায়।
صَدٌّ : صَدًّا (ن) صَدَّ অর্থ– বাধা দেওয়া।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ঐতিহাসিক পটভূমি : দ্বিতীয় হিজরির রজব মাসে রাসূল ﷺ ৮ সদস্যের একটি ক্ষুদ্র বাহিনীকে নাখলা নামক স্থানের দিকে প্রেরণ করলেন। [নাখলা মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী একটি স্থানের নাম।] তিনি তাদেরকে এ উপদেশ দিলেন যে, কুরাইশদের গতিবিধি, কাজকর্ম এবং ভবিষ্যৎ-পরিকল্পনা সম্পর্কে খোঁজখবর নেবে। তিনি তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দান

করেননি। পথিমধ্যে তাদের সামনে কুরাইশদের একটি ছোট ব্যবসায়ী দলের সাথে সাক্ষাৎ ঘটল। তারা তাদের উপর আক্রমণ করে ওমর ইবনে আব্দুল্লাহ হাজরামী নামক এক ব্যক্তিকে কতল করে ফেললেন। তাদের একজন পালিয়ে জীবন রক্ষা করল। অবশিষ্ট দুই ব্যক্তিকে ব্যবসার মাল আসবাবসহ বন্দি করে মদিনায় নিয়ে আসেন। এ ঘটনা ঘটেছিল জুমাদাল উখরার শেষ লগ্নে। তখন সন্দেহ দেখা দিল যে, এ আক্রমণ জুমাদাল উখরার শেষ তারিখে সংঘটিত হয়েছে নাকি রজবের প্রথম তারিখে? [রজব হলো যুদ্ধবিগ্রহ নিষিদ্ধ মাসসমূহের অন্তর্গত] কিন্তু কুরাইশরা এবং তাদের স্বপক্ষীয় ইহুদি ও মুনাফিকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে এ বিষয়টিকে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ করল এবং কঠোর অভিযোগ করল। এ প্রসঙ্গে মুশরিকদের একটি প্রতিনিধিদল ও রাসূল ﷺ -এর সাথে সাক্ষাৎ করে। তারা নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধের ব্যাপারে ফতোয়া জিজ্ঞেস করল। এ আয়াতে তাদের অভিযোগের উত্তর এবং নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ ابْنَ الْحَضْرَمِيِّ : তার আসল নাম হলো ওমর ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাদ হাজরামী। হাজারা মউত নামক স্থানের প্রতি সম্বন্ধিত।

قَوْلُهُ سَرَايَا : سَرِيَّةٌ -এর বহুবচন, অর্থ– সেনাবাহিনীর একটি অংশ। পরিভাষায় ঐ সকল সেনা অভিযানকে سَرِيَّةٌ বলা হয় যাতে রাসূল ﷺ শরিক ছিলেন না। রাসূল ﷺ যাতে শরিক ছিলেন তাকে গাযওয়া বলা হয়। মোট গাযওয়া ও সারিয়্যা -এর সংখ্যা ৭০টি। সারিয়্যা চার থেকে পাঁচশত সৈন্য সংখ্যাকে বলা হয়, এর অধিককে বলা হয় جُنْدٌ;

সমস্যা ও সমাধান : মুফাসসির (র.) এ সারিয়্যাকে প্রথম সারিয়া বলে আখ্যা দিয়েছেন, অথচ মাওয়াহিব গ্রন্থে ইতঃপূর্বে আরও তিনটি সারিয়্যা ও চারটি গাজওয়া সংঘটিত হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। প্রথম সারিয়্যা সপ্তম হিজরি সনের রমজান মাসে প্রেরিত হয়েছিল। রাসূল ﷺ স্বীয় চাচা হযরত হামযা (রা.)-কে তার সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩০জন। তারপর দ্বিতীয় সারিয়্যা হলো সারিয়ায়ে উবায়দা ইবনুল হারিছ। এটা [হিজরতের অষ্টম মাস তথা শাওয়াল মাসে প্রেরিত হয়েছিল। এর সৈন্য সংখ্যা ছিল ৬০ জন। তারপর তৃতীয় সারিয়্যা হলো সারিয়্যায়ে সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস। এটা হেজাজের খেরার নামক উপত্যকায় প্রেরিত হয়েছিল। তখন ছিল হিজরতের নবম মাস জিলকদ। এর সৈন্য সংখ্যা ছিল ২০ জন। এরপর চারটি গাযওয়া প্রেরিত হয়েছিল– ১. গাযওয়ায়ে অদ্দান, ২. বাওয়াত , ৩. যুল উসায়সা, ৪. বদর [প্রথম]। এরপর সারিয়্যায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ এটা রজবের শেষে হিজরতের ১৭তম মাসে প্রেরিত হয়েছিল। কাজেই সারিয়ায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশকে প্রথম সারিয়া বলা প্রশ্নমুক্ত নয়।

সমাধান : এখানে সামঞ্জস্য বিধানের উপায় এই হতে পারে যে, সর্বপ্রথম যে সারিয়ায় কেউ নিহত হয়েছে এবং গনিমতের মাল হস্তগত হয়েছে তা ছিল এটাই। এ কারণে এটাকে প্রথম সারিয়্যা বলা হয়েছে। কারণ এর পূর্বের কোনোটিতে যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি এবং কোনো গনিমতের মালও হস্তগত হয়নি। –[হাশিয়ায়ে সাবী]

قَوْلُهُ الْتَبَسَ عَلَيْهِمْ بِرَجَبٍ : জুমাদাল উখরার শেষ তারিখ মনে করে মুসলমানগণ হাজরামী কাফেলার উপর আক্রমণ করেন। দ্বিতীয় দিন চাঁদ দেখার পরে তাদের সন্দেহ হলো। কেউ বললেন এটা গতকালের চাঁদ, কেউ বললেন আজকের চাঁদ। যদি গতকালের চাঁদ হয় তাহলে রজবের প্রথম তারিখে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। আর রজব মাসে যুদ্ধ করা হারাম। এ কারণে মুসলমানগণ চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়লেন। অপরদিকে মক্কার মুশরিকরাও মুসলমানদের উপর অভিযোগ করতে শুরু করল যে, তোমরা নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধকে বৈধ মনে করেছ, এমনকি মুশরিকদের একটি প্রতিনিধি দল রাসূল ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয়ে তাদের ব্যাপারে অভিযোগ করল এবং মাসআলা জিজ্ঞেস করল, তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ الخ.

قَوْلُهُ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ وَصَدٌّ عَنِ الخ : অর্থাৎ নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা অবশ্যই অন্যায়। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম তো নিজেদের জানা মতে জুমাদাল উখরায় যুদ্ধ করেছেন, নিষিদ্ধ মাস অর্থাৎ রজবে নয়। কাজেই তাদের এ অপরাধ ক্ষমাযোগ্য। এতে আপত্তি করাই ন্যায়-বিরুদ্ধ। কিন্তু হরম ও পবিত্র এলাকায় কুফর বিস্তার করা ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করা জঘন্য অপরাধ এবং নিষিদ্ধ মাসেও মুসলমানদেরকে উৎপীড়ন করা সেই হত্যা হতে শতগুণ বেশি জঘন্য, যা মুসলমানদের দ্বারা নিষিদ্ধ মাসে হয়ে গেছে। –[তাফসীরে উসমানী]

উত্তরের বিশ্লেষণ : এ আয়াতে বর্ণিত কাফেরদের আপত্তির উত্তরসমূহ আরো একটু বিস্তারিতভাবে দেওয়া যায়–

উত্তর.

১. নিষিদ্ধ মাসসমূহে যুদ্ধ করা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত মারাত্মক অপরাধ এবং পাপ। তবে মুসলমানদের থেকে স্বেচ্ছায় এটা ঘটেনি; বরং ভুলে এবং ভুল বুঝার দরুন ঘটেছিল। অতএব এটা দূষণীয় নয়। মুসলমানগণ জুমাদাল উখরার শেষ তারিখ মনে করেছিলেন, কিন্তু ঘটনাক্রমে তা ছিল রজবের প্রথম তারিখ।

২. নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা অত্যন্ত দূষণীয়। তবে এ ব্যাপারে অভিযোগ করা তাদের পক্ষে শোভনীয় নয়। যারা দীর্ঘ ১৩ বছর তাদের শত শত ভাইদের উপর কেবল এ অন্যায়ে অবর্ণনীয় জুলুম-অত্যাচার চালিয়েছে যে, তারা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল। তাদেরকে এতই নির্যাতন করেছে যে, তারা প্রিয় মাতৃভূমি ছেড়ে নির্বাসন জীবন গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। এরপরও ক্ষান্ত হয়নি; বরং তাদেরকে মসজিদে হারামে গমনের রাস্তাও বন্ধ করে দিয়েছে। অথচ তা কোনো ব্যক্তি মালিকানাধীন জায়গা নয়। বিগত দু হাজার বছরের মধ্যে এমন ঘটনা কখনও ঘটেনি যে, কাউকে খানায়ে কা'বা জেয়ারত থেকে বাধা প্রদান করা হয়েছে। অতএব, যেসব জালিমদের কর্মকাণ্ড এ ধরনের কালিমাযুক্ত, তাদের জন্য কিভাবে শোভা পায় যে, ভ্রান্তিমূলক সাধারণ একটি বিষয়ে তারা হৈচৈ করবে? কারণ একে তো তা ছিল ভ্রান্তিমূলক এবং দ্বিতীয়ত তা ছিল নবীজীর অনুমতিবিহীন।

এখানে একটি বিষয় স্মরণ রাখতে হবে যে, যখন ক্ষুদ্র বাহিনী দুজন কয়েদি এবং গনিমতের মাল নিয়ে নবীজীর খেদমতে হাজির হয়েছিলেন তিনি সাথে সাথে তাদেরকে বলেছিলেন, আমি তোমাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেইনি। উপরন্তু তাদের পেশকৃত গনিমতের মাল থেকে বায়তুল মালের নির্ধারিত এক পঞ্চমাংশ নিতে অস্বীকার করেছিলেন। এটাও এ বিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, তাদের এ লুট অবৈধ ছিল। কেউ তাদের এ কাজকে মেনে নেয়নি; বরং সবাই তাদেরকে তিরস্কার করেছে। -[জামালাইন]

জিহাদের বিধান : সাধারণ অবস্থায় জিহাদ ফরজে কেফায়া। কোনো জামাত যদি এ ফরজ দায়িত্ব আঞ্জামে নিয়োজিত থাকে, তাহলে অন্যদের জন্য অন্যান্য কাজ আঞ্জাম দেওয়ার অনুমতি রয়েছে। তবে যদি কোনো সময় মুসলিম রাষ্ট্রপতি জরুরি মনে করে ঘোষণা দেন এবং সবাইকে জিহাদের অংশগ্রহণের আহ্বান জানান, তখন সবার উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। পবিত্র কুরআনের সূরা তওবায় আল্লাহ ইরশাদ করেছেন- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ "হে মুসলমানগণ! তোমাদের কি হলো? যখন তোমাদেরকে বলা হচ্ছে যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় বের হও, তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে যাও"? এ আয়াতে সর্বসাধারণের কথা উল্লিখিত হয়েছে। এভাবে যদি আল্লাহ না করুন! কোনো সময় কোনো কাফের বাহিনী কোনো মুসলমান দেশের উপর আক্রমণ করে, আর প্রতিরোধকারী মুসলিমবাহিনী রীতিমতো তাদের প্রতিরোধ করতে সক্ষম না হয়, তখন এ দায়িত্ব তৎপার্শ্ববর্তী মুসলমানদের উপর অর্পিত হয়। তারাও যদি মোকাবিলায় অক্ষম হয়, তাহলে তাদের নিকটতম অধিবাসীদরে উপর এ দায়িত্ব অর্পিত হয়। এভাবে সমগ্রবিশ্বের প্রত্যেক মুসলমান জনসাধারণের উপর এমন মুহূর্তে জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহ দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণ এ বিধান বের করেছেন যে, স্বাভাবিক অবস্থায় জিহাদ ফরজে কিফায়া।

মাসআলা : যতক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ ফরজে কেফায়া থাকবে পিতামাতার অনুমতিবিহীন সন্তাদের জন্য জিহাদে যোগদান করা জায়েজ নয়।

মাসআলা : ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত জিহাদে কেফায়ায় গমন করা জায়েজ নয়। তবে যে মুহূর্তে জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায় তখন কারো অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন থাকে না।

নিষিদ্ধ মাসসমূহে জিহাদের বিধান : সব সময়ের জন্য নিষিদ্ধ মাসসমূহে যুদ্ধ করা হারাম। তবে যখন এসব মাসে কাফের বাহিনী মুসলমানদের উপর চড়াও হয় তখন প্রতিরক্ষামূলক আক্রমণ করা মুসলমানদের জন্য জায়েজ। যেমন ইমাম জাসসাস (র.) হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ কখনো নিষিদ্ধ মাসে ঐ সময় পর্যন্ত যুদ্ধ করতেন না, যতক্ষণ কাফেরদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের সূত্রপাত না ঘটত।

قَوْلُهُ الْمُحَرَّمُ : প্রশ্ন. জালালাইন শরীফের লেখক اَلْحَرَامُ -এর তাফসীর اَلْمُحَرَّمُ দ্বারা করলেন কেন?

উত্তর. এর দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন: اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ -এর মধ্যে সত্তার উপর মাসদার প্রয়োগ করা হয়েছে, অথচ তা সঙ্গত নয়।

উত্তর: اَلْحَرَامُ মাসদারটি اَلْمُحَرَّمُ অর্থে। কজেই কোনো প্রশ্ন থাকল না। অথবা এটা মোবালাগা স্বরূপ বলা হয়েছে।

وَلَا يَزَالُوْنَ اَىِ الْكُفَّارُ يُقَاتِلُوْنَكُمْ اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى كَىْ يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِلَى الْكُفْرِ اِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰئِكَ حَبِطَتْ بَطَلَتْ اَعْمَالُهُمُ الصَّالِحَةُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَلَا اِعْتِدَادَ بِهَا وَلَا ثَوَابَ عَلَيْهَا وَالتَّقْيِيْدُ بِالْمَوْتِ عَلَيْهِ يُفِيْدُ اَنَّهُ لَوْ رَجَعَ اِلَى الْاِسْلَامِ لَمْ يَبْطُلْ عَمَلُهُ فَيُثَابُ عَلَيْهِ وَلَا يُعِيْدُهُ كَالْحَجِّ مَثَلًا وَعَلَيْهِ الشَّافِعِىُّ (رحـ) وَاُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ـ

অনুবাদ : হে মু'মিনগণ! তারা কাফেররা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে **থাকবে যেন** كَىْ حَتّٰى এ স্থানে كَىْ 'যেন' অর্থে ব্যবহৃত। **তোমাদেরকে** তোমাদের দীন হতে কুফরির দিকে **ফিরিয়ে দিতে পারে** যদি তারা সক্ষম হয়। তোমাদের মধ্যে কেউ স্বীয় দীন হতে ফিরে যায় এবং **কাফেররূপে মৃত্যু** মুখে পতিত হয় ইহকালে ও পরকালে **তাদের সকল সৎ** কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। বিনষ্ট হয়ে যায়। **এ আমলগুলো** কোনোরূপ ধর্তব্য বলে বিবেচ্য হয় **না** এবং এতে কোনো পুণ্যফলও পাবে না। মৃত্যুর সাথে বিজড়িত করে এ পরিণাম বর্ণনা করায় বুঝা যায় যে, যদি ঐ ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে ইসলামের দিকে ফিরে আসে, তবে আর তার ঐ পুণ্যকাজসমূহ নিষ্ফল বলে গণ্য হবে না। তখন তাকে এগুলোরও **পুণ্যফল** দান করা হবে। মুরতাদ হওয়ার পূর্বে কোনো ফরজ আমল করে থাকলে তা আর পুনরায় করতে হবে না। যেমন– হজ। এটাই ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত। তারাই অগ্নিবাসী! সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

তাহকীক ও তারকীব

لَايَزَالُوْنَ : সর্বদা করবে। يَرُدُّكُمْ : তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিতে। مَنْ يَرْتَدِدْ : যে মুরতাদ হয়ে যায়, ফিরে যায়।
حَبِطَتْ : নিষ্ফল হয়ে যায়। اِعْتِدَاءٌ : ধর্তব্য। يُثَابُ عَلَيْهِ : পুণ্যফল দান করা হবে।
لَا يُعِيْدُ : পুনরায় করতে হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ الخ **মুশরিকদের ইসলাম বিদ্বেষ :** যতক্ষণ তোমরা সত্য দীনে প্রতিষ্ঠিত থাকবে, ততক্ষণ এ মুশরিকরা কিছুতেই তোমাদের বিরোধিতা ও তোমাদের সাথে যুদ্ধবিগ্রহ করতে চেষ্টায় কোনো ত্রুটি করবে না, তা মক্কার পবিত্র স্থান এবং পবিত্র মাসেই হোক না কেন? তারা না পবিত্র মক্কার হারাম এলাকার কোনো মর্যাদা রেখেছিল, না পবিত্র মাসের প্রতি লক্ষ্য রেখেছিল। অহেতুক হিংসায় জ্বলে তারা মারতে ও মরতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। কোনোক্রমেই মুসলিমগণের পবিত্র মক্কায় প্রবেশ ও ওমরা আদায়কে তারা সহ্য করে নিতে পারেনি। কাজেই এরূপ হঠকারী সম্প্রদায়ের নিন্দা সমালোচনার আর কি পরোয়া তোমরা করবে? তাদের সাথে যুদ্ধ করতে পবিত্র মাসকে কেন বাধা মনে করা হবে? –[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ الخ : দীন হতে ফিরে যাওয়ার ভয়াবহ পরিণতি দীন ইসলাম হতে ফিরে যাওয়া এবং সে অবস্থায় জীবনের শেষদিন পর্যন্ত স্থির থাকা এমন গুরুতর আপদ, যা একজন লোকের জীবনভরের সৎকর্ম ধূলিসাৎ করে দেয়। ফলে সে আর কোনোরূপ মঙ্গলের উপযুক্ত থাকে না, ইহলোকে না জানমালের নিরাপত্তা থাকে, না বিবাহ-শাদি বহাল থাকে, আর না সম্পত্তির উত্তরাধিকার বজায় থাকে। সেই সঙ্গে আখিরাতেও সে কোনো ছওয়াবের অধিকারী থাকে না এবং জাহান্নাম হতেও নিষ্কৃতি পাবে না। হ্যাঁ, পুনরায় যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে এর পরবর্তী সৎকর্মসমূহের ফলাফল সে পুরোপুরি লাভ করবে। –[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ (رحـ) : উভয় মাসআলায় ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর সাথে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতভেদ রয়েছে। অর্থাৎ মুরতাদ হওয়ার পরে যদি পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে সে মুরতাদ হওয়ার পূর্বের কোনো ছওয়াব পাবে না। যেমন এক ব্যক্তি নামাজ পড়ে মুরতাদ হয়ে গেল। নামাজের সময় বাকি থাকতেই পুনরায় সে ইসলাম গ্রহণ করল, এখন ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তার উপর দ্বিতীয়বার নামাজ পড়া ওয়াজিব। কেননা কুরআনের আয়াতে ব্যাপকভাবে বলা হয়েছে– وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে উক্ত নামাজ পুণরায় পড়া ওয়াজিব নয়।

মাসআলা : ১. দুনিয়ায় মুরতাদের আমল বিনষ্ট হওয়ার উদাহরণ হলো, বিবাহ বন্ধন থেকে স্ত্রী খারিজ হয়ে যায়। কোনো মুসলমান নিকটাত্মীয় মৃত্যুবরণ করলে সে তার মিরাস থেকে বঞ্চিত হয়। মুসলমান অবস্থায় সে যত নামাজ রোজা করেছিল, তা সব নিষ্ফল হয়ে যায়। মুরতাদের জানাজা পড়া নিষেধ। এমনকি মুসলমানদের কবরস্থানেও তাকে দাফন করা নিষেধ। আর পরকালে আমল বিনষ্ট হওয়ার উদ্দেশ্য হলো, সে তার ইবাদতের কোনো ছওয়াব পাবে না। অনন্তকালের জন্য সে দোজখে প্রবিষ্ট হবে।

মাসআলা : ২. প্রকৃত কাফের ব্যক্তি কুফরি অবস্থায় যদি কোনো নেক আমল থেকে থাকে, তাহলে আমলের ছওয়াব ঝুলন্ত থাকে। কখনও ইসলাম গ্রহণ করলে অতীতের সকল নেক কাজের ছওয়াব সে লাভ করে। আর কুফরি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তার সকল আমল বিনষ্ট হয়ে যায়; পরকালে সে কোনো ছওয়াব পাবে না।

মাসআলা : ৩. মুরতাদের প্রকৃত অবস্থা প্রকৃত কাফেরের চেয়ে জঘন্যতম। কাফেরের থেকে জিজিয়া কর গ্রহণ করা যায়; কিন্তু মুরতাদ থেকে জিজিয়া কবুল করা বৈধ নয়। মুরতাদ যদি পুনরায় ইসলাম গ্রহণ না করে তাহলে পুরুষ হলে তাকে হত্যা করতে হবে, আর নারী হলে আজীবন তাকে বন্দী করে রাখতে হবে।

অনুবাদ :

٢١٨. وَلَمَّا ظَنَّ السَّرِيَّةُ أَنَّهُمْ إِنْ سَلِمُوْا مِنَ الْإِثْمِ فَلَا يَحْصُلُ لَهُمْ أَجْرٌ نَزَلَ إِنَّ الَّذِيْنَ أٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فَارَقُوْا أَوْطَانَهُمْ وَجَاهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لِإِعْلَاءِ دِيْنِهِ أُولٰئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ثَوَابَهُ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمٌ بِهِمْ ـ

২১৮. উক্ত সারিয়্যায় [যোদ্ধাদলে] অংশগ্রহণকারীদের এ ধারণা হয় যে, পাপ হতে বেঁচে গেলাম বটে, কিন্তু ঐ জিহাদের শরিক হওয়ার কোনো ছওয়াব আমাদের হবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন– যারা বিশ্বাস করে এবং যারা আল্লাহর পথে হিজরত করে অর্থাৎ স্বদেশ ভূমি পরিত্যাগ করে এবং তাঁর দীনকে সমুচ্চ করার উদ্দেশ্যে জিহাদ করে, তারাই আল্লাহর অনুগ্রহ তার পুণ্যফল প্রত্যাশা করে। আল্লাহ মু'মিনদের বিষয়ে ক্ষমাপরায়ণ, তাদের প্রতি পরম দয়ালু।

٢١٩. يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ الْقِمَارِ مَا حُكْمُهُمَا قُلْ لَهُمْ فِيْهِمَا أَيْ فِيْ تَعَاطِيْهِمَا إِثْمٌ كَبِيْرٌ عَظِيْمٌ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالْمُثَلَّثَةِ لِمَا يَحْصُلُ بِسَبَبِهِمَا مِنَ الْمُخَاصَمَةِ وَالْمُشَاتَمَةِ وَقَوْلِ الْفُحْشِ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ بِاللَّذَّةِ وَالْفَرَحِ فِي الْخَمْرِ وَإِصَابَةِ الْمَالِ بِلَا كَدٍّ فِي الْمَيْسِرِ وَإِثْمُهُمَا أَيْ مَا يَنْشَأُ عَنْهُمَا مِنَ الْمَفَاسِدِ أَكْبَرُ أَعْظَمُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَلَمَّا نَزَلَتْ شَرِبَهَا قَوْمٌ وَامْتَنَعَ أٰخَرُوْنَ إِلٰى أَنْ حَرَّمَتْهُمَا أٰيَةُ الْمَائِدَةِ وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ أَيْ مَا قَدْرُهُ قُلْ أَنْفِقُوا الْعَفْوَ أَيِ الْفَاضِلَ عَنِ الْحَاجَةِ وَلَا تُنْفِقُوْا مَا تَحْتَاجُوْنَ إِلَيْهِ وَتُضَيِّعُوْا أَنْفُسَكُمْ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالرَّفْعِ بِتَقْدِيْرِ هُوَ كَذٰلِكَ أَيْ كَمَا بَيَّنَ لَكُمْ مَا ذُكِرَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْأٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ـ

২১৯. লোকে তোমাকে মদ ও মায়সির জুয়া অর্থাৎ এতদুভয়ের বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে। তাদেরকে বল, উভয়ের মধ্যে এতদুভয়ের লেনদেন অবলম্বনে বিরাট পাপ মহাপাপ। كَبِيْرٌ এটা অপর এক কেরাতে ب-এর স্থলে তিন নোকতা বিশিষ্ট ث সহকারে كَثِيْرٌ রূপে পঠিত রয়েছে। কেননা এগুলোর কারণে কলহ-বিবাদ, গালিগালাজ এবং কটুভাষণ হয়। এবং মানুষের জন্য কিছু উপকারও রয়েছে মদে স্বাদ উপভোগ ও আনন্দ লাভ হয়। আর জুয়ায় বিনা প্ররিশ্রমে অর্থ সমাগম হয়। কিন্তু এতদুভয়ের পাপ অর্থাৎ এতদুভয়ের মাধ্যমে যে অন্যায় ও বিশৃঙ্খলা হয়, তা উপকার অপেক্ষা অধিক বিরাট। এ আয়াত নাজিল হওয়ার পরও মুসলমানদের একদল মদ পান করতেন ও অপর দল তা হতে বিরত রইলেন। শেষে সূরা মায়েদায় উল্লিখিত আয়াত দ্বারা এতদুভয়কে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কি অর্থাৎ কি পরিমাণ তারা ব্যয় করবে? বল, যা উদ্বৃত্ত অর্থাৎ যা প্রয়োজনাতিরিক্ত, তা ব্যয় কর। যা তোমার প্রয়োজন তা [অন্যের জন্য] ব্যয় করো না ও নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ো না। এভাবে অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয়সমূহ যেমন তোমাদের বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিদর্শন তোমাদের জন্য সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর।

اَلْعَفْوُ এটা অপর এক কেরাতে رَفْع সহকারে পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় তার পূর্বে [مُبْتَدَأ উদ্দেশ্যরূপে] هُوَ শব্দটি উহ্য বলে বিবেচ্য হবে।

তাহকীক ও তারকীব

ظَنَّ : ধারণা করল। سَلِمُوْا : বেঁচে গেল। فَارَقُوْا : বিচ্ছিন্ন হয়েছে, ত্যাগ করেছে।

اَوْطَانَ : وَطَنٌ -এর বহুবচন। অর্থ– স্বদেশ, মাতৃভূমি। يَرْجُوْنَ : তারা আশা করে। اَلْخَمْرُ : মদ, শরাব। اَلْمَيْسِرُ : জুয়া।

تَعَاطِىْ : লেনদেন। اَلْمُخَاصَمَةُ : কলহ-বিবাদ। مُشَاتَمَةٌ : গালিগালাজ। كَدٌّ : পরিশ্রম, কষ্ট। يَنْشَأُ : সৃষ্টি হয়।

اَلْمَفَاسِدُ : বিশৃঙ্খলা। اِمْتَنَعَ : বিরত রইল।

اَلْعَفْوُ : উদ্বৃত্ত। اَلْفَاضِلُ عَنِ الْحَاجَةِ : প্রয়োজনাতিরিক্ত। مَا تَحْتَاجُوْنَ اِلَيْهِ : যা তোমাদের প্রয়োজন। لَا تُضَيِّعُوْا اَنْفُسَكُمْ : নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ো না।

قَوْلُهُ كَمَا بَيَّنَ لَكُمْ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اَلْعَفْوُ বিলুপ্ত ফে'লের কারণে মানসূব হয়েছে।

প্রশ্ন: এটাকে هُوَ উহ্য মুবতাদার খবর বললে অসুবিধা কি?

উত্তর: তখন প্রশ্নোত্তরের মধ্যে সামঞ্জস্যতা থাকত না। কেননা প্রশ্ন হলো জুমলায়ে ফে'লিয়া। আর উত্তর হলো জুমলায়ে ইসমিয়া। আর এখন উভয়টি ফে'লিয়া হয়ে গেল।

كَمَا بَيَّنَ لَكُمْ -এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, كَذٰلِكَ -এর মধ্যে كَافٌ পরে উল্লিখিত يُبَيِّنُ -এর বিলুপ্ত মাসদারের সিফত হওয়ার কারণে স্থানগতভাবে মানসূব অর্থাৎ تَبْيِيْنًا مِثْلَ هٰذَا التَّبْيِيْنِ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا الخ : পূর্বের আয়াত দ্বারা উপরিউক্ত সাহাবায়ে কেরাম তো একথা জানতে পারলেন যে, এ ঘটনা সম্পর্কে আমাদের পাকড়াও করা হবে না, কিন্তু তাদের এ সন্দেহ ছিল যে, সে যুদ্ধের কোনো ছওয়াব লাভ হবে কিনা? এ পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাজিল হয় যে, যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং মহান আল্লাহর পথে তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে সে যুদ্ধে তাদের কোনো ব্যক্তিস্বার্থও ছিল না, তারা নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহর রহমতের আশা করতে পারে। তারা এর উপযুক্ত। আল্লাহ তো তাঁর বান্দাদের দোষত্রুটি ক্ষমা করে দেন এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করেন। এরূপ অনুগত বান্দাদের তিনি কিছুতেই বঞ্চিত করবেন না। –[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ : خَمْر ও مَيْسِرْ তথা মদ ও জুয়া শব্দ দুটি নিজ নিজ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মদের অধীনে ঐ সকল নেশাদ্রব্য অন্তর্ভুক্ত যা মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটায়। এভাবে জুয়া শব্দটি তার সকল ধরন ও প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে। মদ ও জুয়া বর্তমানে যেভাবে ইংরেজ সভ্যতায় শুধু বৈধই নয়; বরং সভ্যতার বিশেষ অঙ্গ এবং সামাজিক মর্যাদার দলিল। এভাবে প্রাচীন আরব যুগেও তা সভ্যতার পরিচায়ক ছিল। শুধু আরবেই নয়; বরং সমগ্র বিশ্বের এ পরিস্থিতি ছিল। হিন্দু, মিশরীয় সভ্যতা, রোমীয় সভ্যতা ইত্যাদির মধ্যে তো অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করা হতো। এমনকি ইসরাঈলী ও খ্রিস্টীয় সভ্যতা যা নবুয়তের মর্যাদার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল, তাও এর ব্যতিক্রম ছিল না। কেবল ইসলামি শরিয়তই বিশ্বের অদ্বিতীয় কানুন, যা এসে তা অকাট্য হারাম হওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। মদ ও জুয়া হারাম হওয়ার ব্যাপারে এটা সর্বপ্রথম আয়াত। অকাট্য হারাম হওয়ার বিধান পরবর্তীকালে অবতীর্ণ হয়েছে। মদ ও জুয়া সংশ্লিষ্ট প্রথম বিধানের কেবল অপছন্দনীয়তা প্রকাশ করে ক্ষান্ত করা হয়েছে, যাতে পরবর্তীকালে তা হারাম হওয়ার বিষয়টি মেনে নেওয়ার জন্য মানুষের মন প্রস্তুত হয়ে যায়। এর পরে মদ পান করে নামাজ পড়ার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। ইরশাদ হয়েছে– لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى "তোমরা মাতাল অবস্থায় নামাজের নিকটবর্তী হয়ো না।" এর পর মদ জুয়া এবং এ ধরনের সকল বিষয়কে অকাট্য হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ فِيْ تَعَاطِيْهِمَا : এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মদ ও মূল জুয়ার সত্তার মাঝে কোনো পাপ নেই; বরং তা কাজে বাস্তবায়ন করা ও ব্যবহারের মধ্যে পাপ রয়েছে।

قَوْلُهُ اَيْ مَا يَنْشَأُ عَنْهُمَا مِنَ الْمَفَاسِدِ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اِثْمُهُمَا -এর মধ্যে সববের প্রতি মাসদারের ইযাফত হয়েছে।

مَا يَنْشَأُ عَنْهُمَا مِنَ الْمَفَاسِدِ এটা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য হলো দ্বিরুক্তির অভিযোগ নিরসন করা।

অভিযোগ নিরসন : পূর্বে উল্লিখিত يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ -এর মধ্যে মূল ব্যয়ের ব্যাপারে প্রশ্ন ছিল, আর এখানে ব্যয়ের পরিমাণের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছে। কাজেই এখানে এর দ্বিরুক্তি নেই।

মদের আধুনিকায়ন : আল্লামা আলূসী বাগদাদী (র.) এ স্থানে বিস্তারিতভাবে লিখেছেন যে, আমাদের যুগে ফাসিকরা নেশা জাতীয় বিভিন্ন পানীয় বস্তুর সুন্দর সুন্দর নাম রেখেছেন। যেমন- ইরক, অম্বরী ইত্যাদি। কিন্তু মনে রাখতে হবে নাম পরিবর্তনের দ্বারা কখনো বস্তুর হাকিকত বা প্রকৃতি পরিবর্তন হয় না এবং এর দ্বারা শরিয়তের বিধানেরও কোনো তারতম্য ঘটে না। মদকদ্রব্য সর্বাবস্থায় হারাম। –[জামালাইন]

মদ ও জুয়া দ্বারা সামাজিক ক্ষতি : মদ পানের মাধ্যমে এ যাবৎ যত অনিষ্ট ঘটেছে এবং ঘটছে তা কারো অজানা নয়। অশ্লীল গালমন্দ ও বেহায়াপনা, হারাম কাজের প্রতি আহ্বান, কলহ-দ্বন্দ্ব, বিভিন্নরূপ জীবন-বিনাশী রোগের উদ্ভব, চুরি ডাকাতিতে উৎসাহ প্রদান, এমনকি মানুষকে হত্যা করা, বন্ধু-বান্ধবের মাঝে জুতা-লাঠি উত্তোলন করা ইত্যাদি সর্বপ্রকার গর্হিত কাজ মদ পানের মাধ্যমে অহরহ ঘটেই থাকে। উপরন্তু জুয়ার ধ্বংসাত্মক পরিণামে না জানি কত বংশ ও পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে। ইংরেজদের সর্বাধিক বৃহৎ জুয়াখানা মন্টেকার্লোতে প্রতি বছর সীমাহীন সম্পদ বিনষ্ট হয়। দেওয়ালী উৎসবের রাতে হিন্দুস্থানে কি কিছুই ঘটে না? এতদসত্ত্বেও জুয়ার আধুনিক রূপকাঠামো, বিভিন্ন বীমা কোম্পনির নামে জুয়া, রেকোর্সের জুয়া, লটারি ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অসংখ্য জুয়া প্রচলিত রয়েছে।

قَوْلُهُ وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ **আল্লাহর পথে ব্যয়ের পরিমাণ :** মহান আল্লাহর পথে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হবে? নির্দেশ হলো, নিজেদের প্রয়োজনীয় ব্যয়ের পর যা উদ্বৃত্ত থাকে। কেননা আখিরাতের ন্যায় ইহকালের জন্যও চিন্তা থাকা চাই। সমুদয় অর্থ ব্যয় করে ফেললে নিজ প্রয়োজন কিভাবে মেটানো হবে? যেসব দায়-দায়িত্ব তোমার উপর চাপানো রয়েছে তা পূরণ করবে কি উপায়ে? এভাবে কে জানে তোমরা তখন কত রকম ইহকালীন ও পরকালীন অনিষ্টের শিকার হবে। –[তাফসীরে উসমানী]

অনুবাদ :

٢٢٠. فِيْ اَمْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَتَأْخُذُوْنَ بِالْاَصْلَحِ لَكُمْ فِيْهِمَا وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى وَمَا يَلْقَوْنَهُ مِنَ الْحَرَجِ فِيْ شَأْنِهِمْ فَاِنَّهُمْ فَاِنْ وَاكَلُوْهُمْ يَأْثَمُوْا وَاِنْ عَزَلُوْا مَا لَهُمْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ وَصَنَعُوْا لَهُمْ طَعَامًا وَحْدَهُمْ فَحَرَجٌ قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ فِيْ اَمْوَالِهِمْ بِتَنْمِيَتِهَا وَمُدَاخَلَتُكُمْ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِ ذٰلِكَ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ اَيْ تَخْلِطُوْا نَفَقَتَهُمْ بِنَفَقَتِكُمْ فَاِخْوَانُكُمْ اَيْ فَهُمْ اِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ شَأْنِ الْاَخِ اَنْ يُخَالِطَ اَخَاهُ اَيْ فَلَكُمْ ذٰلِكَ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ لِاَمْوَالِهِمْ بِمُخَالَطَتِهِ مِنَ الْمُصْلِحِ لَهَا فَيُجَازِيْ كُلًّا مِنْهُمَا وَلَوْ شَاۤءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ لَضَيَّقَ عَلَيْكُمْ بِتَحْرِيْمِ الْمُخَالَطَةِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَالِبٌ عَلٰى اَمْرِهِ حَكِيْمٌ فِيْ صُنْعِهِ .

২২০. ইহকাল ও পরকালের বিষয় সম্বন্ধে। অনন্তর উভয় স্থানে যা তোমাদের জন্য অধিক কল্যাণকর, তা যেন গ্রহণ করে নিতে পার। লোকে তোমাকে এতিম ও এদের বিষয়ে তাদের যে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে সেই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। যদি তাদের সাথে একত্রে তাদের আহারের ব্যবস্থা করে তবে হতে হয় গুনাহগার, আর যদি ধন-সম্পত্তি আলাদা করে রাখা হয় এবং আলাদাভাবে তাদের আহারের ব্যবস্থা করতে হয় তাতে নানা ঝামেলার সম্মুখীন হতে হয়। বল, তাদেরকে অর্থাৎ এতিমদের ধন-সম্পত্তিতে প্রবৃদ্ধি সাধন করে এবং তাদের বিষয়ে ব্যাপৃত হয়ে তাদের সুব্যবস্থ করা তা পরিত্যাগ করা অপেক্ষা উত্তম। তোমরা যদি তাদের সাথে তোমাদের সংমিশ্রণ করে নাও অর্থাৎ তোমাদের ব্যয়-ভারের সাথে তাদের ব্যয়-ভারেরও সংমিশ্রণ করে নাও তবে তারা তো তোমাদের দীনি ভাই। আর ভাইতো ভাইকে একত্রে সংমিশ্রণ করতে পারে। অর্থাৎ অনুরূপ কাজ তোমরা করতে পার। আল্লাহ জানেন সম্পদের সংমিশ্রণ করে তাদের ধন-সম্পত্তির বিষয়ে কে হিতকারী আর কে তার অনিষ্টকারী। অনন্তর তিনি উভয়কেই প্রতিদান প্রদান করবেন।

আল্লাহ ইচ্ছা করলে এ বিষয়ে তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতে পারতেন অর্থাৎ এ সংমিশ্রণ নিষিদ্ধ করে তোমাদের উপর বিষয়টি সংকীর্ণ করে দিতে পারতেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রান্ত, তাঁর নির্দেশের বিষয়ে তিনি প্রবল এবং তাঁর কাজে তিনি প্রজ্ঞাময়।

তাহকীক ও তারকীব

اَلْاَصْلَحُ : অধিক কল্যাণকর। اَلْيَتٰمٰى : يَتِيْمٌ -এর বহুবচন। অর্থ– এতিম, অনাথ। مَا يَلْقَوْنَهُ : যার সম্মুখীন হয়। اَلْحَرَجُ : অসুবিধা। فَاِنْ وَاكَلُوْهُمْ : যদি তাদের সাথে একত্রে তাদের আহারের ব্যবস্থা করে। يَأْثَمُوْا : গুনাহগার হতে হয়। وَاِنْ عَزَلُوْا : যদি আলাদা করে দেয়। تَنْمِيَةٌ : প্রবৃদ্ধি সাধন। مُدَاخَلَةٌ : শরিক করা। وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ : যদি সংমিশ্রণ কর। مُخَالَطَةٌ : সংমিশ্রণ। لَاَعْنَتَكُمْ : তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতে পারতেন। لَضَيَّقَ عَلَيْكُمْ : তোমাদের উপর বিষয়টি সংকীর্ণ করে দিতে পারতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ : অর্থাৎ ইহকাল নশ্বর, কিন্তু নানা রকম প্রয়োজনের স্থান। আর পরকাল অবিনশ্বর এবং সেটা পুরস্কার লাভের জায়গা। তাই চিন্তাভাবনা করে উভয় স্থানের জন্য তার অবস্থা অনুযায়ী ব্যয় করা উচিত। দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের কল্যাণকে সামনে রেখেই অর্থ ব্যয় করা দরকার। বিধিবিধান স্পষ্ট করে বর্ণনা করার উদ্দেশ্য এটাই যে, তোমরা চিন্তাভাবনা করার সুযোগ পাবে। -[তাফসীরে উসমানী]

এতিমের সম্পদ ব্যয় নির্বাহের পদ্ধতি : কতিপয় লোক এতিমের অর্থ-সম্পত্তিতে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করত না। তাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল- وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ [সৎ উদ্দেশ্য ছাড়া এতিমের সম্পত্তির নিকটবর্তী হবে না।]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا

"যারা এতিমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা তাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে।"
এর ফলে যারা এতিমদের লালনপালন করত, তারা ভয় পেয়ে যায়। তারা এতিমদের খাওয়া-দাওয়াসহ যাবতীয় খরচাদি পৃথক করে ফেলে। কেননা একত্রে থাকলে অনেক সময় এতিমেরটাও খাওয়া হয়ে যায়। কিন্তু এর ফলে নতুন এক সমস্যা দেখা দিল। এতিমের জন্য কোনো কিছু তৈরি করার পর যা বেঁচে থাকত, তা নষ্ট হয়ে যেতে লাগল, যা ফেলে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকত না। এই সতর্কতার ফলে উল্টো এতিমের ক্ষতি হতে লাগল। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উত্থাপিত হলে তখন এ আয়াত নাজিল হয়। -[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ **এতিমের কল্যাণ উদ্দেশ্য হওয়া চাই :** উদ্দেশ্য তো কেবল এতিমদের অর্থসম্পদ রক্ষা ও তার সুব্যবস্থা করা। কাজেই যে ক্ষেত্রে পৃথক করলে এতিমের উপকার হয়, সে ক্ষেত্রে পৃথক করাই বাঞ্ছনীয় আর যেখানে একত্র করাই লাভজনক মনে হয়, সেখানে যদি তাদের খরচাদি তোমাদের সাথে একত্র করে নাও এবং একবার তাদেরটা খেয়ে অন্যবার তোমাদেরটা তাদের খাওয়াও, তবে তাতে দোষের কিছু নেই। কেননা এতিম শিশু তো তোমাদেরই দীনি বা বংশীয় ভাই। ভাই-বেরাদরের মধ্যে পরস্পরে একত্রীকরণ এবং নিজে খাওয়া ও অন্যকে খাওয়ানো অন্যায় নয়। হ্যাঁ এতিমদের যাতে কল্যাণ হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা অবশ্য কর্তব্য। মহান আল্লাহ ভালো করেই জানেন যে, একত্রীকরণের মাঝে কার উদ্দেশ্য অর্থ আত্মসাৎ ও এতিমের ক্ষতিসাধন করা আর কার উদ্দেশ্য এতিমের কল্যাণ সাধন ও তার উপকার করা। -[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ وَمَا يَلْقَوْنَهُ : এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইবারতে মুযাফ বিলুপ্ত রয়েছে। কেননা প্রশ্ন করা হয় অবস্থা সম্পর্কে, সত্তা সম্পর্কে নয়।

قَوْلُهُ وَاكَلُوْهُمْ : اَكَلُوْا-এর মধ্যে হামযাকে وَاوْ দ্বারা পরিবর্তন করে وَاكَلُوْا রূপেও এসেছে। অর্থ হলো- মিলেমিশে পানাহার করা।

قَوْلُهُ فِىْ اَمْوَالِهِمْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আর্থিক সংশোধনী উদ্দেশ্য, অন্য কোনোটি নয়। এতে প্রশ্নের সাথে উত্তরের সামঞ্জস্য হয়ে যাবে। উপরন্তু আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ -এর মধ্যেও এর আলামত রয়েছে।

قَوْلُهُ مِنْ تَرْكِ ذٰلِكَ : এখানে مُفَضَّلٌ عَلَيْهِ বিলুপ্ত থাকার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَهُمْ اِخْوَانُكُمْ : এ বিলুপ্তির দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, فَاِخْوَانُكُمْ হলো শর্তের জাযা। আর জাযা বাক্য হওয়া জরুরি। এজন্য هُمْ মুবতাদা উহ্য মানা হয়েছে।

قَوْلُهُ اَىْ فَلَكُمْ ذٰلِكَ : এ ইবারত বৃদ্ধির উদ্দেশ্য হলো একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া।

প্রশ্ন : وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ হলো শর্ত আর فَاِخْوَانُكُمْ তার জাযা; কিন্তু শর্তের জাযা প্রযোজ্য হওয়া বৈধ নয়। কেননা উভয়ের মধ্যে কোনো যোগসূত্র থাকে না।

উত্তর : মূলত এখানে জাযা বিলুপ্ত হয়েছে। মুফাসসির (র.) فَلَكُمْ ذٰلِكَ বলে সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, জাযার সববকে জাযার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে।

অনুবাদ :

٢٢١. وَلَا تَنْكِحُوا تَتَزَوَّجُوا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ الْمُشْرِكٰتِ أَيِ الْكَافِرَاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ حُرَّةٍ لِأَنَّ سَبَبَ نُزُوْلِهَا الْعَيْبُ عَلٰى مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً وَالتَّرْغِيْبُ فِي نِكَاحِ حُرَّةٍ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ لِجَمَالِهَا وَمَالِهَا وَهٰذَا مَخْصُوْصٌ بِغَيْرِ الْكِتَابِيَّاتِ بِاٰيَةِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ وَلَا تُنْكِحُوا تُزَوِّجُوا الْمُشْرِكِيْنَ أَيِ الْكُفَّارَ الْمُؤْمِنَاتِ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ لِمَالِهِ وَجَمَالِهِ أُولٰئِكَ أَيْ أَهْلُ الشِّرْكِ يَدْعُوْنَ إِلَى النَّارِ بِدُعَائِهِمْ إِلَى الْعَمَلِ الْمُوْجِبِ لَهَا فَلَا تَلِيْقُ مُنَاكَحَتُهُمْ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا عَلٰى لِسَانِ رُسُلِهِ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ أَيِ الْعَمَلِ الْمُوْجِبِ لَهُمَا بِإِذْنِهِ بِإِرَادَتِهِ فَتَجِبُ إِجَابَتُهُ بِتَزْوِيْجِ أَوْلِيَائِهِ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ يَتَّعِظُوْنَ.

২২১. হে মুসলিমগণ! অংশীবাদী অর্থাৎ কাফের নারীকে ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা নিকাহ করো না বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করো না। অংশীবাদী নারী সৌন্দর্য ও অর্থসম্পদের দরুন তোমাদেরকে মুগ্ধ করলেও নিশ্চয় একজন ধর্মে বিশ্বাসী দাসী একজন স্বাধীনা অংশীবাদী নারী অপেক্ষা উত্তম। ঈমানের অধিকারিণী দাসীকে বিবাহ করলে [তৎকালে] দোষারোপ করা হতো। আর মুশরিক হলেও স্বাধীনা মহিলা বিবাহ করতে উৎসাহ প্রদান করা হতো। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেছিলেন।

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ [যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে, তাদের পবিত্রা মহিলাগণকে বিবাহ করতে পার] এ আয়াতটির কারণে বক্ষ্যমাণ আয়াতটির বিধান যারা কিতাবী নয় সেই সমস্ত কাফের মহিলাদের বেলায়ই কেবল প্রযোজ্য। ঈমান গ্রহণ না করা পর্যন্ত তোমরা অংশীবাদী পুরুষের সাথে কাফের পুরুষগণের সাথে বিশ্বাসী মহিলাগণকে নিকাহ দিয়ো না বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করো না। সৌন্দর্য ও ধন-সম্পত্তির কারণে অংশীবাদী পুরুষ তোমাদেরকে চকমৎকৃত করলেও একজন মু'মিন দাস তা অপেক্ষা উত্তম। তারা অর্থাৎ অংশীবাদীগণ যে সমস্ত আমল দ্বারা জাহান্নামি হতে হয়, সেই সমস্ত আমলের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানিয়ে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করে। সুতরাং তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা কোনোক্রমেই উচিত নয়। আর আল্লাহ তাঁর রাসূলগণের যবানে তাঁর অনুমোদন তাঁর ইচ্ছাক্রমে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে অর্থাৎ এতদুভয় লাভের আমলের দিকে আহ্বান করেন। সুতরাং তাঁর ওলী ও বন্ধুদের কারো সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে তাঁর এ আহ্বানের প্রত্যুত্তর দান করা কর্তব্য। তিনি মানুষের জন্য স্বীয় নিদর্শন সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যেন তারা তা হতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

তাহকীক ও তারকীব

أَمَةٌ : একবচন, বহুবচন إِمَاءٌ অর্থ– বাঁদি, দাসী। حُرَّةٌ : স্বাধীনা। اَلْعَيْبُ : দোষারোপ করা। تَرْغِيْبٌ : উৎসাহ প্রদান করা। وَلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ : যদিও তোমাদেরকে বিমুগ্ধ করে। لَا تَلِيْقُ : উচিত নয়। مُنَاكَحَةٌ : বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা। اِجَابَةٌ : সাড়া দেওয়া। يَتَّعِظُوْنَ : উপদেশ গ্রহণ করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বিধর্মী ও মুশরিক নারী-পুরুষকে বিবাহ সম্পর্কীয় বিধান : প্রথম দিকে মুসলিম পুরুষ ও কাফের নারী কিংবা এর বিপরীত উভয় অবস্থায় বিবাহের অনুমতি ছিল। এ আয়াতে তা রহিত করা হয়েছে। মুশরিক নরনারীর সাথে মুসলিমের বিবাহ বৈধ নয়। বিবাহের পর যদি স্বামী-স্ত্রীর কোনো একজন মুশরিক হয়ে যায়, তাহলে তাদের বিবাহ ভেঙ্গে যাবে। শিরকের অর্থ– জ্ঞান, শক্তি বা মহান আল্লাহর এরূপ অন্য কোনো গুণে কাউকে তাঁর সমকক্ষ মনে করা কিংবা কাউকে মহান আল্লাহর অনুরূপ সম্মান করা, যেমন– কাউকে সিজদা করা, কাউকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী মনে করে তার নিকট প্রার্থনা করা। তবে অন্যান্য আয়াত দ্বারা ইহুদি ও খ্রিস্টান নারীর সাথে মুসলিম পুরুষের বিবাহ বৈধ প্রমাণিত আছে। তারা যদি নিজেদের দীনে প্রতিষ্ঠিত থাকে, প্রকৃতিবাদী ও নাস্তিক না হয়, তবে তারা মুশরিকদের মধ্যে শামিল হবে না। বলা বাহুল্য, আধুনিক কালের অধিকাংশ ইহুদি-খ্রিস্টানই নাস্তিক্যবাদী।

আয়াতটির সারমর্ম হলো, মুসলিম পুরুষের জন্য মুশরিক নারীকে বিবাহ করা বৈধ নয়, যতক্ষণ সে ইসলাম গ্রহণ না করে। নিশ্চয় মুসলিম ক্রীতদাসী কাফের নারী হতে উত্তম, তা সে স্বাধীনই হোক না কেন এবং বিত্ত, সৌন্দর্য ও বংশগত দিক থেকে যতই মনলোভা হোক না কেন। অনুরূপ কাফের পুরুষের সাথে মুসলিম নারীকে বিবাহ দিয়ো না। মুসলিম ক্রীতদাসও মুশরিক হতে অনেক ভালো, তা সে স্বাধীনই হোক না কেন এবং দেখতে-শুনতে ও ধনৈশ্বর্যে যতই পছন্দনীয় হোক না কেন। অর্থাৎ একজন অতি সাধারণ মুসলিমও মুশরিক অপেক্ষা শতগুণ ভালো, চাই সে মুশরিক যতই উচ্চ স্তরের হোক। –[তাফসীরে উসমানী]

কতিপয় মাসআলা :

১. কোনো মুসলমান হিন্দু ও অগ্নিউপাসক মহিলাকে বিবাহ করা নাজায়েজ। ২. আসমানী কিতাবে বিশ্বাসী নারীর সাথে বিবাহ করা বৈধ, যদিও তা উত্তম নয়। হযরত ওমর (রা.) এটাকে অপছন্দ করেছেন। হাদীস শরীফে ধার্মিকা নারী বিবাহ করার নির্দেশ এসেছে। ইসলাম যেখানে মুসলমান ধর্মহীনা মহিলার সাথে বিবাহ করাকে অপছন্দ করেছে সেখানে অমুসলিম মহিলার সাথে বিবাহ কিভাবে পছন্দনীয় হতে পারে? এ কারণেই হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট যখন সংবাদ পৌঁছল যে, ইরাক এবং সিরিয়ায় মুসলমানদের মধ্যে এমন কিছু বিবাহ সংঘটিত হচ্ছে তখন বিশেষ নির্দেশের মাধ্যমে তা থেকে বারণ করা হয়েছে এবং তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, এ ধরনের বৈবাহিক সম্পর্ক ধর্মীয় দৃষ্টিকোণেও মুসলিম পরিবারের জন্য দূষণীয় এবং রাষ্ট্রীয়ভাবেও। বর্তমানে এর ক্ষতি সম্পূর্ণরূপে চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে। বর্তমান কালে কিছু মুসলমান নেতার বিবাহে ইহুদি কিংবা খ্রিস্টান মহিলা রয়েছে। তাদের মাধ্যমে রাষ্ট্রের গোপন বিষয়াদি শত্রুদেশের নিকট পাচার হচ্ছে। বস্তুত পশ্চিমা দেশসমূহ মুসলিম নেতাদেরকে ইহুদি সুন্দরী নারীদের ফাঁদে ফেলে তাদেরকে নিজেদের আয়ত্তে আনার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

প্রশ্ন: আহলে কিতাব মহিলাদের সাথে তো মুসলমান পুরুষের বিবাহ জায়েজ; কিন্তু এর বিপরীতে অর্থাৎ মুসলমান মহিলাদের বিবাহ আহলে কিতাব পুরুষের সাথে জায়েজ নয় কেন?

উত্তর: ১. প্রকৃতি ও সৃষ্টিগতভাবে মহিলারা দুর্বল হয়ে থাকে। উপরন্তু পুরুষকে নারীর শাসক ও অভিভাবক বানানো হয়েছে। অতএব স্বামীর আকিদার দ্বারা মহিলারা প্রভাবান্বিত হওয়া যুক্তির অধিক নিকটবর্তী। কাজেই মুসলমান মহিলা যদি আহলে কিতাব পুরুষের অধীনে থাকে, তাহলে তার ধর্মীয় আকিদা-বিশ্বাস নষ্ট হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে; এর বিপরীতে আশঙ্কা থাকে না, কিংবা অত্যন্ত কম থাকে।

উত্তর: ২. মুসলমানগণ যেহেতু পূর্বের নবীগণের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং অত্যন্ত ভক্তি ও সম্মানের সাথে তাদের নাম নেয়। পক্ষান্তরে ইহুদি, খ্রিস্টান আহলে কিতাবগণ মহানবী ﷺ -এর নবুয়তকে স্বীকার করে না, তারা তাঁর নামকে সম্মানের সাথে নেওয়াকেও জরুরি মনে করে না। অথচ মুসলমানদের উপর পূর্বের সকল নবীগণের নাম ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে নেওয়া জরুরি এবং ইজমালীভাবে তাঁদের প্রতি ঈমান আনাও ফরজ। কোনো মুসলমান যদি কোনো নবীর ব্যাপারে বেয়াদবিমূলক উক্তি করে, তাহলে সে ইসলামের গণ্ডি থেকে খারিজ হয়ে যায়। অতএব, কোনো কিতাবী মহিলা চাই ইহুদি হোক বা খ্রিস্টান তখন তার নবীর নাম মুসলমানের ঘরে আদব ও সম্মানের সাথে নিতে শুনবে। পক্ষান্তরে মুসলমান মহিলা যদি কোনো কিতাবী ইহুদি বা খ্রিস্টানের বিবাহে থাকে, তাহলে সে তার নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নাম আদব ও সম্মানের সাথে নিতে শুনবে না, ফলে সে কষ্ট পাবে। আর এ কারণে পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্ট হওয়ার কারণ ঘটতে পারে। এ সকল কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য করে মুসলমান মহিলার বিবাহ কিতাবী পুরুষের সাথে জায়েজ রাখা হয়নি।

٢٢٢. وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ اَىِ الْحَيْضِ اَوْ مَكَانِهِ مَاذَا يَفْعَلُ بِالنِّسَاءِ فِيْهِ قُلْ هُوَ اَذًى قَذَرٌ اَوْ مَحَلُّهُ فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ اُتْرُكُوْا وَطْيَهُنَّ فِى الْمَحِيْضِ اَىْ وَقْتِهِ اَوْ مَكَانِهِ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ بِالْجِمَاعِ حَتّٰى يَطْهُرْنَ بِسُكُوْنِ الطَّاءِ وَتَشْدِيْدِهَا وَالْهَاءِ وَفِيْهِ اِدْغَامُ التَّاءِ فِى الْاَصْلِ فِى الطَّاءِ اَىْ يَغْتَسِلْنَ بَعْدَ اِنْقِطَاعِهِ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ لِلْجِمَاعِ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ بِتَجَنُّبِهِ فِى الْحَيْضِ وَهُوَ الْقُبُلُ وَلَا تَعْدُوْهُ اِلٰى غَيْرِهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ يُثِيْبُ وَيُكْرِمُ التَّوَّابِيْنَ مِنَ الذُّنُوْبِ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ مِنَ الْاَقْذَارِ .

অনুবাদ :

২২২. লোকেরা তোমাকে রজঃস্রাব অর্থাৎ ঋতু বা তা ক্ষরণের স্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে যে, এ সময় স্ত্রীগণের সাথে কি করবে? এতদসম্পর্কে তারা জানতে চায়। বল, তা অশুচি বা তার ক্ষরণের স্থানটি অপবিত্র। সুতরাং তোমরা রজঃস্রাবকালে সময়ে বা ঐ স্থানটি হতে স্ত্রীগণকে অর্থাৎ তাদের সাথে রতিক্রিয়া বর্জন করবে পরিত্যাগ করবে এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত রতিক্রিয়ার জন্য তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। يَطْهُرْنَ এ ক্রিয়াটি ط সাকিন বা ط ও ه -এর তাশদীদসহ পাঠ করা যায়। দ্বিতীয় অবস্থায় মূলত ط -এ- ت -এর اِدْغَامْ বা সন্ধি সংঘটিত হয়েছে বলে ধরা হবে। অর্থাৎ রজঃস্রাব বন্ধ হওয়ার পর যতক্ষণ গোসল না করেছে [ততক্ষণ রাতিক্রিয়ার জন্য নিকটবর্তী হয়ো না।] সুতরাং তারা যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হবে, তখন তাদের নিকট রতিক্রিয়ার উদ্দেশ্যে সেই স্থানে গমন করবে যে স্থানে আল্লাহ রজঃস্রাবের সময় দূরে থাকতে তোমাদেরকে [নির্দেশ দিয়েছিলেন।] আর তা হলো যোনি প্রদেশ। সুতরাং অন্য কোনো পথে গমন করে সীমালঙ্ঘন করো না। আল্লাহ তা'আলা পাপাচার হতে তাওবাকারীগণকে ভালোবাসেন অর্থাৎ তাদের পুণ্যফল দেন ও সম্মান প্রদান করেন এবং যারা অশুচিতা হতে পবিত্র থাকে, তাদেরকে পছন্দ করেন।

তাহকীক ও তারকীব

اَلْمَحِيْضُ : রজস্রাব। اَذًى : অশুচি। اِعْتَزِلُوْا : বর্জন কর, ভিন্ন থাক। اِنْقِطَاعٌ : বন্ধ হওয়া। تَجَنُّبٌ : পরিত্যাগ করা। اَلْقُبُلُ : সম্মুখ পথ, যোনি পথ। لَا تَعْدُوْا : সীমালঙ্ঘন করো না। اَلْاَقْذَارُ : قَذَرٌ -এর বহুবচন। অর্থ– অশুচি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হায়েজের বিধান : যৌবনপ্রাপ্ত স্ত্রীলোকের মাসিক রক্তস্রাবকে হায়েজ বলে। এ সময় সহবাস, রোজা, নামাজ সব নিষিদ্ধ। সাধারণ নিয়মের বাইরে যে রক্তস্রাব হয়, সেটা রোগবিশেষ। তখন সহবাস ও নামাজ-রোজা বৈধ। জখম বা শিঙ্গা লাগানোর স্থান হতে রক্তক্ষরণের সাথে এর তুলনা করা যেতে পারে। ইহুদি ও অগ্নিপূজকরা রজঃস্রাবকালে স্ত্রীলোকের সাথে পানাহার ও এক ঘরে বসবাসকেও অবৈধ মনে করত। অপর দিকে খ্রিস্টান সম্প্রদায় সহবাসও পরিহার করত না। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলে এ আয়াত নাজিল হয়। তিনি এ সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দেন, রজঃস্রাবকালে স্ত্রীগমন হারাম। তবে তাদের সাথে পানাহার ও একত্রে বাস জায়েজ। ইহুদিদের বাড়াবাড়ি ও খ্রিস্টানদের শৈথিল্য উভয় প্রকার প্রান্তিকতা পরিত্যাজ্য।

قَوْلُهُ الْمَحِيْضِ : যরফে যমান, রজঃস্রাব বা ঋতুকালীন সময়। শব্দটি যরফে মাকান হলে তার অর্থ হবে ঋতুর স্থান। মাসদার হলে তার স্থান হবে ঋতু আসা কিংবা ঋতুস্রাব যা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট অবস্থায় সুস্থ গর্ভবিহীন নারী থেকে নির্গত হয়। -[লুগাতুল কুরআন] اَلْمَحِيْضُ هُوَ الْحَيْضُ وَهُوَ مَصْدَرٌ يُقَالُ حَاضَتِ الْمَرْأَةُ حَيْضًا وَمَحِيْضًا فَهِيَ حَائِضٌ وَحَائِضَةٌ

قَوْلُهُ اَوْ مَكَانَهُ : এটা مَحِيْض -এর দুটি ব্যাখ্যার প্রতি ইঙ্গিত। اَلْحَيْضُ বলে ইঙ্গিত করেছেন যে, مَحِيْض -এর م বর্ণটি মাসদার জ্ঞাপক, অর্থ- রক্তপ্রবাহ, রজঃস্রাব।

قَوْلُهُ قَذَرٌ اَوْ مَحَلُّهُ : এটা اَذًى -এর দুটি ব্যাখ্যা। প্রথম ব্যাখ্যা ঋতুকালীন সময়ে সঙ্গম করা নিষিদ্ধ। স্বাভাবিক কার্যকলাপ এবং তার নিকটবর্তী হওয়া নিষিদ্ধ নয়।

قَوْلُهُ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ **শানে নুযূল :** ইহুদি সমাজের রীতি ছিল যে, মহিলারা ঋতুমতী হলে তাদেরকে ঘর থেকে বের করে দেওয়া হতো। কোনো কোণায় বা ভিন্ন ঘরে তাকে থাকতে বাধ্য করা হতো। একত্রে পানাহার করতে দেওয়া হতো না। হিন্দুদের প্রথাও একই ছিল। তারা ঋতুমতী মহিলাদের পানাহার-পাত্র এবং বিছানা ভিন্ন করে দিত। মোটকথা ঋতুকালে তার সাথে সামাজিক আচরণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়া হতো। পশুর চেয়ে তাকে নিকৃষ্ট মনে করা হতো। এর বিপরীতে খ্রিস্টানদের অবস্থা ছিল এই যে, ঋতুস্রাব কালে তারা স্ত্রীসহবাস বৈধ মনে করত। মোটকথা উভয় দল এ ব্যাপারে ভ্রান্তির মধ্যে লিপ্ত ছিল। হযরত আবূ দাহদা এবং একদল সাহাবী ঋতুকালে সহবাসের ব্যাপারে রাসূল ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞেস করলে তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

ইমাম মুসলিম প্রমুখ হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইহুদিদের অভ্যাস ছিল মহিলারা ঋতুমতী হলে তাদেরকে ঘর থেকে বের করে দিত। তাদের সাথে খানাপিনা বন্ধ করে দেওয়া হতো এবং সহবাস বর্জন করা হতো। মোটকথা তাদের সাথে উঠাবসা, থাকা-খাওয়া সবকিছু বন্ধ থাকত। কতিপয় সাহাবী ঋতু অবস্থায় স্ত্রীর সাথে উঠাবসা এবং সহবাসের ব্যাপারে প্রশ্ন করলে উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয়েছে যে, সহবাস ছাড়া অন্য কিছু নিষেধ নয়। হিন্দুস্থানেও কয়েক শতাব্দী পূর্বে এ রীতি ছিল। বিছানা-বর্তন সবকিছু আলাদা করে দেওয়া হতো। বিশেষত উঁচু বংশ জ্ঞানকারীদের মধ্যে সামান্য কিছুকাল পূর্বেও এ অবস্থা ছিল। এছাড়া আরও অনেক রীতি-নীতি ইহুদিদের সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল। নিজেদের অপেক্ষা নিচু বংশের জাতির জন্য ধর্মীয় পুস্তক অধ্যয়ন করার অধিকার ছিল না। নিম্ন বংশের মানুষ সংখ্যাধিক্য থাকা সত্ত্বেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ক্ষমতাশীল থাকায় সুদকে আয়রোজগারের বিশেষ উপায় মনে করা এবং নিজেদেরকে ক্ষমতার অধিকারী মনে করা ইত্যাদি কার্যাবলি দ্বারা বুঝা যায় যে, হিন্দুদের বংশীয় সম্বন্ধ রয়েছে ইহুদিদের সাথে।

পবিত্র কুরআন ঋতুকালে সহবাসের মাসআলাকে اِسْتِعَارَةٌ তথা রূপকভাবে বর্ণনা করেছে। যেমনটি কুরআনের অভ্যাস অর্থাৎ লজ্জাজনক বিষয়াদিকে ইঙ্গিতপূর্ণ শব্দে বর্ণনা করে থাকে। একইভাবে এখানে وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ দ্বারা সঙ্গম না করার প্রতি নির্দেশ করেছে। অর্থাৎ তাদের থেকে দূরে থাক। তাদের নিকট গমন করো না। এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, ঋতুকালে একই বিছানায় তার সঙ্গে বসা বা একত্রে পানাহার করা থেকেও বিরত থাক। তাদেরকে সম্পূর্ণ অদৃশ্যরূপে ছেড়ে দাও। যেমন- ইহুদি, হিন্দু এবং অন্যান্য জাতির অভ্যাস ছিল। রাসূল ﷺ এ বিধানের স্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন যে, ঋতুকালে কেবল সহবাস থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য সকল সম্বন্ধ পূর্বের অবস্থার ন্যায় বহাল থাকবে।

قَوْلُهُ حَتّٰى يَطْهُرْنَ اَىْ يَغْتَسِلْنَ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ : পবিত্র হওয়া সম্পর্কে বিস্তারিত কথা হলো, হায়েজ যদি পূর্ণ মেয়াদ অর্থাৎ দশ দিনে বন্ধ হয়, তাহলে তখন থেকেই সহবাস জায়েজ। যদি তার আগেই বন্ধ হয়ে যায়, যেমন কোনো স্ত্রীলোকের মাসিকের নিয়ম হলো ছয় দিন। এখন এ ছয় দিনের শেষে যদি স্রাব বন্ধ হয়ে যায়, তবে বন্ধ হওয়া মাত্রই মিলন জায়েজ নয়; বরং বন্ধের পর গোসল করে নেওয়া কিংবা এক সালাতের ওয়াক্ত অতিক্রান্ত শর্ত। যদি সাত-আট দিনের নিয়ম হয়ে থাকে, তাহলে ছয় দিনের শেষে বন্ধ হওয়ার পরও উক্ত মেয়াদ পার হতে হবে তারপর মিলন বৈধ। -[তাফসীরে উসমানী]

অনুবাদ :

২২৩. نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ اَىْ مَحَلُّ زَرْعِكُمْ لِلْوَلَدِ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَىْ مَحَلَّهُ وَهُوَ الْقُبُلُ اَنّٰى كَيْفَ شِئْتُمْ مِنْ قِيَامٍ وَقُعُوْدٍ وَاضْطِجَاعٍ وَاِقْبَالٍ وَاِدْبَارٍ نَزَلَ رَدًّا لِقَوْلِ الْيَهُوْدِ مَنْ اَتٰى اِمْرَأَتَهُ فِىْ قُبُلِهَا مِنْ جِهَةِ دُبُرِهَا جَاءَ الْوَلَدُ اَحْوَلُ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ الْعَمَلَ الصَّالِحَ كَالتَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ فِىْ اَمْرِهِ وَنَهْيِهِ وَاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ مُلٰقُوْهُ بِالْبَعْثِ فَيُجَازِيْكُمْ بِاَعْمَالِكُمْ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْهُ بِالْجَنَّةِ ـ

২২৩. স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র অর্থাৎ সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে অর্থাৎ তার নির্ধারিত স্থান যোনি-প্রদেশে যেভাবে ইচ্ছা দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে, সামনে, পিছনে সকল অবস্থায় গমন করতে পার। ইহুদিরা বলত, কেউ যদি যোনিপ্রদেশে পিছন দিক থেকে সঙ্গম করে তবে সন্তান ট্যারা হয়। ঐ ধারণার প্রত্যাখ্যানে এ আয়াত নাজিল হয়। পূর্বাহ্নে তোমরা তোমাদের জন্য কিছু সৎ আমল যেমন রমনের পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা করে নিও এবং আল্লাহকে তাঁর আদেশ-নিষেধের বেলায় ভয় করিও, আর জেনে রাখ! তোমরা পুনরুত্থানের মধ্যমে তাঁর সম্মুখীন হতে যাচ্ছ। অনন্তর তিনি তোমাদের কার্যের প্রতিফল প্রদান করবেন এবং বিশ্বাসীগণকে যারা তাঁকে ভয় করে, তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও।

তাহকীক ও তারকীব

حَرْثٌ : শস্যক্ষেত্র। قِيَامٌ : দাঁড়িয়ে। قُعُوْدٌ : বসে। اِضْطِجَاعٌ : শুয়ে। اِقْبَالٌ : সামনে। اِدْبَارٌ : পিছনে। اَحْوَلُ : ট্যারা। اَلتَّسْمِيَةُ : বিসমিল্লাহ বলা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করা সঙ্গত নয় : পেছনের দিক হতে সামনের পথে সঙ্গত হওয়াকে ইহুদিরা নিষিদ্ধ মনে করত। তারা বলত, এর ফলে সন্তান ট্যারা চোখের হয়। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করা হলে তখন এ আয়াত নাজিল হয়। অর্থাৎ তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র স্বরূপ। তোমাদের বীর্য যেন তার বীজ এবং সন্তান তার ফসল। অর্থাৎ দাম্পত্য সম্পর্কের মুখ্য উদ্দেশ্য সন্তান উৎপাদন ও বংশ রক্ষা। কাজেই তোমাদের এখতিয়ার আছে সামনাসামনি, অথবা পাশাপাশি কিংবা পেছন দিক হতে বা বসা অবস্থায় যে কোনোভাবেই সঙ্গত হতে পার। তবে হ্যাঁ, বীজ বপন যেন সেই বিশেষ স্থানেই হয়, যেখান থেকে সন্তান উৎপাদনের সম্ভবনা আছে অর্থাৎ স্ত্রী-যোনিই ব্যবহার করতে হবে, পশ্চাদ্বার কিছুতেই নয়। সন্তান ট্যারা চোখের হওয়া সম্পর্কিত ইহুদিদের ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। –[তাফসীরে উসমানী]

অনুবাদ :

٢٢٤. وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ اَىْ الْحَلْفَ بِهٖ عُرْضَةً لِاَيْمَانِكُمْ اَىْ نُصُبًا لَهَا بِاَنْ تُكْثِرُوا الْحَلْفَ بِهٖ اَنْ لَا تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ فَتُكْرَهُ الْيَمِيْنُ عَلٰى ذٰلِكَ وَيُسَنُّ فِيْهِ الْحِنْثُ وَيُكَفِّرُ بِخِلَافِهَا عَلٰى فِعْلِ الْبِرِّ وَنَحْوِهٖ فَهِىَ طَاعَةٌ اَلْمَعْنٰى لَا تَمْتَنِعُوْا مِنْ فِعْلِ مَا ذُكِرَ مِنَ الْبِرِّ وَنَحْوِهٖ اِذَا حَلَفْتُمْ عَلَيْهِ بَلْ ائْتُوْهُ وَكَفِّرُوْا لِاَنَّ سَبَبَ نُزُوْلِهَا الْاِمْتِنَاعُ مِنْ ذٰلِكَ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ لِاَقْوَالِكُمْ عَلِيْمٌ بِاَحْوَالِكُمْ.

২২৪. তোমরা আল্লাহকে আল্লাহর নামে শপথ করাকে তোমাদের শপথের অজুহাত হিসেবে প্রতিবন্ধকরূপে দাঁড় করিও না তাঁর নাম নিয়ে অধিকহারে শপথ করো না। তোমরা সৎকার্য, আত্মসংযম ও লোকদের মধ্যে শান্তি স্থাপন হতে বিরত থাকবে এ উদ্দেশ্যে اَنْ تَبَرُّوْا ক্রিয়াটির পূর্বে না আর্থবোধক শব্দ لا উহ্য রয়েছে। এতদ্বিষয়ের শপথ নিন্দনীয়। এ ধরনের শপথ ভঙ্গ করা সুন্নাহর মাধ্যমে প্রচলিত নিয়ম। এর বিপরীত কর্ম অর্থাৎ সৎ আমল ইত্যাদি করে তার কাফফারা প্রদান করতে হবে। এটা আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও বন্দেগি বলে গণ্য। অর্থাৎ যে সমস্ত সৎকর্ম না করার সে শপথ করেছিল তা করা হতে বিরত হবে না; বরং তা করবে ও শপথের কাফফারা দেবে। কেননা শপথ করে এ ধরনের সংকার্য হতে বিরত থাকার একটি ঘটনা হলো এই আয়াত নাজিলের কারণ। আল্লাহ অতি শুনেন তোমাদের সকল কথা এবং তিনি খুবই জানেন তোমাদের সকল অবস্থা।

٢٢٥. لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ الْكَائِنِ فِىْ اَيْمَانِكُمْ وَهُوَ مَا يَسْبِقُ اِلَيْهِ اللِّسَانُ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ الْحَلْفِ نَحْوُ لَا وَاللّٰهِ وَبَلٰى وَاللّٰهِ فَلَا اِثْمَ فِيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ اَىْ قَصَدَتْهُ مِنَ الْاَيْمَانِ اِذَا حَنِثْتُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ لِمَا كَانَ مِنَ اللَّغْوِ حَلِيْمٌ بِتَاْخِيْرِ الْعُقُوْبَةِ عَنْ مُسْتَحِقِّهَا.

২২৫. তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য فِىْ اَيْمَانِكُمْ এটা এ স্থানে উহ্য اَلْكَائِنُ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট। আল্লাহ তোমাদের দায়ী করবেন না; তা হলো শপথের ইচ্ছা ব্যতিরেকে এমনিতেই যা কথায় কথায় মুখ হতে বের হয়ে যায়। যেমন– কথায় কথায় لَا وَاللّٰهِ [না, খোদার কসম] بَلٰى وَاللّٰهِ [হ্যাঁ, খোদার কসম] ইত্যাদি বলা। তাতে পাপ নেই বা তাতে কাফফারাও দিতে হয় না। কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য দায়ী করবেন। অর্থাৎ হৃদয় যে শপথের সংকল্প করে তা যখন ভঙ্গ করবে, তখন তোমাদের দায়ী করা হবে। আল্লাহ যা 'লাগব' বা অর্থহীন হয়,তার প্রতি ক্ষমাপরায়ণ এবং শাস্তিযোগ্য ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদানে বিলম্ব করায় তিনি পরম ধৈর্যশীল।

তাহকীক ও তারকীব

عُرْضَةً : অজুহাত, প্রতিবন্ধক। نَصَبًا : লক্ষ্যবস্তু। اَلْحِنْثُ : কসম ভঙ্গ করা। اَللَّغْوُ : অনর্থক। مَا سَبَقَ اِلَيْهِ اللِّسَانُ : যা কথায় কথায় মুখ হতে বের হয়। مِنْ غَيْرِ قَصْدِ الْحَلْفِ : কসমের ইচ্ছা ছাড়া। تَاْخِيْرُ الْعُقُوْبَةِ : শাস্তি বিলম্বিত করা। مُسْتَحِقٌّ : যোগ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِاَيْمَانِكُمْ **শানে নুযূল** : আরবে জাহিলি যুগের একটি রীতি ছিল যে, শপথ করে বলত আমরা অমুক নেক কাজ, পরহেজগারির কাজ বা সামাজিক কল্যাণমূলক কাজ করব না। এ বিষয়ে তাদেরকে কিছু জিজ্ঞেস করা হলে তারা বলত, আমরা এসব কাজ না করার ব্যাপারে শপথ করে ফেলেছি। এসব উত্তম কাজ বর্জন করা এমনিতেই দূষণীয়, উপরন্তু আল্লাহর নামে অন্যায় কাজের শপথ করা তাঁর নামকে হেয় করার শামিল। তাদের উক্ত রীতি নিষিদ্ধ করে এ আয়াত নাজিল হয়।

মাসআলা : বিভিন্ন সহীহ হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে শপথ করে পরে যদি তার নিকট স্পষ্ট হয় যে, শপথ ভঙ্গ করার মাঝেই কল্যাণ রয়েছে, তাহলে সে তা ভঙ্গ করবে এবং কাফফারা দেবে। শপথ ভঙ্গের কাফ্‌ফারা হলো ১০ জন মিসকিনকে খাবার দান করা বা বস্ত্র দান করা বা একটি গোলাম আজাদ করা কিংবা তিনটি রোজা রাখা। অবশ্য স্বাভাবিক কথায় অনিচ্ছায় যে শপথ মুখ দিয়ে বের হয়ে যায়, এ ধরনের শপথের ব্যাপারে পাকড়াও হবে না এবং কাফফারা দিতে হবে না।

عُرْضَةً -এর স্বাভাবিক এবং প্রচলিত অর্থ হলো নিশানা, টার্গেট, লক্ষ্যস্থল। কেউ কেউ এ অর্থ গ্রহণ করেছেন। আরেকটি অর্থ হলো অন্তরায় বা প্রতিবন্ধক। এখানে এ অর্থটি অধিক উপযোগী। ফকীহগণ প্রয়োজন ছাড়া এবং বেশি বেশি শপথ করাকে অপছন্দ করেছেন। এতে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র নামের অমর্যাদা হয়। আর ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা শপথের তো কথাই চলে না। কেননা এ ধরনের কসম থেকে বিরত রাখার লক্ষ্যেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। মূল কিতাবের ৩৪নং পৃষ্ঠার ৬নং হাশিয়া থেকেও তা বুঝে আসে। হাশিয়ার বক্তব্য নিম্নরূপ–

اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ رَوَاحَةَ قَدْ حَدَثَتِ الْعَدَاوَةُ بَيْنَ اُخْتِهِ وَبَيْنَ زَوْجِ اُخْتِهِ بَشِيْرِ بْنِ نُعْمَانَ فَقَسَمَ بِاللّٰهِ الْاَعْظَمِ اَنْ لَا يَتَكَلَّمَ مَعَهُ وَلَا يُحْسِنَ فِيْ حَقِّهِ وَلَا يُصْلِحَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَصَمَائِهِ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ .

قَوْلُهُ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ : 'লাগব কসম' -এর দুটি অর্থ– একটি হচ্ছে, কোনো অতীত বিষয়ে মিথ্যা শপথ অনিচ্ছাকৃতভাবে মুখ থেকে বেরিয়ে পড়া কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে বলা বিষয়টিকে নিজের ধারণা মতে সঠিক বলেই মনে করে না। উদাহরণত নিজের জ্ঞান ও ধারণা অনুযায়ী কসম করে বসল যে, 'যায়েদ এসেছে' কিন্তু বাস্তবে সে আসেনি। অথবা কোনো ভবিষ্যৎ বিষয়ে এভাবে কসম কর বসল যে, উদ্দেশ্য ছিল অন্য কিছু, অথচ অনিচ্ছা সত্ত্বেও কসম বেরিয়ে গেছে এরকম– এতে কোনো পাপ হবে না। আর সে জন্যই একে 'লাগব' বা 'অহেতুক' বলা হয়েছে। আখিরাতে এজন্যে কোনো জবাবদিহি করতে হবে না। যেসব কসমের জন্য জবাবদিহির কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে সেসব কসম যা ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা জেনেই করা হয়। একে বলা হয় 'গামূস'। এতে পাপ হয়। তবে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, এর কোনো কাফ্‌ফারা দিতে হয় না। আর উল্লিখিত অর্থে 'লাগব' কসমের জন্যও কোনো কাফফারা নেই। এ আয়াতে এ দু রকমের কসম সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে।

'লাগব' -এর দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, যাতে কাফফারা দিতে হয় না। আর একে 'লাগব' [অহেতুক] এজন্যে বলা হয় যে, এতে পার্থিব কোনো কাফফারা বা প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় না। এ অর্থে 'গামূস' কসমও এরই অন্তর্ভুক্ত। কারণ তাতে পাপ হলেও কোনো রকম কাফফারা দিতে হয় না। এতদুভয়ের তুলনায় যে কসমের প্রেক্ষিতে কাফফারা বা প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় তাকে বলা হয় 'মুনআকিদা'। এর তাৎপর্য হলো যে, কেউ যদি 'আমি অমুক কাজটি করব' কিংবা 'অমুক বিষয়টি সম্পাদন করব' বলে কসম খেয়ে তার বিপরীত কাজ করে, তাহলে তাতে তাকে কাফফারা দিতেই হবে। –[মা'আরিফুল কুরআন]

অনুবাদ :

۲۲٦. لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِسَآئِهِمْ اَىْ يَحْلِفُوْنَ اَنْ لَا يُجَامِعُوْهُنَّ تَرَبُّصُ اِنْتِظَارُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ فَاِنْ فَاءُوْا رَجَعُوْا فِيْهَا اَوْ بَعْدَهَا عَنِ الْيَمِيْنِ اِلَى الْوَطْئِ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ لَهُمْ مَا اَتَوْهُ مِنْ ضَرَرِ الْمَرْأَةِ بِالْحَلْفِ رَحِيْمٌ بِهِمْ.

২২৬. যারা স্ত্রীদের সাথে ঈলা করে অর্থাৎ সঙ্গম না হওয়ার শপথ করে তারা চার মাস প্রতীক্ষা করবে, অপেক্ষা করবে অতঃপর যদি তারা প্রত্যাগত হয় উক্ত সময়ে বা তৎপরে শপথ পরিত্যাগ করে সঙ্গত হওয়ার প্রতি প্রত্যাগত হয় তবে আল্লাহ্ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল, এরূপ শপথ করে স্ত্রীকে যে কষ্ট দিল তা ক্ষমা করে দেবেন ও তাদের প্রতি তিনি পরম দয়ালু।

۲۲۷. وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اَىْ عَلَيْهِ بِاَنْ لَمْ يُفِيْئُوْا فَلْيُوْقِعُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ لِقَوْلِهِمْ عَلِيْمٌ بِعَزْمِهِمْ اَلْمَعْنٰى لَيْسَ لَهُمْ بَعْدَ تَرَبُّصِ مَا ذُكِرَ اِلَّا الْفَيْئَةُ اَوِ الطَّلَاقُ.

২২৭. আর যদি তারা তালাক প্রদানের সংকল্প করে যেমন শপথ হতে প্রত্যাগত হলো না, তবে যেন তারা তালাক দিয়ে দেয়। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের কথা শুনেন এবং তাদের সংকল্প সম্পর্কে তিনি খুব অবহিত। অর্থাৎ উক্ত সময় অপেক্ষার পর প্রত্যাগত হওয়া বা তালাক প্রদান এ দুটি ছাড়া তার আর কিছুই করার অধিকার নেই।

তাহকীক ও তারকীব

يُؤْلُوْنَ : এটি اِيْلَاءٌ থেকে جَمْعٌ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ-এর সীগাহ। অর্থ– যারা স্ত্রীদের সাথে সহবাস না করে কসম করে। আরব জাহিলি প্রথার অন্যতম ছিল-স্বামী রাগের বশে স্ত্রীর সঙ্গে বসবাস না করার কসম খেয়ে বসত। পরিভাষায় এ ধরনের কসমকে اِيْلَاءٌ [ঈলা] বলে। ইসলামি শরিয়ত এতে যে সংস্কার করেছে এবং এর যেসব বিধান রয়েছে, এখানে তারই আলোচনা রয়েছে। اَلْاِيْلَاءُ لُغَةً : اَلْحَلْفُ . يُقَالُ . آلٰى يُؤَالِىْ اِيْلَاءً وَفِى الشَّرْعِ : اَلْيَمِيْنُ عَلٰى تَرْكِ وَطْءِ الزَّوْجَةِ

تَرَبُّصٌ : অপেক্ষা, প্রতীক্ষা। فَاءُوْا : প্রত্যাগত হলো। فَاءَ يَفِيْءُ (ض) فَيْئَةً অর্থ– ফিরে আসা। এ কারণেই ছায়াকে فَيْءٌ বলা হয়। কেননা তা ফিরে আসে। وَاِنْ عَزَمُوْا : যদি সংকল্প করে। فَلْيُوْقِعُوْهُ : যেন তালাক দিয়ে দেয়।

اَلْفَيْئَةُ : প্রত্যাগত হওয়া।

قَوْلُهُ فَاِنْ فَاءُوْا : অর্থাৎ যদি সম্পর্কচ্ছেদের ইচ্ছা থেকে প্রত্যাগত হয় ও বিবাহ অক্ষুণ্ন রাখতে চায়। فَاءُوْا শব্দটি اَلْفَيْءُ মাসদার থেকে جَمْعٌ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ-এর সীগাহ। اَلْفَيْءُ অর্থ– কোনো বিষয়ের দিকে প্রত্যাবর্তন করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ঈলার বিধান : কেউ যদি শপথ করে 'আমি স্ত্রীর কাছে যাব না', তবে চার মাসের ভিতরে তার কাছে গেলে শপথ ভঙ্গের কাফফারা দিতে হবে। এ অবস্থায় স্ত্রী তার বিবাহাধীনে বহাল থাকবে। যদি চার মাস পার হয়ে যায় এবং এর ভিতরে স্ত্রীগমন না করে, তাহলে স্ত্রী বায়েন তালাক হয়ে যাবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : চার মাস বা তার বেশি কিংবা মেয়াদ নির্ধারণ ব্যতিরেকেই স্ত্রীগমন করার শপথকে 'ঈলা' বলা হয়। চার মাসের কম হলে সেটা ঈলা হবে না। তিন প্রকার ঈলায়ই চার মাসের ভিতরে স্ত্রীগমন করলে শপথ ভঙ্গের কাফফারা দিতে হবে। আর এ সময়ের ভিতর স্ত্রীগমন হতে বিরত থাকলে তালাক দেওয়া ছাড়াই স্ত্রী বায়েন তালাক হয়ে যাবে। যদি চার মাসের কম সময়ের জন্য শপথ করে, উদাহরণত কেউ কসম খেল, আমি তিন মাস স্ত্রীগমন করব না। তাহলে এটা শরিয়তের পরিভাষায় ঈলা সাব্যস্ত হবে না। এর হুকুম হলো, যদি কসম ভেঙ্গে ফেলে অর্থাৎ উক্ত তিন মাসের মধ্যে স্ত্রীগমন করে, তবে কসমের কাফফারা দিতে হবে। আর যদি কসম পূর্ণ করে অর্থাৎ তিন মাসের ভিতর স্ত্রীর কাছে না যায়, তবে স্ত্রী তালাক হবে না এবং কাফ্ফারাও দিতে হবে না। -[তাফসীরে উসমানী]

ঈলার চারটি সুরত : যদি স্বামী কসম খেয়ে বলে যে, আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করব না, তবে তার চারটি দিক রয়েছে-

১. কোনো সময় নির্ধারণ করল না।
২. চার মাসের কসম সময়ের শর্ত রাখলো।
৩. চার মাসের বেশি সময়ের শর্ত আরোপ করলো।
৪. চার মাসের কম সময়ের শর্ত রাখল।

বস্তুত ১ম ২য় ও ৩য় দিকগুলোকে শরিয়তে ঈলা বলা হয়। আর তার বিধান হচ্ছে, যদি চার মাসের মধ্যে কসম ভেঙ্গে স্ত্রীর কাছে চলে আসে, তাহলে তাকে কসমের কাফফারা দিতে হবে, কিন্তু বিয়ে যথাস্থানে বহাল থাকবে। পক্ষান্তরে যদি চার মাস অতিবাহিত হয়ে গেলেও কসম না ভাঙ্গে, তাহলে সেই স্ত্রীর উপর 'তালাকে-কাতয়ী' বা নিশ্চিত তালাক পতিত হবে। অর্থাৎ পুনর্বার বিয়ে ছাড়া স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়া জায়েজ থাকবে না। অবশ্য স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ঐকমত্যে পুনরায় বিয়ে করে নিলেই জায়েজ হবে। আর চতুর্থ অবস্থায় নির্দেশ হচ্ছে, যদি কসম ভঙ্গ করে, তাহলে কাফফারা ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে কসম পূর্ণ করলেও বিয়ে যথাযথ অটুট থাকবে। -[বায়ানুল কুরআন সূত্রে মা'আরিফুর কুরআন]

قَوْلُهُ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ : জাহিলি আরবরা ঈলা করার পরে যা তাদের সামাজিক আইনে এক ধরনের বিবাহ বিচ্ছেদই ছিল- সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রীর খোরপোশের দায়দায়িত্ব হতে অব্যাহতি নিয়ে নিত। ইসলাম এতে প্রথম সংস্কার এই করেছে যে, এটিকে তাৎক্ষণিক তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদের সম-পর্যায়ের সাব্যস্ত না করে শুধু তার প্রাথমিক পদক্ষেপ ও ভূমিকা সাব্যস্ত করেছে এবং ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে চিন্তাভাবনার সুযোগ দেওয়ার জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। এ সময়সীমা হলো চার মাস, যা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সব দিক নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় বিচার-বিশ্লেষণ ও চিন্তাভাবনা করার জন্য সম্পূর্ণরূপে যথেষ্ট।

বিভিন্ন ধর্মে তালাক : তালাক বলা হয় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্কের আইনগত ও পূর্ণাঙ্গ বিচ্ছেদকে। ইসলামপূর্ব বিশ্বে তালাকের ব্যাপারে ছিল আজব ধরনের বাড়াবাড়ি। একদিকে ইহুদি ধর্মে ছিল যথেচ্ছাচার, অপরদিকে খ্রিস্টধর্মে ছিল আইনের বাঁধন-কষণ। ইহুদিদের জন্য তালাকে কোনো বিধিনিষেধ ছিল না এবং স্বামীকে তালাকের জন্য কোনো দায়দায়িত্বও নিতে হতো না বা জবাবদিহি করার প্রয়োজনও ছিল না। স্বামীর যখন ইচ্ছা, কারণে অকারণে একখানা তালাকনামা লিখে দিয়ে স্ত্রীর দায়দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করত। আর স্ত্রীও তখনই অন্য কোনো পুরুষের হাত ধরে তার ঘর করতে চলে যেতে পারত। তাওরাতের বিধিমালায় রয়েছে- "কোনো পুরুষ কোনো স্ত্রীকে গ্রহণ করিয়া বিবাহ করিবার পর যদি তাহাতে কোনো প্রকার অনুপযুক্ত ব্যবহার দেখিতে পায়, আর সেই জন্য সে স্ত্রী তাহার দৃষ্টিতে প্রীতিপাত্র না হয়, তবে সেই পুরুষ তাহার জন্য এক ত্যাগপত্র লিখিয়া তাহার হস্তে দিয়া আপন বাড়ি হইতে তাহাকে বিদায় করিতে পারিবে। আর সে স্ত্রী তাহার বাড়ি হইতে বিদায় হইবার পর গিয়া অন্য পুরুষের ভার্যা হইতে পারিবে।" এ অতি স্বাধীনতা ও লাগমহীনতার বিপরীতে খ্রিস্টবাদীরা এমন কড়াকড়ির বাঁধন-কষণ লাগিয়েছে যে, তারা আর [শত প্রয়োজনেও] স্বামী-স্ত্রীর

পৃথক হওয়ার কোনো পথ রাখেনি। ইঞ্জিলের [বাইবেল নতুন নিয়ম] বর্ণনা-ভাষ্য..........অতএব, ঈশ্বর যাহার যোগ করিয়া দিয়াছেন, মনুষ্য তাহার বিয়োগ না করুক। .....যে কেহ আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্যকে বিবাহ করে, সে তাহার [স্ত্রী] বিরুদ্ধে ব্যভিচার করে, আর স্ত্রী যদি আপন স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া আর একজনকে বিবাহ করে, সেও ব্যভিচার করে। "আর বিবাহিত লোকদিগকে এই আজ্ঞা দিতেছি- আমি দিতেছি তাহা নয়, কিন্তু প্রভুই দিতেছেন- স্ত্রী স্বামীর নিকট হতে চালিয়া না যাউক......আর স্বামীও স্ত্রীকে পরিত্যাগ না করুক।" এ কারণেই খ্রিস্টান বিশ্বের বড় দল অর্থাৎ ক্যাথলিকের [রক্ষণশীল] দলের মতে এখনও পর্যন্ত বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ অবৈধ এবং কোনো একজনের মৃত্যু ব্যতীত [দাম্পত্য অমিলের বিভীষিকা থেকে] স্বামী-স্ত্রীর পৃথক হওয়ার অন্য কোনো উপায় নেই। ইসলামপূর্ব যুগে খ্রিস্টবাদের এ দলটিরই অস্তিত্ব ছিল। প্রোটেস্টান্ট [প্রগতিবাদী] দলটির জন্ম হয়েছে ইসলামের আবির্ভাবের বহু শতাব্দী পরে [এবং বলা যায়, ইসলামি বিধানের ধাক্কা খেয়ে]। এদের মতে অবশ্য বিবাহ বিচ্ছেদের অনুমতি পাওয়া গিয়েছে। তবে তাও আদালতে কোনো এক পক্ষের ব্যভিচার বা জুলুম-নির্যাতন প্রমাণিত হওয়ার পরেই।

এতো ছিল সেসব সম্প্রদায়ের হাল অবস্থা, [যারা নামে হলেও] কিতাবধারী। অর্থাৎ যেমন করেই হোক, তাদের আইনের ভিত্তি আসমানি কিতাব হওয়ারই দাবি রয়েছে। পক্ষান্তরে প্রাচীন জাহিলি বর্বর ও পৌত্তলিক 'সভ্য' ও 'উন্নত' জাতিসমূহের কথা- তা একদিকে গ্রীক ও হিন্দুদের ধর্মমতে এবং একটি বিশেষ কাল পর্যন্ত রোমানদের মাঝে তালাক নামের কোনো বিষয়ের সঙ্গে কোনো পরিচিতিই ছিল না; বরং হিন্দু ধর্মে তো আজ পর্যন্ত [১৯৪৫ খ্রি.] তালাক ও বিয়ে ভঙ্গ অবৈধই চলে আসছে। যদিও বাস্তবতায় বাধ্য হয়ে ইংরেজ শাসনাধীন ভারতে এখন তা বৈধ কারার জোর প্রচেষ্টা চলছে এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক কাউন্সিলে ও সংসদে এর জন্য বিল উত্থাপন করা হচ্ছে। অন্যদিকে রোমানদের মাঝে গণতন্ত্রের যুগ শেষ হওয়ার পরে বিবাহ বিচ্ছেদ বৈধ ঘোষিত হওয়ার পর থেকে তাতে এমন প্রবল ঢল নেমেছিল, যেন আভিজাত্য ও বিবাহ বিচ্ছেদ পরস্পর অবিচ্ছেদ্য বিষয়।

পৃথিবীর এসব বড় বড় ধর্ম মতবাদ ও নামীদামী সভ্যজাতিগুলোর এ সীমাহীন বাড়াবাড়ি, বাঁধা-কষণ ও অবাস্তবতার প্রতি নজর রেখে বিচার-বিশ্লেষণ করলে তবেই ইসলামের মিতাচার, সুষমতা ও তার প্রজ্ঞাপূর্ণ বিধানের ভারসাম্যতার মূল্য প্রতিভাত হবে। ইসলাম মানব স্বভাবের সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ জরিপের ভিত্তিতে এ বিধান দিয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রীর মাঝের অমিল ও অসম্প্রীতি প্রতিকারের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার উপক্রম করলে [অবশ্য এ অমিলের কারণ-উপকরণের পূর্ণাঙ্গ ফিরিস্তি দেওয়া সম্ভব নয়; কেননা প্রতিটি দম্পতির ক্ষেত্রে বলা যায়- পৃথক পৃথক কারণ পরিলক্ষিত হবে] এবং মিলমিশ সৃষ্টির যাবতীয় চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে তখনকার জন্য সর্বশেষ ব্যবস্থা এরূপ রাখা হয়েছে যে, উভয় পক্ষ স্বেচ্ছায় খোলাখুলি আলোচনার মাধ্যমে [পরস্পর সামাজিক সৌহর্দবোধ অক্ষুণ্ন রেখেই] নিয়মতান্ত্রিকভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে প্রত্যেকে জীবনের পথ পৃথক করে নেবে। এরই পারিভাষিক নাম তালাক। এ বিচ্ছেদে সংগঠনকেও লাগামহীন ছেড়ে দেওয়া হয়নি; বরং এর জন্য পূর্বাপর অনেক শর্ত ও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। পরবর্তী আলোচনা এসব শর্ত ও বিধিনিষেধ সংক্রান্ত। -[তাফসীরে মাজেদী]

অনুবাদ :

٢٢٨. وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ اَىْ لِيَنْتَظِرْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ عَنِ النِّكَاحِ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ تَمْضِىْ مِنْ حِيْنِ الطَّلَاقِ جَمْعُ قَرْءٍ بِفَتْحِ الْقَافِ وَهُوَ الطُّهْرُ اَوِ الْحَيْضُ قَوْلَانِ وَهٰذَا فِى الْمَدْخُوْلِ بِهِنَّ اِمَّا غَيْرُهُنَّ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهِنَّ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا وَفِىْ غَيْرِ الْاٰيِسَةِ وَالصَّغِيْرَةِ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ وَالْحَوَامِلُ فَعِدَّتُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ كَمَا فِىْ سُوْرَةِ الطَّلَاقِ وَالْاِمَاءِ فَعِدَّتُهُنَّ قَرْاٰنِ بِالسُّنَّةِ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِىْ اَرْحَامِهِنَّ مِنَ الْوَلَدِ اَوْ الْحَيْضِ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَزْوَاجُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ بِمُرَاجَعَتِهِنَّ وَلَوْ اَبَيْنَ فِىْ ذٰلِكَ اَىْ فِىْ زَمَنِ التَّرَبُّصِ اِنْ اَرَادُوْا اِصْلَاحًا بَيْنَهُمَا لَا ضَرَارَ الْمَرْأَةِ وَهُوَ تَحْرِيْضٌ عَلٰى قَصْدِهٖ لَا شَرْطَ لِجَوَازِ الرَّجْعَةِ وَهٰذَا فِى الطَّلَاقِ الرَّجْعِىِّ وَاَحَقُّ لَا تَفْضِيْلَ فِيْهِ اِذْ لَا حَقَّ لِغَيْرِهِمْ فِىْ نِكَاحِهِنَّ فِى الْعِدَّةِ ـ

২২৮. তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীগণ তালাকের সময় হতে তিন কুরু অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত নতুন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে নিজের বিষয়ে অপেক্ষায় প্রতীক্ষায় থাকবে। قُرُوْءٌ এটা قَرْءٌ [قَافٌ বর্ণের ফাতাহসহ] -এর বহুবচন। এর অর্থ সম্পর্কে দুটি অভিমত রয়েছে– ১. রজঃস্রাব বা ২. তুহর [রজঃস্রাবমুক্ত দিনসমূহ]। এ ইদ্দত হলো مَدْخُوْل بِهِنَّ অর্থাৎ সঙ্গমকৃতা স্ত্রীর। সঙ্গমকৃতা না হলে তার তালাকের পর ইদ্দত পালন করতে হয় না। কেননা আল্লাহ তা'আলা অপর এক স্থলে ইরশাদ করেন– فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا অর্থাৎ 'তাদের উপর ইদ্দত পালনের বিধান নেই যে, তারা তা গণনা করবে।' এমনিভাবে আয়িসা অর্থাৎ রজঃস্রাব সম্পর্কে নিরাশ মহিলা বা নাবালিকার বেলায়ও এ বিধান প্রযোজ্য নয়। তাদের ইদ্দত হলো তিন মাস। গর্ভবতী মহিলাগণও এর ব্যতিক্রম। সূরা তালাকে উল্লেখ হয়েছে যে, তাদের ইদ্দত হলো গর্ভমুক্ত হওয়া। দাসীগণের বিধানও এর ব্যতিক্রম। সুন্নার বিবরণানুসারে তাদের ইদ্দত হলো দুই 'কুরু'। তারা আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিনে বিশ্বাসী হলে তাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ তা'আলা রজঃস্রাব বা সন্তান যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন রাখা তাদের পক্ষে বৈধ নয়। যদি তারা পরস্পরে সম্প্রীতির জীবন চায় স্ত্রীকে কষ্ট প্রদান তাদের উদ্দেশ্য না হয় তবে তাতে অর্থাৎ প্রতীক্ষা [ইদ্দত পালন] কালে তাদের পুনঃগ্রহণে রাজআত বা ফিরিয়ে আনার বিষয়ে তারা [স্ত্রীগণ] অস্বীকার করলেও তাদের পুরুষগণ স্বামীগণ অধিক হকদার। 'যদি সম্প্রীতির জীবন চায়' -এ কথা রাজআত বা স্ত্রীকে ইদ্দতের মধ্যে পুনঃগ্রহণের কোনো শর্ত নয়; বরং রাজআতের বেলায় এ ধরনের উদ্দেশ্য থাকা চাই এদিকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে এ স্থানে এর উল্লেখ করা হয়েছে। এ রাজআত বা পুনঃগ্রহণের বিধান তালাকে রাজঈর বেলায়ই কেবল প্রযোজ্য।

اَحَقُّ অর্থাৎ অধিক হকদার এ কথার তুলনামূলক বোধটি এ স্থানে বিবেচ্য নয়। কেননা ইদ্দতের মাঝে তাকে বিবাহ করার আর কারো কোনো হক নেই।

তাহকীক ও তারকীব

قُرُوْءٌ : قَرْءٌ -এর বহুবচন। حَيْض এবং طُهر উভয়টির অর্থে ব্যবহৃত হয়। এটি اِضْدَادٌ -এর অন্তর্ভুক্ত। قَرْءٌ -এর মূল অর্থ হলো اَلْاِجْتِمَاعُ বা একত্রিত হওয়া। حَيْض -এর নাম قَرْءٌ রাখার কারণ হলো, সে সময় গর্ভে রক্ত একত্রিত হয়।
اَلْمَدْخُوْلُ بِهِنَّ : সঙ্গমকৃতা স্ত্রী। اَلْاٰيِسَةُ : রক্তস্রাব সম্পর্কে নিরাশ মহিলা। اَلْحَوَامِلُ : حَامِلَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ– গর্ভবতী। اَلْاِمَاءُ : اَمَةٌ -এর বহুবচন। বাঁদি, দাসী। بُعُوْلَةٌ : بَعْل -এর বহুবচন। অর্থ– স্বামী।
وَلَوْ اَبَيْنَ : যদিও অস্বীকার করে। تَحْرِيْض : উদ্বুদ্ধকরণ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْمُطَلَّقٰتُ : শাব্দিক অর্থে তালাকপ্রাপ্তা যে কোনো নারীকে বুঝায়; কিন্তু এখানে সে সকল তালাকপ্রাপ্তাই উদ্দেশ্য, যারা স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্কা এবং যার সঙ্গে স্বীকৃত একান্ত নির্জনবাস হয়েছে। এখানে এদের বিষয়ই আলোচনা হয়েছে। তালাকপ্রাপ্তা অন্যান্য প্রকার নারীদের আলোচনা অন্যত্র করা হয়েছে।

قَوْلُهُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ **ইদ্দত ও রাজআত সংক্রান্ত আলোচনা :** অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণ তালাকের সময় হতে তিন কুরু অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত নতুন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে নিজের বিষয়ে অপেক্ষায় থাকবে। এমন যেন না হয় যে, এদিকে স্বামী তালাক দিল, ওদিকে স্ত্রী আর দেরী না করে তখনই অন্য স্বামী গ্রহণ করল। এটি তালাক সংক্রান্ত প্রথম বিধিনিষেধ। প্রথম বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্তি পরবর্তী এ অবকাশকালীন সময়কেই শরিয়তের পরিভাষায় عِدَّتْ 'ইদ্দত' বলা হয়। স্ত্রীর জন্য এ নির্ধারিত সময়ের প্রতীক্ষা বিধানে অনেক হিকমত, রহস্য ও স্বার্থ-কুশলতা নিহিত রয়েছে। একদিকে স্বামী ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তাভাবনা করার পূর্ণ অবকাশ পেয়ে যায়। অন্যদিকে স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে পূর্ণ নিশ্চিত হওয়া যায়। অন্যান্য সম্প্রদায়ও অপরাপর ধর্মাবলম্বীরা ইসলামি শরিয়ত নির্দেশিত অন্তর্বর্তীকাল ও বিরতির উপকারিতা ও লক্ষ্য উদ্দেশ্য থেকে বঞ্চিত। তিন মাসের সময় একেবারে কম নয়, ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তাভাবনার জন্য এবং অসন্তুষ্টির সাময়িক আবেগের জোয়ার স্তিমিত হওয়ার জন্য এ সময় যথেষ্ট। এ সময়ের মধ্যে যদি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সদ্ভাব সৃষ্টি হয় এবং স্বামী স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ করতে উদ্যত হয়, তবে মৌলিক বা কার্যত ঐ তালাককে রহিত করতে পারে। পরিভাষায় এ ব্যবস্থাই رَجْعَتْ নামে অভিহিত।

قَوْلُهُ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ : قَرْءٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ শুধু একটি নির্দিষ্ট সময় বা নির্ধারিত মেয়াদ। আর এ শব্দটি اَضْدَادٌ বা পরস্পর বিরোধী। তুহ্‌র [দুই মাসিকের মধ্যেবর্তী পবিত্রকাল] ও হায়েজ [মাসিক ঋতু] এ দুই অর্থের সম্ভবনাযুক্ত। এ কারণে তাফসীরবিদদের দুটি মত সৃষ্টি হয়েছে। এক দল এখানে طُهر বা পবিত্রতা অর্থে অর্থ স্থির করেছেন। যেমন ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতও এটিই। অপর দিকে ইমাম আবূ হানীফা (র.) সহ অনেকেই قَرْءٌ দ্বারা حَيْض বা অপবিত্রতাকালীন সময় অর্থ স্থির করেছেন। ভাষাবিদ ও অভিধান বিশেষজ্ঞদের পক্ষ থেকে এ শেষোক্ত অর্থের অনুকূলে অধিক সনদ পাওয়া যায়। বলা হয়– اَقْرَتِ الْمَرْاَةُ যখন নারী মাসিক স্রাববতী হয়। মোটকথা, হানাফীগণের মতে সর্বসম্মত মাসআলা হলো, স্ত্রী তার তিনটি মাসিক হয়ে যাওয়া পর্যন্ত নিজেদের ইদ্দতের মেয়াদের মধ্যে মনে করবে এবং এ মেয়াদের মধ্যে সে নিজের জন্য দ্বিতীয় বিবাহ জায়েজ মনে করবে না।

قَوْلُهُ مِنَ الْوَلَدِ اَوِ الْحَيْضِ : مَا خَلَقَ اللّٰهُ আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন....ব্যাপক অর্থে, গর্ভে যা কিছুই থাক না কেন। তা প্রাণধারী শিশু হোক কিংবা মাসিকের রক্ত উভয়কেই مَا শব্দ অন্তর্ভুক্ত করে। মুসান্নিফ (র.) বর্ণিত ইবারতে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ اِنْ اَرَادُوْا اِصْلَاحًا بَيْنَهُمَا لَا ضِرَارَ الْمَرْاَةِ وَهُوَ تَحْرِيْضٌ عَلٰى قَصْدِهِ لَا شَرْطٌ لِجَوَازِ الرَّجْعَةِ : এখানে বলা হচ্ছে, পুনঃগ্রহণ ও রাজআত দ্বারা যেন অধিক নির্যাতনের সুযোগ গ্রহণ করা না হয়। এরূপ নিয়ত থাকা না থাকা রাজআতের শর্ত নয়। যদিও বাহ্যত ও আইনত রাজআত তখনও সাব্যস্ত হবে। কেননা আইনগত বিধান ও নৈতিক উপদেশ দুটি পৃথক বিষয়। আইনগত বিধানের ফাঁকে এখানে নিয়ত বিশুদ্ধকরণ ও ইখলাসের তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاَحَقُّ لَا تَفْضِيْلَ فِيْهِ اِذَا لَا حَقَّ لِغَيْرِهِمْ فِىْ نِكَاحِهِنَّ فِى الْعِدَّةِ : এ ইবারত দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে।
প্রশ্ন: اَلْحَقُّ হলো اِسْمُ تَفْضِيْل আর এটা مُفَضَّلٌ عَلَيْهِ দাবি করে। অথচ এখানে তা সম্ভব নয়। কেননা স্বামী ছাড়া কেউ রাজআত দাবি করার অধিকার রাখে না। অথচ এর দ্বারা বুঝা যায়, স্বামীর অধিকার বেশি, তবে অন্যদেরও কিছু অধিকার আছে।
উত্তর: এখানে اِسْمُ تَفْضِيْل শব্দটি اِسْمُ فَاعِلٌ -এর অর্থে। অর্থাৎ حَقِيْق তথা যোগ্য অর্থে। অতএব কোনো প্রশ্ন নেই। মুসান্নিফ (র.) -এর ইবারত– اِذْ لَا حَقَّ لِغَيْرِهِمْ فِىْ نِكَاحِهِنَّ فِى الْعِدَّةِ -এর উদ্দেশ্য এটাই।

وَلَهُنَّ عَلَى الْأَزْوَاجِ مِثْلُ الَّذِي لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحُقُوقِ بِالْمَعْرُوفِ شَرْعًا مِنْ حُسْنِ الْعِشْرَةِ وَتَرْكِ الضِّرَارِ وَنَحْوِ ذٰلِكَ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ فَضِيلَةٌ فِي الْحَقِّ مِنْ وُجُوبِ طَاعَتِهِنَّ لَهُمْ لِمَا سَاقُوهُ مِنَ الْمَهْرِ وَالْإِنْفَاقِ وَاللّٰهُ عَزِيزٌ فِي مُلْكِهِ حَكِيمٌ فِيمَا دَبَّرَهُ لِخَلْقِهِ ـ

অনুবাদ : স্বামীগণের উপর নারীদের ন্যায়সঙ্গত শরিয়তের বিধানানুসারের অধিকার রয়েছে, যেমন রয়েছে তাদের অর্থাৎ স্বামীদের তাদের অর্থাৎ স্ত্রীগণের উপর। যেমন স্ত্রীদের সাথে সদাচরণ করা, কষ্ট না দেওয়া ইত্যাদি। তবে নারীদের উপর পুরুষের রয়েছে প্রাধান্য অর্থাৎ অধিকারের মধ্যে বিশেষ মর্যাদা। তাদের উপর তাদের [স্বামীগণের] প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন অবশ্য কর্তব্য। কেননা তারা [স্বামীগণ] তাদের মোহর প্রদান করে এবং তাদের ভরণ-পোষণ করে। আল্লাহ তাঁর সাম্রাজ্যে মহাপরাক্রমশালী এবং সৃষ্টি পরিচালনা বিষয়ে তিনি প্রজ্ঞাময়।

তাহকীক ও তারকীব

اَلْحُقُوْقُ : حَقٌّ -এর বহুবচন। অর্থ– অধিকার, প্রাপ্য। بِالْمَعْرُوْفِ : ন্যায়সঙ্গতভাবে। حُسْنُ الْعِشْرَةِ : সদাচরণ। اَلضِّرَارُ : কষ্ট। لِمَا سَاقُوْهُ مِنَ الْمَهْرِ وَالْاِنْفَاقِ : কেননা স্বামীগণ তাদের মোহর প্রদান করে এবং তাদের ভরণ-পোষণ করে। دَبَّرَ : دَبَّرَ (تَفْعِيْل) تَدْبِيْرًا অর্থ– পরিচালনা করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ **স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য :** কুরআন এখানে অসাধারণ বর্ণনাশৈলীর মাধ্যমে একটি বড় বিষয়কে সংক্ষেপে উপস্থাপন করেছে। তা হলো. স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য এবং সেগুলোর স্তর নির্ণয়। বলা হয়েছে, যেরূপে স্বামীদের অধিকার রয়েছে স্ত্রীদের উপর, তদ্রূপ স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে স্বামীদের উপর। অর্থাৎ যেন দুনিয়াকে জানিয়ে দেওয়া হলো এমন মনে কর না যে, শুধু পুরুষদেরই নারীদের উপর অধিকার থাকে। না, তেমন নয়। অনুরূপভাবে নারীদেরও পুরুষদের উপর এবং স্ত্রীদেরও স্বামীদের উপর অধিকার বর্তায়। এখানে স্ত্রীলোকের অধিকারের কথা পুরুষের অধিকারের আগে বলা হয়েছে। এর একটি কারণ হচ্ছে, পুরুষ তো নিজের ক্ষমতায় এবং খোদাপ্রদত্ত মর্যাদার বলে নারীর কাছ থেকে নিজের অধিকার আদায় করেই নেয়, কিন্তু নারীদের অধিকারের কথাও চিন্তা করা প্রয়োজন। কেননা তারা শক্তি দ্বারা তা আদায় করতে পারে না।

নারী অধিকারের এ শ্লোগান ও সনদ আরবের একজন নিরক্ষর ব্যক্তির মুখ থেকে তখন উচ্চারিত হচ্ছে, যখন দুনিয়ার এ প্রান্ত থেকে সে প্রান্ত পর্যন্ত এ ধ্যানধারণা সম্পর্কেও অনবগত ছিল এবং ইহুদি ও খ্রিস্টান মতবাদের ধর্মীয় জগতে তো নারী ছিল যেন সকল অকল্যাণের উৎস ও লাঞ্ছনা অমাননরার মূর্তপ্রতীক। –[তাফসীরে মাজেদী]

ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর মর্যাদা : ইসলাম নারী জাতিকে যে মর্যাদা প্রদান করেছে, এখানে প্রথমেই তার যৎসামান্য বিশ্লেষণ বাঞ্ছনীয়। যা অনুধাবন করে নেওয়ার পর নিঃসন্দেহে স্বীকার করতেই হবে যে, একটি ন্যায়ানুগ ও মধ্যমপন্থি জীবন ব্যবস্থার চাহিদাও ছিল তাই এবং এটাই হচ্ছে সে স্থান বা মর্যাদা, যার কমবেশি করা কিংবা যাকে অস্বীকার করা মানুষের দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টির জন্যই বিরাট আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পৃথিবীতে এমন দুটি বস্তু রয়েছে যা গোটা বিশ্বের অস্তিত্ব, সংগঠন এবং উন্নয়নের স্তম্ভস্বরূপ। তার একটি হচ্ছে নারী, অপরটি সম্পদ। কিন্তু চিত্রের অপর দিকটির প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এ দুটো বস্তুই পৃথিবীতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, রক্তপাত এবং নানা রকম অনিষ্ট ও অকল্যাণেরও কারণ। আরও একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও কঠিন নয় যে, এ দুটো বস্তুই আপন প্রকৃতিতে পৃথিবীর গঠন, উন্নয়ন ও উৎকর্ষের অবলম্বন। কিন্তু যখন এগুলোকে তাদের প্রকৃত মর্যাদা, স্থান ও উদ্দেশ্য থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়, তখন এগুলোই দুনিয়ার সবচেয়ে ভয়াবহ ধ্বংসকারিতার রূপ পরিগ্রহ করে।

কুরআন মানুষকে একটি জীবন বিধান দিয়েছে। তাতে উল্লিখিত দুটো বস্তুকেই নিজ নিজ স্থানে এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে, যাতে তাদের দ্বারা সর্বাধিক উপকারিতা ও ফলাফল হতে পারে এবং যাতে দাঙ্গা-হাঙ্গামার চিহ্নটিও না থাকে।

সম্পদের যথার্থ স্থান, তা অর্জনের পন্থা, ব্যয় করার নিয়ম-পদ্ধতি এবং সম্পদ বণ্টনের ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা, এসব একটা পৃথক বিষয়, যাকে ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা বলা যেতে পারে।

এখন নারী সমাজ এবং তার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে– নারীদের উপর যেমন পুরুষের অধিকার রয়েছে এবং যা প্রদান করা একান্ত জরুরি, তেমনিভাবে পুরুষদের উপরও নারীদের অধিকার রয়েছে যা প্রদান করা অপরিহার্য। তবে একটুকু পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে যে, পুরুষের মর্যাদা নারীদের তুলনায় কিছুটা বেশি।

প্রায় একই রকম বক্তব্য সূরা নিসার এক আয়াতে এভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, 'যেহেতু আল্লাহ একজনকে অপরজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, কাজেই পুরুষরা হলো নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। আর এজন্য যে, তারা তাদের জন্য নিজের সম্পদ ব্যয় করে থাকে।'

ইসলামপূর্ব সমাজে নারীর স্থান : ইসলামের পূর্বে জাহেলিয়াত আমলে সমগ্র বিশ্বের জাতিসমূহে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী নারীর মর্যাদা অন্যান্য সাধারণ গৃহস্থালী আসবাবপত্রের চেয়ে বেশি ছিল না। তখন চতুস্পদ জীবজন্তুর মতো তাদেরও বেচাকেনা চলত। নিজের বিয়ে-শাদির ব্যাপারেও নারীর মতামতের কোনো রকম মূল্য ছিল না। অভিভাবকগণ তাদেরকে যার দায়িত্বে অর্পণ করত, তাদেরকে সেখানেই যেতে হতো। নারী তার আত্মীয়স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পদ বা মিরাসের অধিকারিণী হতো না, বরং সে নিজেই ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্রের ন্যায় পরিত্যক্ত সামগ্রী হিসেবে বিবেচিত হতো। তাদেরকে মনে করা হতো পুরুষের স্বত্বাধীন, কোনো জিনিসেরই তাদের নিজস্ব কোনো স্বত্ব ছিল না। আর যা কিছুই নারীর স্বত্ব বলে গণ্য করা হতো, তাতেও পুরুষের অনুমতি ছাড়া ভোগদখল করার এতটুকু অধিকার তাদের ছিল না। তবে স্বামীর এ অধিকার স্বীকৃত ছিল যে, সে তার নারীরূপী নিজস্ব সম্পত্তি যেখানে খুশি ব্যবহার করতে পারবে, তাতে তাকে স্পর্শ করারও কেউ ছিল না। এমনকি ইউরোপের যেসব দেশকে আধুনিক বিশ্বের সর্বাধিক সভ্যদেশ হিসেবে গণ্য করা হয়, সেগুলোতেও কোনো কোনো লোক এমনও ছিল, যারা নারীর মানব-সত্তাকেই স্বীকার করত না।

ধর্ম-কর্মেও নারীদের জন্য কোনো অংশ ছিল না, তাদেরকে ইবাদত-উপাসনা কিংবা বেহেশতের যোগ্যও মনে করা হতো না। এমনকি রোমের কোনো কোনো সংসদে পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সাব্যস্ত করা হয়েছিল যে, এরা হলো অপবিত্র এক জনোয়ার, যাতে আত্মার অস্তিত্ব নেই। সাধারণভাবে পিতার পক্ষে কন্যাকে হত্যা করা কিংবা জ্যান্ত কবর দিয়ে দেওয়াকে কৌলিন্যের নিরিখ বলে মনে করা হতো। অনেকের ধারণা ছিল, নারীকে যে কেউ হত্যা করে ফেলুক না কেন, তাতে হত্যাকারীর প্রতি মৃত্যুদণ্ড কিংবা খুনের বদলা কোনোটাই আরোপ করা ওয়াজিব হবে না। কোনো কোনো জাতির মধ্যে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীকেই তার চিতায় আরোহণ করে জ্বলে মরতে হতো। মহানবী ﷺ -এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে ৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে ফরাসীরা নারী সমাজের প্রতি এতটুকু অনুগ্রহ করেছিল যে, বহু বিরোধিতা সত্ত্বেও তারা এ প্রস্তাব পাশ করে যে, নারী প্রাণী হিসেবে মানুষই বটে; কিন্তু শুধুমাত্র পুরুষের সেবার উদ্দেশ্যেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

মোটকথা, সারা বিশ্ব ও সকল ধর্ম নারী সমাজের সাথে যে আচরণ করেছে, তা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ও লোমহর্ষক। ইসলামের পূর্বে সৃষ্টির এ অংশ ছিল অত্যন্ত অসহায়। তাদের ব্যাপারে বুদ্ধি ও যুক্তিসঙ্গত কোনো ব্যবস্থাই নেওয়া হতো না।

'হযরত রাহমাতুললিল আলামীন' ও তাঁর প্রবর্তিত ধর্মই বিশ্ববাসীর চোখের পর্দা উন্মোচন করেছেন। মানুষকে মানুষের মর্যাদা দান করতে শিক্ষা দিয়েছেন। ন্যায়-নীতির প্রবর্তন করেছেন এবং নারী সমাজের অধিকার সংরক্ষণ পুরুষদের উপর ফরজ করেছেন। বিয়ে-শাদি ও ধনসম্পদে তাদের স্বত্বাধিকার দেওয়া হয়েছে। কোনো ব্যক্তি তিনি পিতা হলেও কোনো প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীলোককে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়েতে বাধ্য করতে পারেন না। এমনকি স্ত্রীলোকের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দিলেও তা তার অনুমতির উপর স্থগিত থাকে, সে অস্বীকৃতি জানালে তা বাতিল হয়ে যায়। তার সম্পদে কোনো পুরুষই তার অনুমতি ছাড়া হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। স্বামীর মৃত্যু বা স্বামী তাকে তালাক দিলে সে স্বাধীন; কেউ তাকে কোনো ব্যাপারে বাধ্য করতে পারে না। সেও তার নিকটাত্মীয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তেমনি অংশীদার হয় যেমন হয় পুরুষেরা। তাদের সন্তুষ্টিবিধানকেও শরিয়তে মুহাম্মদী ইবাদতের মর্যাদা দান করেছে। স্বামী তার ন্যায্য অধিকার না দিলে, সে আইনের সাহায্যে তা আদায় করে নিতে পারে অথবা তার বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করে দিতে পারে।

বর্তমান ফিতনাফ্যাসাদের মূল কারণ : স্ত্রীলোককে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা জঘন্য অন্যায়। ইসলাম এ অন্যায় প্রতিরোধ করেছে। আবার তাদেরকে বল্গাহীনভাবে ছেড়ে দেওয়া এবং পুরুষের কর্তৃত্বের আওতা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে দেওয়াও নিরাপদ নয়। সন্তানসন্ততির লালনপালন ও ঘরের কাজকর্মের দায়িত্ব প্রকৃতিগতভাবেই তাদের উপর ন্যস্ত করে দেওয়া হয়েছে। তারা এগুলোই বাস্তবায়নের উপযোগী। তাছাড়া স্ত্রীলোককে বৈষয়িক জীবনে পুরুষের আওতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেওয়া নিতান্ত ভয়ের কারণ। এতে পৃথিবীতে রক্তপাত ঝগড়া-বিবাদ এবং নানা রকমের ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়। এজন্য কুরআনে এ কথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ অর্থাৎ পুরুষের মর্যাদা স্ত্রীলোক অপেক্ষা এক স্তর উর্ধ্বে। অন্যকথায় বলা যায় যে, পুরুষ তাদের তত্ত্বাবধায়ক ও জিম্মাদার। যেভাবে ইসলামপূর্ব জাহেলিয়াতের যুগে দুনিয়ার মানুষ স্ত্রীলোককে ঘরের আসবাবপত্র ও চতুস্পদ জন্তুতুল্য বলে গণ্য করার ভুলে নিমগ্ন ছিল, অনুরূপভাবে মুসলমানদের বর্তমান পতনের পর জাহেলিয়াতের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়েছে। এতে প্রথম ভুলের

সংশোধন আরেকটি ভুলের মাধ্যমে করা হচ্ছে। নারীকে পুরুষের সাধারণ কর্তৃত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেওয়ার অনবরত প্রচেষ্টা চলছে। ফলে লজ্জাহীনতা ও অশ্লীলতা একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমগ্র বিশ্ব ঝগড়া-বিবাদ ও ফিতনা-ফ্যাসাদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন এত বেড়ে গেছে যে, তা আজ সেই বর্বর যুগকেও হার মানিয়েছে। আরবদের মধ্যে একটা প্রবাদ রয়েছে- اَلْجَاهِلُ اِمَّا مُفْرِطٌ اَوْ مُفَرِّطٌ অর্থাৎ মূর্খ লোক কখনও মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে না। যদি সীমালঙ্ঘন থেকে বিরত থাকে, তবে হীনম্মন্যতা ও সংকীর্ণতার পর্যায়ে চলে আসে। বর্তমানে এমনি অবস্থা চলছে। যে নারীকে সব জাতি এক সময় মানুষ বলে গণ্য করতেও রাজি ছিল না, সে জাতিগুলোই এখন এমন পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে যে, পুরুষদের যে কর্তৃত্ব নারী সমাজ তথা গোটা দুনিয়ার জন্যই একান্ত কল্যাণকর ছিল, সে কর্তৃত্ব বা তত্ত্বাবধায়কের ধারণাটুকুও একেবারে ঝেড়ে মুছে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, যার অশুভ পরিণতি প্রতিদিনই দেখা যাচ্ছে। বলা বহুল্য, যতদিন পর্যন্ত আল কুরআনের এ আদেশ যথাযথভাবে পালন করা না হবে ততদিন পর্যন্ত এ ধরনের ফিতনা দিন দিন বৃদ্ধিই পেতে থাকবে। বর্তমান বিশ্বের মানুষ শান্তির অন্বেষায় নিত্যনতুন আইন প্রণয়ন করে চলছে। নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে, অগণিত অর্থ ব্যয় করছে, কিন্তু যে উৎস থেকে ফিতনা-ফ্যাসাদ ছাড়াচ্ছে, সেদিকে কারো লক্ষ্যই নেই।

যদি আজ ফেতনা-ফ্যাসাদের কারণ উদ্‌ঘাটনের জন্য কোনো নিরপেক্ষ তদন্ত পরিচালনা করা হয়, তবে শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও বেশি সামাজিক অশান্তির কারণই দাঁড়াবে স্ত্রীলোকের বেপরোয়া চালচলন। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে অহংপূজার প্রভাব বড় বড় বুদ্ধিমান দার্শনিকের চক্ষুকেও ধাঁধিয়ে দিয়েছে। অঙ্গ-অভিলাষের বিরুদ্ধে যে কোনো কল্যাণকর চিন্তা বা পন্থাকেও সহ্য করা হয় না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের অন্তরকে ঈমানের আলোতে আলোকিত করে রাসূল ﷺ-এর উপদেশ যথাযথভাবে পালন করার তৌফিক দান করুন। আমিন। -[মা'আরিফুল কুরআন]

নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করলে অধিকার এমনিতেই আদায় হয়ে যাবে : এ আয়াতে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যগুলো যথাযথভাবে পালন করার পথ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। অপর দিকে নিজের অধিকার আদায় করার চেয়ে প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের প্রতি যত্নবান হওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তা যদি হয়, তবে বিনা তাগিদেই প্রত্যেকের অধিকার রক্ষিত হবে। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে প্রত্যেকেই স্বীয় অধিকার আদায় করতে তৎপর, অথচ নিজের দায়িত্বের প্রতি আদৌ সচেতন নয়। ফলে ঝগড়া-বিবাদই শুধু সৃষ্টি হতে থাকে। যদি কুরআনের এ শিক্ষার উপর আমল করা হয়, তবে ঘরে-বাইরে অর্থাৎ সারা বিশ্বে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করবে এবং ঝগড়া-বিবাদ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে।

নারী পুরুষের অধিকারের সাদৃশ্য ও সমতুল্যতার রূপরেখা ও মানদণ্ড কি? এ সাদৃশ্য বা মান-পরিমাণের, সংখ্যা-পরিসংখ্যানের বিচারে নয়, বরং মূল অধিকার ও মুখ্য অপরিহার্যতার ক্ষেত্রে। সমতুল্যতার দ্বারা উদ্দেশ্য পালনীয় কর্তব্যপরায়ণতা, সার্বিক কর্মকাণ্ডে নয়। এর অর্থ হচ্ছে উভয়ের অধিকার ও কর্তব্য পালন সমভাবে ওয়াজিব। তাফসীরে কাশশাফে বর্ণিত হয়েছে- وَالْمُرَادُ بِالْمُمَاثَلَةِ الْوَاجِبِ فِيْ كَوْنِهِ حَسَنَةً لَا فِيْ جِنْسِ الْفِعْلِ
তাফসীরে বায়যাবীতে বর্ণিত হয়েছে- اَىْ فِى الْوُجُوْبِ وَاسْتِحْقَاقِ الْمُطَالَبَةِ عَلَيْهِ অর্থাৎ স্বামী যেন এমন ভ্রান্ত ধারণার শিকার না হয় যে, তার পাল্লায় শুধু অধিকারই, কর্তব্য ও দায়িত্ব কিছুই নেই। তাদের উপরও দায়িত্ব কর্তব্য বর্তাবে, যেমন বর্তায় স্ত্রীদের উপর। আবার স্ত্রীরাও যেন এ প্রগতিবাদী উচ্ছৃঙ্খল ধারণার শিকার না হয় যে, খেদমত ও সেবা করা আমাদের কাজ নয়, আমাদের কাজ শুধু শুয়ে বসে সেবা গ্রহণ করা। -[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ بِالْمَعْرُوْفِ : আয়াতের এ অংশ পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যের মাপকাঠি বাতলে দিয়েছে। আর তা হলো সমান সমান নয়; বরং ন্যায়সঙ্গতভাবে তথা শরিয়তের মূলনীতি ও সুষ্ঠু প্রজ্ঞার আলোকে। [মাদারেক]। যার যেমনটি প্রযোজ্য। শুধু [বুদ্ধিবৃত্তির নামে] কুপ্রবৃত্তি ও বল্গাহীনতা বা জাহেলিয়াত ও অপমূর্খতার ধারা ও দফার অধীনে কোনো সনদ তৈরি করে নারী অধিকার বিধির গালভরা নাম দিলেই তা কিছু হয়ে যাবে না। -[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ : পবিত্র কুরআন এই মাত্র জাহেলিয়াতের এক সময়ের অবাস্তব দাবি প্রত্যাখ্যান করে বলে দিয়েছে যে, নারী অধিকারবিহীন নয়; তাদেরও পুরুষদের ন্যায় যথাসঙ্গত অধিকার রয়েছে। এখন আবার আধুনিক নব্য জাহেলিয়াতের অন্য একটি দাবির খণ্ডন দ্ব্যর্থহীন ও দ্বিধাহীন ঘোষণা দিচ্ছে- দুই শ্রেণির মাঝে সার্বিক সমতা ও পূর্ণাঙ্গ সমতা নয়; বরং পুরুষের নারীর উপরে প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। -[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ لِمَا سَاقُوْهُ مِنَ الْمَهْرِ وَالْاِنْفَاقِ : এটা উভয়ের স্তর সাব্যস্ত করার কারণ নির্দেশক। কেননা আনন্দ উপভোগ এবং সন্তান কামনায় উভয়ে সমানভাবে অংশীদার। এভাবে গৃহস্থলী কাজ কারবার ক্ষেত্রেও উভয়ই অংশীদার। স্বামীর দায়িত্ব হলো বহির্গত কাজ-কারবার এবং স্ত্রীর দায়িত্ব আভ্যন্তরীণ কাজ-কারবার। উপরন্তু স্বামীর এক পর্যায়ের প্রাধান্য রয়েছে। -[জামালাইন]

অনুবাদ :

٢٢٩. اَلطَّلَاقُ اَىِ التَّطْلِيْقُ الَّذِىْ يُرَاجِعُ بَعْدَهُ مَرَّتٰنِ اَىْ اِثْنَتَانِ فَاِمْسَاكٌ م اَىْ فَعَلَيْكُمْ اِمْسَاكُهُنَّ بَعْدَهُ بِاَنْ تُرَاجِعُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ مِنْ غَيْرِ ضِرَارٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ م اَىْ اِرْسَالٌ لَهُنَّ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَيُّهَا الْاَزْوَاجُ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ مِنَ الْمُهُوْرِ شَيْئًا اِذَا طَلَّقْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّخَافَا اَىِ الزَّوْجَانِ اَنْ لَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ اَىْ اَنْ لَا يَأْتِيَا بِمَا حَدَّهُ لَهُمَا مِنَ الْحُقُوْقِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ يُخَافَا بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُوْلِ فَاَنْ لَا يُقِيْمَا بَدَلُ اشْتِمَالٍ مِنَ الضَّمِيْرِ فِيْهِ وَقُرِئَ بِالْفَوْقَانِيَّةِ فِى الْفِعْلَيْنِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ نَفْسَهَا مِنَ الْمَالِ لِيُطَلِّقَهَا اَىْ لَا حَرَجَ عَلَى الزَّوْجِ فِىْ اَخْذِهٖ وَلَا الزَّوْجَةِ فِىْ بَذْلِهٖ تِلْكَ الْاَحْكَامُ الْمَذْكُوْرَةُ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

২২৯. তালাক অর্থাৎ যে তালাক দানের পর স্ত্রীকে ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে আনা যায় তা দুবার অর্থাৎ দুটি। অতঃপর স্ত্রীকে সদাচারের সাথে অর্থাৎ কষ্ট প্রদান না করে রেখে দেবে অর্থাৎ এরপর তোমাদের কর্তব্য হলো তাদের রেখে দেওয়া, যেমন তাদের রাজআত বা ফিরিয়ে নিয়ে আসলে অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দেবে তাদের পথ ছেড়ে দেবে। হে স্বামীগণ! যদি তোমরা তাদেরকে তালাক দিয়ে দাও, তবে তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের যা অর্থাৎ যে মোহর প্রদান করেছ তা হতে কোনো কিছু গ্রহণ করা তোমাদের পক্ষে বৈধ নয়। কিন্তু যদি তাদের অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের আশঙ্কা হয় যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না। অর্থাৎ উভয়ের হক ও অধিকারের যে সীমারেখা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে, তা তারা পালন করতে পারবে না, [তবে তার বিধান ভিন্ন।] يَخَافَا ক্রিয়াটি অপর এক পাঠে مَجْهُوْل রূপে يُخَافَا আকারে পঠিত হয়েছে। এমতাবস্থায় اَنْ لَا يُقِيْمَا তার মধ্যে নিহিত যমীর বা দ্বিবাচক সর্বনাম হতে بَدَلُ اشْتِمَالٍ রূপে গণ্য হবে। অপর এক পাঠে يَخَافَا এবং يُقِيْمَا এ ক্রিয়াদ্বয় فَوْقَانِيَّةٌ বা ঊর্ধ্ব নোকতাসহ [تَخَافَا এবং تُقِيْمَا রূপে] পঠিত রয়েছে। তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না, তবে স্ত্রী কোনো কিছুর অর্থাৎ সম্পদের বিনিময়ে তালাকের মাধ্যমে নিজেকে মুক্ত করে নিতে চাইলে তাতে তাদের কারো কোনো অপরাধ নেই। অর্থাৎ স্বামীর জন্য তা গ্রহণ করায় আর স্ত্রীর জন্য তা ব্যয় করায় কোনো পাপ নেই। এসব অর্থাৎ উল্লিখিত বিধানসমূহ আল্লাহর সীমারেখা। তোমরা তা লঙ্ঘন করো না। যারা এ সীমারেখা লঙ্ঘন করে তারাই জালিম।

তাহকীক ও তারকীব

اَلطَّلَاقُ : طَلَاقٌ -এর অর্থ– বিবাহের বন্ধন ছিন্ন করা। اَلَّذِىْ يُرَاجِعُ بَعْدَهُ : যারপর ফিরিয়ে আনা যায়।

اِمْسَاكٌ : রেখে দেওয়া। تَسْرِيْحٌ : ছেড়ে দেওয়া।

قَالَ الرَّاغِبُ : اَلتَّسْرِيْحُ فِى الطَّلَاقِ مُسْتَعَارٌ مِنْ تَسْرِيْحِ الْاِبِلِ كَالطَّلَاقِ مُسْتَعَارٌ اِطْلَاقِ الْاِبِلِ

اِفْتَدَتْ بِهٖ : তার দ্বারা মুক্ত করে নিতে চাইলে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযূল :

১. হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইর (রা.) বর্ণনা করেন– ইসলামের প্রথম যুগে মানুষ তার স্ত্রীকে যতবার ইচ্ছা তালাক দিত আবার ফিরিয়ে নিত। কেউ কেউ এমনও করত যে, নিজের স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর তার ইদ্দত শেষ হওয়ার নিকটবর্তী হলে পুনরায় ফিরিয়ে নিত। তারপর আবার তালাক দিয়ে দিত। বস্তুত স্ত্রীকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তারা বারবার এমনটি করত। আলোচ্য আয়াতটি সে প্রসঙ্গেই নাজিল হয়।–[তাফসীরে মাযহারী, জামালাইন খ. ১, পৃ. ৩৬০]

২. একবার এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে বসল, আমি তোমাকে তালাকও দেব না যে, আমার থেকে পৃথক হয়ে হয়ে যাবে, আবার কোনো দিন তোমার পাশেও আসব না। স্ত্রী জিজ্ঞেস করল তা কিভাবে? স্বামী বলল, তোমাকে তালাক দিয়ে আবার যখনই ইদ্দত শেষ হওয়ার উপক্রম হবে পুনরায় ফিরিয়ে নেব। মহিলা গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দারবারে অভিযোগ করল। কিন্তু তিনি কোনো জাবাব দিলেন না। অতঃপর কুরআনের উপরিউক্ত আয়াত নাজিল হয়। –[তিরমিযী, হাকেম, লুবাব]

قَوْلُهُ اَلتَّطْلِيْقُ الَّذِىْ : এ অংশ দ্বারা এর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَلطَّلَاقُ শব্দটি اِسْمُ مَصْدَرْ যা মাসদার তথা تَطْلِيْق -এর অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ এখানে طَلَاقٌ দ্বারা স্বামীর 'তালাক প্রদান' কর্মটি উদ্দেশ্য। কেননা فِعْل طَلَاقٌ বা তালাক কর্মটিই مُتَّصِفٌ بِالْوَحْدَةِ وَالْمُتَعَدِّدِ হয়ে থাকে; طَلَاقٌ নয়, যা মহিলার সিফত হয়ে থাকে। সামনের শব্দ اَوْ تَسْرِيْحٌ দ্বারাও এ কথাটির সমর্থন মিলে। কেননা تَسْرِيْحٌ এটিও স্বামীর কর্ম।

قَوْلُهُ فَعَلَيْكُمْ : এতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اِمْسَاكٌ হলো মুবতাদা এবং তার খবর হলো فَعَلَيْكُمْ যা মাহযূফ রয়েছে।

প্রশ্ন: اِمْسَاكٌ শব্দটি এখানে মুবতাদা হয়েছে অথচ এটি نَكِرَةٌ যা মুবতাদা হতে পারে না।

উত্তর: بِمَعْرُوْفٍ শব্দটি اِمْسَاكٌ -এর সিফত হয়েছে বিধায় نَكِرَةْ مَوْصُوْف بِالصِّفَةِ হয়েছে আর এ অবস্থায় তা মুবতাদা হতে পারে।

قَوْلُهُ اَىْ اِثْنَتَانِ : মুসান্নিফ (র.) مَرَّتَانِ -এর ব্যাখ্যায় اِثْنَتَانِ উল্লেখ করার দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, مَرَّتَانِ দ্বারা তার প্রকত অর্থ তথা দুই বা দ্বিবচন উদ্দেশ্য। অর্থাৎ দুই তালাক। এখানে তার মাজাযী বা রূপক অর্থ তথা تَكْرَارٌ [দ্বিরুক্তি] উদ্দেশ্য নয়। যেন এখানে তাদের বক্তব্যের খণ্ডন করা হচ্ছে, যারা বলে- مَرَّتَانْ এখানে تَكْرَارٌ -এর অর্থে। মোটকথা, مَرَّتَانِ -এর প্রকৃত অর্থ 'দুই বা দ্বিবচন' আর তার মাজাযী বা রূপক অর্থ تَكْرَارٌ [দ্বিরুক্তি]। আর এ কথা সর্বজনবিদিত যে, রূপক অর্থের চেয়ে প্রকৃত অর্থই উত্তম। যারা এখানে মাজাযী অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছে, তাদের বক্তব্য হলো একত্রে দুই তালাক সঠিক নয়, বরং দুইবার দুই তালাক দিতে হবে। আর যারা প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছেন তাদের মতে এক শব্দে দুই তালাক দেওয়া জায়েজ আছে। –[জামালাইন] তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআনে মুফতি শফী (র.) রূহুল মা'আনীর বরাত দিয়ে বলেন, مَرَّتَانِ শব্দ দ্বারা এ কথাও বুঝা যায় যে, এক শব্দে দুই তালাক দেওয়া উচিত নয়; বরং দুই তুহরে পৃথক পৃথকভাবে দুই তালাক দিতে হবে।

রেজয়ী তালাক দুবারই দেওয়া যায় : তালাকে রেজয়ী বা যে তালাকের পর স্ত্রীকে পুনরায় রাজআত করা যায়, তা দু'বার দেওয়া যায়। দুবারের পর হয়তো মহিলাকে মহব্বতের সাথে রেখে দেবে অন্যথায় ভদ্রোচিত নিয়মে বিদায় করে দেবে। এ বিষয়টিই فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ -এর মাঝে বলা হয়েছে। অনেকে تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ দ্বারা তৃতীয় তালাক উদ্দেশ্য নিয়েছেন। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, তৃতীয় তালাক নারীর জন্য ضَرَرٌ خَالِصٌ বা নিছক ক্ষতি। এতে কোনো উপকার বা দয়ার আচরণ নেই। সুতরাং اِحْسَانٌ শব্দ ব্যবহারের যৌক্তিকতা কি? বরং এখানে উদ্দেশ্য হলো দ্বিতীয় তালাকের পর যদি رُجُوْعٌ করতে চায় এবং মহব্বতের সাথে সংসার পরিচালনা করতে চায়, তাহলে তো ভালো অন্যথায় চুপচাপ বসে থাকবে। যখন মহিলার ইদ্দতকাল পূর্ণ হবে, তখন মহিলা এমনিতেই বায়েনা হয়ে যাবে। এর পর যদি উভয়ের মর্জি হয় তাহলে ফের বিবাহ করতে পারবে। আর এটাই হবে তার প্রতি ইহসান বা দয়া। –[জামালাইন: খ.১, পৃ. ৩৪০] তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআনে মুফতি শফী (র.) বলেন– تَسْرِيْح -এর অর্থ খুলে দেওয়া বা ছেড়ে দেওয়া। এতে ইঙ্গিত

করা হয়েছে যে, সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য অতিরিক্ত তালাক দেওয়া বা অন্য কোনো কাজ করার প্রয়োজন নেই। তালাক প্রত্যাহার ব্যতীত ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাওয়াই বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

তিনি আরো বলেন, যেভাবে اِمْسَاكٌ-এর সাথে مَعْرُوْفٌ শব্দের শর্ত আরোপ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, তালাক প্রত্যাহার করে স্ত্রীকে ফিরিয়ে রাখতে হলে উত্তম পন্থায় ফিরিয়ে রাখা, তেমনিভাবে تَسْرِيْحٌ-এর সাথে اِحْسَانٌ শব্দের শর্ত আরোপের মাধ্যমে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, তালাক হচ্ছে একটি বন্ধনকে ছিন্ন করা। আর সৎলোকের কর্মপদ্ধতি হচ্ছে কোনো কাজ বা চুক্তি করতে হলে তারা তা উত্তম পন্থায়ই করে থাকে।

তালাক প্রদান পদ্ধতি : তালাক দেওয়ার তিনটি পদ্ধতি রয়েছে–

১. طَلَاقٌ اَحْسَنْ বা উত্তম তালাক পদ্ধতি। অর্থাৎ এমন তুহরে এক তালাক দেবে, যাতে সাহবাস হয়নি। এ এক তালাক দিয়েই ছেড়ে দেবে। ইদ্দত শেষ হলে পরে বিবাহ সম্পর্ক এমনিতেই ছিন্ন হয়ে যাবে।

২. طَلَاقٌ سُنِّىْ অর্থাৎ তিন তুহরে তিন তালাক। যখন মহিলা হায়েজ থেকে পবিত্র হবে, তখন সহবাসের পূর্বে তালাক দেবে। অতঃপর দ্বিতীয় হায়েজের অপেক্ষা করবে। দ্বিতীয় হায়েজের পর দ্বিতীয় তালাক এবং তৃতীয় হায়েজের পর তৃতীয় তালাক দিয়ে বিচ্ছেদ করে দিবে। আর যদি স্ত্রীর হায়েজ না আসে অর্থাৎ ছোট হয় কিংবা বৃদ্ধা হয় তাহলে প্রতি মাসে এক তালাক দিবে।

৩. طَلَاقٌ بِدْعِىْ অর্থাৎ এক সময়ে বা এক তুহরেই তিন তালাক দেওয়া। এভাবে তালাক দিলে তালাক হয়ে যাবে, কিন্তু স্বামী গুনাহগার হবে। অবশ্য এ তালাক সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে কেউ কেউ মতবিরোধ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর মারফূ' হাদীস আমাদের মাযহাব সমর্থন করে। এমনকি হায়েজের মধ্যে তালাক দিলেও তা সংঘটিত হয়ে যায়, কিন্তু رُجُوْعٌ করা ওয়াজিব। যদি হায়েজের সময় তালাক না হয়, তাহলে হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হায়েজ অবস্থায় প্রদত্ত তালাক থেকে رُجُوْعٌ করার বিধানের কি অর্থ? সুতরাং আল্লাহর ঘোষণা- তালাক দুবার অর্থাৎ সুন্নত তো হলো একবার এক তালাক দেবে অতঃপর দ্বিতীয় তালাক দেবে। তারপর চাই রুজু করবে বা তৃতীয় তালাক দিয়ে দেবে। এক সময় একত্রে যেহেতু দুই তালাক দেওয়া ভালো নয় তাই সংখ্যা ও ধীরস্থিরতার প্রতি ইঙ্গিত করে مَرَّتَانِ তথা দুবারের কথা বলেছেন। –[জামালাইন খ. ১, পৃ. ৩৬০]

قَوْلُهُ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ :

স্ত্রীকে দেওয়া মোহর ফেরত নেওয়া হারাম : এখনও তৃতীয় তালাকের আলোচনা আসেনি। মধ্যখানে একটি মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে যা এ অবস্থায় আলোচনায় আসতে পারে। তা হচ্ছে এই যে, কোনো কোনো অত্যাচারী স্বামী স্ত্রীকে রাখতেও চায় না আবার তার অধিকার আদায় করারও কোনো চিন্তা করে না, আবার তালাকও দেয় না। এতে স্ত্রী অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে, সেই সুযোগে স্বামী স্ত্রীর নিকট থেকে কিছু অর্থ-কড়ি আদায় করার বা মহর মাফ করিয়ে নেওয়ার বা ফেরত নেওয়ার দাবি করে বসে। কুরআনে কারীম এ ধরনের কাজকে হারাম ঘোষণা করেছে, ইরশাদ হচ্ছে– وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا অবশ্য একটি ব্যাপারে তা থেকে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যাতে মহর ফিরিয়ে নেওয়া বা ক্ষমা করিয়ে নেওয়া যেতে পারে। তা হচ্ছে, স্ত্রীকে দেওয়া মহর ফেরত নেওয়া হারাম, স্ত্রীকে যে মোহর দেওয়া হয়েছে, তালাকের পরিবর্তে সেটা ফেরত গ্রহণ স্বামীর জন্য বৈধ নয়। হ্যাঁ, যখন নিরুপায় অবস্থায় হয়, কোনোক্রমেই তাদের মধ্যে বনিবনাও না হয় এবং তাদের আশঙ্কা হয় পারস্পরিক অসদ্ভাবের দরুন তারা মহান আল্লাহর বিধিনিষেধ রক্ষা করে চলতে পারবে না, সেই সাথে স্বামীর পক্ষ হতে স্ত্রীর অধিকার আদায়েরও কোনো ত্রুটি না হয়, তখন স্বামী ইচ্ছা করলে তালাকের বদলে মোহর ফেরত নিতে পারে। অন্যথায় স্ত্রীর নিকট হতে অর্থ গ্রহণ করা তার জন্য হারাম। –[তাফসীরে উসমানী]

খুলা তালাকের বিধান : এ আয়াতের আরো একটি ব্যাখ্যা এভাবে করা হয় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ যখন রাগের বশবর্তী হয়ে তালাক দেয়, তখন এ জঘন্য আচরণ করে ফেলে যে, এতদিন যাবৎ [প্রিয়তমা] স্ত্রীকে দেওয়া মহর ও অলংকার-বস্ত্র সব কিছু ছিনিয়ে রেখে দেয়। আরবের জাহিলি যুগে এ রীতি আরো ব্যাপক-বিস্তৃত ছিল। এখানে এ নিপীড়নমূলক প্রথার প্রতিই নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এতে বলে দেওয়া হলো যে, মহর ইত্যাদি যা কিছু স্বামী ইতঃপূর্বে স্ত্রীকে প্রদান করেছিল, তালাকের সময় তা ফেরত চাইতে পারবে না। এমনিতেও এ ব্যাপারটি ইসলামি নৈতিকতার পরিপন্থি।

কাউকে কোনো বস্তু উপহার দিয়ে ফেরত নেওয়ার প্রতি হাদীসে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। হাদীসে তো এ নিচু কাজটিকে কুকুরের আহার কর্মের পর বমি করে ফেলে দিয়ে আবার তা চেটে চেটে খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। এখানে বিষয়টি আরো জঘন্যতম। কেননা একজন স্বামীর জন্য এটি নিতান্তই লজ্জার কথা যে, সে স্ত্রীকে বিদায় করার সময় তার কাছ থেকে পূর্বে দেওয়া কোনো বস্তু রেখে দিচ্ছে। অথচ ইসলাম এ নৈতিক চরিত্র শিক্ষা দিয়েছে যে, স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার সময় কিছু হাদিয়া দিয়ে বিদায় করবে। -[জামালাইন খ. ১, পৃ. ৩৬১]

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, মানুষ তার স্ত্রীর মহর হিসেবে যা আদায় করত, তা পুনরায় আত্মসাৎ করে নিত। আর সামাজেও সেটা দূষণীয় ছিল না। এ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত নাজিল হয়। -[আবূ দাউদ, লুবাব]

قَوْلُهُ فَإِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ : আয়াতের মর্ম হলো, স্ত্রীদেরকে মহর বাবদ প্রদানকৃত কোনো বস্তু ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না। তবে যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মাঝে বনিবনা না হয়; স্ত্রীর পক্ষ থেকে অবাধ্যতা, অসদাচরণ ও বেয়াদবিমূলক ব্যবহার প্রকাশিত হয় এবং স্বামীর পক্ষ থেকে অন্যায়ভাবে স্ত্রীকে মারধর, গালাগালি ইত্যাদি পাওয়া যায়, তাহলে স্ত্রী স্বামীকে মহরের সম্পদ থেকে কিছু দিয়ে নিজেকে মুক্ত করতে চাইলে স্বামীর জন্য তা গ্রহণ করা জায়েজ হবে। আর এটাকেই পরিভাষায় خَلْع বলে। -[জালালাইন, সংশ্লিষ্ট হাশিয়া]

হযরত জুরাইয (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াত ছাবেত ইবনে কায়েস ও হাবীবা কিংবা জামীলা সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। হাবীবা তাঁর স্বামীর ব্যাপারে নবীজী ﷺ -এর দরবারে অভিযোগ করলেন। রাসূল ﷺ ইরশাদ করলেন- তাহলে কি তুমি তোমার স্বামীর কাছ থেকে [মহর স্বরূপ] নেওয়া বাগানটি ফিরিয়ে দেবে? তিনি সম্মতি জানালেন। তখন নবী করীম ﷺ স্বামীকে ডেকে এ প্রস্তাব শুনিয়ে বললেন- اِقْبَلِ الْحَدِيْقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيْقَةً অর্থাৎ বাগানের বিনিময়ে তাকে তালাক দিয়ে দাও। স্বামী আরজ করলেন, সেটি কি আমার জন্য হালাল হবে? নবীজী ﷺ ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ। স্বামী আরজ করলেন, তাহলে আমি তাই করে নিলাম। তখন এ আয়াতটি নাজিল হয়। -[ইবনে জারীর, লুবাব]

خَلْع 'খুলা' তালাক সংক্রান্ত আলোচনা : স্ত্রী যদি বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ ও স্বামীর নিকট হতে তালাক পাওয়ার উদ্দেশ্যে তার পূর্ণ মহর বা মহরের অংশবিশেষের দাবি ছেড়ে দিতে চায়, তবে এটিও বিচ্ছেদের একটি পন্থা হতে পারে এবং এ ক্ষেত্রে স্বামীর জন্য সে বিনিময় গ্রহণ করা বৈধ হবে। তালাকের এ বিশেষ পদ্ধতি, যাতে স্ত্রীর পক্ষ থেকে তালাকের আবেদন হয়ে থাকে- শরিয়তের পরিভাষায় তা خُلْع 'খুলা' তালাক নামে অভিহিত। এ 'খুলা' তালাক শুধু আয়াতে বর্ণিত আশঙ্কার ক্ষেত্রেই সীমিত নয়, বরং সাধারণভাবেই তা বৈধ।

خُلْع -এর পরিচয় : خَلَعَ (ف) يَخْلَعُ অর্থ- খুলে ফেলা। خَلَعَ الْمَرْأَةُ - স্ত্রী সম্পদের বিনিময়ে বিচ্ছেদ গ্রহণ করা। মহিলার পক্ষ থেকে সম্পদের বিনিময়ে তালাকের দাবি হলে তাকে خُلْع বলে। আর স্বামীর পক্ষ থেকে সম্পদের বিনিময়ে তালাকের দাবি করা হলে তাকে طَلَاقٌ عَلَى الْمَالِ বলে।

قَوْلُهُ كَمَا فِى الْحَدِيْثِ : এখানে হাদীসে বর্ণিত আছে বলে নিম্নোক্ত হাদীসটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে-

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَائَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ وَكَانَتْ تَحْتَ رِفَاعَةَ بْنِ وَهَبْ بْنِ عَتِيْكِ الْقُرَظِيِّ فَطَلَّقَهَا فَجَائَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَقَالَتْ اِنِّيْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِيْ فَبَتَّ طَلَاقِيْ وَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَاِنَّمَا مَعَهُ هُدْبَةُ الثَّوْبِ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ : أَتُرِيْدِيْنَ اَنْ تَرْجِعِيْ اِلٰى رِفَاعَةَ؟ لَا حَتّٰى يَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوْقِيْ عُسَيْلَتَهُ .

অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। হযরত রিফাআ (রা.)-এর এক স্ত্রী ছিল। রিফাআ (রা.) তাকে তালাক দিলে তিনি আব্দুর রহমান ইবনে যুবাইর (রা.)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। কিছু দিন সংসার করার পর নতুন স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে নবীজি ﷺ -এর নিকট এসে বললেন, আমি পূর্বে রিফাআর স্ত্রী ছিলাম। তিনি আমাকে তালাক দিলে আমি আব্দুর রহমান ইবনে যুবাইর (রা.)-এর সাথে বিবাহে আবদ্ধ হই। কিন্তু তার যৌনশক্তি নেই বললেই চলে। রাসূল ﷺ মুচকি হেসে বললেন, তাহলে কি তুমি ফের রিফাআর কাছে ফিরে যেতে চাও? যদি তাই চাও! তাহলে উভয়ে উভয়ের মধু আস্বাদন করতে হবে।

٢٣٠. فَإِنْ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ بَعْدَ الثِّنْتَيْنِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ بَعْدَ الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ حَتَّى تَنْكِحَ تَتَزَوَّجَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَطَأُهَا كَمَا فِي الْحَدِيْثِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فَإِنْ طَلَّقَهَا أَيِ الزَّوْجُ الثَّانِيْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَيِ الزَّوْجَةِ وَالزَّوْجِ الْأَوَّلِ أَنْ يَتَرَاجَعَا إِلَى النِّكَاحِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ وَتِلْكَ الْمَذْكُوْرَاتُ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ يَتَدَبَّرُوْنَ.

٢٣١. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ قَارَبْنَ انْقِضَاءَ عِدَّتِهِنَّ فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِأَنْ تُرَاجِعُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ مِنْ غَيْرِ ضِرَارٍ أَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ أُتْرُكُوْهُنَّ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ بِالرَّجْعَةِ ضِرَارًا مَفْعُوْلٌ لَهُ لِتَعْتَدُوْا عَلَيْهِنَّ بِالْإِلْجَاءِ إِلَى الْاِفْتِدَاءِ وَالتَّطْلِيْقِ وَتَطْوِيْلِ الْحَبْسِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ بِتَعْرِيْضِهَا إِلَى عَذَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَلَا تَتَّخِذُوْا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا مَهْزُوًّا بِهَا بِمُخَالَفَتِهَا اُذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ بِالْإِسْلَامِ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتٰبِ الْقُرْاٰنِ وَالْحِكْمَةِ مَا فِيْهِ مِنَ الْأَحْكَامِ يَعِظُكُمْ بِهِ بِأَنْ تَشْكُرُوْهَا بِالْعَمَلِ بِهِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ.

অনুবাদ :

২৩০. অতঃপর সে অর্থাৎ স্বামী দুই তালাক প্রদানের পর যদি তাকে তালাক দেয় তবে এ মোট তিন তালাকের পর সে তার অর্থাৎ পূর্ব স্বামীর জন্য বৈধ হবে না, যে পর্যন্ত সে অন্য স্বামীকে নিকাহ না করবে অর্থাৎ বিবাহ না করেছে এবং তার সাথে সঙ্গত না হয়েছে। শায়খাইন [ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.)] বর্ণিত একটি হাদীসে এ কথার উল্লেখ রয়েছে। তারপর সে অর্থাৎ দ্বিতীয় স্বামী যদি তাকে তালাক দেয় আর তারা উভয়ে যদি মনে করে যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করতে সমর্থ হবে তবে ইদ্দত সমাপ্ত হওয়ার পর বৈবাহিক সম্পর্কের দিকে উভয়ের প্রত্যাগত হতে কারো স্ত্রী ও প্রথম স্বামীর কোনো অপরাধ হবে না। এগুলো উল্লিখিত বিষয়গুলো আল্লাহর সীমারেখা। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য। অর্থাৎ যারা চিন্তাভাবনা করে তাদের জন্য তিনি তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেন।

২৩১. যখন তোমরা স্ত্রীকে তালাক দাও এবং তারা ইদ্দতকাল পূর্ণ করে অর্থাৎ ইদ্দতকাল পূর্ণ হওয়ার সময় যখন ঘনিয়ে আসে, তখন তোমরা হয় [সদাচারের সাথে] কোনরূপ কষ্ট না দিয়ে তাদেরকে রেখে দিবে অর্থাৎ রাজআত বা তাদের পুনঃগ্রহণ করে নেবে অথবা বিধিমতো মুক্ত করে দেবে অর্থাৎ ইদ্দতকাল পূর্ণ করার জন্য ছেড়ে রাখবে। তাদের বিবাহবন্ধন হতে মুক্তিপণ দিতে ও তালাক প্রদান করতে বাধ্য করে বা আটকে রাখাকে দীর্ঘায়িত করে তাঁদের ক্ষতি করত অন্যায় আচরণের উদ্দেশ্যে তাদেরকে রাজআত বা পুনঃগ্রহণের মাধ্যমে তাদেরকে তোমরা আটকে রেখো না। যে এরূপ করে সে আল্লাহর আজাবের মাঝে নিজেকে পেশ করে নিজের প্রতিই জুলুম করে এবং তোমরা আল্লাহর নিদর্শনকে তার বিরোধিতা করে ঠাট্টা-তামাশা-এর বস্তু বানাইও না। তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ অর্থাৎ ইসলাম এবং যে কিতাব অর্থাৎ আল কুরআন ও হিকমত অর্থাৎ তার বিধি-বিধানসমূহ তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, যা দ্বারা তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দেন, তা স্মরণ কর। অর্থাৎ এতদনুসারে আমল করে এগুলোর শুকরিয়া আদায় কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ! যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ সব বিষয়ে জ্ঞানময়। কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই।

তাহকীক ও তারকীব

اَلثِّنْتَيْنِ : দুই [তালাক]। يَطَأَ : সঙ্গম করবে। اِنْقِضَاءُ الْعِدَّةِ : ইদ্দত সমাপ্ত হওয়া। يَتَدَبَّرُوْنَ : **চিন্তাভাবনা করে।** اَجَلَ : নির্দিষ্ট সময়। اِنْقِضَاءَ : অতিক্রান্ত হওয়া। لِتَعْتَدُوْا : অন্যায় আচরণের উদ্দেশ্যে। اَلْاِلْجَاءُ : বাধ্য করা, ঠেলে দেওয়া। اَلْاِفْتِدَاءُ : মুক্তিপণ দেওয়া। تَطْوِيْلُ الْحَبْسِ : আটকে রাখাকে দীর্ঘায়িত করা। تَعْرِيْض : পেশ করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَاِنْ طَلَّقَهَا : অর্থাৎ এই প্রথম দুই তালাকের পর রাজআত না করলে এবং শুধু দ্বিতীয় তালাকে দৃঢ় অবস্থানই নয়, বরং তৃতীয় তালাকও দিয়ে দেয়, তখন বৈবাহিক বন্ধন সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হয়ে গেল। তা আর প্রত্যাহার করার কোনো অধিকার থাকবে না। কেননা এ অবস্থায় এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, সব দিক বুঝেশুনেই সে স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে। তাই এর শাস্তি হবে এই যে, এখন যদি উভয়ে একমত হয়েও পুনর্বিবাহ করতে চায়, তবে তাও তারা করতে পারবে না। তাদের পুর্নবিবাহের শর্ত হলো স্ত্রী ইদ্দতের পর অপর স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বসবে এবং সে স্বামীর সঙ্গে সহবাসের পর দ্বিতীয় স্বামী যদি তাকে কোনো কারণে তালাক দেয় অথবা মৃত্যুবরণ করে তবে ইদ্দত শেষ হওয়ার পর প্রথম স্বামী তাকে গ্রহণ করতে পারবে। –[মা'আরিফুল কুরআন]

এখানে কুরআনে কারীমের বর্ণনাভঙ্গি লক্ষ্য করলে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, তালাক দেওয়ার শরিয়তসম্মত বিধান হচ্ছে সর্বোচ্চ দুই তালাক পর্যন্ত দেওয়া যাবে। তৃতীয় তালাক দেওয়া উচিত হবে না। কেননা আয়াতে اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ -এর পর তৃতীয় তালাককে اِنْ [যদি] শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। –[মা'আরিফুল কুরআন]

قَوْلُهُ بَعْدَ الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ : এ অংশ দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আয়াতে উল্লিখিত بَعْدُ শব্দটি পেশের উপর مَبْنِىْ হয়েছে। কেননা তার মুযাফ ইলাই মাহযূফ রয়েছে। আর তা হলো– اَلطَّلْقَةَ الثَّالِثَةَ সুতরাং এ আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না যে, حَرْفُ الْجَارِ -এর কারণে بَعْدَ মাজরূর হওয়া উচিত ছিল।

قَوْلُهُ تَنْكِحَ : تَنْكِحَ -এর ব্যাখ্যায় تَتَزَوَّجَ উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে نِكَاحٌ পারিভাষিক অর্থে অর্থাৎ শুধু বিয়ে চুক্তির অর্থে নয়; বরং এখানে মূল আভিধানিক অর্থ তথা وَطْى [সহবাস করা] উদ্দেশ্য। কেননা শুধু বিয়ে তো زَوْجًا দ্বারাই বোধগম্য হয়; সেই সঙ্গে تَنْكِحَ শব্দ বৃদ্ধির উদ্দেশ্য সহবাস হওয়া প্রকাশ করা। অপর দিকে عَقْدِ نِكَاحٌ উদ্দেশ্য নিলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের প্রতি নিসবতটি حَقِيْقِىْ হবে। আর যদি وَطْى উদ্দেশ্য হয়, তাহলে পুরুষের ক্ষেত্রে নিসবতটি حَقِيْقِىْ হবে; কিন্তু স্ত্রীর ক্ষেত্রে مَجَازِىْ হবে।

قَوْلُهُ يَطَأَهَا : অর্থাৎ দ্বিতীয় স্বামী তার সঙ্গে সহবাসও করে নেবে। এ ইবারতটুকু দ্বারা ঐ সকল লোকদের মতকে খণ্ডন করা হচ্ছে, যারা হিল্লা করার জন্য শুধু عَقْدِ نِكَاحٌ -ই যথেষ্ট মনে করে। এ উক্তিটি মাশহুর হাদীসের পরিপন্থি।

মোটকথা, তিন তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী ঐ প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না তবে পাঁচ শর্তে–

১. প্রথম স্বামীর তালাকের ইদ্দত পালন।
২. দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে বিয়ে।
৩. দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে সহবাস।
৪. অতঃপর দ্বিতীয় স্বামীর তালাক প্রদান।
৫. তার তালাকের ইদ্দত পালন।

হিল্লা বিয়ের বিধান : কোনো তালাকপ্রাপ্তাকে নতুন স্বামীর এ শর্তে বিয়ে করা যে, সহবাসের পরে তাকে তালাক দিয়ে দেবে, যাতে সে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হতে পারে- একে 'হালালা' [হিলা, হিল্লা বিয়ে] বলে। হাদীসে এ ধরনের **মুহাল্লিল** ও **মুহাল্লাল লাহু** -এর জন্য অভিশাপ উচ্চারিত হয়েছে। অধিকাংশ ফকীহের মতে এ বিয়ে ফাসিদ ও ত্রুটিপূর্ণ বিয়ে হিসেবে

প্রতিপন্ন হবে। হানাফীদের মতে আইনগত পর্যায়ে বিয়ের শর্তসমূহ পাওয়া যাওয়ার কারণে এ বিয়ে সংঘটিত হয়ে যাবে। তবে এতে অবশ্যই গুনাহগার হবে। তবে মুফতি মাহমূদ হাসান গাঙ্গহী (র.) তাঁর মালফূযাতে বলেছেন, হাদীসে যে লানতের কথা উচ্চারিত হয়েছে তা ঐ সুরতের সঙ্গে প্রযোজ্য হবে, যখন হিল্লার জন্য কোনো পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা হয় এবং তালাক দেওয়ার শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু যদি তালাক শর্ত না করা হয় বা পারিশ্রমিক ধার্য না করা হয়; বরং সাধারণ গতিতে বিবাহ করে এবং নিজের মনে মনে রাখে যে দু-এক দিন পর তালাক দিয়ে দেব, যাতে বেচারা প্রথম স্বামীর সংসার বিনষ্ট না হয়ে যায়। তাহলে এটা শুধু জায়েজই নয়; বরং ছওয়াবও মিলবে।

–[মালফূযাতে ফকীহুল উম্মাহ খ. ১, পৃ. ১৪]

قَوْلُهُ قَارَبْنَ انْقِضَاءَ عِدَّتِهِنَّ : **فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ**-এর ব্যাখ্যায় **قَارَبْنَ انْقِضَاءَ عِدَّتِهِنَّ** উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে **بُلُوْغ** দ্বারা উদ্দেশ্য হলো **اَلدُّنُوُّ مِنَ الْوُصُوْلِ** অর্থাৎ ইদ্দত সমাপ্তির কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া, প্রকৃতই শেষ হয়ে যাওয়া নয়। এ অর্থ নেওয়া হলে পরবর্তী শব্দ **فَاَمْسِكُوْهُنَّ** আনা শুদ্ধ হবে। কেননা ইদ্দত শেষ হলে তো আর **اِمْسَاكْ** সম্ভব নয়। –[জালালাইন-সংশ্লিষ্ট টীকা]

قَوْلُهُ اَجَلَهُنَّ : তাদের সময়। **اَجَلْ** কোনো কিছুর পূর্ণ সময়ও বুঝায়, আবার সময়ের শেষ প্রান্তও বুঝায়।

সারকথা, একবার বা দুবার পর্যন্ত দেওয়া রেজয়ী তালাক, যার ইদ্দতের সময় পূর্ণ হয়ে আসছে। এখনো পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়নি। এ সময় স্বামীর দুটি অধিকার রয়েছে– ক. হয়তো এ অর্ধ তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে সসম্মানে ভদ্রতার সাথে নিজের বৈবাহিক সম্পর্কে ফিরিয়ে আনবে। খ. কিংবা ভদ্রতার সঙ্গে ও সসম্মানে তাকে নিজের বাড়ি থেকে বিদায় জানাবে এবং উভয়ে পৃথক হয়ে যাবে। মোটকথা উভয় পন্থার যেটিই গ্রহণ করা হোক, তাতে মূল লক্ষণীয় হবে শরিয়ত ও নৈতিকতার বিধান।

قَوْلُهُ وَلَا تَتَّخِذُوْآ اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا : আল্লাহর আয়াতকে খেলায় পরিণত করো না। খেলায় পরিণত করার একটি তাফসীর হচ্ছে, বিয়ে ও তালাক সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা যে সীমারেখা ও শর্তাবলি নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তার বিরুদ্ধাচরণ করা। আর দ্বিতীয় তাফসীর হযরত আবুদ দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, জাহেলিয়াত যুগে কোনো কোনো লোক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বা বাঁদিকে মুক্ত করে দিয়ে পরে বলত যে, আমি তো উপহাস করেছি মাত্র, তালাক দেওয়া বা মুক্তি দিয়ে দেওয়ার কোনো উদ্দেশ্যই আমার ছিল না। তখনই এ আয়াত নাজিল হয়। এতে ফয়সালা দেওয়া হয়েছে যে, বিয়ে ও তালাককে যদি কেউ খেলা বা তামাশা হিসেবেও সম্পাদন করে তবুও তা কার্যকর হয়ে যাবে। এতে নিয়তের কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– তিনটি বিষয় এমন রয়েছে যে, সেগুলো হাসি-তামাশার মাধ্যমে করা এবং বাস্তবে করা উভয়ই সামান। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে তালাক, দ্বিতীয়টি দাসমুক্তি এবং তৃতীয়টি বিয়ে। হাদীসটি ইবনে মার্দুবিয়্যাহ্ উদ্ধৃত করেছেন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে, আর ইবনুল মুনযির বর্ণনা করেছেন হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রা.) থেকে। –[মা'আরিফুল কুরআন : আয়াত– ১২৮]

٢٣٢. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ خِطَابٌ لِلْأَوْلِيَاءِ أَيْ لَا تَمْنَعُوهُنَّ مِنْ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ الْمُطَلِّقِيْنَ لَهُنَّ لِأَنَّ سَبَبَ نُزُوْلِهَا أَنَّ أُخْتَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَأَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَمَنَعَهَا مَعْقِلٌ كَمَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ إِذَا تَرَاضَوْا أَيِ الْأَزْوَاجُ وَالنِّسَاءُ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ شَرْعًا ذٰلِكَ النَّهْيُ عَنِ الْعَضْلِ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ لِأَنَّهُ الْمُنْتَفِعُ بِهِ ذٰلِكُمْ أَيْ تَرْكُ الْعَضْلِ أَزْكٰى لَكُمْ وَأَطْهَرُ لَكُمْ وَلَهُمْ لِمَا يُخْشٰى عَلَى الزَّوْجَيْنِ مِنَ الرِّيْبَةِ بِسَبَبِ الْعَلَاقَةِ بَيْنَهُمَا وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْهِ مِنَ الْمَصْلَحَةِ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ فَاتَّبِعُوْا أَمْرَهُ .

অনুবাদ :

২৩২. তোমরা যখন স্ত্রীগণকে তালাক দাও এবং তারা তাদের মুদ্দতে পৌঁছায় অর্থাৎ তাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করে তখন তারা যদি শরিয়তানুসারে বিধিমতো পরস্পর অর্থাৎ স্বামী ও স্ত্রীগণ সম্মত হয়, তবে নিজেদের যারা তাদেরকে তালাক প্রদান করেছে সেই স্বামীগণকে বিবাহ করতে তোমরা তাদেরকে বাধা দিও না। নিষেধ করো না। এ নির্দেশে মূলত নারীদের ওলী বা অভিভাবকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। হাকিম (র.) বর্ণনা করেন, এ আয়াতটির শানে নুযূল হলো, মা'কিল ইবনে ইয়াসার নামক জনৈক সাহাবীর বোনকে তার স্বামী তালাক দিয়েছিল। পরে তিনি তাকে পুনরায় গ্রহণ করতে চাইলে মা'কিল তাতে তার বোনকে বাধা দেন। তখন এ আয়াত নাজিল হয়। তা দ্বারা অর্থাৎ এই বাধা নিষিদ্ধ করা দ্বারা উপদেশ দান করা হয় তোমাদের মধ্যে যে জন আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে তাকে। কেননা এ উপদেশ দ্বারা সে-ই কেবল উপকৃত হতে পারে। এটা অর্থাৎ বাধা প্রদান পরিত্যাগ করা তোমাদের জন্য শুদ্ধতম মঙ্গলজনক। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে পূর্ব সম্পর্ক থাকায় তাদের বিষয়ে নানা সন্দেহের আশঙ্কা রয়েছে। ফলে তা তোমাদের ও তাদের সকলের পক্ষে [ও পবিত্রতম।] এতে কি কি কল্যাণ নিহিত তা [আল্লাহই জানেন, আর তোমরা তা জান না। সুতরাং তোমরা তাঁর নির্দেশের অনুসরণ কর।

তাহকীক ও তারকীব

أَجَلٌ : মুদ্দত, নির্দিষ্ট সময়। اِنْقَضَتْ : অতিক্রান্ত হলো। فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ : তোমরা তাদেরকে বাধা দিও না। (ن) اَلْعَضْلُ : বাধা দেওয়া। اَزْكٰى : শুদ্ধতম, অধিক উপকারী। يُقَالُ : زَكَا الزَّرْعُ إِذَا نَمَا بِكَثْرَةٍ وَبَرَكَةٍ - اَلرِّيْبَةُ : সন্দেহ। اَلْعَلَاقَةُ : সম্পর্ক। اَلْمَصْلَحَةُ : কল্যাণ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচনা ও যোগসূত্র : পূর্বের দুটি আয়াতে তালাকের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মাসআলা আলোচিত হয়েছে। এখান থেকে এ সংক্রান্ত আরো কতিপয় বিধান বর্ণনা করা হচ্ছে।

এ আয়াতে সে সমস্ত উৎপীড়নমূলক ব্যবহারের প্রতিরোধ করা হয়েছে, যা সাধারণত তালাকপ্রাপ্ত নারীদের সাথে করা হয়। তা হলো তাদেরকে অন্য লোকের সাথে বিয়ে করতে বাধা দেওয়া হয় কিংবা প্রথম স্বামীর সাথেও শরিয়ত মোতাবিক বিয়ে বসতে চায়, তাহলে তার অভিভাবক ও আত্মীয়স্বজন তালাক দেওয়ার ফলে স্বামীর সাথে সৃষ্ট বৈরিতাবশত উভয়ের সম্মতি থাকা সত্ত্বেও বাধার সৃষ্টি করে। অনেক সময় স্বামীও তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে অন্যত্র বিয়ে দেওয়াতে **নিজের** ইজ্জত ও মর্যাদার অবমাননা মনে করে বাধার সৃষ্টি করে। উক্ত আয়াতে তা নিষেধ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ : এখানে فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ -এর ব্যাখ্যায় اِنْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ উল্লেখ করে এদিকে **ইঙ্গিত করেছেন** যে, এখানে بُلُوْغ দ্বারা পূর্ববর্তী আয়াতের ন্যায় ইদ্দতের সময় শেষের কাছাকাছি পৌঁছা উদ্দেশ্য নয়; **বরং এখানে** حَقِيْقِيْ বা প্রত্যক্ষরূপে অর্থাৎ সম্পূর্ণ শেষ হওয়ার অর্থে। কেননা বিবাহ থেকে বারণ করার ব্যাপারটি কেবল **ইদ্দতের পরেই** হতে পারে। পক্ষান্তরে পূর্বের আয়াতে بُلُوْغ দ্বারা মাজাযী অর্থ তথা قُرْب [নিকটবর্তী হওয়া] উদ্দেশ্য।–[জালালাইন, **সংশ্লিষ্ট টীকা**]

قَوْلُهُ لَا تَعْضُلُوْهُنَّ : এটি فِعْل نَهْى جَمْع مُذَكَّر حَاضِر -এর সীগাহ। অর্থ– তোমরা তাদেরকে **বাধা দিও না**। [ن] عَضْلًا عَضْل অর্থ– কঠোরভাবে বাধা দেওয়া।

قَوْلُهُ خِطَابٌ لِلْاَوْلِيَاءِ : এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে ঐ সমস্ত লোকদের **বক্তব্যের খণ্ডন করা উদ্দেশ্য, যারা** لَا تَعْضُلُوْ -এর مُخَاطَبْ তালাক প্রদানকারী স্বামীকে আখ্যা দিয়ে থাকে। **তাদের মতে অর্থ হবে– তালাক প্রদানকারী স্বামীরা যেন** নিজেদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে বিবাহ বসতে বাধা না দেয়। এ **অর্থটি শুদ্ধ না হওয়ার** কারণ হলো, এ সুরতে اَزْوَاجَهُنَّ -এর মাজাযী অর্থ তথা مَا يَؤُوْلُ হিসেবে **স্বামী উদ্দেশ্য নিতে হবে। আর যদি** لَا تَعْضُلُوْهُنَّ -এর مُخَاطَبْ স্ত্রীর অভিভাবক উদ্দেশ্য হয়, তাহলে اَزْوَاجَهُنَّ -এর প্রকৃত **অর্থ তথা পূর্বের স্বামী উদ্দেশ্য হবে**, তখন অর্থ হবে পূর্বের স্বামীর সাথে বিবাহ বসতে বাধা দিয়ো না। **এখানে স্বামী** مَا كَانَ **হিসেবে হবে**। আর **এটিই** হলো তার প্রকৃত অর্থ।

قَوْلُهُ لِاَنَّ سَبَبَ نُزُوْلِهَا : **এটি এ কথার প্রমাণ যে,** لَا تَعْضُلُوْهُنَّ -এর মুখাতাব স্ত্রীর অভিভাবকরা, পূর্বের স্বামী নয়। কেননা আয়াতের **শানে নুযূল দ্বারা জানা যায় যে**, বাধাদানকারী অভিভাবকরাই ছিল।

قَوْلُهُ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ شَرْعًا : অর্থাৎ যখন উভয়ে শরিয়তের নিয়মানুযায়ী রাজি হবে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদি উভয়ে রাজি না হয়, তবে কোনো এক পক্ষের উপর জোর বা চাপ প্রয়োগ করা বৈধ হবে না।

এরপর بِالْمَعْرُوْفِ অংশ থেকে **বুঝা যায়** যে, মহিলা যদি শরিয়তসম্মত পন্থায় বিবাহ করে, তাহলে তাকে বাধা দিতে নেই। আর শরিয়ত পরিপন্থি পন্থায় **করলে বাধা দেবে। যথা**– বিয়ে না করেই পরস্পর স্বামী স্ত্রীর মতো বাস করতে আরম্ভ করে, অথবা তিন তালাকের পর অন্যত্র **বিয়ে না করেই** যদি পুনঃবিবাহ করতে চায়, অথবা ইদ্দতের মধ্যেই অন্যের সাথে বিয়ের ইচ্ছা করে, তখন সকল মুসলমানের **এবং বিশেষ** করে ঐ সমস্ত লোকের যারা তাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত, সবাইকে সম্মিলিতভাবে বাধা দিতে হবে, এমনকি **শক্তি প্রয়োগ** করতে হলেও তা করতে হবে। মুসান্নিফ (র.) شَرْعًا **শব্দ দ্বারা** এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ لِاَنَّهُ الْمُنْتَفِعُ بِهٖ : অর্থাৎ উল্লিখিত **আদেশ** দ্বারা মু'মিনগণকেই উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা এ উপদেশ দ্বারা তারাই উপকৃত হয়। তা না হলে উপদেশ তো সকলের জন্যই ব্যাপক, বিশেষ কারো জন্য সীমিত নয়। তাছাড়া মু'মিনগণকে বিশেষভবে উল্লেখ করা দ্বারা অন্যদের **প্রতি** তিরস্কার ও অবজ্ঞাও উপলব্ধি করা যায়। অর্থাৎ যারা এসব আদেশ পালন করে না, তাদের যেন আল্লাহ তা'**আলা ও আখিরাতে** বিশ্বাসই নেই। –[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْهِ مِنَ الْمَصْلَحَةِ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ : প্রকৃত কল্যাণ আল্লাহই ভালো জানেন। **স্ত্রীকে বিবাহে** বাধা প্রদান না করা ও তার বিবাহ হয়ে যাওয়ার মঝে এমন পবিত্রতা রয়েছে, যা বিবাহে বাধা **দেওয়ার মাঝে** আদৌ নেই। অনুরূপ স্ত্রী যখন প্রাক্তন স্বামীর প্রতি আকৃষ্ট থাকে, তখন তারই সাথে তার বিবাহ **হওয়ার মাঝে যে পবিত্রতা** নিহিত আছে, তা অন্যের সাথে বিবাহ হওয়ার মাঝে আদৌ নেই। আল্লাহ তা'আলা তাদের **মানোভাব এবং ভবিষ্যৎকালীন** লাভ ক্ষতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত, তোমরা তার কিছুই জান না। –[তাফসীরে উসমানী]

২৩৩. وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَىْ لِيُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ عَامَيْنِ كَامِلَيْنِ صِفَةٌ مُؤَكِّدَةٌ ذٰلِكَ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَلَا زِيَادَةَ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ اَىِ الْاَبِ رِزْقُهُنَّ اِطْعَامُ الْوَالِدَاتِ وَكِسْوَتُهُنَّ عَلَى الْاِرْضَاعِ اِذَا كُنَّ مُطَلَّقَاتٍ بِالْمَعْرُوْفِ بِقَدْرِ طَاقَتِهٖ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا طَاقَتَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا بِسَبَبِهٖ بِاَنْ تُكْرَهَ عَلٰى اِرْضَاعِهٖ اِذَا امْتَنَعَتْ وَلَا يُضَارَّ مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ اَىْ بِسَبَبِهٖ بِاَنْ يُّكَلَّفَ فَوْقَ طَاقَتِهٖ وَاِضَافَةُ الْوَلَدِ اِلٰى كُلٍّ مِّنْهُمَا فِى الْمَوْضَعَيْنِ لِلْاِسْتِعْطَافِ وَعَلَى الْوَارِثِ اَىْ وَارِثِ الْاَبِ وَهُوَ الصَّبِىُّ اَىْ عَلٰى وَلِيِّهٖ فِىْ مَالِهٖ مِثْلُ ذٰلِكَ الَّذِىْ عَلَى الْاَبِ لِلْوَالِدَةِ مِنَ الرِّزْقِ وَالْكِسْوَةِ فَاِنْ اَرَادَا اَىِ الْوَالِدَانِ فِصَالًا فِطَامًا لَهٗ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ صَادِرًا عَنْ تَرَاضٍ اِتِّفَاقٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ بَيْنَهُمَا لِتَظْهَرَ مَصْلَحَةُ الصَّبِىِّ فِيْهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِىْ ذٰلِكَ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ خِطَابٌ لِلْاٰبَاءِ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مَرَاضِعَ غَيْرِ الْوَالِدَاتِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْهِ اِذَا سَلَّمْتُمْ اِلَيْهِنَّ مَا اٰتَيْتُمْ اَىْ اَرَدْتُّمْ اِيْتَاءَهٗ لَهُنَّ مِنَ الْاُجْرَةِ بِالْمَعْرُوْفِ بِالْجَمِيْلِ كَطِيْبِ النَّفْسِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَىْءٌ مِّنْهُ ـ

অনুবাদ :

২৩৩. জননীগণ তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই হাওল كَامِلَيْنِ এটা صِفَةٌ مُؤَكِّدَةٌ বা তাকিদবাচক বিশেষণ। অর্থাৎ দুই বৎসর স্তন্য পান করাবে অর্থাৎ সে যেন দুধ পান করায়। وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ الخ এ স্থানে বাক্যটি خَبَرِيَّةٌ বা বিবরণমূলক হলেও মূলত اَمْر বা নির্দেষ ব্যঞ্জক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তা তার জন্য যে স্তন্যপান কাল পূর্ণ করতে চায়। এর অতিরিক্ত তার কর্তব্য নয়। জনকের পিতার কর্তব্য বিধিমতো অর্থাৎ তার সামর্থ্যানুসার তাদের জননীদের যদি তারা তালাকপ্রাপ্তা হয়, তবে স্তন্যপান করানোর দরুন জীবিকা খাদ্য ও বস্ত্র দান করা। কাউকেও তার সাধ্যাতীত সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেওয়া হয় না। কোনো জননীকে তার সন্তানের কারণে কষ্ট দেওয়া যায় না। অর্থাৎ সে যদি অস্বীকার করে তবে স্তন্য পান করানোর জন্য তাকে বাধ্য করে কষ্ট দেওয়া যায় না। এবং কোনো জনককে তার সন্তানের কারণে, যেমন– তার সাধ্যাতীত ব্যয়ভার তার উপর চাপিয়ে দিয়ে তাকে] ক্ষতিগ্রস্ত করা যায় না। اِسْتِعْطَافٌ বা হৃদয়ে করুণা উদ্রেকের উদ্দেশ্যে উভয় স্থানে সন্তানকে প্রত্যেকের দিকে সম্বন্ধ করে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং উত্তরাধিকারীগণেরও পিতার উত্তরাধিকারী পুত্র অর্থাৎ তার ধন-সম্পত্তির যে অভিভাবক তার উপর অনুরূপ অর্থাৎ জননীকে খাদ্য ও বস্ত্র দান যেরূপ জনকের উপর কর্তব্য ছিল, তেমনি তা তার উপরও কর্তব্য তাদের পরস্পর সম্মতি। عَنْ تَرَاضٍ এটা এ স্থানে উহ্য صَادِرٌ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট। ঐকমত্য এবং স্তন্যপান বন্ধ করতে সন্তানের কি কল্যাণ হতে পারে তা প্রকাশের উদ্দেশ্যে পরস্পর পরামর্শক্রমে যদি তারা জনক ও জননী দুই বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তার স্তন্যপান বন্ধ রাখতে চায় তবে এতে তাদের কারো কোনো অপরাধ নেই। যদি তোমরা এ স্থলে পিতাদের সম্বোধন করা হচ্ছে। তোমাদের সন্তানদেরকে জননী ব্যতীত অন্য ধাত্রীদের দ্বারা স্তন্যপান করাতে চাও তাতে তোমাদের কোনো পাপ নেই, সাদাচারের সাথে সুন্দরভাবে, মনের খুশিতে তোমরা যা দিয়েছিলে অর্থাৎ তাদেরকে যে পরিমাণ পারিশ্রমিক তোমরা দিতে চেয়েছিলে তা যদি তাদেরকে অর্পণ কর। আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ তোমাদের সকল কার্যকলাপেরই দ্রষ্টা। তাঁর নিকট এর কিছুই গোপন নেই।

তাহকীক ও তারকীব

اَلْوَالِدٰتُ : وَالِدَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ- জননীগণ। يُرْضِعْنَ : مُضَارِعْ جَمْعِ مُؤَنَّثْ غَائِبْ-এর সীগাহ। অর্থ- স্তন্যদান করবে। اَلْاَرْضَاعُ : দুধ পান করানো। حَوْلَيْنِ : حَوْلٌ-এর দ্বিবচন। অর্থ- বছর। كِسْوَةٌ : বস্ত্র প্রদান। لَا تُكَلَّفُ : দায়িত্ব দেওয়া হয় না। وَسْعٌ : সামর্থ্য। لا تضار : ক্ষতিগ্রস্ত করা যায় না। اِمْتَنَعَتْ : বিরত থাকল। لِلْاِسْتِعْطَافِ : করুণা উদ্রেকের উদ্দেশ্যে। فِصَالًا : স্তন্যপান বন্ধ করা। سُمِّيَ بِهٖ لِاَنَّ الْوَلَدَ يَنْفَصِلُ عَنْ لَبَنِ اُمِّهٖ اِلٰى غَيْرِهٖ مِنَ الْاَقْوَاتِ.

فِطَامًا : فَطَمَ (ن) فِطَامًا অর্থ- বাচ্চার দুধ ছাড়ানো। مَرَاضِعُ : مُرْضِعَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ- ধাত্রী। طِيْبُ النَّفْسِ : মনের খুশি। تَشَاوُرٌ : পরামর্শ। শব্দটি شَوْر থেকে নির্গত। شَوْر অর্থ- মধু নিংড়িয়ে বের করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ الخ : এ আয়াতে স্তন্যদান সম্পর্কে নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। এর পূর্বে ও পরবর্তী আয়াতে তালাক সংক্রান্ত আদেশাবলির আলোচনা হয়েছে। এরই মধ্যে শিশুকে স্তন্যদান সংক্রান্ত আলোচনা এজন্য করা হয়েছে যে, সাধারণত তালাকের পরে শিশুর লালনপালন ও স্তন্যদান নিয়ে বিবাদের সৃষ্টি হয়। কাজেই এ আয়াতে এমন ন্যায়সঙ্গত নিয়ম বাতলে দেওয়া হয়েছে যা স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের জন্যই সহজ ও যুক্তিসঙ্গত। বিবাহ বহাল থাকাকালে অথবা তালাক দেওয়ার পর স্তন্যদান বা দুধ ছাড়ানোর বিষয় উপস্থাপিত হোক এখানে উভয় অবস্থার বিধানই আলোচিত হয়েছে।

সন্তানদের স্তন্যদানের বিধান : মায়ের প্রতি নির্দেশ সে তার সন্তানকে দু-বছর পর্যন্ত দুধ পান করাবে। এ মেয়াদ সেই পিতামাতার জন্য যারা সন্তানের দুধপানের সময়কাল পূর্ণ করতে চায়। নয়তো এ মেয়াদ হ্রাস করাও জায়েজ, যেমন আয়াতের শেষে আসছে। যে মা বিবাহ বন্ধনে আছে, যাকে তালাক দেওয়া হয়েছে, কিংবা তালাকের পর যার ইদ্দত শেষ হয়ে গেছে তারা সকলেই এ নির্দেশের আওতাভুক্ত। হ্যাঁ, তাদের মাঝে এই পার্থক্য রয়েছে যে, বিবাহাধীন ও ইদ্দত পালনরত স্ত্রীকে ভরণপোষণ দেওয়া সর্বাবস্থায় জরুরি, চাই সে দুধ পান করাক আর না-ই করাক। কিন্তু যার ইদ্দত সমাপ্ত হয়েছে, তাকে ভরণপোষণ দিতে হবে কেবল দুধ খাওয়ানোর কারণে, অন্যথায় নয়। এ আয়াত দ্বারা এতটুকু জানা গেল যে, যখন মা দ্বারা দুধ পান করানোর সময়কাল পূর্ণ করানো ইচ্ছা হয় বা যে অবস্থায় পিতার কাছ থেকে মাকে দুধ পান করানোর বিনিময় আদায় করিয়ে দেওয়া উদ্দেশ্য হয়, তার শেষ সীমা পূর্ণ দু-বছর। সাধারণভাবে সর্বাবস্থায় যে দুধ খাওয়ানোর মেয়াদ দু'বছর এর বেশি নয়, তা এ আয়াতে বলা হয়নি। -[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهٗ اَلْوَالِدٰتُ : এখানে وَالِدٰتُ শব্দ দ্বারা কেবল তালাকপ্রাপ্তা মায়েরাই উদ্দেশ্য, নাকি সকল মায়েরাই? এ প্রসঙ্গে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, তালাকপ্রাপ্তা মায়েরাই উদ্দেশ্য, কেননা পূর্ব থেকে তাদের আলোচনাই চলে আসছে। আর কেউ বলেন, সকল মায়েরাই উদ্দেশ্য। কেননা আয়াতের শব্দ ব্যাপক। কিন্তু নাফকা [ভরণপোষণের] কয়েদ দ্বারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ এবং ইদ্দত পালনকারিণী নারীগণ বের হয়ে গেছে। কেননা তাদের ভরণপোষণ তো পূর্ব থেকেই ওয়াজিব রয়েছে। চাই তারা স্তন্যদান করুক বা না করুক।

قَوْلُهٗ لِيُرْضِعْنَ : يُرْضِعْنَ-এর তাফসীর لِيُرْضِعْنَ দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে خَبَرْ টি اَمْرْ-এর অর্থে। আর এমনটি মোবালাগার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।

শিশুদের দুধ পান করানো মায়ের উপর ওয়াজিব : শিশুদের দুধ পান করানো মায়ের উপর ওয়াজিব। কোনো অসুবিধা ব্যতীত ক্রোধের বশবর্তী হয়ে বা অসন্তুষ্টির দরুন স্তন্যদান বন্ধ করলে পাপ হবে এবং স্তন্যদানের জন্য স্ত্রী স্বামীর নিকট হতে কোনো প্রকার বেতন বা বিনিময় নিতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত বিবাহ বন্ধন বিদ্যমান থাকে। কেননা এটা স্ত্রীরই দায়িত্ব। -[মা'আরিফুল কুরআন]

قَوْلُهُ وَلَا زِيَادَةَ عَلَيْهِ : অর্থাৎ দুগ্ধদানের সর্বোচ্চ সীমা হলো দুবছর, তারপর দুগ্ধপান করানো যাবে না। অবশ্য দু-বছরের চেয়ে কম করতে পারবে। এটা ইমাম শাফেয়ী (র.) সহ সাহেবাইনের অভিমত। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, দুগ্ধপান করানোর সীমা হলো ত্রিশ মাস। তিনি বলেন, আয়াতে দুবছর দ্বারা مُدَّتْ رِضَاعَتْ নির্ধারণ করা হয়নি; বরং দুগ্ধপান করিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। কেননা এখানে اَلْوَالِدٰتُ দ্বারা তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী উদ্দেশ্য। এ কথার প্রমাণ মিলে وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ দ্বারা। –[হাশিয়া]

قَوْلُهُ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ : এখানে اَلْوَالِدُ না বলে اَلْمَوْلُوْدِ لَهُ বলার কারণ এ কথা বুঝানো যে, স্ত্রীগণ স্বামীদের জন্যই সন্তান প্রসব করে থাকে। মূলত পিতারাই হলেন সন্তানের অধিকারী। স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঘটলে সন্তানরা পিতার ভাগে থাকবে।

قَوْلُهُ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ عَلَى الْاِرْضَاعِ اِذَا كُنَّ مُطَلَّقَاتٍ بِالْمَعْرُوْفِ : এ আয়াতের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, শিশুকে স্তন্যদান করা মাতার দায়িত্ব আর মাতার ভরণপোষণ ও জীবনধারণের অন্যান্য যাবতীয় খরচ নির্বাহ করা পিতার দায়িত্ব। তবে এ দায়িত্ব ততক্ষণ পর্যন্ত বলবৎ থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত শিশুর মাতা স্বামীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ বা তালাক-পরবর্তী ইদ্দতের মধ্যে থাকে। তালাক ও ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে গেলে স্ত্রী হিসেবে ভরণপোষণের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় সত্য, কিন্তু শিশুকে স্তন্যদানের পরিবর্তে মাতাকে পারিশ্রমিক দিতে হবে। –[মাযহারী সূত্রে মা'আরিফুল কুরআন]

মুসান্নিফ (র.) اِذَا كُنَّ مُطَلَّقَاتٍ দ্বারা এ কথাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, দুগ্ধদানকারিণী যদি সে লোকের স্ত্রী কিংবা ইদ্দত পালনকারিণী হয়, তবে তার জন্য পারিশ্রমিক ওয়াজিব হবে না। কেননা স্ত্রী হিসেবে তার জন্য ভরণপোষণ পূর্ব থেকেই ওয়াজিব হবে। আর তালাক ও ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে গেলে স্ত্রী হিসেবে ভরণপোষণ পাবে না, কিন্তু শিশুকে স্তন্যদানের পরিবর্তে মাতা পারিশ্রমিক পাবে।

بِاَنْ تَكْرَهَ عَلَى اِرْضَاعِ : اَىْ بِغَيْرِ اُجْرَةٍ اَوْ بِاُجْرَةٍ وَعَنْ اُجْرَةِ الْمِثْلِ حَيْثُ طَلَبَتْهَا

قَوْلُهُ وَعَلَى الْوَارِثِ : এটি পূর্বে বর্ণিত وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ-এর সাথে عَطْف হয়েছে। উভয়ের মধ্যবর্তী আয়াতাংশ مُعْتَرِضَةٌ স্বরূপ, যা اَلْمَعْرُوْفُ-এর ব্যাখ্যা হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে। وَعَلَى الْوَارِثِ অর্থাৎ তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর উদরে সন্তান জন্মলাভ করে বা সন্তান জন্মের পর স্বামী যদি মারা যান এবং সম্পদ রেখে যান, তাহলে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী দুগ্ধদান করলে সন্তানের অভিভাবকগণ তার মাল থেকে মহিলার সে পরিমাণ ভরণপোষণ দেবে, যে পরিমাণ পিতা জীবিত থাকলে ওয়াজিব হতো।

قَوْلُهُ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ : আয়াতের উদ্দেশ্য, অনেক সময় মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে অন্য কাউকে দিয়ে দুধ খাওয়াবার প্রয়োজন বা সার্থকতা থাকতে পারে। সুতরাং তেমন পরিস্থিতিতে অন্য কোনো ধাত্রী বা মায়ের দুধ পান করানো দূষণীয় হবে না। এটা সম্পূর্ণ বৈধ। তবে এ শর্তে যে, যথা চুক্তি ও যথা যুক্তি বিনিময় মজুরি আদায় করে দেওয়া হবে।

٢٣٤. وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ يَمُوْتُوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ يَتْرُكُوْنَ اَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ اَيْ لِيَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ بَعْدَهُمْ عَنِ النِّكَاحِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا مِنَ اللَّيَالِيْ وَهٰذَا فِيْ غَيْرِ الْحَوَامِلِ وَاَمَّا الْحَوَامِلُ فَعِدَّتُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ بِاٰيَةِ الطَّلَاقِ وَالْاَمَةُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذٰلِكَ بِالسُّنَّةِ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ انْقَضَتْ مُدَّةُ تَرَبُّصِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَيُّهَا الْاَوْلِيَاءُ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْ اَنْفُسِهِنَّ مِنَ التَّزَيُّنِ وَالتَّعَرُّضِ لِلْخُطَّابِ بِالْمَعْرُوْفِ شَرْعًا وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ عَالِمٌ بِبَاطِنِهِ كَظَاهِرِهِ .

অনুবাদ :

২৩৪. তোমাদের মধ্যে যারা কাল পূর্ণ করে অর্থাৎ মৃত্যু মুখে পতিত হয় আর পত্নী ছেড়ে যায় রেখে যায়, তাদের পর তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় তবে চার মাস দশ রাত্রি নিজেদের নিয়ে অপেক্ষা করবে يَتَرَبَّصْنَ এটা এ স্থানে خَبَرِيَّةٌ বা বিবরণমূলক হলেও اَمْر বা আজ্ঞাব্যঞ্জক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তারা যেন এ সময়কাল অপেক্ষা করে। এ ইদ্দত যারা গর্ভবতী নয় তাদের জন্য প্রযোজ্য। সূরা তালাকে উল্লিখিত আয়াতানুসারে গর্ভবতীদের ইদ্দত হলো গর্ভমুক্ত হওয়া। আর হাদীসানুসারে দাসীগণের ইদ্দত হলো [অর্থাৎ যে সমস্ত দাসী গর্ভবতী নয়] এর **অর্ধেক। যখন** তারা তাদের মুদ্দত সীমায় পৌছায় অর্থাৎ তাদের **প্রতীক্ষার** সময়সীমা পূর্ণ করে তখন হে **অভিভাবকগণ!** তারা নিজেদের ব্যাপারে সাজসজ্জা, বিবাহের পয়গামের জন্য নিজেকে পেশ করা ইত্যাদি শরিয়তানুসারে **বিধিমতো** যা কিছু করে তাতে তোমাদের কোনো পাপ নেই। আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে **সবিশেষ** অবহিত। বাইরের মতো ভিতর সম্পর্কেও তিনি জানেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ **বিধবার ইদ্দতকাল :** পৃথিবীর বুকে আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে তালাকপ্রাপ্তাদের পরে বিধবা সমস্যাটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্ম ও মতবাদ বিধবা সমস্যাটিকে বিশেষ কোনো গুরুত্বই দেয়নি; বরং কোনো কোনো ধর্মে বিধবাকে জীবন্ত ভস্মীভূত করারই ব্যবস্থা রেখেছে। ইসলাম অবশ্য বিধবাকে জীবনে বেঁচে থাকার; বরং স্বামী সোহাগিনীদের ন্যায়ই বেঁচে থাকার অধিকার দিয়েছে। এ অধ্যায়টিও পার্থিব কল্যাণের বিচারে অন্তত ইসলামের একটি উজ্জ্বল অধ্যায়।

قَوْلُهُ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا مِنَ اللَّيَالِيْ : প্রশ্ন হতে পারে, সাধারণত মাস গণনায় দিনের কথা উল্লেখ করা হয়ে থাকে। যেমন- বলা হয় চার মাস দশ দিন কিন্তু চার মাস দশ রাত বলা হয় না। এখানে রাতের কথা বলা হলো কেন?

উত্তর : ইসলামের কিছু কিছু বিধান যেমন– হজ, রোজা, দুই ঈদ ও মহিলাদের ইদ্দত ইত্যাদির সম্পর্ক চান্দ্র মাসের সাথে। আর চান্দ্র তরিখের সূচনা হয় রাত দিয়ে আর দিন রাতের তাবে বা অনুগামী হয়ে থাকে। সুতরাং রাতের মাঝে দিন এমনিতেই অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু এর বিপরীত হলে চান্দ্র তারিখে চার মাস দশ দিন অসম্পূর্ণ হবে। এজন্য মুফাসসির (র.) مِنَ اللَّيَالِيْ -এর শর্তটি জুড়ে দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, ইসলামি বর্ষপঞ্জিতে দিনকে রাতের অনুগামী করা হয়েছে। তবে আরাফার দিন এর ব্যতিক্রম। সেখানে রাতকে দিনের অনুগামী করা হয়েছে। অর্থাৎ ৯ জিলহজের দিবাগত রাতকে উকূফে আরাফা হিসেবে সে দিনের হুকুমে ধরা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاَمَّا الْحَوَامِلُ فَعِدَّتُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ بِاٰيَةِ الطَّلَاقِ : অর্থাৎ আয়াতের ব্যাপকতায় যারা গর্ভবতী এবং যারা গর্ভবতী নয় এমনকি দাসীগণও উক্ত বিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু সূরা তালাকে উল্লিখিত আয়াত গর্ভবতীদেরকে এ বিধান থেকে পৃথক করে দিয়েছে। আয়াতটি এই– وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ অর্থাৎ তাদের ইদ্দত হলো গর্ভমুক্ত হওয়া। আর হাদীস অনুসারে দাসীগণও উল্লিখিত বিধান থেকে পৃথক হয়ে গেছে। হাদীসটি হলো– عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ অর্থাৎ দাসীদের ইদ্দত হলো দুই হায়েজ [অর্থাৎ স্বাধীনা নারীদের ইদ্দতের অর্ধেক]।

قَوْلُهُ شَرْعًا : বিধবা স্ত্রী যখন তার ইদ্দত সমাপ্ত করবে, অর্থাৎ গর্ভবতী না হলে চার মাস দশ দিন এবং গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসবকাল পর্যন্ত অপেক্ষা শেষ করবে, তখন শরিয়তের বিধান অনুযায়ী বিবাহ করা তার জন্য দূষণীয় নয়। অনুরূপ সাজসজ্জা ও সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করাও তার জন্য বৈধ। –[তাফসীরে উসমানী]

٢٣٥. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ لَوَّحْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ فِي الْعِدَّةِ كَقَوْلِ الْإِنْسَانِ مَثَلًا إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ وَمَنْ يَجِدُ مِثْلَكِ وَرُبَّ رَاغِبٍ فِيكِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ أَضْمَرْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ مِنْ قَصْدِ نِكَاحِهِنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ بِالْخِطْبَةِ وَلَا تَصْبِرُونَ عَنْهُنَّ فَأَبَاحَ لَكُمُ التَّعْرِيضَ وَلَٰكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا أَيْ نِكَاحًا إِلَّا لَكِنْ أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا أَيْ مَا عُرِفَ شَرْعًا مِنَ التَّعْرِيضِ فَلَكُمْ ذَٰلِكَ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ أَيْ عَلَى عَقْدِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَيِ الْمَكْتُوبُ مِنَ الْعِدَّةِ أَجَلَهُ بِأَنْ يَنْتَهِيَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ مِنَ الْعَزْمِ وَغَيْرِهِ فَاحْذَرُوهُ أَيْ يُعَاقِبَكُمْ إِذَا عَزَمْتُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ لِمَنْ يَحْذَرُهُ حَلِيمٌ بِتَأْخِيرِ الْعُقُوبَةِ عَنْ مُسْتَحِقِّهَا.

অনুবাদ :

২৩৫. স্ত্রীলোকদের নিকট অর্থাৎ যে সকল মহিলার স্বামী মারা গিয়েছে তাদের ইদ্দতকালে তোমরা ইঙ্গিতে আভাসে বিবাহের প্রস্তাব করলে যেমন কেউ বলল, তুমি বড় সুন্দরী, তোমার মতো স্ত্রী কয়জনে আর পায়? কতজন তোমার প্রতি অনুরক্ত ইত্যাদি। অথবা তোমাদের অন্তরে তাদের বিবাহের ইচ্ছা গোপন রাখলে লুকিয়ে রাখলে তোমাদের কোনো পাপ নেই। আল্লাহ জানেন যে, তোমরা শীঘ্রই পয়গাম পাঠিয়ে তাদের সাথে আলোচনা করবে। তাদের বিষয়ে তোমরা ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবে না। সুতরাং বিবাহের ইঙ্গিত করে রাখা তোমাদের জন্য বৈধ রাখা হয়েছে। শরিয়তানুসারে যা বিধিসম্মত যেমন– বিবাহের ইঙ্গিত করা ইত্যাদি সেই ধরনের কথাবার্তা ব্যতীত গোপনে তাদের নিকট বিবাহের কোনো অঙ্গীকার নিও না। قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا : حَرْف اِسْتِثْنَاء বা ব্যত্যয়সূচক শব্দ। এ স্থানে مُنْقَطِع বা বিজত্য ব্যত্যয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এদিকে ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্যে মুফাসসির (র.) ًا-এর তাফসীরে لَكِنْ ব্যবহার করেছেন। নির্দিষ্টকাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ নির্ধারিত ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ-চুক্তির অর্থাৎ সে ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার সংকল্প করো না।

জেনে রাখ তোমাদের অন্তরে যা বিবাহের সংকল্প ইত্যাদি আছে, নিশ্চয় আল্লাহ তা জানেন। সুতরাং তাকে সংকল্পবদ্ধ হওয়ায় আল্লাহর শাস্তি প্রদান করাকে [ভয় কর এবং জেনে রাখ] যারা ভয় করে, তাদের প্রতি আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, শাস্তিযোগ্যদের শাস্তি প্রদান বিলম্ব করতে সহনশীল।

তাহকীক ও তারকীব

عَرَّضْتُمْ : ইঙ্গিত করেছ। لَوَّحْتُمْ : আভাস দিয়েছ। تَلْوِيْح - ইঙ্গিত করা। خِطْبَة : পয়গাম, প্রস্তাব। اَلْمُتَوَفّٰى عَنْهُنَّ اَزْوَاجُهُنَّ : যে সকল মহিলার স্বামী মারা গেছে। رَاغِبٌ : অনুরক্ত। اَبَاحَ : বৈধ রেখেছেন। اَلتَّعْرِيْضُ : ইঙ্গিত, আভাস। لَاتُوَاعِدُوْهُنَّ : অঙ্গীকার নিও না। لَاتَعْزِمُوْا : সংকল্প করো না। عُقْدَةَ : চুক্তি, বন্ধন। فَاحْذَرُوْا : ভয় কর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

لَوَّحْتُمْ : এ শব্দটি تَلْوِيْح [ইঙ্গিত করা] মাসদার থেকে নির্গত।

قَوْلُهُ وَلٰكِنْ تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اَىْ نِكَاحًا : سِرًّا-এর ব্যাপক প্রচলিত অর্থ– গোপন ও 'রহস্য' সকলেরই জানা। তবে শব্দটির রূপক অর্থ বিয়েও রয়েছে। মুসান্নিফ (র.) سِرًّ-এর ব্যাখ্যায় اَىْ نِكَاحًا বলে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

٢٣٦. لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ وَفِي قِرَاءَةٍ تَمَاسُّوهُنَّ أَيْ تُجَامِعُوهُنَّ أَوْ لَمْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً مَهْرًا وَمَا مَصْدَرِيَّةٌ ظَرْفِيَّةٌ أَيْ لَا تَبْعَةَ عَلَيْكُمْ فِي الطَّلَاقِ زَمَنَ عَدَمِ الْمَسِيسِ وَالْفَرْضِ بِإِثْمٍ وَلَا مَهْرٍ فَطَلِّقُوهُنَّ وَمَتِّعُوهُنَّ أَعْطُوهُنَّ مَا يَتَمَتَّعْنَ بِهِ عَلَى الْمُوسِعِ الْغَنِيِّ مِنْكُمْ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ الضَّيِّقِ الرِّزْقِ قَدَرُهُ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا نَظَرَ إِلَى قَدْرِ الزَّوْجَةِ مَتَاعًا تَمْتِيعًا بِالْمَعْرُوفِ شَرْعًا صِفَةُ مَتَاعًا حَقًّا صِفَةٌ ثَانِيَةٌ أَوْ مَصْدَرٌ مُؤَكَّدٌ عَلَى الْمُحْسِنِينَ الْمُطِيعِينَ .

অনুবাদ :

২৩৬. তোমাদের কোনো পাপ নেই স্ত্রীদেরকে তালাক দিলে যে পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে স্পর্শ করেছ لَمْ تَمَسُّوهُنَّ এটা অপর এক কেরাতে تَمَاسُّوهُنَّ রূপে পঠিত হয়েছে। এমতাবস্থায় এটার অর্থ হবে– যখন তোমরা সঙ্গত না হয়েছ। অথবা তাদের জন্য নির্ধারিত কিছু মহর; এখানে تَفْرِضُوا ক্রিয়াপদটির পূর্বে না-বাচক শব্দ لَمْ উহ্য রয়েছে। ধার্য করেছ مَا এ স্থানে مَصْدَرِيَّةٌ ظَرْفِيَّةٌ বা কালবাচক ক্রিয়ার উৎস অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ স্পর্শ করা বা মহর নির্ধারণ করা ব্যতিরেকে যদি তালাক হয়, তবুও তোমাদের উপর পাপ বা মহর কিছুই বর্তাবে না। সুতরাং এমতাবস্থায়ও তালাক দিতে পার। তোমরা তাদের সংস্থানের ব্যবস্থা কর অর্থাৎ তাদের মুত'আ স্বরূপ কিছু দিয়ে দাও। সচ্ছল ব্যক্তি অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিত্তবান সে তার সাধ্যমতো এবং বিত্তহীন জীবিকা যার সংকোচিত, সে তার সাধ্যানুযায়ী عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ [অর্থাৎ বিত্তবান ব্যক্তি তার সাধ্যমতো এবং বিত্তহীন তার সাধ্যমতো] এ বাক্য দ্বারা বুঝা যায় এই বিষয়ে স্ত্রীর সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ্য করা হবে না। শরিয়তানুসারে বিধিসম্মতভাবে সংস্থানের ব্যবস্থা করবে। مَتَاعًا শব্দটি اِسْمُ مَصْدَرٍ হলেও مَصْدَرٌ বা ক্রিয়ার উৎসরূপে ব্যবহৃত। এদিকে ইঙ্গিতকরণার্থে মাননীয় তাফসীরকার এর তাফসীরে تَمْتِيعًا শব্দটির ব্যবহার করেছেন। بِالْمَعْرُوفِ এটা مَتَاعًا -এর صِفَةٌ বা বিশেষণ। حَقًّا এটা مَتَاعًا -এর صِفَةٌ ثَانِيَةٌ অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশেষণ। কিংবা مَصْدَرٌ مُؤَكِّدَةٌ অর্থাৎ তাকিদবাচক মাসদার। এটা সৎলোকদের আনুগত্যশীলদের কর্তব্য।

তাহকীক ও তারকীব

مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ : যে পর্যন্ত না তোমরা তাদেরকে স্পর্শ করেছ। أَوْ لَمْ تَفْرِضُوا : অথবা কিছু ধার্য করেছ।
فَرِيضَةً : নির্ধারিত মহর। تَبْعَةٌ : تَبِعَاتٌ (ج) تَبْعَةٌ অর্থ– পরিণতি, পরিণাম, দায়িত্ব।
عَدَمُ الْمَسِيسِ : স্পর্শ না করা। مَتِّعُوهُنَّ : মুতআ প্রদান কর।
مَا يَتَمَتَّعْنَ بِهِ : যার দ্বারা তারা উপভোগ লাভ করবে। اَلْمُوسِعُ : বিত্তবান, সচ্ছল।
اَلْمُقْتِرِ : বিত্তহীন, অসচ্ছল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ الخ শানে নুযূল : এক আনসারী সাহাবী জনৈকা মহিলাকে মহর নির্ধারণ ছাড়া বিবাহ করেছিলেন এবং সহবাসের পূর্বেই তাকে তালাক দিয়েছিলেন। সে মহিলা হুজুর ﷺ -এর দরবারে হাজির হয়ে অভিযোগ করলে উক্ত

আয়াতটি নাজিল হয়। তখন রাসূল ﷺ উক্ত সাহাবীকে ডেকে ইরশাদ করলেন– أَمْتِعْهَا وَلَوْ بِقَلَنْسُوَتِكَ অর্থাৎ তাকে **কিছু উপঢৌকন** দিয়ে দাও, কমপক্ষে তোমার টুপিটি হলেও। –[হাশিয়ায়ে জালালাইন]

জ্ঞাতব্য : মহর এবং সহবাস হিসেবে তালাককে চার ভাগে ভাগ করা যায়–

১. মহর নির্ধারণ করা হয়নি এবং সহবাস বা খালওয়াতে সহীহাও হয়নি।

২. মহর নির্ধারণ করা হয়েছে; কিন্তু খালওয়াতে সহীহা হয়নি।

এ দু অবস্থায় তালাকের বিধান উল্লিখিত আয়াতদ্বয় দ্বারা জানা গেছে। উল্লিখিত আয়াতে প্রথম দুই সুরতের হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম সুরতের হুকুম হলো মহর ওয়াজিব হবে না। কিন্তু স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে কিছু উপহার সামগ্রী দিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। মূলত কুরআনে এ উপহারের কোনো পরিমাণ নির্ধারিত নেই। তবে এতটুকু বলে দেওয়া হয়েছে যে, সম্পদশালী তার সামর্থ্য অনুযায়ী এবং দরিদ্র ব্যক্তি তার সামর্থ্য অনুযায়ী দেওয়া উচিত। হযরত হাসান (রা.) অনুরূপ একটি ঘটনায় তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিশ হাজার দিনার বা দিরহাম সমমূল্যের উপহার দিয়েছিলেন এবং কাজি সুরাইহ (র.) পাঁচ শত দিরহাম সমমূল্যের উপহার দিয়েছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, مُتْعَةٌ -এর সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো এক জোড়া বস্ত্র প্রদান করা।

৩. মহর নির্ধারিত হয়েছে এবং খালওয়াতে সহীহাও হয়েছে। এ সুরতে তালাক দিলে নির্ধারিত মহর পুরোটাই দিতে হবে। কুরআনের অন্যত্র এটা উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. মহর নির্ধারিত হয়নি তবে খালওয়াতে সহীহা হয়েছে। [এ সুরতে তালাক দিলে মহরে মিছিল বা প্রচলিত মহর দিতে হবে।] –[তাফসীরে উসমানী, জামালাইন]

قَوْلُهُ أَوْ لَمْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ : মুফাসসির (র.) أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ -এর মাঝে لَمْ উহ্য ধরে এদিকে ইঙ্গিত করছেন যে, لَمْ -এর مَدْخُول তথা تَفْرِضُوا শব্দটি تَمَسُّوهُنَّ -এর সাথে عَطْف হওয়ার কারণে مَجْزُوْم হয়েছে। আর أَوْ শব্দটি এখানে وَاو -এর অর্থে। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত مَسِيْس -এবং تَفْرِيْض مَهْر না পাওয়া যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তালাক প্রদানে কোনো সমস্যা নেই। কেননা এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, أَوْ যখন سِيَاقِ نَفِيْ -তে পতিত হয়, তখন عُمُوْم -এর ফায়দা দেয়। কেউ কেউ বলেছেন- تَفْرِضُوا শব্দটি أَنْ -এর কারণে مَنْصُوْب হয়েছে । কিন্তু এটা ঠিক নয়। এটি خِلَافِ ظَاهِرْ বক্তব্য। কেননা এ সুরতে أَنْ উহ্য ধরতে হবে এবং أَوْ -কে إِلَّا কিংবা إِلَى -এর অর্থে ধরতে হবে।

অনুবাদ :

২৩৭. وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ يَجِبُ لَهُنَّ وَيَرْجِعُ لَكُمُ النِّصْفُ إِلَّا لَكِنْ أَنْ يَعْفُونَ أَيِ الزَّوْجَاتُ فَيَتْرُكْنَهُ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَهُوَ الزَّوْجُ فَيَتْرُكُ لَهَا الْكُلَّ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْوَلِيُّ إِذَا كَانَتْ مَحْجُورَةً فَلَا حَرَجَ فِي ذَلِكَ وَأَنْ تَعْفُوا مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ أَيْ أَنْ يَتَفَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ فَيُجَازِيكُمْ بِهِ

২৩৭. তোমরা যদি তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দাও আর মহর ধার্য করে থাক তবে যা তোমরা ধার্য করেছ তার অর্ধেক অর্থাৎ এমতাবস্থায় স্ত্রীগণ তার অর্ধেকের অধিকারী হবে. আর বাকি অর্ধেক তোমরা ফেরত পাবে। কিন্তু তারা যদি মাফ করে দেয় إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ : حَرْفُ اسْتِثْنَاءٍ বা ব্যত্যয়সূচক শব্দ ।া এস্থানে اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ বা বিজাত্য ব্যত্যয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এদিকে ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্যে মাননীয় তাফসীরকার এস্থানে لَكِنْ শব্দের ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ স্ত্রীগণ যদি তার দাবি পরিত্যাগ করে কিংবা যার হাতে রয়েছে বিবাহ বন্ধন সে অর্থাৎ স্বামী যদি মাফ করে দেয় অর্থাৎ সম্পূর্ণই তাকে [স্ত্রীকে] দিয়ে দেয় তবে তারা তা পাবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, স্ত্রী যদি শরিয়তানুসারে মাহজূরা [অর্থাৎ উন্মাদ হওয়া, বুদ্ধিহীনতা ইত্যাদির দরুন যাকে কোনো বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হতে বাধাদান করা হয় বা যার চুক্তি বিবেচ্য হয় না] হয়. তবে তার পক্ষ হতে তার ওলী বা অভিভাবক যদি মোহর মাফ করে দেয় তবে এতে তার কোনো অপরাধ নেই। এবং তোমাদের মাফ করে দেওয়া তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। وَأَنْ تَعْفُوا এটা مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য। أَقْرَبُ এটা خَبَرٌ বা বিধেয়। তোমরা নিজেদের মধ্যে সদাশয়তার কথা অর্থাৎ একজন অপরজনের উপর অনুগ্রহ করার কথা বিস্মৃত হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কার্য-কলাপের দ্রষ্টা। অনন্তর তিনি তোমাদেরকে এর প্রতিফল দান করবেন।

তাহকীক ও তারকীব

مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ : স্পর্শ করার পূর্বে। فَرَضْتُمْ : ধার্য করেছ। مَحْجُورَةً : উন্মাদ, বুদ্ধিহীনা।
لَا تَنْسَوُا : ভুলে যেও না। اَلْفَضْلَ : অনুগ্রহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ الخ : তালাকের একটি অবস্থা এইমাত্র বর্ণিত হলো অর্থাৎ মহরও নির্ণীত ছিল না এবং সহবাস বা একান্ত নির্জনবাস-এর পূর্বেই তালাক হয়ে গিয়েছিল। এখন আরেকটি অবস্থার বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে যে, মহর তো নির্ণীত হয়েছিল. কিন্তু একান্ত নির্জনবাস বা সহবাসের পূর্বেই তালাক হয়ে গিয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণ বিধি অনুসারে নির্ণীত মহরের অর্ধেক দিয়ে দেওয়া স্বামীর অপরিহার্য দায়িত্ব। তবে দুটি অবস্থা এ সাধারণ বিধির ব্যতিক্রম। ক. স্ত্রী স্বেচ্ছায় তার দাবি ছেড়ে দিল অর্থাৎ তার প্রাপ্য অর্ধেক মহরও মাফ করে দিল। খ. স্বামী তার দাবি ছেড়ে দিল অর্থাৎ স্ত্রীকে প্রদত্ত মহরের যে অর্ধেক তার রেখে দেওয়ার বৈধতা ছিল. তা না রেখে পুরো মহরটাই স্ত্রীকে দিয়ে দিল।

قَوْلُهُ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى : আইন ও বিধি এইমাত্র বর্ণিত হয়েছে যে. এ ধরনের তালাকের ক্ষেত্রে স্বামী অর্ধেক মহর রেখে দিতে পারে। এখন সঙ্গে সঙ্গেই আবার নৈতিকতার শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ মার্গের প্রতি দিকনির্দেশ দিয়ে বলা হচ্ছে– অধিকার আদায়ের চেয়ে অনেক উত্তম হচ্ছে অধিকার ছেড়ে দেওয়া।

قَوْلُهُ لَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ : সুতরাং তালাকের ক্ষেত্রে যা সম্বন্ধ স্থিতির নয়. সম্পর্কচ্ছেদ ও সম্বন্ধ সমাপ্তির নাম তখনও পরস্পর সদাচার, সুনীতি, মানবতা ও উদারতার জীবনাদর্শ থেকে সরে যেয়ো না। আয়াত থেকে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেলেই তাতে পুরানো সান্নিধ্য ও এককালের ভালোবাসা-সৌহার্দ নিঃশেষ হয়ে যায় না; বরং ক্রোধ-উষ্মার অপ্রীতিকর অবস্থায়ও আল্লাহভীতি, সুনীতি, সদাচরণ ও ক্ষমা-বদান্যতার ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। لَا تَنْسَوْا -এর ক্রিয়ামূল نِسْيَانٌ এখানে 'ভুলে যাওয়া' অর্থে নয়। কেননা তা তো মানুষের সাধ্যাতীত; বরং এখানে অর্থ হচ্ছে বর্জন করা, এড়িয়ে যাওয়া ও উপেক্ষা করা। আবূ মুহাম্মদ বলেছেন, এখানে اَلنِّسْيَانُ বর্জন (اَلتَّرْكُ) অর্থে। -[ইবনে কুতাইবা]

قَوْلُهُ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ : সুতরাং তোমাদের যে কোনো ক্ষেত্রের যে কোনো স্তরের যে কোনো নেক ও ভালো কাজই তাঁর দরবারে অনুল্লেখ্য গুরুত্বহীন ও বেকার হবে না।

অনুবাদ :

٢٣٨. حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ الْخَمْسِ بِاَدَائِهَا فِىْ اَوْقَاتِهَا وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى هِيَ الْعَصْرُ كَمَا فِى الْحَدِيْثِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ اَوِ الصُّبْحِ اَوِ الظُّهْرِ اَوْ غَيْرِهَا اَقْوَالٌ وَاَفْرَدَهَا بِالذِّكْرِ لِفَضْلِهَا وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ فِى الصَّلٰوةِ قٰنِتِيْنَ قِيْلَ مُطِيْعِيْنَ لِقَوْلِهِ ﷺ كُلُّ قُنُوْتٍ فِى الْقُرْاٰنِ فَهُوَ طَاعَةٌ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَغَيْرُهُ وَقِيْلَ سَاكِتِيْنَ لِحَدِيْثِ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ (رض) كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِى الصَّلٰوةِ حَتّٰى نَزَلَتْ فَاَمَرَنَا بِالسُّكُوْتِ وَنُهِيْنَا عَنِ الْكَلَامِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ ـ

২৩৮. তোমরা পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের প্রতি ওয়াক্তানুসারে তা আদায় করতঃ যত্মবান হও, বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের শায়খাইন [ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.)] বর্ণিত হাদীসে আছে যে, এটা আসরের সালাত; কেউ কেউ বলেন, এটা ফজর। অপর কেউ বলেন, এটা জোহর। এ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের অভিমত রয়েছে। এর গুরুত্ব ও মর্যাদার জন্য এটাকে এইস্থানে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করেছেন। এবং সালাতে তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দাঁড়াবে। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ আনুগত্যশীল হওয়া। কেননা ইমাম আহমদ (র.) প্রমুখ বর্ণনা করেন– রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, কুরআনে উল্লিখিত قُنُوْتٌ শব্দটি সকল স্থানে আনুগত্য প্রদর্শন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো 'নীরবে'। কেননা শায়খাইন [ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.)] বর্ণিত হাদীসে আছে যে, হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) বলেন, আমরা পূর্বে সালাতরত অবস্থায়ও কথা বলতাম। তখন এ আয়াত নাজিল হয় এবং আমাদেরকে সালাতে কথাবার্তা হতে নিষেধ করে দেওয়া হয়।

٢٣٩. فَاِنْ خِفْتُمْ مِنْ عَدُوٍّ اَوْ سَيْلٍ اَوْ سَبُعٍ فَرِجَالاً جَمْعُ رَاجِلٍ اَىْ مُشَاةً صَلُّوْا اَوْ رُكْبَانًا جَمْعُ رَاكِبٍ اَىْ كَيْفَ اَمْكَنَ مُسْتَقْبِلِى الْقِبْلَةِ وَغَيْرِهَا وَيُوْمِئُ بِالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ فَاِذَا اَمِنْتُمْ مِنَ الْخَوْفِ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ اَىْ صَلُّوْا كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ قَبْلَ تَعْلِيْمِهِ مِنْ فَرَائِضِهَا وَحُقُوْقِهَا وَالْكَافُ بِمَعْنَى مِثْلِ وَمَا مَوْصُوْلَةٌ اَوْ مَصْدَرِيَّةٌ ـ

২৩৯. যদি তোমরা শত্রু বা বন্যা বা হিংস্র প্রাণীর আশঙ্কা কর, তবে পদচারী رِجَالٌ এটা رَاجِلٌ-এর বহুবচন, অর্থাৎ পদচারী। অথবা আরোহী অবস্থায় رُكْبَانٌ এটা رَاكِبٌ-এর বহুবচন, অর্থাৎ আরোহী। অর্থাৎ কিবলার দিকে মুখ করে বা অন্যদিকে মুখ করে বা রুকু-সেজদা ইশারা করে হোক বা যেভাবে সম্ভব তোমরা সালাত আদায় কর। অনন্তর যখন তোমরা আশঙ্কা হতে নিরাপদ বোধ কর, তখন আল্লাহকে স্মরণ কর সালাত আদায় কর যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা তিনি শিক্ষাদানের পূর্বে তার ফরজ ও হক সম্পর্কে তোমরা জানতে না।

كَمَا -এর كَ অর্থ হলো যেমন। مَا এস্থানে এটা مَوْصُوْلَةٌ অর্থাৎ সংযোজনবাচক সর্বনাম কিংবা مَصْدَرِيَّةٌ বা ক্রিয়ার উৎসমূলক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

حَافِظُوْا : তোমরা যত্নবান হও। بَابُ مُفَاعَلَةٌ -এর মাসদার اَلْمُحَافَظَةُ থেকে اَمْر حَاضِرٌ -এর সীগাহ।
اَلْوُسْطٰى : মধ্যবর্তী। اَفْرَدَهَا بِالذِّكْرِ : স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করেছেন। لِفَضْلِهَا : এর গুরুত্ব ও মর্যাদার জন্য।
سَيْلٌ : বন্যা। سَبُعٌ : হিংস্রপ্রাণী। رِجَالٌ : رَاجِلٌ -এর বহুবচন। অর্থ– পদচারী। رُكْبَان : رَاكِبٌ -এর বহুবচন। অর্থ– আরোহী। كَيْفَ اَمْكَنَ : যেভাবে সম্ভব। يُوْمِيْ : ইশারা করবে। اَلْاِيْمَاءُ : ইঙ্গিত করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ الخ **যোগসূত্র :** বেশ কিছু দূর থেকে স্ত্রীদের দাবিদাওয়া ও তাদের অধিকার কর্তব্য প্রসঙ্গে আলোচনা চলে আসছিল। পরেও এ সংক্রান্ত আলোচনাই চলবে। মাঝে সালাতের বিধান প্রসঙ্গে আলোচিত হচ্ছে। এতে এ তথ্যের প্রতি আরেকবার আলোকপাত হলো যে, ইসলামে সামাজিক আচার-আচরণ ও কারবারি লেনদেন, ব্যবহার ও কারবার এবং আইন ও সুনীতির বিষয়গুলো ইবাদত-বন্দেগি থেকে ভিন্ন নয়; বরং এখানে শরিয়তী জীবন ব্যবস্থায় স্রষ্টার অধিকার [হক্কুল্লাহ] ও সৃষ্টির পাওনা [হক্কুল ইবাদ] পাশাপাশি অবস্থানে চলছে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : তালাকের বিধান আলোচনার মাঝে সালাত সম্পর্কে আদেশ করার কারণ হয়তো এ বিষয়ে সতর্ক করা যে, পার্থিব লেনদেন ও পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত থেকে মহান আল্লাহর ইবাদতকে ভুলে যেয়ো না। অথবা এর কারণ এই যে, যারা খেয়াল-খুশির গোলাম, তাদের পক্ষে লোভ ও কার্পণ্যের প্রাবল্য হেতু ন্যায় প্রতিষ্ঠা রাখা ও ইনসাফের পরিচয় দেওয়াই বিশেষত মনোমালিন্য ও তালাকের সময় অত্যন্ত কঠিন কাজ। এর উপর আবার তাদের পক্ষ হতে وَاَنْ تَعْفُوْا [যদি মাফ করে দাও] এবং وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ [তোমরা অনুগ্রহ করতে ভুলো না]-এর বাস্তবায়নের আশা রাখা আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলেই মনে হয়। তাই এর প্রতিকার স্বরূপ সালাত সম্পর্কে আদেশ করা হয়েছে। কেননা সালাতের রক্ষণাবেক্ষণ, ওয়াক্তের পাবন্দি এবং যাবতীয় নিয়মকানুনসহ সালাত আদায় একটি উত্তম প্রতিষেধক। মন্দ চরিত্র নিবারণ ও উত্তম চরিত্রের বিকাশ সাধনে সালাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। –[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهٗ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ : সালাতে নিয়মানুবর্তী ও যত্নবান হও। বিষয়াভিজ্ঞগণ সালাত সংরক্ষণ ও নিয়মানুবর্তিতার তিনটি স্তর স্থির করেছেন। যথা–

১. **সাধারণ বা নিম্ন স্তর :** সালাত যথাসময়ে আদায় করা, ফরজ ওয়াজিবগুলো যথাযথ পালন করা।

২. **মধ্যবর্তী স্তর :** শরীর সব রকম বাহ্য পবিত্রতায় সজ্জিত হওয়া, স্বভাব ও অভ্যন্তর হালাল খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত হওয়া। অন্তরে খুশূখুজূ তথা বিনয়-আকুতি থাকা ও সুন্নত-মোস্তাহাবগুলোর প্রতি পূর্ণ সতর্ক দৃষ্টি রাখা ও প্রতিপালিত হওয়া।

৩. **বিশেষ ও সর্বোচ্চ স্তর :** হৃদয়ের উপস্থিতি ও একাগ্রতা-নিমগ্নতা এতদূর হওয়া যেন আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা হচ্ছে।

قَوْلُهٗ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى : মধ্যবর্তী সালাত দ্বারা উদ্দেশ্য কি? অধিকাংশ তাফসীর বিশেষজ্ঞ আসরের সালাতের কথা বলেছেন এবং ইবনে জারীরের তাফসীরে এ অর্থই হযরত আলী, হযরত ইবনে মাসউদ, হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) প্রমুখ সাহাবী ও কাতাদা, যাহহাক (রা.) প্রমুখ তাবেয়ী থেকে এবং ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম নাখয়ী (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য ইবনে জরীরের তাফসীরেই পূর্বোল্লিখিতগণের সমপর্যায়ের মনীষীবর্গ হতে জোহর, মাগরিব ও ফজর সালাত মধ্যবর্তী সালাত হওয়া বর্ণিত হয়েছে। অনেকে এখানে শব্দের মূল অর্থের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে এরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, প্রত্যেক সালাত যেহেতু নিজ নিজ স্থানে ইবাদত ও পুণ্যকর্ম তালিকার মধ্য পর্যায়ে রয়েছে এবং এদিক ওদিকের সালাতের হিসেবে যেহেতু প্রত্যেক ওয়াক্তের সালাতকেই মধ্যবর্তী বলা যায়- সুতরাং যে কোনো সালাতই মধ্যবর্তী সালাত অভিধায় আখ্যায়িত হতে পারে। সুতরাং এতে কোনো বিশেষ ওয়াক্তের সালাত উদ্দেশ্য হওয়া জরুরি নয়। –[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهٗ فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا الخ : ইসলামে নামাজের গুরুত্ব এতই অধিক যে, মূল যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ যুদ্ধকালেও তা মাফ হয়ে যায় না। সালাতে নিয়মানুবর্তিতার হুকুম সর্বাবস্থায় স্থায়ী ও অকাট্য। সুতরাং এ বিপদাশংকা কালেও সালাত বর্জন করার অনুমতি নেই। অবশ্য পরিবেশ পরিস্থিতির প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি সংবলিত অবকাশ অন্যান্য ক্ষেত্রেও রাখা হয়েছে।

٢٤٠. وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا فَلْيُوْصُوْا وَصِيَّةً وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالرَّفْعِ اَىْ عَلَيْهِمْ لِاَزْوَاجِهِمْ وَيُعْطُوْهُنَّ مَتَاعًا مَا يَتَمَتَّعْنَ بِهِ مِنَ النَّفَقَةِ وَ الْكِسْوَةِ اِلٰى تَمَامِ الْحَوْلِ مِنْ مَوْتِهِمُ الْوَاجِبِ عَلَيْهِنَّ تَرَبُّصُهُ غَيْرَ اِخْرَاجٍ حَالٌ اَىْ غَيْرَ مُخْرَجَاتٍ مِنْ مَسْكَنِهِنَّ فَاِنْ خَرَجْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ يَا اَوْلِيَاءَ الْمَيِّتِ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِىْ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوْفٍ شَرْعًا كَالتَّزَيُّنِ وَتَرْكِ الْاِحْدَادِ وَقَطْعِ النَّفَقَةِ عَنْهَا وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ فِيْ مُلْكِهِ حَكِيْمٌ فِيْ صُنْعِهِ وَالْوَصِيَّةُ الْمَذْكُوْرَةُ مَنْسُوْخَةٌ بِاٰيَةِ الْمِيْرَاثِ وَتَرَبُّصُ الْحَوْلِ بِاٰيَةِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا السَّابِقَةِ الْمُتَاَخِّرَةِ فِى النُّزُوْلِ وَالسُّكْنٰى ثَابِتَةٌ لَهَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ -

٢٤١. وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌ يُعْطِيْنَهُ بِالْمَعْرُوْفِ بِقَدْرِ الْاِمْكَانِ حَقًّا نَصَبَ بِفِعْلِهِ الْمُقَدَّرِ عَلَى الْمُتَّقِيْنَ اللّٰهَ كَرَّرَهُ لِيَعُمَّ الْمَمْسُوْسَةَ اَيْضًا اِذِ الْاٰيَةُ السَّابِقَةُ فِيْ غَيْرِهَا -

٢٤٢. كَذٰلِكَ كَمَا بَيَّنَ لَكُمْ مَا ذُكِرَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ تَتَدَبَّرُوْنَ

অনুবাদ :

২৪০. তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করেছে এবং স্ত্রী রেখে যাচ্ছে, তারা যেন স্ত্রীকে বহিষ্কার না করে এটা حَالٌ বা ভাব ও অবস্থাবাচক পদ। অর্থাৎ তাদের বাসস্থান হতে বহিষ্কৃত না করে তাদের স্ত্রীর জন্য যেন অসিয়ত করে যায় অপর এক কেরাতে وَصِيَّةٌ শব্দ رَفع সহকারে পঠিত হয়েছে। এবং তাদেরকে যেন মুত'আ দেয় যা দ্বারা তারা ভরণপোষণের সংস্থান করবে তাদের অর্থাৎ স্বামীদের মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত। এ সময়টা তাদের জন্য ইদ্দত হিসেবে আরোপ করা অবশ্য কর্তব্য। যদি তারা নিজেরা বের হয়ে যায়, তবে হে মৃত ব্যক্তির ওলী বা অভিভাবকগণ! শরিয়তানুসারে [বিধিসম্মতভাবে নিজেদের জন্য তারা যা করবে] যেমন সাজসজ্জা করা, সাজসজ্জা না করার বিধান পরিত্যাগ করা, ভরণপোষণ লাভের অধিকার ত্যাগ করা তাতে তোমাদের কোনো পাপ নেই। আল্লাহ তাঁর সাম্রাজ্যে পরাক্রান্ত, তাঁর কর্মকাণ্ডে তিনি প্রজ্ঞাময়। এ অসিয়ত করে যাওয়ার বিধান মিরাস সংক্রান্ত আয়াত দ্বারা মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে। এক বৎসরকাল অপেক্ষা করার বিধান 'চার মাস দশ দিন' ইদ্দত পালনের বিধান সংবলিত আয়াত দ্বারা 'মানসূখ' বা রহিত হয়ে গেছে। এ আয়াতটি [চার মাস দশ দিনের বিধান সংবলিত আয়াতটির] পূর্বে উল্লেখ হয়েছে বটে; কিন্তু নুযূল বা অবতীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে তা এর পরের। বাসস্থান প্রদানের বিধান এখনো প্রযোজ্য রয়েছে। এটাই ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত।

২৪১. তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণের মুত'আ খরচপত্র দেওয়া হবে প্রথামতো অর্থাৎ সামর্থ্যানুসারে যারা আল্লাহকে ভয় করে এটা তাদের উপর কর্তব্য। حَقًّا এটা এ স্থানে উহ্য ক্রিয়া [حَقَّقْتُ] -এর মাধ্যমে مَنْصُوْب রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। স্পর্শকৃতা অর্থাৎ সঙ্গমকৃতা মহিলাগণও এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত। বিধানটির এ ব্যাপকতার দিকে ইঙ্গিত করার জন্য আয়াতটির পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। কেননা পূর্ববর্তী আয়াতটি ছিল ঐ সকল স্ত্রী সম্পর্কে, যাদের সাথে স্বামীদের স্পর্শ [সঙ্গম] হয়নি।

২৪২. এভাবে উল্লিখিত বিধানসমূহ যেমনি তোমাদেরকে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে আল্লাহ তাঁর নিদর্শনসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার, চিন্তা করতে পার।

তাহকীক ও তারকীব

يُتَوَفَّوْنَ : মৃত্যুবরণ করে। يَذَرُوْنَ : রেখে যায়। فَلْيُوْصُوْا : তারা যেন অসিয়ত করে যায়। اَلنَّفَقَةُ : ব্যয়ভার, খরচ। اَلْكِسْوَةُ : পোশাক-পরিচ্ছদ। اَلْحَوْلُ : বছর। مَسْكَنٌ : বাসস্থান। اَلتَّزَيُّنَ : সাজসজ্জা। اَلْاِحْدَادُ : শোক, সাজসজ্জা না করার বিধান। اَلْمُتَأَخِّرَةُ فِى النُّزُوْلِ : অবতীর্ণের ক্ষেত্রে পরের। اَلسُّكْنٰى : বাসস্থান প্রদান।

وَصِيَّةٌ : এটা مَفْعُوْل مُطْلَقْ বা সমধাতুজ কর্মরূপে এ স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। এদিকে ইঙ্গিত করার জন্য মুফাসসির (র.) এটার পূর্বে فَلْيُوْصُوْا শব্দটি উহ্য রয়েছে বলে দেখিয়েছেন। অপর এক কেরাতে এটা رَفْع সহকারে পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় এটা مُبْتَدَأ বা উদ্দেশ্য রূপে বিবেচ্য হবে।

غَيْرَ اِخْرَاجٍ : এটা حَال বা ভাব ও অবস্থাবাচক পদ। مَتَاعٌ : মুত'আ, খরচপত্র। بِقَدْرِ الْاِمْكَانِ : সামর্থ্যানুসারে। كرر : তাকরার করেছে, পুনরাবৃত্তি করেছে। لِيَعُمَّ : যাতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, ব্যাপক হয়ে যায়। اَلْمَمْسُوْسَةُ : স্পর্শকৃতা [সঙ্গমকৃতা]। اَلسَّابِقَةُ : পূর্ববর্তী। تَتَدَبَّرُوْنَ : চিন্তা করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

স্ত্রীর জন্য অসিয়ত : অসিয়তের এ বিধান ছিল তখনকার জন্য, যখন মিরাস-বিধি অবতীর্ণ হয়নি। স্বতন্ত্র উত্তরাধিকার বিধি অবতীর্ণ হওয়ার পরে এবং তাতে স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে বিধবা স্ত্রীর জন্য স্বতন্ত্র অংশ স্থির হয়ে যাওয়ার পরে এখন আর এ ধরনের অসিয়তের নির্দেশ অবশিষ্ট থাকেনি। মুফাসসিরগণের পরিভাষায় একেই নস্‌খ [রহিতকরণ] নাম দেওয়া হয়েছে। সে সময় অর্থাৎ মিরাস আইন নাজিল হওয়ার আগে পর্যন্ত শরিয়ত বিধবাদের জন্য নিম্নবর্ণিত সুযোগ-সুবিধা মঞ্জুর করেছিল : ১. স্বামীর ঘরেই অবস্থান করতে চাইলে এক বছর পর্যন্ত কেউ তাদের উচ্ছেদ করতে পারবে না. ২. এ মেয়াদ পর্যন্ত তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থাও স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পদ হতে নির্বাহ হবে। ৩. বিধবা নিজের স্বার্থ-সুবিধার কথা বিবেচনা করে নিজেই সে ঘরে অবস্থান করতে না চাইলে ইদ্দত শেষ হওয়ার পরে তার জন্য তা সম্পূর্ণ বৈধ এবং অন্যান্য অধিকারের ন্যায় এ অধিকারটি ছেড়ে দেওয়ারও তার অধিকার আছে।

قَوْلُهُ مَتَاعًا : জীবনোপকরণ ভোগ। এখানে অর্থ অন্নবস্ত্র [খোরপোশ] ও বাসস্থান সংক্রান্ত বিষয়। اَلْمَتَاعُ ব্যাপক অর্থে ব্যয় নির্বাহ [খোরপোশ] ও অবস্থান [বাসস্থান] -কে অন্তর্ভুক্ত। -[রূহুল মা'আনী]

ইসলামে বিধবা নারীর মর্যাদা : বেচারী বিধবা ইসলামের আর্বিভাবকালে সব ধর্মে অসহায় অবস্থায় ছিল। আরবের জাহিলি যুগে তো কেউ তার সম্পর্কে কিছু বলারও পক্ষপাতী ছিল না। পৃথিবীর ইতিহাসে ইসলাম এসেই প্রথমবার বিধবার মর্যাদা ও তার অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করল। পৌত্তলিক ধর্মগুলোতে তো বিধবা ও অপয়া অভিন্ন অর্থে ছিল এবং বিধবাকে পরিবারের সকল সদস্যের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সয়েই জীবন কাটাতে হতো।

بِالْمَعْرُوْفِ -এর শর্ত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, সে তৎপরতা কোনো শরিয়তি বিধানের পরিপন্থি- যেমন ইদ্দত বিধি লঙ্ঘন করেও হবে না আবার নৈতিকতা বিরোধী হলেও হবে না।

قَوْلُهُ وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌ الخ : যে নারীকে তালাক দিয়ে দেওয়া হলো তাকে যেন বিবস্ত্র, ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত ও ছন্নছাড়া অবস্থায় তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া না হয়; বরং একটি বিশেষ মেয়াদ পর্যন্ত তার আরাম, বিশ্রামের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর ব্যবস্থা করে দেওয়া স্বামীর দায়িত্ব। ফকীহগণ হাদীস ও সুন্নাহর আলোকে এ উদ্দেশ্যে তিন মাসের একটি মেয়াদ স্থির করেছেন। অর্থাৎ এ সময় পর্যন্ত অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের ব্যবস্থা করা স্বামীর অপরিহার্য দায়িত্ব। তিন তালাক না হওয়ার ক্ষেত্রে তো এ বিধান সর্বসম্মত। আর তিন তালাকের ক্ষেত্রেও হানাফীদের মতে এ বিধানই প্রযোজ্য ও পালনীয়।

পূর্বে খরচ অর্থাৎ পোশাক দেওয়ার নির্দেশ ছিল সেই তালাকের ক্ষেত্রে, যাতে বিবাহকালে না মহর ধার্য করা হয়েছিল, না বিবাহের পর স্বামী তাকে স্পর্শ করেছিল। এ আয়াতে সে নির্দেশ সকলের জন্য ব্যাপক করে দেওয়া হয়েছে। তবে এতটুকু পার্থক্য রয়েছে যে, প্রথম ক্ষেত্রে পোশাক দেওয়া ওয়াজিব, কিন্তু অন্যান্য তালাকপ্রাপ্তাদের ক্ষেত্রে ওয়াজিব নয়, বরং মোস্তাহাব। -[তাফসীরে উসমানী]

অনুবাদ :

٢٤٣. اَلَمْ تَرَ اِسْتِفْهَامُ تَعْجِيْبٍ وَتَشْوِيْقٍ اِلَى اِسْتِمَاعِ مَا بَعْدَهُ اَىْ يَنْتَهِ عِلْمُكَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ اَرْبَعَةٌ اَوْ ثَمَانِيَةٌ اَوْ عَشَرَةٌ اَوْ ثَلٰثُوْنَ اَوْ اَرْبَعُوْنَ اَوْ سَبْعُوْنَ اَلْفًا حَذَرَ الْمَوْتِ مَفْعُوْلٌ لَهُ وَهُمْ قَوْمٌ مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَقَعَ الطَّاعُوْنُ بِبِلَادِهِمْ فَفَرُّوْا فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا فَمَاتُوْا ثُمَّ اَحْيَاهُمْ بَعْدَ ثَمَانِيَةِ اَيَّامٍ اَوْ اَكْثَرَ بِدُعَاءِ نَبِيِّهِمْ حِزْقِيْلَ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَالْقَافِ وَسُكُوْنِ الزَّاىِ فَعَاشُوْا دَهْرًا عَلَيْهِمْ اَثَرُ الْمَوْتِ لَا يَلْبَسُوْنَ ثَوْبًا اِلَّا عَادَ كَالْكَفَنِ وَاسْتَمَرَّتْ فِىْ اَسْبَاطِهِمْ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَمِنْهُ اِحْيَاءُ هٰؤُلَاءِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ وَهُمُ الْكُفَّارُ لَا يَشْكُرُوْنَ ـ

২৪৩. তুমি কি তাদেরকে দেখনি? পরে উল্লিখিত ঘটনাটি শোনার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি এবং শ্রোতাকে চমৎকৃত করার উদ্দেশ্যে এ স্থানে প্রশ্নবোধক ভঙ্গিমা ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ আপনার জ্ঞান কি তাতে পৌঁছেনি? [আপনি কি এটা জানেন না?] মৃত্যুভয়ে حَذَرَ الْمَوْتِ এটা مَفْعُوْل لَه বা হেতুবোধক কর্মপদ। হাজার হাজার লোক স্বীয় আবাসভূমি পরিত্যাগ করেছিল। তারা ছিল বনী ইসরাঈলের একটি গোত্র। তাদের অঞ্চলে মহামারি আকারে প্লেগ দেখা দিলে সেখান থেকে তারা পলায়ন করেছিল। তাদের সংখ্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন মত রয়েছে; যা পরিমাণে চার, আট, দশ, ত্রিশ, চল্লিশ অথবা সত্তর হাজার। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে বলেছিলেন, তোমাদের মৃত্যু হোক। ফলে তারা সকলেই মৃত্যুবরণ করেছিল। অতঃপর তাদের নবী হযরত হিযকীল (আ.) [حِزْقِيْل - ح ও ق কাসরা এবং ز সাকিনসহ পঠিত।] -এর দোয়ায় আট বা ততোধিক দিন পর তিনি তাদেরকে জীবিত করেন। এরপর আরো দীর্ঘকাল তারা জীবিত থাকে। কিন্তু সবসময়ই তাদের উপর মৃত্যুর লক্ষণ পরিস্ফুট থাকত। কাপড় পরিধান করা মাত্র তা কাফনের রূপ ধারণ করত। তাদের পরবর্তী বংশধরদের মাঝেও এ অবস্থা বিদ্যমান দেখা যায়। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল। তাদেরকে জীবিত করাও এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু অধিকাংশ লোক অর্থাৎ কাফেররা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

٢٤٤. وَالْقَصْدُ مِنْ ذِكْرِ خَبَرِ هٰؤُلَاءِ تَشْجِيْعُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ وَلِذَا عُطِفَ عَلَيْهِ وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَىْ لِاِعْلَاءِ دِيْنِهِ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ لِاَقْوَالِكُمْ عَلِيْمٌ بِاَحْوَالِكُمْ فَيُجَازِيْكُمْ ـ

২৪৪. তাদের এ ঘটনা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো মু'মিনদের জিহাদের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা। তাই আয়াতটির সাথে عَطْف বা অন্বয় করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– তোমরা আল্লাহর পথে তাঁর দীনকে সমুচ্চ করার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম কর, আর জেনে রাখ! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কথাবার্তা খুবই শুনেন, তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে খুবই জানেন। অনন্তর তিনি তোমাদের প্রতিফল দান করবেন।

তাহকীক ও তারকীব

تَعَجُّبٌ : চমৎকৃত করা। تَشْوِيْق : আগ্রহ সৃষ্টি করা। اِسْتِمَاعٌ : মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করা। لَمْ يَنْتَهِ : পৌঁছেনি। اَلْاِنْتِهَاءُ : শেষ। دِيَارٌ : دَارٌ-এর বহুবচন, অর্থ– বাড়ি-ঘর। اَلُوْفٌ : اَلْفٌ -এর বহুবচন, অর্থ– হাজার। এটি جَمْعِ كَثْرَةٌ -এর ওযন। আর جَمْعِ قِلَّتْ -এর ওযন হলো اَلَافٌ - حَذَرَ : ভয়, আশঙ্কা। اَلطَّاعُوْنُ : মহামারি। فَرُّوْا : তারা পলায়ন করল। فَرَّ (ض) فِرَارًا অর্থ– পলায়ন করা। عَاشُوْا : বেঁচে ছিল, জীবনযাপন করেছিল। اِسْتَمَرَّتْ : বহাল ছিল, অব্যাহত ছিল। اَسْبَاطٌ : سِبْطٌ -এর বহুবচন। অর্থ– বংশধর। تَشْجِيْع : উৎসাহ প্রদান। يُجَازِيْكُمْ : তোমাদের প্রতিফল দান করবেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَلَمْ تَرَ : আরবি ভাষায় এরূপ বাকরীতি ঐ সময় ব্যবহার করা হয়, যখন শ্রোতার মাঝে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ও প্রসিদ্ধ ঘটনার প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি উদ্দেশ্য হয়। আর رُؤْيَتْ দ্বারা সর্বদা চোখের দেখাই উদ্দেশ্য হয় না। কখনো তা দ্বারা চিন্তাভাবনাও উদ্দেশ্য হয়। এ ধরনের رُؤْيَتْ-কে رُؤْيَتْ قَلْبِىْ বলা হয়।

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত অলঙ্কারপূর্ণ বর্ণনাভঙ্গিতে আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গকারীদের প্রতি হেদায়েত করেছেন। জেহাদের বিধান বর্ণনার পূর্বে ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। যাতে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, হায়াত-মউত বা জীবন-মরণ একান্তভাবেই আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়তির অধীন। যুদ্ধ বা জেহাদে অংশ নেওয়াই মৃত্যুর কারণ নয়। তেমনি ভীরুতার সাথে আত্মগোপন করা মৃত্যু থেকে অব্যাহতি লাভের উপায় নয়। তাফসীরে ইবনে কাছীরে কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবীর উদ্ধৃতিসহ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লিখিত ঐতিহাসিক ঘটনাটি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, কোনো এক শহরে বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের কিছু লোক বাস করত। তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। সেখানে এক মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হয়। তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সে শহর ত্যাগ করে দুটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী এক প্রশস্ত ময়দানে গিয়ে বসবাস করতে লাগল। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এবং দুনিয়ার অন্যান্য জাতিকে একথা অবগত করানোর জন্য যে মৃত্যু ভয়ে পালিয়ে গিয়ে কেউ রক্ষা পেতে পারে না- তাদের কাছে দু'জন ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশতা দু-জন সে ময়দানের দু'ধারে দাঁড়িয়ে এমন এক বিকট শব্দ করলেন যে, তাদের সবাই একসাথে মরে গেল, একটি লোকও জীবিত রইলো না। পার্শ্ববর্তী লোকেরা যখন এ সংবাদ জানতে পারলো, তখন সেখানে গিয়ে দশ হাজার মানুষের দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করা যেহেতু সহজ ব্যাপার ছিল না, তাই তাদেরকে চারিদিকে দেয়াল দিয়ে একটি বন্ধন কূপের মতো করে দিল। স্বাভাবিকভাবেই তাদের মৃতদেহগুলো পচে-গলে এবং হাড়-গোড় তেমনি পড়ে রইল দীর্ঘকাল পর বনী ইসরাঈলের হিযকীল (আ.) নামক একজন নবী সেখান দিয়ে যাওয়ার পথে সেই বন্ধ জায়গায় বিক্ষিপ্তাবস্থায় হাড়-গোড় পড়ে থাকতে দেখে বিস্মিত হলেন। তখন ওহীর মাধ্যমে তাকে মৃত লোকদের সমস্ত ঘটনা অবগত করানো হলো। তিনি দোয়া করলেন, হে পরওয়ারদেগার! তাদের সবাইকে পুনর্জীবিত করে দাও। আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং বিক্ষিপ্ত সেই হাড়গুলোকে আদেশ দিলেন– "ওহে পুরাতন হাড়সমূহ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নিজ নিজ স্থানে সমবেত হতে আদেশ করেছেন।" আল্লাহর নবীর ভাষ্যে এসব হাড় আল্লাহর আদেশ শ্রবণ করল। অনেক জড়বস্তুকে হয়তো মানুষ অনুভূতিহীন মনে করে, কিন্তু দুনিয়ার প্রত্যেকটি অণু-পরমাণুও আল্লাহর অনুগত এবং নিজ নিজ অস্তিত্ব অনুযায়ী বুদ্ধি ও অনুভূতির অধিকারী। কুরআন কারীমে اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى বলে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে তার উপযুক্ত হেদায়েত দান করেছেন। মোটকথা একটি মাত্র শব্দে প্রত্যেকটি হাড় নিজ নিজ স্থানে পুনঃস্থাপিত হলো। অতঃপর সে নবীর প্রতি নির্দেশ হলো, সেগুলোকে বল– 'ওহে হাড়সমূহ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন তোমরা মাংস পরিধান কর এবং রগ ও চামড়া দ্বারা সজ্জিত হও।' সাথে সাথে হাড়ের প্রতিটি কঙ্কাল একেকটি পরিপূর্ণ লাশ হয়ে গেল। অতঃপর রূহকে আদেশ দেওয়া হলো– হে আত্মাসমূহ! আল্লাহ তোমাদেরকে যার যার শরীরে ফিরে আসতে নির্দেশ দিচ্ছেন। এ শব্দ উচ্চারিত হতেই সেই নবীর সামনে লাশগুলো জীবিত হয়ে দাঁড়াল এবং বিস্মিত হয়ে চারদিকে তাকাতে আরম্ভ করা। আর সবাই বলতে লাগল– سُبْحَانَكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ অর্থাৎ 'তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করি, হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই।' এ ঘটনাটি দুনিয়ার সমস্ত চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবীকে সৃষ্টিবলয় সম্পর্কিত চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দেয়। তদুপরি এটা কিয়ামত ও পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদের জন্য একটা অকাট্য প্রমাণ হওয়ার সাথে সাথে এ বাস্তব সত্য উপলব্ধি করার পক্ষেও বিশেষ সহায়ক যে, মৃত্যু ভয়ে পালিয়ে থাকা জেহাদ হোক বা প্লেগ মহামারিই হোক, আল্লাহ এবং তাঁর নির্ধারিত নিয়তির প্রতি যারা বিশ্বাসী

তাদের পক্ষে সমীচীন নয়। যার এ বিশ্বাস রয়েছে যে, মৃত্যুর একটা নির্ধারিত সময় রয়েছে। নির্ধারিত সময়ের এক মুহূর্ত পূর্বেও তা হবে না এবং এক মুহূর্ত পরেও তা আসবে না, তাদের পক্ষে এরূপ পলায়ন অর্থহীন এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ।

মাসআলা : ফকীহবৃন্দ ও মুফাসসিরগণ এক্ষেত্রে প্লেগ [মহামারি] থেকে পলায়নের আলোচনা তুলেছেন এবং প্রসঙ্গত নবী করীম ﷺ -এর ফরমান উদ্ধৃত করেছেন যে, যে ভূখণ্ডে প্লেগ দেখা দেয়, সেখান থেকে পালিয়ো না এবং বাইরে থেকে সেখানে যেয়ো না। এতে একটা যৌক্তিক প্রশ্ন দেখা দেয় যে, প্লেগ আক্রান্ত অঞ্চলে না যাওয়া এবং সেখান থেকে বের না হওয়া এ দুটি কার্যত পরস্পর বিরোধী নির্দেশ। কেননা মহামারী থেকে দূরে থাকা যদি অপরিহার্য হয়, তবে সেখান থেকে সরে আসার হুকুম পাওয়া সমীচীন, আর যদি অপরিহার্য না হয় তবে সে এলাকায় যাওয়াতে কোনো দোষ-আপত্তি না থাকাই সমীচীন। প্রকৃত রহস্য হলো, প্লেগ [ও মহামারী] আক্রান্ত অঞ্চল থেকে সরে যাওয়া ও পালানোর অর্থ হবে এই যে, একজনকে অনুমতি দেওয়া হলে সব পালাতে শুরু করবে এবং দেখতে না দেখতে পুরো এলাকা জনশূন্য হয়ে যাবে। এভাবে এলোপাতাড়ি পলায়ন ও আতঙ্ক সৃষ্টির ফলে সেই জনবসতি যে ভয়াবহ আর্থসামাজিক ক্ষতি, নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও কৃষ্টিগত অবক্ষয়ের শিকার হবে তা বলাই বাহুল্য। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আর পর্যবেক্ষণেও এটা ভুল প্রমাণিত। তা ছাড়া এ ধরনের পলায়নী মনোবৃত্তি একদিকে যেমন সাহসিকতা, স্থৈর্য, বীরত্ব ও সহমর্মিতাবোধের পরিপন্থি, তদ্রূপ অপরদিকে এটা বাহ্য কারণ-উপকরণে পূর্ণ ভরসা-বিশ্বাসের পরিচায়ক। আল্লাহতে ভরসা ও তাওয়াক্কুলেরও পরিপন্থি। এ আচরণ একটা ধর্মানুসারী জাতির মর্যাদারও অনুকূল নয়। আবার মহামারিগ্রস্ত এলাকায় যেখানে অহরহ মানুষ মারা যাচ্ছে, সেখানে বেপরোয়া ঢুকে পড়ার অতি সাহস ও অসতর্কতা প্রদর্শন একদিকে বাহ্য কারণ-উপকরণের প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষার পরিচায়ক অপরদিকে এটা মানুষের মধ্যে নিহিত স্বভাবসুলভ ভীতি-আশঙ্কার চাহিদাকে পদদলিত করার নামান্তর। এ পরস্পর বিরোধী দিকগুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে সমন্বিত ও মধ্যবর্তী নিরাপত্তাপূর্ণ সুষ্ঠু পন্থা নিরূপণ করা একমাত্র ইসলামের ন্যায় প্রজ্ঞা ও হিকমত-কুশলতাসমৃদ্ধ ধর্মমতেরই কাজ। ইসলাম এ ক্ষেত্রে যুক্তিগত ও স্বভাবজাত চাহিদার সবগুলো দৃষ্টিকোণ বিবেচনা করে এ সুষ্ঠু সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ও আদর্শ বিধান দিয়েছে যে, যেখানে প্লেগ-মহামারি দেখা দেয় খামাখা [অতি সাহস দেখিয়ে] সেখানে যেয়ো না এবং অহেতুক [অতি ভীরুতার পরিচয় দিয়ে] সেখান থেকে পালিয়ো না। –[তাফসীরে মাজেদী]

মহামারির কারণে হযরত ওমর (রা.)-এর শাম থেকে প্রত্যাবর্তনের ঘটনা : তাফসীরে কুরতুবীতে বর্ণিত হয়েছে, একবার হযরত ফারুকে আ'যম (রা.) শাম দেশের সফরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। শামের সীমান্ত এলাকা তাবুকের সন্নিকটে 'সারাগ' নামে একটি জায়গা আছে। সেখানে পৌঁছে তিনি অবগত হলেন যে, শামে প্রচণ্ড মহামারি ছড়িয়ে পড়েছে। এ মহামারি ছিল শামের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও ভয়ানক মহামারি, যা عَمْوَاسُ [আমওয়াস] নামে প্রসিদ্ধ। কেননা এ মহামারি সর্বপ্রথম বায়তুল মুকাদ্দাসের নিকটস্থ 'আমওয়াস' নামক একটি বস্তি থেকে শুরু হয়েছিল। অতঃপর গোটা অঞ্চলে তার প্রাদুর্ভাব ছড়িয়ে পড়ে। হযরত ফারুকে আ'যম (রা.) এ সংবাদ শুনে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর সাথে পরামর্শ করলেন যে, এ পরিস্থিতিতে আমাদের কি করা উচিত? সেখানে যাওয়া নাকি ফিরে যাওয়া? উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামের মাঝে এমন কেউ ছিলেন না, যিনি এ সম্পর্কে রাসূল ﷺ -এর কোনো নির্দেশ শুনেছেন। কিছুক্ষণ পর হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (র.) বলেন, এ প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ -এর নির্দেশ হলো এই যে, রাসূল ﷺ মহামারি সম্পর্কে আলোচনা করে বলেছেন যে, এটি একপ্রকার আজাব, যার দ্বারা কোনো কোনো জাতিকে শায়েস্তা করা হয়েছিল। তার কিছু অংশ বাকি রয়ে গেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো এলাকায় মহামারির সংবাদ শুনে সে যেন ঐ এলাকায় না যায়। আর যে পূর্ব থেকেই সে এলাকায় বিদ্যমান ছিল সে যেন মহামারি থেকে পালানোর উদ্দেশ্য সে এলাকা ত্যাগ না করে। –[বুখারী]

হযরত ফারুকে আযম (রা.) এ হাদীস শুনে সঙ্গীদেরকে ফিরে যাওয়ার হুকুম দিলেন। শামের গভর্নর হযরত আবূ উবাদাহ (রা.) সে মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। হযরত ফারুকে আযম (রা.)-এর উক্ত নির্দেশ শুনে তিনি বলতে লাগলেন– أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ অর্থাৎ হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কি আল্লাহর তাকদীর থেকে পলায়ন করতে চাচ্ছেন? উত্তরে হযরত ফারুকে আ'যম (রা.) বলেন– نَعَمْ، نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ إِلٰى قَدَرِ اللّٰهِ অর্থাৎ হ্যাঁ, আমরা আল্লাহর তাকদীর থেকে আল্লাহরই তাকদীরের দিকে পলায়ন করছি। –[জামালাইন]

বস্তুত এ আয়াতে বনী ইসরাঈলের ঘটনাটি সামনের আয়াতের ভূমিকা স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। সামনের আয়াতে জিহাদের বিধান দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনা বর্ণনা করে বোঝানো হলো যে, জিহাদে গেলেই মৃত্যু হবে আর তা থেকে পালিয়ে থাকলে বেঁচে থাকা যাবে তা নয়; বরং মৃত্যু আল্লাহর হাতে। তিনি জিহাদের ময়দানেও বাঁচাতে পারেন আবার বাড়িতেও মৃত্যু দিতে পারেন। যেমনটি বনী ইসরাঈলের উক্ত ঘটনায় লক্ষ্য করা গেল।

অনুবাদ :

٢٤٥. مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ بِاِنْفَاقِ مَالِهٖ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَرْضًا حَسَنًا بِاَنْ يُنْفِقَهٗ لِلّٰهِ تَعَالٰى عَنْ طِيْبِ قَلْبٍ فَيُضٰعِفَهٗ وَفِىْ قِرَاءَةٍ فَيُضَعِّفَهٗ بِالتَّشْدِيْدِ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً مِنْ عَشْرٍ اِلٰى اَكْثَرَ مِنْ سَبْعِمِائَةٍ كَمَا سَيَاْتِىْ وَاللّٰهُ يَقْبِضُ يُمْسِكُ الرِّزْقَ عَمَّنْ يَشَاءُ اِبْتِلَاءً وَيَبْصُطُ يُوَسِّعُهٗ لِمَنْ يَشَاءُ اِمْتِحَانًا وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ فِى الْاٰخِرَةِ بِالْبَعْثِ فَيُجَازِيْكُمْ بِاَعْمَالِكُمْ.

২৪৫. কে এমন যে তার অর্থসম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করবে? অর্থাৎ মনের খুশিতে সানন্দে সে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ব্যয় করবে। তিনি তার জন্য তা বহুগুণে সম্মুখে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, দশ হতে সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করবেন। يُضٰعِفُ ক্রিয়াটি অপর এক কেরাতে يُضَعِّفُ রূপে তাশদীদ সহ পঠিত রয়েছে। আর আল্লাহ সংকোচিত করেন বিপদে পরীক্ষা হিসেবে যার হতে ইচ্ছা তিনি রিজিক ফিরিয়ে রাখেন এবং সম্প্রসারিত করেন অর্থাৎ যাকে ইচ্ছা পরীক্ষা হিসেবে সচ্ছলতা দান করেন। আর পরকালে পুনরুত্থানের মাধ্যমে তাঁর দিকেই তোমরা প্রত্যানীত হবে। অনন্তর তিনি তোমাদের কার্যাবলির প্রতিফল দান করবেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : এইমাত্র জিহাদে অবতীর্ণ হওয়ার আদেশ পাওয়া গিয়েছে। সমরোপকরণের জন্য স্বভাবতই মুসলিম উম্মতের প্রয়োজন দেখা দেবে বড় ধরনের পুঁজির। এজন্যই প্রথম নম্বরেই এখানে মিল্লাতের ধনবানদের এতে অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করা হচ্ছে।

قَوْلُهٗ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا : কর্জ বা ঋণ অর্থ হলো নেক আমল ও আল্লাহর পথে ব্যয় করা। এখানে কর্জ বা ঋণ শব্দটি রূপক অর্থে বলা হয়েছে। অন্যথায় সবকিছুরই তো একমাত্র মালিক তিনিই। উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেভাবে ঋণ পরিশোধ করা ওয়াজিব, এমনিভাবে তোমাদের সদ্ব্যয়ের প্রতিদান অবশ্যই দেওয়া হবে। বৃদ্ধি করার কথা এক হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহর পথে একটি খেজুর দানা ব্যয় করলে, আল্লাহ তা'আলা একে এমনভাবে বৃদ্ধি করে দেবেন যে, তা পরিমাণে ওহুদ পাহাড়ের চেয়েও বেশি হবে। আল্লাহকে ঋণ দেওয়ার এ অর্থও বলা হয়েছে যে, তাঁর বান্দাদেরকে ঋণ দেওয়া এবং তাদের অভাব পূরণ করা। হাদীসে অভাবীদেরকে ঋণ দেওয়ার অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

১. কোনো একজন মুসলমান অন্য মুসলমানকে একবার ঋণ দিলে এ ঋণদান আল্লাহর পথে সে পরিমাণ সম্পদ দুবার সদকা করার সমতুল্য।

২. ইবনে আরাবী (র.) বলেন, এ আয়াত শুনে মানুষের মধ্যে তিন ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। তন্মধ্যে একদল দুর্ভাগা বলাবলি করত যে, মুহাম্মদের রব অভাবী এবং আমাদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে আর আমরা অভাবমুক্ত। এর উত্তরে ইরশাদ হয়েছে– لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَآءُ দ্বিতীয় দল হচ্ছে সে সমস্ত লোক, যারা এ আয়াত শুনে এর বিরুদ্ধাচরণ এবং কার্পণ্য করেছে। ধনসম্পদের লোভ তাদেরকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে যে, আল্লাহর পথে ব্যয় করার তৌফিক তাদের হয়নি। তৃতীয় দল হচ্ছে সেসব নিষ্ঠাবান মুসলমান যাঁরা এ ঘোষণা শোনার সাথে সাথেই সাড়া দিয়েছিলেন এবং নিজেদের পছন্দ করা সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে দিয়েছিলেন। যেমন হযরত আবুদ দারদা (রা.) প্রমুখ। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত আবুদ দারদা (রা.) রাসূল ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক! আল্লাহ তা'আলা কি আমাদের নিকট ঋণ চাচ্ছেন? তাঁর তো ঋণের প্রয়োজন নেই! আল্লাহর রাসূল ﷺ উত্তর দিলেন, আল্লাহ তা'আলা এর বদলে তোমাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করাতে চাচ্ছেন। হযরত আবুদ দারদা (রা.) এ কথা শুনে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! হাত বাড়ান। তিনি হাত বাড়ালেন। হযরত আবুদ দারদা (রা.) বলতে লাগলেন, আমি আমার দুটি বাগানই আল্লাহকে ঋণ দিলাম। রাসূলে কারীম ﷺ বললেন, একটি আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করে দাও এবং অন্যটি নিজের পরিবারের ভরণপোষণের জন্য রেখে দাও। হযরত আবুদ দারদা (রা.) বললেন, আপনি সাক্ষী থাকুন এ দুটি বাগানের মধ্যে যেটি উত্তম যাতে খেজুরের ছয়শ ফলন্ত বৃক্ষ রয়েছে, সেটা আমি আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করলাম। আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, এর বদলে আল্লাহ তোমাকে বেহেশত দান করবেন। হযরত আবুদ দারদা (রা.) বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে বিষয়টি জানালেন। স্ত্রীও তাঁর এ সৎকর্মের কথা শুনে অত্যন্ত খুশি হলেন। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, খেজুরে পরিপূর্ণ অসংখ্য বৃক্ষ এবং প্রশস্ত অট্টালিকা আবুদ দারদার জন্য তৈরি হয়েছে।

৩. ঋণ দেওয়ার বেলায় তা ফেরত দেওয়ার সময় যদি কিছু অতিরিক্ত দেওয়ার কোনো শর্ত করা না থাকে এবং নিজের পক্ষ থেকে যদি কিছু বেশি দিয়ে দেওয়া হয়, তবে তা গ্রহণযোগ্য। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম যে তার [ঋণের] হককে উত্তমরূপে পরিশোধ করে। তবে যদি অতিরিক্ত দেওয়ার শর্ত করা হয়, তাহলে তা সুদ এবং হারাম বলে গণ্য হবে। –[মা'আরিফুল কুরআন]

٢٤٦. اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ الْجَمَاعَةِ مِنْ بَنِىْ
اِسْرَاۤءِيْلَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِ مُوْسٰى اَىْ اِلٰى
قِصَّتِهِمْ وَخَبَرِهِمْ اِذْ قَالُوْا لِنَبِىٍّ لَّهُمُ
هُوَ شَمْوِيْلُ ابْعَثْ اَقِمْ لَنَا مَلِكًا
نُّقَاتِلْ مَعَهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَنْتَظِمُ
بِهِ كَلِمَتُنَا وَنَرْجِعُ اِلَيْهِ قَالَ النَّبِىُّ
لَهُمْ هَلْ عَسَيْتُمْ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ اِنْ
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا خَبَرُ
عَسٰى وَالْاِسْتِفْهَامُ لِتَقْرِيْرِ التَّوَقُّعِ
بِهَا قَالُوْا وَمَا لَنَا اَلَّا نُقَاتِلَ فِىْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا
وَاَبْنَاۤئِنَا بِسَبْيِهِمْ وَقَتْلِهِمْ وَقَدْ فَعَلَ
بِهِمْ ذٰلِكَ قَوْمُ جَالُوْتَ اَىْ لَا مَانِعَ لَنَا
مِنْهُ مَعَ وُجُوْدِ مُقْتَضِيْهِ قَالَ تَعَالٰى
فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا عَنْهُ
وَجَبُنُوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ وَهُمُ الَّذِيْنَ
عَبَرُوا النَّهَرَ مَعَ طَالُوْتَ كَمَا سَيَأْتِىْ
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ فَيُجَازِيْهِمْ.

অনুবাদ :

২৪৬. তুমি কি মূসার মৃত্যুর পরবর্তী বনী ইসরাঈলের একটি সম্প্রদায়কে একটি দলকে দেখনি? অর্থাৎ তাদের কাহিনী ও ঘটনার প্রতি দৃষ্টি দাওনি? তারা যখন তাদের নবীকে শামূঈলকে বলেছিল, আমাদের জন্য এক রাজা পাঠাও নিযুক্ত কর আমরা তার সাথে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করব। অর্থাৎ তিনি আমাদের বিষয়ে সুব্যবস্থা করবেন এবং সকল সমস্যায় আমরা তাঁর শরণাপন্ন হব। তিনি অর্থাৎ নবী তাদেরকে বললেন, যদি তোমাদের উপর জিহাদ ফরজ করে দেওয়া হয়, তবে জিহাদ করবে না বলে কি তোমাদের থেকে আশঙ্কা করা যায়? عَسَيْتُمْ এটা ফাতাহ ও কাসরা উভয় হরকত সহকারে পাঠ করা যায়। اَلَّا تُقَاتِلُوْا এটা عَسٰى -এর خَبَرٌ বা বিধেয়। আয়াতোক্ত আশঙ্কাটি সত্যে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি– এ কথা বুঝানোর উদ্দেশ্যে এ স্থানে প্রশ্নবোধক ভঙ্গিমা ব্যবহার করা হয়েছে। তারা বলল, আমরা যখন স্ব-স্ব আবাস ও স্বীয় সন্তানসন্ততি হতে বহিষ্কৃত হয়েছি, তখন আমাদের কি হলো যে, আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করব না? তাদের সন্তানসন্ততিদেরকে বন্দী ও হত্যা করে ফেলা হয়েছিল। আর তাদের এ অবস্থা করেছিল জালূত সম্প্রদায়। তাদের কথার মর্মার্থ হলো, যুদ্ধ করার যখন সঙ্গত কারণ বিদ্যমান, তখন আর এতে কি বাধা থাকতে পারে? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, অতঃপর যখন তাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করা হলো অল্প কজন ব্যতীত যারা তালূতের সাথে নদী অতিক্রম করতে পেরেছিল, তারা ছিল এরা; সামনে এ কথার উল্লেখ হচ্ছে। সকলেই তা হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল এবং সাহস হারিয়ে ফেলল এবং আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। অনন্তর তিনি তাদের প্রতিফল দান করবেন।

তাহকীক ও তারকীব

اَلْمَلَأُ : নেতা, দল। শব্দটির অর্থ শুধু দল নয়, বরং তার অর্থ হলো বিশেষ দল, নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবী শ্রেণি যাদেরকে দেখলে চোখ ও অন্তর ভক্তি-শ্রদ্ধায় ভরে যায়। আর مَلَأٌ -এর আভিধানিক অর্থও হলো ভরা, পূর্ণ করা। اِبْعَثْ : প্রেরণ কর। بَعَثَ يَبْعَثُ بَعْثًا : প্রেরণ করা। اَقِمْ : নিযুক্ত কর। اِقَامَةً (اِفْعَالٌ) اَقَامَ অর্থ– নিযুক্ত করা। مَلِكٌ : রাজা, বাদশা, বহুবচন, مُلُوكٌ - تَنْتَظِمُ بِهِ كَلِمَتُنَا : যার দ্বারা আমরা আমাদের বিষয়ে সুব্যবস্থা করব। سَبْىٌ : বন্দি করা। مُقْتَضٰى : সঙ্গত কারণ, দাবি। تَوَلَّوْا عَنْهُ : পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল। جَبُنُوْا : সাহস হারিয়ে ফেলল। عَبَرُوْا : অতিক্রম করেছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

তালূত-জালূত প্রসঙ্গে যুদ্ধের বিবরণ : হযরত মূসা (আ.)-এর ইন্তেকালের পর বনী ইসরাঈল গোত্র কিছুকাল সঠিক ছিল। এরপর তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং তাওরাতের পরিপন্থি কাজকর্ম শুরু করে। এমনকি কোনো কোনো ব্যক্তি মূর্তি পূজা করতে আরম্ভ করে। আল্লাহ তা'আলা তখন তাদের উপর জালূত নামক জনৈক অত্যাচারী বাদশাহ চাপিয়ে দেন। উক্ত বাদশাহ ছিল

আমালিকা গোত্রের। সে শুধু তাদেরকে পরাস্তই করেনি বরং বনী ইসরাঈলের তাবূতকেও ছিনিয়ে নিয়ে যায়। তখন বনী ইসরাঈলের অন্তরে নিজেদের সংশোধনের চিন্তা আসে। তারা তাদের যুগের নবী শামবীল (আ.)-এর নিকট আবেদন করল যে, আপনি আমাদের জন্য একজন বাদশাহ নিযুক্ত করুন। আমরা তার নেতৃত্বে যুদ্ধ করব। হযরত শামবীল (আ.) আল্লাহর তা'আলার নিকট দোয়া করলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দোয়া কবুল করে হযরত তালূতকে তাদের বাদশাহ বানিয়ে দিলেন। হযরত তালূতের নেতৃত্বে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়।

ফিলিস্তিনে তৎকালীন রাজা ছিল জালূত। লোকটি অত্যন্ত বীর পুরুষ এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিল। তার সঙ্গে ছিল প্রায় এক লাখ সৈন্য। তারা সর্বপ্রকার যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত ছিল। এমতাবস্থায় হযরত তালূত চাইলেন যে, তার সৈন্যদের শক্তি পরীক্ষা করা হোক। যাতে যারা সাহসী এবং যুদ্ধ অভিজ্ঞ নয়, তাদেরকে বাহিনী থেকে বাদ দেওয়া যায়। সুতরাং যে রাস্তা দিয়ে বনী ইসরাঈলের যাওয়া প্রয়োজন ছিল সে রাস্তায় ছিল একটি নদী। এ নদীটি জর্দান এবং ফিলিস্তিনের মাঝে অবস্থিত। উক্ত নদী অতিক্রম করার প্রয়োজন ছিল। তবে হযরত তালূত জানতেন যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা এবং শৃঙ্খলার বেশ ঘাটতি রয়েছে। এ কারণে তিনি অভিজ্ঞ ও পারদর্শী এবং অনভিজ্ঞদের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করার জন্য এক পরীক্ষার আশ্রয় নিলেন। তিনি বললেন, কোনো ব্যক্তি নদী থেকে পানি পান করবে না। যে পান করবে তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। যারা পানি পান না করবে তারাই আমার সঙ্গী হবে। অর্থাৎ মূল নির্দেশ এই ছিল যে, হাত দ্বারা পানি স্পর্শ করবে না। তবে এক আধ অঞ্জলি পানি মুখে দিয়ে গলা ভিজানোর অনুমতি ছিল। এতে কোনো দোষ নেই। তখন ছিল গ্রীষ্মকাল। প্রচণ্ড গরম পড়েছিল। লোকেরা পানি দেখে তার প্রতি ছুটে গেল। অধিকাংশ মানুষ পরিতৃপ্ত হওয়া পর্যন্ত পানি পান করল। মাত্র ৩১৩ জনের ক্ষুদ্র একটি দল নিজেদের প্রতিজ্ঞার উপর অবিচল থাকল : যারা তৃপ্তিসহকারে পানি পান করেছিল, তারা নদী পার হতে সক্ষম হলো না। পক্ষান্তরে যারা পানি পান করেনি বা সমান্য পান করেছিল তারা অনায়াসে নদী পার হয়ে গেল।

হযরত দাঊদ (আ.) ছিল সে সময় কম বয়সী যুবক। ঘটনাক্রমে তালূতের সোনাবাহিনীর মধ্যে তিনি অংশগ্রহণ করলেন। হযরত দাঊদ (আ.) ছিলেন তাঁর অন্যান্য ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে খাটো ও স্বল্পবয়সী। তিনি ছাগল চরাতেন। তালূত সৈন্য প্রস্তুতিকালে তিনিও তার সাথে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে তিনি একটি পাথর পেয়েছিলেন। আল্লাহর কুদরতে পাথরটি তাকে বলল, হে দাঊদ! তুমি আমাকে তোমার সাথে নিয়ে নাও। আমি হযরত হারুনের পাথর। আমার দ্বারা অনেক বাদশাহকে হত্যা করা হয়েছে। হযরত দাঊদ (আ.) সাথে সাথে পাথরটি তাঁর ঝুলির মধ্যে নিয়ে নিলেন। এরপর তিনি আরেকটি পাথর পেলেন। পাথরটি বলল, আমি হযরত মূসা (আ.)-এর পাথর। আমার দ্বারা অমুক অমুক বাদশাহকে মারা হয়েছে। তিনি এ পাথরটিও তুলেন নিলেন। এরপর তৃতীয় আরেকটি পাথর তাকে বলল, আমাকে তুলে নাও, আমার দ্বারাই জালূতের মৃত্যু ঘটবে। হযরত দাঊদ এ পাথরটিও তুলে নিলেন।

বিখ্যাত পাহলোয়ান জালূত যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে আহ্বান জানালো। তার শক্তি ও ভয়ের কারণে কেউ সামনে অগ্রসর হচ্ছিল না। হযরত তালূত ঘোষণা দিলেন– যে ব্যক্তি জালূতকে হত্যা করবে, আমি তার সাথে আমার কন্যাকে বিবাহ দেব। হযরত দাঊদ (আ.) সামনে অগ্রসর হলেন। বাদশা তালূত নিজ ঘোড়া এবং যুদ্ধাস্ত্রও তাঁকে দিয়ে দিলেন। হযরত দাঊদ (আ.) সামান্য অগ্রসর হয়ে ফিরে এসে বললেন, যদি আল্লাহ আমার সাহায্য না করেন, তাহলে এ সকল হাতিয়ার আমার কোনো কাজে আসবে না। কাজেই আমি অস্ত্র ছাড়াই তার সাথে লড়ব। এরপর হযরত দাঊদ তার থলি এবং ধনুক নিয়ে ময়দানে অগ্রসর হলেন। জালূত বলল, তুমি আমার সাথে এ পাথর নিয়ে যুদ্ধ করতে এসেছ? যার দ্বারা মানুষ কুকুরকে তাড়িয়ে থাকে। হযরত দাঊদ (আ.) বললেন, তুমি তো কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট ও অধম। জালূত রাগান্বিত হয়ে বলল, অবশ্যই আমি তোমার গোশত হিংস্র পশু-পাখিদেরকে খাওয়াব। হযরত দাঊদ জবাব দিলেন, আল্লাহই তোমার গোশত পশুপাখিদেরকে খাওয়াবেন। এ বলে তিনি পাথর বের করে بِسْمِ اللّٰهِ اِلٰهِ اِبْرَاهِيْمَ বললেন। এরপর তাকে ফাঁদে রেখে দ্বিতীয় পাথর বের করলেন এবং বললেন, بِسْمِ اللّٰهِ اِلٰهِ اِسْحَاقَ এ বলেই তিনি উক্ত পাথরকে ফাঁদে রাখলেন। এরপর তৃতীয় পাথর বের করে বললেন, بِسْمِ اللّٰهِ اِلٰهِ يَعْقُوْبَ-এরপর তিনি তাকেও ফাঁদের মধ্যে রাখলেন। এরপর তিনি তা ঘুরালেন। একটি পাথর জালূতের মাথায় আঘাত করল, ফলে তার মাথার মগজ বের হয়ে গেল। তার সাথে আরো ৩০ জন মানুষ মারা গেল।

হযরত দাঊদ (আ.) জালূতের মাথা কেটে ফেললেন এবং তার আঙ্গুল থেকে আংটি খুলে নিয়ে তালূতের সামনে পেশ করলেন। তালূত বাহিনী বিজয় লাভ করে ফিরে আসল। এরপর বাদশাহ তালূত হযরত দাঊদ (আ.)-এর সাথে তার কন্যাকে বিবাহ দিয়ে দিলেন। পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা হযরত দাঊদ (আ.)-কে খেলাফত ও নবুয়ত দান করলেন।
–[জামালাইন]

قَوْلُهُ شَمْوِيْل : হযরত শামবীল (আ.) প্রাচীন সিরিয়া [শাম]-এর পর্বতময় আফ্রিয়ম অঞ্চলে রামা নগরে অবস্থান করতেন।
–[তাফসীরে মাজেদী]

وَالْاِسْتِفْهَامُ لِتَقْرِيْرِ التَّوَقُّعِ بِهَا : অর্থাৎ هَلْ عَسَيْتُمْ-এর هَلْ প্রশ্নবোধক নয়; বরং বক্তব্যের দৃঢ়তা ও তাকীদবোধক। অর্থাৎ যা ভাবছি, তা হয়েই থাকবে।

٢٤٧. وَسَأَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبَّهُ اِرْسَالَ مَلِكٍ فَاَجَابَهُ اِلٰى اِرْسَالِ طَالُوْتٍ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا قَالُوْٓا اَنّٰى كَيْفَ يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ لِاَنَّهُ لَيْسَ مِنْ سِبْطِ الْمَمْلَكَةِ وَلَا النُّبُوَّةِ وَكَانَ دَبَّاغًا اَوْ رَاعِيًا وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ يَسْتَعِيْنُ بِهَا عَلٰى اِقَامَةِ الْمُلْكِ قَالَ النَّبِيُّ لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰهُ اخْتَارَهُ لِلْمُلْكِ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً سَعَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَكَانَ اَعْلَمُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ يَوْمَئِذٍ وَاَجْمَلُهُمْ خَلْقًا وَاللّٰهُ يُؤْتِىْ مُلْكَهُ مَنْ يَّشَاۤءُ اِيْتَاءَهُ لَا اِعْتِرَاضَ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ فَضْلَهُ عَلِيْمٌ بِمَنْ هُوَ اَهْلٌ لَهُ ـ

অনুবাদ :

২৪৭. অনন্তর তাদের নবী একজন রাজা মনোনীত করে পাঠাবার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করেন। তালূতকে সম্রাট হিসেবে প্রেরণ করতঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ দোয়া কবুল করেন। তাদের নবী তাদেরকে বললেন, আল্লাহ তালূতকে তোমাদের সম্রাট নিযুক্ত করেছেন। তারা বলল, আমাদের উপর কখন অর্থাৎ কিরূপে তার কর্তৃত্ব হবে, যখন তদপেক্ষা আমরা কর্তৃত্বের অধিক হকদার! কারণ সে রাজবংশের লোকও নয়, নবী-বংশের লোকও নয়। সে একজন চামড়া পাকাকারী অথবা একজন রাখাল মাত্র। এবং তাকে প্রচুর ঐশ্বর্যও দেওয়া হয়নি। যা দ্বারা সে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সাহায্য নিতে পারে। নবী তাদেরকে বললেন, আল্লাহই তাকে তোমাদের উপর অধিপতি হিসেবে মনোনীত করেছেন গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং তিনি তাকে জ্ঞান ও দেহে সমৃদ্ধ করেছেন, ঐশ্বর্যশালী করেছেন। সে যুগে বনী ইসরাঈলের মধ্যে তিনি সর্বাধিক জ্ঞানী, সুন্দর ও পূর্ণাঙ্গ শারীরিক গঠনের অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন। আল্লাহ যাকে দিতে ইচ্ছা করেন তাকে স্বীয় রাজ্য দান করেন। সুতরাং এর উপর কোনো প্রশ্ন তোলা যেতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা অর্থাৎ তাঁর অনুগ্রহ অতি ব্যাপক এবং কে এর যোগ্য এই সম্পর্কে তিনি খুবই জানেন।

তাহকীক ও তারকীব

اَجَابَ : সাড়া দিলেন। اِرْسَالٌ : প্রেরণ করা। سِبْطُ الْمَمْلَكَةِ : রাজবংশ। دَبَّاغٌ : চামড়া পাকাকারী। رَاعِىٌ : রাখাল। سَعَةً : প্রাচুর্য। بَسْطَةً : সমৃদ্ধি। اَجْمَلُ : অধিকতর সুন্দর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ مِنْ سِبْطِ الْمَمْلَكَةِ وَلَا النُّبُوَّةِ : বনূ ইসরাঈলের মাঝে দুটি বিশেষ বংশ ছিল। একটি নবুয়ত বংশ অপরটি রাজ বংশ। আর তালূত নবুয়ত বংশেরও লোক ছিল না; আর রাজ বংশেরও না। ইবারতে এ কথা বলাই উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ : এখানে ইলম দ্বারা সেসব বিষয়ের জ্ঞান উদ্দেশ্য ছিল, যার সম্পর্ক রাজ্য রক্ষা ও রাজ্য জয়ের সঙ্গে। আর দৈহিক প্রসারতা দ্বারা উদ্দেশ্য তালূত দৈহিক গঠন ও বাহ্য অবয়ব- ঔজ্জ্বল্যে অন্যদের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। পবিত্র কুরআনের বর্ণনালঙ্কার ও শৈলী-সৌন্দর্য লক্ষণীয়। নামটি এমন চয়ন করা হয়েছে, যাতে দীর্ঘকায় হওয়ার পূর্ণ ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। গবেষকদের একদল এরূপ মন্তব্য করেছেন যে, طَالُوْت মূলত طَوْلُوْت ছিল, যা طول [দৈর্ঘ্য] থেকে নির্গত। -[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ غُرْفَةً : [غ বর্ণে পেশ দিয়ে] এক অঞ্জলি বা চিল্লু পানি।

قَوْلُهُ مِنْ مَائِهِ : এটি مُضَافٌ উহ্য থাকার প্রতি ইঙ্গিত। কেননা সরাসরি নদী পান করা সম্ভব নয়।

قَوْلُهُ لَمَّا وَافَوْهُ : এটি اَلْمُوَافَاةُ [পৌছা] মাসদার থেকে جَمْعُ مُذَكَّرٍ غَائِبٌ-এর সীগাহ। অর্থাৎ তারা যখন পৌছল।

٢٤٨. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ لَمَّا طَلَبُوْا مِنْهُ اٰيَةَ عَلٰى مُلْكِهِ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ الصُّنْدُوْقُ كَانَ فِيْهِ صُوَرُ الْاَنْبِيَاءِ اَنْزَلَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى اٰدَمَ وَاسْتَمَرَّ اِلَيْهِمْ فَغَلَبَتْهُمُ الْعَمَالِقَةُ عَلَيْهِ وَاَخَذُوْهُ وَكَانُوْا يَسْتَفْتِحُوْنَ بِهِ عَلٰى عَدُوِّهِمْ وَيُقَدِّمُوْنَهُ فِي الْقِتَالِ وَيَسْكُنُوْنَ اِلَيْهِ كَمَا قَالَ تَعَالٰى فِيْهِ سَكِيْنَةٌ طَمَانِيْنَةٌ لِقُلُوْبِكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ اَيْ تَرَكَاهُ وَهِيَ نَعْلَا مُوْسٰى وَعَصَاهُ وَعِمَامَةُ هٰرُوْنَ وَقَفِيْزٌ مِنَ الْمَنِّ الَّذِيْ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ وَرُضَاضُ الْاَلْوَاحِ تَحْمِلُهُ الْمَلٰئِكَةُ حَالٌ مِنْ فَاعِلِ يَاْتِيْكُمْ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ عَلٰى مُلْكِهِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ فَحَمَلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ حَتّٰى وَضَعَتْهُ عِنْدَ طَالُوْتَ فَاَقَرُّوْا بِمُلْكِهِ وَتَسَارَعُوْا اِلَى الْجِهَادِ فَاخْتَارَ مِنْ شُبَّانِهِمْ سَبْعِيْنَ اَلْفًا.

অনুবাদ :

২৪৮. তারা যখন তার [তালূতের] কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার নিদর্শন চাইল তখন তাদের নবী তাদেরকে বলেছিল, তার কর্তৃত্বের নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট আসবে তাবুত সিন্দুক। এতে নবীদের প্রতিকৃতি রক্ষিত ছিল। হযরত আদম (আ.)-এর নিকট আল্লাহ তা'আলা এটি নাজিল করেছিলেন। পরে তা বনী ইসরাঈলের হস্তগত হয়। আমালিকা সম্প্রদায় তাদের উপর বিজয়ী হলে তারা তা ছিনিয়ে নিয়ে যায়। ইসরাঈলীগণ এর অসিলায় শত্রুর উপর বিজয় প্রার্থনা করত। তারা সেটি যুদ্ধের মাঠে নিজের সম্মুখে স্থাপন করত এবং এর দ্বারা 'সকীনা' বা চিত্তপ্রশান্তি লাভ করত। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– যাতে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে রয়েছে সকীনা। তোমাদের প্রশান্তি এবং মূসা ও হারুন-পরিজন অর্থাৎ তারা দুজন যা রেখে গেছে তার অবশিষ্টাংশ। হযরত মূসা (আ.)-এর পাদুকা ও লাঠি; হযরত হারুন (আ.)-এর পাগড়ি, তাদের প্রতি অবতীর্ণ এক ঝুড়ি মান্না, তাওরাত-তখতির কিছু খণ্ডিত অংশ তাতে ছিল। ফেরেশতাগণ তা বহন করে আনবেন। তোমরা যদি বিশ্বাসী হও, তবে তোমাদের জন্য তাতে তার কর্তৃত্বের নিদর্শন রয়েছে। অনন্তর তাদের দৃষ্টির সামনে আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে ফেরেশতারা তা বহন করে এনে তালূতের নিকট রাখল। এতে তারা তালূতের কর্তৃত্ব স্বীকার করে এবং জিহাদের জন্য দ্রুত প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তখন তালূত যুবকদের মধ্য হতে বাছাই করে ৭০ হাজার যুবককে জিহাদের জন্য মনোনীত করেন।

তাহকীক ও তারকীব

صُوَرٌ : صُوْرَةٌ-এর বহুবচন, অর্থ– ছবি, আকৃতি। اِسْتَمَرَّ : অব্যাহত ছিল। غَلَبَتْ : বিজয়ী হলো। يَسْتَفْتِحُوْنَ بِهٖ : বিজয় প্রার্থনা করত। يَسْكُنُوْنَ اِلَيْهِ : প্রশান্তি লাভ করত। طَمَانِيْنَةٌ : প্রশান্তি। بَقِيَّةٌ : অবশিষ্টাংশ। قَفِيْزٌ : এক কাফীয, পরিমাপবিশেষ। رُضَاضٌ : খণ্ডিত অংশ। اَلْاَلْوَاحُ : لَوْحٌ-এর বহুবচন, অর্থ– তখতি। اَقَرُّوْا : স্বীকার করল। اَمْر يَقِرُّ اِقْرَارًا : স্বীকার করা। تَسَارَعُوْا : দ্রুত গেল। شُبَّانٌ : شَبَابٌ-এর বহুবচন, অর্থ– যুবক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يَاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ **তাবূতে সাকীনা :** বনী ইসরাঈলদের মধ্যে একটি সিন্দুক পূর্ব থেকেই ছিল, তা বংশানুক্রমে চলে আসছিল। তাতে হযরত মূসা (আ.) ও অন্যান্য নবীগণের পরিত্যক্ত কিছু বরকতপূর্ণ বস্তুসামগ্রী রক্ষিত ছিল। বনী ইসরাঈলরা যুদ্ধের সময় এ সিন্ধুকটিকে সামনে রাখত, আল্লাহ তা'আলা এর বদৌলতে তাদেরকে বিজয়ী করতেন। ফিলিস্তিনের জালূত বনী ইসরাঈলদেরকে পরাজিত করে এ সিন্দুকটি লুণ্ঠন করে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ যখন এ সিন্দুক ফিরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন অবস্থা এই দাঁড়াল যে, কাফেররা যেখানেই সিন্দুকটি রাখে, সেখানেই দেখা দেয় মহামারি ও অন্যান্য বিপদাপদ। এমনিভাবে পাঁচটি শহর ধ্বংস হয়ে যায়। অবশেষে অতিষ্ঠ হয়ে এ সিদ্ধান্ত স্থির হলো যে, নাউযুবিল্লাহ! এ কুলক্ষণের গাঁটরিটি অন্য কোথাও ছুড়ে ফেলে আসা হোক। সিদ্ধান্ত মতে দুটি গরুর উপর সেটি উঠিয়ে হাঁকিয়ে দিল। ফেরেশতাগণ গরুগুলোকে তাড়া করে এনে তালূতের দরজায় পৌঁছে দিলেন। বনী ইসরাঈলরা এ নিদর্শন দেখে তালূতের রাজত্বের প্রতি আস্থা স্থাপন করল এবং তালূত জালূতের উপর আক্রমণ পরিচালনা করলেন। –[মা'আরিফুল কুরআন : ১৩৬]

অনুবাদ :

٢٤٩. فَلَمَّا فَصَلَ خَرَجَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَكَانَ حَرًّا شَدِيْدًا وَطَلَبُوْا مِنْهُ الْمَاءَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ مُخْتَبِرُكُمْ بِنَهَرٍ لِيَظْهَرَ الْمُطِيْعُ مِنْكُمْ وَالْعَاصِىْ وَهُوَ بَيْنَ الْاَرْدُنِّ وَفِلَسْطِيْنَ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ اَىْ مِنْ مَائِهٖ فَلَيْسَ مِنِّىْ اَىْ مِنْ اَتْبَاعِىْ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ يَذُقْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّىْ اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِالْفَتْحِ وَالضَّمِّ بِيَدِهٖ فَاكْتَفٰى بِهَا وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا فَاِنَّهٗ مِنِّىْ فَشَرِبُوْا مِنْهُ لَمَّا وَافَوْنَ بِكَثْرَةٍ اِلَّا قَلِيْلًا مِنْهُمْ فَاقْتَصَرُوْا عَلَى الْغُرْفَةِ رُوِىَ اَنَّهَا كَفَتْهُمْ لِشُرْبِهِمْ وَدَوَابِّهِمْ وَكَانُوْا ثَلٰثَ مِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ وَهُمُ الَّذِيْنَ اقْتَصَرُوْا عَلَى الْغُرْفَةِ قَالُوْا اَىِ الَّذِيْنَ شَرِبُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ اَىْ بِقِتَالِهِمْ وَجَبُنُوْا وَلَمْ يُجَاوِزُوْهُ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ يُوْقِنُوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ بِالْبَعْثِ وَهُمُ الَّذِيْنَ جَاوَزُوْهُ كَمْ خَبَرِيَّةٌ بِمَعْنٰى كَثِيْرٍ مِّنْ فِئَةٍ جَمَاعَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِاِذْنِ اللّٰهِ بِاِرَادَتِهٖ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ بِالنَّصْرِ وَالْعَوْنِ.

২৪৯. অতঃপর তালূত যখন সেনাদলসহ বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে আলাদা হলো বের হলো। ঐ সময় ছিল প্রচণ্ড গরম। তারা তার কাছে পানি চাইলে সে বলল, আল্লাহ একটি নদী দ্বারা তোমাদেরকে তোমাদের মধ্যে অনুগত কে? আর অবাধ্য কে? তা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে পরীক্ষা করবেন। তোমাদের যাচাই করবেন। জর্দান ও ফিলিস্তিনের মধ্যবর্তী অঞ্চলে ছিল ঐ নদীটির অবস্থান। যে কেউ তা থেকে অর্থাৎ তার পানি পান করবে, সে আমার দলভুক্ত নয় আমার অনুসারী বলে গণ্য নয় আর যে তা খাবে না তার স্বাদ গ্রহণ করবে না সে আমার দলভুক্ত। এ ছাড়া যে তার হাতে এক কোষ পানি গ্রহণ করবে সে-ও। غُرْفَةً-এর غ-এ ফাতাহ ও পেশ উভয় হরকত সহকারে পাঠ করা যায়। অর্থ– এক অঞ্জলি। এতটুকুতেই যথেষ্ট করবে এর অতিরিক্ত নেবে না সে-ও আমার দলভুক্ত।

কিন্তু যখন তারা সেখানে এসে পৌঁছল তখন অল্প সংখ্যক ব্যতীত সকলেই তা থেকে বেশি করে পান করল। ঐ অল্প সংখ্যকগণ কেবল এক অঞ্জলির উপরই যথেষ্ট করেছিল। বর্ণিত আছে যে, তাদের ও তাদের পশুগুলোর জন্য এতটুকুই যথেষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তারা সংখ্যায় তিনশত এবং কিছু বেশি ছিল। সে এবং তার সাথে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা যখন তা অতিক্রম করল। এরা তারাই ছিল, যারা এক অঞ্জলি পানির উপর যথেষ্ট করেছিল। তখন যারা পানি পান করেছিল তারা বলল, জালূত ও তার সেনাবাহিনীর সাথে অর্থাৎ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শক্তি আজ আমাদের নেই। তারা সাহস হারিয়ে ফেলল এবং তা [নদী] অতিক্রম করতে পারল না। আর যাদের প্রত্যয় ছিল দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, পুনরুত্থানের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাৎ ঘটবে তারা হলো যারা নদী অতিক্রম করতে পেরেছিল। তারা বলল, আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর ইচ্ছায় কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাভূত করেছে! كَمْ مِنْ فِئَةٍ এ স্থানে كَمْ শব্দটি خَبَرِيَّةٌ বা বিবরণমূলক। এ স্থানে كَمْ শব্দটি 'বহু' অর্থে ব্যবহৃত। فِئَةٌ অর্থ– দল। আল্লাহ তাঁর সাহায্য ও সহযোগিতাসহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।

তাহকীক ও তারকীব

فَصَلَ : আলাদা হলো, বের হলো। مُبْتَلِيْكُمْ : তোমাদের পরীক্ষাকারী, পরীক্ষা করবেন। اِغْتَرَفَ : হাতে পানি গ্রহণ করল। وَافَوْا : তারা পৌঁছল। اِقْتَصَرُوْا : যথেষ্ট করেছিল, ক্ষান্ত করেছিল। كَفَتْ : যথেষ্ট হয়েছে। جَاوَزَ : অতিক্রম করল। جَبُنُوْا : সাহস হারিয়ে ফেলল। فِئَةٌ : দল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ بِجَالُوْتَ : জালূত [ইহুদি প্রতিপক্ষ]। ফিলিস্তিনী বাহিনীর প্রখ্যাত সেনানায়ক, দুর্ধর্ষ সুঠামদেহী পালোয়ান ছিল। দেখতে মানুষ নয়, যেন একটা দৈত্য। তাওরাতের বর্ণনা মতে তার দৈর্ঘ্য ছিল- মাথা বাদে ১০ ফুট। মাথা থেকে পা পর্যন্ত লোহার পোশাক পরে থাকত এবং তার ঢালের ওজন ছিল তিন মণ। −[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ : মুফতি মুহাম্মদ শফী (র.) তাঁর তাফসীরে লিখেন- এ পরীক্ষার কারণ আমার মতে এই যে, অনুরূপভাবে মানুষের জোশ ও উত্তেজনা অনেক গুণ বেড়ে যায়। কিন্তু প্রয়োজনের সময় খুব নগণ্য সংখ্যক লোকই এগিয়ে আসে। উপরন্তু তখন কিছু লোকের অসহযোগ অন্যান্য লোকদেরকেও বিচলিত করে। এসব লোকদের দূরে সরানোই ছিল আল্লাহর ইচ্ছা। তাই তাদের জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করলেন, যা অত্যন্ত উপযোগী ছিল। কেননা যুদ্ধের সময় দৃঢ়তা ও কষ্টসহিষ্ণুতারই বেশি প্রয়োজন। অতএব, পিপাসার তীব্রতার সময় পানি পাওয়া সত্ত্বেও পান করা থেকে বিরত থাকা দৃঢ়তার পরিচায়ক। পক্ষান্তরে এ অবস্থায় অন্ধের মতো ঝাঁপিয়ে পড়া অস্থিরতার লক্ষণ।

পরবর্তীতে একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার বর্ণনা করা হয়েছে যে, অতিমাত্রায় পানি পানকারীগণ শারীরিক দিক দিয়ে বেকার হয়ে পড়ল এবং তারা দ্রুত চলাফেরা করতে অপারগ হয়ে গেল। রূহুল মা'আনীতে ইবনে আবী হাতেমের বরাত দিয়ে হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতের উদ্ধৃতিতে ঘটনার যে পরিণতি বর্ণিত হয়েছে, তাতে বোঝা যায়, এতে তিন ধরনের লোক ছিল।

একদল অসম্পূর্ণ ঈমানদার, যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। দ্বিতীয় দল পূর্ণ ঈমানদার, যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ঠিকই কিন্তু নিজেদের সংখ্যা কম বলে চিন্তা করেছে এবং তৃতীয় দল ছিল পরিপূর্ণ ঈমানদার যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এবং নিজেদের সংখ্যালঘিষ্ঠতার কথাও চিন্তা করেনি। −[মা'আরিফুল কুরআন]।

অনুবাদ :

২৫০. وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ اَىْ ظَهَرُوْا لِقِتَالِهِمْ وَتَصَافُّوْا قَالُوْا رَبَّنَا اَفْرِغْ اُصْبُبْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا بِتَقْوِيَةِ قُلُوْبِنَا عَلَى الْجِهَادِ وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ـ

২৫০. তারা যখন জালূত ও তার সেনাদলের সম্মুখীন হলো অর্থাৎ যুদ্ধার্থে সামনে আসল এবং কাতার করে দাঁড়াল তখন বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর ঢেলে দাও ধৈর্য এবং জিহাদের জন্য আমাদের হৃদয় শক্তিশালী করে আমাদের পা' অবিচলিত রাখ এবং সত্য প্রত্যাখানকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য দান কর।

২৫১. فَهَزَمُوْهُمْ كَسَرُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ بِاِرَادَتِهٖ وَقَتَلَ دَاوٗدُ وَكَانَ فِىْ عَسْكَرِ طَالُوْتَ جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ اَىْ دَاوٗد اللّٰهُ الْمُلْكَ فِىْ بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ وَالْحِكْمَةَ النُّبُوَّةَ بَعْدَ مَوْتِ شَمْوِيْلَ وَطَالُوْتَ وَلَمْ يَجْتَمِعَا لِاَحَدٍ قَبْلَهٗ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ كَصَنْعَةِ الدُّرُوْعِ وَمَنْطِقِ الطَّيْرِ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بَدْلٌ بَعْضٍ مِنَ النَّاسِ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ بِغَلَبَةِ الْمُشْرِكِيْنَ وَقَتْلِ الْمُسْلِمِيْنَ وَتَخْرِيْبِ الْمَسَاجِدِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ فَدَفَعَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ـ

২৫১. সুতরাং তারা আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর ইচ্ছায় তাদেরকে পরাভূত করল। فَهَزَمُوْهُمْ অর্থ– তাদেরকে পরাভূত করল। আর দাঊদ তিনি তালূতের সেনাদলে শরিক ছিলেন জালূতকে হত্যা করেছিল। আল্লাহ তাকে দাঊদকে তালূতের পর বনী ইসরাঈলের কর্তৃত্ব ও শামুঈলের মৃত্যুর পর হিকমত নবুয়ত দান করেছিলেন। তার পূর্বে একই ব্যক্তির মধ্যে নবুয়ত ও কর্তৃত্ব আর কারো মধ্যে একত্রে দৃষ্ট হয় না এবং যা তিনি ইচ্ছা করলেন। যেমন বর্ম নির্মাণ কৌশল, পাখির ভাষা বুঝার ক্ষমতা ইত্যাদি তা তাকে শিক্ষা দিলেন। আল্লাহ যদি মানব জাতির একদলকে بَعْضَهُمْ এটা اَلنَّاسَ-এর بَدْل বা অংশবিশেষ স্থলাভিষিক্ত পদ। بَعْضٍ অন্যদল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে পৃথিবী অংশীবাদীদের বিজয়, মুসলিমদের হত্যা ও মসজিদসমূহ বিধ্বংসের দরুন বিনষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ বিশ্বজগতের উপর অনুগ্রহশীল। তাই তিনি একদলকে অন্যদল দ্বারা প্রতিহত করেন।

২৫২. تِلْكَ اَىْ هٰذِهِ الْاٰيَاتُ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا نَقُصُّهَا عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ بِالْحَقِّ بِالصِّدْقِ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اَلتَّاكِيْدُ بِاَنَّ وَغَيْرِهَا رَدٌّ لِقَوْلِ الْكُفَّارِ لَهٗ لَسْتَ مُرْسَلًا ـ

২৫২. এই সব এ সমস্ত আয়াতসমূহ আল্লাহর আয়াতমালা। হে মুহাম্মদ! আমি তোমার নিকট যথাযথভাবে সত্যসহ আবৃত্তি করি বিবৃত করি। আর নিশ্চয় তুমি রাসূলগণের অন্যতম। এ স্থানে اِنَّ এবং এরূপ কতিপয় শব্দ ব্যবহার করে বিষয়টিকে আরো تَاكِيْد অর্থাৎ জোরালো করা হয়েছে। এ বক্তব্যটি 'আপনি প্রেরিত পুরুষ [مُرْسَل] নন' রাসূল ﷺ সম্পর্কে কাফেরদের এহেন উক্তির প্রতিবাদ।

তাহকীক ও তারকীব

بَرَزُوْا : সম্মুখীন হলো, প্রকাশিত হলো। تَصَافُّوا : কাতার করে দাঁড়াল। أَصْبِبْ : ঢেলে দাও। صَبَّ (ن) صَبًّا অর্থ– ঢেলে দেওয়া। تَقْوِيَة : শক্তিশালী করা। هَزَمُوا : পরাজিত হলো। عَسْكَر : সৈন্যবাহিনী। صَنْعَة : নির্মাণ। أَدْرُوْع : دِرْع -এর বহুবচন। অর্থ– বর্ম। مَنْطِقَ الطَّيْرِ : পাখির ভাষা। دِفَع : دَفْعًا (ف) دَفَعَ অর্থ– প্রতিহত করা। غَلَبَةُ الْمُشْرِكِيْنَ : অংশবাদীদের বিজয়। تَخْرِيْب : বিধ্বংস। ذُوْ فَضْلٍ : অনুগ্রহশীল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ : دَاوُد - দাউদ ইবনে যিশর [ইউসা] ইবনে উবেদ [উওয়ায়বিদ] [খ্রিস্টপূর্ব ৯২৩ -১০২৪] এক সত্য নবী ছিলেন। পবিত্র কুরআনের ১৬টি স্থানে তাঁর উল্লেখ রয়েছে। তালূত বাহিনীতে তিনি একজন তরুণ সাধারণ সৈনিকরূপে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তখন পর্যন্ত তিনি নবুয়তপ্রাপ্ত হননি এবং রাজত্বও লাভ করেননি।

قَوْلُهُ اٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ : আল্লাহ তাঁকে রাজত্ব দিলেন। অর্থাৎ এ রাজত্ব যে আল্লাহপ্রদত্ত ছিল, আল কুরআন প্রথমেই সে তথ্যটি স্পষ্ট করে দিল। ইসরাঈল জাতির জন্য এ ছিল দ্বিতীয় ব্যক্তির শাসন কর্তৃত্ব। হযরত দাউদ (আ.) ইসরাঈলী বংশধারার দ্বিতীয় বাদশাহ হলেন। প্রথম মুকুটধারী ছিলেন তালূত; হযরত দাউদ (আ.) তার জামাতা ছিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্রসহ তালূত যুদ্ধেক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন। যিহূদা [ইয়াহূদা] গোত্র হযরত দাউদ (আ.)-কে তাদের শাসক নির্বাচিত করল এবং দুই বছরের অন্তর্দ্বন্দ্বের পর অন্যান্য গোত্রও তাঁকে মেনে নিতে একমত হলো। সাত বছর পর্যন্ত তিনি 'হেবরোন' [আল খালীল]-এ অবস্থান করে রাজ্য পরিচালনা করলেন। পরে শত্রুদের কবল থেকে জেরুজালেম মুক্ত করে সেখানে রাজধানী স্থাপন করলেন। তিনি আশপাশের সকল শাসককে পরাভূত ও বশীভূত করে নিজের রাজ্যসীমা সুবিস্তৃত করেন। তাঁর রাজত্বকাল, রাজ্যজয় ও রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা-শ্রীবৃদ্ধি ইহুদি ইতিহাসের স্মরণীয় যুগ। –[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ الْحِكْمَةَ : এখানে হিকমত দ্বারা নুবয়ত উদ্দেশ্য, যা হিকমত ও প্রজ্ঞা-বুদ্ধিমত্তার সর্বোচ্চ স্তর। অবশ্য হিকমতের সাধারণ ও প্রাথমিক অর্থ হলো বুদ্ধিমত্তা, সৎ বিবেকও উদ্দেশ্য হতে পারে। কেউ কেউ বলেছেন, اَلْحِكْمَةَ হচ্ছে ইলম ও তদনুসারে আমল। আবার কেউ কেউ নবুয়ত দ্বারা এর ব্যাখ্যা করেছেন। –[বাহর] অর্থাৎ নবুয়ত। হিকমত- যার দ্বারা সব বিষয়কে তার সঠিক ও সার্থক অবস্থানে স্থাপন করা যায়। আর এ অর্থের পূর্ণাঙ্গতা অর্জিত হয় নবুয়ত দ্বারা। সুতরাং এখানেও নবুয়ত উদ্দেশ্য হওয়া বস্তবতা বিরোধী হবে না।

قَوْلُهُ عَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ : যা ইচ্ছা শিক্ষা দিলেন......নবীগণের ইলমের সংখ্যা তালিকা নিরুপণ করা কার সাধ্য? مِمَّا يَشَاءُ যা ইচ্ছা-র ব্যাপ্তিতে সেসব বিদ্যা-দক্ষতা ও প্রযুক্তি রয়েছে, যা হযরত দাউদ (আ.)-কে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল। مِمَّا -এর مِنْ অব্যয় আংশিকতাবোধক (تَبْعِيْضِيَّه) নয়, সূচনাবোধক (اِبْتِدَائِيَّه) অর্থাৎ যা 'তথা' বা 'অর্থাৎ' -এর অর্থ দেয়। عَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ অর্থ হবে– শিখিয়ে দিলেন অর্থাৎ যা যা চাইলেন। –[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْاَرْضُ : এখানে একটা ব্যাপকভিত্তিক বিধান জানিয়ে দেওয়া হলো যে, পৃথিবীর বুকে রাজত্ব ও ক্ষমতার যে পট পরিবর্তন ও উত্থান-পতন হয়ে থাকে, তা অপ্রয়োজনে ও অনর্থক নিছক কালচক্রে বা প্রকৃতির নিয়মেই স্বয়ংক্রিয়রূপে হয়ে থাকে– এমন নয়; বরং তা সবসময়ই উদ্দেশ্যগতরূপে ও হেকমতের অধীনেই হয়ে থাকে এবং তা দ্বারা নিপীড়ন, নিগ্রহ, অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ দমন করাই লক্ষ্য হয়ে থাকে। আয়াত দ্বারা এ তত্ত্বও প্রস্ফুটিত হলো যে, এ কার্যকারণ ও উপলক্ষের অধীনে এ বিশ্বে স্রষ্টার মর্জিতে যেসব ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাও সাধারণত সৃষ্টি ও বান্দাদের মাধ্যমেই সম্পাদিত হয়ে থাকে। মোটকথা ক্ষমতা ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের পট পরিবর্তনের পেছনে আল্লাহর রহমতই সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। –[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ : আপনি নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহর রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ পূর্বে যেমন নবী-রাসূলের আগমন হয়েছিল, তেমনি আপনিও একজন নবী। এ কারণেই তো আমি আপনার কাছে বিগত যুগের ঘটনাবলি যথাযথভাবে বর্ণনা করছি, অথচ আপনি এসব না কোনো কিতাবে পড়েছেন, না কোনো মানুষের কাছে শুনেছেন। –[তাফসীরে উসমানী]

اَلْجُزْءُ الثَّالِثُ : তৃতীয় পারা

٢٥٣. تِلْكَ مُبْتَدَأٌ الرُّسُلُ صِفَةٌ وَالْخَبَرُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ بِتَخْصِيْصِهِ بِمَنْقَبَةٍ لَيْسَتْ لِغَيْرِهِ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ كَمُوْسٰى وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ اَىْ مُحَمَّدًا ﷺ دَرَجٰتٍ عَلٰى غَيْرِهِ بِعُمُوْمِ الدَّعْوَةِ وَخَتْمِ النُّبُوَّةِ بِهِ وَتَفْضِيْلِ اُمَّتِهِ عَلٰى سَائِرِ الْاُمَمِ وَالْمُعْجِزَاتِ الْمُتَكَاثِرَةِ وَالْخَصَائِصِ الْعَدِيْدَةِ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ قَوَّيْنَاهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ جِبْرَئِيْلَ يَسِيْرُ مَعَهُ حَيْثُ سَارَ وَلَوْ شَاۤءَ اللّٰهُ هُدَى النَّاسِ جَمِيْعًا مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ بَعْدِ الرُّسُلِ اَىْ اُمَمُهُمْ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ لِاخْتِلَافِهِمْ وَتَضْلِيْلِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا لِمَشِيْئَةِ ذٰلِكَ فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ ثَبَتَ عَلٰى اِيْمَانِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ كَالنَّصَارٰى بَعْدَ الْمَسِيْحِ وَلَوْ شَاۤءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا تَوْكِيْدٌ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ مِنْ تَوْفِيْقِ مَنْ شَاءَ وَخُذْلَانِ مَنْ شَاءَ ـ

অনুবাদ :

২৫৩. এই রাসূলগণ, তাদের মধ্যে কাউকে এমন বিশেষ কিছু গুণে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছি যেগুলো অন্যজনের মধ্যে নেই। কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। এখানে تِلْكَ হলো مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য। اَلرُّسُلُ হলো تِلْكَ -এর সিফত বা বিশ্লেষণ অথবা বিবরণমূলক অন্বয়। আর فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ হলো خَبَر বা বিধেয়। তাদের মধ্যে এমন কেউ রয়েছে, যার সাথে আল্লাহ তা'আলা কথা বলেছেন যেমন– মূসা (আ.) আবার কাউকে অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। অন্যান্যদের উপর দাওয়াতের ব্যাপকতা, খতমে নবুয়ত, তাঁর উম্মতকে সকল উম্মতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান, অসংখ্য মু'জিযা ও আরো বহু বৈশিষ্ট্যে বিভূষিত করে। মরিয়ম তনয় ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করেছি ও পবিত্র আত্মা অর্থাৎ জিবরাঈল (আ.) দ্বারা তাঁকে শক্তি যুগিয়েছি শক্তিশালী করেছি। তিনি যে স্থানেই গমন করতেন জিবরাঈল (আ.) সঙ্গে থাকতেন।

আল্লাহ সকল মানুষের হেদায়েত চাইলে তাদের অর্থাৎ রাসূলগণের পরবর্তীরা অর্থাৎ তাঁদের উম্মতগণ পরস্পরে মতানৈক্যতা ও একজন আরেকজনকে ভ্রষ্ট বলার কারণে এ ধরনের যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হতো না সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর, কিন্তু তাঁর [আল্লাহর] এরূপ অভিপ্রায়ের ফলে তারা মতবিরোধিতায় লিপ্ত হলো। অনন্তর তাদের কতক বিশ্বাস করল অর্থাৎ ঈমানের উপর সুদৃঢ় থাকল এবং কতক যেমন– হযরত ঈসার পর খ্রিস্টানগণ সত্য প্রত্যাখ্যান করল। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তারা পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হতো না এ বাক্যটি তাকিদব্যঞ্জক। কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন যাকে ইচ্ছা তৌফিক অর্থাৎ সাহায্য, কৃতকার্যতা ও সৌভাগ্য দান করেন আর যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছনা দেন।

তাহকীক ও তারকীব

اَلرُّسُلُ : رَسُوْلٌ -এর বহুবচন। অর্থ– রাসূল, দূত। فَضَّلْنَا : বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছি। اَلتَّفْضِيْلُ : শ্রেষ্ঠত্ব দান করা।

مَنْقَبَةٌ : গুণ, মর্যাদা। বহুবচন مَنَاقِب - كَلَّمَ : কথা বলেছেন। اَلتَّكْلِيْمُ কথা বলা।

دَرَجَاتٍ : دَرَجَةٌ -এর বহুবচন। স্তর, উঁচু মর্যাদা। بِعُمُوْمِ الدَّعْوَةِ : দাওয়াতের ব্যাপকতা দ্বারা।

اَلْمُتَكَاثِرَةُ : বহু, অনেক। اَيَّدْنَا : শক্তি যুগিয়েছি। اَلتَّأْيِيْدُ : শক্তিশালী করা।

يَسِيْرُ : চলত।

سَارَ (ض) سَيْرًا : চলা, সফর করা। خُذْلَانٌ: লাঞ্ছনা।

তারকীব : تِلْكَ : যদি تِلْكَ -এর مُشَارٌ اِلَيْهِ উল্লিখিত নবীদের জামাত হয়ে থাকে, যাদের আলোচনা اَنَّكَ عَنِ الْمُرْسَلِيْنَ -এর মাঝে কিংবা গোটা সূরার মাঝে রয়েছে তাহলে اَلرُّسُلُ -এর اَلِف لَام টি عَهْدِي হবে। আর যদি তার مُشَارٌ اِلَيْهِ সাধারণভাবে সকল নবী-রাসূল হয়, তাহলে اَلِف لَامْ টি اِسْتِغْرَاقِي হবে।

প্রশ্ন : এখানে تِلْكَ তথা اِسْم اِشَارَة بَعِيْد ব্যবহার করার কারণ কি?

উত্তর. এর কারণ হয়তো بُعْد زَمَانِي -এর দিকে ইঙ্গিত করা, আর না হয় আল্লাহর কাছে তাদের উঁচু মর্যাদার দিকে ইঙ্গিত করা।

صِفَة বিজ্ঞ মুফাসসির (র.) اَلرُّسُلُ -কে تِلْكَ -এর صِفَة আখ্যা দিয়েছেন। সুতরাং مَوْصُوْف এবং صِفَة মিলে মুবতাদা। আর এ মুবতাদার খবর হলো– فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ

প্রশ্ন : اَلرُّسُلُ -কে جُزْء أَوَّل এবং فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ -কে جُزْء ثَانِي সাব্যস্ত করলে ক্ষতি কি?

উত্তর: خَبَر হওয়ার সাধারণ নিয়ম যেহেতু نَكِرَة হওয়া, আর اَلرُّسُلُ যেহেতু مَعْرِفَة হয়েছে, তাই اَلرُّسُلُ -কে خَبَر সাব্যস্ত করা হয়নি।

প্রশ্ন : وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ -এর মাঝে دَرَجَاتٍ মানসূব হওয়ার কারণ কি?

উত্তর : হয়তো مَصْدَر হিসেবে مَنْصُوْب হয়েছে। কেননা دَرَجَاتٍ এটি رِفْعَة -এর অর্থে। أَيْ رَفَعَ رِفْعَةً অথবা رَفَعَ টি اِلٰى বা عَلٰى বা فِيْ দ্বারা مُتَعَدِّي ছিল। حَرْفُ الْجَرِّ -কে হযফ করার কারণে مَنْصُوْبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের যোগসূত্র : রাসূল ﷺ -কে সম্বোধন করে কিছু পূর্বে বলা হয়েছে– اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ [রাসূল ﷺ ও নবীগণের অন্তর্গত] আয়াতের এ অংশ দ্বারা সন্দেহ হতে পারে, সম্ভবত তাঁর নবুয়তও পূর্বের নবীগণের ন্যায় সাময়িক ও এলাকাভিত্তিক ছিল এবং তাঁর মর্যাদা ও সম্মান অন্যান্য নবীগণের ন্যায় হবে। এ সন্দেহ দূর করার জন্যে অতি স্পষ্টভাবে তাঁর মর্যাদাকে تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ দ্বারা বর্ণনা করেছেন।

নবীগণের মধ্যে পারস্পরিক মর্যাদার তারতম্য : যে সকল নবী ও রাসূলগণের উল্লেখ কুরআন মাজীদে এসেছে তারা সকলে একই স্তরের ছিলেন না। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ 'আমি কোনো কোনো নবীকে অপর নবীর উপর মর্যাদা দান করেছি।' সূরা বনী ইসরাঈলেও وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّيْنَ عَلٰى

بَعْضٍ -এর মাঝে এ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে । অতএব, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, নবীগণের মধ্যে একে অন্যের থেকে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অবশ্য فَضَّلْنَا -এর মুতাকাল্লিমের যমীরটি লক্ষণীয় যে, এ মর্যাদা বা শ্রেষ্ঠত্ব কেবল আল্লাহর নিকট। আনুগত্যের বিচারে মাখলুকের নিকট সকলেই সমান। সবার প্রতি আনুগত্য এবং সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব। বিষয়টি এ সূরার শেষে অপর এক আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে- لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেন-

لَيْسَ مَقَامُ التَّفْضِيْلِ اِلَيْكُمْ اِنَّمَا هُوَ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَيْكُمُ الْاِنْقِيَادُ وَالتَّسْلِيْمُ لَهٗ وَالْاِيْمَانُ بِهٖ.

অর্থাৎ নবীগণের পারস্পরিক মর্যাদার ব্যাপারে সাধারণ মানুষের কোনো মন্তব্য বা আলোচনা বৈধ নয়। অবশ্য পারস্পরিক তুলনা করা ছাড়াই তাঁদের মর্যাদা, অবস্থা ও ঘটনাবলি উল্লেখ করায় কোনো দোষ নেই।

প্রশ্ন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- لَا تُخَيِّرُوْنِىْ مِنْ بَيْنِ الْاَنْبِيَاءِ -[বুখারীও মুসলিম]

অর্থাৎ 'তোমরা আমাকে অন্যান্য নবীগণের মধ্যে বিশেষ প্রধান্য দিয়ো না।' এর দ্বারা শ্রেষ্ঠত্বের নিষেধাজ্ঞা বুঝা যায়। কিন্তু আয়াতে তো বিশেষ শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলা হচ্ছে। আয়াত এবং হাদীসের মাঝে সমাধান কি?

উত্তর. এর দ্বারা প্রাধান্যকে অস্বীকার করা জরুরি হয় না; বরং এতে উম্মতকে নবীগণের ব্যাপারে আদব ও সম্মান প্রদর্শনের একটি বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের যেহেতু সকল বিষয়ে এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে যার উপর ভিত্তি করে প্রাধান্য দেবে সে সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবগত নও। এজন্য তোমরা এভাবে আমার প্রাধান্য বর্ণনা করবে না, যাতে অন্যান্য নবীদের মর্যাদাহানি হয়। অন্যথায় কোনো কোনো নবীর উপর বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান সর্বস্বীকৃত এবং আহলে সুন্নতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত দ্বারা এটা প্রমাণিত।

আংশিক মর্যাদা দ্বারা সামগ্রিক বিচারে মর্যাদাবান হওয়া জরুরী হয় না। উদাহরণস্বরূপ হযরত সুলাইমান (আ.)-কে রাজত্বের ব্যাপারে, হযরত আইয়ুব (আ.)-এর ধৈর্যের ব্যাপরে, হযরত ইউসূফ (আ.)-এর সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে, হযরত ঈসা (আ.)-এর রূহুল-কুদুস -এর সমর্থনে, হযরত মূসা (আ.)-এর আল্লাহর সাথে কথোপকথনে এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আল্লাহর বিশেষ বন্ধুত্বে বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব ছিল। কিন্তু এমন কিছু নবী রয়েছেন যাদের সামগ্রিকভাবে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা ছিল। বিশেষ এ স্থানটি আমাদের নবী ﷺ -এর জন্যেই।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা কতিপয় সাহাবী পরস্পর আলোচনা করছিলেন। একজন বললেন, হযরত ইবরাহীম (আ.) হলেন আল্লাহর বন্ধু বা খলিল। অপর একজন বললেন, হযরত আদম হলেন সাফিউল্লাহ [আল্লাহর মনোনীত]। তৃতীয় একজন বললেন, হযরত ঈসা (আ.) হলেন কালিমাতুল্লাহ বা রূহুল্লাহ। কেউ বললেন, হযরত মূসা (আ.) হলেন কালীমুল্লাহ ইত্যবসরে নবী করীম ﷺ সেখানে তাশরীফ আনলেন, তিনি বললেন, আমি তোমাদের আলোচনা শুনেছি, নিঃসন্দেহে তাঁরা এমনই ছিলেন। اِلَّا وَاَنَا حَبِيْبُ اللّٰهِ وَلَا فَخْرَ 'তবে আমি হলাম হাবীবুল্লাহ, এটা কোনো গর্বের বিষয় নয়। -[মাযহারী- খুলাসাতুত তাফসীর -এর বরাতে]

قَوْلُهٗ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ : অর্থাৎ যে সকল নবী-রাসূলের বৃত্তান্ত বর্ণিত হলো, আমি তাদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে।

قَوْلُهٗ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ الخ : **প্রশ্ন :** হযরত ঈসা (আ.) -এর আলোচনা বিশেষভাবে উল্লেখ করার ফায়দা কি?

উত্তর : এর দ্বারা হযরত ঈসা (আ.)-এর মর্যাদা প্রকাশ এবং ইহুদীদের ধারণা খণ্ডন করা উদ্দেশ্য। কারণ ইহুদিরা হযরত ঈসা (আ.)-কে নবী মানত না। উপরন্তু বিভিন্নরূপ কটুক্তি করত।

প্রশ্ন : পবিত্র কুরআনে অনেক নবীদের আলোচনা এসেছে; কিন্তু কারো ক্ষেত্রে পিতৃ পরিচয় তথা অমুকের পুত্র অমুক উল্লেখ করা হয়নি। একমাত্র হযরত ঈসা (আ.)-এর ক্ষেত্রে ঈসা ইবনে মরিয়ম উল্লিখিত হয়েছে, এর রহস্য কি?

উত্তর : এর দ্বারা নাসারাদের আকিদা খণ্ডন করা হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ.) স্বয়ং আল্লাহর পুত্র ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন মরিয়মের পুত্র ঈসা। যেভাবে অন্যান্য মানুষ মায়ের গর্ভ থেকে সৃষ্টি হয়, হযরত ঈসা (আ.)-ও হযরত মরিয়ম (আ.) -এর গর্ভ থেকে জন্মলাভ করেছেন।

قَوْلُهُ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ **আয়াতের সারমর্ম :** নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে সঠিক ইলমপ্রাপ্ত হওয়ার পরে মানুষের মধ্যে যেসব মতানৈক্য দেখা যায় এমনকি কলহ-দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধেরও সূত্রপাত ঘটে তা এ কারণে নয় যে, [নাঊযুবিল্লাহ] আল্লাহ অক্ষম ছিলেন, এসব মতবিরোধ এবং কলহ প্রতিরোধের শক্তি তাঁর ছিল না। বস্তুত তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তবে নবীগণের দাওয়াত থেকে বিমুখ হওয়ার কারো সুযোগ থাকত না এবং কুফরি ও নাফরমানি করা এবং তাঁর জমিনে ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করা কারো সাধ্য হতো না। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা এমন ছিল না যে, মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে ছিনিয়ে নিয়ে তাদের সবাইকে একই গতির উপর চলতে বাধ্য করবেন। তিনি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে মানুষকে পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন। এ কারণেই তাদেরকে ধর্ম বিশ্বাস এবং আমলে বিভিন্ন মত ও পথের মধ্য থেকে নিজেদের জন্যে কোনো একটি নির্বাচনের স্বাধীনতা দিয়েছেন। নবীদেরকে তিনি দারোগারূপে প্রেরণ করেননি যে, বাধ্যতামূলক তারা লোকদেরকে ঈমান ও আনুগত্যের প্রতি টেনে আনবেন; বরং তাদের প্রেরণের উদ্দেশ্য এই যে, বিভিন্ন দলিল ও প্রমাণাদি দ্বারা মানুষকে সততা ও ন্যায়ের প্রতি আহ্বান করবেন। বস্তুত যে সকল মতবিরোধ এবং যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছে তা সব এ কারণেই যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যে ইচ্ছাশক্তি ব্যবহারের স্বাধীনতা দিয়েছিলেন তাকে কাজে লাগাবে। আর এ স্বাধীনতার কারণেই মানুষ বিভিন্ন মত ও পথ বেছে নিয়েছে। আল্লাহ যদি সবাইকে সরল সঠিক পথের উপর চালাতে ইচ্ছা করতেন তাহলে অবশ্যই তা পারতেন। এমন নয় যে, তিনি তা চাইতেন কিন্তু স্বীয় উদ্দেশ্যে তিনি সফল হতেন না [নাঊযুবিল্লাহ]। -[জামালাইন]

قَوْلُهُ هُدَى النَّاسِ جَمِيْعًا : এ ইবারতটুকু বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য একথা বলে দেওয়া যে, لَوْ شَاءَ হলো فِعْل مُتَعَدِّى আর তার مَفْعُوْل মাহজুফ রয়েছে। এটি হলো তার مَفْعُوْل

প্রশ্ন: সাধারণ ও প্রচলিত নিয়ম হলো, مَشِيَّة-এর مَفْعُوْل ওটাই হয়ে থাকে যা جَزَاء দেখে বুঝে আসে। যেমন কুরআনের আয়াত– لَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَهَدَاكُمْ -এর মাঝে রয়েছে। এ আয়াতের মূলরূপ হলো– لَوْ شَاءَ اللّٰهُ هِدَايَتَكُمْ لَهَدَاكُمْ সুতরাং উক্ত নিয়মের আলোকে উল্লিখিত আয়াতের মূলরূপ এমন হওয়া উচিত ছিল– لَوْ شَاءَ اللّٰهُ عَدَمَ الْقِتَالِ مَا اقْتَتَلُوْا কিন্তু মুফাসসির (র.) এখানে এমন বস্তুকে مَفْعُوْل মেনেছেন যা جَزَاء থেকে বুঝে আসে না। এতে বুঝা গেল مُصَنِّف এ স্থলে বর্ণিত নিয়মের সাথে একমত নন। এর রহস্য কি?

উত্তর : মুফাসসির (র.) নিয়মের সাথে **একমতই** আছেন। তবে এখানে সে নিয়ম প্রযোজ্য হচ্ছে না। এর কারণ হচ্ছে مَا اقْتَتَلَ দ্বারা যে مَفْعُوْل সাব্যস্ত হয়, তা হলো عَدَمُ الْقِتَالِ আর কোনো مَعْدُوْم বস্তুর সাথে مَشِيَّة এবং اِرَادَة-এর সম্পর্ক হতে পারে না। এ কারণে মুফাসসির (র.) এমনটি করেছেন।

قَوْلُهُ لِاخْتِلَافِهِمْ : এর সম্পর্ক হলো اِقْتَتَلَ -এর সাথে।

اٰمَنَ : ثَبَتَ عَلٰى اِيْمَانِهِ -এর ব্যাখ্যা ثَبَتَ দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, ঈমান তো ইখতেলাফের পূর্বেই বিদ্যমান ছিল। ইখতেলাফের পর তার উপর কায়েম ছিল।

٢٥٤. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ زَكٰوتَهٗ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِدَاءٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ صَدَاقَةٌ تَنْفَعُ وَّلَا شَفَاعَةٌ بِغَيْرِ اِذْنِهٖ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِرَفْعِ الثَّلَاثَةِ وَالْكٰفِرُوْنَ بِاللّٰهِ اَوْ بِمَا فُرِضَ عَلَيْهِمْ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ لِوَضْعِهِمْ اَمْرَ اللّٰهِ تَعَالٰى فِىْ غَيْرِ مَحَلِّهٖ.

অনুবাদ :

২৫৪. হে মু'মিনগণ! আমি যা তোমাদেরকে দিয়েছি তা হতে তোমরা ব্যয় কর অর্থাৎ তোমরা তার জাকাত আদায় কর। সেদিনের পূর্বে যেদিন ক্রয়-বিক্রয় ফিদিয়া দান বন্ধুত্ব এমন সহৃদ্যতা যা উপকারে আসে এবং তাঁর [আল্লাহর] অনুমতি ছাড়া কোনোরূপ সুপারিশ থাকবে না। ঐ দিন হলো কিয়ামতের দিন। شَفَاعَة، خُلَّة، بَيْع এ তিনটি শব্দ অপর এক কেরাতে رَفْع সহকারে পঠিত রয়েছে। আর যারা আল্লাহর বা যা ফরজ করা হয়েছে তার অস্বীকারকারী তারাই সীমালঙ্ঘনকারী। আল্লাহর নির্দেশসমূহকে অপাত্রে স্থাপন করার দরুন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ زَكَاتَهٗ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে খরচ করার দ্বারা ওয়াজিব খরচ উদ্দেশ্য। সামনের কঠোর উক্তি এ বিষয়ে প্রমাণ বহন করছে। কেননা যে কাজ ওয়াজিব নয় তার ব্যাপারে কঠোর উক্তি করা হয় না। কিন্তু হযরত থানভী (র.) বলেন, এখানে اِنْفَاق وَاجِب এবং غَيْر وَاجِب উভয়টিই উদ্দেশ্য হতে পারে। পরের وَعِيْد এ সম্পর্কে নয়; বরং সেটিতে কিয়ামতের ভয়াবহতা বুঝানো হয়েছে। –[জামালাইন]

قَوْلُهٗ فِدَاءٌ : فِدْيَة -কে اِشْتِرَاءُ النَّفْسِ مِنَ الْهَلَاكَةِ -কে। ফিদিয়া তথা بَيْع -কে দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। কেননা فِدَاء বলা হয় মুক্তিপণ বলা হয় ঐ অর্থকে যা কোনো কয়েদিকে মুক্ত করার জন্যে প্রদান করা হয়। এখানে সবব দ্বারা মুসাব্বাব উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। কেননা بَيْع শাস্তি থেকে পরিত্রাণের ফায়দা দেয় না; বরং ফিদিয়া পরিত্রাণের ফায়দা দেয়। –[জামালাইন]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ (الْاٰيَة) : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর রাহে খরচ করা। ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যে, যে সকল মানুষ ঈমানের রাস্তা অবলম্বন করেছে তাদের ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে [যার উপর তারা ঈমান আনয়ন করেছে] জান ও মাল উৎসর্গ করা উচিত। কাজের সময় এখনই। পরকালে না কোনো কর্ম করা যাবে, না কোনো ছওয়াব কিনতে পাওয়া যাবে, না পরিস্থিতির দ্বারা লাভ করা যাবে। আর না কোনো সুপারিশকারী পাওয়া যাবে।

قَوْلُهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفٰعَةٌ : ইহুদি নাসারা এবং কাফের ও মুশরিকরা নিজ নিজ ধর্মগুরু তথা নবী, ওলী, পীর, বুজুর্গ প্রমুখের ব্যাপারে এ বিশ্বাস পোষণ করত যে, আল্লাহর উপর তাদের এরূপ প্রভাব রয়েছে যে, তারা তাদের ক্ষমতা বলে নিজেদের অনুসারীদের ব্যাপারে যা ইচ্ছা তা আল্লাহর পক্ষ থেকে হাসিল করিয়ে দেবেন বা দিতে পারেন। এটাকে তারা শাফাআত বলত। অর্থাৎ বর্তমানের অজ্ঞ, মূর্খ মনিবদের ন্যায় তাদের বিশ্বাস ছিল যে, আমাদের

বুজুর্গগণ উড়ে গিয়ে আল্লাহর কাছে বসবেন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করিয়ে ছাড়বেন। এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর নিকট এমন কোনো শাফাআতের অস্তিত্ব নেই। এরপর আয়াতুল কুরসী ও অন্যান্য আয়াত ও হাদীস শরীফে বলে দেওয়া হয়েছে যে, অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার নিকট ভিন্ন এক প্রকারের শাফাআত লাভ হবে। তবে তা, ঐ সকল মানুষের ব্যাপারে করতে পারবেন, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ শাফাআতের অনুমতি দেবেন। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা কেবল তাওহীদে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের জন্যেই অনুমতি দান করবেন। ফেরেশতা, নবী-রাসূল, শহীদ এবং নেককার ব্যক্তিগণ এ শাফাআত করার অধিকারী হবে। তবে আল্লাহর উপর কারো কোনো প্রকার চাপ থাকবে না; বরং এর বিপরীতে এ সকল বান্দাগণও আল্লাহর ভয়ে এ পরিমাণ ভিতু এবং কম্পিত থাকবে যে, তাদের মুখমণ্ডলের রং বিবর্ণ হয়ে যাবে। وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُوْنَ (اَلْاٰيَةَ) -[জামালাইন]

قَوْلُهُ لَا بَيْعٌ فِدَاءٌ : بَيْع -এর ব্যাখ্যায় فِدَاء শব্দ উল্লেখ করার কারণ হলো, فِدَاء বলা হয়- اِشْتِرَاءُ النَّفْسِ مِنَ الْهَلَاكَةِ অর্থাৎ فِدْيَة হলো ঐ মূল্য যা বন্দি মুক্তির বিনিময়ে আদায় করা হয়। মূলত এখানে سَبَبْ বলে مُسَبَّبْ বোঝানো হয়েছে। কেননা بَيْع আজাব থেকে মুক্তি দিতে পারে না; বরং فِدْيَة মুক্তি দিতে পারে ।

قَوْلُهُ تَنْفَعُ : এ শব্দটি বৃদ্ধি করে একথা জানানো উদ্দেশ্য যে, সাধারণ বন্ধুত্বকে নাকচ করা হয়নি; বরং উপকারী বন্ধুত্বকে নাকচ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ بِغَيْرِ اِذْنِهِ : এ অংশটুকু বৃদ্ধির উদ্দেশ্য একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া। প্রশ্নটি হলো, وَلَا شَفَاعَةَ দ্বারা ঢালাওভাবে শাফাআতকে নাকচ করা কিভাবে সহীহ হলো? অথচ হাদীস দ্বারা কিয়ামতের দিন নবীগণের শাফাআত স্বীকৃত আছে।

উত্তর. এখানে যদিও مُطْلَقْ شَفَاعَةَ -কে নাকচ করা হয়েছে, কিন্তু অন্য আয়াতে এ مُطْلَقْ -কে مُقَيَّد করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِرَفْعِ الثَّلَاثَةِ : অর্থাৎ لَا بَيْعٌ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ এ তিনটি শব্দে لَا لِنَفْيِ الْجِنْسِ -এর اِسْم হওয়ার কারণে সাধারণ নিয়মে فَتْحَة হবে। যেমন- ইবনে কাছির, আবূ ওমর -এর কেরাতে ফাতহা রয়েছে; কিন্তু তাঁদের ছাড়া অন্যদের কেরাতে رَفْع সহ পঠিত রয়েছে। رَفْع হওয়ার কারণ হলো, মূলত এ ইবারতটি একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হলো- هَلْ فِيْهِ بَيْعٌ اَوْ خُلَّةٌ اَوْ شَفَاعَةٌ ? জবাব হলো- لَا بَيْعٌ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ প্রশ্ন ও উত্তরের মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের জন্যে জবাবেও رَفْع প্রদান করা হয়েছে। কেউ কেউ এ জবাবও দিয়েছেন যে, لَا لِنَفْيِ الْجِنْسِ -কে তাকরার করার কারণে مُهْمَل সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং بَيْع মুবতাদা হওয়ার কারণে مَرْفُوْع হয়েছে। অবশ্য এ সুরতে একটি প্রশ্ন দেখা দেয় যে, তাহলে بَيْعٌ خُلَّةٌ شَفَاعَةٌ হলো نَكِرَة যার মুবতাদা হওয়া শুদ্ধ নয়। এর জবাব হলো- نَكِرَة تَحْتَ النَّفْيِ হওয়ার কারণে তা মুবতাদা হওয়া শুদ্ধ হয়েছে।

وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ : এখানে কাফের দ্বারা হয়তো সে সকল মানুষকে বুঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহর হুকুমের আনুগত্যকে অস্বীকার করে এবং তাদের ধন-সম্পদকে আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে ব্যয় করতে রাজি নয়। অথবা ঐ সকল মানুষ উদ্দেশ্য যারা কিয়ামতের দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। যে ব্যাপারে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে কিংবা ঐ সকল লোক উদ্দেশ্য যারা এমন অলীক ধারণায় লিপ্ত রয়েছে যে, পরকালে কোনো না কোনোভাবে তারা নাজাত ক্রয়ের এবং বন্ধুত্ব ও সুপারিশের মাধ্যমে উদ্দেশ্য হাসিল করার সুযোগ লাভ করবে। -[জামালাইন]

٢٥٥. اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اَىْ لَا مَعْبُوْدَ بِحَقٍّ فِى
الْوُجُوْدِ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الدَّائِمُ الْبَقَاءِ
الْقَيُّوْمُ الْمُبَالِغُ فِى الْقِيَامِ بِتَدْبِيْرِ خَلْقِهٖ
لَاتَاْخُذُهٗ سِنَةٌ نُعَاسٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهٗ مَا فِى
السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مِلْكًا وَّخَلْقًا
وَّعَبِيْدًا مَنْ ذَا الَّذِىْ اَىْ لَا اَحَدَ يَشْفَعُ
عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ لَهٗ فِيْهَا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ
اَيْدِيْهِمْ اَىِ الْخَلْقِ وَمَا خَلْفَهُمْ اَىْ اَمْرَ
الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ
عِلْمِهٖ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْئًا مِنْ مَعْلُوْمَاتِهٖ
اِلَّا بِمَا شَآءَ اَنْ يُعْلِمَهُمْ بِهٖ مِنْهَا بِاَخْبَارِ
الرُّسُلِ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
قِيْلَ اَحَاطَ عِلْمُهٗ بِهِمَا وَقِيْلَ مُلْكُهٗ
وَقِيْلَ الْكُرْسِىُّ بِعَيْنِهٖ مُشْتَمِلٌ عَلَيْهِمَا
لِعَظْمَتِهٖ لِحَدِيْثِ مَا السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ
فِى الْكُرْسِىِّ اِلَّا كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍ اُلْقِيَتْ
فِىْ تُرْسٍ وَلَا يَـُٔوْدُهٗ يَثْقُلُهٗ حِفْظُهُمَا اَىِ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَلِىُّ فَوْقَ
خَلْقِهٖ بِالْقَهْرِ الْعَظِيْمُ الْكَبِيْرُ.

অনুবাদ :

২৫৫. আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই অর্থাৎ বস্তুত অন্য কোনো উপাস্যের অস্তিত্ব নেই। তিনি চিরঞ্জীব যাঁর অস্তিত্ব চিরকাল থাকবে, অবিনশ্বর সৃষ্টির পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে যিনি অতিশয় তৎপর, তাঁকে তন্দ্রা ঝিমানি ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় সব কিছু মালিকানা, সৃষ্টি ও দাস সকল রূপে তাঁরই, তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করবে এমন কে আছে? অর্থাৎ কেউ নেই তাদের সম্মুখে যা অর্থাৎ সৃষ্টি ও পশ্চাতে যা আছে তা অর্থাৎ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল কিছু তিনি অবগত। যা তিনি ইচ্ছা করেন অর্থাৎ রাসূলগণ কর্তৃক সংবাদ দানের মাধ্যমে তিনি তাদেরকে যা জানাতে ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। অর্থাৎ তাঁর অবহিত বিষয়সমূহের কিছুই তারা জানে না। তাঁর আসন আকাশ ও পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত।

কেউ কেউ বলেন, এর মর্ম হচ্ছে– তাঁর জ্ঞান এতদুভয়কে বেষ্টন করে রেখেছে। কেউ কেউ বলেন, তাঁর সাম্রাজ্য এতদুভয়ের মাঝে বিস্তৃত। কেউ কেউ বলেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁর কুরসিই তার বিরাটত্বে এতদুভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। হাদীসে আছে, একটি বিরাট ঢালের মধ্যে সাতটি দিরহাম ঢেলে রাখলে যে অবস্থা কুরসির তুলনায় সাত আকাশের অবস্থাও হলো তদ্রূপ। তাদের অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না তা তাঁর নিকট ভারী বলে মনে হয় না। তিনি সর্বোচ্চ পরাক্রমে সকল সৃষ্টির ঊর্ধ্বে, মহান শ্রেষ্ঠ।

তাহকীক ও তারকীব

فِى الْوُجُوْدِ : বাস্তবে। اَلدَّائِمُ الْبَقَاءُ : যার অস্তিত্ব চিরকাল থাকবে। بِتَدْبِيْرِ خَلْقِهِ : সৃষ্টির পরিচালনায়।
سِنَةٌ : তন্দ্রা, মূলরূপ وَسْنٌ নিয়মের বাইরে , و -কে ফেলে তার পরিবর্তে শেষে ة যোগ করা হয়েছে।
نُعَاسٌ : তন্দ্রা, ঘুমের পূর্বে যা হয়। تُرْسٌ : ঢাল। لَا يَؤُدُهُ : তাঁকে ক্লান্ত করে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ الخ : **আয়াতুল কুরসী :** এ আয়াতকে আয়াতুল কুরসী **বলা হয়।** হাদীসে এ আয়াতকে কুরআনের শ্রেষ্ঠতম আয়াত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর প্রভূত ফজিলত ও ছওয়াব **বর্ণিত হয়েছে।** এ আয়াতে এত পূর্ণাঙ্গভাবে আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে, যার কোনো নজির নেই। এ কারণে হাদীস শরীফে **এটাকে কুরআনের** সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট আয়াত বলা হয়েছে।

আয়াতুল কুরসীর ফজিলত : সহীহ হাদীস শরীফে আয়াতুল কুরসীর বিস্তর ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। **এর ফজিলত** ও বরকত সম্পর্কে সম্ভবত কেউ অনবহিত নয়। এটা পবিত্র কুরআনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আয়াত। **মুসনাদে আহমদের** বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াতকে অন্য সকল আয়াত থেকে উৎকৃষ্ট বলেছেন। **হযরত উবাই ইবনে** কা'ব এবং হযরত আবূ যর (রা.) থেকেও এ ধরনের একটি বর্ণনা রয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) **বলেন, রাসূল** ﷺ ইরশাদ করেছেন− সূরা বাকারায় একটি আয়াত আছে যা সকল আয়াতের সর্দার। যে ঘরে তা পাঠ **করা হয়, সে ঘর থেকে** শয়তান বের হয়ে যায়।

নাসায়ী শরীফের এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন− যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাজের পরে আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে বেহেশতে প্রবেশের ব্যাপারে মৃত্যু ছাড়া তার কোনো প্রতিবন্ধক থাকবে না।

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার জাত ও সিফতের বর্ণনা অতি চমৎকার ও উন্নত ভঙ্গিতে **বর্ণিত হয়েছে।** এ আয়াতে প্রকাশ্য ইসম ও সর্বনামের মাধ্যমে ১৭ বার আল্লাহর নাম উল্লিখিত হয়েছে। যথা− ১. اَللّٰهُ ২. هُوَ ৩. الْحَىُّ ৪. الْقَيُّوْمُ ৫. لَا تَأْخُذُهُ -এর সর্বনাম ৬. لَهُ -এর সর্বনাম ৭. عِنْدَهُ -এর সর্বনাম ৮. بِاِذْنِهِ -এর সর্বনাম ৯. يَعْلَمُ -এর সর্বনাম ১০. عِلْمِهِ -এর সর্বনাম ১১. شَاءَ -এর সর্বনাম ১২. كُرْسِيُّهُ -এর সর্বনাম ১৩. يَؤُدُهُ -এর সর্বনাম ১৪. وَهُوَ ১৫. الْعَلِىُّ ১৬. الْعَظِيْمُ ১৭. حِفْظُهُمَا মাসদারের উহ্য সর্বনাম। এ মাসদারটি মাফউলের দিকে মুযাফ হয়েছে। আর তা হলো প্রকাশ্য সর্বনাম। -এর জন্যে ফায়েল আবশ্যক, আর ফায়েল হলো আল্লাহ। মাসদার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় তা প্রকাশ্যে উল্লিখিত হয়। যেমন বলা হয়− وَلَا يَؤُدُهُ اَنْ يَحْفَظَهُمَا

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ -এর মধ্যে اَللّٰهُ শব্দটি জাতিগত নাম। **অর্থাৎ এমন সত্তা যিনি সমস্ত উত্তম গুণে গুণান্বিত** এবং সকল দোষত্রুটি থেকে মুক্ত। لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ সে সত্তার বর্ণনা যিনি ছাড়া কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ তিনি চিরঞ্জীব ও স্বাধিষ্ট, বিশ্বধাতা, যিনি অনাদি, অনন্ত। হায়াতের বিশেষণ তাঁর সত্তার অংশবিশেষ। **মৃত্যু কিংবা নাস্তি** তার উপর কখনো আরোপিত হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না। اَلْحَىُّ فِىْ نَفْسِهِ لَا يَمُوْتُ اَبَدًا (اِبْنُ كَثِيْر)

প্রশ্ন: পৃথিবীতে কখনো কি এমন কোনো জাতি গোষ্ঠী অতিবাহিত হয়েছে, যারা আল্লাহর اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ বিশেষণে সন্দেহ করেছে বা অস্বীকার করেছে?

উত্তর : একটি নয়; বরং রোম সাগরের তীরে বসবাসরত এমন অনেক গোত্র অতিবাহিত হয়েছে, যাদের বিশ্বাস এই ছিল যে, প্রত্যেক বছর অমুক তারিখে তাদের খোদা মৃত্যুবরণ করে এবং পরের দিন নতুনভাবে অস্তিত্ব লাভ করে। সুতরাং

প্রত্যেক বছর উক্ত নির্দিষ্ট তারিখে খোদার মৃতদেহ তৈরি করে তা আগুনে পোড়ানো হতো, আর পরের দিন তার জন্মের আনন্দে বিভিন্নরূপ আনন্দ উৎসব করত। হিন্দু ধর্মে দেবতাদের মৃত্যু এবং পুনর্জন্ম এ আকিদার দৃষ্টান্ত। খ্রিস্টানদের আকিদাই বা এ ছাড়া আর কি যে, প্রথমে খোদা মানুষের আকৃতিতে জগতে আগমন করত। অতঃপর ক্রুশের উপর গিয়ে মৃত্যুবরণ করত। –[জামালাইন]

قَوْلُهُ لَا مَعْبُوْدَ بِحَقٍّ الخ : এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اِلٰهَ দ্বারা مَعْبُوْد حَقِيْقِى উদ্দেশ্য; مُطْلَق مَعْبُوْد উদ্দেশ্য নয়। কেননা مَعْبُوْد مُطْلَق غَيْر حَقِيْقِى অনেক রয়েছে। আর مُطْلَق مَعْبُوْد -এর نَفِى করা হলে, مذب بَارِى লাযেম আসবে। অথচ এটা অসম্ভব। অবশ্য এ সুরতে এ প্রশ্ন হবে যে, যখন اِلٰه দ্বারা مَعْبُوْد حَقِيْقِى উদ্দেশ্য– যিনি একক, তখন اِلَّا هُوَ এর দ্বারা اِسْتِثْنَاء শুদ্ধ হবে না। কেননা এটি اِسْتِثْنَاءُ الشَّئْ عَنْ نَفْسِه হবে।

উত্তর : مَعْبُوْد بِالْحَقِّ যেহেতু একটি كُلِّى সেহেতু مُسْتَثْنٰى مِنْه একটি হওয়ার কারণে اِسْتِثْنَاء শুদ্ধ হয়েছে।

قَوْلُهُ فِى الْوُجُوْدِ : এ অংশ দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, لَا -এর খবরটি মাহযূফ রয়েছে। আর সেটি হলো فِى الْوُجُوْدِ

قَوْلُهُ الْقَيُّوْمُ : এটি قَائِم থেকে مُبَالَغَة -এর সীগাহ। অর্থ– যে নিজে কায়েম থাকে এবং অন্যকে কায়েম রাখে। قَيُّوْم মূলত قَيْوُوْمٌ ছিল। وَاو এবং يَاء একত্র হওয়ার কারণে প্রথম [সাকিনযুক্ত।] وَاو -কে يَاء দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে এবং يَاء -কে يَاء -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। قَيُّوْم হয়েছে।

খ্রিস্টানরা যেভাবে আল্লাহর হায়াত বিশেষণের ব্যাপারে সত্য-বিচ্যুত হয়েছে তদ্রূপ তার قَيُّوْمِيَّة বিশেষণের ব্যাপারেও আজব ভ্রষ্টতায় নিমগ্ন হয়েছে। তাদের আকিদা এই যে, যেভাবে পুত্র পিতার অংশীদারিত্ব ছাড়া খোদা হতে পারে না তদ্রূপ খোদাও পুত্রের অংশিদারিত্ব ছাড়া খোদা হতে পারে না। নাউযুবিল্লাহ! আল্লাহর পুত্র মসীহ খোদার মুখাপেক্ষী, তদ্রূপ পিতাও তাঁর খোদায়িত্বে মসীহের মুখাপেক্ষী। قَيُّوْمِيَّة বিশেষণ উল্লেখ করে কুরআন খ্রিস্টানদের আকিদার উপর আঘাত হেনেছে। قَيُّوْم এমন সত্তা, যিনি স্বীয় সত্তার সাথে অধিষ্ঠিত এবং অন্যের অস্তিত্বের কারণ। সমস্ত সৃষ্টিকে তিনি অধিষ্ঠিত রেখেছেন। প্রত্যেক বস্তু স্বীয় অস্তিত্বে তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে যে, اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ -ই হলো ইসমে আজম। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ : এটি আল্লাহ তা'আলার صِفَات سَلْبِيَّة -এর অন্তর্ভুক্ত। سِنَة -এর সম্পর্ক চোখের সাথে। এটি নবীগণের ঘুম। আর نَوْم -এর সম্পর্ক কলবের সাথে। এটি فِطْرَة طَبِيْعَة যা প্রতিটি প্রাণীর উপর অপরিহার্যভাবে চেপে বসে। سِنَة বলা হয়– مَا يَتَقَدَّمُ مِنَ الْفُتُوْرِ وَالْاِسْتِرْخَاءِ مَعَ بَقَاءِ الشُّعُوْرِ অর্থাৎ ঘুমের পূর্বের গাফলতের সময় যে অনুভূতি বাকি থাকে তাকে سِنَة বলা হয়। এটিকে نُعَاس -ও বলা হয়।

لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তা'আলা তন্দ্রা ও নিদ্রা হতে মুক্ত। পূর্বের বাক্য দ্বারা বুঝা গেছে যে, আল্লাহ তা'আলা সমগ্র আসমান-জমিন এবং উভয়ের মধ্যকার সকল কায়েনাতকে তিনি অটুট রেখেছেন। কাজেই কোনো ব্যক্তির জন্যে তাঁর সৃষ্টি মোতাবেক এদিক-সেদিক যাওয়া সম্ভব নয়। যে মহান সত্তা এমন বিশাল কাজ আঞ্জাম দেন সম্ভবত তিনি কোনো সময় ক্লান্তও হতে পারেন, তাঁর বিশ্রাম ও নিদ্রার জন্যে কিছু সময় থাকা উচিত। এ বাক্যে মানুষের এ ধরনের ধারণার ব্যাপারে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে, মহান আল্লাহকে নিজেদের কিংবা অন্যান্য মাখলুকের সাথে তুলনা করো না। কারণ তিনি কোনোরূপ তুলনা এবং উপমা থেকে পবিত্র। তাঁর মহাশক্তির সামনে এ সকল কাজ কষ্টকর নয় এবং এতে তিনি কোনোরূপ ক্লান্তি অনুভব করেন না। তাঁর পবিত্র সত্তা সকল প্রকার প্রভাব, কষ্ট-ক্লেশ ও তন্দ্রা-নিদ্রা থেকে মুক্ত। জাহিলি ধর্মের দেবতারা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয় এবং ঘুমায়। এমন পরিস্থিতিতে তাদের বিভিন্নরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রকাশ পায়। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের আকিদা এই যে, আল্লাহ তা'আলা ছয় দিনে আসমান ও জমিনের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। সপ্তম দিনে তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে, কিন্তু ইসলামের খোদা সদা জাগ্রত ও সজাগ। কোনোরূপ কষ্ট ও ক্লান্তি থেকে পবিত্র।

قَوْلُهُ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ : لَهُ -এর لَام হলো تَمْلِيْك -এর জন্য اِنْتِفَاع -এর জন্য নয়। অতএব, আসমান-জমিনের সকল বস্তু তাঁরই মালিকানাধীন।

مِلْكًا خَلْقًا : এর দ্বারা ইশারা করেছেন যে, لَهُ -এর لَام টি نَفْع -এর জন্যে নয়। যেমনটি সাধারণত হয়ে থাকে। কেননা আল্লাহ তা'আলা কোনো বস্তুর উপকারের মুখাপেক্ষী নন।

قَوْلُهُ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ : অর্থাৎ এমন কেউ নেই যে, তাঁর অনুমতিবিহীন তাঁর সমীপে কারো জন্যে সুপারিশের ব্যাপারে মুখ খুলবে।

হযরত মসীহ (আ.)-এর শাফাআতে কুবরা খ্রিস্টানদের একটি বিশেষ আকিদা। কুরআন মাজীদ খ্রিস্টানদের বিশেষ কুফরি আকিদাসমূহ এবং শাফাআত ইত্যাদির উপর আঘাত হেনেছে। খ্রিস্টানরা যেখানে শাফাআতের উপর তাদের নাজাতের বুনিয়াদ রেখেছে; এর বিপরীতে কোনো কোনো মুশরিক জাতি আল্লাহকে বিশেষ আইনকানুনের সাথে এমনভাবে আবদ্ধ জ্ঞান করেছে যে, তাদের জন্যে ক্ষমা ও শাফাআতের আর কোনো অবকাশ নেই। ইসলাম মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করে বলে দিয়েছে যে, কারো শাফাআতের উপর নাজাত সীমাবদ্ধ নয়। অবশ্য আল্লাহ তা'আলা এর অবকাশ রেখেছেন যে, তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে ক্ষেত্রবিশেষ শাফাআতের অনুমতি দান করবেন এবং কবুলও করবেন। হাশরের ময়দানে সবচেয়ে বড় শাফাআতকারী হবেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। এ আয়াত থেকে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত শাফাআতের বিষয়টি বের করেছেন।

قَوْلُهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ : অর্থাৎ উপস্থিত অনুপস্থিত, অনুভবযোগ্য বা অযোগ্য ইত্যাদি সবকিছুর জ্ঞান আল্লাহর রয়েছে। সবকিছুকেই সামানভাবে তাঁর জ্ঞানে বেষ্টন করে রেখেছে।

قَوْلُهُ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ : অর্থাৎ মানুষ বরং সমস্ত মাখলুক আল্লাহর ইলমের কোনো অংশকে আয়ত্তে আনতে পারে না। তবে আল্লাহ যতটুকু চান বান্দাকে তা দান করেন। সমস্ত সৃষ্টিরাজির অণু-পরমাণু পরিমাণ বস্তুর তাঁর জ্ঞান রয়েছে। এটা আল্লাহর বিশেষ একটি গুণ, কেউ এতে শরিক নেই।

قَوْلُهُ مِنْ مَعْلُوْمَاتِهٖ : مِنْ عِلْمِهٖ -এর ব্যাখ্যায় مِنْ مَعْلُوْمَاتِهٖ উল্লেখ করে বুঝিয়েছেন যে, عِلْم দ্বারা مَعْلُوْمَات উদ্দেশ্য। কেননা عِلم হলো صِفَت بَسِيْط যার মাঝে تَجَزِّى হতে পারে না। অবশ্য مَعْلُوْمَات -এর মধ্যে تجزى হতে পারে।

قَوْلُهُ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ : اَلْكُرْسِىُّ অর্থ مَا يُجْلَسُ عَلَيْهِ যার উপর বসা হয়। كُرْسِى -এর মূল অর্থ হলো– কোনো বস্তু সম্পর্কেও অপর কোনো বস্তুর সাথে মিলানো। এর থেকেই كُرَّاسَة এর ব্যবহার। কেননা, এর মাঝেও কিছু পৃষ্ঠাকে অপর কিছু পৃষ্ঠার সাথে একত্র করা হয়। বলা হয়– تَكَرَّسَ فُلَانٌ الْحَطَبَ 'অমুক ব্যক্তি কাঠ একত্র করেছে।'

কুরসি শব্দটি সাধারণত রাজত্ব ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে اِسْتِعَارَه স্বরূপ বলা হয়। উর্দু ভাষায়ও কুরসি শব্দ বলে প্রশাসনিক ক্ষমতা উদ্দেশ্য নেওয়া হয়। আরশ কুরসির তত্ত্ব ও রহস্যের জ্ঞান মনুষ্য বিবেক বহির্ভূত। অবশ্য বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, আরশ ও কুরসি বিশালকায় বস্তু। সমস্ত আসমান ও জমিন থেকে তা বহুগুণ বড়। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) হযরত আবূ যার (রা.) থেকে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি রাসূল ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন, কুরসী কি এবং কেমন? রাসূল ﷺ উত্তর দিলেন, সে সত্তার কসম! যার হাতে আমার জান রয়েছে, সপ্ত আসমান ও জমিনের উদাহরণ আল্লাহর কুরসির সামনে এই যে, এক বিশাল ময়দানে কোনো আংটির বৃত্ত ফেলে দেওয়া হলো।

قَوْلُهُ وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার এ উভয় মহাসৃষ্টির সংরক্ষণে কোনো প্রকার কষ্ট অনুভব হয় না। কারণ মহাশক্তিশালী আল্লাহর কুদরতের সামনে এসব বস্তু অতি নগণ্য ও তুচ্ছ।

قَوْلُهُ وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ : অর্থাৎ তিনি অতি মহান এবং মর্যাদাবান। এ বাক্যে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ ও উত্তম গুণাবলির বিষয়াদি অতি স্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে এসে গেছে। –[মা'আরিফুল কুরআন]

٢٥٦. لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ عَلَى الدُّخُوْلِ فِيْهِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ اَىْ ظَهَرَ بِالْاٰيَاتِ الْبَيِّنَاتِ اَنَّ الْاِيْمَانَ رُشْدٌ وَالْكُفْرَ غَيٌّ نَزَلَتْ فِيْمَنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْاَنْصَارِ اَوْلَادٌ اَرَادَ اَنْ يُّكْرِهَهُمْ عَلَى الْاِسْلَامِ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ الشَّيْطَانِ اَوِ الْاَصْنَامِ وَهُوَ يُطْلَقُ عَلَى الْمُفْرَدِ وَالْجَمْعِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ تَمَسَّكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى بِالْعَقْدِ الْمُحْكَمِ لَا انْفِصَامَ اِنْقِطَاعَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ لِمَا يُقَالُ عَلِيْمٌ بِمَا يُفْعَلُ .

٢٥٧. اَللّٰهُ وَلِيُّ نَاصِرُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ اللّٰهُ مِنَ الظُّلُمٰتِ الْكُفْرِ اِلَى النُّوْرِ الْاِيْمَانِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓؤُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ذِكْرُ الْاِخْرَاجِ اِمَّا فِىْ مُقَابَلَةِ قَوْلِهِ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اَوْ فِىْ كُلِّ مَنْ اٰمَنَ بِالنَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ بِعْثَتِهِ مِنَ الْيَهُوْدِ ثُمَّ كَفَرَ بِهِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ .

অনুবাদ :

২৫৬. দীন সম্পর্কে অর্থাৎ তাতে প্রবেশের বিষয়ে জোর-জবরদস্তি নেই। সত্যপথ ভ্রান্তপথ হতে সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ সুস্পষ্ট আয়াত ও নিদর্শনাদি দ্বারা এ কথা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে, ঈমানের পথ হলো সত্যপথ আর কুফরির পথ হলো ভ্রান্তপথ। মদিনার আনসার সাহাবীগণ স্ব-স্ব সন্তানাদিকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করার প্রয়াস পেতে চাইলে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। যে তাগূতকে اَلطَّاغُوْتُ শব্দটি একবচন ও বহুবচন উভয়রূপে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ শয়তানকে মতান্তরে প্রতিমাসমূহের অস্বীকার করবে ও আল্লাহতে বিশ্বাস করবে, সন্দেহ নেই সে ধারণ করেছে ধরেছে মজবুত একটি হাতল সুদৃঢ় একটি গ্রন্থি। যা অটুট যা ছিন্ন হওয়ার নয়। যা কিছু বলা হয় তা আল্লাহ শুনেন, যা করা হয় এতদসম্পর্কে তিনি পরিজ্ঞাত।

২৫৭. যারা ঈমান আনে আল্লাহ তাদের অভিভাবক। সাহায্যকারী তিনি তাদেরকে অন্ধকার অর্থাৎ কুফরি হতে বের করে আলোতে অর্থাৎ ঈমানের দিকে নিয়ে যান। আর যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে তাগূত তাদের অভিভাবক। তারা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়। এখানে اِخْرَاج [বের করে আনা] দ্বারা বুঝা যায়, তা তার ভিতর ছিল অথচ কাফেরদের ভিতর ঈমান ছিল না। সুতরাং শব্দটির ব্যবহার يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ [অন্ধকার হতে তাদেরকে বের করে আনে] -এর মোকাবিলায় করা হয়েছে। কিংবা এ আয়াতটি হলো ঐ সমস্ত ইহুদিদের সম্পর্কে যারা রাসূল ﷺ -এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখত। কিন্তু আবির্ভাবের পর তাঁকে অস্বীকার করল। তারাই অগ্নির অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

তাহকীক ও তারকীব

اِكْرَاهٌ : জোর-জবরদস্তি। اَلرُّشْدُ : সত্যপথ। اَلْغَيُّ : ভ্রান্তপথ। اَلطَّاغُوْتُ : আল্লাহ ছাড়া যে কোনো বাতিল উপাস্য, স্বেচ্ছাচারী, শয়তান। উভয় লিঙ্গে এবং একবচনে ও বহুবচনে এর ব্যবহার রয়েছে। তবে বহুবচনের আলাদা শব্দ হলো طَوَاغِيْتُ এবং দ্বিবচনে طَاغُوْتَانِ ; اَلْعُرْوَةُ হাতল, গ্রন্থি। اَلْوُثْقٰى : মজবুত, সুদৃঢ়। اِنْفِصَامٌ : ছিন্ন হওয়া।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযূল : হুসাইন আনসারী নামক জনৈক ব্যক্তির দুটি ছেলে ইহুদি কিংবা খ্রিস্টান হয়ে গিয়েছিল। আনসারগণ যখন মুসলমান হলো তখন তিনি তাঁর পুত্রদেরকেও জোরপূর্বক মুসলমান বানাতে ইচ্ছা করলেন। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। শানে নুযূলের দিক দিয়ে মুফাসসিরগণ এটাকে আহলে কিতাবের জন্যে খাস মনে করেন। অর্থাৎ, ইসলামি রাষ্ট্রে অবস্থানকারী কোনো আহলে কিতাব যদি কর আদায় করে তাহলে তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হবে না। বস্তুত এ আয়াতের হুকুম ব্যাপক। অর্থাৎ কাউকে ইসলাম গ্রহণের জন্যে বাধ্য করা যাবে না। কারণ আল্লাহ্ হেদায়েত ও গোমরাহিকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তথাপি কুফর ও শিরকের সমাপ্তি এবং বাতিলের শক্তি খর্ব করার জন্যে জিহাদের বিধান, আর এখানে উল্লিখিত জোর-জবরদস্তি ভিন্ন ব্যাপার। জিহাদের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সে শক্তিকে দমন করা, যা আল্লাহর দীনের উপর আমল করতে এবং তাঁর মনোনীত দীনের প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়। কারণ এ ধরনের শক্তি মাঝে মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে থাকে। এ কারণেই জিহাদের নির্দেশ এবং প্রয়োজনীয়তা কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে। যেমন হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে- اَلْجِهَادُ مَاضٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ এভাবে মুরতাদ হওয়ার সাজা বা শাস্তির সাথেও এ আয়াতের কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ এ সাজার দ্বারা ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা উদ্দেশ্য নয়; বরং ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি ও নিয়মনীতির সংরক্ষণ উদ্দেশ্য। কোনো ইসলামি রাষ্ট্রে একজন কাফেরের স্বীয় কুফরির উপর অটল থাকার অনুমতি থাকতে পারে। কিন্তু একবার যখন সে ইসলামে দীক্ষিত হলো, তখন তার বিরুদ্ধাচরণ এবং তা থেকে পদচ্যুত হওয়ার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে না। কাজেই আগেই সে উত্তমরূপে ভেবেচিন্তে ইসলাম গ্রহণ করবে। কেননা যদি মুরতাদ হওয়ার অনুমতি দেওয়া হতো তাহলে বুনিয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি বিনষ্ট হয়ে যেত। আর এর দ্বারা মতবাদগত ভিন্নতা ও শত্রুতা বৃদ্ধি পেত। ফলে যা ইসলামি সমাজব্যবস্থার শান্তি, নিরাপত্তা এবং রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব আশঙ্কাযুক্ত হতো। এ কারণেই যেভাবে মানবাধিকারের নামে হত্যা, চুরি, ছিনতাই, ব্যভিচার ইত্যাদি অন্যায়ের অনুমতি দেওয়া যায় না। একইভাবে মুক্ত চিন্তার নামে একই ইসলামি রাষ্ট্রে মতবাদগত দ্রোহিতা তথা ধর্মচ্যুতির অনুমতিও দেওয়া যায় না। এটা কোনো বাধ্যবাধকতা নয়; বরং মুরতাদের মৃত্যুদণ্ড ঠিক সেভাবেই ন্যায়ানুগ বিচার, যেভাবে হত্যা ও ডাকাতি এবং বিভিন্ন চারিত্রিক অন্যায়ে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে কঠোর সাজা দেওয়া আইনের দৃষ্টিতে সঠিক বিবেচিত। একটির উদ্দেশ্য হলো, রাষ্ট্রীয় নিয়ম-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ, আর অপরটির উদ্দেশ্য হলো রাষ্ট্রকে বিভিন্ন ফিতনা-ফ্যাসাদ থেকে রক্ষা করা। রাষ্ট্রের সুশৃঙ্খলার জন্যে উভয় বিষয় অতি জরুরি। বর্তমান অধিকাংশ ইসলামি রাষ্ট্র এ উভয় বিষয়কে গুরুত্ব না দেওয়ারকারণে যেসব বিশৃঙ্খলা, নিরাপত্তাহীনতা ও অস্থিরতার শিকার হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

قَوْلُهُ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ : অভিধানের দিক দিয়ে এমন সব ব্যক্তিকে طَاغُوْت বলা হয়, যারা বৈধ সীমা থেকে অতিক্রম করে যায়। কুরআনের পরিভাষায় এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন ব্যক্তি, যে আল্লাহর দাসত্বের সীমা অতিক্রম করে স্বপ্রভুত্ব ও স্বনির্ভরতার পরিচয় দেয়। আল্লাহর বান্দাদেরকে নিজের দাসত্বে বাধ্য করে। আল্লাহর মোকাবিলায় কোনো এক বান্দার হঠকারিতার তিনটি স্তর রয়েছে-

১. মৌলিকভাবে আল্লাহর আনুগত্যকে সত্য মনে করে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাঁর হুকুমের খেলাফ করে এর নাম হলো ফিসক।
২. আল্লাহর আনুগত্য থেকে মৌলিকভাবে সে বের হয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ সাজে অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করে। এটা হলো কুফরি।
৩. নিজ প্রভুর বিদ্রোহী হয়ে তার দেশে প্রজাদের মধ্যে তার নিজের হুকুম চালায়। এ সর্বশেষ স্তরে কোনো ব্যক্তি উপনীত হলে তাকে তাগুত বলা হয়। -[জামালাইন]

قَوْلُهُ تَمَسَّكَ : اِسْتَمْسَكَ -এর ব্যাখ্যা تَمَسَّكَ দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, اِسْتَمْسَكَ -এর মধ্যে سِيْن হরফটি অতিরিক্ত। بَاب اِسْتِفْعَال -এর অর্থ প্রযোজ্য হবে না।

قَوْلُهُ ذِكْرُ الْاِخْرَاجِ : মুফাসসির (র.) এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, কাফেররা তো আলোর মধ্যে ছিলই না, তারপরও তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাওয়ার মর্ম কি? মুফাসসির (র.) এ প্রশ্নের দুটি জবাব দিয়েছেন-

১. مُقَابَلَة স্বরূপ اِخْرَاج -এর উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ মু'মিনদের জন্যে যেহেতু اِخْرَاج শব্দের ব্যবহার করেছেন তাই কাফেরদের জন্যেও اِخْرَاج শব্দের ব্যবহার করেছেন। এটিকে বালাগাতের পরিভাষায় صِفَةُ مُقَابَلَةٍ বলা হয়।
২. আরেকটি জবাব এই যে, এখানে ইহুদি নাসারাদের মধ্য থেকে ঐ সমস্ত লোক উদ্দেশ্য, যারা নিজেদের ধর্মীয় কিতাবের সুসংবাদে রাসূল ﷺ -এর প্রতি ঈমান এনেছিল। কিন্তু রাসূল ﷺ -এর আবির্ভাবের পর তারা জিদ ও হঠকারিতাবশত সে ঈমান থেকে ফিরে যায়। যেন আলো থেকে অন্ধকারে ফিরে যায়।

অনুবাদ :

٢٥٨. اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ حَآجَّ جَادَلَ اِبْرٰهٖمَ فِىْ رَبِّهٖٓ اَنْ اٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ اَىْ حَمَلَهُ بَطَرُهُ بِنِعْمَةِ اللّٰهِ عَلٰى ذٰلِكَ الْبَطَرِ وَهُوَ نَمْرُوْدُ اِذْ بَدَلٌ مِنْ حَاجَّ قَالَ اِبْرٰهٖمُ لَمَّا قَالَ لَهُ مَنْ رَبُّكَ الَّذِىْ تَدْعُوْنَا اِلَيْهِ رَبِّىَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ اَىْ يَخْلُقُ الْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ فِى الْاَجْسَادِ قَالَ هُوَ اَنَا اُحْىٖ وَاُمِيْتُ بِالْقَتْلِ وَالْعَفْوِ عَنْهُ وَ دَعٰى بِرَجُلَيْنِ فَقَتَلَ اَحَدَهُمَا وَتَرَكَ الْاٰخَرَ فَلَمَّا رَاٰهُ غَبِيًّا قَالَ اِبْرٰهٖمُ مُنْتَقِلًا اِلٰى حُجَّةٍ اَوْضَحَ مِنْهَا فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِىْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا اَنْتَ مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِىْ كَفَرَ تَحَيَّرَ وَدَهِشَ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ بِالْكُفْرِ اِلٰى مُحَجَّةِ الْاِحْتِجَاجِ ـ

২৫৮. তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখনি, যে ব্যক্তি ইবরাহীমের সাথে তাঁর প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল বিতণ্ডা করেছিল, যেহেতু আল্লাহ তাকে সাম্রাজ্য দিয়েছিলেন অর্থাৎ আল্লাহর অপার নিয়ামত ও অনুগ্রহপ্রাপ্তিই তাকে এ ধরনেই গর্বোদ্যত ও ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ করতে উৎসাহ যোগিয়েছিল। এ লোকটি ছিল নমরূদ। যখন اِذْ শব্দটি حَاجَّ-এর بَدَل বা স্থলাভিষিক্ত পদ। নমরূদ তাঁকে [ইবরাহীমকে] বলল, তোমার প্রভু কে? যার প্রতি তুমি আমাদেরকে আহ্বান কর? তখন ইবরাহীম বললেন, আমার প্রভু তিনি যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান অর্থাৎ শরীরে জন্ম ও মৃত্যুর সৃষ্টি করেন। সে বলল, আমিও তো হত্যা করে ও ক্ষমা প্রদর্শন করে জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই। এবং দুই ব্যক্তিকে ডেকে একজনকে হত্যা ও অপরজনকে মুক্তি দিয়ে দিল। তিনি [হযরত ইবরাহীম (আ.)] যখন দেখলেন যে, এ একেবারে নির্বোধ তখন ইবরাহীম বিতর্ক-কৌশল পরিবর্তন করে অধিকতর স্পষ্ট প্রমাণ দিতে গিয়ে বললেন, আল্লাহ সূর্যকে পূর্বদিক থেকে উদয় করেন, তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদয় করাও তো দেখি! অনন্তর যে সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল সে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। বিস্ময়ান্বিত ও হতচকিত হয়ে গেল। নিশ্চয় আল্লাহ কুফরি করে যারা সীমালঙ্ঘন করে সেই সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। প্রমাণ প্রদানের উপায় প্রদর্শন করেন না।

তাহকীক ও তারকীব

حَاجَّ : বিতর্ক করেছে। بَاب مُفَاعَلَة থেকে। মূলরূপ حَاجَجَ এখানে ج-কে ج-এর মাঝে اِدْغَام করা হয়েছে। মাসদার مُحَاجَّةٌ মূলরূপ مُحَاجَجَةٌ ব্যবহার حَاجَّهُ তার সাথে বিতর্ক করল। حَاجَّ مَعَهُ নয়। حَمَلَهُ : উদ্বুদ্ধ করেছিল। بَطَرٌ : গর্ব-অহংকার। اَلْاَجْسَادُ : جَسَدٌ-এর বহুবচন। শরীর, দেহ। غَبِىٌّ : নির্বোধ, বোকা। مَشْرِقٌ : অর্থ شُرُوْقٌ বা উদয়ের স্থান। مَغْرِبٌ : অর্থ غُرُوْبٌ বা অস্ত যাওয়ার স্থান। بُهِتَ : লাজভার হলে গেল। (ف) بَهْتًا হতবাক ও হতবুদ্ধি করা। بَهَتَهُ شَيْئٌ : কোনো কিছু তাকে হতবুদ্ধি করল। মাযহুলের অর্থ সে হতবুদ্ধি হলো। مُحَجَّةٌ : প্রশস্ত রাস্তা, উপায়। اَلْاِحْتِجَاجُ : প্রমাণ প্রদান করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে মু'মিন ও কাফের এবং হেদায়েতের আলো ও কুফরির অন্ধকার সম্পর্কে আলোচনা ছিল। এবারে তার সমর্থনে কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে। প্রথম দৃষ্টান্তে রাজা নমরূদকে দেখানো হয়েছে। আয়াতে পূর্ণ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْ حَاۤجَّ اِبْرٰهٖمَ فِىْ رَبِّهٖ : আরবি সাহিত্যে এ বাকরীতিটি আশ্চর্য ও বিস্ময়কর স্থানে ব্যবহৃত হয় । এর মধ্যে ভর্ৎসনার দিকটি সুস্পষ্ট। যখন কেউ কারো বিষয়ে কোনো বিস্ময়কর দোষত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তখন এ ধরনের বাক্য ব্যবহার হয়, যেমন বলা হয়, তুমি কি অমুকের আচরণ দেখেছ? –[তাফসীরে কবীর, সংক্ষেপিত]

قَوْلُهُ جَادَلَ : حَاجَّ -এর তাফসীর جَادَلَ দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে حَاجَّ অর্থ– غَلَبَ فِى الْحُجَّةِ নয়। যেমন নাকি হাদীসে এসেছে– حَجَّ اٰدَمُ مُوْسٰى অর্থ– হযরত আদম (আ.) হযরত মূসা (আ.)-এর উপর জয়ী হলেন। এখানে এ অর্থ উদ্দেশ্য হবে না। এ জন্য যে, নমরূদ حُجَّةٌ বা দলিল-প্রমাণে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উপর জয়ী হয়নি; বরং সে নিছক তর্ক করেছে।

قَوْلُهُ اَىْ حَمَلَهُ بَطَرُهُ : এখানে ইঙ্গিত রয়েছে যে, নমরূদের হুজ্জতবাজির কারণ ছিল রাজত্ব প্রদান।

قَوْلُهُ اَنْ اٰتٰهُ الْمُلْكَ : বাক্যটি لَام হযফসহ مَفْعُوْل لِاَجْلِهٖ মূলরূপ এমন– لِاَنْ اٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ

قَوْلُهُ نَمْرُوْدُ : স্পষ্টত এখানে বিতর্ককারী হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সমসাময়িক কোনো বাদশাহ হবে। তাই মুফাসসির (র.) নমরূদের নাম উল্লেখ করেছেন। সে ছিল হযরত মূসা (আ.)-এর জন্মভূমি ইরাকের বাদশাহ। এখানে তার আলোচনা করা হচ্ছে। বাইবেলে এ সম্বন্ধে কোনো আলোচনা নেই। এ কারণে আহলে কিতাবগণ এ ঘটনা মানতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে। তবে তালমুদে এর পূর্ণ ঘটনা উল্লিখিত রয়েছে এবং তা প্রায় কুরআনের অনুকূলেই। তাতে উল্লিখিত হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতা নমরূদের দরবারে সবচেয়ে বড় পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন প্রকাশ্যে শিরকের বিরোধিতা ও তাওহীদের প্রচার শুরু করেলেন এবং দেবালয়ে প্রবেশ করে দেব-দেবীকে ভেঙ্গে ফেললেন, তখন তাঁর পিতা নিজেই বাদশাহর দরবারে এ ব্যাপারে অভিযোগ করেন। এরপর সে আলোচনা হয় যা এখানে বর্ণিত হয়েছে।

বিতর্কের বিষয়বস্তু : বিতর্কিত বিষয়টি এই ছিল যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) কাকে প্রভু বলেন? এ দ্বন্দ্বের কারণ এই ছিল যে, দ্বন্দ্বকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা রাজত্ব দান করেছেন– اَنْ اٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করেছেন। এটা বুঝার জন্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখা জরুরি–

১. প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি সকল মুসলিম সোসাইটির সম্মিলিত ও সামষ্টিক বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা সবাই আল্লাহ তা'আলাকে رَبُّ الْاَرْبَابِ তথা মহাক্ষমতাবান স্রষ্টা মান্য করে এবং তাঁর মধ্যেই রব ও উপাস্য হওয়াকে সীমাবদ্ধ রাখে।
২. মুশরিকরা সর্বদা খোদায়িত্বকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছে–
ক. সৃষ্টির ঊর্ধ্বে এক মহান খোদায়িত্বের সত্তা, তিনি সমস্ত সৃষ্টির উপর ক্ষমতাশীল এবং মানুষ নিজেদের দুঃখ-কষ্ট ও বিভিন্ন সমস্যায় তাঁর শরণাপন্ন হয়। এ খোদায়িত্বে তারা আল্লাহর সকল আত্মা, ফেরেশতা, জিন, নক্ষত্র এবং আরো বহু বস্তুকে অংশীদার স্থাপন করে। তাদের নিকট দোয়া প্রার্থনা করে, তাদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পূজা-পার্বন করে। তাদের আস্তানায় বিভিন্ন হাদিয়া-তোহফা উৎসর্গ করে।
খ. দ্বিতীয়টি হলো কৃষ্টি-কালচারজনিত ও প্রশাসনিক বিষয়ের ক্ষমতার অধিকারী। এ দ্বিতীয় প্রকারের খোদায়িত্বে বিশ্বের সকল মুশরিক জাতি নিজ নিজ যুগে আল্লাহ তা'আলা থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে বিভিন্ন রাজবংশ, ধর্মীয় পুরোহিত এবং সোসাইটির আগে-পরের মনীষীদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছে। অধিকাংশ রাজবংশীয় এ দ্বিতীয় অর্থে খোদায়ীর দাবিদার হয়েছে। এটাকে দৃঢ় করার জন্যে তারা সাধারণত প্রথম অর্থের খোদার সন্তান হওয়ার দাবি করেছে। আর ধর্ম অবলম্বনকারীদের এ বিষয়ে তাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছে। যেমন– জাপানের রাজবংশ এ অর্থে নিজেদেরকে আল্লাহর অবতার বলে থাকে। আর জাপানিরা তাদেরকে আল্লাহর দূত জ্ঞান করে।

নমরূদের এ খোদায়ী দাবিও এ দ্বিতীয় প্রকারের ছিল। সে আল্লাহর অস্তিত্বের অস্বীকারকারী ছিল না। আসমান, জমিন ও সমস্ত মাখলুকের সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ন্ত্রণকারী সে নিজে হওয়ার দাবি করত না; বরং তার দাবি ছিল এই যে, ইরাকের এবং ইরাকের জনগণের সর্বময় শাসনকর্তা আমিই। আমার কথাই আইন, আমার উপর ক্ষমতাশীল কেউ নেই, কারো কাছে আমি জবাবদিহিতাকারী নই। ইরাকের যে কোনো অধিবাসী আমাকে তার রব মনে না করবে বা অন্য কাউকে তার পালনকর্তা

জানবে, সে গাদ্দার ও আমার বিদ্রোহী সাব্যস্ত হবে। নমরূদের এ বিশাল সাম্রাজ্যের রাজত্ব তাকে এত নির্ভীক, অহংকারি ও ঔদ্ধত বানিয়েছিল যে, সে নিজেই খোদা হওয়ার দাবি করে বসেছিল। ইহুদিদের বইপুস্তকে এমনও বর্ণিত আছে যে, সে নিজের জন্যে একটি খোদায়ী আরশ বানিয়েছিল, উক্ত আরশে উপবেশন করে তার রাজত্ব পরিচালনা করত।

৩. হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন বললেন, আমি কেবল একই রাব্বুল আলামীনকে আমার ইলাহ, উপাস্য ও প্রতিপালক মানি। অন্য কারো খোদায়িত্ব ও উপাস্য মানি না। তখন শুধু এ প্রশ্নই উঠল না যে, জাতিগত ধর্ম ও উপাস্যদের বিষয়ে তাঁর এ নতুন আকিদা কতটুকু বরদাশতযোগ্য; বরং এ প্রশ্নও দেখা দিল যে, জাতীয় নেতৃত্বে এবং তাঁর কেন্দ্রীয় ক্ষমতার উপর এ আকিদার যে আঘাত পড়ল তাকে কিভাবে এড়িয়ে চলা যায়? এ কারণেই ছিল যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) বিদ্রোহী হিসেবে নমরূদের সম্মুখীন হলেন।

নমরুদ একত্ববাদের এ আহ্বানকারীকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে জিজ্ঞাসা করল– সে কেমন খোদা? যার প্রতি তুমি মানুষকে আহ্বান করছ? আমাকে তাঁর কিছু বৈশিষ্ট্য শোনাও। হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, رَبِّيَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ জীবন-মরণের সকল শক্তি তাঁরই হাতে। তিনিই সমস্ত সৃষ্টি নিয়ন্ত্রণকর্তা ও পালনকর্তা। জীবন মরণের সকল উৎস তাঁরই হাতে। কারো সাধ্য নেই যে, তাঁর এ ক্ষমতার মধ্যে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করবে। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর যদিও উত্তরে প্রথম বাক্য দ্বারাই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ এ ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে না। তথাপি নমরূদ সাধারণভাবে এর উত্তর দিল যে, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত দুজন আসামীকে ডেকে, সে একজনকে ক্ষমা করে দিল এবং অপরজনকে হত্যার নির্দেশ দিল। আর বলল, اَنَا اُحْيٖ وَاُمِيْتُ 'আমি জীবন ও মরণ দান করি।' হযরত ইবরাহীম (আ.) সাথে সাথে দলিল শেষ করে মানুষের সাধারণ বুঝের প্রতি লক্ষ্য রেখে দ্বিতীয় দলিল পেশ করলেন। বললেন, জীবন-মরণের কথা বাদ থাক, প্রকৃতির সাধারণ একটি ক্ষেত্রে তোমার শক্তি প্রয়োগ করে দেখাও। নমরূদ সূর্যদেবীর অবতার নিজেকেই মনে করত এবং সূর্য- সে একথার সর্ববৃহৎ খোদা প্রবক্তা ছিল। তার এ ভ্রান্ত আকিদা খণ্ডনার্থে তিনি সূর্যকেই দলিলস্বরূপ পেশ করলেন। বললেন– فَاِنَّ اللّٰهَ يَأْتِيْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِيْ كَفَرَ আল্লাহ তা'আলা সূর্যকে পূর্বাচল থেকে অস্তাচলে আনয়ন করেন। আচ্ছা তুমি অস্তাচল থেকে পূর্বাচলে নিয়ে এস। কাফের নমরূদ অপারগ হয়ে গেল।' হযরত ইবরাহীম (আ.) অতি চমৎকারভাবে তাকে নির্বাক করে দিলেন।

কোনোভাবে নমরূদ এ দলিলের জবাব দিতে সক্ষম হলো না। কারণ সে জানত, ইবরাহীম যে খোদাকে রব মনে করে, সে খোদার নির্দেশের অধীনেই চন্দ্র-সূর্য আবর্তিত হয়। কিন্তু এভাবে তার সামনে যে বাস্তবতা সুস্পষ্ট হচ্ছিল তা মানার জন্যে সে প্রস্তুত হলো না। তার তাগুত আত্মা সত্য মেনে নিতে রাজি হলো না। রিপু পূজার অন্ধকার থেকে সত্য পূজার আলোর দিকে সে অগ্রসর হলো না।

তালমুদের বর্ণনায় রয়েছে যে, এর পরে নমরূদের নির্দেশে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে গ্রেফতার করা হলো এবং ১০ দিন তাঁকে কারাগারে আবদ্ধ করে রাখা হলো। এরপর রাজ কাউন্সিল তাঁকে জীবিত অগ্নিদগ্ধ করে মারার সিদ্ধান্ত নিল, ফলে তাঁকে আগুনে নিক্ষেপের ঘটনা ঘটল; সূরা আম্বিয়া, আনকাবূত ও সাফফাতে এর বর্ণনা এসেছে। –[জামালাইন]

قَوْلُهٗ بَطِرَةٌ : **بطر** অর্থ গর্ব করা, অহংকার করা এবং অপাত্রে সীমাহীন গর্ব করা।

قَوْلُهٗ اَيْ يَخْلُقُ الْحَيٰوةَ وَالْمَوْتَ : এ ইবারতটুকু দ্বারা নমরূদের আপত্তি বাতিল হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা **يُحْيٖ وَيُمِيْتُ** -এর মর্ম হলো, শরীরের মাঝে জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করা, যা নমরূদের পক্ষে অসম্ভব।

بُهِتَ : تَحَيَّرَ وَ دَهِشَ -এর ব্যাখ্যায় **تَحَيَّرَ وَ دَهِشَ** উল্লেখ করে একথা বুঝিয়েছেন যে, **بُهِتَ** মাজহুলের সীগাহ হলেও **مَعْرُوْف** -এর অর্থে ব্যবহৃত। **اَلْمَحَجَّةُ** : প্রশস্ত রাস্তা।

قَوْلُهٗ مُنْتَقِلًا اِلٰى حُجَّةٍ اَوْضَحَ مِنْهَا : এখানে একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে–

প্রশ্ন : মানুষ কোনো একটি দলিল থেকে অন্য একটি দলিলের দিকে প্রত্যাবর্তন করে দুটি কারণে–

১. দলিলের মাঝে কোনো ত্রুটি বা সমস্যা থাকলে।

২. দলিলের মাঝে এমন কোনো অস্পষ্টতা থাকলে দলিলদাতা প্রকাশ করতে অক্ষম। বর্ণিত কোনো কারণই নবীর শানে সঠিক নয়। তাহলে হযরত ইবরাহীম (আ) কি কারণে এক দলিল ছেড়ে অন্য দলিল দিতে গেলেন?

উত্তর : মূলত এটি اِنْتِقَالٌ عَنْ دَلِيْلٍ اِلٰى دَلِيْلٍ اٰخَرَ নয়; বরং এটি হলো دَلِيْلٌ خَفِيٌّ থেকে دَلِيْلٌ جَلِيٌّ -এর দিকে প্রত্যাবর্তন। আর এটি কোনো সমস্য নয়; বরং বিজ্ঞোচিত কাজ।

٢٥٩. اَوْ رَأَيْتَ كَالَّذِىْ اَلْكَافُ زَائِدَةٌ مَرَّ
عَلٰى قَرْيَةٍ هِىَ بَيْتُ الْمُقَدَّسِ رَاكِبًا
عَلٰى حِمَارٍ وَمَعَهُ سَلَّةُ تِيْنٍ وَقَدَحُ
عَصِيْرٍ وَهُوَ عُزَيْرٌ وَهِىَ خَاوِيَةٌ
سَاقِطَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا سُقُوْفِهَا لَمَّا
خَرَّبَهَا بُخْتَنَصَّرُ قَالَ اَنّٰى كَيْفَ
يُحْىٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا
اِسْتِعْظَامًا لِقُدْرَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى
فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ وَاَلْبَثَهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ
بَعَثَهُ اَحْيَاهُ لِيُرِيَهُ كَيْفِيَّةَ ذٰلِكَ قَالَ
تَعَالٰى لَهُ كَمْ لَبِثْتَ مَكَثْتَ هُنَا قَالَ
لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ لِاَنَّهُ نَامَ اَوَّلَ
النَّهَارِ فَقُبِضَ وَاُحْيِىَ عِنْدَ الْغُرُوْبِ
فَظَنَّ اَنَّهُ يَوْمُ النَّوْمِ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ
مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ التِّيْنِ
وَشَرَابِكَ الْعَصِيْرِ لَمْ يَتَسَنَّهْ يَتَغَيَّرْ
مَعَ طُوْلِ الزَّمَانِ وَالْهَاءُ قِيْلَ اَصْلُ مِنْ
سَانَهْتُ وَقِيْلَ لِلسَّكْتِ مِنْ سَانَيْتُ
وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِحَذْفِهَا وَانْظُرْ اِلٰى
حِمَارِكَ كَيْفَ هُوَ فَرَاٰهُ مَيْتًا وَعِظَامُهُ
بِيْضٌ تَلُوْحُ فَعَلْنَا ذٰلِكَ لِتَعْلَمَ ـ

অনুবাদ :

২৫৯. অথবা তুমি সেই ব্যক্তিকে দেখনি যে كَالَّذِىْ-এর كَاف টি অতিরিক্ত। গাধায় আরোহণ করে এমন এক নগর অতিক্রম করে যা ছাদের উপর পড়ে রয়েছে। অর্থাৎ ছাদসহ বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। উক্ত ব্যক্তিটি ছিলেন হযরত উযাইর (আ.)। তিনি গাধায় চড়ে ভ্রমণ করছিলেন। তাঁর নিকট তখন এক থলে তীন এবং এক পেয়ালা আঙ্গুরের রস ছিল। আর ঐ শহরটি ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস নগরী। সম্রাট বুখতানাসসার এটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছিল। সে বলল, মৃত্যুর পর কোথায় অর্থাৎ কিভাবে আল্লাহ এটাকে জীবিত করবেন। তিনি আল্লাহর কুদরত সম্পর্কে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে এ কথা বলেছিলেন। তারপর আল্লাহ তাকে মৃত্যু দিলেন এবং এ অবস্থায় একশত বৎসর রাখলেন। অতঃপর তার পুনরুত্থানের রূপ প্রদর্শন কল্পে তাঁকে পুনর্জীবিত করলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বললেন, তুমি কতকাল অবস্থান করলে? অর্থাৎ এ স্থানে কতদিন বাস করলে? সে বলল, একদিন বা একদিনের কিছু কম অবস্থান করেছি। তিনি দিনের শুরু ভাগে শুয়েছিলেন তখন তাঁর রূহ কবজা করা হয়েছিল, আর সূর্যাস্তের সময় তাঁকে পুনর্জীবন দান করা হয়। এতে তার ধারণা হয় যে, এটা ঐ নিদ্রার দিনটিই ছিল বুঝি।

তিনি বললেন, না, বরং তুমি একশত বৎসর অবস্থান করেছ। তোমার খাদ্য তীন ও পানীয় বস্তুর আঙ্গুরের রসের প্রতি লক্ষ্য কর তা অবিকৃত রয়েছে, এত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও তা বিকৃত হয়নি। لَمْ يَتَسَنَّهْ-এর শেষ অক্ষর ه সম্পর্কে কারো অভিমত হলো যে, এটা তার মূলধাতুগত অক্ষর। আর এটা سَانَهْتُ হতে উদ্গত শব্দ। কেউ কেউ বলেন, এটা سَانَيْتُ হতে উদ্গত শব্দ। تَاء টি سَكْتَة 'সাকতা' রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। অপর এক কেরাতে তার বিলুপ্তিসহ পাঠ রয়েছে। এবং তোমার গাধাটির প্রতি লক্ষ্য কর তা কেমনভাবে পড়ে রয়েছে। অনন্তর তিনি দেখেন যে, তা মরে পড়ে রয়েছে। হাড়গুলো শুকিয়ে সাদা হয়ে গিয়েছে এবং চকচক করছে। আমি এরূপ বিষয় করেছি যেন তুমি অবহিত হতে পার

وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً عَلَى الْبَعْثِ لِلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ مِنْ حِمَارِكَ كَيْفَ نُنْشِرُهَا نُحْيِيْهَا بِضَمِّ النُّوْنِ وَقُرِئَ بِفَتْحِهَا مِنْ اَنْشَرَ وَنَشَرَ لُغَتَانِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِضَمِّهَا وَالزَّايِ نُحَرِّكُهَا وَنَرْفَعُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا فَنَظَرَ اِلَيْهَا وَقَدْ تُرَكَّبَتْ وَكُسِيَتْ لَحْمًا وَنُفِخَ فِيْهِ الرُّوْحُ وَنَهِقَ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ ذٰلِكَ بِالْمُشَاهَدَةِ قَالَ اَعْلَمُ عِلْمَ مُشَاهَدَةٍ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَفِيْ قِرَاءَةٍ اِعْلَمْ اَمْرٌ مِّنَ اللّٰهِ لَهٗ .

এবং তোমাকে আমি মানব-জাতির জন্যে পুনরুত্থানের নিদর্শন স্বরূপ বানাব। আর তোমার গাধাটির অস্থিগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর কিভাবে তা সংযোজিত করি। نُنْشِرُهَا -এর প্রথম অক্ষরটি পেশ ও ফাতাহ উভয় হরকত সহকারে পঠিত রয়েছে। اَنْشَرَ বা نَشَرَ এ দুই ধরনের বাব [ক্রিয়ার ব্যবহার প্রক্রিয়া] হতে উদ্গত শব্দ। অর্থাৎ কিভাবে তা পুনর্জীবিত করি। অপর এক কেরাতে এটা প্রথমাক্ষরটি পেশ ও শেষে ز সহ نُنْشِزُ রূপে পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ কিভাবে আমি তাকে সঞ্চালিত ও উত্থিত করি। অতঃপর মাংস দ্বারা ঢেকে দেই। অনন্তর তিনি তার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, দেখলেন, এক একটি হাড় সংযোজিত হলো, হাড়ে গোশত স্থাপিত হলো, তাতে রূহ ফুৎকার করা হলো আর তা চিৎকার করে উঠে দাঁড়াল। যখন প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করার পর তার নিকট তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠল তখন সে বলে উঠল, আমি জানি প্রত্যক্ষ দর্শনে জানি আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। اَعْلَمُ শব্দটি অপর এক কেরাতে اَمْر বা আল্লাহর তরফ থেকে অনুজ্ঞাবাচক শব্দ হিসেবে اِعْلَمْ [জেনে রাখ] রূপে পঠিত রয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

مَرَّ : অতিক্রম করল। سَلَّةٌ : থলে, ব্যাগ। قَدَحٌ : পেয়ালা। এটি একবচন। বহুবচন- اَقْدَاحٌ - عَصِيْرٌ : আঙ্গুরের রস। خَاوِيَةٌ : سَاقِطَةٌ : পতিত। عُرُوْشٌ : عَرْشٌ -এর বহুবচন। অর্থ- ছাদ, উঁচু স্থান। بَيْضٌ : সাদা। تَلُوْحُ : চকচক করছে। تُرُكِّبَتْ : সংযোজিত হলো। نَهِقَ : চিৎকার করল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ اَوْ رَاَيْتَ كَالَّذِيْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ : এ আয়াতের আতফ হলো পূর্বের আয়াতের বিষয়বস্তুর উপর। অধিকাংশ নাহবীদের মতে, বাক্যটি এমন ছিল- اَرَاَيْتَ كَالَّذِيْ حَاجَّ اِبْرَاهِيْمَ اَوْ كَالَّذِيْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ আল্লামা যমখশারী, বায়যাবী (র.) প্রমুখ رَاَيْتَ مِثْلَ الَّذِيْ مَرَّ الخ বলেছেন এবং এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এখানে আল্লাহর কুদরত সম্পর্কে দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত উজাইর (আ.)-এর ঘটনা এখানে বিবৃত হবে।

اَوْ رَاَيْتَ كَالَّذِيْ : এখানে رَاَيْتَ -এর বৃদ্ধি মূলত একটি আপত্তি নিরসনকল্পে।

প্রশ্ন : اَوْ كَالَّذِيْ -এর عَطْف পূর্বের كَالَّذِيْ حَاجَّ -এর সাথে সঠিক নয়। কেননা مَعْطُوْف عَلَيْه এবং مَعْطُوْف -এর عَامِل এক ও অভিন্ন হয়ে থাকে। এখানে مَعْطُوْف عَلَيْه -এর عَامِل হলো اِلٰى তার মানে كَالَّذِيْ -এর عَامِل ও اِلٰى হবে। অথচ كَاف -এর মাঝে اِلٰى -এর অনুপ্রবেশ শুদ্ধ নয়।

উত্তর : উক্ত عَطْف টি مُفْرَدٌ عَلَى الْمُفْرَدِ হয়নি; বরং জুমলার عَطْف জুমলার উপর হয়েছে এবং اَوْ كَالَّذِيْ -এর পূর্বে اَرَاَيْتَ মাহযূফ রয়েছে। যেমনটি মুফাসসির (র.) স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

হযরত উযাইর (আ.) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বর্ণনা : পবিত্র কুরআনে হযরত উযাইর (আ.)-এর নাম কেবল সূরা তাওবার এক স্থানে উল্লিখিত হয়েছে। সেখানে কেবল এতটুকু বলা হয়েছে যে, ইহুদিরা উযাইর (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলে থাকে, যেভাবে নাসারারা হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলে। এছাড়া কুরআনের অন্য কোথাও তাঁর নাম বা তাঁর ঘটনা সম্পর্কে কোনো বর্ণনা নেই।

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ بْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ بْنُ اللّٰهِ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ أَنّٰى يُؤْفَكُونَ.

অর্থাৎ আর ইহুদিরা বলে উযাইর আল্লাহর পুত্র, আর নাসারারা বলে মসীহ আল্লাহর পুত্র। এটা তাদের কেবল মুখ-নিঃসৃত কথা। তারাও সেসব মানুষের ন্যায়ই উক্তি করে যারা ইতঃপূর্বে কুফরির পথ অবলম্বন করেছে। তাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত, তারা কোন দিকে বিচ্যুত হয়ে গমন করেছে? –[সূরা তাওবা]

হযরত উযায়ের (আ.)-এর ঘটনা : উপরিউক্ত আয়াতে একটি ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে। তা এই যে, আল্লাহর এক মনোনীত বান্দা স্বীয় গাধার উপর সওয়ার হয়ে এক জনপদ অতিক্রম করছিলেন। জনপদটি সম্পূর্ণ বিরান ও জনমানবহীন হয়ে পড়েছিল। সেখানে না কোনো ঘরবাড়ি ছিল, না কোনো বসবাসকারী। আল্লাহর উক্ত বান্দা এ অবস্থা দেখে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত ও বিস্মিত হয়ে বললেন, এমন ধ্বংসমুখে পতিত বিরান জনপদ কিভাবে নতুনভাবে সজীব হবে? এ জনপদ কিরূপে আবার মানুষের পদভারে সপর হবে? এখানে তো এমন কোনো উৎস দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। আল্লাহর উক্ত বান্দা এ চিন্তা-ভাবনায় নিমগ্ন, ইতোমধ্যে উক্ত স্থানে তাঁর রূহ কবজ করে নেওয়া হলো। ১০০ বছর যাবৎ তিনি উক্ত অবস্থায় থাকলেন। এ দীর্ঘ সময় অতিক্রমের পর তাঁকে পুনরায় জীবিত করা হলো। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কতদিন তুমি এ অবস্থায় কাটিয়েছ? তিনি যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন ছিল সকাল, আর যখন জীবিত করা হলো তখন ছিল সূর্যাস্তের সময়। এ কারণে তিনি জবাব দিলেন একদিন বা কয়েক ঘণ্টা। আল্লাহ তা'আলা বললেন, এমন নয়; বরং তুমি একশত বছর মৃত অবস্থায় কাটিয়েছ। এখন তোমার বিস্ময় ও আশ্চর্যের জবাব এই যে, একদিকে তুমি তোমার পানাহারের দ্রব্যের প্রতি দৃষ্টি কর, দেখ তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসেনি। অপরদিকে তোমার গাধাটির দিকে লক্ষ্য কর, দেখ তার দেহ পচে-গলে কেবল তার কঙ্কাল অবশিষ্ট রয়েছে। এরপর তুমি আমার মহাশক্তির সামান্য অনুমান কর, যাকে আমি চেয়েছিলাম যে, তাকে আমি হেফাজত করব– ১০০ বছরের সুদীর্ঘ সময়ে ঋতু পরিবর্তনের কোনো প্রভাব তাতে পড়েনি। তা যেমন ছিল তেমনি রয়ে গেছে। আর যার ব্যাপারে আমি বিনষ্টের ইচ্ছা করেছিলাম তা পচে-গলে বিনাশ হয়ে গেছে। এখন দেখ তোমার সামনেই আমি তাকে জীবিত করছি। এসব কিছু এজন্যই করলাম, যাতে আমি তোমাকে এবং তোমার এ ঘটনাকে মানুষের জন্যে আমার কুদরতের নিদর্শন বানাই। বিশ্বাসের সাথে সাথে বাস্তবে তা প্রত্যক্ষ করতে পার। তখন তিনি স্বীয় দাসত্ব প্রকাশের স্বীকারোক্তি করলেন, নিঃসন্দেহে তোমার মহাশক্তির নিকট এসব কিছুই অতি সহজ। এখন আমার ইলমুল একিনের পরে আইনুল একিনও লাভ হলো।

উক্ত বুজুর্গ কে ছিলেন? : এ আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, উক্ত বুজুর্গ কে ছিলেন? এর উত্তরে প্রসিদ্ধ মত হলো, তিনি ছিলেন হযরত উযাইর (আ.)। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জেরুজালেম যেতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি তাকে পুনর্বার জনমুখর করবেন, তিনি সেখানে গমন করে নগরকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ও ধ্বংসমুখে পতিত দেখলেন। তখন মানবিক স্বভাবসুলভভাবে বলে উঠলেন, কিভাবে এ মৃত জনপদের পুনর্বার জীবন লাভ হবে? বস্তুত তাঁর এ উক্তি অস্বীকারমূলক ছিল না; বরং বিস্ময়মূলক ছিল। অর্থাৎ কিভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওয়াদাকে পূর্ণ করবেন? আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দা ও নবীর এ উক্তিকে পছন্দ করলেন না। কারণ তাঁর নির্দ্বিধায় ও বিনা বাক্যে তা মেনে নেওয়া উচিত ছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত ঘটনার অবতারণা করলেন। তিনি যখন জীবিত হলেন, এর মধ্যেই জেরুজালেম তথা বায়তুল মুকাদ্দাস পুনরায় জনমুখর হয়ে গিয়েছিল। হযরত আলী, হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম, হযরত কাতাদা, হযরত সুলায়মান ও হযরত হাসান (রা.)-এর ধারণা মতে, এ ঘটনাটি হযরত উযাইর (আ.) সংশ্লিষ্ট।

–[তাফসীর ও তারীখে ইবনে কাছীর।]

ইতিহাস পর্যালোচনা : পবিত্র কুরআনে যেহেতু উক্ত বুজুর্গের নাম উল্লেখ হয়নি এবং রাসূল ﷺ থেকেও এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ কোনো বর্ণনা বিদ্যমান নেই, আর সাহাবী ও তাবেঈন থেকে যেসব উক্তি বর্ণিত রয়েছে তার উৎস হলো হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ, হযরত কাব আহবার ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম কর্তৃক বর্ণিত বিভিন্ন ইসরাঈলী ঘটনা ও বর্ণনা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। এখন ঘটনা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুসন্ধানের জন্যে কেবল একটিই পথ বাকি রইল। আর তা হলো তাওরাত ও ইতিহাস থেকে এর সমাধান বের করা। তাওরাতে বিভিন্ন নবীগণের বর্ণনা ও ঐতিহাসিক আলোচনার উপর গবেষণা করলে এ সিদ্ধান্ত সামনে আসে যে, এ ঘটনাটি ইয়ারমিয়া নবী সংশ্লিষ্ট। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ জানতে হলে দেখুন মাওলানা হিফজুর রহমান (র.) সংকলিত কাসাসুল কুরআন ও হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১, পৃ. ৩২৫]

قَوْلُهُ بُخْتَنَصَّرَ : بُخْتَ অর্থ اِبْنٌ বা সন্তান, আর نَصَّرَ হলো একটি মূর্তির নাম। এ হিসেবে بُخْتَنَصَّرَ অর্থ– اِبْنُ الصَّنَمِ বা মূর্তির সন্তান। তার এ নামকরণের কারণ হলো তার মা তাকে نَصَّرَ নামক মূর্তির সামনে রেখে এসেছিল। তারপর থেকে তার এই নাম হয়ে যায়।

لَمْ يَتَسَنَّهْ اَىْ لَمْ يَتَغَيَّرْ : بَاب تَفَعُّل থেকে مُضَارِع وَاحِد مُذَكَّر غَائِب -এর সীগাহ। অর্থ– বছরের পর বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও নষ্ট হয়নি। কেউ তার শেষের هَاء -কে هَاءُ السَّكْتَة আখ্যা দিয়েছেন এবং মিলিয়ে পড়ার সময় তা হযফ করে পড়া আবশ্যক বলেছেন। তাদের মতে, মূলশব্দ হলো يَتَسَنَّ যার মূলরূপ হলো يَتَسَنَّى। جَزْم অবস্থায় اَلِف সাকেত হয়ে يَتَسَنَّ হয়ে গেছে। এ মত অনুযায়ী শব্দটি سِنَةٌ থেকে নির্গত হবে। যার মূলরূপ سِنْوَةٌ ছিল। এ অভিমত ব্যক্তকারীদের মধ্যে আবূ ওমর শব্দটির উৎস সম্পর্কে বলেন, (تَفَعُّل) تَسَنَّىٌ -এর মূলরূপ تَسَنُّنٌ ছিল। আর تَسَنُّنٌ -এর অর্থ হলো– تَغَيُّر বা পরিবর্তন। আর এ থেকেই কুরআনের শব্দ حَمَاءٍ مَسْنُوْن -এর ব্যবহার রয়েছে। কেউ কেউ يَتَسَنَّهْ -এর هَاء -কে মূল শব্দ বলে আখ্যা দিয়েছেন, যা وَقْف এবং وَصْل উভয় অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে। এ মত অনুসারে শব্দটি سِنَةٌ থেকেই নির্গত হবে। তবে سِنَةٌ -এর মূলরূপ سِنْهَةٌ ধর্তব্য হবে। কেননা তার تَصْغِيْر ব্যবহার হয় سُنَيْهَةٌ রূপে।

প্রশ্ন : لَمْ يَتَسَنَّهْ -কে مُفْرَدٌ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ তার দ্বারা খাদ্য এবং পানীয় উভয়টি উদ্দেশ্য। এ হিসেবে তো শব্দটি দ্বিবচনের হওয়া উচিত ছিল। একবচন হলো কেন?

উত্তর : طَعَام وَ شَرَاب বা খাদ্য-পানীয় উভয়টি غِذَا হিসেবে مُفْرَد -এর হুকুম রাখে, তাই يَتَسَنَّهْ -কে একবচন আনা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَعَلْنَا ذٰلِكَ لِتَعْلَمَ : **প্রশ্ন :** وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً -এর وَاو টি কিসের? عَاطِفَة নাকি اِسْتِيْنَافِيَة। যদি عَاطِفَة হয় তাহলে তার مَعْطُوْف عَلَيْه কি হবে? বাহ্যত পূর্বে এমন কোনো مَعْطُوْف عَلَيْه নেই যার উপর তার عَطْف হতে পারে।

উত্তর : ১. কেউ কেউ উক্ত وَاو টিকে اِسْتِيْنَافِيَة বলেছেন এবং لَام টি মাহযূফ فِعْل এর হিসেবে مُتَعَلِّق ইবারত এই– فَعَلْنَا ذٰلِكَ لِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ আর لِنَجْعَلَكَ মূলত لِاَنْ نَجْعَلَكَ ছিল। جَار এবং مَجْرُوْر মিলে মাহযূফ فِعْل -এর مُتَعَلِّق হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, উক্ত وَاو -কে عَاطِفَة ধরেছেন এবং فِعْل مَحْذُوْف -এর উপর عَطْف করেছেন। যেমন– মুফাসসির (র.) لِتَعْلَمَ -কে مَعْطُوْف عَلَيْه উহ্য ধরেছেন। আর সে উহ্য مَعْطُوْف عَلَيْه টি আবার আরেকটি فِعْل مُقَدَّر -এর সাথে مُتَعَلِّق সেটি হলো فَعَلْنَا [এটি পূর্বের আলোচনা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।] তাকদীরী ইবারত হচ্ছে– فَعَلْنَا ذٰلِكَ لِتَعْلَمَ قُدْرَتَنَا عَلٰى اِحْيَاءِ الْمَوْتٰى

نُنْشِزُهَا এটি কয়েকভাবে পঠিত রয়েছে–

১. نُوْن -এ ضَمّ এবং زَاء সহ اِفْعَال থেকে نُنْشِزُهَا অর্থ– আমরা কিভাবে জীবিত করে উঠাই।

২. نُوْن -এ فَتْحَة এবং رَاء সহ بَاب نَصَرَ থেকে نَنْشُرُهَا ।

৩. نُوْن -এ ضَمّ এবং رَاء সহ পঠিত بَاب اِفْعَال থেকে نُنْشِرُهَا অর্থ– نُحَرِّكُهَا وَنَرْفَعُهَا অর্থ– কিভাবে নাড়াচাড়া দেই এবং উঠাই। এর রূপক অর্থ– আমরা কিভাবে জীবন দান করি।

قَوْلُهُ نُحْيِيْهَا : এ ব্যাখ্যাটি ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا -এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কেননা জীবন দানের ব্যাপারটি গোশত চড়ানোর পরই হয়ে থাকে। তাই এখানে اِحْيَاء দ্বারা একত্রীকরণ এবং একটি অঙ্গ আরেকটির সাথে মিলানো উদ্দেশ্য নেওয়া যেতে পারে, যা نُنْشِزُهَا -এর অর্থের সাথে মিল রাখে। আর কেউ বলেন, نُنْشِرُهَا রূপে পাঠ করা হবে। তখন অর্থ হবে لَفَّ وَنَشْر অর্থাৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দিয়েছেন। –[জামালাইন খ. ১, পৃ. ৩২৪]

قَوْلُهُ نَرْفَعُهَا : اَىْ نَرْفَعُهَا عَنِ الْاَرْضِ لِتَرْكِيْبِ بَعْضِهَا مَعَ بَعْضٍ، وَنَرُدُّهَا اِلٰى اَمَاكِنِهَا مِنَ الْجَسَدِ فَنُرَكِّبُهَا تَرْكِيْبًا لِاِبْقَائِهَا আল্লামা আবুস সাউদ (র.) বলেন, যারা نُنْشِزُهَا -এর ব্যাখ্যা نُحْيِيْهَا করেছেন সম্ভবত তারা উক্ত ব্যাখ্যাই উদ্দেশ্য নিয়েছেন। এমনিভাবে نَشْر -এর ব্যাখ্যাও অনুরূপ। অর্থাৎ نَشَرَ اللّٰهُ الْمَوْتٰى اَىْ اَحْيَاهَا

قَوْلُهُ ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا : اَىْ نَسْتُرُهَا بِهٖ كَمَا يُسْتَرُ الْجَسَدُ بِاللِّبَاسِ

٢٦٠. وَ اذْكُرْ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِمُ رَبِّ اَرِنِى كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى قَالَ تَعَالٰى لَهُ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ بِقُدْرَتِى عَلَى الْاِحْيَاءِ سَأَلَهُ مَعَ عِلْمِهِ بِاِيْمَانِهِ بِذٰلِكَ لِيُجِيْبَهُ بِمَا سَأَلَ فَيَعْلَمَ السَّامِعُوْنَ غَرْضَهُ قَالَ بَلٰى اٰمَنْتُ وَلٰكِنْ سَأَلْتُكَ لِّيَطْمَئِنَّ يَسْكُنَ قَلْبِى بِالْمُعَايَنَةِ الْمَضْمُوْمَةِ اِلَى الْاِسْتِدْلَالِ قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ بِكَسْرِ الصَّادِ وَضَمِّهَا اَمِلْهُنَّ اِلَيْكَ وَقَطِّعْهُنَّ وَاخْلِطْ لَحْمَهُنَّ وَرِيْشَهُنَّ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِنْ جِبَالِ اَرْضِكَ مِنْهُنَّ جُزْءً ثُمَّ ادْعُهُنَّ اِلَيْكَ يَاْتِيْنَكَ سَعْيًا سَرِيْعًا وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ لَايُعْجِزُهُ شَيْءٌ حَكِيْمٌ فِى صُنْعِهِ فَاَخَذَ طَاوُوْسًا وَنَسْرًا وَغُرَابًا وَ دِيْكًا وَفَعَلَ بِهِنَّ مَا ذُكِرَ وَاَمْسَكَ رُؤُوْسَهُنَّ عِنْدَهُ وَدَعَاهُنَّ فَتَطَايَرَتِ الْاَجْزَاءُ اِلٰى بَعْضِهَا حَتّٰى تَكَامَلَتْ ثُمَّ اَقْبَلَتْ اِلٰى رُؤُوْسِهَا ـ

অনুবাদ :

২৬০. আর স্মরণ কর যখন ইবরাহীম বলল, হে আমার প্রভু! কিভাবে তুমি মৃতকে জীবিত কর আমাকে তা দেখাও! তিনি আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বললেন, আমার পুনর্জীবন দান শক্তি সম্পর্কে তবে কি তুমি বিশ্বাস কর না? তাঁর বিশ্বাস সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও এ ধরনের প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য হলো, তিনি যেন নিম্নোল্লিখিত জওয়াব দেন এবং তাঁর উক্ত প্রশ্নের মূল উদ্দেশ্য যেন শ্রোতাদের সামনে পরিস্ফুট হয়ে উঠে। সে বলল, নিশ্চয় বিশ্বাস করি তবে আপনার নিকট এ বিষয় সম্পর্কে জানতে চাইলাম প্রমাণযুক্ত এই প্রত্যক্ষ দর্শন দ্বারা কেবল আমার চিত্তের প্রশান্তির আশ্বস্তির জন্যে। তিনি বললেন, তবে চারটি পাখি নাও এবং তাদেরকে তোমার বশীভূত করে নাও। صُرْهُنَّ শব্দটির প্রথমাক্ষর ص -এ পেশ ও কাসরা উভয় হরকত সহকারে পাঠ করা যায়। অর্থাৎ এগুলোকে তোমার পোষ মানিয়ে নাও, অতঃপর টুকরা টুকরা করে কেটে ফেল এবং গোশত এ পালকগুলো একত্রে মিশ্রিত করে রাখ অতঃপর তোমার এই অঞ্চলের কোনো এক পাহাড়ে তাদের এক একটি অংশ স্থাপন কর। অনন্তর তাদেরকে তোমার দিকে ডাক দাও, তারা দৌড়িয়ে দ্রুতগতিতে তোমার নিকট আসবে। জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী কিছুই তাঁকে অপারগ করতে পারে না। তাঁর কাজে তিনি [প্রজ্ঞাময়।] তিনি তখন একটি ময়ূর, একটি শকুন, একটি কাক ও একটি মোরগ নিয়ে তদ্রূপ করলেন। প্রত্যেকটির মাথা নিজের হাতে রেখে ডাক দিলেন। প্রত্যেকটির স্ব-স্ব অংশ উড়ে উড়ে সংযোজিত হলো, পূর্ণ হওয়ার পর স্ব-স্ব মাথার দিকে দ্রুত বেগে আসল।

তাহকীক ও তারকীব

أَرِنِي : আমাকে দেখাও! اَلْإِرَاءَةُ দেখানো। اَلْمُعَايَنَةُ : প্রত্যক্ষ দর্শন। صُرْ : বশীভূত কর।
أَمْهِلْهُنَّ : পোশ মানিয়ে লও। اَخْلِطْ : মিশ্রিত কর। رِيْشٌ : পালক। طَاوُوْسٌ : ময়ূর।
نَسْرٌ : শকুন। تَطَايَرَتْ : উড়ে এলো। تَكَامَلَتْ : পূর্ণ হলো। اَقْبَلَتْ : এগিয়ে এলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এখানে হযরত ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক মৃতকে জীবিতকরণ প্রত্যক্ষ করার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এটি আল্লাহর কুদরতের বর্ণনা

قَوْلُهُ فَيَعْلَمَ السَّامِعُوْنَ : একটি প্রশ্ন জাগতে পারে আল্লাহ তা'আলা তো হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঈমান সম্পর্কে আগে থেকেই জ্ঞাত আছেন। এরপরও أَوَلَمْ تُؤْمِنْ বলে প্রশ্ন করলেন কেন?

তার উত্তরে বলা হচ্ছে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে প্রশ্নের কারণ عَدَمِ يَقِيْنِ وَعَدَمِ إِيْمَانٍ ছিল না; বরং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল– এ প্রশ্নের ফলে হযরত ইবরাহীম (আ.) এমন একটি জবাব দেবেন যাতে শ্রোতাদের এটা জানা হয় যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর إِحْيَاءِ مَوْتٰى সম্পর্কে প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল إِطْمِيْنَانِ قَلْبِي অর্জন করা। যাতে عِلْمٌ بِالْوَحْيِ -এর সাথে عِلْمٌ الْمُشَاهَدَةِ একত্র হয়ে অতিরিক্ত إِطْمِيْنَانِ লাভ হয়। সুতরাং আর কোনো প্রশ্ন বাকি থাকল না।

قَوْلُهُ فَصُرْهُنَّ : صَارَ يَصُوْرُ বা صَارَ يَصِيْرُ থেকে أَمْرٌ -এর সীগাহ। এর অর্থ– টুকরা টুকরা করাও আসে।

অনুবাদ :

٢٦١. مَثَلُ صِفَةُ نَفَقَاتِ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَىْ طَاعَتِهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ فَكَذٰلِكَ نَفَقَاتُهُمْ تَتَضَاعَفُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ فَضْلَهُ عَلِيْمٌ بِمَنْ يَسْتَحِقُّ الْمُضَاعَفَةَ ـ

২৬১. যারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য আল্লাহর পথে অর্থাৎ তাঁর আনুগত্যের কাজে ব্যয় করে তাদের এ ব্যয়ের উপমা হলো একটি শস্য-বীজ, যা দ্বারা সাতটি শীষ জন্মায়, প্রতিটি শীষে একশত শস্য-কণা। তদ্রূপ তাদের আল্লাহর পথে ব্যয়কেও সাতশতগুণ বর্ধিত করে দেওয়া হয়। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তা থেকেও অধিক বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ অর্থাৎ তাঁর অনুগ্রহ অতি বিস্তৃত, কে এই বহুগণ বৃদ্ধির উপযুক্ত তিনি তা খুবই অবহিত।

٢٦٢. اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا عَلَى الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِمْ مَثَلًا قَدْ اَحْسَنْتُ اِلَيْهِ وَجَبَرْتُ حَالَهُ وَّلَآ اَذًى لَهُ بِذِكْرِ ذٰلِكَ اِلٰى مَنْ لَا يُحِبُّ وَقُوْفَهُ عَلَيْهِ وَنَحْوِ ذٰلِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ ثَوَابُ اِنْفَاقِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ فِى الْاٰخِرَةِ ـ

২৬২. যারা আল্লাহর পথে ধনৈশ্বর্য ব্যয় করে এবং যা ব্যয় করে তার কথা বলে যাকে দিল তার উপর অনুগ্রহ জেতায় না যেমন বলল, তার প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছি এবং তার অবস্থার প্রতি সদাশয়তা প্রদর্শন করে ক্ষতিপূরণ করে দিয়েছি এবং যাকে সে [যাকে দান করা হয়েছে] জানাতে অনিচ্ছুক তার নিকট এ দানের কথা বা তদ্রূপ কিছু বলে তাকে ক্লেশও দেয় না– তাদের পুরস্কার অর্থাৎ তাদের এ দানের পুণ্যফল তাদের প্রতিপালকের নিকট রক্ষিত। আর পরকালে তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।

٢٦٣. قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ كَلَامٌ حَسَنٌ وَرَدٌّ عَلَى السَّائِلِ جَمِيْلٌ وَّمَغْفِرَةٌ لَهُ فِىْ اِلْحَاحِهِ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَا اَذًى بِالْمَنِّ وَتَعْيِيْرٍ لَهُ بِالسُّؤَالِ وَاللّٰهُ غَنِىٌّ عَنْ صَدَقَةِ الْعِبَادِ حَلِيْمٌ بِتَاخِيْرِ الْعُقُوْبَةِ عَنِ الْمَانِّ وَالْمُؤْذِىْ ـ

২৬৩. অনুগ্রহের কথা বলে বেড়িয়ে এবং যাচনার জন্যে লজ্জা দিয়ে যে দানের পর ক্লেশ দেওয়া হয় তা অপেক্ষা ভালো কথা সুন্দর কথা ও সুন্দর সদাশয়তার সাথে প্রার্থীর প্রত্যুত্তরে দান করা [এবং] তার পীড়াপীড়ি ক্ষমা করা অধিক উত্তম। আল্লাহ বান্দাদের সদকা ও দান হতে অমুখাপেক্ষী, এবং যে ব্যক্তি অনুগ্রহ বলে বেড়ায় ও কষ্ট দেয় তার শাস্তি বিলম্বিত করাতে তিনি পরম সহনশীল।

তাহকীক ও তারকীব

حَبَّةٌ : দানা, শস্য। বহুবচন حُبُوْبٌ । اَنْبَتَتْ : অংকুরিত করল। اِنْبَاتًا : অংকুরিত করা, ফলানো। (ن) نَبْتًا نَبَاتًا অংকুরিত হওয়া, ফলা। نَبَتَ الزَّرْعُ : ফসল ফলেছে। اَنْبَتَ الْمَطَرُ الزَّرْعَ : বৃষ্টি ফসল ফলিয়েছে। سَنَابِلُ : سُنْبُلَةٌ -এর

বহুবচন, শীষ। يُضَاعِفُ বাব مُفَاعَلَة থেকে يُضَاعِفُ : দ্বিগুণ করেন। تَضَاعَفُ : দ্বিগুণ হলো, গুরুত্বর হলো। جُبِرَتْ حَالَهُ : তার ক্ষতিপূরণ করে দিয়েছে। اِلْحَاحٌ : পীড়াপীড়ি, যাচনা। تَعْيِيْرٌ : লজ্জা দেওয়া। اَلْمَانٌ : খোঁটাদাতা, যে অনুগ্রহ করে তা বলে বেড়ায়। اَلْمُؤْذِيْ : কষ্ট দাতা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ (الاية) : এর দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَا اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَا اَذًى এটা এ বিষয়ের বিবরণ যে, আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার উল্লিখিত ফজিলত কেবল ঐ ব্যক্তির লাভ হবে, যে খরচ করে খোঁটা দেয় না, মুখে এমন কোনো শব্দ বের করে না, যার দ্বারা গ্রহীতার হেয়তা প্রকাশ পায়, ফলে গ্রহীতা মনে কষ্ট পায়। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তিন ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না। তাদের মধ্যে একজন হলো দান করে খোঁটা দানকারী। –[মুসলিম : কিতাবুল ঈমান।]

مَثَلُ মুযাফ, اَلَّذِيْنَ মাওসূল। يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ বাক্য হয়ে সিলা। উভয়টি মিলে مَثَلُ -এর মুযাফ ইলাইহ مُضَاف এবং مُضَاف اِلَيْه মিলে মুবতাদা। حَبَّة মাওসূফ اَنْبَتَتْ বাক্য হয়ে صِفَة। صِفَة ও مَوْصُوْف মিলে উহ্য শব্দের সাথে مُتَعَلِّق হয়ে خَبَر। ব্যাখ্যাকার صِفَة বৃদ্ধি করে বলে দিয়েছেন যে, مَثَل অর্থ উদাহরণ নয়, বরং صِفَة অর্থে।

প্রশ্ন : نَفَقَات বৃদ্ধির উদ্দেশ্য কি?

উত্তর : اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ হলো مُشَبَّه আর ك হলো হরফে তাশবীহ এবং مَثَل حَبَّة হলো مُشَبَّه بِه ; অতঃপর اَلَّذِيْنَ তথা مُشَبَّه ও مُشَبَّه بِه -এর মধ্যে মিল না হওয়ার কারণে তাশবীহ তথা দৃষ্টান্ত ঠিক হয়নি। কেননা مُشَبَّه يُنْفِقُوْنَ হলো প্রাণীর অন্তর্গত, আর مُشَبَّه তথা حَبَّة হলো জড়বস্তুর অন্তর্গত। এর দুটি উত্তর হতে পারে–

১. مشبة -এর পক্ষে শব্দ বিলুপ্ত মানতে হবে। যেমন– ব্যাখ্যাকার نَفَقَات উহ্য মেনেছেন। এখন বাক্যটি হবে–
مَثَلُ نَفَقَاتِ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ.

২. مُشَبَّه بِه -এর পক্ষে শব্দ বিলুপ্ত মানতে হবে। এক্ষেত্রে বাক্য হবে– يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ

قَوْلُهُ اَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ : এ অংশটুকু দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এর মাফঊল রয়েছে।

প্রশ্ন : পূর্ব থেকেই তো مُضَاعَفَة -এর বিষয়টি বুঝে আসছে। এখানে দ্বিতীয়বার তা উল্লেখ করার দ্বারা তো তাকরার মনে হচ্ছে। এ তাকরারের উপকারিতা কি?

উত্তর. اَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ বৃদ্ধি করে উক্ত প্রশ্নের জবাব দেওয়া হওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পূর্বে উল্লিখিত مُضَاعَفَة -এর চেয়েও বেশি প্রদান করবেন।

قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ : مَوْصُوْف ও صِفَة মিলে মা'তূফ আলাইহ, مَغْفِرَة মা'তূফ, উভয়টি মিলে মুবতাদা। خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ الخ হলো খবর।

প্রশ্ন : খবর হলো নাকেরা। কাজেই তা মুবতাদা হওয়া কিভাবে সঙ্গত হলো।

উত্তর. এর মা'তূফ আলাইহ যেহেতু মা'রেফা, এ কারণে মা'রূফ মুবতাদা হওয়া সঙ্গত হয়েছে।

প্রশ্ন : মা'তূফ আলাইহ হলো قَوْل আর এটা নাকেরা, যা নিজেই মুবতাদা হতে পারে না। এখানে কিভাবে হলো?

উত্তর : যখন নাকেরা শব্দের সিফত হিসেবে উল্লিখিত হয় তখন তা মুবতাদা হতে পারে।

قَوْلُهُ قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ : দানগ্রহীতার জন্যে বিনম্রভাবে কথা বলা এবং দোয়ামূলক শব্দ বলা। যথা– আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এবং আমাকে স্বীয় করুণা দ্বারা উপকৃত করুন। এটা হলো قَوْل مَعْرُوْف আর মাগফিরাতের উদ্দেশ্য হলো দানগ্রহীতার মুখ থেকে যদি অশোভনীয় কোনো শব্দ বের হয়ে যায়, তাহলে তাকে এড়িয়ে গিয়ে ক্ষমা করা। এ দুটি স্বভাব সে দান-সদকার চেয়ে উত্তম, যার পরে খোঁটা দেওয়া হয় বা তাদের মনে আঘাত দেওয়া হয়। মানুষের সাথে উত্তম কথা বলা এবং হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় সাক্ষাৎ করাও সদকা। –[মুসলিম]

٢٦٤. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ اَىْ اُجُوْرَهَا بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى اِبْطَالًا كَالَّذِىْ اَىْ كَاِبْطَالِ نَفَقَةِ الَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَاءَ النَّاسِ اَىْ مُرَائِيًا لَهُمْ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَهُوَ الْمُنَافِقُ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ حَجَرٍ اَمْلَسَ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ مَطَرٌ شَدِيْدٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا صَلْبًا اَمْلَسَ لَا شَىْءَ عَلَيْهِ لَا يَقْدِرُوْنَ اِسْتِيْنَافٌ لِبَيَانِ مَثَلِ الْمُنَافِقِ الْمُنْفِقِ رِيَاءَ النَّاسِ وَجَمْعُ الضَّمِيْرِ بِاِعْتِبَارِ مَعْنَى الَّذِىْ عَلٰى شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا عَمِلُوْا اَىْ لَا يَجِدُوْنَ لَهٗ ثَوَابًا فِى الْاٰخِرَةِ كَمَا لَا يُوْجَدُ عَلَى الصَّفْوَانِ شَىْءٌ مِنَ التُّرَابِ الَّذِىْ كَانَ عَلَيْهِ لِاِذْهَابِ الْمَطَرِ لَهٗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ.

অনুবাদ :

২৬৪. হে বিশ্বাসীগণ! দানের কথা বলে বেড়িয়ে ও ক্লেশ দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে. অর্থাৎ তার ফলকে বিনষ্ট করো না। যেমন বিনষ্ট করে ঐ ব্যক্তি যে ব্যক্তি নিজের ধন লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে লোক প্রদর্শনী করে ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে না অর্থাৎ মুনাফিক তার উপমা একটি শক্ত পাথর মসৃণ পাথর যার উপর কিছু মাটি, অতঃপর প্রবল বৃষ্টিপাত মুষলধারে বৃষ্টি হলো আর তাকে একেবারে সাফ করে মসৃণ শক্ত করে ছেড়ে গেল তাতে আর কিছুই নেই। যা তারা উপার্জন করেছে আমল করেছে তার কিছুর উপরই তাদের শক্তি হবে না। এ আয়াতে মুনাফিক অর্থাৎ যে রিয়া ও লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সম্পদ ব্যয় করে নতুন করে তার উপমা বর্ণনা করা হয়েছে। لَا يَقْدِرُوْنَ -এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে اَلَّذِيْنَ ক্রিয়াপদটিকে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ শক্ত মসৃণ পাথরে সামান্য কিছু মাটি থাকলেও বৃষ্টির পানি তা ধুয়ে মুছে নেওয়ার দরুন তাতে যেমন আর কিছুই পরিলক্ষিত হয় না তেমনি মুনাফিকগণও পরকালে তাদের সৎ আমলের কোনো ছওয়াব বা পুণ্যফল পাবে না। আল্লাহ সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

তাহকীক ও তারকীব

صَفْوَانٌ : মসৃণ পাথর। اَمْلَسُ : মসৃন। وَابِلٌ : প্রবল বৃষ্টি। صَلْدًا : সাফ, পরিষ্কার।

لِاِذْهَابِ الْمَطَرِ لَهٗ : বৃষ্টির পানি তা ধুয়ে মুছে নেওয়ার দরুন।

قَوْلُهٗ جَمْعُ الضَّمِيْرِ بِاِعْتِبَارِ مَعْنَى الَّذِىْ : এটিও একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নটি হলো يَقْدِرُوْنَ -এর যমিরতো اَلَّذِىْ يُنْفِقُ -এর দিকে ফিরেছে, যা কিনা مُفْرَد আর يَقْتَدِرُوْنَ -এর মধ্যকার যমীর হলো দ্বিবচনের।

উত্তর : الذى যদিও শব্দের দিক দিয়ে একবচন কিন্তু অর্থগতভাবে বহুবচন। সুতরাং تَطَابُق সঠিক আছে।

اَىْ اُجُوْرَهَا : প্রশ্ন : اُجُوْر মুযাফ বিলুপ্ত মানার উপকারিতা কি?

উত্তর : মূল সদকা তথা মাল বাতিল হওয়ার কোনো অর্থ হতে পারে না। কেননা খোঁটা দেওয়া বা কষ্ট দেওয়ার দ্বারা সদকার মাল নষ্ট হয় না; বরং তার ছওয়াব বিনষ্ট হয়। এর প্রতি ইঙ্গিত করার জন্যে اُجُوْرَهَا উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ نَفَقَاتٌ : এখানেও মুযাফ বিলুপ্তির কারণ مُشَبَّه ও مُشَبَّه بِه -এর মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করা।

قَوْلُهُ اَعْطَتْ : اٰتَتْ -এর ব্যাখ্যায় اَعْطَتْ উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اٰتَتْ শব্দটি মূলত اِيْتَاءٌ থেকে নির্গত, اِتْيَان থেকে নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى :

صَدَقَاتِكُمْ اَىْ اُجُوْرَهَا : এখানে اُجُوْرَهَا মুযাফকে মাহযূফ ধরার কারণ হলো সদকা তথা সদকার সম্পদ বাতিল হওয়ার কোনো তাৎপর্য নেই। কেননা খোঁটা দেওয়া বা কষ্ট দেওয়ার দ্বারা সদকার সম্পদ বিনষ্ট হয় না; বরং তার ছওয়াব বা প্রতিদান বিনষ্ট হয়ে যায়। এ সংশয়টুকু দূর করার জন্যে اُجُوْرَهَا -কে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا : এটা একটা উপমা। এ উপমায় রিয়াকারীর নেক আমলসমূহকে বৃষ্টির সাথে তুলনা দিয়ে বুঝানো হয়েছে। এ বৃষ্টি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন রূপ নেক আমল, আর পাথরের দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়তের অনিষ্টতা। হালকা মাটির দ্বারা উদ্দেশ্য নেকির বাহ্যিক অবস্থা, যার নীচে নিয়তের অনিষ্টতা লুক্কায়িত থাকে। বৃষ্টির সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য এই যে, তার দ্বারা সকল ফসল উৎপন্ন হয় ও সবুজ-শ্যামল আকার ধারণ করে। কিন্তু যখন উর্বর ভূমি শুধু উপরাংশেই নামেমাত্র কিছু মাটি থাকে আর তার নীচে সম্পূর্ণ পাথর আর পাথর লুক্কায়িত থাকে, তাতে বৃষ্টি আবদ্ধ থাকার পরিবর্তে তা আরও ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। ঠিক এভাবে দান-সদকা যদিও বিভিন্ন রূপ কল্যাণ ও মঙ্গলের যোগ্যতা রাখে; কিন্তু তা উপকারী হওয়ার জন্যে খাঁটি ও নির্ভেজাল নিয়ত পাওয়া যাওয়া শর্ত। নিয়ত যদি সৎ না হয়, তাহলে উক্ত আমল সমূলে বিনাশ হয়ে যায়।

২৬৫. وَمَثَلُ نَفَقَاتِ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ طَلَبَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ اَيْ تَحْقِيْقًا لِلثَّوَابِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْمُنَافِقِيْنَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَهُ لِاِنْكَارِهِمْ لَهُ وَمِنْ اِبْتِدَائِيَّةٌ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بُسْتَانٍ بِرَبْوَةٍ بِضَمِّ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ مُسْتَوٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اَعْطَتْ اُكُلَهَا بِضَمِّ الْكَافِ وَسُكُوْنِهَا ثَمَرَهَا ضِعْفَيْنِ مِثْلَيْ مَا يُثْمِرُ غَيْرُهَا فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ مَطَرٌ خَفِيْفٌ يُصِيْبُهَا وَيَكْفِيْهَا لِاِرْتِفَاعِهَا الْمَعْنٰى تُثْمِرُ وَتَزْكُوْ كَثُرَ الْمَطَرُ اَمْ قَلَّ فَكَذٰلِكَ نَفَقَاتُ مَنْ ذُكِرَ تَزْكُوْ عِنْدَ اللّٰهِ كَثُرَتْ اَمْ قَلَّتْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ فَيُجَازِيْكُمْ بِهِ ـ

অনুবাদ :

২৬৫. যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভার্থে তালাশে ও নিজেদের আত্মা বলিষ্ঠকরণার্থে অর্থাৎ তার পুণ্যফল প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করার আশায় ধনৈশ্বর্য ব্যয় করে পক্ষান্তরে মুনাফিকগণ যেহেতু মূলত পরকালে অবিশ্বাস করে সেহেতু তারা পুণ্যফলের আশা করে না। مِنْ اَنْفُسِهِمْ-এর مِنْ টি اِبْتِدَائِيَّة বা প্রারম্ভসূচক শব্দ। তাদের এ ব্যয়ের উপমা হলো কোনো উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত একটি উদ্যান বাগান رَبْوَةٍ-এর "ر" **হরফটি পেশ ও ফাতাহ উভয় হরকত সহকারেই পাঠ করা যায়।** অর্থাৎ উঁচু সমতল ভূমি। যাতে মুষলধারে বৃষ্টি হয় ফলে তার ফল اُكُل -এর ك হরফটি পেশ ও সাকিন উভয়রূপে পাঠ করা যায়। অর্থাৎ ফল-ফলাদি। অন্যস্থানে যা হয় তার দ্বিগুণ জন্মে। যদি মুষলধারে বৃষ্টি নাও হয় তবে শিশির হালকা বৃষ্টিও যদি তাতে পড়ে তবে উচ্চভূমি হওয়ায় তাই তার জন্যে যথেষ্ট হয়। অর্থাৎ বৃষ্টি কম হোক বা বেশি সর্বাবস্থায়ই ফল-ফলাদি ও ফসল তাতে যথেষ্ট উৎপন্ন হয়, তেমনি উল্লিখিত ব্যক্তির দানসমূহ আল্লাহর নিকট বৃদ্ধি পেতে থাকে– দান বেশি হোক বা অল্প হোক। তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা। সুতরাং তিনি তোমাদেরকে তার প্রতিফল দেবেন।

তাহকীক ও তারকীব

اِبْتِغَاء : তালাশ করা। تَثْبِيْتٌ : বলিষ্ঠকরণ। رَبْوَةٌ : উঁচুস্থান। اُكُلٌ : ফল। مَطَرٌ خَفِيْفٌ : হালকা বৃষ্টি।
تُثْمِرُ : ফল দেয়। تَزْكُوْ : বৃদ্ধি পায়।

قَوْلُهُ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ : এর দ্বারা আল্লাহর পথে খরচ করার ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে।

তারকীব : مَثَلُ মুযাফ الَّذِيْنَ মাউসূল اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ জুমলা হয়ে সেলা। صِلَه এবং مَوْصُوْل মিলে مُضَاف اِلَيْه ও مُضَاف মিলে مُضَاف اِلَيْه। مُبْتَدَأ । অতঃপর كَمَثَلِ حَبَّةٍ : حَبَّة মাউসূফ اَنْبَتَتْ الخ জুমলা হয়ে সিফত। صِفَة ও مَوْصُوْف মিলে مُتَعَلِّق مَحْذُوْف হয়ে মুবতাদার খবর।

قَوْلُهُ مَثَلُ صِفَةُ نَفَقَاتِ : মুফাসসির (র.) صِفَة বৃদ্ধি করে বুঝিয়েছেন যে, مَثَل এখানে مِثَال -এর অর্থে নয়; বরং صِفَة -এর অর্থে।

প্রশ্ন : نَفَقَات বৃদ্ধির উদ্দেশ্য কি?

উত্তর : مُشَبَّه بِهٖ হলো مَثَل حَبَّة এবং حَرْف تَشْبِيْه হলো كَاف আর مُشَبَّة হলো اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ অতঃপর اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ হলো مُشَبَّه ও مُشَبَّه بِهٖ -এর মাঝে সামঞ্জস্য না হওয়ায় تَشْبِيْه শুদ্ধ হবে না। কেননা مُشَبَّه بِهٖ তথা حَيَوَانَات -এর অন্তর্ভুক্ত, আর مُشَبَّه তথা حَبَّة হলো جَمَادَات -এর অন্তর্ভুক্ত, তাই تَشْبِيْه শুদ্ধ হয়নি। এর দুটি উত্তর হতে পারে-

১. এখানে مُشَبَّه এর جَانِب উহ্য ধরা হবে। যেমনটি মুফাসসির (র.) করেছেন। এখন তাকদীরী ইবারত হবে-

مَثَلُ نَفَقَةِ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ الخ .

২. مُشَبَّه بِهٖ -এর جَانِب উহ্য ধারা হবে। এ সুরতে তাকদীরী ইবারত হবে- مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ كَمَثَلِ زَرْعِ حَبَّةٍ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَا اَذًى : এটা এ বিষয়ের বিবরণ যে, আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার উল্লিখিত ফজিলত কেবল ঐ ব্যক্তির লাভ হবে, যে খরচ করে খোঁটা দেয় না, মুখের দ্বারা এমন কোনো শব্দ বের করে না, যার দ্বারা গ্রহীতার হেয়তা প্রকাশ পায়। ফলে সে মনে কষ্ট পায়। হাদীস শরীফে এসেছে- রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তিন ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না। তাদের মধ্যে একজন হলো দান করে খোঁটা দানকারী।

-[মুসলিম : কিতাবুল ঈমান]

٢٦٦. اَيَوَدُّ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهُ جَنَّةٌ بُسْتَانٌ مِّنْ نَخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهُ فِيْهَا ثَمَرٌ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَقَدْ اَصَابَهُ الْكِبَرُ فَضَعُفَ عَنِ الْكَسْبِ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ اَوْلَادٌ صِغَارٌ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلَيْهِ فَاَصَابَهَا اِعْصَارٌ رِيْحٌ شَدِيْدَةٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ فَفَقَدَهَا اَحْوَجُ مَا كَانَ اِلَيْهَا وَبَقِيَ هُوَ وَاَوْلَادُهُ عَجَزَةٌ مُتَحَيِّرِيْنَ لَا حِيْلَةَ لَهُمْ وَهٰذَا تَمْثِيْلٌ لِنَفَقَةِ الْمُرَائِيْ وَالْمَانِّ فِيْ ذَهَابِهَا وَعَدَمِ نَفْعِهَا اَحْوَجُ مَا يَكُوْنُ اِلَيْهَا فِي الْاٰخِرَةِ وَالْاِسْتِفْهَامُ بِمَعْنَى النَّفْيِ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) هُوَ لِرَجُلٍ عَمِلَ بِالطَّاعَاتِ ثُمَّ بُعِثَ لَهُ الشَّيْطَانُ فَعَمِلَ بِالْمَعَاصِيْ حَتّٰى اَحْرَقَ اَعْمَالَهُ كَذٰلِكَ كَمَا بَيَّنَ مَا ذُكِرَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ فَتَعْتَبِرُوْنَ ـ

অনুবাদ :

২৬৬. তোমাদের কেউ কি চায় পছন্দ করে যে, তার একটি খর্জুর ও আঙ্গুর উদ্যান বাগান থাকুক, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং যাতে রয়েছে ফল সর্বপ্রকার ফলমূল, আর وَاَصَابَهُ এ বাক্যটি حَال বা ভাববাচক পদ এদিকে ইঙ্গিত করার জন্যে মাননীয় তাফসীরকার এ স্থানে قَدْ শব্দটি উল্লেখ করেছেন। সে ব্যক্তি বার্ধক্যে উপনীত হয় ফলে উপার্জন করা হতে দুর্বল ও অক্ষম হয়ে পড়ে তার সন্তানসন্ততিও দুর্বল অর্থাৎ ছোট ছোট ; তাদেরও উপার্জনের শক্তি নেই। এমতাবস্থায় অগ্নিক্ষরা ঝড় প্রচণ্ড বাতাস তাতে লাগে এবং তা জ্বলে যায়। অর্থাৎ যে সময় সে তার প্রতি সর্বাপেক্ষা বেশি মুখাপেক্ষী ছিল সেই সময় তা হারিয়ে ফেলল। ফলে সে আর তার সন্তানসন্ততি অক্ষম ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় পড়ে রইল। কোনো উপায়– তদবির আর তাদের অবশিষ্ট নেই। সে ব্যক্তি রিয়া বা লোক দেখানো এবং বলে বেড়ানোর উদ্দেশ্যে দান করে এটা তার উপমা। পরকালে যে যখন এর প্রতি সর্বাধিক মুখাপেক্ষী হবে, তখন তার সর্বপ্রকার দান এমনভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে, এর কোনো উপকারিতা তার লাভ হবে না। اَيَوَدُّ-এর প্রশ্নবোধক হামযাটি এ স্থানে না-সূচক অর্থে ব্যবহৃত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, এ উপমাটি হলো ঐ ব্যক্তির যে ব্যক্তি বহু সৎ আমল করেছিল, পরে তার বিরুদ্ধে শয়তান প্রেরিত হলো; ফলে সে পাপকার্যে লিপ্ত হয়ে পড়ল আর সে তার সকল সৎ আমল জ্বালিয়ে দিল, বিনষ্ট করে দিল।

এভাবে অর্থাৎ উল্লিখিত বিধানসমূহ যেমন সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে দেওয়া হয়েছে তেমনি আল্লাহ তাঁর নিদর্শন তোমাদের জন্যে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তোমরা চিন্তা করতে পার। আর তা হতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পার।

তাহকীক ও তারকীব

يَوَدُّ : কামনা করে, পছন্দ করে। وَدَّ (ن) وُدًّا - পছন্দ করা, কামনা করা। بُسْتَانٌ : বাগান। এটি একবচন। এর বহুবচন হচ্ছে بَسَاتِيْنُ

نَخِيْلٌ : খেজুর বৃক্ষ। اَعْنَابٌ : আঙ্গুর عِنَبٌ-এর বহুবচন। اِعْصَارٌ : প্রচণ্ড বায়ু, ঝড়-তুফান।

عَجَزَةٌ : অক্ষম। اَلْمُرَائِيْ : রিয়াকারী। যে লোক দেখানোর জন্য আমল করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهُ جَنَّةٌ : অর্থাৎ তোমরা যদি পছন্দ না কর যে, তোমাদের সারা জীবনের উপার্জন এমন নাজুক মুহূর্তে বিনাশ হয়ে যাক, যখন তোমরা তা দ্বারা উপকার লাভের সবচেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী হবে। আর নতুন করে উপার্জনের সুযোগও থাকবে না। তাহলে তোমরা এটা কিভাবে পছন্দ কর যে, দুনিয়ার সারা জীবন আমল করার পরে পরকালের জীবনে এভাবে যাত্রা করবে যে সেখানে পৌঁছানোর পর তোমরা দেখতে পাবে, তোমাদের সারা জীবনের কৃতকর্মের এখানে কোনো মূল্য নেই। দুনিয়ায় তোমরা যা উপার্জন করেছিলে তা দুনিয়াতেই রয়ে গেছে। পরকালের জন্যে কিছুই উপার্জন করে আননি যে, এখানে তা দ্বারা উপকৃত হবে। পরকালে তোমাদের নতুনভাবে উপার্জন করার কোনো সুযোগও মিলবে না। পরকালের জন্যে যা উপার্জন করার সুযোগ ছিল তা পার্থিব জীবনেই সীমাবদ্ধ। তোমরা যদি পরকালের চিন্তা না করে সারা জীবন দুনিয়ার চিন্তায় বিভোর থাক, নিজেদের সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও শক্তি-সামর্থ্য পার্থিব উপকার লাভের পিছনে ব্যয় কর, তাহলে জীবন দুনিয়ার চিন্তায় বিভোর থাক, নিজেদের সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও শক্তি-সামর্থ্যকে পার্থিব উপকার লাভের পিছনে ব্যয় কর, তাহলে জীবন রবি অস্তমিত হওয়ার পরে তোমাদের অবস্থা ঐ বৃদ্ধের ন্যায় পরিতাপের হবে যার সারা জীবনের উপার্জন এবং জীবন ধারণের সহায় ছিল একটি মাত্র বাগান। সে বাগানটি একেবারে বৃদ্ধকালে জ্বলেপুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেল, এখন আর সে নতুন করে বাগানটি তৈরি করতে সক্ষম নয়। আর সন্তানাদিও তাকে সহায়তা দেওয়ার যোগ্য নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত ওমর (রা.) এ দৃষ্টান্ত দ্বারা ঐ সকল লোকদেরকে বুঝেছেন, যারা সারা জীবন বিভিন্ন রূপ নেক আমল করে শেষ জীবনে শয়তানের প্ররোচনায় আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত হয়। ফলে তার সারা জীবনের নেক আমল নস্যাৎ হয়ে যায়।

হযরত ওমর (রা.) নবী করীম ﷺ-এর সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, এ আয়াত সম্পর্কে তোমাদের মতামত কি? তারা উত্তর দিলেন, এ ব্যাপারে আল্লাহই অধিক জ্ঞাত। হযরত ওমর (রা.) রাগান্বিত হয়ে বললেন, বল তোমাদের ধারণা কি? অর্থাৎ এ ধরনের অস্পষ্ট উত্তর না দিয়ে যা বুঝে আসে তা বলে দাও । হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তখন আরজ করলেন– আমীরুর মু'মিনীন! এ আয়াত সম্পর্কে আমার অন্তরে একটি বিষয় এসেছে। হযরত ওমর (রা.) বললেন, বল ভাতিজা তা কি? নিজেকে হেয় জ্ঞান করো না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) আরজ করলেন– এ আয়াতে সে ধনী ব্যক্তির দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে যে আল্লাহর আনুগত্যমূলক নেক আমল করেছে। এরপর আল্লাহ তার নিকট শয়তান প্রেরণ করেছেন, ফলে সে নাফরমানিতে লিপ্ত হয়ে নিজের আমলসমূহকে বরবাদ করেছে। –[রূহুল মা'আনী সূত্রে জামালাইন]

٢٦٧. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا زَكُّوْا مِنْ طَيِّبٰتِ جِيَادِ مَا كَسَبْتُمْ مِنَ الْمَالِ وَمِنْ طَيِّبٰتِ مِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ مِنَ الْحُبُوْبِ وَالثِّمَارِ وَلَا تَيَمَّمُوا تَقْصُدُوْا الْخَبِيْثَ الرَّدِيْءَ مِنْهُ اَىْ مِنَ الْمَذْكُوْرِ تُنْفِقُوْنَ فِي الزَّكٰوةِ حَالٌ مِنْ ضَمِيْرِ تَيَمَّمُوْا وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اَيِ الْخَبِيْثَ لَوْ اُعْطِيْتُمُوْهُ فِىْ حُقُوْقِكُمْ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ بِالتَّسَاهُلِ وَغَضِّ الْبَصَرِ فَكَيْفَ تُؤَدُّوْنَ مِنْهُ حَقَّ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنْ نَفَقَاتِكُمْ حَمِيْدٌ مَحْمُوْدٌ عَلٰى كُلِّ حَالٍ .

অনুবাদ :

২৬৭. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যা যে সম্পদ উপার্জন কর এবং আমি যা অর্থাৎ যে শস্য ও ফল-ফলাদি ভূমি হতে তোমাদের জন্যে উৎপাদন করি তা থেকে যা পবিত্র উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর; তার জাকাত আদায় কর। জাকাতের মধ্যে তার উল্লিখিত সম্পদের নিকৃষ্ট নিম্নমানের বস্তু ব্যয় করার সংকল্প ইচ্ছা করো না। تُنْفِقُوْنَ এটা تَيَمَّمُوْا -এর ضَمِيْر [সর্বনাম اَنْتُمْ -তোমরা] -এর حَال বা ভাব ও অবস্থাবাচক পদ। অথচ তোমাদের কোনো পাওনার বেলায় তা আদায় করা হলে যদি না তোমরা চক্ষু বন্ধ করে রাখ আনমনা ও অসতর্কভাবে এবং চক্ষু বুজে না রাখ তবে তোমরা নিজেরা তা নিকৃষ্ট বস্তু গ্রহণ কর না। সুতরাং তোমরা তা হতে আল্লাহর হক কি করে আদায় করতে পার? জেনে রাখ! আল্লাহ তোমাদের এ দান হতে অমুখাপেক্ষী, সর্বাবস্থায় তিনি প্রশংসিত।

٢٦٨. اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ يُخَوِّفُكُمْ بِهِ اِنْ تَصَدَّقْتُمْ فَتَمْسِكُوْا وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ الْبُخْلِ وَمَنْعِ الزَّكٰوةِ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ عَلَى الْاِنْفَاقِ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ لِذُنُوْبِكُمْ وَفَضْلًا رِزْقًا خَلْفًا مِنْهُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ فَضْلُهُ عَلِيْمٌ بِالْمُنْفِقِ .

২৬৮. শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় অর্থাৎ যদি তোমরা দান-সদকা কর তবে দরিদ্রতার আশঙ্কা প্রদর্শন করে। ফলে তোমরা দান করা থেকে বিরত থাক। এবং তোমাদেরকে অশ্লীলতার কার্পণ্য ও জাকাত আদায় না করার নির্দেশ দেয়। আর আল্লাহ তোমাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয়ের উপর তাঁর পক্ষ হতে তোমাদের পাপ কার্যসমূহের ক্ষমা এবং অনুগ্রহের অর্থাৎ এর স্থলে আরও অধিক রিজিক প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। আর আল্লাহ অর্থাৎ তাঁর অনুগ্রহ অতি বিস্তৃত এবং তিনি ব্যয়কারী সম্পর্কে খুবই অবহিত।

٢٦٩. يُؤْتِى الْحِكْمَةَ الْعِلْمَ النَّافِعَ الْمُؤَدِّىْ اِلَى الْعَمَلِ مَنْ يَّشَآءُ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا لِمَصِيْرِهِ اِلَى السَّعَادَةِ الْاَبَدِيَّةِ وَمَا يَذَّكَّرُ فِيْهِ اِدْغَامُ التَّاءِ فِى الْاَصْلِ فِى الذَّالِ يَتَّعِظُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ اَصْحَابُ الْعُقُوْلِ .

২৬৯. তিনি যাকে ইচ্ছা হিকমত অর্থাৎ এমন লাভজনক জ্ঞান যা আমলের প্রতি প্রবুদ্ধ করে। দান করেন এবং যাকে হিকমত প্রদান করা হয় তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়। কারণ এটা চির সৌভাগ্য অর্জনের পথে মানুষকে নিয়ে যায়। এবং বোধশক্তি সম্পন্নগণ অর্থাৎ বুদ্ধির অধিকারীগণ ভিন্ন অন্য কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না। উপদেশ গ্রহণ করে না। يَذَّكَّرُ শব্দটির ت ই মূলত ذ -এর মধ্যে ইদগাম হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

زَكُّوا : জাকাত আদায় কর। جِيَادٌ : উৎকৃষ্ট। اَلْحُبُوْبُ : এটি حَبَّةٌ -এর বহুবচন। অর্থ- শস্য, দানা। اَلرَّدِئُ : নিকৃষ্ট, নিম্নমানের।

اَنْ تُغْمِضُوْا : غَمَضَ (اِفْعَال)اِغْمَاضًا চোখ বুঝে থাকা। اَلتَّسَاهُلُ : অসতর্কতা। غَضُّ الْبَصَرِ : চক্ষু বন্ধ করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ : দান-সদকা কবুল হওয়ার জন্যে যেভাবে মানুষের অন্তরে কষ্ট না দেওয়া এবং লৌকিকতা থেকে মুক্ত হওয়া জরুরি- যেমনটি পূর্বের আয়াতসমূহে উল্লিখিত হয়েছে, তদ্রূপ হালাল ও পবিত্র হওয়াও জরুরি।

শানে নুযূল : মদিনার কতিপয় আনসার যারা খেজুর বাগানের মালিক ছিল, কোনো কোনো সময় তারা কম মূল্যের খারাপ খেজুরের ছড়া মসজিদে এনে ঝুলিয়ে রাখত, আসহাবে সুফফার যেহেতু জীবিকা নির্বাহের কোনো ব্যবস্থা ছিল না, তাই যখন তাদের ক্ষুধা লাগত তখন উক্ত খেজুরের ছড়া থেকে খেজুর খেয়ে নিত। এ সম্পর্কে উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। -[ফাতহুল কাদীর, তিরমিযীর বরাতে।]

قَوْلُهُ اَلْجِيَادِ : طَيِّبٰتِ -এর ব্যাখ্যা اَلْجِيَادُ দ্বারা করে মুফাসসির (র.) এদিকে ইশারা করেছেন যে, এর অর্থ হালাল নয় যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, বরং এখানে তা উত্তমার্থে ব্যবহৃত।

طَيِّبٰتِ -এর ব্যাখ্যা : কোনো কোনো আলেম উত্তম দ্বারা করেছেন। ব্যাখ্যাকার (র.) ও এ মতের প্রবক্তা। এর আলামত স্বরূপ তারা مِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ বাক্য স্থির করেছেন। কেননা ভূমি থেকে উৎপন্ন বস্তু হালাল হয়ে থাকে, তবে ভালোমন্দের দিক দিয়ে অনেক ব্যবধান থাকে। এ কারণেই এ طَيِّبٰت -এর অনুবাদ উত্তম দ্বারা করা হয়েছে। শানে নুযূলের ঘটনা দ্বারাও এর সমর্থন লাভ হয়। কেউ কেউ এর অর্থ হালাল বলেছেন, কারণ পূর্ণাঙ্গরূপে উত্তম বস্তু সেটাই যা হালাল হয়। যদি উভয় অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া হয় তাতেও কোনো সাংঘর্ষিকতা নেই। অবশ্য যার নিকট উন্নতমানের বস্তু না থাকবে সে এ নিষেধাজ্ঞা বহির্ভূত হবে।

تُغْمِضُوْا মুযারের সীগাহ। অর্থ- চোখ বন্ধ করা। এখানে রূপকার্থে ক্ষমা করা উদ্দেশ্য।

উশরী ভূমির বিধান :

مِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ : اَخْرَجْنَا শব্দটি দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, উশরী ভূমির উৎপন্ন ফসলের উশর দেওয়া ওয়াজিব। এ আয়াতের ব্যাপকতা দ্বারা ইমাম আবূ হানীফা (র.) দলিল পেশ করে বলেন, উশরী ভূমির কমবেশী সকল ফসলের উপর উশর ওয়াজিব। উশর ও খেরাজ উভয়টি ইসলামি সরকারের পক্ষ থেকে ভূমির উপর আরোপিত ট্যাক্সবিশেষ। উভয়টির মধ্যে পার্থক্য এই যে , উশর কেবল ট্যাক্সই নয়; বরং তার মধ্যে ইবাদতের দিকও রয়েছে। মুসলমান যেহেতু ইবাদতের যোগ্য এ কারণে উশরী ভূমি থেকে যে ট্যাক্স গ্রহণ করা হয়, তাকে উশর বলে। আর অমুসলিমদের থেকে যে ভূমির ট্যাক্স গ্রহণ করা হয় তাকে খেরাজ বলা হয়। উশর ও খেরাজের বিস্তারিত মাসআলা ফিকাহগ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

قَوْلُهُ اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ : নেক কাজে যদি সম্পদ ব্যয় করা হয় তখন শয়তান বিভিন্নভাবে মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করে যে, এর দ্বারা তুমি অভাবী হয়ে যাবে, তোমার সম্পদের ঘাটতি হবে। পক্ষান্তরে অন্যায় কাজে ব্যয় করলে তখন সে অতিমাত্রায় উৎসাহ যোগায়। দেখা যায় যে, মসজিদ মাদরাসায় কিংবা অন্য কোনো নেক কাজে আর্থিক কাজে সহায়তা করতে ইচ্ছা করলে তখন শয়তান বিভিন্নভাবে তাকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। ফলে বারবার সামান্য অর্থের জন্যে তাদের নিকট যাতায়াত করতে হয়। অথচ সিনেমা, টেলিভিশন, মদ, নাজায়েজ অনুষ্ঠান, অন্যায় মামলা-মকদ্দমা ইত্যাদি কাজে নির্দ্বিধায় মানুষ মোটা অঙ্কের অর্থ ব্যয় করে।

اَلْبُخْلُ -এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, فَحْشَاء শব্দটি ব্যভিচার অর্থে ব্যবহৃত নয়, বরং কৃপণতা অর্থে।

হেকমতের অর্থ ও ব্যাখ্যা :

قَوْلُهُ يُؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ : হিকমত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সঠিক সিদ্ধান্ত এবং সঠিক বিবেচনা শক্তি। এখানে এ কথা বলা উদ্দেশ্য যে, যার নিকট হিকমতের সম্পদ রয়েছে, তখন সে শয়তানের প্রদর্শিত পথে চলবে না; বরং সে প্রশস্ত রাস্তা অবলম্বন করবে, আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছেন। শয়তানের সংকীর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন মুরিদ তথা চেলাদের মধ্যে এটাও বড় জ্ঞানবুদ্ধিতার পরিচয় যে, মানুষ স্বীয় সম্পদ আগলে রাখবে। সর্বদা উপার্জনের চিন্তায় বিভোর থাকবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যাকে সঠিক বিবেচনা শক্তি ও আত্মিক আলো প্রদান করা হয়েছে, তাদের দৃষ্টিতে এটা সম্পূর্ণ নির্বুদ্ধিতার কাজ। হিকমত ও জ্ঞানের চাহিদা এই যে, মানুষ যা উপার্জন করবে, তা দ্বারা নিজের মধ্যম পর্যায়ের প্রয়োজনাদি পূরণ করার পরে অন্তর খুলে ছওয়াবের রাস্তায় খরচ করবে। -[জামালাইন]

অনুবাদ :

٢٧٠. وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ اَدَّيْتُمْ مِنْ زَكٰوةٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَوَفَيْتُمْ بِهٖ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهٗ فَيُجَازِيْكُمْ عَلَيْهِ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ بِمَنْعِ الزَّكٰوةِ وَالنَّذْرِ اَوْ بِوَضْعِ الْاِنْفَاقِ فِىْ غَيْرِ مَحَلِّهٖ مِنْ مَعَاصِى اللّٰهِ مِنْ اَنْصَارٍ مَانِعِيْنَ لَهُمْ مِّنْ عَذَابِهٖ .

২৭০. যা কিছু তোমরা ব্যয় কর অর্থাৎ যে জাকাত বা সদকা তোমরা আদায় কর অথবা যা কিছু তোমরা মানত কর আর তা পালন কর নিশ্চয় আল্লাহ তা জানেন। অনন্তর তিনি তোমাদেরকে তার প্রতিফল দান করবেন। জাকাত ও মানত আদায় না করে বা অস্থানে অর্থাৎ **আল্লাহর অবাধ্যাচরণে** ব্যয় করত যারা সীমালঙ্ঘনকারী তাদের কোনো সাহায্যকারী আল্লাহর শাস্তি হতে তাদেরকে রক্ষাকারী নেই।

٢٧١. اِنْ تُبْدُوْا تُظْهِرُوا الصَّدَقٰتِ اَيِ النَّوَافِلَ فَنِعِمَّا هِىَ اَىْ نِعْمَ شَيْئًا اِبْدَاؤُهَا وَاِنْ تُخْفُوْهَا تُسِرُّوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ اِبْدَائِهَا وَاِيْتَائِهَا الْاَغْنِيَاءَ اَمَّا صَدَقَةُ الْفَرْضِ فَالْاَفْضَلُ اِظْهَارُهَا لِيُقْتَدٰى بِهٖ وَلِئَلَّا يُتَّهَمَ وَاِيْتَاؤُهَا الْفُقَرَاءَ مُتَعَيِّنٌ وَيُكَفِّرُ بِالْيَاءِ وَبِالنُّوْنِ مَجْزُوْمًا بِالْعَطْفِ عَلٰى مَحَلِّ فَهُوَ وَمَرْفُوْعًا عَلَى الْاِسْتِيْنَافِ عَنْكُمْ مِّنْ بَعْضِ سَيِّاٰتِكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ عَالِمٌ بِبَاطِنِهٖ كَظَاهِرِهٖ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَىْءٌ مِنْهُ .

২৭১. তোমরা যদি প্রকাশ্যভাবে নফল দান-খয়রাত কর তবে তা ভালো অর্থাৎ তা প্রকাশ্যে করা কতই না ভালো আর যদি চুপি চুপি কর গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তকে দিয়ে দাও তবে তা তোমাদের জন্যে প্রকাশ্য দান করা ও সচ্ছল লোকদের প্রদান করা অপেক্ষা অধিক ভালো। পক্ষান্তরে ফরজ দান প্রকাশ্যে করা অধিক উত্তম। কারণ, অন্যরা [এ বিষয়ে উৎসাহিত হয়ে] তার অনুসরণ করতে পারবে এবং [সে জাকাত দেয় না বলে] কারো কোনো সন্দেহ হবে না। আর এটা দরিদ্রদের জন্য নির্দিষ্ট। এবং তিনি তোমাদের কিছু কিছু কতক পাপ মোচন করবেন। يُكَفِّرُ এটা ى [নাম পুরুষ একবচন] ও ن [প্রথম পুরুষ, বহুবচন] উভয় অক্ষরসহ পঠিত রয়েছে। فَهُوَ -এর مَحَلّ [جَوَاب شَرْط রূপে] -এ তার عَطْف বা অন্বয় হওয়ায় তা مَجْزُوْم বা জযমসহ আর اِسْتِيْنَاف বা নতুন বাক্যরূপে مَرْفُوْع পাঠ করা যায়। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন। বাইরের মতো তার ভিতর সম্পর্কেও তিনি জানেন। তার কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই।

তাহকীক ও তারকীব

نَفَقَةً : ব্যয়, খরচ। وَفَّيْتُمْ : পূরণ করলে। نَذْرٌ : মানত। لِيُقْتَدٰى بِهٖ : অনুসরণ করতে পারে।
لِئَلَّا يُتَّهَمَ : সন্দেহ হবে না। অপবাদ দিবে না। ظَاهِرٌ : বাইর, বাহির। بَاطِنٌ : ভিতর, অভ্যন্তর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মানতের বিধান : মানত এমন ইবাদতের ব্যাপারে করা যায়, যা ওয়াজিবের অন্তর্গত কিন্তু তা স্বয়ং ওয়াজিব নয়। যেমন– নামাজ, রোজা, হজ প্রভৃতি। এ কারণে কোনো মানুষ যদি রোগীকে দেখতে যাওয়ার মানত মানে তাহলে তা তার উপর ওয়াজিব হয় না। যদি কেউ পাপ কাজের মানত করে তাহলেও তা পূর্ণ করা ওয়াজিব নয়; বরং তা পরিহার করাই ওয়াজিব। তবে এ ব্যাপারে শপথ করে থাকলে শপথের কাফফারা আদায় করা আবশ্যক।

গায়রুল্লাহর নামে মানত করা নাজায়েজ।

মানতও যেহেতু নামাজ রোজার ন্যায় ইবাদত, কাজেই গায়রুল্লাহর জন্যে তা জায়েজ নয়, বরং এটা শিরক। কাজেই কোনো পীর, নবী, ওলী কারো নামে মানত করা শিরক। তা পরিহার করা জরুরি। -[জামালাইন]

দান-সদকা গোপনে করা উত্তম : إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ এর দ্বারা বুঝা গেল যে, স্বাভাবিক ক্ষেত্রে গোপনে দান-সদকা করা উত্তম। তবে যে ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে দান করার দ্বারা মানুষকে উৎসাহিত করা উদ্দেশ্য হয় কিংবা দোষারোপ থেকে বেঁচে থাকা উদ্দেশ্য হয় তা স্বতন্ত্র। অন্যান্য ক্ষেত্রে গোপনে দান-সদকা করাই উত্তম। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– কিয়ামতের দিবসে যে সকল ব্যক্তিকে আরশের নীচে ছায়াদান করা হবে তাদের মধ্যে সে ব্যক্তিও থাকবে, যে গোপনভাবে দান-সদকা করেছে। এমনকি তার ডান হাতে যা খরচ করেছে তার বাম হাতও সে ব্যাপারে অবগত থাকবে না। [এ ধরনের বাচনভঙ্গী দ্বারা উত্তমরূপে গোপনীয়তা রক্ষার প্রতি ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য] নফল দান সদকা গোপনে এবং ফরজ সদকা প্রকাশ্য দেওয়া উত্তম। لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ مُعْتَرِضَةٌ বাক্যটি অর্থাৎ আপনার উপর ওয়াজিব নয় যে, তাদেরকে হেদায়েতপ্রাপ্ত বানাবেন; বরং কেবল সঠিক পথপ্রদর্শন করাই আপনার দায়িত্ব।

শানে নুযূল : কাব ইবনে হুমাইদ ও নাসায়ী (র.) প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, ইসলামের সূচনালগ্নে মুসলমানগণ অমুসলিম আত্মীয়স্বজন এবং অমুসলিম গরিবদেরকে দান-সদকা করতে ইতস্তত করত। তাদের ধারণা ছিল, আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার দ্বারা কেবল মুসলমানদেরকে প্রদান করাই উদ্দেশ্য। এ আয়াত দ্বারা তাদের ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত করা হয়েছে।

হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা.)-এর মা কুফরি অবস্থায় থাকাকালে নিজ কন্যা হযরত আসমা (রা.)-এরই খেদমতে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে মদিনায় আগমন করে। হযরত আসমা রাসূল ﷺ থেকে অনুমতি না নেওয়া পর্যন্ত তাকে সাহায্য করেননি।

মাসআলা : এখানে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, সদকা দ্বারা নফল দান-সদকা উদ্দেশ্য। মানবতার ভিত্তিতে কাফের জিম্মিকেও তা দেওয়া জায়েজ, তবে ওয়াজিব সদকা অমুসলিমকে দেওয়া জায়েজ নয়।

মাসআলা : কাফের জিম্মি অর্থাৎ যারা রাষ্ট্রদ্রোহী নয়, তাদেরকে শুধু জাকাত ও উশর দেওয়া নাজায়েজ, অন্যান্য নফল ও ওয়াজিব দান-সদকা দেওয়া জায়েজ । আয়াতে জাকাত অন্তর্ভুক্ত নয়। -[মা'আরিফুল কুরআন]

قَوْلُهُ مَجْزُومًا بِالْعَطْفِ : -এর দ্বারা يُكَفِّرُ -এর ই'রাব বর্ণনা করেছেন। মুসান্নিফ (র.) বলেন, শব্দটিকে جَزْم দিয়ে পড়লে فَهُوَ -এর উপর আতফ হবে। কেননা فَهُوَ শর্তের জবাব হওয়ার কারণে জযমবিশিষ্ট। আর مَرْفُوع পড়লে مُسْتَانِفَه বাক্য হওয়ার কারণে শর্তের সাথে এর কোনো সম্বন্ধ থাকবে না। -[জামালাইন ৪২৩]

قَوْلُهُ لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا : ঈমানদারদের বৈশিষ্ট্য এই যে, অভাব-অনটন সত্ত্বেও তারা ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বিরত থাকবে, অন্যের দ্বারস্থ হবে না। দানের ব্যাপারে কাউকে পীড়াপীড়ি করবে না। কেউ কেউ এখানে اِلْحَافٌ -এর অর্থ করেছেন যে, তারা মোটেই কারো কাছে কিছু চাইবে না। কেউ বলেন, তারা চাওয়ার ক্ষেত্রে পীড়াপীড়ি করবে না। এ বিষয়বস্তুর সমর্থন উক্ত হাদীসে পাওয়া যায় যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, সে মিসকিন নয়, যে দু-একটি খেজুর বা দু-এক লোকমা আহারের জন্যে মানুষের দ্বারস্থ হয়, বরং প্রকৃত মিসকিন সে যে অভাব সত্ত্বেও মানুষের দ্বারস্থ হওয়া থেকে বিরত থাকে। এরপর রাসূল ﷺ দলিল স্বরূপ لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا আয়াত পাঠ করলেন। এ কারণেই পেশাদার ভিক্ষুকদের দান করার পরিবর্তে সাদা পোশাকধারী অভাবী এবং দীনি কার্যে নিয়োজিত, আলেম ও তালিবে ইলমদেরকে খুঁজে খুঁজে সহায়তা করা উচিত। কারণ এ ধরনের মানুষ অন্যের নিকট হাত সম্প্রসারণ করাকে নিজেদের জন্যে অপমানজনক মনে করে।

قَوْلُهُ اَيِ النَّاس : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, هُدَاهُمْ -এর যমীরটি اَلنَّاس -এর প্রতি ফিরেছে। যদিও তা পূর্বে স্পষ্ট উল্লেখ নেই। তবে এ বাক্যের বিষয়বস্তু দ্বারা বোধগম্য হয় যে, এর দ্বারা فُقَرَاء উদ্দেশ্য নয়। যেমনটা স্বাভাবিকভাবে বুঝে আসে। কারণ এক্ষেত্রে অর্থ ঠিক থাকে না।

قَوْلُهُ مَجْزُوْمًا بِالْعَطْفِ عَلٰى مَحَلِّ فَهُوَ مَرْفُوْعًا عَلَى الْاِسْتِئْنَافِ : এ ইবারতে يُكَفِّر -এর اِعْرَاب বর্ণনা করা হয়েছে। يُكَفِّر -কে যদি مَجْزُوْم পড়া হয় তাহলে সেটা হবে فَهُوَ -এর مَحَلّ -এর উপর عَطْف হওয়ার কারণে। কেননা فَهُوَ টি جَوَابُ الشَّرْطِ হওয়ার কারণে مَجْزُوْم হয়েছে। আর مَرْفُوْع পড়া হলে جُمْلَة مُسْتَانِفَة হওয়ার কারণে হবে। شَرْط -এর সাথে তার কোনো সম্পর্ক হবে না।

অনুবাদ :

٢٧٢. وَلَمَّا مَنَعَ ﷺ مِنَ التَّصَدُّقِ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ لِيُسْلِمُوْا نُزِلَ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰيهُمْ أَيِ النَّاسِ إِلَى الدُّخُوْلِ فِي الْإِسْلَامِ إِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ هِدَايَتَهُ إِلَى الدُّخُوْلِ فِيْهِ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ مَالٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ لِأَنَّ ثَوَابَهُ لَهَا وَمَا تُنْفِقُوْنَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ أَيْ ثَوَابَهُ لَا غَيْرَهُ مِنْ أَغْرَاضِ الدُّنْيَا خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ إِلَيْكُمْ جَزَاؤُهُ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ تُنْقَصُوْنَ مِنْهُ شَيْئًا وَالْجُمْلَتَانِ تَاكِيْدٌ لِلْأُوْلٰى .

২৭২. ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ মুশরিকদেরকে দান-সদকা করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন– তাদের অর্থাৎ লোকদের সৎপথ গ্রহণের দায় অর্থাৎ তাদের ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার দায় তোমার নয়। তোমার দায়িত্ব কেবল পৌঁছিয়ে দেওয়া। বরং আল্লাহ যাকে এতে প্রবেশের হেদায়েতের ইচ্ছা করেন সৎপথে পরিচালিত করেন। যে 'খায়র' ধনসম্পদ তোমরা ব্যয় কর, তা তোমাদের নিজেদের জন্য কেননা তার পুণ্যফল যে ব্যয় করে তারই এবং তোমরা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভার্থেই অর্থাৎ দুনিয়ার অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয় কেবল পুণ্য লাভের আশায়ই ব্যয় করে থাক। وَمَا تُنْفِقُوْنَ এ বাক্যটি خَبَرِيَّةٌ [বিবরণমূলক] হলেও মূলত এটা نَهِي বা নিষেধাজ্ঞার অর্থে ব্যবহৃত। যে ধনসম্পদ তোমরা ব্যয় কর তার পুরস্কার তোমাদেরকে পুরাপুরিভাবে প্রদান করা হবে। তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না। أَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ এবং مَا تُنْفِقُوْنَ এ বাক্য দুটি এ স্থানে প্রথম বাক্যটির জন্যে তাকীদমূলক।

তাহকীক ও তারকীব

مَنَعَ : নিষেধ করলেন। اَلتَّصَدُّقُ : দান-সদকা করা। لِيُسْلِمُوْا : যাতে তারা মুসলমান হয়। اَغْرَاضٌ : স্বার্থ, গরজ। لَا تُنْقَصُوْنَ : হ্রাস করা হবে না, পুরোপুরি দেওয়া হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اِلَى الدُّخُوْلِ فِي الْاِسْلَامِ : এ ইবারতটুকু দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন : রাসূল ﷺ থেকে هِدَايَة -এর نَفِي করার দ্বারা উদ্দেশ্য কি? অথচ রাসূল ﷺ -এর আগমনই হয়েছে মানুষের হেদায়েতের জন্যে।

উত্তর : نَفِي দ্বারা উদ্দেশ্য اِيْصَالٌ اِلَى الْمَطْلُوْبِ -এর نَفِي করা। اِرَائَةُ الطَّرِيْقِ -এর نَفِي করা উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهُ خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ : **প্রশ্ন :** وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ -এর মাঝে সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে খরচ করে থাক। অথচ বহু মানুষ লোক দেখানো ও খ্যাতির উদ্দেশ্যে দান-খয়রাত করে থাকে। এর দ্বারা তো كِذْبِ بَارِي লাযেম আসে।

উত্তর : এখানে خَبَر টি نَهِي -এর অর্থে ব্যবহৃত। এর মর্ম হলো, তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশা ব্যতীত খরচ করো না।

٢٧٣. لِلْفُقَرَاءِ خَبَرُ مُبْتَدَإٍ مَحْذُوْفٍ اَيِ الصَّدَقَاتُ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَيْ حَبَسُوْا اَنْفُسَهُمْ عَلَى الْجِهَادِ وَنَزَلَتْ فِيْ اَهْلِ الصُّفَّةِ وَهُمْ اَرْبَعُمِائَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ اَرْصَدُوْا لِتَعْلِيْمِ الْقُرْاٰنِ وَالْخُرُوْجِ مَعَ السَّرَايَا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا سَفَرًا فِي الْاَرْضِ لِلتِّجَارَةِ وَالْمَعَاشِ لِشُغْلِهِمْ عَنْهُ بِالْجِهَادِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ بِحَالِهِمْ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ اَيْ لِتَعَفُّفِهِمْ عَنِ السُّؤَالِ وَتَرْكِهِ تَعْرِفُهُمْ يَا مُخَاطَبًا بِسِيْمٰهُمْ عَلَامَتِهِمْ مِنَ التَّوَاضُعِ وَاَثَرِ الْجُهْدِ لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ شَيْئًا فَيُلْحِفُوْنَ اِلْحَافًا اَيْ لَا سُؤَالَ لَهُمْ اَصْلًا فَلَا يَقَعُ مِنْهُمْ اِلْحَافٌ وَهُوَ الْاِلْحَاحُ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ فَيُجَازِيْكُمْ عَلَيْهِ.

অনুবাদ :

২৭৩. সাদাকাত অভাবগ্রস্ত লোকদের প্রাপ্য لِلْفُقَرَاءِ এটা এ স্থানে উহ্য مُبْتَدَأ বা উদ্দেশ্য اَلصَّدَقَاتُ-এর خَبَر বা বিধেয়। যারা আল্লাহর পথে রুদ্ধ অর্থাৎ আল্লাহর পথে জিহাদের জন্যে তারা নিজেদেরকে আটকিয়ে রেখেছে। জিহাদের উদ্দেশ্যে নিজেদেরকে ব্যাপৃত রাখায় তারা জীবিকা উপার্জন ও ব্যবসার জন্যে পৃথিবীতে ঘুরাফিরা সফর করতে পারে না। সুফফা [মসজিদে নববীর আঙ্গিনা] বাসী সাহাবীগণ সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হয়েছিল। তাঁরা সংখ্যায় [প্রায়] চারশত মুহাজির সাহাবী ছিলেন। কুরআন শিক্ষা ও জিহাদে বের হওয়ার জন্যে তারা সদা প্রস্তুত হয়ে থাকতেন। [ফলে জীবিকার সন্ধানে ঘুরাফেরা করতে পারতেন না।] যে তাদের অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ সে ব্যক্তি যাচনা না করার কারণে অর্থাৎ কারো নিকট কিছু প্রার্থনা করা হতে তাদের বেঁচে থাকার কারণে তাদেরকে অভাবহীন ধারণা করে। হে সম্বোধিত ব্যক্তি! তাদের চিহ্ন বিনয়, ক্ষুৎপিপাসার কষ্ট দর্শন করে তুমি তাদেরকে চিনতে পারবে। মানুষের নিকট তারা কিছুই যাচনা করে না যে তারা পীড়াপীড়ি করবে অর্থাৎ তারা আদতেই কোনোরূপ যাচনা করে না। সুতরাং তাদের তরফ থেকে পীড়াপীড়ি সংঘটিত হওয়ার কথাই উঠে না। اِلْحَافًا এটা এ স্থানে উহ্য يَحْلَفُوْنَ ক্রিয়ার مَفْعُوْل مُطْلَق বা সমধাতুজ কর্ম। যে ধনসম্পদ তোমরা ব্যয় কর আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত। অনন্তর তিনি তোমাদেরকে তার প্রতিদান দেবেন।

٢٧٤. اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

২৭৪. যারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য রাত্রে ও দিবসে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে তাদের পুণ্যফল। সুতরাং তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

তাহকীক ও তারকীব

أُحْصِرُوْا : তারা নিজেদেরকে ব্যাপৃত রাখে। حُبِسُوْا : আটকিয়ে রেখেছে। اَلسَّرَايَا : سَرِيَّةٌ -এর বহুবচন। অর্থ- অভিযান। اَلْمَعَاشُ : জীবিকা উপার্জন। اَلتَّعَفُّفُ : যাচনা না করা। اَلْعِفَّةُ থেকে নির্গত عَفَّ عَنِ الشَّيْءِ বিরত থাকল। سَمَاءٌ : নিদর্শন, سِمَةٌ : চিহ্ন [নিদর্শন] থেকে নিগর্ত। يُلْحِفُوْنَ : পীড়াপীড়ি করে। اِلْحَافًا : পীড়াপীড়ি করা। عَلَانِيَةً : প্রকাশ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এ আয়াতে সে সকল লোকের বিশেষ ছওয়াব ও ফজিলতের বর্ণনা রয়েছে- যারা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতে অভ্যস্ত। অর্থাৎ যে কোনো মুহূর্তে খরচ করার প্রয়োজন হয়, তখনই তারা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতে প্রস্তুত থাকে।

قَوْلُهُ لِتَعَفُّفِهِمْ : এখানে ইঙ্গিত রয়েছে যে, مِنَ التَّعَفُّفِ -এর مِنْ টি مِنْ تَعْلِيْلِيَّة , تَبْعِيْضِيَّة নয়।

قَوْلُهُ لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا : পীড়াপীড়ি করে যাচনা করা। এখানে বয়ানশাস্ত্রের একটি বিশেষ উপায় অবলম্বন করা হয়েছে, যাকে نَفْيٌ بِاِيْجَابِهٖ বলা হয়। দৃশ্যত এক বস্তুর নেতিবাচক দ্বারা অপর বস্তুর সাব্যস্তকরণ اِثْبَات ঘটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয়ের নফী উদ্দেশ্য হয়। উল্লিখিত আয়াতে দৃশ্যত পীড়াপীড়ি নফী করা হয়েছে। মূল যাচনা বা কামনার নফী করা হয়নি; কিন্তু বাক্য দ্বারা উদ্দেশ্য স্বাভাবিক নফী তথা قَيْد ও مُقَيَّد উভয়টির নফী।

قَوْلُهُ اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ :

শানে নুযূল : তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে **ইবনে আসাকির** -এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) ৪০ হাজার দিনার বা স্বর্ণমুদ্রা এভাবে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করেন যে, দিনের বেলা দশ হাজার, রাতে দশ হাজার, গোপনে দশ হাজার এবং প্রকাশ্যে দশ হাজার দান করেন। তাঁর ফজিলতদান কল্পে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

আব্দুর রাযযাক ও আবদ ইবনে হুমাইদ প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সূত্রে এ আয়াতের শানে নুযূল হযরত আলী সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। হযরত আলীর নিকট চারটি দিরহাম ছিল। তিনি তার থেকে একটি রাতে, একটি দিনে, একটি গোপনে এবং একটি প্রকাশ্যে খরচ করেন, তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। এ দুটি ছাড়া আরও কয়েকটি বর্ণনা রয়েছে।

-[ফাতহুল কাদির সূত্রে জামালাইন]

٢٧٥. اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا اَىْ يَاخُذُوْنَهُ وَهُوَ الزِّيَادَةُ فِى الْمُعَامَلَةِ بِالنُّقُوْدِ وَالْمَطْعُوْمَاتِ فِى الْقَدْرِ اَوِ الْاَجَلِ لَايَقُوْمُوْنَ مِنْ قُبُوْرِهِمْ اِلَّا قِيَامًا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ يُصْرِعُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ الْجُنُوْنِ بِهِمْ مُتَعَلِّقٌ بِيَقُوْمُوْنَ ذٰلِكَ الَّذِىْ نَزَلَ بِهِمْ بِاَنَّهُمْ بِسَبَبِ اَنَّهُمْ قَالُوْآ اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا فِى الْجَوَازِ وَهٰذَا مِنْ عَكْسِ التَّشْبِيْهِ مُبَالَغَةً فَقَالَ تَعَالٰى رَدًّا عَلَيْهِمْ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا فَمَنْ جَاۤءَهٗ بَلَغَهٗ مَوْعِظَةٌ وَعْظٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى عَنْ اَكْلِهٖ فَلَهٗ مَا سَلَفَ قَبْلَ النَّهْىِ اَىْ لَا يُسْتَرَدُّ مِنْهُ وَاَمْرُهٗ فِى الْعَفْوِ عَنْهُ اِلَى اللّٰهِ وَمَنْ عَادَ اِلٰى اَكْلِهٖ مُشَبِّهًا لَهٗ بِالْبَيْعِ فِى الْحِلِّ فَاُولٰۤئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

অনুবাদ :

২৭৫. যারা সুদ খায় অর্থাৎ তা গ্রহণ করে। তারা কবর থেকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা উন্মত্ততা দ্বারা হতবুদ্ধি কাণ্ডজ্ঞানহীন করে দিয়েছে।

সুদ হলো, টাকা-পয়সা বা খাদ্যবস্তুর লেনদেনে পরিমাণ এবং মুদ্দতের মধ্যে দাতার পক্ষে অতিরিক্ত হওয়া। مِنَ الْمَسِّ এটা يَقُوْمُوْنَ ক্রিয়ার সাথে مُتَعَلِّق বা সংশ্লিষ্ট।

এটা অর্থাৎ এই যে অবস্থা তাদের উপর আপতিত এজন্য যে, তারা বলে বেচাকেনা তো বৈধ হওয়ার বেলায় সুদের মতো।

বক্তব্যটিতে مُبَالَغَة বা অধিক জোর সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এ বাক্যটিতে বিপরীত [অর্থাৎ সুদকে বেচাকেনার সাথে তুলনা না করে বেচাকেনাকে সুদের সাথে] তুলনা করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা তাদের এ বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে ইরশাদ করেন– অথচ আল্লাহ বেচাকেনাকে বৈধ ও সুদকে অবৈধ করেছেন। যার নিকট তার প্রতিপালকের তরফ থেকে উপদেশ এসেছে পৌঁছেছে এবং সে তা গ্রহণ করা হতে বিরত রয়েছে অতীতে নিষেধাজ্ঞার পূর্বে যা হয়েছে তা তারই অর্থাৎ তা আর ফিরানো হবে না এবং তার ক্ষমার বিষয়টি আল্লাহর এখতিয়ারে। বৈধ হওয়ার ব্যাপারে তাকে বেচাকেনার সাথে তুল্য মনে করে যারা তার তা ভক্ষণের পুনরাবৃত্তি করবে তারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

তাহকীক ও তারকীব

يَتَخَبَّطُهُ : হতবুদ্ধি করে দেয়। يَصْرَعُهُ : صَرْعًا (ف) صَرَعَ আছাড় দেওয়া, ধরাশায়ী করা। اَلْمَسُّ : উন্মত্ততা, স্পর্শ। عَكْس : বিপরীত, উল্টো। اَحَلَّ : হালাল করেছেন, اِحْلَالٌ - হালাল করা। حَرَّمَ : হারাম করেছেন। تَحْرِيْمًا : হারাম করা। سَلَفَ : পূর্বে হয়েছে, অতীত হয়েছে। لَا يُسْتَرَدُّ : ফিরানো হবে না।

وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ -এর অর্থ হলো বৃদ্ধি পাওয়া। বলা হয়- هٰذَا يَرْبُوْا عَلٰى هٰذَا -এটি তার চেয়ে বেশি। কুরআনে এসেছে- رِّبًا لِيَرْبُوْا فِىْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ অর্থাৎ 'তোমরা মাল বৃদ্ধির জন্য যা প্রদান কর তা আল্লাহর কাছে বৃদ্ধি পায় না।' শরিয়তে رِبَا الْفَضْل ও رِبَا النَّسِيْئَة -এর উপর এটি ব্যবহৃত হয়। رِبَا الْفَضْل বলা হয় এমন বাড়তি অংশকে যা বস্তুর মধ্যে বিনিময়হীন অর্জিত হয়। আর ربا النسيئة বলা হয় এমন উপকারিতাকে, যা মেয়াদের বিনিময়ে অর্জিত হয়। মোটকথা, পরিভাষায় সুদ সে বাড়তি অর্থকে বলে যা কোনো ঋণগ্রহীতা থেকে ঋণদাতা পরস্পরে সিদ্ধান্তকৃত ব্যাখ্যা সাপেক্ষ মূলধন ছাড়া অতিরিক্ত উসুল তথা আদায় করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا :

সুদের আলোচনা : কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় সুদি কারবারের বিভিন্নরূপ প্রচলন ছিল। যেমন- এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির হাতে কোনো বস্তু বিক্রি করত এবং মূল্য উসুল করার একটি নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিত। উক্ত সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর মূল্য উসুল না হলে তাকে আরও অতিরিক্ত সময় দিত। আর মূল্যেও বৃদ্ধি ঘটাত। অথবা যেমন একজন অপরজনকে কিছু ঋণ দিত এবং সিদ্ধান্ত করে নিত যে, এ মেয়াদের মধ্যে মূল ঋণ ছাড়াও বাড়তি এত পরিমাণ দিতে হবে। অথবা যেমন ঋণদাতা ও তা গ্রহীতার মাঝে এক বিশেষ মেয়াদের জন্যে একটি সিদ্ধান্ত করে নিত। উক্ত মেয়াদের মধ্যে মূল অর্থ ও বাড়তি অর্থ উসুল না হলে আরও বেশি সুযোগ দিত, এখানে এ প্রকার লেনদেনকে বর্ণনা করা হয়েছে।

এখানে মোট ছয়টি আয়াত রয়েছে, যেগুলোতে সুদ হারাম হওয়া এবং এ সম্পর্কীয় বিভিন্ন বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম আয়াতে সুদখোরের কুপরিণতি এবং রোজ হাশরে তার লাঞ্ছনা ও ভ্রষ্টতার উল্লেখ রয়েছে। এতে সুদখোরের অবস্থাকে জিনগ্রস্ত ব্যক্তির অবস্থার সাথে তুলনা করা হয়েছে। পরোক্ষভাবে এ আয়াত দ্বারা এ বিষয়টিও প্রতীয়মান হয়েছে যে, জিনের প্রভাবে মানুষ সংজ্ঞাহীন এবং পাগল হতে পারে। বস্তবদর্শীদের থেকে এ ব্যাপারে প্রচুর সাক্ষ্য রয়েছে। হাফেজ ইবনে কাইয়িম জওযী (র.) লিখেন, বিভিন্ন চিকিৎসক ও দার্শনিকগণ এটাকে স্বীকার করেছেন যে, বিভিন্ন কারণে মানুষ পাগল, বেহুঁশ ও মাতাল হয়ে থাকে। তন্মধ্যে জিনের আছরও একটি। যারা এটাকে অস্বীকার করে, তাদের নিকট জাহেরী অসম্ভবতা ছাড়া কোনো প্রমাণ নেই।

قَوْلُهُ اَىْ يَاْخُذُوْنَهٗ : অর্থাৎ, সুদ নেয়। **মুসান্নিফ (র.)** يَاْكُلُوْنَهٗ -এর ব্যাখ্যায় يَاْخُذُوْنَهٗ উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে اَكْل বা খাওয়া দ্বারা শুধু খাওয়াই উদ্দেশ্য নয়; বরং সাধারণ গ্রহণ করা উদ্দেশ্য। চাই সেটা খাওয়া হোক বা পোশাক-পরিচ্ছদ কিংবা অন্য কিছু হোক। তবে যেহেতু খাওয়া গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র তাই বিশেষভাবে খাওয়ার কথা বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ الْمَطْعُوْمَاتِ : মুসান্নিফ (র.) এ বাক্যটি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব মোতাবেক আরোপ করেছেন। কেননা তাঁদের মতে, رِبٰوا হওয়ার জন্যে مَطْعُوْمَات বা ثَمَنِيَات হওয়া জরুরি। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, قَدْر এবং جِنْس -এর মাঝে মিল হওয়াই رِبٰوا সাব্যস্ত হওয়ার জন্যে যথেষ্ট مَطْعُوْمَات -এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া জরুরী নয়।

قَوْلُهُ فِى الْقَدْرِ وَالْاَجَلِ : এটি اَلْمُعَامَلَةُ থেকে بَدَل হয়েছে। قَدْر -এর সম্পর্ক হলো رِبَوا فَضْل -এর সাথে, আর এটি হবে اِتِّحَادُ الْجِنْسِ -এর সুরতে। আর اَلْاَجَل -এর সম্পর্ক اِتِّحَاد عَيْن -এর ক্ষেত্রে। যদি جِنْس ভিন্ন হয় قَدْر অভিন্ন হয় তাহলে تَفَاضُل জায়েজ আছে; বাকি [ধার] জায়েজ নেই।

رِبٰوا -এর ইল্লত : আহনাফের মতে, رِبٰوا -এর ইল্লত হলো قَدْرٌ مَعَ الْجِنْسِ অর্থাৎ যে দুটি বস্তুর মাঝে مُبَادَلَة করা হবে, সে দুটি বস্তু যদি مَكِيْلِى বা مَوْزُوْنِى হয় এবং উভয়টির 'জিনস' অভিন্ন হয় তাহলে কমবেশি করা হরাম। আর যদি উভয়টি مَوْزُوْنِى বা مَكِيْلِى হয়; কিন্তু جِنْس এক না হয় [যেমন– স্বর্ণ-রুপা, গম-জব] তাহলে উভয়টির মধ্যে কমবেশি করা জায়েজ।

উল্লেখ্য, হাদীসে বর্ণিত ছয়টি বস্তু ছাড়াও যেখানে উক্ত ইল্লত পাওয়া যাবে সেখানেই رِبٰوا প্রমাণিত হবে। যেমন– চুনার বিনিময়ে চুনা বিক্রি করার ক্ষেত্রে বেশি কম করলে رِبٰوا হবে। কেননা উভয়টি مَكِيْلِى এবং উভয়টির جِنْس এক। এমনিভাবে লোহার বদলে লোহা এবং পিতলের বদলে পিতল -এরও একই বিধান।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট رِبٰوا -এর ইল্লত হলো مَطْعُوْمَات -এর মধ্যে طَعْم এবং اَثْمَان -এর মধ্যে ثَمَن হওয়া। যেমন– স্বর্ণ, রুপা ও মুদ্রা। তাঁদের মতে, ১ মণ লোহার বদলে ২ মণ লোহার ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ। কেননা এখানে ইল্লত তথা طَعْم এবং ثَمَنِيَّة পাওয়া যায়নি।

قَوْلُهُ مِنْ قُبُوْرِهِمْ : মুফাসসির (র.) مِنْ قُبُوْرِهِمْ কয়েদটি আরোপ করে এ সংশয় নিরসন করেছেন যে, দুনিয়াতে তো আমরা কত সুদখোরকেই দেখতে পাই। কই তাদের কারো উঠা-বসায় তো কোনো প্রকার উন্মত্ততা পরিলক্ষিত হয় না। তাহলে কুরআনের এ কথার মর্ম কি?

জবাব : আয়াতে বর্ণিত قِيَام দ্বারা হাশরের দিন নিজ নিজ কবর থেকে উঠা উদ্দেশ্য। দুনিয়ার উঠা-বসা উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهُ قِيَامًا : এখানে قِيَامًا বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য হলো اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ -এর মাঝে حَرْف اِسْتِثْنَاء টি كَاف -এর উপর দাখেল হয়েছে। অথচ حَرْف اِسْتِثْنَاء নিয়ম অনুযায়ী كَاف -এর উপর দাখেল হওয়া শুদ্ধ নয়। মুসান্নিফ (র.) قِيَامًا উল্লেখ করে উক্ত সংশয়ের জবাব দিয়েছেন এভাবে যে, এখানে مُسْتَثْنٰى মাহযূফ রয়েছে। আর তা হলো قِيَامًا

قَوْلُهُ يَتَخَبَّطُهُ : এটি بَاب تَفَعُّل থেকে مُضَارِع وَاحِد مُذَكَّر غَائِب -এর সীগাহ। অর্থ– যাকে শয়তান উন্মাদ করে রেখেছে। خَبْطٌ -এর মূল অর্থ হলো– অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে চলা। কেউ যখন অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে চলে তখন আরবরা বলে– خَبْطُ الْعَشْوَاءِ

قَوْلُهُ مِنَ الْجُنُوْنِ : এটি اَلْمَسّ -এর তাফসীর।

قَالَ الْفَرَّاءُ اَلْمَسُّ الْجُنُوْنُ وَالْمَمْسُوْسُ الْمَجْنُوْنُ وَاَصْلُ الْمَسِّ بِالْيَدِ فَسُمِّىَ بِهِ لِاَنَّ الشَّيْطَانَ يَمَسُّهُ .

قَوْلُهُ يَصْرَعُهُ : اَىْ يَذْهَبُ عَقْلُهُ وَيَدْهَشُهُ

قَوْلُهُ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا : তারা বলে থাকে বেচা-কেনা ও রিবার মধ্যে প্রভেদ কি? উভয়ের উদ্দেশ্য তো মুনাফা অর্জন করাই। কাজেই ব্যবসা হালাল এবং রিবা হারাম কেন? বস্তুত এটা দৃষ্টিভঙ্গির অসারতা, বরং বিবেকের দেওলিয়াত্ব ছাড়া কিছুই নয়। ব্যবসায় ক্রয়মূল্যের উপর যে লাভ নেওয়া হয় তার ধরন এবং সুদের ধরনের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তারা উভয়কে একই ধরনের মনে করে দলিল পেশ করে যে, ব্যবসায় বিনিয়োগকৃত মূলধনের উপর যে মুনাফা অর্জিত হয় তা জায়েজ, তাহলে ঋণের উপর বিনিয়োগকৃত অর্থের উপর মুনাফা অর্জন করা নাজায়েজ হবে কেন? বর্তমান যুগের সুদখোররাও সুদ বৈধ হওয়ার ব্যাপারে এ ধরনের দলিল পেশ করে থাকে। কিন্তু তারা চিন্তা করে না যে, জগতে যত ধরনের কারবার রয়েছে– চাই ব্যবসা-বাণিজ্য হোক কিংবা শিল্পকারখানা বা কৃষি, আর চাই মানুষ তাতে নিজ শ্রম ব্যয় করুক বা পুঁজি বিনিয়োগ করুক, কিংবা উভয়টি ব্যয় করুক এগুলোর মধ্যে কোনোটি এমন নয় যার মধ্যে মানুষ লোকসানের আশঙ্কাকেও বরণ করে না নেয়। অপরদিকে বিশ্ব বাজারে এক শ্রেণির ঋণ বিনিয়োগকারী মহাজন এমন হবে কেন? যারা লোকসানের আশঙ্কামুক্ত হয়ে এক নির্দিষ্ট নিশ্চিত মুনাফা অর্জনের অধিকারী বিবেচিত হবে?

প্রশ্ন হলো, যে সকল মানুষ কারবারে নিজ সময়, শ্রম, যোগ্যতা ও পুঁজি বিনিয়োগ করে এবং যাদের প্রচেষ্টার উপর উক্ত কারবারের লাভ-লোকসানের আশঙ্কা থাকে তাদের জন্যে সুনির্দিষ্ট কোনো মুনাফার জামানত থাকবে না; বরং লোকসানের সমস্ত দায়দায়িত্ব তাদেরই মাথায় চাপবে। আর পুঁজি বিনিয়োগকারী মহাজনরা আশঙ্কামুক্ত হয়ে তাদের চুক্তিকৃত মুনাফা অর্জন করতেই থাকবে। এটা কোন ধরনের জ্ঞান, বিবেক, মানবতা ও অর্থনৈতিক বুনিয়াদের আলোকে বৈধ হতে পারে? এর অনিষ্টতা আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টিগোচর হয় না কেন? তা বুঝে আসে না। এটা জুলুম-অত্যাচারের সুস্পষ্ট একটি পন্থা। ইসলামি শরিয়ত এটাকে কিভাবে বৈধ স্থির করতে পারে? উপরন্তু শরিয়ত তো ঈমানদারদেরকে অভাবীদের উপর কোনো প্রকার পার্থিব স্বার্থ ও লাভের উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে মুক্ত হস্তে দান করবার জন্যে উৎসাহ দিয়েছে। যার দরুন সমাজের ভ্রাতৃত্ব, সমবেদনা, সহানুভূতি ও স্নেহ-মমতা বৃদ্ধি পায়। একজন সুদখোর মহাজনের তার বিনিয়োগকৃত অর্থের দ্বারা উদ্দেশ্য হয় কেবল তার ব্যক্তিগত আর্থিক মুনাফা অর্জন। তাই অভাবগ্রস্ত, হতদরিদ্র ও পীড়িত মানুষ কাতরাতে থাক সে ব্যাপারে তার কোনো ভ্রুক্ষেপ থাকে না। শরিয়ত এ পাষাণ ব্যবহারকে কিভাবে পছন্দ করতে পারে? মোটকথা ইসলামে সুদ সম্পূর্ণ হারাম, চাই ব্যক্তিস্বার্থের উদ্দেশ্য হোক কিংবা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে।

ব্যবসা ও সুদের নীতিগত পার্থক্য : যেসব কারণে ব্যবসা ও সুদ অর্থনৈতিক ও মানবিক বিচারে এক হতে পারে না সেগুলো নিম্নরূপ–

১. ব্যবসার মধ্যে ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে সমভাবে মুনাফার বিনিময় ঘটে। কেননা ক্রেতা বিক্রেতার থেকে গৃহীত বস্তু দ্বারা উপকৃত হয়। আর বিক্রেতা তার শ্রম, মেধা ও সময়ের পারিশ্রমিক গ্রহণ করে, সেগুলোকে সে ক্রেতার জন্যে উক্ত বস্তু আমদানির ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছিল। পক্ষান্তরে সুদি লেনদেনের মধ্যে সমভাবে মুনাফার বিনিময় ঘটে না। সুদগ্রহীতা সুনির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ গ্রহণ করে, যা তার জন্যে নিশ্চিত উপকারী। কিন্তু এর বিপরীতে সুদদাতা কেবল নির্দিষ্ট মেয়াদ লাভ করে, যা উপকারী হওয়া নিশ্চিত নয়, সে যদি ব্যক্তিস্বার্থে খরচ করার উদ্দেশ্যে পুঁজি নিয়ে থাকে তাহলে তো সুস্পষ্ট যে, এ মেয়াদ বা অবকাশ নিশ্চিত উপকারী নয়, আর যদি ব্যবসা, শিল্প ও পেশামূলক কোনো কাজের জন্যে গ্রহণ করে থাকে তাহলে এ মেয়াদের মধ্যে তার যেভাবে উপকারের সম্ভাবনা থাকে তদ্রূপ ক্ষতিরও সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং সুদি লেনদেন হয়তো এক পক্ষের উপর এবং অপর পক্ষের লোকসানের উপরে ধার্য হয়ে থাকে। অথবা এক পক্ষের নিশ্চিত উপকার আর অপর পক্ষের অনিশ্চিত উপকারের উপর চুক্তি হয়ে থাকে।

২. ব্যবসার মধ্যে বিক্রেতা ক্রেতা থেকে যতই অধিক লাভ গ্রহণ করুক, তা একবারই নিয়ে থাকে। কিন্তু সুদি কারবারে বিনিয়োগকৃত মূলধনের উপর একের পর এক মুনাফা উসুল করতে থাকে। মেয়াদ অতিক্রমের সাথে সাথে তার মুনাফার বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। ঋণগ্রহীতা তার মাল দ্বারা যতই উপকার লাভ করুক না কেন তা এক নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত থাকে। কিন্তু বিনিয়োগকারী যে উপকার লাভ করে তার কোনো সীমা থাকে না। এমন ও হতে পারে যে, ঋণগ্রহীতার সারা জীবনের সকল উপার্জিত সম্পদ তার জীবনধারণের সকল আসবাব-সামগ্রী এমনকি পরিধেয় বস্ত্র এবং বসবাসের ঘরও গ্রাস করে নেয়। এরপরও সুদখোর মহাজনের চাহিদা বহাল থেকে যায়।

ব্যবসায়ের পণ্য এবং তার মূল্যের বিনিময়ের সাথে লেনদেন শেষ হয়ে যায়। ক্রেতার পক্ষে বিক্রেতাকে কোনো বস্তু ফেরত দিতে হয় না। ঘর, দোকান, জমি বা আসবাবপত্রের ভাড়া স্বরূপ যে বিনিময় প্রদান করা হয়, সেসব ক্ষেত্রে মূল বস্তু বিনষ্ট হয় না, বরং তা স্ব অবস্থায় বহাল থাকে। মালিকের নিকট পরে তা ফেরত দিতে হয়। কিন্তু সুদি লেনদেনের মধ্যে ঋণগ্রহীতা মূল ঋণের অর্থ বা বস্তুকে খরচ করে ফেলে। এরপর তার খরচকৃত মাল বা অর্থ যোগাড় করে বাড়তি মুনাফাসহ তাকে ফেরত দিতে হয়। এ সকল কারণে ব্যবসা এবং সুদের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে এত বিশাল পার্থক্য রয়েছে যে, ব্যবসা মনুষ্য সভ্যতা বিনির্মাণকারী সত্তা হয়ে দেখা দেয়। পক্ষান্তরে সুদের ধ্বংসাত্মক পরিণতি মনুষ্য সভ্যতা ও মানবতাকে সমূলে বিনাশ করে। উপরন্তু সুদের চারিত্রিক ক্ষতি এই যে, তা মানুষের মধ্যে কৃপণতা, ব্যক্তিস্বার্থ, ঘৃণা, নির্মমতা ও সম্পদপূজা ইত্যাদি স্বভাব সৃষ্টি করে। সমবেদনা ও পারস্পরিক সহমর্মিতার আত্মাকে বিনাশ করে দেয়। এ কারণেই অর্থনৈতিক ও চরিত্রিক উভয় ক্ষেত্রে সুদ মানব জাতির জন্যে অতিশয় ক্ষতিকর বস্তু।

সুদের চারিত্রিক ক্ষতি : সুধীপাঠক! চারিত্রিক ও আত্মিক বিচারে লক্ষ্য করলে দেখবেন, সুদ মূলত ব্যক্তিস্বার্থ, কৃপণতা, নির্মমতা ইত্যাদি কুস্বভাবের কুফল বয়ে আনে। এ সকল কুস্বভাবকে মানুষের মধ্যে লালন করে। এর বিপরীত দান সদকার ফলে মানুষের মধ্যে বদান্যতা, হৃদ্যতা, সহমর্মিতা, আত্মিক প্রশস্ততা বা উদারতা সৃষ্টি হয়। দান-সদকার আমল করতে

থাকার দ্বারা মানুষের মধ্যে এসব উত্তম গুণাবলি প্রতিপালিত হয়। এমন কে আছে যারা মানবিক এ দু ধরনের স্বভাবের মধ্য থেকে দ্বিতীয় প্রকারকে প্রথম প্রকারের তুলনায় উত্তম জ্ঞান না করবে?

সুদের অর্থনৈতিক ক্ষতি : অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে সুদভিত্তিক বিনিয়োগ বা ঋণ দু প্রকার। যথা–

ক. ব্যক্তিস্বার্থে বা ব্যক্তি প্রয়োজনে সরাসরি গৃহীত ঋণ।

খ. ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা বা কৃষি ইত্যাদি কাজের উদ্দেশ্যে গৃহীত ঋণ।

প্রথম প্রকার ঋণের ব্যাপারে বিশ্ববাসী জানে যে, উক্ত ক্ষেত্রে সুদ উসুল করার যে নিয়ম বা প্রচলন রয়েছে তা অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক। বিশ্বে এমন কোনো দেশ নেই যে দেশে মহাজন ব্যক্তি বা সংস্থা এ ধরনের সুদের মাধ্যমে গরীব-দরিদ্র কৃষকদের রক্ত শোষণ না করছে। সুদের কারণে এ ধরনের ঋণ মানুষের পক্ষে পরিশোধ করা অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে যায়, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষ অসম্ভবও হয়ে পড়ে। এক ঋণ পরিশোধের জন্যে একের পর এক ঋণ নিতে বাধ্য হয়ে পড়তে হয়। মূল ঋণ থেকে কয়েকগুণ সুদ পরিশোধ সত্ত্বেও ঋণ যেমন ছিল তেমনি থেকে যায়। শ্রম দ্বারা অর্জিত মুনাফার বেশির ভাগ অংশ সুদ বিনিয়োগকারী নিয়ে নেয়, আর এই দরিদ্র ব্যক্তির নিজ উপার্জিত অর্থের কিছুই নিজের এবং সন্তানাদি প্রতিপালনের জন্যে অবশিষ্ট থাকে না। এ অবস্থা ক্রমান্বয়ে শ্রমিকের অন্তর থেকে শ্রমের প্রেরণা বিনাশ করে দেয়। ফলে রাষ্ট্রীয় উৎপাদনে প্রচণ্ড ক্ষতি হয়। দেশের অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়ে। এ ছাড়াও ঋণের জালে আবদ্ধ হয়ে মানুষ সর্বদা চিন্তাগ্রস্ত থাকতে হয়। সময়মতো আহার-বিহার সম্ভব হয় না। ফলে দিনদিন স্বাস্থ্য হানি ঘটতে থাকে। সুদি কারবারের অবশ্যম্ভাবী ফলাফল এই যে, মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তি লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্ত শোষণ করে মোটাতাজা হতে থাকে। কিন্তু দুর্বল, বিত্তহীন মানুষেরা দিনদিন আরও দুর্বল এবং নিঃস্ব হতে থাকে। অবশেষে রক্ত শোষণকারী গোষ্ঠী নিজেরাও তার ক্ষতি থেকে রেহাই পায় না। কারণ তাদের ব্যক্তিস্বার্থ দ্বারা সাধারণ মানুষের যে কষ্ট-দুর্ভোগ পোহাতে হয় তার দ্বারা ধনীদের বিরুদ্ধে তাদের আন্তরে ক্রোধ ও ঘৃণার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। সুযোগ পেলে আন্দোলনের ক্ষেত্রে এ আগুন শুধু নির্দিষ্ট এলাকায়ই নয়; বরং সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে শত শহস্র নিরপরাধ মানুষকেও তাদের সাথে জীবন দিতে হয়। –[জামালাইন]

قَوْلُهُ مِنْ عَكْسِ التَّشْبِيْهِ : উল্টা এভাবে যে, আলোচনা চলছে رِبٰوا সম্পর্কে, بَيْع সম্পর্কে নয়। তাই رِبٰوا -কে بَيْع -এর সাথে তাশবীহ দেওয়া উচিত ছিল; بَيْع -কে رِبٰوا -এর সাথে নয়। এমনটি করা হয়েছে মোবালাগা স্বরূপ। কেননা তাদের দৃষ্টিতে সুদের বৈধতাটা মূল ছিল; বেচাকেনাকে তার উপর কিয়াস করেছে।

قَوْلُهُ وَعْظٌ : مَوْعِظَةٌ -এর তাফসীর وَعْظٌ দ্বারা করার উদ্দেশ্য এদিকে ইঙ্গিত করা যে, مَوْعِظَةٌ হলো ظَرْف ; এটি مَصْدَر مِيْمِى নয়।

قَوْلُهُ عَنْهُ : اَىْ عَنْ اَكْلِ الرِّبٰوا

قَوْلُهُ اِلٰى اَكْلِهِ مُشَبِّهًا لَهُ بِالْبَيْعِ فِى الخ : **প্রশ্ন :** আয়াত থেকে এ কথা বোঝা যায় যে, যদি কেউ সুদ গ্রহণ করে তাহলে সে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামি হবে। যা মূলত মু'তাযিলাদের মতবাদ।

উত্তর : চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামি ঐ সুরতে হবে যখন رِبٰوا -কে بَيْع -এর মতো হালাল মনে করে ব্যবহার করবে।

قَوْلُهُ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَفَ : এখানে বলা হয়েছে যে, সুদ হারাম হওয়ার পূর্বে যে ব্যক্তি ধনসম্পদ সঞ্চয় করেছিল, সুদ হারাম ঘোষিত হওয়ার পর ভবিষ্যতের জন্যে যদি তওবা করে এবং এর থেকে বিরত থাকে তাহলে পূর্বের সঞ্চিত সম্পদ শরিয়তের বিধানে তারই মালিকানাধীন থাকবে। আর অভ্যন্তরীণ বিষয় তথা আন্তরিকভাবে এ থেকে বিরত থাকল কিনা কিংবা মুনাফিকসুলভ তওবা করল কিনা? তা আল্লাহর উপর ন্যস্ত থাকবে। তাদের ব্যাপারে সাধারণ মানুষের কুধারণা পোষণ করার অধিকার নেই। উপদেশ শোনা সত্ত্বেও যারা এ ধরনের কথা ও কারবারের পুনরাবৃত্তি ঘটায়– সুদ যেহেতু হারাম এ কারণে তারা দোজখে প্রবিষ্ট হবে। আর "সুদ ব্যবসার মতোই হালাল" তাদের এ ধরনের অন্যায় উক্তি কুফুরি হওয়ার কারণে তারা চিরস্থায়ীভাবে দোজখি হবে। –[জামালাইন]

অনুবাদ :

٢٧٦. يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا يَنْقُصُهُ وَيَذْهَبُ بَرَكَتَهُ وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ يَزِيْدُهَا وَيُنَمِّيْهَا وَيُضَاعِفُ ثَوَابَهَا وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ بِتَحْلِيْلِ الرِّبٰوا اَثِيْمٍ فَاجِرٍ بِاَكْلِهِ اَيْ يُعَاقِبُهُ.

২৭৬. আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন তা হ্রাস করে দেন এবং তা হতে বরকত উঠিয়ে নেন এবং দান বৃদ্ধি করেন তার প্রবৃদ্ধি করেন এবং তার পুণ্যফল বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ সুদ হালাল ধারণাকারী প্রত্যেক অকৃতজ্ঞ এবং তা ভক্ষণকারী পাপী অন্যায়কারীকে ভালোবাসেন না অর্থাৎ তাকে তিনি শাস্তি প্রদান করবেন।

٢٧٧. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ.

২৭৭. যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকার্য করে, সালাত কায়েম করে এবং জাকাত দেয়, তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট রক্ষিত। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

٢٧٨. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا اُتْرُكُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ صَادِقِيْنَ فِيْ اِيْمَانِكُمْ فَاِنَّ مِنْ شَانِ الْمُؤْمِنِ اِمْتِثَالُ اَمْرِ اللّٰهِ نَزَلَتْ لَمَّا طَالَبَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ بَعْدَ النَّهْيِ بِرِبٰوا كَانَ لَهُ قَبْلُ.

২৭৮. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ত্যাগ কর ছেড়ে দাও যদি তোমরা মু'মিন হও। ঈমানের মধ্যে যদি তোমরা সাচ্চা হয়ে থাক। কেননা আল্লাহর নির্দেশ পালন করাই হলো মু'মিনের বৈশিষ্ট্য, তার কর্তব্য। সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার বিধান নাজিল হওয়ার পর সাহাবীগণের কেউ কেউ পূর্বের বকেয়া পাওনা তলব করলে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

তাহকীক ও তারকীব

يَمْحَقُ : মুছে ফেলেন, হ্রাস করেছেন। مَحْق বলা হয় কোন বস্তু ক্রমান্বয়ে কমে যাওয়া। يُنَمِّيْهَا : বৃদ্ধি করেছেন। اَثِيْمٌ : অধিক গোনাহকারী। اَلْمُتَمَادِيْ فِى الذُّنُوْبِ - يُعَاقِبُ : শাস্তি প্রদান করবেন। ذَرُوْا : ছেড়ে দাও, ত্যাগ কর। اِمْتِثَالٌ : পালন করা। طَالَبَ : তলব করল, তাগাদা দিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ : এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং সদকাকে বাড়িয়ে দেন। এখানে সুদের সাথে সদকার আলোচনা এক বিশেষ সামঞ্জস্যের দরুন ঘটেছে। তা হলো, সুদ ও সদকার তত্ত্বের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। উভয়ের ফলাফলও ভিন্ন। সাধারণত উভয় ধরনের কাজ আঞ্জামকারীদের নিয়ত ও উদ্দেশ্যের মধ্যেও ব্যবধান থাকে।

সত্তাগত পার্থক্য : দান সদকার মধ্যে কোনো বিনিময়বিহীন অন্যদেরকে নিজেদের সম্পদ দান করা হয়। আর সুদের মধ্যে বিনিময়বিহীন অন্যের মাল গ্রহণ করা হয়। এ উভয় শ্রেণির নিয়ত ও উদ্দেশ্য এ কারণে সাংঘর্ষিক যে, দান-সদকাকারীরা নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে নিজেদের মাল ঘাটতির বা নিঃশেষের সিদ্ধান্ত নেয়। পক্ষান্তরে সুদ গ্রহীতা নিজের বর্তমান অবৈধ সম্পদের উপর আরও সম্পদ বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষী থাকে।

পরিণতির ক্ষেত্রে পার্থক্য : দান-সদকা দ্বারা সামাজে হৃদ্যতা, ভালোবাসা ও সমবেদনা জন্ম নেয়। **পক্ষান্তরে সুদের দ্বারা** পারস্পরিক শত্রুতা, হিংসা, ক্রোধ, ঘৃণা ও ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করা প্রসারিত হয়।

সুদ নিশ্চিহ্ন করা এবং সদকা বৃদ্ধি করার প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন ও তা প্রত্যক্ষকরণ পূর্ণরূপে পরকালে ঘটবে। সুদি কারবার দ্বারা নামে মাত্রও কোনো বরকত ও মঙ্গল দৃষ্টিগোচর হবে না। পক্ষান্তরে নবী করীম ﷺ শবে মে'রাজে এক ব্যক্তিকে রক্তের মধ্যে হাবুডুবু খেতে দেখেন। হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, লোকটি কে? হযরত জিবরাঈল (আ.) জবাব দিলেন– লোকটি ছিল সুদখোর মহাজন। যেহেতু সে সাধারণ দরিদ্র মানুষের সম্পদ অত্যন্ত নির্মমভাবে হরণ করত, তাদের রক্তশোষণ করে মোটাতাজা হয়েছিল। এ কারণে সুদখোরকে রক্তের নদীতে সন্তরণ করতে দেখা গেছে। এছাড়া দুনিয়ায়ও সুদখোর গোষ্ঠীর ধ্বংসাত্মক পরিণাম বহুবার দুনিয়াবাসী প্রত্যক্ষ করেছে। সুদখোরির অভ্যাস মহাজনদের অন্তরে অর্থের লালসা বাড়িয়ে দেয়। মানবতা ও সহমর্মিতা বিদায় নেয়। জীবনের চেয়ে অর্থের মূল্যই তাদের দৃষ্টিতে বেশি হয়। সম্পদ হাতছাড়া হওয়া তাদের নিকট প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার ন্যায় হয়ে থাকে। ফলে তারা নিজেরাও সম্পদ দ্বারা পূর্ণরূপে শান্তিভোগ করতে পারে না। এর বিপরীতে দান-সদকার সমূহ বরকত জাতীয় সমবেদনা ও সহানুভূতির ক্ষেত্রে একে অন্যের অংশীদারিত্ব উভয় শ্রেণির মধ্যে দর্শনীয় বিষয়।

قَوْلُهُ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ : এর মধ্যে উভয় শ্রেণির নাফরমান শামিল রয়েছে। সুদ হারাম হওয়ার আকিদা রাখা সত্ত্বেও সুদী কারবারকারী ব্যক্তিবর্গ এবং সুদ হারাম হওয়ার যারা আকিদা রাখে না এ উভয় শ্রেণি দোজখে প্রবিষ্ট হবে। তবে যে সকল সুদখোর সুদকে হালাল মনে করত তারা চিরস্থায়ীভাবে দোজখি হবে।

শান্তির উপকরণ এবং শান্তি এক জিনিস নয় : কারো সন্দেহ হতে পারে যে, বর্তমানে দেখা যায় সুদখোর শ্রেণি অনেক ইজ্জত-সম্মানের অধিকারী। শান্তির বিভিন্নরূপ সরঞ্জাম; খাবার, বসবাসের সামগ্রী সব তাদেরই হাতে। কিন্তু চিন্তাভাবনা করলে দেখা যায়, শান্তির উপকরণ এবং প্রকৃত শান্তির মধ্যে বহু ব্যবধান রয়েছে। শান্তির আসবাব তো বিভিন্ন ফ্যাক্টরি ও কলকারখানায় তৈরি হয়, বিভিন্ন বিপনী বিতানে বিক্রি হয়। কিন্তু শান্তি বলে যে বস্তু রয়েছে, তা কোনো ফ্যাক্টরিতে প্রস্তুত হয় না, কোনো বিপনী বিতানে বিক্রি হয় না, বরং তা এমন এক রহমত যা সরাসরি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রদত্ত হয়। তা অনেক সময় শত সহস্র শান্তিসামগ্রী থাকা সত্ত্বেও অর্জিত হয় না। সামান্য নিদ্রার কথা ধরা যাক, নিদ্রা আনয়নকল্পে এ উপায় অবলম্বন করা যায় যে, উত্তম ভবন নির্মিত হবে, যেখানে আলো-বাতাসের পূর্ণ ব্যবস্থা থাকবে, ঘরে মনোরম ফার্নিচার, পছন্দসই লেপ-তোষক ইত্যাদি হবে। কিন্তু এসব কিছু সত্ত্বেও কি নিদ্রা আসা অনিবার্য? আপনি যদি এতে একমত না হন তাহলে আপনার মতো লক্ষ লক্ষ মানুষ এ ব্যাপারে নেতিবাচক উত্তর দেবে। যাদের কোনো কারণে নিদ্রা আসে না। আমেরিকার ন্যায় ধনী রাষ্ট্রের অধিবাসীদের সম্পর্কে বিভিন্ন রিপোর্ট দ্বারা জানা যায় যে,৭৫% মানুষ ঘুমের বড়ি সেবন না করে ঘুমাতে পারে না এবং কোনো কোনো সময় ঘুমের বড়িও কার্যকর হয় না। বাজার থেকে আপনি ঘুমের উপকরণ সংগ্রহ করতে পারেন, কিন্তু ঘুম কোন বাজার থেকে ক্রয় করবেন? এভাবে অন্যান্য শান্তির ব্যাপারেও চিন্তা করুন!

قَوْلُهُ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ : জাহিলি যুগে ঋণ আদায় না হওয়ার কারণে সুদের পর সুদের প্রচলন ছিল। মহাজনদের মুনাফা বেড়েই চলত, ফলে সামান্য অর্থ এক সময় পাহাড়াকার ধারণ করত, আর তা পরিশোধ করা অসম্ভব হয়ে যেত। এর বিপরীতে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিলেন যে, কেউ যদি অভাবগ্রস্ত হয় [তাহলে সুদ নেওয়া তো দূরের কথা মূলধন আদায়ে] তাকে সহজভাবে অবকাশ দাও। আর যদি সম্পূর্ণ ঋণ ক্ষমা করে দাও, তাহলে তা অতি উত্তম। বিভিন্ন হাদীসে এর অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। অনুধাবন করুন, উভয় দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কত ব্যবধান। মুসলিম জাতি যদি এ বরকতময় ঐশী বিধানকে বাস্তবায়ন না করে তাতে ইসলামের উপর অভিযোগ কিসের? কতই না ভালো হতো যদি বিশ্বের মুসলিমগণ তাদের ধর্মের উপকারিতা ও গুরুত্ব বুঝে তদনুযায়ী তাদের জীবন সজ্জিত করত।

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ : কোনো কোনো বর্ণনায় আছে যে, এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর অবতীর্ণ কুরআনের সর্বশেষ আয়াত। এ আয়াত নাজিল হওয়ার কিছুদিন পরেই রাসূল ﷺ ইহধাম ত্যাগ করেন। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

২৭৯. فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا مَا اُمِرْتُمْ بِهٖ فَاْذَنُوْا اِعْلَمُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لَكُمْ فِيْهِ تَهْدِيْدٌ شَدِيْدٌ لَهُمْ وَلَمَّا نَزَلَتْ قَالُوْا لَايَدَى لَنَا بِحَرْبِهٖ وَاِنْ تُبْتُمْ رَجَعْتُمْ عَنْهُ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اُصُوْلُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ بِزِيَادَةٍ وَلَا تُظْلَمُوْنَ بِنَقْصٍ ـ

২৮০. وَاِنْ كَانَ وَقَعَ غَرِيْمٌ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ لَهٗ اَىْ عَلَيْكُمْ تَاخِيْرُهٗ اِلٰى مَيْسَرَةٍ بِفَتْحِ السِّيْنِ وَضَمِّهَا اَىْ وَقْتِ يُسْرِهٖ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا بِالتَّشْدِيْدِ عَلٰى اِدْغَامِ التَّاءِ فِى الْاَصْلِ فِى الصَّادِ وَبِالتَّخْفِيْفِ عَلٰى حَذْفِهَا اَىْ تَتَصَدَّقُوْا عَلَى الْمُعْسِرِ بِالْاِبْرَاءِ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ خَيْرٌ فَافْعَلُوْهُ فِى الْحَدِيْثِ مَنْ اَنْظَرَ مُعْسِرًا اَوْ وَضَعَ عَنْهُ اَظَلَّهُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهٖ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهٗ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ـ

২৮১. وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُوْلِ تُرَدُّوْنَ وَلِلْفَاعِلِ تَصِيْرُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ هُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ثُمَّ تُوَفّٰى فِيْهِ كُلُّ نَفْسٍ جَزَاءَ مَا كَسَبَتْ عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ـ بِنَقْصِ حَسَنَةٍ اَوْ زِيَادَةِ سَيِّئَةٍ ـ

অনুবাদ :

২৭৯. তোমাদেরকে যে বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা যদি তোমরা না কর তবে ঘোষণা শোন জেনে রাখ, তোমাদের সাথে আল্লাহ ও রাসূলের যুদ্ধ। এ আয়াতটিতে তাদের প্রতি চরম হুমকি বিদ্যমান। এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর ঐ সাহাবীরা বললেন, তাঁর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার কোনো শক্তি আমাদের নেই। যদি তোমরা তওবা কর তা থেকে ফিরে আস তবে তোমাদের মূলধন আসল ধন। তাতে বৃদ্ধি দেখিয়ে তোমরা অত্যাচার করবে না এবং হ্রাস ঘটিয়ে তোমাদেরকেও অত্যাচার করা হবে না।

২৮০. যদি সে খাতক অভাবগ্রস্ত হয় كَانَ এটা এ স্থানে تَامَّة তবে সচ্ছলতা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দান مَيْسَرَة -এর س অক্ষটি ফাতাহ ও পেশ উভয়রূপেই পাঠ করা যায় অর্থাৎ সচ্ছলতার সময়। অর্থাৎ তখন পর্যন্ত বিলম্ব করা তোমাদের কর্তব্য। যদি সদকা করে দাও تَصَدَّقُوْا -এর ص তাশদীদসহ পাঠ করা হলে মূলত ص -এ ت -এর ইদগাম হয়েছে বলে বিবেচ্য হবে। আর তা বিলুপ্ত করে تَخْفِيْف [লঘু আকারে ; তাশদীদ ব্যতীত] রূপেও পাঠ করা যায়। অর্থাৎ অভাবগ্রস্ত খাতককে ঋণের দাবি হতে মুক্ত দিয়ে যদি তা তার উপর সদকা করে দাও তবে তা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। যদি তোমরা জান যে তা কল্যাণকর তবে তা তোমরা কর। হাদীসে আছে যে, যদি কেউ অভাবগ্রস্তকে অবকাশ দেয় বা ঋণ মাফ করে দেয় তবে আল্লাহ তা'আলা নিজের ছায়ায় তাকে ছায়া প্রদান করবেন যেদিন আল্লাহর ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না। –[মুসলিম]

২৮১. তোমরা সেদিনকে ভয় কর যেদিন তোমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। تُرْجَعُوْنَ এটা مَجْهُوْل বা কর্মবাচ্যরূপে পঠিত হলে অর্থ হবে– প্রত্যানীত হবে। আর مَعْرُوْف বা কর্তৃবাচ্যরূপে পঠিত হলে অর্থ হবে– তোমরা ফিরে যাবে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। অতঃপর ঐ দিন প্রত্যেককে তার কর্ম অর্থাৎ ভালো বা মন্দ যা করেছে তার প্রতিফল পুরাপুরি প্রদান করা হবে। আর সৎ আমল হ্রাস করে ও মন্দ আমল বৃদ্ধি করে তাদের প্রতি কোনোরূপ অন্যায় করা হবে না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ بِحَرْبٍ : حَرْبٌ -এর نَكِرَة টি تَعْظِيْم وَ شِدَّت বুঝানোর জন্যে সেই সাথে আল্লাহ এবং রাসূলের দিকে নিসবত করার দ্বারা ভয়াবহতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

قَوْلُهُ لَا يَدَ لَنَا : اَىْ لَا طَاقَةَ لَنَا

قَوْلُهُ وَقَعَ غَرِيْمٌ : এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে একথা বুঝানো হয়েছে যে, وَاِنْ كَانَ -এর كَانَ টি كَانَ تَامَّة ; তার খবরের প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ كَانَ শব্দটি এখানে وَقَعَ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ اَىْ عَلَيْكُمْ تَاخِيْرُهٗ : فَنَظِرَةٌ হলো মুবতাদা, আর তার খবর মাহযূফ রয়েছে। তাহলো عَلَيْكُمْ تَاخِيْرُهٗ আর এখানে খবরটি মাহযূফ রাখার প্রয়োজন এজন্য হয়েছে যে, فَنَظِرَةٌ জুমলা হয়ে جَوَابُ الشَّرْطِ হবে। আর تَاخِيْرُهٗ বৃদ্ধি করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, نَظِرَة শব্দটি اِنْظَارٌ থেকে এসেছে, যার অর্থ হলো– অবকাশ দেওয়া; نَظَرٌ থেকে আসেনি, যার অর্থ হলো– দেখা।

قَوْلُهُ وَقْتِ يُسْرِهٖ : অংশটুকু দ্বারা ইশারা করেছেন যে, مَيْسَرَة শব্দটি ظَرْف হয়েছে; مَصْدَر مِيْمِى নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সুদের শাস্তি : উপরের আয়াতসমূহে সুদখোরের জন্যে মোট পাঁচটি শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে।

১. تَخَبُّط ইরশাদ করেছেন– لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

২. مَحْق ইরশাদ হয়েছে – يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ

৩. حَرْب ইরশাদ হয়েছে– فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

৪. كُفْر ইরশাদ হয়েছে – وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ সুদ হারাম হওয়ার পরও যদি কেউ সুদ হলাল মনে করে, তাহলে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে কুফরিতে নিপতিত হবে।

৫. خُلُوْدٌ فِى النَّارِ ইরশাদ হয়েছে– وَمَنْ عَادَ فَاُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ

٢٨٢. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ تَعَامَلْتُمْ بِدَيْنٍ كَسَلَمٍ وَقَرْضٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى مَعْلُوْمٍ فَاكْتُبُوْهُ اِسْتِيْثَاقًا وَدَفْعًا لِلنِّزَاعِ وَلْيَكْتُبْ كِتَابَ الدَّيْنِ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ بِالْحَقِّ فِىْ كِتَابَتِهٖ لَا يَزِيْدُ فِى الْمَالِ وَالْاَجَلِ وَلَا يَنْقُصُ وَلَا يَاْبَ يَمْتَنِعُ كَاتِبٌ مِّنْ اَنْ يَّكْتُبَ اِذَا دُعِىَ اِلَيْهَا كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ اَىْ فَضَّلَهٗ بِالْكِتَابَةِ فَلَا يَبْخَلُ بِهَا وَالْكَافُ مُتَعَلِّقَةٌ بِيَاْبَ فَلْيَكْتُبْ تَاكِيْدٌ وَلْيُمْلِلِ عَلَى الْكَاتِبِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ الدَّيْنُ لِاَنَّهُ الْمَشْهُوْدُ عَلَيْهِ فَيَقِرُّ لِيَعْلَمَ مَا عَلَيْهِ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ فِىْ اِمْلَائِهٖ وَلَا يَبْخَسْ يَنْقُصْ مِنْهُ اَىِ الْحَقِّ شَيْئًا فَاِنْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا مُبَذِّرًا اَوْ ضَعِيْفًا عَنِ الْاِمْلَاءِ لِصِغَرٍ اَوْ كِبَرٍ اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ لِخَرَسٍ اَوْ جَهْلٍ بِاللُّغَةِ اَوْ نَحْوِ ذٰلِكَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ مُتَوَلِّىْ اَمْرِهٖ مِنْ وَالِدٍ وَ وَصِيٍّ وَقَيِّمٍ وَمُتَرْجِمٍ ـ

অনুবাদ :

২৮২. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন একে অন্যের সাথে নির্ধারিত নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ঋণের লেনদেন কারবার কর যেমন– 'সালাম' বা ঋণের কারবার কর। তখন বিষয়টির দৃঢ়তা ও ভবিষ্যতের বিবাদ নিরসনার্থে তা লিখে রাখ। তোমাদের মধ্যে কোনো লেখক যেন তা ঋণ পত্র ন্যায়ভাবে লিখে দেয়। অর্থাৎ মাল বা সময়ের মধ্যে যেন নিজ হতে হ্রাস বা বৃদ্ধি করে না লিখে। লেখক যখন তাকে লিখে দিতে ডাকা হয় তখন সে লিখতে অস্বীকার করবে না। অসম্মতি জানাবে না। যেহেতু আল্লাহ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন كَمَا عَلَّمَهُ -এর كَاف টি لَا يَاْبَ -এর সাথে مُتَعَلِّق বা সংশ্লিষ্ট। সুতরাং সে যেন লিখে। فَلْيَكْتُبْ এটা تَاكِيْد [তাকীদ] স্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। তাকে যেহেতু তিনি লিখনশক্তি দ্বারা মর্যাদামণ্ডিত করেছেন। সুতরাং এ বিষয়ে তার কৃপণতা প্রদর্শন উচিত হবে না। যার উপর হক ঋণ বর্তাবে অর্থাৎ ঋণগ্রহীতা সে যেন লেখককে বিষয়বস্তু বলে দেয়। কেননা [পরে বিবাদ সৃষ্টি হলে] তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হবে। সুতরাং যা তার উপর বর্তাবে তা জেনে রেখে সে যেন তার স্বীকৃতি দিয়ে রাখল। তা লিখাতে গিয়ে সে যেন তার প্রভুকে ভয় করে। আর এটার উক্ত হক হতে কিছু যেন হ্রাস না করে না কমায়। যার উপর হক বর্তাবে অর্থাৎ ঋণগ্রহীতা সে যদি নির্বোধ কম বুদ্ধির, অপব্যয়ী কিংবা বৃদ্ধাবস্থা বা কম বয়সের দরুন সে যদি লিখাতে দুর্বল হয় বা বোবা, ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়া ইত্যাদি কারণে সে যদি লিখার বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে তবে যেন তার অভিভাবক অর্থাৎ পিতা, অছি, তত্ত্বাবধায়ক, অনুবাদক ইত্যাদি যারা তার কার্য-নির্বাহী রয়েছে তারা ন্যায়ভাবে তা লিখিয়ে দেবে।

بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوْا اَشْهِدُوْا عَلَى الدَّيْنِ شَهِيْدَيْنِ شَاهِدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ اَىْ بَالِغَى الْمُسْلِمِيْنَ الْاَحْرَارِ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا اَىِ الشَّاهِدَانِ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ يَشْهَدُوْنَ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاۤءِ لِدِيْنِهٖ وَعَدَالَتِهٖ وَتَعَدُّدُ النِّسَاۤءِ لِاَجْلِ اَنْ تَضِلَّ تُنْسٰى اِحْدٰيهُمَا الشَّهَادَةَ لِنَقْصِ عَقْلِهِنَّ وَضَبْطِهِنَّ فَتُذَكِّرَ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ اِحْدٰيهُمَا الذَّاكِرَةُ الْاُخْرٰى النَّاسِيَةَ وَجُمْلَةُ الْاِذْكَارِ مَحَلُّ الْعِلَّةِ اَىْ لِتُذَكِّرَ اِنْ ضَلَّتْ وَدَخَلَتْ عَلَى الضَّلَالِ لِاَنَّهٗ سَبَبُهٗ وَفِىْ قِرَاۤءَةٍ بِكَسْرِ اِنْ شَرْطِيَّةٌ وَرَفْعِ تَذَكُّرَ اِسْتِيْنَافٌ جَوَابُهٗ .

অনুবাদ : সাক্ষীদের মধ্যে দীনদারি, আদালত বা ন্যায়নিষ্ঠার কারণে যাদের উপর তোমরা সন্তুষ্ট তাদের মধ্যে দুজন সাবালক, মুসলিম, স্বাধীন পুরুষ এ ঋণের বিষয়ে সাক্ষী রাখবে। যদি দুজন পুরুষ সাক্ষী না থাকে তবে একজন পুরুষ ও দুজন স্ত্রীলোক সাক্ষ্যদান করবে। মহিলাদের একাধিক হওয়ার কারণ হলো, সাধারণভাবে তাদের বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি কম থাকার কারণে তাদের একজন যদি বিভ্রান্ত হয় বিষয়বস্তু ভুলে যায় তবে যার স্মরণে আছে সে অপরজনকে ভুলকারিণীকে স্মরণ করিয়ে দেবে فَتُذَكِّرَ এটা তাশদীদসহ ও তাখফীফ বা তাশদীদবিহীন উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে।

স্মরণ করানো সম্পর্কিত এ বাক্যটি উক্ত বিধানের হেতু রূপে গণ্য। অর্থাৎ যদি একজন ভুলে যায়, বিস্মৃতির শিকার হয় তবে অপরজন স্মরণ করিয়ে দেবে। কেননা এ বিস্মৃতিই তার [স্মরণ করিয়ে দেওয়ার] মূল কারণ। বস্তুত اَىْ لِتُذَكِّرَ হলো اِذْكَار -এর প্রবেশস্থল। لَام عِلَّت টি ضَلَال -এর উপর প্রবেশ لَام عِلَّت আর اِنْ ضَلَّتْ করার কারণ হলো সেটিই হলো تَذْكِيْر -এর সবব। আর এক কেরাতে اِنْ شَرْطِيَّه টি কাসরা এবং রফাসহ جُمْلَه مُسْتَانِفَه এবং جَوَاب شَرْط হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ تَعَامَلْتُمْ : تَدَايَنْتُمْ -এর পরে تَعَامَلْتُمْ বৃদ্ধি করা হয়েছে تَدَايَنْتُمْ -এর অর্থ বর্ণনা করার জন্যে। কেননা تَدَايُن -এর দুটি অর্থ রয়েছে। যথা– ১. পরস্পরে বাকি লেনদেন করা। ২. বদলা দেওয়া। যেমন বলা হয়– كَمَا تَدِيْنُ تُدَانُ 'যেমন কর্ম তেমন ফল।' এখানে প্রথম অর্থটি উদ্দেশ্য। আরো একটি কারণ এই যে, পরে উল্লিখিত دَيْن শব্দটি تَدَايَنْتُمْ -এর জন্যে যাতে تَاسِيْس হয় تَاكِيْد না হয়। এজন্য تَعَامَلْتُمْ উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা تَدَايَنْتُمْ -কে دَيْن -এর অর্থে ধরা হলে সামনের دَيْن শব্দ تَدَايَنْتُمْ -এর تَاكِيْد হবে। অথচ تَاكِيْد থেকে تَاسِيْس উত্তম। তাই تداينتم -কে تَعَامَلْتُمْ -এর অর্থে ধরা হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَفِىْ قِرَاۤءَةٍ بِكَسْرِ اِنْ شَرْطِيَّةٌ وَرَفْعِ تَذَكُّرَ اِسْتِيْنَافٌ جَوَابُهٗ : অর্থ فَتُذَكِّرَ জুমলায়ে মুস্তানিফা হবে এ অর্থে যে, তার মধ্যে اِنْ شَرْطِيَّة আমল করবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের যোগসূত্র ও : পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে সুদি লেনদেনের কঠোর নিষেধাজ্ঞা এবং দান-সদকার গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে। এখন পরস্পরে ঋণ লেনদেনের বিধান ও মাসআলার দিকনির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে। কারণ সুদি লেনদেনকে যখন হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে আর সকল মানুষ দান-খয়রাত করার ক্ষমতা রাখে না এবং কিছু সংখ্যক মানুষ দান-খয়রাত গ্রহণকেও পছন্দ করে না। এমতাবস্থায় মানবিক প্রয়োজন মিটানোর জন্যে একটি উপায়ই থেকে গেল, তা হলো ঋণগ্রহণ। এ কারণে

বিভিন্ন হাদীসে ঋণ প্রদানের বড়ই ছওয়াব বর্ণিত হয়েছে। তবে ঋণ যেভাবে এক অনস্বীকার্য জরুরি বিষয় এ ক্ষেত্রেও অসাবধানতা বা গুরুত্ব না দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ দ্বন্দ্ব-কলহের কারণ হয়ে থাকে। এ কারণেই অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঋণ সম্পর্কে জরুরি দিক-নির্দেশনা দান করেছেন। এ আয়াতকে 'আয়াতে দাইন' বলা হয়। এটা কুরআনের সর্ববৃহৎ আয়াত। ঋণ বা বাকি লেনদেনের দুটি ধরন আছে। যথা–

ক. পণ্য নগদ উসুল করবে, নগদ গ্রহণ করবে এবং মূল্য পরিশোধের জন্যে মেয়াদ নির্ধারণ করবে।

খ. পণ্যের মূল্য নগদ প্রদান করবে, আর পণ্য হস্তান্তরের জন্যে নির্দিষ্ট মেয়াদ স্থির করবে। দ্বিতীয়টিকে পরিভাষায় بَيْع سَلَم [সলম চুক্তি] বলে। হাদীসের দৃষ্টিতে এটা বৈধ। যদিও অনুপস্থিত পণ্য ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى : ব্যাখ্যাকারগণ ইঙ্গিত স্বরূপ مَعْلُوْم শব্দ দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, ঋণের ক্ষেত্রে মেয়াদ সম্পূর্ণ পরিষ্কার হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোনো রূপ অস্পষ্টতা রাখা ঠিক নয়। যেমন বলল, শীতকালে বা গরমকালে ফসল কাটার সময় দিয়ে দেব। এগুলো প্রত্যেকটি অস্পষ্ট। এ ধরনের অস্পষ্টতা থেকে বাঁচার জন্যে মাস ও দিন তারিখ উল্লেখ করা জরুরি।

قَوْلُهُ فَاكْتُبُوْهُ : অর্থাৎ, যখন তোমরা পরস্পরে বাকি লেনদেন কর, তখন তা লিখে রাখ। এ আয়াতে একটি বিশেষ রীতি বর্ণিত হয়েছে। তা হলো বাকি লেনদেন লিখে রাখা। সাধারণত বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের মধ্যে ঋণ লেনদেনের বিষয়টি লিখে রাখা ও এ ব্যাপারে সাক্ষী রাখাকে দূষণীয় এবং অনাস্থার দলিল মনে করা হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, ঋণ এবং ব্যবসায়িক সিদ্ধান্তবলি লিখে রাখা উচিত এবং এ ব্যাপারে সাক্ষী রাখা উচিত, যাতে ভবিষ্যতে কোনোরূপ কলহ সৃষ্টি না হয়। এ আয়াতে অপর একটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে যে, ঋণ লেনদেন করলে তার মেয়াদ যেন অবশ্যই নির্ধারণ করা হয়। মেয়াদবিহীন ঋণ লেনদেন জায়েজ নয়। কারণ এর দ্বারা দ্বন্দ্ব-কলহের দ্বার উন্মুক্ত হয়। এ কারণে ফকীহগণ বলেন, মেয়াদ সুনির্দিষ্ট এবং স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

قَوْلُهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ : কুরআন অবতরণের যুগে লেখার প্রচলন ততটা ছিল না, শিক্ষিত মানুষ কমই পাওয়া যেত। বর্তমান উন্নতির যুগেও বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষার হার অতি নগণ্য। কাজেই সম্ভাবনা ছিল যে, লেখকের যা মনে চায় তাই লিখে দেবে। ফলে কারো ক্ষতি এবং কারো উপকার সাধিত হবে। এ করণেই বলা হয়েছে যে, লেখকের জন্যে ন্যায়নিষ্ঠা ও সততার সাথে সঠিক বিষয়টি লেখা আবশ্যক। এ লেখনীর সারমর্ম যেহেতু নিজ জিম্মায় অন্যের অধিকারের স্বীকারোক্তিকরণ, কাজেই লেখার ব্যবস্থা করা তারই দায়িত্ব, যার উপর অন্যের অধিকার বা হক থাকে। যে লিখবে এবং লিখাবে উভয়ের অন্তরে আল্লাহর ভয় রাখা জরুরি। وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ আয়াতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا : কোনো কোনো সময় এমনও হয় যে, যার উপর অন্যের হক চেপে বসে সে অবুঝ কিংবা বৃদ্ধ, নাবালেগ, বোবা বা ভিন্নভাষী হতে পারে, যার দরুন লেখকের ভাষা সে বুঝে না। ফলে সে চুক্তিনামা লিখাতে সক্ষম হয় না। এমন ক্ষেত্রে তার অভিভাবক বা উকিল তার দায়িত্ব আঞ্জাম দেবে।

সাক্ষ্যের ব্যাপারে কতিপয় জরুরি নীতি : পূর্বের আয়াতে চুক্তিনামা লিখা ও লিখানোর বর্ণনা ছিল। এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, শুধু চুক্তিনামা লিখাই যথেষ্ট নয়, বরং সে ব্যাপারে সাক্ষী বানাবে, যাতে দ্বন্দ্বের সময় আদালতে তাদের সাক্ষ্য দ্বারা হাকিম রায় দিতে পারেন। এ কারণেই শুধু লেখনী বা চুক্তিনামা শরয়ী দলিল নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত ব্যাপারে শরিয়তসিদ্ধ সাক্ষী না পাওয়া যাবে। বর্তমানেও আদালতে শুধু লেখনীর উপর মৌখিক সাক্ষী ছাড়া কোনো রায় দেওয়া হয় না।

সাক্ষ্যের ব্যাপারে দুজন ন্যায়নি-ষ্ঠাবান ধার্মিক মুসলমান পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা হওয়া আবশ্যক।

قَوْلُهُ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى : এর দ্বারা এক পুরুষের স্থলে দুই মহিলাকে সাক্ষী বানানোর রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, দুজন মহিলাকে একজনের স্থলে রাখার উদ্দেশ্য এই যে, স্বাভাবিকভাবে মহিলারা পুরুষের তুলনায় দুর্বল সৃষ্টি ও স্বল্প বুঝের অধিকারীণী। এ কারণে এক মহিলা যদি ঘটনার কিছু অংশ ভুলে যায় তখন অপর মহিলা তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে। বাকি কথা হলো, মহিলাকে পুরুষের তুলনায় দুর্বল জ্ঞান করা হয়েছে কেন? পুরুষের ক্ষেত্রে ভুলের সম্ভাবনা ধর্তব্য হয়নি কেন? বস্তুত এ প্রশ্নটি মানুষের শারীরিক কাঠামো ও বিভিন্ন উৎসের ব্যাপারে প্রশ্ন করার ন্যায় অর্থাৎ গর্ভধারণ ও স্তন্যের সম্পর্ক মহিলার ক্ষেত্রে করা হলো কেন? পুরুষ জাতি মহিলাদের চেয়ে শক্তিশালী ও সহনশীল হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে অযোগ্য মনে করা হলো কেন? মহান স্রষ্টা যিনি বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণু সম্পর্কে অবগত, তিনি সর্ববিষয়ে সূক্ষ্ম রহস্য সম্পর্কেও অবগত। হ্যাঁ যদি ব্যবসায়িক লেনদেন সরাসরি হাতে হাতে হয়, আর তা লিখা না হয়, তা দূষণীয় নয়। অর্থাৎ দৈনন্দিন বেচাকেনা ও লেনদেন লিখে রাখা জরুরী নয়। তথাপি যদি লিখে রাখা হয় তাহলে তা উত্তম। যেমন বর্তমানে ক্যাশ-মেমোর প্রচলন রয়েছে।

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا زَائِدَةٌ دُعُوا إِلَى تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا وَلَا تَسْئَمُوا تَمِلُّوا مِنْ أَنْ تَكْتُبُوهُ أَيْ مَا شَهِدْتُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ لِكَثْرَةِ وُقُوعِ ذٰلِكَ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا إِلَى أَجَلِهِ وَقْتِ حُلُولِهِ حَالٌ مِنَ الْهَاءِ فِيْ تَكْتُبُوهُ ذٰلِكُمْ أَيِ الْكُتُبُ أَقْسَطُ أَعْدَلُ عِنْدَ اللّٰهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ أَيْ أَعْوَنُ عَلَى إِقَامَتِهَا لِأَنَّهُ يُذَكِّرُهَا وَأَدْنَى أَقْرَبُ إِلَى أَنْ لَّا تَرْتَابُوا تَشُكُّوا فِيْ قَدْرِ الْحَقِّ وَالْأَجَلِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تَقَعَ تِجَارَةٌ حَاضِرَةٌ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالنَّصْبِ فَتَكُوْنُ نَاقِصَةً وَاسْمُهَا ضَمِيْرُ التِّجَارَةِ تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ أَيْ تَقْبِضُوْنَهَا وَلَاأَجَلَ فِيْهَا فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْ أَلَّا تَكْتُبُوْهَا وَالْمُرَادُ بِهَا الْمَتْجَرُ فِيْهِ وَأَشْهِدُوْا إِذَا تَبَايَعْتُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ أَدْفَعُ لِلْاِخْتِلَافِ وَهٰذَا وَمَا قَبْلَهُ أَمْرُ نُدُبٍ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيْدٌ صَاحِبُ الْحَقِّ وَمَنْ عَلَيْهِ بِتَحْرِيْفٍ أَوْ اِمْتِنَاعٍ مِنَ الشَّهَادَةِ أَوِ الْكِتَابَةِ أَوْ لَا يَضُرُّهُمَا صَاحِبُ الْحَقِّ بِتَكْلِيْفِهِمَا مَا لَا يَلِيْقُ فِي الْكِتَابَةِ وَالشَّهَادَةِ وَإِنْ تَفْعَلُوْا مَا نُهِيْتُمْ عَنْهُ فَإِنَّهُ فُسُوْقٌ خُرُوْجٌ عَنِ الطَّاعَةِ لَا حَقٌّ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ فِيْ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ مَصَالِحَ أُمُوْرِكُمْ حَالٌ مُقَدَّرَةٌ أَوْ مُسْتَانِفٌ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ـ

অনুবাদ : সাক্ষ্যদান বা সাক্ষী হওয়ার জন্যে যখন ডাকা হয় তখন সাক্ষীগণ যেন অস্বীকার না করে। مَا دُعُوْا এটা অর্থাৎ مَا শব্দটি এ স্থানে অতিরিক্ত। ছোট হোক বা বড় কম হোক বা বেশি যে হকের বিষয়ে তোমরা সাক্ষী হয়েছ মেয়াদসহ অর্থাৎ তার সময় শেষ হওয়ার সীমাসহ إِلَى أَجَلِهِ এটা تَكْتُبُوْهُ -এর ه সর্বনাম হতে حَال বা ভাব ও অবস্থাবাচক পদ। লিখতে অধিক হারে এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয় বলে তোমরা বিরক্ত হয়ো না। ত্যক্ত হয়ো না।

এটা অর্থাৎ লিখে নেওয়া আল্লাহর নিকট ন্যায্যতর অধিক ইনসাফের ও প্রমাণের জন্যে দৃঢ়তর অর্থাৎ সাক্ষ্যদানের পক্ষে অধিকতর সহায়ক। কেননা তা তাকে মূল বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিতে সক্ষম হবে। এবং তোমাদের মধ্যে সন্দেহ উদ্রেক না হওয়ার অর্থাৎ নির্ধারিত মেয়াদ ও পরিমাণ সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি না হওয়ার নিকটতর অধিক কাছের । কিন্তু তোমরা পরস্পর যে ব্যবসার নগদ আদান-প্রদান কর تِجَارَةٌ অপর এক কেরাতে এটা নসব সহকারে পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় كَانَ টি نَاقِصَة বা অসমাপিকা বলে গণ্য হবে এবং تِجَارَةٌ [ব্যবসা] শব্দের প্রতি ইঙ্গিতবহ সর্বনাম هِيَ তার اِسْم বলে গণ্য হবে। তৎক্ষণাৎই কবজা করে নাও, যাতে কোনো মেয়াদ থাকে না, তা অর্থাৎ ঐ লেনদেনের বিষয় তোমরা না লিখলে কোনো দোষ নেই। যখন তোমরা বেচাকেনা কর তখন তার সাক্ষী রাখবে। কেননা এটা মতবিরোধ নিরসনে অধিক কার্যকরী।

এটা এবং পূর্বোল্লিখিত উভয় বিধানই মুস্তাহাব বলে বিবেচ্য।

লেখক এবং সাক্ষী যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় অর্থাৎ লিখন বা সাক্ষ্যদানে তাদের সাধ্যের বাইরে কোনো জিনিস চাপিয়ে যার অধিকার সে অর্থাৎ ঋণদাতা তাদের কোনো ক্ষতি করবে না। কিংবা তার তাফসীর হলো, তারা কোনোরূপ পরিবর্তন করে বা সাক্ষ্যদান বা লিখতে অস্বীকৃতি জানিয়ে যার হক এবং যার উপর হক বর্তায় অর্থাৎ ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা তাদের কাউকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবে না।

তোমাদেরকে যা করতে নিষেধ করা হয়েছে তা যদি তোমরা কর তবে তা তোমাদের জন্য অন্যায় অর্থাৎ আনুগত্যের সীমা অতিক্রম ও অন্যায় [বলে বিবেচিত]। তোমরা আল্লাহকে অর্থাৎ তাঁর আদেশ-নিষেধসমূহ সম্পর্কে ভয় কর। আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের জন্যে কল্যাণকর বিষয়সমূহের শিক্ষা দেন। وَيُعَلِّمُكُمْ -এ বাক্যটিকে حَال مُقَدَّرَة অর্থাৎ নির্ধারিত ভাব ও অবস্থাবাচক বাক্য বলে বিবেচনা করা যায়। অথবা এটা مُسْتَانِفَة বা একটি নতুন বাক্য। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সবিশেষে অবহিত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيْدٌ : এর এক উদ্দেশ্য এই যে, কাউকে চুক্তিনামা লিখতে বা সাক্ষী হতে বাধ্য করা যাবে না। এর দ্বারা এ বিষয়টি প্রতীয়মান হয় যে, লেখক যদি লেখার পারিশ্রমিক চায় কিংবা সাক্ষী আদালতে যাতায়াত বাবদ খরচ চায় তাহলে এটা তার প্রাপ্য।

قَوْلُهُ صَغِيْرًا كَانَ اَوْ كَبِيْرًا : এখানে كَانَ মাহযূফ ধরে ইশারা করেছেন যে, صَغِيْرًا এবং كَبِيْرًا হলো كَانَ مَحْذُوْف -এর খবর।

قَوْلُهُ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تَقَعَ تِجَارَةٌ : تَكُوْنَ -এর তাফসীর تَقَعَ দ্বারা করে ইশারা করেছেন যে, এখানে كَانَ টি كَانَ تَامَّه আর تِجَارَةٌ হলো তার اِسْم। অপর একটি কেরাতে تِجَارَةً حَاضِرَةً -এর মাঝে নসব দিয়ে পঠিত আছে। তখন تَكُوْنَ টি نَاقِصَة হবে। তাকদীরী ইবারত হবে- اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ التِّجَارَةُ تِجَارَةً حَاضِرَةً

قَوْلُهُ حَالٌ مُقَدَّرَةٌ اَوْ مُسْتَأْنِفٌ : এ অংশটুকু দ্বারা একটি سُؤَال مُقَدَّر -এর জবাব প্রদান করা হয়েছে।

প্রশ্ন : وَاتَّقُوا اللّٰهَ -এর উপর يُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ -এর عَطْف সঠিক হয়নি। কেননা এর দ্বারা جُمْلَه اِنْشَائِيَّة -এর উপর جُمْلَه خَبَرِيَّة -এর عَطْف হয়, যা শুদ্ধ নয়।

উত্তর. এখানে واو টি عَاطِفَة নয়; বরং حَالِيَه বা اِسْتِئْنَافِيَّة

۲۸۳. وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ اَىْ مُسَافِرِيْنَ وَتَدَايَنْتُمْ وَلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرُهُنٌ وَفِىْ قِرَاءَةٍ فَرِهٰنٌ مَقْبُوْضَةٌ تَسْتَوْثِقُوْنَ بِهَا وَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ جَوَازَ الرَّهْنِ فِى الْحَضَرِ وَ وُجُوْدِ الْكَاتِبِ فَالتَّقْيِيْدُ بِمَا ذُكِرَ لِاَنَّ التَّوَثُّقَ فِيْهِ اَشَدُّ وَاَفَادَ قَوْلُهُ مَقْبُوْضَةٌ اِشْتِرَاطَ الْقَبْضِ فِى الرَّهْنِ وَالْاِكْتِفَاءَ بِهِ مِنَ الْمُرْتَهِنِ وَ وَكِيْلِهِ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَىِ الدَّائِنُ الْمَدِيْنَ عَلٰى حَقِّهِ فَلَمْ يَرْتَهِنْ فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَىِ الْمَدِيْنُ اَمَانَتَهُ دَيْنَهُ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ فِىْ اَدَائِهِ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اِذَا دُعِيْتُمْ لِاِقَامَتِهَا وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهُ اٰثِمٌ قَلْبُهُ خُصَّ بِالذِّكْرِ لِاَنَّهُ مَحِلُّ الشَّهَادَةِ وَلِاَنَّهُ اِذَا اَثِمَ تَبِعَهُ غَيْرُهُ فَيُعَاقَبُ مُعَاقَبَةَ الْاٰثِمِيْنَ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَىْءٌ مِنْهُ.

অনুবাদ :

২৮৩. যদি তোমরা সফরে থাক অর্থাৎ যদি মুসাফির হও আর এমতাবস্থায় ঋণের লেনদেন কর আর কোনো লেখক না পাও তবে বন্ধক রাখবে যা ঋণদাতার অধিকারে দেওয়া হবে। فَرُهُنٌ অপর এক কেরাতে এটা فَرِهٰنٌ রূপে পঠিত হয়েছে। অর্থাৎ তার [বন্ধকের] মাধ্যমে বিষয়টি নির্ভরযোগ্য ও সুদৃঢ় করে নিবে।

সুন্নায় বর্ণিত আছে যে, বাড়িতে অবস্থান এবং লেখক উপস্থিত থাকাকালেও বন্ধক রাখা বৈধ। এ স্থানে বিধানটি উল্লিখিত শর্তে শর্তযুক্ত করার কারণ হলো, এ অবস্থায় নির্ভরযোগ্যকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় আরো বেশি।

مَقْبُوْضَةٌ [যা অধিকারে দেওয়া হবে] এ শর্তটি দ্বারা বুঝা যায়, রাহন বা বন্ধকের বেলায় [বন্ধকীয় বস্তুটি] 'কবজা' করা শর্ত। 'মুরতাহিন' বা যার নিকট বন্ধক থাকবে সে নিজে বা তার পক্ষ থেকে তদীয় উকিলের অধিকারে দেওয়াই যথেষ্ট বলে বিবেচ্য হবে। তোমরা যদি একে অপরকে বিশ্বাস কর অর্থাৎ ঋণদাতা যদি ঋণগ্রহীতার উপর আস্থা রাখে আর সেহেতু বন্ধক না নেয় তবে যাকে বিশ্বাস করা হলো অর্থাৎ ঋণগ্রহীতা সে যেন যথাযথভাবে আমানত অর্থাৎ ঋণ প্রত্যর্পণ করে এবং তা আদায়ের বিষয়ে সে যেন তার প্রভু আল্লাহকে ভয় করে। যখন তোমাদেরকে সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠাকল্পে ডাকা হয় তখন তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। যে কেউ তা গোপন করে তার অন্তর পাপী। এ স্থানে এর [অন্তরের] কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো, সাক্ষ্যের মূল স্থান এটাই। দ্বিতীয়ত এটা যদি পাপী হয় তবে অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এর অধীন বলে [ঐগুলোও পাপী হবে।] সুতরাং তাকে পাপীগণের মতোই শাস্তি প্রদান করা হবে। তোমরা যা কর আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত। কোনো কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ الخ : এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, বন্ধকী লেনদেন সফরেই হতে হবে; বরং উদ্দেশ্য এই যে, সফরে যেহেতু এ ধরনের বিষয় সংঘটিত হয়, এ কারণেই তাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এটাও নয় যে, যদি কোনো ব্যক্তি শুধু লেখনীর মাধ্যমে ঋণ দিতে প্রস্তুত না হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে বন্ধক রেখে ঋণ গ্রহণ করবে। লেখনী এবং বন্ধক উভয়টি একত্রে জায়েজ। আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঋণদাতা নিজের সান্ত্বনার জন্যে বন্ধক রাখতে পারে। তবে مَقْبُوْضَةٌ দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত বুঝা যায় যে, বন্ধকী দ্রব্য দ্বারা উপকার লাভ করা যাবে না; বরং তার এতটুকু অধিকার আছে যে, পাওনা উসুল করা পর্যন্ত সে উক্ত বস্তুকে নিজের করায়ত্তে রাখবে।

قَوْلُهُ فَرُهُنٌ : শব্দটি হয়তো মাসদার হবে না হয় رَهْنٌ -এর বহুবচন। কোনো কোনো কেরাতে رُهُنٌ বহুবচনের সীগাহ রয়েছে।

قَوْلُهُ تَسْتَوْثِقُوْنَ بِهَا : এ জুমলাটি মাহযূফ ধরার উদ্দেশ্য এ কথা বলা যে, فَرِهَانٌ مَقْبُوْضَةٌ মাওসূফ সিফত মিলে মুবতাদা আর تَسْتَوْثِقُوْنَ بِهَا জুমলা হয়ে তার খবর।

قَوْلُهُ فَاِنَّهُ اٰثِمٌ قَلْبُهُ : এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বিতর্কিত ব্যাপারে যে ব্যক্তির সঠিক বিষয়টি জানা আছে, সে যেন সাক্ষ্য গোপন না করে, সে তা গোপন করলে তার অন্তর গুনাগার হবে। এখানে অন্তরের কথা বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ এই যে, কেউ যেন এটাকে মুখের গুনাহ মনে না করে। কারণ প্রথমে অন্তর থেকেই ইচ্ছা সূচিত হয়। এ কারণে অন্তর প্রথমে গুনাহগার হবে। −[জামালাইন]

٢٨٤. لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوْا تُظْهِرُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ مِنَ السُّوْءِ وَالْعَزْمِ عَلَيْهِ اَوْ تُخْفُوْهُ تُسِرُّوْهُ يُحَاسِبْكُمْ يُجْزِكُمْ بِهِ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ الْمَغْفِرَةَ لَهُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ تَعْذِيْبَهُ وَالْفِعْلَانِ بِالْجَزْمِ عَطْفًا عَلٰى جَوَابِ الشَّرْطِ وَالرَّفْعِ اَيْ فَهُوَ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَمِنْهُ مُحَاسَبَتُكُمْ وَجَزَاؤُكُمْ .

অনুবাদ :

২৮৪. আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। তোমাদের মনে মন্দ চিন্তা এবং তা করার সংকল্প যা আছে তা জাহির কর প্রকাশ কর বা গোপন রাখ লুকায়িত রাখ আল্লাহ কিয়ামত দিবসে তার হিসাব নেবেন। অর্থাৎ তোমাদেরকে এর প্রতিফল দেবেন। অতঃপর যাকে ক্ষমা করার ইচ্ছা করবেন তাকে ক্ষমা করবেন, আর যাকে শাস্তিদানের ইচ্ছা করবেন তাকে শাস্তি দেবেন। يَغْفِرُ وَيُعَذِّبُ এ দুটি বাক্য শর্তবাচক إِنْ تُبْدُوْا -এর জওয়াব (يُحَاسِبْكُمْ) -এর সাথে عَطْف বা অন্বয়রূপে জযমসহ পাঠ করা যায়। এ স্থানে উহ্য مُبْتَدَأ অর্থাৎ উদ্দেশ্য هُوَ -এর خَبَر বা বিধেয় রূপে এ দুটিকে رَفْع সহকারেও পাঠ করা যায়। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। তোমাদের হিসাব নেওয়া ও প্রতিদান দেওয়া -এর অন্তর্ভুক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ الخ : এটা কুরআনের সর্ববৃহৎ সূরার সর্ববৃহৎ রুকূ'। এর মধ্যে তাওহীদি আকিদাকে পুনঃ উল্লেখ করা হয়েছে। সূরার সূচনায় ধর্মীয় উসুল সংশ্লিষ্ট সামষ্টিক শিক্ষা ছিল। আর সূরার সমাপ্তিতেও বুনিয়াদি আকিদার সামষ্টিক বিবরণ রয়েছে। বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে 'হুসনুল খিতাম' বলা হয়।

হাদীস শরীফে উল্লিখিত হয়েছে যে, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো তখন সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত চিন্তিত হলেন। রাসূল ﷺ -এর দরবারে হাজির হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, প্রভৃতি নেক আমল যে ব্যাপারে আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আমরা তা পালনে সচেষ্ট রয়েছি। এসব আমাদের সাধ্য বহির্ভূত নয়। কিন্তু অন্তরে যেসব খেয়াল ও সংকল্প জাগে তা আমাদের এখতিয়ারাধীন নয়। তা মানুষের শক্তির বাহিরে তথাপি আল্লাহ তা'আলা সে ব্যাপারে হিসাব নেওয়ার ঘোষণা করেছেন। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করলেন, বর্তমানে তোমরা سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا বল। সাহাবীদের আনুগত্য দেখে আল্লাহ তা'আলা لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا অবতীর্ণ করলেন। এর দ্বারা প্রথম আয়াতটি রহিত হয়ে গেল। -[ফাতহুল কাদীর]

বুখারী, মুসলিম ও সুনানে আরবা'আ -এর নিম্নোক্ত হাদীসটিও এর সমর্থন করে–

اِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ لِيْ عَنْ اُمَّتِيْ مَا وَسْوَسَتْ بِهٖ صَدْرُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ وَتَتَكَلَّمْ .

আমার উম্মতের অন্তরে যেসব কথা আসে 'আল্লাহ তা'আলা তা ক্ষমা করে দিয়েছেন। তবে সে ব্যাপারে পাকড়াও হবে যেগুলোকে বাস্তবায়ন করা হয় বা যাকে প্রকাশ করা হয়।'

এর দ্বারা বুঝা গেল যে, অন্তরে সাধারণত ইচ্ছা এবং কল্পনার উপর পাকড়াও হবে না। যতক্ষণ না তাকে বাস্তবায়ন করবে কিংবা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করবে।

ইমাম ইবনে জারীর তাবারীর ধারণা মতে, এ আয়াতটি মানসূখ নয়। কেননা হিসাবের জন্যে সাজা প্রদান অবধারিত নয়। অর্থাৎ এমন নয় যে, আল্লাহ তা'আলা যার হিসাব নেবেন অবশ্যই তাকে সাজা দেবেন; বরং আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক কাফেরেরও হিসাব নেবেন। বহু মানুষ হিসাবের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর ক্ষমা লাভ করবে।

قَوْلُهُ تُظْهِرُوْا : এ ব্যাখ্যা দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, تُبْدُوْا শব্দটি إِبْدَاءٌ থেকে নিষ্পন্ন। بَدْءٌ থেকে নয়, যার অর্থ– শুরু করা।

قَوْلُهُ مِنْ سُوْءٍ : -এর মধ্যে مِنْ বয়ানিয়া। এটা مَا -এর বর্ণনা।

قَوْلُهُ يُحَاسِبْكُمْ : এর দুটি ব্যাখ্যা রয়েছে– ক. يُجْزِكُمْ তিনি তোমাদেরকে প্রতিদান দেবেন। খ. يُخْبِرُكُنَّ তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন। ব্যাখ্যাকার اَلْعَزْمِ عَلَيْهِ দ্বারা سُوْءٌ -এর ব্যাখ্যা প্রথম শব্দের দিক দিয়ে করেছেন। আর وَالْعَزْمِ عَلَيْهِ -এর মধ্যে وَاو টি তাফসীরিয়া। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের অন্তরে যেসব দৃঢ় সংকল্প আসে, অর্থাৎ যেগুলোকে বাস্তবে পরিণত করার দৃঢ় উদ্দেশ্য নেওয়া হয়, সে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পাকড়াও করবেন। শুধু সাধারণ ইচ্ছা ও সংকল্পের উপর পাকড়াও করবেন না।

قَوْلُهُ وَالْعَزْمِ عَلَيْهِ : এর দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

প্রশ্ন: وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ **দ্বারা** বুঝা যায় অন্তরের সাধারণ ইচ্ছার উপরও পাকড়াও হবে। অথচ এ ব্যাপারে বান্দার কোনো এখতিয়ার থাকে না। এমনিতেই বিভিন্ন সময় অন্তরে বিভিন্ন ইচ্ছা ও কামনা জাগে। কাজেই এর দ্বারা تَكْلِيْفُ مَا لَا يُطَاقُ সাব্যস্ত হয়।

উত্তর: مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ দ্বারা এমন ইচ্ছা উদ্দেশ্য যেগুলোকে বাস্তবে পরিণত করার দৃঢ় সংকল্প করা হয়। এভাবে ব্যাখ্যাকার (র.) يُحَاسِبْكُمْ -এর ব্যাখ্যা يُخْبِرْكُمْ দ্বারা করে এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন যে, হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, অন্তরের সাধারণ ইচ্ছার উপর কোনো পাকড়াও হবে না। যতক্ষণ না তাকে বাস্তবে পরিণত করবে। এর উত্তর দিয়েছেন যে, يُحَاسِبْكُمْ -এর অর্থ يُخْبِرْكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন বান্দার আন্তরিক সাধারণ ইচ্ছার ব্যাপারেও অবহিত করবেন। যে সকল কপিতে يُجْزِكُمْ এসেছে তা لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ দ্বারা মানসূখ হবে।

সার সংক্ষেপ : পূর্বোক্ত আয়াত وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ الخ -কে যদি আম [ব্যাপক] রাখা হয় তাহলে আন্তরিক সাধারণ ইচ্ছা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞাকে শামিল করবে। দ্বিতীয়টি পরবর্তী আয়াত لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ الخ দ্বারা মানসূখ হবে। আর পূর্বের আয়াতকে যদি দৃঢ় সংকল্পের উপর প্রয়োগ করা হয়, তাহলে নসখের প্রয়োজন হবে না; পরবর্তী আয়াত পূর্ববর্তী আয়াতের বিশ্লেষণ হবে।

قَوْلُهُ عَطْفًا عَلٰى جَوَابِ الشَّرْطِ : যদি يُعَذِّبُ ও يَغْفِرُ -কে জযম পড়া হয়, তাহলে শর্তের জবাব অর্থাৎ يُحَاسِبِ -এর উপর আতফ হবে, আর উভয়টিকে মারফূ' পড়লে هُوَ লুপ্ত মুবতাদার খবর হবে। বাক্যটি ইসতেনাফিয়া হবে।

قَوْلُهُ تُظْهِر : تُبْدُوْا -এর তাফসীর تُظْهِرُ দ্বারা করার উদ্দেশ্য এদিকে ইশারা করা যে, تُبْدُوْا শব্দটি إِبْدَاءٌ [প্রকাশ করা] থেকে এসেছে; بَدْءٌ [শুরু করা] থেকে নয়।

قَوْلُهُ مِنَ السُّوْءِ : এর مِنْ টি بَيَانِيَه বা বিবরণমূলক। আর বিবরণ দেওয়া হয়েছে مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ-এর মাঝে উল্লিখিত مَا -এর।

قَوْلُهُ وَالْعَزْمِ عَلَيْهِ : মুফাসসির (র.) اَلْعَزْمِ عَلَيْهِ বলে একটি প্রশ্নের সমাধান দিয়েছেন।

প্রশ্ন: وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ দ্বারা বোঝা যায় যে, অন্তরের ওয়াসওয়াসাসমূহেরও বিচার হবে। অথচ وَسَاوِس قَلْبِى বান্দার এখতিয়ারভুক্ত নয়। অধিকন্তু এটি تَكْلِيْفُ مَا لَا يُطَاقُ -এর শামিল।

উত্তর: মুফাসসির (র.) وَالْعَزْمِ عَلَيْهِ বলে উক্ত প্রশ্নের সমাধান দিয়েছেন এভাবে যে, مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ দ্বারা ঐ সকল ওয়াসওয়াসা উদ্দেশ্য, যেগুলো আমলে পরিণত করার দৃঢ় সংকল্প করা হয়েছে। অনুরূপভাবে বিজ্ঞ মুফাসসির (র.) يُحَاسِبْكُمْ -এর ব্যাখ্যায় يُجْزِكُمْ উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন এগুলোর বিচার হবে না; বরং সেগুলোর সম্পর্কে শুধু খবর দেওয়া হবে। তুমি অমুক ধারণা মনে পোষণ করেছ। আর যে নোসখায় يُحَاسِبْكُمْ -এর ব্যাখ্যায় يُجْزِكُمْ লিখা রয়েছে। তার উত্তর হলো– لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا দ্বারা তা রহিত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَالْفِعْلَانِ بِالْجَزْمِ عَطْفًا عَلٰى جَوَابِ الشَّرْطِ وَالرَّفْعِ اَىْ فَهُوَ : অর্থাৎ يَغْفِرُ এবং يُعَذِّبُ -কে ضَمَّة সহ পড়া হলে جَوَاب شَرْط তথা يُحَاسِبْكُمْ-এর উপর عَطْف হবে। আর উভয়টিকে مَرْفُوْع পড়া হলে উভয়টি هو মুবতাদা মাহযূফের খবর হবে এবং جُمْلَة اِسْتِيْنَافِيَه হবে।

অনুবাদ :

٢٨٥. اٰمَنَ صَدَّقَ الرَّسُوْلُ مُحَمَّدٌ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ عَطْفٌ عَلَيْهِ كُلٌّ تَنْوِيْنُهٗ عِوَضٌ عَنِ الْمُضَافِ اِلَيْهِ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ بِالْجَمْعِ وَالْاِفْرَادِ وَرُسُلِهٖ يَقُوْلُوْنَ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ فَنُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ كَمَا فَعَلَ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى وَقَالُوْا سَمِعْنَا مَا اُمِرْنَا بِهٖ سَمَاعَ قَبُوْلٍ وَاَطَعْنَا نَسْأَلُكَ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ الْمَرْجِعُ بِالْبَعْثِ.

২৮৫. রাসূল মুহাম্মদ ﷺ তাঁর প্রতিপালকের তরফ হতে তাঁর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে অর্থাৎ আল কুরআন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে অর্থাৎ তা সত্য বলে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং মু'মিনগণও। اَلْمُؤْمِنُ এটা اَلرَّسُوْلُ এর সাথে عَطْف হয়েছে। তাঁদের প্রত্যেকে كُلٌّ -এর تَنْوِيْن [দুই পেশ] এ স্থানে مُضَاف اِلَيْه -এর স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ كُتُبِهٖ এটা বহুবচন ও একবচন উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। এবং রাসূলগণে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। তারা বলে আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না। অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মতো কতক জনের উপর বিশ্বাস স্থাপন ও কতক জনকে অস্বীকার করি না। আর তারা বলে তুমি আমাদেরকে যে সকল বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছ তা কবুল করার মতো আমরা শুনেছি এবং আনুগত্য করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ক্ষমা চাই, পুনরুত্থানের মাধ্যমে তোমারই নিকট প্রত্যাগমন প্রত্যাবর্তন।

٢٨٦. وَلَمَّا نَزَلَتِ الْاٰيَةُ الَّتِىْ قَبْلَهَا شَكَا الْمُؤْمِنُوْنَ مِنَ الْوَسْوَسَةِ وَشَقَّ عَلَيْهِمُ الْمُحَاسَبَةُ بِهَا فَنَزَلَ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا اَىْ مَا تَسَعُهٗ قُدْرَتُهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ مِنَ الْخَيْرِ اَىْ ثَوَابُهٗ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ مِنَ الشَّرِّ اَىْ وِزْرُهٗ وَلَا يُؤَاخَذُ اَحَدٌ بِذَنْبِ اَحَدٍ وَلَا بِمَا لَمْ يَكْسِبْهُ مِمَّا وَسْوَسَتْ بِهٖ نَفْسُهٗ.

২৮৬. উল্লিখিত اِنْ تُبْدُوْا الخ আয়াতটি নাজিল হওয়ার পর বিশ্বাসীগণ রাসূল ﷺ -এর খেদমতে ওয়াসওয়াসা বা মনের কুধারণা সম্পর্কে অভিযোগ করেন। এগুলোরও হিসাব-নিকাশ হবে শুনে তাদের খুবই আশঙ্কাবোধ হয়। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেন, আল্লাহ কারো উপর তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করেন না। অর্থাৎ যতটুকু একজনের সামর্থ্যে কুলায় ততটুকু পরিমাণই তিনি দায়িত্ব দেন। সে ভালো যা করে তা অর্থাৎ তার পুণ্যফল তারই এবং সে মন্দ যা করে তা অর্থাৎ তার পাপের বোঝা তারই। সুতরাং একজনের পাপে অন্যজনকে ধরা হবে না। মনে যে সমস্ত ওয়াস-ওয়াসা বা কুধারণা হয়, তা করার কৃতসংকল্প না হওয়া ও তা না করা পর্যন্ত ঐগুলোও ধরা হবে না।

قُوْلُوْا رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا بِالْعِقَابِ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَأْنَا تَرَكْنَا الصَّوَابَ لَا عَنْ عَمَدٍ كَمَا اَخَذْتَ بِهٖ مَنْ قَبْلَنَا وَقَدْ رَفَعَ اللّٰهُ ذٰلِكَ عَنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيْثِ فَسُؤَالُهُ اِعْتِرَافٌ بِنِعْمَةِ اللّٰهِ

তোমরা বল, হে আমাদের প্রভু ! যদি আমরা বিস্মৃত হই বা ভুল করি অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি সত্যকে আমরা পরিহার করে বসি তবে আমাদের পূর্ববর্তীগণকে এ কারণে যেমন পাকড়াও করেছ তেমন তুমি আমাদেরকে তোমার শাস্তিসহ পাকড়াও করো না।

হাদীসে আছে, আল্লাহ তা'আলা এ উম্মত হতে এ ধরনের পাপকর্মের শাস্তি রহিত করে দিয়েছেন। এর পরও এ সম্পর্কে ক্ষমা যাচনা করার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর এই মহা অনুগ্রহের স্বীকৃতি দান।

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا اَمْرًا يَثْقُلُ عَلَيْنَا حَمْلُهُ كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا اَيْ بَنِيْ اِسْرَاءِيْلَ مِنْ قَتْلِ النَّفْسِ فِي التَّوْبَةِ وَاِخْرَاجِ رُبْعِ الْمَالِ فِي الزَّكٰوةِ وَقَرْضِ مَوْضِعِ النَّجَاسَةِ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ قُوَّةَ لَنَا بِهٖ مِنَ التَّكَالِيْفِ وَالْبَلَاءِ وَاعْفُ عَنَّا اُمْحُ ذُنُوْبَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا فِي الرَّحْمَةِ زِيَادَةٌ عَلَى الْمَغْفِرَةِ اَنْتَ مَوْلٰنَا سَيِّدُنَا وَمُتَوَلِّيْ اُمُوْرِنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ بِاِقَامَةِ الْحُجَّةِ وَالْغَلَبَةِ فِيْ قِتَالِهِمْ فَاِنَّ مِنْ شَانِ الْمَوْلٰى اَنْ يَنْصُرَ مَوَالِيْهِ عَلَى الْاَعْدَاءِ

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলে যেমন বনু ইসরাঈলের উপর ছিল– তওবায় নিজেদের হত্যা করা, সম্পত্তির চতুর্থাংশের জাকাত প্রদান, নাপাকি লাগলে সে স্থানটি কেটে ফেলা ইত্যাদি কঠোর বিধান আমাদের উপর তেমন কঠোর বোঝা অর্থাৎ এমন ভারি দায়িত্ব যা বহন করা আমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াবে তা আমাদের উপর অর্পণ করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার কষ্ট ও বিপদ আমাদের উপর অর্পণ করো না, যার শক্তি সামর্থ্য আমাদের নেই। আমাদের ক্ষমা কর, আমাদের পাপ মোচন কর, আমাদের মাফ কর, আমাদের প্রতি দয়া কর اَلرَّحْمَةُ [দয়া] শব্দটিতে مَغْفِرَةٌ ক্ষমা অপেক্ষা অধিক অনুকম্পা বিদ্যমান। তুমিই আমাদের অভিভাবক নেতা ও আমাদের সকল বিষয়ে কর্মবিধায়ক অতএব প্রমাণ প্রতিষ্ঠা ও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয় দান করে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য প্রদান কর। কারণ আশ্রিতদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য করাই তো অভিভাবকের শান, তাঁর কর্তব্য।

وَفِي الْحَدِيْثِ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فَقَرَأَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قِيْلَ لَهٗ عَقْبَ كُلِّ كَلِمَةٍ قَدْ فَعَلْتُ .

হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতসমূহ নাজিল হওয়ার পর রাসূল ﷺ এগুলো তেলাওয়াত করে শুনান। প্রতিটি শব্দের পর তাঁকে বলা হয়েছিল– قَدْ فَعَلْتُ 'আমি নিশ্চিতভাবেই তা পূর্ণ করেছি।'

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ : প্রথম আয়াত নাজিলের পর সাহাবায়ে কেরাম ভয় পেয়ে রাসূল ﷺ -এর কাছে বিষয়টি জানালে তিনি বললেন, قُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا অর্থাৎ 'তোমরা বল, আমরা শুনলাম ও মানলাম।' অর্থাৎ প্রশ্ন জাগুক বা কঠিন মনে হোক, কোনো অবস্থাতেই মহান আল্লাহর নির্দেশ মেনে নিতে এক মুহূর্ত বিলম্ব করব না। তখন সকলের হৃদয় খুলে যায় এবং মনের অবচেতনে সকলের মুখ থেকে উচ্চারিত হয়– سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا অর্থাৎ 'আমরা ঈমান আনলাম এবং আল্লাহর আদেশ মেনে নিলাম।' এভাবে তারা নিজেদের কষ্ট ও দ্বিধা সংশয় ঝেড়ে ফেলে আদেশ পালনে সংকল্প ও উদ্দীপনা প্রকাশ করলেন। আল্লাহর কাছে তাঁদের এ আকুতি পছন্দ হলো। কাজেই তিনি এ আয়াত দুটি ইরশাদ করলেন। প্রথম আয়াত اٰمَنَ الرَّسُوْلُ -এর মাঝে আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরামের ঈমানের প্রশংসা করেছেন। যাতে তাদের ঈমানের প্রশান্তি বৃদ্ধি পায় এবং পূর্বেকার সংশয় সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয়। এরপর দ্বিতীয় আয়াত لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ -এর মাঝে বলে দেওয়া হয়েছে যে, কাউকে সাধ্যাতীত কষ্ট দেওয়া হয় না। তাই মন্দ কাজের খেয়াল ও কল্পনা বা ভুলত্রুটি ইত্যাদির জন্যে পাকড়াও হবে না। –[তাফসীরে ওসমানী]

হাদীসে এ দুটি আয়াতের ফজিলত বর্ণিত রয়েছে। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাকারার শেষ দুটি আয়াত পাঠ করবে তা তার জন্যে যথেষ্ট হবে। এছাড়া আরও অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ تَنْوِيْنُهُ عِوَضٌ عَنِ الْمُضَافِ اِلَيْهِ : এটি একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন : যেহেতু اَلْمُؤْمِنُوْنَ -এর عَطْف হয়েছে اَلرُّسُلُ -এর উপর সেহেতু جُمْلَةٌ مَعْطُوْفَةٌ হয়ে كُلٌّ হবে خَبَرٌ مُقَدَّمٌ আর হবে مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ অথচ كُلٌّ নাকিরা হওয়ার কারণে মুবতাদা হওয়া শুদ্ধ নয়।

উত্তর : كُلٌّ শব্দটি اِضَافَةٌ اِلَى الْغَيْرِ বা অন্যের প্রতি মুযাফ হওয়ার কারণে مَعْرِفَةٌ হয়েছে। কেননা كُلٌّ -এর তানবীনটি مُضَافٌ اِلَيْهِ -এর বদলে এসেছে। তাকদীরী ইবারত كُلُّهُمْ ছিল। আর عِوَض -এর হুকুম مُعَوَّض -এর মতোই হয়। তাই মারেফার প্রতি মুযাফ হওয়ার করণে শব্দটি মারেফা হয়েছে।

قَوْلُهُ يَقُوْلُوْنَ : **প্রশ্ন** يَقُوْلُوْنَ উহ্য মানার প্রয়োজন কি?

উত্তর : لَا نُفَرِّقُ হলো جَمْعٌ مُتَكَلِّمٌ -এর সীগাহ। তার যমীরটি اَلرَّسُوْلُ ও اَلْمُؤْمِنُوْنَ -এর দিকে ফিরেছে। অথচ اِسْمٌ ظَاهِرٌ হওয়ার কারণে শব্দটি গায়েবের বিধানে শামিল। আর গায়েবের দিকে একই বাক্যে مُتَكَلِّمٌ -এর যমীর ফিরতে পারে না। তাই نُفَرِّقُ -এর পূর্বে يَقُوْلُوْنَ উহ্য মেনেছেন, যাতে বহুবচন ও যমীরের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান হয়।

سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرَانَ مَدَنِيَّةٌ : সূরা আলে ইমরান মাদানী

وَهِيَ مِائَتَا اٰيَةٍ : ২০০ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে [আরম্ভ করছি]

১. الٓمّٓ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِذٰلِكَ ـ

২. اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ـ

৩. نَزَّلَ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ الْكِتٰبَ الْقُرْاٰنَ مُتَلَبِّسًا بِالْحَقِّ بِالصِّدْقِ فِىْ اِخْبَارِهٖ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ قَبْلَهٗ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ ـ

৪. مِنْ قَبْلُ اَىْ قَبْلَ تَنْزِيْلِهٖ هُدًى حَالٌ بِمَعْنٰى هَادِيَيْنِ مِنَ الضَّلَالَةِ لِّلنَّاسِ مِمَّنْ تَبِعَهُمَا وَعَبَّرَ فِيْهِمَا بِاَنْزَلَ وَفِى الْقُرْاٰنِ بِنَزَّلَ الْمُقْتَضِىْ لِلتَّكْرِيْرِ لِاَنَّهُمَا اُنْزِلَا دَفْعَةً وَّاحِدَةً بِخِلَافِهٖ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ بِمَعْنَى الْكِتٰبِ الْفَارِقَةِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَذَكَرَ بَعْدَ ذِكْرِ الثَّلَاثَةِ لِيَعُمَّ مَا عَدَاهَا اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ الْقُرْاٰنِ وَغَيْرِهٖ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ غَالِبٌ عَلٰى اَمْرِهٖ فَلَا يَمْنَعُهٗ شَيْءٌ مِنْ اِنْجَازِ وَعِيْدِهٖ وَوَعْدِهٖ ذُوْ انْتِقَامٍ عُقُوْبَةٍ شَدِيْدَةٍ مِمَّنْ عَصَاهُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى مِثْلِهَا اَحَدٌ ـ

অনুবাদ :

১. الٓمّٓ আলিম-লাম মীম এর প্রকৃত মর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই অধিক অবগত।

২. আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, তত্ত্বাবধায়ক।

৩. হে মুহাম্মদ! তিনি সত্যসহ بِالْحَقِّ এটা এ স্থানে উহ্য مُتَلَبِّسًا -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ সত্য সংবাদবাহী রূপে তোমার প্রতি কিতাব আল কুরআন অবতীর্ণ করেছেন যা এর সম্মুখবর্তী পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থক এবং অবতীর্ণ করেছেন তাওরাত ও ইঞ্জিল।

৪. এটা অবতীর্ণ করার পূর্বে তিনি মানব জাতির অর্থাৎ যারা এতদুভয়ের অনুসরণ করে তাদের সৎপথ প্রদর্শনের জন্যে هُدًى এটা ভাব ও অবস্থাবাচক পদ। অর্থাৎ গোমরাহি থেকে হেদায়েতকারী রূপে অবতীর্ণ করেছেন। তাওরাত ও ইঞ্জিলের বেলায় اَنْزَلَ [যা এক দফায় অবতীর্ণ] কুরআন সম্পর্কে نَزَّلَ অর্থাৎ যা পুনঃপুন অবতীর্ণ, এ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ ঐ দুটি কিতাব এক দফায়ই সম্পূর্ণ অবতীর্ণ করা হয়েছিল। পক্ষান্তরে আল কুরআন [অবতীর্ণ হয়েছে ক্রমে ক্রমে, বারবার।] এবং তিনি ফুরকান অর্থাৎ হক ও বাতিল, সত্য ও অসত্যের মধ্যে পৃথককারী কিতাবসমূহও অবতীর্ণ করেছেন। উল্লিখিত কিতাব তিনটি ছাড়াও অন্যান্য কিতাবসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে এ স্থানে উক্ত তিনটির পর وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ এ বাক্যটির উল্লেখ করা হয়েছে।

যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অর্থাৎ আল কুরআন ইত্যাদি প্রত্যাখ্যান করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, তিনি তাঁর কাজের ব্যাপারে ক্ষমতাবান। তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করা ও হুমকি বাস্তবায়ন করার কোনো কিছুই তাঁকে বাধা দিতে পারে না। প্রতিশোধ গ্রহণকারী অর্থাৎ অবাধ্যাচরণকারীদের প্রতি সুকঠিন শাস্তি প্রদানকারী। তদ্রূপ শাস্তি প্রদান করতে আর কেউ সক্ষম নয়।

তাহকীক ও তারকীব

اٰلُ : বংশ, পরিবার, সন্তানাদি।

عِمْرَان : ইমরান সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এখানে হযরত মূসা (আ.)-এর পিতা ইমরান উদ্দেশ্য। কেউ কেউ বলেন, ইমরান মরিয়মের পিতার নাম। হযরত মূসা (আ.)-এর পিতা ইমরান এবং মরিয়মের পিতা ইমরানের মধ্যে ১ হাজার ৮ শত বছরের ব্যবধান রয়েছে।

قَوْلُهُ الٓمّٓ : এ বিচ্ছিন্ন বর্ণমালাগুলোকে [কুরআনের] পরিভাষায় 'হুরূফুল মুকাত্‌তাআত' বা বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা বলা হয়। এগুলো সূরা বাকারার প্রারম্ভে লিখিত হয়েছে। এ ব্যাপারে আশ্চর্যের কিছুই নেই যে, এগুলো اَنَا اللّٰهُ اَعْلَمُ আমি আল্লাহ সর্বাপেক্ষা জ্ঞাত] বাক্যের সংক্ষিপ্ত রূপ।

قَوْلُهُ بِالْحَقِّ : সঠিক সত্য ও নির্ভুল যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে নির্ভেজাল সত্যসহ অবতীর্ণ করা হয়েছে। আর حَقٌّ শব্দটি আরবি هَزْل [বেহুদা, অনর্থক, বাজে] শব্দের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়। -[তাফসীরে কুরতুবী]

قَوْلُهُ قَبْلَ تَنْزِيْلِهِ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, بَاء ইলসাক তথা মিলানো অর্থে। بِالْحَقِّ . مُتَلَبِّسًا -এর সাথে মুতাআল্লিক হয়ে হাল হয়েছে।

قَوْلُهُ حَالٌ بِمَعْنٰى هَادِيَيْنِ : এর দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

প্রশ্ন : هُدًى হলো মাসদার, তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাবদ্বয়ের উপর তার প্রয়োগ বৈধ নয়।

উত্তর : এখানে هُدًى মাসদারটি هَادِيَيْنِ অর্থে হয়ে হাল হয়েছে। আর সত্তার উপর হাল প্রয়োগ হতে পারে। قوله وانزل اَلْفُرْقَانُ : [আর সে আল্লাহ তা'আলাই ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন।] فُرْقَان [ফুরকান] এবং فَرْق [ফরক] সমার্থবোধক শব্দ। তবে فَرْق শব্দের অর্থ শুধু পার্থক্য নির্ণয় করা। আর فُرْقَان [ফুরকান] শব্দের অর্থ- সত্য মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয় করা।

اَلْفُرْقَانُ اَبْلَغُ مِنَ الْفَرْقِ لِاَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ . (رَاغِب)

কারো কারো মতে, 'ফুরকান' শব্দের তাৎপর্য হলো সমগ্র আসমানী কিতাব, যা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য মূল্যায়ন বিশ্লেষণ করে। -[তাফসীরে কাশশাফ]

কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, এর তাৎপর্য নবী ও রাসূলের জীবনের সে সকল অলৌকিক ঘটনাবলি [মু'জিযা], যা দ্বারা কুরআনুল কারীমের অলৌকিকতা ও সত্যতা প্রমাণিত হয় এবং নবুয়তের সত্যতা বহন করে। -[তাফসীরে কাবীর]

وَالْمُخْتَارُ عِنْدِيْ اَنَّ الْمُرَادَ مِنْ هٰذَا الْفُرْقَانِ الْمُعْجِزَاتِ الَّتِيْ قرنها اللّٰهُ تَعَالٰى بِاِنْزَالِ هٰذِهِ الْكِتٰبِ (كَبِيْر)

কিন্তু অধিকাংশ তাফসীর বিশেষজ্ঞের অভিমত যে, فُرْقَان [ফুরকান] শব্দের তাৎপর্য হলো সমগ্র কুরআনুল কারীম, যা মানব জীবনের সকল দিক বিভাগের ক্ষেত্রে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয় করে দেয়।

-[তাফসীরে ইবনে জারীর, ইবনে কাছীর, কুরতুবী ও কাবীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে নাজরান প্রতিনিধি দল : এ সূরার প্রথম ৮৩ আয়াত পর্যন্ত নাসারাদের নাজরান প্রতিনিধি দলের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে। আরবের মানচিত্র সামনে থাকলে দেখা যাবে পূর্ব-দক্ষিণের যে অঞ্চল ইয়ামান নামে পরিচিত তার উত্তরাংশে এক জায়গার নাম হলো নাজরান। রাসূল ﷺ -এর যুগে এটা খ্রিস্টানদের বসতি ছিল। নবম কিংবা দশম হিজরিতে তাদের শীর্ষস্থানীয় ১৪ জন ব্যক্তি রাসূল ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয়েছিল। নাজরান হতে ষাট সদস্যের একটি সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাপূর্ণ প্রতিনিধি দল নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয়। তাদের মধ্যে তিনজন ছিলেন সর্বখ্যাত ও স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী; আব্দুল মাসীহ আকিব নেতৃত্বে, আয়হাম সায়্যিদ বিচক্ষণতা ও কূটনীতিতে এবং আবু হারিসা ইবনে আলকামা সবচেয়ে বড় ধর্মবেত্তা ও প্রধান পাদরি হিসেবে। এ তৃতীয় ব্যক্তি মূলে আরবের প্রসিদ্ধ গোত্র বনু বাকর

ইবনে ওয়াইলের লোক ছিল। পরে সে পাক্কা খ্রিস্টান হয়ে যায়। তার ধর্মীয় দৃঢ়তা ও মান-সম্ভ্রম দেখে রোমান শাসকবর্গ তার খুব কদর ও সম্মান করত। প্রচুর অর্থ দান ছাড়াও তার জন্য একটি গীর্জা তৈরি করে এবং তাকে ধর্ম-বিষয়ক প্রধান নিযুক্ত করে। এ প্রতিনিধি দলটি মহাসাড়ম্বরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয় এবং বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয়ে তাঁর সাথে কথোপকথন করে। বিস্তারিত বিবরণ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র.) রচিত সীরাতগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। এ ঘটনা সম্পর্কে সূরা আলে ইমরানের প্রথম দিকের প্রায় আশি-নব্বইখানা আয়াত নাজিল হয়। রাসূল ﷺ আলোচনার মধ্যে তাদের ত্রিত্ববাদের আকিদা ও পুত্রত্বের অলীক ধারণার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করেন।

সূরাতুল বাকারায় যেভাবে বিশেষ করে ইহুদিদেরকে সম্বোধন করা হয়েছিল এ সূরায় তদ্রূপ খ্রিস্টানদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। হাদীস শরীফে সূরা আলে ইমরানের অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ : [আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, উকনুম হিসেবেও নয় এবং অন্য কোনো ভাবেও নয়।] উকনুম আরবি শব্দ, যা প্রতিটি বস্তুর মূল ভিত্তিকে বুঝায়। আর খ্রিস্টীয় ধর্মমতে, খোদার প্রত্যেক অংশ যথা– পিতা, পুত্র এবং রূহুল কুদস ত্রিত্ববাদের যে কাউকে উকনুম বলা হয়। অর্থাৎ ঐ এক আল্লাহর কোনোই অংশীদার নেই, না তাঁর সত্তাতে, না তাঁর গুণাবলিতে এবং না তার কার্যাবলিতে। পৃথিবীতে এমন বহু অংশীবাদী ধর্মমতের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল এবং এখানো আছে, যাতে বলা হয় যে, সবার বড় খোদাতো নিঃসন্দেহে একজনই, কিন্তু তাঁর অধীনে দলগতভাবে বহু রকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খোদা আর দেবদেবী রয়েছে। কুরআন মাজীদ এসবের তীব্র প্রতিবাদ ঘোষণা করেছে যে, শুধুমাত্র তাঁর অস্তিত্বেই অপর কোনো খোদা [কোনো অংশ] নেই– না কোনো ক্ষুদ্রের, না কোনো বৃহতের। উলূহিয়াত আর রবূবিয়াত সবকিছু একই সত্তায় নিহিত। আলোচ্য আয়াত এসব জাহিলি মতবাদ ছাড়াও বিশেষত খ্রিস্টীয় মতবাদের কঠোর প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে।

–[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ اَلْحَیُّ : চিরঞ্জীব। তিনি সেই আল্লাহ, যিনি সর্বদাই জীবিত আছন। জীবিতই আছেন এবং জীবিতই থাকবেন। তাঁর মৃত্যুর কোনো সম্ভাবনাই নেই। না ক্রুশের উপরে, না অন্য কোনো রূপে। তার আয়ু আজকে যেমন প্রতিষ্ঠিত, তেমনি চিরকালের জন্যে সর্বদাই স্থিতিশীল। এমন নয় যে, তাঁর আকৃতি বারবার পরিবর্তনের প্রয়োজন ঘটবে। কখনো তিনি মানুষ হয়ে যাবেন, আবার কখনো বা জানোয়ারে রূপান্তরিত হয়ে যাবেন। নাউযুবিল্লাহ ! তিনি জীবিত। [মা'আযাল্লাহ] এরূপ নন যে, প্রতি বছর তাঁর মৃত্যু আসতে থাকবে আর তিনি নতুন নতুন জীবন লাভ করতে থাকবেন।

قَوْلُهُ اَلْقَیُّوْمُ : তিনি আপন সত্তায় প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন এবং সমস্ত সৃষ্টিজগৎ তাঁরই অস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব লাভ করে বিদ্যমান। সমগ্র বিশ্বকে তিনি ধারণ করে রেখেছেন। সবকিছুর রক্ষক ও নিয়ন্ত্রক তিনিই। এই নয় যে, তিনিও কোনো অর্থে অন্যের মুখাপেক্ষী। খ্রিস্টানগণ হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহ বা আল্লাহর পুত্র কিংবা তিন উৎসের একজন জ্ঞান করে। তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, হযরত ঈসা (আ.)-ও আল্লাহর সৃজিত। তিনি মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছেন। তার জন্মের কালও বিশ্ব সৃষ্টির বহু পরে। কাজেই আল্লাহ কিংবা আল্লাহর পুত্র কিভাবে হতে পারে? তোমাদের আকিদা সঠিক হয়ে থাকলে তিনি খোদায়িত্বের সিফতবিশিষ্ট এবং চিরন্তন হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। কখনো তাঁর উপর মৃত্যুর আগমন না হওয়া জরুরি ছিল। কিন্তু এক সময় তিনিও মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাবেন না।

খ্রিস্টানদের একটি মৌলিক বিশ্বাস, হযরত ঈসা (আ.) স্বয়ং মহান আল্লাহ বা মহান আল্লাহর ছেলে কিংবা তিন আল্লাহর একজন। এ সূরার প্রথম আয়াতে খাঁটি তাওহীদের দাবি করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দুটি গুণ "اَلْحَیُّ" [চিরজীবী] ও "قَیُّوْمٌ" [সারা বিশ্বের ধারক]-এর উল্লেখ করা হয়েছে, যা তাদের এ দাবীকে সুস্পষ্টরূপে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করে। কাজেই, বিতর্ককালে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বললেন, তোমরা কি জান না, মহান আল্লাহ حَیٌّ [চিরজীবী] যাঁর কখনো মৃত্যু হতে পারে না এবং তিনিই সৃষ্টিরাজির অস্তিত্ব দান করেছেন, তারপর তাদের বেঁচে থাকার উপকরণাদি সৃষ্টি করে তাদেরকে নিজ অপার শক্তিতে ধারণ করে রেখেছেন? পক্ষান্তরে হযরত ঈসা (আ.)-এর উপর অবশ্যই মৃত্যু ও ধ্বংস আসবে। বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তি নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে না, সে অন্যান্য জীবের অস্তিত্ব রক্ষা করবে কি উপায়ে? এ কথা শুনে খ্রিস্টান দলটি স্বীকার করল, নিশ্চয় আপনি সত্য বলেছেন। হয়তো তারা মনে করে থাকবে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী عِیْسٰی یَاْتِیْ عَلَیْهِ الْفَنَاءُ [ঈসার উপর অবশ্যই ধ্বংস আসবে] সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন। উত্তর নেতিবাচক হলে 'ঈসা বহুকাল পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছেন' আমাদের এ বিশ্বাস অনুযায়ী তিনি আমাদেরকে আরও বেশি লা-জবাব ও পরাস্ত করতে সক্ষম হবেন। কাজেই শাব্দিক ঝগড়ায় না পড়াই সমীচীন। এরা হয়তো খ্রিস্টানদের সেই শাখার লোক হয়ে থাকবে, যারা ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী হযরত ঈসা (আ.)-এর হত্যা ও ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ধারণাকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে এবং তাঁকে দৈহিকভাবে আকাশে তুলে নেওয়ার বিশ্বাস পোষণ করে।

হাফেজ ইবনে তাইমিয়া (র.) 'আল জাওয়াবুস সহীহ' গ্রন্থে এবং 'আল ফারিক বায়নাল মাখলূক ওয়াল খালিক' -এর গ্রন্থকার লিখেছেন যে, শাম ও মিসরের খ্রিস্টানগণ সাধারণত এ আকিদাই পোষণ করত। কালক্রমে ইউরোপ হতে শাম ও মিসরেও তাদের এ ধারণা পৌছে যায়। মোট কথা, إِنَّ عِيْسٰى اَتٰى عَلَيْهِ الْفَنَاءُ [নিশ্চয় ঈসার উপর মৃত্যু এসেছে] বাক্যটি হযরত ঈসা (আ.)-এর উলূহিয়্যাত [আল্লাহ হওয়া] -এর রদে অধিক স্পষ্ট ও লা-জবাব হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ যে তার পরিবর্তে يَاتِىْ عَلَيْهِ الْفَنَاءُ [তাঁর উপর মৃত্যু আসবে] বলেছেন, তার দ্বারা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, বিতর্ক স্থলেও তিনি হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্যে মৃত্যু সংঘটিত হওয়ার পূর্বে মৃত্যু শব্দের ব্যবহার পছন্দ করেননি। -[তাফসীরে ওসমানী]

قَوْلُهُ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ : অর্থাৎ কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এর পূর্বে নবীগণের উপর যে সকল কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে এ গ্রন্থ সেগুলোকে সত্যায়ন করে। অর্থাৎ সেসবে যা লিখিত ছিল সেগুলোকে সত্য জানে এবং তার বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহকে স্বীকার করে। এর স্পষ্ট অর্থ এই যে, কুরআনুল কারীমও একই সত্তার অবতারিত, যিনি পূর্বে বহু কিতাব অবতীর্ণ করেছেন।

قَوْلُهُ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ : **কুরআন সকল আসমানী গ্রন্থের প্রত্যায়নকারী :** পবিত্র কুরআন পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের প্রত্যয়ন করে। তাওরাত, ইঞ্জিল প্রভৃতি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ কুরআন মাজীদ ও তার বাহকের প্রতি পথনির্দেশ করত এবং আপন আপন সময়ে উপযুক্ত বিধান ও হেদায়েত প্রদান করত। যেন বলে দেওয়া হলো মাসীহ (আ.) খোদায়ী বা তিনি যে মহান আল্লাহর ছেলে এ আকিদা তো কোনো আসমানী কিতাবেই বর্ণিত ছিল না, অথচ দীনের মূল বিষয়সমূহে সমস্ত আসমানী কিতাবই এক ও অভিন্ন। তাতে মুশরিকসুলভ আকিদা-বিশ্বাসের তালিম কখনই দেওয়া হয়নি।

قَوْلُهُ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ : মহান আল্লাহর আয়াতসমূহ- এখানে দুটি অর্থই গ্রহণ করা যেতে পারে। একটি হলো কুরআনুল কারীমের আয়াতসমূহ; আর অপর অর্থ হলো, মহান আল্লাহর অস্তিত্ব। তাঁর অসীম কুদরতের নিদর্শন ও মহান আল্লাহর একত্ববাদের নিদর্শন, সাক্ষ্য ও অখণ্ডনীয় যুক্তি-প্রমাণসমূহ।

তাওরাত ও ইঞ্জিলের ঐতিহাসিক পটভূমি :

প্রশ্ন : বর্তমান বাইবেল, তাওরাত ও ইঞ্জিলে যেসব বিষয় বর্ণিত আছে কুরআন কি সেসবের সমর্থন ও সত্যায়ন করে?

উত্তর : এ প্রশ্নের জবাব বুঝার জন্যে তাওরাত ও ইঞ্জিলের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বুঝা আবশ্যক।

তাওরাত দ্বারা মূলত সে সকল বিধান উদ্দেশ্য যা হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়ত থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত দীর্ঘ ৪০ বছরে অবতীর্ণ হয়েছে। তার মধ্য থেকে ১০টি বিধান ছিল, যা আল্লাহ তা'আলা পাথরে খোদাই করে দান করেছিলেন। অবশিষ্ট বিধানগুলোকে হযরত মূসা (আ.) লিখে তার ১২ টি কপি বনি ইসরাঈলের ১২ টি গোত্রকে দান করেছিলেন, আর একটি কপি বনি লাবী -এর নিকট অর্পণ করেছিলেন, যাতে তারা তা সংরক্ষণ করে। সংরক্ষিত এ কপির নামই তাওরাত। এটা একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থের পর্যায়ে। বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রথম ধ্বংসযজ্ঞের পর্যন্ত তা সংরক্ষিত ছিল। বনি লাবীর নিকট অর্পিত কপি পাথরখণ্ডসহ সিন্ধুকে রাখা ছিল। বনি ইসরাঈল এটাকে তাওরাত বলে জানত। তবে সে ব্যাপারে তাদের অমনোযোগিতা এ পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, ইহুদি বাদশাহ ইউসিয়া ইবনে আমুন-এর আমলে তার সিংহাসনে আরোহণের ১৮ বছর পর যখন হযরত সুলায়মান (আ.)-এর ইবাদতখানার পূর্ণঃনির্মাণ ঘটল তখন ঘটনাক্রমে বিশিষ্ট গণক সর্দার খালকিয়া এক জায়গায় সংরক্ষিত তাওরাত দেখতে পেল। সে আশ্চর্যকর বস্তু হিসেবে শাহী মুনশির নিকট তা অর্পণ করল। সে বাদশাহর সামনে তা এমনভাবে পেশ করল যেন একটি নতুন বস্তুর সন্ধান ঘটেছে। [দ্বিতীয় পরিচ্ছদ সালাতিন ২২, আয়াত নম্বর ৮-১৩ দ্রষ্টব্য] এ কারণেই বুখতে নাসসার যখন জেরুজালেম জয় করল এবং ইবাদতখানাসহ শহরের সকল ভবন ধ্বংস করল, এমনকি ইট পর্যন্ত খুলে ফেলল, তখন বনি ইসরাঈলের সে মূল কপি পাওয়া গেল যার অধিকাংশ এক পর্যায়ে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং সামান্য সংখ্যক ছিল, আর তখন থেকে তা চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। অতঃপর আজরা জ্যোতিষ [হযরত উযাইর (আ.)]-এর যুগে বনি ইসরাঈলের সন্তানাদি বাবেলের বন্দি জীবন থেকে যখন জেরুজালেম ফিরে এল তখন তারা দ্বিতীয়বার বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করল। হযরত উযাইর (আ.) তাঁর জাতির কতিপয় বিশিষ্ট বুজুর্গের সাহায্যে বনি ইসরাঈলের পূর্ণ ইতিহাস সংকলন করেন, যা বাইবেলের প্রথম সাতটি অধ্যায়ে সন্নিবেশিত। এ গ্রন্থের ৪টি অনুচ্ছেদ হযরত মূসা (আ.)-এর সীরাত তথা জীবনচরিত বিষয়ক। উক্ত সীরাতে উল্লিখিত নাজিল হওয়ার তারীখের ক্রমধারা অনুযায়ী তাওরাতের সে সকল আয়াতও যথাস্থানে উল্লিখিত হয়েছে, যা আজরা বিশেষ বুজুর্গদের সহায়তায় লাভ করেছিলেন। অতএব বর্তমানে সে সকল বিক্ষিপ্ত অংশগুলোর নাম তাওরাত, যা হযরত মূসা (আ.)-এর জীবনচরিতের মাঝে বিক্ষিপ্তভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমরা তাকে কেবল এ আলামত দ্বারা চিনতে পারি যে, ঐতিহাসিক বর্ণনার মাঝে যেখানে হযরত মূসা

(আ.)-এর জীবনী লেখকগণ বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে এ কথা বলেছেন যে, খোদাবন্দ তোমাদেরকে এ কথা বলেছেন– সেখান থেকে তাওরাতের একটি অংশ শুরু হয়। আর যেখানে হযরত মূসা (আ.)-এর জীবনী শুরু হয়েছে তার আগেই তাওরাতের বর্ণনা শেষ হয়েছে।

কুরআন ঐ সকল বিক্ষিপ্ত অংশসমূহকেই তাওরাত অভিহিত করে এবং সেগুলোকেই সত্যায়ন করে। আর বাস্তব বিষয় এই যে, যে সকল অংশকে সংকলন করে কুরআনের সাথে যখন মোকাবিলা করা হয়, তখন ক্ষেত্রবিশেষ শাখাগত বিধানের পার্থক্য ছাড়া বুনিয়াদি বিষয়ে উভয় গ্রন্থের মধ্যে সামান্যতম পার্থক্যও দেখা যায় না।

এভাবে ইঞ্জিল সে সকল ইলহামী উক্তি ও বাণীর নাম, যা হযরত ঈসা (আ.) জীবনের শেষ আড়াই কিংবা তিন বছরে নবী হিসেবে ইরশাদ করেছেন। সে সকল ইলহামী উক্তি ও বাণী তাঁর জীবদ্দশায় লিখিত হয়েছে এবং সংকলিত হয়েছে কিনা এ ব্যাপারে আমাদের কাছে বর্তমানে কোনো নির্ভরযোগ্য দলিল-প্রমাণ নেই। মোটকথা, এক দীর্ঘ সময়ের পরে যখন হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবনচরিত সংকলিত হলো এবং পুস্তিকা রচিত হলো তখন তার মধ্যে ঐতিহাসিক বর্ণনার সাথে সাথে বিভিন্ন জায়গায় সে সকল মূল্যবান বাণীও নকল করা হয়েছে যা ঐ সকল গ্রন্থের রচয়িতাগণের নিকট মৌখিক বা লেখনীর মাধ্যমে পৌঁছেছিল। বর্তমান মাত্তা, মারকিস, লোকা, ইউহান্না এর যে সকল কিতাবকে ইঞ্জিল বলা হয় মূলত তা ইঞ্জিল নয়। প্রকৃত ইঞ্জিল হলো হযরত ঈসা (আ.)-এর সে সকল বাণী যা সেগুলোর মধ্যে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমাদের নিকট তা চিনবার এবং লেখকদের নিজস্ব উক্তি থেকে তা প্রভেদ করার এ ছাড়া কোনো উপায় নেই যে, যেখানে জীবনচরিত লেখকগণ বলছেন যে, এটা হযরত ঈসা (আ.) ইরশাদ করেছেন কিংবা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। কেবল সেগুলোই মূল ইঞ্জিলের অংশ। কুরআন এ সকল অংশকেই ইঞ্জিল বলে এবং তাকে সত্যায়ন করে। বর্তমানে যদি কেউ সে সকল বিক্ষিপ্ত অংশকে সংকলন করে কুরআনের সাথে তুলনা করে তাহলে উভয়ের মধ্যে নিতান্ত কমই ব্যবধান লক্ষ্য করবে।

সারকথা : বর্তমান পরিভাষায় তাওরাত হলো কতিপয় পুস্তিকার সমষ্টির নাম। যেগুলোর মধ্য থেকে প্রত্যেকটিকে কোনো না কোনো নবীর প্রতি সম্বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু এসবের কোনো একটিকে তার শব্দ ও ভাষাসহ আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতারিত হওয়ার দাবি কোনো ইহুদি করতে পারে না। এভাবে ইঞ্জিলও কতিপয় কিতাবের সমষ্টির নাম, যেগুলোকে ঈসা মাসীহ (আ.)-এর প্রতি সম্বোন্ধিত বিভিন্ন মানুষের সংকলিত ঘটনাবলি ও বাণী। তবে তাদের সংকলকদের পরিচয় অজানা রয়ে গেছে। এগুলোর কোনোটি খ্রিস্টানদের আকিদার মধ্যে আসমানী বলা হয়নি; বরং পরিষ্কারভাবে এগুলোকে মাসীহী বলা হয়। এ সমষ্টিকে হযরত ঈসা (আ.) হাওয়ারীদের যুগে সাধারণভাবে প্রস্তুত করা হয়। –[তাফসীরের মাজেদী-বারকা বিশ্বকোষ তৃতীয় খণ্ড ৫১৩ পৃ. এর বরাতে] এ ধরনের সনদবিহীন পবিত্র কিতাবসমূহের সত্যায়ন করা কুরআনের দায়িত্ব নয় এবং বর্তমান বাইবেলের কোনো অংশ কুরআন মান্যকারীদের ব্যাপারে দলিলও নয়।

قَوْلُهُ اَلْفَارِقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ : এটা এ প্রশ্নের উত্তর যে, ফুরকান হলো কুরআনের অপর নাম। কাজেই এখানে দ্বিরুক্তি হলো। **উত্তর:** এখানে ফুরকানের শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ হক ও বাতিলের মধ্যে প্রভেদকারী।

আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানী (র.) বলেন, প্রত্যেক কালে এমন সময়োপযোগী বিষয় দেওয়া হয়েছে, যা হক-বাতিল, হালাল-হারাম ও সত্য-মিথ্যার মাঝে মীমাংসা করে দেয়। কুরআন মাজিদ, অন্যান্য আসমানী কিতাব, নবীগণের মু'জিযা সবই এর অন্তর্ভুক্ত। আরও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় যেসব বিষয় নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত তার মীমাংসাও কুরআন দ্বারা করে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ : আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী-এর ব্যাখ্যা : এরূপ অপরাধীদেরকে শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে না এবং তারা মহান আল্লাহর মহাপরাক্রম হতে পালিয়েও বাঁচতে পারবে না। এর মাঝেও মাসীহের খোদা হওয়ার বিষয়টি খণ্ডনের প্রতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা সেই নিরঙ্কুশ শক্তি ও ক্ষমতা মহান আল্লাহর জন্যে প্রমাণ করা হয়েছে, সুস্পষ্ট কথা তা মাসীহের মাঝে পাওয়া যায় না; বরং খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুযায়ী হযরত মাসীহ (আ.) কাউকে শাস্তি দেবেন তো দূরের কথা, নিজেকেই তো জালিমদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেননি। [তাদের বিশ্বাস মতে] অত্যন্ত অসহায় ও মর্মান্তিক অবস্থায় তাদের হাতে প্রাণ বিসর্জন দেন। এরপরও তিনি কী করে আল্লাহ বা আল্লাহর ছেলে হতে পারেন? সন্তান তো পিতাতুল্যই হয়ে থাকে। কাজেই আল্লাহর যিনি ছেলে তিনিও আল্লহ হবেন বৈ কি? কিন্তু একজন অসহায় সৃষ্টিকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার মালিক আল্লাহর ছেলে সাব্যস্ত করা, পিতা ও সন্তান উভয়ের জন্যেই অবমাননাকর। মহান আল্লাহর নিকট এর থেকে পানাহ চাই। –[তাফসীরে ওসমানী]

৫. إِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ كَائِنٌ فِى الْأَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ لِعِلْمِهِ بِمَا يَقَعُ فِى الْعَالَمِ مِنْ كُلِّيٍّ وَجُزْئِيٍّ وَخَصَّهُمَا بِالذِّكْرِ لِأَنَّ الْحِسَّ لَا يَتَجَاوَزُهُمَا .

৬. هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ مِنْ ذُكُوْرَةٍ وَأُنُوْثَةٍ وَبَيَاضٍ وَسَوَادٍ وَغَيْرِ ذٰلِكَ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ فِىْ مُلْكِهِ الْحَكِيْمُ فِىْ صُنْعِهِ .

অনুবাদ :

৫. নিশ্চয় আল্লাহর নিকট জমিনের হোক فِى الْأَرْضِ এটা এ স্থানে উহ্য كَائِنٍ -এর সাথে مُتَعَلِّق বা সংশ্লিষ্ট। বা আকাশের কিছুই গোপন থাকে না। কারণ বিশ্বব্যক্ষাণ্ডে ছোট বা বড়, সার্বিক বা আংশিক যাই ঘটুক না কেন সে সম্পর্কে তিনি খবর রাখেন।
বিশেষ করে শুধু আকাশ ও পৃথিবীর উল্লেখ করার কারণ হলো মানুষের অনুভূতি এ দুয়ের সীমা অতিক্রম করে যেতে পারে না।

৬. তিনি মাতৃগর্ভে ছেলে বা মেয়ে, সাদা বা কালো ইত্যাদি যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন। তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি তাঁর সাম্রাজ্যে প্রবল পরাক্রমশালী, তাঁর কাজে প্রজ্ঞাময়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ : [আল্লাহর কাছে গোপন বলতে কিছু নেই] : মহান আল্লাহর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা যেমন অসীম, তেমনি তাঁর জ্ঞানও সর্বব্যাপী। বিশ্ব জগতের কোনো একটি বস্তুও এক মুহূর্তের জন্যে তাঁর অগোচরে থাকে না। সকল অপরাধী ও নিরপরাধ এবং সমস্ত অপরাধের ধরণ-ধারণ তাঁর জানা। অপরাধী পালিয়ে আত্মগোপন করতে চাইলে তা কোথায় পালাবে? এর দ্বারা ইশারা করে দেওয়া হলো যে, মাসীহ (আ.) আল্লাহ হতে পারে না। কেননা এরূপ সর্বব্যাপী জ্ঞান তাঁর ছিল না। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যতটুকু জানাতেন, ততটুকুই তিনি জানতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রশ্নের জবাবে খ্রিস্টানরাও এ কথা স্বীকার করেছিল এবং আজও প্রচলিত ইঞ্জিল দ্বারা এটা প্রমাণিত। -[তাফসীরে ওসমানী]

قَوْلُهُ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ : আসমান ও জমিনের নামের উল্লেখ এ আয়াতে করার তাৎপর্য হলো, মানুষের জ্ঞান ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল পর্যন্ত সীমিত। প্রাসঙ্গিকভাবে এ আয়াতে খ্রিস্টানদেরও সম্বোধন করা হয়েছে, তোমরা যে [যীশুখৃষ্ট] হযরত ঈসা মাসীহ (আ.)-কে মহান আল্লাহর পুত্র তথা আল্লাহ বলে স্বীকার করছ, বল, তার কাছে এ পরিপূর্ণ ইলম কোথায় ছিল? তাছাড়া হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ মানা এবং আল্লাহকে বান্দার রূপ ধরে আগমনের এ কল্পিত আকিদার মাধ্যমে মহান আল্লাহকে বান্দার আকৃতির সসীমতার গণ্ডিতে আবদ্ধ করার ফলে মহান আল্লাহ সম্পর্কে এ সসীমতার ত্রুটির ধারণা কিভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে? কি করে তোমরা খ্রিস্টানরা আল্লাহকে এত সংকীর্ণ ও সসীম বলে গ্রহণ করলে? -[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ : অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে বিনা বাপে, আবার তিনি ইচ্ছা করলে বাপের মাধ্যমে কাউকে সৃষ্টি করতে পারেন।' তিনি সকল ব্যাপারে সকল দিকেই সর্বশক্তিমান। বাপ তো সৃষ্টির উৎস নয়, বরং একটি মাধ্যম মাত্র, যিনি সৃষ্টির মূল উৎসশক্তি তিনি ইচ্ছা করলে যে কোনো মুহূর্তে এ মাধ্যমটিকে হটিয়ে দিতে পারেন। يُصَوِّرُكُمْ শব্দের সম্বোধন একান্ত সাধারণভাবে এখানে মানব সৃষ্টিকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। তিনি যেভাবে ইচ্ছা তোমাদেরকে আকৃতি প্রদান করেন। فِى الْأَرْحَامِ অর্থ হলো– মাতৃগর্ভে। আর হযরত ঈসা মাসীহ (আ.)-এর আকৃতি গঠন মায়ের গর্ভেই সম্পন্ন করা হয়েছে।
-[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আপন জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী অপার শক্তি দ্বারা যেরূপ ও যেভাবে চেয়েছেন মাতৃগর্ভে তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন, পুরুষ বা নারী, সুদর্শন বা কদাকার। যেমন সৃষ্টি করার ছিল করে দিয়েছেন। একটি পানির ফোঁটাকে কতগুলি ধাপ অতিক্রম করিয়ে মানব আকৃতিতে পরিণত করেছেন। যাঁর শক্তি ও শিল্প নৈপুণ্যের এ অবস্থা তাঁর জ্ঞানে কি কোনো কমতি থাকতে পারে, বা যে মানুষ নিজেও মাতৃগর্ভের আঁধার প্রকোষ্ঠে অবস্থান করে এসেছে এবং অপরাপর শিশুর মতো পানাহার ও মলমূত্র ত্যাগ করে তাকে সেই মহান পবিত্র আল্লাহর ছেলে, নাতি বলা যেতে পারে?

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُوْلُوْنَ إِلَّا كَذِبًا . – [১৮ : ৫]

খ্রিস্টানদের প্রশ্ন ছিল, হযরত মাসীহের প্রকাশ্য পিতা যখন কেউ নয় তখন আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কাকে তাঁর পিতা বলা যায়? এর উত্তর يُصَوِّرُكُمْ فِى الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ দ্বারা আদায় হয়ে গেছে অর্থাৎ মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছা মানবাকৃতি গঠনের শক্তি মহান আল্লাহর কাছে, তা পিতামাতা উভয়ের মিলনের মাধ্যমেই হোক কিংবা শুধু জননীর ক্রিয়াগ্রহণশক্তি দ্বারাই হোক। এ কারণেই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ অর্থাৎ তিনি মহাপরাক্রমশালী, যাঁর শক্তিকে কেউ পরিমাপ করতে পারে না। তিনি প্রজ্ঞাময়, যেখানে যেমন সমীচীন তাই করেন। তিনি হাওয়াকে মা ছাড়া, মাসীহকে বাপ ছাড়া এবং আদমকে মা-বাপ উভয় ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কাজের রহস্য ও তাৎপর্য কে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারে? -[তাফসীরে ওসমানী]

٧. هُوَ الَّذِىٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ وَاضِحَاتُ الدَّلَالَةِ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ اَصْلُهُ الْمُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِى الْاَحْكَامِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ لَا يُفْهَمُ مَعَانِيْهَا كَاَوَائِلِ السُّوَرِ وَجَعَلَهُ كُلَّهُ مُحْكَمًا فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى اُحْكِمَتْ اٰيَاتُهٗ بِمَعْنٰى اَنَّهٗ لَيْسَ فِيْهِ عَيْبٌ وَمُتَشَابِهًا فِىْ قَوْلِهٖ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا بِمَعْنٰى اَنَّهٗ يُشْبِهُ بَعْضُهٗ بَعْضًا فِى الْحُسْنِ وَالصِّدْقِ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ مَيْلٌ عَنِ الْحَقِّ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ طَلَبَ الْفِتْنَةِ لِجُهَّالِهِمْ بِوُقُوْعِهِمْ فِى الشُّبُهَاتِ وَاللَّبْسِ وَابْتِغَآءَ تَاْوِيْلِهٖ تَفْسِيْرِهٖ وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗٓ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ وَالرّٰسِخُوْنَ الثَّابِتُوْنَ الْمُتَمَكِّنُوْنَ فِى الْعِلْمِ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهٗ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ اَىْ بِالْمُتَشَابِهِ اَنَّهٗ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَلَا نَعْلَمُ مَعْنَاهُ كُلٌّ مِنَ الْمُحْكَمِ وَالْمُتَشَابِهِ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ بِاِدْغَامِ التَّاءِ فِى الْاَصْلِ فِى الذَّالِ اَىْ يَتَّعِظُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ اَصْحَابُ الْعُقُوْلِ.

অনুবাদ :

৭. তিনিই তোমার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন **যার** কতক আয়াত দ্ব্যর্থহীন অর্থাৎ সুস্পষ্ট যার বক্তব্য এগুলো কিতাবের মূল অংশ আসল অংশ। এগুলো হলো হুকুম-আহকাম ও বিধিবিধানসমূহের মূল ভিত্তি। আর অন্যগুলো মুতাশাবিহ যেগুলোর মর্ম বুঝা যায় না। যেমন অনেক সূরার শুরুর কতিপয় অক্ষর। اُحْكِمَتْ اٰيَاتُهٗ [অর্থাৎ এর আয়াতসমূহ মুহকাম] এ আয়াতটিতে গোটা কুরআনকে 'মুহকাম' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ স্থানে এর অর্থ হলো, এটা সকল প্রকার দোষত্রুটি মুক্ত। আবার كِتَابًا مُّتَشَابِهًا এ আয়াতটিতে গোটা কুরআনকে মুতাশাবিহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ স্থলে এর অর্থ হলো– ভাষালঙ্কার, সৌন্দর্য ও সততায় এর কতক আয়াত কতক আয়াতের অনুরূপ এবং সামঞ্জস্যশীল। যাদের অন্তরে রয়েছে বক্রতা অর্থাৎ সত্যের প্রতি বিরাগ-প্রবণতা শুধু তারাই এ সম্পর্কে সন্দেহ ও বিভ্রান্তিতে নিপতিত করে মূর্খদের জন্যে ফিতনা প্রত্যাশী হয়ে এবং তার তাবিলের ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা মুতাশাবিহ তার পিছনে ছুটে। অথচ এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর সুদৃঢ় যোগ্যতার অধিকারী। اَلرَّاسِخُوْنَ এটা مُبْتَدَأ বা উদ্দেশ্য يَقُوْلُوْنَ এটা خَبَر বা বিধেয়। তারা বলে আমরা এটা মুতাশাবিহ সম্পর্কে বিশ্বাস করি যে, এটাও আল্লাহর নিকট হতেই অবতীর্ণ; কিন্তু এর প্রকৃত মর্ম আমাদের জানা নেই। সকল কিছু অর্থাৎ মুহকাম ও মুতাশাবিহ সকল কিছুই আমাদের প্রভুর নিকট হতে আগত এবং বোধশক্তি সম্পন্নরা ব্যতীত অর্থাৎ জ্ঞানের অধিকারীগণ ব্যতীত কেউ শিক্ষাগ্রহণ করে না يَذَّكَّرُ এতে মূলত ت এবং ذ -এর اِدْغَام বা সন্ধি সংঘটিত হয়েছে। উপদেশ লাভ করে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মুহ্কাম ও মুতাশাবিহ আয়াত এবং নাজরান খ্রিস্টান দল : নাজরানের খ্রিস্টানগণ সমস্ত দলিল-প্রমাণে পরাভূত হয়ে শেষে রণকৌশল পরিবর্তন করে বলল, তা যা হোক আপনি তো হযরত মাসীহকে আল্লাহর 'কালিমা' ও তাঁর 'রূহ' মানেন। আমাদের দাবি প্রমাণের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। এ স্থানে এর তাত্ত্বিক জবাব একটি সাধারণ নীতির আকারে দেওয়া হয়েছে, যা উপলব্ধি করার পর হাজারও দ্বন্দ্ব-কলহের অবসান হতে পারে। বিষয়টি এভাবে বুঝুন, কুরআন মাজিদ ও সমস্ত আসমানী কিতাবে দুই রকমের আয়াত পাওয়া যায় এক তো সেসব আয়াত যার অর্থ সুবিদিত ও সুনির্দিষ্ট। তা হয়তো এ কারণে যে, অভিধান ও শব্দবিন্যাস প্রভৃতির দিক থেকে আয়াতের শব্দমালার মাঝে কোনো অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতা নেই, ভাষার মাঝেও একাধিক অর্থের অবকাশ নেই এবং বিষয়বস্তুও সাধারণ স্বীকৃত মূলনীতিসমূহের পরিপন্থি নয়। কিংবা এ কারণে যে, ভাষা ও শব্দে আভিধানিক দিক থেকে একাধিক অর্থের অবকাশ থাকলেও কুরআন-হাদীসের সুবিদিত ও অকাট্য উক্তি বা উম্মতের সর্ববাদী রায় কিংবা দীনের সর্বজন স্বীকৃত মূলনীতি দ্বারা নিশ্চিতভাবে নির্দিষ্ট হয়ে গেছে যে, বক্তার উদ্দেশ্য ঐ অর্থ নয়; বরং এই অর্থ। এরূপ আয়াতসমূহকে 'মুহকামাত' বলে। প্রকৃতপক্ষে কিতাবের যাবতীয় শিক্ষার মূলভিত্তি এ প্রকারের আয়াতই হয়ে থাকে। দ্বিতীয় প্রকার আয়াতকে 'মুতাশাবিহাত' বলে, অর্থাৎ যার অর্থ জানতে ও নির্ণয় করতে সংশয় ও বিভ্রমের সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে সঠিক পন্থা হলো, এ দ্বিতীয় প্রকার আয়াতকে প্রথম প্রকার আয়াতের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে দেখতে হবে, কোন অর্থ তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যে অর্থ তার পরিপন্থি হবে তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করতে হবে এবং যা তার পরিপন্থি না হবে, তাকেই বক্তার উদ্দিষ্ট অর্থ বলে গণ্য করতে হবে। যদি চূড়ান্ত চেষ্টার পরও বক্তার উদ্দিষ্ট অর্থ নির্ণয় করা সম্ভব না হয় তবে সবজান্তার দাবিতে সীমা অতিক্রম করে যাওয়া উচিত নয়। যেসব ক্ষেত্রে জ্ঞানের কমতি ও যোগ্যতার ত্রুটির কারণে বিষয়ের রহস্য ও তাৎপর্য উপলব্ধি করতে আমরা সক্ষম না হই তাকেও এ তালিকার অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হবে। কিন্তু সাবধান এরূপ কোনো ব্যাখ্যা ও হেরফের করা যাবে না, যা ধর্মের মূলনীতি ও মুহকাম আয়াতের বিরোধী হয়। যেমন কুরআন মাজীদে হযরত মাসীহ (আ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে- إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ 'সে তো ছিল আমারই এক বান্দা, যাকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম।' [সূরা যুখরুফ : ৫৯] অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ 'আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত তো আদমের দৃষ্টান্ত সদৃশ। তাকে তিনি মাটি হতে সৃষ্টি করেছিলেন।' [সূরা আলে ইমরান : ৫৯] আরও বলা হয়েছে-

ذٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلُ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ . مَا كَانَ لِلّٰهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ .

অর্থাৎ 'এই-ই ঈসা, মরিয়ম তনয়। আমি বললাম সত্য কথা, যে বিষয়ে তারা বিতর্ক করে। সন্তান গ্রহণ করা মহান আল্লাহর কাজ নয়। তিনি পবিত্র মহিমাময়। তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন হও এবং তা হয়ে যায়।

-[সূরা মারইয়াম : ৩৪-৩৫]

এছাড়া কোথাও কোথাও তাঁর খোদায়ী ও ছেলে হওয়ার বিষয়টি রদ করা হয়েছে। এখন যদি কোনো ব্যক্তি এসব মুহকাম আয়াত থেকে চোখ বন্ধ করে كَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ 'তাঁর কালিমা, যা তিনি মরিয়মের নিকট প্রেরণ করেছিলেন ও তাঁর রূহ।' [সূরা নিসা : ১৭১] প্রভৃতি মুতাশাবিহ আয়াতের পেছনে ধাবিত হয় এবং তার যে অর্থ মুহকাম আয়াতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ তা বাদ দিয়ে এমন ভাসাভাসা অর্থ গ্রহণ করতে শুরু করে, যা কিতাবের সাধারণ ও সুস্পষ্ট বক্তব্য এবং সর্বখ্যাত বর্ণনার পরিপন্থি, তবে সেটা তার মনের কুটিলতা ও হঠকারিতা ছাড়া আর কি হতে পারে? কতক দুষ্ট প্রকৃতির লোক তো চায় এরূপ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে মানুষকে গোমরাহিতে ফাঁসিয়ে দিতে।

আবার কিছু দুর্বল ও টলটলায়মান বিশ্বাসের লোক নিজস্ব মত ও খেয়াল-খুশি অনুযায়ী টেনেহ্যাঁচড়ে এরূপ আয়াতের একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর প্রয়াস পায়। অথচ এর সত্যিকারের অর্থ আল্লাহ তা'আলাই জানেন। তিনিই আপন অনুগ্রহে তা থেকে যাকে যে পরিমাণ ইচ্ছা অবহিত করেন। যারা পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারী তারা মুহকাম ও মুতাশাবিহ সর্বপ্রকার আয়াতকেই সত্য বলে বিশ্বাস করে। তাঁদের এ প্রত্যয় আছে যে, উভয় প্রকার আয়াত একই উৎস হতে উৎসারিত, যাতে পরস্পর বিরোধ ও বৈসাদৃশ্যের কোনো অবকাশ নেই। এজন্যই তাঁরা মুতাশাবিহকে মুহকামের দিকে ফিরিয়ে অর্থ বোঝার চেষ্টার করে। আর যা তাঁদের বোধশক্তির ঊর্ধ্বে তা মহান আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয় এবং বলে এর অর্থ তিনিই ভালো জানেন, আমাদের কাজ ঈমান আনা। -[তাফসীরে ওসমানী]

মোট কথা, مُحْكَمَات দ্বারা সে সকল আয়াত উদ্দেশ্য যেগুলোতে বিভিন্ন আদেশ, নিষেধ-বিধান, মাসআলা ও কাহিনী বিবৃত রয়েছে; যেগুলোর অর্থ ও উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। পক্ষান্তরে মুতাশাবিহ আয়াতসমূহ যেমন আল্লাহর অস্তিত্ব, তাকদীরের মাসআলা, বেহেশত-দোজখ, ফেরেশতা প্রভৃতি। অর্থাৎ যেগুলো বুঝা মানুষের জ্ঞান বহির্ভূত বা যেগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে। কিংবা এমন অস্পষ্টতা রয়েছে যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে পথভ্রষ্ট করা সম্ভব।

قَوْلُهُ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ : এখানে একথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কুরআনুল কারীমের যে সকল আয়াত স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট, বা একটি মাত্র অর্থেই ব্যবহৃত হয়, তাই কুরআনের মূল ভিত্তি ও মানদণ্ড। যে সকল আয়াত বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা, সেগুলোর অর্থ গ্রহণের ক্ষেত্রে মুহকাম আয়াতসমূহকেই মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। তাফসীরে কাবীরে উল্লেখ রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন, কুরআনুল কারীমে মুহকাম ও মুতাশাবিহ আয়াতসমূহ রয়েছে, মুতাশাবিহ আয়াত থেকে দলিল গ্রহণ করা শরয়ী আহকামের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা জায়েজ নয়।

قَوْلُهُ فَأَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ : এখানে বলা হয়েছে যে, যাদের অন্তরে বক্রতা থাকে তারা মুতাশাবিহ আয়াতের পিছনে পড়ে। এর মাধ্যম তারা ফিতনা সৃষ্টি করে। যেমন পবিত্র কুরআনে হযরত ঈসা (আ.)-কে যে রূহুল্লাহ ও কালিমাতুল্লাহ বলা হয়েছে এর দ্বারা খ্রিস্টান জাতি নিজেদের ভ্রান্ত আকিদার উপর দলিল পেশ করে। বস্তুত এটা বিদ'আতিদের অবস্থাও। কুরআনের সুস্পষ্ট আকিদার বিপরীতে বিদ'আতি দল যে ভ্রান্ত আকিদা পেশ করে এ ব্যাপারে তারা মুতাশাবিহ আয়াতমূহকে তাদের দলিল বানায়।

মুফাসসির আবূ বকর জাসসাস (র.)-এর মতে, এ আয়াতে ফিতনা فِتْنَة অর্থ– কুফরি ও গোমরাহি اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ এ সকল বক্র স্বভাববিশিষ্ট দুষ্কৃতিকারীদের বিকৃত ব্যাখ্যা প্রদানের চূড়ান্ত লক্ষ্য জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা, তাদের বিকৃত ব্যাখ্যা সংক্রান্ত ব্যাপারেও তারা নিষ্টাবান নয়। মূলত মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি নষ্ট করার ও মুসলিম সমাজে বিভ্রান্ত সৃষ্টি, বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির লক্ষ্যেই তারা এ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। –[তাফসীরে কুরতুবী]

قَوْلُهُ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيْلِهِ : অর্থাৎ কুরআনুল কারীমের মুতাশাবিহ আয়াতসমূহের নিজেদের ইচ্ছামাফিক ভুলবিকৃত অর্থ পরিবেশন করা। এখানে تَأْوِيْل [তাবীল] শব্দটি تَحْرِيْف অর্থাৎ বিকৃতকরণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। –[ইবনে কাছীর]

قَوْلُهُ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ إِلَّا اللّٰهُ : তাবীলের এক অর্থ হলো, কোনো বস্তুর মূল তত্ত্ব অবগত হওয়া। এ অর্থে إِلَّا اللّٰهُ -এর মাঝে ওয়াকফ করা জরুরি। কেননা, প্রত্যেক বস্তুর মূল তত্ত্ব আল্লাহ তা'আলাই জানেন। তাবীলের আরেকটি অর্থ হলো, কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বর্ণনা করা। এ অর্থে ﻻ -এর উপর ওয়াকফ করা যেতে পারে। কারণ যারা সুদৃঢ় জ্ঞানের অধিকারী তারাও বিশুদ্ধ তাফসীর ও ব্যাখ্যার ইলম রাখে। তাবীলের এ উভয় অর্থ কুরআনে ব্যবহৃত হওয়ার প্রমাণ রয়েছে। –[ইবনে কাছীর সংক্ষেপিত]

তাফসীরশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ এ মত পোষণ করেন যে, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ إِلَّا اللّٰهُ এরপর যে চিহ্ন রয়েছে তা, ওয়াকফে তাম অর্থাৎ আয়াত পূর্ণ হওয়ার যতিচিহ্ন। অর্থাৎ বাক্য এখানে পরিসমাপ্ত হয়েছে। অতঃপর اَلرَّاسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ থেকে নতুনভাবে পরবর্তী বাক্যের সূচনা করা হয়েছে। যার খবর يَقُوْلُوْنَ অর্থাৎ মুবতাদা اَلرَّاسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ [গভীর পাণ্ডিত্যে পরিপক্ক জ্ঞানীগণ] يَقُوْلُوْنَ খবর অর্থাৎ তারা বলেন, সবকিছুই আমাদের প্রতিপালকের তরফ হতে। ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম কুরতুবী (র.) বিভিন্ন সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মধ্যে হযরত আয়েশা (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হযরত আব্দুল্লাহ, ইবনে মাসউদ (রা.) হযরত উরওয়া ইবনে যুবায়ের (রা.), হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)' ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) এবং আরবি ভাষা ও ব্যাকরণবিদ কিসাঈ, আখফাশ এবং ফাররা ও আবূ উবায়িদ প্রমুখ এ মতই প্রকাশ করেছেন। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) এবং হানাফী ফিকহের অনুসারীগণ এ মতই গ্রহণ করেছেন। অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম এবং আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতও উল্লিখিত মতের অনুসারী। –[রূহুল মা'আনী, মাদারেক ও কুরতুবী]

অনুবাদ :

৮. وَيَقُوْلُوْنَ اَيْضًا اِذَا رَأَوْا مَنْ يَتَّبِعَهُ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا تُمِلْهَا عَنِ الْحَقِّ بِابْتِغَاءِ تَأْوِيْلِهِ الَّذِىْ لَا يَلِيْقُ بِنَا كَمَا اَزَغْتَ قُلُوْبَ اُولٰئِكَ بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا اَرْشَدْتَنَا اِلَيْهِ وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ مِنْ عِنْدِكَ رَحْمَةً تَثْبِيْتًا اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ .

৮. যখন তারা ঐ সকল লোকদের দেখে যারা মুতাশাবিহ আয়াতের পিছনে পড়ে তখন বলে হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে হেদায়েত দান করার পর সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে বক্র করো না। অর্থাৎ তাদের অন্তর যেমন বক্র করে দিয়েছ তেমনি এ আয়াতসমূহের তাবিল বা ব্যাখ্যার পিছনে পড়ে যা আমাদের জন্যে অনুচিত সত্য হতে আমাদের ফিরিয়ে দিয়ো না। তোমার নিকট হতে পক্ষ হতে আমাদেরকে করুণা দান কর সুদৃঢ়তা দাও, তুমিই মহাদাতা।

৯. يَا رَبَّنَا اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ تَجْمَعُهُمْ لِيَوْمٍ اَىْ فِىْ يَوْمٍ لَّا رَيْبَ شَكَّ فِيْهِ هُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ فَتُجَازِيْهِمْ بِاَعْمَالِهِمْ كَمَا وَعَدْتَ بِذٰلِكَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ مَوْعِدَهُ بِالْبَعْثِ فِيْهِ اِلْتِفَاتٌ عَنِ الْخِطَابِ وَيَحْتَمِلُ اَنْ يَكُوْنَ مِنْ كَلَامِهِ تَعَالٰى وَالْغَرَضُ مِنَ الدُّعَاءِ بِذٰلِكَ بَيَانُ اَنَّ هَمَّهُمْ اَمْرُ الْاٰخِرَةِ وَلِذٰلِكَ سَأَلُوا الثُّبَاتَ عَلَى الْهِدَايَةِ لِيَنَالُوْا ثَوَابَهَا رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ تَلَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذِهِ الْاٰيَةَ هُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيَاتٌ مُّحْكَمٰتٌ اِلٰى اٰخِرِهَا وَقَالَ

৯. হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় তুমি একদিন অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মানব জাতির একত্রকারী অর্থাৎ তুমি তাদেরকে একদিন একত্র করবে যাতে কোনো সন্দেহ সংশয় নেই। তোমার প্রতিশ্রুতি অনুসারে ঐদিন তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দান করবে। নিশ্চয় আল্লাহ নির্ধারিত সময়ের অর্থাৎ পুনরুত্থান সম্পর্কে তাঁর নির্ধারিত ওয়াদার ব্যতিক্রম করেন না।

اِنَّ اللّٰهَ এ বাক্যটিতে خِطَاب অর্থাৎ দ্বিতীয় পুরুষ হতে নাম পুরুষের দিকে اِلْتِفَات বা রূপান্তর হয়েছে। এটা আল্লাহর উক্তিও হতে পারে।

এ দোয়ার উদ্দেশ্য হলো এ কথা বুঝানো যে, এর মূল চিন্তা ও ধ্যান হচ্ছে পরকাল। তাই সে স্থানে যাতে পুণ্যফল লাভ করতে পারে, সে জন্যই তারা আল্লাহর নিকট হেদায়েতের উপর সুদৃঢ়তার যাচনা করেছে।

শায়খাইন [বুখারী ও মুসলিম] বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ هُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ الخ এ আয়াত তেলাওয়াত করে ইরশাদ করেছেন–

فَاِذَا رَأَيْتَ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَاُولٰئِكَ الَّذِيْنَ سَمَّى اللّٰهُ تَعَالٰى فَاحْذَرُوْهُمْ وَرَوَى الطَّبَرَانِىْ فِى الْكَبِيْرِ عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الْاَشْعَرِىْ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ مَا اَخَافُ عَلٰى اُمَّتِىْ اِلَّا ثَلٰثَ خِلَالٍ وَذَكَرَ مِنْهَا اَنْ يُفْتَحَ لَهُمُ الْكِتٰبُ فَيَأْخُذُهُ الْمُؤْمِنُ يَبْتَغِىْ تَأْوِيْلَهُ وَلَيْسَ يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ اِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا اُولُو الْاَلْبَابِ الْحَدِيْثَ .

মুতাশাবিহ আয়াতসমূহের পিছনে পড়তে যখন কাউকে দেখতে পাবে, বুঝবে এরা তারা যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে [এ আয়াত] উল্লেখ করেছেন। সুতরাং তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকবে।

আবূ মালেক আশআরী হতে তাবারানী তৎপ্রণিত 'আল কাবীর' এ বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূল ﷺ -কে বলতে শুনেছেন যে, তিনি ইরশাদ করেন, আমার উম্মত সম্পর্কে আমি তিনটি বিষয়ের আশঙ্কা করি। এদের মধ্যে একটি হচ্ছে, তাদের সামনে আল্লাহর কিতাব খোলা হবে আর মু'মিনগণ মুতাশাবিহাতের তাবীলের [মনগড়া ব্যাখ্যার] পিছনে পড়বে। অথচ এগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর ও সুদৃঢ় তারা বলে, আমরা এটা বিশ্বাস করি। সবকিছুই আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে আগত আর বোধসম্পন্ন ব্যতীত অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না। –[আল হাদীস]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا : ঈমানের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে দোয়া করা উচিত যে, হে আমাদের প্রতিপালক! অনুগ্রহ করে যখন আমাদেরকে হেদায়েত দান করেছেন, তখন সকল অবস্থায়ই আমাদেরকে সিরাতে মুস্তাকীমের উপর কায়েম রাখুন, আমাদের অবস্থা কখনো যেন ইহুদি ও নাসারাদের অনুরূপ না হয়। যাদের নিকট নবুয়ত ও মহান আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাবের মতো মহামূল্যবান নিয়ামত থাকা সত্ত্বেও তারা গোমরাহ হয়েছে।

আয়াতে উল্লিখিত সমস্ত দোয়াসূচক কালিমা পরিপক্ক জ্ঞানীদের মুখনিঃসৃত দোয়া। তাঁরা নিজেদের জ্ঞানগত যোগ্যতা ও ঈমানী শক্তিতে আত্মগর্বী ও নিশ্চিন্ত থাকে না; বরং তাঁরা সর্বদা আল্লাহ তা'আলার নিকট অবিচলতা এবং অতিরিক্ত করুণা ও দয়া প্রার্থনা করে, যাতে অর্জিত ধন হস্তচ্যুত না হয় এবং আল্লাহ না করুন অন্তর সরলপথ প্রাপ্তির পর বেঁকে না যায়। হাদীসে আছে, রাসূলে কারীম ﷺ প্রায়ই [উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে] এ দোয়া পড়তেন– يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلٰى دِيْنِكَ 'হে অন্তরসমূহের ওলট-পালটকারী! আমার অন্তরকে তোমার দীনে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখ।

–[তাফসীরে ওসমানী]

অনুবাদ :

১০. إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ تَدْفَعَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ أَيْ عَذَابِهِ شَيْئًا وَأُولٰئِكَ هُمْ وَقُوْدُ النَّارِ بِفَتْحِ الْوَاوِ مَا تُوْقَدُ بِهِ .

১০. যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে তাদের ধনৈশ্বর্য ও সন্তানসন্ততি আল্লাহর নিকট কোনো কাজে আসবে না অর্থাৎ এগুলো তাঁর শাস্তি প্রতিহত করতে পারবে না এবং এরাই জাহান্নামের অগ্নির ইন্ধন। وَقُوْد এটা وَاو বর্ণে ফাতাহ সহকারে পঠিত। অর্থাৎ যার দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করা হয়।

১১. دَأْبُهُمْ كَدَأْبِ كَعَادَةِ اٰلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْأُمَمِ كَعَادٍ وَثَمُوْدَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللّٰهُ أَهْلَكَهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَالْجُمْلَةُ مُفَسِّرَةٌ لِمَا قَبْلَهَا وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ .

১১. এদের অভ্যাস ফিরআউন সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তীগণের অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মত যেমন আদ ও ছামূদগণের প্রথার অভ্যাসের ন্যায়। এরা আমার আয়াতকে মিথ্যা মনে করে অস্বীকার করেছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদের পাপের জন্যে তাদেরকে পাকড়াও করেছিলেন। এদেরকে ধ্বংস করেছিলেন। كَذَّبُوْا এ বাক্যটি পূর্বোল্লিখিত বিষয়টির ব্যাখ্যাস্বরূপ। আর আল্লাহ শাস্তিদানে অতি কঠোর।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَقُوْدٌ : وَاو বর্ণটি ফাতহা দিয়ে পঠিত, অর্থ- জ্বালানি। এটা ইসম, আর وَاو পেশযোগে হলে মাসদার হবে। সত্তার উপর মাসদার প্রয়োগ হতে পারে না। এ কারণেই যবরযুক্ত وَاو সহ ইসম সাব্যস্ত করা হয়েছে, যাতে মাসদারের উপর এর প্রয়োগ হতে পারে।

قَوْلُهُ دَأْبُهُمْ : শব্দটি উহ্য মেনে ইশারা করেছেন যে, كَدَأْبِ فِرْعَوْنَ উহ্য মুবতাদার খবর হয়ে মুসতানিফা বাক্য। دَأْب অর্থ- অভ্যাস, অবস্থা, (ف) دأب মাসদার। অবিরত কোনো কাজে লেগে থাকা। এ কারণেই এটা অভ্যাস **অর্থে ব্যবহৃত হয়।**

قَوْلُهُ الْجُمْلَةُ مُفَسِّرَةٌ : ব্যাখ্যাকার (র.) উল্লিখিত ইবারত উহ্য মেনে ইশারা করেছেন যে, كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا **বাক্য** حَالِيَة নয়, কেননা অতীতকালীন সীগাহ حَال হওয়ার জন্যে قَدْ থাকা জরুরি; বরং এ বাক্যটি **পূর্বের বাক্যের ব্যাখ্যা**। এ কারণেই উভয় বাক্যের মাঝে وَاو উল্লেখ করা হয়নি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কাফের সম্প্রদায়ই হবে জাহান্নামের ইন্ধন; ধনসম্পদ সেদিন কাজে আসবে না : কিয়ামতের উল্লেখ করতে গিয়ে কাফেরদের পরিণতিও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহর শাস্তি হতে কোনো বস্তুই তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। যেমন- আমি সূরার শুরুতে লিখে এসেছি। এসব আয়াতের প্রকৃত সম্বোধন ছিল **নাজরানের** প্রতিনিধি দলের প্রতি, যাদেরকে খ্রিস্টান ধর্ম ও সম্প্রদায়ের সর্ববৃহৎ প্রতিনিধি দল বলেই জানা উচিত। ইমাম **ফখরুদ্দীন রাযী**

(র.) মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র.)-এর রচিত সীরাতগ্রন্থের বরাতে লিখেন, এ প্রতিনিধি দল যখন নাজরান হতে পবিত্র মদিনার উদ্দেশ্য রওয়ানা হয়, তখন তাদের প্রধান পাদরি আবূ হারিসা ইবনে আলকামা একটি খচ্চরে সওয়ার ছিল। পথ চলতে গিয়ে খচ্চরটি একবার হোঁচট খায়। তখন আবূ হারিসার ভাই কুরযা ইবনে আলকামা বলে উঠে- تَعِسَ الْاَبْعَدُ 'দূরবর্তী [অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ] ধ্বংস হোক।' নাউযুবিল্লাহ! আবূ হারিসা সঙ্গে সঙ্গে বলল, تَعِسَتْ اُمُّكَ 'তোর মা ধ্বংস হোক।' কুরয হতবুদ্ধি হয়ে এ প্রতি উত্তরের কারণ জিজ্ঞেস করলে আবূ হারিসা বলল, আল্লাহর কসম! আমরা ভালো করে জানি, এ ব্যক্তি [মুহাম্মদ ﷺ] সেই প্রতীক্ষিত নবী, যাঁর সম্পর্কে আমাদের কিতাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। কুরয বলল, তাহলে মানছ না যে? সে বলল, لِاَنَّ هٰؤُلَاءِ الْمُلُوْكَ اَعْطَوْنَا اَمْوَالًا كَثِيْرَةً وَاَكْرَمُوْنَا فَلَوْ اٰمَنَّا بِمُحَمَّدٍ لَاَخَذُوْا مِنَّا كُلَّ هٰذِهِ الْاَشْيَاءِ 'কারণ, আমরা যদি মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি ঈমান আনি, তাহলে এ সকল রাজা-বাদশা আমাদেরকে যে প্রভূত অর্থকড়ি ও মানসম্মান দিচ্ছে, তা সব কেড়ে নেবে। কুরয এ কথাটি তার অন্তরে লুকিয়ে রাখল এবং শেষ পর্যন্ত এ কথাই তার ইসলামের কারণ হয়ে দাঁড়াল। আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাকে সন্তুষ্ট করুন। -[তাফসীরে ওসমানী]

আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র.) বলেন, আমার মতে এ আয়াতগুলোতে আবূ হারিসার উল্লিখিত বক্তব্যেরই জবাব দেওয়া হয়েছে। যেন যুক্তি ও বর্ণনানির্ভর দলিল দ্বারা তাদের ভ্রান্ত আকিদা রদ করার পর সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে, সত্য পরিস্ফুট হয়ে যাওয়ার পর যারা পার্থিব ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি ইত্যাদির কারণে ঈমান আনয়ন করছে না, তারা ভালো করে জেনে রাখুক, ধনসম্পদ ও জ্ঞাতি-গোষ্ঠী তাদেরকে না পার্থিব জীবনে মহান আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারবে, না আখিরাতের মহা আজাব হতে। এর তরতাজা দৃষ্টান্ত তোমরা সম্প্রতি বদর প্রান্তরে মুসলিম ও মুশরিকদের লড়াইতে দেখে নিয়েছে। দুনিয়ার বাহার তো ক্ষণস্থায়ী। ভবিষ্যতের সাফল্য তাদের জন্যে রক্ষিত যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে। এভাবে বহুদূর পর্যন্ত এ আলোচনা এগিয়ে গেছে। শব্দের ব্যাপকতা হিসেবে ইহুদি ও মুশরিকরাও এ সম্বোধনের আওতায় পড়ে গেছে, যদিও নাজরানের খ্রিস্টানরাই ছিল আসল লক্ষ্য। -[তাফসীরে ওসমানী]

قَوْلُهُ كَدَأْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ : যেমনিভাবে অতীতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এ সত্য প্রতীয়মান হয় যে, ফিরআউন গোষ্ঠীর ধনসম্পদ ও জনসম্পদ তাদের জন্যে কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারেনি। মহান আল্লাহর আজাব হতে তাদের কিছুই তাদেরকে রেহাই দিতে পারেনি, তেমনি বর্তমান যুগের অন্যায়কারীও বেঈমানদের জন্যেও তাদের সমস্ত সম্পদ ও শক্তি তাদের জন্যে মহান আল্লাহর আজাব থেকে রেহাই দেওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরর্থক, নিষ্ফল বলে প্রমাণিত হবে। اٰل فرعون। ফিরআউন গোষ্ঠী, দল বা সম্প্রদায় সম্পর্কীয় আলোচনা প্রথম পারার সূরা বাকারায় এতদসম্পর্কীয় টীকায় বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। ফিরাউনের প্রসঙ্গ আলোচনার সাথে এ আলোচনার মিলের কারণ হলো- ফিরাআউন গোষ্ঠীর ধ্বংসলীলা তাদের চরম শাস্তি ও পরিণতি সম্পর্কে খ্রিস্টধর্মের দাবিদাররাও ঐকমত্য পোষণ করে। তাই এ সূরায় আলোচনার লক্ষ্যস্থল নাজরানের খ্রিস্টান সম্প্রদায়। এ কারণে খ্রিস্টানগণ যেন ফিরআউন গোষ্ঠীর অশুভ পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে, তাই ফিরআউন গোষ্ঠীর অবস্থা এ ক্ষেত্রে আলোচিত হয়েছে। -[তাফসীরে মাজেদী]

অনুবাদ :

١٢. وَنَزَلَ لَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ الْيَهُوْدَ بِالْإِسْلَامِ مَرْجِعِهِ مِنْ بَدْرٍ فَقَالُوْا لَهُ لَا يَغُرَّنَّكَ أَنْ قَتَلْتَ نَفَرًا مِنْ قُرَيْشٍ اِغْمَارًا لَا يَعْرِفُوْنَ الْقِتَالَ قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ الْيَهُوْدِ سَتُغْلَبُوْنَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ فِى الدُّنْيَا بِالْقَتْلِ وَالْاِسْرِ وَضَرْبِ الْجِزْيَةِ وَقَدْ وَقَعَ ذٰلِكَ وَتُحْشَرُوْنَ بِالْوَجْهَيْنِ فِى الْاٰخِرَةِ اِلٰى جَهَنَّمَ فَتَدْخُلُوْنَهَا وَبِئْسَ الْمِهَادُ الْفِرَاشُ هِىَ ـ

১২. বদর যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহুদিদেরকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেন। তখন তারা তাকে উত্তর দিয়েছিল, যুদ্ধ সম্পর্কে অজ্ঞ ও অদক্ষ কিছু কোরাইশ লোককে পরাজিত ও হত্যা করতে পারা [আমাদের সম্পর্কে] আপনাকে যেন প্রবঞ্চনায় না ফেলে। এ উপলক্ষে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন যে, হে মুহাম্মদ! ইহুদিদের যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে বলুন, তোমরা শীঘ্রই দুনিয়াতে হত্যা, বন্দী ও জিজিয়া আরোপের মাধ্যমে পরাভূত হবে। سَتُغْلَبُوْنَ এখানে ت [দ্বিতীয় পুরুষ] এবং ي [প্রথম পুরুষ] উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। আর সত্যিকারভাবেই তা ঘটেছিল। এবং তোমাদেরকে পরকালে একত্র করা হবে تُحْشَرُوْنَ এখানে দ্বিতীয় পুরুষ ও প্রথম পুরুষ উভয়রূপেই পাঠ করা যায়। জাহান্নামে। অনন্তর তোমরা তাতে প্রবেশ করবে। আর কতই না নিকৃষ্ট আবাস এটা। এটা কত নিকৃষ্ট শয্যা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا الْاٰيَةَ : শানে নুযূল : একটি শানে নুযূল তো ইবারতে বর্ণিত হয়েছে। কেউ বলেন, বদরের বিজয় দেখে ইহুদিরা বিশ্বাসের পথে কিছুটা এগিয়ে আসছিল। এ সময় তাদের কিছু লোক বলল, ব্যস্ত হয়ো না। দেখ, সামনে কি হয়। পরবর্তী বছরে ওহুদের পরাজয় দেখে তাদের মন শক্ত হয়ে গেল এবং স্পর্ধা বেড়ে গেল। এমনকি তারা চুক্তি ভঙ্গ করে মুসলিমগণের সাথে যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত হয়ে গেল। কবি ইবনে আশরাফ ষাট সওয়ারির একটি কাফেলা নিয়ে মক্কায় চলে গেল এবং আবূ সুফিয়ান প্রমুখ কুরাইশ কাফেরদের সাথে মিলিত হয়ে বলল, তোমরা আমরা এক। কাজেই সম্মিলিত বাহিনী তৈরি করে আমাদের উচিত মুহাম্মদের মোকাবিলা করা। এ পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। আল্লাহই ভালো জানেন। যা হোক অল্প দিনের মধ্যেই আল্লাহ তা'আলা দেখিয়ে দেন, আরব উপদ্বীপে মুশরিকদের নাম-নিশানা কিছু বাকি থাকেনি। বনু কুরায়যার বিশ্বাসঘাতকতার কারণে এ ইহুদি গোত্রকে কতল করা হয়। বনু নযীরকে নির্বাসন দেওয়া হয়। নাজরানের খ্রিস্টানগণ বশ্যতা স্বীকার করে বার্ষিক কর দিতে বাধ্য হয় এবং প্রায় এক হাজার বছর পর্যন্ত বিশ্বের বৃহৎ ও উদ্ধত শক্তিবর্গ মুসলিম জাতির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে থাকে। মহান আল্লাহরই সমস্ত প্রশংসা। –[তাফসীরে ওসমানী]

সম্ভাবনা আছে যে, কোনো ব্যক্তি এ আয়াতে সন্দেহ করতে পারে যে, আয়াত দ্বারা বুঝা যায় কাফেররা পরাজিত হবে, অথচ দুনিয়ার সকল কাফের পরাজিত নয়। এ সন্দেহ এ কারণে করা যাবে না যে, এখানে কাফের দ্বারা দুনিয়ার সকল কাফের উদ্দেশ্য নয়, বরং সে সময়ের মুশরিক ও ইহুদি জাতি উদ্দেশ্য। আর মুশরিকদেরকে সে যুগে গ্রেফতার ও হত্যা এবং ইহুদিদেরকে গ্রেফতার, হত্যা, কর আরোপ ও দেশান্তর করার মাধ্যমে পরাজিত করা হয়েছিল, আর খায়বার বিজয়ের পর সকল ইহুদিদের উপর কর আরোপ করা হয়েছিল –[জামালাইন]

আল্লামা মাজেদী (র.) বলেন, تُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ -এর সম্পর্ক যে আখিরাতের সঙ্গে, তা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। **কিন্তু আয়াতে** سَتُغْلَبُوْنَ 'তোমরা শীঘ্রই পরাজিত ও পরাভূত হবে।' মহান আল্লাহর দীনের দুশমনদের সম্পর্কে এ দুঃসংবাদ **শুধু আখিরাতেই হবে**, না দুনিয়ায়ও ইসলামি শক্তির মোকাবিলায় চূড়ান্ত পর্যায়ে বাতিল ও কাফের শক্তি পরাজিত ও পরাভূত **হবে? তা একটি** মৌলিক প্রশ্ন এ প্রসঙ্গে সমস্ত তাফসীরকারগণ সর্ববাদী সম্মতভাবে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, দুনিয়ায় **চূড়ান্ত পর্যায়ে কুফ**রি শক্তিই চরমভাবে লাঞ্ছিত, অপমানিত, পরাজিত ও পরাভূত হবে। এ আয়াতের হুকুম দুনিয়া ও **আখিরাত উভয়** ক্ষেত্রে কুফরি শক্তির চরম পরিণতি সম্পর্কে সমভাবে প্রযোজ্য। তাফসীরকারগণ এ-ও বলেছেন, এ আয়াত **থেকে এটাও** প্রমাণিত হয় যে, কুফরি শক্তি অদূর ভবিষ্যতে এ মুসলিম শক্তির মোকাবিলায় পরাজিত, পরাভূত ও পর্যুদস্ত **হবে। বাস্ত**বে দেখা গেল, মহান আল্লাহর রাসূলের জীবদ্দশাতেই তদানীন্তন কুফর শক্তি ও নাফরমান গোষ্ঠী পরাজিত, **পরাভূত**, পর্যুদস্ত ও বিতাড়িত হয়েছিল।

কাফেররা পরাভূত হবে : আমরা বলতে চাই, আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণীর প্রসঙ্গটি বদর বা ইহুদি শক্তি কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ত না করে একে সকল কুফরি শক্তির চরম পরিণাম সম্পর্কীয় একটি সাধারণ হুকুম ও ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে গ্রহণ করাই উত্তম। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়কালীন বাতিল ও কুফরি শক্তি, চাই তা বদর হোক, খন্দক হোক, খায়বার হোক, হুনায়ন হোক আর মক্কা মুকাররমা বিজয় হোক, চূড়ান্ত পরাজয় কুফরি শক্তির জন্যেই নির্ধারিত রয়েছে। আর কিয়ামত পর্যন্ত নিষ্ঠাবান মুসলিম দীনের মুজাহিদের সাথে বাতিল ও কুফরি শক্তি যে যুগেই সংঘাত, দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধের মোকাবিলায় লিপ্ত হোক না, সকল যুগেই চূড়ান্ত বিজয় ইসলামি শক্তির, আর চূড়ান্ত পরাজয়, পর্যুদস্থতা বাতিল ও কুফরি শক্তির জন্যেই নির্ধারিত হয়েছে। তাই আয়াতের প্রাসঙ্গিক ভবিষ্যদ্বাণী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পরবর্তী যুগের সকল কুফরি শক্তির ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য বলে গ্রহণ করার মধ্যে সকল বিতর্কের অবসান নিহিত রয়েছে। ইতিহাসের নিরীক্ষণেও তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে যে, মুসলিম শক্তি সকল যুগেই বাতিল শক্তির মোকাবিলায় বিজয়ের মর্যাদায় সুনাম অর্জন করেছে। আর চূড়ান্ত পর্যায়ে কাফের, মুশরিক ও ক্রুসেড শক্তি চরমভাবে লাঞ্ছিত, অপমানিত, পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়েছে। তাই সকলকে আয়াতের হুকুমের ব্যাপারে সমানভাবে গ্রহণ করাই শ্রেয়।

মোদ্দাকথা, পবিত্র কুরআনের অলৌকিক মহত্ত্ব সকল দিকে প্রকাশিত ও উদ্ভাসিত। কুরআন নাজিলের সময়ে মুসলমানদের **পার্থিব স**ম্পদের অভাব, শক্তিহীনতা, অসহায়ত্বকে প্রত্যক্ষ করে এর কল্পনাও কি কেউ করতে পেরেছে যে, এ ধনশক্তি ও **জনশক্তি**হীন, মুষ্টিমেয় অসহায় দুর্বল লোকেরা বিপুল যশ, কীর্তি, শক্তি, সম্পদ ও খ্যাতির অধিকারী মক্কাবাসী, ইহুদি **সম্প্রদায়কে** এমনকি তদানীন্তন বিশ্বের বৃহৎ শক্তিদ্বয় [পারস্য ও গ্রীক সাম্রাজ্যকে] পদানত, পরাজিত, পরাভূত ও পর্যুদস্ত **করতে সক্ষম হবে**, তাদের মোকাবিলা করার সাহস পাবে? কিন্তু ইতিহাসকে বিস্ময়াভিভূত করে ইসলামের স্বর্ণযুগের উজ্জ্বল **ইতিহাস রাসূলুল্লাহ** ﷺ -এর তিরোধানের পর এক যুগ সময় অতিবাহিত হতে না হতে সমগ্র বিশ্বের তদানীন্তন কালের **শ্রেষ্ঠ শক্তি ও সাম্রাজ্য**সমূহ পরাজিত পরাভূত হয়ে ইসলামের সুশীতল ও সুমহান ছায়াতলে সমবেত হয়।

-[তাফসীরে মাজেদী]

١٣. قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ عِبْرَةٌ وَذُكِّرَ الْفِعْلُ لِلْفَصْلِ فِيْ فِئَتَيْنِ فِرْقَتَيْنِ الْتَقَتَا يَوْمَ بَدْرٍ لِلْقِتَالِ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَيْ طَاعَتِهٖ وَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ وَاَصْحَابُهٗ (رض) وَكَانُوْا ثَلٰثَمِائَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا مَعَهُمْ فَرَسَانِ وَسِتُّ اَدْرُعٍ وَثَمَانِيَةُ سُيُوْفٍ وَاَكْثَرُهُمْ رَجَّالَةٌ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ اَيْ اَلْكُفَّارَ مِثْلَيْهِمْ اَيْ اَلْمُسْلِمِيْنَ اَيْ اَكْثَرَ مِنْهُمْ كَانُوْا نَحْوَ اَلْفٍ رَأْيَ الْعَيْنِ اَيْ رُؤْيَةً ظَاهِرَةً مُعَايَنَةً وَ قَدْ نَصَرَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى مَعَ قِلَّتِهِمْ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ يُقَوِّىْ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَاۤءُ نَصْرَهٗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرِ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ لِذَوِى الْبَصَائِرِ اَفَلَا تَعْتَبِرُوْنَ بِذٰلِكَ فَتُؤْمِنُوْنَ ـ

অনুবাদ :

১৩. তোমাদের জন্যে ছিল নিদর্শন অর্থাৎ শিক্ষা। এ كَانَ ক্রিয়াটিকে مُذَكَّرْ বা পুংলিঙ্গরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও এর اِسْم [কর্তা اٰيَةٌ] مُؤَنَّثْ বা স্ত্রীলিঙ্গ। কারণ كَانَ এবং اٰيَةٌ -এর মধ্যে ব্যবধান রয়েছে। দুটি দলের সম্প্রদায়ের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বদরের দিন একত্র হওয়ার মধ্যে। একদল অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ আল্লাহর পথে অর্থাৎ তাঁর আনুগত্যে যুদ্ধে লড়েছিল। এরা সংখ্যায় ছিল তিনশত তেরজন। তাদের সঙ্গে মাত্র দুটি ঘোড়া, ছয়টি বর্ম ও আটটি তলোয়ার ছিল। অধিকাংশ মুজাহিদই ছিল পদাতিক। অন্যদল ছিল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী; তারা তাদেরকে يَرَوْنَهُمْ এটা ى [নাম পুরুষ] এবং ت [দ্বিতীয় পুরুষ] উভয় রূপেই পাঠ করা যায়। অর্থাৎ কাফেরদেরকে চোখের দেখায় অর্থাৎ বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুসলমানদের দ্বিগুণ দেখেছিল। এরা ছিল অনেক বেশি। এদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার। আর অল্প সংখ্যক হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ এদের [মুসলমানদের] সাহায্য করেছিলেন। আল্লাহ যাকে সাহায্য করার ইচ্ছা করেন তাকে নিজ সাহায্যে শক্তিশালী করেন মজবুত করেন। নিশ্চয় এতে উল্লিখিত বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকের জন্য বিবেকবান লোকদের জন্যে শিক্ষা রয়েছে। সুতরাং তোমরা কি এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর না? অনন্তর ঈমান আনয়ন কর না?

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ وَذُكِّرَ الْفِعْلُ الخ : **প্রশ্ন:** اٰيَةٌ হলো كَانَ -এর ইসম। ফে'লকে পুংলিঙ্গ আনা হয়েছে অথচ স্ত্রীলিঙ্গ তথা كَانَتْ আনা উচিত ছিল, যাতে ফে'ল ও ইসমের মধ্যে সামঞ্জস্য হয়ে যায়।

উত্তর: ফে'ল এবং তার ইসমের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি হলে তখন মিল থাকা জরুরি নয়। আর এখানে لَكُمْ -এর ব্যবধান ঘটেছে।

اَلْفِئَةُ : দল, জামাত -এর কোনো একবচন শব্দ ব্যবহৃত হয় না। বহুবচন فِئَاتٌ

قَوْلُهٗ وَكَانُوْا ثَلٰثَمِائَةٍ الخ : তন্মধ্য হতে ৭৭ জন ছিলেন মুহাজির। তাদের পতাকাবাহী ছিলেন হযরত আলী (রা.) আর আনসার ছিলেন ২৩৬ জন। তাঁদের পতাকাবাহী ছিলেন হযরত সা'দ ইবনে উবাইদা (রা.)। -[হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১, পৃ. ৩৭৬]

اَدْرُعٌ : এটি دِرْعٌ -এর বহুবচন। অর্থ- লোহার বর্ম। وَدِرْعُ الْمَرْأَةِ قَمِيْصُهَا

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ فِئَتَيْنِ (الاية) : **বদর যুদ্ধ :** এ আয়াতে বদর যুদ্ধের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এ যুদ্ধে কাফেরদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার। তাদের নিকট ছিল সাতশত উট এবং একশত ঘোড়া। অপর পক্ষে মুসলমান মুজাহিদ ছিল তিন শতাধিক, তাদের নিকট ছিল সত্তরটি উট, দুটি ঘোড়া, ছয়টি লৌহবর্ম ও আটটি তরবারি। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রত্যেক পক্ষ অপর পক্ষকে নিজেদের চেয়ে দ্বিগুণ দেখছিল। ফল এই হয়েছিল যে, কাফেরদের অন্তরে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্যের কল্পনা ভীতিগ্রস্ত করেছিল। আর মুসলমানরা তাদের সংখ্যা দ্বিগুণ দেখে আরও বেশি মাত্রায় আল্লাহর অভিমুখী হয়েছিল। কাফেরদের পূর্ণসংখ্যা যা মুসলমানদের সংখ্যার প্রায় তিনগুণ ছিল, তা যদি প্রকাশ হয়ে যেত তাহলে সম্ভাবনা ছিল যে, মুসলমানদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার হতো। কেননা فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ আয়াতে মুসলমানদের দ্বিগুণের উপর বিজয়ী হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল এবং আল্লাহর ওয়াদা ছিল। কিন্তু তিনগুণের উপর বিজয়ের প্রতিশ্রুতি ছিল না। আর উভয় পক্ষের পরস্পরে দ্বিগুণ সংখ্যক দেখার বিষয়টি বিশেষ ক্ষেত্রে ছিল। -[তাফসীরে ওসমানী]

অনুবাদ :

١٤. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مَا تَشْتَهِيهِ النَّفْسُ وَتَدْعُوْ إِلَيْهِ زَيَّنَهَا اللّٰهُ تَعَالٰى اِبْتِلَاءً أَوِ الشَّيْطَانُ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْأَمْوَالِ الْكَثِيْرَةِ الْمُقَنْطَرَةِ الْمُجَمَّعَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ الْحِسَانِ وَالْأَنْعَامِ اَىِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْحَرْثِ الزَّرْعِ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرُ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا يَتَمَتَّعُ بِهِ فِيْهَا ثُمَّ يَفْنٰى وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ الْمَرْجِعُ وَهُوَ الْجَنَّةُ فَيَنْبَغِيْ الرَّغْبَةُ فِيْهِ دُوْنَ غَيْرِهٖ.

১৪. নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণ, রৌপ্য সঞ্চিত সম্পদরাশি, চিহ্নিত সৌন্দর্যমণ্ডিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি এবং কৃষি-ফসল ক্ষেত-খামার ইত্যাদি চিত্তাকর্ষক বস্তুর অর্থাৎ প্রবৃত্তি যা কামনা করে, তা যে বস্তুর অনুরাগ সৃষ্টি করে সে সকল বস্তুর প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট মনোহর করা হয়েছে। মানুষের পরীক্ষার জন্যে আল্লাহ তা'আলা তা সুসজ্জিত করে তুলে ধরেছেন। কিংবা শয়তান মানুষের চোখে তা মনোহর করে তুলে ধরে। এটা উল্লিখিত বস্তু পার্থিব জীবনের সাজ-সরঞ্জাম। যা সে এতে ভোগ করে। অতঃপর সেসব ধ্বংস হয়ে যাবে। আর আল্লাহ তা'আলা, তাঁর নিকটই রয়েছে সর্বোত্তম আশ্রয়। উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল অর্থাৎ জান্নাত। সুতরাং অন্য কিছুর প্রতি নয়; বরং আল্লাহর প্রতিই কেবল ধাবিত হওয়া কর্তব্য।

١٥. قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِقَوْمِكَ أَؤُنَبِّئُكُمْ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذٰلِكُمُ الْمَذْكُوْرِ مِنَ الشَّهَوَاتِ اِسْتِفْهَامُ تَقْرِيْرٍ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا الشِّرْكَ عِنْدَ رَبِّهِمْ خَبَرٌ مُبْتَدَؤُهُ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ اَىْ مُقَدَّرِيْنَ الْخُلُوْدَ فِيْهَا إِذَا دَخَلُوْهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ مِنَ الْحَيْضِ وَغَيْرِهٖ مِمَّا يُسْتَقْذَرُ وَ رِضْوَانٌ بِكَسْرِ أَوَّلِهٖ وَضَمِّهٖ لُغَتَانِ اَىْ رِضًا كَثِيْرٌ مِنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ عَالِمٌ بِالْعِبَادِ فَيُجَازِيْ كُلًّا مِنْهُمْ بِعَمَلِهٖ.

১৫. হে মুহাম্মদ! তোমার সম্প্রদায়কে বল, আমি কি তোমাদেরকে এসব অর্থাৎ উল্লিখিত চিত্তাকর্ষক বস্তুসমূহ হতে উৎকৃষ্টতর কোনো কিছুর বার্তা সংবাদ দেব? এ স্থানে প্রশ্নবোধক চিহ্নটি تَقْرِيْرِىْ অর্থাৎ বিষয়টির নিশ্চয়তা বিধানমূলক।
যারা শিরক হতে বেঁচে থাকে তাদের জন্যে রয়েছে উদ্যানরাজি لِلَّذِيْنَ الخ এটা خَبَرْ বা বিধেয়। جَنّٰتٌ الخ এটা مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য। যাদের পাদদেশে নদী বহমান। যখন তারা প্রবেশ করবে তখন সেখানে তারা স্থায়ী হবে। সেস্থানের স্থায়িত্ব তাদের জন্যে সুনির্ধারিত এবং রজঃস্রাব ইত্যাদি সকল প্রকার অসুচিতা থেকে সুপবিত্রা সঙ্গিনী ও আল্লাহর নিকট হতে বিরাট সন্তুষ্টি। رِضْوَانٌ -এর প্রথমাক্ষরে কাসরা ও পেশ এ দু-ধরনের উচ্চারণভঙ্গি বিদ্যমান। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের দ্রষ্টা। অর্থাৎ তাদের সম্পর্কে অবহিত। সুতরাং প্রত্যেককেই তিনি তদীয় কার্যানুসারে প্রতিদান দেবেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ **পার্থিব ভোগ সামগ্রী :** মানুষ আকর্ষণীয় ভোগ সামগ্রীর মাঝে নিমজ্জিত হয়ে আল্লাহকে ভুলে যায়। এ কারণেই হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- مَا تَرَكْتُ بَعْدَ فِتْنَةٍ اَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ 'আমি আমার পর পুরুষদের জন্যে নারী অপেক্ষা বেশি ক্ষতিকর কোনো ফিতনা রেখে যাইনি।' হ্যাঁ, নারী দ্বারা যদি চারিত্রিক পবিত্রতা ও সন্তান বৃদ্ধি হয় তবে তা নিন্দনীয় নয়: বরং তা বাঞ্ছনীয় ও প্রশংসনীয়। কাজেই রাসূলে কারীম ﷺ বলেন, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ভোগ্য বস্তু হলো সতীসাধ্বী স্ত্রী, যার দিকে তাকালে অন্তর জুড়ায়, যাকে আদেশ করলে আনুগত্য করে। স্বামীর অনুপস্থিতিকালে তার অর্থসম্পদ ও স্বীয় সম্ভ্রম রক্ষায় যত্নবান থাকে। এভাবেই সামনে ইহজীবনের ভোগ্যবস্তুর যে তালিকা দেওয়া হয়েছে, সবগুলোর ভালোমন্দ হওয়ার বিষয়টি নিয়ত ও কর্মপদ্ধতির উপর নির্ভর করবে এবং এ হিসেবেই তার মাঝে তারতম্য হবে। কিন্তু দুনিয়ায় সংখ্যাধিক্য যেহেতু এমন লোকের, যারা ভোগবিলাসের সামগ্রীতে নিমজ্জিত হয়ে আল্লাহ ও নিজ পরিণতি ভুলে যায়। এজন্যই زُيِّنَ لِلنَّاسِ -এর মাঝে প্রকাশভঙ্গি ব্যাপক রাখা হয়েছে।

–[তাফসীরে ওসমানী]

এ সকল বস্তুর ভালোবাসা বা আকর্ষণ বেশিরভাগ মানুষের অন্তরে জায়েজের সীমারেখা থেকে নাফরমানির কারণ ঘটে। এখানে شَهَوَاتٌ দ্বারা مُشْتَهَيَاتٌ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যে সকল বস্তু প্রকৃতগতভাবে মানুষের নিকট আকর্ষণীয় ও পছন্দনীয় হয়। এ কারণেই সেসবের প্রতি আকর্ষণ ও ভালোবাসা অপছন্দনীয় নয়। তবে শর্ত হলো তা মধ্যম পর্যায়ের এবং শরিয়তের সীমারেখার মধ্যে হবে। এগুলোকে সুশোভিত করাও আল্লাহ তা'আলার পরীক্ষাবিশেষ।

قَوْلُهُ الْمَذْكُوْرُ : **প্রশ্ন :** ذٰلِكَ -এর মুশারুন ইলাইহ اَلتَّقْلِيْلُ وَالتَّكْثِيْرُ অতএব, ইসমে ইশারা এবং মুশারুন ইলাইহ -এর মধ্যে সামঞ্জস্য নেই।

উত্তর : اَلتَّقْلِيْلُ وَالتَّكْثِيْرُ এখানে اَلْمَذْكُوْرُ তথা উল্লিখিত অর্থে। ইসমে ইশারা ও মুশারুন ইলাইহির মাঝে কাজেই সামঞ্জস্য রয়েছে।

অনুবাদ :

١٦. اَلَّذِيْنَ نَعْتٌ اَوْ بَدَلٌ مِنَ الَّذِيْنَ قَبْلَهُ يَقُوْلُوْنَ يَا رَبَّنَا اِنَّنَا اٰمَنَّا صَدَّقْنَا بِكَ وَبِرَسُوْلِكَ فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

১৬. যারা اَلَّذِيْنَ الخ এটা نَعْتٌ বা বিশেষণ কিংবা পূর্বোল্লিখিত اَلَّذِيْنَ -এর بَدَلٌ বা স্থলাভিষিক্ত বাক্য। বলে, হে আমাদের প্রভু! আমরা বিশ্বাস করেছি তোমাকে এবং তোমার রাসূলকে সত্য বলে স্বীকার করেছি সুতরাং তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা কর এবং আমাদেরকে আগুনের আজাব হতে রক্ষা কর।

١٧. اَلصّٰبِرِيْنَ عَلَى الطَّاعَةِ وَعَنِ الْمَعْصِيَةِ نَعْتٌ وَالصّٰدِقِيْنَ فِي الْاِيْمَانِ وَالْقٰنِتِيْنَ الْمُطِيْعِيْنَ لِلّٰهِ وَالْمُنْفِقِيْنَ الْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ اللّٰهَ بِاَنْ يَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا بِالْاَسْحَارِ اَوَاخِرِ اللَّيْلِ خُصَّتْ بِالذِّكْرِ لِاَنَّهَا وَقْتُ الْغَفْلَةِ وَلَذَّةِ النَّوْمِ ـ

১৭. পাপকার্য হতে বিরত থেকে আনুগত্যের কার্য পালনে তারা ধৈর্যশীল, اَلصّٰبِرِيْنَ এটা نَعْتٌ বা বিশেষণ। ঈমানের বিষয়ে সত্যবাদী, অনুগত আল্লাহর বাধ্যগত, ব্যয়কারী দান সদকাকারী, এবং ঊষাকালে রাত্রি শেষে আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থী অর্থাৎ তারা বলে, اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا 'হে আল্লাহ আমাদের ক্ষমা কর।'

রাত্রির শেষভাগ যেহেতু নিদ্রাসুখ ও অসতর্কতার সময় সেহেতু বিশেষ করে এ স্থানে এ বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে।

١٨. شَهِدَ اللّٰهُ بَيَّنَ لِخَلْقِهِ بِالدَّلَائِلِ وَالْاٰيَاتِ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ لَا مَعْبُوْدَ بِحَقٍّ فِي الْوُجُوْدِ اِلَّا هُوَ وَ شَهِدَ بِذٰلِكَ الْمَلٰئِكَةُ بِالْاِقْرَارِ وَاُولُوا الْعِلْمِ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ بِالْاِعْتِقَادِ وَاللَّفْظِ قَائِمًا بِتَدْبِيْرِ مَصْنُوْعَاتِهِ وَنَصْبُهُ عَلَى الْحَالِ وَالْعَامِلُ فِيْهَا مَعْنَى الْجُمْلَةِ اَيْ تَفَرَّدَ بِالْقِسْطِ بِالْعَدْلِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ كَرَّرَهُ تَاكِيْدًا اَلْعَزِيْزُ فِيْ مُلْكِهِ اَلْحَكِيْمُ فِيْ صُنْعِهِ ـ

১৮. আল্লাহ সাক্ষ্য দেন অর্থাৎ প্রমাণ ও নিদর্শনাবলির মাধ্যমে সকল সৃষ্টিকে তিনি সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। মূলতই আর কোনো অস্তিত্বশীল উপাস্য নেই। ফেরেশতাগণ স্বীকৃতিদানের মাধ্যমে এবং নবী ও বিশ্বাসীগণ যারা জ্ঞানের অধিকারী তারাও বিশ্বাস ও স্বীকৃতির মাধ্যমে এ বিষয়ে সাক্ষ্য দান করে। তাঁর সৃষ্টি পরিচালনায় এককভাবে তিনি ন্যায়ের মাঝে প্রতিষ্ঠিত। قَائِمًا এটা حَالٌ বা অবস্থা ও ভাববাচক পদরূপে مَنْصُوْب রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। উল্লিখিত বাক্যটির মর্মবোধক শব্দ تَفَرَّدَ [তিনি এক] এর عَامِلٌ রূপে গণ্য। اَلْقِسْطَ অর্থাৎ اَلْعَدْلَ বা ন্যায় নিষ্ঠা। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। تَاكِيْد বা জোর প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য এ বিষয়টির পুনরুক্তি করা হয়েছে। তিনি তাঁর সাম্রাজ্যে পরাক্রমশালী, তাঁর কাজে তিনি প্রজ্ঞাময়।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ نَعْتٌ اَوْ بَدَلٌ مِنَ الَّذِيْنَ قَبْلَهُ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য একটি প্রশ্ন নিরসন করা যে, اَلْعِبَادُ যা নিকটবর্তী তা থেকে বদল কিংবা সিফত, এ ধারণাকে দূর করেছেন যে, এটা اِتَّقَوْا থেকে বদল কিংবা সিফত, اَلْعِبَادُ থেকে নয়।

قَوْلُهُ يَا رَبَّنَا : يَا উহ্য মেনে ইশারা করেছেন যে, رَبَّنَا শব্দটি উহ্য يَا -এর কারণে মানসূব হয়েছে।

قَوْلُهُ نَعْتٌ : অর্থাৎ যেভাবে اَلَّذِيْنَ শব্দটি اِتَّقَوْا -এর সিফত তদ্রূপ اِتَّقَوْا ও সিফত।

قَوْلُهُ الصَّابِرُوْنَ وَالصَّادِقُوْنَ : অর্থাৎ ধৈর্যধারণকারী। ইমাম রাযী (র.) লিখেন, **ফে'ল -এর পরিবর্তে** ইসমে ফায়েল আনার কারণ হলো, সে সকল ব্যক্তির একটা বিশেষ অভ্যাস প্রকাশ করা।

قَوْلُهُ نَصْبُهُ عَلَى الْحَالِ : অর্থাৎ قَائِمًا - هُوَ থেকে হাল, اِلٰهٌ **-এর সিফত হওয়ার কারণে নয়। কেননা সিফত** ও মওসূফের মধ্যে فَصْلٌ بِالْاَجْنَبِيِّ রয়েছে।

قَوْلُهُ وَالْفَاعِلُ فِيْهَا مَعْنَى الْجُمْلَةِ : এটা মূলত একটি প্রশ্নের **উত্তর.**।

প্রশ্ন: قَائِمًا যদি মা'তুফ ও মা'তুফ আলাইহ -এর **সমষ্টি থেকে হাল হয় তাহলে প্রয়োগ** বৈধ হয় না। যদি শুধু আল্লাহ শব্দ থেকে হাল হয় তাও বৈধ নয়। যেমন- جَاءَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو رَاكِبًا এ সময় হালের কোনো আমিল থাকবে না। এর উত্তর দিয়েছেন যে, لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ বাক্যটি অর্থের দিক দিয়ে تَفَرَّدَ অর্থে। কেননা ইসতিছনা নফীর পরে একবচন হওয়ার ফায়দা দেয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ : বিশেষভাবে শেষ রাতের কথা এজন্য বলা হয়েছে যে, তা অন্তরকে মজবুত রাখা এবং রূহানী শক্তি বৃদ্ধির কারণ হয়। নফসের উপর সে সময় জাগ্রত হওয়া কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। রাতের শেষ প্রহর ছাড়া অন্য সময় ইস্তিগফার হতে পারে না- এমন উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهُ شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ (الاية) : شَهَادَتْ অর্থ হলো- বর্ণনা করা, অবহিত করা। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যে সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং বর্ণনা করেছেন, সেসবের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা নিজের একত্ববাদের প্রতি আমাদের দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। ফেরেশতা এবং আলেমগণও তাঁর একত্ববাদের সাক্ষ্য দেয়। এতে আলেমগণের বিশেষ ফজিলত ও মর্যাদাও রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা নিজের এবং ফেরেশতাদের নামের সাথে আলেমদের কথা উল্লেখ করেছেন, তবে এর দ্বারা সেসব আলেম উদ্দেশ্য- যারা কিতাব ও সুন্নাহর ইলম সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞ।

অনুবাদ :

১৯. إِنَّ الدِّيْنَ الْمَرْضِيَّ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ الْإِسْلَامُ أَيِ الشَّرْعُ الْمَبْعُوْثُ بِهِ الرُّسُلُ الْمَبْنِيَّ عَلَى التَّوْحِيْدِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِفَتْحِ أَنْ بَدَلٌ مِنْ أَنَّهُ الخ بَدَلُ اشْتِمَالٍ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى فِى الدِّيْنِ بِأَنْ وَحَّدَ بَعْضٌ وَكَفَرَ بَعْضٌ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بِالتَّوْحِيْدِ بَغْيًا مِنَ الْكٰفِرِيْنَ بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَإِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ أَيِ الْمُجَازَاةُ لَهُ .

১৯. নিশ্চয় আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় ধর্ম হলো একমাত্র ইসলাম। অর্থাৎ তাওহীদের বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত যে জীবন-বিধানসহ রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন তা। أَنَّ এটা অপর এক কেরাতে أَنَّهُ-এর بَدَل বা স্থলাভিষিক্ত বাক্যরূপে প্রথমাক্ষর ফাতাহসহ [أن রূপে] পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় এটা بَدَل اشْتِمَالٌ বা সন্নিবেশিত স্থলাভিষিক্ত পদ বলে গণ্য হবে। যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছিল অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রিস্টানরা তারা কাফেরদের প্রতি জিদবশত তাদের নিকট তাওহীদ সম্পর্কে জ্ঞান আসার পর তাদের মধ্যে ধর্ম বিষয়ে মতানৈক্য ঘটেছিল। কতকজন তাওহীদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করল এবং আর কতকজন সত্য প্রত্যাখ্যান করল। আর কেউ আল্লাহর নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করল। নিশ্চয় আল্লাহ অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। অর্থাৎ তার প্রতিফল দানে [তিনি অতিদ্রুত]।

২০. فَإِنْ حَاجُّوْكَ خَاصَمَكَ الْكُفَّارُ يَا مُحَمَّدُ فِى الدِّيْنِ فَقُلْ لَهُمْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ انْقَدْتُ لَهُ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَخُصَّ الْوَجْهُ بِالذِّكْرِ لِشَرَفِهِ فَغَيْرُهُ أَوْلٰى وَقُلْ لِلَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى وَالْأُمِّيّٖنَ مُشْرِكِى الْعَرَبِ ءَأَسْلَمْتُمْ أَيْ أَسْلِمُوْا فَإِنْ أَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا مِنَ الضَّلَالِ وَإِنْ تَوَلَّوْا عَنِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ أَيِ التَّبْلِيْغُ لِلرِّسَالَةِ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ فَيُجَازِيْهِمْ بِأَعْمَالِهِمْ وَهٰذَا قَبْلَ الْأَمْرِ بِالْقِتَالِ .

২০. হে মুহাম্মদ! যদি তারা কাফেররা তোমাদের সাথে ধর্ম বিষয়ে বিতর্কে বিতণ্ডায় লিপ্ত হয় তবে তুমি এদের বল, আমি ও আমার অনুসারীগণ আল্লাহর নিকট চেহারা সমর্পণ করেছি। অর্থাৎ তাঁর প্রতি আমরা বাধ্যগত। শরীরের মধ্যে চেহারা সর্বোৎকৃষ্ট বলে তাকে বিশেষভাবে এ স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। এটাই যখন সমর্পিত তখন অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোর তো কথাই নেই এবং যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রিস্টানগণ তাদেরকে ও নিরক্ষরদেরকে অর্থাৎ আরব মুশরিকদেরকে বল, তোমরা কি আত্মসমর্পণ করেছ? অর্থাৎ তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তবে তারা পথভ্রষ্টতা হতে হেদায়েত পাবে আর যদি তারা ইসলাম হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তোমার কর্তব্য কেবল প্রচার করা। রিসালাতের বাণী পৌঁছিয়ে দেওয়া। আল্লাহ বান্দাদের দ্রষ্টা। সুতরাং তিনি তাদের কার্যাবলির প্রতিফল দান করবেন। এ আয়াতটি যুদ্ধ সম্পর্কিত বিধান সংবলিত আয়াত নাজিল হওয়ার পূর্বের ছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ : ইসলাম এমন ধর্ম যার দাওয়াত ও তালীম প্রত্যেক নবী আপন আপন যুগে দান করেছেন। বর্তমানে তার পূর্ণাঙ্গ অবস্থা সেটাই, যাকে আখেরী জামানার নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করেছেন। এতে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের উপর এমনভাবে ঈমান ও একিন রাখতে হবে যেভাবে নবী করীম ﷺ রাখতে বলেছেন। শুধুমাত্র এমন আকিদা রাখা যে, আল্লাহ এক এবং কিছু নেক আমল করা ইসলাম নয় এবং তার দ্বারা নাজাত লাভ হবে না।

অনুবাদ :

٢١. اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ وَفِىْ قِرَاءَةٍ يُقَاتِلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ بِالْعَدْلِ مِنَ النَّاسِ وَهُمُ الْيَهُوْدُ رُوِىَ اَنَّهُمْ قَتَلُوْا ثَلٰثَةً وَاَرْبَعِيْنَ نَبِيًّا فَنَهَاهُمْ مِائَةٌ وَسَبْعُوْنَ مِنْ عِبَادِهِمْ فَقَتَلُوْهُمْ فِىْ يَوْمِهِمْ فَبَشِّرْهُمْ اَعْلِمْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ مُؤْلِمٍ وَذِكْرُ الْبِشَارَةِ تَهَكُّمٌ لَهُمْ وَدَخَلَتِ الْفَاءُ فِىْ خَبَرِ اِنَّ لِشِبْهِ اِسْمِهَا الْمَوْصُوْلِ بِالشَّرْطِ.

২১. যারা আল্লাহর নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করে, অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করে يَقْتُلُوْنَ এটা অপর এক কেরাতে يُقَاتِلُوْنَ রূপে পঠিত রয়েছে। এবং যারা মানুষের মধ্যে ন্যায়ের ইনসাফের নির্দেশ দেয় তাদেরকে হত্যা করে এরা হলো ইহুদি সম্প্রদায়। বর্ণিত আছে যে, তারা তেতাল্লিশজন নবীকে হত্যা করে। তখন তাদের দাসদের একশত সত্তরজন এর নিষেধ করলে ঐদিন তাদেরও তারা হত্যা করে। তুমি তাদের মর্মন্তুদ শাস্তির সুসংবাদ দাও ঘোষণা দাও। এ স্থানে ব্যঙ্গার্থে এটাকে সুসংবাদ রূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। اِنَّ-এর اِسْم এখানে اِسْمِ مَوْصُوْل বা সংযোজনবাচক বিশেষ্য [اَلَّذِيْنَ]। এই اَلَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ الخ বাক্যাংশটি শর্তবাচক অর্থ প্রকাশ করায় এটা শর্ত -এর অনুরূপ, ফলে তার خَبَرْ বা বিধেয় فَبَشِّرْهُمْ -এ فَ ব্যবহার করা হয়েছে।

٢٢. اُولٰۤئِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ بَطَلَتْ اَعْمَالُهُمْ مَا عَمِلُوْهُ مِنْ خَيْرٍ كَصَدَقَةٍ وَصِلَةِ رَحِمٍ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَلَا اعْتِدَادَ بِهَا لِعَدَمِ شَرْطِهَا وَمَا لَهُمْ مِنْ نّٰصِرِيْنَ مَانِعِيْنَ لَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ.

২২. এসব লোক, এদের কার্যাবলি অর্থাৎ যে সমস্ত ভালো কাজ তারা করেছে। যেমন– দান-সাদকা, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা ইত্যাদি তা ইহকালে ও পরকালে নিষ্ফল হবে। বাতিল বলে গণ্য হবে। কারণ শর্ত অর্থাৎ ঈমান না থাকায় এসব আমল কোনো ধর্তব্যের হবে না। তাদের কোনো সাহায্যকারী হবে না। শাস্তি থেকে কোনো রক্ষাকারী থাকবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ : অর্থাৎ তাদের অহংকার ও বিদ্রোহ এ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল যে, তারা শুধু নবীদেরকেই অন্যায়ভাবে হত্যা করেনি; বরং যারা হক ও ইনসাফের কথা বলত তাদেরকেও হত্যা করেছে। অর্থাৎ যারা খাঁটি ঈমানদার ছিল, সত্যের প্রতি মানুষদেরকে আহ্বান করত, সৎকাজের আদেশ ও অন্যায় কাজে নিষেধকে নিজের দায়িত্ব মনে করত।

قَوْلُهُ وَفِىْ قِرَاءَةٍ يُقَاتِلُوْنَ : ব্যাখ্যাকার এ মতভেদকে সামনের يَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ-এর পরে উল্লেখ করলে আরও ভালো হতো। কারণ মতভেদটি দ্বিতীয় يَقْتُلُوْنَ শব্দের ক্ষেত্রে।

قَوْلُهُ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ : অর্থাৎ, যে সকল কাজের উপর তারা অত্যন্ত আনন্দিত হচ্ছে এবং মনে করছে যে, আমরা অনেক ভালো কাজ করছি তাদেরকে বলে দিন যে, তোমাদের সে সকল কাজের পরিণাম এই।

অনুবাদ :

٢٣. اَلَمْ تَرَ تَنْظُرْ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا نَصِيْبًا حَظًّا مِنَ الْكِتٰبِ التَّوْرٰىةِ يُدْعَوْنَ حَالٌ اِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ عَنْ قَبُوْلِ حُكْمِهٖ نَزَلَ فِى الْيَهُوْدِ زَنٰى مِنْهُمْ اثْنَانِ فَتَحَاكَمُوْا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَحَكَمَ عَلَيْهِمَا بِالرَّجْمِ فَاَبَوْا فَجِيْئَ بِالتَّوْرٰىةِ فَوُجِدَ فِيْهَا فَرُجِمَا فَغَضِبُوْا ـ

২৩. তুমি কি তাদেরকে দেখনি লক্ষ্য করনি যাদেরকে কিতাবের اَلَّذِيْنَ يُدْعَوْنَ হলো -এর حَالٌ অর্থাৎ ভাব ও অবস্থাবাচক পদ। তাওরাতের অংশ কিছু হিস্যা প্রদান করা হয়েছিল? তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের দিকে আহ্বান করা হয়েছিল যাতে তা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়। অতঃপর তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়, আর তারাই তাঁর বিধান গ্রহণে পরাঙ্মুখ। একবার ইহুদিদের দুই ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তারা রাসূল ﷺ -এর কাছে তার বিচার নিয়ে আসে। তখন তিনি তাদেরকে 'রজম' বা প্রস্তর নিক্ষেপে সংহার করার নির্দেশ দেন। কিন্তু তারা এ নির্দেশ মানতে অস্বীকার করে। শেষে তাওরাত নিয়ে আসা হলে এতেও ঐ বিধান পাওয়া যায়। [তখন বাধ্য হয়ে] উক্ত দুই ব্যাভিচারীকে রজম করা হয়। ফলে তারা খুব রাগ করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেছিলেন।

٢٤. ذٰلِكَ التَّوَلِّىْ وَالْاِعْرَاضُ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اَىْ بِسَبَبِ قَوْلِهِمْ لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا مُدَّةَ عِبَادَةِ اٰبَائِهِمُ الْعِجْلَ ثُمَّ تَزُوْلُ عَنْهُمْ وَغَرَّهُمْ فِىْ دِيْنِهِمْ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهٖ مَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ مِنْ قَوْلِهِمْ ذٰلِكَ ـ

২৪. এটা অর্থাৎ এ মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ও পরাঙ্মুখ হওয়া এ হেতু যে, তারা বলে যে অর্থাৎ তাদের এ উক্তির কারণে, কয়েক দিন ব্যতীত অর্থাৎ চল্লিশ দিন, যে কয়েক দিন তাদের পূর্বপুরুষরা গোবৎসের পূজা করেছিল অগ্নি আমাদের স্পর্শ করবে না উক্ত কতকদিন পর তা তাদের উপর হতে অপসারিত হবে। নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে তাদের এ মিথ্যা উদ্ভাবন উক্ত মিথ্যা কথন তাদেরকে প্রবঞ্চিত করেছে। فِىْ دِيْنِهِمْ এটা مَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট।

٢٥. فَكَيْفَ حَالُهُمْ اِذَا جَمَعْنٰهُمْ لِيَوْمٍ اَىْ فِىْ يَوْمٍ لَّا رَيْبَ شَكَّ فِيْهِ هُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَغَيْرِهِمْ جَزَاءَ مَا كَسَبَتْ عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ وَهُمْ اَىِ النَّاسُ لَا يُظْلَمُوْنَ بِنَقْصِ حَسَنَةٍ اَوْ زِيَادَةِ سَيِّئَةٍ ـ

২৫. কিভাবে তাদের কি অবস্থা হবে? সেদিন, যাতে কোনো সন্দেহ সংশয় নেই অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যখন আমি তাদেরকে একত্র করব এবং কিতাবী বা অন্যান্য প্রত্যেককে তার অর্জিত কর্মের ভালো বা মন্দ যা সে করেছে তার পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি অর্থাৎ লোকদের প্রতি সৎ আমল হ্রাস করে বা মন্দ আমল বাড়িয়ে দিয়ে কোনো অন্যায় করা হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য বিষয় : এখানে সত্য ও অসত্যের আহ্বানকারীদের সাথে ইহুদিদের হঠকারিতা, বিরোধিতা, বিদ্বেষ ও এড়িয়ে চলার চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

قَوْلُهُ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِنَ الْكِتٰبِ : এসব আহলে কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য মদিনার ইহুদিরা, যাদের অধিকাংশই ইসলাম গ্রহণ থেকে বঞ্চিত ছিল। তারা ইসলাম ও মুসলমান এবং তাদের নবীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। ফলে একটি গোত্রকে এবং দুটি গোত্রকে দেশান্তর করা হয়েছিল।

ইহুদিরা তাদের ধর্মীয় গ্রন্থেরও অনুসরণ করে না : তাদেরকে যখন আহ্বান করা হয় যে, পাক কুরআনের দিকে আস, যা তোমাদের স্বীকৃত কিতাবসমূহের দেওয়া ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী অবতীর্ণ এবং যা তোমাদের নিজেদের মতবিরোধসমূহের যথাযথ মীমাংসা দানকারী তখন তাদের ধর্মবেত্তাদের এক শ্রেণী অবজ্ঞাভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অথচ পাক কুরআনের প্রতি আহ্বান প্রকৃতপক্ষে তাওরাত ইঞ্জিলের প্রতি আহ্বান; বরং অসম্ভব নয় যে, এ স্থলে মহান আল্লাহর কিতাব বলতে তাদের তাওরাত ও ইঞ্জিলকেই বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ ধর, আমরা তোমাদের ঝগড়ার ফয়সালা তোমাদের কিতাবের উপরই ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু পরিহাসের কথা, তারা নিজেদের কুপ্রবৃত্তি ও তুচ্ছ স্বার্থের বশবর্তী হয়ে নিজেরদের কিতাবের নির্দেশনা হতেও মুখ ফিরিয়ে নেয়। না তার ভবিষ্যদ্বাণী শোনে, না তার নির্দেশে কর্ণপাত করে। তাইতো তারা ব্যভিচারীর রজম [প্রস্তারাঘাতে হত্যা] -এর ক্ষেত্রে তাওরাতের সুস্পষ্ট নির্দেশকে পাশ কাটিয়ে যায়। যেমনটা সূরা মায়িদায় আসবে। −[তাফসীরে ওসমানী]

لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ : তাদের সকল ধর্মীয় মতবিরোধের মীমাংসার জন্যে।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ : অর্থাৎ, তারা ঐ গ্রন্থ মানতে অস্বীকার করার কারণ হলো তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, তারা তো দোজখে প্রবেশ করবেই না। যদি প্রবিষ্ট হয়ই, তবে তা সামান্য কয়েকদিনের জন্যে হবে। তাদের এ মনগড়া দাবি তাদেরকে প্রতারিত করেছে। তারা মনে করে তারা আল্লাহর অতি প্রিয়, আমরা যা কিছুই করি না কেন, বেহেশত আমাদের জন্যেই নির্ধারিত। আমরা ঈমানদার, আমরা অমুকের বংশধর এবং অমুক নবীর উম্মত। কাজেই আমাদেরকে আগুনে স্পর্শ করার কোনো ক্ষমতা নেই। আর যদি স্পর্শ করেও তাহলে পাপমুক্ত করার জন্যে কয়েকদিনের জন্য হতে পারে, এরপর আমরা বেহেশতে প্রবেশ করব। এ ভ্রান্ত ধারণা তাদেরকে এত নির্ভীক বানিয়ে দিয়েছে যে, তারা কঠোর থেকে কঠোর অন্যায়ে লিপ্ত হতে দ্বিধাবোধ করে না।

قَوْلُهُ مَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ : আকায়েদ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ সম্পর্কে কোনো প্রমাণহীন অযৌক্তিক তথ্যহীন বক্তব্য ও বিশ্বাস নিজেরা মনগড়াভাবে সৃষ্টি করে মহান আল্লাহর নামে ভিত্তিহীনভাবে তা চালিয়ে দেওয়াকে 'ইফতিরা' বা 'ভিত্তিহীন মনগড়া মিথ্যাচার' বলা হয়। আর ইহুদিগণ তাদের ধর্মবিশ্বাসে অসংখ্য মনগড়া ভিত্তিহীন মিথ্যা রটনা করে এগুলোকে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের সপক্ষে কল্পিত 'রক্ষাকবচ' বানিয়ে নিয়েছিল। আর তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসমূহের মধ্যে এটিও উল্লেখযোগ্য ছিল যে, [শুধু নামে মাত্র চল্লিশ দিন ব্যতীত] জাহান্নাম তাদের জন্য হারাম। তাদের বুজুর্গদের সাথে সম্পর্ক ও বুজুর্গদের সুপারিশই তাদের নাজাতের জন্যে যথেষ্ট। তাদের নাজাত ঈমান ও আমল ব্যতীত আপনা-আপনিই হয়ে যাবে।

فَكَيْفَ : এ প্রশ্নবোধক শব্দ আজাবের ভয়াবহতা, নিষ্ঠুরতা ও কঠোরতা বুঝানোর জন্যেই ব্যবহৃত হয়েছে।

وَوُفِّيَتْ : কারো উপর কোনো জুলুম করা হবে না। অর্থাৎ কাউকেও বিনা অপরাধে অথবা অপরাধের মাত্রার চেয়ে শাস্তির পরিমাণ বেশি দেওয়া হবে না এবং কেউ তার সৎকর্মের প্রতিদান হতে বঞ্চিত হবে না।

অনুবাদ :

২৬. وَنَزَلَ لَمَّا وَعَدَ ﷺ اُمَّتَهُ مُلْكَ فَارِسَ وَالرُّوْمِ فَقَالَ الْمُنَافِقُوْنَ هَيْهَاتَ قُلِ اللّٰهُمَّ يَا اللّٰهُ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى تُعْطِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاۤءُ مِنْ خَلْقِكَ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاۤءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاۤءُ بِاِيْتَائِهِ اِيَّاهُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاۤءُ بِنَزْعِهِ مِنْهُ بِيَدِكَ بِقُدْرَتِكَ الْخَيْرُ اَىْ وَالشَّرُّ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ .

২৬. রাসূল ﷺ একদিন রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য মুসলমানদের করতলগত হবে বলে যখন উম্মতকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তখন মুনাফিকরা উপহাস করে বলেছিল, ইস, কেমন [পাগলের] কথা! এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন– বল, আল্লাহুম্মা হে আল্লাহ ! সকল সাম্রাজ্যের অধিপতি তুমি তোমার সৃষ্টির যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর تُؤْتِىْ অর্থ– تُعْطِىْ বা প্রদান কর। এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নাও। যাকে সম্মান দানের ইচ্ছা কর তাকে সম্মান দাও এবং তা ছিনিয়ে যাকে ইচ্ছা তুমি হীন কর। তোমার হস্তেই তোমার ক্ষমতায়ই কল্যাণ এবং অকল্যাণ। তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

২৭. تُوْلِجُ تُدْخِلُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ تُدْخِلُهُ فِى الَّيْلِ فَيَزِيْدُ كُلَّ مِنْهُمَا بِمَا نَقَصَ مِنَ الْاٰخَرِ وَتُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ كَالْاِنْسَانِ وَالطَّائِرِ مِنَ النُّطْفَةِ وَالْبَيْضَةِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ كَالنُّطْفَةِ وَالْبَيْضَةِ مِنَ الْحَىِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاۤءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ اَىْ رِزْقًا وَاسِعًا .

২৭. তুমিই রাত্রিকে দিবসে পরিণত কর প্রবিষ্ট কর এবং দিবসকে রাত্রিতে পরিণত কর প্রবিষ্ট কর। ফলে একটিতে যতটুকু হ্রাস পায় অন্যটিতে ততটুকু বৃদ্ধি পায়। তুমিই মৃত হতে জীবন্তের যেমন– বীর্য হতে মানুষের এবং ডিম হতে পাখির আবির্ভাব ঘটাও, আবার জীবন্ত হতে মৃতের যেমন– বীর্য এবং ডিমের আবির্ভাব ঘটাও। তুমি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিজিক প্রচুর জীবনোপকরণ দান কর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ : **সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর :** পূর্বেই বলা হয়েছে, নাজরান প্রতিনিধি দলের নেতা **আবূ হারিছা** ইবনে আলকামা বলেছিল, হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর ঈমান আনলে রোম সম্রাট আমাদেরকে যে সম্মান ও **অর্থকড়ি** দেয় তা সব বন্ধ করে দেবে। সম্ভবত এ স্থলে দোয়া ও মুনাজাত আকারে তার সে উক্তির জবাব দেওয়া হয়েছে যে, **তোমরা রাজা**-বাদশার ক্ষমতা ও তাদের দেওয়া সম্মান দ্বারা প্রতারিত হও। জেনে রেখ, সার্বভৌম ক্ষমতা ও সম্মানের আসল **মালিক আল্লাহ** তা'আলা। যাকে ইচ্ছা দেওয়া ও যাকে ইচ্ছা বঞ্চিত করার ক্ষমতা তাঁরই হাতে। এটা কি সম্ভব নয় যে, তিনি

রোম ও পারস্যের রাজত্ব ও মর্যাদা কেড়ে নিয়ে মুসলিমগণকে দান করবেন? বরং মহান আল্লাহর ওয়াদা রয়েছে, তিনি এটা অবশ্যই করবেন। আজ মুসলিম সমাজের সহায়-সম্বলহীনতা ও শত্রুদের দাপট দেখে তোমাদের এটা বুঝে না আসারই কথা। এ কারণেই তো ইহুদি ও মুনাফিকরা এই বলে ঠাট্টা করত যে, কুরাইশদের আক্রমণের ভয়ে ভীত হয়ে যারা মদিনার চারপাশে পরিখা খনন করছে, সেই মুসলমান আবার কায়সার ও কিসরার মুকুট ও সিংহাসন দখলের স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কয়েক বছরের মধ্যেই দেখিয়ে দেন যে, রোম ও পারস্যের ধনভাণ্ডারসমূহের চাবিগুচ্ছ তিনি তাঁর প্রিয়নবীর হাতে তুলে দেন। হযরত ফারূকে আযম (রা.)-এর আমলে তা মুসলিম মুজাহিদগণের মাঝে বণ্টিত হয়।

আসলে এ বৈষয়িক ক্ষমতা ও সম্পদের আর কি মূল্য! সর্বশক্তিমান ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ রূহানী ক্ষমতা ও ইজ্জতের শীর্ষস্থান তথা নবুয়ত ও রিসালাতের পদমর্যাদাই যখন বনী ইসরাঈল থেকে কেড়ে বনী ইসমাঈলকে দান করলেন, তখন রোম ও আরব বিশ্বের প্রকাশ্য রাজত্ব যাযাবর আরবদের হাতে তুলে দেওয়ার মাঝে আশ্চর্যের কি আছে? এ প্রার্থনা যেন এক রকম ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, অতি সত্বর বিশ্বমানচিত্রে এক বিরাট পরিবর্তন আসবে। যে জাতি সভ্যতা বিবর্জিত হয়ে আলাদা পড়ে রয়েছে। তারা রাজক্ষমতা ও মহামর্যাদার অধিকারী হবে। এ যাবৎ যারা রাজত্ব করছিল তারা নিজেদের কর্মদোষে পতন ও হীনতার অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হবে। -[তাফসীরে ওসমানী]

مَنْ تَشَاءُ এর শর্ত প্রত্যেক ব্যাপারে প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞগণ এ রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন যে, সম্পদ রাজ্য, শাসন ক্ষমতা ইত্যাদি নিয়ামত বণ্টনের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির সামগ্রিক কল্যাণের যোগ্যতার মাপকাঠিতে প্রাকৃতিক বিধানের ভিত্তিতেই সম্পাদন করেন। এসব নিয়ামত বণ্টনের ব্যাপারে মহান আল্লাহর নৈকট্য ও নৈতিক মূল্যবোধের দৃষ্টিভঙ্গী বিবেচিত নয় এবং নৈতিক উৎকর্ষতার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহান আল্লাহর প্রিয় ও নিকটতম হওয়া এসব প্রাকৃতিক নিয়ামত বণ্টনের নীতির সাথে আদৌ সম্পর্কিত নয়।

بِيَدِكَ الْخَيْرُ : অর্থাৎ মহান আল্লাহরই হাতে সর্বপ্রকার কল্যাণ। মন্দের সৃষ্টিও মৌলিকভাবে কল্যাণই বটে। কেননা সামগ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এর মাঝে বহু কল্যাণ নিহিত রয়েছে। সহীহ হাদীসে আছে- اَلْخَيْرُ كُلُّهُ فِىْ يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ অর্থাৎ, যাবতীয় কল্যাণ তোমার হাতে, অকল্যাণ তোমার দিকে নয়। -[তাফসীরে উসমানী]

অনুবাদ :

২৮. لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ يُوَالُوْنَهُمْ مِنْ دُوْنِ اَىْ غَيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ اَىْ يُوَالِيْهِمْ فَلَيْسَ مِنْ دِيْنِ اللّٰهِ فِىْ شَىْءٍ اِلَّا اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰةً مَصْدَرُ تُقْيَةٍ اَىْ تَخَافُوْا مَخَافَةً فَلَكُمْ مُوَالَاتُهُمْ بِاللِّسَانِ دُوْنَ الْقَلْبِ وَهٰذَا قَبْلَ عِزَّةِ الْاِسْلَامِ وَيَجْرِىْ فِىْ مَنْ هُوَ فِىْ بَلَدٍ لَيْسَ قَوِيًّا فِيْهَا وَيُحَذِّرُكُمُ يُخَوِّفُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ اَىْ اَنْ يَغْضَبَ عَلَيْكُمْ اِنْ وَالَيْتُمُوْهُمْ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ الْمَرْجِعُ فَيُجَازِيْكُمْ .

২৮. বিশ্বাসীগণ যেন বিশ্বাসীগণ ব্যতীত এদের ছাড়া অবিশ্বাসীদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ না করে। তাদের সাথে যেন বন্ধুত্ব-সম্পর্ক না রাখে। যে কেউ এমন করবে অর্থাৎ তাদের সাথে বন্ধুত্ব সম্পর্ক রাখবে তার সাথে আল্লাহর দীনের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। তবে হ্যাঁ যদি তোমরা তাদের কোনো ভয়ের আশঙ্কা কর। تُقَاةً এটা এ স্থানে مَصْدَرْ বা সমধাতুজ কর্ম। অর্থাৎ ভয় করার মতো [তোমাদের অবস্থা] হলে এদের সাথে তোমাদের মৌখিক বন্ধুত্ব হতে পারে; অন্তর হতে নয়। এ বিধান ইসলামের শক্তি ও গৌরব অর্জনের পূর্বে ছিল। বর্তমানে যে সমস্ত নগরে [অঞ্চলে] ইসলামপন্থিদের শক্তি নেই সেসব স্থানেও এ বিধান প্রযোজ্য। আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর নিজের সম্পর্কে সতর্ক করছেন। ভয় দেখাচ্ছেন যে, যদি এদের সাথে তোমরা বন্ধুত্ব পোষণ কর তবে তিনি তোমাদের উপর ক্রোধান্বিত হবেন। আর আল্লাহর দিকেই হলো প্রত্যাবর্তন। সে দিকেই ফিরতে হবে। অনন্তর তিনি তোমাদেরকে প্রতিফল দান করবেন।

২৯. قُلْ لَهُمْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِىْ صُدُوْرِكُمْ قُلُوْبِكُمْ مِنْ مُوَالَاتِهِمْ اَوْ تُبْدُوْهُ تُظْهِرُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ وَهُوَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ وَمِنْهُ تَعْذِيْبُ مَنْ وَالَاهُمْ .

২৯. এদেরকে বল, তোমাদের অন্তরে যা আছে অর্থাৎ এদের প্রতি যে বন্ধুত্ব তোমাদের হৃদয়ে আছে তা তোমরা গোপন কর বা ব্যক্ত কর প্রকাশ কর আল্লাহ তা অবগত আছেন এবং তিনি আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে তাও অবগত আছেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। যারা এদের অর্থাৎ কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করে তাদের শাস্তি প্রদানও এর অন্তর্গত।

৩০. وَاذْكُرْ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْهُ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْهُ مِنْ سُوْءٍ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ اَمَدًا بَعِيْدًا غَايَةً فِىْ نِهَايَةِ الْبُعْدِ فَلَا يَصِلُ اِلَيْهَا وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ كَرَّرَهُ لِلتَّاكِيْدِ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ .

৩০. স্মরণ কর যেদিন প্রত্যেকে সে যে ভালোকাজ করেছে তা উপস্থিত পাবে এবং সে যে মন্দকাজ করেছে তা উপস্থিত পাবে। مَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ এটা مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য। تَوَدُّ الخ এটা خَبَرٌ বা বিধেয়। সেদিন সে কামনা করবে সে এবং এর মধ্যে যদি দূর ব্যবধান ঘটে যেত। চূড়ান্ত পর্যায়ের দূরত্ব হতো যে সে পর্যন্ত যেন পৌঁছতে না পারে। আল্লাহ তাঁর নিজের সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করছেন। تَاكِيْد বা জোর সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এর পুনরোক্তি করা হয়েছে। আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র।

তাহকীক ও তারকীব

يُوَالُوْنَهُمْ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, اَوْلِيَاءَ শব্দটি وَلِىٌّ [অর্থ– ভালোবাসা] থেকে গৃহীত, اِسْتِعَانَةٌ থেকে নয়।

تُقٰةً : এটা تُقْيَةً -এর মাফউলে মুতলাক, অর্থ– বিরত থাকা, হেফাজত করা। শব্দটি মূলত وَقْيَةً ছিল, وَاوْ-কে تَاءْ দ্বারা ও ى-কে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করে تَاء -কে বিলুপ্ত وَاوْ বুঝানোর জন্যে পেশ দেওয়া হয়েছে। –[হাশিয়ায়ে জামাল]

تَقْيَةً : مَصْدَر رَمْيَةٌ এর ওজনে।

وَفِى الْمُخْتَارِ : تَقٰى يَتْقِىْ كَقَضٰى يَقْضِىْ وَالتَّقْوٰى وَالتُّقٰى وَاحِدٌ وَالتُّقَاةُ وَالتَّقِيَّةُ . يُقَالُ اِتَّقٰى تَقِيَّةً وَتُقَاةً وَفِى الْقَامُوْسِ : تَقَيْتُ الشَّيْءَ اَتْقِيْتُهُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ . (جمل : ٣٩٥)

قَوْلُهُ اَنْ يَغْضَبَ عَلَيْكُمْ : এর দ্বারা মুযাফ বিলুপ্ত থাকার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এর দ্বারা ঐ সকল লোকদের কথা খণ্ডন করা হয়েছে যারা تُقٰةً -কে মাফউল সাব্যস্ত করেন। কেননা মাফউল হলো মাজায। আর মাজায বিনা প্রয়োজনে উদ্দেশ্য নেওয়া ঠিক নয়।

خَبَرُهُ تَوَدُّ -এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, وَمَا عَمِلَتْ -এর আতফ تَجِدُ -এর মা'মূলের উপর নয়; বরং এটা মুবতাদা, এর খবর হলো تَوَدُّ কেননা এ সময় عَمِلَتْ . تَوَدُّ -এর সর্বনাম থেকে হাল হবে। আর সাহায্য না করার কারণে হাল হওয়া সঙ্গত নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ : **কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন** : কর্তৃত্ব ও রাজক্ষমতা, সম্মান ও মর্যাদা এবং সর্বপ্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধনের লাগাম যখন একমাত্র মহান আল্লাহরই হাতে, তখন সেই মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী মুসলিমগণের জন্যে এটা কিছুতেই শোভনীয় নয় যে, তারা তাদের মুসলিম ভাইদের ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বে সন্তুষ্ট না থেকে অনর্থক মহান আল্লাহর দুশমনদের সাথে বন্ধুত্ব করতে অগ্রসর হবে। মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দুশমনরা কখনই তাদের দোস্ত হতে পারে না। এ ধোঁকায় যারা পড়বে, তারা জেনে রাখুক, মহান আল্লাহর বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা তাদের নসিবে নেই। একজন মুসলিমের আশা-নিরাশা শুধু আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের সাথেই সম্পৃক্ত থাকা উচিত। মহান আল্লাহর সাথে এরূপ সম্পর্ক যাদের আছে তারাই তাঁর আস্থা ও ভালোবাসা এবং তাঁর সাহায্য-সহযোগিতার উপযুক্ত হতে পারে। হ্যাঁ, কৌশলগত কারণে কাফেরদের অনিষ্ট হতে আত্মরক্ষার উপায় হিসেবে শরিয়তসম্মত ও যুক্তিযুক্ত নীতিতে যদি তাদের সাথে মৈত্রী স্থাপন করা হয়, তবে সেটা ব্যতিক্রম। যেমন– যুদ্ধ ক্ষেত্রে ঠিক এ রকমই এক ব্যতিক্রম।

সম্পর্কে সূরা আনফালে ইরশাদ হয়েছে– مَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ সেদিন কেউ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলে সে তো মহান আল্লাহর বিরাগভাজন হবে এবং তার আশ্রয় জাহান্নাম আর তা কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল, তবে যুদ্ধকৌশল অবলম্বন কিংবা দলে স্থান নেওয়ার জন্যে হলে তা ব্যতিক্রম। [৮ : ১৬] তো কৌশল অবলম্বন বা দলে স্থান নেওয়ার জন্যে পিছপা হলে তা যেমন সত্যিকারের পৃষ্ঠপ্রদর্শন হয়ে যায় না; বরং বাহ্যদৃষ্টিতে হয় মাত্র, তেমনি এখানেও اِلَّا اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰةً -কে সত্যিকারের বন্ধুত্ব না বুঝে কেবল আপাতদৃষ্টিতেই বন্ধুত্ব মনে করা উচিত। আমরা এটাকে مُرَاعَاةٌ অর্থাৎ সৌজন্যমূলক আচরণ বলে থাকি। –[তাফসীরে ওসমানী]

এ আয়াতে কাফের, নাস্তিক মহান আল্লাহর নাফরমানদের সাথে মুসলমানগণের বন্ধুত্ব করাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বুদ্ধি-বিবেচনা ও যৌক্তিকতার দিক হতে মুসলমান ও কাফেরের বন্ধত্ব সম্ভব নয় এবং আদর্শিক দিক হতেও পরস্পর বিরোধী চিন্তা-বিশ্বাস ও কর্মতৎপরতায় লিপ্ত ব্যক্তিদের সাথে বন্ধুত্ব ও [illegible] জাতীয় চেতনা, আত্মমর্যাদা বোধ ও ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ পরিপন্থি।

مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ 'মু'মিন ব্যতীত।' অর্থাৎ মু'মিনগণকে বাদ দিয়ে কাফেরদের সাথে অথবা মু'মিনের **সাথে মিলে** কাফেরদের সাথে অর্থাৎ কিছু কিছু বন্ধু মু'মিন ও কিছু কিছু কাফের উভয় প্রকারই নিষিদ্ধ।

أَوْلِيَاءَ : শব্দটি وَلِيٌّ-এর বহুবচন– وَلِيٌّ এমন বন্ধুকে বলে যার প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা ও বিশেষ সম্পর্ক থাকে। **উদ্দেশ্য** এই যে, মু'মিনদের পরস্পরে বিশেষ সম্বন্ধ ও আন্তরিক ভালোবাসা থাকে। আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে এ বিষয় থেকে কঠোর নিষেধ করেছেন যে, তারা যেন কাফেরদেরকে তাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু না বানায়। কারণ কাফের হলো আল্লাহর এবং মু'মিনদের শত্রু। কাজেই তাদেরকে মিত্র ভাবার কোনো প্রশ্নই আসে না এবং শরিয়ত মতে তা বৈধ হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়বস্তুকে কুরআনের কয়েক জায়গায় অতি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন, যাতে ঈমানদারগণ কাফেরদের সাথে মৈত্রী, বন্ধুত্ব ও বিশেষ সম্পর্ক থেকে দূরে থাকে। অবশ্য প্রয়োজন মাফিক ও বিশেষ মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের সাথে সন্ধি ও চুক্তি করা যেতে পারে এবং ব্যবসায়িক লেনদেনও করা যেতে পারে। এভাবে যে সকল কাফের মুসলমানদের শত্রু নয়, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং সদাচার করা বৈধ।

قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُ تُقَٰةً : হ্যাঁ, যদি কাফেরদের তরফ হতে তোমাদের ক্ষতির কোনো আশঙ্কা থাকে, তবে এমন ক্ষেত্রে ক্ষতির আশঙ্কা মুক্তির জন্যে যতটুকু বাহ্যিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করা দরকার, শুধু ততটুকু সম্পর্ক স্থাপন করা অনুমোদনযোগ্য। কাফেরদের সম্পর্কে তিনটি সম্ভাব্য অবস্থা হতে পারে। যথা–

১. তাদের সাথে বন্ধুত্ব ও হৃদ্যতা।
২. বাহ্যিক সৌজন্য, উত্তম চারিত্রিক ব্যবহার, মানবীয় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও উদার ব্যবহার।
৩. ভদ্র আচরণ ও মানবীয় সম্পর্কের বুনিয়াদে তাদের উপকার ও কল্যাণ সাধন। এক্ষেত্রে ইসলামি আইন ও শরিয়তবিদগণের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত হলো, কাফেরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব ও গভীর সম্পর্ক স্থাপন কোনো অবস্থায়ই জায়েজ নয়। তৃতীয় অবস্থা খুব কঠিন নয়। মানবীয় প্রেম, সৌজন্য, কল্যাণ ও উপকার মুসলমানগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত কাফেরদের সাথে জায়েজ নেই। যাদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও শান্ত পরিবেশে বসবাস করছ, এমন ধরনের কাফেরদের সাথেও মানুষ হিসেবে সম্পর্ক রক্ষা ও উপকার সাধন করা বৈধ ও সঙ্গত। বাহ্যিক সৌজন্য ও মানবীয় সম্পর্ক স্থাপন উত্তম আচরণ তিন অবস্থায় বৈধ। যথা–

১. ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষার জন্যে।
২. কাফেরের দীনি ফায়েদার লক্ষ্যে অর্থাৎ তার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে হেদায়েতের পথে অগ্রসরের উদ্দেশ্যে।
৩. কাফের যখন মেহমান [অতিথি] হিসেবে আগমন করে তখন মেহমানের ইকরাম তথা সম্মান প্রদর্শনের জন্যে। এ তিন অবস্থা ব্যতীত নিজের স্বার্থ উদ্ধার, মর্যাদা বৃদ্ধি, নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির জন্যে কোনো কাফেরের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা কোনো মতেই জায়েজ নয়। আর কাফেরের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ফলে যদি নৈতিক-ধর্মীয় অবস্থার অবক্ষয় ও ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, এমতাবস্থায় তাদের সাথে মিলামিশা ও সম্পর্ক স্থাপন করা আরো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

قَوْلُهُ وَإِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ : অর্থাৎ তোমাদেরকে যখন অবশ্যই মহান আল্লাহর দরবারেই ফিরে যেতে হবে, তোমাদের **চিরন্তন** বাসস্থান যখন মহান আল্লাহরই সমীপে, তখন সে আল্লাহ তা'আলার প্রকাশ্য ও গোপন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সকল **প্রকার হুকুমের** অবাধ্যতা থেকে বিরত থেকো। এ আয়াতে মহান আল্লাহর প্রিয় রাসূল ﷺ-এর মাধ্যমে সকল মানুষকেই **সম্বোধন** করা হয়েছে।

قَوْلُهُ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيْدًا : কিয়ামতের দিন কাফেরদের আফসোস : অর্থাৎ 'তার বদআমল ও তার **প্রতিদানের** এ দৃশ্য যদি তাকে অবলোকন করতে না হতো! এ আফসোস তাদের হৃদয়েই সৃষ্টি হবে যাদের কাছে তাদের **ভালো ও মন্দ** উভয় ধরনের আমলের স্তূপ হাজির হবে এবং এমতাবস্থায় যে, হতভাগ্যের সামনে শুধু বদ আর বদের স্তূপই **পরিলক্ষিত হবে**। তার করুণ অবস্থার কথা কি কল্পনা করা যায়? بَيْنَهَا সর্বনামটি মানুষের নিজের দিকে আর بَيْنَهُ **-এর সর্বনামটি** কিয়ামত দিবসের দিকে অর্থাৎ সে আফসোস করে বলবে– আহা! আমার আমলসহ আমার ও কিয়ামত **দিবসের মধ্যে যদি আরও** বিস্তর ব্যবধান থাকত! আমার সমস্ত কর্মের এ প্রতিদান দিবসটি যদি আরও অনেক দেরিতে **অনুষ্ঠিত হতো!**

অনুবাদ :

٣١. وَنَزَلَ لَمَّا قَالُوا مَا نَعْبُدُ الْاَصْنَامَ اِلَّا حُبًّا لِلّٰهِ لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَيْهِ قُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ بِمَعْنٰى اَنَّهُ يُثِيْبُكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ لِمَنِ اتَّبَعَنِىْ مَا سَلَفَ مِنْهُ قَبْلَ ذٰلِكَ رَحِيْمٌ بِهٖ .

৩১. মুশরিকগণ বলত, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার কারণেই আমরা প্রতিমাপূজা করে থাকি যেন এগুলোর মাধ্যমে আমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন– হে মুহাম্মদ! এদেরকে বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস তবে আমার অনুসরণ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন। অর্থাৎ তিনি তোমাদেরকে পুণ্যফল দান করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করবে তার তরফ হতে পূর্বে যা ঘটে গেছে অর্থাৎ গুনাহ ইত্যাদি আল্লাহ তৎপ্রতি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, তার প্রতি পরম দয়ালু।

٣٢. قُلْ لَهُمْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فِيْمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖ مِنَ التَّوْحِيْدِ فَاِنْ تَوَلَّوْا اَعْرَضُوْا عَنِ الطَّاعَةِ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ فِيْهِ اِقَامَةُ الظَّاهِرِ مَقَامَ الْمُضْمَرِ اَىْ لَا يُحِبُّهُمْ بِمَعْنٰى اَنَّهُ يُعَاقِبُهُمْ .

৩২. এদেরকে বল, আল্লাহ ও রাসূল তোমাদেরকে তাওহীদ সম্পর্কে যে নির্দেশ দিয়েছেন সে সম্পর্কে তাঁদের আনুগত্য কর। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় আনুগত্য প্রদর্শন হতে পরাঙ্মুখ হয় তবে আল্লাহ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে ভালোবাসেন না। অর্থাৎ এদেরকে তিনি শাস্তি প্রদান করবেন। اِقَامَةُ الظَّاهِرِ مَقَامَ الْمُضْمَرِ এ স্থানে لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ অর্থাৎ সর্বনাম [هُمْ - তারা] -এর স্থলে প্রকাশ্য বিশেষ্য اَلْكَافِرِيْنَ -এর ব্যবহার হয়েছে। মূলত ছিল لَا يُحِبُّهُمْ আল্লাহ এদেরকে ভালোবাসেন না; এদের শাস্তি প্রদান করবেন।

٣٣. اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى اِخْتَارَ اٰدَمَ وَنُوْحًا وَاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرَانَ بِمَعْنٰى اَنْفُسِهِمَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ بِجَعْلِ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ نَسْلِهِمْ .

৩৩. নিশ্চয় আল্লাহ আদম, নূহ, ইবরাহীম ও ইমরানের বংশধরকে অর্থাৎ ইবরাহীম ও ইমরানকেও বিশ্বজগতে মনোনীত করে গ্রহণ করে নিয়েছেন। এদের বংশধরের মাঝে তিনি নবীগণের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন।

٣٤. ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ وَلَدِ بَعْضٍ مِنْهُمْ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ .

৩৪. এরা সন্তানসন্ততি, এদের কতকজন কতকজন থেকে জাত। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইহুদি খ্রিস্টানদের দাবি ছিল যে, আল্লাহর সাথে আমাদের এবং আমাদের সাথে আল্লাহর ভালোবাসা আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, শুধু এ ধরনের দাবি এবং মনগড়া পন্থায় চলার দ্বারা আল্লাহর ভালোবাসা এবং সন্তুষ্টি অর্জন হয় না। এটা তাদের মৌখিক দাবি মাত্র, আর দলিল ছাড়া দাবি গ্রহণযোগ্য নয়। ভালোবাসা একটি গোপন বিষয়, কার সাথে কার ভালোবাসা আছে বা নেই এবং কম আছে না বেশি, তা পরিমাপের কোনো যন্ত্র নেই। বিভিন্ন অবস্থা ও আচরণ দ্বারাই তা অনুমান করা

যায়। ভালোবাসার যেসব নিদর্শনাবলি রয়েছে তার দ্বারা বুঝা যায় যে, এ সকল লোক আল্লাহর ভালোবাসার দাবিদার এবং তাঁর প্রিয়পাত্র হওয়ার আকাঙ্ক্ষী। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতের মাধ্যমে তাঁর ভালোবাসার মানদণ্ড জানিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ পৃথিবীতে যদি কারো নিজ মালিকের সাথে প্রকৃত ভালোবাসার দাবি থাকে, তাহলে এটা তার জন্যে আবশ্যক যে, তাকে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। পরীক্ষার পর আসল ও নকল স্পষ্ট হয়ে যাবে।

يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ : بِمَعْنٰى يُثِيْبُكُمْ -এর ব্যাখ্যা يُثِيْبُكُمْ দ্বারা করে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

প্রশ্ন : আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার সম্পর্ক করা সঙ্গত নয়। কেননা ভালোবাসা বলা হয়– مَيَلَانُ الْقَلْبِ اِلَى الشَّيْءِ তথা কোনো বস্তুর প্রতি আন্তরিক আকর্ষণকে। আর আল্লাহ অন্তর থেকে মুক্ত।

উত্তর : ভালোবাসা দ্বারা উদ্দেশ্য ছওয়াব ও প্রতিদান দান করা।

قَوْلُهُ اَطِيْعُوا اللّٰهَ : এ আয়াতেও হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সম্বোধনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকেও সম্বোধন করা হয়েছে। اَطِيْعُوا اللّٰهَ মৌলিকভাবে এবং মূল লক্ষ্য হিসেবে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উল্লেখ করা হয়েছে; اَلرَّسُوْلَ -এর আনুগত্যকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের অধীন ও প্রতিনিধিত্বমূলক আনুগত্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ রাসূলে কারীম ﷺ আনুগত্যের মাধ্যমেই প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর আনুগত্য করা যায়। কেননা পয়গাম্বর মহান আল্লাহর পয়গাম ও নির্দেশসহ আগমন করে থাকেন।

قَوْلُهُ فَاِنْ تَوَلَّوْا : [যারা রাসূলে কারীম ﷺ-এর আনুগত্যকে অস্বীকার করে এবং অবাধ্যতা প্রকাশ করে, মহান আল্লাহর মহব্বতের দাবিতে তাদের মুখে যত খৈ-ই ফুটুক না কেন, মূলত তাঁরা কাফের।] فَاِنْ تَوَلَّوْا অর্থাৎ যারা এমনি সাফ হুকুম মেনে নিতে অস্বীকার করে। –[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ اَعْرَضُوْا : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, تَوَلَّوْا হলো অতীতকালীন সীগাহ, মুযারে নয়। যেমন– কেউ কেউ বলেছেন, কারণ মুযারের ক্ষেত্রে একটি تَاءْ বিলুপ্তি অনিবার্য হয়। ব্যাপকতার উদ্দেশ্যে এবং এ কথা বুঝানোর জন্যে যে, তাওহীদ থেকে বিরত থাকা কুফরির কারণ ঘটে। هُمْ বহুবচনের স্থলে اَلْكٰفِرِيْنَ প্রকাশ্য ইসম ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنَ التَّوْحِيْدِ : এটাও একটি প্রশ্নের উত্তর। শাখাগত আমল থেকে বিমুখ হওয়া কুফরি অনিবার্য করে না। অথচ এখানে বলা হয়েছে– اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ এর দ্বারা বুঝা যায় যে, শাখাগত আমল থেকে বিরত থাকাও কুফরি অনিবার্য করে।

উত্তর : এখানে اِعْرَاضٌ তথা বিরত থাকা দ্বারা তাওহীদের স্বীকারোক্তি থেকে বিরত থাকা উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ نُوْحٌ : [হযরত নুহ (আ.)] নূহ ইবনে লামেখ অথবা লমক একজন নবী। বহুকাল আগে ইরাকে রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। বিভিন্ন বর্ণনার মাধ্যমে জানা যায়, হযরত আদম (আ.)-এর পর দশম পুরুষে তাঁর আগমন ঘটে। তিনি পরম ধৈর্য ও নিষ্ঠার সাথে সাড়ে নয়শত বছরকাল প্রকাশ্যে ও গোপনে, দিবসে ও রাতে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জ্ঞাপন করা সত্ত্বেও জাতির স্বল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত সবাই তাঁর বিরোধিতা করে। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.) ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস আনয়নকারী মুষ্টিমেয় লোক ও প্রাণীকুলের মধ্যে এক এক জোড়া প্রাণী ছাড়া, সমস্ত জনপদ, মানুষ, প্রাণীকুলসহ মহাপ্লাবনের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেন।

قَوْلُهُ اٰلَ اِبْرَاهِيْمَ : হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর আলে ইবরাহীমের উল্লেখের সাথে আলে ইসমাঈলের উল্লেখ হয়ে গেছে। কেননা হযরত ইসমাঈল (আ.) হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ছেলে ছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.) সম্পর্কীয় টীকা প্রথম পারার পঞ্চদশ রুকুতে বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ اٰلَ عِمْرَانَ : ইমরান নামীয় দুজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্বের সন্ধান ইতিহাসে পাওয়া যায়। একজন হযরত মূসা (আ.)-এর পিতা ইমরান ইবনে ইয়াসহার। অপরজন তাঁর কয়েক শতাব্দী পরে হযরত মরিয়ম (আ.)-এর পিতা হযরত ঈসা (আ.) -এর সম্মানিত নানা ইমরান ইবনে মাতান। এখানে উভয় ইমরানই উদ্দেশ্য হতে পারে। কিন্তু আয়াতের পূর্ব-সম্পর্কের ভিত্তিতে এখানে ইমরান অর্থাৎ মরিয়ামের পিতা ইমরান গ্রহণ করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। হাসান বসরী ও ওয়াহাব (র.)-এ ক্ষেত্রে পরবর্তী ইমরানের কথাই উল্লেখ করেছেন। –[তাফসীরে ইবনে কাছীর, রূহুল মা'আনী, কাবীর।]

قَوْلُهُ بِمَعْنَى اَنْفُسِهِمَا : ইবরাহীম ও ইমরানের বংশধর দ্বারা স্বয়ং ইবরাহীম এবং ইমরান উদ্দেশ্য। ইমরান হযরত মূসা (আ.)-এর পিতার নাম। বংশধারা এরূপ- مُوْسَى بْنُ عِمْرَانَ بْنِ يَصْهُرَ بْنِ قَاهَثَ بْنِ لَاوِى بْنِ يَعْقُوْبَ بْنِ اِسْحٰقَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ হযরত মরিয়মের পিতার নামও ইমরান। তাঁর বংশধারা এরূপ- مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بْنِ مَاثَانَ بْنِ يَاهُوْزَ بْنِ يَعْقُوْبَ بْنِ اِسْحٰقَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ উভয়ের মাঝে ১ হাজার ৮ শত বছরের ব্যবধান ছিল।

قَوْلُهُ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ মানব জাতির শ্রেষ্ঠত্ব এবং ইবরাহীমী বংশধারার ইতিবৃত্ত : আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিরাজির মধ্যে জমিন, আসমান, চাঁদ, সুরুজ, তারকা, ফেরেশতা, জিন, গাছপালা, পাথর কত কিছু বিরাজমান। কিন্তু মানবজাতির পিতা হযরত আদম (আ.)-এর মাঝে তিনি নিজের সর্বব্যাপক জ্ঞান ও প্রজ্ঞা হতে দৈহিক ও আত্মিক যোগ্যতার যে সমষ্টি গচ্ছিত রাখেন তা আর কোনো সৃষ্টির মাঝে রাখেননি; বরং তিনি ফেরেশতাগণ কর্তৃক আদমকে সিজদা করিয়ে একথা স্পষ্ট করে দেন যে, তাঁর দরবারে হযরত আদম (আ.)-এর মর্যাদা আর সব মাখলুকের উর্ধ্বে। হযরত আদম (আ.)-এর এ নির্বাচনী মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব, যাকে আমরা 'নবুয়ত' নামে অভিহিত করে থাকি, তা কেবল তাঁরই ব্যক্তিত্বের জন্যে নির্দিষ্ট ও সীমিত ছিল না; বরং পরবর্তীকালে তাঁর বংশধরদের মধ্যে হযরত নূহ (আ.)-ও তা লাভ করেন এবং তাঁর পরে লাভ করেন তাঁর উত্তরপুরুষ হযরত ইবরাহীম (আ.)। এখান থেকে একটি নতুন অবস্থার সূত্রপাত হয়। হযরত আদম (আ.) ও হযরত নূহ (আ.)-এর পর পৃথিবীতে যত মানুষ বসবাস করে তারা সকলে তাদেরই বংশধর। তাদের বংশধারার বাইরে কোনো জনগোষ্ঠীর বাস এ পৃথিবীতে ছিল না। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পর অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটে। কেননা তাঁর পরে পৃথিবীতে তাঁর বংশধারা ছাড়া আরও বহু বংশধারা বর্তমান। কিন্তু যে আল্লাহ তা'আলা তাঁর অগণিত সৃষ্টিরাজির মধ্যে নবুয়তের পদমর্যাদার জন্যে কেবল হযরত আদম (আ.)-কে মনোনীত করেছিলেন। তাঁরই সর্বজনীন জ্ঞান ও সার্বভৌম কর্তৃত্ব পরবর্তীকালে এ মহান পদমর্যাদার জন্যে হাজারও বংশধারার মধ্যে কেবল হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশধারাকেই নিদিষ্ট করে দেন। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পর যত নবী-রাসূলের আবির্ভাব ঘটে তাঁরা সকলেই তাঁর দুই পুত্র হযরত ইসহাক ও হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সাধারণত বংশধারা পিতার থেকেই বয়ে চলে। হযরত মাসীহ (আ.) বিনা বাপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ধারণার সৃষ্টি হতে পারত যে, তাঁকে ইবরাহীমী বংশধারা হতে ব্যতিক্রম বলতে হবে। তাই আল্লাহ তা'আলা اٰلُ عِمْرَانَ [ইমরানের বংশধর] ও ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ [তারা একে অপরের বংশধর] বলে ইশারা করে দিয়েছেন যে, হযরত মাসীহ (আ.) যখন বিনা বাপে জন্মগ্রহণ করেছেন, তখন তাঁর বংশ পরিক্রমাও মায়ের দিক থেকেই ধরা হবে, মহান আল্লাহর থেকে নয়, নাউযুবিল্লাহ। আর তাঁর মা মরিয়াম (আ.)-এর পিতা ইমরানের বংশ পরাম্পরা তো শেষ পর্যন্ত হযরত ইবরাহীম (আ.) পর্যন্ত পৌছায়। কাজেই ইমরানের বংশ ইবরাহীমী বংশেরই একটি শাখা হলো, ফলে কোনো নবী আর ইবরাহীমী বংশের বাইরে হলো না। -[তাফসীরে ওসমানী]

قَوْلُهُ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ : অর্থাৎ তিনি সকলের দোয়া ও কথা শোনেন, তিনি সব কথা সব ভাষায়ই শুনেন এবং সকলের প্রকাশ্য ও গোপন যোগ্যতা জানেন, তিনি মানব মনের সকল চিন্তা-কল্পনাও জানেন। কাজেই এ ধারণা করার অবকাশ নেই যে, তিনি কোনো যাচাই-বাছাই ছাড়াই যেনতেন প্রকারে মনোনীত করেছেন। তাঁর যাবতীয় কাজ পরিপূর্ণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুসারে সাধিত হয়। -[তাফসীরে ওসমানী]

٣٥. اُذْكُرْ اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرَانَ حَنَّةُ لَمَّا اَسَنَّتْ وَاشْتَاقَتْ لِلْوَلَدِ فَدَعَتِ اللّٰهَ وَاَحَسَّتْ بِالْحَمْلِ يَا رَبِّ اِنِّىْ نَذَرْتُ اَنْ اَجْعَلَ لَكَ مَا فِىْ بَطْنِىْ مُحَرَّرًا عَتِيْقًا خَالِصًا مِنْ شَوَاغِلِ الدُّنْيَا لِخِدْمَةِ بَيْتِكَ الْمُقَدَّسِ فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ لِلدُّعَاءِ الْعَلِيْمُ بِالنِّيَّاتِ وَهَلَكَ عِمْرَانُ وَهِىَ حَامِلٌ.

অনুবাদ :

৩৫. স্মরণ কর, যখন ইমরানের স্ত্রী হান্না বলেছিল অর্থাৎ একান্ত বৃদ্ধা হয়ে যাওয়ার পর সন্তান লাভের তীব্র বাসনায় সে আল্লাহর নিকট দোয়া করেছিল। পরে যখন গর্ভসঞ্চারের অনুভব করেছিল তখন বলেছিল হে আমার প্রতিপালক! আমার গর্ভে যা আছে তা তোমার নামে মুক্ত করে দিতে; অর্থাৎ জগতের যাবতীয় কাজ থেকে মুক্ত করে কেবল তোমার ঘর বায়তুল মুকাদ্দাসের সেবার উদ্দেশ্যে আমি মানত করলাম। সুতরাং তুমি আমার নিকট হতে এটা কবুল কর। নিশ্চয় তুমি দোয়াসমূহের অতি শ্রবণকারী ও নিয়ত সম্পর্কে খুবই অবহিত। পরে তাঁকে গর্ভাবস্থায় রেখে ইমরান মারা গেলেন।

٣٦. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا وَلَدَتْهَا جَارِيَةً وَكَانَتْ تَرْجُوْ اَنْ يَكُوْنَ غُلَامًا اِذْ لَمْ يَكُنْ يُحَرَّرُ اِلَّا الْغِلْمَانُ قَالَتْ مُتَعَذِّرَةً يَا رَبِّ اِنِّىْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰى وَاللّٰهُ اَعْلَمُ اَىْ عَالِمٌ بِمَا وَضَعَتْ جُمْلَةُ اِعْتِرَاضٍ مِنْ كَلَامِهٖ تَعَالٰى وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِضَمِّ التَّاءِ وَلَيْسَ الذَّكَرُ الَّذِىْ طَلَبَتْ كَالْاُنْثٰى الَّتِىْ وُهِبَتْ لِاَنَّهٗ يُقْصَدُ لِلْخِدْمَةِ وَهِىَ لَا تَصْلُحُ لَهَا لِضُعْفِهَا وَعَوْرَتِهَا وَمَا يَعْتَرِيْهَا مِنَ الْحَيْضِ وَنَحْوِهٖ وَاِنِّىْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّىْ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا اَوْلَادَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ الْمَطْرُوْدِ فِى الْحَدِيْثِ مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ اِلَّا مَسَّهُ الشَّيْطَانُ حِيْنَ يُوْلَدُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا اِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.

৩৬. অতঃপর সে যখন তা প্রসব করল অর্থাৎ এক কন্যা সন্তান জন্ম দিল। তাঁর আশা ছিল হয়তো পুত্র সন্তানের জন্ম হবে। কারণ পুত্র সন্তান ব্যতীত কাউকে বায়তুল মুকাদ্দাসের সেবার জন্যে উৎসর্গ করার নিয়ম ছিল না। তাই সে কৈফিয়ত হিসেবে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তা কন্যা প্রসব করেছি; সে যা প্রসব করেছে আল্লাহ তা অধিক অবগত। তিনি তা জানেন। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ الخ এটা আল্লাহর উক্তি হিসেবে جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ বা বিচ্ছিন্ন বাক্য। وَضَعْتُ এটা অপর এক কেরাত অনুসারে ت -এ পেশ [উত্তম পুরুষ, একবচন] সহকারে পঠিত রয়েছে। যে পুত্রের সে প্রত্যাশা করেছিল সে পুত্র যে কন্যা তাকে দান করা হয়েছে সে কন্যার মতো নয় কারণ বায়তুল মুকাদ্দাসের সেবা হলো উদ্দেশ্য। আর কন্যা শারীরিক গঠন-দুর্বল তা, পর্দার বিধান, রজঃস্রাব ইত্যাদির কারণে তার উপযুক্ত নয়। আমি তাঁর নাম মরিয়ম রাখলাম। আমি তাঁকে এবং তাঁর বংশধর সন্তানসন্ততিদেরকে অভিশপ্ত বিতাড়িত শয়তান হতে তোমার আশ্রয়ে দিচ্ছি। হাদীসে আছে, জন্ম মুহূর্তে প্রত্যেক শিশুকেই শয়তান স্পর্শ করে। ফলে তারা চিৎকার করে উঠে। কেবল মাত্র মরিয়ম এবং তাঁর পুত্র [হযরত ঈসা (আ.)] হলেন এর ব্যতিক্রম।

–[বুখারী ও মুসলিম]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ اَنْ اَجْعَلَ : نَذَرْتُ-এর ব্যাখ্যা اَجْعَلُ দ্বারা করে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

প্রশ্ন : মানত মানা হলো ফে'ল, স্বয়ং বস্তু নয়। এতে এ প্রশ্নের উত্তরও রয়েছে যে, نَذَرْتُ শব্দটি এক মাফউলের প্রতি مُتَعَدِّىْ হয়েছে। এক হলো مَا فِىْ بَطْنِىْ এবং দ্বিতীয় হল مُحَرَّرًا -

উত্তর : نَذَرْتُ শব্দটি جَعَلْتُ অর্থে, আর এটা দুই মাফউলের প্রতি مُتَعَدِّىْ হয়।

অনুবাদ :

٣٧. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا اَىْ قَبِلَ مَرْيَمَ مِنْ اُمِّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا اَنْشَأَهَا بِخُلُقٍ حَسَنٍ فَكَانَتْ تَنْبُتُ فِى الْيَوْمِ كَمَا يَنْبُتُ الْمَوْلُوْدُ فِى الْعَامِ وَاَتَتْ بِهَا اُمُّهَا الْاَحْبَارَ سَدَنَةَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَتْ دُوْنَكُمْ هٰذِهِ النَّذِيْرَةَ فَتَنَافَسُوا فِيْهَا لِاَنَّهَا بِنْتُ اِمَامِهِمْ فَقَالَ زَكَرِيَّا اَنَا اَحَقُّ بِهَا لِاَنَّ خَالَتَهَا عِنْدِىْ فَقَالُوْا لَا حَتّٰى نَقْتَرِعَ فَانْطَلَقُوْا وَهُمْ تِسْعَةٌ وَّعِشْرُوْنَ اِلٰى نَهْرِ الْاُرْدُنِّ وَاَلْقَوْا اَقْلَامَهُمْ عَلٰى اَنَّ مَنْ ثَبَتَ قَلَمُهٗ فِى الْمَاءِ وَصَعِدَ فَهُوَ اَوْلٰى بِهَا فَثَبَتَ قَلَمُ زَكَرِيَّا فَاَخَذَهَا وَبَنٰى لَهَا غُرْفَةً فِى الْمَسْجِدِ بِسُلَّمٍ لَا يَصْعَدُ اِلَيْهَا غَيْرُهٗ وَكَانَ يَأْتِيْهَا بِاَكْلِهَا وَشُرْبِهَا وَدُهْنِهَا فَيَجِدُ عِنْدَهَا فَاكِهَةَ الشِّتَاءِ فِى الصَّيْفِ وَفَاكِهَةَ الصَّيْفِ فِى الشِّتَاءِ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى

৩৭. অতঃপর তাঁর প্রতিপালক তাঁকে উত্তমভাবে কবুল করলেন অর্থাৎ মরিয়মকে তাঁর মাতার পক্ষ থেকে গ্রহণ করে নিলেন। এবং তাঁকে ভালোভাবে বর্ধিত করলেন মনোহর গঠনে বড় করলেন। সাধারণভাবে শিশুরা এক বৎসরে যতটুকু বৃদ্ধি পায় তিনি একদিনেই ততটুকু বৃদ্ধি পেতে লাগলেন। শেষে তাঁর মাতা তাঁকে নিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসের সেবায় নিয়োজিত ইহুদি আলেমদের নিকট আসলেন। বললেন, এ ছোট এবং প্রিয় উৎসর্গটি আপনারা গ্রহণ করুন। তখন তাঁরা সকলেই এতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। কারণ তিনি ছিলেন তাঁদের প্রধান [মরহুম ইমরান] -এর কন্যা। তখন [তাঁদের অন্যতম] হযরত যাকারিয়া (আ.) বললেন, আমি এর বিষয়ে সর্বাপেক্ষা অধিকার রাখি। কারণ এর খালা আমার ঘরে [স্ত্রী হিসেবে] রয়েছেন। অন্যরা বললেন, এ বিষয়ে লটারি প্রদান ভিন্ন অন্য কোনো কথা আমরা মানব না। তাঁরা ছিলেন সংখ্যায় ঊনত্রিশজন। সকলেই জর্ডান নদীতে চললেন। যার কলম পানিতে স্থির থাকবে এবং ভেসে উঠবে সেই এর [মরিয়মের] তত্ত্বাবধানের অধিকার পাবে– এ শর্তে সকলেই স্ব-স্ব কলম পানিতে নিক্ষেপ করলেন, তখন হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর কলম স্থির থাকার ফলে তিনি তাঁর তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন।

হযরত যাকারিয়া (আ.) মসজিদের উপর তাঁর থাকার জন্য একটি কক্ষ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। সিড়ি ব্যতীত তাতে আরোহণ করা সম্ভবপর ছিল না; আর তিনি ভিন্ন অন্য কেউ সেখানে উঠত না। তিনি নিজে সেখানে তাঁর খাদ্য, পানীয়, তেল ইত্যাদি পৌঁছাতেন। তখন অনেক সময় মরিয়মের নিকট শীতকালীন ফল গ্রীষ্মে এবং গ্রীষ্মকালীন ফল শীতকালে দেখতে পেতেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ضَمَّهَا اِلَيْهِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالتَّشْدِيْدِ وَنَصَبِ زَكَرِيَّاءَ مَمْدُوْدًا وَمَقْصُوْرًا وَ الْفَاعِلُ اَللّٰهُ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ الْغُرْفَةَ وَهِىَ اَشْرَفُ الْمَجَالِسِ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى مِنْ اَيْنَ لَكِ هٰذَا قَالَتْ وَهِىَ صَغِيْرَةٌ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ يَأْتِيْنِىْ بِهِ مِنَ الْجَنَّةِ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ رِزْقًا وَاسِعًا بِلَا تَبِعَةٍ .

এবং তিনি তাকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে দিলেন। অর্থাৎ তাঁকে হযরত যাকারিয়া (আ.) স্বীয় পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। كَفَّلَ এটা অপর এক কেরাতে ف -এ তাশদীদ [بَابُ تَفْعِيْل] সহ পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় زَكَرِيَّا মদসহ ও মদ ছাড়া উভয় রূপে উচ্চারণ করা যায়- مَنْصُوْب হবে, আর উক্ত ক্রিয়াটির فَاعِل বা কর্তা হবেন আল্লাহ তা'আলা। যখনই যাকারিয়া মিহরাবে উক্ত কক্ষে, আর এটা হলো সর্বোত্তম স্থান; তাঁর নিকট প্রবেশ করত তখনই তাঁর নিকট দেখতে পেত খাদ্য সামগ্রী। সে বলল, মরিয়ম তোমার জন্যে এটা কেমন করে কোথা হতে এল? বলল, অথচ সে তখন ছিল নিতান্ত বালিকা মাত্র তা আল্লাহর নিকট হতে, জান্নাত হতে আমার জন্যে আসে, নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিজিক কোনোরূপ পরিশ্রম ব্যতীত একজনকে প্রভূত জীবনোপকরণ দান করেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বিবি মরিয়মের লালনপালন এবং তাঁর ইবাদত-বন্দেগী : যদিও তিনি মেয়ে ছিলেন, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ছেলের চেয়েও বেশি কবুল করেন। তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের খাদিমগণের অন্তরে আগ্রহ সৃষ্টি করে দেন, যাতে তাঁরা সাধারণ নিয়মের বাইরে মেয়েটিকে গ্রহণ করে নেন। আর এমনিতে তিনি হযরত বিবি মরিয়মকে সমাদৃত আকারে সৃষ্টি করেন এবং নিজ সমাদৃত বান্দা যাকারিয়া (আ.)-এর তত্ত্বাবধানে তাঁকে ন্যস্ত করেন। সেই সঙ্গে নিজ দরবারে তাঁকে উৎকৃষ্ট সমাদরে ভূষিত করেন। দৈহিক, আত্মিক, জ্ঞানগত ও চারিত্রিক সর্বোতভাবে অসাধারণভাবে তাঁর উৎকর্ষ সাধন করেন। খাদিমগণের মাঝে তাঁর লালনপালন নিয়ে মতভেদ দেখা দিলে নির্বাচনী লটারিতে হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর নাম বের করে দিলেন, যাতে মেয়ে তার খালার কোলে থেকে প্রতিপালিত এবং হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর জ্ঞান ও ধর্মপরায়ণতা দ্বারা উপকৃত হতে পারে। হযরত যাকারিয়া (আ.) তাঁর সযতন প্রতিপালনে সচেষ্ট থাকলেন। বিবি মরিয়ম যখন পরিণত বয়সে পদার্পণ করলেন, তখন মসজিদের পাশে তাঁর জন্যে একটি কামরা বরাদ্দ করলেন। বিবি মরিয়ম সেখানে দিনভর ইবাদত ইত্যাদিতে মশগুল থাকতেন। রাত কাটাতেন খালার কাছে। -[তাফসীরে ওসমানী]

قَوْلُهُ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ : হযরত মরিয়ম (আ.)-এর মায়ের মানতকে আল্লাহ তা'আলা উত্তমরূপে কন্যার মাধ্যমে কবুল করলেন, যা 'হায়কলে সুলায়মানী'র খিদমতের ইতিহাসে এক অভিনব সংযোজন ছিল। খ্রিস্টীয় লিপি অনুসারে হযরত মরিয়মকে তিন বছর বয়ঃক্রমকালে 'হায়কলে সুলায়মানী'র খাদিমা হিসেবে গ্রহণ করা হলো। আর ইবাদতখানার ছোটবড় সকল খাদিমরাই এ অল্প বয়স্কা মেয়েটিকে দেখে খুবই আনন্দিত হতো।

অনুবাদ :

٣٨. هُنَالِكَ اَىْ لَمَّا رَأَى زَكَرِيَّا ذٰلِكَ وَعَلِمَ اَنَّ الْقَادِرَ عَلَى الْاِتْيَانِ بِالشَّيْءِ فِىْ غَيْرِ حِيْنِهٖ قَادِرٌ عَلَى الْاِتْيَانِ بِالْوَلَدِ عَلَى الْكِبَرِ وَكَانَ اَهْلُ بَيْتِهٖ انْقَرَضُوْا دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ لَمَّا دَخَلَ الْمِحْرَابَ لِلصَّلٰوةِ جَوْفَ اللَّيْلِ قَالَ رَبِّ هَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ مِنْ عِنْدِكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً وَلَدًا صَالِحًا اِنَّكَ سَمِيْعُ مُجِيْبُ الدُّعَاءِ .

৩৮. সে স্থানেই অর্থাৎ হযরত যাকারিয়া (আ.) যখন দেখলেন এবং তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় এবং জ্ঞান হলো যে, অসময়ে যিনি কোনো দ্রব্য আনয়নে সক্ষম নিশ্চয় তিনি অসময়ে এ বৃদ্ধাবস্থায়ও সন্তান দানের ক্ষমতা রাখেন। তাঁর বংশের সকলেই তখন শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর প্রতিপালকের নিকট যখন মধ্যরাতে সালাতের জন্যে মিহরাবে প্রবেশ করেছিল তখন প্রার্থনা করে বলল, হে আমার প্রভু! আমাকে তুমি তোমার নিকট হতে পক্ষ হতে পবিত্র বংশধর সৎ সন্তান দান কর। তুমিই প্রার্থনা শ্রবণকারী কবুলকারী।

٣٩. فَنَادَتْهُ الْمَلٰئِكَةُ اَىْ جِبْرَئِيْلُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّىْ فِى الْمِحْرَابِ اَىِ الْمَسْجِدِ اَنَّ اَىْ بِاَنَّ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالْكَسْرِ بِتَقْدِيْرِ الْقَوْلِ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ مُثَقَّلًا وَمُخَفَّفًا بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ كَائِنَةٍ مِنَ اللّٰهِ اَىْ بِعِيْسٰى اَنَّهٗ رُوْحُ اللّٰهِ وَسُمِّىَ كَلِمَةً لِاَنَّهٗ خُلِقَ بِكَلِمَةِ كُنْ وَسَيِّدًا مَتْبُوْعًا وَحَصُوْرًا مَمْنُوْعًا عَنِ النِّسَاءِ وَنَبِيًّا مِنَ الصّٰلِحِيْنَ رُوِىَ اَنَّهٗ لَمْ يَعْمَلْ خَطِيْئَةً وَلَمْ يَهُمَّ بِهَا .

৩৯. অনন্তর যখন সে মিহরাবে মসজিদে সালাতে দাঁড়িয়েছিল ফেরেশতারা অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল তাঁকে সম্বোধন করে বলল যে, ان এটা بان রূপে ব্যবহৃত। অপর এক কেরাতে এর প্রথমাক্ষর কাসরাসহ পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় এর পূর্বে قول ধাতু হতে উদ্গত কোনো শব্দ উহ্য ধরা হবে। আল্লাহ তোমাকে ইয়াহইয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন। يبشرك এটা مثقلا বা তাশদীদসহ [باب تفعيل] ও مخففا [তাশদীদ ব্যতীত লঘু] উভয় রূপে পাঠ করা যায়। সে হবে আল্লাহর বাণীর অর্থাৎ হযরত ঈসার সমর্থক, من الله এটা এ স্থানে উহ্য كائنة -এর সাথে متعلق বা সংশ্লিষ্ট। তিনি [হযরত ঈসা] হলেন 'রূহুল্লাহ' বা আল্লাহর তরফ হতে আগত পবিত্রাত্মা। 'কুন' বাণী দ্বারা তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছিল বলে তাঁকে 'কালিমাতুল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর বাণী বলে অভিহিত করা হয়; নেতা, অনুসৃত ব্যক্তি, জিতেন্দ্রিয় নারী সংস্রব থেকে বিরত এবং পুণ্যবানদের মধ্যে একজন নবী। বর্ণিত আছে, তিনি কখনো কোনো পাপ কর্ম করেননি বা তাঁর কল্পনাও করেননি।

٤٠. قَالَ رَبِّ اَنّٰى كَيْفَ يَكُوْنُ لِىْ غُلَامٌ وَلَدٌ وَقَدْ بَلَغَنِىَ الْكِبَرُ اَىْ بَلَغْتُ نِهَايَةَ السِّنِّ مِائَةً وَعِشْرِيْنَ سَنَةً وَامْرَاَتِىْ عَاقِرٌ بَلَغَتْ ثَمَانِىْ وَتِسْعِيْنَ قَالَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ غُلَامًا مِنْكُمَا اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ لَا يُعْجِزُهٗ عَنْهُ شَىْءٌ وَلِاِظْهَارِ هٰذِهِ الْقُدْرَةِ الْعَظِيْمَةِ اَلْهَمَهُ اللّٰهُ السُّؤَالَ لِيُجَابَ بِهَا .

৪০. সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র সন্তান হবে কিরূপে? انى এটা এ স্থানে كيف [কিরূপে] অর্থে ব্যবহৃত। আমি বার্ধক্যে উপনীত চূড়ান্ত বয়ঃসীমায় আমি পৌঁছে গেছি। তাঁর তখন বয়স ছিল একশত বিশ বছর। আর আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। তাঁর বয়স ছিল আটানব্বই বছর। তিনি বলেন, বিষয় এভাবেই হয়। তোমাদের মাধ্যমে শিশু জন্মদানের মতো আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই করেন। কিছুই তাঁকে অপারগ করতে পারে না। এ বিস্ময়কর কুদরত প্রকাশের নিমিত্ত আল্লাহ তাঁর মনে এরূপ জিজ্ঞাসার উদয় করেন যেন তিনি উত্তমরূপে উত্তর প্রদত্ত হন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ هُنَالِكَ دَعَا : হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর দোয়া : মহান আল্লাহর কুদরতের প্রত্যক্ষ দর্শনে প্রভাবান্বিত হয়ে সেখানেই তিনি মুনাজাত করলেন। هُنَا -এর অপর অর্থ সেখানের পরিবর্তে 'তৎক্ষণাৎ'ও হয়। هُنَا - ظَرْف আর ظَرْف শুধু স্থান নয়, সময়ও। অর্থাৎ যরফে মাকান হলে অর্থ হবে– সেখানে তিনি মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন। আর যরফে যমান হলে অর্থ হবে– তখনই বা সে মুহূর্তেই মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন। যদিও এখানে মূলত এর মর্ম যরফে মাকানই হয়ে থাকে। هُنَالِكَ دَعَا আয়াতাংশ থেকে কোনো কোনো মুবারক স্থানে দোয়া কবুল হওয়ার দলিলও গ্রহণ করা হয়। এমনিভাবে কোনো কোনো সময় দোয়া কবুল হওয়ার দলিলও গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ হযরত যাকারিয়া (আ.) এ অলৌকিক ঘটনা প্রত্যেক্ষ করে যখন উপলব্ধি করলেন যে, এ স্থানটি দোয়া কবুল হওয়ার ও আলৌকিক কিছু অনুষ্ঠিত হওয়ার জায়গা, তখনই সেখানেই তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন।

قَوْلُهُ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ : অমৌসুমি ফল দেখে হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর অন্তরে [বার্ধক্য এবং স্ত্রী বন্ধ্যা হওয়া সত্ত্বেও] এ আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হলো যে, যদি আল্লাহ তা'আলা এভাবে তাঁকে একটি সন্তান দান করতেন তাহলে বেশ ভালো হতো। কারণ যে মহান সত্তা অমৌসুমি ফল দিতে সক্ষম তিনি অসময়ে সন্তান দান করতেও সক্ষম। অজান্তে তিনি আল্লাহর দরবারে মিনতির জন্যে হাত উঠালেন। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে কবুলিয়াতের দ্বারা ধন্য করলেন। ফেরেশতা ডেকে বললেন, আল্লাহ আপনাকে ইয়াহইয়া -এর সুসংবাদ দান করেছেন। যিনি কালিমাতুল্লাহ তথা হযরত ঈসা (আ.)-কে সত্যায়নকারী, নেতা ও নফসকে সংবরণকারী নবী হবেন এবং তিনি হবেন সৎ বান্দাদের অন্তর্গত। হযরত ইয়াহইয়া (আ.) -এর বিশেষ গুণ স্বরূপ حَصُوْر তথা নফস সংবরণকারী এবং গুনাহ থেকে দূরে অবস্থানকারী বলা হয়েছে। কোনো কোনো আলেম حَصُوْر -এর অর্থ বলেছেন কাপুরুষ, এটা এখানে সঠিক নয়। কেননা এ ক্ষেত্র হলো প্রশংসা ও ফজিলত বর্ণনার। আর কাপুরুষতা কোনো ভালো গুণ নয়; বরং দোষ বিশেষ।

اَیْ جِبْرَائِیْلُ এটা সে প্রশ্নের উত্তর যে, نَادَتْ -এর ফায়েল হলো مَلَائِكَةُ অথচ আহ্বানকারী কেবল হযরত জিবরাঈল। উত্তর হলো, এখানে ال দ্বারা اَقَلُّ جِنْس তথা সর্বনিম্ন সংখ্যা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল উদ্দেশ্য।

শক্তি ও ইচ্ছা আসবাব-উপকরণের অধীন নয় : যদিও ইহজাগতে তাঁর রীতি হলো স্বাভাবিক কারণ হতে কার্য সৃষ্টি করা তবু কখনো কখনো স্বাভাবিক কারণের বিপরীত অসাধারণ উপায়ে কোনো বস্তুর উদ্ভব ঘটানোও তাঁর একটি বিশেষ নীতি। আসলে বিবি মরিয়ম সিদ্দীকার নিকট অস্বাভাবিক উপায়ে রিজিক আসা, বহু অস্বাভাবিক ঘটনার প্রকাশ ঘটা, এসব দৃষ্টে বিবি মরিয়মের কক্ষে অবচেতন মনে হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর প্রার্থনা, তারপর তাঁর বার্ধক্য ও স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব সত্ত্বেও অস্বাভাবিক উপায়ে সন্তান লাভ এসব কিছুকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাঁর সেই মহাবিস্ময়কর নিদর্শনের পূর্বাভাস মনে করতে হবে, যা বিবি মরিয়মের অস্তিত্ব হতে অদূর ভবিষ্যতে স্বামীসঙ্গ ব্যতিরেকেই প্রকাশ পাওয়ার ছিল। যেন হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর অস্বাভাবিক জন্ম সম্পর্কে كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ [এভাবেই আল্লাহ তা'আলা যা চান করেন] বাক্যটি كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ 'এভাবেই আল্লাহ পাক যা চান সৃষ্টি করেন।' বাক্যের ভূমিকা স্বরূপ, যা সামনে হযরত মসীহ (আ.)-এর অস্বাভাবিক জন্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে। –[তাফসীরে ওসমানী]

قَوْلُهُ الْمَلٰئِكَةُ : শব্দটি বহুবচন; কিন্তু এটি অপরিহার্য নয় যে, কয়েকজন ফেরেশতা এসে ডেকে বলেছেন। বহুবচন অনেক সময় ইসমে জিনস তথা শ্রেণী বিশেষ্য বুঝাবার জন্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

يَحْيٰى [ইয়াহইয়া] খ্রিস্টানদের আধুনিক সহীফায় তাঁর নাম লিখা হয়েছে يُوْحَنَّا [ইউহান্না]। বাইবেলে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ফেরেশতা তাঁকে বললেন, ওহে যাকারিয়া ! শঙ্কিত হয়ো না, তোমার দোয়া কবুল হয়েছে এবং তোমার স্ত্রী ইল ইয়াশবা তোমার জন্যে সন্তান প্রসব করবে। তাঁর নাম উইহান্না রেখ। তুমি সুখী ও আনন্দিত হবে। –[লুক ১ : ১৪] হযরত ইয়াহইয়া হযরত ঈসা (আ.)-এর খালাতো ভাই। বাইবেলের ভাষ্য মোতাবেক হযরত ঈসা (আ.) মাত্র ছয় মাসের বড় ছিলেন। ৩০ বছর বয়ঃক্রমকালে তাঁকে সিরিয়ার শাসনকর্তা হিরোডাসের আদেশে শূলীতে শহীদ করা হয়।

قَوْلُهُ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلَامٌ : এ সুসংবাদ সুনিশ্চিত হওয়ার নিদর্শন বা লক্ষণটা হবে কি ধরনের? আমাদের যৌবন কি আবার ফিরে আসবে? না আল্লাহ তা'আলা অপর কোনো বিপ্লবাত্মক ব্যবস্থা করবেন? প্রশ্নটি কোনো মতেই অবিশ্বাস বা অনাস্থাসূচক ছিল না। হযরত যাকারিয়া (আ.) এ অলৌকিকভাবে সন্তান জন্মের পদ্ধতিগত দিক সম্পর্কে অবগত হতে চেয়েছিলেন। প্রশ্নটি যদি আশ্বস্ত হওয়ার জন্যে করেছিলেন বলে ধরে নেওয়া যায়, তবুও প্রচলিত নিয়ম-পদ্ধতির সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক নিয়মের খেলাফ কোনো কিছু অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, এ কথা জানার পর আশ্চর্যান্বিত হয়ে প্রশ্ন করাটা একান্ত স্বাভাবিক ও মানবীয় প্রকৃতির সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। নবী হলেও তিনি মানবীয় স্বভাব ও প্রবৃত্তির উর্ধ্বে ছিলেন না। কেননা তিনিও একজন মানুষ ছিলেন।

অনুবাদ :

٤١. وَلَمَّا تَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَى سُرْعَةِ الْمُبَشَّرِ بِهِ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّي آيَةً أَيْ عَلَامَةً عَلَى حَمْلِ امْرَأَتِي قَالَ آيَتُكَ عَلَيْهِ أَنْ لَا تُكَلِّمَ النَّاسَ أَيْ تَمْتَنِعُ مِنْ كَلَامِهِمْ بِخِلَافِ ذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالَى ثَلٰثَةَ أَيَّامٍ أَيْ بِلَيَالِيْهَا إِلَّا رَمْزًا إِشَارَةً وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَسَبِّحْ صَلِّ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ أَوَاخِرِ النَّهَارِ وَأَوَائِلِهِ.

৪১. সুসংবাদ প্রদত্ত জিনিসটি শীঘ্র প্রাপ্তির প্রতি তাঁর তীব্র আগ্রহ হওয়ায় বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে অর্থাৎ আমার স্ত্রীর গর্ভসঞ্চারের চিহ্ন হিসেবে একটি নিদর্শন দাও। তিনি বললেন, এর উপর তোমার জন্যে নিদর্শন এই যে, তুমি ইঙ্গিত ইশারা ব্যতীত রাতসহ তিন দিন কথা বলতে পারবে না। 'যিকরুল্লাহ' বা আল্লাহর জিকির ব্যতীত এদের সাথে কথা বলা থেকে বিরত থাকবে। আর তোমার প্রতিপালককে অধিক স্মরণ করবে এবং সন্ধ্যায় ও প্রভাতে দিনের শেষ ভাগে ও প্রথম ভাগে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে। অর্থাৎ সালাত আদায় করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّي آيَةً : বৃদ্ধকালে মু'জিযা স্বরূপ সন্তানের সুসংবাদ শুনে তাঁর আগ্রহ আরও বেড়ে গেল। তিনি এর নির্দশন জানতে চাইলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, এর নিদর্শন হলো, তিনদিন পর্যন্ত তোমার বাকশক্তি রুদ্ধ থাকবে। এটা আমার পক্ষ থেকে নিদর্শনমূলক হবে, তবে তুমি এ নীরবতার অবস্থায় সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবীহ আদায় কর। অর্থাৎ তোমার যখন এ অবস্থা হবে যে, তিন দিন তিন রাত ইশারা ছাড়া মুখে কারো সাথে কথা বলতে পারবে না এবং তোমার জিহ্বা কেবল মহান আল্লাহর জিকিরে নিবদ্ধ থাকবে, তখন বুঝে নেবে গর্ভ সঞ্চার হয়ে গেছে। সুবহানাল্লাহ! নিদর্শন এমন স্থির করেছিলেন, যা একদিকে নিদর্শনেরও কাজ দেবে, অন্যদিকে অবগতি লাভের; যা উদ্দেশ্য ছিল অর্থাৎ নিয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপন তাও পরিপূর্ণভাবে সাধিত হয়ে যাবে। সারকথা, মহান আল্লাহর জিকির ও শোকর ছাড়া অন্য কোনো কথা ইচ্ছা করলেও বলতে পারবে না। –[তাফসীরে ওসমানী]

قَوْلُهُ رَمْزًا : ফিকহ ও তাফসীর বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, এটা ইশারা বা আকার-ইঙ্গিত ইত্যাদি কথার স্থলাভিষিক্ত। [যেমন– বিবাহ উপলক্ষে ইজন চাওয়ার পর বালিগা মেয়ে যদি মাথা নেড়ে বা হেসে সম্মতি জানায়, তবে তাতেই আকদ তথা বিবাহ চুক্তি সিদ্ধ হয়ে যাবে।]

قَوْلُهُ وَاذْكُرْ وَسَبِّحْ : অর্থাৎ মুখে এবং অন্তরে আল্লাহর জিকির ও তাসবীহে রত থাকুন। এমনটি যেন না হয়, কেউ যেন একথা মনে না করতে পারে যে, কোনো রোগ অথবা শাস্তির কারণে আপনার জবান বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে আপনি বোবা হয়ে গেছেন। যেমনটি বাইবেলে উল্লেখ রয়েছে; বরং অবিরতভাবে আপনি মহান আল্লাহর জিকির ও তাসবীহের মাধ্যমে নিজ রসনাকে সিক্ত রাখুন, অবশ্য আপনি কারো সাথেই কোনো কথা বলতে পারবেন না, আর এটিই আপনার স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়ার সুস্পষ্ট লক্ষণ ও ইয়াহইয়ার জন্মের পূর্বাভাস।

قَوْلُهُ عَشِيٌّ : দ্বিপ্রহরে সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে যাওয়ার পর থেকে সূর্যাস্তের পর রাতের অন্ধকার পর্যন্ত সমস্ত সময় আশিয়্যান পরিধির অন্তর্ভুক্ত। –[তাফসীরে বায়যাবী]

قَوْلُهُ إِبْكَارٌ : সূর্যোদয়ের পর দিনের আলো ছড়িয়ে যাওয়া পর্যন্ত সময় ইবকার -এর পরিধির আওতাভুক্ত। –[তাফসীরে কাশশাফ] পরিভাষা অনুসারে সকাল-সন্ধ্যা শব্দদ্বয় শুধু নির্দিষ্ট সময়কে না বুঝিয়ে বরং বিরামহীনভাবে সমস্ত সময়কেও বুঝানো হতে পারে। অর্থাৎ তখন বেশি করে মহান আল্লাহর জিকির করবে এবং সকাল-সন্ধ্যা তাসবীহ পাঠে লেগে থাকবে। বোঝা যায়, মানুষের সাথে কথা বলার শক্তি যদিও রহিত করে দেওয়া হয়েছিল, যাতে এ তিন দিন কেবল জিকির ও শোকরের জন্যেই নির্দিষ্ট ছিল, কিন্তু জিকির ও শোকরে মশগুল থাকার বিষয়টির ইচ্ছা রহিত পর্যায়ের, বাধ্যতামূলক ছিল না। এ কারণেই তা আদেশ করা হয়েছে।

অনুবাদ :

٤٢. وَ اذْكُرْ اِذْ قَالَتِ الْمَلٰئِكَةُ اَىْ جِبْرَئِيْلُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ اِخْتَارَكِ وَطَهَّرَكِ مِنْ مَسِيْسِ الرِّجَالِ وَاصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَاۤءِ الْعٰلَمِيْنَ اَىْ اَهْلِ زَمَانِكَ ـ

৪২. আর স্মরণ কর, যখন ফেরেশতারা অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.) বলেছিল, হে মরিয়ম! আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করেছেন গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং পুরুষের স্পর্শ থেকে তোমাকে পবিত্র রেখেছেন এবং তোমার যুগের বিশ্বের নারীগণের মাঝে তোমাকে মনোনীত করেছেন নির্বাচিত করেছেন।

٤٣. يٰمَرْيَمُ اقْنُتِىْ لِرَبِّكِ اَطِيْعِيْهِ وَاسْجُدِىْ وَارْكَعِىْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ اَىْ صَلِّىْ مَعَ الْمُصَلِّيْنَ ـ

৪৩. হে মরিয়ম! তোমার প্রতিপালকের বন্দেগি কর, তাঁর আনুগত্য প্রদর্শন কর, সেজদা কর এবং যারা রুকু করে তাদের সাথে রুকু কর। অর্থাৎ সালাত আদায়কারীদের সাথে সালাত আদায় কর।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اصْطَفٰى : اِصْطِفَاءٌ থেকে মাযির সীগাহ, অর্থ– সে বেছে নিয়েছে, মনোনীত করেছে, নির্বাচিত করেছে।

قَوْلُهُ اَىْ جِبْرَائِيْلُ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, اَلْمَلَائِكَةُ হলো ইসমে জিনস। এর সর্বনিম্ন সংখ্যা তথা এক উদ্দেশ্য। অথবা হযরত জিবরাঈলের সম্মানার্থে বহুবচন আনা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اِذْ قَالَتِ الْمَلٰئِكَةُ يٰا مَرْيَمُ : হযরত ঈসা (আ.)-কে কালিমাতুল্লাহ বলা হয়েছে এ কারণে যে, তাঁর জন্ম মুজিযার বহিঃপ্রকাশ ও মানুষের জন্মপদ্ধতির বিপরীত। পিতাবিহীন আল্লাহর খাস কুদরত দ্বারা كُنْ শব্দের মাধ্যমে ঘটেছে। প্রথম اصْطَفٰى -এর সম্পর্ক হলো মরিয়মের শৈশবকালের সাথে, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শুরু থেকেই বুজুর্গি দান করেছিলেন। তাঁর মায়ের দোয়া কবুল করে তাঁকে অস্তিত্ব দান করা হয়েছে। এছাড়া ইবাদতখানার কাজকর্ম ছেলেদের উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি কন্যা হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে এ সুযোগ দান করা হয়েছে। এরপর তাঁর কক্ষে অমৌসুমি ফল মুজিযাস্বরূপ পৌঁছানো হত, হযরত যাকারিয়া (আ.)-কে তা হতবাক করেছে। এ সকল কিছুই তিনি আল্লাহর বিশেষ মনোনীতা হওয়ার নিদর্শন।

বিবি মরিয়মের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব : মাঝখানে হযরত যাকারিয়া ও হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর ঘটনা প্রসঙ্গক্রমে এসে গিয়েছিল, যা দ্বারা ইমরান পরিবারের মনোনয়নের বিষয়টিকে পরিস্ফুট করে তোলা হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে হযরত মাসীহ (আ.)-এর ঘটনার জন্যে সেটা ছিল ভূমিকা স্বরূপ। এখানেই তা সমাপ্ত। পুনরায় বিবি মরিয়ম ও হযরত মাসীহ (আ.)-এর ঘটনায় ফিরে যাওয়া হচ্ছে। কাজেই প্রথমে হযরত মাসীহের আগে তাঁর জননীর মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরা হয়। ফেরেশতাগণ বিবি মরিয়মকে বলল, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে প্রথম দিন থেকেই বাছাই করে নিয়েছেন, যে কারণে মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও নিজ নজরানায় আপনাকে কবুল করেছেন। নানা রকম উচ্চতর অবস্থা ও উন্নত কারামত আপনাকে দান

করেছেন। নির্মল চরিত্র, অনাবিল প্রকৃতি এবং প্রকাশ্য ও অভ্যন্তরীণ উৎকর্ষে ভূষিত করে আপনাকে নিজ মসজিদের সেবা করার উপযুক্ত করে তুলেছেন। সর্বোপরি বিশ্বের সমস্ত নারীর উপর বিভিন্ন দিক থেকে আপনাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। যেমন তাঁর মাঝে এমন যোগ্যতা ও ক্ষমতা নিহিত রেখেছেন যে, পুরুষের স্পর্শ ব্যতিরেকে কেবল তাঁর একার অস্তিত্ব হতে হযরত মাসীহ (আ.)-এর মতো একজন মহান নবীর জন্ম হতে পারে। এ বৈশিষ্ট্য দুনিয়ার আর কোনো নারী লাভ করেনি। –[তাফসীরে ওসমানী]

ফায়দা : হযরত মরিয়মের এ বিশেষ মর্যাদা তাঁর যুগের প্রতি লক্ষ্য করে। কেননা বিভিন্ন সহীহ হাদীসে হযরত মরিয়মের সাথে হযরত খাদীজা (রা.)-কেও خَيْرُ النِّسَاءِ তথা সর্বোৎকৃষ্ট নারী বলা হয়েছে এবং আরও বিভিন্ন নারীর মর্যাদা ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন– হযরত আছিয়া ও হযরত আয়েশা প্রমুখ। হযরত আয়েশা (রা.) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, অন্যান্য সকল নারীর উপর তাঁর মর্যাদা এরূপ যেমন অন্যান্য খাদ্যের উপর আরবের প্রসিদ্ধ খাবার সারীদ -এর মর্যাদা।

–[তাফসীরে ইবনে কাছীর]

তিরমিযী শরীফের এক বর্ণনায় হযরত ফাতিমা (রা.)-কেও বিশেষ মর্যাদাবান নারীদের মধ্যে শামিল করা হয়েছে।

–[তাফসীরে ইবনে কাছীর]

قَوْلُهُ طَهَّرَكِ : আপনাকে সকল প্রকার পাপ-পঙ্কিলতার স্পর্শ হতে পবিত্র রেখেছেন, আপনার পূত-পবিত্র চরিত্রের এক নমুনা বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। –[তাফসীরে ইবনে জরীর, রূহুল বয়ান, কবীর, বাহর]

আয়াতে কারীমাতে এ প্রশংসার মাধ্যমে ইসলামের জঘন্যতম দুশমন ইহুদিদের সে সকল হীন ও ঘৃণ্য প্রচারণা নিরসন করা হয়েছে, যাতে তারা হযরত মরিয়ম (আ.)-এর চরিত্রের উপর জঘন্য ও নিকৃষ্ট ধরনের অপবাদ ও কলঙ্ক আরোপ করেছিলেন; এমনকি বর্তমান যুগেও করছে।

قَوْلُهُ يٰمَرْيَمُ اقْنُتِىْ لِرَبِّكِ الخ : **ইহুদি খ্রিস্টানদের ভ্রান্ত বিশ্বাস :** পূর্ববর্তী আয়াতে ইহুদিদের ভ্রান্ত আকিদা ও জঘন্য প্রচারণা নিরসন করা হয়েছে ; আর আলোচ্য আয়াতে খ্রিস্টানদের ভ্রান্ত আকিদা ও প্রচারণাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। ইহুদিদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, মরিয়ম অত্যন্ত ইবাদতগুজার, সচ্চরিত্রা ও আনুগত্যশীলা রমণী ছিলেন। আর খ্রিস্টানদেরকে সতর্ক ও অবগত করে দেওয়া হয়েছে যে, মরিয়ম আল্লাহর পুত্রের [নাউযুবিল্লাহ] মা ছিলেন না। তিনি এমন কোনো দেবী ছিলেন না, যাকে পূজা করা যেতে পারে, তাঁর ইবাদত করা যেত পারে বা আল্লাহর সাথে শিরক করা যেতে পারে; বরং তাঁর প্রাপ্য সকল মর্যাদা ও সম্মান এ পর্যন্ত সীমিত যে, তিনি তাঁর মালিক ও প্রভুর অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, অত্যন্ত অনুগত, ইবাদতগুজার রমণী ছিলেন। –[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ وَارْكَعِىْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ : রুকুকারীগণ যেভাবে মহান আল্লাহর সম্মুখে রুকু করে আপনিও সেভাবে রুকু করুন। কিংবা এর অর্থ হলো, আপনি জামাতের সাথে সালাত আদায় করুন। যে ব্যক্তি অন্ততপক্ষে রুকুতেও ইমামের সাথে শরিক হতে পারে, তাকে রাকাত পেয়েছে বলে গণ্য করা হয়। সম্ভবত এ কারণেই সালাতকে রুকু শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র.) তাঁর ফতোয়ায় যা বলেছেন, তা দ্বারা এমনই বোঝা যায়। এ ব্যাখ্যা অনুসারে اُقْنُتِىْ -এর قُنُوْتٌ অর্থ দাঁড়ানো নিলে সালাতের কিয়াম, রুকু, সিজদা তিনটি অবস্থাই আয়াতে এসে যায়। –[তাফসীরে ওসমানী]

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সম্ভবত সে সময় মেয়েদেরও সাধারণভাবে অথবা ফিতনার আশঙ্কা না থাকলে কিংবা বিশেষভাবে বিবি মরিয়মের জন্যে জামাতে উপস্থিত হওয়া জায়েজ ছিল। এমনও হতে পারে যে, তিনি একা বা অন্য মেয়েদের সাথে কক্ষের ভিতর থেকে ইমামের ইকতিদা করে থাকবেন। এর যে কোনোটি হওয়ার অবকাশ আছে। –[তাফসীরে ওসমানী]

٤٤. ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرُ مِنْ اَمْرِ زَكَرِيَّا وَمَرْيَمَ مِنْ اَنْبَاۤءِ الْغَيْبِ اَخْبَارِ مَا غَابَ عَنْكَ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ فِى الْمَاءِ يَقْتَرِعُوْنَ لِيَظْهَرَ لَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ يُرَبِّى مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ فِىْ كَفَالَتِهَا فَتَعْرِفُ ذٰلِكَ فَتُخْبِرُ بِهٖ وَاِنَّمَا عَرَفْتَهُ مِنْ جِهَةِ الْوَحْىِ .

অনুবাদ :

৪৪. এটা অর্থাৎ হযরত যাকারিয়া ও মরিয়ম সম্পর্কিত উল্লিখিত কাহিনী অদৃশ্য বিষয়ক সংবাদ, আপনার থেকে যা কিছু অদৃশ্য সে সম্পর্কিত কাহিনী, হে মুহাম্মদ! যা আমি তোমার নিকট ওহী প্রেরণ করছি। মরিয়মের তত্ত্বাবধানের লালনপালনের ভার কে গ্রহণ করবে? এজন্য এটা উদ্ঘাটনের উদ্দেশ্যে যখন তারা তাদের কলম পানিতে নিক্ষেপ করছিল অর্থাৎ লটারি দিচ্ছিল তখন তুমি তাদের নিকট ছিলে না এবং তাঁর তত্ত্বাবধান সম্পর্কে যখন তারা বাদানুবাদ করেছিল তখনও তুমি তাদের নিকট ছিলে না। যে, বলা যায় তা নিজে জেনে এতদসম্পর্কে আপনি এদের সংবাদ দিচ্ছেন; বরং ওহীর মাধ্যমেই আপনি তৎসম্পর্কে অবহিত হয়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নবীগণের জ্ঞানের মূল উৎস ওহী : দৃশ্যত রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো লেখাপড়া করেননি। প্রথম থেকে আহলে কিতাবের বিশেষ সাহচর্যও পাননি যাতে অতীত ঘটনাবলির এরূপ বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ হতে পারে। সাহচর্য পেলেই বা কি হতো? যেখানে তারা নিজেরাই নানা রকম কল্পকথা ও ভিত্তিহীন গালগল্পের অন্ধকারে ঘূরপাক খেয়ে চলেছে। কেউ শত্রুতাবশত এবং কেউ সীমাতিরিক্ত ভালোবাসার আবর্তে সত্যিকারের ঘটনাবলিকে বিকৃত করে ফেলেছিল। অন্ধের চোখ থেকে আলো গ্রহণের কি আশা থাকতে পারে? এহেন পরিস্থিতিতে মাক্কী ও মাদানী উভয় প্রকার সূরায় বিগত ঘটনাবলি এমন বিশুদ্ধ ও বিশদ বিবরণ দান, যা বড় বড় জ্ঞানের দাবিদারকে বিস্ময়-বিমূঢ় করে দেয় এবং কারও পক্ষে তা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ থাকেনি; এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, এ জ্ঞান প্রিয়নবী ﷺ -কে ওহীর মাধ্যমে দান করা হয়েছিল। কেননা তিনি সেসব অবস্থা না স্বচক্ষে দেখেছেন, না সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভের অপর কোনো মাধ্যম তাঁর কাছে ছিল। –[তাফসীরে ওসমানী]

قَوْلُهُ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ : এ ঘটনার প্রকৃত বিবরণ যতটুকু জানা যায় তা হলো, 'হায়কলে সুলায়মানী' [বায়তুল মুকাদ্দাস] -এর খাদেম হিসেবে বহু লোক নিয়োজিত ছিল। তাদের কেউ ছিল ঝাড়ুদার, কেউ ঘরবাড়ি সংস্থাপনকারী, কেউ মেঝে ও বিছানা পরিচ্ছন্নকারী ও কার্পেট ইত্যাদি বিছানা বিছাবার কাজে নিয়োজিত, কেউ ছিল দারোয়ান, আবার কেউ ছিল মুয়াজ্জিন। হযরত মরিয়মের পিতা ইমরান ছিলেন তাঁর জীবদ্দশায় খাদিমদের তত্ত্বাবধায়ক। তাঁর ইন্তেকালের পর মরিয়মের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব কার উপর ন্যস্ত হবে এ নিয়ে খাদিমদের মধ্যে বিতর্ক ও ঝগড়ার সূত্রপাত হলো। হযরত যাকারিয়া (আ.) ছিলেন বিবি মরিয়মের নিকটাত্মীয় এবং খালু। তখন তাঁরা এ মতে পৌঁছল যে, ভাগ্যপরীক্ষার মাধ্যমে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। তখন এমনি ধরনের প্রথা প্রচলিত ছিল এবং তাওরাত যে কলম দিয়ে লিখা হতো, সে কলম দিয়ে তাওরাতের কিছু অংশ লিখে কলমসহ উক্ত লিখিত টুকরো জর্ডান নদীতে নিক্ষেপ করা হতো। কলম সাধারণত স্রোতের অনুকূলেই প্রবাহিত হতো। এ স্রোতের বিপরীতমুখী কলমের অধিকারীকেই কৃতকার্য ও সফল বলে ঘোষণা দেওয়া হতো এবং এ ব্যবস্থাকে গায়েবী ইঙ্গিতের স্থলাভিষিক্ত মনে করা হতো এবং মনে করা হতো, স্রোতের বিপরীতমুখী প্রবাহিত কলমের মালিকের পক্ষেই গায়েব থেকে রায় প্রদান করা হয়েছে। মরিয়মের অভিভাবকত্বের এ কলম পরীক্ষা তথা ভাগ্যপরীক্ষায় হযরত যাকারিয়া (আ.) কৃতকার্য হলেন।

قَوْلُهُ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ : এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, যখন মরিয়মের অভিভাবকত্বের 'কুরআহ' তথা ভাগ্যপরীক্ষা [জর্ডান নদীতে কলম নিক্ষেপের মাধ্যমে] অনুষ্ঠিত হয়, তখন আপনি তো স্বয়ং ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না এবং কোনো প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তির সাক্ষ্যও আপনার নিকট পৌঁছেনি। এরপরও আপনি যে ঘটনার নিখুঁত ও নির্ভুল বর্ণনা প্রদান করেছেন, তা একমাত্র ওহী ব্যতীত আর কোনো পদ্ধতিতে আপনার নিকট পৌঁছেছে? নিশ্চয় ওহী-ই একমাত্র মাধ্যম। অর্থাৎ আলোচ্য আয়াতে মুশরিক, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বিবেকের কাছে এ যুক্তি উত্থাপন আপনার নিকট ওহী নাজিলের জ্বলন্ত প্রমাণ এবং ওহী নাজিলের সত্যতা প্রমাণিত হওয়াই আপনার নবুয়তের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

অনুবাদ :

٤٥. اُذْكُرْ اِذْ قَالَتِ الْمَلٰئِكَةُ اَىْ جِبْرَئِيْلُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اَىْ وَلَدٍ اِسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ خَاطَبَهَا بِنِسْبَتِهِ اِلَيْهَا تَنْبِيْهًا عَلٰى اَنَّهَا تَلِدُهُ بِلَا اَبٍ اِذْ عَادَةُ الرِّجَالِ نِسْبَتُهُمْ اِلٰى اٰبَائِهِمْ وَجِيْهًا ذَا جَاهٍ فِى الدُّنْيَا بِالنُّبُوَّةِ وَالْاٰخِرَةِ بِالشَّفَاعَةِ وَالدَّرَجَاتِ الْعُلٰى وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ.

৪৫. আর স্মরণ কর, যখন ফেরেশতারা অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.) বলল, হে মরিয়ম! আল্লাহ তোমাকে তাঁর একটি কথার অর্থাৎ তাঁর তরফ থেকে একটি সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছেন, তাঁর নাম মসীহ, মরিয়ম তনয় ঈসা। সে ইহলোকে নবুয়ত লাভে, পরলোকে শাফাআতের অধিকার ও উচ্চ মর্যাদা লাভে সম্মানিত সম্মানের অধিকারী. এবং আল্লাহর নিকট সান্নিধ্যপ্রাপ্তদের মধ্যে হবে। তাঁকে [হযরত ঈসাকে] এ আয়াতে হযরত মরিয়মের সাথে সম্পর্কিত করে তাঁকে [মরিয়মকে] সম্বোধন করত এদিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, পিতার মাধ্যম ব্যতীত তাঁকে মরিয়ম জন্ম দেবেন। নইলে পিতার সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে সন্তানের উল্লেখ করাই হলো সাধারণ নিয়ম।

٤٦. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ اَىْ طِفْلًا قَبْلَ وَقْتِ الْكَلَامِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ.

৪৬. **সে দোলনায় অর্থাৎ শিশু অবস্থায়,** কথা বলার সময় **হওয়ার পূর্বেই ও পরিণত বয়সে মানুষের** সাথে কথা **বলবে এবং সে হবে পুণ্যবানদের একজন।**

٤٧. قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ بِتَزَوُّجٍ وَلَا غَيْرِهِ قَالَ الْاَمْرُ كَذٰلِكِ مِنْ خَلْقِ وَلَدٍ مِنْكِ بِلَا اَبٍ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاۤءُ اِذَا قَضٰى اَمْرًا اَرَادَ خَلْقَهُ فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ اَىْ فَهُوَ يَكُوْنُ.

৪৭. **সে বলল, হে আমার প্রভু!** আমাকে কোনো পুরুষ **বিবাহ বা** অন্য কোনোভাবে স্পর্শ করেনি, আমার সন্তান হবে কিভাবে? اَنّٰى এটা এ স্থানে كَيْفَ [কিরূপে] অর্থে ব্যবহৃত। তিনি বললেন, এভাবেই অর্থাৎ পিতার মাধ্যম ব্যতীত তোমার সন্তান পয়দা করার বিষয়টি এরূপেই হবে। আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কিছু স্থির করেন অর্থাৎ তা সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন তখন বলেন, হও; অনন্তর তা হয়ে যায়।

তাহকীক ও তারকীব

বিশেষ দ্রষ্টব্য : মাসীহ مَسِيْحٌ শব্দটি মূলত হিব্রুতে ছিল মাশীহ (مَاشِيْحٌ) বা মাশীহা (مَشِيْحًا) অর্থ– বরকতময়। আরবিতে এসে এটা মাসীহ مَسِيْحٌ হয়ে গেছে। দাজ্জালকেও মাসীহ বলা হয়ে থাকে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে সেটা আরবি শব্দ, এ নামে নামকরণের কারণ যথাস্থানে বর্ণিত হয়েছে। মাসীহের দ্বিতীয় নাম বা উপাধি ঈসা। এর আসল হিব্রু উচ্চারণ ছিল ঈশূ اَيْشُوْعٌ। আরবিতে এসে ঈসা হয়ে গেছে। এর অর্থ– নেতা। লক্ষণীয় বিষয় হলো, কুরআন মাজীদ ইবনে মরিয়ম [মরিয়ম তনয়] -কে হযরত মাসীহের নামের অংশরূপে ব্যবহার করেছেন। কেননা সুসংবাদ দানকালে খোদ মরিয়মকে এ

কথা বলা হয়েছে যে, তোমাকে 'মহান আল্লাহর কালিমা' সম্পর্কে সুসংবাদ দেওয়া হলো, যার নাম হবে মাসীহ ঈসা ইবনে **মরিয়ম, এটা নিশ্চয়** ঈসার পরিচয় দেওয়ার জন্য নয়; বরং এ বিষয়ে সচেতন করার জন্যে যে, বাপ না থাকার কারণে তাঁর **বংশ-পরিচয় মায়ের** সাথেই সম্পৃক্ত থাকবে। তাই মানুষের কাছে মহান আল্লাহর এ বিস্ময়কর নিদর্শন চির স্মরণীয় এবং বিবি **মরিয়মের মর্যাদা** অমর রাখার জন্যে মায়ের পরিচয়কে তাঁর নামের অংশ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। -[তাফসীরে ওসমানী]

قَوْلُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسٰى : عِيْسٰى হলো اَلْمَسِيْحُ থেকে বদল। হযরত ঈসা (আ.)-এর উপাধি ছিল মাসীহ। ইবরানী ভাষায় **এর অর্থ** হলো- ভ্রমণকারী বা পর্যটক, বরকতময়, পুণ্যময়। তাঁকে এ কথা বলার কারণ, হয়তো তিনি খুব বেশি সফর ও **ভ্রমণ** করতেন অথবা তিনি যে কোনো রুগীর শরীরে হাত বুলালে মাসাহ করলে সে সুস্থ হয়ে যেত।

عِيْسٰى : শব্দটি اَيْشُوْعُ থেকে নিষ্পন্ন; কেউ বলেন, اَلْعَيَسُ থেকে নিষ্পন্ন। অর্থ- বেশির ভাগ মিশ্রিত শুভ্রতা, যেহেতু তিনি সোনালি বর্ণের ছিলেন, এ কারণে তাঁকে ঈসা বলা হয়।

قَوْلُهُ ابْنُ مَرْيَمَ : এটা هُوَ মুবতাদার খবর।

قَوْلُهُ وَجِيْهًا : এটা كَلِمَةٌ থেকে হাল হয়েছে, যদিও শব্দটি নাকেরা। তবে এটা মওসূফা অর্থাৎ **كلمة كائنة منه** ছিল।

وَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ : এর আতফ হলো وَجِيْهًا -এর উপর।

فَهُوَ يَكُوْنُ এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, اَنِّىْ হলো هُوَ উহ্য মুবতাদার খবর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ : হযরত মরিয়মকে পুত্রের সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছে। পুত্রকে পিতাবিহীন সৃষ্টি করার কারণে কালিমাতুল্লাহ বলা হয়েছে। মরিয়ম সে সময় পর্যন্ত ইহুদিদের প্রচলন মোতাবেক কুমারী তথা অবিবাহিতা ছিলেন, অবশ্য তাঁর বিবাহের ব্যাপারে দাউদ গোত্রের ইউসুফ নামক এক যুবকের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। সে কাঠের কাজ করত। ইঞ্জিলের বর্ণনা রয়েছে যে, ফেরেশতা জিবরাঈলকে আল্লাহর পক্ষ থেকে গ্যালিলের নাসেরা শহরে এক কুমারীর নিকট পাঠানো হলো। দাউদ গোত্রের ইউসুফ নামের এক ব্যক্তি তার বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিল, উক্ত কুমারীর নাম ছিল মরিয়ম। -[লুকা খ. ১, পৃ. ২৬-২৭]

ইয়াসু' মাসীহের জন্ম এভাবে হয়েছিল যে, যখন তাঁর মা মরিয়মকে ইউসুফের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, বিবাহের পূর্বেই রূহুল কুদ্দুসের কুদরতে সে গর্ভবতী হয়েছিল। -[মাত্তা খ. ১, পৃ. ৮১]

قَوْلُهُ اَىْ وَلَد : এটা كَلِمَةٌ -এর ব্যাখ্যা :

মাসীহ (আ.) -কে 'কালিমা' বলার তাৎপর্য : হযরত মাসীহ (আ.)-কে এ স্থলে এবং কুরআন ও হাদীসের বহু জায়গায় মহান আল্লাহর 'কালিমা' বলা হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে-

اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ اَلْقَاهَا اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ .

অর্থাৎ 'মরিয়ম তনয় ঈসা মাসীহ তো মহান আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর কালিমা, যা তিনি মরিয়মের নিকট প্রেরণ করেছিলেন ও তাঁর রূহ।' [সূরা নিসা : ১৭১] এমনিতে তো মহান আল্লাহর কালিমা অসংখ্য, যেমন অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّىْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا .

অর্থাৎ 'বল, আমার প্রতিপালকের কালিমা লিপিবদ্ধ করার জন্যে সমুদ্র যদি কালি হয়, তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে, সাহায্যার্থে এর অনুরূপ আরও সমুদ্র আনলেও।' [সূরা কাহাফ : ১০৯] কিন্তু বিশেষভাবে হযরত মাসীহ (আ.)-কে মহান আল্লাহর কালিমা [হুকুমে] বলা হয়ে থাকে এ দৃষ্টিতে যে, তাঁর জন্ম পিতার

মাধ্যম ব্যতিরেকে সাধারণ নিয়মের বাইরে কেবল মহান আল্লাহর হুকুমে সাধিত হয়। যেসব কার্য স্বাভাবিক কারণাদির বাইরে ঘটে, সেগুলোকে সাধারণত সরাসরি মহান আল্লাহর সাথেই সম্পর্ক স্থাপন করা হয়ে থাকে। যেমন ইরশাদ হয়েছে- وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى অর্থাৎ 'আপনি যখন নিক্ষেপ করেছিলেন তখন আপনি নিক্ষেপ করেননি, আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন। -[সূরা আনফাল : ১৭]

قَوْلُهُ وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ : এটা ইহুদিদের উক্তি খণ্ডনার্থে অবতীর্ণ হয়েছে, বলা হচ্ছে তোমরা যার ব্যাপারে সর্বপ্রকার অভিযোগ আরোপ কর এবং যাকে লাঞ্ছিত করার চেষ্টা কর, মূলত সে অতি সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। ইহুদিদের প্রাচীন কোনো কিতাবে হযরত মাসীহ (আ.)-এর কটূক্তি ও হেয়তার কমতি ছিল না। এটা কুরআনের বরকত ও মু'জিযা যে, তা অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে ধীরে ধীরে ইহুদিদের মধ্যেও এ ব্যাপারে পরিবর্তন এসেছে। এমনকি তালমুদের বিভিন্ন অভিযোগ তারা প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করে। পরকালের ইজ্জত-সম্মান তো ভিন্ন কথা, দুনিয়াতে তাঁর সম্মান এভাবে প্রকাশিত হয়েছে যে, বিশ্বের একশত কোটির বেশি মুসলমান আজও তাঁকে আল্লাহর খাঁটি নবী মনে করে, তাঁর নামের শেষে আলাইহিস সালাম যুক্ত করে এবং প্রায় এক কোটি নাসারা তাঁকে রাসূলের মর্যাদা থেকেও উঁচু মনে করে- যদিও আকিদা ভ্রান্ত তথাপি এটা তাঁর ইজ্জত ও সম্মানেরই ফলাফল।

যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল বিবি মরিয়মের অন্তরে এ দুশ্চিন্তা দেখা দেবে যে, কেবল নারী হতে সন্তানের জন্ম হলে দুনিয়ার মানুষ তাকে কিভাবে স্মরণ করবে? তারা নিরুপায় হয়ে আমার উপরই অপবাদ আরোপ করবে এবং নিকৃষ্ট উপাধি আরোপ করে সর্বদা তাঁকে উৎপীড়ন করবে। আমি কিভাবে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করব? এ কারণেই পরে وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ বলে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাঁকে কেবল আখিরাতেই নয়; বরং দুনিয়াতেও প্রভূত সম্মান ও মর্যাদা দান করবেন এবং শত্রুদের সব অপবাদ মিথ্যা প্রতিপন্ন করবেন। -[তাফসীরে ওসমানী]

হযরত ঈসা মাসীহের গুণাবলি : অত্যন্ত মার্জিত ও উচ্চস্তরের পুণ্যবান হবেন। প্রথমে মায়ের কোলে, তারপর বড় হয়ে তিনি আশ্চর্য কথা বলবেন। এর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে বিবি মরিয়মকে পরিপূর্ণ সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে। পূর্বের সুসংবাদগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল যে, তিনি ধারণা করে বসবেন, মর্যাদা যখন লাভ হওয়ার হবে, কিন্তু সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই তো নিন্দা ও অপবাদের লক্ষবস্তুতে পরিণত হতে হবে। তখন নির্দোষ প্রমাণের কি উপায় হবে? এর জবাবে আল্লাহ তা'আলা সান্ত্বনা দানকল্পে বলেন যে, বিচলিত হয়ো না, তোমার মুখ খোলার প্রয়োজনই পড়বে না। শুধু এতটুকু বলে দিও যে, আমি আজ রোজা রেখেছি, তাই কথা বলতে অপারগ। শিশু স্বয়ং জবাবদিহি করবে। সূরা মরিয়মে এর বিস্তারিত বিবরণ আসবে।

কোনো কোনো মুহাদ্দিস বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী- يُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا দ্বারা কেবল বিবি মরিয়মকে সান্ত্বনা দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল যে, শিশু বোবা হবে না। অন্যান্য শিশুর মতোই শৈশব ও পূর্ণ বয়সে কথা বলবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, হাশরের মাঠেও মানুষ হযরত ঈসা (আ.)-কে লক্ষ্য করে বলবে- يَا عِيْسٰى اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهُ اَلْقَاهَا اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا অর্থাৎ 'হে ঈসা! আপনি আল্লাহর রাসূল ও তাঁর কালিমা, যাকে তিনি মরিয়মের নিকট প্রেরণ করেছিলেন এবং আপনি তাঁর রূহ। আপনি শৈশবে দোলনায় কথা বলেছেন।' অনুরূপ স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাও কিয়ামতের দিন বলবেন-

اُذْكُرْ نِعْمَتِىْ عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ اِذْ اَيَّدْتُكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا.

অর্থাৎ 'তোমার প্রতি ও তোমার জননীর প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর, পবিত্র আত্মা দ্বারা আমি তোমাকে সাহায্য করেছিলাম এবং তুমি দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলবে।' -[সূরা মায়েদা : ১১০] তাহলে সেখানেও কি এ নিদর্শন কেবল এ উদ্দেশ্যেই বর্ণনা করা হবে যে, বিবি মরিয়ম যাতে নিশ্চিন্ত হয়ে যান তাঁর ছেলে বোবা হবে না, অন্যান্য শিশুর মতো কথা বলতে পারবে? [আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রকার বিভ্রান্তি হতে আমাদের রক্ষা করুন।]

-[তাফসীরে ওসমানী]

قَوْلُهُ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ : এর মর্ম প্রসঙ্গে বলতে হয় যে, এটি কুরআনুল কারীমের বিস্ময়কর মু'জিযা যে, মাত্র একটি শব্দ দ্বারা গোটা বিষয়বস্তুকে পরিস্ফুটিত করে তোলে। এখানে এ শব্দ দ্বারা তো তাঁর মূল মর্যাদা ও স্থানকে নির্ণীত করেছে যে, তিনি **মহান আল্লাহর ঘনিষ্ঠ** নৈকট্যের অধিকারী, অপর দিকে ইহুদি চক্রের ভ্রান্ত প্রচারণার অপনোদন করে তাঁর সম্মান ও মর্যাদার **সাক্ষ্যও দান করা** হয়েছে।

مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ শব্দ সংযোজনের ফলে তৃতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় হলো, তিনি একাই আল্লাহর ঘনিষ্ঠ ও নিকটতম মর্যাদার **অধিকারী** নন; বরং এমনি আল্লাহর অসংখ্য নবী, রাসূল ও প্রিয়তম বান্দা রয়েছেন, তিনি তাঁদের মধ্যেই একজন। আর **হযরত** ঈসা মাসীহ (আ.) সকল সম্মান ও মর্যাদা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার আবদিয়্যাতের উর্ধ্বে কোনো সত্তা নন, এমন **কোনো** বৈশিষ্ট্য ও মর্তবার অধিকারী নন, যার কারণে তাঁকে আল্লাহ মানা যায় অথবা তাঁর বন্দেগি ও পূজা অর্চনা করা যায়।

قَوْلُهُ يُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ : مَهْد অর্থ- দোলনা। দোলনায় কথা বলার উদ্দেশ্য পরিষ্কার যে, দুগ্ধ পানের বয়সে মু'জিযা স্বরূপ ভাবগাম্ভীর্যময় কথা বলবে। **كَهُوْلَتٌ** অর্থ- অর্ধ বয়স, এ বয়সে কথা বলার উদ্দেশ্য কি? এ সময় তো সকলেই কথা বলে। এর উত্তর এই যে, এখানে মূল উদ্দেশ্য হলো, দুগ্ধপানকালে কথা বলার বর্ণনা করা। এর সাথে প্রাপ্ত বয়সের কথা বলার উল্লেখ এজন্য এসেছে যে, মানুষ যেভাবে প্রাপ্ত বয়সে জ্ঞান-বিবেক খাটিয়ে কথা বলে- হযরত ঈসা (আ.) শৈশবে সেভাবে কথা বলবেন। দ্বিতীয় উত্তর এই যে, হযরত ঈসা (আ.)-কে যখন আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয় তখন তাঁর বয়স ছিল ৩২ বছর, যা ঠিক যৌবনকাল। দুনিয়ায় অবস্থানকালে তাঁর **كَهُوْلَتٌ** মধ্যবয়সী হওয়ার সময় আসেনি। যখন তিনি পুনরায় অবতরণ করবেন, তখন তিনি এ বয়সে উপনীত হবেন। কেমন যেন এর দ্বারা তাঁর অবতরণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এভাবে শৈশবকালে কথা বলার ন্যায় তাঁর সে সময়কার কথাও মু'জিযা স্বরূপ হবে।

قَوْلُهُ طِفْلًا قَبْلَ وَقْتِ الْكَلَامِ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, **اَلْمَهْدُ** দ্বারা দোলনা উদ্দেশ্য নয়; বরং শৈশব অবস্থা উদ্দেশ্য। চাই কথা বলার সময় মায়ের কোলে বা বিছানায় কিংবা দোলনায় থাকুক না কেন।

كَهْلًا অর্থ- পরিণত বয়সে। 'কাহলান' শব্দটি কিশোর জীবন সমাপ্তির পর যৌবনের এক বিশেষ স্তর। প্রৌঢ়ত্বের এক বিশেষ স্তরকে বুঝায়, সাধারণত ত্রিশ বছর বয়স হতে পঞ্চাশ বছর কাল পর্যন্ত সময়কে 'কাহ্ল' বা পরিণত বয়স বলা হয়। -[তাফসীরে কুরতুবী ও রূহুল মা'আনী]

হযরত মাসীহ (আ.) সম্পর্কে শিশু, কিশোর, পরিণত বয়স ইত্যকার শব্দ সমষ্টির ব্যবহার হতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, তিনিও অপরাপর মানুষের মতোই জীবনের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে ক্রমবিকাশের মাধ্যমেই বড় হবেন। আর ক্রমবিকাশের ধারা বেয়ে তাঁর পরিবর্ধিত হওয়াটাই প্রমাণ করে যে, তিনি **اَلُوْهِيَّتٌ** তথা খোদায়ী শক্তিসম্পন্ন কোনো উর্ধ্বতন সত্তা ছিলেন না। তাঁর ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধিই তাঁর সম্পর্কে উলূহিয়্যাতের ধারণা অপনোদনের জ্বলন্ত প্রমাণ।

قَوْلُهُ قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ : তোমার বিস্ময় যথার্থ। তবে আল্লাহর কুদরতের নিকট এটা কোনো দুরূহ বিষয় নয়। তিনি যখন ইচ্ছা করেন- স্বাভাবিক অবস্থার ও সূত্রসমূহের ধারা শেষ করে **كُنْ** -এর নির্দেশ দ্বারা মুহূর্তের মধ্যেই তা বাস্তবায়ন করেন।

قَوْلُهُ كَذٰلِكَ : অর্থাৎ এভাবেই পুরুষের স্পর্শ ছাড়াই হয়ে যাবে। স্বাভাবিক অবস্থার বিপরীত বলে তুমি বিস্মিত ও আশ্চর্য হয়ো না। আল্লাহ তা'আলা যা চান, যখন চান, যেভাবে চান কার্য সম্পাদন করে থাকেন। তাঁর ক্ষমতার কোনো সীমাবদ্ধতা নেই, তিনি কোনো কাজের ইচ্ছা করলেই তা হয়ে যায়। তিনি কোনো মৌল পদার্থের মুখাপেক্ষী নন এবং তিনি আসবাব-উপকরণেরও অধীন নন। -[তাফসীরে ওসমানী]

٤٨. وَيُعَلِّمُهُ بِالنُّونِ وَالْيَاءِ الْكِتٰبَ الْخَطَّ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ ـ

٤٩. وَنَجْعَلُهُ رَسُوْلًا اِلٰى بَنِىْ اِسْرَاءِيْلَ فِى الصِّبَا اَوْ بَعْدَ الْبُلُوْغِ فَنَفَخَ جِبْرَئِيْلُ فِىْ جَيْبِ دِرْعِهَا فَحَمَلَتْ وَكَانَ مِنْ اَمْرِهَا مَا ذُكِرَ فِىْ سُوْرَةِ مَرْيَمَ فَلَمَّا بَعَثَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ قَالَ لَهُمْ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ اَنِّىْ اَىْ بِاَنِّىْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ عَلَامَةٍ عَلٰى صِدْقِىْ مِنْ رَّبِّكُمْ هِىَ اَنِّىْ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالْكَسْرِ اِسْتِئْنَافًا اَخْلُقُ اُصَوِّرُ لَكُمْ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ مِثْلَ صُوْرَتِهِ وَالْكَافُ اِسْمُ مَفْعُوْلٍ فَاَنْفُخُ فِيْهِ الضَّمِيْرُ لِلْكَافِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا وَفِىْ قِرَاءَةٍ طَائِرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ بِاِرَادَتِهِ فَخَلَقَ لَهُمُ الْخُفَّاشَ لِاَنَّهُ اَكْمَلُ الطَّيْرِ خَلْقًا فَكَانَ يَطِيْرُ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَهُ فَاِذَا غَابَ عَنْ اَعْيُنِهِمْ سَقَطَ مَيِّتًا وَاُبْرِئُ اُشْفِى الْاَكْمَهَ الَّذِىْ وُلِدَ اَعْمٰى وَالْاَبْرَصَ وَخُصَّا لِاَنَّهُمَا دَاءَ اِنْ اَعْيَيَا الْاَطِبَّاءَ ـ

অনুবাদ :

৪৮. এবং তিনি তাকে শিক্ষা দেবেন কিতাব লেখনী হিকমত, তাওরাত ও ইঞ্জিল। يُعَلِّمُهُ এটা نُوْن [উত্তম পুরুষ, বহুবচন] ও ى [নাম পুরুষ, একবচন] উভয় রূপেই পাঠ করা যায়।

৪৯. এবং তাকে শৈশব অবস্থায়ই বা সাবালক তথা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর বনী ইসরাঈলের প্রতি রাসূল করব। অনন্তর তাঁর জামার ফাঁক দিয়ে হযরত জিবরাঈল ফুঁক দেন। ফলে তিনি গর্ববতী হন। পরে তাঁর অবস্থা সূরা মরিয়মে উল্লিখিত অবস্থার ন্যায় হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁকে বনী ইসরাঈলের প্রতি রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেন তখন তাদেরকে তিনি বলেন, আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর রাসূল। আমি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট নিদর্শন অর্থাৎ আমার সত্যতার চিহ্ন নিয়ে এসেছি। তা হলো, আমি اِنِّىْ এটা অপর এক কেরাতে প্রথমাক্ষর কাসরাসহ পঠিত। এমতাবস্থায় তা اِسْتِئْنَاف বা নববাক্য বলে বিবেচ্য হবে। তোমাদের জন্যে কাদা দ্বারা পাখি সদৃশ আকৃতি অর্থাৎ তার অনুরূপ আকৃতি গঠন করব সুরত বানাব। كَهَيْئَةِ-এর كَاف টি এ স্থানে اَخْلُقُ-এর اِسْمُ مَفْعُوْل বা কর্মবাচক বিশেষ্য। অতঃপর তাতে আমি ফুৎকার দেব, فِيْهِ-এর ضَمِيْر বা সর্বনামটি উক্ত كَاف -এর প্রতি ইঙ্গিতবহ। ফলে আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর অভিপ্রায়ক্রমে তা পাখি হয়ে যাবে। طَيْرًا এটা অপর এক কেরাতে طَائِرًا রূপে পঠিত রয়েছে। অনন্তর তিনি তাদের চামচিকা সৃষ্টি করে দেখালেন। কারণ গঠন প্রকৃতি হিসেবে তা পাখিদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ প্রাণী বলে স্বীকৃত। [যাহোক, বানানোর পর] তা তাদের সামনে উড়ে প্রস্থান করত এবং তাদের দৃষ্টির অন্তরালে গিয়ে তা মরে পড়ে যেত। [এটা এজন্য যে, আল্লাহর সৃষ্টিই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, মানুষকে সৃষ্টি করার ক্ষমতা দেওয়া হলেও মানুষের সৃষ্টি অপূর্ণ থাকে।] তিনি আরও বলেন, জন্মান্ধ اَكْمَهَ অর্থাৎ জন্মান্ধ। ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে ভালো করব নিরাময় করব।

وَكَانَ بَعْثُهُ فِىْ زَمَنِ الطِّبِّ فَابْرَأَ فِىْ يَوْمٍ خَمْسِيْنَ اَلْفًا بِالدُّعَاءِ بِشَرْطِ الْاِيْمَانِ وَأُحْيِى الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ بِاِرَادَتِهٖ كَرَّرَهُ لِنَفْيِ تَوَهُّمِ الْاُلُوْهِيَّةِ فِيْهِ فَاَحْيَا عَازِرًا صَدِيْقًا لَهُ وَابْنَ الْعَجُوْزِ وَابْنَةَ الْعَاشِرِ فَعَاشُوْا وَ وُلِدَ لَهُمْ وَسَامَ بْنَ نُوْحٍ وَمَاتَ فِى الْحَالِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ تَخْبَئُوْنَ فِىْ بُيُوْتِكُمْ مِمَّا لَمْ أُعَايِنْهُ فَكَانَ يُخْبِرُ الشَّخْصَ بِمَا اَكَلَ وَمَا يَاْكُلُ بَعْدُ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرِ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ

এ রোগ দুটির বিষয়ে যেহেতু চিকিৎসকগণ অক্ষম সেহেতু এ স্থানে বিশেষ করে এ দুটিরই উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত ঈসা (আ.) -এর আগমন হয়েছিল চিকিৎসা বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগে। ঈমান গ্রহণের শর্তে একদিনে পঞ্চাশ হাজার রুগীকে তিনি দোয়া করে নিরাময় করেছিলেন। এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর ইচ্ছা বা অভিপ্রায়ক্রমে মৃতকে জীবন দান করব। তাঁর সম্পর্কে ঈশ্বরত্ব আরোপের ধারণা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে এ কথাটির অর্থাৎ بِاِذْنِ اللّٰهِ কথাটির পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। তিনি তাঁর বন্ধু আযারকে, জনৈকা বৃদ্ধার পুত্রকে ও আশিরের কন্যাকে জীবিত করেন। পরেও তারা জীবিত ছিল এবং তাদের সন্তানাদিও হয়। হযরত নূহ (আ.) -এর পুত্র সামকেও জীবিত করেছিলেন। তবে তিনি সে ক্ষণেই মারা যান।

তোমরা যা আহার কর ও তোমাদের গৃহে মজুদ করে রাখ গোপন করে রাখ, যা আমি দেখিনি তা তোমাদেরকে বলে দেব। একজন গৃহে কি আহার করে এসেছে এবং পরে কি আহার করবে তা তিনি বলে দিতেন।

তোমরা যদি বিশ্বাসী হও তবে নিশ্চয় এতে উল্লিখিত বিষয়সমূহে তোমাদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ الْكَافُ اِسْمُ مَفْعُوْلٍ : এ ইবারত বৃদ্ধি করে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

প্রশ্ন : فَاَنْفُخُ فِيْهِ -এর মধ্যে ه সর্বনাম كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ -এর- كَافٌ -এর দিকে ফিরেছে, আর এটা হলো হরফ যার দিকে সর্বনাম ফিরতে পারে না।

উত্তর : এখানে كَافٌ হলো مِثْل অর্থে, যা ইসমে মাফউল । অর্থাৎ مُمَاثَلَةُ هَيْئَةِ الطَّيْرِ অর্থে।

قَوْلُهُ الْخَطُّ : اَلْكِتَابُ -এর ব্যাখ্যা اَلْخَطُّ দ্বারা করে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

প্রশ্ন : তাওরাত ও ইঞ্জিলের আতফ اَلْكِتٰبُ -এর উপর সঠিক নয়। কারণ কিতাবের মধ্যে তাওরাত ও ইঞ্জিল উভয়টি **শামিল রয়েছে।** কাজেই এটা عَطْفُ الشَّيْءِ عَلٰى نَفْسِهٖ -এর অন্তর্গত হবে।

উত্তর : اَلْكِتٰبُ দ্বারা اَلْكِتَابَةُ উদ্দেশ্য। اَلْخَطُّ দ্বারা সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ هِيَ اَنِّىْ : هِيَ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, اَنِّىْ তার পরের অংশসহ উহ্য মুবতাদার খবর; اَنِّىْ قَدْ جِئْتُكُمْ থেকে বদল **হওয়ার কারণে** মানসূব নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْحِكْمَةَ : **সম্ভবত** কিতাব ও হিকমত দ্বারা কুরআন ও হাদীস বুঝানো উদ্দেশ্য। কেননা হযরত মাসীহ (আ.) দুনিয়ায় পুনরাগমনের পর কুরআন ও হাদীসে নববী ﷺ অনুযায়ী ফয়সালা দেবেন। আর এটা তখন সম্ভব যখন তাঁকে এ বিষয়ের জ্ঞান দান করা হবে।

قَوْلُهُ وَرَسُوْلًا اِلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ : বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের একজন রাসূল হিসেবে তাঁর আগমন ঘটবে। এ রিসালাতের মর্যাদায় তিনি অভিষিক্ত হবেন। [মা'আযাল্লাহ] তিনি কোনো যাদুকর বা বাজিকর হবেন না, যেমনটি প্রতারক ইহুদিগণ মনে করে। [নাঊযুবিল্লাহ] না তিনি আল্লাহ বা আল্লাহর পুত্র, যেমনটি খ্রিস্টানগণ অনর্থক মনে করে থাকে। اِلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ এখানে একথা অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, শুধু বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের নিকটই ইসলাম প্রচার করবেন। তাঁর আহ্বান বনী ইসরাঈল পর্যন্তই সীমিত। বনী ইসরাঈলের অন্য নবীগণের মতো তিনিও শুধু বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়েরই নবী ও রাসূল ছিলেন।

হযরত ঈসা (আ.) -এর মু'জিযা : جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ -এর মধ্যকার আয়াত শব্দের অর্থ– চিহ্ন বা নিদর্শন। এখানে মু'জিযা তথা অলৌকিক ঘটনা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মু'জিযা এমন ধরনের ঘটনাবলি প্রকাশের নাম, যা সাধারণ ও স্বাভাবিক প্রচলিত নিয়ম ও ব্যবস্থার ব্যতিক্রম।

قَوْلُهُ مِنْ رَّبِّكُمْ : আয়াতের এ অংশে এর প্রতিই সর্বাধিক জোর, তাকিদ ও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যে, এ সকল মু'জিযা নবীগণের ইচ্ছা ও শক্তির দ্বারা হয় না, বরং নিঃসন্দেহে এর প্রকাশ একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছা ও কুদরতেই হয়। অবশ্য এসব মু'জিযার দ্বারা নবুয়ত ও রিসালাতের সাহায্য-সহযোগিতা ও তাদের সত্যতা প্রমাণিত হয়।

قَوْلُهُ اَخْلُقُ : خَلْقٌ -এর অর্থ– সৃষ্টি। সৃষ্টি শব্দের সম্পর্ক যখন আল্লাহ তা'আলার সাথে জড়িত হয়, তখন তার অর্থ অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনা। আর خَلْقٌ বা সৃষ্টিকর্মের সম্পর্ক যখন মানুষের সাথে হয়, তখন তার অর্থ হয়– পরিমাপ করা, বিশেষভাবে প্রস্তুত করা, আকৃতি দান করা, রূপ দান করা ও উপযোগ সৃষ্টি করা ইত্যাদি। মোট কথা, এক বা একাধিক বস্তু বা পদার্থকে তার নিজস্ব রূপ ঠিক রেখে অথবা আংশিক বা পরিপূর্ণ পরিবর্তন করে কিংবা প্রয়োজনীয় যোজন-বিয়োজনের মাধ্যমে এক ধরন হতে অন্য ধরনে রূপান্তর করে মানুষের ব্যবহারের উপযোগী করা, যা মানব জাতির উপকারে আসে। এখানে হযরত ঈসা (আ.) -এর সম্পর্কে اَخْلُقُ শব্দ বলার তাৎপর্য নতুন করে কিছু সৃষ্টি করা নয়; বরং আকৃতি প্রদান ও রূপদান করাই বুঝানো হয়েছে।

خَلَقَهُ تَقْدِيْرَهُ وَلَمْ يَرِدْ اَنَّهُ يُحْدِثُ مَعْدُوْمًا (تاج) اَلْخَلْقُ اَصْلُهُ التَّقْدِيْرُ الْمُسْتَقِيْمُ (راغب) اَلَّذِىْ يَكُوْنُ بِالْاِسْتِحَالَةِ فَقَدْ جَعَلَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى بِغَيْرِ فِىْ بَعْضِ الْاَحْوَالِ وَالْخَلْقُ لَا يُسْتَعْمَلُ فِىْ كَافَّةِ النَّاسِ اِلَّا عَلٰى وَجْهَيْنِ اَحَدُهُمَا فِىْ مَعْنَى التَّقْدِيْرِ (راغب) اَىْ اُقَدِّرُ وَاُصَوِّرُ (كبير) وَالْمُرَادُ بِالْخَلْقِ التَّصْوِيْرُ وَالْاِبْرَازُ عَلٰى مِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ (روح)

قَوْلُهُ لَكُمْ : অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে একিন পয়দা করার লক্ষ্যে।

اَىْ لِاَجَلِ تَحْصِيْلِ اِيْمَانِكُمْ وَدَفْعِ تَكْذِيْبِكُمْ اِيَّاىَ (روح) وَاللَّامُ فِىْ لَكُمْ لِلتَّعْلِيْلِ (بحر) সাধারণ জনতা সর্বদাই যুক্তি-প্রমাণের চেয়ে অদ্ভুত ও অলৌকিক ঘটনাবলির প্রতি বেশি আকৃষ্ট এবং প্রভাবান্বিত হয়। আর ইহুদিদের মধ্যেও এ ধরনের অলৌকিকত্ব ও অদ্ভুত ঘটনাবলির প্রতি আকর্ষণ বিশেষভাবে মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণ ছিল।

قَوْلُهُ مِنَ الطِّيْنِ : 'কাদা মাটির দ্বারা' আয়াতের এ অংশ দ্বারা হযরত ঈসা (আ.) -এর সত্যকে আরও পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন। আমার পাখি তৈরির ব্যাপরটি অনস্তিত্ব হতে কোনো কিছুকে অস্তিত্বে আনা নয়; বরং মহান আল্লাহর দেওয়া পদার্থ ও বস্তুকে তাঁর দেওয়া বিভিন্ন উপকরণকে বিশেষ পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ও সংযোজনের মাধ্যমে তাঁরই শক্তিতে আকৃতি ও রূপদান করা শুধু। –[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ اَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ : বলা হয়ে থাকে, 'ইরহাস' [নবুয়ত পূর্বকালীন অলৌকিক ঘটনা] হিসেবে শৈশব কালেই তাঁর থেকে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে, যাতে অপবাদ আরোপকারীদের কুদরতের এক ছোট্ট নিদর্শন দেখিয়ে একথা বুঝিয়ে দিতে পারেন যে, যখন আমার এক ফুঁ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মাটির নিষ্প্রাণ আকৃতিকে প্রাণময় করে তোলেন, তখন তিনি যদি পুরুষাঙ্গ ব্যতিরেকেই রূহুল কুদুসের ফুঁ দ্বারা এক মহিমান্বিত রমণীর বাচ্চাদানীতে হযরত ঈসা (আ.)-এর আত্মা সঞ্চারিত করেন, তাতে আশ্চর্যের কি আছে? বরং হযরত মাসীহ (আ.) যেহেতু হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ফুৎকারে জন্মলাভ করেছেন, সেহেতু তাঁর নিজের ফুৎকারকেও সেই জন্ম ধারারই সক্রিয় প্রভাব মনে করা

উচিত। সূরা মায়িদার শেষ দিকে হযরত মাসীহ (আ.) -এর এসব অলৌকিক ঘটনা সম্পর্কে এক আলোচনা করা হবে। বিষয়টি সেখানে দ্রষ্টব্য। সারকথা, হযরত মাসীহ (আ.) -এর মাঝে ফেরেশতাসুলভ ও আত্মিক বৈশিষ্ট্যাবলির প্রাবল্য ছিল। সে অনুযায়ীই ক্রিয়াদি প্রকাশ পেত। কিন্তু তাই বলে ফেরেশতাদের উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব এবং ফেরেশতাগণের আদমকে সিজদা করার কারণে কোনোরূপ প্রশ্ন দেখা দেবে না। কেননা যাবতীয় মানবিক গুণাবলি তথা দৈহিক ও আত্মিক গুণ সমষ্টির সমারোহ যাঁর মাঝে চূড়ান্ত পর্যায়ে ঘটবে তাঁকে হযরত মাসীহ (আ.) হতেও শ্রেষ্ঠ স্বীকার করতে হবে আর তা হলো হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর পূত-পবিত্র সত্তা। -[তাফসীরে ওসমানী]

قَوْلُهُ اِنِّىْ اَخْلُقُ : এখানে خَلْق দ্বারা সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য নয়, কারণ তা কেবল আল্লাহই করেন। এখানে তার অর্থ হলো- বাহ্যিক গঠন-প্রকৃতি দান করা এবং তৈরি করা। ব্যাখ্যাকার (র.) خَلْق -এর ব্যাখ্যায় اُصَوِّرُ উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন। হযরত ঈসা (আ.) মাটি দ্বারা বাদুড়ের আকৃতি তৈরি করেন। প্রসিদ্ধ আছে যে, বাদুড় হলো সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গ পাখি। তার দাঁত ও স্তন আছে এবং পালকবিহীন উড়ে। মাগরিবের পরে এবং ফজরের পরেই কেবল তাকে দেখা যায়। -[সাবী]

قَوْلُهُ بِاِذْنِ اللّٰهِ : আয়াতের এ অংশে হযরত ঈসা (আ.) নিজস্ব ভাষণে সুস্পষ্টভাবে এ স্বীকৃতি দিয়েছেন যে, আমি আল্লাহ বা আল্লাহর পুত্র কোনোটাই নই। আমার দ্বারা সংঘটিত এ সকল অদ্ভুত ও অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডকে আমার নিজস্ব শক্তি ও ক্ষমতার ফলশ্রুতি মনে করে গোমরাহির অথৈ সমুদ্রে হাবুডুবু খেয়ো না, বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হয়ো না। যা কিছু আমার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে, মূলত এসব কিছুই মহাশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা, তাঁরই শক্তি-ক্ষমতা ও মহান কুদরতের ফলেই হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ : জন্মান্ধ শিশুও আমার হাতের পরশে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়। তা হযরত ঈসা (আ.) -এর এক বিস্ময়কর মু'জিযা। বিভিন্ন রোগগ্রস্ত ব্যক্তির চক্ষুও অপারেশন ব্যতীত সুস্থ করে তোলা খুব সহজ ব্যাপার নয়, অথচ এখানে জন্মান্ধকে সুস্থ করার মতো অলৌকিক কাণ্ডের কথাই বলা হয়েছে। আর প্রকৃতপক্ষে আকমাহ বলতে জন্মান্ধ ব্যক্তিকেই বুঝায়।

হযরত মাসীহ (আ.)-কে যুগোপযোগী মু'জিযা দেওয়া হয়েছিল : সেকালে চিকিৎসক শ্রেণির প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। হযরত মাসীহ (আ.) -কে এমন সব মু'জিযা দেওয়া হয়, যা সমকালীন মানুষের উপর তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবজনক বিষয়েও হযরত মাসীহের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে দেয়। এ কথা অনস্বীকার্য যে, মৃতকে জীবিত করা আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণ, যা কেবলমাত্র মহান স্রষ্টার জন্যই প্রযোজ্য; অন্য কারো জন্য নয়। যেমন- بِاِذْنِ [আল্লাহর হুকুমে] শব্দ দ্বারাও তা পরিস্ফুট হয়, কিন্তু হযরত মাসীহ (আ.) যেহেতু সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে এর মাধ্যম বা অসিলা ছিলেন, তাই রূপকার্থে নিজের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। -[তাফসীরে ওসমানী]

قَوْلُهُ بِاِذْنِ اللّٰهِ : দ্বিতীয়বার بِاِذْنِ اللّٰهِ বলার উদ্দেশ্য হলো, কেউ যেন এ ভুল ধারণার শিকার না হয় যে, আমি আল্লাহর গুণাবলি এবং তাঁর এখতিয়ার ও ক্ষমতার অধিকারী; বরং আমি তো তাঁরই অক্ষম বান্দা ও রাসূল। আমার হাতে যা কিছু প্রকাশ পায় তা হলো মু'জিযা; আল্লাহর নির্দেশেই তা প্রকাশিত হয়। ইমাম ইবনে কাছীর (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নবীকে তাঁর যুগের অবস্থানুযায়ী মু'জিযা দান করেন, যাতে তাঁর সত্যতা এবং মহত্ত্ব প্রকাশিত হয়। হযরত মূসা (আ.)-এর যুগে যাদুর প্রভাব ছিল, তাই তাঁকে এমন মর্যাদা দান করা হয়েছে, যার সামনে বড় বড় যাদুকররা ক্ষমতা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে, ফলে তাদের নিকট হযরত মূসা (আ.)-এর সত্যতা প্রকাশিত হয়েছে এবং তারা ঈমান এনেছে। আর হযরত ঈসা (আ.)-এর যুগে চিকিৎসাশাস্ত্রের ব্যাপক উন্নতি ছিল, তাই তাঁকে মৃতকে জীবিত করার, জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করার মর্যাদা দান করা হয়েছে। বড় থেকে বড় কোনো চিকিৎসক এ ব্যাপারে ক্ষমতাশীল ছিল না। আমাদের নবী ﷺ -এর যুগে কবিতা, সাহিত্য এবং ফাসাহাত ও বালাগাত তথা ভাষা অলঙ্কারের বিশেষ প্রভাব ছিল, তাই তাঁকে কুরআনের ন্যায় উন্নত অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত গ্রন্থ দান করা হয়, যার নজির পেশ করতে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, কবি ও অলঙ্কারশাস্ত্রবিদগণ অপারগ হয়েছে এবং এখন পর্যন্তও তাঁর চ্যালেঞ্জ বহাল রয়েছে। এমনকি কিয়ামত পর্যন্ত এই চ্যালেঞ্জ তার সুমহান মর্যাদা নিয়ে টিকে থাকবে।

অনুবাদ :

٥٠. وَجِئْتُكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ قَبْلِيْ مِنَ التَّوْرٰةِ وَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ فِيْهَا فَاَحَلَّ لَهُمْ مِنَ السَّمَكِ وَالطَّيْرِ مَالَا صِيْصِيَةَ لَهٗ وَقِيْلَ اَحَلَّ الْجَمِيْعَ فَبَعْضَ بِمَعْنٰى كُلٍّ وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ كَرَّرَهٗ تَاْكِيْدًا وَلِيُبْنٰى عَلَيْهِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ فِيْمَا اٰمُرُكُمْ بِهٖ مِنْ تَوْحِيْدِ اللّٰهِ وَطَاعَتِهٖ.

৫০. আর আমার আগমন হয়েছে আমার সম্মুখে অর্থাৎ আমার পূর্বে তাওরাতে যা রয়েছে তার সমর্থকরূপে ও তোমাদের জন্যে তাতে যা নিষিদ্ধ ছিল তার কতকগুলিকে বৈধ করতে। মৎস্য, ঝুটিবিহীন পাখি ইত্যাদি তাদের জন্যে তিনি বৈধ করেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি তাদের জন্যে সবকিছুই বৈধ করে দিয়েছিলেন। এমতাবস্থায় আয়াতোক্ত بَعْض [কতক] শব্দটি كُلّ [সবকিছু] অর্থে ব্যবহৃত বলে গণ্য হবে। এবং তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে নিদর্শন নিয়ে এসেছি تَاكِيْد বা জোর সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এ বাক্যটির পুনরুক্তি করা হয়েছে। কিংবা পরবর্তী বাক্যটির বুনিয়াদরূপে এর পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর এবং আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস ও তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন বিষয়ে যেসব নির্দেশ তোমাদেরকে দেই সেসব বিষয়ে আমার অনুসরণ কর।

٥١. اِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا الَّذِيْ اٰمُرُكُمْ بِهٖ صِرَاطٌ طَرِيْقٌ مُّسْتَقِيْمٌ فَكَذَّبُوْهُ وَلَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖ.

৫১. নিশ্চয় আল্লাহ আমার প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং তাঁর ইবাদত কর। এটাই যে পথের আমি তোমাদেরকে নির্দেশ করি তাই সরল পথ পন্থা। **কিন্তু তারা মিথ্যা বলে ধারণা করে তাকে অস্বীকার করল এবং তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করল না।**

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ لِاُحِلَّ لَكُمْ : এটা উহ্য ফে'লের মা'মূল। মূল বাক্য এমন হবে– جِئْتُكُمْ لِاَجَلِ التَّحْلِيْلِ এর উপর আতফ مُصَدِّقًا নয়, কারণ তা হলো حَال আর এটা হলো ইল্লত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ : অর্থাৎ তোমরা তো আমার সত্যতার নিদর্শনাবলি দেখলে। কাজেই এখন মহান আল্লাহকে ভয় করে আমার কথা শোনা তোমাদের কর্তব্য।

قَوْلُهٗ اِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ : অর্থাৎ সব কথার এক কথা এবং যাবতীয় মূলের আসল মূল হলো, আল্লাহ তা'আলাকে আমার ও তোমাদের সকলের একই প্রতিপালক মেনে নাও। বাপ-বেটার সম্বন্ধ স্থাপন করো না। তোমরা সকলে তাঁরই ইবাদত কর। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পথ এটাই। অর্থাৎ তাওহীদ, তাকওয়া ও রাসূলের আনুগত্য।

অনুবাদ :

৫২. فَلَمَّا اَحَسَّ عَلِمَ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ وَاَرَادُوْا قَتْلَهُ قَالَ مَنْ اَنْصَارِىْ اَعْوَانِىْ ذَاهِبًا اِلَى اللّٰهِ لِاَنْصُرَ دِيْنَهُ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ اَعْوَانُ دِيْنِهِ وَهُمْ اَصْفِيَاءُ عِيْسٰى اَوَّلُ مَنْ اٰمَنَ بِهِ وَكَانُوْا اِثْنَىْ عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الْحَوْرِ وَهُوَ الْبَيَاضُ الْخَالِصُ وَقِيْلَ كَانُوْا قَصَّارِيْنَ يَحُوْرُوْنَ الثِّيَابَ اَىْ يُبَيِّضُوْنَهَا اٰمَنَّا صَدَّقْنَا بِاللّٰهِ وَاشْهَدْ يَا عِيْسٰى بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ.

৫২. যখন ঈসা তাদের অবিশ্বাস উপলব্ধি করল জানতে পারলেন আর তারা তাঁকে হত্যা করার অভিপ্রায় করল তখন সে বলল, কে আমার সাহায্যকারী সহযোগিতাকারী গমন করতে প্রস্তুত আল্লাহর পথে, যাতে আমিও তাঁর দীনের সহযোগিতা করতে পারি। اِلَى اللّٰهِ এটা এ স্থানে উহ্য ذَاهِبًا -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট। হাওয়ারীগণ-শিষ্যগণ বলল, আমরাই আল্লাহর পথে সাহায্যকারী। তাঁর দীনের সাহায্যকারী। এরা [হাওয়ারীরা] হলো হযরত ঈসা (আ.) -এর অন্তরঙ্গ সঙ্গী। শুরুতেই তারা তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। এরা ছিল সংখ্যায় বারো। শব্দটি حَوْر [হাওর] হতে উদ্গত। হাওর অর্থ হলো– নির্মল শুভ্র। কেউ কেউ বলেন, এরা পেশায় ছিল ধোপা। তারা কাপড় حَوْر অর্থাৎ সাদা ও পরিষ্কার করত। এ হিসেবে তাদেরকে حَوَارِىْ [হাওয়ারী] বলে আখ্যায়িত করা হতো। আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি। তাঁকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছি। হে ঈসা! তুমি সাক্ষী থাক আমরা মুসলিম-আত্মসমর্পণকারী।

৫৩. رَبَّنَا اٰمَنَّا بِمَاۤ اَنْزَلْتَ مِنَ الْاِنْجِيْلِ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ عِيْسٰى فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ لَكَ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَلِرَسُوْلِكَ بِالصِّدْقِ.

৫৩. হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি ইঞ্জিলে যা কিছু অবতীর্ণ করেছ তাতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং আমরা এই রাসূলের অর্থাৎ হযরত ঈসার অনুসরণ করেছি। সুতরাং আমাদেরকে তোমার একত্বের এবং তোমার রাসূলের সত্যতার সাক্ষ্যবহনকারীদের তালিকাভুক্ত কর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ الْحَوَارِيُّوْنَ হাওয়ারী কারা ছিলেন : 'হাওয়ারী' কারা ছিলেন এবং তাদের এ উপাধির হেতু কি? এ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের একাধিক মত রয়েছে। প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী সর্বপ্রথম যে দুই ব্যক্তি হযরত ঈসা (আ.) -এর অনুসারী হন তাঁরা ধোপা ছিলেন। হযরত ঈসা (আ.) তাদের দেখে বললেন, কি কাপড় পরিষ্কার করছ? এস, আমি তোমাদেরকে আত্মা পরিষ্কার করা শিখিয়ে দেই। সে মুহূর্তেই তারা তাঁর অনুসারী হয়ে যান। তারপর যারাই তাঁর অনুসরণ করেন, তাদের এ উপাধি হয়ে যায়। –[তাফসীরে ওসমানী]

আল্লামা মাজেদী (র.) বলেন, হযরত ঈসা মাসীহ (আ.) -এর প্রাথমিক শিষ্যগণ অধিকাংশ নদীর উপকূলবর্তী এলাকায় মৎসজীবী বাসিন্দা ছিলেন। এজন্যই [নদীর পানি তাদের বস্ত্রকে শুভ্র ও পরিচ্ছন্ন করে তুলত বলে] তাদেরকে হাওয়ারী বলে সম্বোধন করা হতো। এ কারণেই তাঁর পরবর্তী শিষ্য ও সঙ্গীরাও এ উপাধিতেই পরিচিতি হয়ে পড়েন। এর প্রচলিত অর্থ হলো– নিষ্ঠাবান সহযোগী, মুখলিস সাথী। যেমনি হাদীসে হযরত যুবায়ের (রা.) সম্পর্কে এ শব্দটি উপরিউক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। হাওয়ারীরা প্রতি উত্তরে নিজেদেরকে اَنْصَارُ اللّٰهِ [আল্লাহর সাহায্যকারী] বলে ঘোষণা করলেন।

٥٤. قَالَ تَعَالٰى وَمَكَرُوْا اَىْ كُفَّارُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ بِعِيْسٰى اِذْ وَكَّلُوْا بِهٖ مَنْ يَّقْتُلُهٗ غِيْلَةً وَمَكَرَ اللّٰهُ بِهِمْ بِاَنْ اَلْقٰى شِبْهَ عِيْسٰى عَلٰى مَنْ قَصَدَ قَتْلَهٗ فَقَتَلُوْهُ وَرُفِعَ عِيْسٰى وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ اَعْلَمُهُمْ بِهٖ -

অনুবাদ :

৫৪.আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- এবং তারা বনি ইসরাঈলভুক্ত কাফিরগণ হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে চক্রান্ত করল অসতর্ক মুহূর্তে হঠাৎ আক্রমণ করে তাঁকে হত্যা করার জন্যে তারা কতিপয় লোক নিযুক্ত করেছিল। আল্লাহও এদের সঙ্গে ফন্দি করলেন। যে ব্যক্তি হযরত ঈসাকে হত্যা করার জন্যে গিয়েছিল হযরত ঈসার আকৃতির সাথে তার আকৃতিকে সাদৃশ করে দিয়েছিলেন। এতে তারা তাকেই [ঈসা মনে করে] হত্যা করল। আর হযরত ঈসাকে আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হয়। আর আল্লাহ শ্রেষ্ঠ ফন্দিকারী অর্থাৎ এতদসম্পর্কে তিনি অধিক অবহিত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ الخ **হযরত ঈসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে ইহুদিদের ষড়যন্ত্র :** আয়াতে কারীমায় আল্লাহর প্রতি প্রতারণার যে সম্বন্ধ করা হয়েছে তা مُشَاكَلَةْ তথা কাফেরদের কাজের সহিত মিলস্বরূপ। প্রথম مَكَرُوْا-এর ফায়েল হলো ইহুদিরা। ইহুদিদের নেতা এবং ধর্মগুরুরা হযরত ঈসা (আ.)-এর বিরোধিতা এবং তাঁকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দেওয়ার পরে সর্বশেষ তারা সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, ইয়াসু নামক ইসরাঈলী নবুয়তের দাবিদারকে মেরে ফেলতে হবে। অতএব, তারা ধর্মীয় আদালতে নাস্তিকতার অভিযোগ তুলল। আদালত তাঁকে মৃত্যুদণ্ডের রায় দিল। এরপর রোমীয় বিচারকদের রাষ্ট্রীয় আদালতে দেশদ্রোহীতার মামলা করা হলো।

হযরত ঈসা (আ.) এবং তাঁর বিরোধীদের এসব মামলা-মকদ্দমা শাম দেশের ফিলিস্তিন প্রদেশে পেশ হয়েছিল। শাম তখন রোম সাম্রাজ্যের একটি অংশ ছিল। এখানকার ইহুদি অধিবাসীদের নিজস্ব বিষয়ে স্বাধীনতা ছিল। রোম সম্রাটের পক্ষ থেকে শাম দেশের একজন গর্ভনর নিযুক্ত ছিল। তার অধীনে ছিল ফিলিস্তিন প্রদেশের প্রদেশিক গভর্নর। রোমীয়দের ধর্ম ছিল শিরক ও মূর্তিপূজার। ইহুদিদের নিজস্ব ব্যাপারে তাদের ধর্মীয় আদালতে মামলা করার এখতিয়ার ছিল। তবে দণ্ড কার্যকর করার জন্যে রাষ্ট্রীয় আদালতের অনুমতি নিতে হতো। রাষ্ট্রদ্রোহীতার সাজা মৃত্যুদণ্ডের রায়ই স্বয়ং ইহুদি আদালতেও দিতে পারত। তবে তা কার্যকর করার নির্দেশ কেবল রাষ্ট্রীয় আদালতের হাতে ছিল। রাষ্ট্রীয় আদালতে মৃত্যুদণ্ডের সাজা স্বরূপ শূলীতে চড়ানোর নিদের্শ দেওয়া হতো। ইহুদিদের এ ষড়যন্ত্রকে পবিত্র কুরআনে مَكَرُوْا শব্দে উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَمَكَرَ اللّٰهُ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাও তাদের এ জঘন্য গভীর চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দেওয়ার নিজস্ব কৌশল ও পরিকল্পনা অবলম্বন করলেন। কুরআনুল কারীমের 'ওয়া মাকারাল্লাহু' অংশের বাস্তব তাৎপর্য এই। অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদীদের সকল ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিয়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজস্ব কৌশল ও পরিকল্পনার মাধ্যমে হযরত ঈসা (আ.) -কে শূলীবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর পরিণতি থেকে রক্ষা করলেন।

قَوْلُهٗ الْمَكْرُ : 'মাকর' বলা হয় সূক্ষ্ম কৌশল অবলম্বনকে । এটা মঙ্গলজনক উদ্দেশ্যে হলে ভালো, অসদুদ্দেশ্যে হলে মন্দ। এ কারণেই وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ -এর মাঝে اَلْمَكْرُ -এর সাথে اَلسَّيِّئُ বিশেষণ যুক্ত হয়েছে। এ স্থলে আল্লাহ তা'আলাকে خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ বলা হয়েছে। অর্থাৎ ইহুদিরা হযরত ঈসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে নানা রকম ষড়যন্ত্র শুরু করে দিল। এমনকি তারা এই বলে রাজার কান ভারী করল যে, এ ব্যক্তি [নাউযুবিল্লাহ] ধর্মদ্রোহী। সে তাওরাত পাল্টে দিতে চায় এবং সে সকলকে বিধর্মী বানিয়ে ছাড়বে। ফলে রাজা হযরত মাসীহ (আ.) -কে গ্রেফতার করার হুকুম দিল। এদিকে এসব চলছিল আর অন্যদিকে তাদের এ ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিতে মহান আল্লাহর সূক্ষ্ম কৌশল চলছিল। সামনে যার বিবরণ আসছে। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহর কৌশল সর্বশ্রেষ্ঠ, যা কেউ নস্যাৎ করতে পারে না। -[তাফসীরে ওসমানী]

আল্লাহর কিভাবে مَكْر করেন? আরবি ভাষায় একটি নিয়ম প্রচলিত রয়েছে, কোনো কাজ অথবা শাস্তির ভাষার ক্ষেত্রে তার জবাবও একই শব্দ ও ভাষায় দেওয়া হয় এবং এ ধরনের প্রতিউত্তরের ভাষার ব্যবহারকে দূষণীয় মনে করা হয় না; বরং বক্তার বাকপটুতার বহিঃপ্রকাশ ভাবা হয়। যেমন ধরুন, কেউ বলল, যায়েদের উপর আক্রমণ চালানো হয়েছে। যায়েদও পাল্টা আক্রমণ করেছে। এক্ষেত্রে যায়েদের আক্রমণটা মূলত শাস্তি প্রতিরক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করা; কিন্তু আরবি পরিভাষায় আক্রমণের পর পাল্টা আক্রমণ শব্দই ব্যবহৃত হয়। অথবা মনে করুন, কেউ যদি আমাকে ঠকায় বা প্রতারণা করে, তখন আমি যদি তার প্রতারণার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চাই, তখন বলে থাকি- অমুকে আমাকে ঠকিয়েছে, আমিও তাকে ঠকিয়েছি। অথচ আমার তরফ হতে ঠকাবার ও প্রতারণা করার প্রসঙ্গই উঠে না। কেননা প্রকৃতপক্ষে আমার তরফ হতে প্রতারক আমাকে ঠকাবার শাস্তিই পেয়ে থাকে।

এ ধরনের ব্যাপারগুলো সম্পর্কে গভীরভাবে মনোনিবেশ করলেই কুরআনে হাকীমে

১. وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ -এর প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায়।

২. ঠিক তেমনি اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا وَ اَكِيْدُ كَيْدًا তারাও ফাঁদ পাতে, আমিও ফাঁদ পাতি।

৩. جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ খারাবির শাস্তিও তেমনি খারাবি।

৪. قَالُوْا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ -এর জবাবে বলা হয়েছে- اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ তারাও ঠাট্টা করে, আল্লাহও তাদরে সাথে ঠাট্টা করেন।

৫. فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ তারা বাড়াবাড়ি করলে, তোমরাও বাড়াবাড়ি কর। এ সমস্ত জায়গায় চক্রান্তের শাস্তি, খারাবির শাস্তি, ঠাট্টার শাস্তি, বাড়াবাড়ির শাস্তিই বুঝানো হয়েছে। এভাবে ব্যাপারটিকে বুঝে নিলে সকল জটিলতার অবসান হয়ে যায়। আর আল্লাহর ফাঁদ, খারাবি, ঠাট্টা ও বাড়াবাড়ি ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ জনিত কারণে কোনো প্রশ্নই উত্থাপিত হয় না। এছাড়া আরবি 'মকর' শব্দটি আবশ্যকীয়ভাবে কোনো দূষণীয় বিষয় নয়। 'মকর' শব্দটি প্রয়োগ জনিত কারণে নিন্দনীয় ও প্রশংসনীয় উভয় অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। মূল অর্থ, গোপন পরিকল্পনা, গভীর চক্রান্ত, ইংরেজিতে প্লান বলতে যা বুঝায়, আরবি ও উর্দুতে তদবির বলতে তাই বুঝায়।

আল্লাহর চক্রান্ত : কোনো দৈহিক শক্তি ও বস্তুগত ক্ষমতার অধিকারী কেউ আল্লাহর সাথে পাল্লা দিয়ে জয়ী হতে পারে না। এমনিভাবে কোনো বুদ্ধিমত্তা এবং কৌশলও আল্লাহর বুদ্ধিমত্তার সাথে টেক্কা দিতে পারে না। তাই এক্ষেত্রে আল্লাহর বুদ্ধি, কৌশল ও পরিকল্পনাই সকলের উর্ধ্বে স্থান লাভ করেছে এবং সকল ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত ও প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে হযরত ঈসা (আ.)-কে জীবিত ও অক্ষত অবস্থায় আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন। শূলীবিদ্ধ করার জন্যে ভীষণ ভিড়, হৈচৈ ও গণ্ডগোলের মধ্য দিয়ে সময়ের স্বল্পতার কারণে, তাড়াহুড়া করে শূলীকক্ষে [ক্রুশবিদ্ধ করার স্থলে] সঠিকভাবে চিনতে না পেরে হযরত ঈসা (আ.)-এর সমবয়সী তাঁরই বংশের এক ব্যক্তি, যার দৈহিক গঠন আকৃতি হযরত ঈসা (আ.)-এর মতোই ছিল তাকে শূলীতে চড়িয়ে দিয়ে হযরত ঈসা (আ.)-কে শূলীবিদ্ধ করেছে বলে আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠে। আজকের গির্জার পাদ্রিসহ খ্রিস্টানগণ মনে করে যে, হযরত ঈসা মাসীহ (আ.) শূলীবিদ্ধ হয়েছেন এবং তৃতীয় দিনে পুনঃজীবিত হয়েছেন। কিন্তু খ্রিস্টানদের বর্তমান প্রচলিত ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টন্ট সম্প্রদায় ছাড়াও সর্বাধিক প্রাচীন সম্প্রদায় 'বাসিলিদিয়াস' সহ কতিপয় সম্প্রদায় ঠিক কুরআনুল কারীমে বর্ণিত ও মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ইসলামি আকিদার অনুরূপ আকিদাই পোষণ করে যে, ইহুদিরা চিনতে না পেরে হযরত ঈসা (আ.) -এর গঠন ও আকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল হযরত ঈসা (আ.)-এর বংশীয় জনৈক ব্যক্তিকেই শূলীবিদ্ধ করে হত্যা করেছে। আর আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতা দ্বারা হযরত ঈসা (আ.)-কে চতুর্থ আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন। কিয়ামতের আগে তিনি স্বশরীরে জীবিত অবস্থায় পৃথিবীতে আগমন করবেন এবং দজ্জালের সাথে যুদ্ধ করে দজ্জালকে পরাজিত করে পরিপূর্ণ ইসলামের বাস্তবায়ন ও বিজয় সাধনের পর স্বাভাবিকভাবে ইন্তেকাল করবেন।

অনুবাদ :

৫৫. اُذْكُرْ اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ قَابِضُكَ وَ رَافِعُكَ اِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا مِنْ غَيْرِ مَوْتٍ وَمُطَهِّرُكَ مُبْعِدُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ صَدَّقُوْا بِنُبُوَّتِكَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالنَّصَارٰى فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِكَ وَهُمُ الْيَهُوْدُ يَعْلُوْنَهُمْ بِالْحُجَّةِ وَالسَّيْفِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ مِنْ اَمْرِ الدِّيْنِ .

৫৫. স্মরণ কর, যখন আল্লাহ বললেন, হে ঈসা! আমি তোমার কাল পূর্ণ করব অর্থাৎ তোমাকে কবজ করে নিয়ে যাব এবং আমার নিকট তোমাকে দুনিয়া থেকে মৃত্যুদান ব্যতিরেকেই উঠিয়ে নিয়ে যাব এবং যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের থেকে তোমাকে পাক করব। অর্থাৎ দূরে সরিয়ে নেব। আর তোমার অনুসারীগণকে অর্থাৎ মুসলিম ও খ্রিস্টান যারা তোমার নবুয়তকে সত্য বলে বিশ্বাস স্থাপন করে তাদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত তোমাকে প্রত্যাখ্যান- কারীদের উপর অর্থাৎ ইহুদিদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেব যুক্তি-প্রমাণ ও অস্ত্রবল সকলভাবে তারা এদের উপর জয়যুক্ত থাকবে। অতঃপর আমার কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অনন্তর ধর্মের যে বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ করছ আমি তার মীমাংসা করে দেব।

তাহকীক ও তারকীব

مُطَهِّرُكَ : مُبْعِدُكَ -এর ব্যাখ্যা مُبْعِدُكَ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, مَلْزُوْمْ বলে لَازِمْ উদ্দেশ্য। কারণ تَطْهِيْر নাপাকি দূরীভূত করাকে অনিবার্য করে। কাজেই এ প্রশ্ন দূর হয়ে গেল যে, পাক করার জন্যে নাপাক হওয়া জরুরি। আর তা এখানে উদ্দেশ্য নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ **হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর সান্ত্বনা :** হযরত ঈসা (আ.) -কে সম্বোধন করে বলা হয় হযরত ঈসা (আ.) ইহুদিগণ কর্তৃক তাঁর গ্রেফতারির মুহূর্তে পরিস্থিতি ও অবস্থার প্রেক্ষাপটে নিজের পরিণতি সম্পর্কে স্পষ্টতই অনুমান করতে পেরেছিলেন যে, ইহুদিগণ তাঁকে গ্রেফতার করার পরই তাঁর বিরুদ্ধে অবশ্যই মামলা দায়ের করবে এবং গ্রীকদের রাষ্ট্রীয় আদালতের অনুমোদনের পর তাঁকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হবে। আল্লাহ তা'আলা ঐ মুহূর্তেই হযরত ঈসা (আ.) -কে প্রবোধ ও সান্ত্বনা প্রদানের জন্যে আয়াতে উল্লিখিত সান্ত্বনা বাণী তাঁকে শুনিয়ে দেন এবং সে ঘটনার বিবরণ নাজরান গোত্রের সাথে আলোচনা কালে শেষ রাসূল ﷺ -কে অবগত করান।

قَوْلُهُ مُتَوَفِّيْكَ : অর্থাৎ আমিই তোমার মৃত্যুদাতা। তাই এখন ইহুদিদের হাতে তোমার মৃত্যু হবে না। তোমার জন্যে আমার ইলমে নির্ধারিত ও প্রতিশ্রুত সময়ে তোমার মৃত্যু হবে। তাই তুমি ইহুদি জালিমদের এ ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা দেখে উদ্বিগ্ন, পেরেশান ও চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না। এরা তোমার কিছুই করতে পারবে না এবং কোনো প্রকার ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। এমনকি তারা তোমার কোনো ধরনের ক্ষতি সাধনের ক্ষমতাই রাখে না।

নিম্নোল্লিখিত নির্ভরযোগ্য তাফসীরসমূহের বক্তব্য লক্ষণীয়-

اَىْ مُسْتَوْفِىْ اَجَلَكَ وَمَعْنَاهُ اِنِّىْ عَاصِمُكَ مِنْ اَنْ يَّقْتُلَكَ الْكُفَّارُ وَمُؤَخِّرُكَ اِلٰى اَجَلٍ كَتَبْتُهُ لَكَ (كَشَّاف) مُمِيْتُكَ حَتْفَ اَنْفِكَ لَا قَتْلًا بِاَيْدِيْهِمْ (مَدَارِك) مُؤَخِّرُكَ اِلٰى اَجَلِكَ الْمُسَمّٰى عَاصِمًا اِيَّاكَ مِنْ قَتْلِهِمْ (بَيْضَاوِى) اِنِّىْ مُتِمٌّ عُمْرَكَ

فَحِيْنَئِذٍ اَتَوَفَّاكَ فَلَا اَتْرُكُهُمْ حَتّٰى يَقْتُلُوْكَ بَلْ اَنَا رَافِعُكَ اِلٰى سَمَائِيْ وَمُقَرِّبُكَ بِمَلَائِكَتِيْ وَاَصُوْنُكَ عَنْ اَنْ يَتَمَكَّنُوْا مِنْ قَتْلِكَ وَهٰذَا تَاوِيْلٌ حَسَنٌ (كَبِيْر)

تُوَفِّىْ : অর্থ– পুরোপুরি দেওয়া। তাই এখান থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.)-কে বলে দেন **যে, তোমাকে দীর্ঘ** হায়াত পুরোপুরি দেওয়া হবে।

مُتَوَفِّيْكَ : শব্দ দ্বারা এটা জরুরি হয় না যে, তখনই তার মৃত্যু ঘটবে। আমাদের বিশিষ্ট মুফাসসিরগণ এমন উক্তি **করেছেন। ইমাম** রাযী (র.) এটাকে সর্বোত্তম ব্যাখ্যা সাব্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ সময় মতো তোমার মৃত্যু ঘটবে। তোমার **শত্রুপক্ষ** মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ব্যাপারে সফল হবে না। তাদের কবল থেকে রক্ষা কল্পে তোমাকে উঠিয়ে নেওয়া হবে।

পবিত্র কুরআনে যদিও হযরত ঈসা (আ.) -কে স্বশরীরে উঠিয়ে নেওয়ার সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই, তবে তার নিকটবর্তী অর্থ এ আয়াতে বিদ্যমান রয়েছে। বিভিন্ন হাদীস তা সুস্পষ্ট করে দিয়েছে। এ কারণেই সংখ্যাগরিষ্ঠ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত এ আকিদা পোষণ করেন। হযরত ঈসা (আ.) -এর জন্ম যেভাবে স্বাভাবিক জন্মসূত্র ও প্রক্রিয়ার বিপরীত তথা পিতাবিহীন কেবল হযরত জিবরাঈলের ফুৎকারের মাধ্যমে ঘটেছিল, কাজেই তাঁকে স্বশরীরে আকাশে উঠিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে এত অসম্ভবনা কিসের? বরং এটাই সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত যে, জন্মের ন্যায় তাঁর পরিণতিও স্বাভাবিক অবস্থার বিপরীত হবে।

প্রশ্ন : হযরত ঈসা (আ.)-কে আকাশে উঠিয়ে নেওয়ার দ্বারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ থেকে তাঁকে বেশি মর্যাদাশীল মনে হয় না কি?

উত্তর : এ কথাটি সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন। কেননা আল্লাহই জানেন দিনে-রাতে কি পরিমাণ ফেরেশতা আসমানে যাওয়া-আসা করে? কাজেই তারা সবাই কি মহানবী ﷺ -এর তুলনায় অধিক মর্যাদাবান হবেন? –[তাফসীরে মাজেদী]

مُتَوَفِّيْكَ : শব্দটি (تَفَعُّلْ) تَوَفِّىْ থেকে ইসমে ফায়েলের সীগাহ, মুযাফ। আর كَافْ হলো মুযাফ ইলাইহ, অর্থ– আমি তোমাকে মৃত্যুদানকারী, আমার আয়ত্তে উঠিয়ে নেব, শয়ন করাব। تَوَفِّىْ -এর অর্থ হলো– পুরোপুরি নেওয়া। অর্থাৎ আমি তোমাকে শয়ন করিয়ে নিদ্রা অবস্থায় আসমানে উঠিয়ে নেব। এ ব্যাপারে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে– هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ আয়াত [আল্লাহ তোমাকে রাতে শুইয়ে দিয়েছেন] দ্বারা শেষোক্তিটির সমর্থন মিলে। আর ঘটনাটি এমনই ঘটেছে। আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.) -কে শয়ন অবস্থায় উঠিয়ে নিয়েছেন। –[মা'আলিম]

আবুল বাক্কা বলেন, مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ যদিও ইসমে ফায়েলের সীগাহ, তবে উভয়টি মুসতাকবিল তথা ভবিষ্যৎকালের অর্থে। বাক্যে আগপিছ ঘটেছে, মূলত رَافِعُكَ وَمُتَوَفِّيْكَ ছিল। কেননা হযরত ঈসা (আ.) -কে আগে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। আর তাঁর মৃত্যু হবে ভবিষ্যতে। তাফসীরে আব্বাসীতেও এর সমর্থন রয়েছে। ইমাম রাযী (র.) এখানে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। তিনি বলেন, اِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ হলো اِنِّيْ مُتَمِّمٌ عُمْرَكَ فَحِيْنَئِذٍ اَتَوَفَّاكَ অর্থে। অর্থাৎ اِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ -এর উদ্দেশ্য হলো, আমি তোমার বয়স পূর্ণ করব, বয়স পূর্ণ করার পর তোমাকে মৃত্যু দেব, কাফেরদের হাতে তোমাকে নিহত হতে দেব না, বরং আসমানে উঠিয়ে নেব। তোমার অবস্থান হবে ফেরেশতাদের সাথে, তোমাকে সেখানে **পৌঁছে দেব**। কাফেরদের হত্যা থেকে তোমায় রক্ষা করব। –[তাফসীরে কাবীর]

বি. দ্র. এ আয়াত সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় মনে রাখা উচিত। تُوَفِّىْ শব্দ সম্পর্কে আবুল বাক্কা-এর কুল্লিয়াতে বলা হয়েছে– اَلتَّوَفِّىْ اْلاِمَاتَةُ وَقَبْضُ الرُّوْحِ وَعَلَيْهِ اِسْتِعْمَالُ الْعَامَّةِ وَالْاِسْتِيْفَاءُ وَاَخْذُ الْحَقِّ وَعَلَيْهِ اِسْتِعْمَالُ الْبُلَغَاءِ . অর্থাৎ **সাধারণের নিকট** اَلتَّوَفِّىْ শব্দটি মৃত্যু ঘটানো ও প্রাণ সংহার অর্থে ব্যবহৃত, কিন্তু সাহিত্যালঙ্কারিকদের নিকট এর অর্থ **পুরোপুরি উসুল** করা ও প্রাপ্য আদায় করা। যেন তাদের নিকট মৃত্যু অর্থেও শব্দটি এ কারণেই ব্যবহৃত হয় যে, মৃত্যুতে **বিশেষ কোনো অঙ্গ** নয়, বরং মহান আল্লাহর পক্ষ হতে পুরো আত্মাটাই উসুল করে নেওয়া হয়। এবারে মনে করুন, আল্লাহ **তা'আলা কারো দেহ** সমেত আত্মা নিয়ে গেলেন, এমতাবস্থায় কি اَلتَّوَفِّىْ শব্দটি আরও বেশি রকম প্রযোজ্য নয়?

যে সকল অভিধান প্রণেতা তাদের অভিধানে اَلتَّوَفِّىْ অর্থ প্রাণ সংহার লিখেছেন, তারা একথা বলেননি যে, দেহ সমেত আত্মা **তুলে নেওয়াকে** اَلتَّوَفِّىْ বলা হয় না এবং তারা এরূপ কোনো মূলনীতিও উল্লেখ করেননি যে, اَلتَّوَفِّىْ -এর কর্তা আল্লাহ **তা'আলা এবং কর্ম** কোনো প্রাণসম্পন্ন বস্তু হলে তার অর্থ মৃত্যু ছাড়া কিছুই হতে পারে না। হ্যাঁ সাধারণত প্রাণ সংহার **যেহেতু দেহ থেকে** বিচ্ছিন্ন করেই হয়ে থাকে, তাই তারা এ সাধারণ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৃত্যু শব্দ **লিখে দেন। নয়তো** দেহ সমেত রূহ নিয়ে যাওয়াও اَلتَّوَفِّىْ -এর আভিধানিক অর্থের অন্তর্ভুক্ত। দেখুন! আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ **করেছেন–** اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا অর্থাৎ 'আল্লাহ জীবনসমূহের প্রাণ হরণ করেন তার মৃত্যুর সময়, আর যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের প্রাণও নিদ্রার সময়।' [৩৯ : ৪২] এখানে تَوَفِّىْ نَفْس

তথা আত্মা সংহারের দুই পদ্ধতি বলা হয়েছে– মৃত্যু ও নিদ্রা। এ বিভাক্তিও اَنْفُسْ -এর উপর تُوُفِّيَ শব্দের প্রয়োগ এবং حِيْنَ مَوْتِهَا -এর শর্তারোপ স্পষ্ট বলে দিচ্ছে, تُوُفِّيَ ও মৃত্যু ভিন্ন দুই জিনিস। আসলে আত্মা হরণের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এক তো সেই স্তর যা মৃত্যু আকারে পাওয়া যায়। আরেক স্তর হয় নিদ্রার আকারে। কুরআন মাজীদ এখানে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিল যে, উভয় ক্ষেত্রেই تُوُفِّي শব্দের প্রয়োগ বিধেয়; কেবল মৃত্যুর জন্যে নির্দিষ্ট নয়। এ কথার সমর্থনে কুরআন মাজীদের অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে– يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ অর্থাৎ 'তিনি রাত্রিবেলা তোমাদের প্রাণ হরণ করেন এবং যা কিছু দিনের বেলা কর তা জানেন।' [৬ : ৬০] এ উভয় আয়াতে কুরআন মাজীদ নিদ্রার জন্যে যেমন تَوَفِّي শব্দের প্রয়োগকে বৈধ রেখেছে, অথচ নিদ্রার প্রাণ হরণ পূর্ণাঙ্গরূপে হয় না। তেমনিভাবে যদি সূরা আলে ইমরান ও মায়িদার আয়াতদ্বয়ে দেহ সমেত প্রাণ হরণ অর্থে تَوَفِّي শব্দকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তাতে অসম্ভবের কি আছে? বিশেষত যখন দেখা যাচ্ছে নিদ্রা ও মৃত্যু অর্থে تَوَفِّي শব্দের ব্যবহার কুরআন মাজীদই শুরু করেছে। জাহিলি যুগের মানুষ তো সাধারণভাবে একথা জানতই না যে, মৃত্যু বা নিদ্রাকালে আল্লাহ তা'আলা মানুষের কাছ থেকে কোনো জিনিস হরণ করে নেন, যে কারণে তাদের বাকরীতিতে মৃত্যু ও নিদ্রা অর্থে تَوَفِّي শব্দের প্রচলন ছিল না। কুরআন মাজীদই মৃত্যু ইত্যাদির স্বরূপ সম্পর্কে আলোকপাত করার জন্যে প্রথমে এ শব্দটির ব্যবহার শুরু করে। কাজেই কুরআনেরই এ অধিকার আছে যে, সে মৃত্যু ও নিদ্রার মতো দেহ সমেত আত্মা হরণ -এর মতো বিরল বিষয়ের জন্যেও এ শব্দটি ব্যবহার করবে।

মোদ্দাকথা, আলোচ্য আয়াতে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে, تَوَفِّي শব্দটি মৃত্যু অর্থে প্রযুক্ত নয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতেও বিশুদ্ধতম রেওয়ায়েত এটাই যে, হযরত মাসীহ (আ.)-কে জীবিত অবস্থায়ই আকাশে তুলে নেওয়া হয়েছে। যেমন– রূহুল মাআনী প্রভৃতি গ্রন্থে উদ্ধৃত আছে, তাঁর জীবিত উত্তোলন এবং দুনিয়ায় তাঁর পুনরায় অবতরণের বিষয়টি পূর্বসূরিদের একজনও অস্বীকার করেছে বলে বর্ণিত নেই; বরং হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) তালখীসুল হাবীর গ্রন্থে এ বিষয়ে সকলের ঐকমত্য উল্লেখ করেছেন, ইবনে কাছীর প্রমুখ পুনরায় অবতরণ সম্পর্কিত গ্রন্থে ইমাম মালেক (র.) হতেও এ মত উদ্ধৃত আছে।

হযরত মাসীহ (আ.) যেসব মু'জিযা দেখিয়েছেন, তন্মধ্যে আরও বহু তাৎপর্য ছাড়াও একটি বিশেষ রহস্য এরূপ নিহিত রয়েছে যে, তাঁর আকাশে উত্তোলনের সাথে সেগুলোর একটা বিশেষ সম্পর্ক বিদ্যমান। তিনি শুরুতেই ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, একটি মাটির পুতুল যখন আমার ফুঁ দেওয়ার ফলে মহান আল্লাহর হুকুমে পাখি হয়ে আকাশে উড়ে যায়, তখন যে ব্যক্তির জন্যে আল্লাহ তা'আলা 'রূহুল্লাহ' শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং যিনি রূহুল কুদুসের ফুঁ দ্বারা জন্ম নিয়েছেন তাঁর পক্ষে কি এটা সম্ভব নয় যে, মহান আল্লাহর হুকুমে আকাশে উড়ে যাবেন? যার হাতের ছোঁয়ায় বা মুখের কথায় মহান আল্লাহর হুকুমে অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগী ভালো হয়ে যায় এবং মৃত জীবিত হয়ে উঠে, তিনি যদি এ নশ্বর জগৎ হতে আলাদা হয়ে ফেরেশতাদের মতো আসমানে হাজার হাজার বছর জীবিত ও সুস্থ থাকেন, তাতে আশ্চর্যের কি আছে? হযরত কাতাদা (রা.) বলেন– فَطَارَ مَعَ الْمَلٰئِكَةِ فَهُوَ مَعَهُمْ حَوْلَ الْعَرْشِ وَصَارَ اِنْسِيًّا مَلَكِيًّا سَمَاوِيًّا اَرْضِيًّا অর্থাৎ 'তিনি ফেরেশতাদের সাথে আসমানে উড়ে গেছেন এবং তাঁদের সাথেই আরশের পাশে অবস্থান করছেন। তিনি এখন একই সাথে মানুষ ও ফেরেশতাও এবং আকাশের ও মর্ত্যেরও। –[বাগাবী, ওসমানী]

رَافِعُكَ [এর মধ্যবর্তী সময়ে] অর্থাৎ হে ঈসা (আ.)! তোমার মৃত্যু তো যথাসময়েই অনুষ্ঠিত হবে। তোমাকে ধ্বংস করার জন্য তোমার শত্রুদের গৃহীত পরিকল্পনা সফল হবে না। এ মুহূর্তে শত্রুদের হাত থেকে তোমাকে রক্ষা করার জন্যে আমি [আল্লাহ] তোমাকে তাদের কাছ থেকে উঠিয়ে নেব।

رافعك হযরত ঈসা (আ.) -কে ঊর্ধ্ব জগতে স্বশরীরে উঠিয়ে নেওয়ার কথা তো সরাসরি কুরআনুল কারীমে উল্লেখ রয়েছে। আর সুস্পষ্টতার নিকটতর শব্দ তো এ আয়াতেও উল্লেখ রয়েছে। এ ধরনের বিভিন্ন হাদীসে তা আরও পরিষ্কার ও সুনিশ্চিত করে দিয়েছে।

وَاَوْلٰى هٰذِهِ الْاَقْوَالِ بِالصِّحَّةِ عِنْدَنَا قَوْلُ مَنْ قَالَ اِنِّىْ قَابِضُكَ مِنَ الْاَرْضِ وَرَافِعُكَ اِلَيَّ لِتَوَاتُرِ الْاَخْبَارِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ (اِبْنُ جَرِيْر) مُمِيْتُكَ فِىْ وَقْتِكَ بَعْدَ النُّزُوْلِ مِنَ السَّمَاءِ وَرَافِعُكَ اِلَى الْاٰنِ (مَدَارِك)

অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.)-কে স্বশরীরে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া সম্পর্কে সমগ্র উম্মত ঐকমত্য পোষণ করে। হযরত মাসীহ (আ.)-এর জন্মই যখন প্রচলিত সাধারণ রীতি ও নিয়ম বহির্ভূত পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে, বিনা বাপে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর একটি মাত্র ফুঁকের মাধ্যমে আল্লাহর কুদরতে তাঁর জন্ম হয়েছে, তখন তাঁর মৃত্যুও অলৌকিক বা অস্বাভাবিক

পদ্ধতিতে **অনুষ্ঠিত হওয়াটা** কি করে অসম্ভব হতে পারে? এতে আশ্চর্যান্বিত হওয়ারই বা কি কারণ থাকতে পারে? বরং এটিই **অধিক যুক্তিসঙ্গত যে,** তাঁর জন্মের মতো মৃত্যুও অস্বাভাবিক পদ্ধতি ও সাধারণ নিয়ম বহির্ভূতভাবে হওয়াই স্বাভাবিক। **এমনটি হওয়াও** তো অসম্ভব নয় যে, ফেরেশতার ফুঁয়ের মাধ্যমে জন্ম হওয়ার মধ্যে ফেরেশতার মতোই মহাশূন্যে উড্ডয়নের **বৈশিষ্ট্য আল্লাহ** তা'আলা তাঁর দেহে রেখে দিয়েছেন। এ যুক্তি তো একবারেই ধোপে টিকে না যে, তাঁর মহাশূন্যে উড়ে **যাওয়ার কথা জেনে** নিলে সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম বিশেষ করে সাইয়েদুল মুরসালীনের চেয়েও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদাকে **মেনে নিতে হয়**। পরিশেষে বলতে হয়, আল্লাহ তা'আলাই এর প্রকৃত ইলম রাখেন যে, কত অগণিত অসংখ্য ফেরেশতা **প্রতিদিন জমিন** থেকে আকাশে উঠে যান। কত অগণিত ফেরেশতা বিভিন্ন আসমানে বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন। **তাই বলে** কি একথা মেনে নিতে হবে যে, তাঁদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব শ্রেষ্ঠ রাসূল খাতামুন নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মদ ﷺ **-এর চেয়ে বেশি?**

হযরত ঈসা (আ.) জীবিত না মৃত? : গোটা পৃথিবীতে কেবল ইহুদিদের এ আকিদা রয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ.) নিহত এবং শূলীবিদ্ধ হয়ে সমাহিত হয়েছেন, পরে জীবিত হননি। তাদের এ ভ্রান্ত আকিদাকে সূরা নিসার মধ্যে স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং এ আয়াতে وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ দ্বারাও এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে– আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.) -কে শত্রুদের ষড়যন্ত্রের কবল থেকে উঠিয়ে নিয়ে তাদের প্রতি এ ষড়যন্ত্রকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ যে ইহুদিরা হযরত ঈসাকে হত্যার জন্যে ঘরে প্রবেশ করেছিল। তাদের একজনকে আল্লাহ তা'আলা হুবহু হযরত ঈসা (আ.) -এর রূপে পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। আর হযরত ঈসা (আ.)-কে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল। আয়াতের শব্দ এই– وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ 'তারা ঈসাকে হত্যা করেনি, শূলে ঝুলায়নি, তবে আল্লাহ তাদেরকে দ্বিধাদ্বন্দ্বে নিক্ষেপ করেছেন।' তারা নিজেরাই একজনকে হত্যা করে আনন্দিত হয়েছে।

খ্রিস্টানরা বলত যে, হযরত ঈসা (আ.)-কে হত্যা করা হয়েছে, তাকে শূলে ঝুলানো হয়েছিল, তবে পুনরায় জীবিত করে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। উল্লিখিত আয়াত তাদের ধারণাকেও খণ্ডন করেছে এবং বলে দিয়েছে যে, ইহুদিরা যেভাবে তাদেরই একজনকে হত্যা করে আনন্দ-উৎসব করেছিল, তা থেকেই খ্রিস্টানদের এ ধারণা হয়েছিল যে, প্রকৃতপক্ষে হযরত ঈসা (আ.)-ই নিহত হয়েছেন। এ কারণে ইহুদিদের ন্যায় খ্রিস্টানরাও شُبِّهَ لَهُمْ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এ উভয় দলের বিপরীতে মুসলমানদের আকিদা তাই, যা এ আয়াত এবং আরও কতিপয় আয়াতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ইহুদিদের হাত থেকে রক্ষার্থে জীবিত আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন। তারা তাঁকে হত্যা করেনি এবং শূলেও **ঝুলায়নি**। তিনি আসমানে বিদ্যমান রয়েছেন। কিয়ামতের প্রাক্কালে আসমান থেকে অবতরণ করে ইহুদি জাতির উপর বিজয় **লাভ করবেন**। অবশেষে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করবেন। এ কথার উপরই মুসলিম জাতির ইজমা ও ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত **হয়েছে**। আল্লামা হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) তালখীসুল খায়র গ্রন্থের ৩১৯ পৃষ্ঠায় এ ব্যাপারে ইজমা উল্লেখ **করেছেন**, কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াত ও মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা এ আকিদা এবং এ ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত **রয়েছে**। –[মা'রিফুল কুরআন ২য় খণ্ড]

قَوْلُهُ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ : অর্থাৎ সত্যিকার মুসলমান ও সত্যিকার খ্রিস্টান। সত্যিকার খ্রিস্টান তারাই যারা **হযরত মুহাম্মদ** ﷺ -এর নবুয়ত প্রকাশের পর হযরত ঈসা (আ.) -এর ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক রাসূলের প্রতি ঈমান এনে **মুসলমান হয়েছে**। কেননা যে কোনো পর্যায়ে কিয়ামত পর্যন্ত হযরত ঈসা (আ.)-এর শত্রু ইহুদিদের উপর খাঁটি খ্রিস্টান ও **মুসলমানদের প্রাধান্য** বহাল থাকবে। যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতেও এবং আধ্যাত্মিক ও নৈতিকতার ক্ষেত্রেও। বস্তুগত বিশ্লেষণ ও **প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে** তাদের অবস্থা পর্যালোচনা করলে আয়াতে বর্ণিত অবস্থাকে মেনে নিতে কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়। **অর্থাৎ এর তাৎপর্য** উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই হতে পারে।

اَلْمُرَادُ مِنْ هٰذِهِ الْفَوْقِيَّةِ بِالْحُجَّةِ وَالدَّلِيْلُ (كَبِيْر) اَىْ بِالْقَهْرِ وَالْاِسْتِعْلَاءِ وَالسُّلْطَانِ (كَبِيْر) اَىْ ظَاهِرِيْنَ قَاهِرِيْنَ بِالْعِزَّةِ وَالْمُنْعَةِ وَالْحُجَّةِ (مَعَالِم) اَىْ يَعْلُوْنَ بِالْحُجَّةِ وَفِىْ اَكْثَرِ الْاَحْوَالِ بِهَا وَبِالسَّيْفِ (مَدَارِك)

তাফসীরে **কাবীরের রচয়িতা** ও মায়ালিমের রচয়িতা উভয়ের যুগই হিজরি ৬ষ্ঠ শতক। উভয়েই লিখেছেন- এ আয়াতের আলোকে **ইহুদিদের অবস্থার** প্রতি লক্ষ্য কর। ইহুদি জাতি সারা দুনিয়ায় কিভাবে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও বঞ্চিত এবং তাদের মোকাবিলায় খ্রিস্টানদের **আধিক্য** ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

অনুবাদ :

٥٦. فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِى الدُّنْيَا بِالْقَتْلِ وَالسَّبْيِ وَالْجِزْيَةِ وَالْاٰخِرَةِ بِالنَّارِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نّٰصِرِيْنَ مَانِعِيْنَ مِنْهُ ـ

৫৬. যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে আমি তাদেরকে হত্যা, কয়েদ ও জিজিয়া কর আরোপ করতঃ ইহকালেও জাহান্নামাগ্নির মাধ্যমে পরকালে কঠোর শাস্তি প্রদান করব এবং তাদের কোনো সাহায্যকারী নেই। তা হতে রক্ষাকারী নেই।

٥٧. وَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ بِالْيَاءِ وَالنُّوْنِ اُجُوْرَهُمْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ اَىْ يُعَاقِبُهُمْ رُوِىَ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَرْسَلَ اِلَيْهِ سَحَابَةً فَرَفَعَتْهُ فَتَعَلَّقَتْ بِهٖ اُمُّهٗ وَبَكَتْ فَقَالَ لَهَا اِنَّ الْقِيٰمَةَ تَجْمَعُنَا وَكَانَ ذٰلِكَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَلَهٗ ثَلٰثٌ وَثَلٰثُوْنَ سَنَةً وَعَاشَتْ اُمُّهٗ بَعْدَهٗ سِتَّ سِنِيْنَ وَرَوَى الشَّيْخَانِ حَدِيْثَ اَنَّهٗ يَنْزِلُ قُرْبَ السَّاعَةِ وَيَحْكُمُ بِشَرِيْعَةِ نَبِيِّنَا ﷺ وَيَقْتُلُ الدَّجَّالَ وَالْخِنْزِيْرَ وَيَكْسِرُ الصَّلِيْبَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَفِىْ حَدِيْثِ مُسْلِمٍ اَنَّهٗ يَمْكُثُ سَبْعَ سِنِيْنَ وَفِىْ حَدِيْثِ اَبِىْ دَاوٗدَ الطَّيَالِسِىِّ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً وَيَتَوَفّٰى وَيُصَلّٰى عَلَيْهِ فَيَحْتَمِلُ اَنَّ الْمُرَادَ مَجْمُوْعُ لُبْثِهٖ فِى الْاَرْضِ قَبْلَ الرَّفْعِ وَبَعْدَهٗ ـ

৫৭. আর যারা বিশ্বাস করেছে এবং সৎকার্য করেছে তিনি তাদের প্রতিফল পুরোপুরি প্রদান করবেন। আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালোবাসেন না। অর্থাৎ তিনি তাদের শাস্তি প্রদান করবেন।

يُوَفِّيْهِمْ এটা ى [নাম পুরুষ] ও ن [উত্তম পুরুষ বহুবচন] উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে।

হযরত ঈসা (আ.) -কে আকাশে উঠিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ এক খণ্ড মেঘ প্রেরণ করেছিলেন। তা তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তখন তাঁর মাতা তাঁকে জড়াইয়া ধরেন এবং কেঁদে উঠেন। তখন তিনি মাকে [সান্ত্বনা দিয়ে] বলেছিলেন, কিয়ামত আমাদের একত্রিত করবে। ঐ রাত ছিল পবিত্র [লাইলাতুল কদর]। তিনি ঐ সময় বায়তুল মুকাদ্দাসে ছিলেন। তাঁর বয়স ছিল তেত্রিশ। এরপর তাঁর মা আরো ছয় বছরকাল জীবিতা ছিলেন।

শায়খাইন [ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.)] একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে তিনি পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। আমাদের নবী রাসূল ﷺ -এর শরিয়তের বিধানানুসারে তিনি ফয়সালা প্রদান করবেন, দাজ্জাল ও শূকর হত্যা করবেন, ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন এবং জিজিয়া কর রহিত করবেন।

মুসলিম শরীফের হাদীসে উল্লেখ আছে, তিনি সাত বছর [দুনিয়াতে] অবস্থান করবেন।

আবূ দাউদ ত্বয়ালিসির বর্ণনায় আছে যে, তিনি চল্লিশ বছর অবস্থান করে মারা যাবেন এবং তাঁর জানাজার নামাজ হবে। এ বর্ণনাটির মর্ম সম্ভবত এই যে, তাঁর আকাশে উত্থানের আগের ও পরের মোট অবস্থান হবে চল্লিশ বছর।

٥٨. ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرُ مِنْ اَمْرِ عِيْسٰى نَتْلُوْهُ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ مِنَ الْاٰيٰتِ حَالٌ مِنَ الْهَاءِ فِيْ نَتْلُوْهُ وَعَامِلُهُ مَا فِيْ ذٰلِكَ مِنْ مَعْنَى الْاِشَارَةِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ الْمُحْكَمِ اَىِ الْقُرْاٰنِ .

৫৮. তা হযরত ঈসা সম্পর্কে উল্লিখিত কাহিনী, হে মুহাম্মদ! তোমার নিকট নিদর্শন مِنَ الْاٰيٰتِ এটা نَتْلُوْهُ -এর কর্মপদ ه -এর حَالٌ বা ভাব ও অবস্থাবাচক পদ। ذٰلِكَ [তা] -এর মধ্যে اِشَارَةٌ [ইঙ্গিত করা] -এর যে মর্ম বিদ্যমান সে ক্রিয়া এ স্থানে তাঁর عَامِلٌ। ও সারগর্ভ দ্ব্যর্থহীন বাণী অর্থাৎ আল কুরআন হতে আবৃত্তি করছি অর্থাৎ বিবৃত করছি।

٥٩. اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى شَانَهُ الْغَرِيْبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ كَشَانِهِ فِيْ خَلْقِهِ مِنْ غَيْرِ اَبٍ وَلَا اُمٍّ وَهُوَ مِنْ تَشْبِيْهِ الْغَرِيْبِ بِالْاَغْرَبِ لِيَكُوْنَ اَقْطَعَ لِلْخَصْمِ وَاَوْقَعَ فِي النَّفْسِ خَلَقَهُ اَىْ اٰدَمَ اَىْ قَالَبَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ بَشَرًا فَيَكُوْنُ اَىْ فَكَانَ وَكَذٰلِكَ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَهُ كُنْ مِنْ غَيْرِ اَبٍ فَكَانَ .

৫৯. আল্লাহর নিকট ঈসার অর্থাৎ তাঁর এই বিরল ও অত্যাশ্চার্য অবস্থার দৃষ্টান্ত পিতা ব্যতীত সৃষ্টি করার বিষয়ে আদমের দৃষ্টান্তসদৃশ; তাকে আদমকে অর্থাৎ তাঁর কাঠামোকে মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছিলেন, অতঃপর তাকে বলেছিলেন মানুষ হও, ফলে সে হয়ে গেল। ঈসাও তদ্রূপ। আল্লাহ তাঁকে পিতা ভিন্ন সৃষ্টি হতে বললেন, আর তিনি হয়ে গেলেন।

يَكُوْنُ -এর প্রকৃত অর্থ হলো– হবে বা হচ্ছে। কিন্তু এখানে كَانَ [হয়ে গেল] অর্থাৎ অতীতকাল অর্থে ব্যবহৃত। এ স্থানে একটি বিরল বিষয়কে [ঈসার জন্মকে] বিরলতর অপর একটি বিষয়ের [আদমের জন্মের] সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। বিরুদ্ধবাদীদের বিবাদ জোরালো যুক্তিতে খণ্ডন ও মনে অধিক প্রভাব সৃষ্টি করা এর উদ্দেশ্য।

٦٠. اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوْفٍ اَىْ اَمْرُ عِيْسٰى فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ الشَّاكِّيْنَ فِيْهِ .

৬০. হযরত ঈসা (আ.)-এর বিষয়টি সত্য, তোমার প্রতিপালকের তরফ হতে। اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ এটা এ স্থানে উহ্য مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য اَمْرُ عِيْسٰى [ঈসার বিষয়টি] এর خَبَرٌ বা বিধেয়। সুতরাং সন্দেহবাদীদের এতে সংশয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فِي الدُّنْيَا ইহুদি জাতির প্রতি দুনিয়ায় শাস্তি : ইহুদি জাতির প্রতি দুনিয়ায় শাস্তির ব্যাপারটা তাদের ইতিহাসের পাতায় খুঁজে দেখুন। মহান আল্লাহর এমন কোনো আজাব নেই, যা বিগত দু-হাজার বছর যাবৎ এ হতভাগ্য জাতির উপর পতিত হয়নি। আর বর্তমানে অপর একটি জাতির সাহায্যে ফিলিস্তিনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর স্বস্তির নিঃশ্বাস গ্রহণ করা তাদের ভাগ্যে জুটেনি। তাদের মাথায় কি আপদ সওয়ার হয়ে আছে তার বিবরণ আমি 'জিউশ [ইহুদি] এনসাইক্লোপেডিয়া'র উদ্ধৃতি সহকারে প্রথম পারার টীকায় উল্লেখ করেছি। এ জাতির সুখশান্তি, আমোদ-প্রমোদ -এর প্রত্যাশাও এক নাটক মাত্র। [প্রকৃতপক্ষে সম্পদের পরিবর্তে আজ তাদের সংকটই প্রকট। বড় বড় পুঁজির মালিক হওয়া সত্ত্বেও আজ ইহুদিদের বহির্বিশ্ব থেকে খাদ্য আমদানি করতে হয়। ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর হতে আজ পর্যন্ত যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়া একটি বর্ষপঞ্জিও তাদের

অতিবাহিত হয়নি।] খাদ্যাভাব ও দারিদ্র্য তাদের নিত্যসঙ্গী। জার্মান, ইটালী, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, রাশিয়া সেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে তাদেরকে কুকুর তাড়া করে বের করে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পৈশাচিক উল্লাস ও নারকীয় বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার অপরাধে আজও তাদেরকে ধরে ধরে শাস্তি দেওয়া হয়। হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, ইটালী, জার্মান ও রাশিয়া থেকে তাদের বিতাড়নের মর্মস্পর্শী ইতিহাস কার অজানা? তাদের রক্তাক্ত ইতিহাসের দাগ আজও মুছে যায়নি।

قَوْلُهُ وَالْاٰخِرَةُ : আর রয়েছে আখিরাত। তাদের শাস্তির প্রকৃত ও ভয়াবহ রূপ তো মূলত আখিরাতেই প্রকাশ পাবে। সেদিন তাদেরকে তাদের প্রতারণা, ঠকবাজি আর চালবাজির প্রকৃত শাস্তি প্রদান করা হবে।

قَوْلُهُ الظّٰلِمِيْنَ : জুলুম বা অত্যাচার বলতে বুঝায় যথাযথ আচরণ না করা, বাড়াবাড়ি বা সঙ্কুচিত করা, অতিরঞ্জন ও সংকোচন করা। যার যা মর্যাদা অথবা অধিকার বা প্রাপ্য, তাকে তা বুঝিয়ে না দেওয়াই হলো জুলুম। এখানে জালিম বলতে ইহুদিদেরকেই বুঝানো হয়েছে। যারা হযরত ঈসা (আ.) -এর নবুয়ত, রিসালাত, শরিয়ত ও রাব্বুল আলামীনের কুদরতে তাঁর অভিনব জন্মবৃত্তান্ত ও তাঁর শারাফতে নসবেরও বিরোধিতা করত। অপর দিকে আয়াতে বিভ্রান্ত খ্রিস্টানদেরকেও বুঝানো হয়েছে, যারা হযরত ঈসা (আ.) -কে মহান আল্লাহর বান্দা ও রাসূল হিসেবে গ্রহণ না করে তাঁকেই মহান আল্লাহর সাকার প্রকাশ, অবতার ও মহান আল্লাহর পুত্র ইত্যাদি হিসেবে মেনে নিয়েছে ও তার প্রচার করেছে। হযরত ঈসা (আ.) সংক্রান্ত আকিদার ক্ষেত্রে ইহুদি ও নাসারা উভয়েই সিরাতুল মুস্তাকীমের সুষম ও ভারসাম্যমূলক পন্থাকে পরিহার, অতিরঞ্জন ও সংকোচনের অভিশপ্ত ও বিভ্রান্ত পথকে গ্রহণ করেছে।

قَوْلُهُ ذٰلِكَ : [হে আমার রাসূল!] এ সঠিক ঘটনাবলি হযরত ঈসা (আ.)-এর নির্ভুল কাহিনী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে লক্ষ্য করে উল্লেখ করা হয়েছে। যেন তিনি সে সম্পর্কে সম্যক অবগতি লাভ করতে পারেন।

ذٰلِكَ [ইসমে ইশারা লিল বায়ীদ] দূরের প্রতি ইঙ্গিতসূচক শব্দ দ্বারা সম্মান-মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

اِشَارَةٌ اِلٰى مَا تَقَدَّمَ مِنْ نَبِيِّنَا عِيْسٰى وَزَكَرِيَّا وَغَيْرِهِمَا (كَبِيْر) وَالْاِتْيَانُ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الْبُعْدِ لِلْاِشَارَةِ اِلٰى عَظْمِ الشَّانِ الْمُشَارِ اِلَيْهِ وَبُعْدِ مَنْزِلَةٍ فِى الشَّرْفِ (رُوْح)

قَوْلُهُ مِنَ الْاٰيَاتِ : অর্থাৎ শত শত বছর পূর্বের এ সকল কাহিনীর নির্ভুল ও সঠিক বিবরণ প্রদান আপনার নবুয়তের সত্যতার উজ্জ্বল নিদর্শন। উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ সত্যই তুলে ধরেছেন যে, হে আমার রাসূল! আপনি যে হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রকৃত অবস্থা ও সে সংক্রান্ত সমস্ত ঘটনাবলি নিখুঁত, নির্ভুল ও সঠিক বিবরণ প্রদান করেছেন, যে ঘটনাগুলোকে ইহুদিরা সংকোচন আর খ্রিস্টানগণ অতিরঞ্জনের আবর্জনার স্তূপে আচ্ছাদিত করে রেখেছিল। কুরআনুল কারীমের আয়াতে আপনি যে তার নিখুঁত, সঠিক ও নির্ভরযোগ্য সত্যিকার কাহিনীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা দিচ্ছেন, শত শত বছর আগের ঘটনাবলির অবিকৃত দিকসমূহ তুলে ধরে হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে এ সত্যভিত্তিক বর্ণনা প্রদান করাটাই আপনার নবুয়ত, রিসালাতের সত্যতার ও আপনি যে মহান আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত তারই উজ্জ্বল ও জ্বলন্ত প্রমাণ। আর আপনার পবিত্র জবান হতে বর্ণিত এ সকল কাহিনী আপনি নিজের তরফ থেকে বলেন না, বরং অদৃশ্য জগতের নিয়ন্তা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই এ মহাবাণী আপনার জবান মুবারক দ্বারা প্রকাশ করান।

قَوْلُهُ الذِّكْرِ الْحَكِيْمِ : আয়াতের এ অংশে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে, আপনার জবান মুবারক হতে এসব ঘটনাবলির বিবরণ শুধু আপনার নবুয়ত-রিসালতের সত্যতার জ্বলন্ত প্রমাণই। তদুপরি এ প্রাণস্পর্শী বর্ণনা অত্যন্ত তথ্যসমৃদ্ধ বিজ্ঞানময় ও সূক্ষ্ম তত্ত্বে ভরপুর।

قَوْلُهُ اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ : হযরত ঈসা (আ.) মহান আল্লাহর বান্দা নয়; বরং তাঁর ছেলে– এ দাবি নিয়ে খ্রিস্টানরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে অনেক তর্ক করে। শেষে বলে, তিনি যদি আল্লাহর ছেলে না হন তবে আপনারাই বলুন। তিনি কার ছেলে? এরই জবাবে আল্লাহ তা'আলা খ্রিস্টানদেরকে সম্বোধন করে এ উপমা উপস্থাপন করেছেন, ঈসা (আ.)-এর দৃষ্টান্ত তো আদমের অনুরূপ। তোমরা খ্রিস্টানরাও হযরত আদম (আ.)-কে একজন মানুষ বলেই বিশ্বাস কর, অথচ তাঁর জন্ম তো আরও অলৌকিক পদ্ধতিতে, মাতাপিতা ব্যতীতই তিনি সৃষ্টি হয়েছেন। তাঁকে যদি সৃষ্ট ও মানুষ হিসেবে মেনে নিতে পার, তবে হযরত ঈসা (আ.)-কে মানুষ হিসেবে মেনে নিতে আপত্তি কোথায়?

قَوْلُهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ : হযরত মাসীহ (আ.) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা যা কিছু বলেছেন, সেটাই সত্য। তার মাঝে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। প্রকৃত বিষয় যা ছিল, তা কমবেশি না করে পুরোপুরি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। –[তাফসীরে ওসমানী]

٦١. فَمَنْ حَآجَّكَ جَادَلَكَ مِنَ النَّصَارٰى فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ بِاَمْرِهٖ فَقُلْ لَهُمْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَاَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ فَنَجْمَعُهُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ نَتَضَرَّعْ فِى الدُّعَاءِ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ بِاَنْ نَقُوْلَ اَللّٰهُمَّ اِلْعَنِ الْكَاذِبَ فِىْ شَانِ عِيْسٰى وَقَدْ دَعَا ﷺ وَفْدَ نَجْرَانَ لِذٰلِكَ لَمَّا حَاجُّوْهُ فِيْهِ فَقَالُوْا حَتّٰى نَنْظُرَ فِىْ اَمْرِنَا ثُمَّ نَاْتِيْكَ فَقَالَ ذَوُوْ رَأْيِهِمْ لَقَدْ عَرَفْتُمْ نُبُوَّتَهٗ وَاَنَّهٗ مَا بَاهَلَ قَوْمٌ نَبِيًّا اِلَّا هَلَكُوْا فَوَادَعُوْا الرَّجُلَ وَانْصَرَفُوْا فَاَتَوْهُ وَقَدْ خَرَجَ وَمَعَهُ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَفَاطِمَةُ وَعَلِيٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَقَالَ لَهُمْ اِذَا دَعَوْتُ فَاَمِّنُوْا فَاَبَوْا اَنْ يُّلَاعِنُوْا وَصَالَحُوْهُ عَلَى الْجِزْيَةِ رَوَاهُ اَبُوْ نُعَيْمٍ وَ رَوٰى اَبُوْ دَاوُدَ اَنَّهُمْ صَالَحُوْهُ عَلٰى اَلْفَىْ حُلَّةٍ اَلنِّصْفُ فِىْ صَفَرٍ وَالْبَقِيَّةُ فِىْ رَجَبٍ وَثَلٰثِيْنَ دِرْعًا وَثَلٰثِيْنَ فَرَسًا وَثَلٰثِيْنَ بَعِيْرًا وَثَلٰثِيْنَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ اَصْنَافِ السِّلَاحِ وَ رَوٰى اَحْمَدُ فِىْ مُسْنَدِهٖ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ لَوْ خَرَجَ الَّذِيْنَ يُبَاهِلُوْنَهٗ لَرَجَعُوْا لَا يَجِدُوْنَ مَالًا وَلَا اَهْلًا وَ رَوَى الطَّبَرَانِىُّ مَرْفُوْعًا لَوْ خَرَجُوْا لَاحْتَرَقُوْا ـ

অনুবাদ :

৬১. এ বিষয়ে তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর খ্রিস্টানদের যারা এ বিষয়ে তোমার সাথে তর্ক করে বাদানুবাদ করে তাদেরকে বল, আস, আমরা আমাদের পুত্রগণকে, তোমরা তোমাদের পুত্রগণকে, আমরা আমাদের নারীগণকে, তোমরা তোমাদের নারীগণকে, আমরা আমাদের নিজেদেরকে তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে আহ্বান করি এবং তাদের একত্রিত করি অতঃপর বিনীত প্রার্থনা করি দোয়ায় খুব কাকুতি-মিনতি করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত দেই। অর্থাৎ বলি, হে আল্লাহ! ঈসার বিষয়ে যে মিথ্যাবাদী তার উপর তুমি লানত বর্ষণ কর!

রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজরানবাসী খ্রিস্টান প্রতিনিধি দলকে যখন তারা এই বিষয়ে তাঁর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল তখন এ আহ্বান জানিয়েছিলেন। অতঃপর তারা বলল, বিষয়টি চিন্তা করে নেই, পরে আসব। তাদের [আল আকিব নামক] জনৈক বিচক্ষণ ব্যক্তি তাদেরকে বলল, তোমরা তাঁর নবুয়ত সম্পর্কে ভালোভাবেই জ্ঞাত রয়েছ। যে সম্প্রদায়ই নবীর সাথে এ ধরনের 'মুবাহালা' করেছে, তারাই ধ্বংস হয়েছে। সুতরাং তাঁর সাথে সন্ধি করে নাও এবং বাড়ি ফিরে চল। এদিকে রাসূল ﷺ হযরত হাসান, হযরত হুসাইন, হযরত ফাতিমা ও হযরত আলীকে নিয়ে এ মুবাহালার উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়েছিলেন। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন, তোমরা আমার দোয়ার সাথে আমিন বলিও। শেষ পর্যন্ত নাজরানবাসী খ্রিস্টানগণ মুবাহালায় অবতীর্ণ হতে অস্বীকৃতি জানায় এবং জিজিয়া প্রদান করতে রাজি হয়ে তাঁর সাথে সন্ধি করে। -[আবূ নু'আইম] আবূ দাঊদ (র.) বর্ণনা করেন, দুই হাজার হুল্লা [এক ধরনের পরিচ্ছদ] অর্ধেক সফর মাসে বাকি অর্ধেক রজব মাসে দেয়, ত্রিশটি বর্ম, ত্রিশটি ঘোড়া, ত্রিশটি উট, বিভিন্ন ধরনের ত্রিশটি যুদ্ধাস্ত্র দানের শর্তে তারা তাঁর সাথে সন্ধি করে। ইমাম আহমদ (র.) তৎপ্রণীত মুসনাদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করেন, যদি খ্রিস্টান প্রতিনিধি মুবাহালার জন্য বাহির হতো, তবে তারা বাড়ি ফিরে ধন-সম্পত্তি ও পরিবার-পরিজন কিছুই পেত না। তাবরানী মারফূ' হাদীসে বর্ণনা করেন, যদি এরা মুবাহালা করতে বের হতো, তবে জ্বলে ভস্ম হয়ে যেত।

অনুবাদ :

٦٢. إِنَّ هٰذَا الْمَذْكُوْرَ لَهُوَ الْقَصَصُ الْخَبَرُ الْحَقُّ الَّذِىْ لَا شَكَّ فِيْهِ وَمَا مِنْ زَائِدَةٌ إِلٰهٍ إِلَّا اللّٰهُ وَإِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ فِىْ مُلْكِهِ الْحَكِيْمُ فِىْ صُنْعِهِ.

৬২. নিশ্চয় এটা অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয়টি সত্য কাহিনী সত্য সংবাদ। এতে কোনো সন্দেহ নেই আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। مِنْ এটা এ স্থানে زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাম্রাজ্যে পরম পরাক্রমশালী, তাঁর কার্যে প্রজ্ঞাময়।

٦٣. فَإِنْ تَوَلَّوْا أَعْرَضُوْا عَنِ الْإِيْمَانِ فَإِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ فَيُجَازِيْهِمْ وَفِيْهِ وَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ.

৬৩. যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় ঈমান হতে বিমুখ হয় তবে নিশ্চয় আল্লাহ দুর্বৃত্তদের সম্পর্কে সম্যক অবহিত। অনন্তর তিনি তাদেরকে প্রতিফল প্রদান করবেন। اَلْمُفْسِدِيْنَ এ স্থানে وَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ বা সর্বনাম هُمْ -এর স্থলে প্রকাশ্য বিশেষ্য পদ اَلْمُفْسِدِيْنَ -এর উল্লেখ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ : এটাকে মুবাহালার আয়াত বলা হয়। মুবাহালা অর্থ হলো– দু-পক্ষের প্রত্যেকেরই একে অন্যের উপর অভিসম্পাত দেওয়া অর্থাৎ বদদোয়া করা । এর ব্যাখ্যা হলো, যখন কোনো বিষয়ে দু পক্ষ ন্যায়-অন্যায়ের ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হয় এবং উভয় পক্ষের দলিল-প্রমাণ শেষ হয় না তখন উভয় পক্ষ আল্লাহর দরবারে এই বলে দোয়া করে যে, হে আল্লাহ! আমাদের দু-পক্ষের মধ্যে যারা মিথ্যাবাদী তাদের উপর লানত বর্ষণ কর।

মুবাহালার পটভূমি : যখন কোনো বিষয়ে, নবম হিজরী সনে নাজরানের ১৪ জন বিশিষ্ট খ্রিস্টানের এক প্রতিনিধিদল রাসূল ﷺ-এর খেদমতে হাজির হয়ে হযরত ঈসা (আ.)-এর খোদায়িত্বের ব্যাপারে কথোপকথন করল। এ ব্যাপারে ইসলামি আকিদা সম্পূর্ণ পরিষ্কার ও স্পষ্ট ছিল। কিন্তু খ্রিস্টান প্রতিনিধিগণ তাদের কথার উপর অনড় থাকল। পরিশেষে রাসূল ﷺ তাই করলেন, যা কোনো একজন খাঁটি ধার্মিক ব্যক্তি এমন ক্ষেত্রে করে থাকে। তিনি আল্লাহর বিধানের অধীনে খ্রিস্টানদের মুবাহালার প্রতি আহ্বান জানালেন। বললেন, যেহেতু এ বিষয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা হলো, এখন এসো আমরা এবং তোমরা নিজ নিজ আত্মীয়স্বজন ও সন্তানাদিকে নিয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট কাকুতি-মিনতি করে দোয়া করি যে, যে পক্ষ অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাদের উপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক।

মুবাহালার আহ্বান শুনে নাজরান প্রতিনিধিদল সময় চাইল যে, তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে জবাব দেবে। পরামর্শ সভায় তাদের সচেতন দায়িত্বশীলরা বলল, হে খ্রিস্টান সম্প্রদায়! নিশ্চয় তোমরা মনে মনে উপলব্ধি করেছ যে, মুহাম্মদ ﷺ একজন প্রেরিত নবী। হযরত মাসীহ (আ.) সম্পর্কে তিনি দ্ব্যর্থহীন মীমাংসাপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন। তোমরা জান, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইসমাঈলের বংশধরদের মাঝে নবী পাঠানোর ওয়াদা করেছেন। অসম্ভব নয় যে, তিনিই সেই নবী হবেন। কোনো নবীর সাথে মুবাহালার পরিণতি একটি সম্প্রদায়ের জন্য এটাই হতে পারে যে, তাদের ছোট বড় কেউ ধ্বংস হতে নিষ্কৃতি পাবে না। নবীর লানতের পরিণাম প্রজন্মের পর প্রজন্ম ভোগ করতে থাকবে। কাজেই তার চেয়ে ভালো আমরা তাঁর সাথে সন্ধি করে নিজ দেশে ফিরে যাই। কারণ আরব জাহানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কিনে নেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই। তারা এ প্রস্তাবই অনুমোদন করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে হাজির হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত হাসান, হযরত হুসাইন, হযরত ফাতিমা ও হযরত আলী (রা.) -কে সাথে নিয়ে বের হয়ে আসছিলেন। এ জ্যোতির্ময় চেহারাগুলো দেখে তাদের প্রধান পাদ্রি

বলল, আমি এমন পবিত্র কতগুলো চেহারা দেখছি, যাদের দোয়া পাহাড় টলাতে পারে। এদের সাথে মুবাহালা করে তোমরা ধ্বংস হতে যেয়ো না। নচেৎ ভূপৃষ্ঠে একজন খ্রিস্টানেরও অস্তিত্ব থাকবে না। যাহোক, শেষ পর্যন্ত তারা মোকাবিলা ছেড়ে বার্ষিক কর দিতেই সম্মত হলো এবং সন্ধি করে দেশে ফিলে গেল। হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মুবাহালা করলে গোটা উপত্যকা আগুন হয়ে তাদের উপর বর্ষিত হতো এবং আল্লাহ তা'আলা নাজরান ভূখণ্ডটি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতেন। এক বছরের ভেতর সমস্ত খ্রিস্টান নির্মূল হয়ে যেত। –[তাফসীরে ওসমানী].

فَوَادَعُوْا اَىْ صَالَحُوْا অর্থাৎ মুবাহালা করো না; বরং তাদের সাথে সন্ধি কর।

فَاتَوْهُ : তারা রাসূল ﷺ -এর খেদমতে আসল এবং সন্ধি করল।

قَوْلُهُ وَضْعَ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ : اَللّٰهُ عَلِيْمٌ بِهِمْ -এর স্থলে اَللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ উল্লেখ করেছেন। যাতে স্পষ্টভাবে তাদের খারাপ গুণ প্রকাশিত হয়।

(اِفْتِعَالٌ) لِنَبْتَهِلْ : আমরা কেঁদে কেঁদে দোয়া করব। আল্লামা যমখশারী (র.) বলেন, بَهْلَةٌ -এর আসল অর্থ হলো– অভিশাপের দোয়া বা বদদোয়া করা। এরপর তা স্বাভাবিক দোয়া অর্থেও ব্যবহৃত হতে থাকে। –[লুগাতুল কুরআন]

বিশেষ জ্ঞাতব্য : মুবাহালার পন্থা বা পদ্ধতি রাসূলে কারীম ﷺ -এর পরও অবলম্বন করা যাবে কিনা এবং যে ফলাফল তাঁর মুবাহালায় প্রকাশ পাওয়ার কথা ছিল, অনুরূপ সর্বদাই প্রকাশ পাওয়া অবশ্যম্ভাবী কিনা? একথা কুরআন মাজীদে স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই। পূর্বসূরিদের কতিপয়ের কর্মপদ্ধতি এবং কতক হানাফী ফকীহের বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায়, মুবাহালার বৈধতা এখনও বহাল আছে। অবশ্য তা কেবল সেইসব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। মুবাহালায় নারী ও শিশুদের শরিক করা জরুরি নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুবাহালায় প্রতিপক্ষের উপর যে আজাব আপতিত হওয়া অনিবার্য ছিল, এখনকার মুবাহালায় তদ্রূপ আজাব আসা অবশ্যম্ভাবী নয়; বরং বর্তমানে মুবাহালার উদ্দেশ্য কেবল দলিল-প্রমাণের দ্বারা চূড়ান্ত করে তর্কবিতর্কের অবসান ঘটানো। আমার ধারণা, মুবাহালা যে কোনো মিথ্যাবাদীর সাথে নয়; বরং ধোঁকাবাজ মিথ্যুকের সাথেই হওয়া উচিত। ইবনে কাসীর (র.) বলেন, সুস্পষ্ট বর্ণনার পরেও হযরত ঈসা (আ.)-এর ব্যাপার যারা হটকারিতামূলভাবে, সত্য প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে মুবাহালা করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নির্দেশ দিয়েছিলেন। –[তাফসীরে ওসমানী]

قَوْلُهُ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ : অর্থাৎ এ সমগ্র ঘটনা যা দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত মাসীহ এবং তাঁর মা উভয়ই শুধু মানুষ ছিলেন। কেউ খোদায়িত্বে শরিক ছিলেন না। সত্তা, গুণাবলি ও উৎস সবকিছুই মনগড়া। এর মধ্যে مِنْ অব্যয়টি বাক্যের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য অতিরিক্ত হয়েছে।

قَوْلُهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ : মহাপরাক্রমশালী ও কুশলী। এ বিশেষণে হযরত মাসীহ প্রমুখ কেউ আল্লাহ তা'আলার সাথে শরিক নয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সর্ব ব্যাপক জ্ঞানের মাধ্যমে প্রত্যেককেই সাজা দেবেন।

قَوْلُهُ فَاِنْ تَوَلَّوْا : অর্থাৎ এত স্পষ্ট বর্ণনার পরও যদি তারা তাদের ঔদ্ধত্য বহাল রাখে এবং সত্য মানতে অস্বীকার করে, দীন ও আকিদার মধ্যে ফিতনা সৃষ্টি করে, তাওহীদের স্থলে মানুষেকে শিরকের প্রতি আহ্বান করে, তাহলে তারা যেন মনে রাখে যে, আল্লাহর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞানের বাইরে কোনো কিছুই নেই। তিনি তাদের সকল কৃতকর্মের ব্যাপারে সম্যক অবগত। সে অনুপাতে তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন।

قَوْلُهُ فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ : যদি তারা দলিল-প্রমাণ না মানে এবং মুবাহালা করতেও প্রস্তুত না হয়, তবে বুঝে নিতে পার, তাদের উদ্দেশ্য সত্য প্রতিষ্ঠা নয়; বরং তাদের অন্তরে নিজ বিশ্বাসের সত্যতারও আস্থা নেই। কেবল ফিতনা-ফ্যাসাদ বিস্তার করাই তাদের লক্ষ্য। তারা যেন ভালো করে বুঝে নেয়, সব ফাসাদকারী মহান আল্লাহর দৃষ্টির মধ্যে রয়েছে।

অনুবাদ :

٦٤. قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ الْيَهُوْدِ وَالنَّصٰرٰى تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ مَصْدَرٌ بِمَعْنٰى مُسْتَوٍ اَمْرُهَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ هِىَ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَمَا اتَّخَذْتُمُ الْاَحْبَارَ وَالرُّهْبَانَ فَاِنْ تَوَلَّوْا اَعْرَضُوْا عَنِ التَّوْحِيْدِ فَقُوْلُوْا اَنْتُمْ لَهُمْ اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ مُوَحِّدُوْنَ ـ

৬৪. বল, হে কিতাবীগণ! অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রিস্টানগণ আস এমন কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে একই। سَوَاءٍ শব্দটি مَصْدَرٌ বা ক্রিয়ার উৎস। অর্থাৎ একই সমান তার বিষয়সমূহ। তা হলো আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত করি না, কোনো কিছুকেই তাঁর সাথে শরিক করি না। তোমরা যেমন তোমাদের শাস্ত্রজ্ঞ ও সন্ন্যাসীদেরকে 'রব' বলে মেনে নিয়েছ, তেমনি আমাদের কেউ আল্লাহ ব্যতীত অপর কাউকেও 'রব' বলে গ্রহণ করে না। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাওহীদ গ্রহণ করা থেকে বিমুখ হয় তবে তোমরা এদেরকে বল, তোমরা সাক্ষী থাক আমরা আত্মসমর্পণকারী অর্থাৎ তাওহীদ অবলম্বনকারী।

٦٥. وَنَزَلَ لَمَّا قَالَتِ الْيَهُوْدُ اِبْرَاهِيْمُ يَهُوْدِيٌّ وَنَحْنُ عَلٰى دِيْنِهٖ وَقَالَتِ النَّصَارٰى كَذٰلِكَ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَاجُّوْنَ تَخَاصَمُوْنَ فِىْ اِبْرَاهِيْمَ بِزَعْمِكُمْ اَنَّهٗ عَلٰى دِيْنِكُمْ وَمَا اُنْزِلَتِ التَّوْرٰةُ وَالْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْ بَعْدِهٖ بِزَمَنٍ طَوِيْلٍ وَبَعْدَ نُزُوْلِهِمَا حَدَثَتِ الْيَهُوْدِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ بُطْلَانَ قَوْلِكُمْ ـ

৬৫. ইহুদিগণ বলত, হযরত ইবরাহীম ছিলেন ইহুদি। সুতরাং আমরা তাঁরই ধর্মে রয়েছি। খ্রিস্টানরাও নিজেদের ব্যাপারে এমন কথা বলত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন- হে কিতাবীগণ! ইবরাহীম তোমাদের ধর্মানুসারী ছিলেন এ ধারণাবশত তোমরা ইবরাহীম সম্পর্কে কেন তর্ক কর, বাদানুবাদ কর; অথচ তাওরাত ও ইঞ্জিল তার দীর্ঘকাল পরে অবতীর্ণ হয়েছিল। আর এতদুভয়ের অবতীর্ণ হওয়ার পর উদ্ভব হয়েছিল ইহুদিবাদ এবং খ্রিস্টবাদের। সুতরাং তোমাদের এ কথা কত যে ভিত্তিহীন, তা তোমরা কি বুঝ না?

٦٦. هَا لِلتَّنْبِيْهِ اَنْتُمْ مُبْتَدَأٌ يَا هٰؤُلَاءِ وَالْخَبَرُ حَاجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ مِنْ اَمْرِ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَزَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ عَلٰى دِيْنِهِمَا فَلِمَ تُحَاجُّوْنَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ مِنْ شَاْنِ اِبْرَاهِيْمَ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ شَاْنَهٗ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ـ

৬৬. ওহে! দেখ, هَا এটা تَنْبِيْه বা সতর্কীকরণ অব্যয়। اَنْتُمْ শব্দটি مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য। هٰؤُلَاءِ শব্দটির পূর্বে সম্বোধনবোধক অব্যয় يَا উহ্য রয়েছে। حَاجَجْتُمْ শব্দটি خَبَرٌ বা বিধেয়। যে বিষয়ে তোমাদের কিছু জ্ঞান আছে যেমন হযরত মূসা ও ঈসা (আ.) সম্পর্কে তোমাদের ধারণা যে, তোমরা তাঁদের ধর্মের অনুসারী। সে বিষয়ে তর্ক কর। তবে যে বিষয়ে জ্ঞান নেই যেমন ইবরাহীম সম্পর্কে সে বিষয়ে কেন তর্ক করছ? আল্লাহ তাঁর বিষয়ে জ্ঞাত আছেন, আর তোমরা জ্ঞাত নও।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاۤءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ : 'আহলে কিতাব' শব্দটি যদিও ইহুদি ও খ্রিস্টান উভয়ের জন্য প্রযোজ্য হয়, তবে বাক্যের ভঙ্গি দ্বারা বুঝা যায় যে, নাজরানী প্রতিনিধিদের সাথে এ আলোচনা হয়েছিল। কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার এর দ্বারা ইহুদি সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করেছেন। তবে উক্ত বাক্য দ্বারা উভয় উদ্দেশ্য নেওয়া উত্তম। কারণ যে বিষয়ের দিকে তাঁকে আহ্বান করা হয়েছিল তা ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলমান তিনো জাতির সাথে সম্পৃক্ত ছিল। অর্থাৎ আমরা এমন আকিদার উপর একমত হব, যে ব্যাপারে আমরা ঈমান রাখি এবং তোমরাও তা সঠিক হওয়াকে অস্বীকার কর না। তোমাদের নবীগণ থেকে এ আকিদা বর্ণিত রয়েছে। তোমাদের ধর্মীয় গ্রন্থে এর তা'লীম বিদ্যমান রয়েছে।

নাজরান খ্রিস্টান দলের মিথ্যা দাবি : পূর্বে উদ্ধৃত করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নাজরানের প্রতিনিধি দলকে বলেছিলেন, أَسْلِمُوْا 'তোমরা মুসলিম হয়ে যাও', তখন তারা জবাব দিয়েছিল, أَسْلَمْنَا 'আমরা তো মুসলিমই।' এর দ্বারা বোঝা গেল, মুসলিমগণের ন্যায় তাদেরও দাবী ছিল, তারা মুসলিম। অনুরূপ ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সামনে তাওহীদ তুলে ধরা হলে তারা বলত, আমরাও মহান আল্লাহকে এক বলি; বরং যে কোনো ধর্মাবলম্বী কোনো না কোনো রঙে এক পর্যায়ে গিয়ে স্বীকার করে- বড় আল্লাহ একজনই। এখানে সেদিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, বুনিয়াদি আকিদা অর্থাৎ মহান আল্লাহকে এক বলা এবং নিজেকে মুসলিম বলে স্বীকার করা, যার উপর আমরা উভয় সম্প্রদায় একমত- এটা এমন এক বিষয়, যা আমাদের সকল কলহ ঘুচিয়ে দিতে পারে, যদি না আমরা নিজেদের হস্তক্ষেপ ও বিকৃতি সাধন দ্বারা এ আকিদার স্বরূপ পরিবর্তন করে ফেলি। প্রয়োজন শুধু এতটুকু যে, যেভাবে আল্লাহর নিকট সমর্পণ করে দেই, না তাকে ভিন্ন আর কারো বন্দেগি করব, না তাঁর পয়গাম্বরের সাথে এমন আচরণ করব, যা কেবল সর্বশক্তিমান প্রতিপালকের সাথেই প্রযোজ্য। যেমন কাউকে তাঁর ছেলে ও নাতি বলা শরিয়তের নির্দেশনা হতে চোখ বন্ধ করে কোনো বস্তুর বৈধাবৈধ হওয়াকে কোনো ব্যক্তির বৈধ-অবৈধ বলার উপর নির্ভরশীল মনে করা, যেমন- اِتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ -এর তাফসীর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে উঠে। এসব বিষয় ইসলাম ও তাওহীদের দাবির পরিপন্থি। -[তাফসীরে ওসমানী]

দাওয়াতের এক গুরুত্বপূর্ণ নীতি : এ আয়াত দ্বারা দাওয়াতের এক গুরুত্বপূর্ণ নীতি বুঝা যায়, তা হলো, যদি এমন কোনো দলকে দাওয়াত দেওয়া হয়, যারা আকিদা ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে ভিন্নমুখী, তাহলে তার নিয়ম হলো, তাদেরকে কেবল এমন বিষয়ে একমত হয়ে দাওয়াত দিতে হবে, যে ব্যাপারে উভয় পক্ষ একমত হতে পারে। যেমন রাসূল ﷺ যখন রোমের বাদশাহ হিরাক্লিয়াসকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করেছিলেন তখন এমন বিষয় পেশ করেছিলেন, যে ব্যাপারে উভয়ে একমত ছিলেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ বিষয়ে।

قَوْلُهُ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاۤءٍ : تَعَالَوْا আদেশসূচক ক্রিয়া, বহুবচন। অর্থ- তোমরা এস, শব্দটি মাবনী। وَاوْ হলো ফায়েল বা কর্তা, শব্দটি মূলত تَعَالَيُوْا ছিল يَاءْ এবং তার পূর্বাক্ষর যবরযুক্ত হওয়ার কারণে يَاءْ -কে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। এখন দুই সাকিন একত্র হওয়ার কারণে আলিফ বিলুপ্ত হয়েছে।

প্রশ্ন : এখানে تَعَالَوْا -এর মাফউল اِلٰى كَلِمَةٍ উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু পূর্বের تَعَالَوْا -এর মাফউল উল্লেখ নেই কেন?

উত্তর : প্রথমটি দ্বারা শুধু দৃষ্টি আকর্ষণ করা উদ্দেশ্য ছিল, আর দ্বিতীয়টি দ্বারা পরস্পর স্থিরকৃত বিষয়ের প্রতি আহ্বান করা উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন : سَوَاۤءٌ -কে **مُسْتَوٍ অর্থে** নেওয়ার ফায়দা কি?

উত্তর : سَوَاۤءٌ **শব্দটি মাসদার, কাজেই** كَلِمَةً -এর উপর তার প্রয়োগ সঙ্গত নয়, এ কারণে مُسْتَوٍ অর্থে নেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন : أَمْرُهَا উহ্য মানার কারণ কি?

উত্তর : যেহেতু مُسْتَوٍ হলো পুংলিঙ্গ, তাই كَلِمَةٌ -এর উপর এর প্রয়োগ সঙ্গত নয়। কারণ এটা হলো স্ত্রীলিঙ্গ। এ কারণেই كَلِمَةٌ -এর পূর্বে أَمْر উহ্য মেনেছেন, যাতে প্রয়োগ সঙ্গত হয়। –[তারবীহুল আরওয়াহ]

هِيَ أَن لَّا : এটা كَلِمَةٌ -এর ব্যাখ্যা।

قَوْلُهُ بِزَمَانٍ طَوِيْلٍ : হযরত মূসা (আ.) এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মাঝে এক হাজার বছরের ব্যবধান ছিল। আর হযরত ঈসা (আ.) ও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মাঝে ছিল দু হাজার বছরের ব্যবধান। কাজেই হযরত ইবরাহীম (আ.) কিভাবে ইহুদি বা খ্রিস্টান হতে পারেন? কারণ উভয় ধর্ম ইবরাহীম (আ.)-এর অনেক পরের।

هَآ أَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ حَاجَجْتُمْ : هَا হরফে তাম্বীহ, اَنْتُمْ মুবতাদা, يَا হরফে নেদা বিলুপ্ত, هٰٓؤُلَآءِ মুনাদা। নেদা মুনাদা মিলে মু'তারিযা বাক্য حَاجَجْتُمْ মুবতাদার খবর। সম্ভবনা আছে যে, هٰٓؤُلَآءِ হলো খবর, আর حَاجَجْتُمْ প্রথম বাক্যের বর্ণনা।

مُوَحِّدًا : প্রশ্ন: مُسْلِمًا -এর ব্যাখ্যা مُوَحِّدًا দ্বারা করা হলো কেন?

উত্তর: مُسْلِمًا দ্বারা বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়। অন্যথায় ইহুদি এবং খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের উপর যে প্রশ্ন ছিল, ইসলামের উপরও সে প্রশ্ন হবে। কেননা পারিভাষিক ইসলামতো রাসূল ﷺ -এর আমল থেকেই অস্তিত্ব লাভ করেছে। এ কারণেই মহানবী ﷺ হযরত ঈসা (আ.) ও হযরত মূসা (আ.) -এর বহু বছর পরে নবুয়ত লাভ করেছেন। এ কারণেই مُسْلِمًا -এর ব্যাখ্যা مُوَحِّدًا দ্বারা করেছেন।

قَوْلُهُ فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ : এ আয়াতে যে কথা বলা হয়েছে- তোমরা সাক্ষী থাক, এর দ্বারা শিক্ষা দেওয়া রয়েছে যে, যখন দলিল-প্রমাণ সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও হক বিষয়কে কেউ না মানে, তখন আলোচনা শেষ করার জন্য নিজ মতবাদ প্রকাশ করে কথা শেষ করা উচিত, অতিরিক্ত আলাপ-আলোচনা সমীচীন নয়।

قَوْلُهُ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ : হে আহলে কিতাব! তোমারা ইবরাহীমের ব্যাপারে কেন বিতর্ক কর? তাওরাত এবং ইঞ্জিল তো ইবরাহীমের পরে অবতীর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের ইহুদি এবং খ্রিস্টীয় মতবাদ তাওরাত ও ইঞ্জিলের পরে শুরু হয়েছে। আর ইবরাহীম তাওরাত ও ইঞ্জিল অবতীর্ণ হওয়ার হাজার হাজার বছর পূর্বে অতিবাহিত হয়েছেন। সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও সহজে একথা বুঝতে পারে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) যে ধর্মের উপর ছিলেন, তা বর্তমানের ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্ম ছিল না।

قَوْلُهُ هَآ اَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ : এখানে هَا অবজ্ঞাজ্ঞাপক শব্দ। অর্থাৎ তোমরা এমন বির্বোধ যে, যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান ছিল যেমন তোমরা বলে থাক আমরা হযরত মূসা (আ.)-এর ধর্মের উপর কিংবা হযরত ঈসা (আ.) -এর ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ বিষয়ে তোমাদের নিকট সাধারণ কোনো জ্ঞান নেই। বস্তুত তোমরা সীমালঙ্ঘন করেছ, বহু বিধান তোমরা পরিবর্তন করে ফেলেছ, তথাপি একটি সম্পর্ক অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু যে বিষয়ে আদৌ তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে তোমরা দখল নিতে চেষ্টা করছ কেন?

অনুবাদ :

٦٧. قَالَ تَعَالَى تَبْرِيَةً لِإِبْرَاهِيْمَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مَائِلًا عَنِ الْاَدْيَانِ كُلِّهَا اِلَى الدِّيْنِ الْقَيِّمِ مُسْلِمًا مُوَحِّدًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

৬৭. এসব বিষয়ে হযরত ইবরাহীমের সম্পর্কহীনতার কথা বলতে গিয়ে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন- ইবরাহীম ইহুদিও ছিলেন না, খ্রিস্টানও ছিলেন না। তিনি ছিলেন হানীফ। সকল মিথ্যা ধর্ম হতে বিমুখ হয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত এই মনোনীত ধর্মের প্রতি একনিষ্ঠ, মুসলিম তাওহীদবাদী এবং তিনি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

٦٨. اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ اَحَقُّهُمْ بِإِبْرَاهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِىْ زَمَانِهِ وَهٰذَا النَّبِىُّ مُحَمَّدٌ لِمُوَافَقَتِهِ لَهُ فِىْ اَكْثَرِ شَرْعِهِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْ اُمَّتِهِ فَهُمُ الَّذِيْنَ يَنْبَغِىْ اَنْ يَّقُوْلُوْا نَحْنُ عَلَى دِيْنِهِ لَا اَنْتُمْ وَاللّٰهُ وَلِىُّ الْمُؤْمِنِيْنَ نَاصِرُهُمْ وَحَافِظُهُمْ.

৬৮. যারা ইবরাহীমের যুগে ইবরাহীমের অনুসরণ করেছিল তারা এবং এই নবী অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ; কারণ অধিকাংশ বিষয়ে তাঁর শরিয়ত হযরত ইবরাহীমের শরিয়তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ [ও] তাঁর উম্মতের বিশ্বাসীগণ মানুষের মধ্যে ইবরাহীমের ঘনিষ্ঠতম। ইবরাহীম সম্পর্কে এরাই বেশি হকদার। সুতরাং তোমরা নয়; বরং তাদের জন্যই বলা উচিত হবে যে, আমরা তাঁর [ইবরাহীমের] ধর্মের অনুসারী। আর আল্লাহর বিশ্বাসীদের অভিভাবক। তাদের সাহায্যকারী এবং রক্ষাকারী।

٦٩. وَنَزَلَ لَمَّا دَعَا الْيَهُوْدُ مُعَاذًا وَحُذَيْفَةَ وَعَمَّارًا اِلَى دِيْنِهِمْ وَدَّتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ لِاَنَّ اِثْمَ اِضْلَالِهِمْ عَلَيْهِمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ لَا يُطِيْعُوْنَهُمْ فِيْهِ وَمَا يَشْعُرُوْنَ بِذٰلِكَ.

৬৯. ইহুদিরা হযরত মু'আয, হুযায়ফা ও আম্মার (রা.) -কে তাদের ধর্ম গ্রহণ করতে আহ্বান জানায়। এ উপলক্ষে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- কিতাবীদের একদল তোমাদেরকে বিপদগামী করতে চায়; অথচ তারা তাদের নিজেদেরকে বিপথগামী করে। কেননা এ বিপথগামী করার পাপ এদের নিজেদের উপরই বর্তাবে। মু'মিনগণ এ বিষয়ে তাদের অনুসরণ করে না। কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالَى مَا كَانَ اِبْرَاهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا মিল্লাতে ইবরাহীমী সন্দেহাতীতভাবে তাওহীদপন্থি : **ইসলাম** ও তাওহীদের দাবিতে যেমন সবাই সমান ছিল, তেমনি হযরত ইবরাহীম খলিলুল্লাহ (আ.)-কে **সম্মান ও মর্যাদা দানেও সকলে** শামিল ছিল। ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রত্যেকে দাবি করে ইবরাহীম আমাদের ধর্মানুসারী ছিলেন। **অর্থাৎ তিনি ইহুদি বা খ্রিস্টান** ছিলেন- নাঊযুবিল্লাহ। এর জবাব দেওয়া হয়েছে যে, ইহুদি ও নাসারারা যে তাওরাত ও ইঞ্জিলের **অনুসারী বলে দাবি** করে, তা তো হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর হাজারও বছর পর অবতীর্ণ হয়েছে। এমতাবস্থায় তাঁকে **ইহুদি বা খ্রিস্টান** কি করে বলা যেতে পারে? বরং তোমাদের কথামতো বলা যায় যে, তোমরা যে অর্থে ইহুদি বা খ্রিস্টান, সে **অর্থে তো খোদ হযরত** মূসা ও ঈসা (আ.)-কেও ইহুদি বা খ্রিস্টান বলা যায় না। যদি অর্থ এই হয়ে থাকে যে, হযরত **ইবরাহীম (আ.)-এর শরিয়ত** আমাদের ধর্মের বেশি কাছাকাছি ছিল, তবে এটাও ভুল। তোমরা এটা কোত্থেকে জানলে? একথা না তোমাদের **কিতাবে আছে**, না আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে জানিয়েছেন এবং না তোমরা এর

সপক্ষে কোনো প্রমাণ দেখাতে পার। যে বিষয়ে কোনো প্রকার জানাশুনা নেই, তা নিয়ে তর্ক করা বোকামি ছাড়া আর কি হতে পারে?

হযরত মাসীহ (আ.)-এর ঘটনাবলি, শেষ নবীর আগমন সম্পর্কিত সুসংবাদাদি ইত্যাদি বিষয়ে অপূর্ণ হলেও কিছুটা জ্ঞান তোমাদের ছিল এবং সে নিয়ে তর্কও তোমরা করেছ, কিন্তু যে বিষয়ে কোনোরূপ ছোঁয়াও তোমাদের লাগেনি বা যার একটু বাতাসও তোমরা পাওনি অন্তত তা তো মহান আল্লাহর উপর ন্যস্ত কর। তিনিই জানেন হযরত ইবরাহীম (আ.) কি ছিলেন এবং বর্তমানে দুনিয়ায় কোন সম্প্রদায়ের ধর্মাদর্শ তাঁর কাছাকাছি? –[তাফসীরে ওসমানী]

বিশেষ জ্ঞাতব্য : এখানে مُسْلِمًا -এর ইসলাম দ্বারা বিশেষভাবে মুহাম্মদী শরিয়তকে বুঝানোর দরকার নেই; বরং এর অর্থ আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য, যা সকল নবী-রাসূলের দীন। হযরত ইবরাহীম (আ.) বিশেষভাবে এ নাম ও উপাধিকে সমুদ্ভাসিত করে তোলেন। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে– إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ যখন তাকে তাঁর প্রতিপালক বললেন, অনুগত হও, সে বলল, আমি সারা বিশ্বের প্রতিপালকের অনুগত হলাম। [২ : ১৩১] হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জীবন বৃত্তান্তের এক একটি অক্ষর ঘোষণা করে যে, তিনি ছিলেন ইসলাম ও আত্মসমর্পণের বাস্তব দৃষ্টান্ত। হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর জবাইয়ের ঘটনায় فَلَمَّآ أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ আয়াতাংশ তাঁর ইসলামের শানকে অত্যন্ত স্পষ্টরূপে পরিস্ফুট করে তোলে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের নবী ও তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

قَوْلُهُ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ **উম্মতে মুহাম্মদীর সাথে হযরত ইবরাহীমের বেশি সাদৃশ্য :** আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিচ্ছেন, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে বেশি সম্পর্ক ও সাদৃশ্য ছিল তখনকার উম্মতের আর পরবর্তীকালে এ নবীর উম্মতের। কাজেই এ উম্মত নামেও এবং আদর্শেও হযরত ইবরাহীমের সাথে বেশি সাদৃশ্যময়। অনুরূপ এ উম্মতের নবী আকৃতি, গঠন ও চরিত্রে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়ার অনুরূপই আবির্ভূত হয়েছেন। সূরা বাকারায় বর্ণিত হয়েছে– رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্যে থেকেই তাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করুন যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ পাঠ করবে। [সূরা বাকারা : ১২৯] এজন্যই হাবশার খ্রিস্টান রাজা নাজাশী মুসলিম মুহাজিরগণকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দল নামে অভিহিত করতেন। সম্ভবত এ রকম সাদৃশ্যের কারণেই দরূদ শরীফে كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ সংযুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ সেই রকমের সালাত নাজিল করুন, যা হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি নাজিল করেছেন। তিরমিযী শরীফে হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে– إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ وُلَاةً مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَإِنَّ وَلِيَّ أَبِيْ وَخَلِيْلُ رَبِّي অর্থাৎ প্রত্যেক নবীরই নবীগণের মধ্য হতে একজন অভিভাবক রয়েছেন। আমার অভিভাবক হচ্ছেন আমার পিতা এবং আমার প্রতিপালকের বন্ধু। মোটকথা সকল মানুষের মধ্যে সে ব্যক্তিই হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্মের নিকটবর্তী যে স্বীয় আমলে তাঁর ধর্ম এবং সুন্নতের অনুসরণ করেছে। হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাঁর উপর ঈমান আনয়নকারী। যেহেতু ইবরাহীমী শরিয়তের অনেক বিধান ইসলামের অনুকূলে। কাজেই উক্ত ধর্মই ইবরাহীমী ধর্ম হওয়ার দাবির অধিক যোগ্য। আল্লাহ কেবল তাদের সাহায্যকারী, যারা ঈমান রাখে।

قَوْلُهُ وَدَّتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ : আয়াত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায়, চরমপন্থি ইহুদি সম্প্রদায়ের ঘৃণ্য ও জঘন্য মানসিকতার দাপট এতটুকু পর্যন্ত পৌঁছেছিল যে, তারা এমন দুঃসাহসী অভিযান শুরু করেছিল, বাতিলের শক্তির উপর তারা এতটা আত্মগর্বে গর্বিত ও অভিমানী হয়ে উঠেছিল যে, তারা নবুয়তের যুগে শুধু ইসলাম কবুল করা হতে নিজেরাই দূরে সরে পড়েনি; বরং নব দীক্ষিত মুসলমানদেরকে দীন হতে মুরতাদ করার অপচেষ্টায় নিয়োজিত হয়েছিল। আজকের বিশ্বে এমন অনেক খ্রিস্টান সংস্থা ও ব্যক্তি রয়েছে, যারা বন্ধুবরের ছদ্মাবেশে ত্রাণসামগ্রী কাঁধে উদগ্র কামনা নিয়ে মুসলিম বিশ্বের দ্বারে দ্বারে দিনরাত ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের মনের কোণে এ আশা নিয়ে যে, মুসলমানদের কি করে খ্রিস্টান শিরকবাদীতে পরিণত করা যায়। খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত না করতে পারলেও ইসলামি আকিদা-বিশ্বাসকে কি করে নড়বড়ে ও দুর্বল করে দেওয়া যায়। তাদের এ প্রচেষ্টায় তারা অনেকটা সফলকামও হয়েছে বলা যায়। এ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল আমাদের এ বাংলাদেশেও এমন তথাকথিত প্রগতিশীল বেঈমানের সংখ্যা নেহায়েত নগণ্য নয়, যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দিতে এবং ইসলামের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে সংগতিপূর্ণ নাম রাখতেও লজ্জা বোধ করে। এমনকি জাতীয় সম্প্রচার কেন্দ্র ও প্রশাসনের উঁচু তলায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা পর্যন্ত ত্রিত্ববাদী খ্রিস্টান ও পৌত্তলিক বা ধর্মান্তরিত করা ব্যক্তিদেরকেই বিয়ে করে নিশ্চিন্তায় দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করছে।

অনুবাদ :

٧٠. يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ الْقُرْاٰنِ الْمُشْتَمِلِ عَلٰى نَعْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ تَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ حَقٌّ .

৭০. হে কিতাবীগণ! তোমরা কেন আল্লাহর নির্দেশকে মুহাম্মদ ﷺ -এর বিবরণ সংবলিত আল কুরআনকে অস্বীকার কর? অথচ তোমরাই সাক্ষ্য বহন কর। অর্থাৎ জান যে এটা সত্য।

٧١. يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ تَخْلِطُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ بِالتَّحْرِيْفِ وَالتَّزْوِيْرِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ اَىْ نَعْتَ النَّبِىِّ ﷺ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ حَقٌّ .

৭১. হে কিতাবীগণ! তোমরা কেন সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত কর? সত্যকে বিকৃত করে এবং মিথ্যাকে সাজিয়ে তার সাথে সংমিশ্রণ কর; এবং সত্য অর্থাৎ রাসূল ﷺ -এর গুণাবলি সংবলিত বিবরণসমূহ গোপন কর, অথচ তোমরা জান যে তা সত্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ طَائِفَةٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ : বিশেষভাবে এ আয়াতে ইহুদি সম্প্রদায়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। يُضِلُّوْنَكُمْ এখানে সাধারণ মুসলমানদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। مَا يُضِلُّوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ অর্থাৎ মূলত মুলমানদেরকে গোমরাহ করার অনেক ক্ষেত্রে তারা সফলতা অর্জন করতে পারেনি; বরং তারা নিজেদের আমলনামাকে কলুষিত করেছে। وَمَا يَشْعُرُوْنَ অথচ এ আহাম্মক আর অজ্ঞদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে কোনো অনুভূতি বা চেতনাই নেই।

قَوْلُهٗ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ : শেষ নবীর প্রতি ঈমান এনে মুসলমান হওয়ায় তোমাদের এ অস্বীকৃতি, বিরোধিতা ও হঠকারিতা তোমাদের অজ্ঞতা ও অনবহিত হওয়ার কারণে নয়, তোমরা আহলে কিতাবরা জেনে-বুঝে, স্বেচ্ছায়-স্বজ্ঞানে, স্বপ্রণোদিত ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে অত্যন্ত সচেতনভাবে বিরোধিতা করছ এবং তাওরাত ও ইঞ্জিলে উল্লিখিত আয়াতের শব্দ, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সকল ক্ষেত্রেই অত্যন্ত সচেতনতার সাথেই বিকৃত ও পরিবর্তিত করে চলেছ।

–[তাফসীরে মাজেদী]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা শাব্বীর আহমদ ওসমানী (র.) বলেন, তোমরা তো তাওরাত প্রভৃতি গ্রন্থে বিশ্বাসী। তাতে অর্থাৎ তাওরাতে আরবি নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআন মাজীদ সম্পর্কে সুসংবাদ বিদ্যমান। তোমাদের অন্তর তা জানে এবং তোমরা নিজেদের মজলিসে তা স্বীকারও কর। এতদসত্ত্বেও প্রকাশ্যভাবে পাক কুরআনের প্রতি ঈমান আনতে ও শেষ নবীর সত্যতা স্বীকার করতে কোন জিনিস বাধা হতে পারে? ভালো করে বুঝে রাখ, পাক কুরআনকে অবিশ্বাস করা যেন পূর্ববর্তী সমস্ত আসমানী কিতাবকে অস্বীকার করার শামিল। –[তাফসীরে ওসমানী]

قَوْلُهٗ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوا الْحَقَّ .... وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ : হে কিতাবধারীগণ! কেন তোমরা ন্যায়ের উপর বাতিলের রং বা প্রলেপ দিয়ে ন্যায়কে গোপন করছ? এ কথা বলে ইহুদিদের বিশেষ দুটি অন্যায় চিহ্নিত করে তাদেরকে এ থেকে বিরত থাকার আহ্বান করা হয়েছে। প্রথম অন্যায় হলো হক ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যাকে সংমিশ্রণ করা, যাতে মানুষের নিকট হক ও বাতিল স্পষ্ট না হয়। দ্বিতীয়টি হলো, সত্য গোপন করা এবং নবী করীম ﷺ -এর যে সকল গুণাবলি তাওরাতে লিখিত ছিল, তা গোপন করা, যাতে মহানবী ﷺ -এর সত্যতা প্রকাশ না পায়। আর উপরিউক্ত এ দুটি অন্যায় তারা জেনে বুঝেই করত। এর দরুন তাদের অন্যায় ও নিকৃষ্টতা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

অনুবাদ :

٧٢. وَقَالَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ الْيَهُوْدِ لِبَعْضِهِمْ اٰمِنُوْا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَيِ الْقُرْاٰنَ وَجْهَ النَّهَارِ اَوَّلَهٗ وَاكْفُرُوْا بِهٖ اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ اَيِ الْمُؤْمِنِيْنَ يَرْجِعُوْنَ عَنْ دِيْنِهِمْ اِذْ يَقُوْلُوْنَ مَا رَجَعَ هٰؤُلَاۤءِ عَنْهُ بَعْدَ دُخُوْلِهِمْ فِيْهِ وَهُمْ اُولُوْ عِلْمٍ اِلَّا لِعِلْمِهِمْ بُطْلَانَهٗ .

৭২. কিতাবীদের অর্থাৎ ইহুদিদের একদল তাদের অপর কতককে বলে, বিশ্বাসীদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে অর্থাৎ আল কুরআন তা দিনের প্রথমে শুরু ভাগে বিশ্বাস কর এবং তার শেষ ভাগে তা প্রত্যাখ্যান কর, হয়তো তারা বিশ্বাসীরা নিজেদের ধর্মমত হতে ফিরে আসতে পারে। কেননা এতে তারা বলবে, এরা জ্ঞানীগুণী। সুতরাং তা গ্রহণ করার পর তা মিথ্যা ও বাতিল বলে জানার পরই কেবল এরা তা থেকে ফিরে গেছে।

٧٣. وَقَالُوْا اَيْضًا وَلَا تُؤْمِنُوْا تُصَدِّقُوْا اِلَّا لِمَنْ اللَّامُ زَائِدَةٌ تَبِعَ وَافَقَ دِيْنَكُمْ قَالَ تَعَالٰى قُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ الَّذِيْ هُوَ الْاِسْلَامُ وَمَا عَدَاهُ ضَلَالٌ وَالْجُمْلَةُ اِعْتِرَاضٌ اَنْ اَيْ بِاَنْ يُؤْتٰٓى اَحَدٌ مِّثْلَ مَآ اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ وَالْفَضَائِلِ وَاَنْ مَفْعُوْلُ تُؤْمِنُوْا وَالْمُسْتَثْنٰى مِنْهُ اَحَدٌ قُدِّمَ عَلَيْهِ الْمُسْتَثْنٰى الْمَعْنٰى لَا تُقِرُّوْا بِاَنَّ اَحَدًا يُؤْتٰى ذٰلِكَ اِلَّا مَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ اَوْ بِاَنْ يُحَاجُّوْكُمْ اَيِ الْمُؤْمِنُوْنَ يَغْلِبُوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ .

৭৩. এরা আরো বলে যে, যা তোমাদের দীনের অনুগামী অর্থাৎ তোমাদের দীনের সাথে সামঞ্জস্যশীল তা ব্যতীত আর কিছু বিশ্বাস করো না। সত্য বলে স্বীকার করো না। لِمَنْ-এর لَامْ টি এ স্থানে زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মুহাম্মদ! এদেরকে বল, আল্লাহর নির্দেশিত পথই অর্থাৎ ইসলামই সত্যিকারের পথ অবশিষ্ট সবকিছুই হলো গুমরাহি বা পথভ্রষ্টতা। قُلْ اِنَّ الْهُدٰى .... এ বাক্যটি এখানে مُعْتَرِضَةٌ বা বিচ্ছিন্ন বাক্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। বিশ্বাস করো না যে, তোমাদেরকে যে কিতাবসমূহ, হিকমত ও মর্যাদা দান করা হয়েছে অনুরূপ আর কাউকে দেওয়া হবে। আয়াতটির মর্ম হলো, তোমাদের ধর্মের অনুসারী ব্যতীত অন্য কারো নিকট স্বীকার করো না যে, অন্য কাউকে উক্তরূপ মর্যাদা দান করা হয়েছে বা হবে। اَنْ يُؤْتٰى শব্দটি بِاَنْ রূপে ব্যবহৃত। এটা تُؤْمِنُوْا ক্রিয়ার مَفْعُوْل বা কর্মপদ। اَحَدٌ এটা مُسْتَثْنٰى. مُسْتَثْنٰى مِنْهُ-কে এ স্থানে তার আগে উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা কিয়ামতের দিন তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তাঁরা অর্থাৎ মু'মিনরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি উত্থাপন করবে। তারা যুক্তিতে তোমাদের উপর প্রবল হয়ে যাবে।

لِأَنَّكُمْ أَصَحُّ دِيْنًا وَفِيْ قِرَاءَةٍ أَأَنْ بِهَمْزَةِ التَّوْبِيْخِ أَيْ أَإِيْتَاءُ أَحَدٍ مِّثْلَهُ تُقِرُّوْنَ بِهٖ قَالَ تَعَالٰى قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ فَمِنْ أَيْنَ لَكُمْ أَنَّهُ لَا يُؤْتٰى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوْتِيْتُمْ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ كَثِيْرُ الْفَضْلِ عَلِيْمٌ بِمَنْ هُوَ أَهْلُهُ .

তোমাদের ধর্মইতো সর্বাপেক্ষা সত্য ধর্ম। أَوْ يُحَاجُّوْكُمْ -এর أَوْ -এর পর بِأَنْ শব্দটির উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পূর্বোল্লিখিত أَنْ يُؤْتٰى বাক্যটির সাথে এ বাক্যটির عَطْف বা অন্বয় সাধিত হয়েছে। অপর কিরাতে أَنْ -এর পূর্বে আরেকটি أ [হামযা] রয়েছে। এ হামযাটি تَوْبِيْخ বা হুমকি অর্থবোধক বলে গণ্য। এমতাবস্থায় আয়াতটির মর্ম হবে, তদ্রূপ কাউকে প্রদান করা হয়েছে বলে কি তোমরা স্বীকার কর? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, বল, নিশ্চয় সকল অনুগ্রহ আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। সুতরাং তোমাদের অনুরূপ আর কাউকেও দান করা হবে না, এ কথা তোমরা কোথায় পেলে? আল্লাহ প্রাচুর্যময়, অপার তাঁর অনুগ্রহ এবং কে তার যোগ্য এ সম্পর্কে তিনি সবিশেষ অবগত। [তিনিই এ ব্যাপারে সবার চেয়ে বেশি পরিজ্ঞাত।]

٧٤. يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ .

৭৪. তিনি স্বীয় অনুগ্রহের জন্য যাকে ইচ্ছা বিশেষ করে বেছে নেন। আল্লাহ মহাঅনুগ্রহশীল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ أَيِ الْيَهُوْدِ لِبَعْضِهِمْ **ইহুদিদের অপর একটি প্রতারণার ঘটনা :** এখানে ইহুদিদের অপর এক প্রতারণা আলোচিত হয়েছে। যার দ্বারা তারা মুসলমানদেরকে পথভ্রষ্ট করতে চাইত। قَالَتْ طَّائِفَةٌ -এর মধ্যে মদিনার পার্শ্ববর্তী ইহুদিদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। মদিনার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসরত ইহুদি নেতা ও ধর্মাযাজকরা ইসলামের আহ্বানকে দুর্বল করার জন্য এক ফন্দি খাঁটিয়েছিল। ফন্দিটি ছিল নিম্নরূপ– ইহুদিরা মুসলামনদের অন্তর খারাপ করার এবং সাধারণ মানুষকে নবী করীম ﷺ -এর প্রতি কু-ধারণায় লিপ্ত হওয়ার জন্য গোপনে বিভিন্ন মানুষ তৈরি করে পাঠাতে থাকে। যেন তারা প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করে শীঘ্রই মুরতাদ হয়ে যায়। অতঃপর বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে এ কথা প্রচার করতে থাকে যে, আমরা ইসলাম গ্রহণ করে ভিতরগত অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়েছি। ইসলামে কিছুই নেই, আমরা ভেবেছিলাম ইসলামের কোনো বাস্তবতা রয়েছে; কিন্তু আমরা ইসলাম গ্রহণ করার পর তাকে অন্তসারশূন্য পেয়েছি। ইসলাম ও মুসলমানদের মধ্যে এবং তাদের নবীর মধ্যে অমুক অমুক দোষত্রুটি ও বাতুলতা রয়েছে। এসব কারণেই আমরা ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছি। অর্থাৎ ইসলাম পরিত্যাগ করেছি।

ইহুদি জাতির ঘৃণিত ইতিহাসে এ ধরনের দৃষ্টান্ত শুধু একটাই নয়; বরং তাদের বিভিন্ন বই-পুস্তকেও এ ঘটনা স্পষ্টভাবে লিখিত আছে যে, দ্বাদশ শতাব্দীতে যখন স্পেনে ইসলামি শাসন ছিল, তখন রাষ্ট্রীয়পক্ষ থেকে বিভিন্নরূপে আরোপিত বিভিন্ন জুলুম-অত্যাচার থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যেই ইহুদিরা তাদের ধর্মগুরুদের অনুমতি ও ফতোয়াক্রমে মুখে ইসলাম প্রকাশ করতে থাকে। আন্তরিকভাবে কেউ মুসলমান ছিল না। –[জায়ুশ বিশ্বকোষ প্রথম খণ্ড ৪৩২-৩৩ পৃ. মাজেদী]

বর্তমান যুগে যেসব ইংরেজ গবেষক, ইহুদি এবং খ্রিস্টান লেখকবৃন্দ ইংরেজি ভাষায় সীরাতুন্নবী লেখার এ পদ্ধতি অবলম্বন করেছে যে, ভূমিকায় বিশেষ কোনো ধর্মের পক্ষপাতিত্ব না করে, কোনো ধর্মীয় গোড়ামির শিকার না হয়ে গ্রন্থনার প্রয়াস পেয়েছে। মনে হয় যেন আরবের নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রশংসা এবং হযরত মূসা (আ.)-এর মর্যাদা বর্ণনায় তারা জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছে। কিন্তু যতই সামনের দিকে যাওয়া যায়, ততই তার আলোচনা দ্বারা বুঝা যায় যে, [নাউযুবিল্লাহ]

তাদের মস্তিষ্কের কিছু বিকৃতি ঘটেছিল, ইহুদি ও নাসারাদের গ্রন্থসমূহ পাঠ করলে তা থেকে বুঝা যায় যে, তারা কোথাও কারো নিকট থেকে কোনো বিষয়বস্তু শুনে তাকে নিজ ভাষায় নতুন রূপ দান করে প্রকাশ করেছে। বস্তুত এটাও প্রাচীন ইহুদিদের ষড়যন্ত্রসমূহের একটি নতুন চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা সাধারণ ইহুদিদের অজ্ঞতামূলক ধারণাই নয়; বরং তাদের ধর্মীয় শিক্ষাও এটাই। তাদের বড় বড় ধর্মীয় ইমামদের ফিকহী বিধানও এমনই ছিল। ঋণ এবং সুদের বিধানে বাইবেলগ্রন্থ ইসরাঈলী এবং অইসরাঈলীদের মধ্যে স্পষ্ট ব্যবধান করেছে। −[ইসতেসনা, ১৫ : ৩১]

তালমুদ গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, যদি কোনো ইসরাঈলীর গরু কোনো অইসরাঈলীর গরুকে আঘাত করে, তাহলে এর কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। পক্ষান্তরে যদি কোনো অইসরাঈলীর গরু কোনো ইসরাঈলীর গরুকে জখম করে, তাহলে এর ক্ষতিপূরণ আবশ্যক। যদি কারো কোনো বস্তু পড়ে পায় বা হারিয়ে যায় তাহলে লক্ষ্য করতে হবে যে, তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় কারা বাস করে। যদি ইসরাঈলী মানুষ বসবাস করে, তাহলে প্রাপকের জন্য এ ব্যাপারে ঘোষণা করা বাঞ্ছনীয়। আর যদি অইসরাঈলী বসবাসকারী হয়, তাহলে ঘোষণাবিহীন সে তা নিজের কাছে রেখে দেবে। রিব্বী শামবীল বলেন, যদি কোনো বিচারকের নিকট কোনো উম্মী ও ইসরাঈলীর মুকদ্দমা যায়, আর বিচারক যদি ইসরাঈলী আইন অনুযায়ী তার ভাইকে মামলায় বিজয়ী করতে সক্ষম হয়, তাহলে বিচারক তাকে বিজয়ী করবে এবং বলবে এটাই আমাদের আইন। আর যদি উম্মীদের আইন অনুযায়ী বিজয়ী করতে পারে, তাহলে তাকে উক্ত আইন অনুযায়ী বিজয়ী করবে এবং বলবে তোমাদেরই আইন মতে এ সিদ্ধান্ত দিয়েছি। আর উভয় আইনে যদি তাকে বিজয়ী করা সম্ভব না হয়, তাহলে যে সিদ্ধান্ত দ্বারাই হোক তাকে অবশ্যই বিজয়ী করবে। রিব্বী শামবীল বলেন, অইসরাঈলীদের সর্বপ্রকার ভুল-ভ্রান্তি দ্বারা উপকৃত হওয়া উচিত। −[তালমুদ, মসনিলুনী পল ১৮৮০ খ্রি. মাজেদী]

اَوَّلَهُ : দিনের প্রথম ভাগকে **وَجْهٌ** বলা হয়েছে এ কারণে যে, মুখমণ্ডল যেভাবে সৌন্দর্যমণ্ডিত হয় তদ্রূপ দিনের প্রথম ভাগও সৌন্দর্যময় হয়ে থাকে। **وَجْهٌ**-এর ব্যাখ্যা **اَوَّلُ** দ্বারা এ কারণে করা হয়েছে যে, সাক্ষাতের সময় যেমন মুখমণ্ডল আগে আসে, ঠিক তেমনিভাবে রাত শেষ হবার পরে দিনের প্রথম ভাগও সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।

قَوْلُهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ : বর্তমান বিশ্বে আজও অনেক প্রাচ্য দেশীয় ফিরিঙ্গি, খ্রিস্টান ও ইহুদি দার্শনিক, চিন্তাবিদ, পণ্ডিত ইউরোপীয় ভাষায় মহানবী ﷺ-এর জীবনী গ্রন্থ রচনা করছে। রাসূল ﷺ-এর জীবনী গ্রন্থের ভূমিকায় এমনভাবে বিশ্ব সংস্কারক, জাতি গঠক, আইন প্রণেতা, বিশ্বনেতা ইত্যাদি প্রশংসার বুলি আওড়িয়ে গ্রন্থ রচনা করে নিজেদের উদার, নিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক পণ্ডিত, দার্শনিক হিসেবে প্রমাণ করার জন্য মহানবী ﷺ-এর প্রশংসা ও স্তুতিতে যত সব বিস্ময়কর বিশেষণ সংযোজন করে। পরিশেষে গ্রন্থের ইতি এমনভাবে টানে, মনে হয় যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো বিকার বা বাতিকগ্রস্ত ব্যক্তি ছিলেন [নাউযুবিল্লাহ], তাঁর মস্তিষ্কের ভারসাম্য ছিল না। অথবা তিনি ইহুদি-নাসারাদের গ্রন্থ চুপিসারে কারো কাছ থেকে শুনে শুনে তা বলে বেড়াতেন ইত্যাদি। তাদের এ সকল আচরণ ও তাদের অতীত ঐতিহ্যবাহী সত্য গোপন, অসত্যের মিশ্রণ, ধোঁকাবাজি ও দাজ্জালী চরিত্রেরই প্রতিফলন বৈ কি হতে পারে? বস্তুত এ সকল শঠতা ও ধোঁকাবাজি তাদের অতীত চরিত্র ও ঐহিহ্যের নমুনা। −[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ : অগ্রবর্তী মুসতাছনা, আর **اَنْ يُؤْتٰى اَحَدٌ** মুসতাছনা মিনহু।

قَوْلُهُ وَفِىْ قِرَاءَةٍ ءَاَنْ بِهَمْزَةِ التَّوْبِيْخِ : এটা **اَنْ يُّؤْتٰى اَحَدٌ مِّثْلَ مَآ اُوْتِيْتُمْ**-এর মধ্যে দ্বিতীয় কেরাত অনুযায়ী জিজ্ঞাসাবোধক হামযাটি ধমকের জন্য অর্থাৎ তোমার কি নিজেদের মতো হেকমত ও ফজিলত অন্যদেরকে দেওয়ার স্বীকারোক্তি করছ? এমনটি উচিত নয়।

قَوْلُهُ وَلَا تُؤْمِنُوْا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ : এ আয়াতটি তারকীবের দিক দিয়ে সর্বাধিক জটিল হিসেবে বিবেচিত। কেউ কেউ এ আয়াতের নয়টি তারকীব উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে সবচেয়ে সহজ তারকীবটি আল্লামা যমখশারী (র.) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থ কাশশাফের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

তারকীব : وَاوْ **আতিফা,** لَا নাহিয়া, تُؤْمِنُوْا মুযারের সীগাহ, لَا -এর কারণে জযমী হিসেবে নূন বিলুপ্ত হয়েছে। وَاوْ টি **ফায়েল** يَا **হরফকে ইসতেছনা।** لِمَنْ -এর لَ টি হরফে জর, مَنْ ইসমে মাওসূল, মাজরূর। জার মাজরূর মিলে মাহযূফের **সাথে মুতাআল্লিক হয়ে** ইসতেছনার কারণে নসবের স্থলে। বাক্যটি এমন হলো–

وَلَا تُؤْمِنُوْا اَىْ تَعْتَقِدُوْا وَتَظْهَرُوْا بِاَنْ يُؤْتٰى اَحَدٌ بِمِثْلِ مَا اُوْتِيْتُمْ لِاَحَدٍ مِنَ النَّاسِ اِلَّا لِاَشْيَاعِكُمْ دُوْنَ غَيْرِكُمْ .

قَوْلُهُ وَلَا تُؤْمِنُوْا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ : অর্থাৎ তারা পরস্পর এটাও বলল যে, তোমরা প্রকাশ্যে ইসলাম প্রকাশ করবে, তবে **ইহুদি মতবাদ ছাড়া** অন্য কোনো মতবাদ বিশ্বাস করবে না।

قَوْلُهُ اَنْ يُؤْتٰى اَحَدٌ مِثْلَ مَا اُوْتِيْتُمْ : এটাও ইহুদিদের উক্তি, এর আতফ হলো وَتُؤْمِنُوْا -এর উপর। অর্থাৎ তোমরা একথা **স্বীকার করো না** যে, তোমাদের মধ্যে যেভাবে নবুয়তের ধারা রয়েছে অন্য কেউ তার অধিকারী হতে পারে? ইহুদি মতবাদ **ছাড়া অন্য** কোনো ধর্মও কি সঠিক হতে পারে?

قَوْلُهُ بِاَنْ يُحَاجُّوْكُمْ : اَنْ উহ্য মানার উদ্দেশ্য হলো এ কথা বর্ণনা করা যে, এর আতফ হয়েছে بِاَنْ يُؤْتٰى -এর উপর। اَنْ **এখানে** اِوْ অর্থে নয়। কারণ এটা মাজায হওয়ার কারণে স্বাভাবিকের বিপরীতে।

قَوْلُهُ وَالْجُمْلَةُ اِعْتِرَاضٌ : لَا تُؤْمِنُوْا ক্রিয়া এবং তার কর্ম اَنْ تُؤْتٰى الخ -এর মাঝে اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ মু'তারিযা বাক্য **উল্লিখিত** হয়েছে।

قَوْلُهُ قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ : এটা একটা মু'তারিযা বাক্য। আগে পরের বাক্যের সাথে এর কোনো সম্বন্ধ নেই। এর দ্বারা কেবল তাদের হীন ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের বাস্তবতা স্পষ্ট করা উদ্দেশ্য। বলা হয়েছে তাদের ষড়যন্ত্র দ্বারা কিছুই হবে না, কারণ হেদায়েত আল্লাহর হাতেই ন্যস্ত। তিনি যাকে হেদায়েত দিতে চান তার ব্যাপারে তোমাদের কোনো চক্রান্ত কোনো কাজে আসবে না।

قَوْلُهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاۤءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ : এ আয়াতে দুটি অর্থ বর্ণিত হয়েছে–

১. ইহুদিদের বিশিষ্ট আলেমগণ যখন তাদের শিষ্যদেরকে একথা শিখাতো যে, তোমরা দিনের প্রথমভাগে ঈমান আনবে এবং শেষভাগে মুরতাদ হয়ে যাবে। এতে করে যারা প্রকৃত মুসলমান তারা সন্দিহান হয়ে মুরতাদ হয়ে যাবে। তারা শিষ্যদেরকে এ ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নির্দেশ দিত যে, তোমরা কেবল বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করবে। আন্তরিক, নিষ্ঠা ও সততার সাথে মুসলমান হবে না। এমন ধারণা করবে না যে, তোমাদেরকে যেভাবে ধর্ম, ওহী, শরিয়ত এবং বিশেষ ইলম ও প্রজ্ঞা দান করা হয়েছে, অন্য কাউকে এরূপ দান করা যেতে পারে বা তোমরা ছাড়া অন্য কেউ এ বিশেষ হকের উপর থাকতে পারে। যারা তোমাদের বিপরীতে আল্লাহর নিকট প্রমাণ পেশ করতে পারে এবং তোমাদেরকে ভ্রান্ত আখ্যা দিতে পারে। এ অর্থের দিক দিয়ে বাক্যটি মু'তারিযা না হয়ে عِنْدَكُمْ পর্যন্ত সম্পূর্ণ অংশ ইহুদিদের উক্তি হবে।

২. উল্লিখিত বাক্যের অর্থ হলো– হে ইহুদিরা! তোমরা সত্যকে ধামাচাপা দেওয়ার এবং তাকে নিশ্চিহ্ন করার এ সকল অপচেষ্টা ও ষড়যন্ত্র এজন্য করছ যে, একে তো তোমাদের এ চিন্তা রয়েছে যে, তোমাদেরকে যেরূপ ওহী, শরিয়ত, ধর্ম এবং ইলম ও প্রজ্ঞা দান করা হয়েছিল, ঠিক তদ্রূপ এসব অন্য কাউকে দেওয়া হবে। দ্বিতীয়ত তোমাদের আশঙ্কা ছিল, যদি হকের এ দাওয়াত প্রসার লাভ করে এবং তার মূল সুদৃঢ় হয়ে যায় তাহলে কেবল এটাই নয় যে, জগতে তোমাদের যে প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জিত রয়েছে তা বিলীন হয়ে যাবে; বরং তোমরা যে সত্যকে লুকানোর চেষ্টা করছ, তার আবরণও উন্মুক্ত হয়ে যাবে। অথচ তোমাদের বুঝা উচিত ছিল যে, শরিয়ত ও ধর্ম আল্লাহর অনুগ্রহ। এটা কারো উত্তরাধিকারী সম্পদ নয় যে, তিনি তা যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন। তিনিই জানেন অনুগ্রহ কাকে দান করা উচিত।

অনুবাদ :

٧٥. وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ اَىْ بِمَالٍ كَثِيْرٍ يُؤَدِّهٖۤ اِلَيْكَ لِاَمَانَتِهٖ كَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ اَوْدَعَهُ رَجُلٌ اَلْفًا وَمِائَتَىْ اُوْقِيَةٍ ذَهَبًا فَاَدَّاهَا اِلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَا يُؤَدِّهٖۤ اِلَيْكَ لِخِيَانَتِهٖ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا لَا تُفَارِقُهُ فَمَتٰى فَارَقْتَهُ اَنْكَرَهُ كَكَعْبِ بْنِ الْاَشْرَفِ اِسْتَوْدَعَهُ قُرَشِىٌّ دِيْنَارًا فَجَحَدَهُ ذٰلِكَ اَىْ تَرْكُ الْاَدَاءِ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا بِسَبَبِ قَوْلِهِمْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيّٖنَ اَىِ الْعَرَبِ سَبِيْلٌ اَىْ اِثْمٌ لِاِسْتِحْلَالِهِمْ ظُلْمَ مَنْ خَالَفَ دِيْنَهُمْ وَنَسَبُوْهُ اِلَيْهِ تَعَالٰى قَالَ تَعَالٰى وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ فِىْ نِسْبَةِ ذٰلِكَ اِلَيْهِ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهُمْ كَاذِبُوْنَ ـ

৭৫. কিতাবীদের মাঝে এমন লোক রয়েছে যে, কিনতার অর্থাৎ বিপুল পরিমাণ সম্পদ আমানত রাখলেও আমানতদারীর দরুন তা তোমাকে ফেরত দেবে। যেমন– হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালামের নিকট এক ব্যক্তি বারশত উকিয়া স্বর্ণ আমানত রেখেছিল। তিনি সম্পূর্ণ স্বর্ণ তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। আবার এমন লোকও আছে যার কাছে একটি দিনারও আমানত রাখলে খেয়ানতের কারণে তার পিছনে লেগে না থাকলে সে তা তোমাদের নিকট ফেরৎ দেবে না। বিচ্ছিন্ন না হয়ে লেগে না থাকা পর্যন্ত সে কিছুই দেবে না। বিচ্ছিন্ন হলেই সে অস্বীকার করে বসে। যেমন– ইহুদি কা'ব ইবনে আশরাফের নিকট জনৈক কুরাইশী ব্যক্তি একটি স্বর্ণমুদ্রা আমানত রেখেছিল। কিন্তু পরে সে তা অস্বীকার করে বসে। এটা অর্থাৎ আমানত আদায় না করা এ কারণে যে, তারা বলে بِاَنَّهُمْ -এর ب টি سَبَبِيَّةٌ বা হেতু বোধক। অর্থাৎ তাদের এ উক্তির কারণে যে, নিরক্ষরদের অর্থাৎ সাধারণ আরবদের প্রতি আমাদের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। [এদের কিছু আত্মসাৎ করলে আমাদের] পাপ নেই। কারণ তাদের ধর্মের বিরুদ্ধবাদীদের এরা বৈধ বলে মনে করে এবং আল্লাহর প্রতি তারা তা আরোপ করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, এ ধরনের বিষয় আল্লাহর প্রতি আরোপ করে [তারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে অথচ তারা জানে] যে, তারা মিথ্যাবাদী।

٧٦. بَلٰى عَلَيْهِمْ فِيْهِمْ سَبِيْلٌ مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ الَّذِىْ عَاهَدَ اللّٰهَ عَلَيْهِ اَوْ بِعَهْدِ اللّٰهِ اِلَيْهِ مِنْ اَدَاءِ الْاَمَانَةِ وَغَيْرِهٖ وَاتَّقٰى اللّٰهَ بِتَرْكِ الْمَعَاصِىْ وَعَمَلِ الطَّاعَاتِ فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْهِ وَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ اَىْ يُحِبُّهُمْ بِمَعْنٰى يُثِيْبُهُمْ ـ

৭৬. হ্যাঁ এদের প্রতিও তাদের নিশ্চয় বাধ্যবাধকতা রয়েছে। যে কেউ আল্লাহর সহিত কৃত তার অঙ্গীকার বা আল্লাহর নামে শপথ করে আমানত ইত্যাদি আদায়ের যে চুক্তি তারা করে সেই অঙ্গীকার পূর্ণ করবে এবং পাপ বর্জন এবং সৎ আমল করার বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করে চলবে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালোবাসেন। অর্থাৎ তাদেরকে তিনি পুণ্যফল দান করবেন।

وَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ বা এ স্থানে اَلْمُتَّقِيْنَ সর্বনাম هُمْ -এর স্থলে প্রকাশ্য বিশেষ্য اَلْمُتَّقِيْنَ -এর উল্লেখ করা হয়েছে। মূলত ছিল يُحِبُّهُمْ আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ (الاية) ইহুদিদের আর্থিক খেয়ানত : ইহুদিদের ধর্মীয় বিশ্বাসঘাতকতা বর্ণনা করার পর এখন তাদের আর্থিক বিশ্বাসঘাতকতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ধার্মিকও রয়েছে। তাদের আল্লাহ তা'আলা পরবর্তীতে ঈমান গ্রহণের তৌফিক দান করেছেন। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম। জনৈক ব্যক্তি তার নিকট ১২০০ উকিয়া স্বর্ণ আমানত রেখেছিল [১ উকিয়া সমান সাড়ে সাত ভরি] লোকটি তার আমানত ফেরত চাওয়া মাত্র তিনি তাকে তা হস্তান্তর করেন। পক্ষান্তরে কা'ব ইবনে আশরাফ -এর নিকট জনৈক কুরাইশী একটি মাত্র দিনার আমানত রেখেছিল, লোকটি তা ফেরত চাইলে সে তা সরাসরি অস্বীকার করে বসল। এটা কেবল দু এক ব্যক্তির আচরণ ছিল না, বরং ইহুদিদের সাধারণ অভ্যাস ছিল যে, অ-ইহুদিদের সম্পদ বৈধ অবৈধ যেভাবেই সম্ভব হতো তারা গ্রাস করত। এটাকে তারা তাদের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী জায়েজ মনে করত। এমনকি আল্লাহর প্রতি এর বৈধতার সম্বন্ধ করত। তারা বলত, তাওরাতে এ বিধান লিখিত আছে। এ ব্যাপারে আমরা কোনো কৈফিয়তের সম্মুখীন হব না। অথচ তারা এটা ভালোভাবেই জানত যে, এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত কথা। এ ধরনের অন্যায় করার পরও তারা মনে করত যে, তারা আল্লাহর অতি প্রিয় ও নৈকট্যভাজন।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- بَلٰى مَنْ أَوْفٰى بِعَهْدِهٖ الخ কেন নয় অবশ্যই তাদেরকে পাকড়াও করা হবে। যে ওয়াদা রক্ষা করে এবং আল্লাহকে ভয় করে সেই হলো মুত্তাকী।

قِنْطَارٌ : এটা একবচন, বহুবচন হলো قَنَاطِيْرُ অর্থ- অঢেল সম্পদ।

اَلْاُمِّيُّوْنَ : অর্থাৎ উম্মুল কুরা তথা মক্কার অধিবাসীবৃন্দ। ইহুদি সম্প্রদায় বংশগত অভিমান, আত্মম্ভরিতা, বিদ্বেষ ও জাতীয় গর্বে ভরপুর হওয়ার কারণে মক্কাবাসীদেরকে নিজেদের তুলনায় তুচ্ছ ও হেয় মনে করত এবং নিরক্ষর বলে সম্বোধন করত।

قَوْلُهُ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ : ইয়াহুদীরা অ-ইহুদি মানুষের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যে, লেনদেন ও আচরণের ক্ষেত্রে অসৌজন্য ও অশালীন ব্যবহারের জন্য চিরকাল দুর্নামের অধিকারী। বস্তুত আত্মভিমানী ও আত্মম্ভরিতায় লিপ্ত জাতির আচরণ সাধারণত এমনটিই হয়ে থাকে। বর্ণ বৈষম্যবাদে বিশ্বাসী, শ্বেতজাতি কৃষ্ণকায় লোকদের সাথে আচরণ কি ধরনের, তা বর্তমান সভ্যতা ও প্রযুক্তিগত উন্নতি ও উৎকর্ষতার দাবিদার বিশ্বে কি ধরনের, তা সমগ্র মানবতাবাদী বিশ্বই অবলোকন করেছে। سَبِيْلٌ হুজ্জত; এখানে দায়দায়িত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, প্রধান বা সাফল্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আমাদের [ইহুদিদের] উপর উম্মীদের [নিরক্ষরদের] কোনো দায়দায়িত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না [ইহুদিদের বর্ণনা মতে]।
-[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ بَلٰى مَنْ أَوْفٰى بِعَهْدِ اللّٰهِ : [প্রকৃতপক্ষে এ তাকওয়া ও আল্লাহভীতিই সকল প্রকার নৈতিক উৎকর্ষতা ও উত্তম আচরণের মূল ভিত্তি।] بَلٰى অর্থাৎ কেন কোনো দায়দায়িত্ব থাকবে না? অবশ্যই এ দায়দায়িত্ব আছে। عَهْدِهٖ চুক্তি সম্পাদন স্রষ্টার সাথে হোক অথবা সৃষ্টির সাথেই হোক, সকল অবস্থায়ই তা রক্ষা ও পালন করা অপরিহার্য কর্তব্য। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.) এ সম্পর্কে লিখেছেন, এ আয়াত দ্বারা চুক্তির মর্যাদা ও গুরুত্ব বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কেননা সমস্ত ইবাদত-বন্দেগি ও আনুগত্য দুটো জিনিসের উপরই নির্ভরশীল। একটি মহান আল্লাহর সাথে সম্পাদিত চুক্তি ও মহান আল্লাহর আহকামের যথাযথ মর্যাদা গুরুত্ব প্রদান ও সংরক্ষণ। আর দ্বিতীয়টি মহান আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সম্পাদিত চুক্তির যথাযথ মর্যাদা, গুরুত্ব প্রদান ও সংরক্ষণ এবং সৃষ্টির সাথে সহমর্মিতা। [অর্থাৎ হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদ] এ দু ধরনের বন্দেগির সমন্বয় ও সম্মিলনের মধ্যেই সকল প্রকার ইবাদত-বন্দেগি পুঞ্জীভূত রয়েছে।

অনুবাদ :

٧٧. وَنَزَلَ فِى الْيَهُوْدِ لَمَّا بَدَّلُوا نَعْتَ النَّبِىِّ ﷺ وَعَهْدَ اللّٰهِ اِلَيْهِمْ فِى التَّوْرٰةِ اَوْ فِيْمَنْ حَلَفَ كَاذِبًا فِىْ دَعْوٰى اَوْ فِىْ بَيْعِ سِلْعَةٍ اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ يَسْتَبْدِلُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ اِلَيْهِمْ فِى الْاِيْمَانِ بِالنَّبِىِّ ﷺ وَاَدَاءِ الْاَمَانَةِ وَاَيْمَانِهِمْ حَلْفِهِمْ بِهٖ تَعَالٰى كَاذِبِيْنَ ثَمَنًا قَلِيْلًا مِنَ الدُّنْيَا اُولٰئِكَ لَا خَلَاقَ نَصِيْبَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ غَضَبًا عَلَيْهِمْ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَرْحَمُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ يُطَهِّرُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ مُؤْلِمٌ ـ

৭৭. তাওরাতে উল্লিখিত রাসূল ﷺ -এর গুণাবলি সংবলিত বিবরণ এবং তাদের সাথে আল্লাহর চুক্তিসমূহ ইহুদিগণ কর্তৃক পরিবর্তিত করার বিষয়ে অথবা ক্রয়-বিক্রয়ে বা দাবি ইত্যাদিতে মিথ্যা শপথ করার বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেন– যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অর্থাৎ রাসূল ﷺ -এর প্রতি ঈমান আনয়ন এবং যথাযতভাবে আমানত আদায় করা সম্পর্কিত এদের যে প্রতিশ্রুতি ছিল তার এবং নিজেদের শপথকে অর্থাৎ আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ করে তা দুনিয়ার স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করে বিনিময় করে এরা ঐসব লোক পরকালে যাদের কোনো অংশ নেই। لاخلاق অর্থ কোনো হিস্যা নেই। এদের উপর ক্রোধবশত কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে দৃষ্টি দেবেন না অর্থাৎ তাদের প্রতি দয়া করবেন না। এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না পবিত্র করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ যন্ত্রণাকর [শাস্তি]।

٧٨. وَاِنَّ مِنْهُمْ اَىْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَفَرِيْقًا طَائِفَةً كَكَعْبِ بْنِ الْاَشْرَفِ يَلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ اَىْ يَعْطِفُوْنَهَا بِقِرَاءَتِهٖ عَنِ الْمُنْزَلِ اِلٰى مَا حَرَّفُوْهُ مِنْ نَعْتِ النَّبِىِّ ﷺ وَنَحْوِهٖ لِتَحْسَبُوْهُ اَىِ الْمُحَرَّفَ مِنَ الْكِتٰبِ الَّذِىْ اَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهُمْ كَاذِبُوْنَ ـ

৭৮. তাদের মধ্যে অর্থাৎ কিতাবীদের মধ্যে একদল লোক আছেই যেমন কা'ব ইবনে আশরাফ যারা আল্লাহর কিতাবকে নিয়ে জিভ বাঁকায় অর্থাৎ রাসূল ﷺ-এর গুণাবলির বিবরণ ইত্যাদি সংবলিত আয়াতসমূহ ঘুরিয়ে আবৃত্তি করতঃ সেগুলো স্থানচ্যুত করে বিকৃত পাঠের দিকে নিয়ে যায় যাতে তোমরা তা ঐ বিকৃত পাঠকে আল্লাহর তরফ হতে নাজিলকৃত কিতাবের অংশ বলে মনে কর; অথচ তা কিতাবের অংশ নয় এবং তারা বলে, তা আল্লাহর নিকট থেকে প্রেরিত অথচ তা আল্লাহর নিকট হতে প্রেরিত নয়। তারা আল্লাহর সম্পর্কে মিথ্যা বলে অথচ তারা জানে যে, সত্যই তারা মিথ্যাবাদী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا শানে নুযূল : খুলাসাতুত তাফসীর গ্রন্থকার জাহেদীর বরাতে লিখেন, একবার মদিনায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। কতিপয় ইহুদি মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। তারা কা'ব ইবনে আশরাফের নিকট গমন করল, সে ছিল ইহুদিদের সরদার, তারা তার নিকট সাহায্যের আবেদন করল। কা'ব বলল, যে লোকটি নবুয়তের দাবি করছে তাঁর ব্যাপারে তোমাদের মন্তব্য কি? তারা জবাব দিল, তিনি আল্লাহর নবী এবং তাঁর বান্দা। কা'ব বলল, তোমরা আমার নিকট কিছু পাবে না। নব মুসলিম ইহুদিরা বলল, একথা আমরা এমনিই বলেছিলাম, আমাদেরকে অবকাশ দিন, আমরা ভেবে-চিন্তে জবাব দেব। সামান্য সময় পরে এসে তারা বলল, মুহাম্মদ শেষ নবী নয়। কা'ব তাদের শপথ করতে বললে তারা এ ব্যাপারে দ্বিধাবোধ করল না। এরপর কা'ব তাদের প্রত্যেককে পাঁচ সা' যব এবং আট গজ কাপড় দান করল। উল্লিখিত আয়াতটি এদের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে। আবূ উমামা বাহেলী কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথের মাধ্যমে কোনো মুসলমানের অধিকার বিনষ্ট করে আল্লাহ তার উপর বেহেশত হারাম করবেন এবং দোজখ অবধারিত করবেন। কেউ আরজ করল, যদি তা খুব সামান্য বস্তু হয়? তিনি জবাব দিলেন, যদিও তা পেলু বৃক্ষের শাখাও হয়। –[মুসলিম শরীফ]

قَوْلُهُ ثَمَنًا قَلِيْلًا : দুনিয়ার স্বার্থে আখিরাতের চিরন্তন কল্যাণ ও মুক্তিকে প্রাধান্য না দিয়ে যত অধিক পরিমাণ মূল্যই গ্রহণ করুক না কেন, আখিরাতের কল্যাণ ও সাফল্যের তুলনায় তা নিতান্তই নগণ্য ও স্বল্প।

উপরিউক্ত আয়াতাংশের তাৎপর্য এই নয় যে, পার্থিব সম্পদের পরিমাণ কম হলেই চুক্তি ভঙ্গ, বদদিয়ানতী ও খিয়ানত করা যাবে না। আর বিনিময় ও সম্পদের পরিমাণ বেশি হলে তা করা যাবে; বরং কোনো অবস্থাতেই দুনিয়ার স্বার্থ ও সম্পদকে আখিরাতের সাফল্য ও মুক্তির উপর প্রাধান্য দেওয়া যাবে না। কোনো অবস্থাতেই অসৌজন্যমূলক আচরণে মহান আল্লাহর আইনের সীমালঙ্ঘন ও চুক্তি ভঙ্গের মতো জঘন্য অপরাধে লিপ্ত হওয়া যাবে না।

عَهْدِ اللّٰهِ : অর্থাৎ মহান আল্লাহর সাথে যে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। اَيْمَانِهِمْ অর্থাৎ তাদের পরস্পরের আচরণের ক্ষেত্রে যে সকল কসম তারা খেয়েছে।

قَوْلُهُ لَا خَلَاقَ : অর্থাৎ কল্যাণের কোনো অংশই তার জন্য নেই। (بُخَارِى) لَا يُكَلِّمُهُمْ اَىْ لَا خَيْرَ অর্থাৎ দয়া ও অনুগ্রহের দৃষ্টিতে তাকে সম্বোধন করবেন না, কথা বলবেন না। এর দ্বারা আজাব-গজব ও পাকড়াও সম্বোধন করা রহিত হওয়া বুঝায়নি; বরং لَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ অর্থাৎ রহম ও করমের দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকাবেন না। এখানে ক্রোধ ও কঠোরতার দৃষ্টিতে তাকানো রহিত হওয়া বুঝায়নি। لَا يُزَكِّيْهِمْ অর্থাৎ পাপের কলুষিত কালিমা হতে তাদেরকে পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও মার্জিত করবেন না। اَلِيْمٌ যন্ত্রণাদায়ক। এখানে مُؤْلِمٌ অর্থাৎ যে শাস্তির কঠোরতার কারণে তারা ব্যথা ও বেদনা উপভোগ করবে। বেদনাদায়ক শাস্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (بُخَارِى) اَىْ مُؤْلِمٌ مُوْجِعٌ مِنَ الْاَلَمِ وَهُوَ مَوْضَعُ مَفْعَلٍ

قَوْلُهُ وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَلْوُنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ : উল্লিখিত আয়াতের উদ্দেশ্য এই হতে পারে যে, তারা আল্লাহর কিতাবের অর্থের মধ্যে হেরফের করত বা শব্দ পরিবর্তন করে ইচ্ছামাফিক উদ্দেশ্য বের করত। তবে এর আসল অর্থ হলো, তারা আল্লাহর কিতাব পাঠকালে বিশেষ কোনো শব্দ বা বাক্য যদি তাদের মনগড়া আকিদার পরিপন্থি মনে করত, তবে জিহ্বার সাহায্যে ঘুরিয়ে ভিন্ন শব্দে পরিণত করত। কুরআন মান্যকারীদের মধ্যেও এর দৃষ্টান্ত বিরল নয়। যেমন– যে সকল ব্যক্তি নবীকে بَشَرٌ তথা মানুষ হওয়াকে অস্বীকার করে, তারা قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ -এর اِنَّمَا -কে اِنْ مَا পড়ে। তারা

এর অর্থ করে– হে নবী! আপনি বলে দিন, নিশ্চয় আমি তোমাদের মতো মানুষ নই। এভাবে তারা মানুষের নিকট বলে যে, এটা আল্লাহর কালাম। বস্তুত তারা জেনে-বুঝে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে।

আহলে কিতাব নিজেদের আসমানি কিতাবের বিকৃতি সাধান করেছিল : এখানে কিতাবীদের বিকৃতি সাধনের অবস্থা বিধৃত হয়েছে। অর্থাৎ তারা আসমানি কিতাবে নিজেদের পক্ষ হতে কিছু বিষয় এমনভাবে বাড়িয়ে অথবা কমিয়ে পাঠ করে যে, যারা প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জানে না, তারা বিভ্রান্তিতে পড়ে যায় এবং মনে করে, এটাও আসমানি কিতাবেরই কথা। কেবল এতটুকুই নয়, বরং তারা মুখে দাবিও করে যে, এগুলো মহান আল্লাহর পক্ষ হতে আগত। অথচ প্রকৃতপক্ষে না তা কিতাবে উল্লেখ আছে, না তা মহান আল্লাহর নিকট হতে এসেছে; বরং বিকৃত কিতাবকেও সমষ্টিগতভাবে মহান আল্লাহর কিতাব বলা যায় না। কেননা এতে নানা রকমের হস্তক্ষেপ, পরিবর্তন ও হেরফের করা হয়েছে। আর দুনিয়ায় যে বাইবেল প্রচলিত, তা নানারকম স্ববিরোধিতায় ভরপুর। তাতে এমন কিছু বিষয়বস্তু রয়েছে, যাকে কিছুতেই মহান আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা যায় না। তাফসীরে রূহুল মাআনীতে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। বাইবেলের বিকৃতি প্রমাণে আমাদের ওলামায়ে কেরাম অনেক বড় বড় পুস্তকাদিও রচনা করেছেন।

قَوْلُهُ يَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ : অর্থাৎ তাদের উপরিউক্ত দাবিতে এবং আল্লাহর ওহী বিবর্জিত তাদের মনগড়া ধর্মের নীতিমালা ও নৈতিকতায় তারা মিথ্যাবাদী। আল্লাহ কখনো তাদের সাথে তাদের চিরস্থায়ী শ্রেষ্ঠত্বের চুক্তি সম্পাদান করেননি। এগুলো আল্লাহ সম্পর্কে তাদের ডাহা মিথ্যা ও বানোয়াট কথা। এ সকল আয়াতে ইহুদি আচরণ ও চরিত্রের বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপনের ফলে তাদের হীন চরিত্র ও মারাত্মক অপরাধ এবং জঘন্য আচরণের মুখোশ আরো ভীষণ ও প্রকটভাবে উন্মোচিত হয়েছে। তারা শুধু আল্লাহপ্রদত্ত শরিয়তের সীমা-ই লঙ্ঘন করেনি; বরং তারা আল্লাহর নাম ভাঙ্গিয়ে মনগড়া বিকৃত ধর্মমত সৃষ্টি করেছে। আর কেবল আচরণ ও কর্মেই অপরাধী নয়, বরং তাদের চরিত্র ও ক্রিয়াকাণ্ডের চেয়ে আরও বেশি জঘন্য ও ভয়াবহ আকিদা বিশ্বাসে তারা লিপ্ত হয়েছে।

يَقُوْلُوْنَ [তারা বলে] এখানে জরুরি নয় যে, তারা প্রকাশ্যেই বলে, বরং তাদের আচরণে ইঙ্গিতে বুঝা যায় যে, তাদের মানসিকতা এ ধরনের। তাদের কার্যকলাপ দ্বারা বলা– বুঝানোটাই এক্ষেত্রে যথেষ্ট।

অনুবাদ :

٧٩. وَنَزَلَ لَمَّا قَالَ نَصَارٰى نَجْرَانَ اِنَّ عِيْسٰى اَمَرَهُمْ اَنْ يَّتَّخِذُوْهُ رَبًّا اَوْ لَمَّا طَلَبَ بَعْضُ الْمُسْلِمِيْنَ السُّجُوْدَ لَهُ ﷺ مَا كَانَ يَنْبَغِيْ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ اَيِ الْفَهْمَ لِلشَّرِيْعَةِ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ يَقُوْلُ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ عُلَمَاءَ عَامِلِيْنَ مَنْسُوْبٌ اِلَى الرَّبِّ بِزِيَادَةِ اَلِفٍ وَنُوْنٍ تَفْخِيْمًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ اَيْ بِسَبَبِ ذٰلِكَ فَاِنَّ فَائِدَتَهُ اَنْ تَعْمَلُوْا ـ

৭৯. নাজরান অধিবাসী খ্রিস্টানরা বলেছিল, হযরত ঈসাকে প্রভু হিসেবে উপাসনা করতে তিনি নিজে তাদেরকে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। এর প্রতিবাদে কিংবা কিছু সংখ্যক মুসলিম রাসূল ﷺ-কে সিজদা করার অনুমতি চেয়েছিল বলে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করলেন– কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহ কিতাব, হেকমত, অর্থাৎ শরিয়তের বিশেষ জ্ঞান, প্রজ্ঞা বা উপলব্ধি ও নবুয়ত দান করার পর তার জন্য শোভন নয় উচিত নয় যে, সে মানুষকে বলবে, 'আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা আমার দাস হয়ে যাও' বরং সে বলবে, 'তোমরা রব্বানী হও'; অর্থাৎ সৎকর্মশীল আলেম হও, رَبَّانِيٌّ শব্দটি অতিরিক্ত اَلِفْ وَنُوْنْ সহ تَفْخِيْمًا বা মর্যাদা বিধানরূপে رَبٌّ -এর সাথে مَنْسُوْبٌ বা সম্পর্কিত করে গঠিত শব্দ। যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষাদান কর تَعْلَمُوْنَ শব্দটি তাশদীদসহ অর্থাৎ بَابُ تَفْعِيْل ও تَخْفِيْف বা তাশদীদ ব্যতীত উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। এবং যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন কর। অর্থাৎ এসব কারণে তোমরা তা হও। কেননা আমল বা কাজে রূপায়িত করার মধ্যেই এর উপকারিতা ও সার্থকতা নিহিত।

٨٠. وَلَا يَاْمُرَكُمْ بِالرَّفْعِ اِسْتِئْنَافًا اَيِ اللّٰهُ وَالنَّصْبِ عَطْفًا عَلٰى يَقُوْلَ اَيِ الْبَشَرُ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا كَمَا اتَّخَذَتِ الصَّائِبَةُ الْمَلٰئِكَةَ وَالْيَهُوْدُ عُزَيْرًا وَالنَّصٰرٰى عِيْسٰى اَيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ لَا يَنْبَغِيْ لَهُ هٰذَا ـ

৮০. সাবিঈ সম্প্রদায় যেমন ফেরেশতাগণকে, ইহুদিগণ যেমন উযায়িরকে, খ্রিস্টানরা যেমন ঈসাকে রব রূপে গ্রহণ করেছে। এমনিভাবে ফেরেশতাগণ ও নবীগণকে রব রূপে গ্রহণ করতে সে তোমাদের নির্দেশ দেবে না। يَاْمُرُكُمْ এ ক্রিয়াটি رَفْع সহকারে পঠিত হলে তা مُسْتَاْنِفَةٌ বা নববাক্য বলে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় উল্লিখিত اَلْبَشَرُ শব্দটি হবে এর কর্তা। মুসলমান হওয়ার পর সে কি তোমাদেরকে কাফের হতে বলবে? তাঁর জন্য এটা কখনো উচিত নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতে কারীমায় কথা প্রসঙ্গে ইহুদিদের আলোচনা এসেছিল। এখন পুনরায় খ্রিস্টানদের আলোচনা শুরু হয়েছে। উল্লিখিত আয়াতে খ্রিস্টানদের বিভ্রান্তির অপনোদন করা হয়েছে। খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.) -কে খোদা বানিয়ে বসে আছে। অথচ তিনি ছিলেন আল্লাহর বান্দা ও মানুষ। তাঁকে কিতাব, নবুয়ত ও হেকমত দ্বারা ধন্য করা হয়েছিল। আর এমন কোনো ব্যক্তি এ দাবি করতে পারে না যে, আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা আমার উপাসনা কর ও দাস হও; বরং তিনি তো এ কথাই বলেন, তোমরা রবওয়ালা হয়ে যাও, রব্বানী শব্দটি মূলত রবের প্রতি সম্বন্ধিত, ان আধিক্যজ্ঞাপক। -[ফাতহুল কাদীর]

শানে নুযূল : কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার উক্ত আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে ইসহাক, ইবনে জারীর ও ইবনে মুনযির প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল ﷺ ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তারা বলল, হে মুহাম্মদ! আপনি কি চান যে, নাসারারা যেভাবে হযরত ঈসা (আ.)-এর উপসনা করে আমরা তদ্রূপ আপনার উপসনা করব? রাসূল ﷺ বললেন, নাউযুবিল্লাহ! আল্লাহর পানাহ যে, আমরা গায়রুল্লাহর উপাসনা করব কিংবা আমি গায়রুল্লাহর উপাসনার নির্দেশ দেব- আল্লাহ আমাকে এজন্য প্রেরণ করেননি এবং এর নির্দেশও দেননি। এ সময় উপরিউক্ত আয়াত নাজিল হয়।

আবদ ইবনে হুমাইদ (র.) হাসান সূত্রে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি আরজ করল-

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ كَمَا نُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ يُسَلِّمُكَ اَفَلَا نَسْجُدُ لَكَ؟

অর্থাৎ আমরা পরস্পর যেভাবে সালাম বিনিময় করি তদ্রূপ আপনাকেও সালাম করি। আমরা কি আপনাকে সেজদা করব না? রাসূল ﷺ জবাব দিলেন, না। তবে তোমরা তোমাদের নবীর সম্মান কর, তাঁর পরিবারের হক আদায় কর। কারো জন্য গায়রুল্লাহর সেজদা করা উচিত নয়। তখন উল্লিখিত আয়াত নাজিল হয়।

قَوْلُهُ مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ الخ : অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর যে বান্দাকে কিতাব, হেকমত ও মীমাংসা করার শক্তি দেন এবং নবুওয়তের পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন, সে তো যথাযথভাবে মহান আল্লাহর পয়গাম মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে তাদেরকে তাঁর আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করারই আহ্বান জানাবে। তাঁর কাজ এটা কখনই হতে পারে না যে, তিনি তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদত হতে সরিয়ে তার নিজের বা অন্য কোনো সৃষ্টির বান্দা বানাতে শুরু করবে। অন্যথায় তার অর্থ দাঁড়াবে, আল্লাহ তা'আলা যাকে যেই পদের উপযুক্ত জেনে পাঠিয়েছেন প্রকৃতপক্ষে সে তার যোগ্য নয়।

এ দুনিয়ার কোনো সরকারও যদি কাউকে কোনো দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করেন, তখন প্রথমে দুটি বিষয় চিন্তা করেন-

ক. উক্ত ব্যক্তি সরকারের নীতি বোঝার ও আপন দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়ার যোগ্যতা রাখে কিনা?

খ. তার পক্ষ হতে সরকারি আইন পালন ও প্রজাসাধারণকে সরকারের আনুগত্যে প্রতিষ্ঠিত রাখার আশা কতটুকু করা যায়?

কোনো সরকার বা পার্লামেন্ট এমন কোনো ব্যক্তিকে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করতে পারে না, যার সম্পর্কে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বিস্তার বা সরকারি আইন ও নীতি লঙ্ঘন করার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ হয়। হ্যাঁ, এটা অবশ্যই সম্ভব যে, সরকার কোনো ব্যক্তির যোগ্যতা ও আনুগত্যের প্রেরণা সঠিকভাবে নিরূপণ নাও করতে পারে; কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহর ক্ষেত্রে তো সে সম্ভবনাও নেই। কারো সম্পর্কে যদি তার জানা তাকে যে, সে তার বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য হতে এক চুলও স্থানচ্যুত হবে না, তাহলে ভবিষ্যতে এর বিপরীত হওয়া একবারেই অসম্ভব। অন্যথায় মহান আল্লাহর জ্ঞানে ভুলত্রুটি থাকা অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়, নাউযুবিল্লাহ। এর দ্বারাই আম্বিয়া (আ.)-এর ইসমত বা নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়টি উপলব্ধি করা যায়, যেমন- আবূ হায়্যান 'আল বাহরুল মুহীত' গ্রন্থে ইঙ্গিত করেছেন এবং হযরত মাওলানা কাসেম নানুতাবী (র.) তাঁর রচনাবলিতে বিস্তারিত লিখেছেন। আর নবীগণ যখন মামুলি পর্যায়ের অন্যায়-অপরাধ হতেও পবিত্র, তখন শিরক ও আল্লাহ-দ্রোহিতার আর অবকাশ থাকে কোথায়? এর দ্বারা খ্রিস্টানদের এ দাবিও খণ্ডন হয়ে গেল যে, হযরত মাসীহ (আ.) যে মহান আল্লাহর ছেলে এবং তিনি নিজেও ইলাহ এ আকিদা খোদ হযরত মাসীহ (আ.) তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই

মুসলিমগণের জন্যও তা নসিহত হয়ে গেল, যারা হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আরজ করেছিল, **আমরা আপনাকে সালামের পরিবর্তে সিজদা** করলে দোষ কি? ইহুদিরা তাদের ধর্মযাজকদেরকে মহান আল্লাহর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত **করেছিল, নাউযুবিল্লাহ। এ আয়াতে** তাদেরকেও সাবধান করে দেওয়া হলো। −[তাফসীরে ওসমানী]

قَوْلُهُ مَا كَانَ لِبَشَرٍ ...... وَالنُّبُوَّةَ : কোনো মানুষকে কিতাব, হিকমত ও নবুয়ত রূপ নিয়ামত প্রদানের মাধ্যমে **যেমন তিনি মানুষকে** নিজের বান্দা বানাতে পারে না, তেমনি হযরত ঈসা (আ.)-কে নবুয়ত, কিতাব ও হিকমত প্রদানের মাধ্যমে **তিনি কাউকে** তাঁর বন্দেগির দাওয়াত ও পয়গাম দিতে পারেন না। যাকে উপরিউক্ত সব কয়টি নিয়ামতই দান করা হয়েছে, **যার আত্মা** মার্জিত, বিশুদ্ধ ও পবিত্র এবং যিনি অপরের আত্মাকেও মার্জিত ও পবিত্র করার দায়িত্ব পালন করেন, তাঁর পক্ষে **এমনি শিরকের** দাওয়াত দেওয়া কি করে সম্ভব হতে পারে?

اَلْحُكْمَ এখানে حُكْم -এর তাৎপর্য জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অথবা শরিয়তের আহকামকে অনুধাবন করার জ্ঞান- অর্জনকে বুঝানো হয়েছে। বলা হয়েছে−

اَلْحُكْمُ اَلْعِلْمُ وَالْفَهْمُ وَقِيْلَ اَيْضًا اَلْكِتَابُ الْاَحْكَامُ (قُرْطُبِى) ..... وَالظَّاهِرُ اَنَّ الْحُكْمَ هُوَ الْقَضَاءُ ـ (بَحْر)

হিকমত বা জ্ঞান বলতে এখানে সকল আসমানি কিতাবকে বুঝানো হয়েছে। এখানে 'কিতাব' শব্দটি ইসমে জিনস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

اَلرَّبَّانِىْ রাব্বানী : [যা মূলত হযরত ঈসা মাসীহ (আ.)-এর দাওয়াত ছিল।] রাব্বানী শব্দ রব -এর সাথে সংযুক্ত ও সম্পর্কিত। রাব্বি শব্দের সামর্থবোধক অর্থাৎ বড় আল্লাহওয়ালা ও আল্লাহর নিকটতম বান্দা।

مَعْنَى الرَّبَّانِىْ الْعَالِمُ بِدِيْنِ الرَّبِّ الَّذِىْ يَعْمَلُ بِعِلْمِهٖ ـ (قُرْطُبِى) قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ يَوْمَ مَاتَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ اَلْيَوْمَ مَاتَ رَبَّانِىُّ هٰذِهِ الْاُمَّةِ (قُرْطُبِى) وَهُمْ شَدِيْدُ التَّمَسُّكِ بِدِيْنِ اللّٰهِ وَطَاعَتِهٖ ـ (مَدَارِكْ)

قَوْلُهُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ : এজন্য তোদেরকে এ ধরনের বেহুদা ও বাজে শিরক থেকে বেশি করে আত্মরক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত।

اَىْ بِسَبَبِ كَوْنِكُمْ مُعَلِّمِيْنَ الْكِتَابَ وَسَبَبِ كَوْنِكُمْ دَارِسِيْنَ لَهٗ ـ (بَيْضَاوِى)

ইমাম রাযী (র.) এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ রহস্য উদ্ঘাটন করে বলেছেন যে, ইলম, তা'লীম-তাআল্লুম অর্থাৎ শিক্ষা-সাধনা, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকতার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার মর্ম ও তাৎপর্যই আল্লাহওয়ালা হওয়া। যে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক জ্ঞান সাধনার সাথে সম্পৃক্ত থাকার পরও আল্লাহওয়ালা হওয়ার বৈশিষ্ট্য অর্জনে সক্ষম হয় না, সে বৃথাই সময় নষ্ট করে। যে ইলম মানুষকে আল্লাহওয়ালা বানায় না, মহান আল্লাহর হাবীব হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ধরনের আমলহীন ইলম থেকে মহান আল্লাহর কাছে নিরাপদ আশ্রয় চেয়েছেন। نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا تَخْشَعُ (كَبِيْر) আয়াতের মর্ম হচ্ছে− ইলম তথা মহান আল্লাহ কিতাব মওজুদ থাকা সত্ত্বেও তোমরা অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তিতে ডুবে আছ।

−[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ وَلَا يَأْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ : যেমন খ্রিস্টানরা হযরত মসীহ (আ.) ও 'রূহুল কুদুস' -কে, কতক ইহুদি হযরত উযাইর (আ.) -কে এবং কতক মুশরিক ফেরেশতাদেরকে সাব্যস্ত করেছিল। ফেরেশতা ও নবীই যখন মহান আল্লাহর শরিক হতে পারে না, তখন পাথরের মূর্তি ও কাঠের ক্রুসের তো হিসাবই আসে না।

অনুবাদ :

٨١. وَاذْكُرْ اِذْ حِيْنَ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ عَهْدَهُمْ لَمَا بِفَتْحِ اللَّامِ لِلْاِبْتِدَاءِ وَتَوْكِيْدِ مَعْنَى الْقَسَمِ الَّذِىْ فِىْ اَخْذِ الْمِيْثَاقِ وَكَسْرِهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِاَخَذَ وَمَا مَوْصُوْلَةٌ عَلَى الْوَجْهَيْنِ اَىْ لِلَّذِىْ اٰتَيْتُكُمْ اِيَّاهُ وَفِىْ قِرَاءَةٍ اٰتَيْنٰكُمْ مِنْ كِتٰبٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاۤءَكُمْ رَسُوْلٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَهُوَ مُحَمَّدٌ ﷺ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ جَوَابُ الْقَسَمِ اِنْ اَدْرَكْتُمُوْهُ وَاُمَمُهُمْ تَبَعٌ لَهُمْ فِىْ ذٰلِكَ قَالَ تَعَالٰى لَهُمْ ءَاَقْرَرْتُمْ بِذٰلِكَ وَاَخَذْتُمْ قَبِلْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ عَهْدِىْ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا ط قَالَ فَاشْهَدُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ وَاَتْبَاعِكُمْ بِذٰلِكَ وَاَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ عَلَيْكُمْ وَعَلَيْهِمْ ـ

৮১. আর স্মরণ কর, যবে যখন আল্লাহ নবীদের অঙ্গীকার তাঁদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন– لَمَا-এর لَامٌ টি ফাতাহ সহকারে পঠিত। এমতাবস্থায় তা اِبْتِدَاءٌ বা সূচনাবাচক لَامٌ এবং অঙ্গীকার নেওয়ার মর্মে যে কসম ও শপথের অর্থ বিদ্যমান এর تَاكِيْد [তাকীদ] রূপে গণ্য হবে। আর তা কাসরাহ সহকারে পঠিত হলে اَخَذَ-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট বলে গণ্য হবে। উক্ত উভয় অবস্থায় مَا টি اِسْم مَوْصُوْل বা সংযোজক বিশেষ্য বলে বিবেচ্য হবে। اٰتَيْتُكُمْ এটা অপর এক কিরাআতে اٰتَيْنٰكُمْ [উত্তম পুরুষ, বহুবচন] রূপে পঠিত রয়েছে। কিতাব ও হিকমত যা কিছু দিলাম তার শপথ তোমাদের কাছে কিতাব ও হিকমতের যা আছে তার সমর্থকরূপে, যখন একজন রাসূল আসবে অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ তখন তাঁকে যদি তোমরা পাও তবে নিশ্চয় তোমরা তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ এটা কসমের জওয়াব। এবং তাঁকে সাহায্য করবে। এ অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে তাঁদের উম্মতগণ তাঁদের অধীন। আল্লাহ তা'আলা এদেরকে বললেন, তোমরা কি তা স্বীকার করলে আমার অঙ্গীকার দেয় প্রতিশ্রুতি কি তোমরা গ্রহণ করলে? কবুল করে নিলে? তারা বলল, আমরা স্বীকার করলাম। তিনি বললেন, তবে তোমরা নিজেদের ও তোমাদের অনুসারীদের সম্পর্কে তার সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে তোমাদের ও তাদের সম্পর্কে সাক্ষী থাকলাম।

٨٢. فَمَنْ تَوَلّٰى اَعْرَضَ بَعْدَ ذٰلِكَ الْمِيْثَاقِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ـ

৮২. এর উক্ত অঙ্গীকারের পর যারা মুখ ফিরিয়ে নেয় যারা পরাঙ্মুখ হয় তারাই সত্যত্যাগী।

٨٣. اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ بِالْيَاءِ اَىِ الْمُتَوَلُّوْنَ وَالتَّاءِ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ اِنْقَادَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا بِلَا اِبَاءٍ وَكَرْهًا بِالسَّيْفِ وَمُعَايَنَةِ مَا يُلْجِئُ اِلَيْهِ وَاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ وَالْهَمْزَةُ لِلْاِنْكَارِ ـ

৮৩. তারা অর্থাৎ পরাঙ্মুখ ব্যক্তিরা কি আল্লাহর দীন ব্যতীত অন্য কিছু চায়? অথচ আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে, সবকিছুই স্বেচ্ছায় অঙ্গীকার না করে ও অনিচ্ছায় অথবা এমন জিনিস দর্শন করে যা তাকে মানতে বাধ্য করে তাঁর মাধ্যমে তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। তাঁর বাধ্যগত রয়েছে। আর তাঁর দিকেই এরা প্রত্যানীত হবে। اَفَغَيْرَ-এর হামযাটি اِنْكَارٌ বা অস্বীকারসূচক। يَبْغُوْنَ শব্দটি ت অর্থাৎ দ্বিতীয় পুরুষ ও ى অর্থাৎ নাম পুরুষ উভয়রূপেই পাঠ করা যায়। يُرْجَعُوْنَ শব্দটি ت দ্বিতীয় পুরুষ ও ى অর্থাৎ নাম পুরুষ উভয়রূপেই পাঠ করা যায়।

অনুবাদ :

٨٤. قُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ اَوْلَادِهٖ وَمَا اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ بِالتَّصْدِيْقِ وَالتَّكْذِيْبِ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ مُخْلِصُوْنَ فِي الْعِبَادَةِ.

৮৪. হে মুহাম্মদ! এদেরকে বল, আমরা আল্লাহ এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাঁর বংশধরদের সন্তানসন্ততিদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে প্রদান করা হয়েছে, তাতে বিশ্বাস করেছি; আমরা কাউকেও সত্য বলে বিশ্বাস ও কাউকে মিথ্যা বলে ধারণা করে অস্বীকার করত তাদের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না এবং আমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণকারী ইবাদত পালনে একনিষ্ঠ।

٨٥. وَنَزَلَ فِيْمَنِ ارْتَدَّ وَلَحِقَ بِالْكُفَّارِ وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ لِمَصِيْرِهٖ اِلَى النَّارِ الْمُؤَبَّدَةِ عَلَيْهِ.

৮৫. যারা মুরতাদ হয়ে গেছে [ইসলাম ত্যাগ করে] কাফেরদের সাথে মিলে গিয়েছিল তাদের সম্পর্কে আল্লাহ নাজিল করেন, কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দীন চাইলে তা কখনো কবুল করা হবে না এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামে তার যাত্রা হওয়ায় সে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَاِذْ حِيْنَ : حِيْنَ শব্দ উল্লেখ করা দ্বারা ইশারা করেছেন যে, اِذْ শব্দটি হলো যরফিয়া। اُذْكُرْ উহ্য ফে'লের সাথে মুতাআল্লিক। এ আয়াতের কয়েকটি তারকীব করা হয়েছে। এ আয়াতটি জটিল তারকীবসমূহের অন্তর্গত।

জালালাইন গ্রন্থকারের পছন্দনীয় তারকীব : এখানে وَاوْ টি ইসতেনাফিয়া, اِذْ উহ্য اُذْكُرْ-এর সাথে মুতাআল্লিক। لَمَّا-এর ل টি এখানে কসম অর্থে, اِبْتِدَاءٌ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ দ্বারা বুঝা যায় তার গুরুত্বারোপের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কেউ কেউ লাম বর্ণ যেরসহ পড়েছেন। اِذَا -এর সাথে اَخَذَ مُتَعَلِّقٌ। উভয় ক্ষেত্রে مَا মাওসূলা, আর এক কেরাতে اٰتَيْنَاكُمْ এসেছে। لتئمنن জবাবে কসম, اِيَّاهُ বিলুপ্ত রয়েছে। এটা মাওসূলের দিকে ফিরেছে, مَا হলো মাওসূলা, এটা শর্তের অর্থবোধক হতে পারে। আর لتئمنن কসমের জবাবের স্থলাভিষিক্ত ও শর্তের জবাব।

قَوْلُهُ اَاَقْرَرْتُمْ : এখানে জিজ্ঞাসাটি নির্দেশ অর্থে। কিংবা تَقْرِيْرِيْ -ও হতে পারে। اَفَغَيْرَ -এর মধ্যকার হামযাটি অস্বীকারজ্ঞাপক তথা না-বোধক। কাজেই এ প্রশ্ন দূর হয়ে গেল যে, আল্লাহর প্রশ্ন করার অর্থ কি?

প্রশ্ন : আল্লাহর বাণী لَا نُفَرِّقُ -এর উদ্দেশ্য হলো আমরা নবীদের মধ্যে প্রভেদ করি না। সবাইকে সমপর্যায়ের মনে করি। অথচ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা মতে, নবীগণের ফজিলত ও মর্যাদা বিভিন্নরূপ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ مِّنْ بَعْضٍ আয়াত দ্বারাও তো এ কথাই স্পষ্ট বুঝা যায়, তাহলে لَا نُفَرِّقُ দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর : প্রভেদ না করার অর্থ হলো তাদেরকে সত্যায়ন করা ও মিথ্যা সাব্যস্ত না করার ব্যাপারে তাদের পারস্পরিক মর্যাদার দিক দিয়ে নয় অর্থাৎ আমরা ইহুদিদের মতে কোনো কোনো নবীকে সত্য জানি এবং কোনো কোনো নবীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করি, এমন নয়।

প্রশ্ন : مُسْلِمُوْنَ -এর ব্যাখ্যা مُخْلِصُوْنَ দ্বারা করা হলো কেন?

উত্তর : এর কারণ হলো, اٰمَنَّا দ্বারাই ঈমানের বিষয়টি আগেই বুঝা গেছে, কাজেই এর দ্বারা ইখলাস উদ্দেশ্য।

وَشَهَادَتِهِمْ : এ শব্দটি দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, এর আতফ হলো اَنْ উহ্য সহকারে اِيْمَانِهِمْ -এর উপর। মা'তূফ ফে'লটি ইসমের তাবীলে।

قَدْ : قَدْ বিলুপ্ত করার দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, وَاوْ টি عَاطِفَةْ নয়; বরং حَالِيَةْ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

অঙ্গীকার যেখানে গ্রহণ করা হয়েছিল : مِيْثَاقْ [অঙ্গীকার] শব্দটি পবিত্র কুরআনে একাধিক জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে। এটা [অঙ্গীকার গ্রহণ] হয়তো রূহানী জগতে কিংবা দুনিয়ায় ওহীর মাধ্যমে হয়েছে। তবে উভয়টির সম্ভবনাই রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের থেকে তিন ধরনের অঙ্গীকার নিয়েছেন–

১. সূরা আ'রাফে اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ -এর অধীনে উল্লিখিত হয়েছে। এ অঙ্গীকারের উদ্দেশ্য হলো সমস্ত মানুষ যেন আল্লাহর অস্তিত্বে এবং তাঁর রবুবিয়্যাতের উপর বিশ্বাস রাখে।

২. وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَ الخ আয়াত দ্বারা গৃহীত হয়েছে। এ অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল কেবল আহলে কিতাব আলেমদের থেকে, যাতে তারা সত্যকে গোপন না করে।

৩. وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَا اٰتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ আয়াত দ্বারা গৃহীত হয়েছে।

এ অঙ্গীকার কি বিষয়ে গৃহীত হয়েছে এ ব্যাপারে বিভিন্নরূপ মন্তব্য রয়েছে। হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এর দ্বারা নবী করীম ﷺ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সমস্ত নবীদের থেকে মুহাম্মদ ﷺ -এর ব্যাপারে এ অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। তাঁরা যদি তাঁর নবুয়তকাল পায় তাহলে তাঁরা যেন তাঁর প্রতি ঈমান নিয়ে আসেন এবং তাঁর সমর্থন ও সহায়তা করেন। অন্যথায় নিজ নিজ উম্মতকে এ ব্যাপারে দিকনির্দেশনা প্রদান করে যাবেন।

হযরত তাউস হযরত হাসান বসরী ও হযরত কাতাদা (র.) বলেন, নবীদের থেকে এ অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল যে, তাঁরা যেন পরস্পর একে অন্যের সহায়তা ও সহযোগিতা করেন। –[তাফসীরে ইবনে কাছীর, মা'আরিফুল কুরআন]

এখানে এ বিষয়টি প্রনিধাণযোগ্য যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর পূর্বের সকল নবী থেকে এ ব্যাপারে পর্যায়ক্রমে এ অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে। এর ভিত্তিতে প্রত্যেক নবী তাঁর উম্মতকে পরবর্তীকালে আগত নবীর সুসংবাদ দান করেছেন এবং তাঁর সহযোগিতা করার জোর তাকিদ দিয়েছেন। কিন্তু কুরআন ও হাদীসের কোথাও এ কথা পাওয়া যায়নি যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ থেকে এ ধরনের কোনো অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে। কিংবা তিনি স্বীয় উম্মতকে তাঁর পরবর্তীকালের আগত নবীর সংবাদ দিয়ে তাঁর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দান করেছেন। এর দ্বারা আহলে কিতাবকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকারকে ভঙ্গ করেছ। মুহাম্মদ ﷺ -কে অস্বীকার এবং তাঁর বিরোধিতা করে তোমরা এ প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করছ, যা তোমাদের নবীগণ থেকে নেওয়া হয়েছিল। অতএব তোমরা বর্তমানে ঈমানের সীমারেখা থেকে বেরিয়ে এসেছ। অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্য থেকে বহির্ভূত হয়েছ। এতে কোনো সন্দেহ নেই।

যদি পূর্বের নবীগণের আমলে আমাদের নবী করীম ﷺ -এর আবির্ভাব ঘটত, তাহলে তাদের সবার নবী হতেন তিনিই, সকল নবী তাঁর উম্মত গণ্য হতেন। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, তিনি শুধু উম্মতের নবী নন, বরং সকল নবীগণেরও নবী। যেমন এক হাদীসে উল্লেখ হয়েছে, যদি হযরত মূসা (আ.) জীবিত থাকতেন, তাহলে আমার আনুগত্য ছাড়া তাঁর গত্যন্তর থাকত না। অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন হযরত ঈসা (আ.) -এর আবির্ভাব ঘটবে, তখন তিনিও পবিত্র কুরআন ও তোমাদের নবীর বিধান অনুযায়ী আমল করবে। –[মা'আরিফ, ইবনে কাছীর]

এসব হাদীসের আলোকে প্রতীয়মান হলো যে, মহানবী ﷺ -এর নবুয়ত সর্বব্যাপী এবং সর্বজনীন। তাঁর শরিয়তের মধ্যে অন্যান্য শরিয়ত নিহিত রয়েছে। তাঁর এ বাণী بُعِثْتُ اِلَى النَّاسِ كَافَّةً দ্বারা এ কথার সমর্থন মিলে। অতএব এ কথা বুঝা ঠিক হবে না যে, নবী করীম ﷺ -এর নবুয়ত কেবল তাঁর যুগ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী উম্মতের জন্য, বরং তাঁর নবুয়তের আমল এত ব্যাপৃত, যা হযরত আদম (আ.)-এর নবুয়তের পূর্বে সূচিত হয়েছে। كُنْتُ نَبِيًّا وَاٰدَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ অর্থাৎ আমি তখনও নবী ছিলাম যখন আদম (আ.) রূহ ও দেহের মধ্যে ছিলেন। হাশরের ময়দানে শাফাআতে কুবরা -এর জন্য অগ্রসর হওয়া এবং সকল আদম জাতি মহানবী ﷺ -এর পতাকাতলে সমবেত হওয়া, শবে মেরাজে বায়তুল মুকাদ্দাসে সমস্ত নবীগণের ইমামতি করা মহানবী ﷺ -এর সর্বোপরি নেতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের নির্দশন।

অনুবাদ :

٨٦. كَيْفَ أَيْ لَا يَهْدِي اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْا أَيْ وَشَهَادَتُهُمْ أَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَقَدْ جَاءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ الْحُجَجُ الظَّاهِرَاتُ عَلٰى صِدْقِ النَّبِيِّ ﷺ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ الْكَافِرِيْنَ .

৮৬. ঈমান আনয়নের পর ও রাসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্যদানের পর এবং রাসূল ﷺ -এর সত্যতার স্পষ্ট নিদর্শন প্রকাশ্য প্রমাণাদি এসে যাওয়ার পর যে সম্প্রদায় সত্য প্রত্যাখ্যান করে তাকে আল্লাহ কিরূপে সত্য পথে হেদায়েত করবেন? অর্থাৎ তিনি তা করবেন না। كَيْفَ ই প্রশ্নবোধক শব্দটি এ স্থানে না-সূচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। شَهِدُوْا এটা অতীত কালবোধক ক্রিয়া হলেও এ স্থানে شَهَادَةٌ অর্থাৎ مَصْدَرْ বা ক্রিয়ার উৎস অর্থে ব্যবহৃত। আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়কে অর্থাৎ কাফেরগণকে হেদায়েত করেন না। [অর্থাৎ আল্লাহ নিজ থেকে হেদায়েত দিয়ে দেন না। যদি বান্দা স্বেচ্ছায় তা গ্রহণ না করে।]

٨٧. أُولٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ .

৮৭. এরাই তারা, যাদের প্রতিফল হলো আল্লাহ, ফেরেশতা এবং মানুষ সকলের পক্ষ হতে লানত বা অভিসম্পাত।

٨٨. خٰلِدِيْنَ فِيْهَا أَيْ اَللَّعْنَةُ أَوِ النَّارُ الْمَدْلُوْلُ بِهَا عَلَيْهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ يُمْهَلُوْنَ .

৮৮. তারা এতে অভিসম্পাত বা লানত শব্দ দ্বারা ইঙ্গিতবহ জাহান্নামে স্থায়ী হবে। তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না। এবং তাদেরকে বিরামও সময়ও দেওয়া হবে না।

٨٩. إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُوْا عَمَلَهُمْ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ لَهُمْ رَحِيْمٌ بِهِمْ .

৮৯. তবে এরপর যারা তওবা করে ও নিজেদের আমল সংশোধন করে তারা ব্যতিক্রম। নিশ্চয় আল্লাহ এদের প্রতি ক্ষমাশীল, তাদের প্রতি পরম দয়ালু।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ كَيْفَ لَا يَهْدِي اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْا أَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ : এ আয়াতের পূর্বে যে সকল বিষয়কে বারবার বর্ণনা করা হয়েছিল এখানে একই কথার পূর্ণরাবৃত্তি ঘটেছে। তা এই যে, নবী করীম ﷺ -এর যুগে আরবের ইহুদি আলেমগণ জানত এবং মুখে সাক্ষ্য দিয়েছিল যে, তিনি সত্য নবী। তিনি যে দীক্ষা এনেছেন তা পূর্বের নবীদের আনীত দীক্ষার অনুকূলে। এরপর তারা যা কিছু করেছে তা নিছক গোঁড়ামি এবং শত্রুতামূলক। এটা ছিল তাদের প্রাচীন অভ্যাসের ফল। শত শত বৎসর যাবৎ তারা সে দোষে দোষী সাব্যস্ত হচ্ছিল।

قَوْلُهُ إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ : কিন্তু যারা মুরতাদ হওয়ার পরে অনুতপ্ত হয়েছে এবং তওবা করে নিজ নিজ আমল ও আকিদা সংশোধন করেছে, আল্লাহ তাদের পাপসমূহ ক্ষমাকারী, দুনিয়ায় সৎ আমলের প্রতি এবং পরকালে বেহেশতের প্রতি তাদের পথ নির্দেশকারী।

মুরতাদের তওবা গ্রহণযোগ্য : যে গুনাহই হোক না কেন তওবা দ্বারা তা ক্ষমা হয়ে যায়। তবে তওবার ক্ষেত্রে শর্ত হলো পাপ যে ধরনের হবে, তওবা সে ধরনের হতে হবে। জুলুম-অত্যাচারের তওবা হলো মজলুমের নিকট ক্ষমা চাইতে হবে বা যে কোনো উপায়ে ক্ষমা করাতে হবে। সুদখোরির তওবা হলো পূর্বে গৃহীত সুদের মাল ফেরত দিতে হবে। যদি এরূপ না করে কেবল অনুতপ্ত হয়ে খাঁটি দিলে তওবা করে তাতে আল্লাহর হক সংক্রান্ত বিষয়াদি ক্ষমা হবে; কিন্তু বান্দার হক সংক্রান্ত সকল পাপ বহাল থাকবে। -[মা'আলিম]

অনুবাদ :

٩٠. وَنَزَلَ فِي الْيَهُوْدِ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعِيْسَى بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ بِمُوْسَى ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا بِمُحَمَّدٍ لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ اِذَا غَرْغَرُوْا اَوْ مَاتُوْا كُفَّارًا وَاُولٰئِكَ هُمُ الضَّالُّوْنَ ـ

৯০. আল্লাহ তা'আলা ইহুদিদের সম্পর্কে নাজিল করেন, মূসার উপর বিশ্বাস স্থাপন করার পর যারা ঈসাকে অস্বীকার করল, অতঃপর মুহাম্মদ ﷺ -কে অস্বীকার করে যাদের কুফরি আরো বৃদ্ধি পেল। মুমূর্ষ অবস্থায় পৌঁছে গেলে বা কাফের অবস্থায় মারা গেলে তাদের তওবা কখনো কবুল করা হবে না। এরাই পথভ্রষ্ট।

٩١. اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِلْءُ الْاَرْضِ مِقْدَارَ مَا يَمْلَؤُهَا ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدٰى بِهٖ اُدْخِلَ الْفَاءُ فِيْ خَبَرِ اِنَّ لِشِبْهِ الَّذِيْنَ بِالشَّرْطِ وَاِيْذَانًا بِتَسَبُّبِ عَدَمِ الْقَبُوْلِ عَنِ الْمَوْتِ عَلَى الْكُفْرِ اُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ مُؤْلِمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نّٰصِرِيْنَ مَانِعِيْنَ مِنْهُ ـ

৯১. যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং সত্য প্রত্যাখ্যান-কারীরূপে যাদের মৃত্যু ঘটে, তাদের পক্ষে পৃথিবী পূর্ণ অর্থাৎ তাও ভরে যায় ততটুকু পরিমাণ স্বর্ণ বিনিময় স্বরূপ প্রদান করলেও কখনো তা কবুল করা হবে না। এরাই তারা, যাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ যন্ত্রণাকর শাস্তি; আর তাদের কোনো সাহায্যকারী নেই। তা অর্থাৎ এ পরিণাম থেকে তাদের কেউ রক্ষাকারী নেই।

যেহেতু اَلَّذِيْنَ -তে শর্তের মর্মের সাথে সামঞ্জস্য বিদ্যমান সেহেতু اِنَّ-এর خَبَرٌ বা বিধেয় فَلَنْ يُقْبَلَ -এ ف ব্যবহার করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এর মাধ্যমে এদিকেও ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, কাফের রূপে মৃত্যুবরণ করাই হলো তাদের তওবা কবুল না হওয়ার কারণ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا (الاية) : এ আয়াতের উদ্দেশ্য হলো, মুরতাদ হওয়ার পরে যে ব্যক্তি তার উপর অটল থাকে; তওবা করে না, এমতাবস্থায় তার মৃত্যুর নিদর্শন স্পষ্ট হয়ে যায়। তখন তার তওবা কবুল হবে না। হাদীস শরীফে উল্লিখিত হয়েছে যে, কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ তা'আলা জনৈক দোজখিকে বলবেন, যদি তোমার নিকট সারা পৃথিবী পরিমাণ সম্পদ থাকে, তাহলে কি দোজখের শাস্তির বিনিময়ে তা দান করা পছন্দ করবে? লোকটি বলবে, হ্যাঁ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করবেন– দুনিয়ায় আমি তোমার নিকট এর চাইতে অনেক সহজ বস্তু কামনা করেছিলাম। তা এই যে, আমার সাথে কাউকে শরিক করবে না। কিন্তু তুমি শিরক থেকে বিরত থাকনি। –[মুসনাদে আহমদ, বুখারী ও মুসলিম]

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, কাফেরদের জন্য চিরস্থায়ী আজাব রয়েছে। দুনিয়ায় তারা যদি কোনো ভালো কাজ করে থাকে, তাহলে কুফরির কারণে তা বিনষ্ট হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে হাদীস শরীফে উল্লিখিত হয়েছে যে, আব্দুল্লাহ ইবনে জাদআন -এর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, লোকটি অতিথিপরায়ণ ও গরিব-দুঃখীর সহায়তাকারী এবং ক্রীতদাস মুক্তকারী। এ সকল আমল কি তার উপকারে আসবে? নবী করীম ﷺ জবাব দিলেন, না। কারণ সে একদিনও আল্লাহর নিকট তার পাপসমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেনি। –[মুসলিম]

اَلْجُزْءُ الرَّابِعُ : চতুর্থ পারা

অনুবাদ :

٩٢. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ اَىْ ثَوابَه وَهُوَ الْجَنَّةَ حَتّٰى تُنْفِقُوْا تَصَدَّقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ. مِنْ اَمْوَالِكُمْ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَىْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِه عَلِيْمٌ فَيُجَازِىْ عَلَيْهِ.

৯২. তোমরা কল্যাণ তথা কল্যাণের ছওয়াব আর তা হচ্ছে বেহেশত লাভ করতে পারবে না। যতক্ষণ না তোমরা নিজেদের প্রিয়তম বস্তু তথা তোমাদের অর্থ-সম্পদ হতে ব্যয় দান না কর। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় কর নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তা জানেন। সুতরাং তিনি এর উপর প্রতিদান দেবেন।

٩٣. وَنَزَلَ لَمَّا قَالَ الْيَهُوْدُ اِنَّكَ تَزْعُمُ اَنَّكَ عَلٰى مِلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ وَكَانَ لَا يَأْكُلُ لُحُوْمَ الْاِبِلِ وَاَلْبَانَهَا كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا حَلَالًا لِبَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَآءِيْلُ يَعْقُوْبُ عَلٰى نَفْسِه وَهُوَ الْاِبِلُ لَمَّا حَصَلَ لَه عِرْقُ النَّسَا بِالْفَتْحِ وَالْقَصْرِ فَنَذَرَ اِنْ شَفٰى لَا يَأْكُلُهَا فَحَرَّمَ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰىةُ وَذٰلِكَ بَعْدَ اِبْرَاهِيْمَ وَلَمْ تَكُنْ عَلٰى عَهْدِه حَرَامًا كَمَا زَعَمُوْا قُلْ لَهُمْ فَأْتُوْا بِالتَّوْرٰىةِ فَاتْلُوْهَا لِيَتَبَيَّنَ صِدْقُ قَوْلِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ فِيْهِ فَبُهِتُوْا وَلَمْ يَأْتُوْا بِهَا.

৯৩. ইহুদিরা যখন বলল, [হে মুহাম্মদ ﷺ] আপনি তো মনে করেন যে, আপনি মিল্লাতে ইবরাহীমের উপর আছেন। অথচ ইবরাহীম (আ.) উটের গোশতও খেতেন না এবং দুধও ব্যবহার করতেন না। তখন তাদের জবাবে নিম্নোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তাওরাত নাজিল হওয়ার পূর্বে ইসরাঈল তথা হযরত ইয়াকূব (আ.) যেগুলো নিজের উপর হারাম করে নিয়েছিলেন। আর তা ছিল উট যখন তার ইরকুননাসা ব্যাধি বা সাইটিকা রোগ হয়ে যায় (عِرْقُ النَّسَا শব্দটি নূনের জবর ও আলিফে মাকসূরার সাথে) তখন তিনি মানত করলেন যে, তিনি যদি সুস্থ হয়ে যান তাহলে উটের গোশত ও দুধ ব্যবহার করবেন না। সেগুলো ব্যতীত সকল আহার্য বস্তুই বনী ইসরাঈলের জন্য হালাল ছিল। আর ইয়াকূবের নিজের উপর উট হারাম করে নেওয়ার বিষয়টা তো ইবরাহীমের পরের ঘটনা। তাঁর [ইবরাহীমের] যুগে উটের গোশত ও দুগ্ধ হারাম ছিল না। যেরূপ ইহুদিদের ধারণা। আপনি তাদেরকে [ইহুদিদেরকে] বলে দিন তোমরা তাওরাত নিয়ে এসো এবং তা পাঠ কর যাতে তোমাদের কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়ে যায়। যদি তোমরা এ কথায় সত্যবাদী হও। ফলে তারা নির্বাক হয়ে পড়ে এবং তাওরাত এনে দেখাতে পারেনি।

٩٤. قَالَ تَعَالٰى فَمَنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ اَىْ ظُهُوْرِ الْحُجَّةِ بِاَنَّ التَّحْرِيْمَ اِنَّمَا كَانَ مِنْ جِهَةِ يَعْقُوْبَ لَا عَلٰى عَهْدِ اِبْرَاهِيْمَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ الْمُتَجَاوِزُوْنَ الْحَقَّ اِلَى الْبَاطِلِ.

৯৪. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– অতএব, এরপরও অর্থাৎ হারাম করার বিষয়টি ইয়াকূবের তরফ থেকে হয়েছে ইবরাহীমের পক্ষ থেকে নয়– এই প্রমাণ উপস্থাপিত হওয়ার পরও যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তারাই জালেম। যারা হক ছেড়ে বাতিলের প্রতি ধাবমান।

٩٥. قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ فِىْ هٰذَا كَجَمِيْعِ مَا اَخْبَرَ بِهٖ فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ الَّتِىْ اَنَا عَلَيْهَا حَنِيْفًا مَائِلًا عَنْ كُلِّ دِيْنٍ اِلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ

অনুবাদ :

৯৫. [হে রাসূল ﷺ !] আপনি বলে দিন যে, আল্লাহ তা'আলা সত্য বলেছেন, এসব বিষয়েই যার সংবাদ দেওয়া হয়েছে। অতএব তোমরা সবাই ইবরাহীমের ধর্মের অনুসরণ কর। যার উপর আমি রয়েছি। যিনি ছিলেন সকল বাতিল ধর্ম থেকে সরে গিয়ে একনিষ্ঠভাবে। [সত্যধর্ম] দীনে ইসলামের অনুসারী। তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

তাহকীক ও তারকীব

نَالَ يَنَالُ কাঙ্খিত বস্তুতে পৌছা, পাওয়া, লাভ করা। اَلْبِرُّ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো পুরস্কার, বেহেশ্‌ত, কল্যাণ, অধিক পরিমাণ উপহার, সত্যবাদিতা ও অনুগত। [কামূস] কাজী সানাউল্লাহ পানিপতী (র.) বলেন, بِرٌّ শব্দটি যদি বান্দার সাথে সম্পৃক্ত হয় তখন তার অর্থ হয় আনুগত্য, সত্যবাদিতা ও উপকারের ব্যাপকতা, তখন তার বিপরীতে اَلْفُجُوْرُ [নাফরমানি] ও اَلْعُقُوْقُ [নাফরমানি, বিরুদ্ধচারণ] আসে। তবে بِرٌّ এর সম্পর্ক যদি আল্লাহর সাথে করা হয় তখন তার উদ্দেশ্য হয় সন্তুষ্টি, রহমত ও জান্নাত। তখন তার বিপরীত শব্দ আসে غَضَبٌ [গোস্‌সা, ক্রোধ] ও عَذَابٌ [শাস্তি]। আলোচ্য আয়াতে بِرٌّ শব্দের মর্ম সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস (রা.) এবং মুজাহিদ (র.) বলেন, এর মর্ম হলো জান্নাত। মুকাতিল ইবনে হিব্বানের মতে, তাক্‌ওয়া। কতিপয় ওলামাদের মতে আনুগত্য এবং কারো মতে কল্যাণ।-[তাফসীরে মাযহারী উর্দূ খ. ২, পৃ. ২৯১]

আল্লামা সুয়ূতী (র.) হিবরুল উম্মাহ তথা উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ তাফসীরবিদ ইবনে আব্বাসের তাফসীরটিকেই গ্রহণ করেছেন। مِمَّا تُحِبُّوْنَ বাক্যটিতে ব্যবহৃত مِنْ অব্যয় পদটি بَعْضِيَّة অংশ বুঝাবার অর্থে এসেছে بَيَانِيَّة বা ব্যাখ্যা বুঝাতে নয়। তবে কেউ কেউ مِنْ -কে بَيَانِيَّةٌ ও বলেছেন। এক কেরাতে مِمَّا تُحِبُّوْنَ -এর বদলে بَعْضَ مَا تُحِبُّوْنَ রয়েছে।

اِسْرَائِيْلُ ইবরানী বা হিব্রু ভাষার শব্দ। এর আরবি অনুবাদ হলো عبد الله [আব্দুল্লাহ] এটা হযরত ইয়াকূব (আ.) -এর নাম। আর তাঁর লকব ছিল ইয়াকূব। يَعْقُوْبُ [ইয়াকূব] অর্থ পরে বা পিছনে আগত ব্যক্তি। ইয়াকূবের অন্যান্য ভ্রাতাগণের জন্মের পর যেহেতু ছোট ভাই হিসেবে তাঁর জন্ম পরে হয়েছিল। এজন্যে তাঁকে ইয়াকূব বলা হতো। عِرْقُ النَّسَا পায়ের বিশেষ এক রোগ ব্যাম্পিক বলে। نَسَا শব্দটি عَصَا শব্দটির ওজনে হবে। -[তাফসীরে কাবীর খ. ৮, পৃ. ১৪৯, কামালাইন পারা ৪. পৃ. ৩]

مِلَّةٌ : দীনের জন্য ঐ তরীকাকে মিল্লাত বলে যাকে আল্লাহ পাক নবীদের জবানে স্বীয় বান্দাদের জন্য শরিয়ত সিদ্ধ করেছেন। যাতে করে তারা নৈকট্য ও সন্তুষ্টির স্তরসমূহ অর্জন এবং উভয় জগতের দুরস্তী ও কল্যাণ লাভ করতে পারে। মিল্লাত ও দীনের মধ্যে পার্থক্য হলো এই যে, মিল্লাতের সম্পর্ক হয় নবীর দিকে। যথা ইবরাহীমের মিল্লাত, মূসার মিল্লাত, মুহাম্মদ ﷺ -এর মিল্লাত ইত্যাদি। পক্ষান্তরে দীনের সম্পর্ক হয় আল্লাহর দিকে। যেমন এটা আল্লাহর দীন। এটা আল্লাহর মিল্লাত বলা জায়েজ হবে না। তেমনিভাবে মিল্লাতের প্রয়োগ শরয়ী আহকামের সমষ্টির উপর হয়ে থাকে। এক একটি হুকুমের উপর মিল্লাত শব্দের ব্যবহার হয় না। সুতরাং শুধু নামাজ বা শুধু জাকাতকে মিল্লাত বলা যাবে না। [মাআরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্দলবী (র.) খ. ২ পৃ. ৬. حَنِيْفٌ - বহুবচনে حُنَفَاءُ সরল, ইসলামি বিধি বিধানের অনুসারী, মিল্লাতে ইবরাহীমির অনুসারী ও একত্ববাদী।

কতিপয় শব্দের তারকীব : مِمَّا -এর মধ্যে مَا শব্দটি মাওসূলা বা মাওসূফা। আব্দুল হক্কানী বলেন, مَا টি এখানে মাসদারিয়া হতে পারে না। তবে আলূসী (র.) বলেছেন, আবূ আলীর মতে, মাফউলের অর্থে ব্যবহৃত মাসদারিয়া ও مَا টি হতে পারবে। فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ -এর মধ্যে ব্যবহৃত بِهٖ যমীরের মারজি' [প্রত্যাবর্তন স্থল] পূর্বোক্ত مَا বা شَيْءٌ

مِنْ قَبْلِ اِسْتِثْنَاء ۚ হতে حَلًّا -এর খবর كَانَ -মহল্লে নসবের মধ্যে অবস্থিত হয়েছে, কারণ এটা كَانَ -এর খবর حِلًّا হতে اِسْتِثْنَاء হয়েছে। اِلَّا مَا حَرَّمَ মুতা'আল্লিক হয়েছে حَرَّمَ ফে'লের সঙ্গে। আর مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ মুতা'আল্লিক হয়েছে اِفْتَرٰى ফে'লের সাথে। اِبْرَاهِيْم - حَنِيْفًا থেকে হাল হয়েছে। مِلَّةَ শব্দ থেকেও হাল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। -[তাফসীরে হক্কানী. পারা ৪, পৃ. ২-৩]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের যোগসূত্র : ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.) বলেন, পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক একথা বর্ণনা দিয়েছিলেন যে, কাফেরদের নাজাতের জন্য আখিরাতে গিয়ে তারা যদি সারা পৃথিবীর সম পরিমাণ অর্থ সম্পদও ব্যয় করে দেয়, তবুও তাদের জন্য উপকারী হবে না। لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ আয়াতটিতে আল্লাহ পাক মুমিনদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, কিভাবে ব্যয় করলে আখিরাতে তাদের জন্য উপকারী হবে। -[তাফসীরে কাবীর- খ. ৮ পৃ. ১৪৭]

আলোচ্য আয়াত ও সাহাবাদের আমলের আবেগ :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ الخ আয়াতটি অবতরণের পর সাহাবাদের অনেকেই নিজ নিজ প্রিয় বস্তু খোঁজে বের করে আল্লাহর রাসূলের দরবারে এসে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার জন্য দরখাস্ত করতে লাগলেন। হযরত আনাস (রা.) বলেন- মদিনার আনসারী সাহাবীদের মধ্যে সর্বাধিক খেজুর বাগানের মালিক ছিলেন হযরত আবূ তালহা আনসারী (রা.)। তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বস্তু ছিল মসজিদে নববীর নিকটবর্তী বায়রুহা নামক একটি বাগান। নবী করীম ﷺ এই বাগানটিতে মাঝে মধ্যে তশরিফ নিয়ে এর মিষ্টি মধুর পানি পান করতেন। অতঃপর যখন لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ الخ আয়াতটি নাজিল হলো তখন আবূ তালহা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ পাক বলেন, তোমরা নিজের প্রিয় বস্তু দান না করা পর্যন্ত কল্যাণ লাভ করতে পারবে না। আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় বস্তু হলো আমার বায়রুহা বাগান। তাই এটা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করে দিলাম। আমি এর কল্যাণ আল্লাহর কাছে সঞ্চিত রাখতে চাই। সুতরাং আপনার ইচ্ছামতে একে ব্যয় করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তা লাভজনক সম্পদ, তা লাভজনক সম্পদ। আমি তোমার কথা শুনেছি। আমি মনে করি তোমার আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে বাগানটি দান করে দিলে ভালো হবে। হযরত আবূ তালহা বললেন, তা আমি করে নিবো ইয়া রাসূলাল্লাহ! অতঃপর হযরত আবূ তালহা বাগানটি তাঁর আত্মীয় ও চাচার সন্তানদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে, হাস্সান ইবনে সাবেত ও উবাই ইবনে কাবের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছেন। [হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম মালেক, আহমদ, আব্দুল্লাহ ইবনে হুমাইদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও নাসায়ীসহ প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ।] এ রেওয়ায়েত দ্বারা বুঝা গেল, দান খয়রাত কেবল তাই নয় যা সাধারণ গরিবদেরকে দেওয়া হয়, বরং নিজের পরিবারবর্গ, আত্মীয় স্বজনদের উপর ব্যয় করলেও তা ছওয়াবের কারণ হয়।

* হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রা.) নিজের একটি ঘোড়া নিয়ে হুজুর ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমার সম্পদের মধ্যে এ ঘোড়াটিই আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। তাই আমি একে আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিতে চাই। হুজুর ﷺ একে গ্রহণ করে নিলেন। তবে এটাকে গ্রহণ করে তিনি তাঁরই পুত্র উসামাকে দিয়ে দিলেন। হযরত যায়েদ এটা দেখে মনে মনে কিছুটা চিন্তিত হলেন, যে আমার সদকা আমারই ঘরে চলে আসল। ফলে হুজুর ﷺ তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বললেন, আল্লাহ পাক তোমার সদকা অবশ্যই কবুল করেছেন।
* হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, এ আয়াতটি তেলাওয়াতকালে আমার মনে একথা আসলো যে, আমার সম্পদের মধ্যে আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়বস্তু হলো আমার মারজানা নামক রুমী দাসীটি। তাই আমি আল্লাহর ওয়াস্তে একে আজাদ করে দিলাম। তিনি বলেন, আল্লাহ পাকের রাহে দানকৃত বস্তু ফেরত নেওয়া নিষিদ্ধ না হলে আমি বাঁদীটিকে ফেরত এনে বিয়ে করে নিতাম।

হযরত ওমর (রা.)-ও এই আয়াতের উপর আমল করতে গিয়ে তার একাধিক বাঁদিকে আজাদ করে দিয়েছিলেন।

-[দুররে মানছুর খ. ১, পৃ. ৫০]

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র.) টাকার বিনিময়ে চিনি খরিদ করে তা আল্লাহর রাস্তায় দান করতেন। কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হুজুর সরাসরি টাকা দান করে দেন না কেন? তার উত্তরে তিনি বললেন, চিনি আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় বস্তু। তাই আমার ইচ্ছে হলো সর্বাধিক প্রিয় বস্তু আল্লাহর রাস্তায় দান করবো। -[হাশিয়ায়ে জালালাইন]

* হযরত ইবনে ওমর (রা.) সম্পর্কেও তাঁর শিষ্য নাফে (রা.) বর্ণনা করেন যে, ইবনে ওমর চিনি ক্রয় করে তা সদকা করে দিতেন। আমরা বললাম, যদি আপনি চিনি ক্রয় না করে এর মূল্য দ্বারা অন্য কোনো খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করে নিতেন তাহলে গরিবদের জন্য অধিক উপকারী হতো। এর উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা যা বলছ, আমি তা অবশ্যই বুঝি। তবে আমি আল্লাহকে বলতে শুনেছি- لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ [তোমাদের প্রিয় বস্তু দান না করা পর্যন্ত তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে না। আর ইবনে ওমর তো চিনিকে ভালোবাসে। [তাই আমি চিনি ক্রয় করে সদকা করছি।]

-[দূররে মানছূর খ. ১, পৃ. ৫১]

এরূপ আরো বহু ঘটনা হাদীস ও তাফসীর গ্রন্থাবলিতে বিবৃত রয়েছে। এই আয়াত দ্বারা একথা বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহর রাস্তায় যে কোনো সদকা খয়রাত চাই ফরজ, ওয়াজিব হোক বা নফল হোক, তখনই তাতে পরিপূর্ণ ফজিলতও ছওয়াব অর্জন হবে যখন নিজের প্রিয় ও মায়ার বস্তু আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় ব্যয় করা হবে। এ রকম নয় যে, সদকা খয়রাত কে জরিমানা মনে করে দায়িত্ব হতে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে বেকার ও নিম্নমানের বস্তু দান করার জন্য বেছে নিবে। -[জামালাইন খ. ১, পৃ. ৫১৬]

বেকার ও নিজের অপ্রয়োজনীয় বস্তু দান করার মধ্যেও ছওয়াব রয়েছে : যদিও উপরিউক্ত আয়াতে একথা বলা হয়েছে যে, পরিপূর্ণ কল্যাণ ও অধিক ছওয়াব অর্জন করাটা নির্ভরশীল নিজের প্রিয় বস্তু খোদার রাহে দান করার মধ্যে। তবে এতে একথা বুঝা যাচ্ছে না যে, নিজের অপ্রয়োজনীয়, বেকার নষ্ট মাল দান করার মধ্যে কোনো রকম ছওয়াবই নেই। বরং আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ অর্থাৎ তোমরা যা কিছু দান করছ আল্লাহ তার সম্পর্কে অবগত। এই আয়াতের মর্মে যদিও একথা রয়েছে যে, পরিপূর্ণ কল্যাণ লাভ করা এবং কামেল নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া নির্ভরশীল প্রিয়বস্তু দান করার মধ্যে নিহিত। তবে যে কোনো ধরনের দান সাধারণ ছওয়াব হতে খালি নয়। নিজের অপ্রয়োজনীয় ও বেকার জিনিস-পত্র, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি গরিবদেরকে দান করলেও এক রকম ছওয়াব পাওয়া যাবে। তবে দান করতে গেলেই শুধু বেকার নষ্ট ও নিম্নমানের বস্তু দান করার তরিকা গ্রহণ করে নেওয়াটা নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ।

-[জামালাইন খ. ১, পৃ. ৫১৬]

মধ্যপন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন : আয়াতে مِمَّا শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সমস্ত প্রিয়বস্তু নিঃশেষ করে আল্লাহর পথে ব্যয় করা উদ্দেশ্য নয়, বরং উদ্দেশ্য এই যে, যতটুকু ব্যয় করবে তার মধ্যে ভালো ও প্রিয়বস্তু দেখে ব্যয় করবে। তবেই পুরোপুরি ছওয়াবের অধিকারী হবে।

প্রিয়বস্তু ব্যয় করার অর্থ শুধু অধিক মূল্যবান বস্তু ব্যয় করা নয়। বরং স্বল্প এবং মূল্যের দিক দিয়ে নগণ্য এমন বস্তু কারো দৃষ্টিতে প্রিয় হলে, তা দান করলেও পুরাপুরি ছওয়াবের অধিকারী হবে। হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য খাঁটি মনে যা দান করা হয়, তা একটা খেজুরের দানা হলেও তাতে দাতা আয়াতে বর্ণিত ছওয়াবের অধিকারী হবে।

-[মা'আরিফুল কুরআন খ. ২, পৃ. ১১১]

একটি প্রশ্নের সমাধান : আয়াত থেকে বাহ্যত বুঝা যায় যে, যারা গরিব, নিঃস্ব এবং দান করার মতো অর্থ কড়ির মালিক নয়, তারা আয়াতে বর্ণিত কল্যাণ ও বিরাট পূণ্য হতে বঞ্চিত হবে। কারণ আয়াতে বলা হয়েছে যে, প্রিয়বস্তু ব্যয় করা ব্যতীত এ পুণ্য অর্জিত হবে না। গরিব মিসকিনদের হাতে এমন কোনো আকর্ষণীয় বস্তু নেই যে, তা ব্যয় করে তারা এ পুণ্য অর্জন করতে পারে। কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায়, আয়াতের অর্থ এরূপ নয় যে, প্রিয় অর্থকরী ব্যয় করা ব্যতীত এ লক্ষ্য অর্জিত হবে না। বরং এ পুণ্য ইবাদত, জিকির, তেলাওয়াতও অধিক নফল ইত্যাদি উপায়েও অর্জন করা যায়। কোনো কোনো হাদীসে এ বিষয় বস্তুটি পরিষ্কার ভাবে বর্ণিত হয়েছে। আল্লামা আলুসী (র.) তার বিশ্ব বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ রুহুল মা'আনিতে এ প্রশ্নের কয়েকটি জবাব দিয়েছেন। শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে তা নিম্নে পেশ করা হলো-

১. আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার প্রতি উৎসাহ দানের লক্ষ্যে কথাটি বলা হয়েছে। আর তা সম্ভাব্যের শর্ত সাপেক্ষে হওয়াটাই স্বাভাবিক। মুবালাগার ভিত্তিতে সাধারণ ভাষায় উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

২. কারো মতে, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ এর মর্ম হলো এই যে, পরিপূর্ণ সর্ব দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ পন্থায় কল্যাণ অর্জন হবে না প্রিয়বস্তু আল্লাহর রাস্তায় দান না করা পর্যন্ত। আর ফকির ব্যক্তি, যে নিজের দীর্ঘ জীবনের কোনো সময় আল্লাহর রাহে দান করেনি। এরূপ ব্যক্তি সম্পর্কে এরূপ বলা অসমীচীন হবে না যে, সে পরিপূর্ণ নেককার হলো না এবং আল্লাহর পূর্ণ রহমত লাভে ধন্য হতে পারল না।

৩. কারো মতে এর জবাব হলো এই যে, তোমরা প্রিয়বস্তু ব্যয় না করে অপ্রিয় বস্তু ব্যয় করে পরিপূর্ণ কল্যাণ লাভ করতে পারবেনা। এই জবাবের সারমর্ম হলো এই যে, প্রিয়বস্তু দান করলে কল্যাণ অর্জন হবে। আর অপ্রিয় বস্তু দান করলে কল্যাণ অর্জন হবে না। তবে আয়াতে একথার প্রমাণ নেই যে, সর্বপ্রকার কল্যাণ অর্জন প্রিয় বস্তুদান করার মধ্যে সীমিত এবং অন্যান্য নির্দেশিত কার্যাবলি পালন করণে কল্যাণ অর্জন হবে না। তখন ব্যয় করতে অক্ষম গরিবের জন্য নেককার হওয়া এবং অন্যান্য আমলের মাধ্যমে আল্লাহর কল্যাণ লাভে ধন্য হওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই। অনেক সময় মাল দান করার মাধ্যমে কল্যাণ লাভের তুলনায় অন্যান্য নেক আমলের মাধ্যমে অধিক কল্যাণ লাভ হয়ে থাকে। তাই তো ওলামাদের গ্রহণযোগ্য মতানুসারে ধৈর্যধারণকারী গরিব শুকুর গুজার ধনী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। -[তাফসীরে রূহুল মা'আনী খ. ৩, পৃ. ২২৩]

قَوْلُهُ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ : অর্থাৎ তোমরা কোন জিনিস ব্যয় করছ, তা উত্তম না অনুত্তম, প্রিয় না অপ্রিয়, ভালো না মন্দ আল্লাহ পাক এ ব্যাপারে অবগত আছেন। তাই সে অনুপাতেই তোমাদেরকে প্রতিদান দিবেন। আল্লাহ যেহেতু সহীহ ও ভেজাল নিয়ত সম্পর্কে অবগত, তাই মুখে বলার কোনো ফায়দা নেই। আল্লামা আলুসী (র.) বলেছেন, فَإِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ বলে গোপনীয় ভাবে সদকা-খয়রাত করার দিকে উৎসাহ দানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ .... الخ : অর্থাৎ সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্য বনী ইসরাঈলের জন্য হালাল ছিল। অর্থাৎ ইহুদিগণ যে সকল বস্তু হারাম হওয়ার কথা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি সম্পর্ক করত। সে সব বস্তুর সবটাই বনী ইসরাঈলের জন্য হালাল ছিল। ঢালাও ভাবে সর্ব প্রকার খাদ্যবস্তু হালাল হওয়ার কথা বলা হয়নি যে, শুকর ও মৃত প্রাণির গোশত হালাল ছিল বলতে হবে। তবে হালাল বস্তু সমূহের মধ্য হতে হযরত ইয়াকূব (আ.) তাওরাত নাজিলের পূর্বে বিশেষ কারণে তাঁর নিজের উপর উটের গোশত ও দুধ হারাম করে নিয়েছিলেন। ফলে তাঁর উম্মতের জন্যও তা হারাম ঘোষিত হয়ে যায়। হে ইহুদিগণ! যদি তোমরা তোমাদের দাবিতে উটের গোশত ও দুধ নূহ ও ইবরাহীমের যুগ থেকে এ পর্যন্ত হারাম হিসেবে চলে আসার দাবিতে সত্যবাদী হও তাহলে তাওরাত নিয়ে এসো এবং পাঠ করে দেখাও। কিন্তু তারা সেই চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে গিয়ে তাওরাত এনে দেখায়নি। এতে প্রমাণিত হলো, তারা তাদের দাবিতে মিথ্যাবাদী। অতএব যারা নিজেদের মিথ্যা প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার পরও আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যারোপ করে যে, আল্লাহ পাক হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আমল থেকে উটের মাংস হারাম করেছেন, তারা বড়ই অত্যাচারী, সীমালঙ্ঘনকারী। হে রাসূল! আপনি বলে দিন, আল্লাহ তা'আলা সত্য বলেছেন। সুতরাং তোমরা এখন ইবরাহীমের ধর্মের তথা ইসলামের অনুসারী হয়ে যাও, যাতে সামান্যতম বক্রতাও নেই। তিনি [ইবরাহীম (আ.)] মুশরিক ছিলেন না।

আয়াতের যোগসূত্র : বহুদূর থেকে আহলে কিতাব তথা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সম্পর্কে আলোচনা চলে আসছিল। তাদের বিভিন্ন বিতর্ক অভিযোগের জবাব দেওয়া হচ্ছিল। এখানে সেই ধারাবাহিকতায়ই ইহুদিদের এক অভিযোগের জবাব দেওয়া হয়েছে।

আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) পূর্বের আয়াতের সাথে যোগসূত্র বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, প্রথম আয়াতে প্রিয় বস্তু ব্যয় করার আলোচনা ছিল। আর আলোচ্য আয়াতে হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর প্রিয়বস্তু ত্যাগ করার কথা উল্লেখ হয়েছে। এভাবে আয়াত দুটির মধ্যে খুবই সূক্ষ্ম সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে গেছে। -[মা'আরিফ ইদ্রিসিয়া খ. ২, পৃ. ৪]

শানে নুযূল : আল্লামা আলূসী কলবী থেকে ওয়াহেদীর বর্ণনা নকল করেছেন যে, নবী করীম ﷺ যখন বললেন, আমি মিল্লাতে ইবরাহীম তথা ইবরাহীমের ধর্মের উপর রয়েছি। তখন ইহুদিরা অভিযোগ করে বলল, তা কেমন করে হবে? আপনি তো উটের গোশত ও দুধ খান, অথচ ইবরাহীমের ধর্মে তা হারাম ছিল। হুজুর ﷺ বললেন, ইবরাহীমের জন্য তা হালাল ছিল তাই আমরাও হালাল বিশ্বাস করি। তা শুনে ইহুদিরা বলল, আমরা আজ যে সকল বস্তুকে হারাম মনে করছি সেগুলো হযরত নূহ ও ইবরাহীম (আ.)-এর আমল থেকে হারাম হিসেবে চলে আসছে। তাদের এ কথার প্রতিবাদে এবং তাদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার লক্ষ্যে আল্লাহ পাক كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ .... الخ আয়াতটি নাজিল করেছেন।

-[তাফসীরে রূহুল মা'আনী- খ. ৪ পৃ. ২]

মূলত তারা নসখ বা রহিত করণের অস্বীকারকারী ছিল। তাই তাদের প্রতিবাদে এ আয়াত রহিত করণের ঘোষণা নিয়ে নাজিল হয়েছে যে, হালাল বস্তুকে হারাম করে নেওয়াটা তো রহিত করণের মাধ্যমেই হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে যে, সমস্ত খাদ্যদ্রব্য হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাঁর উম্মতের জন্য হালাল ঘোষণা করেছেন, তা বনী ইসরাঈলের জন্যও হালাল ছিল। শুধু যে খাদ্য দ্রব্য হযরত ইয়াকূব (আ.) স্বেচ্ছায় নিজের উপর যা হারাম করে নিয়েছিলেন, তা ব্যতীত সব খাদ্যদ্রব্যই তাদের জন্য হালাল ছিল।

হযরত ইয়াকুব (আ.) নিজের উপর উট হারাম করে নেওয়ার কারণ : হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর عِرْقُ النَّسَا [ইরকুন নাসা] বা সাইটিকা রোগ দেখা দিয়েছিল। আর ইরকুন নাসা রোগ উরুর রগের মধ্যে এক রকম ব্যাধি হয়, এ রোগটি নিতম্ব বা পাছা থেকে উরু পর্যন্ত আসে। ঐ রোগে যে ব্যক্তি আক্রান্ত হয় ক্রমান্বয়ে তাঁর পা শুকিয়ে সে লেংড়া হয়ে পড়ে। ঐ রোগে যখন হযরত ইয়াকূব (আ.) আক্রান্ত হলেন, তখন তিনি মানত করলেন, আল্লাহপাক যদি আমাকে সুস্থ করেন তাহলে আমি আমার প্রিয় খাবার বর্জন করে নিব। আর তাঁর প্রিয় খাবার ছিল উটের গোশত ও তাঁর দুধ। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সুস্থতা দান করলে তিনি তাঁর মানত অনুযায়ী নিজের উপর উটের গোশত খাওয়া এবং তার দুধ পান করা হারাম করে নেন। ভিন্ন এক রেওয়ায়েতে এসেছে যে, আমি যদি সুস্থ হই তবে আমার খাতিরে আমার উম্মতের উপরও উটের গোশত ও দুধ হারাম হয়ে যাবে। মোটকথা তিনি তাঁর মানত পুরা করতে নিজের উপর ইজতেহাদী ভাবে বা জাহেদগণের ন্যায় মনের বিরোধিতা করতে গিয়ে উটের গোশত ও তার দুধ নিজের উপর হারাম করে নিয়েছিলেন। তাকেই আল্লাহ তা'আলা اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَائِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ الخ বলে উল্লেখ করেছেন।

মাসআলা : হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর শরিয়তে হালাল বস্তুকে নজর মানত করে হারাম করে নেওয়ার অনুমতি ছিল। তাই তিনি এরূপ করেছিলেন। যেরূপ আমাদের শরিয়তে মুহাম্মদীতে হালাল বস্তুকে নজর মানত করে নিজের উপর ওয়াজিব করে নেওয়ার বিধান রয়েছে। তবে আমাদের শরিয়তে কোনো হালাল বস্তুকে নজর-মানত বা কসমের মাধ্যমে হারাম করে নেওয়ার অনুমতি নেই। হুজুর ﷺ মধু বা আপন বাদী মারিয়াকে বিবিদের খুশি করার উদ্দেশ্যে কসম করে নিজের উপর হারাম করে নিয়েছিলেন, ফলে এর অসমর্থনে আল্লাহ পাক সূরা তাহরীমে নাজিল করেন, لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ الخ হে নবী ! আপনি আপনার স্ত্রীদের খুশি করার জন্য আল্লাহর হালালকৃত বস্তুকে কেন হারাম করেছেন? এতে প্রমাণিত হলো, আমাদের শরিয়তে হালালকে হারাম করে নেওয়ার অনুমতি নেই।

عِرْقُ النَّسَا বা সাইটিকা রোগের চিকিৎসা : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন, আমি রাসূল ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, একটা গ্রাম্য বকরির একটা নিতম্ব বা পাছা নিয়ে একে জ্বালিয়ে গলানো যাবে। অতঃপর তিন অংশ করে প্রতিদিন একাংশ সকালে বাসিমুখে পান করে নিবে। এর মাধ্যমে ইরকুন নাসা ব্যাধি দূর হয়ে যাবে।

অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে যে, হুজুর ﷺ বলেছেন, একটি আরবি মধ্যম ধরনের বকরির পাছা নিয়ে তাকে কেটে ছোট ছোট টুকরা করা হবে। অতঃপর পাছাটির হাড্ডির গলিত মগজ বের করা হবে। তারপর তিন অংশ করে প্রতিদিন খালি পেটে বাসিমুখে এক অংশ করে খেয়ে নিবে। হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি এ চিকিৎসাটি এক শতাধিক রোগীকে বলে দিয়েছি, তারা সবাই আল্লাহর হুকুমে সুস্থ হয়েছে। -[তাফসীরে কুরতুবী খ. ৪, পৃ. ১৩৩- হাশিয়াতুস সাবী, খ. ১, পৃ. ১৬৮]

اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَائِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ .... الخ তাওরাত নাজিল হওয়ার পূর্বে হযরত ইয়াকূব (আ.) উল্লিখিত বস্তু ছাড়া অন্য কিছু নিজের জন্য এবং বনী ইসরাঈলের জন্য হারাম করেননি। তবে তাওরাত নাজিল হওয়ার পর তাওরাত তাদের জুলুম, অন্যায়, অনাচার ও কুফরের কারণে তাদের শাস্তি হিসেবে আরো কিছু খাদ্যদ্রব্য তাদের উপর হারাম করে দেওয়া হয়েছিল। যেমন ইরশাদ হয়েছে-

فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا ـ وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِىْ ظُفُرٍ ـ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ ـ (اَلنِّسَاءُ ـ ١٦٠) ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَاِنَّا لَصَادِقُوْنَ ـ (اَلْاَنْعَامُ ـ ١٤٦)

প্রভৃতি আয়াতে শাস্তিমূলকভাবে তাদের উপর হালাল বস্তু হারাম করে দেওয়ার কথা বিবৃত হয়েছে।

-[তাফসীরে কুরতুবী খ. ৪, পৃ. ১৩৩]

অনুবাদ :

٩٦. وَنَزَلَ لَمَّا قَالُوا قِبْلَتُنَا قَبْلَ قِبْلَتِكُمْ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ مُتَعَبَّدًا لِلنَّاسِ فِى الْاَرْضِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ بِالْبَاءِ لُغَةٌ فِىْ مَكَّةَ سُمِّيَتْ بِذٰلِكَ لِاَنَّهَا تَبُكُّ اَعْنَاقَ الْجَبَابِرَةِ اَىْ تَدُقُّهَا بِنَاهُ الْمَلٰئِكَةُ قَبْلَ خَلْقِ اٰدَمَ وَوُضِعَ بَعْدَهُ الْاَقْصٰى وَبَيْنَهُمَا اَرْبَعُوْنَ سَنَةً كَمَا فِىْ حَدِيْثِ الصَّحِيْحَيْنِ وَفِىْ حَدِيْثٍ اَنَّهُ اَوَّلُ مَا ظَهَرَ عَلٰى وَجْهِ الْمَاءِ عِنْدَ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ زُبْدَةً بَيْضَاءَ فَدُحِيَتِ الْاَرْضُ مِنْ تَحْتِهِ مُبٰرَكًا حَالٌ مِنَ الَّذِىْ اَىْ ذَا بَرَكَةٍ وَهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ لِاَنَّهُ قِبْلَتُهُمْ .

৯৬. আর সামনের আয়াতটি ওই সময় নাজিল হয় যখন ইহুদিরা বলেছিল যে, আমাদের কিবলা [বায়তুল মুকাদ্দাস] তোমাদের কিবলার [কা'বার] পূর্বেকার [ঘর]। নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা উপাসনালয় হিসেবে মানুষের জন্য পৃথিবীতে নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই হচ্ছে ঐ ঘর যা বাক্কায় অবস্থিত। মক্কার এক লোগাত بَكَّةَ -ও রয়েছে, با বর্ণের জবরের সাথে। বাক্কাকে এই জন্য বাক্কা (بَكَّةَ) বলে যে, بَكَّةَ অর্থ ভেঙ্গে দেওয়া, গুড়িয়ে দেওয়া। যেহেতু বাক্কা তাকে ধ্বংসকারী বড় বড় জালেমদের গর্দান ভেঙ্গে দেয় ও গুড়িয়ে ফেলে, এই জন্য তাকে বাক্কা বলে নামকরণ করা হয়েছে। আদম (আ.) সৃষ্টির পূর্বে এ ঘরটি ফেরেশতাগণ নির্মাণ করেছিলেন। অতঃপর মসজিদে আকসা নির্মিত হয়েছে। ঘর দুটি নির্মাণের মধ্যে চল্লিশ বৎসরের ব্যবধান রয়েছে। যেরূপ বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে এসেছে। অন্য আরেকটি হাদীসে এসেছে যে, আকাশসমূহ এবং জমিন সৃষ্টিকালে পানির পৃষ্ঠের উপর সাদা ফেনার ন্যায় যে বস্তুটি প্রকাশিত হয়েছিল তাই কাবা ছিল। অতঃপর জমিনকে তার নীচ থেকে বিস্তৃত করা হয়েছে।

লোকদের জন্য বরকতময় (مُبَارَكًا) শব্দটি اَلَّذِىْ ইসমে মাওসূল থেকে তারকীবের মধ্যে হাল হয়েছে। এবং বিশ্ববাসীর জন্য পথ প্রদর্শক। কারণ মক্কা তাদের সকলেরই কিবলা।

٩٧. فِيْهِ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ مِنْهَا مَقَامُ اِبْرٰهِيْمَ اَىِ الْحَجَرُ الَّذِىْ قَامَ عَلَيْهِ عِنْدَ بِنَاءِ الْبَيْتِ فَاَثَّرَ قَدَمَاهُ فِيْهِ وَبَقِىَ اِلَى الْاٰنِ مَعَ تَطَاوُلِ الزَّمَانِ وَتَدَاوُلِ الْاَيْدِىْ عَلَيْهِ وَمِنْهَا تَضْعِيْفُ الْحَسَنَاتِ فِيْهِ وَاَنَّ الطَّيْرَ لَا يَعْلُوْهُ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا لَا يَتَعَرَّضُ لَهُ بِقَتْلٍ اَوْ ظُلْمٍ اَوْ غَيْرِ ذٰلِكَ .

৯৭. তাতে প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মাকামে ইবরাহীম। অর্থাৎ ঐ পাথর যার উপর হযরত ইবরাহীম (আ.) কাবাগৃহ নির্মাণকালে দাঁড়াতেন। তাঁর উভয় পায়ের চিহ্ন অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও এবং লোকদের হাতে বারংবার স্পর্শ করার পরও অদ্যাবধি তা অক্ষুণ্ন রয়েছে। এই নিদর্শনসমূহের আরেকটি হলো, তাতে কৃত পুণ্য কাজের ছওয়াব অধিক হওয়া এবং কোনো পাখিও এ গৃহের উপর দিয়ে অতিক্রম করতে পারে না। আর যে ব্যক্তি এ ঘরে প্রবেশ করে সে নিরাপদ হয়ে যায় হত্যা বা জুলুম প্রভৃতির জন্য তার থেকে প্রতিশোধ নেওয়া হয় না।

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وَاجِبٌ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَفَتْحِهَا لُغَتَانِ فِىْ مَصْدَرِ الْحَجِّ بِمَعْنَى قَصَدَ وَيُبْدَلُ مِنَ النَّاسِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا طَرِيْقًا فَسَّرَهُ ﷺ بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ وَمَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ اَوْ بِمَا فَرَضَهُ مِنَ الْحَجِّ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ اَلْاِنْسِ وَالْجِنِّ وَالْمَلَائِكَةِ وَعَنْ عِبَادَتِهِمْ ـ

আর আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্টি লাভের জন্য এ ঘরের হজ করা লোকদের জন্য আবশ্যকীয়। حَجٌّ -এর মাসদার বা ক্রিয়ামূলের মধ্যে حَا বর্ণের যবর ও যের বিশিষ্ট হওয়া স্বতন্ত্র দুটি লোগাত। حَجٌّ অর্থ قَصْد অর্থাৎ ইচ্ছা ও সংকল্প করা। যারা ঐ ঘর পর্যন্ত ভ্রমণের সামর্থ্য রাখে। (مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا) পূর্বোক্ত اَلنَّاس শব্দ হতে বদল হয়েছে। سَبِيْلًا অর্থ طَرِيْقًا [রাস্তা, পথ] পথের সামর্থ্যের ব্যাখ্যা রাসূলুল্লাহ ﷺ পথ খরচ ও ভ্রমণের বাহন [খরচ] দ্বারা করেছেন। এই হাদীসটি হাকেমসহ প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন। আর যে ব্যক্তি অস্বীকার করে অথবা তার উপর ফরজকৃত হজের অস্বীকার করে, তার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ বিশ্ববাসীর মুখাপেক্ষী নন অর্থাৎ জিন, মানব ও ফেরেশতাকুল ও তাদের ইবাদতের তিনি অমুখাপেক্ষী।

তাহকীক ও তারকীব

بَكَّةَ [বাক্কা] দ্বারা এখানে মক্কাই উদ্দেশ্য। একদল ওলামা বলেছেন, বাক্কা ও মক্কা একই বস্তুর দুই নাম। কেননা بَا আর মীম উচ্চারণ স্থলের প্রেক্ষিতে কাছাকাছি সম্পর্ক রাখে। যেমন– مِيْم -রাতেব - هٰذَا دَائِمٌ ـ ضَرْبَةُ لَازِمٌ -এর ক্ষেত্রে যথাক্রমে رَاتِبٌ ও هٰذَا دَائِبٌ ـ ضَرْبَةُ لَازِبٌ বলা হয়ে থাকে। এখানে ও مَكَّةَ -এর বদলে بَكَّةَ বলা হয়েছে। আল্লামা সুয়ূতী (র.) এ মতটিরই অনুসরণ করেছেন। বাক্কার নামকরণ সম্পর্কে সুয়ূতী (র.) বলেছেন যে, বাক্কা শব্দের অর্থ হলো ভেঙ্গে ফেলা, গুঁড়িয়ে ফেলা। যে কোনো জালিম বাদশা আল্লাহর ঘরের প্রতি আক্রমণ করতে চাইলে, এ ঘরের প্রতি বক্র ভাবে অশনি দৃষ্টিতে তাকালে, আল্লাহ পাক তার গর্দানকে ভেঙ্গে দেন এবং কালো হাতকে গুঁড়িয়ে দেন। তাই এই ঘরকে মক্কা বা বাক্কা বলা হয়ে থাকে।

* ভিন্ন মতে, বাক্কা শব্দের আরেক অর্থ হলো ভিড় করা। বলা হয় تَبَاكَ الْقَوْمُ অর্থাৎ লোকেরা পরস্পর ভিড় করেছে। তাই সাঈদ ইবনে জুবাইর বলেছেন মক্কাকে এই জন্যই বাক্কা বলা হয় যে, (لِاَنَّهُمْ يَتَبَاكُوْنَ فِيْهَا اَىْ يَزْدَحِمُوْنَ فِى الطَّوَافِ) লোকেরা তওয়াফ কালে এত ভিড় করে থাকে।
* আর مَكَّةَ শব্দটির অর্থ হয়েছে দূর করা। যেহেতু মক্কা লোকদের গোনাহকে দূর করে দেয়, তাই একে মক্কা বলা হয়। বলা হয় اُمْتُكَ الْفَصِيْلُ ضَرْعَ اُمِّهِ اِذَا امْتَصَّ مَا فِيْهِ – উটনীর বাচ্চা তার মায়ের স্তন হতে পৃথক হয়ে পড়েছে, যখন সে স্তনের দুধ চুষে শেষ করে নিয়েছে।
* মক্কার আরেকটি অর্থ হলো আকর্ষণ করা, টানা। মক্কা যেহেতু সমগ্র মানব গোষ্ঠীকে তার দিকে চুম্বকের ন্যায় আকৃষ্ট করে, তাই একে মক্কা বলা হয়। যেমন বলা হয়– اُمْتُكَ الْفَصِيْلُ اِذَا اسْتَقْصَى مَا فِى الضَّرْعِ
* মক্কা শব্দের আরেক অর্থ হলো পানি শুকিয়ে যাওয়া। যেমন– سُمِّيَتْ مَكَّةُ لِقِلَّةِ مَائِهَا كَاَنَّ اَرْضَهَا اُمْتُكَ مَائُهَا
* ভিন্ন আরেকদল ওলামা মক্কা ও বক্কার মধ্যে পার্থক্য ও প্রভেদ বর্ণনা করেছেন। ১. তাদের কেউ বলেন, বাক্কা হলো মসজিদে হারামের নাম, আর মক্কা হলো পূর্ণ শহরের নাম। ২. আর তাদের অধিকাংশরা বলেন, মক্কা হলো মসজিদে হারাম ও মাতাফের নাম। আর বাক্কা হলো পূর্ণ শহরের নাম। –[তাফসীরে কাবীর খ. ৮, পৃ. ১৬১-৬২]
* হযরত ইকরামা (রা.) বলেছেন, বায়তুল্লাহ ও তার আশপাশ হলো বাক্কা,. আর এ ছাড়া বাকি সম্পূর্ণ শহরটাই মক্কা। ইবনে শিহাব যুহরী বলেন, বায়তুল্লাহ ও মসজিদে হারাম হলো বাক্কা আর পূর্ণ হারাম শরীফ হচ্ছে মক্কা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, ফজ্জ হতে তানঈম পর্যন্ত হলো মক্কা, আর বায়তুল্লাহ হতে বাতহা পর্যন্ত হচ্ছে বাক্কা। মুজাহিদ (র.) বলেন, বাক্কা হলো কা'বা, আর কাবার চতুর্পাশ হলো মক্কা। –[দূররে মানুছূর খ. ২, পৃ. ৫৩]

اَلْحَجّ -এর শাব্দিক অর্থ হলো ইচ্ছা করা সংকল্প করা। এখানে حَجّ শব্দের জীমে যবর ও পড়া যাবে, এবং حِجّ যের ও পড়া যেতে পারে। **উভয়টাই** প্রসিদ্ধ কেরাতে সাব্‌আর অন্তর্ভুক্ত। আর পরিভাষায় হজ বলা হয় هُوَ الْقَصْدُ فِيْ اَشْهُرٍ مَعْلُوْمَاتٍ কে। سَبِيْلًا রাস্তা, পথ, বহুবচনে سُبُلٌ। এখানে اِسْتِطَاعَةً মুযাফ উহ্য রয়েছে। **অর্থাৎ** اِسْتِطَاعَةَ السَّبِيْلِ যার ব্যাখ্যা হাদীস শরীফে এসেছে زَادٌ পথ খরচ رَاحِلَةٌ যাতায়াত খরচ এর সাথে।

اَسْمَاءُ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ [পবিত্র মক্কার নামসমূহ] : পবিত্র মক্কার অনেক নাম রয়েছে, যথা – ১. مَكَّةُ [মক্কা] ২. بَكَّةُ [বাক্কা] ৩. اَلْبَيْتُ الْعَتِيْقُ [আল-বাইতুল আতীক] ৪. اَلْبَيْتُ الْحَرَمُ [আল-বায়তুল হারাম] ৫. اَلْبَلَدُ الْاَمِيْنُ [আল-বালাদুল আমীন] ৬. اَلْمَامُوْنُ [আল-মামুন] ৭. اُمُّ الرَّحِيْمِ [উম্মুর রাহীম] ৮. اُمُّ الْقُرٰى [উম্মুল কুরা] ৯. صَلَاحٌ [সালাহ] ১০. اَلْعَرْشُ [আল-আরশ] ১১. اَلْقَادِسُ [আল-কাদিস] ১২. اَلْمُقَدَّسُ [আল-মুকাদ্দাস] ১৩. اَلنَّبَاسَةُ [আন্-নাবাসা] ১৩. اَلْحَاطِمَةُ - [আল-হাতিমা] ১৫. اَلْبَنَاسَةُ - [আল-বানাসা] ১৬. اَلرَّأْسُ [আর-রাস] ১৭. كُوْثَاءُ [কুরছা] ১৮, اَلْبَلْدَةُ [আল-বালদা] ১৯. اَلْبَنِيَّةُ [আল-বিনয়াহ] ২০. اَلْكَعْبَةُ [আল-কাবা]। –[জালালাইন খ. ১, পৃ. ৫১৪]

তারকীব : اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ মুবতাদা لِلَّذِيْ بِبَكَّةَ খবর, مُبَارَكًا - اَلَّذِيْ থেকে হাল, অথবা مُبَارَكًا ও هُدًى উভয়টাই وُضِعَ এর যমীর থেকে হাল হয়েছে। وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ পূর্বোক্ত খবর, আর حِجُّ الْبَيْتِ পরে উক্ত মুবতাদা। مَقَامُ اِبْرَاهِيْمَ মুবতাদা, এর খবর مِنْهَا উহ্য আছে। অথবা مَقَامُ اِبْرَاهِيْمَ . اَحَدُهَا উহ্য মুবতাদার খবর।

–[জামালাইন, তাফসীরে হক্কানী, হাশিয়াতুস সাবী]

مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا — وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ -এর اَلنَّاسُ হতে بَدَلُ الْبَعْضِ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের যোগসূত্র : اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِيْ بِبَكَّةَ বলে আল্লাহ তা'আলা ইহুদিদের তরফ থেকে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নবুয়ত তথা দীনে ইসলামের উপর আরোপিত আরেকটি অভিযোগের জবাব দান করেছেন। নবী করীম ﷺ যখন আল্লাহর নির্দেশে বায়তুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তে বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে কিবলা পরিবর্তন করে নিলেন। তখন ইহুদিরা হুজুর ﷺ -এর নবুয়তের উপর অভিযোগ, আপত্তি ও সমালোচনা করতে শুরু করে দিল। আর তারা বলতে লাগল, বায়তুল মুকাদ্দাস কাবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং বায়তুল মুকাদ্দাসকেই কিবলা বানানো উচিত। কারণ এটা বরকতময় স্থান। এটাই হবে হাশরের স্থান, অনেক নবীগণের সমাধিস্থান, এবং পূর্ববর্তী সকল নবীদের এটাই কিবলা। সুতরাং এসব কিছুর পরও বায়তুল মুকাদ্দাসকে বাদ দিয়ে কাবাকে কিবলা বানানো মোটেই ঠিক নয়। তাদের এ অভিযোগের প্রতিবাদ ও খণ্ডন করতে গিয়ে আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। ইরশাদ হয়েছে, কাবাই বিশ্বের সর্ব প্রথম ঘর বা উপাসনার জন্য সর্বপ্রথম নির্মিত ঘর [মসজিদ]। তাই কাবাই বায়তুল মুকাদ্দাস হতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম। সুতরাং তাকে কিবলা বানানোটাই উত্তম হওয়ার কথা।

–[তাফসীরে কাবীর খ. ৮, পৃ. ১৫৬]

আল্লামা আলূসী (র.) বলেন, আল্লাহ পাক পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদেরকে মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর বায়তুল্লাহ শরীফের প্রতি সম্মান প্রদর্শন মিল্লাতে ইবরাহীমেরই আমল। সুতরাং সমীচীন হলো এরপর বায়তুল্লাহ শরীফ তার ফজিলত শ্রেষ্ঠত্বের কথা আলোচনা করা। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী খ. ৪, পৃ. ৪]

আয়াতের শানে নুযূল : ইবনুল মনজির ইবনে জুরাইজের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইহুদিরা বলেছিল বায়তুল মুকাদ্দাস কাবা শরীফ থেকে শ্রেষ্ঠ। কেননা বায়তুল মুকাদ্দাস বহু নবীর হিজরতের স্থান। আর তা পবিত্র ভূমিতে অবস্থিত। আর মুসলমানগণ বলেছিলেন কাবা শরীফ শ্রেষ্ঠ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে যখন এসব কথার বিবরণ পৌছে তখন اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ থেকে مَقَامُ اِبْرَاهِيْمَ পর্যন্ত নাজিল হয়।

–[তাফসীরে রূহুল মা'আনী খ. ৪, পৃ. ৪]

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ الخ অর্থাৎ আল্লাহ পাকের ইবাদতের উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে যে ঘরটি নির্মাণ করা হয়েছে, তা এ মক্কার বুকে অবস্থিত, যা বরকতময় এবং বিশ্ববাসীর জন্য পথের দিশারী।

কাবাগৃহ সর্বপ্রথম ঘর হওয়ার মর্ম : কাবাগৃহ পৃথিবীর সর্ব প্রথম ঘর কথাটির দুটি অর্থ হতে পারে।

এক: বসবাসের জন্য হোক বা উপাসনার জন্য হোক সর্বপ্রথম ঘর পৃথিবীতে যা নির্মাণ করা হয়েছিল তা হচ্ছে কাবাগৃহ। এর পূর্বে বিশ্বে আর কোনো রকম ঘর নির্মিত হয়নি। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, মুজাহিদ, কাতাদা, ও সুদ্দী প্রমুখ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মতে কাবাই পৃথিবীর সর্বপ্রথম ঘর।

দুই: ইবাদত বন্দেগীর জন্য নির্মিত ঘর হিসেবে সর্বপ্রথম গৃহ। মানুষের বসবাসের জন্য এর পূর্বে ও ঘর থাকতে পারে। তবে কাবাকে প্রথম গৃহ ফজিলতের প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে। হযরত আলী (রা.)-সহ কিছু সংখ্যক আলেম এ মতটাই পোষণ করেছেন।

হযরত আবূ জর (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাস করা হলো, উভয় ঘর নির্মাণে কতটুকু সময়ের ব্যবধান ছিলো? জবাবে হুজুর ﷺ বললেন, চল্লিশ বৎসরের। –[বুখারী ও মুসলিম]

এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, মসজিদে হারাম নির্মাতা হলেন, হযরত ইবরাহীম (আ.)। আর বায়তুল মুকাদ্দাসের নির্মাতা হলেন, হযরত দাউদ ও সুলাইমান (আ.)। তারা উভয়ের ও ইবরাহীমের নির্মাণের কালের ব্যবধান চল্লিশ বৎসরের চেয়ে অনেক বেশি।

১. এর এক জবাব হলো এই যে, ইবরাহীম (আ.) যেরূপ বায়তুল্লাহ নির্মাতা তেমনিভাবে বায়তুল মুকাদ্দাসেরও নির্মাণকারী। তিনি বায়তুল্লাহর নির্মাণ করার চল্লিশ বৎসর পর বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করেন।

২. বায়তুল মুকাদ্দাসকে দাউদ ও তাঁর ছেলে সুলাইমানের পূর্বে হয়তো, অন্যকোনো নবী নির্মাণ করেছিলেন, অতঃপর তাঁরা উভয়ে তাঁর পরে নির্মাণ করেন। সুতরাং চল্লিশ বৎসরের ব্যবধান সেই নবীর নির্মাণ কালের প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী খ. ৪ পৃ. ৪-৫]

৩. শায়খ আহমদ সাবী মালেকী (র.) বলেন, বাহ্যিক ভাবে ফেরেশতাগণ কর্তৃক বায়তুল্লাহ নির্মাণর মধ্যেও বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণের মধ্যে চল্লিশ বৎসরের ব্যবধান বুঝা গেলেও তা ঠিক নয়। বরং হযরত আদম (আ.) বায়তুল্লাহ শরীফ নির্মাণের চল্লিশ বৎসর পর বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করেন। –[হাশিয়াতুস সাবী খ. ১, পৃ. ১৬৯]

৪. আল্লামা কুরতুবী (র.) বলেন, হযরত ইবরাহীম ও সুলাইমান (আ.)-এর মধ্যে সহস্রাধিক বৎসরের ব্যবধান। সুতরাং হাদীসে আরোপিত প্রশ্নের জবাবে একথা বলা যেতে পারে যে, হয়তো হযরত ইবরাহীম ও হযরত সুলাইমান (আ.) ব্যতীত অন্য কোনো পয়গাম্বর গৃহ দুটির ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন। আর তাঁরা উভয় এসে এর পুনঃ নির্মাণ করেছেন। সুতরাং ঐ পূর্বের নবীর নির্মাণ বা ভিত্তি স্থাপনের প্রেক্ষিতে কাবার চল্লিশ বৎসর পর বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মিত হয়েছিল। তিনি একথাও বলেন যে, ফেরেশতা কর্তৃক বায়তুল্লাহ নির্মাণের চল্লিশ বৎসর পর বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মিত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। –[তাফসীরে কুরতুবী খ. ৪, প. ১৩৪–৩৫]

বায়তুল্লাহ নির্মাণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস :

১. আল্লামা আলূসী (র.) বলেন, কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এসেছে যে, বায়তুল্লাহ শরীফ সর্ব প্রথম আল্লাহর ফেরেশতাগণ নির্মাণ করেন। আর তাঁরা একে হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টির দুই হাজার বৎসর পূর্বে নির্মাণ করেছিলেন।

২. দ্বিতীয় বার কাবা নির্মিত হয়েছে, হযরত আদম (আ.)-এর মাধ্যমে। হযরত আদম (আ.) হলেন, প্রথম মানব আর বায়তুল্লাহ হচ্ছে পৃথিবীতে নির্মিত প্রথম ঘর।

৩. অতঃপর তৃতীয় পর্যায়ে আদমের পুত্র হযরত শীস (আ.) এই ঘরটিকে মাটি ও পাথর দ্বারা নির্মাণ করেন। হযরত নূহ (আ.)-এর জমানা পর্যন্ত তাঁর নির্মিতা কাবা রয়েছিল। অতঃপর হযরত নূহ (আ.)-এর যুগে বিশ্বব্যাপী প্লাবনের পরে কাবাগৃহ নষ্ট হয়ে যাওয়ার দরুন হযরত শীস (আ.) একে নির্মাণ করেন। এক বর্ণনা অনুযায়ী এই মহা বন্যার সময় আল্লাহ পাক কাবা গৃহকে আবূ কুবাইস পাহাড়ে উঠিয়ে নিয়ে হেফাজত করে রেখে দিয়েছিলেন।

৪. চতুর্থবার হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ইঞ্জিনিয়ারির মাধ্যমে হযরত ইবরাহীম (আ.) নির্মাতা হয়ে কাবা গৃহ নির্মাণ করেন। হযরত ইসমাঈল ও ইসহাক (আ.) সহায়তা করেছিলেন।

৫. পঞ্চমবার কাবাগৃহ নির্মাণ করেন আমালেকা সম্প্রদায়ের লোকেরা। আর তারা ছিলেন আমালিক ইবনে সাম ইবনে নূহ (আ.)-এর আওলাদ, তারা ছিলেন তখনকার রাজা বাদশাহ।

৬. **ষষ্ঠবার বায়তুল্লাহ শরীফ** নির্মাণ করেন জুরহাম গোত্রীয় লোকেরা। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন হারিস বিন **মিযাযে আসগর।**

৭. **সপ্তমবার কাবা নির্মাণ** করেন হুজুর ﷺ-এর পঞ্চম ঊর্ধ্বতন দাদা কুসাই।

৮. **অষ্টমবার কাবা গৃহ নির্মাণ** করেন কুরাইশগণ। তখনকার নির্মাণে হুজুর ﷺ ও অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তখন তাঁর বয়স **ছিল পঁয়ত্রিশ বৎসর।** আর তখন তিনিই হাজরে আসওয়াদ স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু কুরাইশদের এ নির্মাণের ফলে হযরত **ইবরাহীম (আ.)** -এর ভিত্তি সামান্য পরিবর্তিত হয়ে যায়।

প্রথমত কাবার একটি অংশ 'হাতীম' কাবা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়ত হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর নির্মাণে কাবা গৃহের দরজা ছিল দুইটি, একটি প্রবেশের জন্য এবং অপরটি **প্রশ্চাৎমুখী** হয়ে বের হওয়ার জন্য। কিন্তু কুরাইশগণ শুধু পূর্ব দিকে একটি দরজা রাখে।

তৃতীয়ত তারা সমতল ভূমি থেকে অনেক উঁচুতে দরজা নির্মাণ করে যাতে সবাই সহজে ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে। বরং তারা যাকে অনুমতি দেয় সেই যেন প্রবেশ করতে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার হযরত আয়েশা (রা.) কে বললেন, আমার ইচ্ছা হয় কাবা গৃহের বর্তমান নির্মাণ ভেঙ্গে দিয়ে ইবরাহীমী নির্মাণের অনুরূপ করে দেই। কিন্তু কাবাগৃহ ভেঙ্গে দিলে নও-মুসলিম অজ্ঞলোকদের মনে ভুল বুঝাবুঝি দেখা দেওয়ার আশঙ্কার কথা চিন্তা করেই বর্তমান অবস্থা বহাল রাখছি। এ কথা বার্তার কিছুদিন পরেই মহানবী ﷺ দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

৯. নবমবার কাবা গৃহ নির্মাণ করেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা.) হযরত আয়েশা (রা.) -এর ভাগ্নে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা.) মহানবী ﷺ-এর উপরিউক্ত ইচ্ছা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের পর যখন মক্কার উপর তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তিনি উক্ত ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করেন এবং কাবা গৃহের নির্মাণ ইবরাহীমী নির্মাণের অনুরূপ করে দেন। কিন্তু মক্কার উপর তার কর্তৃত্ব বেশিদিন টিকেনি। অত্যাচারী হাজ্জাজ বিন ইউসূফ মক্কায় সৈন্যাভিযান চালিয়ে তাঁকে শহীদ করে দেয়।

১০. দশমবার কাবা গৃহ নির্মাণ করেন হাজ্জাজ বিন ইউসূফ। সে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেই আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইরের এ চির স্মরণীয় কীর্তিটি মুছে ফেলতে মনস্থ করে। সে মতে সে জনগণের মধ্যে প্রচার করতে থাকে যে, আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইরের এ কাজটি ঠিক হয়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ কাবা গৃহকে যে অবস্থায় রেখে গেছেন, সে অবস্থায় রাখাই আমাদের কর্তব্য। এ অজুহাতে কাবাগৃহকে ভেঙ্গে জাহেলিয়াত আমলের কুরাইশগণ যে ভাবে নির্মাণ করেছিল সে ভাবেই নির্মাণ করা হলো। হাজ্জাজ ইবনে ইউসূফের পর কোনো কোনো বাদশাহ উল্লিখিত হাদীসের আলোকে কাবা গৃহকে ভেঙ্গে হাদীস অনুযায়ী নির্মাণ করার ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন ইমাম মালেক (র.) ও ইবনে আনাস (র.) ফতোয়া দেন যে, এভাবে কাবা গৃহের ভাঙ্গাগড়া অব্যাহত থাকলে পরবর্তী বাদশাহদের জন্য একটি খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়ে যাবে এবং কাবাগৃহ তাদের হাতে একটি খেলায় পরিণত হবে। কাজেই বর্তমান যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায়ই থাকতে দেওয়া উচিত। বিশ্বের মুসলিম সমাজ তার এ ফতোয়া গ্রহণ করে নেয়। ফলে আজ পর্যন্ত হাজ্জাজ ইবনে ইউসূফের নির্মাণই অবশিষ্ট রয়েছে। তবে মেরামতের প্রয়োজনে ছোটখাট ভাঙ্গাগড়ার কাজ সবসময়ই অব্যাহত থাকে। এসব রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, খানায়ে কাবা জগতের সর্বপ্রথম গৃহ এবং কমপক্ষে সর্ব প্রথম উপাসনালয়।

কোনো কবি তার কবিতায় দশবারের নির্মাণের কথা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন–

بَنٰى بَيْتَ رَبِّ الْعَرْشِ عَشَرٌ فَخُذْهُمْ * مَلَائِكَةُ اللّٰهِ الْكِرَامُ وَاٰدَمُ۔
فَشِيْثٌ فَابْرَاهِيْمُ ثُمَّ عَمَالِيْقٌ * قُصَيٌّ قُرَيْشٌ قَبْلَ هٰذَيْنِ جُرْهُمُ۔
وَعَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ بَنٰى كَذَا * بِنَاءُ الْحَجَّاجِ وَهٰذَا مُتَمِّمُ۔

–[হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১, পৃ. ১০৬-৭, তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন, রূহুল মা'আনী]

কাবা শরীফের ফজিলত : কাবা শরীফের অনেক ফজিলত রয়েছে–

১. প্রথম ফজিলত হলো কাবাই পৃথিবীর সর্বপ্রথম গৃহ। এক বর্ণনা অনুযায়ী কাবাগৃহের স্থানটিকে আল্লাহ পাক পৃথিবী সৃষ্টির দুই হাজার বৎসর পূর্বে সৃষ্টি করেছেন। কাবার স্থানটি পানির উপরে ভাসমান ফেনা ছিল জমিনকে তার নীচ হতে বিস্তার করা হয়েছে। –[তাফসীরে খাযেন খ. ১, পৃ. ৮০]

হযরত ইবরাহীম (আ.) কাবার এক নির্মাতা, আর বায়তুল মুকাদ্দাসের নির্মাতা হলেন হযরত সুলাইমান (আ.)। আর হযরত খলীলুল্লাহ সুলাইমান (আ.) হতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ হওয়াতে কোনো সন্দেহ নেই। এ হিসেবেও কাবা বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়ারই কথা। হযরত আদম (আ.)-এর কেবলাও কাবাই ছিল।

২. কাবার দ্বিতীয় ফজিলত হলো এই যে, তাতে রয়েছে মাকামে ইবরাহীম। মাকাম অর্থ দাঁড়ানোর স্থান। হযরত ইবরাহীম (আ.) যে পাথরটির উপর দাঁড়িয়ে কাবাগৃহ নির্মাণের কাজ করেছিলেন সেই পাথরটিকে মাকামে ইবরাহীম বলা হয়। হযরত ইবরাহীম (আ.) এ পাথরটির উপর আরোহন করলে পাথরটি প্রয়োজন অনুপাত উপরে উঠত ও নিচে অবতরণ করত। এক কথায় পাথরটি লিফটের ন্যায় কাজে দিতো। ইবরাহীম (আ.) পাথরের যে স্থানটিতে পা রাখতেন কেবল সে স্থানটি নরম হয়ে যেত, এমনকি তাঁর পদচিহ্ন তাতে অঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। এখনও তা অবশিষ্ট রয়েছে। হাজীদের জন্য এই পাথরের নিকট দু'রাকাত নামাজ পড়া ওয়াজিব। মসজিদে হারামের যে কোনো স্থানে নামাজ পড়ে নিলে সেই ওয়াজিব পালিত হয়ে যাবে।

৩. কাবা শরীফ هُدًى لِّلْعَالَمِيْنَ গোটা বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়েতের দিশারী, সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য কিবলা। তার দিকেই মুখ ফিরিয়ে সকলেই নামাজ আদায় করে।

৪. তাতে রয়েছে اٰيَاتٌ بَيِّنَاتٌ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি। যারা তাকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল তারা নিজেরাই ধ্বংস হয়েছে। তার কোনো ক্ষতিসাধন করতে পারেনি। পক্ষান্তরে বায়তুল মুকাদ্দাসকে বখতে নসর জামিল বাদশাহ ধ্বংস করে দিয়েছিল। আবরাহার ঘটনা এর জ্বলন্ত প্রমাণ। যারা সেখানে অসুস্থতা ইত্যাদির জন্য দোয়া করে তাদের দোয়া কবুল হয়।

৫. কোনো পাখি কাবা শরীফের উপর দিয়ে উড়ে যেতে পারে না; বরং কাবার সামনে গিয়ে দিক পরিবর্তন করে জায়গা অতিক্রম করে। হ্যাঁ, কোনো পাখি যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন সুস্থ হওয়ার জন্য কাবার উপরে গিয়ে উড়ে আবহাওয়া ভোগ করা সেটা ভিন্ন কথা।

৬. কাবা শরীফের এরিয়াতে কোনো জংলী প্রাণীও একে অপরের উপর আক্রমণ করে না। কেউ কাউকে কষ্ট দেয় না। যারাই সেখানে গিয়ে আশ্রয় নেয়, নিরাপত্তা লাভ করে। তাদের উপর কোনো আক্রমণ চালানো হয় না। এমনকি কোনো খুনিও যদি সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিয়ে নেয়, তাকে সেখানে কেসাসের মধ্যেও হত্যা করার বিধান নেই। তবে যদি সে হারামের ভিতরেই হত্যাকাণ্ড বা অন্য কোনো অপরাধ করে, তাহলে তার শাস্তি হারামের ভিতরেই দিয়ে দেওয়া জায়েজ হবে। এটা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا অর্থাৎ "হে আমার প্রভু এ শহরটিকে নিরাপদ বানিয়ে দাও" এবং যারা সেখানে প্রবেশ করে তারা আখিরাতেও শাস্তি থেকে নিরাপদ থাকবে।

-[তাফসীরে কাবীর, মাআরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রিস কান্ধলবী]

৭. কোনো কোনো ইবাদত এ রকম রয়েছে, যেগুলো কাবা শরীফ ছাড়া অন্য কোথাও আদায়ই হয় না। যেমন- হজ, জিয়ারতে কাবা ও তওয়াফ ইত্যাদি। আবার অনেক ইবাদত যদিও অন্যান্য স্থানে আদায় করে নিলে পালিত হয়ে যায় বটে, তবে কাবা শরীফে আদায় করলে যে পরিমাণ ছওয়াব অর্জন হয় সে পরিমাণ হয় না। যথা-

* হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোনো ব্যক্তি তার ঘরে নামাজ আদায় করলে সে এক নামাজেরই ছওয়াব পাবে, আর তার মহল্লার মসজিদে আদায় করলে পঁচিশ গুণবেশি ছওয়াব পাবে, আর জুমার মসজিদে আদায় করলে পাঁচশত নামাজের ছওয়াব পাবে, আর বায়তুল মুকাদ্দাসে নামাজ আদায় করলে পঞ্চাশ হাজার নামাজের ছওয়াব পারে, আর আমার মসজিদে অর্থাৎ মসজিদে নববীতে নামাজ আদায় করলে পঞ্চাশ হাজার নামাজের ছওয়াব পাবে। আর মসজিদে হারামে নামাজ আদায় করলে এক লক্ষ নামাজের ছওয়াব পারে। -[ইবনে মাজাহ]

* হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মক্কাতে রমজান মাস পেল, অতঃপর সে পূর্ণ মাসের রোজা রাখল ও সাধ্যানুযায়ী তারাবীহসহ কিয়ামুল লাইল করল, আল্লাহ পাক গায়রে মক্কার [মক্কা ছাড়া অন্যস্থানে] এক লক্ষ রমজান মাসের রোজার ছওয়াব তাকে দান করবেন। প্রতিদিনে তাকে একটা নেকী দিবেন, প্রতিরাতে একটা নেকী দিবেন। প্রতিদিন ও রাত এক একটি গোলাম আজাদ করার ছওয়াব দিবেন। প্রতিদিন ও রাত আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে এক একটি ঘোড়া দান করার ছওয়াব দিবেন, এবং প্রতিদিন তার একটা দোয়া কবুল করবেন।

-[বায়হাকী শু'আবুল ঈমান]

* হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে মক্কা ও মদিনার যে কোনো একটিতে মারা যাবে সে কিয়ামতের দিন নিরাপদ হয়ে উঠবে। -[দূররে মানছূর]

এছাড়া আরো বহু ফজিলত কাবা শরীফ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আলোচনা দীর্ঘায়িত হওয়ার আশঙ্কায় সেগুলো উল্লেখ করা হলো না। কাবা শরীফের এতসব ফজিলত থাকার পরও ইহুদিরা কিভাবে বলে যে, বায়তুল মুকাদ্দাস কাবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ? এটা ছিল ইসলাম ও মুসলমান এবং আমাদের নবীজীর প্রতি তাদের জিদের বহিঃপ্রকাশ। যার প্রতিবাদে আল্লাহ পাক إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ বলে ঘোষণা করেছেন।

وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا আর যে ব্যক্তি কাবা শরীফে প্রবেশ করে নিল সে দুনিয়া এবং আখিরাতের সকল বালা মসিবত হতে নিরাপত্তা লাভ করে নিল।

মাসআলা : যদি কোনো ব্যক্তি কাউকে অন্যায় ভাবে হারামের বাহিরে হত্যা করে অথবা শাস্তিযোগ্য যে কোনো অপরাধ করে হারামের ভিতরে দাখিল হয়ে যায়। তাহলে কাবা শরীফের সম্মানার্থে তাকে হারামের ভিতরে প্রাণদণ্ড ও দেওয়া যাবে না, এবং শাস্তিও প্রদান করা জায়েজ হবে না। হ্যাঁ, তবে আমাদের মাজহাব মতে খাদ্য ও পানীয় না দিয়ে এবং তার কাছে কোনো দ্রব্য বিক্রি না করে তাকে হারাম শরীফের বাহিরে আসতে বাধ্য করা হবে। অতঃপর শাস্তি প্রদান করা যাবে। তবে যদি সে হারাম শরীফের ভিতরেই অপরাধ করে ফেলে তাহলে সে অপরাধের শাস্তি আলেমদের ঐকমত্যে হারামের ভিতরেই প্রদান করা যাবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, হারামের বাইরে অপরাধ করে যে ব্যক্তি হারামে আশ্রয় গ্রহণ করেছে তার কাছ থেকে হারামের ভিতরেও কেসাস নেওয়া যাবে। -[তাফসীরে মাযহারী উর্দূ খ. ২, পৃ. ৩০২]

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ .

আর আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মানুষের উপর এ গৃহের হজ করা ফরজ। তবে সবার উপর নয়; বরং যে এ পর্যন্ত পৌছার সামর্থ্য রাখে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশ অস্বীকার করে তাতে আল্লাহর কি ক্ষতি? কেননা আল্লাহ বিশ্বজগত থেকে বে-পরওয়া। কারো অস্বীকারে তাঁর কিছু আসে যায় না, বরং অস্বীকারকারীই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক শর্তাধীনে মানবজাতির উপর কাবা গৃহের হজ ফরজ করেছেন। শর্ত হলো এই যে, সে পর্যন্ত পৌছার সামর্থ্য থাকতে হবে। সুতরাং কাবা ঘর পর্যন্ত পৌছতে পথ খরচ, যাতায়াত খরচ এবং বাড়ি ফেরা পর্যন্ত পরিবারের লোকদের ভরণপোষণের খরচের উপর যে ব্যক্তি সামর্থ্যবান হবে এবং আকেল, বালেগ, আজাদ ও সুস্থজ্ঞান রাখবে তার উপরই জীবনে মাত্র একবার হজ করা ফরজ। সুতরাং যারা সামর্থ্য রাখে না, তাদের উপর হজ ফরজ নয়। তেমনিভাবে পাগল, না বালেগ, গোলাম ও অসুস্থ ব্যক্তির উপর হজ ফরজ নয়। রাস্তা নিরাপদ হওয়াও একটি শর্ত। তাই রাস্তায় যদি প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকে তাহলেও ফরজ হবে না। ইমাম আবূ হানীফা ও মালেক (র.)-এর মতে, শারীরিক সুস্থতাও শর্ত। তাই তাদের মতে মাজুর, খুব বেশি দুর্বল ব্যক্তির উপরও হজ ফরজ নয়। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.)-এর নিকট শারীরিক সুস্থতা শর্ত নয়। সুতরাং তারা উভয়ের মতে শারীরিক দিক দিয়ে অসুস্থ ব্যক্তির অসমর্থ নয়। তাই তার উপরও হজ ফরজ।

-[তাফসীরে মাযহারী খ. ২, পৃ. ৩০৩-৫]

মহিলাদের জন্য মাহরাম ব্যক্তি ছাড়া সফর করা শরিয়ত মতে নাজায়েজ। কাজেই মহিলাদের সামর্থ্য তখন-ই হবে, যখন তার সাথে কোনো মাহরাম পুরুষ হজে থাকবে। নিজ খরচে করুক বা মহিলাই তার খরচ বহন করুক। -[মা'আরিফুল কুরআন]

قَوْلُهُ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ : অর্থাৎ যে ব্যক্তি অস্বীকার করে তার জানা উচিত যে, আল্লাহ সারা বিশ্ব থেকে অমুখাপেক্ষী। সে ব্যক্তিই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত যে পরিষ্কারভাবে হজকে ফরজ মনে করে না। সে যে ইসলামের গণ্ডী বহির্ভূত তা সবারই জানা। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি হজকে ফরজ বলে বিশ্বাস করে, কিন্তু সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ করে না, সেও এক দিক দিয়ে অবিশ্বাসী। আয়াতে শাসনের ভঙ্গিতে তার সম্পর্কে কুফর শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ সে কাফেরদের মতো কাজেই লিপ্ত। অবিশ্বাসী কাফের যেরূপ হজের গুরুত্ব অনুভব করে না সেও তদ্রূপ। এ কারণেই ফিকহ শাস্ত্রবিদগণ বলেন, যারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ করে না তাদের জন্য এ আয়াতে কঠোর হুশিয়ারী রয়েছে। কারণ সে কাফেরদের মতোই হয়ে গেছে। "নাউযুবিল্লাহ"। অথবা এখানে কুফর দ্বারা كُفْرَانُ نِعْمَتٍ বা নিয়ামতে অকৃতজ্ঞতা উদ্দেশ্য।

অনুবাদ :

٩٨. قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ الْقُرْاٰنِ وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ فَيُجَازِيْكُمْ عَلَيْهِ .

৯৮. হে রাসূল ﷺ আপনি বলে দিন, হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ তথা কুরআনকে কেন অমান্য করছ? অথচ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কার্যাবলি প্রত্যক্ষ করেছেন। তোমাদেরকে এর প্রতিদান দিবেন।

٩٩. قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ تَصْرِفُوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَىْ دِيْنِهٖ مَنْ اٰمَنَ بِتَكْذِيْبِكُمُ النَّبِىَّ وَكَتْمِ نَعْتِهٖ تَبْغُوْنَهَا اَىْ تَطْلُبُوْنَ السَّبِيْلَ عِوَجًا مَصْدَرٌ بِمَعْنٰى مُعَوَّجَةً اَىْ مَائِلَةً عَنِ الْحَقِّ وَاَنْتُمْ شُهَدَاۤءُ عَالِمُوْنَ بِاَنَّ الدِّيْنَ الْمَرْضِىَّ الْقَيِّمَ هُوَ دِيْنُ الْاِسْلَامِ كَمَا فِىْ كِتَابِكُمْ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ مِنَ الْكُفْرِ وَالتَّكْذِيْبِ وَاِنَّمَا يُؤَخِّرُكُمْ اِلٰى وَقْتِكُمْ لِيُجَازِيَكُمْ .

৯৯. [হে রাসূল ﷺ !] আপনি বলে দিন, হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা কেন মু'মিনদেরকে আল্লাহর পথ হতে তার দীন হতে নবীয়ে করীম ﷺ -এর মিথ্যায়ন করে ও তাঁর নিদর্শনাবলি লুকিয়ে বাধা দিচ্ছ? কেন তোমরা তাদের দীনের পথে বক্রতা অনুসন্ধান করছ? (عِوَجًا) মাসদার مُعَوَّجَةً ইসমে মাফউলের অর্থে ব্যবহৃত অর্থাৎ সত্য বিমুখ পথ কেন খুঁজছ? অথচ তোমরা সাক্ষী এবং তোমরা জান যে, পছন্দনীয় এবং সঠিক ধর্ম ইসলামই, যেরূপ তোমাদের কিতাবে রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কুফর মিথ্যায়ন প্রভৃতি আমল সম্পর্কে উদাসীন নন। তিনি কেবল তোমাদেরকে একটি সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে রেখেছেন মাত্র। অতঃপর তোমাদেরকে এর শাস্তি দেবেন।

١٠٠. وَنَزَلَ لَمَّا مَرَّ بَعْضُ الْيَهُوْدِ عَلَى الْاَوْسِ وَالْخَزْرَجِ فَغَاظَهُ تَاَلُّفُهُمْ فَذَكَّرَهُمْ بِمَا كَانَ بَيْنَهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ مِنَ الْفِتَنِ فَتَشَاجَرُوْا وَكَادُوْا يَقْتَتِلُوْنَ . يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْاۤ اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ .

১০০. সামনের আয়াতটি ঐ সময় নাজিল হয়, যখন জনৈক ইহুদি আওস ও খাজরাজ গোত্রীয় লোকদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে তখন তারা উভয় গোত্রের পারস্পরিক ভালোবাসায় তাকে ক্রোধান্বিত করে তোলে। সুতরাং ঐ ইহুদি ব্যক্তি আওস ও খাজরাজের মধ্যে জাহেলী যুগের ফেতনার [যুদ্ধের] কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যার দরুন তারা পরস্পরে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে পরে, পরস্পরে রক্তপাত হওয়ার উপক্রম হয়ে গিয়েছিল। হে মু'মিনগণ! তোমরা যদি আহলে কিতাবদের দল বিশেষের কথা মেনে নাও, তবে তারা তোমাদেরকে ঈমান আনার পর পুনরায় নাফরমান সম্প্রদায় বানিয়ে ছাড়বে।

١٠١. وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ اِسْتِفْهَامُ تَعْجِيْبٍ وَتَوْبِيْخٍ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ وَمَنْ يَعْتَصِمْ يَتَمَسَّكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِىَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ .

১০১. আর তোমরা কেমন করে আল্লাহর নাফরমানি করতে পার (كَيْفَ) প্রশ্নবোধক শব্দটি আশ্চর্য ও তিরস্কারের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অথচ তোমাদের নিকট আল্লাহর আয়াতসমূহ পঠিত হচ্ছে, এবং তোমাদের মধ্যে তাঁর রাসূল বর্তমান রয়েছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর দীন বা কুরআনকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়ে ধরবে, নিশ্চয় সে সরল সত্যপথের হেদায়েত পাবে।

তাহকীক ও তারকীব

عِوَجًا - (عَيْن) **আইন বর্ণে** যেরের সহিত মাআনিতে অর্থাৎ আর্থিক বিষয়ে ব্যবহৃত হয়। আর عَوَجًا আইন বর্ণে জবরের সহিত **বাহ্যিক দেহধারী** বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এখানে عِوَجًا মাসদারটি ইসমে মাফউল তথা مُعْوَجَّةً [বক্র] এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا বাক্যটির অর্থগত রূপ হবে تَتْرُكُوْنَ السَّبِيْلَ الْمُعْتَدِلَةَ وَتَطْلُبُوْنَ السَّبِيْلَ الْمُعْوَجَّةَ তোমরা সরল সঠিক পথ ছেড়ে বক্র রাস্তা অনুসন্ধান করছ। -[হাশিয়াতুস সাবী]

عِوَجًا - تَبْغُوْنَهَا -এর যমীর (هَا) থেকে হাল হয়েছে। আর وَاَنْتُمْ شُهَدَاءُ - تَبْغُوْنَهَا -এর যমীর ওয়াও থেকে হাল হয়েছে।

وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيَاتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ বাক্য দুটি كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ ফে'লের যমীরে ফায়েল থেকে হাল হয়েছে। -[হাশিয়াতুস সাবী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের যোগসূত্র : قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আহলে কিতাবদের ভ্রান্তবিশ্বাস ও তাদের সন্দেহ সম্পর্কে আলোচনা ছিল। মাঝখানে কাবাগৃহ ও হজ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে পুনরায় আহলে কিতাবদের সম্বোধন করা হচ্ছে। তবে এই সম্বোধনের বিষয়টি একটা বিশেষ ঘটনার সাথে জড়িত।

আয়াতের শানে নুযূল : ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, আর যায়েদ ইবনে আসলাম থেকে একদল লোক বর্ণনা করেছেন যে, এক ইহুদি ব্যক্তি যার নাম ছিল সাম্মাস ইবনে কায়েস। সে মুসলমানদের প্রতি অত্যন্ত হিংসা ও বিদ্বেষ রাখত। একদা সে আওস ও খাজরাজের এক মজলিস দিয়ে অতিক্রম করে। সেখানে আনসারী এই গোত্র দুটি এক জায়গায় বসেছিল। সাম্মাস যখন তাদের পরস্পরের ভালোবাসা ও স্নেহ মমতা দেখাল, তখন সে হিংসার আগুনে জ্বলে উঠল। মূর্খতার যুগে গোত্র দুটির মধ্যে অত্যন্ত দুশমনি ও বিদ্বেষ ছিল। প্রসিদ্ধ বুআছ যুদ্ধ এই দুটি গোত্রের মধ্যেই সংঘটিত হয়েছিল। আর সেই যুদ্ধে আওস গোত্রের লোকদের বিজয় হয়েছিল। সাম্মাস ইবনে কায়েসের চোখে আওস ও খাজরাজের পারস্পরিক বন্ধুত্বের সম্পর্ক ভালো লাগল না। এজন্য সে তাদের মধ্যে বিভক্তি ও বিবাদ সৃষ্টির চিন্তায় লেগে গেল। শেষ পর্যন্ত মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল যে, তাদের মধ্যে বুআছ যুদ্ধের আলোচনা তোলে ধরা হোক। সুতরাং সে তার সাথি একজন ইহুদি যুবককে বলল, তুমি গিয়ে তাদের নিকট বসে যাবে। অতঃপর তাদের সামনে বুআছ যুদ্ধের আলোচনা তুলে ধরবে। সুতরাং সে এরূপই করল। আর ঐ যুদ্ধের সময় যে সব কবিতা পাঠ করা হয়েছিল সেগুলোকে সে পুনরাবৃত্তি করল। এই কবিতাগুলো পাঠ করা মাত্রই এক অগ্নিশিখা জ্বলে উঠলো। এবং তর্কযুদ্ধ, পরে লাঠি-ডান্ডার যুদ্ধের পর্যায়ে পৌঁছে গেল। উভয় গোত্রের লোকদের মধ্য থেকে এক একজন করে ময়দানে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগল। আওস ইবনে কাইযী নামক এক যুবক আওস গোত্রের তরফ থেকে আর বনী মাসলামার বিন মাসখার নামক এক যুবক খাজরাজের পক্ষ থেকে ময়দানে নেমে পড়ল। উভয় গোত্রের অন্যান্য লোকেরা তাদের উভয়ের সাথে যোগ দিতে লাগল। এমনকি যুদ্ধের সময় ও স্থান নির্ধারণ হয়ে গেল। হুজুর ﷺ যখন এর সংবাদ পেলেন তখন তাৎক্ষণিক ভাবে সেখানে উপস্থিত হলেন, আর বললেন, একি মূর্খতা? আমার জীবদ্দশায় মুসলমান হয়ে পরস্পর বন্ধু ভাবাপন্ন হওয়ার পর তোমরা একি করছ? তোমরা কি এ অবস্থায়ই কুফরের দিকে ফিরে যেতে চাও? এতে উভয় পক্ষের চৈতন্য ফিরে পেল। তারা বুঝতে পারল এটা ছিল শয়তানের প্ররোচনা। এরপর সবাই একে অপরকে বুকে জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি করল এবহং তওবা করল। এ ঘটনা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত সমূহ অবতীর্ণ হয়। আল্লামা আলূসী (র.)

বলেছেন, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ থেকে নিয়ে وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়। আর শায়খ আহমদ সাবী, মালেকী বলেছেন لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ পর্যন্ত নাজিল হয়। -[তাফসীরে রূহুল মা'আনী খ. ৪, ১৪, হাশিয়াতুস সাবী খ. ১, ১৭০]

আর আল্লামা সুয়ূতী (র.) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا الاية আয়াতের শানে নুযূল হিসেবে এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কাজী সানাউল্লাহ পানিপতী (র.) ও সুয়ূতী (র.) অনুরূপ বলেছেন। -[তাফসীরে মাযহারী]

এবং ফখরুদ্দীন রাজী (র.) ও সুয়ূতীর ন্যায়ই উল্লেখ করেছেন। -[তাফসীরে কাবীর]

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ .... الخ এই আয়াতে اٰيَاتُ اللّٰهِ বা আল্লাহর নিদর্শনাবলির ব্যাখ্যায় আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেছেন, কুরআনের আয়াত উদ্দেশ্য। আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী (র.) বলেন, আল্লাহর আয়াতসমূহের দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, ঐ সকল দালাইল যেগুলোকে আল্লাহ পাক মুহাম্মদ ﷺ -এর নবুয়তের সত্যতার উপর কায়েম করেছেন। আর তাদের তথা ইহুদিদের অস্বীকার করার মর্ম হচ্ছে নবুয়তে মুহাম্মদীর উপর প্রমাণ হওয়ার কথা অস্বীকার করা। وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ পাক তোমাদের আমল অর্থাৎ নবুয়তে মুহাম্মদীর সত্যতার প্রমাণাদি অস্বীকার করার ব্যাপারে সাক্ষী প্রত্যক্ষকারী। তাই তিনি এর উপর তোমাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন। এই আয়াতে আল্লাহ পাক ইহুদিদের পথ ভ্রষ্টতার প্রতিবাদ করেছেন। আর সামনের আয়াতে তাদের اِضْلَال তথা দুর্বল মুসলমানদেরকে পথভ্রষ্টকরণের উপর প্রতিবাদ করা হয়েছে। সুতরাং ইরশাদ হয়েছে- قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ হে রাসূল ﷺ ! আপনি বলেদিন, তোমরা লোকদেরকে আল্লাহর দীনের রাস্তা থেকে কেন বিচ্ছিন্ন করছ? কেন তাদের দীনের পথে বক্রতা অনুসন্ধান করছ? وَاَنْتُمْ شُهَدَاءُ অথচ তোমরা নিজেরাই সাক্ষী নিজেরাই জান। কিসের উপর সাক্ষী, কিসের উপর অবগত? এর ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা এ কথার উপর সাক্ষী যে, তাওরাতে একথা আছে যে, যে ধর্ম ব্যতীত আল্লাহ অন্য কোনো ধর্ম কবুল করেন না, সেটি হচ্ছে একমাত্র ইসলাম। এর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হলো এই যে, তোমরা মুহাম্মদ ﷺ -এর নবুয়তের উপর প্রকাশিত মোজেজাত সম্পর্কে অবগত। তৃতীয় ব্যাখ্যা হলো এই যে, আল্লাহর রাস্তা থেকে লোকদেরকে বিচ্ছিন্ন করা, বিরত রাখা অবৈধ হওয়ার উপর তোমরা অবশ্যই অবগত। وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ বলে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করেছেন। পরবর্তী আয়াত يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ... الخ এর মধ্যে মুমিনদেরকে ইহুদিদের কথার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করার জন্য সতর্ক করা হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতে তাদের প্রতারণা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার উপর সতর্ক করা হয়েছিল। وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ মুমিনদেরকে একথার উপর সতর্ক করা হয়েছে যে, ইহুদি ও মুনাফিকদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মুসলমানদেরকে তাদের পবিত্র ধর্ম ইসলাম থেকে বিচ্যুত করে দেওয়া। অতঃপর وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِىَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ বলে পূর্বোক্ত ভীতি প্রদর্শনের পর প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হচ্ছে।

-[তাফসীরে কাবীর খ. ৮, পৃ. ১৭৩-৭৫]

অনুবাদ :

١٠٢. يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ بِاَنْ يُّطَاعَ فَلَا يُعْصٰى وَيُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرُوَ يُذْكَرَ فَلَا يُنْسٰى فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَنْ يَقْوٰى عَلٰى هٰذَا فَنُسِخَ بِقَوْلِهٖ فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ مُوَحِّدُوْنَ .

১০২. হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক যেরূপ তাকে ভয় করা উচিত। এরকম ভাবে যে, তাঁর আনুগত্য করা যাবে, নাফরমানি করা যাবে না। তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যাবে, অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যাবে না। তাকে স্মরণ রাখা যাবে ভুলা যাবে না। এ আয়াত অবতরণের পর সাহাবাগণ আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! এরূপ ভয় করার সামর্থ্য কার আছে? এর জবাবে আল্লাহ পাক তাঁর ইরশাদ فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ দ্বারা রহিত করে দিলেন। আর তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না অর্থাৎ একত্ববাদে বিশ্বাসী না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।

١٠٣. وَاعْتَصِمُوْا تَمَسَّكُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ اَىْ دِيْنِهٖ جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوْا بَعْدَ الْاِسْلَامِ وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْعَامَهٗ عَلَيْكُمْ يَا مَعْشَرَ الْاَوْسِ وَالْخَزْرَجِ اِذْ كُنْتُمْ قَبْلَ الْاِسْلَامِ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ جَمَعَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ بِالْاِسْلَامِ فَاَصْبَحْتُمْ فَصِرْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا فِى الدِّيْنِ وَالْوَلَايَةِ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا طَرْفِ حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ لَيْسَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْوُقُوْعِ فِيْهَا اِلَّا اَنْ تَمُوْتُوْا كُفَّارًا فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا بِالْاِيْمَانِ كَذٰلِكَ كَمَا بَيَّنَ لَكُمْ مَا ذُكِرَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ .

১০৩. আর তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে তথা দীনে ইসলামকে একত্র হয়ে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর। আর মুসলমান হওয়ার পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। হে আওস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয়ের লোকেরা! তোমরা নিজেদের উপর আল্লাহর কৃত নিয়ামতের কথা স্মরণ কর। যখন তোমরা মুসলমান হওয়ার পূর্বে একে অন্যের দুশমন ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের অন্তরে ইসলামের খাতিরে সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দিয়েছেন। অনন্তর তোমরা তাঁরই নিয়ামতে পরস্পরে দীন ও সহায়তার ভাই ভাই হয়ে গেলে। আর তোমরা দোজখের পারের নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিলে, তোমরা দোজখে নিক্ষিপ্ত হতে কেবল কাফেরাবস্থায় মৃত্যুবরণ করাটাই বাকি ছিল। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে ঈমানের খাতিরে দোজখ হতে রক্ষা করেছেন। এমনিভাবে যেরূপ তোমাদের জন্য উল্লিখিত বিধানসমূহের বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিদর্শনসমূহ তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন, যাতে তোমরা হেদায়েতপ্রাপ্ত হতে পার।

١٠٤. وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ الْإِسْلَامِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَأُولٰئِكَ الدَّاعُوْنَ الْأٰمِرُوْنَ وَالنَّاهُوْنَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ـ الْفَائِزُوْنَ وَمِنْ لِلتَّبْعِيْضِ لِأَنَّ مَا ذُكِرَ فَرْضُ كِفَايَةٍ لَا يَلْزَمُ كُلَّ الْأُمَّةِ وَلَا يَلِيْقُ بِكُلِّ وَاحِدٍ كَالْجَاهِلِ وَقِيْلَ زَائِدَةٌ اَىْ لِتَكُوْنُوْا أُمَّةً ـ

অনুবাদ :

১০৪. আর তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক থাকা দরকার যারা মানুষকে কল্যাণ তথা ইসলামের দিকে আহ্বান করবে, ভালোকাজের নির্দেশ দেবে এবং মন্দকাজ থেকে বিরত রাখবে আর তারাই তথা কল্যাণের প্রতি আহ্বানকারী ভালোকাজের নির্দেশ দানকারী ও মন্দকাজে বাধাদানকারীগণই সফলকাম কামিয়াব। আর আয়াতে বর্ণিত (مِنْكُمْ) -এর মধ্যে مِنْ অব্যয় পদটি تَبْعِيْضِيَّةٌ অর্থাৎ কিছু সংখ্যক বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা উল্লিখিত হুকুমটি ফরজে কেফায়াহ্ পর্যায়ের, উম্মতের সকল ব্যক্তির উপর আবশ্যকীয়ও নয় এবং প্রত্যেকের জন্য উপযোগীও নয়। যেমন উদাহরণত মূর্খ লোকের জন্য। কেউ কেউ مِنْ অব্যয় পদটিকে অতিরিক্ত বলেছেন। তখন (وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ) -এর মর্ম হবে (لِتَكُوْنُوْا أُمَّةً) যাতে তোমরা একদল হতে পারো।

١٠٥. وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا عَنْ دِيْنِهِمْ وَاخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَهُمُ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى وَأُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ـ

১০৫. এবং তোমরা সেসব লোকদের ন্যায় হয়ো না যারা দলিল-প্রমাণপ্রাপ্ত হওয়ার পরও বিচ্ছিন্ন হচ্ছে আপন ধর্ম হতে এবং তাতে মতবিরোধ করেছে আর তারা হচ্ছে ইহুদি ও খ্রিস্টানেরা। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাহকীক ও তারকীব

حَقَّ تُقَاتِهٖ اَىْ حَقَّ تَقْوَاهُ ـ تُقَاةً বেঁচে থাকা, ভয় করা। تُقَاةً শব্দটি আসলে وُقْيَةٌ ছিল, পেশযুক্ত ওয়াও (و) টি 'তা' দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে। যেরূপ تـصـمـة ও تخمة এর মধ্যে করা হয়েছে। এবং যবর যুক্ত 'ইয়া' টি 'আলীফ' দ্বারা বদলে গেছে। ফলে تُقَاةً হয়ে গেছে। ইয়ার পূর্বের বর্ণ 'কাফ' হরফে সহীহ সাকিন, এজন্যে ইয়ার হরকত কাফের মধ্যে নকল করে দিয়ে ইয়াকে আলিফ দ্বারা বদলানো হয়েছে। ইমাম যুজাজ (র.) এতে তিনটি লোগাত জায়েজ বলেছেন–

১. تُقَاةً, ২. وَقَاةً ও ৩. إِقَاةً -।

اِعْتِصَامٌ অর্থ– দৃঢ়ভাবে আকড়িয়ে ধরা, শক্তভাবে ধরা।

حَبْلٌ অর্থ– দড়ি, রশি, রজ্জু। বহুবচনে حُبُوْلٌ ـ حِبَالٌ – । حَبْلَ اللّٰهِ বা আল্লাহর রশির মর্ম কি? তা সামনে আসতেছে ইনশাআল্লাহ। اَصْبَحْتُمْ মানে صِرْتُمْ

اِخْوَانٌ অর্থ– বন্ধু, ভাই اَخٌ -এর বহুবচন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বন্ধু ভাইয়ের (اخ) বহুবচনে আসে اِخْوَانٌ আর বংশীয় (اَخٌ) ভাইয়ের বহুবচন আসে اِخْوَةٌ - شَفَا ـ طَرَف কিনারা, পার্শ্ব। বহুবচনে اَشْفَاءُ - حُفْرَةٌ অর্থ– গর্ত। বহুবচনে حُفَرٌ – اِنْقَاذٌ অর্থ– রক্ষা করা, মুক্তি দেওয়া।

أُمَّةٌ শব্দটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে দল বা জামাতের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। أُمَّةٌ অর্থ **বিশেষ কোনো কাজে নিযুক্ত দল। أُمَّةٌ অর্থ– নবীগণের** অনুসারী। أُمَّةٌ অর্থ– নেতা, সরদার। যেমন ইরশাদ হয়েছে اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ كَانَ اُمَّةً - **أُمَّةٌ অর্থ– দীন, মিল্লাত। যেমন** اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاۤءَنَا عَلٰى اُمَّةٍ - أُمَّةٌ অর্থ– জমানা, যথা وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

তারকীব : حَقَّ تُقَاتِهٖ উহ্য মাসদারে মাওসূফের সিফত। আসল রূপ হবে اِتَّقُوا اللّٰهَ تَقْوٰى حَقَّ تُقَاتِهٖ - اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاۤءً - كُنْتُمْ **ফেলে নাকিস,** যমীর তার ইসিম ও اَعْدَاۤءً খবর। اَصْبَحْتُمْ ফেলে নাকিস, যমীর তার ইসিম ও اِخْوَانًا খবর। وَكُنْتُمْ عَلٰى - شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ কُنْتُمْ ফে'লে নাকিস, যমীর তার ইসিম عَلٰى شَفَا الخ খবর। اُولٰۤئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ - اُولٰۤئِكَ **মুবতাদা** لَهُمْ উহ্য ফেলের মুতাআল্লিক। عَذَابٌ عَظِيْمٌ সিফাত মাওসূফ মিলে খবর। –[হাশিয়াতুস সাবী, তাফসীরে হক্কানী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের যোগসূত্র : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফের ও মুনাফেকদের গোমরাহী এবং প্রতারণা থেকে মুমিনদেরকে সতর্ক থাকার হুকুম দেওয়া হয়েছিল। আর এই আয়াতে মুমিনদিগকে আল্লাহ পাকের প্রতি ভয় রাখার, তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার এবং যাবতীয় কল্যাণকর কাজে আত্মনিয়োগ করার নির্দেশ দিয়েছেন। প্রথমত: ইরশাদ হয়েছে, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। (اِتَّقُوا اللّٰهَ) দ্বিতীয়ত: ইরশাদ হয়েছে, তোমরা আল্লাহর রশিকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর। (وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ) তৃতীয়ত হুকুম হয়েছে, তোমরা আল্লাহর নিয়ামতসমূহকে স্মরণ কর– (وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ) এই বর্ণনা ধারার কারণ এই যে, মানুষ যখন কোনো কাজ করে তখন কোনো উদ্দেশ্য সামনে রেখেই করে। হয় কোনো ক্ষতির আশঙ্কা থেকে আত্মরক্ষার জন্য করে অথবা কোনো কিছু পাওয়ার আশায় করে। আর ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষার বিষয়টা লাভ অর্জন করার চেয়ে অধিক গুরুত্ববহ। তাই প্রথমে আল্লাহর আজাব থেকে আত্মরক্ষা লাভের নিমিত্তে আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতঃপর আল্লাহর রশিকে সুদৃঢ় ভাবে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তারপর আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। এ সব আয়াতে নিজেকে কামেল রূপে গঠন করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। আর وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ -এ অন্যদের ঈমান ও আনুগত্যের চেষ্টা করে তাদেরকে কামেল বানানোর চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। –[তাফসীরে কাবীর খ. ৮, পৃ. ১৭৬-৮২]

আয়াতের শানে নুযূল : আল্লামা বগবী মোকাতেল ইবনে হাব্বানের বর্ণনায় লিখেছেন যে, বর্বরতার যুগে আওস ও খাজরাজ গোত্রের মধ্যে ছিল চরম দুশমনি এবং লড়াই। যখন প্রিয়নবী ﷺ মক্কায়ে মুয়াজ্জমা থেকে হিজরত করে মদিনায় তাশরিফ আনলেন, তখন তিনি তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিলেন। উভয় গোত্র মুসলমান হয়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভাই ভাই হয়ে বাস করতে লাগল। ঘটনাক্রমে একবার আওস গোত্রের সালবা ইবনে গনাম এবং খাজরাজ গোত্রের আসাদ ইবনে জোরার এর মধ্যে গোত্রীয় প্রাধান্য সম্পর্কে ঝগড়া হলো। সালবা বললেন আমরাই আওস গোত্রের লোক। আমাদের মধ্যেই রয়েছেন খোজায়া ইবনে সাবেত (রা.) যার একজনের সাক্ষ্য দুইজনের সাক্ষী গণ্য করা হয়। আর আমাদের গোত্রেই রয়েছে হানজালা (রা.) যাকে ফেরেশতাগণ গোসল দিয়েছিলেন এবং আমাদের গোত্রেই রয়েছে আসেম ইবনে সাবেত আর আমাদের মধ্যেই রয়েছে হযরত সাদ ইবনে মা'আজ যার মৃত্যুর সময় আল্লাহর আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল। আর বনূ কুরাইজার ব্যাপারে আল্লাহ পাক তাঁর সিদ্ধান্ত পছন্দ করেছিলেন।

অপর পক্ষে খাজরাজ গোত্রের আসাদ বললেন, আমাদের গোত্রেই রয়েছেন চারজন ব্যক্তি যারা কুরআনের হাফেজ, কারী এবং আলেম হয়েছেন। তাঁরা হলেন উবাই ইবনে কাব, মু'আজ ইবনে জাবাল, জায়েদ ইবনে সাবেত এবং আবূ জায়েদ (রা.)। আর আমাদের মধ্যেই রয়েছেন সাদ ইবনে উবায়দা (রা.) যিনি আনসারদের খতিব এবং সরদার পদে অধিষ্ঠিত। তাদের উভয়ের বিতর্ক এভাবে শুরু হলো এবং পরস্পরে পরস্পরে গোস্যা ও রাগ এসে গেল। উভয়ে নিজ নিজ গোত্রের প্রশংসায় কবিতা আবৃতি করতে লাগলেন। এমনকি উভয় গোত্রের লোকেরা হাতিয়ার নিয়ে হাজির হলো। এমন সময় প্রিয়নবী ﷺ আগমন করলেন, তখন এই আয়াত নাজিল হয়– يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ –[তাফসীরে মাযহারী খ. ২, পৃ. ৩১৬]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ (الاية) আলোচ্য আয়াতটিতে আল্লাহ পাক মুসলমানদের জাগতিক শক্তির ভিত্তি হিসেবে এক মূলনীতির আলোচনা করেছেন। আর তা হচ্ছে তাকওয়া বা আল্লাহকে ভয় করা। অর্থাৎ তাঁর অপছন্দনীয় কাজকর্ম

থেকে বেঁচে থাকা। যার তিনটি স্তর রয়েছে। এসবের আলোচনা সূরা বাকারার শুরুর দিকে হয়েছে। আর وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا الخ আয়াতটিকে মুসলমানদের জাগতিক শক্তির ভিত্তি হিসেবে দ্বিতীয় আরেকটি মূলনীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

তাকওয়ার হকের মর্ম : يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। যেরূপ তাকে ভয় করার হক রয়েছে। এখানে বর্ণিত তাকওয়ার হক এর ব্যাখ্যায় ওলামাদের বিভিন্ন রকম উক্তি পাওয়া যায়। এর মধ্য থেকে কয়েকটি উক্তি নিম্নে প্রদত্ত হচ্ছে–

গ্রন্থকার আল্লামা সুয়ূতী (র.) তাকওয়ার হক এর সূরত বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন اَنْ يُّطَاعَ فَلَا يُعْصٰى وَيُشْكَرُ فَلَا يُكْفَرُ وَيُذْكَرُ فَلَا يُنْسٰى অর্থাৎ তাকওয়ার হক হলো এই যে, প্রত্যেক কাজে আল্লাহর আনুগত্য করা, আনুগত্যের বিপরীত কোনো কাজ না করা, আল্লাহকে সর্বদা স্মরণে রাখা কখনো তাকে না ভুলা এবং সর্বদা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অকৃতজ্ঞ না হওয়া।

- মূলত এটি একটি হাদীস হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে মারফূ ও মাওকূফ উভয় রকম সনদে বর্ণিত হয়েছে।
- ইমাম মুজাহিদ (র.) বলেছেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার হক আদায় কর, আল্লাহর নির্দেশাবলি পালনের ক্ষেত্রে তোমাদেরকে যেন কোনো সমালোচকের সমালোচনায় বিরত না রাখে। আল্লাহর ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য দাঁড়িয়ে যাও, এতে যদিও তোমাদের, তোমাদের মাতা-পিতা ও সন্তান সন্ততির ক্ষতি হয়।
- হযরত আনাস (রা.) বলেন, বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত তাকওয়ার হক আদায় করতে পারবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের জবানের হেফাজত না করেছে।
- আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানীপতী (র.) বলেন, এই আয়াতের দাবি হলো ওয়ালায়েতের পরাকাষ্ঠা অর্জন করা ওয়াজিব।

মূলত: হাদীসে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণিত তাক্ওয়ার হকের উদ্দেশ্য ও মর্মকেই ওলামাগণ বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করেছেন। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী, মাযহারী ও মা'আরিফুল কুরআন]

তাকওয়ার হক পালন কি রহিত? : আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেছেন যে, এই আয়াত নাজিল হলে সাহাবাদের জন্য বড় কঠিন মনে হলো, তাই তারা হুজুর ﷺ -এর দরবারে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! এই হুকুম পালন করার মতো সামর্থ্য শক্তি কার মধ্যে রয়েছে? তাদের এ কথার পর فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ তোমাদের যতটুকু শক্তি সামর্থ্য রয়েছে তদানুযায়ী তাক্ওয়া অবলম্বন করতে থাক। এই আয়াত দ্বারা প্রথম আয়াতের হুকুম রহিত হয়ে গেছে। মুকাতিল বলেছেন, সূরা আলে ইমরানের মধ্যে এ আয়াত ব্যতীত আর কোনো আয়াত রহিত নেই। –[তাফসীরে মাযহারী খ. ২, পৃ. ৩১৮]

আল্লামা আলূসী (র.) বলেছেন, এই আয়াতটি রহিত হওয়ার কথা অনেক ওলামাগণই দাবি করেছেন। আর ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে তা বর্ণিত রয়েছে। গ্রন্থকার ও অনুরূপই বলেছেন। আনাস, কাতাদা ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর এক বর্ণনায় এরূপই পাওয়া যায়। তবে আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী (র.) এর ভাষ্য মতে, আয়াতটি রহিত নয়।

তিনি বলেন, কিছু সংখ্যক ওলামাদের ধারণা যে, এই আয়াতের প্রথমাংশ (اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ) ইবনে আব্বাসের এক বর্ণনার আলোকে রহিত হয়ে গেছে। আর এর দ্বিতীয় অংশ (وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ) রহিত হয়নি।

তবে জমহুর তত্ত্বজ্ঞানী ওলামাগণ বলেছেন, প্রথমাংশটি রহিত হয়ে যাওয়ার উক্তিটা ঠিক নয়। এর স্বপক্ষে তারা নিম্নে বর্ণিত প্রমাণাদি পেশ করেছেন।

১. হযরত মু'আজ (রা.) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে মু'আজ! তুমি কি জান বান্দাদের উপর আল্লাহ তা'আলার কি হক রয়েছে? উত্তরে হযরত মু'আজ বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তখন হুজুর ﷺ ইরশাদ করলেন, তা হচ্ছে এই যে, বান্দাগণ আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না। আর এটা রহিত হয়ে যাওয়া ঠিক হতে পারে না।
২. (اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ) -এর অর্থ হলো আল্লাহকে ভয় কর, যেরূপ তাঁকে ভয় করার হক রয়েছে। আর তা অর্জিত হবে যাবতীয় পাপকর্ম বর্জনের মাধ্যমে। আর তা তো রহিত হওয়া জায়েজ হতে পারে না। কেননা এতে কোনো কোনো পাপ কাজ মুবাহ বুঝা যাবে। আর তখন اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ আর اِتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ উভয়টার অর্থ এক হয়ে যাবে। সুতরাং বুঝা গেল এটা অরহিত। আর এর উদাহরণ হচ্ছে কুরআনের আয়াত وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ

এই মতটি ইবনে জারীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে একটি সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

আল্লামা আলূসী (র.) উভয় উক্তি ও মতের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করতে গিয়ে বলেছেন, যারা রহিত হওয়ার মত পোষণ করেছেন, তারা حَقَّ تُقَاتِهٖ এর মর্ম বলেন– مَا يَحِقُّ لَهٗ وَيَلِيْقُ بِجَلَالِهٖ وَعَظْمَتِهٖ অর্থাৎ আল্লহর হক এবং তাঁর বুযুর্গী ও সুমহান শান অনুযায়ী তাঁকে ভয় করা। আর এটাতো সম্ভব নয়। যেরূপ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ তে বলা হয়েছে।

আর যারা **বলেন, রহিত নয়** তাদের মতে এর মর্ম হচ্ছে এই যে, اِتَّقُوا اللّٰهَ اِتِّقَاءً حَقًّا اَىْ ثَابِتًا وَ وَاجِبًا অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় কর, **তথা এরূপ ভয় কর** যেরূপ ভয় করা প্রমাণিত ও সাব্যস্ত রয়েছে।

তখন فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ আয়াতটি اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ-এর ব্যাখ্যা হয়ে যাবে।

সুতরাং حَقَّ تُقَاتِهٖ আয়াতটি রহিত না মানাই অধিক বিশুদ্ধ। কারণ রহিত তখন বলার প্রয়োজন হতো যদি আয়াত দুটির মধ্যে **সমন্বয় সাধন সম্ভব না** হতো। আর এখানে তো সমন্বয় সম্ভব রয়েছে। সুতরাং আয়াতের মর্ম হবে اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ مَا اسْتَطَعْتُمْ **আল্লাহকে** এরূপ ভয় কর, যেরূপ ভয় করা তাঁর হক রয়েছে নিজের শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী।

–[তাফসীরে রূহুল মা'আনী খ. ৪, পৃ. ১৭-১৮. কাবীর খ. ৮, পৃ. ১৭৭, জামালাইন খ. ১, পৃ. ৫২৪]

قَوْلُهُ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ : আর তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যু বরণ করো না। এরূপ স্থানে ইসলাম দ্বারা **আন্তরিক ঈমান** বিশ্বাসই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কেননা মৃত্যুর সময় তো জাহেরী আমল নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদি **পালন করা সম্ভব** হয় না। তাই এরূপ স্থানে ইসলাম দ্বারা আন্তরিক ঈমান বিশ্বাসই উদ্দেশ্য হওয়া স্বাভাবিক। এর প্রতিই গ্রন্থকার مُوَحِّدُوْنَ বলে ইঙ্গিত করেছেন। অথবা এর মর্ম হচ্ছে এই যে, دُوْمُوْا عَلٰى اِسْلَامِكُمْ অর্থাৎ তোমরা তোমাদের ইসলামের **উপর** সর্বদা অটল থাক। মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামের অবস্থায়, আল্লাহর আনুগত্যের অবস্থায় বাকি থাক। যাতে করে মৃত্যু যখনই তোমাদের নিকট আসে তখন যেন ইসলামের অবস্থায় মৃত্যু নসীব হয়। এর প্রতি হাদীসেও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। হাদীসটি হলো **এই** – كَمَا تَحْيَوْنَ تَمُوْتُوْنَ وَكَمَا تَمُوْتُوْنَ تُحْشَرُوْنَ – অর্থাৎ তোমরা যে অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করবে, সে অবস্থায়ই **মৃত্যু** আসবে এবং যে অবস্থায় মৃত্যু আসবে সেই অবস্থায়ই হাশরের ময়দানে সমবেত হবে।

اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ-এর ব্যাখ্যায় যে একটি উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, مُسْلِمُوْنَ-এর অর্থ– مُتَزَوِّجُوْنَ তা নেহায়াতই **ভিত্তিহীন**। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী, হাশিয়াতুস সাবী ও হাশিয়ায়ে জালালাইন]

قَوْلُهُ وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوْا : তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে আকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না, বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ো না, দলাদলি করো না। ঐক্য-একতা এমন বস্তু যা প্রশংসিত হওয়ার মধ্যে পৃথিবীর কারো কোনো দ্বিমত নেই। তবে পবিত্র কুরআন যে কোনো বিষয়ে ঐক্য ও একতার দাওয়াত দেয়নি; বরং আল্লাহর রজ্জু বা তাঁর রশিতে সারা বিশ্বের লোকদেরকে বিশেষ করে বিশ্বমুসলিমকে ঐক্য হওয়ার দাওয়াত দিয়েছে। এবার আমাদেরকে তলিয়ে দেখতে হবে আল্লাহর রশি কি?

حَبْلُ اللّٰهِ বা আল্লাহর রশির ব্যাখ্যা :

১. গ্রন্থকার আল্লামা সুয়ূতী (র.) حَبْلُ اللّٰهِ বা আল্লাহর রশির ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহর দীন, দীনে ইসলাম। তখন অর্থ হবে তোমরা একত্রিত হয়ে সুদৃঢ়ভাবে আল্লহর রশি তথা পবিত্র ইসলামকে ধারণ কর। ইসলাম নিয়ে পরস্পর পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না।

২. হযরত ইবনে মাসঊদ ও আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন اَلْقُرْاٰنُ هُوَ حَبْلُ اللّٰهِ الْمَمْدُوْدُ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ অর্থাৎ পবিত্র কুরআন আসমান থেকে পৃথিবী পর্যন্ত প্রলম্বিত আল্লাহর রশি। তখন অর্থ হবে তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর কুরআনকে আঁকড়িয়ে ধর, কুরআন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না।

৩. **আল্লাহর** রশির অর্থ হচ্ছে, আনুগত্য ও জামাতের অনুসরণ তথা সাহাবায়ে কেরামের জামাতের অনুসরণ। ইবনে মাসঊদ থেকে এ ব্যাখ্যাটিও বর্ণিত আছে। সাবেত ইবনে মুযমী বলেন, আমি ইবনে মাসঊদ (রা.) কে খুৎবা প্রদান করতে বলতে **শুনেছি**, তিনি বলেন,

হে লোক সকল! তোমাদের জন্য আল্লাহর ও রাসূলের আনুগত্য এবং সাহাবাদের জামাতের অনুসরণ আবশ্যকীয়। কেননা এ **বিষয় দুটাই আল্লাহ** তা'আলার রশি, যাকে আঁকড়ে ধরার জন্য তিনি নির্দেশ দান করেছেন।

–[তাফসীরে রুহুল মা'আনী খ. ৪, পৃ. ১৮]

■ **হযরত আবূ হুরায়রা** (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাক তোমাদের জন্য তিনটি বিষয় পছন্দ করেছেন **এবং তিনটি** বিষয় অপছন্দ করেছেন। পছন্দনীয় বিষয়গুলো এই–

১. আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করবেনা।

২. সকলে মিলে সুদৃঢ়ভাবে আল্লাহর রশিকে আঁকড়ে ধরবে। এবং অনৈক্য থেকে বেঁচে থাকবে।

৩. শাসনকর্তাদের প্রতি শুভেচ্ছার মনোভাব রাখবে।

আর অপছন্দনীয় বিষয়গুলো এই– এক. অনর্থক কথাবার্তা ও বিতর্কানুষ্ঠান। দুই. সম্পদ বিনষ্ট করা। তিন. বিনা প্রয়োজনে কারো কাছে ভিক্ষা চাওয়া। –[মুসলিম, মুসনাদে আহমদ]

- হযরত ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ পাক আমার উম্মতকে গোমরাহীর উপর ঐক্যবদ্ধ হতে দিবেন না। আল্লাহর হাত তথা সাহায্য জামাতের উপর রয়েছে, যে ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন হলো, সে জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জাহান্নামে গেল। –[তিরমিযী]
- হযরত মু'আজ ইবনে জাবাল (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, বাঘ যেরূপ ছাগল পাল থেকে বিচ্ছিন্ন বকরিকে শিকার করে ফেলে, ঠিক তেমনিভাবে শয়তান মানুষের জন্য বাঘের মতো। তাই [জামাত থেকে] বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘোরাফেরা করো না এবং জামাতের সঙ্গে থাক। –[আহমদ]
- হযরত আবূ যর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জামাত থেকে দূরে সরে গেল, সে ইসলামের রশিকে নিজের গর্দান হতে বের করে নিল।

–[মুসনাদে আহমদ, আবূ দাঊদ, তাফসীরে মাযহারী খ. ২, পৃ. ৩২০]

৪. হযরত আবূল আলিয়া (র.) হতে বর্ণিত, কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমল করা তথা ইখলাছই হচ্ছে আল্লাহর রশি।

–[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

৫. হযরত কাতাদা (র.) বলেন, আল্লাহর রশির মানে হলো তাঁর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশ। আল্লাহর রশির ব্যাখ্যায় বিবৃত এসব বিষয়াদির একটার সঙ্গে অপরটির কোনো সংঘর্ষ নেই। বরং প্রত্যেকটিই অপরটির কাছাকাছি। তাই সবগুলো উদ্দেশ্য হওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই।

৬. ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.) বলেন, اَلْمُرَادُ مِنَ الْحَبْلِ هٰهُنَا كُلُّ شَيْءٍ يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ بِهٖ اِلَى الْحَقِّ فِيْ طَرِيْقِ الدِّيْنِ অর্থাৎ এখানে আল্লাহর রশির মর্ম হলো প্রত্যেক ঐ বস্তু যা দ্বারা দীনের পথে সত্য পর্যন্ত পৌছা যায়। সেই বস্তুর এক একটি এক এক মুফাসসির উল্লেখ করেছেন। যেরূপ আমরা উপরে বলে এসেছি। –[তাফসীরে কাবীর খ. ৮, পৃ. ১৭৮]

حَبْل বা রশির প্রয়োজনীয়তা : বলা বাহুল্য যে, কোনো ব্যক্তি যদি সূক্ষ্ম কোনো রাস্তায় চলে, তাতে পদস্খলনের আশঙ্কা থাকে। তবে রাস্তার উভয় দিক থেকে বাঁধা কোনো রশি ধারণ করে নিলে পদস্খলিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। [যেরূপ আমাদর দেশে বাশের তৈরি হালকা সেতুর উভয় তরফ থেকে প্রলম্বিত এক পার্শ্বে একটি ধরনী বাশ থাকে।] আর এতে সন্দেহ নেই যে, হকের রাস্তা খুবই সূক্ষ্মতম রাস্তা, তাতে বহু লোকের পদস্খলন ঘটেছে। সুতরাং আল্লাহর লম্বিত রজ্জুকে তথা তাঁর প্রদত্ত ধর্ম, কিতাবকে আঁকড়ে ধরবে, তাঁর বিধি-বিধানের আনুগত্য করবে, সাহাবা তথা মুমিনদের জামাতের সমর্থন দিয়ে চলবে, সে নিশ্চিত ভাবেই আল্লাহ ও জান্নাত পর্যন্ত পৌছার সত্যপথ অতিক্রম করতে পদস্খলিত হয়ে জাহান্নামের অতলগহ্বরে নিক্ষিপ্ত হবে না। –[তাফসীরে কাবীর খ. ৮, পৃ. ১৭৮–৭৯]

وَلَا تَفَرَّقُوْا الخ -এর ব্যাখ্যা : আর তোমরা পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ো না, ইসলাম নিয়ে, ধর্ম নিয়ে দলাদলি করো না। ইজমায়ে উম্মতের খেলাফ বিভিন্ন মতের দিকে যেয়োনা। হক থেকে বিচ্যুত হয়োনা, পরস্পরে কোন্দল, যুদ্ধ বিগ্রহ সৃষ্টি করো না। যেরূপ জাহিলী যুগে এসব তোমাদের মধ্যে ছিল। বরং আল্লাহর নিয়ামত রাশিকে স্মরণ কর, তিনি তোমাদেরকে হেদায়েতের মতো নিয়ামত দান করেছেন, ইসলাম গ্রহণের তৌফিক দিয়ে ধন্য করেছেন। ফলে তোমাদের মধ্যে পূর্বের পরস্পর দুশমনির অবসান ঘটেছে, একশত বিশ বৎসরে চলে আসা যুদ্ধ চিরতরে থেমে গড়ে উঠেছে তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ববোধ, সম্প্রীতি ও নিজের উপর অন্য মুসলমানকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতা।

আল্লাহর এই রজ্জুকে ধারণ করে তোমরা আজ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ সম্প্রদায় হিসেবে সনদ প্রাপ্ত হয়ে গেছ। অথচ তোমরাই দীনে ইসলাম নামক রশি পাবার পূর্বে কুরআন নামক খোদায়ী রজ্জু লাভের আগে বর্বর যুগের শ্রেষ্ঠ বর্বর শ্রেণিতে পরিগণিত ছিলে। তোমরা ছিলে জাহান্নামের গর্তের পার্শ্বে অবস্থান রত, দোজখের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিমজ্জিত হওয়ার উপক্রম।

ইতোমধ্যে মুহাম্মদ ﷺ খোদা প্রদত্ত দীনে ইসলাম ও কুরআনের রশি নিয়ে এসে তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। আল্লাহ পাক **এভাবেই তাঁর নিদর্শনাবলি** বর্ণনা করেন, যাতে করে তোমরা সর্বদা হেদায়েতের উপর অটল থাকতে পার এবং ক্রমাগতভাবে **সেই হেদায়েতের স্তর** সমূহে উন্নতি লাভ করতে পার। -[তাফসীরে রূহুল মা'আনী সংযোজন বিয়োজনসহ]

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ الخ -এর ব্যাখ্যা : এই আয়াতে আল্লাহ পাক ব্যক্তি সংশোধনের পথ ও পদ্ধতি এবং **নীতিমালা** বর্ণনা করার পর অন্যদেরকে সংশোধন ও কামেল বানানোর প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করার জন্য নির্দেশ দান করেছেন। **যাতে করে** ইহুদি, মুনাফেক বাতিল চক্রদের বিপরীতে মুমিনগণ পথ প্রাপ্ত ও পথের দিশারী হয়ে যেতে পারে, যেরূপ ওরা ছিল **নিজে পথ** হারা, ভ্রান্ত, গোমরাহ ও অন্যদেরকে গোমরাহকারী। ইরশাদ হচ্ছে, তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত **যারা** লোকদেরকে কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে। যাতে থাকবে তাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উন্নতি ও মঙ্গল। বিশেষ করে তারা লোকদেরকে সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ ও শরিয়ত গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখবে। আর তারাই বস্তুত সফলকাম।

يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ এর মর্মার্থ : যারা ভালো জিনিসের দিকে ডাকে। خَيْر বা ভালোবস্তু ও কল্যাণের দিকে ডাকার মানে হলো এসব আকাইদ ও আমলের প্রতি আহ্বান করা যেগুলোর মধ্যে দীন দুনিয়ার কল্যাণ রয়েছে।

* ইবনে মারদুবিয়া ইমাম বাকির থেকে **বর্ণনা** করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কুরআন ও আমার সুন্নতের উপর চলাই কল্যাণ বা খাইর। -[তাফসীরে মাযহারী]
* কারো মতে اَلْخَيْرِ -এর মানে হলো আল্লাহর উপর ঈমান আনা। আর اَلْمَعْرُوْف বলতে অন্যান্য আনুগত্য।
* মুকাতিল বলেছেন, اَلْخَيْرُ -এর অর্থ হলো ইসলাম আর اَلْمَعْرُوْف অর্থ হলো আল্লাহর আনুগত্য এবং اَلْمُنْكَرُ অর্থ হলো তার নাফরমানি।

مِنْكُمْ -এর সম্বোধিত ব্যক্তি কারা :

* **কারো** মতে, এতে সম্বোধন করা হয়েছে পূর্বের সম্বোধিত আওস ও খাজরাজ গোত্রের লোকদেরকে।
* **ইমাম** যাহহাক (র.) বলেন, এতে সম্বোধিত হলেন কেবলমাত্র সাহাবায়ে কেরামগণ।
* **তবে** অধিসংখ্যক ওলামাগণের মতে এ সম্বোধন ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত, যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তারা হলেন **প্রাথমিক** সম্বোধিতগণ অন্যথায় কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত সকল মু'মিন-মুসলমানই এ সাধারণ সম্বোধনের আওতার **অন্তর্ভুক্ত**।

مِنْكُمْ -এর মধ্যে উল্লিখিত مِنْ অব্যয় পদটি অধিকাংশ ওলামার মতে تَبْعِيْضِيَّةٌ কিছু সংখ্যকের মতে بَيَانِيَّةٌ ।
আসূলে গণা দু-চার জন আলেম ছাড়া পুরা উম্মতই এ কথার উপর একমত যে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ **ফরজে কেফায়া, ফর**জে আইন নয়। অর্থাৎ উম্মতের কিছু সংখ্যক লোকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধাদান করে নিলে **পুরো উম্মত দায় মুক্ত** হয়ে যাবে। আর কেউই না করলে সকলেই গুনাহগার হবে। -[তাফসীরে রুহুল মা'আনী]

مَعْرُوْف وَمُنْكَر -মারুফ বলতে ঐসব কাজ যার সৌন্দর্যতা আবশ্যকীয়ভাবে বা মোস্তাহাব হওয়ার প্রেক্ষিতে শরিয়তের তরফ **থেকে জানা হয়েছে। আর** মুনকার বলতে ঐ সব হারাম বা মাকরুহ কার্যাবলিকে শরিয়ত মন্দ বলে সাব্যস্ত করেছে।

قَوْلُهُ اُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ : উপরোল্লিখিত গুণে গুণান্বিত লোকেরাই পরিপূর্ণ কামিয়াব ও সফলকাম।

উল্লেখ্য **যে, সৎকাজের আদেশ** ও অসৎকাজের নিষেধ মৌখিকভাবে করাটাই কাম্য। শক্তি প্রয়োগ করাটা ব্যক্তি বিশেষের উপর আবশ্যকীয়। **যেমন- প্রশাসকবৃন্দ** ও সন্তানদের বেলায় মাতা-পিতা ও অভিভাবকগণ।

* সৎকাজটি **যে পর্যায়ের হবে** তার প্রতি আদেশকারীও ঐ পর্যায়ের হবে। সুতরাং সৎ কাজটি ফরজ, ওয়াজিব বা মোস্তাহাব হলে এর জন্য **আদেশ করাটাও ফরজ**, ওয়াজিব বা মোস্তাহাব হবে। তেমনিভাবে অসৎকাজটি যে পর্যায়ের হবে তার নিষেধ করাটাও সেই **পর্যায়েরই হবে**। সুতরাং হারাম কাজ থেকে নিষেধ করাটা ওয়াজিব হবে, আর মাকরুহে তাহরিমী থেকে নিষেধ করাটা সুন্নত **হবে,** এবং তানজিহী থেকে নিষেধ করাটা মোস্তাহাব হবে।

* গুনাহগার বা ফাসেকদের জন্যও সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা ওয়াজিব। কারণ সকল অসৎ কাজে জড়িতদেরকেই নিষেধ করা ওয়াজিব। সুতরাং ফাসেক তার নিজ সত্ত্বাকে নিষেধ না করার দরুন অন্যদেরকে নিষেধ করার দায়িত্ব তার উপর থেকে সরে যাবে না। -[তাফসীরে রূহুল মা'আনী খ. ৪, পৃ. ২৩]

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের শর্ত : সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের জন্য পাঁচটি জিনিসের প্রয়োজন রয়েছে।

১. আদেশ ও নিষেধের সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে শরয়ী জ্ঞান থাকা। কারণ মূর্খ ব্যক্তি শরিয়ত সম্মত তরিকায় আদেশ নিষেধ করতে পারবে না।

২. এর দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আল্লাহর কালিমা সমুন্নত করা উদ্দেশ্য হওয়া। লোক দেখানো ও খ্যাতিলাভ উদ্দেশ্য না হওয়া।

৩. যাকে আদেশ করা হবে বা নিষেধ করা হবে তার প্রতি স্নেহপরায়ণ থাকা, নরম ও ভদ্র ভাষায় বলা।

৪. এ মহান কাজ করতে গিয়ে ধৈর্য ও সহনশীল থাকা।

৫. যে আদেশ বা নিষেধটা করেছে সেটা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল থাকা। [ফতোয়ায়ে আলমগীরী]

তাফসীরে আহমদীতে বলা হয়েছে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের বাধাদানকারীর জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে। আর তা হচ্ছে আদেশ বা নিষেধকারীর শক্তি সামর্থ্যের ভিতরে হওয়া। ফেৎনা ও ফ্যাসাদ সৃষ্টির আশঙ্কা না থাকা। -[হাশিয়ায়ে জালালাইন]

قَوْلُهُ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا الخ : অর্থাৎ ঐ সব লোকদের ন্যায় হয়োনা, যারা ধর্ম নিয়ে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং তাওহীদ ও আখিরাতের ব্যাপারে বিভিন্ন রকম মত পোষণ করেছে। যেমন- ইহুদি ও খ্রিস্টানেরা। তাদের নিকট প্রকাশ্য প্রমাণাদি এসে যাওয়ার পর। ঐ সব প্রমাণাদি উপস্থিত হয়ে যাওয়ার পর যা দ্বারা কালিমা একই প্রমাণিত হয় বা তাওরাত মতান্তরে কুরআন আসার পর। তাদের জন্য রয়েছে বড় শাস্তি।

আলোচ্য আয়াতে যত ইখতেলাফকে নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ বলা হয়েছে তা হচ্ছে আকাইদের ব্যাপারে। ফিকহী মাসাঈলের ইখতেলাফ জায়েজ বরং রহমতের কারণ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোনো বিষয় তোমরা আল্লাহর কিতাবে পেয়ে গেলে তদানুযায়ীই আমল করে নিবে। এর ব্যতিক্রম করার কারো সুযোগ নেই। আর যদি আল্লাহর কিতাব [কুরআনে] না পাওয়া যায় তবে আমার সুন্নতের উপর আমল করে নিবে। এ ব্যাপারে আমার কোনো হাদীসও যদি না পাওয়া যায় তাহলে আমার সাহাবাদের কথা অনুযায়ী আমল করে নিবে। আমার সাহাবাগণ নিঃসন্দেহে আকাশের নক্ষত্ররাজি তুল্য, তাদের যাকেই তোমরা অনুসরণ করবে হেদায়েত পেয়ে যাবে। আর আমার সাহাবাগণের ইখতেলাফ বা মতবিরোধ তোমাদের জন্য রহমত। উল্লিখিত হাদীসটিতে বিশেষ সাহাবাগণ উদ্দেশ্য যারা মুজতাহিদ পর্যায়ের ছিলেন। ইমাম বায়হাকী "আল মাদখাল" গ্রন্থে কাসিম ইবনে মুহাম্মদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন- اِخْتِلَافُ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ رَحْمَةٌ لِعِبَادِ اللّٰهِ تَعَالٰى অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর সাহাবাগণের মতবিরোধ আল্লাহর বান্দাদের জন্য রহমত।

আল্লামা আলূসী (র.) এই মর্মে আরো অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। এসব রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুজতাহিদ ওলামাগণের মতবিরোধ শুধু জায়েজ তাই নয়; বরং রহমতও বটে। তবে ইজতেহাদী ইখতেলাফ কেবলমাত্র مَسَائِلُ غَيْر مَنْصُوْصَة -এর মধ্যেই হবে। কারণ مَسَائِلُ مَنْصُوْصَة -এর মধ্যে তো ইজতেহাদই জায়েজ নয়। তাতে আবার ইখতেলাফ কিসের। -[তাফসীরে রূহুল মা'আনী খ. ৪, পৃ. ২৩-২৪]

بَلَاغَتْ তথা অলংকার শাস্ত্রীয় আলোচনা : এখানে تَشْبِيْه ও اِسْتِعَارَةْ সম্পর্কে কিছু আলোচনা হবে। তাই এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় লাভ করে নেওয়া আবশ্যক।

اَلتَّشْبِيْهُ [উপমা] অর্থ এক বস্তুকে অন্য বস্তুর সাথে বিশেষ কোনো বিষয়ে বা অর্থে তুলনা দেওয়া। যেমন - زَيْدٌ كَالْاَسَدِ যায়েদ সিংহের মতো। এখানে যায়েদ مُشَبَّهْ বা উপমেয়, আর সিংহ مُشَبَّهْ بِه বা উপমান। আর ك বর্ণটি اَلَةُ التَّشْبِيْهِ বা

তুলনার মাধ্যম [বর্ণ]। যাকে কোনো বিষয়ে তুলনা দেওয়া হয় তাকে مُشَبَّهْ আর যার সহিত দেওয়া হয় তাকে مُشَبَّهْ بِهٖ আর যে বিষয়ে তুলনা দেওয়া হয় তাকে وَجْهُ الشَّبْهِ এবং যে বর্ণের মাধ্যমে তুলনা দেওয়া হয় তাকে اٰلَةُ التَّشْبِيْهِ বা হরফে তাশবীহ বলে।

সুতরাং উল্লিখিত উদাহরণটিতে زَيْد হবে মুশাব্বাহ আর اَسَدْ হবে মুশাব্বাহ বিহী আর ك [কাফ] বর্ণটি হবে হরফে তাশবীহ এবং مَعْنٰى شُجَاعَتْ হবে وَجْهُ الشَّبْهِ উল্লেখ্য যে, তাশবীহের মধ্যে হরফে তাশবীহ উল্লেখ থাকা আবশ্যক।

اَلْاِسْتِعَارَةُ : আর ইস্তেআরা বলা হয় উপমার ক্ষেত্রে হরফে তাশবীহ উল্লেখ না করে মুবালাগার উদ্দেশ্যে কোনো বস্তুতে প্রকৃত অর্থের দাবি করা। যেমন– তুমি বললে لَقِيْتُ اَسَدًا আমি সিংহের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। এখানে সিংহ বলে তুমি উদ্দেশ্য করছ বাহাদুর পুরুষকে।

সুতরাং উপরিউক্ত নিয়মের তাশবীহের মধ্যে যদি مُشَبَّهْ উল্লেখ করে রূপক অর্থে مُشَبَّهْ بِهٖ উদ্দেশ্য হয় তবে তাকে اِسْتِعَارَةْ بِالْكِنَايَةِ - اِسْتِعَارَةْ مَكْنِيَّةْ বলা হয়। আর যদি مُشَبَّهْ بِهٖ উল্লেখ হয় আর مُشَبَّهْ অনুল্লেখ থাকে তবে তাকে اِسْتِعَارَةْ مُصَرَّحَةْ বা اِسْتِعَارَةْ تَصْرِيْحِيَّةْ বলে। مُشَبَّهْ بِهٖ এর কোনো لَازِمْ তথা আবশ্যকীয় বস্তুকে مُشَبَّهْ -এর দিকে সম্পৃক্ত করাকে اِسْتِعَارَةْ تَخْيِيْلِيَّةْ বলে। আর مُشَبَّهْ بِهٖ -এর কোনো মুনাসিব বস্তুকে মুশাব্বাহের জন্য সাবিত করাকে اِسْتِعَارَةْ تَرْشِيْحِيَّةْ বলে।

اِسْتِعَارَةْ تَبْعِيَّةْ : কোনো ফেলের মধ্যে ইস্তেআরা হলে তাকে اِسْتِعَارَةْ تَبْعِيَّةْ বলে।

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ -এর মধ্যে দীন বা কুরআনকে حَبْل বা রশির সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে আর মুশাব্বাহের জন্য অর্থাৎ দীন বা কুরআনের জন্য মুশাব্বাহ বিহীর নামটিকে ধার গ্রহণ করা হয়েছে اِسْتِعَارَةْ تَصْرِيْحِيَّةْ اَصْلِيَّةْ -এর প্রেক্ষিতে। উভয়টার মধ্যে মাকসূদ পর্যন্ত পৌঁছার মাধ্যম হওয়ার বিষয়টা পাওয়া যায়। সুতরাং এখানে اِسْتِعَارَةْ تَصْرِيْحِيَّةْ পাওয়া যাচ্ছে। কেননা দীন বা কুরআনকে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে রশির সাথে। কারণ মানুষ যেরূপ রশি ধারণ করে নিলে নিক্ষিপ্ত হওয়া থেকে সংরক্ষিত হয়ে যায় তেমনিভাবে দীন এবং কুরআনকে ধারণ করে নিলে দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় ধ্বংস থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। সুতরাং রশি বা حَبْل হলো মুশাব্বাহ বিহী যাকে উল্লেখ করা হয়েছে। আর দীন বা কুরআন হচ্ছে মুশাব্বাহ। তাই এখানে اِسْتِعَارَةْ تَصْرِيْحِيَّةْ বা مُصَرَّحَةْ পাওয়া গেল। আর اِعْتِصَامْ উল্লেখ করাটা تَرْشِيْح হয়েছে। এতে اِسْتِعَارَةْ تَبْعِيَّةْ ও হয়েছে। কেননা প্রথমে وثوق কে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে اِعْتِصَامْ -এর সাথে। অতঃপর وُثُوْق -এর জন্য اِعْتِصَامْ ধার হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। অতঃপর اِعْتِصَامْ থেকে اِعْتَصِمُوْا ক্রিয়া মুশতাক করা হয়েছে যা وَثِقُوْا -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

* اِخْوَانًا ও اَعْدَاءً -এর মধ্যে صَنْعَتْ طِبَاقْ হয়েছে। একে صَنْعَتْ مُقَابَلَةْ ও বলা হয়ে থাকে।

* يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ এর মধ্যেও صَنْعَتْ طِبَاقْ হয়েছে। اَمْر ও نَهْى একটা অপরটির বিপরীত। তেমনিভাবে مَعْرُوْف ও مُنْكَر ও একটি অপরটির বিপরীত।

–[জামালাইন খ. ১, পৃ. ৫২৪, হাশিয়াতুস সাবী খ. ১, পৃ. ১৭১]

অনুবাদ :

١٠٦. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوهٌ أَيْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَأَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ وَهُمُ الْكٰفِرُوْنَ فَيُلْقَوْنَ فِي النَّارِ وَيُقَالُ لَهُمْ تَوْبِيْخًا أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ يَوْمَ اَخْذِ الْمِيْثَاقِ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ .

১০৬. সে দিনকে স্মরণ কর, যেদিন বহু মুখমণ্ডল শুভ্র [উজ্জ্বল] হবে আর বহু মুখমণ্ডল কালো হবে। তথা কিয়ামত দিবসে। অতঃপর যাদের মুখমণ্ডল কালো হবে আর তারা হবে কাফেররা। সুতরাং তাদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে এবং ভর্ৎসনার প্রেক্ষিতে তাদেরকে বলা হবে। তোমরা কি ঈমান আনার পর কাফের হয়ে গেছ? (اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ) এর দিন ঈমান আনার পর। এখন কাফের হওয়ার শাস্তি ভোগ কর।

١٠٧. وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ وَهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ فَفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اَيْ جَنَّتِهٖ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ .

১০৭. আর যাদের চেহারাসমূহ সাদা উজ্জ্বল হবে আর তারা হবে মু'মিনগণ তারা থাকবে আল্লহর রহমতে তথা তাঁর জান্নাতে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

١٠٨. تِلْكَ اَيْ هٰذِهِ الْاٰيٰتُ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ بِالْحَقِّ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ بِاَنْ يَّأْخُذَهُمْ بِغَيْرِ جُرْمٍ .

১০৮. ঐ সমস্ত অর্থাৎ এ সমস্ত আল্লাহর আয়াতসমূহ যা আপনার নিকট সঠিকভাবে পাঠ করছি হে মুহাম্মদ ﷺ। আর আল্লাহ পাক বিশ্ববাসীর উপর অত্যাচারের ইচ্ছা করেন না যে, তাদেরকে তিনি অপরাধ ছাড়াই শাস্তি দিয়ে দিবেন।

١٠٩. وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِلْكًا وَخَلْقًا وَعَبِيْدًا وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ تَصِيْرُ الْاُمُوْرُ .

১০৯. আর মালিকানা, সৃষ্টি ও অধীনস্ত বান্দা হওয়ার প্রেক্ষিতে আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ তা'আলার এবং সব বিষয়ই আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রত্যাবর্তন করবে। ফেরত যাবে।

তাহকীক ও তারকীব

يَوْمَ تَبْيَضُّ الخ এর মধ্যে يَوْمَ শব্দটি اُذْكُرْ [স্মরণ কর] উহ্য ক্রিয়ার মাধ্যমে মাফউল বা কর্ম হওয়ার প্রেক্ষিতে জবরযুক্ত হয়েছে। تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ الخ পূর্ণ জুমলায়ে ফে'লিয়াটি بِتَاوِيْلِ مُفْرَدٍ মুযাফ ইলাইহি আর يَوْمَ মুযাফ মিলে مُرَكَّبْ اِضَافِىْ হয়ে اُذْكُرْ এর মাফউল হয়েছে। অথবা يَوْمَ - ظَرْف হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে। তখন ইবারতের রূপ হবে وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ فِىْ هٰذَا الْيَوْمِ –[তাফসীরে কাবীর খ. ৮, পৃ. ১৮৬]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কালো চেহারা ও সাদা চেহারা বিশিষ্ট কারা হবে? : কিয়ামত দিবসে সাদা চেহারা বিশিষ্ট কারা হবে এবং কালো চেহারা বিশিষ্ট কারা হবে এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের বিভিন্ন ধরনের উক্তি বর্ণিত রয়েছে। যেমন–

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, কিয়ামতের দিন আহলুস সুন্নাত এর চেহারা সাদা উজ্জ্বল শুভ্র হবে। আর বেদআতীদের চেহারা কালো হবে।

২. হযরত আতা (র.) বলেন, মুহাজির ও আনসারদের চেহারা সাদা হবে, আর বনূ কুরাইজা ও বনূ নজীরের চেহারা কালো হবে।

৩. হযরত আবূ উমামা (রা.) হতে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে যে, যাদের চেহারা কালো হবে তারা হলো খারেজীরা আর যাদের চেহারা সাদা হবে তারা হবে ঐ সব ব্যক্তি যারা খারেজীদের হাতে শহীদ হবে। হযরত আবূ উমামা (রা.) কে যখন জিজ্ঞাসা হলো, তুমি কি এই হাদীসটি রাসূল ﷺ থেকে শুনেছ? তখন তিনি আঙ্গুলে গুণে বললেন, যদি আমি এই হাদীসটি হুজুর ﷺ হতে সাতবার না শুনতাম তাহলে বর্ণনা করতাম না। –[তিরমিযী, জামালাইন খ. ১, পৃ. ৫২৭]

৪. গ্রন্থকার আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেছেন, যাদের চেহারা কালো হবে তারা কাফেরগণ, আর যাদের চেহারা সাদা হবে তারাই হলেন মুমিনগণ। ইহাই অধিক গ্রহণযোগ্য। উল্লেখ্য যে, সাদা ও কালো হওয়ার অর্থ সম্পর্কে তাফসীরবিদ ওলামাগণের দুটি মত পাওয়া যায়।

এক. প্রকৃত অর্থেই মুমিনদের চেহারা কিয়ামতের দিন সাদা সুন্দর হবে। আর কাফেরদের চেহারা কালো বিশ্রী হবে। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম এ মতটিকেই গ্রহণযোগ্য করেছেন।

দুই. এখানে সাদা হওয়ার অর্থ আনন্দিত হওয়া, আর কালো হওয়ার অর্থ হলো এর বিপরীত নিরানন্দ ও দুঃখিত হওয়া।

–[তাফসীরে রূহুল মা'আনী খ. ৪, পৃ. ২৫]

فَأَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ এর ব্যাখ্যা : অতএব, যাদের চেহারা কালো হবে, তাদেরকে বলা হবে, তোমরা কি ঈমান আনার পর কাফের হয়ে গেছ? এখানে বর্ণনা ভঙ্গির উপর একটা প্রশ্ন হয় যে, সংক্ষিপ্ত বর্ণনার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা সাদা চেহারার কথা প্রথমে উল্লেখ করেছেন, আর এর তাফসীলের সময় কালো চেহারা বিশিষ্টগণের কথা পূর্বে ও সাদা চেহারা বিশিষ্টগণের কথা পরে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং ইজমালের ব্যতিক্রম তাফসীল করলেন কেন এর রহস্য কি? ওলামায়ে মুফাসসিরীন এর অনেক জবাব দিয়েছেন। যথা –

১. এখানে আতফের জন্য ব্যবহৃত ওয়াও বর্ণটি উভয়টির মধ্যে কেবলমাত্র জমা ও একত্রিত করা বুঝাবার জন্য ব্যবহার হয়েছে। তারতীব বা ধারাবাহিকতা বুঝাবার জন্য নয়।

২. বিশ্ব মানবতার সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো তাদের কাছে আল্লাহর রহমত পৌছিয়ে দেওয়া, তাদের শাস্তি পৌছানো নয়। হুজুরে পাক ﷺ হাদীসে কুদসীতে আপন প্রভুর কথা নকল করে বলেন, خَلَقْتُهُمْ لِيَرْبَحُوْا عَلَيَّ لَا لِأَرْبَعَ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ আমি মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছি তারা আমার উপর লাভবান হওয়ার জন্য আমি তাদের উপর লাভবান হওয়ার জন্য নয়। বিষয়টা যখন এ রকমই হলো তাই আল্লাহ পাক প্রথমে ছওয়াবধারী সাদা চেহারা ওয়ালাদের কথা দ্বারা আলোচনাটা শুরু করেছেন। কারণ আলোচনায় উত্তমকে অধমের উপর প্রাধান্য দেওয়াটাই শ্রেয়। অতঃপর শেষ দিকে ও সাদা চেহারা ওয়ালাদের আলোচনার মাধ্যমে কথার সমাপ্তি টেনে এনেছেন। এ কথার উপর সর্তক করার জন্য যে, গজবের তুলনায় আল্লাহর রহমতের অভিপ্রায়টাই অধিক। যেরূপ তিনি বলেছেন, سَبَقَتْ رَحْمَتِيْ غَضَبِيْ আমার গজবের উপর আমার রহমত অগ্রগামী এবং প্রবল।

৩. ভাষাবিদ সাহিত্যিক ও কবিগণ বলেন, কথার শুরু এবং শেষ এমন জিনিস দ্বারা করার প্রয়োজন যে জিনিসটি মনে আনন্দ যোগায়। বলা বাহুল্য তা তো আল্লাহর রহমতই। তাই আলোচনা শুরু করা হয়েছে সাদা চেহারার সু সংবাদ প্রাপ্ত মুমিনদের দ্বারা এবং সমাপ্তও করা হয়েছে তাদেরই আলোচনার মাধ্যমে। –[তাফসীরে কবির খ. ৮, পৃ. ১৮৮-৮৯]

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো এই যে, এই আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন, اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ তোমরা কি ঈমান আনার পর কাফের হয়ে গেছ? অথচ সম্বোধনটা হচ্ছে কাফেরদেরকে, ওরা তো কোনো সময় ইতোপূর্বে ঈমান আনেনি। তাই তাদেরকে কেমন করে বলা হলো তোমরা ঈমান আনার পর কাফের হয়ে গেছ কি? এর জবাবে ওলামাগণ অনেক কিছু লিখেছেন, তন্মধ্যে থেকে নিম্নে কয়েকটি জবাব প্রদত্ত হলো–

১. গ্রন্থকার আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেছেন, আদম সন্তানদের রূহসমূহকে তার পৃষ্ঠ থেকে পিপিলিকার ন্যায় বের করে আল্লাহ পাক তাদের থেকে আপন প্রভুত্বের অঙ্গীকার গ্রহণ করতে বলেছিলেন أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ আমি কি তোমাদের প্রভু নই? তদুত্তরে সকলেই বলেছিলো قَالُوْا بَلٰى কেন হবেন না, অবশ্যই আপনি আমাদের প্রভু। সেই দিন তো সকলই আল্লাহর উপর ঈমান এনেছিল। দুনিয়াতে এসে যারা ঈমানকে অক্ষুণ্ন রাখেনি, বরং অবিশ্বাসী হয়ে কাফের হয়ে গেছে। মূলত তারা সকলেই ঈমান আনার পরই কাফের হয়েছে। এ হিসেবেই বলা হয়েছে أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ তোমরা কি মুমিন হওয়ার পর কাফের হয়ে গেলে?

২. আল্লামা আলূসী (র.) বলেছেন, এই আয়াতে পূর্বাপর অবস্থা দেখলে বুঝা যায় এখানে সম্বোধিত কাফের বলতে আহলে কিতাব ইহুদি খ্রিস্টান কাফেরই উদ্দেশ্য। আর তারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে তাঁর উপর ঈমান এনেছিল। অতঃপর যখন তিনি নবুয়ত প্রাপ্ত হলেন তখন তারা তার প্রতি অবিশ্বাসী কাফের হয়ে যায়। হযরত ইকরামা, যুজাজ ও আসিম (র.) এ মত পোষণ করেছেন।

৩. একদল আলিমের মতে এখানে সাধারণ কাফের উদ্দেশ্য বিশেষ কোনো শ্রেণির কাফের উদ্দেশ্য নয়। তাদের মতানুযায়ী এক জবাব হয়ে গেছে অর্থাৎ প্রথম জবাবটি। আরেকটি জবাব হলো এই যে, এখানে ঈমান দ্বারা ঈমানে ফিতরত উদ্দেশ্য। অর্থাৎ জন্মগতভাবে সকল মানুষের মধ্যে ঈমান আনার মতো যোগ্যতা ছিল, পরে কেউ সেই যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে মুমিন থেকেছে আর কেউ কাফের হয়েছে।

৪. হযরত হাসান (র.) বলেছেন, এখানে সম্বোধিত কাফের দ্বারা মুনাফিকগণ উদ্দেশ্য। তারা বাহ্যিকভাবে ঈমান আনার পর কুফরি প্রকাশ করেছে।

৫. হযরত কাতাদাহ্ (র.) বলেছেন, এখানে ঈমান আনার পর যারা মুরতাদ হয়ে কাফের হয়েছে তারা উদ্দেশ্য।

৬. কারো মতে, এখানে কাফের দ্বারা খারেজীগণ উদ্দেশ্য। কেননা তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ অর্থাৎ তারা ধর্ম থেকে এ রকম ভাবে বের হয়ে যায়। যেরূপ তীর ধনুক থেকে বের হয়ে যায়।

৭. কারো মতে এখানে সম্বোধিত কাফের দ্বারা বিদআতিরা উদ্দেশ্য। তবে শেষোক্ত ৬-৭ নং জবাব দুটিকে ইমাম রাযী (র.) খুবই দুর্বল বলেছেন। -[তাফসীরে কাবীর খ. ৮, পৃ. ১৮৭, রূহুল মা'আনী খ. ৪, ২৫-২৬]

قَوْلُهُ وَأَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ : অর্থাৎ আর যাদের চেহারা সেই দিন সাদা হবে, মুখমণ্ডল শুভ্র হবে তারা আল্লাহর রহমতে থাকবে। রহমত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বেহেশত। বেহেশত হলো আল্লাহ তা'আলার অবতরণ স্থল। সুতরাং এখানে حَالٌ বলে مَحَلٌ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর জান্নাতকে রহমত বলে এ কথার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সকলেই আল্লাহর রহমত তথা দয়ার মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তবে জান্নাতের স্তরসমূহ লাভ হবে আমল অনুপাতে। এর দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ দ্বারা। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বাণীও এর প্রতি ইঙ্গিত বহন করে, তিনি বলেছেন, তোমরা পুলসিরাত অতিক্রম করবে আল্লাহর ক্ষমার দ্বারা আর জান্নাতে প্রবেশ করবে তার রহমত দ্বারা এবং জান্নাতে তোমাদের অংশ তথা স্তরসমূহ লাভ হবে আমল অনুযায়ী।

* হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, সত্যতা অবলম্বন কর, মধ্যপন্থায় চলো, ভালো থাক। কেননা কারো আমল তাকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবে না। সাহাবাগণ আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ তবে কি আপনার আমলও আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবেনা। তদুত্তরে তিনি বললেন না, তবে যদি আমাকে আল্লাহ মাগফিরাত ও রহমত তথা দয়া দ্বারা ঢেকে নেন তাহলে জান্নাতে প্রবেশ হওয়া যাবে। -[বুখারী, মুসলিম, আহমদ, মাজহারী খ. ২, পৃ. ৩৩৪]

قَوْلُهُ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِيْنَ : আর আল্লাহপাক বিশ্ববাসীর প্রতি জুলুম করার ইচ্ছা করছেন না। অর্থাৎ তাদের নেকীর ছওয়াবের মধ্যে কমতি করবে না, আর গুনাহের শাস্তি গোনাহের পরিমাণের ঊর্ধ্বে দিবেন না। কুফর যেহেতু সবচেয়ে বড় গুনাহ তাই এর শাস্তিও হবে বড় এবং চিরস্থায়ী। কেননা কাফেরদের দুনিয়াতে নিয়ত থাকে যতদিন তারা বেঁচে থাকবে ততদিনই কাফের অবস্থায়ই থাকবে। তাই তাদের সেই নিয়ত অনুযায়ী শাস্তিটাও হবে স্থায়ী। সুতরাং এটা কোনো জুলুম নয়। এছাড়া আল্লাহ হলেন সারা জাহানের মালিক। আর মালিক তার মালিকাধীন বস্তুতে যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তারই উপর কোনো জিনিস করা না করা ওয়াজিব নয়। তাহলে জুলুম হবে কেমন করে? জুলুম তো বলা হয় কোনো ওয়াজিব বর্জন করাকে। -[তাফসীরে মাযহারী খ. ২, পৃ. ৩৩৫]

অনুবাদ :

١١٠. كُنْتُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ أُظْهِرَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ بِاللّٰهِ لَكَانَ الْاِيْمَانُ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ كَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ وَاَصْحَابِهِ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ الْكَافِرُوْنَ ـ

১১০. হে মুহাম্মদ ﷺ -এর উম্মতগণ! আল্লাহ তা'আলার ইলমের মধ্যে তোমরাই উত্তম দল যাদেরকে মানবজাতির উপকারার্থে বের করা হয়েছে তথা বিকাশ করা হয়েছে। তোমরা ভালোকাজের নির্দেশ দিয়ে থাক, আর মন্দকাজ থেকে বিরত রাখ এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান রাখ। আর আহলে কিতাবরাও যদি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনত তবে তাদের জন্য ঈমান আনাটা ভালো হতো। তাদের মধ্যে কিছু লোক মু'মিন রয়েছে যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) ও তার সাথীরা আর তাদের অধিকাংশরাই নাফরমান কাফের।

١١١. لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اَيِ الْيَهُوْدُ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ بِشَيْءٍ اِلَّا اَذًى ـ بِاللِّسَانِ مِنْ سَبٍّ وَوَعِيْدٍ وَاِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ الْاَدْبَارَ مُنْهَزِمِيْنَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ عَلَيْكُمْ بَلْ لَكُمُ النَّصْرُ عَلَيْهِمْ ـ

১১১. হে মুসলমানগণ ! এই ইহুদিরা মৌখিক গালাগালি ও ভীতি প্রদর্শনে সামান্য কষ্ট দেওয়া ব্যতীত তারা তোমাদের কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। আর যদি তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তবে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে পরাজিত হয়ে, অতঃপর তোমাদের বিরুদ্ধে তাদেরকে কোনো সাহায্য করা হবে না; বরং তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে।

١١٢. ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَمَا ثُقِفُوْا حَيْثُمَا وُجِدُوْا فَلَا عِزَّ لَهُمْ وَلَا اِعْتِصَامَ اِلَّا كَائِنِيْنَ بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ الْمُؤْمِنُوْنَ وَهُوَ عَهْدُهُمْ اِلَيْهِمْ بِالْاِيْمَانِ عَلٰى اَدَاءِ الْجِزْيَةِ اَيْ لَا عِصْمَةَ لَهُمْ غَيْرَ ذٰلِكَ وَبَآءُوْا رَجَعُوْا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اَيْ بِسَبَبِ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذٰلِكَ تَاْكِيْدٌ بِمَا عَصَوْا اَمْرَ اللّٰهِ وَكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ يَتَجَاوَزُوْنَ الْحَلَالَ اِلَى الْحَرَامِ ـ

১১২. তাদের [ইহুদিদের] উপর অপমান নির্ধারিত হয়ে আছে, তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাক না কেন, তাদের কোনো ইজ্জত ও সম্মানের সাথে বাঁচার উপায় নেই। কেবলমাত্র আল্লাহর ও মানুষের তথা মু'মিনদের প্রতিশ্রুতি ব্যতীত। আর মু'মিনদের প্রতিশ্রুতির অর্থ হলো ওদের জন্য তাদের তরফ থেকে জিজিয়া কর আদায়ের ভিত্তিতে নিরাপত্তা দেওয়ার সন্ধি চুক্তি হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ উল্লিখিত পদ্ধতি ছাড়া তাদের সংরক্ষণ হবে না। আর তারা আল্লাহর গজবে পতিত তথা প্রত্যাবর্তন করেছে। এবং দারিদ্র তাদের জন্য অবিচ্ছেদ্য করে দেওয়া হয়েছে। তা এ জন্য যে, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করত এবং অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করত। তা এ জন্যও যে, এটা তাকিদের জন্য এসেছে তারা আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচারণ করেছে এবং সীমালঙ্ঘন করত। হালাল ছেড়ে হারামের দিকে ছুটে যেত।

١١٣. لَيْسُوْا اَىْ اَهْلُ الْكِتٰبِ سَوَاءً. مُسْتَوِيْنَ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ مُّسْتَقِيْمَةٌ ثَابِتَةٌ عَلَى الْحَقِّ كَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ وَاَصْحَابِهٖ يَتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَاۤءَ الَّيْلِ اَىْ فِىْ سَاعَاتِهٖ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ يُصَلُّوْنَ حَالٌ.

১১৩. তারা সব তথা আহলে কিতাবগণ সমান নয়, বরাবর নয়, আহলে কিতাবদের মধ্যে একদল এমনও আছে যারা অবিচল রয়েছে, তথা হকের উপর প্রতিষ্ঠিত ও দৃঢ়পদ রয়েছে, যেমন– আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) ও তাঁর সাথিগণ। তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে রাতের মুহূর্তসমূহে পাঠ করে সিজদারত অবস্থায় তথা নামাজরত অবস্থায়। (وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ) বাক্যটি يَتْلُوْنَ ক্রিয়ার ফা'য়েলের যমীর থেকে হাল হয়েছে।

١١٤. يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَاُولٰۤئِكَ الْمَوْصُوْفُوْنَ بِمَا ذُكِرَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَيْسُوْا كَذٰلِكَ وَلَيْسُوْا مِنَ الصّٰلِحِيْنَ.

১১৪. তারা ঈমান রাখে আল্লাহর প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি, আর সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা দেয়। আর তারা কল্যাণকর কাজে দ্রুত অগ্রসর হয়। তারাই তথা উল্লিখিত গুণে গুণান্বিত লোকেরাই নেককার লোকদের অন্তর্ভুক্ত। আর তাদের আহলে কিতাবদের মধ্যে অনেক লোক এ রকমও রয়েছে যারা উল্লিখিত গুণাবলির অধিকারী নয় এবং নেককারদের অন্তর্ভুক্তও নয়।

١١٥. وَمَا تَفْعَلُوْا بِالتَّاءِ اَيَّتُهَا الْاُمَّةُ وَبِالْيَاءِ اَىِ الْاُمَّةُ الْقَائِمَةُ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوْهُ بِالْوَجْهَيْنِ اَىْ تُعْدَمُوْا ثَوَابَهٗ بَلْ تُجَازُوْنَ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ.

১১৫. আর তারা যেসব সৎকাজ করবে সেগুলোর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হবে না। وَمَا تَفْعَلُوْا ক্রিয়াটি يَا ও تَا বর্ণের সাথে বিশুদ্ধ কেরাতে রয়েছে। ইয়ার يَا সাথে (يَفْعَلُوْا) হলে অর্থ হবে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত যেদল যেসব সৎকাজ করবে সেগুলোর প্রতি অবজ্ঞা ...। আর তার (تَا) সহিত تَفْعَلُوْا হলে, অর্থ হবে, আর তোমরা যেসব সৎকাজ করবে হে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত দল। সেগুলোর প্রতি .... فَلَنْ يُكْفَرُوْهُ-তেও অনুরূপ দুই সূরত হবে। অর্থাৎ তাদের বা তোমাদের সৎকাজের ছওয়াব বিনষ্ট করা হবে না; বরং এর উপর প্রতিদান দেওয়া হবে। আর আল্লাহ তা'আলা পরহেজগারদের ব্যাপারে অবগত।

١١٦. اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِىَ تَدْفَعَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ اَىْ عَذَابِهٖ شَيْئًا وَخَصَّهُمَا بِالذِّكْرِ لِاَنَّ الْاِنْسَانَ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهٖ تَارَةً بِفِدَاءِ الْمَالِ وَتَارَةً بِالْاِسْتِعَانَةِ بِالْاَوْلَادِ وَاُولٰۤئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

১১৬. নিশ্চয় যারা কুফরি করেছে তাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি আল্লাহর নিকট কোনো কাজে আসবে না, তথা বিন্দুমাত্রও তার কোনো শাস্তি হটাতে পারবে না। বিশেষভাবে এ দুটিকে এজন্য উল্লেখ করেছেন, কারণ মানুষ নিজের উপর থেকে হয়তো কোনো সময় অর্থের বিনিময়ে শাস্তি প্রতিহত করতে চায়, আবার কোনো সময় সন্তানদের সহায়তায়ও প্রতিহত করতে চায়। তবে আল্লাহর নিকট এ দুয়ের কোনোটাই উপকারে আসবে না যদি ঈমান নিয়ে না যেতে পারে আর তারাই হলো দোজখবাসী, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

١١٧. مَثَلُ صِفَةُ مَا يُنْفِقُوْنَ اَىِ الْكُفَّارُ فِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِىْ عَدَاوَةِ النَّبِيِّ ﷺ اَوْ صَدَقَةٍ وَنَحْوِهَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ حَرٌّ اَوْ بَرْدٌ شَدِيْدٌ اَصَابَتْ حَرْثَ زَرْعَ قَوْمٍ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِالْكُفْرِ وَالْمَعْصِيَةِ فَاَهْلَكَتْهُ فَلَمْ يَنْتَفِعُوْا بِهٖ فَكَذٰلِكَ نَفَقَاتُهُمْ ذَاهِبَةٌ لَا يَنْتَفِعُوْنَ بِهَا وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ بِضَيَاعِ نَفَقَاتِهِمْ وَلٰكِنَّ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ بِالْكُفْرِ الْمُوْجِبِ لِضَيَاعِهَا -

১১৭. তারা নবী করীম ﷺ -এর প্রতি শত্রুতা করতে এবং দান খয়রাত প্রভৃতি কাজে যা দুনিয়ার জীবনে ব্যয় করে তার উদাহরণ বা অবস্থা হলো এরূপ যেমন ঐ বাতাস যাতে রয়েছে তীব্র গরম বা ঠাণ্ডা, যা ঐ সব লোকদের শস্য খেতে গিয়ে লেগেছে, যারা নিজেদের প্রতি কুফর ও নাফরমানি করে জুলুম করেছে। অতঃপর সেগুলোকে বিনষ্ট করে দিয়েছে। ফলে তারা এ ক্ষেত থেকে উপকৃত হতে পারল না, তদ্রূপ অবস্থা তাদের দান-খয়রাতেরও যে, সেসব বেকার চলে যাবে, তাদের কোনো উপকারে আসবে না। আল্লাহ তাদের সদকা খয়রাত বিনষ্ট করে তাদের প্রতি কোনো অত্যাচার করেননি; বরং তাদের সেসব ছদকার ছওয়াব বিনষ্টের কারণ-কুফর গ্রহণ করে তারা নিজেরাই নিজেদের উপর অত্যাচার করছে।

তাহকীক ও তারকীব

كُنْتُمْ -এর كَانَ নাকেসা, তাম্মাহ, যায়েদা ও صَارَ -এর অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার চারটি সম্ভাবনা রয়েছে।

১. كَانَ নাকেসা হলে অর্থ হবে, তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত ছিলে।

২. তাম্মাহ হলে অর্থ হবে, حَدَثْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ وَ وَجَدْتُمْ وَخُلِقْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ অর্থাৎ তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসেবে সৃষ্ট হয়েছে।

৩. كَانَ যায়েদা বা অতিরিক্ত হলে অর্থ হবে. كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اَىْ اَنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ উম্মত।

৪. كَانَ بِمَعْنٰى صَارَ হলে অর্থ হবে, كُنْتُمْ اَىْ صِرْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত হয়ে গেলে। তবে তৃতীয় সম্ভাবনা তথা যায়েদা বা অতিরিক্ত হওয়ার সম্ভাবনাটিকে আল্লামা ইবনুল আম্বারী নেহায়েত ত্রুটিপূর্ণ বলেছেন, কারণ كَانَ বাক্যের মধ্যে বা শেষে অতিরিক্ত হয়ে থাকে, শুরুতে নয়। যেমন আরবগণ বলেন, عَبْدُ اللّٰهِ كَانَ قَائِمٌ [আব্দুল্লাহ দাঁড়ানো আছে] তবে তারা كَانَ কে অতিরিক্ত মেনে كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ قَائِمٌ বলেনি। এছাড়া আয়াতে খবরকে নসব [যবর] দিয়ে كَانَ কে অতিরিক্ত মানা জায়েজ হতে পারে না। كَانَ কে تَامَّةٌ ধরে নিলে যেরূপ একদল তাফসীরবিদগণ বলেছেন, তখন خَيْرَ اُمَّةٍ হালের অর্থে হওয়ার কারণে মানসূব হবে। আর كَانَ কে نَاقِصَةٌ মেনে নিলে যেরূপ অধিকাংশ মুফাসসিরগণ বলেছেন, তেমনিভাবে كَانَ بِمَعْنٰى صَارَ হওয়ার সূরতেও خَيْرَ اُمَّةٍ - كَانَ ফেইলে নাকিসের খবর হওয়ার প্রেক্ষিতে নসব হবে। اُخْرِجَتْ অর্থ اُظْهِرَتْ প্রকাশ করা হয়েছে, বিকাশ করা হয়েছে তথা সৃষ্টি করা হয়েছে। اَذًى কষ্ট, তাকলিফ। اَلْاَدْبَارُ - دُبُرٌ এর বহুবচন পৃষ্ঠ, পিঠ। ضُرِبَتْ অর্থ এখানে اُلْزِمَتْ নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে, বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে। اَلذِّلَّةُ বেইজ্জতি, অপমান, লাঞ্ছনা। اَلْمَسْكَنَةُ দারিদ্রতা, গরিবী, পর মুখাপেক্ষীতা। حَبْلٌ -এর মূল

অর্থ রশি, বহুবচনে حُبُوْلٌ - حِبَالٌ । তবে এখানে প্রতিশ্রুতির অর্থে ব্যবহার হয়েছে। بَاءُوْا অর্থ رَجَعُوْا অর্থাৎ তারা প্রত্যাবর্তন করেছে। تَبَوَّأَ মূল (بَوْءٌ) ঘর থেকে নির্গত। বলা হয় تَبَوَّأَ فُلَانٌ مَنْزِلَ كَذَا অমুক ব্যক্তি এরূপ একটি ঘর বানিয়েছে। اٰنَاءٌ অর্থ- (اَوْقَاتٌ - سَاعَاتٌ) মুহূর্তসমূহ। এর একবচনের মধ্যে বহুবিধ লোগাত রয়েছে। যথা- اِنىً - [اَعْصَا -এর ওজনে] - اَنَىً [مِعَى -এর ওজনে] اِنْىٌ - اَنْىٌ আখফাশ থেকে اَنْو ও বর্ণিত আছে। يُسَارِعُوْنَ তারা দ্রুত সম্পন্ন করে, তাড়াতাড়ি করে। سُرْعَةٌ [দ্রুত করা, তাড়াতাড়ি করা] থেকে নির্গত। سُرْعَةٌ বা দ্রুত করা বলা হয় বৈধ মুহূর্তের মধ্যে আগে আগে কাজ সম্পন্ন করে নেওয়া। আর প্রশংসিত বিষয়। এর বিপরীত শব্দ আসে اِبْطَاءٌ [বিলম্ব করা]।

আর عُجْلَةٌ বা তাড়াহুড়ার অর্থ হলো অসমীচীন মুহূর্ত বা সময় আসার পূর্বে কাজ করে নেওয়া। এটা নিন্দনীয় বিষয়। এর বিপরীত শব্দ আসে اِنَاءَةٌ বা ধীরস্থিরভাবে কাজ করা বা প্রশংসিত। رِيْحٌ বাতাস, হাওয়া। বহুবচনে- اَرْوَاحٌ - اَرْيَاحٌ رِيَاحٌ তবে رِيْحٌ একবচনীয় শব্দটি আজাবের জন্য আর رِيَاحٌ বহুবচনীয় শব্দটি রহমতের জন্য খাছ। এই জন্যই হাদীস শরীফে এসেছে

- اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا وَلَا تَجْعَلْهَا رِيْحًا

صِرٌّ ঠাণ্ডা বাতাস যা ক্ষেত ও গাছ পালাকে বিনষ্ট করে দেয়। কারো মতে, صِرٌّ অর্থ - লু হাওয়াও আসে যদিও তা অপ্রসিদ্ধ। যাজ্জাজ বলেছেন, اَلصِّرُّ অর্থ صَوْتُ لَهِيْبِ النَّارِ অগ্নি শিখার ধ্বনি। কারো মতে, صِرٌّ আসলে [হিম বাতাসের কনকনে আওয়াজ] صَرَّ الْقَلَمُ وَالْبَابُ صَرِيْرًا اِذَا صَوَّتَ [কলম ও দরজায় আওয়াজ করেছে] থেকে উদ্ভূত।

বালাগাত : تَأْمُرُوْنَ وَ تَنْهَوْنَ - اَلْمَعْرُوْفَ وَالْمُنْكَرَ - اَلْمُؤْمِنُوْنَ وَالْفٰسِقُوْنَ -এর মধ্যে صَنْعَتُ طِبَاقٍ বা তেমনিভাবে مُقَابَلَةٌ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের যোগসূত্র : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুসলমানদের বিশ্বাসে অটল থাকতে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা দান করার প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আলোচ্য আয়াত كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ الخ -এর মধ্যে এ নির্দেশটি আরো অধিকতর জোরদার করা হচ্ছে। আল্লাহ পাক মুসলিম উম্মাহকে জগতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম বলে ঘোষণা করেছেন। এর প্রধান কারণই হচ্ছে তাদের উল্লিখিত গুণ বা বৈশিষ্ট্য।

একটি প্রশ্ন ও সমাধান : كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ - (الاية) : كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ আলোচ্য আয়াতটিতে বলা হয়েছে এতে كُنْتُمْ ফে'লে মাযিটি যদি ফে'লে নাকিস হয়, তবে অর্থ হবে তোমরা উত্তম ছিলে। এ দ্বারা সন্দেহ হয় যে, এ উম্মত অতীতে শ্রেষ্ঠ ছিল কিন্তু এখন নেই এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না।

১. এর উত্তরে কাজী সানাউল্লাহ (র.) বলেছেন, এখানে كَانَ (كُنْتُمْ) মাযীর সিগাহ সত্য যা অতীত কালে কোনো জিনিস প্রমাণিত করা বুঝায়। তবে এ দ্বারা এ কথা বুঝা যাচ্ছে না যে, অতীত কালের প্রমাণিত জিনিসটা এখন শেষ হয়ে গেছে বা ভবিষ্যতে গিয়ে শেষ হয়ে যাবে। এ রকমভাবে শেষ হওয়াটা নির্ভর করবে বাহ্যিক করীনা বা নিদর্শনের উপর। যেমন- যায়েদ পেট ভরে খেয়ে নেওয়ার পর কেউ বলল- كَانَ زَيْدٌ جَائِعًا قَبْلَ السَّاعَتَيْنِ অথাৎ যায়েদ দু'ঘণ্টা পূর্বে ক্ষুধার্ত ছিল। এতে বাহ্যিক নিদর্শন দ্বারা একথা বুঝা যাচ্ছে যে, এখন তার ক্ষুধা নেই। ক্ষুধার সময় তার শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু যদি অতীতে বা ভবিষ্যতে শেষ হয়ে যাওয়ার কোনো নিদর্শন না থাকে তখন সর্বদাই বুঝা যাবে। যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন- وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا [আর আল্লাহ হলেন, ক্ষমাশীল ও দয়ালু] وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَحِيْمًا আয়াত উভয়টিতে মাযী বা অতীত কালসূচক ক্রিয়া ব্যবহার হয়েছে। তবে এজন্য আল্লাহ পাক কোনো নির্দিষ্ট কালে ক্ষমাশীল দয়াবান ও জ্ঞাত বুঝা যায় না; বরং সর্বকালেই তিনি ক্ষমাশীল, দয়াবান ও জ্ঞাত। তেমনিভাবে كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ ও একথা বুঝাচ্ছে যে, উম্মতে মুসলিমা অতীতে উত্তম ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

-[তাফসীরে মাযহারী খ. ২, পৃ. ৩৩৬]

২. গ্রন্থকার আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেছেন এর অর্থ হলো كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ فِىْ عِلْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ পাকের জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ উম্মত ছিলে।

৩. এর অর্থ হলো পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে তোমাদেরকে উত্তম বলে স্মরণ করা হতো।

৪. অথবা এর অর্থ হবে كُنْتُمْ فِى اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ مَوْصُوْفِيْنَ بِاَنَّكُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ অর্থাৎ লাওহে মাহফূজে তোমাদের গুণ লিপিবদ্ধ আছে যে, তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত।

৫. তোমরা যখন থেকে ঈমান এনেছ, তখন থেকেই শ্রেষ্ঠ উম্মত। যাদেরকে মানবজাতির কল্যাণে সৃষ্টি করা হয়েছে।

এছাড়া আরো অনেক জবাব ইমাম রাযী (র.) তাঁর তাফসীরে উল্লেখ করেছেন। -[তাফসীরে কাবীর খ. ৮, পৃ. ১৯৫]

আলোচ্য আয়াতটিতে উম্মত বলে সকল মুসলিম উম্মাহকেই বুঝানো হয়েছে। যদিও এর প্রাথমিক সম্বোধিতরা ছিলেন সাহাবাগণ। এই উম্মতকে তিনটি গুণের কারণে শ্রেষ্ঠ উম্মত বলা হয়েছে। হযরত কাতাদা (র.) বলেন, হে লোক সকল! যে ব্যক্তি এই শ্রেষ্ঠ উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হতে চায়, সে যেন শ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়ার শর্তগুলো পূর্ণ করে। আর ইশারা করেছেন আয়াতে উল্লিখিত তিনটি গুণের দিকে। অর্থাৎ ১. সৎকাজের আদেশ। ২. অসৎ কাজে বাধাদান ও ৩. আল্লাহর প্রতি ঈমান। এই তিনগুণ কারো মধ্যে অর্জিত হয়ে গেলে প্রকৃত পক্ষে সেই শ্রেষ্ঠ উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবিদার হতে পারে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি এবং আমার উম্মতগণ এ করুণায় দাখিল হওয়ার আগ পর্যন্ত বাকি সমস্ত উম্মতের জন্য বেহেশতে প্রবেশ করা হারাম করে দেওয়া হয়েছে। -[মুসনাদে আহমদ]

তিরমিযী শরীফের হাদীসে এসেছে হাশরের মধ্যে বেহেশতীদের ১২০ কাতার হবে। তন্মধ্যে উম্মতে মুহাম্মদী হবে ৮০ কাতার। -[তাফসীরে মাযহারী খ. ২, পৃ. ৩৩৭]

تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, ঈমানের উপর সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা দানের বিষয়কে অগ্রে আনার কারণ কি? অথচ ঈমান তো হলো যেকোনো ইবাদত গ্রহণযোগ্য হওয়ার পূর্বশর্ত। তাই এ হিসেবে ঈমানকে পূর্বে উল্লেখ করার ছিল। এর ব্যতিক্রম হলো কেন?

১. এর জবাবে কাজী সানাউল্লাহ পানিপতী (র.) বলেন, শ্রেষ্ঠ উম্মত যারা হন তারা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ আল্লাহর প্রতি ঈমান ও অন্তরিক বিশ্বাস রেখে করে, লোক দেখানো ও খ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে নয়। এ কথাটির উপর সতর্ক করার জন্যই ঈমানের কথা পরে উল্লেখ করা হয়েছে। এমন কি আল্লাহর প্রতি ঈমান, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের জন্য এক বিশেষ ধরনের শর্ত।

২. অথবা পরবর্তী বাক্য وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتَابِ এর সহিত সম্পৃক্ত করার পক্ষে ঈমানের কথাটি শেষে উল্লেখ করা হয়েছে।
-[তাফসীরে মাযহারী খ. ২, পৃ. ৩৩৯]

৩. আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী (র.) লিখেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখার বিষয়টা সকল হকপন্থি উম্মতের মধ্যেই সমভাবে বিদ্যমান। আল্লাহর এই আয়াতের মাধ্যমে সকল উম্মতের উপর এই উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব ও ফজিলত বুঝানো উদ্দেশ্য। সুতরাং হকপন্থি সকল উম্মতের মাঝে সমভাবে বিদ্যমান। ঈমানের কারণে এ উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব ও ফজিলত অন্যান্য উম্মতের উপর প্রমাণিত করতে কার্যকর হতে পারে না। বরং এ ব্যাপারে ক্রিয়াশীল বস্তু হচ্ছে অন্যান্য উম্মতের তুলনায় এ উম্মতের উন্নত ও শক্তিশালী পন্থায় সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা দান করা যা অন্যান্য উম্মতের মধ্যে ছিল না। তাই ঈমানের পূর্বে এ দুটি বিষয়কে উল্লেখ করা হয়েছে। আর ঈমান ছাড়া যেহেতু যে কোনো আমলই গ্রহণযোগ্য হয় না, তাই একে পরে উল্লেখ করা হয়েছে। -[তাফসীরে কাবীর খ. ৮, পৃ. ১৯৮]

৪. আল্লামা আলূসী (র.) বলেন, আলোচনাটা হচ্ছে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের উদ্দেশ্যে, তাই এ দুটি বিষয়কে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এবার যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, ঈমানসহ সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ তো অন্যান্য উম্মতের মধ্যেও ছিল। তাই এসবের কারণে এই উম্মতের ফজিলত প্রমাণিত হয় কেমন করে?

এর জবাবটি ইমাম রাযী (র.) আল্লামা কাফফাল (র.)-এর বরাত দিয়ে বলেছেন, যার সারমর্ম হলো এই যে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ সাধারণত তিন পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। ১. অন্তর দ্বারা ঘৃণা করার মাধ্যমে। ২. জবান দ্বারা ও ৩. হাত তথা শক্তি প্রয়োগ তথা লড়াই ও জিহাদের মাধ্যমে। আর এই তৃতীয় পদ্ধতির সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ অর্থাৎ ইসলামি জিহাদের বিষয়টা বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়ে আছে একমাত্র আমাদের শরিয়তেই, অন্য কোনো শরিয়তে নয়। সুতরাং এই জিহাদের বিষয়টা অন্যান্য সকল উম্মতের উপর আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হয়ে দাঁড়ালো। এর দ্বারাই আমরা বাকি সকল উম্মতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছি। -[তাফসীরে কাবীর খ. ৮, পৃ. ১৯৭]

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ - الخ অর্থাৎ ইহুদিদের উপর অপমান আর লাঞ্ছনা অবধারিত করে দেওয়া হয়েছে। তথা তাদের কতল করা, বন্দি করা, তাদের সন্তানদের ও মহিলাদেরকে গোলাম-বাঁদি বানানো, তাদের সম্পদ ছিনিয়ে আনাসহ যাবতীয় অপমান ও বেইজ্জতী সবই এর অন্তর্ভুক্ত। তারা কোনোদিন পৃথিবীতে সম্মানের অধিকারী হতে পারবে না। তবে حَبْلٌ مِّنَ اللّٰهِ ও حَبْلٌ مِّنَ النَّاسِ -এর মাধ্যমে তাদের সেই বেইজ্জতির কিছুটা লাঘব হতে পারে। অর্থাৎ আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ও মানুষের প্রতিশ্রুতি, আশ্রয়ের মাধ্যমে তাদের অপমান ও লাঞ্ছনা কিছুটা হালকা হতে পারে। আল্লহর প্রতিশ্রুতি হলো ইসলাম। ইসলামের মাধ্যমে তাদের শিশু-সন্তানেরা, অযোদ্ধা মহিলারা এবং রোগী ও মাজুর পুরুষরা প্রাণ নষ্ট হওয়া থেকে বেঁচে যাবে। কারণ তাদেরকে মারতে ইসলাম নিষেধ করেছে। আর মানুষের প্রতিশ্রুতি বলতে তাদের সাথে কৃত চুক্তি। তারা যদি মুসলমানদের সাথে সন্ধি করে নেয়, চুক্তি করে নেয় তবুও তারা এক রকম লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি পেতে পারবে। মানুষের প্রতিশ্রুতির মধ্যে অমুসলমানও শামিল। তাদের আশ্রয়েও তারা কিছুটা রক্ষা পেতে পারে। যেরূপ বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্র। এই ইহুদিরা বেইজ্জত হয়ে মদিনা হতে বের হওয়ার পর থেকে প্রায় চৌদ্দশত বৎশর যাবত এরা বেইজ্জত হয়েই আছে। পৃথিবীতে তাদের কোনো স্বাধীন স্বীকৃত রাষ্ট্র নেই। ইসরাঈল স্বাধীন স্বীকৃত কোনো দেশ নয়। বিশ্ব তাদেরকে এখনো স্বীকৃতি দেয়নি। তারা আমেরিকা, ব্রিটেন ও রাশিয়ার ছত্রছায়ায় তাদের এক সেনা ছাউনির উর্ধ্বে কিছু নয়। তাদের সাহায্য সহায়তা যদি ইহুদিদের উপর থেকে সরে যায় তবে এক দিনের জন্যও তারা ইসরাইলে টিকে থাকতে পারবে না। তাই ইসরাইলের ইহুদিদের কারণে আল্লাহর ঘোষণা অসত্য প্রমাণিত হচ্ছে না। কারণ তিনি তো ইস্তেছনা বা পৃথক করে বলে দিয়েছেন যে, আল্লাহর আশ্রয় বা মানুষের আশ্রয়ে তারা কিছুটা লাঞ্ছনা হতে বাঁচতে পারবে।

এখানে একটা প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ পাক বলেছেন, তাদের এই লাঞ্ছনা ও অপমানের কারণ হলো এই যে, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করতো এবং নবীদেরকে হত্যা করতো। প্রশ্ন হয় বর্তমান যুগের ইহুদিরা তো নবীদেরকে অন্যায় ভাবে হত্যা করছেনা। তদুপরি তাদের দিকে হত্যার সম্পর্ক হয় কেমন করে? এর জবাব হলো এই যে, তাঁরা বাব-দাদাদের না হক হত্যার প্রতি সন্তুষ্ট। তাই তাদের প্রতি এই হত্যার সম্পর্ক করা হয়েছে। -[হাশিয়ায়ে জালালাইন, তাফসীরে কাবীর]

لَيْسُوْا سَوَآءً مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ - الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** উক্ত আয়াতের শানে নুযূল নিয়ে কয়েকটি বর্ণনা পাওয়া যায়-

১. যখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ও তাঁর সাথীগণ- যেমন হযরত সা'লবা ইবনে শুবা, উসাইদ ইবনে শুবা, উসাইদ ইবনে উবাইদ এবং তাদের সাথে ইহুদিদেরও কিছু লোকেরা ইসলাম কবুল করেন। ঈমান আনলেন, বিশ্বাস স্থাপন করলেন এবং ইসলামের প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়েন, তখন ইহুদি আলেমরা এবং তাদের অমুসলিমরা বলতে লাগল মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি ঈমান এনেছে যারা এবং যারা তাঁর অনুসারী হয়েছে তারা তো হলো আমাদের মন্দ-খারাপ লোকেরা যদি তারা ভালো মানুষ হতো তবে বাব-দাদাদের ধর্ম ছেড়ে অন্য ধর্মের দিকে যেতো না। তাদের প্রতিবাদে আল্লাহ পাক لَيْسُوْا سَوَآءً থেকে নিয়ে اُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ পর্যন্ত আয়াত দুটি নাজিল করেন। এতে প্রমাণ করিয়ে দিয়েছেন যে, যারা মুসলমান হয়েছে তারা মন্দলোক নয়; বরং তারা নেককারদের অন্তর্ভুক্ত। আর তোমরা যারা ইসলাম গ্রহণ কর নাই তারাই মন্দ ও দুষ্ট।

-[তাফসীরে রুহুল মা'আনী খ. ৪, পৃ. ৩৩]

২. উল্লিখিত আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে আরেকটি বিবরণ হলো এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে যেহেতু আহলে কিতাবদের অন্যান্য আচরণের কথা বর্ণিত হয়েছে তাই এই সত্য ঘোষণা করা হযেছে যে, আহলে কিতাবদের সকলই পথভ্রষ্ট না; বরং তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক রয়েছে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং ভালোগুণে গুণান্বিত।

৩. ইমাম ছাওরী (র.) বলেছেন, যারা মাগরিব ও ঈশার মধ্যবর্তী সময়ে নামাজ পড়ত তাদের সম্পর্কে আয়াতটি নাজিল হয়েছে।

৪. হযরত আতা (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতটি নাজরানের ৪০ জন, হাবশার ৩২ জন এবং রুমের ৩ জন সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তারা ঈসায়ী ধর্মের অনুসারী ছিল পরে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি ঈমান নিয়ে এসেছিলো। প্রিয় নবীর আবির্ভাবের পূর্বেই তারা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং তার হিজরতের পূর্বে মদিনায় আনসারদের সঙ্গে তাদের বন্ধুত্ব ছিল। আনসারদের মধ্যে হযরত আসআদ ইবনে জোবায়ের, বারা ইবনে আনাস (রা.) সহ প্রমুখ সাহাবাদের সঙ্গে তাদের বন্ধুত্ব ছিল। তারা মিল্লাতে ইবরাহীমি সম্পর্কে অবগত ছিল। তদানুযায়ী আমল করতো। অতঃপর আমাদের প্রিয় নবী ﷺ-এর নবুয়তের পর তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং তাকে সহায়তা করে তারা ধন্য হয়েছিল।

-[তাফসীরে কাবীর খ. ৮, পৃ. ২০৬, মাযহারী খ. ২, ৩৪৩, হাশিয়ায়ে জালালাইন]

অনুবাদ :

١١٨. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً اَصْفِيَاءَ تَطَّلِعُوْنَهُمْ عَلٰى سِرِّكُمْ مِنْ دُوْنِكُمْ اَىْ غَيْرِكُمْ مِنَ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى وَالْمُنَافِقِيْنَ لَا يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا نَصَبَ بِنَزْعِ الْخَافِضِ اَىْ لَا يَقْصُرُوْنَ لَكُمْ جُهْدَهُمْ فِى الْفَسَادِ وَدُّوْا تَمَنَّوْا مَا عَنِتُّمْ اَىْ عَنَتَكُمْ وَهُوَ شِدَّةُ الضَّرَرِ قَدْ بَدَتْ ظَهَرَتِ الْبَغْضَاءُ الْعَدَاوَةُ لَكُمْ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ بِالْوَقِيْعَةِ فِيْكُمْ وَاطِّلَاعِ الْمُشْرِكِيْنَ عَلٰى سِرِّكُمْ وَمَا تُخْفِىْ صُدُوْرُهُمْ مِنَ الْعَدَاوَةِ اَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ عَلٰى عَدَاوَتِهِمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ذٰلِكَ فَلَا تُوَالُوْهُمْ .

১১৮. হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের আপনজন ব্যতীত কোনো লোককে তথা ইহুদি, নাসারা ও মুনাফিকদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু তথা অকৃত্রিম বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না। যারা তোমাদের গোপন রহস্যের উপর অবগতি লাভ করে নিবে। তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোনো ত্রুটি করে না। خَبَالًا শব্দটি যের দানকারী فِىْ অব্যয় পদ উহ্য হওয়ার মাধ্যমে [মানসূব] যবর যুক্ত হয়েছে। আসল রূপ হবে لَا يَقْصُرُوْنَ لَكُمْ جُهْدَهُمْ فِى الْفَسَادِ [তারা তোমাদের জন্য ফাসাদ করার মধ্যে স্বীয় প্রচেষ্টায় ত্রুটি করবে না।] তারা কামনা করে আশা করে তোমাদের কষ্ট তথা তীব্র ক্ষতি। বস্তুত তাদের মুখ থেকেই তোমাদের কুৎসা রটনা করে এবং তোমাদের গোপন রহস্য সম্পর্কে মুশরিকদেরকে অবগত করে তোমাদের প্রতি তাদের বিদ্বেষ শত্রুতা প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। আর যা কিছু তাদের অন্তরে লুকিয়ে রয়েছে তা অত্যন্ত জঘন্য। নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট তাদের শত্রুতামির নিদর্শনাবলি বর্ণনা করেছি যদি তোমরা বুঝে নিতে পার। তবে তাদের সাথে বন্ধুত্ব রেখো না।

١١٩. هَاَ لِلتَّنْبِيْهِ اَنْتُمْ يَا اُولَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ تُحِبُّوْنَهُمْ لِقَرَابَتِهِمْ مِنْكُمْ وَصَدَاقَتِهِمْ وَلَا يُحِبُّوْنَكُمْ لِمُخَالَفَتِهِمْ لَكُمْ فِى الدِّيْنِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهٖ اَىْ بِالْكُتُبِ كُلِّهَا وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِكِتَابِكُمْ وَاِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْا اٰمَنَّا وَاِذَا خَلَوْا عَضُّوْا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ اَطْرَافَ الْاَصَابِعِ مِنَ الْغَيْظِ .

১১৯. সাবধান! هَا শব্দটি সতর্ক করণের জন্য এসেছে। তোমরাই শুধু হে মুমিনগণ! তাদেরকে ভালোবাস, তাদের সঙ্গে তোমাদের আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের দরুন, আর ওরা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের সাথে বিরোধ থাকার দরুন তোমাদেরকে ভালোবাসে না। আর তোমরা সকল আসমানি কিতাবের উপরই ঈমান রাখ এবং তারা তোমাদের কিতাবের [কুরআনের] উপর বিশ্বাস রাখে না। আর তারা যখন তোমাদের সাথে মিলিত হয় তখন তারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি, আর যখন একাকী হয় তখন তারা আক্রোশের কারণে আঙ্গুলি তথা আঙ্গুলির অগ্রভাগ কাটতে থাকে।

شِدَّةَ الْغَضَبِ لِمَا يَرَوْنَ مِنْ اِئْتِلَافِكُمْ وَيُعَبَّرُ عَنْ شِدَّةِ الْغَضَبِ بِعَضِّ الْاَنَامِلِ مَجَازًا وَاِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ عَضٌّ قُلْ مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ ـ اَىْ اِبْقُوْا عَلَيْهِ اِلَى الْمَوْتِ فَلَنْ تَرَوْا مَا يَسُرُّكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ بِمَا فِى الْقُلُوْبِ وَمِنْهُ مَا يُضْمِرُهُ هٰؤُلَاءِ ـ

অর্থাৎ তীব্র রাগের কারণে এরা এরূপ করে, তোমাদের পারস্পরিক সম্প্রীতি দেখে প্রচণ্ড রাগকে রূপক অর্থে আঙ্গুলি কাটা দ্বারা বুঝানো হয়েছে, যদিও সেখানে বাস্তবে আঙ্গুলি কাটা ছিল না। [হে রাসূল ﷺ] আপনি এদেরকে বলে দিন যে, তোমরা তোমাদের আক্রোশের দরুন মরে যাও। অর্থাৎ তোমরা মরণ পর্যন্ত ক্রোধগ্রস্ত হয়ে থাক। তবুও তোমরা তোমাদের আনন্দদায়ক বস্তুটি দেখতে পাবে না। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা বক্ষের কথা তথা মনের কথা খুব ভালো জানেন। আর এসব কথার থেকেই ঐসব কথা যেগুলোকে তারা লুকিয়ে রেখেছে।

١٢٠. اِنْ تَمْسَسْكُمْ تُصِبْكُمْ حَسَنَةٌ نِعْمَةٌ كَنَصْرٍ وَغَنِيْمَةٍ تَسُؤْهُمْ تُحْزِنُهُمْ وَاِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ كَهَزِيْمَةٍ وَجَدْبٍ يَفْرَحُوْا بِهَا وَجُمْلَةُ الشَّرْطِيَّةِ مُتَّصِلَةٌ بِالشَّرْطِ قَبْلُ وَمَا بَيْنَهُمَا اِعْتِرَاضٌ وَالْمَعْنٰى اَنَّهُمْ مُتَنَاهُوْنَ فِىْ عَدَاوَتِكُمْ فَلِمَ تُوَالُوْنَهُمْ فَاجْتَنِبُوْهُمْ وَاِنْ تَصْبِرُوْا عَلٰى اَذَاهُمْ وَتَتَّقُوا اللّٰهَ فِىْ مُوَالَاتِهِمْ وَغَيْرِهَا لَا يَضُرُّكُمْ بِكَسْرِ الضَّادِ وَسُكُوْنِ الرَّاءِ وَضَمِّهَا وَتَشْدِيْدِهَا كَيْدُهُمْ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ مُحِيْطٌ عَالِمٌ فَيُجَازِيْهِمْ بِهِ ـ

১২০. যদি তোমাদের কোনো কল্যাণ লাভ হয় তথা কোনো নিয়ামত তোমাদের কাছে পৌঁছে যায়। যেমন সাহায্য বা গনিমতের মাল তবে তারা দুঃখিত হয় টেনশনগ্রস্ত হয়। আর যদি তোমাদের কোনো প্রকার অকল্যাণ হয় যেমন– পরাজয় ও দুর্ভিক্ষ তখন এতে তারা আনন্দ বোধ করে। (اِنْ تَمْسَسْكُمْ) (وَاِذَا لَقُوْكُمْ الخ) জুমলায়ে শর্তিয়াটি শর্তের পূর্বোক্ত বাক্য (الخ) -এর সাথে সম্পৃক্ত, আর এই বাক্য উভয়টির মাঝখানে (مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ الخ) বাক্যটি جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ হিসেবে এসেছে। মর্ম হলো এই যে, তারা তোমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণে চরমে পৌঁছে আছে। তদুপরি তোমরা তাদের সঙ্গে আন্তরিক বন্ধুত্ব কেন রাখ? সুতরাং তোমাদের জন্য তাদেরকে এড়িয়ে চলা উচিত। আর যদি তোমরা তাদের দেওয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ কর এবং তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ইত্যাদি বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করতে থাক, তবে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না (لَا يَضُرُّكُمْ) -এর মধ্যে ض -এর যের ও ر [রা] সাকিনের সহিত এবং ض [দোয়াদের পেশ] ও ر [রার] তাশদীদের সহিতও কেরাত রয়েছে।

নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাদের কার্যাবলিকে পরিবেষ্টন করে আছেন এবং জানেন। يَعْمَلُوْنَ -এর মধ্যে ى [ইয়া] ও ت [তা] উভয় বর্ণের সহিত কেরাত রয়েছে। সুতরাং তিনি তোমাদেরকে ভিন্ন কেরাত মতে তাদেরকে প্রতিদান দিবেন।

তাহকীক ও তারকীব

بِطَانَةٌ বহুবচনে بَطَائِنُ অন্তরঙ্গ বন্ধু, অকৃত্রিম বন্ধু।

بِطَانَةٌ মূলত: কাপড়ের ভিতরের অংশকে বলা হয় যা শরীরে চামড়ার সাথে মিলে থাকে। যেরূপ ظِهَارَةٌ কাপড়ের বহিরাংশকে বলা হয়।

اَلو ـ لَا يَأْلُوْنَ [ত্রুটি করা] মাসদার থেকে নির্গত। যা جَمْعُ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ সীগাহ। অর্থ- তারা ত্রুটি করে না।

خَبَالًا ـ خَبَالٌ অর্থ- ফ্যাসাদ, ক্ষতি। خَبَالٌ আসলে ঐ ফ্যাসাদকে বলা হয় যা মানুষের মধ্যে এসে যাওয়ার পর তার মধ্যে অস্বস্তি সৃষ্টি হয়ে যায়। যেমন, ব্যাধি, উন্মাদনা, পাগলামি। কোনো সময় সাধারণ ভাবে ক্ষতি ও ফ্যাসাদের অর্থে ব্যবহৃত হয়।

اَىْ لَا يُقَصِّرُوْنَ لَكُمْ فِى الْخَبَالِ اَىْ فِى الشَّرِّ শব্দটি خَبَالًا مَنْصُوْبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ এর প্রেক্ষিতে মানসূব হয়েছে। مَا وَالْفَسَادِ অথবা لَا يَأْلُوْنَ -এর ফায়েলের যমীর হতে হাল হওয়ার প্রেক্ষিতে মানসূব হয়েছে। وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ -এর মধ্যে টি মাসদারিয়া اَشَدَّ الْبُغْضِ - اَلْبَغْضَاءُ মারাত্মক শِدَّةُ الضَّرَرِ وَالْمَشَقَّةِ [অত্যন্ত ক্ষতি ও কষ্ট] অর্থ عَنَتٌ - اَىْ عَنَتَكُمْ । দুশমনি, চরম বিদ্বেষ। اَفْوَاهٌ - فَمٌ -এর বহুবচন মুখ। যা মূলত فَوْهٌ ছিল। এই জন্যই এর বহুবচন اَفْوَاهٌ -এর ওজনে আসে।

–[হাশিয়ায়ে জালালাইন, তাফসীরে রূহুল মা'আনী, তাফসীরে কাবীর]

বালাগাত :

* لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ -এর মধ্যে اِسْتِعَارَةٌ تَصْرِيْحِيَّةٌ হয়েছে। بِطَانَةً এর মূল অর্থ হচ্ছে কাপড়ের ভিতরের অংশ, চামড়ার দিকের অংশ। এখানে রহস্যবিদ অন্তরঙ্গ বন্ধুকে بِطَانَةً -এর সাথে তাশবীহ বা তুলনা দেওয়া হয়েছে, অতঃপর بطانة মুশাব্বাহ বিহী উল্লেখ করত: মুশাব্বাহ তথা অন্তরঙ্গ বন্ধু উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

* وَاِذَا خَلَوْا عَضُّوْا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ -এর মধ্যে اِسْتِعَارَةٌ تَمْثِيْلِيَّةٌ হয়েছে। এতে দুশমনের রাগ ও ক্রোধের অবস্থাকে লজ্জিত ও হতবুদ্ধি দিশেহারা ব্যক্তির দাঁত দ্বারা আঙ্গুল কাটার সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে।

–[জামালাইন খ. ১, পৃ. ৫৩১-৩২]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً ـ الخ অর্থাৎ হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের লোক [ঈমানদারগণ] ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোনো ত্রুটি করে না। তোমরা কষ্টে থাক তাতেই তাদের আনন্দ।

আয়াতের শানে নুযূল : উপরোল্লিখিত আয়াত অবতরণের একটি প্রেক্ষাপট রয়েছে। আর তা হলো এই-

মদিনার পার্শ্ববর্তী এলাকা বসবাসকারী ইহুদিদের সাথে আওস ও খাজরাজ গোত্রের প্রাচীনকাল থেকেই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। ব্যক্তিগত এবং গোত্রগত উভয় পর্যায়েই তারা একে অন্যের প্রতিবেশী ও মিত্র ছিল। আওস ও খাজরাজ গোত্র মুসলমান হওয়ার পরও ইহুদিদের সাথে পুরাতন সম্পর্ক বহাল রাখে এবং তাদের লোকেরা ইহুদি বন্ধুত্বের সাথে ভালোবাসা ও আন্তরিকতা পূর্ণ ব্যবহার অব্যাহত রাখে। কিন্তু ইহুদিদের মনে মহানবী ﷺ ও তাঁর দীনের প্রতি শত্রুতা। তাই তারা এমন কোনো ব্যক্তিকে আন্তরিকতার সাথে ভালোবাসতে সম্মত ছিল না, যে এ ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যায়। কাজেই তারা আওস ও খাজরাজ গোত্রের আনসারদের সাথে বাহ্যত পূর্ব সম্পর্ক বহাল রাখলেও এ সময় মনে মনে তাদের শত্রুতা হয়ে গিয়েছিল। বাহ্যিক বন্ধুত্বের আড়ালে তারা মুসলমানদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিবাদ বিসংবাদ সৃষ্টির চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকত এবং তাদের দলগত গোপন তথ্য শত্রুদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করতো। আলোচ্য আয়াত নাজিল করে আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাবদের এহেন দুরভিসন্ধি থেকে মুসলমানদেরকে সতর্ক থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি বর্ণনা করেছেন।

–[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন খ. ২, পৃ. ১৬৩]

অতএব আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, স্বধর্মাবলম্বী ছাড়া অন্য কাউকে এমন মুরব্বী ও উপদেষ্টা রূপে গ্রহণ করো না, যার কাছে যাবতীয় ও রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য প্রকাশ করা যেতে পারে।

অনুবাদ :

١٢١. وَاذْكُرْ يَا مُحَمَّدُ اِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ تُبَوِّئُ تُنَزِّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ مَرَاكِزَ يَقِفُوْنَ فِيْهَا لِلْقِتَالِ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ لِاَقْوَالِكُمْ عَلِيْمٌ بِاَحْوَالِكُمْ وَهُوَ يَوْمُ اُحُدٍ خَرَجَ مُحَمَّدٌ ﷺ بِاَلْفٍ اَوْ اِلَّا خَمْسِيْنَ رَجُلًا وَالْمُشْرِكُوْنَ ثَلَاثَةُ اٰلَافٍ وَنَزَلَ بِالشِّعْبِ يَوْمَ السَّبْتِ سَابِعَ شَوَّالٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ مِنَ الْهِجْرَةِ وَجَعَلَ ظَهْرَهُ وَعَسْكَرَهُ اِلَى اُحُدٍ وَسَوّٰى صُفُوْفَهُمْ وَاَجْلَسَ جَيْشًا مِنَ الرُّمَاةِ وَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ جُبَيْرٍ بِسَفْحِ الْجَبَلِ وَقَالَ انْضَحُوْا عَنَّا بِالنَّبْلِ لَا يَاْتُوْنَا مِنْ وَرَائِنَا وَلَا تَبْرَحُوْا غُلِبْنَا اَوْ نُصِرْنَا .

১২১. হে মুহাম্মদ ﷺ ! স্মরণ করুন সেই সময়কে যখন আপনি সকাল বেলা আপনার পরিজনদের কাছ থেকে মদিনা হতে বের হয়ে মু'মিমনদেরকে যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত স্থানে অবতরণ করিয়েছিলেন, যেখানে দাঁড়িয়ে তারা যুদ্ধ করবে এবং আল্লাহ তা'আলা খুব শ্রোতা তোমাদের কথাবার্তার ব্যাপারে খুব অবগত তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে। আর তা ছিল ওহুদের দিন, যেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ এক হাজার বা নয়শত পঞ্চাশ জন সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে বের হয়েছিলেন। অন্যদিকে মুশরিকদের সংখ্যা ছিল তিন হাজার। তৃতীয় হিজরির শাওয়াল মাসের সাত তারিখ শনিবার তিনি ঘাঁটিতে গিয়ে অবতরণ করেন। আর তাঁর এবং তাঁর দলের পৃষ্ঠ দিলেন ওহুদ পাহাড়ের দিকে এবং তিনি সৈন্যদলের কাতারসমূহ ঠিক করে দিলেন। আর তিরন্দাজের একটি দল পাহাড়ি পথে মোতায়েন করলেন, যাদের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা.)-কে। আর [তাদেরকে] বলেছিলেন, তোমরা শত্রুদেরকে তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে বিক্ষিপ্ত করে আমাদের তরফ থেকে প্রতিহত করবে যাতে করে তারা আমাদের পিছন দিক থেকে আসতে না পারে। আর তোমাদের স্থান কোনো অবস্থাতেই ত্যাগ করবে না। আমরা পরাজিত হই বা বিজিত হই।

١٢٢. اِذْ بَدَلٌ مِنْ اِذْ قَبْلَهُ هَمَّتْ طَّائِفَتٰنِ مِنْكُمْ بَنُوْ سَلِمَةَ وَبَنُوْ حَارِثَةَ جَنَاحَا الْعَسْكَرِ اَنْ تَفْشَلَا تَجْبُنَا عَنِ الْقِتَالِ وَتَرْجِعَا لَمَّا رَجَعَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَيٍّ الْمُنَافِقُ وَاَصْحَابُهُ وَقَالَ عَلَامَ نَقْتُلُ اَنْفُسَنَا وَاَوْلَادَنَا وَقَالَ لِاَبِيْ جَابِرٍ السُّلَمِيِّ الْقَائِلِ لَهُ اُنْشِدُكُمُ اللّٰهَ فِيْ نَبِيِّكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ فَثَبَّتَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى وَلَمْ يَنْصَرِفَا وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا نَاصِرُهُمَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَثِقُوْا بِهِ دُوْنَ غَيْرِهِ .

১২২. اِذْ পূর্বোক্ত اِذْ থেকে তারকীবে বদল হয়েছে। স্মরণ কর সেই সময়কে যখন তোমাদের মধ্যে দু'দল তথা বনূ সালিমা ও বনূ হারিছা যারা সৈন্যদলের দুটি বাহু ছিল। সাহস হারাবার উপক্রম হয়ে পড়েছিল। অর্থাৎ যুদ্ধ করা থেকে ভীরুতা প্রদর্শন করল এবং ফেরত চলে যাওয়ার উপক্রম হয়ে পড়ল ঐ মুহূর্তে যখন মুনাফিক আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার সাথিরা ফেরত চলে গেল, আর বলল, আমরা কিসের উপর আমাদের ও আমাদের সন্তানদের প্রাণ হত্যা করাবো? আর সে আবূ জাবের সুলামীকে বলল, যিনি তাকে বলেছিলেন, আমি তোমাদেরকে তোমাদের নবী ও তোমাদের প্রাণের হেফাজতের ব্যাপারে আল্লাহর কসম দিচ্ছি আমরা যদি একে যুদ্ধ মনে করতাম তবে তোমাদের পিছনে সাহায্য করতাম [এটাতো যুদ্ধ নয়; বরং নিজেকে ধ্বংস করার নামান্তর] এমতাবস্থায় আল্লাহপাক তাদের উভয় দলকে দৃঢ়পদ করলেন, ফলে তারা [যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে] ফেরত এলো না। অথচ আল্লাহ পাক উভয় দলেরই সহায়ক সাহায্যকারী ছিলেন। আর মু'মিনদের আল্লাহ তা'আলার উপরই নির্ভর করা উচিত। তাঁর উপরই ভরসা করা উচিত, অন্য কারো উপর নয়।

তাহকীক ও তারকীব

إِذْ غَدَوْتَ [আপনি যখন সকাল বেলা বের হলেন] মাজী وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ-এর সীগাহ। اَلْغُدُوُّ [সকাল বেলা বের হওয়া] থেকে নির্গত। تُبَوِّئُ আপনি স্থান ঠিক করে দিচ্ছেন, অবতরণ করাচ্ছেন, ঠিক ও প্রস্তুত করছেন। تَبْوِيَةً মাসদার থেকে উদ্ভুত। تَبْوِيَةً মাসদারটি উপরিউক্ত অর্থ তিনটির জন্য ব্যবহৃত হয়। مَقَاعِدَ - مَقْعَدْ-এর বহুবচন, এর অর্থ- স্থান, অবস্থানস্থল। مَقْعَدْ ও مَقَامْ-এর আসল অর্থ হলো (مَحَلُّ الْقُعُوْدِ وَالْقِيَامِ) বসার স্থান ও দাঁড়ানোর স্থান। অতঃপর এতে ব্যাপকতা এসে যাওয়ার ফলে এখন রূপক অর্থে যেকোনো স্থানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে যায়। যদিও তাতে বসা বা দাঁড়ানোর মতো কাজ নাও পাওয়া যায়। إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ পূর্বোক্ত إِذْ غَدَوْتَ থেকে বদল হয়েছে। أَنْ تَفْشَلَا অর্থাৎ تَجْبُنَا ও تَضْعُفَا দুর্বল হওয়া, শৈথিল্য প্রদর্শন করা। اَلْفَشَلُ (س) ভীত হওয়া, শৈথিল্য প্রদর্শন করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের যোগসূত্র : পূর্ববর্তী আয়াত وَإِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا-এর মধ্যে ইরশাদ হয়েছিল, যদি তোমরা সবর ও পরহেজগারী অবলম্বন কর তবে কাফেরদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবেনা। এ পর্যায়ে আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতসমূহে ওহুদ যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কারণ এতে বদর যুদ্ধের তুলনায় সৈন্য সংখ্যা অধিক হওয়া সত্ত্বেও কয়েকজন সাহাবা কর্তৃক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশ অমান্য হওয়ায় তারা এক পর্যায়ে পরাজিত হয়ে গিয়েছিলেন। এতে সবরের অভাবের ফলেই এ রকম হয়েছিল। ইমাম রাযী (র.) আরো একটি যোগসূত্র বর্ণনা করেছেন, যে, ওহুদ যুদ্ধে মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল এর কারণে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়েছিল। তাই এরূপ মুসলিম বিদ্বেষী কাফেরদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা মোটেই জায়েজ হতে পারে না। পূর্বের এক আয়াতে তাই বলা হয়েছিল।

–[তাফসীরে কাবীর খ. ৮, পৃ. ২২৪]

ওহুদ যুদ্ধ : وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ الخ-এর মধ্যে বিবৃত ঘটনা দ্বারা সংখ্যা গরিষ্ঠ ওলামাদের মতে, ওহুদ যুদ্ধের ঘটনাই উদ্দেশ্য। যদিও এতে বদর ও আহযাব যুদ্ধ উদ্দেশ্য হওয়ার ব্যাপারে আরো দুটি মত বর্ণিত রয়েছে। তবে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হলো এই যে, হিজরি তৃতীয় সনের শাওয়াল মাসের শুরুর দিকে মক্কার কাফেররা মদিনা আক্রমণ করার জন্য তিন হাজার অস্ত্রে সজ্জিত বাহিনী নিয়ে ওহুদ পাহাড়ের নিকট অবস্থান গ্রহণ করে। তাদের দলপতি ছিল আবূ সুফিয়ান। [তখনও তিনি মুসলমান হননি] সংখ্যাধিক্য ছাড়াও তাদের নিকট যুদ্ধের সামগ্রীও ছিল অধিক এবং দ্বিতীয় হিজরিতে অনুষ্ঠিত বদর যুদ্ধে অপমানকর পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জযবাও তাদের মধ্যে জাগরিত ছিল। স্বয়ং রাসূল ﷺ ও অভিজ্ঞ সাহাবাদের অভিমত ছিল মদিনার মধ্যেই থেকে যুদ্ধ করা যাক। মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইর মতও ছিল অনুরূপই। কিছু সংখ্যক যুবক সাহাবা যারা শাহাদাত লাভের আশায় অস্থির ছিল বদর যুদ্ধে যাদের অংশ গ্রহণের সুযোগ হয়নি। তারা মদিনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করতে হুজুরের কাছে বারংবার অনুরোধ জানাতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তিনি তাদের অনুরোধে মদিনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্তই গ্রহণ করে নিলেন। আর যুদ্ধের পোশাক যেরাহ ইত্যাদি পরিধান করে তিনি প্রস্তুত হয়ে গেলেন। তখন সাহাবাদের উপলব্ধি হলো যে, তিনি তো অনুরোধের কারণে বাধ্য হয়ে নিজের রায়ের বিরুদ্ধে মদিনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়েছেন। ফলে কিছুসংখ্যক সাহাবী আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার যদি ইচ্ছা হয় মদিনার ভিতরে থেকে প্রতিরোধ করার তাহলে এ রকমই করেন। কিন্তু তিনি জবাব দিলেন, কোনো নবী যখন যুদ্ধের পোশাক পরে নেয় তখন তাঁর জন্য আল্লাহর ফয়সালা ব্যতীত ফেরত আসা বা পোশাক খুলে নেওয়া সমীচীন নয়।

এক হাজার মুজাহিদ তাঁর সঙ্গে বের হলেন, কিন্তু উভয় দল যখন মুখোমুখি হলো ঠিক ঐ মুহূর্তের আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তার তিনশত সাথিকে নিয়ে শওত নামক স্থান থেকে একথা বলে ফিরত চলে আসল যে, আমাদের কথাই যখন মানা হলো না তাহলে অনর্থক প্রাণ কেন দেব? মুনাফিক আব্দুল্লাহর কথার দরুন বিক্ষিপ্ততা সৃষ্টি হয়ে যাওয়া একটা স্বাভাবিক বিষয় ছিল। এমন

কি বনূ হারিসা ও বনূ সালিমা গোত্রদ্বয়ের মন এরূপ ভেঙ্গে পড়ল যে তারা ফেরত চলে আসার ইচ্ছা করে নিয়েছিল। পরে বুযুর্গ সাহাবাদের প্রচেষ্টায় এই মতানৈক্যের অবসান ঘটে। এই অবশিষ্ট সাতশ সাহাবাদেরকে নিয়ে নবী করীম ﷺ সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন আর ওহুদ পাহাড়ের নিকট মদিনা মুনাওয়ারা থেকে প্রায় চার মাইল দূর গিয়ে নিজের সৈন্যদলকে এরূপ সারিবদ্ধ ভাবে বিন্যস্ত করলেন যে, ওহুদ পাহাড় ছিল পিছন দিকে, কুরাইশ দল ছিল সম্মুখে। এক পাশে ছিলো একটি গিরিপথ যে দিক থেকে হঠাৎ আক্রমণের আশঙ্কা ছিল। এই জন্য সেখানে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইরের নেতৃত্বাধীন পঞ্চাশজন দক্ষ তীরন্দাজের একটি দল মোতায়েন করে দিলেন, আর তাদেরকে তাকিদ দিয়ে বলে দিলেন যে, আমাদের পরিণতি যাই হোক না কেন, আমরা পরাজিত হই বা বিজয় লাভ করি, কিছুতে তোমরা নিজেদের স্থান ত্যাগ করবে না। অতঃপর যুদ্ধ শুরু হলো। কুরাইশরা বড় গুরুত্ব সহকারে ময়দানে অবতরণ করল। তাদের সংখ্যাছিল তিন হাজার, যাদের মধ্যে তিনশত ছিলো লৌহবর্ম পরিহিত সেনা, দুইশত ছিলো অশ্বারোহী বাকীরা ছিলো উষ্ট্রারোহী। কোরাইশ গোত্রের বড় বড় নেতারা সঙ্গে ছিল, সাহসবৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধ এবং উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে মহিলারাও সাথে ছিল। হাতে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে যুদ্ধের সংগীত গাইতেছিল। আর বদর যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তাদের আত্মীয় স্বজনদেরকে উত্তেজিত করতে ছিল।

ইসলামি দল তাঁর মোকাবিলায় মোট এক হাজারের চেয়েও কম ছিল। আর সমর সামগ্রীর অবস্থা ছিল এই যে, হুজুর ﷺ-এর বাহন ব্যতীত মাত্র একটি ঘোড়া ছিল।

যুদ্ধের সূচনা : যুদ্ধের প্রথম দিকে মুসলমানদের পাল্লা ভারি ছিলো। এমনকি বিরোধী দলের মধ্যে বিক্ষিপ্ততা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই প্রাথমিক সফলতাকে পরিপূর্ণ বিজয় পর্যন্ত পৌছানোর পরিবর্তে মুসলমানগণ গনিমতের মাল অর্জনের ফিকিরে লেগে যায়। এদিকে যে সব তীরন্দাজদেরকে হুজুর ﷺ গিরিপথ রক্ষার জন্য নিযুক্ত করে রেখেছিলেন তারা যখন দেখতে পেল শত্রুদলের পা নড়েবড়ে হয়ে গেছে। তারা পলায়ন করতে শুরু করছে আর মুসলমানগণ গনিমতের মাল সংগ্রহ করছে। তখন তারাও নিজেদের জায়গা ছেড়ে গনিমতের মাল গ্রহণের দিকে ধাবিত হতে লাগল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা.) তাদেরকে নবী করীম ﷺ -এর তাকিদ পূর্ণ নির্দেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, বহুবার তাদেরকে নিষেধ করেছেন। কিন্তু কয়েকজন ব্যতীত কেউই বিরত হয়নি। এই সুযোগে খালেদ ইবনে ওয়ালীদ যিনি তখন কাফের দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি সুযোগের সৎ ব্যবহার করেছেন। ওহুদ পাহাড় ঘুরে পার্শ্বের গিরিপথ দিয়ে আক্রমণ করে বসলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা.) ও তাঁর অবশিষ্ট সাথিরা ঐ আক্রমণ রোধ করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন। আর এই আক্রমণটি মুসলমানদের উপর অতর্কিতভাবে হঠাৎ এসে পৌছে যায়। অপর দিকে কাফের সৈন্যদের যারা পালিয়ে গিয়েছিলো তারাও আবার ফেরত এসে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়লো। এ রকমভাবে যুদ্ধের অবস্থা পাল্টে গেল। আর মুসলমানগণ এই অপ্রত্যাশিত অবস্থার কারণে এরূপ হতাশাগ্রস্থ হলো যে, একটি বড় অংশ বিক্ষিপ্ত হয়ে পলায়ন করল। এতদসত্ত্বেও কিছু সংখ্যক বাহাদুর সাহাবীগণ তখনও ময়দান ছাড়েননি। এমতাবস্থায় কোথা থেকে জানি এ গুজব রটে গেল যে, নবী ﷺ শহীদ হয়ে গেছেন। এই সংবাদে সাহাবাদের অবশিষ্ট শক্তিটাও লোপ পেয়ে গেল। ফলে ময়দানে অবশিষ্ট লোক খুবই কম ছিলেন। ঐ সময় হুজুর ﷺ -এর পাশে কেবলমাত্র দশজন প্রাণ উৎসর্গকারী সাহাবী ছিলেন। আর তিনি আহত হয়ে গিয়েছিলেন। পরাজয়ে কোনো ত্রুটি ছিলনা। এমতাবস্থায় সাহাবাগণ জানতে পারলেন যে, হুজুর ﷺ বহাল তবিয়তে জীবিত আছেন। ফলে ক্ষণিকের মধ্যেই তারা চতুর্দিক থেকে ছুটে এসে হুজুরের পাশে সমবেত হয়ে গেলেন। আর হুজুর ﷺ কে নিরাপদে পাহাড়ের দিকে নিয়ে গেলেন। অতঃপর কাফেররা ময়দান ছেড়ে পলায়ন করে অবশেষে মুসলমানদের বিজয় লাভ হয়।

قَوْلُهُ وَإِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ . : এই আয়াতের মধ্যে বনূ হারিছা ও বনূ সালিমা গোত্রদ্বয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। উভয় গোত্রের সম্পর্ক ছিল আওস ও খাজরাজের সাথে। মুসলমানরা যখন দেখল যে, কাফেরদের দলে তিন হাজার, আর আমাদের মাত্র সাতশত।

আর অস্ত্রের দিক দিয়েও তারা মক্কার কাফেরদের তুলনায় প্রায় নিরস্ত্রের মতোই ছিলো। ফলে তাদের মনের মধ্যে দুর্বলতা সৃষ্টি হতে লাগল। তখন আল্লহর নবী ওহীর মাধ্যমে এক থাগুলো ইরশাদ করলেন যে, মুমিনদের একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত। এছাড়া ইতঃপূর্বে বদর যুদ্ধে আল্লাহ পাক তো তোমাদের সাহায্য করেছিলেন। অথচ তখন তোমরা দুর্বল ছিলে। সুতরাং তোমাদেরকে আল্লাহর নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা থেকে বেঁচে থাকা উচিত। আশা করি তোমরা এখন শোকরগুযার হবে।

অনুবাদ :

١٢٣. وَنَزَلَ لَمَّا هَزَمُوْا تَذْكِيْرًا لَهُمْ بِنِعْمَةِ اللّٰهِ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ مَوْضِعَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ وَاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ بِقِلَّةِ الْعَدَدِ وَالسِّلَاحِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ نِعَمَهُ ـ

১২৩. আর সামনের আয়াতটি ঐ মুহূর্তে তাদেরকে আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য নাজিল হলো, যখন তারা [ওহুদে এক পর্যায়ে সাময়িক] পরাজয় হয়ে গিয়েছিল। এবং নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে বদরের যুদ্ধে সাহায্য করেছেন, বদর মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী একটা স্থান। অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল সংখ্যা ও অস্ত্র কম হওয়ার কারণে। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পার তাঁর নিয়ামতরাজির।

١٢٤. اِذْ ظَرْفٌ لِنَصَرَكُمْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ تُوْعِدُهُمْ تَطْمِيْنًا لِقُلُوْبِهِمْ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ يُعِيْنَكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلَافٍ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ ـ

১২৪. اِذْ - نَصَرَكُمْ -এর যরফ [হে রাসূল ﷺ!] স্মরণ করুন সেই সময়কে যখন আপনি মু'মিনদেরকে বলতে লাগলেন তাদের সান্ত্বনার জন্য তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিতে লাগলেন যে, তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের সাহায্যার্থে তোমাদের প্রতিপালক আসমান থেকে অবতীর্ণ তিন হাজার ফেরেশতা পাঠাবেন (مُنْزَلِيْنَ) -এর মধ্যে জযম ও তাশদীদ যোগে দুটি কেরাত রয়েছে।

١٢٥. بَلٰى يَكْفِيْكُمْ ذٰلِكَ وَفِى الْاَنْفَالِ بِاَلْفٍ لِاَنَّهُ اَمَدَّهُمْ اَوَّلًا بِهَا ثُمَّ صَارَتْ ثَلٰثَةً ثُمَّ صَارَتْ خَمْسَةً كَمَا قَالَ تَعَالٰى اِنْ تَصْبِرُوْا عَلٰى لِقَاءِ الْعَدُوِّ وَتَتَّقُوا اللّٰهَ فِى الْمُخَالَفَةِ وَيَأْتُوْكُمْ اَىِ الْمُشْرِكُوْنَ مِنْ فَوْرِهِمْ وَقْتِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلَافٍ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ بِكَسْرِ الْوَاوِ وَفَتْحِهَا اَىْ مُعَلَّمِيْنَ وَقَدْ صَبَرُوْا اَوْ اَنْجَزَ اللّٰهُ وَعْدَهُمْ بِاَنْ قَاتَلَتْ مَعَهُمُ الْمَلٰئِكَةُ عَلٰى خَيْلٍ بُلْقٍ عَلَيْهِمْ عَمَائِمُ صُفْرًا وَ بَيْضٌ اَرْسَلُوْهَا بَيْنَ اَكْتَافِهِمْ ـ

১২৫. অবশ্যই তা তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে। আর সূরা আনফালে এক হাজারের কথা এসেছে তার কারণ হলো এই যে, প্রথমত এক হাজার দ্বারা সাহায্য করেছেন। অতঃপর তাদের সংখ্যা তিন হাজারে উন্নীত হয়েছে। তারপর পাঁচ হাজার হয়ে গেছে। যেরূপ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তোমরা যদি শত্রুদের সাথে মোকাবিলার সময় ধৈর্য ধারণ কর এবং বিরুদ্ধাচারণ হতে আল্লাহকে ভয় কর, আর এমন সময় যদি কাফেররা দ্রুতগতিতে তোমাদের প্রতি আক্রমণ করে, তবে তোমাদের প্রভু তোমাদেরকে পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করবেন। (مُسَوِّمِيْنَ) -এর (و) ওয়াও যের ও যবরযোগে। যেরের অবস্থায় অর্থ হবে সমরনীতিতে পারদর্শী আর যবরের অবস্থায় অর্থ হবে, সমরবিদ্যায় শিক্ষিত। আর তাঁরা অবশ্যই ধৈর্যধারণ করেছেন এবং আল্লাহ ও তাদের সাথে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন, এ রকমভাবে যে, তাদের সাথে মুশরিকদের বিরুদ্ধে ফেরেশতাগণ চিত্রল ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে হলুদ বা সাদা রংগের পাগড়ি পরিহিতাবস্থায় যুদ্ধ করেছে, তাদের পাগড়ির শামলা উভয় কাঁধের দিকে ছেড়ে রেখেছিল।

١٢٦. وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اَىْ اَلْاِمْدَادَ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ بِالنَّصْرِ وَلِتَطْمَئِنَّ تَسْكُنَ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ فَلَا تَجْزَعْ مِنْ كَثْرَةِ الْعَدُوِّ وَقِلَّتِكُمْ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ـ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاۤءُ وَلَيْسَ بِكَثْرَةِ الْجُنْدِ ـ

১২৬. এবং আল্লাহ তা'আলা শুধু তোমাদের নসরতের সুসংবাদ হিসেবে তা তথা সাহায্য করেছেন, আর তোমাদের মনকে যেন সে সাহায্য শান্ত রাখে এবং তোমরা যেন দুশমনদের সংখ্যাধিক্য ও নিজেদের সংখ্যালঘুতার কারণে ঘাবড়ে না যাও। আর সাহায্য কেবল পরাক্রমশালী বিজ্ঞানময় আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে হয়, যাকে চান তাকে তিনি সাহায্য দান করেন। সেই সাহায্য সৈন্যবাহিনীর আধিক্যের উপর নির্ভরশীল নয়।

١٢٧. لِيَقْطَعَ مُتَعَلِّقٌ بِنَصْرِكُمْ اَىْ لِيُهْلِكَ طَرَفًا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْقَتْلِ وَالْاَسْرِ اَوْ يَكْبِتَهُمْ يُذِلُّهُمْ بِالْهَزِيْمَةِ فَيَنْقَلِبُوْا يَرْجِعُوْا خَائِبِيْنَ لَمْ يَنَالُوْا مَا رَامُوْهُ ـ

১২৭. لِيَقْطَعَ . نَصَرَكُمْ -এর মুতা'আল্লিক যাতে ধ্বংস করে দেন কাফেরদের এক অংশকে হত্যা ও বন্দী করার মাধ্যমে অথবা তাদেরকে লাঞ্ছিত করেন পরাজয়ের মাধ্যমে যেন তারা বঞ্চিত হয়ে ফিরে যায় তারা নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন করতে পারল না।

١٢٨. وَنَزَلَ لَمَّا كُسِرَتْ رُبَاعِيَّتُهُ ﷺ وَشُجَّ وَجْهُهُ يَوْمَ اُحُدٍ وَقَالَ كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ خَضَبُوْا وَجْهَ نَبِيِّهِمْ بِالدَّمِ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَىْءٌ بَلِ الْاَمْرُ لِلّٰهِ فَاصْبِرْ اَوْ بِمَعْنٰى اِلٰى اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ بِالْاِسْلَامِ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ بِالْكُفْرِ ـ

১২৮. যখন ওহুদের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর রুবাঈ দাঁত মোবারক ভেঙ্গে যায় এবং তাঁর চেহারা মোবারক যখম হয়ে পড়ে আর তিনি বললেন যে, সেই জাতি কেমন করে সফলতা লাভ করতে পারে যারা তাদের নবীর চেহারাকে রক্তাক্ত করে দিয়েছে তখন সামনের আয়াতটি নাজিল হয়। [হে রাসূল ﷺ] এতে আপনার করণীয় কিছু নেই বরং মামলাটা আল্লাহর হাতেই ন্যস্ত, তাই আপনি ধৈর্য ধারণ করুন। او - الى ان -এর অর্থে ব্যবহৃত, আল্লাহ তা'আলা হয় তাদেরকে ক্ষমা করবেন তাদেরকে মুসলমান হওয়ার তাওফীক দান করে কিংবা তাদেরকে শাস্তি দিবেন কুফরি গ্রহণ করার কারণে।

١٢٩. وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مِلْكًا وَخَلْقًا وَعَبِيْدًا يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ الْمَغْفِرَةَ لَهُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاۤءُ تَعْذِيْبَهُ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ لِاَوْلِيَائِهٖ رَحِيْمٌ بِاَهْلِ طَاعَتِهٖ ـ

১২৯. আর মালিকানা, সৃষ্টি ও অধীন দাস হওয়ার প্রেক্ষিতে যা কিছু আসমান ও জমিনে রয়েছে সে সবই আল্লাহর। তিনি যাকে ক্ষমা করতে ইচ্ছা করেন তাকে ক্ষমা করেন। আর যাকে শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছা করেন তাকে শাস্তি দান করেন। আর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বন্ধুদের জন্য অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াময় স্বীয় অনুসারীদের জন্য।

তাহকীক ও তারকীব

بَدْر মক্কা-মদিনার মধ্যস্থিত একটি কুয়ার নাম যা জুহাইনা গোত্রের বদরনামী এক লোকের ছিল। তার নামে এ কুয়াটির নাম রাখা হয়েছে। ওয়াকেদী বলেছেন, বদর একটি স্থানের নাম। কারো মতে এটা ঐ ময়দানের নাম যাতে এ কুয়াটি রয়েছে। اَذِلَّة শব্দটি ذَلِيْل -এর বহুবচন অর্থ লাঞ্ছিত, অপদস্থ ও তুচ্ছ। কারণ তারা তখন কাফেরদের নজরে খুবই হীন ও তুচ্ছ ছিল। অথবা বলা যাবে, এখানে ذُلّ -এর প্রসিদ্ধ অর্থ লাঞ্ছিত হওয়া, হীন হওয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং এখানে ذِلَّتْ -এর মর্ম সৈন্য ও সমর সামনে তুচ্ছ হওয়া। -[তাফসীরে রুহুল মা'আনী, তাফসীরে কাবীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ الاية : মুসলমানগণ কেবল মাত্র কুরাইশী কাফেলার উপর যারা ছিল নিরস্ত্র তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করার জন্য বের হয়েছিলেন। এ জন্য কুরাইশরা এ সিদ্ধান্ত করে নিয়েছিল যে, এ কাফেলার ব্যবসা দ্বারা যে আমদানি হবে এসবগুলো মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যয় করা হবে। এ উদ্দেশ্য কে সামনে রেখেই মক্কাবাসী ঐ কাফেলার বাণিজ্য অধিক থেকে অধিকতর পুঁজি বিনিয়োগের চেষ্টা করেছিল। তাই মুসলমানগণ এই কাফেলার উপর অতর্কিত আক্রমণ করে তাদের সম্পূর্ণ মাল জব্দ করার চেষ্টা করলেন। আর এটা সমর নীতির সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর বর্তমান যুগেও এ রকম হচ্ছে। বরং সম্প্রতি কেবল অজুহাত সৃষ্টি করে লোকদের এবং দেশ ও রাজ্যের বেসামরিক আসবাব পত্রকে যুদ্ধের সামান ও মারণাস্ত্র বলে এ সবগুলো জব্দ করা হচ্ছে।

বদর যুদ্ধের সারমর্ম ও এর গুরুত্ব : মদিনার দক্ষিণ–পশ্চিমে প্রায় বাইশ মাইল দূরে অবস্থিত একটি কুয়ার নাম বদর। মূলত এ কুয়াটি বদর নামী এক ব্যক্তির ছিল। তার নামে কুয়াটির নামও বদর হয়ে গেছে। তখনকার সময় ঐ স্থানটি গুরুত্বপূর্ণ এজন্য ছিল যে, সেখানে পানি ছিলো প্রচুর। এটা বাহরে আহমরের উপকুল থেকে এক মঞ্জিল দূরে অবস্থিত একটি ছাউনি ও বাজারের নাম। এ স্থানটি সিরিয়া, মদিনা ও মক্কার সড়কসমূহে তেমোড়ে ছিল। আর কুরাইশের বাণিজ্যিক কাফেলা সমূহ এ পথ দিয়েই আসা–যাওয়া করত।

এটি তাওহীদ ও শিরকের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ। এখানেই ১৭ রমজান, শুক্রবার হিজরি দ্বিতীয় সাল মোতাবেক ১১ মার্চ ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ যুদ্ধ বিশ্বের ইতিহাসে এক বিরাট ধরনের ইনকিলাব সৃষ্টি করেছিল। ইংরেজ ইতিহাসবিদগণও এর গুরুত্বের কথা স্বীকার করেছে। হিস্টুরিস হাটুরী অফ ওয়ার্ল্ড এর মধ্যে বিবৃত হয়েছে যে, "ইসলামি বিজয়ের ধারাবাহিকতায় বদর যুদ্ধ সর্বাধিক গুরুত্ব রাখে। –[হিস্টুরী হাটুরী অফ ওয়াল্ড খ. ৮. পৃ. ১২২]

এবং আমেরিকার প্রফেসর হিট্টির রচিত হিস্টুরি অফ দ্যা আরচস এর মধ্যে বলা হয়েছে যে, এটা [বদর যুদ্ধ] ইসলামের সর্ব প্রথম সুস্পষ্ট বিজয় ছিল।" –[হিস্টুরী অফ দ্যা আরচস ১০৭ পৃ.]

মক্কার মুশরিকদের সৈন্য সংখ্যা এবং তাদের সশস্ত্র হওয়ার অবস্থা শুনে মুসলমানদের মধ্যে ঘাবরানো ও বিক্ষিপ্ততা এবং জুশের মিশ্র প্রতিক্রিয়া হওয়াটা একটি কুদরতি ব্যাপার ছিল, আর তা হয়েছিলও বটে। ফলে তারা আল্লাহর কাছে দোয়া ও ফরিয়াদ জানালেন। এর উপর আল্লাহ পাক এক হাজার ফেরেশতা অবতরণ করলেন। আর অতিরিক্ত আরো প্রেরণ করার এ অঙ্গীকার প্রদান করলেন যে, তোমরা যদি সবর ও পরহেজগারীর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পার তাহলে ফেরেশতাদের সংখ্যা বাড়িয়ে পাঁচ হাজার করে দেওয়া হবে। বলা হয় যে, যেহেতু মুশরিকদের উত্তেজনা ও ক্রোধ টিকে থাকতে পারেনি তাই পূর্ব ঘোষিত সুসংবাদ অনুযায়ী তিন হাজার ফেরেশতা পাঠানো হয়েছিল, পাঁচ হাজারের সংখ্যা পূরণ করার প্রয়োজন পড়েনি। আর কিছু সংখ্যক তাফসীরবিদগণ বলেন, এই পাঁচ হাজারের সংখ্যাপূর্ণ করা হয়েছে। কারণ ফেরেশতাদের অবতরণ করার উদ্দেশ্য সরাসরি তাদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা ছিল না। বরং কেবলমাত্র মুসলমানদের সাহসবৃদ্ধি করাটাই উদ্দেশ্য ছিল। অন্যথায় ফেরেশতাদের মাধ্যমে যদি কাফেরদেরকে ধ্বংস করানোই উদ্দেশ্য হতো, তাহলে এত ফেরেশতা নাজিল করার প্রয়োজন ছিল না। একজন ফেরেশতাই সকলের ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট ছিল। একজন ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ.) ইসুদ্দুম জাতি তথা লূৎ (আ.) -এর জনপদকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। যেহেতু এটা ছিলো জিহাদের বিষয় আর জিহাদ মানুষেরই করতে হয়, যাতে তারা ছওয়াব ও প্রতিদানের উপযোগী হতে পারে। ফেরেশতাদের কাজ ছিল কেবল সাহস বৃদ্ধি করে দেওয়া, যা পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। –[জামালাইন –১/৫৩৮ – ৪১]

قَوْلُهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ : [হে রাসূল ﷺ! এতে আপনার করণীয় কিছু নেই যে, আল্লাহ পাক তাদেরকে ক্ষমা করবেন কি শাস্তি দিবেন, কেননা তারা অত্যাচারী।] আলোচ্য আয়াতটির শানে নুযূল সম্পর্কে দুটি উক্তি রয়েছে।

আয়াতের শানে নুযূল :

১. প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী আলোচ্য আয়াতটি ওহুদ যুদ্ধের ক্ষেত্রে নাজিল হয়েছে। ২. এবং অপ্রসিদ্ধ একটি মতানুসারে আয়াতটি বীরে মাউনার ঘটনায় অবতীর্ণ হয়েছে। প্রসিদ্ধ মতের অনুসারীদের মধ্যে আবার তিনটি উক্তি পাওয়া যায়। ১. যথা– নবী করীম ﷺ ওহুদ যুদ্ধে কাফেরদের উপর বদদোয়া করতে চাইলে আয়াতটি নাজিল হয়।

উৎবা ইবনে উবাই ইবনে ওয়াক্কাস ওহুদ যুদ্ধে রাসূল ﷺ-এর চেহারা মুবারক জখম করেছিল যুদ্ধের শিরস্ত্রানের কড়া ভেঙ্গে কপাল মুবারকে ঢুকে যায় ও দান্দান মোবারক শহীদ হয়ে যায়। তখন আবূ হুযাইফার মাওলা সালিম তাঁর চেহারা

থেকে রক্ত মুছতে থাকে। এমতাবস্থায় তিনি বলেছিলেন, ঐ জাতি কেমন করে কামিয়াব হতে পারে যে তাদের নবীর চেহারাকে রক্তাক্ত করে দিয়েছে অথচ তিনি তাদেরকে তাদের প্রভুর প্রতি আহ্বান.করছে। অতঃপর তিনি তাদের উপর বদদোয়া করতে চাইলেন, ফলে আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি কিছু সংখ্যক কাফেরদের নাম ধরে তাদের উপর লানত করেছেন। তিনি বলেছেন। اَللّٰهُمَّ الْعَنْ اَبَا سُفْيَانَ . اَللّٰهُمَّ الْعَنِ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ . اَللّٰهُمَّ الْعَنْ صَفْوَانَ بْنَ اُمَيَّةَ ফলে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয়, আপনিতো আদিষ্ট বান্দামাত্র আপনার দায়িত্ব হলো তাদের জন্য মঙ্গলের দোয়া করা বদদোয়া না করা।

কারণ তাদের হেদায়েত পাওয়া না পাওয়ার ব্যাপারে আপনার করণীয় কিছু নেই। তার মালিক একমাত্র আল্লাহ। সুতরাং এদের অনেককেই আল্লাহ পাক মুসলমান হওয়ার তৌফিক দিয়েছিলেন।

আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, আয়াতটি হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে। কারণ হুজুর ﷺ যখন দেখলেন হামজার মুছলার অবস্থা তখন তাঁর অন্তরে খুবই ব্যাথা লাগে। কেননা কাফেররা তাঁর নাক-কান কেটে ফেলেছিল, তাঁর গুপ্তাঙ্গও কেটে দিয়েছিলো। কলিজা কেটে টুকরা টুকরা করে দাত দ্বারা চিবিয়েছিল। এমতাবস্থা দেখে হুজুর ﷺ বলেছিলেন,আমি হামজার বদলে তাদের ত্রিশজনকে মুছলা করবো। ফলে আয়াতটি নাজিল হয়। উপরোল্লিখিত ঘটনা তিনটিই ওহুদে ঘটেছে তাই এ সকল ঘটনার প্রেক্ষিতেই আয়াতখানি নাজিল হয়েছে। আল্লামা কাফ্‌ফাল এরূপই বলেছেন।

২. দ্বিতীয় উক্তি মতে, ওহুদ যুদ্ধে যে সকল মুসলমান আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ অমান্য করেছিলো এবং যারা সাময়িক পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছিল তাদের উপর আল্লাহর রাসূল ﷺ লানত করার মনস্থ করেছিলেন। ফলে আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতটি নাজিল করে তাকে তা থেকে বারণ করেন। এ উক্তিটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে।

৩. তৃতীয় উক্তি মতে, ওহুদ যুদ্ধে হুজুর ﷺ যারা সাময়িকভাবে পরাজিত হয়েছিল এবং তাঁর নির্দেশের অমান্য করেছিল তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া এবং তাদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করতে চেয়েছিলেন। ফলে আলোচ্য আয়াতটি নাজিল করে তাকে তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

৪. দ্বিতীয় অপ্রসিদ্ধ মতানুযায়ী আয়াতটি নাজিল হয়েছে বীরে মাউনার ঘটনা সম্পর্কে। নবী করীম ﷺ বীরে মাউনাবাসীর নিকট তাদের দরখাস্তনুযায়ী সত্তরজন কারী সাহাবীর একটি জামাত পাঠিয়ে ছিলেন। আমির ইবনে তুফাইল তার দল নিয়ে তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করে ফেলে। ফলে রাসূল ﷺ চিন্তিত ও দুঃখিত হন এবং ঐ কাফেরদের উপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত বদদোয়া করতে থাকেন। অতঃপর আয়াতটি নাজিল করে তাকে বারণ করা হয়। এটা হচ্ছে ইমাম মুকাতিলের উক্তি। তবে এ মতটি খুবই দুর্বল। কারণ অধিকাংশ ওলামাগণ এর উপর একমত যে আয়াতটি ওহুদের ঘটনায় নাজিল হয়েছে। আর আয়াতটির পূর্বাপর অবস্থায়ও তাই বুঝা যাচ্ছে। -[তাফসীরে কাবীর খ. ৮, পৃ. ২৩৮ - ৩৯]

ফায়দা : আল্লাহ পাকের ইন্তেজাম দু'রকম হয়ে থাকে। একটি হলো شَرْعِىْ বা আইনগত। আর অপরটি হলো تَكْوِيْنِىْ বা সৃষ্টিগত। আইনগত ইন্তেজামের সম্পর্ক নবীগণের সাথে। আর সৃষ্টি সংক্রান্ত ইন্তেজামের সম্পর্ক ফেরেশতাদের সাথে, অর্থাৎ আল্লাহর ফয়সালা ও তাঁর তাকদীরি হুকুম মতেই সেই ইন্তেজামটা হয়ে থাকে। হযরত খাজির (আ.)-এর ইন্তেজামটাও ছিলো সৃষ্টি সংক্রান্ত বিষয়াদির সাথে জড়িত। আর হযরত মূসা (আ.) কর্তৃক তাঁর উপর অভিযোগ করাটা ছিলো আইন সংক্রান্ত বিষয়াদির ভিত্তিতে। وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا তদ্রূপ নবী করীম ﷺ কর্তৃক ইসলামের বিশেষ বিশেষ দুশমনদের বিরুদ্ধে তাদের নাম ধরে বদদোয়া করাটাও ছিল আইন সংক্রান্ত ইন্তেজামের ভিত্তিতে। কারণ তারা ছিল ইসলামের দুশমন, ওরা এরই উপযুক্ত যে তাদের উপর বদদোয়া করা যাবে। কিন্তু আল্লাহর ফয়সালা ও তাঁর তাকদীরে যেহেতু এ কথার সিদ্ধান্ত ঠিক হয়ে রয়েছিল যে, তাদের মধ্যে অনেকেই ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ করে ধন্য হবে। তাই তিনি আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ করে হুজুর ﷺ -কে তাদের সম্পর্কে বদদোয়া করা থেকে নিষেধ করে দিয়েছেন। এটা ছিলো তাকদিরী বা সৃষ্টি সংক্রান্ত ইন্তেজাম।
-[মাআরিফে ইদ্রিসিয়া খ. ২, পৃ. ৪৭ - ৪৮]

١٣٠. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً بِالْاَلِفِ وَدُوْنَهَا بِاَنْ تَزِيْدُوْا فِى الْمَالِ عِنْدَ حُلُوْلِ الْاَجَلِ وَتُؤَخِّرُوا الطَّلَبَ وَاتَّقُوا اللّٰهَ بِتَرْكِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ تَفُوْزُوْنَ .

১৩১. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ اَنْ تُعَذَّبُوْا بِهَا .

١٣٢. وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ .

١٣٣. وَسَارِعُوْا بِوَاوٍ وَدُوْنَهَا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اَىْ كَعَرْضِهِمَا لَوْ وُصِلَتْ اِحْدٰهُمَا بِالْاُخْرٰى وَالْعَرْضُ السَّعَةُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ اَللّٰهُ بِعَمَلِ الطَّاعَاتِ وَتَرْكِ الْمَعَاصِىْ .

١٣٤. اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِىْ طَاعَةِ اللّٰهِ فِى السَّرَّاۤءِ وَالضَّرَّاۤءِ اَىْ الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ الْكَافِيْنَ عَنْ اِمْضَائِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ مِمَّنْ ظَلَمَهُمْ اَىْ التَّارِكِيْنَ عُقُوْبَتَهُمْ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ بِهٰذِهِ الْاَفْعَالِ اَىْ يُثِيْبُهُمْ .

অনুবাদ :

১৩০. হে মু'মিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ গ্রহণ করো না। (مُضٰعَفَةً) শব্দটিতে আলিফসহ এবং আলিফ ছাড়া উভয় পদ্ধতিই শুদ্ধ আছে। এ রকমভাবে যে, মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়াতে তোমরা অর্থের পরিমাণে বৃদ্ধি করে দিয়ে প্রাপ্তি তলবে অবকাশ দিয়ে দিবে। আর সুদ বর্জনের মাধ্যমে আল্লাহকে ভয় করতে থাকো, হয়তো তোমরা কামিয়াব হয়ে যাবে। সফলকাম হয়ে যাবে।

১৩১. আর সেই দোজখকে ভয় করো যা মূলত কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে তোমাদেরকে তা দ্বারা শাস্তি প্রদান করা থেকে ভয় করো।

১৩২. এবং তোমরা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ কর, হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে।

১৩৩. তোমরা দ্রুত গতিতে অগ্রসর হও (سَارِعُوْا) শব্দের س-এর পূর্বে আতফের 'ওয়াও' এর সাথে এবং 'ওয়াও' ছাড়া উভয় কিরাতে রয়েছে। তোমাদের প্রভুর ক্ষমা ও সেই বেহেশতের দিকে যার প্রশস্ততা আসমান ও জমিনের ন্যায় অর্থাৎ বেহেশতের প্রশস্ততা এ উভয়টির প্রশস্ততার ন্যায়, যদি উভয়টিকে একত্র করে নেওয়া হয়। আর (عَرْضٌ) অর্থ প্রশস্ততা। যা আনুগত্য প্রদর্শন ও পাপরাশি বর্জনের মাধ্যমে পরহেজগার লোকদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

১৩৪. যারা সচ্ছলতা এবং অভাবের সময় আল্লাহর আনুগত্যে ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধকে দমন করে তথা ক্রোধ চরিতার্থ করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তা নিয়ন্ত্রণ করে রাখে আর যেসব লোকেরা তাদের প্রতি অবিচার করেছে তাদেরকে মাফ করে তথা তাদের শাস্তি ক্ষমা করে দেয়। আল্লাহ এসব আমলের কারণে নেককার লোকদেরকে পছন্দ করেন অর্থাৎ তাদেরকে ছওয়াব প্রদান করবেন।

١٣٥. وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً ذَنْبًا قَبِيْحًا كَالزِّنَا اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِمَا دُوْنَهٗ كَالْقُبْلَةِ ذَكَرُوا اللّٰهَ اَىْ وَعِيْدَهٗ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ اَىْ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا يُدِيْمُوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا بَلْ اِقْلَعُوْا عَنْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ اَنَّ الَّذِىْ اَتُوْهُ مَعْصِيَةٌ.

১৩৫. আর যারা কোনো প্রকাশ্য পাপকাজ করে ঘৃণ্য কোনো গুনাহের কাজ যথা ব্যভিচারের কোনো কাজ করে বা তার চেয়ে ছোট কোনো পাপ কাজ যথা অবৈধ চুম্বন দিয়ে নিজেদের প্রতি অবিচার করে বসে, তখন আল্লাহকে তথা তার ভীতির কথা স্মরণ করে এবং নিজের পাপ কার্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কে আছে যে পাপ ক্ষমা করবে? আর তারা যা করে ফেলেছে তাতে এসরার করেনি সর্বদা লেগে থাকেনি বরং তা থেকে বিরত হয়ে পড়ে অথচ তারা জানে যে, তারা যা করেছে তা ছিল গুনাহের কাজ।

١٣٦. اُولٰٓئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ حَالٌ مُقَدَّرَةٌ اَىْ مُقَدَّرِيْنَ الْخُلُوْدَ فِيْهَا اِذَا دَخَلُوْهَا وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ. بِالطَّاعَةِ هٰذَا الْاَجْرُ.

১৩৬. তারাই সেসব লোক যাদের প্রতিদান হলো তাদের পালনকর্তার তরফ থেকে ক্ষমা এবং বেহেশত, যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত রয়েছে। তারা সেই বেহেশতে চিরদিন থাকবে। যখন থেকে তাতে প্রবেশ করবে। (خٰلِدِيْنَ) শব্দটি حَالٌ مُقَدَّرَةٌ অর্থাৎ তাদের জন্য বেহেশতে চিরকাল থাকার বিষয়টা স্থির হয়ে রয়েছে। আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে আমলকারীদের এ প্রতিদানটা কতইনা উত্তম প্রতিদান।

তাহকীক ও তারকীব

اَلرِّبَا-এর শাব্দিক অর্থ, অতিরিক্ত, বর্ধিতাংশ। আর শরিয়তের পরিভাষায় পরস্পর চুক্তি সম্পাদনকারী দুই ব্যক্তির কারো জন্য শর্তায়িত ঐ অর্থ বা বস্তুর অতিরিক্ত অংশকে রিবা বা সুদ বলা হয়, যার বদলে কোনো বিনিময় নেই।

(فَضْلٌ خَالٍ عَنْ عِوَضٍ شَرْطٍ لِاَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ)

অর্থনীতির পরিভাষায় রিবা বা সুদ বলা হয়, টাকার ঐ পরিমাণকে যা ঋণগ্রহীতা ঋণ গ্রহণের পরিমাণের চেয়ে স্বাভাবিকভাবে বর্ধিত হারে প্রদান করে থাকে বিশেষ শর্ত মাফিক। –[আল মুজামুল ওয়াসীত, পৃ. ৩২৬]

اَضْعَافًا مُضَاعَفَةً - এটা ضَعْف-এর বহুবচন, অর্থ দ্বিগুণ। তবে এখানে শাব্দিক অর্থটা শর্ত হিসেবে উদ্দেশ্য নয়। اَضْعَاف শব্দ থেকে তারকীবের মধ্যে (حَالٌ) হাল হয়েছে। اَلرِّبَا اَلْكَاظِمِيْنَ . كَظَمَ . يَكْظِمُ থেকে اِسْمُ فَاعِلْ-এর সীগাহ। অর্থ ক্রোধ সংবরণকারীগণ। كَظَمَ . كَظْمًا ক্রোধ সংবরণ করা, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিশোধ না নেওয়া।

মশক পরিপূর্ণ হয়ে যাওয়ার সময় তার মাথা বা মুখ বেঁধে নেওয়াকে মূলত اَلْكَظْمُ বলে। বলা হয় فُلَانٌ كَظِيْمٌ অমুক ব্যক্তি ভারাক্রান্ত চিন্তিত।

اَلْغَيْظُ রাগ, ক্রোধ, গোস্সা। মন্দ কাজ বা বস্তু দেখলে মনে যে ক্ষোভের বা উত্তেজনা সৃষ্টি হয় তাকে غَيْظٌ বা ক্রোধ বলে, যার প্রভাব অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বিকাশ লাভ করে।

غَضَبٌ ও غَيْظٌ -এর পার্থক্য : غَضَبٌ [গাজাব] ও غَيْظٌ [গাইজ] উভয়টার অর্থই ক্রোধ বা রাগ। তবে উভয়টার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। আর তা হচ্ছে নিম্নরূপ–

- غَضَبٌ -এর পর প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে غَيْظٌ -এর পর তা হয় না।
- غَضَبٌ অঙ্গ প্রতঙ্গে ও চেহারায় অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশিত হয়ে যায়, তবে غَيْظٌ -এর মধ্যে অন্তরেই সীমিত থাকে।
- কারো মতে, উভয়টা সমার্থবোধক। তবে غَضَبٌ -এর সম্পর্ক আল্লাহর দিকে করা শুদ্ধ আছে। আর غَيْظٌ -এর সম্পর্ক তার দিকে করা ঠিক নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের যোগসূত্র : বাহ্যত এসব আয়াতের পূর্বের সহিত কোনো যোগসূত্র বুঝা যায় না। এজন্য কিছু সংখ্যক ওলামায়ে কেরাম বলেন, এটা পৃথক ও স্বতন্ত্র করা। যার মধ্যে আল্লাহ পাক আদেশ, নিষেধ, উৎসাহ দান. ভীতি প্রদানের কথা একত্রিত করেছেন এবং উত্তম চরিত্র ও আমলের কথা বর্ণনা করেছেন। কোনো কোনো ওলামায়ে কেরাম পূর্বের সহিত সম্বন্ধ ও যোগসূত্র বর্ণনা করেছেন। যার সারমর্ম হলো এই–

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সবর ও তাকওয়ার হুকুম ছিল এবং কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব সংস্রব ও তাদেরকে রহস্যবিদ বন্ধু বানাতে নিষেধ ছিল। এখন এসব আয়াতের মধ্যে আবার সবর ও তাকওয়ার বর্ণনা করা হচ্ছে যে, সবর ও তাকওয়া কি বস্তু, ধৈর্যশীল ও মুত্তাকী কারা এবং তাদের কি কি গুণাবলি? এসবের মধ্যে সর্বাগ্রে সুদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। কারণ হালাল খাবার হচ্ছে তাকওয়ার মূল ভিত্তি। এছাড়া কাফেররা সুদী কারবার করতো, আর যা মুনাফা অর্জন হত তা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যয় করত। ওহুদের যুদ্ধে যে অর্থ তারা ব্যয় করেছিলো তা ঐ কাফেলার ব্যবসায় অর্জিত মুনাফারই টাকা ছিল যে কাফেলাটি বদরের বছর সিরিয়া হতে এসেছিল। এখানে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে সুদ থেকে ভয় দেখাচ্ছেন যে, তোমরা কাফেরদের ন্যায় এরূপ মনে করবেনা যে, আমরাও সুদী ব্যবসা দ্বারা যুদ্ধে সাহায্য গ্রহণ করবো। সাবধান! সুদী ব্যবসা-বাণিজ্য করা আল্লাহর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার নামান্তর। মুসলমানদেরকে তা থেকে দূরে থাকা আবশ্যক। এতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, যেরূপভাবে ব্যক্তিগত প্রয়োজনের ভিত্তিতে ঋণ দিয়ে সুদ গ্রহণ হারাম। তেমনিভাবে সম্মিলিত ব্যবসা–বাণিজ্যি ও সুদী কারবার হারাম। ইসলাম পূর্ব অন্ধকার যুগে উভয় রকম সুদের প্রচলন ছিল। লোকেরা ব্যক্তিগত ভাবে ও সুদী ব্যবসা করত এবং সম্মিলিত ভাবেও গোত্রের সকলে মিলে সুদী কারবার করত। সম্প্রতি একে কোম্পানী ও ব্যাংক বলা হয়। হাকীকত তাই যা পূর্বে ছিল কেবল নামে পরিবর্তন হয়েছে। নাম পরিবর্তন হয়ে গেলেই হাকীকত বদলে না। পবিত্র কুরআন সর্বপ্রকার সুদকে হারাম করে দিয়েছেন। চাই ব্যক্তিগত হোক বা সমষ্টিগত তথা কোম্পানী ও ব্যাংকের মাধ্যমে বীমার মাধ্যমে হোক। শরিয়তে চুরি, জিনা ও মদকে হারাম করে দিয়েছে, একবার কেউ যদি এগুলোকে আধুনিক কোনো নামে উন্নত পদ্ধতিতে করে তাহলে কি হালাল হয়ে যাবে? না, কখনো না। সর্বপ্রকার সুদের কারবার হারাম হওয়ার ব্যাপারে কুরআনের অনেক আয়াত ও বহুসংখ্যক হাদীস এসেছে।

ইরশাদ হয়েছে– يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো যাতে তোমরা কল্যাণ অর্জন করতে পার।

আলোচ্য আয়াতে চক্র বৃদ্ধিহারে সুদ খেয়ো না, কথা দ্বারা একথা বুঝে নেওয়া ঠিক হবে না যে, অল্পহারে সুদ খেয়ে নেওয়া হয়তো জায়েজ হবে। কারণ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً শব্দটি শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি; বরং আবরদের মধ্যে প্রচলিত চক্রবৃদ্ধি হারে সুদী লেনদেনের তীব্র নিন্দা ও ভর্ৎসনার উদ্দেশ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। এ রকম শব্দ এরূপ অর্থেই বলা হয়ে থাকে। যেমন ইরশাদ হয়েছে– فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর জন্য বহু শরিক সাব্যস্ত করিও না। এতে কি একজন বা দুইজন শরিক সাব্যস্ত করা জায়েজ হবে? না কখনো নয়, ঠিক তেমনিভাবে এখানেও কাফেরদের মধ্যে প্রচলিত সুদের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপনার্থে اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যথায় সর্বপ্রকার সুদই কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী হারাম।

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন, আর সুদকে হারাম করে দিয়েছে। -[মাআরিফে ইদ্রিসীয়া খ. ২, পৃ. ৪৯-৫২]

সুদের চারিত্রিক ও অর্থনৈতিক অনিষ্ট :

১. মানব চরিত্রের সর্বপ্রধান গুণ হচ্ছে আত্মত্যাগ ও দানশীলতা অর্থাৎ নিজে কষ্ট করে হলেও অপরকে সুখী করার প্রেরণা। সুদের ব্যবসায়ের অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতিতে এ প্রেরণা লোপ পায়। সুদখোর ব্যক্তি অপরে উপকার করা তো দূরের কথা, অপরকে নিজ চেষ্টায় ও নিজ পুঁজি দ্বারা তার সমতুল্য হতে দেখলেও তা সহ্য করতে পারে না।

২. সুদখোর কোনো বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি দয়ার্দ্র হওয়ার পরিবর্তে তার বিপদের সুযোগে অবৈধ মুনাফা লাভের চেষ্টায় মত্ত থাকে।

৩. সুদ খাওয়ার ফলশ্রুতিতে অর্থ লালসা সীমাহীনভাবে বেড়ে যায়। সে এতে এমন মত্ত হয়ে পড়ে যে, ভালো মন্দেরও পরিচয় থাকেনা এবং সুদের অশুভ পরিণামের প্রতি সে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়ে।

৪. সুদের ফলে গুটিকতক লোকের উপকার এবং সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের ক্ষতি হয়। এছাড়া সুদের মধ্যে যদি অন্য কোনো দোষ নাও থাকতো তবুও এ দোষটিই সুদ নিষিদ্ধ ও ঘৃণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। অথচ এতে এছাড়া আরো অর্থনৈতিক অনিষ্ট এবং আত্মিক বিপর্যয় বিদ্যমান রয়েছে। -[মা'আরিফুল কুরআন]

وَسَارِعُوٓا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ মুফাসসিরগণ বলেন, এখানে مَغْفِرَةً এর পূর্বে مَا يُوجِبُ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ তোমরা তোমাদের প্রভুর ক্ষমার দিকে তথা ক্ষমার কারণ ও মাধ্যমের দিকে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হও। আর মাগফিরাত বা ক্ষমার কারণ হলো করণীয় কার্যাদি পালন ও বর্জনীয় কর্মকাণ্ড বর্জন করা। সুতরাং এর মর্ম হলো, তোমরা শরিয়তের নির্দেশিত কাজসমূহ পালন ও নিষেধকৃত কাজসমূহ বর্জনের জন্য দ্রুত অগ্রসর হও।

مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ তোমাদের প্রভুর মাগফিরাত বা ক্ষমার ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ অনেক কথা বলেছেন। নিম্নে সংক্ষেপে তা প্রদত্ত হলো।

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, প্রভুর ক্ষমার মর্ম হচ্ছে ইসলাম। এখানে তানবীন (مَغْفِرَةٍ) দ্বারা চূড়ান্ত ও বৃহৎ ক্ষমার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর সেই ক্ষমা তো ইসলাম দ্বারাই লাভ হয়।

২. হযরত আলী (রা.) বলেন, ক্ষমা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ফরায়েজ পালন করা। কেননা এর দ্বারাই ক্ষমা অর্জন হয়।

৩. হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা.) বলেন, মাগফিরাতের অর্থ হচ্ছে ইখলাস। কারণ যাবতীয় ইবাদতের মূলই হচ্ছে ইখলাস। যেরূপ ইরশাদ হয়েছে - وَمَآ أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

৪. ইমামে তাফসীর আবুল আলিয়া বলেন, মাগফিরাতের অর্থ হলো হিজরত।

৫. ইমাম যাহ্‌হাক ও মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেন, মাগফিরাতের মর্ম হলো জিহাদ। কেননা وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ থেকে নিয়ে ষাটটি আয়াত পর্যন্ত ওহুদ যুদ্ধ সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং এসব আদেশ নিষেধ জিহাদের সাথেই খাছ হবে।

৬. হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রা.) বলেন, এর অর্থ হলো তাকবীরে উলা।

৭. হযরত ওসমান (রা.) বলেন, এর মর্ম হচ্ছে পাঞ্জেগানা নামাজ।

৮. হযরত ইকরামা বলেন, মাগফিরাতের অর্থ হচ্ছে যাবতীয় আনুগত্য। কারণ ব্যাপক অর্থবহ শব্দে সর্বপ্রকার আনুগত্যকেই শামিল রাখে।

৯. ইমাম আসেম বলেন- سَارِعُوٓا أَيْ بَادِرُوا إِلَى التَّوْبَةِ مِنَ الرِّبَا وَالذُّنُوبِ অর্থাৎ সুদ ও যাবতীয় পাপকার্য থেকে তওবার দিকে দ্রুত অগ্রসর হও। কেননা ইতঃপূর্বে সুদের আলোচনা হয়েছে। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.) বলেন, মাগফিরাত দ্বারা সর্বপ্রকার ফরজ, ওয়াজিব পালন ও যাবতীয় গুনাহ থেকে তওবার অর্থ নেওয়াটাই উত্তম। কারণ শব্দ যেহেতু আম তাই খাছ করা সমীচীন নয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মাগফিরাতের প্রতি যেরূপ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হওয়ার আবশ্যকীয়তার কথা বর্ণনা করেছেন, তেমনিভাবে জান্নাতের প্রতি দ্রুত গতিতে অগ্রসর হতেও নির্দেশ প্রদান করেছেন। কেননা মাগফিরাতের মর্ম হচ্ছে শাস্তি না দেওয়া আর জান্নাতের মর্ম হচ্ছে প্রতিদান দেওয়া। তাই উভয়টিকে একত্রিত করে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, শরিয়তের আদেশ-নিষেধের মুকাল্লাফ ব্যক্তির জন্য ক্ষমা ও ছওয়াব উভয়টিই লাভ করা একান্ত আবশ্যক।

قَوْلُهُ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ : বেহেশতের প্রস্থ আসমান ও জমিন, এ কথাটি প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত নয়; বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ অর্থাৎ বেহেশতের প্রস্থ আসমান ও জমিনের প্রস্থের মতো। কেননা সূরায়ে হাদীদে عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এবার প্রশ্ন হলো বেহেশতের প্রস্থ আসমান ও জমিনের প্রস্থের মতো কথাটির মর্ম কি?

এর জবাবে ওলামায়ে কেরাম অনেক উক্তি পেশ করেছেন। নিম্নে সংক্ষেপে কয়েকটি উক্তি পেশ করা হলো–

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর তাফসীর অনুযায়ী বেহেশতের প্রস্থ আসমান ও জমিনের প্রস্থের বরাবর কথাটি প্রকৃত অর্থেই ব্যবহৃত। অর্থাৎ আসমান ও জমিনকে যদি স্তর বিশিষ্ট করে বিস্তার করে একটিকে অপরটির সঙ্গে মিলানো হয় তবে সকল স্তরের সম্মিলিত পরিমাণটা হবে বেহেশতের প্রস্তের সমান। রয়ে গেল দৈর্ঘ্যের কথা, তা আল্লাহ ছাড়া কেউই জানে না। দৈর্ঘ্যের প্রশস্ততার কথা না বলে প্রস্থের প্রশস্ততার কথা এজন্য উল্লেখ করেছেন যে, দৈর্ঘ্যের প্রশস্ততায় প্রস্থের প্রশস্ততা বুঝায় না। পক্ষান্তরে প্রস্থের প্রশস্ততায় দৈঘ্যেরও প্রশস্ততা বুঝায়।

২. অন্যান্য ওলামায়ে কেরামের মতে, এখানে প্রস্থ বলে রূপক অর্থে প্রশস্ততা বুঝানো হয়েছে এবং জান্নাতের অধিক প্রশস্ততা বুঝাবার লক্ষ্যে উপমার ভঙ্গিতে বলা হয়েছে عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ এখানে عَرض বা প্রস্থ طُول বা দৈর্ঘ্যের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, বরং প্রশস্ততার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেরূপ বলা হয়– بِلَادٌ عَرِيْضَةٌ وَدَعْوٰى عَرِيْضَةٌ اَىْ وَاسِعَةٌ عَظِيْمَةٌ

৩. যে বেহেশতের প্রস্থ হবে আসমান–জমিনের সমান, তাহলো এক ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত বেহেশতের পরিমাণ। সম্মিলিত বেহেশতের পরিমাণ নয়।

৪. আবূ মুসলিম বলেন, عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ-এর অর্থ হলো আসমান ও জমিনকে যদি জান্নাতের বিনিময়ে পেশ করা হয় তবে তার মূল্য হতে পারে। এই আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে বেহেশত ও দোজখ বর্তমানে সৃষ্ট হয়ে আছে। কিয়ামতের পর আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করবেন এ রকম নয়। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা তাই। তাদের আকীদা হলো اَلْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوْقَتَانِ مَوْجُوْدَتَانِ الْاٰنَ হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী বেহেশত সাত আসমানের উপরে আরশের নীচে সৃষ্ট। আর দোজখ সাত জমিনের নীচে সৃষ্ট।

–[তাফসীরে কাবীর খ. ৫, পৃ. ৬-৭, হাশিয়াতুস সাবী খ. ১, পৃ. ১৭৯ ও হাশিয়ায়ে জালালাইন]

قَوْلُهُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ : আল্লাহ তা'আলা পূর্বোক্ত আয়াতে যখন এ কথার বর্ণনা দিলেন যে, জান্নাত মুত্তাকীদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই উপরিউক্ত আয়াতে তিনি মুত্তাকীদের গুণাবলি বর্ণনা করেছেন, যাতে করে লোকেরা ঐসব গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে জান্নাত লাভ করতে পারে। আলোচ্য আয়াতে মুত্তাকীদের তিনটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে।

এক. اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ যারা সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা, দরিদ্রতা ও ধনাঢ্যতা সর্বাবস্থায় আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে দান-খয়রাত করে।

দুই. وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ অর্থাৎ যারা ক্রোধকে সংবরণ করে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلٰى اِنْفَاذِهٖ مَلَاَ اللّٰهُ تَعَالٰى قَلْبَهٗ اَمْنًا وَاِيْمَانًا অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি থাকা সত্ত্বেও ক্রোধকে সংবরণ করে নেয়, আল্লাহ পাক তার অন্তরকে শান্তি ও ঈমান দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেন।

عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلٰى اَنْ يُنْفِذَهٗ دَعَاهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى رُءُوْسِ الْخَلَائِقِ حَتّٰى يُخَيِّرَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنْ اَيِّ الْحُوْرِ شَاءَ .

অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রতিশোধ নেওয়ার সামর্থ্যবান হওয়া সত্ত্বেও নিজের রাগকে সংবরণ করে দমিয়ে রাখে আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন সমস্ত হাশরবাসীর সামনে ডেকে বেহেশতী হুরের সাথে তার যাকে ইচ্ছা হয় তার সঙ্গে বিয়ে করিয়ে দিবেন।

তিন. মুত্তাকীদের তৃতীয় গুণে বলা হয়েছে وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ – যারা অপরের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ বস্তুত আল্লাহ পাক অনুগ্রহকারীদের ভালোবাসেন।

عَنِ الْحَسَنِ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَقُمْ مَنْ كَانَ لَهٗ عَلَى اللّٰهِ اَجْرٌ فَلَا يَقُوْمُ الْاِنْسَانُ عَفَا

অর্থাৎ হযরত হাসান থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে বলবেন, আল্লাহর উপর যার পাওনা রয়েছে সে দাঁড়াও এ কথা শুনার পর কেবল সে লোকটিই দাঁড়াবে যে অপরকে দুনিয়াতে মার্জনা করেছিল।

وَعَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يُشْرِفَ لَهُ الْبُنْيَانُ وَتَرْفَعَ لَهُ الدَّرَجَاتِ فَلْيَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَهٗ وَيُعْطِ مَنْ حَرَمَهٗ وَيَصِلُ مَنْ قَطَعَهٗ .

অর্থাৎ হযরত উবাই ইবনে কা'আব (রা.) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জান্নাতে তার উচ্চ প্রাসাদ ও উন্নত স্তর কামনা করে। তার উচিত, যে অত্যাচার করে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া। যে তাকে কিছু দেয় না তাকে দান করা এবং যে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে রাখতে চায় তার সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখা।

–[তাফসীরে রুহুল মা'আনী খ. ৪, পৃ. ৫৮, তাফসীরে কাবীর খ. ৫, পৃ. ৮,৯]

قَوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً الخ :

আয়াতের যোগসূত্র : পূববর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, জান্নাত মুত্তাকীদের জন্য তৈরি করে রাখা হয়েছে। অতঃপর মুত্তাকীদেরকে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন।

১. প্রথম শ্রেণির মুত্তাকী তাদের তিনটি গুণ পূর্বের আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।
২. দ্বিতীয় শ্রেণির মুত্তাকী আলোচ্য আয়াতে তাদের গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে।

পূর্বের আয়াতে আল্লাহ পাক অপরের প্রতি অনুগ্রহ করতে আহ্বান করেছিলেন, আর আলোচ্য আয়াতে নিজের প্রতি অনুগ্রহ করতে আহ্বান করেছেন। কারণ গুনাহগার ব্যক্তি যখন তাওবা করে নেয় তখন তার তওবাটা তার নিজের জন্য অনুগ্রহই হয়ে থাকে।

আয়াতের শানে নুযূল :

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, মুমিনগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, বনী ইসরাঈলগণ আল্লাহর কাছে আমাদের চেয়ে অধিক সম্মানী। কারণ তাদের কেউ গুনাহ করে নিলে এর কাফফারা হিসেবে তার দরজার চৌকাটে লিখা হয়ে যেত যে, অমুক ব্যক্তি এই গুনাহ করেছে। এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতটি নাজিল করে বলেছিলেন যে, তোমরা বনী ইসরাঈলের চেয়ে উত্তম! কারণ তোমাদের গোনাহের কাফফারা সাব্যস্ত করা হয়েছে ইস্তেগফার অর্থাৎ ইস্তেগফারের মাধ্যমে তোমাদের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

২. কালবীর বর্ণনায় এসেছে যে, এক আনসারী ও আরেকজন ছকীফ গোত্রের সাহাবীদ্বয়ের মধ্যে আল্লাহর রাসূল ﷺ ভাই ভাইয়ের সম্পর্ক সৃষ্টি করে দিয়েছেন। ফলে তারা উভয়ে অবিচ্ছিন্নভাবে একত্রে কালাতিপাত করতে থাকে। একদা রাসূল ﷺ ছকীফী বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে কোনো এক জিহাদে চলে যান, আর তার বিবি বাচ্চার প্রয়োজন মিটাতে আনসারী ভাইকে স্থলাভিষিক্ত হিসেবে বাড়িতে রেখে যান। সে তার ছকীফী ভাইয়ের স্ত্রীর দেখা শুনা করতে থাকে। একদা কেশ খোলাবস্থায় তার স্ত্রীকে দেখে আনসারীর মনে তার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে যায়। ফলে অনুমতি ছাড়া তার গৃহে প্রবেশ করে তার মুখে যখন চুমু খেতে গেলো তখন মহিলাটি তার চেহারার উপর নিজের হাত রেখে দেয়। ফলে আনসারী তার হাতের পৃষ্ঠ দিকে চুমু খেয়ে নেওয়ার পর লজ্জায় ভেঙ্গে পরে এবং লজ্জিত হয়ে ফেরত চলে আসে। এদিকে মহিলাটি বলতে লাগল,

সুবহানাল্লাহ! [হে আনসারী] তুমি তোমার আমানতে খিয়ানত করেছ এবং আপন প্রভুর নাফরমানি করেছ। অথচ তুমি তোমার প্রয়োজন ও মেটাতে পারলে না। বর্ণনাকারী বলেন, আনসারী তারকৃত কর্মের উপর খুবই লজ্জিত হয়ে পাহাড়ে গিয়ে একাকী চলতে থাকে আর নিজের গুনাহ থেকে আল্লাহর কাছে তওবা করতে থাকে। তার ছকীফী বন্ধু যখন বাড়িতে ফেরল তখন তার স্ত্রী তার কাছে ঘটনা খুলে বলল, ছকীফী তার অনুসন্ধানে বের হলো। খোঁজ করতে করতে গিয়ে সিজদারতবস্থায় তাকে সে পেল। তখন সে বলতেছিলো, হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহকে মাফ কর। আমি তো আমার ভাইয়ের অবশ্যই খিয়ানত করেছি। ছকীফী বলল, মাথা উঠান। অতঃপর তাকে নিয়ে হুজুর ﷺ-এর দরবারে চলে গেল এবং এ নিয়তে হুজুরের মাধ্যমে তাকে তার গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করালো যে, হয়ত! আল্লাহ পাক তার মুক্তির কোনো পথ ও তওবার রাস্তা বের করে দিবেন। অতঃপর আল্লাহর রাসূল ﷺ মদিনায় তাকে নিয়ে ফেরত আসার পর একদিন আসরের নামাজের সময় আলোচ্য আয়াতটি নিয়ে নাজিল হয়, তারপর হুজুর ﷺ আয়াটি তেলাওয়াত করেন- وَالَّذِيْنَ فَعَلُوا থেকে নিয়ে وَنِعْمَ اَجْرُ الْعَامِلِيْنَ পর্যন্ত। আয়াতটি শুনে হযরত ওমর (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! এই তওবা ও গুনা মাফের ব্যবস্থাটা শুধু কি ঐ ব্যক্তির জন্যই খাছ নাকি সকল মানুষের জন্যই আম। হুজুর ﷺ জবাবে বললেন, এই সুযোগ সকল মানুষের জন্যই উন্মুক্ত।

৩. ইমাম আতা (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতটি খেজুর বিক্রেতা নবহানের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে, যার উপনাম ছিলো আবূ মা'বাদ। ঘটনাটি হলো এই যে, একজন সুন্দরী মহিলা খেজুর কেনার জন্য তার কাছে আসল। নবহান বলল, এই বাহিরের খেজুরগুলো ভালো নয়, ঘরের ভিতরে এর চেয়ে উত্তম খেজুর রয়েছে। সুতরাং নবহান ঐ মহিলাটিকে নিয়ে ঘরের ভিতরে গেল। ভিতরে গিয়ে তাকে আকড়ে ধরল এবং তাকে চুম্বন করল। মহিলাটি বলল, তুমি আল্লাহকে ভয় কর। এটা শুনে নবহান তাৎক্ষণিকভাবে মহিলাটিকে ছেড়ে দিল। আর এই কাজটির উপর অনুতপ্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ঘটনা খুলে বলল। এর উপর আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়।

-[তাফসীরে রুহুল মা'আনী খ. ৪, পৃ. ৫৯-৬০, তাফসীরে কাবীর খ. ৫, ১১, তাফসীরে মাযহারী খ. ২, পৃ. ৩৬৬]

আলোচ্য আয়াতের মর্ম হলো এই যে, যারা কোনো সময় অশ্লীল কোনো কাজ তথা কবীরা গুনাহ করে নেওয়ার পর অথবা নিজেদের প্রতি কোনো অত্যাচার তথা সগীরা গুনাহ করে নেওয়ার পর যদি আল্লাহর আজাব- গজবের ভয়ের কথা স্মরণ করে ক্ষমা প্রার্থনা করে নেয়, তওবা করে নেয় এবং গুনাহে লেগে না থাকে। নিজেদের কৃত পাপকাজের উপর হঠকারিতা প্রদর্শন না করে, তাদের জন্যও বেহেশত তৈরি করে রাখা হয়েছে। মোটকথা প্রথম শ্রেণির মুত্তাকী মুহসীনিন এবং দ্বিতীয় শ্রেণির মুত্তাকী তওবাকারীগণ উভয়ের জন্যই বেহেশত রয়েছে। রয়ে গেল তৃতীয় আরেকটি, অর্থাৎ ঐসব মুমিন যারা গুনাহে কবীরা করার পর তওবা না করেই মারা গেছে। তাদের ক্ষমার ব্যাপারটা আল্লাহর ইচ্ছাধীন হয়ত। তিনি তাদেরকে নিজ কৃপায় ক্ষমা করে বেহেশত দিয়ে দিবেন নতুবা পাপানুযায়ী শাস্তি দিয়ে গুনাহ থেকে পাক করার পর বেহেশত দিবেন। এটাই হচ্ছে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকীদা পক্ষান্তরে মুতাজিলা ও খারিজীরা বলে, তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী।

মাসআলা : সগীরা গুনাহ বার বার করলে তা কবীরা হয়ে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, ইস্তেগফারের দ্বারা কোনো কবীরা, কবীরা থাকে না, অর্থাৎ মাফ হয়ে যায়। আর ইসরার তথা হঠকারিতার সাথে কোনো সগীরা সগীরা থাকে না; বরং কবীরা হয়ে যায়। -[তাফসীরে মাযহারী খ. ২, পৃ. ৩৬৮]

١٣٧. وَنَزَلَ فِى هَزِيْمَةِ اُحُدٍ قَدْ خَلَتْ مَضَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ طَرَائِقُ فِى الْكُفَّارِ بِاِمْهَالِهِمْ ثُمَّ اَخْذِهِمْ فَسِيْرُوا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ الرُّسُلَ اَىْ اٰخِرُ اَمْرِهِمْ مِنَ الْهَلَاكِ فَلَا تَحْزَنُوا لِغَلَبَتِهِمْ فَاَنَا اُمْهِلُهُمْ لِوَقْتِهِمْ .

١٣٨. هٰذَا الْقُرْاٰنُ بَيَانٌ لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ وَهُدًى مِنَ الضَّلَالَةِ وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِيْنَ مِنْهُمْ .

١٣٩. وَلَا تَهِنُوْا تَضْعَفُوْا عَنْ قِتَالِ الْكُفَّارِ وَلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا اَصَابَكُمْ بِاُحُدٍ وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ بِالْغَلَبَةِ عَلَيْهِمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ حَقًّا وَجَوَابُهُ دَلَّ عَلَيْهِ مَجْمُوْعُ مَا قَبْلَهُ .

١٤٠. اِنْ يَمْسَسْكُمْ يُصِبْكُمْ بِاُحُدٍ قَرْحٌ بِفَتْحِ الْقَافِ وَضَمِّهَا جُهْدٌ مِنْ جَرْحٍ وَنَحْوِهِ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ الْكُفَّارَ قَرْحٌ مِثْلُهُ بِبَدْرٍ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا نُصَرِّفُهَا بَيْنَ النَّاسِ يَوْمًا لِفِرْقَةٍ وَيَوْمًا لِاُخْرٰى لِيَتَّعِظُوْا وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ عِلْمَ ظُهُوْرٍ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَخْلَصُوْا فِىْ اِيْمَانِهِمْ مِنْ غَيْرِهِمْ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ . يُكْرِمُهُمْ بِالشَّهَادَةِ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ . الْكَافِرِيْنَ اَىْ يُعَاقِبُهُمْ وَمَا يُنْعِمُ بِهِ عَلَيْهِمْ اِسْتِدْرَاجٌ .

অনুবাদ :

১৩৭. ওহুদ যুদ্ধের পরাজয় সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। নিশ্চয় তোমাদের পূর্বে কাফেরদেরকে অবকাশ দেওয়ার পর পাকড়াও করার বহু তরিকা অতিবাহিত হয়েছে। অতএব [হে মু'মিনগণ!] তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ রাসূলগণকে মিথ্যায়নকারীদের পরিণাম কেমন ছিল। অর্থাৎ তাদের পরিণাম ধ্বংসই হয়েছিল, সুতরাং তোমরা তাদের কাফেরদের সাময়িক বিজয়ের দরুন চিন্তিত হয়ো না। কারণ আমি তাদেরকে তাদের ধ্বংসের সময় পর্যন্ত অবকাশ দিচ্ছি।

১৩৮. এটি পবিত্র কুরআন সমগ্র মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট বর্ণনা আর তাদের মধ্য থেকে পরহেজগারদের জন্য গোমরাহি থেকে পথের দিশারী ও উপদেশ।

১৩৯. আর তোমরা সাহসহারা হয়ো না, কাফেরদের সাথে লড়াই করতে দুর্বল হয়ো না এবং ওহুদে তোমাদের উপর যা কিছু পৌঁছেছে এর জন্য চিন্তিত হয়ো না। তোমরাই তাদের উপর জয়ের মাধ্যমে থাকবে বিজয়ী যদি তোমরা প্রকৃত মু'মিন হও। এখানে জবাবে শর্ত (فَلَا تَحْزَنُوْا) এর উপর পূর্বোক্ত (فَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا) প্রমাণ বহন করছে, তাই তা উহ্য রয়েছে।

১৪০. যদি তোমাদের ওহুদে আঘাত লেগে থাকে। (قَرْحٌ) (ق) কাফের যবর ও পেশের সাথে যখন ইত্যাদির কষ্ট, তবে অনুরূপ আঘাত কাফের সম্প্রদায় বিশেষেরও [বদরে] লেগেছে। আর আমি এ জন্য মানুষের মাঝে দিনকাল পালাক্রমে পরিবর্তন করে থাকি, একদিন এক দলের আরেকদিন অপর দলের যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে! যাতে আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ্যভাবে অবগত হন যে গায়রে মুখলিস মু'মিনদের থেকে মুখলিস মু'মিন কারা এবং তোমাদের মধ্য থেকে যেন তিনি কতককে শহীদরূপে গ্রহণ করতে পারেন তথা তাদেরকে শাহাদতের মাধ্যমে সম্মানিত করেন, আল্লাহ তা'আলা জালিমদেরকে কাফেরদেরকে আদৌ পছন্দ করেন না। অর্থাৎ তাদেরকে তিনি শাস্তি দিবেন। আর তাদেরকে যা কিছু নিয়ামত দেওয়া হচ্ছে তা অবকাশ বৈ কিছু নয়।

١٤١. وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُطَهِّرَهُمْ مِنَ الذُّنُوْبِ بِمَا يُصِيْبُهُمْ وَيَمْحَقَ يُهْلِكَ الْكَافِرِيْنَ .

১৪১. আর যেন আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে পবিত্র করেন। তাদের প্রতি পৌঁছা কষ্টের মাধ্যমে যেন তাদেরকে গুনাহ থেকে পাক করেন এবং কাফেরদেরকে মিটিয়ে দেন। ধ্বংস করে দেন।

١٤٢. اَمْ بَلْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا لَمْ يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ عِلْمَ ظُهُوْرٍ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ فِى الشَّدَائِدِ .

১৪২. তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা বেহেশতে প্রবেশ করে নিবে? অথচ তোমাদের মধ্যে কে মুজাহিদ এবং কে বিপদে ধৈর্যধারণকারী তা আল্লাহ তা'আলার প্রকাশ্যভাবে জেনে নেবেন না?

١٤٣. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ فِيْهِ حَذْفُ اِحْدَى التَّائَيْنِ فِى الْاَصْلِ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ حَيْثُ قُلْتُمْ لَيْتَ لَنَا يَوْمًا كَيَوْمِ بَدْرٍ لِنَنَالَ مَا نَالَ شُهَدَاءُهُ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ اَىْ سَبَبَهُ وَهُوَ الْحَرْبُ . وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ . اَىْ بُصَرَاءُ تَتَاَمَّلُوْنَ الْحَالَ كَيْفَ هِىَ فَلِمَ انْهَزَمْتُمْ .

১৪৩. আর তোমরা মৃত্যু আসার পূর্বেই তার আকাঙ্ক্ষা করেছিলে। (تَمَنَّوْنَ) মূলত تَتَمَنَّوْنَ ছিল, তাতে একটি ت তা বিলুপ্ত হয়েছে। যখন তোমরা বলেছিলে, আফসোস! আমাদের জন্যও যদি বদর দিবসের মতো একটি দিন হতো, তাহলে আমরাও তা অর্জন করতাম যা বদরের শহীদগণ অর্জন করেছে। এখন তো তোমরা মৃত্যুকে তথা মৃত্যুর কারণ যুদ্ধকে স্বচক্ষে দেখে নিলে অথচ তোমরা দেখছিলে চিন্তা-ফিকির করছিলে তোমাদের অবস্থার এ অবস্থা কেন সৃষ্টি হলো এবং তোমরা পরাজিত হলে কেন?

তাহকীক ও তারকীব

لَا تَهِنُوْا তোমরা হীনমনা হয়ো না, দুর্বল হয়ো না। এটা وَهْن থেকে جَمْعُ مُذَكَّر حَاضِر-এর সীগাহ। نُدَاوِلُهَا - مُدَاوَلَةً থেকে مُضَارِعْ مُتَكَلِّم-এর সীগাহ। আমরা একে পরিবর্তন করে থাকি, دَوْلَة পরিবর্তন বিবর্তন থেকে নির্গত। الْاَعْلَوْنَ আসলে اَلْاَعْلَوُوْنَ ছিল, তালীলের পর اَعْلَوْنَ হয়েছে قَوْلُهُ اِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ-এর মধ্যে قَرْح শব্দটিতে দুটি লোগাত রয়েছে। যথা قَرْح ও قُرْح যেরূপ دَفّ এর মধ্যে রয়েছে দুটি লোগাত। যথা اَلدَّفُّ ও اَلدُّفُّ ইমাম ফাররা বলেছেন, اَلْقَرْحُ بِالْفَتْحِ অর্থ জখম, আর اَلْقُرْحُ بِالضَّمِّ অর্থ জখমের কষ্ট। قَوْلُهُ وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ ইমাম খলীল ইবনে আহমদ বলেছেন, تَمْحِيص-এর আসল অর্থ হচ্ছে যাবতীয় দোষ-ক্রোটি থেকে মুক্ত বা قَوْلُهُ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِيْنَ مَحْقٌ বিদূরিত করা। مَحْق এর আসল অর্থ تَنْقِيْصُ الشَّيْءِ قَلِيْلًا قَلِيْلًا ক্রমশ কোনো বস্তুতে হ্রাস ঘটানো। তা থেকেই مُحَاقٌ চাঁদের ক্রমশ হ্রাস প্রাপ্তি। -[তাফসীরে রূহুল মা'আনী, ও হাশিয়াতুস সাবী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ الخ : এই আয়াতটি নাজিল করে আল্লাহ পাক হুজুর ﷺ ও তাঁর সাহাবাগণকে সান্ত্বনা দান করেছেন। যখন তারা ওহুদ যুদ্ধে সাময়িকভাবে পরাজিত হয়ে গিয়েছিলেন। ইরশাদ হয়েছে, তোমাদের পূর্বেও অনেক তরিকা অতিবাহিত হয়েছে। যথা আদ জাতি আল্লাহর নবী হুদ (আ.)-এর সাথে বিরোধিতা করেছে, ছামুদ জাতি হযরত সালেহ (আ.) -এর বিরোধিতা করেছে, নূহের সম্প্রদায় তাঁর সাথে, লূতের সম্প্রদায় তাঁর সঙ্গে, নমরুদ ও তার সম্প্রদায় হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সঙ্গে এবং ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় হযরত মূসা (আ.)-এর সঙ্গে তীব্র বিরোধিতা করেছে। তাদেরকে তাঁদের স্বজাতীয় লোকেরা অনেক কষ্ট দিয়েছে। তাই আপনাদের চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। আপনাদের মধ্যে তাদের অবস্থা দেখা দিবে। শেষ পর্যন্ত বিজয় আপনাদেরই হবে। যেরূপ পূর্ববর্তী নবীদের হয়েছিল।

سُنَنٌ শব্দটি سُنَّةٌ-এর বহুবচন। سُنَّةٌ-এর শাব্দিক অর্থ হলো যে কোনো রকম তরিকা, ভালো হোক বা মন্দ হোক। হাদীস শরীফে এসেছে- مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَلَهُ وِزْرُهَا وَ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا

এখানে سُنَنٌ-এর পূর্বে একটি উহ্য শব্দ اَهْل ও মেনে নেওয়া যেতে পারে। কোনো কোনো আলেমের মতে, سُنَنٌ এর মর্ম হচ্ছে [পূর্ববর্তী] পয়গাম্বরদের জাতিসমূহ। কেননা سُنَّةٌ-এর অর্থ জাতিও রয়েছে। -[তাফসীরে মাযহারী খ. ২, পৃ. ৩৭০]

অনুবাদ :

١٤٤. وَنَزَلَ فِيْ هَزِيْمَتِهِمْ لَمَّا أُشِيْعَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قُتِلَ وَقَالَ لَهُمُ الْمُنَافِقُوْنَ اِنْ كَانَ قُتِلَ فَارْجِعُوْا اِلٰى دِيْنِكُمْ وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ كَغَيْرِهِ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ رَجَعْتُمْ اِلَى الْكُفْرِ وَالْجُمْلَةُ الْاَخِيْرَةُ مَحَلُّ الْاِسْتِفْهَامِ الْاِنْكَارِيِّ اَيْ مَا كَانَ مَعْبُوْدًا فَتَرْجِعُوْا وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَاِنَّمَا يَضُرُّ نَفْسَهُ وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ نِعَمَهُ بِالثَّبَاتِ.

১৪৪. সামনের আয়াতটি সাহাবাদের ওহুদ যুদ্ধে সাময়িক পরাজয়ের মুহূর্তে তখন অবতীর্ণ হয় যখন এ কথা ছড়িয়ে পড়ে যে, মুহাম্মদ ﷺ -কে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে। আর সাহাবাদেরকে মুনাফিকরা বলল যে, মুহাম্মদ যেহেতু নিহত হয়ে গেছেন, তাই তোমরা নিজেদের পুরাতন ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন করে চলে এসো! আর মুহাম্মদ ﷺ একজন রাসূল মাত্র। তাঁর পূর্বে বহু রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। যদি তিনি মৃত্যুবরণ করেন অথবা অন্যদের ন্যায় নিহত হন। তবে কি তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? অর্থাৎ তোমরা কি কুফরের দিকে ফিরে যাবে? পরবর্তী বাক্যটি (اِنْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ) ইস্তেফহামে ইনকারী বা অস্বীকৃতিবোধক প্রশ্নের মহলে রয়েছে। অর্থাৎ তিনি তো মা'বুদ ছিলেন না যে, তোমরা তাঁর [মৃত্যুর কারণে] ধর্ম থেকে প্রত্যাবর্তন করে নিবে। বস্তুত কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না; বরং সে তার নিজেরই ক্ষতি করবে। আর আল্লাহ তা'আলা অচিরেই ছওয়াবের মাধ্যমে তাঁর নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞ লোকদেরকে পুরস্কার দান করবেন।

١٤٥. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ بِقَضَائِهِ كِتٰبًا مَصْدَرٌ اَيْ كَتَبَ اللّٰهُ ذٰلِكَ مُؤَجَّلًا مُوَقَّتًا لَا يَتَقَدَّمُ وَلَا يَتَأَخَّرُ فَلِمَ انْهَزَمْتُمْ وَالْهَزِيْمَةُ لَا تَدْفَعُ الْمَوْتَ وَالثَّبَاتُ لَا يَقْطَعُ الْحَيٰوةَ وَمَنْ يُّرِدْ بِعَمَلِهِ ثَوَابَ الدُّنْيَا اَيْ جَزَاءَهُ مِنْهَا نُؤْتِهِ مِنْهَا مَا قُسِمَ لَهُ وَلَا حَظَّ لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا اَيْ مِنْ ثَوَابِهَا وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ.

১৪৫. আর আল্লাহ তা'আলার হুকুম ছাড়া তথা ফয়সালা ছাড়া কেউ মরতে পারে না। সে জন্য একটা নির্ধারিত সময় রয়েছে। (كِتٰبًا) শব্দটি মাসদার মাফউলের মুতলাক, এর ক্রিয়া ও কর্তা যথাক্রমে كَتَبَ اللّٰهُ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ পাক মৃত্যুর জন্য একটি সুনির্দিষ্ট সময় লিখে রেখে দিয়েছেন। মৃত্যু তার নির্ধারিত সময়ের পূর্বাপর হয় না। তাহলে তোমরা সাহস হারা হবে কেন? সাহস হারিয়ে ফেলায় মৃত্যুকে হটাতে পারবে না। আর দৃঢ়পদ থাকায় জীবনকে নিঃশেষ করতে পারবে না। আর যে ব্যক্তি তার আমলের বদলে দুনিয়ার বিনিময় চায় তথা দুনিয়ার পুরস্কার চায় আমি তাকে তার ভাগ্যে নির্ধারিত অংশ দুনিয়া থেকেই দান করবো। তবে আখিরাতে তার কোনো অংশ থাকবে না। আর যে আখিরাতের বিনিময় চায় আমি তাকে তা থেকেই দেব। তথা আখিরাতের ছওয়াব থেকে দিব। আর আমি অদূর ভবিষ্যতে কৃতজ্ঞ লোকদেরকে পুরস্কার দান করব।

তাহকীক ও তারকীব

مُحَمَّدٌ : ইমাম বগবী (র.) বলেন, مُحَمَّدٌ ঐ ব্যক্তি যিনি যাবতীয় গুণে গুণান্বিত। مُحَمَّدٌ বহুল প্রশংসিত যার প্রশংসা **বারংবার অধিক** পরিমাণে করা হয়। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর নাম মোবারক। أَعْقَابٌ - عَقِبٌ - এর বহুবচন, عَقِبٌ অর্থ **গোড়ালি,** পায়ের গিঁঠ।

قَوْلُهُ وَالْجُمْلَةُ الْأَخِيْرَةُ مَحَلُّ الْاِسْتِفْهَامِ الْاِنْكَارِىْ কথাটির মর্ম হলো, এই যে, أَفَإِنْ مَّاتَ -এর উপর যে প্রশ্নবোধক **হামযাটি** দাখিল হয়েছে, তা মূলত اِنْقَلَبْتُمْ عَلٰى أَعْقَابِكُمْ -এর উপর দাখিল হয়েছে। ইবারতের রূপ হবে

أَأَنْقَلَبْتُمْ عَلٰى أَعْقَابِكُمْ اِنْ مَاتَ اَوْ قُتِلَ الخ اَىْ لَا يَنْبَغِىْ مِنْكُمُ الْاِنْقِلَابُ وَالْاِرْتِدَادُ لِاَنَّ مُحَمَّدًا مُبَلِّغٌ لَا مَعْبُوْدٌ ـ

তারকীব : كَانَ ـ اَنْ تَمُوْتَ এর ইসম। اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ তার খবর।

كِتَابًا ـ مُؤَجَّلًا -এর সিফত। كِتَابًا ـ كِتَابًا مُؤَجَّلًا উহ্য ফেলের মাফউলে মুতলাক اَللّٰهُ শব্দ ফায়েল كَتَبَ (اللّٰهُ) ـ মাওসূফ-সিফত মিলে মাফউলে মুতলাক। كَاَيِّنْ - (مَعْنَا) مُمَيِّزْ كَمْ خَبَرِيَّةٌ ـ مِنْ نَبِىٍّ তার تَمْيِيْز ও مُمَيِّزْ ـ تَمْيِيْز মিলে মুবতাদা ও فِى الدُّنْيَا উহ্য খবর। قَوْلُهُ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ - قَوْلَهُمْ - كَانَ -এর খবর ও اِلَّا اَنْ قَالُوْا তার ইসিম অথবা তার বিপরীত। -[তাফসীরে হক্কানী, হাশিয়াতুস সাবী ও জামালাইন।]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের শানে নুযূল : ইবনে আবী হাতিম রবী'আর বরাত দিয়ে বলেন, ওহুদের দিন মুসলমানদের উপর আহত হওয়ার যে মসিবত পৌছার ছিল তা যখন পৌছল তখন তাঁরা আল্লাহর রাসূল ﷺ -কে ডাকল। লোকেরা বলল, তিনি তো শহীদ হয়ে গেছেন। কিছু লোকেরা বলল, তিনি যদি নবী হতেন তবে শহীদ হতেন না। অন্য আরেকদল লোকেরা বলল, যে জিনিসের জন্য তোমাদের নবী যুদ্ধ করেছিলেন তার জন্য তোমরাও বিজয় লাভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাক। অথবা যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে তোমরাও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়ে যাও। ইবনুল মুনজির হযরত ওমর (রা.)-এর উক্তি নকল করেছেন যে, তিনি বলেন, আমরা ওহুদের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ছেড়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমি পাহাড়ের উপর চড়ে যাই। একজন ইহুদিকে বলতে শুনেছি যে, মুহাম্মদ মারা গেছে। আমি বললাম, যে বলবে মুহাম্মদ নিহত হয়েছে আমি তার গর্দান কেটে ফেলবো। ইতোমধ্যে আমি দেখতে পেলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ ও অন্যান্য লোকেরা ফেরত আসতেছেন।

ইমাম বায়হাকী (র.) দালাইল গ্রন্থে আবুন নাজীহ -এর বর্ণনায় লিখেন যে, একজন মুহাজির জনৈক আনসারীর কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। আনসারী সাহাবী রক্তের মধ্যে অস্থির হয়ে নড়াচড়া করতে ছিলেন। মুহাজির সাহাবী আনসারীকে বলল, তুমি কি জান? মুহাম্মদ তো শহীদ হয়ে গেছে। আনসারী জবাব দিল, মুহাম্মদ ﷺ যদি শহীদ হয়ে গিয়ে থাকেন, তবে তিনি তো আল্লাহর পয়গাম পৌছে দিয়ে গেছেন। তাই তোমরা এখন নিজেদের ধর্মের পক্ষ থেকে যুদ্ধ করতে থাক। এর উপর وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ الخ আয়াতটি নাজিল হয়েছে। -[তাফসীরে মাযহারী খ. ২, পৃ. ৩৭৬]

শায়খ আহমদ সাবী বলেন, আলোচ্য আয়াতটিতে মুনাফেকদেরকে রদ করা হয়েছে। কেননা ওরা দুর্বল মুসলমানদেরকে **বলেছিল,** মুহাম্মদ যদি নিহত হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তোমরা তোমাদের এবং তোমাদের বাব-দাদাদের ধর্মের দিকে ফিরে **এসো! আলোচ্য** আয়াতে একথা বলে দিয়েছে যে, মুহাম্মদ একজন প্রেরিত রাসূল মাত্র, যেরূপ তাঁর পূর্বে আরো অনেক নবী **রাসূল অতিবাহিত** হয়ে গেছেন। তিনি উপাসনার যোগ্য রব নন যে, তাঁর মৃত্যু হয়ে গেলে তাঁর মৃত্যুর কারণে আল্লাহর ইবাদত

ছেড়ে দিতে হবে। কেননা তাঁর মওজুদ থাকার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপন প্রভুর প্রদত্ত রেসালাতের দায়িত্ব পালন তথা রেসালাতের তাবলীগ করা। এই জন্যই তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে নাজিল হয়েছিল- اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا তবে আমাদের জন্য তাঁর জীবদ্দশায় ও মৃত্যুবস্থায় সর্বাবস্থায় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা করা ওয়াজিব। আর এ কথায় আকিদা পোষণ করা আবশ্যকীয় যে, তাঁর মোজেজাসমূহ অব্যাহত থাকবে এবং তাঁর অনুসরণ ও আনুগত্য করা জরুরি।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন - مَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهُ যে ব্যক্তি রাসূলের অনুসরণ করল সে বস্তুত আল্লাহর অনুসরণ করল। কেবল তাঁর জীবদ্দশায় অনুসরণ করার কথা বলা হয়নি। হুজুর ﷺ ইরশাদ করেছেন, حَيَوَاتِيْ خَيْرٌ لَكُمْ وَمَمَاتِيْ خَيْرٌ لَكُمْ অর্থাৎ আমার জীবদ্দশাও তোমাদের জন্য ভালো এবং আমার মৃত্যুও তোমাদের জন্য ভালো। সুতরাং নবীজী যদি সাধারণ মৃত্যুতে মারা যান অথবা যুদ্ধের ময়দানে শাহাদাত বরণ করেন তাহলে তোমাদের যুদ্ধ ত্যাগ করা বা ইসলাম ত্যাগ করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। -[হাশিয়াতুস সাবী খ. ১, পৃ. ১৮২]

কেউ যদি নবীর মৃত্যুর কারণে ইসলাম ধর্ম ছেড়ে দিয়ে পুনরায় কুফরের দিকে ফিরে এসে কাফের মুরতাদ হয়ে যায় তাতে আল্লাহর বিন্দুমাত্রও কোনো ক্ষতি হবে না। তবে যারা ইসলামের উপর অটুট থেকে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করবে, আল্লাহ পাক অদূর ভবিষ্যতে তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করবেন।

قَوْلُهٗ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ الخ : এই আয়াতে ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে। যারা সাহসহারা হয়ে গিয়েছিল তাদেরকে ভর্ৎসনা করা হয়েছে এবং যুদ্ধের উপর উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এজন্য পূর্ববর্তী নবীগণ এবং তাদের অনুসারীদের সবরও ইস্তেকামাতের উদাহরণ বর্ণনা করা হয়েছে।

١٤٦. وَكَاَيِّنْ كَمْ مِّنْ نَّبِيٍّ قُتِلَ وَفِيْ قِرَاءَةٍ قَاتَلَ وَالْفَاعِلُ ضَمِيْرُهُ مَعَهُ خَبَرٌ مُبْتَدَؤُهُ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ جُمُوْعٌ كَثِيْرَةٌ فَمَا وَهَنُوْا جَبُنُوْا لِمَا اَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مِنَ الْجِرَاحِ وَقَتْلِ اَنْبِيَائِهِمْ وَاَصْحَابِهِمْ وَمَا ضَعُفُوْا عَنِ الْجِهَادِ وَمَا اسْتَكَانُوْا خَضَعُوْا لِعَدُوِّهِمْ كَمَا فَعَلْتُمْ حِيْنَ قِيْلَ قُتِلَ النَّبِيُّ ﷺ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ عَلَى الْبَلَاءِ اَيْ يُثِيْبُهُمْ.

১৪৬. আর বহু নবী ছিলেন, যাদের সঙ্গী হয়ে অনেক আল্লাহওয়ালা লোক শহীদ হয়েছেন। ভিন্ন এক কেরাতে এসেছে قَاتَلَ যার ফায়েল তার যমীর! অর্থ হবে, যাদের সঙ্গী হয়ে তারা যুদ্ধ করেছেন। مَعَهُ তারকীবে খবর হয়েছে আর رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ তার মুবতাদা। رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ -এর মানে হচ্ছে [গ্রন্থকারের মতে] বড় দল। আল্লাহর পথে যে বিপর্যয় ঘটেছিল তথা তাদের জখম, নবীগণ ও সাথিগণের শাহাদাত হয়েছিল। তাতে তারা সাহসহারা হয়ে ভেঙ্গে পড়েন নি, জিহাদ করা থেকে ক্লান্তও হয় নাই এবং নতও হয় নি তাদের শত্রুদের জন্য, তোমরা মুহাম্মদ শহীদ হয়ে গেছে বলার পর যেরূপ হয়েছ। আর আল্লাহ পাক মসিবতে সবর অবলম্বনকারী লোকদের ভালোবাসেন। অর্থাৎ তাদেরকে ছওয়াব দান করেন।

١٤٧. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ عِنْدَ قَتْلِ نَبِيِّهِمْ مَعَ ثُبَاتِهِمْ وَصَبْرِهِمْ اِلَّا اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا تَجَاوُزَنَا الْحَدَّ فِيْ اَمْرِنَا اِيْذَانًا بِاَنَّ مَا اَصَابَهُمْ لِسُوْءِ فِعْلِهِمْ وَهَضْمًا لِاَنْفُسِهِمْ وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا بِالْقُوَّةِ عَلَى الْجِهَادِ وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ.

১৪৭. তাদের দৃঢ়পদ ও সবর সত্ত্বেও স্বীয় নবীদের শাহাদাতকালে তাদের দোয়া তো এতটুকুই ছিল যে, তারা আর কিছুই বলেনি, শুধু বলেছে, হে আমাদের প্রতিপালক। মোচন করে দাও আমাদের পাপরাশি আর যা কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে আমাদের কাজে তথা আমাদের সীমালঙ্ঘনকে। তাদের এ উক্তিটি এ কথা প্রকাশ করার জন্য ছিল যে, তাদের উপর যা কিছু মসিবত পৌঁছেছে এসব তাদের মন্দ আমলের কারণেই পৌঁছেছে এবং বিনয় প্রকাশার্থে ছিলো তাদের এ উক্তিটি। [হে আমাদের প্রতিপালক!] জিহাদের জন্য শক্তিদান করার মাধ্যমে আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখ এবং কাফেরদের উপর আমাদেরকে সাহায্য কর।

١٤٨. فَاٰتٰهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا النَّصْرَ وَالْغَنِيْمَةَ وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ اَيِ الْجَنَّةِ وَحُسْنُهُ التَّفَضُّلُ فَوْقَ الْاِسْتِحْقَاقِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ.

১৪৮. অতঃপর আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার ছওয়াব তথা সাহায্য ও গনিমতের মাল দান করেছেন। আর আখিরাতেও উত্তম ছওয়াব দান করেছেন। আখিরাতের ছওয়াব হচ্ছে জান্নাত আর উত্তম ছওয়াবের অর্থ হচ্ছে প্রাপ্ত অধিকারের চেয়ে বেশি অনুগ্রহপূর্বক দান করা। আর যারা সৎকর্মশীল আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভালোবাসেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ كَاَيِّنْ - كَافْ تَشْبِيْه দাখিল হয়েছে اَيْ -এর উপর। তানবীনের নূনকে কিয়াসের খেলাফ লিখে দেওয়া হয়েছে। এটা كَمْ خَبَرِيَّة -এর অর্থে ব্যবহৃত যা দ্বারা আধিক্য বুঝানো হয়েছে।

رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ এর অর্থ হলো جُمُوْعٌ كَثِيْرَةٌ বড়দল। رِبِّيُّوْنَ - رِبَّةٌ -এর দিকে মানসূব। رِبَّةٌ অর্থ জামাত, দল। এ অর্থটাই গ্রন্থকার গ্রহণ করেছেন, যা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এক রেওয়ায়েত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেই ইবনে জুবাইরের এক বর্ণনা মতে, এটা رَبّ -এর দিকে কিয়াসের খেলাফ নিসবত করা হয়েছে, যেরূপ رَبَّانِيٌّ - رَب -এর খেলাফে কিয়াস ইসমে মানসূব। এ বর্ণনা মতে, رِبِّيُّوْنَ -এর অর্থ হবে আল্লাহওয়ালাগণ। ইবনে যায়েদ বলেছেন– رِبِّيُّوْنَ অর্থ অনুসারীগণ।

অনুবাদ :

١٤٩. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْمَا يَأْمُرُوْنَكُمْ بِهٖ يَرُدُّوْكُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ اِلَى الْكُفْرِ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ـ

১৪৯. হে ঈমানদারগণ! তোমাদেরকে যে বিষয়ে কাফেররা আদেশ করছে সে বিষয়ে যদি তোমরা কাফেরদের অনুসরণ কর তবে তারা তোমাদের পিছন দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। তথা মুরতাদ বানিয়ে দিবে ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

١٥٠. بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ نَاصِرُكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ ـ فَاَطِيْعُوْهُ دُوْنَهُمْ ـ

১৫০. বরং আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অভিভাবক তথা সাহায্যকারী আর তিনিই উত্তম সহায়ক সুতরাং তারই অনুসরণ কর, অন্য কারো নয়।

١٥١. سَنُلْقِىْ فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِسُكُوْنِ الْعَيْنِ وَضَمِّهَا الْخَوْفَ وَقَدْ عَزَمُوْا بَعْدَ ارْتِحَالِهِمْ مِنْ اُحُدٍ عَلَى الْعَوْدِ وَاسْتِيْصَالِ الْمُسْلِمِيْنَ فَرُعِبُوْا وَلَمْ يَرْجِعُوْا بِمَا اَشْرَكُوْا بِسَبَبِ اِشْرَاكِهِمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطَانًا ـ حُجَّةً عَلٰى عِبَادَتِهٖ وَهُوَ الْاَصْنَامُ وَمَأْوٰىهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى مَأْوَى الظّٰلِمِيْنَ الْكَافِرِيْنَ هِىَ ـ

১৫১. অচিরেই আমি কাফেরদের অন্তরে ভয়ভীতির সঞ্চার করবো। (اَلرُّعْبُ) আইন বর্ণে পেশ ও সাকিনের সাথে, তার অর্থ হয়েছে ভয়-ভীতি। কাফেররা ওহুদের ময়দান থেকে চলে আসার পর আবার ফেরত আসতে এবং মুসলমানদের মূলোৎপাটন করতে প্রতিজ্ঞা করেছিল। কিন্তু তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে যার দরুন ফেরত আসতে পারেনি। যেহেতু তারা আল্লাহর সাথে শিরক করেছে। যে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কোনো দলিল-প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি তথা মূর্তিপূজার উপর আল্লাহ কোনো দলিল অবতীর্ণ করেননি। আর তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম আর তা জালেমদের তথা কাফেরদের জন্য অত্যন্ত মন্দ ঠিকানা।

١٥٢. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ اِيَّاكُمْ بِالنَّصْرِ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ تَقْتُلُوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ بِاِرَادَتِهٖ حَتّٰى اِذَا فَشِلْتُمْ جَبُنْتُمْ عَنِ الْقِتَالِ وَتَنَازَعْتُمْ اِخْتَلَفْتُمْ فِى الْاَمْرِ اَىْ اَمْرِ النَّبِىِّ بِالْمَقَامِ فِىْ سَفْحِ الْجَبَلِ لِلرَّمْىِ فَقَالَ بَعْضُكُمْ نَذْهَبُ فَقَدْ نَصَرَ اَصْحَابُنَا وَبَعْضُكُمْ لَا نُخَالِفُ اَمْرَ النَّبِىِّ ﷺ وَعَصَيْتُمْ اَمْرَهٗ فَتَرَكْتُمُ الْمَرْكَزَ لِطَلَبِ الْغَنِيْمَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا اَرٰكُمُ اللّٰهُ مَا تُحِبُّوْنَ مِنَ النَّصْرِ ـ

১৫২. আর নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সাথে তাঁর সাহায্যের অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন, যখন তাঁর হুকুমে ইচ্ছায় তোমরা কাফেরদেরকে বিনাশ করছিলে, যে পর্যন্ত না তোমরা নিজেরাই যুদ্ধ করা থেকে সাহসহারা হয়ে পড়লে এবং নির্দেশ তথা নবী করীম ﷺ -এর নির্দেশ সম্পর্কে পরস্পর মতবিরোধ করলে, যখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রিয়বস্তু তথা সাহায্য দেখিয়েছিলেন। তখন তোমরা নাফরমানি করেছিলে রাসূলের নির্দেশ এবং গনিমতের মাল অর্জনের জন্য নির্ধারিত স্থান ছেড়ে দিয়েছিলে।

وَجَوَابُ اِذَا دَلَّ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهُ اَىْ مَنَعَكُمْ نَصْرَهُ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيْدُ الدُّنْيَا فَتَرَكَ الْمَرْكَزَ لِلْغَنِيْمَةِ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ فَثَبَتَ بِهِ حَتّٰى قُتِلَ كَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جُبَيْرٍ وَاَصْحَابِهِ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَطْفٌ عَلٰى جَوَابِ اِذَا الْمُقَدَّرِ رَدَّكُمْ بِالْهَزِيْمَةِ عَنْهُمْ اَىِ الْكُفَّارِ لِيَبْتَلِيَكُمْ ـ لِيَمْتَحِنَكُمْ فَيَظْهَرَ الْمُخْلِصُ مِنْ غَيْرِهِ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ مَا ارْتَكَبْتُمُوْهُ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ بِالْعَفْوِ ـ

وَلَقَدْ ـ جَوَابُ اِذَا (مَنَعَكُمْ نَصْرَهُ) -এর প্রতি পূর্ববর্তী বাক্য صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهُ ইঙ্গিত বহন করে। [তাই এটা উহ্য রয়েছে] তোমাদের মধ্যে কিছুলোক দুনিয়ার লাভ চায়। তাই তারা গনিমতের মাল গ্রহণের জন্য নির্ধারিত স্থান ছেড়ে দিয়েছে। আর কিছু লোক আখিরাতের লাভ চায় তাই তারা স্বস্থানে স্থির থেকে [যুদ্ধ করে] শহীদ হয়েছে। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর ও তাঁর সাথিগণ। অতঃপর তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেন তাদের থেকে তথা কাফেরদের থেকে ثُمَّ صَرَفَكُمْ -কে আতফ করা হয়েছে উহ্য জবাবে اِذَا তথা مَنَعَكُمْ نَصْرَهُ এর উপর, তোমাদের পরীক্ষার উদ্দেশ্যে যার ফলে মুখলিস গাইরে মুখলিস থেকে পার্থক্য হয়ে যাবে। আর নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কৃত অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের প্রতি অত্যন্ত দয়াবান ক্ষমা ও মার্জনার মাধ্যমে।

١٥٣. اُذْكُرُوْا اِذْ تُصْعِدُوْنَ تُبْعِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ هَارِبِيْنَ وَلَا تَلْوٗنَ تُعَرِّجُوْنَ عَلٰى اَحَدٍ وَّالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِىْٓ اُخْرٰىكُمْ اَىْ مِنْ وَرَائِكُمْ يَقُوْلُ اِلَىَّ عِبَادَ اللّٰهِ اِلَىَّ عِبَادَ اللّٰهِ فَاَثَابَكُمْ فَجَازَاكُمْ غَمًّا بِالْهَزِيْمَةِ بِغَمٍّ بِسَبَبِ غَمِّكُمُ الرَّسُوْلَ بِالْمُخَالَفَةِ وَقِيْلَ الْبَاءُ بِمَعْنٰى عَلٰى اَىْ مُضَاعَفًا عَلٰى غَمٍّ فَوْتَ الْغَنِيْمَةِ لِكَيْلَا مُتَعَلِّقٌ بِعَفَا اَوْ بِاَثَابَكُمْ فَلَا زَائِدَةٌ تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ مِنَ الْغَنِيْمَةِ وَلَا مَا اَصَابَكُمْ مِنَ الْقَتْلِ وَالْهَزِيْمَةِ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ـ

১৫৩. আর স্মরণ কর সেই সময়কে যখন তোমরা ঊর্ধ্বমুখে ছুটতেছিলে তথা ময়দান ছেড়ে পলায়ন করেছিলে এবং পিছন ফিরে কারো প্রতি লক্ষ্য করছিলে না। আর আল্লাহর রাসূল ﷺ তোমাদেরকে পিছন দিক থেকে ডাকছিলেন। হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা আমার দিকে এসো, হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা আমার দিকে এসো। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে কষ্টের বদলে কষ্ট দিলেন। তথা তোমাদের রাসূলকে কষ্ট দেওয়ার বদলে তোমাদেরকে আল্লাহ পরাজয়ের কষ্ট দিলেন। ভিন্নমতে بَا বর্ণটি عَلٰى -এর অর্থে ব্যবহৃত অর্থাৎ পরাজয়ের উপর গনিমত হাত ছাড়া হওয়ার কষ্ট দিলেন। যাতে তোমরা দুঃখবোধ না করে হস্তচ্যুত গনিমতের উপর এবং যে কতল ও পরাজয়ের বিপদ পৌঁছেছে তোমাদের প্রতি তার উপর। لِكَيْلَا ـ عَفَا অথবা اَثَابَكُمْ -এর সাথে মুতা'আল্লিক আর لَا বর্ণটি অতিরিক্ত। এবং আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কার্যাবলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

তাহকীক ও তারকীব

ইবনে আমের ও কিসায়ী اَلرُّعُبَ আইন বর্ণের পেশের সাথে পড়েছেন আর অবশিষ্ট কারীগণ সাকিনের সাথে اَلرُّعْبَ পড়েছেন। **اَلرُّعْبَ মাসদার** ও اَلرُّعْب ইসমে মাসদার ও হতে পারে। اَلرُّعْبُ ঐ ভীতি যা অন্তরে সৃষ্টি হয়। اَلرُّعْبُ -এর আসল অর্থ হচ্ছে **পরিপূর্ণ করে** দেওয়া, ভরে দেওয়া। বলা হয় سَيْلٌ رَاعِبٌ اِذَا مَلَأَ الْاَوْدِيَةَ وَالْاَنْهَارَ ভরপুর বন্যা, যখন বন্যার পানি মাঠ ও **নদ-নদী ভরে** যায়। ভীতি বা ত্রাসকে এই জন্য রুউব বলা হয়। কারণ রুউব অন্তরকে ভয়ে পরিপূর্ণ করে দেয়, قَوْلُهُ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا - سُلْطَانًا এখানে দলিল প্রমাণের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। سُلْطَانٌ এর উৎসমূল সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে।

১. ইমাম যুজাজ বলেন, সুলতান سَلِيْط থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে سَلِيْط অর্থ তেল, যার দ্বারা প্রদীপ প্রজ্বলিত হয়। রাজা বাদশাহকে এই জন্য সুলতান বলা হয়। কারণ তাদের দ্বারা লোকেরা নিজেদের অধিকার আদায় করে।
২. سُلْطَانٌ-এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে দলিল। বাদশাহকে সুলতান এই জন্য বলা হয়, কারণ তিনি হলেন দলিলওয়ালা।
৩. লাইছ বলেন, (سُلْطَان) সুলতান অর্থ শক্তি। এই অর্থেই এসেছে سُلْطَانُ الْمَلِكِ বাদশাহের সুলতান অর্থাৎ قُوَّتَهٗ وَقُدْرَتَهٗ তার শক্তি ও সামর্থ্য। দলিলকে এই জন্য সুলতান বলা হয়, কারণ এ দ্বারা বাতিলকে প্রতিহত করার শক্তি অর্জন হয়।
৪. ইবনে ছুরাইদ বলেছেন, প্রত্যেক বস্তুর ধার ও তেজকে সুলতান বলা হয়। এটা لِسَانٌ سَلِيْطٌ তেজ জবান থেকে নির্গত। سَلَاطَةٌ অর্থ জবান তেজ হওয়া। قَوْلُهٗ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ - تَحُسُّوْنَهُمْ অর্থাৎ تُقْتِلُوْنَهُمْ قَتْلًا كَثِيْرًا অর্থাৎ তোমরা যখন তাদেরকে ব্যাপক হারে হত্যা করতে ছিলে। লাইছ বলেন, اَلْحَسُّ অর্থ – ব্যাপক হত্যা, কতল। আবূ উবাইদ, যুজাজ ও ইবনে কুতাইবা বলেন, حَسٌّ অর্থ হত্যার মাধ্যমে নির্মূল করে ফেলা تَحُسُّوْنَهُمْ-এর অর্থ হবে تَسْتَأْصِلُوْنَهُمْ قَتْلًا ইশতেকাক বা শব্দ প্রকরণ শাস্ত্র বিশারদগণ বলেন, حسه তথা قَتَلَهٗ কারণ হত্যা দ্বারা حِسٌّ বা অনুভূতি নষ্ট হয়ে যায়। لَا تَلْتَفِتُوْنَ اِلٰى اَحَدٍ مِنْ شِدَّةِ الْهَرَبِ অর্থাৎ তীব্র পলায়নের কারণে কারো প্রতি তাকাতে পারেনি। تَلْوُوْنَ عَلٰى اَحَدٍ তথা

قَوْلُهٗ بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰكُمْ - ۔ قَوْلُهٗ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تُطِيْعُوا الخ শর্তিয়া اِنْ শর্ত تُطِيْعُوا الخ জবাবে শর্ত يَرُدُّوْكُمْ الخ। اَللّٰهُ মুবতাদা مَوْلٰكُمْ খবর। قَوْلُهٗ بِمَا اَشْرَكُوْا-এর মধ্যে بَا পূর্ববর্তী ক্রিয়া سَنُلْقِيْ-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে। আর مَا মাসদারিয়া। قَوْلُهٗ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ الخ - صَدَقَ ফে'ল اَللّٰهُ ফায়েল كُمْ প্রথম মাফউল وَعْدَهٗ দ্বিতীয় মাফউল حَتّٰى উহ্য ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে তথা مَا دَامَ ذٰالِكَ اِلٰى وَقْتِ فَشَلِكُمْ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের যোগসূত্র : ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক পরাজয় ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যুর গুজব ছড়িয়ে পড়তেই মুনাফেকরা দুষ্কৃতির সুযোগ পেয়ে বসে। তারা মুসলমানদের বলতে লাগল যে, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নাই তখন আমরা নিজ নিজ ধর্মে ফিরে যাইনা কেন? এতে সব বিবাদ বিসংবাদ মিটে যাবে। এ উক্তি থেকে মুনাফিকদের দুষ্টামি ও মুসলমানদের সাথে শত্রুতা ফুটে উঠেছে। তাই আলোচ্য আয়াতে (يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الخ) মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা এসব শত্রুর কথায় কর্ণপাত করবে না, তাদেরকে কোনো পরামর্শে শরিক করবেনা এবং তাদের পরামর্শ অনুযায়ী কোনো কাজ ও করবেনা। সুতরাং পূর্ববর্তী আয়াতে যেমন আল্লাহ ওয়ালাদের অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতেও তেমনি মুনাফিক তথা ইসলামের শত্রুদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। –[মা'আরিফুল কুরআন খ. ২২, পৃ. ২১২]

سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا اَشْرَكُوْا الخ পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ পাকই সাহায্যকারী। আলোচ্য আয়াতসমূহে সাহায্যের কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

সাহাবায়ে কেরামের উচ্চ মরতবা : ওহুদ যুদ্ধে কতিপয় সাহাবার মতামত ভ্রান্তছিল সত্য, তবে এ ভ্রান্তির পরও আল্লাহ পাকের দয়া সাহাবাদের প্রতি দর্শনীয়। প্রথমত, لِيَبْتَلِيَكُمْ বলে প্রকাশ করেছেন যে, সাময়িক পরাজয়টি শাস্তি হিসেবে নয়, বরং পরীক্ষার জন্য। অতঃপর وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ বলে পরিষ্কার ভাষায় ত্রুটি মার্জনার কথা ঘোষণা করেছেন।

কতিপয় সাহাবীর ইহকাল কামনার অর্থ : مِنْكُمْ مَنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا الخ আয়াতে বলা হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম তখন দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। একদল ইহকাল কামনা করেছিলেন এবং একদল শুধু পরকালের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোন কর্মের ভিত্তিতে একদল সাহাবীকে ইহকালের প্রত্যাশী বলা হয়েছে? এটা জানা কথা যে, গনিমতের মাল আহরণের ইচ্ছাকেই ইহকাল কামনা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। এখন চিন্তা করা দরকার যে, যদি তারা স্বীয় স্থানে দায়িত্ব পালনরত থাকতেন এবং গনিমতের মাল আহরণে অংশ গ্রহণ না করতেন তবে কি তাদের প্রাপ্য অংশ হ্রাস পেত? কিংবা অংশ গ্রহণের ফলে কি তাদের প্রাপ্য অংশ বেড়ে গেছে? কুরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণিত রয়েছে যে, গনিমতের আইন যাদের জানা আছে তারা এ ব্যপারে নিশ্চিত যে, মাল আহরণে শরিক হওয়া এবং স্বস্থানে অবস্থান করা উভয় অবস্থাতেই তারা সমান অংশ পেতেন। এতে বুঝা যায়, তাদের এ কর্ম নির্ভেজাল ইহকাল কামনা হতে পারে না; বরং একে জিহাদের কাজেই অংশ গ্রহণ বলা যায়। তবে স্বাভাবিক ভাবে তখন গনিমতের মালের কল্পনা অন্তরে জাগ্রত হওয়া অসম্ভব নয়; কিন্তু আল্লাহ পাক স্বীয় পয়গাম্বরের সহচরদের অন্তর এ থেকেও মুক্ত ও পবিত্র দেখতে চান। এ কারণে একেই ইহকাল কামনা রূপে ব্যক্ত করে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়েছে। –[মা'আরিফুল কুরআন খ. ২, পৃ. ২১৫-১৬]

١٥٤. ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً أَمْنًا نُعَاسًا يَغْشَى بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ طَائِفَةً مِنْكُمْ وَهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ فَكَانُوا يَمِيدُوْنَ تَحْتَ الْحُجُفِ وَتَسْقُطُ السُّيُوْفُ مِنْهُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَيْ حَمَلَتْهُمْ عَلَى الْهَمِّ فَلَا رَغْبَةَ لَهُمْ إِلَّا نَجَاتُهَا دُوْنَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ فَلَمْ يَنَامُوْا وَهُمُ الْمُنَافِقُوْنَ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ ظَنًّا غَيْرَ الظَّنِّ الْحَقِّ ظَنَّ أَيْ كَظَنِّ الْجَاهِلِيَّةِ حَيْثُ اعْتَقَدُوا أَنَّ النَّبِيَّ قُتِلَ أَوْ لَا يَنْصُرُ يَقُوْلُوْنَ هَلْ مَا لَنَا مِنَ الْأَمْرِ أَيِ النَّصْرِ الَّذِيْ وُعِدْنَاهُ مِنْ زَائِدَةٌ شَيْءٍ قُلْ لَهُمْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ بِالنَّصْبِ تَوْكِيْدًا وَالرَّفْعِ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ لِلّٰهِ أَيِ الْقَضَاءُ لَهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ يُخْفُوْنَ فِيْ أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُوْنَ يُظْهِرُوْنَ لَكَ يَقُوْلُوْنَ بَيَانٌ لِمَا قَبْلَهُ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هٰهُنَا أَيْ لَوْ كَانَ الْاِخْتِيَارُ إِلَيْنَا لَمْ نَخْرُجْ فَلَمْ نُقْتَلْ لَكِنْ أُخْرِجْنَا كُرْهًا .

অনুবাদ :

১৫৪. অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর নাজিল করেছেন দুঃখের পর শান্তি তন্দ্রারূপে যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করেছিল। يَغْشَى -তে ي ও ت -এর সাথে। আর তারা হলো মুমিনগণ! তারা ঝুঁকে পড়তেছিল ঢালের নীচে এবং তলোয়ার তাদের হাত থেকে পড়তেছিল। আর একদল তাদের জীবনের চিন্তায় উদ্বিগ্ন ছিল। তাদের চিন্তা ছিল কেবল তাদের প্রাণ রক্ষার, নবী এবং সাহাবাদের কোনো চিন্তা তাদের ছিল না। আর তারা হলো মুনাফিকগণ। তারা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে জাহেলীযুগের অজ্ঞ লোকদের ন্যায় অবাস্তব ধারণা করল। কারণ তারা ধারণা করেছিল হয়তো নবী নিহত হয়ে গেছেন অথবা তাঁকে সাহায্য করা হবে না, এই বলে যে, আমাদেরকে যে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার কিছুই আমাদের জন্য নেই। অথবা অনুবাদ হবে আমাদেরও কি কিছু এখতিয়ার আছে? مِنْ অব্যয় পদটি অতিরিক্ত। [হে রাসূল ﷺ] আপনি তাদের বলে দিন, সমস্ত বিষয় আল্লাহ পাকের হাতেই রয়েছে। كُلَّهُ যবরের সাথে হলে اَلْاَمْرَ-এর তাকিদ হবে আর পেশের সাথে হলে মুবতাদা হবে। তখন তার খবর হবে لِلّٰهِ অর্থাৎ ফায়সালা আল্লাহর হাতে তিনি যা ইচ্ছা করেন। আপনার কাছে যা প্রকাশ করে না তা তাদের অন্তরে গোপন রাখে, তারা বলে এটা পূর্বের বাক্যের ব্যাখ্যা যদি এ ব্যাপারে আমাদের কোনো অধিকার থাকতো তাহলে আমরা এখানে এভাবে নিহত হতাম না অর্থাৎ আমাদের হাতে যদি এখতিয়ার থাকতো তবে আমরা মদিনা থেকে বের হতাম না এবং নিহতও হতাম না; কিন্তু আমাদেরকে জোরপূর্বক বের করা হয়েছে।

قُلْ لَهُمْ لَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ وَفِيكُمْ مَنْ كَتَبَ
اللّٰهُ عَلَيْهِ الْقَتْلَ لَبَرَزَ خَرَجَ الَّذِيْنَ كُتِبَ قُضِيَ
عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ مِنْكُمْ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ
مَصَارِعِهِمْ فَيُقْتَلُوْا وَلَمْ يُنْجِهِمْ قُعُوْدُهُمْ لِاَنَّ
قَضَاءَهُ تَعَالٰى كَائِنٌ لَا مُحَالَةَ وَفَعَلَ مَا فَعَلَ بِاُحُدٍ
لِيَبْتَلِيَ يَخْتَبِرَ اللّٰهُ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ قُلُوْبِكُمْ مِنَ
الْاِخْلَاصِ وَالنِّفَاقِ وَلِيُمَحِّصَ يُمَيِّزَ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ . بِمَا فِيْ الْقُلُوْبِ لَا
يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ وَاِنَّمَا يَبْتَلِيْ لِيُظْهِرَ لِلنَّاسِ .

হে রাসূল ﷺ! আপনি তাদেরকে বলে দিন যে যদি তোমরা স্বগৃহেও থাকতে তবুও তোমাদের মধ্যে যাদের ভাগ্যে নিহত হওয়া লিখা হয়ে আছে তারা অবশ্যই নিহত হওয়ার স্থানে বের হয়ে আসত। অতঃপর নিহত হয়ে যেত। তাদের গৃহে বসে থাকায় তাদেরকে বাঁচতে পারতো না। কারণ আল্লাহর ফয়সালা নিঃসন্দেহে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। আর ওহুদ যুদ্ধে তার যা করার ছিল তা করে নিয়েছেন। আর এ সব কিছু এই জন্য হয়েছে [যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তরে] ইখলাস ও নেফাকের যা কিছু আছে তা পরীক্ষা করবেন এবং তোমাদের অন্তরে যা আছে তা পরিষ্কার করবেন তথা পার্থক্য করে দেবেন। আর আল্লাহ তা'আলা বক্ষের কথাসমূহ তথা অন্তরের কথাসমূহ ভালো রকম জানেন তার কাছে কোনো বিষয় গোপন নয়। আর পরীক্ষা তো কেবল লোকদের কাছে একথা প্রকাশ করার জন্য করা হয়েছে যে,

١٥٥. اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ عَنِ الْقِتَالِ يَوْمَ
الْتَقَى الْجَمْعٰنِ جَمْعُ الْمُسْلِمِيْنَ وَجَمْعُ
الْكَافِرِيْنَ بِاُحُدٍ وَهُمُ الْمُسْلِمُوْنَ اِلَّا اثْنَيْ
عَشَرَ رَجُلًا اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ اَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ
بِوَسْوَسَتِهِ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا مِنَ الذُّنُوْبِ وَهُوَ
مُخَالَفَةُ اَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ
اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ حَلِيْمٌ لَا يُعَجِّلُ
عَلَى الْعُصَاةِ .

১৫৫. নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে [রণাঙ্গণে] দুই দলে মোকাবিলা হওয়ার দিন যুদ্ধ করা থেকে ফিরে গিয়েছিল। দুই দল বলতে মুসলমান ও কাফেরদের দল উদ্দেশ্য। বারজন ছাড়া সকল মুসলমানই সরে পড়েছিল। তাদের পাপের পরিণামে শয়তানই তাদেরকে কুমন্ত্রণার মাধ্যমে পদস্খলন ঘটিয়েছিল। আর সেই পাপটি হলো নবী করীম ﷺ -এর হুকুমের বিরোধিতা করা। অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের জন্য অত্যন্ত ক্ষমাশীল অতীব সহিষ্ণু তথা পাপীদের শাস্তি দিতে তড়িঘড়ি করেন না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَاَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ : এর মধ্যে بَا বর্ণটি বিনিময়ের অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন বলা হয়, هٰذَا بِهٰذَا -এর বিনিময়ে এটা। তখন অর্থ হবে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে দুঃখের বিনিময়ে দুঃখ পৌছিয়েছেন। بَا বর্ণটি (مَعَ) সাথে সাথে অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। তখন অর্থ হবে- اَثَابَهُمْ غَمًّا مَعَ غَمٍّ তাদেরকে এক দুঃখের সাথে আরেক দুঃখ দিয়েছেন। اَزَلَّ ও اِسْتَزَلَّ একই অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ শয়তান পদস্খলনের উপর প্ররোচিত করেছে।

তারকীব : وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ বাক্যটি হালিয়া। بِغَمٍّ - غَمًّا এর সিফত হওয়ার প্রেক্ষিতে مَحَلِّ نَصْب -এর মধ্যে রয়েছে। نُعَاسًا -এর বদল হয়েছে اَمَنَةً থেকে। اَمَنَةً - نُعَاسًا থেকে عَطْف بَيَان ও হতে পারে। جُمْلَة - يَغْشٰى টি نُعَاسًا -এর সিফত। قَوْلُهُ وَطَائِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ - طَائِفَة মুবতাদা قَدْ اَهَمَّتْهُمْ খবর।

قَوْلُهُ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ : شَيْءٌ - كَانَ -এর ইসিম ও لَنَا তার খবর। مَا قُتِلْنَا - لَوْ كَانَ -এর জওয়াব।

لِيُمَيِّزَ وَلِيَبْتَلِيَ - فِعْل মুতা'আল্লিক হয়েছে لَبَرَزَ ফে'লের সাথে। وَلِيَبْتَلِيَ আতফ হয়েছে উহ্য ফে'ল مَضَاجِعِهِمْ مَا فَعَلَ -এর উপর। وَلِيُمَحِّصَ আতফ হয়েছে وَلِيَبْتَلِيَ -এর উপর। -[তাফসীরে কাবীর ও তাফসীরে হক্কানী]

অনুবাদ :

١٥٦. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَيِ الْمُنَافِقِيْنَ وَقَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ اَيْ فِيْ شَاْنِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا سَافَرُوْا فِي الْاَرْضِ فَمَاتُوْا اَوْ كَانُوْا غُزًّى جَمْعُ غَازٍ فَقُتِلُوْا لَوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا اَيْ لَا تَقُوْلُوْا كَقَوْلِهِمْ لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ الْقَوْلَ فِيْ عَاقِبَةِ اَمْرِهِمْ حَسْرَةً فِيْ قُلُوْبِهِمْ وَاللّٰهُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ فَلَا يَمْنَعُ عَنِ الْمَوْتِ قُعُوْدٌ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ بَصِيْرٌ فَيُجَازِيْكُمْ بِهٖ.

১৫৬. হে মু'মিনগণ! তোমরা তাদের ন্যায় হয়ো না যারা কাফের তথা মুনাফিক এবং যারা নিজেদের ভ্রাতাদের সম্পর্কে বলে- যখন তারা দেশ ভ্রমণে বের হয়। অতঃপর মারা যায় অথবা জিহাদে গমন করে এবং শহীদ হয়ে যায় [غَازٍ - غُزًّى -এর বহুবচন] যদি তারা আমাদের নিকট থাকত তবে তারা মারাও যেত না এবং নিহতও হতো না অর্থাৎ তোমরা তাদের কথার ন্যায় বলো না। তাদের জবানে এ কথাটি এ জন্য এসেছে যে তাদের শেষ পরিণতিতে যাতে আল্লাহ্ তা'আলা এ কথাটিকে তাদের অন্তরে আক্ষেপের কারণ বানিয়ে দেন। বস্তুত আল্লাহ্ পাকই জীবন ও মৃত্যুদান করেন। সুতরাং গৃহে বসে থাকা মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে পারে না। আর আল্লাহ্ তোমাদের ভিন্ন কেরাত মতে তাদের يَعْلَمُوْنَ শব্দটি تَا ও يَا -এর সাথে পড়া হয়েছে। যাবতীয় কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ করছেন সুতরাং এর প্রতিদান তিনি তোমাদের দিবেন।

١٥٧. وَلَئِنْ لَامُ قَسَمٍ قُتِلْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَيِ الْجِهَادِ اَوْ مُتُّمْ بِضَمِّ الْمِيْمِ وَكَسْرِهَا مِنْ مَاتَ يَمُوْتُ وَيَمَاتُ اَيْ اَتَاكُمُ الْمَوْتُ فِيْهِ لَمَغْفِرَةٌ كَائِنَةٌ مِّنَ اللّٰهِ لِذُنُوْبِكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّنْهُ لَكُمْ عَلٰى ذٰلِكَ وَاللَّامُ وَمَدْخُوْلُهَا جَوَابُ الْقَسَمِ وَهُوَ فِيْ مَوْضِعِ الْفِعْلِ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهٗ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ مِنَ الدُّنْيَا بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ.

১৫৭. আর যদি তোমরা আল্লাহর রাহে তথা জিহাদে শহীদ হও لَئِنْ -এর لَام বর্ণটি কসমের জন্য। অথবা সাধারণ মৃত্যুতে মারা যাও مُتُّمْ মীমের পেশ ও যেরের সাথে প্রথমটি مَاتَ - يَمُوْتُ نَصَرَ বাবে হতে আর দ্বিতীয়টি مَاتَ يَمَاتُ سَمِعَ বাবে হতে, অর্থাৎ আল্লাহর রাহে যদি তোমাদের মৃত্যু এসে যায় তবে তোমাদের পাপরাশির জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে ক্ষমা এবং দয়া লাভ হবে। এই ক্ষমা ও দয়া ঐ দুনিয়া থেকে উত্তম যা তোমরা ভিন্ন কেরাত মতে তারা সঞ্চয় কর বা করে لَمَغْفِرَةٌ -এর লাম ও তার মদখুল জওয়াবে কসম, তবে এটা ফে'লের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। মূল বাক্যের রূপ ছিল لَمَغْفِرَةٌ الخ - لَغُفِرَتْ لَكُمْ وَرَحْمَتُكُمْ মুবতাদা আর خَيْر الخ তার খবর।

١٥٨. وَلَئِنْ لَامُ قَسَمٍ مُتُّمْ بِالْوَجْهَيْنِ اَوْ قُتِلْتُمْ فِي الْجِهَادِ اَوْ غَيْرِهٖ لَاِلَى اللّٰهِ لَا اِلٰى غَيْرِهٖ تُحْشَرُوْنَ فِي الْاٰخِرَةِ فَيُجَازِيْكُمْ.

১৫৮. যদি তোমরা মৃত্যুবরণ কর لَئِنْ -এর লাম কসমের জন্য, আর مُتُّمْ পূর্বের ন্যায় দুই বাব থেকে আসবে অথবা তোমাদেরকে জিহাদে বা অন্য কোথাও নিহত করা হয় সর্বাবস্থায় আল্লাহর নিকটই তোমাদেরকে আখিরাতে একত্রিকরা হবে অন্য কারো দিকে নয়। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে প্রতিদান দিবেন।

অনুবাদ :

١٥٩. فَبِمَا مَا زَائِدَةٌ رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ يَا مُحَمَّدُ لَهُمْ اَىْ سَهَّلْتَ اَخْلَاقَكَ اِذْ خَالَفُوْكَ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا سَيِّئَ الْخُلُقِ غَلِيْظَ الْقَلْبِ جَافِيًا فَاَغْلَظْتَ لَهُمْ لَا انْفَضُّوْا تَفَرَّقُوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ تَجَاوَزْ عَنْهُمْ مَا اَتَوْهُ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ذُنُوْبَهُمْ حَتّٰى اَغْفِرَ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ اِسْتَخْرِجْ اٰرَاءَهُمْ فِى الْاَمْرِ اَىْ شَانِكَ مِنَ الْحَرْبِ وَغَيْرِهٖ تَطْيِيْبًا لِقُلُوْبِهِمْ وَلِيَسْتَنَّ بِكَ وَكَانَ ﷺ كَثِيْرَ الْمُشَاوَرَةِ لَهُمْ فَاِذَا عَزَمْتَ عَلٰى اِمْضَاءِ مَا تُرِيْدُ بَعْدَ الْمُشَاوَرَةِ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ـ ثِقْ بِهٖ لَا بِالْمُشَاوَرَةِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ عَلَيْهِ ـ

১৫৯. হে রাসূল ﷺ! আল্লাহ তা'আলার রহমতে আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন আপনার চরিত্র কোমল হয় যখন তারা আপনার বিরোধিতা করে فَبِمَا-এর مَا টি অতিরিক্ত। যদি আপনি কর্কশভাষী ও কঠিন হৃদয় হতেন, তবে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। অতএব আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন মার্জনা করুন তাদের কৃত অপরাধের এবং তাদের জন্য তাদের গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করুন যাতে করে আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দেই। আর যুদ্ধ প্রভৃতি বিষয়ে তাদের মনের সন্তুষ্টির জন্য তাদের সাথে পরামর্শ করুন আর এ ব্যাপারে আপনার থেকে তরীকাও জারি হয়ে যাবে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদের সাথে অধিক পরামর্শকারী ছিলেন। অতঃপর আপনি পরামর্শের পর আপনার ইচ্ছা বাস্তাবায়নের উপর সংকল্প করলে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভরসা করুন পরামর্শের প্রতি নয়। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি ভরসাকারীদেরকে ভালোবাসেন।

١٦٠. اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ يُعِنْكُمْ عَلٰى عَدُوِّكُمْ كَيَوْمِ بَدْرٍ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ يَتْرُكْ نَصْرَكُمْ كَيَوْمِ اُحُدٍ فَمَنْ ذَا الَّذِىْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهٖ اَىْ بَعْدَ خِذْلَانِهٖ اَىْ لَا نَاصِرَ لَكُمْ وَعَلَى اللّٰهِ لَا غَيْرِهٖ فَلْيَتَوَكَّلِ لِيَثِقِ الْمُؤْمِنُوْنَ ـ

১৬০. যদি আল্লাহ তা'আলা বদর দিবসের ন্যায় তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করেন তবে তোমাদের উপর কেউ বিজয়ী হতে পারবে না। আর যদি আল্লাহ তা'আলাই তোমাদেরকে সাহায্য না করেন ওহুদ দিবসের ন্যায়, তবে তাঁর পর তথা তাঁর সাহায্য বর্জনের পর কে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? কেউই সাহায্যকারী হবে না তোমাদের জন্য আর মু'মিনদের আল্লাহর প্রতিই ভরসা করা উচিত, অন্য কারো প্রতি নয়।

١٦١. وَنَزَلَ لَمَّا فُقِدَتْ قَطِيْفَةٌ حَمْرَاءُ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَعَلَّ النَّبِىَّ ﷺ اَخَذَهَا وَمَا كَانَ يَنْبَغِىْ لِنَبِىٍّ اَنْ يَّغُلَّ يَخُوْنَ فِى الْغَنِيْمَةِ فَلَا تَظُنُّوْا بِهٖ ذٰلِكَ

১৬১. আর বদরের দিন যখন একটি লাল চাদর হারিয়ে যায় তখন কিছু লোক বলল, হয়তো নবী করীম ﷺ নিয়ে নিছেন। এ কথার প্রেক্ষিতে সামনের আয়াতটি নাজিল হয়েছে। আর কোনো নবীর জন্য এটা সমীচীন নয় যে, তিনি গনিমতের মালে খেয়ানত করবেন। সুতরাং তাঁর প্রতি খেয়ানতের ধারণা পোষণ করো না,

وَفِى قِرَاءَةٍ بِالْبِنَا لِلْمَفْعُوْلِ اَىْ يُنْسَبُ اِلَى الْغُلُوْلِ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حَامِلًا لَهٗ عَلٰى عُنُقِهٖ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ اَلْغَالِ وَغَيْرِهٖ جَزَاءَ مَا كَسَبَتْ عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا .

ভিন্ন এক কেরাতে يُغَلَّ ক্রিয়াটি মাজহুল এসেছে অর্থাৎ খেয়ানতের দিকে নবীকে সম্পৃক্ত করা সমীচীন নয়। অথচ যে খেয়ানত করবে সে খেয়ানতকৃত বস্তু নিয়ে কেয়ামতের দিন হাজির হবে, তার গর্দান বহন করে। অতঃপর প্রত্যেকই খেয়ানতকারী এবং যে করেনি সবাই নিজের কৃতকর্মের প্রতিদান পরিপূর্ণ রূপে পাবে। আর তাদের প্রতি সামান্যতমও জুলুম করা হবে না।

١٦٢. اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّٰهِ فَاطَاعَ وَلَمْ يَغُلَّ كَمَنْ بَاءَ رَجَعَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ بِمَعْصِيَّتِهٖ وَغُلُوْلِهٖ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ الْمَرْجِعُ هِىَ لَا .

১৬২. যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুগত অর্থাৎ তাঁর আনুগত্য করেছে খেয়ানত করেনি, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান হতে পারে যে আল্লাহর গজব অর্জন করেছে? তাঁর নাফরমানী ও খেয়ানতের কারণে? বস্তুত তার ঠিকানা হলো দোজখ। আর তা কতইনা নিকৃষ্টতম প্রত্যাবর্তনস্থল। না, তারা উভয়ে সমান হতে পারে না।

١٦٣. هُمْ دَرَجٰتٌ اَىْ اَصْحَابُ دَرَجٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ اَىْ مُخْتَلِفُوا الْمَنَازِلِ فَلِمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ الثَّوَابُ وَلِمَنْ بَاءَ بِسَخَطِهِ الْعِقَابُ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ فَيُجَازِيْهِمْ بِهٖ .

১৬৩. তাঁরা লোকেরা বিভিন্ন স্তর তথা বিভিন্ন স্তরের রয়েছে আল্লাহর নিকট তথা তাঁর নিকট লোকদের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁর সন্তুষ্টির তাবেদার হবে তার জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান আর যে ব্যক্তি তাঁর ক্রোধ নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছে সে শাস্তির উপযুক্ত হবে। আর আল্লাহর তা'আলা তাদের যাবতীয় কার্যাবলি লক্ষ্য করেছেন, সুতরাং তিনি তাদেরকে এর প্রতিদান দেবেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ فِىْ شَاْنِهِمْ এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, لَام এখানে فِىْ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। قَوْلُهٗ فِىْ عَاقِبَةِ اَمْرِهِمْ এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে لِيَجْعَلَ-এর মধ্যে لَام টি আকিবত বা পরণতি বুঝাবার জন্য এসেছে। قَوْلُهٗ وَهُوَ فِىْ مَوْضِعِ الْفِعْلِ-এর প্রত্যাবর্তন স্থল হলো لَمَغْفِرَةٌ ; ইবারতের স্বরূপ হবে وَاللّٰهِ لَئِنْ قُتِلْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَيُغْفَرَتْ لَكُمْ وَرَحْمَتُكُمْ এখানে জওয়াবে শর্ত উহ্য রয়েছে, কেননা প্রসিদ্ধ একটি কায়দা আছে যে, কসম আর শর্ত যখন একত্রিত হয়ে যায় তখন পূর্বোক্ত যা হয় তার জওয়াব উল্লিখিত হয় আর পরে উল্লিখিত বিষয়টির জওয়াব উহ্য থাকে। এই কায়দার প্রেক্ষিতে لَمَغْفِرَةٌ الخ জওয়াবে কসম হবে আর জওয়াবে শর্ত উহ্য রয়েছে যার উপর জওয়াবে কসম প্রমাণ বহন করছে। গ্রন্থকারের وَهُوَ فِىْ مَوْضِعِ الْفِعْلِ বলা দ্বারা বুঝা যাচ্ছে তার দৃষ্টিতে জওয়াবে কসম হতে হলে ফে'ল হওয়া জরুরি, অথচ ইসিম ও ফে'ল উভয়টাই জওয়াবে কসম হতে পারে। قَوْلُهٗ وَقَدْ قَعَدُوْا . قَعَدُوْا . قَالُوْا-এর যমীর থেকে হাল হয়েছে। আর মাজী قَد ব্যতীত حَال হতে পারে না, তাই গ্রন্থকার قَد উহ্য মেনে নিয়েছেন। اَلضَّرْبُ فِى الْاَرْضِ অর্থ- দূরবর্তী সফর غُزًّى খেলাফে কিয়াস غَازٍ আসার কথা ছিল। যেমন رَام এর জমা আসে رُمَاةٌ। غَلَّ . يَغُلُّ . غُلُوْلًا অর্থ- গনিমতের সম্পদে মধ্যে খেয়ানত করা। আর غَلَّ অর্থ, বিদ্বেষ। -[জামালাইন খ. ১, পৃ. ৫৬০ -৬১]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا الخ : আলোচ্য আয়াতে মু'মিনদেরকে ভ্রান্ত একটি আকিদা থেকে বিরত রাখা হচ্ছে, যে আকিদা পোষণকারী ছিল কাফের মুনাফিকরা। মুনাফিকরা বলত মু'মিনদের দুঃখ বৃদ্ধির লক্ষ্যে যে, তারা যদি ওহুদ যুদ্ধে না যেত এবং আমাদের ন্যায় ঘরে বসে থাকত তবে তারা নিহত হতো না। আল্লাহ পাক মু'মিনদেরকে সতর্ক করে বলতেছেন, তোমরা তাদের ন্যায় হয়ো না। কেননা হায়াত ও মউত, জীবন ও মৃত্যু একমাত্র আল্লাহর হাতে। এর জন্য সুনির্দিষ্ট সময় রয়েছে এর পূর্বে কেউ মারতে পারবে না এবং মরতেও পারবে না। আর মৃত্যুর নির্ধারিত সময় এসে গেলে কেউ

কাউকে বাঁচাতেও পারবে না। কিন্তু যাদের ভেতরে ঈমান নেই তারা সব কিছুকে নিজেদের তদবীর প্রচেষ্টার উপর নির্ভরশীল মনে করে। তাদের জন্য এ ধরনের যুক্তি প্রবণতা আফসোস ও পরিতাপের কারণ হয়ে থাকে। তারা আক্ষেপের কণ্ঠে বলে হায়! যদি এ রকম হতো তবে তা হতো আর যদি এ রকম না হতো তবে তা হতো না।

قَوْلُهُ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ الخ : মৃত্যু তো আসবেই। তবে যে মৃত্যুর পর মানুষ আল্লাহর রহমত ও মাগফেরাতের উপযুক্ত হয় সেই মৃত্যু দুনিয়ার সম্পদ ও আসবাবপত্র থেকে শতগুণে ভালো যা সংগ্রহণ করার জন্য তারা জীবন কুরবান করে থাকে। তাই আল্লাহর রাহে জিহাদ করা থেকে পিছপা হয়ে থাকা ঠিক নয়। বরং উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে জিহাদে আত্ম নিয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। তাতে আল্লহর রহমত ও মাগফেরাত লাভ নিশ্চিত হয়ে যাবে। তবে শর্ত হলো ইখলাসের সাথে হতে হবে।
–[জামালাইন খ. ১, পৃ. ৫৬২]

قَوْلُهُ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ الخ : নবী করীম ﷺ ছিলেন উত্তম চরিত্রের মূর্তপ্রতীক। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক তাঁর নবীর প্রতি একটি বড় ইহসানের কথা উল্লেখ করছেন যে, হুজুর ﷺ-এর মধ্যে যে কোমলতা রয়েছে তা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের ফলশ্রুতিতে। আর এই কোমলতাটা দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য একান্ত আবশ্যক। যদি তার মধ্যে এ গুণ না থাকত বরং এর বিপরীত তিনি শক্ত হৃদয়, রূঢ় স্বভাবের হতেন তবে লোকেরা তাঁর কাছে আসার পরিবর্তে তাঁর থেকে দূরে থাকত; সুতরাং আপনি ক্ষমা ও উদারতার মাধ্যমে কাজ করতে থাকুন।

قَوْلُهُ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ : অর্থাৎ মুসলমানদের মনতুষ্টি ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে তাদের সাথে পরামর্শ করে নিবেন। এই আয়াত দ্বারা পরামর্শের গুরুত্ব উপকার প্রয়োজনীয়তা ও শরিয়ত সিদ্ধতার কথা প্রমাণিত হচ্ছে। পরামর্শের এই হুকুমটা ওয়াজিব, কারো মতে মোস্তাহাব।

রাষ্ট্রের প্রধান ও শাসকবর্গের জন্য প্রয়োজন ঐ সব বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া, যে সব বিষয়ে তাদের জ্ঞান নেই। অথবা যে বিষয়ে তাদের অস্পষ্টতা রয়েছে। সৈন্য দলের প্রধান হলো তার সাথে ফৌজি বিষয় সম্পর্কে নেতৃবৃন্দের সাথে জনগণের ব্যাপারে এবং অধীনস্ত গভর্নর ও প্রাদেশিক আমিরদের সাথে তাদের এলাকায় প্রয়োজনাদি সম্পর্কে পরামর্শ করার প্রয়োজন।

ইবনে আতিয়া বলেন, এ রকম শাসকদের পদচ্যুতি ঘটানোর ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই, যারা জ্ঞানীদের কাছ থেকে পরামর্শ করে না। এসব পরামর্শ শুধু ঐ সকল ব্যাপারেই সীমিত থাকবে যার সম্বন্ধে শরিয়ত নীরব, অথবা সেসব বিষয় দেশ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের সাথে সম্পৃক্ত।

قَوْلُهُ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ : অর্থাৎ পরামর্শের পর যেদিকে আমার রায় দৃঢ় হয়ে যাবে আল্লাহর উপর ভরসা করে তা করে নিবেন। এতে একথাও বুঝা যাচ্ছে যে, পরামর্শ গ্রহণের পরও শেষ সিদ্ধান্ত সরকার প্রধানেরই থাকবে পরামর্শদাতাদের নয় এবং তাদের সংখ্যা গরিষ্ঠদেরও নয় যেরূপ প্রচলিত গণতন্ত্রের রয়েছে। আরেকটি কথা এও বুঝা যাচ্ছে পরিপূর্ণ ভরসা ও তাওয়াক্কুল আল্লাহর সত্তার উপর হতে হবে উপদেষ্টা বা পরামর্শদাতার জ্ঞান-বুদ্ধির উপর নয়। সামনের আয়াতে আল্লাহর উপর ভরসার জন্য অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ . (الاية) : ওহুদ যুদ্ধে যে সব লোকেরা রক্ষাব্যূহ ছেড়ে গনিমতের মাল আহরণের জন্য দৌড়ে এসেছিলেন। তাদের ধারণা ছিল যে, আমরা যদি না যাই তাহলে সমস্ত মাল অন্যরা নিয়ে যাবে। এর উপর সতর্ক করা হচ্ছে যে, তোমরা এরূপ ধারণা কেমন করে পোষণ করছ যে, তোমাদের অংশ তোমাদেরকে দেওয়া হবে না? তোমাদের নেতা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর কি তোমাদের পূর্ণ আত্মবিশ্বাস নেই? স্মরণ রাখ! একজন পয়গাম্বর হতে খেয়ানত প্রকাশ হওয়া সম্ভব নয়। কারণ খেয়ানত ও নবুয়ত পরস্পরে সাংঘর্ষিক বিষয়। নবীই যদি খেয়ানত করেন তবে তাঁর নবুয়তের উপর কিরূপে ইয়াকীন করা যাবে? খেয়ানত মস্ত বড় অপরাধ। হাদীস শরীফ এর তীব্র নিন্দা এসেছে।

যে সকল তীরন্দাজদেরকে পাহাড়ী রাস্তা হেফাজতের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারা মনে করল দুশমনের দলের পরিত্যক্ত মালামাল সংগ্রহ করা হচ্ছে তাই আমরা বঞ্চিত থাকবো কেন? এ কথা ভেবে তারা নিজের স্থান ছেড়ে গনিমতের মাল সংগ্রহনের জন্য চলে এসেছিল।

যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর যখন নবী করীম ﷺ মদিনার ফেরত আসলেন তখন তাদেরকে ডেকে এনে নির্দেশ অমান্য করার হেতু জিজ্ঞাসা করলেন। তারা কিছু ওজর পেশ করেছে যেগুলো দুর্বল হওয়ার কারণে গ্রহণ করার মতো ছিল না। এর উপর হুজুর ﷺ বললেন- بَلْ ظَنَنْتُمْ اَنَا نَغُلُّ وَلَا نَقْسِمُ لَكُمْ আসল কথা হলো এই যে, আমাদের উপর তোমাদের পূর্ণ আত্মবিশ্বাস ছিল না। তোমরা ধারণা করেছ, আমরা তোমাদের প্রতি খেয়ানত করবো। তোমাদের অংশ তোমাদেরকে দেবো না। আলোচ্য আয়াতটিতে এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আবূ দাঊদ, তিরমিযী, ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ الخ আয়াতটি একটি লাল বর্ণের চাদর সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, যা বদরের দিন হারিয়ে গিয়েছিল। কিছু লোকেরা এ কথা বলেছিল যে, সম্ভবত রাসূল ﷺ নিয়ে গেছেন (نَعُوْذُ بِاللّٰهِ) -এর উপর আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়।

অনুবাদ :

١٦٤. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ اَىْ عَرَبِيًّا مِثْلَهُمْ لِيَفْهَمُوْا عَنْهُ وَيَشْرُفُوْا بِهٖ لَا مَلَكًا وَلَا عَجَمِيًّا يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ اَلْقُرْاٰنِ وَيُزَكِّيْهِمْ يُطَهِّرُهُمْ مِّنَ الذُّنُوْبِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ الْقُرْاٰنَ وَالْحِكْمَةَ السُّنَّةَ وَاِنْ مُخَفَّفَةٌ اَىْ اَنَّهُمْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ اَىْ قَبْلَ بَعْثِهٖ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ بَيِّنٍ .

১৬৪. নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের মধ্য থেকেই তাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন। অর্থাৎ তাদের ন্যায় তিনিও আরবি ভাষা ভাষী, যাতে তাঁর কথা তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে এবং তাঁর দ্বারা গৌরবান্বিত হতে পারে, তাকে ফেরেশতা এবং অনারবি করে প্রেরণ করা হয়নি। যিনি তাদের নিকট তাঁর কুরআনের আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তাদেরকে পাক করেন পবিত্র করেন পাপরাশি থেকে এবং তাদের কিতাব তথা কুরআন ও হেকমত তথা সুন্নত শিক্ষা দান করেন। বস্তুত তারা ছিল পূর্ব থেকেই স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে। وَاِنْ كَانُوْا-এর মধ্যে اِنْ-এর সহজরূপ মূলত - اَنَّهُمْ كَانُوْا - اِنْ ছিল।

١٦٥. اَوَلَمَّآ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ بِاُحُدٍ بِقَتْلِ سَبْعِيْنَ مِنْكُمْ قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا بِبَدْرٍ بِقَتْلِ سَبْعِيْنَ وَاَسْرِ سَبْعِيْنَ مِنْهُمْ قُلْتُمْ مُتَعَجِّبِيْنَ اَنّٰى مِنْ اَيْنَ لَنَا هٰذَا الْخُذْلَانُ وَنَحْنُ مُسْلِمُوْنَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ فِيْنَا وَالْجُمْلَةُ الْاَخِيْرَةُ فِىْ مَحَلِّ الْاِسْتِفْهَامِ الْاِنْكَارِىِّ قُلْ لَهُمْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ لِاَنَّكُمْ تَرَكْتُمُ الْمَرْكَزَ فَخُذِلْتُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ وَمِنْهُ النَّصْرُ وَمَنْعُهُ وَقَدْ جَازَاكُمْ بِخِلَافِكُمْ .

১৬৫. আর যখন তোমাদের উপর একটি স্পষ্ট মসিবত এসে পৌছল ওহুদে তোমাদের সত্তর জন শহীদ হওয়ার কারণে অথচ তোমরা তার পূর্বেই দ্বিগুণ মসিবত পৌছে দিয়েছে বদরে তাদের সত্তরজনকে নিহত করে ও সত্তরজনকে বন্দী করে। তখন তোমরা বিস্ময় প্রকাশ করে বললে, এ পরাজয় কোথা থেকে আসল? অথচ আমরা মুসলমান এবং আল্লাহর রাসূল আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। পরবর্তী বাক্যটি ইস্তেফহামে এনকারীর মহল। আপনি বলে দিন, তাদেরকে এই পরাজয় তোমাদের নিজেদের তরফ থেকেই এসেছে। কারণ তোমরা তোমাদের নির্দিষ্ট স্থান পরিত্যাগ করেছ, যার ফলে তোমাদের পরাজয় এসেছে। নিশ্চয় আল্লাহ পাক সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। আর তাঁর থেকেই সাহায্য পাওয়া ও না পাওয়া বর্জন। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের রাসূলের নির্দেশ অমান্য করার প্রতিদান দিয়েছেন।

١٦٦. وَمَآ اَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ بِاُحُدٍ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ بِاِرَادَتِهٖ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ عِلْمَ ظُهُوْرٍ الْمُؤْمِنِيْنَ حَقًّا .

১৬৬. আর যেদিন দু'দল পরস্পরে সম্মুখীন হয়েছিল ওহুদে সেদিন তোমাদের উপর যে বিপদ এসেছিল তা আল্লাহ তা'আলা হুকুম তথা ইচ্ছায়ই হয়েছিল এবং তা এজন্য হয়েছে যাতে প্রকৃত মু'মিনদেরকে আল্লাহ বাহ্যিকভাবেও জেনে নেন।

অনুবাদ :

١٦٧. وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا وَالَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ لَمَّا انْصَرَفُوْا عَنِ الْقِتَالِ وَهُمْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَيٍّ وَاَصْحَابُهٗ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَعْدَاءَهٗ اَوِ ادْفَعُوْا عَنَّا الْقَوْمَ بِتَكْثِيْرِ سَوَادِكُمْ اِنْ لَّمْ تُقَاتِلُوْا قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ نُحْسِنُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنٰكُمْ قَالَ تَعَالٰى تَكْذِيْبًا لَهُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ بِمَا اَظْهَرُوْا مِنْ خُذْلَانِهِمُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَكَانُوْا قَبْلُ اَقْرَبَ اِلَى الْاِيْمَانِ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرِ يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ وَلَوْ عَلِمُوْا قِتَالًا لَمْ يَتَّبِعُوْكُمْ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ مِنَ النِّفَاقِ .

১৬৭. এবং যাতে জেনে নেন তাদেরকে যারা মুনাফিক ছিল। আর তাদেরকে মুনাফিকদেরকে বলা হলো, যখন তারা যুদ্ধ থেকে ফেরত এসে গেল আর তারা হলো আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার সাথিরা, তোমরা চলে এসো, আল্লাহর রাহে জিহাদ কর তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে অথবা আমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে কাফের সম্প্রদায়কে আমাদের থেকে প্রতিহত কর যদি তোমরা জিহাদ না কর, তখন মুনাফিকরা বলল, যদি আমরা একে কোনো যুদ্ধ জানতাম তথা উপলব্ধি করতাম, তবে অবশ্যই আমরা তোমাদের অনুসরণ করতাম আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মিথ্যায়িত করে বলেন, এই মুনাফিকরা এদিন ঈমানের তুলনায় কুফরের নিকটবর্তী হয়েছিল অনেক বেশি কারণ তারা মু'মিনদের নিকট নিজেদের কাপুরুষতা প্রকাশ করে দিয়েছে, ইতঃপূর্বে তারা বাহ্যিকভাবে ঈমানের নিকটবর্তী ছিল অধিক। তাঁরা মুখে এসব কথা বলে, যা তাদের অন্তরে নেই, যদি তারা একে যুদ্ধ জানত তবুও তারা তোমাদের সঙ্গে আসত না এবং আল্লাহ তা'আলা খুব ভালোভাবেই জানেন যা তারা অন্তরে গোপন রাখে। নেফাককে

١٦٨. اَلَّذِيْنَ بَدَلٌ مِنَ الَّذِيْنَ قَبْلَهٗ اَوْ نَعْتٌ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ فِي الدِّيْنِ وَقَدْ قَعَدُوْا عَنِ الْجِهَادِ لَوْ اَطَاعُوْنَا اَيْ شُهَدَاءُ اُحُدٍ وَاِخْوَانُنَا فِي الْقُعُوْدِ مَا قُتِلُوْا قُلْ لَهُمْ فَادْرَءُوْا اِدْفَعُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ فِيْ اَنَّ الْقُعُوْدَ يُنَجِّيْ مِنْهُ .

১৬৮. যারা [মুনাফিকরা] দ্বিতীয় اَلَّذِيْنَ প্রথম اَلَّذِيْنَ থেকে তারকীবে বদল হয়েছে অথবা সিফত হয়েছে। তাদের দীনি ভাইদেরকে বলে অথচ তারা নিজেরাও জিহাদ করা থেকে বসে রয়েছে যদি তারা আমাদের কথা মানত বসে থাকার ক্ষেত্রে ওহুদের শহীদগণ বা আমাদের ভাইয়েরা তবে তারা নিহত হতো না। [হে রাসূল ﷺ] আপনি তাদেরকে বলে দিন, তোমরা নিজেদের মৃত্যুকে দূরীভূত কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও একথার মধ্যে যে, যুদ্ধ থেকে বসে থাকায় মুক্তি দান করে মৃত্যু থেকে।

١٦٩. وَنَزَلَ فِي الشُّهَدَاءِ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَيْ لِاَجْلِ دِيْنِهٖ اَمْوَاتًا بَلْ هُمْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ اَرْوَاحُهُمْ فِيْ حَوَاصِلِ طُيُوْرٍ خُضْرٍ تَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ كَمَا وَرَدَ فِيْ حَدِيْثٍ يُرْزَقُوْنَ يَاْكُلُوْنَ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ .

১৬৯. সামনের আয়াতটি ওহুদের শহীদগণের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আর যারা আল্লাহর রাহে তার দীনের জন্য মৃত্যুবরণ করেছে তাদেরকে তুমি মৃত মনে করো না। قُتِلُوْا ও قُتِّلُوْا উভয় রকম কেরাত রয়েছে; বরং তারা নিজেদের প্রতিপালকের নিকট জীবিত শহীদগণের রূহসমূহ সবুজ পাখির পেটে থেকে বেহেশতের যেথায় ইচ্ছা বিচরণ করছে, যেরূপ হাদীস শরীফে এসেছে। তাঁরা পানাহাররত বেহেশতের ফল দ্বারা।

১৭০. فَرِحِيْنَ حَالٌ مِنْ ضَمِيْرِ يُرْزَقُوْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ يَفْرَحُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ مِنْ اِخْوَانِهِمُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَيُبْدَلُ مِنَ الَّذِيْنَ اَنْ اَىْ بِاَنْ لَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ اَىِ الَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ فِى الْاٰخِرَةِ اَلْمَعْنٰى يَفْرَحُوْنَ بِاَمْنِهِمْ وَفَرَحِهِمْ ـ

১৭১. يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ ثَوَابٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ زِيَادَةٍ عَلَيْهِ وَّاَنَّ بِالْفَتْحِ عَطْفًا عَلٰى نِعْمَةٍ وَالْكَسْرِ اِسْتِئْنَافًا اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بَلْ يَاْجُرُهُمْ ـ

অনুবাদ :

১৭০. আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তার প্রেক্ষিতে তাঁরা আনন্দিত। فَرِحِيْنَ শব্দটি يُرْزَقُوْنَ -এর যমীর থেকে তারকীবে হাল হয়েছে। আর তারা সেসব লোকদের কারণেও আনন্দিত যারা তাদের পশ্চাতে রয়েছে, এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি অর্থাৎ তাদের মু'মিন ভাইদের কারণে। اَنْ لَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ - اَلَّذِيْنَ থেকে তারকীবে বদল হয়েছে। তার কারণ, না সেজন্য তাদের উপর কোনো ভয়ভীতি আছে যারা তাদের সাথে মিলিত হয়নি এবং না তারা চিন্তিত হবে আখিরাতে। আয়াতের মর্ম হলো এই যে, তারা তাদের ভাইদের শান্তি ও আনন্দে আনন্দিত।

১৭১. তাঁরা আনন্দ প্রকাশ করে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত তথা ছওয়াব ও অনুগ্রহের কারণে আর তা এই জন্য যে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না; বরং তাদেরকে প্রতিদান প্রদান করেন। اَنَّ اللّٰهَ -এর اَنَّ যবরযুক্ত হলে نِعْمَةٍ -এর উপর আতফ হবে। আর যেরযুক্ত হলে নতুন বাক্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ (الاية) : এ আয়াতটিকে নবীজী ﷺ মানুষ হওয়াটাকেই আল্লাহ পাকের একটি বিশেষ অনুগ্রহ হিসেবে বর্ণনা করছেন। আর বাস্তবে এ অনুগ্রহটি অবশ্যই বড়। কারণ এতে করে তিনি স্বজাতির ভাষায়ই আল্লাহর পয়গাম পৌঁছাতে পারছেন, যা হৃদয়ঙ্গম করা সবার জন্য সহজ হবে। দ্বিতীয়ত একই সম্প্রদায়ের হওয়ার কারণে তাঁর প্রতি ধাবিত হবে এবং তাঁর কাছে যাবে। তৃতীয় মানুষের জন্য মানুষের অনুকরণ করাতো সম্ভব কিন্তু মানুষের জন্য ফেরেশতার অনুসরণ করা অসাধ্য ব্যাপার। এছাড়া ফেরেশতা মানুষের আবেগ অনুভূতির গভীরতা ও সূক্ষ্মতা ও বুঝতে পারে না। সুতরাং পয়গাম্বর যদি ফেরেশতাদের থেকে হতো তবে এসব সৌন্দর্যতা থেকে বঞ্চিত থাকতো যা ধর্মের প্রচার ও দাওয়াতের জন্য জরুরি। এই জন্যই পয়গাম্বর যারাই এসেছেন সকলই মানুষই ছিলেন। কুরআনে পাক তাদের মানুষ হওয়ার বিষয়টাকে সুস্পষ্ট রূপে বর্ণনা করেছেন।

قَوْلُهٗ اَوَلَمَّاۤ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ (الاية) : বুজুর্গ সাহাবাগণ তো বাস্তবদর্শী ছিলেন। তাঁরা তো কোনো ভুল বুঝাবুঝির শিকার ছিলেন না; কিন্তু সাধারণ মুসলমানগণ এ কথা বুঝতে ছিলেন যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ যখন আমাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছেন এবং আল্লাহর সাহায্য আমাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। তাই কোনো অবস্থাতেই কাফেররা আমাদের উপর বিজয় লাভ করতে পারে না। এই জন্য ওহুদে যখন সাময়িক পরাজয় হলো তখন তাদের মনে বড় কষ্ট পৌঁছল। তাঁরা পেরেশান হয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগল। এটা কি হলো? আমরা আল্লাহর দীনের জন্য যুদ্ধ করতে গিয়েছিলাম। আর পরাজয়টাও ওদের তরফ থেকে যারা দীনকে মিটাতে এসেছিল। আলোচ্য আয়াতটি তাদের ঐ পেরেশানিকে দূরীভূত করার জন্যই নাজিল করা হয়েছে।

ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের সত্তর জন্য শহীদ হয়েছেন। পক্ষান্তরে বদর যুদ্ধে কাফেরদের সত্তর জন মুসলমানদের হাতে নিহত হয়েছে আর সত্তর জনকে গ্রেফতার করে আনা হয়েছিল।

قَوْلُهُ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ : অর্থাৎ এই সাময়িক পরাজয় ও সত্তর জনের শাহাদাত তোমাদের ঐ ভুলের কারণে হয়েছে যা তোমরা রাসূল ﷺ-এর তাকিদপূর্ণ নির্দেশের পরও রক্ষাব্যূহ থেকে চলে এসেছিলে।

قَوْلُهُ وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا (الاية) : আর এই পরাজয়ের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এটাও ছিল যে, এর মাধ্যমে মু'মিন ও মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে যাবে।

আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই যখন তিনশত মুনাফিক সঙ্গে নিয়ে রাস্তা থেকেই ফেরত আসতে লাগল, তখন কিছু সংখ্যক মুসলমান গিয়ে তাকে বুঝাবার চেষ্টা করল এবং সাথে যুদ্ধে চলার জন্য রাজি করতে চাইল; কিন্তু সে জবাব দিল যে, আমাদের বিশ্বাস আছে এটা কোনো যুদ্ধ নয়; বরং ধ্বংস ও আত্মহত্যা। যদি তামাশার যুদ্ধও হতো তবে আমরা অবশ্যই সঙ্গে চলতাম। এ রকম ভুল কাজে আমরা আপনাদের সাথি কেন হবো? আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার সাথিরা এ কথা এ জন্য বলেছিল যে, মদিনার ভেতরে থেকে যুদ্ধ করার তাদের প্রস্তাব মানা হয়েছিল না। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফিক তার সাথিরা এ কথা ঐ সময় বলল, যখন তারা শওক নামক স্থানে পৌঁছে ফেরত আসছিল। আর আব্দুল্লাহ ইবনে হারাম আনসারী বুঝিয়ে তাদেরকে ফেরত আনার চেষ্টা করছিলেন।

قَوْلُهُ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (الاية) : এই আয়াতে শহীদগণের বিশেষ ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে। বিশুদ্ধ হাদীসসমূহে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। এখানে শহীদগণের প্রথম ফজিলত তো এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা মৃত নন, বরং তারা চিরস্থায়ী জীবনের অধিকারী হয়ে গেছেন।

শহীদগণের বাহ্যিকভাবে মৃত্যুবরণ করা, সমাধিতে দাফন হওয়া তো প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে, এরপরও কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে তাদেরকে মৃত বলতে এবং মৃত মনে করতে যে নিষেধ এসেছে তার মর্ম কি?

এর জবাবে যদি বলা হয়, বরজখী জীবন উদ্দেশ্য, তবে তাতো প্রত্যেক মু'মিন–কাফেরেরই লাভ হয়ে থাকে। মৃত্যুর পর তাদের রূহ জীবিত থাকে, আর কবরের প্রশ্নোত্তরের পর নেককার মু'মিনদের জন্য শান্তির ব্যবস্থা এবং কাফের ও ফাজেরদের জন্য কবরের আজাবের কথা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। সুতরাং এই বরজখী জীবন যেহেতু সবাইকে শামিল রাখে তাহলে শহীদগণের এক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য রইল কেমন করে?

জবাব হলো এই যে, কুরআনে কারীমের এই আয়াত একথা বলে দিয়েছে যে, শহীদগণ আল্লাহর তরফ থেকে জান্নাতের রিজিক প্রাপ্ত হন।

আর এক বিশেষ ধরনের জীবন তাদের লাভ হয় যা সাধারণ মৃতদের থেকে ভিন্ন হয়। এখন রয়ে গেল এ কথা যে, সেই ভিন্নতা ও স্বতন্ত্রটা কি এবং ঐ জীবনটার ধরণ কি? এর হাকীকত বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কেউ না জানতে পারে এবং না জানার কোনো প্রয়োজন আছে। তবে কোনো কোনো সময় তাদের জীবনের বিশেষ আলামত দুনিয়াতেও তাদের দেহে প্রকাশিত হয়ে যায়। অর্থাৎ জমিন তাদের দেহকে ভক্ষণ করে না, যার বহু ঘটনাবলি প্রত্যক্ষ করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে আবূ দাউদের বর্ণনা মতে আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল হলো এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, ওহুদে যখন তোমাদের ভাইয়েরা শহীদ হলো তখন আল্লাহ তাদের রূহসমূহকে সবুজ পাখীদের দেহে রেখে স্বাধীন করে দিয়েছেন। তারা জান্নাতে নহর ও বাগানের ফলমূলসমূহ থেকে তাদের রিজিক গ্রহণ করছে। অতঃপর তাদের ফানূস রূপী নীড়ে চলে আসে যা তাদের জন্য আরশের নীচে ঝুলন্ত করে রাখা হয়েছে। যখন তারা তাদের সুখ–শান্তির জীবন দেখল, তখন তারা বলতে লাগল- কেউ আছ কি? যে আমাদের অবস্থার সংবাদ আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের নিকট পৌঁছাতে পারবে? যারা আমাদের শহীদ হয়ে যাওয়ায় দুনিয়াতে শোকাহত রয়েছে। তাহলে তারা আর শোক চিন্তা করবে না, আর তারাও জিহাদ করার জন্য সচেষ্ট হবে। আল্লাহ পাক বললেন, আমি তোমাদের এ সংবাদ পৌঁছিয়ে দিয়েছি। এর উপর وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ الخ আয়াতটি নাজিল হয়।

–[জামালাইন খ. ১, পৃ. ৫৬২–৬৫, মা'আরিফুল কুরআন খ. ২, পৃ. ২৫৪–৫৫]

অনুবাদ :

١٧٢. اَلَّذِيْنَ مُبْتَدأُ اِسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ دُعَاءَهُ بِالْخُرُوْجِ لِلْقِتَالِ لَمَّا اَرَادَ اَبُوْ سُفْيَانَ وَاَصْحَابُهُ الْعَوْدَ وَتَوَاعَدُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سُوْقَ بَدْرِ الْعَامِ الْمُقْبِلِ مِنْ يَوْمِ اُحُدٍ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ بِاُحُدٍ وَخَبَرُ الْمُبْتَدَأِ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا مِنْهُمْ بِطَاعَتِهِ وَاتَّقَوْا مُخَالَفَتَهُ اَجْرٌ عَظِيْمٌ هُوَ الْجَنَّةُ ـ

১৭২. যারা ওহুদে আহত হয়ে পড়ার পরও আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। অর্থাৎ তাঁর আহ্বানে আবার যুদ্ধের জন্য বের হতে সাড়া দিয়েছে, যখন আবূ সুফিয়ান ও তার সাথিরা আবার ফেরত আসতে চাইল এবং ওহুদের পরের বৎসর বদর নামক স্থানের বাজারে যুদ্ধ করার জন্য নবীর সাথে চ্যালেঞ্জ করল। اَلَّذِيْنَ মুবতাদা الخ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا খবর; তাদের মধ্যে যারা নেক কাজ করে তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করা থেকে বেঁচে থাকে তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার তথা বেহেশত।

١٧٣. اَلَّذِيْنَ بَدَلٌ مِنَ الَّذِيْنَ قَبْلَهُ اَوْ نَعْتٌ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اَىْ نُعَيْمُ بْنُ مَسْعُوْدٍ الْاَشْجَعِيُّ اِنَّ النَّاسَ اَبَا سُفْيَانَ وَاَصْحَابَهُ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمُ الْجُمُوْعَ لِيَسْتَاصِلُوْكُمْ فَاخْشَوْهُمْ وَلَا تَاْتُوْهُمْ فَزَادَهُمْ ذٰلِكَ الْقَوْلُ اِيْمَانًا تَصْدِيْقًا بِاللّٰهِ وَيَقِيْنًا وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ كَافِيْنَا اَمْرَهُمْ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ الْمُفَوَّضُ اِلَيْهِ الْاَمْرُ هُوَ وَخَرَجُوْا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَوَافَوْا سُوْقَ بَدْرٍ وَاَلْقَى اللّٰهُ الرُّعْبَ فِىْ قَلْبِ اَبِىْ سُفْيَانَ وَاَصْحَابِهِ فَلَمْ يَاْتُوْا وَكَانَ مَعَهُمْ تِجَارَاتٌ فَبَاعُوْا وَرَبِحُوْا ـ

১৭৩. اَلَّذِيْنَ পূর্বোক্ত اَلَّذِيْنَ থেকে বদল হয়েছে অথবা সিফত হয়েছে। তাদেরকে লোকেরা যখন বলল তথা নুআইম ইবনে মাসউদ আশজায়ী যখন বলল, লোকেরা তথা আবূ সুফিয়ান ও তার সাথিরা তোমাদের জন্য একটি বড় দলকে সমবেত করেছে, তোমাদের মূলোৎপাটনের জন্য। সুতরাং তাদেরকে তোমরা ভয় কর, তাদের মোকাবিলায় বের হয়ো না। তখন মুনাফিকদের এসব কথা তাদের মুসলমানদের ঈমান ও ইয়াকীনকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে এবং তারা বলেছে, আমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট এবং কর্ম সম্পাদনে তিনি অতি উত্তম। যাবতীয় বিষয় তাঁর উপরই ন্যাস্ত। সাহাবাগণ নবীজীর সাথে বের হয়ে বদরের বাজারে গিয়ে অবস্থান করেন, আর এ দিকে আল্লাহ পাক আবূ সুফিয়ান ও তার সাথিদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দেন। যার কারণে তারা [তাদের প্রতিশ্রুতি মতে] আসতে পারেনি। মুসলমানদের সাথে ব্যবসার পণ্য ছিল তা বিক্রি করে তারা লাভবান হয়।

١٧٤. قَالَ تَعَالٰى فَانْقَلَبُوْا رَجَعُوْا مِنْ بَدْرٍ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ بِسَلَامَةٍ وَرِبْحٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْءٌ مِنْ قَتْلٍ اَوْ جُرْحٍ وَاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ بِطَاعَتِهِ وَطَاعَةِ رَسُوْلِهِ فِى الْخُرُوْجِ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ عَلٰى اَهْلِ طَاعَتِهِ ـ

১৭৪. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, অতঃপর তাঁরা আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহ লাভ করে বহাল তবিয়তে মুনাফাসহ ফেরত এসেছে। তাদেরকে কোনো অনিষ্ট তথা কোনো হতাহতে স্পর্শ করেনি। তারপর তাঁরা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসারী হয়েছে যুদ্ধে বের হওয়ার মাধ্যমে তাঁর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য পালন করে। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর আনুগত্যশীলদের জন্য মহান দানের অধিকারী।

١٧٥. إِنَّمَا ذٰلِكُمُ الْقَائِلُ لَكُمْ أَنَّ النَّاسَ الخ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُكُمْ أَوْلِيَاءَهُ الْكُفَّارَ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ فِي تَرْكِ أَمْرِي إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ حَقًّا .

১৭৫. নিশ্চয় যারা তোমাদের জন্য এ কথা **বলেছে যে,** লোকেরা তোমাদের জন্য বড় দল সমবেত করেছে। **তারা** তোমাদেরকে ভয় দেখায় নিজেদের কাফের **বন্ধুদের** ব্যাপারে। অতএব তোমরা তাদেরকে ভয় করো না **এবং** আমাকেই ভয় কর আমার নির্দেশ অমান্য করার ব্যাপারে যদি তোমরা প্রকৃত মু'মিন হও।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَلَّذِيْنَ - اَلَّذِيْنَ ইসমে মাওসূল তার সেলাসহ মুবতাদা। لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ الخ পূর্বোক্ত খবর اَجْرٌ عَظِيْمٌ সিফত মাওসূফ মিলে পরে উক্ত মুবতাদা। মুবতাদা খবর মিলে জুমলা হয়ে প্রথম اَلَّذِيْنَ-এর খবর হয়েছে। قَوْلُهُ اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ الخ : গ্রন্থকার মুফাসসির দ্বিতীয় اَلَّذِيْنَ-কে প্রথম اَلَّذِيْنَ থেকে বদল বা সিফত সাব্যস্ত করেছেন। তবে এতে **একটি** প্রশ্ন হয়। কারণ প্রথম اَلَّذِيْنَ দ্বারা বিশেষ লোকেরা উদ্দেশ্য যারা ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। আর দ্বিতীয় اَلَّذِيْنَ দ্বারা সকল মুসলমান উদ্দেশ্য। তাই দুনো اَلَّذِيْنَ-এর উদ্দেশ্য এক হলো না। অথচ বদল ও সিফতের জন্য মুবদাল মিনহু ও **বদল,** তেমনিভাবে মাওসূফ ও সিফত এক ও অভিন্ন হওয়ার প্রয়োজন। সুতরাং উত্তম হলো এই যে, দ্বিতীয় اَلَّذِيْنَ কে اَمْدَحُ **উহ্য** ফে'লের মাফঊলের ভিত্তিতে মানসূব সাব্যস্ত করে নেওয়া। (اِعْرَابُ الْقُرْاٰنِ)

قَوْلُهُ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ الخ : حَسْبُنَا মুবতাদা اَللّٰهُ খবর, অথবা اَللّٰهُ মুবতাদা আর حَسْبُنَا পূর্বোক্ত খবর। بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ হালের স্থলে অবস্থিত হয়েছে فَانْقَلَبُوْا থেকে, لَمْ يَمْسَسْهُمْ ও اِنْقَلَبُوْا-এর যমীর থেকে হাল হয়েছে। وَاتَّبَعُوْا মা'তূফ হয়েছে اِنْقَلَبُوْا-এর উপর। قَوْلُهُ اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ الخ - ذٰلِكُمْ মুবতাদা اَلشَّيْطَانُ খবর। يُخَوِّفُ জুমলাটি اَلشَّيْطَانُ থেকে হাল হয়েছে তার মধ্যে আমেল হলো ইশারা। اَىْ يُخَوِّفُكُمْ بِاَوْلِيَائِهٖ اَوْ يُخَوِّفُ اَوْلِيَائَهٗ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের যোগসূত্র : উপরে ওহুদ যুদ্ধের কাহিনীর বর্ণনা ছিল। উল্লিখিত اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ الخ আয়াতে **সে** যুদ্ধ প্রসঙ্গেই আরেকটি যুদ্ধের আলোচনা করা হয়েছে যা 'গাযওয়ায়ে হামরাউল আসাদ' নামে খ্যাত। হামরাউল আসাদ **হলো** মদিনা থেকে আট মাইল দূরে অবস্থিত একটি জায়গার নাম।

আয়াতের শানে নুযূল : অধিক সংখ্যক মুফাসসিরগণের মতে, আলোচ্য আয়াতটি গাযওয়ায়ে হামরাউল আসাদ **সম্পর্কে** নাজিল হয়েছে। কোনো মুফাসসিরদের মতে, এ আয়াতটি গাযওয়ায়ে বদরে সুগরা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তবে **ইমাম** ফখরুদ্দীন রাযী (রা.) বলেছেন – اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ ـ اِلٰى اَجْرٌ عَظِيْمٌ আয়াতটি নাজিল হয়েছে গাযওয়ায়ে **হামরাউল** আসাদ সম্পর্কে, আর اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ ـ الى ـ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ পর্যন্ত নাজিল হয়েছে গাজওয়ায়ে বদরে ছুগরা সম্পর্কে। এ মতটিকে কাজী ছানাউল্লাহ পানিপতী (র.) ও মাওলানা **ইদ্রিস** কান্ধলবী (র.) প্রমুখ মুফাসসিরগণ পছন্দ করেছেন। আল্লামা শায়খ আহমদ সাবী তাঁর রচিত হাশিয়াতুস সাবীতে **লিখেছেন,** সূয়ূতী সাহেবের জন্য উভয় আয়াতের সম্মিলিত শানে নুযূল হিসেবে গাযওয়ায়ে বদরে ছুগরার ঘটনাকে উল্লেখ করা ঠিক **হয়নি।**

–[হাশিয়াতুস সাবী খ. ১, পৃ. **১৯১**]

গাযওয়ায়ে হামরাউল আসাদের সংক্ষিপ্ত ঘটনা : নাসায়ী ও তাবরানী বিশুদ্ধ সনদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর **উক্তি** উদ্ধৃত করেছেন যে, মুশরিকরা যখন ওহুদ থেকে ফেরত চলে গেল তখন তারা পরস্পরে বলতে লাগল, তোমরা মারাত্মক **ভুল** করেছ। না তোমরা মুহাম্মদকে হত্যা করতে পেরেছ এবং না পেরেছ বন্দী করে আনতে নিজেদের পেছনে সওয়ার **করিয়ে** যুবতী মহিলাদেরকে। সুতরাং তোমরা এখন আবার ফেরত চল। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন এ কথা শুনতে পেলেন, **তখন** মুসলমানদেরকে আহ্বান করলেন তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য তাতে সকলই সাড়া দিলেন এবং হাজির হলেন।

মুহাম্মদ বিন আমর বর্ণনা করেন যে, যখন তৃতীয় হিজরির শাওয়ালের ১৫ তারিখ শনিবার ওহুদ থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন শত্রুদল আবার ফিরে আসার আশঙ্কায় খাজরাজ ও আওসের নেতারা হুজুরের নিকট রাত্রিযাপন করল। ১৬ তারিখ রবিবার ফজরের সময় হলে হযরত বেলাল (রা.) আজান দিয়ে হুজুর ﷺ-এর অপেক্ষা করতে থাকেন। হুজুর ﷺ তাশরিফ আনলে একজন মযনী গোত্রের লোক তাকে সংবাদ দিল যে, মুশরিকরা যখন রাওয়াহা নামক স্থানে পৌঁছে তখন আবূ সুফিয়ান বলল, মদিনায় আবার ফেরত চল তাহলে মুসলমানদের যারা অবশিষ্ট রয়েছে তাদেরকে আমরা সমূলে উৎপাটন করে দেব। সফওয়ান ইবনে উমাইয়া অস্বীকার করল এবং বলতে লাগল, তোমরা এ রকম করো না মুসলমানেরা পরাজিত হয়ে চলে গেছে। এখন আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, খাজরাজের যে সব লোকেরা বাকি রয়ে গিয়েছিল তারাও তোমাদের বিরুদ্ধে একত্র হয়ে যাবে। তোমরা যদি আবার ফিরে যাও তবে আমার আশঙ্কা হয়, হয়তো তোমার বিজয় পরাজয়ে বদলে যেতে পারে। সুতরাং মক্কায়ই ফেরত চলে যাও। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন, সফওয়ান সঠিক পথে না থাকলেও এই রায়ে সে সর্বাধিক অভ্রান্ত ছিল। কসম ঐ সত্তার যার হাতে আমার প্রাণ! এদের উপর বর্ষিত হওয়ার জন্য [গায়বি] পাথর নাম ধরে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছিল। যদি তারা ফেরত আসত তবে বিগত দিনের ন্যায় তারা অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ত, [তাদের চিহ্নও বাকি থাকত না] । অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর (রা.)-কে ডেকে আনলেন এ ব্যাপারে তারা উভয়ের সঙ্গে আলোচনা করলেন। উভয়ই জবাব দিলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! শত্রুদেরকে পিছন দিক থেকে ধাওয়া করা হোক তারা যাতে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের উপর মাথাচাড়া দিতে না পারে।

এই পরামর্শের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বেলালকে নির্দেশ দিলেন, তুমি ঘোষণা করে দাও যে রাসূল ﷺ দুশমনদের উপর আক্রমণ করার জন্য তাদের প্রতি ধাওয়া করার নির্দেশ তোমাদেরকে দিচ্ছেন। তবে আমাদের সঙ্গে কেবল ঐ সব লোকই আজ যেতে পারবে, যারা গতকাল ওহুদের যুদ্ধে শরিক ছিল। হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইরের গায়ে ছিল নয়টি জখম, তিনি এ গুলোর চিকিৎসা করতে ইচ্ছা করছিলেন। তিনি এই ঘোষণা শুনে বললেন, সানন্দে আল্লাহ এবং তার রাসূলের হুকুম পালনে আমি হাজির। বনী সালমা গোত্রের চল্লিশজন আহত ব্যক্তি বের হয়ে গেলেন। তোফায়েল ইবনে নোমানের ছিল তেরটি জখম, খাব্বাশ বিন সাম্মারের ছিল দশটি, কাআব বিন মালেকের ছিল দশের কিছু উর্ধ্বে, আতিয়া ইবনে আমেরের ছিল নয়টি। মোটকথা মুসলমানগণ নিজেদের জখমের চিকিৎসার দিকেও মনোযোগ দেননি; বরং দ্রুত তারা অস্ত্র হাতে উঠিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। মোটকথা হুজুর ﷺ সত্তর জন সাহাবীকে নিয়ে তাদের পিছনে ধাওয়া করলেন। যাতে তারা এ কথা বুঝতে না পারে যে মুসলমানরা গতকালের পরাজয়ে দুর্বল হয়ে গেছে। মদিনা থেকে বের হয়ে তিনি আট মাইল দূরে অবস্থিত হামরাউল আসাদ নামক স্থানে অবস্থান করেন। এখানে পৌঁছে সাহাবাগণ উট জবাই করলেন, পাক করার জন্য পাঁচশত জায়গায় আগুন জ্বালালেন, যাতে কাফেররা দূর থেকে দেখে মুসলমানদের সংখ্যা অধিক মনে করে। মা'বাদে খুজায়ী, যে তখন মুশরিক ছিল এবং হুজুরের সাথে তার চুক্তি ছিল। সে মক্কার কোনো খবর তাঁর কাছে গোপন রাখত না। সে বলল, হে মুহাম্মদ ﷺ আপনার এবং আপনার সাথিদের উপর যে মসিবত নেমে এসেছে এই জন্য আমরা খুবই মর্মাহত। আমাদের মনের খাহিশ ছিল আল্লাহ আপনাকে এ থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন। অতঃপর সে এখান থেকে বের হয়ে রাওহা নামক স্থানে আবূ সুফিয়ানের নিকট গিয়ে পৌঁছে । সেখানে মুশরিকরা ফেরত এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবাদের উপর আক্রমণ করার জন্য সিদ্ধান্ত করে নিয়েছিল। তারা বলেছিল মুসলমানদের বড় বড় নেতা ও লিডারদেরকে তো আমরা খতম করে দিয়েছি। এবারে বাকি লোকদেরকে আক্রমণ করে শেষ করে তাদের তরফ থেকে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে যাবো। আবূ সুফিয়ান যখন মা'বাদকে দেখল, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করল সে দিকের খবর কি? উত্তরে মা'বাদ বলল, মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর সাথিরা এত বড় সৈন্যদল নিয়ে তোমাদের খোঁজে বের হয়েছে যে, এত বেশি সৈন্য আমি কখনো দেখিনি। তাঁরা তোমাদের উপর রাগে দাঁত পেষণ করছে। যারা তাদের সাথে যুদ্ধে শরিক হয়নি তারাও এখন তাদের সঙ্গে একত্র হয়েছে। আর নিজেদের অতীত কৃতকর্মের উপর তাঁরা লজ্জাবোধ করছে। তাঁরা তোমাদের উপর এত রাগান্বিত যে, আমি ইতঃপূর্বে এরূপ রাগ দেখিনি। আবূ সুফিয়ান বলল, আরে তোমার ধ্বংস হোক! তুমি বলছ কি? মা'বাদ বলল, খোদার কসম তোমরা সামনে চলামাত্রই মুসলমানদের ঘোড়ার কপাল দেখতে পাবে। আবূ সুফিয়ান বলল, খোদার কসম! আমরা তো এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, তাদের উপর আক্রমণ করে তাদের অবশিষ্ট লোকদেরও মূলোৎপাটন করে দেব। মা'বাদ বলল, আমি তোমাদেরকে এই কাজ থেকে নিষেধ করছি। মা'বাদের এ কথা সফওয়ানের পরামর্শের সাথে এক হয়ে আবূ সুফিয়ান এবং তার সাথিদের দিক পাল্টে দিল, আর তারা পাল্টা ধাওয়ার ভয়ে তাড়াতাড়ি ফেরত চলে যায়। ঐ সময় কালেই আবূ সুফিয়ানের নিকট দিয়ে আব্দুল কায়েস গোত্রের কিছু সওয়ার অতিক্রম করে। আবূ সুফিয়ান জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কোথায় যাওয়ার উদ্দেশ্য করছ? তারা বলল, মদিনায় পণ্য নিয়ে যাচ্ছি। আবূ সুফিয়ান বলল, তোমরা আমার পক্ষ থেকে মুহাম্মদকে একটি সংবাদ দিতে পারবে কি? যদি তোমরা এ কাজটি করে দিতে পার, তবে আমি আগামী কাল উকাজ বাজারে তোমাদের উটের উপর কিশমিশ উঠিয়ে দিবো। তারা বলল, হ্যাঁ! আমরা পারবো। আবূ সুফিয়ান বলল, তোমরা যখন মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকট পৌঁছবে, তখন তাকে এ

সংবাদটা দিয়ে দিবে যে, আমরা ফায়সালা করে নিয়েছি যে, আমরা মুহাম্মদ ও তাঁর সাথিদের উপর আক্রমণ করবো। যাতে অবশিষ্ট লোকেরাও খতম হয়ে যায়। এই সংবাদ পাঠিয়ে আবূ সুফিয়ান মক্কায় চলে গেছে। আর ঐ আরোহী দল গিয়ে হামরাউল আসাদ নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এই সংবাদটি দিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই সংবাদ শুনে বললেন حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ অতঃপর তিনি ঐ স্থানে ১৭,১৮, ও ১৯ শাওয়াল, সোম, মঙ্গল, ও বুধবার পর্যন্ত অবস্থান করেন। আর তখনই আল্লাহ পাক اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ الخ আয়াতটি নাজিল করেন।

–[তাফসীরে মাযহারী উর্দূ খ. ২, পৃ. ৪২২–৪৫]

গাযওয়ায়ে বদরে সুগরা : ওহুদ যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর যখন আবূ সুফিয়ান মক্কায় ফেরার ইচ্ছা করল তখন সে বলল, হে মুহাম্মদ! আপনি যদি চান তবে আমাদের ও তোমাদের আবার যুদ্ধ হবে আগামী বৎসর বদরে। আবূ সুফিয়ানের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, বদরে যেহেতু আমাদের বড় বড় নেতারা মারা গেছে, তাই আগামী বৎসর যদি ঐ বদরেই আবার যুদ্ধ হয়, আর আমরা ওহুদের ন্যায় সেখানেও মুসলমানদের বড় বড় নেতাদেরকে মারতে পারি তাহলে বদরের প্রতিশোধ হয়ে যাবে। হুজুর ﷺ আবূ সুফিয়ানের জবাবে বললেন, ঠিক আছে। বৎসর পূর্ণ হয়ে গেলে আবূ সুফিয়ান কুরাইশী দুই হাজার কাফেরদেরকে নিয়ে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হলো। তাদের সঙ্গে ছিল পঞ্চাশটি ঘোড়া। এদিকে হুজুর ﷺ সাহাবাদেরকে তাঁর সঙ্গে চলার জন্য নির্দেশ দিলেন। তাঁরা শুনামাত্রই সাথি হয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। আর বদর নামক স্থানে পৌছে গেলেন। আবূ সুফিয়ান মক্কা থেকে বের হয়ে মাত্র মাররুজ জাহরান নামক স্থানে পৌছে ছিল। তখন হঠাৎ তার মনের মধ্যে মুসলমানদের প্রতি ভয় ভীতির সঞ্চার হয়ে গেল। তবে সে কামনা করছিল যে, হুজুর ﷺ যদি ওয়াদার ক্ষেত্রে না আসেন তাহলে অভিযোগটা তাঁর উপর থাকবে। আর আমি লড়াই করা থেকে বেঁচে গেলাম। তাই সে মনে করল আমার জন্য সৈন্য বাহিনীকে মক্কায় ফেরত নিয়ে যাওয়াটাই সমীচীন। ঘটনাক্রমে তার সাথে নুআইম ইবনে মাসউদ আশজায়ীর সাক্ষাৎ হয়ে যায়, যে মক্কা থেকে ওমরা পালন করে ফেরত আসছিল। আবূ সুফিয়ান তাকে বলল, আমি মুহাম্মদ ও তাঁর সাথিদেরকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছিলাম যে, বদরের মেলার মৌসূমে আগামী বৎসর আমাদের ও তোমাদের মধ্যে যুদ্ধ হবে। কিন্তু এই বৎসরটি দুর্ভিক্ষের। এ রকম সময় যুদ্ধ করা উচিত নয়। এখন আমার এটাই উত্তম মনে হচ্ছে যে, আমি মক্কায় ফেরত চলে যাবো। তবে আমি এ কথাটা পছন্দ করি না যে, মুহাম্মদ তো প্রতিশ্রুত ক্ষেত্রে এসে পৌছে যাবে। আর আমি পৌছতে পারবো না। এতে মুসলমানদের দুঃসাহস আরো অধিক বেড়ে যাবে। তাই ভালো হবে এটাই যে, হে নুআইম! তুমি মদিনায় গিয়ে মুসলমানদের মধ্যে এ কথা ছড়িয়ে দিবে যে, মক্কার কুরাইশগণ তোমাদের মোকাবিলা করার জন্য এক বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করেছে, যাদের প্রতিরোধ তোমরা করতে পারবে না। তাই তোমাদের যুদ্ধের জন্য বের না হওয়াটাই উত্তম হবে। ফলে মুসলমানরা এ রকম সংবাদে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যাবে এবং তাদের সাহস ভেঙ্গে যাবে। আর ভয়ের কারণে যুদ্ধের জন্য বের হবে না। আর আবূ সুফিয়ান নুআইম ইবনে মাসউদকে একথা বলল যে, এই কাজের বিনিময়ে আমি তোমাকে দশটা উট দেব। নুআইম পুরস্কারের লোভে মদিনায় পৌছে গিয়ে দেখল যে, মুসলমানগণ আবূ সুফিয়ানের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বদরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। নুআইম তাদেরকে বলল, মক্কার লোকেরা তোমাদের মোকাবিলার জন্য বিরাট বাহিনী তৈরি করছে। সুতরাং তোমাদের যুদ্ধ না করাটাই শ্রেয় হবে। নুআইম বলল, দেখ! ওহুদের বৎসর কুরাইশের লোকেরা তোমাদের ঘরে এসে তোমাদেরকে কতল করে গেছে এবং কোনো পরিবার হতাহত থেকে খালি নেই। এরপরও যদি তোমরা নিজেদের এলাকা ছেড়ে যুদ্ধ করতে যাও, তবে আমি কসম খেয়ে বলছি যে, তোমাদের মধ্যে একজন ব্যক্তিও প্রাণে বেঁচে মদিনায় ফেরত আসতে পারবে না। এ কথা শুনার পর মুসলমানদের মধ্যে ভয়ের পরিবর্তে ঈমানী জোশ বেড়ে গেছে। আর তারা বলতে লাগলেন– حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ অর্থাৎ, আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং উত্তম কর্ম সম্পাদনকারী। আর আল্লাহ যাদের কর্ম সম্পাদনকারী হয়ে যান তাদেরকে বড় থেকে মহা বড় কোনো বাহিনীও কোনো ক্ষতি করতে পারে না। আর আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করলেন, শপথ ঐ খোদার যার হাতে আমার প্রাণ, আমি অবশ্যই তাদের মোকাবিলায় বের হবো যদিও আমার একাই বের হতে হয়। অতঃপর তিনি বদর অভিমুখে রওয়ানা হলেন, তাঁর সঙ্গে ছিলেন সত্তর জন সাহাবী। যারা حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ বলে যাচ্ছিলেন। তিনি বদরে পৌছে আটদিন পর্যন্ত সেখানে আবূ সুফিয়ানের অপেক্ষায় অবস্থান করলেন। কিন্তু আবূ সুফিয়ান আসলো না এবং কোনো যুদ্ধও হলো না। এই দিনগুলোতে বদরে মেলা লেগেছিল। মুসলমানরা সেখানে কেনাবেচা করেছেন এবং খুবই লাভবান হয়েছেন। তাঁরা মুনাফা গ্রহণ করে মঙ্গলের সহিত মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেছেন। এই ঘটনাকে গাজওয়ায়ে বদরে সুগরা বলে। আর ওহুদের পূর্বে যে যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল তাকে গাজওয়ায়ে বদরে কুবরা বলে।

–[মা'আরিফে ইদ্রিসিয়া খ. ২, পৃ. ৯৫–৯৭]

١٧٦. وَلَا يَحْزُنْكَ بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الزَّايِ وَبِفَتْحِهَا وَضَمِّ الزَّايِ مِنْ حَزَنَهُ لُغَةٌ فِي أَحْزَنَهُ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ يَقَعُوْنَ فِيْهِ سَرِيْعًا بِنُصْرَتِهِ وَهُمْ أَهْلُ مَكَّةَ أَوِ الْمُنَافِقُوْنَ أَيْ لَا تَهْتَمَّ لِكُفْرِهِمْ إِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْئًا بِفِعْلِهِمْ وَإِنَّمَا يَضُرُّوْنَ أَنْفُسَهُمْ يُرِيْدُ اللّٰهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا نَصِيْبًا فِي الْاٰخِرَةِ أَيِ الْجَنَّةِ فَلِذٰلِكَ خَذَلَهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ فِي النَّارِ.

১৭৬. হে রাসূল ﷺ ! আর তারা যেন তোমাকে চিন্তান্বিত করে না তোলে। [لَا يَحْزُنْكَ ইয়ার পেশ ও যা বর্ণের যেরের সাথে এবং ইয়ার যবর ও যা বর্ণের পেশের সাথে, حَزَنَ বাবে نَصَرَ হতে এটা أَحْزَنَ-এর একটি লোগাত] যারা দ্রুতবেগে কুফরের দিকে ধাবিত হয় তথা কুফরের সহায়তা করে তাতে দ্রুত গতিতে পতিত হয় আর তারা হচ্ছে মক্কাবাসী কাফেররা বা মুনাফিকরা অর্থাৎ তাদের কুফরের কারণে আপনি চিন্তাগ্রস্ত হবেন না। তারা কখনো আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, তাদের কর্মকাণ্ডের দ্বারা; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করছে। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা তাদেরকে আখিরাতে কোনো কল্যাণের অংশ না দেওয়া অর্থাৎ বেহেশত না দেওয়া। এ জন্যই তাদেরকে সাহায্য থেকে বঞ্চিত রেখেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে দোজখের কঠিন শাস্তি।

١٧٧. إِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيْمَانِ أَيْ أَخَذُوْهُ بَدَلَهُ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ بِكُفْرِهِمْ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ مُؤْلِمٌ.

১৭৭. নিশ্চয় যারা ঈমানের পরিবর্তে কুফর খরিদ করে নিয়েছে তথা ঈমানের বদলে কুফরকে গ্রহণ করেছে [তারা] তাদের কুফর দ্বারা আল্লাহর বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করতে পারবে না। এবং তাদের জন্য অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

١٧٨. وَلَا تَحْسَبَنَّ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَنَّمَا نُمْلِيْ أَيْ إِمْلَاءَنَا لَهُمْ بِتَطْوِيْلِ الْأَعْمَارِ وَتَاخِيْرِهِمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ وَمَعْمُوْلَهَا سَدَّتْ مَسَدَّ الْمَفْعُوْلَيْنِ فِيْ قِرَاءَةِ التَّحْتَانِيَّةِ وَمَسَدَّ الثَّانِيْ فِي الْأُخْرٰى إِنَّمَا نُمْلِيْ نُمْهِلُ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْا إِثْمًا بِكَثْرَةِ الْمَعَاصِيْ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ذُوْ إِهَانَةٍ فِي الْاٰخِرَةِ.

১৭৮. وَلَا تَحْسَبَنَّ এটা يَاء ও تَاء-এর সাথে আর কাফেররা যেন এই ধারণা না করে যে আমি তাদেরকে যে অবকাশ দেই তা তাদের জন্য কল্যাণকর তথা আমার অবকাশ তাদের দীর্ঘজীবন ও শাস্তি প্রদানে বিলম্বকে যেন কল্যাণকর মনে না করে নিজেদের জন্য। يَاء-এর কেরাত অনুযায়ী (إِنَّمَا) -এর أَنَّ তার মা'মূলসহ দুই মাফঊলের স্থলবর্তী لَا تَحْسَبَنَّ ফে'লের আর لَا تَحْسَبَنَّ-এর কেরাত অনুযায়ী أَنَّ তার মা'মূলসহ لَا تَحْسَبَنَّ-এর দ্বিতীয় মাফঊলের স্থলবর্তী। আমি তো তাদেরকে এজন্য অবকাশ দেই যাতে তারা পাপে অধিক নাফরমানি করার মাধ্যমে উন্নতি লাভ করতে পারে। আর তাদের জন্য রয়েছে অত্যন্ত অপমানজনক তথা আখিরাতে অপমানযুক্ত শাস্তি।

١٧٩. مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ لِيَتْرُكَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَا اَنْتُمْ اَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْهِ مِنْ اِخْتِلَاطِ الْمُخْلِصِ بِغَيْرِهِ حَتّٰى يَمِيْزَ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ يُفَصِّلُ الْخَبِيْثَ الْمُنَافِقَ مِنَ الطَّيِّبِ الْمُؤْمِنِ بِالتَّكَالِيْفِ الشَّاقَّةِ الْمُبَيِّنَةِ لِذٰلِكَ فَفَعَلَ ذٰلِكَ يَوْمَ اُحُدٍ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ فَتَعْرِفُوا الْمُنَافِقَ مِنْ غَيْرِهِ قَبْلَ التَّمْيِيْزِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ يَخْتَارُ مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَّشَاءُ فَيُطْلِعُهُ عَلٰى غَيْبِهِ كَمَا اَطْلَعَ النَّبِيَّ ﷺ عَلٰى حَالِ الْمُنَافِقِيْنَ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوا النِّفَاقَ فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ.

১৭৯. আল্লাহ তা'আলা এমন নন যে, মুসলমানদেরকে সে অবস্থাতেই রাখবেন হে লোকেরা! যাতে তোমরা রয়েছঃ তথা নিষ্ঠাবান ও অনিষ্ঠাবানের সংমিশ্রণের যে অবস্থাতে তোমরা রয়েছ, যে পর্যন্ত না নাপাককে তথা মুনাফিককে পাক তথা মু'মিন থেকে পৃথক করে দেবেন। এ পার্থক্য বিধানকারী কষ্টসাধ্য নির্দেশের মাধ্যমে যেরূপ ওহুদ দিবসে করা হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা এমন নন যে, তোমাদেরকে গায়বি বিষয়ে অবহিত করবেন যার কারণে তার পৃথকীকরণের পূর্বে তোমরা মুনাফিককে গায়রে মুনাফিক থেকে চিনে নিতে পারবে। তবে আল্লাহ তাঁর রাসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন, অতঃপর তাকে গায়বি বিষয়ে অবগত করেন, যেরূপ তিনি নবী করীম ﷺ কে মুনাফিকদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেছেন। অতএব তোমরা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর যদি তোমরা ঈমান আন এবং নেফাক থেকে বেঁচে থাক তবে তোমাদের জন্য রয়েছে বিরাট প্রতিদান।

١٨٠. وَلَا تَحْسَبَنَّ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ اَىْ بِزَكَاتِهِ هُوَ اَىْ بُخْلُهُمْ خَيْرًا لَّهُمْ مَفْعُوْلٌ ثَانٍ وَالضَّمِيْرُ لِلْفَصْلِ وَالْاَوَّلُ بُخْلُهُمْ مُقَدَّرًا قَبْلَ الْمَوْصُوْلِ عَلَى الْفَوْقَانِيَّةِ وَقَبْلَ الضَّمِيْرِ عَلَى التَّحْتَانِيَّةِ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ اَىْ بِزَكَاتِهٖ مِنَ الْمَالِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِاَنْ يُّجْعَلَ حَيَّةً فِىْ عُنُقِهٖ تَنْهَشُهٗ كَمَا وَرَدَ فِى الْحَدِيْثِ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَرِثُهُمَا بَعْدَ فَنَاءِ اَهْلِهِمَا وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ خَبِيْرٌ فَيُجَازِيْكُمْ بِهٖ.

১৮০. وَلَا تَحْسَبَنَّ -ইয়া ও تَاء -এর সাথে তারা যেন এমন ধারণা না করে যারা কার্পণ্য করে সে বিষয়ে, আল্লাহ যা তাদের দান করেছেন। নিজের অনুগ্রহে যে, এই কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে। لَا يَحْسَبَنَّ -এর দ্বিতীয় মাফঊল হয়েছে خَيْرًا لَّهُمْ - (هو) যমীরটি فَصْل বা পার্থক্যের জন্য। আর প্রথম মাফঊল الَّذِيْنَ -এর পূর্বে উহ্য রয়েছে لَا تَحْسَبَنَّ -এর কেরাতানুযায়ী, আর যমীরে ফসলের পূর্বে উহ্য হবে لَا يَحْسَبَنَّ -এর কেরাত অনুযায়ী; বরং এটা তাদের জন্য একান্তই ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে। সে সমস্ত ধন সম্পদকে তথা জাকাতের সম্পদকে কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ি বানিয়ে পরানো হবে। তাদের মালকে সর্প বানিয়ে তাদের গর্দানে দেওয়া হবে যে সর্প তাদেরকে ছোবল মারতে থাকবে। যেরূপ হাদীস শরীফে এসেছে। আর আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে তার প্রকৃত স্বত্বাধিকারী একমাত্র আল্লাহ তা'আলা তথা আসমান ও জমিনবাসী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর তিনিই এসবের উত্তরাধিকারী হবেন। আর আল্লাহ তা'আলা তাদের বা তোমাদের যাবতীয় কার্যাবলি সম্পর্কে খবর রাখেন। (يَعْمَلُوْنَ) -এর মধ্যে يَاء ও تَاء -এর সাথে উভয় কেরাত রয়েছে সুতরাং তিনি তোমাদেরকে প্রতিদান দেবেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الخ : اَللّٰهُ - كَانَ -এর ইসিম তার খবর مُرِيْدًا উহ্য রয়েছে। ইবারতের রূপ হবে এমন مَا كَانَ اللّٰهُ مُرِيْدًا لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ - اللّٰهُ مُرِيْدًا لِيَذَرَ - كَانَ لِيَذَرَ -এর খবর হতে পারে না। يَذَرُ আসলে يَوْذَرُ ছিল, يَدَعُ -এর সামঞ্জস্যতায় তা থেকে (و) ওয়াওকে বিলুপ্ত করা হয়েছে। নতুবা তার মধ্যে বিলুপ্তির কোনো কারণ ছিল না। يَذَرُ -এর মাজী আসে না। قَوْلُهُ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ الخ - اَلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ الخ - لَا يَحْسَبَنَّ -এর ফায়েল। خَيْرًا তার দ্বিতীয় মাফঊল هُوَ যমীরে ফসল। আর উহ্য اَلْبُخْلُ বা هُوَ প্রথম মাফঊল। -[জামালাইন খ. ১, পৃ. ৫৬৮, তাফসীরে হক্কানী, পারা – ৪ পৃ. ৩৬-৩৯]

١٨١. لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَاۤءُ وَهُمُ الْيَهُوْدُ قَالُوْهُ لَمَّا نَزَلَ مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا وَقَالُوْا لَوْ كَانَ غَنِيًّا مَا اَسْتَقْرَضْنَا سَنَكْتُبُ نَاْمُرُ بِكَتْبِ مَا قَالُوْا فِيْ صَحَائِفِ اَعْمَالِهِمْ لِيُجَازُوْا عَلَيْهِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالْيَاءِ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُوْلِ وَ نَكْتُبُ قَتْلَهُمْ بِالنَّصْبِ وَالرَّفْعِ الْاَنْبِيَاۤءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّيَقُوْلُ بِالنُّوْنِ وَالْيَاءِ اَيِ اللّٰهُ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَلٰى لِسَانِ الْمَلٰئِكَةِ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ النَّارِ .

১৮২. وَيُقَالُ لَهُمْ اِذَا اُلْقُوْا فِيْهَا ذٰلِكَ الْعَذَابُ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ عَبَّرَ بِهِمَا عَنِ الْاِنْسَانِ لِاَنَّ اَكْثَرَ الْاَفْعَالِ تُزَاوَلُ بِهِمَا وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ اَيْ بِذِيْ ظُلْمٍ لِّلْعَبِيْدِ فَيُعَذِّبُهُمْ بِغَيْرِ ذَنْبٍ .

অনুবাদ :

১৮১. নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলেছে যে, আল্লাহ হচ্ছেন ফকির আর আমরা ধনী। আর তারা হলো ইহুদিরা مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا যখন নাজিল হলো তখন তারা এ উক্তিটি করেছে আর বলেছে, যদি তিনি ধনী হতেন তবে আমাদের নিকট ঋণ চাইতেন না। আমি তাদের এ কথা, যা তারা বলেছে এবং অন্যায়ভাবে নবীগণকে তাদের হত্যা করার বিষয়টি লিখে রাখব, তথা তাদের আমলনামায় লিখতে [ফেরেশতাদেরকে] নির্দেশ দেবো, যাতে করে এর ভিত্তিতে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা যায়। سَنَكْتُبُ -এর মধ্যে এক কেরাত سَيَكْتُبُ -ও রয়েছে, يَاء -এর সাথে মুজারে মাজহুল। قَتْلَهُمْ -কে জবর ও পেশ উভয় সূরতে পাঠ করা হয়েছে। (يَقُوْلُ) নূন ও ইয়ার সাথে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আখিরাতে ফেরেশতাদের জবানে তাদেরকে বলবেন, আস্বাদন কর তোমরা জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি।

১৮২. আর তাদেরকে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তাদেরকে বলা হবে, এ শাস্তি হলো তারই প্রতিফল যা তোমাদের হাতে ইতঃপূর্বে পাঠিয়েছে হাত বলে মানুষ বুঝানো হয়েছে। কারণ অধিকাংশ কাজই উভয় হাত দ্বারাই করা হয়ে থাকে। আর এ কথা নিশ্চিত যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের জন্য অত্যাচারী নন যে, তিনি তাদেরকে গুনাহ ব্যতীত শাস্তি দেবেন।

١٨٣. اَلَّذِيْنَ نَعْتٌ لِلَّذِيْنَ قَبْلَهُ قَالُوْا لِمُحَمَّدٍ اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَا فِى التَّوْرٰىةِ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ نُصَدِّقُهُ حَتّٰى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ . فَلَا نُؤْمِنُ لَكَ حَتّٰى تَأْتِيْنَا بِهٖ وَهُوَ مَا يَتَقَرَّبُ بِهٖ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى مِنْ نَعَمٍ وَغَيْرِهَا فَاِنْ قُبِلَ جَاءَتْ نَارٌ بَيْضَاءُ مِنَ السَّمَاءِ فَاَحْرَقَتْهُ وَاِلَّا بَقِىَ مَكَانَهُ وَعَهِدَ اِلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ ذٰلِكَ اِلَّا فِى الْمَسِيْحِ وَمُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ تَعَالٰى قُلْ لَهُمْ تَوْبِيْخًا قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِىْ بِالْبَيِّنٰتِ بِالْمُعْجِزَاتِ وَبِالَّذِىْ قُلْتُمْ كَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى فَقَتَلْتُمُوْهُمْ وَالْخِطَابُ لِمَنْ فِىْ زَمَنِ نَبِيِّنَا وَاِنْ كَانَ الْفِعْلُ لِاَجْدَادِهِمْ لِرِضَاهُمْ بِهٖ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ فِىْ اَنَّكُمْ تُؤْمِنُوْنَ عِنْدَ الْاِتْيَانِ بِهٖ .

১৮৩. اَلَّذِيْنَ পূর্ববর্তী اَلَّذِيْنَ -এর সিফত হয়েছে। যারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে একথা বলে যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের সঙ্গে তাওরাতে অঙ্গীকার করে রেখেছেন যে, আমরা যেন কোনো রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করি। যে পর্যন্ত তিনি আমাদের নিকট এমন কুরবানি উপস্থিত না করবেন যাকে অগ্নিগ্রাস করে নেবে। সুতরাং আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবো না, যে পর্যন্ত আপনি তা আমাদের নিকট না নিয়ে আসবেন। আর কুরবানি বলা হয় যার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়, চাই চতুষ্পদ প্রাণী হোক বা অন্য কিছু হোক। কুরবানি যদি মকবুল হতো তবে আসমান থেকে একটি সাদা আগুন নেমে এসে একে জ্বালিয়ে দিত। অন্যথায় তা স্বস্থানে পড়ে থাকত। হযরত মসীহ (আ.) ও হযরত মুহাম্মদ ﷺ ব্যতীত বনী ইসরাঈলদের জন্য এরূপ জ্বালানোর নিয়ম ছিল। হে রাসূল ﷺ! আপনি তাদেরকে তিরস্কারার্থে বলে দিন, নিশ্চয় আমার পূর্বে অনেক রাসূল সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ তথা মু'জিযাসমূহ নিয়ে এবং তোমরা যা বল তা নিয়ে তোমাদের নিকট এসেছিলেন। যথা– জাকারিয়া ও ইয়াহইয়া (আ.)। অতঃপর তোমরা তাদেরকে হত্যা করে ফেললে। সম্বোধন করা হয়েছে আমাদের নবীর যুগের [ইহুদি] যারা, তাদেরকে; যদিও এ [হত্যাকাণ্ড] কাজটি তাদের পিতা ও পিতামহদের ছিল। কারণ তাদের সেই কাজের এদের প্রতি সম্মতি ছিল। যদি তোমরা এ কথার মধ্যে সত্যবাদী হও যে, মু'জিযা নিয়ে আসার পর ঈমান গ্রহণ করে নিবে, তবে তাঁদেরকে হত্যা করেছিলে কেন?

١٨٤. فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَآءُوْا بِالْبَيِّنٰتِ الْمُعْجِزَاتِ وَالزُّبُرِ كَصُحُفِ اِبْرَاهِيْمَ وَالْكِتٰبِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِاِثْبَاتِ الْبَاءِ وَفِيْهِمَا الْمُنِيْرِ الْوَاضِحِ هُوَ التَّوْرٰىةُ وَالْاِنْجِيْلُ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرُوْا .

১৮৪. হে রাসূল ﷺ! এরা যদি আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। তবে আপনার পূর্বেও বহু রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে, যারা সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি তথা মোজেজাসমূহ অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহ [যথা– ইবরাহীমের সহীফা এবং দীপ্তমান গ্রন্থসমূহসহ এসেছিলেন। ভিন্ন এক কেরাতে উভয়টিতে তথা اَلزُّبُرُ ও اَلْكِتٰبُ -তে بَا বর্ণসহ এসেছে। [অর্থাৎ بِالزُّبُرِ ও بِالْكِتٰبِ] দীপ্তি গ্রন্থ যেমন– তাওরাত ও ইঞ্জিল। সুতরাং তারা যেরূপ ধৈর্যধারণ করেছেন তেমনি আপনিও ধৈর্যধারণ করুন!

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ : এখানে حَرِيْقٍ . مُحْرِقٍ অর্থে ব্যবহৃত, যেরূপ اَلِيْمٌ . مُؤْلِمٌ অর্থে ব্যবহৃত। حَرِيْقٌ অর্থ– দগ্ধ, আর مُحْرِقٌ অর্থ– দগ্ধকারী।

قَوْلُهُ ذِيْ ظُلْمٍ : এতে ইশারা করা হয়েছে যে, ظَلَّامٌ মুবালাগার সীগাহটি ইসমে ফায়েলের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গাতেই মুবালাগার সীগাহ ইসমে ফায়েলের অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

قَوْلُهُ بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ : اَلْبَيِّنَاتُ - بَيِّنَةٌ-এর বহুবচন, অর্থ দলিল এখানে দালাইল ও মুজেযার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। اَلزُّبُرُ - زَبُوْرٌ এর বহুবচন। زَبُوْرٌ অর্থ– কিতাব, গ্রন্থ। زَبُوْر মূলত মাসদার, যার অর্থ লিখা, তবে এখানে মাসদার ইসমে মাফউলের (مَزْبُوْر) অর্থে ব্যবহার হয়েছে। اَلْكِتَابُ (ن . ض) زَبَرَ . কিতাব, গ্রন্থ বা পত্র লিখল।

ইমাম যাজ্জাজ (র.) বলেন, যে কোনো হেকমত বা প্রজ্ঞাপূর্ণ গ্রন্থকে زَبُوْر বলে। তখন زَبْر. زَبُوْر তথা ধমক প্রদান থেকে উদ্ভব হওয়াটা অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। গ্রন্থ বা কিতাবকে এই জন্য যাবূর বলা হয়। কারণ তাতে খেলাফে হক থেকে ধমক প্রদান করা হয়ে থাকে। এ হিসেবেই হযরত দাউদ (আ.)-এর উপর অবতারিত কিতাবকেও যাবূর নামে নামকরণ করা হয়েছে। কারণ তাতেও অধিক পরিমাণ ধমকি ও ভীতিপ্রদ কথা এবং উপদেশ বাণী ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) بَا সহ بِالزُّبُرِ পাঠ করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের যোগসূত্র : সূরা আলে ইমরানের শুরুতে ইহুদিদের বদভ্যাস ও দুষ্কর্মের যে আলোচনা চলছিল এখান থেকে পুনরায় সে আলোচনা প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে। উল্লিখিত আয়াতগুলোর অধিকাংশই এই বিষয় সম্পর্কিত। তবে মাঝখানে রাসূলে কারীম ﷺ ও মুসলমানদের প্রতি সান্ত্বনা ও উপদেশমূলক আলোচনা সন্নিবেশিত হচ্ছে। –[মা'আরিফুল কুরআন]

ইমাম রাযী (র.) লিখেন, আল্লাহ পাক পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তার রাস্তায় জান–মাল কুরবানি করার নির্দেশ দিয়ে ছিলেন। আলোচ্য আয়াতগুলোতে ইহুদিদের হুজুর ﷺ-এর নবুয়তের ব্যাপারে কতিপয় সন্দেহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। –[তাফসীরে কাবীর খ. ৫, পৃ. ১২১]

قَوْلُهُ لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَنَحْنُ اَغْنِيَاءُ :

আয়াতের শানে নুযূল : মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক, ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতিম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে লিখেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-কে বনী কায়নুকার ইহুদিদের কাছে একটি চিঠি দিয়ে পাঠান। চিঠিতে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ, নামাজ পড়া, জাকাত প্রদান এবং আল্লহর জন্য কর্জে হাসানা তথা আল্লাহর রাহে দান খয়রাত করার জন্য দাওয়াত দিলেন। নির্দেশ মোতাবেক হযরত আবূ বকর একদিন ইহুদিদের মাদরাসায় যান। সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন, অনেক ইহুদি একজন লোকের নিকট সমবেত হয়ে আছে। আর সে ছিল ফাখখাস বিন আযুরা নামক এক ইহুদি। যে ইহুদিদের আলেমদের একজন ছিল এবং তার সঙ্গে আরো একজন আলেম ছিল যার নাম ছিল উশাই। হযরত আবূ বকর (রা.) ফাখখাসকে বললেন, আল্লাহকে ভয় কর, আর মুসলমান হয়ে যাও। আল্লাহর কসম তোমরা অবশ্যই এ কথা জান যে, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল, যিনি আল্লাহর তরফ থেকে সত্য নিয়ে আগমন করেছেন। আর তাঁর আলোচনা তোমাদের নিকট তাওরাতের মধ্যে লিখাও রয়েছে। সুতরাং তাঁর প্রতি ঈমান নিয়ে আস এবং তাকে মেনে নাও, আর আল্লাহকে কর্জে হাসানা দান কর। আল্লাহ তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবেন এবং তোমাদেরকে ডবল ছওয়াব প্রদান করবেন। ফাখখাস বলল, আবূ বকর! তুমি বলছ যে, আমাদের প্রভু আমাদের কাছে আমাদের মাল ঋণ চাচ্ছেন, ঋণ তো গরিব ধনীর কাছে চায়। সুতরাং তোমার কথা যদি সত্য হয় তাহলে আল্লাহ ফকির হলেন আর আমরা ধনী। আল্লাহ তো নিজে সুদ দিতে নিষেধ করেন, অথচ তিনি আমাদেরকে সুদ [দান খয়রাতের বর্ধিত হারে ছওয়াব] দিবেন। তিনি যদি ধনী হতেন, তবে আমাদেরকে সুদ দিতেন না। এ কথা শুনে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর রাগ এসে গেল। তিনি ফাখখাসের মুখে সজোরে চড় মেরে দিলেন। আর বললেন, ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, যদি তোমাদের সাথে আমাদের শান্তি-চুক্তি না হতো তবে হে আল্লাহর দুশমন! আমি তোমার গর্দান কেটে ফেলতাম। ফাখখাস রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বিচার দিল যে, দেখ মুহাম্মদ! তোমার সাথি আমার সঙ্গে কি ব্যবহার করেছে? হুজুর ﷺ হযরত আবূ বকর (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এ রকম কাজ কেন করলে? হযরত আবূ বকর (রা.) আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! এই খোদার দুশমন মারাত্মক জঘন্যতম উক্তি করেছিল। সে

বলেছিল, আল্লাহ হলেন ফকির, আর আমরা ধনী। এ কথা শুনে আমার রাগ এসে গেছে, এই জন্য আমি তার মুখে চড় মেরেছি। ফাখখাস হযরত আবূ বকর (রা.)-এর এ কথা অস্বীকার করে দিল। [আর হযরত আবূ বকর (রা.)-এর নিকট কোনো সাক্ষী প্রমাণ ছিল না] এর উপর আল্লাহ পাক ফাখখাসের কথার প্রতিবাদে এবং হযরত আবূ বকর (রা.) -এর সত্যায়নে আলোচ্য আয়াতটি নাজিল করলেন। ইকরামা, সুদ্দী ও মুকাতিল অনুরূপই বলেছেন। -[তাফসীরে মাযহারী খ. ২, পৃ. ৪৩৬-৩৭]

এই আয়াতে ইহুদিরা হুজুর ﷺ -এর নবুয়তের অস্বীকার করেছে। কারণ তাদের দৃষ্টিতেও আল্লাহ তো কারো মুখাপেক্ষী নন, তাহলে তার অন্যের কাছে কর্জে হাসানা অবশ্যই মিথ্যা হবে। এ রকম কথা কুরআনে হওয়ার কথা নয়। তাই এতে প্রমাণিত হচ্ছে, এ কথা হযরত মুহাম্মদ ﷺ নিজ তরফ থেকে মিথ্যা বলেছেন। نَعُوْذُ بِاللّٰهِ তাদের এই অহেতুক প্রমাণটি যেহেতু সুস্পষ্ট রূপে বাতিল ছিল তাই কোনো উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। কারণ জাকাত ও সদকা সংক্রান্ত আল্লাহর নির্দেশ তাঁর কোনো লাভের জন্য নয়; বরং যারা মালদার তাদের পার্থিব ও আখিরাতের ফায়দার জন্য ছিল; কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিষয়টিকে আল্লাহকে ঋণদানের শিরোনামে এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, যাতে এ কথা বুঝা যায় যে, যেভাবে ঋণ পরিশোধ করা প্রত্যেক ভদ্রলোকের জন্য অপরিহার্য সন্দেহাতীত হয়ে থাকে। তেমনিভাবে যে সদকা মানুষ দিয়ে থাকে তার প্রতিদানও নিজ দায়িত্বে দিয়ে দিবেন।

قَوْلُهُ اَلَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَآ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ . الخ :

আয়াতের যোগসূত্র : আলোচ্য আয়াতটি ইহুদিদের হুজুরের নবুয়তের উপর আরোপিত দ্বিতীয় একটি সন্দেহের অবসান হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা বলেছে, আল্লাহ পাক আমাদের সাথে অঙ্গীকার করেছেন যে, আমরা এমন কোনো রাসূলের বিশ্বাস স্থাপন করব না যতক্ষণ না সে এ রকম কুরবানি নিয়ে আসবে যাকে অগ্নি খেয়ে ফেলে। আর হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি সেই মুজেজা দেখাতে পারছেন না। সুতরাং এতে বুঝা যাচ্ছে আপনি নবী নন।

আয়াতের শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আলোচ্য আয়াতটি কা'আব ইবনে আশরাফ, কা'আব ইবনে আসাদ, মালেক ইবনে সায়ফ, ওয়াহাব ইবনে ইয়াহুদা, যায়েদ ইবনে তাবুব ও ফাখখাস ইবনে আযুরা প্রমুখ ইহুদিদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তারা হুজুর ﷺ -এর কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি মনে করেন, আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আপনার উপর তিনি একটি কিতাবও অবতীর্ণ করেছেন। অথচ আল্লাহ আমাদের সাথে তাওরাতে অঙ্গীকার করেছেন যে, আমরা কোনো রাসূলের প্রতি ঈমান আনবো না। যতক্ষণ না তিনি এমন কুরবানি নিয়ে আসবেন মুজিযা হিসেবে যাকে অগ্নি গ্রাস করে ফেলবে। আর তার আওয়াজ হবে কম, নাজিল হবে আকাশ থেকে। যদি আপনি আমাদের কাছে এটা নিয়ে আসতে পারেন, তবে আমরা আপনার প্রতি ঈমান নিয়ে আসবো। অতঃপর তাদের প্রতিবাদে আয়াতটি নাজিল হয় যে, ইতঃপূর্বে তো ঈসা ও মুহাম্মদ ﷺ ব্যতীত অনেক নবী রাসূল অতিবাহিত হয়েছেন। তারা তো এ রকম মুজিযা তোমাদেরকে দেখিয়েছেন, এরপরও তোমরা তাদের প্রতি ঈমান আনবে দূরের কথা তাদের অনেককে হত্যা করেছ। যেমন- হযরত জাকারিয়া ও ইয়াহইয়া (আ.)। সুতরাং তোমাদের এ দাবি ভিত্তিহীন, পাশ কেটে যাওয়ার ছল-চাতুরী মাত্র।

হযরত আতা (র.) বলেন, বনী ইসরাঈলের লোকেরা আল্লাহর জন্য প্রাণী জবাই করে এর আতুড়ী ও পাকস্থলীর পাতল চর্বির আবরণ ও ভালো মাংসকে একটি ঘরের মাঝখানে রেখে দিত, আর ছাদ খোলা থাকত। অতঃপর নবী ঘরের মধ্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন। আর বনী ইসরাঈলের লোকেরা ঘরের বাহিরে দাঁড়িয়ে থাকত ঘরের চতুর্পাশে। তারপর আসমান থেকে একটা সাদা আগুন অবতীর্ণ হতো। যার আওয়াজ থাকত ক্ষীণ এবং কোনো ধুয়া থাকত না তাতে। আর এ আগুনটি ঐ কুরবানির বস্তুটিকে গ্রাস করে ফেলতো।

ইহুদিদের এ দাবি সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের দু'রকম মতামত পাওয়া যায়। যথা-

এক. ইমাম সুদ্দী (র.) বলেন, এ কথা তাওরাতে ছিল বটে, তবে শর্তের সহিত যে, এই মোজেজাটা হযরত ঈসা (আ.) ও হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর হবে না।

দুই. তাদের এ দাবিটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তাওরাতে এ রকম কোনো কথা ছিল না। ইহুদিদের মিথ্যা বলা ও সত্য গোপন করার কথা সুবিদিত। -[তাফসীরে কাবীর খ. ৫, পৃ. ১২৬]

قَوْلُهُ فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ الْاٰيَةَ : এই আয়াতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে যে, এদের অস্বীকার করার কারণে আপনি মনক্ষুণ্ন হবেন না। কেননা নবী না মানার বিষয়টা নতুন কিছু নয়, অস্বীকার করার ব্যাপারটা পূর্বের নবীদের সাথেও হয়ে আসছে।

অনুবাদ :

١٨٥. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ جَزَاءَ أَعْمَالِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ بُعِدَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ نَالَ غَايَةَ مَطْلُوبِهِ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا أَيِ الْعَيْشُ فِيهَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ الْبَاطِلِ يُتَمَتَّعُ بِهِ قَلِيلًا ثُمَّ يَفْنٰى.

১৮৫. প্রাণী মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করতে হবে এবং নিশ্চয় কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে পরিপূর্ণ ফল দেওয়া হবে। তথা তোমাদের আমলের প্রতিদান দেওয়া হবে। অতঃপর যাকে দোজখ হতে দূরে রাখা হবে এবং বেহেশতে প্রবেশ করানো হবে সেই সফলকাম হবে, তথা সে তার চূড়ান্ত অভীষ্ট পাবে। আর পার্থিব জীবন তথা পার্থিব জীবনের জীবন যাত্রা ধোঁকার ভোগ্যবস্তু ছাড়া কিছু না তথা বাতিল পণ্য ছাড়া কিছুই না, যা থেকে খুবই কম উপকৃত হওয়া যায়। অতঃপর ধ্বংস হয়ে যায়।

١٨٦. لَتُبْلَوُنَّ حُذِفَ مِنْهُ نُونُ الرَّفْعِ التَّوَالِي النُّونَاتِ وَالْوَاوُ ضَمِيرُ الْجَمْعِ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ لَتُخْتَبَرُنَّ فِيْ أَمْوَالِكُمْ بِالْفَرَائِضِ فِيهَا الْجَوَائِحِ وَأَنْفُسِكُمْ بِالْعِبَادَاتِ وَالْبَلَاءِ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا مِنَ الْعَرَبِ أَذًى كَثِيرًا مِنَ السَّبِّ وَالطَّعْنِ وَالتَّشْبِيبِ بِنِسَائِكُمْ وَإِنْ تَصْبِرُوا عَلٰى ذٰلِكَ وَتَتَّقُوا اللّٰهَ فَإِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ أَيْ مِنْ مَعْزُومَاتِهَا الَّتِي يُعْزَمُ عَلَيْهَا لِوُجُوبِهَا.

১৮৬. অবশ্য তোমাদেরকে তোমাদের ধনসম্পদে তার ফরজসমূহ ও বিপদ-বালা দিয়ে এবং জনসম্পদে ইবাদত ও মসিবত দিয়ে পরীক্ষা করা হবে। لَتُبْلَوُنَّ-এর মধ্যে পরস্পর তিনটি নূন একত্র হওয়ার কারণে রফার [পেশের] চিহ্ন নূনকে এবং দুই সাকিন একত্র হওয়ার কারণে বহুবচনের যমীর (و) ওয়াওকে বিলুপ্ত করা হয়েছে। এবং তোমরা পূর্ববর্তী আহলে কিতাব তথা ইহুদি ও খ্রিস্টান এবং আরবের মুশরিকদের তরফ থেকে অবশ্য বহু কষ্টদায়ক কথা তথা গালিগালাজ এবং তোমাদের মহিলাদের সাথে প্রেমযুক্ত কবিতা শ্রবণ করবে। আর যদি এতে ধৈর্যধারণ কর এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক তবে নিশ্চয় তা হবে সৎসাহসের কাজ, তথা ঐসব উদ্দিষ্টের অন্তর্ভুক্ত হবে যার প্রতি অভিপ্রায় করা হয় তা ওয়াজিব হওয়ার কারণে।

١٨٧. وَ اذْكُرْ إِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ أَيِ الْعَهْدَ عَلَيْهِمْ فِي التَّوْرٰةِ لَتُبَيِّنُنَّهُ أَيِ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ وَلَا يَكْتُمُونَهُ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ فِي الْفِعْلَيْنِ فَنَبَذُوهُ طَرَحُوا الْمِيثَاقَ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ فَلَمْ يَعْمَلُوا بِهِ وَاشْتَرَوْا بِهِ أَخَذُوا بَدَلَهُ ثَمَنًا قَلِيلًا مِنَ الدُّنْيَا مِنْ سَفَلَتِهِمْ بِرِيَاسَتِهِمْ فِي الْعِلْمِ فَكَتَمُوهُ خَوْفَ فَوْتِهِ عَلَيْهِمْ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ شِرَاؤُهُمْ هٰذَا.

১৮৭. আর স্মরণ কর ঐ সময়ের কথা যখন আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাবদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন তাওরাতে যে, তোমরা এই কিতাবখানি মানব জাতির নিকট প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না [ফে'ল দুটির মধ্যে يَا ، ও تَا ، -এর সাথে] তখন তারা তাকে তথা উক্ত অঙ্গীকারকে নিজেদের পেছনে ফেলে রাখল যে, তার উপর আমল করলো না, আর হীন মূল্যে একে বিক্রি করল। অর্থাৎ জ্ঞানে তাদের নেতৃত্ব থাকার কারণে তাদের নিম্নশ্রেণির লোকদের কাছ থেকে পার্থিব স্বল্পমূল্য তার বদলে গ্রহণ করল, এবং সেই অল্পমূল্যটুকু হাত ছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয়ে তারা সেই অঙ্গীকারকে তাদের উপর গোপন রাখল। অথচ তারা যা ক্রয় করল তা কতইনা নিকৃষ্ট।

١٨٨. لَا تَحْسَبَنَّ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا أَتَوْا فَعَلُوْا مِنْ اِضْلَالِ النَّاسِ وَيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا مِنَ التَّمَسُّكِ بِالْحَقِّ وَهُمْ عَلٰى ضَلَالٍ فَلَا يَحْسَبَنَّهُمْ بِالْوَجْهَيْنِ تَاكِيْدٌ بِمَفَازَةٍ بِمَكَانٍ يَنْجُوْنَ فِيْهِ مِنَ الْعَذَابِ فِى الْاٰخِرَةِ بَلْ هُمْ فِيْ مَكَانٍ يُعَذَّبُوْنَ فِيْهِ وَهُوَ جَهَنَّمُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ مُؤْلِمٌ فِيْهَا وَمَفْعُوْلًا يَحْسَبُ الْاُوْلٰى دَلَّ عَلَيْهِمَا مَفْعُوْلًا الثَّانِيَةِ عَلٰى قِرَاءَةِ التَّحْتَانِيَّةِ وَعَلَى الْفَوْقَانِيَّةِ حُذِفَ الثَّانِىْ فَقَطْ.

১৮৮. আপনি মনে করবেন না لَا تَحْسَبَنَّ শব্দটি تَاء ও يَاء যোগে যারা নিজেদের কৃতকর্মের তথা লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করার উপর আনন্দিত হয় এবং না করা বিষয়ের উপর তথা সত্য ধারণের উপর অথচ তারা গোমরাহীতে রয়েছে, প্রশংসা কামনা করে, তারা এমন স্থানে রয়েছে মনে করবেন না যে, যেখান থেকে আখিরাতে শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে; বরং তারা এমন স্থানে হবে যেখানে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা হবে, আর তা হচ্ছে দোজখ। فَلَا تَحْسَبَنَّ তাকিদের জন্য এসেছে। তাতেও পূর্বোক্ত উভয় পদ্ধতি তথা يَاء ও تَاء -এর সাথে পঠিত হবে। আর তাদের জন্য রয়েছে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। প্রথম لَا تَحْسَبَنَّ -এর উভয় মাফউল উহ্য রয়েছে। যার প্রতি দ্বিতীয় لَا يَحْسَبَنَّ -এর উভয় মাফউল ইঙ্গিত বহন করে يَاء যুক্ত কেরাত অনুযায়ী আর تَا যুক্ত কেরাত অনুযায়ী কেবল দ্বিতীয় মাফউল বিলুপ্ত হবে।

١٨٩. وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ خَزَائِنُ الْمَطَرِ وَالرِّزْقِ وَالنَّبَاتِ وَغَيْرِهَا وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ وَمِنْهُ تَعْذِيْبُ الْكَافِرِيْنَ وَاِنْجَاءُ الْمُؤْمِنِيْنَ.

১৮৯. আর আল্লাহর জন্যই হলো আসমান ও জমিনের রাজত্ব অর্থাৎ বৃষ্টির খাজানা, রিজিক ও উদ্ভিদ বৃক্ষাদিসহ প্রভৃতিতে রয়েছে কেবল তাঁরই রাজত্ব। আল্লাহই সর্ববিষয়ে ক্ষমতার অধিকারী। কাফেরদেরকে শাস্তি দেওয়া ও মুমিনদেরকে মুক্তি দেওয়ার বিষয়টিও তাঁর পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ - غُرُوْر বাবে قَوْلُهُ زُحْزِحَ - زَحْزَحَةٌ বিদূরীত করা, বিতাড়িত করা থেকে مَاضِى مَجْهُوْل -এর সীগাহ, نَصَرَ -এর মাসদার। ধোকা দেওয়া, প্রতারণা করা। আল্লাহ পাক এখানে দুনিয়াকে ঐ পণ্যের সহিত উপমা দিয়েছেন, যার উপর দাম-দরকারী ক্রেতাকে ধোঁকা দেওয়া হয়েছে। প্রতারিত হয়ে খরিদ করার পর ঐ পণ্য নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে সে অবগত হয়েছে আর সে প্রতারণা দানকারী হলো ইবলিস শয়তান قَوْلُهُ مَفَازَةٌ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ অর্থ- مَنْجَاةٌ মুক্তি পাওয়ার স্থান। বলা হয় فَازَ فُلَانٌ اَىْ نَجَا ইমাম ফাররা বলেন, بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ অর্থ بِبُعْدٍ مِنَ الْعَذَابِ - فَوْز এর এক অর্থ অপছন্দনীয় জিনিস থেকে দূরে থাকাও রয়েছে। -[তাফসীরে কাবীর, জামালাইন]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ : এ আয়াতটি ঐ চিরন্তন বাস্তব কথাটা বলা হয়েছে যে, মৃত্যু থেকে কেউই পলায়ন করে বাঁচতে পারবে না। প্রাণী মাত্রই মৃত্যুর স্বাদগ্রহণ করতে হবে। দুনিয়াতে ভালো মন্দ যে যেরূপ কাজ করেছে তাকে তার ই প্রতিদান দেওয়া যাবে। অতঃপর সফলতার মাপকাঠি বলতে গিয়ে ইরশাদ করেছেন যে, সফলতা হলো মূলত এই যে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে থেকেই তাঁর প্রভুকে সন্তুষ্ট করে নিয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে সে জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে গেছে। আর জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি পেয়ে গেছে। সেই প্রকৃত সফলকাম। পরিশেষে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার জীবন ধোকার সামান, যে ব্যক্তি নিজেকে হেফাজত করে চলে গেছে সেই ভাগ্যবান। আর যে এর ধোকায় গ্রেফতার হয়ে পড়েছে সে নিস্ফল, ব্যর্থ ও মনোরথ।

قَوْلُهُ وَلَتُبْلَوُنَّ فِيْ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ . (الاية)

ঈমানদারদের পরীক্ষা : মু'মিনদেরকে তাদের ঈমান অনুযায়ী পরীক্ষা করা হবে। এর আলোচনা সূরায়ে বাকারার ৫৫ নং আয়াতে চলে গেছে। আহলে কিতাব ও মুশরিকদের তরফ থেকে কষ্ট পৌছার মর্ম হলো এই যে, মুসলমানদেরকে ওদের তরফ থেকে দীনে ইসলামে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যতা, ইসলামের পয়গাম্বরের অবমাননা এবং তাদের গালি-গালাজ, অভিযোগ ও অর্থহীন কথাবার্তা শুনতে হবে। তাই তোমরা তাদের মোকাবিলায় সবর ও ইস্তেকামত অবলম্বন কর। এতে শত্রু ও মিত্রতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

আয়াতের শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে একটি ঘটনাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাই তখনও ইসলাম প্রকাশ করেনি এবং বদর যুদ্ধও অনুষ্ঠিত হয়নি, এমতাবস্থায় নবী করীম ﷺ হযরত সা'আদ বিন উবাদাকে অসুস্থাবস্থায় দেখতে গেলেন। রাস্তায় এক মজলিসে মুশরিক, কয়েকজন ইহুদি এবং আব্দুল্লাহ বিন উবাই প্রমুখ বসা ছিল। হুজুর ﷺ -এর সওয়ার হতে যে ধুলা-বালি উড়ল এতে আব্দুল্লাহ বিন উবাই অসুন্তুষ্টির প্রকাশ করল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তথায় থেমে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াতও দিলেন। এর উপর আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই কিছু বেয়াদবিমূলক কথাও বলে ফেলল। সেখানে কিছু মুসলমানও ছিলেন, তারা তার বিপরীত হুজুরের প্রশংসা করলেন। তাদের উভয়ের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। হুজুর ﷺ তাদের সকলকে নীরব করে দিলেন। অতঃপর হযরত সাআদের নিকট তশরিফ নিয়ে গেলেন। সেখানে হুজুর ﷺ সা'আদকেও এই ঘটনাটি শুনালেন। এর উপর সা'আদ (রা.) বললেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এসব এজন্য করছে যে, আপনার মদিনায় তশরিফ আনার পূর্বে মদিনার লোকেরা তাকে নেতা মানতো। আপনি আসার পর তার সেই নেতৃত্বের স্বপ্ন স্বাদ নষ্ট হয়ে গেছে, যার ফলে তার খুবই কষ্ট হচ্ছে। তার এসব কথা তার অন্তরে পোষিত সে বিদ্বেষেরই বহিঃপ্রকাশ। সুতরাং আপনি ক্ষমার সাথে কাজ গ্রহণ করুন!

قَوْلُهُ وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ . الخ : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক আহলে কিতাবদের ঐ অঙ্গীকারের কথা স্বরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, অঙ্গীকার তিনি তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন। আর তা হচ্ছে এই যে, তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, তোমরা তাওরাত কিতাবের শিক্ষার প্রচার প্রসার করবে। তাকে গোপন করে রাখবেনা। কিন্তু তারা তাওরাত পিছনে নিক্ষেপ করে ফেলে দিয়েছে। অর্থাৎ এর উপর আমল ছেড়ে দিয়েছে। আর হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর যে গুণাবলি তাওরাতে এসেছে তা গোপন করে রেখেছে। আর এই গোপন করে রাখার বিনিময়ে ঘৃণ্য বদল তথা কিছু পানাহারের দ্রব্য ও ঘুষ গ্রহণ করেছে। বস্তুত তারা সত্য গোপন করে রাখার বিনিময়ে যা নিজেদের জন্য বেছে নিয়েছে তা খুবই নিকৃষ্ট।

- হযরত কাতাদা (রা.) বলেন, আল্লাহ পাক ওলামাদের কাছ থেকে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন যে, যারা যা কিছু জানবে তা অন্যের কাছে গোপন করে রাখবে না। জ্ঞানের কথা গোপন করে রাখা ধ্বংসের কারণ।
- হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন আল্লাহ পাক আহলে কিতাবদের থেকে এই ওয়াদা নিয়েছিলেন যে, আমি তোমাদের কাছে যা কিছু বর্ণনা করবো তা গোপন করবে না। অতঃপর হুজুর ﷺ وَإِذْ أَخَذَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ الخ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন।
- হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যদি কারো কাছে এমন ইলমের কথা জিজ্ঞাসা করা হয় যা সে জানে, আর সে একে গোপন রাখল তবে তার মুখে কিয়ামতের দিন আগুনের লাগাম পরানো হবে।

–[মুসনাদে আহমদ, মুসতাদরাকে হাকিম; জামালাইন খ. ১, পৃ. ৫৭৬-৭৭. তাফসীরে মাযহারী খ. ২, পৃ. ৪৪৮ -৪৯]

অনুবাদ :

১৯০. إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِمَا مِنَ الْعَجَائِبِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِالْمَجِيْئِ وَالذَّهَابِ وَالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ لَاٰيٰتٍ دَلَالَاتٍ عَلٰى قُدْرَتِهٖ تَعَالٰى لِّاُولِي الْاَلْبَابِ لِذَوِي الْعُقُوْلِ ـ

১৯০. নিশ্চয় আসমান ও জমিনের সৃষ্টি এবং এর মধ্যে যা কিছু বিস্ময়কর বস্তুসমূহ রয়েছে তার সৃষ্টির মধ্যে এবং দিন ও রাত্রির আসা-যাওয়া, বৃদ্ধি ও হ্রাসের মধ্যে পরিবর্তনে বুদ্ধিমানদের জন্য আল্লাহর কুদরতের উপর প্রমাণ বহনকারী বহু নিদর্শন রয়েছে।

১৯১. الَّذِيْنَ نَعْتٌ لِمَا قَبْلَهٗ اَوْ بَدَلٌ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَعَلٰى جُنُوْبِهِمْ مُضْطَجِعِيْنَ اَىْ فِيْ كُلِّ حَالٍ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يُصَلُّوْنَ كَذٰلِكَ حَسْبَ الطَّاقَةِ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لِيَسْتَدِلُّوْا بِهٖ عَلٰى قُدْرَةِ صَانِعِهِمَا يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا الْخَلْقَ الَّذِيْ نَرَاهُ بَاطِلًا ـ حَالٌ عَبَثًا بَلْ دَلِيْلًا عَلٰى كَمَالِ قُدْرَتِكَ سُبْحٰنَكَ تَنْزِيْهًا لَكَ عَنِ الْعَبَثِ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

১৯১. اَلَّذِيْنَ পূর্বোক্ত اُولِى الْاَلْبَابِ থেকে সিফত হয়েছে অথবা বদল। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় তথা সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, যারা উল্লিখিতাবস্থায় সামার্থ্যানুযায়ী নামাজ পড়ে এবং আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা গবেষণা করে, যাতে করে তারা এর মাধ্যমে আসমান ও জমিন স্রষ্টার শক্তির উপর প্রমাণ পেশ করতে পারে। আর এই চিন্তা গবেষণার ফলাফল হিসেবে তাঁরা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! এসব সৃষ্টবস্তু যা আমরা দেখছি তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি; বরং এসব তোমার পরিপূর্ণ শক্তির প্রমাণ হিসেবে সৃষ্টি করেছ। সকল অনর্থক কাজ থেকে তুমি পবিত্র। আমাদেরকে তুমি দোজখের শাস্তি থেকে বাঁচাও।

১৯২. رَبَّنَا اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ لِلْخُلُوْدِ فِيْهَا فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ اَهَنْتَهٗ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ الْكَافِرِيْنَ فِيْهِ وَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ اِشْعَارًا بِتَخْصِيْصِ الْخِزْيِ بِهِمْ مِنْ زَائِدَةٌ اَنْصَارٍ اَعْوَانٍ يَمْنَعُوْنَهُمْ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ ـ

১৯২. হে আমাদের পালনকর্তা তুমি যাকে চিরদিনের জন্য দোজখে দাখিল কর, তাকে নিশ্চয় অপমান করেছ, আর জালেমদের তথা কাফেরদের জন্য তো কোনো সাহায্যকারী নেই। যারা তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। এখানে যমীরের ক্ষেত্রে ইসমে জাহির ব্যবহার করে অপমান তাদের জন্য খাছ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

١٩٣. رَبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ يَدْعُو النَّاسَ لِلْإِيْمَانِ أَيْ إِلَيْهِ وَهُوَ مُحَمَّدٌ أَوِ الْقُرْآنُ أَنْ أَيْ بِأَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا بِهٖ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ غَطِّ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا فَلَا تُظْهِرْهَا بِالْعِقَابِ عَلَيْهَا وَتَوَفَّنَا اِقْبِضْ أَرْوَاحَنَا مَعَ فِيْ جُمْلَةِ الْأَبْرَارِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصّٰلِحِيْنَ.

১৯৩. হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা এক আহ্বানকারীকে ঈমানের দিকে লোকদের আহ্বান করতে শুনেছি আর সেই আহ্বানকারী হলেন হযরত মুহাম্মদ ﷺ বা পবিত্র কুরআন। তিনি বলেছিলেন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। ফলে আমরা বিশ্বাস করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের গুনাহসমূহ মাফ কর এবং আমাদের দোষত্রুটি দূর করে দাও তথা ঢেকে নাও! সুতরাং এসবের উপর শাস্তি প্রদান করে আমাদের সামনে প্রকাশ করো না। আর নেককারদের দলের সাথে তথা নবীগণ ও পুণ্যবানদের সাথে আমাদের মৃত্যুদান কর তথা প্রাণসমূহ কবজ কর।

١٩٤. رَبَّنَا وَاٰتِنَا أَعْطِنَا مَا وَعَدْتَّنَا بِهٖ عَلٰى أَلْسِنَةِ رُسُلِكَ مِنَ الرَّحْمَةِ وَالْفَضْلِ وَسُؤَالُهُمْ ذٰلِكَ وَإِنْ كَانَ وَعْدُهٗ تَعَالٰى لَا يُخْلَفُ سُؤَالٌ أَنْ يَجْعَلَهُمْ مِنْ مُسْتَحِقِّيْهِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَتَيَقَّنُوْا اسْتِحْقَاقَهُمْ لَهٗ وَتَكْرِيْرُ رَبَّنَا مُبَالَغَةٌ فِي التَّضَرُّعِ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ الْوَعْدَ بِالْبَعْثِ وَالْجَزَاءِ.

১৯৪. হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তোমার রাসূলগণের জবানে দয়া ও কৃপার যে ওয়াদা তুমি আমাদের করেছ তা আমাদেরকে দান কর! আল্লাহর ওয়াদা যদিও লঙ্ঘিত হয় না, তারপরও তাদের সেই সুওয়ালটি এই জন্য যে, যাতে তিনি তাদেরকে উল্লিখিত বিষয়ের উপযুক্ত বানিয়ে দেন। কারণ তারা নিজেদেরকে এ ওয়াদার উপযুক্ত বলে ইয়াকীন করতে পারেনি। আর বারংবার (رَبَّنَا) হে আমাদের প্রতিপালক! বাক্যটি অনুনয়-বিনয়ের আধিক্য বুঝাবার স্বার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আর কিয়ামতের দিন তুমি আমাদেরকে অপমানিত করো না। নিশ্চয় তুমি পুনরুত্থান ও প্রতিদানের ওয়াদার খেলাফ কর না।

তাহকীক ও তারকীব

إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ الخ - إِنَّ খবরে لَاٰيٰتٍ - إِنَّ ইসমে الَّذِيْنَ الخ . أُولِي الْأَلْبَابِ এর সিফত বা বদল অথবা বয়ান। قِيَامًا ও قُعُوْدًا হাল হয়েছে يَذْكُرُوْنَ-এর যমীরে ফায়েল থেকে عَلٰى جُنُوْبِهِمْ-ও উহ্য শিবহে ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে হাল হয়েছে। অর্থাৎ كَائِنِيْنَ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ বা مُضْطَجِعِيْنَ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ - يَتَفَكَّرُوْنَ মা'তুফ হয়েছে يَذْكُرُوْنَ-এর উপর। بَاطِلًا . مَا خَلَقْتَ ফে'লের মাফঊলে লাহু হয়েছে অথবা তা থেকে হাল হয়েছে। سُبْحَانَكَ উহ্য ফে'ল أُسَبِّحُ-এর মাফঊলে মুতলাক। سُبْحَانَكَ তার পূর্বাপর বাক্যদ্বয়ের মধ্যে জুমলায়ে মু'তারিজা হিসেবে অবস্থিত হয়েছে। بَاطِل-এর অর্থ এখানে অনর্থক, অর্থহীন, বেকার।

قَوْلُهٗ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ : مِنْ أَنْصَارٍ-এর মধ্যে مِنْ অতিরিক্ত তাকিদের জন্য এসেছে। مِنْ أَنْصَارٍ পরে উক্ত মুবতাদা (مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ) ও لِلظّٰلِمِيْنَ পূর্বোক্ত খবর (خَبَرٌ مُقَدَّمٌ)

قَوْلُهٗ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ : মাওসূফ সিফত মিলে উহ্য মুবতাদা تَقَلُّبُهُمْ-এর খবর হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের শানে নুযূল : মক্কার কাফেরগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলল, আল্লাহ যে এক তার উপর একটি প্রমাণ আমাদেরকে দেখাও। তাদের এ কথার জবাবে আল্লাহ পাক إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الخ আয়াতটি নাজিল করলেন। –[হাশিয়াতুস সাবী খ. ১, পৃ. ১৯৬]

হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা.)-কে বললাম, হুজুর ﷺ থেকে প্রকাশিত অধিক আশ্চর্যজনক কোনো বিষয়ের ব্যাপারে আমাকে সংবাদ দেন। এ কথা শুনে হযরত আয়েশা (রা.) দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত কাঁদলেন অতঃপর বললেন, কি বলব? তাঁর তো প্রতিটি বিষয়ই আশ্চর্যজনক। তবে একটির কথা বলছি শুন। তিনি এক রাতে আমার কাছে আসলেন এবং লেপের নীচে শুয়ে পড়লেন। অতঃপর আমাকে বললেন, হে আয়েশা! যদি তুমি অনুমতি দাও তবে আমি আমার প্রতিপালকের কিছু ইবাদত করে আসি। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমি আপনার সান্নিধ্যকেও ভালোবাসী এবং আপনার উদ্দেশ্য সাধন হওয়াকেও ভালোবাসি। আমি আপনাকে অবশ্যই অনুমতি দিলাম যেতে পারেন। অতঃপর তিনি ঘরে রাখা একটি মুশকের দিকে গিয়ে খুবই স্বল্প পানি দ্বারা অজু করলেন। তারপর নামাজ পড়তে দাঁড়ালেন। নামাজে দাঁড়িয়ে কুরআন পাঠ করে ক্রন্দন করতে শুরু করে দেন, অতঃপর উচ্চ কণ্ঠে ক্রন্দন করতে থাকেন। তারপর নামাজ শেষ করে উভয় হাত উঠিয়ে দোয়াতে খুবই ক্রন্দন করলেন, এমনকি ক্রন্দনের কারণে চোখের পানিতে জমিন ভিজে গেছে। এমতাবস্থায় হযরত বেলাল (রা.) ফজরের নামাজের আজান দিতে এসে দেখেন হুজুর ﷺ ক্রন্দন করছেন। হযরত বেলাল (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনি ক্রন্দন করছেন অথচ আল্লাহ তা'আলা আপনার পূর্বাপর যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তদুত্তরে হুজুর ﷺ বললেন, আমি কি আল্লাহর শোকরগুজার বান্দা হব না? অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, কেন আমি ক্রন্দন করবো না, অথচ আল্লাহ পাক আজ রাতে إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الخ আয়াতটি নাজিল করেছেন। অতঃপর ইরশাদ করলেন, সেই ব্যক্তির ধ্বংস হোক, যে এ আয়াতটি তেলাওয়াত করল অথচ তার ফিকির করল না।

হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ঘুম থেকে উঠতেন তখন মেসওয়াক করতেন। অতঃপর আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতেন, إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الخ

হযরত হাসান বসরী (রা.) বলেছেন تَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِّنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ অর্থাৎ এক প্রহরের চিন্তা, ফিকির গোটা রাত্রির ইবাদত অপেক্ষা উত্তম এবং অধিক উপকারী। –[তাফসীরে কাবীর – ৫/১৩৯ ও মা'আরিফুল কুরআন]

আলোচ্য আয়াতে আসমান-জমিন তথা আল্লাহর সৃষ্টি জগতের মধ্যে চিন্তা ফিকির ও গবেষণা করার প্রতি উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কারণ তাতে রয়েছে আল্লাহ পাকের একত্ববাদের নিদর্শনাবলি। আর সেই নিদর্শনাবলির মাধ্যমে লোকেরা তাদের প্রভুর পরিচয় লাভ করতে পারবে যা হচ্ছে মানব জীবনের মূল উদ্দেশ্য।

আসমান ও জমিন সৃষ্টির উদ্দেশ্য : خَلْقٌ মাসদার। এর অর্থ হলো সৃষ্টি ও নতুন আবিষ্কার। উদ্দেশ্য হলো এই যে, আসমান ও জমিন সৃষ্টি করার মধ্যে আল্লাহর নিদর্শনাবলি রয়েছে। এসব নিদর্শন দ্বারা যে কোনো হাকিকত পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। শর্ত হলো তার আল্লাহ থেকে গাফেল না হওয়া, সৃষ্টি জগতের নিদর্শনগুলোকে চতুষ্পদ প্রাণীদের ন্যায় না দেখা বরং চিন্তাফিকির ও গবেষণার দৃষ্টিতে দেখা। যখন সে সৃষ্টি জগতের নেজামের মধ্যে চিন্তা ফিকির করে এবং আল্লাহ কুদরতের নিদর্শনাবলিকে প্রত্যক্ষ করে তখন এ বাস্তবতা তার সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে যে, এটা নিঃসন্দেহে বিজ্ঞ জনোচিত একটা ব্যবস্থাপনা। তখন সে বলে উঠে رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি এসব অনর্থক সৃষ্টি করেননি।

আর এ কথাও তার সামনে ভেসে উঠে, যে সৃষ্টিকে আল্লাহর চরিত্রের অনুভূতি দান করেছেন, যাদেরকে স্বাধীন হস্তক্ষেপের অধিকার দিয়েছেন, যাদেরকে বিবেক-বুদ্ধি দান করেছেন, ভালো মন্দ পার্থক্যের ক্ষমতা দিয়েছেন, তাদেরকে যে দুনিয়ার জীবনের আমলের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না এবং তাদেরকে নেকের উপর পুরস্কার ও পাপের শাস্তি যে প্রদান করা হবে না, তা হতেই পারে না। এরূপ বিশ্বজগতের নেজাম তথা পরিচালনার নীতিমালার উপর চিন্তা ভাবনা করলে তাদের অবশ্যই আখিরাতের ইয়াকীন অর্জন হয়ে যায়। আর আল্লাহর আজাব তথা শাস্তি থেকে পানাহ চাইতে শুরু করে বলতে থাকে سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি অবশ্যই সকল প্রকার দোষত্রুটি থেকে পবিত্র, সুতরাং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচাও।

তেমনিভাবে এই নিদর্শনাবলি প্রত্যেক্ষ করার কারণে তাদের অন্তর আত্মা এ কথার উপর শান্ত হয়ে পড়ে যে, পয়গাম্বর ﷺ এ বিশ্বজাহান ও তার শুরু এবং শেষ সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করেছেন এবং জীবন পরিচালনার জন্য যে পথ বাতলিয়ে দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে সত্য। আর অন্তরের জবানে বলতে লাগে– رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْإِيْمَانِ أَنْ آمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ .

তাদের এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ ছিল না যে, আল্লাহ তার ওয়াদাসমূহ পূরণ করবেন কিনা? তবে তাদের সন্দেহ এ ব্যাপারে ছিল যে, এই ওয়াদাসমূহের উপযুক্ত আমরাও হতে পারবো কিনা!

এই জন্য তারা আল্লাহর কাছে দোয়া করছে যে, আমাদেরকে এসব ওয়াদার উপযুক্ত বানিয়ে দিন। এ রকম যেন না হয় যে, আমরা তো দুনিয়াতেও পয়গাম্বরের উপর ঈমান এনে কাফেরদের উপহাস ও গালি-গালাজের পাত্র হয়ে রইলাম। আর কিয়ামতের দিনও এসব কাফেরদের সামনে আমরা লাঞ্ছিত হবো।

١٩٥. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ دُعَاءَهُمْ اَنِّيْ اَيْ بِاَنِّيْ لَآ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى بَعْضُكُمْ كَائِنٌ مِّنْ بَعْضٍ اَيِ الذُّكُوْرُ مِنَ الْاِنَاثِ وَبِالْعَكْسِ وَالْجُمْلَةُ مُؤَكِّدَةٌ لِمَا قَبْلَهَا اَيْ هُمْ سَوَاءٌ فِي الْمُجَازَاةِ بِالْاَعْمَالِ وَتَرْكِ تَضْيِيْعِهَا نَزَلَتْ لَمَّا قَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَا اَسْمَعُ اللّٰهَ ذِكْرَ النِّسَاءِ فِي الْهِجْرَةِ بِشَيْءٍ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْ مَكَّةَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ دِيْنِيْ وَقٰتَلُوا الْكُفَّارَ وَقُتِلُوْا بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِتَقْدِيْمِهٖ لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ اَسْتُرُهَا بِالْمَغْفِرَةِ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ثَوَابًا مَصْدَرٌ مِنْ مَعْنٰى لَاُكَفِّرَنَّ مُؤَكِّدٌ لَهٗ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ فِيْهِ الْتِفَاتٌ عَنِ التَّكَلُّمِ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ الْجَزَاءِ -

١٩٦. وَنَزَلَ لَمَّا قَالَ الْمُسْلِمُوْنَ اَعْدَاءُ اللّٰهِ فِيْمَا نَرٰى مِنَ الْخَيْرِ وَنَحْنُ فِي الْجَهْدِ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تَصَرُّفُهُمْ فِي الْبِلَادِ بِالتِّجَارَةِ وَالْكَسْبِ -

অনুবাদ :

১৯৫. অতঃপর তাদের প্রতিপালক কবুল করে নিলেন তাদের দোয়া এই বলে যে আমি তোমাদের পুরুষ ও নারীর মধ্য থেকে কোনো আমলকারীর আমল বিনষ্ট করি না। তোমরা একে অন্যের অংশ তথা পুরুষ মহিলার অংশ আর মহিলা পুরুষের অংশ। (لَآ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ) বাক্যটি জুমলায়ে মু'তারিযা বা পূর্বাপর বাক্যের সাথে সম্পর্কহীন বাক্য যা পূর্বের কথার তাকিদ হিসেবে এসেছে। অর্থাৎ আমলের প্রতিদান ও তা বিনষ্ট না করার ক্ষেত্রে তারা নারী পুরুষ সকলেই সমান। [فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا থেকে وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ] পর্যন্ত তখন নাজিল হয়েছে। যখন হযরত উম্মে সালমা (রা.) বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! হিজরতের কোনো বিষয়ে আল্লাহকে মহিলাদের কথা উল্লেখ করতে আমি শুনছি না। যারা মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেছে এবং তাদেরকে নিজের বাড়িঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। আর আমারই দীনের পথে অত্যাচারিত হয়েছেও কাফেরদের সাথে জিহাদ করেছে এবং নিহত হয়েছে। (قُتِلُوْا)-এর تَا বর্ণের তাখফীফ [সহজতা] ও তাশদীদের সাথে আরেক কেরাত قُتِلُوْا শব্দটি قُتِلُوْا-এর পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্যই আমি তাদের দোষত্রুটি দূরীভূত করে দেব, তথা ক্ষমা দ্বারা ঢেকে নেব। আর অবশ্যই আমি তাদেরকে কর্মফল স্বরূপ ঐ বেহেশতে প্রবেশ করাব, যার তলদেশে বহু নহর প্রবাহিত। ثَوَابًا শব্দটি لَاُكَفِّرَنَّ ক্রিয়ার অর্থ থেকে মাফউলে মুতলাক, যা তাকিদের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি হলো আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে বিনিময় এতে উত্তম পুরুষ থেকে নাম পুরুষের দিকে ইলতেফাত হয়েছে। বা বাচনভঙ্গির রূপ পরিবর্তন করা হয়েছে। আর আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম ছওয়াব প্রতিদান।

১৯৬. মুসলমনরা যখন বলল, আল্লাহর দুশমনদেরকে আমরা ভালো অবস্থায় দেখছি অথচ আমরা মুসলমান হওয়ার পরও কষ্টের মধ্যে আছি, তখন সামনের আয়াতটি নাজিল হয়েছে। নগরীতে কাফেরদের ব্যবসা ও উপার্জনের চালচলন যেন তোমাদেরকে ধোঁকা না দেয়।

١٩٧. هُوَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ يَتَمَتَّعُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا يَسِيرًا وَيَفْنَى ثُمَّ مَأْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ـ وَبِئْسَ الْمِهَادُ الْفِرَاشُ هِيَ ـ

১৯৭. এটা হলো সামান্য ফায়দা যা থেকে তারা দুনিয়াতে ফায়দা গ্রহণ করছে অতঃপর তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। তারপর তাদের ঠিকানা হবে দোজখ। আর এটা খুবই নিকৃষ্ট বিছানা।

١٩٨. لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ اَيْ مُقَدَّرِيْنَ الْخُلُوْدَ فِيْهَا نُزُلًا هُوَ مَا يُعَدُّ لِلضَّيْفِ وَنَصْبُهُ عَلَى الْحَالِ مِنْ جَنّٰتٍ وَالْعَامِلُ فِيْهَا مَعْنَى الظَّرْفِ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الثَّوَابِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا ـ

১৯৮. কিন্তু যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে প্রস্রবণ, তাতে তাঁরা চিরদিন থাকবে। তথা চিরদিন থাকাটা তাদের জন্য সাব্যস্ত করা হয়ে গেছে। তাতে আল্লাহর তরফ থেকে সদা আপ্যায়ন চলতে থাকবে। মেহমানদের জন্য যা কিছু প্রস্তুত করা হয় তাকে نُزُل বলে। نُزُلًا শব্দটি جَنّٰتٍ থেকে حَال হয়েছে। তাতে আমেল হলো যরফের অর্থ তথা ثَبَتَ لَهُمْ । আর নেককারদের জন্য আল্লাহর নিকট যা কিছু ছওয়াব রয়েছে তা একান্তই উত্তম দুনিয়ার সামগ্রী থেকে।

١٩٩. وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ كَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ وَاَصْحَابِهِ وَالنَّجَاشِيِّ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ اَيِ الْقُرْاٰنُ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ اَيِ التَّوْرٰىةُ وَالْاِنْجِيْلُ خٰشِعِيْنَ حَالٌ مِنْ ضَمِيْرِ يُؤْمِنُ مُرَاعًى فِيْهِ مَعْنٰى مَنْ اَيْ مُتَوَاضِعِيْنَ لِلّٰهِ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ الَّتِيْ عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ مِنْ نَعْتِ النَّبِيِّ ﷺ ثَمَنًا قَلِيْلًا مِنَ الدُّنْيَا بِاَنْ يَكْتُمُوْهَا خَوْفًا عَلَى الرِّيَاسَةِ كَفِعْلِ غَيْرِهِمْ مِنَ الْيَهُوْدِ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ ثَوَابُ اَعْمَالِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُؤْتَوْنَهُ مَرَّتَيْنِ كَمَا فِي الْقَصَصِ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ يُحَاسِبُ الْخَلْقَ فِيْ قَدْرِ نِصْفِ نَهَارٍ مِنْ اَيَّامِ الدُّنْيَا ـ

১৯৯. আর আহলে কিতাবদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও রয়েছে, যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনে। যেমন– আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) ও তার সাথিরা এবং নাজ্জাশী, আর যা কিছু তোমার উপর অবতীর্ণ হয় কুরআন এবং যা কিছু তাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে তথা তাওরাত ও ইঞ্জিল -এর উপর। আল্লাহর সামনে বিনয়াবনত থাকে। (خَاشِعِيْنَ) শব্দটি يُؤْمِنُ ফে'লের যমীর থেকে حَال হয়েছে, বহুবচন আনার ক্ষেত্রে لَمَنْ -এর মধ্যে উল্লিখিত مَنْ শব্দের অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। আর আল্লাহর আয়াতসমূহকে যা তাদের কাছে তাওরাত ও ইঞ্জিলে নবী করীম ﷺ -এর গুণাবলি থেকে রয়েছে তাকে দুনিয়ার স্বল্পমূল্যে বিক্রি করো না। অর্থাৎ তারা গোপন রাখে না তাঁর গুণাবলিকে তাদের নেতৃত্ব চলে যাওয়ার আশঙ্কায়, যেরূপ তারা ব্যতীত অন্যান্য ইহুদিরা তা করত। তারাই হলো সেসব লোক যাদের জন্য পারিশ্রমিক রয়েছে তথা আমলের ছওয়াব রয়েছে তাদের পালনকর্তার নিকট তাদেরকে দ্বিগুণ ছওয়াব প্রদান করা হবে,. যেরূপ সূরা কাসাসে বলা হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ পাক দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। তিনি সমগ্র মাখলুকের হিসাব নিয়ে নিবেন দুনিয়ার অর্ধদিন পরিমাণ সময়ের মধ্যে।

٢٠٠. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا عَلَى الطَّاعَاتِ وَالْمَصَائِبِ عَنِ الْمَعَاصِىْ وَصَابِرُوْا الْكُفَّارَ فَلَا يَكُوْنُوْا اَشَدَّ صَبْرًا مِنْكُمْ وَرَابِطُوْا اَقِيْمُوْا عَلَى الْجِهَادِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ فِىْ جَمِيْعِ اَحْوَالِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ تَفُوْزُوْنَ بِالْجَنَّةِ وَتَنْجُوْنَ مِنَ النَّارِ .

২০০. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আনুগত্যে, বিপদাপদে এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার উপর ধৈর্যধারণ কর এবং কাফেরদের মোকাবিলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর, তারা যেন তোমাদের চেয়ে অধিক দৃঢ়তা অবলম্বনকারী হতে পারে। আর জিহাদের জন্য প্রস্তুত থাক এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করতে থাক। হয়তো তোমরা সফলকাম হবে। জান্নাত লাভে সফল হবে এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে।

তাহকীক ও তারকীব

نُزُلًا পূর্বোক্ত جَنّٰتٌ থেকে হাল হয়েছে। نُزُل বলা হয় ঐ খাবারকে যা অতিথিকে আপ্যায়নের জন্য প্রস্তুত করা হয়।

قَوْلُهٗ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اصْبِرُوْا - صَبْر -এর শাব্দিক অর্থ হলো, বিরত রাখা ও বাঁধা। আর কুরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় এর অর্থ হলো নফসকে তার প্রকৃতি বিরুদ্ধ বিষয়ের উপর জমিয়ে রাখা।

مُصَابَرَةٌ বাবে মুফা'আলার মাসদার। صَبْر থেকেই নির্গত। এর অর্থ হলো– শত্রুর মোকাবিলা করতে গিয়ে দৃঢ়তা অবলম্বন করা।

صَبْر ও مُصَابَرَة -এর পার্থক্য : মানুষের আস্থা দু'রকম, **এক.** যা তার একা নিজের সাথে সম্পৃক্ত। **দুই.** যা তার এবং অন্যের মধ্যে যৌথ। প্রথমটিতে সবরের প্রয়োজন হয়ে থাকে আর দ্বিতীয়টিতে প্রয়োজন মুসাবারার। আর مُرَابَطَة -এর অর্থ হলো ঘোড়াকে বাঁধা এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। ইসলামি রাষ্ট্রের সীমান্তের হেফাজত করার লক্ষ্যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকাকেই রেবাত বা মোরাবাত বলা হয়।

–[তাফসীরে হক্কানী, তাফসীরে কাবীর, হাশিয়াতুস সাবী ও মা'আরিফুল কুরআন]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ : এদের দোয়া ও দরখাস্তের জবাবে আল্লাহপাক ইরশাদ করলেন, আমি তোমাদের কারো আমল নষ্ট করবো না। চাই সে পুরুষ হোক বা মহিলা। একথা বলার কারণ হলো এই যে, ইসলাম বিভিন্ন বিষয়ে জন্মগত কিছু গুণের ব্যবধানের কারণে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে পার্থক্য করেছে। যেমন কর্তৃত্ব ও শাসক হওয়ার ক্ষেত্রে, রুজি রোজগারের দায়িত্বে, জিহাদে অংশ গ্রহণের বেলায় এবং উত্তরাধিকার সূত্রে অর্ধেক অংশ পাওয়ার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করা হবে। এরকম মোটেই করা হবে না; বরং প্রত্যেক নেক কাজের ছওয়াব একজন পুরুষ করলে যেরূপ পাবে তেমনিভাবে ঐ কাজটি কোনো মহিলা করলে সেও পুরুষের সমানই পাবে। –[তাফসীরে কুরতুবী, ইবনে কাছীর]

قَوْلُهٗ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِى الْبِلَادِ الخ : এই আয়াতের মধ্যে সম্বোধন যদিও রাসূল ﷺ -কে করা হয়েছে বটে; কিন্তু উদ্দেশ্য পুরা উম্মত। কারণ তাঁর তো কাফেরদের যে কোনো কাজ দ্বারা প্রতারিত হওয়ার আশঙ্কা নেই। সুতরাং অর্থ হবে – لَا يَغُرَّنَّكَ اَيُّهَا السَّامِعُ –[তাফসীরে কাবীর খ. ৫, পৃ. ১৫৮, ও হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১, পৃ. ৩৪৯]

আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল : আল্লামা বগবী (র.) লিখেছেন যে, পৌত্তলিকেরা ব্যবসা-বাণিজ্য করতো, আর্থিক স্বচ্ছলতার কারণে আনন্দ উল্লাসে থাকতো। তাদের এই অবস্থা দেখে কোনো কোনো মুসলমানের মনে এই ভাবনা আসল যে, এই পৌত্তলিকরা আল্লাহর দুশমন হওয়া সত্ত্বেও এত স্বচ্ছল অবস্থায় এত আনন্দ উল্লাসে জীবনযাপন করে, অথচ আমরা মুমিন হওয়া সত্ত্বেও এত অভাব-অনটনের কষ্টে কালযাপন করি। তখন এই আয়াতটি মুমিনদেরকে সান্ত্বনা ও ধৈর্যধারণ করার উদ্দেশ্যে নাজিল হয়েছে । -[তাফসীরে মাযহারী খ. ২, পৃ. ৪৬৩, কাবীর খ. ৫, পৃ. ১৯]

قَوْلُهُ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ الخ : আলোচ্য আয়াতে ঐসব আহলে কিতাবের আলোচনা করা হয়েছে যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর ঈমান এনে ধন্য হয়েছিল। তাদের ঈমান ও ঈমানী গুণাবলি উল্লেখ করে আল্লাহ পাক তাদেরকে অন্যান্য আহলে কিতাবদের থেকে পার্থক্য করে দিয়েছেন। যারা সর্বদা ইসলাম মুসলমান ও নবীর বিরুদ্ধাচারণে লিপ্ত থাকতো। যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লেগেই থাকতো এবং আসমানি কিতাবের তাওরাত ইঞ্জিলের বিকৃতি ঘটাতো।

আয়াতের শানে নুযূল : হযরত ইমাম নাসায়ী হযরত আনাস (রা.)-এর বর্ণনা এবং ইবনে জারীর হযরত জাবের (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, যখন নাজ্জাশীর মৃত্যুর খবর আসে তখন প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করলেন,তার উপর তোমরা জানাজার নামাজ পড়। কেউ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি একজন হাবশী গোলামের উপর নামাজ পড়বো? তখন এই আয়াতটি নাজিল হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা.)-ও বলেছেন এই আয়াতটি নাজ্জাশী সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।

হযরত আতা (রা.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়েছে ৪০ জন্য নাজরানবাসী সম্পর্কে। যাদের ৩২ জন ছিল আবিসিনিয়ার অধিবাসী। আর ৮ জন ছিল রোমের অধিবাসী। এরা ইতঃপূর্বে হযরত ঈসা (আ.)-এর ধর্মের অনুসারী ছিলেন। পরে তারা ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইবনে জারীর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এই আয়াত নাজিল হয়েছে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম এবং তার সাথিদের সম্পর্কে। আর মুজাহিদ (র.) বলেছেন, এই আয়াত নাজিল হয়েছে সে সমস্ত আহলে কিতাবদের সম্পর্কে যারা প্রিয়নবী ﷺ -এর উপর বিশ্বাস করেছিল। -[তাফসীরে মাযহারী খ. ২, পৃ. ৪৬৫-৬৬]

قَوْلُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا الخ : এ আয়াতটি সূরা আলে ইমরানের সর্বশেষ আয়াত। মুসলমানদের জন্য এতে অতি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়ের নসিহত করা হয়েছে। সমগ্র সূরার সারমর্ম যেন এ আয়াতটিতেই অতি সংক্ষেপে বিবৃত হয়ে গেছে। এতে প্রথমত সবরের নসিহত করা হয়েছে।

ছবরের অর্থ ও প্রকারভেদ : সবরের অর্থ শব্দ বিশ্লেষণে বর্ণনা করা হয়েছে। সবর চার প্রকার।

১. তাওহীদ, ইনসাফ, নবুয়ত ও আখিরাত পরিচয়ের ব্যাপারে চিন্তা-ফিকির গবেষণা ও প্রমাণাদি পেশ করার কষ্টের উপর সবর বা ধৈর্যধারণ করা এবং ইসলাম বিরোধীদের আরোপিত অভিযোগ ও সন্দেহের জবাব বের করার কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করা।

২. ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও মোস্তাহাব বিষয়াদি পালন করার কষ্টের উপর সবর করা, যাকে 'সবর আলাত্তাআত' বলা হয়।

৩. নিষিদ্ধ ও শরিয়ত গর্হিত কর্মকাণ্ড থেকে বেঁচে থাকার কষ্টের উপর সবর করা। যাকে 'সবরে আনিল মা'সিয়্যাত' বলা হয়।

৪. অসুস্থতা, দরিদ্রতা, দুর্ভিক্ষ ও ভয়-ভীতি প্রভৃতি দুনিয়ার বিপদাপদ ও বালা মসিবতের কষ্টে ধৈর্য-ধারণ করা, যাকে 'সবর আলাল মাসায়েব' বলা হয়।

اِصْبِرُوْا তোমরা সবর কর। এ নির্দেশের মধ্যে উল্লিখিত সকল প্রকার সবরই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

আর মুসাবারার অর্থ হলো, শত্রুর মোকাবিলা করতে গিয়ে দৃঢ়তা অবলম্বন করা।

মুরাবাতার অর্থ : মুরাবাতার ব্যাখ্যায় তাফসীরবিদগণের দুটি উক্তি রয়েছে। যথা-

১. মুজাহিদগণের ঘোড়াকে বাঁধা এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং ইসলামি রাষ্ট্রের সীমান্ত হেফাজতে সুসজ্জিত থাকা যাতে শত্রুরা ইসলামি রাষ্ট্রের কোনো ক্ষতি সাধন করতে না পারে।
   আল্লাহ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি একদিন ও একরাত আল্লাহর রাস্তায় তথা যুদ্ধে পাহারাদারী করবে সে এক মাস নামাজ ও এক মাস রোজা রাখার সমপরিমাণ ছওয়াব পাবে।

২. মুরাবাতার দ্বিতীয় অর্থ হলো, জামাতের সাথে এক নামাজ আদায় করার পর দ্বিতীয় নামাজের অপেক্ষায় থাকা।

এই আয়াতের সর্বশেষে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাকওয়ার, যা এ সমুদয় কাজের প্রাণ এবং আমল কবুল হওয়ার জন্য অপরিহার্য। শরিয়তের যাবতীয় হুকুম আহকামের ক্ষেত্রেই এ সমস্ত বিষয় প্রযোজ্য।

-[তাফসীরে কাবীর খ. ৫, পৃ. ১৬১ ও মা'আরিফুল কুরআন]

আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে এসব আহকামের উপর আমল করার পুরোপুরী তৌফিক দান করুন। আমীন!

سُوْرَةُ النِّسَاءِ مَدَنِيَّةٌ : সূরা নিসা মদিনায় অবতীর্ণ

مِائَةٌ وَّخَمْسٌ اَوْ سِتٌّ اَوْ سَبْعٌ وَّسَبْعُوْنَ اٰيَةً

এতে ১৭৫ বা ১৭৬ মতান্তরে ১৭৭ টি আয়াত রয়েছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

১. يٰاَيُّهَا النَّاسُ اَىْ اَهْلُ مَكَّةَ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ اَىْ عِقَابَهُ بِاَنْ تُطِيْعُوْهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ اٰدَمَ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا حَوَّاءَ بِالْمَدِّ مِنْ ضِلْعٍ مِنْ اَضْلَاعِهِ الْيُسْرٰى وَبَثَّ فَرَّقَ وَنَشَرَ مِنْهُمَا مِنْ اٰدَمَ وَحَوَّاءَ رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً كَثِيْرَةً وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَّاءَلُوْنَ فِيْهِ اِدْغَامُ التَّاءِ فِى الْاَصْلِ فِى السِّيْنِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالتَّخْفِيْفِ بِحَذْفِهَا اَىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ فِيْمَا بَيْنَكُمْ حَيْثُ يَقُوْلُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ اَسْأَلُكَ بِاللّٰهِ وَاَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ وَ اتَّقُوا الْاَرْحَامَ اَنْ تَقْطَعُوْهَا وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى الضَّمِيْرِ فِىْ بِهِ وَكَانُوْا يَتَنَاشَدُوْنَ بِالرَّحِمِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا حَافِظًا لِاَعْمَالِكُمْ فَيُجَازِيْكُمْ بِهَا اَىْ لَمْ يَزَلْ مُتَّصِفًا بِذٰلِكَ ـ

অনুবাদ :

১. হে মানবমণ্ডলী তথা মক্কাবাসী। তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালককে তথা আনুগত্য স্বীকার করে তাঁর শাস্তিকে ভয় কর। যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি আদম থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তাঁর থেকেই তাঁর সঙ্গিনীও সৃষ্টি করেছেন। তথা হাওয়া (আ.) কে তাঁর বাম পাঁজরের বক্রতম হাড্ডি থেকে সৃষ্টি করেছেন। حَوَّاء শব্দটি মদের সাথে। আর বিস্তার করেছেন তাঁদের উভয় তথা আদম ও হাওয়া (আ.) থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর ভয় কর সেই আল্লাহকে যাঁর নামে তোমরা একে অন্যের নিকট সাহায্য প্রার্থী হও। تَسَّاءَلُوْنَ -এর মধ্যে দুটি কেরাত রয়েছে– ১. দ্বিতীয় تَاء -কে সীন দ্বারা পরিবর্তন করে প্রথম সীনকে দ্বিতীয় সীনের মধ্যে ইদগাম বা সন্ধি করা অর্থাৎ تَسَّاءَلُوْنَ ২. দ্বিতীয় تَاء কে বিলুপ্ত করে তথা تَسَاءَلُوْنَ অর্থাৎ যার পদ্ধতি হলো এই যে, তোমরা একে অপরকে বল যে, আমি তোমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে জিজ্ঞাসা করছি বা তোমাকে আল্লাহর নামে শপথ দিচ্ছি। আর আত্মীয়তা সম্পর্ক নষ্ট করা থেকে বেঁচে থাক। اَلْاَرْحَامَ -এর এক কেরাত যেরের সাথে بِهٖ -এর যমীরের উপর আতফ করে। আর আরববাসীগণ পরস্পরে একে অন্যকে আত্মীয়তা সম্পর্কেও শপথ দিত। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। অর্থাৎ তিনি তোমাদের যাবতীয় আমল সংরক্ষণ করে রাখেন, সুতরাং তিনি এর প্রতিদান তোমাদেরকে দেবেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এ সংরক্ষণ গুণে সর্বদাই গুণান্বিত।

٢. وَنَزَلَ فِيْ يَتِيْمٍ طَلَبَ مِنْ وَلِيِّهِ مَالَهُ فَمَنَعَهُ وَاٰتُوا الْيَتٰمٰى الصِّغَارَ الْاُلٰى لَا اَبَ لَهُمْ اَمْوَالَهُمْ اِذَا بَلَغُوْا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ الْحَرَامَ بِالطَّيِّبِ الْحَلَالِ اَىْ تَأْخُذُوْهُ بَدَلَهُ كَمَا تَفْعَلُوْنَ مِنْ اَخْذِ الْجَيِّدِ مِنْ مَالِ الْيَتِيْمِ وَجَعْلَ الرَّدِئِ مِنْ مَالِكُمْ مَكَانَهُ وَلَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَهُمْ مَضْمُوْمَةً اِلٰى اَمْوَالِكُمْ اِنَّهُ اَىْ اَكْلَهَا كَانَ حُوْبًا ذَنْبًا كَبِيْرًا عَظِيْمًا .

২. সামনের আয়াতটি একজন এতিম সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যে তার অলীর কাছে তার মাল চাওয়ার পর সে দিতে অস্বীকার করেছিল। আর এতিমদেরকে তথা ঐ সকল ছোট ছেলেমেয়েদেরকে যাদের পিতা নেই, তাদের ধনসম্পদ দিয়ে দাও যখন তারা সাবালক হয়ে যায়। আর নিকৃষ্ট সম্পদের তথা হারামের বিনিময়ে উৎকৃষ্ট সম্পদ তথা হালাল বদল করো না তথা গ্রহণ করো না। যেরূপ তোমরা এতিমের উৎকৃষ্ট মাল নিয়ে তার জায়গায় তোমাদের নিকৃষ্ট মাল রেখে দিয়ে থাক। আর তাদের মাল নিজেদের মালের সাথে সংমিশ্রিত করে গ্রাস করো না। নিশ্চয়ই এটা তথা তাদের সম্পদ গ্রাস করা মহাপাপ।

٣. وَلَمَّا نَزَلَتْ تَحَرَّجُوْا مِنْ وَلَايَةِ الْيَتٰمٰى وَكَانَ فِيْهِمْ مَنْ تَحْتَهُ الْعَشْرُ اَوِ الثَّمَانُ مِنَ الْاَزْوَاجِ فَلَا يَعْدِلُ بَيْنَهُنَّ فَنَزَلَتْ وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا تَعْدِلُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَتَحَرَّجْتُمْ مِنْ اَمْرِهِمْ فَخَافُوْا اَيْضًا اَلَّا تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ اِذَا نَكَحْتُمُوْهُنَّ فَانْكِحُوْا تَزَوَّجُوْا مَا بِمَعْنٰى مَنْ طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ اَىْ اِثْنَيْنِ اِثْنَيْنِ وَثَلَاثًا ثَلَاثًا وَاَرْبَعًا اَرْبَعًا وَلَا تَزِيْدُوْا عَلٰى ذٰلِكَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فِيْهِنَّ بِالنَّفَقَةِ وَالْقَسْمِ فَوَاحِدَةً اَنْكِحُوْهَا اَوْ اِقْتَصِرُوْا عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنَ الْاِمَاءِ اِذْ لَيْسَ لَهُنَّ مِنَ الْحُقُوْقِ مَا لِلزَّوْجَاتِ ذٰلِكَ اَىْ نِكَاحُ الْاَرْبَعِ فَقَطْ اَوِ الْوَاحِدَةِ وَالتَّسَرِّىْ اَدْنٰى اَقْرَبُ اِلٰى اَلَّا تَعُوْلُوْا تَجُوْرُوْا .

৩. আলোচ্য আয়াতটি যখন নাজিল হলো তখন লোকেরা এতিমদের দায়িত্ব গ্রহণে জটিলতায় পড়ে গেল। অথচ তখন তাদের মধ্যে কারো অধীনে দশজন কারো আটজন স্ত্রী ছিল, যাদের মধ্যে ইনসাফ রক্ষা করে চলতে পারছিল না। [তাদের সেই জটিলতার নিরসন কল্পে] সামনের আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আর যদি তোমরা ভয় কর যে, এতিম মেয়েদের প্রতি ইনসাফ করতে পারবে না, আর তোমরা তাদের ব্যাপারে গুনাহ থেকে বাঁচতে চাও এবং এই এতিম মেয়েদেরকে বিয়ে করার অবস্থায়ও ইনসাফ না করার আশঙ্কা বোধ কর, তবে এতিম মেয়েরা ছাড়া অন্য মহিলাদেরকে বিয়ে করে নাও যাদেরকে তোমাদের ভালো লাগে দুই দুই, তিন তিন কিংবা চার চারটি করে, এর ঊর্ধ্বে যাবে না। তবে যদি তোমাদের আশঙ্কা হয় যে, তাদের মধ্যেও ভরণপোষণ ও বারীর ক্ষেত্রে ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে একজনকে বিয়ে কর। অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত বাঁদিতেই ক্ষান্ত থাক। কেননা বাঁদিদের ঐ অধিকার থাকে না যা স্ত্রীদের জন্য হয়ে থাকে। এতেই তথা চারজনের সঙ্গে বিয়ে বা একজনের সঙ্গে অথবা দাসীর উপর ক্ষান্ত থাকাতেই পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিকতর সম্ভবনা।

৪. وَاٰتُوا اَعْطُوا النِّسَاۤءَ صَدُقٰتِهِنَّ جَمْعُ صَدُقَةٍ مُهُوْرَهُنَّ نِحْلَةً مَصْدَرٌ عَطِيَّةً عَنْ طِيْبِ نَفْسٍ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَیْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا تَمْيِيْزٌ مُحَوَّلٌ عَنِ الْفَاعِلِ اَیْ اِنْ طَابَتْ اَنْفُسُهُنَّ لَكُمْ عَنْ شَیْءٍ مِّنَ الصَّدَاقِ فَوَهَبْنَهُ لَكُمْ فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا طَيِّبًا مَّرِيْئًا مَحْمُوْدَ الْعَاقِبَةِ لَا ضَرَرَ فِيْهِ عَلَيْكُمْ فِی الْاٰخِرَةِ نَزَلَ رَدًّا عَلٰی مَنْ كَرِهَ ذٰلِكَ .

৪. আর তোমরা স্ত্রীগণকে তাদের মোহর দিয়ে দাও সন্তুষ্ট চিত্তে। صَدُقَةٌ - صَدُقَاتٌ -এর বহুবচন। অর্থ- মোহর। نِحْلَةً অর্থ- সন্তুষ্ট চিত্তে দান করা। তারা যদি খুশি হয়ে তা থেকে কিছু অংশ ছেড়ে দেয় نَفْسًا শব্দটি ফায়েল থেকে পরিবর্তিত হয়ে তামঈয হয়েছে। বাক্যের আসল রূপ ছিল- طَابَتْ اَنْفُسُهُنَّ لَكُمْ مِنْ شَیْءٍ مِّنَ الصَّدَاقِ فَوَهَبْنَهُ لَكُمْ তবে তা তোমরা সানন্দে ভোগ করতে পার। অর্থাৎ তা খাওয়ার মধ্যে আখেরাতে তোমাদের জন্য কোনো ক্ষতি নেই। এ আয়াতটি তাদের ধারণা খণ্ডনের জন্য নাজিল হয়েছে যারা একে অপছন্দ মনে করত।

তাহকীক ও তারকীব

يَاَيُّهَا النَّاسُ বলে কেবল মক্কাবাসীদেরই সম্বোধন করা হয়নি, যেরূপ গ্রন্থকার হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর মতানুসারে বলেছেন। বরং তারাসহ কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত সকল মানুষই এর পরোক্ষ সম্বোধিত। কেননা তাকওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তোমাদেরকে আল্লাহ একই সত্তা তথা হযরত আদম (আ.) থেকে সৃষ্টি করেছেন। আর তাঁর থেকে সৃষ্ট হওয়ার মধ্যে তো সকল মানুষই শামিল। তাই এ সম্বোধনটিও সকলের জন্য ব্যাপক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, প্রসিদ্ধ কায়দা অনুযায়ী মক্কী আয়াতে يَاَيُّهَا النَّاسُ বলে আর মদনী আয়াতে يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বলে সম্বোধন করা হয়ে থাকে। অথচ সূরা নিসা পূর্ণটাই মদনী হওয়া সত্ত্বেও يَاَيُّهَا النَّاسُ বলে সম্বোধনের কারণ কি? এর জবাবে বলা যায় যে, এই কায়দাটা সামগ্রিক নয়; বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে হযরত আদম (আ.)। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আদমকে যেহেতু আদীম তথা মাটির সমগ্র উপরিভাগ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে তাই তাকে আদম বলা হয়। মাটির উপরিভাগে লাল, কালো, উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট সব ধরনের রংই ছিল, তাই তাঁর সন্তানদের মধ্যে লাল, কালো, সাদা, উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট হয়ে থাকে।

قَوْلُهٗ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا : স্ত্রীলিঙ্গে زَوْجٌ ও زَوْجَةٌ উভয়টাই ব্যবহার হয় ,তবে زَوْجٌ টাই অধিকতর বিশুদ্ধ। এখানে আদমের স্ত্রী হাওয়াকে زَوْجٌ বলা হয়েছে। হযরত حَوَّاءُ (আ.) যেহেতু حَیٌّ তথা জীবিত আদমের বাম পাঁজরের বক্রতম হাড্ডি থেকে সৃষ্ট হয়েছে তাই তাকে হাওয়া বলে নামকরণ করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَبَثَّ مِنْهُمَا : بَثًّا (ن) بَثٌّ বিস্তার করা। قَوْلُهٗ تَسَاۤءَلُوْنَ আসিম, হামযা ও কাসায়ী কারী সাহেবগণ تَسَاءَلُوْنَ পাঠ করেছেন, আর বাকীরা تَسَّاۤءَلُوْنَ পড়েছেন।

প্রথম কেরাতে সহজ করণার্থে বাবে تَفَعُّلٌ -এর প্রথম [তা] কে বিলুপ্ত করা হয়েছে, আর দ্বিতীয় কেরাতে [تَاءٌ তা] কে সীন سِيْن দ্বারা পরিবর্তন করে প্রথম سِيْن সীনকে দ্বিতীয় سِيْن সীনে ইদগাম করা হয়েছে। কারণ সরফীদের একটি নীতি হলো যে, তারা পরস্পর নিকটবর্তী মাখরাজের দুই হরফকে একত্রে পেলে কোনো সময় সহজ করণার্থে বিলুপ্ত আবার কখনো প্রথমটিকে দ্বিতীয়টি দ্বারা পরিবর্তন করে ইদগাম করে থাকেন। قَوْلُهٗ وَالْاَرْحَامَ - رَحِمٌ -এর বহুবচন। رَحِمٌ অর্থ – আত্মীয়তা সম্পর্ক, জরায়ু। এখানে আত্মীয়তার সম্পর্ক উদ্দেশ্য। اَلْاَرْحَامَ কে اِتَّقُوْا উহ্য ফেলের মাফউল হিসেবে যবর যুক্তও পড়া যায়, যেরূপ অধিকাংশ কারীগণ পাঠ করেছেন, এবং بِهٖ তে উল্লিখিত যেরযুক্ত যমীরের উপর আত্‌ফ করে মাজরূরও পড়া যেতে পারে। কাশশাফ প্রণেতা বলেছেন, উহ্য খবরের মুবতাদা হিসেবে মারফূ' ও পড়া যেতে পারে। তখন বাক্যের রূপ হবে

قَوْلُهُ وَاٰتُوا الْيَتٰمٰى اَمْوَالَهُمْ - وَالْاَرْحَامَ كَذٰلِكَ : يَتٰمٰى - يَتِيْمٌ -এর বহুবচন। এতিম বলা হয় ঐ বাচ্চাকে, যার পিতা নেই, মারা গেছে। আর অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে এতিম বলা হয়, যার মাতা নেই। يَتِيْمٌ শব্দটি يُتْمٌ একা হয়ে পড়া থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, يَتِيْمٌ শব্দটি فَعِيْلٌ -এর ওযনে হয়েছে। আর فَعِيْلٌ -এর ন্যায় শব্দের বহুবচন فَعْلٰى -এর ওজনে এসে থাকে فَعَالٰى -এর ওজনে নয়। যেমন- مَرِيْضٌ - مَرْضٰى ,قَتِيْلٌ - قَتْلٰى ও جَرِيْحٌ - جَرْحٰى। এই কায়দা অনুযায়ী يَتِيْمٌ -এর বহুবচন يَتْمٰى আসার কথা ছিল يَتَامٰى আসল কেন? এর জবাবে কাশ্‌শাফ প্রণেতা বলেন, يَتِيْمٌ -এর বহুবচন يَتْمٰى আর يَتْمٰى -এর বহুবচন হলো يَتَامٰى। অথবা বলা যাবে, يَتِيْمٌ -এর বহুবচন يَتَائِمُ। অতঃপর কলবে মকানী করে يَتَامٰى করা হয়েছে। ইমাম কাফফাল বলেছেন, يَتِيْمٌ -এর বহুবচন يَتَامٰى ও আসতে পারে। যেরূপ نَدِيْمٌ -এর জমা نَدَامٰى এসে থাকে। এছাড়া يَتِيْمٌ -এর জমা اَيْتَام আসে। যেরূপ شَرِيْف -এর জমা আসে اَشْرَاف।

এখানে আরো একটি প্রশ্ন হয় যে, আয়াতে বালেগ হওয়ার পর এতিমদেরকে তাদের মাল বুঝিয়ে দিতে বলা হয়েছে। এবারে প্রশ্ন হয়, বালেগ হয়ে যাওয়ার পর তো আর তারা এতিম রইল না। সুতরাং এতিমদেরকে তাদের মাল দেওয়ার নির্দেশ কেমন করে হলো। এর জবাবে বলা হয়েছে, এখানে শাব্দিক অর্থে বালেগদেরকেও এতিম বলে দেওয়া হয়েছে। শরয়ী অর্থে নয়। শরিয়তে পিতৃহীন বালেগ লোকদেরকে এতিম না বললে শাব্দিক অর্থে বলা হয়ে থাকে। আর এখানে শাব্দিক অর্থটাই প্রযোজ্য। অথবা রূপক অর্থে مَجَازُ مَا كَانَ -এর প্রেক্ষিতে তাদেরকে এতিম বলা হয়েছে। কেননা এখন যদিও তারা বালেগ হয়ে যাওয়ার দরুন শরিয়তের দৃষ্টিতে এতিম থাকেনি, তবে নিকট অতীতে তো অবশ্যই ছিল। حُوْبًا অর্থ কবীরা গুনাহ। এতে حَابَ ও একটি লোগাত রয়েছে। হজুর ﷺ ইরশাদ করেছেন- رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِيْ وَاغْسِلْ حُوْبَتِيْ

قَوْلُهُ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ لَا تُقْسِطُوْا : اِقْسَاط অর্থ ইনসাফ করা। ছুলাছি মুজাররাদে قِسْط অর্থ জুলুম করা। বাবে اِفْعَال -এর মধ্যে হামযাটি سَلْب مَاخَذ -এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে তার অর্থ হয় জুলুম দূর করা তথা ইনসাফ করা। قَوْلُهُ . مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ শব্দ তিনটির অর্থ হচ্ছে যথাক্রমে- দুই দুই, তিন তিন, চার চার।

আদল ও ওয়াসফের কারণে গায়রে মুনসারিফ হয়েছে।

قَوْلُهُ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً : صَدُقَاتٌ . صَدُقَةٌ -এর বহুবচন- অর্থ মহর।

نِحْلَةً শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে দিয়ানত, মিল্লত, শরিয়ত, মাজহাব। এখানে عَطِيَّة বা فَرِيْضَة তথা উপহার বা ফরজের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর বহুবচন আসে نِحْلَاتٌ ও نِحَلٌ। هَنِيْئٌ -পবিত্র আনন্দদায়ক খাবার।

مَرِيْئٌ শুভ পরিণতি বিশিষ্ট, সহজে হজম হয় এরূপ খাবার।

قَوْلُهُ اِسْرَافًا وَبِدَارًا اَنْ يَكْبَرُوْا : অর্থ হচ্ছে مُسْرِفِيْنَ وَمُبَادِرِيْنَ كِبَرَهُمْ এখানে اِسْرَافًا ও بِدَارًا শব্দদ্বয় لَا تَاْكُلُوْا ফে'লের যমীরে ফায়েল থেকে নাহবী তারকীবে হাল হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা পরিচিতি : এই সূরাটির নাম সূরায়ে নিসা। যেহেতু এই সূরার মধ্যে নারী জাতির অধিকার, বিবাহের বিধি-নিষেধ এবং উত্তরাধিকার সম্পর্কে বিশেষ বিধান ও তাগিদ রয়েছে তাই এই সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে সূরাতুন নিসা নামে।

আলোচ্য সূরাটি মদনী তথা মদিনায় হিজরতের পর অবতীর্ণ হয়েছে। এতে ১৭০টি আয়াত হওয়ার ব্যাপারে ওলামাদের ঐকমত্য রয়েছে। তবে এর উর্ধ্বে তাদের মতপার্থক্য রয়েছে। কারো মতে ১৭৫টি, কারো কারো মতে ১৭৬টি এবং কারো কারো মতে ১৭৭টি আয়াত রয়েছে। এতে ৩০৪৫ টি শব্দ, ১৬০৩০ টি হরফ ও ২০টি রুকূ' রয়েছে। এই সূরাটির মধ্যে এতিম-বিধবাদের হক, বিয়ে-শাদীর নিয়ম কানুন, মুহাজির ও আনসারদের ঐক্য এবং সেই ঐক্যে ফাটল ধরাবার মুনাফেকী অপচেষ্টা, আত্মীয়-স্বজনের হক, প্রতিবেশীর অধিকার, পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব পালনের তাগিদ, আত্ম সংশোধনের শিক্ষা, যুদ্ধ অবস্থায় নামাজের প্রশিক্ষণ, মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র, তাদের সম্পর্কে সতর্কবাণী এবং অমুসলিমদের সাথে সম্পর্কের ভিত্তি প্রভৃতি বিষয়ে এই সূরায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

-[নুরুল কুরআন খ. ৪, পৃ. ১১১, তাফসীরে খাযেন খ. ১, পৃ. ৩৩৭ ও সাবী খ. ১, পৃ. ২০০]

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : সূরা আলে ইমরানের শেষ বাক্যটি ছিল وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ অর্থাৎ তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক, হয়তো তোমরা জীবন সংগ্রামে সাফল্যমণ্ডিত হবে। এই সূরার প্রথম আয়াতেও আল্লাহর প্রতি ভয় পোষণের নির্দেশ রয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে- يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ অর্থাৎ হে মানব মণ্ডলী! তোমরা ভয় কর তোমাদের সেই প্রতিপালককে যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে। উভয় সূরাতেই আল্লাহর প্রতি ভয় পোষণের তাগিদ রয়েছে। কারণ বিষয় এরূপ রয়েছে যেগুলোতে আল্লাহর ভয় ব্যতীত শুধু রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন লোকদেরকে সঠিক ও ইনসাফের পথে অবিচল রাখতে পারে না। আল্লাহর ভয়ই হচ্ছে মানব জীবনে চরম উৎকর্ষ সাধনের চাবি-কাঠি।

সূরা নিসার ফজিলত : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, সূরায়ে নিসার পাঁচটি আয়াত আমার নিকট দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু রয়েছে তা থেকে অধিকতর প্রিয়। আয়াত পাঁচটি হলো এই-

١. إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ الخ . ٢. إِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ الخ . ٣. إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ . ٤. وَلَوْ اَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ الخ . ٥. وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضَاعِفْهَا الخ .

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, সূরায়ে নিসার আটটি আয়াত আমার নিকট সমগ্র পৃথিবী থেকে অধিক প্রিয়। আয়াত আটটি হলো এই [উপরিউক্ত পাঁচসহ নিম্নোক্ত ৩টি]

١. يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ الخ .

٢. وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ الخ .

٣. يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا .

-[মাআরিফে ইদরিসিয়া খ. ২, পৃ. ১২৫-২৬]

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ الخ এই আয়াতটিতে আল্লাহ পাক সর্বকালে সর্বস্থানের মানব জাতিকে তার প্রতি ভয় পোষণ করার নির্দেশ দান করেছেন। তারা সবাইকে একই পিতা- মাতা আদম ও হাওয়ার সন্তান একথা স্মরণ করে দিয়ে গোটা মানব জাতিকে একতা, ঐক্যবদ্ধতা, পরস্পরে মমত্ত্ববোধ ও সহমর্মিতার প্রতি অনুপ্রাণিত করেছেন। আর আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য বিশেষ ভাবে তাগিদ প্রদান করেছেন। আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট কারীদের প্রতি হাদীস শরীফে কঠোর ভাবে ভীতি বাণী এসেছে-

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَهُمْ اِلٰى اَمْوَالِكُمْ الخ .

এতিমদের মাল সম্পর্কে হুকুম : আলোচ্য আয়াতটিতে আল্লাহ পাক এতিমদের মাল-সম্পদ থেকে সতর্ক থাকতে নির্দেশ দান করেছেন। নিজেদের হালাল মালের বদলে তাদের সম্পত্তি যা এতিমের অভিভাবকদের জন্য হারাম তা গ্রহণ করার জন্য হুকুম করেছেন এবং নিজেদের সম্পদের সাথে মিশিয়ে তাদের সম্পত্তি গ্রাস না করতে নির্দেশ দান করেছেন।

আয়াতের শানে নুযূল : মোকাতেল ও কালবী (র.) বর্ণনা করেছেন, একজন গাতফানী ব্যক্তির নিকট তার এতিম ভ্রাতুষ্পুত্রের অনেক ধনসম্পদ সঞ্চিত ছিল। এতিম সাবালক হয়ে চাচার নিকট তার অর্থ-সম্পদ দাবি করলে, চাচা তা আদায়ে অস্বীকৃতি জানলো। তখন উভয়ে এই মোকদ্দমা নিয়ে হাজির হলো প্রিয়নবী ﷺ -এর দরবারে। এই সময়ে এই আয়াতটি নাজিল হয়।

-[তাফসীরে মাজহারী খ. ২, পৃ. ৪৭২]

এতিমদেরকে বিয়ে করার ব্যাপারে হুকুম :

وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ الخ

পূর্ববর্তী আয়াতে এতিমদেরকে আর্থিক ক্ষতি পৌঁছানোর ব্যাপারে পথ প্রদর্শন করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে এতিম মেয়েদের বিয়ে করার ব্যাপারে হেদায়েত দেওয়া হচ্ছে। কেননা কোনো কোনো সময় আত্মীয়তার সূত্রে যে গায়রে মাহরাম অভিভাবক ব্যক্তির অধীনে এতিম মেয়েরা থাকত, ঐ মেয়ে উক্ত অভিভাবকের সম্পদের মধ্যে শরিক হয়ে যেতো আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকার কারণে। উদাহরণত ধরে নেন চাচাতো ভাই ও বোন। এমতাবস্থায় দুটি সূরতের সৃষ্টি হতো। কোনো সময় অলী বা অভিভাবক ঐ এতিম মেয়ের সম্পদ ও রূপ সৌন্দর্যতার লিপ্সায় এতিম বেচারীকে খুবই অল্প মহরে বিয়ে করে নিত। যেহেতু এতিম মেয়ের কোনো পৃষ্ঠপোষক নেই, যে তার অধিকার আদায় ও সংরক্ষণের জন্য এবং দাম্পত্য জীবনের অন্যান্য অধিকার আদয়ের লক্ষ্যে প্রতিবাদী হবে। এ জন্য ঐ অলী তার মহরও দিতো কম এবং অন্যান্য অধিকারেও তাকে ঠকাতো। আবার কোনো সময় এ রকম হতো যে, এতিম মেয়ের রূপ সৌন্দর্য কম হলেও তার সঙ্গে যেন-তেনভাবে একটি বিয়ে করে নিতো এ ভয়ে যে, যদি অন্য কোথাও বিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে মেয়ের সম্পদ আমার হাতছাড়া হয়ে যাবে এবং আমার সম্পদে অন্য ব্যক্তি এসে শরিক হয়ে যাবে। কিন্তু ঐ এতিম অসহায় স্ত্রীর সাথে কোনো রকম আকর্ষণ বা ভালোবাসা ঐ অভিভাবক রাখতো

না। এরই প্রেক্ষিতে অলী বা অভিভাবকদেরকে সম্বোধন করে ইরশাদ হয়েছে যে, যদি তোমরা এ ব্যাপারে আশঙ্কাবোধ করো যে, তোমাদের অধীনস্ত এতিম মেয়েদের প্রতি ইনসাফ করতে পারবে না এবং তাদের মহর আদায়ে ও অন্যান্য অধিকার প্রদানে ত্রুটি-বিচ্যুতি হবে, তবে এমতাবস্থায় তোমাদের জন্য এসব এতিম মেয়েদের সাথে বিয়ের অনুমতি নেই; বরং তাদেরকে বাদ দিয়ে অন্য মহিলাদেরকে বিয়ে করে নাও, যাদেরকে তোমাদের ভালো লাগে। তবে গায়রে মাহরাম হওয়া আবশ্যক। প্রয়োজনে এক থেকে নিয়ে চার পর্যন্ত বিয়ে করতে পারো। তবে চারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। উম্মতের কারো জন্য এক সাথে চারের উর্ধ্বে স্ত্রী রাখা যাবে না। আর যদি একাধিক মহিলাকে বিয়ে করলে তাদের সঙ্গে ইনসাফ করতে পারেবে না বলে আশঙ্কাবোধ করো, তবে এক বিয়ের উপরই যথেষ্ট করো। নতুবা তোমাদের শরয়ী বাঁদিদের উপর যথেষ্ট করো [যার প্রচলন বর্তমানে নেই] এই হুকুম পালন করে নিলে তোমরা বেইনসাফী এবং কারো অধিকার নষ্ট করার অন্যায় থেকে বেঁচে যেতে পারবে। -[মা'আরিফে ইদ্রিসীয়া খ. ২, পৃ. ১৩০-৩১]

মাসআলা : রাফেজীগণ এক সাথে নয়জনকে বিয়ে করা বা নয়জনকে স্ত্রী হিসেবে রাখা জায়েজ মনে করে। তারা দলিল হিসেবে আলোচ্য আয়াতটিকেই পেশ করে থাকে। ইমাম নখয়ী ও ইবনে আবী লাইলার দিকেও উক্তিটিকে সম্পৃক্ত করা হয়। তারা বলেন, وَاو عَطْف বা সংযুক্তকারী (وَاو) ওয়াও বর্ণটি পূর্বাপরের উভয়টি বস্তুকে কেবল একত্র করে দেওয়ার জন্য এসে থাকে। সুতরাং فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ -এর মর্ম হবে, তোমরা বিয়ে করো দুজন মহিলাকে তিনজন এবং চারজনকে। সুতরাং ২+৩+ও ৪ = এর যোগফল হবে ৯। আর খারিজীগণ একই সাথে আঠারো জন মহিলার সঙ্গে বিয়ে জায়েজ হওয়াতে বিশ্বাসী। তারা বলে আয়াতের শব্দ (مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ) একক হলেও অর্থে দ্বিগুণ হওয়ার কথা পাওয়া যাচ্ছে। তাই নয়ের দ্বিগুণ আঠারো হবে। উল্লিখিত উক্তি উভয়টাই গলদ।

খারিজীদের উক্তি ভ্রান্ত হওয়ার কারণ হলো এই যে, উল্লিখিত শব্দগুলো তাকরারযুক্ত শব্দাবলি হতে নির্গত। তবে সংখ্যার তাকরার বা দ্বিগুণ হওয়ার কোনো সীমা নেই। দ্বিগুণের অর্থ শুধু দুবার বা দু সংখ্যাই নয়; বরং দুই- দুই - দুই ....। মোটকথা অসীমিত দুইকে مَثْنٰى শব্দে শামিল রাখে। যেমন কেউ যদি কোনো একদল মানুষকে বলে যে, তোমরা এ টাকাগুলো হতে দুটি দুটি করে নিয়ে নাও। তখন উদ্দেশ্য হয় প্রতিজনই দুই টাকা নিবে। উদ্দেশ্য এটা হয় না যে, তোমরা প্রত্যেকে চার টাকা নিয়ে নাও। আয়াতের মধ্যে যদি এ অর্থটাই উদ্দেশ্য হয়, তাহলে অর্থই ঠিক হবে না। কারণ সকল লোকদের জন্য দুইজন, তিনজন, চারজন, নয়জন বা আঠারোজন মহিলার সাথে বিয়ে সম্ভবই নয়। এই জন্যই তাফসীরে কাশশাফ প্রণেতা আল্লামা জারুল্লাহ যমখশারী (র.) লিখেন, এসব শব্দকে যদি এক হিসেবে উল্লেখ করা হয় অর্থাৎ মাদুল বা নির্গত বলা না হয় আর অর্থগত তাকরারের মর্ম সৃষ্টি না হয়] তাহলে সঠিক কোনো অর্থই হবে না। [অর্থাৎ যদি فَانْكِحُوْا اِثْنَيْنِ وَثَلَاثًا وَاَرْبَعًا বলা হয় তবে অর্থ শুদ্ধ হবে না।

রাফেজীদের উক্তি ভ্রান্ত হওয়ার কারণ এই যে, অলংকার শাস্ত্রবিদগণ নয়ের সংখ্যা সঠিক বুঝাবার জন্য দুই, তিন ও চার বলেননি; বরং আয়াতের মর্ম হলো এই যে, প্রত্যেকের জন্য দুইজন মহিলার সাথে বিয়ে করা জায়েজ রয়েছে। তেমনিভাবে প্রত্যেকের জন্য তিনজনের সঙ্গে এবং চার জনের সঙ্গেও বিয়ে জায়েজ রয়েছে।

চারো মাযহাবের ইমামগণসহ জমহুর ওলামায়ে উম্মত এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, এক সাথে চারের অধিক মহিলা বিয়ে করা বা বিয়েতে রাখা নাজায়েজ। এ জন্যই তো আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হওয়ার পর কায়েস বিন হারিছসহ অন্যান্য সাহাবাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ চারের উর্ধ্বে বিবিগণকে তালাক দিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর তারাও সেই নির্দেশ পালন করেছিলেন। -[তাফসীরে মাযহারী খ. ২, পৃ. ৪৭৭-৭৮]

বহু বিবাহ ও পবিত্র ইসলাম : বহু বিবাহের প্রথাটা ইসলাম-পূর্ব যুগেও দুনিয়ার প্রায় সকল ধর্ম মতেই বৈধ বিবেচিত হতো। আরব, ভারতীয় উপমহাদেশ, ইরাক, মিশর, বেবিলন প্রভৃতি সব দেশেই এই প্রথার প্রচলন ছিল। বহু বিবাহের প্রয়োজনীয়তার কথা বর্তমান যুগেও স্বীকৃত।

বর্তমানকালে ইউরোপের এক শ্রেণির চিন্তাবিদ বহু বিবাহ রহিত করার জন্য তাদের অনুসারীদেরকে উদ্বুদ্ধ করে এসেছেন বটে; কিন্তু তাতে কোনো সুফল বয়ে আনেনি; বরং তাতে সমস্যা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। অবশেষে প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক ব্যবস্থাটাই বিজয়ী হয়েছে। তাই বর্তমানে ইউরোপের বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদ ব্যক্তিরা তার পুনঃ প্রচলন করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই বহু বিবাহের প্রচলন ছিল। ইসলামের প্রাথমিক যুগেও কোনো সংখ্যা নির্ধারণ ছাড়াই এই ব্যবস্থা চালু ছিল। তবে তৎকালে এই সীমা-সংখ্যাহীন বহুবিবাহের জন্য অনেকের লোভ-লালসার কোনো অন্ত ছিল না। অন্যদিকে এ থেকে উদ্ভূত দায়িত্বের ব্যাপারেও তারা সঠিক ভূমিকা পালন করত না; বরং এই সব স্ত্রীকে তারা রাখতো দাসী-বাঁদির মতো এবং তাদের সাথে যথেচ্ছা ব্যবহার করতো। তাদের প্রতি কোনো রকম ইনসাফ করা হতো না। চরম বৈষম্য বিরাজ করতো পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে। অনেক সময় পছন্দসই দু একজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে বাকিদের প্রতি চরম অবহেলা প্রদর্শন করা

হতো। পবিত্র কুরআন ও ইসলাম এই সামাজিক অনাচার ও জুলুমের প্রতিরোধ করেছে। বহু বিবাহের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় বিধি-নিষেধও জারি করেছে। ইসলাম একই সময়ে চারের অধিক স্ত্রী রাখাকে হারাম ঘোষণা করেছে। ইসলাম এই ক্ষেত্রে ইনসাফ কায়েমের জন্য বিশেষ তাকিদ দিয়েছে এবং ইনসাফের পরিবর্তে জুলুম করা হলে তার জন্য শাস্তির কথা ঘোষণা করেছে। ইনসাফ করে চলতে পারলে চারজনকে রাখার অনুমতি দিয়েছে। অন্যথায় একজনের উপরই যথেষ্ট করতে নির্দেশ দিয়েছে।

একাধিক বিয়ের প্রয়োজনীয়তা :

১. বিয়ের আসল উদ্দেশ্য হলো নিজের পবিত্রতা, দৃষ্টি রক্ষা করে চলা, লজ্জাস্থানের হেফাজত, সন্তান লাভ ও জেনা-ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকা। অনেক সময় সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ধনবান অবসর লোকও সমাজে পাওয়া যায়। তারা চারজন স্ত্রীর হক যথারীতি আদায় করার সামর্থ্য রাখে। তাদের মতো লোকের নিকট হাজারো গরিব মানুষের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা হয়। এমতাবস্থায় যদি তারা দু-চারজন গরিব পরিবারের মহিলাকে বিয়ে করে নেয় তবে তাতে অসুবিধা কি?

২. অনেক সময় মহিলারা বিভিন্ন রোগব্যাধি ও গর্ভধারণ প্রভৃতি কারণে স্বামীকে দেহদানের যোগ্য থাকে না। এমতাবস্থায় সুস্থ সবল ধনী স্বামীকে দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি দেওয়া ছাড়া জেনা থেকে বাঁচানোর আর কোনো উত্তম ব্যবস্থা নেই।

৩. অনেক সময় মহিলা রোগের কারণে বা বন্ধ্যা হওয়ার কারণে সন্তান জন্ম দেওয়ার যোগ্য থাকে না। অন্যদিকে স্বভাবগতভাবেই পুরুষদের সন্তান লাভের আগ্রহ থাকে অধিক। এমতাবস্থায় পূর্বের বন্ধ্যা বা রোগী স্ত্রীকে অকারণে তালাক দিয়ে দেওয়া বা কোনো অভিযোগ তৈরি করে তালাক দেওয়া [যেরূপ ইউরোপের দেশসমূহে প্রতিনিয়ত হয়ে থাকে] উত্তম হবে নাকি তার বিয়ে ও যাবতীয় অধিকার বহাল রেখে দ্বিতীয় বিয়ে করে নেওয়া উত্তম হবে? কোনো জাতি যদি তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে চায়, তবে একাধিক বিয়ে ছাড়া অন্য কোনো উত্তম পন্থা নেই।

৪. এছাড়া কুদরতিভাবেই মহিলাদের সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি। মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের জন্মের হার কম পক্ষান্তরে মৃত্যুর হার বেশি। অনেক পুরুষ যুদ্ধে, জাহাজ ডুবে, আরো বিভিন্ন রকম দৈব দুর্ঘটনায় মারা যায়। সুতরাং একাধিক বিয়ের অনুমতি দেওয়া না হলে অতিরিক্ত সংখ্যক মহিলাদের জীবন বিপন্ন হতে বাধ্য, চরিত্র ধ্বংস হওয়া প্রায় নিশ্চিত। তাই এই সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য দ্বিতীয় বিবাহই উত্তম পদ্ধতি।

৫. মহিলারা পুরুষদের তুলনায় হাদীসানুযায়ী আকল বুদ্ধিতেও অর্ধেক এবং ধর্ম পালনেও অর্ধেক। যার ফলাফল হলো এই যে, মহিলা পুরুষের এক চতুর্থাংশ। আর একথা সুস্পষ্ট যে, চার চতুর্থাংশ মিলে পূর্ণ এক হয়। এতে বুঝা যাচ্ছে, চারজন মহিলা একজন পুরুষের সমান। এই জন্যই শরিয়ত একজন পুরুষকে এক সঙ্গে চারজন স্ত্রী গ্রহণ করতে বা রাখতে অনুমতি প্রদান করেছে। -[মা'আরিফে ইদ্রীসিয়া খ. ২, পৃ.১৩৩-৩৭]

এক মহিলার জন্য একাধিক স্বামী গ্রহণ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ :

১. যদি একজন মহিলা একাধিক পুরুষের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, তাহলে বিয়ের অধিকার হিসেবে প্রত্যেকেরই যৌন চাহিদা পূর্ণ করার অধিকার থাকবে, আর এতে ফ্যাসাদ ও পরস্পর শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। হতে পারে একই মুহূর্তে সকলেরই প্রয়োজন পড়ে যাবে। ফলে খুন খারাবির পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

২. পুরুষ স্বভাবগত এবং জন্মগতভাবেই শাসক আর মহিলা শাসিত। এই জন্যই শরিয়ত তালাকের এখতিয়ার পুরুষকে প্রদান করেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত পুরুষ তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে স্বাধীন করে না দিবে ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রী ভিন্ন কোনো পুরুষকে বিয়ে করতে পারবে না।

   সুতরাং পুরুষ যখন শাসকের পর্যায়ে হলো তখন যুক্তিসঙ্গত কারণেই একজন শাসকের অধীনে একাধিক শাসিত থাকতে পারবে।এই শাসকের অধীনে অনেক শাসিত থাকা লাঞ্ছনা ও অপমানের কোনো কারণ নয় এবং মুশকিলও নয়। পক্ষান্তরে যখন শাসিত ব্যক্তি এক হবে আর শাসক হবে একাধিক তখন শাসিত ব্যক্তিকে বিস্ময়কর মসিবতের সম্মুখীন হতে হবে। সে কার আনুগত্য করবে আর কার করবে না। আর এতে অপমানও অধিক। শাসক যতই বেশি হবে শাসিত ব্যক্তির অপমান ততই অধিক হবে।

   এই জন্য ইসলামি শরিয়ত একজন মহিলকে একসাথে একাধিক স্বামী গ্রহণের অনুমতি প্রদান করেনি। কারণ এ অবস্থায় মহিলার জন্য অপমান লাঞ্ছনা অধিক এবং মসিবতও হবে কঠিন।

   এ ছাড়া একাধিক স্বামীর মন যুগিয়ে চলা, তাদের খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাওয়া, সবাইকে খুশি রাখা অসহনীয় ব্যাপার। তাই শরিয়ত একজন মহিলাকে দুই বা চারজন পুরুষকে বিয়ে করার অনুমতি দেয়নি। যাতে করে মহিলা উল্লিখিত লাঞ্ছনা, অপমান ও অসহনীয় কষ্ট ও মসিবত থেকে বেঁচে থাকতে পারে।

৩. এছাড়া একজন মহিলার একাধিক স্বামী হলে তাদের যৌন মিলনে যে সন্তান হবে, সে তাদের মধ্য থেকে কার সন্তান পরিগণিত হবে? তার লালন-পালন ভরণ-পোষণ হবে কেমন করে? তার পরিত্যাজ্য সম্পত্তি বণ্টন হবে কিরূপে? এছাড়া এই সন্তান একাধিক স্বামীর জন্য যৌথ হবে, অথবা তারা বণ্টন করে নিবে। বণ্টন করে নিলে বণ্টনটা হবে কেমন করে?

সন্তান যদি একটাই হয় তবে তাদের মধ্যে বণ্টনের উপায় হবে কি? আর একাধিক সন্তান হলে বণ্টনের পালা যখন আসবে তখন ছেলে মেয়ে হওয়ার ব্যবধানের প্রেক্ষিতে সূরত বা নমুনা, সুন্দর-অসুন্দর, দুর্বল-শক্তিশালী, সুস্থ-অসুস্থ, মেধাহীন ও মেধাসম্পন্ন হওয়াসহ প্রভৃতি বিষয়ে ব্যবধান ও পার্থক্য থাকাটা স্বাভাবিক। তখন তাদের সন্তান বণ্টনে খুবই জটিলতা সৃষ্টি হবে। ফলশ্রুতিতে পরস্পরে কত রকম ঝগড়া, ফ্যাসাদ ও ফিতনা যে হবে তার কোনো সীমা পরিসীমা আছে কি? এসব জটিলতা ফিতনা ফাসাদ থেকে বেঁচে থাকার জন্যই পবিত্র ইসলাম একই মুহূর্তে একজন মহিলাকে একাধিক স্বামী রাখতে বা একাধিক বিয়ে করতে নিষেধ করেছে। -[মা'আরিফে ইদ্রিসীয়া খ. ২, পৃ. ১৩৭-৩৮]

বিশ্বনবী ও বহু বিবাহ : নবী ﷺ-এর আগমনের উদ্দেশ্যই হলো আল্লহর দীনের বিধি-বিধান উম্মতের নিকট পৌঁছে দেওয়া এবং বিশ্ব মানবতার আত্মশুদ্ধির কাজ করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসলামের শিক্ষা, বিধি-বিধান, কথা ও কাজের মাধ্যমে পৃথিবীতে বিস্তার করে গেছেন। মানব জীবনের এমন কোনো ধাপ নেই যেখানে নবীর শিক্ষা ও তার পথ প্রদর্শনের প্রয়োজন নেই। পানাহার, উঠাবসা, নিদ্রা-জাগ্রত হওয়া, পাক-পবিত্রতা, ইবাদত-রিয়াজত, মুজাহাদা-সাধনা প্রভৃতি বিষয়ে মোটকথা জীবনের প্রতিস্তরে এমন কোনো ধাপ নেই যেখানে নবীর হেদায়েত ও পথ নির্দেশিকা বিদ্যমান নেই। ঘরের ভিতরে তিনি কি কি আমল করেছেন, বিবিগণের সাথে কিরূপ আচার-আচরণ করতেন ঘরে এসে দীনের মাসআলা-মাসাইল জিজ্ঞেসকারী মহিলাদেরকে তিনি কি কি জবাব প্রদান করেছেন? এরকম হাজারো মাসআলা রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে নবীপত্নীদের মাধ্যমেই উম্মত জ্ঞান লাভ করতে পেরেছে। বহু বিবাহ করার মধ্যে তার এই উদ্দেশ্যটাই মুখ্য ছিল। শুধু হযরত আয়েশা (রা.) হতেই নবীজীর সীরাত সম্পর্কিত দুই হাজার দুইশত হাদীস বর্ণিত রয়েছে। হযরত উম্মে সালামা (রা.) থেকে ৩৭৮ টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। নবীগণের মহান উদ্দেশ্য তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সংশোধনের চিন্তা-ফিকিরের কথা দুনিয়ার খাহেশ পূজারীরা কি করে জানবে? তারা তো সকলকেই নিজের উপর কিয়াস করে মাপতে জানে। এরই ফলশ্রুতিতে বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে ইউরোপের নাস্তিক ও পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্যবাদীরা হঠকারিতামূলকভাবে বিশ্ব নবীর বহু বিবাহকে এক বিশেষ যৌন সম্ভোগ ও কাম প্রবৃত্তির ভিত্তিতে হয়েছে বলে মন্তব্য করেছে। হুজুর ﷺ-এর পবিত্র জীবনের উপর সামান্য চিন্তা করলেও কোনো বুদ্ধিমান ও ইনসাফ-প্রিয় লোক তাঁর বহু বিবাহ সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করতে পারে না।

তিনি তাঁর পবিত্র জীবনটাকে মক্কাবাসীদের সামনে এরকমভাবে অতিবাহিত করেছেন যে, পঁচিশ বৎসর বয়সে একজন ৪০ বৎসরের বয়স্কা সন্তানের মা তার [যার পূর্বের দুইজন স্বামী মারা গেছে] সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তার সাথেই অতিক্রান্ত করেছেন। আবার তাও এরকম যে, মাসের পর মাস বাড়ি-ঘর ছেড়ে গারে হেরায় গিয়ে ইবাদত বন্দেগীতে কাটিয়ে দিতেন। তাঁর অন্যান্য সকল বিয়েই বয়স পঞ্চাশ হওয়ার পরে সংঘটিত হয়েছে। এই পঞ্চাশ বৎসরের জীবন এবং পূর্ণ যৌবনের সারাটা সময় মক্কাবাসীদের চোখের সামনে ছিল। কোনো সময় কোনো দুশমনের পক্ষেও তাঁর প্রতি এরূপ কোনো কথা উঠানোর সুযোগ হয়নি, যা দ্বারা তার পবিত্রতা ও খোদাভীতির বিষয়টা সন্দেহযুক্ত হতে পারে। তাঁর দুশমনেরা তাকে জাদুকর, কবি, পাগল, মিথ্যুক, মিথ্যারচনাকারীর ন্যায় বিভিন্ন অভিযোগ দিতে কোনো রকম ত্রুটি করেনি। কিন্তু তাঁর নিষ্পাপ মাসুম জীবনের উপর এমন কোনো অপবাদ দেওয়ার দুঃসাহস করতে পারেনি, যা দ্বারা তার পবিত্র চরিত্র কলুষযুক্ত হতে পারে।

চিন্তা ফিকিরের বিষয় হলো এই যে, তিনি যৌবনের পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত সংসার-বিমুখতা, তাকওয়া, পরহেজগারী, খোদাভীতি ও দুনিয়ার ভোগ বিলাস থেকে দূরে থেকে কালাতিপাত করার পর কি কারণ ছিল যদ্দরুন তিনি বহু বিবাহ করতে বাধ্য হয়ে পড়লেন। মনে যদি সামান্যতম ইনসাফও অবশিষ্ট থাকে তবে এসব বিবাহের প্রকৃত কারণ ছাড়া অন্য কিছু বলা যেতে পারে না, যার আলোচনা উপরে হয়েছে।

হুজুর ﷺ-এর বহু বিবাহের অবস্থা : পঁচিশ বৎসর বয়স থেকে পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্যন্ত একমাত্র হযরত খাদীজা (রা.) তাঁর বিবাহে ছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের পর হযরত সাওদা ও আয়েশা (রা.)-এর সাথে বিবাহ হয়। হযরত সাওদা (রা.) হুজুরের ঘরে চলে আসেন। কিন্তু আয়েশা কম বয়সী হওয়ার দরুন তাঁর পিতা আবূ বকর (রা.)-এর ঘরেই থেকে যান। অতঃপর কয়েক বৎসর অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর হিজরি দ্বিতীয় সনে তিনি হুজুর ﷺ-এর ঘরে আসেন। তখন হুজুর ﷺ-এর বয়স ছিল ৫৪ বৎসর। এই বয়সে উপনীত হওয়ার পর দুই স্ত্রী তার বিয়ের সূত্রে একত্র হলো। এখান থেকে একাধিত বিবাহের বিষয়টির সূচনা হয়। তার এক বৎসর পর হযরত হাফসা (রা.)-এর সঙ্গে বিয়ে হয়। তারপর কয়েক মাস যাওয়ার পর হযরত যায়নাব বিনতে খুজাইমা (রা.)-এর সাথে বিবাহ হয়েছে। তিনি মাত্র আঠারো মাস বিবাহ বন্ধনে থেকে ইন্তেকাল করলেন। এক বর্ণনা মতে, তিনি হুজুর ﷺ -এর বিবাহ বন্ধনে মাত্র তিনমাস জীবিত থাকেন। অতঃপর দ্বিতীয় হিজরিতে হযরত উম্মে সালামা (রা.) -এর সাথে এবং পঞ্চম হিজরিতে হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা.)-এর সাথে তাঁর বিবাহ হয়। তখন তাঁর বয়স ছিল ৫৮ বৎসর। এই বৃদ্ধ বয়সে গিয়ে চারজন স্ত্রী এক সাথে একত্র হয়েছিল। অথচ যে সময় উম্মতের জন্য চারজন স্ত্রী গ্রহণ করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল, তখনই তিনি চারটি বিয়ে করে নিতে পারতেন, কিন্তু তিনি এরূপ করেননি। অতঃপর ষষ্ঠ হিজরিতে হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.)-এর সাথে, সপ্তম হিজরিতে উম্মে হাবীবার সঙ্গে এবং তারপর এই বৎসরই হযরত সুফিয়্যা ও হযরত মায়মূনা (রা.)-এর সাথে বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। -[জামালাইন খ. ১, পৃ. ৫৯৬-৯৮]

٥. وَلَا تُؤْتُوا أَيُّهَا الْأَوْلِيَاءُ السُّفَهَاءَ الْمُبَذِّرِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ أَمْوَالَكُمْ أَيْ أَمْوَالَهُمُ الَّتِيْ فِيْ أَيْدِيْكُمْ الَّتِيْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا مَصْدَرُ قَامَ أَيْ تَقُوْمُ بِمَعَاشِكُمْ وَصَلَاحِ أَوْلَادِكُمْ فَيُضَيِّعُوْهَا فِيْ غَيْرِ وَجْهِهَا وَفِيْ قِرَاءَةٍ قِيَمًا جَمْعُ قِيْمَةٍ مَا تَقُوْمُ بِهِ الْأَمْتِعَةُ وَارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا أَطْعِمُوْهُمْ مِنْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوْفًا عِدُوْهُمْ عِدَةً جَمِيْلَةً بِإِعْطَائِهِمْ أَمْوَالَهُمْ إِذَا رَشَدُوْا -

٦. وَابْتَلُوا اخْتَبِرُوا الْيَتٰمٰى قَبْلَ الْبُلُوْغِ فِيْ دِيْنِهِمْ وَتَصَرُّفِهِمْ فِيْ أَحْوَالِهِمْ حَتّٰى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ أَيْ صَارُوْا أَهْلًا لَهُ بِالْاِحْتِلَامِ أَوِ السِّنِّ وَهُوَ اسْتِكْمَالُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رحـ) فَإِنْ اٰنَسْتُمْ أَبْصَرْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا صَلَاحًا فِيْ دِيْنِهِمْ وَمَالِهِمْ فَادْفَعُوْا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوْهَا أَيُّهَا الْأَوْلِيَاءُ إِسْرَافًا بِغَيْرِ حَقٍّ حَالٌ وَبِدَارًا أَيْ مُبَادِرِيْنَ إِلٰى إِنْفَاقِهَا مَخَافَةَ أَنْ يَكْبَرُوْا رُشْدًا فَيَلْزَمُكُمْ تَسْلِيْمُهَا إِلَيْهِمْ وَمَنْ كَانَ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ أَيْ يَعُفُّ عَنْ مَالِ الْيَتِيْمِ وَيَمْتَنِعُ مِنْ أَكْلِهِ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ بِالْمَعْرُوْفِ بِقَدْرِ أُجْرَةِ عَمَلِهِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَيْ إِلَى الْيَتٰمٰى أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ تَسَلَّمُوْهَا وَبَرِئْتُمْ لِئَلَّا يَقَعَ اخْتِلَافٌ فَتَرْجِعُوْا إِلَى الْبَيِّنَةِ وَهٰذَا أَمْرُ إِرْشَادٍ وَكَفٰى بِاللّٰهِ الْبَاءُ زَائِدَةٌ حَسِيْبًا حَافِظًا لِأَعْمَالِ خَلْقِهِ وَمُحَاسِبُهُمْ -

অনুবাদ :

৫. আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের যে ধনসম্পদকে তথা এতিমদের যে ধনসম্পদ তোমাদের হাতে রক্ষিত রয়েছে তাকে তোমাদের জীবনযাত্রার অবলম্বন করেছেন তা নির্বোধ লোকদেরকে তথা অপচয়কারী পুরুষ, নারী ও বাচ্চাদের হাতে দিও না হে অভিভাবকগণ! قِيٰمًا - قَامَ -এর মাসদার। অর্থাৎ যা দ্বারা তোমাদের জীবিকা ও তোমাদের সন্তানদের উপকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং এ সম্পদ উল্লিখিত লোকদের হাতে দিয়ে দিলে তাকে অনর্থক বিনষ্ট করে ফেলবে। ভিন্ন এক কেরাতে قِيَمًا রয়েছে, তখন তা قِيْمَةٌ-এর বহুবচন হবে। অর্থাৎ যা দ্বারা তোমাদের বস্তু সামগ্রী ঠিক থাকে। তাদেরকে তা থেকে খাওয়াও, পরাও এবং তাদের সাথে বিনম্রভাবে কথা বল। অর্থাৎ তাদের সম্পদ বুঝদার হয়ে যাওয়ার পর তাদেরকে দিয়ে দেওয়ার সুন্দর ওয়াদা প্রদান কর।

৬. আর এতিমদেরকে পরীক্ষা কর বালেগ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত, তাদের ধর্মীয় এবং লেনদেনের বিষয়ে। অতঃপর যখন তারা বিয়ের বয়স পর্যন্ত পৌঁছে যাবে তথা স্বপ্নদোষ বা বয়সের মাধ্যমে বিয়ের উপযুক্ত হয়ে যাবে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, সেই বয়সটি হলো পনের বৎসর পরিপূর্ণ হওয়া। অতঃপর যদি তাদের মধ্যে বিচার-বুদ্ধি তথা তাদের ধর্মীয় ও আর্থিক ব্যাপারে উপকারিতাবোধ দেখতে পাও, তবে তাদের ধনসম্পদ তাদের প্রতি সোপর্দ করতে পার এবং তারা বড় হয়ে উঠার ভয়ে যে, তখন তাদের সম্পদ তাদের প্রতি সোপর্দ করে দিতে হবে এই ভয়ে হে অভিভাবকগণ! তাড়াহুড়া করে অপচয় করে অন্যায় ভাবে ব্যয় করো না। إِسْرَافًا ও بِدَارًا - لَا تَأْكُلُوْا -এর যমীর থেকে হাল হয়েছে। আর ওলীদের মধ্যে যে ধনী সে যেন এতিমের সম্পদ থেকে আত্মরক্ষা করে চলে এবং তা ভোগ করা থেকে বিরত থাকে। আর যে দরিদ্র সে যেন ভোগ করে নেয় ন্যায়নীতি অনুসারে তথা তার কাজের বিনিময় অনুপাতে। অতঃপর যখন তাদের তথা এতিমদের প্রতি তাদের সম্পত্তি ফেরত দিতে চাও তখন তাদের উপর সাক্ষী রেখে দিও যে, তারা পেয়ে গেছে আর তোমরা দায়িত্বমুক্ত হয়ে গেছ, যাতে তোমাদের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব সৃষ্টি না হয়। আর যদি হয়ে যায় তবে যেন সাক্ষীর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে পার। এ নির্দেশ বাক্যটি সংশোধনমূলক মোস্তাহাব বুঝাতে এসেছে। আর আল্লাহ তা'আলা হিসেব গ্রহণকারী হিসাবে যথেষ্ট তথা তিনি তাঁর সৃষ্টির কৃতকর্মের সংরক্ষণকারী ও হিসাব গ্রহণকারী।

٧. وَنَزَلَ رَدًّا لِمَا كَانَ عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّةُ مِنْ عَدَمِ تَوْرِيْثِ النِّسَاءِ وَالصِّغَارِ لِلرِّجَالِ الْاَوْلَادِ وَالْاَقَارِبِ نَصِيْبٌ حَظٌّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ الْمُتَوَفَّوْنَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَيِ الْمَالِ اَوْ كَثُرَ جَعَلَهُ اللّٰهُ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا مَقْطُوْعًا بِتَسْلِيْمِهِ اِلَيْهِمْ.

৭. সামনের আয়াতটি জাহিলি যুগে প্রচলিত মহিলা ও শিশুদেরকে উত্তরাধিকার না দেওয়ার কুপ্রথার প্রতিবাদে অবতীর্ণ হয়েছে। মৃত পিতামাতা এবং নিকটতম আত্মীয়স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদের জন্য তথা সন্তানাদি ও আত্মীয়দের জন্য অংশ রয়েছে এবং নারীদের জন্য অংশ রয়েছে, যা পিতামাতা এবং নিকটতম আত্মীয়স্বজন রেখে গেছে সে মালের অংশ বেশি হোক বা কম, তার পরিমাণ আল্লাহ তা'আলা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। তথা তাদের প্রতি সোপর্দ করে দেওয়ার ক্ষেত্রে তা সুনির্দিষ্ট।

٨. وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ لِلْمِيْرَاثِ اُولُوا الْقُرْبٰى ذُو الْقَرَابَةِ مِمَّنْ لَا يَرِثُ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ شَيْئًا قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَقُوْلُوْا اَيُّهَا الْاَوْلِيَاءُ لَهُمْ اِذَا كَانَ الْوَرَثَةُ صِغَارًا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا جَمِيْلًا بِاَنْ تَعْتَذِرُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّكُمْ لَا تَمْلِكُوْنَهُ وَاَنَّهُ لِلصِّغَارِ وَهٰذَا قِيْلَ مَنْسُوْخٌ وَقِيْلَ لَا وَلٰكِنْ تَهَاوَنَ النَّاسُ فِيْ تَرْكِهِ وَعَلَيْهِ فَهُوَ نَدْبٌ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) وَاجِبٌ.

৮. আর যখন মিরাস বণ্টনের সময় উত্তরাধিকার পায় না এমন আত্মীয়স্বজন, এতিম, মিসকিন উপস্থিত হয়, তখন ঐ সম্পদ থেকে বণ্টনের পূর্বে তাদেরকে কিছু দান কর এবং হে ওলীগণ! তাদের সাথে ভালো কথা বল, যখন ওয়ারিশদের মধ্যে নাবালেগরাও থাকে, অর্থাৎ তাদের কাছে এরূপ ওজর পেশ কর যে, তোমরা এ সম্পদের মালিক হতে পারবে না। কারণ এর ওয়ারিশরা হচ্ছে নাবালেগ। এক বর্ণনা মতে, যারা ওয়ারিশ নয় তাদেরকে দেওয়ার এ বিধানটি রহিত হয়ে গেছে। অন্য আরেক বর্ণনা মতে, এ হুকুমটি রহিত হয়নি। তবে লোকেরা এর উপর আমল না করাতেই সহজতা অনুভব করতে লেগেছে। রহিত না হওয়ার বর্ণনা মতে, নির্দেশটি হবে মোস্তাহাবের জন্য। পক্ষান্তরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ নির্দেশটিও ওয়াজিব বুঝাতে এসেছে।

٩. وَلْيَخْشَ اَيْ لِيَخَفْ عَلَى الْيَتٰمٰى الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا اَيْ قَارَبُوْا اَنْ يَّتْرُكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ اَيْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا اَوْلَادًا صِغَارًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ الضِّيَاعَ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ فِيْ اَمْرِ الْيَتٰمٰى وَلْيَاْتُوْا اِلَيْهِمْ مَا يُحِبُّوْنَ اَنْ يُفْعَلَ بِذُرِّيَّتِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمْ وَلْيَقُوْلُوْا لِلْمَيِّتِ قَوْلًا سَدِيْدًا صَوَابًا بِاَنْ يَاْمُرُوْهُ اَنْ يَتَصَدَّقَ بِدُوْنِ ثُلُثِهِ وَيَدَعُ الْبَاقِيْ لِوَرَثَتِهِ وَلَا يَتْرُكُهُمْ عَالَةً.

৯. যারা নিজেদের পশ্চাতে তথা মৃত্যুর পর দুর্বল, অসমর্থ নাবালেগ সন্তানাদি রেখে যায় যাদের নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে অর্থাৎ রেখে যাওয়ার সময় ঘনিয়ে আসে, তখন তাদের এতিমদের ব্যাপারে ভয় করা উচিত। অতএব, তারা যেন এতিমদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে এবং এতিমদের সাথে যেন ঐ ব্যবহার করে, যা মৃত্যুর পর তাদের সন্তানদের সাথে করে যাওয়াকে পছন্দ করে। আর মৃত্যুর ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে তারা যেন সঠিক কথা বলে। এ রকমভাবে যে, তাকে যেন তার এক তৃতীয়াংশ সম্পদের চেয়ে কম সদকা করতে এবং বাকি অংশ ওয়ারিশদের জন্য ছেড়ে যেতে ও তাদেরকে পরমুখাপেক্ষী করে না রেখে যাওয়ার নির্দেশ দেয়।

١٠. إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ أَىْ مِلْأَهَا نَارًا لِأَنَّهُ يَؤُوْلُ إِلَيْهَا وَسَيَصْلَوْنَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُوْلِ يَدْخُلُوْنَ سَعِيْرًا نَارًا شَدِيْدَةً يَحْتَرِقُوْنَ فِيْهَا ـ

১০. নিশ্চয় যারা এতিমদের অর্থসম্পদ অন্যায়ভাবে নাহক রূপে ভোগ করে, তাদের উদরে অগ্নিভক্ষণ করে ভরে। কেননা শেষ ফলে তাদের এ ভক্ষিত অর্থসম্পদ অগ্নিতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। অতিসত্বর তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত অগ্নিতে তথা মারাত্মক আগুনে প্রবেশ করবে, তাতে তারা জ্বলতে থাকবে। سَيَصْلَوْنَ ফে'লটি মা'রূফ ও মাজহুল উভয় রকমই পড়া হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِىْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا الخ

উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ পাক নির্বোধ ও বোকাদের হাতে তাদের সম্পদ সোপর্দ করে দিতে নিষেধ করেছেন। আলোচ্য আয়াতে سُفَهَاء বলতে কারা উদ্দেশ্য এ ব্যাপারে মুফাসসিরিনগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কারো মতে, এতিম মেয়েরা উদ্দেশ্য। আর أَمْوَالَكُمْ বলে এতিমদের মাল বুঝানো হয়েছে। যেহেতু এসব মাল তাদের অলী বা অভিভাবকদের কর্তৃত্বাধীন রয়েছে তাই তাদের প্রতি সম্পৃক্ত করে أَمْوَالَكُمْ বলা হয়েছে। এর মধ্যে এতিমদের সম্পদকে নিজেদের সম্পদের ন্যায় সংরক্ষণযোগ্য মনে করার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) প্রমুখ তাফসীরবিদগণের মতে, নির্বোধ বলে সম্বোধিত ব্যক্তিদের বিবি-বাচ্চা উদ্দেশ্য।

কারো মতে, নির্বোধ দ্বারা প্রত্যেক ঐ বোকা লোক উদ্দেশ্য যার মধ্যে নিজের সম্পদের হেফাজতের যোগ্যতা নেই। যেই ব্যক্তি বেওকুফির দরুন নিজের সম্পদকে বিনষ্ট করে ফেলে সেই নির্বোধ বা বোকা। সে চাই এতিম হোক বা নিজের স্ত্রী ও সন্তান হোক।

মাসআলা : আল্লাহপাকের ইরশাদ لَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ 'নির্বোধদের হাতে সম্পদ তুলে দিও না'-এর বাহ্যিক অর্থ দ্বারা একথা বুঝা যায় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত নির্বোধদের বোকামি বিদূরিত না হয় এবং বুঝ-সমজ না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সম্পদ তাদের কাছে সোপর্দ করা যাবে না, যদিও তারা শত বৎসরের বৃদ্ধ হোক না কেন। ইমাম শাফেয়ী (র.)-সহ অধিকাংশ আলেমের মত এটাই। কিন্তু ইমাম আযম হযরত আবূ হানীফা (র.) বলেন, পঁচিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাবে; যদি এর ভেতরে তাদের বুঝ-সমজ এসে যায় তবে তাদের সম্পদ তাদেরকে সোপর্দ করে দেওয়া যাবে। আর পঁচিশ বৎসর বয়স হয়ে গেলে সর্বাবস্থায় তাদের মাল তাদের হাওয়ালা করে দিতে হবে। পরিপূর্ণ বুঝ শক্তি আসুক বা না আসুক।

হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, পুরুষের আকল ও বোধশক্তি পঁচিশে গিয়ে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। সুতরাং তারপর তাকে আর বঞ্চিত রাখা যায় না। আয়াতের কারীমার মধ্যে رُشْدًا শব্দটি নাকেরার সহিত এসেছে। এতে বুঝা যাচ্ছে, মাল সোপর্দ করে দেওয়ার জন্য এক রকম আকল-বুদ্ধি হয়ে যাওয়াটাই যথেষ্ট। সম্পদ বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য পরিপূর্ণ বোধশক্তি ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির অধিকারী হওয়ার জরুরি নয়। -[মা'আরিফে ইদ্রিসীয়া খ. ২, পৃ. ১৪২-৪৩]

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا : এতিমরা বালেগ হয়ে যাওয়ার পর তাদের অর্থ সম্পদ তাদের নিকট সোপর্দ করে দেওয়ার সময় সাক্ষীর সামনে দিয়ো।

মাসআলা : এতিমদেরকে সাক্ষীদের সামনে তাদের মাল বুঝিয়ে দেওয়া শাফেয়ী ও মালেকী মাযহাব মতে ওয়াজিব। আর **হানাফীদের মতে,** মোস্তাহাব অর্থাৎ সাক্ষী রেখে দেওয়াটা উত্তম তবে ওয়াজিব নয়। -[মা'আরিফে ইদ্রিসীয়া খ. ২, পৃ. ১৪৪]

قَوْلُهُ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ الخ :

উপরিউক্ত আয়াতের শানে নুযূল : ইসলামপূর্ব যুদ্ধে মহিলা এবং নাবালেগ ছেলে মেয়েদেরকে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে কোনো অংশ দেওয়া হতো না। কেবল যুদ্ধের উপযুক্ত পুরুষদেরকেই দেওয়া হতো। এর প্রতিবাদে আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়েছে।

আবুশ শায়খ ইবনে হিব্বান কিতাবুল ফরাইযের মধ্যে কলবীর সনদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, জাহেলী যুগের লোকেরা না মেয়েদেরকে উত্তরাধিকার দিত এবং না দিত ছেলেদেরকে ছোট। আওস বিন ছাবেত নামী একজন আনসারী সাহাবীর ইন্তেকাল হলো, সে দুইজন মেয়ে একজন ছোট ছেলে ও তাঁর স্ত্রীকে রেখে গেল। আওসের দুইজন চাচাত ভাই ছিল খালেদ ও আরফাজা। তারা উভয়ে তাঁর সমূহ সম্পত্তি নিয়ে গেল। ফলে আওসের স্ত্রী হুজুর ﷺ-এর দরবারে হাজির হয়ে ঘটনাটি পেশ করলে তিনি বললেন, এ ব্যাপারে আমার জানা নেই, আমি কি বলব? এর উপর আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। –[তাফসীরে মাযহারী খ. ২, ৪৯৪]

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা দেন যে, পুরুষদের ন্যায় মহিলাগণ এবং ছোট ছেলে-মেয়েরাও নিজেদের পিতা-মাতা ও আত্মীয়স্বজনদের ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে অংশ পাবে। তাদেরকে বঞ্চিত করা যাবে না। মেয়ের অংশ ছেলের অংশের অর্ধেক সেটা ভিন্ন কথা। এতে মহিলাদের প্রতি অবিচার করা হয়নি এবং এতে তাদের অবমূল্যায়নও হয়নি; বরং ইসলামের এই উত্তরাধিকারের নীতি সম্পূর্ণ ইনসাফ ভিত্তিক। কারণ ইসলাম মহিলাদেরকে রুজি-রোজগারের দায়িত্ব থেকে মুক্ত রেখেছে, পুরুষদের স্কন্ধে সেই দায়িত্ব অর্পণ করেছে। এছাড়া মহিলাগণ মহরের মাধ্যমেও মাল পেয়ে থাকে। এ হিসেবে মহিলাদের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি আর্থিক দায়িত্ব রয়েছে পুরুষদের উপর। সুতরাং মহিলাদের অংশ পুরুষদের সমান হলে পুরুষদের উপর জুলুম হতো। কিন্তু আল্লাহপাক কারো প্রতি জুলুম করেননি। কেননা আল্লাহপাক যেমন ইনসাফগার তেমনি প্রজ্ঞাবানও বটে। –[জামালাইন খ. ১, পৃ. ৫৭৮]

قَوْلُهُ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنُ الخ : আলোচ্য আয়াতটিকে কিছু সংখ্যক আলেম আয়াতে মিরাছের দ্বারা রহিত বলেছেন। তবে বিশুদ্ধতম কথা হলো এই যে, এই আয়াতটি রহিত নয়; বরং এতে উত্তম চরিত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ হেদায়েত দেওয়া হয়েছে যে, সাহায্যের উপযুক্ত আত্মীয়-স্বজন, এতিম ও মিসকিনরা যাদের মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তিতে অংশ নেই। উত্তরাধিকারের সম্পদ বণ্টনের সময় নফল হিসেবে তাদেরকেও অল্প কিছু দিয়ে দিবে এবং তাদের সঙ্গে মায়া ও দয়াপূর্ণ কথা বলবে।

সামনের আয়াত وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ-এর মধ্যে সেই হেদায়েত ও নির্দেশের তাকিদ প্রদান করা হয়েছে।

١١. يُوْصِيْكُمُ يَأْمُرُكُمُ اللّٰهُ فِيْ شَاْنِ
اَوْلَادِكُمْ بِمَا يُذْكَرُ لِلذَّكَرِ مِنْهُمْ مِثْلُ
حَظِّ نَصِيْبِ الْاُنْثَيَيْنِ اِذَا اجْتَمَعَتَا
مَعَهُ فَلَهُ نِصْفُ الْمَالِ وَلَهُمَا النِّصْفُ
فَاِنْ كَانَ مَعَهُ وَاحِدَةٌ فَلَهَا الثُّلُثُ وَلَهُ
الثُّلُثَانِ وَاِنْ اِنْفَرَدَ حَازَ الْمَالَ فَاِنْ كُنَّ
اَيِ الْاَوْلَادُ نِسَاۤءً فَقَطْ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ الْمَيِّتُ وَكَذَا
الْاِثْنَتَانِ لِاَنَّهُ لِلْاُخْتَيْنِ بِقَوْلِهِ فَلَهُمَا
الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ فَهُمَا اَوْلٰى وَلِاَنَّ
الْبِنْتَ تَسْتَحِقُّ الثُّلُثَ مَعَ الذَّكَرِ فَمَعَ
الْاُنْثٰى اَوْلٰى وَفَوْقَ قِيْلَ صِلَةٌ وَقِيْلَ
لِدَفْعِ تَوَهُّمِ زِيَادَةِ النَّصِيْبِ بِزِيَادَةِ
الْعَدَدِ لِمَا فُهِمَ اِسْتِحْقَاقُ الْاِثْنَتَيْنِ
الثُّلُثَيْنِ مِنْ جَعْلِ الثُّلُثِ لِلْوَاحِدَةِ مَعَ
الذَّكَرِ وَاِنْ كَانَتْ الْمَوْلُوْدَةُ وَاحِدَةً وَفِيْ
قِرَاءَةٍ بِالرَّفْعِ فَكَانَ تَامَّةٌ فَلَهَا
النِّصْفُ وَلِاَبَوَيْهِ اَيِ الْمَيِّتِ وَيُبْدَلُ
مِنْهُمَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ
مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ذَكَرٌ اَوْ اُنْثٰى

অনুবাদ :

১১. আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে সামনে উল্লিখিত কথাগুলো দ্বারা আদেশ দিয়েছেন– তাদের একজন পুরুষের অংশ দুজন নারীর অংশের সমান। যখন দুজন মেয়ে একজন ছেলের সাথে একত্র হবে তখন ছেলের জন্য হবে মৃতব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তির অর্ধেক, আর মেয়ে দুজনের হবে বাকি অর্ধেক। আর একজন ছেলের সাথে যদি একজন মেয়ে হয় তখন মেয়ে পাবে তিনভাগের একভাগ, আর ছেলে পাবে তিন ভাগের দুভাগ। আর ছেলে যদি একাই ওয়ারিশ হয়, তবে সমস্ত মাল সে একাই পেয়ে যাবে। কিন্তু তারা তথা সন্তানরা যদি নারীই হয় দুয়ের অধিক, তবে তাদের জন্য হবে তিনভাগের দুই অংশ ঐ মালের যা মৃত ব্যক্তি রেখে মারা গেছে। তেমনিভাবে মেয়ে দুজন হলেও দুই তৃতীয়াংশই পাবে। কেননা আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ– فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ অনুযায়ী দু-বোনের জন্য দুই তৃতীয়াংশ, সুতরাং দু-মেয়ের জন্য দুই তৃতীয়াংশ উত্তমরূপে হবে। এছাড়া এক মেয়ে এক ছেলের সাথে এক তৃতীয়াংশের যখন মালিক হয় তখন এক মেয়ে আরেক মেয়ের সাথে উত্তমরূপে এক তৃতীয়াংশের অধিকারী হবে। কারো মতে, فَوْقَ اثْنَتَيْنِ -এর মধ্যে فَوْقَ শব্দটি অতিরিক্ত। আরেক উক্তি মতে, মেয়েদের সংখ্যা বাড়ার সাথে অংশ বাড়ার ধারণা প্রতিহত করার জন্য فَوْقَ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ ছেলের সাথে এক মেয়ে থাকাবস্থায় তার জন্য এক তৃতীয়াংশ সাব্যস্তকরণের দ্বারা দু-মেয়ের জন্য দুই তৃতীয়াংশ প্রাপ্তির কথা বোধ্য হয়েছে। আর মেয়ে যদি একজনই হয় এক কেরাত মতে وَاحِدَةٌ শব্দটি পেশের সাথে (وَاحِدَةٌ) পাঠ করা হয়েছে, তখন كَانَ টি হবে তাম্মাহ, নাকেসা নয়, তবে তার জন্য হবে অর্ধেক। আর মৃত ব্যক্তির পিতামাতার মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্য ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয় ভাগের এক অংশ হবে, যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান তথা পুত্র বা কন্যা থাকে।

وَنُكْتَةُ الْبَدَلِ إِفَادَةُ أَنَّهُمَا لَا يَشْتَرِكَانِ فِيهِ وَالْحِقَ بِالْوَلَدِ وَلَدُ الْاِبْنِ وَبِالْاَبِ الْجَدُّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَقَطْ أَوْ مَعَ زَوْجٍ فَلِأُمِّهِ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَبِكَسْرِهَا فِرَارًا مِنَ الْاِنْتِقَالِ مِنْ ضَمَّةٍ إِلَى كَسْرَةٍ لِثِقْلِهِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ الثُّلُثُ أَيْ ثُلُثُ الْمَالِ أَوْ مَا يَبْقَى بَعْدَ الزَّوْجِ وَالْبَاقِي لِلْاَبِ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ أَيْ اِثْنَانِ فَصَاعِدًا ذُكُوْرًا أَوْ اُنَاثًا فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَالْبَاقِي لِلْاَبِ وَلَا شَيْءَ لِلْاِخْوَةِ وَارِثُ مَنْ ذُكِرَ مَا ذُكِرَ مِنْ بَعْدِ تَنْفِيْذِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُوْلِ بِهَا أَوْ قَضَاءِ دَيْنٍ عَلَيْهِ وَتَقْدِيْمُ الْوَصِيَّةِ عَلَى الدَّيْنِ وَإِنْ كَانَتْ مُؤَخَّرَةً عَنْهُ فِي الْوَفَاءِ لِلْاِهْتِمَامِ بِهَا اٰبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ لَا تَدْرُوْنَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَظَانٌّ أَنَّ ابْنَهُ أَنْفَعُ لَهُ فَيُعْطِيْهِ الْمِيْرَاثَ فَيَكُوْنُ الْاَبُ أَنْفَعَ وَبِالْعَكْسِ وَإِنَّمَا الْعَالِمُ بِذٰلِكَ اللّٰهُ فَفَرَضَ لَكُمُ الْمِيْرَاثَ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا بِخَلْقِهِ حَكِيْمًا فِيْمَا دَبَّرَهُ لَهُمْ أَيْ لَمْ يَزَلْ مُتَّصِفًا بِذٰلِكَ ـ

نাহবী তারকীব অনুযায়ী لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا থেকে أَبَوَيْهِ বদল হয়েছে। আর বদল আনার রহস্য হলো একথা বুঝানো যে, মাতাপিতা ষষ্ঠাংশের মধ্যে যৌথভাবে শরিক নয়; [বরং প্রত্যেকের জন্য এক ষষ্ঠাংশ]। সন্তানের সাথে পুত্রের সন্তানদেরকেও, পিতার সাথে দাদাকেও যুক্ত করা হয়েছে। আর মৃত ব্যক্তির যদি সন্তান না থাকে এবং কেবল পিতামাতাই ওয়ারিশ হয় অথবা মৃত ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রী থাকে তবে মাতা পাবে তিন ভাগের একাংশ (فلامه) -এর হামযা পেশের সাথে এবং যেরের সাথেও পাঠ হয়েছে উভয় ক্ষেত্রে। যেরের সাথে পঠিত হয়েছে পেশের পর যেরের দিকে প্রত্যাবর্তনের কাঠিন্য থেকে পরিত্রাণের জন্য। উল্লিখিতাবস্থায় পূর্ণ ত্যাজ্য সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ হবে মাতার জন্য অথবা স্বামী বা স্ত্রীর অংশ দেওয়ার পর যা থাকবে তার তৃতীয়াংশ পাবে। আর অবশিষ্টাংশ পাবে পিতা। আর যদি তার তথা মৃত ব্যক্তির দুই বা ততোধিক ভাই অথবা বোন থাকে, তবে মাতার জন্য হবে ষষ্ঠাংশ আর অবশিষ্টাংশ পাবে পিতা এবং ভাই বা বোনদের জন্য কিছুই হবে না। উপরোল্লিখিত ওয়ারিশদের বর্ণিত উত্তরাধিকারের অংশসমূহ হবে অসিয়ত পালনের পর যা করে মারা গেছে কিংবা ঋণ পরিশোধের পর, যা মৃত ব্যক্তির উপর ছিল। يُوْصِيْ ক্রিয়াটি মা'রূফ ও মাজহুল উভয় রকমই পড়া হয়েছে। বিধানগতভাবে আদায়ের বেলায় ঋণের পর অসিয়ত পালন করা হলেও এখানে বর্ণনার ক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদানের লক্ষ্যে অসিয়তকে ঋণের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। اٰبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ মুবতাদা; তার খবর হলো لَا تَدْرُوْنَ। তোমাদের পিতা ও পুত্রদের মধ্যে কে তোমাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে অধিকতর উপকারী হবে? তা তোমরা জান না। কেউ ধারণা করল, তার পুত্র তার জন্য অধিকতর উপকারী হবে। ফলে তাকে সে উত্তরাধিকার দান করার পর বাস্তবে তার পিতা তার জন্য অধিক উপকারী হয়ে যায় এবং এর বিপরীতও হতে পারে; বরং এ সম্পর্কে জ্ঞাতা হলেন আল্লাহ তা'আলা, তাই তিনি তোমাদের জন্য উত্তরাধিকার নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এসব অংশ আল্লাহর তরফ থেকে নির্ধারিত। নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী স্বীয় সৃষ্টি সম্পর্কে তাদের জন্য যেসব অংশ নির্ধারণ করেছেন সে সম্পর্কে রহস্যবিদ। অর্থাৎ তিনি এ গুণে সর্বদা গুণান্বিত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ يُوْصِيْ : إِيْصَاءٌ মাসদার থেকে মুজারে ওয়াহিদে মুজাক্কার গায়েবের সিগাহ। অর্থ তিনি অসিয়ত করছেন, নির্দেশ দিচ্ছেন। অসিয়ত এর আসল অর্থ হচ্ছে ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্তে অসিয়ত ও নসিহত করা। অসিয়তের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে যেহেতু আল্লাহপাকের জন্য প্রয়োগ সম্ভব নয়, তাই গ্রন্থকার يُوْصِيْ -এর তাফসীর يَأْمُرُ দ্বারা করেছেন।

قَوْلُهُ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ مَا تَرَكَ : إِنْ হরফে শর্ত। كُنَّ ফে'লে নাকিস, هُنَّ যমীর তার ইসিম نِسَاءً মাওসূফ اثْنَتَيْنِ فَوْقَ সিফত। মাওসূফ সিফত মিলে খবরে كُنَّ। كُنَّ তার ইসিম ও তার খবর মিলে জুমলা হয়ে শর্ত। فَلَهُنَّ مَا تَرَكَ জবাবে শর্ত। শর্ত ও জবাবে শর্ত মিলে জুমলায়ে শর্তিয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ وَفَوْقَ صِلَةٌ وَقِيلَ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ زِيَادَةِ النَّصْبِ الخ : এই ইবারতটি বৃদ্ধি করে গ্রন্থকার হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর ইকামতের জবাব দিয়েছেন। এ বাক্যটিতে দুটি জবাবের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর তাফাররুদ বা একক মতটি হলো এই যে, তিনি বলেন, দুই তৃতীয়াংশ মেয়েরো তখনই পাবে যখন তারা দুয়ের অধিক হয়। অথচ জমহুর ওলামায়ে কেরামের মত হলো এই যে, মেয়রা দুজন হলেও দুই তৃতীয়াংশ পাবে এবং দুইয়ের অধিক হলেও পাবে। তারা এই তাফাররুদের দুটি জবাব দিয়েছেন।

১. فَوْقَ শব্দটি صِلَةٌ হিসেবে অতিরিক্ত ব্যবহৃত হয়েছে। যেরূপ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ -এর মধ্যে فَوْقَ শব্দটি অতিরিক্ত ব্যবহৃত হয়েছে।
২. দ্বিতীয় জবাব হলো এই যে, فَوْقَ শব্দটি একটি সম্ভাব্য সৃষ্ট ধারণা খণ্ডনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আর তা হলো এই যে, মেয়েদের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের অংশও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। কারণ তারা একজন হলে এক তৃতীয়াংশ পায়, দুইজন হলে দুই তৃতীয়াংশ, সুতরাং দুইয়ের অধিক হলেও তাদের অংশ বৃদ্ধি পেতে থাকবে অথচ বাস্তবে বিষয়টি এ রকম ন। কারণ তারা দুইয়ের অধিক যতজনই হোক দুই তৃতীয়াংশই পাবে। আর এই সন্দেহটা যেহেতু فَوْقَ শব্দ দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে তাই দ্বিতীয় জবাব হিসেবে বলে দিলেন যে, এই ধারণা দূর করার জন্য فَوْقَ শব্দ এসেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উত্তরাধিকার বিধান : لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الخ আয়াতের মধ্যে উত্তরাধিকারের সংরক্ষিত বিধান ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এর বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

জাহিলী যুগে উত্তরাধিকারের কারণ ছিল তিনটি। যথা–

১. বংশীয় সম্পর্ক। তবে বংশীয় সম্পর্কে সম্পর্কিত লোকদের মধ্যেও কেবল তারাই ওয়ারিশ হতো, যারা স্বগোত্রের পক্ষে শত্রুদের মোকাবিলায় যুদ্ধ করার যোগ্যতা রাখত। অর্থাৎ সুস্থ যুবক পুরুষেরা কেবল ওয়ারিশ হতো। মৃত ব্যক্তির মহিলা, বাচ্চা ও দুর্বল আত্মীয়দেরকে উত্তরাধিকারের সম্পত্তি থেকে অংশ দেওয়া হতো না।
২. تَبَنِّي বা কাউকে পালক পুত্র বানিয়ে নেওয়া। মৃত্যুর পর পোষ্য পুত্রও উত্তরাধিকারে অধিকারী হতো।
৩. অঙ্গীকার ও শপথ। অর্থাৎ একজন অপরজনকে বলে দিত আমার রক্ত তোমার রক্ত, আমার প্রাণ তোমার প্রাণ। আমার রক্ত বিনষ্ট হলে তোমার রক্তও বিনষ্ট হবে। আমি মারা গেলে তুমি হবে আমার ওয়ারিশ, আর তুমি মারা গেলে আমি হব তোমার ওয়ারিশ। আমার বদলে তুমি হবে পাকড়াও, আমি হবো তোমার বদলে। উভয়ে যখন পরস্পরে এরূপ অঙ্গীকার করে নিত তখন তারা উভয়ে একে অন্যের ওয়ারিশ হয়ে যেত। প্রথমে যে মারা যেত, দ্বিতীয়জন তার ওয়ারিশ হতো।

ইসলামের প্রথম যুগে পরস্পরে ওয়ারিশ হওয়ার কারণ ছিল দুটি। একটি ছিল হিজরত আর অপরটি ছিল ইসলামি ভ্রাতৃত্ব বন্ধন। অর্থাৎ যখন কোনো সাহাবী হিজরত করে মদিনায় আসতেন তখন দ্বিতীয় মুহাজিরই তার ওয়ারিশ হতেন, যদিও তিনি তার আত্মীয় বা স্বজন না হতেন। আর গায়রে মুহাজির, মুহাজির ব্যক্তির ওয়ারিশ হতেন না, যদিও তিনি তার আত্মীয়ই হোক না কেন। আর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের মর্ম হলো এই যে, হুজুর ﷺ যখন মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরত করে আসলেন তখন তিনি দুই মুসলমানকে একজনকে অপরজনের ভাই বানিয়ে দিয়েছিলেন। তারা উভয়ে পরস্পরে একে অন্যের ওয়ারিশ হতেন। কিন্তু পরবর্তীতে ইসলাম অন্ধকার যুগের এবং ইসলামের প্রথম যুগের পরস্পরে ওয়ারিশ হওয়ার পদ্ধতিকে রহিত করে দিয়েছে। এবং ওয়ারিশ হওয়ার ভিত্তি স্বরূপ তিনটি বস্তুকে সাব্যস্ত করেছে। ১. নসব বা বংশীয় সম্পর্ক তথা সন্তান ও জনক-জননী হওয়া। ২. বিবাহ অর্থাৎ স্বামী ও স্ত্রী বিবাহ সম্পর্কের কারণে একে অন্যের ওয়ারিশ হয়ে থাকে এবং ৩. তৃতীয়টি হলো উলা বা দাস-দাসীকে স্বাধীন করা। যার ভিত্তিতে মালিক তার আজাদকৃত গোলাম বাঁদির, আর আজাদকৃত গোলাম বাঁদি তাদেরকে আজাদকারী মালিকের উত্তরাধিকারের ওয়ারিশ হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ :

উল্লিখিত আয়াতের শানে নুযূল : ইবনে আবী শাইবা, আহমদ, ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম তিরমিযী ও ইমাম ইবনে মাজাহ (র.) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ হযরত জাবের (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, সা'দ ইবনে রবীর স্ত্রী হুজুর ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! সাদ ইবনে রবীর দুটি কন্যা রয়েছে। আর তাদের পিতা রবী আপনার সঙ্গে ওহুদ যুদ্ধে গিয়ে শহীদ হয়ে গেছে এবং তার ত্যাজ্য সম্পত্তি সারাটাই তার চাচা নিয়ে নিয়েছে, তার কন্যাদেরকে কিছুই দেয়নি। আর অর্থ- সম্পদ ছাড়া তাদের বিয়ে-শাদীও হবে না। হুজুর ﷺ বললেন, আল্লাহ পাক তাদের সম্পর্কে ফয়সালা দিবেন। এর উপর উত্তরাধিকারের বিধান সম্বলিত يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ الخ আয়াতটি নাজিল হয়। এ আয়াতটি নাজিল হওয়ার পর তিনি সা'আদের কন্যাদের চাচার নিকট সংবাদ পাঠিয়ে বলে দিলেন যে, সা'আদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ তার দুই মেয়েকে আর এক অষ্টমাংশ তার স্ত্রীকে দিয়ে দিবে আর বাকিটা তোমার জন্য হবে। ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, এটাই ইসলামের প্রথম মৃত্যের ত্যাজ্য সম্পত্তি, যা বণ্টন করা হয়েছে।

মেয়েদের অংশ : আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে দুই এর অধিক কন্যাদের অংশ বর্ণনা করেছেন। দুজন মেয়ের অংশ সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেননি। কারণ-

১. এর পূর্বে لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ দ্বারা একথা জানা হয়ে গেছে যে, একজন ছেলের অংশ দুজন মেয়ের সমান। অর্থাৎ দুই তৃতীয়াংশ। এতে একথাও প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, দুই মেয়ের অংশ হবে দুই তৃতীয়াংশ।
২. এ ছাড়া এক ছেলের বর্তমানে যখন মেয়ের তৃতীয়াংশ হয়, তাহলে দ্বিতীয় মেয়ের বর্তমানে তার জন্য উত্তমরূপে তৃতীয়াংশ হওয়া উচিত। কেননা পুত্র সন্তান কন্যা সন্তানের তুলনায় অধিক প্রাপ্তির অধিকার রাখে।
৩. শানে নুযূলের ঘটনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, হুজুর ﷺ সা'আদের দুই মেয়েকে দুই তৃতীয়াংশ দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তাছাড়া আল্লাহ পাক এক মেয়ে এবং তিন ও তিনের অধিক মেয়েদের হুকুম বর্ণনা করেছেন। তবে দুই মেয়ের হুকুম সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেননি। কিন্তু বোনদের উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে দু বোনের দুই তৃতীয়াংশের কথা বর্ণনা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

اِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ـ

সুতরাং দু'বোনের অংশ যখন দুই তৃতীয়াংশ হলো তখন দু মেয়ের অংশ উত্তমরূপে দুই তৃতীয়াংশ হওয়া উচিত। কেননা মৃতের মেয়েরা মৃতের বোনদের তুলনায় নিকটতম।

মোটকথা দুই মেয়ের দুই তৃতীয়াংশ হওয়াটা পূর্বের আয়াত দ্বারা জানা হয়ে গিয়েছিল। এখানে সন্দেহ ছিল যে, যদি কারো তিন মেয়ে থাকে তবে হয়তো তাদের তিন তৃতীয়াংশ অর্থাৎ পূর্ণ সম্পদই মিলে যাবে। তাই আলোচ্য আয়াতে এই সন্দেহের অবসানকল্পে বলে দিয়েছেন য়ে, মেয়েরা দুয়ের অধিক হলেও তাদের অংশ দুই তৃতীয়াংশ হতে বৃদ্ধি পাবে না।

পিতা-মাতার মিরাছী স্বত্ব : وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ এখানে পিতা-মাতার অংশের তিনটি অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

১. মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতার সাথে যদি তার ছেলেমেয়েরাও থাকে তবে এ অবস্থায় মৃতব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে মাতা-পিতা প্রত্যেকেই ষষ্ঠাংশ করে পাবে।
২. মৃত ব্যক্তির ছেলে-মেয়েও নেই এবং ভাই-বোনও নেই শুধু তার মাতা-পিতা রয়েছে। এমতাবস্থায় তার মাতা পাবে এক তৃতীয়াংশ আর পিতা পাবে অবশিষ্ট দুই তৃতীয়াংশ।
৩. তৃতীয় অবস্থা হলো এই যে, মৃত ব্যক্তির মাতা-পিতার সাথে মৃতের ছেলে-মেয়ে নেই, তবে তার একাধিক ভাই-বোন রয়েছে, চায় সহোদর ভাই হোক বা বৈমাত্রেয় হোক বা বৈপিত্রেয় হোক। এমতাবস্থায় মাতা পাবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ আর বাকি পুরোটা পেয়ে যাবে পিতা; এমতাবস্থায় ভাই-বোনেরা কিছুই পাবে না।

ওয়ারিশগণের এ পর্যন্ত যেসব অংশ বর্ণনা করা হয়েছে, তার সবই মৃতব্যক্তির অসিয়ত পালন করার এবং ঋণ পরিশোধ করার পর হবে। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে প্রথমে তার কাফন-দাফনের কাজ সারা যাবে, অতঃপর ঋণ পরিশোধ করা হবে, তার এক তৃতীয়াংশ মাল থেকে অসিয়ত আদায় করা হবে। তারপর অবশিষ্ট সম্পত্তি ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

১২. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ مِنْكُمْ أَوْ مِنْ غَيْرِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَا اَوْ دَيْنٍ ـ وَاُلْحِقَ بِالْوَلَدِ فِيْ ذٰلِكَ وَلَدُ الْاِبْنِ بِالْاِجْمَاعِ وَلَهُنَّ اَيِ الزَّوْجَاتِ تَعَدَّدْنَ اَوْلَا الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ مِنْهُنَّ اَوْ مِنْ غَيْرِهِنَّ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَا اَوْ دَيْنٍ وَوَلَدُ الْاِبْنِ كَالْوَلَدِ فِيْ ذٰلِكَ اِجْمَاعًا وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ صِفَةٌ وَالْخَبَرُ كَلٰلَةً اَيْ لَا وَالِدَ لَهٗ وَلَا وَلَدَ اَوِ امْرَأَةٌ تُوْرَثُ كَلٰلَةً وَّلَهٗ اَيْ لِلْمَوْرُوْثِ الْكَلَالَةِ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ اَيْ مِنْ اُمٍّ وَقَرَأَ بِهِ ابْنُ مَسْعُوْدٍ وَغَيْرُهٗ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ فَاِنْ كَانُوْا اَيِ الْاِخْوَةُ وَالْاَخَوَاتُ مِنَ الْاُمِّ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ اَيْ مِنْ وَاحِدٍ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ يَسْتَوِيْ فِيْهِ ذُكُوْرُهُمْ وَاِنَاثُهُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَا اَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ حَالٌ مِنْ ضَمِيْرِ يُوْصٰى اَيْ غَيْرَ مُدْخِلِ الضَّرَرِ عَلَى الْوَرَثَةِ بِاَنْ يُّوْصِيَ بِاَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَصِيَّةً مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ لِيُوْصِيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِمَا دَبَّرَهٗ لِخَلْقِهٖ مِنَ الْفَرَائِضِ حَلِيْمٌ بِتَاخِيْرِ الْعُقُوْبَةِ عَمَّنْ خَالَفَهٗ وَخَصَّتِ السُّنَّةُ تَوْرِيْثَ مَنْ ذُكِرَ بِمَنْ لَيْسَ فِيْهِ مَانِعٌ مِنْ قَتْلٍ اَوْ اِخْتِلَافِ دِيْنٍ اَوْ رِقٍّ ـ

অনুবাদ :

১২. আর তোমাদের স্ত্রীদের ত্যাজ্য সম্পত্তির অর্ধেক হবে তোমাদের জন্য, যদি তাদের কোনো সন্তান না থাকে, তোমাদের তরফ থেকে বা অন্য কোনো স্বামীর তরফ থেকে। যদি তাদের সন্তান থাকে, তবে তোমাদের হবে এক চতুর্থাংশ ঐ সম্পত্তির, যা তারা ছেড়ে যায়– অসিয়তের পর যা তারা করে এবং ঋণ পরিশোধের পর। আর এ হুকুমের মধ্যে সন্তানের সাথে পুত্রের সন্তানদেরকেও মিলিত করা হয়েছে ইজমা দ্বারা। আর স্ত্রীদের জন্য চাই একাধিক হোক বা না হোক এক চতুর্থাংশ হবে ঐ সম্পত্তির যা তোমরা ছেড়ে যাও, যদি তোমাদের সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে তাদের তরফ থেকে হোক বা অন্য স্ত্রীর তরফ থেকে হোক, তবে তাদের জন্য হবে অষ্টমাংশ ঐ সম্পত্তির, যা তোমরা ছেড়ে যাও অসিয়তের পর যা তোমরা কর এবং ঋণ পরিশোধের পর। এ হুকুমে ছেলের সন্তানরা আপন সন্তানের ন্যায় হবে ইজমা দ্বারা। আর যদি কোনো [মৃত] পুরুষ বা মহিলা কালালা তথা এমন ব্যক্তি হয় যার পিতা-পুত্র না থাকে এবং এ মৃতের বৈমাত্রেয় একভাই বা বোন থাকে, তবে উভয়ের মধ্যে প্রত্যেকেই এক ষষ্ঠাংশ পাবে মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তির। وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ -এর মধ্যে يُّوْرَثُ বাক্যটি رَجُلٌ -এর সিফত হয়েছে। [মাওসূফ সিফত মিলে كَانَ -এর ইসিম] আর كَلٰلَةً তার খবর। এখানে ভাই-বোন বলতে বৈপিত্রেয় ভাই-বোন উদ্দেশ্য। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) প্রমুখের কেরাতে وَلَهٗ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ مِنْ اُمٍّ রয়েছে। আর বৈপিত্রেয় ভাই ও বোন, যদি একাধিক হয়, তবে তারা এক তৃতীয়াংশে শরিক হবে এতে নারী-পুরুষ উভয়ই সমান। অসিয়তের পর, যা করা হয় অথবা ঋণ পরিশোধের পর। এমতাবস্থায় যে, অপরের ক্ষতি না করে। غَيْرَ مُضَارٍّ তারকীবে يُوْصٰى -এর যমীর থেকে হাল হয়েছে। অর্থাৎ ওয়ারিশদেরকে ক্ষতি সাধনকারী না হয়ে। যেমন– এক তৃতীয়াংশেরও অধিক সম্পদ অসিয়ত করে। এটি আল্লাহর আদেশ। وَصِيَّةً শব্দটি يُوْصِيْكُمْ ফে'লের মাফউলে মুতলাক। আল্লাহ সর্বজ্ঞ তাঁর বান্দাদের জন্য উত্তরাধিকার বিধান নির্ধারণে সহনশী।ল তাঁর বিরুদ্ধাচারণকারীদের থেকে শাস্তি পিছিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে। উল্লিখিত উত্তরাধিকার বিধান তাদের জন্যই প্রযোজ্য বলে সুন্নতে রাসূল খাস করে দিয়েছে, যাদের মধ্যে উত্তরাধিকার প্রাপ্তিতে কোনো প্রতিবন্ধক না থাকে। যেমন– হত্যা, ধর্মবিরোধ, গোলাম ও বাঁদি হওয়া।

١٣. تِلْكَ الْاَحْكَامُ الْمَذْكُورَةُ مِنْ اَمْرِ الْيَتٰمٰى وَمَا بَعْدَهُ حُدُودُ اللّٰهِ شَرَائِعُهُ الَّتِىْ حَدَّهَا لِعِبَادِهٖ لِيَعْمَلُوْا بِهَا وَلَا يَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فِيْمَا حَكَمَ بِهٖ يُدْخِلْهُ بِالْيَاءِ وَالنُّوْنِ اِلْتِفَاتًا جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ـ

১৩. এসব এতিমদের বিষয়াদি ও তার পরবর্তী বিধানসমূহ আল্লাহ তা'আলার নির্দিষ্ট সীমাসমূহ তথা শরিয়তের বিধানসমূহ যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যাতে তারা এর উপর আমল করে এবং এর সীমালঙ্ঘন না করে। আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে ঐসব বিষয়ে যার নির্দেশ তিনি দিয়েছেন, তাকে এমন বেহেশতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত রয়েছে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। يُدْخِلْهُ ইয়া ও নূনের সাথে, নূনের সুরতে গায়েব থেকে মুতাকাল্লিমের দিকে এলতেফাত হবে। আর এটাই বিরাট সাফল্য।

١٤. وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ بِالْوَجْهَيْنِ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهٗ فِيْهَا عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ذُوْ اِهَانَةٍ وَرُوْعِىَ فِى الضَّمَائِرِ فِى الْاٰيَتَيْنِ لَفْظُ مَنْ وَفِىْ خٰلِدِيْنَ مَعْنَاهَا ـ

১৪. আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করে এবং তাঁর সীমাসমূহ অতিক্রম করে তাকে জাহান্নামে দাখিল করবেন। نُدْخِلْهُ -এর মধ্যে পূর্বের ন্যায় দুই সুরত হবে। সেখানে সে চিরকাল থাকবে। আর তার জন্য সেখানে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। উল্লিখিত আয়াত দ্বয়ের উভয়টির মধ্যেই যমীরসমূহে مَنْ শব্দের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। আর خٰلِدِيْنَ -এর মধ্যে مَنْ -এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

كَلٰلَةً [কালালা]-এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত কালালার বিভিন্ন সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

১. তবে প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা হলো, যার ঊর্ধ্বতন পুরুষ যেমন– পিতা, দাদা বা পরদাদাও নেই এবং অধঃস্তন পুরুষ যেমন– ছেলে বা নাতিও নেই– এ রকম মৃত ব্যক্তিকে কালালা বলা হয়।

২. ঐ ওয়ারিশ যার ঊর্ধ্বতন ও অধঃস্তন লোকেরা তথা পিতা, দাদা ও ছেলে, নাতি নেই, তাকে কালালা বলা হয়।

৩. ঐ ত্যাজ্য সম্পত্তি যা পুত্র ও পিতাবিহীন মৃত ব্যক্তি রেখে যায়, সেটাকে কালালা বলা হয়।

كَلَالَةٌ আসলে كَلَالٌ -এর ন্যায় মাসদার। كَلَالٌ -এর অর্থ হলো শ্রান্ত ও ক্লান্ত হওয়া, যা দুর্বলতার পরিচায়ক। পিতা–পুত্রের আত্মীয়তা ব্যতীত অন্য আত্মীয়তাকে কালালা বলা হয়েছে। কেননা এ আত্মীয়তা পিতা-পুত্রের আত্মীয়তার তুলনায় দুর্বল। বলা হয় যে– كَلَّ الرَّجُلُ فِىْ مَشْيِهٖ كَلَالًا অর্থাৎ লোকটি তার চলার গতিতে দুর্বল হয়ে পড়েছে। ক্লান্ত হয়ে গেছে। كَلَّ السَّيْفُ عَنْ ضَرْبَتِهٖ كُلُوْلًا وَكَلَالَةً অর্থাৎ তলোয়ার ভোঁতা হয়ে গেছে। كَلَّ اللِّسَانُ عَنِ الْكَلَامِ অর্থাৎ, জবান কথা বলতে অপারগ হয়ে গেছে। রূপক অর্থে কালালা দ্বারা ঐ আত্মীয়তা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে যাদের পরস্পরে পিতা– পুত্রের সম্পর্ক হয় না। অতঃপর কালালাকে যুল কালালার অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আর তা দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য যার আসলও নেই অর্থাৎ বাপ-দাদাও নেই এবং নসলও নেই অর্থাৎ ছেলে বা নাতিও নেই। এমন ব্যক্তি চায় মৃত হোক বা কারো ওয়ারিশ হোক।

–[তাফসীরে মাযহারী খ. ২, পৃ. ৫১৬, মা'আরিফুল কুরআন খ. ২, পৃ. ৩৬১]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

স্বামী-স্ত্রীর ওয়ারিশী স্বত্ব : (الاية) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ আলোচ্য আয়াতটিতে স্বামী-স্ত্রীর উত্তরাধিকার বর্ণনা করা হয়েছে। স্বামী ও স্ত্রীর প্রত্যেকেরই দু'টি অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। যথা–

১. মৃত ব্যক্তি যদি স্ত্রী হয় আর তার কোনো সন্তান না থাকে তবে এ অবস্থায় তার স্বামী তার স্ত্রীর ত্যাজ্য সম্পত্তির অর্ধেক পাবে।

২. আর যদি স্ত্রীর সন্তান থাকে তাহলে এক অষ্টমাংশ পাবে। –[মা'আরিফে ইদ্রীসিয়া খ. ২, পৃ. ১৫১–৫৫]

বৈপিত্রেয় ভাইবোনের অংশ :

وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗٓ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ الخ . আলোচ্য আয়াতে বৈপিত্রেয় ভাই-বোনদের অংশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

ভাই–বোন তিন প্রকার। যথা– ১. সহোদর ২. বৈমাত্রেয় অর্থাৎ পিতা এক তবে মাতা ভিন্ন ভিন্ন এবং ৩. বৈপিত্রেয় অর্থাৎ তাদের মাতা এক, তবে পিতা ভিন্ন ভিন্ন। আলোচ্য তৃতীয় প্রকার ভাই-বোনদের অংশের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন– হযরত ইবনে মাসউদ, উবাই বিন কা'আব, সা'আদ বিন আবী আক্কাস (রা.) প্রমুখের কেরাতে وَلَهٗٓ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ এর পরে مِنَ الْاُمِّ -এর কথা উল্লেখ রয়েছে। বৈপিত্রেয় ভাই-বোনেরাই যদি মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ হয় তবে তারা একজন হলেও এক তৃতীয়াংশ পাবে। আর একাধিক হলেও সকলে মিলে এক তৃতীয়াংশ পাবে। কারণ বৈপিত্রেয় ভাই-বোনেরা তাদের মাতার মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির দিকে সম্পৃক্ত হয়। আর মাতা যেহেতু এক তৃতীয়াংশের অধিক পাবে না, তাই তারাও কেবল তাদের মাতার অংশেরই অধিকারী হবে। এই জন্যই এখানে নারী–পুরুষ উভয়কে সমান রাখা হয়েছে। মিরাস বণ্টনের ক্ষেত্রে এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী অংশ।

মাসআলা : আলোচ্য আয়াতে তিনবার অসিয়তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তির কাফন–দাফনের খরচের পর তার ত্যাজ্য সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ মাল থেকে তার কৃত অসিয়ত আদায় করা যাবে। এর অধিক হলে শরিয়তের দৃষ্টিতে তা গ্রহণযোগ্য নয়। তার অসিয়ত বাতিল বলে বিবেচিত হবে। বিধানগত দিক দিয়ে ঋণ পরিশোধ অসিয়তের পূর্বে হলেও এখানে অসিয়তের গুরুত্ব প্রদানের জন্য অসিয়তকে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

মাসআলা : কোনো ওয়ারিশের জন্য অসিয়ত করা জায়েজ নয়। যদি কেউ তার ওয়ারিশের জন্য অসিয়ত করে নেয়, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। তার জন্য মিরাসী স্বত্বই যথেষ্ট।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজের খুৎবায় ইরশাদ করেছেন– اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَعْطٰى كُلَّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهٗ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ আল্লাহ পাক প্রত্যেক হকদারকে তার হক দিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং কোনো ওয়ারিশের জন্য অসিয়ত গ্রহণযোগ্য হবে না। হ্যাঁ, অন্যান্য ওয়ারিশগণ যদি অনুমতি দিয়ে দেয় তাহলে অসিয়ত কার্যকর হয়ে যাবে। অবশিষ্ট সম্পত্তি শরয়ী বিধান মোতাবেক বণ্টন করা হবে, তাতে সে ও তার মিরাসি স্বত্ব পাবে।

غَيْرَ مُضَارٍّ -এর ব্যাখ্যা : এর মর্ম হলো এই যে, মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তির জন্য অসিয়ত বা ঋণের মাধ্যমে নিজের ওয়ারিশদেরকে ক্ষতি পৌঁছানো জায়েজ নেই। অসিয়ত বা ঋণের মাধ্যমে ক্ষতি পৌঁছানোর বিভিন্ন সূরত হতে পারে। যেমন– মিথ্যা ঋণের কথা স্বীকার করে নেওয়া বা নিজের ব্যক্তিগত সম্পদকে আমানতের মাল স্বীকার করা যে, এটা অমুকের আমানত। যাতে করে তাতে মিরাসি স্বত্ব চলতে না পারে অথবা এক তৃতীয়াংশ মালের অধিক সম্পদের অসিয়ত করা। অথবা কোনো ব্যক্তির উপর তার ঋণ পাওনা রয়েছে। কিন্তু সে বলে দিল যে, আদায় হয়ে গেছে ইত্যাদি। –[জামালাইন খ. ১, পৃ. ৬০৭]

قَوْلُهٗ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ : এতে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা তথা বিধি-নিষেধ লঙ্ঘনকারীদের জন্য ভীতি প্রদান করা হয়েছে।

অনুবাদ :

١٥. وَالّٰتِىْ يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ الزِّنَا مِنْ
نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً
مِّنْكُمْ اَىْ مِنْ رِجَالِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاِنْ شَهِدُوْا
عَلَيْهِنَّ بِهَا فَاَمْسِكُوْهُنَّ اِحْبِسُوْهُنَّ فِى
الْبُيُوْتِ وَامْنَعُوْهُنَّ مِنْ مُخَالَطَةِ النَّاسِ
حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَىْ مَلٰئِكَتُهٗ اَوْ اِلٰى اَنْ
يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا طَرِيْقًا اِلَى الْخُرُوْجِ
مِنْهَا اُمِرُوْا بِذٰلِكَ اَوَّلَ الْاِسْلَامِ ثُمَّ جَعَلَ لَهُنَّ
سَبِيْلًا بِجَلْدِ الْبِكْرِ مِائَةً وَتَغْرِيْبِهَا عَامًا
وَرَجْمِ الْمُحْصَنَةِ وَفِى الْحَدِيْثِ لَمَّا بَيَّنَ
الْحَدَّ قَالَ ﷺ خُذُوْا عَنِّىْ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ
سَبِيْلًا رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৫. আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা নির্লজ্জ কাজ তথা ব্যভিচার করে তাদের উপর তোমাদের মধ্য থেকে চারজন মুসলমান পুরুষকে সাক্ষী হিসেবে তলব কর। অতঃপর যদি তারা তাদের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের সাক্ষ্য প্রদান করে, তবে তাদেরকে গৃহে আবদ্ধ রাখ, লোকদের সাথে তাদের মিলামেশা করা হতে বিরত রাখ। যে পর্যন্ত তাদেরকে মৃত্যু তথা মৃত্যুর ফেরেশতাগণ তুলে না নেয়। অথবা আল্লাহ্ তাদের জন্য এ থেকে বেরিয়ে আসার কোনো পথ নির্ধারিত না করেন। এ হুকুমটি ইসলামের প্রথম যুগে ছিল। অতঃপর তাদের এরূপ পথ নির্ধারণ করেছেন যে, কুমারী হলে একশত বেত্রাঘাত ও এক বৎসরের নির্বাসন আর বিবাহিতা হলে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড। হাদীস শরীফে এসেছে যে, যখন হদ্দ বা ব্যভিচারের দণ্ডবিধি বর্ণনা করেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন, আমার কাছ থেকে নিয়ে নাও, আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তাদের জন্য পথ নির্ধারিত করে দিয়েছেন। হাদীসটি ইমাম মুসলিম (র.) বর্ণনা করেছেন।

١٦. وَالَّذٰنِ بِتَخْفِيْفِ النُّوْنِ وَتَشْدِيْدِهَا
يَأْتِيٰنِهَا اَىِ الْفَاحِشَةَ الزِّنَا وَاللِّوَاطَةَ
مِنْكُمْ اَىْ مِنَ الرِّجَالِ فَاٰذُوْهُمَا بِالسَّبِّ
وَالضَّرْبِ بِالنِّعَالِ فَاِنْ تَابَا مِنْهَا
وَاَصْلَحَا الْعَمَلَ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا وَلَا
تُؤْذُوْهُمَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا عَلٰى مَنْ تَابَ
رَحِيْمًا بِهٖ وَهٰذَا مَنْسُوْخٌ بِالْحَدِّ اِنْ اُرِيْدَ بِهِ
الزِّنَا وَكَذَا اِنْ اُرِيْدَ بِهَا اللِّوَاطَةُ عِنْدَ
الشَّافِعِىْ (رح) لٰكِنَّ الْمَفْعُوْلَ بِهٖ لَا يُرْجَمُ
عِنْدَهٗ وَاِنْ كَانَ مُحْصَنًا بَلْ يُجْلَدُ وَيُغَرَّبُ

১৬. وَالَّذٰنِ-এর নূনটি জযম ও তাশদীদযোগে পঠিত হয়েছে। আর তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে যে দুজন সেই কুকর্মে তথা ব্যভিচারে বা সমকামিতায় লিপ্ত হয়, তাদের উভয়কে শাস্তি দাও ভর্ৎসনা ও জুতা দ্বারা প্রহার করে। অতঃপর যদি তারা উভয়ে এ কুকর্ম থেকে তওবা করে নেয় এবং আমল সংশোধন করে নেয়, তবে তাদের পেছনে পড়ো না এবং তাদেরকে কষ্ট দিয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তওবাকারীর তওবা গ্রহণকারী এবং তার প্রতি অতিশয় দয়ালু। এ হুকুমটি ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে, হদের দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। এ কুকর্ম দ্বারা ব্যভিচার উদ্দেশ্য হোক অথবা সমকামিতা উদ্দেশ্য হোক। তবে তাঁর মতে, যার সঙ্গে এ কুকর্ম হয়েছে তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা যাবে না যদিও সে বিবাহিত হয়; বরং তাকে বেত্রাঘাত করা যাবে এবং নির্বাসন দেওয়া যাবে।

وَاَرَادَةُ اللِّوَاطَةِ اَظْهَرُ بِدَلِيْلِ تَثْنِيَةِ الضَّمِيْرِ وَالْاَوَّلُ قَالَ اَرَادَ الزَّانِىْ وَالزَّانِيَةَ وَيَرُدُّهُ تَبْيِيْنُهُمَا بِمِنَ الْمُتَّصِلَةِ بِضَمِيْرِ الرِّجَالِ وَاشْتِرَاكُهُمَا فِى الْاَذٰى وَالتَّوْبَةِ وَالْاِعْرَاضِ وَهُوَ مَخْصُوْصٌ بِالرِّجَالِ لِمَا تَقَدَّمَ فِى النِّسَاءِ مِنَ الْحَبْسِ ـ

তবে সমকামিতা উদ্দেশ্য হওয়াটাই অধিকতর স্পষ্ট। কারণ আয়াতের (اَلَّذَانِ) -এর মধ্যে দ্বিবচনের সর্বনাম পদ এসেছে। আর প্রথম মত পোষণকারী [অর্থাৎ কুকর্ম দ্বারা ব্যভিচার উদ্দেশ্যকারী] উক্ত দ্বিবচন দ্বারা ব্যভিচার ও ব্যভিচারিণী উদ্দেশ্য নিয়েছেন। কিন্তু مِنْ শব্দটিকে পুংবাচক ضَمِيْر বা সর্বনাম (كُمْ) -এর সাথে ব্যবহার করা এবং শাসন, তওবা, উপেক্ষা ইত্যাদি শাস্তির ক্ষেত্রে উভয়কে এক করা তাদের ঐ অর্থ প্রত্যাখ্যান করে। কেননা এ ধরনের শাস্তি তখন কেবলমাত্র পুরুষদের জন্যেই ছিল নির্দিষ্ট। কারণ মহিলাদের হুকুম গৃহবন্দী হওয়ার কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

১٧. اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ اَىِ الَّتِىْ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهٖ قَبُوْلَهَا بِفَضْلِهٖ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ الْمَعْصِيَةَ بِجَهَالَةٍ حَالٌ اَىْ جَاهِلِيْنَ اِذْ عَصَوْا رَبَّهُمْ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ زَمَنٍ قَرِيْبٍ قَبْلَ اَنْ يُغَرْغِرُوْا فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ يَقْبَلُ تَوْبَتَهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا بِخَلْقِهٖ حَكِيْمًا فِىْ صُنْعِهٖ بِهِمْ ـ

১৭. আল্লাহর জন্য তওবা কবুল করাই জরুরি যা তিনি স্বীয় অনুগ্রহে নিজের উপর অপরিহার্য করে নিয়েছেন। ঐ সব লোকদের তওবা যারা ভুলবশত মন্দকাজ গুনাহ করে ফেলে। بِجَهَالَةٍ তারকীবে حَال হয়েছে। অর্থাৎ স্বীয় প্রভুর নাফরমানি কালে তারা মূর্খতাই করে বসে। অতঃপর অনতিবিলম্বে হলকুমে দম আসার পূর্বে তওবা করে ফেলে, আল্লাহ তা'আলা তাদের তওবাকে কবুল করে নেন। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টি সম্পর্কে অতীব অবহিত, তাদের প্রতি ব্যবহারে প্রজ্ঞাবান।

١٨. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ الذُّنُوْبَ حَتّٰٓى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ وَاَخَذَ فِى النَّزْعِ قَالَ عِنْدَ مُشَاهَدَةِ مَا هُوَ فِيْهِ اِنِّىْ تُبْتُ الْـٰٔنَ فَلَا يَنْفَعُهُ ذٰلِكَ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ اِذَا تَابُوْا فِى الْاٰخِرَةِ عِنْدَ مُعَايَنَةِ الْعَذَابِ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ اُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا اَعْدَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا مُؤْلِمًا ـ

১৮. এবং তাদের জন্য তওবা নেই যারা মন্দকাজ ও গুনাহের কাজসমূহ করে যেতে থাকে, এমনকি যখন তাদের কারো নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয়ে যায় এবং প্রাণবায়ু বের হয়ে যাওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায় তখন ঐ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে বলে আমি এখন তওবা করেছি। তখন তার তওবা কোনো উপকারে আসবে না এবং কবুলও হবে না। আর তাদের জন্যও তওবা নেই যারা কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, যখন আখেরাতে আজাব প্রত্যক্ষ করার সময় তওবা করবে তখন তাদের সেই তওবা কবুল করা হবে না। আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

তাহকীক ও তারকীব

وَالّٰتِىْ শব্দটি اَلَّتِىْ-এর বহুবচন। আরবিগণ এর বহুবচনে কয়েকটি শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। যেমন–
اَللّٰوَاتُ ـ اَللّٰوَاتِىْ ـ اَللَّاتُ ـ اَللَّاتِىْ

اَلْفَاحِشَةَ মন্দকথা বা কাজ। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.) বলেছেন, ওলামাদের ঐকমত্যে এখানে ফাহেশা বলতে ব্যভিচার উদ্দেশ্য। ব্যভিচার অনেক মন্দকাজের উপর অধিকতর মন্দ হওয়ার কারণে তার উপর ফাহেশা শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, কুফর, শিরক ও হত্যা এর চাইতেও জঘন্যতম মন্দকাজ, কিন্তু তার উপর তো ফাহেশা শব্দ ব্যবহার করা হয়নি তার কারণ কি? এর জবাবে বলা হয়েছে যে, মানবদেহের চালিকা শক্তি তিনটি। যথা– ১. কথনশক্তি, ২. ক্রোধশক্তি ও ৩. কামশক্তি। কথনশক্তি নষ্ট হওয়ার দ্বারা কুফর, বিদআত প্রভৃতি সৃষ্ট হয়ে থাকে। ক্রোধশক্তি নষ্ট হলে হত্যা প্রভৃতি সংঘটিত হয়ে থাকে, আর কাম বা যৌনশক্তি ফাসেদ হলে ব্যভিচার, সমকামিতা ইত্যাদি মন্দকাজ সংঘটিত হয়ে থাকে। সুতরাং যৌনশক্তির ফাসেদ হওয়াটা নিকৃষ্টতম ফসাদ হলো। বিধায় ব্যভিচারকে ফাহেশার সাথে খাস করা হয়েছে।

قَوْلُهُ بِجَهَالَةٍ : জাহালত বা মূর্খতার কয়েকটি অর্থ রয়েছে–

১. যে কোনো পাপ কাজ মূর্খতা বা জাহালত। এ হিসেবে প্রত্যেক পাপী গুনাহগারই জাহেল মূর্খ হবে। কেননা গুনাহগার যদি তার ইলম বা ছওয়াব ও শাস্তির ইলম ও জ্ঞানকে ব্যবহার করত তবে গুনাহ করতে অগ্রসর হতো না। এ অর্থানুযায়ী জেনে বা না জেনে যে কোনো অবস্থায় গুনাহ করলে তাকে মাসিয়াত বলা যাবে।

২. জাহালতের দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হলো, গুনাহকে গুনাহ জেনে তবে তার শাস্তির পরিমাণ না জেনে করাকে জাহালত বলে।

৩. জাহালতের তৃতীয় ব্যাখ্যা হলো, গুনাহকে গুনাহ জানার শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও না জেনে পাপ কাজে লিপ্ত হওয়া।

–[তাফসীরে কাবীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَالّٰتِىْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ আয়াতটি পূর্বে وَالَّذٰنِ يَاْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ পরে নাজিল হওয়ার প্রেক্ষিতে নাজিল হয়েছে। জমহুর বা অধিকাংশ ওলামাদের মতে وَالّٰتِىْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ আয়াতটি বিবাহিতা মহিলার জেনা বা ব্যভিচারের হুকুম সম্পর্কে আর দ্বিতীয় আয়াতটি অবিবাহিত ও অবিবাহিতার ব্যভিচারের হুকুম সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আর وَالَّذٰنِ ও مِنْكُمْ পুংলিঙ্গবোধক শব্দ تَغْلِيْب-এর কায়দার ভিত্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন চন্দ্র, সূর্য উভয়টাকে একত্রে قَمَرَيْنِ বলা হয়। এতে চন্দ্রকে সূর্যের উপর প্রাধান্য দিয়ে قَمَرَيْنِ বলা হয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে এখানে মহিলাদেরকে পুরুষদের অনুগামী করে তাদের উপর পুরুষদেরকে তাগলীব তথা প্রাধান্য দিয়ে اَلَّذٰنِ ও مِنْكُمْ পুংলিঙ্গবোধক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এরূপ তাগলীবের ব্যবহার আরবি ভাষায় বহুল প্রচলিত রয়েছে। যেমন– عُمَرَيْنِ ـ اَبَوَيْنِ ইত্যাদি।

প্রথম আয়াতে হাকিম ও বিচারকদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, বিবাহিতা মহিলারা যদি ব্যভিচার করে তবে তাদের উপর চারজন স্বাধীন, আদেল ও মু'মিন পুরুষ সাক্ষী তলব কর। মহিলাদের সাক্ষ্য জেনার বেলায় গ্রহণযোগ্য নয়। কঠোরতা অবলম্বনের জন্য চারজন সাক্ষী হওয়ার শর্ত লাগানো হয়েছে। অতঃপর যথারীতি সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেলে তাদের শাস্তি হিসেবে বলা হয়েছে যে, তাদেরকে গৃহে আবদ্ধ করে রাখ। এমন যেন গৃহটাই তাদের জন্য কারাগার। অতঃপর হয়তো তারা গৃহবন্দী থাকতে থাকতে মারা যাবে অথবা আল্লাহ তা'আলা শরয়ী দণ্ডবিধান নাজিল করে তাদেরকে গৃহবন্দী থেকে মুক্তির পথ নির্ধারণ করে দিবেন। জেনার শাস্তির হুকুম নাজিল হওয়ার পর রাসূল ﷺ সাহাবীদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন, তোমরা আমার কাছ থেকে পথ নিয়ে নাও। এ হাদীসে তিনি বলেছেন, বিবাহিতার জন্য একশত বেত্রাঘাতসহ প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা অবিবাহিতার জন্য একশত বেত্রাঘাত ও এক বৎসরের নির্বাসন। আয়াতে উল্লিখিত বিধানটি ছিল ইসলামের প্রথম যুগে অতঃপর তা রহিত হয়ে গেছে। কারো মতে, রহিতকারী দলিল হলো আলোচ্য হাদীস। আবার কারো মতে, সূরা নূরের আয়াত– اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ الخ

তবে আল্লামা যমখশারী (র.) বলেন, আয়াতটি রহিত হয়নি; বরং অরহিতাবস্থায়ই বাকি রয়েছে। তবে আয়াতে জেনার শাস্তির বিধানটি অস্পষ্ট ছিল, বা ব্যাখ্যা সাপেক্ষে ছিল। আর হাদীস বা সূরা নূরের আয়াত ব্যাখ্যা হিসেবে এসেছে।

-[রুহুল মা'আনী খ. ২, পৃ. ২৩৪-৩৫]

দ্বিতীয় আয়াত وَالَّذَانِ يَأْتِيٰنِهَا الخ -এর মধ্যে বলা হয়েছে অবিবাহিত ও অবিবাহিতা যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে যায়, তবে তাদের শাস্তি হলো তাদেরকে কষ্ট পৌঁছানো। তবে সেই কষ্ট পৌঁছানোর বিশেষ কোনো পদ্ধতি বর্ণিত হয়নি। শাসকবর্গের বিবেচনায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এখানে তাদেরকে কষ্ট পৌঁছানোর অর্থ হচ্ছে, মৌখিকভাবে লজ্জা-শরম দেওয়া এবং কার্যতভাবে শাসনের উদ্দেশ্যে জুতা ইত্যাদি দ্বারা কিছু প্রহার করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর এ উক্তিটা উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে। আসল হুকুম এটাই যে, এ বিষয়টা বিচারকদের বিবেচনাধীন ছেড়ে দেওয়া যাবে। তবে তাও হদের বিধান নাজিল হওয়ার পর রহিত হয়ে গেছে।

উভয় আয়াতে বর্ণিত ফাহেশার মর্ম : জমহুরের মতে, প্রথম আয়াতে বর্ণিত ফাহেশার অর্থ হলো বিবাহিতা মহিলাদের ব্যভিচার, আর দ্বিতীয় আয়াতে বর্ণিত ফাহেশার অর্থ হচ্ছে অবিবাহিত পুরুষ ও মহিলার ব্যভিচার। পক্ষান্তরে জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) বলেন, প্রথম আয়াতে বর্ণিত ফাহেশার মর্ম হচ্ছে বিবাহিতা মহিলাদের জেনা, আর দ্বিতীয় আয়াতে বর্ণিত ফাহেশার অর্থ হচ্ছে পুরুষে পুরুষে সমকামিতা করা।

আবূ মুসলিম ইস্পাহানী বলেন, প্রথম আয়াতে উল্লিখিত ফাহেশার অর্থ হলো মহিলায় মহিলায় সমকামিতা করা। আর দ্বিতীয় আয়াতে বিবৃত ফাহেশার মর্ম হলো, পুরুষে পুরুষে সমকামিতা বা লিওয়াতাত করা।

জমহুর বলেন, পুরুষদের ও নারীদের সমকামিতার কথা এখানে উল্লিখিত না হলেও জেনার হুকুমের উপর কিয়াস করে তা জেনে নেওয়া সম্ভব রয়েছে। যেরূপ শরিয়তের মধ্যে নবীযের ও দাদার হুকুম কিয়াসের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সব কথা তো আর কুরআনে সুস্পষ্ট রূপে বর্ণিত হয়নি; বরং অনেকটাই শরয়ী কিয়াসের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অথবা বলা যাবে, দ্বিতীয় আয়াতে উল্লিখিত ফাহেশার মর্মের মধ্যে জেনার সাথে লিওয়াতাত ও মহিলাদের সমকামিতাও শামিল রয়েছে। এতে প্রমাণিত হচ্ছে সুয়ূতী (র.) الْأَظْهَرُ الخ ইবারতে ফাহেশা দ্বারা লিওয়াতাত উদ্দেশ্য হওয়াটাই অধিক গ্রহণযোগ্য বলাটা সঠিক হয়নি। আর ইস্পাহানীর উক্তি তো মোটেই ঠিক হতে পারেনি। কারণ নবীর যুগের পর সাহাবাদের মধ্যে যখন সমকামিতার শাস্তির প্রশ্ন উত্থাপিত হলো তখন তারা কিয়াসানুযায়ী বিভিন্ন রকম মত পেশ করেছেন। তাদের মধ্যে কেউই একথা মনে করেনি যে, সমকামিতার বিধান সূরা নিসার আলোচ্য আয়াতে বিদ্যমান রয়েছে। যদি তা হতো তবে তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দেওয়ার প্রশ্নই আসত না।

-[রুহুল মা'আনী খ. ৪, পৃ. ২৩৭, জামালাইন খ. ১, পৃ. ৬১২-১৩, সাবী খ. ১, পৃ. ২০৯]

সমকামিতার বিধান :

১. সমকামীদের উপর ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, হদ আসবে না তা'যীর অর্থাৎ যুগের হাকিম বা শরয়ী বিচারকদের বিবেচনা মোতাবেক তাদেরকে শাস্তি দেওয়া যাবে। তাঁরা তাদের অবস্থানুযায়ী শাস্তি প্রদান করবেন। তবে জেনার শাস্তির ন্যায় তাতে হদ আসবে না। কারণ কিতাবুল্লাহতে কেবলমাত্র কষ্ট পৌঁছানোর কথা এসেছে। তাই খবরে ওয়াহিদ দ্বারা কিতাবুল্লাহর উপর বর্ধন বা পরিবর্তন ঠিক হবে না। এছাড়া লিওয়াতাত বা সমকামিতা জেনার মতোও নয়। কারণ সন্তান না হওয়ার দরুন নসবের মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটারও আশঙ্কা থাকে না এবং ব্যভিচারের ন্যায় উভয়ের তরফ থেকে খাহেশও হয় না। কেননা জেনাতে যেমন মাফউলের পূর্ণ খাহেশ হয়, তা সমকামিতাতে হয় না। সুতরাং এতে জেনার হদ বা সুনির্ধারিত শাস্তি আসতে পারে না।

২. ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর বিশুদ্ধতম উক্তি অনুযায়ী এবং ইমাম আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মদ (র.) -এর মতানুসারে তাদের উভয়কে জেনার হদ লাগানো যাবে। অর্থাৎ অবিবাহিত হলে একশত বেত্রাঘাত আর বিবাহিত হলে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর এছাড়া আরো কয়েকটি উক্তি রয়েছে।

* বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত হোক উভয়বস্থায় তাদেরকে হত্যা করা হবে। হত্যার পদ্ধতির মধ্যেও আবার তাঁর থেকে বিভিন্ন রকম মত বর্ণিত হয়েছে। তাঁর এক বর্ণনা মতে উভয়কে তলোয়ার দ্বারা হত্যা করা হবে। আরেক বর্ণনা মতে, বিবাহিতা হোক বা অবিবাহিতা সর্বাবস্থায় প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে। ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (র.) তাঁর এ বর্ণনার সাথেই মত পোষণ করেছেন। তাঁর আরেক বর্ণনা মতে, সমকামীর উপর দেয়াল ফেলিয়ে হত্যা করা হবে। আরেকটি বর্ণনা মতে, পাহাড়ের চূড়া থেকে নিক্ষেপ করে মেরে ফেলা যাবে। এতে ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (র.) -এর মাজহাবও জানা হয়ে গেল।

৩. ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (র.) -এর মত হলো, তাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে- বিবাহিত **হোক বা** অবিবাহিতা হোক।

তাঁদের দলিল হলো হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত হাদীস- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে- فَارْجُمُوا الْاَعْلٰى وَالْاَسْفَلَ অর্থাৎ উপরের ও নীচের উভয় ব্যক্তিকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা কর।

হযরত আবূ হুরায়রা (র.) হতে বর্ণিত হাদীসও তাঁদের দলিল- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَارْجُمُوا الْاَعْلٰى وَالْاَسْفَلَ অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যারা হযরত লূত (আ.) -এর সম্প্রদায়ের ন্যায় আমল করবে তাদের উপর ও নীচের উভয়কে প্রস্তারাঘাতে হত্যা **কর**। এছাড়া দলিলে আকলী হিসেবে তারা বলেন, লিওয়াতাতও জেনার মতো। কারণ তাতে সন্তান আশঙ্কামুক্তির দরুন **খাহেশ** আরো বেশি হয়।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর বিপরীত মত পোষণকারী ইমামগণের দলিলের জবাব :

১. বর্ণিত হাদীসগুলো সনদের দিক দিয়ে দুর্বল, তাই হদের মতো বিধান যা সামান্যতম সন্দেহ আসলেই বিদূরিত হয়ে যায় **তা** প্রমাণের জন্য এসব দুর্বল খবরে ওয়াহিদ যথেষ্ট নয়।

২. অথবা বলা যাবে, যারা হালাল মনে করে সমকামিতা করে তাদের বেলায় এসব বর্ণনা প্রযোজ্য।

৩. অথবা বলা যাবে, যারা এ সমস্ত রুচি বিবর্জিত ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হয়েছিল তাদেরকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ঠিক রাখার **জন্য** سِيَاسَةً হত্যা বা রজমের নির্দেশ দিয়েছিলেন- হদ হিসেবে নয়। আর ইসলামি রাষ্ট্রের সরকার প্রধানের এ রকম **করার** অধিকার রয়েছে।

তাঁদের আকলী দলিলের জবাব হলো, সমকামিতা ব্যভিচারের মতো নয়। কারণ তাতে ফায়েলের খাহেশ হলেও **মাফউলের** খাহেশ হয় না, তাই তাতে হদ আসবে না। যদি তাতে হদ তথা সুনির্ধারিত শাস্তি হতো তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর **পর** সাহাবীদের মধ্যে এর শাস্তির ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দেওয়ার অবকাশ ছিল না। অথচ তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে **মতবিরোধ** রয়েছে। তাঁদের কারো মতে, আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে হত্যা করে ফেলা। আবার কারো মতে, উঁচু স্থান থেকে নিক্ষেপ **করে,** অতঃপর পাথর মেরে হত্যা করা ইত্যাদি। যদি জেনার ন্যায় তাতে হদ আসত তবে তাদের মধ্যে এর শাস্তির ব্যাপারে এ **রকম** মতবিরোধ দেখা দিত না। এতে বুঝা যাচ্ছে এটা জেনার মতো নয়, তাই এতে জিনার শাস্তি হদও আসবে না; বরং **তাতে** তা'যীর আসবে। অর্থাৎ যুগের ইসলামি সরকারের কাজি বা বিচারকের বিবেচনা মোতাবেক তাদের অবস্থানুসারে শাস্তি **প্রদান** করা হবে। -[তাফসীরে মাযহারী খ. ২, পৃ. ৫৩৫-৩৭, হেদায়া বেনায়া সমেত খ. ৬, পৃ. ৩০৮ -১১]

قَوْلُهُ اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ الخ : পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছিল, যারা ব্যভিচারে লিপ্ত **হয়ে** যাওয়ার পর তওবা করে নেয় এবং নিজেদের আমল সংশোধন করে নেয় তাদেরকে কষ্ট দিয়ো না। আলোচ্য আয়াতে **তওবা** কবুলের শর্ত বর্ণনা করা হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে যারা নফসের ধোঁকায়, শয়তানের প্ররোচনায়, গুনাহের পরিণতি ও পারলৌকিক শাস্তি থেকে গাফেল হয়ে **পাপ** কাজ করে নেয়, অতঃপর অনতিবিলম্বে অর্থাৎ মওতের ফেরেশতা দেখার পূর্বে প্রাণবায়ু গলায় আসার আগে আগে তওবা **করে** নেয়, আল্লহর জন্য তাদের সেই তওবা কবুল করে নেওয়া স্বীয় করুণায় ওয়াজিব হয়ে যায়। তবে অন্তিম অবস্থায় পৌঁছে **গেলে** মৃত্যুর ফেরেশতার চেহারা দেখে নেওয়ার পর, কারো কোনো তওবা কবুল হবে না। মৃত্যু যেহেতু নিশ্চিত আর নিশ্চিত **বিষয়** দূরে হলেও নিকটেই হয়ে থাকে। তাই মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সময়কে আয়াতে কারীমাতে مِنْ قَرِيْبٍ নিকটবর্তী সময় **বলা** হয়েছে। হাদীস শরীফে এসেছে- اِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَبْدِهٖ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ অর্থাৎ অন্তিম অবস্থায় পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত **আল্লাহ** তা'আলা তাঁর বান্দার তওবা কবুল করে থাকেন।

তবে আল্লামা শায়খুল হিন্দ (র.) বলেন, مِنْ قَرِيْبٍ ও جَهَالَةً শব্দ উভয়টিকে তার বাহ্যিক অর্থে রেখেই তাফসীর করা **উত্তম** তখন আয়াতের মর্ম হবে, তাওবা কবুলের ওয়াদা ও দায়িত্ব তাদের জন্যই রয়েছে যারা না জেনে, না বুঝে কোনো সগীরা **বা** কবীরা গুনাহ করে বসে। অতঃপর যখন সেই গুনাহের ধ্বংসাত্মক ক্ষতির উপর অবগত হয় তখনই অনতিবিলম্বে তওবা **করে** নেয় এবং আল্লাহর সামনে লজ্জিত হয়ে যায়। আর যারা জেনেবুঝে গুনাহ করে, সতর্ক করার পরও তওবা করে না, বিলম্ব **করে** তাদের তওবা যদিও আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনুগ্রহ ও দয়ায় কবুল করে নেন সত্য, তবে তাদের তওবা কবুল করে নেওয়ার **জন্য** তাঁর ওয়াদা ও জিম্মাদারি নেই। যেরূপ প্রথম লোকদের জন্য ছিল। -[তাফসীরে মা'আরিফে ইদ্রিসীয়া খ. ২, পৃ. ১৬৭]

١٩. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ
تَرِثُوا النِّسَاءَ اَيْ ذَاتَهُنَّ كَرْهًا بِالْفَتْحِ
وَالضَّمِّ لُغَتَانِ اَيْ مُكْرِهِيْهِنَّ عَلٰى
ذٰلِكَ كَانُوْا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَرِثُوْنَ
نِسَاءَ اَقْرِبَائِهِمْ فَاِنْ شَاءُوا تَزَوَّجُوْهَا
بِلَا صَدَاقٍ اَوْ زَوَّجُوْهَا وَاَخَذُوْا صَدَاقَهَا
وَعَضَلُوْهَا حَتّٰى تَفْتَدِيْ بِمَا وَرِثَتْهُ اَوْ
تَمُوْتَ فَيَرِثُوْهَا فَنُهُوْا عَنْ ذٰلِكَ وَلَا اَنْ
تَعْضُلُوْهُنَّ اَيْ تَمْنَعُوْا اَزْوَاجَكُمْ عَنْ
نِكَاحِ غَيْرِكُمْ بِاِمْسَاكِهِنَّ وَلَا رَغْبَةَ
لَكُمْ فِيْهِنَّ ضِرَارًا لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا
اٰتَيْتُمُوْهُنَّ مِنَ الْمَهْرِ اِلَّا اَنْ يَّأْتِيْنَ
بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِهَا
اَيْ بُيِّنَتْ اَوْ هِيَ بَيِّنَةٌ اَيْ زِنًا نُشُوْزًا
فَلَكُمْ اَنْ تُضَارُّوْهُنَّ حَتّٰى يَفْتَدِيْنَ
مِنْكُمْ وَيَخْتَلِعْنَ وَعَاشِرُوْهُنَّ
بِالْمَعْرُوْفِ اَيْ بِالْاِجْمَالِ فِي الْقَوْلِ
وَالنَّفَقَةِ وَالْمَبِيْتِ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ
فَاصْبِرُوْا فَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا
وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا وَلَعَلَّهُ
يَجْعَلُ فِيْهِنَّ ذٰلِكَ بِاَنْ يَرْزُقَكُمْ مِنْهُنَّ
وَلَدًا صَالِحًا .

অনুবাদ :

১৯. হে ঈমানদারগণ! বলপূর্বক নারীদের সত্তা কে উত্তরাধিকারে গ্রহণ করা তোমাদের জন্য হালাল নয়। كَرْهًا -এর মধ্যে দুটি লোগাত রয়েছে, كَاف -এ যবর ও পেশের সাথে। অর্থাৎ তাদের উপর বল প্রয়োগকারী হয়ে। মূর্খতার যুগে লোকেরা তাদের আত্মীয়দের স্ত্রীগণের মালিক হয়ে যেত। অতঃপর ইচ্ছা হলে তাদেরকে মহর ব্যতীতই বিয়ে করে নিত, অথবা অন্যের কাছে বিয়ে দিয়ে নিজেরা তার মহর নিয়ে নিত। অথবা তাকে আটকে রাখত, অতঃপর সেই বেচারি হয়তো নিজের প্রাপ্ত উত্তরাধিকার দিয়ে মুক্তি পেত, নতুবা সে মারা যাওয়ার পর তারা তার ওয়ারিশ হয়ে যেত। তাদেরকে এসব থেকে নিষেধ করা হয়েছে। এবং তাদেরকে আটক রেখো না অর্থাৎ তোমাদের স্ত্রীদেরকে অন্যের সাথে বিয়ে করতে নিষেধ করো না তাদেরকে আটক করে রেখে ক্ষতি পৌঁছাবার জন্য, অথচ তাদের প্রতি তোমাদের কোনো আসক্তি নেই। যাতে তোমরা তাদেরকে যা প্রদান করেছ মহরের তার কিয়দংশ নিয়ে নাও। কিন্তু তারা যদি কোনো প্রকাশ্য অশ্লীলতা করে। مُبَيِّنَةٍ -এর মধ্যে যবর ও যেরের সাথে। অর্থাৎ যা খুবই স্পষ্ট বা প্রকাশকারী তথা ব্যভিচার বা অবাধ্যতা। তখন তোমাদের জন্য তাদেরকে কষ্ট পৌঁছানো জায়েজ হবে। এমনকি তারা তোমাদেরকে বিনিময় দিয়ে খুলা করে নেবে। আর নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন কর, অর্থাৎ কথাবার্তা, ভরণপোষণ ও রাত্রি যাপনে তাদের সাথে উত্তম ব্যবহারের বিকাশ ঘটাও। অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে ধৈর্যধারণ কর। হয়তো তোমরা এমন এক বস্তুকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ তা'আলা অনেক কল্যাণ রেখেছেন। হয়তো তিনি তাদের মধ্যে কল্যাণ রেখে দিয়েছেন। এরূপে যে, তিনি তোমাদেরকে তাদের থেকে নেককার সন্তান দান করবেন।

٢٠. وَإِنْ أَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ أَيْ أَخْذَهَا بَدْلَهَا بِأَنْ طَلَّقْتُمُوْهَا وَّ قَدْ اٰتَيْتُمْ إِحْدٰهُنَّ أَيِ الزَّوْجَاتِ قِنْطَارًا مَالًا كَثِيْرًا صِدَاقًا فَلَا تَأْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا ط أَتَأْخُذُوْنَهُ بُهْتَانًا ظُلْمًا وَإِثْمًا مُّبِيْنًا بَيِّنًا وَنَصْبُهُمَا عَلَى الْحَالِ وَالْاِسْتِفْهَامُ لِلتَّوْبِيْخِ وَلِلْاِنْكَارِ فِيْ -

২০. আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী **গ্রহণ** করতে চাও, অর্থাৎ একজনকে তালাক **দিয়ে** অন্যজনকে তার স্থলে গ্রহণ করতে চাও। **অথচ** স্ত্রীদের একজনকে প্রচুর ধন মহর হিসেবে **দিয়ে** থাক, তবে তা থেকে কিছুই ফেরত গ্রহণ করো না। তোমরা কি তা অন্যায়ভাবে ও প্রকাশ্য **গুনাহ** করে গ্রহণ করবে? উভয়টি [إِثْمًا ও ظُلْمًا] **হাল** হওয়ার ভিত্তিতে যবরযুক্ত হয়েছে, আর প্রশ্নবোধক হামযাটি তিরস্কারার্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٢١. وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهُ أَيْ بِأَيِّ وَجْهٍ وَقَدْ أَفْضٰى وَصَلَ بَعْضُكُمْ إِلٰى بَعْضٍ بِالْجِمَاعِ الْمُقَرِّرِ لِلْمَهْرِ وَّأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا عَهْدًا غَلِيْظًا شَدِيْدًا وَّهُوَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ مِنْ إِمْسَاكِهِنَّ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ تَسْرِيْحِهِنَّ بِإِحْسَانٍ -

২১. এবং তোমরা কেমন করে তা গ্রহণ করতে পার, অথচ তোমরা একজন অন্যজনের কাছে পৌঁছে এরকম সহবাসের সাথে যা মহরকে সাব্যস্ত করে। এতে ইস্তেফহাম প্রশ্নটি অস্বীকৃতিমূলক। এবং নারীরা তোমাদের কাছ থেকে কঠিন অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে। আর সেই অঙ্গীকার হলো, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সদ্ভাবে রাখতে বা সদয়ভাবে ছাড়তে নির্দেশ দিয়েছেন।

٢٢. وَلَا تَنْكِحُوْا مَا بِمَعْنٰى مَنْ نَكَحَ اٰبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ إِلَّا لٰكِنْ مَا قَدْ سَلَفَ مِنْ فِعْلِكُمْ فَإِنَّهٗ مَعْفُوٌّ عَنْهُ إِنَّهٗ أَيْ نِكَاحَهُنَّ كَانَ فَاحِشَةً قَبِيْحًا وَّمَقْتًا ط سَبَبًا لِلْمَقْتِ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ أَشَدُّ الْبُغْضِ وَسَآءَ بِئْسَ سَبِيْلًا طَرِيْقًا ذٰلِكَ -

২২. আর তোমরা সেই নারীকে বিবাহ করো না, যাকে তোমাদের পিতা ও পিতামহগণ বিবাহ করেছেন। তবে অতীতে যা হওয়ার হয়ে গেছে, তোমাদের কর্মকাণ্ড তা ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। আয়াতে مَا শব্দটি مَنْ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি অর্থাৎ তাদেরকে বিয়ে করা অত্যন্ত জঘন্য, অশ্লীলতা ও আল্লাহর গজবের কাজ। আর তা হচ্ছে মারাত্মক ঘৃণ্য কাজ। আর অত্যন্ত নিকৃষ্টতর পন্থা এটা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا الخ : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর বিধানাবলিতে **সীমালঙ্ঘনের** একটি বিশেষ সুরতের বর্ণনা করা হয়েছে যে, জবরদস্তিমূলকভাবে মহিলাদের মালিক হয়ে যাওয়াও আল্লাহর **বিধানে সীমালঙ্ঘন** করা।

মূর্খতার অন্ধকার যুগে এ প্রথা ছিল যে, যখন কোনো লোক স্ত্রী রেখে মারা যেত তখন তার অন্য স্ত্রীর তরফের আপন ছেলে **অথবা অন্য** কোনো ওয়ারিশ এসে ঐ বিধবা মহিলাটির উপর কোনো চাদর বা কাপড় ফেলে দিত। আর সে বলত, আমি যেরূপ **মৃতব্যক্তির** সম্পদের মালিক তেমনিভাবে এ বিধবারও মালিক। অতঃপর তার ইচ্ছা হলে সে নিজেই তাকে বিয়ে করে নিত, বা **অন্য কারো** সাথে বিয়ে দিয়ে মহরের অর্থ নিজে নিয়ে নিত এবং ইচ্ছা হলে তাকে নিজেও বিয়ে করত না এবং অন্য কারো **কাছেও** বিয়ে দিত না; বরং এমনিতে তাকে আটকে রাখত এ উদ্দেশ্যে যে, যখন ঐ বিধবা মারা যাবে তখন সে তার সম্পদের **মালিক** হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা এসব ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডের নিষেধাজ্ঞা জারি করে ইরশাদ করছেন– يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا الخ এবং তাতে স্ত্রীদেরকে কষ্ট দিয়ে খোলাতে বাধ্য করে তাদের মহরের মাল গ্রহণ **করতেও** নিষেধ করা হয়েছে। আর তাদের সাথে সদ্ভাবে চলতে ও ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। হ্যাঁ, তবে যদি প্রকাশ্য নাফরমানি, জেনাকারিণী ও অবাধ্য হয়ে যায় তখন তাদেরকে খোলা দিতে বাধ্য করে তালাক দিয়ে দিতে পার। অতঃপর وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهٗ বলে স্বাভাবিক অবস্থায় তালাক দিলে স্ত্রীদের মহরের অর্থ ফেরত গ্রহণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এতে মহরের মাল অধিকই হোক না কেন।

قَوْلُهُ وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ الخ : জাহিলি যুগের একটি কুপ্রথা খণ্ডনের জন্য আয়াতটি নাজিল হয়েছে। **প্রথাটি** ছিল এই যে , তাদের কেউ যদি মারা যেত তখন তার স্ত্রীর মালিক তার [বড়] অন্য স্ত্রীর ছেলে হয়ে যেত। অতঃপর ইচ্ছা হলে সে নিজেই তার পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করে নিত অথবা অন্য কারো সাথে তার বিয়ে করিয়ে দিত। এর প্রতিবাদে আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল : ইবনে সা'আদ মুহাম্মদ ইবনে কা'আবে কুরযীর কথা নকল করে বলেছেন যে, আবূ কায়সের ইন্তেকাল হলে জাহিলি যুগের প্রথা অনুসারে তার ছেলে মিহসান তার স্ত্রীর মালিক হয়ে যায়। তার স্ত্রীকে মিহসান কোনো অংশ দেয়নি তার ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে। মহিলাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে এসে ঘটনাটি শুনাল। তিনি বললেন, এখন চলে যাও, আমার আশা যে, আল্লাহ তা'আলা তোমার ব্যাপারে হুকুম নাজিল করবেন।

ইবনে আবী হাতিম ও তাবারানী হযরত আদী ইবনে ছাবিতের মাধ্যমে এ ঘটনাটি একজন আনসারীর সূত্রে নকল করেছেন। এ রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, আবূ কায়েস ইবনে সালামার ইন্তেকাল হলো। আবূ কায়েস বড় নেককার একজন আনসারী ছিলেন। তার [অন্য স্ত্রীর ঘরের] ছেলে কায়েস তার পিতা আবূ কায়েস মারা যাওয়ার পর তার পিতার স্ত্রীর সাথে বিয়ে করতে চাইল। মহিলাটি কায়েসকে বলল, আমি তো তোমাকে নিজের ছেলেই মনে করি। আর তুমি তো তোমার সম্প্রদায়ের একজন নেককার ব্যক্তিও। [তারপরও বিয়ের প্রস্তাব?] অতঃপর মহিলাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ঘটনাটি খুলে বলল। শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি এখন তোমার ঘরে চলে যাও এবং আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষায় থাক। তারপর আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়েছে। –[মাযহারী খ. ২, পৃ. ৫৪৮–৪৯]

এতে পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করা হারাম হওয়া সম্পর্কে তিনটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। যথা– ১. فَاحِشَةً ২. مَقْتًا ৩. سَاءَ سَبِيْلًا ফাহেশার মানে হলো আকলী মন্দ কাজ। অর্থাৎ পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করা আকল ও বিবেকের দৃষ্টিতেও জঘন্যতম খারাপ কাজ। আর مَقْتًا-এর মর্ম হলো শরিয়তের দৃষ্টিতে মন্দ। অর্থাৎ শরিয়তের আলোকে এবং আল্লাহর কাছেও কাজটি খুবই ঘৃণ্য, তাঁর ক্রোধ ও গজব নাজিল হওয়ার মতো কাজ। আর سَاءَ سَبِيْلًا-এর মর্ম হলো, এ কাজটি সামাজিকভাবেও একটি খুবই খারাপ অভ্যাস ও তরিকা। মোটকথা চূড়ান্ত পর্যায়ের একটি ঘৃণ্য খারাপ কাজ। এরকম কাজ যে ব্যক্তি করে সে হত্যার উপযুক্ত। –[মাআরিফে ইদ্রিসীয়া খ. ২, পৃ. ১৭৩–১৭৪]

٢٣. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰتُكُمْ أَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَشَمَلَتِ الْجَدَّاتِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَوِ الْأُمِّ وَبَنٰتُكُمْ وَشَمَلَتْ بَنَاتُ الْأَوْلَادِ وَإِنْ سَفُلْنَ وَأَخَوٰتُكُمْ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ أَوِ الْأُمِّ وَعَمّٰتُكُمْ أَىْ أَخَوَاتُ اٰبَائِكُمْ وَأَجْدَادِكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ أَىْ أَخَوَاتُ أُمَّهَاتِكُمْ وَجَدَّاتِكُمْ وَبَنٰتُ الْأَخِ وَبَنٰتُ الْأُخْتِ وَتَدْخُلُ فِيْهِنَّ بَنَاتُ أَوْلَادِهِنَّ وَأُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ قَبْلَ اِسْتِكْمَالِ الْحَوْلَيْنِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ كَمَا بَيَّنَهُ الْحَدِيْثُ وَأَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَيُلْحَقُ بِذٰلِكَ بِالسُّنَّةِ الْبَنَاتُ مِنْهَا وَهُنَّ مَنْ أَرْضَعَتْهُنَّ مَوْطُوْءَتُهُ وَالْعَمَّاتُ وَالْخَالَاتُ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ مِنْهَا لِحَدِيْثٍ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ وَأُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ جَمْعُ رَبِيْبَةٍ وَهِىَ بِنْتُ الزَّوْجَةِ مِنْ غَيْرِهِ الّٰتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ تَرَبُّوْنَهَا صِفَةٌ مُوَافِقَةٌ لِلْغَالِبِ .

অনুবাদ :

২৩. তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতাগণকে বিয়ে করা, এ হুকুমে দাদি ও নানিগণও শামিল। তোমাদের কন্যাগণকে, এতে নাতিনরাও শামিল রয়েছে। যতই অধস্তন হোক না কেন, তোমাদের সহোদর, বৈপিত্রেয় ও বৈমাত্রেয় বোনদেরকে, তোমাদের ফুফুকে তথা তোমাদের বাপ-দাদার বোনদেরকে, তোমাদের খালাকে তথা তোমাদের মাতা ও দাদির বোনদেরকে, ভ্রাতৃকন্যা, ভাগিনী কন্যাকে, এতে তাদের মেয়েরাও শামিল রয়েছে, তোমাদের সেই মাতাগণকে, যারা তোমাদেরকে স্তন্য পান করিয়েছে। যারা দুই বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে পাঁচ ঢোক স্তন্য পান করিয়েছে, যেরূপ হাদীস শরীফ তা বর্ণনা করেছে, তোমাদের দুধবোনকে হাদীসের আলোকে তাদের সাথে দুধ মেয়েদেরকে হারাম করা হয়েছে। আর তারা হলো ঐ সব মেয়ে যাদেরকে তাদের সহবাস লব্ধ মহিলাগণ দুধপান করিয়েছে। তেমনিভাবে দুধ ফুফু, খালা, ভ্রাতৃকন্যা ও ভাগিনীরাও শামিল ঐ নীতির আলোকে যে, বংশীয় সম্পর্ক দ্বারা যা হারাম হয়, দুধ পানের সম্পর্ক দ্বারাও তা হারাম হয়ে যায়। এ হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) বর্ণনা করেছেন। এবং তোমাদের স্ত্রীগণের মা তাদের বিয়ে করাও তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে। তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছ সেই স্ত্রীদের কন্যাকে, যারা তোমাদের লালনপালনে আছে। رَبِيْبَةٌ - رَبَائِبُ -এর বহুবচন। আর সে হচ্ছে স্ত্রীর অন্য স্বামীর কন্যা, যাদেরকে তোমরা লালনপালন করছ। তোমাদের লালন-পালনে রয়েছে কথাটি স্বাভাবিক রূপে এসেছে, আবশ্যকীয় শর্ত হিসেবে নয়।

فَلَا مَفْهُوْمَ لَهَا مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِىْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ اَىْ جَامَعْتُمُوْهُنَّ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِىْ نِكَاحِ بَنَاتِهِنَّ اِذَا فَارَقْتُمُوْهُنَّ وَحَلَآئِلُ اَزْوَاجُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ بِخِلَافِ مَنْ تَبَنَّيْتُمُوْهُمْ فَلَكُمْ نِكَاحُ حَلَآئِلِهِمْ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ مِنْ نَسَبٍ اَوْ رَضَاعٍ بِالنِّكَاحِ وَيَلْحَقُ بِهِمَا بِالسُّنَّةِ الْجَمْعِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَمَّتِهَا اَوْ خَالَتِهَا وَيَجُوْزُ نِكَاحُ كُلِّ وَاحِدَةٍ عَلَى الْاِنْفِرَادِ وَمَلَكُهُمَا مَعًا وَيَطَأُ وَاحِدَةً اِلَّا لٰكِنْ مَا قَدْ سَلَفَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ نِكَاحِكُمْ بَعْضَ مَا ذُكِرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا لِمَا سَلَفَ مِنْكُمْ قَبْلَ النَّهْىِ رَّحِيْمًا بِكُمْ فِىْ ذٰلِكَ ـ

সুতরাং এর বিপরীত অর্থ গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাক তাহলে তোমাদের উপর কোনো গুনাহ্ নেই, তাদের মেয়েদেরকে বিয়ে করার মধ্যে, যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে পৃথক করে দেবে। তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীদেরকেও তোমাদের উপর হারাম করে দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে তোমাদের পালক ছেলের স্ত্রীগণ [তালাকপ্রাপ্ত হওয়ার পর] তোমাদের জন্য হালাল রয়েছে। এবং দুই বোনকে বংশীয় হোক বা দুধ শরিক হোক একত্রে বিবাহ করাও তোমাদের উপর হারাম করে দেওয়া হয়েছে হাদীসের আলোকে স্ত্রী, তার ফুফু ও খালাকে বিবাহ করাও এর সাথে হারাম করা হয়েছে। তবে তাদের প্রত্যেকের সাথে স্বতন্ত্রভাবে বিয়ে করা জায়েজ হবে এবং তারা উভয়ের একত্রে মালিক হওয়াও জায়েজ রয়েছে। তবে সহবাস কেবল একজনের সাথেই জায়েজ হবে। কিন্তু যা অতীত হয়ে গেছে জাহিলি যুগে মাহরাম মহিলাদেরকে তোমাদের বিয়ে করার উপরোল্লিখিত কথা তাতে তোমাদের উপর কোনো গুনাহ্ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সব ক্ষমাকারী যা নিষেধ হওয়ার পূর্বে তোমাদের থেকে হয়ে গেছে এবং এ ব্যাপারে তোমাদের উপর দয়ালু।

তাহকীক তারকীব

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ-এর মধ্যে اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ এজন্য সংযোজন করা হয়েছে যে, এতে হারাম হওয়ার সম্পর্ক **মাতাদের** সত্তার সাথে করা হয়ে গেছে। অথচ সত্তা হারাম হওয়ার কোনো অর্থ নেই। কারণ হারাম ও হালাল হওয়া কাজের **অবস্থা**– সত্তার নয়। তাই এখানে তাদের বিয়ে করা কথাটি গ্রন্থকার সংযোজন করে দিয়েছেন। اُمَّهَات [মাতাগণ] শব্দটি اُمٌّ **-এর বহুবচন**। বহুবচনের মধ্যে هَا বর্ধিত করা হয়েছে। বিবেক সম্পন্ন ও বিবেকহীনদের বহুবচনের মধ্যে প্রার্থক্য বিধানের **জন্য এরূপ** করা হয়েছে। বিবেক সম্পন্নদের বহুবচনে বলা হয় اُمَّهَات আর বিবেকহীনদের বহুবচনে বলা হয়েছে اُمَّاتٌ। اَلرَّبَائِبُ - رَبِيْبَةٌ-এর বহুবচন। رَبِيْبَةٌ স্ত্রীর ভিন্ন স্বামীর কন্যা, যে বর্তমান স্বামীর কোলে লালিত হচ্ছে। اَلْحُجُوْرُ - حُجْرٌ বা **حَجْرٌ -এর বহুবচন**। حُجْر অর্থ– কোল, লালনপালন, প্রতিপালন। فِىْ حُجُوْرِكُمْ-তোমাদের লালনপালনে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ الخ : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঐ সব নারীদের বিবরণ দিয়েছেন, যাদের সাথে বিবাহ করা হারাম। কোনো কোনো নারীকে কোনো অবস্থাতেই বিয়ে করা হালাল হয় না তাদেরকে মুহাররামাতে আবাদিয়া বলা হয় তথা চিরতরে হারাম। আর কোনো কোনো নারীদেরকে বিয়ে করা হারাম নয়; বরং বিশেষ অবস্থায় হারাম, তাদেরকে মুহাররামাতে মুওয়াক্কাতা বলা হয় তথা সাময়িক হারাম।

প্রথমোক্ত নারীগণ তিন প্রকার যথা– ১. বংশগত হারাম নারী, ২. দুধের কারণে হারাম নারী এবং শ্বশুর সম্পর্কের কারণে হারাম নারী।
ইরশাদ হয়েছে– حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ অর্থাৎ তোমাদের উপর তোমাদের মাতাগণকে বিবাহ করা হারাম করে দেওয়া হয়েছে। اُمَّهَات শব্দের ব্যাপকতায় দাদি-নানি সবাই এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
وَبَنٰتُكُمْ : স্বীয় ঔরসজাত কন্যাকে বিয়ে করা হারাম। কন্যার কন্যাকে এবং পুত্রের কন্যাকেও বিয়ে করা হারাম।
মোটকথা কন্যা, পৌত্রি, প্রপৌত্রি, দৌহিত্রী, প্রদৌহিত্রী এদের সবাইকে বিবাহ করা হারাম। তবে যে কন্যা ঔরসজাত নয়, বরং পালিত, তাদেরকে এবং তাদের মেয়েদেরকে বিবাহ করা জায়েজ, যদি অন্য কোনো পথে অবৈধতা না থাকে। তেমনিভাবে ব্যভিচারের মাধ্যমে যে কন্যা জন্মগ্রহণ করে সেও কন্যার পর্যায়ভুক্ত। তাদেরকেও বিয়ে করা জায়েজ নয়।
وَاَخَوٰتُكُمْ : সহোদরা বোনদেরকে বিবাহ করা হারাম। তেমনিভাবে বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় বোনেদরকেও বিবাহ করা হারাম।
وَعَمّٰتُكُمْ : পিতার সহোদরা, বৈমাত্রেয়, বৈপিত্রেয় বোনকে অর্থাৎ তিন রকম ফুফুকে বিয়ে করা হারাম।
وَخٰلٰتُكُمْ : আপন মাতার তিন প্রকার বোন তথা খালাদের সাথে বিবাহ করা হারাম।
وَبَنٰتُ الْاَخِ : ভাতিজীর সাথেও বিবাহ হারাম, আপন হোক, বৈমাত্রেয় হোক বা বৈপিত্রেয় হোক।
وَبَنٰتُ الْاُخْتِ : বোনের কন্যা অর্থাৎ ভাগিনীদের সাথেও বিবাহ হারাম চাই আপন হোক, বৈমাত্রেয় হোক বা বৈপিত্রেয় হোক।
وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِىْٓ اَرْضَعْنَكُمْ : যেসব নারীদের স্তন্য পান করা হয়, তারা জননী না হলেও বিবাহ হারাম হওয়ার ব্যাপারে জননীর পর্যায়ভুক্ত এবং তাদের সাথে বিবাহ হারাম। অল্প দুধপান করুক বা অধিক, একবার পান করুক বা একাধিক বার সর্বাবস্থায় তারা হারাম হয়ে যায়। ফিকহবিদগণের পরিভাষায় একে হুরমতে রেযাআত বলা হয়।

দুধ পানের সময়সীমা : একথা জেনে রাখা প্রয়োজন যে, ঐ সময়ই দুধ পানে বিবাহ-শাদি হারাম হওয়ার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে থাকে, যে সময়টি হয় দুধ পানের কাল।

আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– اِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ অর্থাৎ দুধপানের কারণে যে অবৈধতা প্রমাণিত হয়, তা ঐ সময়ে দুধপান করলে হবে, যে সময় দুধপান করেই শিশু শারীরিক দিক দিয়ে বর্ধিত হয়। –[বুখারী ও মুসলিম]

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, এ সময়কাল হচ্ছে শিশুর জন্মের পর থেকে আড়াই বছর বয়স পর্যন্ত। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর বিশিষ্ট শাগরিদ হযরত ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) এবং বাকি ইমাম তিনজনসহ অধিকাংশ ওলামাদের মতে, দুধ পানের ঊর্ধ্ব সময়সীমা হচ্ছে দুই বছর। এ মতের উপরই ফতোয়া।

তাই উভয় পক্ষের দালাইল ও জবাব উল্লেখ করা হলো না। কোনো বালক-বালিকা যদি দুই বৎসর বয়সের পর কোনো স্ত্রীলোকের দুধ পান করে তবে দুধ পান জনিত অবৈধতা প্রমাণিত হবে না।

مِقْدَارِ رَضَاعَت বা দুধ পানের পরিমাণ : যে পরিমাণ দুধ দুই বৎসরকালের ভেতরে দুগ্ধপায়ী শিশু দুধ পান জনিত অবৈধতা প্রমাণিত হয়, সেই পরিমাণের ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে–

১. ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালেক, সাহেবাইনসহ অধিকাংশ ইমামগণের মতে, দুগ্ধপায়ী শিশু দুধ কম পান করুক বা বেশি পান করুক, তাতে দুধ পান জনিত অবৈধতা প্রমাণিত হয়ে যাবে। তবে শর্ত হলো দুধ পেটের ভেতরে পৌঁছতে হবে।
২. **ইমাম শাফেয়ী** (র.) -এর মতে, পাঁচবার দুধ পান করলে হুরমতে রেযাআত প্রমাণিত হবে। এর কমের মধ্যে নয়।
৩. **এক বর্ণনা** মতে, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মত হলো, কমপক্ষে তিনবার শিশু মহিলার স্তন চুষে দুধ পান করলে হুরমতে রেযাআত প্রমাণিত হবে।

জমহুরের দালাইল :

১. আল্লাহর তা'আলার বাণী- أُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِىْٓ اَرْضَعْنَكُمْ এতে নিঃশর্তভাবে দুধ পানের কথা বলা হয়েছে, কমবেশির কোনো উল্লেখ নেই।

২. হাদীস শরীফে এসেছে- يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে- اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ. এসব হাদীসে সাধারণভাবে বলা হয়েছে, এতেও কমবেশির কোনো কথা উল্লেখ নেই।

৩. وَعَنْ عَلِيِّ ابْنِ اَبِىْ طَالِبٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ قَلِيْلُهٗ وَكَثِيْرُهٗ এছাড়া আরো বহু দালাইল রয়েছে, লম্বা হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় পেশ করা হচ্ছে না।

৪. কিয়াসী দলিল হলো, দুধ মনীর ন্যায় একটি প্রবাহমান বস্তু। মনী দ্বারা হুরমত প্রমাণিত হওয়াতে যেহেতু কোনো সংখ্যা বা পরিমাণের শর্ত নেই, সুতরাং দুধের মধ্যেও কোনো রকম পান করার সংখ্যা বা পরিমাপ ধার্য করা ঠিক হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল : হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস, যাকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন- ثُمَّ نُسِخَ بِخَمْسٍ مَعْلُوْمَاتٍ فَتُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهِىَ فِيْمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْاٰنِ এ হাদীসটি আল্লামা সুয়ূতী দলিল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কারণ হচ্ছে, তিনি হলেন শাফেয়ী মতাবলম্বী আলেম। তবে এ হাদীস দ্বারা দলিল প্রদান করা ঠিক হবে না। কারণ এটি রহিত হয়ে গেছে।

ইমাম আহমদ (র.) -এর দলিল : তাঁর দলিল হচ্ছে- لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ অর্থাৎ, একবার বা দুইবার স্তন চুষলে হুরমাতে রেযাআত প্রমাণিত হয় না। এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল কমপক্ষে তিনবার চুষলে বা দুধ পান করলে হুরমতে রেযাআত প্রমাণিত হবে।

এর জবাবে বলা হয়েছে, এখানে দুবার চুষার দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে শিশুর পেটে দুধ পৌঁছে যাওয়া। কারণ একবার বা দুবার যখন শিশু বাচ্চায় স্তনে মুখ লাগিয়ে চুষে তখন সাধারণত দুধ নেমে আসে না, অতঃপর পরবর্তী চুষার সময় দুধ নেমে আসে। এ হিসেবে হাদীসটিতে বলা হয়েছে যে, একবার বা দুবার চুষা দ্বারা হুরমত প্রমাণিত হয় না।

অথবা বলা যাবে, এটা ছিল পাঁচবার দুধপান করলে হুরমত প্রমাণিত হওয়ার সময়ের হুকুম। সুতরাং পাঁচবার পান করার হুকুম যেরূপ রহিত, তেমনিভাবে দুবার চুষলে হুরমত প্রমাণিত না হওয়ার হাদীসও রহিত। তাই সুস্পষ্ট আয়াত ও হাদীসসমূহকে বাদ দিয়ে এসব রহিত হাদীসের উপর আমল করা যাবে না।

قَوْلُهٗ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ : অর্থাৎ দুধ পান সম্পর্কীয় যেসব বোন আছে তাদেরকেও বিবাহ করা হারাম। এর বিশদ বিবরণ হলো, দুধপানের নির্দিষ্ট সময়কালে কোনো বালক অথবা বালিকা কোনো স্ত্রীলোকের দুধ পান করলে সে তার মা এবং তার স্বামী তাদের পিতা হয়ে যায়। এছাড়া সে স্ত্রীলোকের আপন পুত্র-কন্যা তাদের ভাই-বোন হয়ে যায়। অনুরূপ সে স্ত্রীলোকের বোন তাদের খালা হয়ে যায় এবং সে স্ত্রীলোকের জেঠা-দেবররা তাদের চাচা হয়ে যায়। তার স্বামীর বোনেরা শিশুদের ফুফু হয়ে যায়। দুধ পানের কারণে তাদের সবাই পরস্পরে বৈবাহিক অবৈধতা প্রমাণিত হয়ে যায়। বংশগত সম্পর্কের কারণে পরস্পরে যেসব বিবাহ হারাম হয়ে যায়, দুধপানের সম্পর্কের কারণে সেসব সম্পর্কীয়দের সাথে বিবাহ হারাম হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে- اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ। অর্থাৎ বংশীয় সম্পর্কের কারণে আল্লাহ তা'আলা যেসব বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম করেছেন, দুধপানের কারণেও তা হারাম করেছেন।

মাসআলা : একটি বালক ও একটি বালিকা কোনো মহিলার দুধপান করলে তাদের পরস্পরে বিবাহ হতে পারে না। এমনিভাবে দুধ ভাই ও দুধ বোনের কন্যার সাথেও বিবাহ হতে পারে না।

মাসআলা : দুধ ভাই কিংবা দুধ বোনের বংশগত মাকে বিবাহ করা জায়েজ এবং বংশগত বোনের দুধ মাকেও বিয়ে করা হালাল। এমনিভাবে দুধ বোনের বংশগত বোনের সাথে এবং বংশগত বোনের দুধ বোনের সাথেও বিয়ে জায়েজ।

মাসআলা : দুধ পানের সময়কালে মুখ কিংবা নাকের পথে দুধ ভিতরে গেলেও অবৈধতা প্রমাণিত হয়। যদি অন্য কোনো পথে দুধ ভিতরে প্রবেশ করানো হয় কিংবা দুধের ইনজেকশন দেওয়া হয়, তবে অবৈধতা প্রমাণিত হবে না।

মাসআলা : স্ত্রীলোকের দুধ ছাড়া অন্য কোনো দুধ, যেমন- চতুষ্পদ জন্তু কিংবা পুরুষের দুধ দ্বারা অবৈধতা প্রমাণিত হয় না।

মাসআলা : যদি ঔষধে কিংবা গরু-ছাগলের দুধের মিশ্রিত হয়, তবে দুধপান জনিত অবৈধতা তখন প্রমাণিত হবে, যখন নারীর দুধ পরিমাণে অধিক হয়। সমান সমান হলেও অবৈধতা প্রমাণিত হয়। কম হলে হয় না।

মাসআলা : যদি কোনো পুরুষের বুকে দুধ হয় এবং তা কোনো শিশু পান করে, তবে এ দুধ পানের দ্বারা দুধ পান জনিত অবৈধতা বর্তায় না।

মাসআলা : দুধপান করার ব্যাপারে সন্দেহ হলে তা দ্বারা অবৈধতা প্রমাণিত হয় না। যদি কোনো মহিলা কোনো শিশুর মুখে স্তন দেয় কিন্তু খাওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হয়, তবে তাতে অবৈধতা প্রমাণিত হবে না এবং বিবাহ হালাল হবে।

মাসআলা : একব্যক্তি কোনো একজন স্ত্রীলোককে বিবাহ করল। অতঃপর অন্য একজন মহিলা বলল, আমি তোমাদের **উভয়কে দুধপান করিয়েছি, যদি** তারা উভয়ে একথার সত্যায়ন করে তবে বিবাহ ফাসেদ বলে ফয়সালা করা হবে। পক্ষান্তরে **উভয়ে যদি মিথ্যা বলে এবং** মহিলা ধার্মিকা ও খোদাভীরুও হয়, তবু বিবাহ ফাসেদ বলে ফয়সালা করা হবে না। কিন্তু এরপরও **তালাকের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন হয়ে** যাওয়া উত্তম।

মাসআলা : যেরূপ দুজন দীনদার পুরুষ লোকের সাক্ষ্য দ্বারা রেযাআত প্রমাণিত হয়ে যায়, তেমনিভাবে একজন পুরুষ ও **একজন দীনদার মহিলার** সাক্ষ্য দ্বারাও দুধপান জনিত অবৈধতা প্রমাণিত হয়ে যায়।

মাসআলা : রেযাআত প্রমাণিত হওয়ার জন্য দুজন দীনদার পুরুষের সাক্ষ্য প্রয়োজন। কিন্তু ব্যাপারটা যেহেতু হারাম ও হালালের তাই সতর্কতা উত্তম। এমনকি কোনো কোনো ফিকহবিদ লিখেছেন যে, যদি কোনো মহিলা বিবাহ করার সময় একজন ধার্মিক পুরুষ সাক্ষ্য দেয় যে, এরা উভয়েই দুধ ভাই-বোন, তবে বিবাহ জায়েজ হবে না। বিবাহের পরে সাক্ষ্য দিলে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়াই উত্তম। এমনকি একজন মহিলা সাক্ষ্য দিলেও বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করা উত্তম।

قَوْلُهُ وَاُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ : স্ত্রীদের মাতা তথা শাশুরিগণও স্বামীর জন্য হারাম। এখানেও স্ত্রীদের নানি, দাদি বংশগত হোক বা দুধগত সবাই অন্তর্ভুক্ত।

মাসআলা : বিবাহিতা স্ত্রীর মা যেমন হারাম, তেমনি ঐ মহিলার মাও হারাম যার সাথে সন্দেহবশত সহবাস করা হয়েছে কিংবা ব্যভিচার করা হয়েছে কিংবা কামভাব নিয়ে স্পর্শ করা হয়েছে।

মাসআলা : শুধু বিবাহ দ্বারাই স্ত্রীর মাতা হারাম হয়ে যায়। এর জন্য সহবাস ইত্যাদি জরুরি নয়।

وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِىْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ .

অর্থাৎ যে মহিলাকে বিবাহ করে সহবাসও করেছে, সেই মহিলার অন্য স্বামীর ঔরসজাত কন্যা, পৌত্রী ও দোহিত্রী হারাম হয়ে যায়। তাদেরকে বিবাহ করা জায়েজ নয়। কিন্তু যদি সহবাস না হয় শুধু বিবাহ হয়, তবে উল্লিখিত নারীরা হারাম হয় না। বিবাহের পর তাকে কামভাব নিয়ে স্পর্শ করে কিংবা তার গুপ্তাঙ্গের অভ্যন্তরে কামভাব সহকারে দৃষ্টিপাত করে তবে এগুলোও সহবাসের পর্যায়ভুক্ত। ফলে স্ত্রীর কন্যা হারাম হয়ে যায়।

মাসআলা : এখানে نِسَآئِكُمْ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত। কাজেই ঐ মহিলার কন্যা, পৌত্রি ও দোহিত্রীও হারাম হয়ে যায়, যার সাথে সন্দেহবশত সহবাস করা হয় বা ব্যভিচার করা হয়।

قَوْلُهُ وَحَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ : পুত্রের স্ত্রীগণও হারাম। পৌত্র, দৌহিত্র ও পুত্র শব্দের ব্যাপক অর্থের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই তাদের স্ত্রীকেও বিবাহ করা জায়েজ হবে না।

مِنْ اَصْلَابِكُمْ কথাটি পোষ্য পুত্রকে বাইরে রাখার উদ্দেশ্যে সংযোজিত হয়েছে। তার স্ত্রীকে বিবাহ করা হালাল। দুধ পুত্রও বংশগত পুত্রের পর্যায়ভুক্ত, কাজেই তার স্ত্রীকেও বিবাহ করা হারাম।

قَوْلُهُ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ : দুই বোনকে বিবাহে একত্রিত করাও হারাম। সহোদরা বোন হোক কিংবা বৈমাত্রেয় অথবা বৈপিত্রেয় হোক, বংশের দিক দিয়ে হোক কিংবা দুধের দিক দিয়ে এ বিধান সবার জন্য প্রযোজ্য। তবে একবোনের তালাক হয়ে যাওয়ার পর ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে গেলে কিংবা মৃত্যু হলে অপর বোনকে বিবাহ করা জায়েজ, ইদ্দতের মাঝখানে জায়েজ নয়।

মাসআলা : যেভাবে একসাথে দুই বোনকে একব্যক্তির বিবাহে একত্রিত করা হারাম, তেমনি ফুফু, ভ্রাতুষ্পুত্রী, খালা ও ভাগিনীকেও একব্যক্তির বিবাহে একত্রিত করা হারাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- لَا تُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا . -[বুখারী ও মুসলিম]

মাসআলা : ফিকহবিদগণ একটি সামগ্রিক নীতি হিসেবে লিখেছেন, প্রত্যেক এমন দুজন মহিলা যাদের মধ্যে একজনকে পুরুষ ধরা হলে শরিয়ত মতে উভয়ের পরস্পরে বিবাহ দুরস্ত হয় না, তারা একজন পুরুষের বিবাহে একত্রিত হতে পারে না।

قَوْلُهُ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ : অর্থাৎ জাহেলিয়াত যুগে যা কিছু হয়েছে, তার জন্য পাকড়াও করা হবে না। তবে ভবিষ্যতে বেঁচে থাকা অপরিহার্য।

قَوْلُهُ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا : মুসলমান হওয়ার পূর্বে তারা নিবুদ্ধিতা বশত যা কিছু করেছে, এখন মুসলমান হওয়ার পর আল্লাহ তাদেরকে তা ক্ষমা করবেন এবং তাদের প্রতি দয়ার দৃষ্টি দেবেন।

-[মা'আরেফ খ. ২, পৃ. ৩৯০- ৯৯ ও জামালাইন খ. ১, পৃ. ৬১৯-৬২২]

اَلْجُزْءُ الْخَامِسُ : পঞ্চম পারা

٢٤. وَ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمُحْصَنٰتُ اَىْ ذَوَاتُ
الْاَزْوَاجِ مِنَ النِّسَاۤءِ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ قَبْلَ
مُفَارَقَةِ اَزْوَاجِهِنَّ حَرَائِرَ مُسْلِمَاتٍ كُنَّ
اَوْلَا اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنَ الْاِمَاۤءِ
بِالسَّبْىِ فَلَكُمْ وَطْؤُهُنَّ وَاِنْ كَانَ لَهُنَّ
اَزْوَاجٌ فِىْ دَارِ الْحَرْبِ بَعْدَ الْاِسْتِبْرَاءِ
كِتٰبَ اللّٰهِ نَصْبٌ عَلَى الْمَصْدَرِ اَىْ كَتَبَ
ذٰلِكَ عَلَيْكُمْ وَاُحِلَّ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ
وَالْمَفْعُوْلِ لَكُمْ مَّا وَرَاۤءَ ذٰلِكُمْ اَىْ سِوٰى
مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ مِنَ النِّسَاۤءِ لِ اَنْ
تَبْتَغُوْا تَطْلُبُوا النِّسَاۤءَ بِاَمْوَالِكُمْ
بِصَدَاقٍ اَوْ ثَمَنٍ . مُّحْصِنِيْنَ مُتَزَوِّجِيْنَ
غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ زَانِيْنَ فَمَا فَمَنِ
اسْتَمْتَعْتُمْ تَمَتَّعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ مِمَّنْ
تَزَوَّجْتُمْ بِالْوَطْئِ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ
مُهُوْرَهُنَّ الَّتِىْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً وَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرَاضَيْتُمْ اَنْتُمْ وَهُنَّ
بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ مِنْ حَطِّهَا اَوْ
بَعْضِهَا اَوْ زِيَادَةٍ عَلَيْهَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
عَلِيْمًا بِخَلْقِهٖ حَكِيْمًا فِيْمَا دَبَّرَهٗ لَهُمْ .

অনুবাদ :

২৪. আর তোমাদের উপর হারাম করে দেওয়া হয়েছে, সধবা নারীদেরকে তথা স্বামী ওয়ালী মহিলাদেরকে সকল মহিলাদের মধ্য থেকে অর্থাৎ তাদের স্বামীদের থেকে যথারীতি পৃথক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদেরকে তোমাদের বিয়ে করা নিষিদ্ধ, তারা স্বাধীন মুসলিম নারী হোক বা নাই হোক। তবে তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়ে গেছে বাঁদিদের থেকে, যারা যুদ্ধবন্দী হয়ে তোমাদের অধীনে এসে গেছে, তোমাদের জন্য তাদের সঙ্গে ইস্তেবরায়ে রেহেমের [পূর্বস্বামীর পানি থেকে জরায়ূ মুক্ত হওয়ার] পর সহবাস করা জায়েজ আছে, যদিও তাদের স্বামীগণ দারুল হরবে বিদ্যমান থাকে না কেন। আল্লাহ তা'আলা এ বিধানটি তোমাদের উপর ফরজ করে দিয়েছেন। كِتٰبَ শব্দটি মাফউলে মুতলাক হওয়ার ভিত্তিতে যবর যুক্ত হয়েছে, আসল রূপ ছিল كُتِبَ ذٰلِكَ – اُحِلَّ ফে'লটি মা'রূফ ও মাজহুল উভয় রকমভাবে গঠিত হয়েছে। এছাড়া অর্থাৎ তোমাদের উপর হারামকৃত উল্লিখিত নারীগণ ছাড়া সকল নারীকে তোমাদের জন্য হালাল করে দেওয়া হয়েছে। এই শর্তে যে, তোমরা নারীদেরকে স্বীয় অর্থের বিনিময়ে তথা মহর বা মূল্যের বিনিময়ে তলব করবে, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য ব্যভিচারের জন্য নয়। অতঃপর তাদের মধ্যে যাকে তোমরা সহবাসের মাধ্যমে ভোগ করবে তাদেরকে তাদের নির্ধারিত মহর যা তোমরা ধার্য করেছ তা দান কর। তোমাদের কোনো গুনাহ হবে না নির্ধারণের পর তোমরা ও তারা পরস্পরে মহর একেবারে না দেওয়া, হ্রাস-বৃদ্ধির ব্যপারে যদি সম্মত হয়ে যাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টি সম্পর্কে অতিশয় অবহিত এবং তাদের পরিচালনা বিষয়ে যা করেন তাতে প্রজ্ঞাময়।

তাহকীক ও তারকীব

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمُحْصَنٰتُ অধিকাংশ ওলামাগণের মতে, اَلْمُحْصَنٰتُ সোয়াদে যবর দিয়ে اِسْم مَفْعُوْل -এর সীগাহ, তারা হলো ঐ সব মহিলা, যারা বিবাহের মাধ্যমে নিজেদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে নিয়েছে। [বিবাহিতা নারীগণ]। আলোচ্য আয়াত ব্যতীত সকল স্থানে ইমাম কাসায়ী সোয়াদ -এ যেরের সহিত اِسْم فَاعِل -এর সীগাহ পড়েছেন। اِحْصَان [ইহসান] শব্দের ধাতুগত অর্থ হচ্ছে বিরত রাখা, নিষেধ করা। বলা হয়, مَدِيْنَةٌ حَصِيْنَةٌ ও دِرْعٌ حَصِيْنَةٌ - اَىْ مَانِعَةٌ صَاحِبَهَا مِنَ الْجِرَاحَةِ সংরক্ষিত স্থানকে حِصْن বলে, কারণ তাতে অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে প্রবেশকারীকে প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়ে থাকে। উল্লেখ থাকে যে, পবিত্র কুরআনে اِحْصَان শব্দটি চারটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে-

১. اَلْحُرِّيَّةُ স্বাধীনতা। যেমন- اَلَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ এখানে مُحْصَنٰت স্বাধীন নারীদের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
২. اَلْعِفَافُ তথা সতীত্ব রক্ষা, যথা مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ
৩. اَلْاِحْصَانُ অর্থ ইসলাম, যথা- فَاِذَا اُحْصِنَّ اَىْ اِذَا اَسْلَمْنَ [এক ব্যাখ্যা অনুযায়ী]
৪. মহিলা স্বামী ওয়ালী হওয়া, যেমন اِمْرَأَةٌ مُحْصَنَةٌ অর্থাৎ সধবা নারী।

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاۤءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -এর মধ্যে مُحْصَنٰت শব্দটি চতুর্থ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মুসান্নিফ (রহ.) ذَوَاتُ الْاَزْوَاجِ বলে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

উপরিউক্ত চারটি অর্থেই اِحْصَان শব্দের মূল অর্থ তথা বিরত রাখা, নিষেধ করার অর্থ সমভাবে পাওয়া যায়। কেননা স্বাধীনা মানুষের জন্য অপরের হুকুম চলতে বাধার কারণ, সতীত্ব মানুষকে অসমীচীন কর্মকাণ্ড থেকে নিষেধ করে। এবং ইসলাম মানুষকে মনের কুপ্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ থেকে বিরত রাখে। তেমনিভাবে স্বামীও স্ত্রীকে অনেক কাজ থেকে বারণ করে থাকে। আর স্ত্রী স্বামীকে জেনায় লিপ্ত হতে বারণ করে। এতে বুঝা যাচ্ছে, উল্লিখিত সকল অর্থেরই মূল উৎস হচ্ছে اِحْصَان শব্দের ধাতুগত মূল অর্থটি।

আলোচ্য আয়াতে اَلْمُحْصَنَاتُ শব্দটিকে সকল কারীগণই সোয়াদের জবরের সাথে তথা ইসমে মাফঊলের সীগাহ পাঠ করেছেন। এছাড়া কুরআনের অন্যান্য সকল স্থানে জবর ও যেরের সাথে তথা ইসমে মাফঊল ও ইসমে ফায়েল উভয় রূপেই পঠিত হয়েছে।

اَلْمُحْصَنَاتُ -এর পূর্বে وَحُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ উহ্য মেনে এ কথার দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, اَلْمُحْصَنَاتُ শব্দটিকে পূর্বোক্ত আয়াতের اُمَّهَاتُكُمْ -এর উপর আত্‌ফ করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ : সংযোজন করে একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন।

প্রশ্নটি হলো এই যে, হারাম হওয়া তো কোনো ক্রিয়ার মধ্যে হয়ে থাকে, সত্তাতে নয়। অথচ وَحُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمُحْصَنَاتُ দ্বারা এ সব মহিলাদের সত্তা হারাম হওয়া বুঝা যাচ্ছে।

জবাবে মুফাসসিরে আল্লাম اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ [তাদের বিয়ে করা] সংযোজন করেছেন। অর্থাৎ তোমাদের জন্য সধবা নারীদেরকে বিয়ে করা হারাম, তাদের সত্তা নয়। قَبْلَ مُفَارَقَةِ اَزْوَاجِهِنَّ বলে এ কথার দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, বিবাহিতা মহিলাগণ স্বীয় পূর্বস্বামী হতে যথারীতি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর, তাদেরকে বিয়ে করতে কোনো অসুবিধা নেই। চাই তারা স্বাধীন হোক বা পরাধীন, তথা শরয়ী বাদী হোক।

قَوْلُهٗ بِالسَّبْىِ -এই কয়েদ দ্বারা একথার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেছেন যে, যুদ্ধবন্দী বাদী হলে তার দারুল হরবের পূর্বস্বামী হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বেও তার সহিত সহবাস জায়েজ রয়েছে। তবে যদি বাদী খরিদা হয়, অথবা বিবাহিতা হয় তাহলে পূর্বস্বামী হতে যথারীতি বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে সহবাস জায়েজ নয়।

قَوْلُهٗ نَصْبٌ عَلَى الْمَصْدَرِيَّةِ অর্থাৎ كِتَابَ اللّٰهِ -এর كِتَاب মাফঊলে মুতলাক হওয়ার প্রেক্ষিতে জবরযুক্ত হয়েছে। كِتَاب -এর আমেল হচ্ছে উহ্য كُتِبَ যা حُرِّمَتْ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে। কেননা كِتَاب - فَرْض ও تَحْرِيْم একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। كَتَبَ اللّٰهُ ذٰلِكَ عَلَيْكُمْ كِتَابًا বলে মুফাসসিরে আল্লাম সেই উহ্য আমেলের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন।

هُوَ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ কথাটি বলে গ্রন্থকার একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো এই যে, اَلْمُؤْمِنَاتُ -এর কয়েদ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, আহলে কিতাব মহিলাদেরকে বিয়ে করা ঠিক নয়। এর জবাবে তিনি বলেছেন, মুমিন মহিলা হওয়ার কয়েদটি অধিকাংশের প্রেক্ষিতে লাগানো হয়েছে। নতুবা বিয়ে শাদীর ব্যাপারে স্বাধীন মু'মিন নারীদের যে হুকুম, স্বাধীন আহলে কিতাব নারীদেরও সেই হুকুম। সুতরাং এর বিপরীত মর্ম গ্রহণ করা ঠিক হবে না।

قَوْلُهُ مُحْصَنَاتٍ - تَنْكِحُوْهُنَّ -এর মাফউলের যমীর হতে হাল হয়েছে, সিফত নয়। কেননা প্রসিদ্ধ কায়দা রয়েছে- اَلضَّمِيْرُ لَا يُوْصَفُ وَلَا يُوْصَفُ بِهٖ যমীর মাওসূফও হয় না এবং সিফতও হয় না।

غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ হালে মুয়াক্কিদাহ اَخْدَانٌ - خِدْنٌ -এর বহুবচন। خِدْنٌ মানে বন্ধু।

-[তাফসীরে কাবীর খ. ৫, পৃ. ৪১-৪২, জামালাইন খ. ২, পৃ. ১৬-১৭]

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ الخ পূর্বে আয়াতেও মাহরাম মহিলাদের আলোচনা হয়েছে, এবং আলোচ্য আয়াতে এক বিশেষ শ্রেণির মাহরাম নারীদের সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে।

যে সকল মহিলাদের সাথে বিয়ে শাদী শরিয়তের দৃষ্টিতে হারাম তারা প্রথমত দু প্রকার। যথা-

১. مُحَرَّمَاتٌ اَبَدِيَّةٌ [যারা চিরদিনের জন্য হারাম] ও

২. مُحَرَّمَاتٌ مُؤَقَّتَةٌ অর্থাৎ যারা সাময়িক হারাম।

প্রথম প্রকার আবার তিন শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা-

১. مُحَرَّمَاتٌ نَسَبِيَّةٌ [বংশীয় সূত্রে হারাম নারীগণ],

২. مُحَرَّمَاتٌ رَضَاعِيَّةٌ [দুধের সম্পর্কে হারাম নারীগণ] ও

৩. مُحَرَّمَاتٌ بِالْمُصَاهَرَةِ [বৈবাহিক সম্পর্কে হারাম নারীগণ]।

পূর্বোল্লিখিত আয়াতে উপরোক্ত তিন শ্রেণির চিরস্থায়ী হারাম নারীদের আলোচনা হয়েছে, আর আলোচ্য আয়াতে চতুর্থ শ্রেণির হারাম নারী তথা مُحَرَّمَاتٌ مُؤَقَّتَةٌ বা সাময়িক হারাম নারীদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ الخ অর্থাৎ তেমনিভাবে তোমার জন্য সেই সব নারীদেরকেও হারাম করে দেওয়া হয়েছে, যাদের স্বামী রয়েছে। মুহসানাত বলে এখানে সধবা তথা স্বামীওয়ালা নারীদেরকেই বুঝানো হয়েছে। তাদের স্বামীগণ মৃত্যুবরণ করার পূর্বে বা তাদেরকে তালাক দেওয়ার পূর্বে তাদের সাথে বিয়ে শাদী হারাম। তবে তাদের মৃত্যুর পর বা তাদের তরফ থেকে তালাক প্রাপ্তা হওয়ার পর এবং যথারীতি মৃত্যুর ইদ্দত ও তালাকের ইদ্দত পালন করার পর তাদের সাথে বিয়ে জায়েজ হবে।

قَوْلُهُ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ : পূর্বের বিধান থেকে ব্যতিক্রম। অর্থাৎ স্বামী ওয়ালী নারীদেরকে অন্য ব্যক্তির বিবাহ করা জায়েজ নয়, তবে কোনো নারী যদি মালিকানাধীন দাসী হয়ে আসে তাহলে এই বিধান নয়। মুসলমানরা যদি দারুল হরবের কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে এবং সেখান থেকে কিছু নারী বন্দী করে আসে তবে তাদের দারুল হরবে অবস্থানরত স্বামীদের সাথে তাদের বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যায়। এখন এ নারী ইহুদি-খ্রিস্টান কিংবা মুসলমান হলে, দারুল ইসলামের যে কোনো মুসলমান তাকে বিয়ে করতে পারবে। আর আমীরুল মু'মিনীন যদি তাকে দাসী করে কোনো সিপাহীকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মধ্যে বণ্টন করে দেন তবুও তাকে ভোগ করা জায়েজ হবে। কিন্তু এই বিবাহ ও ভোগ করা এক হায়েজ আসার পরে কিংবা গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব করার পর জায়েজ হবে।

মাসআলা : যদি কোনো কাফের মহিলা দারুল হরবে মুসলমান হয়ে যায় এবং তার স্বামী কাফের থাকে, তবে শরিয়তের বিচারক তাকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলবে। যদি সে অস্বীকার করে তবে বিচারক তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ করবে। এ বিচ্ছেদ তালাক বলে গণ্য হবে। এরপর ইদ্দত অতিবাহিত হলে মহিলা যে কোনো মুসলমানকে বিবাহ করতে পারবে।

-[জামালাইন খ. ৫, পৃ. ১৭, মা'আরেফুল কুরআন খ. ২, পৃ. ৪০০]

শানে নুযূল : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, আলোচ্য আয়াতটি ঐ সব মুহাজির মহিলাদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা স্বামী ছাড়া হিজরত করে এসে যেত এবং কিছু সংখ্যক মুসলমান তাদেরকে বিয়ে করে নিত, অতঃপর তাদের স্বামীগণ মুসলমান হয়ে হিজরত করে আসত। আল্লাহ পাক আয়াতটিকে এ রকম নারীদেরকে বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন। -[তাফসীরে মাজহারী খ. ৩, পৃ. ১৭]

মুসনাদে আহমদ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ সাঈদ (রা.) -এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, আওতাস যুদ্ধে কিছু সংখ্যক মহিলা বন্দী হয়ে এসেছে যারা ছিল স্বামী ওয়ালী। আর হুজুরে পাক ﷺ তাদেরকে সাহাবাদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। অথচ তাদের স্বামীগণ তাদের সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে স্বদেশে বর্তমান ছিল। তখন ঐ সব মহিলাদের সাথে সহবাস করতে সাহাবাদের মধ্যে ইতস্ততঃ ভাব সৃষ্টি হলো। ফলে তারা হুজুর ﷺ -এর কাছে বিষয়টি উল্লেখ করলে আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়। وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ الخ -[ইবনে কাসীর খ. ৫, পৃ. ২, মা'আরিফে ইদ্রসীয়া খ. ২, পৃ. ১৭৮]

আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপতী (র.) বলেন, উল্লিখিত হাদীসের উদ্দেশ্য হলো এই যে, যদি স্বাধীন নারীগণ হিজরত করে দারুল ইসলামে চলে আসে, আর তাদের স্বামীগণ মুসলমান হয়, তবে তারা দারুল হরবের মধ্যে থাকলেও তাদের স্ত্রীদের সাথে বিয়ে জায়েজ নয়। কারণ তারা স্বামী স্ত্রী উভয়ের দ্বীন-ধর্ম এক ও অভিন্ন যদিও বাহ্যত উভয়ের দেশ ভিন্ন ভিন্ন। তবে যদি কোনো মহিলা মুসলমান হয়ে হিজরত করে দারুল ইসলামে চলে আসে, আর তার স্বামী অমুসলিম হয় এবং দারুল হরবে বিদ্যমান থাকে তাহলে মহিলার নতুন বিবাহ জায়েজ রয়েছে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ .

সূরায়ে মুমতাহানার এই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, মুমিনা নারী যারা হিজরত করে এসেছে তারা পরীক্ষা নিরীক্ষার পর যদি মু'মিনই প্রমাণিত হয় তবে তাদের দারুল হরবে অবস্থানরত কাফের স্বামীদের প্রতি ফিরিয়ে দেওয়া জায়েজ হবে না। তারা একে অন্যের জন্য হালাল হবে না। এমতাবস্থায় তোমাদের জন্য তাদেরকে বিয়ে করতে কোনো অসুবিধা নেই।

-[মাজহারী- খ. ৩, পৃ. ১৭]

قَوْلُهُ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذٰلِكُمْ : অর্থাৎ, উল্লিখিত হারাম নারীদের ছাড়া অন্যান্য নারী তোমাদের জন্য হালাল। আয়াতে বর্ণিত নারীগণ ব্যতীত আরো কিছু মহিলাদেরকে বিয়ে করা হারাম, তাদের কথা আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্টরূপে না আসলেও অন্যান্য আয়াত ও হাদীসসমূহে এসেছে। যেমন- স্ত্রীর সহিত তার ফুফু অথবা খালাকে একত্রে বিয়েতে রাখা হারাম। কেননা হাদীসে আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلٰى عَمَّتِهَا وَلَا عَلٰى خَالَتِهَا তেমনিভাবে তিন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকেও হালালার পূর্বে এবং অপরের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে ইদ্দতের ভেতরে বিবাহ করাও জায়েজ নেই।

আর স্বাধীন স্ত্রী থাকাবস্থায় কোনো বাদীকে বিয়ে করাও জায়েজ হবে না। এবং এক সাথে চারের অধিক পঞ্চম মহিলাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করাও জায়েজ হবে না। -[তাফসীরে কাবীর খ. ৫, পৃ. ৪৬-৪৮]

قَوْلُهُ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ : অর্থাৎ, হারাম নারীদের বর্ণনা এজন্য করা হয়েছে যাতে তোমরা স্বীয় অর্থ সম্পদের মাধ্যমে হালাল নারীদেরকে তালাশ কর এবং তাদেরকে বিবাহ কর।

আবূ বকর জাসসাস (র.) আহকামুল কুরআনে লিখেন- এ থেকে দুটি বিষয় জানা গেল। এক. মোহর ব্যতীত বিবাহ হতে পারে না। এমনকি যদি স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে সিদ্ধান্ত নেয় যে, মোহর ব্যতীত বিবাহ হবে, তবুও মোহর অপরিহার্য হবে। এর সবিস্তারে আলোচনা ফিকহ গ্রন্থসমূহে রয়েছে। দুই. মোহর এমন বস্তু হতে হবে যাকে মাল বলা যায়।

বিবাহের শর্তাবলি : হালাল মহিলাদের সাথে বিবাহ কয়েকটি শর্তের সহিত জায়েজ। শর্তগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে-

১. স্বামী-স্ত্রী উভয়ের তরফ থেকে মৌখিক তলব হতে হবে, অর্থাৎ প্রস্তাব ও সমর্থন। তবে ফিকহবিধগণ একে বিবাহের রুকন বলেছেন।

২. মোহর প্রদান। ৩. সদা-সর্বদা মহিলাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ রাখা উদ্দেশ্য হতে হবে। কোনো সময়-সীমা নির্ধারণ হতে পারবে না।

৪. গোপনীর ভাবে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে নিলেই বিয়ে হয়ে যায় না। বরং কমপক্ষে আকেল-বালেগ, মুসলিম দুজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা বিয়ের সাক্ষী হতে হবে। সাক্ষী ব্যতীত প্রস্তাব সমর্থন হয়ে গেল। তার শরিয়তের দৃষ্টিতে বিবাহ হবে না। বরং জেনা বিবেচিত হবে। -[মাআরিফে ইদ্রিসীয়া খ. ২, পৃ. ১৭৯]
এছাড়া আরো কিছু শর্ত রয়েছে। যথা-

৫. স্বামী -স্ত্রী যারা হতে যাচ্ছে, তাদের উভয়ের প্রত্যেকেই সরাসরি অথবা উকিলের মাধ্যমে একে অন্যের প্রস্তাব সমর্থনের কথা শুনতে হবে।

৬. সাক্ষীগণ একত্রিতভাবে তারা উভয়ের কথা শুনতে হবে। -[ঈযাহুল মিশকাত খ. ৩, পৃ. ১৭]

মাসআলা : ওলামাদের ঐকমত্যে মহরের উর্ধ্ব পরিমাণের সুনির্দিষ্ট কোনো সীমা নেই। উভয়েরা পরস্পরের সম্মতিতে মহরের পরিমাণ বেশির চেয়েও বেশি হতে পারে। তবে মোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণে উলামাদের মতবিরোধ রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.) -এর মতে, মহরের সর্বনিম্ন কোনো পরিমাণ নেই। বরং যে বস্তু এবং যে পরিমাণ বস্তু কেনা বেচার মধ্যে মূল্য নির্ধারণ হতে পারে তা বিয়েতেও মোহর সাব্যস্ত হতে পারে। কারণ আয়াতের মধ্যে সাধারণভাবে أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ বলা হয়েছে। এতে মহরের কম বা বেশির কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়নি।

আর ইমাম আবূ হানীফা ও মালেক (র.) বলেন, মহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে। আর তা হচ্ছে ঐ পরিমাণ অর্থ যাকে চুরি করলে চোরের হাত কাটা যায়। আর সেই পরিমাণটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে এক দিনার দশ দিরহাম। এক দিরহাম সমান সাড়ে চার মাশা বা তিনগ্রাম ও বাষট্টি গ্রামের সমপরিমাণ হয়। এ হিসেবে দশ দিরহাম সমান হবে ৩৬ গ্রাম ও ২ কিলোগ্রাম তাই এ পরিমাণে রৌপ্য বা তার সমপরিমাণ মূল্য হবে মহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ।

আর ইমাম মালেক (র.) -এর মতে $\frac{১}{৪}$ দিনার বা তিন দিরহাম।

তাদের উভয়ের দলিল হলো আল্লাহ পাকের ইরশাদ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْٓ أَزْوَاجِهِمْ এখানে فَرْض -এর মানে হচ্ছে পরিমাণ নির্ধারণ করা। এতে বুঝা যাচ্ছে আল্লাহপাক মহরের পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

أَنْ تَبْتَغُوْا بِأَمْوَالِكُمْ -এর মধ্যে মাল মহর হতে বলা হয়েছে। আর দু এক দিরহামকে পরিভাষায় মাল বলা যায় না।

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ تَنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ- এতে স্বাধীন মহিলাকে বিয়ে করার সামর্থ না রাখাবস্থায় বাঁদীদেরকে বিয়ে করতে বলা হয়েছে। এতে বুঝা যাচ্ছে, সামর্থ্য তথা মহর এক উল্লেখযোগ্য মাল হওয়া উচিত। নতুবা দু-চার টাকা থেকে কেউই অপারগ হয়ে থাকে না।

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَا مَهْرَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ -

এছাড়া আরো বহু দালাইল রয়েছে। সংক্ষিপ্ত করণের লক্ষ্যে সেগুলো উল্লেখ করা হলো না। -[মাজহারী খ. ৩, পৃ. ২৮, জামালাইন খ. ২, পৃ. ১৮, ঈজাহুল মিশকাত খ. ৩, পৃ. ১১০-১১]

মুতা প্রসঙ্গ : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً অর্থাৎ, বিবাহের পর যে সকল নারীদেরকে ভোগ কর, তাদের মোহর দিয়ে দাও। এটা তোমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে।

এ আয়াতে اِسْتِمْتَاع ভোগ তথা ফায়দা গ্রহণ করার দ্বারা স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা বুঝানো হয়েছে। অথবা اِسْتِمْتَاع দ্বারা কেবলমাত্র বিয়ের আকদ বুঝানো হয়েছে।

প্রথমাবস্থায় পূর্ণ মহর ওয়াজিব হবে। আর যদি আকদের পর স্বামীর ঘরে যাওয়ার পূর্বেই তালাক হয়ে যায়। তবে অর্ধেক মোহর স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে। এ আয়াতে মহরের অর্থ প্রদানের জন্য বিশেষভাবে তাকিদ প্রদান করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের মধ্যে উল্লিখিত فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ -এর মাঝে যে اِسْتِمْتَاع শব্দটি এসেছে তার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে اِنْتِفَاع বা ফায়দা গ্রহণ। كُلُّ مَا انْتُفِعَ بِهٖ فَهُوَ مَتَاعٌ যে বস্তু দ্বারা ফায়দা গ্রহণ করা যায়, তাকেই مَتَاع বলে। আর এখানে اِسْتِمْتَاع দ্বারা বিয়ের পর সহবাসের মাধ্যমে অথবা কেবল আকদের মাধ্যমে ফায়দা গ্রহণ করাই অধিকাংশ ওলামায়ে উম্মতের অভিমত। পারিভাষিক অর্থে 'মুতা' বা সাময়িক বিবাহ উদ্দেশ্য নয়। কারণ সেই নিকাহে মুতা বা সাময়িক বিবাহ ইসলামের প্রথম যুগে জায়েজ ছিল বটে, তবে পরবর্তীতে চির দিনের জন্য হারাম করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সেই বিধান রহিত হয়ে গেছে।

নিকাহে মুতা বা সাময়িক বিবাহ হারাম হওয়ার প্রমাণ : 'মুতা' হারাম হওয়ার বহু প্রমাণাদি রয়েছে। সে সবের মধ্য হতে কয়েকটি প্রমাণ নিম্নে পেশ করা হচ্ছে-

১. আল্লাহ পাক স্ত্রী অথবা শরয়ী বাঁদী ছাড়া অন্য যে কোনো মহিলার সাথে সহবাস করাকে হারাম করেছেন। আর মুতার মাধ্যমে যে মহিলার সাথে সহবাস করা হয় সে স্ত্রীও নয়, এবং শরিয়ত সম্মত দাসী নয়। তাই মুতা হারাম। যেমন তিনি ইরশাদ করেন- اَلَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ إِلَّا عَلٰٓى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ - এই আয়াতে উপরিউক্ত দুই শ্রেণির মহিলা ছাড়া যে কোনো নারীকে হারাম করা হয়েছে।

সাময়িক বিয়ে বা মুতা দ্বারা লব্ধ মহিলা যে শরয়ী বাদী নয় তাতো স্পষ্টই। কারণ তাকে কেনা-বেচা করা যায় না, দান করা যায় না, এবং আজাদ করার বিধানও তার উপর জারি করা যায় না।

আর স্ত্রী যে নয় তাও সুস্পষ্ট। কারণ তাদেরকে খোদ শিয়াগণসহ কেহই স্ত্রী বলেন না। কেননা ঐ মহিলা ও মুতা কারী পুরুষের মধ্যে উত্তরাধিকার চলে না। অথচ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে থেকে একে অন্যের উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে। যেমন- আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন- وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ তেমনিভাবে মুতা দ্বারা অর্জিত মহিলার জন্য পুরুষের উপর ভরণ-পোষণ, খানা-খোরাক ওয়াজিব হয় না এবং বাসস্থান দেওয়াও ওয়াজিব হয় না। তার সাথে ঐ মহিলার সন্তানের জন্য বংশীয় সম্পর্কও প্রমাণিত হয় না। এবং তালাক হদ ও মহরের কিছুই মুতার মধ্যে আসেনা। এতে বুঝা গেল, মুতার মহিলা স্ত্রী ও নয় এবং শরয়ী দাসীও নয়। তাই এদেরকে মুতার নামে ব্যবহার করা সম্পূর্ণরূপে হারাম।

২. হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত হাদীস- عَنْ عَلِيٍّ (رض) أَنَّ الرَّسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَعَنْ أَكْلِ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْأَنْسِيَّةِ অর্থাৎ, হযরত আলী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুতা [সাময়িক বিবাহ] এবং পোষ্য গাধার মাংস খেতে নিষেধ করেছেন।

৩. হযরত রবী হতে বর্ণিত হাদীস-

رُوِيَ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ غَدَوْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ يَقُوْلُ يٰأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ أَمَرْتُكُمْ بِالْاِسْتِمْتَاعِ مِنْ هٰذِهِ النِّسَاءِ أَلَا وَأَنَّ اللّٰهَ قَدْ حَرَّمَهَا عَلَيْكُمْ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيْلَهَا وَلَا تَأْخُذُوْا مِمَّا أٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا - وَرُوِيَ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مُتْعَةُ النِّسَاءِ حَرَامٌ -

অর্থাৎ, হযরত রবী বিন সাবুরা জুহানী তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি এক সকালে রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট গিয়ে দেখতে পেলাম, তিনি রুকন ও মাকামে ইবরাহীমের মধ্যখানে কাবার দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছেন, তখন তিনি বলতে ছিলেন, লোক সকল! আমি তোমাদেরকে এসব মহিলাদের সাথে মুতা করতে অনুমতি দিয়েছিলাম বটে, তবে জেনে রাখো! আল্লাহ পাক অবশ্যই কিয়ামত পর্যন্তের জন্য একে তোমাদের উপর হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং মুতার কোনো মহিলা যার কাছে রয়েছে সে যেন তাকে অবশ্যই বিদায় দিয়ে দেয়। আর তাদেরকে যা কিছু তোমরা দিয়েছ তার কিছু ফেরত আনতে পারবে না।

তিনি আরো বলেছেন- মুতা বা নারীদেরকে সাময়িকভাবে বিবাহ করা হারাম। উপরোক্ত হাদীস তিনটি ওয়াহিদী তার আল বসীত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

৪. হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) সাহাবায়ে কেরামের সামনে তাঁর খোতবার মধ্যে মুতাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তাঁর এ নিষেধের উপর একজন সাহাবীও প্রতিবাদ করেন নি। এতে বুঝা গেল, সাহাবাদের মুতা হারাম হওয়ার ব্যাপারটা জানা ছিল। নতুবা অবশ্যই কেউ না কেউ প্রতিবাদ করতেন। এতে করে ইজমায়ে সাহাবা দ্বারাও মুতা হারাম প্রমাণিত হয়েছে।

চারো মাজহাবের ইমামসহ সকল আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ওলামাদের ঐকমত্যে মুতা হারাম। ইমাম সারখসী ও হেদায়া প্রণেতা মালেক (র.) -এর প্রতি যে মুতার বৈধতার সম্পর্ক করেছেন, ইবনে হুমাম প্রমুখ ওলামাদের মতে তাদের এ সম্পর্ক করাটা ঠিক নয়। বরং ইমাম মালেক (র.) -এর মতেও মুতা হারাম। তার মাজহাবই এর প্রকৃষ্ঠ প্রমাণ।

কেবলমাত্র শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরাই বলে মুতা জায়েজ।

আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) প্রথমে জায়েজ ফতোয়া দিয়ে থাকলে পরবর্তীতে তিনি তার সেই মত প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর এ মত থেকে তওবা করেছেন। বিস্তারিত জানতে হলে তাফসীরে কাবীর দেখুন।

-[খ. ৫, পৃ. ৫১-৫৩]

মুতা ও শিয়া সম্প্রদায় : শিয়ারা বলে, মুতা জায়েজ। তারা আলোচ্য আয়াতের اِسْتِمْتَاع কে পারিভাষিক মুতা বলে। আর একেই তারা দলিল হিসেবে পেশ করে থাকে। কারণ তাতে وَاٰتُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ বলা হয়েছে। আর বিয়েতে মহর প্রদান করা হয়, আজর বা বিনিময় নয়। এতে বুঝা যাচ্ছে, এখানে মুতা উদ্দেশ্য। তেমনিভাবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) মুতাকে জায়েজ বলেছেন।

জবাব : আয়াতে বর্ণিত إِسْتِمْتَاع দ্বারা যে পারিভাষিক উদ্দেশ্য নয় তা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আর কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে মোহরকে أَجْر বলা হয়েছে। তাই এখানেও أُجُورَهُنَّ -এর মর্ম হবে مُهُورَهُنَّ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর ফতোয়া থেকে তিনি যে প্রত্যাবর্তন করেছেন এবং মৃত্যুর পূর্বে তা থেকে তওবাও যে করেছেন ইতিপূর্বে তা আলোচনা হয়েছে। তাই তার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না।

ইসলামের প্রথম যুগের ও শিয়াদের মুতার মধ্যকার পার্থক্য : শিয়ারা যেই মুতাকে জায়েজ বলে বিশ্বাস করে সেই মুতা কোনো ধর্মে কোনো এক সময়ও জায়েজ ছিল না। আর তাদের মুতা ইসলামের প্রথম যুগেও বৈধ ছিল না। কারণ শিয়াদের মুতা ও জেনার মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। আর জেনাতো কোনো ধর্মে কখনোই হালাল ছিল না। সমস্ত শরিয়ত ও ধর্ম ব্যভিচারের অবৈধতার উপর একমত। পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে এ পর্যন্ত যে কোনো ধর্মে চাই আসমানি হোক বা মানব রচিত হোক কেবল মাত্র শিয়া মতালম্বী ছাড়া কোথাও তাদের এই ঘৃণ্য মুতার অস্তিত্বও খুজে পাওয়া যায় না।

শিয়াদের মতে, মুতার অর্থ হলো এই যে, হারাম ও সধবা নারীগণ ব্যতীত যে কোনো নারীর সাথে যতটুকু সময়ের ইচ্ছা যে কোনো রকম নির্ধারিত বিনিময়ের উপর পরস্পরে সম্মত হয়ে সাক্ষী ছাড়া নামকাওয়াস্তে আকদ করে নেওয়া। অতঃপর সেই নির্ধারিত মিয়াদ পার হয়ে যাওয়ার পর তালাক ব্যতীত মুতার নারী নিজে নিজেই তার থেকে পৃথক হয়ে যায়। পৃথক হয়ে যাওয়ার পর তার উপর কোনো রকম ইদ্দতও থাকে না। আর মুতা হচ্ছে শিয়া মতালম্বীদের নিকট এক প্রকার বিবাহ এবং উচ্চতর ইবাদত। আর আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের নিকট মুতা সুস্পষ্ট জেনা ও চরম নির্লজ্জ হারাম কাজ।

আর যে মুতা ইসলামের প্রথম যুগে জায়েজ তথা অনিষিদ্ধ ছিল, তার মর্ম হলো, এক প্রকার নিকাহে মুয়াক্কাত বা সাময়িক বিবাহ। অর্থাৎ এক সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য সাক্ষীদের সামনে অভিভাবকের অনুমতিক্রমে বিবাহ করা। অতঃপর নির্দিষ্ট মিয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পর মহিলা তালাক ব্যতীতই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তবে পৃথক হয়ে যাওয়া পর ইস্তেবরায়ে রেহেমের জন্য এক হায়েজ আসা আবশ্যক, যাতে করে অন্য জনের বীর্যের সাথে সংমিশ্রণ না ঘটে। কেবলমাত্র এই ধরনের মুতা ইসলামের প্রথম যুগে জায়েজ ছিল। অর্থাৎ মুর্খতার যুগের রেওয়ায বা প্রথানুযায়ী লোকেরা এরকম মুতা করত এবং শরিয়তের মধ্যে তখনও তার উপর কোনো নিষিদ্ধতা ও অবৈধতার হুকুম নাজিল হয়নি, যেরূপ মদ ও সুদের নিষিদ্ধতার এবং অবৈধতার উপর কোনো হুকুম ইসলামের প্রথম যুগে অবতীর্ণ হয়নি। আল্লাহর পানাহ! জায়েজের অর্থ এই নয় যে, হুজুরে পাক ﷺ মৌখিকভাবে নিকাহে মুতার অনুমতি দিয়েছিলেন।

অতঃপর নিকাহে মুতা হারাম হওয়ার প্রথম ঘোষণা হয়েছে খায়বার যুদ্ধে, দ্বিতীয়বার হারাম হওয়ার ঘোষণা হয়েছে আওতাস যুদ্ধে, তৃতীয়বার হয়েছে তবুক যুদ্ধে, অতঃপর বিদায় হজের মধ্যে মুতা হারাম হওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে।

যাতে করে আম-খাছ সব ধরনের লোকেরাই এই মুতার অবৈধতা জেনে নিতে পারে। হুজুরে পাক ﷺ মুতা হারাম হওয়ার ব্যাপারে এই বারংবার ঘোষণা ঐ প্রথম বারের ঘোষণারই তাকিদ হিসাবে ছিল। যা তিনি খায়বার যুদ্ধের সময় করেছিলেন, নতুন কোনো হুকুম ছিল না। রইল কথা শিয়াদের মুতার, অর্থাৎ নর-নারীকে একদিন বা দুদিনের জন্য বিনিময় সাব্যস্ত করে উপভোগ করা। ইহা নির্ভেজাল খাঁটি ব্যভিচার। তা কোনো সময়ও ইসলামের মধ্যে জায়েজ ও মুবাহ ছিল না। তাই রহিত হওয়ার তো প্রশ্নই আসতে পারে না। যেরূপ জেনা কোনো সময় না মুবাহ ছিল এবং না রহিত হয়েছে।

–[মাআরেফে ইদ্রিসিয়া খ. ২, পৃ. ১৮২–৮৩]

মাসআলা : নিকাহে মুতার ন্যায় নিকাহে মুয়াক্কাতও হারাম ও বাতিল।

মুয়াক্কাত বিবাহ হলো নির্দিষ্ট মিয়াদের জন্য বিবাহ করা। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, 'মুতা' বিবাহে মুতা শব্দ বলা হয়।এবং মুয়াক্কাত বিবাহ নিকাহ শব্দের মাধ্যমে যে সম্পন্ন হয়। –[মা'আরিফুল কুরআন খ. ২, পৃ. ৪০৫]

২৫. وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا غِنًى اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْحَرَائِرَ الْمُؤْمِنٰتِ هُوَ جَرىً عَلَى الْغَالِبِ فَلَا مَفْهُوْمَ لَهُ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ يَنْكِحُ مِنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ فَاكْتَفُوْا بِظَاهِرِهٖ وَكِلُوا السَّرَائِرَ اِلَيْهِ فَاِنَّهُ الْعَالِمُ بِتَفَاصِيْلِهَا وَرُبَّ اَمَةٍ تَفْضُلُ الْحُرَّةَ فِيْهِ وَهٰذَا تَانِيْسٌ بِنِكَاحِ الْاِمَاءِ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ اَىْ اَنْتُمْ وَهُنَّ سَوَاءٌ فِى الدِّيْنِ فَلَا تَسْتَنْكِفُوْا مِنْ نِكَاحِهِنَّ فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ مَوَالِيْهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اَعْطُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُهُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مِنْ غَيْرِ مَطْلٍ وَنَقْصٍ مُحْصَنٰتٍ عَفَائِفَ حَالٌ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ زَانِيَاتٍ جَهْرًا وَّلَا مُتَّخِذَاتِ اَخْدَانٍ اَخِلَّاءٍ يَزْنُوْنَ بِهَا سِرًّا فَاِذَآ اُحْصِنَّ زُوِّجْنَ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ تَزَوَّجْنَ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ زِنًا فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ الْحَرَائِرِ الْاَبْكَارِ اِذَا زَنَيْنَ مِنَ الْعَذَابِ الْحَدِّ فَيُجْلَدْنَ خَمْسِيْنَ وَيُغَرَّبْنَ نِصْفَ سَنَةٍ وَيُقَاسُ عَلَيْهِنَّ الْعَبِيْدُ وَلَمْ يُجْعَلِ الْاِحْصَانُ شَرْطًا لِوُجُوْبِ الْحَدِّ بَلْ لِاِفَادَةِ اَنَّهُ لَا رَجْمَ عَلَيْهِنَّ اَصْلًا ذٰلِكَ اَىْ نِكَاحُ الْمَمْلُوْكَاتِ عِنْدَ عَدَمِ الطَّوْلِ لِمَنْ خَشِىَ خَافَ الْعَنَتَ الزِّنَا ـ

অনুবাদ :

২৫. আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সামর্থ্য না রাখে স্বাধীন মুসলমান নারীকে বিয়ে করার সামর্থ্য না রাখে মুসলমান হওয়ার কথাটা স্বাভাবিকভাবে এসেছে, তাই এর বিপরীত অর্থ উদ্দেশ্য করা ঠিক হবে না। তবে সে তোমাদের অধিকারভুক্ত মুসলিম ক্রিতদাসীদেরকে বিয়ে করবে। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ঈমান সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত আছেন। সুতরাং তার বাহ্যিক ঈমানের উপর যথেষ্ট কর, আর অভ্যন্তরীন গোপন রহস্যাদির ব্যাপারটা আল্লাহর উপর ছেড়ে দাও। কারণ তিনি সেই ব্যাপারে সবিস্তারে অবগত আছেন। আর সেই অভ্যন্তরীণ বিষয়ের প্রেক্ষিতে অনেক বাদী স্বাধীন নারীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখে। এতে বাদীদের বিয়ের প্রতি অনুপ্রেরণা দেওয়া হয়েছে।

তোমরা পরস্পরে এক। অর্থাৎ তোমরা ও তারা ধর্মের ব্যাপারে বরাবর, সুতরাং তাদেরকে বিয়ে করার মধ্যে লজ্জাবোধ করোনা। তাই তাদেরকে তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে বিয়ে কর এবং নিয়মানুযায়ী কোনো রকম টালবাহানা ও হ্রাস ঘটানো ছাড়া তাদেরকে তাদের মহরানা প্রদান কর। এমতাবস্থায় যে, তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ পবিত্র হবে, প্রকাশ্যে ব্যভিচারিণী হবে না কিংবা উপপতি গ্রহণ কারিণী হবে না। যারা তার সাথে গোপনে জেনা করে। অতঃপর যখন তারা বিবাহ বন্ধনে এসে যায়, এক কেরাতে মারুফের সীগাহের সাথে অর্থাৎ, যখন তারা বিয়ে করে নেয় তখন যদি কোনো অশ্লীল তথা জেনার কাজে লিপ্ত হয়ে যায়, তাহলে তাদের উপর স্বাধীন কুমারী নারীদের অর্ধেক শাস্তি তথা হদ আসবে। যদি তারা জেনা করে নেয়। সুতরাং তাদেরকে পঞ্চাশটি বেত্রাঘাত ও অর্ধবৎসরের নির্বাসন দেওয়া হবে। এবং তাদের উপর গোলামদেরকে কেয়াস করা হবে। আর বিবাহিতা হওয়ার বিষয়টা হদ ওয়াজিব হওয়ার শর্ত হিসেবে নয়, বরং একথা বুঝাবার স্বার্থে এসেছে যে, তাদের উপর রজম মোটেই নেই। এ বিষয়টা তথা স্বাধীন নারীকে বিয়ে করার সামর্থ্য না থাকা অবস্থায় বাদীদেরকে বিয়ে করার এ হুকুম তাদের জন্য তোমাদের মধ্যে যারা গুনাহ তথা ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে ভয় করে।

وَاَصْلُهُ الْمَشَقَّةُ سُمِّىَ بِهِ الزِّنَا لِاَنَّهُ سَبَبُهَا بِالْحَدِّ فِى الدُّنْيَا وَالْعُقُوْبَةِ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْكُمْ بِخِلَافِ مَنْ لَا يَخَافُهُ مِنَ الْاَحْرَارِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا وَكَذَا مَنِ اسْتَطَاعَ طَوْلَ حُرَّةٍ وَعَلَيْهِ الشَّافِعِىُّ (رحـ) وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مِنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ الْكَافِرَاتِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا وَلَوْ عَدِمَ وَخَافَ وَاَنْ تَصْبِرُوْا عَنْ نِكَاحِ الْمَمْلُوْكَاتِ خَيْرٌ لَّكُمْ لِئَلَّا يَصِيْرَ الْوَلَدُ رَقِيْقًا وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ بِالتَّوْسِعَةِ فِىْ ذٰلِكَ ـ

অনুবাদ : عَنَتَ -এর আসল অর্থ হচ্ছে কষ্ট। আর ব্যভিচারের নাম عَنَتَ [কষ্ট] এই জন্য রাখা হয়েছে যে, ব্যভিচার দুনিয়াতে হদ এবং আখেরাতে শাস্তির মাধ্যমে কষ্টের কারণ। পক্ষান্তরে যে স্বাধীন লোকদের জেনাতে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা নেই, তাদের জন্য বাঁদীদেরকে বিয়ে করা হালাল নয়। তেমনিভাবে এই হুকুম ঐ ব্যক্তির জন্যও, যে স্বাধীন নারীকে বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মত এটাই। আল্লাহ পাকের ইরশাদ- مِنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ দ্বারা কাফের নারীগণ বের হয়ে গিয়েছে। সুতরাং তার জন্য বাঁদীদের কে বিয়ে করা হালাল হবে না, যদিও সামর্থ্য না রাখে এবং গুনাহের আশঙ্কা হয়। আর যদি তোমরা সবর কর বাদীদেরকে বিয়ে করা হতে, তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম, যাতে করে সন্তান গোলাম না হয়। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময় এ ব্যাপারে প্রশস্ততা প্রদানের মাধ্যমে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الخ : পূর্বে বিবাহের আহকামের বর্ণনা ছিল। তারই অধীনে এখন শরয়ী বাদীদের সাথে বিবাহের আলোচনা শুরু হয়েছে। এরই ভিতরে বাদী ও গোলামের জেনার শাস্তির হুকুমও বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের শাস্তি স্বাধীনদের শাস্তির অর্ধেক হবে।

طَوْل শক্তি, সামর্থ্যকেও বলে। আলোচ্য আয়াতের মর্ম হলো এই যে, যার স্বাধীন নারীদেরকে বিবাহ করার সামর্থ্য নেই, সে মু'মিন বাদীদেরকে বিয়ে করতে পারবে। এতে বুঝা যাচ্ছে, যথাসম্ভব স্বাধীন নারীদেরকেই বিয়ে করা উচিত। আর বাদীকে যদি বিয়ে করতেই হয় তবে বাদী মু'মিন হতে হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মাজহাব এটাই যে, স্বাধীন নারীদেরকে বিয়ে করার সামর্থ্য থাকাবস্থায় বাদী বা আহলে কিতাব নারীদেরকে বিয়ে করা মকরূহ। আর অন্যান্য ইমাম যেমন- ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে স্বাধীন নারীদেরকে বিয়ে করার সামর্থ্য থাকলে বাঁদীদের সাথে বিবাহ হারাম, তেমনিভাবে কিতাবীয়া বাদীর সাথেও বিয়ে মোটেই জায়েজ নয়।

قَوْلُهُ فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ : অর্থাৎ, বাদীদের সাথে বিয়ে তাদের মালিকদের অনুমতিক্রমে কর। যদি তারা অনুমতি প্রদান না করে তবে বিয়ে শুদ্ধ হবে না। কারণ বাদীর নিজের মালিকানাই নিজের অর্জিত নেই। গোলামের ক্ষেত্রেও একই হুকুম। অর্থাৎ সেও তার মালিকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করতে পারবেনা।

অতঃপর ইরশাদ করেছেন, বাদীদের মহর উত্তমরূপে আদায় কর। বাদী মনে করে তাদের সাথে টালবাহানা করো না। ইমাম মালেক (র.)-এর মতে, মহরের অর্থ সম্পদের অধিকারী হলো বাদী। আর অন্যান্য ইমামদের মতে, মহরের হকদার হলো মালিক।

قَوْلُهُ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ : অর্থাৎ, মু'মিন বাদীদের সাথে বিয়ে কর যাতে করে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থেকে সংরক্ষিত থাকতে পারে। স্বাধীনভাবে যৌনচারিতা করে ঘুরে না বেড়ায়। এবং গোপনীয় ভাবেও যাতে অবৈধ প্রেমমগ্ন না হয়। অতঃপর বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পরও যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে যায় তবে তাদের উপর ঐ শাস্তির অর্ধেক আসবে যা স্বাধীন নারীদের উপর এসে থাকে। এর দ্বারা অবিবাহিতা স্বাধীন নারী উদ্দেশ্য। তাদের ব্যভিচারের শাস্তি হলো একশত বেত্রাঘাত। আর স্বাধীন নারী বা পুরুষ যদি ব্যভিচার করে তবে তার শাস্তি হলো রজম বা প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড। রজম যেহেতু অর্ধেক করা যায় না, তাই চারো ইমামের মতে, গোলাম বাদী চাই বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত সর্বাবস্থায় তাদের থেকে ব্যভিচার প্রকাশ পেলে তার শাস্তি হবে ৫০ টি বেত্রাঘাত।

قَوْلُهُ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ الخ : অর্থাৎ, বাদীদের সাথে বিবাহ করার অনুমতি ঐ সব লোকদের জন্য, যাদের জেনায় লিপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

قَوْلُهُ وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ : অর্থাৎ, জেনার আশঙ্কা সত্ত্বেও যদি সবর কর এবং নিজেকে পবিত্র ও সৎ রাখতে পার, তবে এটা তোমাদের জন্য বাদীকে বিয়ে করার চেয়ে উত্তম। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো স্বাধীন মহিলা বিবাহের যোগ্য পাওয়া না যাবে।

-[জামালাইন খ. ২, পৃ. ২১ -২২]

অনুবাদ :

٢٦ . يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ شَرَائِعَ دِيْنِكُمْ وَمَصَالِحَ اَمْرِكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ طَرَائِقَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ فِى التَّحْلِيْلِ وَالتَّحْرِيْمِ فَتَتَّبِعُوْهُمْ وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمْ يَرْجِعُ بِكُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ الَّتِىْ كُنْتُمْ عَلَيْهَا اِلٰى طَاعَتِهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِكُمْ حَكِيْمٌ فِيْمَا دَبَّرَهُ لَكُمْ .

২৬. আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মের বিধিবিধান ও তোমাদের সার্বিক বিষয়াদির কল্যাণ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করতে চান এবং তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ববর্তী নবীগণের হালাল হারাম সম্বন্ধীয় পথ প্রদর্শন করতে চান, যাতে তোমরা তাদের অনুসরণ করে নাও। আরো চান তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করতে তথা তোমরা তার যে সব পাপ কাজে ছিলে তা থেকে স্বীয় আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে আনতে চান। আল্লাহ তোমাদের সম্পর্কে খুবই জ্ঞাত এবং তোমাদের তদবীর সম্বন্ধে খুবই প্রজ্ঞাবান।

٢٧ . وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ كَرَّرَهُ لِيُبْنٰى عَلَيْهِ وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوَاتِ اَلْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى وَالْمَجُوْسُ اَوِ الزُّنَاةُ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا تَعْدِلُوْا عَنِ الْحَقِّ بِارْتِكَابِ مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ فَتَكُوْنُوْا مِثْلَهُمْ .

২৭. আল্লাহ তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হতে চান। একথাটির উপর পরবর্তী বাক্যের ভিত্তি রাখার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয়বার পুনঃ উল্লেখ করা হয়েছে। আর যারা অবৈধ কামনা-বাসনার অনুসারী তথা ইহুদি খ্রিস্টান, অগ্নি পুজক ও ব্যভিচারী। তারা চায় যে, তোমরা হারাম কর্মে লিপ্ত হয়ে হক থেকে অনেক দূরে বিচ্যুত হয়ে পড়, যাতে তোমরাও তাদের অনুরূপ হয়ে যাও।

٢٨ . يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ يُسَهِّلَ عَلَيْكُمْ اَحْكَامَ الشَّرْعِ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا لَا يَصْبِرُ عَنِ النِّسَاءِ وَالشَّهَوَاتِ .

২৮. আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করতে চান, তাই তোমাদের উপর শরিয়তের বিধি-বিধান সহজ করে দেন। মানুষ দুর্বল সৃজিত হয়েছে, যদ্দরুন মহিলা ও কামনা থেকে নিয়ন্ত্রণে থাকতে পারে না।

তাহকীক ও তারকীব

يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ - এর يُرِيْدُ - لِيُبَيِّنَ - এর লাম يُرِيْدُ - এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে। অথবা لِيُبَيِّنَ - এর মাফউলে বিহী হয়েছে, তখন লাম বর্ণটি অতিরিক্ত হবে। বাক্যের রূপ হবে يُرِيْدُ اَنْ يُبَيِّنَ لِيُبَيِّنَ - এর মাফউল উহ্য রয়েছে, আর তা হচ্ছে شَرَائِعَ دِيْنِكُمْ।

وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمْ - এর মধ্যে যে تَوْبَةٌ রয়েছে তা এখানে শাব্দিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এই জন্যই গ্রন্থকার এর ব্যাখ্যা করেছেন يَرْجِعُ بِكُمْ عَنِ الْمَعْصِيَةِ দ্বারা وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا - এর মধ্যে ضَعِيْفًا শব্দটি اَلْاِنْسَانُ থেকে তারকীবে হাল হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ ...... خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيْفًا : হালাল ও হারামের বিধি-বিধান বর্ণনা করার পর আল্লাহ পাক মুসলমানদের উপর স্বীয় করুণা ও দয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদেরকে এমন জিনিসের নির্দেশ দান করেছেন যা তোমাদের মঙ্গল ও কল্যাণ বয়ে আনে। আর মনের খাহেশ পূজারীরা তোমাদেরকে ভিন্ন পথে নিয়ে যেতে চায়। খাহেশ পূজারীদের নিকট হালাল ও হারামের কোনো পার্থক্য নেই। ইরশাদ হয়েছে-

يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ .

শানে নুযূল : অগ্নিপূজকরা আপন বোন, ভাতিজী, ভাগিনীদেরকে বিয়ে করা হালাল মনে করত। আল্লাহ পাক যখন এদেরকে হারাম করে দিলেন, তখন তারা বলতে লাগল [হে মুসলমানগণ!] তোমরা খালাতো বোন ও ফুফাতোবোনকে বিয়ে করা হালাল মনে কর অথচ খালা ও ফুফুকে হারাম বিশ্বাস কর। সুতরাং তোমরা ভাতিজী ও ভাগিনীদেরকে বিয়ে করো। এরই প্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়- وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَتُوْبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا অর্থাৎ আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হলো তোমাদের অবস্থার প্রতি রহমত সহকারে মনোনিবেশ করা, ইহুদি, খ্রিস্টান, অগ্নিপূজক, জেনাকার, পাপাচারী, প্রবৃত্তি পূজারীরা চায় যে, তোমরা সৎপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাও।

তিনি তোমাদেরকে সহজ বিধান দান করেছেন। বিয়ের ক্ষেত্রে স্বাধীন নারীদেরকে বিবাহ করার সামর্থ্য না থাকাবস্থায় বাদীদেরকে বিবাহ করার অনুমতি দান করেছেন। উভয়পক্ষকে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে মোহর নির্ধারণ করার ক্ষমতা দান করেছেন। এবং প্রয়োজনের সময় ইনসাফ ও সুবিচারের শর্তে একাধিক বিবাহ করার অনুমতি দান করেছেন।

অতঃপর বলা হয়েছে- وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيْفًا অর্থাৎ, মানুষ সৃষ্টিগতভাবে দুর্বল। তার মধ্যে কামনা-বাসনার উপদান নিহিত আছে। যদি তাকে নারীদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকার আদেশ দেওয়া হতো, তবে সে আনুগত্য করতে অক্ষম হয়ে পড়তো। তাই নারীদেরকে বিবাহ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

২৯. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ بِالْحَرَامِ فِى الشَّرْعِ كَالرِّبٰوا وَالْغَصَبِ اِلَّا لٰكِنْ اَنْ تَكُوْنَ تَقَعَ تِجَارَةً وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالنَّصْبِ اَنْ تَكُوْنَ الْاَمْوَالُ تِجَارَةً صَادِرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَطِيْبِ نَفْسٍ فَلَكُمْ اَنْ تَأْكُلُوْهَا وَلَا تَقْتُلُوْۤا اَنْفُسَكُمْ بِارْتِكَابِ مَا يُؤَدِّىْ اِلٰى هَلَاكِهَا اَيًّا كَانَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ بِقَرِيْنَةِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا فِىْ مَنْعِهٖ لَكُمْ مِنْ ذٰلِكَ ـ

৩০. وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ اَىْ مَا نُهِىَ عَنْهُ عُدْوَانًا تَجَاوُزًا لِلْحَلَالِ حَالٌ وَّظُلْمًا تَاكِيْدٌ فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نُدْخِلُهٗ نَارًا يَحْتَرِقُ فِيْهَا وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا هَيِّنًا ـ

৩১. اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبٰۤئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ وَهِىَ مَا وَرَدَ عَلَيْهَا وَعِيْدٌ كَالْقَتْلِ وَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) هِىَ اِلَى السَّبْعِمِائَةِ اَقْرَبُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ الصَّغَائِرَ بِالطَّاعَاتِ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا بِضَمِّ الْمِيْمِ وَفَتْحِهَا اَىْ اِدْخَالًا اَوْ مَوْضِعًا كَرِيْمًا هُوَ الْجَنَّةُ ـ

অনুবাদ :

২৯. হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে তথা শরিয়তের দৃষ্টিতে হারাম পন্থায় যথা সুদ ও ডাকাতির মাধ্যমে গ্রাস করো না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা তোমরা ভোগ করতে পার। এক কেরাতে تِجَارَةً শব্দটি كَانَ নাকেসার খবর হওয়ার ভিত্তিতে জবরযুক্ত পঠিত হয়েছে। তখন অর্থ হবে ঐ মাল তোমাদের জন্য হালাল হবে, যা হবে ব্যবসায়ের মাল, যে ব্যবসা তোমাদের পরস্পরের সম্মতি ও সন্তুষ্টির মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছে। আর তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে হালাক করো না। চাই সেই ধ্বংসটা দুনিয়াতে হোক বা আখেরাতে হোক। اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا এই ব্যাপক ধ্বংসের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি দয়ালু। এজন্যেই তো তিনি তোমাদেরকে এসব ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড থেকে বারণ করেছেন।

৩০. আর যে কেউ হালাল থেকে সীমালঙ্ঘন করে কিংবা জুলুমের বশবর্তী হয়ে এরূপ করবে তথা নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হবে তাকে অচিরেই আগুনে নিক্ষেপ করব, তাতে সে জ্বলতে থাকবে। নাহবী তারকীবে يَفْعَلْ - عُدْوَانًا -এর যমীর থেকে حَال হয়েছে। আর ظُلْمًا হয়েছে তাকিদ। এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজসাধ্য।

৩১. যদি তোমরা বেঁচে থাকতে পার সেসব বড় গুনাহগুলো থেকে যেগুলোকে তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। আর ঐ গুনাহকে বড় গুনাহ বলা হয় যার উপর শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। যেমন- হত্যা, ব্যভিচার, চুরি প্রভৃতি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, বড় গুনাহের সংখ্যা সাতশত এর কাছাকাছি। তবে আমি তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো তথা ছোট গুনাহগুলো আনুগত্যের কারণে ক্ষমা করে দেব। আর তোমাদেরকে প্রবেশ করাব মর্যাদার স্থানে, আর তা হচ্ছে বেহেশত। مُدْخَلًا এই শব্দটির মীম বর্ণে পেশের সহিত ও জবরের সহিত উভয় পদ্ধতিতেই পঠিত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ الخ - بَيْنَكُمْ উহ্য ثَابِت শিবহে ফে'লের মুতা'আল্লিক হয়ে اَمْوَالَكُمْ থেকে حَال হয়েছে। بِالْبَاطِلِ - لَا تَاْكُلُوْٓا -এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে।

اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً الخ-এর মধ্যে اِلَّا ইস্তেছনায়ে মুনকাতের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। تَكُوْنَ এখানে تَامَّة ও হতে পারে এবং نَاقِصَة হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। تَامَّة হলে تِجَارَةٌ পেশযুক্ত হবে। আর نَاقِصَة হলে تِجَارَةً যবরযুক্ত হবে।

مُدْخَلًا মীমে পেশ ও যবরযুক্ত উভয় রকমই হতে পারে। পেশযুক্ত হলে মানে হবে প্রবেশ করো না। আর مَدْخَلًا জবরযুক্ত হলে অর্থ হবে প্রবেশের স্থান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ : অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পরস্পরের সম্পদ অবৈধ পন্থায় ভক্ষণ করো না। বাতেলের মধ্যে ধোকা, প্রতারণা, কৃত্রিমতা, এবং খাঁটি-ভেজালের সংমিশ্রণসহ ঐ সকল ব্যবসা-বাণিজ্যও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যেগুলো করতে শরিয়ত নিষেধ করেছে। যেমন- জুয়া, সুদ প্রভৃতি। তেমনিভাবে নিষিদ্ধবস্তুর ব্যবসা করাও বাতেলের মধ্যেই গণ্য হবে। যেমন- অপ্রয়োজনে ছবি তোলা, অডিও, ভিডিও ফিল্ম, নির্লজ্জ কেসেট ইত্যাদি। এগুলো তৈরি করা, বেঁচা ও মেরামত করা সবটাই নাজায়েজ।

قَوْلُهُ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ : অপরের যেসব সম্পদ পরস্পরের সম্মতি ও সন্তুষ্টিক্রমে খাওয়া যেতে পারে, চাই ব্যবসার মাধ্যমে হোক বা অন্য কোনো পন্থায় হোক, সকল বৈধ পন্থায়ই ভোগ করা শুদ্ধ আছে। ব্যবসা যেহেতু রুজি-রোজগারের জন্য শ্রেষ্ঠ পন্থা, তাই একে বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন। নতুবা হাদিয়া, হেবা, চাকুরী, নকরী, মজদুরী সকল পন্থায়ই অর্জিত সম্পদ হালাল মালের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা.) বলেন, হুজুরে পাক ﷺ -কে হালাল-পবিত্র মাল সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বলেন, عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهٖ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ অর্থাৎ হাতের কামাই ও বিশুদ্ধ ব্যবসা লব্ধ সম্পদ। [আহমদ, হাকেম] হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ الشُّهَدَاءِ অর্থাৎ, সত্যবাদী আমানতদার ব্যবসায়ী নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সাথে থাকবে। -[তিরমিযী]

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত রাসূলে পাক ﷺ বলেছেন-

اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ تَحْتَ ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رَوَاهُ الْاَصْبَهَانِىْ - تَرْغِيْب) অর্থাৎ, সত্যবাদী ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের নীচে স্থান পাবে।

قَوْلُهُ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ : অর্থাৎ তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। এতে মুফাস্সরি ঐকমত্যে আত্মহত্যাও শামিল এবং অন্যকে না হকভাবে হত্যা করাও শামিল। আর দুনিয়া ও আখেরাতে ধ্বংসের কারণ গুনাহে লিপ্ত হওয়া এই অর্থের অন্তর্ভুক্ত। -[জামালাইন খ. ২, পৃ. ২৭]

قَوْلُهُ اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ : অর্থাৎ, তোমরা যদি কবীরা তথা বড় বড় গুনাহগুলো থেকে বেঁচে থাক, তবে তোমাদের বাকি ত্রুটি বিচ্যুতি তথা সগীরা বা ছোট ছোট গুনাহসমূহকে আমি নিজ দয়াগুণে ক্ষমা করে দিবো। এটা হচ্ছে আয়াতের মর্ম।

কবীরা ও সগীরা গুনাহের সংজ্ঞা : কোন গুনাহ কবীরা আর কোনটি সগীরা তার প্রভেদ ও পার্থক্য কুরআনে আল্লাহ পাক বর্ণনা করেননি। এই জন্যই এর সংজ্ঞার ব্যাপারে ওলামাদের বিভিন্ন রকম মত ও ইবারত পরিলক্ষিত হয়। মূলতঃ ওলামাদের এসব সংজ্ঞা ধারণা প্রসূত, নিশ্চিত কোনো কিছু না। কবীরার সংজ্ঞায় যা উল্লেখ করা হবে এর বিপরীতটাই হবে সগীরার সংজ্ঞা। নিম্নে কবীরার কয়েকটি সংজ্ঞা প্রদত্ত হচ্ছে।

১. যে গুনাহের কারণে গুনাহগারের প্রতি কঠোর ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে কুরআনের মাধ্যমে অথবা হাদীসের মাধ্যমে তাকে কবীরা গুনাহ বলে। কতিপয় শাফেয়ী ওলামাগণ এ সংজ্ঞাটি গ্রহণ করেছেন।
২. যে গুনাহের উপর শরয়ী হদ বা শাস্তি আসে তাকে কবীরা গুনাহ বলে। যেমন- চুরি, ডাকাতি, হত্যা, ব্যভিচার, মদ্যপান, অপবাদ প্রদান ইত্যাদি।
৩. পবিত্র কুরআনে যে জিনিস হারাম হওয়ার কথা সুস্পষ্টরূপে এসেছে অথবা যে গুনাহের ন্যায় গুনাহের উপর হদ আসে তাকে কবীরা গুনাহ বলে।

৪. হযরত আলী (রা.) বলেন, যে গুনাহের আলোচনাকে আল্লাহ পাক দোজখ,গজব, লানত অথবা আজাব শব্দ দ্বারা শেষ করেছেন তাই কবীরা গুনাহ।

৫. সুফিয়ান ছাওরী (র.) বলেন, বান্দাদের মধ্যকার পারস্পরিক জুলুম ও অন্যায় হচ্ছে কবীরা, আর বান্দা ও আল্লাহর মধ্যকার ত্রুটি বিচ্যুতি হলো সগীরা।

৬. মালেক ইবনে মিগওয়াল বলেন, বেদআতীদের কৃত গুনাহ হচ্ছে কবীরা, আর সুন্নীদের কৃত গুনাহ হলো সগীরা।

৭. কারো মতে, স্বেচ্ছায় কৃত গুনাহ হচ্ছে কবীরা, আর খাতা ও ভুলবশত কৃত অথবা অপারগ ও বাধ্য হয়ে কৃত গুনাহ হচ্ছে সগীরা।

৮. ইমাম সুদ্দী (র.) বলেন, যে গুনাহ সম্পর্কে আল্লাহ পাক নিষেধ করেছেন তা হচ্ছে কবীরা, আর সাধারণ ত্রুটি বিচ্যুতি যা ইবাদত দ্বারা ক্ষমা হয়ে যায় এবং মূল গুনাহের অসিলা ও মাধ্যম যেগুলোতে নেককার ও ফাসেক সকলেই লিপ্ত হয়ে থাকে তা হচ্ছে সগীরা। যেমন– দৃষ্টি, স্পর্শ ও চুম্বন। হ্যাঁ তবে যদি মূল গুনাহ জেনাতে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে এসব অসিলাও কবীরা হয়ে যাবে।

৯. যে গুনাহকে কুরআন হারাম শব্দ দ্বারা উল্লেখ করেছে, তা কবীরা।

১০. ইমাম ওয়াহেদী বলেন, বিশুদ্ধ অভিমত হলো এই যে, কবীরা গুনাহের সুনির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা নেই। যা দ্বারা বান্দাগণ সকল কবীরা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে। যদি এরকম হতো, তাহলে তারা সগীরাতে অধিক পরিমাণে লিপ্ত হয়ে যেত। এমনকি সগীরাকে তারা হালাল মনে করে নিত। কিন্তু আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদের উপর কবীরা সগীরার সুস্পষ্ট পরিচিতি গোপন রেখেছেন, যাতে করে তারা কবীরাতে লিপ্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কায় সগীরা থেকেও বিরত থাকে। যেমন– তিনি সালাতে উস্তা, শবে কদর, জুমার দিনের দোয়া কবুল হওয়ার মুহূর্তটিকে গোপন রেখেছেন, যাতে করে লোকেরা এগুলো হাসিল করার জন্য পূর্ণ সময়েই ব্যস্ত থাকে।

কবীরা গুনাহের সংখ্যা : কবীরা গুনাহের যেরূপ নিশ্চিত কোনো সংজ্ঞা নেই, তেমনিভাবে সুনির্ধারিত কোনো সংখ্যাও তার নেই। বিভিন্ন হাদীসে আল্লাহর রাসূল ﷺ যে সংখ্যা বর্ণনা করেছেন তা সীমাবদ্ধতার অর্থে নয়। বরং আলোচনা করলে যতটার প্রয়োজন ছিল ততটাই বলেছেন। এই জন্য বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্ন রকম সংখ্যা এসেছে।

বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে তিনি ইরশাদ করেছেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক গুনাহ থেকে বেঁচে থাক। ১. আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা, ২. যাদু, ৩. অবৈধভাবে কাউকে হত্যা করা, ৪. এতিমের অর্থ-সম্পদ গ্রাস করা, ৫. সুদ খাওয়া, ৬. যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করে আসা ও ৭. নির্দোষ মুমিন নারীদের উপর জেনার অপবাদ দেওয়া।

অন্য রেওয়ায়েতে নয়টি বলা হয়েছে, উল্লিখিত সাতটি আর অষ্টম ও নবম হলো– মাতা-পিতার নাফরমানি ও বায়তুল্লাহ তথা হারাম শরীফের ভিতরে খোদাদ্রোহিতা করা।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) -এর বর্ণনায় তিনটি উল্লেখ হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে কবীরার সংখ্যা সত্তর থেকে সাতশত পর্যন্ত বর্ণিত রয়েছে। তিনি একথাও বলেছেন, لَا كَبِيْرَةَ مَعَ الْإِسْتِغْفَارِ وَلَا صَغِيْرَةَ مَعَ الْإِصْرَارِ অর্থাৎ ইস্তেগফার বা তওবা দ্বারা যে কোনো কবীরা গুনাহ মাফ হতে পারে, আর সর্বদা লেগে থাকলে সগীরাও কবীরায় রূপান্তরিত হয়ে যায়।

সগীরা ও কবীরার প্রকারভেদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ইমাম আবূ ইসহাক ইসফেরাইনী, কাজী আবূ বকর রাকিল্লানী, ইমামুল হারামাইন আবুল মা'আলী, ইবনুল কুশাইরীসহ একদল আলেম বলেন, গুনাহের মধ্যে কোনো প্রকারভেদ নেই, গুনাহ সবটাই কবীরা বা বড়, সগীরা বা ছোট গুনাহ বলতে কোনো গুনাহ নেই। তারা বলেন, গুনাহ হচ্ছে আল্লাহর নাফরমানির নাম। আর তার নাফরমানি আবার ছোট হয় কেমন করে? তবে ইবনে হাজার আসকালানীসহ প্রমুখ ওলামাদের উক্তি মতে, অধিকাংশ আলেমের মতে, গুনাহের মধ্যে সগীরা কবীরার বিভক্তি রয়েছে।

কারণ আলোচ্য আয়াতসহ কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এবং বিভিন্ন সহীহ হাদীসে কবীরা শব্দদ্বারা কবীরা গুনাহের কথা বর্ণিত হয়েছে।

আল্লামা ইবনে হাজার (র.) বলেন, উভয় দলের মধ্যে গুনাহের প্রকারভেদ থাকা-না থাকার মতবিরোধটি মূলত এক রকম **শাব্দিক** ইখতেলাফ। অর্থগত কোনো ইখতেলাফ নয়। কারণ যারা বলেছেন, গুনাহ কোনোটাই সগীরা নেই, তারা **আল্লাহপাকের মাহাত্ম্য**, বুযুর্গী, শানের প্রতি লক্ষ্য করে তাঁর নাফরমানিকে সগীরা বা ছোট বলাকে অপছন্দ করেছেন। আর যারা **সগীরা কবীরার** প্রতি বিভক্তি করেছেন, তারা মূলত কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বক্তব্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই করেছেন। এছাড়া **তুলনামূলক ভাবে এক গুনাহ** অপর গুনাহ থেকে ছোট-বড় হওয়ার প্রেক্ষিতেই তারা বলেছেন, আল্লাহর শানের প্রেক্ষিতে নয়।

–[রূহুল মা'আনী খ. ৫, পৃ. ১৭-১৮, তাফসীরে কাবীর খ. ৫, পৃ. ৭৭-৮২, তাফসীরে খাজেন খ. ১, পৃ. ৩৬৭]

অনুবাদ :

٣٢. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ مِنْ جِهَةِ الدُّنْيَا وَالدِّيْنِ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ اِلَى التَّحَاسُدِ وَالتَّبَاغُضِ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ ثَوَابٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا بِسَبَبِ مَا عَمِلُوْا مِنَ الْجِهَادِ وَغَيْرِهٖ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ مِنْ طَاعَةِ اَزْوَاجِهِنَّ وَحِفْظِ فُرُوْجِهِنَّ نَزَلَتْ لَمَّا قَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ لَيْتَنَا كُنَّا رِجَالًا فَجَاهَدْنَا وَكَانَ لَنَا مِثْلَ اَجْرِ الرِّجَالِ وَاسْئَلُوْا بِهَمْزَةٍ وَدُوْنِهَا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ـ مَا احْتَجْتُمْ اِلَيْهِ يُعْطِيْكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا وَمِنْهُ مَحَلُّ الْفَضْلِ وَسُؤَالُكُمْ ـ

৩২. আর তোমরা আকাঙ্ক্ষা করোনা এমন সব বিষয়ে যাতে আল্লাহ পাক তোমাদের উপর অপরের দীন ও দুনিয়ার প্রেক্ষিতে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। যাতে পরস্পরে হিংসা- বিদ্বেষের সৃষ্টি না হয়। পুরুষ যা অর্জন করে জিহাদ প্রভৃতি আমলের মাধ্যমে সেটা তাদের ছওয়াবের অংশ, আর নারী যা অর্জন করে স্বামীর আনুগত্য ও সতীত্ব রক্ষাসহ প্রভৃতি আমলের মাধ্যমে সেটা তাদের ছওয়াবের অংশ। আলোচ্য আয়াতটি তখন নাজিল হয়েছিল যখন হযরত উম্মে সালমা (রা.) বলেছিলেন, আফসোস! আমরা যদি পুরুষ হতাম তবে তাদের ন্যায় জিহাদ করতাম এবং আমরাও পুরুষদের ন্যায় ছওয়াব পেতাম। আর আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। اِسْئَلُوْا তে হামযাসহ এবং হামজা ব্যতীত উভয় কেরাত রয়েছে। যা তোমাদের প্রয়োজন আল্লাহ তোমাদেরকে তা দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত। এরই মধ্য থেকে অনুগ্রহের পাত্রও তোমাদের প্রার্থনা।

٣٣. وَلِكُلٍّ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاۤءِ جَعَلْنَا مَوَالِيَ اَيْ عَصَبَةً يُعْطَوْنَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ لَهُمْ مِنَ الْمَالِ وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ بِالِفٍ وَدُوْنِهَا اَيْمَانُكُمْ جَمْعُ يَمِيْنٍ بِمَعْنَى الْقَسَمِ اَوِ الْيَدِ اَيِ الْحُلَفَاۤءُ الَّذِيْنَ عَاهَدْتُمُوْهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى النُّصْرَةِ وَالْاِرْثِ فَاٰتُوْهُمْ اَلْاٰنَ نَصِيْبَهُمْ حَظَّهُمْ مِنَ الْمِيْرَاثِ وَهُوَ السُّدُسُ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ـ مُطَّلِعًا وَمِنْهُ حَالُكُمْ وَهُوَ مَنْسُوْخٌ بِقَوْلِهٖ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ ـ

৩৩. পিতামাতা এবং নিকটাত্মীয়গণ তাদের যে সম্পত্তি ত্যাগ করে যান তাদের নারী-পুরুষ সকলের জন্যই আমি উত্তরাধিকারী তথা আসাবা নির্ধারণ করে দিয়েছি। তাদেরকে সেই সম্পত্তি যথারীতি প্রদান করা হবে। আর যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছ, عَاقَدَتْ -এর মধ্যে আলিফসহ এবং আলিফ ছাড়া উভয় কেরাতই রয়েছে। يَمِيْن - اَيْمَان -এর বহুবচন। يَمِيْن অর্থ- কসম ও অঙ্গীকার। অর্থাৎ মূর্খতার যুগে যাদের সাথে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলে সহায়তা প্রদান ও উত্তরাধিকারের উপর এখন তাদের মিরাসি অংশ দিয়ে দাও। আর তা হচ্ছে এক ষষ্ঠমাংশ। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা সব কিছু প্রত্যক্ষ করেন। আর সেসব থেকে তোমাদের অবস্থা ও রয়েছে। وَاُولُو الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ দ্বারা এ বিধান রহিত হয়ে গেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ (الاية) :

শানে নুযূল : একদা হযরত উম্মে সালামা (রা.) আরজ করলেন, পুরুষ লোকেরা জিহাদে অংশগ্রহণ করে শাহাদাত লাভ করে থাকে, আর আমরা মহিলা মানুষ এসব ফজিলতপূর্ণ কাজসমূহ থেকে বঞ্চিত থাকি। আর আমাদের উত্তরাধিকারের অংশও পুরুষদের অর্ধেক। এর প্রেক্ষিতে উপরিউক্ত আয়াত নাজিল হয়।

আলোচ্য আয়াতটির মর্ম হলো এই যে, পুরুষদেরকে আল্লাহপাক তার হেকমত অনুযায়ী যে শারীরিক শক্তি সামর্থ্য দান করেছেন। যার ভিত্তিতে তাঁরা জিহাদও করে থাকে এবং অন্যান্য বাইরের কাজেও অংশ নিয়ে থাকে, এটা আল্লাহর তরফ থেকে তাদের উপর বিশেষ দান। তা থেকে মহিলাদেরকে পুরুষসুলভ যোগ্যতার কাজ করার আকাঙ্ক্ষা করা ঠিক নয়। তবে আল্লাহর আনুগত্য ও নেক কাজে অংশ গ্রহণ করা উচিত।

একটিগুরুত্ব পূর্ণ চারিত্রিক নির্দেশনা : আলোচ্য আয়াতটিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, তার প্রতি লক্ষ্য রাখলে সামাজিক জীবনে মানুষের শান্তি নসীব হবে। আল্লাহ পাক সকল মানুষকে এক রকম বানান নি। বরং তাদের মধ্যে বহুবিধ প্রেক্ষিতে পার্থক্য রেখেছেন। যেখানে লোকে এই খোদায়ী পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য না রেখে তার দেওয়া স্বভাবগত সীমা রেখা পার হয়ে নিজেদের কৃত্রিম বৈশিষ্ট্যের সংযোজন ঘটায়, সেখানে এক প্রকার ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়। মানুষের এই মানসিকতা যে, যাকেই তার চেয়ে কোনো দিকে অগ্রসর দেখে সে পেরেশান হয়ে যায়। এটাই হচ্ছে সামাজিক জীবনে পরস্পরে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টির মূল বস্তু। এর ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, যে মঙ্গল তার জন্য বৈধ পন্থায় অর্জন হয় না, অবৈধ পন্থায় তা অর্জন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে উক্ত মানসিকতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য তাকিদ প্রদান করেছেন। অর্থাৎ যে নিয়ামত তিনি অন্যকে দান করেছেন তার আকাঙ্ক্ষা করো না বরং আল্লাহর দয়ার প্রার্থনা কর। তিনি তাঁর হেকমতানুযায়ী যে নিয়ামত প্রদান করা তোমাদের জন্য উপযোগী মনে করেন তা দান করেন।

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ الخ আয়াতটি ইবনে কাছীরসহ অধিকাংশ ওলামার মতে وَأُولُوا الْأَرْحَامِ আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। আল্লামা সুয়ূতীও তাই বলেছেন। তবে ইবনে জারীর তাবারী একে রহিত নয় বলে দাবি করেছেন।

–[কামালাইন খ. ২, পৃ. ২৯-৩০]

٣٤. اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ مُسَلَّطُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ يُؤَدِّبُوْنَهُنَّ وَيَأْخُذُوْنَ عَلٰى اَيْدِيْهِنَّ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اَىْ بِتَفْضِيْلِهٖ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ بِالْعِلْمِ وَالْعَقْلِ وَالْوِلَايَةِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ وَبِمَآ اَنْفَقُوْا عَلَيْهِنَّ مِنْ اَمْوَالِهِمْ فَالصّٰلِحٰتُ مِنْهُنَّ قٰنِتٰتٌ مُطِيْعَاتٌ لِاَزْوَاجِهِنَّ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ اَىْ لِفُرُوْجِهِنَّ وَغَيْرِهَا فِىْ غَيْبَةِ اَزْوَاجِهِنَّ بِمَا حَفِظَ هُنَّ اللّٰهُ حَيْثُ اَوْصٰى عَلَيْهِنَّ الْاَزْوَاجَ وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ عِصْيَانَهُنَّ لَكُمْ بِاَنْ ظَهَرَتْ اَمَارَاتُهٗ فَعِظُوْهُنَّ فَخَوِّفُوْهُنَّ مِنَ اللّٰهِ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ اِعْتَزِلُوْٓا اِلٰى فِرَاشٍ اٰخَرَ اِنْ اَظْهَرْنَ النُّشُوْزَ وَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ اِنْ لَمْ يَرْجِعْنَ بِالْهِجْرَانِ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فِيْمَا يُرَادُ مِنْهُنَّ فَلَا تَبْغُوْا تَطْلُبُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا طَرِيْقًا اِلٰى ضَرْبِهِنَّ ظُلْمًا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا فَاحْذَرُوْهُ اَنْ يُعَاقِبَكُمْ اِنْ ظَلَمْتُمُوْهُنَّ.

অনুবাদ :

৩৪. পুরুষগণ নারীগণের উপর কর্তৃত্বশীল, তারা নারীদেরকে শিষ্টাচার শিখায় এবং অপছন্দনীয় কাজ হতে তাদেরকে বিরত রাখে এ কারণে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের একের উপর অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তথা জ্ঞান, বুদ্ধি, অভিভাবকত্ব প্রভৃতি বিষয়ে তিনি নারীদের উপর পুরুষদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন এবং এ কারণে যে, পুরুষগণ স্ত্রীদের উপর তাদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে। অতএব তাদের মধ্য থেকে যে সকল নেককার স্ত্রীগণ তাদের স্বামীদের অনুগত হয়, তাদের স্বামীদের অবর্তমানে স্বীয় সতীত্ব প্রভৃতি বিষয় যা আল্লাহ সংরক্ষণীয় করে দিয়েছেন তা হেফাজত করে। যেরূপ তাদের স্বামীদেরকে আল্লাহপাক আদেশ দিয়েছেন, স্বীয় স্ত্রীদের হেফাজত করতে। আর যে সকল স্ত্রীদের অবাধ্যতার তোমরা আশঙ্কা কর, এ হিসেবে যে, তাদের অবাধ্যতার নিদর্শন প্রকাশ পেয়ে গেছে, তবে তাদেরকে সদুপদেশ দাও, তথা তাদেরকে আল্লাহর শাস্তির ভয় দেখাও, এবং তাদেরকে শয্যাস্থান থেকে দূরে রাখো, অর্থাৎ তোমরা ভিন্ন শয্যা গ্রহণ কর। যদি তারা অবাধ্যতা প্রকাশ করে, আর শয্যা পৃথক করার পরও যদি তারা বাধ্য হয়ে ফেরত না আসে তখন তাদেরকে মৃদু প্রহার কর। এতে যদি তারা তোমাদের বাধ্য হয়ে যায় তাদের কাছ থেকে তোমাদের কাম্য বস্তুতে, তবে তাদের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে শক্ত প্রহারের কোনো পথ অন্বেষণ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মহান শ্রেষ্ঠতম। সুতরাং তোমরা তার শাস্তি হতে ভয় করতে থাক, যদি তাদের প্রতি জুলুম কর।

৩৫. وَاِنْ خِفْتُمْ عَلِمْتُمْ شِقَاقَ خِلَافَ بَيْنِهِمَا بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَالْاِضَافَةُ لِلْاِتِّسَاعِ اَيْ شِقَاقًا بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوْا اِلَيْهِمَا بِرِضَاهُمَا حَكَمًا رَجُلًا عَدْلًا مِّنْ اَهْلِهٖ اَقَارِبِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا وَيُوَكِّلُ الزَّوْجُ حَكَمَهٗ فِيْ طَلَاقٍ وَقَبُوْلِ عِوَضٍ عَلَيْهِ وَتُوَكِّلُ هِيَ حَكَمَهَا فِي الْاِخْتِلَاعِ فَيَجْتَهِدَانِ وَيَأْمُرَانِ الظَّالِمَ بِالرُّجُوْعِ اَوْ يُفَرِّقَانِ اِنْ رَاٰيَاهُ قَالَ تَعَالٰى اِنْ يُّرِيْدَاۤ اَيِ الْحَكَمَانِ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ اَيْ يُقَدِّرُهُمَا عَلٰى مَا هُوَ الطَّاعَةُ مِنْ اِصْلَاحٍ اَوْ فِرَاقٍ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا بِكُلِّ شَيْءٍ خَبِيْرًا بِالْبَوَاطِنِ كَالظَّوَاهِرِ ـ

৩৫. আর যদি তোমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে ঝগড়া-ফ্যাসাদের আশঙ্কা বোধ কর জান, এখানে شِقَاقَ মাসদারের ইযাফত بَيْنِهِمَا জরফের দিকে হয়েছে, জরফের মধ্যে প্রস্ততা থাকার কারণে। ইবারতের আসল রূপ ছিল شِقَاقًا بَيْنَهُمَا [তখন] তারা উভয়ের সম্মতিতে স্বামীর আত্মীয়স্বজনদের থেকে একজন বিচারক এবং স্ত্রীর আত্মীয়স্বজনদের থেকে একজন বিচারক তারা উভয়ের দিকে প্রেরণ কর। স্বামী তার পক্ষের বিচারককে তালাক এবং তালাকের উপর বিনিময় গ্রহণের অধিকার দিয়ে দিবে। আর স্ত্রী তার পক্ষের বিচারককে খোলা প্রদানের অধিকার দিয়ে দেবে। অতঃপর উভয় বিচারক সংশোধনের চেষ্টা করবে, এবং অন্যায়কারীকে তার অন্যায় থেকে প্রত্যাবর্তন করতে নির্দেশ দেবে, অথবা সমীচীন মনে করলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিবে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, যদি বিচারকদ্বয় সংশোধন করাবার চায়, তবে আল্লাহ তা'আলা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে তৌফিক দিয়ে দেবেন অর্থাৎ তারা উভয়কে সংশোধন বা বিচ্ছেদ যে কোনো একটির আনুগত্যের সামর্থ্য দিয়ে দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত গোপন বিষয়াদি সম্বন্ধে বাহ্যিক বিষয়াদির ন্যায় খবর রাখেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوَّامٌ : قَوَّامُوْنَ - قَوَّامٌ-এর বহুবচন। قَوَّامٌ অর্থ– ব্যবস্থাপক, তত্ত্বাবধায়ক, অভিভাবক, পরিচালক, কর্তৃত্বশীল শাসক ইত্যাদি। قَوَّامٌ আধিক্য বাচক শব্দ, মুবালাগার সীগাহ। اَلرِّجَالُ মুবতাদা. قَوَّامُوْنَ খবর। عَلَى النِّسَاءِ মুতা'আল্লিক হয়েছে قَوَّامُوْنَ-এর সাথে। তেমনিভাবে بِمَا ও قَوَّامُوْنَ-এর মুতাআল্লিক।

قَوْلُهٗ وَالْاِضَافَةُ لِلْاِتِّسَاعِ : এটা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব। আর প্রশ্ন হলো এই যে, মাসদারের ইজাফত হয় ফায়েল অথবা মাফউলের দিকে। আর এখানে شِقَاقٍ মাসদারের ইজাফত بَيْنَ-এর দিকে হচ্ছে, যা ফায়েল ও মাফউলের কোনোটাই নয়, বরং জরফ। উত্তর হলো এই যে, জরফের এরকম প্রশস্ততা রয়েছে যা গায়রে জরফের মধ্যে নেই। তাই এখানে মাসদারের ইজাফত জরফের দিকে হতে পেরেছে। কেননা একটি কায়দা রয়েছে– يَجُوْزُ فِي الظَّرْفِ مَا لَا يَجُوْزُ فِيْ غَيْرِهٖ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : নারীদের সম্পর্কে যে সকল বিধি-বিধান পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে, তাতে তাদের অধিকার ক্ষুণ্ন করার উপর নিষিদ্ধতাও বর্ণিত হয়েছে। এবারে পুরুষদের অধিকারের আলোচনা হচ্ছে।

শানে নুযূল : মুকাতিল বর্ণনা করেন, এই আয়াত নাজিল হয় সা'দ ইবনে রবী ইবনে ওমর এবং তাঁর স্ত্রী হাবীবাহ বিনতে **যায়েদ ইবনে আবি** জোহাইর সম্পর্কে। আর কলবী বলেছেন, সা'দ এর স্ত্রীর নাম হলো খাওলা বিনতে মুহাম্মদ ইবনে **মাসলামা।** ঘটনার বিবরণ এই যে, সা'দের স্ত্রী তাঁর মর্জির খেলাফ কোনো কাজ করেছিল। এই জন্য সা'দ তাকে একটি চাপড় **মারে। স্ত্রী ক্ষুদ্ধ** হয়ে স্বীয় পিতাকে এ সম্পর্কে অবগত করে। পিতা প্রিয়নবী ﷺ -এর নিকট এ সম্পর্কে অভিযোগ করে। **প্রিয়নবী** ﷺ স্বামীর নিকট থেকে স্ত্রীকে প্রতিশোধ গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন। ঠিক এমন সময় আলোচ্য আয়াতটি নাজিল **হয়। তখন** প্রিয়নবী ﷺ সা'দের স্ত্রীকে প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে বারণ করে ইরশাদ করেন– আমি চেয়েছিলাম এক কিন্তু **পাকের মর্জি** অন্য। আর আল্লাহ পাকের ইচ্ছাই যে সর্বোত্তম এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এই ঘটনা বর্ণনার পর **আল্লামা আলুসী** (র.) লিখেছেন, একটি বর্ণনায় রয়েছে আয়াতখানি নাজিল হয়েছে জামিলা বিনতে আব্দুল্লাহ এবং তার স্বামী **সাবেত ইবনে** কায়েস সম্পর্কে।

* **ইবনে** আবি হাতেম হাসানের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, একজন স্ত্রী লোক প্রিয়নবী ﷺ -এর খেদমতে তার স্বামীর বিরুদ্ধে **এই অভিযোগ** করল যে, সে তাকে প্রহার করেছে। তখন প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করলেন, স্বামীর নিকট থেকে প্রতিশোধ **নিতে** পার, তখন এই আয়াত নাজিল হয়।
* **ইবনে** মরদাবিআহ হযরত আলী (রা.) -এর বর্ণনার উল্লেখ করেছেন যে, একজন আনসারী সাহাবী তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে প্রিয়নবী ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয়ে, স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করে যে, সে আমাকে এত বেশি প্রহার করেছে যে, **আমার** চেহারায় এখনও তার চিহ্ন রয়েছে। প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করলেন, এভাবে প্রহার করার কোনো অধিকার তার **নেই**। তখন এই আয়াত নাজিল হয়। –[নূরুল কুরআন খ. ৫, পৃ. ৩৩]

নারীর উপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব : اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ এই আয়াতে নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব কর্তৃত্ব ও **অভিভাবকত্বের** কথা বর্ণিত হয়েছে। পুরুষদের নারীদের উপর প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্বের দুটি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। একটি **ওহাবী** বা আল্লাহ প্রদত্ত, তাতে পুরুষদের কোনো চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও কোনো রকম অর্জনের দখল নেই। এটা কেবল সৃষ্টিগত। **পুরুষকে** ধী শক্তি, চেষ্টা-তদবীরের ক্ষমতা, জ্ঞানের প্রশস্ততা, দৈহিক শক্তি এবং যোগ্যতা বিশেষভাবে প্রদান করা হয়েছে। আর **এসব** নিয়ামত এভাবে নারীদেরকে প্রদান করা হয়নি। এ কারণেই পুরুষকে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়েছে যা **নারীদেরকে** দেওয়া হয়নি। যেমন– নবুয়ত ইমামত, হুকুমত বা রাষ্ট্র পরিচালনা, বিচার ক্ষমতা, বিচক্ষণতা, জিহাদ ওয়াজিব **হওয়া**, জুমা ওয়াজিব হওয়া, দুই ঈদের নামাজ, আজান, খোতবা, নামাজের জামাত, উত্তরাধিকারে অধিকতর অংশলাভ, **একাধিক** বিয়ে করার ক্ষমতা, তালাক প্রদানের এখতিয়ার প্রভৃতি। আর দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে কসবী বা প্রচেষ্টা লব্ধ। আর তা **হলো** এই যে, পুরুষ তথা স্বামী নারী তথা স্ত্রীর মহরসহ যাবতীয় খরচ-পত্র, ভরণ-পোষণ, খোরপোষ, বাসস্থান সর্ব প্রকার ব্যয় **ভার বহন** করে চলে। এই দুই কারণে আল্লাহ পাক নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব, প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব দান করেছেন। এই **প্রাধান্যের** কারণেই প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যদি আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সেজদা করার আদেশ দিতাম, **তবে স্ত্রী** লোককে আদেশ দিতাম যেন তার স্বামীকে সেজদা করে। [আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ]

স্ত্রী কর্তব্য : এমনি অবস্থায় স্ত্রীর কর্তব্য হলো স্বামীর কর্তৃত্ব মেনে চলা। এটিই আলোচ্য আয়াতের মর্ম কথা। স্বামীর কর্তৃত্ব **মেনে চলার** এই বিধান অমান্য করলে সমূহ অকল্যাণ এবং অমঙ্গলের সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে।

–[নূরুল কুরআন খ. ৫, পৃ. ৩৩-৩৪]

ইসলামে নারীর অধিকার : সূরায়ে বাকারার এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ অর্থাৎ স্ত্রী **লোকদের** অধিকার পুরুষদের উপর ততটুকুই ওয়াজিব যতটুকু স্ত্রী লোকের উপর পুরুষের অধিকার। এখানে উভয়ের প্রতি **উভয়ের** অধিকার সমান বলে ঘোষণা করে তা বাস্তবায়নের নিয়ম পদ্ধতি প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মের অধীন করে দেওয়া **হয়েছে**। এতে জাহিলিয়্যাতের যুগ থেকে নারীদের ব্যাপারে যেসব অমানবিক আচরণ করা হতো সে সবের উৎখাত করা **হয়েছে**। অবশ্য এটা জরুরি নয় যে, অধিকার বাস্তবায়নের পদ্ধতিও একই ধরনের হবে। নারী ও পুরুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যের **ধরন অবশ্যই** স্বতন্ত্র। কিন্তু অধিকারের সীমা সংকুচিত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। যেমন– নারীর প্রতি গৃহের কর্তৃত্ব, **সন্তান লালন**-পালন প্রভৃতি বিশেষ কতগুলো দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তেমনি পুরুষের প্রতি নারীদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য **জীবিকার্জনের** দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। অনুরূপ নারীদের প্রতি যেমন পুরুষের সেবা ও আনুগত্যের দায়িত্ব অর্পণ করা **হয়েছে,** তেমনি পুরুষের উপরও তাদের মহর ও খোরপোষের দায়িত্ব ফরজ করা হয়েছে। মোটকথা এ আয়াতের নারী এবং

পুরুষের মধ্যে অধিকারের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্য নারী জাতির উপর পুরুষ জাতির প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে যা আয়াতের শেষাংশে وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ বলে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ স্ত্রী জাতির উপর পুরুষদের একস্তর প্রাধান্য রয়েছে। আর সেই প্রাধান্যের স্তরটি اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

আর তা হচ্ছে ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে পুরুষ শাসক, অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক। আর নারীগণ পুরুষদের কর্তৃত্বাধীন পরিচালিত। -[মা'আরিফুল কুরআন খ. ২, পৃ. ৪৩৬-৩৭]

ইসলাম পূর্বযুগে নারীর মজলুমানাবস্থা : নারীর অসহায়ত্ব ও দৈন্যদশার ইতিহাস এতটুকু সুদীর্ঘ ও সনাতন যতটুকু খোদ জুলুমের। অর্থাৎ যখন থেকে জুলুমের সূচনা পৃথিবীতে হয়েছে তখন থেকেই নারী নির্যাতিতা হয়ে আসছে। ইসলাম এসে নারীদের কেবল মজলুমানাবস্থা বিদূরিতই করেনি বরং তাদের ন্যায্য অধিকার প্রদান করে সম্মানিতাও করেছে।

নারীদের সম্পর্কে রোমান দৃষ্টিভঙ্গি : রোমানদের আমলে নারীকে জাতীয় যৌথ উপভোগের বস্তু মনে করা হতো যা থেকে প্রত্যেকের উপভোগের অধিকার ছিল।

নারী সম্পর্কে ইউহান্নার দৃষ্টিভঙ্গি : নারী সম্পর্কে হযরত ঈসা (আ.) এর এক শিষ্য ইউহান্নার দৃষ্টিভঙ্গি এই ছিল যে, নারী হচ্ছে অনিষ্টের মূল এবং শান্তি ও নিরাপত্তার শত্রু।

নারী সম্পর্কে খ্রিস্টানদের দৃষ্টিভঙ্গি : খ্রিস্টানদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী নারী মানুষ হবে দূরের কথা জীবও নয়। খ্রিস্টীয় ৫৮৬ সালে সমগ্র খ্রিস্টান জাহানের জ্ঞানী, গুণীগণ এ ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য ইউরোপে সমবেত হলো যে, নারীর মধ্যে রূহ বা আত্মা আছে কি নাই। অনেক আলোচনা পর্যালোচনার পর সিদ্ধান্ত হলো যে, নারীর মধ্যেও আত্মা রয়েছে।

নারী সম্পর্কে হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গি : প্রাচীন হিন্দু সভ্যতায় স্বামীর মৃত্যুর পর নারীকে স্পর্শের অযোগ্য হতভাগীনি মনে করা হতো, আর এরকম অবস্থা সৃষ্টি করে দেওয়া হতো যে, সে জীবন্ত অবস্থায়ই জ্বলে মরাকে প্রাধান্য দিয়ে দিত। বিধবা নারীর শয্যা পৃথক করে দেওয়া হতো। তার জন্য অন্য কারো বিছানায় বসার অনুমতি ছিল না। তার বর্তন পৃথক করে দেওয়া হতো। বিয়ে শাদীসহ যে কোনো আদন্দ উৎসবে তার অংশগ্রহণ অমঙ্গলজনক মনে করা হতো। এগুলোই হচ্ছে ঐ অবস্থা যার দরুন এহেন অপমানের জীবনের উপর সে মৃত্যুকেই প্রাধান্য দিয়ে দিতো। আর হিন্দু ধর্মীয় ঠিকাদারেরা একে ধর্মীয় পবিত্রতা বলে নাম দিতো। আর যে নারী অবস্থায় বাধ্য হয়ে স্বামীর সাথে তারই শ্মশানে জ্বলে যেত তাকে বড় স্বামী ভক্তাদের মধ্যে গণ্য করা হতো।

অবাধ্য স্ত্রী ও তার সংশোধনের পদ্ধতি : পবিত্র কুরআন অবাধ্য স্ত্রীর সংশোধনের জন্য ক্রমাগত তিনটি পদ্ধতি বাতলে দিয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ অর্থাৎ, স্ত্রীদের তরফ থেকে যদি নাফরমানি প্রকাশ পাওয়ার আশঙ্কা ও তার নিদর্শনাবলি প্রকাশ হয়, তবে প্রথম পর্যায়ে তাদের সংশোধনের পন্থা হলো এই যে, কোমলভাবে তাদেরকে বুঝাও। যদি তারা শুধু বুঝানোর দ্বারা নাফরমানি হতে বিরত না হয় তখন দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদের শয্যা পৃথক করে দাও। যাতে স্বামীর অসন্তুষ্টির কথা তারা উপলব্ধি করতে পারে। আর নিজের কৃতকর্মের উপর লজ্জিত হয়ে শুভ পথে এসে যায়। فِى الْمَضَاجِعِ শব্দ দ্বারা একথা বুঝা যাচ্ছে যে, পৃথক কেবল শয্যাতেই হবে গৃহে নয়। কারণ এতে স্ত্রীর মনোকষ্টও হবে অধিক এবং কোনো ফেতনা-ফ্যাসাদেরও আশঙ্কা সৃষ্টি হবে না। যে স্ত্রী ভদ্রতাসুলভ সতর্কীকরণ দ্বারা দুরস্ত না হয়, তবে তাকে তৃতীয় পর্যায়ে হালকা প্রহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। স্বামী তাকে হালকা প্রহার করতে পারবে, যাতে শরীরে কোনো রকম চিহ্ন না পড়ে। আর চেহারায় তো সম্পূর্ণ রূপে প্রহার নিষিদ্ধ। হালকা প্রহারের যদিও অনুমতি রয়েছে কিন্তু এর সাথে সাথে একথাও বিবৃত হয়েছে যে, لَنْ يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ অর্থাৎ ভদ্র, ভালো লোকেরা তাদের স্ত্রীদেরকে প্রহার করবেনা। এবং হুজুরে পাক ﷺ তাঁর কোনো স্ত্রীকে প্রহার করেছেন বলে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

সংশোধনের চতুর্থ পদ্ধতি : ঘরোয়া তিনটি পদ্ধতি যদি ফলপ্রসূ না হয় তখন চতুর্থ পদ্ধতি অবলম্বন করা যাবে। আর তা হচ্ছে দুইজন হাকেম সালিশ নিযুক্ত করা। স্বামীর পরিবারের লোকজন থেকে একজন সালিশ আর স্ত্রীর পরিবারের লোকজন থেকে আরেকজন সালিশ নিযুক্ত করা হবে। তারা উভয় এবং স্বামী-স্ত্রী যদি নিষ্ঠাবান হয় তবে অবশ্যই তারা তাদের সংশোধনের চেষ্টায় সফল হবে।

আর যদি সফল না হয় তখন সালিশদ্বয়ের জন্য স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট করার এখতিয়ার হবে কি না এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে।

উভয় পক্ষের সালিশকে যদি স্বামী-স্ত্রীর তরফ থেকে এ কথার এখতিয়ার প্রদান করা হয়ে থাকে যে, তোমরা মিলে মিশে যে সিদ্ধান্ত নেবে আমরা তাই মেনে নেবো। তখন সালিশদ্বয় সম্পূর্ণ রূপে তাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী হয়ে যাবে। তারা দুজন তালাকের ব্যাপারে একমত হয়ে গেলে তালাকই হয়ে যাবে। আবার তারা খোলা প্রভৃতি যে কোনো সিদ্ধান্তে একমত হলে তাই হবে। এবং পুরুষদের তরফ থেকে প্রদত্ত অধিকার অনুসারে যদি তারা উকিল হিসেবে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়, তবে তাই মেনে নিতে হবে। পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দের মধ্যে হযরত হাসান বসরী ও হযরত আবূ হানীফা (র.) প্রমুখের এমনি অভিমত।

ইমাম শাফেয়ী (র.) ও অনুরূপ মতই পোষণ করেন। হ্যাঁ, যদি তারা উভয়কে উকিল বানিয়ে এ অধিকার না দেওয়া হয়, তবে তারা কেবল সংশোধনের জন্যই চেষ্টা করবে তালাক, খোলা প্রভৃতির অধিকার তাদের হবে না।

আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও সাঈদ ইবনে জুবাইরসহ প্রমুখদের মতে, তারা উভয় সালিশের তালাক, খোলা, মিলিয়ে দেওয়া, পৃথক করে দেওয়া প্রভৃতির পূর্ণ অধিকার থাকবে।

হযরত আলী (রা.) -এর সামনে এমনি এক ঘটনা উপস্থিত হয়। তাতেও প্রমাণ হয় যে, একমাত্র আপোষ মীমাংসা ছাড়া উল্লিখিত সালিশদ্বয়ের অন্য কোনো অধিকার থাকে না, যতক্ষণনা উভয় পক্ষ তাদেরকে পূর্ণ অধিকার দান করে। ঘটনাটি সুনানে বায়হাকী গ্রন্থে হযরত ওবায়দা সালমানীর রেওয়ায়েত ক্রমে এভাবে বর্ণিত হয়েছে।

একজন পুরুষ ও একজন মহিলা হযরত আলী (রা.) -এর খেদমতে এসে হাজির হলো, তাদের উভয়ের সাথেই ছিল বহু লোকের একেক দল। হযরত আলী নির্দেশ দিলেন যে, পুরুষের পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন হাকিম বা সালিশ নির্ধারণ করা হোক। অতঃপর সালিশ নির্ধারিত হয়ে গেলে তাদের সম্বোধন করে হযরত আলী (রা.) বললেন, তোমরা কি তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জান? আর তোমাদিগকে কি করতে হবে সে ব্যাপারে কি তোমরা অবগত? শোন, তোমরা যদি এই স্বামী-স্ত্রীকে একত্রে রাখার ব্যাপারে এবং তাদের পারস্পরিক আপোষ করে নেওয়ার ব্যাপারে একমত হতে পার, তবে তাই কর। পক্ষান্তরে তোমরা যদি মনে কর যে, তাদের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করা সম্ভব নয়, কিংবা তা করে দিলে তা টিকতে পারবে না এবং তোমরা উভয়েই তাদের পৃথক করে দেওয়ার ব্যাপারে একমত হয়ে এতেই মঙ্গল বিবেচনা কর, তবে তাই করবে। একথা শুনে মহিলাটি বলল, আমি এটা স্বীকার করি, এতদুভয় সালিশ আল্লাহর আইন অনুসারে ফায়সালা করবে। তা আমার মতের অনুসারী হোক বা বিরোধী হোক, আমি তাই মানি। কিন্তু পুরুষটি বলল, পৃথক হয়ে যাওয়া বা তালাক হয়ে যাওয়া তো আমি কোনো ক্রমেই সহ্য করবো না। অবশ্য সালিশদের এ অধিকার দিচ্ছি যে তারা আমার উপর যে কোনো রকম আর্থিক জরিমানা আরোপ করে তাকে স্ত্রীকে সম্মত করিয়ে দিতে পারেন। হযরত আলী (রা.) বললেন, না তা হয় না। তোমারও সালিশদিগকে তেমনি অধিকার দেওয়া উচিত যেমন স্ত্রী দিয়েছে।

এ ঘটনা দ্বারা কোনো কোনো মুজতাহিদ ইমাম এ বিষয়টি উদ্ভাবন করেছেন যে, সালিশদের অধিকার সম্পন্ন হওয়া কর্তব্য। যেমন– হযরত আলী (রা.) উভয়পক্ষকে বলে তাদেরকে অধিকার সম্পন্ন করেছিলেন। কিন্তু ইমাম আজম আবূ হানীফা ও হযরত হাসান বসরী (র.) সাব্যস্ত করেছেন যে, উল্লিখিত সালিশদ্বয়ের অধিকার সম্পন্ন হওয়াই যদি অপরিহার্য হতো, তবে হযরত আলী (রা.) কর্তৃক উভয় পক্ষের সম্মতি লাভের চেষ্টা করার প্রয়োজনীয়তাই ছিল না। সুতরাং উভয় পক্ষকে সম্মত করার চেষ্টাই প্রমাণ করে যে, প্রকৃত প্রস্তাবে এই সালিশদ্বয় অধিকার সম্পন্ন নয়। তবে অবশ্য স্বামী-স্ত্রী যদি অধিকার দান করে তবে অধিকার সম্পন্ন হয়ে যায়। কুরআনে কারীমের এই শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের পারস্পরিক বিবাদ বিসংবাদের মীমাংসার ক্ষেত্রে অতি চমৎকার এক নতুন পথের উন্মোচন হয়ে যায়। যার মাধ্যমে মামলা-মোকাদ্দমা আদালতে যাবার পূর্বেই পারিবারিক কিংবা সামাজিক পঞ্চায়েতেই মীমাংসা হয়ে যেতে পারে। –[জামালাইন খ. ২, পৃ. ৩৭-৩৮, মা'আরিফুল কুরআন খ. ২, পৃ ৪৪৭-৪৮]

৩৬. وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَحِّدُوْهُ وَلَا تُشْرِكُوْهُ بِهٖ شَيْئًا وَ اَحْسِنُوْا بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا بِرًّا وَلِيْنَ جَانِبٍ وَّبِذِى الْقُرْبٰى الْقَرَابَةِ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى الْقَرِيْبِ مِنْكَ فِى الْجَوَارِ اَوِالنَّسَبِ وَالْجَارِ الْجُنُبِ الْبَعِيْدِ عَنْكَ فِى الْجَوَارِ اَوِالنَّسَبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ الرَّفِيْقِ فِىْ سَفَرٍ اَوْ صَنَاعَةٍ وَقِيْلَ الزَّوْجَةُ وَابْنِ السَّبِيْلِ الْمُنْقَطِعِ فِىْ سَفَرِهٖ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنَ الْاَرِقَاءِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا مُتَكَبِّرًا فَخُوْرًا عَلَى النَّاسِ بِمَا اُوْتِىَ ـ

অনুবাদ :

৩৬. আর আল্লাহর ইবাদত কর তথা তাকে একত্ব বিশ্বাস কর, এবং তাঁর সাথে কাউকেও শরিক করো না, আর পিতামাতার সাথে ইহসান কর, তথা তাদের সাথে উত্তম ও বিনম্র ব্যবহার প্রদর্শন কর এবং আত্মীয়-স্বজন, এতিম-মিসকিন প্রতিবেশিত্ব বা বংশীয় সম্পর্কে নিকটতম প্রতিবেশী প্রতিবেশিত্ব বা বংশীয় সম্পর্কে দূরবর্তী প্রতিবেশী, সফর বা সমবৃত্তির সাথী ভিন্নমতে জীবন সঙ্গীনি মুসাফির যে পথ চলতে অক্ষম হয়ে পড়েছে এবং তোমাদের গোলামদের সাথে সদ্ব্যবহার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা এমন লোকদেরকে পছন্দ করেন না যারা দাম্ভিক এবং পার্থিক ধন দৌলত পেয়ে যারা লোকদের উপর গর্বিত।

৩৭. اَلَّذِيْنَ مُبْتَدَأٌ يَبْخَلُوْنَ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ بِهٖ وَيَكْتُمُوْنَ مَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ مِنَ الْعِلْمِ وَالْمَالِ وَهُمُ الْيَهُوْدُ وَخَبَرُ الْمُبْتَدَأِ لَهُمْ وَعِيْدٌ شَدِيْدٌ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ بِذٰلِكَ وَبِغَيْرِهٖ عَذَابًا مُّهِيْنًا ذَا اِهَانَةٍ ـ

৩৭. اَلَّذِيْنَ মুবতাদা, যারা কার্পণ্য করে আবশ্যকীয় বিষয়াদিতে এবং অন্যদেরকেও কার্পণ্য করতে বলে এবং আল্লাহ তা'আলার স্বীয় কৃপায় যা জ্ঞান ও ধন দান করেছেন তাকে গোপন করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর ভীতি। আর তারা হচ্ছে ইহুদিরা لَهُمْ وَعِيْدٌ شَدِيْدٌ হলো اَلَّذِيْنَ মুবতাদার খবর। আর আমি এসব কার্পণ্য প্রভৃতির কারণে নাফরমানদের জন্য অপমান জনক শাস্তি তৈরি করে রেখেছি।

৩৮. وَالَّذِيْنَ عَطْفٌ عَلَى الَّذِيْنَ قَبْلَهٗ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ مُرَائِيْنَ لَهُمْ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ كَالْمُنَافِقِيْنَ وَاَهْلِ مَكَّةَ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا صَاحِبًا يَعْمَلُ بِاَمْرِهٖ كَهٰؤُلَاءِ فَسَاءَ بِئْسَ قَرِيْنًا هُوَ ـ

৩৮. وَالَّذِيْنَ পূর্ববর্তী اَلَّذِيْنَ-এর উপর আতফ হয়েছে। আর যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে স্বীয় ধনসম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ তা'আলা ও কিয়ামত দিবসের বিশ্বাস করে না যেমন- মুনাফিক ও মক্কাবাসী কাফেররা আর যার সাথী হয় শয়তান সে তার নির্দেশ মোতাবেক কাজ করে যেরূপ এসব লোকেরা। আর শয়তান তার অত্যন্ত নিকৃষ্ট সাথী।

٣٩. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ اَىْ اَىُّ ضَرَرٍ عَلَيْهِمْ فِىْ ذٰلِكَ وَالْاِسْتِفْهَامُ لِلْاِنْكَارِ وَلَوْ مَصْدَرِيَّةٌ اَىْ لَا ضَرَرَ فِيْهِ وَاِنَّمَا الضَّرَرُ فِيْمَا هُمْ عَلَيْهِ وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيْمًا فَيُجَازِيْهِمْ بِمَا عَمِلُوْا ـ

৩৯. তাদের কি ক্ষতি হতো যদি তারা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাস করতো এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যা রিজিক দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করত? এখানে প্রশ্নবোধক বাক্যটি অস্বীকৃতি জ্ঞাপনার্থে ব্যবহৃত হয়েছে, لَوْ হচ্ছে মাসদারী অর্থাৎ এতে তাদের কোনো ক্ষতি নেই, বরং যাতে তারা রয়েছে তাতেই ক্ষতি বিদ্যমান। এবং আল্লাহ তা'আলা] তাদের সকল বিষয়ে অবগত আছেন। সুতরাং তিনি তাদেরকে নিজেদের কৃতকর্মের প্রতিদান দেবেন।

٤٠. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ اَحَدًا مِثْقَالَ وَزْنَ ذَرَّةٍ اَصْغَرَ نَمْلَةٍ بِاَنْ يَنْقُصَهَا مِنْ حَسَنَاتِهِ اَوْ يَزِيْدَهَا فِىْ سَيِّاٰتِهِ وَاِنْ تَكُ الذَّرَّةُ حَسَنَةً مِنْ مُؤْمِنٍ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالرَّفْعِ فَكَانَ تَامَّةٌ يُضٰعِفْهَا مِنْ عَشْرٍ اِلٰى اَكْثَرَ مِنْ سَبْعِمِائَةٍ وَفِىْ قِرَاءَةٍ يُضَعِّفْهَا بِالتَّشْدِيْدِ وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ مِنْ عِنْدِهٖ مَعَ الْمُضَاعَفَةِ اَجْرًا عَظِيْمًا لَا يَقْدِرُهُ اَحَدٌ ـ

৪০. নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কারো প্রতি এক বিন্দুমাত্রও অত্যাচার করেন না অর্থাৎ ক্ষুদ্রতম পিপিলিকার সমপরিমাণ ছওয়াব কমান না এবং তার সমপরিমাণ গুনাহতে বৃদ্ধিও করে না। আর যদি কোনো নেককাজ হয় কোনো মু'মিনের তরফ থেকে, অন্য এক কেরাতে حَسَنَةٌ-এর পেশের সাথে তখন كَانَ টি তাম্মাহ হবে, তবে তিনি দশ থেকে সাত শতাধিক পরিমাণে ছওয়াব বাড়িয়ে দেন। এক কেরাত يُضَعِّفْهَا তাশদীদের সাথে এসেছে। এবং তার নিকট থেকে প্রবৃদ্ধিসহকারে শ্রেষ্ঠতম পুরস্কার দান করেন যার উপর অন্য কারো সামর্থ্য নেই।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا : এর পূর্বে اَحْسِنُوْا উহ্য মেনে ও একটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো এই যে, وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا হলো জুমলায়ে খবরিয়া, তার আতফ হয়েছে اُعْبُدُوا اللّٰهَ জুমলায়ে ইনশাইয়্যার উপর। অথচ عَطْفُ الْخَبَرِ عَلَى الْاِنْشَاءِ ঠিক নয়। গ্রন্থকার اَحْسِنُوْا উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, مَعْطُوْف ও ইনশাইয়্যাহ। তাই কোনো অভিযোগ নেই। اَلَّذِيْنَ মুবতাদা, আর তার খবর উহ্য। আর তা হচ্ছে لَهُمْ وَعِيْدٌ شَدِيْدٌ –[জামালাইন খ. ২, পৃ. ৩৪, তাফসীরে হক্কানী খ. ২, পৃ. ১১]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَالْجَارِ الْجُنُبِ এ বাক্যটি আত্মীয় প্রতিবেশীর মোকাবিলায় ব্যবহার হয়েছে। যার মর্ম হলো এই যে, যে প্রতিবেশী আত্মীয় নয়, তার সাথেও প্রতিবেশী হিসেবে সদ্ব্যবহার করা উচিত। বহু হাদীসে প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করতে তাকিদ এসেছে।

وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সফর বা ব্যবসার সাথী এবং স্ত্রী ও ঐ সব লোক, যারা কোনো ফায়দার আশা নিয়ে কারো সান্নিধ্যে আসে তারাও শামিল। তাদের সাথেও কোমল সদ্ব্যবহার করতে হবে।

ফখর করা, আত্মম্ভরিতা করা, আল্লাহর নিকট খুবই অপছন্দনীয় বস্তু। হাদীস শরীফে এ পর্যন্ত এসেছে ঐ ব্যক্তি জান্নাতে যেতে পারবে না, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার রয়েছে। যে সকল বস্তু আল্লাহর হক ও বান্দার হক আদায় করার মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, এসবের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হচ্ছে আত্মম্ভরিতা, আত্ম প্রীতি এবং রিয়া ও মর্যাদা লাভের লিপসা। অহংকার ও গৌরবের পর তৃতীয় বড় প্রতিবন্ধক হচ্ছে কৃপণতা। আর্থিক কৃপণতা উদ্দেশ্য হওয়া তো সুস্পষ্টই। ইলমে দীনের ক্ষেত্রে কৃপণতা করাকেও অনেকে এর অন্তর্ভুক্ত রেখেছেন।

৪১. فَكَيْفَ حَالُ الْكُفَّارِ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ يَشْهَدُ عَلَيْهِ بِعَمَلِهَا وَهُوَ نَبِيُّهَا وَجِئْنَا بِكَ يَا مُحَمَّدُ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا ـ

৪২. يَوْمَئِذٍ يَوْمَ الْمَجِيْءِ يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ عَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ اَيْ اَنْ تُسَوّٰى بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُوْلِ وَالْفَاعِلِ مَعَ حَذْفِ اِحْدَى التَّائَيْنِ فِي الْاَصْلِ وَمَعَ اِدْغَامِهَا فِي السِّيْنِ اَيْ تُتَسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ بِاَنْ يَكُوْنُوْا تُرَابًا مِثْلَهَا لِعِظَمِ هَوْلِهِ كَمَا فِيْ اٰيَةٍ اُخْرٰى وَيَقُوْلُ الْكَافِرُ يَالَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرَابًا وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا عَمَّا عَمِلُوْهُ وَفِيْ وَقْتٍ اٰخَرَ يَكْتُمُوْنَ وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ ـ

অনুবাদ :

৪১. তখন কাফেরদের অবস্থা কি দাঁড়াবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে সাক্ষী নিয়ে আসব যিনি ঐ উম্মতের উপর সাক্ষ্য প্রদান করবেন, আর তিনি হবেন সেই উম্মতের নবী। আর হে মুহাম্মদ ﷺ আপনাকে তাদের উপর সাক্ষী উপস্থিত করব।

৪২. সেই দিন তথা সাক্ষী উপস্থিত করার দিন, যারা কাফের হয়েছে এবং রাসূল ﷺ -এর কথা অমান্য করেছে, তারা আকাঙ্ক্ষা করবে হায়! যদি তারা মাটির সাথে মিশে যেতে পারত। تُسَوّٰى মাজহুল মারূফ উভয় রকমই পঠিত হয়েছে, এক تَاء 'তা' বিলুপ্তির সাথে এবং تَاء তা'কে সীনের মধ্যে ইদগাম করার সাথে। অর্থাৎ তারা সেই দিনের ভয়াবহতার কারণে মাটির ন্যায় হয়ে যেতে আকাঙ্ক্ষা করবে। যেমন– অন্য আয়াতে এসেছে, يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرَابًا [হায় আফসোস! যদি মাটি হয়ে যেতাম] আর তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে কোনো কথাই গোপন রাখতে পারবে না, যা কিছু আমল তারা করছে। তবে অন্য এক সময় গোপন রাখতে পারবে। যেমন– তাদের উক্তি নকল হয়েছে, وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ আল্লাহর কসম!হে প্রভু আমরা মুশরিক ছিলাম না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا : অর্থাৎ, প্রত্যেক উম্মতের নবী আল্লাহর দরবারে এ কথার সাক্ষ্য দিবেন যে, আমি আমার জাতির কাছে আপনার পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি। তারা সেই পয়গামকে মেনে নেয়নি। সুতরাং আমার ত্রুটি কিসের? অতঃপর তাঁরা সকলের উপর আমাদের প্রিয়নবী ﷺ সাক্ষ্য দিবেন যে, হে আল্লাহ! তাঁরা সত্যই বলেছেন। আর তিনি এ সাক্ষ্যটা দিবেন পবিত্র কুরআনের ভিত্তিতে, যাতে আল্লাহ পাক অতীতের সকল উম্মত ও তাদের নবীগণের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, সকল নবীগণই খোদায়ী পয়গাম নিজ নিজ সম্প্রদায় ও উম্মতের নিকট যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়েছেন। –[জামালাইন খ. ২, পৃ. ৩৮]

٤٣. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ اَيْ لَا تُصَلُّوْا وَاَنْتُمْ سُكَارٰى مِنَ الشَّرَابِ لِاَنَّ سَبَبَ نُزُوْلِهَا صَلَاةُ جَمَاعَةٍ فِيْ حَالِ السُّكْرِ حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ بِاَنْ تَصْحُوْا وَلَا جُنُبًا بِاِيْلَاجٍ اَوْ اِنْزَالٍ وَنَصْبُهُ عَلَى الْحَالِ وَهُوَ يُطْلَقُ عَلَى الْمُفْرَدِ وَغَيْرِهِ اِلَّا عَابِرِيْ مُجْتَازِيْ سَبِيْلٍ طَرِيْقٍ اَيْ مُسَافِرِيْنَ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا فَلَكُمْ اَنْ تُصَلُّوْا وَاُسْتُثْنِيَ الْمُسَافِرُ لِاَنَّ لَهُ حُكْمًا اٰخَرَ سَيَاْتِيْ وَقِيْلَ الْمُرَادُ النَّهْيُ عَنْ قُرْبَانِ مَوَاضِعِ الصَّلٰوةِ اَيِ الْمَسَاجِدِ اِلَّا عُبُوْرَهَا مِنْ غَيْرِ مُكْثٍ وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضٰى مَرَضًا يَضُرُّهُ الْمَاءُ اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَيْ مُسَافِرِيْنَ وَاَنْتُمْ جُنُبٌ اَوْ مُحْدِثُوْنَ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ هُوَ الْمَكَانُ الْمُعَدُّ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ اَيْ اَحْدَثَ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِلَا اَلِفٍ وَكِلَاهُمَا بِمَعْنٰى مِنَ اللَّمْسِ وَهُوَ الْجَسُّ بِالْيَدِ قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَاَلْحَقَ بِهِ الْجَسَّ بِبَاقِي الْبَشَرَةِ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُوَ الْجِمَاعُ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً تَطَهَّرُوْنَ بِهِ لِلصَّلٰوةِ بَعْدَ الطَّلَبِ وَالتَّفْتِيْشِ وَهُوَ رَاجِعٌ اِلٰى مَا عَدَا الْمَرْضٰى فَتَيَمَّمُوْا اقْصُدُوْا بَعْدَ دُخُوْلِ الْوَقْتِ صَعِيْدًا طَيِّبًا تُرَابًا طَاهِرًا فَاضْرِبُوْا بِهِ ضَرْبَتَيْنِ فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ـ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ مِنْهُ وَمَسَحَ يَتَعَدّٰى بِنَفْسِهِ وَبِالْحَرْفِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ـ

অনুবাদ :

৪৩. হে ঈমানদারগণ! তোমরা মদ্যপানে নেশাগ্রস্তাবস্থায় নামাজের কাছে যেয়ো না। কেননা এ আয়াতটি নাজিল হওয়ার কারণ ছিল নেশাগ্রস্তবস্থায় নামাজ পড়া, যতক্ষণ না তোমরা বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বল, অর্থাৎ হুশে আসার পূর্ব পর্যন্ত। এবং জানাবাতের অবস্থায়ও নামাজের কাছে যেয়ো না, তা চাই যৌনসঙ্গমের মাধ্যমে হোক বা ইঞ্জালের মাধ্যমে হোক। আর جُنُبًا শব্দটি হাল হওয়ার প্রেক্ষিতে যবরযুক্ত হয়েছে। جُنُبٌ একবচন ও বহুবচন উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু মুসাফির অবস্থার কথা স্বতন্ত্র, যতক্ষণ না তোমরা গোসল করে নাও। গোসলের পর তেমাদের জন্য নামাজ পড়া শুদ্ধ হবে। মুসাফিরকে পৃথক করা হয়েছে। কেননা তার জন্য ভিন্ন হুকুম [তায়াম্মুমের হুকুম] রয়েছে যার বর্ণনা অচিরেই আসছে। এক তাফসীর মতে উদ্দেশ্য হচ্ছে, এতে নামাজের স্থান তথা মসজিদের কাছে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে না থেমে মসজিদ অতিক্রম করা যেতে পারে। যদি তোমরা এমন রোগে রোগাক্রান্ত হও যাতে পানি ক্ষতিকারক হয় কিংবা সফরে মুসাফির থাক অথচ তোমরা জানাবাত যুক্ত বা অজুহীন হও অথবা তোমাদের কেউ শৌচাগার থেকে আস। اَلْغَائِطُ অর্থ ঐ ঘর যাকে প্রস্রাব ও পায়খানার প্রয়োজন মেটাতে প্রস্তুত করা হয়েছে। অর্থাৎ যার অজু নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিংবা যদি তোমরা স্ত্রীজনকে স্পর্শ করে থাক, ভিন্ন এক কেরাতে আলিফ ছাড়া (اَوْ لَمَسْتُمْ) এসেছে, তবে কেরাত উভয়টার অর্থ একই। এটা لَمْس থেকে নির্গত, তার অর্থ হচ্ছে হাত দ্বারা স্পর্শ করা। ইবনে ওমরের উক্তি এটাই। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মাজহাব এটাই। তিনি দেহের বাকি অংশের স্পর্শকে এই হাতের স্পর্শের সাথে মিলিত করেছেন। আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে স্পর্শ করার অর্থ সহবাস বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর তোমরা যদি খোঁজাখুঁজির পরও পানি না পাও যা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে নামাজের জন্য এর সম্পর্ক রোগীরা ব্যতীত অন্যরা, তবে পাক-পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও। অর্থাৎ নামাজের ওয়াক্ত দাখেল হওয়ার পর পাক মাটির ইচ্ছা করো এবং তাতে দুই বার হাত মারো, তারপর তা দ্বারা তোমাদের চেহারা ও কনুইসহ উভয় হাত মাসেহ করো। আর مَسَحَ শব্দটি সরাসরি ও সকর্মক হয় এবং হরফে জরের মাধ্যমেও হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা পাপ মোচনকারী ও অতীব ক্ষমাশীল।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ : নামাজের নিকটবর্তী হয়ো না, কাছেও যেয়োনা'র মর্ম হচ্ছে নামাজ পড়ো না। নামাজ পড়তে নিষেধ করার মধ্যে মুবালাগা বা অধিক তাকিদ প্রদানের লক্ষ্যে এরূপ বাচন ভঙ্গিতে বলা হয়েছে।

وَاَنْتُمْ سُكَارٰى - لَا تَقْرَبُوا ফে'লের যমীর থেকে হাল হয়েছে। سُكَارٰى - سَكْرَانٌ -এর বহুবচন। এর বহুবচন سُكَارٰى এবং سُكْرٰى ও এসে থাকে। سَكْرَانٌ অর্থ- মদপানে মাতাল বা নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি। سُكْر -এর মূল অর্থ হচ্ছে سَدُّ الطَّرِيْقِ রাস্তা বন্ধ করা। বলা হয় سَدُّ الْبَثْقِ নদীর বাঁধে ফাটল বন্ধ করেছে। اِنَّمَا سُكِرَتْ اَبْصَارُنَا অর্থাৎ মোদের চোখ আবৃত হয়ে যাওয়ার দরুন বন্ধ হয়ে গেছে। তাই তাতে বাহিরের আলো প্রবেশ হচ্ছে না। এবং বস্তুকে তার প্রকৃত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। اَلسُّكْرُ مِنَ الشَّرَابِ বা মদের নেশার মানে সুস্থাবস্থায় তার বিবেকের যে অবস্থা ছিল তা বন্ধ হয়ে যাওয়া। মোটকথা এসবেই سُكْر -এর মূল অর্থ বন্ধ হওয়া পাওয়া যাচ্ছে। এখানে سُكْر সুকরের দ্বারা অধিকাংশ সাহাবা, তাবেয়ীন ও আয়িম্মায়ে দীনের মতে মদ্যপানে নেশা গ্রস্ত হওয়া।

আর ইমাম যাহহাকের মতে, অধিক ঘুমের তাড়নায় স্বাভাবিক জ্ঞান অনুভূতি না থাকা। جُنُبًا শব্দটিও হাল হওয়ার ভিত্তিতে মানসূব বা যবর যুক্ত হয়েছে। একে আতফ করা হয়েছে اَنْتُمْ سُكَارٰى -এর উপর। ইবারতের আসল রূপ হবে-

لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ حَالَ مَا تَكُوْنُوْنَ سُكَارٰى وَحَالَ مَا تَكُوْنُوْنَ جُنُبًا ـ

جُنُب ইসিমটি মাসদার রূপে ব্যবহৃত। তাই এটা একবচন, বহুবচন, পুংলিঙ্গ-স্ত্রীলিঙ্গ সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারবে। সুতরাং جُنُبًا শব্দটিকে বহুবচনীয় পদ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى -এর উপর আতফ করতে কোনো অসুবিধা হবে না। جُنُب -এর অর্থ হলো, গোসল না হলে চলে না এমন বড় অপবিত্রতায় অপবিত্র ব্যক্তি جُنُب -এর মূল অর্থ হচ্ছে দূর হওয়া। যে ব্যক্তির উপর গোসল ওয়াজিব তাকেও জুনুব বলা হয়। কারণ নামাজ ও মসজিদ থেকে দূরে সরে থাকে।

اَلْغَائِطُ অর্থ শৌচাগার, টয়লেট রুম। ঐ গৃহ যাকে প্রস্রাব-পায়খানার জন্য তৈরি করা হয়েছে। বহুবচন غَائِط - غَيْطَان আসলে নীচু ভূমিকে বলা হয়। যেহেতু প্রস্রাব-পায়খানার সময় লোকদের চোখের আড়ালে থাকার জন্য প্রাচীন যুগের মানুষ নীচুস্থান অন্বেষণ করতো, তাই এর স্থানকে غَائِط বলা হয়েছে। গায়েত যদিও মূলত স্থান বা রুমের নাম কিন্তু এখানে রূপক অর্থে প্রস্রাব-পায়খানা করার অর্থে তথা অজু নষ্টকর কাজের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ - مُلَامَسَة মানে একে অন্যকে স্পর্শ করা। তকে রূপক অর্থে এখানে স্বামী-স্ত্রীর সহবাস উদ্দেশ্য। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মত এটাই তবে অন্যান্য ইমামগণ বাহ্যিক অর্থ তথা পরস্পরে চামড়ায় চামড়ায় স্পর্শ করার অর্থটাই গ্রহণ করেছেন।

فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا - تَيَمُّم -এর শাব্দিক অর্থ ইচ্ছা করা। মূলধাতু হচ্ছে اَمٌّ এই জন্যই ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, তায়াম্মুমের মধ্যে নিয়ত শর্ত। যদিও অজু ও গোসলের মধ্যে নিয়ত ওয়াজিব নয়। ইমাম জুফার (র.) -এর মতে, অজু গোসলের ন্যায় তায়াম্মুমের মধ্যেও নিয়ত শর্ত নয়। এবং বাকি ইমামত্রয়ের মতে, অজু গোসলের মধ্যে নিয়ত শর্ত।

صَعِيْدًا طَيِّبًا মানে পবিত্র মাটি। صَعِيْد বলতে মাটি জাতীয় বুঝায়। চায় মাটি হোক বা বালু, চুনা পাথক প্রভৃতি হোক সবগুলোতেই তায়াম্মুম শুদ্ধ হবে। তায়াম্মুমের পারিভাষিক অর্থাৎ জমিনে উভয় হাত মেরে চেহারা ও কনুইসহ উভয় হাত মাসেহ করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى الخ :

আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল : মদ্যপান হারাম হওয়ার পূর্বে এই আয়াত নাজিল হয়েছে। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.) তাফসীরে কাবীরে এই আয়াতের দুটি শানে নুযূল বর্ণনা করেছেন।

১. **বিখ্যাত সাহাবী হযরত** আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) একদল বুযুর্গ সাহাবাকে তাঁর বাড়িতে খানার দাওয়াত করেন। **তখন মদ্যপান মুবাহ** ছিল। তাই তারা আহারের পর মদপান করলেন। কিছুক্ষণ পর যখন মাগরিবের নামাজের সময় হলো, **তখন তারা তাদের** একজনকে নামাজের ইমামতি দিলেন। যেহেতু তারা নিশা গ্রস্ত ছিলেন, তাই قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَأَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত 'লা' বাদ দিয়ে পড়তে লাগলেন। তাদের এই অবস্থার **প্রেক্ষিতে আয়াত** খানী অবতীর্ণ হয়। এরপর থেকে তারা নামাজের সময়ের মধ্যে আর মদ পান করেননি। বরং ইশার **নামাজের পর** পান করে নিতেন, ফলে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত নেশা দূর হয়ে যেত। এবং তারা কি বলত তা বুঝে নিতে সক্ষম **হয়ে যেত।**

২. **হযরত ইবনে** আব্বাস (রা.) বলেন, আলোচ্য আয়াতটি একদল বুজুর্গ সাহাবাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা মদ হারাম **হওয়ার পূর্বে মদপান** করার পর মসজিদে যেতেন নবীজী ﷺ -এর সাথে নামাজ পড়ার জন্য। আলোচ্য আয়াতে তাদেরকে **তা থেকে** নিষেধ করা হয়েছে। –[তাফসীরে কাবীর খ. ৫, পৃ. ১১২]

* **আবূ দাউদ**, তিরমিযী হযরত আলী (রা.) -এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) আমাদের **জন্য খাবার** তৈরি করান, এবং পানাহারের পর আমাদেরকে মদপান করান। এই ঘটনা মদ হারাম হওয়ার পূর্বের। আমরা **তখন** নেশা গ্রস্ত হই। এমন অবস্থায় মাগরিবের নামাজের সময় এসে যায়। লোকেরা আমাকে ইমাম নির্বাচন করে। আমি **নামাজে** সূরায়ে কাফিরূন পড়তে গিয়ে قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ শেষ পর্যন্ত অনুরূপ ভাবেই লাম ব্যতীত **পাঠ** করি। এর উপর আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়েছে। –[মাজহারী খ. ৩, পৃ. ৮৭]

পর্যায়ক্রমে মদপান হারাম হওয়ার ঘোষণা : ইসলাম তার সাধারণ রীতি অনুযায়ী বিধান জারি করার ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়েই **করে থাকে**। এক সাথে সব কিছুর নির্দেশ দিয়ে দেয় না। এই রীতি মাফিকই মদ্যপানকে শরিয়তের পর্যায়ক্রমে হারাম ঘোষণা **করেছে**।

প্রথমে সূরায়ে বাকারাতে বলা হয়েছে মদ্য পানে কিছুটা সাময়িক উপকার থাকলেও ক্ষতি অধিক। ইরশাদ হয়েছে– يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا إِثْمٌ كَبِيْرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ অতঃপর আলোচ্য আয়াতে কেবলমাত্র নামাজের **সময়** মদ্যপান করতে নিষেধ করা হয়েছে। তারপর সূরায়ে মায়েদায় সর্বাবস্থায় চিরদিনের জন্য মদ্যপানকে হারাম ঘোষণা করা **হয়েছে**। ইরশাদ হয়েছে يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ - আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে لا تقربوا الصلوٰة وانتم سكارى অর্থাৎ তোমরা **নেশাগ্রস্তাবস্থায়** নামাজের কাছেও যেয়োনা তথা নামাজ পড়ো না। এখানে صلوة দ্বারা অধিকাংশ তাফসীরবিদ ও ইমাম আবূ **হানীফা** (র.) -এর মতে নামাজ উদ্দেশ্য। আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, নামাজ দ্বারা **নামাজের** স্থান তথা মসজিদ উদ্দেশ্য।

وَأَنْتُمْ سُكَارٰى : অধিকাংশ তাফসীরবিদগণের মতে, মদ্যপানে নেশাগ্রস্ত হওয়া উদ্দেশ্য। তবে ইমাম যাহহাক বলেন, নিদ্রার **কারণে** মাথায় নেশা সৃষ্টি হওয়া উদ্দেশ্য।

মাসআলা : নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাজ পড়া যেমন হারাম তেমনি কোনো কোনো মুফাসসির মনীষী এমনও বলেছেন যে, নিদ্রার **এমন প্রবল** চাপ হলেও নামাজ পড়া জায়েজ নয়, যাতে মানুষ নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।

এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِى الصَّلٰوةِ فَلْيَرْقُدْ حَتّٰى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِىْ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কারো যদি নামাজের মাঝে তন্দ্রা আসতে আরম্ভ করে, তাহলে তাকে কিছু **সময়ের** জন্য ঘুমিয়ে পড়া উচিত, যাতে ঘুমের প্রভাব দূর হয়ে যায়। অন্যথায় ঘুমের ঘোরে সে বুঝতে পারবে না এবং দোয়া **ইস্তেগফারের** পরিবর্তে হয়তো নিজেই নিজেকে গালি দিতে থাকবে। –[মা'আরিফুল কুরআন খ. ২, পৃ. ৪৭০]

তায়াম্মুমের বিধান এ উম্মতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য : এটা আল্লাহ পাকের কতইনা অনুগ্রহ যে, তিনি অজু-গোসল প্রভৃতি **পবিত্রতার** নিমিত্তে এমন এক বস্তুকে পানির স্থলাভিষিক্ত করে দিয়েছেন। যার প্রাপ্তি পানি অপেক্ষা সহজ। বলা বাহুল্য ভূমি ও **মাটি সর্বত্রই** বিদ্যমান। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এই সহজ ব্যবস্থাটি একমাত্র উম্মতে মুহাম্মদীকেই দান করা হয়েছে। তায়াম্মুম **সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়**-মাসআলা মাসায়েল ফিকহের কিতাব ছাড়াও সাধারণ বাংলা উর্দু পুস্তিকায় বর্ণিত হয়েছে। প্রয়োজনে **সেগুলো পাঠ** করা যেতে পারে।

অনুবাদ :

٤٤. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ أُوْتُوْا نَصِيْبًا حَظًّا مِّنَ الْكِتٰبِ وَهُمُ الْيَهُوْدُ يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى وَيُرِيْدُوْنَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ . تَخْطَؤُوْا طَرِيْقَ الْحَقِّ لِتَكُوْنُوْا مِثْلَهُمْ .

৪৪. তুমি কি তাদেরকে দেখনি? যাদেরকে আসমানি কিতাবের কিছু অংশ দেওয়া হয়েছে, আর তারা হচ্ছে ইহুদিরা। অথচ তারা হেদায়েতের পরিবর্তে পথভ্রষ্টতাকে খরিদ করে, এবং তারা কামনা করে তোমরাও যাতে বিভ্রান্ত হয়ে যাও, আল্লাহর পথ থেকে তথা সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাও, যাতে তোমরাও তাদের মতো হয়ে পড়।

٤٥. وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ مِنْكُمْ فَيُخْبِرُكُمْ بِهِمْ لِتَجْتَنِبُوْهُمْ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا حَافِظًا لَكُمْ وَكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا مَانِعًا لَكُمْ مِنْ كَيْدِهِمْ .

৪৫. এবং আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শত্রুদেরকে ভালোভাবেই জানেন, তাই তিনি তাদের সম্পর্কে তোমাদের অবগত করেছেন, যেন তোমরা তাদের থেকে বেঁচে থাক। আর বন্ধু হিসেবে তথা তোমাদের সংরক্ষক হিসেবে আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট এবং সহায়ক তথা তোমাদেরকে তাদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষাকারী হিসেবেও আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট।

٤٦. مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا قَوْمٌ يُحَرِّفُوْنَ يُغَيِّرُوْنَ الْكَلِمَ الَّذِيْ أَنْزَلَ اللّٰهُ فِي التَّوْرٰةِ مِنْ نَعْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ عَنْ مَّوَاضِعِهِ الَّتِيْ وُضِعَ عَلَيْهَا وَيَقُوْلُوْنَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِذَا أَمَرَهُمْ بِشَيْءٍ سَمِعْنَا قَوْلَكَ وَعَصَيْنَا أَمْرَكَ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ حَالٌ بِمَعْنَى الدُّعَاءِ أَيْ لَا سَمِعْتَ وَ يَقُوْلُوْنَ لَهُ رَاعِنَا . وَقَدْ نُهِيَ عَنْ خِطَابِهِ بِهَا وَهِيَ كَلِمَةُ سَبٍّ بِلُغَتِهِمْ لَيًّا تَحْرِيْفًا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا قَدْحًا فِي الدِّيْنِ الْإِسْلَامِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا بَدَلَ وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ فَقَطْ وَانْظُرْنَا أُنْظُرْ إِلَيْنَا بَدَلَ رَاعِنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِمَّا قَالُوْهُ وَأَقْوَمَ أَعْدَلَ مِنْهُ وَلٰكِنْ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ أَبْعَدَهُمْ عَنْ رَحْمَتِهِ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ إِلَّا قَلِيْلًا مِنْهُمْ كَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ وَأَصْحَابِهِ .

৪৬. আর ইহুদিদের কেউ কেউ ঐ কথা মোড় ঘুড়িয়ে নেয় তার লক্ষ্য থেকে, যা আল্লাহপাক হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর গুণাবলি সম্পর্কে তাওরাতে নাজিল করেছেন। আর নবী করীম ﷺ যখন তাদেরকে কোনো বিষয়ে নির্দেশ দান করেন, তখন তারা বলে, তোমার কথা শুনেছি, আর তোমার নির্দেশ অমান্য করেছি, আর [তারা একথাও বলে যে,] শোন, এমতাবস্থায় যে, তোমাকে যেন শুনানো না হয় غَيْرَ مُسْمَعٍ তারকীবে اِسْمَعْ -এর যমীর থেকে হাল হয়েছে, বদদোয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ তুমি যেন না শোন, আর তারা তাঁকে মুখ বাঁকিয়ে ও ইসলাম ধর্মের উপর দোষারোপ করার উদ্দেশ্যে বলে, রায়েনা, [আমাদের রাখাল] অথচ তাদেরকে এ শব্দে তাকে সম্বোধন করতে নিষেধ করা হয়েছে, আর ইহা হচ্ছে তাদের ভাষায় একটি গালির শব্দ। আর যদি তারা শুনেছি ও অমান্য করেছি -এর পরিবর্তে বলত, আমরা শুনেছি এবং অনুসরণ করেছি, এবং যদি কেবল শোন বলত, আর রায়েনার বদলে আমাদের প্রতি লক্ষ্য কর বলত, তবে তা অবশ্যই তাদের জন্য ভালো এবং সুসঙ্গত হতো, ঐ কথার চেয়ে যা তারা বলেছে, কিন্তু তাদের কুফরির দরুন আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর লানত করেছেন, অর্থাৎ স্বীয় রহমত থেকে তাদের বিদূরিত করেছেন। পরিণামে তারা ঈমান আনছে না। কিন্তু অতি অল্প সংখ্যক যেমন– আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ও তাঁর সাথীরা।

তাহকীক ও তারকীব

اِسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ . اِسْمَعْ - غَيْرَ مُسْمَعٍ -এর যমীর থেকে হাল হয়েছে। অর্থাৎ শোন অশ্রুতাবস্থায়। এর বিস্তারিত আলোচনা পরে আসছে। رَاعِنَا ইহুদিদের হিব্রু ভাষায় একটি গালি। অর্থাৎ হে আহমক। অথবা رَاعِيْنَا পড়লে অর্থ হবে হে আমাদের রাখাল।

لَيًّا আসলে لَوْيًا ছিল। ওয়াও কে ইয়া দ্বারা পরিবর্তন করে يَاء -কে يَاء -এর মধ্যে এদগাম করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে মুখ ঘুরিয়ে কথা বলা। -[তাফসীরে কাবীর, সাবী, মাজহারী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُوْنَ الضَّلَالَةَ الخ আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল : মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, ইহুদিদের একজন সরদারের নাম ছিল রেফাআ ইবনে যায়েদ ইবনে তাবুত। সে যখন প্রিয়নবী ﷺ -এর সঙ্গে কথা বলতো, তখন তার জিব টেনে কথাকে বিকৃত করে এমনভাবে কথা বলতো যেন তার কথা এবং তার কথার বিকৃত অর্থ অন্যরা বুঝতে না পারে এবং এভাবে সে বলতো, যে, হে মুহাম্মদ ﷺ ! আপনি আমাদের দিকে মনোনিবেশ করুন। তারপর সে ইসলামের উপর দোষারোপ করতো এবং ইসলামের সমালোচনা করতো। رَاعِنَا এ বাক্যটির দুটি অর্থ। একটি হলো, আমাদের দিকে লক্ষ্য করুন, আর অন্যটি হলো- হে আমাদের রাখাল। প্রকাশ্যে সে বলতো আমাদের দিকে লক্ষ্য করুন এবং মুখ বিকৃত করে এমনভাবে বলতো যেন তার অর্থ হয় হে আমাদের রাখাল। এমনিভাবে তারা বলতো اِسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ। অর্থাৎ আপনি শুনুন, অপ্রিয় কথা যেন আপনাকে শুনতে না হয়, অথচ তার এ বাক্য দ্বারা একথার উদ্দেশ্য করতো যে, কিছুই যেন শুনতে না পাও। এই দুরাত্মা ইহুদিদের সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

আল্লামা আলুসী (র.) দুরাত্মা ইহুদি রেফাআ ইবনে যায়েদের সঙ্গে মালেক ইবনে দোখশামের নামও উল্লেখ করেছেন যে, তারা উভয়ে উপরোল্লিখিত অন্যায় কাজটি করতো।

ইমাম রাযী এই পর্যায়ে মুনাফিক সরদার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের নামও উল্লেখ করেছেন।

-[নূরুল কুরআন খ. ৫, পৃ. ৭০-৭১, তাফসীরে মাজহারী খ. ৩, পৃ. ১২০]

ইহুদিদের গুমরাহীর ব্যাখ্যা : مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهِ الخ পূর্ববর্তী আয়াতে ইহুদিদের হেদায়েতের পরিবর্তে গোমরাহী খরিদ করে নেওয়ার কথা বিবৃত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে তাদের সেই গোমরাহীর কিছুটা ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। তাদের সেই গোমরাহী গুলো হচ্ছে-

১. একটি হলো يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهِ তারা তাওরাতের পরিবর্তন ও বিকৃতি ঘটাতো। এক শব্দের স্থানে অন্য শব্দ রেখে দিত। যেমন, তারা বিবাহিতা-বিবাহিতদের জেনার শাস্তি রজমের স্থানে বেত্রাঘাত রেখে দিয়েছিল এবং তাতে তারা অপব্যাখ্যা প্রদান করতো।

২. তাদের দ্বিতীয় গোমরাহীর উল্লেখ করা হয়েছে- يَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا দ্বারা। আমরা শুনেছি ও অমান্য করেছি কথাটার দুটি মর্ম হতে পারে।

ক. প্রিয়নবী ﷺ যখন তাদেরকে কোনো বিষয়ে নির্দেশ দান করতেন, তখন তারা বাহ্যিকভাবে বলতো আমরা শুনেছি আর মনে মনে বলতো আমরা অমান্য করেছি।

খ. তারা হুজুরে পাক ﷺ -এর বিরোধিতা ও তার নির্দেশের প্রতি অশ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে বলতো আমরা শুনেছি এবং অমান্য করেছি।

৩. তাদের তৃতীয় প্রকার গোমরাহীর হচ্ছে اِسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ বলা। এ বাক্যের দ্বিবিধ অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এক. প্রশংসা ও সম্মান প্রদর্শন। দুই. অবমাননা ও গালি। প্রথম সূরতে অর্থ দাঁড়াবে আপনি আমাদের ভালো কথা শুনুন এমতাবস্থায় যে, মন্দ কথার প্রতি কর্ণপাত না করুন। আর দ্বিতীয় সূরতে বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন–

ক. তারা নবীয়ে করীম ﷺ কে বলতো শুন, আর আন্তরিকভাবে বদদোয়া দিয়ে বলতো لَا سَمِعْتَ তুমি যেন কখনো না শোন, অর্থাৎ তুমি যেন বধির হয়ে যাও। তখন غَيْرَ مُسْمَعٍ -এর অর্থ হবে غَيْرَ سَامِعٍ কেননা শ্রোতা শ্রুত হয়ে থাকে, আবার শ্রুত হয়ে থাকে শ্রোতা।

খ. এ বাক্যের মর্ম হলো তুমি শোন, তবে غَيْرَ مُسْمَعٍ اَیْ غَيْرَ مَقْبُوْلٍ مِنْكَ অর্থাৎ তোমার কথা শোনা যাবে না তথা গ্রহণযোগ্য হবে না।

গ. তুমি শোন, তবে পছন্দনীয় কোনো কথা শুনতে প্যাবে না। বরং তোমার কাছে যা অপছন্দনীয় তাই আমাদের কাছ থেকে তুমি শুনতে পাবে।

৪. তাদের চতুর্থ গোমরাহী হচ্ছে وَرَاعِنَا لَيًّا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِى الدِّيْنِ বলা। رَاعِنَا -এর ব্যাখ্যায় বিভিন্ন উক্তি তাফসীর বিদগণের বিবৃত হয়েছে। যথা–

ক. ইহুদিরা পরস্পরে উপহাস ও ঠাট্টা স্বরূপ একথাটি বলতো। তাই মুসলমানদেরকে রাসূল ﷺ -এর সামনে একথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে।

খ. এ বাক্যের অর্থ হলো اِرْعِنَا سَمْعَكَ অর্থাৎ আমাদের কথায় কর্ণপাত কর এবং বুঝার জন্য নীরবতা অবলম্বন কর শ্রবণ কর। এরকম ভাষায় নবীদেরকে সম্বোধন করা ঠিক নয়, বরং তাদেরকে তাজীম ও সম্মানের সাথে সম্বোধন করা উচিত।

গ. তারা 'রায়েনা' বলে বাহ্যিকভাবে তাকে বুঝাতো যে, আমাদের কথার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে শ্রবণ কর। আর তাদের ভাষা অনুযায়ী رَعُوْنَتْ তথা নির্বুদ্ধিতার গালি দিত। অর্থাৎ হে আমাদের নির্বোধ, আহমক।

ঘ. ইহুদিরা মুখ ঘুরিয়ে জবান বাকিয়ে বলতো رَاعِنَا ফলে ইহা হয়ে যেত رَاعِيْنَا অর্থাৎ আমাদের মেষপালের রাখাল।

তাদের এসব গুমরাহীর বর্ণনার পর আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, তারা যদি (سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا) শুনেছি ও অমান্য করেছি -এর পরিবর্তে (سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا) শুনেছি ও মেনে নিয়েছি বলতো এবং وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ এর বদলে শুধু اِسْمَعْ আমাদের কথা শুনুন বলতো, তেমনিভাবে رَاعِنَا -এর পবিবর্তে যদি اُنْظُرْنَا আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন বলতো, তবে তাদের জন্য ভালো যুক্তিসঙ্গত ও সঠিক হতো। কিন্তু আল্লাহ পাক তাদের কুফরির কারণে তাদের উপর লানত করেছেন, তাই তাদের অল্প সংখ্যক ছাড়া বাকিরা ঈমান আনবে না। –[তাফসীরে কাবীর খ. ৫, পৃ. ১২১-২৪]

অনুবাদ :

٤٧. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْاٰنِ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِنَ التَّوْرٰةِ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا نَمْحُوْ مَا فِيْهَا مِنَ الْعَيْنِ وَالْاَنْفِ وَالْحَاجِبِ فَنَرُدَّهَا عَلٰى اَدْبَارِهَا فَنَجْعَلُهَا كَالْاَقْفَاءِ لَوْحًا وَاحِدًا اَوْ نَلْعَنَهُمْ نَمْسَخُهُمْ قِرَدَةً كَمَا لَعَنَّا مَسَخْنَا اَصْحٰبَ السَّبْتِ . مِنْهُمْ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَضَاؤُهُ مَفْعُوْلًا . وَلَمَّا نَزَلَتْ اَسْلَمَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ فَقِيْلَ كَانَ وَعِيْدًا بِشَرْطٍ فَلَمَّا اَسْلَمَ بَعْضُهُمْ رُفِعَ وَقِيْلَ يَكُوْنُ طَمْسٌ وَمَسْخٌ قَبْلَ قِيَامِ السَّاعَةِ .

৪৭. হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা ঈমান আন সেই কিতাবের তথা কুরআনের প্রতি যা আমি অবতীর্ণ করেছি, যা সেই কিতাবের সত্যায়নকারী যে কিতাব তোমাদের নিকট রয়েছে, তথা তাওরাত। এর পূর্বে যে, আমি বিকৃত করে দেব অনেক চেহারাকে, তথা চেহারায় যা কিছু রয়েছে, যেমন– চোখ, নাক ও ভ্রুকে মুছে দেব, অতঃপর সেগুলোকে ঘুরিয়ে দেব পশ্চাৎ দিকে, ফলে করে দিব তাদের চেহারাগুলোকে গর্দানের ন্যায় এক তক্তা, অথবা শনিবারের ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তিদেরকে যেভাবে লানত করেছিলাম তথা আকৃতি বদলে দিয়েছিলাম তাদেরকে সেরূপ লানতের তথা আকৃতি বদলানোর পূর্বে। আর আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ তথা ফয়সালা কার্যকর হয়েই থাকে। উল্লিখিত আয়াত যখন নাজিল হলো তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) মুসলমান হয়ে যান। তাদের আকৃতি বিকৃত হলোনা কেন?] এর জবাবে বলা হয়েছে যে, এটা ছিল একটি শর্তের সাথে [ঈমান গ্রহণ না করার সাথে] শর্তযুক্ত ভীতি প্রদর্শন, তাদের কেউ কেউ যখন ঈমান নিয়ে আসল, তখন সেই ধমক প্রত্যাহার করে নেওয়া হলো। ভিন্ন উক্তি মতে তাদের চেহারা মুছে ফেলা ও সুরত বিকৃত করা কিয়ামতের পূর্বে হবে।

٤٨. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ اَيِ الْاِشْرَاكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ سِوٰى ذٰلِكَ مِنَ الذُّنُوْبِ لِمَنْ يَّشَاۤءُ اَلْمَغْفِرَةَ لَهٗ بِاَنْ يُّدْخِلَهُ الْجَنَّةَ بِلَا عَذَابٍ وَمَنْ شَاءَ عَذَّبَهٗ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِذُنُوْبِهٖ ثُمَّ يُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰۤى اِثْمًا ذَنْبًا عَظِيْمًا كَبِيْرًا .

৪৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে শিরক করার অপরাধকে ক্ষমা করেন না। এছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে তিনি ক্ষমা করতে চান ক্ষমা করেন, এভাবে যে, তাকে শাস্তি ব্যতীতই বেহেশতে প্রবেশ করিয়ে দিবেন, এবং মু'মিনদের মধ্য থেকে যাকে চান তার পাপের কারণে শাস্তি প্রদান করার পরও জান্নাতে দাখিল করতে পারেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করল, সে অবশ্যই মহাঅপবাদে তথা গুনাহে লিপ্ত হলো।

٤٩. اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ وَهُمُ الْيَهُوْدُ حَيْثُ قَالُوْا نَحْنُ اَبْنَاءُ اللّٰهِ وَاَحِبَّاؤُهُ اَىْ لَيْسَ الْاَمْرُ بِتَزْكِيَتِهِمْ اَنْفُسَهُمْ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّىْ يُطَهِّرُ مَنْ يَّشَاءُ بِالْاِيْمَانِ وَلَا يُظْلَمُوْنَ يُنْقَصُوْنَ مِنْ اَعْمَالِهِمْ فَتِيْلًا قَدْرَ قِشْرَةِ النَّوَاةِ .

৪৯. হে রাসূল ﷺ! আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি, যারা নিজেদেরকে পবিত্র মনে করে? আর তারা হচ্ছে ইহুদিরা। কেননা তারা বলত, আমরা আল্লাহর সন্তান ও তার প্রিয়জন। অর্থাৎ ব্যাপার এ রকম নয় যে, তাদের পবিত্র দাবি করাতেই তারা পবিত্র হয়ে যাবে। বরং আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা ঈমানের মাধ্যমে পবিত্র করেন। আর তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবে না, অর্থাৎ তাদের আমল থেকে খেজুর বীচের ছাল পরিমাণ হ্রাস ঘটিয়েও অবিচার করা হবে না।

٥٠. اُنْظُرْ مُتَعَجِّبًا كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ بِذٰلِكَ وَكَفٰى بِهٖ اِثْمًا مُّبِيْنًا بَيِّنًا .

৫০. হে রাসূল ﷺ! দেখুন তারা এর মাধ্যমে কিভাবে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে, আর প্রকাশ্য পাপ হিসেবে এটিই যথেষ্ট।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا الخ .

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইহুদিদের ইসলাম বিরোধী বিভিন্ন প্রকার ষড়যন্ত্রের কথা উল্লিখিত হয়েছে। আর এই আয়াতে তাদের সেই সমস্ত দুস্কৃতি ও দৌরাত্ম্য সম্পর্কে সতর্ক করত, তাদেরকে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

ইহুদিদের প্রতি সতর্কবাণী : আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা পবিত্র কুরআনের প্রতি ঈমান আনয়ন কর। পবিত্র কুরআন তাওরাতের সত্যতা প্রমাণ করে, যা হযরত মূসা (আ.) -এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। যা তোমাদের নিকট বিদ্যমান আছে। মনে রেখো এখনও সময় আছে, ইচ্ছা করলে তোমরা আত্মরক্ষার সুযোগের সদ্ব্যবহার কর। এক আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর। পবিত্র কুরআনের প্রতি এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতিও ঈমান আন। তোমাদের দৌরাত্ম্য, ষড়যন্ত্র, জুলুম-অত্যাচারের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ তোমাদের চেহারা বিকৃত করে পৃষ্ঠ দেশের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার পূর্বে তোমরা ঈমান আন। যা কিছু করার অবিলম্বে কর। অথবা এমনও হতে পারে যেভাবে আসহাবে সাবত" তথা যাদেরকে শনিবারে মাছ না ধরার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল। তোমাদের অবস্থাও তাদের ন্যায় হতে পারে। তারা নির্দেশ অমান্য করে মাছ ধরেছিল, পরিণামে আল্লাহপাক তাদেরকে লানত দিয়েছিলেন। তারা বানরে রূপান্তরিত হয়েছিল। তোমাদের অবস্থাও তাদের ন্যায় হতে পারে। অতএব, তাদের ন্যায় শাস্তি হওয়ার পূর্বেই তোমরা আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হও। আর আল্লাহ পাকের শাস্তি থেকে আত্মরক্ষার একমাত্র পথ হলো পবিত্র কুরআনের প্রতি ঈমান। তাই তোমরা অবিলম্বে ঈমান আন।

তাফসীরকারগণ লিখেছেন যে, এই আয়াতে আল্লাহ পাক যে শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ ইহুদিদের চেহারা বিকৃত হওয়া তা কিয়ামতের পূর্বে অবশ্যই হবে।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন যে, চেহারা বিকৃত হওয়ার এই আজাবের জন্য শর্ত হলো ইহুদিদের ঈমান না আনা। কিন্তু যেহেতু কিছু ইহুদি ঈমান এনেছে তাই তাদের চেহারা বিকৃত হওয়ার এই শাস্তি রহিত হয়ে গেছে।

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞান, বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে ইহুদিদের জন্য দুটি শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। একটি হলো চেহারা বিকৃত করা আর অপরটি হলো তাদের প্রতি লানত করা। যেহেতু তাদের প্রতি লানত দেওয়া হয়ে গেছে, তাই চেহারা বিকৃত করার শাস্তি হয়নি।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপতী (র.) বলেন, আমার মতে চেহারা বিকৃত করার সময় এখনও রয়ে গেছে। কিয়ামতের দিন ইহুদিদের চেহারা বিকৃত করা হবে।

এক হাদীসে আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মত [উম্মতে দাওয়াত] হাশরের দিন দশ দলে বিভক্ত হবে।

একদলের হাশর হবে বানরের আকৃতিতে। আর একদলের হাশর হবে শুকরের আকৃতিতে। আর এক দলের হাশর হবে কুকুরের আকৃতিতে এবং আর একদলের হাশর হবে গাধার আকৃতিতে। -[নূরুল কুরআন খ. ৫, পৃ. ৭৫-৭৬]

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** তাবারানী ও ইবনে আবি হাতিম হযরত আবূ আইয়্যুব আনসারী (রা.) -এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি হুজুরে পাক ﷺ -এর দরবারে গিয়ে আরজ করল যে, আমার একজন ভ্রাতুষ্পুত্র আছে যে নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত হয় না। হুজুর ﷺ বললেন, তার ধর্ম কি? সে ব্যক্তি বললো, নামাজ আদায় করে এবং আল্লাহর একত্ববাদের বিশ্বাস করে। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, তার নিকট থেকে তার ধর্মকে ক্রয় করে লও। সর্ব প্রথম তাকে বল, তুমি আমাকে তোমার ধর্মকে তোহফা হিসেবে দান করে দাও। যদি অস্বীকার করে তবে একথা প্রমাণিত হবে যে, তার নিকট দুনিয়া থেকে দীন অতি প্রিয়। এই ব্যক্তি হুকুম পালন করল। কিন্তু তার ভ্রাতুষ্পুত্র তার দীনদারী বিক্রি করতে রাজি হলো না। এমন অবস্থায় ঐ ব্যক্তি হুজুরে পাক ﷺ -এর দরবারে হাজির হলো এবং আরজ করলো, হজুর তাকে আমি দ্বীনদারীর ব্যাপারে অত্যন্ত সুদৃঢ় পেয়েছি। তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ الخ : আল্লাহপাক তাঁর সাথে শিরক করাকে মাফ করবে না। যদি সে তাওবা না করে শিরক নিয়ে মারা যায়। কিন্তু যদি কেউ শিরক থেকে তওবা করে নেয়, এবং ঈমান নিয়ে আসে তবে আল্লাহপাক তার অতীত জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিবেন। হাদীস শরীফে এসেছে- اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهٗ অর্থাৎ গুনাহ থেকে তওবাকারী এরূপ যেমন সে গুনাহ করেই নাই। শিরক ছাড়া অন্য বাকি যে কোনো কবীরা বা সগীরা গুনাহ নিয়ে মারা গেলে আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হলে নিজ দয়ায় ক্ষমাও করে দিতে পারেন এবং ইচ্ছা হলে গুনাহ পরিমাণ শাস্তি প্রদানের পরও জান্নাত দিতে পারেন। এটা হচ্ছে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকীদা। পক্ষান্তরে মুতাযিলা ও কাদরিয়ারা বলে কবীরাহ গুনাহগারকে মাফ করে দেওয়া আল্লাহর জন্য জায়েজ নয়। বরং তাকে শাস্তি দেওয়া ওয়াজিব, সে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। আলোচ্য আয়াত তাদের বিরুদ্ধে প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এ আয়াত দ্বারা একথাও বুঝা যাচ্ছে যে, শরিয়তের পরিভাষায় ইহুদিদেরকে মুশরিক বলা যেতে পারে।

এক বর্ণনা মতে, আয়াতটি ওয়াহশী ও তার সাথীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তার বিবরণ হলো এই যে, ওয়াহশী যখন ওহুদ যুদ্ধে হযরত হামযা (রা.) -কে শহীদ করে মক্কায় ফেরত আসলো তখন সে এবং তার সাথীরা লজ্জিত হয়ে হুজুর ﷺ -এর নিকট চিঠি লেখলো যে, আমরা আমাদের কৃত কর্মের উপর লজ্জিত হয়েছি। আর আমাদের জন্য ইসলাম গ্রহণ করতে কেবল ঐ কথাই বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে যা আমরা মক্কায় শুনতে পেয়েছি। আর তা হচ্ছে এই যে, যা আপনি বলেন-

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ـ يُضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا ـ

অথচ আমি আল্লাহর সঙ্গে শিরক ও করেছি এবং নাহক হত্যা ও জেনাও করেছি। যদি এ আয়াতগুলো না হতো তাহলে আমরা অবশ্যই আপনার অনুসারী হয়ে যেতাম।

অতঃপর সূরায়ে ফুরকানের পরবর্তী এ দুটি আয়াত নাজিল হয়-

إِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ـ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهٗ يَتُوْبُ إِلَى اللّٰهِ مَتَابًا ـ

এই আয়াত দুটি নাজিল হওয়ার পর হুজুর ﷺ একে তাদের কাছে পাঠালেন। তারা পাঠ করার পর জবাবে লিখলো আমাদের জন্য আয়াতে বর্ণিত শর্ত শক্ত হয়ে যায়। কারণ নেক আমলের তৌফিক পাবো না বলে আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে। তারপর নাজিল হয় আলোচ্য আয়াতখানি। إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ এই আয়াত নাজিল হওয়ার পর হুজুরে পাক ﷺ তা লিখে তাদের কাছে পাঠান। তদুত্তরে তারা বলল, আমাদেরকে ক্ষমা করতে চাবেন না বলে আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে। তাপর অবতীর্ণ হয় পাইকারী ক্ষমার ঘোষণা নিয়ে قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ الخ অতঃপর এই আয়াতের সংবাদ পাঠালে তারা মুসলমান হয়ে যায়। -[তাফসীরে খাজেন খ. ১, পৃ. ৩৮৭, মাজহারী খ. ৩, পৃ. ১২৭]

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :**

১. ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.) তাঁর বিশ্ব বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ তাফসীরে কাবীরে লিখেছেন, আল্লাহ পাক যখন ইহুদিদেরকে إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ দ্বারা ভীতি প্রদর্শন করলেন, তখন তারা বলতে লাগলো لَسْنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ بَلْ نَحْنُ خَوَاصُّ اللّٰهِ تَعَالٰى আমরা মুশরিক নই, বরং আমরা আল্লাহর বিশেষ বান্দা। যেরূপ আল্লাহ পাক তাদের বক্তব্য নকল করে পবিত্র কুরআনে বলেছেন نَحْنُ اَبْنَاءُ اللّٰهِ وَاَحِبَّاؤُهٗ আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়জন। তিনি আরো নকল করেছেন لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصَارٰى আরো বলেছেন لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَعْدُوْدَةً এছাড়া তাদের কেউ কেউ একথাও বলতো আমাদের বাপ দাদারা ছিলেন নবী তাই তারা আমাদের জন্য সুপারিশ করবেন।

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। একদল ইহুদি তাদের সন্তানদেরকে নিয়ে নবীয়ে করীম ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে মুহাম্মদ ﷺ তাদের কোনো গুনাহ আছে কি? তিনি বললেন না। অতঃপর তারা বলল, আল্লাহর কসম আমরাও তাদের মতোই। আমরা রাতে যা কিছু করি তা দিনে আর দিনে যা কিছু করি তা রাতে মাফ হয়ে যায়। মোটকথা ইহুদিরা নিজেদের পবিত্রতা ও আত্মপ্রশংসা করেছিল এরই প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতখানি নাজিল হয়।

-[তাফসীরে কাবীর খ. ৫, পৃ. ১৩১]

৩. বগবী ও সালবী কলবীর উদ্ধৃতি উল্লেখ করে লিখেছেন যে, কিছু সংখ্যক ইহুদি যাদের মধ্যে বহরী ইবনে আমরা, নোমান ইবনে আওফা এবং মারহাম ইবনে এজীদও ছিল, তারা নিজেদের ছোট সন্তানদেরকে হুজুর ﷺ-এর দরবারে নিয়ে এসে আরজ করলো, হে মুহাম্মদ ﷺ! তাদের কি কোনো গুনাহ হতে পারে? তিনি বললেন, না। তখন তারা বলতে লাগল, আমরাও তাদের মতো। আমরা দিনে যা কিছু করি তা রাতে আর রাতে যা কিছু করি তা দিনে মাফ করে দেওয়া হয়। তাদের একথার উপর আলোচ্য আয়াতখানি নাজিল হয়। -[তাফসীরে মাজহারী খ. ৩, পৃ. ১৩১]

এই আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, কোনো মানুষের জন্যে নিজের পবিত্রতা ও আত্ম প্রশংসা বর্ণনা করা জায়েজ নয়। কারণ আত্মার পবিত্রতা সৃষ্টি হয় তাকওয়ার মাধ্যমে আর তাকওয়া হচ্ছে একটি অভ্যন্তরীণ গোপনীয় বিষয়। আল্লাহ ছাড়া কেউ তা জানতে পারে না। সুতরাং আল্লাহ এবং [ওহীর মাধ্যমে] নবী রাসূল ছাড়া অন্য কারো পক্ষে কোনো মানুষ পবিত্রতা বর্ণনা করা তাকওয়া ও আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয়ে গেছে বলে ঘোষণা দেওয়া ঠিক হবে না।

ইরশাদ হয়েছে- لَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى তোমরা নিজেদের পবিত্রতা বর্ণনা করো না, আল্লাহ ভালো জানেন পরহেজগার কে? بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَاءُ বরং আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা পবিত্রতা অর্জনের তৌফিক দান করেন।

-[তাফসীরে খাজেন খ. ১, পৃ. ৩৮৮]

অনুবাদ :

৫১. وَنَزَلَ فِىْ كَعْبِ بْنِ الْاَشْرَفِ وَنَحْوِهِ مِنْ عُلَمَاءِ الْيَهُوْدِ لَمَّا قَدِمُوْا مَكَّةَ وَشَاهَدُوْا قَتْلٰى بَدْرٍ وَحَرَّضُوا الْمُشْرِكِيْنَ عَلَى الْاَخْذِ بِثَارِهِمْ وَمُحَارَبَةِ النَّبِىِّ ﷺ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ صَنَمَانِ لِقُرَيْشٍ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَبِىْ سُفْيَانَ وَاَصْحَابِهِ حِيْنَ قَالُوْا لَهُمْ اَنَحْنُ اَهْدٰى سَبِيْلًا وَنَحْنُ وُلَاةُ الْبَيْتِ نَسْقِى الْحَاجَّ وَنُقْرِى الضَّيْفَ وَنَفُكُّ الْعَانِىَ وَنَفْعَلُ اَمْ مُحَمَّدٌ وَقَدْ خَالَفَ دِيْنَ اٰبَائِهِ وَقَطَعَ الرَّحِمَ وَفَارَقَ الْحَرَمَ هٰؤُلَاءِ اَىْ اَنْتُمْ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا اَقْوَمُ طَرِيْقًا ـ

৫১. সামনের আয়াতটি ইহুদি ওলামাদের মধ্য থেকে কা'ব ইবনে আশরাফ ও তার ন্যায় লোকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যখন তারা মক্কায় এসে বদর যুদ্ধে নিহতদেরকে প্রত্যক্ষ করে এবং মুশরিকদেরকে তাদের নিহতদের খুনের বদলা গ্রহণ ও নবীয়ে করীম ﷺ -এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করে। হে রাসূল ﷺ আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি? যাদেরকে আসমানি কিতাবের কিছু অংশ প্রদান করা হয়েছে, যারা মূর্তি এবং শয়তানের উপর বিশ্বাস রাখে, জিবত ও তাগুত কুরাইশদের দুটি মূর্তির নাম। আর তারা কাফেরদেরকে তথা আবূ সুফিয়ান ও তার সহচরদের সম্পর্কে বলে যখন তাদের আবূ সুফিয়ান ও তার সহচররা বলল যে, আমরা অধিকতর সুপথগামী না মুহাম্মদ ﷺ? অথচ আমরা বায়তুল্লাহর মুতাওয়াল্লী, হাজীদেরকে পানি পান করাই, অতিথিদের আপ্যায়ন করি এবং বন্দীদেরকে মুক্ত করি এছাড়া আরো অনেক কিছু করে থাকি। পক্ষান্তরে সে [মুহাম্মদ ﷺ!] স্বীয় বাপ-দাদাদের ধর্মের বিরোধিতা ও আত্মীয়তা সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেছে এবং হারাম শরীফ থেকে কেটে পড়েছে। যে, এরা অর্থাৎ তোমরা মুসলমানদের তুলনায় অধিকতর সুপথগামী।

৫২. اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا مَانِعًا مِنْ عَذَابِهِ ـ

৫২. এরা হলো সে সমস্ত লোক, যাদের উপর আল্লাহ তা'আলা লানত করেছেন, আর আল্লাহ তা'আলা যার প্রতি লানত করেন, তার জন্য কোনো সাহায্যকারী তথা আল্লাহর আজাব থেকে রক্ষাকারী পাবে না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ بِثَارِهِمْ : اَلثَّارُ ও اَلثُّوْرَةُ খুনের বদলা বা প্রতিশোধ গ্রহণ করা। اَلْجِبْتُ ও اَلطَّاغُوْتُ সুয়ূতী (র.) -এর ব্যাখ্যানুযায়ী কুরাইশদের দুটি মূর্তির নাম। আরবি লোগাত বিশারদগণ বলেছেন كُلُّ مَعْبُوْدٍ دُوْنَ اللّٰهِ فَهُوَ جِبْتٌ وَطَاغُوْتٌ আল্লাহ ব্যতীত অন্য যে কোনো বস্তুর উপাসনা করা হয় তাকেই জিবত ও তাগুত বলে। অধিকাংশ অভিধানবিদগণের মতে, اَلْجِبْتُ -এর মধ্যে সরফী কোনো রূপান্তর নেই; বরং এটা ইসমে জামেদ। তবে কাফফাল থেকে বর্ণিত আছে যে, جِبْتٌ আসলে ছিল جِبْسٌ আর جِبْسٌ -এর অর্থ হলো খবীছ-নিকৃষ্ট। অতঃপর সীনকে তা দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। আর طَاغُوْت নির্গত হয়েছে طُغْيَان [সীমালঙ্ঘন] থেকে, তথা আল্লাহর নাফরমানিতে সীমালঙ্ঘন করা থেকে। সুতরাং যে ব্যক্তি বা বস্তু গুনাহে কবীরার প্রতি লোকদেরকে আহ্বান করে তাকেই তাগুত বলে আখ্যায়িত করা যাবে।

اَلْعَانِىْ কয়েদী, বন্দী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্ববর্তী আয়াত أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ أُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ থেকেই ইহুদিদের দুষ্কৃতি ও বদ অভ্যাসের আলোচনা চলে আসছে। আলোচ্য আয়াত أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ أُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ الخ -এর মধ্যেও তাদের এ কর্ম কাণ্ডের উপর বিস্ময় প্রকাশ করা হচ্ছে।

আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল : তৃতীয় হিজরিতে অনুষ্ঠিত ওহুদ যুদ্ধের পর হুয়াই ইবনে আখতাব ও কাব ইবনে আশরাফ ৭০ জন ইহুদি নিয়ে মক্কার কুরাইশদের নিকট উপস্থিত হয়। উদ্দেশ্য হলো প্রিয়নবী ﷺ-এর বিরুদ্ধে কুরাইশদের সাহায্য গ্রহণ এবং তাঁর বিরুদ্ধে কুরাইশদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন। আর প্রিয়নবী ﷺ-এর সঙ্গে ইহুদিরা যে শান্তি চুক্তি করেছিল, তা ভঙ্গ করা এর লক্ষ্য ছিল। মক্কায় পৌছে তারা আবূ সুফিয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো এবং তাদের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করার পর আবূ সুফিয়ান এবং তার সঙ্গীরা বলল, তোমরা হলে আহলে কিতাব। আর মুহাম্মদ ﷺ-এর নিকট আসমানি কিতাব নাজিল হয়। অতএব তোমরা পরস্পর কাছাকাছি এবং আমরা তোমাদের প্রতি আস্থা স্থাপন করতে পারি না। এজন্য তোমরা প্রথমে আমাদের মূর্তিগুলোকে সেজদা কর, যাতে করে আমরা তোমাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি এবং তোমাদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারি। তখন তারা মূর্তিকে সেজদা করে। অতঃপর আবূ সুফিয়ান তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে তোমাদের মতে, আমরা সুপথগামী নাকি মুহাম্মদ ﷺ? তখন কা'ব জিজ্ঞাসা করে মুহাম্মদ ﷺ কি বলেন? তারা বললো, এক আল্লাহর ইবাদত করতে আদেশ দেয়, মূর্তি পূজা করতে নিষেধ করে, আমাদের পূর্ব পুরুষদের ধর্মকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়। তাই আমাদের পরস্পরের মধ্যে তাঁর কারণে পার্থক্য এবং দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে। তখন কা'ব বলে, তোমাদের ধর্ম কি? জবাবে আবূ সুফিয়ান বলে, আমরা তো আল্লাহর ঘরের মুতাওয়াল্লী। হাজীদের পানাহারের ব্যবস্থা করি। তখন কাব বলে, মুসলমানদের চেয়ে তোমরাই সুপথ প্রাপ্ত। তারপর তারা সিদ্ধান্ত করে যে, ৩০ জন ইহুদি এবং ৩০ জন মক্কাবাসী কাবা শরীফ স্পর্শ করে অঙ্গীকার করবে যে, আমরা ইসলামের বিরুদ্ধে যৌথ অভিযান করবো। তখন আলোচ্য আয়াতখানি নাজিল হয়। ইরশাদ হয়েছে أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ أُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ অর্থাৎ, হে রাসূল ﷺ! আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি, যাদেরকে আসমানি কিতাবের কিছু অংশ দান করা হয়েছে। তাঁরা মূর্তি এবং শয়তানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। আর কাফেরদেরকে বলে, তোমরা মুসলমানদের চেয়ে সুপথগামী। তারা এসব লোক, যাদের উপর আল্লাহপাক লানত করেছেন। আর আল্লাহ যার প্রতি লানত করেন তার জন্য কোনো সাহায্যকারী আপনি পাবেন না, তার আজাব থেকে বাঁচাবার মতো কেউ তার জন্য পাবেন না। –[নূরুল কুরআন খ. ৫, পৃ. ৮৪, তাফসীর কাবীর খ. ৯, পৃ. ১৩, মাজহারী খ. ৩, পৃ. ১৩৩]

اَلْجِبْتُ وَالطَّاغُوْتُ [জিবত ও তাগুতের ব্যাখ্যা] : ওলামায়ে কেরাম জিবত ও তাগুতের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন রকম উক্তি পেশ করেছেন। তা থেকে নিম্নে কয়েকটি উক্তি প্রদত্ত হয়েছে।

১. ইকরামা (রা.) -এর মতে, জিবত ও তাগুত কুরাইশদের দুটি মূর্তির নাম। যাদের সেজদা করে ইহুদিরা কুরাইশদের সাথে চুক্তি সম্পাদন করেছিল এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট করেছিল।
২. আবূ উবাইদা (রা.) বলেন, জিব্‌ত ও তাগুত আল্লাহ ব্যতীত যে কোনো বাতিল উপাস্যকে বলে।
৩. ইমাম যাহহাক (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতে হুয়াই ইবনে আখতাবকে জিবত এবং কাব ইবনে আশরাফকে তাগুত বলা হয়েছে।
৪. ইমাম শাবী ও মুজাহিদ (র.) বলেন, জিবতের অর্থ হচ্ছে যাদু আর তাগুতের অর্থ হচ্ছে শয়তান।
৫. মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (র.) বলেন, জিবতের অর্থ হলো গণক আর তাগুতের অর্থ হলো যাদুকর।
৬. সাঈদ ইবনে জুবায়ের ও আবুল আলিয়া এর বিপরীত বলেছেন। অর্থাৎ জিবতের অর্থ যাদুকর এবং তাগুতের অর্থ গণক।
৭. আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানীপতী (র.) বলেন, জিবতের উদ্দেশ্য হলো ঐ মূর্তি যার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। আর তাগুতের উদ্দেশ্য হলো মূর্তির শয়তান। প্রত্যেক মূর্তির একটি শয়তান থাকে, যে মূর্তির ভেতরে থেকে কথা বলে এবং তা দ্বারা লোকদেরকে প্রতারিত করে। –[তাফসীরে মাজহারী খ. ৩, পৃ. ১৩৪]
৮. কাশশাফ প্রণেতা আল্লামা যামাখশরী বলেন, জিবত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মূর্তি এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য যে কোনো উপাস্য। আর তাগুত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শয়তান।
৯. জিবতের অর্থ– হচ্ছে প্রতিমা, আর তাগুতের অর্থ হলো প্রতিমাদের ভাষ্যকারগণ, যারা প্রতিমাদের তরফ থেকে অজস্র মিথ্যা ব্যাখ্যা করে লোকদেরকে বিভ্রান্ত করে থাকে। এই উক্তিটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে। –[তাফসীরে কাবীর খ. ৯, পৃ. ১৩৩]

উল্লিখিত সকল অর্থই জিবত ও তাগুতের ব্যাপক অর্থের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

অনুবাদ :

٥٣. اَمْ بَلْ اَلَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ اَىْ لَيْسَ لَهُمْ شَىْءٌ مِنْهُ وَلَوْ كَانَ فَاِذًا لَّا يُؤْتُوْنَ النَّاسَ نَقِيْرًا اَىْ شَيْئًا تَافِهًا قَدْرَ النُّقْرَةِ فِىْ ظَهْرِ النَّوَاةِ لِفَرْطِ بُخْلِهِمْ.

৫৩. তাদের জন্য কি রাজত্বে কোনো অংশ রয়েছে? অর্থাৎ রাজত্বে তাদের কোনো অংশই নেই। যদি তাই হতো, তবে তারা অন্যান্য লোকদেরকে তিল পরিমাণ বস্তুও তথা কৃপণতার কারণে খেজুরের খোসা পরিমাণও দিত না।

٥٤. اَمْ بَلْ اَيَحْسُدُوْنَ النَّاسَ اَىِ النَّبِىَّ ﷺ عَلٰى مَاۤ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ مِنَ النُّبُوَّةِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ اَىْ يَتَمَنَّوْنَ زَوَالَهُ عَنْهُ وَيَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ نَبِيًّا لَاشْتَغَلَ عَنِ النِّسَاءِ فَقَدْ اٰتَيْنَاۤ اٰلَ اِبْرَاهِيْمَ جَدَّهُ كَمُوْسٰى وَدَاوٗدَ وَسُلَيْمَانَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ النُّبُوَّةَ وَاٰتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا فَكَانَ لِدَاوٗدَ تِسْعٌ وَّتِسْعُوْنَ اِمْرَاَةً وَلِسُلَيْمٰنَ اَلْفٌ مَا بَيْنَ حُرَّةٍ وَّسُرِّيَّةٍ.

৫৪. বরং তারা মানুষকে তথা নবী করীম ﷺ -কে হিংসা করে এ কারণে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর স্বীয় অনুগ্রহ তাকে দান করেছেন তথা নবুয়ত ও অধিক স্ত্রীদান করেছেন। তারা তার থেকে সেই অনুগ্রহ বিদূরিত হওয়ার কামনা করে। আর বলে, যদি তিনি নবী হতেন, তবে নারীদের থেকে বিমুখ থাকতেন। নিশ্চয়ই আমি মুহাম্মদ ﷺ -এর শ্রদ্ধাভাজন দাদা ইবরাহীম (আ.) -এর বংশধরকে যেমন- মূসা, দাউদ ও সুলাইমান (আ.)-কে কিতাব এবং হেকমত তথা নবুয়ত দান করেছি এবং তাঁদেরকে দিয়েছি বিশাল রাজত্ব। সুতরাং হযরত দাউদ (আ.) -এর নিরানব্বই জন স্ত্রী আর হযরত সুলাইমান (আ.) -এর স্বাধীন স্ত্রী ও দাসী মিলে একহাজার ছিল।

٥٥. فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ بِمُحَمَّدٍ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ اَعْرَضَ عَنْهُ فَلَمْ يُؤْمِنْ وَكَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا عَذَابًا لِمَنْ لَا يُؤْمِنُ.

৫৫. অতঃপর অনেকে তাঁর তথা মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি ঈমান এনেছে এবং অনেকে তাঁর থেকে বিরত রয়েছে তাই ঈমান আনেনি। যারা ঈমান আনেনি তাদের শাস্তির জন্য দোজখের অগ্নি শিখাই যথেষ্ট।

٥٦. اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نُدْخِلُهُمْ نَارًا يَحْتَرِقُوْنَ فِيْهَا كُلَّمَا نَضِجَتْ اِحْتَرَقَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا بِاَنْ تُعَادَ اِلٰى حَالِهَا الْاَوَّلِ غَيْرَ مُحْتَرِقَةٍ لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ لِيُقَاسُوْا شِدَّتَهٗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا لَا يُعْجِزُهٗ شَىْءٌ حَكِيْمًا فِىْ خَلْقِهٖ

৫৬. নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, আমি অচিরেই তাদেরকে দোজখে প্রবেশ করাব, তাতে তারা বিদগ্ধ হতে থাকবে। যখন তাদের চামড়া জ্বলে যাবে, তৎক্ষণাৎ আমি অন্য চামড়া পরিবর্তন করে দেব। এরকমভাবে যে, পূর্বের অদগ্ধাবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে, যেন তারা আজাবের আস্বাদন গ্রহণ করতে পারে। তথা আজাবের তীব্রতা অনুভব করতে পারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মহাপরাক্রমশালী, তাঁকে কোনো বস্তুই অপারঙ্গম করতে পারে না, [এবং] স্বীয় সৃষ্টি সম্পর্কে হেকমতের অধিকারী।

٥٧. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا لَهُمْ فِيْهَا اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ مِنَ الْحَيْضِ وَكُلِّ قَذَرٍ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيْلًا دَائِمًا لَا تَنْسَخُهُ شَمْسٌ هُوَ ظِلُّ الْجَنَّةِ.	৫৭. আর যারা ঈমান এনেছে ও নেককাজ করেছে, অবশ্যই আমি তাদেরকে প্রবেশ করাব এমন বেহেশতে যার তলদেশে প্রবাহিত হয়েছে প্রশ্রবণসমূহ। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। সেখানে তাদের জন্য ঋতুস্রাব এবং যে কোনো নোংরামি থেকে পবিত্র স্ত্রীগণ রয়েছে। আর আমি তাদেরকে স্থায়ী ছায়ায় প্রবেশ করাব যাকে সূর্যের কিরণ দূরীভূত করতে পারবে না। আর তা হচ্ছে বেহেশতের ছায়া।

তাহকীক ও তারকীব

نَقِيْرًا - نَقِيْرٌ - فَعِيْلٌ এর ওজনে। সামান্যতম বস্তু, তিল পরিমাণ। نَقِيْر মূলত, খেজুরের বীচের খোসার গিড়াকে বলে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, তারা যদি রাজত্ব পেয়ে যেতো, তাহলে কোর্পণ্যতার দরুন এক তিল পরিমাণ বস্তুও লোকদেরকে দান করতো না।

سَعِيْرًا - سَعِيْرٌ অর্থ প্রজ্বলিত অগ্নি। سَادِنُهَا - خَادِمُهَا - سَادِنٌ অর্থ– খাদেম। ظِلٌّ - ظَلِيْلٌ অর্থ স্থায়ী ছায়া। ছায়ার আধিক্য বুঝাতে ظَلِيْل শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেরূপ বলা হয় لَيْل أَلْيَل

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَاِذًا لَا يُؤْتُوْنَ النَّاسَ نَقِيْرًا **আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত রাজত্বের মর্ম :** ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.) আলোচ্য আয়াতের বর্ণিত রাজত্বের কয়েকটি ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

১. ইহুদিরা বলতো, রাজত্ব ও নবুয়তের অধিকতর উপযুক্ত হলাম আমরা। সুতরাং আরবদের অনুসরণ করবো কেমন করে? আল্লাহপাক তাদের এ দাবিকে আলোচ্য আয়াতে বাতিল প্রমাণিত করেছেন।

২. ইহুদিরা বলতো, শেষ জমানায় রাজত্ব তাদের হাতে চলে আসবে। অর্থাৎ তাদের থেকে এমন লোক বের হবে যে, তাদের রাজত্ব ও ক্ষমতাকে নতুনভাবে মজবুত করে তুলবে এবং লোকদেরকে তাদের ধর্মের প্রতি আহ্বান করবে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহপাক তাদেরকে মিথ্যায়িত করেছেন। ইরশাদ হয়েছে, যদি তাদেরকে রাজত্বের কিছু অংশ প্রদান করা হতো, তবে তারা এরূপ কৃপণতা প্রদর্শন করতো যে, সামান্যতম তিল পরিমাণ বস্তুও কাউকে দিত না। অথচ রাজত্ব ও কৃপণতা একত্রিত হতেই পারে না। –[তাফসীরে কাবীর খ. ৯, পৃ. ১৩৫-৩৬]

অনুবাদ :

٥٨. إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ مَا أُوْتُمِنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحُقُوْقِ إِلٰى أَهْلِهَا ـ نَزَلَتْ لَمَّا أَخَذَ عَلِيٌّ (رضـ) مِفْتَاحَ الْكَعْبَةِ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ الْحَجَبِيْ سَادِنِهَا قَهْرًا لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَمَنَعَهُ وَقَالَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَمْ أَمْنَعْهُ فَأَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِرَدِّهِ إِلَيْهِ وَقَالَ هَاكَ خَالِدَةً تَالِدَةً فَعَجِبَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَرَأَ لَهُ عَلِيٌّ الْاٰيَةَ فَأَسْلَمَ وَأَعْطَاهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لِأَخِيْهِ شَيْبَةَ فَبَقِيَ فِيْ وَلَدِهِ وَالْاٰيَةُ وَإِنْ وَرَدَتْ عَلٰى سَبَبٍ خَاصٍّ فَعُمُوْمُهَا مُعْتَبَرٌ بِقَرِيْنَةِ الْجَمْعِ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ـ إِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا فِيْهِ إِدْغَامُ مِيْمِ نِعْمَ فِيْ مَا النَّكِرَةِ الْمَوْصُوْفَةِ أَيْ نِعْمَ شَيْئًا يَعِظُكُمْ بِهِ ـ تَادِيَةِ الْأَمَانَةِ وَالْحُكْمِ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا لِمَا يُقَالُ بَصِيْرًا بِمَا يُفْعَلُ ـ

৫৮. নিশ্চয়ই আল্লাহপাক তোমাদেরকে আদেশ করছেন, তোমরা যেন ঐ সব প্রাপ্য আমানতসমূহ যা তোমাদের নিকট গচ্ছিত রাখা হয়েছে। প্রাপকের কাছে পৌছে দাও। আলোচ্য আয়াতখানি তখন নাজিল হয়, যখন হযরত আলী (রা.) কাবার খাদেম উসমান ইবনে তালহা হাজাবীর কাছ থেকে জোরপূর্বক ঐ মুহূর্তে কাবাগৃহের চাবি নিয়ে আসেন। যখন হুজুর ﷺ মক্কা বিজয়ের বৎসর মক্কায় তাশরিফ এনেছিলেন, আর ওসমান ইবনে তালহা তাকে চাবি দিতে অস্বীকার করেছিল, এবং সে একথা বলেছিল যে, আমার যদি বিশ্বাস হতো তিনি আল্লাহর রাসূল তবে আমি চাবি দিতে অস্বীকার করতাম না। আয়াতখানি নাজিল হওয়ার পর হুজুর ﷺ হযরত আলীকে ওসমান ইবনে তালহা (রা.) -এর নিকট চাবি ফেরত দিতে নির্দেশ দেন, আর বললেন, এ চাবির খেদমত সর্বদাই তোমাদের নিকট থাকবে। এতে ওসমান বড় আশ্চর্যান্বিত হলো, জবাবে হযরত আলী (রা.) আয়াতটি পাঠ করে শুনালেন, ফলে ওসমান ঈমান নিয়ে আসে। আর ওসমান ইবনে তালহা তার মৃত্যুর সময় চাবিটি তার ভাই শাইবার নিকট দিয়ে যায় এবং তাঁর আওলাদের মধ্যে অদ্যাবধি চাবি রাখার খেদমত বহাল রয়েছে। আয়াতটি যদিও বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে কিন্তু বহুবচনীয় শব্দ ব্যবহৃত হওয়ার দরুন তার ব্যাপক অর্থই গ্রহণীয় হবে। আর তোমরা যখন মানুষের মধ্যে কোনো বিচার মীমাংসা করতে আরম্ভ কর, তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা যেন ন্যায় ভিত্তিক বিচার মীমাংসা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমানত আদায় ও ন্যায়বিচারের যে বিষয়ে উপদেশ দান করেছেন তা খুবই উত্তম। نِعِمَّا শব্দটিতে نِعْمَ -এর মীম বর্ণটি مَا -ই নাকেরায়ে মাওসূফার মধ্যে ইদগাম হয়েছে। ইবারতের রূপ হবে نِعْمَ شَيْئًا يَعِظُكُمْ بِهِ নিশ্চয়ই আল্লাহপাক সকল কথার [সর্বশ্রোতা] ও সকল কাজের সর্বজ্ঞ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.) তাফসীরে কাবীরে উল্লেখ করেছেন। তথায় বর্ণিত আছে যে, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কা'বা ঘরে প্রবেশ করতে চাইলেন তখন উসমান ইবনে তালহা ইবনে আবদুদ্দার যে ছিল কাবার খাদেম, সে কাবার দরজা বন্ধ করে ছাদের উপর উঠে গেল এবং হুজুর ﷺ-এর নিকট চাবি দিতে অস্বীকৃতি জানালো আর একথা বলল যে, আমি যদি জানতাম আপনি আল্লাহর রাসূল তবে অবশ্যই চাবি দিতে অস্বীকার করতাম না। তখন হযরত আলী (রা.) বল পূর্বক তার হাত থেকে চাবি নিয়ে নেন এবং কাবাঘরের দরজা

খুলে দেন। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ কাবা গৃহের ভিতরে প্রবেশ করে দুই রাকাত নামাজ পড়েন। অতঃপর তিনি যখন বের হলেন তখন তার চাচা হযরত আব্বাস (রা.) চাবিটি তাকে দিয়ে দিতে আবেদন জানালেন, যাতে সে কাবা তথা পানি পান করানোর খেদমতের সাথে সাথে সাদানা তথা চাবি রাখার খেদমতও তার ভাগে এসে যায়। এমন সময় আলোচ্য আয়াত খানা নাজিল হয়। তখন প্রিয়নবী ﷺ হযরত আলী (রা.)-কে নির্দেশ প্রদান করলেন, চাবিটি উসমানের নিকট ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য এবং তার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হওয়ার জন্য। ওসমান হযরত আলী (রা.)-কে বলল, তুমি আমাকে কষ্ট দিয়ে জোরপূর্ব চাবি নিলে অতঃপর এখন আবার ফেরত দিচ্ছ এবং কোমল ব্যবহার দেখাচ্ছে তার কারণ কি?

হযরত আলী (রা.) বললেন, আল্লাহপাক তোমার সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আয়াত নাজিল করে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করে তাকে যখন শুনালেন তখন উসমান আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মদার রাসূলুল্লাহ পাঠ করে মুসলমান হয়ে যায়। এদিকে হযরত জিবরাঈল (আ.) নাজিল হয়ে হুজুরে পাক ﷺ কে আল্লাহর নির্দেশ জানিয়ে দিলেন যে, কাবা ঘরের চারি রাখার খেদমত কিয়ামত পর্যন্ত উসমানের বংশধরদের মধ্যেই থাকবে। এটা হচ্ছে সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব ও মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের উক্তি।

আবূ রওক বলেছেন, হুজুরে পাক ﷺ ওসমান ইবনে তালহাকে বললেন, আমাকে কাবার চাবিটি দিয়ে দাও, সে বলল, আল্লাহর আমানত নিয়ে নিন। অতঃপর যখন তিনি গ্রহণ করতে চাইলেন তখন সে তার হাত গুটিয়ে নিল। অতঃপর দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি বললেন, তুমি যদি আল্লাহ এবং আখেরাতে বিশ্বাসী হও, তবে আমাকে চাবিটি দিয়ে দাও। সে বলল, আল্লাহর আমানত নিয়ে নিন। অতঃপর তিনি যখন তা গ্রহণ করতে চাইলেন তখন সে হাত গুটি নেয়। তৃতীয়বার হুজুর ﷺ এরূপই বললেন, তখন সে আল্লাহর আমানত নিয়ে নিন বলে, চাবিটা হুজুরের হাতে সোপর্দ করে দেয়। অতঃপর নবী করীম ﷺ চাবিটি সঙ্গে নিয়ে তওয়াফ করেন। তারপর বললেন, হে উসমান! তুমি আর আব্বাস যৌথভাবে চাবিটি গ্রহণ করে নাও। ফলে আল্লাহপাক আলোচ্য আয়াতটি নাজিল করেন। অতঃপর হুজুরে পাক ﷺ উসমানকে বললেন, হে ওসমান! তুমি সর্বদার জন্য চাবিটি গ্রহণ কর। এই চাবি কোনো জালিম ব্যতীত কেউ তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিবে না। অতঃপর উসমান যখন হিজরত করে চলে যান তখন চাবিটি তার ভাই শাইবার নিকট দিয়ে যান। আর এই চাবি অদ্যাবধি তার বংশধরদের মধ্যেই রয়েছে।

উসমান ইবনে তালহা (রা.) -এর বিবৃতিতে তাঁর ঘটনা :

ইবনে সাদ ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ আবদরীর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, উসমান ইবনে তালহা বর্ণনা করেছেন, হিজরতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলো। তিনি আমাকে ইসলাম গ্রহণ করতে দাওয়াত দিলেন। আমি বললাম মুহাম্মদ ﷺ ! আশ্চর্যের বিষয় যে, তুমি নিজের সম্প্রদায়ের ধর্মমত ছেড়ে নতুন ধর্মমত নিয়ে এসেছ। আর এবারে তোমার লোভ হয়ে গেছে যে, আমিও তোমার পদাঙ্ককে অনুসরণ করে চলবো। উসমান বললেন, আমি সোমবার ও বৃহস্পতি বার মূর্খতার যুগে কাবা গৃহ খোলতাম। একদা হুজুরে পাক ﷺ অন্যান্য লোকদের সঙ্গে কাবাঘরে প্রবেশ করার ইচ্ছা নিয়ে আসলেন। আমি তাকে কঠোর কথা ও দোষারোপ করলাম। তিনি ধৈর্যধারণ করলেন, অতঃপর বললেন, ওসমান। হয়তো এক দিন এই চাবিটি তুমি আমার হাতে দেখবে, তখন আমি যেখানে ইচ্ছা তাকে ব্যবহার করবো। আমি বললাম, তবে তো সেই কুরাইশ ধ্বংস ও পদদলিত হয়ে যাবে। তিনি বললেন, না তারা তখন প্রতিষ্ঠিত ও সম্মানিত হবে। একথা বলে তিনি কাবার ভিতরে প্রবেশ করে নিলেন। কিন্তু তাঁর একথা আমার অন্তরে রেখাপাত করেছিল। আমার বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে, তিনি যা বলেছেন তা অবশ্যই প্রতিফলিত হবে। তাই আমি মুসলমান হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করি। কিন্তু আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাকে খুবই গালাগালি করলো এবং আমাকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধা প্রদান করলো। মক্কা বিজয়ের দিন যখন আসল তখন তিনি আমাকে বললেন উসমান! চাবি নিয়ে আস, আমি চাবি নিয়ে তাঁর দরবারে উপস্থিত হলাম। তিনি আমার কাছ থেকে চাবি নিয়ে অতঃপর আমার নিকট ফেরত দান করে বললেন, সর্বদার জন্য তুমি এই চাবিটি নিয়ে নাও। জালিম ব্যতীত অন্য কেউ তোমার কাছ থেকে এটা ছিনিয়ে নিতে পারবে না। উসমান! তোমাদেরকে আল্লাহপাক তার ঘরের আমানতদার বানিয়েছেন। সুতরাং এই ঘরের মাধ্যমে তোমাদের যা কিছু অর্জন হয় তা যথারীতি ভোগ কর। আমি যখন ফেরত আসতে শুরু করলাম তখন তিনি আমাকে আহ্বান করলেন। আমি ফিরে গেলে তিনি ফরমালেন, সেই দিনটি কি হয়নি যার কথা আমি পূর্বে তোমার সঙ্গে বলেছিলাম। তার একথা বলায় আমার ঐ কথা স্মরণ হয়ে গেল, যা তিনি হিজরতের পূর্বে বলেছিলেন। আমি বললাম, অবশ্যই স্মরণ হয়েছে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসূল।-[মাজহারী খ. ৩, পৃ. ১৪২-১৪৩]

এই ঘটনাটিকে আল্লামা হাফেজ ইমাদুদ্দীন ইবনে কাছীর (র.) আরো বিস্তারিত ভাবে লিখেছেন। বর্ণিত আছে যে, যখন রাসূলে কারীম ﷺ মক্কা বিজয় করেন এবং বায়তুল্লাহ শরীফ প্রাঙ্গনে তাশরিফ আনেন এবং বায়তুল্লাহ শরীফের চাবি রক্ষক উসমান ইবনে তালহাকে ডেকে চাবি দিতে বললেন, তিনি চাবি দিতে চাইলেন। এমন সময় হযরত আব্বাস (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! চাবিটি আমাকে দান করুন, যে আমাদের বংশে হাজীদের খেদমত, জমজমের পানি পান করানো এবং চাবিটি রক্ষা করার দায়িত্ব থাকে। এই কথা শুনে হযরত উসমান ইবনে তালহা (রা.) চাবি দিতে বিরত রইলেন। প্রিয়নবী ﷺ দ্বিতীয় বার চাবি চাইলেন, তখন পূর্ব ঘটনার পূনরাবৃত্তি হলো।

তিনি তৃতীয় বার চাবি দিতে আদেশ দিলেন। তখন উসমান ইবনে তালহা (রা.) এই কথা বলে দিলেন যে, আল্লাহর আমানত স্বরূপ দিলাম। হুজুর ﷺ দরজা খোলে ভিতরে প্রবেশ করেন। কাবা শরীফের ভিতরে যেসব মূর্তি ছিল সেগুলো ভেঙ্গে বাইরে ফেলে দিলেন এবং সেই স্থানসমূহ পানি দ্বারা ধৌত করলেন। অতঃপর বাইরে এসে কাবা শরীফের দ্বার প্রান্তে দণ্ডায়মান হয়ে ঘোষণা করলেন, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি তাঁর অঙ্গীকারকে সত্য প্রমাণিত করেছেন। তিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন, সকল শত্রু সৈন্যকে তিনি পরাজিত করেছেন। অতঃপর তিনি এক সুদীর্ঘ ভাষণ দেন। এই ভাষণে তিনি ঘোষণা করেন, জাহেলিয়াতের যুগের সকল কলহ দ্বন্দ্ব এখন আমার পায়ের তলে। সেই কলহ দ্বন্দ্ব কোনো আর্থিক ব্যাপারে হোক বা প্রাণের ব্যাপারে হোক। তবে হ্যাঁ বায়তুল্লাহ শরীফের চাবি রক্ষা করা এবং হাজীদেরকে জমজমের পানি পান করানোর দায়িত্ব পূর্বের ন্যায়ই থাকবে। এই ভাষণ শেষ করে উপবেশন করার সঙ্গে সঙ্গে হযরত আলী (রা.) অগ্রসর হয়ে আরজ করলেন, আমাকে চাবিটি দান করুন যেন বায়তুল্লাহ শরীফের চাবি রক্ষা করা এবং হাজীদের জমজমের পানি পান করানোর দায়িত্ব আমাদের উপরই থাকে। কিন্তু প্রিয়নবী ﷺ চাবি হযরত আলী (রা.) কে দিলেন না। তিনি মাকামে ইবরাহীমকে কাবা শরীফের ভিতর থেকে বের করে এনে দেওয়ালের সঙ্গে রেখে দিলেন এবং ঘোষণা করলেন, এই হলো তোমাদের কেবলা। অতঃপর তিনি তওয়াফে মশগুল হয়ে গেলেন। দুবার কাবা শরীফ প্রদক্ষিণ করার পর হযরত জিবরাঈল (আ.) নাজিল হলেন। তখন প্রিয়নবী ﷺ আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করতে শুরু করলেন। তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কোরবান হোক। আমি ইতিপূর্বে আপনাকে এই আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করতে শুনিনি। অতঃপর প্রিয়নবী ﷺ হযরত উসমান ইবনে তালহা (রা.) কে ডাকলেন এবং কাবা শরীফের চাবি তাকে প্রদান করলেন এবং বললেন, আজকের দিন অঙ্গীকার রক্ষার, সৎকাজ করার এবং ভালো ব্যবহার করার দিন। –[ইবনে কাছীর খ. ৫, পৃ. ৫১]

আমানত রক্ষার নির্দেশ : এই আয়াতে আল্লাহপাক মু'মিনদেরকে আমানত রক্ষার বিশেষ নির্দেশ প্রদান করেছেন। যদিও এই আয়াত হযরত উসমান ইবনে তালহা (রা.) -এর পক্ষে তাকে কা'বা শরীফের চাবি প্রদান সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, কিন্তু এতে সর্বপ্রকার আমানত রক্ষার বিশেষ তাকিদ রয়েছে। কেননা তাফসীরবিদগণের একটি মূলনীতি রয়েছে– اَلْعِبْرَةُ بِعُمُوْمِ اللَّفْظِ لَا لِخُصُوْصِ السَّبَبِ একথা সর্বজন বিদিত যে, মানুষের সম্পর্ক সাধারণত তিন প্রকার–

১. মানুষের সম্পর্ক তার স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহর সঙ্গে।
২. মানুষের সম্পর্ক সকল বান্দার সাথে।
৩. মানুষের সম্পর্ক তার নিজের সঙ্গে।

আমানতের প্রশ্ন সকল সম্পর্কের ব্যাপারেই উত্থিত হয় এবং সর্ব ক্ষেত্রে আমানতের হেফাজত ও আমানত আদায় করতে হয়। –[তাফসীরে নুরুল কুরআন খ. ৫, পৃ. ৯৭]

وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে বিচারকদেরকে ইনসাফের সাথে বিচার মীমাংসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক হাদীসে এসেছে বিচারক যতক্ষণ পর্যন্ত জুলুম করে না ততক্ষণ আল্লাহপাক তাঁর সঙ্গে থাকেন। আর যখন সে জুলুম করে বসে তখন আল্লাহ পাক তাকে তার নিজের দিকে সোপর্দ করে দেন। ইহুদিদের এই অভ্যাস ছিল যে, তারা আমানতের মধ্যে খেয়ানত করতো, মামলা মুকাদ্দমার ফয়সালায় ঘুষ প্রভৃতির কারণে পক্ষপাতিত্ব করতো। ইহুদিরা ব্যক্তিগত এবং সাম্প্রদায়িক স্বার্থের কারণে নির্দ্বিধায় ইনসাফের গলায় ছুরি চালিয়ে দিতো। এই জন্য উল্লিখিত দুটি বস্তু থেকে মুসলমানদেরকে বিরত থাকতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। –[জামালাইন খ. ২, পৃ. ৫১]

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক بَيْنَ النَّاسِ বলেছেন, بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ কিংবা بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ বলেননি। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে, বিচার মীমাংসার ক্ষেত্রে সকল মানুষই বরাবর, মুসলমান হোক বা অমুসলিম, বন্ধু হোক বা শত্রু, স্বদেশী হোক বা ভিনদেশী, একই বর্ণ ও ভাষার হোক বা নাই হোক, বিচার মীমাংসাকারীদের ফরজ হলো এসব সম্পর্কের ঊর্ধ্বে থেকে হক ও ইনসাফ মোতাবেক ফয়সালা করা।

* হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (র.) হতে বর্ণিত। রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, ইনসাফকারীগণ কিয়ামতের দিন রাহমানের ডান হাতের দিকে নূরের মিম্বরের উপর থাকবে। আর রহমানের হাত উভয়টাই ডান। আর তারা হবে ঐ সব লোক, যারা বিচার মীমাংসার ফয়সালায় উভয় পক্ষের ব্যাপারে এবং নিজের কর্তৃত্বাধীন বিষয়াদিতে ইনসাফ করে থাকে। –[মুসলিম]
* হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহর সর্বাধিক প্রিয় ও নৈকট্যতম ব্যক্তি হবে ইনসাফগার হাকিম, বিচারক। আর কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম ও কঠিনতম শাস্তির উপযুক্ত হবে জালিম বিচারক বা শাসক। –[তিরমিযী]

৫৯. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى اَصْحَابَ الْاَمْرِ اَيِ الْوُلَاةَ مِنْكُمْ اِذَا اَمَرُوْكُمْ بِطَاعَةِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ اِخْتَلَفْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ اَىْ كِتَابِهٖ وَالرَّسُوْلِ مُدَّةَ حَيَاتِهٖ وَبَعْدَهٗ اِلٰى سُنَّتِهٖ اَىْ اِكْشِفُوْا عَلَيْهِ مِنْهُمَا اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ اَيِ الرَّدُّ اِلَيْهِمَا خَيْرٌ لَّكُمْ مِنَ التَّنَازُعِ وَالْقَوْلِ بِالرَّاْيِ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا مَاٰلًا -

অনুবাদ :

৫৯. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর অনুসরণ কর এবং রাসূলের অনুসরণ কর এবং তোমাদের বিচারকদের অনুসরণ কর যখন তারা তোমাদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের নির্দেশ প্রদান করে। অতঃপর যদি কোনো বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ কর, তাহলে সে বিষয়কে আল্লাহ তা'আলার তথা তাঁর কিতাবের প্রতি এবং রাসূলের জীবদ্দশায় রাসূলের প্রতি এবং তাঁর তিরোধানের পর তাঁর সুন্নতের প্রতি অর্পণ কর, অর্থাৎ সে বিষয়ের সমাধান কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে জেনে নাও। যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলা ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাস করে থাক, এটি তথা কুরআন ও সুন্নাহের প্রতি অর্পণ করা তোমাদের জন্য ঝগড়া ও আপন রায় মত বলার চেয়ে উত্তম এবং পরিণতির দিক দিয়েও শ্রেয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ الخ আয়াতের শানে নুযূল :

১. বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ সকলেই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) -এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়েছে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুজাফা (রা.) সম্পর্কে, যাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুজাহিদদের একদল দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন।

২. ইবনে জারীর এবং ইবনে হাতেম সুদ্দির বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, রাসূলে কারীম ﷺ হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদের নেতৃত্বে মুজাহিদদের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। এই বাহিনীতে হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.) -ও ছিলেন, যাদের উপর আক্রমণ করার পরিকল্পনা ছিল তাদের নিকট এই বাহিনী অতি প্রত্যুষে পৌঁছল। কিন্তু সেখানকার লোকেরা পলাতক ছিল, শুধু একজন লোক উপস্থিত ছিল। সে ব্যক্তি হযরত আম্মার (রা.) -এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করলো এবং কালেমায়ে শাহাদত পাঠ করল। হযরত আম্মার (রা.) বললেন, তুমি এখানেই থাকো, মুসলমান হওয়ার উপকার তুমি পাবে। অতঃপর হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.) যখন ঐ ব্যক্তির উপর হামলা করলেন, তখন হযরত আম্মার (রা.) বললেন, এই ব্যক্তিকে ছেড়ে দাও, সে মুসলমান হয়ে গেছে এবং আমার আশ্রয়ে এসে গেছে। তখন হযরত খালেদ ও আম্মারের মধ্যে এ বিষয়ে তর্ক হলো। এমন কি মদিনায় প্রত্যাবর্তনের পর তারা উভয়ে বিষয়টি প্রিয়নবী ﷺ -এর খেদমতে পেশ করলেন। তিনি আম্মারের আশ্রয় দেওয়ার কথা ঠিক রাখলেন। কিন্তু ভবিষ্যতে যেন নেতার কথার বরখেলাফ না করা হয় সে বিষয়ে তাকিদ করলেন। স্বয়ং প্রিয়নবী ﷺ -এর সামনেও উভয়ের মধ্যে কিছু কথা কাটাকাটি হলো। তখন প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করলেন, হে খালেদ! আম্মারকে গালি দিয়ো না। যে আম্মারকে গালি দিবে আল্লাহ পাক তাকে মন্দ বলবেন। যে আম্মারের প্রতি লানত দিবে আল্লাহপাক তার প্রতি লানত দিবেন। এই ফরমান শুনে হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ সঙ্গে সঙ্গে হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসিরের নিকট ক্ষমা প্রার্থী হলেন, এবং হযরত আম্মার তার প্রতি রাজি হলেন। তখন এই আয়াত নাজিল হয়।

-[রূহুল মা'আনী খ. ৫, পৃ. ৫৬, তাফসীরে মাজহারী খ. ৩, পৃ. ১৪৭-৪৮]

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত اُولِى الْاَمْرِ -এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর আনুগত্য এবং রাসূল ﷺ -এর আনুগত্যকে আবশ্যকীয় করা হয়েছে। আল্লাহপাকের ইরশাদ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ দ্বারা এবং হুজুরে পাক ﷺ -এর তিরোধানের পর কুরআন ও সুন্নাহর আনুগত্য করা ফরজ প্রমাণিত হয়েছে। এবং اُولِى الْاَمْرِ দ্বারা ইজমায়ে উম্মত ও শরয়ী

কিয়াস দলিল হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত উলিল আমরের ব্যাখ্যায় ওলামাদের বিভিন্ন রকম উক্তি বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি উক্তি বিবৃত হচ্ছে–

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– هُمُ الْعُلَمَاءُ وَالْفُقَهَاءُ তারা হলেন, ওলামা ও ফুকাহাগণ। যারা লোকদেরকে তাদের ধর্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান শিক্ষাদান করেন। হাসান যাহহাক ও মুজাহিদও এ মতই পোষণ করেন।

২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, তারা হলেন ইসলামি রাষ্ট্রের শাসকবর্গ ও গভর্নরগণ। হযরত ইবনে আব্বাস থেকেও এরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

* হযরত আলী (রা.) বলেন, ইসলামি রাষ্ট্রের শাসকের উপর আবশ্যকীয় হলো, আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার মীমাংসা করা এবং যথাযথ ভাবে আমানত আদায় করা। তারা যদি এরূপ করে নেয় তবে নাগরিকদের কর্তব্য হলো তাদের কথা মান্য করা এবং তাদের আনুগত্য করা।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَطَاعَنِىْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَمَنْ يُطِعِ الْاَمِيْرَ فَقَدْ اَطَاعَنِىْ وَمَنْ يَعْصِ الْاَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِىْ .

অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে আমার আনুগত্য করল সে বস্তুত আল্লাহর আনুগত্য করল, আর যে আমার বিরুদ্ধাচারণ করল সে আল্লাহর বিরুদ্ধাচারণ করল, আর যে আমির বা শাসকের আনুগত্য করল, সে আমার আনুগত্য করল, আর যে আমিরের বিরুদ্ধাচারণ করল সে আমার বিরুদ্ধাচারণ করল।

* হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য আমিরের কথা শ্রবণ করা ও মান্য করা, চায় তাঁর পছন্দ হোক বা নাই হোক। তবে হ্যাঁ যদি তিনি আল্লাহর নাফরমানির জন্য নির্দেশ প্রদান করেন তখন তার সেই নির্দেশ শুনাও যাবে না এবং গ্রহণ করাও যাবে না। বরং হাদীস অনুযায়ী তার সেই রকম নির্দেশ পালন না করাটাই ওয়াজিব। কেননা ইরশাদ হয়েছে لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ অর্থাৎ স্রষ্টার বিরুদ্ধাচারণে যে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করা বৈধ নয়।

৩. মায়মুন ইবনে মেহরান বলেন, উলিল আমরের মানে হচ্ছে বিভিন্ন দিকে প্রেরিত ছোট ছোট সৈন্যদলের আমির বা নেতাগণ। কেননা আয়াতটি তো তাদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছিল।

৪. হযরত ইকরামা (রা.) বলেন, উলিল আমরের উদ্দেশ্য হলো হযরত আবূ বকর ও ওমর (রা.)। কেননা হযরত হুযায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– اِنِّىْ لَا اَدْرِىْ مَابَقَائِىْ فِيْكُمْ فَاقْتَدُوْا بِالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِىْ اَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ অর্থাৎ, আমি তোমাদের মধ্যে কতদিন জীবিত থাকবো জানিনা। সুতরাং তোমরা আমার পর আবূ বকর ও ওমরের অনুসরণ করবে। [তিরমিযী]

৫. কারো মতে, উলিল আমরের উদ্দেশ্য হচ্ছে সকল সাহাবায়ে কেরাম। কেননা হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে, রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, اَصْحَابِىْ كَالنُّجُوْمِ بِاَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ অর্থাৎ, আমার সাহাবাগণ আকাশের নক্ষত্রের মতো, তাদের যে কাউকে তোমরা যদি অনুসরণ কর তবে হেদায়েত পেয়ে যাবে। হযরত হাসান (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, مَثَلُ اَصْحَابِىْ فِىْ اُمَّتِىْ كَالْمِلْحِ فِى الطَّعَامِ لَا يَصْلُحُ الطَّعَامُ اِلَّا بِالْمِلْحِ অর্থাৎ, আমার উম্মতের মধ্যে আমার সাহাবাদের উদাহরণ হচ্ছে খাদ্যে লবণের মতো, খাদ্য দ্রব্য লবণ ব্যতীত খাবার উপযোগী হতে পারে না।

আল্লামা তাবারী (র.) বলেন, যারা বলেছেন, উলিল আমরের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমির শাসক ও গভর্নরগণ তাদের উক্তিটাই অধিকতর বিশুদ্ধ।

আল্লামা যাজ্জাজ বলেন, যারা মুসলমানদের ধর্মীয় ব্যাপারে এবং তাদের কল্যাণে ব্যস্ত তারা সকলেই উলিল আমরের অন্তর্ভুক্ত। –[তাফসীরে খাযেন খ. ১, পৃ. ৩৯২-৯৩]

ইজতেহাদ ও কিয়াসের প্রমাণ : فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ আয়াতে আল্লাহ পাক নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমাদের মাঝে যদি কোনো বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়, তবে তোমরা তা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি প্রত্যাবর্তন কর।

কিতাব ও সুন্নাহর বা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি প্রত্যাবর্তনের দুটি দিক রয়েছে। ১. তোমরা কিতাব ও সুন্নাহর সরাসরি হুকুম-আহকামের প্রতি প্রত্যাবর্তন কর। ২. কোনো বিষয়ে যদি কুরআন ও সুন্নাহর কোনো সরাসরি নির্দেশ না থাকে, তবে সেসব সরাসরি নস-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উদাহরণ সমূহের উপর কেয়াস করে সে দিকে প্রত্যাবর্তন কর। এখানে فَرُدُّوْهُ শব্দটি সব দিকেই ব্যাপক। –[মা'আরিফুল কুরআন খ. ২, পৃ. ৫০৫]

٦٠. وَنَزَلَ لَمَّا اخْتَصَمَ يَهُوْدِيٌّ وَمُنَافِقٌ فَدَعَا الْمُنَافِقُ اِلٰى كَعْبِ بْنِ الْاَشْرَفِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمَا وَدَعَا الْيَهُوْدِيُّ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاَتَيَاهُ فَقَضٰى لِلْيَهُوْدِيْ فَلَمْ يَرْضَ الْمُنَافِقُ وَاَتَيَا عُمَرَ فَذَكَرَ لَهُ الْيَهُوْدِيُّ ذٰلِكَ فَقَالَ لِلْمُنَافِقِ اَكَذٰلِكَ قَالَ نَعَمْ فَقَتَلَهُ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ الْكَثِيْرِ الطُّغْيَانِ وَهُوَ كَعْبُ بْنُ الْاَشْرَفِ وَقَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ وَلَا يُوَالُوْهُ وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًا بَعِيْدًا عَنِ الْحَقِّ .

٦١. وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِى الْقُرْاٰنِ مِنَ الْحُكْمِ وَاِلَى الرَّسُوْلِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ يُعْرِضُوْنَ عَنْكَ اِلٰى غَيْرِكَ صُدُوْدًا .

অনুবাদ :

৬০. [সামনের আয়াতটি] তখন নাজিল হয়, যখন জনৈক ইহুদি ও মু'নাফিকের মধ্যে কোনো বিষয়ে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়ে পড়ে, ফলে মুনাফিক চাইল বিষয়টি কা'ব ইবনে আশরাফের কাছে নিয়ে যেতে, যাতে সে উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দিতে পারে। আর ইহুদি ব্যক্তি বিষয়টি নবীয়ে করীম ﷺ-এর দরবারে বিষয়টি নিয়ে যেতে বলল। পরিশেষে তারা উভয়ে হুজুর ﷺ-এর দরবারে বিষয়টি নিয়ে আসলে তিনি ইহুদির পক্ষে রায় দিয়ে দিলেন। তবে এই রায়ের প্রতি মু'নাফিক ব্যক্তি সন্তুষ্ট হলো না। তাই তারা উভয়ে [ছানী বিচারের জন্য] হযরত ওমর (রা.) -এর নিকট আসল। তবে ইহুদি ব্যক্তি হযরত ওমর (রা.) -এর নিকট হুজুর ﷺ-এর কৃত বিচার মীমাংসার কথাটিও উল্লেখ করে দিল। হযরত ওমর (রা.) মুনাফিক লোকটিকে বললেন, ব্যাপারটা কি তাই? মুনাফিক বলল, জী হ্যাঁ। [তা শুনে] হযরত ওমর (রা.) তাকে হত্যা করে ফেললেন। হে রাসূল ﷺ! আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি? যারা দাবি করে যে, তারা সেই কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেই কিতাবসমূহের প্রতিও যা আপনার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা নিজেদের মামলা তাগুত-শয়তানের নিকট নিয়ে যেতে চায়। তাগুত বলা হয় অধিক সীমালঙ্ঘন কারীকে। আর সে হচ্ছে কা'ব ইবনে আশরাফ। অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে যাতে তারা তাকে অমান্য করে এবং তার সাথে বন্ধুত্ব না রাখে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে হক থেকে বহুদূরে সরিয়ে রাখতে চায়।

৬১. আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা কুরআনের সেই হুকুমের দিকে আস, যা আল্লাহ পাক অবতীর্ণ করেছেন এবং তাঁর রাসূলের দিকে আস, যাতে তিনি তাদের মধ্যে ফয়সালা করতে পারেন। তখন আপনি মুনাফিকদেরকে দেখবেন যে, তারা আপনার নিকট থেকে সম্পূর্ণ রূপে দূরে সরে অন্যদের দিকে চলে যাচ্ছে।

٦٢. فَكَيْفَ يَصْنَعُوْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ عُقُوْبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ مِنَ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِيْ اَيْ اَيَقْدِرُوْنَ عَلَى الْاِعْرَاضِ وَالْفِرَارِ مِنْهَا لَا ثُمَّ جَآءُوْكَ مَعْطُوْفٌ عَلٰى يَصُدُّوْنَ يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ اِنْ مَا اَرَدْنَا بِالْمُحَاكَمَةِ اِلٰى غَيْرِكَ اِلَّآ اِحْسَانًا صُلْحًا وَّتَوْفِيْقًا تَالِيْفًا بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ بِالتَّقْرِيْبِ فِى الْحُكْمِ دُوْنَ الْحَمْلِ عَلٰى مُرِّ الْحَقِّ .

৬২. তখন তাদের কি অবস্থা হবে তথা তারা কি করবে? যখন তাদের কৃতকর্ম তথা কুফর ও পাপের কারণে তাদের উপর কোনো বিপদ তথা শাস্তি এসে পড়বে। অর্থাৎ তারা কি সেই বিপদ থেকে এড়িয়ে এবং পলায়ন করে যেতে পারবে? না পারবে না। অতঃপর তারা আপনার নিকট আসবে, جَآءُوْكَ -এর আতফ يَصُدُّوْنَ -এর উপর হয়েছে। আল্লাহর নামে শপথ করে তারা বলবে যে, অন্যের নিকট মকদ্দমা নিয়ে যাওয়াতে কল্যাণ তথা সন্ধি এবং ফয়সালাতে ইনসাফ করত বাদী-বিবাদীর মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি করাই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। হকের তিক্ততার বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করা নয়।

তাহকীক ও তারকীব

اَلَمْ تَرَ আপনি কি দেখেননি, লক্ষ্য করেননি? এ দ্বারা নবীয়ে কারীম ﷺ কে সম্বোধন করা হয়েছে। اَلزَّعْمُ - يَزْعُمُوْنَ সত্য বা মিথ্যা বলা। এই শব্দটি বিপরীতার্থ বোধক শব্দাবলির অন্তর্ভুক্ত। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্দেহযুক্ত ও প্রমাণহীন উক্তির বেলায় زَعْمٌ শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কোনো কোনো সময় সত্য কথার ক্ষেত্রেও তার ব্যবহার হয়।

যেমন হাদীস শরীফে এসেছে زَعَمَ جِبْرَئِيْلُ যেমন ইমাম ইবনে ছা'লাবা (র.) -এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসে এসেছে زَعَمَ رَسُوْلُكَ ইমামুন নুহাত আল্লামা সীবওয়াই তার জগত বিখ্যাত কিতাব কিতাবে সীবওয়াই -এর মধ্যে তদীয় উস্তাদ খলীল ইবনে আহমদের উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে প্রায়ই বলেছেন - زَعَمَ الْخَلِيْلُ كَذَا [আল্লামা খলীল এরূপ বলেছেন] তবে এখানে يَزْعُمُوْنَ -এর অর্থ হলো يَدَّعُوْنَ অর্থাৎ, মিথ্যা দাবি করা। কেননা আয়াতটি নাজিল হয়েছে মু'নাফিকদের সম্পর্কে।

يُرِيْدُوْنَ - وَقَدْ اُمِرُوْا থেকে হাল হয়েছে। اَنَّهُمْ ও তার مَعْمُوْل দুই মাফঊলের স্থলবর্তী হয়েছে। اَلَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ - يُرِيْدُوْنَ -এর যমীরে ফায়েল থেকে হাল হয়েছে। ضَلَالًا بَعِيْدًا মুরাক্কাবে তাওসীফী হয়ে اَنْ يُّضِلَّ ফে'লের মাফঊলে মুতলাক হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতগুলোর সকল বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফয়সালার প্রতি চলে আসার নির্দেশ ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে শরিয়ত বিরুদ্ধ নীতিমালার দিকে চলে যাওয়ার নিন্দা বর্ণিত হয়েছে। [জামালাইন - ৫৬/২]

শানে নুযূল : ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ তাফসীরে কাবীরে اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا الخ আয়াতটির শানে নুযূল সম্পর্কে চারটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তা নিম্নে প্রদত্ত হচ্ছে।

১. বহু সংখ্যক মুফাসসিরগণ বলেছেন যে, [বিশর নামী] এক মুনাফিক এবং এক ইহুদি ব্যক্তির মধ্যে কোনো বিষয়ে দ্বন্দ্ব হয়। ইহুদি বলল, তোমার ও আমার বিষয়টি মীমাংসা করবেন আবুল কাসেম হযরত মুহাম্মদ ﷺ আর মুনাফিক ব্যক্তি বলল, আমাদের উভয়ের বিষয়টি নিষ্পত্তি করবে কা'আব ইবনে আশরাফ। তার কারণ হলো রাসূল ﷺ বিচার মীমাংসা করতেন যে কোনো প্রকার ঘুষ ব্যতীত ইনসাফের সাথে। আর কা'আব ইবনে আশরাফ বিচার করতো ঘুষ নিয়ে। আর এদিকে ইহুদি ব্যক্তি ছিল হকের উপর এবং মু'নাফিক ছিল বাতিলের উপর। এই জন্য ইহুদি ব্যক্তি হুজুর ﷺ -এর দিকে আর মুনাফিক ব্যক্তি কা'আব ইবনে আশরাফের দিকে বিচারটি নিয়ে যেতে চেয়েছিল। যাই হোক শেষ পর্যন্ত ইহুদি ব্যক্তি তার বক্তব্যে অনড় থাকার ফলে উভয়েই হুজুর ﷺ -এর নিকট গেল। হুজুর ﷺ অবস্থার বর্ণনা শুনে ইহুদিদের পক্ষে ও

মুনাফিকের বিরুদ্ধে রায় প্রদান করেন। এতে মুনাফিক লোকটি অসন্তুষ্টি জ্ঞাপন করে ইহুদিকে বলল, চল আমরা আবূ বকরের নিকট যাই। হযরত আবূ বকর (রা.) এর নিকট গেলে তিনিও ইহুদির পক্ষে রায় প্রদান করেন। তাতে মুনাফিক লোকটি সম্মত হলো না। সে ইহুদিকে বলল, তোমার আমার বিচার হবে ওমরের দরবারে। অতঃপর তারা উভয়ে হযরত ওমর (রা.) -এর নিকট চলল। সেখানে যাওয়ার পর ইহুদি বলল, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবূ বকর (রা.) মুনাফিকের বিরুদ্ধে আমার পক্ষে রায় প্রদান করেছেন। কিন্তু সে তাদের উভয়ের রায়ের উপর সম্মত হয়নি। হযরত ওমর (রা.) মুনাফিককে বললেন, ব্যাপার কি এটাই? জবাবে সে বলল জি-হ্যাঁ। অতঃপর হযরত ওমর (রা.) বললেন, তোমরা উভয়ে এখানে অবস্থান কর। ঘরে আমার একটি প্রয়োজন আছে তা সেরে আমি তোমাদের নিকট আসছি। ঘরে গিয়ে তিনি তাঁর তলোয়ারটি নিয়ে এসে মু'নাফিক ব্যক্তিটিকে হত্যা করে ফেললেন। অতঃপর বললেন, এটাই হচ্ছে ফয়সালা ঐ ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ এবং রাসূলের বিচারে সন্তুষ্ট হয় না। তা দেখে ইহুদি লোকটি পলায়ন করল। অতঃপর নিহত মুনাফিকের আত্মীয়-স্বজনেরা এসে হুজুর ﷺ -এর দরবারে হযরত ওমরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। হুজুর ﷺ তাকে ঘটনার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি জবাবে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! [সে তো আপনার ফয়সালাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তাই সে মুরতাদ কাফের হয়ে গেছে।] এমতাবস্থায় হযরত জিবরাঈল (আ.) আলোচ্য আয়াতটি নিয়ে এসে বলেন- إِنَّهُ الْفَارُوقُ فَرَّقَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ অর্থাৎ হযরত ওমর (রা.) অবশ্যই পার্থক্য বিধানকারী, সে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে দিয়েছে। অতঃপর হুজুর ﷺ হযরত ওমরকে বললেন, তুমি ফারুক। এই বর্ণনা মতে, তাগুতের দ্বারা উদ্দেশ্য হবে কা'আব ইবনে আশরাফ।

২. আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে দ্বিতীয় রেওয়ায়েত এই বর্ণিত হয়েছে যে, কিছু সংখ্যক ইহুদি ইসলাম গ্রহণ করে আর তাদের কতিপয় লোকেরা মুনাফিক হয়ে পড়ে। মূর্খতার যুগের কুরাইজা গোত্রের কেউ যদি নযীর গোত্রের কাউকে হত্যা করতো, তবে বনূ নযীরের নিহত ব্যক্তির বদলে হত্যাকারীকে কতল করা হতো। এবং দিয়ত বা রক্তমূল্য হিসেবে একশত অসক খেজুর গ্রহণ করা হতো। আর বনূ নজীরের কেউ যদি কুরাইজা গোত্রের কাউকে হত্যা করতো তখন তার বদলে বনূ নজীরের হত্যাকারীকে কতল করা হতো না, বরং রক্তমূল্য হিসেবে কেবল মাত্র ষাট অসক খেজুর প্রদান করা হতো। বনূ নযীর ছিল সামাজিকভাবে শ্রেষ্ঠ এবং আউস গোত্রের মিত্র গোষ্ঠী আর কুরাইজা ছিল খাজরাজ গোত্রের মিত্র গোষ্ঠী। হুজুরে পাক ﷺ যখন মদিনায় হিজরত করলেন তখন এক নযীরী এক কুরাইজী ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলে। এ নিয়ে উভয় গোত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয়। বনূ নজীর বলল, আমাদের উপর কোনো কেসাস নেই বরং পূর্বের প্রথানুযায়ী আমাদের উপর কেবল ষাট অসক খেজুর আসবে। এদিকে খাজরাজ গোত্রের লোকেরা বলল, এটা তো মূর্খতা যুগের বিচার। এখন তোমরা ও আমরা ভাই ভাই, আমাদের ধর্মও এক। আমাদের একের উপর অন্যের পার্থক্য প্রভেদ নেই। বনূ নযীর তাদের একথা মেনে নিল না। ফলে মুনাফেকরা বলল, চল ইহুদি ধর্ম যাজক আবূ বুরদা আসলামী গণকের দিকে। আর মুসলমানগণ বললেন, চল রাসূলে কারীম ﷺ -এর দরবারে। মুনাফিকরা তা না মেনে ঐ গণকের নিকট চলে গেল তাদের এ বিষয়ে বিচার মীমাংসা গ্রহণের জন্য। এর প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ গণক লোকটিকে ইসলামের দাওয়াত দিলে সে মুসলমান হয়ে যায়। এটা হচ্ছে আল্লামা সুদ্দীর উক্তি। এ বর্ণনা মতে তাগুত হলো গণক লোকটি।

৩. হাসান বসরী (র.) বলেন, জনৈক মুসলমান ব্যক্তির এক মু'নাফিক ব্যক্তির উপর কিছু পাওনা ছিল। [এ নিয়ে দ্বন্দ্ব হলে] মু'নাফিক ব্যক্তি বিষয়টি এক মূর্তির দিকে নিয়ে যেতে চাইল। মূর্খতার যুগের লোকেরা যার দিকে তাদের বিষয়াদি মীমাংসার জন্য যেত। আর একজন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে মূর্তির তরফ থেকে তরজমা করত। এরই প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়। এ বর্ণনা মতে তাগুতের উদ্দেশ্য হবে ঐ তরজমাকারী ব্যক্তি।

৪. চতুর্থ বর্ণনায় ইমাম রাযী (র.) উল্লেখ করেন যে, মূর্খতার যুগের লোকেরা তাদের বিবাদ মীমাংসার জন্য মূর্তিদের কাছে যেত। আর মীমাংসার পদ্ধতি ছিল এই যে, তারা মূর্তির সামনে চকমক পাথরে অগ্নি জ্বালাত। চকমক পাথরে যা বেরিয়ে আসত তদানুযায়ী তারা আমল করত। এ উক্তি অনুযায়ী তাগুতের উদ্দেশ্য হবে মূর্তি।

সারকথা হলো এই যে, কিছু লোক তাগুত তথা সীমালঙ্ঘনকারীদের দিকে মীমাংসার জন্য তাদের বিরোধ নিয়ে যেতে চাইল। হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর দিকে নিয়ে যেতে সম্মত হলো না। এরই প্রেক্ষিতে আয়াতটি নাজিল হয়েছে। কাজী ইয়াজ (র.) বলেন, বিচার মীমাংসার জন্য তাগুতের নিকট যাওয়া এবং মুহাম্মদ ﷺ -এর রায় বা ফয়সালার উপর অসম্মত হওয়া কুফরি। এর উপর কাজী সাহেব অনেক প্রমাণাদি উপস্থাপন করেছেন। বিস্তারিত জানতে হলে তাফসীরে কাবীর খ. ১০, পৃ. ১৬০ দেখে নিন।

অনুবাদ :

٦٣. اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ مِنَ النِّفَاقِ وَكِذْبِهِمْ فِيْ عُذْرِهِمْ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ بِالصَّفْحِ وَعِظْهُمْ خَوِّفْهُمُ اللّٰهَ وَقُلْ لَّهُمْ فِيْ شَانِ اَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيْغًا . مُؤَثِّرًا فِيْهِمْ اَيْ اِزْجِرْهُمْ لِيَرْجِعُوْا عَنْ كُفْرِهِمْ .

৬৩. এদের অন্তরে নেফাক ও ওজর বর্ণনায় মিথ্যা বলার ব্যাপার সেপার- যা কিছু রয়েছে আল্লাহ তা'আলা তা খুব ভালোভাবেই জানেন, অতএব হে রাসূল ﷺ! ক্ষমার চোখে দেখে তাদের থেকে নির্লিপ্ত থাকুন এবং তাদেরকে উপদেশ দান করুন তথা তাদেরকে আল্লাহর ভীতি প্রদর্শন করুন এবং তাদের সম্পর্কে এমন কথা বলুন, যা তাদের মর্মস্পর্শী হয়। অর্থাৎ তাদেরকে ধমক প্রদান করুন যাতে তারা নিজেদের কুফরি থেকে ফিরে চলে আসে।

٦٤. وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ فِيْمَا يَاْمُرُ بِهِ وَيَحْكُمُ بِاِذْنِ اللّٰهِ بِاَمْرِهِ لَا يُعْصٰى وَيُخَالَفُ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ بِتَحَاكُمِهِمْ اِلَى الطَّاغُوْتِ جَآءُوْكَ تَائِبِيْنَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ فِيْهِ اِلْتِفَاتٌ عَنِ الْخِطَابِ تَفْخِيْمًا لِشَانِهِ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا عَلَيْهِمْ رَّحِيْمًا بِهِمْ .

৬৪. আর আমি একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি, যেন আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী তাদের নির্দেশ ও ফয়সালা মান্য করা হয়, তাদের নাফরমানি ও বিরুদ্ধাচারণ যেন না করা হয়। আর সেই সব লোক যখন নিজেদের উপর তাগুতের নিকট মকদ্দমা নিয়ে গিয়ে জুলুম করেছিল, তখন যদি তারা তাওবাকারী হয়ে আপনার কাছে চলে আসত, অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রাসূলও যদি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থী হতেন। (وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ) -এর মধ্যে মধ্যম পুরুষ থেকে নাম পুরুষের দিকে বাচনভঙ্গিতে ইলতেফাত বা পরিবর্তন হয়েছে রাসূল ﷺ-এর শানের মাহাত্ম্য বিকাশের উদ্দেশ্যে। তবে তারা অবশ্যই আল্লাহকে তাদের তওবা কবুলকারী তাদের প্রতি দয়াময়রূপে পেত।

٦٥. فَلَا وَرَبِّكَ لَا زَائِدَةٌ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ اِخْتَلَطَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا ضَيِّقًا اَوْ شَكًّا مِّمَّا قَضَيْتَ بِهِ وَيُسَلِّمُوْا يَنْقَادُوْا لِحُكْمِكَ تَسْلِيْمًا مِنْ غَيْرِ مُعَارَضَةٍ .

৬৫. অতএব হে রাসূল ﷺ আপনার পালনকর্তার শপথ যে, (لا) বর্ণটি অতিরিক্ত তারা কখনো মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর আপনার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোনো রকম সংকীর্ণতা বা সন্দেহ পাবে না এবং আপনার রায়কে কোনো রকম বিরোধিতা ব্যতীত শান্ত চিত্তে মেনে নেবে।

٦٦. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ مُفَسِّرَةٌ اقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ كَمَا كَتَبْنَا عَلَى بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ مَا فَعَلُوْهُ أَيِ الْمَكْتُوْبَ عَلَيْهِمْ إِلَّا قَلِيْلٌ بِالرَّفْعِ عَلَى الْبَدَلِ وَالنَّصْبِ عَلَى الْإِسْتِثْنَاءِ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهِ مِنْ طَاعَةِ الرَّسُوْلِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيْتًا تَحْقِيْقًا لِإِيْمَانِهِمْ.

৬৬. আর যদি আমি তাদেরকে এই আদেশ দিতাম যে, তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে হত্যা কর, অথবা আপন গৃহ ত্যাগ কর যেরূপ আমি বনী ইসরাঈলের প্রতি আদেশ করেছিলাম। এখানে أَنْ শব্দটি ব্যাখ্যাকারক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে তাদের অল্প সংখ্যক ব্যতীত অন্য কেউ এই আদেশ পালন করত না। قَلِيْلٌ শব্দটি নাহবী তারকীবে বদল হওয়ার প্রেক্ষিতে পেশযুক্ত আর ইস্তেছনার প্রেক্ষিতে জবরযুক্ত হবে। যদি তারা উপদেশ অনুযায়ী কাজ করত তথা রাসূলের আনুগত্য করতো তবে তাদের জন্য অবশ্যই উত্তম হতো এবং তাদের ঈমান দৃঢ়তর রাখত।

٦٧. وَإِذًا أَىْ لَوْ ثَبَتُوْا لَآتَيْنٰهُمْ مِنْ لَدُنَّا مِنْ عِنْدِنَا أَجْرًا عَظِيْمًا هُوَ الْجَنَّةُ.

৬৭. আর তখন তথা যদি তারা সুদৃঢ় থাকত, তবে আমি নিজের তরফ থেকে অবশ্যই তাদেরকে মহা প্রতিদান দিতাম। আর তা হলো বেহেশত।

٦٨. وَلَهَدَيْنٰهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا.

৬৮. আর তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করব।

তাহকীক ও তারকীব

وَمَا أَرْسَلْنَا . إِلَّا لِيُطَاعَ . فِىْ أَنْفُسِهِمْ . قُلْ -এর মুতা'আল্লিক হয়েছে। قُلْ لَهُمْ فِىْ أَنْفُسِهِمْ الخ -এর মধ্যে থেকে মাফঊলে লাহুর প্রেক্ষিতে নসবের ক্ষেত্রে অবস্থিত হয়েছে। وَلَوْ أَنَّهُمْ শর্ত لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا الخ জওয়াবে শর্ত। فَلَا وَرَبِّكَ -এর মধ্যে لَا বর্ণটি অতিরিক্ত তাকিদ বুঝাতে এসেছে। বাক্যের রূপ হবে فَوَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ -لَا يُؤْمِنُوْنَ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** মদিনা শরীফের উপকণ্ঠে অবস্থিত হাররা নামক স্থানে কোনো পাহাড়ের নালা থেকে জমিনে পানি সেচনের ব্যাপারে হযরত জুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রা.) -এর সাথে এক মদিনাবাসী লোকের ঝগড়া হয়। তারা উভয়ে হুজুর ﷺ -এর দরবারে হাজির হয়।

তিনি আদেশ দেন জুবায়ের তুমি প্রথমে তোমার জমিনে পানি দাও অতঃপর তোমার প্রতিবেশীর জমিনে পানি ছেড়ে দাও। আনসারী এ ফয়সালাতে অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ জুবাইর আপনার ফুফাতো ভাই হওয়ার কারণে এরকম সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। এই কথাটি শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে পড়ল। তিনি ইরশাদ করলেন, জুবায়ের! তোমার জমিনে পানি দেওয়ার পর পানিকে এতক্ষণ পর্যন্ত ধরে রাখ যে, বাগানের দেয়াল পর্যন্ত পৌছে যায়। অতঃপর তোমার প্রতিবেশীর দিকে পানি ছেড়ে দাও।

বস্তুত প্রিয়নবী ﷺ প্রথমে যে সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন তা এমন ছিল যে, হযরত জুবায়েরেরও কষ্ট হতো না এবং তাঁর প্রতিবেশীরও সুযোগ হতো। কিন্তু যেহেতু সেই ব্যক্তি এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করল। তাই তিনি এমন ব্যবস্থা দিলেন, যদ্দারা হযরত জুবায়ের (রা.) -এর হক পূর্ণভাবে আদায় হয়। হযরত জুবায়ের (রা.) বর্ণনা করেন যে, এই সময়ে আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয় এবং যে কোনো অবস্থায় প্রিয়নবী ﷺ -এর সকল সিদ্ধান্ত কে মেনে নেওয়ার বিধান পেশ করা হয়। -[তাফসীরে মাজহারী খ. ৩, পৃ. ১৫৮]

ইমাম রাযী (র.) বলেন যে, আলোচ্য আয়াতটি পূর্ববর্তী ইহুদি ও মুনাফিক এর ঘটনাতে অবতীর্ণ হয়েছে। এ মতটিকে তিনি পছন্দ করেছেন। ইমাম আতা মুজাহিদ এবং শা'বীও অনুরূপ বলেছেন।

অনুবাদ :

٦٩. قَالَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ لِلنَّبِيِّ ﷺ كَيْفَ نَرَاكَ فِى الْجَنَّةِ وَاَنْتَ فِى الدَّرَجَاتِ الْعُلٰى وَنَحْنُ اَسْفَلُ مِنْكَ فَنَزَلَ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فِيْمَا اَمَرَ بِه فَاُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ اَفَاضِلَ اَصْحَابِ الْاَنْبِيَاءِ لِمُبَالَغَتِهِمْ فِى الصِّدْقِ وَالتَّصْدِيْقِ وَالشُّهَدَاۤءِ الْقَتْلٰى فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالصّٰلِحِيْنَ غَيْرَ مَنْ ذُكِرَ وَحَسُنَ اُولٰئِكَ رَفِيْقًا ـ رُفَقَاءَ فِى الْجَنَّةِ بِاَنْ يَسْتَمْتِعَ فِيْهَا بِرُؤْيَتِهِمْ وَزِيَارَتِهِمْ وَالْحُضُوْرِ مَعَهُمْ وَاِنْ كَانَ مَقَرُّهُمْ فِىْ دَرَجَاتٍ عَالِيَةٍ بِالنِّسْبَةِ اِلٰى غَيْرِهِمْ .

৬৯. কতিপয় সাহাবী (রা.) আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনাকে আমরা বেহেশতে কেমনে দেখব? অথচ আপনি থাকবেন বেহেশতের সর্বোচ্চ স্তরে আর আমরা থাকব আপনার নীচে। তাঁদের এ কথার প্রেক্ষিতে সামনের আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এবং যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত বিষয়াদিতে আনুগত্য করবে তারা সে সমস্ত লোকদের সাথী হবে, যাদের উপর আল্লাহপাক নিয়ামত দান করেছেন। যেমন– নবীগণ, সিদ্দীকগণ, তাঁরা হলেন নবীদের শ্রেষ্ঠতম সহচরগণ। তাদের সত্যবাদীতা ও সত্যায়নে আধিক্য বুঝতে তাদেরকে সিদ্দীক বা খুবই সত্যবাদী বলা হয়েছে, শহীদগণ তথা খোদার রাহে প্রাণোৎসর্গকারীগণ এবং উল্লিখিতগণ ব্যতীত অন্যান্য নেককারগণ। আর তাঁরাই হলো সর্বোত্তম সাথী। এরূপ জান্নাতের সাথী যে, তারা সেথায় পরস্পরের দর্শন, সাক্ষাৎ ও সঙ্গ লাভে ধন্য হবেন। যদিও একের ঠিকানা অন্যের তুলনায় উঁচুস্তরে হবে।

٧٠. ذٰلِكَ اَىْ كَوْنُهُمْ مَعَ مَنْ ذُكِرَ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ تَفَضَّلَ بِه عَلَيْهِمْ لَا اَنَّهُمْ نَالُوْهُ بِطَاعَتِهِمْ وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا بِثَوَابِ الْاٰخِرَةِ فَثِقُوْا بِمَا اَخْبَرَكُمْ بِه وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ .

৭০. এটি অর্থাৎ তাদের বর্ণিত লোকদের সহচর হওয়াটা আল্লাহ তা'আলার দান, তিনি তাদেরকে দান করেছেন, তারা নিজের আনুগত্যের বিনিময়ে অর্জন করেননি। নাহবী তারকীবে ذٰلِكَ শব্দটি মুবতাদা আর اَلْفَضْلُ الخ তার খবর। আর পরকালের প্রতিদান সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট পরিজ্ঞাত। সুতরাং তোমরা তাঁর প্রদত্ত সংবাদে বিশ্বাস করো, তোমাকে তাঁর ন্যায় কোনো সংবাদ দাতা সংবাদ দিতে পারবে না।

তাহকীক ও তারকীব

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ الخ শর্ত فاولئك জবাবে শর্ত। اَلَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّٖنَ الخ থেকে বয়ান হয়েছে। صِدِّيْق মুবালাগার সীগাহ। যার জীবনে একটি কথাও মিথ্যা বলেনি পুরোটা জীবনই সত্য বলে অতিবাহিত করেছেন তাকে সিদ্দীক বা অধিক সত্যবাদী বলা হয়। অথবা যার বক্তব্য হয় অন্তরে পোষিত আকিদা বিশ্বাসের মোতাবেক আর আমল হয় বক্তব্যের অনুরূপ তাকে সিদ্দীক বলা হয়। গ্রন্থকার اَفَاضِلُ اَصْحَابِ الْاَنْبِيَاءِ لِمُبَالَغَتِهِمْ فِى الصِّدْقِ وَالتَّصْدِيْقِ বলে সিদ্দীকের এই সংজ্ঞার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এই উম্মতের প্রধান সিদ্দীক হলেন হযরত আবূ বকর (রা.)। তিনিই হলেন নবীগণের পর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব।

পুরুষদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম নবীজী ﷺ-কে সত্যায়ন করতঃ ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তার অনুসরণেই অনেক বুযুর্গ সাহাবাগণ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। وَحَسُنَ ফে'লে মদাহ اُولٰئِكَ তার ফায়েল আর مَخْصُوْصٌ بِالْمَدْحِ হলো هٰؤُلَاءِ যা উহ্য রয়েছে। এবং رَفِيْقًا তামীয। ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ـ ذٰلِكَ মুবতাদা اَلْفَضْلُ খবর। [তাফসীরে হাক্কানী, সাবী, রুহুল মা'আনী ও তাফসীরে কাবীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :**

১. একদল মুফাসসিরীনে কেরাম বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় আজাদকৃত গোলাম ছাওবান (রা.) -এর প্রতি অধিক মহব্বত রাখতেন। একদিন তিনি বিবর্ণ চেহারা ও বিষণ্ন বদন নিয়ে হুজুর ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হলে, তাঁর চেহারায় চিন্তার লক্ষণ উপলব্ধি করে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর অবস্থা জানতে চাইলেন। তদুত্তরে ছাওবান (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমার মধ্যে কোনো রোগ ব্যাধি নেই, তবে আপনাকে যখন দেখতে না পাই তখন আপনার দর্শন লাভ করার আগ পর্যন্ত আমার মন অস্থির হয়ে পড়ে। আপনার দিদার লাভ করে অশান্ত মনে শান্তি পাই। এবারে আমার মনে আখেরাতের ব্যাপারে চিন্তা হলো যে, আমি পরকালে জান্নাতে প্রবেশ করলেও তো আপনার সঙ্গ পাবো না। আপনার দিদার নসীব আমার হবে না। কেননা আপনি নবীগণের সর্বোচ্চ স্তরে থাকবেন। আর আমি থাকবো আল্লাহর অন্যান্যা বান্দাদের স্তরে। তাই আমি আপনাকে সেখানে না দেখার আতঙ্কে ভোগছি। আর [আল্লাহ এমন না করুন] যদি জান্নাতে প্রবেশই করতে না পারি, তবে তো দেখা হওয়ার আর কথাই নেই। এই চিন্তায়ই আমাকে বিষণ্ন ও চিন্তাগ্রস্থ দেখতে পাচ্ছেন। তাঁর এই চিন্তা নিরসন কল্পে আল্লাহপাক আলোচ্য আয়াতটি নাজিল করেন। ইরশাদ হয়েছে– مَنْ يُطِعِ اللّٰهَ الرَّسُوْلَ فَاُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ الخ অর্থাৎ, যে বা যারা আল্লাহ এবং রাসূল ﷺ -এর বিধানের আনুগত্য করবে তাঁরা আল্লাহর নিয়ামত প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ যথা– নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও নেককারদের সঙ্গে জান্নাতে সাথী হবে।

২. ইমামুত তাফসীর আল্লামা সুদ্দী (র.) বলেন, একদল আনসারী সাহাবী আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আপনি তো জান্নাতের সর্বোচ্চস্তরে বাস করবেন অথচ আমরা আপনার প্রতি আসক্ত থাকবো। তখন আমাদের অবস্থা কি হবে। আমরা কেমন করে আমাদের মনকে সান্ত্বনা দেবো? তাদের এ আরজের প্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে আলোচ্য আয়াতটি নাজিল করেন।

৩. ইমাম মুকাতিল (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতটি একজন আনসারী সাহাবী সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি হুজুরে পাক ﷺ কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমরা যখন আপনার পবিত্র দরবার থেকে বেরিয়ে আমাদের বাড়ি ঘরে বিবি-বাচ্চাদের কাছে আসি অতঃপর যখন আবার আপনার কথা মনে পড়ে তখন আপনার দরবারে ফেরত এসে দিদার লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত মনে শান্তি পাইনি। অতঃপর আমরা আপনার জান্নাতে অবস্থানের কথা মনে মনে স্মরণ করলাম। কেননা আপনিতো থাকবেন জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে আর আমরা থাকবো আপনার নীচে। তখন আমরা কেমন করে আপনার দর্শন লাভ করতে পারবো? আনসারীর এ কথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ করেছেন।

অতঃপর যখন নবীজীর ইন্তেকাল হলো তখন আনসারীর ছেলে তাঁর নিকট সংবাদ নিয়ে যায়। তখন তিনি তাঁর এক বাগানে কর্মরত ছিলেন। আল্লাহর রাসূলের ইন্তেকালের খবর শুনে নবীজীর সত্যিকার আশেক আনসারী লোকটি আল্লাহর দরবারে দোয়া করে বসলেন। اَللّٰهُمَّ اَعْمِنِىْ حَتّٰى لَا اَرٰى شَيْئًا بَعْدَهٗ اِلٰى اَنْ اَلْقَاهُ [হে আল্লাহ আপনি আমার চক্ষুকে অন্ধ বানিয়ে দিন [পরকালে] তাঁর সাথে সাক্ষাৎ লাভের পূর্ব পর্যন্ত আমি যেন কাউকে দেখতে না পাই]। এই দোয়া করার সাথে সাথে আল্লাহর বান্দা আনসারী লোকটি স্বস্থানেই অন্ধ হয়ে পড়েন। তিনি নবীজীকে প্রাণাধিক ভালো বাসতেন, তাই আল্লাহ পাক এর বদলে বেহেশতে তাকে নবীজীর সাথী বানিয়েছেন।

৪. হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, নবী যুগের মুমিনগণ হুজুরে পাক ﷺ কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ আপনাকে যা দেখার আমরা তো দুনিয়াতেই দেখে নিচ্ছি। কারণ পরকালে তো আপনি বহু উর্ধ্বে চলে যাবেন। তখন তো আমরা আর আপনার দেখা পাবো না। তাদের একথা শুনে হুজুর ﷺ ও চিন্তিত হলেন এবং তাঁরাও চিন্তায় ভেঙ্গে পড়লেন। তাদের এ চিন্তা দূরীকরণার্থে আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতটি নাজিল করেন। তত্ত্বজ্ঞানী ওলামাগণ শানে নুযূলের এসব বর্ণনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, তার চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আয়াতটির অবতরণের প্রেক্ষাপট হওয়া আবশ্যক। আর তা হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করণ। সুতরাং আয়াতটি সকল মুকাল্লাফ বান্দাদের বেলায়ই সাধারণভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে আল্লাহর নিকট সে উঁচুস্তর ও সম্মানিত মাকাম পাবে। –[তাফসীরে কাবীর খ. ১০, পৃ. ১৭৬]

আল্লাহ রাসূলের অনুগতরা নবী-সিদ্দীকদের সঙ্গী হওয়ার মর্ম : আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে তারা পরকালে, বেহেশতে নবীগণ এবং সিদ্দীকগণের সঙ্গী হবে। একথার মর্ম এটা নয় যে, অনুগতরা ও নবী-সিদ্দীকগণ একই স্তরের জান্নাতে থাকবে। বরং এর মর্ম হলো, তারা সকলেই জান্নাতে থাকবে যদিও ভিন্ন ভিন্ন স্তরের হয়। তবে স্তর ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও পরস্পরে তারা একে অন্যের সাথে দেখা- সাক্ষাৎ করতে পারবে। যখন ইচ্ছা করবে তখনই দর্শন ও সাক্ষাৎ করতে পারবে। এটাই হচ্ছে আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত সঙ্গী হওয়ার মর্ম।

–[তাফসীরে কাবীর খ. ১০, পৃ. ১৭৭]

আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী (র.) সুদীর্ঘ আলোচনার পর লিখেছেন, উল্লিখিত চারগুণে গুণান্বিত লোক ব্যতীত অন্য কেউই জান্নাতে প্রবেশ হবে না। হয়তো: নবুয়তের গুণে গুণান্বিত হয়ে নবী হতে হবে। এই গুণটা কারো ইচ্ছাধীন নয়। বরং আল্লাহর বিশেষ দান। নতুবা সিদ্দীকিয়্যাতের বিশেষণে বিশেষিত হয়ে সিদ্দীক হতে হবে। কিংবা শহীদ বা নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

–[তাফসীরে কাবীর খ. ১০, পৃ, ১৮০]

অনুবাদ :

٧١. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ اَيْ اِحْتَرِزُوْا مِنْهُ وَتَيَقَّظُوْا لَهُ فَانْفِرُوْا اِنْهَضُوْا اِلٰى قِتَالِهِ ثُبَاتٍ مُتَفَرِّقِيْنَ سَرِيَّةً بَعْدَ اُخْرٰى اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا مُجْتَمِعِيْنَ.

৭১. হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের শত্রু থেকে আত্মরক্ষার জন্য স্বীয় অস্ত্রধারণ কর, অর্থাৎ শত্রুর প্রতি সতর্কতা অবলম্বন কর এবং সজাগ দৃষ্টি রাখো। অতঃপর দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য পৃথক পৃথকভাবে ক্ষুদ্র সেনাদল হিসাবে অথবা সমবেতভাবে বেরিয়ে পড়।

٧٢. وَاِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ لَيَتَاَخَّرَنَّ عَنِ الْقِتَالِ كَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُبَيٍّ الْمُنَافِقِ وَاَصْحَابِهِ وَجَعَلَهُ مِنْهُمْ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرِ وَاللَّامُ فِى الْفِعْلِ لِلْقَسَمِ وَاِنْ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ كَقَتْلٍ وَهَزِيْمَةٍ قَالَ قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَىَّ اِذْ لَمْ اَكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيْدًا حَاضِرًا فَاُصَابَ.

৭২. এবং তোমাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা যুদ্ধে বের হতে অবশ্যই বিলম্ব করে। যেমন মু'নাফিক আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার সাথীরা। তাকে বাহ্যিক হিসেবে মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। لَيُبَطِّئَنَّ ক্রিয়াটির মধ্যে لَام বর্ণটি কসমের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর তোমাদের উপর কোনো বিপদ যেমন মৃত্যু ও পরাজয় যদি উপস্থিত হয় তবে সে বলে যে, আল্লাহপাক আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি তাদের সাথে উপস্থিত ছিলাম না। যদি থাকতাম তবে আমার উপরও সেই বিপদ পৌঁছত।

٧٣. وَلَئِنْ لَامُ قَسَمٍ اَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ كَفَتْحٍ وَغَنِيْمَةٍ لَيَقُوْلَنَّ نَادِ مًا كَاَنْ مُخَفَّفَةٌ وَاِسْمُهَا مَحْذُوْفٌ اَيْ كَاَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ مَعْرِفَةٌ وَصَدَاقَةٌ وَهٰذَا رَاجِعٌ اِلٰى قَوْلِهِ قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَىَّ اِعْتَرَضَ بِهِ بَيْنَ الْقَوْلِ وَمَقُوْلِهِ وَهُوَ يَا لِلتَّنْبِيْهِ لَيْتَنِيْ كُنْتُ مَعَهُمْ فَاَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيْمًا اَخُذَا حَظًّا وَافِرًا مِنَ الْغَنِيْمَةِ.

৭৩. আর যদি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি কোনো অনুগ্রহ যেমন বিজয় ও গনিমতের মাল আসে, তখন তারা এমনভাবে লজ্জিত হয়ে বলতে শুরু করে যেন তোমাদের ও তাদের মধ্যে কোনো মিত্রতা -তথা পরিচিতি ও বন্ধুত্বের সম্পর্কই ছিল না। وَلَئِنْ-এর মধ্যে لَام বর্ণটি কসমের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। كَاَنْ لَمْ كَاَنْ - مُخَفَّفَةٌ - مِنْ مُثَقَّلَةٍ টি كَان এর- تَكُنْ -এর ইসিম উহ্য রয়েছে । অর্থাৎ كَاَنَّهُ । لَمْ تَكُنْ ইয়া ও তা -এর সাথে উভয় রকমই পঠিত হয়েছে। অর্থগত দিক দিয়ে كَاَنْ لَّمْ تَكُنْ الخ বাক্যটি সম্পৃক্ত হয়েছে পূর্বতী বাক্য قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَىَّ الخ-এর সাথে। আর (لَيَقُوْلَنَّ) - قَوْل বাক্যটি كَاَنْ لَّمْ تَكُنْ الخ ও مَقُوْلَه - (يَا لَيْتَنِىْ) -এর মধ্যে জুমলায়ে মুতারিজা হিসেবে এসেছে। সে বলে আহ! যদি তাদের সাথে থাকতাম তবে আমিও সে সফলতা লাভ করতাম। অর্থাৎ গনিমতের মালের বড় অংশ লাভ করতাম।

তাহকীক ও তারকীব

حِذْر ও حَذَر ও أَثَر ـ أَثْر -এর ন্যায়। حِذْر বা حَذَر -এর অর্থ হচ্ছে- সরঞ্জাম, আসবাব, সতর্কতা, সজাগ দৃষ্টি ও আশঙ্কা পূর্ণ বিষয়াদি থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ। যেমন- অস্ত্র ইত্যাদি। ইমাম ওয়াহেদী বলেছেন, এখানে حِذْر -এর দুটি অর্থ উদ্দেশ্য হতে পারে। এক. অস্ত্র। তখন আয়াতের মর্ম হবে خُذُوا سِلَاحَكُمْ অর্থাৎ তোমাদের অস্ত্র ধারণ কর এবং আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ কর। দুই. সতর্ক ও সচেতন থাকা। তখন মানে হবে اِحْذَرُوا عَدُوَّكُمْ অর্থাৎ, তোমরা নিজেদের শত্রুদের থেকে সতর্ক ও সচেতন থাকো। দ্বিতীয় অর্থেও অস্ত্র ধারণের কথা শামিল রাখে। ثُبَاتٍ ـ ثُبَةٌ -এর বহুবচন। ثُبَةٌ -এর অর্থ হলো বিক্ষিপ্ত দল, সৈন্যদল। আর جَمِيْعًا অর্থ مُجْتَمِعِيْنَ একত্রিতাবস্থায়, একত্রিত ভাবে, সম্মিলিতভাবে। ثُبَاتٍ ও جَمِيْعًا শব্দ দু'টি اِنْفِرُوْا থেকে حَال হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ الخ : আলোচ্য আয়াতের প্রথমাংশে জিহাদের জন্য অস্ত্র সংগ্রহের, অতঃপর আয়াতের দ্বিতীয়াংশে জিহাদে অংশ গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে একটি বিষয় বুঝা যাচ্ছে এই যে, কোনো বিষয়ে বাহ্যিক উপকরণ অবলম্বন করা তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতার পরিপন্থি নয়। দ্বিতীয়ত বুঝা যাচ্ছে, এখানে অস্ত্র সংগ্রহের নির্দেশ দেওয়া হলেও এমন প্রতিশ্রুতি কিন্তু দেওয়া হয়নি যে, এ অস্ত্রের কারণে তোমরা নিশ্চিত ভাবেই নিরাপদ হতে পারবে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বাহ্যিক উপকরণ অবলম্বন করাটা মূলত মানসিক স্বস্তি লাভের জন্যই হয়ে থাকে। বাস্তবে এগুলো লাভ-ক্ষতির ব্যাপারে কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। ইরশাদ হয়েছে قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا অর্থাৎ হে নবী ﷺ ! আপনি বলে দিন, আমাদের উপর এমন কোনো বিপদাপদই আসেনা, যা আল্লাহ তা'আলা আমাদের তকদির বা নিয়তিতে নির্ধারিত করে দেননি।

আয়াতে প্রথমে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ অতঃপর জিহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার সুশৃঙ্খল নিয়ম বাতলে দেওয়া হয়েছে। -[মা'আরিফুল কুরআন খ. ২, পৃ. ৪৫৫-৫৬]

قَوْلُهُ وَاِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ الخ : আলোচ্য আয়াতের দ্বারা বাহ্যত বুঝা যায় যে, এখানেও মু'মিনদেরই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অথচ এ প্রসঙ্গে যেসব গুণ বর্ণনা করা হয়েছে তা মু'মিনদের গুণাবলি হতে পারে না।

১. কাজেই আল্লামা কুরতুবী (র.) বলেছেন যে, এতে মুনাফিকদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যেহেতু তারাও প্রকাশ্যে মুসলমান হওয়ার দাবি করেছিল, সেহেতু তাদেরকেও মু'মিনদেরই একটি দল বা জামাত বলে সম্বোধন করা হয়েছে।
২. ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.) বলেন, স্বজাতি, বংশ ও পরস্পর মিশ্রণের প্রেক্ষিতে মুনাফিকদেরকে মু'মিনদের পর্যায়ভুক্ত গণনা করা হয়েছে।
৩. আল্লাহপাক বাহ্যিকভাবে তাদেরকে মু'মিন ধার্য করেছেন। কেননা বাহ্যত তারা মু'মিনদের সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল।
৪. তাদের দাবি ও ধারণাতে, তাদেরকে মু'মিনদের ভেতরে গণনা করে সম্বোধন করা হয়েছে, যদিও তারা মূলত মুনাফিক ছিল।

একদল মুফাসসির এখানে উল্লিখিত জিহাদে বিলম্বকারীগণ দ্বারা দুর্বল মু'মিনগণকে উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

-[তাফসীরে কাবীর খ. ১০, পৃ. ১৮৪]

অনুবাদ :

٧٤. قَالَ تَعَالٰى فَلْيُقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لِإِعْلَاءِ دِيْنِهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ يَبِيْعُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ يُسْتَشْهَدْ اَوْ يَغْلِبْ يَظْفَرُ بِعَدُوِّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ثَوَابًا جَزِيْلًا ـ

৭৪. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রি করে তাদের কর্তব্য হলো আল্লাহর রাহে তার দীনকে সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে জিহাদ করা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে জিহাদ করবে সে শহীদ হোক বা শত্রুর উপর জয়ী হোক আমি তাকে মহাপুরস্কার দান করব। তথা মহা প্রতিদান দেব।

٧٥. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ اِسْتِفْهَامُ تَوْبِيْخٍ اَىْ لَا مَانِعَ لَكُمْ مِنَ الْقِتَالِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ فِىْ تَخْلِيْصِ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاۤءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ حَبَسَهُمُ الْكُفَّارُ عَنِ الْهِجْرَةِ وَاٰذَوْهُمْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (رض) كُنْتُ اَنَا وَاُمِّىْ مِنْهُمْ ـ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ دَاعِيْنَ يَا رَبَّنَاۤ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ مَكَّةَ الظَّالِمِ اَهْلُهَا بِالْكُفْرِ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ مِنْ عِنْدِكَ وَلِيًّا يَتَوَلّٰى اُمُوْرَنَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ـ يَمْنَعُنَا مِنْهُمْ وَقَدِ اسْتَجَابَ اللّٰهُ دُعَاءَهُمْ فَيَسَّرَ لِبَعْضِهِمُ الْخُرُوْجَ وَبَقِىَ بَعْضُهُمْ اِلٰى اَنْ فُتِحَتْ مَكَّةُ وَوَلّٰى ﷺ عَتَّابَ بْنَ اُسَيْدٍ فَانْصَفَ مَظْلُوْمَهُمْ مِنْ ظَالِمِهِمْ ـ

৭৫. আর তোমাদের কি হলো যে, এখানে ইস্তেফহাম বা প্রশ্নবোধক শব্দটি শাসনার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তোমরা আল্লাহর রাহে এবং পুরুষ-নারী ও শিশুদের মধ্যে যারা দুর্বল তাদের মুক্তির জন্য কেন জিহাদ করো না? যাদেরকে কাফেরগণ হিজরত করা থেকে বিরত রেখেছে এবং কষ্ট পৌছিয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আমি এবং আমার মাতা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! এই মক্কা জনপদ যার অধিবাসীগণ কুফরি করার কারণে অত্যাচারী তা থেকে আমাদিগকে অন্যত্র নিয়ে যাও। তোমার তরফ থেকে আমাদের জন্য কোনো অভিভাবক নির্ধারণ করে দাও যে, আমাদের বিষয়াদির দায়িত্ব নেবে এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও যে তাদের থেকে আমাদের কে রক্ষা করবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের এই দোয়া কবুল করেছেন। ফলে তাদের অনেককে মক্কা থেকে বেরিয়ে যাওয়া সহজ করে দিয়েছেন। আর কিছু লোক মক্কা বিজয় হওয়া পর্যন্ত মক্কাতেই অবস্থান করেছে। হুজুরে পাক ﷺ আত্তাব ইবনে উসাইদকে তাদের অভিভাবক নির্ধারণ করে দিলেন। যিনি মাজলুমদেরকে জালেমদের কাছ থেকে অধিকার আদায় করে দিয়েছেন।

٧٦. اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ الشَّيْطَانِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ اَنْصَارَ دِيْنِهِ تَغْلِبُوْهُمْ لِقُوَّتِكُمْ بِاللّٰهِ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ بِالْمُؤْمِنِيْنَ كَانَ ضَعِيْفًا وَاهِيًا لَا يُقَاوِمُ كَيْدَ اللّٰهِ بِالْكٰفِرِيْنَ.

৭৬. যারা ঈমানদার তারা আল্লাহর রাহে জিহাদ করে। আর যারা কাফির তারা তাগুত বা শয়তানের পথে জিহাদ করে। অতএব, তেমরা শয়তানের বন্ধুদের তথা শয়তানের ধর্মের সহায়কদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। খোদা প্রদত্ত শক্তির কারণে তোমরাই বিজয়ী থাকবে। নিশ্চয়ই মু'মিনদের বিরুদ্ধে শয়তানের চক্রান্তএকান্তই দুর্বল। কাফেরদের বিরুদ্ধে আল্লাহর চক্রান্তের মোকাবিলা করতে পারবে না।

তাহকীক ও তারকীব

وَمَنْ يُقَاتِلْ الخ শর্ত। فَلْيُقَاتِلْ ফে'ল فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ তার মুতা'আল্লিক আর اَلَّذِيْنَ الخ তার ফায়েল। نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا তার জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়ায়ে ইনশাইয়্যাহ হয়েছে।

-[তাফসীরে কাবীর, রুহুল মা'আনী ও হক্কানী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الخ : আলোচ্য আয়াতে জালিমদের জনপদ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মক্কানগরী। হিজরতের পর মক্কায় অবস্থানরত মুসলমানগণ বিশেষ করে বৃদ্ধ নারী-পুরুষ ও বাচ্চারা কাফেরদের জুলুম ও নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর দরবারে সাহায্যের দোয়া করতেছিল। আল্লাহপাক মুসলমানদেরকে সতর্ক করেছেন যে, তোমরা এসব মুসলমানদেরকে নিষ্কৃতি প্রদানের জন্য কেন জিহাদ করছ না। এই আয়াতকে দলিল বানিয়ে ওলামাগণ বলেছেন, যে অঞ্চলে মুসলমানরা আবদ্ধ, তাদেরকে জুলুম থেকে বাঁচাবার জন্য অন্যান্য মুসলমানদের উপর জিহাদ করা ফরজ। এটা হচ্ছে জিহাদের দ্বিতীয় প্রকার। প্রথম প্রকার জিহাদ ছিল আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত তথা দীনের প্রচার-প্রসারের উদ্দেশ্যে।

قَوْلُهُ اَلَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (الاية) : মু'মিন ও কাফের উভয়ই যুদ্ধ করে। তবে উভয়ের যুদ্ধের উদ্দেশ্যের মধ্যে বিরাট তফাত রয়েছে। মুমিন আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জিহাদ করে। আর কাফের কেবল দুনিয়ার স্বার্থ ও ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে লড়াই করে। -[জামালাইন খ. ২, পৃ. ৬১]

অনুবাদ :

৭৭. اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْا اَيْدِيَكُمْ عَنْ قِتَالِ الْكُفَّارِ لَمَّا طَلَبُوْهُ بِمَكَّةَ لِاَذَى الْكُفَّارِ لَهُمْ وَهُمْ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ فَلَمَّا كُتِبَ فُرِضَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ يَخَافُوْنَ النَّاسَ الْكُفَّارَ اَىْ عَذَابَهُمْ بِالْقَتْلِ كَخَشْيَةِ هِمْ عَذَابَ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً مِنْ خَشْيَتِهِمْ لَهُ وَنَصَبُ اَشَدَّ عَلَى الْحَالِ وَجَوَابُ لَمَّا دَلَّ عَلَيْهِ اِذَا وَمَا بَعْدَهَا اَىْ فَاجَأَتْهُمُ الْخَشْيَةُ وَقَالُوْا جَزْعًا مِنَ الْمَوْتِ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا هَلَّا اَخَّرْتَنَا اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ قُلْ لَهُمْ مَتَاعُ الدُّنْيَا مَا يُتَمَتَّعُ بِهِ فِيْهَا وَالْاِسْتِمْتَاعُ بِهَا قَلِيْلٌ ـ اٰئِلٌ اِلَى الْفَنَاءِ وَالْاٰخِرَةُ اَىِ الْجَنَّةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقٰى عَذَابَ اللّٰهِ بِتَرْكِ مَعْصِيَتِهِ وَلَا يُظْلَمُوْنَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ تُنْقَصُوْنَ مِنْ اَعْمَالِكُمْ فَتِيْلًا قَدْرَ قِشْرَةِ النَّوَاةِ فَجَاهِدُوْا ـ

৭৭. হে রাসূল ﷺ আপনি কি তাদেরকে দেখেননি? যাদেরকে বলা হয়েছিল, তোমাদের হাত সংযত রাখ কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে। যখন তারা মক্কার কাফেরদের যন্ত্রণার কারণে যুদ্ধ প্রার্থনা করেছিল। আর তাঁরা ছিলেন একদল সাহাবা (রা.)। নামাজ কায়েম কর এবং জাকাত দিতে থাক। অতঃপর যখন তাদের উপর জিহাদ ফরজ করা হলো তখন তাদের মধ্যে একদল লোক মানুষকে তথা কাফেরদের হত্যার শাস্তিকে ভয় করতে লাগল। যেমন– তারা আল্লাহকে তথা তাঁর আজাবকে ভয় করে। এমনকি তাঁর ভয়ের চেয়েও অধিক ভয় করতে লাগল। اَشَدَّ নসব বা যবরযুক্ত হয়েছে حَال হওয়ার প্রেক্ষিতে। لَمَّا -এর জবাব اِذَا ও তার পরবর্তী শব্দে বুঝাচ্ছে। অর্থাৎ আচমকা তাদের মধ্যে ভয় সৃষ্টি হয়ে গেল। আর তারা মৃত্যুর ভয়ে বলতে লাগল, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের উপর জিহাদ কেন ফরজ করলেন? আরো কিছু দিন আমাদেরকে কেন অবকাশ দিলেন না? হে রাসূল ﷺ! আপনি তাদেরকে বলেদিন যে, দুনিয়ার সামগ্রী অর্থাৎ দুনিয়ায় উপকৃত হওয়ার বস্তু বা উপকৃত হওয়াটা খুবই স্বল্প অর্থাৎ ধ্বংসের দিকে প্রত্যাবর্তনশীল। আর আখেরাত তথা জান্নাত তাদের জন্য উত্তম যারা আল্লাহর নাফরমানি বর্জন করে তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। আর তোমাদের আমলের ছওয়াব কমিয়ে একটি সূতা তথা খেজুর বীচের তুষ পরিমাণও তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। সুতরাং তোমরা জিহাদ করতে থাক।

তাহকীক ও তারকীব

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ -এর মধ্যে হামযাটি اِسْتِفْهَام تَعَجُّبِى -এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ হে মোহাম্মদ ﷺ! লক্ষ্য করুন, আপনার সম্প্রদায়ের প্রতি তারা কেমন করে জিহাদকে অপছন্দ করে অথচ ইতিপূর্বে তারা জিহাদ প্রার্থনা করেছিল এবং এর জন্য অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করেছিল।

وَنَصَبُ اَشَدَّ عَلَى الْحَالِ অর্থাৎ اَشَدَّ শব্দটি তারকীবে 'হাল' হওয়ার ভিত্তিতে যবরযুক্ত হয়েছে। বাক্যের রূপ হবে– يَخْشَوْنَ اَشَدَّ خَشْيَةً

মাফউলে মুতলাক হওয়ার প্রেক্ষিতে ও মানসূব হতে পারে। তখন বাক্যের মূল রূপ হবে يَخْشَوْنَ النَّاسَ مِثْلَ خَشْيَةِ اللّٰهِ

اِذَا فَرِيْقٌ -এর قَوْلُهُ وَجَوَابُ لَمَّا دَلَّ عَلَيْهِ اِذَا وَمَا بَعْدَهَا অর্থাৎ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الخ -এর লَمَّا -এর জবাবের প্রতি اِذَا -এর ও তার পরবর্তী শব্দে ইঙ্গিত করেছে। শায়খ আহমদ সাবী (র.) হাশিয়ায়ে সাবীতে বলেছেন, এ রকম না বলে মুফাসসিরে আল্লাম যদি جَوَابُ لَمَّا اِذَا وَمَا بَعْدَهَا বলতেন তবে ভালো হতো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** আলোচ্য আয়াতটির শানে নুযূল সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের দুটি উক্তি রয়েছে।

১. প্রথম উক্তি : আয়াতটি এক শ্রেণির দুর্বল মু'মিনদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তাফসীরবিদ কালবী (র.) বলেন, আয়াতটি আব্দুর রহমান ইবনে আওফ, কুদামা ইবনে মাজউন ও সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) -এর সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁরা মদিনায় হিজরতের পূর্বে নবীয়ে করীম ﷺ -এর সঙ্গে ছিলেন। মুশরিকদের তরফ থেকে অনেক যন্ত্রণা সয়ে তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আবেদন জানালেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমাদেরকে কাফেরদের সাথে যুদ্ধের জন্য অনুমতি প্রদান করুন। তিনি তাদেরকে জবাবে বললেন, তোমরা তোমাদের হাতকে সংযত রাখ, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে। বরং তোমরা নামাজ আদায় ও জাকাত প্রদানে নিয়োজিত থাক। কারণ আমাকে এখনো আল্লাহর তরফ থেকে যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করা হয়নি। অতঃপর হিজরতের পর বদরে যখন তাদের যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করা হলো, তখন তাঁরা এ সংখ্যা লঘিষ্ঠ ও দুর্বলাবস্থায় যুদ্ধ করাটাকে অপছন্দ করল। তাঁদের এ অবস্থার প্রেক্ষিতে আল্লাহপাক আলোচ্য আয়াতটি নাজিল করেন। এ উক্তি বা মত পোষণকারীগণ তাঁদের স্বপক্ষে দলিল হিসেবে বলেন যে, যাদেরকে আল্লাহর রাসূল ﷺ একথা বলতে বাধ্য হলেন যে, তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে নিজেদের হাতকে সংযত রাখ, তারা অবশ্যই যুদ্ধ বা জিহাদের প্রতি আগ্রহী ছিল। আর জিহাদের প্রতি আগ্রহী তো কেবল মু'মিনগণই হতে পারে, মুনাফিকরা নয়। সুতরাং এতে প্রমাণিত হলো যে,আয়াতটি মু'মিনদের সম্পর্কেই নাজিল হয়েছে। তবে একথার জবাবে বলা যেতে পারে যে, মুনাফিকরা নিজেদেরকে মু'মিন বলে প্রকাশ করত, আর একথা বলত যে, আমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও জিহাদ করতে চাই। অতঃপর আল্লাহ যখন কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের অনুমতি দিলেন, তখন তারা জিহাদের প্রতি অনীহা প্রকাশ করল, এবং তাদের বক্তব্যের বিপরীত আচরণ তাদের থেকে প্রকাশ পেল।

২. দ্বিতীয় উক্তি : এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের দ্বিতীয় উক্তি হলো এই যে, আয়াতটি নাজিল হয়েছে মুনাফিকদের সম্বন্ধে। যারা এ উক্তির পক্ষে রয়েছেন তারা বলেন, আলোচ্য আয়াতটি এমন কিছু বিষয়কে শামিল রেখেছে যা কেবল মু'নাফিকদের জন্যই খাছ। যেমন বলা হয়েছে- يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً [তারা লোকদেরকে এরকম ভাবে ভয় করে, যেরূপ আল্লাহকে ভয় করা উচিত ছিল বা তার চেয়ে আরো অধিক পরিমাণে লোকদেরকে তারা ভয় করে চলে।] আর মানুষকে এরূপ ভয় করা তো মুনাফিকদের জন্যই শোভা পায়, মু'মিনদের জন্য নয়। কেননা কোনো মু'মিনের জন্য আল্লাহর চেয়ে অধিক অন্য কাউকে ভয় করা জায়েজ হতে পারে না। এছাড়া আল্লাহ পাক তাদের উক্তি নকল করে বলেছেন যে, তারা একথা বলেছিল رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ অর্থাৎ, হে আমাদের প্রভু! আমাদের প্রতি আপনি কেন লড়াই ফরজ করেছেন? এতে করে তারা আল্লাহর উপর অভিযোগ করল। আর আল্লাহর উপর অভিযোগ আপত্তি করা কেবলমাত্র কাফের মুনাফিকদের তরফ থেকেই হতে পারে, মু'মিনদের পক্ষ থেকে নয়। তৃতীয় আল্লাহ পাক রাসূল ﷺ কে জানিয়ে দিলেন যে, مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى অর্থাৎ দুনিয়ার সামগ্রী খুবই স্বল্প, আর আখেরাত তাদের জন্য উত্তর যারা আল্লাহকে ভয় করে। আর এরকম কথাতো তাদেরকেই বলা হয়ে থাকে, যাদের আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার প্রতি আসক্তি অধিক। আর এটা যে মুনাফিকদের স্বভাব তা তো বলাই বাহুল্য।

তবে প্রথম উক্তিকারীগণ এসব কথার জবাব এভাবে দিয়ে থাকেন যে, জীবনের প্রতি ভালোবাসা ও প্রাণ উৎসর্গ করার প্রতি অনীহাটা মূলত: মানুষের স্বভাবগত বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত।

আর আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত ভয় দ্বারা সেই স্বভাবগত ভয়ই উদ্দেশ্য। আর তাদের উক্তি, হে প্রভু! আমাদের উপর আপনি কেন যুদ্ধ ফরজ করলেন? মূলত: অভিযোগ ও আপত্তিমূলক নয়; বরং যুদ্ধের কষ্ট লাঘব আকাঙ্ক্ষা স্বরূপ ছিল। আর দুনিয়ার সামগ্রী স্বল্প আর আখেরাত খোদাভীরুদের জন্য উত্তম, একথাটির অস্বীকার কারী ছিল না। বরং দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করার জন্য আল্লাহপাক তাদেরকে একথাটি শুনিয়েছেন। যাতে একথা শুনে তাদের অন্তর থেকে যুদ্ধের অনীহা ও পার্থিব জীবনের প্রীতি বিদূরিত হয়ে যায় এবং নির্ভিক হৃদয়ে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই হলো আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের দ্বিবিধ উক্তি। তবে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.) বলেন, মুনাফিকদের সম্পর্কে আয়াতটি নাজিল হওয়ার উক্তিটা-ই অধিক গ্রহণযোগ্য। কেননা পরবর্তী এক আয়াতে উল্লিখিত- وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ উক্তিটা নিঃসন্দেহে মুনাফিকদেরই। -[তাফসীরে কাবীর খ. ১০, পৃ. ১৯০ - ৯১]

٧٨. اَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ حُصُوْنٍ مُّشَيَّدَةٍ مُرْتَفِعَةٍ فَلَا تَخْشَوُا الْقِتَالَ خَوْفَ الْمَوْتِ وَاِنْ تُصِبْهُمْ اَيِ الْيَهُوْدَ حَسَنَةٌ خِصْبٌ وَسَعَةٌ يَقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ جَدْبٌ وَبَلَاءٌ كَمَا حَصَلَ لَهُمْ عِنْدَ قُدُوْمِ النَّبِيِّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ يَقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ يَا مُحَمَّدُ اَيْ بِشُؤْمِكَ قُلْ لَهُمْ كُلٌّ مِنَ الْحَسَنَةِ وَالسَّيِّئَةِ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مِنْ قِبَلِهٖ فَمَالِ هٰٓؤُلَآءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ اَيْ لَا يُقَارِبُوْنَ اَنْ يَفْهَمُوْا حَدِيْثًا ـ يُلْقٰى اِلَيْهِمْ وَمَا اِسْتِفْهَامُ تَعَجُّبٍ مِنْ فَرْطِ جَهْلِهِمْ وَنَفْىُ مُقَارَبَةِ الْفِعْلِ اَشَدُّ مِنْ نَفْيِهٖ ـ

অনুবাদ :

৭৮. তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদেরকে অবশ্যই পাবে, যদিও তোমরা সুদৃঢ় **সুউচ্চ** দুর্গের মধ্যে থাক। সুতরাং মৃত্যুর আশঙ্কায় **জিহাদকে** ভয় করো না। যদি তাদের তথা **ইহুদিদের** কোনো কল্যাণ তথা সচ্ছলতা ও প্রাচুর্য **সাধিত হয় তখন** তারা বলে, এতো আল্লাহর তরফ থেকে। **আর যদি** কোনো অকল্যাণ হয়, তথা কোনো **দুর্ভিক্ষ** ও মহামারি দেখা দেয়, যেরূপ তাদের **দেখা দিয়েছিল** নবী করীম ﷺ-এর মদিনায় সুভাগমন কালে। **তখন তারা বলে,** এতো তোমার পক্ষ থেকে হে **মুহাম্মদ** ﷺ ! অর্থাৎ তোমার দুর্ভাগ্যের কারণেই এসেছে। **আপনি** তাদেরকে বলে দিন, ভালোমন্দ **এসবই আল্লাহর তরফ** থেকে। তবে এ জাতির **কি হলো যে,** তারা কথা বুঝার নিকটবর্তীও হয় না যে কথা তাদেরকে বলা হয়। مَا দ্বারা ইস্তেফহাম বা প্রশ্ন করা হয়েছে। তাদের মূর্খতার আধিক্য বুঝাতে। আসর বোধের অস্বীকার করার তুলনায় বোধের নিকটবর্তীতার অস্বীকার করাটা কঠোরতর।

٧٩. مَآ اَصَابَكَ اَيُّهَا الْاِنْسَانُ مِنْ حَسَنَةٍ خَيْرٍ فَمِنَ اللّٰهِ اَتَتْكَ فَضْلًا مِنْهُ وَمَآ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ بَلِيَّةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ اَتَتْكَ حَيْثُ اِرْتَكَبْتَ مَا يَسْتَوْجِبُهَا مِنَ الذُّنُوْبِ وَاَرْسَلْنٰكَ يَا مُحَمَّدُ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا حَالٌ مُّؤَكِّدَةٌ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ـ عَلٰى رِسَالَتِكَ ـ

৭৯. হে মানবমণ্ডলী! যা কিছু কল্যাণকর হয় তা আল্লাহর তরফ থেকেই হয়। তথা তার অনুগ্রহেই হয় আর যা কিছু অকল্যাণকর হয় বিপদ-বালা আসে তা তোমারই কারণে হয়, বিপদ-বালার কারণ গুনাহে লিপ্ত হওয়াতেই আসে। হে মুহাম্মদ ﷺ ! আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছি। رَسُوْلًا শব্দটি তারকীবে **حَالُ مُؤَكِّدَه** হয়েছে। এবং আপনার রিসালাতের উপর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট।

٨٠. مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ تَوَلّٰى اَعْرَضَ عَنْ طَاعَتِهٖ فَلَا يُهِمَّنَّكَ فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا حَافِظًا لِاَعْمَالِهِمْ بَلْ نَذِيْرًا وَاِلَيْنَا اَمْرُهُمْ فَنُجَازِيْهِمْ وَهٰذَا قَبْلَ الْاَمْرِ بِالْقِتَالِ ـ

৮০. যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য করল, সে বস্তুত আল্লাহ তা'আলারই আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য থেকে বিমুখ হলো তাতে আপনার চিন্তিত হওয়ার কিছুই নেই। কারণ আমি আপনাকে তাদের আমালের রক্ষক হিসেবে প্রেরণ করিনি। বরং ভীতি প্রদর্শনকারী পয়গাম্বর হিসেবে প্রেরণ করেছি। আর তাদের মু'আমালা আমার দিকেই ফিরে আসবে। তখন আমি তাদেরকে প্রতিদান দেবো। এই হুকুমটা জিহাদের হুকুম নাজিল হওয়ার পূর্বে প্রযোজ্য ছিল।

٨١. وَيَقُولُونَ أَيِ الْمُنَافِقُونَ إِذَا جَاءُوكَ أَمْرُنَا طَاعَةٌ لَكَ فَإِذَا بَرَزُوا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بِإِدْغَامِ التَّاءِ فِي الطَّاءِ وَتَرْكِهِ أَيْ أَضْمَرَتْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ لَكَ فِي حُضُورِكَ مِنَ الطَّاعَةِ أَيْ عِصْيَانَكَ وَاللّٰهُ يَكْتُبُ يَأْمُرُ بِكَتْبِ مَا يُبَيِّتُونَ فِي صَحَائِفِهِمْ لِيُجَازُوا عَلَيْهِ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ بِالصَّفْحِ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ثِقْ بِهِ فَإِنَّهُ كَافِيكَ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَكِيلًا مُفَوَّضًا إِلَيْهِ.

৮১. আর তারা তথা মুনাফিকরা যখন আপনার কাছে আসে তখন বলে যে, আমাদের কাজ হচ্ছে আপনার আনুগত্য করা। অতঃপর আপনার নিকট থেকে বেরিয়ে গেলে, তাদের একদল রাতে ঐ কথার বিপরীত বলে, যা আপনার সামনে আনুগত্যের জন্য বলেছিল। অর্থাৎ আপনার বিরুদ্ধাচরণের জন্য পরামর্শ করে। (بَيَّتَ طَائِفَةٌ) -এর মধ্যে 'তা'কে 'ত্বোয়া'র মধ্যে ইদগাম করেও পঠিত হয়েছে। এবং ইদগাম বিহীনও পাঠ করা হয়েছে। এবং আল্লাহ ত'আলা তাদের পরামর্শকে তাদের আমলনামায় লিখে রাখছেন তথা লিখে রাখতে নির্দেশ দিচ্ছেন, যাতে তারা এর উপর প্রতিদান প্রাপ্ত হয়। অতএব, ক্ষমার সাথে আপনি তাদের আচরণ উপেক্ষা করুন এবং আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা রাখুন, কেননা তিনিই আপনার জন্য যথেষ্ট। বস্তুত আল্লাহই কার্য সম্পাদনকারী হিসেবে যথেষ্ট।

٨٢. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ يَتَأَمَّلُونَ الْقُرْآنَ وَمَا فِيهِ مِنَ الْمَعَانِي الْبَدِيعَةِ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا تَنَاقُضًا فِي مَعَانِيهِ وَتَبَايُنًا فِي نَظْمِهِ.

৮২. তারা কি কুরআনের মধ্যে এবং তার অভিনব অর্থের মধ্যে চিন্তা করে না? যদি তা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো তরফ থেকে হতো, তবে তারা এতে অবশ্যই অনেক বৈপরীত্য তথা তার শব্দে ও অর্থে অনেক গরমিল পেতো।

তাহকীক ও তারকীব

بُرُوجٌ - بَرْجٌ -এর বহুবচন। بَرْجٌ অর্থ- দুর্গ, কেল্লা। مُشَيَّدَةٌ সুউচ্চ। ইমাম যাজ্জাজ এ শব্দটির অর্থ এরূপই বলেছেন। ইকরামা বলেন, এর অর্থ হলো مَطْلِيَّةٌ بِالشَّيْدِ চুনা দ্বারা প্রলেপযুক্ত, মজবুত। ইমাম মুজাহিদ (র.) مُشَيَّدَةٌ পাঠ করেছেন। যেরূপ قَصْرٌ مُشَيَّدٌ -এর মধ্যে বলা হয়েছে। আর আবূ নাঈম বিন মাইসারা مُشَيِّدَةٌ ইয়া বর্ণের যেরের সহিত পাঠ করেছেন।

بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ আল্লামা সুয়ূতী (র.) -এর মর্ম বর্ণনা করেছেন এই যে, মুনাফিকরা যখন হুজুরে পাক ﷺ -এর নিকট থেকে বাইরে আসত, তখন তারা হুজুর ﷺ -এর বাণীর বিপরীত কথা অন্তরে পোষণ করে রাখতো। অথচ এ মর্মটা গ্রহণ করা ঠিক নয়। কেননা হুজুর ﷺ -এর বাণীর বিপরীত কথা তো তাদের দিলে তখনও পোষণ করে রাখতো যখন

তাঁরা তাঁর মজলিসে উপস্থিত থাকতো। এ জন্যই মুনাফিকরা মজলিসের মধ্যেই سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا বলে ফেলতো। যদি মুফাসসিরে আল্লাম بَيَّتَ -এর ব্যাখ্যা تَدْبِيْرُ الْاَمْرِ لَيْلًا [রাতের ষড়যন্ত্র] দ্বারা করতেন তবে অধিক ভালো হতো। কেননা মুনাফিকরা রাতে হুজুর ﷺ-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে থাকতো। –[জামালাইন, সাবী, রুহুল মা'আনী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ الخ আয়াতের শানে নুযূল : মুনাফিকরা ওহুদ যুদ্ধের শহীদগণের সম্পর্কে এই মন্তব্য করেছিল যে, যেভাবে আমরা রণাঙ্গন থেকে পলায়ন করে এসেছি। তারাও যদি সেভাবে আমাদের সঙ্গে চলে আসতো, তবে মৃত্যু মুখে পতিত হতো না। তখন আল্লাহপাক আলোচ্য আয়াতটি নাজিল করেন এবং সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন যে, তোমরা যত সুরক্ষিত দুর্গে আত্মরক্ষার চেষ্টা করো না কেন, মৃত্যু তোমাদের অবশ্যম্ভাবী। মৃত্যু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই। এ পৃথিবীতে যার আগমন হয়েছে তাকে এখান থেকে প্রত্যাবর্তন করতেই হবে। –[নূরুল কুরআন খ. ৫, পৃ. ১৩৫]

وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ الخ -আয়াতের শানে নুযূল : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদিনায় আগমন করেন, তখন ইহুদি ও মুনাফিকরা বলল যে, এই ব্যক্তি [নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক] অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাথীরা যখন আমাদের এখানে [মদিনায়] এসেছে তখন থেকে আমাদের ক্ষেত-খামারে এবং ফলমূলে শুধু ক্ষতিই হচ্ছে। এরই প্রেক্ষিতে উপরিউক্ত আয়াতটি নাজিল হয়েছে। –[তাফসীরে মাজহারী খ. ৩, পৃ. ১৭৩]

ইরশাদ হয়েছে, যদি এদের কোনো প্রকার কল্যাণ লাভ হয় তবে তারা বলে, এতো আমাদের প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ মেহেরবানি। পক্ষান্তরে যখন তাদের কোনো বিপদ হয় তখন তারা বলে, এই অবস্থাতো শুধু তোমার কারণে। আপনি বলে দিন, ভালোমন্দ সবকিছুই আল্লাহ পাকের তরফ থেকে।

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ الخ -আয়াতের শানে নুযূল : আল্লামা বগবী (র.) লিখেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে আমার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করল প্রকৃত পক্ষে সে আল্লাহরই অনুগত হলো। আর যে আমার প্রতি মহব্বত রাখলো সে নিশ্চয়ই আল্লাহপাকের প্রতি মহব্বত রাখলো। এই কথা শুনে কতিপয় মুনাফিক বলতে লাগলো খ্রিস্টানরা যেভাবে ঈসা ইবনে মারিয়াম (আ.) কে তাদের রব বানিয়ে নিয়েছিল, মনে হয় ইনিও আমাদের কাছ থেকে তাই চান। এরই প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়। –[তাফসীরে মাজহারী খ. ৩, পৃ. ১৭৬]

অনুবাদ :

٨٣. وَاِذَا جَاۤءَهُمْ اَمْرٌ عَنْ سَرَايَا النَّبِيِّ ﷺ مِمَّا حَصَلَ لَهُمْ مِّنَ الْاَمْنِ بِالنَّصْرِ اَوِ الْخَوْفِ بِالْهَزِيْمَةِ اَذَاعُوْا بِهٖ اَفْشَوْهُ نَزَلَ فِيْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ اَوْ ضُعَفَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ذٰلِكَ فَتَضْعَفُ قُلُوْبُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَيَتَاَذَّى النَّبِيُّ ﷺ وَلَوْ رَدُّوْهُ اَيِ الْخَبَرَ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلٰٓى اُولِي الْاَمْرِ مِنْهُمْ اَيْ ذَوِي الرَّاْيِ مِنْ اَكَابِرِ الصَّحَابَةِ اَيْ لَوْ سَكَتُوْا عَنْهُ حَتّٰى يُخْبَرُوْا بِهٖ لَعَلِمَهُ هَلْ هُوَ مِمَّا يَنْبَغِيْ اَنْ يُذَاعَ اَوْلَا الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهٗ يَتَّبِعُوْنَهٗ وَيَطْلُبُوْنَ عِلْمَهٗ وَهُمُ الْمُذِيْعُوْنَ مِنْهُمْ مِنَ الرَّسُوْلِ وَاُولِي الْاَمْرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ بِالْاِسْلَامِ وَرَحْمَتُهٗ لَكُمْ بِالْقُرْاٰنِ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطٰنَ فِيْمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖ مِنَ الْفَوَاحِشِ اِلَّا قَلِيْلًا .

৮৩. আর যখন তাদের নিকট নবী করীম ﷺ-এর সৈন্যদলের কোনো শান্তির সাহায্যের বা ভয়ের পরাজয়ের সংবাদ পৌঁছে তখন তারা তা খুব প্রচার করে। আয়াতটি নাজিল হয়েছে একদল মুনাফিক সম্পর্কে অথবা দুর্বল মুমিনদের সম্পর্কে যারা এরূপ করতো। এতে মুমিনদের অন্তরে দুর্বলতা সৃষ্টি হতো, ফলে নবী করীম ﷺ কষ্ট অনুভব করতেন। আর যদি তারা এ সংবাদ রাসূল ﷺ পর্যন্ত বা নিজেদের শাসক তথা বুজুর্গ সাহাবীদের পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিত অর্থাৎ তাদেরকে সংবাদ দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যদি তারা নীরবতা অবলম্বন করতো। তবে তাদের তথ্য সন্ধানীরা তা অনুসন্ধান করে দেখত রাসূল ﷺ ও বুজুর্গ সাহাবাদের থেকে তা প্রচার করা যায় কিনা। আর সেই তথ্য সন্ধানীরা হচ্ছে মুনাফিক প্রচারকগণ। যদি ইসলামের মাধ্যমে তোমাদের উপর আল্লাহর বিশেষ দান ও কুরআনের মাধ্যমে অনুগ্রহ না হতো, তবে তোমাদের অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত সকলেই নির্লজ্জ কাজে শয়তানের হুকুমের অনুসরণ করতে।

٨٤. فَقَاتِلْ يَا مُحَمَّدُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ فَلَا تَهْتَمَّ بِتَخَلُّفِهِمْ عَنْكَ الْمَعْنٰى قَاتِلْ وَلَوْ وَحْدَكَ فَاِنَّكَ مَوْعُوْدٌ بِالنَّصْرِ .

৮৪. অতএব, হে মুহাম্মদ ﷺ! আল্লাহর রাহে জিহাদ করুন। আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ের জিম্মাদার নন। সুতরাং তারা আপনার থেকে পিছনে রয়ে যাওয়ার কারণে চিন্তিত হবেন না। আয়াতের মর্ম হলো আপনি একা হলেও জিহাদ করতে থাকুন। কেননা আপনাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে।

وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ حُثَّهُمْ عَلَى الْقِتَالِ وَرَغِّبْهُمْ فِيْهِ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّكُفَّ بَأْسَ حَرْبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَأْسًا مِنْهُمْ وَّاَشَدُّ تَنْكِيْلًا تَعْذِيْبًا مِنْهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَاَخْرُجَنَّ وَلَوْ وَحْدِيْ فَخَرَجَ بِسَبْعِيْنَ رَاكِبًا اِلٰى بَدْرِ الصُّغْرٰى فَكَفَّ اللّٰهُ بَأْسَ الْكُفَّارِ بِاِلْقَاءِ الرُّعْبِ فِيْ قُلُوْبِهِمْ وَمَنْعِ اَبِيْ سُفْيَانَ عَنِ الْخُرُوْجِ كَمَا تَقَدَّمَ فِيْ اٰلِ عِمْرَانَ ـ

আর আপনি মু'মিনদেরকে জিহাদের উপর উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করতে থাকুন। শ্রীঘ্রই আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের যুদ্ধ বন্ধ করে দেবেন এবং আল্লাহ তা'আলা জিহাদের ব্যাপারে তাদের চেয়ে অত্যন্ত কঠিন ও শাস্তিদানে অতিশয় কঠোর। আলোচ্য আয়াত নাজিল হওয়ার পর নবীয়ে করীম ﷺ ইরশাদ করলেন, ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, আমি কেবল একা হলেও জিহাদে বের হয়ে যাবো। অতঃপর তিনি সত্তরজন আরোহীদেরকে নিয়ে বদরে সুগরার দিকে বের হয়ে পড়েন। ফলে আল্লাহপাক কাফেরদের অন্তরে ভীতি সৃষ্টি করে এবং আবূ সুফিয়ানকে যুদ্ধে বের হওয়া থেকে বিরত রেখে তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছেন। যেরূপ এর আলোচনা সূরা আলে-ইমরানে চলে গেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَاِذَا جَآءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوْا بِهٖ (الاية) **-আয়াতের শানে নুযূল :** আল্লামা বগবী (র.) লিখেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন এলাকায় ছোট-বড় সৈন্যদল প্রেরণ করতেন। তাঁরা দুশমনের মোকাবিলা করতো। কোথাও তাঁরা বিজয়ী হতেন, আবার কোথাও পরাজিত। কিন্তু মুনাফিকরা সর্বদা পূর্বাহ্ন খবর সংগ্রহের চেষ্টা করতো। এবং খবর পাওয়া মাত্রই প্রিয়নবী ﷺ -এর তরফ থেকে ঘোষণার পূর্বেই তারা সে খবর প্রচার আরম্ভ করে দিত। যদি পরাজয়ের খবর হতো তবে মুনাফিকরা তা ফলাও করে প্রচার করতো। এবং দুর্বল মনা মুসলমানদেরকে আরো দুর্বল করার চেষ্টা করতো। এতে নতুন-নতুন সমস্যা সৃষ্টি হতো। আর এসব খবরের কারণে দুশমনদের উপকৃত হওয়ার সুযোগ থাকতো। তখন আল্লাহপাক উল্লিখিত আয়াতটি নাজিল করেন।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে, কিছু দুর্বল রায়ের মুসলমানগণকে যখন কোনো সাময়িক দলের ভালো-মন্দ খবর পৌঁছতো অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহীর মাধ্যমে জয়ের ওয়াদা বা ভয়ের কথা প্রকাশ করতেন, তখন এই দুর্বল রায়ের লোকেরা তা প্রচার করে দিতো। আর এ প্রচারের ফলে কাজ নষ্ট হয়ে যেত। শত্রুদের যদি নিরাপত্তার সংবাদ পৌঁছতো, তবে তারা নিজেদের সংরক্ষণের চেষ্টা করতো। আর যদি ভয়ের খবর পৌঁছতো তাহলে যুদ্ধ, ঝগড়া ও ফ্যাসাদের দিকে এগিয়ে আসতো। এরই প্রেক্ষিতে আঁলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়েছে। -[তাফসীরে মাজহারী খ. ৩, পৃ. ১৭৮]

হাফেজ ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর (র.) বলেন, এই আয়াতের শানে নুযূলের মধ্যে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) -এর হাদীসটি উল্লেখ করা ভালো মনে হচ্ছে। আর তা হলো এই যে, হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে এ খবর পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পত্নীদেরকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন। হযরত ওমর (রা.) এ খবর শুনে ঘর থেকে মসজিদে নববীর দিকে এলেন। যখন মসজিদের দ্বারে পৌঁছলেন তখন জানতে পারলেন যে, মসজিদেও এই কথাটির চর্চা হচ্ছে। এটা দেখে তিনি ভাবলেন এ খবরটা যাচাই করা উচিত। সুতরাং তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আপনি কি আপনার স্ত্রীগণকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন? হুজুর ﷺ বললেন, না। হযরত ওমর বলেন, আমি একথা যাচাই করে মসজিদে গেলাম। আর দরজায় দাঁড়িয়ে এ ঘোষণা দিলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীগণকে তালাক দেননি। তোমরা যা বলছ তা ভুল। তখন এর উপর আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়। -[জামালাইন খ. ২, পৃ. ৬৮]

উড়োকথা প্রচার করা মারাত্মক গুনাহ ও ফেতনার কারণ : আলোচ্য আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, লোক মুখে শ্রুত উড়োকথা যাচাই বাছাই না করেই বর্ণনা করা ঠিক নয়। যেমন- রাসূলুল্লাহ ﷺ এক হাদীসে ইরশাদ করেছেন- كَفٰى بِالْمَرْءِ كَذِبًا اَنْ يُّحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি মিথ্যুক হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে জনশ্রুত কথা তদন্ত ছাড়াই বলে ফেলে।

অনুবাদ :

٨٥. مَنْ يَّشْفَعْ بَيْنَ النَّاسِ شَفَاعَةً حَسَنَةً
مُوَافِقَةً لِلشَّرْعِ يَّكُنْ لَّهُ نَصِيْبٌ مِنَ
الْاَجْرِ مِّنْهَا بِسَبَبِهَا وَمَنْ يَّشْفَعْ
شَفَاعَةً سَيِّئَةً مُخَالِفَةً لَهُ يَّكُنْ لَّهُ كِفْلٌ
نَصِيْبٌ مِنَ الْوِزْرِ مِّنْهَا بِسَبَبِهَا وَكَانَ
اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ مُّقِيْتًا مُقْتَدِرًا
فَيُجَازِىْ كُلَّ اَحَدٍ بِمَا عَمِلَ ـ

৮৫. আর যে ব্যক্তি লোকদের মাঝে শরিয়ত মোতাবেক সৎকাজের জন্য কোনো সুপারিশ করবে, সে তার কারণে ছওয়াবের একটি অংশ পাবে এবং যে ব্যক্তি শরিয়ত বিরোধী মন্দ কোনো কাজের জন্য সুপারিশ করবে সে তার কারণে গুনাহের বোঝারও একটি অংশ পাবে। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল। সুতরাং প্রত্যেককেই তিনি আমলের প্রতিদান দিবেন।

٨٦. وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ اَىْ قِيْلَ لَكُمْ سَلَامٌ
عَلَيْكُمْ فَحَيُّوْا الْمُحَيِّىَ بِاَحْسَنَ مِنْهَا
بِاَنْ تَقُوْلُوْا لَهُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ
اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَوْ رُدُّوْهَا بِاَنْ تَقُوْلُوْا كَمَا
قَالَ اَىِ الْوَاجِبُ اَحَدُهُمَا وَالْاَوَّلُ اَفْضَلُ اِنَّ
اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ حَسِيْبًا مُحَاسِبًا
فَيُجَازِىْ عَلَيْهِ وَمِنْهُ رَدُّ السَّلَامِ وَخَصَّتِ
السُّنَّةُ الْكَافِرَ وَالْمُبْتَدِعَ وَالْفَاسِقَ الْمُسْلِمَ
عَلٰى قَاضِى الْحَاجَةِ وَمَنْ فِى الْحَمَّامِ
وَالْاٰكِلِ فَلَا يَجِبُ الرَّدُّ عَلَيْهِمْ بَلْ يُكْرَهُ
فِىْ غَيْرِ الْاَخِيْرِ وَيُقَالُ لِلْكَافِرِ وَعَلَيْكَ ـ

৮৬. আর যখন তোমাদেরকে কেউ সালাম দেয়। যেমন– কেউ তোমাদেরকে বলল, সালামুন আলাইকুম, তখন তোমরা সালামকারীকে তার চেয়েও উত্তম কথায় জবাব দাও।

যেমন তোমরা তাকে বললে, ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। অথবা অনুরূপ কথাই বলে দাও। যেমন– তোমরা তাকে অনুরূপ কথাই বলে দিলে যা সে বলেছে। অর্থাৎ, দুয়ের যে কোনো একটা বলা ওয়াজিব, তবে প্রথমটা উত্তম। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ে হিসেব-নিকাশ গ্রহণকারী। সুতরাং তিনি এরই ভিত্তিতে প্রতিদান দেবেন। আর সালামের জবাব দেওয়া এরই অংশবিশেষ। তবে কাফের, বেদআতী, ফাসেক, শৌচকার্যরত মুসলিম, বাথরুমে প্রবেশিত ব্যক্তি এবং ভোজনরত ব্যক্তিকে হাদীস দ্বারা বিশেষিত করা হয়েছে। সুতরাং তাদের উপর সালামের জবাব দেওয়া ওয়াজিব হবে না। বরং শেষোক্ত ব্যক্তি ছাড়া বাকিদের উপর সালাম করা মাকরূহ হবে। আর কাফেরের সালামের জবাবে 'ওয়া আলাইকা' বলা যাবে।

٨٧. اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَاللّٰهِ لَيَجْمَعَنَّكُمْ مِنْ
قُبُوْرِكُمْ اِلٰى فِيْ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ شَكَّ
فِيْهِ ـ وَمَنْ اَىْ لَا اَحَدَ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ
حَدِيْثًا قَوْلًا ـ

৮৭. আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই। অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে কবর থেকে সমবেত করবেন কিয়ামতের দিন, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আল্লাহর চেয়ে কথাবার্তায় অধিক সত্যবাদী আর কে হতে পারে? কেউই নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا (الاية) **সালাম ও ইসলাম :** এ আয়াতে আল্লাহপাক সালাম ও তার জওয়াবের আদব বর্ণনা করেছেন।

تَحِيَّة **শব্দের ব্যাখ্যা ও এর ঐতিহাসিক পটভূমি :** تَحِيَّة -এর শাব্দিক অর্থ কাউকে حَيَّاكَ اللّٰهُ [আল্লাহ তোমাকে জীবিত রাখুন] বলা। ইসলাম পূর্বকালে আরবরা পরস্পরে সাক্ষাত কালে حَيَّاكَ اللّٰهُ কিংবা أَنْعَمَ اللّٰهُ بِكَ عَيْنًا কিংবা أَنْعِمْ صَبَاحًا ইত্যাদি সম্ভাষণে সালাম করতো। ইসলাম এ সালাম পদ্ধতি পরিবর্তন করে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলার রীতির প্রচলন করেছে। -এর অর্থ তুমি সর্ব প্রকার কষ্ট ও বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাক।

ইবনে আরাবী আহকামুল কুরআন গ্রন্থে বলেন, সালাম শব্দটি আল্লাহ তা'আলার উত্তম নামসমূহের অন্যতম। اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ -এর অর্থ এই যে, اَللّٰهُ رَقِيْبٌ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সংরক্ষক।

জগতের অন্য যে কোনো সভ্য জাতি পরস্পরে সাক্ষাতকালে তারা যে ভালোবাসা ও সম্প্রীতি প্রকাশক বাক্য ব্যবহার করে থাকে, তাদের সেই সব বাক্যের তুলনায় ইসলামের সালামের বাক্য হাজারো গুণে উত্তম। কেননা তাদের সেই বাক্যে কেবল প্রীতি লেন-দেন হয়। আর ইসলামের সালাম ও এর জওয়াবে প্রীতি বিনিময়ের সাথে সাথে এর মাধ্যমে দোয়াও করা হয়।

ইরশাদ হয়েছে, فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا অর্থাৎ, সালামকারী সালামের মাধ্যমে যেরূপ শব্দ ব্যবহার করেছে তার চেয়ে উত্তমরূপে জবাব দাও। অথবা তার শব্দই পুনঃরায় বলে দাও। সুতরাং কেবল সালাম শব্দের জবাব দেওয়া ওয়াজিব হবে, আর তার উর্ধ্বে রহমত ও বরকত শব্দ যোগ করে দেওয়াটা মোস্তাহাব হবে।

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে হাজির হয়ে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলল। তিনি তাঁর সালামের জবাব দিয়ে বললেন, সে দশটি ছওয়াব প্রাপ্ত হয়েছে। অতঃপর লোকটি বসে গেল। অতঃপর আরেকজন ব্যক্তি এসে বলল, اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ হুজুর ﷺ তাঁর জবাব দিয়ে বললেন, সে বিশটি ছওয়াব প্রাপ্ত হয়েছে। এরপর সে বসে গেল। তারপর আরেকজন ব্যক্তি এসে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ বলল। হুজুর তাঁর জবাব দিয়ে বললেন, সে ত্রিশটি ছওয়াব প্রাপ্ত হয়েছে। তারপর সেও বসে গেল, হযরত মা'আজ ইবনে আনাসের বর্ণনায় এসছে যে, চতুর্থ একজন ব্যক্তি এসে বলল, اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ তিনি তাঁরও জবাব দিলেন। অতঃপর বললেন, সে চল্লিশটি ছওয়াব প্রাপ্ত হয়েছে।

মাসআলা : সালামের জওয়াব দেওয়া ফরজে কেফায়া। কোনো জামাতের যে কোনো একজনে জওয়াব দিয়ে দিলে যথেষ্ট হবে। ফতোয়ায়ে সিরাজিয়াতে অনুরূপ বলা হয়েছে।

হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, কোনো একদল মানুষ অন্যদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করে গেলে তাদের একজনের সালাম করে নেওয়াই যথেষ্ট। তেমনিভাবে বসে আছে এরকম একদল লোকদের মধ্য থেকে একজনে জবাব দিলেই সবার পক্ষ হতে যথেষ্ট হবে। তবে বসা লোকদের মধ্য থেকে যদি কাউকে বিশেষভাবে নাম ধরে আগন্তুক ব্যক্তি সালাম করে, তবে কেবল তার উপরই জবাব দেওয়া ওয়াজিব হবে। অন্য কোনো ব্যক্তি দিলে যথেষ্ট হবে না। তেমনিভাবে যদি কোনো নির্দিষ্ট জামাত লোকদেরকে সালাম করার পর বাইরের কোনো ব্যক্তি সালামের জবাব দিয়ে দেয় তবে যথেষ্ট হবে না। [বয়ানুল আহকাম]

মাসআলা : আগে সালাম করা সুন্নত। আর তাই উত্তম। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা ঈমান না আনা পর্যন্ত জান্নাতে যেতে পারবে না। আর পরস্পরে মহব্বত না করা পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না। আমি কি তোমাদেরকে এমন কথা বলে দিব, যা দ্বারা তোমাদের পরস্পরে মহব্বত বৃদ্ধি পাবে। তা হচ্ছে পরস্পর সালামের প্রসার ঘটানো। [মুসলিম]

মাসআলা : আরোহী ব্যক্তি পদাতিক ব্যক্তিকে, পদব্রজে গমনকারী উপবিষ্ট ব্যক্তিকে এবং সংখ্যালঘিষ্ঠরা সংখ্যা গরিষ্ঠদেরকে সালাম করবে। আর বড় ছোটকে সালাম করবে।

মাসআলা : বালক এবং মহিলাদেরকেও সালাম করা যাবে। কেননা হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মেয়েদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করেছেন এবং তাদেরকে সালাম করেছেন। -[বুখারী, মুসলিম]

হযরত জারীর (রা.) -এর বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করা কালে তাদেরকে সালাম করেছেন। -[আহমদ]

ফতোয়ায়ে গারায়েব -এ রয়েছে, বেগানাহ যুবতী মহিলাকে এবং আমরদ [দাড়ি মোঁচ গজায়নি এমন বালক] কে সালাম করা মাকরূহ। তারা যদি সালাম করে তবে জবাব দেওয়া ওয়াজিব নয়। হযরত কাজী ছানা উল্লাহ পানিপতী (র.) বলেন, আমি বলি, এ হুকুমটি হলো ফেতনার আশঙ্কার মুহূর্তে।

মাসআলা : পরিবারের লোক ও তার আপন গৃহে দাখিল হলে গৃহবাসীদেরকে সালাম করবে। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, হে আমার প্রিয় বৎস! তুমি তোমার গৃহে প্রবেশ হলে গৃহবাসীদেরকে সালাম করবে। তা তোমার জন্য এবং তোমার ঘর ওয়ালাদের জন্য বরকতের কারণ হবে। -[তিরমিযী]

মাসআলা : কোনো ব্যক্তি যদি শূন্য গৃহে প্রবেশ করে তবে- اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ বলে সালাম করবে। ফেরেশতাগণ এ সালামের জবাব দেবে। শিরআহ নামক গ্রন্থে এরূপই বলা হয়েছে।

মাসআলা : কথা বলার পূর্বে সালাম করা সুন্নত। হযরত জাবের (রা.) -এর সূত্রে বর্ণিত এক মারফূ' হাদীসে এসেছে, اَلسَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ অর্থাৎ, কথা বলার পূর্বে সালাম করা বিধেয়। -[তিরমিযী]

মাসআলা : মুসলিম ভাইকে প্রতিবার সাক্ষাতে সালাম করা সুন্নত। সালাম করার পর যদি বৃক্ষ বা দেয়াল আড়াল হয়ে দাঁড়ায়। অতঃপর আবার সাক্ষাৎ হয়, তাহলে নতুন করে আবার সালাম করতে হবে। আবূ দাউদে বর্ণিত হাদীসে এরূপই এসেছে।

মাসআলা : বিদায় নেওয়ার সময় সালাম করা সুন্নত।

মাসআলা : যদি কোনো ব্যক্তি কারো পক্ষ হতে সালাম পৌছায় তবে সালাম প্রাপ্ত ব্যক্তি- وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ বলে জবাব দিবে।

মাসআলা : অমুসলিমদেরকে আগে বেড়ে সালাম করা জায়েজ নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে অগ্রগামী হয়ে সালাম করবে না। রাস্তায় পাওয়া গেলে তাদেরকে সংকীর্ণ রাস্তায় চলতে বাধ্য করবে। [অর্থাৎ তোমরা নিজেরা প্রশস্ত রাস্তায় চলবে] । -[মুসলিম]

কোনো দলের মধ্যে যদি মুসলমান, প্রতিমাপূজারী, মুশরিক এবং ইহুদি পাওয়া যায়, তবে তাদেরকে সালাম করা যাবে। কিন্তু সালাম করার মুহূর্তে মুসলমানকে সালাম করার নিয়ত রাখতে হবে। যাতে করে অমুসলিমকে আগে বেড়ে সালাম করা না হয়।

মাসআলা : জিম্মি কাফেরদের সালামের জবাব দেওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে কেবলমাত্র وَعَلَيْكَ বলে জবাব দিবে। এর চেয়ে অধিক বলা যাবে না। কেননা বুখারী ও মুসলিমে হযরত আনাস (রা.) এর বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদেরকে যখন আহলে কিতাবগণ সালাম করে, তখন তোমরা وَعَلَيْكُمْ বলো।

মাসআলা : নামাজ এবং খোতবার ভিতর সালামের জবাব দেওয়া জায়েজ নয়। দিলে নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে। উচ্চকণ্ঠে তেলাওয়াতে কুরআনের সময়, হাদীস বর্ণনা করার সময়, ইলমি আলোচনার সময় এবং আজান ও ইকামতের সময় সালামের জবাব দেওয়া ওয়াজিব নয়। কেবল জায়েজ।

মাসআলা : সালামের পূর্ণতা হচ্ছে মুসাফাহা ও মু'আনাকা। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের পরস্পরের সালামের পরিপূরক হচ্ছে মুসাফাহা। -[আহমদ, তিরমিযী]

শরহুস সুন্নাহ নামক গ্রন্থে হযরত জাফর ইবনে আবী তালিব (রা.)-এর বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ইস্তেকবাল করেছেন এবং আমার সঙ্গে মু'আনাকা করেছেন। -[তাফসীরে মাজহারী খ. ৩, পৃ. ১৮২- ৮৭]

অনুবাদ :

৮৮. وَلَمَّا رَجَعَ نَاسٌ مِنْ اُحُدٍ اِخْتَلَفَ النَّاسُ فِيْهِمْ فَقَالَ فَرِيْقٌ اُقْتُلْهُمْ وَقَالَ فَرِيْقٌ لَا فَنَزَلَ فَمَالَكُمْ اَىْ مَا شَاْنُكُمْ صِرْتُمْ فِى الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ فِرْقَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ رَدَّهُمْ بِمَا كَسَبُوْا مِنَ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِىْ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ اَىْ تَعُدُّوْهُمْ مِنْ جُمْلَةِ الْمُهْتَدِيْنَ وَالْاِسْتِفْهَامُ فِى الْمَوْضِعَيْنِ لِلْاِنْكَارِ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا طَرِيْقًا اِلَى الْهُدٰى ـ

৮৮. আর মুনাফিক লোকেরা যখন ওহুদ থেকে ফেরত আসল, তখন তাদের সম্পর্কে লোকেরা [সাহাবা] মতবিরোধ করে নিল। একদল বলল, তাদেরকে হত্যা করে ফেল, আর অন্যদল বলল, তাদেরকে হত্যা করো না। ফলে সামনের আয়াতটি নাজিল হলো। তোমাদের কি হলো অর্থাৎ তোমাদের অবস্থা কি হলো যে, তোমরা মুনাফিকদের ব্যাপারে দু-দলে বিভক্ত হয়ে গেলে? অথচ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, তাদের কৃত কুফর ও নাফরমানির দরুন। তোমরা কি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করতে চাও, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা পথভ্রষ্ট করেছেন? অর্থাৎ অথচ তোমরা তাদেরকে হেদায়েতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত মনে কর। ইস্তেফহাম উভয়স্থানেই অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি তার জন্য হেদায়েতের কোনো রাস্তা পাবে না।

৮৯. وَدُّوْا تَمَنَّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ اَنْتُمْ وَهُمْ سَوَاۤءً فِى الْكُفْرِ فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَاۤءَ تُوَالُوْنَهُمْ وَاِنْ اَظْهَرُوا الْاِيْمَانَ ـ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ هِجْرَةً صَحِيْحَةً تُحَقِّقُ اِيْمَانَهُمْ فَاِنْ تَوَلَّوْا وَاَقَامُوْا عَلٰى مَا هُمْ عَلَيْهِ فَخُذُوْهُمْ بِالْاَسْرِ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا تُوَالُوْنَهٗ وَلَا نَصِيْرًا تَنْتَصِرُوْنَ بِهٖ عَلٰى عَدُوِّكُمْ ـ

৮৯. তারা চায় যে, তোমরাও কাফির হয়ে যাও যেরূপ তারা কাফের হয়েছে। যাতে তোমরা ও তারা কুফরিতে সমান হয়ে যাও। অতএব তাদের মধ্য থেকে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। অর্থাৎ তাদেরকে বন্ধু বানিয়ো না যদিও তারা [মুখে] ঈমান প্রকাশ করে যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর পথে বিশুদ্ধ রূপে হিজরত করে যা তাদের ঈমানকে প্রমাণিত করবে। অতঃপর যদি তারা বিমুখ হয় এবং বর্তমান নেফাকের অবস্থাতেই অটল থাকে তাহলে তাদেরকে বন্দী করে পাকড়াও কর এবং যেখানে পাও হত্যা কর। আর তাদের মধ্য থেকে কাউকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না যাতে তার সাথে তোমরা বন্ধুত্ব করতে লাগো এবং সাহায্যকারীও বানিও না যা দ্বারা তোমাদের শত্রুদের মোকাবেলায় সাহায্য গ্রহণ করবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنٰفِقِيْنَ الخ - مَا মুবতাদা, لَكُمْ খবর। فِى الْمُنٰفِقِيْنَ - صِرْتُمْ উহ্য ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে। আর فِئَتَيْنِ সেই উহ্য ফে'লে নাকিসের খবর। رَكَسَ ও اَرْكَسَ উভয়টারই অর্থ হলো এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থার দিকে ফিরিয়ে দিল। اِرْتِكَاسٌ অর্থ ফিরে যাওয়া।

قَوْلُهُ كَمَا : وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ الخ তাবীলের মাধ্যমে মাসদার হয়ে ودوا ফেউলের মাফউল হয়েছে। لَوْ تَكْفُرُوْنَ - كَفَرُوْا উহ্য মাসদারের সিফত হয়েছে। مَا শব্দটি মাসদারের অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ كَكُفْرِهِمْ كَفَرُوْا

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنَافِقِيْنَ فِئَتَيْنِ الخ : এখানে ইস্তেফহামটি ইনকার বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে এই মুনাফিকদের ব্যাপারে মতবিরোধ হওয়াটা উচিত নয়। কেননা তাদের কৃতকর্মের দ্বারা তাদের নেফাক প্রকাশিত হয়ে গেছে। ফলে তারা প্রকাশ্য কাফের হয়ে গেছে। তারা ছিল ঐ সব মুনাফিক যারা ওহুদ যুদ্ধে মদিনা হতে কিছু দূরে গিয়ে রাস্তা থেকেই ফেরত এসে গিয়েছিল। আর এজন্য এই বাহানা করেছিল যে, পরামর্শের মধ্যে আমাদের কথা তো মেনে নেওয়া হয়নি। [তাই আমরা যাবো কেন?] [বুখারী ও মুসলিম এবং জামালাইন]

শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূলের ব্যাপারে তাফসীরবিদ আলেমগণের বিভিন্ন রকম মতামত রয়েছে। নিম্নে তা প্রদত্ত হলো।

১. আলোচ্য আয়াতটি ঐসব লোকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। যারা মদিনায় হুজুরে পাক ﷺ -এর দরবারে মুসলমান হয়ে এসেছিল। অতঃপর কিছুদিন অবস্থান করে তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমরা মদিনার বাইরে ময়দানে বের হয়ে যেতে চাই। সুতরাং আমাদেরকে অনুমতি প্রদান করুন। হুজুর ﷺ তাদেরকে অনুমতি প্রদান করলেন। অতঃপর তারা মদিনা থেকে বের হয়ে চলতে চলতে মুশরিকদের সাথে [মক্কাতে] গিয়ে মিলিত হয়ে গেল। তাদের সম্পর্কে মু'মিনদের দু রকম মত হয়ে গেল। একদল বলল, তারা মু'মিন নয়। কেননা তারা আমাদের ন্যায় মু'মিন হলে আমাদের সঙ্গে থাকতো এবং আমরা যেরূপ কাফিরদের যন্ত্রণায় সবর ও ধৈর্যধারণ করছি তারাও করতো। আর দ্বিতীয় দল বলল, তারা মুসলমান। তাদের ব্যাপারটা সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তাদেরকে কাফির বলাটা আমাদের জন্য ঠিক হবে না। এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক আয়াতটি নাজিল করে তাদের নেফাক ও কুফরের অবস্থা বর্ণনা করে দিলেন।

২. আয়াতটি তাদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে যারা মক্কায় নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করেছিল। অথচ তারা গোপনে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সহায়তা করতো। তাদের সম্বন্ধে মুসলমানদের মধ্যে মতবিরোধ হয়ে গেল। একদল বলে তারা মুসলমান আর অপর দল বলে তারা কাফের মুনাফিক। ফলে তাদের এ বিরোধ মীমাংসার উদ্দেশ্যে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। এটা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও কাতাদা (রা.) -এর উক্তি।

৩. আয়াতটি মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলূল ও তার সাথীত্রয়ের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। যারা ওহুদ যুদ্ধের দিন একথা বলে রাস্তা থেকে ফেরত এসে গিয়েছিল যে, আমরা তো একে যুদ্ধই মনে করি না, বরং আত্মঘাতী কাজ মনে করি। যদি একে যুদ্ধ মনে করতাম, তবে অবশ্যই আমরা তোমাদের অনুকরণ করতাম। তাদের সম্পর্কে সাহাবাদের দু'দল হয়ে গেল। একদল বলেন, তারা কাফের হয়ে গেছে। আর অন্যদল বলেন, তারা কাফের হয়নি। ফলে তাদের এ মতবিরোধের নিরসন কল্পে আয়াতটি নাজিল হয়েছে। আল্লামা সুয়ূতী (র.) -এ শানে নুযূলটির প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। এটা হচ্ছে যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.)-এর উক্তি। তবে এ উক্তির প্রতি অনেকের মন্তব্য রয়েছে। কেননা আয়াতের বর্ণনা ধারা অনুযায়ী বুঝা যাচ্ছে, তারা ছিল মক্কাবাসী। কেননা তাতে ইরশাদ হয়েছে–

فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَاءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ .

৪. আয়াতটি নাজিল হয়েছে ঐ সব লোকদের সম্পর্কে, যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং মুসলমানদের সম্পদ লুণ্ঠন করে ইয়ামামার দিকে পলায়ন করেছিল। অতঃপর তাদের সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়। এটা হচ্ছে ইকরামার উক্তি।

৫. তারা হলো উরাইনা ওয়ালা, যারা মুসলমানদের উট ডাকাতি করে নিয়ে গিয়েছিল, এবং উটের রাখাল হুজুর পাক ﷺ -এর আজাদকৃত গোলাম ইয়াসারকে হত্যা করেছিল।

৬. ইবনে যায়েদ বলেন, ইফকের ঘটনার সাথে জড়িত মুনাফিকদের সম্পর্কে আয়াতটি নাজিল হয়েছে।

–[তাফসীরে কাবীর খ. ১০, পৃ. ২২৫-২৬]

وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيْرًا اِلَّا الَّذِيْنَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হুজুরে পাক ﷺ মক্কায় তাশরিফ নিয়ে যাওয়ার পূর্বে হেলাল ইবনে উওয়াইমির আসলামীর সাথে এ চুক্তি হয়েছিল যে, সে হুজুর ﷺ -কে সাহায্য করবে না এবং হুজুর ﷺ -এর বিরুদ্ধেও কাউকে সহায়তা করবে না। আর যে ব্যক্তি হেলালের নিকট চলে যাবে এবং তার কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে নিবে, তার জন্য আমাদের তরফ থেকে অনুরূপই নিরাপত্তা হবে যেরূপ স্বয়ং হেলালের জন্য। চাই ঐ ব্যক্তি হেলালের সম্প্রদায়ের হোক বা অন্য কোনো সম্প্রদায়ের হোক। এর পরি প্রেক্ষিতে وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيْرًا اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْثَاقٌ থেকে فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا পর্যন্ত নাজিল হয়েছে।

অনুবাদ :

٩٠. اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ يَلْجَأُوْنَ اِلٰى قَوْمٍ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْثَاقٌ عَهْدٌ بِالْاَمَانِ
لَهُمْ وَلِمَنْ وَصَلَ اِلَيْهِمْ كَمَا عَاهَدَ
النَّبِيُّ ﷺ هِلَالَ ابْنَ عُوَيْمِرِ الْاَسْلَمِيَّ
اَوِ الَّذِيْنَ جَاءُوْكُمْ وَقَدْ حَصِرَتْ ضَاقَتْ
صُدُوْرُهُمْ عَنْ اَنْ يُقَاتِلُوْكُمْ مَعَ قَوْمِهِمْ
اَوْ يُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ مَعَكُمْ اَىْ
مُمْسِكِيْنَ عَنْ قِتَالِكُمْ وَقِتَالِهِمْ فَلَا
تَتَعَرَّضُوْا اِلَيْهِمْ بِاَخْذٍ وَلَا قَتْلٍ وَهٰذَا
وَمَا بَعْدَهُ مَنْسُوْخٌ بِاٰيَةِ السَّيْفِ
وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ تَسْلِيْطَهُمْ عَلَيْكُمْ
لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ بِاَنْ يُقَوِّىَ قُلُوْبَهُمْ
فَلَقٰتَلُوْكُمْ وَلٰكِنَّهُ لَمْ يَشَأْهُ فَاَلْقٰى فِىْ
قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَاِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ
يُقَاتِلُوْكُمْ وَاَلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ
الصُّلْحَ اَىْ اِنْقَادُوْا فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ
عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا طَرِيْقًا بِالْاَخْذِ اَوِ الْقَتْلِ ـ

৯০. কিন্তু তাদেরকে হত্যা করো না যারা এমন সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হয় যে, তোমাদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে শান্তি চুক্তি রয়েছে তাদের জন্য এবং ওদের জন্য যাদের সাথে তারা মিলিত হয়েছে। যেরূপ নবী করীম ﷺ হেলাল ইবনে উআইমীর আসলামীর সাথে শান্তি চুক্তি করেছিলেন। অথবা যারা তোমাদের নিকট এমন অবস্থায় আসে যে, তাদের অন্তর স্বজাতির পক্ষ হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে অথবা তোমাদের পক্ষ হয়ে স্বজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক। অর্থাৎ যারা তোমাদের বিরুদ্ধে এবং স্বজাতিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত, সুতরাং তাদেরকে পাকড়াও ও হত্যা করার পিছনে পড়ো না। এ হুকুমটি এবং এর পরবর্তী হুকুমটি জিহাদের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তাদেরকে তোমাদের উপর প্রবল করে দেওয়ার তবে অবশ্যই তোমাদের উপর তাদেরকে প্রবল করে দিতে পারতেন তাদের অন্তরকে শক্তিশালী করে দিয়ে। ফলে তারা অবশ্যই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এর ইচ্ছা করেননি। যার দরুন তিনি তাদের অন্তরে ভীতি ঢেলে দিয়েছেন। অতঃপর যদি তারা তোমাদের নিকট থেকে পৃথক থাকে, তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের সাথে সন্ধি করে অর্থাৎ তারা যদি তোমাদের অনুগত হয়ে যায় তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে পাকড়াও ও হত্যার কোনো পথ দেননি।

৯১. سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّأْمَنُوْكُمْ بِاِظْهَارِ الْاِيْمَانِ عِنْدَكُمْ وَيَاْمَنُوْا قَوْمَهُمْ بِالْكُفْرِ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ وَهُمْ اَسَدٌ وَغَطْفَانُ كُلَّمَا رُدُّوْٓا اِلَى الْفِتْنَةِ دُعُوْا اِلَى الشِّرْكِ اُرْكِسُوْا فِيْهَا وَقَعُوْا اَشَدَّ وُقُوْعٍ فَاِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ بِتَرْكِ قِتَالِكُمْ وَلَمْ يُلْقُوْٓا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَلَمْ يَكُفُّوْٓا اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ فَخُذُوْهُمْ بِالْاَسْرِ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَاُولٰٓئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا بُرْهَانًا بَيِّنًا ظَاهِرًا عَلٰى قَتْلِهِمْ وَسَبْيِهِمْ لِغَدْرِهِمْ .

৯১. তোমরা অচিরেই এমন কিছু লোক পাবে, যারা তোমাদের কাছে ঈমান প্রকাশ করে তোমাদের নিকটও এবং স্বজাতিদের নিকট নিয়ে গেলে তাদের কাছেও কুফর প্রকাশ করে নির্বিঘ্ন থাকতে চায়। আর তারা হলো আসাদ ও গাতফান গোত্রদ্বয়। যখনই তাদেরকে ফেতনার দিকে ফেরত আনা হয় তথা শিরকের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তারা দৃঢ়তার সাথে তাতে নিপতিত হয়। অতএব, তারা যদি তোমাদের থেকে যুদ্ধ বর্জনের মাধ্যমে নিবৃত্ত না থাকে তোমাদের সাথে সন্ধি না রাখে এবং স্বীয় হস্তসমূহ তোমাদের থেকে বিরত না রাখে, তবে তোমরা তাদেরকে কয়েদ করে পাকড়াও কর এবং যেখানেই পাও হত্যা কর। তারা ঐসব লোক যাদের বিরুদ্ধে আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য প্রমাণ দান করেছি তথা তাদেরই গাদ্দারীর কারণে তাদের হত্যার ও বন্দী করার উপর প্রকাশ্য প্রমাণ দান করেছি।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ الخ - اِلَّا الَّذِيْنَ ইস্তেসনা হয়েছে فَاقْتُلُوْهُمْ থেকে। بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ পূর্ণ জুমলায়ে খবরিয়াটি قَوْمٌ-এর সিফত হয়েছে। اَوْ جَاءُوْا আতফ হয়েছে يَصِلُوْنَ-এর উপর حَصِرَتْ - صُدُوْرُهُمْ বাক্যটি উহ্য قَدْ-এর সহিত حَالٌ হয়েছে। جَاءُوْكُمْ-এর ফায়েলের যমীর হতে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ اَنْ يَّأْمَنُوْكُمْ وَيَأْمَنُوْا قَوْمَهُمْ الخ আয়াতের শানে নুযূল : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ الخ আয়াতটি আসাদ ও গাতফান গোত্রদ্বয় সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা যখন মদিনায় আসতো, তখন নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করতো এতে করে মুসলমানদের পক্ষ থেকে তাদের কোনো ক্ষতি পৌঁছেত না। আর তাঁরা যখন নিজেদের গোত্রের কাছে যেত তখন নিজেদেরকে কাফির বলে প্রকাশ করতো এবং তাদের ন্যায় কথা বলতো। যাতে তাদের থেকেও নিরাপদ থাকতে পারে। আর তাদের সম্প্রদায়ের কোনো লোক যখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করতো যে, তোমরা কার উপর ঈমান এনেছ? তখন তারা বলতো, আমরা বানর ও বিচ্ছুর উপর ঈমান এনেছি।

আলোচ্য আয়াতটি তাদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে এবং এতে তাদের হুকুম বর্ণিত হয়েছে। -[মাআরিফে ইদ্রিসিয়া খ. ২, পৃ. ২৭৬ - ৭৭]

٩٢. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا اَىْ مَا يَنْبَغِىْ لَهُ اَنْ يَصْدُرَ مِنْهُ قَتْلٌ لَهُ اِلَّا خَطَأً مُخْطِئًا فِىْ قَتْلِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً بِاَنْ قَصَدَ رَمْىَ غَيْرِهِ كَصَيْدٍ اَوْ شَجَرَةٍ فَاَصَابَهُ اَوْ ضَرَبَهُ بِمَا لَا يُقْتَلُ غَالِبًا فَتَحْرِيْرُ عِتْقُ رَقَبَةٍ نَسَمَةٍ مُؤْمِنَةٍ عَلَيْهِ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ مُؤَدَّاةٌ اِلٰى اَهْلِهِ اَىْ وَرَثَةِ الْمَقْتُوْلِ اِلَّا اَنْ يَصَّدَّقُوْا يَتَصَدَّقُوْا عَلَيْهِ بِهَا بِاَنْ يَعْفُوْا عَنْهَا وَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ اَنَّهَا مِائَةٌ ـ مِنَ الْاِبِلِ عِشْرُوْنَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَكَذَا بَنَاتُ لَبُوْنٍ وَبَنُوْ لَبُوْنٍ وَحِقَاقٌ وَجِذَاعٌ وَاَنَّهَا عَلٰى عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ وَهُمْ عَصَبَةُ الْاَصْلِ وَالْفَرْعِ مُوَزَّعَةً عَلَيْهِمْ عَلٰى ثَلٰثِ سِنِيْنَ عَلَى الْغَنِىِّ مِنْهُمْ نِصْفُ دِيْنَارٍ وَالْمُتَوَسِّطِ رُبُعٌ كُلَّ سَنَةٍ فَاِنْ لَمْ يَفُوْا فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَاِنْ تَعَذَّرَ فَعَلَى الْجَانِىْ فَاِنْ كَانَ الْمَقْتُوْلُ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ حَرْبٍ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ عَلٰى قَاتِلِهِ كَفَّارَةً وَلَا دِيَةَ تُسَلَّمُ اِلٰى اَهْلِهِ لِحَرَابَتِهِمْ ـ

অনুবাদ :

৯২. কোনো মু'মিনকে হত্যা করা মু'মিনের জন্য সঙ্গত নয় ভুলবশত ব্যতীত অর্থাৎ অনিচ্ছাবশত, ভুল করা ছাড়া তার [একজন মুমিনের] দ্বারা অন্য এক মুমিনের হত্যা সংঘটিত হওয়া উচিত নয়। কেউ কোনো মু'মিনকে ভুলবশত হত্যা করলে যেমন, শিকার বা কোনো বৃক্ষ ইত্যাদি করে একজন তীর ছুড়েছিল কিন্তু কারও গায়ে লেগে সে মারা গেল অথবা এমন এক অস্ত্র দ্বারা তাকে আঘাত করেছিল যদ্দ্বারা সাধারণত মানুষ হত্যা করা যায় না। তবে এক মু'মিন গর্দান অর্থাৎ মু'মিন দাস মুক্ত করা স্বাধীন করা এবং তার পরিজনবর্গকে অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণকে দিয়ত-রক্তপণ অর্পণ করা পরিশোধ করা তার উপর বিধেয়, যদি না তারা সদকা করে অর্থাৎ উত্তরাধিকারীগণ তা ক্ষমা করতঃ তার উপর সদকা করে দেয়।

সুন্নাতে দিয়ত বা রক্তপণের বিবরণে উল্লেখ হয়েছে যে, তার পরিমাণ হলো একশ উট। তন্মধ্যে বিশটি বিনতে মাখাজ [দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণকারী স্ত্রী উট] এবং তত পরিমাণ বিনত লাবূন [তৃতীয় বৎসরে পদার্পণকারী স্ত্রী উট] বানূ লাবূন [অর্থাৎ তৃতীয় বৎসরে পদার্পণকারী পুরুষ উট], হিকাক [অর্থাৎ চতুর্থ বৎসরে পদার্পণকারী উট], জিযা' [অর্থাৎ পঞ্চম বৎসরে পদার্পণকারী উট] হতে হবে।

উক্ত রক্তপণ ধার্য হবে হত্যাকারীর আকিলাগণের উপর। তারা হলো হত্যাকারীর ঊর্ধ্বতন ও অধঃস্তন আসাবাগণ। নিম্নবর্ণিত হারে তা তিন বৎসর মেয়াদে তাদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হবে। প্রতি বৎসর ধনীদের উপর অর্ধ দিনার [স্বর্ণমুদ্রা] এবং মধ্যবিত্তদের উপর এক চতুর্থাংশ দিনার হারে তা ধার্য হবে। আসাবাগণ যদি তা পরিশোধ করতে অক্ষম হয় তবে রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে তা আদায় করা হবে। তাও যদি সম্ভব না হয় তবে খোদ অপরাধীর দায়িত্বে তা বর্তাবে।

যদি সে অর্থাৎ নিহত ব্যক্তি তোমাদের শত্রু পক্ষের অর্থাৎ আহলে হারব বা তোমাদের সাথে যুদ্ধরত সম্প্রদায়ের লোক হয় এবং মু'মিন হয় তবে কাফ্ফারা হিসাবে এক মু'মিন দাস মুক্ত করা হত্যাকারীর উপর বিধেয়।

وَاِنْ كَانَ الْمَقْتُوْلُ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْثَاقٌ عَهْدٌ كَاَهْلِ الذِّمَّةِ فَدِيَةٌ لَهُ مُسَلَّمَةٌ اِلَى اَهْلِهِ وَهِيَ ثُلُثُ دِيَةِ الْمُؤْمِنِ اِنْ كَانَ يَهُوْدِيًّا اَوْ نَصْرَانِيًّا وَثُلُثَا عُشْرِهَا اِنْ كَانَ مَجُوْسِيًّا وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ عَلَى قَاتِلِهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدِ الرَّقَبَةَ بِاَنْ فَقَدَهَا وَمَا يَحْصُلُهَا بِهِ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ عَلَيْهِ كَفَّارَةً وَلَمْ يَذْكُرْ تَعَالَى الْاِنْتِقَالَ اِلَى الطَّعَامِ كَالظِّهَارِ وَبِهِ اَخَذَ الشَّافِعِيُّ فِيْ اَصَحِّ قَوْلَيْهِ تَوْبَةً مِنَ اللّٰهِ مَصْدَرٌ مَنْصُوْبٌ بِفِعْلِهِ الْمُقَدَّرِ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا بِخَلْقِهِ حَكِيْمًا فِيْمَا دَبَّرَهُ لَهُمْ ـ

যেহেতু শত্রুদেশের বাসিন্দা সেহেতু তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ করা হবে না। আর যদি সে অর্থাৎ নিহত ব্যক্তি এমন এক সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যার সাথে তোমরা অঙ্গীকারবদ্ধ চুক্তিবদ্ধ, যেমন জিম্মিগণ তবে সে রক্তপণের অধিকারী হবে যা তার পরিজনবর্গকে অর্পণ করা হবে এবং একজন মু'মিন দাস মুক্ত করা এ হত্যাকারীর উপর জরুরি হবে। [যদি সে] অর্থাৎ জিম্মি ইহুদি বা খ্রিস্টান হয় তবে তার রক্তপণের পরিমাণ হলো একজন মু'মিনের রক্তপণের একতৃতীয়াংশ। আর যে সে যদি অগ্নিপূজারীয় তবে তার রক্তপণের পরিমাণ হলো, একজন মু'মিনের রক্তপণের এক দশমাংশের দুই তৃতীয়াংশ। যে ব্যক্তি মুক্ত করার দাস না পায় অর্থাৎ তা পাওয়া যায় না বা তার মূল্য তার নেই তবে কাফফারা হিসাবে একাধিক্রমে দুই মাস সিয়াম পালন করা তার উপর বিধেয়। যিহার এর কাফফারার ন্যায় আল্লাহ তা'আলা এখানে সিয়াম পালন সম্ভব না হলে দরিদ্রদেরকে আহার প্রদানের বিধান উল্লেখ করেনি। এটাই ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অধিকতর নির্ভরযোগ্য অভিমত। এটা আল্লাহর তরফ হতে তওবার বিধান এবং আল্লাহ তার সৃষ্টি সম্পর্কে অবহিত এবং তাদের জন্য ব্যবস্থা প্রদানে প্রজ্ঞাময়। تَوْبَةً এটা এখানে উহ্য একটি ক্রিয়ার মাধ্যমে مَصْدَرٌ বা সমধাতুজ কর্ম হিসাবে مَنْصُوْبٌ [ফাতাহযুক্ত] হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

نَسَمَةً : نَسَمَةٌ ব.ব نَسَمَاتٌ ব্যক্তি, লোক, প্রাণী, শ্বাস, বাতাস।

مُوَزَّعَةً : مُوَزَّعَةٌ [اِسْمُ فَاعِلٍ : وَاحِدٌ مُؤَنَّثٌ] বণ্টনকৃত, বাবে تَفْعِيْل থেকে وَزَّعَ تَوْزِيْعًا বিতরণ করা।

دِيَةٌ : دِيَةٌ বহুবচন دِيَاتٌ রক্তমূল্য, হত্যাকারীর উপর ধার্য্যকৃত ক্ষতিপূরণ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্ব থেকে হত্যা ও যুদ্ধের আলোচনা চলে এসেছে। এখানেও সে আলোচনা করা হয়েছে।

শানে নুযূল : আবদ ইবনে হামীদ এবং ইবনে জারীর প্রমুখ হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আইয়্যাশ ইবনে আবী রাবীআ একজন মু'মিনকে না জেনে হত্যা করে ফেলেছিলেন। যার প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

ঘটনার বিবরণ : রাসূল ﷺ এখনও হিজরত করেননি। আইয়্যাশ ইবনে রাবীআ নামে এক ব্যক্তি মুসলমান হন কুরাইশদের নির্যাতন ও নিপীড়নের ভয়ে তিনি ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিতে পারেননি। এমনকি তার পরিবারের কাউকেও তিনি তা জানাননি। সে সময় মদিনা মুসলমানদের জন্য আশ্রয় কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। একজন দু'জন করে বিপদগ্রস্ত মুসলমানগণ মক্কা ছেড়ে মদিনার পথে পাড়ি জামাচ্ছেন। তাদের মতো আইয়্যাশ ইবনে রাবীআ ও মদিনায় চলে গেছেন। আইয়্যাশ ইবনে রাবীআ এবং আবু জেহেল পরস্পরে সৎ ভাই ছিল। উভয়ের মা এক বাপ ভিন্ন। তিনি মদিনায় চলে যাওয়ায় তার মা খুব পেরেশান হলেন। মায়ের পেরেশানী ও অস্থিরতার কারণে আবু জেহেলও পেরেশান হলো। ফলে আবু জেহেল তার অপর ভাই হারেস এবং আরেকজন ব্যক্তি হারেস ইবনে জায়েদ ইবনে আবি উনায়সাকে নিয়ে মদিনায় পৌছল। তার

আইয়্যাশকে কেঁদে কেঁদে তার মায়ের অবস্থা শুনাল এবং পূর্ণ আশ্বাস দিল যে, তুমি শুধু তোমার মায়ের সাথে সাক্ষাত করার জন্য মক্কায় চলো। আমরা তোমার কোনো ক্ষতি করব না। হযরত আইয়্যাশ স্বীয় মায়ের অস্থিরতা এবং ভ্রাতাবৃন্দের প্রতিশ্রুতির উপর ভরসা করে নিজেকে তাদের হাতে সোপর্দ করলেন এবং তাদের সাথে মক্কা যাওয়ার জন্য রওনা হলেন।
মদিনা থেকে দুই মঞ্জিল পথ অতিক্রম করার তারা তার সাথে গাদ্দারী করল। যা কিছু ঘটার আশঙ্কা ছিল তা সবই ঘটল। প্রথমে তার হাত পা বাঁধল। তার পর তিন কাফের মিলে অত্যন্ত নির্মমভাবে এ পরিমাণ বেত্রাঘাত করল যে, তার শরীর ঝাজরা হয়ে যায়। তারপর তাকে তপ্ত রোদে ফেলে রাখে এবং বলে যতক্ষণ না ইসলাম ধর্ম বর্জন করবে ততক্ষণ পর্যন্ত রোদের তাপে জ্বলতে থাকবে।
রক্তে রঞ্জিত শরীর। হাত পা বাঁধা। সফরের ক্লান্তি। মায়ের কষ্টের অনুভূতি। ভাইদের পৈশাচিক নির্মমতা। মক্কার তপ্ত কংকরময় ভূমিতে পুড়ে যাওয়া আইয়্যাশ অবশেষে অপারগ হয়ে কুলাতে না পেরে মুখ থেকে সে অবাঞ্ছিত বাক্য বের করলেন, যা বলার জন্য তার দিল আদৌ প্রস্তুত ছিল না। নির্যাতন থেকে মুক্তির আশায় তাকে সে বাক্যটি উচ্চারণ করতে হয়েছে। তার এ অসহায়ত্বের উপর নিন্দা করে আবু জেহেলের সাথে আসা হারেস ইবনে জায়েদ একটি সাংঘাতিক উক্তি করে যে, হে আইয়্যাশ তোমার ধর্ম কি কেবল এইটুকু? এতই হালকা? যেন মরার উপর খাড়ার ঘা। আইয়্যাশ রাগে ক্ষোভে বেসামাল হয়ে গলেন। কসম খেয়ে বললেন, যখনই সুযোগ হবে তোমাকে হত্যা করে ছাড়ব।
তারপর কোনো মতে হযরত আইয়্যাশ মদিনায় পৌছে যান। তার কিছুদিনের মধ্যেই সেই ব্যাঙ্গকারী হারেস ইবনে যায়েদও মক্কা থেকে মদিনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করে ফেলে। ঐ দিকে হযরত আইয়্যাশ হারেসের মুসলমান হওয়ার সংবাদ জানতেন না। একদিন ঘটনাচক্রে কোবার পাশে উভয়ের সাক্ষাত ঘটল। হারেসের নির্দয় আচরণের যাবতীয় ব্যাপার তার মনে জাগল। ভাবলেন হয়তো এবারও সে অন্য কাউকে নির্যাতন করার কুমতলবে এসেছে। তাই তিনি তলোয়ার মেরে তার গর্দার উড়িয়ে দিলেন। দুর্ঘটনা সম্পর্কে সকলে অবগত হওয়ার পর আইয়্যাশকে জানালেন যে হারেস তো মুসলমান হয়ে মদিনায় এসেছিল। এ খবর শুনে হযরত আইয়্যাশ রাসূল ﷺ -এর দরবারে হাজির হয়ে অত্যন্ত আক্ষেপের সাথে নিবেদন জানালেন যে, হুজুরের তো ভালো করেই জানা আছে, যে হযরত হারেস আমার সাথে কিরূপ আচরণ করেছিল। আমার অন্তরে সেসব দুঃখ জাগ্রত ছিল এবং আমি তার মুসলমান হওয়ার কথা একবারেই জানতাম না। একথা চলাকালীন অবস্থায়ই কুরআনের আয়াত নাজিল হয়। [জামালাইন খ- ২. পৃ. ৭৮]।

হত্যার প্রকার ও তার শরয়ী বিধান : ফুকাহায়ে কেরাম قَتْل -এর পাঁচ প্রকার উল্লেখ করেছেন।

প্রথম প্রকার : قَتْل عَمَدْ অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত হত্যা। এর সংজ্ঞা হচ্ছে বাহ্যত ইচ্ছা করে এমন অস্ত্র দ্বারা হত্যা করা, যা লৌহনির্মিত অথবা অঙ্গচ্ছেদনের ব্যাপারে লৌহনির্মিত অস্ত্রের মতো। যথা ধারাল বাঁশ, ধারাল পাথর ইত্যাদি।

দ্বিতীয় প্রকার : قَتْل شِبْهَ عَمَدّ অর্থাৎ ইচ্ছকৃত হত্যার সাথে যা সাদৃশ্যপূর্ণ। এর সংজ্ঞা এই : ইচ্ছা করেই হত্যা করা, কিন্তু এমন অস্ত্র দ্বারা নয় যা দ্বারা অঙ্গচ্ছেদ হতে পারে।

তৃতীয় প্রকার : قَتّل خَطَأ অর্থাৎ ভ্রমবশত: হত্যা। এটির দুই সূরত। ১. خَطَأ فِى الْقَصْدِ ২. خَطَأ فِى الْفِعْلِ.

১. خَطَأٌ فِى الْقَصْدِ হলো– ইচ্ছা ও ধারণায় ভ্রম হওয়া। যেমন, দূর থেকে মানুষকে শিকারী জন্তু কিংবা দারুল হরবের কাফের মনে করে লক্ষ্য স্থির করত : **গুলি করে ফেলা।**

২. خَطَأٌ فِى الْفِعْلِ হলো– লক্ষ্যচ্যুতি ঘটা। **যেমন, জন্তুকে লক্ষ্য করেই** তীর অথবা গুলি ছোঁড়া; কিন্তু তা কোনো মানুষের গায়ে লেগে যাওয়া।

এখানে خَطَأٌ [ভ্রম] বলতে غَيْرُ عَمَدَ ইচ্ছা নয়, বোঝানো হয়েছে। অতএব, দ্বিতীয় উভয় প্রকার হত্যাই এর অন্তর্ভুক্ত। তাই قَتْل خَطَأ ও قَتْل شِبْهُ عَمَدّ উভয় প্রকারের বিধান একই। অর্থাৎ এগুলোর মধ্যে গোনাহ ও রক্ত-বিনিময়ের বিধান রয়েছে। তবে উভয় প্রকারের গোনাহ ও রক্ত-বিনিময় বিভিন্ন রকম। দ্বিতীয় প্রকারের রক্ত বিনিময় হচ্ছে একশ উট। উটগুলো চার প্রকারের হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকারে পঁচিশটি করে উট থাকবে। তৃতীয় প্রকারের রক্ত বিনিময়ও একশ উট। কিন্তু উটগুলো হলো পাঁচ প্রকারের। অর্থাৎ, প্রত্যেক প্রকারের বিশটি করে উট থাকবে। তবে রক্ত বিনিময় মুদ্রার মাধ্যমে দিলে উভয় প্রকারে দশ হাজার দেরহাম অথবা এক হজার দিনার দিতে হবে। ইচ্ছার কারণে দ্বিতীয় প্রকারের গোনাহ বেশি এবং তৃতীয় প্রকারের গুনাহ কম। অর্থাৎ শুধু অসাবধানতার গুনাহ হবে। –[মাআরিফুল কুরআন]

উপরিউক্ত তিন প্রকারের হত্যার যে স্বরূপ বর্ণিত হলো তা পার্থিব বিধানের দিক বিবেচনায়। গুনাহের দিক দিয়ে ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত হওয়া আন্তরিক ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। শাস্তির বিধানও এরই উপর নির্ভলশীল আল্লাহ তা'আলা জানেন, এদিক দিয়ে প্রথম প্রকার অনিচ্ছাকৃত এবং দ্বিতীয় প্রকার ইচ্ছাকৃত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। –[মা'আরিফুল কুরআন]

চতুর্থ প্রকার : قَائِمٌ مَقَامَ بِالْخَطَأِ অর্থাৎ ভ্রমবশত: হত্যার স্থলাভিষিক্ত। যেমন কোনো ঘুমন্ত ব্যক্তি কারো উপর গড়িয়ে পড়ল এবং তার চাপে সে মারা গেল।

পঞ্চম প্রকার : قَتْل بِالسَّبَبِ অর্থাৎ হত্যার কারণ হওয়া। যেমন, কেউ অন্যের জমিতে কূপ খনন করল যাতে নিপতিত হয়ে কেউ মারা গেল অথবা বড় পাথর রেখে দিল যার সাথে সংঘর্ষ লেগে কেউ মারা গেল।

অনুরূপভাবে مَقْتُوْل বা নিহত ব্যক্তি চার প্রকার।

১. مُؤْمِنْ মুমিন ২. ذِمِّىْ জিযিয়া প্রদানকারী কাফের। ৩. مَصَالِحْ مُسْتَأْمِنْ চুক্তিবদ্ধ ও অভয়প্রাপ্ত কাফের, ৪. حَرْبِىْ দারুল হরবের কাফের।

হত্যার মোট প্রকার : قَاتِلْ ও **مَقْتُوْلْ** উভয়ের অবস্থাভেদে কতলের অনেক সূরত ও প্রকার সাব্যস্ত হয়। হিসাব করলে তা সর্বোচ্চ আট প্রকার হয়। কেননা নিহত ব্যক্তি হয় মুসলমান, না হয় জিম্মী, না হয় চুক্তিবদ্ধ ও অভয়প্রাপ্ত এবং না হয় দারুল হরবের কাফের হবে। এ চার অবস্থার কোনো না কোনো একটি হবেই। হত্যাকারী দুই প্রকার : হয় ইচ্ছাকৃত, না হয় ভ্রমবশত। এতএব, মোট প্রকার হলো আটটি–

১. মুসলামনকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করা।
২. মুসলমানকে ভ্রমবশত হত্যা করা।
৩. জিম্মিকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করা।
৪. জিম্মিকে ভ্রমবশত হত্যা করা।
৫. চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করা।
৬. চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে ভ্রমবশত হত্যাকরা।
৭. হরবী কাফেরকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করা।
৮ হরবী কাফেরকে ভ্রমবশত হত্যা।

বিধান : এসব প্রকারের মধ্যে কিছু সংখ্যকের বিধান পূর্বে বলা হয়েছে, আর কিছু পরে বর্ণিত হবে এবং কিছু সংখ্যকের বিধান হাদীসে উল্লিখিত রয়েছেঃ

প্রথম প্রকারের পার্থিব বিধান. অর্থাৎ কেসাস ওয়াজিব হওয়া সূরা বাক্বারায় উল্লেখ করা হয়েছে এবং পারলৌকিক বিধান পরবর্তী আয়াত وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا এ বর্ণিত হবে।

দ্বিতীয় প্রকারের বিধান. দারাকুতনীর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে জিম্মি হত্যার বিনিময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানের কাছ থেকে কেসাস নিয়েছেন। –[তাখরীজে হেদায়া।]

চতুর্থ প্রকার وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْثَاقٌ আয়াতে উল্লিখিত হবে।

পঞ্চম প্রকারের পূর্ববর্তী রুকুর فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا বাক্যে বর্ণিত হয়েছে।

ষষ্ঠ প্রকারের বিধান চতুর্থ প্রাকরের সাথেই উল্লিখিত হয়েছে। কেননা, مِيْثَاقٌ তথা চুক্তি অস্থায়ী ও স্থায়ী উভয় প্রকারই এর রক্ত বিনিময় ওয়াজিব হওয়ার মাসআলা বিশুদ্ধাভাবে প্রমাণ করা হয়েছে।

সপ্তম ও অষ্টম প্রকারের বিধান স্বয়ং জিহাদ আইনসিদ্ধ হওয়ার মাসআলা থেকে জানা গেছে। কেননা জিহাদে দারুল হরবের কাফেরদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবেই নিহত করা হয়। অতএব ভ্রমবশত: হত্যার বৈধতা আর ও সন্দেহতীতরূপে প্রমাণিত হবে। –[বয়ানুল কুরআন, মাআরিফুল কুরআন]

কতিপয় মাসআলা :

* রক্ত বিনিময়ের উপরিউক্ত পরিমাণ তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন নিহত ব্যক্তি পুরুষ হবে। পক্ষান্তরে মহিলা হলে এর পরিমাণ হবে অর্ধেক। –[হেদায়া]

* মুসলমান ও জিম্মির রক্ত বিনিময় সামান। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, دِيَةُ كُلِّ ذِيْ عَهْدٍ اَلْفُ دِيْنَارٍ [হেদায়া, আবূ দাউদ]।
*. কাফ্‌ফারা অর্থাৎ ক্রীতদাস মুক্ত করা কিংবা রোজা রাখা স্বয়ং হত্যাকারীর করণীয় এবং রক্তবিনিময় হত্যাকারীর স্বজনদের জিম্মায় ওয়াজিব। শরিয়তের পভিাষায় তাদেরকে আকেলা বলা হয়। -[বয়ানুল কুরআন]
* কাফ্‌ফারায় বাদী ও ক্রীতদাস সমান। رَقَبَةٌ শব্দে উভয়কেই বোঝানো হয়েছে। তবে তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিখুঁত হতে হবে।
* নিহত ব্যক্তির রক্ত বিনিময় তার ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। কোনো কানো ওয়ারিশ স্বীয় অংশ মাফ করে দিলে সে পরিমাণ মাফ হয়ে যাবে। সকলে মাফ করে দিলে সম্পূর্ণ মাফ হয়ে যাবে।
* যে নিহত ব্যক্তির কোনো ওয়ারিশ নেই, তার রক্ত বিনিময় বায়তুর মাল তথা সারকারি কোষাগারে জমা হবে। কেননা রক্ত বিনিময় হলো ত্যাজ্য সম্পত্তি। ত্যাজ্য সম্পত্তি বিধান তাই। -[বায়ানুল কুরআন]

চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায় [জিম্মি অথবা অভয়প্রাপ্ত] -এর ক্ষেত্রে যে রক্ত বিনিময় ওয়াজিব হয়, বাহ্যত তা তখনই হয়, যখন জিম্মি কিংবা অভয়প্রাপ্তের পরিবার পরিজন বিদ্যমান থাকে। পক্ষান্তরে যদি তার পরিবার পরিজন বিদ্যমান না থাকে কিংবা তারা অমুসলমান হয়, মুসলমান কাফেরের ওয়ারিশ হতে পারে না বলে এরূপ পরিবার-পরিজন বিদ্যমান থাকা না থাকারই শামিল- এমত ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তি জিম্মি হলে তার রক্ত বিনিময় বায়তুল মালে জমা হবে। কেননা জিম্মি বে ওয়ারিশের ত্যাজ্য সম্পত্তি রক্ত- বিনিময়সহ বাযতুল মালে যায়। [দুররে মুখতার] নিহত ব্যক্তি জিম্মি না হলে রক্ত বিনিময় ওয়াজিব হবে না। [বয়ানুল কুরআন]

* কাফ্‌ফারার রোজায় যদি রোগ ব্যধির কারণে ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন হয়, তবে প্রথম থেকে রোজা রাখতে হবে। অবশ্য মহিলাদের ঋতুস্রাবের কারণে যে রোজা ভাঙ্গতে হয় তাতে ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন হবে না।
* ওজরবশত : রোজা রাখতে সক্ষম না হলে সক্ষম হওয়া পর্যন্ত তওবা করবে।
* ইচ্ছাকৃত হত্যার বেলায় কাফ্‌ফারা নেই তওবা করা উচিত। -[বয়ানুল কুরআন]।

দিয়ত কি? : ভুলবশত হত্যা করলে নিহতের পরিবারর্গকে যে রক্তপণ দেওয়া হত্যাকারীর অবশ্য কর্তব্য, তাকে পরিভাষায় দিয়াত বলা হয়।

قَوْلُهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ : এখানে মূলত نَفْيٌ -এর সূরতে نَهْيٌ বুঝানো হয়েছে। যেমন- وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ -এর মাঝে হয়েছে। কেননা যদি বাহ্যিকভাবে نَفْيٌ -এর অর্থেই ধরা হতো তাহলে এটি একটি সংবাদ হতো। যার বাস্তবে ঘটা আবশ্যক হতো। ফলে অর্থ হবে কোনো মুমিনের হত্যা সংঘটিত হয়নি। অথচ এটি একটি বস্তবতা বিরোধী কথা।

মুসান্নিফ (র.) اَیْ مَا یَنْبَغِیْ لَهٗ اَنْ یَصْدُرَ مِنْهُ قَتْلٌ لَهٗ বলে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ مُخْطِئًا فِیْ قَتْلِهٖ : এ বাক্য দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, خَطَاءً হাল হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে। আর মাসদারটি ইসমে ফায়েলের অর্থে। এমনও হতে পারে যে مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে এবং উহ্য মাসদারের সিফত হয়েছে। তখন ইবারত এমন হবে। اِلَّا قَتْلًا خَطَاءً

قَوْلُهُ بِاَنْ قَصَدَ رَمْیَ غَیْرِهٖ الخ : ভুলবশত কোনো মুসলিমকে হত্যা করলে তার কয়েকটি অবস্থা হতে পারে। মুসান্নিফ (র.) এখানে কয়েকটি অবস্থা তুলে ধরেছেন। যেমন কোনো মুসলিমকে শিকার মনে করে হত্যা করা শিকারকে লক্ষ্য করে তীর বা গুলি চালানো কিন্তু তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে কোনো মুসলিমের দেহে বিদ্ধ হওয়া।

এছাড়াও আরেকটি সুরত এই হতে পারে যে, কাফিরদের মধ্যে বসবাসকারী কোনো মুসলিমকে কাফির মনে করে হত্যা করা। এখানে এ শেষোক্ত অবস্থার বর্ণনাই বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ। মুসলিম মুজাহিদগণ অনেক ক্ষেত্রেই এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হতেন। পূর্বের আয়াতের সাথে এ অবস্থাই বেশি সঙ্গতিপূর্ণ, যদিও ভুলক্রমে করার বাকি অবস্থাগুলোর একই বিধান। সেগুলোও এর মধ্যে এসে গেছে।

اَوْ ضَرَبَهٗ بِمَا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا : شِبْهُ عَمَدٍ কে সুস্পষ্টরূপে আয়াতের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য মুফাসসির (র.) এ তাবীলটি করেছেন। -[হাশিয়া]

قَوْلُهُ نَسَمَةً : অর্থ প্রাণী মানুষ এবং জন্তু উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। رَقَبَةً -এর পরে এ শব্দটির উল্লেখ করে বুঝানো হয়েছে যে, এখানে جُزْء অংশ বলে كُلْ [পূর্ণ বস্তু] বুঝানো হয়েছে। رَقَبَةٌ -শব্দটি সাধারণত ক্রীতদাসের অর্থেই সুপরিচিত।

قَوْلُهُ عَلَيْهِ : এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে,

১. تَحْرِيْرُ হলো মুবতাদা এবং তার খবর মাহযূফ রয়েছে। اَىْ فَعَلَيْهِ تَحْرِيْرُ

২. অথবা تَحْرِيْرُ হলো উহ্য মুবতদার খবর। اَىْ فَاوْجَبَ عَلَيْهِ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ اِلاَّ قَتْلاً خَطَاً

৩. تَحْرِيْرُ উহ্য ফেলের ফায়েল ও হতে পারে। اَىْ لِيَجِبَ عَلَيْهِ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ اِلاَّ قَتْلاً خَطَاً

৪. এটাও হতে পারে যে, عَلَيْهِ হলো শর্তের জাযা আর যেহেতু জাযার জন্য জুমলা হওয়া শর্ত, তাই عَلَيْهِ কে মাহযূফ ধরা হয়েছে।

قَوْلُهُ دِيَةً : এর عَطْف হয়েছে تَحْرِيْر -এর সাথে। আর دِيَةً শব্দটি মূলত. মাসদার। অধিকৃত সম্পদের অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে এ কারণেই তার সিফত হিসেবে مُسْلِمَةٌ আনা হয়েছে। دِيَةً এর মূল রূপ وَدِيٌ ছিল। وَاو হযফ করে তার বদলে শেষে تَاء تَانِيْث বৃদ্ধি করা হয়েছে। دِيَةً হয়েছে।

قَوْلُهُ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسْلِمَةٌ اِلٰى اَهْلِهِ : এ আয়াতে ভুলবশত হত্যা করলে তার দু'টি হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে।

এক. এক মুসলিম গোলাম আজাদ করা এবং সে সঙ্গতি না থাকলে একাধিক্রমে দু'মাস রোজা রাখা। এটা মহান আল্লাহর পক্ষ হতে নিজ অপরাধের কাফ্‌ফারা [প্রায়শ্চিত্ত]।

দুই. নিহতের পরিবারবর্গকে রক্তপণ দেওয়া। এটা তাদের অধিকার। তারা ক্ষমা করলে ক্ষমা হতে পারে। কিন্তু কাফ্‌ফারা কারও ক্ষমা করার দ্বারা ক্ষমা হয় না।

এর মোট তিনটি অবস্থা হতে পারে। কেননা ভুলে যে মুসলিমকে হত্যা করা হলো তার ওয়ারিশ মুসলিম হবে বা কাফির। কাফির হলে তার সাথে মৈত্রী বন্ধন থাকবে কি থাকবে না। প্রথম দুই অবস্থায় নিহতের ওয়ারিশদেরকে রক্তপণ দিতে হবে। তৃতীয় অবস্থায় রক্তপণ দিতে হবে না। কাফ্‌ফারা সর্বাবস্থায়ই দিতে হবে।

কতলের কাফ্‌ফারায় গোলাম আজাদ সম্পর্কিত মাসআলা : কতলের কাফ্‌ফারায় হানাফীদের মতে মুমিন গোলাম আজাদ করা জরুরি। কেননা আয়াতে তার উল্লেখ রয়েছে । কিন্তু অন্যান্য কাফ্‌ফারায় মুমিন গোলাম আজাদ করা জরুরি নয়। কাফের গেলাম আজাদ করলেও কাফ্‌ফারা আদায় হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর অভিমত হলো সকল কাফ্‌ফারায়ই মুমিন গোলাম আজাদ করা জরুরি।

আর গোলাম হতে হবে সুস্থ ও পরিপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অধিকারী। লেংড়া, অন্ধ, পাগল তথা প্রতিবন্ধী গেলাম আজাদ করলে আদায় হবে না আনুরূপভাবে মুদাব্বির, উম্মে ওয়ালাদ ও ঐ মুকাতিব, যার আংশিক টাকা আদায় হয়েছে তাদেরকে আজাদ করাও যথেষ্ট হবে না। কেননা আয়াতে مُطْلَقْ رَقَبَةً বলা হয়েছে। আর مُطْلَقْ দ্বারা فَرْد كَامِلْ উদ্দেশ্য হয়। উপরে বর্ণিত গোলামরা কেউ যাতের দিক থেকে আর কেউ সিফতের দিক থেকে সম্পূর্ণ হওয়ার কারণে তাদের দ্বারা কাফ্‌ফারা আদায় হবে না। -[জামালাইন খ. ২, পৃ. ৮০] অবশ্য পুরুষ মহিলা, ছোট বড় সকলকেই আজাদ করা যাবে।

কতলের কাফ্‌ফারায় মুমিন গলোম আজাদ করার রহস্য : হত্যাকারী কোনো মুমিনকে হত্যা করে পৃথিবীর বুক থেকে একজন মুমিন কমিয়ে দিয়েছে। তাই মুমিনদেরই একজনকে আজাদ করে তার ক্ষতিপূরণ করবে। কেননা গোলামি হলো প্রকারান্তরে মৃত্যু আর আজাদি হলো জীবন।

قَوْلُ اِلاَّ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا : ইস্তেছনার কারণে মানসূব হয়েছে। اَىْ فِىْ جَمِيْعِ الْاَحْيَانِ اِلاَّ حِيْنَ التَّصَدُّقِ

اَنْ يَّصَّدَّقُوْا. রক্তপণের ক্ষমাকে تَصَدُّقْ অর্থাৎ দান অর্থে প্রকাশ করা হয়েছে। এতে এ কথারই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এটাই উত্তম। (بَيْضَاوِىْ) سُمِّىَ الْعَفْوُ عَنْهَا صَدَقَةً حَثًّا عَلَيْهِ تَنْبِيْهًا عَلٰى فَضْلِهِ অর্থাৎ ক্ষমাকে সদকা নাম দেওয়ার অর্থ তাতে উৎসাহ দেওয়া এবং তার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা। -[বায়যাবী সূত্রে মাজেদী]

وَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ اَنَّهَا مِاَةٌ مِنَ الْاِبِلِ এটি ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মাতানুসারে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত হলো বিশটি اِبْنُ لَبُوْنٍ -এর স্থলে اِبْنُ مَخَاضٍ প্রদান করা হবে। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণিত হাদীসে তা বিদ্যমান।

আর দিয়ত মুদ্রায় পরিশোধ করলে তার **পরিমাণ হলো, এক হাজার** দীনার স্বর্ণমুদ্র অথবা দশ হাজার দিরহাম বা রৌপ্যমুদ্রা। ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে **বার হাজার দিরহাম।**

সাহেবাইনের মতে উপরিউক্ত তিনটি **বস্তু ছাড়াও অন্য বস্তুর দ্বারা দিয়ত** দেওয়া যাবে। যেমন, দুইশত গাভী অথবা একহাজার ছাগল কিংবা দুই শত জোড়া **কাপড়।**

قَوْلَهُ وَهُمْ عَصَبَةُ الْاَصْلِ وَالْفَرْعِ : এটি **ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর অভিমত।** কেননা রাসূল ﷺ -এর যুগে এমনই ছিল। আকিলার বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর **অভিমত হলো, হত্যাকারী ব্যক্তি যদি দীওয়ানা** অর্থাৎ সরকারি ভাতাপ্রাপ্তদের রেজিস্টারভুক্ত হয়ে থাকে তবে উক্ত দীওয়ানভুক্ত **ব্যক্তিরা তার আকিলা হবে এবং তাদের প্রাপ্তব্য** ভাতা হতে তা পরিশোধ করা হবে। কেননা হযরত ওমর (রা.) সাহাবায়ে **কেরামের উপস্থিতিতে এমনই পদক্ষেপ নিয়েছেন** কিন্তু কোনো সাহাবী আপত্তি করেননি। তবে হত্যাকারী রেজিস্টারভুক্ত **না হলে তার বংশের লোকেরাই তার আকেলা হবে।**

সংশয় নিরসন : এখানে প্রশ্ন করা উচিত হবে **না যে, হত্যাকারীর অপরাধের বোঝা তার স্বজনদের উপর** কেন চাপানো হয়? তারা তো নিরপরাধ। কুরআনেও তো উল্লেখ রয়েছে- **وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰى অর্থাৎ কেউ কারো** পাপের বোঝা বহন করবে না।

জবাব : এর কারণ এই যে, হত্যাকারীর স্বজনরাও দোষী। **তারা তাকে এ ধরনের উচ্ছৃঙ্খল কাজ কর্মে বাধা** দেয়নি। রক্ত বিনিময়ের ভয়ে ভবিষ্যতে তারা তার দেখাশোনা করতে ত্রুটি **করবে না। আর আয়াতের সম্পর্ক বিশেষ গুনাহের সাথে।** অর্থাৎ এক ব্যক্তি অপরের কোনো গুনাহের জিম্মাদার হবে **না কিন্তু দুনিয়াবী শাস্তি ও বিধানের সাথে তার কোনো সম্পর্ক** নেই। সুতরাং কোনো আপত্তি বাকি থাকল না।

রক্তপণের ওয়ারিশদের অংশীদারিত্ব : হত্যার কাফ্ফারা তথা গেলাম **আজাদ এবং রোজা রাখা শুধুমাত্র** হত্যাকারীর দায়িত্ব তবে দিয়তের মাঝে অন্যান্য সহযোগীরাও শরিক হবে।

قَوْلَهُ نِصْفُ دِيْنَارٍ : এটি ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে।

قَوْلَهُ ثُلُثَا عُشْرِهَا : এটিও ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে।

قَوْلَهُ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ : অর্থাৎ কোনো হরবী কাফের মুসলমান হয়ে দারুল **হরবে বসবাস করছে** অথবা দারুল ইসলামে হিজরত করার পর কোনো প্রয়োজনে দারুল হরবে নিজের আত্মীয় **স্বজনদের কাছে গমন** করে এবং সেখানে কোনো মুসলমানের হাতে নিহত হয়।

قَوْلَهُ ثُلُثُ دِيَةِ الْمُؤْمِنِ : এটিও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে। তিনি **ঐ হাদীস দ্বারা দলিল** পেশ করেন যেখানে ইহুদি নাসারা তথা আহলে কিতাবের দিয়ত চারহাজার দিরহাম এবং মাজুসীদের **দিয়ত আটশ** দিরহাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর যেহেতু ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে দিয়তের আর্থিক পরিমাণ দশ **হাজারের বদলে বার হাজার** তাই তার এক তৃতীয়াংশ চারহাজার এবং দশমাংশের দুই তৃতীয়াংশ আটশ দিরহাম।

ইমাম মলেক (র.) -এর মতে জিম্মির দিয়ত ছয়হাজার দিরহাম। কেননা **একটি** হাদীসে রয়েছে- **عَقْلُ الْكَافِرِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِ** অর্থাৎ কাফেরের দিয়ত মুসলমানের দিয়তের অর্ধেক। কিন্তু **হানাফীগণ হযরত** সিদ্দীকে আকবর ও ফারুকে আজম (রা.) -এর আমলের ভিত্তিতে জিম্মি ও মুসলমানের দিয়ত সামান মনে **করেন। এ বিষয়ে** একটি হাদীস ও রয়েছে।

قَوْلَهُ وَبِهِ اَخَذَ الشَّافِعِيُّ : এ ক্ষেত্রে হানাফী এবং শাফেয়ী উভয়ের **মতামত** এক ও অভিন্ন দু'মাস একটানা রোজা না রাখতে পারলে যিহারের কাফ্ফারার মতো ষাট মিসকিনকে খাদ্য দান **করলে চলবে না।**

যিহার : যাদেরকে বিবাহ করা হারাম তাদের কোনো অঙ্গের সাথে বিবাহিতা স্ত্রীকে তুলনা করাকে যিহার বলা হয়।

قَوْلَهُ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ : এ আয়াতে এ বিষয়ের তাকিদ স্বরূপ **বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে** যে, কাফ্ফারা ও দিয়তের এ ব্যবস্থা স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, কোনো **বান্দার পক্ষ থেকে নয়।** কোনো পীর বা ধর্মগুরু কাউকে ক্ষমা করলে তার পাপ ক্ষমা হয়ে যাবে না।

অনুবাদ :

٩٣. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا بِاَنْ يَقْصُدَ قَتْلَهُ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا عَالِمًا بِاِيْمَانِهِ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ اَبْعَدَهُ مِنْ رَحْمَتِهِ وَاَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا فِى النَّارِ وَهٰذَا مُؤَوَّلٌ بِمَنْ يَسْتَحِلُّ اَوْ بِاَنَّ هٰذَا جَزَاؤُهُ اِنْ جُوْزِىَ وَلَا بِدْعَ فِىْ خُلْفِ الْوَعِيْدِ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّهَا عَلٰى ظَاهِرِهَا وَاَنَّهَا نَاسِخَةٌ لِغَيْرِهَا مِنْ اٰيَاتِ الْمَغْفِرَةِ وَبَيَّنَتْ اٰيَةُ الْبَقَرَةِ اَنَّ قَاتِلَ الْعَمَدِ يُقْتَلُ بِهِ وَاَنَّ عَلَيْهِ الدِّيَةَ اِنْ عُفِىَ عَنْهُ وَسَبَقَ قَدْرُهَا وَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ اَنَّ بَيْنَ الْعَمَدِ فِى الصِّفَةِ وَالْخَطَأِ قَتْلًا يُسَمّٰى شِبْهَ الْعَمَدِ وَهُوَ اَنْ يَقْتُلَهُ بِمَا لَا يُقْتَلُ غَالِبًا فَلَا قِصَاصَ فِيْهِ بَلْ دِيَةٌ كَالْعَمَدِ فِى الصِّفَةِ وَالْخَطَأِ فِى التَّاجِيْلِ وَالْحَمْلِ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَهُوَ وَالْعَمَدُ اَوْلٰى بِالْكَفَّارَةِ مِنَ الْخَطَأِ ـ

৯৩. কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মু'মিনকে হত্যা করলে যেমন, তাকে মু'মিন বলে জানার পরও হত্যার ইচ্ছায় এমন অস্ত্র দ্বারা আঘাত করল যা দ্বারা সাধারণত হত্যা করা যায়। তার শাস্তি জাহান্নাম সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন। তাকে অভিসম্পাত করবেন। তার রহমত হতে বিতাড়িত করে দিবেন। এবং জাহান্নামে তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন।

এ আয়াতটি মর্ম বর্ণনায় বলা হয় যে, এ শাস্তি ঐ ব্যক্তির উপরই প্রযোজ্য হবে যে ব্যক্তি তা [মু'মিনকে হত্যা করা] হালাল ও বৈধ বলে মনে করে। বা তার অর্থ হলো, যদি এর যথার্থ শাস্তি দেওয়া হয় তবে সেটাই হলো যথার্থ শাস্তি। আর [ক্ষমা প্রদর্শন করত] হুমকির বিপরীত করাতে কোনো বিস্ময় বা প্রশ্ন হয় না আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَالِكَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ আল্লাহ শিরক ভিন্ন অন্য অপরাধ ক্ষমা করে দেন যাকে তাঁর ইচ্ছা হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আয়াতটি এখানে বাহ্যিক অর্থেই ব্যবহৃত। এ আয়াতটি ক্ষমার বিধান সম্বলিত আয়াতসমূহের জন্য নাসিখ বা হুকুম রহিতকারী বলে গণ্য।

সূরা বাকারায় উল্লেখ হয়েছে যে, স্বেচ্ছায় যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করে তাকে [কিসাসের বিধান অনুসারে] হত্যা করা হবে। আর যদি [নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ কর্তৃক] তাকে মাফ করে দেওয়া হয় তবে তার উপর রক্তপণ ধার্য হবে। তার পরিমাণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুন্নাহর বর্ণনায় জানা যায় যে, কাতলে আমাদ অর্থাৎ, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হত্যা ও কাতলে খাতা অর্থাৎ ভুলবশতঃ হত্যার মাঝামাঝি শিবহে আমাদ অর্থাৎ প্রায় স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হত্যা নামক আরেক ধরনের হত্যাকাণ্ড রয়েছে। তা হলো হত্যা করার ইচ্ছায় একজনকে এমন অস্ত্র দ্বারা হত্যা করা যা দ্বারা সাধারণত: হত্যা করা যায় না। এতে কিসাস নয়, বরং দিয়ত বা রক্তপণ ধার্য হয়। আর তা [রক্তপণ] অবস্থা হিসাবে কাতলে আমদ বা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হত্যা। আর সময়সীমা ও আকিলাদের ঘাড়ে ধার্য দিয়ত প্রদান হিসাবে কাতলে খাতা অর্থাৎ ভুলবশতঃ হত্যার অনুরূপ। কাতলে খাতা বা ভুলবশত: হত্যার তুলনায় এতে এবং কাতলে আমাদ অর্থাৎ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হত্যার কাফফারার বিধান প্রযোজ্য হওয়া অধিকতর যুক্তিযুক্ত। [এটি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত হলো এতে কাফফারা নেই।]

তাহকীক ও তারকীব

بِدْعٌ : **بِدْعٌ বহুবচন** اِبْدَاعٌ অভূতপূর্ব, নতুন। আর কামূসে এর অর্থ দেওয়া হয়েছে বিরলতা, স্বল্পতা।
قِصَاصٌ : قِصَاصٌ প্রতিশোধ, শাস্তি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا....الخ : যদি কোনো মুসলিম অপর এক মুসলিমকে অজ্ঞাতসারে নয়; বরং মুসলিম জেনেই হত্যা করে, তবে আখেরাতে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম, লা'নত ও মহাশাস্তি। কাফফারা দ্বারা তার নিষ্কৃতি হবে না। তার পার্থিব সাজা সূরা বাকারায় বর্ণিত হয়েছে।

ইচ্ছাকৃত হত্যার যেসব পরিচিত ও সাধারন ধরন পদ্ধতি রয়েছে, তাতো আছেই, কিন্তু তাছাড়া আশ্চর্যের কিছুই নেই যে, এই সতর্ককরণের আওতায় সেসব পদ্ধতিও পড়ে যাবে, যেগুলো কোনো শরিয়ত বিরোধী আইন অনুসারে এবং কোনো কাফির আইন ও প্রশাসনের অধীনে সংঘটিত হয়। যেমন কেউ কোনো কাফির রাষ্ট্রের সৈনিক কিংবা পুলিশ বিভাগের ভর্তি হয়ে ঐ রাষ্ট্রের কোনো বিদ্রোহী ও অপরাধী মুসলমানের উপর গুলি করা কিংবা কোনো অমুসলিম আদালতের আসনে ম্যাজিস্ট্রেট বা জজ হিসেবে বসে কোনো মুসলমানকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া ইত্যাদি। -[মাজেদী]

قَوْلُهُ عَالِمًا بِإِيْمَانِهِ : অর্থাৎ উক্ত আজাবের উপযুক্ত তখন হবে যখন সে তাকে মু'মিন মনে করে হত্যা করে। যদি হরবী মনে করে হত্যা করে তাহলে আজাবের উপযুক্ত হবে না।

قَوْلُهُ وَهٰذَا مَأْوَلٌ بِمَنْ .... : এখান থেকে একটি প্রসিদ্ধ সংশয়ের জবাব দিচ্ছেন। সংশয়: জাহান্নামে চির দিনের জন্য প্রবেশ করবে কাফেররা। কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও অকাট্য প্রমাণের আলোকে সুস্পষ্ট যে, গুনাহগার মুমিনের শাস্তি চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে প্রবেশ নয়। কিন্তু এ আয়াতের বহ্যিক অর্থে বুঝা যাচ্ছে হত্যাকারী মুমিনের শাস্তি হলো চিরস্থায়ী জাহান্নাম।

প্রথম জবাব : স্থায়ী জাহান্নাম সেই ব্যক্তির জন্য যে মুসলিমকে হত্যা করা বৈধ মনে করে। কেননা এর ফলে সে নিঃসন্দেহে কাফির হয়ে যায়। যে এ শাস্তি কাফিরকেই দেওয়া হচ্ছে।

দ্বিতীয় জবাব : এ জঘন্যতম অপরাধের প্রকৃত শাস্তি তো হলো চিরস্থায়ী জাহান্নাম। বাকি আল্লাহ সব কিছুর মালিক। তিনি যা ইচ্ছা করবেন। তিনি দয়ার আচরণ করে চিরদিন নাও দিতে পারেন। এতে অবশ্য خَلْفُ وَعِيْد এর সম্ভাবনা রয়েছে। আর خَلْفُ وعده মন্দ হলেও خَلْف وَعِيْد মন্দ নয়। শাস্তির ঘোষণা দিয়ে তা না দেওয়ার মাঝে কোনো বিস্ময় নেই। হাদীস শরীফে এসেছে- مَنْ وَعَدَهُ اللّٰهُ عَلٰى عَمَلٍ ثَوَابًا فَهُوَ مُنْجِزُهٗ لَهٗ وَمَنْ اَوْعَدَهٗ عَلٰى عَمَلِهٖ عِقَابًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ

তারপরও আপত্তি থেকেই যায় যে, প্রকৃত শাস্তি যদি তাই হয় তাহলে তো মুমিনকে চিরস্থায়ী জাহান্নামের শাস্তিই দেওয়া হচ্ছে যা শরিয়তের অকাট্য নীতির বিপরীত। তাই কেউ কেউ বলেন, এ স্থলে স্থায়ী জাহান্নাম দ্বারা দীর্ঘ জাহান্নাম বাস বোঝান হয়েছে।

قَوْلُهُ لَا بِدْعَ : اَیْ لَانُدْرَةَ বিস্ময়ের কিছু নেই।

তৃতীয় জবাব : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ বলে তৃতীয় জবাবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যার সারকথা হলো, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর দ্বারা অপরাধের জঘন্যতা বুঝানো হয়েছে। কেননা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেই এ মতের বিপরীত বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে।

মু'তাযিলাদের খণ্ডন : قَوْلُهُ بِمَنِ اسْتَحَلَّ : এ অংশটুকু দ্বারা মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের মতেরও খণ্ডন করা হয়েছে। কেননা জহান্নামে চির দিনের জন্য প্রবেশ করবে কাফেররা। সুন্নাহ, ইজমা ও অকাট্য প্রমাণের আলোকে সুস্পষ্ট যে, গুনাহগার মুমিনের শাস্তি চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে প্রবেশ নয়। পক্ষান্তরে মু'তাযিলারা বলে, যে কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়েছে সে যদি তওবা ছাড়া মারা যায় তাহলে সেও চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে যাবে।

قَوْلُهُ وَهُوَ وَالْعَمْدُ اَوْلٰى بِالْكَفَّارَةِ مِنَ الْخَطَاِ : এটি ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে। আর হানাফীদের মতে قَتْلُ عَمْدٍ -এর ক্ষেত্রে শুধু কেসাস আসবে, কাফফারা ওয়াজিব নয়। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে قَتْلُ خَطَاٍ এর মাঝে যখন কাফফারা আছে সেহেতু قَتْلُ عَمْدٍ -এর মাঝে আরো জোরালোভাবে আসবে। -[কামালাইন-৮০]

অনুবাদ :

٩٤. وَنَزَلَ لَمَّا مَرَّ نَفَرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ (رض)
بِرَجُلٍ مِنْ بَنِيْ سُلَيْمٍ وَهُوَ يَسُوْقُ غَنَمًا
فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوْا مَا سَلَّمَ عَلَيْنَا اِلَّا
تَقِيَّةً فَقَتَلُوْهُ وَاسْتَاقُوْا غَنَمَهُ يَاَيُّهَا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا ضَرَبْتُمْ سَافَرْتُمْ
لِلْجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَفِيْ
قِرَاءَةٍ بِالْمُثَلَّثَةِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَلَا
تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰى اِلَيْكُمُ السَّلَمَ بِاَلِفٍ
وَدُوْنَهَا. اَيْ اَلتَّحِيَّةَ اَوِ الْاِنْقِيَادُ بِقَوْلِ
كَلِمَةِ الشَّهَادَةِ الَّتِيْ هِيَ اِمَارَةٌ عَلٰى
اِسْلَامِهِ لَسْتَ مُؤْمِنًا وَاِنَّمَا قُلْتَ هٰذَا
تَقِيَّةً لِنَفْسِكَ وَمَالِكَ فَتَقْتُلُوْهُ تَبْتَغُوْنَ
تَطْلُبُوْنَ بِذٰلِكَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
مَتَاعَهَا مِنَ الْغَنِيْمَةِ فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ
كَثِيْرَةٌ تُغْنِيْكُمْ عَنْ قَتْلِ مِثْلِهِ لِمَا لَهُ
كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ تُعْصَمُ دِمَاؤُكُمْ
وَاَمْوَالُكُمْ بِمُجَرَّدِ قَوْلِكُمُ الشَّهَادَةَ فَمَنَّ
اللّٰهُ عَلَيْكُمْ بِالْاِشْتِهَارِ بِالْاِيْمَانِ
وَالْاِسْتِقَامَةِ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تَقْتُلُوْا مُؤْمِنًا
وَافْعَلُوْا بِالدَّاخِلِ فِي الْاِسْلَامِ كَمَا فُعِلَ
بِكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا
فَيُجَازِيْكُمْ بِهِ.

৯৪. একদল সাহাবী জিহাদের সফরে কোনো এক পথ অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। পাশে বনূ সুলাইমের এক ব্যক্তি কিছু ছাগল চড়াচ্ছিল। সে তাদেরকে দেখে সালাম করল। তাদের ধারণা হলো, প্রাণ বাচাবার উদ্দেশ্যই এ ব্যক্তি সালাম করেছে। ফলে তারা তাকে হত্যা করে সমুদয় ছাগল ছিনিয়ে নিলেন।

এ উপলক্ষে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন আল্লাহর পথে যাত্রা করবে জেহাদের সফরে বের হবে تَبَيَّنُوْا এটা উভয় স্থানেই অপর এক ক্বেরাতে تَثَبَّتُوْا রূপে পঠিত রয়েছে। খন পরীক্ষা করে নিবে এবং কেউ তোমাদেরকে সালাম করলে اَلسَّلَمْ এর لَامْ -এর পর اَلِفْ সহ ও তা ব্যতিরেকে পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ অভিবাদন করলে, এর অর্থ এরূপও হতে পারে, ইসলামের নির্দশন কালিমা-ই শাহাদত পাঠ করে আনুগত্য প্রদর্শন করলে ইহজীবনের সম্পদের আকাঙ্ক্ষায় অর্থাৎ গনিমত বা যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী কামনায় তাকে বলো না, তুমি বিশ্বাসী নও তুমি কেবল নিজের জান ও মাল রক্ষা করে এরূপ বলছো। আর এর ফলশ্রুতিতে তাকে হত্যা করে ফেলবে- এমন যেন না হয়।

আল্লাহর নিকট যুদ্ধলব্ধ সম্পদ প্রচুর অর্থ লাভের উদ্দেশ্যে এ ধরনের হত্যাকাণ্ড হতে যা তোমাদেরকে অনপেক্ষ করতে সক্ষম। তোমরাও তো পূর্বে এরূপই ছিলে। শুধুমাত্র কালিমা-ই-শাহাদতের স্বীকৃতির মাধ্যমেই তো তোমরা নিজেদের জান মাল রক্ষা করতে পারলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের ঈমানের সংবাদ প্রচার করে দিয়ে ও ঈমানে তোমাদেরকে দৃঢ়তা দান করত: তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। সুতরাং কোনো বিশ্বাসী ব্যক্তিকে হত্যা করছো কি-না তা পরীক্ষা করে নেবে। তোমাদের সাথে যে ব্যবহার করা হয়েছে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত জনের সাথেও অদ্রূপ ব্যবহার করবে।

তোমরা যা কর আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত অনন্তর তিনি তোমাদেরকে এর প্রতিফল দান করবেন।

তাহকীক ও তারকীব

تَقِيَّةً : تَقِيَّةً -আত্মরক্ষা, খোদাভীতি, বাবে ضَرَبَ থেকে وَقَى يَقِى تَقِى রক্ষা করা।
اِسْتَاقَ : اِسْتَاقَ [বাবে اِفْتِعَالٌ] চালিয়ে নেওয়া পরিচালিত করা।
تَبَيَّنَ : تَبَيَّنَ [বাবে تَفَعُّلٌ] পরীক্ষা করা , যাচাই করা, স্পষ্ট হওয়া।
اِنْقِيَادٌ : اِنْقِيَادٌ - আত্মসমর্পণ করা, অনুগত হওয়া।
مَتَاعٌ : مَتَاعٌ বহুবচন غَنَائِمُ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ।
دِمَاءٌ : دَمٌ ব.ব دِمَاءٌ রক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে মুমিন হত্যার আলোচনা ছিল। এখানে বলা হচ্ছে, মুসলমান হওয়ার জন্য বাহ্যিক নিদর্শনাবলিই যথেষ্ট। জাহেরী আলামত দেখেই বিরত থাকতে হবে। ভেতরে সে মুমিন হোক বা না হোক।

শানে নুযূল ও আলোচনা : হযরত রাসূলে কারীম ﷺ একদল মুজাহিদকে এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদে পাঠিয়েছিলেন। সে সম্প্রদায়ের একজন লোক মুসলিম ছিলেন। নাম মারদাস ইবনে নাহীক। মুসলমানরা হামলা করলে সে কওমের সকলে পালিয়ে যায়। শুধু মিরদাস ইবনে নাহীক একা থেকে যায় এবং সে নিজের যাবতীয় ধন সম্পদ নিয়ে পাহাড়ের দিকে যাচ্ছিলেন। মুজাহিদগণকে দেখে তিনি সালাম দিলেন। কিন্তু তারা তাকেও কাফির মনে করলেন এবং ভাবলেন, জানমাল বাচানোর দায়ে নিজেকে মুসলিম বলে পরিচয় দিয়েছে। কাজেই তারা তাকে হত্যা করলেন এবং তার পশুপাল ও ধন সম্পদ হস্তগত করলেন। হত্যাকারী সাহাবী ছিলেন হযরত যায়েদ ইবনে উসামা। রাসূল ﷺ -এর পালকপুত্র যায়েদ নয়। তিনি গিয়ে রাসূল ﷺ -এর কাছে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে আমার তলোয়ার থেঁকে বাচার জন্য সালাম করেছে এবং কালিমা পড়েছে। রাসূল ﷺ রাগতস্বরে বললেন هَلَّا شَقَقْتَ قَلْبَهُ তুমি কি তার অন্তর চিরে দেখেছিলে? তারপর যায়েদ ইবনে উসামা (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ" আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। রাসূল ﷺ তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং কাফ্ফারা স্বরূপ গোলাম আজাদ করতে বললেন। সেই সাথে তার পশুপাল ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

হযরত যায়েদ বিন উসামা (রা.) সে ভুলের কারণে হৃদয়ে এত বেশি চোট পেলেন যে, এতেই তার ইন্তেকাল হয়ে যায়। ইন্তেকালের পর দাফন করা হলো। কিন্তু তৎক্ষণাত লাশ কবর থেকে বের হয়ে যায়। তিনবার এ ঘটনার ঘটল। উপস্থিত লোকজন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে হাজির হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যদিও মাটি তার চেয়ে মন্দ লোককে গ্রহণ করেছে কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সতর্ক করার জন্য এমনটি করেছেন। তারপর বললেন, যাও এবার দাফন কর। এবার দাফন করার পর মাটি তাঁকে গ্রহণ করেছে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। এতে মুসলিমগণকে সাবধান ও তাকিদ করা হয়েছে যে, তোমরা যখন যুদ্ধাভিযানে যাও, তখন যাচাই করে কাজ করো। চিন্তা ভাবনা না করে কোনো পদক্ষেপ নিও না। কেউ তোমাদের সামনে নিজেকে মুসলিমরূপে প্রকাশ করলে, তার মুসলিম হওয়াকে কখনই অস্বীকার করো না। মহান আল্লাহর নিকট প্রচুর গনিমত আছে এরূপ তুচ্ছ মালামালের পতি দৃষ্টিপাত করা উচিত নয়।

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে এ ঘটনা ছাড়া আরও ঘটনাবলি বর্ণিত রয়েছে, কিন্তু সুবিজ্ঞ তাফসীরবিদগণ বলেছেন, এসব রেওয়ায়েতের মাঝে কোনো বিরোধ নেই। সমষ্টিগতভাবে কয়েকটি ঘটনাও আয়াতটি অবতরণের হেতু হতে পারে। [মাআরিফুল কুরআন]

قَوْلُهُ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا :

ঘটনার তদন্ত না করে সিদ্ধান্ত নেওয়া বৈধ নয় : আলোচ্য আয়াতের প্রথম বাক্যে একটি সাধারণ নির্দেশ রয়েছে যে, মুসলমানরা কোনো কাজ সত্যাসত্য যাচাই না করে শুধু ধারণার বশবর্তী হয়ে করবে না। বলা হয়েছে إِذَا ضَرَبْتُمْ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا। অর্থাৎ তোমারা যখন আল্লাহর পথে সফর কর, তখন সত্যাসত্য অনুসন্ধান করে সব কার্জ করো। শুধু ধারণার বশবর্তী হয়ে কাজ করলে প্রায়ই ভুল হয়ে যায়। এমনটি যেন না হয়, কাফির ভেবে কোনো কালিমা পড়া মুসলমানকে হত্যা করে ফেল।

এরূপ তথ্যানুসন্ধান ও সতর্কতা অবলম্বন করা সফর ও বাড়িতে, স্বদেশে ও বিদেশে সর্বত্রই এবং সর্বাবস্থায়ই ওয়াজিব। তবে এ ক্ষেত্রে জিহাদের সফর দ্বারা কেবল এ কারণে সীমিত করা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াত নাজিল হওয়ার পূর্বে ঘটনাটি আকস্মিকভাবে জিহাদের সফরেই ঘটে যায়। –[কুরতবী সূত্রে মাজেদী]

কিংবা এর কারণ এও হতে পারে যে, সাধারণত: সফরে থাকা অবস্থায় অন্যের সন্দেহ দেখা দেয়। নিজ শহরে অন্যের অবস্থা সাধারণত জানা থাকে। তাই আসল নির্দেশটি ব্যাপক। অর্থাৎ সফরে হোক কিংবা বাসস্থানে হোক, সর্বত্রই খোঁজ খবর না নিয়ে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা বৈধ নয়। এক হাদীসে বলা হয়েছে ভেবে চিন্তে কাজ করা আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং তড়িঘড়ি কাজ করা শয়তানের পক্ষ থেকে। −[বাহরে মুহীত সূত্রে মাআরিফুল কুরআন]

কেবলার অনুসারীকে কাফের না বলার তাৎপর্য : এ আয়াত থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা জানা গেল যে, যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমানরূপে পরিচয় দেয়, কালেমা পাঠ করে কিংবা অন্য কোনো ইসলামি বৈশিষ্ট যথা নামাজ, আজান ইত্যাদিতে যোগদান করে তাকে মুসলমান মনে করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। তার সাথে মুসলমানদের মতোই ব্যবহার করতে হবে এবং সে আন্তরিকভাবে মুসলমান হয়েছে না কোনো স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, এ কথা প্রমাণ করার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

এছাড়া এ ব্যাপারে তার কাজকর্মের উপর ও উপরিউক্ত নির্দেশ নির্ভরশীল হবে না। মনে করুন সে, নামাজ পড়ে না, রোজা রাখে না এবং সর্বপ্রকার গোনাহে জড়িত, তবুও তাকে ইসলাম বহির্ভূত বলার কিংবা তার সাথে কাফেরের মতো ব্যবহার করার অধিকার কারও নেই। এ কারণেই ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) বলেন: আমরা কেবলার অনুসারীকে কোনো পাপ কার্যের কারণে কাফের সাব্যস্ত করি না। কোনো কোনো হাদীসে এ জাতীয় উক্তি বর্ণিত আছে যে, যত গোনাহগার দুষ্কর্মীই হোক, কেবলার অনুসারীকে কাফের বলো না।

কিন্তু এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলামান বলে, কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী তাকে কাফের বলা বা মনে করা বৈধ নয়। এর সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, কুফরের নিশ্চিত লক্ষণ, এরূপ কোনো কথা বা কাজ যতক্ষণ তার দ্বারা সংগঠিত না হবে, ততক্ষণ তার ইসলামের স্বীকারোক্তিকে বিশুদ্ধ মনে করা হবে এবং তাকে মুসলমানই বলা হবে। তার সাথে মুসলমানের মতোই ব্যবহার করা হবে এবং তার আন্তরিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করার অধিকার কারও থাকবে না।

কিন্তু যে ব্যক্তি ইসলাম ও ঈমান প্রকাশ করার সাথে সাথে কিছু কুফরি কালেমা ও বলাবলি করে, অথবা প্রতিমাকে আভূমি নত হয়ে প্রণাম করে কিংবা ইসলামের কোনো অকাট্য ও স্বত:সিদ্ধ নির্দেশ অস্বীকার করে কিংবা কাফেরদের কোনো ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করে, যেমন− গলায় পৈতা পরা ইত্যাদি, তবে তাকে সন্দেহতীতভাবে কুফরি কাজকর্মের কারণে কাফের আখ্যা দেওয়া হবে। আলোচ্য আয়াতের শব্দে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। নতুবা ইহুদি ও খ্রিস্টান সবাই নিজেকে মুমিন মুসলমান বলত। মুসায়লামা কায্যাব শুধু কালেমার স্বীকারোক্তিই নয়, ইসলামি বৈশিষ্ট্য, যথা নামাজ আজান ইত্যাদির ও অনুগামী ছিল। আজানে আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' -এর সাথে আশহাদু আন্না মহাম্মাদার রাসূলুল্লাহও উচ্চারণ করত। কিন্তু সাথে সাথে সে নিজেকে ও নবী রাসূল ও ওহীর অধিকারী বলে দাবি করত, যা কুরআন সুন্নাহর প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ। এ কারণেই তাকে ধর্মত্যাগী সাব্যস্ত করা হয় এবং সাহাবায়ে কেরামের এজমা তথা সর্বসম্মতিক্রমে তার বিরুদ্ধে জিহাদ করে তাকে হত্যা করা হয়।

মোটামুটি মাসআলা হলো এই যে, প্রত্যেক কালেমা উচ্চারণকারী কেবলার অনুসারীকে মুসলমান মনে কর। তার অন্তরে কি আছে তা খোজাখুজি করার প্রয়োজন নেই, অন্তরের বিষয় আল্লাহর হাতে সমর্পণ কর। তবে ঈমান প্রকাশের সাথে সাথে ঈমান বিরোধী কোনো কাজ সংঘটিত হলে তাকে মুরতাদ অর্থাৎ ধর্মত্যাগী মনে কর। এর জন্য শর্ত এই যে, কাজটি যে ঈমান বিরোধী, তা অকাট্য ও নিশ্চিত হতে হবে। এতে কোনোরূপ দ্ব্যর্থতার অবকাশ না থাকা চাই। −[মাআরিফুল কুরআন]

قَوْلُهُ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِكُمْ : এখানে মুসলমান সাহাবী ও অন্যান্যদের স্বরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তোমারাও এরূপই ছিলে, অর্থাৎ ইসলামের আগে তোমরা পার্থিব স্বার্থে অন্যায় রক্তপাত করতে। এখন তো তোমরা মুসলিম। কাজেই তা আর করা উচিত নয়। বরং যা সম্পর্কে মুসলিম, হওয়ার সম্ভাবনা ও থাকে, তাকে হত্যা করতে যেয়ো না। কিংবা অর্থ এই যে, ইতিপূর্বে ইসলামের সূচনা লগ্নে তোমরা কাফিরদের দেশেই বাস করতে। তোমাদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রও স্বতন্ত্র আবাসভূমি ছিল না। তখন তোমাদের ইসলাম যেমন গ্রহণযাগ্য ছিল এবং তোমাদের জান মালের নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছিল, তেমনি তোমাদের উচিত সে রকম মুসলিমগণের সার্বিক নিরপত্তা বিধান করা। কাউকে যাচাই না করে হত্যা করো না। চিন্তাভাবনা ও সতর্কতার সাথে কাজ করা উচিত।

قَوْلُهُ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রকাশ্য কাজ কর্ম ও মনের অভিপ্রেত সবই জানেন। কাজেই, যাকে হত্যা করবে কেবল মহান আল্লাহর আদেশ অুযায়ীই হত্যা করবে। কোনো ব্যক্তি স্বার্থের যেন এতে দখল না থাকে। কোনো কাফির যদি নিজের জান মালের ভয়ে তোমাদের সম্মুখে ইসলাম প্রকাশ করে এবং ধোঁকা দিয়ে জান মাল রক্ষা করে নেয়, তবে আল্লাহ পাক তো সব জানেন। তাঁর শাস্তি হতে রক্ষা পাবে না কিছুতেই। কিন্তু তোমরা তাকে কিছুই বলো না। এটা তোমাদের কাজ নয়। আমিই দেখব।

অনুবাদ :

٩٥. لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَنِ الْجِهَادِ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ بِالرَّفْعِ صِفَةٌ وَالنَّصَبِ اِسْتِثْنَاءٌ مِنْ زَمَانَةٍ اَوْ عَمًى وَنَحْوِهِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ لِضَرَرٍ دَرَجَةً ط فَضِيْلَةً لِاِسْتِوَائِهِمَا فِى النِّيَّةِ وَزِيَادَةِ الْمُجَاهِدِ بِالْمُبَاشَرَةِ وَكُلًّا مِنَ الْفَرِيْقَيْنِ وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى الْجَنَّةَ وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ لِغَيْرِ ضَرَرٍ اَجْرًا عَظِيْمًا وَيُبْدَلُ مِنْهُ .

৯৫. [বিশ্বাসীদের মধ্যে] অঙ্গহীনতা, দুর্বলতা, অন্ধত্ব ইত্যাদির কারণে যারা অক্ষম নয় অথচ জিহাদ না করে ঘরে বসে থাকে এবং যারা আল্লাহর পথে স্বীয় জানমাল দ্বারা জেহাদ করে তারা সমান নয়। যারা স্বীয় ধনপ্রাণ দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যারা ওজরবশত [ঘরে বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদা ফজিলত দিয়েছেন। তারা উভয়ে নিয়ত হিসাবে সমান তবে জিহাদকারী সক্রিয়ভাবে তাতে লিপ্ত বলে অধিক মর্যাদার অধিকারী।

আল্লাহ প্রত্যেককেই উভয় দলকেই কল্যাণের জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যারা ওজর অজুহাত ব্যতিরেকে ঘরে বসে থাকে তাদের উপর যারা জিহাদ করে তাদেরকে আল্লাহ মহা পুরস্কার শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

غَيْرُ এটা رَفْع [পেশ] সহকারে পঠিত হলে صِفَة বা বিশেষণরূপে গণ্য হবে। আর نَصَب [যবর] সহকারে পঠিত হলে اِسْتِثْنَاءٌ বা ব্যত্যয় বলে বিবেচ্য হবে।

٩٦. دَرَجٰتٍ مِنْهُ مَنَازِلَ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ مِنَ الْكَرَامَةِ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ط مَنْصُوْبَانِ بِفِعْلِهِمَا الْمُقَدَّرِ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا لِاَوْلِيَائِهِ رَحِيْمًا بِاَهْلِ طَاعَتِهِ .

৯৬. এটা তাঁর নিকট হতে মর্যাদা অর্থাৎ, মর্যাদা হিসাবে কতক হতে অপর কতক সুউচ্চ মানযিলসমূহ এবং ক্ষমা ও দয়া। আল্লাহ তাঁর ওলীদের প্রতি ক্ষমাশীল এবং আনুগত্য পরায়ণদের বিষয়ে পরম দয়ালু।

دَرَجٰت -এটা পূর্বোক্ত আয়াতের اَجْرًا -এর بَدَل বা স্থলাভিষিক্ত পদ।

مَغْفِرَةً وَرَحْمَةً এখানে উহ্য ক্রিয়ার মাধ্যমে مَصْدَر বা সমধাতুজ কর্ম হিসাবে এ উভয়টি مَنْصُوْب যবরযুক্ত] রূপে পঠিত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

لَا يَسْتَوِى : সমান নয়। اَلْاِسْتِوَاءُ সমান হওয়া।

اَلْقَاعِدُوْنَ : যারা ঘরে বসে থাকে।

زَمَانَةٌ : অঙ্গহীনতা।

بِالْمُبَاشَرَةِ : সরাসরি, সক্রিয়ভাবে লিপ্ত।

بِالرَّفْعِ صِفَةٌ অর্থাৎ قَاعِدُوْنَ -এর সিফত হওয়ার কারণে غَيْرُ শব্দটি মারফূ' হবে।

প্রশ্ন : اَلْقَاعِدُوْنَ তো اَلِفْ لَامْ -এর সিফত হওয়ার কারণে مَعْرِفَةٌ হয়েছে তাই এটি সিফত হওয়া শুদ্ধ হলো কিভাবে?

উত্তর :

১. غَيْرِ শব্দটি বিপরীত বস্তুর মাঝে পতিত হয় তখনও তা مَعْرِفَةٌ হয়ে যায়।

২. اَلْقَاعِدُوْنَ এর মাঝে اَلِفْ لَامْ টি হয়েছে। যার কারণে এটি نَكِرَةٌ -এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

৩. اَلْقَاعِدُوْنَ দ্বারা যেহেতু কোনো নির্দিষ্ট জাতি উদ্দশ্য নয়, তাই এটি نَكِرَةٌ ই রয়ে গেছে। মারেফা তো اَلْقَاعِدُوْنَ তখন হয় যখন তার কোনো নির্দিষ্ট জাতি উদ্দেশ্য হবে।

বাহ্যিকভাবে غَيْرِ শব্দটি اَلْقَاعِدُوْنَ থেকে بَدَلْ হয়েছে। আর بدل مبدل منه -এর মাঝে تَعْرِيْف وَتَنْكِيْر -এর মাঝে মোতাবাকাত আবশ্যক নয়। غَيْرِ -এর উপর নসব পড়া ও জায়েজ আছে القاعدون থেকে اِسْتِثْنَاءٌ -এর কারণে। مِنَ الزَّمَانَةِ এটি لِلضَّرَرِ -এর بَيَانٌ হয়েছে।

لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ الخ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : উপরে না জেনেশুনে হত্যা করার কারণে মুসলমানগণকে ভর্ৎসনা ও সাবধান করা হয়েছিল, যে কারণে সম্ভাবনা ছিল কেউ এর প্রতিক্রিয়ায় জিহাদই ছেড়ে দেবে। কেননা যুদ্ধক্ষেত্রে মুজাহিদগণের সামনে এরূপ এসেই পড়ে। তাই এ আয়াতে মুজাহিদগণের মর্যাদা তুলে ধরে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। আয়াতের সারমর্ম, পঙ্গু অন্ধ, রুগণ ও ওজর বিশিষ্টদের জন্য তো জিহাদ ফরজ নয়। বাকি সব মুসলিমগণের মধ্যে যারা জিহাদ করে, তাদের বিরাট মর্যাদা জিহাদ থেকে যারা বিরত, তারা সে মর্যাদা হতে বঞ্চিত, যদিও জিহাদ না করলেও তারা জান্নাতী হবে, বটে। বোঝা গেল, জিহাদ ফরযে কিফায়া। ফরযে আইন নয়। অর্থাৎ মুসলিমগণের মধ্যে প্রয়োজন মাফিক একদল লোক যদি জিহাদে লিপ্ত থাকে তবে বাকিদের কোনো গুনাহ হবে না। নচেৎ সকলেই গুনাহগার হবে।

শানে নুযূল : যখন এ আয়াত নাজিল হয় যে, ঘরে অবস্থানকারী এবং আল্লাহর পথে জিহাদকারী সমান নয়, তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.) [অন্ধ সাহাবী] সহ আরো প্রতিবন্ধী ও দুর্বল সাহাবীগণ আরজ করল, আমরা তো মাজুর। ওজরের কারণে আমরা জিহাদে শামিল হতে পরি না। ফলে আমরা জিহাদের প্রতিদান থেকে বঞ্চিত থাকছি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ অংশটি নাজিল করে ইস্তেসনা করে দেন যে, ওজরের কারণে যুদ্ধে অংশ করতে অপারগ ব্যক্তিরা প্রতিদানে মুজাহিদদের সাথে শামিল থাকবে।

قَوْلُهُ مَنْصُوْبَانِ بِفِعْلِهِمَا الْمُقَدَّرِ : অর্থাৎ مَغْفِرَةً এবং رَحْمَةً উভয়টি স্বীয় فِعْل مُقَدَّرْ -এর কারণে مَنْصُوْب হয়েছে أَجْرًا -এর সাথে عَطْف হওয়ার কারণে নয়, তাকদীরী ইবারত এভাবে হবে- غَفَرَ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَرَحِمَهُمْ الده رَحْمَةً

قَوْلُهُ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَحِيْمًا : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তিনি জিহাদকারীদের জন্য প্রতিদান, ক্ষমা ও দয়ার যে অঙ্গীকার করেছেন তা অবশ্যই পূরণ করবেন। কিংবা, মুজাহিদগণের দ্বারা অজ্ঞাতসারে কোনো মুসলিমের রক্তপাত ঘটলে তিনি তা ক্ষমা করে দেবেন। কাজেই এ আশঙ্কায় জিহাদ ত্যাগ করো না।

অনুবাদ :

٩٧. وَنَزَلَ فِىْ جَمَاعَةٍ اَسْلَمُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا فَقُتِلُوْا يَوْمَ بَدْرٍ مَعَ الْكُفَّارِ اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰئِكَةُ ظَالِمِىْٓ اَنْفُسِهِمْ بِالْمَقَامِ مَعَ الْكُفَّارِ وَتَرْكَ الْهِجْرَةِ قَالُوْا لَهُمْ مُوَبِّخِيْنَ فِيْمَ كُنْتُمْ اَىْ فِىْ اَىِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ مِنْ اَمْرِ دِيْنِكُمْ قَالُوْا مُعْتَذِرِيْنَ كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ عَاجِزِيْنَ عَنْ اِقَامَةِ الدِّيْنِ فِى الْاَرْضِ اَرْضِ مَكَّةَ قَالُوْا لَهُمْ تَوْبِيْخًا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا مِنْ اَرْضِ الْكُفْرِ اِلٰى بَلَدٍ اٰخَرَ كَمَا فَعَلَ غَيْرُكُمْ قَالَ تَعَالٰى فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاۤءَتْ مَصِيْرًا هِىَ .

৯৭. কতিপয় লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল বটে কিন্তু তারা হিজরত করে আসেনি। ফলে তারা বদর যুদ্ধে কাফিরদের সাথে শামিল হয়ে নিহত হয়। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন, যারা কাফিরদের সাথে অবস্থান করতঃ এবং হিজরত পরিত্যাগ করত: নিজেদের উপর জুলুম করেছে তাদের প্রাণ গ্রহণের সময় ফেরেশতারা ভর্ৎসনা স্বরে তাদেরকে [বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে?] অর্থাৎ ধর্ম বিষয়ে তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা কৈফিয়ত দানরূপে বলে দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম অর্থাৎ মক্কা ভূমিতে দীনের প্রতিষ্ঠা করতে আমরা অক্ষম ছিলাম। তারা ভর্ৎসনা স্বরে তাদেরকে [বলে] অন্যান্যদের মতো কুফরিস্থান ত্যাগ করত: অন্যস্থানে তোমরা হিজরত করে যাওয়ার মতো আল্লাহর দুনিয়া কি এতটুকু প্রশস্ত ছিল না? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, এদের আবাসস্থল জাহান্নাম আর কত মন্দ আবাস এটা।

٩٨. اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاۤءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً لَا قُوَّةَ لَهُمْ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَا نَفَقَةَ وَلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا طَرِيْقًا اِلٰى اَرْضِ الْهِجْرَةِ .

৯৮. তবে যেসব অসহায় পুরুষ নারী ও শিশু কোনো উপায় পায় না অর্থাৎ হিজরত করার যাদের শক্তি ও সঙ্গতি নেই এবং হিজরতের বা অন্য অঞ্চলে যাওয়ার কোনো পথও পায় না।

٩٩. فَاُولٰٓئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا .

৯৯. আল্লাহ হয়তো তাদের পাপ মোচন করবেন। কারণ আল্লাহ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।

١٠٠. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِى الْاَرْضِ مُرَاغَمًا مُهَاجَرًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً فِى الرِّزْقِ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فِى الطَّرِيْقِ كَمَا وَقَعَ الْجُنْدَعِ بْنِ ضَمْرَةَ اللَّيْثِىِّ فَقَدْ وَقَعَ ثَبَتَ اَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا .

১০০. কেউ আল্লাহর পথে দেশ ত্যাগ করলে সে দুনিয়ায় বহু আশ্রয়স্থল অর্থাৎ হিজরতযোগ্য স্থান এবং জীবনোপকরণে প্রাচুর্য লাভ করলে এবং কেউ আল্লাহ ও রাসূলের উদ্দেশ্যে হিজরত করে বের হলে এবং পথে তার মৃত্যু ঘটলে যেমন জুনদা ইবনে যামরা আল লাইসীর বেলায় ঘটেছিল তার পুরস্কারের ভার আল্লাহর উপর সুসাব্যস্ত। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাহকীক ও তারকীব

بِالْمَقَامِ : অবস্থান করার কারণে।

مُوَبِّخِيْنَ : مُوَبِّخ [وَاحِدْ مُذَكَّر] اِسْم فَاعِل : ব. ব مُوَبِّخُوْن ধমকদাতা।

مَهَاجِرَ : مَهْجَرٌ ব. ব مَهَاجِر সফর করার স্থান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

দ্বীন ও ঈমান বাচানোর জন্য হিজরত করা ফরজ : এমন কিছু মুসলিমও আছে, যারা সত্যিকারভাবেই ইসলাম গ্রহণ করেছে, কিন্তু তারা কাফির রাষ্ট্রে বসবাস করে এবং তাদের কাছে অসহায়। কাফিরদের ভয়ে তারা প্রকাশ্যে ইসলামের কথা বলতে পারে না। জিহাদের আদেশও তারা তামিল করতে সক্ষম হয় না। তাদের জন্য সে দেশ ত্যাগ করা ফরজ। এ রুকুতে তারই আলোচনা।

আয়াতের সারমর্ম এই যে, যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করে অর্থাৎ কাফিরদের সাথে মিলেমিশে বাস করে, আর হিজরত করে না, তাদের মৃত্যুকালে ফেরেশতাগণ জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কোন দীনের অনুসারী ছিলে? তারা বলে আমরা তো মুসলিমই ছিলাম, কিন্তু অসহায়ত্ব ও দুর্বলতা হেতু দীনের কাজ কর্ম করতে পারতাম না। ফেরেশতাগণ বলেন, মহান আল্লাহর জমিন তো সুপ্রশস্ত ছিল। তোমরা তো অন্যত্র হিজরত করতে পারতে? বস্তুত এরূপ লোকদের আবাসস্থল জাহান্নাম। হ্যা, যারা দুর্বল কিংবা নারী ও শিশু, না হিজরতের উপায় গ্রহণ করতে পারে, না তাদের হিজরতের পথ জানা আছে, তারা ক্ষমার যোগ্য।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : এতদ্বারা জানা গেল, যে দেশে মুসলিমগণ খোলামেলা [নির্বিঘ্নে বসবাস করতে পারে না, সেখান থেকে হিজরতে করা ফরজ। কেবল ওজর বিশিষ্ট ও অসহায় ছাড়া আর কারোর জন্য সেখানে পড়ে থাকার অনুমতি নেই।

বর্তমানে হিজরতের বিধান : যখন ইসলামের পর্যাপ্ত পরিমাণ শক্তি অর্জিত হলো এবং বিরুদ্ধবাদীদের শক্তি খর্ব হলো তখন থেকে হিজরতের আবশ্যিকতা বাকি থাকেনি। এতদসত্ত্বেও কখনো কোথাও হিজরত করার পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে হিজরত করা ওয়াজিব হবে। আর لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ হাদীসের মর্মও তাই।

হিজরতের সংজ্ঞা : আলোচ্য আয়াতে হিজরতের ফজিলত, বরকত ও বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। অভিধানে হিজরত শব্দটি হিজরান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ অসন্তুষ্টচিত্তে কোনো কিছুকে ত্যাগ করা সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ভাষায় দেশত্যাগ করাকে হিজরত বলা হয়। শরিয়তের পরিভাষায় দারুল কুফর তথা কাফেরদের দেশ ত্যাগ করে দারুল ইসলাম তথা মুসলমানদের দেশে গমন করার নাম হিজরত। -[রুহুল মা'আনী]

মোল্লা আলী কারী (র.) মেশকাতের শরাহতে বলেন, ধর্মীয় কারণে কোনো দেশ ত্যাগ করা হিজরতের অন্তর্ভুক্ত। -[মেরকাত ১ম খণ্ড ৩৯ পৃ.]

মুহাজির সাহাবীগণের সম্পর্কে অবতীর্ণ সূরা হাশরের اَلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কোনো দেশের কাফেররা যদি মুসলমানকে মুসলমান হওয়ার কারণে দেশ থেকে জোর জবরদস্তিমূলকভাবে বহিষ্কার করে তবে তাও হিজরতের অন্তর্ভুক্ত।

হিজরতের ফজিলত : জিহাদ সম্পর্কিত আয়াতসমূহ যেমন সমগ্র কুরআন পাকে ছড়িয়ে রয়েছে, তেমনি হিজরতের বর্ণনাও কুরআনের পাকের অধিকাংশ সূরায় একাধিকবার বিবৃত হয়েছে। সবগুলো আয়াত একত্রিত করলে জানা যায় যে, হিজরত সম্পর্কিত আয়াতসমূহে তিন রকমের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এক. হিজরতের ফজিলত, দুই. হিজরতের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বরকত এবং তিন. সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও দারুল কুফর থেকে হিজরত না করার কারণে শাস্তিবাণী।

হিজরতের ফজিলত সম্পর্কিত প্রথম বিষয়বস্তু সূরা বাক্বারায় এক আয়াতে রয়েছে- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে এং যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পাথে জেহাদ করেছে, তারা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহপ্রার্থী। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল করুণাময়।

দ্বিতীয় আয়াত সূরা তওবায় আছে : اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে ও হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জানা ও মাল দ্বারা জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহর কাছে বিরাট মর্যদার অধিকারী এবং তারাই সফলকাম।

তৃতীয় আয়াত : আলোচ্য সূরা নিসার–

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ـ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি **আল্লাহ ও** রাসূলের নিয়তে নিজ গৃহ থেকে বেরিয়ে পথেই মৃত্যুবরণ করে তার ছওয়াব আল্লাহর জিম্মায় সাব্যস্ত হয়ে যায়।

কোনো কোনো রেওয়ায়েত মতে এ আয়াতটি হযরত খালেদ ইবনে হেযাম সম্পর্কে আবিসিনিয়ায় হিজরতের সময় অবতীর্ণ হয়। তিনি মক্কা থেকে হিজরতের নিয়তে আবিসিনিয়ার পথে রওয়ানা হয়ে যান। পথিমধ্যে সর্পদংশনে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। মোটকথা, উপরিউক্ত তিনটি আয়াত দারুল কুফর থেকে হিজরতের উৎসাহ দান এবং বিরাট ফজিলত সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হিজরত পূর্বকৃত সব গোনাহকে নিঃশেষ করে দেয়।

হিজরতের বরকত : হিজরতের বরকত সম্পর্কে সূরা নাহলের এক আয়াতে বলা হয়েছে :

যারা আল্লাহর জন্য হিজরতে করে নির্যাতিত হওয়ার পর, আমি তাদেরকে দুনিয়াতে উত্তম ঠিকানা দান করব এবং পরকালের বিরাট ছওয়াব তো রয়েছেই , যদি তারা বুঝে।

সূরা নিসার উল্লিখিত চার আয়াতে বলা হয়েছে। 'যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে হিজরত করবে সে পৃথিবীতে অনেক জায়গা ও সুযোগ সুবিধা পাবে।

আয়াতে বর্ণিত مُرَاغِمٌ শব্দটি একটি ধাতু। এর অর্থ এক জায়গায় স্থানান্তরিত হওয়া। স্থানান্তরিত হওয়ার জায়গাকেও অনেক সময় مُرَاغَمًا বলে দেওয়া হয়।

এ আয়াতদ্বয়ে হিজরতের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ বরকত বর্ণিত হয়েছে। এতে আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা রয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের জন্য হিজরত করে, আল্লাহ তার জন্য দুনিয়াতে অনেক পথ খুলে দেন। সে দুনিয়াতেও উত্তম অবস্থান লাভ করে এবং পরকালের ছওয়াব ও পদমর্যাদা তো কল্পনাতীত।

মোটকথা হলো– আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকে মুহাজিরদের জন্য যে ওয়াদা করেছেন, জগদ্বাসী তা স্বচক্ষে দেখে নিয়েছে তবে আলোচ্য আয়াতেই এ শর্ত বর্ণিত হয়েছে যে, هَاجَرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহর পথে হিজরত হওয়া চাই। পার্থিব ধন সম্পদ, রাজত্ব, সম্মান অথবা প্রভাব প্রতিপত্তি অন্বেষায় হিজরত না হওয়া চাই। বুখারী শরীফের হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এ উক্তিও বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের নিয়তে হিজরত করে, তার হিজরত আল্লাহ ও রাসূলের জন্যই হয়। অর্থাৎ এটিই বিশুদ্ধ হিজরত।এর ফজিলত ও বরকত কুরআন পাকে বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অর্থের অন্বেষণে কিংবা কোনো মহিলাকে বিয়ে করার নিয়তে হিজরত করে, তার হিজরতের বিনিময়ে ঐ বস্তুই পাবে, যার জন্য সে হিজরত করে।

আজকাল কিছু সংখ্যক মুহাজিরকে দুর্দশাগ্রস্ত দেখা যায়। হয় তারা এখনও অন্তরবর্তীকালে অবস্থান করছে, অর্থাৎ হিজরতের প্রাথমিক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে, না হয় তারা সঠিক অর্থে মুহাজির নয়। স্বীয় নিয়ত ও অবস্থা সংশোধনের প্রতি তাদের মনোনিবেশ করা উচিত। নিয়ত ও আমল সংশোধন করার পর তারা আল্লাহ তা'আলার ওয়াদার সত্যতা স্বচক্ষে দেখতে পাবে। [মা'আরিফুল কুরআন]

قَوْلُهٗ وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِى الْاَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً :

হিজরতের উপকারিতা : এ আয়াতে হিজরতের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি মাহান আল্লাহর জন্য হিজরত করবে ও নিজের জন্মভূমি ত্যাগ করবে, সে বসবাসের জন্য বহু জায়গা পাবে এবং তাঁর জীবন ও জীবিকা নির্বাহের স্বাচ্ছন্দ্য......

লাভ হবে কাজেই, কোথায় থাকবে, কি খাবে এ ভয়ে হিজরত থেকে বিরত থেকো না এবং আশঙ্কাও করো না যে, পথিমধ্যে মৃত্যু হয়ে গেলে না এ দিকের থাকলাম, না ওদিকের হলাম। কেননা এ অবস্থায়ও হিজরতের পুরোপুরি ছওয়াব লাভ হবে। মৃত্যু তো তার নির্দিষ্ট সময়ই আসে, আগে আসতে পারে না।

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ـ

শানে নুযূল : সাদ ইবনে জুবাইর প্রমুখ থেকে তাবারী বর্ণনা করেন, উক্ত আয়াত জমরাহ নামক এক ব্যক্তির ব্যাপারে নাজিল হয়েছে তিনি হিজরতের পর মক্কায় বসবাস করতে থাকেন। যখন তিনি আল্লাহর কালাম اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا শুনতে পেলেন তখন তিনি অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও তার পরিবারের লোকজনকে বললেন, আমাকে মদিনায় নিয়ে চলো। নির্দেশ মতো তারা তাকে খাটে করে মদিনায় নিয়ে চললেল। পথে তানঈম নাক স্থানে পৌছার পর তার ইন্তেকাল হয়ে যায়। তখন তার প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত নাজিল হয়। –[জামালাইন, পৃ: ৮৫, খ. ২]

١٠١. وَاِذَا ضَرَبْتُمْ سَافَرْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِىْ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ بِاَنْ تَرُدُّوْهَا مِنْ اَرْبَعٍ اِلَى اثْنَتَيْنِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمْ اَىْ يَنَالَكُمْ بِمَكْرُوْهٍ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَيَانٌ لِلْوَاقِعِ اِذْ ذَاكَ فَلَا مَفْهُوْمَ لَهُ وَ وَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ اَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّفَرِ الطَّوِيْلِ الْمُبَاحِ وَهُوَ اَرْبَعَةُ بُرُدٍ وَهِىَ مَرْحَلَتَانِ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنَّهُ رُخْصَةٌ لَا وَاجِبٌ وَعَلَيْهِ الشَّافِعِىُّ اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا بَيِّنَ الْعَدَاوَةِ .

অনুবাদ :

১০১. এবং তোমরা যখন পৃথিবীতে সফর করবে পরিভ্রমণ করবে তখন যদি তোমাদের আশঙ্কা হয় যে, সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা তোমাদের জন্য ফিতনা সৃষ্টি করবে অর্থাৎ তোমাদের ক্ষতিকর কিছু করবে তবে সালাত সংক্ষিপ্ত করলে অর্থাৎ, চার রাকাতের স্থলে দুই রাকাত করে আদায় করলে তোমাদের কোনো দোষ নেই। কাফেররা নিশ্চয় তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। তাদের শত্রুতা সুস্পষ্ট।

সুন্নাহতে বর্ণিত আছে যে, এ সফরের অর্থ হলো দীর্ঘ ও বৈধ উদ্দেশ্যে যে সফর সংঘটিত হয়। কমপক্ষে তার দূরত্ব চার বুরাদ পরিমাণ স্থান হতে হবে। আর চার বুরাদ হলো দুই মারহালা। [বার হাজার কদমে একমাইল। এ হিসাবে বার মাইলে এক বুরাদ। সুতরাং চার বুরাদে আটচল্লিশ মাইল।]

اِنْ خِفْتُمْ [তোমাদের যদি আশঙ্কা হয়..........] তৎসময়ের বাস্তব অবস্থার বিবরণ হিসাবে এ কথাটির উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এ স্থানে مَفْهُوْمِ مُخَالِفْ বা বিপরীতার্থ বিবেচ্য হবেনা।

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ [এতে তোমাদের কোনো দোষ নেই] এ বাক্যাংশটি দ্বারা প্রমাণ হয় যে. এ বিধানটি জায়েজ মাত্র। এটা ওয়াজিব বা অবশ্যকরণীয় নয়। এটাই ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত। [ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত হলো, শরিয়তের পারিভাষিক অর্থে যা সফর সেই সফরে কসর বা সালাত সংক্ষিপ্ত করা জরুরি।

তাহকীক ও তারকীব

يَنَالُ : (مُضَارِعْ مَعْرُوْف : وَاحِدْ مُذَكَّر) [نَيْل] সে পাবে, পায় বাবে سَمِعَ থেকে نَالَ يَنَالُ نَيْلًا অর্থ– পাওয়া।
بَيِّنٌ : (صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ : وَاحِدْمُذَكَّر) بَيْن সুস্পষ্ট, পরিষ্কার।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্বে জিহাদ ও হিজরতের আলোচনা ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জিহাদ ও হিজরতের জন্য সফর করতে হয় এবং এ জাতীয় সফরে শত্রুদের পক্ষ থেকে বিপদাশঙ্কাও থাকে। তাই সফর ও আতঙ্কাবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে নামাজে প্রদত্ত বিশেষ সুবিধা ও সংক্ষিপ্ততা আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হচ্ছে।

শানে নুযূল : হযরত আলী (রা.) বলেন বনূ নাজ্জারের কিছু লোক রাসূল ﷺ -এর খেদমতে এসে আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের অধিকাংশ সময় সফরে থাকতে হয়। এমন অবস্থায় নামাজ পড়ার কি সূরত? এ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াতটি নাজিল হয়।

قَوْلُهُ وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ : অর্থাৎ তোমরা যখন জিহাদ ইত্যাদির জন্য সফর কর এবং তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু তথা কাফিরদের পক্ষ হতে এ আশঙ্কা কর যে, সুযোগ পেলে তারা আক্রমণ করে বসবে। তাহলে সালাত সংক্ষিপ্ত কর। অর্থাৎ বাড়ি থাকাকালে যে সালাত চার রাকাত পড়তে হয়, তা দু'রাকাত পড়।

কসরের বিধান : কাফিরের উৎপীড়নের আশঙ্কা সেই সময় ছিল, যখন এ আয়াত নাজিল হয়। সে আশঙ্কা শেষ হয়ে যাওয়ার পর ও রাসূলুল্লাহ ﷺ যথারীতি কসর আদায় করতে থাকেন, সাহাবায়ে কেরামকেও এরূপ করতে নির্দেশ দিতেন। এখন হামেশাই সফরে কসরের নির্দেশ প্রদান করা হয়, তাতে উল্লিখিত ভয় থাকুক বা নাই থাকুক। এটা আল্লাহর তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ। কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করা জরুরি, যেমন হাদীসে ইরশাদ হয়েছে।

হযরত ইয়ালা ইবনে উমাইয়া (র.) বলেন, হযরত ওমর (রা.) -এর কাছে জিজ্ঞেস করা হলো কসরের ব্যাপারে তো ভয় ও শঙ্কার কয়েদ লাগানো হয়েছে এখনতো অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেছে, এখনও কি কসরের অনুমতি অবশিষ্ট থাকবে? হযরত ওমর (রা.) বলেন, আমার অন্তরেও এ ব্যাপারে সন্দেহ ছিল কিন্তু রাসূল ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এটি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ, সুতরাং তা কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করো। −[মুসলিম]

সফর এবং কসরের মাসআলা :

* যে সফর তিন মনজিলের কম হয়ে তাতে কসর করার অনুমতি নেই। তিন মনজিল মাইলের হিসেবে ৪৮ মাইল যা প্রায় ৭৭.২৫ কিলোমিটার হয়।
* যে সফরের কসরের অনুমতি রয়েছে তাতে পূর্ণ নামাজ পড়া জায়েজ আছে কি না? হযরত আলী (রা.)হযরত ইবনে ওমর, হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ, হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত হাসান বসরী, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ, হযরত কাতাদাহ এবং ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে কসর আবশ্যক। পক্ষান্তরে হযরত উসমান গণী, হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস হযরত ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মতে মুসাফিরের জন্য কসর করা এবং পূর্ণ নামাজ পড়া উভয়টিই জায়েজ।
* পাপের সফরেও ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে কসর করার অনুমতি রয়েছে। অন্যান্য ইমামদের মতে অনুমতি নেই।
* মুসাফির নিজ আবাদী থেকে বের হতেই কসর করতে পারবে। এ ব্যাপারে ইমাম চতুষ্ঠয়ের ঐকমত্য রয়েছে। ইমাম মালেক (র.) -এর ফতোয়া হলো মুসাফির আবাদী থেকে কমপক্ষে তিন মাইল অতিক্রম করার পর কসর করবে।
* সফরের মঝে কোথাও ইকামতের নিয়ত করলে ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে শুধু চার দিন ইকামতের নিয়ত করলেই কসরের অনুমতি শেষ হয়ে যাবে। ইমাম আহমদ (র.) -এর মতে বিশ ওয়াক্তের বেশি পরিমাণ নামাজের সময়ের ইকামত করে তাহলে অনুমতি শেষ হয়ে যাবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে যদি পনের দিন একই জায়গায় অবস্থানের নিয়ত করে তাহলে কসরের অনুমতি শেষ হয়ে যাবে।
* যদি কোথাও পনের দিনের অবস্থানের নিয়ত ছাড়াই কোনো কারণে অবস্থান দীর্ঘ হয়ে যায়, তাহলে কসরই পড়বে। এভাবে বছরের পর বছর পার হয়ে গেলেও।
* কোনো লঞ্চ স্টীমারের ঐ কর্মচারী যে পরিবার পরিজন নিয়ে তাতে বসবাস করে কিংবা এমন ব্যক্তি যে সর্বদা সফরে থাকে সে সবসময় কসর করবে।
* কোনো মুসাফির মুকীমরে পিছনে নামাজের ইক্তেদা করলে পূর্ণ নামাজ পড়বে। ইক্তেদা পূর্ণ নামাজে করুক বা আংশিকের মাঝে করুক। ইমাম মালেক (রা.) -এর মতে কমপক্ষে এক রাকাতে ইক্তেদা আবশ্যক। হযরত ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (র.) বলেন, মুসাফির মুকীমের ইক্তেদা করেও কসর পড়তে পারবে।
* সফর শেষ করে গন্তব্যস্থলে পৌছার পর যদি সেখানে পনের দিনের কম সময় অবস্থান করার ইচ্ছা থাকে, তবে সে অবস্থান ও সফরের অন্তর্ভুক্ত। এমতাবস্থায় চার রাকাত বিশিষ্ট ফরজ নামাজ অর্ধেক পড়তে হবে। একে শরিয়তের পরিভাষায় কসর বলা হয়। পক্ষান্তরে যদি একই জনপদে পনের দিন অথবা তদুর্ধ্ব সময় অবস্থান করার ইচ্ছা থাকে, তবে তা সাময়িক বাসস্থান হিসেবে গণ্য হবে। এমন জায়গায় অস্থায়ী বাসস্থানের মতো কসর পড়তে হবে না, পূর্ণ নামাজ পড়তে হবে।
* কসর শুধু তিনি ওয়াক্তের ফরজ নামাজে হবে। মাগরিব, ফজর সুন্নত ও বিতিরের নামাজে কসর নেই।
* কেউ সফর অবস্থায় মুকীম অবস্থায় কাজা হওয়া নামাজ পড়তে চাইলে পূর্ণ নামাজ পড়তে হবে। এমনিভাবে সফরে কাজা হওয়া নামাজ মুকীম অবস্থায় পড়লে ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম মালেক (র.)-এর নিকট কসরই পড়া হবে।
* পূর্ণ নামাজের স্থলে অর্ধেক পড়ার মধ্যে কারও মনে এরূপ ধারণা আনাগোনা করে যে, বোধ হয় এতে নামাজ পূর্ণ হলো না, এটা ঠিক নয়। কারণ কসরও শরিয়তেরই নির্দেশ। এ নির্দেশ পালনে গোনাহ হয় না, বরং ছওয়াব পাওয়া যায়। −[মাআরেফ পৃ. ২৭৯]

قَوْلَهُ بَيَانٌ لِلْوَاقِعِ : অর্থাৎ إِنْ خِفْتُمْ শর্তটি কুরআন নাজিলের সময়ের ভিত্তিতে বলা হয়েছে। কেননা এ আয়াত নাজিলের সময় সাধারণ মুসলমানদের সফরে দুশমনের আশঙ্কা বিরাজ করত। সুতরাং এর مَفْهُوم مُخَالِفْ উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং এমনটি বলা যাবে না যে, শত্রু আশঙ্কা। না থাকলে নামাজে কসর করা জায়েজ নেই।

قَوْلَهُ اَرْبَعَةُ بُرُدٍ : بَرِيْد -এর বহুবচন। মূলত : بَرِيْدَهْ دَمْ এর مُعَرَّبْ তথা আরববি কৃত। যার অর্থ লেজকাটা। পথের দূরত্বের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। বার হাজার কদমে এক মাইল। এ হিসেবে বার মাইলে এক বুরাদ। সুতরাং চার বুরাদে আট চল্লিশ মাইল। এ হিসাবে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে স্বাভাবিক সফরে তিন দিন তিন রাত সমপরিমাণ দূরত্ব।

قَوْلَهُ بَيْنَ الْعَدَاوَةِ : مُبِيْنًا -এর ব্যাখ্যায় بَيِّنَ الْعَدَاوَةِ উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, مُبِيْن শব্দটি لَازِمْ بِمَعْنَى مُتَعَدِّيْ

قَوْلَهُ الْمُبَاحِ : এ কয়েদ দ্বারা পাপের সফর বের হয়ে যায় না।

١٠٢. وَإِذَا كُنْتَ يَا مُحَمَّدُ حَاضِرًا فِيْهِمْ وَأَنْتُمْ تَخَافُوْنَ الْعَدُوَّ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ وَهٰذَا جَرٰى عَلٰى عَادَةِ الْقُرْاٰنِ فِي الْخِطَابِ فَلَا مَفْهُوْمَ لَهُ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَتَتَأَخَّرُ طَائِفَةٌ وَلْيَأْخُذُوْا أَيِ الطَّائِفَةُ الَّتِيْ قَامَتْ مَعَكَ أَسْلِحَتَهُمْ مَعَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوْا أَيْ صَلَّوْا فَلْيَكُوْنُوْا أَيِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرٰى مِنْ وَّرَائِكُمْ يَحْرُسُوْنَ إِلٰى أَنْ تَقْضُوا الصَّلٰوةَ وَتَذْهَبَ هٰذِهِ الطَّائِفَةُ تَحْرُسُ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ مَعَهُمْ إِلٰى أَنْ يَقْضُوا الصَّلٰوةَ وَقَدْ فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذٰلِكَ بِبَطْنِ نَخْلٍ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً بِأَنْ يَحْمِلُوْا عَلَيْكُمْ فَيَأْخُذُوْكُمْ وَهٰذَا عِلَّةُ الْأَمْرِ بِأَخْذِ السِّلَاحِ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضٰى أَنْ تَضَعُوْا أَسْلِحَتَكُمْ فَلَا تَحْمِلُوْهَا وَهٰذَا يُفِيْدُ أَنْ يُّجَابَ حَمْلُهَا عِنْدَ عَدَمِ الْعُذْرِ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ (رحـ) وَالثَّانِيْ أَنَّهُ سُنَّةٌ وَرُجِّحَ وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ مِنَ الْعَدُوِّ أَيْ احْتَرِزُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ إِنَّ اللّٰهَ أَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ذَا إِهَانَةٍ.

অনুবাদ :

১০২. হে মুহাম্মদ ! তুমি যখন তাদের মাঝে উপস্থিত থাক আর তোমরা শত্রুর ভয় কর এ অবস্থায় তাদের সাথে সালাত কয়েম কর তখন তাদের একদল তোমার সাথে যেন দাঁড়ায় আর আরেক দল যেন পিছনে থাকে এবং যে দল তোমার সাথে দাঁড়িয়েছে তারা যেন সশস্ত্র থাকে। তারা যখন সিজদা করবে অর্থাৎ সালাত আদায়ে থাকবে তখন তারা যেন অর্থাৎ অপর দলটি যেন তোমাদের পেছনে অবস্থান করে। তারা সালাত না হওয়া পর্যন্ত পাহারা দিবে এবং পরে এ দল অর্থাৎ যারা তোমার সাথে প্রথমে দাড়িয়েছে তারা পাহারা দিতে যাবে।

আর অপর দল যারা সালাতে শরিক হয়নি, তারা তোমার সাথে যেন সালাতে শরিক হয় এবং সালাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা যেন সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে।

শায়খাইন [বুখারী ও মুসলিম] বর্ণনা করেন যে, বাতনে নাখ্লা নামক স্থানে রাসূল ﷺ এরূপ পদ্ধতিতে সালাত আদায় করেছিলেন।

فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ [যখন তুমি সালাত কায়েম করবে] আল কুরআনের প্রচলিত রীতি অনুসারে এখানেও রাসূল ﷺ-কে সম্বোধন করা হয়েছে বটে তবে مَفْهُوْم مُخَالِف বা বিপরীতার্থ বিবেচ্য হবে না।

সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা কামনা করে তোমরা যখন সালাতে দাড়াও তখন যেন তোমরা তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও আর তারা তোমাদের উপর একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। অর্থাৎ তোমাদের উপর হামলা চালিয়ে তোমাদেরকে পাকড়াও করে ফেলতে পারে। এটাই হলো সালাতের সময় অস্ত্র হাতে রাখার কারণ।

যদি তোমরা বৃষ্টির জন্য কষ্ট পাও অথবা পীড়িত থাক তবে তোমারা অস্ত্র রেখে দিলে ওটা সাথে বহন না করলে তোমাদের কোনো দোষ নেই।

এ বাক্যটি দ্বারা বুঝা যায়, এ সুবিধা না থাকলে অস্ত্র সাথে বহন করা অবশ্য জরুরি। এটা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অন্যতম অভিমত। তার অপর অভিমত হলো, এটা সুন্নত। এ মতই প্রাধান্যপ্রাপ্ত অভিমত।

শত্রু হতে তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করবে অর্থাৎ যতটুকু সম্ভব তোমারা তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকবে। আল্লাহ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক অবমাননাকর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।

তাহকীক ও তারকীব

تَتَأَخَّرُ : (مُضَارِعْ مَعْرُوفْ : وَاحِدْ مُؤَنَّثْ) সে পিছনে থাকে, থাকবে বাবে تَفَعُّلٌ থেকে বিলম্ব করা, পিছনে পড়া।

اَسْلِحَةً : سِلَاحٌ বহুবচন اَسْلِحَةٌ অস্ত্র, সরঞ্জাম।

يَحْرُسُوْنَ : (مُضَارِعْ مَعْرُوفْ : جَمْعُ مُذَكَّرْ) তারা পাহারা দিবে, দেয়। বাবে نَصَرَ থেকে حَرَسَ يَحْرُسُ حَرْسًا حَرَاسَةً পাহারা দেওয়া, প্রহরায় থাকা।

اِحْتَرَزُوْا : (مَاضِىْ مَعْرُوفْ : جَمْعُ مُذَكَّرْ) তারা বেঁচে থাকবে বা পরহেজ করবে, বাবে افتعال থেকে পরহেজ করা, বেঁচে থাকা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শত্রু আক্রমণের আশঙ্কা দেখা দিলে সালাতের নিয়ম : পূর্বে সফর অবস্থায় সলাত আদায়ের নিয়ম বলা হয়েছিল। এবার শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা দেখা দিলে সে অবস্থায় কিভাবে সালাত আদায় করতে হবে তার বর্ণনা। কাফির বাহিনীর মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকলে মুসলিম বাহিনী দু'দলে বিভক্ত থাকবে। একদল ইমামের সাথে অর্ধেক সালাত আদায় করে শত্রুর সামনে গিয়ে অবস্থান নিবে। দ্বিতীয় দল এসে ইমামের সাথে অর্ধেক আদায় করবে। ইমাম সালাম ফেরানোর পর উভয় দল পৃথকভাবে অবশিষ্ট অর্ধেক আদায় করে নিবে। মাগরিবের সালাত হলে প্রথম দল দু'রাকাত এবং দ্বিতীয় দল এক রাকাত ইমামের সাথে আদায় করবে এ অবস্থায় সালাতে চলাফেরা ক্ষমাযোগ্য। তরবারি, বর্ম, ঢাল ইত্যাদিও সাথে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে শত্রু সৈন্য সুযোগ পেয়ে অতর্কিত আক্রমণ করে না বসে।

শানে নুযূল : হযরত আবূ আইয়্যাশ (রা.) বলেন, আমরা যাতুর রিকার অভিযানে আসফালান এবং দাহনান নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে ছিলাম। সে অভিযানে মুশরিকরা আমাদের কিবলার দিকে অবস্থান করেছিল। খালেদ ইবনে ওয়ালিদ সে সময় মুসলমান হননি। তিনি মুশরিক বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন। যোহরের সময় হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে জামাত করে নামাজ আদায় করেন। তখন তারা পরস্পরে বলাবলি শুরু করল যে, একটি সুবর্ণ সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে গেল। যদি নামাজরত অবস্থায় মুসলমানদের উপর হামলা করা হতো তাহলে সহজেই কাজ হয়ে যেত। তখন তাদের একজন বলে উঠল, একটু পরেই তাদের এমন একটি নামাজ রয়েছে, যা তাদের কাছে জানমাল ও সন্তান-সন্ততি অপেক্ষা বেশি প্রিয়। মুশরিকরা আসর নামাজের প্রতি ইঙ্গিত করছিল। এদিকে মুশরিকদের এ আলোচনা চলছিল অপর দিকে হযরত জিবরীল (আ.) সালাতুল খওফ পড়ার বিধান সম্বলিত উক্ত আয়াত নিয়ে অবতরণ করেন।

-[ইবনে কাসীর : খ. ১, পৃ : ৫৪৮ জামালাইন : খ. ২, পৃ : ৯০]।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইক্তেদায় 'সালাতুল খওফ : যখন আসরের সময় হলো তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ পূর্ণ বাহিনীকে অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। তারপর গোটা বাহিনী দু'টি সারিতে বিভক্ত হয়ে হুজুরের ইক্তেদায় নামাজ শুরু করলেন। সকলেই প্রথম রাকাতের রুকু এবং কিয়াম একত্রে করলেন। সিজদার সময় প্রথম কাতারে সৈন্যরা নবীজি ﷺ -এর সাথে সিজদা করল এবং দ্বিতীয় কাতারের সৈন্যরা দাড়িয়ে রইলেন। যাতে মুশরিকরা মুসলমানদেরকে সিজদাবস্থায় দেখে সামনে অগ্রসর হওয়ার সাহস না করে। প্রথম কাতারের সৈন্যরা সিজদা করে উঠার পর দ্বিতীয় কাতারের সৈন্যরা নিজ নিজ স্থানে সিজদা করে নেন। তারপর সামনের কাতারের সৈন্যরা পেছনে এবং পেছনের সৈন্যরা সামনে চলে যান। দ্বিতীয় রাকাতের কিয়াম ও রুকু সকলে একত্রে করার পর সিজদার সময় পুনরায় পূর্বের নিয়মে প্রথম কাতার ওয়ালারা নবীজির সাথে সিজদা করেছেন এবং দ্বিতীয় কাতারের সৈন্যরা দাড়িয়ে থাকেন এবং পরে সিজদা করে নেন। এভাবেই বাকি নামাজটুকু শেষ করা হয়।

সলাতুল খওফের বিভিন্ন পদ্ধতি : এখানে মনে রাখতে হবে যে, যুদ্ধের ময়দান ঈদের ময়দানের মতো হয় না যে, সব সময় একই পদ্ধতিতে নামাজ আদায় করা হবে। বরং সেখানে তরবারির ঝনঝনানী, তীরের বর্ষণ, বন্দুকের গর্জন, তোপ-কামানের গোলা বর্ষণ ইত্যাদি ভয়ানক অবস্থায় নামাজ পড়তে হয়। এজন্য যুদ্ধের অবস্থার বিভিন্নতার কারণে সেখানে নামাজ পড়ার পদ্ধতি ও বিভিন্ন হওয়াই যুক্তিযুক্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ নামাজের চৌদ্দটি পদ্ধতি বর্ণিত রয়েছে। ইমামগণ নিজ নিজ পছন্দ অনুযায়ী সে পদ্ধতিগুলো থেকে কোনো একটি বা কয়েকটি পদ্ধতি নির্বাচন করেছেন। যেমন ইমাম আবূ হানীফা (র.) নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলো পছন্দ করেছেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে পছন্দনীয় পদ্ধতি : সৈন্য বাহিনীর এক অংশ ইমামের সাথে নামাজ পড়বে এবং আরেক অংশ শত্রুদের মোকাবিলায় থাকবে। এক রাকাত পূর্ণ হলে প্রথম অংশ সালাম ফিরিয়ে শত্রুদের মোকাবিলায় যাবে এবং

দ্বিতীয় অংশ এসে ইমামের সাথে দ্বিতীয় রাকাতে শরিক হবে। এভাবে ইমামের দুই রাকাত শেষ হবে এবং সৈন্যদের এক এক রাকাত। [এ পদ্ধতিটি হযরত ইবনে আব্বাস, জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ এবং মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত]।

সালাতুল খওফের দ্বিতীয় পদ্ধতি : দ্বিতীয় পদ্ধতি এই যে, প্রথম অংশ ইমামের সাথে এক রাকাত পড়ে চলে যাবে। তারপর দ্বিতীয় অংশ এসে এক রাকাত ইমামের পিছনে পড়বে। তারপর প্রত্যেকে পালাক্রমে এসে নিজেদের ছুটে যাওয়া নামাজের এক এক রাকাত নিজে নিজে আদায় করবে। এভাবে প্রত্যেক অংশের এক রাকাত ইমামের সাথে হবে এবং এক রাকাত ভিন্ন ভিন্নভাবে হবে।

সালাতুল খওফের তৃতীয় পদ্ধতি : তৃতীয় পদ্ধতি হলো– ইমামের পেছনে সৈন্যদের এক অংশ দুই রাকাত আদায় করবে এবং তাশাহহুদের পর সালাম ফিরিয়ে দুশমনদের মোকাবিলায় যাবে। তারপর দ্বিতীয় অংশ এসে তৃতীয় রাকাতে এসে শরিক হবে এবং ইমামের সাথে সালাম ফিরাবে। এভাবে ইমামের চার রাকাত হবে এবং সৈন্যদের দুই দুই রাকাত হবে।

সলাতুল খওফের চতুর্থ পদ্ধতি : সৈন্যদের এক অংশ ইমামের সাথে এক রাকাত পড়বে এবং ইমাম দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়ালে মুক্তাদীগণ নিজেরা এক রাকাত তাশাহুদসহ পড়ে সালাম ফিরাবে। তারপর দ্বিতীয় অংশ এসে এ অবস্থায় ইমামের পিছনে ইক্তিদা করবে। ইমাম এখনও দ্বিতীয় রাকাতে থাকবেন। তারা অবশিষ্ট নামাজ ইমামের সাথে পড়ার পর নিজেরা এক রাকাত পড়ে নিবে। এ সুরতে ইমামকে দ্বিতীয় রাকাতের কিয়াম দীর্ঘায়িত করতে হবে।

এছাড়াও আরো পদ্ধতি রয়েছে। জানার জন্য ফিকহের বড় বড় কিতাবের দ্রষ্টব্য।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের পর সালাতুল খওফের বিধান : আয়াতে বলা হয়েছে إِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ [অর্থাৎ আপনি যখন তাদের মধ্যে থাকেন], এতে এরূপ মনে করার অবকাশ নেই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তিরোধানের পর এখন 'সালাতুল খওফ' এর বিধান নেই। কেননা তখনকার অবস্থা অনুযায়ী আয়াতে এ শর্ত বর্ণিত হয়েছে । নবী বিদ্যমান থাকলে ওজর ব্যতীত অন্য কেউ নামাজে ইমাম হতে পারে না । রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পর এখন যে ইমাম হবেন, তিনিই তার স্থলাভিষিক্ত হবেন এবং 'সালাতুল খওফ' পড়াবেন। সব ফিকহবিদগণের মতে সালাতুল খওফের বিধান এখনও অব্যাহত রয়েছে, রহিত হয়নি। [মা'আরিফ : ২৭৯]

ইমামদের মধ্যে শুধু ইমাম আবূ ইউসূফ (রা.)-এর মাজহাব হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পর সালাতুল খওফ পড়া জায়েজ নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পর এখন এমন কোনো ব্যক্তিত্ব বাকি নেই যার পেছনে সকলে নামাজ পড়ার জন্য লালায়িত হবে। বরং এখন পদ্ধতি এই হতে পারে যে, সৈন্য বাহিনীর বিভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন ইমামের পিছনে নামাজ পড়ে নিবে। [জামালাইন]

* মানুষের পক্ষ থেকে বিপদাশঙ্কার কারণে সালাতুল খওফ পড়া যেমন জায়েজ, তেমনিভাবে যদি বাঘ ভল্লুক কিংবা অজগর ইত্যাদির ভয় থাকে এবং নামাজের সময় ও সংকীর্ণ হয়, তাহলে তখনও সালাতুল খওফ পড়া জায়েজ।
* আয়াতে উভয় দলের এক এক রাকাত পড়ার নিয়ম বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় রাকাতের নিয়ম হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'রাকাতের পর সালাম ফিরিয়েছেন। [বিস্তারিত বিবরণ হাদীসের দ্রষ্টব্য।]

قَوْلُهُ فَلَا مَفْهُوْمَ لَهُ : এ অংশটুকু দ্বারা ইমাম আবু ইউসুফ (র.) -এর মতের খণ্ডন করা হয়েছে। কেননা ইমাম আবু ইউসুফ (র.) উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর صَلَاةُ الْخَوْفِ জায়েজ নেই। অন্যান্য ইমামদের নিকট তা এখনও জায়েজ আছে। তবে রাসূল ﷺ -কে সম্বোধন করে বালার কারণ হলো কুরআনের বর্ণনাধারার স্বাভাবিক রীতি।

قَوْلُهُ بِاَنْ يَحْمِلُوْا عَلَيْكُمْ فَيَاْخُذُوْكُمْ : এটি وَلْيَاْخُذُوْهُمْ -এর ইল্লত। অর্থাৎ হাতিয়ার এ জন্য সাথে রাখবে যে, যাতে শত্রুরা অতর্কিত হামলা না করতে পারে।

قَوْلُهُ وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ : অর্থাৎ বৃষ্টি, অসুস্থতা বা দুর্বলতা হেতু যদি অস্ত্র বহন করা মুশকিল হয়, তবে অস্ত্র খুলে রাখার অনুমতি আছে তবে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা রাখা চাই, অর্থাৎ বর্ম, ঢাল সাথে রাখবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : শত্রুর ভয়ে যদি উল্লিখিত পদ্ধতিতে সালাত আদায় করার মতো সুযোগ না পাওয়া যায়, তবে জামাত স্থগিত রেখে প্রত্যেকে আলাদা সালাত আদায় করে নেবে। বাহন থেকে নামার সুযোগ না হলে সাওয়ার অবস্থায়ই ইশারায় আদায় করে নিবে। আর যদি সে সুযোগও না হয়, তবে কাজা করবে।

قَوْلُهُ اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا : অর্থা আল্লাহ তা'আলার আদেশ অনুযায়ী সুব্যবস্থা, সতর্কতা ও সুকৌশলের সাথে কাজ কর। মহান আল্লাহর অনুগ্রহের আশা রাখ। তিনি তোমাদের হাতে কাফিরদের লাঞ্ছিত করবেন। তাদেরকে ভয় করো না।

অনুবাদ :

١٠٣. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَرَغْتُمْ مِنْهَا فَاذْكُرُوا اللّٰهَ بِالتَّهْلِيْلِ وَالتَّسْبِيْحِ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ مُضْطَجِعِيْنَ اَىْ فِىْ كُلِّ حَالٍ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ اَمِنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ اَدُّوْهَا بِحُقُوْقِهَا اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَكْتُوْبًا اَىْ مَفْرُوْضًا مَّوْقُوْتًا مُقَدَّرًا وَقْتُهَا فَلَا تُؤَخَّرُ عَنْهُ .

১০৩. যখন তোমরা সালাত সমাপ্ত করবে তা আদায় করে অবসর পাবে তখন দাড়িয়ে, বসে ও পার্শ্বোপরি শুয়ে অর্থাৎ সকল অবস্থায় তাসবীহ তাহলীলের মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করবে।

যখন তোমরা ভরসাজনক অবস্থায় হবে অর্থাৎ নিরাপদ হবে তখন যথাযথ সালাত কায়েম করবে। অর্থাৎ তার সকল হকসহ তা আদায় করবে। নিশ্চয় সালাত বিশ্বাসীদের উপর লিপিবদ্ধ করা হয়েছে অর্থাৎ ফরজ করা হয়েছে নির্ধারিত সময়ের ভিত্তিতে। অর্থাৎ তার সময় সুনির্ধারিত সুতরাং ঐ সময় হতে তাকে পিছিয়ে নেওয়া যাবে না।

١٠٤. وَنَزَلَ لَمَّا بَعَثَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَائِفَةً فِىْ طَلَبِ اَبِىْ سُفْيَانَ وَاَصْحَابِهٖ لَمَّا رَجَعُوْا مِنْ اُحُدٍ فَشَكَوُا الْجِرَاحَاتِ وَلَا تَهِنُوْا تَضْعُفُوْا فِى ابْتِغَآءِ طَلَبِ الْقَوْمِ الْكُفَّارِ لِتُقَاتِلُوْهُمْ اِنْ تَكُوْنُوْا تَاْلَمُوْنَ تَجِدُوْنَ اَلَمَ الْجِرَاحِ فَاِنَّهُمْ يَاْلَمُوْنَ كَمَا تَاْلَمُوْنَ اَىْ مِثْلَكُمْ وَلَا يَجْبُنُوْنَ عَنْ قِتَالِكُمْ وَتَرْجُوْنَ اَنْتُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنَ النَّصْرِ وَالثَّوَابِ عَلَيْهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ هُمْ فَاَنْتُمْ تَزِيْدُوْنَ عَلَيْهِمْ بِذٰلِكَ فَيَنْبَغِىْ اَنْ تَكُوْنُوْا اَرْغَبَ مِنْهُمْ فِيْهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا بِكُلِّ شَىْءٍ حَكِيْمًا فِىْ صُنْعِهٖ .

১০৪. উহুদ যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনের পর আবূ সুফিয়ান ও তার সঙ্গীদের অনুসন্ধানে রাসূল ﷺ একদল সৈন্য প্রেরণ করতে চাইলে তারা তখন জখমী ইত্যাদির অজুহাত পেশ করে।

এ উপলক্ষে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন, কোনো কাফির সম্প্রদায়ের তালাশে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে তাদের অনুসন্ধানে কাতর হয়ো না, দুর্বল হয়ে পড়ো না। যদি তোমরা কষ্ট পাও অর্থাৎ আঘাতের যন্ত্রণা পাও তবে তারাও তো তোমাদের মতো তোমাদের অনুরূপ [যন্ত্রণা পায়।] এতদসত্ত্বেও তারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে দুর্বল ও সাহসহারা হয় না। অথচ তোমরা আল্লাহর নিকট যা আশা কর অর্থাৎ যে সাহায্য ও পুণ্যফল আশা কর তারা তা আশা করে না। তোমরা তাদের অপেক্ষা বিশ্বাসে কর্মের পুণ্যফলের ক্ষেত্রে প্রাধান্য রাখ, সুতরাং তাতেও তোমাদেরকে তাদের অপেক্ষা অধিক আগ্রহ পোষণ করা উচিত। আর আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ে অবহিত এবং তিনি তার কার্যকৌশলে প্রজ্ঞাময়।

তাহকীক ও তারকীব

تَهْلِيْل : ইহা বাবে تَفْعِيْل এর মাসদার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু উচ্চারণ করা, জয়ধ্বনি দেওয়া।
تَسْبِيْح : ইহা বাবে تَفْعِيْل এর মাসদার গুণ কীর্তন করা, পবিত্রতা বর্ণনা করা।
مُضْطَجِعِيْنَ : مُضْطَجِع বহুবচন مضطجعون শয়নকারী, শায়িত।
مَفْرُوْضًا : (اِسْمُ مَفْعُوْل : وَاحِدْ مُذَكَّر) ধার্য কৃত, নির্ধারিত।
شَكَوْا : (مَاضِىْ مَعْرُوْف : جَمْعُ مُذَكَّرْغَائِبْ) তারা অভিযোগ করল। বাবে ضَرَبَ থেকে شَكَى يَشْكِىْ شِكَايَةً অভিযোগ করা।
اَلَمٌ : اَلَمٌ বহুবচন اٰلَامٌ কষ্ট, ক্লেশ, ব্যথা।
يَجْبُنُوْنَ : (مُضَارِعْ مَعْرُوْف : جَمْعُ مُذَكَّر) তারা ভীরু হবে। বাবে كَرُمَ থেকে جَبُنَ يَجْبُنُ جُبْنًا جَبَانَةً ভীরু হওয়া।
اَرْغَبُ : اَرْغَبُ (اِسْمُ تَفْضِيْل) বহুবচন اَرَاغِبُ، اَرْغَبُوْنَ অধিক আগ্রহী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَعَلٰى جُنُوْبِكُمْ : ভয়-ভীতি কালে সংকট ও উৎকণ্ঠার কারণে সালাতে কোনো ত্রুটি হয়ে গেলে সালাত শেষে দাড়িয়ে বসে ও শুয়ে সর্বদা সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর, এমন কি যখন যুদ্ধরত থাক, তখনও। কেননা সময়সহ যাবতীয় শর্ত শরায়েত রক্ষার বিষয়টি তো সালাতের সাথে সম্পৃক্ত, যদ্দরুন সংকট ও উৎকণ্ঠা দেখা দেওয়ার অবকাশ ছিল। সালাতের অবস্থা ছাড়া অন্যান্য অবস্থায় কোনোরূপ শর্তের সীমাবদ্ধতা ছাড়াই মহান আল্লাহর জিকির অনুমোদিত। কাজেই কোনো অবস্থাতেই তাঁর জিকির হতে গাফিল হয়ো না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, কেবল সেই ব্যক্তিই ক্ষমাযোগ্য, যার বিবেক-বুদ্ধি কোনো কারণে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, অন্যথায় মাহান আল্লাহর জিকির না করার জন্য কারও ওজরই গ্রহণযোগ্য নয়।

قَوْلُهُ فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ الخ : ভীতির অবসান হলে যথাযথ নিয়মে সালাত আদায় করা ফরজ যখন উপরিউক্ত ভয়ের অবসান ঘটবে এবং সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ হয়ে যাও, তখন যে সালাত আদায় করবে, তা ধীরস্থিরভাবে সকল নিয়ম-কানুন ও শর্ত শরায়েত এবং আদব কায়দা রক্ষা করেই আদায় করবে, যে অতিরিক্ত নড়াচড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তা ভীতিকর অবস্থায়ই প্রযোজ্য। নিশ্চয়ই সালাত তার সুনির্দিষ্ট ওয়াক্তেই ফরজ। সফরে, ইকামতে ভয় ভীতিকালে ও শান্ত অবস্থায় সর্বদাই সেই নির্দিষ্ট সময়ই আদায় করতে হবে। ইচ্ছামতো আদায় করা যাবে না। অথবা এর অর্থ, আল্লাহ তা'আলা সালাত সম্পর্কে পূর্ণ নীতিমালা স্থির করে দিয়েছেন। মুকীম অবস্থায় কিভাবে আদায় করতে হবে, সফরে কিভাবে এবং ভয়-ভীতিকালে তার পদ্ধতি কি হবে এবং শান্ত অবস্থায় কি? সবই ঠিক করে দিয়েছেন। কাজেই সর্বাবস্থায় সে নীতির অনুসরণ করতে হবে।

قَوْلُهُ لَا تَهِنُوْا فِى ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ : অর্থাৎ কাফিরদের অনুসন্ধান ও পশ্চাদ্ধাবনে, [তাড়িয়ে নিয়ে যেতে] সৎসাহসের পরিচয় দাও, কোনোরূপ দুর্বলতা প্রকাশ কারো না। তাদের সাথে লড়াই করতে গিয়ে তোমারা যদি আহত ও যন্ত্রণাপ্রাপ্ত হয়ে থাক, তবে সে কষ্টে তো তারাও অংশীদার অর্থাৎ তারাও আহত নিহত হয়ে চলেছে। অথচ ভবিষ্যতে মহান আল্লাহর নিকট তোমাদের যে আশা আছে তার কিছুই তাদের নেই। অর্থাৎ তোমরা দুনিয়ার কাফিরদের উপর বিজয় ও আখেরাতে মহা প্রতিদান পাবে। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কল্যাণে ও প্রয়োজন সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। তার আদেশের মাঝে তোমাদের দীন দুনিয়ার সার্বিক কল্যাণ নিহিত। কাজেই তাঁর আদেশ পালনকে সুবর্ণ সুযোগ ও অনুগ্রহ মনে কর।

١٠٥. وَسَرِقَ طُعْمَةُ بْنُ اُبَيْرِقٍ دِرْعًا وَخَبَاهَا عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ فَوُجِدَتْ عِنْدَهُ فَرَمَاهُ طُعْمَةُ بِهَا وَحَلَفَ اَنَّهُ مَا سَرَقَهَا فَسَأَلَ قَوْمُهُ النَّبِيَّ ﷺ اَنْ يُجَادِلَ عَنْهُ وَيُبَرِّئَهُ فَنَزَلَ اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ الْقُرْاٰنَ بِالْحَقِّ مُتَعَلِّقٌ بِاَنْزَلْنَا لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرٰكَ عَلَّمَكَ اللّٰهُ فِيْهِ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِيْنَ كَطُعْمَةَ خَصِيْمًا مُخَاصِمًا عَنْهُمْ.

١٠٦. وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ مِمَّا هَمَمْتَ بِهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

অনুবাদ :

১০৫. তু'মা ইবনে উবায়রাক নামক জনৈক ব্যক্তি একটি বর্ম চুরি করে জনৈক ইহুদির নিকট সেটা লুকিয়ে রাখে। তালাশের পর শেষে তার [উক্ত ইহুদির] নিকট সেটা পাওয়া যায়। তখন তু'মা এ সম্পর্কে তাকে দোষারোপ করে এবং শপথ করে বলে যে, সে ওটা চুরি করেনি। তু'মার বংশের লোকেরা তার পক্ষে তার মীমাংসা করতে এবং তাকে নিরপরাধ বলে ঘোষণা করতে রাসূল ﷺ -কে অনুরোধ জানায়।
এ উপলক্ষে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন : তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অর্থাৎ আল কুরআন অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি আল্লাহ তোমাকে যা প্রদর্শন করেছেন অর্থাৎ যা জানিয়েছেন তদনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা কর এবং বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের যেমন তু'মার সমর্থনে তর্ক করো না। অর্থাৎ তার পক্ষে তুমি বিতর্ককারী হয়ো না। بِالْحَقِّ এটা اَنْزَلْنَا -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট।

১০৬. এ বিষয়ে যে ইচ্ছা করেছিলে তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

তাহকীক ও তারকীব

دِرْعٌ : دِرْعٌ ব.ব اَدْرُعٌ، دُرُوْعٌ - বর্ম, তনুত্রাণ।

هَمَمْتَ : (مَاضِىْ مَعْرُوْف : وَاحِد مُذَكَّر) আপনি ইচ্ছা করলেন বাবে نَصَرَ থেকে هَمَّ يَهُمُّ بِه ইচ্ছা করা, করতে চাওয়া চিন্তিত হওয়া।

دِرْعًا : مُؤَنَّثٌ হিসেবে ব্যবহৃত। অর্থ লৌহ বর্ম। আর دِرْعٌ - مُذَكَّرٌ হিসেবে ব্যবহৃত। অর্থ উড়না।

خَبَاهَا : اَىِ الدِّرْعَ অর্থাৎ বর্মটি লুকিয়ে রেখেছে।

عَلَّمَكَ : এর দ্বারা ইশারা করেছেন যে, اَرَاكَ اللّٰهُ এর رُؤْيَتٌ শব্দটি عَلِمَ -এর অর্থে। অন্যথায় তিন মাফউলের দিকে مُتَعَدِّىْ হওয়া লাযেম হতো। এখানে বিদ্যমান নেই।

مِمَّا هَمَمْتَ : اَىْ بِقَطْعِ يَدِ الْيَهُوْدِ

قُرِءَ عَنْهُ : অর্থাৎ এক কেরাতে جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ -এর স্থলে عَنْهُ ও পঠিত রয়েছে।

اِنَّمَا مُبِيْنًا بَيِّنًا : مُبِيْنًا -এর পরে بَيِّنًا উল্লেখ করে বুঝিয়েছেন যে, مُتَعَدِّىْ - مُبِيْنًا টি লাযেম -এর অর্থে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযূল ও আলোচনা : ১০৫ থেকে সাতটি আয়াত এক বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু কুরআনের সাধারণ পদ্ধতি অনুযায়ী এ ব্যাপারে প্রদত্ত নির্দেশাবলি এ ঘটনার সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং বর্তমানে ও ভবিষ্যতে আগমনকারী মুসলমানদের জন্য ব্যাপক। এ ছাড়া এসব নির্দেশের মধ্যে অনেক মৌলিক ও শাখাগত মাসআলাও রয়েছে।

মুনাফিক ও দুর্বল প্রকৃতির মুসলিমগণের মধ্যে কেউ কোনো পাপ ও অপরাধ করে ফেললে শাস্তি ও দুর্নাম হতে বাচার জন্য নানারকম ছল চাতুরীর আশ্রয় নিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে এসে এমন ধারায় তা প্রকাশ করত, যাতে তিনি তাকে সম্পূর্ণ নির্দোষ মনে করেন। পরন্তু কোনো নির্দোষ ব্যক্তির উপর অপবাদ আরোপ করে তাকে অপরাধী বানানোর চেষ্টা চালাত।

ঘটনার বিবরণ : হিজরতের প্রাথমিক যুগে সাধারণ মুসলমানরা দারিদ্র্য ও অনাহারে দিনাতিপাত করতেন। তাঁদের সাধারণ খাদ্য ছিল যবের আটা কিংবা খেজুর অথবা গমের আটা। এগুলো খুব দুর্লভ ছিল এবং মদিনায় প্রায় পাওয়াই যেত না। সিরিয়া থেকে চালান এলে কেউ কেউ মেহমানদের জন্য কিংবা বিশেষ প্রয়োজনের জন্য ক্রয় করে রাখত। হযরত রেফাআহ এমনিভাবে কিছু গমের আটা কিনে একটি বস্তায় ভরে রেখে দিয়েছিলেন। এ বস্তার মধ্যেই কিছু অস্ত্রশস্ত্রও রেখে একটি ছোট কক্ষে সংরক্ষিত রেখেছিলেন। বশীর কিংবা তো'মা সিঁধ কেটে বস্তা বের করে নেয়। সকালে হযরত রেফাআহ ব্যাপার দেখে ভ্রাতুষ্পুত্র কাতাদার কাছে ঘটনা বিবৃত করলেন। সবাই মিলে মহল্লায় খোজাখুজি শুরু করলেন। কেউ কেউ বলল, আজ রাত্রে আমরা বনী উবায়রাকের ঘরে আগুন জ্বলতে দেখেছি। মনে হয় সে খাদ্যই পাকানো হয়েছে। রহস্য ফাঁস হয়ে পড়ার সংবাদ পেয়ে বনী উবায়রাক নিজেরাই এসে হাজির হলো এবং বলল, এটা লবীদ ইবনে সাহলের কাজ। আমরা তো তাকে খাঁটি মুসলমান বলেই জানতাম। খবর পেয়ে লবীদ তরবারি কোষমুক্ত করে এলেন এবং বললেন, তোমরা আমাকে চোর বলছ? শুনে নাও, চুরির রহস্য উদঘাটিত না হওয়া পর্যন্ত আমি এ তরবারি কোষবদ্ধ করব না।

বনী উবায়রাক আস্তে বলল, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার নাম কেউ নেয়নি। আপনার দ্বারা এ কাজ হতেও পারে না। বগভী ও ইবনে জরীরের রেওয়াতে এস্থলে বলা হয়েছে যে, বনী ইবায়রাক জনৈক ইহুদির প্রতি চুরির অপবাদ আরোপ করল। ধূর্ততাবশত তারা আটার বস্তা সামান্য ছিড়ে ফেলেছিল। ফলে রেফাআর গৃহ থেকে উপরোক্ত ইহুদীর গৃহ পর্যন্ত আটার লক্ষণ পাওয়া গেল। জানাজানির পর চোরাই অস্ত্রশস্ত্র এবং লৌহ-বর্ম ও ইহুদির কাছাকাছি রেখে দিল। তদন্তের সময় তার গৃহ থেকেই এগুলো বের হলো। ইহুদি কসম খেয়ে বলল, ইবনে উবায়রাক আমাকে লৌহ বর্মটি দিয়েছে।

তিরমিযী শরীফের রেওয়ায়েত ও বগভীর রেওয়ায়েতে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় যে, বনী উবায়ারাক প্রথমে দেখল যে, এটা ধোপে টিকবে না তখন ইহুদির ঘাড়ে চাপিয়ে দিল। যাহোক, এখন বিষয়টি বনী উবায়রাক ও ইহুদির মধ্যে গিয়ে গড়ায়।

এদিকে বিভিন্ন পন্থায় হযরত কাতাদা ও রেফাআহ এর প্রবল ধারণা জন্মেছিল যে, এটি বনী উবায়রাকেরই কীর্তি। হযরত কাতাদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে চুরির ঘটনা এবং তদন্তক্রমে বনী উবায়রাকের প্রতি প্রবল ধারণার কথা আলোচনা করলেন। বনী উবায়রাক সংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে রেফাআহ ও কাতাদার বিরুদ্ধে অভিযোগ করল যে, শরিয়তসম্মত প্রমাণ ছাড়াই তারা আমাদের নামে চুরির অপবাদ আরোপ করছে। অথচ চোরাই মাল ইহুদির ঘর থেকে বের হয়েছে। আপনি তাদেরকে বারণ করুন, তারা যেন আমাদেরকে দোষারোপ না করে এবং ইহুদির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে।

বাহ্যিক অবস্থা ও লক্ষণাদি দৃষ্টে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এরও প্রবল ধারণা জন্মে যে, এ কাজটি ইহুদির। বনী উবায়রাকের বিরুদ্ধে অভিযোগ ঠিক নয় বগভীর রেওয়ায়েতে আছে, এমন কি তিনি ইহুদির উপর চুরির শাস্তি প্রয়োগ করার এবং হস্ত কর্তন করার বিষয়ও স্থির করে ফেলেন।

এদিকে হযরত কাতাদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হলে তিনি বললেন: আপনি বিনা প্রমাণে একটি মুসলমান পরিবারকে চুরির জন্য দোষারোপ করেছেন। এতে হযরত কাতাদাহ খুব দুঃখিত হলেন এবং আফসোস করে বললেন, আমার মাল গেলেও এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কোনো কিছু না বলাই ভালো ছিল। এমনিভাবে হযরত রেফাআহকেও তিনি এ ধরনের কথা বললেন। রেফাআহও ধৈর্যধারণ করলেন এবং বললেন- وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ, [আল্লাহ সহায়]

বেশিদিন অতিবাহিত হতে না হতেই এ ব্যাপারে কুরআন পাকের পূর্ণ একটি রুকূ' অবতীর্ণ হয়। এর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ ﷺ এর সামনে ঘটনার বাস্তবরূপ তুলে ধরা হয় এবং এ জাতীয় ব্যাপারাদি সম্পর্কে সাধারণ নির্দেশ দান করা হয়।

পবিত্র কুরআন বনী উবায়রাকের চুরি ফাঁস করে ইহুদিকে দোষমুক্ত করে দিল। এতে বনী উবায়রাক বাধ্য হয়ে চোরাই মাল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে সমর্পণ করল। তিনি রেফাআকে তা প্রত্যর্পণ করলেন। রেফাআহ সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র জিহাদের জন্য ওয়াকফ করে দিলেন। এদিকে বনী উবায়রাকের চুরি প্রকাশ হয়ে পড়লে বশীর ইবনে উবায়রাক মদিনা থেকে পলায়ন করল এবং মক্কার কাফেরদের সাথে একাত্ম হয়ে গেল। সে পূর্বে মুনাফিক থাকলে এবার প্রকাশ্য কাফের এবং পূর্বে মুসলমান থাকলে এবার ধর্মত্যাগী হয়ে গেল।

তাফসীর বাহরে মুহীতে বলা হয়েছে, আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের পাপ বশীরকে মক্কায় ও শান্তিতে থাকতে দেয়নি। যে মহিলার গৃহে সে আশ্রয় নিয়েছিল সে ঘটনা জানতে পেরে তাকে বহিষ্কার করে দিল। এমনিভাবে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে সে এক ব্যক্তির গৃহে সিঁধ কাটে এবং প্রাচীর চাপা পড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

[মা'আরিফুল কুরআন]

রাসূল ﷺ -এর ইজতিহাদ করার অধিকার : اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ আয়াত থেকে পাঁচটি বিষয় প্রমাণিত হয়।

১. যেসব বিষয় সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে কোনো স্পষ্ট উক্তি বর্ণিত নেই সেগুলোতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিজ মতামত দ্বারা ইজতিহাদ করার অধিকার ছিল। জরুরি বিষয়াদিতে তিনি অনেক ফয়সালা স্বীয় ইজতিহাদদ্বারাও করতেন।

২. আল্লাহ তা'আলার কাছে সে ইজতিহাদই গ্রহণযোগ্য, যা কুরআন ও সুন্নাহর মূলনীতি থেকে গৃহীত। এ ব্যাপারে নিছক ব্যক্তিগত মতামত ও ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়, শরিয়তের পরিভাষায় একে ইজতিহাদ বলা যায় না।

৩. রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইজতিহাদ অন্যান্য মুজতাহিদ ইমামের ইজতিহাদের মতো ছিল না। যাতে ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা সর্বদাই বিদ্যমান থাকে। তিনি যখন ইজতিহাদের মাধ্যমে কোনো ফয়সালা করতেন, তাতে কোনো ভুল হয়ে গেলে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সতর্ক করে ফয়সালাকে নির্ভুল ও সঠিক করিয়ে দিতেন।

৪. রাসূলুল্লাহ ﷺ পবিত্র কুরআন থেকে যা কিছু বুঝতেন, তা ছিল আল্লাহরই বোঝানো বিষয়। এতে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ ছিল না। অন্যান্য আলেম ও মুজতাহিদের অবস্থা তেমন নয়। তাঁরা যা বোঝেন সে সম্পর্কে একথা বলা যায় না যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলে দিয়েছেন। আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে بِمَا اَرٰىكَ اللّٰهُ বলা হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ আপনাকে যা দেখিয়ে দেন। এ কারণেই فَاحْكُمْ بِمَا اَرٰىكَ اللّٰهُ অর্থাৎ আল্লাহ আপনাকে যা দেখিয়ে দেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন। তখন তিনি শাসিয়ে দিয়ে বললেন, এ বৈশিষ্ট্য একমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অন্য কারও নয়।

৫. মিথ্যা মকদ্দমা ও মিথ্যা দাবির তদবীর করা, ওকালতি করা, সমর্থন করা ইত্যাদি সবই হারাম। [মাআরিফুল কুরআন]

উল্লিখিত আয়াত থেকে যা বোঝা যায় :

* উক্ত ঘটনা থেকে প্রথমত : একটি বিষয়ে জানা গেল যে, নবীগণেরও মানুষ হিসেবে ত্রুটি বিচ্যুতি হতে পারে।
* দ্বিতীয়ত : জানা গেল, নবী ﷺ আলিমুল গায়েব নন। অন্যথায় তিনি প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে তৎক্ষণাত জেনে যেতেন।
* তৃতীয়ত : জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা তার নবীগণের হেফাজত করে থাকেন। এবং কখনো ইজতিহাদী ভুল হয়ে গেলেও তৎক্ষণাত শোধরিয়ে দেন। [জামালাইন]

১০৬. **قَوْلُهُ وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ** : অর্থাৎ খোজ খবর না নিয়ে কেবল বাহ্য অবস্থা দেখে প্রকৃত চোরকে নির্দোষ ও নির্দোষ ইহুদিকে চোর মনে করাটা আপনার নিষ্পাপ হওয়া ও মহা মর্যাদার জন্য শোভনীয় নয়, এর থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। এর দ্বারা সেই সকল সরলপ্রাণ সাহাবীগণকেও পূর্ণ সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, যারা ইসলামি জাতীয় ভ্রাতৃত্বের কারণে চোরের প্রতি সুধারণা রেখে ইহুদিকে চোর সাব্যস্ত করতে সচেষ্ট ছিলেন। -[তাফসীরে উসমানী]

১০৭. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ أَنْفُسَهُمْ يَخُوْنُوْنَهَا بِالْمَعَاصِيْ لِأَنَّ وَبَالَ خِيَانَتِهِمْ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا كَثِيْرَ الْخِيَانَةِ أَثِيْمًا أَيْ يُعَاقِبُهُ.

১০৮. يَسْتَخْفُوْنَ أَيْ طُعْمَةُ وَقَوْمُهُ حَيَاءً مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ يَعْلَمُهُ إِذْ يُبَيِّتُوْنَ يُضْمِرُوْنَ مَا لَا يَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ مِنْ عَزْمِهِمْ عَلَى الْحَلْفِ عَلٰى نَفْيِ السَّرِقَةِ وَرَمْيِ الْيَهُوْدِيِّ بِهَا وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا ج عِلْمًا.

অনুবাদ :

১০৭ যারা নিজেদের প্রতারিত করে অর্থাৎ পাপকার্য করে নিজেদের সাথে খেয়ানত করে; কেননা এ খেয়ানতের মন্দ পরিণাম তাদের নিজেদের উপরই বর্তাবে; তাদের পক্ষে কথা বলো না। আল্লাহ বিশ্বাসভঙ্গকারী অতি খেয়ানতকারী পাপীকে ভালোবাসেন না। অর্থাৎ তাকে তিনি শাস্তি প্রদান করবেন।

১০৮. [তারা] যেমন তু'মা ও তার গোষ্ঠী লজ্জায় মানুষ হতে গোপন করে কিন্তু আল্লাহ হতে গোপন করে না। অপছন্দনীয় কথা অর্থাৎ নিজে চুরি না করার এবং ঐ ইহুদির ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেওয়ার বিষয়ে শপথ করার সংকল্প সম্পর্কে তারা যখন লুকিয়ে রাখে গোপন করে রাখে তখন তিনি তাদের সাথে বিদ্যমান। অর্থাৎ তাদের এ গোপন সংকল্প তিনি জানেন। তারা যা করে তা তিনি তাঁর জ্ঞানে বেষ্টন করে রেখেছেন।

তাহকীক ও তারকীব

وَبَالٌ : ইহা বাবে كَرُمَ-এর মাসদার, ক্ষতি, বিপদ, কষ্ট।

خَوَّانٌ : ব. ব خَوَّانُوْنَ প্রতারক, প্রবঞ্চক।

يُعَاقِبُ : [وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ : مُضَارِعٌ مَعْرُوْفٌ] তিনি শাস্তি দিবেন عَاقَبَ يُعَاقِبُ عِقَابًا শাস্তি দেওয়া, সাজা দেওয়া।

يُضْمِرُوْنَ : [جَمْعُ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ : مُضَارِعٌ مَعْرُوْفٌ] তারা গোপন করে أَضْمَرَ يُضْمِرُ إِضْمَارًا - গোপন করা, লুকানো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ব আয়াতে প্রকৃত চোর ও তার জ্ঞাতি গোষ্ঠীর ছলচাতুরী উন্মোচিত করে দেওয়ায় সম্ভবত রাসূলুল্লাহ ﷺ নিখিল সৃষ্টি বিশেষত উম্মতের প্রতি তাঁর যে অতলান্তিক স্নেহ মায়া ছিল তার আলোড়নে অপরাধীদের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকবেন। তাই ইরশাদ হয়েছে, ওসব প্রবঞ্চকের পক্ষে মহান আল্লাহর দরবারে যুক্তিতর্ক করছেন কেন? ওদের আল্লাহ পাক পছন্দ করেন না। ওরা রাতে লোক চক্ষুর আড়ালে অবৈধ পরামর্শে বসে, অথচ মহান আল্লাহর কাছে লজ্জা পায় না, যিনি সদাসর্বদা তাদের সঙ্গে এবং তাদের যাবতীয় কার্যাবলি তার আয়ত্বে। আর যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা নাও করে থাকেন, তবুও এ সম্ভাবনা তো অবশ্যই ছিল যে, তিনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বসবেন। যেমন, দেখুন হযরত ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে এক জায়গায় পরিষ্কার বলা হয়েছে- يُجَادِلُنَا فِيْ قَوْمِ لُوْطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ لَحَلِيْمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ সে লুতের সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে আমার নিকট যুক্তিতর্ক করতে লাগল। ইবরাহীম তো অবশ্যই সহনশীল, কোমল হৃদয়, সতত আল্লাহ পাক অভিমুখী, [১১ :৭৪,৭৫] কাজেই এ সম্ভাবনার মুখবন্ধের জন্য আল্লাহ তা'আলা আগেভাগেই এ নির্দেশ দিয়ে তাদের জন্য সুপারিশ করতে নির্দেশ করে দিয়েছেন।

-[তাফসীরে উসমানী]

অনুবাদ :

১০৯. هَاَنْتُمْ يَا هٰؤُلَاۤءِ خِطَابٌ لِقَوْمِ طُعْمَةَ جَادَلْتُمْ خَاصَمْتُمْ عَنْهُمْ اَىْ عَنْ طُعْمَةَ وَذَوِيْهِ وَقُرِئَ عَنْهُ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللّٰهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِذَا عَذَّبَهُمْ اَمْ مَّنْ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا يَتَوَلّٰى اَمْرَهُمْ وَيَذُبُّ عَنْهُمْ اَىْ لَا اَحَدَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ ـ

১০৯. ও হে! তোমরাই هؤلاء -এর পূর্বে সম্বোধন বোধক শব্দ يا উহ্য রয়েছে। এখানে সম্বোধন হলো তু'মার সম্প্রদায়ের প্রতি عنهم এক কেরাতে عنه রূপেও এর পাঠ রয়েছে। ইহজীবনে তাদের পক্ষে তু'মা ও তার সংশ্লিষ্টদের পক্ষে কথা বলছ; তর্ক করছ; কিয়ামতের দিন যখন তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা হবে তখন আল্লাহর সম্মুখে কে তাদের পক্ষে কথা বলবে অথবা কে তাদের উকিল হবে? অর্থাৎ কে তাদের বিষয়ের দায়িত্ব বহন করবে ও তাদের হতে শাস্তি প্রতিহত করবে? না, কেউই এরূপ করবে না।

১১০. وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْۤءًا ذَنْبًا يَسُوْءُ بِهٖ غَيْرَهٗ كَرَمْىِ طُعْمَةَ الْيَهُوْدِىَّ اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ بِعَمَلِ ذَنْبٍ قَاصِرٍ عَلَيْهِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ عَنْهُ اَىْ يَتُبْ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا لَهٗ رَحِيْمًا بِهٖ ـ

১১০. কেউ যদি মন্দ পাপ কাজ করে যা অন্যকে ক্লেশ দেয় যেমন, ইহুদির ঘাড়ে তু'মা কর্তৃক দোষ চাপিয়ে দেওয়া বা নিজের প্রতি জুলুম করে অর্থাৎ এমন পাপকার্য করে যা কেবল তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে পরে সে সেটা হতে ক্ষমা প্রার্থনা করে তওবা করে তবে সে আল্লাহকে তার সম্পর্কে ক্ষমাশীল তার প্রতি পরম দয়ালু পাবে।

১১১. وَمَنْ يَكْسِبْ اِثْمًا ذَنْبًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ لِاَنَّ وَبَالَهٗ عَلَيْهَا وَلَا يَضُرُّ غَيْرَهٗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا فِىْ صُنْعِهٖ ـ

১১১. যে অপরাধ করে পাপকার্য করে সে তা নিজের ক্ষতির জন্যই করে। কেননা এর মন্দ পরিণাম তার উপরই বর্তাবে অন্য কারও কোনো ক্ষতি করবে না। এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও তার কার্যে তিনি প্রজ্ঞাময়।

১১২. وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيْئَةً ذَنْبًا صَغِيْرًا اَوْ اِثْمًا ذَنْبًا كَبِيْرًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْۤئًا مِنْهُ فَقَدِ احْتَمَلَ تَحَمَّلَ بُهْتَانًا بِرَمْيِهٖ وَاِثْمًا مُّبِيْنًا بَيِّنًا بِكَسْبِهٖ

১১২. কেউ কোনো খাতা অর্থাৎ ছোট পাপ বা অপরাধ অর্থাৎ বড় পাপ করে তা [নির্দোষ ব্যক্তির প্রতি আরোপ করলে সে] তা আরোপ করে মিথ্যা অপবাদ এবং তা অবলম্বন করে স্পষ্ট নির্ভেজাল পাপের বোঝা উঠিয়ে নেয়, বহন করে।

তাহকীক ও তারকীব

يَذُبُّ : (مُضَارِعٌ مَعْرُوْف : وَاحِدْ مُذَكَّر) সে রক্ষা করবে, বাবে نَصَرَ থেকে ذَبَّ يَذُبُّ ذَبًّا তাড়িয়ে দেওয়া ذَبَّ عِنْدَ রক্ষা করা।

رَمْىٌ : [ইহা বাবে ضَرَبَ এর মাসদার] নিক্ষেপ করণ, অপবাদ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচনা : এখানে চোর ও তার গোত্রের সেসব লোকদের সম্বোধন করা হয়েছে, যারা তার পক্ষপাতিত্ব করেছিল। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সব কিছুই জানেন। এ অন্যায় পক্ষপাত দ্বারা কিয়ামতের দিন চোরের কোনো আর লাভ হতে পারে না। –[তাফসীরে উসমানী।

قَوْلُهُ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْءً اَوْ يَظْلِمْ الخ :

سُوْءٌ ও ظُلْم দ্বারা ছোট ও বড় পাপ বোঝানো হয়েছে। অথবা سُوْء হলো সেই পাপ, যা দ্বারা অন্যকে ব্যথা দেওয়া হয়। যেমন কারো উপর অপবাদ আরোপ। আর যে পাপের অনিষ্ট নিজের উপরই বর্তায় তা জুলুম। বলা হয়েছে পাপকর্ম যেমনই হোক তার প্রতিষেধক হলো তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা। তওবা করলে আল্লাহ্ সব গুনাহ্ই ক্ষমা করে দেন। কেউ জেনেশুনে ছল চাতুরী করে কোনো দোষীকে নির্দোষ প্রমাণ করলে বা ভুলে দোষীকে নির্দোষ মনে করলে তাতে তার অপরাধ মোটেই লাঘব হয় না। হ্যাঁ, তওবা করলে ক্ষমা হতে পারে। এর দ্বারা চোর এবং যারা জ্ঞাতসারে বা না জেনে তার পক্ষপাতিত্ব করেছিল, তাদের সকলকেই তওবা ও ইস্তিগফারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সেই সাথে এ কথার প্রতি ও সূক্ষ্ম ইঙ্গিত হয়ে গেছে যে, এখনও যদি কেউ নিজ অবস্থানে অটল থাকে এবং তওবা না করে তবে সে মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা হতে বঞ্চিত থাকবে। –[তাফসীরে উসমানী]

তওবার তাৎপর্য : ১১০ তম আয়াত অর্থাৎ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْءً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ থেকে জানা যায় যে, সংক্রামক গোনাহ ও অসংক্রামক গোনাহ অর্থাৎ বান্দার হকের সাথে কিংবা আল্লাহর হকের সাথে সম্পর্কযুক্ত সব গোনাহই তওবা ও ইস্তেগফার দ্বারা মাফ হতে পারে। তবে তওবা ও এস্তেগফারের স্বরূপ জানা জরুরি। শুধু মুখে আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়া আতুবু ইলাইহি বলার নাম তওবা ও ইস্তেগফার নয়। তাই আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তি যদি সে জন্য অনুতপ্ত না হয় এবং তা পরিত্যাগ না করে কিংবা ভবিষ্যতে পরিত্যাগ করতে দৃঢ়সংকল্প না হয়, তবে মুখে মুখে আস্তাগফিরুল্লাহ' বলা তওবার সাথে উপহাস করা বৈ কিছু নয়।

তওবার জন্য মোটামুটি তিনটি বিষয় জরুরি : [এক] অতীত গোনাহের জন্য অনুতপ্ত হওয়া, [দুই] উপস্থিত গোনাহ অবিলম্বে ত্যাগ করা এবং [তিন] ভবিষ্যতে গোনাহ থেকে বেচে থাঁকতে দৃঢ়সংকল্প হওয়া। বান্দার হকের সাথে যেসব গোনাহের সম্পর্ক, সেগুলো বান্দার কাছ থেকেই মাফ করিয়ে নেওয়া কিংবা হক পরিশোধ করে দেওয়া তওবার অন্যতম শর্ত। নিজের গোনাহের দোষ অন্যের উপর চাপানো দ্বিগুণ শাস্তির কারণ: ১১২তম আয়াতে অর্থাৎ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيْئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ থেকে জানা যায় যে, যে লোক নিজে পাপ করে এবং অপর নিরপরাধ ব্যক্তিকে সে জন্য অভিযুক্ত করে, সে নিজ গোনাহকে দ্বিগুণ ও অত্যন্ত কঠোর করে দেয় এবং নির্মম শাস্তির যোগ্য হয়ে যায়। একে তো নিজের আসল গোনাহের শাস্তি, দ্বিতীয়ত: অপবাদের কঠোর শাস্তি। –[মাআরিফুল কুরআন]

وَمَنْ يَكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় পাপ কাজ করবে তার পরিণতি খোদ তাকেই ভোগ করতে হবে। তাকেই তার শাস্তি দেওয়া হবে অন্যকে নয়। কেননা এরূপ তো সেই করতে পারে যে প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে অবগত নয় বা যার হিতাহিত জ্ঞান নেই। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কোনোরূপ অতিশয়োক্তি ছাড়াই সর্বজ্ঞ ও পরম প্রজ্ঞাময়। তাঁর আদালতে এরূপ ঘটার অবকাশ কোথায়? কাজেই নিজে চুরি করে ইহুদির উপর অপবাদ চাপালে কি লাভ হবে? –[তাফসীরে উসমানী]

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيْئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْئًا الخ **অর্থাৎ কেউ ছোট** বড় যে কোনো পাপ করে কোনো নির্দোষ ব্যক্তির উপর চাপালে তার উপর তো দু'টি পাপ বর্তাল। একটি মিথ্যা অপবাদ, আরেকটি সেই আসল পাপ। সুস্পষ্ট হয়ে উঠল যে, নিজে চুরি করে ইহুদির মাথায় দোষ চাপানোর দ্বারা বিপদ আরও বেড়ে গেল, লাভ হলো না কিছুই। আরও জানা গেল, পাপ ছোট হোক কিংবা বড় তওবা ছাড়া তার কোনো প্রতিশেধক নেই। –[তাফসীরে উসমানী]

١١٣. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ وَرَحْمَتُهُ بِالْعِصْمَةِ لَهَمَّتْ طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ مِنْ قَوْمِ طُعْمَةَ أَنْ يُضِلُّوكَ عَنِ الْقَضَاءِ بِالْحَقِّ بِتَلْبِيْسِهِمْ عَلَيْكَ وَمَا يُضِلُّوْنَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ زَائِدَةٌ شَيْءٍ لِأَنَّ وَبَالَ اِضْلَالِهِمْ عَلَيْهِمْ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ الْقُرْاٰنَ وَالْحِكْمَةَ مَافِيْهِ مِنَ الْاَحْكَامِ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ مِنَ الْاَحْكَامِ وَالْغَيْبِ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ بِذٰلِكَ وَغَيْرِهِ عَظِيْمًا ـ

অনুবাদ :

১১৩. হে মুহাম্মদ! তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও পাপ হতে বাঁচিয়ে রাখার মাধ্যমে দয়া না থাকলে তাদের অর্থাৎ তু'মার সম্প্রদায়ের একদল সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করে তোমাকে সঠিক মীমাংসা প্রদান হতে পথভ্রষ্ট করতে চাইতই, তবে তারা নিজেদেরকে ব্যতীত আর কাউকেই পথভ্রষ্ট করে না আর তোমার কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। কারণ তাদের এ পথভ্রষ্ট করার মন্দ পরিণাম কেবল তাদের উপরই বর্তাবে।

আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব অর্থাৎ আল কুরআন এবং হিকমত অর্থাৎ তার মধ্যে যে সমস্ত বিধি বিধান বিদ্যমান তা অবতীর্ণ করেছেন এবং তুমি বিধিবিধান ও অদৃশ্য সম্পর্কে যা জানতে না তা তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। তোমার উপর আল্লাহর এটা এবং আরো অন্যান্য বিরাট অনুগ্রহ বিদ্যমান।

مِنْ شَيْءٍ -এর مِنْ টি زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ الخ : রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নিজের মর্যাদা ও পবিত্রতা রক্ষার নির্দেশ : এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সম্বোধন করে উক্ত প্রতারকদের ছলচাতুরী প্রকাশ এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মহা মর্যাদা ও নিষ্পাপ হওয়া ব্যক্ত করা হয়েছে। আরও দেখানো হয়েছে যে, সকল গুণ ও যোগ্যতার মধ্যমণি যেইজ্ঞান, সে ক্ষেত্রে ও তিনি সবার উপরে। তার প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ অনন্ত, যা আমাদের ব্যাঞ্জনা ও বোধশক্তির উর্ধ্বে। সেই সাথে এ কথার প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বাহ্যিক অবস্থা দৃষ্টে এবং কথাবার্তা ও সাক্ষ্য সবূত দেখেও তা সত্য মনে করেই রাসূলুল্লাহ ﷺ চোরকে নির্দোষ ভেবেছিলেন। সত্যকে পাশ কাটানো বা সত্যকে রাখঢাক দেওয়ার মনোবৃত্তি এর কারণ ছিল না আদৌ। আর এতটুকুতে কোনো দোষও ছিল না; বরং এমন হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল। অবশেষে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অনুগ্রহে যখন সত্য প্রকাশ হলো তখন আর কোনো সংশয় বাকি থাকল না। এ সমুদয় কথার উদ্দেশ্য এই যে, ভবিষ্যতে যাতে এসব প্রতারক প্রিয়নবী ﷺ -কে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা আর না করে এবং তারা সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে যায়। সেই সাথে তিনি যেন নিজের মর্যাদা ও পবিত্রতা অনুসারে চিন্তা-ভাবনা ও সর্তকতার সাথে কাজ করেন। -[তাফসীরে উসমানী]

কুরআন ও সুন্নাহর তাৎপর্য : وَاَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ বাক্যে 'কিতাব' এর সাথে 'হিকমত' শব্দটি উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাহ ও শিক্ষার নাম যে 'হেকমত' তাও আল্লাহ তা'আলারই অবতারিত। পার্থক্য এই যে, সুন্নাহর শব্দাবলি আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়। এ কারণেই কুরআনের অন্তর্ভুক্ত নয়। অবশ্য কুরআন ও সুন্নাহ উভয়টিরই তথ্যসমূহ আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত। তাই উভয়ের বাস্তবায়নই ওয়াজিব।

এ থেকে কোনো কোনো ফিকহবিদের এ উক্তির স্বরূপও জানা গেল যে, ওহী দুই প্রকার- এক. مَتْلُوْ [যা তেওলায়াত করা হয়] এবং দুই. غَيْرُ مَتْلُوْ [যা তেলাওয়াত করা হয় না]। প্রথম প্রকার ওহী কুরআনকে বলা হয়, যার অর্থ ও শব্দাবলি উভয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত। দ্বিতীয় প্রকার ওহী হাদীস তথা সুন্নাহ। এর শব্দাবলি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এবং মর্ম আল্লাহর পক্ষ থেকে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জ্ঞান সমগ্র সৃষ্টিজীবের চেয়ে বেশি : وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের মতো সর্বব্যাপী ছিল না। যেমন কতক মূর্খ বলে থাকে। বরং আল্লাহ যতটুকু দান করতেন তিনি তাই পেতেন। তবে এতে বিতর্কের অবকাশ নেই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা সমগ্র সৃষ্টজীবের জ্ঞানের চেয়ে অনেক বেশি। -[মা'আরিফুল কুরআন]

অনুবাদ :

١١٤. لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِنْ نَجْوٰهُمْ أَيِ النَّاسِ أَيْ مَا يَتَنَاجَوْنَ فِيْهِ وَيَتَحَدَّثُوْنَ اِلَّا نَجْوٰى مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ عَمَلِ بِرٍّ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرَ ابْتِغَاءَ طَلَبَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ لَا غَيْرَهُ مِنْ اُمُوْرِ الدُّنْيَا فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ بِالنُّوْنِ وَالْيَاءِ اَيِ اللّٰهُ اَجْرًا عَظِيْمًا.

১১৪. তাদের অর্থাৎ লোকদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে তারা যে গোপন সলা ও আলোচনা করে তাতে কোনো কল্যাণ নেই তবে যে ব্যক্তি দান খয়রাত, ভালো কাজ সৎকর্ম ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয় তার পরামর্শে অবশ্য কল্যাণ বিদ্যমান। জাগতিক কোনো উদ্দেশ্য নয় আল্লাহর সন্তুষ্টির সন্ধানে তার আকাঙ্ক্ষায় কেউ তা উল্লিখিত কাজসমূহ করলে তাকে তিনি يُؤْتِيْهِ এটা ى [নাম পুরুষ] ও نُوْن [প্রথম পুরুষ বহুবচন] সহ পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মহাপুরস্কার দেবেন।

١١٥. وَمَنْ يُّشَاقِقِ يُخَالِفِ الرَّسُوْلَ فِيْمَا جَاءَ بِهٖ مِنَ الْحَقِّ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى ظَهَرَ لَهُ الْحَقُّ بِالْمُعْجِزَاتِ وَيَتَّبِعْ طَرِيْقًا غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَيْ طَرِيْقِهِمُ الَّذِيْ هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الدِّيْنِ بِاَنْ يَّكْفُرَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى نَجْعَلْهُ وَالِيًا لِمَا تَوَلَّاهُ مِنَ الضَّلَالِ بِاَنْ نُخَلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا وَنُصْلِهٖ نُدْخِلْهُ فِي الْاٰخِرَةِ جَهَنَّمَ لِيَحْتَرِقَ فِيْهَا وَسَاءَتْ مَصِيْرًا مَرْجِعًا هِيَ.

১১৫. কারও নিকট সৎপথ প্রকাশিত হওয়ার পর অর্থাৎ তার নিকট মু'জিযার মাধ্যমে ন্যায়ও সত্য উদঘাটিত হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে অর্থাৎ তিনি যে ন্যায় সত্য নিয়ে এসেছেন তার বিরোধিতা করে এবং মু'মিনদের পথ ব্যতীত অর্থাৎ ধর্ম বিষয়ে তারা যে পথে অধিষ্ঠিত তা ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে অর্থাৎ যদি সে কুফরি করে তবে যেদিকে সে ফিরে যায় সে দিকেই তাকে ফিরিয়ে দেবে অর্থাৎ পৃথিবীতে সে ও তার অবলম্বিত বিষয়ের মাঝে তাকে বাধাহীনভাবে ছেড়ে দিয়ে যে পথভ্রষ্টতা সে অবলম্বন করেছে তাকে তার নির্বাহী বানিয়ে দেব এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব। অর্থাৎ দগ্ধ করার উদ্দেশ্যে তাকে পরকালে তাতে প্রবিষ্ট করব। আর কত মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল সেটা। اَلْمَصِيْرُ অর্থ– প্রত্যাবর্তনস্থল।

তাহকীক ও তারকীব

نُخَلِّيْ : (مُضَارِعْ مَعْرُوْف : جَمْع مُتَكَلِّم) আমরা ছেড়ে দেব, বাবে تَفْعِيْل থেকে خَلّٰى يُخَلِّيْ অর্থ– ছেড়ে দেওয়া, মুক্ত করা।

يَحْتَرِقُ : (مُضَارِعْ مَعْرُوْف : وَاحِدْ مُذَكَّرْ) সে জ্বলে যাবে বা যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَا خَيْرَ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَجْوٰىهُمْ :

আলোচনা : মুনাফিক ও কূট চরিত্ররা মানুষের কাছে নিজেদের নামদাম, ফলানোর জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কানেকানে কথা বলত। এ ছাড়া মজলিসে বসে নিজেরা অনর্থক বিষয়ে কানাকানি করত। কারও ছিদ্রান্বেষণ, কারও দোষচর্চা, কারও সম্পর্কে ফালতু অভিযোগ ইত্যাদি নিয়ে মেতে থাকত। এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে, যারা পরস্পরে কানেকানে পরামর্শ করে তাদের বেশির ভাগ পরামর্শেই কোনো কল্যাণ থাকে না। অকপট ও সত্যকথা গোপন করার দরকার পড়ে না গুপ্তালোচনায় কোনো না কোনো প্রতারণা থাকে। হ্যাঁ, যদি গোপনই করতে হয় তবে দান খয়রাতের কথা গোপন কর যাতে গ্রহীতা লজ্জিত না হয় বা কোনো অজ্ঞজনকে শোধরানো তাকে সঠিক কথা বোঝানো ও সহীহ মাসআলা শেখানোর বিষয়টি গোপনে লোকজনের আড়ালে সম্পন্ন কর, যাতে তার অসম্মান না হয়, কিংবা দুই ব্যক্তির মাঝে বিবাদ ঘটলে যদি উত্তেজিত ব্যক্তি মীমাংসায় আসতে না চায় তবে তাকে গোপনে বোঝাও, প্রয়োজনে বানিয়ে কথা বলারও অনুমতি আছে। শেষে বলা হয়েছে যে, কেউ এসব কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের বাসনায় করলে তাকে মহা পুরস্কারে ভূষিত করা হবে। অর্থাৎ এরূপ কাজ লোক দেখানোর মনোবৃত্তি বা কোনো পার্থিব স্বার্থে যেন না হয়। [উসমানী]

পারস্পরিক সলাপরামর্শ ও মজলিসের উত্তম পন্থা : বলা হয়েছে : لَا خَيْرَ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ অর্থাৎ মানুষের যেসব পারস্পরিক সলাপরামর্শ পরকালের ভাবনা ও পরিণতির চিন্তা বিবর্জিত শুধু ক্ষণস্থায়ী পার্থিব ও সাময়িক উপকার লাভের জন্য হয়ে থাকে, সেগুলোতে কোনো মঙ্গল নেই।

এরপর বলা হয়েছে– اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ অর্থাৎ এসব সলাপরামর্শ ও কানাকানিতে মঙ্গলের কোনো কিছু থাকলে তা হচ্ছে একে অপরকে দান খয়রাতে উৎসাহিত করা কিংবা সৎকাজের আদেশ দেওয়া অথবা মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শান্তি স্থাপনের পরামর্শ দান করা এক হাদীসে বলা হয়েছে : মানুষের যেসব কথাবার্তায় আল্লাহর জিকির কিংবা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ থাকে সেগুলো ছাড়া সবই তাদের জন্য ক্ষতিকর।

مَعْرُوْفٌ এমন কাজকে বলা হয়, যা শরিয়তে প্রশংসিত এবং যা শরিয়ত পন্থিদের কাছে পরিচিত। এর বিপরীতে مُنْكَرٌ ঐ কাজ, যা শরিয়তের অপছন্দনীয় এবং শরিয়তপন্থিদের কাছে অপরিচিত।

যে কোনো সৎকাজের আদেশ এবং উৎসাহ দান আমর বিল মারূফে'র অন্তর্ভুক্ত। উৎপীড়িতকে সাহায্য করা, অভাবীদের ঋণ দেওয়া পথভ্রান্তকে পথ বলে দেওয়া ইত্যাদি সৎকাজ আমর বিল মা'রূফ-এর অন্তর্ভুক্ত। সদকা এবং মানুষের পারস্পরিক শান্তি স্থাপন যদিও এর অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, এতদুভয়ের উপকারিতা বহু লোকের মধ্যে বিস্তার লাভ করে এবং জাতীয় জীবন সংশোধিত হয়।

এছাড়া দু'টি কাজ জনসেবার গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়সমূহকে পরিব্যপ্ত করে [এক] সৃষ্টজীবের উপকার করা, [দুই] মনুষকে দুঃখ কষ্ট থেকে রক্ষা করা। সদকা উপকার সাধনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এবং মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করা, সৃষ্টজীবকে ক্ষতির কবল থেকে রক্ষা করার সর্বপ্রধান মাধ্যম। তাই তাফসীরবিদগণ বলেন, এখানে সদকার অর্থ ব্যাপক। ওয়াজিব সদকা জাকাত নফল সদকা এবং যে কোনো সদকা এবং যে কোনো উপকার এর অন্তর্ভুক্ত। –[মাআরিফুল কুরআন]

قَوْلُهُ وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى الخ : অর্থাৎ কারও কাছে হক কথা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও যদি সে রাসূলের আদেশ অমান্য করে এবং মুসলিমদের পথ ছেড়ে ভিন্ন পথ অবলম্বন করে তবে তার পরিণাম জাহান্নাম। যেমন উপরিউক্ত চোর করেছিল। সে নিজের অপরাধ স্বীকার ও তওবা না করে, বরং হাত কাটা যাওয়ার ভয়ে মক্কা শরীফে পালিয়েছিল এবং মুশরিকদের সাথে মিলিত হয়েছিল।

ইজমা মানা ফরজ : মুসলিম বিশেষজ্ঞ আলোচ্য আয়াত থেকে এ মাসআলাও উদ্ভাবন করেছেন যে, উম্মতের ইজমা [সর্ববাদীসম্মত রায়] –কে অস্বীকারকারী জাহান্নামী। অর্থাৎ ইজমা মানা ফরজ। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর হাত মুসলিমগণের জমাতের উপর। যে দলছুট হয় সে জাহান্নামে পতিত হয়। –[তাফসীরে উসমানী]

١١٦. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ط وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا عَنِ الْحَقِّ .

١١٧. اِنْ مَا يَدْعُوْنَ يَعْبُدُ الْمُشْرِكُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ اَىِ اللّٰهِ اَىْ غَيْرِهٖ اِلَّآ اِنٰثًا اَصْنَامًا مُؤَنَّثَةً كَاللَّاتِ وَالْعُزّٰى وَمَنَاةَ وَاِنْ مَا يَدْعُوْنَ يَعْبُدُوْنَ بِعِبَادَتِهَا اِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا خَارِجًا عَنِ الطَّاعَةِ لِطَاعَتِهِمْ لَهٗ فِيْهَا وَهُوَ اِبْلِيْسُ .

অনুবাদ :

১১৬. আল্লাহ তাঁর সাথে শরিক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এটা ব্যতীত সব কিছু ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরিক করে সে অন্যায় ও সত্য হতে বহুদূর পথভ্রষ্ট।

১১৭. তাঁর অর্থাৎ আল্লাহর পরিবর্তে তারা অর্থাৎ মুশরিকরা নারীমূর্তিকে ডাকে অর্থাৎ লাত, উযযা, মানাত ইত্যাদি নারী মূর্তিসমূহের উপাসনা করে। এবং তারা প্রতিমা পূজায় শয়তানের আনুগত্য করে বিদ্রোহী অর্থাৎ অবাধ্য শয়তানকেই অর্থাৎ ইবলীসকেই ডাকে অর্থাৎ এসব প্রতিমা পূজার মাধ্যমে মূলত : শয়তানেরই তারা উপাসনা করে। اِنْ يَّدْعُوْنَ -এর اِنْ টি এ আয়াতের উভয় স্থানেই مَا ['না'] অর্থে ব্যবহৃত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ الخ শিরকের নীচে যে কোনো গুনাহ মহান আল্লাহ ক্ষমা করবেন। কিন্তু শিরক কখনই ক্ষমা হবে না। মুশরিকদের জন্য শাস্তিই অবধারিত। কাজেই চুরি করা ও অপবাদ আরোপ করা যদিও কবীরা গুনাহ ছিল তবুও সম্ভাবনা ছিল আল্লাহ স্বীয় কৃপায় সে চোরকে ক্ষমা করে দিবেন। কিন্তু সে যখন রাসূলের আদেশ থেকে গা ঢাকা দিয়ে মুশরিকদের সাথে গিয়ে মিলিত হলো, তখন তার ক্ষমাপ্রাপ্তির সম্ভাবনাও বাতিল হয়ে গেল।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : এর দ্বারা জানা গেল মাহান আল্লাহ ছাড়া অন্যের পূজা করাই কেবল শিরক নয়, বরং মহান আল্লাহর আদেশের বিপরীতে অন্য কারও আদেশ পছন্দ করাও শিরকের অন্তর্ভুক্ত। -[তাফসীরে উসমানী]

শিরক ও কুফরের শাস্তি চিরস্থায়ী হওয়া : এখানে কেউ কেউ প্রশ্ন করে যে, কর্ম পরিমাণে শাস্তি হওয়া উচিত। মুশরিক ও কাফিররা যে শিরক ও কুফরের অপরাধ করে, তা সীমাবদ্ধ আয়ুষ্কালের মধ্যে করে। এতএব এর শাস্তি অনন্তকাল স্থায়ী হবে কেন? উত্তর এই যে, কাফের ও মুশরিকরা কুফর ও শিরককে অপরাধই মনে করে না। বরং পুণ্যের কাজ বলে মনে করে। তাই তাদের ইচ্ছা ও সংকল্প এটাই থাকে যে, চিরকাল এ অবস্থার উপরই কায়েম থাকবে। মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত যখন সে এ অবস্থার উপরই কায়েম থাকে, তখন সে নিজ সাধ্যের সীমা পর্যন্ত চিরস্থায়ী অপরাধ করে নেয়, তাই শাস্তিও চিরস্থায়ী হবে।

জুলুম ও অবিচার তিন প্রকার : এক প্রকার জুলুম আল্লাহ তা'আলা কখনও ক্ষমা করবেন না। দ্বিতীয় প্রকার জুলুম মাফ হতে পরে। তৃতীয় প্রকার জুলুমের প্রতিশোধ আল্লহ তা'আলা না নিয়ে ছাড়বেন না।

প্রথম প্রকার জুলুম হচ্ছে শিরক দ্বিতীয় প্রকার আল্লাহর ত্রুটি করা এবং তৃতীয় প্রকার বান্দার হক বিনষ্ট করা। -[ইবনে কাছীর]।

শিরকের তাৎপর্য : শিরকের তাৎপর্য হচ্ছে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সৃষ্টবস্তুকে ইবাদত কিংবা মহব্বত ও সম্মান প্রদর্শনে আল্লাহর সমতুল্য মনে করা। জাহান্নামে পৌছে মুশরিকরা যে উক্তি করবে, পবিত্র কুরআন তা উদ্ধৃত করেছে-

تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

অর্থাৎ আল্লাহর কসম আমরা প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত ছিলাম যখন তোমাদেরকে বিশ্বপালনকর্তার সমতুল্য স্থির করেছিলাম।

জানা কথা যে, মুশরিকদেরও এরূপ বিশ্বাস ছিল না যে, তাদের স্বনির্মিত প্রস্তরমূর্তি বিশ্বজাহানের স্রষ্টা ও মালিক। তারা অন্যান্য ভুল বোঝাবুঝির কারণে এদেরকে ইবাদতে কিংবা মহব্বত ও সম্মান প্রদর্শনে আল্লাহ তা'আলার সমতুল্য স্থির করে নিয়েছিল। এ শিরকই তাদেরকে জাহান্নামে পৌছে দিয়েছে। [ফাতহুল মুলহিম]। জানা গেল যে, স্রষ্টা, রিজিকতাদা, সর্বশক্তিমান, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী আল্লাহ তা'আলার ইত্যাকার বিশেষ গুণে কোনো সৃষ্ট বস্তুকে আল্লাহর সমতুল্য মনে করাই শিরক। –[মাআরিফুল কুরআন]

قَوْلُهُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا : **শিরক মানুষকে চরম গুমরাহীতে ফেলে দেয় :** সুদূর পথভ্রষ্টতায় পতিত হওয়ার কারণ সে তো মহান আল্লাহ হতেই প্রকাশ্য বিমুখ হয়ে তাঁর বিপরীতে অন্য উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে এবং শয়তানের বংশবদ ও অনুগত হয়ে গিয়েছে। মহান আল্লাহর আনুগত্য ও তার রহমত সব কিছু হতেই সে বেপরওয়া হয়ে গিয়েছে। মহান আল্লাহ হতে যে এত দূরে সে মহান আল্লাহর মাগফিরাত ও ক্ষমার উপযুক্ত কি করে হতে পারে? বরং এমনতরো লোককে ক্ষমা করা অযৌক্তিক ও ন্যায়বিরুদ্ধ সাব্যস্ত হওয়া উচিত। এ কারণেই এরূপ লোকদের ক্ষমাপ্রাপ্তি সম্বন্ধে নিরাশ করে দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে একজন মুসলিম যতবড় পাপীই হোক তার দোষ যেহেতু কর্মের মাঝেই সীমাবদ্ধ আকিদা বিশ্বাস সম্পর্ক ও আশাবাদ সবই যথারীতি বহাল আছে, তাই আজ হোক কাল হোক তার মাগফিরাত অবশ্যই হবে। মহান আল্লাহর যখন ইচ্ছা হবে তখন ক্ষমা করবেন। –[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ اِنْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اِنٰثًا : মুশরিকরা আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে উপাস্য বানিয়েছে তারা তো এমন সব দেবী, নারীর নামে যাদের নাম উয্যা, মানাত, নাইলা ইত্যাদি।

قَوْلُهُ وَاِنْ يَدْعُوْنَ اِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا : আর সত্যিকার অর্থে তারা তো মহান আল্লাহর অভিশপ্ত উদ্ধত শয়তানেরই উপাসনা করে। সেই তো তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে এরূপ বানিয়েছে। মূর্তিপূজা তো শয়তানেরই আনুগত্য ও তাকে খুশি করার নামান্তর। এর দ্বারা মুশরিকদের পথভ্রষ্টতা ও তাদের ঘোর মূর্খতা তুলে ধরাই উদ্দেশ্য দেখুন প্রথম মহান আল্লাহকে ছেড়ে অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণের চেয়ে বড় পথভ্রষ্টতা আর কি হতে পারে? পরন্তু উপাস্য বানাল তো কাকে বানাল? পাথরের মূর্তিকে, যার মাঝে কোনোরূপ অনুভূতি ও নড়াচড়ার শক্তি পর্যন্ত নেই। নারীর নামে তাদের নামকরণ করল। আর এ সবই করল সেই শয়তানের প্ররোচনায় যে মহান আল্লাহ কর্তৃক অভিশপ্ত, তার রহমত হতে বিতাড়িত। এই পথ ভ্রষ্টতারও কি কোনো দৃষ্টান্ত আছে? চূড়ান্ত পর্যায়ের আহমকের পক্ষেও কি এটা গ্রহণ করা সম্ভব? –[তাফসীরে উসমানী]

অনুবাদ :

١١٨. لَعَنَهُ اللّٰهُ اَبْعَدَهُ عَنْ رَحْمَتِهٖ وَقَالَ اَىْ الشَّيْطٰنُ لَاَتَّخِذَنَّ لَاَجْعَلَنَّ لِىْ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا حَظًّا مَّفْرُوْضًا مَقْطُوْعًا اَدْعُوْهُمْ اِلٰى طَاعَتِىْ .

১১৮. আল্লাহ তাকে অভিসম্পাত করেন অর্থাৎ তাঁর রহমত হতে তাকে বিতাড়িত করে দিয়েছেন। এবং সে অর্থাৎ শয়তান বলেছিল, আমি তোমার বান্দাদের একটা নির্দিষ্ট অংশ হিস্যা গ্রহণ করবই অর্থাৎ তাদেরকে আমার আনুগত্যের প্রতি আহবান জানিয়ে আমার জন্য একটা অংশ নিয়ে নেব। مَفْرُوْضًا অর্থ সুনির্ধারিত।

١١٩. وَلَاُضِلَّنَّهُمْ عَنِ الْحَقِّ بِالْوَسْوَسَةِ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ اَلْقِىْ فِىْ قُلُوْبِهِمْ طُوْلَ الْحَيٰوةِ وَاَنْ لَا بَعْثَ وَلَا حِسَابَ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ يُقَطِّعُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَقَدْ فَعَلَ ذٰلِكَ بِالْبَحَائِرِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ دِيْنَهٗ بِالْكُفْرِ وَاِحْلَالِ مَاحَرَّمَ وَتَحْرِيْمِ مَا اُحِلَّ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا يَتَوَلَّاهُ وَيُطِيْعُهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَىْ غَيْرِهٖ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا بَيِّنًا لِمَصِيْرِهٖ اِلَى النَّارِ الْمُؤَبَّدَةِ عَلَيْهِ .

১১৯. ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণা দিয়ে তাদেরকে সত্য ও ন্যায় হতে পথভ্রষ্ট করবই। তাদের মনে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করবই অর্থাৎ তাদের হৃদয়ে দীর্ঘায়ূ হওয়ার বাসনা সৃষ্টি করব এবং এ ধারণা দেব যে কিয়ামত ও হিসাব নিকাশ বলতে কিছুই নেই। এবং তাদেরকে নিশ্চয় আমি নির্দেশ দেব ফলে তারা পশুর কর্ণচ্ছেদ অর্থাৎ ওটা কর্তন করবেই। لَيُبَتِّكُنَّ অর্থ কর্তন করবেই। বাহীরা পশুগুলোর ক্ষেত্রে তা করত [দ্রষ্টব্য: সূরা মায়িদা, আয়াত ১০৩] এবং তাদেরকে নিশ্চয় নির্দেশ দেব ফলে তারা কুফরি ও হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম করে আল্লাহর সৃষ্টি অর্থাৎ তাঁর দীনকে বিকৃত করবেই আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে যে ব্যক্তি অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে। অর্থাৎ তার সাথে সম্পর্ক করবে ও তার অনুগত্য প্রদর্শন করবে সে এ কারণে চিরস্থায়ী জাহান্নামে গমন করত: প্রত্যক্ষভাবে স্পষ্টত : ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

١٢٠. يَعِدُهُمْ طُوْلَ الْعُمْرِ وَيُمَنِّيْهِمْ نَيْلَ الْاٰمَالِ فِى الدُّنْيَا وَاَنْ لَا بَعْثَ وَلَا جَزَاءَ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ بِذٰلِكَ اِلَّا غُرُوْرًا بَاطِلًا .

১২০. সে তাদেরকে দীর্ঘ জীবনের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদের হৃদয়ে পৃথিবীতে সকল কামনা পূরণ হওয়ার এবং পুনরুত্থান ও হিসাব-নিকাশ হবে না বলে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করে। শয়তান তাদেরকে এতদ্বিষয়ে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনা মাত্র। সকলই মিথ্যা নিষ্ফল।

١٢١. اُولٰٓئِكَ مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا مَعْدِلًا .

১২১. এদেরই আশ্রয়স্থল জাহান্নাম, তা থেকে তারা নিষ্কৃতির উপায় প্রত্যাবর্তন স্থল পাবে না।

١٢٢. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ط وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا اَيْ وَعَدَهُمُ اللّٰهُ ذٰلِكَ وَحَقَّهُ حَقًّا وَمَنْ اَيْ لَا اَحَدَ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا قَوْلًا .

১২২. এবং যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদেরকে দাখিল করব জান্নাতে, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আল্লাহ তা'আলা তার অঙ্গীকার করেছেন এবং তা সুদৃঢ় করেছেন। কে আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী? অর্থাৎ কেউ অধিক সত্যবাদী নয়।
وَعْدَ اللّٰهِ এটা مَصْدَرْ বা সমাধাতুজ কর্ম مَفْعُوْلْ مُطْلَقْ হিসাবে مَنْصُوْب ফাতাহযুক্ত] রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। قِيْلًا অর্থ, কথা।

তাহকীক ও তারকীব

وَسْوَسَةٌ : [ইহা বাবে فَعْلَلَةٌ এর মাসদার] কুমন্ত্রণা, ওয়াসওয়াসা। مُؤَبَّدَةٌ : (اِسْمُ فَاعِلٍ : وَاحِدْمُؤَنَّثْ) স্থায়ী, চিরকাল।
طُوْلٌ - [ইহা نَصَرَ এর মাসদার] দীর্ঘতা, দৈর্ঘ্য। طُوْلُ الْعُمْرِ - দীর্ঘ জীবন।
مَعْدِلٌ : مَعْدِلٌ বহুবচন مَعَادِلٌ - প্রত্যাবর্তনের স্থল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَقَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا শয়তানের ওয়াদা আদমকে সেজদা না করার কারণে শয়তান যখন অভিশপ্ত ও বিতাড়িত হয় তখনই সে বলেছিল আমি তো ধ্বংস হয়েছিই তোমার বান্দা আদম সন্তানদের বড় একটি অংশকেও আমার পথে টেনে আনব। তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে আমার সাথে জাহান্নামে নিয়ে যাব। যেমন সূরা হিজর, বনী ইসরাঈল প্রভৃতিতে বর্ণিত হয়েছে।এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, শয়তান অভিশপ্ত ও সম্পাদিত হওয়া ছাড়াও শয়তান প্রথম দিন হতেই সমগ্র মানব জাতির শত্রু ও অহিতকামী। সে তা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশও করেছে। কাজেই এ ধারণা করারও অবকাশ থাকল না যে শয়তান যদিও সব রকমের দুষ্টমতি ও ভ্রষ্ট কিন্তু তবুও বিশেষ কাউকে কানো হিতকর কথা বলতেও তো পারে। বস্তুত সে আদি শত্রু। বনী আদমকে যা কিছু বলবে তা অনিষ্ট সাধন ও ধ্বংস করার মনোবৃত্তি নিয়েই বলবে। এরূপ ভ্রষ্ট ও অশুভার্থী জনের আনুগত্য করা কত বড় মূর্খতা ও অজ্ঞতার পরিচায়ক।

نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا বা নির্ধারিত অংশ নেওয়ার এক অর্থ এটাও যে, তোমার বান্দারা আমার জন্য অর্থ সম্পদের একটা অংশ ধার্য করবে, যেমন এক শ্রেণির লোকদের দেবী প্রভৃতি গায়রুল্লাহর নামে নজর নিয়ায দিয়ে থাকে। [উসমানী]

وَلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ অর্থাৎ যারা আমার ভাগে আসবে আমি তাদেরকে সত্য পথ হতে বিচ্যুত করব এবং তাদেরকে পার্থিব জীবন ও ইহলৌকিক স্বার্থ চরিতার্থ হওয়ার এবং হিসাব নিকাশ ও পরকালীন বিষয়াদি না ঘটার আশা দেব।

তাদেরকে জীব জন্তুর কান ফুঁড়ে, দেব-দেবীর নামে উৎসর্গ করার এবং মহান আল্লাহর সৃজিত আকার-আকৃতি ও তাঁর স্থিরীকৃত বিধানকে বিকৃত করার তা'লীম দেব।

قَوْلُهُ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ .... فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ : কাফিরদের রেওয়াজ ছিল তারা উট ছাগলের বাচ্চাকে কান ফুঁড়ে বা কানে কোনো চিহ্ন লাগিয়ে দেব দেবীর নামে ছেড়ে দিত। এ ছাড়া আকৃতি পরিবর্তন অর্থাৎ খোঁজা করা, সুঁই দ্বারা দেহে তিলক চিহ্ন বা কোনো চিত্র অঙ্কন করা, শিশুদের মাথায় কারও নামে টিকি রাখা ইত্যাদি নানা রকম রীতি তাদের মাঝে চালু ছিল। এসব পরিহার করে চলা মুসলিমগণের জন্য একান্ত কর্তব্য। দাড়ি কামানোও এ আকৃতি পরিবর্তনের মধ্যে পড়ে। মহান আল্লাহর যে কোনো বিধানে পরিবর্তন সাধন ঘোরতম অন্যায়। তিনি যা হালাল করেছেন। তাকে হারাম বা তিনি যা হারাম করেছেন তাকে হালাল করলে ইসলাম থেকে খারিজ হতে হয়। যারা এসব কাজে লিপ্ত তারা যেন নিশ্চয় জানে যে তারা শয়তানের সেই নির্ধারিত অংশের অন্তর্ভুক্ত যার কথা উপরে বলা হয়েছে। −[তাফসীরে উসামানী]

১২১. قَوْلُهُ اُولٰٓئِكَ مَأْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا : অর্থাৎ শয়তানের ইতর স্বভাব ও দুষ্ট মনোবৃত্তি এবং তার চিরায়ত শত্রুতা সম্পর্কে যখন অবগত হলে তখন যে কেউ তার প্রকৃত মা'বুদ হতে বিমুখ হয়ে শয়তানের আনুগত্য করবে সে যে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাতে আর সন্দেহ কি? তার যাবতীয় ওয়াদা ও আশা ছলনা মাত্র। কাজেই তার অনুসারীদের পরিমণাম তো এটাই যে তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। তা থেকে নিষ্কৃতির কোনো উপায় থাকবে না।−[তাফসীরে উসমানী]

১২২. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ অর্থাৎ যারা শয়তানের অনিষ্ট হতে নিরাপদ আছে মহান আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলে এবং সৎকাজে লিপ্ত থাকে তারা চিরদিন পরম সুখের বেহেশতে থাকবে। এ হলো মহান আল্লাহর ওয়াদা। তাঁর চেয়ে সত্য কথা আর কারও হতে পারে না। এমন সত্য ওয়াদা ছেড়ে শয়তানের মিথ্যা আশ্বাসে ভরসা করা কত বড় বিভ্রান্তি! এর দ্বারা যে কি পরিমাণ ক্ষতির বোঝা মাথায় তোলা হয়। −[তাফসীরে উসমানী]

অনুবাদ :

١٢٣. نَزَلَ لَمَّا افْتَخَرَ الْمُسْلِمُوْنَ وَاَهْلُ الْكِتَابِ لَيْسَ الْاَمْرُ مَنُوْطًا بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَا اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ ۚ بَلْ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ مَنْ يَعْمَلْ سُوْءً يُجْزَ بِهٖ اِمَّا فِى الْاٰخِرَةِ اَوْ فِى الدُّنْيَا بِالْبَلَاءِ وَالْمِحَنِ كَمَا وَرَدَ فِى الْحَدِيْثِ وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَىْ غَيْرِهٖ وَلِيًّا يَحْفَظُهٗ وَلَا نَصِيْرًا يَمْنَعُهٗ مِنْهُ ـ

১২৩. কিতাবীগণ ও মুসলিমগণ স্ব-স্ব বিষয়ে অহংকার প্রদর্শন করে এতদসম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন তোমাদের খেয়াল-খুশি ও কিতাবীদের খেয়াল-খুশির উপর কোনো বিষয় নির্ভরশীল নয়। বরং সৎ আমল হিসাবেই ফয়সালা হয়ে থাকে। কেউ মন্দ কাজ করলে সে পরকালে বা হাদীসে আছে যে, দুনিয়াতেই আপদ-বিপদ ও কষ্টে নিপতিত হয়ে তার প্রতিফল পাবে এবং আল্লাহ ব্যতীত সে তার জন্য কোনো অভিভাবক যে তাকে হেফাজত করবে ও সাহায্যকারী পাবে না। যে তাকে তার নিকট থেকে রক্ষা করবে।

١٢٤. وَمَنْ يَعْمَلْ شَيْئًا مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُوْلِ وَالْفَاعِلِ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا قَدْرَ نُقْرَةِ النَّوَاةِ ـ

১২৪. পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে কেউ সৎকাজসমূহের কিছু করলে এবং সে যদি মু'মিন হয় তবে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি অণু পরিমাণও জুলুম করা হবে না। نَقِيْرًا -অর্থ অর্জুর বিচির বাকল পরিমাণ ও। يَدْخُلُوْنَ এটা مَعْرُوْفٌ বা কর্তৃবাচ্যরূপে ও مَجْهُوْل বা কর্মবাচ্যরূপে পাঠ করা যায়।

তাহকীক ও তারকীব

مَنُوْطًا : (اِسْمُ مَفْعُوْل : وَاحِد مُذَكَّر) অর্পিত, নিয়োজিত, নির্ভরশীল।
مِحَنٌ : مِحْنَةٌ বহুবচন مِحَنٌ মেহনত, কষ্ট, ক্লেশ।
نَقْرَةٌ : نَقْرَةٌ বহুবচন نُقَرٌ، نِقَارٌ - গর্ত, খেজুরের বিচির গর্ত।
نَوَاةٌ : نَوَاةٌ বহুবচন نَوًى - বিচি, আঁটি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى : কিতাবধারী তথা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ধারণা ছিল, তারা মহান আল্লাহর খাস বান্দা যেসব পাপের কারণে অন্যরা ধৃত হবে, তাদেরকে সেসব কারণে ধর-পাকড় করা হবে না। আমাদের নবী বিশেষ সুপারিশে আমাদেরকে বাঁচিয়ে নেবেন। একদল অজ্ঞ মুসলিমও নিজেদের ব্যাপারে এরূপ ধারণা রাখে। আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে যে মুক্তি ও পুরস্কার কারও আশা ও ধারণার উপর নির্ভর করে না। মন্দ কাজ যেই করবে তাকে শাস্তি পেতেই হবে। মহান আল্লাহ যাকে পাকড়াও করবেন তার আজাবের সময় কারও সাহায্য কাজে লাগবে না। আল্লাহ পাক মুক্তি দিলেই মুক্তি লাভ হতে পারে। যে কেউ ভালো কাজ করবে শর্ত হলো ঈমান থাকতে হবে সে জান্নাতাবাসী হবে এবং নিজের সৎকাজে পূর্ণ প্রতিদান লাভ করবে যার কথা শাস্তি ও পুরস্কারের সম্পর্ক কর্মের সাথে, কারও আশা আকাঙ্ক্ষায় কিছু হয় না। কাজেই মিথ্যা আশায় পদাঘাত হান, সৎকাজে হিম্মত কর্। -[তাফসীরে উসমানী]

শানে নুযূল : হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন, একবার কিছু সংখ্যক মুসলমান ও আহলে কিতাবের মধ্যে গর্বসূচক কথাবার্তা শুরু হলে আহলে কিতাবরা বলল, আমরা তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সম্ভ্রান্ত। কারণ আমাদের নবী ও আমাদের গ্রন্থ তোমাদের নবী ও তোমাদের গ্রন্থের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। সুমলমানরা বলল, আমরা তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কেননা আমাদের নবী সর্বশেষ নবী এবং আমাদের গ্রন্থ সর্বশেষ গ্রন্থ। এ গ্রন্থ পূর্ববর্তী সব গ্রন্থকে রহিত করে দিয়েছে। এ কথোপকথনের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

এতে বলা হয়েছে যে এ গর্ব ও অহংকার কারও জন্য শোভা পায় না। শুধু কল্পনা, বাসনা ও দাবি দ্বারা কেউ কারো চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয় না, বরং প্রত্যেকের কাজ-কর্মই শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি। কারও নবী ও গ্রন্থ যতই শ্রেষ্ঠ হোক না কেন, যদি সে ভ্রান্ত কাজ করে, তবে সেই কাজের শাস্তি পাবে। এ শাস্তির কবল থেকে রেহাই দিতে পারে এরূপ কাউকে সে খুঁজে পাবে না। [মাআরিফুল কুরআন]

قَوْلُهُ مَنْ يَعْمَلْ سُوْءً يُجْزَ بِهٖ : এ আয়াত অবতীর্ণ হলে সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। ইমাম মুসলিম তিরমিযী, নাসায়ী ও ইমাম আহমদ (র.) হযরত আবূ হুরায়রা হতে রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, مَنْ يَعْمَلْ سُوْءً يُجْزَ بِهٖ অর্থাৎ যে কেউ কোনো অসৎকাজ করবে সে জন্য তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। আয়াতটি যখন অবতীর্ণ হলো, তখন আমরা খুব দুঃখিত ও চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়লাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আরজ করলাম যে, এ আয়াতটি তো কোনো কিছুই ছাড়েনি। সামান্য মন্দ কাজ হলেও তার সাজা দেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, চিন্তা করো না, সাধ্যমতো কাজ করে যাও। কেননা [উল্লিখিত শাস্তি যে জাহান্নমই হবে, তা জরুরি নয়] তোমরা দুনিয়াতে যে কোনো কষ্ট অথবা বিপদাপদে পড়, তাতে তোমাদের গোনাহের কাফ্ফারা এবং মন্দ কাজের শাস্তি হয়ে থাকে। এমন কি যদি কারও পায়ে কাঁটা ফুটে তাও গোনাহের কাফফারা বৈ নয়।

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, মুসলমান দুনিয়াতে যে কোনো দুঃখ কষ্ট, অসুখ বিসুখ অথবা ভাবনা চিন্তার সম্মুখীন হয়, তা তার গোনাহের কাফ্ফারা হয়ে যায়।

তিরমিযী ও তাফসীরে ইবনে জারীর হযরত আবূ বকর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাদেরকে مَنْ يَعْمَلْ سُوْءً يُجْزَ بِهٖ আয়াতটি শুনালেন, তখন তাদের যেন কোমর ভেঙ্গে গেল। এ প্রতিক্রিয়া দেখে তিনি বললেন, ব্যাপার কি? হযরত সিদ্দীক (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ" আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে কোনো মন্দ কাজ করেনি? প্রত্যেক কাজেরই যদি প্রতিফল ভোগ করতে হয়, তবে কে রক্ষা পাবে? রাসূল্লাহ ﷺ বললেন, হে আবূ বকর! আপনার মোটেই চিন্তা হবে না। কেননা দুনিয়ার দুঃখ কষ্টের মাধ্যমে আপনাদের গোনাহের কাফফারা হয়ে যাবে।

এক রেওয়াতে আছে, তিনি বললেন, আপনি কি অসুস্থ হন না? আপনি কি কোনো দুঃখ ও বিপদে পতিত হন না! হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) আরজ করলেন, নিশ্চয় এসব বিষয়ের সম্মুখীন হই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ব্যাস, এটাই আপনার প্রতিফল।

আবূ দাউদ প্রমুখের বর্ণিত হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) -এর হাদীসে বলা হয়েছে যে, বান্দা জ্বরে কষ্ট পেলে কিংবা পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হলে তা তার গোনাহের কাফ্ফারা হয়ে যায়। এমনকি, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো বস্তু এক পকেটে তালাশ করে অন্য পকেটে পায়, তবে এতটুকু কষ্টও তার গোনাহের কাফ্ফারা হয়ে যায়।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছে যে, শুধু দাবি ও বাসনায় লিপ্ত হয়োনা; বরং কাজের চিন্তা কর। কেননা তোমরা অমুক নবী কিংবা গ্রন্থের অনুসারী শুধু এ বিষয় দ্বারাই তোমারা সাফল্য লাভ করতে পারবে না। বরং এ গ্রন্থের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান এবং তদনুযায়ী সৎকার্য সম্পাদনের মধ্যেই প্রকৃত সাফল্য নিহিত রয়েছে। -[মাআরিফুল কুরআন]

অনুবাদ :

১২৫. وَمَنْ اَىْ لَا اَحَدَ اَحْسَنَ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ اَىْ اِنْقَادَ وَاَخْلَصَ عَمَلَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ مُوَحِّدٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ الْمُوَافِقَةَ لِمِلَّةِ الْاِسْلَامِ حَنِيْفًا حَالٌ اَىْ مَائِلًا عَنِ الْاَدْيَانِ كُلِّهَا اِلَى الدِّيْنِ الْقَيِّمِ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا صَفِيًّا خَالِصَ الْمَحَبَّةِ لَهُ.

১২৫. তার অপেক্ষা আর কার দীন উত্তম যে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে অর্থাৎ আনুগত্য প্রদর্শন করে ও তার প্রতি ইখলাস প্রদর্শন করে ও একনিষ্ঠ হয়ে কাজ করে আর সে হয় সৎকর্মপরায়ণ অর্থাৎ একত্ববাদী এবং ইসলামি ধর্মাদর্শের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ বিধায় একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করে? حَنِيْفًا এটা حَالٌ বা অবস্থা ও ভাববাচক পদ। অর্থাৎ সকল ধর্মাদর্শ হতে বিমুখ হয়ে সরল সঠিক এ ধর্মের প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে তা অনুসরণ করে? না, আর কারও ধর্ম তদপেক্ষা উত্তম নেই। এবং আল্লাহ ইবরাহীমকে বন্ধুরূপে অন্তরঙ্গ ও তৎপ্রতি নির্ভেজাল ভালোবাসা পোষণকারী রূপে [গ্রহণ করেছেন।]

১২৬. وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط مِلْكًا وَخَلْقًا وَعَبِيْدًا وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ مُحِيْطًا عِلْمًا وَقُدْرَةً اَىْ لَمْ يَزَلْ مُتَّصِفًا بِذٰلِكَ.

১২৬. [আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে] মালিকানা, সৃষ্টি ও দাস হিসাবে সব কিছু আল্লাহর এবং সব কিছুকে আল্লাহ তার জ্ঞানে ও কুদরতে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। অর্থাৎ সকল সময়েই তিনি এ গুণে গুণান্বিত।

তাহকীক ও তারকীব

اِنْقَادَ : (مَاضِىْ مَعْرُوْف : وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ) সে অনুগত হলো।
قَيِّمٌ : দামি, মূল্যবান, সোজা। صَفِيًّا : صَفِىٌّ - নির্মল, খাঁটি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ : ইতিপূর্বে জানা হয়েছে, মহান আল্লাহর নিকট কর্মই গ্রহণযোগ্য মিথ্যা আশায় কোনো ফল হয় না। কিতাবী ও অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ের জন্য এটাই অমোঘ বিধান। এর দ্বারা ইসলামপন্থি তথা সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা ও প্রশংসার প্রতিও প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত হয়ে গেছে। সেই সাথে আহলে কিতাবের অসৎবৃত্তি ও নিন্দার প্রতি ও এবার খোলাখুলি বলা হচ্ছে ধার্মিকতার ক্ষেত্রে যার মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধের সম্মুখে মস্তক স্থাপন করে সৎকাজে কায়েমে নিমগ্ন থাকে এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দীনকে নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করে তাদের মোকাবিলা কে করতে পারে? -[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا : হযরত ইবরাহীম (আ.) একান্তভাবে মহান আল্লাহরই জন্য আত্মনিবেদিত ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে একান্ত বন্ধুরূপে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, উক্ত গুণত্রয় পরিপূর্ণরূপে কেবল মহান সাহাবীগণের মধ্যেই বিদ্যমান ছিল আহলে কিতাবের মধ্যে নয়। কাজেই আহলে কিতাবের পূর্বোক্ত আশা আকাঙ্খা সম্পূর্ণ অবান্তর ও বাতিল প্রমাণিত হয়। -[তাফসীরে উসমানী]

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الخ অর্থাৎ আসমান জমিনে যা কিছু আছে সবাই মাহান আল্লাহর বান্দা তাঁর মাখলুক ও অধিকারভুক্ত এবং তারই আয়ত্তাধীন। তিনি নিজ রহমত ও হিকমত অনুযায়ী যার সঙ্গে যেমন ইচ্ছা ব্যবহার করেন। কারও প্রতি তাঁর মুখাপেক্ষিতা নেই। বন্ধু গ্রহণ দ্বারা কেউ যেন ধোঁকায় না পড়ে এবং জগতের যাবতীয় কার্য ভালো হোক, কি মন্দ তার শাস্তি ও পুরস্কার সম্পর্কে যেন সন্দিহান না হয়। -[তাফসীরে উসমানী]

১২৭. وَيَسْتَفْتُونَكَ يَطْلُبُونَ مِنْكَ الْفَتْوٰى فِىْ شَاْنِ النِّسَاۤءِ وَمِيْرَاثِهِنَّ قُلْ لَّهُمْ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ الْقُرْاٰنِ مِنْ اٰيَةِ الْمِيْرَاثِ وَيُفْتِيْكُمْ اَيْضًا فِىْ يَتٰمَى النِّسَاۤءِ الّٰتِىْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ فُرِضَ لَهُنَّ مِنَ الْمِيْرَاثِ وَ تَرْغَبُوْنَ اَيُّهَا الْاَوْلِيَاۤءُ عَنْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ لِدَمَامَتِهِنَّ وَتَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَتَزَوَّجْنَ طَمَعًا فِىْ مِيْرَاثِهِنَّ اَىْ يُفْتِيْكُمْ اَنْ لَا تَفْعَلُوْا ذٰلِكَ وَفِى الْمُسْتَضْعَفِيْنَ الصِّغَارِ مِنَ الْوِلْدَانِ اَنْ تُعْطُوْهُمْ حُقُوْقَهُمْ وَيَاْمُرُكُمْ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ بِالْعَدْلِ فِى الْمِيْرَاثِ وَالْمَهْرِ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا فَيُجَازِيْكُمْ عَلَيْهِ ـ

অনুবাদ :

১২৭. লোক তোমার নিকট নারীদের ও তাদের উত্তরাধিকারত্বের বিষয়ে জানতে চায়, ফতোয়া জিজ্ঞাসা করে। তাদেরকে বল আল্লাহ এবং আল কিতাবে অর্থাৎ আল কুরআনে তোমাদের নিকট মিরাশ সম্পর্কে যা আবৃত্তি করা হয় তা তোমাদেরকে পরিষ্কার জানাচ্ছেন এবং ঐ পিতৃহীনা নারী মিরাশ তাদের যে প্রাপ্য নির্ধারিত রয়েছে তা তোমারা প্রদান কর না অথচ হে অভিভাবকগণ ! তোমরা স্ত্রীহীনা হওয়ার কারণে নিজেরাও তাদেরকে বিবাহ করতে চাও না এবং তাদের মিরাশ হস্তগত করার লালসায় অন্য কারও নিকট তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে বাধা দিয়ে রাখ। এ সমস্ত নারীদের সম্পর্কে আল্লাহ তোমাদেকে পরিষ্কার জানাচ্ছেন যে, এ ধরনের কাজ তোমরা করো না।

এবং অসহায় ছোট শিশুদের সম্পর্কেও তিনি জানাচ্ছেন যে, তাদের অধিকার তোমরা আদায় করে দেবে এবং তিনি তোমাদেরকে আরো নির্দেশ দিচ্ছেন যে, এতিমদের বিষয়ে অর্থাৎ তাদের মিরাশ ও মহর ইত্যাদিতে তোমরা ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে। এবং যে কোনো সৎকাজ তোমরা কর আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত। অনন্তর তিনি তোমাদেরকে তার প্রতিদান প্রদান করবেন।

তাহকীক ও তারকীব

دَمَامَةٌ : دمَامَةٌ কুৎসিত আকৃতি, বিভৎসতা।

تَعْضُلُوْنَ : (مُضَارِعْ مَعْرُوْفْ : جَمْعُ مُذَكَّرْ) তোমরা বারণ কর বাবে نَصَرَ থেকে নিষেধ করা, বারণ করা।

طُعْمًا : طُعْمٌ - লোভ, আশা।

صِغَارٌ : صَغِيْرٌ বহুবচন صِغَارٌ ছোট, নাবালেগ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এতিম মেয়েদের বিধান : এ সূরার শুরুতে এতিমের হক আদায়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছিল কোনো এতিম মেয়ের ওলী [চাচাতো ভাই বা এরূপ কেউ] যদি মনে করে আমি তার হক পুরোপুরি আদায় করতে পারব না. তবে সে নিজে তাকে বিবাহ না করে? অন্যের সাথে যেন বিবাহ দিয়ে দেয় এবং নিজে তার অভিভাবক হিসেবে থেকে যায়।

এ পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিমগণ এরূপ মেয়েদের বিবাহ করা ছেড়েই দিয়েছিল। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এরূপ মেয়েদের পক্ষে এটাই উত্তম যে, অভিভাবক নিজেই তাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে নেবে। সে যেমন তার প্রতি লক্ষ্য রাখবে অন্যরা তা রাখবে না। তাই এক পর্যায়ে মুসলিমগণ প্রিয়নবী ﷺ -এর নিকট তাদেরকে বিবাহ করার অনুমতি চাইলেন। তখন এ আয়াত নাজিল হয় এবং অনুমতি দেওয়া হয়। বলা হয়েছে যে, পূর্বে যে নিষেধ করা হয়েছিল সে তো কেবল সেই অবস্থায় যখন তোমরা তাদের হক পুরোপুরি আদায় করতে পারবে না। এতিমের হক আদায় অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু এতিমের সাথে সদাচরণ ও তার মঙ্গলের জন্য যদি এরূপ বিবাহ করা হয় তবে তার পূর্ণ অনুমতি আছে।

প্রাক ইসলামি আরবে নারী, শিশু ও এতিম : প্রাক ইসলামি আরবে নারী, শিশু ও এতিমদের বহু অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হতো। তাদেরকে মিরাশ ও দেওয়া হতো না। বলা হতো যারা শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে পারবে মিরাশ তাদেরই প্রাপ্য। এতিম মেয়েদেরকে তাদের ওলীগণই বিবাহ করত এবং মহরানা ও ভরণ-পোষণে ঠকাত। তাদের ধন-সম্পদ ও অন্যায়ভাবে ব্যবহার করত। সূরার শুরুতে এসব বিষয়ে সাবধান করা হয়েছে। এস্থলে কয়েক রুকূ' আগে হতেই যে বিষয়টি চলে আসছে তার সারমর্ম এই যে, কেবল মহান আল্লাহর আদেশই অবশ্য পালনীয় বিষয়, তার বিপরীতে কারও যুক্তি, মনগড়া আইন, ব্যক্তি বিশেষের আদেশ, মিথ্যা আশ্বাস, আন্দাজ অনুমান ইত্যাদি কোনো কিছুই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। মহান আল্লাহর হুকুমের সামনে অন্য কারও কথা শুনা এবং মহান আল্লাহর আদেশ ছেড়ে তা মান্য করা প্রকাশ্য কুফর ও পথভ্রষ্টতা। এ বিষয়টিকে নানা বর্ণনাশৈলী ও কঠোর গুরুত্বারোপের সাথে বর্ণনা করা হয়েছে। এবার পূর্ববর্তী আয়াতগুলোর বরাতে নারী ও এতিম মেয়েদের সম্বন্ধে আরও কিছু মাসআলা বর্ণনা করা হয় যাতে উল্লিখিত সতর্কীকরণ ও গুরুত্বারোপের পর নারীদের অধিকার আদায়ে কোনো সমস্যা বাকি না থাকে।

বর্ণিত আছে, নারীদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মিরাশের আদেশ ঘোষণা করলেন, তখন কতিপয় আরব নেতা তার সঙ্গে সাক্ষাত করে বিস্ময় প্রকাশ করল যে, আমরা শুনেছি, আপনি বোন ও কন্যাকে মিরাশ দেওয়ার হুকুম দিয়েছেন অথচ মিরাশ তো কেবল তাদেরই প্রাপ্য যারা শত্রুর সাথে লড়তে পারে ও গনিমত অর্জনে সক্ষম হয়। তিনি বললেন, মহান আল্লাহর আদেশ এটাই যে তাদের মিরাশ দেওয়া হবে।

قَوْلُهُ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا : অর্থাৎ তোমাদের খুটিনাটি যাবতীয় সৎকাজের সম্যক খবর মহান আল্লাহর আছে। এতিম ও নারীদের ব্যাপারে যা কিছু ভালো কাজ করবে তার প্রতিদান অবশ্যই পাবে। -[উসমানী]

١٢٨. وَاِنِ امْرَأَةٌ مَرْفُوْعٌ بِفِعْلٍ يُفَسِّرُهُ خَافَتْ تَوَقَّعَتْ مِنْ بَعْلِهَا زَوْجِهَا نُشُوْزًا تَرَفُّعًا عَلَيْهَا بِتَرْكِ مَضَاجِعَتِهَا وَالتَّقْصِيْرِ فِىْ نَفَقَتِهَا لِبُغْضِهَا وَطُمُوْحِ عَيْنِهِ اِلٰى اَجْمَلَ مِنْهَا اَوْ اِعْرَاضًا عَنْهَا بِوَجْهِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يَّصَّالِحَا فِيْهِ اِدْغَامُ التَّاءِ فِى الْاَصْلِ فِى الصَّادِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ يُصْلِحَا مِنْ اَصْلَحَ بَيْنَهُمَا صُلْحًا فِى الْقَسْمِ وَ النَّفَقَةِ بِاَنْ تَتْرُكَ لَهُ شَيْئًا طَلَبًا لِبَقَاءِ الصُّحْبَةِ فَاِنْ رَضِيَتْ بِذٰلِكَ وَاِلَّا فَعَلَى الزَّوْجِ اَنْ يُوَفِّيَهَا حَقَّهَا اَوْ يُفَارِقَهَا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ مِنَ الْفُرْقَةِ وَالنُّشُوْزِ وَ الْاِعْرَاضِ قَالَ تَعَالٰى فِىْ بَيَانِ مَاجُبِلَ عَلَيْهِ الْاِنْسَانُ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ شِدَّةَ الْبُخْلِ اَىْ جُبِلَتْ عَلَيْهِ فَكَاَنَّهُ حَاضِرَتُهُ لَا تَغِيْبُ عَنْهُ الْمَعْنٰى اَنَّ الْمَرْاَةَ لَا تَكَادُ تُسَمِّىْ بِنَصِيْبِهَا مِنْ زَوْجِهَا وَالرَّجُلَ لَا يَكَادُ يَسْمَحُ عَلَيْهَا بِنَفْسِهِ اِذَا اَحَبَّ غَيْرَهَا وَاِنْ تُحْسِنُوْا عِشْرَهَ النِّسَاءِ وَتَتَّقُوْا الْجَوْرَ عَلَيْهِنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا فَيُجَازِيْكُمْ بِهِ.

অনুবাদ :

১২৮. কোনো নারী যদি তার পুরুষ অর্থাৎ স্বামীর পক্ষ হতে দুর্ব্যবহারের অর্থাৎ তাকে ঘৃণা কারার কারণে বা অধিকতর সুন্দরী অন্য কোনো নারীর প্রতি দৃষ্টি পড়ার কারণে স্বামী যদি শয্যা পরিহার ও তার ভরণ পোষণে সংকোচন করে তার প্রতি অন্যায় ব্যবহারের ও উপেক্ষার তার নিকট হতে বিমুখ হওয়ার ভয় করে আশঙ্কা করে তবে তারা উভয়ে আপস নিষ্পত্তি করতে চাইলে যেমন, স্ত্রী এ স্বামীর সাথে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখার উদ্দেশ্যে দিন বণ্টন ও ভরণ পোষণ ব্যয়ের বেলায় তার কিছু দাবি ছেড়ে দিয়ে আপস মীমাংসা করলে এতে তাদের কোনো দোষ নেই। তবে স্ত্রী যদি এতে সম্মত না হয় তবে স্বামী তাকে রাখলে পূর্ণ অধিকার প্রদান করে রাখবে নতুবা সম্পূর্ণরূপে তাকে পরিত্যাগ করবে। এবং বিচ্ছিন্ন করা, দুর্ব্যবহার করা ও উপেক্ষা করা আপস নিষ্পত্তিই শ্রেয়।

মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাবের উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : মানুষের মন স্বভাবত লালসাময়। ফলে সে অতিশয় কৃপণ। এ অস্থায়ই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলে সেটা যেন এতটুকু সময়ের জন্যও তার কাছ থেকে অনুপস্থিত হয় না; বরং সব সময়ই তার নিকট উপস্থিত থাকে। অর্থাৎ মানুষের এ স্বভাবের দরুন স্ত্রী স্বামীর নিকট তার প্রাপ্তব্য অংশ ছেড়ে দিতে চাইবে না বা স্বামী যদি অন্য কোনো নারীকে ভালোবেসে থাকে তবে সেও তার স্ত্রীর সাথে কোনোরূপ সহযোগিতামূলক ব্যবহার করতে চাইবে না।

যদি তোমরা স্ত্রীর সাথে সংসার যাত্রা নির্বাহে সৎকর্মপরায়ণ হও এবং তাদের পীড়ন করা হতে সাবধান হও তবে তোমরা যা কর আল্লাহ তার সবিশেষ খবর রাখেন। অন্তর তিনি তোমাদেরকে তার প্রতিদান প্রদান করবেন।

وَاِنِ امْرَأَةٌ এটা এখানে এমন একটি উহ্য فِعْل বা ক্রিয়ার মাধ্যমে مَرْفُوْعٌ [পেশযুক্ত] রূপে ব্যবহৃত হয়েছে পরবর্তী ক্রিয়া خَافَتْ যার বিবরণ ব্যক্ত করছে।

يَصَّالِحَا এতে মূলত : ص ও ت -এর اِدْغَام বা সন্ধি হয়েছে। অপর এক কেরাতে اَصْلَحَ ক্রিয়া রূপ হতে উদগত শব্দ يُصْلِحَا রূপে পঠিত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

طُمُوحٌ : طُمُوحٌ প্রত্যাশা, কামনা, বাসনা, উচ্চাভিলাষ।

جُبِلَ : (مَاضِى مَجْهُوْل : وَاحِدْ مُذَكَّرْ) তাকে তৈরি করা হয়েছে বাবে ضَرَبَ ও نَصَرَ থেকে তৈরি করা, বানানো, আকৃতি প্রদান করা।

نَشْدَةً : نَشْدَةً [ইহা نَصَرَ এর মাসদার] সন্ধান, খোজ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে কতিপয় পথনির্দেশ : وَاسِعًا حَكِيْمًا ...... وَاِنِ امْرَأَةٌ অত্র তিনটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষের দাম্পত্য জীবনের এমন একটি জটিল দিক সম্পর্কে পথনির্দেশ করেছেন, সুদীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন সময়ে প্রত্যেকটি দম্পতিকেই যার সম্মুখীন হতে হয়। তা হলো স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক মনোমালিন্য ও মন কষাকষি। আর এটি এমন একটি জটিল সমস্যা, যার সুষ্ঠু সমাধান যথাসময়ে না হলে শুধু স্বামী-স্ত্রীর জীবনই দুর্বিসহ হয় না, বরং অনেক ক্ষেত্রে এহেন পারিবারিক মনোমালিন্যই গোত্র ও বংশগত কলহ-বিবাদ তথা হানাহানি পর্যন্ত পৌছে দেয়। পবিত্র কুরআন নর ও নারীর যাবতীয় অনুভূতি ও প্রেরণার প্রতি লক্ষ্য রেখে উভয় শ্রেণিকে এমন এক সার্থক জীবন ব্যবস্থা বাতলে দেওয়ার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, যার ফলে মানুষের পারিবারিক জীবন সুখময় হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এর অনুসরণে পারস্পরিক তিক্ততা ও মর্মপীড়া ভালোবাসা ও প্রশান্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। আর যদি অনিবার্য কারণে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হয়, তবে তা করা হবে সম্মানজনক ও সৌজন্যমূলক পন্থায় যে, তার পেছনে শত্রুতা, বিদ্বেষ বা উৎপীড়নের মনোভাব না থাকে।

১২৮. তম আয়াতটি এমনি সমস্যা সম্পর্কিত, যাতে অনিচ্ছাকৃতভাবে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে ফাটল সৃষ্টি হয়। নিজ নিজ হিসাবে উভয়ে নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও পারস্পরিক মনের মিল না হওয়ার কারণে উভয়ে নিজ নিজ ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা করে। যেমন, একজন সুদর্শন সুঠামদেহী স্বামীর স্ত্রী স্বাস্থ্যহীনা, অধিক বয়স্কা অথবা সুশ্রী না হওয়ার কারণে তার প্রতি স্বামীর মন আকৃষ্ট হচ্ছে না। আর এর প্রতিকার করাও স্ত্রীর সাধ্যাতীত। এমতাবস্থায় স্ত্রীকেও দোষারোপ করা যায় না, অন্যদিকে স্বামীকেও নিরপরাধ সাব্যস্ত করা যায়।

অত্র আয়াতের শানে নুযূল প্রসঙ্গে কতিপয় ঘটনা তাফসীরে মাযহারী প্রভৃতি কিতাবে বর্ণিত রয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে পবিত্র কুরআনের সাধারণ নীতি فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ অর্থাৎ উক্ত স্ত্রীকে বহাল রাখতে চাইলে তার যাবতীয় ন্যায্য অধিকার ও চাহিদা পূরণ করে রাখতে হবে। আর তা যদি সম্ভব না হয়, তবে কল্যাণকর ও সৌজন্যমূলক পন্থায় তাকে বিদায় করবে। এমতাবস্থায় স্ত্রীও যদি বিবাহ বিচ্ছেদে সম্মত হয়, তবে ভদ্রতা ও শালীনতার সাথেই বিচ্ছেদ সম্পন্ন হবে, পক্ষান্তরে স্ত্রী যদি তার সন্তানের খাতিরে অথবা নিজের অন্য কোনো আশ্রয় না থাকার কারণে, বিবাহ বিচ্ছেদ অসম্মত হয়, তবে তার জন্য সঠিক পন্থা এই যে, নিজের প্রাপ্য মোহর বা খোর-পোষের ন্যায্য দাবি আংশিক বা পুরোপুরি প্রত্যাহার করে স্বামীকে বিবাহ বন্ধন অটুট রাখার জন্য সম্মত করাবে। দায়দায়িত্ব ও ব্যয়ভার লাঘব হওয়ার কারণে স্বামীও হয়তো এ সমস্ত অধিকার থেকে মুক্ত হতে পেরে এ প্রস্তাব অনুমোদন করবে। এভাবে সমঝোতা হয়ে যেতে পারে।

–[মা'আরিফুল কুরআন]

قَوْلُهُ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ : অর্থাৎ প্রত্যেক অন্তরেই লোভ বিদ্যমান রয়েছে। কুরআনে কারীমের অত্র আয়াতে এ ধরনের সমঝোতার সম্ভাব্যতার প্রতি পথনির্দেশ করতে গিয়ে বলা হয়েছে কাজেই স্ত্রী হয়তো মনে করবে যে, আমাকে বিদায় করে দিলে সন্তানাদির জীবন বরবাদ হবে, অথবা অন্যত্র আমার জীবন আরো দুর্বিসহ হতে পারে তার চেয়ে বরং এখানে কিছু ত্যাগ স্বীকার করে পড়ে থাকাই লাভজনক। স্বামী হয়তো মনে করবে যে, দায়দায়িত্ব হতে যখন অনেকটা রেহাই পাওয়া গেল, তখন তাকে বিবাহ, বন্ধনে রাখতে ক্ষতি কি? এতএব, এভাবে অনায়াসে সমঝোতা হতে পারে, সাথে সাথে এরশাদ করা হয়েছে .... وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا যদি কোনো নারী স্বামীর পক্ষ থেকে কলহ-বিবাদ বা বিমুখ হওয়ার আশঙ্কা বোধ করে, তবে উভয়ের কারোই কোনো গোনাহ হবে না, যদি তারা নিজেদের মধ্যে শর্ত সাপেক্ষে পারস্পরিক সমঝোতায় উপনীত হয়।

এখানে গোনাহ না হওয়ার কথা বলার কারণ এই যে, ব্যাপারটি বাহ্যিক দৃষ্টিতে ঘুষের আদান প্রদানের মতো মনে হয়। কারণ স্বামীকে মহরানা ইত্যাদি ন্যায্য দাবি হতে অব্যাহতির প্রলোভন দিয়ে দাম্পত্য বন্ধন অটুট রাখা হয়েছে। কিন্তু পবিত্র কুরআনে এ ভাষ্যের দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, বস্তুত এটা ঘুষের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং উভয় পক্ষ কিছু কিছু স্বার্থ ত্যাগ করে মধ্যপন্থা অবলম্বন ও সমঝোতার ব্যাপার মাত্র। অতএব এটা সম্পূর্ণ জায়েজ। –[মাআরিফুল কুরআন]

দাম্পত্য কলহের মধ্যে অযথা অন্যের হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছনীয় : তাফসীরে মাযহারীতে বর্ণিত আছে যে, أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا অর্থাৎ স্বামী স্ত্রী নিজেদের মধ্যে সমঝোতা করে নেবে। এখানে بَيْنَهُمَا শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া কলহ বা সন্ধি-সমঝোতার মধ্যে অহেতুক কোনো তৃতীয় ব্যক্তি নাক গলাবে না; বরং তাদের নিজেদেরকে সমঝোতায় উপনীত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। কারণ তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতির ফলে স্বামী-স্ত্রীর দোষ-ত্রুটি অন্য লোকের গোচরীভূত হয়, যা তাদের উভয়ের জন্যই লজ্জাকর ও স্বার্থের পরিপন্থি। তদুপরি তৃতীয় পক্ষের কারণে সন্ধি-সমঝোতা দুষ্কর হয়ে পড়াও বিচিত্র নয়। অত্র আয়াতের শেষ অংশে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন– وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا অর্থাৎ আর যদি তোমরা কল্যাণ সাধন কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কার্য-কলাপ সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন। এখানে বুঝানো হয়েছে যে, অনিবার্য কারণ বশত স্বামীর অন্তরে যদি স্ত্রীর প্রতি কোনো আকর্ষণ না থাকে এবং তার ন্যায্য অধিকার পূরণ করা অসম্ভব মনে করে তাকে বিদায় করতে চায়, তবে আইনের দৃষ্টিতে স্বামীকে সে অধিকার দেওয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় স্ত্রীর পক্ষ থেকে কিছুটা স্বার্থ পরিত্যাগ করে সমঝোতা করাও জায়েজ। কিন্তু এতদসত্ত্বেও স্বামী যদি সংযম ও খোদাভীতির পরিচয় দেয়, স্ত্রীর সাথে সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবাহার করে, মনের মিল না হওয়া সত্ত্বেও তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ না করে, বরং তার যাবতীয় অধিকার ও প্রয়োজন পূরণ করে, তবে তার এই ত্যাগ ও উদারতা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ওয়াকিফহাল রয়েছেন। অতএব, তিনি এহেন ধৈর্য, উদারতা, সহনশীলতা ও মহানুভবতার এমন প্রতিদান দেবেন, যা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। এখানে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কার্য-কলাপ সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন। বলেই ক্ষান্ত করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিদান কি দেবেন, তা উল্লেখ করা হয়নি। কারণ এর প্রতিদান হবে কল্পনার ঊর্ধ্বে, ধারণাতীত।

মোটকথা, পবিত্র কুরআন উভয় পক্ষকে একদিকে স্বীয় অভাব-অভিযোগ দূর করা ও ন্যায্য অধিকার লাভ করার আইনত অধিকার দিয়েছে। অপর দিকে ত্যাগ, ধৈর্য, সংযম ও উন্নত চরিত্র আয়ত্ব করার উপদেশ দিয়েছে। এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, বিবাহ বিচ্ছেদ হতে যথাসাধ্য বিরত থাকা কর্তব্য। বরং উভয়ের পক্ষেই কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার করে সমঝোতায় আসা বাঞ্ছনীয়। –[মাআরিফুল কুরআন]

قَوْلُهُ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ : অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীতে মিটমাট খুবই উত্তম বিষয় : কোনো পত্নী যদি দেখে স্বামীর মন তার থেকে উঠে গেছে এবং সে জন্য নিজের মহরানা ও ভরণ-পোষণ কিছুটা হ্রাস করে দিয়ে তাকে প্রসন্ন ও নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে নেয় তবে এরূপ মিটমাটের কারণে কারও কোনো পাপ হবে না। স্বামী স্ত্রীতে মিটমাট ও বনিবনাও খুবই উত্তম বিষয়। হ্যাঁ, স্ত্রীকে অকারণে যন্ত্রণা দেওয়া বা বিনা অনুমতিতে তার অর্থসম্পদে হস্তক্ষেপ করা গুনাহের কাজ। –[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ : অর্থাৎ নিজের স্বার্থ, অর্থ লালসা ও কার্পণ্য মানুষের মজ্জাগত বিষয়। কাজেই অবস্থা দৃষ্টে স্ত্রী যদি স্বামীর কিছু আর্থিক উপকার করে তবে সে খুশি হয়ে যাবে।

فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا : অর্থাৎ স্ত্রীদের সাথে যদি ভালো আচরণ কর এবং দুর্ব্যবহার ও বিবাদ বিসম্বাদ পরিহার কর, তবে মহান আল্লাহ তো তোমাদের সব খবরাখবর রাখেন। এ পুণ্যের ছওয়াব অবশ্যই দেবেন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ অবস্থায় মন উঠে যাওয়া ও নাখোশ হওয়ার মতো কোনো ব্যাপার ঘটাবে না, ফলে প্রসন্ন করার জন্য নিজের অধিকার হ্রাসেরও প্রয়োজন পড়বে না। –[তাফসীরে উসমানী]

۱۲۹. وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا تُسَوُّوْا بَيْنَ النِّسَآءِ فِى الْمَحَبَّةِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ عَلٰى ذٰلِكَ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ اِلَى الَّتِىْ تُحِبُّوْنَهَا فِى الْقَسْمِ وَالنَّفَقَةِ فَتَذَرُوْهَا اَىْ تَتْرُكُوْا الْمَمَالَ عَلَيْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ الَّتِىْ لَا هِىَ اَيِّمٌ وَلَا ذَاتُ بَعْلٍ وَاِنْ تُصْلِحُوْا بِالْعَدْلِ فِى الْقَسْمِ وَتَتَّقُوْا الْجَوْرَ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا لِمَا فِىْ قُلُوْبِكُمْ مِنَ الْمَيْلِ رَحِيْمًا بِكُمْ فِىْ ذٰلِكَ.

১২৯. তোমরা তার যতই কামনা কর না কেন ভালোবাসার ক্ষেত্রে কখনও তোমারা স্ত্রীদের বরাবর করতে পারবে না, সমান ব্যবহার করতে পারবে না। তবে তোমরা কোনো একজনের প্রতি অর্থাৎ ভরণ পোষণ ও দিন বণ্টনের ক্ষেত্রে যাকে ভালোবাস কেবল তার প্রতি সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড়ো না আর অপরকে ঝুলানো অবস্থায় রেখো না। অর্থাৎ যার প্রতি বিমুখ তাকে এ অবস্থায় ছেড়ে রেখো না যে, সে স্বামীহীনাও নয় আবার স্বামীর অধিকারিনীও নয়।
যদি তোমরা দিন বণ্টনের ক্ষেত্রে সমান ব্যবহার করতে: নিজেদেরকে সংশোধন কর এবং পীড়ন করা হতে সাবধান হও, তবে আল্লাহ তোমাদের হৃদয়ে যে একজনের প্রতি অধিক আকর্ষণ বিদ্যমান তৎপ্রতি ক্ষমাশীল এবং এ বিষয়ে তোমাদের সাথে পরম দয়ালু।

۱۳۰. وَاِنْ يَتَفَرَّقَا اَىِ الزَّوْجَانِ بِالطَّلَاقِ يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا عَنْ صَاحِبِهِ مِنْ سَعَتِهِ اَىْ فَضْلِهِ بِاَنْ يَّرْزُقَهَا زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَرْزُقَهُ غَيْرَهَا وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا لِخَلْقِهِ فِى الْفَضْلِ حَكِيْمًا فِيْمَا دَبَّرَهُ لَهُمْ.

১৩০. যদি তারা অর্থাৎ স্বামী স্ত্রী তালাকের মাধ্যমে পরস্পর পৃথক হয়ে যায় তবে আল্লাহ তার প্রাচুর্য দ্বারা, তার অনুগ্রহ দ্বারা তাদের প্রত্যেককে অপর জন হতে অভাব মুক্ত করে দেবেন। যেমন, স্ত্রীর জন্য অন্য কোনো স্বামীর, আর স্বামীর জন্য অন্য কোনো স্ত্রীর ব্যবস্থা করে দেবেন।
আল্লাহ তার সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনে প্রাচুর্যময় এবং তাদের জন্য তিনি যা ব্যবস্থা করেন তাতে প্রজ্ঞাময়।

তাহকীক ও তারকীব

مَمَالٌ : مَمَالٌ [ইহা বাবে ضَرَبَ-এর মাসদার] ঝুঁকে যাওয়া, ধাবিত হওয়া।
جَوَرٌ : جَوْرٌ [ইহা বাবে نَصَرَ-এর মাসদার] জুলুম করা, অন্যায় করা।
مَيَلٌ : مَيْلٌ [ইহা ضَرَبَ এর মাসদার] ধাবিত হওয়া।
دَبَّرَ : دَبَّرَ [وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ : مَاضِىْ مَعْرُوْف] ব্যবস্থা করা, পরিচালনা করা, চিন্তা করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ الخ : অর্থাৎ স্ত্রী একাধিক থাকলে মনের ভালোবাসা ও অন্যান্য আচার-আচরণে সমতা রক্ষা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। তবে এরূপ বৈষম্য ও করো না যে, একজনের প্রতি পুরোপুরি ঝুঁকে গেলে এবং অন্যজনকে মাঝখানে ঝুলিয়ে রাখলে; না সুখ-শান্তিতে রাখছ, না ত্যাগ করছ যে, অন্যত্র তার বিবাহ হবে। -[তাফসীরে উসমানী]

وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا : অর্থাৎ যদি সংশোধন ও সম্প্রীতিমূলক আচরণ কর এবং জুলুম ও অধিকার খর্ব করা হতে যথাসম্ভব বেঁচে থাক, তবে এরপর কিছু হয়ে গেলে তা মহান আল্লাহ ক্ষমা করবেন।
وَاِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ : অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী যদি বিচ্ছেদকেই পছন্দ করে নেয় এবং তালাককেই স্থির হয়ে যায়, তবে কোনো অসুবিধা নেই, আল্লাহর তা'আলা প্রত্যেকের কর্মবিধায়ক ও সকলের প্রয়োজন সমাধানকারী। এর দ্বারা ইশারা করা হয়েছে যে, স্ত্রীকে আরামে রাখবে, কোনো প্রকার কষ্ট দেবে না। আর তা না পারলে তালাক দেওয়াই সমীচীন। -[তাফসীরে উসমান]

অনুবাদ :

١٣١. وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِمَعْنَى الْكُتُبِ مِنْ قَبْلِكُمْ اَىِ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى وَاِيَّاكُمْ يَا اَهْلَ الْقُرْاٰنِ اَنِ اَىْ بِاَنْ اتَّقُوا اللّٰهَ خَافُوْا عِقَابَهُ بِاَنْ تُطِيْعُوْهُ وَ قُلْنَا لَهُمْ وَلَكُمْ اَنْ تَكْفُرُوْا بِمَا وَصَّيْتُمْ بِهِ فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ خَلْقًا وَمِلْكًا وَعَبِيْدًا فَلَا يَضُرُّهُ كُفْرُكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا عَنْ خَلْقِهِ وَعَنْ عِبَادَتِهِمْ حَمِيْدًا مَحْمُوْدًا فِىْ صُنْعِهِ بِهِمْ .

১৩১. আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব অর্থাৎ কিতাবসমূহ দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় তাদেরকে এবং হে কুরআনের অধিকারীগণ! তোমাদেরকেও নির্দেশ দিয়েছি যে, আল্লাহকে ভয় কর। তার শাস্তিকে ভয় কর; অর্থাৎ তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন কর।

আর তোমাদেরকে ও তাদেরকে বলেছিলাম, তোমরা যে বিষয়ে তোমাদেরকে অসিয়ত করা হয়েছে তা যদি প্রত্যাখ্যান কর তবে আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সব কিছু সৃষ্টি, মালিকানা ও দাস হিসাবে আল্লাহর। সুতরাং তোমাদের সত্য প্রত্যাখ্যান তাঁর কোনোরূপ ক্ষতি করবে না। আর আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি এবং তাদের ইবাদত হতে অনপেক্ষ এবং তাদের সাথে আচরণে তিনি প্রশংসাভাজন।

اَنْ এটা بِاَنْ অর্থে ব্যবহৃত। حَمِيْد অর্থ مَحْمُوْد বা প্রশংসিত।

١٣٢. وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ كَرَّرَهُ تَاكِيْدًا لِتَقْرِيْرِ مُوْجِبِ التَّقْوٰى وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا شَهِيْدًا بِاَنَّ مَا فِيْهِمَا لَهُ .

১৩২. আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই। তাকওয়া ও তাকে ভয় করার মূল কারণটির মধ্যে ......বা জোর সৃষ্টির উদ্দেশ্য এ আয়াতটির পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। উকিল হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। অর্থাৎ এতদুভয়ের সব কিছু আল্লাহর এ কথার সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।

١٣٣. اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ يَاَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ بَدَلَكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا .

১৩৩. হে মানুষ! তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে অপসারিত এবং তোমাদের স্থলে অন্য এক সম্প্রদায়কে আনতে পারেন। আর আল্লাহ এতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

١٣٤. مَنْ كَانَ يُرِيْدُ بِعَمَلِهِ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لِمَنْ اَرَادَهُ لَا عِنْدَ غَيْرِهِ فَلِمَ يَطْلُبُ اَحَدُهُمَا الْاَخَسَّ وَهَلَّا طَلَبَ الْاَعْلٰى بِاِخْلَاصِهِ لَهُ حَيْثُ كَانَ مَطْلَبُهُ لَا يُوْجَدُ اِلَّا عِنْدَهُ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا .

১৩৪. যে ব্যক্তি তার কার্যের মাধ্যমে ইহকালে পুরস্কার চায় সে জেনে রাখুক, যে আল্লাহর নিকট ইহকাল ও পরকাল সকল কালের পুরুস্কার বিদ্যমান, যে ব্যক্তি তা চায় তার জন্য। অন্য কারও নিকট তা নেই। সুতরাং তোমরা এতদুভয়ের নিকৃষ্টতরটি কেন চাও? ইখলাস ও আন্তরিকতার সাথে শ্রেয়স্তরটি কেন চাও না? কারণ, তিনি ব্যতীত আর কারও নিকট তো উদ্দেশ্য পূরণ হতে পারে না আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا : **সব কিছুর মালিত আল্লাহ এবং তিনিই কর্মবিধায়ক :** উৎসাহ দান ও সতর্কীকরণ ছিল ইতিপূর্বের আলোচনা মূল বিষয়বস্তু অর্থাৎ মহান আল্লাহর আদেশ মান্য করা ও তার বিরুদ্ধাচরণ পরিহার করা সকলের জন্যই অবশ্য কর্তব্য। তার আদেশের বর্তমানে অন্য কারও কথায় কর্ণপাত করা আদৌ জায়েজ নয়। মাঝখানে এতিম ও নারী সম্পর্কিত কতিপয় বিধান উদ্ধৃত হয়েছে। কারণ এ ক্ষেত্রে তখন সমানে অন্যায় অনাচার চলছিল। এখন আবার সেই উদ্বুদ্ধ ও সতর্কীকরণ করা হচ্ছে। এ আয়াদ্বয়ের সারমর্ম এই যে, তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে আদেশ শুনিয়ে দেওয়া হয়েছে। তোমরা মহান আল্লাহকে ভয় কর, তার অবাধ্যতা প্রকাশ করো না। কেউ যদি তার আদেশ অমান্য করে, তবে জেনে রাখুন মহান আল্লাহ সব কিছুর মালিক। কার ও কোনো পরওয়া তার নেই। অর্থাৎ সে নিজেরই ক্ষতি করবে মহান আল্লাহর কিছু ক্ষতি হবে না। যদি আনুগত্য প্রকাশ কর, তবুও মনে রেখ, তিনি সব কিছুর অধিকর্তা। তোমাদের যাবতীয় কার্য সমাধা করতে পারেন। -[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ : অর্থাৎ আসমান ও জমিন যা কিছু আছে সবই আল্লাহ তা'আলার। এখানে এই উক্তিটির তিন বার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। প্রথমবার বোঝানো হয়েছে আল্লাহর সচ্ছলতা প্রাচুর্য ও তাঁর দরবারে অভাবহীনতা। দ্বিতীয়বার বোঝানো হয়েছে যে, কারো অবাধ্যতায় আল্লাহ তা'আলার কোনোই ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। তৃতীয়বার আল্লাহ পাকের অপার রহমত ও সহয়তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমরা যদি খোদাভীতি ও আনুগত্য কারো, তবে তিনি তোমাদের সর্ব কাজে সহায়তা করবেন, রহমত বর্ষণ করবেন এবং অনায়াসে তা সুসম্পন্ন করে দেবেন।

-[মাআরিফুল কুরআন]

اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ .... : এ আয়াতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা অপরিসীম ক্ষমতাবান। তিনি ইচ্ছা করলে এক মুহূর্তে সব কিছু পরিবর্তন করে দিতে পারেন। তোমাদের সবাইকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে তোমাদের স্থলে অন্যদেরকে অধিষ্ঠিত করতে সক্ষম। অবাধ্যদের পরিবর্তে তিনি অনুগত ও বাধ্য লোক অনায়াসে সৃষ্টি করতে পারেন। এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলার স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও অনির্ভিরতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। এবং অবাধ্যদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। -[মাআরিফুল কুরআন]

قَوْلُهُ فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ : অর্থাৎ তাঁর আনুগত্য করলে তোমাদেরকে দুনিয়া আখেরাত উভয়ই দিবেন। কাজেই কেবল দুনিয়ার পেছনে পড়া ও আখেরাত থেকে বঞ্চিত হওয়া নিতান্তই মুর্খতা।

قَوْلُهُ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের যাবতীয় কাজ দেখেন সব কথা শুনেন। তোমরা যা চাইবে তা-ই পাবে।

١٣٥. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ قَائِمِيْنَ بِالْقِسْطِ بِالْعَدْلِ شُهَدَآءَ بِالْحَقِّ لِلّٰهِ وَلَوْ كَانَتِ الشَّهَادَةُ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ فَاشْهَدُوْا عَلَيْهَا بِاَنْ تُقِرُّوْا بِالْحَقِّ وَلَا تَكْتُمُوْهُ اَوْ عَلَى الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَّكُنِ الْمَشْهُوْدُ عَلَيْهِ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا مِنْكُمْ وَاَعْلَمُ بِمَصَالِحِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوْا الْهَوٰى فِىْ شَهَادَتِكُمْ بِاَنْ تُحَابُّوْا الْغَنِيَّ لِرِضَاهُ اَوِ الْفَقِيْرَ رَحْمَةً لَهُ . اَنْ لَا تَعْدِلُوْا تَمِيْلُوْا عَنِ الْحَقِّ وَاِنْ تَلْوُا تُحَرِّفُوْا الشَّهَادَةَ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِحَذْفِ الْوَاوِ الْاُوْلٰى تَخْفِيْفًا اَوْ تُعْرِضُوْا عَنْ اَدَائِهَا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا فَيُجَازِيْكُمْ بِهٖ .

অনুবাদ :

১৩৫. হে বিশ্বাসী ! তোমারা ন্যায় বিচারে ইনসাফ বিধানে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ কায়েম থাকবে। আল্লাহর উদ্দেশ্য সঠিক সাক্ষ্য প্রদান করবে, যদি ও এটা এ সাক্ষ্য তোমাদের নিজের অথবা পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে হয় অর্থাৎ এদের বিরুদ্ধে হলেও সাক্ষ্য প্রদান করবে, সত্যকে স্বীকার করে নেবে এবং তা গোপন করে রাখবে না। যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করা হচ্ছে সে বিত্তবান হউক বা বিত্তহীন তোমাদের অপেক্ষা আল্লাহই উভয়ের যোগ্যতর অভিভাবক এবং তাদের কল্যাণ সম্পর্কে তিনিই অধিক অবহিত। ন্যায় বিধান না করার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ সত্য হতে বিমুখ হয়ে সাক্ষ্য প্রদানে তোমরা প্রবৃত্তির অনুরসণ করো না। যেমন বিত্তশালীর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তার পক্ষে বা বিত্তহীনের প্রতি দয়ার্দ্র হয়ে তার পক্ষে সাক্ষ্য দান করো না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল অর্থাৎ সাক্ষ্য বিকৃত কর বা তা প্রাদানে পাশ কেটে যাও তবে জেনে রাখ, তোমারা যা কর আল্লাহ তার খবর রাখেন। অনন্তর তিনি তোমাদেরকে তার প্রতিদান প্রদান করবেন।

ان -এর পূর্বে একটি হেতুবোধ لَامْ উহ্য রয়েছে।

تَعْدِلُوْا -এর পূর্বে একটি নাবোধক শব্দ لَا উহ্য রয়েছে।

تَلْوُا এটা মূলত: ছিল تَلْوُوْا অপর এক কেরাতে تَخْفِيْف বা সরলী ও লঘু করণার্থে প্রথম وَاوْ টি বিলুপ্ত করে পঠিত রয়েছে।

١٣٦. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا دَاوِمُوْا عَلَى الْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِىْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْقُرْاٰنُ وَالْكِتٰبِ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ عَلَى الرُّسُلِ بِمَعْنَى الْكُتُبِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ فِى الْفِعْلَيْنِ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا عَنِ الْحَقِّ .

১৩৬. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ তার রাসূল, তিনি যে কিতাব তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি অবতীর্ণ করেছেন তাতে অর্থাৎ আল কুরআনে এবং যে কিতাব অর্থাৎ কিতাবসমূহ তার রাসূলগণের উপর পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন তাতে বিশ্বাস কর। অর্থাৎ এ বিশ্বাসের উপর চির প্রতিষ্ঠিত থাক।

আর যে কেউ আল্লাহ, তার ফেরেশতা, তার কিতাব, তার রাসূল এবং পরকাল প্রত্যাখ্যান করে সে সত্য হতে বহুদূর পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে।

بِنَاءُ اَنْزَلَ ও نَزَّلَ এ উভয় ক্রিয়াই অপর এক কেরাত لِلْفَاعِلِ অর্থাৎ কর্তৃবাচ্য গঠিত রয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

تَكْتُمُوْنَ : (مُضَارِعْ مَعْرُوْف : جَمْعْ مُذَكَّر) অর্থ– তোমরা গোপন কর, বাবে نَصَرَ থেকে كَتَمَ يَكْتُمُ كِتْمَانًا গোপন করা। مَصَالِحْ : مُصْلَحَةٌ বহুবচন مَصَالِحْ কল্যাণ, সুবিধা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

দুনিয়ার বুকে নবী প্রেরণ ও কিতাব নাজিলের উদ্দেশ্য ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা এবং এটাই বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার চাবিকাঠি। সূরা নিসার এই আয়াতে সব মুসলমানকে ইনসাফ ও ন্যায়নিষ্ঠার উপর অটল থাকতে এবং সত্য সাক্ষ্যদান করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতাসমূহ ও স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। একই বিষয় প্রসঙ্গে সূরা মায়েদা ও সূরা হাদীদে দু'খানি আয়াত রয়েছে।, সূরা মায়েদার আয়াতের বিষয়বস্তু এমনকি শব্দাবলি ও প্রায় অভিন্ন। সূরা হাদীদের আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, হযরত আদম (আ.) কে প্রতিনিধিরূপে দুনিয়ায় পাঠানো, অতঃপর একের পর এক নবী প্রেরণ এবং শতাধিক সাহীফা ও আসমানি কিতাব নাজিল করার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়ার বুকে শান্তি শৃঙ্খলা এবং ইনসাফ ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ ক্ষমতার গণ্ডির মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায়নীতির উপর অবিচল থাকে। শিক্ষা-দীক্ষা, ওয়াজ নসিহত, তালিম ও তরবিয়তের মাধ্যমে যেসব অবাধ্য লোককে সত্য ও ন্যায়ের পথে আনা যাবে না, তাদেরকে প্রশাসনিক আইন অনুসারে উপযুক্ত শাস্তি দান করে সৎপথে আসতে বাধ্য করা হবে।

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা ও তার উপর অবিচল থাকা শুধু সরকার ও বিচার বিভাগেরই বিশেষ দায়িত্ব নয়, বরং প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন সে নিজে ন্যায়নীতির উপর স্থির থাকে এবং অন্যকেও ইনসাফ ও ন্যায়নীতির উপর অবিচল রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। অবশ্য ইনসাফ ও ন্যায়নীতির একটি পর্যায় সরকার ও শাসন কর্তৃপক্ষের বিশেষ দায়িত্ব। তা হচ্ছে দুষ্টু ও অবাধ্য লোকেরা যখন ন্যায়নীতিকে পদদলিত করবে নিজেরা তো ন্যায়নীতির ধার ধরবেই না, বরং অন্যকেও ন্যায়নীতির উপর স্থির থাকতে দেবে না; তখন তাদেরকে দমন করার জন্য আইন ও উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। এমতাবস্থায় একমাত্র ক্ষমতাসীন সরকার ও কর্তৃপক্ষই ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠ করতে পারে।

বর্তমান বিশ্বের মূর্খ জনগণ তো দূরের কথা, শিক্ষিত সুধীরাও মনে করেন যে, ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা শুধু সরকার ও আদালতেরই দায়িত্ব; এ ব্যাপারে জনগণের কোনো দায়দায়িত্ব নেই। এহেন ভ্রান্ত ধারণার কারণেই বিশ্বের সব দেশে সব রাজ্যে সরকার ও জনগণ দু'টি পরস্পর বিরোধী শক্তিতে বিভক্ত হয়ে গেছে। শাসক ও শাসিতের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। সব দেশের জনগণ সরকারের কাছে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি দাবি করে, কিন্তু নিজেরা কখনো ন্যায়নীতি পালন করতে প্রস্তুত নয়। এরই কুফল আজ সারা বিশ্বকে গ্রাস করেছে। আইন-কানুন নিষ্ক্রিয় ও অপরাধ প্রবণতা ক্রমবর্ধমান। আজকাল সব দেশেই আইন প্রণয়নের জন্য সংসদ রয়েছে। এখানে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। আর তার সদস্য মনোনয়নের জন্য অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সারা দুনিয়ায় হৈ চৈ পড়ে যাচ্ছে। অতঃপর নির্বাচিত সদস্যগণ দেশবাসীর মনমানসকিতা, আবেগ অনুভূতি ও দেশের প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আইন প্রণয়ন করেছে। তারপর জনমত যাচাই করার জন্য তার প্রকাশ ও প্রচার করা হয় এবং জনসমর্থন লাভের পর তা প্রবর্তন করা হয়। আর সেটা কার্যকর করার জন্য সরকারের প্রশাসনযন্ত্র সচল হয়ে উঠে। যার অসংখ্য শাখা-প্রশাখা সারা দেশে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রত্যেক শাখার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন দেশের সুদক্ষ বিশেজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ। দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা, কল্যাণ ও নিরাপত্তার জন্য তারা সক্রিয় কর্মতৎপরতা প্রদর্শন করছেন। কিন্তু এত বিপুল আয়োজন সত্ত্বেও প্রচলিত তন্ত্রমন্ত্রের মোহমুক্ত হয়ে তথাকথিত সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঠিকাদারদের অন্ধ অনুকরণের ঊর্ধ্বে উঠে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলে প্রত্যেকেই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, ফলাফল অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। –[মাআরিফুল কুরআন]

খোদাভীতি ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসই বিশ্বশান্তির চাবিকাঠি : সুষ্ঠু বিবেকসম্পন্ন যে কোনো ব্যক্তি চলমান সামাজের প্রথা ও রীতিনীতির বন্ধন ছিন্ন করে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে রাসূলে আরাবি ﷺ-এর আনীত পয়গাম সম্পর্কে চিন্তা করলে স্পষ্ট উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন যে, শুধু আইন ও দণ্ডদান করেই পৃথিবীতে কখনো শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জিত হয়নি, বরং

ভবিষ্যতেও অর্জিত হবে না একমাত্র খোদাভীতি ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসই বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারে। যার ফলে রাজা প্রজা, শাসক ও শাসিত সর্বপ্রকার দায়দায়িত্ব উপলব্ধি করতে, তা যথাযথভাবে পালন করতে সচেষ্ট হয়। আইনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে জনসাধারণ একথা বলে দায়িত্ব এড়াতে পারে না যে, এটা সরকারের কাজ। কুরআন মাজীদের পূর্বোল্লিখিত আয়াতসমূহে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এক বৈপ্লবিক বিশ্বাসের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শেষ করা হয়েছে।

উপরিউক্ত আয়াতত্রয়ের মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায়নীতির উপর অটল অনড় থাকা এবং অন্যকেও অটল রাখার চেষ্ট করার জন্য শাসক-শাসিত নির্বিশেষে সবাইকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর আয়াতসমূহের শেষ দিকে এমন এক তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যা মানুষের ধ্যান ধারণা ও প্রেরণার জগতে মহাবিপ্লবের সূচনা করতে পারে। তা হলো আল্লাহ তা'আলার অপরিসীম ক্ষমা ও পরাক্রম, তার সম্মুখে উপস্থিতি ও জবাবদিহি এবং প্রতিদান ও প্রতিফল লাভের বিশ্বাস। এটা এমন এক সম্পদ যার দৌলতে আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্ববর্তী অশিক্ষিত বিশ্বাসী লোকেরাও বিপুল শান্তি ও নিরাপত্তা ভোগ করতো এবং যার অভাবের কারণেই আজকের মহাশূন্যের অভিযাত্রা, কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণকারী উন্নত বিশ্ববাসীরা শান্তি ও নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত।

আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের পূজারী ও তন্ত্রমন্ত্রের অন্ধ অনুসারীদের উপলব্ধি করা উচিত যে, বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতির ফলে তারা হয়তো মহাশূন্যে আরোহণ করতে গ্রহ হতে গ্রহান্তরে ভেসে এবং মহাসাগর পাড়ি দিতে পারবে, কিন্তু সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প কারখানা, উপাদান-উপকরণ প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের মুখ্য উদ্দেশ্য অর্থাৎ সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা কোথাও পাবে না। কোনো আধুনিক আবিষ্কারের মাঝে কিংবা কোনো গ্রহ-উপগ্রহেই তা খুঁজে পাওয়া যাবে না। বরং পাওয়া যাবে একমাত্র রাসূলে আরাবি ﷺ -এর পয়গাম ও শিক্ষার মধ্যে, খোদাভীতি ও আখেরাতের বিশ্বাসের মধ্যে। এরশাদ হয়েছে- اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ অর্থাৎ মনে রেখো একমাত্র আল্লাহর স্মরণের মধ্যেই অন্তরসমূহের প্রশান্তি নিহিত। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার সমূহ বস্তুত: পক্ষে আল্লাহ তা'আলার অফুরন্ত কুদরত ও কল্পনাতীত সৃষ্টি বৈচিত্র্যকে ভাস্বর করে চলেছে, যার সামনে মানুষ তার অক্ষমতা ও অযোগ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য। কিন্তু অনুভূতিশীল অন্তর ও অন্তদৃষ্টিসম্পন্ন চোখ না হলে তাতেই বা কি লাভ।

কুরআন হাকীম একদিকে পৃথিবীতে ইনসাফ ও ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিধি-বিধানে ব্যবস্থা করেছে, অপরদিকে এমন এক অপূর্ব নীতিমালা ঘোষণা করেছে। যাকে পুরোপুরি গ্রহণ ও নিষ্ঠার সাথে বাস্তবায়ন করা হলে, জুলুম ও অনাচারে জর্জরিত দুনিয়া সুখ-শান্তির আধারে পরিণত হবে। আখেরাতে জান্নাত লাভের পূর্বে দুনিয়াতেই জান্নাতি সুখের নমুনা উপভোগ করা যাবে। -[মাআরিফুল কুরআন।]

قَوْلُهُ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ : অর্থাৎ সাক্ষ্য সততা ও মহান আল্লাহর আদেশ অনুসারেই দেওয়া উচিত। যদিও তাতে তোমাদের বিশেষ প্রিয়জনের ক্ষতি হয়ে যায়, যা সত্য তাই প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয়। পার্থিব স্বার্থের খাতিরে আখেরাতের ক্ষতি কুড়িও না।

قَوْلُهُ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا : সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে ন্যায়নীতি ও সততা রক্ষা করা ফরজ। সত্য সাক্ষ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে নিজের মনের ইচ্ছাও প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। যেমন বিত্তবানের পক্ষপাত করে বা অভাভগ্রস্তের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে সত্য গোপন করা। যা সত্য তাই বল। তাদের প্রতি আল্লাহ তোমাদের চেয়ে বেশি সহানুভূতিশীল এবং তিনি তাদের হিতাহিত সম্বন্ধে অবগত। তার কোনো কিছুর কমতি নেই। -[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ وَاِنْ تَلْوٗا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا : জিহ্বা বিকৃত করার অর্থ সত্য বললেও জিহ্বা চাপিয়ে ও কথা পেঁচিয়ে বলা, যাতে শ্রোতা সন্দেহে পড়ে যায়। অর্থাৎ স্পষ্ট না বলা। পাশ কাটানোর অর্থ সব কথা না বলা এবং গুরুত্বপূর্ণ কোনো তথ্য ছেড়ে যাওয়া। এ উভয় অবস্থায় মিথ্যা বলা না হলেও সত্য প্রকাশ না করার দরুন গুনাহ হবে। সাক্ষ্য সত্য ও দিতে হবে এবং স্পষ্ট ও পূর্ণও। -[তাফসীরে উসমানী]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الخ : অর্থাৎ যে ইসলাম গ্রহণ করবে তাকে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় আদেশ-নিষেধ প্রত্যয়ী হতে হবে। কোনো একটি নির্দেশও অস্বীকার করলে সে মুসলিম হতে পারে না। কেবল বাহ্য ও মৌখিক কথার কোনো মূল্য নেই।

অনুবাদ :

١٣٧. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِمُوْسٰى وَهُمُ الْيَهُوْدُ ثُمَّ كَفَرُوْا بِعِبَادَةِ الْعِجْلِ ثُمَّ اٰمَنُوْا بَعْدَهُ ثُمَّ كَفَرُوْا بِعِيْسٰى ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا بِمُحَمَّدٍ لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ مَا اَقَامُوْا عَلَيْهِ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًا طَرِيْقًا اِلَى الْحَقِّ ـ

১৩৭. যারা হযরত মূসা (আ.)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে অর্থাৎ ইহুদি সম্প্রদায় পরে গোবৎস উপাসনা করে সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে, অতঃপর পুনঃবিশ্বাস এনেছে, অতঃপর হযরত ঈসা (আ.)-এর সাথে কুফরি করেছে, অতঃপর মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে তাদের ঐ কুফরি আরো বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তারা যে অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত তা কখনও ক্ষমা করার নন আর কখনও তাদেরকে পথ অর্থাৎ সত্যে উপনীত হওয়ার পন্থা প্রদর্শন করার নন।

١٣٨. بَشِّرِ اَخْبِرْ يَا مُحَمَّدُ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا مُؤْلِمًا هُوَ عَذَابُ النَّارِ ـ

১৩৮. হে মুহাম্মদ! [মুনাফিকদেরকে সুসংবাদ দাও] অর্থাৎ খবর দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ যন্ত্রণাকর শাস্তি অর্থাৎ জাহান্নামের শাস্তি।

١٣٩. اَلَّذِيْنَ بَدَلٌ اَوْ نَعْتٌ لِلْمُنٰفِقِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ط لِمَا يَتَوَهَّمُوْنَ فِيْهِمْ مِنَ الْقُوَّةِ اَيَبْتَغُوْنَ يَطْلُبُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ اِسْتِفْهَامُ اِنْكَارٍ اَىْ لَا يَجِدُوْنَهَا عِنْدَهُمْ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَلَا يَنَالُهَا اِلَّا اَوْلِيَاؤُهُ ـ

১৩৯. মু'মিনদের পরিবর্তে যারা কাফিরদেরকে তাদের শক্তি আছে বলে ধারণা করে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে এরা কি তাদের নিকট শক্তি চায়? বল অনুসন্ধান করে? না, তা তাদের নিকট পাবে না। ইহকালে ও পরকালে সমস্ত শক্তি তো আল্লাহরই। তারা ওলী ও বন্ধুরা ব্যতীত আর কেউ তা পাবে না।

اَلَّذِيْنَ এটা بَدَلٌ বা স্থলাভিষিক্ত পদ অথবা মুনাফিকদের نَعْتٌ বা বিশ্লেষণ।

اَيَبْتَغُوْنَ-এর প্রশ্নবোধকটি اِنْكَارٌ বা অস্বীকার অর্থে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

اِزْدَادُوْا : বৃদ্ধি করল।

مَا اَقَامُوْا عَلَيْهِ : তারা যে অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত।

يَتَوَهَّمُوْنَ : তারা ধারণা করে।

اَلْعِزَّةُ : শক্তি।

يَبْتَغُوْنَ : তারা চায়, কামনা করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا : মুনাফিকী করে মুক্তি পাওয়া যাবে না : কেবল প্রকাশ্য ইসলাম গ্রহণ করল, কিন্তু অন্তরে দোদুল্যমান এবং শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস স্থাপন ছাড়াই মারা গেলে, তার মুক্তির কোনো পথ নেই। সে কাফির। বাইরে ইসলাম জাহির করলে কোনো কাজ হবে না। এর দ্বারা মুনাফিকদের কথা বোঝানো হয়েছে। কেউ বলেন, এ আয়াত ইহুদিদের সম্পর্কে অবতীর্ণ। তারা প্রথমে ঈমান এনেছিল। তারপর বাছুর পূজা করে কাফির হয়ে যায়। আবার তওবা করে মু'মিন হয়। সবশেষে হযরত ঈসা (আ.) কে অস্বীকার করে কাফির হয়ে যায়। আরও পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে অবিশ্বাস করে সে কুফরিতে অগ্রগামী হতে থাকে। –[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًا : এ আয়াতের তাৎপর্য এই যে, বার বার কুফরির মধ্যে লিপ্ত হওয়ার ফলে সত্যকে উপলব্ধি করার এবং গ্রহণ করার যোগ্যতা রহিত হয়ে যায়। ভবিষ্যতে তওবা করা ও ঈমান আনার সৌভাগ্য হয় না। তবে কুরআন হাদীসের অকাট্য দলিলাদির দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, বড় কট্টর কাফির বা মুরতাদই হোক না কেন, যদি সত্যিকারভাবে তওবা করে, তবে পূর্ববর্তী সমুদয় গোনাহ মাফ হয়ে যায়। অতএব বার বার কুফরি করার পরও যদি তারা সত্যিকারভাবে তওবা করে, তবে তাদের জন্য এখনো ক্ষমার আইন উন্মুক্ত রয়েছে।

এখানে প্রথম আয়াতে মুনাফিকদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি হুঁশিয়ারী দেওয়া হয়েছে। তবে এহেন দুঃসংবাদকে بَشَارَتْ অর্থাৎ, সুসংবাদ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নিজের ভবিষ্যত সম্পর্কে কোনো সুসংবাদ শোনার জন্য প্রত্যেকই উদগ্রীব থাকে। কিন্তু মুনাফিকদের জন্য এছাড়া আর কোনো সংবাদ নেই। বরং তাদের জন্য সুসংবাদের পরিবর্তে এটাই একমাত্র ভবিষ্যদ্বাণী।

মানমর্যাদা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সমীপে কামনা করা বাঞ্ছনীয় : দ্বিতীয় আয়াতে কাফির ও মুশরিকদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ স্থাপন করাকে নিষিদ্ধ করে এ ধরনের আচরণে লিপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। সাথে সাথে এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার উৎস ও মূল কারণ বর্ণনা করতঃ একেও অযথা অবান্তর প্রতিপন্ন করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا অর্থাৎ তারা কি ওদের কাছে গিয়ে ইজ্জত সম্মান লাভ করতে চায়? তবে ইজ্জত সম্মান তো সম্পূর্ণ আল্লাহ তা'আলার এখতিয়ারাধীন।

কাফির ও মুশরিকদের সাথে সৌহার্দ ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখা এবং অন্তরঙ্গ মেলামেশার প্রধান কারণ এই যে, ওদের বাহ্যিক মান মর্যাদা, শক্তিসামর্থ্য, ধনবলে প্রভাবিত হয়ে হীনমন্যতার শিকার হয় এবং মনে করে যে, ওদের সাহায্য সহযোগিতায় আমাদের ও মান মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে আল্লাহ তা'আলা তাদের ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করে বলেন যে, তারা এমন লোকদের সাহায্যে মর্যাদাবান হওয়ার আকাঙ্খা করছে, যাদের নিজেদেরই সত্যিকারে কোনো মর্যাদা নেই। তাছাড়া যে শক্তি ও বিজয়ের মধ্যে সত্যিকার ইজ্জত ও সম্মান নিহিত, তাতো একমাত্র আল্লাহ তা'আলার এখতিয়ারভুক্ত। অন্য কারো মধ্যে যখন কোনো ক্ষমতা বা সাফল্য পরিদৃষ্ট হয়, তা সবই আল্লাহ প্রদত্ত। এতএব, মান-মর্যাদা দানকারী মালিককে অসন্তুষ্ট করে তারা শত্রুদের থেকে ইজ্জত হাসিল করার অপচেষ্টা কত বড় বোকামি!

এ সম্পর্কে সূরায়ে মুনাফিকূন -এ ইরশাদ হয়েছে– وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ ইজ্জত-সম্মান একমাত্র আল্লাহ, রাসূল এবং ঈমানদারদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু মুনাফিকরা তা অবগত নয়। এখানে আল্লাহ তা'আলার সাথে হযরত রাসূল ﷺ ও মুমিনদের উল্লেখ করে বোঝানো হয়েছে যে, ইজ্জতের মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। তিনি যাকে ইচ্ছা আংশিক মর্যাদা দান করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুমিনগণ যেহেতু আল্লাহ তা'আলা একান্ত অনুগত, পছন্দনীয় ও প্রিয়পাত্র, তাই তিনি তাঁদেরকে সম্মান দান করেন। পক্ষান্তরে কাফির ও মুশরিকদের ভাগ্যে সত্যিকার কোনো ইজ্জত নেই। অতএব, তাদের সাথে সৌহার্দের সম্পর্ক স্থাপন করে সম্মান অর্জন করা সুদূর পরাহত। ফারূকে আজম হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি বান্দাদের [মাখলুকের] সাহায্যে মর্যাদাবান হওয়ার বাসনা করে আল্লাহ তা'আলা তাকে লাঞ্ছিত করেন।

হযরত আবূ বকর (রা.) আহকামুল কুরআনে লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের মর্ম এই যে, কাফির, মুশরিক পাপিষ্ঠ ও পথভ্রষ্টদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে মর্যাদা ও প্রতিপত্তি অর্জনের ব্যর্থ চেষ্টা করা অন্যায় ও অপরাধ। তবে এই উদ্দেশ্যে মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন নিষেধ করা হয়নি। কেননা সূরা মুনাফিকূনের পূর্বোক্ত আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল ﷺ -কে ও মুমিনদেরকে ইজ্জত দান করেছেন।

এখানে মর্যদার অর্থ যদি আখেরাতের চিরস্থায়ী ইজ্জত-সম্মান হয়, তবে তা আল্লাহ তা'আলা শুধুমাত্র তার রাসূল ﷺ ও মুমিনদের জন্য সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। কারণ আখেরাতের আরাম-আয়েশ, ইজ্জত-সম্মান কোনো কাফির বা মুশরিক কস্মিনকালেও লাভ করবে না। আর যদি এখানে পার্থিব মান মর্যদা ধরা হয়, তবে মুসলমানরা যতদিন সত্যিকার মুমিন থাকবে, ততদিন সম্মান ও প্রতিপত্তি তাদেরই করায়ত্ব থাকবে। অবশ্য তাদের ঈমানের দুর্বলতা, আমলের গাফলতি বা পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার কারণে তাদের সাময়িক ভাগ্যবিপর্যয় হলে বা ঘটনাচক্রে অসহায় হতমান হলে পরিশেষে তারাই আবার মর্যাদা ও বিজয়ের গৌরব লাভ করবে দুনিয়ার ইতিহাসে এর বহু নজির রয়েছে। শেষ যুগে হযরত ঈসা (আ.) ও ইমাম মাহদীর নেতৃত্বে মুসলমানরা আবার যখন সত্যিকার ইসলামের অনুসারী হবে, তখন তারাই দুনিয়ার একচ্ছত্র ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী হবে। -[মা'আরিফুল কুরআন]

قَوْلُهُ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا : অর্থাৎ মুনাফিকরা মুসলিমগণকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি, তারা মনে করে কাফিরদের সাথে উঠাবসা করলে আমরা দুনিয়ায় সম্মানিত হব। এটা বিলকুল মিথ্যা। সম্মান ও মর্যাদা সব আল্লাহরই হাতে। যে তার আনুগত্য করবে সে ইজ্জত পাবে। সারকথা, ওরা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে লাঞ্ছিত থাকবে। -[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ : অত্র আয়াতে ইতিপূর্বে মক্কা মুকাররমায় অবতীর্ণ সূরা আনআমের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে বলা হয়েছে। আমি তো মানুষের সংশোধনের নিমিত্ত আগেই হুকুম নাজিল করেছিলাম যে, কাফির ও মুনাফিকরা আদেশ লঙ্ঘন করে ওদের সাথে সৌহার্দ স্থাপন করতে শুরু করেছে এবং তাদেরকে ইজ্জত- সম্মানের মালিক মুক্তার মনে করেছে।

বাতিলপন্থিদের মজলিসে উপস্থিতি ও তার হুকুম : সূরায়ে নিসার আলোচ্য আয়াত এবং সূরায়ে আনআমের যে আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, এতদুভয়ের সমন্বিত মর্ম এই যে, যদি কোনো প্রভাবে কাতিপয় লোক একত্রিত হয়ে আল্লাহ তা'আলার কোনো আয়াত বা হুকুমকে অস্বীকার বা ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে থাকে, তবে যতক্ষণ তারা এহেন গর্হিত ও অবাঞ্ছিত কার্যে লিপ্ত থাকবে, ততক্ষণ তাদের মজলিসে বসা বা যোগদান করা মুসলমানদের জন্য হারাম।

মোটকথা, বাতিলপন্থিদের মজলিসে উপস্থিতি ও তার হুকুম কয়েক প্রকার। প্রথম : তাদের কুফরি চিন্তাধারার প্রতি সম্মতি ও সন্তুষ্টি সহকারে যোগদান করা এটা মারাত্মক অপরাধ ও কুফরি। দ্বিতীয়ত : গর্হিত আলোচনা চলাকালে বিনা প্রয়োজনে অপছন্দ সহকারে উপবেশন করা। এটা অত্যন্ত অন্যায়ও ফাসেকি। তৃতীয়ত : পার্থিব প্রয়োজনবশত বিরক্তি সহকারে বসা জায়েজ। চতুর্থতঃ জোর জবরদস্তির কারণে বাধ্য হয়ে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে বসা ক্ষমার্হ পঞ্চমতঃ তাদেরকে সৎপথে আনয়নের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হওয়া ছওয়াবের কাজ। -[মাআরিফুল কুরআন]

কুফরির প্রতি মৌন সম্মতি ও কুফরি : আলোচ্য আয়াতের শেষে ইরশাদ হয়েছে- اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ অর্থাৎ এমন মজলিস যেখানে আল্লাহ তা'আলার আয়াত ও আহকামকে অস্বীকার, বিদ্রূপ বা বিকৃত করা হয়, সেখানে হৃষ্টচিত্তে উপবেশন করলে তোমরাও তাদের সমতুল্য ও তাদের গোনাহের অংশীদার হবে। অর্থাৎ খোদা না করুন, তোমরা যদি তাদের কুফরি কথাবার্তা মনেপ্রাণে পছন্দ কর, তাহলে বস্তুত: তোমারাও কাফির হয়ে যাবে। কেননা কুফরিকে পছন্দ করাও কুফরি। আর যদি তাদের কথাবার্তা পছন্দ না করা সত্ত্বেও বিনা প্রয়োজনে তাদের সাথে উঠাবসা করে এমতাবস্থায় তাদের সমতুল্য হওয়ার অর্থ হবে তারা যেভাবে শরিয়তকে হেয় পতিপন্ন করা এবং ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি সাধন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে, তোমরা তাদের আসরে যোগদান করে সহযোগিতা করায় তাদের মতোই ইসলামের ক্ষতি সাধন করছ। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিকা। -[মাআরিফুল কুরআন]

١٤٠. وَقَدْ نَزَّلَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُوْلِ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ الْقُرْاٰنِ فِىْ سُوْرَةِ الْاَنْعَامِ اَنْ مُخَفَّفَةٌ وَاسْمُهَا مَحْذُوْفٌ اَىْ اَنَّهُ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ الْقُرْاٰنَ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَءُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ اَىِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُسْتَهْزِءِيْنَ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ اِنَّكُمْ اِذًا اِنْ قَعَدْتُّمْ مَعَهُمْ مِّثْلُهُمْ فِى الْاِثْمِ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِىْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا كَمَا اجْتَمَعُوْا فِى الدُّنْيَا عَلَى الْكُفْرِ وَالْاِسْتِهْزَاءِ

অনুবাদ :

১৪০ আল কিতাবে نَزَّلَ- এটা مَعْرُوْف অর্থাৎ কর্তৃবাচ্যও مَجْهُوْل অর্থাৎ কর্মবাচ্য উভয়রূপেই রয়েছে। অর্থাৎ আল কুরআনে, তার সূরা আনআমে اَنْ এটা مُثَقَّلَة [তশদীদসহ রূঢ়রূপ] হতে مُخَفَّفَةٌ [তাশদীদহীন লঘু] রূপে পরিবর্তিত হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে তার اِسْم বা উদ্দেশ্যটি উহ্য। মূলত: ছিল اَنَّهُ নিশ্চয় এটা যে ......]। তোমাদের প্রতি তিনি অবতীর্ণ করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর অর্থাৎ আল কুরআনের কোনো আয়াত প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে এবং তাকে বিদ্রূপ করা হচ্ছে তখন যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত না হবে তোমরা তাদের সাথে অর্থাৎ প্রত্যাখ্যানকারী ও বিদ্রূপকারীদের সাথে বসো না। অন্যথায় অর্থাৎ এমতাবস্থায়ও যদি তাদের সাথে বস তবে পাপের ক্ষেত্রে তোমরাও তাদের মতো হয়ে পড়বে। নিশ্চয় আল্লাহ মুনাফিক এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সকলকেই জাহান্নামে একত্রিত করবেন। যেমন, দুনিয়াতে সত্য প্রত্যাখ্যান এবং বিদ্রূপ করার কাজে তাদেরকে একত্রিত করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا الخ : যে সব মজলিসে পবিত্র কুরআন নিয়ে তামাশা করা হয় তাতে সংশ্লিষ্ট থাকা যাবে না। আয়াতে বলা হচ্ছে হে মুসলিমগণ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে কুরআন মাজীদে পূর্বেই নির্দেশ দিয়েছেন যে, যে মজলিসে কুরআন নিয়ে তামাশা করা হয় ও তার প্রতি অবিশ্বাস জ্ঞাপন করা হয় সেখানে কিছুতেই বসবে না। নতুবা তোমাদেরকেও তাদের অনুরূপ মনে করা হবে। হ্যা , যখন তারা অন্য কথায় লিপ্ত হবে, তখন বসতে মানা নেই। মুনাফিকদের মুজলিসমূহে মহান আল্লাহর বিধানাবলিতে অবিশ্বাস জ্ঞাপন ও কুরআন নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হতো। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। পূর্বেই আদেশ দেওয়া হয়েছে বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে নিম্নের আয়াতে প্রতি وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِىْ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ তুমি যখন দেখ, তারা আমার আয়াত সম্বন্ধে উপহাসমূলক আলোচনা মগ্ন হয়, তখন তুমি দূরে সরে পড়বে। [৬ : ৬৮] এ আয়াত পূর্বে নাজিল হয়েছিল।

–[তাফসীরে উসমানী]

১৪১. اَلَّذِيْنَ بَدْلٌ مِنَ الَّذِيْنَ قَبْلَهُ يَتَرَبَّصُوْنَ يَنْتَظِرُوْنَ بِكُمُ الدَّوَائِرَ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ ظَفَرٌ وَغَنِيْمَةٌ مِنَ اللّٰهِ قَالُوْا لَكُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ فِى الدِّيْنِ وَالْجِهَادِ فَاَعْطُوْنَا مِنَ الْغَنِيْمَةِ وَاِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ مِنَ الظَّفَرِ عَلَيْكُمْ قَالُوْا لَهُمْ اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ نَسْتَوْلِ عَلَيْكُمْ وَنَقْدِرُ عَلٰى اَخْذِكُمْ وَقَتْلِكُمْ فَاَبْقَيْنَا عَلَيْكُمْ وَ اَلَمْ نَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْ يَظْفَرُوْا بِكُمْ بِتَخْذِيْلِهِمْ وَمُرَاسَلَتِكُمْ بِاَخْبَارِهِمْ فَلَنَا عَلَيْكُمُ الْمِنَّةُ قَالَ تَعَالٰى فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِاَنْ يُدْخِلَكُمُ الْجَنَّةَ وَيُدْخِلُهُمُ النَّارَ وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا طَرِيْقًا بِالْاِسْتِيْصَالِ.

১৪২. اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ بِاِظْهَارِهِمْ خِلَافَ مَا اَبْطَنُوْهُ مِنَ الْكُفْرِ لِيَدْفَعُوْا عَنْهُمْ اَحْكَامَهُ الدُّنْيَوِيَّةَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ مُجَازِيْهِمْ عَلٰى خِدَاعِهِمْ فَيَفْتَضِحُوْنَ فِى الدُّنْيَا بِاِطِّلَاعِ اللّٰهِ نَبِيَّهُ عَلٰى مَا اَبْطَنُوْهُ وَيُعَاقَبُوْنَ فِى الْاٰخِرَةِ وَاِذَا قَامُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَامُوْا كُسَالٰى مُتَثَاقِلِيْنَ يُرَاۤؤُوْنَ النَّاسَ بِصَلَاتِهِمْ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ يُصَلُّوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا رِيَاءً.

অনুবাদ :

১৪১. যারা اَلَّذِيْنَ এটা পূর্ববর্তী اَلَّذِيْنَ -এর بَدْل বা স্থলাভিষিক্ত পদ। তোমাদের উপর বিপদ নেমে আসার অপেক্ষায় থাকে, প্রতীক্ষায় থাকে আল্লাহর অনুগ্রহে তোমাদের জয় সাফল্য ও গনিমত লাভ হলে তোমাদেরকে তারা বলে, ধর্ম বিশ্বাস ও জেহাদের ক্ষেত্রে আমরা কি তোমাদের সঙ্গে নই? সুতরাং আমাদেরকে গনিমত বা যুদ্ধলব্ধ সামগ্রীন হতে অংশ দাও। আর ভাগ্য যদি সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের অনুকূল হয়। অর্থাৎ তাদের যদি তোমাদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ ঘটে তখন তাদেরকে এরা বলে আমরা কি তোমাদের উপর জয়ী হওয়ার মতো ছিলাম না? অর্থাৎ তোমাদেরকে পাকড়াও করার এবং হত্যা করার শক্তি আমাদের ছিল কিন্তু আমরা তোমাদের উপর দয়া প্রদর্শন করেছি আর আমরা কি বিশ্বাসীদেরকে অপমান করত: ও তাদের সম্পর্কে তোমাদেরকে সংবাদ প্রদান করত তোমাদের বিরুদ্ধে জয়ী হওয়া হতে বাধা দিয়ে রাখিনি? সুতরাং তোমাদের প্রতি আমাদের বহু অনুগ্রহ বিদ্যমান। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- আল্লাহ কিয়ামতের দিন তোমাদের ও তাদের [মধ্যে বিচার মীমাংসা করবেন।] তোমাদেরকে জান্নাতে এবং তাদেরকে তিনি জাহান্নামে প্রবিষ্ট করবেন। এবং আল্লাহ কখনও মু'মিনদের বিরুদ্ধে কাফিরদের জন্য অর্থাৎ তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেওয়ার কোনো পথ কোনো উপায় রাখবেন না।

১৪২. ইসলামের জাগতিক বিধানসমূহ হতে নিজেদেরকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে মুনাফিকরা অন্তরে যে কুফরি গোপন করে রেখেছে তার বিপরীত ঈমানের কথা প্রকাশ করত। মুনাফিকরা আল্লাহকে প্রতারিত করতে চায়: বস্তুত তিনিই তাদেরকে প্রতারিত করেন। অর্থাৎ তিনি এদের মুনাফিকীর প্রতিফল প্রদান করবেন। অনন্তর তারা অন্তরে যা গোপন করে রেখেছে আল্লাহ কর্তৃক তা রাসূলকে অবহিত করার মাধ্যমে তারা এ দুনিয়াতেই লাঞ্ছিত হবে এবং পরকালেও তাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হবে। মু'মিনদের সাথে তারা যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সাথে বিরাট এক বোঝা বহন করছে সেভাবে দাঁড়ায়। এ সালাতের মাধ্যমে তারা লোক প্রদর্শনী করে এবং আল্লাহকে তারা খুব কমই স্মরণ করে। অর্থাৎ কেবল রিয়া ও লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে তারা সালাতে শরিক হয়।

١٤٣. مُذَبْذَبِيْنَ مُتَتَرِّدِدِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ الْكُفْرِ وَالْاِيْمَانِ لَا مَنْسُوْبِيْنَ اِلٰى هٰؤُلَاءِ اَىْ الْكُفَّارِ وَلَا اِلٰى هٰؤُلَاءِ اَىْ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيْلًا اِلَى الْهُدٰى .

১৪৩. দোটানায় অর্থাৎ কুফর ও ঈমানের মাঝে তারা দোদুল্যমান, দ্বিধান্বিত। না এদের অর্থাৎ কাফিরদের সাথে তারা সম্পর্কিত আর না এদের অর্থাৎ মু'মিনদের সাথে তারা সংশ্লিষ্ট। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি তার জন্য হেদায়েতের কোনো পথ পাবে না।

١٤٤. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ بِمُوَالَاتِهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا بُرْهَانًا بَيِّنًا عَلٰى نِفَاقِكُمْ .

১৪৪. হে বিশ্বাসীগণ! মু'মিনদের পরিবর্তে কাফিরদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের বিরুদ্ধে অর্থাৎ এদের সাথে তোমাদের বন্ধুত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট প্রমাণ অর্থাৎ তোমাদের মুনাফিফীর উপর সুস্পষ্ট দলিল দিতে চাও?

١٤٥. اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْمَكَانِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَهُوَ قَعْرُهَا وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ۙ مَانِعًا مِنَ الْعَذَابِ .

১৪৫. নিশ্চয় মুনাফিকরা জাহান্নামাগ্নির নিম্নতম স্তরে স্থানে, অর্থাৎ তার গহীন গহ্বরে থাকবে এবং তাদের পক্ষে তুমি কখনও কোনো সহায় পাবে না। যে শাস্তি প্রতিহত করতে পারবে।

তাহকীক ও তারকীব

دَوَائِرَ : دَائِرَةٌ বহুবচন دَوَائِرُ অর্থ– বিপদ, দুর্যোগ, পরিধি।

ظَفَرٌ : ظَفَرٌ [ইহা سَمِعَ -এর মাসদার] সফলতা বিজয়।

نَسْتَوِىْ : نَسْتَوِىْ [مُضَارِعٌ مَعْرُوْفٌ : جَمْعُ مُتَكَلِّمٍ] অর্থ– আমরা প্রভাব বিস্তার করি। বাবে اِسْتِفْعَالٌ থেকে اِسْتَوٰى يَسْتَوِىْ অর্থ– প্রভাব বিস্তার করা, কর্তৃত্ব লাভ করা।

تَخْذِيْلٌ : تَخْذِيْلٌ [ইহা বাবে تَفْعِيْلٌ -এর মাসদার] লাঞ্ছিত করা, অপদস্ত করা।

مِنَّةٌ : مِنَّةٌ বহুবচন مِنَنٌ অর্থ– অনুগ্রহ , দয়া।

اِسْتِيْصَالٌ : اِسْتِيْصَالٌ অর্থ– সমূলে ধ্বংস করা, শিকড় উপড়ে ফেলা।

يَفْتَضِحُوْنَ : يَفْتَضِحُوْنَ : (مُضَارِعٌ مَعْرُوْفٌ : جَمْعُ مُذَكَّرٍ غَائِبٌ) অর্থ– তারা অপদস্ত হবে। বাবে اِفْتِعَالٌ থেকে অপদস্ত হওয়া।

مُتَثَاقِلِيْنَ : مُتَثَاقِلٌ বহুবচনে مُتَثَاقِلُوْنَ অর্থ– অলস, কুঁড়ে বোঝা বহনকারী।

مُتَرَدِّدِيْنَ : مُتَرَدِّدٌ বহুবচনে مُتَرَدِّدُوْنَ অর্থ– দ্বিধান্বিত, সন্দিহান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ الَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ ..... : অর্থাৎ এ সব মুনাফিক তো সেই লোক, যারা হামেশা তোমাদের সাথে থাকে তোমরা জয়ী হলে বলে, আমরা কি তোমাদের সাথী নই? গনিমতের মালে আমাদেরও শরিক রাখ, আবার রণক্ষেত্রে কাফিরদের নসীবে কিছু ঘটলে অর্থাৎ তারা জয়ী হলে তাদের কাছে গিয়ে বলে, আমরা কি তোমাদের ঘিরে রেখেছিলাম না? আমরা তোমাদের হেফাজত করিনি? আমরা মুসলিমগণের আঘাত হতে তোমাদের রক্ষা করিনি? কাজেই লুণ্ঠিত দ্রব্যে আমাদেরকেও অংশ দাও।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : এতদ্বারা জানা গেল, সত্য দীনের অনুসারী হয়ে পথভ্রষ্টদের সাথে বনিবনা রাখাও মুনাফিকী কাজ। –[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জান্নাত ও তাদের মাঝে বিচার মীমাংসা করে দেবেন। তোমাদেরকে জান্নাত দেবেন এবং তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। দুনিয়ায় তাদের পক্ষে যা সম্ভব করে দেখুক।

قَوْلُهُ وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا : মু'মিনগণকে নির্মূল করা কাফেরদের পক্ষে কস্মিন কালেও সম্ভব হবে না, যেটা তাদের পরম বাঞ্ছনা।

قَوْلُهُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ :

মুনাফিকরা মূলত ধান্ধাবাজ : মুনাফিকরা ভিতরে কাফির, বাইরে মুসলিম, যাতে উভয় পক্ষের অনিষ্ট হতে নিরাপদ থাকতে এবং উভয় তরফ হতে মজা লুটতে পারে। আল্লাহ তাদের এই ছল-চাতুরীর শাস্তি দিলেন যে, তাদের [ইতরামি] সব ও গোপন অপকর্ম তার নবীর কাছে প্রকাশ করে দিয়ে তাদেরকে এমনভাবে লাঞ্ছিত করলেন, যে তারা আস্তাঁকুড়ের পাতায় পর্যবসিত হলো। তাদের সব প্রতারণা মুসলিমগণের কাছে ফাঁস হয়ে গেল। তাদেরকে আখেরাতে যে শাস্তি দেওয়া হবে তাও প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছে যা পরবর্তীতে বর্ণিত হচ্ছে। সারকথা, তাদের প্রতারণায় অন্যের তো কিছুই হলো না, পরন্তু আল্লাহ তাদেরকে এমনভাবে প্রতারিত করলেন যে, তাদের দুনিয়া ও আখেরাত সব বরবাদ হয়ে গেল। –[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى : অর্থাৎ যেই সালাত একটি অবশ্য পালনীয় খালিস ইবাদত, যা আদায়ে জানমাল কোনোরূপ ক্ষয়-ক্ষতির আশঙ্কা নেই, মুনাফিকরা তাতেও চৌর্যবৃত্তি করে। নিতান্ত ঠেকে গেলে লোক দেখানোর জন্যও ধোঁকা দেওয়ার অভিপ্রায় আদায় করে নেয়, যাতে তাদের কুফরি কেউ টের না পায় এবং সকলে তাদেরকে মুসলিম মনে করে নেয়। এদের দ্বারা আর কিসের আশা করা যায় এবং কিভাবেই বা এরা মুসলিম হতে পারে:? [উসমানী]

قَامُوْٓا كُسَالٰى আল্লাহর বাণীতে যে শিথিলতার নিন্দা করা হয়েছে তা হচ্ছে বিশ্বাসের শিথিলতা। বিশ্বাস সুদৃঢ় থাকা সত্ত্বেও আমরের মধ্যে যদি কোনো শৈথিল্য থাকে, তবে তা অত্র আয়াতের আওতাভুক্ত নয়। কিন্তু তখনও বিনা ওজরে শিথিলতা করা নিন্দনীয়। আর রোগকষ্ট, নিদ্রালুতা প্রভৃতি কোনো অনিবার্য কারণবশত হলে ক্ষমার্হ। [মাআরিফুল কুরআন]

قَوْلُهُ مُذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ : **মুনাফিকরা মানসিক দ্বন্দ্বের শিকার :** মুনাফিকরা তো দোদুল্যমানতাও মানসিক দ্বন্দ্বের শিকার। না ইসলাম দ্বারা নিশ্চিত হতে পারছে, না কুফরিতে নিরুদ্বেগ। ভীষণ দুশ্চিন্তায় নিমজ্জিত। কখন ও এদিকে এগোয় কখন ও ওদিকে। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, মুক্তিপথ সে কোথায় পাবে?

মুনাফিকদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন মুনাফিকী : মুসলিমগণকে ছেড়ে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করা মুনাফিকীর প্রমাণ, যেমন মুনাফিকরা করত, কাজেই হে মুসলিমগণ! তোমরা কখনও এরূপ কারো না। নচেৎ তোমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলার সুস্পষ্ট অভিযোগ ও চূড়ান্ত প্রমাণ খাড়া হয়ে যাবে। ফলে তোমরাও মুনাফিক সাব্যস্ত হবে। মুনাফিকদের জন্য জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তর নির্ধারিত। কেউ তাদের সাহায্য করতে পারবে না। যে, সে স্তর থেকে বের করে আনবে বা শাস্তি কিছুটা লাঘব করাবে। কাজেই এরূপ কাজ থেকে মুসলিমগণের দূরে থাকা উচিত। –[তাফসীরে উসমানী]

অনুবাদ :

١٤٦. اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنَ النِّفَاقِ وَاَصْلَحُوْا عَمَلَهُمْ وَاعْتَصَمُوْا وَثِقُوْا بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ مِنَ الرِّيَاءِ فَاُولٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْمَا يُؤْتَوْنَهُ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا فِى الْاٰخِرِ هُوَ الْجَنَّةُ .

১৪৬. কিন্তু যারা মুনাফিকী হতে তওবা করে, নিজেদের আমল সংশোধন করে, আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে অর্থাৎ তাঁর উপর ভরসা করে এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাদের দীনকে রিয়া ও লোক প্রদর্শন হতে নির্মল করে তারাই বিশ্বাসীদের সাথে থাকবে। অর্থাৎ বিশ্বাসীদেরকে যা প্রদান করা হবে তাতে তারা থাকবে এবং বিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ পরকালে মহাপুরস্কার দেবেন অর্থাৎ জান্নাত দেবেন।

١٤٧. مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ نِعَمَهُ وَاٰمَنْتُمْ بِهِ وَالْاِسْتِفْهَامُ بِمَعْنَى النَّفْيِ اَىْ لَا يُعَذِّبُكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا لِاَعْمَالِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِالْاِثَابَةِ عَلِيْمًا بِخَلْقِهِ .

১৪৭. যদি তোমরা তার নেয়ামতসমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর ও তাঁর উপর ঈমান আনয়ন কর, তবে তোমাদের শাস্তি দানে আল্লাহর কি কাজ? অর্থাৎ তবে তিনি তোমাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন না। مَا يَفْعَلُ এখানে نَفِىْ বা নিষেধাত্মক অর্থে প্রশ্নবোধকের ব্যবহার করা হয়েছে। আর আল্লাহ মু'মিনদের কাজের গুণগ্রাহী, তাদেরকে তিনি পুণ্যফল দেবেন এবং তিনি তার সৃষ্টি সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ : এখানে মুনাফিকদের বাচার উপায় বাতলে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যেই মুনাফিক তার মুনাফিকী হতে তওবা করবে, নিজের কাজ কর্ম সংশোধন করবে, মহান আল্লাহর প্রিয় দীনকে মজবুতভাবে আকড়ে ধরবে, মহান আল্লাহর প্রতি নির্ভর করবে এবং লোক দেখানো মনোবৃত্তি ও অন্যান্য চারিত্রিক দোষ হতে দীনকে পাকপবিত্র রাখবে সে খাঁটি মু'মিন, দুনিয়া ও আখেরাতে সে মু'মিনগণের সঙ্গে থাকবে। ঈমানদারগণের জন্য রয়েছে মহা প্রদিতান। যারা মুনাফিকী হতে তওবা করবে তারাও সে প্রতিদানে শরিক থাকবে। -[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ : অত্র আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার দরবারে একমাত্র ঐসব আমলই গৃহীত ও কবুল হয় যা শুধু তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে এবং কোনোরূপ রিয়াকারী যা স্বার্থের লেশমাত্র যার মধ্যে নেই মুখলেস শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাফসীরে মাজহারীতে লিখিত আছে- ذِىْ يَعْمَلُ لِلّٰهِ لَا يُحِبُّ اَنْ يَحْمَدَهُ النَّاسُ عَلَيْهِ অর্থাৎ, মুখলেস সে ব্যক্তিকে বলে যে শুধু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য সর্বপ্রকার আমল করে এবং ঐ কাজের জন্য লোকের প্রশংসা কামনা করে না। -[মাআরিফুল কুরআন]

قَوْلُهُ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا : আল্লাহ তা'আলা সৎকাজের মূল্যায়ন করেন। তিনি বান্দাদের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পর্কে অবগত। কাজেই, যে ব্যক্তি তার আদেশ ও নিষেধকে কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করে ও সেগুলোকে মহান আল্লাহর অনুগ্রহ মনে করে এবং তাতে বিশ্বাস রাখে, পরম দয়ালু ন্যায়পরায়ণ আল্লাহ এরূপ ব্যক্তিকে কেন শাস্তি দিতে যাবেন। অর্থাৎ তা কস্মিনকালেও শাস্তি দিবেন না। তিনি তো উদ্ধত অহংকারীকেই শাস্তি দিয়ে থাকেন। -[তাফসীরে উসমানী]